

স্নানান্তে

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রবাসী

কার্ত্তিক—চৈত্র

৩১শ ভাগ, ২য় খণ্ড ১৩৩৮

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"---

৩১শ ভাগ } কার্ত্তিক, ১৩৩৮ { ১ম সংখ্যা
২য় খণ্ড

সর্ব্ববঙ্গ মুসলিম্ ছাত্রসম্মিলনীর প্রতি সম্বেদন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েচে। তাই অবুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশ্রয়ের আশায় অল্পমাত্র যা-কিছু গ'ড়ে তুলি তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আমাদের শুভচেষ্টাও খণ্ড খণ্ড হ'য়ে দেশকে আহত করচে। আত্মীয়কে আঘাত করার আত্মঘাত যে কি সর্ব্বনেশে সে কথা বুঝেও বুঝিনে। যে-শিক্ষা লাভ করচি ভাগ্যদোষে সেই শিক্ষাই বিকৃত হ'য়ে আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের অস্ত্র জোগাচ্চে।

এই যে পাপ দেশের বুকের উপর চেপে তা'র নিঃশ্বাস রোধ ক'রতে প্রবৃত্ত এ পাপ প্রাচীন যুগের, এই ন্ধ বার্দ্ধক্য যাবার সময় হ'ল। তা'র প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আজ নিদারুণ দুর্য্যোগ ঘটিয়ে নিজেরই চতানল জ্বালিয়েচে। এই উপলক্ষ্যে আমরা যতই দুঃখ পাই মেনে নিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের পরম বেদনায় এই পাপ হ'য়ে যাক্ নিঃশেষে ভস্মসাৎ। বহু যুগের পুঞ্জীকৃত অপরাধ যখন আপন প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করে তখন তা'র দুঃখ অতি কঠোর,—এই দুঃখের দ্বারাই অপরাধ আপন বীভৎসতার পরিচয় দিয়ে উদাসীন চিত্তকে জাগিয়ে তোলে। একান্ত মনে কামনা করি এই দুঃসহ পরিচয়ের কাল যেন এখনি শেষ হয়, দেশ যেন আত্মকৃত অপঘাতে না মরে, বিশ্বজগতের কাছে বার-বার যেন উপহসিত না হই।

আজ অন্ধ অমারাত্রির অবসান হোক্ তরুণদের নবজীবনের মধ্যে। আচার-ভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ, ধর্ম্মভেদের সমস্ত ব্যবধানকে বীরতেজে উত্তীর্ণ হ'য়ে তা'রা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক্। যে দুর্ব্বল সে-ই ক্ষমা ক'রতে পারে না, তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত ক'রে দিক্, সকলে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সর্ব্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।

পত্রধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

আমাকে অনেকে ভুল বুঝে থাকেন, তুমিও বোধ হয় বুঝেচ। প্রথম কথা, আমি মস্ত কেউ একজন নই। তাতে কিছু আসে যায় না। তোমরা যে-কেউ আমাকে যা মনে করো তার সঙ্গেই আমার কিছু-না-কিছু মিশ খেয়ে যায়। তার কারণ, কিশোর বয়স থেকে আমার মনকে নানাখানা ক'রে আমি নানা কথাই বলেচি—এ ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই। আমার উপর যদি কেবল এক সুরের ফরমাস থাকত তাহ'লে সহজে দিন কেটে যেত। যেই কোনো সমজদার আমাকে চিনে নিয়েচে ব'লে হাঁফ ছাড়ে অমনি উল্টো তরফের কথাটা ব'লে বসি, লোকে সহ্য করতে পারে না।

আমি নির্গুণ নিরঞ্জন নির্ব্বিশেষের সাধক এমন একটা আভাস তোমার চিঠিতে পাওয়া গেল। কোনো একদিক থেকে সেটা হয়ত সত্য হতেও পারে—যেখানে সমস্তই শূন্য সেখানেও সমস্তই পূর্ণ-যিনি তিনি আছেন এটাও উপলব্ধি না করব কেন? আবার এর উল্টো কথাটাও আমারই মনের কথা। যেখানে সব-কিছু আছে সেখানেই সবার অতীত সব হয়ে বিরাজ করেন এটাও যদি না জানি তাহ'লে সেও বিষম ফাঁকি। আজ এই প্রৌঢ় বসন্তের হাওয়ায় বেলফুলের গন্ধসিঞ্চিত প্রভাতের আকাশে একটা রামকেলি রাগিণীর গান থাকে ব্যাপ্ত হয়ে,—স্তব্ধ হয়ে একা একা বেড়াই যখন, তখন সেই অনাহত-বীণার আলাপে মন ওঠে ভ'রে। এই হ'ল গানের অন্তর্লীন গভীরতা। তারপরে হয়ত ঘরে এসে দেখি গান শোন্‌বার লোক বসে আছে—তখন গান ধরি, "প্যালা ভর ভর লায়ারি"। সেই ধ্বনিলোকে দেহমন সুরে সুরে মুখরিত হ'য়ে ওঠে, যা-কিছুকে সেই সুর স্পর্শ করে তাই হয় অপূর্ব্ব। এও তো ছাড়বার জো নেই। সুরের গান, না-সুরের গান, কাকে ছেড়ে কাকে বাছব? আমি দুইকেই স্বীকার ক'রে নিয়েচি।

এক জায়গায় কেবল আমার বাধে। খেলনা নিয়ে নিজেকে ভোলাতে আমি কিছুতেই পারিনে। এটা পারে নিতান্তই শিশুবধূ। সাথী আছেন কাছে ব'সে তাঁর দিকে পিছন ফিরে খেলনার বাক্স খুলে বসা একেবারেই সময় নষ্ট করা। এতে ক'রে সত্য অনুভূতির রস যায় ফিকে হয়ে। ফুল দিতে চাও দাও না, এমন কাউকে দাও যে-মানুষ ফুল হাতে নিয়ে বল্‌বে বাঃ—তার সেই সত্য খুশি সত্য আনন্দে গিয়ে পৌঁছয়। শিলাইদহের বোষ্টমী আমার হাতে আম দিয়ে বল্‌লে, তাঁকে দিলুম। এই তো সত্যকার দেওয়া—আমারই ভোগের মধ্যে তিনি আমটিকে পান। পূজারী ব্রাহ্মণ সকালবেলায় গোলকচাঁপার গাছে বাড়ি মেরে ফুল সংগ্রহ ক'রে ঠাকুরঘরে যেত—তার নামে পুলিসে নালিশ করতে ইচ্ছা করত—ঠাকুরকে ফাঁক দিচ্চে ব'লে। সেই ফুল আমার মধ্যে দিয়েই ঠাকুর গ্রহণ ক'রবেন বলেই গাছে ফুল ফুটিয়েছেন আর আমার মধ্যে ফুলে আনন্দ আছে। কত মানুষকেই বঞ্চিত ক'রে তবে আমরা এই দেবতার খেলা খেলি। ঠাকুরঘরের নৈবেদ্যের মধ্যে আমরা ঠাকুরের সত্যকার প্রাপ্যকে প্রত্যহ নষ্ট করি।

এর থেকে একটা কথা বুঝতে পারবে, আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্ব্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্চে ব'লে আমি ঠাকুরঘর থেকে দূরে থাকি একথা সত্য নয়—মানুষ বঞ্চিত হচ্চে ব'লেই আমরা নালিশ করি। যে-সেবা যে-প্রীতি মানুষের মধ্যে সত্য ক'রে তোলবার সাধনাই হ'চ্চে ধর্ম্মসাধনা তাকে আমরা খেলার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে মেটাবার চেষ্টায় প্রভূত অপব্যয় ঘটাচ্চি।

এই জন্যেই আমাদের দেশে ধার্ম্মিকতার দ্বারা মানুষ এত অত্যন্ত অবজ্ঞাত।

মানুষের রোগতাপ উপবাস মিট্‌তে চায় না, কেন-না এই চিরশিশুর দেশে খেলার রাস্তা দিয়ে সেটা মেটাবার ভার নিয়েচি। মাদুরার মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে সগৌরবে দেখানো হ'ল তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ঐ সব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। মন্দিরে বন্দী দেবতা এই সব সোনা জহরাৎকে ব্যর্থ ক'রে ব'সে থাকুন—এ দিকে লোকালয়ের দেবতা সত্যকার মানুষের কঙ্কালশীর্ণ হাতের মুষ্টি প্রসারিত ক'রে ঐ মন্দিরের বাহিরে পথে পথে ফিরচেন। তবু আমাকে ব'লবে আমি নিরঞ্জনের পূজারি? ঐ ঠাকুরঘরের মধ্যে যে-পূজা পড়চে সমস্ত ক্ষুধিতের ক্ষুধাকে অবজ্ঞা ক'রে, সে আজ কোন্ শূন্যে গিয়ে জমা হচ্চে?

হয়ত বল্‌বে এই খেলার পূজাটা সহজ। কিন্তু সত্যের সাধনাকে সহজ কোরো না। আমরা মানুষ, আমাদের এতে গৌরব নষ্ট হয়। দেবতার পূজা কঠিন দুঃখেরই সাধনা—মানুষের দুঃখভার পর্ব্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেচে সেইখানেই দেবতার আহ্বান শোনো—সেই দুঃসাধ্য তপস্যাকে ফাঁকি দেবার জন্যে মোহের গহ্বরের মধ্যে লুকিয়ে থেকো না। দরকার নেই এই খেলার, কেন-না প্রেম দাবি ক'রচেন সত্যকার ত্যাগের, সত্যকার পাত্রে।

তোমাকে বোধ হয় কিছু কষ্ট দিলুম। কিন্তু সেও ভাল, যদি তোমাকে অবজ্ঞা করতুম তাহ'লে এ কষ্টটুকু দিতুম না। ইতি—২৯ চৈত্র ১৩৩১।

সন্ধ্যা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অয়ি সন্ধ্যা সন্ন্যাসিনী, আগমনে তোর
থেমে গেছে ধরণীর সব কলরোল;
নির্ব্বাণের সে পবিত্র ভাষাহীন সুখ,
স্মরাইয়া দেয় বিভু-শান্তিময়-কোল।
তোরি সম একদিন মোদেরো জীবনে
আসিবে উদাস-সন্ধ্যা ঘিরি' অন্ধকার,
নিবে যাবে জীবনের শেষ আলো-রেখা,
নাহি জানি আগমন কবে সে তাহার?
সাধের এ স্বপ্ন-কুঞ্জে ঝরে যাবে ফুল,
থেমে যাবে এ ঝঙ্কৃত জীবনের বীণ;
তপনের শেষরশ্মি ঝরিবে কাঁদিয়া,
বিদায় মাগিবে বিশ্ব আঁধার-মলিন।
　হে তাপসি, আজি তব এই আগমনে,
　জীবনের সেই সন্ধ্যা পড়ে শুধু মনে।

সাহিত্য ও জীবন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম এ

সাহিত্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ রসসাহিত্য বুঝি। জ্ঞানসাহিত্যে রসের বিকাশ চরম লক্ষ্য নয়। সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রচার। প্রকাশভঙ্গী অথবা রচনাকলার ভিতর দিয়া আমরা মাঝে মাঝে রচয়িতার ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাই বলিয়া তাহাকে সাহিত্য আখ্যা দিই।

প্রাচীন কালে সকল রসসাহিত্যকেই কাব্য নামে অভিহিত করা হইত। নাটকও ছিল কাব্য। এখন পদ্য না হইলে কাব্য হয় না। উপন্যাস ছোট গল্প প্রভৃতি গদ্য রচনা। এগুলি আধুনিক সৃষ্টি, রস-সাহিত্যের নূতন দিক।

সাহিত্যের নূতন দিক বলিয়াই গল্প উপন্যাস আজ আমাদিগকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইহার নব নব রূপের প্রকাশে আমরা মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই, ব্যাকুল হই।

এই প্রবন্ধে সাহিত্য কথাটি সাধারণভাবে রস সাহিত্য এবং বিশেষভাবে কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোথাও কোথাও পুরাতন অর্থে কবি ও কাব্য কথা-দুইটি ব্যবহার করিয়াছি।

বিশ্বে যে প্রাণের চাঞ্চল্য প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি, সাহিত্যের সম্পর্কে তাহার সবটাকে জীবন বলিয়া ধরি না। সাহিত্যে জীবনের পরিধি সঙ্কীর্ণতর। সেখানে শুধু বাঁচিয়া থাকাই জীবন নয়। জন্ম হইতে সুরু করিয়া মৃত্যুর সীমা পর্য্যন্ত যে যাত্রা সাহিত্যের পক্ষে তাহা প্রকৃত জীবনযাত্রা না হইতে পারে। সাহিত্যগত জীবন সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা আকাঙ্ক্ষা-কামনা দিয়া গঠিত। জ্ঞান কর্ম্ম চেষ্টা চিন্তা—সেখানে গৌণ, হৃদয়ের অনুভূতি ও আবেগই সাহিত্যে জীবন সঞ্চার করে। ফাউষ্ট অথবা প্যারাসেল্‌সাস্ যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, সেই জ্ঞানসম্ভার সাহিত্যের বিষয় নয়। সাহিত্যের বিষয় তাহাদের অনুভূতিময় জীবন।

বহুজীবনের বৈচিত্র্যকে যখন সমগ্রভাবে উপলব্ধি করি তখন তাহাকে সংসার বলি। সংসার বিচিত্র জীবনের সমাহার। মানুষ যেখানে একা সেখানে সংসার নাই। যেখানে সে সকলের সহিত মিলিয়া এক হইয়াছে, তাহার সংসার সেইখানে। কথা সাহিত্যে বিশেষ করিয়া সংসার-কাহিনী শুনিতে পাই। সাহিত্যের এই বিভাগে নিজের সহিত পরের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়। এখানে ব্যক্তিগত জীবন ও সংসার এক হইয়া গেছে। মোটামুটি ধরিতে গেলে সংসার ও জীবন অন্বর্থ।

সাহিত্যের সহিত জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ম্যাথিউ আর্ণল্ড হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতীচ্য সমালোচকই এ কথা বার-বার বহুপ্রকারে বিবৃত করিয়াছেন। সাহিত্যে জীবনের সাড়া পাই। অর্থাৎ সাংসারিক জীবনে আমারা যে হর্ষ বেদনা উদ্বেগ অনুভব করি, সাহিত্যও আমাদের মনে সেই ধরণের অনুভূতির সঞ্চার করে।

মানবহৃদয়তা সাহিত্যের ধর্ম্ম। বিজ্ঞানে দর্শনে তাহা নাই। অবচ্ছিন্ন চিন্তার প্রকাশ গণিতে। হৃদয়ের অধিকার এতটুকু নাই বলিয়া গণিত সাহিত্যের বিপরীত-গামী। জীবনের কৌতূহল বহুবিস্তৃত—বিশ্বব্যাপী। সেই কৌতূহলের সহিত যেখানে হৃদয়ের যোগ আছে সাহিত্যের অধিকার সেইখানে। জটিল যন্ত্রের কাজ দেখিয়া অনেক সময় তাহা জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। হৃদয়ের অভাবে তাহা নিষ্প্রাণ যন্ত্র মাত্র। জীবনকে যন্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া যখন তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয় সে আলোচনাও তখন বৈজ্ঞানিক হইয়া ওঠে।

জীবনের সহিত সাহিত্যের যোগ দেখাইতে গিয়া আমরা ভুলিয়া যাই সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে রসসৃষ্টি। সংসার আমাদের মনকে নানারূপে আন্দোলিত করে।

জীবনের যে অনুভূতি কবির অন্তরকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে তাহাই রচনার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। কবি যে সর্ব্বদা জানিয়া শুনিয়া এই অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করেন তাহা নয়। অনেক সময় তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই সকল অনুভূতি রচনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। পাঠকের হৃদয়ে রচনা যখন অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হয়, স্রষ্টার মনের ভাববস্তু তখনই রস বলিয়া পরিগণিত হয়।

সাহিত্য জীবনের ব্যবসায়ী। কিন্তু জীবনের যে দিক কবি ও স্রষ্টার মনে রসের উদ্বোধন করিতে পারে, জীবনের সেই দিকটুকু মাত্র সাহিত্যের বিষয়। হয়ত সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য রসের সৃষ্টি। জীবনকে ব্যক্ত করা সাহিত্যের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য না হইলেও একতর উদ্দেশ্য বটে।

সত্য কথা বলিতে গেলে জীবন ও সংসার সাহিত্যের উপাদান মাত্র। সংসারের একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। ঠিক-যেমন একেবারে তেমনিটি করিয়া সংসারকে আঁকা বাস্তববাদীর একান্ত কাম্য হইলেও, তাহা সম্ভবও নয় সাধ্যও নয়। বাহিরের জিনিষ কবির মনের ভিতর দিয়া যাত্রা-কালে রূপান্তর গ্রহণ করে। এই রূপান্তরিত বস্তুই সাহিত্যে বাস্তব হইয়া আমাদের আনন্দের কারণ হইয়া ওঠে।

সংসারকে আমরা সংসাররূপে চিত্রিত করি না। সংসারের যে ছবির ছাপ আমাদের মনের উপর পড়িয়াছে, সংসারকে আমরা সেইরূপ করিয়াই আঁকি। কাব্যের রস কবির মনের সৃষ্টি। সাহিত্যে সংসারের স্বরূপ নাই। যাহা আছে তাহা রচয়িতার অন্তরে গৃহীত সংসারচিত্র।

সাহিত্যের জীবন আমাদের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া গড়া। রোমান্সে আমরা নিজেদেরই ভয় বিস্ময় কল্পনা আদর্শকে মূর্ত্ত করিয়া তুলি। সে সুবিধা নাই বলিয়া বাস্তব-সাহিত্যে আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়াই বিচিত্র জীবন সৃষ্টি করি।

মানুষের কাছে মানবজীবনের মত কৌতূহলের বিষয় আর কি আছে? জীবনের আলোচনা, জীবনের ব্যাখ্যা, জীবন-সমস্যার মীমাংসা থাকে বলিয়াই সাহিত্য আমাদের এত আকর্ষণ করে। সে আলোচনা ব্যাখ্যা বা মীমাংসার মূলসূত্র—আমি অথবা আমার জীবন।

পরের বলিয়া সাহিত্যে আমরা নিজের জীবন চিত্রিত করি। মনের বিচারালয়ের কাছে সাহিত্য আত্মপক্ষ সমর্থনের লিপিবদ্ধ বক্তৃতা। সাহিত্যে আমরা জীবনের ভুলভ্রান্তির ক্ষমা প্রার্থনা করি, দোষত্রুটির ওজর দেখাই, কৃত কর্ম্ম অথবা কৃত-কল্পনার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করি। সাহিত্য আমাদের জীবনেরই ব্যাখ্যা। উপন্যাস অল্পবিস্তর আমাদের আত্মজীবনচরিত।

সাহিত্যে আমরা নিজেদের আত্মার প্রতিষ্ঠা করি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখি। যেখানে সমাজ আমাদের আক্রমণ করিতে চায়, সেখানে সাহিত্যে আমরা আত্মরক্ষা করি। সংসারে যাহা ভোগ করি না, সাহিত্যে তাহা উপভোগ করি। কাল্পনিক হইলেও সাহিত্যে আমাদের কামনা পরিতৃপ্ত হয়। সাহিত্যে আমরা নিজের দাবী সমর্থন করি, নিজের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করি। সেখানে আমাদের অন্যায় ন্যায় রূপে, আমাদের অপরাধ গৌরব রূপে এবং আমাদের স্বার্থপরতা আত্মচরিতার্থতার রূপে প্রতিভাত হয়। সকল সাহিত্য মমত্ব দিয়া রচিত। সকল কাব্যই কলঙ্কভঞ্জনের কাহিনী।

বড় সাহিত্যিক নিজের সূক্ষ্ম জীবনের ব্যাখ্যা করে, ছোট নিজের স্থূল জীবনের কথাও বলে। এই ব্যাখ্যা বা মীমাংসা যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়া পাই না বলিয়াই সাহিত্যে আনন্দের প্রেরণা লাভ করি। মানবজীবন বৈচিত্র্যে অনন্ত হইলেও মূলতঃ অভিন্ন। মানুষের মৌলিক প্রকৃতির ঐক্য বশতঃ আমার জীবন সকলের মধ্যে এবং সকলের জীবন আমার মধ্যে অনুভব করি। তাই, একটি জীবনের বিবৃতিতে সকলের সহানুভূতি জাগিয়া ওঠে। একটি জীবনসমস্যার সমাধানে সকল জীবনসমস্যার সমাধান পাওয়া গেল বলিয়া মনে হয়। একটি জীবনের ব্যাখ্যায় সকল জীবনের অর্থ সরল হইয়া ওঠে। এ ব্যাখ্যা তর্কমূলক নয়। সাহিত্যে অখণ্ড রসসৃষ্টি রূপে সমগ্র জীবনকে প্রত্যক্ষ করি বলিয়া জীবনের অর্থ উপলব্ধি করিতে কষ্ট হয় না।

ধরা যাক, শার্লট ব্রন্টির উপন্যাসগুলি। কাহিনীর ভিতর দিয়া এই অপূর্ব্ব প্রতিভাশালিনী লেখিকার অতি অনুভূতিপ্রবণ জীবন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এমন-কি তাঁহার সাংসারিক জীবনের বহু পরিচয় এগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। জেন আয়ারের সুখদুঃখ শার্লট ব্রন্টির নিজের সুখদুঃখ। ধরা যাক, বায়রণের কাহিনীকাব্য গুলি। ম্যান্‌ফ্রেড, ডন জোয়ান, চাইল্ড হ্যারল্ড—সকলের মধ্যেই বায়রণের জীবনলীলার প্রকাশ দেখি। টলষ্টয়ের বহু চরিত্রই টলষ্টয়ের জীবনের অনুভূতি দিয়া গড়া।

ধরা যাক, শরৎচন্দ্রের 'শেষ-প্রশ্ন।'

ইহার মধ্যে শরৎচন্দ্রের প্রবৃত্তি ধারণা সংস্কার ঝোঁক যতটা অনাবৃতভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার অন্য কোন উপন্যাসে ততটা পায় নাই।

যেটি যাহা সেটি তাহাই করিয়া যিনি আঁকিতে চান তিনি রিয়ালিষ্ট। সকল ক্ষেত্রে সাধ্য না হইলেও বাস্তব বাদী নিজের কামনা অভিপ্রায় পক্ষপাত যত দূব সম্ভব পরিহার করিয়া চলেন। শরৎচন্দ্র সংসারকে as it is আঁকেন না। তাঁহার প্রতিভার সে ধারাও নয়। তাঁহার সুখদুঃখবোধ তীব্র। নিজের ভাললাগা মন্দলাগার মধ্য দিয়া তিনি সংসারকে গ্রহণ করেন। যেমনটি তেমন করিয়া আঁকিবার ঝোঁক তাঁহার নাই। তাই তিনি রিয়ালিষ্ট নহেন।

তিনি নিজের মনে নিজের জগৎ রচনা করেন। সে জগৎ তাঁহার কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত। সত্য কথা বলিতে গেলে বাস্তবের পরিচ্ছদে তিনি রোমান্স রচনা করেন।

'শেষের কবিতা'য় আধুনিক মনের ছবি আছে। কিন্তু 'শেষ প্রশ্ন' কি? ইহা আদর্শ জীবনের আলোচনাও নয়, জাগতিক জীবনের ব্যাখ্যাও নয়। শরৎচন্দ্রের মনগড়া কতকগুলি মানুষ তাহাদের মনগড়া কতকগুলি প্রশ্ন করিতেছে এবং মনগড়া কতকগুলি উত্তর দিতেছে। ইহার মধ্যে তর্ক আছে সিদ্ধান্ত নাই, অকারণ উষ্মা, অহেতুক তীক্ষ্ণতা, অনাবশ্যক শ্লেষ আছে, সৃষ্টির সুষমা নাই।

একজন প্রবীণ সাহিত্যিক বলিলেন, "ছেলেরা বলে, এ না-কি আধুনিকতার ফিলসফি।" দর্শন ও বিজ্ঞানের এমন অপব্যাখ্যা আমরা মাঝে মাঝে করি। কথা তাহা নয়, ছেলেদের কথায় এ উপন্যাসের গতি কোন্ দিকে তাহা সহজে বুঝিতে পারি।

সে দিন ইসাডোরা ডানকানের আত্মজীবন পাঠ করিতেছিলাম। আত্মজীবনচরিত লেখার মত আত্ম-প্রতারণার কৌশল আর নাই। দৃশ্যতঃ যাহা প্রতিভাত হইতেছে ভিতরের কথা তাহা নয়, যাহা আমার ত্রুটি বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা অন্যের দোষ, সাধারণের দোষ, সমাজের দোষ, সমাজ-সংস্থানের দোষ,—মনকে চোখ ঠারিয়া এমনি করিয়া দাবাইয়া রাখিতে চাই। যে বস্তু যাহা তাহাকে সেই নামে ডাকি না। কোদালকে কোদাল না বলিয়া অন্য কিছু বলি। মনকে তিরস্কার করিয়া তীব্রভাবে বলি, "ঠিক, ঠিক, আমি ঠিক করিয়াছি, দেখিতেছ না ইহা আমার জীবনের ফিলসফির সহিত কেমন খাপ খাইতেছে।" পরের বেলায় যেখানে বলিতাম, এ ত আত্মসুখপরায়ণ স্বার্থপরের আত্মতৃপ্তি, নিজের বেলায় সেখানে বলি জীবনের মূল-নীতির অনুসরণ।

সাহিত্যিক আত্মহত্যা তখনই ঘটে, যখন রচয়িতা নিজের অধিকার ভুলিয়া যান, হৃদয়বান নিজেকে যুক্তিবাদী মনে করেন, রসস্রষ্টা দার্শনিক হইতে চান।

শরৎচন্দ্রের ভাবপ্রবণতাই ভাবমত্ত বাঙালীর কাছে তাহাকে আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি যখন হৃদয়াবেগের রাজ্য ছাড়িয়া লজিকের জগতে ঢুকিতে চান, তখন ব্যাপারটা সত্যই জটিল হইয়া পড়ে।

এরূপ অবস্থায় সাহসিকতা দেখাইবার অভিপ্রায়ে বংশানুক্রম টানিয়া আনিতে হয়, স্বাধীন চিন্তার জন্ম সাহেব বাপ করিতে হয়, নিজের দেশের জাতি বিশেষের সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক ইঙ্গিত করিতে হয়। ইংরেজীতে একটি ভাবদ্যোতক কথা আছে। বাংলায় তাহার সম্পূর্ণ অর্থ করা যায় না। সে কথাটি স্নবিশনেস্।

'গোরা'র সহিত 'শেষ প্রশ্নে'র নায়িকা কমলের কিছু মিল আছে। গোরা আইরিস্‌ম্যানের ছেলে, কমলও সাহেবের মেয়ে। কিন্তু আশ্চর্য্য মনোবিশ্লেষণ এবং অদ্ভুত সৃষ্টিপ্রতিভার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' যেখানে অপরূপ, দোষে গুণে প্রকৃত মানুষ, কমল সেই অবস্থায় কতকগুলি অদ্ভুত মত এবং উল্টা কথার গ্রামোফোন মাত্র। তাহার অসামাজিক সংস্কার বুদ্ধি ও প্রকৃতি লইয়া কমল যদি রক্তমাংসের মানুষ হইয়া উঠিত, তাহা হইলে বলিবার কিছু থাকিত না, কেন-না সামাজিক ও অসামাজিক উভয়বিধ বৃত্তি হইতেই পুষ্ট হইয়া সাহিত্যের রসমূর্ত্তি সম্ভব হইয়া ওঠে। 'শেষ প্রশ্নে' কোথাও তাহা দেখি না। তাই রসসৃষ্টির পরিবর্ত্তে 'শেষ প্রশ্নে' শরৎচন্দ্রের প্রবৃত্তি ধারণা সংস্কার ও ঝোঁকের প্রকাশ দেখিতে পাই, জীবনের ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে মতামতের তর্ক-কোলাহল শুনিতে পাই।

সমগ্রের মধ্যে যখন সামঞ্জস্য পাই, সৃষ্টিকে তখন সুষমাময় আখ্যা দিই। 'শেষ প্রশ্নে' সুষমা নাই। এই মোটা বইখানি ভারকেন্দ্রের অযথা সংস্থানে যেন টলিয়া টলিয়া পড়িতেছে।

আর্ট বাহির হইতে ভিতরের দিকে যায়। রস ভিতর হইতে বাহিরে ফুটিয়া উঠিতে চায়। সেই প্রস্ফুটনকালে সে আপনার রূপ আপনি ধরে।

আর্ট ও রসের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য দু-একটি মাত্র কবির মধ্যে দেখিতে পাই। যেমন কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ। আর্ট স্বচেষ্টায় রস ফুটাইতে চায়। একান্ত রসপ্রধান রচনায় এই চেষ্টার লক্ষণ থাকে না।

শরৎচন্দ্র আর্টিষ্ট নন। তিনি অনুভূতিপ্রবণ লেখক। যেখানে হৃদয়ের প্রখরতা নাই, ইমোশন্‌ নাই, সেখানে তিনি নিস্তেজ। 'শেষ প্রশ্নে' অনুভূতির তীব্রতা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র রসসঞ্চারে অপারক বলিয়া রচনায় আর্টের সুষমার একান্ত অভাব হইয়াছে।

যে ক্ষণিক সুখের সার্থকতায় নর্ত্তকী ইসাডোরা ডানকান Moment Musicaleএর নৃত্যরূপ রচনা করিয়াছিলেন কমলের মুখে সেই ক্ষণিকবাদের উক্তি শুনিতে পাই। অতীত মৃত, ভবিষ্যৎ মায়া, বর্ত্তমান সত্য, অতএব আনন্দময় মুহূর্ত্তগুলিকে ব্যর্থ হইতে দিও না, এইরূপ উৎকট মত প্রতিষ্ঠার জন্য কমলকে কতকগুলি অসংলগ্ন ঘটনা ও অযাচিত তর্কের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কাজেই শিবনাথ ছায়া, কমল খাপছাড়া এবং সকল ঘটনাই সৃষ্টিছাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

'শেষ প্রশ্নে' জীবনের ব্যাখ্যা নাই, জীবনের আলোচনাও নাই। যাহা আছে তাহা ক্ষণিকের জয়গান। সে গান সৃষ্টির সুরে বাঁধা নয়। জীবন চিরন্তন। সেই চিরন্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার মধ্যে যে বাহ্বাস্ফোট আছে, এ সঙ্গীতের তাহাই মূল সুর। এ সুরে তাই বিবাদী—discord বাজিয়া উঠিয়াছে। তাই উপন্যাস হইয়াও তর্কবহুল 'শেষ প্রশ্ন' রসসাহিত্যে পরিণত হইতে পারে নাই।*

* রবি-বাসরে পঠিত।



ভারত-ভাষা-বাচস্পতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীযুক্ত স্যর জ্যরজ্‌ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের উদ্দেশে

স্যর জ্যরজ্‌ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন সাতাশ বৎসর পরিশ্রমের ফলে তদনুষ্ঠিত বিরাট Linguistic Survey of India বিগত ১৯৩০ সালে সমাপ্ত করিয়াছেন। তদুপলক্ষে Linguistic Society of India-র মারফৎ ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহিরের ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া স্যর জ্যরজ্‌কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রিয়ার্সন-সংবর্দ্ধন-প্রবন্ধমালা তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন। ভারতের নানা ভাষায় স্যর জ্যরজ্‌-এর নামে প্রশস্তি রচনা করিয়া উক্ত প্রবন্ধমালার অন্তর্গত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এই কবিতাটি এই উপলক্ষ্যে রচিত।

সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হ'য়ে সেই শ্বেতদ্বীপেই শেষে
তোমার হৃদয়-পদ্মখানি খুঁজে নিলে ভারত-সরস্বতী !—
হিম-সায়রের মরাল-গলে পরিয়ে আগে মালায়-গাঁথা মোতি,
ধব্‌ধবে তার পালক দিয়ে মরচে বীণার মুছিয়ে নিলে হেসে !
সূর্য্য যখন এই আকাশে অস্ত গিয়ে উঠ্‌ল তোমার দেশে,
সন্ধেবেলার সাবিত্রী কি সঙ্গে ছিল ? আর্য্যকুলের সতী
চিন্‌লে তোমায়,—তুমিই বুঝি আর জনমে ছিলে বাচস্পতি ?
এবার এলে ভাষা-সরিৎ-শতবেণীর শঙ্খধারীর বেশে !

আজকে তোমায় স্মরণ করি, বরণ করি—প্রণাম করি মোরা
নূতন ঋষি দ্বৈপায়নে, ভাষা-মহাভারত-রচয়িতা !
সত্যবতী-সুত যে তুমি, তোমার তপে বাণী শুচিস্মিতা
অষ্টাদশ পর্ব্ব ঘিরে পরিয়ে দিলে একই পুঁথির ডোরা !
এম্‌নি প্রেমেই ধন্য হবে তোমার জাতির শাসন ভারত-জোড়া,
তোমার আসন বুকের মাঝে,—তুমি মোদের চিরদিনের মিতা।

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

অবতরণিকা

পুরাকালে মগধ দেশে শর্ব্বীলক নামে এক মহাতেজস্বী ধনবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শর্ব্বীলক শালপ্রাংশু মহাভুজ ও অসীম শক্তিশালী। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। নানাদেশ হইতে বহু শিষ্য তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত। যজন-যাজন ও শাস্ত্রচর্চ্চায় তাঁহার গৃহ সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। মগধে শর্ব্বীলকের সম্মানের সীমা ছিল না।

শর্ব্বীলকের পুণ্ডরীক নামে এক পুত্র ছিল। পুত্রটি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। পুণ্ডরীক ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলে একদিন প্রত্যুষে তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বৎস, আজ অতি শুভদিন, আজ তোমাকে দীক্ষা দিব স্থির করিয়াছি। তুমি আজ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিবে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে অমাবস্যা পড়িলে তোমাকে আমাদের কৌলিক প্রথায় দীক্ষিত করিব; তুমি সন্ধ্যা হইতে নিজ গৃহে নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান করিও।"

পিতার উপদেশ-মত পুণ্ডরীক সারাদিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রে নিজগৃহে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া পিতার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। অমাবস্যার দ্বিপ্রহর রাত্রি; সমস্ত পুরী নির্জ্জন নিস্তব্ধ। সহসা পুণ্ডরীকের গৃহদ্বার খুলিয়া গেল। ক্ষীণ দীপালোকে পুণ্ডরীক দেখিল—কৌপীনধারী এক বিরাট পুরুষ গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান; সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার তৈললিপ্ত—উভয় স্কন্ধে শাণিত কুঠার। এই বীভৎস মূর্ত্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, ভীত পুণ্ডরীক নিজ পিতাকে চিনিতে পারিয়া অতীব বিস্মিত হইল। গম্ভীর কণ্ঠে শর্ব্বীলক বলিলেন, "বৎস, নির্ভয় হও। তোমার দীক্ষাকাল উপস্থিত। কাষায় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন ধারণ কর; সর্ব্বাঙ্গে তৈল লেপন করিয়া এই কুঠার হস্তে আমার অনুগমন কর—কোন প্রশ্ন করিও না।" এই বলিয়া শর্ব্বীলক পুত্রের হাতে একখানি শাণিত কুঠার দিলেন, অপর কুঠার তাঁহার স্কন্ধে রহিল। পুণ্ডরীক মন্ত্রমুগ্ধের মত পিতার নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিল।

নানাপথ অতিক্রম করিয়া শর্ব্বীলক পুত্রকে মগধ হইতে বারানসী যাইবার রাজবর্ত্মের পার্শ্বে এক বৃহৎ বটবৃক্ষতলে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বলিলেন,—"তুমি এই অন্ধকারে সতর্ক হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাক, কেহ যেন তোমাকে দেখিতে না পায়।" শর্ব্বীলকও পুত্রের পার্শ্বে উদ্যত কুঠার হস্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে ও অন্ধকারে ভ্রমণ-জনিত পথশ্রমে পুণ্ডরীকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। অনিশ্চিতের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্তকে যুগ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। কপালে স্বেদসঞ্চার হইল, শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল।

ধনবীর শ্রেষ্ঠী বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে রাজগৃহ হইতে বারানসী যাইতেছিলেন। শীঘ্র পৌঁছিবার আদেশ থাকায় রাত্রেও তাঁহাকে পথ চলিতে হইতেছিল। সঙ্গে তাঁহার চর্ম্ম-পেটিকায় বদ্ধ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। পথ বিপদসঙ্কুল বলিয়া শকটের সম্মুখে চারিজন ও পশ্চাতে চারিজন সশস্ত্র প্রহরী চলিতেছে। শকট যেমনি সেই বৃহৎ বটবৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি বিকট হুঙ্কার করিয়া শর্ব্বীলক অতর্কিতভাবে শকট আক্রমণ করিলেন। শকটের ম্লান আলোকে তাঁহাকে অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল। শকট-চালক ও রক্ষিগণ প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল। শাণিত কুঠার ঘুরাইয়া শর্ব্বীলক ধনবীরের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন,—রুধিরাক্ত ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে লুটাইল। স্বর্ণমুদ্রার সুবৃহৎ গুরুভার পেটিকা অক্লেশে পৃষ্ঠদেশে ফেলিয়া শর্ব্বীলক বটবৃক্ষমূলে ফিরিয়া আসিলেন। এই

নৃশংস ব্যাপার দর্শনে পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে কুঠার স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে—সে বেতসপত্রের মত কাঁপিতেছে। শর্ব্বীলক কুঠার কুড়াইয়া লইলেন এবং পুত্রের হাত ধরিয়া যন্ত্রচালিতের মত তাহাকে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়া পুত্রকে তাহার নিজ ঘরে বসাইয়া বহির্দেশ হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ একাকী গৃহমধ্যে অবস্থান করিবার পর পুণ্ডরীক প্রকৃতিস্থ হইল। তখন ঘৃণায়, রোষে, ক্ষোভে তাহার মন মথিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য আর সে এরূপ পিতার গৃহে অবস্থান করিবে না। দারুণ উদ্বেগে অবশিষ্ট রাত্রি কাটাইয়া প্রত্যূষে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। ঘুম ভাঙিলে দেখিল—মুক্ত দ্বারপথ দিয়া প্রভাত সূর্য্যকিরণ গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং গৃহমধ্যে প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি তাহার পিতা চিরপরিচিত বেশে দাঁড়াইয়া আছেন। রাত্রের সমস্ত ঘটনা দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু পরক্ষণে নিজের কৌপীন ও তৈলাক্ত শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার সে ভুল ভাঙিয়া গেল। পিতা কহিলেন,—"বৎস! বৃথা উতলা হইও না। এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহা তোমার মনোকষ্টের কারণ হইতে পারে।" পুণ্ডরীক বলিল,—"গতরাত্রে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে আর মুহূর্ত্তকালও এ গৃহে অবস্থান করিবার ইচ্ছা নাই। আমি এই দণ্ডে গৃহত্যাগ করিব, আপনি পথ ছাড়িয়া দিন।" পিতা বলিলেন,—"অনাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় তোমার মন প্রকৃতিস্থ নাই; তুমি স্নানাহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, পরে তোমাকে আমাদের বংশ-গত কৌলিক দীক্ষার বিবরণ বলিব। সমস্ত শুনিয়া তখন যদি গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় করিও, আমি তাহাতে বাধা দিব না। কিন্তু এখন তুমি কোথাও যাইতে পাইবে না।" পুণ্ডরীক বুঝিল পিতার অমতে তাহার গৃহ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। প্রয়োজন বুঝিলে তিনি বলপ্রয়োগেও দ্বিধাবোধ করিবেন না। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুণ্ডরীককে স্নানাহার সারিয়া বিশ্রাম করিতে হইল।

দ্বিপ্রহরে শর্ব্বীলক আসিলেন। বলিলেন,—"যাহা বলি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তোমার কিছু প্রশ্ন থাকিলে পরে করিও।" শর্ব্বীলক বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের বংশ অতি প্রাচীন। পাণ্ডবের রাজত্বকাল হইতে অদ্যাবধি আমাদের বংশে একই কৌলিক প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পুত্র ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলে পিতা তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষিত করিয়া, কৌলিক প্রথায় দীক্ষিত করিবেন। আমিও ষোড়শ বর্ষে আমার পিতার নিকট হইতে দীক্ষা পাইয়াছি এবং আশা করি তুমিও পুত্রলাভ করিয়া তাহাকে ষোড়শ বর্ষ বয়সে এই সনাতন কুলপ্রথায় দীক্ষিত করিয়া বংশের কৌলিক আচার অক্ষুণ্ণ রাখিবে। আমার যে এই অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিতেছ, তাহার অধিকাংশই পরের নিকট হইতে বাহুবলে অর্জ্জিত। আমি দিবাভাগে লোকধর্ম্ম পালন করি, অনাথ আতুর দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোকের প্রার্থনা পূর্ণ করি, এবং রাত্রে কৌলিক আচার পালন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করি। এই কৌলিক আচার পালনে আমাকে কোনও প্রকার অধর্ম্ম স্পর্শ করে না। আমি বুঝিতেছি তোমার মনে কি চিন্তা উদিত হইতেছে। তুমি তোমার পিতাকে ভণ্ড, পরস্বাপহারক ও নরহন্তা বলিয়া মনে করিতেছ। ভাবিতেছ, এরূপ পিতার আশ্রয়ে বাস ও অন্নগ্রহণ মহাপাপ। ইহা অপেক্ষা ভিক্ষান্নভোজন অথবা মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়। তোমার মনে দুঃখ ক্ষোভ ও নানাবিধ ব্যামোহ আসিয়া চিত্তবিভ্রম ঘটাইতেছে। তোমার শরীর মন প্রকৃতিস্থ নাই। তুমি তীক্ষ্ণধী। স্থিরভাবে সমস্ত কথা বিচার করিলে দেখিতে পাইবে, বাস্তবিকপক্ষে তোমার মনক্ষোভের কোনই কারণ নাই। তুমি গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ ও তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছ। অর্জ্জুনেরও যুদ্ধকালে ঠিক এইরূপ চিত্তবিকার দেখা দিয়াছিল। আমি নিজকর্ম্মের জন্য তোমাকে কোনরূপ মনগড়া কারণ দেখাইয়া দোষক্ষালনের চেষ্টা করিব না। সর্ব্বলোকমান্য গীতাশাস্ত্রের উপদেশমাত্র তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিব; তুমি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছ—সহজেই গীতার উপদেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তুমি মোহবশে অর্জ্জুনের মত কষ্ট পাইতেছ। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে কুরুসৈন্যের সম্মুখীন করিলেন, তখন

অর্জ্জুনের মনে মোহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—

দেখিয়া স্বজন, কৃষ্ণ ! সমবেত রণোন্মুখ
অবসন্ন গাত্র মম, বিশুষ্ক হতেছে মুখ। ১।২৮
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে রোমাঞ্চিত,
পড়িছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত। ১।২৯
নাহি শক্তি থাকি স্থির, হইতেছে ভ্রান্ত মন,
হে কেশব। দুর্ন্নিমিত্ত করিতেছি দরশন। ১।৩০

দেখ, তোমারই মত অর্জ্জুনের শরীরে ও মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল। তুমিও অর্জ্জুনেরই মত এ অবস্থায় ভিক্ষান্নভোজন শ্রেয় মনে করিতেছ,—

না বধিয়া গুরু, মহান আশয়
ভিক্ষান্নভোজন মঙ্গল আমার ;
অর্থলুব্ধ মন গুরু করি হত,
ভুঞ্জিব কি ভোগ, শোণিত আধার। ২।৫

আমি দিবাভাগে লোকধর্ম্ম ও রাত্রে কুলধর্ম্ম পালন করি। সাধারণকে আমার কুলাচারের কথা বলি না বলিয়া তুমি হয়ত আমাকে মিথ্যাচারী ও ভণ্ড মনে করিতেছ। কিন্তু দেখ, সাধারণে দুর্ব্বলচিত্ত, তাহারা আমার কুলাচারের মহিমা কেমন করিয়া বুঝিবে? আমার কুলধর্ম্মের কথা জানিতে পারিলে তাহারা আমাকে উৎপীড়িত করিবে ; সে উৎপীড়ন হয়ত আমার পক্ষে অসহ্য হইবে। এই দুর্ব্বলতার ফলে আমাকে সত্য গোপন করিতে হয়। তুমি মনে করিও না আমি সত্য-গোপনকে মিথ্যাচার বলিয়া মনে করি না। যে সত্য গোপন করে, সেই মিথ্যাচারী। অতএব স্বীকার করিতেছি, আমি মিথ্যার আশ্রয়ে আছি। তুমি জানিবে মিথ্যার আশ্রয় ব্যতীত কাহারও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সকলেই অল্পবিস্তর দুর্ব্বল, এবং এই দৌর্ব্বল্যজনিত অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিতে গেলে সকলকেই মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ-বধকালে নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়াছিলেন। মহাভারতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মিথ্যা কথা বলিবার ব্যবস্থা আছে। আরও দেখ

মাব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্

অপ্রিয় সত্য গোপন মিথ্যারই প্রকার-ভেদমাত্র। সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় সত্যকথা বলিতে গেলে সংসারে বাস করা চলে না, এমন কি লৌকিক ভদ্রতাও রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে। গীতায় আছে :—

কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্ষান্ত রাখে, কিন্তু মনে মনে থাকে
ধ্যান যার ইন্দ্রিয় বিষয়।
মূঢ় আত্মা মিথ্যাচারী তাহাকেই কয়। ৩।৬

আমরা সকলেই মনে একরূপ ভাবি, আর সমাজ-ভয়ে কার্য্যে অন্যরূপ ব্যবহার করি। সুতরাং আমরা সকলেই ভণ্ড ও মিথ্যাচারী। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা সমুদয় প্রাণীতে মিথ্যা আচরণ বিধান করিয়াছেন। প্রবল শক্তিশালী সিংহ-ব্যাঘ্রও লুক্কায়িত থাকিয়া অতর্কিতভাবে মৃগকে আক্রমণ করে। বহু কীটপতঙ্গ আত্মরক্ষার জন্য অন্য প্রাণীর রূপ ধারণ করিয়া থাকে। এ সমস্তই মিথ্যা ব্যবহার বলিয়া জানিবে। অতএব আমাকে যদি মিথ্যাচারী ভণ্ড বলিয়া ঘৃণা করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তিকেও ঘৃণা করিতে হয়। সত্যের ন্যায় মিথ্যাও ভগবানেরই বিধান ; নচেৎ ক্ষুদ্র মনুষ্যের বা অন্য কোন প্রাণীর সাধ্য কি যে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিথ্যার সৃষ্টি করে?

যদি আমাকে পরস্বাপহারক মনে করিয়া দোষ দিতে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমাকে আমি পুনরায় বলিব যে, পৃথিবীসুদ্ধ লোকই পরস্বাপহারক। তুমি যে-শাক যে-অন্ন যে-ফল ভোজন কর, তাহা সেই সেই বৃক্ষ-লতাদিকে বঞ্চিত করিয়াই কর। আমিষাশী মনুষ্য অপর প্রাণীর প্রাণ হিংসা করে। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু কিছুই নাই। ধনাপহরণ অপেক্ষা প্রাণাপহরণ গুরুতর অপরাধ বলিতে হইবে। আরও দেখ, ভগবান কাহাকেও কোনও ধন বা ঐশ্বর্য্য দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন নাই। এই পরিমাণ ভূমি অর্থ পশু তোমার এবং এই পরিমাণ অপরের—এমন বিভাগ তিনি কাহাকেও করিয়া দেন নাই। মানুষ নিজ বাহু ও বুদ্ধিবলে যাহা অর্জ্জন করে, তাহাই তাহার সম্পত্তি। রাজা পরস্বাপহরণ করিয়া রাজা হন। যখন পাণ্ডবদিগের রাজত্ব ছিল, তখন তাঁহারা পরের নিকট হইতেই রাজ্যৈশ্বর্য্য আহরণ করিয়াছিলেন ; আবার যখন তাঁহারা বিতাড়িত হইলেন, তখন কৌরবেরাই তাহা অধিকার

করিয়া লইলেন। রাজার অধিকার বাহুবলেরই অধিকার—রাজার তাহাতে পাপ স্পর্শে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই রাজ্যই পুনরায় অধিকার করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই কুরুপাণ্ডবেরা এখন কোথায়? বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। রাজারা বহুব্যক্তির ধনাপহরণ করেন; সেই তুলনায় আমি অল্প কয়েকজনেরই অর্থ বাহুবলে লইয়াছি।

নরহন্তা ভাবিয়া তুমি আমাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছ। সাধারণ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুনেরও তোমার মতই নরহত্যা-সম্বন্ধে ভ্রান্তজ্ঞান মনে উঠিয়াছিল।

এ কি মহাপাপ মোরা করিতে বসেছি হায়
রাজ্যসুখ লোভে ব্রতী বন্ধুবধ-ব্যবসায়। ১।৪৪

প্রতিহিংসা প্রতিহত অশস্ত্র আমারে হত
করে যদি সশস্ত্র এ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ
তাহাও মানিব মম মঙ্গলকারণ। ১।৪৫

কাহারও মৃত্যু ঘটিতে দেখিলে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির দুঃখবোধ স্বাভাবিক। শ্রেষ্ঠীর মৃত্যুতে তুমি যদি অর্জ্জুনের মত দুঃখবোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের কথায় তোমাকে বলিব:—

অ-শোকে করহ শোক কহ কথা বিজ্ঞপ্রায়
মৃত বা জীবিতজনে পণ্ডিতে না শোক পায়। ২।১১

কৌমার যৌবনজরা যথা এ দেহীর দেহে,
দেহান্তর প্রাপ্তি তথা জ্ঞানী তাহে মুগ্ধ নহে। ২।১৩

জেনো তুমি অবিনাশী যেই আত্মা সর্ব্বময়,
নাশিতে অব্যয় আত্মা, কেহই সমর্থ নয়। ২।১৭

অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য আত্মা যিনি
অন্তবন্ত এই সব দেহধারী তিনি
নাশ নাই কভু তাঁর শরীর সহিত
হে ভারত হও তুমি যুদ্ধে উৎসাহিত। ২।১৮

যে ইহারে হন্তা ভাবে, যেবা ভাবে হত,
উভয়ের কেহই না জানে স্বরূপতঃ
না করেন হত্যা ইনি, নাহি হন হত। ২।১৯

না জন্মেন না মরেন ইনি কদাচন
জন্মবিনা নন স্থিত না ভাব এমন
জন্মহীন সদা এক পুরাণ শাশ্বত
শরীরের নাশে কভু না হয়েন হত। ২।২০

তুমি বুদ্ধিমান; গীতাশাস্ত্রের এই সমস্ত উপদেশে মনোযোগ করিলে তোমার শোক অপনোদন হইবে। আত্মা অবিনাশী হইলেও যদি মনে কর যে আমার দ্বারা শ্রেষ্ঠীর শরীর বিনষ্ট হইয়াছে, তবে তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই:—

যদি তার জন্মমৃত্যু নিত্য বলি কহ
তবু মহাবাহো! তুমি শোকযোগ্য নহ। ২।২৬
জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু মৃতে জন্ম ধ্রুব,
হেন অনিবার্য্যে শোক অনুচিত তব। ২।২৭

যথা জীর্ণ বস্ত্রভার, করি নর পরিহার,
পরে নব বসন অপর।
তথাবৎ জীর্ণকায়, দেহী পরিত্যজি যায়,
পুনঃ পায় নব কলেবর। ২।২২

ধনবীর বৃদ্ধ হইয়াছিল অথচ তাহার ভোগবাসনা বিরহিত হয় নাই। দেহ বিনাশে তাহার উপকার হইল। সে এখন কামনা অনুযায়ী নব কলেবর ধারণ করিবে। ক্ষণবিধ্বংসী শরীরের জন্য শোক অনুচিত:—

সর্ব্বদেহে দেহী নিত্য অবধ্য ভারত।
অতএব কারও জন্য শোক অনুচিত। ২।৩০

নরহত্যা করিয়া লোকাচার লঙ্ঘন করিয়া আমি পাপভাগী হইয়াছি—এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই। দেখ, প্রত্যেকে নিজ নিজ কুলধর্ম্ম পালন করে, ইহাতে তাহাদের পাপ হয় না। বরং কুলধর্ম্ম বর্জ্জন করিলে পাপভাগী হইতে হয়। অর্জ্জুন আত্মীয়স্বজন-বধ-ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

স্বধর্ম্মেও চাহি কর চলচ্চিত্ত পরিহার।
ধর্ম্মযুদ্ধ সম শ্রেয় ক্ষত্রিয়ের নাহি আর। ২।৩১
যদৃচ্ছা যুটেছে যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গ-দ্বার প্রায়
সুখী ক্ষত্র তারা পার্থ! যাঁরা হেন রণ পায়। ২।৩২
আর যদি ক্ষান্ত রও এ ধর্ম্মআহবে
স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিত্যাগে পাপভাগী হবে। ২।৩৩

কুলধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া ধনবীরকে হত্যা না করিলেই আমি পাপভাগী হইতাম। আমিই ধনবীরকে হত্যা করিয়াছি, এরূপ মনে করাও সমীচীন নহে। ভগবানই সকলকে নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। মনুষ্য নিমিত্তমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন:—

লোকান্তক মহাকাল আমি হই
লোক সংহারেতে প্রবৃত্ত হেথায়
তুমি না হলেও রবে না কেহই
প্রতি সৈন্যস্থিত যোদ্ধা সমুদয়। ১১।৩২

অতএব উঠ, লভ যশ তুমি
ভুঞ্জ সুখরাজ্য জিনি শত্রুদল
পূর্ব্বেই করেছি সবে হত আমি
হও সব্যসাচী নিমিত্ত কেবল। ১১।৩৩

তোমার মনে যদি এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে পূর্ণজ্ঞানীর প্রতি এই-সব উপদেশ প্রযোজ্য, তবে তাহাও ভ্রান্ত বলিয়া জানিবে। অর্জ্জুনের দিব্যদৃষ্টিলাভের বহুপূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন :—

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়

অতএব হে পুণ্ডরীক, সর্ব্বজ্ঞানী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত বাণী স্মরণ করিয়া তুমি শোক মোহ বর্জ্জন কর; সনাতন কুলধর্ম্ম-পালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন কর। তুমি অতি পবিত্র মহান্ বংশের সন্তান; সেই প্রাচীন বংশের কুলধর্ম্ম-সূত্র কর্ত্তন করিও না :—

ভ'জো না ক্লীবত্ব, নহে তব যোগ্য কদাচন
হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ক্ষুদ্র ত্যজি উঠ অরিন্দম। ২।৩

পুণ্ডরীক একাগ্রমনে সকল কথা শুনিতেছিল। পিতৃমুখে গীতোক্ত সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার মনের সকল দ্বন্দ্ব সূর্য্যালোকে অন্ধকারের ন্যায় অপসৃত হইল। রোমাঞ্চিত কলেবরে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া পুণ্ডরীক বলিল :—

মোহ গেল স্মৃতি এল অচ্যুত প্রসাদে তব
সন্দেহ বিগত হ'ল তব আজ্ঞাকারী হব। ১৮।৭৩

শর্ব্বীলক উপাখ্যানে গীতার যে উপদেশ আছে, প্রকৃতপক্ষে কি গীতাশাস্ত্র ঐরূপ উপদেশ দেয়? পুণ্ডরীককে নরহত্যায় উৎসাহিত করা ও অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করা কি একই ব্যাপার? অহিংস-ধর্ম্মী জৈন বা আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিবেন উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। শর্ব্বীলক যদি গীতাশাস্ত্রের যথার্থ উপদেশ দিয়া থাকেন তবে সাধারণ নরহত্যাকারী, চোর, ঠগ, লম্পট প্রভৃতি সকলেই গীতার দোহাই দিবে। আর শর্ব্বীলক যদি ভুল উপদেশ দিয়া থাকেন, তবে সে ভুল কোথায়? শর্ব্বীলক কথিত গীতার শ্লোকগুলির যথার্থ মর্ম্মই বা কি? এই সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান ব্যতীত গীতার কোন ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য হইতে পারে না। শর্ব্বীলকের উপাখ্যান মনে রাখিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। গীতার ব্যাখ্যায় আমি এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার অবতারণা কেন?

গীতার উপদেশ সাংসারিক সর্ব্ব ব্যাপারেই প্রযোজ্য। গীতাকার তাঁহার বক্তব্য প্রচারের জন্য যুদ্ধের ঘটনার আশ্রয় লইলেন কেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। তিনি কথায় কথায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বলাইতেছেন,—

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্। ১১।৩৩

অর্থাৎ, অতএব তুমি উঠ, যশোলাভ কর, শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।

সমস্ত সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশের মূল উদ্দেশ্য আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। মোক্ষলাভের আগ্রহও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন। সাধারণে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের কষ্ট লইয়া মাথা ঘামায় না। এই জন্মেই সে যা কষ্ট ভোগ করে, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় সে চিন্তা করে। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইলে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য ইত্যাদি সকল কষ্টেরই নিবৃত্তি হইবে আশা করা যায়। সংসারে থাকিলে কিছু-না-কিছু কষ্ট সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এই কষ্ট নিবারণের জন্য নানা উপায় কল্পিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে সাংসারিক দুঃখনিবৃত্তির উপায়-কল্পনার আদর্শের ধারা একেবারে বিভিন্ন। পাশ্চাত্যের শিক্ষা নিজকে সংসার-সংগ্রামের উপযোগী কর, পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাহাতে নিজের অধিকার ও সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার চেষ্টা দেখ, জ্ঞানার্জ্জন করিয়া প্রকৃতিকে নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে নিয়োজিত কর;— মোট কথা, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিজের সুবিধানুযায়ী পরিবর্ত্তিত কর। সংসার-কণ্টকারণ্যের যতগুলি পার কণ্টক উৎপাটন কর। প্রাচ্যে যে এরূপ চেষ্টা নাই, তাহা নহে। তবে এখানকার সনাতন আদর্শ অন্যরূপ। সংসারের সমস্ত কণ্টক তুমি কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না। কাজেই তোমার নিজেকেই এমনভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে কণ্টক তোমাকে না বেদনা দিতে পারে। রাস্তার কঙ্কর সব দূর করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া পায়ে জুতা পরাই ভাল। এক আদর্শে বহিঃপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব, এবং অপর আদর্শে

নিজের উপর প্রভুত্বের চেষ্টাই কাম্য। পাশ্চাত্য আদর্শ মতে সমগ্র প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সম্ভবপর নহে, তবে প্রকৃতিকে আমি তোমার অপেক্ষা বেশী পরিমাণে নিজের কাজে লাগাইতে শিখিয়া অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারি, প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখে ইচ্ছামত আহার বিহার করিতে পারি। একেবারেই আমার কোনও কষ্ট থাকিবে না, এমন কথা বলিতে পারি না। রোগ শোক দুঃখ ইত্যাদির হাত হইতে একেবারে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব।

হিন্দু আদর্শ বলিবে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব। রোগ-শোক দুঃখ-দারিদ্র্য, মৃত্যু-ভয়, ইত্যাদি সকল প্রকার অশান্তি দূর করা যাইতে পারে এবং তুমি আমি চেষ্টা করিলে এইরূপ অবস্থায় পৌছিলেও পৌছিতে পারি। এত বড় কথা বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ কখনও বলে নাই। এই দুঃখময় সংসারের সকল দুঃখ যে মৃত্যু ভিন্নও নিবারিত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন। আমাদের দেশের আদর্শ যাঁহারা মানেন তাঁহাদের ভিতরেও কি উপায়ে এইরূপ আত্যন্তিক দুঃখ নিবারিত হইতে পারে, সে-সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। কেহ বলেন, সংসার পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও ভোগবিলাসের মায়ামমতা বিসর্জ্জন দিয়া দণ্ড-কৌপীনমাত্র সম্বল করিয়া নির্জ্জনে আত্মচিন্তাই ইহার উপায়। কৌপীনবন্তম্ খলু ভাগ্যবন্তম্। তুমি আমি এই উপায় অবলম্বন করিতে বিলক্ষণ ইতস্ততঃ করিব, কারণ সংসার পরিত্যাগের ইচ্ছামাত্রই সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কষ্টকর। তবে যদি কাহারও সংসারে বিরতি হইয়া থাকে, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কেহ বলিবেন, যাগ-যজ্ঞ ও ভগবানের উপাসনা ইত্যাদি কর, শান্তি পাইবে। কিন্তু এই উপায়ে কিরূপে রোগ-শোক ইত্যাদি কষ্ট নিবারণ হইবে তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, এই সকল প্রক্রিয়ায় মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা হয়। কিন্তু কষ্ট সহ্য করা এক, ও কষ্ট না-হওয়া আর এক। কেহ বলিবেন, যোগ অভ্যাস কর, যোগীর পৃথিবীতে কোন কষ্ট নাই। "প্রাপ্তেতু যোগাগ্নিময়ং শরীরং ন তস্যরোগো ন জরা ন দুঃখ।" যোগাগ্নিময় শরীর পাইলে তাহার রোগ, জরা, দুঃখ থাকে না। কথাটি বড়ই অদ্ভুত। সত্যই যদি এ প্রকার হয়, তবে বাস্তবিকই এই মার্গ অনুসরণীয়। যোগ অভ্যাস সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে এবং যদি কেহ যোগ অভ্যাস করিতে মনস্থ করেন, তবে তাঁহার মনে এরূপ সন্দেহ উঠা স্বাভাবিক যে, এত কষ্ট করিয়া যোগ অভ্যাস করিবার পর যে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইবে তাহার সঠিক প্রমাণ কোথায়? কোথায় সেই যোগী যিনি বলিতে পারেন—এই দেখ আমি সাংসারিক সমস্ত দুঃখ-কষ্টের উর্দ্ধে উঠিয়াছি। লঙ্কায় প্রচুর সোনা পাওয়া যায় শুনিলেও হয়ত অনেকেই সোনা আনিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া সেখানে যাইতে রাজী হইবেন না। কাজেই অধিকাংশ ব্যক্তিই অনির্শিচতের আশায় কঠোর যোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত না হইয়া, সাংসারিক কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারি না।

ভক্তিমার্গে ভগবান লাভ হয় ও ভগবান লাভ হইলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, একথা হয়ত সত্য; কিন্তু আমার মনে যদি ভক্তি না উঠে, তার উপায় কি? লঙ্কায় যাইলে সোনা মিলিতে পারে, কিন্তু আমার যাইবার শক্তি কই? যাঁহাদের মন ভক্তিপ্রবণ তাঁহারা এই মার্গের অনুসরণ করিতে পারেন।

নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষ কেহ ভক্তিমার্গে, কেহ যোগমার্গে, কেহ সন্ন্যাসমার্গে যাইয়া থাকে। গীতাকার বলেন, তোমাকে কোন নূতন পন্থা ধরিতে হইবে না। তোমার নিজের মার্গে চলিয়াই কি করিয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, আমি তাহাই বলিব। এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, আমার উপদেশের সমস্ত না বুঝিলে বা তদনুসারে পূর্ণমাত্রায় চলিতে না পারিলে সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হইবে।

স্বল্পমপিহ ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোঽভয়াৎ

গীতা-শাস্ত্রের সামান্য মাত্র বুঝিয়াও তুমি মহৎ ভয় হইতে উদ্ধার পাইতে পার। সংসারে যে যতই কষ্টকর অবস্থার মধ্যে থাকুক না কেন, গীতোক্ত ধর্ম্মের মহিমা

বুঝিলে তাহার সমস্ত কষ্টের নিবৃত্তি হইবে। এ অতি আশ্চর্য্য কথা। তুমি ভিক্ষুক হও, পরের দাস হও, রোগী হও, ভোগী হও, ধনবান হও, যাহাই হও না কেন, এবং যে-অবস্থাতেই থাক না কেন, গীতার মর্ম্ম উপলব্ধি করিলে তোমাকে কোন কষ্ট স্পর্শ করিতে পারিবে না। স্বল্প উপলব্ধিতেও অনেক লাভ।

সংসারে যতপ্রকার কষ্ট আছে, কোন্ অবস্থায় তাহাদের সকলগুলি প্রকট হয়—প্রশ্ন উঠিলে বলা যায় যে যুদ্ধ। যুদ্ধে অঙ্গহানির সম্ভাবনা; রোগ শোক মৃত্যু ত আছেই, তাহা ছাড়াও যাহা কিছু মানুষের প্রিয়, সমাজের যাহা কিছু কল্যাণকর বন্ধন, সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। এমন কোনও কষ্টই আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না যাহা যুদ্ধের ফলে উৎপন্ন না হইতে পারে। যে-ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে নিজে ত এই সকল কষ্টভোগ করিতেই পারে, পরন্তু অন্যকেও এই সকল দুঃখ-কষ্টের অংশীদার করে। অতএব এক কথায় যুদ্ধের মত দুঃখের ব্যাপার আর কিছুই নাই। এমত অবস্থায় পড়িয়াও যদি দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব হয়, তবে সর্ব্বাবস্থাতেই তাহা সম্ভব। এইজন্যই গীতাকার যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন। মহাভারতের যুদ্ধ বহুকাল পূর্ব্বে হইলেও গীতার উপদেশ সর্ব্বব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

আত্মকথা

সংস্কৃত ভাষায় আমার অধিকার অল্প; এত অল্প যে তাহার দ্বারা গীতার মূল সংস্কৃত বুঝিয়া ব্যাখ্যা করা কঠিন। সুতরাং প্রধানতঃ টীকাটিপ্পনী, ভাষ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়াই গীতার ব্যাখ্যা লিখিতে হইয়াছে। এরূপক্ষেত্রে অনেকস্থলে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক।

গীতার ব্যাখ্যার অন্ত নাই; গদ্যে পদ্যে গীতার অসংখ্য ব্যাখ্যা দেখা যায়, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামির ছাপ বর্ত্তমান। অর্থাৎ গীতার টীকাকার যে-মার্গের উপাসক, ব্যাখ্যায় তিনি সেই মার্গকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। ভক্তিমার্গের উপাসক হইলে তিনি ভক্তিমার্গকে, অথবা জ্ঞানমার্গের উপাসক হইলে জ্ঞানমার্গকেই প্রাধান্য দিবেন। যদিও সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়গত শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে নিজের ব্যাখ্যাতে প্রতিপন্ন করেন না, তথাপি তাঁহাদের লেখার মধ্যে প্রায়ই সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ থাকিয়া যায়। যুক্তিবাদীর পক্ষে এরূপ ব্যাখ্যা বিশেষ আদরণীয় হইতে পারে না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতাবর্জ্জিত ব্যাখ্যাই সত্যসন্ধিৎসুর আদর্শ। গীতাকার ঠিক কি বলিয়াছেন, আমরা তাহাই জানিতে চাই।

এই ধরণের নিরপেক্ষ ব্যাখ্যায় সর্ব্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন স্বর্গগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার প্রথমাংশে যে উৎকর্ষ ও বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, শেষ পর্য্যন্ত তাহা রক্ষিত হয় নাই।

মনোবিদ্যার দিক্ হইতে আমি গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। যুক্তিবাদকে ভিত্তি করিয়া গীতার আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং আমার এই ব্যাখ্যা যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতা দোষবর্জ্জিত হইবার কথা। ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত হইয়া আমি এই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হই নাই; তবে আমার ব্যাখ্যা যে অন্য দোষে দুষ্ট নহে, একথাও বলিতে পারি না। গীতায় এমন অনেক তথ্য আছে, যাহা মনোবিদ্যার দিক্ হইতে অত্যন্ত মূল্যবান্। গীতার সর্ব্বত্রই একটা সঙ্গতির অবিচ্ছিন্ন ধারা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অধ্যায়ের মধ্যেও এই সঙ্গতি বিদ্যমান। এই সঙ্গতিই যেন গীতার প্রাণ। যেখানে এই সঙ্গতি উপলব্ধ হইয়াছে, সেইখানেই বুঝিতে হইবে গীতার ব্যাখ্যা মোটামুটি নির্ভুল।

সত্যসন্ধিৎসা লইয়া গীতার ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করিলে দেখা যায়, এমন কতকগুলি শ্লোক আছে, যাহার অর্থ বুঝা কঠিন। আপাতদৃষ্টিতে এই সকল শ্লোক কবিকল্পনা, বা অনর্থক কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয়। যেমন,

> অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
> তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ৮।২৪

উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে একরূপ গতি এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে অন্যরূপ গতি কেন হইবে, আর যে-যে ভাবে হইবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাই না। তিলক মহোদয় তাঁহার গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, এই

বিশ্বাস বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শ্লোকটির অবশ্য নানারূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। যথা :—

(১) রূপক ব্যাখ্যা—

"ধূমরূপ বাসনা-বিরহিত, নিশ্চল এবং জ্যোতিঃ-স্বরূপ যে মন, তাহাই 'অগ্নির্জ্যোতি' নামে অভিহিত। দিবস সদৃশ প্রকাশময় যে জ্ঞানে নিরন্তর জাগৃতি, তাহাই 'অহঃ' শব্দদ্বারা আখ্যাত শুক্লপক্ষীয় রাত্রির নির্ম্মল ও শান্ত চন্দ্রিকার স্থায় মনের যে অবস্থা, তাহাই এস্থলে 'শুক্লপক্ষ'। চিত্তের পূর্ণ জ্ঞানময় অবস্থা এস্থলে 'ষণ্মাসা উত্তরায়ণ' শব্দের ব্যবহার দ্বারা উদ্দিষ্ট।"

এই রূপক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা বলা যায়। হঠাৎ গীতাকার কেন রূপকের আবরণে তাঁহার বক্তব্য ঢাকিলেন তাহা বুঝা যায় না। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে "যত্রকালে..." ইত্যাদি বলা হইয়াছে। 'কালে'র অর্থ 'সময়'—'চিত্ত অবস্থা' নহে। সুতরাং রূপক ব্যাখ্যা সমীচীন নহে।

(২) আক্ষরিক ব্যাখ্যা।—

এইরূপ ব্যাখ্যায়, গীতাকারের মতে উত্তরায়ণে মরিলে ব্রহ্মলাভ হয় মানিয়া লইতে হয়। যুক্তির দিক দিয়া একথা আমরা সহজে স্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং মনে হয়, ইহা কবি-কল্পনা, অথবা তৎকালীন সাধারণ বিশ্বাসের সমর্থনে কষ্টকল্পনা।

(৩) অলৌকিক ব্যাখ্যা।—

এইরূপ মরিলে সত্যই ব্রহ্মলাভ হয়। তবে তুমি আমি একথা বুঝিতে পারিব না। যোগবলে এই সত্য পাওয়া গিয়াছে, এবং স্বয়ং ভগবান যখন গীতায় একথা বলিয়াছেন, তখন তোমাকে একথা মানিতেই হইবে। যোগ-বল জন্মিলে একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

(৪) শ্লোকটি কষ্টকল্পনা বা কবিকল্পনা—এরূপ মানিয়া লইতেও বাধা আছে। যিনি গীতায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, সেই গীতাকার যে হঠাৎ একটা গাঁজাখুরি কথা বলিবেন, একথা বিশ্বাস করা দুরূহ। অবশ্য একদিকে অলৌকিক জ্ঞান, অপরদিকে ভ্রান্ত কুসংস্কারের একত্র সমাবেশ যে একেবারে অসম্ভব,

উপরের কথাগুলি মনে রাখিয়া যুক্তিবাদীর পক্ষে "শ্লোকটির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না" বলাই সঙ্গত। যেখানে আমি যুক্তিবিচারের সহিত অর্থসঙ্গতি করিতে পারি নাই, সেখানেই আমি এরূপ মন্তব্য করিব। আশা করি, ভবিষ্যতে কেহ শ্লোকগুলির সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারিবেন। ব্যাখা শুধু কথার মানে নহে। কেন কথাটি বলা হইল, পূর্ব্ব বা পরের শ্লোকের সহিত ইহার সঙ্গতিই বা কি, বিষয়টি যুক্তিসহ কি না, এই সমস্ত আলোচনাই ব্যাখ্যার বিষয়ীভূত। গীতার অলৌকিক অংশ বাদ দিলেও গীতাকারের উপদেশ বুঝিতে কিছু অসুবিধা হয় না। গীতায় কোন কোন শ্লোক বা অংশ আমি ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। তাহা বুঝিতে হয়ত অধিকতর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, অথবা তাহাদের অর্থ যোগবল ভিন্ন উপলব্ধ হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে আমি কোন ব্যাখ্যাই প্রদান করিব না।

ব্যাখ্যাকালে আমি নিম্নলিখিত পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছি :—

(ক) যেখানে কোন শ্লোকের একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভব, সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সাধারণের বোধগম্য ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছি, কারণ আমার বিশ্বাস, গীতা জনসাধারণের জন্যই লিখিত হইয়াছে, এবং গীতাকারের সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিবার যোগ্যতার অভাব ছিল না।

(খ) যেখানে কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা অন্যান্য শ্লোকের বিরোধী মনে হইয়াছে, আমি সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছি।

(গ) যে ব্যাখ্যাতে সঙ্গতির অভাব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বর্জ্জন করিয়াছি।

(ঘ) কোনও অলৌকিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করি নাই।*

* বাংলা পদ্য অনুবাদ নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি; কতক আমার পূজ্যপাদ খুল্লতাত ৺শরদিন্দু মিত্র মহাশয়ের দুষ্প্রাপ্য 'চিদানন্দা গীতা' হইতে গৃহীত; কিছু আমার পিতৃদেব ৺চন্দ্রশেখর বসুর, কিছু কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের, বাকী আমার নিজের। শ্লোকের আক্ষরিক গদ্যানুবাদ আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু কৃত। মূল শ্লোকের যতপ্রকার ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব, অনুবাদেরও ততপ্রকার ব্যাখ্যা করা সম্ভব,—ইহাই আদর্শ। অবশ্য এ আদর্শ সব শ্লোকে অক্ষুণ্ণ আছে,—এরূপ বলিতে পারি না।

বাদল

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

চাণক্য যখন লেখেন—'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ...' সে-সময় নিশ্চয় আমাদের বাদলের মত ছেলে জন্মগ্রহণ করিত না। ঐ একফোঁটা ছেলে সবে দুটো বৎসর পুরো হয়েছে, অথচ বাড়ীসুদ্ধ এতগুলা লোক ওর পেছনে হিমসিম্ খাইয়া যাইতেছি! ওর ঠাকুরমার কাছে ওর সাতখুন মাপ—এমন কি, প্রতিদিন সত্য সত্য সাতটি করিয়া খুন করিলেও—কিন্তু তাঁহার মুখেও কখন কখন শোনা যায়—"না, আমাদের কম্ম নয়; আমরা হার মানলাম বাপু, ও-ছেলেকে শাসনে রাখবার জন্যে একটা নেটেড়া রাখতে হবে...'

—অর্থাৎ 'লালন'-এর ব্যবস্থাটা বাদলের সম্বন্ধে ক্রমেই অচল হইয়া উঠিতেছে। তবে, লেঠেড়াতেও যে তাহাকে বেশ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে সে-সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে; কারণ, তাহার দৌরাত্ম্যে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এবং তাহার মা প্রভৃতি দু-একজন বড়দের মধ্যেও গোটাকতক এমেচার লেঠেড়া গড়িয়াই উঠিয়াছে; কিন্তু বাদল ত এখনও ঠিক যে-বাদল সেই বাদল!

আমি ত 'তোর যা ইচ্ছা কর বাপু' বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি,—এক রকম নিরাশ হইয়াই; কারণ, ছোট ছেলেদের—দেশের ভবিষ্যৎ আশাদের শরীর এবং মনের তত্ত্ব এবং এই দুটিকে উৎকর্ষিত করিবার উপায় সম্বন্ধে মোটা মোটা দামী ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরেজী প্রভৃতি বই হইতে এত পরিশ্রমে যে জ্ঞান এবং ধারণা আহরণ করিয়াছিলাম তাহা বিলকুল ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। আমার আটাশ টাকার পাঁচখানা অতিকায় বইয়ের কোন পাতাতেই বাদলের কোন অংশ ধরা পড়ে না। কেতাব-লেখকের পাকা, ঝুনো মাথায় যে সবের ধারণাও কস্মিনকালে আসিতে পারে না, এমন সব নিত্যনূতন অনাসৃষ্টির মতলব এই একরত্তি ছেলেটির মাথায় ঠাসা!

...এই চরিতাখ্যানের আদ্যোপান্ত পড়িলে বুঝা যাইবে যে, চেষ্টার আমি কসুর করি নাই; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছি—এ-ছেলেকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা খালি পয়সার শ্রাদ্ধ—সময় আর উৎসাহের অপব্যয়। ওর যাহা অভিরুচি করুক গিয়া।

তবে ইহার মধ্যে বাড়ির লোকেদের বেশ একটু দোষ আছে। প্রথমত—মা। তাঁহার একটা গুমর ছেলেপিলেদের সম্বন্ধে কোন ব্যাটাছেলে কিছু বোঝে না; জোর করিয়া বলেন—"একেবারে কিচ্ছু নয়, আমার কাছে লিখিয়ে নাও এ-কথা..."

আমাদের সম্বন্ধে এ রকম হীন ধারণায় রাগ হয়, বলি—"তুমি কি বল্‌তে চাও মা, এই সাত টাকা, দশ টাকা দামের বইগুলো সবাই খাতিরে পড়ে কিন্‌চে? এতে ছেলেদের..."

"—দুধ জাল হ'তে পারে পুড়িয়ে...থাম, আর বকিস্ নি বাপু..."

এর পর আর বকিতে ইচ্ছাও হয় না।

কিন্তু ইহাতে তেমন কিছু ক্ষতি নাই। ক্ষতি হইতেছে এইখানে যে, বিশেষ করিয়া বাদলের সম্বন্ধে আবার দুনিয়ার মেয়েপুরুষ কেহই কিছুই বোঝে না; —এক তিনি ছাড়া। কি করিয়া এই ধারণা মাথায় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে ও এক মহাপুরুষ হইবে—ব্যস্, ওর সাজা নাই, বকুনি নাই, এমন কি ওর দুষ্টামিতে বাধা দেওয়ারও হুকুম নাই—বলিলে চলে।

এক একবার যে রাগ দেখান সেটা একেবারে মৌখিক—আদরেরই রূপান্তর।

সেদিন শিশুদের অনুকরণপ্রিয়তা ও স্বাধীনচিন্তার উন্মেষ সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ পড়িতেছি, হঠাৎ ছেলে-মেয়েদের পড়িবার ঘরে হাসিকান্নার একটা মস্ত হট্টগোল উঠিল। একটু পরে বাম হাতে দক্ষিণ হাতটা ধরিয়া

রাণু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল। দেখি—কব্জির উপর স্পষ্ট চারিটি দাঁতের দাগ—লাল হইয়া উঠিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে করেছে ?"

"বাদল, রাক্কস্ ছেলে।"

"হুঁ, তা বুঝেছি। কোথায় সে, চল্ দেখি।"

ঘরে গিয়া তদন্তে জানা গেল গৃহশিক্ষক জগন্নাথ-বাবু যাওয়ামাত্র বাদল আসিয়া তাঁহার আসনটি অধিকার করিয়া বসে এবং শিক্ষকতার বাজে অংশ-গুলিতে সময় অপব্যয় না করিয়া একেবারে সার অংশ লগুড় চালনায় লাগিয়া যায়। ছাত্রছাত্রীরা জাড়িয়া-পরা এই কচি মাষ্টারের অভিনব মাষ্টারিখানিকটা আমোদ-চ্ছলে উপভোগ করিল; কিন্তু তাহার অব্যর্থ সন্ধানের চোটে আমোদের ভাগটা ক্রমেই সাংঘাতিক রকম কমিয়া আসিতে লাগিল। তখন রাণু লগুড়টি কাড়িয়া লয়, তাহার পর এই কাণ্ড!

বাদল একপাশে দাঁড়াইয়া, মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দিয়া অপ্রতিভভাবে সব শুনিতেছিল। হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিয়া গট্-গট্ করিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল এবং মুখটা তুলিয়া বলিল—"কাকা আম্..."

রাণু বলিল—"অমনি ছেলে ঘুষ দিতে এলেন, ভারী চালাক।"

ঘুষ লইবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। বাদলের হাতটা ধরিয়া বাড়ির ভিতর গিয়া একটু রাগত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে একে ওদের পড়বার ঘরে যেতে দিয়েছিল?—আমি না পইপই করে বারণ করে আসছি?"

মা বলিলেন—"যেতে আর দেবে কে? ও কি কারুর হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না-কি? তোমাদের এক অদ্ভুত ছেলে হয়েচে—রাজার রেয়ৎ নয়, মহাজনের খাতক নয়—মনে হ'ল ভেতরে রইল, মনে হ'ল বাইরে টহল দিতে গেল; কে ওকে রুকছে বল।"

বলিলাম—"না, দিনকতক একটু সজাগ থাকতেই হবে মা; দরকার হয় ওর মার সংসারের পাট করা একেবারে বন্ধ ক'রে দাও দিনকতকের জন্ত। তোমরা বোঝ না,- এটা ওদের নকল করবার বয়স কি-না—যত সৎ জিনিষের নকল করতে শিখবে ততই মঙ্গল। এখন যদি বাইরে গিয়ে জগন্নাথবাবুর হুঙ্কার, বেৎ আছড়ানি, কিংবা ঠাকুর আর চাকরের নিত্য ঘুষোঘুষির নকল করতে যায় ত ও একটি আস্ত খুনে হয়ে উঠবে—এই বলে দিলাম। এখন ওদের মনটা..."

মা কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, জানি, আমার কোন কথাই তোমাদের পছন্দ হয় না। কিন্তু এ ত আমার নিজের মনগড়া কথা নয়। এ যে ফরাসী লেখকের বই থেকে তুলে বলচি—সে যে-সে লোক নয়; বইটার এর মধ্যে সাত-সাতটা সংস্করণ..."

মা যেন উদ্ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আঃ, তুই থাম দিকিন বাপু; কচি ছেলে নকল করতে শেখে একথা জানবার জন্যে না-কি আমায় ফারসী আরবী বই ওটকাতে হবে, গেলাম আর কি। এই নকলের চোটেই ত গেরস্তকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েচে।...এই ত এক্ষুণি ওর মায়ের ঘরে কীর্ত্তি ক'রে এলো। ঘরের মেঝেয় একবাটি দুধ আর একটা ঝিনুক রেখে বেচারি কি কাজে একটু এদিকে এসেচে। আর আছে কোথায়!—লুসীর কোল থেকে তার ছানাটা টেনে নিয়ে গিয়ে, থেবড়ে ব'সে, সেটাকে চিৎ ক'রে কোলে ফেলে, মুখের মধ্যে ঝিনুক পুরে দুধ খাওয়ানোর সে ধূম দেখে কে!...ঘরের মধ্যে 'কেউ, কেঁউ' শব্দ কিসের? গিয়ে দেখি—ওম্মা! —ছেলে দুধের সমুদ্রের মধ্যে বসে—আর ঐ কাণ্ড!... ধমকে দাঁড়াতে, মুখের দিকে চেয়ে—"বাদো ডুডু।"

—তার মানে উনি হ'য়েচেন মা, লুসীর ছানা হয়েচে বাদল—মার বাদলকে দুদু খাওয়ানো হচ্চে।...বাঁচাতে বাঁচাতেও বৌমা এসে দিলে ঘা-কতক বসিয়ে।

এখন বল—চাও এমন সৎ কাজের নকল?...ওকে বাইরে রাখবে কি ওর জন্যে একটা খোঁয়াড় গড়বে তোমরাই ঠিক কর। বাড়ির সবাই ত হেরে বসে আছি..."

আমি বলিলাম—"আমার উদ্দেশ্য তুমি ঠিক ধরতে পারনি মা। ওর কাছে ত ভাল মন্দ ব'লে প্রভেদ নেই। —কা'কে নকল করতে হবে, কোন্‌টা নকল করতে হবে

কি ভাবে নকল করতে হবে—আমাদেরই বেছে দেখিয়ে দিতে হবে। নিজের স্বাধীন ইচ্ছে খাটাতে গেলেই গলদ। চোখে পড়লে আমাদের ধমকে ধমকে শুধরে দিতে হবে। বেশ ত আজকের এই দুটো ব্যাপারই এখন টাটকা রয়েচে,—এই দুটো নিয়েই আরম্ভ করা যাক্।"

বাদল মার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া, মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দিয়া অপরাধীর মত নিজের কীর্ত্তিকাহিনী শুনিতেছিল, আমি হাতটা ধরিয়া সামনে দাঁড় করাইয়া চোখ মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলাম—"বাদল!"

আজ ঝোঁকটা বড় বেশী পড়িয়াছে, বাদলের ঠোঁট দুটি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া মার ভাবগতিকটা লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। বিষন্ন মুখ, সামলাইয়া-লওয়া-কান্নার দুটি বিন্দু অশ্রু চক্ষে ঠেলিয়া আসিয়াছে। আস্তে আস্তে ডাকিল "গিন্নি!"

ব্যস, মা গলিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি কোলে তুলিয়া লইয়া, আদরে চুম্বনে যতক্ষণ না মুখটাতে হাসি ফুটাইতে পারিলেন ততক্ষণ নিরস্ত হইলেন না।

আমি নিরাশ হইয়া বলিলাম—"ঐ, স—ব মাটি করলে!—কি, না একটু 'গিন্নী' বলে ডেকেচে। মনের ওপর নিজের দোষের জ্ঞানটি দিব্যি জমে আসছিল—তুমি সব ভেস্তে দিলে। ঐ জিনিষটি হচ্চে অনুতাপের অঙ্কুর। তোমরা নষ্ট ক'রচ ওকে—তুমি আর দাদা মিলে..."

মা ধমক দিয়া উঠিলেন—"ক্ষ্যামা দে বাপু, ঐটুকু ছেলের না-কি আবার অনুতাপ, প্রাশ্চিত্তির—অমুঙ্গুলে কথা শোন একবার। ক'রে নিক যত দুষ্টুমি করবে ও—শেষ পর্য্যন্ত একটা মহাপুরুষ হবেই ব'লে দিচ্ছি। ...তোরা সব লক্ষণ চিনিস্ না..."

এই অবস্থা। চুপ করিয়া ভাবিতে থাকি; দুঃখ হয়—এঁরা বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া ঘেঁষেন না, মেথড্ বোঝেন না—ইনি আর দাদা। এ-বিষয়ে দাদার গাফিলতি আরও মারাত্মক, কেন-না, তিনি আবার বিচার এবং শাসনের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সেটা প্রকাশ করেন।

২

কোর্ট থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গে দাদার ঘরে তাঁহার দৈনন্দিন ঘরোয়া কোর্ট বসিয়া গিয়াছে। এক পাল বাদী—রাণু, আভা, ভোম্বল, রেখা—আরও সব। ফরিয়াদী মাত্র একটি,—বাদল। সে বিচার-পদ্ধতির সনাতন ধারা লঙ্ঘন করিয়া জজের কোলে বসিয়া লেবেঞ্চুস্ খাইতেছে এবং অবসর-মত মাথা সঞ্চালন করিয়া কি একটা সুর ভাঁজিতেছে।

নানা রকম ছোট বড় নালিসের চোটে ঘরের মধ্যে হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। রাণুর হাতে দাঁতের ছাপ, আভার মাথা-ভাঙা কাঁচের পুতুল, রেখার ছেঁড়া বই—ভোম্বলের ছেঁড়া চুল—এক প্রলয় কাণ্ড! চৌকাঠের বাহিরে লুসীও তাহার পাঁচটি নিরীহ, বিপন্ন, অত্যাচার-গ্রস্ত শাবক পাশে লইয়া দীন নয়নে বিচারাসনের দিকে চাহিয়া আছে। দেখিলে এক একবার মনে হয় বটে তাহার সপরিবারে ঐ লেবেঞ্চুসটির দিকে লোভ; কিন্তু সে বেচারি ছাপোষা, সে বাদলের অত্যাচারে উদ্বাস্ত হইয়া ন্যায়ের দ্বারস্থ হইয়াছে, এ অনুমানেও কোন বাধা দেখি না।

এমন জবরদস্ত মোকদ্দমা দাদা দু-কথায় শেষ করিয়া দিলেন। পকেট হইতে কাগজে মোড়া খান-চার-পাঁচ বিস্কুট বাহির করিয়া ফরিয়াদীকে প্রশ্ন করিলেন,—"এগুলো সমস্ত পেলে আর দুষ্টুমি করবে না, বাদল?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"মন্দ বিচার নয়। আমারও একটু দুষ্টুমি করবার লোভ হচ্ছে। কাল আবার দুষ্টুমি করলে জরিমানার পরিমাণ ডবল হয়ে যাবে ত?"

দাদা বলিলেন,—"ও, এই-সব করেচে ব'লে বিশ্বাস হয়?—ওর চোখ দু'টো দেখ্ দিকিন।"

বেঁটে, চওড়া চওড়া গড়ন, একটু ঘাড়ে-গর্দ্দানে;—আর এই রকম ধড়ের উপর প্রকাণ্ড একটা মাথা,—এগুলো সবাই বাদলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুটি সত্যই একটু গোল বাধায় বটে—যদি বাদলের সঙ্গে অষ্টপ্রহর পরিচয় না থাকে। আর সে রকম পরিচয় দাদার বড় একটা নাই-ও।

সকাল সকাল দুইটি খাইয়া আপিস যান; প্রায় সন্ধ্যার সময় আসেন। ডাক পড়ে—"বাদল!"

শান্তশিষ্ট শিশুটি আসিয়া উপস্থিত হয়। দাদার জন্য বিশেষ-করিয়া পরান পরিষ্কার জামা গায়ে, হাতমুখ যত্ন করিয়া মোছান। আসিয়াই গোটাকতক চুমো উপঢৌকন, প্রায় কাঁদকাঁদ হইয়া একবার "একা" একবার "আমুর" নাম উচ্চারণ—মানে, রেখা ও রাণুর হাতে আজ সমস্ত দিনটা নির্যাতন গিয়াছে। সান্ত্বনা-স্বরূপ লেবেঞ্চুস্-প্রাপ্তি।

তারপর জেঠার সেবা। জুতা রাখিয়া দেওয়া, চটি আনিয়া তাহার পা-দুখানি পাতিয়া বসাইয়া দেওয়া, হাত পা ধুইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—যেন কোন্-বাড়ি-না-কোন্-বাড়ির ছেলে…

দাদা তৈয়ার হইলে ভাঁড়ার ঘরে গিয়া দাদার জল-যোগের বন্দোবস্তের জন্য মোতায়েন হওয়া—পানের ডিবা হাতে করিয়া আবার প্রবেশ ··

তাহার পর বসিয়া বেশ পরিপাটি ভাবে দাদার জল-খাবারের রেকাবীর ভার লাঘব করা…

এই অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায় বাদল দাদার সঙ্গে খানিকক্ষণ হুড়াহুড়ি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পাশে শুইয়া পড়িয়াছে—দাদা আস্তে আস্তে রগের উপর করাঘাত করিতেছেন, এবং বাদলের শান্ত অধরে তাহার —"ভাত আস্‌চেন আমি খাচ্ছেন"-শীর্ষক স্বরচিত প্রিয় গানটি মৃদুতর হইয়া মিলাইয়া আসিতেছে।

আমি বলিলাম—"ওর চোখ-দুটো ত মারামারির জন্যে হয়নি; ওকে বাঁচাবার জন্যে হ'য়েচে, বাঁচাচ্ছেও বেশ। কিন্তু ওর হাত পা আর দাঁত—যা ওর অস্ত্র—সেগুলো দেখে তোমার কোন সন্দেহের কারণ আছে? —যদি থাকে ত না হয় বাঁখারিগুলোও আনিয়ে দিই।"

দাদা হাসিয়া বলিলেন,—"শুনছ বাদল, বাদীরা নিজের মুখেও নালিশ করলে আবার ভাল উকিলও রেখেছে। এখন তোমার কি বলবার আছে—বিশেষ ক'রে বাঁখারি সম্বন্ধে?"

বাদল দাদার হাঁটু-ঘোড়ার উপর ঘোড়সওয়ার হইয়া বসিয়া ঘোড়াকে চালাইবার নানা উপায় লইয়া ব্যস্ত ছিল; বাঁখারির কথা শুনিয়া শড়াৎ করিয়া নামিয়া পড়িয়া গট্‌গট্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমরা তাহার এই হঠাৎ তিরোভাবের কারণ না ধরিতে পারিয়া তাহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় বাদল একখানা চওড়া, প্রায় হাতখানেকের বাঁখারি লইয়া প্রবেশ করিল।

চৌকাঠ না পার হইতেই ছেলেমেয়েগুলো কলরব করিয়া উঠিল; কেহ বলিল—"ওটা ওর তরওয়াল, ওই দিয়ে আমার কপালে মেরেছিল—এই দেখ," কেহ বলিল —"ওটা আমার রাঁধার হাতা; আমায় দিয়ে দিতে বল।" সব চেয়ে ছোট সন্তানবৎসলা আভা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—"না গো না, ওটা হাতা নয়, তরওয়াল নয়—আমার ছেলে, ওর কাপড় কেড়ে নিয়েছে বাদলা।"

বাদল এসবের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সটাং দাদার কোলে গিয়া বসিল, এবং তাহার অচল ঘোড়াটিকে গতিবান করিবার জন্য তাহার এই নূতন আমদানি করা সূক্ষ্ম চাবুকটি উঁচাইয়া ধরিল।

দাদা হাসিয়া উদ্যত চাবুকটি ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"আহা বাদল, ঘোড়া দুটো সমস্ত দিন তোমার জেঠাটিকে ব'য়ে ব'য়ে এলিয়ে পড়েচে,—আর এর ওপর ঠেঙিয়ে কাজ নেই…"

বাদল দাদার মুখের দিকে চাহিয়া নালিশের সুরে বলিল—"দুষ্টু।'

দাদা বলিলেন—"আহা কিছু খায় নি কি-না অনেকক্ষণ, তাই দুষ্টু হয়েচে।"

তোমায় একটা ভাল ঘোড়া কিনে দোব'খন, কি বল?"

আমায় বলিলেন—"কালকে কামার-বাড়িতে একটা কাঠের ঘোড়ার কথা ব'লে দিসতো।"

বলিলাম—"দোহাই, আর উপসর্গ বাড়িয়ে কাজ নেই। যা সরঞ্জাম সব মজুত ··"

দাদা শেষ না করিতে দিয়া বলিলেন—'না, কাজ কি? —আমার ঠ্যাং দুটো ঐ আখাম্বা বাঁশপেটা থাক আর কি।··এখন ঐ ঝোঁক চেপেচে—সেদিনে রমনায় ঘোড়দৌড় দেখে।"

বলিলাম,—"কামারকে ব'লে দিতে বিশেষ আমার আপত্তি নেই, স্রুধু ভয় এই যে, আর একটা ঝগড়ার ঘর বাড়বে। আর, তা ভিন্ন কচি ছেলের ঝোঁকমত সব বিষয়েই জোগান দিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়, তাতে ওদের মন একটা নির্দ্দিষ্ট গতি পায় না। এ কথাটা বেশ সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েচেন বিখ্যাত জার্ম্মান লেখক ফন্ ..."

দাদা বিরক্তভাবে বলিলেন,—"তোর ঐ কেতাবী বুলি রাখ দিকিন। ছেলেপিলের মন এখন হাজার পথে হুহু ক'রে দৌড়বে,—ও মাঝ থেকে পাহাড়-প্রমাণ কেতাবের লাইন ঘেঁটে ঘেঁটে হয়রান হ'ল। বাংলা কথা হচ্ছে—ছোট ছেলের ঘোড়ার সখ হয়েছে—তাকে একটা কিনে দিতেই হবে। না দাও—আমার হাঁটু, তোমার কাঁধ, চেয়ারের হাতল, ছাতের আলসে—যা সুবিধে পাবে ঘোড়া ক'রে বসে থাকবে। শেষকালে একটা কাণ্ড ঘটাক আর কি..."

আভা বলিল—"বা রে, ও আমাদের মারলে আর ওকেই বিস্কুট দেওয়া হ'ল; আবার একটা ঘোড়া পাবে .."

রেখার কথায় ইহার মধ্যেই বেশ ঝাঁঝ হইয়াছে। একটু পিছনে ছিলই, সেই আড়াল হইতে বলিল—"ও ছেলে কি-না; আমরা সব বানের জলে..."

দাদা রাগ দেখাইয়া বলিলেন—"কে রে?—রাখী বুঝি?...মেয়ে হ'তে গিছলে কেন?"

রেখা আর একটু আড়ালে সরিয়া গিয়া বলিল—"বাদলের মার খাবার জন্যে।"

দুজনেই হাসিয়া উঠিলাম, দাদা বলিলেন—"একেবারে পেকে গেছে হতভাগা মেয়ে।...নাঃ, এরা বেজায় মরিয়া হ'য়ে উঠেছে।...আচ্ছা, তোদের বিচার ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়া।"

ডাকিলেন—"বাদলবাবু, এদিকে এস ত, লক্ষ্মী-ছেলে।"

বিচারের আশায় বাদীমহলে একটু চঞ্চলতা, ফিস্‌ফিসানি পড়িয়া গেল। বাদল দাদার ইজিচেয়ারের পিছনে গিয়া দুলিয়া দুলিয়া বিস্কুট খাইতেছিল এবং রেখার সহিত লুকোচুরি খেলা করিতেছিল; ডাক শুনিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাদা রাণুর হাতটা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"এ কি করেচ বল ত?...এ তোমার কে হয়?"

গড়পড়তা রোজ এ রকম দশবারটি বিচার অভিনয় হওয়ায় বাঁধা-গৎটি বাদলের খুব রপ্ত। দাদার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে খাসা নির্ব্বিকারভাবে নিজের কান-দুটি ধরিয়া বলিল—"ডি ডি অয়।"

"প্রণাম কর।"

হুকুমের পূর্ব্বেই সে অর্দ্ধেক ঝুঁকিয়াছিল, প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ধির স্বাক্ষর-স্বরূপ রাণু একটা চুমা খাইল।—বাঁধা-রীতির আর একটা অঙ্গ ..

এই রকম ভাবে দোষের গুরুত্ব লঘুত্ব নির্ব্বিশেষে পাচটি মোকদ্দমার এই একই পদ্ধতিতে বিচারকার্য্য শেষ হইলে দাদা বলিলেন,—"কেমন, তোমাদের আর কোন দুঃখু নেই ত? বাদলের সাজা মনে ধরেচে? আর কোন নালিশ নেই?"

ও-বয়সে ভাব করিবার ইচ্ছাটাই প্রবল, সেইজন্যই হোক, কি এর বেশী বিচারের আশা নাই বলিয়াই হোক, সবাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না।"—এক রেখা ছাড়া। তাহার ঐতিহাসিক দৃষ্টিটা বেশ তীক্ষ্ণ, বলিল—"আবার কাল।"

দাদা হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ কালকের কথা কাল দেখা যাবে। এই চারখানা ক'রে বিস্কুট নাও সব; বাদল যদি দুষ্টুমি করে একটু ক'রে ভেঙে দিও সব, ঠাণ্ডা থাক্‌বে। যাও বিচার শেষ।"

না বলিয়া পারিলাম না—"এই একঘেয়ে নকল-বিচারে ওর মনে কোন দাগ বসাতে পারে না—এই জন্যেই..."

দাদা তাঁহার সেই হাসির হিল্লোল তুলিয়া বলিলেন—"দাগ বসাতে হ'লে ত ওরই বিদ্যে শিখতে হয় আমাকেও,—রাণুর কব্জিটা দেখেছিস্ ত?...আমার দাঁতে অত জোরটোর নেই বাপু..."

সবাই চেঁচামেচি করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাদল দাদার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"দাত্তা, দুচী?"

দাদা আমায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন; অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, লুসী, আমি যতদূর দেখছি, শৈলেন..."

বাদল আধ-খাওয়া বিস্কুটটা লুসীর দিকে বাড়াইয়া ডাকিল—"আঃ আঃ।"

লুসী আপনার বাচ্ছাগুলিকে ঘাড়পিঠ হইতে ঝাড়িয়া দিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে উপস্থিত হইল।

দাদা বলিয়া যাইতেছিলেন—"এই ত গ্রামে নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব—দল পাকাতে পেলে সব ছেড়ে তাইতে মেতে উঠে—কতটা দুঃখের বিষয় বল্ ত... তুই হাস্‌চিস্ যে?"

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তিনিও সজোরে হাসিয়া উঠিলেন। বাদল তাঁহার বিচারের ত্রুটিটুকু পূরণ করিয়া দু-হাতে দুটি কান ধরিয়া লুসীর সামনের থাবা দুটির উপর মাথা দিয়া পড়িয়া আছে এবং লুসী তাহার দীর্ঘ জিহ্বা দিয়া পরম ক্ষমাভরে তাহার মাথা পিঠ চাটিয়া চাটিয়া একশা করিয়া দিতেছে...

দাদার বিচারের সদ্য সদ্য আলোচনা করিবার এমন চমৎকার সুযোগটা আমি নষ্ট হইতে দিলাম না। হাসিতে হাসিতেই বলিলাম—"তোমার বিচারের ফার্স্ট'টা যেটুকু অসম্পূর্ণ ছিল, বাদল নিখুঁৎভাবে সেটা পূরিয়ে দিলে, দাদা।"

৩

পরের দিন সকালে দাদার ঘরে বাদলের কথা হইতেছিল। মা বলিতেছিলেন—"ওর ত সর্ব্বজীবে সমান ব্যবহার হবেই—ও সব লক্ষণই আলাদা। স্থির হয়ে এক এক সময় যখন ব'সে থাকে ঠিক পরমহংসদেবের মত মুখের ভাবটি হয় দেখিস না?—তিনিও নিশ্চয় ছেলেবেলায় ঠিক অমনটি ছিলেন। আর তা ছাড়া অমন একটা বড় তীর্থে জন্মেচে—ও একটা মহাপুরুষ না হয়ে যায় না,—তোরা সব..."

এমন সময় বারান্দায় চটাস্ করিয়া একটা প্রচণ্ড চড়ের আওয়াজ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাদলের ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিবার আওয়াজ!

মা তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন—"ও কি বউমা, ছেলের গায়ে হাত?—আর ঐ রকম হাত! দিন-দিন যে কষাই হয়ে উঠছ..."

বৌমার চাপা গলায় ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যাইতে লাগিল—"আমি ত আর এই ডানপিটে চোরকে নিয়ে পারি না মা; দেখবে চল, রান্নাঘরে কি কাণ্ডটা করেচে হতচ্ছাড়া ছেলে।"

দৃশ্যটি নিশ্চয় খুবই মনোজ্ঞ, সবাই উৎসুকভাবে উঠিয়া গেলাম।—সরেজমিনে বাদল মুখের মধ্যে চারিটি আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—দুই হাতের কনুই পর্য্যন্ত ঝোলে সবুজ হইয়া গিয়াছে—বাম হাতের মুঠোর মধ্যে একমুঠো মাছ। কান্না থামিয়া গিয়াছে; কিন্তু তখনও তাহার মাকে অতিক্রম করিয়া এদিকে আসিয়া পড়িবার মত সাহস জোগাইয়া ওঠে নাই।

দাদা একেবারে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"ওমা, তোমার সাধুপুরুষের সর্ব্বজীবে সমভাবের আর একটা নমুনা দেখ—এইখানে এস—ঐ জলের টবটার আড়ালে!"

সেখানটা হঠাৎ কাহারও দৃষ্টি যায় না, আর বাদল কিংবা লুসী ভিন্ন কেহ প্রয়োগ করিতেও পারে না। সেই অন্ধকার কোণে ঝক্‌ঝকে একখানি রেকাবীতে আধ সের পরিমাণ মাছের মুড়া একটা—রেকাবীর এধারে ওধারে কাঁটাকুটা দু-একটা পড়িয়া আছে।—লুসী আরম্ভ করিয়াছিল—এখন সভয়ে গুটিসুটি মারিয়া দীন নয়নে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

দাদা হাসিতে হাসিতে রাঙা হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—"আবার মাজা রেকাবীতে তোয়াজ ক'রে।... ও বাদল, ওটি আমাদের নাত-বৌ নাকি?"

দার্শনিক হিসাবে বাদল একজন সুবিধাবাদী। বুঝিল আর দেরি করা নয়। যেন মস্ত একটা ইয়ারকি চলিতেছে—যাহার মর্ম্ম সুধু দাদা আর সে বোঝে—এই ভাবে দাদার পানে চাহিয়া—"নাত-বো!" বলিয়া খুব বড় করিয়া একগাল হাসিয়া পা বাড়াইল, কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মার চোখের দিকে নজর পড়ায় থমকিয়া মুখে চারিটি আঙুল পুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রেখা হাসিয়া বলিল—"ও সাধুপুরুষ! তোমার আবার চুরিবিদ্যে…"

মার ধমক খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল।

আমরা সরিয়া গেলেই বৌমাকে আর দেখা যাইবে না; অন্ততঃ রুখিবার পূর্ব্বেই লুসী-ঘটিত এই নূতন আবিষ্কারের ঝাল তিনি ঝাড়িয়া লইবেনই। মা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বাদলকে বাহির করিয়া আনিলেন। পরমহংসদেব থেকে একেবারে চুরির দায়ে গ্রেপ্তার—নাতি তাঁহাকে একটু অপ্রতিভ করিয়া ফেলিয়াছে বইকি!

কাহারও দিকে না চাহিয়া বলিলেন—"ও আমার ননীচোরা, তাঁরও চুরি ক'রে না খেলে পেট ভরত না।… নে, আর জটলা করতে হবে না সব—হাতে-নাতে পাট সেরে নে…"

এই রকম এক একটা কাণ্ডের খুব খানিকটা হল্লা হাসি হয়… যোগদান করি—তারপর বিষণ্ণ হইয়া পড়ি। একটা গোটা ছেলের ভবিষ্যৎ—সোজা কথা নয় ত? এদিকে দেশের এই দুর্দ্দিন…

মাকে বলিলাম—"দেখ মা, এ ঠিক হচ্ছে না। এতে ক'রে নাতি তোমার "পরমহংসদেবও" যত হবে, ননীচোরাও তত হবে, আর বাবার "রোঘোডাকাত"ও খুব হবে—এঁর ঠ্যাঙ ওঁর ধড়, তার মুড়ো নিয়ে যা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে উঠবে দেখবার মত। তার চেয়ে দিনকতক আমার হাতে দাও। বেশ ত, সাধুপুরুষ চাও? সেই রকমভাবেই…"

মা বলিলেন—"তোর কাছে সব ছাঁচ আছে না-কি, যে, ঢালাই ক'রে যেমনটি চাইবি গ'ড়ে টেনে তুলবি? তা রাখ্ না বাপু তোর কাছেই। এতগুলো লোককে নাজেহাল ক'রে তুলেচে—পারবি ত একা সামলাতে?"

দাদা বলিলেন,—"কিছু না, ওকে একটা ঘোড়া কিনে দে আপাততঃ; কিছুদিন ঠাণ্ডা থাকবেখন।"

বলিলাম—"ঘোড়ার খেয়ালটাই মাথা থেকে সরিয়ে দিতে হবে। ঐ জিদ্‌ভাঙা দিয়েই আরম্ভ করব…"

"আর ও-ও তোমার প্রান-ভাঙা দিয়ে শেষ ক'রবে—এই বলে রাখলাম। কি বাদল, পারবি ত?" হাসিতে লাগিলেন।

সেইদিন হইতেই আরম্ভ করিয়া দিলাম। ঠিক হইল এক খাওয়ার সময় ছাড়া বাদল সমস্ত দিন আমার কাছে থাকিবে। সন্ধ্যা থেকে দাদার চাই-ই; অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হইলাম, কিন্তু সমস্ত দিনের অপকীর্ত্তির বিচারের ভারটা দাদার হাত হইতে তুলিয়া লইলাম। বলিলাম—"ও ব্যাপারটাকে অত হাল্‌কাভাবে নিলে চলবে না—বিচারটা বেশ সূক্ষ্মভাবে ওর সমস্ত দিনের কাণ্ডকারখানার আলোচনা হবে,—রোজকার রোজ ওর মনের কোন বৃত্তিকে একটু একটু ক'রে উস্‌কে দিতে হবে, আবার কোনটাকে বা অল্প অল্প করে নিবিয়ে আনতে হবে…"

দাদা হাসিয়া বলিলেন—"মন্দ হয় না; তা হ'লে শীগ্‌গির মনোবৃত্তির একটা টেম্পারেচার চার্ট তোয়ের ক'রে ফেল্। রোগীটিকে বাইরের ধুলো বাতাস থেকে বাঁচিয়ে কোন্ ঘরে পুরে রাখবি?"

রাগিয়া বলিলাম—"ঘরে পোরবার দরকার আছে বল্‌ছি কি? হাসবে খেলবে, একটু মারামারিও করবে—এমন কি, চুরিও করতে পারে মাঝে মাঝে—তবে একটা সিষ্টেমের মধ্যে।…স্পার্টান্‌রা ত তাদের ছেলেদের চুরি করতে…"

দাদা আবার হাসিয়া উঠিলেন—"অর্থাৎ ছেলেটাকে তুই একটা সিষ্টেমেটিক্ চোর করতে চাস্? হাঃ-হাঃ-হাঃ!"

দাদাকে পারিবার জো নাই।

পরের দিন সতের টাকা দামে দুই ভলুম বই আনিতে দিলাম। অথর আমেরিকার একজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক; সমস্ত জীবন অবিবাহিত থাকিয়া কেবল শিশুমনের আলোচনা করিয়াছেন।

মা শুনিয়া বলিলেন—"নে, আর জ্বালাস্ নি বাপু, যে বিয়েই করলে না, ছেলেপিলের মুখ দেখলে না, সে শিশুদের বিষয় কি বুঝবে? ঢং একটা…।"

দাদা বলিলেন—"কেন, এক সময় নিজে ত শিশু ছিল…"

এ সব ঠাট্টায় কান দিলে চলে না। বই দু'খানা সযত্নে মলাট দিয়া আলমারিতে তুলিলাম। আমার

অন্যান্য বইগুলাকেও ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সাজাইয়া রাখিলাম।

দুই চারি দিন গেল। আমার কেতাবের ছত্রগুলি লাল নীল দাগের উর্দ্দি পরিয়া আমার সাহায্যের জন্য মোতায়েন হইয়া উঠিল। প্রথমটা বাদলকে একচোট অগাধ মুক্তি দিয়া দিলাম,—বাড়িতে অষ্টপ্রহর সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল। মা বলিলেন—"এই কি তোর শাসন হচ্ছে?—এর চেয়ে সে যে ঢের ভাল ছিল।"

মাকে ছকটা বুঝাইয়া দিলাম। "হোমিওপ্যাথি ওষুধে প্রথমে রোগটা একচোট বাড়িয়ে তোলে।... আমি ওর সমস্ত দোষগুণগুলো ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুলে ওকে ভাল ক'রে চিনে নিচ্ছি আগে,—সপ্তাখানেক লাগবে..."

মা বলিলেন—"তদ্দিনে বাড়ির অন্য ছেলেপিলেদের আর চিন্‌তে পারবে না কিন্তু, এই ব'লে দিলাম। আজ খুমুন্তু আভার মুখে পাউডারের সমস্ত কৌটা গেছে,—দম আটকে যায় আর কি!...ঐ গো, আবার বুঝি কি কাণ্ড বাধালে—ওরে, কে আছিস্—দেখ—দেখ..."

চার দিন গেল, ছয় দিন গেল, দশ দিন গেল—চিনিতে অত্যধিক দেরি হইতেছে—উত্তরোত্তর শক্তও হইয়া উঠিতেছে যেন,—দুষ্টামিতে বাদলের নিত্য নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার জন্য।...ক্রমে দেখিতেছি—এ বেলা একরকম, ও বেলা একরকম। নালিশের চোটে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি।—দাদা বলেন—'শৈলেনের কাছে যা', মা বলেন—'শৈলেনের কাছে যা; কিছু ব'ললে আমাদের ওপর চট্‌বে।' বৌয়েদের মুখেও ঐ কথা। আবার তাঁদেরও নিজের নিজের নালিশ আছে।

অথচ আমি চটিব না; একটুও চটিব না; কিন্তু সে কথা বলি কি করিয়া? ছেলেপিলেদের মধ্যে যে নালিশ করিতে আসিতেছে সেই উল্টা মার খাইয়া গেল—এমন ব্যাপারও ঘটিতেছে দু-একটা। বলি—"মাথায় ধুলো দিয়ে দিয়েছে ত দিক্ দু'দিন; আমায় বই পড়ে নেবারও একটু অবসর দিবি নি তোরা?"

আসলে ঠিক বই পড়া নয়। বইয়ে দাগ দেওয়া থেকে এখন সমস্ত পাতার ওপর ঢেরা কাটায় দাঁড়াইয়াছে,—বোধ হয় রাগের মাথায় দু-একখানা পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াও থাকিব।...আমার মুখ দিয়া কি ইহারা না বলিয়াই ছাড়িবে না?...এদিকে সপ্তাহখানেক ছুটি বাড়াইব বলিয়া যে ঠিক করিয়াছিলাম, সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি; বোধ হয় ছুটি ফুরাইবার সপ্তাহখানেক আগেই চলিয়া যাইতে পারি।

আজ পনের দিনের দিন। নবীনতম সংবাদ—বাদল বাবার গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিল, বাবার মত ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া। আভা চোখ দুটা এত বড় করিয়া আসিয়া খবর দিল—"একবার দেখবে এসো আস্পদ্দাটা!..."

একটা চড় কষাইয়া দিয়া বলিলাম—"আর তুমি কোথায় ছিলে, পোড়ার বাঁদর? ছোট ভাইটিকে একটু চোখে চোখে রাখতে পার না?"

অর্থাৎ আভার হাতেও অভিভাবকত্বের ভারটা ছাড়িয়া দিতে রাজী আছি।

বলিলাম—"ধ'রে নিয়ে আয় হতভাগাকে।"

—সেটা দৈহিক সম্ভাবনার বাহিরে জানিয়া নিজেই গেলাম। দেখি—একবর্ণও মিথ্যা নয়। অবশ্য কলিকাতে আগুন নাই; কিন্তু টানার ভঙ্গী নিখুঁৎ—মায় বাবার কাশিটি পর্য্যন্ত। বাবার প্রতিবেশী বন্ধু উপেনবাবু আসিলে নলটি বাড়াইয়া দেন,—সেটুকুও বাদ গেল না; আমি সামনে আসিতেই মুখ থেকে নলটা সরাইয়া "কুলো, এতো"—বলিয়া হাতটি বাড়াইতে যাইতেছিল; আমার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া মাঝপথেই থামিয়া গেল।

খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আমি কানমলা কি ঐরকম একটি ছোটখাট সাজা দিতে যাইতেছিলাম, একটা কথা ভাবিয়া থামিয়া গেলাম।—হঠাৎ মনে হইল —বাদল নিশ্চয় এটা দোষ বলিয়া আগে জানিত না। কেন-না, জানিয়া শুনিয়া যে দোষ করা তাহাতে ধরা পড়িলেই বাদল নিজে হইতেই কান ধরিয়া পূর্ব্বাহ্নেই হাঙ্গাম মিটাইয়া রাখে। তাভিন্ন দোষ বুঝিলে আমাকে দেখা মাত্রই ডরাইয়া যাইত নিশ্চয়; "খুড়ো, এসো" বলিয়া এভাবে সটকাটা বাড়াইয়া দিতে সাহস করিত না।

আমি এটিকে নিছক একটি দৈব সুযোগ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। অপরাধটি একেবারে নূতন, কেন-না, বাবা কখনও নল বাহিরে ছাড়িয়া যান না,—কেমন ভুল হইয়া গিয়াছে।—দামী রবারের নল, এখানে পাওয়া যায় না; তাঁহার অত্যন্ত হেফাজতের জিনিষ।

এই অপরাধটিকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাক্। এখন থেকেই অপরাধের গুরুত্বটি মাথার মধ্যে এমন করিয়া সাঁদ করাইয়া দিতে হইবে যেন এ জাতীয় অপরাধ সমস্ত জীবনে আর না করে···

নিজের ঘরে লইয়া আসিয়া বাদলকে একখানি মাদুরে বসাইলাম এবং সামনে একটি টুলের উপর নলসুদ্ধ গড়গড়াটি বসাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঐ দেখ্, আর মুখ দি'বি ওটাতে?"

এ নূতন ধরণের অভিজ্ঞতায় বাদল একেবারে হকচকিয়া গিয়াছিল; আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িল।

"ঠিক ঐ ভাবে ব'সে থাক্,—বজ্জাৎ কোথাকার"—বলিয়া আমি শেল্‌ফ হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতে লাগিলাম।

একটু পরে আবার ফিরিয়া তাকাইলাম,—বাদল জড়ভরতের মত ঠায় সেইভাবে বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"দিবি আর মুখ ওটাতে?"···পেরেকের মাথায় একটি একটি করিয়া ঘা দেওয়া হইতেছে···

সেইরকম মাথা নাড়িল—"না।"

"বসে থাক্ ঠিক ঐভাবে,—ঐদিকে চেয়ে···"

বইয়ে ঠিক এই ধরণের চিকিৎসার কথা লিখিতেছে; সেইখানটা খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম।—বলিতেছে—সাজা কড়া হইবার কোন দরকার নাই; একটি গাম্ভীর্য্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া দোষের গুরুত্বটা মাথার মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। বার্লিনের পাঁচটি চিকিৎস্য শিশুর কেস্ দেওয়া আছে; রীতিমত রেকর্ড রাখিয়া দেখা গিয়াছে সাত বৎসরের মধ্যে তাহারা সে দোষ আর করে নাই—অথচ সব জার্ম্মাণ বাচ্ছা!

বিবৃতিটি এতই চিত্তাকর্ষক যে, চোখ ফেরান যায় না। পড়িতে পড়িতেই থাকিয়া থাকিয়া তিন চার বার প্রশ্ন করিলাম—"আর দিবি মুখ ওতে?"

উত্তর নাই,—বুঝিতেছি সেই রকম ভাবে মাথা নাড়িতেছে।

খানিক পরে সমস্ত অধ্যায়টি শেষ করিয়া বইটা মুড়িয়া রাখিলাম। নিজের পরীক্ষার এই আশু সফলতায় মনে মনে তৃপ্তিবোধ হইতেছিল। বেশ নিশ্চিন্তভাবে—"আর ওটাতে দিবি না তো মুখ, অ্যাঁ?"—বলিয়া ফিরিয়া উঠিয়া বসিলাম।

কোথায় বাদল?—মাদুর শূন্য—টুলের ওপর খালি গড়গড়া,—সটকা নাই!

হাঁকিলাম—"বাদল!"

ও বারান্দা হইতে উত্তর আসিল—"অ্যাঁগোন্!"—ওর বাবার শেখান ভদ্রতা,—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাদল ব্যবহার করে।

উঠিয়া গিয়া ব্যাপার যা দেখিলাম তাহাতে ত চক্ষু স্থির!

রবারের নলের আধখানা লইয়া লুসীর বাচ্ছারা খেলা করিতেছে, আধখানা ঘোড়ার লাগামের আকারে লুসীর মুখে,—বাদলের হাতে তাহার খুঁট দুটো—মুখে 'হ্যাট্—হ্যাট' শব্দ চলিতেছে!

লুসী মাংসভ্রমে পরম পরিতোষ সহকারে চিবাইয়া যাইতেছে—এটারও দুখানা হইয়া যাইতেছে আর দেরি নাই।···বাবার সখের নল,—সমস্ত রাধাবাজার উজাড় করিয়া বাছিয়া কেনা।

একটুখানির মধ্যেই বাড়িতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল—বাবা আসিয়া সটকার খোঁজ করিতেই। বৌমার নির্দ্দয় প্রহারে বাদলের বাড়ি ফাটান কান্না—মার বৌমাকে বকুনি,—আর সমস্তটাই এমন দ্ব্যর্থক যে, প্রত্যেকটি কথা আমার ওপর একটু বক্রভাব খাটে; লুসীর চীৎকার করিতে করিতে গৃহত্যাগ এবং তাহার বাচ্ছাদের গৃহের মধ্যে থাকিয়া অসহায় ভাবে চীৎকার···

দাদা ক্রমাগতই বলিতেছেন—"বল্‌চি ওকে একটা ঘোড়া কিনে দে—সেদিন পই পই ক'রে বুঝিয়ে বল্‌লাম···"

বাবা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' তিরস্কার লাগাইয়াছেন,—তাহার মধ্যে সে কাল এ কালের তুলনামূলক ব্যাখ্যান

আছে—এ-সংসারে তামাক ধরার জন্য আত্মধিকার "আছে—বিজ্ঞান মাত্রেরই—বিশেষ করিয়া মনস্তত্ত্বের শ্রাদ্ধ কামনা আছে…

বলিতেছেন—"ভড়ংয়ের যেন যুগ পড়ে গেছে—ছেলে ত আমিও মানুষ করেছি—একটা আধটা নয়…"

মা শেষ করিতে দিলেন না; আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন, মুখটা বিরক্ত ভাবে ঘুরাইয়া লইয়া ঝাঁঝিয়া বলিলেন—"ছাই মানুষ ক'রেছ—আর বড়াই করতে হবে না…"

শিশু মনস্তত্ত্বমূলক সাতখানি নামজাদা পুস্তকের গ্রাহকের জন্য 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' বিজ্ঞাপন দিয়া দিয়াছি।

সেকালের কলিকাতা

শ্রীহরিহর শেঠ

জব চার্ণক্ নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক কর্ম্মচারী ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকাযোগে সুতানুটীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি পূর্ব্বে আরও দুইবার আসিয়া ছিলেন। তিনিই বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। যে সময় তিনি আগমন করেন তখন মজুমদার বংশীয় বিদ্যাধর রায় চৌধুরীর জায়গীরের মধ্যে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম তিনটি ছিল। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আলমগীরের পৌত্র আজিম-উশ্-শান্-এর নিকট হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ষোল হাজার টাকায় উহা খরিদ করেন। তখন তিনটি গ্রামের পরিমাণ ছিল মোট ৫,০৭৭ বিঘা। প্রথম প্রথম কোম্পানীকে মোগল সরকারে ১২৮১৷৷০ খাজনা দিতে হইত।

কোম্পানী যখন প্রথম এখানে আসেন, তখন শেঠ, বসাক ও মজুমদার উপাধিভূষিত বেহুলার সাবর্ণ চৌধুরীরাই এখানকার প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। শেঠ বসাকরাই এখানকার প্রাচীনতম অধিবাসী, ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া তাঁহারা সুতানুটীতে বাসস্থাপন করেন। সুতানুটীর হাট পত্তন তাঁহাদের দ্বারাই হয়। চার্ণকের এ স্থান মনোনীত করার অন্যতম কারণ এই শেঠদের সহিত ব্যবসা-সম্পর্ক স্থাপন।

প্রথম কিছুকাল কোম্পানীর সমস্ত কর্ম্মচারীর থাকিবার মত আবাস-গৃহ ছিল না। যাহা ছিল তাহা কতিপয় সামান্য মাটির ঘর। পাকাবাড়ির মধ্যে তখন ছিল একখানি বর্ত্তমান লালদীঘির ধারে মজুমদারদের কাছারি বাড়ি, অপরখানি 'মাস্ হাউস্'—পোর্ত্তুগীজদের প্রার্থনা-গৃহ। এই প্রথমোক্ত বাড়িখানি ভাড়া লইয়া কোম্পানী প্রথম তাঁহাদের সেরেস্তার খাতাপত্র রাখিতেন। তখন অধিকাংশ কর্ম্মচারীদের গৃহাভাবে তাঁবুর মধ্যে বা গঙ্গাবক্ষে বোটের উপর বাস করিতে হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খাস কলিকাতায় ভদ্রাসন জমি ছিল মোট ২৪৮ বিঘা ৬ কাঠা, ধান জমি ৪৮৪ বিঘা ১৭ কাঠা, অবশিষ্ট প'তত জমি ও জঙ্গলবাদ বাগান ও তামাকের চাষ, তুলার চাষ, খামার জমি, বাঁশঝাড় প্রভৃতিতে পূর্ণ ছিল। প্রথম প্রথম কলিকাতায় জমি বিলি হইত প্রতি বিঘা ৷৷০ হইতে ৸০ আনা; তৎপরে হার এইরূপ বর্দ্ধিত হয়—ভদ্রাসনবাটী ২৲ হইতে ২৷৷০, ধান জমি ১৲, সবজী ক্ষেত্র ১৷৷০, পানের বোরোজ ৩৲, তামাকের চাষ ২৲, বাগান ১৷৷০, কলাবাগান ২৲, বাঁশ ঝাড় ২৲, তৃণভূমি—১৲ টাকা।

১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ২টি রাস্তা, ২টি গলি,



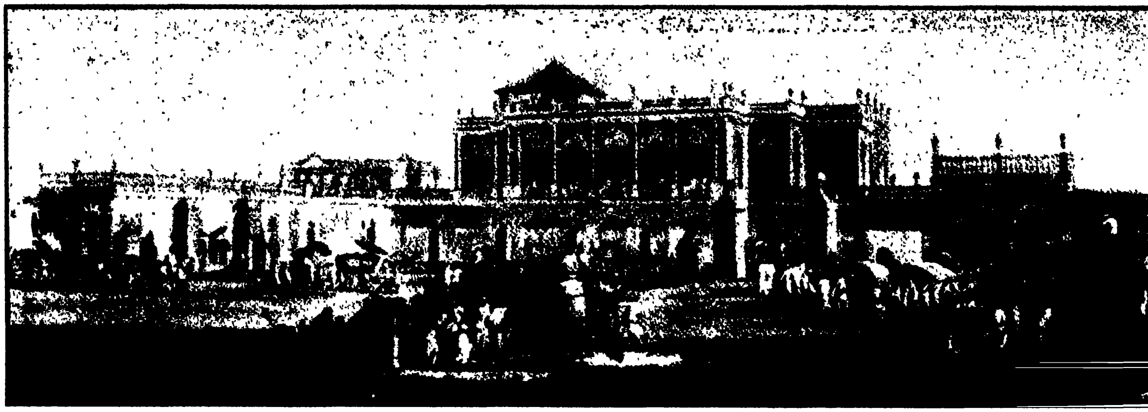
সেকালের কলিকাতা

১৭টী পুষ্করিণী, আটটি পাকাঘর ও আটহাজার মেটে ঘর ছিল।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দে জমির খাজনা, কুতঘাটার আয় ও জরিমানা জমাখরচের জের কাটিয়া মুনফা ছিল মোট ৪৮০৲ টাকা মাত্র। ১৭০৮ এ উহা হয় ১০০০৲ টাকা, পরবর্ত্তী সালে হয় ১৩০০৲ টাকা।

চার্ণকের মৃত্যুর পর স্যর জন্ গোল্ডস্‌বরা যখন কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন তখন ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা সর্ব্বপ্রথম একখানি পাকা কোঠা ক্রয় করেন। এই কোঠায় সেরেস্তার কাগজপত্র রাখা হইত। তিনি কুঠীর চতুর্দ্দিকে মাটির প্রাচীর তুলিয়া দেন।

কোম্পানীর কুঠিপত্তনের পর সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শহরের অবস্থা সর্ব্বদিক দিয়াই হীন ছিল। কুঠি-সমীপবর্ত্তী কতকটা স্থান ভিন্ন অনেকদিন পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাবৃত ছিল। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর পতিত জমি ও জঙ্গলের মধ্যে লোকের প্রয়োজন মত স্থান পরিষ্কার করাইয়া ইচ্ছামত বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিতে পারিবে এই আদেশ প্রচারিত হয়। ইহার পর হইতে লোক-সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সহরের উন্নতির আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। ১৭০৩-এ লোক-সংখ্যা যাহা ছিল ১৭০৮এ তাহার দ্বিগুণ হইল। মিউনিসিপ্যালিটির মত তখন কিছু ছিল না। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিলের আদেশে দেশীয় অধিবাসীদের জরিমানার টাকা যাহা আদায় হইত তাহা হইতেই যথাসম্ভব শহরের ভিতরের খানাডোবা সকল ভরাট ও নর্দ্দমা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। যাহাতে বিশৃঙ্খল ভাবে বাড়ী-ঘর কেহ প্রস্তুত না করিতে বা যেখানে সেখানে পুষ্করিণী খনন না করিতে পারে, এজন্যও ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল।



সেকালের লাটভবন—১৭৮৮

স্বাস্থ্যবিষয়ে শহরের অবস্থা অতি কদর্য্য ছিল। পাক্কা ফিভার নামে একপ্রকার জ্বর হইত, তাহাতে সময় সময় অনেক সাহেব মারা পড়িত। পেটের পীড়া ও জ্বর তখনকার প্রধান ব্যাধি ছিল। চিকিৎসা পদ্ধতিও অদ্ভুত ছিল। রক্ত আমাশয় রোগে তখন পাছে রোগীর বল হ্রাসপ্রাপ্তি হয় এজন্য মদ্য ও মাংসের ব্যবস্থা করা হইত। সেকালে শহরের জলবায়ুর অবস্থা এত খারাপ ছিল, লবণ হ্রদ হইতে এমন দূষিত বায়ু উৎপন্ন হইত যে, বর্ষাকালটা কাটাইয়া বাঁচিয়া থাকা যেন একটা বড় সৌভাগ্যের কথা ছিল। এই জন্য প্রতি বৎসরে ১৫ই নভেম্বর সাহেবদের একটা মিলনোৎসব হইত। ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন লবণ হ্রদ কলিকাতার খুব কাছেই ছিল।

সামান্য ভাবে মিউনিসিপ্যালিটির গঠন হয় প্রথম ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে। মেয়র মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয় জন অল্ডারম্যান ছিলেন। হলওয়েল করপোরেশনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন। অতঃপর শহরের স্বাস্থ্য বিষয়ে উন্নতি মিউনিসিপ্যালিটিরই লক্ষ্যের বিষয় হইল। এই ভাবেই মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। জানা যায় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সাতজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ইহাদের মধ্যে তিনজনকে কোম্পানী এবং চারজনকে করদাতৃগণ মনোনীত করিতেন। লর্ড ওয়েলসলির সময় এই সভ্যের সংখ্যা হইয়াছিল ত্রিশ জন। ব্যক্তিগত ভোট তখনও প্রচলিত হয় নাই।

মিউনিসিপ্যালিটির উল্লেখযোগ্য কাজ হিসাবে জানা যায়—১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে নালা ও খাদসমূহ কাটাইবার জন্য কিছু টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছিল এবং ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নগরকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপূর্ণ করিবার জন্য চারিদিকে নর্দ্দামা কাটাইবার ব্যবস্থা হয়।

মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইলেও বহু দিন পর্য্যন্ত ময়লা ফেলা বিভাগ পুলিসের অধীন ছিল। সে বিভাগের নাম ছিল "স্কাভেঞ্জর অফিস"। দেশীয় পল্লীর প্রত্যেক থানার অধীনে দুইখান করিয়া ময়লা ফেলা গাড়ী থাকিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পাকা রাস্তা একটিও নির্ম্মিত হয় নাই। লর্ড ওয়েলেসলির সময়ই অনেক নূতন রাস্তা ও ড্রেনাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময়ে বর্ত্তমান ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের মত একটি সমিতি গঠিত হইয়া তাহার দ্বারাই এ সব কাজ হইয়াছিল। এই সময়ই সার্কুলার রোড পাকা হয়।

নগরের সম্পদ ও আয়তন বৃদ্ধির সহিত স্বাস্থ্যাদি বিষয় উন্নতির বিশেষ প্রচেষ্টা হইলেও, দীর্ঘকাল, এমন কি, একশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক স্থান জঙ্গলময়, জনহীন, আবাদে জাম, জলা বা পচা পুষ্করিণীতে ভরা ছিল। অনেক স্থান খুনে ডাকাতের বাসে ভয়াবহ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৃজাপুর ও সিমলায় ধান্যের আবাদ হইত। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দেও চোর ডাকাতের ভয়ে

সন্ধ্যার পর কেহ সিমলার মধ্য দিয়া যাইত না। কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার, সার্কুলার রোড, চৌরঙ্গী, বৈঠকখানার আশে পাশে তখন ডাকাতদের আড্ডা ছিল। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে চৌরঙ্গীকতকগুলি কুটীর সম্বলিত পাড়া গাঁ ছিল। শত বৎসর পূর্ব্বেও উহা শহরতলি বলিয়া গণ্য হইত। তখনও এখানে ব্যাঘ্রের ডাক শুনা যাইত। এখন লাটসাহেবের বাড়ী যেখানে আছে, দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও সেখানে কতকগুলি পর্ণকুটীর ছিল। এই স্থানটিতেও হেষ্টিংসের অনেক পর পর্য্যন্ত চুরিডাকাতি যথেষ্ট হইত।

ফর্ডাইস্ লেন্ নামক গলিকে পূর্ব্বে গলাকাট গলি বলিত। কথিত আছে, রাত্রে কেহ ঐ রাস্তা দিয়া গেলে তাহার গলা কাটা যাইত। ষ্ট্রাণ্ড রোড ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়, তৎপূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত এই স্থান বাদাবন পূর্ণ ছিল। গার্ডেন রিচ, বেলভেডিয়ার, চৌরঙ্গী, প্রভৃতি স্থানগুলি অনেক দিন পর্য্যন্ত শহরের বাহিরে বলিয়া গণ্য হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় পর্য্যন্ত কোম্পানীর উপনিবেশের এক-তৃতীয়াংশ স্থান হিংস্র বন্য জন্তুময় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ক্লাইবের সময় মেটে চালাঘর যাহা ছিল তাহার সবই প্রায় গোলপাতার ছাউনিযুক্ত। পাকা বাড়ি যাহা ছিল সবই প্রায় একতলা। তখনকার লোকের মনে ভয় ছিল বাড়ি অধিক উচ্চ হইলে বজ্রাঘাতের সম্ভাবনা থাকে।

শহরের সমৃদ্ধি দুর্গের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহেই প্রথম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন বাড়ি, গির্জ্জা, বিচারগৃহ, চলিবার ভাল পথ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তৎপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে গাছপালাও বসান হইয়াছিল। তখনকার প্রধান সৌন্দর্য্য ছিল সেণ্ট য্যানের গির্জ্জা। ইহাই কলিকাতার প্রথম চূড়াওয়ালা গির্জ্জা, সাধারণের চাঁদায় ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শহরের সকল স্থান হইতেই উহার সু-উচ্চ চূড়া দেখা যাইত। বর্ত্তমানে যেখানে অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ আছে উহার নিকটেই উত্তরাংশে উহা অবস্থিত ছিল। সেকালের সাহেবদের বাড়ীতে ধূম নিঃসরণের নল, শাসি, খড়খড়ি এ-সব কিছুই ছিল না। শাসিতে কাঁচের পরিবর্ত্তে বেত বোনা থাকিত। কথিত আছে, হেষ্টিংসের বাড়িতেই প্রথম কাচের শাসি হয়।

কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে ১২,০০০ এবং ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ১১৭,৩৬৪ জন। ঘরবাড়ির সংখ্যা ছিল ১৭০২ এ পাকাবাড়ি ৮খানি, কাঁচাঘর ৮,০০০; ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে পাকা বাড়ি ১২১, কাঁচাঘর ১৪,৭৪৭। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আইন দ্বারা চালাঘর নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ হয়। পলাসীর যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত কলিকাতায় ইংরেজদের সর্ব্বসুদ্ধ সত্তরখানির অধিক বাড়ি প্রস্তুত হয় নাই।



সেকালের কলিকাতার বস্তি

১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে রাস্তা ছিল মাত্র দু-টি, গলিও দু-টি, ১৭৪২-এ উহার সংখ্যা হয় ষোলটি।

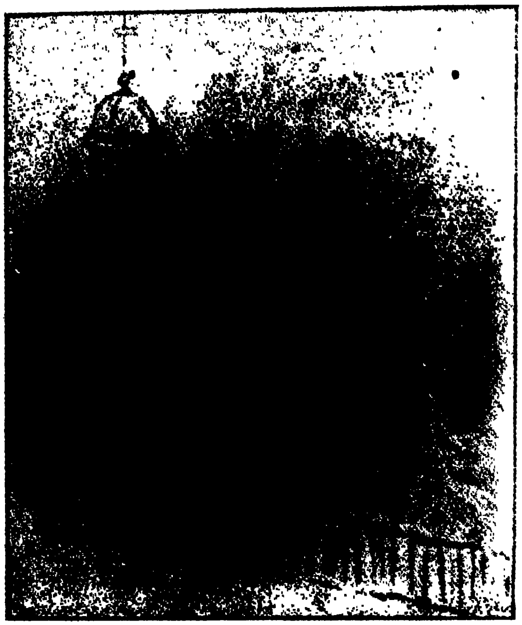
বড়বাজার বহু প্রাচীন। পূর্ব্বে বাজারগুলি জমাবিলি করা হইত। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বড়বাজার ৮০০৲, বৈঠকখানা বাজার ৭৫০৲, সুতানুটী বাজার ৫৭০৲, জানবাজার ৫০০৲, ধর্ম্মতলা বাজার ৫০০৲, মেছুয়া বাজার ৪৫০৲ ও বৌবাজার ৭৫০৲ টাকায় এক বৎসরের জন্য বিলি হইয়াছিল জানা যায়।

তখনকার বন জঙ্গল, ডোবা, জলা প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও শহরের অবস্থা কিছু বিভিন্ন প্রকারের ছিল। পূর্ব্বদিকে লবণ হ্রদ তখন বিস্তৃত ছিল। এখন হেষ্টিংস ষ্ট্রীট যেখানে আছে, তথায় একটি খাল ছিল।

বর্ত্তমানে যে স্থানটিকে ক্রীক্ রো বলে সেখানেও একটি খাল বা খাড়ীর মত ছিল।

কোম্পানীর কথা ও ইংরেজ সমাজ

ভারতের ধনৈশ্বর্য্যের কাহিনী শুনিয়া উহা লাভের জন্যই প্রধানতঃ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়, তাই ইংরেজরা



সেকালের প্রাচীনতম গির্জ্জা

এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা কখনও তাঁহাদের মনে উদয় হয় নাই। তাঁহারা তখন মুসলমান সম্রাট ও নবাবদের কৃপার ভিখারী হইয়াই এদেশে বণিকরূপে স্থান পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবীর ইচ্ছা স্বতন্ত্র, ক্রমে অবস্থা ভিন্নরূপ দাঁড়াইল। তাঁহাদের ক্ষুদ্র বাণিজ্যকুঠি দুর্গে, কোম্পানী সাম্রাজ্য শাসক এবং তাঁহাদের ব্যবসাকেন্দ্র এক বিশাল তুলনাহীন সাম্রাজ্যের ইন্দ্রপুরী-সম রাজধানীতে পরিণত হইল।

জব চার্ণকের কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ছয় বৎসরের মধ্যেই ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে চেতোয়া ও বর্দ্দার জমীদার শোভা-সিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে নবাবের সম্মতিক্রমে চন্দননগরে ফরাসীদের ফোর্ট দে আরলঁ্যা এবং চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের ফোর্ট গাষ্টেভাসের ন্যায় তাঁহারাও কলিকাতার গঙ্গাতীরে তদানীন্তন ইংলণ্ডাধিপের নামে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ চার্লস্ আয়ারের দ্বারা নির্ম্মাণ করান। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় ১৭০১ খৃষ্টাব্দে। গভর্ণরের একটি স্বতন্ত্র বাসভবন দুর্গমধ্যেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। তখন কুঠির কর্ত্তা অর্থাৎ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টকেই গভর্ণর বলিত। অবিবাহিত গোমস্তা ও অন্যান্য ইংরেজ কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলে কেল্লার মধ্যে 'লংরো' নামক তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশে বাস করিত। তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থাও সেইস্থানেই ছিল। বিবাহিতগণ বাড়িভাড়া ও খোরাকি হিসাবে মাসিক ৩০৲ টাকা পাইয়া বাহিরে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পাইত।

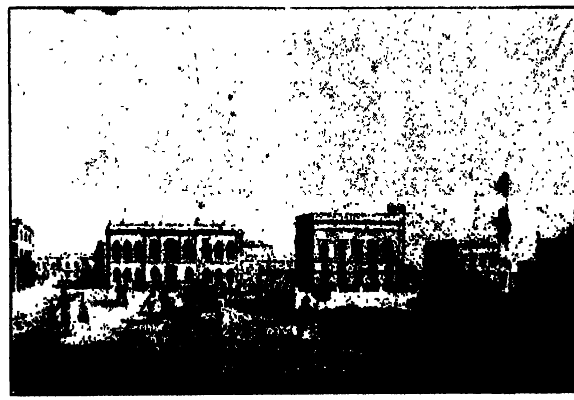
প্রথমাবস্থায় কোম্পানীর সকল ব্যবস্থা একটি কাউন্সিলের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইত। প্রতি সপ্তাহের গোড়ায় কেল্লার ভিতরে বসিয়া সদস্যগণ মিলিয়া কাউন্সিলের আলোচনা হইত। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে সভ্য সংখ্যা ছিল আটজন, তন্মধ্যে দুইজন সভাপতি; এক একজন এক এক সপ্তাহে সভাপতিত্ব করিতেন। প্রেসিডেণ্ট ও যাজকের বেতন ছিল বৎসরে ১০০ পাউণ্ড এবং অন্য সদস্যরা পাইতেন ৪০ পাউণ্ড। পলাসী যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদের বেতন খুব কমই ছিল। তখন কেরাণীদের বাৎসরিক বেতন ছিল পাঁচ পাউণ্ড, উহা ছয় মাস অন্তর দেওয়া হইত। অবশ্য দস্তুরি হিসাবে এবং উপরি পাওনাও উহাদের ছিল। গোরা সৈনিক-দিগের জন্য তখন প্রত্যহ চারি আনা, করপোরালের জন্য ছয় আনা এবং সারজেণ্টদিগের জন্য আট আনা খোরাকীর ব্যবস্থা ছিল।

তখনকার দিনে আপিসে কাজের সময় ছিল সাধারণতঃ প্রাতে ৯৷১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে ৪টার পর হইতে। মধ্যাহ্নে কর্ম্মচারীদের একটি হর্ম্ম্যমধ্যে পদমর্য্যাদা অনুসারে বসিবার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া একত্র ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। রাত্রের ব্যবস্থাও ঐরূপ ছিল। মধ্যাহ্নে আহারের পর নিদ্রা দেওয়া একটা প্রচলিত রীতির মধ্যেই ছিল। হুঁকা বা আলবোলায়

তাম্রকূট সেবন সাহেব এমন কি মেমেদের মধ্যেও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। বলনাচের সময়ও আল্‌বোলা চলিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা নিষিদ্ধ হয়। যাহারা তামাকু সাজিয়া দিত, বা আলবোলা ধরিয়া থাকিত তাহাদের হুঁকাবরদার বলিত। তখন শিকার ও মাছধরা সাহেবদের বড় প্রিয় ছিল। বৈকালে নৌকাবিহারও অনেকে পছন্দ করিত। তখন জলপথে যানের মধ্যে নৌকা পান্সি বোট প্রভৃতি এবং স্থলে পাল্‌কী। কেবল মাত্র প্রধান কর্ম্মচারী ও তাহার সহকারী ভিন্ন পাল্‌কী ব্যবহারের অধিকার আর কাহারও ছিল না। অন্যান্য সদস্য ও পাদ্রিদের পথে ছাতা ধরিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা ছিল। সেকালে পথে বেতনভোগী ছত্রধারীও পাওয়া যাইত। তাহাদের ছাতাবরদার বলিত। আবদার, ফরাস্, ভুরিয়া, চোপদার, মসাল্‌চি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য তখন ভিন্ন ভিন্ন নামের দাসদাসী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে তাহাদের মাসিক বেতনের হার ছিল সাধারণতঃ ১৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। পলাসী যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবলমাত্র গভর্ণর ও কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর ভিন্ন অন্য কেহ গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিতেন না।

প্রথমাবস্থায় সাহেবদের সাধারণ পোষাক ছিল একটি মসলিনের কামিজ, ঢিলে পায়জামা ও সাদা টুপি। তখনকার ইংরেজরা এদেশের প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি কোনরূপ অনাস্থা দেখাইত না বরং তাহারা ইহার পক্ষপাতী—এই ভাবই দেখাইত। এমন কি, কোন যুদ্ধাদি জয় হইলে কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদের মহাসমারোহে কালীঘাটে পূজা দিতেও দেখা যাইত।

সেকালে যাহারা বাহিরে বাস করিত অনেকেরই বাড়ীতে মাত্র দুইটি ছোট ঘর ও একটি বারান্দা ছিল। আসবাবপত্রের মধ্যে দুই তিনখানি চেয়ার, একখানা সোফা ও একখানা খাট থাকিত। আর পরবর্ত্তীকালে ঘরের মধ্যে একখানি টেবিলের উপর কাগজপত্র, বই চুরট-কেশ প্রভৃতির সঙ্গে একখানি হিন্দুস্থানী অভিধান প্রায়ই দেখা যাইত এবং অনেকের ঘরের কোণে একটি বন্দুক দাঁড় করান থাকিত। তখন আহারের টেবিলের অভাব ঘটিলে মুসলমানদের ন্যায় মাটিতে কাপড় বা সতরঞ্চ বিছাইয়া তাহার উপর খানা রাখিয়া খাইত। এখনকার মত টিফিন্ খাওয়ার ব্যবস্থা তখন ছিল না, ইহা তখন একটি ছোটখাট ডিনার ছিল। পার্থক্যের মধ্যে তখন টেবিলে কাপড় পাতা হইত না। ১২টার সময় গরম খানা, তাহাকে টিফিন্ বলিত। ডিনারের সময় ছিল



সেকালের মেয়র কোর্ট

৭টা হইতে ৮টা। সে সময় মদ খুব বেশী চলিত এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া টেবিলে থাকিত, বিশেষ শীতকালে।

বাড়িবেড়ান সাহেব বিবিদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের আড্ডা দিবার প্রধান স্থান ছিল বিবি ডোমিঙ্গো য়্যাশের (Mistress Domingo Ash) বৈঠকখানা। তখন খবরের কাগজ ছিল না, বিলাতের চিঠিপত্র খুব কমই আসিত। তাহাদের সেখানে বসিয়া বসিয়া গল্প করা মদ্যপান এবং শেষ জাহাজে দেশের কি খবর আসিল তাহা লইয়া আলোচনা করাই কাজ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এদেশে ইংরেজদের ধর্ম্ম কতকটা লোক দেখান মত ছিল। ধর্ম্মযাজক প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা পাঠ করিতেন। গভর্ণরকে পুরোভাগে রাখিয়া প্রতি রবিবার মিছিল করিয়া পদব্রজে বেশ গম্ভীরভাবে গির্জ্জায় যাওয়া হইত। তখন একজন মাত্র বেতনভোগী পাদ্রী ছিল। সন্ধ্যাবেলা গির্জ্জায় উপাসনার পর অনেকে তথা হইতেই প্রায় কোন দেশীয় নাচ দেখিতে যাইত। তবে রাত্রি ৯টার

পর কেল্লার ফটক বন্ধ হইয়া যাইত এবং কুঠীর কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কেহ বাহিরে রাত্রি যাপন করিতে পারিত না।

প্রথম আমলে ইংরেজ সমাজ পাপে পরিপূর্ণ ছিল। নৈতিক চরিত্র অনেকেরই খারাপ ছিল। অনেক শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিরাও ইহা হইতে মুক্ত ছিলেন না। পরস্ত্রীর



সেকালের ফোর্ট উইলিয়ম

সহিত হেষ্টিংসের স্বামী-স্ত্রীরূপে অবৈধবাস, ফ্রান্সিসের পরস্ত্রী ম্যাডাম্-গ্রাণ্টকে পাপে লিপ্ত করা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তখন সুপ্রিম্ কাউন্সিলের সদস্যগণও হিংসাদ্বেষাদিতে উত্তেজিত হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ইতিহাস প্রসিদ্ধ হেষ্টিংস ও ফিলিপ ফ্রান্সিসের এবং ক্লেভারিং ও বারওয়েলের দ্বৈরথ যুদ্ধ তাহার অন্যতম প্রমাণ। লেফ্‌টেন্যাণ্ট হোয়াইটও দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান। তখন অনেকে এদেশীয় স্ত্রীলোক লইয়া প্রকাশ্য ভাবে ঘর সংসার করিত। অনেকে দেশীয় মহিলাদের বিবাহ করিত। ইহা আইনে বাধিত না বরং এ কার্য্যে উৎসাহই পাইত। ক্রীতদাসীগণ প্রায় সকল ক্ষেত্রে বেশ্যার ন্যায় ব্যবহৃত হইত। তাহারা প্রায় বিবাহ করিতে পাইত না। ক্রীত দাস-দাসীগণ সেকালে স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় বিবেচিত হইত। অনেকে মৃত্যুর পর অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির সহিত তাহাদের বিলি বন্দোবস্ত করিয়া যাইত। কেহ বা উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি করিয়া, আবার কেহ বা মুক্তি দিয়াও যাইত।

জুয়াখেলা সেকালে সাহেবদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। সেলির ক্লাব জুয়ার প্রধান আড্ডা ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ উহা তুলিয়া দেন। তখনকার দিনে নানা পাপাচরণ ফলে ইউরোপীয় সমাজে আত্মহত্যা সর্ব্বদাই হইত।

সাহেবদের মধ্যে অনেকে সাদাসিদা ভাবে জীবন যাপন করিলেও, অবস্থাপন্নদের নবাবীও যথেষ্ট ছিল। তাহারা নিজেরা কখনও বাজারে যাইত না, বেনিয়ান্ বা সরকার জিনিষপত্র কিনিতে যাইত। তাহাদের সাংসারিক প্রত্যেক কাজের জন্য স্বতন্ত্র চাকর থাকিত। তখন বরফের প্রচলন ছিল না, সোরার দ্বারা এক প্রকার প্রক্রিয়ায় পানীয় জল ঠাণ্ডা করা হইত। যাহারা এ-কাজ করিত তাহাদের 'আবদার' বলিত। এক একজন পদস্থ সাহেব বাড়িভাড়া ও দাসদাসী প্রভৃতিতে বহু অর্থ ব্যয় করিত। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস্ বাড়ীভাড়া দিতেন একশত পাউণ্ড। তাঁহার সংসারে লোক ছিলেন মাত্র চারি জন, কিন্তু ভৃত্য ছিল ১০০জন। উহাদের কাজ দেখিয়া লইবার জন্য সরকার অনেকগুলি ছিল।

পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিয়া যতদূর জানা যায় তখনকার অল্প কয়েকজন উচ্চমনা ইংরেজ ভিন্ন ইংরেজ সমাজ তুলনায় হীন ছিল।

বিচার ও দণ্ড

কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অপরাধের বিচার ও আবশ্যক দণ্ড বিধান করিতেন প্রথম প্রথম কাউন্সিলের সভাপতি। কলিকাতায় কুঠী স্থাপনের পূর্ব্বেও কর্ম্মচারিগণকে সচ্চরিত্র ও সুনীতিপরায়ণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গভর্ণর বঙ্গদেশে আসিয়া এখানকার পাদ্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ম্মচারিদের চরিত্র নীতি ও ধর্ম্মগত উন্নতি সাধনের জন্য কতকগুলি নীতিগর্ভ নিয়ম প্রচলন করেন। উহা কুঠির কর্ম্মচারিগণকে বৎসরে দুইবার পড়িয়া শুনান হইত। সেই সকল নিয়মগুলি হইতে জানা যায়—রাত্রি ৯টার পর বাটীর বাহিরে থাকিলে, নিয়মিত প্রার্থনা না

করিলে, অযথা শপথ করিলে বা মাত্লামি করিলে প্রত্যেকবার অপরাধের জন্য এক শিলিং হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত, যে অপরাধের জন্ত যে জরিমানা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা দিতে হইত।

রাজকীয় সনন্দানুসারে প্রথম আদালতের সৃষ্টি হয় ১৭২৬ বা ২৭ খ্রীষ্টাব্দে। উহার নাম ছিল মেয়র কোর্ট, উহাকে কোর্ট অব রেকর্ডও বলিত। এখানে মেয়র ও নয়জন সহকারী বা অল্ডারম্যান; তন্মধ্যে সাতজন খাঁটি ইংরেজ ও দুজন দেশীয় প্রোটেষ্টান্ট্ খৃষ্টান। ইহারাই বিচার করিতেন। এই আদালতে প্রধানতঃ ইংরেজদের বিষয়-ঘটিত দেওয়ানী মোকদ্দমার শুনানী হইত। বর্ত্তমানে যেখানে সেণ্ট এণ্ড্রুস্ গির্জ্জা আছে এই স্থানেই পুরাতন কোর্ট হাউস্ ছিল। ইহার উপরে কোর্ট অব আপিল নামে আর একটি আদালত ছিল, গভর্ণর ও কাউন্সিলের সভ্যগণ একত্র বসিয়া তথায় বিচার করিতেন। বড় বড় ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য সেকালে আর একটি আদালত ছিল। তাহার নাম ছিল কোর্ট অব্ কোয়ার্টার সেসান্স এখানে কেবলমাত্র গভর্ণর নিজে বিচার করিতেন।

মেয়রের নীচেই জমিদার সাহেব নামে একটি পদ ছিল। তাঁহাদের একাধারে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কাজ করিতে হইত। সেকালের সিবিলিয়ানরাই এই পদ পাইতেন। সুপ্রসিদ্ধ হলওয়েল বহু দিন এই কাজ করিয়াছিলেন। এই সাহেব জমিদারের একজন দেশীয় সহকারী থাকিত তাহাকে "ব্ল্যাক জমিদার" বলিত। ফৌজদারী বিভাগে ইহার দস্তরমত শাসন কর্ত্তৃত্ব চলিত। দেশীয় লোকেদের অনেক বিষয় বিচার তাঁহাদের হাতে ছিল। অপরাধীদের প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের হাতে ছিল। গোবিন্দরাম মিত্র নামে সেকালে এক দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ব্ল্যাক্ জমিদার ছিলেন।

কলিকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে সদর নিজামত আদালত ও সুপ্রীম কোর্টের নাম খুবই পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব ছাড়া কোর্ট অব্ রিকোয়েষ্ট নামে আর একটি আদালত ছিল। উহা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে খোলা হয়; এখানে সামান্ত অর্থাৎ বিশ পঁচিশ টাকা দেনাপাওনার



সেকালের কালীঘাট

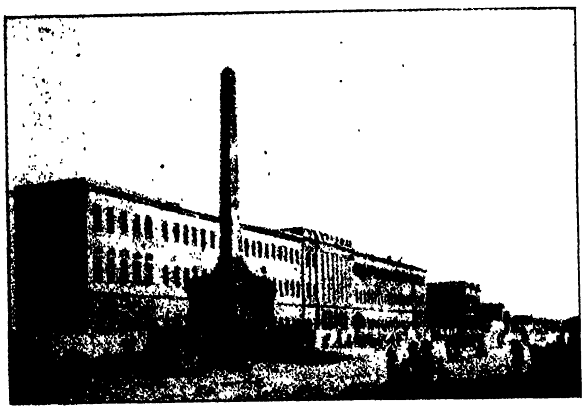
বিচার হইত। সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বিশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে চব্বিশ জন কমিশনরের দ্বারা তথায় বিচার হইত। তিনজনে কোরাম হইত। প্রতি বৃহস্পতিবার আদালত বসিত।

এক সময় কোম্পানীর সভার তিন জন সভ্য বিচার করিতেন। প্রতি শনিবার এই বিচারকার্য্য হইত। কোর্ট অব্ আয়ার এণ্ড টারসিনার নামক আর এক প্রকার আদালতের নাম পাওয়া যায়। কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি পর্য্যন্ত উক্ত সকল আদালতের অস্তিত্ব ছিল।

তখনকার দিনে বিবাহ-সংক্রান্ত ও জাতিনাশ বিষয়ক বিবাদ প্রায়ই ঘটিত। এক সময় কান্ত মুদির উপর এই সবের বিচারভার ন্যস্ত ছিল। সে সময় কান্তবাবুর প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, তিনি হেষ্টিংস্কে কাশিম বাজারে গোপন আশ্রয় দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। এবং এই কারণে তিনি তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন।

সুপ্রীম কোর্ট ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়। বুশিয়ে (Mr. Boucheir) নামক এক সওদাগরের বাটীতে প্রথম ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার জন্ম স্বতন্ত্র বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে। এদেশের লোকেদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ও তাহাদের ইংলণ্ডীয় আইনের সুবিধা প্রদান করাই এই আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান হাইকোর্ট যে স্থানে আছে সেই স্থানেই পূর্ব্বে

সুপ্রীম কোর্ট ছিল। সে বাড়ী ভাঙ্গিয়া হাইকোর্ট নির্ম্মিত হইয়াছে। সদর দেওয়ানী আদালতও পূর্ব্বে এই স্থানে ছিল। সুপ্রীম কোর্টে চীফ জষ্টিস্ ও পিউনি জজ এই উভয় শ্রেণীর বিচারক বসিতেন। স্যার এলাইজা ইম্পে এখানকার প্রথম চীফ্ জষ্টিস্ এবং স্যার রবার্ট চেম্বার্স প্রথম পিউনি জজ হইয়াছিলেন। এই আদালতেই বিচারপতি ইম্পের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল।



সেকালের রাইটাস বিল্ডিং ও হলওয়েল্ মনুমেন্ট

সুপ্রসিদ্ধ স্যার উইলিয়ম্ জোন্স এই সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে মাত্র চারিজন এটর্ণীর আদালতে কার্য্যের অধিকার ছিল। তখনকার দিনে কোন মোকদ্দমার আপীল করিতে হইলে সপারিষদ গভর্ণরের কাছে করিতে হইত।

প্রথম প্রথম আদালতে যাহারা মামলা করিত তাহারা নিজেই যাহা কিছু বলিত। ওকালতি আরম্ভ হয় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে। প্রথম ১৪ জন এটর্ণী ও ৬ জন ব্যারিষ্টার ছিল। তাঁহারা সকলেই ইংরেজ বা ফিরিঙ্গী ছিলেন। তাঁহাদের দক্ষিণা বড় বেশী ছিল। একটি প্রশ্নের উত্তর দিলে তাঁহারা সাধারণতঃ এক মোহর লইতেন! একখানি পত্র লিখিতে আটাশ টাকা লইতেন।

সেকালে কোর্ট ফি দিবার ব্যবস্থা ছিল। বাদী প্রতিবাদীর উপর সমন জারি করা, কাহাকেও আটক করিয়া রাখার প্রার্থনা বা কারারুদ্ধ করিবার দরখাস্ত প্রভৃতির জন্য কোর্ট ফি দিতে হইত। উহাকে "এত্লাক্" বলিত। এত্লাকের কোন নির্দ্দিষ্ট হার ছিল না।

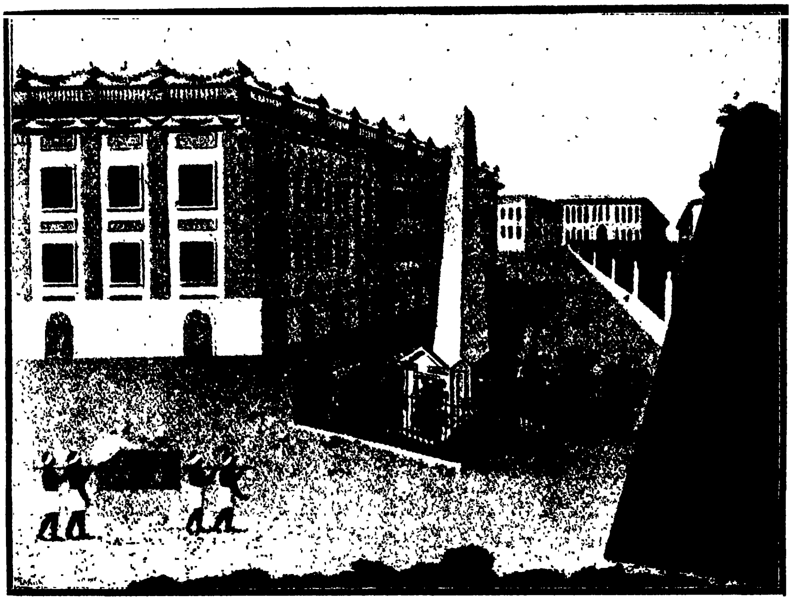
১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মেয়র কোর্টের ফোলিও বহিতে কোন মোকদ্দমার বিবরণ রেজেষ্টারী করিতে প্রতি পৃষ্ঠা নয় আনা হিসাবে খরচ লাগিত। উহা হইতে বৎসরে প্রায় ১৬০০৲ টাকা আয় হইত। প্রত্যেক আদালতের পেয়াদা অর্থীপ্রত্যর্থীর কাজের জন্য প্রত্যহ মেহনত-আনা পাইত তিনপণ কড়ি। ইহার মধ্য হইতে এত্লাক্ খরচ হিসাবে কোম্পানী একপণ চৌদ্দ গণ্ডা কড়ি কাটিয়া লইতেন, পেয়াদারা খোরাকীরূপে মাত্র একপণ কড়ি পাইত, বাকি, ছয়গণ্ডা কড়ি "এত্লাকমুড়ি" বা দরখাস্ত লেখকগণ দক্ষিণা স্বরূপ পাইত।

সেকালের বিচারপতিদের পরিচ্ছদ ও বিচারাসন প্রভৃতি খুব আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। মেয়র কোর্টের বিচারাসন মখমলমণ্ডিত থাকিত। এই আদালতের অল্ডারম্যানেরা পকেট খরচা হিসাবে মাসিক ১০৲।১৫৲ টাকা পাইতেন।

অপরাধের দণ্ড এখনকার তুলনায় তখন গুরু ছিল। জাল করা অপরাধে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির কথা সকলেই জানেন। ব্যভিচার ঘটিত অপরাধে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের ৫০,০০০৲ জরিমানা হইয়াছিল। সামান্য চুরি রাহাজানি অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হইত। কথায় কথায় তখন চাবুকের ব্যবস্থা ছিল। যাহারা চাবুক মারিত তাহাদের 'চাবুক'-সওয়ার বলিত। হাত পোড়াইয়া দেওয়া তখন একটা দণ্ড ছিল। ছেঁকা দিয়া কখনও কখনও গঙ্গাপার করিয়া দেওয়া হইত। কাঠের তক্তার ছিদ্র মধ্যে পা ঢুকাইয়া তুড়ুম ঠোকাও তখনকার একটা প্রচলিত দণ্ড ছিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে আইন দ্বারা উহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে

প্রাণদণ্ডের জন্য ফাঁসি দেওয়াই প্রচলিত ব্যবস্থা থাকিলেও মুসলমানদের জন্য ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। তাহাদের বিধি অনুসারে নরহত্যাকারী বা গুরুতর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে চাবুক মারিয়া হত্যা করা হইত। বিশেষ প্রকাশ্য স্থানে যেথায় সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় সাধারণতঃ সেই স্থানে বা রাস্তার চৌমাথাতে অপরাধীদের দণ্ড দেওয়া হইত। এই সব স্থানেই অস্থায়ী ফাঁসিকাঠ রচিত হইয়া ফাঁসি দেওয়া হইত।

সেকালের বিচারপদ্ধতি এবং দণ্ড দিবার ব্যবস্থা হইতে বুঝা যায়, কোম্পানী কঠোর দণ্ডের প্রবর্ত্তন দ্বারা এদেশের লোকের উপর একটা প্রভাব স্থাপনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন।



সেকালের রাইটার্স বিল্ডিংস্ ও হলওয়েল মনুমেণ্ট

সেকালের বাঙ্গালী সমাজ

সেকালে দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রায় ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। সপ্তগ্রাম ও হুগলী হইতে আসিয়া অনেকে এখানে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কোম্পানীর পণ্য সরবরাহ করা বা তাঁহাদের আমদানী মাল বিক্রয় করা অনেকের কাজ ছিল।

তখনকার দিনে অর্থশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই অনাড়ম্বর ভাবে জীবন যাপন করিলেও পূজা-পার্ব্বণ ও ক্রিয়াকলাপে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। বহু দিন পর্য্যন্ত সাধারণ লোকেদের মধ্যে সাজপোষাকের কোন পারিপাট্য ছিল না। ক্লাইবের সময়ও সাধারণ লোকে হাঁটুর উপর কাপড় পরিত, গায়ে জামা দিত না। বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গমনাগমনের জন্য পাল্কী ব্যবহার করিতেন, নচেৎ গোলপাতার ছাতা তখনকার দিনে বাবুয়ানী ছিল। গ্রীষ্মকালে মেদিনীপুরের মছলন্দ মাদুর বিছানায় পাতিয়া শয়ন করা তখনকার বিলাসিতা ছিল। সোনা রূপার গহনার প্রচলন পূর্ব্বে প্রায় ছিল না, তখন লোহা ও শাঁখা সিন্দুরের ব্যবস্থা ছিল। বর্গীর হাঙ্গামা শেষ হইবার পর হইতে সোনা রূপার গহনার ব্যবহার আরম্ভ হয়।

ধনী সমাজে বুলবুলির লড়াই সেকালে একটা সখের জিনিষ ছিল। বাঙ্গালীর সাহেব পূজা ইংরেজ আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকিয়াছে। তখনকার দিনে পদস্থ সাহেবদিগর দেশীয় ধনী লোকেরা প্রায়ই খাদ্যদ্রব্যাদি সহযোগে মূল্যবান ভেট পাঠাইত। তাঁহারা পূজাদিতে সাহেবদের আপ্যায়িত করিবার জন্য বাটীতে নাচ গান দিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন ও ইংরেজী ধরণের খানা দিতেন। রাজা নবকৃষ্ণ ও রাজা সুখময়ই এ-বিষয় কতকটা অগ্রণী। হিন্দুস্থানী গতের সহিত ইংরেজি গৎ মিশাইয়া গান সর্ব্বপ্রথম রাজা সুখময়ের বাটীতেই আরম্ভ হয়।

শিক্ষার কথা

কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এখানে শিক্ষার অবস্থা অতি হীন ছিল। সাধারণতঃ পাঠশালা বা বাঙ্গালা বিদ্যালয়েই প্রথম শিক্ষার স্থান ছিল। আধুনিক ভাবের বিদ্যালয় কয়েকটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য উল্লেখযোগ্য শিক্ষালয়গুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে স্থাপিত হয়। ইংরেজদিগের দ্বারা ইউরোপীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কলিকাতার মাদ্রাসাই প্রথম। মুসলমানদিগের আরবী, পারস্য ভাষা ও মুসলমান আইন শিক্ষার উদ্দেশ্যে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের চেষ্টায় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সরকারের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বাঙ্গালা শিক্ষার সুবিধার্থ লর্ড ওয়েলেসলির দ্বারা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙ্গালা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনেক পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে কতিপয় ছোট ছোট ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তন্মধ্যে খিদিরপুর মিলিটারি অরফ্যান্ স্কুল, কিয়ারন্যানডার স্কুল, সেরবোরণ সেমিনারি, ইউনিয়ন স্কুল, হজেস স্কুল, গ্রিফিথ সাহেবের স্কুল, আরচার সাহেবের, মার্টিন বাউলের, রামজয় দত্ত, রামনারায়ণ মিত্র প্রভৃতির স্কুলগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই-সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী যাহা শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা সামান্য ভাবের। কিন্তু সুবিখ্যাত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রামকমল সেনের মত লোক সকলও এই সব স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তদানীন্তনকালে ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তবে একথাও বলা প্রয়োজন, তখনকার কালে ইংরেজী শিক্ষিত লোকের অভাব হেতু সামান্য শিক্ষিত লোকও অনেক উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

হিন্দু কলেজই এখানকার সর্ব্বপ্রথম উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়। লর্ড ময়রার সময় ডেভিড হেয়ার, জাষ্টিস্ হাইড ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু অধিবাসীদের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, ইহা স্থাপিত হয়। ইহার জন্য বাটী নির্ম্মিত হয় ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাহার জন্য ব্যয় হয় ৮২০,০০০৲ টাকা। ইহার পর উচ্চাঙ্গের ইংরেজী বিদ্যালয় বলিতে ডভ্‌টন্ কলেজ বুঝায়। ইহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম্ রিকেট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ক্যাপটেন্ ডভটন্ ইহার তহবিলে ২০০,০০০৲ টাকা দান করেন। প্রতিষ্ঠাকালে ইহার নাম ছিল পেরেণ্টাল্ একাডেমী। বিশপ কলেজ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু ইহা কলিকাতায় নহে, শিবপুরে। জেনারেল্ এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন্, সেণ্টজিভিয়ার, লা মার্টিনিয়ার প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলিও খুব প্রাচীন, তাহা হইলেও উহা পরে স্থাপিত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন শিক্ষালয় ছিল বলিয়া জানা যায় না। কলিকাতার প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের কথা যাহা জানা যায় তাহা হেজেস্ বালিকা বিদ্যালয়। উহা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিবি হেজেস্ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এখানে ফরাসী ভাষা ও নৃত্যকলা শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পিট্স নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলা প্রাপ্তবয়স্কা



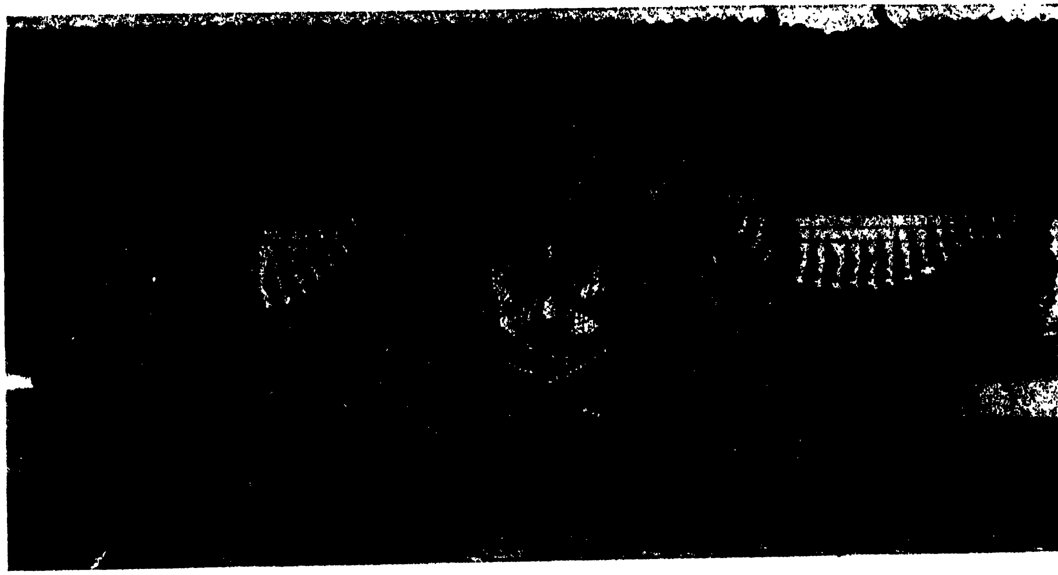
সেকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'আর্ম্‌স্'

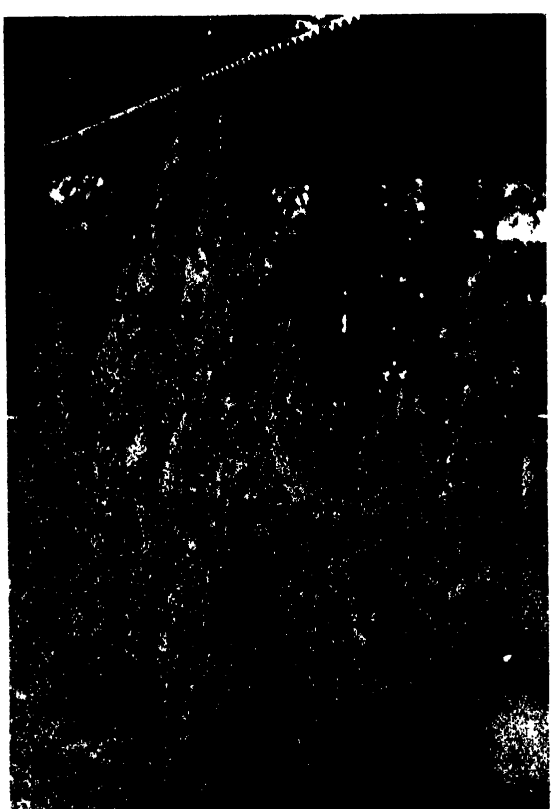
নারীদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহার পর বৎসর মিসেস্ ডারেল্ নাম্নী অন্য একজন মহিলা "ডারেল্ সেমিনারি" নামে একটি স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরজে বালিকাদের শিক্ষার জন্য পর পর আরও ব্যবস্থা হয়। এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্য ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে উইলসন্ নাম্নী এক মহিলার দ্বারা লেডিস্ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল্ এডুকেশন নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। ইহার দ্বারা বিশেষ কিছু কাজ হইয়াছিল বলিয়া জানা না যাইলেও, ইহাকে কতকটা প্রথম প্রচেষ্টা বলা যায়। ইহার পর রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে এদেশীয়দের মধ্যে এ কার্য্যে তিনিই অগ্রণী; অবশ্য খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা যে এ বিষয়ে বহুল সহায়তা হইয়াছে এ কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।*

* ১৫ই আগষ্ট কলিকাতা Y. W. C. A. এর হলে Bengal Women's Education Leagueর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

ব্রহ্মে দারুশিল্প

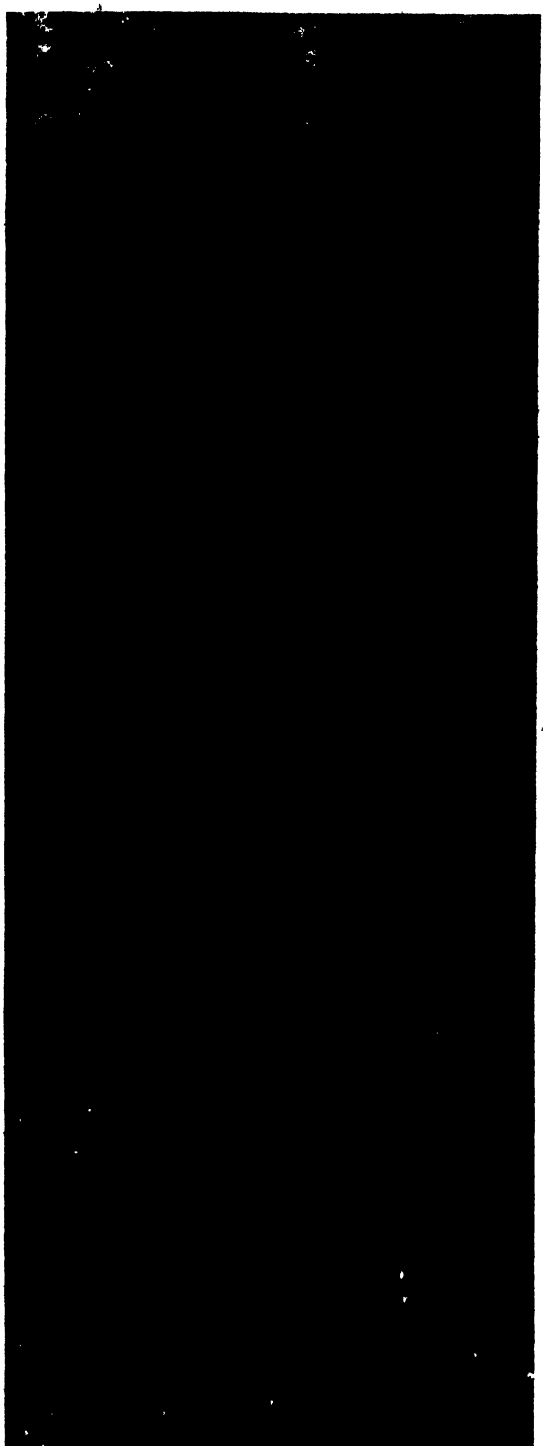
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

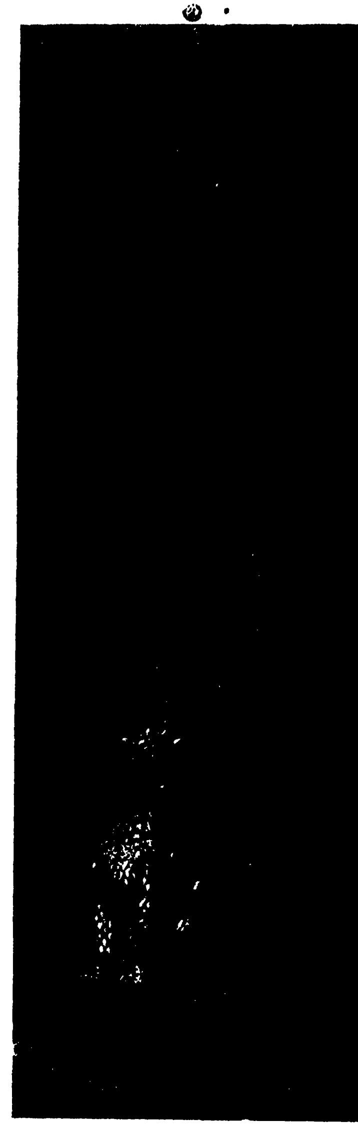


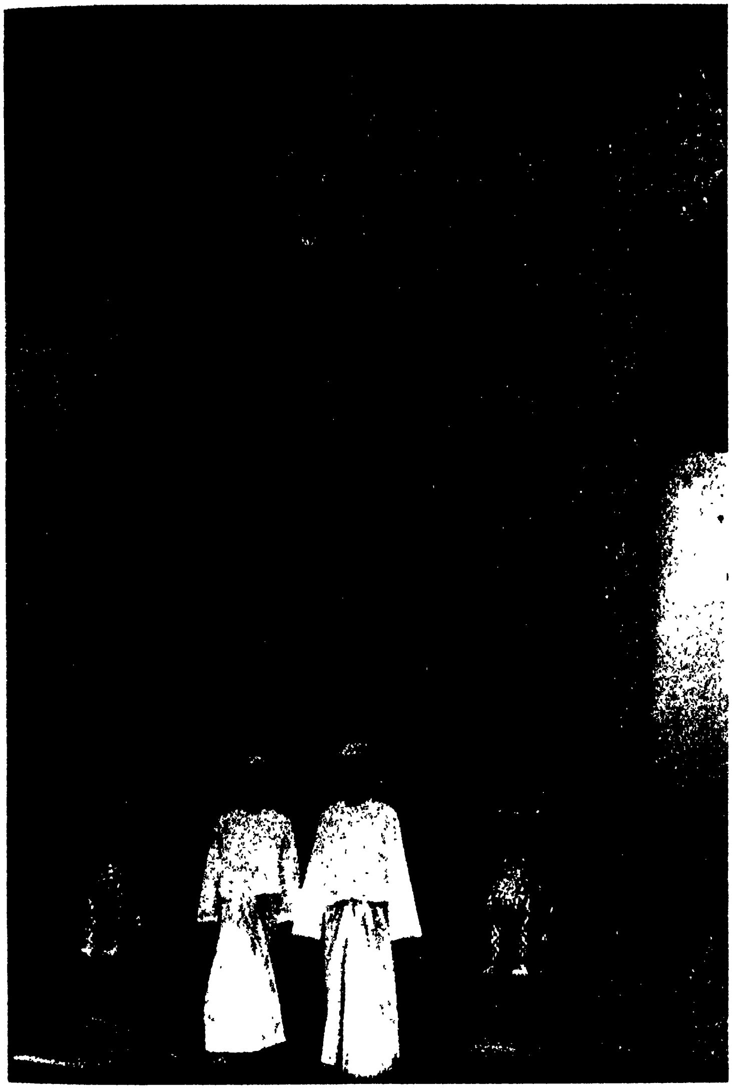


১৩৩৪ সালের আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "দারুশিল্প" প্রবন্ধে ব্রহ্মদেশে টীক্ কাষ্ঠে খোদাই যুদ্ধ-অভিযানের একটি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রেঙ্গুনের বিশ্ববিখ্যাত সোয়েডাগন্ প্যাগোডায় এরূপ খোদাইকার্য্য বহুল ভাবে চোখে পড়ে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মের বহু প্যাগোডায় ও ফুঙ্গী-নিবাসে প্রধানতঃ যুদ্ধ-অভিযানের ও রাজসভার দৃশ্য নানা ভাবে সেগুন কাষ্ঠের উপর খোদাই করা আছে। ব্রহ্মগণ এক সময় দারুশিল্পে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার সম্যক্ পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়।

কেদারবাবুর প্রকাশিত চিত্রগুলির বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, যে-সকল প্রদেশে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের উপযোগী কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মে, সাধারণতঃ সেই প্রদেশগুলিই দারুশিল্পে কৃতিত্ব দেখাইয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। ব্রহ্মদেশে সেগুন কাষ্ঠের অভাব নাই। এই কাষ্ঠ প্রতি বৎসর নানা দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। ব্রহ্মের বন-বিভাগের সরকারী আয় বোধ করি







ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ বন-বিভাগের আয় অপেক্ষা অধিক। ১৯২৯-৩০ সালে ব্রহ্মদেশের বন-বিভাগে মোট ১,৮৫,৪০,১৭৫৲ টাকা সরকারী রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। সেগুন কাষ্ঠ সহজলভ্য বলিয়াই ব্রহ্মে উহার শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। নতুবা অলস ব্রহ্মগণ এ বিষয়ে কতদূর অগ্রণী হইত বলা কঠিন। অবশ্য একথা ঠিক যে ব্রহ্মগণের মধ্যে একটি সাধারণ ও সহজ শিল্পীর ভাব আছে। তাহা এমন কি দরিদ্র ব্রহ্মগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও বেশভূষা হইতেও বুঝা যায়।

ব্রহ্মরাজগণের মান্দালয়স্থ প্রাসাদ এদেশের দারুশিল্পের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। ইহা সমস্তই সেগুন কাষ্ঠে প্রস্তুত এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যেরও ইহাতে অভাব নাই। রাজা থিবোর সিংহাসন এখন কলিকাতার যাদুঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, তাহাও সেগুন কাষ্ঠে প্রস্তুত। গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্রহ্মগণ সেগুন কাষ্ঠের উপর যে সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয় এবং জগতে দারুশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই চিত্রগুলি হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

তৃতীয়া

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

প্রথম বিবাহ যখন হয় তখন প্রথম যৌবনের সমারোহ। প্রণবেশের জীবনে সেদিন নবীন বসন্তের আবির্ভাব। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন, আনন্দ-উল্লাস—ইহাদেরই ভিতর দিয়া সে সুন্দরী শিক্ষিতা বধূ ঘরে আনিয়াছিল। সংসার ছিল আনন্দের হাট।

তারপর একদিন আকাশের চেহারা বদ্‌লাইল, দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া কালবৈশাখী নামিয়া আসিল। গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জন, দিক্‌চিহ্নহীন অন্ধকার, শিলাবৃষ্টি, তারপর বজ্রাঘাত। শাঁখা ও সিঁদুর পরিয়া প্রণবেশের প্রথম স্ত্রী বিদায় লইল।

তাহার পর দ্বিতীয় স্ত্রী। ঘা শুকাইয়াছে, কিন্তু দাগ তখনও মিলায় নাই। তবু প্রণবেশ ঘর বাঁধিল; ফাটলগুলি মেরামত করিল, চুনকাম করিল, জানালা দরজা খুলিয়া আলো-বাতাসের পথ করিয়া দিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর মধ্যে প্রথমাকে সে আবিষ্কার করিয়া লইল।

স্ত্রী যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী নয়। এক বৎসর কায়ক্লেশে ঘর করিয়া অবশেষে সে শয্যাগ্রহণ করিল। শয্যা সমেতই প্রণবেশ একদিন তাহাকে ট্রেনে করিয়া বাপের বাড়ি লইয়া গেল। ফিরিবার সময় দেখা গেল, স্ত্রী তাহার সঙ্গে নাই—প্রণবেশ একা; অশ্রুসিক্ত তাহার মুখ।

সেই হইতে কয়েক মাস সে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাইয়াছে। সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সদ্বংশের সন্তান—জীবনে সে অন্যায় করে নাই, জীবন-বিধাতাকে সে কোনোদিন অপমানও করে নাই! তবু সে পথে পথে ঘুরিয়াছে, অসহ্য লজ্জায় সমাজ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে।

জীবনের প্রতি তাহার গোপন মমতা ও ভালবাসা মৃত্যুর মধ্য দিয়া একটু একটু করিয়া বাড়িয়াছে, কিন্তু সে আর কাহাকেও বিশ্বাস করে না। মানুষ তাহার কাছে অসহায়, ক্ষুদ্র, অবস্থার দাস,—নিয়তির খেয়ালের খেলনা।

***

তারপর তৃতীয়া।

বিবাহ-বাড়ির গোলমাল চুকিয়াছে, একে একে সব আলোগুলি নিবিয়া গেল। এ বিবাহে আনন্দের চেয়ে স্বস্তিই যেন বেশী। উত্তেজনা নাই, একটি মন্থর ক্লান্তির ভাব।

ফুলশয্যার রাত। আলোটা একধারে টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে নিবিয়াও যাইতে পারে। ঘরের বাহিরে আড়ি পাতিবার মত মানুষ কেহ নাই। না আছে কাহারও ধৈর্য্য, না অভিরুচি।

ঘরের উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া প্রণবেশ জানালার বাহিরের শুক্লা রাত্রির দিকে তাকাইয়া ছিল, ঘরের দক্ষিণ দিকে দরজার কাছে সুললিতা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া। দেখিলে মনে হয় একজনের কথা ফুরাইয়া গেছে, আর একজনের কথা আরম্ভ করিবার পথ নাই।

ঘরের মাঝখানে খাটের উপর শয্যা রচনা করা ছিল, সুললিতা এক সময় উঠিয়া আসিয়া একপাশে শুইয়া পড়িল। বিছানায় শুইয়া জাগিয়া থাকিবার অভ্যাস সে করে নাই, সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রণবেশ তাহার দিকে একবার তাকাইল, তারপর অত্যন্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে দূর হইতেই বলিল,—চোখে লাগছে, আলোটা নিবিয়ে দেবো?

সুললিতা স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল,—না।

এমন সহজ ও পরিচ্ছন্ন গলার আওয়াজ প্রণবেশ জীবনে শোনে নাই। সে চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, প্রণবেশ ক্লান্ত হইয়া জানালার কাছ হইতে

সরিয়া আসিল, খাটের কাছাকাছি আসিয়া কহিল,—সারাদিন উপবাস গেল, কত কষ্ট হয়েছে, কিছু খেলে হ'ত না?

সুললিতা মুখ তুলিয়া সামান্য একটুখানি হাসিল, তারপর কহিল,—একদিন না খেলেও মানুষ বেঁচে থাকে।—বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

কুণ্ঠায় ও সঙ্কোচে প্রণবেশ ধীরে ধীরে খাটের নিকট হইতে সরিয়া গেল।

সকাল বেলা উঠিয়া যে যার কাজে নামিল, বেলা বাড়িল, কিন্তু নূতন বউ আর উঠিতে চায় না। পিসিমা একবার মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া গেলেন, বউ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। প্রণবেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া অপ্রস্তুত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইল—কিন্তু সুললিতা আর জাগে না।

প্রণবেশ এক সময় ঘরে ঢুকিয়া অতি সন্তর্পণে বার-দুই ডাকিল। চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া সুললিতা কহিল,—কেন?

নূতন বধূর মুখের সহিত সে-মুখের চেহারা মেলে না, প্রণবেশ অপ্রস্তুত হইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, পরে কহিল,—এমনি ডাক্‌ছি, এ-ক'দিন বোধ হয় তুমি ঘুমোতেই পাওনি!

—তা জেনেও আবার ডাকা হ'ল কেন?—বলিয়া গম্ভীর হইয়া সুললিতা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। মনে হইল ঘুম ভাঙাইলে সে অকারণে চটিয়া যায়।

এই মেয়েটির দিকে অগ্রসর হইতে কোথায় যেন একটি ভয়ানক বাধা আছে। প্রণবেশের ধারণা হইল সে-পথ ভয়ানক দুর্গম, অতিরিক্ত কণ্টকাকীর্ণ। নারী কেমন করিয়া নিঃশ্বাস ফেলে তা পর্য্যন্ত প্রণবেশের জানিতে আর বাকী নাই।

কাপড় কাচিয়া সুললিতা ঘরে ঢুকিতেই প্রণবেশ বাহির হইয়া গেল। পিসিমা জলখাবার লইয়া আসিলেন। মনে হইল, সুললিতা যেন তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই; পিছন ফিরিয়া সে চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

—বউমা?

সুললিতা ফিরিয়া তাকাইল, তারপর কহিল,—রাখুন না ওইখানে, আমি এখন মাথা আঁচড়াচ্ছি।

পিসিমা কহিলেন,—মুখখানি তোমার শুকিয়ে আছে, আগেই খেয়ে নাও মা।

—না, পরে খাবো। আপনি রাখুন ওইখানে।

পিসিমা কহিলেন,—আচ্ছা আচ্ছা, তাই খেয়ো মা, এই রইল জল, পরেই খেয়ো, আমি ভাবছিলাম—বলিতে বলিতে তিনি সস্নেহ হাসি হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরিবারের মধ্যে অনেকেই ছিল, কিন্তু তাহারা কেহই নব-পরিণীতা বধূর ভাবগতিক বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। অথচ বলিবার এবং অভিযোগ করিবার কিই-বা আছে! মৃত্যু ও বেদনার মধ্য দিয়া এই মেয়েটি সকলের মধ্যে আসিয়াছে, ইহাকে নির্ব্বিচারে যত্ন করিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে, ইহার দাবি, স্বাধীন ইচ্ছা এবং অবাধ অধিকার সকলকে মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। এই মেয়েটিকে সম্ভ্রম করিতে সকলেই বাধ্য।

কয়েক দিন পরে একদিন সুললিতা বলিল,—আচ্ছা এটা ত আমাদেরই ঘর?

প্রণবেশ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল,—হ্যাঁ, কি হ'ল? কেন বল ত?

—ভাঙা বাক্স আর বিছানাগুলো কা'র?

—ওঃ ওগুলো পিসিমার,—আজ ক'দিন থেকেই—

সুললিতা কহিল,—সরিয়ে নিয়ে যান্ উনি, শোবার ঘরের মধ্যে ওসব ছাই-পাঁশ আমি সইতে পারিনে। এখনি নিয়ে যেতে ব'লে দাও।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে আবার ঘুরিয়া আসিয়া অলক্ষ্য কাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল,—এত ভিড়ই বা এ বাড়িতে কেন? কাজকর্ম্ম কবে চুকে গেছে, এবার সবাই আমাকে নিশ্বেস ফেলতে দিক্ বাপু।—এই বলিয়া সে সম্রাজ্ঞীর মত উন্নত মস্তক লইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

প্রণবেশ মুখ ফিরাইয়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বিধা-কুণ্ঠিত নিজের মুখখানা নিজেই অনুভব করিয়া সে

একবার কোথাও নির্জ্জনে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যে শাসন সুললিতা এইমাত্র করিয়া গেল, তাহা না মানিয়া লইবারও কোনো উপায় নাই। বিপন্নের মত প্রণবেশ ভাঁড়ারঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

—পিসিমা?—দরজার পাশ হইতে সে ডাকিল।

পিসিমাও তাহাকে ডাকিলেন না, শুধু ভিতর হইতে বলিলেন,—কেন বাবা? কিছু বল্‌বি?

—বলছিলাম যে—বলিয়া প্রণবেশ একবার এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর কোনো রকমে কথাটা বলিয়াই ফেলিল,—তোমরা কি কালকেই যাওয়া ঠিক করলে পিসিমা?

—কাল ত নয় বাবা, আজই—কথাগুলি ছাড়াও আর একটি শব্দ পিসিমার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, সম্ভবতঃ সেটি তাঁহার তীক্ষ্ণ হাসির একটি শিখা।

প্রণবেশ কহিল,—আজকেই?

—হ্যাঁ বাবা, আজকেই। সেখানে সংসার ফেলে এসেছি, না গেলে আর চলছে না। আমি গাড়ী ডাকতে পাঠিয়েছি বাবা।

গাড়ী আসিল। ছেলেপুলে সঙ্গে করিয়া পিসিমা বিদায় লইলেন। ইতিমধ্যে আর সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। বাকী ছিলেন ছোট মাসিমা, একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে লইয়া রাত্রের গাড়ীতে তিনি সেদিন কাশী রওনা হইলেন।

নারীর গোপন আত্মপরতা প্রণবেশের চোখ এড়ায় না, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল। অনাদর করিয়া সে ভুল করিবে না, অশ্রদ্ধা করিয়া সে অশান্তি আনিবে না,—চুপ করিয়া তাহাকে থাকিতেই হইবে। সুললিতাকে আগে তাহার রহস্যময়ী মনে হইয়াছিল, এখন দেখিল তাহা নয়, সে অতিরিক্ত স্পষ্ট, তাহাকে বুঝিবার জন্য চোখ খুলিয়া থাকিলেই হয়, পরিশ্রম করিতে হয় না।

তবু তৃপ্তির মরুভূমির ভয়াবহতা কেমন, এ কথা প্রণবেশের চেয়ে আর কে বেশী জানে! তাই সে তৃপ্তি চক্ষু আর তাহার জ্বালা করে না, বরং একটি অলসতার আবেশে ভারী হইয়া আসে।

রাস্তায় বেড়াইয়া ঘুরিয়া আপন মনে টহল দিয়া বাড়ি ফিরিতে তাহার একটু রাতই হয়। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া সেদিন ঘরে ঢুকিল। ভাবিল, সুললিতাকে একটু চম্‌কাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু কৌতুক করা আর তাহার হইয়া উঠিল না। জানালার ধারে সুললিতা বসিয়াছিল, মুখ ফিরাইয়া একবার তাহাকে দেখিল। তাহার উদাসীন মুখ দেখিয়া প্রণবেশের মুখের হাসি ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসিল, কোথায় যেন কি একটা খচ্‌ খচ্‌ করিয়া উঠিল।

জানালার ধার হইতে সুললিতা উঠিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। খানিকক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল এবং সেই অবস্থাতেই এক সময় জিজ্ঞাসা করিল,—চিঠিখানা ফেলা হয়েছিল?

প্রণবেশের চমক ভাঙিল। বলিল,—ওই যা ভুলে গেছি পকেটেই রয়ে গেছে। কাল সকালে উঠেই—

উত্যক্ত কণ্ঠে সুললিতা বলিয়া উঠিল,—কাল সকালে, কিন্তু আজ ত আর ফেলা হ'ল না? কই, দাও আমার চিঠি, আমি ঝি-কে দিয়ে ফেলতে পাঠাবো।

প্রণবেশ নিঃশব্দে চিঠি বাহির করিয়া দিল। হাতে লইয়া সুললিতা কহিল,—খুলেছিলে ত? নিশ্চয় খুলেছিলে!

—আমি ত অন্যের চিঠি খুলি না?

—সত্যি বলছ?

প্রণবেশের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, মাথা হেঁট করিয়া কহিল,—হ্যাঁ।

সুললিতা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া অতি যত্নে চিঠিখানি নিজের মাথার বালিশের তলায় রাখিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

রাত জাগিয়া প্রণবেশের পড়াশুনা করা অভ্যাস। টেবিলের উপর আলোটা ঠিক করিয়া লইয়া সে চেয়ার টানিয়া বসিল। এই পড়াশুনা অনেক দিনের অনেক অবস্থা হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়াছে।

এক সময় সে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি খেয়েছ সুললিতা?

সুললিতা তাহার এ কথার জবাব দিল না, বাঁ-হাত বাড়াইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কেবল কহিল,—খাবার ঢাকা আছে ও-কোণে, খেও।

আর কেহ কোনো কথা কহিল না। শুধু টেবিলের উপর টাইম্‌পিস ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল।

একখানি বই মুখের কাছে খুলিয়া প্রণবেশ কি করিতেছে তাহা সে নিজেই জানে না। হয়ত বইয়ের অক্ষরগুলির দিকে তাকাইয়া সে ভাবিতেছিল এমনি করিয়াই তাহার প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি রাত কাটিবে। আলো জ্বলিতেই লাগিল, কিন্তু বই হইতে সে মুখ তুলিল না, হাত পা নাড়িল না, চোখের পলক ফেলিল না!

সুললিতা একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, তারপর কহিল,—ও বাড়ির মেজবৌটা আজ এসেছিল আমার কাছে··· ছুঁড়ির কি অংখার গো, ও সব সাপের হাঁচি আমি চিন্‌তে পারি···আ মরু! দিলাম আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে। আমি কারও তক্কা রাখিনে।

প্রণবেশ একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কিছু বলিল না। শুধু তাহার সত্যবাদী মন বলিয়া উঠিল, এ মেয়েটির অন্তরে আভিজাত্যও নাই, ঐশ্বর্য্যও নাই!

স্বামীর নিকট হইতে কোনো উত্তর এবং সমর্থন না পাইয়া সুললিতা একবার ভ্রূকুঞ্চন করিল, তারপর গুছাইয়া পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

অনেকক্ষণ পরে প্রণবেশ উঠিল। ঘরের এক কোণে খাবার ঢাকা ছিল, সরিয়া গিয়া খাবারের ঢাকা খুলিল, কিন্তু কি জানি, আহার করিবার তাহার রুচি ছিল না—সে আবার উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। অভিমান সে করিতে পারে কিন্তু করিবে কাহার উপর?

বাহিরে অনেকক্ষণ পায়চারি করিয়া সে আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। আলোতে বোধ করি তেল ছিল না, ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছে। জানালার বাহির হইতে চাঁদের আলো স্পষ্ট হইয়া বিছানার উপর আসিয়া লাগিয়াছে। খাটের কাছে গিয়া প্রণবেশ দাঁড়াইল। সুললিতা এবার সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রণবেশের মনে হইল ঘুমাইলে তাহার মনের মালিন্য মুখের উপর ফুটিয়া উঠে না। মুখ তাহার সত্যই সুন্দর। জানালাটা প্রণবেশ সবখানি খুলিয়া দিল। বাতাস আসিতেছিল না, হাত-পাখাখানি লইয়া সে সুললিতার মাথার কাছে বাতাস করিতে লাগিল। অনেক দুঃখ ও অনেক গ্লানির ভিতর দিয়া এই মেয়েটিকে সে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, ইহার উপর কোনোদিন কোনো মুহূর্ত্তেই অভিমান করা চলিতে পারে না।

ভালবাসিয়া সে দুঃখ পাইয়াছে, এই মেয়েটিকে সে আর ভালবাসিবে না। প্রেম তাহার জীবনে মৃত্যুর পর মৃত্যু আনিয়াছে, অভিশাপ আনিয়াছে, কাঙালের মত তাহাকে পথে পথে ঘুরাইয়াছে—স্ত্রী তাহার বাঁচে না বলিয়া আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কঠোর ইঙ্গিত সে সহ্য করিয়াছে,—ভাল আর সে বাসিবে না। স্ত্রীর সহিত তাহার এবারের সম্পর্ক হইবে প্রেমের নয়—মমতা, দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতির।

অনেকক্ষণ ধরিয়া বাতাস করিয়া প্রণবেশ খাটের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। আলোটা ইতিমধ্যে নিবিয়া গিয়াছে।

সংসারের কিছু কাজ না করিয়া সুললিতার উপায় নাই, নিতান্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। অথচ তাহাকে ছুটিয়া হাঁটিয়া চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে দেখিলে প্রণবেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। সতর্ক পাহারায় সমুস্ত আঘাত হইতে সে তাহার স্ত্রীকে সাবধান করিয়া রাখিতে চাহে।

—কিন্তু তুমি উনুনের কাছে গিয়ে যেন বসো না সুললিতা।

—কেন?

—দরকার কি? যে চঞ্চল তুমি, কোন্ সময় যদি আঁচল ধরে যায়?

সুললিতা হাসিতে লাগিল, তারপর কহিল,—এ যে জেলের শাস্তি! উনুনের কাছে যাব না পাছে আঁচল ধরে যায়, কুটনো কুটতে বসবো না পাছে হাত কাটে,

জল তুলতে যাবো না পাছে পা পিছ্‌লে পড়ে যাই,—সেদিন আর একটা কি বলছিলে ? হ্যাঁ মনে পড়েছে, ছাতে বেড়াতে পারব না পাছে ঘূর্ণী হাওয়ায় ঘুরে পড়ে যাই ! তাহ'লে কি করব বল ত সারাদিন ?

বিদ্রূপ সুললিতা করিতে পারে, করিলে অন্যায়ও হয় না, কিন্তু প্রণবেশ ত জানে জীবনের অর্থ কি ! একটি বিশেষ দৈব ঘটনার জন্য মানুষ বসিয়া আছে, কখন কেমন করিয়া কি রূপে সে-দৈব নিয়তির মত মানুষের উপর আসিয়া পড়িবে তাহার কোনো স্থিরতাই নাই।

কিয়ৎক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল,—বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে ?

সুললিতা কহিল,—কি ভাগ্যি !

প্রণবেশ বলিল,—প্রতাপবাবুর বাড়িতে কীর্ত্তন আছে, চল আজ শুনে আসি।

সন্ধ্যার সময় সেদিন তাহারা দুইজনে সত্যই বাহির হইল। কাঁসারীপাড়ায় কোথায় কীর্ত্তন হইতেছে, সেইখানে গাড়ী করিয়া তাহারা আসিল। বাল্যকাল হইতে প্রণবেশের কীর্ত্তন শুনিবার সখ।

ভিতরে কীর্ত্তন বসিয়াছে, কথক ঠাকুর 'দোয়ার' সঙ্গে লইয়া আসরের মাঝখানে বসিয়াছেন। পালা মাথুরের। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রার সময় শোকার্ত্ত ব্রজবাসীর করুণ বিলাপ সুরু হইয়াছে। উদ্ধব আনিয়াছে সংবাদ, অক্রূর আনিয়াছে রথ। আসন্ন প্রিয়-বিরহে বিবশা ব্যাকুল শ্রীমতী ধূলায় ধূসরিতা। কথক ঠাকুর মধুর কণ্ঠে ও সুললিত ভাষায় সমস্ত বর্ণনা করিতেছেন।

নিস্তব্ধ আসরে সকলেই উদ্বেলিত অশ্রুতে কীর্ত্তন শুনিতেছিল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলেই সেই সুন্দর কথকতায় মুগ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে চোখের জল মুছিতেছিল।

প্রণবেশের নিঃশ্বাসও ভারী হইয়া আসিতেছিল, তাহার মন বড় নরম। অনেকক্ষণ এমনি করিয়া শুনিতে শুনিতে এক সময় পিঠে চাপ পড়িতেই সে ফিরিয়া তাকাইল। একটি ছোট ছেলে তাহাকে ডাকিতেছিল। ছেলেটি তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া দরজার দিকে দেখাইয়া কহিল,—আপনাকে ডাকছেন।

প্রণবেশ কহিল,—কে ?

—ওই যে, উঠে আসুন না ?

শ্রোতাদের ভিতর হইতে অতি কষ্টে পথ কাটিয়া প্রণবেশ উঠিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, দরজার কাছে সুললিতা দাঁড়াইয়া। মুখে কাপড় চাপা দিয়া কোনও রকমে সে তখন হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল।

প্রণবেশকে দেখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া সে কহিল,—কি জায়গাতেই এনেছিলে বাপু, হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দম আট্‌কে যাচ্ছিল। যেদিকেই তাকাই, সবাই ফোঁস ফোঁস করছে। কাঁদবার জন্যে এরা সবাই তৈরি হয়ে এসেছিল !

আবার সে হাসিতে লাগিল।

প্রণবেশের চোখে তখনও জলের রেখা মিলায় নাই। সে শুধু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আর একটু শুনে গেলে হ'ত না ?

—না, আর এক মিনিটও নয়, এখুনি চল। মানুষের কান্না শোনবার জন্যে ত আর বেড়াতে বেরুনো হয়নি !

অগত্যা প্রণবেশ তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিল। ফুটপাথের উপর এক জায়গায় সুললিতাকে দাঁড় করাইয়া সে গাড়ী ডাকিতে গেল। পথের অন্ধকারে তাহার মুখের চেহারাটা কি রকম হইয়াছিল তাহা বুঝা গেল না। কীর্ত্তন শেষ হইবার আগেই তাহাকে উঠিয়া আসিতে হইয়াছে এজন্য সে দুঃখিত নয়, কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, সুললিতার অকরুণ ও হৃদয়হীন হাসিটা তখনও তাহার মনের মধ্যে আগুনের ঢেলার মত নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। বিয়োগান্ত ভালবাসা যে-নারীর মনে রেখাপাত করে না, করুণ রস যাহার নিতান্তই বিদ্রূপের বস্তু, হৃদয়ের কোমল বৃত্তির পরিচয় যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও নাই—সে নারীর বোঝা চিরদিন সে বহিবে কেমন করিয়া ? ভয়ে প্রণবেশের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

গাড়ীতে বসিয়া কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছিল না, কেবল এক একবার সুললিতা কীর্ত্তনের

আসরের দৃশ্য স্মরণ করিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিতে লাগিল।

সে-রাত্রে প্রণবেশ স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারে নাই।

বাড়িতে অনেক দিন হইতে তাহাদের কয়েকটি পাখী পোষা ছিল। নীচে ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে মনুয়াপাখীর একটা বড় খাঁচা অনেকদিন হইতেই এ বাড়িতে রহিয়াছে। পাখীগুলি প্রণবেশের বড় আদরের। সুললিতা ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের নিয়মিত আহার পরিবেশন করিবার ভার লইয়াছিল।

সেদিন উদ্বিগ্ন হইয়া আসিয়া প্রণবেশ কহিল,—ইস্, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, পাখীগুলোর কি অবস্থা হয়েছে দেখেছ সুললিতা?

সুললিতা একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—ওঃ, ওদের ক'দিন খাবার দেওয়া হয়নি বটে। চল যাচ্ছি।—বলিয়া সে নিতান্ত উদাসীনের মত বিছানা গুছাইয়া খাবার লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, তিন চারিদিন অনাহার সহিতে না পারিয়া পাঁচ ছয়টি পাখী ইতি-মধ্যেই মরিয়া গিয়াছে, বাকী কয়েকটি ধুঁকিতেছে।

প্রণবেশ তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া ধীরে ধীরে একটা বড় নিঃশ্বাস শুধু ফেলিল, কথা কহিল না।

সুললিতা বলিল,—বাবারে, কি ক্ষীণজীবী এরা! দু-দিন খাবার দিতে মনে নেই তা'তেই একেবারে বংশলোপ! ধন্য!

প্রণবেশ তবুও কথা কহিতেছে না দেখিয়া সে বলিল, —এত শিগ্‌গির যখন এরা নষ্ট হয় তখন এদের দাম অল্পই। কাল দুটো টাকা দেবো, গোটাকয়েক পাখী আমায় এনে দিও।

প্রণবেশ চুপ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

এমনি করিয়াই তাহাদের দিন চলিয়াছিল।

স্বার্থান্ধতার স্পষ্ট রূপ দেখিয়া প্রণবেশ শিহরিয়া উঠিয়াছে, মনের দৈন্য ও দারিদ্র্যের ভয়াবহ পরিচয় পাইয়া ভিতরে ভিতরে তাহার অসহ্য হইয়াছে, অসঙ্গত দাবি ও অনধিকার মন্তব্য শুনিয়া সে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু ফাটিয়া পড়িবার সাধ্য তাহার ছিল না। নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্য তাহাকে প্রতিদিন যন্ত্রণা দিতেছিল, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে, মার্জ্জনা তাহাকে করিতেই হইবে!

এমনি করিয়াই তাহাদের দিন চলিতেছিল।

শরৎকালের ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়টায় সুললিতার একদিন গা গরম হইল। অতিরিক্ত জল-ঘাঁটা তাহার অভ্যাস, তাই ঠাণ্ডা লাগিয়া গিয়াছে। সারাদিন সে কিছু খাইল না, শুইয়া বসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দিন-তিনেক পরে সে আর লুকাইতে পারিল না, গা তাহার পুড়িয়া যাইতেছে। মুখ চোখ লাল হইয়াছে, গা ভারী, মাথা তুলিতে পারিতেছে না। ধীরে ধীরে আসিয়া সে বিছানা লইল। বিছানায় শুইয়া চোখ বুজিল।

প্রণবেশ তাহার দিকে চাহিয়া এক সময় একটু হাসিল। সে-হাসি সুললিতা দেখিতে পাইল না, পাইলে বুঝিত এ-হাসির সহিত পরিচয় তাহার অতি অল্প। কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া প্রণবেশ দেখিল, ভয়ানক গরম। তারপর কহিল,—নিশ্চয় তোমার বুকেও সর্দ্দি বসেছে, নয়? গলাটা ঘড়-ঘড় করছে ত? সে ত করবেই, আমি জান্‌তাম!

সুললিতা রাগ করিয়া কহিল,—বুকে আমার সর্দ্দি বসেনি!

—বসেনি? আশ্চর্য্য!—বলিয়া প্রণবেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর আবার একটু হাসিয়া গায়ে জামা ও পায়ে জুতা দিয়া সে ডাক্তার ডাকিতে গেল।

ডাক্তার তাহার পরিচিত। দেখা করিয়া সে কহিল,—আর একবার এলাম আপনার কাছে, ডাক্তারবাবু!—এই বলিয়া সে হাসিয়া একেবারে আকুল হইল।

ডাক্তার কহিলেন,—কি হ'ল?

—প্রথমে যা হয়, জ্বর; তারপর যা হয়, সর্দ্দি; সর্দ্দির পর যা হয় তা আপনি জানেন! জ্বর বোধ হয় এখন দু-তিন ডিগ্রি, পাঁচ ডিগ্রিও হ'তে পারে! কোনো ভুল হয়নি ডাক্তারবাবু, ঠিক পথেই চল্‌ছে!

ডাক্তার কাছে আসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—অত ভয় কিসের, জ্বর বই ত কিছু নয়। চলুন।

মোটরে করিয়া ডাক্তারবাবু আসিলেন।

রোগী দেখিয়া তিনি খানিকক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না। মনে হইল তিনি যাহা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন তাহা নয়। এ জ্বর অন্য জাতের। এ জ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, সামান্য সেবায় ইহা শান্ত হয় না।

ঔষধ লিখিয়া তিনি যখন উপদেশ দিতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন প্রণবেশ বলিল,—রোগটা শক্ত হলেও বেঁচে যাবে, কি বলেন?

কণ্ঠস্বর শুনিয়া ডাক্তারবাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে তাকাইলেন,তারপর কহিলেন,—ভাল ক'রে দেখাশুনো করবেন, এমন আর কি ভয়ের কারণ আছে!

ভয়ের কারণ থাকিলে ভাল হইত কি-না তাহা প্রণবেশ একবার চিন্তা করিয়া দেখিল। তারপর কহিল, —বুঝলেন ডাক্তারবাবু, আপনি ত সবই জানেন আমার এবার আমি বিয়ে ক'রে অন্যায়ই করেছি, না করলেই পারতাম। আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইলেন, তারপর চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—একটু চোখে চোখে রাখলেই সেরে যাবে, এমন কিছু কঠিন রোগ নয়!

—নয়?—প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করিল।

—বিশেষ না!

ডাক্তার যখন চলিয়া গেলেন, তখন রাত হইয়াছে। প্রণবেশ ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সুললিতা জ্বরে তখন অচেতন হইয়া চোখ বুজিয়া আছে। প্রণবেশ নিঃশব্দে তাহার মাথার কাছে আসিয়া বসিল। মাথার মধ্যে তখন তাহার ঝড় বহিতেছিল।

এই নারীটির সেবা করিয়া, যত্ন করিয়া, ইহাকে ঔষধপত্র খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া তুলিতেই হইবে। মৃত্যু আর সে চাহে না, সে জীবন ভিক্ষা করিতে চাহে। এই নারীটির চরিত্রে শত দৈন্য ও শত অন্যায়ের সন্ধান সে পাইয়াছে, এই নারী বাঁচিয়া থাকিলে তাহার সমস্ত জীবন দুর্ব্বিসহ বোধ হইবে, প্রতিটি দিন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া উঠিবে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার মন ক্লেদাক্ত হইয়া উঠিতে থাকিবে—তবু সে বিধাতার কাছে ইহার জীবন ভিক্ষা চাহে। চিরদিনের অশান্তির অসহ্য বেদনায় তাহার বুক ভাঙিয়া যাক্—তবু সে সুললিতার মৃত্যুকামনা করে না। সুললিতা বাঁচুক, বাঁচুক,—ভগবান, সুললিতাকে তুমি বাঁচাও!





কালীপ্রসন্ন সিংহ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দের উত্তর

গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত মল্লিখিত 'কালীপ্রসন্ন সিংহ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী' প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রাবণ সংখ্যায় যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। তৎকালীন সংবাদপত্রের ফাইলে পুরাতন নাট্যশালা ও নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে তিনি উক্ত প্রবন্ধের কয়েকটি তারিখ ও তথ্যের ভুল দেখাইয়া এই বিষয়ের আলোচনার সাহায্য করিয়াছেন। ঢাকা হইতে এই সকল কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ নাই। তাহা ছাড়া এ সমস্ত কাজ পরস্পর-সাহায্য-সাপেক্ষ, এবং বন্ধু ও বহুজ্ঞ হিসাবে তাঁহার সাহায্য লইতে আমি কোনদিনই কুণ্ঠিত নহি। তাঁহার পুঁজিতে এমন অনেক তথ্য আছে, যাহা অন্যের সুপ্রাপ্য নহে; সম্প্রতি এগুলি তিনি প্রকাশ করিয়া তৎকালের ইতিহাস রচনার যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন। এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

কিন্তু দু-একটি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই, এবং একটি বিষয়ে তাঁহার অনুমান ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

১। কুলীনকুলসর্ব্বস্বের তৃতীয় অভিনয় ২২শে মার্চ্চ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গদাধর শেঠের বাড়ি হইয়াছিল, এবং আর এক অভিনয় ইহার পর জুলাই ১৮, ১৮৫৮ তারিখে চুঁচুড়ায় হইয়াছিল, এইরূপ তিনি 'সংবাদ-প্রভাকর' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হইতে দেখাইয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয় কোথায় হইয়াছিল তাহার কথা ব্রজেন্দ্রবাবু কিছু বলেন নাই। 'ভারতবর্ষে' (৪র্থ বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২৩, পৃঃ ৭১১) প্রকাশিত, রামনারায়ণ তর্করত্নের হরিনাভি বাসভবনে প্রাপ্ত, তাঁহার স্বলিখিত কাগজপত্রে রামনারায়ণ নিজের সম্বন্ধে যে-কয়টি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার নিজের কথায় আমরা জানিতে পারি যে "এই নাটক ['কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'] কলিকাতা নূতনবাজারে, বাঁশতলার গলিতে ও চুঁচুড়ায় অভিনীত হয়।" নূতনবাজার বলিয়া যে অভিনয়ের স্থান এই বিবরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বারা, বোধ হয়, জোড়াসাঁকো চড়কডাঙ্গা জয়রাম বসাকের ভবন বুঝিতে হইবে। কারণ, রামনারায়ণ তাঁহার 'বেণীসংহার' নাটক সম্বন্ধে আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বিতীয় অভিনয় "নূতনবাজারে জয়রাম বসাকের বাটীতে" হইয়াছিল। গৌরদাস বসাকের উক্তি হইতেও তাহাই বুঝায়। রামনারায়ণের স্বলিখিত বিবরণ ও গৌরদাস বসাকের বৃত্তান্ত হইতে আরও মনে হয় যে, বাঁশতলা রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটস্থ গদাধর শেঠের বাড়িতেই এই নাটকের দ্বিতীয় (তৃতীয় নয়) অভিনয় হয়। চুঁচুড়াতে যে অভিনয় হয়, তাহাই বোধ হয় তৃতীয় অভিনয়।

২। হাতের কাছে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' নাই, কিন্তু যে-ভুল ব্রজেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন, তাহা আমার নহে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের। আমি তাঁহার বিবরণ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। খুব সম্ভব 'হিন্দু পায়োনিয়র' সাপ্তাহিক ছিল, মাসিক ছিল না। কিন্তু তাহাতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ের যে তারিখ ও বিবরণ উক্ত পত্রিকা হইতে বিদ্যানিধি মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোন মীমাংসা হইতেছে না।

৩। 'বিধবোদ্বাহ নাটক' কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা, এইরূপ ব্রজেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়াছেন (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃঃ ৪৯০; ভারতবর্ষ, ১৩৩৮, পৃঃ ৩৩৮), কিন্তু এ অনুমান ঠিক বলিয়া মনে হয় না। এই নামের একটি নাটক ১৭৭৮ শকাব্দে (=খ্রীঃ অঃ ১৮৫৬) উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত বলিয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নাটকই বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক ১৮৫৫ সালের বিজ্ঞাপনে "প্রকাশ করিতেছি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই নাটকের প্রথম সংস্করণের কাপি বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। পঞ্চাঙ্কে ও ২৫২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই নাটক বিদ্যোৎসাহিনী সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। হালিসহর নিবাসী উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় যে এই সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহা উক্ত সভার দ্বারা প্রকাশিত তদ্রচিত 'বালকরঞ্জন' (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃঃ ৩৩৮-৩৯) হইতেই বুঝা যায়।

৪। এই উপলক্ষ্যে আমার ও অন্যের একটি পুরাতন ভ্রম সংশোধন করিয়া লইব। আমি উক্ত প্রবন্ধে (পৃঃ ৩০৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩২৪, পৃঃ ৪২) তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন'কে (১৮৫২ খ্রীঃ অঃ) বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালী রচিত প্রথম নাটক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, ইহা ঠিক নহে। Lebedeff-এর অধুনালুপ্ত নাটক ছাড়িয়া দিলেও ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা নাটক রচিত হইয়াছিল। শ্রীহর্ষের সংস্কৃত রত্নাবলী অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা গদ্যে ও পদ্যে নীলমণি পাল রচিত 'রত্নাবলী নাটিকা' কলিকাতা হইতে ১৭৭১ শকাব্দে (=১৮৪৯ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা 'ভদ্রার্জ্জুনের' তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত; সুতরাং ইহাকেই আপাততঃ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার দুইটি কাপি বিলাতে যথাক্রমে ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তকাগারে আছে। ইহার পত্রসংখ্যা ২১৬। নাটক-হিসাবে ইহার বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। ভাষা ও ভাব পাণ্ডিত্য ধরণের, এবং পুস্তকে উল্লিখিত আছে যে, পণ্ডিত চন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য ইহার সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য

১। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের কলিকাতায় প্রথম ও তৃতীয়, এবং চুঁচুড়ায় চতুর্থ অভিনয়ের তারিখ সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আমিই প্রকাশ করি; দ্বিতীয় অভিনয়ের তারিখ এখনও জানিতে পারি নাই। রামনারায়ণ তর্করত্ন নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই নাটক নূতনবাজার, বাঁশতলার গলি ও চুঁচুড়া—এই তিন জায়গায় অভিনীত নয়; এই কারণে সুশীলবাবু অনুমান করেন যে, কুলীন কুলসর্ব্বস্বের সর্ব্বশুদ্ধ তিনবারই অভিনয় হয় এবং ১৮৫৮, ২৫ মার্চ্চ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' যে-অভিনয়টিকে

'তৃতীয়' অভিনয় বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে 'দ্বিতীয়' অভিনয় হইবে। সুশীলবাবুর এই অভিমত আমি দু-একটি কারণে মানিয়া লইতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ, সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত সংবাদটি অভিনয়ের দুই দিন পরে প্রকাশিত। ইহাতে ভুল থাকা অন্যরূপ না হইলেও, সে সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ, রামনারায়ণ 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' অভিনয় তিন জায়গায় হইয়াছে বলিলেই যে অভিনয় তিনবারই মাত্র হইতে পারে,—এক জায়গায় দুইবার হইতে পারে না, এইরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন—"নূতনবাজারে জয়রাম বসাকের ভবনে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব বারম্বার অভিনীত হয়" ('রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত'—অনুশীলন, ১৩০১ কার্ত্তিক, পৃ. ৬৮)। সুশীলবাবুও দেখিতে পাইতেছি অপর একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"কিন্তু '১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার [কুলীন কুলসর্ব্বস্বের] দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় জোড়াসাঁকো চড়কডাঙ্গা জয়রাম বসাকের বাড়িতে হইয়াছিল।" (প্রগতি, ১৩৩৪ কার্ত্তিক, পৃ. ৩০০)। বলা বাহুল্য, এই সকল অনুমান সত্য কি ভুল তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ অনুমান—অনুমানই। ১৮৫৭ সালের বাংলা সংবাদপত্রের সম্পূর্ণ ফাইল সংগৃহীত না-হওয়া পর্য্যন্ত এই বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে না।

২। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির "সন্দর্ভ-সংগ্রহ" (১৮৯৭ ডিসেম্বরে প্রকাশিত) হস্তগত হওয়াতে দেখিতে পাইলাম আমি আলোচনায় ভুল করি নাই,—'হিন্দু পায়োনিয়ারে' প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ের বিবরণটি উদ্ধৃত করিতে গিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় যে-ভুল করিয়াছেন, সুশীলবাবুও সেই ভুলটিই করিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের লেখার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না-করিলেই হয়ত সুশীলবাবু ভাল করিতেন,—বিশেষতঃ ঐ বিবরণটি যখন এশিয়াটিক জর্নাল, ইংলিশম্যান, ক্যালকাটা কুরিয়র প্রভৃতি সাময়িকপত্রেও মুদ্রিত হইয়াছিল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের লেখা যাচাই করিয়া না-লইলে সময়ে সময়ে কিরূপ ভুলে পড়িতে হয়, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সুশীলবাবু তাঁহার অপর একটি প্রবন্ধে (প্রগতি, আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ. ২৩৩) ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে শেক্‌সপীয়ারের যে-যে নাটক যে-যে ইংরেজী তারিখে অভিনীত হয় তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। স্পষ্টতঃ না-বলিলেও মনে হয় অভিনয়ের তারিখগুলিও তিনি বিদ্যানিধির "সন্দর্ভ-সংগ্রহ" হইতেই লইয়াছেন। এই পুস্তকে বিদ্যানিধি মহাশয় ওথেলো নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩* না লিখিয়া ভুলক্রমে ২২ সেপ্টেম্বর লিখিয়াছেন; সুশীলবাবুও তাঁহার প্রবন্ধে তারিখটি ২২এ বলিয়াই দিয়াছেন। Arundell Esdaile প্রণীত *A Student's Manual of Bibliography* নামক এবং নবপ্রকাশিত পুস্তকে পড়িলাম,—

VI. Take nothing on trust (without necessity, and not even then without saying so); there have been many bad bibliographers, and it is human to err.

VII. Never guess; you are sure to be found out, and then you will be written down as one of the bad bibliographers, than which there is no more terrible fate.

আমরা যে গবেষণা করিতেছি তাহাকেও Bibliographer-এর কাজই বলা চলে। সুতরাং আমাদেরও এ কয়েকটি কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। নূতন অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছি, 'হিন্দু পায়োনিয়র'-এর প্রথম সংখ্যা বৃহস্পতিবার ২৭ আগষ্ট ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৫ সালের 'ক্যালকাটা মন্থলি জর্ণালে'র ৩২৭ পৃষ্ঠায় আছে :—

New Publications.—A periodical, called the *Hindu Pioneer*, closely resembling in exterior the *Literary Gazette* and entirely the production of the students of the Hindoo College, has been published. The first number of the work was issued on the 27th. August and on the whole reflects great credit on the contributors and editors.*

এই 'হিন্দু পায়োনিয়রে'র ২২এ অক্টোবর, ১৮৩৫, তারিখে 'বিদ্যা-সুন্দর' অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই দুইটি তারিখ নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করে যে কাগজখানি সাপ্তাহিক ছিল,—পাক্ষিকও নহে, মাসিকও নহে।

৩। সুশীলবাবু ঠিকই লিখিয়াছেন, 'বিধবোদ্বাহ নাটক' উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের রচিত। আলোচনায় যোগদানকালে ১৮৫৬ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পূর্ণ ফাইল হস্তগত না হওয়ায় আমাকে অনুমানের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার অনুমান ভুল হইয়াছিল। কিন্তু আমার ভুল দেখাইতে গিয়া সুশীলবাবু নিজেও সামান্য একটি ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, বিধবোদ্বাহ নাটক "বিদ্যোৎসাহিনী সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।" এ কথাগুলি বোধ করি সুশীলবাবুর নিজের—বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে এই পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় তিনি এরূপ লিখিয়াছেন। বিলাতে তিনি এই নাটকের যে একাধিক কাপি দেখিয়াছেন তাহাতে ঐ ধরণের কোন কথা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না, কারণ ৮ জুলাই ১৮৫৬ (২৬ আষাঢ় ১২৬৩) সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত গ্রন্থকারের নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি হইতে জানিতে পারিতেছি যে, শেষ-পর্য্যন্ত নাটকখানি মোটেই "বিদ্যোৎসাহিনী সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত" হয় নাই :—

বিজ্ঞাপন। সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে আমি যে 'বিধবোদ্বাহ নাটক' প্রস্তুত করিয়া যোড়াসাঁকোস্থ 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভায় বিশেষ অনুরোধে প্রায় বৎসরাতীত হইল প্রদান করিয়াছিলাম, সভার অধ্যক্ষগণ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ে অক্ষম হইবায় আমি নিজ ব্যয়ে তাহা এইক্ষণে উক্ত মুদ্রাঙ্কন করিতেছি অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক, গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন ইতি।

সন ১২৬৩ সাল ২৩ আষাঢ়। শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়
সাং হালিশহর খাসবাটী।

৪। এই আলোচনা প্রসঙ্গে সুশীলবাবু তাঁহার একটি নূতন অনুসন্ধানের কথা আমাদের জানাইয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত জানা ছিল, ১৮৫২ সালে প্রকাশিত তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন'ই বাঙালী রচিত প্রথম বাংলা নাটক। কিন্তু বিলাতে অবস্থানকালে সুশীলবাবু

* এই বৎসরের অক্টোবর মাসের *Modern Review* পত্রে প্রকাশিত আমার The Early History of the Bengali Theatre প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* *The Calcutta Monthly Journal* for 1835, Pt. II—Asiatic News, p. 327.



কেদারনাথের যাত্রী

শ্রীমনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীহর্ষের রত্নাবলী অবলম্বনে নীলমণি পাল কর্ত্তৃক গদ্যে পদ্যে রচিত 'রত্নাবলী নাটিকা' নামে ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত একখানি নাটকের সন্ধান পাইয়াছেন। এই নাটকখানির নাম অবশ্য আমাদের নিকট অপরিচিত নহে (বিশ্বকোষ, "নাটক," পৃ. ৭২৯), তবে ইহার সঠিক প্রকাশকাল জানা ছিল না। এখন দেখিতেছি ইহা তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুনে'র তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত।

কিন্তু বাঙালী রচিত প্রথম বাংলা নাটক (এখানে অনুবাদিত ও মৌলিক নাটকের মধ্যে আমরা কোন প্রভেদ করিতেছি না, সুশীলবাবুও করেন নাই) কোন্‌খানি, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। অন্ততঃ, ১৮৪৯ সালে শ্রীহর্ষের রত্নাবলী অবলম্বনে গদ্য পদ্যে রচিত 'রত্নাবলী নাটিকা' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও যে বাংলা নাটকের অস্তিত্ব ছিল তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেকে বলেন, ১৮২১ সালে রচিত 'কলিরাজার যাত্রা'ই প্রথম বাংলা নাটক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নাটক নহে,—সংদার যাত্রা (pantomimo) মাত্র। সুতরাং ইহার কথা বাদ দিতেছি। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে দুইখানি নাটকের উল্লেখ বাংলা সংবাদপত্রে পাওয়া যায়।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামক সংবাদপত্রে ২ মে ১৮৩১ (২০ বৈশাখ ১২৩৮) তারিখে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পশ্চাৎ লিখিত পুস্তক সকল চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে,…।
কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক মূল্য ১
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক „ ২।"

কেহ কেহ বলেন, এই কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটকই ১৮৩৩ (?) সালে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে অভিনীত হইয়াছিল।* ১৮৩০ সালে চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় হইতে 'কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক' প্রকাশিত হয়। পাদরী লং তাঁহার *Descriptive Catalogue of Bengali Books* পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"*Kautuk Sarbasa Natak*, Ch. P., 1830, a drama, by R. Chundra Tarkalankar of Harinabhi."

২৮ জুন ১৮৪৮ (১৬ আষাঢ় ১২৫৫) সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও অনুধাবনযোগ্য :—

"আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য গৃহের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক গৌড়ীয় গদ্য পদ্যে শ্রীমন্মহাকবি কালীদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সুবিখ্যাত নাটক গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তদীয় ভূমিকা ও মঙ্গলাচার প্রভৃতি কিয়দংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, অপর উক্ত পুস্তক উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে,…।

"গৌড়ীয় ভাষার পুনরুন্নতি হওন কালাবধি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ব্যতীত আর কোন নটরসাশ্রিত গ্রন্থের গৌড়ীয় অনুবাদ হয় নাই, বিশেষতঃ এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদ প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না, অতএব এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরস যাহাতে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে সন্দীপন হয় তাহাতে সম্যগ্‌রূপ প্রযত্ন প্রকাশ করা বিধেয়,…।"

* "'কৌতুক সর্ব্বস্ব' বা 'বিদ্যাসুন্দর'…অভিনয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালীর নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়।…১২৩৮ সালে কলিকাতা শ্যামবাজারে ৺নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়।"—

—

দ্বীপময় ভারত

প্রবাসীর গত ভাদ্র সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "দ্বীপময় ভারত" প্রবন্ধের ৭১৫ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন :—

"মাতা চ পার্ব্বতী গৌরী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো মানবাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্‌।"

এবং বলিয়াছেন, "দেশে ফিরে এসে একটী শ্লোক পেয়েছি, শ্লোকটী কোথা থেকে নেওয়া জানি না।"

মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের অন্নপূর্ণা স্তোত্রের দ্বাদশ শ্লোক পাঠ করিলে উহা জানা যাইবে। অধ্যাপক মহাশয় যে শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সহিত মূল শ্লোকের যে পার্থক্য আছে, তাহা নিম্নে দেখান হইল।

"মাতা মে পার্ব্বতী দেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্‌।"

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা

—

"অপরাজিত" ও সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়

মাননীয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

গত মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার 'অপরাজিত' উপন্যাসের কয়েকটি ছত্রে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বলিয়া আমাকে জানাইয়াছেন। ছত্র কয়টি এই :—

"সোনার বেনেদের বাড়ীর ঘৃতদুগ্ধপুষ্ট আহ্লাদে ছেলে, তাদের না আছে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, না আছে কল্পনার অঙ্কুর। এই বয়সেই তারা এমনি পয়সা চিনিয়াছে, এক ক্লাসের বই পড়া হইয়া গেলে চাকরের হাতে পুরাণো বইএর দোকানে বিক্রয় করিতে পাঠায়, মাহিনা দিবার সময় আবার ছাত্রের দাদা আগে রসিদটা লিখাইয়া ও সই করাইয়া লয়। দু-তিনবার পড়িয়া দেখে, তারপর মাহিনা দেয়।"

বলাই বাহুল্য এই কথা কয়টির দ্বারা আমি সুবর্ণবণিক্‌ সম্প্রদায় বা উক্ত সম্প্রদায়ের কোনো প্রকৃত ব্যক্তি-বিশেষের উপরে কটাক্ষ করি নাই। তত্রাচ যদি সেই সম্প্রদায়ের কেহ এই ছত্রকয়টিতে মনে ব্যথা পাইয়া থাকেন, তবে আমি তাঁহার নিকট এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ইতি

বারাকপুর, যশোহর
৭ই আশ্বিন, ১৩৩৮।

বিনীত
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় মন্তব্য—সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আমরাও

যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা সকলেই জানেন, যে, কোন তথাকথিত উচ্চ বা নীচ সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরূপ অবিচার যে তাঁহার অভিপ্রেত নয় লেখক একথা তাঁহার পত্রে জানাইয়াছেন। এই ব্যাপারের জন্য তাঁহার মত আমরাও দুঃখিত।—প্রবাসীর সম্পাদক

—

বাংলার কুটীর-শিল্প ও পাট

গত মাসের প্রবাসীতে আমার "বাংলার কুটির-শিল্প ও পাট" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে একটি গুরুতর ভুল ছিল। তাহার একস্থানে ছিল যে "ক্ষেতের কাজ যখন খুব বেশি তখনও কৃষকেরা প্রত্যূষে ও সন্ধ্যার পর ছয় সের সুতা কাটিতে পারে, আমরা এই শুনিয়াছি। ক্ষেতের কাজ কমিয়া গেলে বা একেবারেই না থাকিলে অবশ্য এই সুতার পরিমাণ আরও অনেক বেশি হইবে। সুতরাং পাটের সুতা কাটিয়া কৃষকেরা অন্তত মাসে ২০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে অনুমান করা যাইতে পারে।"

বস্তুত, কৃষকেরা ক্ষেতের কাজ যখন বেশি তখনও অবসরকালে অনায়াসে এক পোয়া সুতা কাটিতে পারে। এইরূপে মাসে উপরি রোজগার মোট ১॥০। ২৲ হইতে পারে। অবশ্য দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। তবে পাটের সুতা বয়ন করিয়া মাসে অনায়াসে ২০৲ টাকা রোজগার করা যায়।

শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী

—

অধ্যাপক রামনের গবেষণা ও বাঙালী বিদ্যার্থী

বিগত শ্রাবণ সংখ্যার 'প্রবাসীতে' সম্পাদক মহাশয় আচার্য্য সার্ বেঙ্কট রামনের পরীক্ষাগারে বাঙালী ছাত্রের সংখ্যাল্পতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠে মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু এ বিষয়ে আরও কিছু বলিবার আছে। বিগত ১৯২২ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত রামন্ মহোদয় তাঁহার নোবেল প্রাইজ সংক্রান্ত গবেষণাটি ভারতীয় বিজ্ঞানানুশীলন সভার (Indian Association for the Cultivation of Scienceএ) পরিচালনা করিয়াছেন, এবং তৎ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ মুখ্য প্রবন্ধ দুইটি—একটি রয়্যাল সোসাইটীতে ও অপরটি ফ্যারাডে মেমোরিয়াল সোসাইটীতে লণ্ডনে পড়াইয়া দেন। উক্ত দুই প্রবন্ধই বারো-তের জন বিদেশী ছাত্রের নামোল্লেখ সহিত রামন্ মহোদয়ের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ সম্বলিত। উহাতে একটিও বাঙালী ছাত্রের নামগন্ধ নাই। যে-সকল পরীক্ষা ঐ সকল বিদেশী ছাত্রেরা সাধন করিয়াছে, তাহা যে বাঙালী ছাত্রেরা সহজে সাধন করিতে পারিত না, এ বিষয় কেহই স্বীকার করিবে না। উহা যে বাঙালী ছাত্রেরা অনায়াসে সাধন করিতে পারিত, তাহা উক্ত দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। মোট কথা, এত বড় ভুবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারটা কলিকাতায়, বাঙ্গালীর অর্থে, বাঙালীর পূর্ণ সহায়তায়, ও বাঙালীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রতিপালকতায় সাধিত হইল, অথচ একজনও বাঙালী ছাত্রের তাহার মধ্যে নামের উল্লেখ মাত্র হইল না—বা লিপিবদ্ধ রহিল না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা ও বাংলার ও সমগ্র বাঙালী ছাত্রের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। এখন হইতে ইহার কারণ অনুসন্ধান আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয়।

৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ শ্রীমনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১ প্রসন্নকুমার দত্তের লেন, শিবপুর, হাবড়া।

—

বাংলার কাপড়ের কলের মালিকগণের অতি লোভ ও তাহার পরিণাম

ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'র ৭২৭ পৃষ্ঠায় "বাঙালীর কাপড়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। এ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য জানাইতেছি।

বাংলায় উৎপন্ন বস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা বাংলার শিল্পোন্নতির সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি বাঙালীর পক্ষে সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আন্দোলনের প্রথম হইতে অধিকাংশ—বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায়—অধিক মূল্য দিয়াও বঙ্গে উৎপন্ন পণ্য ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী হইতে দেখা গিয়াছিল। খুবই পরিতাপের বিষয় যে, বাংলার ব্যবসায়ী এবং পণ্য প্রস্তুত-কারকগণ—প্রস্তুত খরচা অধিক এবং গুণে উৎকৃষ্ট না হইলেও—ইহা একটা সুযোগ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া অযথা পণ্যের মূল্য অধিক গ্রহণে বাঙালীর উপরোক্ত মনোভাবের অবমাননা করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। বোম্বাই, আহম্মদাবাদ, এমন কি জাপানী বস্ত্রাদি বঙ্গের মিলের কাপড় ও ছিট অপেক্ষা বহু অধিক খরচ বহন করিয়াও বঙ্গের বাজারেই সুলভে বিক্রীত হইতেছে। এরূপ অর্থসঙ্কটের দিনে সস্তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কাহারও পক্ষে অস্বাভাবিক নহে এবং দীর্ঘকাল কেবল দেশপ্রীতির দোহাই দিয়া এরূপ জুলুমও চলিতে পারে না। বর্ত্তমানে মফস্বলের বাজারে কেবলমাত্র জাপানী এবং বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের বস্ত্র ও ছিটই পাওয়া যাইতেছে। মূল্যাধিক্য হেতু ক্রেতার অভাবে বস্ত্রবিক্রেতারা বঙ্গের মিলের বস্ত্রাদি আমদানি ক্রমশই বন্ধ করিতেছেন। আমি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা মারফতে গত ৬।৫।৩১, ১২।৫।৩১, ২৭।৫।৩১ তারিখে (মফস্বল সংস্করণ দ্রষ্টব্য) মিল কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিতে যত্নবান হইলেও সুফল কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। 'বঙ্গবাণী' সম্পাদক মহাশয়ও গত ২১।৬।৩১ তারিখে এবং দৈনিক 'বসুমতী'তে সম্প্রতি সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। মিল কর্ত্তৃপক্ষগণের দেশাত্মবোধ জাগ্রত না-হওয়া পর্য্যন্ত এবং রাজা-মহারাজার ন্যায় চাল-চলন (মিলের সংস্রবে থাকায় নিজ অভিজ্ঞতা) পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত দেশবাসীর সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রাপ্তির আশা সম্ভবপর ত নহেই বরং উল্টা মনোভাবেরই সৃষ্টি করিতেছে।

শ্রীঅতুলেন্দু ভাদুড়ী

দুধমা

শ্রীসীতা দেবী

বিশাল প্রাসাদতুল্য বাড়ি, অন্যদিনে আত্মীয়-পরিজন দাসদাসীর কলরবে মুখরিত হইয়া থাকে। আজ কিন্তু বাড়ি উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায় যেন রুদ্ধশ্বাস হইয়া আছে। অথচ লোকজনের ছুটাছুটি সমানে চলিতেছে, পরিবারের যে দু-চারজন মানুষ এধার ওধার ছড়াইয়া থাকিত, তাহারাও আজ আসিয়া জুটিয়াছে। আব্‌হাওয়াটা কেমন যেন অদ্ভুত হইয়া রহিয়াছে, খালি যে উদ্বেগ আশঙ্কাতেই বাতাস ভারি হইয়া উঠিয়াছে তাহা নয়, একটু যেন আশা আগ্রহও তাহার মধ্যে মিশান রহিয়াছে।

মুখুজ্জ্যেগোষ্ঠী এদিককার ডাকসাইটে বড়মানুষের বংশ। ধন, জন, কুল, মান কিছুর অপ্রতুল নাই। তবে খুঁৎ নাই এমন মানুষই জগতে পাওয়া অসম্ভব, সুতরাং এতবড় একটা বৃহৎ পরিবার, তাহার ভিতর খুঁতও অসংখ্য বাহির হইবে। তবে রূপায় না-কি সব দোষ-ত্রুটি চাপা পড়ে, তাই মুখুজ্জ্যেবাড়ীর নিন্দাটাও লোকে জোরগলায় প্রচার করে না। বড় জোর পাড়ার বউ-ঝিরা নিজেদের ভিতর ফুস্‌ফাস্ করে, "গলায় দড়ি অমন টাকার, বড় বউটাকে দগ্ধে মারলে। এর চেয়ে আমরা শাক ভাত খাই সেও ভাল।" নয় ত নব-বিবাহিতা কোনো বধূ মধ্য রাত্রে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁ গা, পার তুমি আমাকে ঐ কান্তি বাবুর বড় স্ত্রীর মত ভাসিয়ে দিতে?"

স্বামী রসিকতা করিয়া জিজ্ঞাসা করে "কেন? অবস্থাটা কি অতখানি সঙ্গীনই হয়ে উঠেছে?"

বধূ মিথ্যা অভিমানভরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলে, "যাও, সব তাতে খালি ফাজ্‌লামি।"

কান্তিচন্দ্র বিংশতাব্দীর আদর্শ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। পিতৃআজ্ঞায় নিরপরাধিনী পত্নী তরঙ্গিণীকে ত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করিয়াছেন। সে প্রায় চার পাঁচ ভুলিতে পারে নাই। তাহার কারণ, বড়লোকের মেয়ে বড়মানুষের বউ হইয়াও, তরঙ্গিণীর অহঙ্কার ছিল না। ছোট-বড় সকলের সঙ্গে সে হাসিমুখে কথা বলিত, শ্বশুর-বাড়ির শাসন এড়াইয়াও গরীবদুঃখীকে অপ্রত্যাশিত রকম সাহায্য করিয়া বসিত। এই সকল নানা কারণেই এ বাড়িতে সকলে তাহাকে সুনজরে দেখিত না।

কিন্তু এ সকল দোষ উপেক্ষা করিয়াই মুখুজ্জ্যে বাড়ীর বিরাট সংসারচক্র বনিয়াদিচালে ঘুরিয়া চলিয়াছিল, এবং তরঙ্গিণীর দিনও সুখেদুঃখে একরকম কাটিয়া যাইতেছিল। বিবাহ হইয়াছিল তাহার বারো বৎসর বয়সে, কান্তিচন্দ্রের প্রথম প্রথম বউয়ের প্রতি সুনজরও ছিল। কিন্তু এত বড় বংশের ছেলে, তাও পিতার একমাত্র ছেলে, কতদিন আর স্ত্রীর আঁচলে বাঁধা থাকিতে পারে? কাজেই ক্রমে বাঁধন ঢিলা হইতে আরম্ভ করিল। তরঙ্গিণী হিন্দু পরিবারের আদর্শে পালিতা, প্রথমটা সে সহিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চেষ্টা বিফল হইল, এবং স্বামী-স্ত্রীতে কলহবিবাদ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। ঝগড়া করিয়া অবশ্য তরঙ্গিণীর বিশেষ কোনো লাভ হইত না, তবু না বলিয়া সে থাকিতে পারিত না।

দশ বারো বৎসর বউ আসিয়াছে, অথচ এখন পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ে কিছুই হইল না। হঠাৎ তরঙ্গিণীর এই বিষম ত্রুটিটা বড় বেশী করিয়া সকলের চোখে পড়িতে আরম্ভ করিল। আগেও যে মাঝে মাঝে কথাটা না উঠিত তাহা নয়, তবে কান্তিচন্দ্র কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিত বলিয়া, তাহার মা খুড়ীরাও ইহা লইয়া বেশী ঘাঁটা-ঘাঁটি করিতেন না। শাশুড়ী বলিতেন, "এমন কি বেশী বয়স হয়েছে? ছেলে হবার দিন ত পড়েই আছে।" কত মানুষের বেশী বয়সে সন্তান হইতে তাঁহারা দেখিয়াছেন,

তরঙ্গিণী তখনকার মত চুপ করিয়া শুনিত, কিন্তু ঘরে গিয়া গোপনে চোখের জল মুছিত। ছেলের মা না হওয়ায় এ বাড়ীতে তাহার যে পাকা দখল জন্মায় নাই, তাহা সে ক্রমেই ভাল করিয়া বুঝিতেছিল।

হঠাৎ পরিবার শুদ্ধ সবাই সচেতন হইয়া উঠিল। তাই ত এমন ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে কি করিয়া? বংশ যে লোপ পাইতে বসিয়াছে? কান্তির যদি পুত্র না হয়, তাহা হইলে বড় তরফের ত অবসান হইয়া যাইবে! আছে বটে কান্তির কাকার ছেলেরা, কিন্তু সে যে বড়ছেলের বড়ছেলে, তাহার সঙ্গে কি অন্য কাহারও তুলনা হয়? এ হেন অচিন্তনীয় বিপদের সম্ভাবনায় সকলেই যেন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তরঙ্গিণীর বুকের রক্ত ভয়ে জল হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও কাছে সে কোনো ভরসা পাইল না।

কান্তিচন্দ্রের পিতা অন্দর মহলের ব্যাপারে কোনো দিনই কথা বলিতেন না, তিনি জমিদারী দেখিবেন এবং গিন্নী সংসার দেখিবেন, এইরকম একটা ব্যবস্থা আপনা হইতেই হইয়া গিয়াছিল। এবার কিন্তু তিনিও অনধিকারচর্চ্চা করিয়া বসিলেন। হঠাৎ বলা নাই কহা নাই, কি একটা সামান্য ছুতা করিয়া তরঙ্গিণীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ছুতাটা যে নিতান্তই ছুতা তাহা তরঙ্গিণী বুঝিল, ব্যথায় লজ্জায় তাহার অশ্রুর উৎসও যেন শুকাইয়া গেল। এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলিয়া, কঠিন মুখে সে বিদায় হইয়া গেল, কাহাকেও বিদায় সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিল না। কান্তিচন্দ্র সময় বুঝিয়া আগে হইতেই সরিয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহাকে আর চক্ষুলজ্জার দায়ে পড়িতে হইল না।

অন্তঃপুরিকারা শেষ বাণ ছাড়িলেন, "ঐ ত কপাল, তবু দেমাকে মট্‌মট্‌ করছেন, কাউকে যেন চোখে দেখতেই পান না।"

সত্যই ত। যাহাকে খোঁচা মারিয়া মানুষ একটু আমোদ করিতে চায়, সে যদি জাঁক করিয়া খোঁচাটা গায়েই না নেয়, তাহা হইলে রসিক জনের রাগ

আর একজন বলিল, "হবে না জাঁক? হাজার হোক্ জমীদারের বেটী বলে নাম ত আছে?"

কান্তিচন্দ্রের খুড়ীমা কথাটা শুনিয়া একেবারে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন, "ওমা, ওমা, কোথায় যাব! ভূধর বাঁড়ুয্যেও আবার জমিদার, তেলাপোকাও আবার পাখী!"

একটি মানুষের কাছে খালি তরঙ্গিণী বিদায় লইয়া গেল। সে পাড়ার গণেশশঙ্কর তেওয়ারীর স্ত্রী, লীলা। ইহারা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, তবে বহুকাল বাংলা দেশে বাস করার দরুণ বাঙালীই হইয়া গিয়াছে। গণেশশঙ্কর সামান্য স্কুলমাষ্টার, ইংরেজী বিশেষ জানে না, নীচু ক্লাসে ছেলেদের সংস্কৃত পড়ায়। মাহিনা মাত্র পঁচিশ টাকা। সংসার মাঝে মাঝে অচল হইয়া উঠে।

এমন দরিদ্রের পত্নীর সঙ্গে তরঙ্গিণীর কেমন করিয়া হঠাৎ ভাব হইয়া গেল। লীলারও সন্তান হয় নাই, সেই দুঃখ তাহার মনে একটা ব্যথার উৎস সৃজন করিয়া রাখিয়াছিল, তবে ইহা লইয়া গরীবের ঘরে তাহাকে খোঁটা খাইতে হইত না। সে মাঝে মাঝে বড়লোকের বাড়ির সকল রকম আভিজাত্যের খোঁচা খাইয়াও তরঙ্গিণীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিয়া জুটিত। তরঙ্গিণীকে বলিত, "আমার মত সারাদিন ভূতের বেগার খাটতে হত ত ছেলের দুঃখ একবার মনে করবারও সময় পেতে না, বউরাণী। বুড়ী শাশুড়ী দিনে দিনে যা হয়ে উঠছেন একলাই দশ ছেলের সমান।"

তরঙ্গিণী বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিত, 'কাজ করলে আমাদের পাপ হয়।"

কিন্তু হঠাৎ একটু পরিবর্ত্তন দেখা দিল। জমিদার-বাড়ি হইতে নিরন্তর ঘটা করিয়া যে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর আবাহন চলিতেছিল, তিনি যেন পথ ভুল করিয়াই গরীব গণেশশঙ্করের গৃহে ঢুকিয়া পড়িলেন। পাড়ার লোকে শুনিয়া বিস্মিত হইল যে, লীলার সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছে।

সন্তান হইবার সময় কিন্তু বিষম বিপদ ঘটিল। প্রসূতীকে লইয়া যখন যমে মানুষে টানাটানি চলিতেছে,

বউ মরিয়া গেলেও তিনি ডাক্তার ডাকিবেন না তখন তরঙ্গিণী উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদারবাড়ির বউকে খাতির করিয়া বৃদ্ধা মুখ বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। তরঙ্গিণী নিজে টাকা দিয়া ডাক্তার, নর্স প্রভৃতি আনাইল, এবং অচেতন সখীর মাথার কাছে ভগিনীস্নেহে তাহাকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া রহিল। দুই তিনদিন নরক-যন্ত্রনা ভোগ করিয়া লীলা একটি কন্যা প্রসব করিল।

তরঙ্গিণী বাড়ি ফিরিয়া বকুনি খোঁটা বেশ প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিল, কিন্তু লীলার প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দে সব-কিছু সে উপেক্ষা করিয়া গেল। লীলা অনেক দিন ধরিয়া ভুগিল, তারপর আস্তে আস্তে সারিয়া উঠিল। শিশুটি অযত্নে পাছে মারা যায়, সেই ভয়ে লীলার মা তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন। মায়ের চেয়ে দিদিমার কোলই তাহার প্রিয় হইয়া উঠিল। লীলা ছেলের মা হইয়াও অনেকটা ঝাড়া হাত পা লইয়াই দিন কাটাইতে লাগিল।

কালের চক্র ঘুরিতে ঘুরিতে নানারকম পরিবর্ত্তন দেখা দিল। তরঙ্গিণী বিদায় হইল। যাইবার সময় লীলার হাত ধরিয়া বলিয়া গেল, "চল্‌লাম ভাই, শীগ্‌গিরই বউভাতের নেমন্তন্নের ঘটা দেখ্‌বি হয় ত।"

লীলা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "বউয়ের মুখে আমি ঝুমড়ো ঠেসে দেব। কিছু মনে কোরো না দিদি, কিন্তু তোমার স্বামীর গায়ে মানুষের চামড়া নেই।"

তরঙ্গিণী আর ফিরিল না। জমিদার-বাড়িতে বছর না-ঘুরিতেই বিবাহ বউভাতের ধুম লাগিল বটে, তবে লীলার অবশ্য তাহাতে নিমন্ত্রণ হইল না। লীলা নিজের ছোট খোলার ঘরে রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জন করিতে লাগিল। শাশুড়ী তাহাকে তাড়া দিয়া বলিলেন, "তুই ব্যাজর ব্যাজর করছিস্ কেন লা? রাজ-রাজড়ার ঘর, হবেই ত! ওরা কি ভিখ্‌ মেঙে খায় যে, একটার বেশী দুটো বউ পুষতে পারবে না?" এ হেন যুক্তি শুনিয়া লীলা নীরব হইয়া গেল।

জমিদার-বাড়ির নূতন বউ সুয়োরাণীর নাম সুধারাণী। বড়লোকের মেয়েও নয়, কিন্তু তাহাকে ঘিরিয়া যে আদর সোহাগের আবর্ত্ত সৃষ্ট হইল, তাহা দেখিয়া পাড়ার লোকের তাক লাগিয়া গেল। শোনা গেল বধূর কোষ্ঠীতে এবং হাতে আছে সে অতি ভাগ্যবতী এবং বহু সন্তানবতী। ভাল ভাল জ্যোতিষ ডাকিয়া তাহার গুণাবলী যাচাই করিয়া তবে তাহাকে এ-ঘরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কান্তিচন্দ্রের রূপের তৃষ্ণা ছিল না যে তাহা নয়, তবে সে-তৃষ্ণা মিটাইবার নানা রকম সুযোগ ছিল। সুধারাণী সুন্দরী না হওয়াতেও বড় একটা কিছু আসিয়া গেল না।

তরঙ্গিণীর কথা লোকে ক্রমে ভুলিতে সুরু করিল। চোখের সামনে না থাকিলে আত্মীয়-স্বজনেই বা ক'টা মানুষকে মনে রাখে, তা পাড়াপ্রতিবেশীর কথা ছাড়িয়াই দাও। শুধু লীলার মনের ক্রোধের আগুন কিছুতেই নিবিল না। সুধারাণীকে জান্‌লা দরজার ফাঁকে দেখিলেই সে এমন অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাকাইত যে, নূতন বউ বেচারী ভ্যাবাচাকা খাইয়া সরিয়া যাইত।

লীলার নিজের সংসারেও নানা রকম পরিবর্ত্তন, ভাঙাগড়া চলিতেছিল। খুকী এখনও বেশীর ভাগ সময় দিদিমার কাছেই থাকে। কাজেই লীলার সঙ্গি-হীনতার দুঃখ আর ঘোচে নাই। এমন দিনে তাহার স্বামীও হঠাৎ বহু দূর দেশে কাজ লইয়া চলিয়া গেল। দেশে তাহার ছোটভাই থাকিত, সে সম্প্রতি মারা গিয়াছে। রাখিয়া গিয়াছে বিধবা স্ত্রী এবং তিন চারটি ছেলেমেয়ে। সকলের ভার পড়িল গণেশশঙ্করের উপর, পঁচিশ টাকা মাহিনায় আর কোনো মতেই কুলাইল না। তবু কপাল ভাল যে সুদূর আসামে এক ধনী মাড়োয়ারীর বাড়ীতে ছেলেদের সংস্কৃত পড়াইবার একটা কাজ তাহার জুটিয়া গেল। মাহিনা পঁচাত্তর টাকা, থাকিবার ঘর মিলিবে। এমন সুযোগ সে ছাড়িতে পারিল না। স্ত্রীকে নানা কথায় বুঝাইয়া, বৃদ্ধা মায়ের ভার তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া বিষণ্ণ মুখে গণেশশঙ্কর যাত্রা করিল। বৎসরে একবার মাত্র পূজার সময় সে দিন পনেরো ছুটি পাইবে, তাহারই আশায় তাহার মাতা, পত্নী

দেখিতে দেখিতে আরও অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেল। পাড়ার লোকে মাঝে দিন কতক একটা কুসংবাদ লইয়া খুব আলোচনা করিল, তাহার পর সেটাও আবার কালক্রমে চাপা পড়িয়া গেল। তরঙ্গিণী না কি বাপের বাড়িতে আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, ইহা ছাড়া আরও কিছু দুঃখের কারণ তাহার ঘটিয়াছিল কি-না তাহা বিশেষ কিছু জানা গেলনা, তবে তরঙ্গিণী যে আর নাই, সেটা নানা জনেই নানা ভাবে প্রচার করিল। কান্তিচন্দ্র লোক-দেখানো শ্রাদ্ধ একটা করিতে বাধ্য হইল, একদিনের জন্য তরঙ্গিণী অন্ততঃ তাহাকে স্বামীর কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য করিল।

লীলা ঘরে দ্বার দিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। তরঙ্গিণীর কোনো একটা স্মৃতিচিহ্ন তাহার কাছে নাই, ইহা ভাবিয়া বুকের ভেতর তাহার অশ্রুরাশি কেবলই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। একখানি ছবি কেন চাহিয়া লয় নাই, মনে করিয়া নিজেকে কেবলই ধিক্কার দিতে লাগিল। জমিদার-বাড়িতে তরঙ্গিণীর কত সুন্দর সুন্দর ছবি সে দেখিয়াছে, সে সকলই হয়ত আঁস্তাকুড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। হায়, হায়, তাহাকে যদি একখানা কেহ আনিয়া দিত।

বিবাহের পর চার বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু নূতন বউ সুধারাণী এখন পর্য্যন্ত কোষ্ঠী এবং হাতের রেখার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না। বাড়িতে আবার কোলাহল সুরু হইল। একদিকে গ্রহশান্তি, দৈবজ্ঞের স্রোত, অন্যদিকে ডাক্তার ধাত্রীর চোটে বাড়ীতে রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল। পঞ্চম বৎসরে সুখবর শোনা গেল, বড় তরফের বংশলোপ হইবার আর ভয় নাই।

কিন্তু এ পাড়াতে মা ষষ্ঠীতে এবং যমরাজেতে বিবাদ যেন সনাতন রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পাঁচ ছয় বৎসর পরে লীলারও আবার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু মায়ের মনে অতৃপ্ত স্নেহের তুফান জাগাইয়া অকালেই সে বিদায় গ্রহণ করিল। লীলা করিয়া নয়, বিদেশবাসী স্বামীকে এবং পরলোকগতা সখীকেও উদ্দেশ করিয়া। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল গরীবের ঘরে যত্নের অভাবেই যেন তাহার শিশু অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। ভাল করিয়া সারিয়া উঠিবারও তর সয় না, দরিদ্রের ঘরের অভাব, অভিযোগ অসুস্থতাকে উপহাস করিয়া দূরে তাড়াইয়া দেয়। লীলা মাস ফিরিতে-না-ফিরিতে আবার উঠিয়া কাজে লাগিয়া গেল, শরীর যতই বিকল হউক, শাশুড়ীর ক্ষুরধার রসনা যে একটু বিশ্রাম পাইল, তাহাতে সে আরাম বোধ করিল।

সকালে উঠিয়া রান্নাঘর নিকাইতেছে এমন সময় বৃদ্ধা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বলি ওগো বাছা, খোঁজ নাও ত একটু, জমিদার-বাড়িতে কি হল। কেবল ছুটোছুটি, গোলমাল, মোটরকার করে একটার পর একটা ডাক্তার আস্‌ছে, টুপি মাথায় একটা ডাক্তারণীও এল দেখছি। ভাল মন্দ কিছু হল না-কি নূতন বউটার?"

নূতন বউয়ের খবর জানিতে লীলার বিশেষ কিছু উৎসাহ ছিল না, তবু একেবারে খোঁজ না করিয়াও পারিল না। হাজার হউক মেয়েমানুষ ত? তাহাদের একটা দিন অন্ততঃ আসে যখন নারীমাত্রেরই সমবেদনা জাগিয়া উঠে। লীলাও পাশের বাড়ির খুকী রাজুকে হাতে একটু চিনি ঘুষ দিয়া জমিদার বাড়ির রাঁধুনী বামাঠাকরুণের কাছে পাঠাইয়া দিল। রাজু চটপটে মেয়ে, চিনির হাতটা ভাল করিয়া চাটিয়া লইয়া, ছেঁড়া চৌখুপী শাড়ীটা কোমরে জড়াইয়া ভোঁ করিয়া এক দৌড়ে রাস্তা পার হইয়া গেল। ছোট্ট এক রত্তি মেয়ে, বয়স যদিও নয় বৎসর, কোন্ ছিদ্র পথে ভিতরে ঢুকিয়া যাইত, তাহা দেউড়ীর দরোয়ান পর্য্যন্ত টের পাইত না। মিনিট পাঁচের ভিতরেই সে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, "ওদের বউরাণীর ছেলে হবে গো, তিন দিন হ'ল বেদনা উঠেছে।"

ছোট মেয়ের মুখে পাকা পাকা কথা, লীলা হাসিয়া তাহাকে আর একটু চিনি দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

ব্যথা খাচ্ছে? দেখ গো, ভালমানুষের মেয়ে, তুমি ত একদিনেই পাড়া মাথায় করেছিলে।"

বিরক্তিতে ভ্রুকুটি করিয়া লীলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। শারীরিক রোগ বেদনার ভিতরেও কৃতিত্ব কোথায় আছে তাহা এক তাহার শাশুড়ীই জানেন। লীলা যদি এক দিনের অসুখে মারা যায়, তাহা হইলেও হয়ত শাশুড়ীঠাকুরাণী সেটা একটা অন্যায় আবদার মনে করিবেন। সাততাড়াতাড়ি মরা কেন? কিন্তু রাগ ও বিরক্তির মধ্যে মধ্যেও সুধারাণীর জন্য তাহার দুঃখ হইতে লাগিল। আহা, না জানি কি অসহ্য কষ্ট পাইতেছে। হউক বড় মানুষ, আসুক না দশটা ডাক্তার নার্স, তবু এ বেদনা গরীব ভিখারিণীর যতখানি, রাজরাণীরও ততখানি। নিতান্ত ও-বাড়ির চৌকাঠ আর মাড়াইবার নামে তাহার গায়ে জর আসে, না হইলে একবার গিয়া বৌটাকে দেখিয়া আসিত। মন হইতে সব চিন্তা সে দূর করিয়া দিয়া নিজের কাজে লাগিয়া গেল, আঁচ বহিয়া যাইতেছিল।

সন্ধ্যাবেলা রাজুর মায়ের কাছে খোঁজ পাইল বৌরাণীর একটি খোকা হইয়াছে, কিন্তু তাহার নিজের জীবন সংশয়, শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিবে কি-না কিছুই বলা যায় না। ভয়ানক জর, মাথায় বরফ দেওয়া হইতেছে, ডাক্তার চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের ভিতর বসিয়া আছে।

কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে সুধারাণীর খবর সে পাইতে লাগিল। বউরাণী না-কি উন্মাদের মত চীৎকার লাফালাফি করিতেছে, ছেলের গলা টিপিয়া মারিতে যাইতেছে, নিজে জানলা দিয়া লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। আঁতুড়-ঘরের ঝি, নার্স প্রভৃতিকে মারিয়া ধরিয়া, চুল ছিঁড়িয়া একাকার করিতেছে, অনেক টাকার লোভেও কেহ থাকিতে চাহিতেছে না।

শাশুড়ী বলিলেন, "তাই না-কি গা? ঠিক উপদেবতায় পেয়েছে। সতীন মাগী কি আর শোধ তুলবে না? অমনি করে তাকে দগ্ধে মারলে।"

রাজুর মা বলিল, "সে কথা একশবার। একটা ন্যায় বিচার আছে ত?"

কথা ঠিক না-কি? হইতেও পারে, জগতে কত জিনিষ ত ঘটে।

আরও দিন দুই কাটিয়া গেল। বউরাণীর অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। জমিদার-বাড়িতে উদ্বেগ-আশঙ্কার স্রোত সমানে বহিতে লাগিল।

দুপুর বেলা। শাশুড়ী খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া ছেঁড়া পাটি বিছাইয়া, সিঁড়ির মুখে যে বাঁধান জায়গাটুকু, সেইখানে শুইয়া পড়িয়াছেন। হইলেই বা রাস্তার উপর, এ খানটাতে তবু হাওয়া আছে। তিনি ত আর নূতন কনে বউ নন যে, কেহ দেখিয়া ফেলিলে মারা যাইবেন। লীলা তেলের বোতলটা উপুড় করিয়া দেখিল তাহাতে এক ফোঁটাও তেল নাই, রোজ রোজ রুক্ষ স্নান করিয়া তাহার মাথাধরার রোগ দাঁড়াইয়া যাইতেছিল। বিরক্তমুখে সে কলতলার দিকে অগ্রসর হইতেছে এমন সময় শাশুড়ীর কাংস্যকণ্ঠের ঝঙ্কার শুনিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কাহার উপর তিনি তর্জ্জন করিতেছেন, "আমর্ মিন্‌ষে, দিলে কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে। চেঁচাবার আর জায়গা পাস্‌নি?"

লীলা দরজাটা ফাঁক করিয়া উঁকি দিয়া দেখিল জমিদার-বাড়ির দরোয়ানি। এখানে কি করিতে?

দ্বারের অন্তরালে লীলার শাড়ীর লাল পাড়টা দরোয়ানের চোখে পড়িল, সে বলিয়া উঠিল, "এ মাই থোড়া শুন্ ত যাও। এ বুঢ়ীয়া মাই ত ঝুট্‌মুট্ গুস্‌সা কর্‌তা।"

লীলা গরীবের বউ, বেশী পরদানশীন্ হইবার তাহার উপায় নাই। কপালের উপর ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিয়া সে দরজার বাইরে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা বক্‌বক্ করিতে করিতে মাদুরের উপর উঠিয়া বসিলেন। দরোয়ান জানাইল, রাণীমা এ বাড়ির বউকে একবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

লীলা একেবারে ধনুকের টঙ্কারের মত বাজিয়া উঠিল। সে ত জমিদারের ঝি বা চাকর নয়? তাহাকে ডাকা কেন? তাহাকে দিয়া রাজরাণীর কি প্রয়োজন? সে যাইবে না।

বউয়ের উপর বেশী জোর জবরদস্তি খাটাইতে পারিতেন না। তবু ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ কর বেশরম ছুঁড়ি। বউ মানুষের এত লম্বা জবান কেন?"

লীলা খর খর করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল। দরোয়ান হতভম্ব হইয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ফিরিয়া গেল। বউয়ের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে বৃদ্ধা আবার শুইয়া পড়িলেন।

লীলার অদৃষ্টে সেদিন নিশ্চিন্তে স্নানাহার লেখা ছিল না। স্নান সারিয়া সবে হাঁড়ি হইতে খোরায় ভাত ঢালিতে বসিয়াছে, এমন সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া বসিল। জমিদার-বাড়ীর মস্ত সেডান্ গাড়ীখানা আসিয়া তাহাদের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং তাহার ভিতর হইতে দাসীর সাহায্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহির হইয়া আসিলেন স্বয়ং জমিদার-গৃহিণী। শাশুড়ীর চোখ প্রায় ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে দেখিয়া লীলা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। গৃহিণী বোধ হয় এক মিনিটের বেশী এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকার অভ্যাস বহুদিন ত্যাগ করিয়াছেন, লীলা ভাবিয়াই পাইল না, কোথায় তাঁহাকে বসাইবে। গরীব মানুষের ঘর, সোফা-কুর্‌সীর বালাই নাই। একখানা ভাঙ্গা তক্তাপোষ আছে, শাশুড়ী তাহাতে শোন, নিজে সে মাটিতেই বিছানা করিয়া শোয়। তক্তপোষের উপর তাহার একমাত্র গায়ের কাপড় জয়পুরের ছাপ দেওয়া চাদরটা পাতিয়া দিয়া বলিল, "এইখানেই বসুন, আমাদের ত আর বস্‌তে দেবার জায়গা নেই।"

গৃহিণী বসিতে পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন, একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হাঁটাচলার অভ্যেস একেবারে গেছে। নিতান্ত দায়, তাই এলাম। তুমি ত বাছা ডেকে পাঠালেও যাবে না।"

লীলার শাশুড়ী এতক্ষণে সামলাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আজকালকার মেয়ে সব স্বাধীন, কারও কথার ধার ধারে ওরা? আমরাই তাঁবেদারীতে আছি। তা গরীবের কুঁড়েয় আজ যে রাণীমা পা দিলেন?"

বংশের এক ছেলে, শিবরাতের সল্‌তে, আর ত নেই? তার প্রাণটা ত রাখতে হবে? আমার বৌয়ের কথাত শুনেছ? বাছার উপর কার যে ভর হ'ল জানি না। চারদিকে শত্তুর মা, কাকে বল্‌ব? তা নাতিটাও যেতে বসেছে। দশ বারোদিনের বাচ্চা, একফোঁটা মায়ের দুধ পেল না, কিসে তার জীবন টেঁকে বল ত? ডাক্তার বল্‌ছে, আর কিছু খাওয়ালে টিক্‌বে না। তা বাছা, তুমিও বামুনের মেয়ে, তোমারটা ত কোল শূন্যি করে গেল। খোকাটাকে যদি একটু দুধ দাও ত বেঁচে যায়। টাকা দিতে আমরা পেছ্‌পা নই। একশ চাও একশ পাবে, দুশো চাও দুশো পাবে। থাক্‌বার ঘর পাবে, একটা কুটো ভাঙ্‌তে হবে না, পায়ের উপর পা দিয়ে থাকবে।"

শাশুড়ী কিছু বলিবার আগেই লীলা বলিয়া উঠিল, "সে আমি পারব না। গরীব বলে আমাদের মান সম্ভ্রম নেই না কি?"

জমিদার-গৃহিণী জন্মে এমন কথা শোনেন-নাই। তাঁহার খাড়িতে গেলে মান-সম্ভ্রম যাইবে? অন্য সময় হইলে কি ঘটিত বলা যায় না, কিন্তু গরজ বড় বালাই, তাঁহাকে রাগ চাপিয়াই যাইতে হইল। বলিলেন, "মান সম্ভ্রম কেন যাবে মা? আমার ঘরে মেয়ের মত থাক্‌বে, কেউ একটা কথা যদি বলে, ঘাড়ে তার মাথা থাক্‌বে না। যা চাও তা তুমি পাবে মা, ছেলেটাকে বাঁচাও। এতে তোমার পুণ্যি হবে।"

লীলা কথা কহিল না। গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা একটু ভেবে দেখ বাছা, আমি তবে আসি। ঘণ্টাখানেক পরে গাড়ী পাঠাব, যেয়ো। নিজেও ছেলের মা তুমি, কচি ছেলে গলা শুকিয়ে মর্‌বে, তাকে একটু দুধ দেবে না?"

কথাটা লীলার প্রাণে লাগিল। ছেলের মূল্য সে কি বোঝে না? কিন্তু তরঙ্গিণীর বিষণ্ণ মুখ যেন তাহার পথে অলঙ্ঘ্য বাধা তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহারই হত্যাকারীকে শেষে সে সাহায্য করিতে যাইবে? কান্তিচন্দ্রের শাস্তি ত পাওনাই আছে, সে কেন মাঝে

আবার ভাতের খোরাটা টানিয়া লইল, কিন্তু দু-তিন গ্রাসের বেশী মুখে তুলিতে পারিল না।

একঘণ্টা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, লীলা কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। তাহার শাশুড়ী ক্রমাগত বউয়ের "ন্যাকামী ঢেঁটামী" প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা করিয়া চলিলেন, কিন্তু কোনো কথাই প্রায় তাহার কানে গেল না। জমিদার-বাড়ির গাড়ী যখন আবার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও তাহার মন স্থির হয় নাই। গৃহিণীর খাস ঝি চন্দ্রমুখী তাহাকে লইতে আসিয়াছিল। সে একখানা চিঠি লীলার হাতে দিয়া বলিল, "এই চিঠি রাণীমা দিলেন, চট করে গুছিয়ে নাও। শাশুড়ী বুড়ো মানুষ, তাঁকে আর কোথায় ফেলে যাবে, তিনিও চলুন।"

বৃদ্ধা দিনকতক অন্ততঃ জমিদার-বাড়ির আরাম উপভোগ করিবার আশায় উঠিয়া বসিলেন। লীলা চিঠিখানা খুলিয়া দেখিল, গৃহিণী লিখিয়াছেন, সে যেন অতি অবশ্য আসে, না হইলে তাঁহার নাতি বাঁচিবে না। কর্ত্তা বলিয়াছেন গণেশশঙ্করকে বাড়ীতে খুব ভাল কাজ দিবেন, সেও এখানে আসিয়া থাকিবে।

এইবার লীলার মন টলিল। আজন্ম দুঃখকষ্ট সহিয়াই তাহার দিন কাটিতেছিল, কিন্তু স্বামীর প্রবাসজনিত বিচ্ছেদটা কিছুতেই এতদিনেও তাহার সহিয়া যায় নাই। ইহারই অবসান হইবার লোভে সে নিজের সামান্য পরিধেয় কাপড়চোপড় এবং শাশুড়ীর দুই চারিটা জিনিষ গুছাইয়া লইয়া, ঘরে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। স্বামী বিরক্ত হইবেন হয়ত, এই আশঙ্কাটা থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনকে কাতর করিয়া তুলিতে লাগিল।

কান্তিচন্দ্রের ছেলে এবারকার মত টিঁকিয়া গেল। লীলা প্রথম যখন শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইল, তাহার মনে স্নেহের কোনো আলোড়ন উপস্থিত হইল না। এই শিশু একদিক দিয়া তরঙ্গিণীর মৃত্যুর কারণ, সে ইহাকে জন্ম দিতে পারে নাই বলিয়া সকল অধিকার হইতে, স্বামীর ঘর হইতে পর্য্যন্ত বিচ্যুত হইয়াছিল। সুধারাণী যে আজ রাণীর অধিকার পাইয়াছে, সেও কেবল ইহার জননী বলিয়াই। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহার মনের বিরুদ্ধভাবটা কাটিয়া গেল। শিশুকে কখনও নারী-শত্রু মনে করিতে পারে না। স্তনদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার পালিকা মাতার হৃদয়ও যেন প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

লীলার শাশুড়ী ত খুশীতে ভরপুর। এত আরাম, এত আদর যত্ন, তাহার যেন নবজীবন লাভ হইল। লীলার মনে কিন্তু এই সকল আড়ম্বর, আদর আপ্যায়ন কিছুই কোনো রেখাপাত করিতেছিল না। সে নিজের মনের সংগ্রামেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। এ শিশুকে আর যেন কোল ছাড়া করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। এ যেন তাহারই খোকা, আবার মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ে যে সন্তানের অধিকার কচিমুখের জোরে, অসহায় ক্ষীণ দুর্ব্বল দুইটি মুঠির জোরে কাড়িয়া লইতেছে, বাহিরে তাহার উপর লীলার কোনো অধিকারই নাই। নিতান্ত শিশুর প্রাণের দায়, তাই এ রাজার দুলাল আজ দরিদ্রা ধাত্রীর কোলে আসিয়া জুটিয়াছে, যখনই প্রয়োজন ফুরাইবে, ধন ঐশ্বর্য্য মান মর্য্যাদার প্রাচীর দুই জনের মধ্যে অভ্রভেদী হইয়া উঠিবে। যাহাকে লীলা আজ বুকের রক্তে মানুষ করিতেছে, দুইদিন পরে তাহাকে চোখে দেখিবার অধিকারটুকুও তাহার থাকিবে না। সেই দারুণ বিচ্ছেদের ব্যথা সে সহিবে কি করিয়া? কেন সে এমন অসহনীয় বেদনার পথে জানিয়া শুনিয়া পা বাড়াইল। এই বংশটা নারীর চিরশত্রু, যাহারা ঘরের বধূকে কোনো করুণা দেখায় নাই, তাহারা লীলাকে কখন প্রয়োজনের অধিক প্রশ্রয় দিবে না।

আরও একটা ব্যাপারে তাহার মনের চঞ্চলতা বাড়িতে লাগিল। গণেশশঙ্করকে আনাইবার কোনো লক্ষণই ইহারা দেখাইল না। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল, তাহাকে চিঠি লেখা হইয়াছে, কিন্তু জবাব এখনও আসে নাই। লীলা বিস্মিত হইল। এতখানি প্রয়োজনীয় চিঠির উত্তর সে দিল না, তাহা কখনও হইতে পারে না। সে নিজেও একখানা চিঠি লিখিয়া উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া উত্তরের প্রত্যাশা করিতে লাগিল।

সুধারাণীর ঘর তেতলায়। লীলা এবং তাহার

শাশুড়ীকে বউয়ের সান্নিধ্য হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিবার জন্য, একতলার এক টেরে স্থান দান করা হইয়াছে। একতলা হইলেও ঘরগুলি চমৎকার, আসবাবপত্র, বিছানা, পরদাতে উত্তমরূপে সাজান। লীলা সুধু খোকাকে খাওয়াইয়াই নিশ্চিন্ত, তাহার অন্যসব কাজ করিবার জন্য একজন ঝি আছে। সারাদিন বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া লীলা হাঁপাইয়া ওঠে। আজন্ম কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত সে, বসিয়া বসিয়া তাহার দিন যেন আর কাটিতে চায় না। এ বাড়ীর কোনো মানুষ তাহার সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না, সে যে গরীবের মেয়ে। ঝি রাঁধুনীরা বিশেষ ভরসা করে না, যদিই কর্ত্রী বিরক্ত হন। তবু দুপুর বেলা যখন সবাই বেশ নিশ্চিন্তমনে দিবানিদ্রা উপভোগ করেন, তখন বামাঠাকরুণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুটা কথা কহিয়া যায়।

রবিবার দিনটা এ বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া চুকিতে বেলা প্রায় গড়াইয়া যায়, কাজেই সন্ধ্যার আগে অন্তঃপুরিকাদের দিবানিদ্রা ভাঙে না। লীলা বসিয়া বসিয়া একখানা মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতেছিল। এখানে আসিয়া তাহার বহু দিনের পরিত্যক্ত বিদ্যাচর্চ্চা আবার সুরু হইয়াছে। বাংলা এবং দেবনাগরী দুই-ই সে পড়িতে জানিত, কিন্তু দুইটাই প্রায় সে ভুলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। এখানে নিতান্ত আর কিছু করিবার নাই এবং বই হাতের কাছে আছে, কাজেই পাতা না উল্টাইয়া পারা যায় না।

বামা ঠাকরাণী আসিয়া বলিল, "কি করছ গো মেয়ে? বই পড়ছ?"

লীলা বলিল, "কি আর করি বামুনদিদি? হাতে পায়ে ত বাত ধরবার জোগাড় করেছে। কাজকর্ম্ম ত কিছু নেই, এদের মত এত ঘুমনোও অভ্যেস নেই।"

বামা গলাটা একটু নামাইয়া বলিল, "একটু আরাম করে নাও, ক দিনই বা? এর পর ত চিরকাল খাটবার দিন পড়েই আছে।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কত দিনে এঁরা ছুটি দেবেন, জান না-কি কিছু দিদি? অনেক কথা বলে

বামুন ঠাকরুণ এ ধার ও ধার চাহিয়া দরজাটা গিয়া ভেজাইয়া দিয়া আসিল। তাহার পর লীলার কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, "তুমিও যেমন বাছা, ওদের কথা বিশ্বেস কর। নিজেদের কাজ উদ্ধার হয়ে যাক্, তারপর দেখো কেমন মূর্ত্তি ধরে। এরই মধ্যে পঞ্চাশ বার ডাক্তারের কাছে খোঁজ হচ্ছে এখন গরুর দুধ ছেলেকে দেওয়া যায় কি-না। ছেলে পাছে তোমার বশ হয়ে যায়, এই ভাবনায় তাদের বলে চোখে ঘুম নেই।"

লীলা মনে যাহাই ভাবুক মুখে কিছু বলিল না। একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রাহ্মণী আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "তেওয়ারীকে ওরা এখানে আন্‌বে টান্‌বে না বাছা, তোমায় মিছে করে বুঝিয়েছে। তাকে চিঠিও লেখেনি কিছু না, তুমি যে সব চিঠি-পত্তর দাও, সে সবও ওরা গাপ্ করে।"

আশঙ্কায় লীলার গলা শুকাইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা? এ রকম করছে কেন?"

বামা ঠাকরুণ বলিল, "পাছে সে এসে কিছু গোলমাল বাধায়, তাই আর কি? ওদের মতলব ছেলেটাকে অন্য দুধ ধরাতে পারলেই তোমায় দশ পনেরো টাকা ধরে দিয়ে বিদেয় করবে। ও সব দুশো পাঁচশোর কথা ভুয়ো, অত টাকা আবার ওরা দিচ্ছে।"

এমন সময় পাশের ঘরে সশব্দে হাইতোলার আওয়াজে, বামাঠাকরুণ সতর্ক হইয়া চুপ করিয়া গেল। দরজাটা অতি সন্তর্পণে খুলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

লীলা অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল। নিজেকে মনে মনে সহস্র বার ধিক্কার দিল, কেন সে মূর্খের মত ইহাদের ফাঁদে পা দিয়াছিল। এখন কেমন করিয়া মান বজায় রাখিয়া এখান হইতে উদ্ধার হইবে, তাহাই কেবল ভাবিতে লাগিল। অসহায়া নারী সে, শাশুড়ী তাহার ঘাড়ের উপর বোঝা মাত্র, তাঁহাকে দিয়া সাহায্য কিছুই হইবে না। স্বামীকে খবর দেওয়ারও উপায় নাই। না জানিয়া সে স্বেচ্ছায় কারাগারে প্রবেশ

খোকার ঝিকে ডাকিয়া বলিল, "খোকা কোথা রে, তার দুধ খাবার সময় হ'ল না ?"

ঝি বলিল, "সে ত রাণীমার ঘরে, তিনি ঘণ্টা খানিক হ'ল চেয়ে নিয়ে গেছেন না ?"

রাণীমার ঘরে লীলা কখনও যাইত না, তাহাকে যে কেহ যাইতে মানা করিয়াছিল তাহা নয়, নিজেরই কখনও তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। আজ কি মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে জমিদার-গৃহিণীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। প্রায় সমস্ত দুতলাটা জুড়িয়াই গৃহিণীর রাজত্ব। লীলা উপরে উঠিতে উঠিতেই শুনিতে পাইল, বড় শয়নকক্ষে মহোৎসাহে হাসি তামাসা গল্প চলিতেছে।

কান্তিচন্দ্রের খুড়ী বলিতেছেন, "খোকন দিন দিন কি চমৎকার দেখতে হচ্ছে দিদি, কান্তি ছোট বেলায় ঠিক্ অমনি ছিল। ভাগ্যে নতুন বৌয়ের রং পায় নি।"

দিদি বলিলেন, "এখন ভালয় ভালয় আর মাস খানেক কাটলে বাঁচি বোন। যা পুতনা রাক্ষসী ঘরে পুষতে হচ্ছে। টাকার লোভে এসেছে বটে, কিন্তু খোকাকেও কি আর ভাল চোখে দেখে ? বড় বউটার সঙ্গে বড় ভাব ছিল না ?"

কে আর একজন বলিল, "সত্যি জ্যাঠাইমা, রাজ্যে যেন আর লোক ছিল না, তাই ঐ খোট্টা মাগীকে নিয়ে এলে।"

গৃহিণী বলিলেন, "লোক আর পেলাম কৈ ? তাহলে আর ওঁর ছায়া মাড়াই ? কত দেমাক দেখিয়ে নিল বলে। আগেকার দিন হলে চুলের মুঠি ধরে, পাইকে জুতো মারতে মারতে নিয়ে আস্ত: আজকাল কোম্পানীর রাজত্বে ছোটলোকের বড় বাড় হয়েছে।"

লীলা আর দাঁড়াইল না, কম্পিত পদে নীচে নামিয়া আসিল। অপমানে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বালা করিতেছিল। নিজের উপায়হীনতায় তাহার নিজের মাথার চুল ছিঁড়িতে ইচ্ছা করিতেছিল। কি করিয়া সে এই বেড়াজালের ভিতর হইতে উদ্ধার পাইবে ?

ঝি খানিক পরে খোকাকে দুধ খাওয়াইতে লইয়া আসিল। তাহার নবনীতকোমল দেহ বক্ষে লইয়া লীলা হঠাৎ ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ঝিটা একটু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল মা ? শরীর গতিক ভাল ত ? রাণীমাকে ডাক্‌ব ?"

লীলা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "না বাছা, তোমার কাউকে ডাকতে হবে না, আমি ভালই আছি।"

রাত্রে লীলা কিছু আহার করিল না দেখিয়া গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া খোঁজ করিতে আসিলেন। লীলা বাজে কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল।

পরদিন সকালে খোকার কান্নায় ঝিটা চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিয়া হাঁকিল, "কোথায় গেলে গো, আমাদের খোকাবাবুর যে গলা শুকিয়ে গেল।"

কোনো সাড়া না পাইয়া সে বিস্মিতভাবে ঘরের বাহিরে আসিয়া আর একজন ঝিকে বলিল, "সে খোট্টানী গেল কোথায় গা ? ছেলেটা যে তেষ্টায় গেল ?"

অপরা বলিল, "দেখ তার শাশুড়ী বুড়ীর ঘরে।"

শাশুড়ীর ঘরেও বৌ বা শাশুড়ী কাহাকেও দেখা গেল না। তখন হৈ চৈ বাধিয়া গেল, গৃহিণী ও তাঁহার সাজপাঙ্গের দল ছুটিয়া আসিলেন, সারাবাড়ি খানাতল্লাশীর মত করিয়া খোঁজা হইল, কোথাও লীলা বা তাহার শাশুড়ীর চিহ্ন নাই। অতঃপর কর্ত্তা এবং কান্তিচন্দ্র আসরে অবতীর্ণ হইলেন। দেউড়ীর দরোয়ানদের ডাকিয়া ধমক্ ধামক্ চলিতে লাগিল, তাহারা কিন্তু কোনো সন্ধানই দিতে পারিল না। গৃহিণী নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, দেউড়ী দিয়ে রথ হাঁকিয়েই তারা গিয়েছে কি-না ? এতগুলো খিড়কীর দরজা পড়ে আছে কি কর্‌তে ?"

খুড়ীমা বলিলেন, "ন্যাও, এখন কিছু নিয়ে পালিয়েছে, কি না তাই দেখ। শুধু হাতে কি আর গেছে ? টাকাকড়ি কিছু দেওনি ত ?"

গৃহিণী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, টাকা দিচ্ছে। আসুক না এর পর, জুতিয়ে পিঠের ছাল তুলে দেব।"

খোকার ঝি কিছুতেই ক্রন্দনপরায়ণ শিশুকে সামলাইতে পারিতেছিল না, সে বলিল, "তোমরা ত ওদিকে রাগঝাল নিয়ে আছ মা, এদিকে ছেলে যে কোকিয়ে গেল।"

মহা হট্টগোল। বোতল আসিল, গরুর দুধ আসিল, বই দেখিয়া কতখানি দুধে কতজল মিশাইতে হইবে তাহা ঠিক হইল, কিন্তু খোকাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না, কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

গৃহিণী বলিলেন, "এখন উপায়? ওদের ঘরের দরজা ভেঙে দেখ।"

কর্ত্তা বলিলেন, "বোকামী করতে হবে না। তারা ঘরে ঢুকে বাইরে থেকে তালা দিয়ে রেখেছে আর কি। পুলিশে খবর দিচ্ছি আমি।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, পুলিশ কি করবে, সে ত আর চোর ডাকাত নয়?"

কর্ত্তা বলিলেন, "চোর বলেই এখন বল্‌তে হবে, নইলে খোঁজ পাওয়া যাবে কেন?"

পুলিশ আসিল। ডাইরী করিয়া লইয়া গেল, লীলা তেওয়ারী, গণেশশঙ্কর তেওয়ারীর স্ত্রী, এবাড়ীতে দাইয়ের কাজ করিত, কালরাত্রে গৃহিণীর সোনার হার চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

লীলার ঘরের তালা ভাঙিয়া সব জিনিষপত্র উল্টাইয়া ফেলা হইল, কিন্তু তাহাতে লীলার ঠিকানা মিলিল না। গণেশশঙ্কর আসামে থাকে, ইহা ভিন্ন পাড়ার লোকে তাহারও কোনো ঠিকানা দিতে পারিল না। যাইবার সময় স্বামীর চিঠিপত্র লীলা কাপড়ের পুঁটুলিতে বাঁধিয়াই লইয়া গিয়াছিল, কাজেই চিঠিও কিছু পাওয়া গেল না। লীলার বাপের বাড়ীতে পুলিশে খোঁজ করিয়া দরিদ্র পরিবারে শোক ও আশঙ্কার বন্যা বহাইয়া দিল বটে, কিন্তু লীলার খোঁজ সেখানেও মিলিল না।

খোকা দিন দিন শুকাইয়া অস্থিচর্ম্ম সার হইতে লাগিল। তাহার আর সে নধরকান্তি নাই, সে হাসি-খেলা নাই, চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে। ডাক্তার রোজ আসেন, একই কথা বলেন, "অত্যন্ত ক্ষীণজীবী শিশু, ইহাকে স্তন্যদুগ্ধ ভিন্ন বাঁচান কঠিন।" সুধারাণী এখনও উন্মাদিনী, ছেলে যে ফাঁকি দিতে বসিয়াছে, সেদিকে তাহার খেয়ালও নাই।

খবরের কাগজে লীলার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। জুলুমে এই মেয়েটিকে প্রথমেই মুখুজ্জো গোষ্ঠী কাবু করিতে পারেন নাই, শেষ অবধি জুলুম ইহার উপর চলিবে না, তাহা ইহারা অবশেষে বুঝিলেন। লীলা নিজে যদি ফিরিয়া আসে, তাহাকে ২০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, কেহ যদি লীলার খোঁজ দিতে পারে, তাহাকে ১০০০৲ টাকা দেওয়া হইবে। বিজ্ঞাপনে শিশুর অবস্থা লিখিয়া দেওয়া হইল, যদি পাষাণীর তাহাতে মন গলে।

কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তারপর দরোয়ান ভোরবেলা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া কর্ত্তার খাস চাকরকে ধাক্কা মারিয়া তুলিয়া দিল। সে গাল দিবার জোগাড় করিতেই বলিল, "আরে, ও লোক ত আগিয়া।"

আবার সোরগোল পড়িয়া গেল। জমিদার-বাড়িসুদ্ধ যখন লীলার ভাঙা দরজার সামনে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে হাতের ঝাঁটাগাছা কোণে ঠেশান দিয়া রাখিয়া আসিয়া বলিল, "আবার কেন এসেছেন উৎপাত করতে, যান্ আপনারা। টাকা থাকলেই মানুষের প্রাণ, মান সব কিনে নেওয়া যায় না।"

কান্তিচন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিল সকলের আগে, সে এই দরিদ্রার দর্পের কাছে পিছাইয়া গেল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "উৎপাত করবার ইচ্ছা আমাদের নেই। আপনাকে পুরস্কার বরং আমরা দিতে চাই। কাগজ দেখেছেন ত?"

লীলা বলিল, "আপনাদের টাকায় আমার কাজ নেই। আমার ঘর ছেড়ে দয়া করে, আপনারা চলে যান।"

কান্তিচন্দ্র বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। কি করিবে কিছু যেন সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। ইহাকে বেশী চটাইয়া শেষে কি নিজের শিশুর প্রাণ নষ্ট করিবে?"

কিন্তু তাহাকে অব্যাহতি দিলেন গৃহিণী। আবার লাল মোটরকার আসিয়া লীলার দরজায় দাঁড়াইল। আগাগোড়া রেশমের চাদরে মোড়া শীর্ণকায় শিশুকে কোলে করিয়া তাহার ঠাকুরমা নামিয়া পড়িলেন। লোকজন সম্ভ্রমে সরিয়া গেল। সোজা লীলার সামনে গিয়া তিনি শিশুকে তাহার কোলে ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, "তোমার মান ত খুব দেখ্‌ছি বাছা, এটা কি শুকিয়েই মরবে?"

রুগ্ন শিশু নিস্তেজ চক্ষু মেলিয়া লীলার দিকে চাহিল।

লীলা শিহরিয়া তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিল, "মা গো, এ কি হয়ে গেছে ?"

গৃহিণী পুত্রকে তাড়া দিয়া বলিলেন, "কি হাঁ করে সং-এর মত সব দাঁড়িয়ে আছিস, যা এখান থেকে।"

লীলা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "এ বাঁচে না শুনেই আমি এলাম গো, এখন পুলিশেই দাও আর যাই কর।"

গৃহিণী মাটিতে বসিয়া হাঁপাইতে ছিলেন। বলিলেন, "দিক ত পুলিশে, কার ঘাড়ে কটা মাথা দেখব। ও মিনসের কথা আর বোলো না বাছা, চিরকাল ওর বোকামীর জালায় হাড় কালি হ'ল। তা চল এখন।"

লীলা বলিল, "ঐটি মাপ করতে হবে মা। খোকাকে তার মায়ের কুঁড়েতেই থাকতে হবে। ও চৌকাঠ আর আমি মাড়াব না।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, তা কি করে হবে ?"

লীলা বলিল, "হতেই হবে মা। তোমার নাতির প্রাণও থাক্, আমার মানও থাক্।"

গৃহিণী হতাশ হইয়া আবার মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

জৈন মরমী আনন্দঘন

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

১৮৯৭ হইতে ১৯০৩ ঈশাব্দের মধ্যে যখন আমি রাজপুতানার পূর্ব্ব প্রদেশভাগে সাধুদের বাণী সংগ্রহে রত ছিলাম তখন একজন সাধুর পরিচয় পাইয়াছিলাম যাঁহার নাম কাহারও কাহারও মতে ঘনানন্দ। তাঁর কতকগুলি পদও পাইয়াছিলাম। তিনি ঘনানন্দ নামটি উল্‌টাইয়া আনন্দঘন নামে ভণিতা দিয়াছেন। যে পদগুলি পাইয়াছিলাম তাহাতে কয়েকটি ছিল বৈষ্ণব ভাবের পদ; আর অধিকাংশই ছিল অসাম্প্রদায়িক ভাবের পদ। তাঁহার পদ দেখিয়া মনে হইল তিনি প্রথমে সাম্প্রদায়িক ভাবে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া ক্রমে অসাম্প্রদায়িক মরমিয়া সহজভাবে আসিয়া উপস্থিত হন। তবে ঠিক কোন্ সম্প্রদায়ে তাঁহার জন্ম, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

সেখানে কেহ বলিলেন তিনি ছিলেন প্রথমে বৈষ্ণব, কেহ বলিলেন তিনি ছিলেন নাথনিরঞ্জনপন্থী, আবার কেহ ইহাও বলিলেন যে, তাঁহার জাতিকুল জানা নাই। জন্ম-পরিচয় ঠিক জানা না গেলেও তাঁর সাধনা ও ক্রম-পরিণতি সম্বন্ধে সাধুদের কাছে কিছু কিছু জানিয়াছিলাম। পরে আরও বহু বহু সাধু ভক্তের বাণী সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় ঘনানন্দের পদগুলি আমার সংগ্রহের মধ্যে বহু কাল পড়িয়া রহিল। পণ্ঢরপুরের ভজন শুনিবার অভিপ্রায়ে ইহার অনেকদিন পরে আমি বোম্বাই প্রদেশে যাই। সেই বারই আমার পরলোকগত সুহৃৎ ফার্গুসন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধেয় পটবর্দ্ধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পুণায় যাই। সেখানে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু জৈন জিনবিজয় মুনির অতিথি ছিলাম। মুনি জিনবিজয় সেই সময়ে আমার কাছে জৈন সাধু আনন্দঘনের নাম করেন। তখনও মনে করি নাই সেই আনন্দঘন ও এই আনন্দঘন একই ব্যক্তি। একই নামে এমন বহু সাধুর পরিচয়ের উদাহরণ মধ্যযুগে পাওয়া যায়। ইহার বহু দিন পরে মুনি জিনবিজয় শান্তিনিকেতনে আসিলে আবার সেই ভক্ত সাধু আনন্দঘনের কথা উঠিল। কথা হইল তিনি গুজরাত হইয়া ফিরিয়া আসিলে উভয়ে আনন্দঘনের পদগুলি লইয়া বসিব। মুনিজী গেলেন, কিন্তু সেখান হইতে তিনি আসিতে পারিলেন না। তখন আমি

নাহার মহাশয়ের কাছে আমার ইচ্ছা জানাইলে তিনি স্বীয় গ্রন্থভাণ্ডার হইতে দুইখানি মুদ্রিত পুস্তক পাঠাইলেন।

উঁহাদের একখানি শ্রাবক শ্রীযুত ভীমসিংহ মাণকের মুদ্রিত পুস্তক, বোম্বাইতে ১৯৪৪ সংবতে ছাপা। তাহাতে আনন্দঘনজীর ১০৬টি পদ আছে। ইহাতে কোনো ভূমিকা টীকা টিপ্পনী পরিচয় প্রভৃতি আর কিছুই নাই। ভুল-ভ্রান্তিও বেশ আছে। আর একখানি শ্রীযুত মতীচংদ গিরিধর লাল কাপড়ীয়া সম্পাদিত আনন্দঘনের পঞ্চাশটি গান। ইনি আইন ব্যবসায়ী। ইনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, এই জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে তাঁর কিছুই প্রবেশ নাই। ভাবনগরের প্রসিদ্ধ জৈন সাধু গম্ভীরবিজয়জীর কাছে তিনি গানগুলির ব্যাখ্যা শোনেন। তার প্রত্যেকটি কথা তিনি লিখিয়া রাখেন, তার পরে সেই সব আলোচনার বহু বিস্তারে তিনি সেই পঞ্চাশটি গান টীকা ভাব ব্যাখ্যা প্রভৃতি সহ বাহির করেন। তিনি নিজে একটি খুব বিস্তৃত ভূমিকাও লেখেন। কিন্তু আনন্দঘন হইলেন নিয়ম ও প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। নিয়মনিষ্ঠ সনাতন প্রথাবদ্ধ সাধুদের ব্যাখ্যায় কি তাঁহার কোনো পরিচয় মেলা সম্ভব? এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে কোনো ব্যাখ্যা না থাকাই অশেষ প্রকারে শ্রেয়ঃ।

যাহা হউক, আমার পুরাতন আনন্দঘনের পদগুলি বাহির করিয়া দেখি এই জৈন আনন্দঘন ও আমার সেই আনন্দঘন একই ব্যক্তি। কারণ পদগুলি একই, তবে আমার সংগৃহীত কোনো কোনো পদ হইতে ইঁহাদের সংগৃহীত পদ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। কেহ বলিতে পারেন যে, ছোট পদকেই পরে স্ফীত করা হইয়াছে। কারণ সেই সব গুঁজিয়া দেওয়া স্ফীত পদাংশগুলিতে না আছে তেমন শক্তি, না আছে তেমন মহত্ত্ব। তবে ইহাও হইতে পারে সাধুরা পদের সারটুকুই তাঁহাদের প্রয়োজনবশতঃ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, বাকীটা তাঁহাদের বিশেষ কোনো কাজে লাগে নাই, সেগুলি শুধু পুঁথিতেই রক্ষিত আছে। এইখানে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, তাঁর এই পদসংগ্রহের নাম "বহোঁতেরী" অর্থাৎ বাহাত্তরী বা ৭২ পদের সমষ্টি। কিন্তু ভীমসিংহ মাণকের সংগ্রহে পদ-সংখ্যা পাই ১০৪ ও পরিশিষ্টে আরও দুইটি। বুদ্ধি-সাগরজীর সংগ্রহে আরও দুই একটি পদ বেশী। তবে কি কতকগুলি পদকে ভাঙিয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করা হইয়াছে, না আনন্দঘনেরই রচিত এই "৭২ সংগ্রহের" বাহিরের পদও এই সঙ্গেই পরে গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে, না অন্যের কিছু রচনাও এখানে ঠাঁই পাইয়াছে, অথবা এই হেতুত্রয়ের একাধিক হেতু এই সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য দায়ী?

আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুত নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী বৃন্দাবনের একজন আনন্দঘনের কিছু পদের সন্ধান দিয়াছেন, তাঁহার পদগুলি এখনও পাই নাই। পাইলে হয়ত দেখা যাইবে তিনিও এই আনন্দঘনই। কারণ এই আনন্দঘনের অনেক পদ বৈষ্ণব ভাবের। কাব্য ও সঙ্গীতে প্রবীণ একজন বৈষ্ণব ঘন-আনন্দ আছেন যিনি কাজ করিতেন বাদশাহ্ মুহম্মদ শাহের দফ্তরে। ইঁহার জন্ম কায়স্থকুলে ও দীক্ষা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে। আপন প্রিয়তমা সুজানকে লক্ষ্য করিয়াই ইঁহার বহু গীত ও কবিতা লিখিত। সুজানের প্রতি অতি আসক্তিবশতঃ একদিন বাদশাহের প্রতি ইঁহার কিছু অসৌজন্য প্রকাশ পায়। ইনি দিল্লী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বৃন্দাবনে আসেন ও ভক্ত নাগরী দাসের সঙ্গ লাভ করেন। নাদির শাহের মথুরা আক্রমণ কালে ইনি মারা যান।

আনন্দঘনের যতটা পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় জৈন-বংশে তাঁহার জন্ম। কাজেই বুঝা যাইতেছে বাহিরের প্রভাবকে জৈনরা যতই দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চান না কেন, মধ্যযুগের মরমিয়া সহজবাদের সার্ব্বভৌম আদর্শের প্রভাবকে ঠেকাইতে পারেন নাই। জৈন ধর্ম্মের আরম্ভই হইল বেদের শাস্ত্রাচারের ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ জিনিষটাই এমন যে, কোনো একদিকে যদি ইহা দেখা দেয় তবে ক্রমে ক্রমে সবদিকেই ইহা আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ সংস্কৃতের দাসত্ব অস্বীকার করিল। বুদ্ধের আগেই মহাবীর প্রভৃতি জৈন-মত গুরুরা প্রাকৃত ভাষায় নিজ নিজ মত স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আন্দোলনের ফলে প্রাকৃত পালি

প্রভৃতি ভাষা দেখিতে দেখিতে সর্ব্বৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ধর্ম্মবুদ্ধির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও মুক্তি অনিবার্য্য। ভারতে এই কথার প্রাচীন সাক্ষী জৈন ও বৌদ্ধদের ইতিহাস। ইউরোপে রোমের গুরুদের শাসন হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে যাঁহারা মুক্ত করিলেন তাঁহারাও প্রাচীন পবিত্র ভাষার দাস্য অস্বীকার করিলেন। নিজ নিজ কথিত ভাষাই তাঁহারা আশ্রয় করিলেন। চীন দেশে আজ যাঁহারা প্রাচীনের বন্ধন হইতে মুক্তির প্রয়াসী, শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁহারা আর স্থবির কুলীন বা ক্লাসিকাল (classical) ভাষা চালাইতে রাজী নহেন। তাঁহারা এখন চলতি ভাষারই পক্ষপাতী। এখন সেখানে "পেইহুয়া" (Pei-hua) বা 'সাদা কথা'তেই সাহিত্য ও শিক্ষার কাজ চলিয়াছে।

ভারতের মধ্যযুগের সাধনার নূতন প্রাণসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত বাংলা, হিন্দী, গুরুমুখী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষার প্রবর্ত্তন হইল।

একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বৌদ্ধ ও জৈনগণ যে-কারণে প্রথাবদ্ধ সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া সহজ চলন্ত প্রাকৃত ভাষা আশ্রয় করিলেন সেই কারণেই যুগে যুগে তাঁহাদের ভাষা বদল করা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা সেই পালি বা বুদ্ধভাষিতের মধ্যে, ও অর্দ্ধমাগধী বা জিনভাষিতের মধ্যেই, বদ্ধ হইয়া রহিলেন। যদি বলা যায় বদল করিতে হইলেই মহাবীর, বুদ্ধ প্রভৃতি মনীষিগণের রত্নভাণ্ডার হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয় তখন বুঝা উচিত তাঁহারা যখন প্রথম বিদ্রোহ করেন তখনও যে প্রাচীন মতবাদীরা বাধা দিয়াছিলেন তাহাও সেই পূর্ব্বসঞ্চয়ের মোহবশতঃই। পূর্ব্বসঞ্চয়ের মোহে নূতন পথ ধরা কঠিন হইয়া উঠে। বিদ্রোহ করিয়া মানুষ হয়ত প্রথমে একবার বন্ধনের বাহির হইয়া আসে, ক্রমে সেও আবার আপনারই রচিত ঐশ্বর্য্যের কঠিনতর বন্ধনে আরও দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়া পড়ে। গুজরাতে বহু জৈন আছেন, তাই গুজরাতী ভাষা তাঁহারা ব্যবহার করেন। হিন্দীও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সে-সব প্রায়ই টীকা টিপ্পনী বা অন্য কোন গৌণ উদ্দেশ্যে, মুখ্যভাবে তেমন ব্যবহার নাই। অর্দ্ধমাগধীর কাছাকাছিও তাহাদের স্থান নাই।

জৈন ও বৌদ্ধগণ অর্থহীন মৃত আচারাদির জন্য প্রাচীন বেদপন্থীদের কত না সমালোচনাই করিয়াছেন, শেষে অর্থহীন আচার নিয়ম বিধিনিষেধের বোঝা তাঁহাদের মধ্যেই কি কম জমিয়া উঠিয়াছিল?

জৈন ও বৌদ্ধ মতের আরম্ভেই ছিল কোটিবাদ (extremism) পরিত্যাগ করিয়া মধ্যমার্গগ্রহণ বা সংসারের নানাবিধ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটা যোগভাবের (synthetic) সাধনা। "সহজ," "স্বাভাবিক," "সমতা," "একরস," প্রভৃতি বড় বড় সত্য তাঁহারা সাধনার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মও ক্রমে প্রথাবদ্ধ হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনও ঐ সব শব্দ তাঁহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতে লাগিল, তবে তাহার মধ্যে জীবন আর তেমন রহিল না। বাউলদের ভাষায় "বরযাত্রীরা চলিতে চলিতে মশাল নিবিয়া গেল, তবু সেই নির্ব্বাপিত দণ্ডগুলি মশালবাহকেরা যখন পরিত্যাগ করিল না, তখন আলোকটুকু আর নাই, আছে কেবল দণ্ডরাশির বিপুল ভারের গৌরব।"

বৌদ্ধ নাথপন্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পরে যে-সব বিকৃত সম্প্রদায় ভারতকে ছাইয়া ফেলিতে লাগিল তাহাতে 'সহজ', 'একরস' প্রভৃতি কথাও মলিন হইয়া আসিতে লাগিল তবু এই যে সব বড় বড় কথা প্রাণহীন ভাবেও রহিয়া গেল তাহাতেও উপকার কম হয় নাই। যখন দুই একজন জীবন্ত মহামনা সাধক পরে এই সব মণ্ডলীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহারা এই সব কথা শুনিয়াই চমকিয়া সচেতন হইলেন; পুরাতন মৃতকল্প বীজগুলি তাঁহাদের সরস সাধনক্ষেত্রে নবপ্রাণে বাঁচিয়া উঠিল।

কবীর প্রভৃতি সাধকেরা এই সব শব্দেই আবার নূতন জীবন সঞ্চার করিলেন। ভক্ত নানক, দাদূ, রজ্জবজী প্রভৃতি সাধক ঐ সব তত্ত্বগুলিকে মধ্যযুগে আবার সজীব করিয়া তুলিলেন। গ্যেটের ভাষায়—"পুরাতন কথাকে আবার তাঁহারা নূতন করিয়া চিন্তা করিলেন এবং নব সত্যে

মধ্যযুগেও একস্থানে একজন মহামনীষী জন্মগ্রহণ করিলে ভারতে সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িত। তখন সংবাদপত্র ছিল না, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতি ছিল না। অথচ বাংলায় গোপীচাঁদের গান ছড়াইয়া পড়িল পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মহারাষ্ট্র কর্ণাটে। কবীরের ভাব বিস্তৃত হইয়া গেল মহারাষ্ট্র গুজরাত আসাম বাংলা উড়িষ্যায়। দ্রাবিড় দেশের বিল্বমঙ্গলের কথা বাংলায় বৃন্দাবনে ও উত্তর-ভারতের নানাস্থানে ঘরের বস্তু হইয়া গেল। তখনকার দিনে এসব ঘটিত কেমন করিয়া? তীর্থযাত্রায় নানা স্থানে সাধুদের সঙ্গমে, গানে, ভজনে, ধর্ম্মকথায় ও আরও বহুবিধ উপায়ে ভাব ও সাধনা তখনকার দিনেও অতি সহজেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। পরিব্রাজক সাধুরা নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া ও চাতুর্মাস্যাদিতে দীর্ঘকাল নানা স্থানে বিশ্রাম করিয়া ভাবস্রোত চারিদিকে ছড়াইতেন। এই প্রসঙ্গের মধ্যে সে-যুগের সে-সব উপায়ের বিষয়ে বিস্তৃত করিয়া বলিবার অবসর নাই।

ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতে সেই যুগে সাধনার জন্য এক একটা সার্ব্বভৌম "কাল্‌চারাল" ভাষা ছিল। এক রকমের অপভ্রংশ ভাষা পুরাতন বাংলায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহায় দেখি। ইহারই প্রায় কাছাকাছি অপভ্রংশ ভাষায় রচনা ঐ যুগে রাজপুতানায়, পঞ্জাবে, গুজরাতে, মহারাষ্ট্রে, এমন কি কর্ণাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। জৈনদের তখনকার দিনের অনেক সাহিত্যেই তাহার পরিচয় মেলে। শ্রীযুত মুনি জিনবিজয়জী এ-সম্বন্ধে কিছু কাজ করিবেন আশা দিয়াছেন।

তারপর আসিল কবীর প্রভৃতির যুগ। তাঁদের মধ্যেও নাথপন্থী গোরখপন্থী ভাষার ও প্রকাশের (presentation) প্রভাব। আর দেখি কবীর-ভাষিত সেই ভাষা তখন উত্তরে পঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কর্ণাটে এবং পশ্চিমে দ্বারকা হইতে পূর্ব্বে জগন্নাথের ভক্তদের মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। নানকের ভাষাও ত ঠিক পঞ্জাবের ভাষা নয়। গুরু-মুখের ঐ রকমের ভাষার নামই হইল গুরুমুখী। কাঠিয়াবাড় গুজরাত মহারাষ্ট্রেও ভাষা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই ভাষা ও সাহিত্যই ভক্তদের ভাবের একটি যোগ-প্রাঙ্গণ হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার ও বৃন্দাবনের মধ্যেও পদাবলী প্রভৃতির মধ্য দিয়া বেশ একটি যোগ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী এমন করিয়াই মধ্যপ্রদেশে উত্তর-পশ্চিমে রাজপুতানায় এমন কি সিন্ধ গুজরাতেও বৈষ্ণবদের দ্বারা গীত হইয়াছে। আসাম উড়িষ্যায় ত কথাই নাই। এই ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিকতার ছাপ যথেষ্ট থাকিত, তবু পরস্পরের ভাব বুঝিতে বাধা হইত না।

কাজেই ভজনের ভাষা দিয়া প্রমাণান্তর বিনা কাহারও দেশ অনুমান করা কঠিন। যাঁহারা ভজন-গুলি বহন করিতেন, তাঁহাদের মুখে মুখেও কিছু বিলক্ষণতা আসিয়া জুটিত; কাজেই অন্য কোনো প্রমাণ না থাকিলে শুধু ভাষা দ্বারা 'ভজন' 'সাখী' 'শব্দ' ও 'পদ' রচয়িতাদের স্থান নির্ণয় করা কঠিন। রাজপুতানা কাঠিয়াবাড় গুজরাতেও হিন্দী ভজন চলিয়াছে এবং রচিতও হইয়াছে।

আনন্দঘনের ভাষাতে রাজস্থানী ও গুজরাতীর বহু প্রভাব আছে। তার কতটা পদকর্ত্তার নিজের, কতটা পরবর্ত্তী সংগ্রাহক ও গায়কদের, তাহা নির্ণয় হওয়া কঠিন। মোতিচংদ কাপড়ীয়া মহাশয় গম্ভীরবিজয়জী গণি মহারাজের কাছে শুনিয়াছেন যে, ঐরূপ ভাষা নাকি বুংদেলখণ্ডের হইতে পারে। গম্ভীরবিজয়জীরও জন্ম বুন্দেলখণ্ডে। তিনি মনে করেন ঐ সব বিশেষত্ব শুধু তাঁহারই দেশের। কিন্তু পূর্ব্ব-রাজস্থানেরও বহু ভক্তের ভজন দেখা যায় ঐ রকম ভাষায়; আর সেই সব দেশেই আনন্দঘনের পূর্ব্বে ও পরে বহু ভক্তের জন্ম। জৈন সাধুদেরই সাক্ষ্য অনুসারে আনন্দঘনের শেষজীবন অতিবাহিত হয় পশ্চিম-রাজস্থানে মেড়তা নগরে। তাঁর রচনায় যে গুজরাতী ও রাজস্থানী প্রভাব আছে তাহা কি বুন্দেলখণ্ডে হওয়া সম্ভবে? রাজস্থানের রচনায়ই তাহা খুব মেলে। কাজেই রাজস্থান যে কেন আনন্দঘনের জন্মভূমি নয়, তাহা ঠিক বুঝিলাম না।

আলোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, জৈন-বংশেই তাঁর জন্ম। এখনও তাঁর অনেক গান জৈন-মন্দিরে শ্রদ্ধার সহিত গীত হয়। অনেক জৈন গ্রন্থভাণ্ডারেও তাঁহার রচিত গানগুলি সংগৃহীত আছে, যদিও তাঁহার অসাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রদায়িক জৈনদের পক্ষে রুচিকর নয়।

আনন্দঘন তাঁহার রচিত "চৌবীশী" বা ২৪টি স্তবে জৈন তীর্থঙ্করদের বন্দনা জানাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও দেখা যায় জৈনস্তুতি অপেক্ষা তিনি তাঁর হৃদয়ের মনের সমস্যা লইয়াই বেশী বিব্রত। সেই সব দেখিয়াও তাঁহার ভবিষ্যৎ উদার মরমী জীবনের সূচনা পাওয়া যায়।

সেই সময়ে জৈনধর্ম্ম নিয়মে নিয়মে অনুশাসনের বজ্রবন্ধনে একেবারে নাগপাশে রুদ্ধশ্বাস হইয়া আসিয়াছিল। এই সব পক্ষবাদীদের দুঃসহ বন্ধনই ভাঙ্গিয়া আনন্দঘন "নিষ্পক্ষ" সহজ সরল সাধনার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

বাহিরের সকল প্রভাব হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ রাখিতে জৈনগণ অতিশয় সাবধান। এমন অবস্থায়ও যে সহজ মরমিয়া ভাবের প্রচণ্ড প্রভাব তাঁহাদের যত্নরচিত গণ্ডীর বাধা মানিল না, ইহা প্রণিধান করিবার মত বিষয়। হয়ত তাঁহার নিজ সমাজের অতি সাবধানতা-প্রসূত অসংখ্য অর্থহীন বজ্রবন্ধনও এই বিদ্রোহের একটা প্রধান হেতু।

যাহা হউক, নিজ শাস্ত্রে একান্ত বিশ্বাসী জৈনগণ অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সাধু ও পণ্ডিতদের সব রচনা সংগ্রহ করিয়া বড় বড় গ্রন্থাগার ভরিয়া রাখিয়াছেন। মুসলমান রাজাদের দেশ-অধিকারের প্রচণ্ডতা শেষ হইয়া আসিলে, মোগল রাজাদের সহায়তায় যখন ভারতে নূতন ভাবের চিত্র, স্থাপত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হইতে আরম্ভ করিল তখনি দেখি জৈন গ্রন্থভাণ্ডারও সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। কথিত আছে, আকবরের পূর্ব্বে ও পরে জৈনদের মধ্যে শত শত মহাপণ্ডিতের আবির্ভাব হইল, তার মধ্যে শ্রীমৎ হীরবিজয়-শিষ্য বায়ান্ন জন প্রখ্যাত পণ্ডিতেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাঁহাদের কৃপায়ই জৈন-গ্রন্থাগারগুলি বিপুল বেগে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

পুরাতন সব গ্রন্থেরও নানা পুঁথি সব তখন লিখিত হইয়া রক্ষিত হইতে লাগিল। গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশ পুঁথি ১৪৫০ হইতে ১৮০০ ঈশাব্দের। আনন্দঘনের রচনাও পালিতানায় অম্বালালজীর ভাণ্ডারে, মুনিরাজ ভক্ত বিজয়জীর কাছে, এবং আরও নানা স্থানে সংগৃহীত ছিল। আরও অনেক গ্রন্থভাণ্ডারে তাঁহার রচনা সংগৃহীত আছে। পাটন, ভাবনগর, আমেদাবাদ, লিমড়ী, মেড়তা, খাম্বাত, পালিতানা ও রাজপুতানার বহুস্থানে জৈনদের বড় বড় গ্রন্থভাণ্ডার আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন ভাণ্ডার-রক্ষকগণ তাঁহাদের গ্রন্থগুলি কোনো উপযোগে আসিতে দিতে চান না। এই সব সংগ্রহের মধ্যে ভারতীয় "কাল্‌চারের" কত ইতিহাসের সন্ধান মিলিতে পারে, তবু সে-পথ সকলের কাছে রুদ্ধ। এমন কি, জৈন হইলেও মুনি জিনবিজয়জী, পণ্ডিত সুখলালজী, পণ্ডিত বেচরদাস প্রভৃতির কাছেও সব ভাণ্ডার উন্মুক্ত নহে। কারণ তাঁহারা বর্ত্তমান কালের আলোকে সব সত্য ধরিতে চান।

গম্ভীরবিজয়জী প্রভৃতি কোন কোন জৈনপণ্ডিত বলেন যে, আনন্দঘন দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তপগচ্ছে। কিন্তু একথা সর্ব্বসম্মত নহে। গচ্ছ হইল কতকটা আমাদের গুরুপরম্পরা। গম্ভীরবিজয়জী বলেন তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল "লাভানন্দ," কেবল স্বীয় পদের ভণিতায় তিনি নাম দিয়াছেন আনন্দঘন। মরমিয়া ভক্তদের কাছে আমি শুনিয়াছিলাম তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল ঘনানন্দ। যাক, ইহাতে বেশী কিছু আসে যায় না। তিনি পরিব্রাজন করিতে করিতে মাড়বার, আবু, পালনপুর, শত্রুঞ্জয় প্রভৃতি স্থানে আসিতেন। জীবনের শেষভাগ তিনি মাড়বারের অন্তর্গত মেড়তা নগরে অতিবাহিত করেন। এখনও সেখানে তাঁহার উপাশ্রয়টি সকলে নির্দ্দেশ করেন। তাঁর স্তূপের আর এখন চিহ্ন নাই, তবে স্থানটি আছে।

শ্রীমৎ যশোবিজয়জী তাঁহার অষ্টপদীতে আনন্দঘনের প্রতি বহু ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। যশোবিজয়জীর সময় নির্ণয় করা কঠিন নহে। বড়োদার অন্তর্গত দভোই নগরে তাঁর সমাধিস্থানে লেখা আছে যে, ১৭৪৫

সংবতে মার্গশীর্ষ মাসে শুক্লা একাদশীতে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

গচ্ছনেতা শ্রীমৎ বিজয়সিংহ সূরির অনুরোধে যখন শ্রীমৎ সত্যবিজয়জী ক্রিয়া উদ্ধার ব্যাপারে নিরত তখন যশোবিজয়জীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

ইঁহারা সকলেই আনন্দঘনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্। এই শ্রদ্ধা জানাইতেই যশোবিজয়জী তাঁর অষ্টপদী রচনা করিয়াছেন। মেড়তা নগরে আনন্দঘনের সঙ্গে যশোবিজয়জী একত্রে কিছু সময় যাপন করিয়াছেন। কাজেই ইঁহারা সমসাময়িক। হয়ত আনন্দঘন বয়সে কিছু বড়ও হইতে পারেন। খুব সম্ভব ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর জন্ম এবং ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর দেহাবসান ঘটে।

ভক্তদের কাছে শুনিয়াছি দাদূর শিষ্য মস্‌কীনজীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছিল। দাদূর জন্ম ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৬৬০ সংবতে। আনন্দঘন মস্‌কীনজী হইতে বয়সে ছোট ছিলেন।

জৈন সাধুদের মধ্যে আনন্দঘনের সম্বন্ধে কিছু কিছু আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। যথা, একজন শ্রেষ্ঠী আনন্দঘনকে অশন-বসনাদি উপহার দিতেন। একবার আনন্দঘনের ধর্ম্মব্যাখ্যানের সময় শ্রেষ্ঠীর আসিতে বিলম্ব ঘটে; অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর জন্য বিলম্ব করিলেন না। শ্রেষ্ঠী বিরক্ত হইয়া খোঁটা দিলে, আনন্দঘন তাঁহার দেওয়া বসনাদি দূরে ফেলিয়া দিলেন।

আর একবার একজন রাণী নাকি নিজ স্বামীকে বশ করিতে এক কবচ চাহিয়া পাঠান। আনন্দঘন এক পত্রীতে লিখিয়া পাঠান, 'রাজা তোমার বশ হন বা না-হন তাহাতে আমার কি করিবার আছে!' রাণী পত্রীটুকু না পড়িয়াই কবচ ভাবিয়া তাহা মাদুলীতে ভরিয়া ধারণ করেন। তাহাতেই নাকি রাজা বশীভূত হইয়া যান ইত্যাদি। এরূপ গল্প অনেক সাধুর সম্বন্ধেই চলিত আছে।

যতি জ্ঞান-সাগর লিখিত আনন্দঘনের এক টীকায় জানা যায় যে, তিনি জৈন-সাধুবেশেই থাকিতেন। কিন্তু আনন্দঘনের নিজের লেখায় এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণে মনে হয় যে, তিনি বেশভূষা প্রভৃতি 'ভেখ্' একেবারেই মানিতেন না। বরং ইহাও জানা যায় যে, তিনি সাধুবেশ পরিত্যাগ করিয়া মরমীদের মত দীর্ঘ অঙ্গাবরণ পরিধান করিতেন ও সেতার দিলরুবা প্রভৃতি [illegible]জনবিগর্হিত বাদ্যযন্ত্র পরিবৃত হইয়া ফিরিতেন। ভক্তদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, আনন্দঘনের নিজের লেখার মধ্যে তাহার সায় অনেক পরিমাণে মেলে। তাঁহার লেখা দেখিয়াও মনে হয় যে, আনন্দঘন নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রথমে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করেন। সেই ভাবের পদ তাঁহার---

'মনু প্যারা মনু প্যারা, রিখভদেব মনু প্যারা' ইত্যাদি (পদ ১০১); অর্থাৎ 'ঋষভ দেব আমার মনের প্রিয়।'

'এইসে জিনচরণে চিত্ত ল্যাউ রে মনা' (পদ ৯৫); এমন জিন-চরণে চিত্ত আন হে মন ইত্যাদি।

'এ জিনকে পায় লাগরে, তুনে কহীয়েঁ কেতো' ইত্যাদি (পদ ১০২); হে মন জিনের চরণে লাগ তোকে কতবারই ত ইহা বুঝাইয়া বলিয়াছি।

কিন্তু এই বুঝাইয়া বলা সত্ত্বেও তাঁর সাধনা কোনো সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট সীমায় তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। প্রথমে প্রথমে অন্তরকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য তিনি দর্শনের জ্ঞানে ডুবিতে চাহিলেন,

উপজে বিনসে তবহী।
উলট পুলট ধ্রুবসত্তা রাখে। ইত্যাদি পদ ৫

"যখনি উৎপাদ তখনি বিনাশ। উলটে পালটে তবু ধ্রুব-সত্তার মত দেখায়"। এ সব দর্শনও জৈন দর্শনই। এই সব জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দঘন বুঝিলেন সাম্প্রদায়িক মতামতের অতীত না হইলে জীবনের সার মর্ম্ম বুঝা অসম্ভব। তাই তিনি বলিলেন—

নিরপখ হোয় লখে কোই বিরলা
ক্যা দেখে মতজংগী? (পদ ৫)

"সম্প্রদায়ের অতীত হইলে যদি ক্বচিৎ কেহ সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে। যাহারা মতবাদের লড়াই করিয়া মরে (মতজংগী) তাহারা কিই বা দেখিতে পায়!"

অন্তরের ব্যাকুলতায় আনন্দঘন যোগের পথ খুঁজিলেন। আনন্দঘনের পূর্ব্বে ও পরে জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে হেমচন্দ্র, শুভচন্দ্র, হরিভদ্র সূরি, যশোবিজয়জী প্রভৃতি অনেক যোগ

শাস্ত্রের জ্ঞানী ও লেখক জন্মিয়াছেন। আনন্দঘন জপ নিয়ম প্রাণায়ামাদির সাধনা করিলেন। কায়াযোগ, চক্রাদিবেধও সাধন করিয়া দেখিলেন; তখন এই সাক্ষ্য দিলেন "যে আত্মঅনুভব রসের যাঁরা রসিক তাঁদেরই অদ্ভুত উপলব্ধি। কারণ সেই অনুভবই জানায় অজানা তত্ত্বকে এবং উপলব্ধি করায় অনন্তকে।"

আতম অনুভব রসিককো অজব সুন্যো বিরতংত।
নির্বেদী বেদন করে, বেদন করে অনংত। সাখী পদ ৬

দর্শন, যোগ, কিছুতেই আনন্দঘন তৃপ্তি পাইলেন না। দেখিলেন বৈষ্ণবরা ত বেশ ভক্তির রসে তৃপ্ত। বৈষ্ণব ভাবেই যদি তৃপ্তি মেলে, ইহা ভাবিয়া তিনি বৈষ্ণব সাধনাতেই মসগুল হইতে চাহিলেন। এই ভাবরসে মজিয়াই তিনি গাহিলেন,—"আমার সারা হৃদয় মজিয়াছে বংশীধারীতে" ইত্যাদি।

সারা দিল লগা হৈ বংসীবারেসুঁ (পদ ৫৩)

আনন্দঘনের এই পরিবর্ত্তনে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহাদের বুঝাইতে গিয়া তিনি বলিলেন, 'ব্রজনাথের মতন এমন প্রিয়তম স্বামী আর কোথায়? কাজেই হাতে হাতে তাঁর কাছে নিজকে বিকাইলাম।' ইত্যাদি

ব্রজনাথসেঁ সুনাথবিন হাথো হাথ বিকায়ো (পদ ৬৩) ইত্যাদি

আনন্দঘন সেই ব্রজনাথকে বলিলেন 'আমি অন্যের উপাসক,·· এই দ্বিধা, প্রভু মনে রাখিও না।' ইত্যাদি

ঔরকো উপাসক হুঁ দুবিধা য়হ রাখো মত (পদ ৬৩)

সেখানেও দেখিলেন শ্রীরাধিকার মত কৃষ্ণের বিরহে তাঁহার জনম যাইবে। তিনি গাহিলেন,

"হে শ্যাম, কেন আমায় অসহায়া করিয়া ফেলিয়া রাখিলে? এখন এমন কেহই নাই যার আশ্রয় ধরিতে পারি, কাহার কাছেই বা দুঃখের কথা বলি।

হে প্রাণনাথ, আমার প্রেমকে নিরাশ করিয়া ফেলিয়া তুমি দূরে গেলে চলিয়া। দিনের পর দিন জনের জনের গুণ গাহিয়া বল কেমন করিয়া আমার জনম কাটে?

যার পক্ষ টানিয়া কিছু বলি, সেই মনে মনে হয় খুশী, আর যার পক্ষ ত্যাগ করিয়া বলি, জনম ভরিয়া তাহার চিত্ত রহে বিমুখ হইয়া। তোমার কথা মনে আসে বল কার কাছে যাইয়া তাহা বলি? ললিত স্খলিত খলের দল যখন দেখি, তখন সব সাধারণ কথা তাহাদের খুলিয়া দেখাই। ঘটে ঘটে আছ তুমি অন্তর্যামী, আমার মধ্যে কেন তোমাকে দেখিতে পাই না? যাহাই দেখি তাহা আমার চোখে ধরে না। প্রাণধনকে কেন দেখিতে পাই না? কোন্ নির্দ্দিষ্ট মিলন কালের প্রতীক্ষায় (অবধ—ফিরিয়া আসিবার প্রতিজ্ঞাত সময়) পথপানে থাকি চাহিয়া, আবার প্রতীক্ষা· করিয়াও কোন নির্দ্দিষ্ট কালের আশা নাই বলিয়া ঝুরিয়া মরি (pine)। আনন্দঘনের স্বামী, শীঘ্র এস, যাহাতে মনের আশা করিতে পারি পরিপূর্ণ।

শ্যাম, মুনে নিরাধার কেম মূকী।
কোই নহীঁ হুঁ কোণ শুঁ বোলুঁ,
সহু আলংবন টুকী।
প্রাণনাথ তুমে দুর পধার্য্যা
মূকী নেহ নিরাশী,
জণজণনা নিত্য প্রতিগুণ গাতাঁ
জনমারো কিম জাসী।
জেহনো পক্ষ লহীনে বোলুঁ
তে মনমাঁ সুখ আণে
জেহনো পক্ষ মূকীনে বোলুঁ
তে জনম লগেঁ চিত তাণে॥
বাত তমারী মনমাঁ আবে,
কোন আগল জঈ বোলুঁ।
ললিত খলিত খল জো দেখুঁ
আম বাত সব খোলুঁ॥
ঘটে ঘটে ছো অন্তরজামী
মুজমাঁ কাঁ নহিঁ দেখুঁ।
জে দেখুঁ তে নজর ন আবে
প্রাণবস্তু ন পেখুঁ।
অবধে কেহণী বাটড়া জোউঁ
বিন অবধে অতি ঝুরুঁ।
আনংদঘন প্রভু বেগ পধারো
জিম মন আস পুরুঁ। (২৪ পদ)

তাঁহাকে না পাইলে যে জনে জনের স্তব করিয়া জীবন কাটাইতে হয় সব দুঃখের চেয়ে সেই দুঃখই বড়।

আনন্দঘন মনে করিলেন, হয়ত অন্তরে কিছু অহংভাব, কিছু গ্রন্থী আছে, তাই তাঁর কৃপা হয় না, তখন তিনি গাহিলেন, 'গুণহীন আমি কি আর চাহিব? শুধু··· প্রভুর ঘরের দ্বারে বসিয়া কেবল তাঁর নামই করি রটন'···

ক্যা মাগুঁ গুণহীনা······
প্রভুকে ঘরদ্বারে রটন করুঁ··· (পদ ২৬)

আনন্দঘন মনের ব্যাকুলতায় সাধনার পথে বাহির হইলেন। নানা সাধনার মধ্য দিয়াই তিনি চলিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ব্যাকুলতার সুযোগ বুঝিয়া কত সম্প্রদায়ের কত জবরদস্ত সব চাঁই তাঁহাকে জোর করিয়া আপন আপন সম্প্রদায়ের সব মত লওয়াইয়া ছাড়িল। তিনি দুর্ব্বল নিরুপায়; সব জুলুমই মাথা পাতিয়া লইলেন; ফল হইল না কিছু। এক এক দল আসে, আর তাঁকে জুলুম করিয়া এক এক পাঠ পড়ায়; আবার যখন তিনি দেখেন যে পথ ব্যর্থ

তখন আবার পথে হন বাহির। এ যেন কোন অসহায়া অবলা নারী স্বামীর অন্বেষণের ব্যাকুলতায় যখন পথে বাহির হইয়াছে তখন পথের মধ্যে সুযোগ বুঝিয়া নানা দলের লোক তার উপর জুলুম চালাইয়াছে। নিজের সমস্ত জীবনের এই দুঃখের কাহিনীটি আনন্দঘন অতি চমৎকার ভাবে বলিয়াছেন। তাঁর নিজের জৈন সম্প্রদায়কেও তিনি বাদ দেন নাই।

'মাগো, কেহই আমাকে "নিষ্পক্ষ" (পক্ষাপক্ষী সাম্প্রদায়িকতার অতীত) থাকিতে দিল না। নিষ্পক্ষ রহিতে বহু বহু করিলাম চেষ্টা, কিন্তু সবাই ধীরে ধীরে নিজ মতের প্রভাব আমার উপর চালাইলেন।

'যোগী আসিয়া মিলিলেন, তিনি আমায় করিলেন 'যোগিনী'; যতি আমায় করিলেন 'যতিনী', ভক্ত আমাকে পাক্‌ড়িয়া করিলেন 'ভক্তানী', মতবাদী (বা মাতাল) আমায় করিলেন তাঁরই মতের দাসী।

'কখনো আমি 'রাম' কহিলাম, কখনো আমাকে 'রহিমান' কহাইল, কখনো অরহন্তের (জৈন উপাস্তের) পাঠও পড়াইল। ঘরে ঘরে আমি নানা ধান্দায় গেলাম লাগিয়া, কেবল আত্মার সঙ্গে যোগ রহিল দূরে।

'কেহ আমার মাথা করাইল মুণ্ডন, কেহ বা কেশ সব করাইল উৎপাটন (জৈন সাধুরা মুণ্ডিত না হইয়া শন্না দিয়া একটি একটি করিয়া কেশ উৎপাটন করান), কেহ বা কেশে আমার বাঁধাইল জটা; এক ভাবের ভাবুক আমি কাহাকেই ত দেখিলাম না, অন্তরের বেদনা কেহই ত মিটাইলেন না।

'কেহ আমায় বসাইলেন, কেহ উঠাইলেন, কেহ চালাইলেন, কেহ নিশ্চল রাখিলেন; কেহ জাগাইলেন, কেহ শোয়াইলেন, কেহই কাহারও সত্যের সাক্ষ্য দিলেন না।

'প্রবল দুর্ব্বলকে রাখে দাবাইয়া; শক্তে শক্তে বাজে যুদ্ধ; অবলা আমি, বড় বড় যোদ্ধার শাসনে কেমন করিয়াই বা কিছু বলি? ইহারা আমাকে যাহা যাহা করিল বা করাইল সে সব কহিতে আজ আমি লজ্জায় মরি। আমার অল্প বলার মধ্যেই অনেকখানি লও বুঝিয়া। বুঝিলাম ঘর হইতে আর কোন পবিত্র স্থান নাই।

'কত কিছুই গেল আমার উপর দিয়া, বলিতে গেলে এঁরা আবার হন রুষ্ট; তাই ত আমার আর কোন জোর চলে না; আনন্দঘনের প্রিয়তম যদি তাহার হাতখানি ধরে, তবে (যত সব জুলুমবাজের দল) সবাই করে পলায়ন। (৪৮ পদ)

মায়ড়ী মুনে নিরপথ কিণহী ন মুকী।
নিরপথ রহেবা ঘণু হি ঝুরী
ধীমে নিজমত ফুকী॥
জোগীয়ে মলীনে যোগিণ কীনী
জতিয়েঁ কীনী জতনী।
ভগতেঁ পকড়ী ভগতানী কীনী
মতবালে কীনী মতণী॥
রাম ভণী রহেমান ভণাবী
অরিহংত পাঠ পঢ়াঈ
ঘর ঘরনে হম ধংধে বলগী
কোইয়ে মুণ্ডী কোইয়ে লুঁচী
কোই এ কেসেঁ লপেটী
একমনো মেঁ কোই ন দেখ্যো
বেদন কিণহী ন মেটী॥
কোইএ থাপি কোঈ উথাপি
কোঈ চলাবি কোঈ রাখী।
কোঈ জগাড়ী কোঈ শূয়াড়ী
কোঈনুঁ কোঈ নথী সাখী।
ধীংগো দুর্বলনে ঠেলিজেঁ
ঠীংগে ঠীংগো বাজে
অবলা তে কিম্‌ বোলী শকীয়েঁ
বড় জোদ্ধানে রাজে!
জে জে কীধু জে জে করাব্যু
তে কহেতী হুঁ লাজু।
থোড়ে কহে ঘণু প্রীছি লেজ্যো
ঘরশুঁ তীরথ নহী বীজু
আপ বীতী কহেতা রীসাবে
তেথী জোরে ন চালে।
আনংদঘন বাহলো বাঁহড়ী ঝালে,
তো বীজু সঘলু পালে। (৪৮ পদ)

জনের জনের দাসত্বই ভয়ানক। বিচ্ছিন্ন সত্যের ভয়ঙ্কর ভার; সমগ্র সত্যের ত কোন ভার নাই। এক কলসী জল মাথায় দুর্বহ। সমগ্র সাগরে ডুব দিলে আর ভার নাই। আনন্দঘন বুঝিলেন সমগ্র বিশ্ব সত্যকেই জীবনে করিবেন গ্রহণ। সকল বিশ্বকেই যদি করা যায় গুরু, তবে ত আর বাদ-বিবাদের কোন ভয় থাকে না। তাই তিনি বলিলেন 'বিশ্ব আমার গুরু, আমি বিশ্বের চেলা, তাই বাদ-বিবাদের জাল গিয়াছে মিটিয়া।'

জগত গুরু মেরা মৈঁ জগতকা চেরা
মিট গয়া বাদ বিবাদকা ঘেরা (পদ ৭৮)

[রজ্জবজীর—"সকল জগত পাকে গুরু
তাকে পরলয় নাহিঁ"—তুলনীয়]

তখন তিনি দেখিলেন সেই পরম প্রভু বিশ্বের সব কিছুর এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও উপরে। এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দঘন গাহিলেন, 'হে প্রভু, বিশ্বে তোমার সমান আর কে?' ইত্যাদি—

প্রভু তো সম অবর ন কোই খলকমে। (৮২ পদ)

'অনুভবের এই আনন্দ যখন জাগিয়া উঠিল তখন অনাদি অজ্ঞান-নিদ্রা আপনি গেল মিটিয়া। তখন

... জাগি অনুভব প্রীত।
নিংদ অজ্ঞান অনাদিকী
মিট গঈ নিজ রীত॥
ঘটমংদির দীপক কিয়ো
সহজ সুজ্যোতি সরূপ। ইত্যাদি (পদ ৪)

তখন কোন সম্প্রদায়ের সহিত তাঁর আর বিরোধ রহিল না। তখন তিনি বলিলেন, 'তোমরা রামই বল বা কেউ রহিমানই বল, কৃষ্ণই বল বা মহাদেবই বল, পারসনাথই বল, কেউ ব্রহ্মাই বল, সকল আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই বা কেউ বল, সকলই এক কথা।

রাম কহো রহিমান কহো কোউ
কান কহো মহাদেবরী।
পারসনাথ কহো কোউ ব্রহ্মা
সকল ব্রহ্ম স্বয়মেবরী॥ (৬৭ পদ)

জীবনের সাধনার পথে আনন্দঘন যে আলোকে, যে অনুপ্রাণনায় চলিয়াছেন, তাহা কবীর প্রভৃতি সহজবাদী মরমিয়াদের। আনন্দঘনের অনেক ভাবই কবীর ও তাঁহার অনুরাগী দাদূ রজ্জবজী প্রভৃতির ভাবের সঙ্গে এক। এই যে প্রিয়তম বলিয়া প্রেমের জোরে তাঁহাকে চাওয়া ইহা ত যতির বা সন্ন্যাসীর মত কথা নয়; এসব মরমিয়াদের কথা। আনন্দঘনের ১৬ নং ১৮ নং, প্রভৃতি বহু বহু পদে প্রিয়তম স্বামী প্রভৃতি সম্বোধন। দাদূ প্রভৃতি সাধকেরা কবীরের ভাবে এতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, কবীরের অনেক বাণীতে তাঁহারা নিজের নাম যোগ করিয়া তাহাতে আপন সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। আনন্দঘনও ঠিক সেরূপ করিয়া গিয়াছেন। তাহা পরে দেখান যাইতেছে।

কবীর প্রভৃতির সঙ্গে ভাবের অনুরূপতা আনন্দঘনের যে কত জায়গাতেই আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তুলিয়া দেখাইতে গেলে তাঁহার অধিকাংশ পদই উদ্ধৃত করিতে হয়। ৩৭ নং পদে যে ভাব উপকরণে আনন্দঘন যোগী হইতে চাহিয়াছেন, ইহা মধ্যযুগের অনেক ভক্তদের রচনার সঙ্গে মেলে।

৩৮ নং পদে লোকলজ্জা ত্যাগ করিয়া তিনি নটনাগরের সঙ্গে মিলিতে চাহিয়াছেন, এই ভাবও মরমিয়াদের।

৪৬ নং পদে তাঁহার যে বীরের মত খড়্গহস্তে সাধনার যুদ্ধ, তাহা কবীর দাদূ প্রভৃতির শূরাতন অংগের (heroic) পদের সঙ্গে খুবই মেলে। এসব অহিংস জৈন সাধুর কথা নয়।

৭ নং পদে প্রেমের অব্যর্থ বাণে হৃদয় বিদ্ধ হইবার কথা বলিয়াছেন 'তীর অচুক প্রেমকা', এও মরমীয়াদের কথা। ৫৭ নং পদে আছে ব্রহ্ম একাই বিশ্বে সকল খেলা খেলিতেছেন। ৭০ নং পদে পেয়ালা ভরিয়া উপলব্ধির আনন্দ রস পানের কথা তিনি বলিয়াছেন। এ সব মত্ততা মরমীয়া ছাড়া কাহাকেও সাজে না। ৮৪ নং পদে আনন্দঘন বলেন, মাতালের মত প্রেমে বিভোর হইয়া লোক লজ্জাদি সব ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই পদের মধ্যে জিন রাজের নাম জুড়িয়া দেওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই তাহা জৈন স্তবের মত শোনায় না। ৯২ নং পদে প্রাণনাথের দর্শনের জন্য আকুল প্রার্থনা। ১০৫ নং পদে প্রেম-পেয়ালার কথা বলিয়া তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, 'কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, কাকেই বা পত্র পাঠাই?' ৯৫ নং পদে আছে, 'চরিতে চরিতেও গরুর মন নিজ বাছুরের কাছে। ঘট-বাহিকার মন মাথার ঘটে, দড়ি-নাটুয়ার মন দড়ির দিকে। তোমার দিকে আমার মন তেমন হইবে কবে?' ৮ নং পদে 'সেই ফুলের গন্ধ নাকে নয় কানে বোঝে।' কবীরও এক ইন্দ্রিয়গম্য অনুভব অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধির কথা বহু স্থলে বলিয়াছেন। ১৯ নং পদে আনন্দঘন বলেন, 'পিয়া জাগে তু সোবে।' অর্থাৎ 'প্রিয়তম জাগেন আর তুই শুইয়া থাকিস্?' ইহার সঙ্গে কবীরের 'জাগ পিয়ারী অবকা সোবৈ' আর ঐ ১৯ নং পদেই 'পীয়া চতুর হম নির্পট অয়ানী', 'প্রিয়তম ত চতুর আমি অজ্ঞানী'র সঙ্গে কবীরের 'পিয় তেরে চতুর তু মূরখ নারী' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। ২১ নং পদে আনন্দঘন বলেন, এই ভাবে যদি বলি তবেও বিপদ, ঐভাবে যদি বলি তবেও বিপদ। কবীরের 'ঐসা লো নহি তৈসা লো' বাণীর সহিত তুলনীয়। ১৯ নং পদে আনন্দঘন বলেন, আমি আত্মস্বরূপ "আমি না-পুরুষ না-নারী, না-লঘু, না-গুরু" ইত্যাদি এই রকম পদ কবীরাদি বহু ভক্তেরই আছে। ২৩ নং পদে 'বৃষ্টিবিন্দু মিলাইল সমুদ্রে।'—'বর্ষা বুংদ সমুংদ সমানী' মরমীয়াদের কথা

খোঁজে, জলে যে মীনগতিরেখা খোঁজে, সে মূঢ়!' এখানেও ইনি কবীরের সঙ্গে এক্।

পংছীকে খোঁজ মীনকে মারগ
কহহী কবীর দোউ ভারী ॥
—কবীর, বীজক, শব্দ ২৪

৪২ নং পদে 'অব হম অমর ভয়ে ন মরেংগে' এখন আমি অমর হইয়াছি আর আমার মৃত্যু নাই। ৯৭ নং পদে 'যা দেহকা গর্ব ন করণা' প্রভৃতির ভাব ও ভাষা উভয়ই মরমীয়াদের। ৪৮ নং পদটি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে যাহাতে নানা দল তাঁহাকে নানাদিকে টানিয়াছে। কবীর-বীজক কানপুর মিশন সংস্করণ ৫৯ নং শব্দের সঙ্গে তার চমৎকার মিল। ইহার মধ্যে 'ঘরসূঁ তীরথ নহিঁ বীজু' পংক্তিটি কবীরের—'অবধূ, ভূলেকো ঘর লাবে' পদের কয়টি পংক্তির সঙ্গে তুলনীয়। ৪ নং পদে আনংদঘনের 'নাদ বিলুদ্ধো প্রাণকুঁ গিণে ন তৃণ মৃগ লোয়',—'এই জগতে নাদ বিলুব্ধ মৃগ প্রাণকে তৃণের সমানও মনে করে না।' পদটি কবীরের

জৈসে মিরগা শব্দসনেহী
শব্দ সুননকো জাঈ।
শব্দ সুনৈ ঔর প্রাণদান দে
তনিকো নহি ডরাঈ ॥

পদের সঙ্গে তুলনীয়।

৯৮ নং পদে আনন্দঘন বলিলেন—

অবধূ, সো জোগী গুরু মেরা।
জো ইন পদকা করে নিবেড়া॥
তরুবর এক মূল বিন ছায়া
বিন ফলে ফল লাগা।
শাখা পত্র কছু নহী উনকু
অমৃত গগনে লাগা॥
* *
থড় বিনু পত্র, পত্র বিনু তুংবা
বিন জীভ্যা গুণ গায়া।
গাবন বালেকা রূপ ন রেখা
সুগুরু সোহি বতায়া॥

অর্থাৎ, হে সাধো সেই যোগীই আমার গুরু, যিনি এই পদের রহস্য ভেদ করিতে পারেন।

তরুবর এক, বিনা মূলে তার ছায়া, বিনা ফুলে তাতে ফল লাগে, শাখাপত্র কিছুই নাই তাহার, অমৃত তাহার লাগিল গগনে।

কাণ্ড বিনা পত্র, পত্র বিনা তুম্বা, বিনা জিহ্বায় গাহিল গুণ, গানেওয়ালার না আছে রূপ, না আছে রেখা, সুগুরুই ইহা দিলেন কহিয়া।

কবীরের বীজকের ২৪ নং শব্দে আছে—

অবধূ সো জোগী গুরু মেরা
জো যহ পদ কা করে নিবেড়া
তরুবর এক মূল বিন ঠাড়ো,
বিন ফুলে ফল লাগা।
শাখা পত্র কিছু নহী বাকে,
অষ্ট গগন মুখ জাগা॥
পৌ বিনু পত্র করহ বিনু তুম্বা
বিনু জিহ্বা গুণ গাবৈ।
গাবনহায়কে রূপ ন রেখা
সতগুরু হোই লখাবৈ॥
(বীজক, ২৪ শব্দ)

৯৯ পদে আনন্দঘন বলিলেন—

অবধূ ঐসো জ্ঞান বিচারী।
বামে কোণ পুরুষ কোণ নারী॥
বম্মনকে ঘর নহাতী ধোতী
জোগীকে ঘর চেলী।
কলমা পঢ় পঢ় ভঈরে তুরকড়ী তো,
আপহী আপ অকেলী
* * *
নহি হুঁ পরণী নহী হুঁ কুঁবারী
পুত্র জণাবনহারী।
কালী দাঢ়ীকো মে কোই নহী ছোড়্যো তো,
হজুয়ে হুঁ বাল কুঁবারী॥
(আনন্দঘন, ভীমসিংহ মাণকে সংস্করণ—পদ ৯৯)

অর্থাৎ, হে সাধু, এইরূপ জ্ঞান বিচার করিয়া বল, ইহার মধ্যে পুরুষ বা কে, নারী বা কে।

ব্রাহ্মণের ঘরে সে (ব্রাহ্মণী হইয়া) নায় ধোয়, যোগীর ঘরেই সে চেলী, কলমা পড়িয়া পড়িয়া সেই হয় মুসলমানী, আবার আপনাতে সে আপনি একাকিনী।

আমি বিবাহিতাও নই, কুমারীও নই, আবার আমি পুত্রের জননী। কাল-দাড়ী আমি একজনকেও ছাড়ি নাই, আজও আমি বাল-কুমারী।

ইহার সঙ্গে কবীরের বীজকের ৪৪ নং শব্দ তুলনা করিয়া দেখা উচিত।

বুঝহু পণ্ডিত করহু বিচারা,
পুরুষা হৈ কি নারী হো।
ব্রাহ্মণ কে ঘর ব্রাহ্মণী হোতী
যোগী কে ঘর চেলী হো॥

কলিয়া পড়ি পড়ি ভঈ তুরকিনী,
কলিমে রহৈ অকেলী হো।
বর নহী বরৈ ব্যাহ নহী করঈ
পুত্র জনমাবনহারী হো।
কারে মুড়ে কো এক নহী ছাড়ে
অবহু আদি কুবারী হো।
(কবীর, বীজক, ৪৪ শব্দ)

দাদূ প্রভৃতি ভক্তেরও এমন অনেক পদ কবীরের পদের সঙ্গে এক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তার অর্থ তাঁহাদের সাক্ষ্য তাতে আছে।

আর অধিক এই বিষয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন।

গভীর গভীর সব তত্ত্ব আনন্দঘন অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

প্রেম জহাঁ দুবিধা নহি রে
নহি ঠকুরাইত রেজ।
(পদ ১৮)

যেখানে প্রেম, সেখানে নাই কোনো সংশয়, নাই সেখানে কণামাত্র প্রভুত্বের কর্ত্তৃত্বপনা।

অব জাগো পরম দেব পরম গুরু প্যারে,
মেটহু হম তুম বিচ ভেদ।
(পদ ৬৪)

হে প্রিয়তম, পরম দেব, পরম গুরু, এখন জাগ। দূর কর তোমার ও আমার মধ্যে সব ভেদ।

কাজেই পরম দেব প্রিয়তমই যে পরম গুরু, এই তত্ত্ব আনন্দঘন উপলব্ধি করিয়াছেন।

ফির ফির জোউ ধরণী অগাসা
তেরা ছিপনা প্যারে লোক তমাসা।
(পদ ৭৩)

বার-বার চাহিয়া দেখি ধরণীতে, বার-বার চাহিয়া দেখি আকাশে, তোমার এই লুকাইয়া থাকা, হে প্রিয়তম, এক আশ্চর্য্য লোক-লীলা!

আনন্দঘনের পদের মধ্যে সুন্দর কবিত্ব শক্তির প্রকাশ আছে। পূর্ব্বের উদ্ধৃত অংশগুলিতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় নিশ্চয় মিলিয়াছে, তবু আরও দুই এক পংক্তি দুই এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাউক। তাঁহার ভাব ভাষা ও রচনার কতকটা পরিচয় ইহাতে হইবে।

অমল কমল বিকচ ভয়ে ভূতল
মন্দ বিষয় শশিকোর। (পদ ১৫)

(ভানুর প্রকাশে) "ভূতল অমল কমলটির মত উঠিল বিকসিত হইয়া। চন্দ্রমার প্রান্তভাগ হইয়া আসিল মন্দপ্রভ।"

করে জারে জারে জারে জা।
সজি সণগার বণাই আভূষণ
গঈ তব সুনী সেজা। (পদ ৩৫)

"সবাই শুধু বলে, যারে যারে যারে যা। মিলনের সাজসজ্জা করিয়া আভূষণ পরিয়া যখন গেলাম, তখন দেখি শূন্য আমার বাসর-সজ্জা!"

নিস অঁধিয়ারী ঘনঘটা রে
পাউ ন বাটকো ফংদ। (পদ ১৮)

"রাত্রি অন্ধকার, মেঘের ঘনঘটা, পথের সন্ধানও ত মিলিতেছে না।

ঝড়ী সদা আনন্দঘন বরখত
বনমোর একনতারী। (পদ ২০)

"ঘন ঘোর দুর্য্যোগের বর্ষা সদাই ঝরিয়া চলিয়াছে, আমার (চিত্ত) বনময়ূর সেই সঙ্গে সঙ্গে একতানে সঙ্গীতে মত্ত।

দুখিয়ারী নিস দিন্ রহূঁ রে
ফিরূঁ সুধ বুধ খোয়।
তনকী মনকী কবন লহে প্যারে
কীসে দেখাউ রোয়। (পদ ৩৩)

"নিশিদিন রহি অতি দুঃখী, বুদ্ধিশুদ্ধিহারা হইয়া বেড়াই ঘুরিয়া। তনু মনের এই বেদনা কে বুঝিবে, প্রিয়তম? কাকেই বা দেখাই সেই দুঃখ কাঁদিয়া?"

আঁখ লগাই দুঃখ মহেলকে
ঝরোখে ঝূলী হো। (পদ ৪১)

"দুঃখ মহলের ঝরোখায় (গবাক্ষে) নয়ন লাগাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যেন ঝুলিয়াই দিন কাটাইতেছি।"

শ্রাবণ ভাদু ঘন ঘটা
বিচ বিচ ঝমকা হো।
সরিতা সরবর সব ভরে
মেরা ঘটসর সব সূকা হো। (পদ ৬২)

"শ্রাবণ ভাদ্রের ঘনঘটা! মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘোর বর্ষণ! নদী সরোবর সবই উঠিল ভরিয়া। আমার অন্তর-সরোবরই রহিল শুধু একেবারে শুষ্ক!"

পোর্ট-আর্থারের ক্ষুধা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২১

পদোন্নতি ও বিদায়

সম্রাটের ঘোড়ার ক্ষুরের তলায় ধূলায় পরিণত হইবার সঙ্কল্প করিয়া আমরা জাপান ছাড়িয়াছিলাম সত্য; বলিয়াছিলাম—মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া এখানে দাঁড়াইলাম! হৃদয় অধীর, কিন্তু সুযোগ আসিতেছে মন্দগতি! যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রার সুরু থেকে শতাবধি দিন কাটিয়া গেল। তখন দেশের মাঠে ও পাহাড়ে কত ফুল মধুর গন্ধে আমাদের পোষাক সুরভিত করিয়াছিল, মলয় বাতাস সন্তর্পণে সূর্য্য-পতাকাকে চুমা দিয়া অজানা দূরদেশে আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল! সময় কত শীঘ্র চলিয়া যায়—এখন আমরা সবুজ পাতার ছায়ে বসিয়া আছি। রাতে বাহুর উপর মাথা দিয়া যখন ঘুমাইয়াছি, দিনে গুলিবৃষ্টির মাঝে যখন ঘুরিয়াছি, মরিয়া সম্রাটের দয়ার ঋণ শুধিবার ইচ্ছা কখনই মন থেকে সরিয়া যায় নাই। শেষ যুদ্ধ জয়ের আনন্দ উপভোগ না করিয়াই আমাদের হাজার হাজার সঙ্গী মারা পড়িল, তাদের অশান্ত আত্মা এখনও বিরাম পাইল না। তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আমরা উৎসুক কিন্তু সুযোগ আসে কই? আমরা যারা বাঁচিয়া আছি, আমরা গলিত মাংস ও ঘুণধরা অস্থির দুর্গন্ধের মাঝে বাস করিতেছি। আমাদের দেহের মাংসও শুকাইয়াছে, অস্থি শীর্ণ হইয়াছে। আমরা যেন একদল আত্মা, শীর্ণ ভঙ্গুর দেহে তীব্র অধীর আকাঙ্ক্ষা বহিয়া ফিরিতেছি, অথচ আমরা য়্যামাতোর * আসল চেরিগাছেরই শাখা প্রশাখা। কি করিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি, একটা দুটো নয়, চার চারটে যুদ্ধ লড়িয়া? কেন এখনও মনোরম চেরির পাপড়ির মত যুদ্ধক্ষেত্রে ঝরিয়া পড়িলাম না? তাকুশানের উপর মরিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, আমার কত সঙ্গী আমাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আমার মরা হইল কই? এবার নিশ্চয়ই জন্মভূমিকে আমার নগণ্য দেহ নিবেদন করার সম্মান লাভ করিতে পারিব! এই ধারণা, ইচ্ছা ও সঙ্কল্প লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলাম।

আগষ্ট মাসের প্রথমেই পদোন্নতি হয়, কিন্তু প্রথম-লেফ্‌টেন্যান্ট হওয়ার খবরটা এখন আসিল। কর্নেল আওকি আমাকে ডাকিয়া খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন—তোমার পদোন্নতিতে অভিনন্দন করি! গোড়া থেকেই তুমি পতাকা বহন করেছ, সে-কাজ থেকে এবার তোমার অব্যাহতি। অতঃপর আরও তৎপর হওয়া চাই—কাল সম্মিলিত আক্রমণের দিন। অনেক দিন একত্রে আহার নিদ্রা সম্পন্ন হয়েছে, আজ বিদায় নিতে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু তবুও বলি, নমস্কার! তোমার চেষ্টা সার্থক হোক!

তাই বটে। এদেশে আসার পর থেকেই নায়কের সঙ্গে খাইয়াছি শুইয়াছি, তাঁর পাশে পাশে থাকিয়া লড়িয়াছি। বৃষ্টি ও হিম মাথায় করিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় থাকার সময় কর্নেল তাঁর শয্যার ভাগ দিয়াছেন পাছে আমার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। আহার্য্য পর্য্যাপ্ত নয়, তবুও তাহা আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইয়াছেন—মুখে প্রসন্ন তৃপ্ত হাসি, যেন আপন গৃহে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে আহার সমাধা হইতেছে। বাড়িতে পালঙ্কে দিব্য আরামে শোওয়ার যাঁর অভ্যাস, খড়ের মাদুরে খড়ের বালিশ মাথায় দিয়া হয়ত অসুখে পড়িবেন বলিয়া ভয় হইত। তিন হাজার প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর জীবন মহামূল্য—তাঁর স্বাস্থ্যের উপর সমস্ত রেজিমেণ্টের উদ্যম ও উৎসাহ নির্ভর করে। সাধ্যমত তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছি, যুদ্ধক্ষেত্রের নানা অসুবিধার মধ্যে তাঁহাকে যথাসম্ভব

* জাপানের।

আরামে রাখার চেষ্টা করিয়াছি। কিছুকাল আগে চুংচিয়াতুনে থাকার সময় একটা জালায় জল গরম করিয়া তাঁকে স্নানের জন্য দিয়াছিলাম। তিনি ভারি খুশী হইয়াছিলেন—তখনকার তাঁর সেই আনন্দিত মুখ কখনও ভুলিব না। এখন সেই কর্নেলকে ছাড়িয়া যাওয়ার সময় দুঃখের আর অবধি রহিল না। এখনও অবশ্য তাঁরই অধীনে অন্য এক দলে থাকিব, এখনও আমি তাঁরই তাঁবেদার। এ প্রকৃত ছাড়াছাড়ি নয়, তবুও কিন্তু মনে হইল তাঁর কাছ থেকে বহুদূরে চলিয়া যাইতেছি। তাঁর বিদায়বাণী শুনিয়া কান্নায় আমার গলা ধরিয়া আসিল, কিছুক্ষণ মাথা তুলিতে পারিলাম না। সম্পদে-বিপদে এতকাল যে-পতাকার পরিচর্য্যা করিয়া আসিলাম, সেই পতাকা ত্যাগ করাও আমার পক্ষে কষ্টকর হইল। ছিন্নভিন্ন মলিন সেই পতাকা কর্নেলের বামে ঝুলিতেছে; তার পানে চাহিয়া মনে হইল, ঐ পতাকা দর্শনে তিন হাজার লোকের প্রাণে উত্তেজনার সঞ্চার হয় বটে, তবুও তার মধ্যে কেবল আমারই মনে সবার বেশী ভাবের সঞ্চার হওয়ার যেন একটা বিশেষ দাবি আছে।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া কহিলাম—কর্নেল, লড়াই করে' আপনাকে দেখাবো··! আর কিছু বলিতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে ফিরিয়া কয়েক পা গিয়া ছুটিয়া আমার ভৃত্যের কাছে হাজির হইলাম। বলিলাম—হুকুম এসেছে, এবার আমায় যেতে হবে। কাজেই তোমাকেও আমার কাজ ছাড়তে হবে, কিন্তু তোমার দয়া আমি ভুলবো না। চিরদিন আমাকে বড় ভাই বলে' মনে রেখো আর নির্ভয়ে যুদ্ধ কোরো।

শুনিয়া আমার সৈনিক ভৃত্য তাকায়ো কাঁদিয়া অস্থির। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, তাকুশানের যুদ্ধের আগে দুজনে যে-কৌটাটি তৈরি করিয়াছি, এবার নিশ্চয়ই সেটি কাজে লাগিবে!

তাকায়ো কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি আপনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখেন?

পাছে নিজেও কাঁদিয়া ফেলি সেই ভয়ে আর জবাব দিতে পারিলাম না।

পতাকা ছাড়িয়া, কর্নেলকে ছাড়িয়া, অনুগত বিশ্বাসী ভৃত্যকে পিছনে ফেলিয়া নির্জ্জনতার মাঝ দিয়া একলা চলিয়াছি। এই-সব পাহাড় ও উপত্যকা এখন আমার স্নেহের সাথীদের সমাধিভূমি···আকাশে মেঘ আসাযাওয়া করিতেছে···ভাবিতে লাগিলাম, যা-কিছু পার্থিব তা-কত নশ্বর! হঠাৎ মনে হইল আর একবার ডাক্তার য়্যাসুইয়ের সঙ্গে দেখা করি, আমার গ্রামের উপরিতন কর্ম্মচারী কাপ্তেন মাৎসুওকাকেও বিদায় নমস্কার করিয়া যাই। তখনই ফিরিলাম। তাকুশানের উত্তর পাদমূলে এক গিরিসঙ্কটে গিয়া পৌছিলাম। কাপ্তেন একাকী তাঁর তাঁবুর মধ্যে বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া খুশী হইলেন।

কিছু কাল তোমায় দেখিনি। ভাল আছ বেশ?

ভালই আছি। ধন্যবাদ! আমার পদোন্নতি হয়েছে—প্রথম লেফ্‌টেন্যাণ্ট হয়েছি। আমার ওপর দয়া রাখবেন।

কাপ্তেন হঠাৎ বলিলেন, তাহলে এ জগতে এই আমাদের শেষ দেখা!

আমি বলিলাম, আমিও মরিব বলিয়া আশা করি। চিকুয়ান্‌শানের চূড়ায় একসঙ্গে মরিতে পারিলে বেশ হয়!

যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলে কাপ্তেন আমার কাঁধ থাবড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোমরবন্ধে ওটা কি?

ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, আমার 'কফিন্'!

বটে? তুমি ত তাহলে তৈরি হয়েই আছ!

তারপর প্রথম ব্যাট্যালিয়নের সদরে হাজির হইলাম—চুচিয়াতুনের কাছে, পাহাড়ের আড়ালে। ডাক্তার য়্যাসুইয়ের সঙ্গে দেখা হইল। সেখানে পৌছানর অল্পক্ষণ পরেই তাঁবুর সামনে বিকট শব্দে কয়েকটি শত্রুর গোলা আসিয়া পড়িল। এ সব এখন সহিয়া গেছে। আমরা ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। শুনিলাম, এই জায়গাটিকে লক্ষ্য করিয়া শত্রু প্রায়ই তোপ দাগিয়া থাকে। ডাক্তার য়্যাসুইকে পদোন্নতির খবর দিলে তিনি আমাকে এক পাশে লইয়া গেলেন। দেখিলাম বারুদের বাক্সগুলো গাদা করা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমার দেখা পাইবার জন্য অধীর হইয়া ছিলেন। বলিলেন, এক জায়গায় থাকি তবু একটু নিরিবিলি গল্প করা

ঘটিয়া ওঠে না। প্রতিদিন তিনি আমার চিঠির অপেক্ষা করিয়াছেন। শুনিয়া মন গলিয়া গেল। বলিলাম, আশ্চর্য্য যে আমরা দুজনে এখনও বাঁচিয়া আছি! কিন্তু এবার আর গোল নাই, মরিতেই হইবে—এবার শেষ বিদায় লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই আসিলাম। সেই হুয়াংনিচুয়ানের বাড়িতে দুজনে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম, দুজনে মরিলে কথা নাই, কিন্তু যদি আমি আগে মরি, তবে সে আমার রক্তমাখা পোষাকের খানিকটা কাটিয়া লইয়া স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া দিবে। তারপর পরস্পরে হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, এই শেষ! পরস্পরের সাফল্য কামনা করিয়া চোখের জল ফেলিয়া বিদায় লইলাম।

অনিচ্ছায় পায়ে পায়ে তাঁবু থেকে বার হইয়া তাকু নদী পার হইলাম। তারপর শত্রুর কেল্লার মুখোমুখি পাহাড়ের ঢালু বাহিয়া উঠিয়া ব্রিগেড্-সদরে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেলকে সেলাম দিবার জন্য গেলাম। ঠিক সেই সময় এক কর্ম্মচারী পীড়িত হইয়া ছুটি লইয়াছিলেন, আমাকে তাঁর জায়গায় একটিনি নিযুক্ত করা হইল। পরে আমি বারো নম্বর কম্পানির নায়কের পদ পাই।

আক্রমণের আগের রাতে পাচক দুখানা চিঠি আনিয়া দিল। এমন জায়গায় এই অবস্থায় চিঠির আশা করা যায় না—চিঠি দুখানা অনেক ঘুরিয়া আমার হাতে পৌঁছিয়াছে। দুই পত্রই দাদার লেখা—একখানার মধ্যে এক ফাউণ্টেন্ পেন্, অন্যখানার মধ্যে তিন ও চার বৎসর বয়সের দুই ভাইঝির ছবি। কচি কচি মিষ্টি মুখ—ছবির মাঝ থেকে যেন তারা 'কাকা' বলিয়া ডাকিতেছে! ফটোর শিশুগুলি যদি দেখিতে পাইত, তবে দেখিত কাকার মুখ এমন শীর্ণ যে আর চেনা যায় না—দেখিয়া হয়ত কাঁদিয়া ফেলিত। দিনরাত কেবল অপরিচ্ছন্ন সৈনিক, ভাঙা হাড় আর ছিন্ন মাংস দেখিয়া আসিতেছি। তৃণভূমির উপর যে ফুলগুলি হাসিতে থাকিত তারাও এখন পায়ের চাপে সব মারা পড়িয়াছে। এমন নিষ্করুণ নীরস যুদ্ধক্ষেত্রে কঠিন যুদ্ধের আগের রাতে আমায় স্নেহের দুই ভাইঝি আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিল—আমার অধীর অন্তরে কোমল হাত বুলাইয়া দিল—এ কী আনন্দ! তাদের সুন্দর চোখেমুখে চুমা না দিয়া পারিলাম না। আপন মনে বলিতে লাগিলাম—তোদের সাহস ত কম নয়! মায়ের আদরের কোল ছেড়ে বিরাট বিস্তীর্ণ সাগর আর বিশাল ঢেউ অতিক্রম করে' আমাকে দেখতে এলি এই বারুদের মেঘ আর গোলাগুলির বৃষ্টির দেশে! তা বেশ করেছিস, কাকা কাল তোদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে দেখাবে কেমন ক'রে জাপানের শত্রুকে শাস্তি দিতে হয়!

আজ রাতের মত ধোঁয়ার মেঘ কাটিয়া গেছে, আকাশে উজ্জ্বল তারাদল হাসিতেছে। শিশু 'ভাইঝি-দুটিকে' পাশে নিয়া তাঁবুতে ঘুমাইলাম। নেল্‌শনের শেষ কথা মনে পড়িতে লাগিল। জাপান ছাড়ার সময় যে-শ্লোক লিখিয়া বাবাকে দিয়া আসিয়াছিলাম, সেটি বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। তাহাতে লিখিয়াছিলাম—যুদ্ধে মৃত্যুর মহিমা…সাতজন্ম ব্যাপী রাজভক্তি! নির্জ্জন প্রান্তরে মাথার খুলি ফেলিয়া দেশভক্ত আত্মার সপ্ত জন্ম পরিগ্রহ ইহা কাল ঘটিবে, না তার পরদিন?

য়্যামামোতো নামে এক ল্যান্স-কর্পোর্‌য়াল ছিল। সে এই সময় মা ও ভাইয়ের কাছে নখ ও চুলের টুকরা পাঠায়, তার সঙ্গে ছিল বিদায়-লিপি ও একটি কবিতা: সেই চিঠি তার শেষ চিঠি। তাহাতে লেখা ছিল—

"ইতিমধ্যে দুই দুইবার দুঃসাহসী দলে যোগ দিলাম, তবুও মাথা এখনও কাঁধের উপর আছে। মৃত সঙ্গীদের কথা ভাবিলে দুঃখে মন ভরিয়া ওঠে। আমাদের দলের প্রায় দু-শ' লোকের মধ্যে কেবল কুড়িজন অক্ষত-দেহ আছে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক, এই অল্প-সংখ্যকের মধ্যে আমিও একজন। মানুষ বাঁচে আর কতদিন, জোর বছর পঞ্চাশ—যথাসময়ে সেই জীবন দিতে না পারিলে এর পর হয়ত সুযোগ মিলিবে না। দু-দিন আগে নয় পরে সকলের মত আমাকেও মরিতে হইবে, তাই 'টালি হইয়া আস্ত থাকার চেয়ে মণি হইয়া গুঁড়া হওয়ার' বাসনা। গোলাগুলি কিরীচ যাই আসুক না কেন, মরিব. কেবল একবার। ডানদিকে আমার

সাথীর গায়ে গুলি বিঁধিল, বাঁদিকে আমার নায়কের উরু ও বাহু শূন্যে উড়িল, মধ্যে আমার গায়ে কিন্তু আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগিল না—স্বপ্ন কি না পরখ করার জন্য নিজের গায়ে চিমটি কাটিলাম। চিমটি লাগিল—তবে নিশ্চয়ই এখনও বাঁচিয়াই আছি! আমার মৃত্যুকাল এখনও আসে নাই—সঙ্গীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তৎপর হওয়া চাই। আমি নির্গুণ, কিন্তু হৃদয় আমার অধীর। কুঁড়েঘরে খড়ের চাটাইয়ের উপর স্বাভাবিক অথচ তুচ্ছ মৃত্যুর বদলে যদি নির্ভয়ে লড়িয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ দিই, তবে চাষার ছেলে হইলেও লোকে আমার সঙ্গে চেরিফুলের তুলনা করিয়া গান গাহিবে!

বান্‌জাই, বান্‌জাই, বান্‌জাই!"

২২

সমবেত আক্রমণের সুরু

শোনা যায় রুশ খবরের কাগজ Novoye Vremya-র সংবাদদাতা পোর্ট-আর্থার রক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—এ যেন ঈগলের বাসা—আকাশ-ছোঁয়া মইও তার কাছে পৌছিতে পারিবে না! তাই বটে। যতদূর চোখ যায়, ছোটবড় প্রত্যেক পাহাড়ে কেবল কেল্লা আর প্রাচীর (র‍্যাম্পার্ট) স্থলের দিকটা সুকঠিন লৌহ-প্রাচীর-বেষ্টিত। রুশ সৈন্যদলের বাছা বাছা সাহসী সৈনিক তার রক্ষক। সেই 'দুর্ভেদ্য' দুর্গকে 'ভেদ্য' প্রমাণ করার জন্য আমরা এখন তার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছি।

তাকুশানের তলায় থাকার সময় আক্রমণের নানা আয়োজন চলিতে লাগিল। কাঁটা-তারের বাধার উপর শত্রুর খুব আস্থা—তাহা অতিক্রম করার উপায় আবিষ্কার করা দরকার। সেই বেড়ার তারে ও খুঁটিতে আগেকার যুদ্ধে আমাদের বহু সৈনিক মারা পড়িয়াছে। বড় ছোট উঁচু নীচু যত পাহাড় দেখিতেছি সর্ব্বত্রই এই সব ভয়ানক পদার্থ—দূর হইতে দেখিলে মনে হয় জমির উপর কালো কালো ফোঁটা ছিটানো রহিয়াছে।

এই-সব বাধা ভাঙিয়া মাড়াইয়া যাইতে হইবে। আসলে তার-কাটার কাজ ইঞ্জিনিয়ারের, কিন্তু তাদের সংখ্যা পরিমিত, অথচ তারের বেড়ার শেষ নাই বলিলেও চলে, অগত্যা পদাতিক সৈন্যদলকে এই কাজ শিখিতে হইল। তাকু-নদীর তীরে এক নকল তারের বেড়া খাড়া করিয়া ঠিক সেটিকে কিরূপে ভাঙিয়া ফেলিতে হয়, ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শিখিতে লাগিলাম। প্রথমে একদল লোক বড় হাতলের কাঁচি হাতে অগ্রসর হইয়া লোহার তার কাটিয়া ফেলিবে, তারপর করাতধারীরা গিয়া খোঁটাগুলো ভূমিসাৎ করিবে অথবা করাত দিয়া চিরিয়া ফেলিবে, এইরূপে তারের বেড়ায় খানিকটা ফাঁক হইলেই তার মাঝ দিয়া একদল লোক ছুটিয়া ঢুকিয়া যাইবে।

কাজটি বিশেষ জরুরী, তাই অধ্যবসায় ও উৎসাহের সঙ্গে অভ্যাস করিতে লাগিলাম। আসল লড়াইয়ে কিন্তু এত সহজে কাজ সম্পন্ন হয় না। তারের বাধা ধ্বংস করিতে যারা অগ্রসর হয়, তারা প্রায় সকলেই মারা পড়ে, কারণ 'মেশিন্‌-গানের' মুখের কাছে দাঁড়াইয়া তাদের কাজ করিতে হয়। তার উপর দেখা গেল তারগুলোতে তড়িৎ-প্রবাহ আছে। যদিও উক্ত তড়িৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে দুইটা মত ছিল—কেহ বলিত, প্রবাহ এত প্রবল যে, তার ছুঁইলেই মৃত্যু হয়; আর কেহ বলিত, প্রবাহ দুর্ব্বল; উহার উদ্দেশ্য, তার যারা ধ্বংস করিতে আসিবে তাদের আগমন শত্রুর মিনারে জানাইয়া দেওয়া। সে যাই হোক, বিদ্যুৎ-প্রবাহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সাধারণ কাঁচি দিয়া তার কাটার উপায় নাই, তাই আমরা কাঁচির হাতলে বাঁশের ছড়ি বাঁধিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তিকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলাম। এসব সাবধানতা সত্ত্বেও আসল লড়াইয়ের সময় দেখা গেল তারে প্রবল প্রবাহ বর্ত্তমান, তার ফলে আমাদের কতক লোক নিমেষে মারা পড়িল, কারও কারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাখারির মত ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। মইয়ের সাহায্যে শত্রুর খাত পার হওয়ার অভ্যাসও চলিতে লাগিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল খাতগুলি এত চওড়া বা গভীর যে, মইগুলি বিশেষ কোনো কাজে লাগিল না।

সর্ব্বত্র মাটিতে পোঁতা 'মাইন্‌'। ইঞ্জিনিয়ারেরা পলিতা কাটিয়া দিয়া সেগুলো নষ্ট করিল। আক্রমণের দিন পর্য্যন্ত দূরবীন্‌ দিয়া দেখিতে লাগিলাম রুশেরা ইতস্তত এই-সব বিস্ফোরক মাটিতে পুঁতিতেছে। আমাদের

ম্যাপে সেই সব জায়গা চিহ্নিত করিলাম। সন্ধান লইয়া যতটা সম্ভব সমস্তই মনে করিয়া রাখিলাম। যেমন, তারের বেড়ার প্রত্যেক খুঁটি হাতুড়ির বারো ঘায়ে বসানো হইয়াছে; অমুক উপত্যকায় এতগুলি 'মাইন্‌' পোঁতা হইয়াছে! আমাদের সন্ধানী দল জানিতে পারিল যে, যে-সব গিরিসঙ্কট দিয়া আমাদের সেনাদলের উপরে ওঠার সম্ভাবনা, তার প্রত্যেকটির মধ্যে প্রচুর চতুরতার সহিত 'মাইন্‌' বসানো হইয়াছে। যেমন ধরুন গিরিসঙ্কট যেখানে খুব সরু, সেখানে এমন একটি 'মাইন্‌' পোঁতা আছে যার উপর পা দিলেই ফাটিয়া যাইবে। প্রথম লোকটি মারা পড়িলে স্বভাবতই বাকি লোক গিরিসঙ্কটের দুই পাশে সরিয়া দাঁড়াইবে, অমনি সেখানকার শ্রেণীবদ্ধ 'মাইন্‌' সমস্ত দলটাকেই শেষ করিয়া দিবে! এই সব জায়গা দিয়া নিরাপদে যাওয়া ভারি শক্ত। তার উপর সমস্ত কেল্লা ও গুপ্ত খাতের (ট্রেঞ্চ) কামান ও বন্দুক এমন ভাবে স্থাপিত যে, প্রত্যেক গিরিসঙ্কট ও পাহাড়কে লক্ষ্য করিয়া গোলাগুলি দাগা চলে। তিন দিকের গোলাগুলি থেকে কারও পরিত্রাণের উপায় নাই। শত্রুর আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় ত্রুটি নাই বলিলেও হয়।

১৯এ আগষ্ট তারিখের প্রত্যূষে আমাদের সমস্ত গোলন্দাজেরা একযোগে গোলা দাগিতে সুরু করিল। পূর্ব্ব-চিকুয়ান্‌শান্‌ যদিও প্রধান লক্ষ্যস্থল, তবুও অন্যান্য কেল্লা বাদ গেল না। অচিরে আক্রমণকারীরা তোপের আড়ালে শত্রুর দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। রুশেদের উপর যেই তোপের ফল ফলিতে সুরু করিবে অমনি সকলে হুড়মুড় করিয়া গিয়া পড়িবে। তাই আমাদের গোলন্দাজেরা সমস্ত শক্তি দিয়া কেল্লা ভাঙার, বোমা-নিবারক আড়াল চূর্ণ করার এবং গুপ্ত খাতের মাঝ দিয়া পথ করার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই পথ দিয়া আমাদের দল প্রবেশ করিবে।

আমাদের দিক থেকে গোলা চলা সুরু হইতে-না-হইতে শত্রুর সকল কামানের সারি জবাব দিতে লাগিল। উদ্দেশ্য, আমাদের কামানের মুখ বন্ধ করিয়া পদাতিক দলকে অগ্রসর হইতে না দেওয়া। দু-দিকের অতিকায় কামান থেকে যখন বড় বড় গোলার লেনদেন চলিতে লাগিল, তখন সে কী দৃশ্য! পিপের মত বড় বড় বিস্ফোরক 'শেল্‌' আর গোলাকার 'শেল্‌' শূন্যে বিষম কাঁপনের সৃষ্টি করিল, তাদের গোঙানির ঘাত-প্রতিঘাত বাজের হুহুঙ্কারকে আমলেই আনিল না। 'শেল্‌' ফাটিয়া সর্ব্বত্র তড়িৎ বৃষ্টি করিতে লাগিল, ধোঁয়া দিগ্বিদিক বাষ্পঘন মেঘে ঢাকিয়া দিল, মনে হইল তার মধ্যে কোনো জীবেরই নিশ্বাস লওয়া অসম্ভব। শত্রুর 'শেল্‌'-এর নাম দিয়াছিলাম 'ট্রেন্‌-শেল্‌', কারণ সেগুলো গুম্‌গুম্‌ শব্দের সঙ্গে তীক্ষ্ণ চীৎকার করিতে করিতে আসিত—যেন তীব্রস্বরে বাঁশী বাজাইয়া ট্রেন ষ্টেসন ছাড়িতেছে। আমাদের কাছে যখন এমনি শব্দ পাইতাম তখন সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁপিতে থাকিত, আর সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে মানুষ, ঘোড়া, পাথর ও বালি একযোগে উপরপানে ছিটকাইয়া উঠিত। এই সমস্ত ট্রেনের সঙ্গে যার ধাক্কা লাগিত তাই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত; সেই টুকরাগুলা মাটিতে পড়িয়া আবার লাফাইয়া উঠিত যেন তাদের ওড়ার ডানা আছে। 'শেল্‌'-এর টুকরায় একজন লেফটেন্যান্টের গলা ছিঁড়িয়া কেবল চামড়ায় মুণ্ডটা ঝুলিতে লাগিল! এক সৈনিকের দু-দুটা হাত কাঁধ থেকে পরিষ্কার কাটিয়া উড়িয়া গেল!

গোলা চালাইয়াই সে দিনটা শেষ হইল। প্রথমে দু-একদিন তোপ দাগিয়া পরে পদাতিকের আক্রমণ হইবে ইহাই স্থির ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় কার্য্যগতিকে আমাদের ডিভিসনের সদরে গেলাম—সেখানেই আমাদের গোলন্দাজেরা স্থাপিত হইয়াছিল। অন্ধকার রাত, আকাশের মাঝ দিয়া শ্বেতাভ নীল আগুনের দণ্ড যুদ্ধমান দুই দলের মাঝে ছুটাছুটি করিতেছে—মনে হইল সেটা যেন নরকে যাইবার প্রশস্ত পথ! চিকুয়ান্‌শান ও পাইইন্‌শান থেকে রুশেদের সন্ধানী আলো আমাদের গোলন্দাজের আড্ডার উপর পড়িতেছে। ভীতিপ্রদ সেই আলো ঘনঘন আমাদের পায়ে পায়ে অগ্রগামী পদাতিকদলের দিকে ফিরিতেছে। শত্রুর যে-সব সন্ধানী আলো কাড়িয়া লইয়াছিলাম তাহার দ্বারা রুশেদের আলোর শক্তি প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম,

সেই আলোয় রুশেদের কামানগুলোও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু শত্রুর কাছে এখনও যেগুলো আছে তার শক্তি আমাদের সন্ধানী আলোর চেয়ে ঢের বেশি। মাঝে মাঝে শত্রু তারা-'শেল্' ছুড়িতেছে—মনে হইতেছে যেন শূন্যে বিজলী বাতি ঝুলিতেছে; চারিদিকে যেন দিনের আলো, তাহাতে একটি পিঁপড়ের চলাফেরাও দেখা যায়। সুতরাং আমাদের এতটুকু নড়াচড়াও শত্রুর দৃষ্টি এড়ায় না, অমনি আক্রমণেচ্ছু সেনাদলের উপর 'মেশিন-গান্'-এর মারাত্মক গুলিবৃষ্টি সুরু হইয়া যায়। তাই আকাশে তারা-বাজি ফাটিতে দেখিলেই পরস্পরকে সাবধান করি—খবরদার! নোড়োনা, নোড়োনা!

'ডিভিসন্'-নায়কের সদরে পৌছিয়া দেখি দলবল-সহ তিনি গোলন্দাজদের কাছে দাঁড়াইয়া তিমিরাবরণ-মুক্ত রাতের লড়াইয়ের দৃশ্য দেখিতেছেন। রুশ-কেল্লায় সন্ধানী আলো দেখা দিলেই বলেন—লাগাও ওটাকে! দাও গুঁড়ো করে'! নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভাবে হাতদুটো মুড়িয়া বলিতে থাকেন—নতুন ক'নের মত আমার অবস্থা! এত আলোর মাঝে দাঁড়িয়ে লজ্জায় মারা যেতে বসেছি!

সেই রাতে আমাদের দল ইয়াংচিয়া-কউ পর্য্যন্ত হাঁটিল। সেখানে পৌছিবার কিছু পরেই বিকট শব্দে এক 'শেল্' আসিয়া পড়িল। আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম—নিশ্চয়ই কেউ মরেছে! কে তারা? কে? ধোঁয়া সরিলে দেখিলাম জন চার পাঁচ হতাহত পড়িয়া আছে, তাদের মধ্যে দু-জন নবাগত, মাত্র কয়েকদিন আগে দেশ হইতে আসিয়াছিল। দু-জনের ভয়াবহ মৃত্যু—কোমরের নীচে আধখানা দেহ উড়িয়া গেছে! অপরের দুই পা চূর্ণ হইয়াছে—হুহু করিয়া জলের মত রক্ত বার হইতেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে একজনের গায়ে কেন গুলি লাগে অথচ অপর জনের গায়ে লাগে না—এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এমন লোক আছে যে একটার পর একটা ভয়ানক যুদ্ধে লড়িতেছে, কিন্তু গায়ে তার একটি আঁচড়ও লাগিতেছে না; আবার এমন লোক আছে যে নিজের উপর গুলি যেন টানিয়া লইতেছে চুম্বকের মত—যেখানেই যাক, গুলি তার পিছু ধাওয়া করিবেই! যুদ্ধক্ষেত্রে পা দিয়াই কেহ কেহ মারা পড়ে—গুলির আঘাত কেমন লাগে বোঝার আগেই। একবার যদি বন্দুকের লক্ষ্যস্থল হও তবে চল্লিশ পঞ্চাশটা গুলি তোমার গায়ে বিঁধিতে পারে। ইহাই কি অদৃষ্ট, না কেবল ঘটনাচক্র? ১৯এ আগষ্ট তারিখে ডিভিসনের সদর তাকুশানের উত্তর ঢালুতে সরাইবার সময় ডিভিসন-নায়ক দুই ধারে দুই কর্ম্মচারী লইয়া শত্রুকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় একটা গোলা আসিয়া নিমেষে কর্ম্মচারী দুজনের প্রাণ সংহার করিল, অথচ নায়ক দুজনের মাঝে থাকিয়াও অক্ষতদেহ রহিলেন! কেল্লা আক্রমণের সময় যারা সামনে থাকে তাদেরই আঘাত পাওয়ার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু আসলে যারা পিছনে থাকে তাদেরই চোট লাগে বেশি। নেপোলিয়ন বলিতেন—"গুলি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হইতে পারে, কিন্তু সেটা তোমাকে তাড়া করিতে পারে না! যদি তা পারিত, তবে জগতের শেষ সীমায় পালাইয়াও তোমার নিস্তার থাকিত না, তার কবলে তুমি পড়িতেই!" গুলিটা ভূতের মত এক বিদ্‌কুটে ব্যাপার। কাহারও বলার শক্তি নাই সেটা লাগিবে না ফসকাইবে। উহা সম্পূর্ণ মানুষের বরাতের উপর নির্ভর করে। এই সূত্রে আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তাই-পোশানের যুদ্ধের পর দেখা গেল পলায়নপর রুশেদের মধ্যে জন পাঁচ ছয় লোক তাড়াহুড়া না করিয়া ধীরে-সুস্থে বেপরোয়াভাবে হাত দুলাইতে দুলাইতে চলিয়া যাইতেছে। তাদের স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমরা প্রত্যেকে, ড্রিলের মাঠে লক্ষ্যভেদ অভ্যাসের সময় যেমন করিতাম, তেমনি সাবধানে অনড় জিনিসের উপর বন্দুক রাখিয়া টিপ্ করিয়া গুলি ছাড়িতে লাগিলাম—কিন্তু একটি গুলিও তাদের গায়ে লাগিল না। শেষে একজন নায়ক বলিল, নিশ্চয়ই সে মারিবে, কিন্তু সেও পারিল না। রুশেরা ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে শেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারপর কতবার রুশেরা কেল্লার উপর দাঁড়াইয়া রুমাল নাড়িয়া আমাদের ডাকিয়াছে, কখনও বা দেওয়ালের বাহিরে আসিয়া অপমান করিয়াছে—তাদের উপর

লক্ষ্যভেদ শক্তির পরখ করিতে গিয়া আমাদের ক্রোধ, কৌতূহল ও দক্ষতা সত্ত্বেও বারে বারে নিষ্ফল হইয়াছি। ইহাকেই বলে নিয়তির খেলা। এইজন্যই কয়েকটা লড়াই পার হইলেই লোকে নির্ভয় অসাবধানী হইয়া ওঠে। প্রথম প্রথম ছোট একটি 'বুলেটের' শব্দে মাথা আপনি নামিয়া যায়, নায়ক ধমক দিয়া বলেন, শত্রুর গুলিকে সেলাম করে কে হে? কিন্তু তিনিও গোড়ায় শত্রুকে সেলাম না করিয়া পারেন নাই! অবশ্য, এটা মোটেই ভীরুতার লক্ষণ নয়—এ একটা স্নায়বিক ব্যাপার। কিন্তু গুলি যখন বৃষ্টিধারার মত আসিতে থাকে তখন প্রত্যেক গুলিকে সেলাম করার অবসর কোথায়? অগত্যা তখন নিমেষে সাহসী হইয়া উঠি। তখন বড় বড় গোলার গর্জ্জনেও মনে ভাবান্তর হয় না। যখন বুঝি বিকট শব্দটা কানে পৌঁছানর অনেক আগেই গোলা আমাদের ছাড়াইয়া বহুদূর চলিয়া গেছে, তখন মনে সাহস আসে, তখন আর ফাঁকা আওয়াজের সামনে মাথা নীচু করি না। তখন দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়াইয়া শত্রুকে কলা দেখাইয়া ভাতের নাড়ু চিবাইতে থাকি! আর গুলিগোলাও তখন দুঃসাহসীর কাছে ঘেঁসে না—পাশ কাটাইয়া গিয়া অন্যের গায়ে লাগে।

ক্রমশ

সনাতন হিন্দু*

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

গৃহপতি যত দিন সাবধানে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের কোথায় কি প্রয়োজন লক্ষ্য রাখিয়া যথাযথ ভাবে তাহার ব্যবস্থা করেন, কোথায় কি হইতেছে না-হইতেছে ইহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন, সর্ব্বত্র একটি যুক্তিযুক্ত সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন, ততদিন তাঁহার গৃহ বা গৃহস্থালী পরম সুখ ও শান্তির কারণ হয়। কিন্তু তাহার একটু ব্যতিক্রম হইলেই সুখসম্ভোগের সমগ্র উপকরণ থাকিলেও পরিবারে মহা-অস্বস্তি মহা-অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

পরিবারে অনেক সময়ে এমন অনেক ঘটনা উপস্থিত হয় যাহা কস্মিন্‌ কেহ চিন্তাও করিতে পাবে না। অতএব তাহার প্রতীকারের উপায়ও কাহারো জানা থাকে না। গৃহপতিকে তখন ভাবিতে হয়, উপায় আবিষ্কার করিতে হয়, এবং তাহার পর তাহার প্রয়োগ করিতে হয়। যে গৃহপতি ইহা করিতে পারেন না, তাঁহার পরিবারের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

যদি কোনো ব্যাধি নূতন দেখা দেয় তবে তাহার চিকিৎসাও নূতন হইবে। এখানে পুরাতন ঔষধ প্রয়োগ করিতে গেলে হিতে বিপরীতই হইবার কথা। নূতন ঔষধ হইতেই পারে না; এ নির্বন্ধ কাহারো হইতে পারে; কিন্তু তাহা বিপদেরই জন্য, সম্পদের জন্য নহে। পূর্ব্বে যাহা ছিল না, এখনো তাহা হইবে না, অথবা পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনো ঠিক তাহাই সর্ব্বত্র হইবে, কেহ এইরূপ আগ্রহ করিয়া বসিলে তাঁহার বস্তুতত্ত্বের বিরুদ্ধে গমন করা হয়, এবং সেইজন্যই নিজেই তিনি নিজের বিনাশকে আনয়ন করেন।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেরও সম্বন্ধে এই কথাগুলি বিচার্য্য। কোনো একটি পরিবারকে যদি বড় করিয়া ধরা যায় তবে তাহাই সমাজ, ইহা অন্য কিছু নহে। যেমন গৃহের জন্য গৃহপতি আবশ্যক, তেমনি সমাজেরও জন্য সমাজপতি আবশ্যক। সমাজপতি ব্যক্তিবিশেষই না হইতে পারেন, ব্যক্তিসমষ্টিও হইতে পারেন। যিনিই হউন, ঠিক গৃহপতিরই মত ইঁহাকেও সমাজের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়। সমাজের যত দিন প্রাণ থাকে, তত দিন তাহার অভ্যুদয় দেখা যায়, তা যেমন অন্য দেশে, তেমনি এই দেশে, তেমনি এই হিন্দুসমাজেও। ইহার অন্যথা হইলেই, বলা বাহুল্য, নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়।

হিন্দুসমাজে এই অনর্থের সৃষ্টি বহুকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রোগে রোগে সে এত জীর্ণ যে, মোহ বা মূর্চ্ছা অবস্থায় সে থাকে না, এমন অল্প সময়ই সে পায়। তাই নিজের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে না, বা বুঝাইবার জন্য অন্য কেহ চেষ্টা করিলেও তাহা বিপরীত ভাবে বুঝিয়া বসে। রোগের প্রকোপে সে এমনি অচেতন।

চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য কখনো-কখনো মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে তপ্ত লৌহশলাকার দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তাহাতে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনও হিন্দু সমাজের পক্ষে অনেকটা এইরূপ কার্য্য করিয়াছে। তাহা ইহাতে একটি বিলক্ষণ চাঞ্চল্য বা বিক্ষোভ আনয়ন করিয়াছে। তাহা দ্বারা মূর্চ্ছিত সমাজে চৈতন্যের সাড়া পাওয়া গিয়াছে।' দায়াদসূত্রে যাঁহারা সমাজের অধিপতিত্বের

* সনাতন হিন্দু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ-রচিত, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১10।

দাবী রাখেন তাঁহারা, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, অন্যান্য সকলের সহিত এখন ইহার অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতীকারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন—যদিও এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিচার-পদ্ধতির দিক্ দুইটি পরস্পর বিভিন্ন। শরীরের রোগ যখন জানা গিয়াছে, এবং তাহার প্রতীকারেরও ইচ্ছা হইয়াছে, তখন, আশা করা যায়, দুই দিন আগেই হউক আর পরেই হউক, উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া যাইবে, তিনি রোগের নিদান বুঝিয়া উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে রোগীকে নীরোগ করিয়া তুলিবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় আলোচ্য পুস্তকখানিতে হিন্দুসমাজ শরীরে প্রবিষ্ট রোগের বিবিধ লক্ষণ, তাহার নিদান ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তিনি বঙ্গদেশের বহু স্থানে সম্মিলিত বহু হিন্দুসভায় এই সমস্ত কথা নিজের অভিভাষণরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার এই কথাগুলি যে বিশেষ আবশ্যক, এবং ইহা দ্বারা যে হিন্দুসমাজের বিশেষ কল্যাণ হইবে, তৎসম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক সমাজেই স্থিতিবাদী ও গতিবাদী এই দুই প্রকারের লোক দেখা যায়। ইঁহারা উভয়েই কোনো-না-কোনো রূপে উভয়ের উপকার করেন, এবং তাহা দ্বারা সমাজের উপকার হয়। গতিকে বাদ দিয়া স্থিতি, বা স্থিতিকে বাদ দিয়া গতি হয় না। সিদ্ধি ইহাদের উভয়ের সামঞ্জস্যেই। অতএব একান্তবাদী হইয়া যদি কেহ ইহাদের অন্যতরটিকে একমাত্র লক্ষ্য করিয়া চলেন তবে বিপদের সম্ভাবনা আছে, নিজের উচ্ছেদ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

এক সময়ে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো বিধান হয়, অপর সময়ে অবস্থাদি বিচার না করিয়া যদি ঐ বিধানটিই অনুসরণ করা হয় তবে তাহাতে ভাল হয় না। এক সময়ে কোনো একটি রোগীকে 'জয়মঙ্গলরস' প্রয়োগ করা হইয়াছিল, পরে যদি অন্য সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় আবার উহাই প্রয়োগ করা হয় তো তাহার ফল কখনো ভাল হয় না। সমস্ত রোগীর জন্য এক ঔষধ নহে, একেরও জন্য সমস্ত ঔষধ নহে। শিশুর খাদ্য ও যুবকের খাদ্য এক নহে। আবার শিশুই হউক, বা যুবকই হউক, কাহারো সব সময়ে একই খাদ্য নহে। শীতের পরিচ্ছদ শীতকালেই পরিধেয়, গ্রীষ্মে নহে; গ্রীষ্মেরও শীতে নহে। দেশ, কাল, পাত্র বিচার না করিয়া, কোনো কালের কোনো একটি বিধান আছে বলিয়াই তাহা যদি অনুসরণ করা যায়, তবে অনুসরণকারীর তাহাতে একটা গভীর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সেই বিধান অনুসরণের দ্বারা যাহা পাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা পাওয়া শক্ত হয়। ইহাতে মনের জড়তাই প্রকাশ পায়। যে সমাজে মনের ভাব এইরূপ থাকে কল্যাণ তাহার দুর্লভ। এইরূপ ছিল না বলিয়াই হিন্দুসমাজ একদিন উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

পরিবর্ত্তন চাই। ইচ্ছা না করিলেও ইহা আসিবে। ইহা বস্তুর স্বভাব। সাংখ্য দর্শনে একটা কথা বলা হয় যে, এক চিচ্ছক্তি ছাড়া সমস্ত বস্তুরই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হয়। আত্মার পরিবর্ত্তন হয় না, আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যে রূপ থাকে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। ইহা অবশ্যম্ভাবী, রূপ পরিবর্ত্তনেরই মধ্যে থাকে। রূপের যদি পরিবর্ত্তন না হইত, বীজ বীজ-আকারেই থাকিত, অঙ্কুর হইত না। বীজের যে আত্মা বা শক্তি তাহা ঠিক থাকে। তাহা বীজ, অঙ্কুর ও শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প-পল্লবাদির আকারে বিবিধরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। স্বর্ণ নিজে ঠিক থাকে, কিন্তু তাহার কঙ্কণ, বলয় প্রভৃতি রূপ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়। আত্মা আমাদের ঠিক থাকে, কিন্তু জন্মক্ষণ আরম্ভ করিয়া শরীর কত-কত পরিবর্ত্তনের মধ্যে চলিতে থাকে।

হিন্দুসমাজেরও তেমনি একটা কিছু আত্মা আছে। তাহা কি, এখানে আলোচ্য নহে। আচার হইতেছে তাহার বাহ্য রূপ। রূপকেই যদি আমরা আত্মার স্থানে বসাই, তবে বড় ভুল করা হয়। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অতিস্থিতিবাদীরা এইটিই করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকে যে সমাজের কল্যাণকামনা করেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই; অনেকে যে সাধুচিত্তে নিজের সাধু বিশ্বাসে চলিতেছেন তাহাতেও কোনো সংশয় নাই। এরূপ লোকের সহিত এই লেখকের পরিচয় আছে, তাঁহারা বস্তুতই শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমনো অনেক আছেন যাঁহারা সমাজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজেরই কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া চলেন, যাঁহারা পরার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল স্বার্থেরই চিন্তা করিয়া থাকেন। সমস্ত সমাজেই এইরূপ থাকে, হিন্দুসমাজেও আছে, তা যেমন পূর্ব্বে তেমনি এখনো। আমাদেরই প্রাচীন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এ কথা উল্লেখ করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যাতারা এই কথা বলিতে গিয়া কোনো সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহারা নিজ-নিজ জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে সত্যকে, ধর্ম্মের স্বরূপকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনোরূপ স্বার্থের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। ইচ্ছা হইলে, এ সম্বন্ধে কেহ শবর স্বামীর ভাষ্যের সহিত মী মাং সা দ র্শ নে র স্মৃতিপ্রামাণ্য-অধিকরণ (১. ৩. ১—৮) আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

তাই মানবজাতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার কথা জানিলেও ধরা যায় যে, অতিস্থিতিবাদীদের অনেকে এমন আছেন যাঁহারা জানিয়াই হউক, বা না জানিয়াই হউক, সমাজের স্বার্থ না দেখিয়া নিজেরই স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। গতিবাদীদের মধ্যে যে এমন লোক থাকিতে পারে না, বা নাই, তাহা নহে। তবে সংখ্যার অনুপাতে অনেক কম বলিয়াই মনে হয়।

যাহাই হউক, অতিস্থিতিবাদীদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এই যে, তাঁহারা অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে কোনো দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল মাত্র বর্ত্তমানের দিকে তাকাইয়া চলিতেছেন, কিন্তু ইহাও আংশিকভাবে, সমগ্র বর্ত্তমানকেও ইঁহারা দেখিতেছেন না। ইঁহারা সমাজের কেবলমাত্র এক শ্রেণীর লোকের ভাল-মন্দ সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবিতেছেন; কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণভাবে নহে, সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা ইঁহারা ভাবিতে পারিতেছেন না। যত ক্ষুদ্রই হউক না, কোনো একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাদ দিলে যেমন কেহ বিকলাঙ্গ হয়, পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির সুবিধা সে পায় না, তেমনি সমাজের এক দেশ বা বহু দেশ বর্জ্জন করিয়া একটিমাত্র দেশের উন্নতির ব্যবস্থা করিলে তাহা একবারেই ব্যর্থ হয়। ধরা যাউক না, সমগ্র দেহের মধ্যে না হয় মাথাটাই খুব বড় হইয়া উঠিল, আর অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুষ্ক বিশুষ্ক হইয়া পড়িল। দেহীর ইহাতে সুখ, না দুঃখ হয়? নিজের গৃহে আগুন না লাগিলেও চারিপাশের ঘরগুলিতে যদি আগুন ধরে তবে নিজেরও ঘরখানি নিরাপদ থাকে না। অতিস্থিতিবাদীরা এ কথাটি ভাবিয়া দেখিতেছেন না।

রোগীর অবস্থা যখন যেমন পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয় তখন যদি তেমনি ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া ঔষধ দেওয়া না হয়, আর বহুপূর্ব্বে ব্যবস্থাপিত ঔষধই তাহাকে পান করান যায়, তবে সে রোগীর পরিণাম যে

শোকাবহ, তাহা বলাই বাহুল্য। ঔষধের জন্য রোগী নহে, রোগীরই জন্য ঔষধ। রোগীই যদি না টিকে তো ঔষধে কি হইবে?

দেশ, কাল, অবস্থা সবই পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে, অথচ ব্যবস্থা সেই একই থাকিবে; ইহাতে কাহারো নির্ব্বন্ধ থাকিতে পারে কিন্তু তাহা জীবনের জন্য নহে, মরণের জন্য। সমাজপতি যখন এ বিষয়ে সচেতন হইয়া থাকেন, তখন তিনি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে বিলম্ব করেন না, এবং এই রূপেই তাঁহার সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুসমাজেও ইহা হইয়া আসিয়াছে। তর্কভূষণ মহাশয়ের পুস্তকে ইহার বহু উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এখানেও একটা স্থূল উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ধর্ম্মকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে দান দেওয়ার ব্যবস্থা অতিপ্রাচীন। ইহা অতিসুন্দর ব্যবস্থা, কারণ, ব্রাহ্মণকে দান দিলে তাহা দ্বারা ব্রাহ্মণের দোতালা বাড়ীও হইত না, ব্রাহ্মণীর বহুমূল্য অলঙ্কারও হইত না; সে দান সমগ্র সমাজই পাইত, সেই দানে কোনরূপে শিষ্যবর্গ ও নিজের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া, ব্রাহ্মণ যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই থাকিয়া, অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিয়া, সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ ও শান্তি চিন্তা করিয়া, নব নব জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া প্রচার করিতেন। এরূপ দানপাত্র কোথায়? মহাত্মা গান্ধীর মত দানপাত্র কোথায়? গান্ধীকে দিলে যে বিশ্বকে দেওয়া হয়। গান্ধী যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণকে দান দিবার কথা, সে এই ব্রাহ্মণ। হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির দানখণ্ডের প্রথম কয়েকখানি পৃষ্ঠ দেখিলে এ সম্বন্ধে বিশেষ জানা যাইবে। ব্রাহ্মণ যখন শ্রেষ্ঠ দানপাত্র, তখন যাহা কিছু উৎকৃষ্ট দান সমস্তই ব্রাহ্মণকে দিবার ব্যবস্থা হইল। ইহা সর্ব্ব প্রথম ব্যবস্থা, এবং অতি সুব্যবস্থা।

দিন চলিতে লাগিল। দেখা গেল ব্রাহ্মণের মধ্যে কাহারো কাহারো দান গ্রহণ করায় ক্রমশ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। দানের আকাঙ্ক্ষায় বা লোভে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের স্খলন দেখা দিয়াছে। যে জীর্ণ করিতে পারে তাহারই যেমন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, তেমনি যে ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা নিজের ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জ্জন না দেন তিনিই দান গ্রহণ করিবার অধিকারী। সমাজপতি দান গ্রহণের দোষ দেখিয়া ব্রাহ্মণকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন সামর্থ্য থাকিলেও ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন না, দান গ্রহণে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ নষ্ট হয়। (দান গ্রহণ করিয়া দাতার পক্ষপাতী হন না, এমন লোকের সংখ্যা অল্প, দান গ্রহণে দুর্ব্বল হইয়া অনেকে জানিয়া শুনিয়াও দাতার অপকার্য্য সমর্থন করেন।) ব্রাহ্মণের পক্ষে বড়-বড় দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইল; ব্রাহ্মণ সোনা লইবেন না, হাতী লইবেন না; ঘোড়া, পাল্কী প্রভৃতি যাহা যাহা মহাদান বলিয়া প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিবেন না, কারণ তাহাতে তিনি পতিত হন। ইহা পরের ব্যবস্থা, এবং অতি উত্তম ব্যবস্থা। সমাজপতি ইহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং সমাজও তাহা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

এখন যে প্রাচীনপন্থীরা নিজেকে সমাজপতি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রায়ই সমাজের দিকে তাকান না, তাকাইলেও তাহার বাহ্য বা আন্তরিক অবস্থা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না; অথবা করিলেও ব্যবস্থা করিতে পারেন না, বা করিলেও সামাজিকগণকে তাহা গ্রহণ করাইবার মত প্রভাব তাঁহাদের নাই। তাঁহারা নিজের সমাজ এখন তাঁহাদের নিকট হইতে প্রায়ই তেমন কিছু পাইতেছে না, যাহাতে ইহার তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হইতে পারে।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজে 'অস্পৃশ্যতার' কথা উঠিয়াছে। এ খুব ভাল। তন্ন-তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে তাহাতে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা আছে। আমরা মদ্যকে অস্পৃশ্য বলি, কেন-না, তাহা পান করিলে চিত্ত ও দেহ উভয়েরই ক্ষতি আছে; ইহাতে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক উভয় উন্নতির বাধা হয়। মদ্য যখন পানকারীর মত্ততা আনয়ন করে তখনই তাহা 'মদ্য' এবং সেই জন্যই 'অস্পৃশ্য' বলিয়া তাহা আমরা দূরে বর্জ্জন করি। কিন্তু সান্নিপাতিক বিকারে মদ্য জীবনী শক্তি বাড়াইয়া দেয়, সে সময়ে মদ্য 'মদ্য' নহে, এই জন্য অস্পৃশ্যও নহে। শিশু যখন মল-মূত্রে অশুচি হইয়া থাকে তখন অনেক পিতা তাহাকে স্পর্শ করিতে চান না, শিশুর মাকে ডাকিয়া বলেন, 'ওগো, তোমার ছেলেকে লইয়া যাও!' মা তাহাকে ধুইয়া-পুঁছিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া আনিয়া দিলে বাপ তখন নিজেই আদর করিয়া কোলে তুলিয়া তাহাকে আদর করেন। তাই দেখা যাইতেছে বস্তুর গুণ-দোষেই তাহা স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য হয়। ব্যক্তি-সম্বন্ধেও এইরূপ। যদি কাহারো শরীরে তেমন কোনো দুষণীয় ক্ষত বা রোগ হয়, তবে সে অস্পৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু যখন সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে তখন আর অস্পৃশ্য থাকে না। যাহারা হত্যা, মিথ্যা, চৌর্য্য, ব্যভিচার বা এইরূপ অপর কোনো দারুণ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে সমাজে তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু যে এরূপ নহে তাহাকে অস্পৃশ্য বলিবার কোনো উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। ব্যক্তিবিশেষ নিজের অসৎকার্য্যের জন্য অস্পৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু কোনো সমগ্র জাতিবিশেষ বা বর্ণবিশেষকে অস্পৃশ্য বলা যায় না। তবে যদি এমন হয় যে, সেই জাতিবিশেষ বা বর্ণবিশেষের মধ্যে প্রত্যেকটি লোক অসৎকার্য্যে লিপ্ত, তবে তাহাকেও অস্পৃশ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার যে এই অস্পৃশ্যতা, তাহা বিশেষ জাতি বলিয়া নহে, তাহার অনুষ্ঠিত কোনো অসৎকার্য্য বলিয়াই। ব্যক্তির ধর্ম্ম জাতির উপর আরোপ করিলে তাহা ঠিক হয় না।

এইরূপে দেখা যাইতেছে, অস্পৃশ্যতার কারণ অপগুণ বা অপকার্য্য। কাহারো পিতা বা পিতামহ কোনো অপকার্য্য করিয়াছিল, কিন্তু নিজে সে তাহা করে নাই, বরং নানাবিধ সৎকার্য্যই অনুষ্ঠান করে। এস্থলে পিতা বা পিতামহের অপরাধের জন্য পুত্রকেও দণ্ড দিতে হইবে? এ কোন্ ন্যায়? অপরদিকে, কাহারো পিতা-পিতামহ বহু সৎকার্য্য করিয়াছিল, কিন্তু নিজে সে সৎকার্য্যের কথা তো দূরে, বরং সর্ব্বদা অসৎকার্য্যে লিপ্ত থাকে। এখানে যদি কেবল তাহার পিতাপিতামহের কথা মনে করিয়া তাহাকে সম্মান দেওয়া হয়, তবে তাহাতেই বা কোন্ ন্যায় আছে?

ব্যক্তির দিকে না দেখিয়া সমাজ যখন বংশের দিকে অত্যধিক দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করিল, তখনই সর্ব্বনাশে আরম্ভ হইল। বংশের গুণ অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু তাহাই একমাত্র বিচার্য্য নহে। বংশের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা থাকায় ব্যক্তিগত গুণাগুণের কথা একেবারে লোপ পাইল। গুরু যে আমাদিগকে ভবসংসার তরাইয়া দিতে পারেন তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই—ঠিক যেমন চিকিৎসকে আমাদের রোগ অপনয়ন করিয়া দিতে পারেন। সে গুরু কে, তাহার লক্ষণ কি, যাঁহারা গুরুর প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন,

এবং ইহাও বুঝা যাইবে তাঁহাদের ঐ উক্তি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যখন গুরুর ব্যক্তিগত গুণাগুণের কথা একেবারে লোপ পাইল, এবং তাঁহার বংশের উপর অতিরিক্ত এবং সেই জন্যই অনুচিত শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল, তখন সেইখানেই অনর্থের সূত্রপাত হইয়া গেল। ব্যবস্থা হইল, ব্যবহার চলিল. গুরুর পুত্রও গুরু—তা এই পুত্রে গুরুর গুণসমূহ থাকুক-বা-না-ই থাকুক। অন্ধ অন্ধকে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে যে অনর্থপাত অবশ্যম্ভাবী তাহা বলাই বাহুল্য। লোকে বলিয়া থাকে "অন্ধস্যেবান্ধলগ্নস্য বিনিপাতঃ পদে পদে!"

অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে অতিস্থিতিবাদীরা বড় চঞ্চল হইয়া উঠেন; চিত্তে তাঁহাদের বড় বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাই তাঁহারা অস্পৃশ্যতার মূল কারণ দেখিতে পান না, তাঁহারা দেখেন আরোপিত কারণ। কোনো ব্যক্তি সৎকার্য্যে বা অসৎকার্য্যে লিপ্ত থাকুক. ইহা বিচার না করিয়া কেবলমাত্র জাতি দেখিয়াই তাঁহারা স্পৃশ্যতা বা অস্পৃশ্যতা নিরূপণ করিয়া ফেলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সত্য-সত্য বস্তুতত্ত্ব দেখিতে ইচ্ছা করেন তো দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের মতে যাঁহারা 'অতিসুস্পৃশ্য' তাঁহাদেরও মধ্যে অনেকে 'অতি-অস্পৃশ্য' আছেন; অপরপক্ষে যাঁহারা তাঁহাদের কাছে 'অতি-অস্পৃশ্য' তাঁহাদেরও মধ্যে অনেক 'অতিসুস্পৃশ্য' ব্যক্তি পাওয়া যাইবে। "শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে অন্য অভক্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া ভাগবতচূড়ামণি যবন শ্রীহরিদাসকে আদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধে পাত্রীয় অন্ন ভোজন করাইয়াছিলেন।" শ্রীপাদ অদ্বৈত প্রভু ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণও অব্রাহ্মণ হয়, অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হয়। ইহা না হইলে সৎ-অসৎ কার্য্য বা পাপ-পুণ্যের কোনো মানে থাকে না।

অস্পৃশ্যের দেবমন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ, ইহা উত্তম ব্যবস্থা. ইহা তো মানাই উচিত। যাহার দেহ ও মন অশুচি দেবমন্দিরে প্রবেশে সে অধিকারী নহে, প্রবেশার্থীকে পূর্ব্বে দেহ ও মন শুচি করিয়া লইতে হইবে। তবেই তাহার দেবমন্দিরে গিয়া দেবপূজা করা সার্থক হইবে। এ যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে তেমনি অব্রাহ্মণের পক্ষে। ইহাতে ভেদ করিবার কোনো যুক্তি নাই। যাঁহাদের উপরে দেব-মন্দিরের ভার আছে তাঁহারা পূজার্থীকে দেহ ও মন শুচি করিবার উপদেশ দিবেন, এবং দেখিবেন তাহা অনুষ্ঠিত হইতেছে কি-না। কেহ পূজা করিতে-না জানিলে তাঁহারা তাহাকে তাহা শিখাইয়া দিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হয়। ভগবান্ যখন জীবরূপে উচ্চ-নীচ সকলেরই মধ্যে আছেন তখন কাহারো স্পর্শে তাঁহারও অশুচি হইবার আশঙ্কা অমূলক। শুচিভাবে কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিলে তাঁহার শ্রীবিগ্রহেরও কোনো দোষের সম্ভাবনা নাই। যদি হয় তো ব্রাহ্মণেরও প্রবেশে তাহা হইবার সম্ভাবনা আছে।

যাহার একদিন ধন ছিল না, তাহার কখনো ধন হইবে না; এক দিন যাহার বিদ্যা ছিল না, পরে কখনো তাহার বিদ্যা হইবে না; নীচ চিরদিনই নীচ থাকিবে, উচ্চ হইবে না; অভক্ত চিরকাল অভক্তই থাকিবে, ভক্ত হইবে না; এ কথা কেহই বলিতে পারে না, সুযোগ-সুবিধা হইলে এ সমস্তই সম্ভব। তেমনি, যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই অস্পৃশ্যতার আন্দোলন, তাহাদিগকে যদি উপযুক্ত সাহায্য, সুযোগ, ও সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে অভিলষিত ফল না পাইবার কোনো কারণ থাকিবে না।

বুদ্ধদেব বলিতেন 'ভিক্ষুগণ, তোমরা ব্যঞ্জনশরণ হইও না, অর্থশরণ হও.' অর্থাৎ তোমরা অক্ষরকে অনুসরণ করিয়া চলিও না, অর্থকে অনুসরণ করিয়া চলিও। শাস্ত্রের অক্ষর লইয়া চলিলে ফলের প্রতি নিরাশ হইতে হয়, তাহার তাৎপর্য্যতা কি তাহাই দেখিবার বিষয়। অতিস্থিতিবাদীরা যদি ধীর-শান্তভাবে ইহাই করেন তো দেশের বহু উপকার করিতে পারিবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় নিজের 'সনাতন হিন্দু' পুস্তকে তাঁহাদের চিন্তনীয় বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়া শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমগ্র বাঙালী জাতির প্রণিধানযোগ্য। এই সময়ে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির এই সমস্ত জটিল সামাজিক সমস্যার আলোচনা সময়োচিত ও অত্যন্ত সমীচীন হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। পাঠকেরা প্রত্যেকে ইহা পাঠ করিয়া দেখুন। উদাসীন হইয়া থাকিবার আর সময় নাই।

উপহার

শ্রীশান্তা দেবী

পাড়ায় বড় হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। এতগুলা বাড়ির মাঝখানে এতগুলা মানুষের নাকের ডগার কাছে এত বড় চুরিটা হইয়া গেল। কত কালের পুরানো সব বাসিন্দা, এমন কাণ্ড ঘটিতে তাহারা জীবনে কখনও দেখে নাই। ইংরেজ কোম্পানীর আমলেও যে আবার এমন ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা কি কেহ কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিয়াছে?

অরুণাদের ত পাশেরই বাড়ি, প্রায় গায়ে গায়ে বলিলেই চলে। রাত সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত ছুটো বাড়িতেই ত প্রতিদিন চলে ঝি-চাকরদের ভাত খাওয়া, মুখ ধোয়া, পান দোক্তা চিবোনো, খড়কে দিয়া দাঁত খোঁটা, তারপর বিছানা মাদুর পাতা, গলিতে ও সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পরস্পরের কাছে সে দিন অথবা রাত্রিকার মত বিদায় লওয়া। আবার এদিকে চারটা না বাজিতেই

ঝিয়ে আলিস্যি ভাঙিয়া হাই তুলিয়া মনিবদের গালি দিতে দিতে উঠিয়া পড়ে, কারণ দুটি বাড়িতেই কুচোকাচা ত কম নাই; ভোর না হইতেই তাহাদের ফুড চাই, গরম জল চাই, জুটিলে দুধও চাই, মা'দের শেষ রাত্রির সুনিদ্রা টুকুও চাই। সঙ্গে সঙ্গে বামুন ঠাকুরদেরও সুখস্বপ্ন শেষ হয়, কারণ কোথাও বা ছোটবাবু পাঁচটায় চা চান, কোথাও বা বড়বাবু সাড়ে আটটায়ই কই মাছের ঝোল, মৌরলা মাছের অম্বল, চিংড়ি মাছের কাটলেট ও ভাত না হইলে ঠাকুরের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলেন। সুতরাং মাঝখানে মাত্র সাড়ে তিনটি ঘণ্টা ত বাড়ী নিঃঝুম হয়। এরি মধ্যে এত কাণ্ড!

আহা বেচারী স্বরূপা! গহনা কাপড় টাকাকড়ি কিছু আর রাখে নাই। হইলই বা স্বামীর বড় চাকরি, তাই বলিয়া এত কালের এত সখের সব জিনিষ, কত টাকা তাহার পিছনে যে ঢালা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কত জল্পনাকল্পনা, কত পাড়ায় পাড়ায় নমুনা সংগ্রহ করা, বাছিয়া বাছিয়া ভাল কারিগর আবিষ্কার করা, সখীদের হিংসা ফুটাইয়া তোলা, তিন ঘণ্টার ভিতর সব একেবারে বর্ত্তমান হইতে উবিয়া ইতিহাসের কোঠায় গিয়া ধামা চাপা পড়িল। ঘুমাইতে যখন গিয়াছিল, তখন হীরার আংটি, মরকতের দুল, মুক্তার শেলী, জয়পুরী এনামেলের কণ্ঠমালা, জড়োয়া তাবিজ, সোনার সাতনর, কাশ্মীরী শাল, বেনারসী কিংখাব, এমন কি, আইরিশ ও রুশীয় সোনার ব্রোচ পর্য্যন্ত সব কিছুর অধিকার-গর্ব্বে মগ্নচৈতন্য ভরপুর করিয়া আনন্দেই চোখ বুজিয়াছিল, স্বপ্নে হয়ত আরও কত চোখ-জুড়ানো শাড়ী ও চোখ-ধাঁধানো গহনাই আলমারীর তাকে তাকে কৌটায় দেরাজে সাজাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ঘুম ভাঙিয়া দেখিল কিছু নাই, অরুণার মত অতসীর মত ছয়গাছা মামুলী চুড়ি ও আটপৌরে শাড়ীজামা মাত্র সম্বল। তাহাদের যদিও বা দুইচারখানা জিনিষ এ বাক্সে সে দেরাজে মিলিতে পারে, স্বরূপার তাও নাই।

সকালে উঠিয়া চা খাইবার আগেই নজর পড়িয়াছিল আলমারীর খোলা ডালা দুইটার দিকে। স্বরূপা মনে করিয়াছিল ভুল করিয়া কাল রাত্রে বুঝি আলমারী বন্ধ না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এমন ভোলা মন ত তাহার কোনো দিন ছিল না। গহনা কাপড় সম্বন্ধে সে চিরকালই খুব হুঁসিয়ার। কোথাও বেড়াইতে গেলে কি নিমন্ত্রণে বাহির হইলে সে দুই ঘরের তিনটা আলমারীর চাবি বারবার টানিয়া পরীক্ষা করিয়া এবং ঘরের দরজার গাকড়ায় তালা লাগাইয়া তবে বাহির হয়। রাত্রি একটাতেও যদি কোনোদিন নিমন্ত্রণ হইতে ফিরে তবু গলার নেকলেস হইতে মাথার কাপড়ের ছোট ব্রোচ দুটি পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি গহনা গুণিয়া আলমারীতে না বন্ধ করিয়া সে বিছানায় বসে না।

অতসীর মত আয়না-টেবিলের উপর সোনার ঘড়ি, রূপার কাঁটা আলমারীর চাবি দিবারাত্রি ছড়াইয়া রাখা তাহার কোনো দিন অভ্যাস নাই।

অরুণাদের বাড়িভরা মানুষ, তার উপর চাকর-বাকর, মুটে, পিয়ন, ফলওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, দরজি, নাপিত, বিশ্বের সব রকম ফিরিওয়ালা এবং কারিগর বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের দোতলার বারান্দায় ব্যাগ, ঝাঁকা, পুঁটুলি মাথায় যখন তখন উঠিয়া পড়ে। অরুণার সব ক'টা দেরাজ আলমারী এবং ট্রাঙ্কের চাবিই সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এইজন্য স্বরূপা কতদিন অরুণাকে বকিয়াছে, ঠাট্টা করিয়াছে। আর সেই স্বরূপারই এমন বিস্মৃতি ঘটিল যে, গহনা কাপড়ের আলমারীর ডালা দুটা অমন ফাঁক করিয়া রাখিয়া সারারাত্রি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিল? তবু ত অরুণাদের বাড়ি টাকা-পয়সা কি গহনা চুরির কথা কখনও শোনা যায় নাই। আর বেচারী স্বরূপা! চার আনা পয়সাও কখনও ভুলিয়া তালা চাবির বাহিরে সে রাখে না; তাহারই অদৃষ্টে এমন ঘটিল!

নিজের চোখ দুটাকে তাহার নিজেরই অবিশ্বাস হইতেছিল। চোখ মুছিয়া ছুটিয়া আলমারীর কাছে গিয়া দেখিল তাকগুলা সব একেবারে খালি। স্বরূপা দুই হাত দিয়া আঁচল তুলিয়া চোখ দুটা সজোরে রগড়াইল, সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? নিজের মাথায় নিজে হাত দিল, মাথার ভিতরটা দপ দপ করিতেছে, অকারণে অকস্মাৎ সে কি পাগল হইয়া

গেল? কোনো দুর্ঘটনা ঘটিল না, কোনো দুঃখ-কষ্ট সমস্যার ছায়াও দেখিল না, হঠাৎ একরাত্রে একটা মানুষ পাগল হইয়া গেল! এমন কথা ইতিপূর্ব্বে জীবনে সে কখনও শোনে নাই। স্বরূপা খানিকক্ষণের জন্য চোখ বুজিয়া কিছু পরে আবার তাকাইল। আলমারী তেমনি শূন্য, আবার লোহার সিঁড়ির পাশের দরজাটাও খোলা।

চুরি। এই বুঝি চুরি? সর্ব্বস্ব এমন করিয়া ঘরের ভিতর হইতে চলিয়া যাইতে পারে, সে ঘরের ভিতরে থাকিতেই, এ অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। এ কল্পনাও সে কোনোদিন করে নাই। চুরির ভয়ে সাবধানতার অন্ত তাহার ছিল না। সেই সমস্ত সাবধানতাকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া কোন্ যাদুকর এমন করিয়া তাহাকে ভিখারী সাজাইয়া দিল ভাবিয়া স্বরূপা থই পাইতেছিল না। এ যেন একেবারে আরব্য উপন্যাসের যুগ; আলাদীনের দৈত্য আসিয়া তাহার গর্ব্ব, যত্ন ও মমতায় ঘেরা সমস্ত ঐশ্বর্য্য কোন্ লোভীর লোভ মিটাইতে নিঃশেষ করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি স্বরূপার ছিল না। কিন্তু তাহাকে উঠিতেই হইল। এ-বাড়িতে তাহার ভাসুর অনুরূপবাবু এবং ও-বাড়িতে বড় মেজ সেজ যতগুলি বাবু ছিলেন সকলেই শুনিলেন যে, স্বরূপার ঘরে এই রকম অদ্ভুত চুরি হইয়া গিয়াছে। বাবুরা প্রায় সমস্বরে হাঁকিয়া উঠিলেন। এক মুহূর্ত্তে দোতলার ঘর বারান্দা সিঁড়ি সদর দরজা এবং ফুটপাথ কৌতূহলী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। পাশের বাড়ির ছাদে, জানালায়, বারান্দায় সর্ব্বত্র কেবল বিস্ময় ও কৌতূহল-বিস্ফারিত চোখ জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। কোনোখানে লুকাইয়া পড়িয়া শোক করিবার জায়গা স্বরূপার ছিল না। তবু সে তাহারই মধ্যে ঘরের এক পাশে একটা চেয়ারে সাধ্যমত চুপ করিয়াই বসিয়াছিল। লোকের খোঁচায় কথার জবাব দু-একটা করিয়া তাহাকে দিতেই হইতেছিল। কারণ মানুষ ত কেবল স্বরূপার রিক্ত মূর্ত্তি ও শূন্য আলমারীটা দেখিতে আসে নাই। তাহারা এই বৈচিত্র্যহীন জগতে নূতন একটা গল্পের সন্ধানেই বেশী করিয়া আসিয়াছিল। বড় রকম একটা ডিটেক্‌টিভ গল্প এখনি শুনিতে পাইলে সকলেই খুশী হইত। কিন্তু চুরি ধরা পড়ামাত্রই গল্পটা বাঁধিয়া উঠে না এবং হৃতসর্ব্বস্ব মানুষের গল্প বানাইবার ইচ্ছা বা শক্তিও থাকে না, ইহা তাহাদের বুঝাইয়া দিবার লোক ছিল না এই যা দুঃখ।

তবু অতসী একবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরে বাপু, চুরি কেমন করে হ'ল, এত জিনিষ কি করে নিলে সবই যদি চোরে লিখে দিয়ে যাবে তবে পৃথিবীতে পুলিস পেয়াদা আছে কি করতে?"

একজন বলিল, "আহা, তবু ত কিছু জানা যায়! বাড়িতে কেউ চোরটোর ছিল?"

অতসী বলিল, "এতগুলো মানুষের মধ্যে কে যে চোর ছিল আমাকে ত কেউ বলে নি; তাহলে চুরি হবার আগেই তাকে জেলে পূরে রাখ্‌তাম।"

অনুরূপবাবু বলিলেন, "বৃথা বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে কি হবে? যাই পুলিসে খবর দিয়ে আসি গে। এ ঘরের কোনো জিনিষ কেউ নাড়াচাড়া করে না যেন। দরজা জানালা যেটা যেমন খোলা কি বন্ধ ছিল পুলিশে ঠিক তেমনি সব দেখ্‌তে চাইবে। সুতরাং সেখানেও কেউ হাত দিতে যেও না।"

জন কয়েক লাল পাগ্‌ড়ী পাহারাওয়ালা সঙ্গে করিয়া বাঙালী এক ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া হাজির হইলেন। দেখিয়াই অনেক লোক পলায়ন দিল। কেহ সাক্ষ্য দিবার ভয়ে দৌড়, কেউ বা ধরাপড়ার ভয়ে। ইন্‌স্পেক্টরবাবু একলাই তিনটা মানুষের সমান মোটা, গাড়ীর যে সিটটাতে বসিয়াছিলেন সেটা প্রায় সবটাই ভরিয়া গিয়াছিল। অনেক কষ্টে কনষ্টেবলদের হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলেন। ডাক পড়িল বাড়ীর সব চাকরবাকরদের। চাকর বেহারা উড়ে বামুন ঝি দারোয়ান কেহ বাদ গেল না। দারোগাবাবু বিপুল দেহ নাড়া দিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, "কিহে, দলে কে কে ছিলে বল না! কত করে বখরা ঠিক হয়েছে?" ভৃত্যবর্গ নুইয়া পড়িয়া জোড়হস্তে বলিল, "আজ্ঞে,—আজ্ঞে, আমরা ত কিছুই জানি না। আমরা নিমকের গোলাম।" ঝিরা সকলে এক গলা করিয়া ঘোমটা টানিয়া এ উহার গায়ের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া নীরবে

দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের বাড়ির একটা নিতান্ত ছোকরা চাকর একবার একটা পার্কার ফাউনটেন পেন চুরি করিয়া এক টাকায় বিক্রী করিতে গিয়া পুলিসের চড়-চাপড় কয়েকটা খাইয়া আসিয়াছিল। ভীড়ের ভিতর তাহাকে উঁকি মারিতে দেখিয়া একটা কনষ্টেবল তাহার কান ধরিয়া টানিয়া আনিল। ভয়ে বেচারীর কাল মুখ ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গিয়াছে। দারোগা টিটকারী দিয়া বলিল, "কি হে ব্যবসাদার, তোমার ত চোরদের সঙ্গে কারবার আছে, কে কে ঢুকেছিল বল দেখি!" ছেলেটা ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অনুরূপবাবু বলিলেন, "ওকে ছেড়ে দিন মশায়, ও নেহাৎ কচি ছেলে। এ সব কাণ্ডয় এগোবে এত বড় বুকের পাটা ওর নেই।"

দারোগা বলিল, "তবে আপনারা কাকে কাকে সন্দেহ করেন বলুন।"

অনুরূপ বলিলেন, "সন্দেহ যদি আমরাই করব তবে আপনাদের ডাক্‌লাম কেন? আমরা কাউকে সন্দেহ করি না। তবে আপনারা চারদিক দেখে শুনে জেরা করে কিছু যদি বার করতে পারেন সে আপনাদের কৃতিত্ব।"

চাকরদের বাক্স পেঁটরা তল্লাস হইল, তাদের বহু গালাগালি এবং দু-চারটা রুলের গুঁতোও দেওয়া হইল, বাড়ি ঘিরিয়া নানা জায়গায় নানা রকম চিহ্ন দেওয়া এবং খাতায় নক্সা ও নোট লওয়া হইল, কিন্তু কূলকিনারা কিছু হইবে বলিয়া মনে হইল না। দারোগা বলিলেন, "জিনিষ-পত্রের দুটো ফর্দ্দ করুন, একটা আমার চাই আর একটা আপনারা রেখে দেবেন। আজ রাতে ঘরটা অন্ধকার করে যেখানে যেমন তেমনি রেখে দেবেন। কাল একবার এসে সব ভাল করে দেখে পথঘাট সিঁড়ি গলি সব বুঝে নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, আলমারীর গা-কলটা খুলে নিয়ে যেতে চাই। কি রকম করে ওটা ভাঙা হয়েছে দেখ্‌তে হবে।"

অনুরূপ বলিলেন, আচ্ছা, আপনারা একটু বসুন, ফর্দ্দটর্দ্দ সব তৈরি করে দিচ্ছি।"

একটা পাহারাওয়ালা বলিল, "বাবুজি, বহুত হয়রানি হুয়া, থোড়া পান তামাকু মিল যানেসে···" সঙ্গে সঙ্গে সব কয়জনই দন্তবিকশিত করিয়া বাবুর মুখের দিকে তাকাইল।

অনুরূপ অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এতটাকা যখন গেল, তখন তোমাদের লোভটুকুর উপর রাগ করে আর কি হবে?"—"এই নাও বাপু পান কিনে আন' বলিয়া তিনি পকেট হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

* * *

সুরূপা অন্দরের দিকের সরু বারান্দাতে বসিয়া কোলের মেয়েটির সঙ্গে কথা বলিয়া মনটা একটু স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রথম যৌবনে তাহার কোলেও এমনি একটি পুষ্পপেলব শিশু আসিয়াছিল, সে আজ প্রায় একযুগ আগের কথা। তখন অলঙ্কারের ভারের চেয়ে তাহার কচি হাতের মধুর স্পর্শই সুরূপার অঙ্গে অধিক আনন্দের শিহরণ জাগাইত। সে শিশুর উজ্জ্বল চোখের হাসিভরা দৃষ্টির কাছে হীরার কন্তির দ্যুতি কোথায় লাগে? কিন্তু সে হাসির আলো ত ধরিয়া রাখা গেল না। বছর দশ হইয়া গেল তাহার সে নন্দিনী মার ঘর অন্ধকার করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর বহু রত্নমাণিক্যের চমক এ ঘরে দেখা দিয়াছে, কিন্তু শিশু-নয়নের প্রদীপ জ্বালিতে তাহার কোলে আর কেহ আসে নাই। সোনারূপা হীরা জহরতের আলোও কে এক ঘায়ে নিবাইয়া দিল। সুরূপার আর চোখ মেলিয়া এই বর্ণ-হীন পৃথিবীর দিকে তাকাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কে যেন একটা কালীর প্রলেপ দিয়া সমস্ত পৃথিবীটাই ধোঁয়াটে করিয়া দিয়াছে। কেবল ছোট শিশুদের মুখের হাসি মাঝে মাঝে জোনাকির আলোর মত অন্ধকারের গায়ে ফুটিয়া উঠিতেছে। আজ মনে পড়িতেছে বারো বৎসর আগের সেই হাসির ঝরণাধারা; কিন্তু পরের মেয়ের মুখের হাসিতে সে দীপ্তি দেখিবার শক্তি যে তাহার নাই। মন খুশী হইতে পারিতেছে কই? এ হাসি দেখিয়া কেন শ্রান্তি দূর হয় না?

হঠাৎ আসিয়া অনুরূপ বলিলেন, "বৌমা, তোমার গয়নাগাঁটি জিনিষপত্র সব কিছুর একটা ফর্দ্দ দিতে হবে, ওদের দরকার আছে। তোমার মনে আছে ত?"

হায় ভগবান! মনে আবার নাই? এই গহনাকাপড় সোনারূপার মধ্যেই ত সে এতকাল বাঁচিয়াছিল। এই কাপড়গুলির প্রত্যেকটি ভাঁজ তাহার পরিচিত ছিল। অপরে পাট করিয়া গুছাইয়া রাখিলে তাহার পছন্দ হইত না। কেমন যেন এলোমেলো ভাঁজ পড়িয়াছে, তাহার প্রিয় হস্তের সেবা না পাইলে তাহারা ঠিক মত পাটে পাটে বসিবে না। স্বরূপা আবার সব খুলিয়া সস্নেহ স্পর্শে তাহাদের যথাযথ ভাবে যথাস্থানে সাজাইয়া তবে স্বস্তি বোধ করিত। ইহারা কে কবে কোন্‌ক্ষণে কোন্ পথে কেমন করিয়া কাহার হাতে তাহার দরবারে আসিয়াছে, তারপর কবে কোথায় কখন তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য তাহার সঙ্গ লইয়া কত উৎসবে কত আনন্দে কতবার ঘুরিয়াছে তাও যে আজ ছবির মালার মত পরে পরে মনে আসিতেছে।

প্রথম দিন হইতে সব কথাই ত স্পষ্ট মনে পড়ে। যখন সে সাত বছরের মেয়ে তখন স্বরূপার মা তাহাকে সরু সরু ছয়গাছা অমৃতী পাকের চুড়ি পাশের বামুন বাড়ীর মেয়ের হাত হইতে খুলিয়া কিনিয়া দিয়াছিলেন। চুড়ি খুলিতে মেয়েটির হাতের মুঠির দুই পাশে গামছা বাঁধিতে হইয়াছিল, তাতেও বেচারীর হাত ছড়িয়া রক্ত পড়িয়াছিল এ কথা স্বরূপার আজও বেশ মনে আছে। রাত্রে এলোমেলো শুইয়া ছয় মাসেই সে ছয়গাছা চুড়ি যে সে বাঁকাচোরা করিয়া শেষে ভাঙিয়া বারো টুকরা করিয়া ফেলিয়াছিল তাহাও এ পর্য্যন্ত ভুলে নাই। আজও যেন দেখিতে পাইতেছে মার মুখ। এক গাছা করিয়া চুড়ি ভাঙে আর মা চোখ রাঙাইয়া বলেন, "ভাঙ্‌লি আবার এক গাছা, কি অলক্ষ্মী মেয়ে, বাবা!" সেই বারো টুকরা চুড়ি দিয়া পরের বছর মা তাহাকে বাঁশ প্যাটার্ণ বালা গড়াইয়া দিয়াছিলেন। 'ও মেয়ের যুগ্যি বাঁশ ছাড়া আর কি হবে' বলিয়া। বালা জোড়া পরশুও স্বরূপা একবার খুলিয়া দেখিয়াছিল। বারো বৎসর বয়সে একবার কলতলায় পড়িয়া গিয়া বাঁহাতের বালাটা টোল খাইয়া গিয়াছিল, আজ ষোল বৎসর তাহা তেমনি ছিল, সারিতে দিলেই স্যাকরারা ভাঙিতে চায়, তাই আর সারা হয় নাই।

ছেলেবেলায় ব্রোচ কাহাকে বলে, দুল্‌ই বা কি এ সব স্বরূপা জানিত না। মা ছিলেন সেকেলে মানুষ। ইহুদী মাকড়ী আর পালিশ পাতের ফুল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। কিন্তু মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হইতেই মেয়ের দৃষ্টি খুলিয়া গেল। সহপাঠিনীরা কত রকম সব সৌখীন গহনা পরিয়া আসে। স্বরূপা বেচারী টিনের রঙকরা-ফুল-বসানো ব্রোচ ইস্কুলে ফিরিওয়ালার কাছে কিনিয়া কোনো রকমে আধুনিক পোষাকের মর্য্যাদা রক্ষা করে। তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া বাবা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বড় একটা গহনার দোকানে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে সেদিন জীবনে সেই প্রথম অত ঝল্‌মলে গহনার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে যে কেমন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল কোনো দিন তাহা ভুলিবে না। মনটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল হাজারটার উপর। অথচ বাবা বলিলেন, "এক একটা বেছে নাও।" বাছিতে কি পারা যায়? কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা লইবে সে! অগত্যা বাবাই বাছিয়া দিলেন। কাঁধের জন্য একটা সোনার ডাঁটিতে বসানো বড় একটি মৌমাছি, গলায় মুক্তা-বসানো ধুক্‌ধুকি দেওয়া ছোট একটি বিছা চেন, কানে মুক্তা দুলানো দুল। দোকানে দাঁড়াইয়া এই সামান্য কয়টা গহনা তাহার মনে লাগে নাই। যেন না লইলেই ইহার চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু বাড়ি আসিয়া সেগুলির রূপ ও মূল্য সহস্রগুণ বাড়িয়া গেল। ওই মৌমাছির চোখের দুটি পাথর তখন দোকানের সব হীরা মোতির অপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাওয়ায় কাঁপা মৌমাছির সোনার শুঁড় দুটি যেন কারিগরের নৈপুণ্যের পরম নিদর্শন। বড়-বয়সে-পাওয়া কত সক্ষম শিল্পের বহুমূল্য কাজ তাহার মনে এই শুঁড় দুটির দেওয়া আনন্দের কণা-পরিমাণ আনন্দও সঞ্চার করিতে পারে নাই।

তারপর দিনে দিনে তাহার রত্ন-ভাণ্ডারে কত ছোটবড় রত্নই আহরিত ও সঞ্চিত হইয়াছে। সে সবের ইতিহাস ঘিরিয়াই তাহার জীবনের ইতিহাস। জীবনে যত মানুষের স্নেহ ভালবাসা বন্ধুত্ব সে পাইয়াছে, সকলেই যেন সে ভালবাসার আলো সোনারূপার বন্ধনে

বাঁধিয়া তাহার মণিকোঠায় বন্দী করিয়া দিয়া গিয়াছিল। যত বিশেষ দিনের বিশেষ আনন্দ সবই এক একটি স্বর্ণসূত্রে ধরিয়া তাহার মনে আসিয়া একটা বাসা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। যে-স্মৃতির সহিত অলঙ্কার জড়িত নাই তাহাকেও সে আর কোনো পার্থিব রূপ দিয়াই ধরিয়া রাখিয়াছিল। কত শাড়ী, কত জরি, কত রূপা পিতলের কারুকার্য্য সবই এইখানে নানা স্মৃতির মূর্ত্তি ধরিয়া পাশাপাশি দিন কাটাইয়াছিল। তাহারা আজ সকলে এক সঙ্গেই বিদায় লইয়াছে।

বিবাহের দিনের যত সুখস্মৃতি, মা বাবা, ভাই বোন মাসি পিসি আত্মীয়বন্ধু সকলের মুখ সকলের আশীর্ব্বাদ, তাহা সবই তাহার ওই হীরার কণ্ঠী, মুক্তার চুড়, সোনার তাবিজ, ঝাপটা, ঝুম্‌কো, সিঁথির সহিত সে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। হয়ত আশীর্ব্বাদের চেয়ে গহনার অস্তিত্বটাই অনেক সময় বড় হইয়া উঠিত। কিন্তু তবু শুধু গহনা বলিয়া, শুধু ঐশ্বর্য্যের একটা মাপ বলিয়াই সে ওগুলিকে দেখে নাই। তাঁহাদের অমূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ উহাদেরই ভিতর মূর্ত্তি ধরিয়া আছে এমনি একটা বিশ্বাস তাহার মনে গাঁথা ছিল। ওই ছোট বড় গহনার কোনোটিকে সে বদলায় নাই, ভাঙে নাই বা বেচে নাই। মনের মত হউক বা না হউক, যেটি যেমন ছিল ঠিক তেমনই সে রাখিয়াছিল।

স্বামীর প্রথম যৌবনের ভালবাসার একটা নেশা ছিল স্ত্রীকে এমন কাপড়, এমন গহনা প্রত্যেক স্মরণীয় দিনে দিবে যাহা আশেপাশের বাড়ির কোনো বউ ঝি কখনও পরে নাই। কোথা হইতে সে নমুনা সংগ্রহ করিত, কোথা হইতে গড়াইত তাহা কাহাকেও জানিতে দিত না, এমন কি সুরূপাকেও না; পাছে আর কেহ নকল করিয়া বসে। ইহা ছিল সুরূপার স্বামীর একটা পরম গর্ব্ব ও অহঙ্কারের বিষয়। কেহ নমুনা চাহিলে সুরূপা বলিত, "উনি বড় রাগ করবেন ভাই, তোমরা এইখানে দেখে যা পার করিয়ে নিও।" মেয়েরা আড়ালে বলিত, "বাবা, এত দেমাক্ আবার ভাল না। আমরা কি আর মানুষ নয়, না আমাদের গায়ে ওঁর অমরাবতীর অলঙ্কার উঠ্‌লে কিছু মহাপাপ হয়ে যাবে?"

ছোটবড় নূতন পুরাতন ভাঙা ছেঁড়া প্রতিটি জিনিষের স্মৃতির ভিতর হইতে কত বিগত দিনের সুখ-শিহরণ যেন বাহির হইয়া আসিয়া সুরূপাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। আজ এক দিনে সে জীবনের বিশ একুশ বছরের সুখ-সৌভাগ্যের তীর্থগুলির উপর চোখ বুলাইয়া আসিল। সে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিবার আলোকগুলি তাহার চিরদিনের মতই নিবিয়া গেল কি-না কে জানে?

পুলিসের লোক গহনা কাপড় রূপার বাসন ইত্যাদির ফর্দ্দ লইয়া এবং আর একটা ফর্দ্দে সহি দিয়া চলিয়া গেল।

* * *

সুরূপার স্বামী বাড়ি ছিলেন না। ছুটিতে বিদেশে গিয়াছিলেন, কাজও ছিল এবং বেড়ানোরও সখ। এমন অবস্থায় স্বামীকে এই দুঃসংবাদটা দিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। বাড়িতে ফিরিয়া যা হইয়াছে সবই ত দেখিবেন, মিথ্যা আগে হইতে মানুষকে কষ্ট দিয়া লাভ কি?

পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। অরুণা বলিল, "ভাই, পাঁচ ছ'দিন ত হয়ে গেল। এখনও কোনো কূলকিনারা হ'ল না। বছরকার দিনে এয়োস্ত্রী মানুষ এমনিধারা করে মানুষের সাম্‌নে কি করে বেরোবি? খবর দে না সেখানে একটু, যেন সব দিক্ সাজিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে।"

সুরূপা বলিল, "সে হয় না ভাই। রেখেঢেকে আমি লিখ্‌তে জানি না, কিছু লিখ্‌তে গেলেই আমার সব বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে ওদিক্ দিয়ে আমার না যাওয়াই ভাল। প্রতিবারই ত কিছু আসে, তাইতেই আমার চল্‌বে। আর যদি নিতান্ত বিধাতা সদয় হন ত সবই ফিরে পাব।"

বড়-মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, তুই এখনও আশা রাখিস্? আমার ত একটা আধলা হারালে কখনও ফিরে পাই না।"

অরুণা বলিল, "আধলা সহজেই যায়, কিন্তু সোনাদানা

লক্ষ্মী, গেরস্তর হারাতে নেই। আমি রেলগাড়ীতে অচেনা ট্যাক্সিতে জিনিষ হারিয়েও পেয়েছি।"

বড়-যা বলিলেন, "কিসে আর কিসে? গলাটা কাটেনি এই চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি, আবার জিনিষ ফিরে পাবে! একেবারে সাক্ষাৎ ডাকাতি, একে কি হারানো বলে?"

সাত দিনের দিন পুলিস হইতে খবর আসিল কতক চোরাই মাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের জিনিষের সহিত মিলে কিনা দেখিয়া যাইতে হইবে।

স্বরূপার বড়-জা গলায় আঁচল দিয়া জোড়হস্তে মা দুর্গাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "হে মা দুর্গা, জোড়াপাঁঠা দেব মা, এ যাত্রা যেন সফল হয়।" স্বরূপা মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে মানত করিল যদি সব ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে গায়ে যৎসামান্য যা অলঙ্কার আছে তা মা'র পূজায় ব্যয় করিবে।

অনুরূপবাবু বাড়ির একটি বৃদ্ধা আত্মীয়াকে সঙ্গে করিয়া রওনা হইলেন। স্বরূপা ত থানায় যাইবে না, কাজেই গহনা দেখিয়া চিনিতে পারিবে এমন একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকা চাই। স্বরূপা এই বুড়ী পিসিমাকেই প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল।

গহনা বাহির হইল, হিন্দুস্থানী ঢঙের রূপার পৈছা, সোনার ফাঁদ নথুনি, নাকের বেশর, পায়ের গোছাভরা মল ইত্যাদি। দেখিয়া পিসিমা, 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, "মাগো মা, কোন্ মেড়োনির গায়ের তেলকালীমাখা যত গয়না ঘাঁট্‌তে আমায় টেনে নিয়ে এলে?"

দ্বিতীয় আর একদিন অনুরূপ একা আসিয়া কোন একটি সাত বছরের খুকীর কোমরের বিছা, হাতের রুলি ও মাথার ফুলচিরুণী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গেলেন।

যাক্, আশা ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো। যা গিয়াছে তাহার মায়া করিয়া আর কি হইবে?

* * *

স্বরূপা বসিয়া পূজার দিন গুণিতেছিল আর ভাবিতেছিল এবার কিছু একটা ছুতা করিয়া সে পূজার কয়'দিন গেঁয়োখালিতে তাহার খুড়তুতো বোনের বাড়ি কাটাইয়া আসিবে। তাহা হইলে নিরাভরণ বেশে আর দশজনের চোখের সম্মুখে তাহাকে পড়িতে হইবে না।

ছোট একটি ছেলে একখানা চিঠি হাতে আর তিন চারজনের আগে আগে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, "কাকীমা, তোমার চিঠি। আমি সকলের আগে এনেছি।"

বাকি কয়জন চীৎকার করিয়া উঠিল, 'আমিও দেব।'

সকলের হাতে চিঠিখানা একবার করিয়া দিতে হইল। প্রত্যেকেই 'এই নাও' বলিয়া স্বরূপাকে ফিরাইয়া দিল। সকলেরই দেওয়া হইল।

ছেলেদের খেলা এক মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়া গেল। তাহারা আবার নূতন একটা কিছুর অন্বেষণে অদৃশ্য হইয়া গেল।

স্বরূপার স্বামী লিখিয়াছে, "এবার পূজোয় কি উপহার বল দেখি? তুমি কিছুতেই বল্‌তে পারবে না। তোমার হীরার নেক্‌লেসের সঙ্গে মানাবে, রুবির চুড়ির সঙ্গেও মানাবে, পান্নার দুলের সঙ্গেও বেমানান হবে না। এমন জিনিষ ভাব্‌তে পার? কত তার দাম পড়েছে বল্‌ব না। কিন্তু তুমি একদিন বল্‌বে তোমার সমস্ত গহনার মোট দামের চেয়েও তার দাম বেশী। কাল সকালে তুমি সেটি পাবে।"

স্বরূপা ভাবিল অতি তুচ্ছ উপহারের দামও ত এখন তাহার সমস্ত অলঙ্কারের চেয়ে বেশী। কিন্তু স্বামী ত তা জানেন না। তবে কি মহামূল্য রত্ন তাহার জন্য আসিল? স্বামী কি সন্ধান করিয়া সমস্ত অলঙ্কার উদ্ধার করিয়া পাঠাইয়াছেন? তাহা কি একেবারেই অসম্ভব? তবে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমা বলিতে হইবে। একটা তিরস্কার নাই, অনুযোগ নাই উপদেশ নাই, কেবল সাদর উপহারের অর্ঘ্য। স্বরূপা চিঠির কথা কাহাকেও কিছু বলিল না।

পরদিন সকালেই বাহির বাড়িতে একটা গোলমাল শোনা গেল। কি একটা জিনিষ লইয়া চাকর-বাকর সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। একজন বলিতেছে "ওরে, ছোটবৌমাকে আগে খবর দে।" আর একজন বলিতেছে, "সাত তাড়াতাড়ি যেখানে সেখানে টেনে

তুলিস্ না। ও সব জিনিষের তোরা কি বুঝিস্? বড়বাবুকেই না হয় বল্।" দরোয়ান বলিল, "ইয়ে লোগ বহুত চিল্লাতা হ্যায়, জল্‌দি করনা চাহি।"

স্বরূপা গোলমাল শুনিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া দেখিতে গেল। নিশ্চয় কোনো বড় মণিকার কি স্বর্ণকার লোক সঙ্গে আসিয়াছে তাহার স্বামীর বহুমূল্য উপহার সরবরাহ করিতে। বোকা চাকরেরা তাই লইয়া হট্টগোল বাধাইয়া দিয়াছে। বৌমাকে ডাকা উচিত কি বাবুকে তাহা স্থির করিতেই কলহ বাধিয়া গিয়াছে। স্বরূপা নিজেই জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে, এত চেঁচামেচি কিসের?"

লাখুয়া বলিল, "এই যে মা, এই এরা বড় গোলমাল করছে। কি কোম্পানী থেকে যেন লোক এসেছে। বাবু না-কি ওদের বাক্স নিয়ে আস্‌তে বলেছিলেন।"

স্বরূপা বলিল, "বাক্স আবার কিসের?"

একটা নীলকুর্ত্তা পরা কুলী হাসিয়া বলিল, "বহুত ভারি বাকস্ মাজি, গহনা কো বাকস্।"

স্বরূপা বিস্মিত হইয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল। আর একটা লোক বোধ হয় চাপরাশি, তাহার হাতে একটা জিনিষ সরবরাহের ছাপা কাগজ দিল—গড্‌রাজ কোম্পানীর একটি লোহার সিন্দুক,—নিরাপদে গহনা রাখিবার জন্য। সিন্দুকটি ছোট, দেয়াল কাটিয়া সেখানে বসাইয়া দিলে আর কাহারও সাধ্য নাই কিছু করে।

শরদাগমে

শ্রীগোপাললাল দে

শরতের আলো পরতে পরতে দরদে বোনা,
ঝিকিমিকি করে সতেজ সবুজ পাতার ফাঁকে,
হাওয়ায় হাওয়ায়-তন্দ্রা পাওয়ায় আঁখির কোণা,
তবু চেয়ে থাকে কিসের আশায় পথের বাঁকে।

ত্রিভুবন বসে পথ-পাশে পেয়ে আসার আশা,
তাহারই স্বপন ঘুরে ফিরে দেখি ঘুমের কূলে,
যত কিছু কথা বলিবারে চাই সে সবই ভাষা,
ঘুরে ফিরে শুধু তারই কথা বলে মনের ভুলে।

অশথ পাতায় বায়ু ঝিরি ঝিরি ঝরিয়া পড়ে,
ডালিমের ডালে তরুলতা কুঁড়ি মেলিছে আঁখি,
কিষণ-কলির ফুলদল অলি চরণে নড়ে,
নারিকেল শাখে হাওয়া লেগে যেন উড়িছে পাখী।

কাঁঠালি চাঁপার কুঞ্জের ছায়ে টগর শাখে,
গোপনে আপনি ফুটিয়া টুটিছে কুসুম মালা,
সাঁঝ না হ'তেই শশা ও ঝিঞ্জের বেড়ার ফাঁকে,
ফুটি উঠে শত সৌদামিনীর বরণ জ্বালা।

ভরা সরোবর পরে লীলাময়ী হেমাম্ভোজে,
পবন-বিধৃত কণ্টকী কেয়া খুঁজিছে সাড়া,
কেকা কলরব লুটায় হাওয়ায় দেয়ার খোঁজে,
ধানের কাণেতে বাঁশরী বাজায় লক্ষ্মী-ছাড়া।

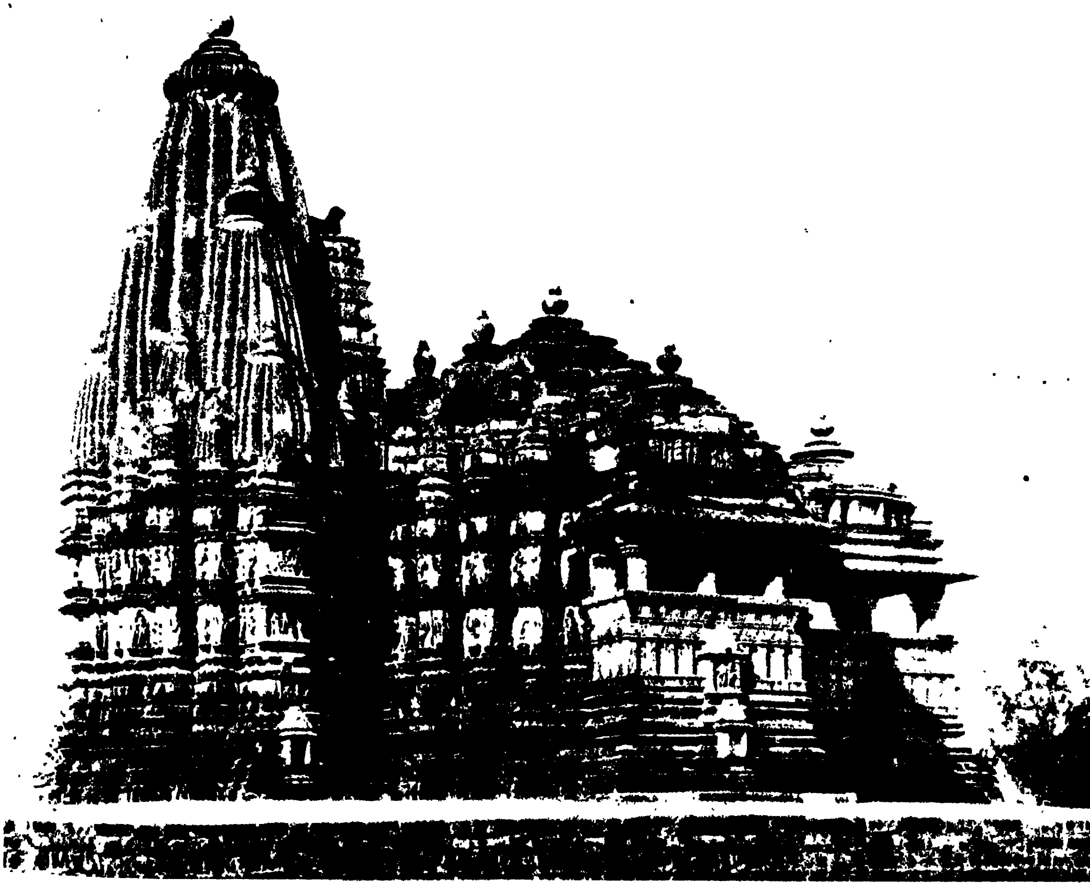
পথে যেতে দেখি বেগুনী রঙের জমির গায়ে,
সাচ্চা জরির চুমকি বসানো ওড়না পাশে,
বিম্ব অধরা হরিণ-নয়না প্রেমের ছায়ে;
নীল অম্বরে কলঙ্কী চাঁদ যেন বা হাসে!

মনে বনে নভে এত যে ইসারা, ইহারও পরে,
আগমনী বাণী পাইনি এখনও কেমনে বলি,
প্রদীপ জ্বলিছে আলিপনে ধূপ-গন্ধী ঘরে,
শুভ সমাচার বহিয়া আনিছে মরমী অলি।

'খজুরাহা'

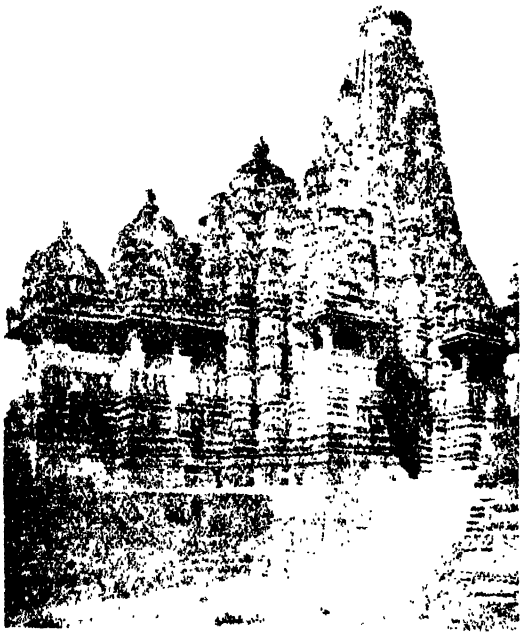
স্বর্গীয় কৃষ্ণবলদেব বর্ম্মা

গুপ্ত সম্রাটদিগের যুগে "জীজভুক্তি" নামে খ্যাত এবং বর্ত্তমানকালে বুন্দেলখণ্ড নামে পরিচিত, প্রাচীন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "যজুর্হোতি" দেশে খর্জ্জুরবাহ নামক প্রসিদ্ধ নগর ও তীর্থস্থান ছিল। এই নগর এখন ছত্রপুর রাজ্যের রাজধানী ছত্রপুর হইতে সাতাশ মাইল পূর্ব্বে, পান্না রাজধানী হইতে পঁচিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং কেন্ নদী হইতে আট মাইল পশ্চিমে স্থিত। জি-আই-পি রেলওয়ের ঝাঁসী-মাণিকপুর শাখার হরিপালপুর অথবা মহোবা ষ্টেশন এবং ই-আই রেলওয়ের এলাহাবাদ-জব্বলপুর শাখার সতনা ষ্টেশন খজুরাহা যাইবার পথ। ইহার মধ্যে হরিপালপুর দিয়া যাওয়াই সুবিধা, কেন-না, ঐ ষ্টেশনে ভাড়ার মোটর সর্ব্বদাই মজুত থাকে। পান্না হইতে যে পথ নৌগাঁও গিয়াছে তাহার উপর বমীঠা নামে গ্রাম ও পুলিশ চৌকী আছে। বমীঠা হইতে উত্তরমুখে এক পাকা রাস্তা গিয়াছে। তাহার উপর বমীঠা হইতে সাত মাইল উত্তরে "খজুরাহা"র বর্ত্তমান স্থিতি।



'চিত্রগুপ্তের শিব মন্দির—খজুরাহো'

এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ তীর্থ ও বৈভবশালী নগর ছিল। গ্রীক টলেমীর ভূগোলে বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড 'সুন্দরাবতী" নামে বর্ণিত আছে এবং ঐ



কন্দরিয়া মহাদেব মন্দির

দেশের "তামসীস্", "কুরাপোরিনা", "এস্পালাথ্রা", নন্দনগর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ নগরের বর্ণনা আছে। আধুনিক কালঞ্জরই টলেমীর তামসীস্ (Tamsis), কেন-না, বৈদিক সাহিত্যে কালঞ্জর দুর্গ 'তাপসস্থান" নামে খ্যাত। কালঞ্জর পৌরাণিক যুগেও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল এবং উহা নবম উখর মধ্যে গণিত হইত। যথা—

রেণুকঃ শূকরঃ কাশী কালীকাল বটেশ্বরৌঃ।
কালঞ্জর মহাকালঃ উখরঃ নব মোক্ষদাঃ॥

মহাভারতে কালঞ্জরের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং কলচুরি, চন্দেল এবং মুসলমানী ইতিহাসেও ইহার খ্যাতি আছে। ব্রিটিশ যুগেও কালঞ্জর দুর্গের জন্য রোমাঞ্চকর রক্তপাত হইয়াছিল।

কুরাপোরিনা (Kuraporina) খর্জ্জুরপুরের টলেমীকৃত রূপান্তর। চৈনীক পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার বর্ণনা আছে। উক্ত চৈনীক যাত্রী ৬৪১ খৃঃ ভারতে আগমন করেন। "জাজাকভুক্তি"র রূপান্তরে জুঝৌতি নামক প্রদেশকে তিনি "চি-চি-তো" বলিয়া লিখিয়াছেন এবং উহার রাজধানী খজুরাহার পরিধি ১৬ লি অর্থাৎ ২½ মাইলের অধিক বলিয়া গিয়াছেন। হুয়েন্থসাং যখন এই নগর দর্শন করেন তখন এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ও পৌরাণিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান চলিতেছিল। তিনি খজুরাহা-নিবাসিগণকে প্রায় অবৌদ্ধ বলিয়াছেন। ঐ স্থানের বৌদ্ধবিহার সকল তখন অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং শ্রমণ ভিক্ষু ও স্থবিরের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মমতের দ্বাদশ মন্দির তখন ওখানে ছিল, যাহাতে সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ পূজন পাঠে নিরত থাকিতেন। এই দেশের নৃপতি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের সমভাবে আদর করিতেন। উঁহার শ্রদ্ধা বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের উপরই ছিল।



কালী মন্দির

হুয়েন্থসাং এই প্রদেশকে বিশেষ উর্ব্বর এবং শ্রীসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। খজুরাহা ঐ সময়ে বিদ্যাপীঠ

ছিল, দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞানপিপাসু এখানে আসিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেন। দেশ ধনধান্যে পূর্ণ ছিল, জলাশয়ের বাহুল্য ছিল। এই কারণে এই স্থানের উর্ব্বরতা



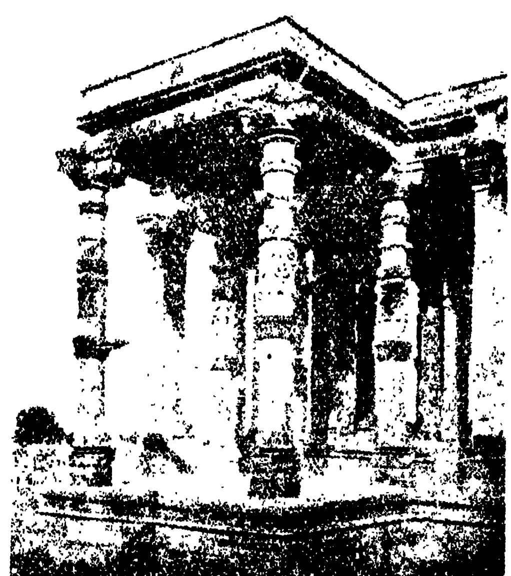
নাগ ও নাগিনী

বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে সর্ব্বদা সুখশান্তি বিরাজ করিত।

হ্যুয়েন্‌সাং-এর পর মহমুদ গজনবীর সাথী অবু রৈহা এই স্থান ১০২২ খৃঃ দর্শন করেন। ইহার নাম তিনি "কজুরাহা" লিখিয়া গিয়াছেন এবং উহাকে জুঝৌতীর রাজধানী বলিয়াছেন। এই স্থানের এক বিস্তৃত তড়াগের বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, উহা লম্বে প্রায় এক মাইল ও চওড়ায় ½ মাইল ছিল ও তাহার তটে অনেক মন্দির ছিল।

১৩৫৬ খৃঃ ইব্‌ন্ বতুতা এই নগর দেখিয়াছিলেন এবং ইহার নাম খজুরা বলিয়া লিখেন। এই মুসলমান ঐতিহাসিক এখানে বিশ্বমোহন দেবালয়, জলাশয়, বহু-সংখ্যক বিদ্যামন্দির ও সাধনাশ্রম দেখেন এবং ঐ সকল আশ্রমে জটাধারী যোগীজনকে দেখিয়া যান। এই সকল তপস্বী বিশ্বপ্রেমী ছিলেন, তাঁহারা জাত পংক্তি এবং স্বধর্ম্ম বিধর্ম্ম ইত্যাদি বিচার হইতে পৃথক থাকিতেন। বতুতার সময়ে উক্ত মহানুভবদিগের আশ্রমে অনেক মুসলমান জিজ্ঞাসু বিদ্যালাভ ও যোগাভ্যাস করিতেন। এই মহাপুরুষগণ সংসারের সকলকেই জাতিনির্ব্বিশেষে আপনার পারমার্থিক সম্পত্তি দান করিতেন। দান, দয়া এবং প্রেম ঐ সকল সিদ্ধাশ্রমে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিত।

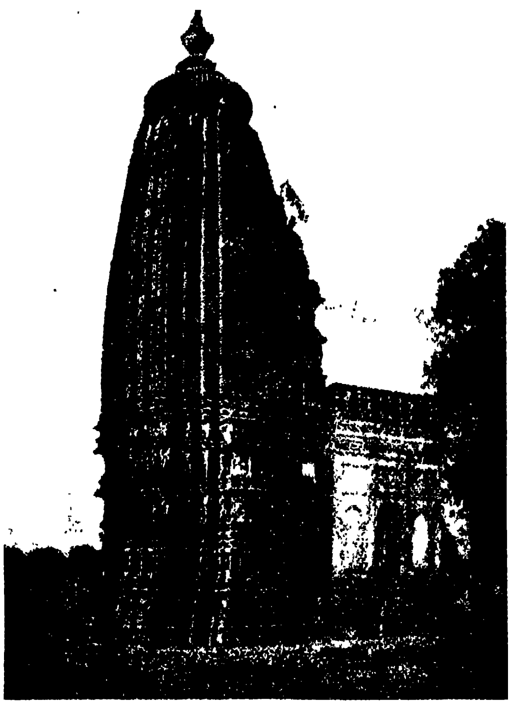
চন্দেল বংশের প্রভাবশালী রাজকবি- যিনি চন্দ কবি নামে প্রসিদ্ধ—মহোবাখণ্ডনাম কাব্যে খজুরাহের সবিস্তৃত বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। এই চন্দ কবি ও "পৃথ্বীরাজ রায়সৌ" মহাকাব্য রচয়িতা চন্দবরদাই কবি পৃথক ব্যক্তি। ইনি খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর খজুরাহের বর্ণনা করিয়াছেন এবং উঁহার লেখায় ইহা প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্রাত্রেয়ি বংশের উদ্ভবের বহু পূর্ব্ব কাল হইতে খজুরাহা এক শ্রীসম্পন্ন ও প্রভাবশালী নগর



ঘণ্টাই মন্দির

ছিল। যে "মহাভাগে হেমবতীর" গর্ভে চন্দ্রাত্রেয়ি (চন্দেল) বংশের প্রথম পুরুষ শ্রীচন্দ্রবর্মা (চন্দ্রব্রহ্ম) জন্মগ্রহণ

করেন, তিনি কাশী হইতে আসিয়া প্রথমে কর্ণবতী (কেন্) নদীতীরে তপস্যা এবং তাহার পর খর্জ্জুরপুরে যাইয়া সেই স্থানের ভূম্যধিকারীর প্রাসাদে পুত্ররত্ন প্রসব করেন এবং পুত্র



পার্শ্বনাথ মন্দির

ষোড়শবর্ষায়ু প্রাপ্ত হইবার পর তথায় ভাণ্ডব যজ্ঞ করেন, ইহাও উক্ত পুস্তকে পাওয়া যায়। ঐ ভাণ্ডব যজ্ঞের ৮৪ বেদী খজুরাহের মন্দির সমূহ, যাহার মধ্যে অনেকগুলি কালের বজ্রপ্রহারে বিনষ্ট বা বিনষ্ট প্রায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে চল্লিশটি এখনও জীর্ণ বা ভগ্নপ্রায় হইয়া রহিয়াছে তাহাদের বিরাট আকার, নির্ম্মাণকলা এবং অনুপম কারুবৈচিত্র্য দেখিয়া কলাবিদ্‌গণ আশ্চর্য্যান্বিত হন। ভারতের অন্য কোনও স্থলে এতগুলি বিশালকায় এবং শিল্পগুণসম্পন্ন মন্দির একত্রে নাই।

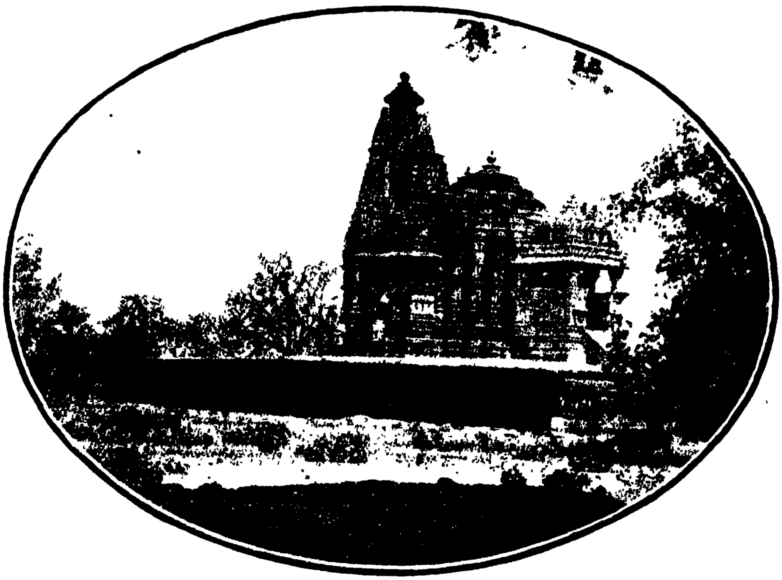
খজুরাহের মন্দির সকল শিল্পশাস্ত্র অনুসারে নির্ম্মিত এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলি মন্দিরই পঞ্চাঙ্গে সম্পূর্ণ। ঐগুলি আর্য্য-শিল্পের মূর্ত্ত উদাহরণ এবং উহাতে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের জাজ্জ্বল্যমান চিত্র পাওয়া যায়। ঐগুলিতে আমাদের পূর্ব্বকালের গৌরব, মহত্ত্ব এবং বৈভবের অক্ষয় স্মৃতি নিহিত রহিয়াছে। যশোবর্ম্মা ধংগদেব, কীর্ত্তিবর্ম্মা, মদনবর্ম্মা ও অন্য নরেশ-গণের উৎকর্ষকাল ইহারা দেখিয়াছে—যখন তাঁহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী সমগ্র ভারত নিনাদিত করিয়া ফিরিত। আবার চন্দেল বংশের দুর্দ্দিনও এই খজুরাহার মন্দিরসমূহের সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। অত্যাচারী অর্থ-পিশাচ মহমুদ গজনবী ও অন্যান্য ধর্ম্মান্ধ বিজেতার হস্তে প্রজাহত্যা, সম্পদলুণ্ঠন ও ধর্ম্মস্থানের দুর্গতিও ইহারা দেখিয়াছে। ১২০০ খৃঃ চন্দেল রাজ্যের প্রধান নগর কালিঞ্জরে প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং পঞ্চাশ হাজার স্ত্রীপুরুষ ও শিশু বন্দী অবস্থায় ক্রীতদাসত্বে বিক্রীত হয়। পৃথিবী নিরপরাধের রক্তে রক্তিম হইয়া যায় এবং হিন্দুধর্ম্মনাশের যৎপরোনাস্তি চেষ্টা হয়। প্রজাদিগের সম্পত্তি লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিক্ষেপ, মন্দির ও মূর্ত্তি ধ্বংস ইত্যাদি অত্যাচারে এই নন্দনকানন শ্মশানে পরিণত হয়। কেবলমাত্র এই পর্ব্বতাকার বিশাল



খজুরাহা বিচিত্রশালার দ্বার

মন্দিররাজি বিজেতার অপারগতায় ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইহাদের অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে ঐ বর্ব্বরদিগের হৃদয় টলিয়াছিল কিংবা এই স্থলে বীরগণের

পরাক্রমে উহারা মন্দির ধ্বংসের পূর্ব্বেই লুঠতরাজ করিয়া পলাইয়া যায়। কোন্‌টি রক্ষা পাইবার কারণ তাহা কেহ জানে না।



বিশ্বনাথ মন্দির

প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত পাহিল্ল নামক ব্যক্তির লিপি আছে। উক্ত লেখ সংবৎ ১০১১ বৈশাখ সুদি সপ্তমী সোমবারে লিখিত হয়। ইহাতে জিনদেবের মন্দিরের ব্যয়ের জন্য পাহিল্ল কর্তৃক বহু বাটিকা দানের উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভব যে, এই রূপে প্রদত্ত প্রাচীন কালে বিখ্যাত কোনও খর্জ্জুর বাটিকা হইতে এই স্থানের নামের উৎপত্তি হয় এবং এইরূপ হওয়ার আরও কারণ এই যে, বুন্দেলখণ্ডে খর্জ্জুর বা তালের বিশেষ বাহুল্য নাই। সুতরাং অসাধারণ কোনও বৃক্ষের কুঞ্জ বা বাটিকা হইতে সেই স্থানের নামকরণ হওয়া স্বাভাবিক। আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, অতি প্রাচীন কালেও এই স্থানের পুণ্যময় তীর্থ বলিয়া খ্যাতি ছিল; যেমন

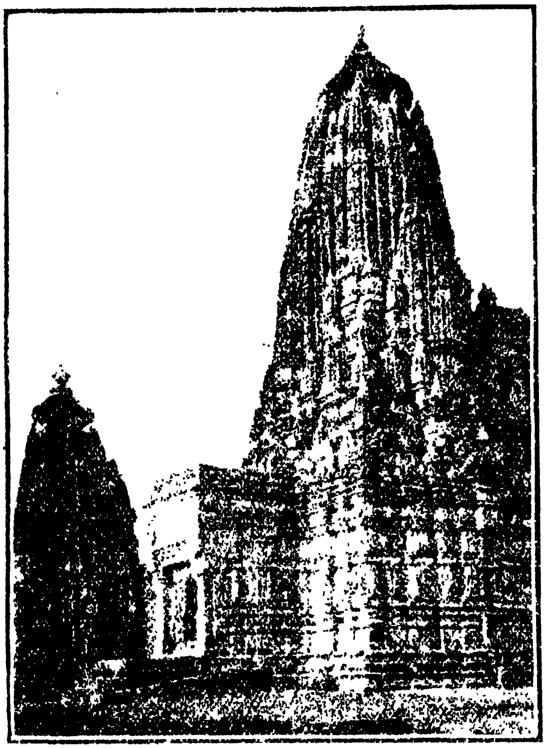
ইতিহাসকারের লেখায় পাওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে খজুরাহের চতুর্দ্দিকে দুর্গপ্রাকার ছিল। নগরের মুখ্য দ্বারের দুইপার্শ্বে স্বর্ণময় খর্জ্জূরবৃক্ষ স্থাপিত ছিল, যে কারণে ইহার নাম খর্জ্জূরবাহ অথবা খজুরপুর হয়। কিন্তু এই কথা মনোকল্পিত বলিয়া মনে হয়, কেন-না আমি বিশেষ যত্নের সহিত খজুরাহের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সেই প্রকারের ভিত বা বুনিয়াদের কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাই নাই। খজুরাহের চিহ্ন কুঠারনালার অন্যপারে জিটকরী গ্রাম পর্য্যন্ত আছে, সুতরাং এই প্রাকার (কোট) সাত আট মাইল পরিধির হওয়া উচিত। এইরূপ বৃহৎ প্রাকারের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হওয়া সম্ভব নহে। চন্দেল রাজাদিগের শিলালেখেও এই কোট ও স্বর্ণময় খর্জ্জূর বৃক্ষের উল্লেখ নাই। মনে হয় এই স্থানে কোন সময়ে খর্জ্জূর বৃক্ষের বাহুল্য ছিল, অথবা কোন বিশেষ খর্জ্জুর বাথিকা (বাটিকা) ছিল, যাহার দরুণ এই স্থলের পরিচয় খর্জ্জূর দ্বারা দেওয়া হয়।

খজুরাহাতে এক জৈন মন্দিরে মহারাজ ধংগদেবের



গণেশ

কালঞ্জর পর্ব্বতের ছিল। বিভবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তপোভূমির রূপান্তর ঘটে। কুটীরের স্থলে সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হয়, জলাশয় গুম্ফা ও ঝরণার



নেমিনাথ মন্দির

নৈসর্গিক রূপ শিল্পীর কৌশলে পরিবর্ত্তিত হয়। কোথাও দ্বার, কোথাও তোরণ ইত্যাদি স্থাপিত হয় এবং দাতা বা নির্ম্মাতার নাম তাহার উপর খোদিত হয়। ইহার দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের নির্ণয় সুকঠিন হইয়া যায়। প্রাচীনতম ইতিহাস লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, যদি বা কোথাও তাহার শেষ চিহ্ন থাকে তবে তাহার পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য।

খজুরাহার দেবালয় পঞ্চ শ্রেণীর, যথা—শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও জৈন। এই সকল মন্দির শিব-সাগর তটে, খর্জ্জুর সাগর (নিনৌরা তাল) তটে খজুরাহা গ্রামের ভিতর ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, কুরার নালার পাড়ে এবং জটকরী গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও বিহারের ভগ্নাবশেষ টিলা-রূপে আছে। পৌরাণিক মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমস্থ ভূমিখণ্ডে বহুদূর পর্য্যন্ত ভগ্ন স্তূপ ছড়াইয়া আছে। সমস্ত দেখিতে হইলে সাত আট মাইল ঘুরিতে হয়।

অধিকাংশ মন্দিরের অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পুরাতত্ত্বপ্রেমিক লর্ড কার্জ্জনের কৃপায় ইহাদের সংস্কার সম্ভব হয়। উপরন্তু মহারাজ শ্রীবিশ্বনাথ সিংহজু দেব বাহাদুর নিজরাজ্যান্তর্গত এই প্রাচীন আর্য্য-কীর্ত্তির উদ্ধারাভিলাষী হন এবং পণ্ডিত শ্যামবিহারী মিশ্র ও পণ্ডিত শুকদেববিহারী মিশ্র, এই ইতিহাসবিদ্ সুধীদ্বয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং লর্ড কার্জ্জনের সহায়তায় কার্য্যোদ্ধার সহজ হইয়া যায়।

প্রথমে পান্না রাজ্যের ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মৈনলী এই কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার ইতিহাস বা এই প্রকার জীর্ণোদ্ধার কার্য্য, দুই বিষয়েই কিছু মাত্র



বিষ্ণু মূর্ত্তি

জ্ঞান ছিল না। পরে ছত্রপুর-অধিপতি এই কার্য্য পুরাতত্ত্ববিভাগের সুযোগ্য বিদ্বান ভঁবরলালজী ধাম

দ্বারা করান। মহারাজা ছত্রপুর মহাজ্ঞানী ভোজরাজের বংশধর। এই প্রধান কীর্ত্তি সকলের উদ্ধার করাইয়া তিনি বংশের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন।

খজুরাহে সহস্রাধিক প্রাচীন চিহ্ন রহিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৩৪টি প্রধান ঃ—

১। চৌষট্টি যোগিন মন্দির, ২। গণেশ মন্দির, ৩। কেন্দরিয়া মহাদেব মন্দির, ৪। শ্রীজগদম্বাজী মন্দির, ৫। রাম-মন্দির, ৬। শ্রীবিশ্বনাথজীর মন্দির, ৭। নন্দিগণের মন্দির, ৮। শ্রীপার্ব্বতী মন্দির, ৯। চতুর্ভুজ মন্দির, ১০। বরাহ মন্দির, ১১। শ্রীমহাদেবজীর মন্দির, ১২। শ্রীদেবজীর মন্দির, ১৩। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মন্দির (মনঙ্গ), ১৪। একটি বৌদ্ধ বাহিরের খণ্ড, ১৫। শতধারা, ১৬। বৎসকা টৌরিয়া, ১৭। বামন মন্দির, ১৮। লক্ষ্মণজীকা মন্দির, ১৯। হনুমানজীকা মন্দির, ২০। ব্রহ্মজীকা মন্দির, ২১। ঘণ্টাই মন্দির, ২২। শ্রীপার্শ্বনাথজীকা মন্দির, ২৩। শ্রীআদীনাথজীকা ২৪। শ্রীঅজিতনাথজীকা মন্দির, ২৫। পার্শ্বনাথজীকা মন্দির, ২৬। শান্তিনাথজীকা মন্দির, ২৭। আদিনাথজীকা মন্দির, ২৮। একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ টিলা, ২৯। নীলকণ্ঠজীকা মন্দির, ৩০। কুমার মঠ, ৩১। মূর্ত্তি সংগ্রহালয়, ৩২। শিবসাগর, ৩৩। খজুরসাগর, ৩৪। মহারাজ প্রতাপ সিংহজীর ছত্রী।

এই সকল স্থান ব্যতীত অন্য অনেক স্থানে ও গ্রামের ভিতর ও বাহিরে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য মূর্ত্তি ও মূর্ত্তিখণ্ড ছড়াইয়া আছে। লোকে খজুরাহো হইতে বহুরের নানা মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছে। শেষশায়ী বিষ্ণু ও একটি রাশিচক্র, যাহা এখন ছত্রপুরে রহিয়াছে, ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আশার বাসা

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

ভারত কহিল,—না সাবিত্রী, এবার সত্যই গল্প লিখব।

টেবিলটা কেরাসিন কাঠের, পায়াগুলি জারুলের। দু-পাশে দু-খানি চেয়ার। একখানিতে বসিয়া ভারত কাগজ কলম লইয়া গল্পের ছক্ ভাবিতেছিল, অপরখানিতে সাবিত্রী।

সাবিত্রী মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিল,—লিখলেই যখন পয়সা পাও তখন কেন যে লেখ না তা বুঝি না। ধর, মাস গেলে যদি গোটা ত্রিশেক টাকাও বেশী আসে তা হলেও এক রকম করে আমি চালিয়ে নিতে পারি।

ভারত মনে মনে হাসিল। মাসে ত্রিশটাকা মানে ৩টি ভাল গল্প লেখা এবং দুখানি ভাল কাগজে তা' ছাপা হওয়া। বলিল,—সাবিত্রী, গল্প লিখলেই যদি পয়সা পাওয়া যেত তা হলে ত বেঁচে যেতাম।

সাবিত্রী কহিল,—লেখ কই যে, পাবে? এই ত এমন বাত্রিশটা গল্প একটু করে লিখে ফেলে রেখে দিয়েছ, একটাও শেষ করে যদি পাঠাতে তা হলেও না হয় বোঝা যেত।

ভারত একটু অন্যমনস্ক হইল। তাহার মনে যাহা আছে তাহা যেন সাবিত্রীকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছে না। সাবিত্রী লক্ষ্মী, অর্থের অনটন বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন ভারতকে উৎসাহ দেওয়া ভিন্ন অভিযোগ করে নাই। তাই ভারতের আরও বেশী কষ্ট হয়। আজ খুব শক্ত করিয়াই সঙ্কল্প করিয়া

বসিয়াছিল, একটা গল্প সে আজ আরম্ভ করিবেই, শেষ করিতে না পারে অন্ততঃ অনেকখানি লিখিবে। গল্পের ছক্ সে সকাল হইতে স্নানে, খাওয়ায় সকল সময় ভাবিয়া ভাবিয়া একটা খাড়া করিয়াছিল, কিন্তু লিখিতে বসিয়া তাহার মন যেন দমিয়া গেল। গল্পের বিষয়টি যদি সম্পাদকের পছন্দ না নয় তাহা হইলে ত এত পরিশ্রমই বৃথা হইবে। অথচ মাসে গোটা কয়েক টাকা বেশী পাওয়া নিতান্ত দরকার। সাবিত্রীর কথায় নিজের মনের অশান্ত অবস্থাটা আবার জাঁকিয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া বলিল,—সাবিত্রী, আমার কি ইচ্ছা নয় যে গল্পগুলো শেষ করি? কিন্তু পারি না, তা কি করব?

সাবিত্রী বলিল,—খুব পার। চেষ্টা করলেই পার। আগে ত কত লিখতে। আমি নিজেও তোমার কত গল্প পড়েছি। তখন পারতে কি করে?

ভারত বুঝাইতে চেষ্টা করিল, বলিল,—ঐ ত মজা। যেটাই জোর করে করতে হয় সেটাই আর হয়ে ওঠে না। আগে লিখতাম লেখার সখে নাম কেনবার লোভে। আজ লিখতে হচ্ছে রোজগারের জন্য। না লিখলে উপায় নেই এই যে একটা ভাব মনের মধ্যে তাড়া দিচ্ছে, এইটেতেই আরও সব পেছিয়ে দেয়। গল্প লিখতে বসে মনে আসে যত রাজ্যের কথা, উৎসাহ আর থাকে না।

সাবিত্রী অবুঝ ত ছিলই না, বরং ভারতকে সে যতদূর সম্ভব কিছু বুঝাইবার কষ্ট হইতে রেহাই দিত।

সাবিত্রী আদরের সুরে বলিল, আচ্ছা আর কথা নয়। লিখতে বসেছ লিখে যাও। খাবার আমি ঘরে এনে রেখেছি,যখন চাও ব'লো। আমি সমরের কাছে শুনলাম, তুমি তোমার কাজ কর।

একখানিই ঘর। সোয়া বসা লেখা-পড়া সবই সেই ঘরে। দেওয়ালের ধারে একখানি তক্তাপোষ, সাবিত্রী যাইয়া ঘুমন্ত সমরের কাছে বসিল, শুইল না। ভারত দেখিল, কি একটা সেলাই হাতে করিয়া সাবিত্রী কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

ভারত হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—এমন করে সামনে

সাবিত্রী গম্ভীরভাবে বলিল, মাষ্টারি হতে যাবে কেন? তুমি তোমার কাজ কর, আমি আমার কাজ করি।

ভারত তবু মন দিতে পারিল না। যতটুকু লিখিয়াছিল তাহা কাটিয়া দিয়া নিরুপায়ের মত বলিল, কি নিয়ে যে লিখব তাই ঠিক্ করতে পাচ্ছি না। এমন দশ-বিশটা গল্পের মুখ মাথার মধ্যে দেখা দিয়েছে, তার বেশী আর কারুর নাগাল পাচ্ছি না। এ করে কি আর গল্প লেখা হয়?

সাবিত্রী মিষ্টি হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা গল্পের প্লট্ বলে দিচ্ছি। এতকাল ত নিজের মন থেকে লিখেছ, আজ না হয় আমার কাছ থেকে একটা প্লট্ নিলে।

ভারত যেন অকূলে কূল পাইল। বলিল,—বেঁচে গেলাম। বল, কি তোমার প্লট্। নিশ্চয় সেইটেই লিখব।

—লিখবে?

—লিখব—নিশ্চয়—লিখব।

—হাসবে না?

—না, হাসব না। তুমি শিগগীর বল। আমার মনে হচ্ছে তোমার প্লট্টাই উতরে যাবে।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা বলছি শোন। হেসো না কিন্তু। আমার কথাটা হচ্ছে, যা তুমি প্রত্যক্ষ ভাবে জেনেছ তাই নিয়ে লিখলেই তোমার লেখা সজীব হবে অর্থাৎ গল্প শেষ হবে। তোমার মনের এখন যা অবস্থা তাতে ভাবের বিলাস চলবে না।

ভারত অধীরভাবে বলিল, তা ত বুঝলাম, এখন তুমি প্লট্টা বল। এ উৎসাহ আমার কেটে গেলে আর কিন্তু আমার দ্বারা লেখা হবে না ব'লে দিচ্ছি।

সাবিত্রী উঠিয়া আসিয়া আবার ভারতের সামনেকার চেয়ারটিতে বসিল। দুই একবার টেবিলের পায়ায় পা ঠেকাইয়া চেয়ারটা দোলাইল। মুখে তাহার একটা সলজ্জ হাসি। বলি বলি করিয়াও যেন তাহার মুখ ফুটিতেছে না।

ভারত অধীর হইয়া পড়িতেছিল। কহিল, আর সময় নষ্ট করো না, এবার বল। দিন তিনেকের মধ্যে



আঙিনায়

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

হবে। ওরা গল্প পড়বে, সিলেক্ট করবে, তারপর ছাপবে—তারপরে যদি ভাগ্যে থাকে—টাকা।

সাবিত্রী এবার জোরেই হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার যে দেখছি বেজায় তাড়া লেগে গেল আজ!

ভারত বলিল, হ্যাঁ, আজ আমার সুসময় এসেছে। গল্প আজ বাতাসে ভর করে ছুটে চলবে। প্লট্‌টা তুমি বল। দেখো, মনের সঙ্গে হাতের কলম চলতে পারবে না। এইটেই হল গল্প লেখার প্রধান জিনিষ, এই লেখার ইচ্ছা, এই আকুলতা।

সাবিত্রী দুষ্টামি করিয়া হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, এবার বলি, কেমন?

ভারত অধীরভাবে বলিল,—বল, আমি ত কখন থেকে তোমাকে বলতেই বলছি।

সাবিত্রী বলিল,—তুমি চোখ বন্ধ কর।

ভারত বিরক্তির সুরে বলিল,—করলাম।

সাবিত্রী আবার বলিল,—আলোটা নিবিয়ে দিই। আমার বলা শেষ হলে আবার জ্বেলে দেব।

ভারতের ধৈর্য্যের সীমা এবার যেন টুটিতে চাহিল। বলিল,—দাও নিবিয়ে। বাবাঃ বাবাঃ, কি যে করছ একটা সামান্য প্লট্ বলতে গিয়ে।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, তোমাদের প্লট্ যেমন দক্ষিণা বাতাসে ভর করে আসে তেমনি উত্তুরে বাতাসে ঝরে পড়ে। আমাদের ত আর তা নয়। আমাদের গল্প হচ্ছে একটা, প্লট্ও একটা। সেটা বাতাসে ভর ক'রে আসেও না, বাতাসের ভরে ঝরেও যায় না। আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে জড়িয়ে রয়েছে সে। এতে যে-রং লাগাবে সে-রকমটি দেখাবে।

ভারত কথা বন্ধ করিয়া দিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী বলিল,—রাগ করো না। আমাদের ছোট সংসারটিই হচ্ছে আমার গল্প, আমার প্লট্। আমাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অল্পদূর-বিস্তার আমাদের কল্পনা, এরই মধ্যে নাচে, কাঁদে, ওড়ে। তাই বলছি আমাদেরই সংসারের কথা লেখ। এর মধ্যে কষ্টও আছে যতখানি, আনন্দও আছে ততখানি। শুধু কষ্টের কথাই বড় করে লিখো না, আনন্দের কথাও লিখো।

ভারত তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। হঠাৎ টেবিলের উপর হাত চাপড়াইয়া বলিল,—পেয়েছি। আর বলতে হবে না।

সাবিত্রী বাধা দিয়া বলিল,—পাও নি।

ভারত যেন দমিয়া গেল। কহিল,—আমি বলছি, দেখ কি চমৎকার হয়।

সাবিত্রী মাথা নীচু করিল, বলিল, একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। তোমরা গল্প লেখ, কিন্তু তা পড়ে মানুষের মনে তার দুঃখটাই বড় করে দেখা দেয়। তাতে করে দুঃখের আর ইজ্জত থাকে না। আমরা অভাবে-অনটনে, নানা বিপদে-আপদে দুঃখ পাই সত্য, কিন্তু তার ভিতরেও কি আমরা একটা সুখের সংসার কামনা করি না?

ভারত বলিল, কামনা করি, কিন্তু পাই কি?

সাবিত্রী বলিল,—সেই কামনার মধ্যেই যতটুকু আনন্দ তা কি তোমার আমার পক্ষে কম? আমাদেরও কি আশা হয় না—একদিন আমাদের এত অভাব সব চলে যাবে, তোমার সমস্ত কল্পনা সোনার কাঠির ছোঁয়ায় হয়ত একদিন সোনা হয়ে উঠবে, সমর আমাদের বড় হবে, দেশের নাম রাখ্‌বে, পরিবারের নাম রাখ্‌বে, আমাদের সংসারের শ্রী তখন ফিরে যাবে, সমরের ছেলে মেয়ে কত আনন্দ করবে, আমরা তাই অবাক হয়ে দেখ্‌ব—এই আশা কি কম সুখের? আশা ফলুক না ফলুক, কিছু আসে যায় না—আশায় বেঁচে থাকাটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। ওকে তোমরা তেতো করে দিও না, ওকে তোমরা মানুষের মন থেকে একেবারে নির্ম্মূল করবার চেষ্টায় এমন ক'রে উঠে-পড়ে লেগো না।—বলিতে বলিতে সাবিত্রীর চোখ জলে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। তবু সে মনের আবেগে বলিতে লাগিল,—কি হয়েছে কষ্ট আছে, কি হয়েছে বেদনার ভারে মানুষের মন ভেঙে যাচ্ছে? তবু আশা করতে দাও মানুষকে—এত দুঃখেরও হয়ত শেষ আছে, হয়ত পার আছে, হয়ত একদিন বাংলার

ভাগ্য সৌভাগ্যের পরম প্রসাদে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠবে। কে জানে—কে জানে সে কথা?—সাবিত্রী যেন সমস্ত বাংলার ভাগ্যকে ফিরাইবার ভার লইয়াছে, এমনি একটা দৃঢ়তা, এমনি একটা বিশ্বাসের জোরে সে কথাগুলি বলিতেছিল। ভারত তাহা অনন্যমন হইয়া শুনিতেছিল আর ভাবিতেছিল সত্যই যদি সাবিত্রীর কথা ফলিয়া যাইত! সাবিত্রী হঠাৎ থামিয়া গেল। বাস্তবের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে তাহার বড় লজ্জা হইল।

ভারত কলমটা লইয়া কাগজের উপর এক জায়গায় কতকগুলি আঁচড় কাটিতে কাটিতে বলিল,—কি আছে আমাদের যে এত আশা করব? পরাধীন, পরের করুণার বিন্দু লইয়া অর্দ্ধাশনে অনশনে একটা মৃতপ্রায় জাত—তার আবার আশা? ভাবতেও ভয় করে সাবিত্রী?

সাবিত্রী মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল। ধীরে ধীরে বলিল, বুঝলাম কিন্তু তা ব'লে কি আমাদের কারুর আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়ে গেছে বলতে পার? মেনে নিলাম, শুধু বাংলার গ্রামে গ্রামে নয়, বাংলার ঘরে ঘরে নিত্য দুর্ভিক্ষ, রোগ, অশান্তি; কিন্তু তারই ভেতরে কি রক্ষাকালী পূজা হয় না, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত চলছে না, শনিপূজা, লক্ষ্মীপূজা নারায়ণসেবা হচ্ছে না? এ সব কেন? আমাদের দেশের লোক অনাহারে থেকেও দেবতার নামে পূজা দেয়, এ কেন? আশা করে নয় কি? অকূলে প'ড়ে অকূলের কাণ্ডারীকেই কি ভরসা ক'রে ধরবে না? যে জাতের আশা গেল তার ত মরণ।

ভারত কহিল,—বড় কথা ছেড়ে দাও সাবিত্রী, আমাদেরই ঘরের কথা ধর। আমাদের যে নিত্য নবোৎসব চলেছে তার মধ্যে কি আর আশা থাকে, না আশা বাসা বাঁধে? ভারত কহিতে লাগিল,—আজ যদি সম্ভব হ'ত নিজের মান-সম্মান বাঁচিয়ে সমর আর শীলাকে কোনও একটা অনাথ আশ্রমে রেখে মানুষ করা যেত তা হলে কি বাপ মা হয়েও আমরা তা দিতাম না?

সাবিত্রী জোর দিয়া বলিল,—না, দিতাম না। দেওয়া যদি দরকার বুঝতাম মান-সম্মানের জন্য ভাবতাম না। কিন্তু ওদের আমরাই মানুষ করে তুলতে পারব এই আশাই না করছি? আজও ত নিরাশ হবার মত এমন কিছু ঘটে নি।

তাহাদের কথায় মাঝখানে বাধা পড়িল, শীলা সন্ধ্যার সময়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া বলিল,—মা, আমরা কি আজ খাব না?

অনেক রাত হইয়া গিয়াছে, সাবিত্রী নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, এবার আমরা সবাই খাব। তুমি জায়গা ক'খানা করে ফেল, আমি টপ্ ক'রে সব বের করে আনছি।

দিন তিনেক পরে ভারত একটা গল্প লিখিয়া ডাকে পাঠাইল, সঙ্গে একখানা টিকেটও দিল। ডাকে ফেলিবার সময় টপ্ করিয়া একবার চোখ বুজিয়া মনে মনে বলিল,—ভগবান তুমি দেখো। পথে চলিতে চলিতে কত কি ভাবিল। এবার যদি গল্পটা ফেরত না আসে তাহলে গোটা পনেরো টাকা হয় ত পাওয়া যাইবে। সাবিত্রীর কাপড় নাই, ছেলেদের জামা নাই, আরও কত কি! সব কিছু করিতে গেলে এই টাকায় কুলায় না।

ছোট চাকরি ভারতের, মাস গেলে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা বাদ দিয়া ঘরে আসে গোটা বিয়াল্লিশ টাকা। ডাক্তারখানার বিলশোধ, ধোপা, গোয়ালা প্রভৃতি ত আছেই। দিয়া থুইয়া অতি সামান্য টাকাই বাঁচে—মাসের শেষ অবধি বাজার খরচও চলে না। এই ত অবস্থা। তবু এক রকম করিয়া কাটিতেছিল, তাহার উপর এক নূতন বিপদ। বিপদ বই কি? গোনা-গাঁথা যার আয় তার উপর একটা কুটো পড়লেও যে আর ভার সয় না। ভারতের বড় ভায়ের একটি ছেলে সবে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে, দাদা তাই ছেলেটিকে শহরে থাকিয়া কলেজে পড়িবার জন্য ভারতের কাছে পাঠাইয়াছেন। ভারত তাহার জামাকাপড় খাই-খরচের জন্য দাদার নিকট হইতে সাহায্য লয় কেমন করিয়া। চাহিতে তাহার লজ্জাও করে, কষ্টও হয়, দাদার অবস্থাও ত তেমন ভাল নয়। দাদা কলেজের মাহিনা ও ছেলের বইপত্রের জন্য মাসে দশটি করিয়া টাকা পাঠান। কিন্তু তাতে সংসার খরচের আয় বাড়ে কই? কাজেই

ক্ষুদ্র সংসারটির সমস্ত কাজ সারিয়া সাবিত্রীকে আজকাল সেলাই ফোঁড় লইয়া আরও বেশী সময় দিতে হয়। পাড়ার দু-চার ঘর ভরসা—তাদের কৃপায় দু-দশটা জামা-কাপড় সেলাই করিয়া দিয়া যা আসে।

কিন্তু তাহাও চলিল না। সাবিত্রীর স্বাস্থ্যে কুলাইল না। মাসেক পরেই সে শয্যা লইল। ভারত চোখে অন্ধকার দেখিল।

এমনি এক অন্ধকার দিনে একটি পনর টাকার মনিঅর্ডার আসিল। ভারতের গল্পটি মনোনীত হইয়া ছাপা হইয়া গিয়াছে এ সংবাদটিও কুপনে লেখা ছিল। ভারত চাকরিতে এবং ভাসুরপুত্র শচীন্দ্র কলেজে ছিল, কাজেই সাবিত্রীকে মণিঅর্ডার সই করিয়া লইতে হইয়াছিল। ভারত বাড়ি ফিরিয়া সাবিত্রীর কাছে এই শুভসংবাদটি• শুনিয়াও মনমরা হইয়া রহিল।

সাবিত্রী তখন আর তাহাকে কিছু বলিল না। পরে এক সময় বলিল, এমন দুঃসময়ে টাকাটা এল এ কি ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব'লে তোমার মনে হচ্ছে না?

ভারত বলিল,—গল্প যখন মনোনীত হয়েছিল তখন টাকাটা আসতই, কিন্তু তার সঙ্গের দুঃসময়টাও পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্তটা বিধাতা না করলেও পারতেন।

সাবিত্রী বুঝিল, ভারত তাহার জন্য খুব ভাবনায় পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে আর কথা বাড়াইয়া ভারতকে বিরক্ত করা উচিত নয়। তাই কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল,—এ টাকাটা দিয়ে কি করব জান?

ভারত সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল,—আমার জন্য অত ভেবো না। আমি দিন তিনেকের মধ্যেই খাড়া হয়ে উঠ্ব। একটু ভাল হলেই এ টাকা থেকে আমার জন্য একখানা ভাল তাগার হাত শাড়ী, সমর আর শীলার জন্য জামার কাপড়, তোমার জন্য একটা চায়ের পেয়ালা, আর—আর— সমরের পড়বার জন্য একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন, দশটাকার মধ্যে সব সারতে হবে—আর থাকে পাঁচ টাকা এই পাঁচ টাকা দিয়ে—এ পর্য্যন্ত বলিয়াই সাবিত্রী খুব হাসিতে লাগিল। ভারত মুখ গম্ভীর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিল, —না তুমি রাগ করতে পারবে না। বাকি পাঁচ টাকা দিয়ে একদিন আমরা ভাল ক'রে চারটি ঘি-ভাত আর মাংস খাব। যদি পয়সায় কুলোয় একটু পায়েস—শচীন ভালবাসে।

ফরমাস শুনিয়া ভারত অবাক। তাহার তখন মনে হইতেছিল আর ক'দিন পরেই ত ডাক্তারখানার মোটা বিল শোধ করিতে হইবে।

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া সাবিত্রী হাসিয়া বলিল— আমাকে পাগল ভাবছ, না? ভাব্ছ আমার জন্য যে এত ওষুধপত্র এল তার টাকা দেব কোত্থেকে? তার জন্য ভাবনা করো না, আরেকটা গল্প লিখে পাঠিয়ে দাও, খরচার টাকা এসে যাবে।

ভারত ভাবিল, বার বার কি তা হয়! বিশেষ কিছু না বলিয়া মনিঅর্ডারের কুপনটার দিকে চাহিয়া শুধু বলিল, হুঁ।

সাবিত্রী ছাড়িল না। বলিল,—হুঁ নয়। এ টাকা থেকে আমি এক পয়সা দিচ্ছিনে জেনে রেখো। এ আমার প্লটের দাম, তোমার গল্পের নয়।

সাবিত্রীর ছেলেমানুষী দেখিয়া ভারত আর না হাসিয়া পারিল না।

সাবিত্রীও হাসিয়া বলিল,—হাসি নয়, কালই আপিস-ফেরতা জিনিষগুলো কিনে আন্‌বে—তা নইলে আমাদের যে তপ্ত খোলা, কোথায় এ টাকা উবে যাবে।

রাখে কেষ্ট মারে কে যেমন, আবার মারে কেষ্ট রাখে কে-ও তেমনি। একটি রাত্রি মাত্র টাকা কয়টা তাদের বাক্সে বাসি হইতে পাইল। সকাল বেলাই একটি পাওনা-দার বন্ধু আসিয়া টাকার জন্য বড় কড়া তাগিদ দিল। বন্ধু হইলেও টাকাটা অনেকদিন পড়িয়া আছে। বন্ধু যে সকল কথা শুনাইল তাহাতে মাথা খুঁড়িয়া হইলেও টাকা কয়টা ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হয়। ভারত অনেক কালের ঋণ শোধ করিতে পাইয়া একটু যেন হাল্‌কা বোধ করিল।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, টাকা কয়টা গেল ত?

ভারত মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল,—অনেকদিন হয়ে গেল এনেছিলাম, ভাগ্যিস্ আজ দিতে পারলাম, বলিয়া সে সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিল।

সাবিত্রী·বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। বলিল—ভাবছ

আমার আশা পূর্ণ হ'ল না? হবে, একবার-না-একবার হবেই।

বছর ঘুরিয়া গেল, গল্প লেখার টাকাও বার কয়েক আসিল, কিন্তু জামাকাপড়ও হইল না, পোলাও-মাংসও খাওয়া হইল না। লোকে বলে টানাটানি—কিন্তু টানে ত সংসারই, ভারত আর সাবিত্রী টানিতে অবসর পায় কই? শচীনের হইল টাইফয়েড্। এখনকার মত ত ডাক্তার ওষুধপথ্য সবই যোগাইতে হইবে, পরে না হয় দাদা যা হয় দিবেন। অভাব আর রোগে এতদিনে ওদের সংসারটার বেশ রং ধরিয়াছে। এমনি একদিনে ভারত রাত্রে খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করে চল্‌বে?

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, তুমি গল্প লিখবে আর আমি সেলাই করব। আমাদের খরচের হিসাব আগে, জমার হিসাব পরে।

ভারতও হাসিয়া বলিল, এমনি ক'রে কতদিন চল্‌বে?

সাবিত্রী উত্তর করিল, চলুক না যতদিন চলে। হয়ত ভাল দিন এসে যাবে। আমার আশা মরে নি।

ভারত অবিশ্বাসের স্বরে বলিল,—হুঁ।

বন্যার ধ্বংসলীলা

শ্রীরেবতীমোহন লাহিড়ী, এম্‌-এ,

(হিন্দুসভার প্রতিনিধির বর্ণনা)

আজ পনর দিন হইল বঙ্গীয় হিন্দুসভার তরফ হইতে মোহনপুর কেন্দ্রের গ্রামগুলি পরিদর্শন করিয়া প্রকৃতির যে ধ্বংসলীলা দেখিতে পাইতেছি, তাহার আংশিক আভাস মাত্র সহৃদয় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। আর্ত্তের কাতর নিবেদন, অন্নহীন বস্ত্রহীনের করুণ ক্রন্দন কি তাঁহাদের প্রাণে পৌঁছিবে না—ভগবান যেখানে বিরূপ হইয়া তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত অপসারণ করিয়াছেন?

এখন বাড়ির উপর হইতে বন্যার জল নামিয়া গিয়াছে। যাহারা অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা ধীরে ধীরে এখন বাড়িতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। ধ্বংসাবশিষ্ট পরিত্যক্ত বাড়িঘরের অবস্থা এখন শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে। ভগ্ন হাড়ি, জীর্ণবংশদণ্ড, কাঁথা, মৃন্ময় তৈজসপত্র ইত্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়িয়া আছে। ঘরের মেঝের মাটি ধুইয়া গিয়াছে। পর্ণকুটীর বন্যার স্রোতে কতক ভাসিয়া গিয়াছে, যে দু-এক খানি অবশিষ্ট আছে তাহাও কোনরূপে দাঁড়াইয়া ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য

মোহনপুর হইতে দিলপসার পর্য্যন্ত নৌকা ভাসাইয়া দিয়া যে বর্ষাকালে উত্তর বঙ্গের শোভা সন্দর্শন করে নাই, সে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের শোভা দেখে নাই বলিলেই হয়।

গত দুই বৎসর হইল এদেশের কৃষকমণ্ডলী অর্থাভাবে তিল তিল করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছিল—গত আষাঢ়ে অঙ্কুরস্ত ধানভরা ক্ষেত দেখিয়া তাহাদের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—সে কেবল ক্ষণেকের জন্য। তারপর নটরাজের তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হইল—মহাপ্লাবনে তাহাদের ঘরবাড়ি শস্য সমুদয় বিনষ্ট হইয়া গেল। বন্যার তাড়নে এদেশের গৃহস্থের যে কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে—এই দুঃখের ছবি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। আগে যেখানে নয়নভুলানো শ্যামশোভা ছিল, এখন সেখানে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর ব্যাপিয়া শস্যরাশির চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত করিয়া ধূসর জলরাশি



বন্যাপীড়িতদিগকে সাহায্যদান



বন্যাপীড়িত কয়েকটি বালক ও স্ত্রীলোক



বন্যার দৃশ্য

জীর্ণ, ভগ্নদশাগ্রস্ত চালের নীচে বসিয়া শিশুসন্তানসহ বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে। বৃষ্টিধারারও যেন বিরাম নাই। আউশ ধান, পাট ভাসিয়া গিয়াছে, হৈমন্তিক ধানের চিহ্নমাত্রও নাই। অধিকাংশ লোক একরূপ অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। মা-লক্ষ্মীরা বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহির হইতে পারিতেছেন না। চাউল ও বস্ত্র বিতরণের সময় বামনগ্রামে ও পাতিয়াবেড়ায় যে করুণ দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। অভাবের তাড়নায় হিন্দু তাহার নৈমিত্তিক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ভুলিয়াছে। অনেকে স্ত্রী-পুত্র পরিজন পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশে চলিয়া যাইতেছে।

যে গৃহস্থ দুই বৎসর পূর্ব্বেও নিত্যনিয়মিত অতিথিসেবা করিয়াছে, কত অন্নহীনের অন্ন জোগাইয়াছে, অদৃষ্টের পরিহাসে সে আজ কোনোরূপে নিজের উদরান্নের সংস্থানের চেষ্টায় ফিরিতেছে। গত তিন বৎসরের অজন্মা, অর্থাভাব, তদুপরি এবারকার এই ভীষণ বন্যা তাহার এই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

গৃহপালিত মূক বধির গবাদি পশুর যে কষ্ট হইয়াছে তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা অসম্ভব। আজ তিন মাস ধরিয়া তাহারা জলকাদায় ভিজিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কচুরী পানা খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে। তাহাদের ছলছল নেত্রে দুঃখ করুণ হইয়া ফুটিয়াছে। যে হিন্দু গো-জাতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে তাহার নিকট এ দৃশ্য নিতান্ত মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত হিন্দুসভা এই কেন্দ্রের প্রায় ৫,০০০ দরিদ্র বুভুক্ষিত নর-নারীগণের সেবার ভার লইয়াছে, অভাবের তুলনায় এ সেবা নিতান্তই লঘু। অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। গবাদি পশু খাদ্যাভাবে মরিতে আরম্ভ করিয়াছে, অনাহারে মানুষ মরিবে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ছবি কল্পনা করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছি। আমাদের কি দুঃখের শেষ নাই?

এখনও উল্লাপাড়া হইতে দিলপসার পর্য্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায় ধূসর জলরাশি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। মধ্যে মধ্যে মরা পাটগাছের সাদা কাঠিগুলি দাঁড়াইয়া আছে—যেন মানুষের ভাগ্যকে বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছে।

একদিন যে এখানে দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল প্রান্তর ছিল; তাহা স্বপ্নলোকের কথা বলিয়া মনে হয়।

এই বিস্তীর্ণ জলরাশি একদিন সরিয়া যাইবে, রুদ্রের তাণ্ডব লীলার অবসান হইয়া আষাঢ়ের সজল ছায়ায় আবার প্রান্তর ভরিয়া কচি শ্যাম ধানের ঢেউ খেলিয়া যাইবে, বসুন্ধরা আবার শস্যশালিনী হাস্যমুখী হইয়া উঠিবে, শিশুর আনন্দ-উজ্জ্বল কলহাস্যে আবার গৃহস্থের দিক্-অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিবে—কিন্তু আজ যাহারা এক মুষ্টি অন্নের অভাবে মরিতে বসিয়াছে, তাহারা কি সেই ভাবী সুখের দিন দেখিয়া যাইতে পারিবে না? —যাহারা আমাদের সুখদুঃখের দিনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, মুখের আহার যোগাইয়াছে, পরিধানের বস্ত্র যোগাইয়াছে, দেশের নব নব ধন-সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছে?

"অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্দ্ধপানে
ডাকে ভগবানে
যে দেশের ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
সারাদিন বীর্য্যরূপে, দয়ারূপে, দুঃখ, কষ্ট, ভয়ে
সে দেশেরি দৈন্য হবে
হবে তার জয়?"

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

মহিলা-সংবাদ



শ্রীযুক্তা সুজাতা রায়

ঢাকা কামরুন্নেসা গার্ল্‌স্ স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্তা সুজাতা রায় ভারতীয় নারীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিলাতের লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্‌-এড উপাধি লাভ করেন।

—



শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক

শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত শিক্ষয়িত্রী ডিপ্লোমা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের মধ্য হইতে দশজন পাঁচ বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা-সমিতির (Court) সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এরূপ নির্ব্বাচন এখানে এই



শ্রীমতী গার্গী দেবী মাথুর

প্রথম। নির্ব্বাচিত সভ্যদের মধ্যে এই তিনজন মহিলা আছেন,—

(১) শ্রীমতী আশা অধিকারী, এম্‌-এ, (২) শ্রীমতী গার্গী দেবী মাথুর ও (৩) শ্রীমতী কেশবকুমারী শারগা।



বৌদ্ধধর্ম্মের দান

বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্রের গোড়ার কথা কিছু বলা দরকার। এমন কথা বলা চলে না যে এই বিপুল শাস্ত্র বুদ্ধের জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর কয়েকশ বৎসরের মধ্যেই রচিত হ'য়েছিল। বহু শতাব্দী ধরে এর রচনা চলেছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রের নানাদিক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যায় যে অশোকের পূর্ব্বে বা খৃঃ পূর্ব্ব তিন শতকের পূর্ব্বে যে বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত হ'য়েছিল ত'ার সংখ্যা খুব বেশী নয়। ত্রিপিটক ত দূরের কথা, একটা পিটকও রচিত হয় নি' অশোকের একশ বছর পরেও 'ত্রিপিটকে'র কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় শুধু 'পিটক' কথাটা। তখন বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা অধ্যয়নের সুবিধার জন্য ছোট ছোট শাস্ত্রের একত্র সন্নিবেশ করতে সুরু করেছেন, এইমাত্র বোঝা যায়। অশোক তাঁর অনুশাসনে ভিক্ষু সঙ্ঘকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বলেছেন। তাঁর সময় যদি 'ত্রিপিটক' থাকৃত তাহ'লে তারই নাম করতেন, কিন্তু তা' না করে মাত্র সাতটী সূত্রের নামোল্লেখ করেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠবে, অশোকের পূর্ব্বে বৌদ্ধশাস্ত্রের কি রূপ ছিল, কোন ভাষায় বা তা' লেখা হ'ত। বুদ্ধ নিজ ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন কোশল ও মগধ দেশে। তাঁর মৃত্যুর পর দু'-তিনশ বছর ধ'রে—এমন কি অশোকের সময় পর্য্যন্ত—বুদ্ধের ধর্ম্ম এই দেশের বাইরে যে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল তা' মনে করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। অশোকের চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বুদ্ধ নিজে ও তাঁর পরবর্ত্তীকালে, এমন কি অশোকের সময় পর্য্যন্ত, সঙ্ঘনায়কেরা কোশল-মগধের ভাষায় ধর্ম্মের আলোচনা করতেন। শাস্ত্র প্রথমতঃ সেই দেশের ভাষায় রচিত হ'ত। কোশল-মগধের ভাষা ছিল মাগধী প্রাকৃত। জৈনরাও এই প্রাকৃতেই তাঁদের শাস্ত্র লিখেছিলেন। এই ভাষার সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল "র" আর "স"-এর প্রয়োগ। সংস্কৃতে বা অন্য প্রাকৃতে যেখানে "র" ছিল, মাগধীতে সেখানে হ'ত "ল"। আর পালিতে যেখানে "স" ছিল, মাগধীতে হ'ত "শ"। অশোক তাঁর অনুশাসনে যে সাতখানি ধর্ম্মগ্রন্থের নাম করেছেন সে নামগুলি যে অর্দ্ধমাগধী ভাষায় লেখা তাতে সন্দেহ নেই। এই দুটি বিশেষত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অন্যান্য নিয়ম-কানুনের সাহায্যে বিচার ক'রে দেখা গেছে যে, পালি ভাষা কোশল-মগধের প্রাকৃত নয়। এ ভাষা ছিল পশ্চিম ভারতের বা খুব সম্ভবতঃ অবন্তীর কথিত ভাষার মার্জ্জিত রূপ। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে এর যে রূপ পাওয়া যায় সে রূপ যে অশোকের পূর্ব্বের নয় বরং পরের, এই কথা ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা জোর করেই বলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই পালি ভাষার ভিতরও অনেক মাগধী শব্দ রয়েছে। সেরূপ শব্দ হীনযানের অন্যান্য শাখার সংস্কৃতে লেখা শাস্ত্রেও পাওয়া গেছে। হীনযানের নানা শাখার ত্রিপিটক তুলনা করলেও কতকগুলি সাধারণ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এতেই মনে হয় যে, অশোকের পূর্ব্বেই বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা সুরু হয়। সে রচনা হ'ত মাগধীতে বা তার মার্জ্জিত প্রতিরূপ অর্দ্ধমাগধীতে। আর নানা সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক তুলনা করলে যে সব সাধারণ বিষয়গুলির সন্ধান পাওয়া যায়—সেইগুলিও এই ভাষায় লেখা হ'ত—সেইগুলি ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন শাস্ত্র, তার আকার খুব বড় ছিল না, আর তাকে সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম্ম প্রভৃতি পিটক-ভাগে সাজাবার দরকার হয় নি। এই প্রাচীন শাস্ত্রের এক প্রধান বই হচ্ছে ধর্ম্মপদ। ধর্ম্মপদ পালি, সংস্কৃত ও ভারতের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাচীন প্রাকৃতে পাওয়া গেছে। এবং বিভিন্ন সংস্করণগুলি তুলনা করলেই এর প্রাচীন অর্দ্ধমাগধী রূপ ধরা পড়ে।

অশোকের সময় থেকে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের নানাস্থানে প্রসার লাভ করল। তার তখন প্রধান কেন্দ্র হ'ল, মথুরা, উজ্জয়িনী ও কাশ্মীর। পরে কাঞ্চী উজ্জয়িনীর স্থান নিয়েছিল। ক্রমশঃ প্রাচীন অর্দ্ধমাগধী শাস্ত্র মথুরা ও কাশ্মীরে সংস্কৃত ও উজ্জয়িনীতে স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় অনূদিত বা রূপান্তরিত হ'ল। সেই কারণেই এ সব অনুবাদের ভিতর এখনও অর্দ্ধমাগধী শব্দের সন্ধান মেলে। সঙ্ঘনায়কেরা শুধু প্রাচীন শাস্ত্র অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হ'লেন না—প্রাচীন শাস্ত্রের কাঠামো ও নিজেদের সাম্প্রদায়িক মত নিয়ে শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করে চল্‌লেন। তাই বৌদ্ধশাস্ত্র ক্রমশঃ বিপুল আকার নিল। তাকে পিটকভাগে সাজাবার দরকার হ'ল। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে আরম্ভ করে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত ভারতীয় আচার্য্যেরা দলে দলে চীন দেশে গিয়ে চীনা পণ্ডিতদের সহায়তায় নানা সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে ক্রমশঃ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই সব ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যেই সপ্তম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এবং দ্বাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে তিব্বতী ও মাঙ্গোলীয় ভাষায়ও অনূদিত হ'ল। তাই হীনযান বৌদ্ধশাস্ত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে এই সব দিক্‌টা না দেখলে চলে না। তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও কিছু বল্‌তে গেলে তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া গতি নেই।

হীনযান শাস্ত্র ত্রিপিটকে বিভক্ত হ'লেও মহাযান শাস্ত্রের তা হ'বার কথা নয়। কারণ পূর্ব্বেই বলেছি যে মহাযান যাঁরা অবলম্বন করলেন তাঁরা হীনযানের বিনয়-পিটকই মেনে নিলেন। কিন্তু তা' হ'লেও বোধিসত্ত্বচর্য্যার জন্য যে-সব আচার-ব্যবহার শাস্ত্রীয় বলে ধরা হ'ল তা সাধারণ ভিক্ষুর পালনীয় আচারের থেকে কিছু অন্যরূপ। বোধিসত্ত্বমার্গ যাঁরা অবলম্বন করলেন তাঁদের বাইরের আচারের কতকগুলি খুঁটিনাটি না মানলেও চল্‌ত—কারণ তাঁদের কাছে অন্তর্দৃষ্টিরই ছিল বেশী মূল্য। এ-সব কারণেই কালক্রমে মহাযান শাস্ত্রেও এক নূতন বিনয়-পিটকের সৃষ্টি হ'ল। মহাযানের প্রাচীন সাহিত্য কিন্তু কতকগুলি সূত্র নিয়ে গঠিত। তার ভিতর সব চেয়ে প্রধান হ'ল প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র। প্রজ্ঞা হ'ল মৈত্রী করুণা প্রভৃতির মতই এক পারমিতা। বোধিসত্ত্বমার্গে উন্নীত হ'তে হ'লে প্রজ্ঞার চর্চ্চা ছিল খুব দরকারী—কারণ, তা বাদ দিলে বোধিজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র লেখা হয়েছিল সংস্কৃতে—তার পর নানাভাষায় তার অনুবাদও করা হয়েছিল। প্রজ্ঞাপারমিতা রচনার কাল এখনও সঠিক নির্দ্দেশ করা যায়নি। তবে মনে হয় যে, কনিষ্কের সময় বা খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব্বেই এই সূত্র রচিত হ'য়েছিল। অবশ্য পরে এর কলেবর বেড়ে উঠেছিল। এই প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র অবলম্বন করে পারমিতাযান সৃষ্টি হ'ল ও খৃষ্টীয় প্রথম শতক কিংবা তার কিছু পূর্ব্বে নাগার্জ্জুন তাঁর মাধ্যমিক এবং এর কিছু পরেই মৈত্রেয়নাথ,

অসদি ও বসুবন্ধু যোগাচার দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। এই সব আচার্য্যদের লেখা কিন্তু পিটকে স্থান পেল না। প্রজ্ঞাপারমিতাকে বুদ্ধের মুখ দিয়ে শোনান হয়েছে—কিন্তু নাগার্জ্জুন প্রমুখ আচার্য্যদের লেখা শাস্ত্র ও ধর্ম্মের বুদ্ধের বাণী নয়। তাই তাদের লেখাগুলিকে "শাস্ত্র" সংজ্ঞা দিয়ে পৃথক করে রাখা হ'ল,—যদিও সূত্রগ্রন্থের চেয়ে সে সব শাস্ত্র আদর কিছু কম পেল না। এই শাস্ত্রগুলিই হ'ল মহাযানের অভিধর্ম্ম। মহাযানের প্রথম সূত্রপাত হয় খুব সম্ভব অমরাবতীতে। নাগার্জ্জুন তাঁর শাস্ত্র অমরাবতী কিম্বা তার অদূরে ধান্যকটকের মহাবিহারে বসে লেখেন। কিন্তু কনিষ্কের সময় গান্ধারও মহাযানের একটা বড় কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। শোনা যায় মহাযানের সব চেয়ে বড় কবি অশ্বঘোষ তাঁর অনেক বই গান্ধারে বসেই লিখেছিলেন। অসঙ্গ ও বসুবন্ধুও গান্ধারের লোক। নাগার্জ্জুনের সব চেয়ে বড় বই হ'ল প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের টীকা। এই টীকার ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠা করে যান। আর যোগাচারের উপর অসদি ও বসুবন্ধুর সব চেয়ে বড় বই হ'ল—সূত্রালঙ্কার এবং মহাযান বিংশতিকা ও ত্রিংশতিকা। নাগার্জ্জুনের বইয়ের মূল পাওয়া যায় নি—তা চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে পড়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর বইগুলির সংস্কৃত মূল নেপালে পাওয়া গেছে। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু তাঁদের বই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে লিখেছিলেন মনে হয়।

এই দুই দর্শনের পুঁথিপত্র ছাড়া মহাযান শাস্ত্রের মধ্যে কতকগুলি সরস কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়—সেগুলি হচ্ছে ললিতবিস্তর এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত। এ ছাড়া অশ্বঘোষের কতকগুলি ছোট ছোট বইয়েরও সন্ধান মেলে। শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতারকে কাব্যের হিসাবেই ধরা যেতে পারে। ললিতবিস্তর কার লেখা তা বলা যায় না কিন্তু সে বই যে কাব্য তাতে সন্দেহ নেই। সে কাব্য আরও ফুটে উঠেছে অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিতে"। অশ্বঘোষ নিজে বুদ্ধচরিতকে মহাকাব্য আখ্যা দিয়েছেন—সেটা যে মহাকাব্য তা সে বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরা অস্বীকার করেন না। মহাকবি কালিদাসের কাব্যের উপর যে তার ছায়াপাত হয়েছে তা পণ্ডিতেরা জোর গলায় বলেছেন। বুদ্ধচরিতের ভাষা সরস, ছন্দের ভিতর প্রাণ আছে, উপমার ভিতর বৈচিত্র্য আছে। আর সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে মহাকাব্যের যে যে গুণ নির্দ্দেশ করেছেন তা সবই বুদ্ধচরিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধঘোষ কবিগুরু বাল্মীকির নাম করেছেন। সুতরাং রামায়ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ও তার থেকেই তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন, তা মনে করা অসঙ্গত হ'বে না। অশ্বঘোষের লেখা শারিপুত্র প্রকরণ হচ্ছে নাটক। এ নাটকের কতকগুলি খণ্ডিত অংশমাত্র জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা মধ্য এসিয়ায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাঁদের যত্নেই এই নাটকের কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। এ নাটক বুদ্ধদেবের জীবনী নিয়েই রচিত হয়েছিল। ভাসের নাটকের কথা বাদ দিলে এর চেয়ে প্রাচীন নাটক আর পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া কতকগুলি বৌদ্ধস্তোত্র, বজ্রদত্তের লোকেশ্বরশতক, বা রাজা হর্ষদেবের সুপ্রভাতস্তোত্র—তাদের ভিতরও যে কাব্য রয়েছে তা নেহাৎ খেলো নয়। স্রগ্ধরাস্তোত্র থেকে একটা নমুনা দিলেই এ-সব স্তোত্রের ভিতর যে কাব্যরস রয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। যে-সব দেবকন্যারা মহাযানের দেবতাকে বরণ করতে ছুটেছিলেন কবি তাঁদেরই ছবি আঁকছেন—

হারাক্রান্তস্তনান্তাঃ শ্রবণকুবলয়স্পর্দ্ধমানায়তাক্ষ্যো
মন্দারোদারবেণী তরুণ পরিমলামোদমাদ্যদ্ দ্বিরেফাঃ।
কাঞ্চী নাদানুবদ্ধোদ্ধতত্তর চরণোদারমঞ্জীর তূর্য্যা—
স্তত্রাধান্ প্রার্থয়ন্তে স্মরমদমুদিতাঃ সাদরা দেবকন্যাঃ।

"দেবকন্যারা তোমাকে স্বামীরূপে সাদরে আকাঙ্ক্ষা করছেন। মন্মথের পীড়াজনিত হর্ষে তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। গলার হার এসে বক্ষের উপরে পড়েছে; তাঁদের আয়তলোচন শ্রবণকুবলয়কে হার মানিয়েছে। তাঁদের বেণীতে যে মন্দার ফুল রয়েছে তার গন্ধে ভ্রমর আকুল হয়ে উঠেছে। আর তাদের পায়ের নূপুরধ্বনি দোদুল্যমান কাঞ্চির শব্দকে ডুবিয়ে দিয়েছে।"

এই কাব্যরসই আবার অন্য দিকে ভাস্কর ও চিত্রকরের হাতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ-শতকের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য দেখুন, অজন্তার চিত্রকলা দেখুন—এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী দেবকন্যাদের খোঁজ সহজেই মিলবে। কিন্তু অজন্তার চিত্রকর কোথা থেকে তার প্রেরণা পেয়েছিল তা স্পষ্ট বুঝতে গেলে পড়তে হবে শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার! শান্তিদেব ছিলেন বলভীর লোক—আর তিনি তাঁর বই লিখেছিলেন ষষ্ঠ শতকে। সুতরাং অজন্তার চিত্রকরেরা তাঁর কাব্য থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল তা মনে করা অসঙ্গত হবে না।

এইবার মহাযানের শেষযুগের শাস্ত্র-সম্বন্ধে দু-এক কথা বলেই বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় শেষ করব। এই যুগের একদল বৌদ্ধ আচার্য্যেরা বলতে সুরু করলেন যে বোধিচর্য্যা মন্ত্রবলেই হতে পারে। এঁরা সপ্তম অষ্টম শতকেই বেশ প্রভাবসম্পন্ন হয়ে উঠ্‌লেন ও নূতন নূতন শাস্ত্র রচনা করতে লাগ্‌লেন। অবশ্য এঁদের দর্শনের মূল যে যোগাচারের মধ্যেই রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এঁরা যে-সব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলেন তাঁদের শাস্ত্র নিয়ে বেশী আলোচনা হয়নি। তা রয়েছে বেশীর ভাগ নেপালী পুঁথিতে আর তিব্বতী অনুবাদে। বজ্রযান ও কালচক্রযানের শাস্ত্র সংস্কৃতে আর সহজযানের শাস্ত্র অপভ্রংশে লেখা হল। এই অপভ্রংশ শাস্ত্রের রচয়িতারা হ'লেন সিদ্ধপুরুষ। তাঁদের ভিতর সরহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নুপাদ ও তিল্লোপাদের লেখা বেশী পাওয়া গেছে। এঁদের ভাষা ও প্রাচীন বাংলা ভাষার ভিতর বড় পার্থক্য নেই—তাই এদের লেখা বইগুলি বাংলা ভাষার আলোচনার জন্য খুব মূল্যবান। প্রাচীন ছন্দে এঁরা যে সব নূতন সুর সংযোগ করলেন তারই প্রভাবে প্রাচীন বাংলা ও হিন্দী সাহিত্য গড়ে উঠ্‌ল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কবীর প্রভৃতির ভিতর এই প্রাচীন সহজসিদ্ধদের লেখার ভাব ও রূপ আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ল।

তিল্লোপাদ যখন সমাধিস্থ হবার জন্য নিজের মনকে আদেশ করছেন—"মন, তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। তোমার আর এখানে স্থান নেই। আমি অধ্যাত্মকে উদ্ঘাটন করে, এখন ধ্যানে স্থিত হ'ব ও ধ্যানদৃষ্টি লাভ করব।"

অথবা সহরপাদ যখন সহজ সিদ্ধির প্রাধান্য প্রতিপন্ন করবার জন্য বল্‌ছেন—এই সে সুরসরিৎ মন্দাকিনী, এই সে যমুনা, আর এই সে গঙ্গাসাগর। প্রয়াগ বারাণসী, বা চন্দ্র দিবাকরও এই।"

তখন তাদের ভাবের ভিতর যে ঐশ্বর্য্যের ও ভাষা আর ছন্দের ভিতর যে শক্তির খোঁজ পাই তা' ভারতের মধ্যযুগের সাহিত্যে বিরল।

বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শন, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা বহুকাল ধরে যে আমাদের তৃষ্ণা মেটাবে তাতে আর সন্দেহ কি? সে রত্নকে শুধু উপযুক্ত আদরে ঘরে তুলে নিতে জানা চাই।

পরিচয়, শ্রাবণ (ত্রৈমাসিক), ১৩৩৮ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

—

মেয়েদের কাজ

আমাদের দেশের মেয়েদের আজকাল এমন সব কাজে দেখা যাচ্ছে যে সব কাজে দশ বারো বৎসর আগে ভদ্র মেয়েদের যোগ দেওয়াটা মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। আধুনিক বাঙালী ভদ্র মেয়ে ডাক্তার ও শিক্ষয়িত্রী হয়েই তাঁদের বাইরের কাজ শেষ করে না। অনেকে ব্যাঙ্কে, জীবন বীমা আপিসে, পোষ্ট আপিসে, রেল ষ্টেশনে চাকরি করছেন; কেউ খবরের কাগজ, কেউ দোকান বাজার, কেউ ঔষধের কারখানা, কেউ কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিচালনা করছেন। আইন চর্চ্চা, বিজ্ঞান চর্চ্চা সবই মেয়েরা করছেন। রাজনৈতিক কাজে মেয়েরা যে কতখানি সাহায্য করেছেন তা ত সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। তবে সেটা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নয়, কেবলমাত্র দেশহিতেরই জন্য।

যাই হোক্ দেশহিতের জন্য যে-মেয়েরা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ছাড়া নূতনতর প্রণালীতে কাজ করতে সুরু করেছেন সে-মেয়েরা দেশহিত একভাবে করেন নি, দুই দিক দিয়েই করেছেন। আপাতত দেশের যে সকল কর্ম্মক্ষেত্রে তাদের নামা প্রয়োজন ছিল সেখানে নেমে কার্য্য সিদ্ধি ত তাঁরা অনেকখানি করেইছেন, উপরন্তু মেয়েদের জীবিকা অর্জ্জনের পথও তাঁরা প্রশস্ততর করে দিয়েছেন। এমন অনেক কাজ আছে যাতে পরিশ্রমের তুলনায় আয়, শিক্ষণবৃত্তি প্রভৃতি থেকে বেশী; কিন্তু কেবলমাত্র অকারণ সঙ্কোচ, অজ্ঞতা ও অনভ্যাসের জন্য মেয়েরা সে সব কাজে হাত দিতে ভয় পান। রাজনৈতিক কাজে শিক্ষিতা, অর্দ্ধ-শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা সব রকম ভদ্র মেয়েরা যোগ দেবার পর তাঁদের এই ভয় অনেকখানি কমে গিয়েছে। পৃথিবীকে তাঁরা আগে যতখানি ভয়াবহ স্থান মনে করতেন এখন আর তা মনে করেন না। এই ভয়েরও দুটো দিক আছে। প্রথম দিক্ হচ্ছে— মেয়েদের শালীনতা ও ভদ্রতা হানির ভয়। তাঁরা মনে করতেন দোকান বাজার কি রেল ষ্টেশন প্রভৃতি স্থানে কাজ করতে গেলে মেয়েদের ভদ্রতা ও শালীনতা রক্ষা হয় না, মান-মর্য্যাদা থাকে না। দ্বিতীয় ভয় হচ্ছে অক্ষমতার ভয়। কিছুকাল আগেও মেয়েরা মনে করতেন যে পুরুষের জগতের কার্য্য-প্রণালী বুঝতে হলে এবং হাতে কলমে করতে হলে যে ধরণের মস্তিষ্ক, চিন্তাশক্তি ও বিষয়বুদ্ধি থাকা উচিত মেয়েদের তা নেই। কিন্তু অকস্মাৎ পুরুষের সেই বৈষয়িক জগতের মাঝখানে এসে পড়ে মেয়েরা দেখলেন যে যদিও তাঁরা সেখানে পুরুষের কাজে ভাগ বসাতে আসেন নি, তবু সেখানকার ধরণ-ধারণ কাজ-কর্ম্ম আশ্চর্য্য রকম দুর্ব্বোধ্য কিছু নয়; এবং সেখানে ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে শালীনতা ও ভদ্রতা রক্ষা করাও খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। সুতরাং সম্প্রতি নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে মেয়েদের মুষ্টিমেয় দেখা গেলেও শীঘ্রই এই সব ক্ষেত্রে তাঁদের দলবৃদ্ধি হবে এটা বোঝা যাচ্ছে।...

সম্ভব হলে স্বামী ও শিশুসন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেও মেয়েদের প্রত্যেকেরই কিছু উপার্জ্জন করা উচিত। কিন্তু ঠিক পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে পুরুষের কাজ করা এঁদের পক্ষে শক্ত; কেননা তাতে তাঁদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যে ত্রুটি থেকে যায়।

এরকম অবস্থায় পুরুষের পক্ষে যেমন যে কোনো কাজ নিজের শক্তি ও ইচ্ছামত করা চলে, মেয়েদের বেলা তা চলে না। মেয়েদের বেলা কাজগুলিকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করতে হয়। যথা— (১) অবিবাহিতা মেয়েদের কাজ, (২) বিবাহিতা নিঃসন্তান মেয়েদের কাজ, (৩) বিবাহিতা সন্তানবতীর কাজ, (৪) বিধবা ও চিরকুমারীদের কাজ।

এখানে দেখছি যে বিধবা, আজন্ম বৈধব্য পালন করবেন এবং যে কুমারী চিরকাল কৌমার্য্য রক্ষা করবেন, তাঁরাই কেবল পুরুষের মত সর্ব্বক্ষেত্রে কাজ করে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করতে পারেন। আর সকলের পক্ষেই অল্প-বিস্তর বাধা আছে।

আমাদের দেশেও মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়ছে; তার কারণ খানিকটা আধুনিক মনোভাব, খানিকটা অর্থাভাব, সম্প্রতি খানিকটা আইন। সুতরাং আশা করা যায় কিছুকাল পরে ভদ্র সমাজের সকল মেয়েই শিক্ষাসমাপনের পর এবং বিবাহের পূর্ব্বে কিছুদিন অর্থ উপার্জ্জন করবার অবসর পাবেন। এই অবসর কালে তাঁদের প্রতিভা কি ক্ষমতা তাঁদের যে কাজে হাত দেওয়ায় তাঁরা তাই করেই অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু এই সময় ত দীর্ঘ সময় নয়। অধিকাংশ মেয়েরই এ দেশে বিবাহ হবে, এখন ত প্রায় সকলেরই হয়। বিবাহের পূর্ব্বে যে মেয়ে ওকালতী করেছেন তাঁর হয়ত বিবাহ হল এক কৃষি-বিভাগের পরিচালকের সঙ্গে কোনো অজ পাড়া গাঁয়ে। সেখানে আইন আদালতের কোনো চিহ্ন নেই। সুতরাং বিবাহের পর এঁকে হয় কেবল সংসার নিয়ে থাকতে হবে, নয় অর্থ-প্রতিপত্তি ও অবসর সদ্ব্যয়ের জন্য নূতন একটা বিদ্যায় মন দিতে হবে। যে মেয়ে ঔষধাদির কারখানায় কাজ করতেন তাঁর স্বামী হয়ত বছরে চার বার চার জায়গায় বদলির চাকরি করেন। মেয়েটিকে কারখানার মায়া ছাড়তেই হবে। না হলে আধুনিক ইউরোপের মত স্বামী এক মুলুকে স্ত্রী আর এক মুলুকে থাকবার মত প্রথা আমাদের দেশেও এসে পড়বার চেষ্টা করবে।

বিবাহিতা সন্তানহীনা মেয়েরা ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারেন। কিন্তু সন্তান যদি ভবিষ্যতে হয় তাহলে আর বাইরে যাওয়া চলবে না। তখন তাঁদের অন্য কাজের প্রয়োজন হবে।

এই সব কারণে মেয়েদের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার পর অথবা সঙ্গে সঙ্গেই যে অর্থকরী বিদ্যা শেখান দরকার, সেগুলি বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে করার প্রয়োজন আছে। আমার মতে মেয়েরা পুরুষের সকল কাজই করতে পারেন; করবার যোগ্যতা এবং অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু নিজেদের এবং নিজ পরিবারের ভবিষ্যৎ সুখ সুবিধা ও হিতের দিকে চেয়ে তাঁদের কাজ নির্ব্বাচন করা উচিত। অধ্যাপনা, শুশ্রূষা, চিকিৎসা ইত্যাদি কাজের বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে না; কারণ মানুষ এমন জায়গায় যেতে পারে না যেখানে এই কাজগুলির প্রয়োজন নেই। মেয়েদের হাতে যখন ভবিষ্যৎ মানবজাতির দেহ এবং মন গড়বার ভার, প্রকৃতি বিশেষ করে দিয়েছেন এবং সমাজ ও মেয়েদেরই হাতে গৃহ পরিবার পরিজনের সেবা তুলে দিয়েছেন তখন অধ্যাপনা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা মানব-সেবার এই তিনটি বড় অঙ্গ সম্বন্ধে তার জ্ঞান যত থাকে ততই মঙ্গল। এতে সব জায়গায় অর্থ না থাকলেও অনেক জায়গায় অল্প-বিস্তর অর্থও পাওয়া যাবে। নিজের সন্তানের শিক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক শুশ্রূষা শিক্ষিতা মমতাময়ী মার মত আর কেউ হয়ত দিতে পারেন না; কাজেই এ সব কাজ ত প্রতি ভবিষ্যৎ মাতার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তারপর দেখ্‌তে হবে এমন কাজ যা ঘরে বসে এবং ডাক ও রেলের সাহায্যে করা যায়। আজকাল কুটিরশিল্পের সম্মান বেড়েছে, মানুষ মেয়েদের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে বুঝতে শিখেছে। কিন্তু সব মানুষ এই ধরণের কাজ পারে না অথবা ভালবাসে না। অনেক মেয়ের বিশেষ দিকে প্রতিভা থাকে, অনেক মস্তিষ্ক খুব উঁচুদরের। তাদের ত উপযুক্ত কাজ দেওয়া চাই।

এই সব মেয়ে নানারকম পুস্তক রচনা, সঙ্কলন, পত্রিকা ও পুস্তকাদি

সম্পাদন, প্রুফ দেখা, ছবি আঁকা, পোষাক, গহনা আসবাবের ডিজাইনকরা, বাড়ি, ঘর, পাড়া, রাস্তা, মন্দির ইত্যাদির প্ল্যান করা, বিজ্ঞাপনের ও পাঠ্য পুস্তকাদির ছবি আঁকিয়া দেওয়া, ডাক বিভাগের সাহায্যে কি হইয়া চিঠিতে মানুষকে নানা বিদ্যা ও ভাষা শিক্ষা দেওয়া, খবর সংগ্রহ ও বিতরণ করা, গ্রামোফনে গান দেওয়া, দেশী বাজনা তৈয়ারী করা, ছায়াচিত্র তোলা, প্রতিকৃতি আঁকা, ছবি এন্‌লার্জ্‌ করা, ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কত কাজ করিতে পারেন।

এই সব কাজে ঘরে বসে যাঁরা সুনাম ও অর্থ অর্জ্জন করবেন, সন্তান-সন্ততি বড় হলে অথবা অন্য কারণে ভারমুক্ত হলে তাঁরা সেই ধরণের বড় কাজ, বড় রকম প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পরিণত বয়সে করতে পারেন। হাতে কলমে একা যে কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, পরিণত বয়সে দশজনকে খাটিয়ে নিজে পরিচালনার ভার নিয়ে সেটা অনেক উন্নত ও উচ্চ আদর্শে গড়ে তুলতে পারবেন।

জয়শ্রী, আশ্বিন, ১৩৩৮ শ্রীশান্তা দেবী

—

চা-পান ও দেশের সর্ব্বনাশ

চা না হইলে বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘর-সংসার এক দিন চলে না। ভদ্র, শিক্ষিত, ইতর, অশিক্ষিত সকলের ঘরেই চা চাই। ইহার ফলে বাঙ্গালার ধনের ও স্বাস্থ্যের প্রতিদিন কত অপচয় হইতেছে, তাহা কয়জন বাঙ্গালী ভাবিয়া দেখেন ?

গত শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাঙ্গালা দেশে চাএর এমন বিষম প্রচলন ছিল না। তখন দুই চারি জন সৌখীন বাঙালী বাবু ও বাঙালী ডাক্তার চা-পান করিতেন। বাঙালী জনসাধারণ তখন চা-পান করিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিত না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইবার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন আসামে চা-বাগান পর্য্যবেক্ষণ করিতে যান। তথায় চা-করদিগের অভিনন্দনপত্রের উত্তরে তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "তোমরা কেবল য়ুরোপ ও আমেরিকায় এদেশের চায়ের প্রচলন করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু এই ত্রিশ কোটি লোকের আবাসভূমি ভারতবর্ষে চালাইবার কোন চেষ্টা করিতেছ না। আমি যদি তোমাদের মত চা-কর হইতাম, তাহা হইলে ভারতে চা চালাইবার ব্যবস্থা করিতাম। যাহাতে কৃষকগণ ধান কাটিতে কাটিতে একবার অবসর মত মাঠের মধ্যেই চা-পান করিয়া শীতের বা বর্ষার কাঁপুনী হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, যাহাতে আবক্ষ জলে নিমজ্জিত থাকিয়া কৃষক পাট কাটিতে কাটিতে এক পেয়ালা চা-পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, যাহাতে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বাঙালীর ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া-নাশের জন্য চায়ের প্রচলন হয়, যাহাতে এদেশবাসী এক পয়সায় সস্তার চায়ের মোড়ক পাইয়া ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তি করিতে পারে, আমি সেই ব্যবস্থা করিতাম।" লর্ড কার্জ্জনের এই ভবিষ্যৎ চিত্র আজ সফল হইয়াছে, চা-করেরা তাঁহার উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া অদ্ভুত বিজ্ঞাপন ও প্রচারের সাহায্যে এই বাংলা দেশের রাজধানী হইতে সুদূর পল্লীর নিভৃত কোণেও চা ছড়াইয়া দিয়াছেন।

ভারতে লর্ড কার্জ্জনের বক্তৃতায় কাজ হইল, চা-করেরা এইবার ভারতে চা-প্রচারে মস্তিষ্ক ও অর্থ নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। আসাম ও কাছাড়ের চা-করগণ স্ব স্ব চা-বাগিচার পরিমাণ অনুসারে চা ভিক্ষা দিতে লাগিলেন; সেই চা ছোট ছোট মোড়কে পুরিয়া

সাহেবরা আজকাল নাকি ভারতের সর্ব্বত্র মাত্র এক পয়সা মূল্যে

বিনা মূল্যে চা-পান করাইবার উদ্দেশে কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাম্বু ফেলা হইতে লাগিল।

এক জন "টি কমিশনার" এতদর্থে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান টি সাপ্লাই কোম্পানী সুলভ মূল্যে জনসাধারণকে চা সরবরাহ করিত। "টি কমিশনার" সুলভ মূল্য নহে, একবারে বিনা মূল্যে জনসাধারণকে 'চা-খোর' করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক রেল-ষ্টেশনে উপবীতধারী হিন্দুকে 'হিন্দু' চা বেচিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। পাছে জাতিনাশ হইবার ভয়ে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা চা ক্রয় না করে, এজন্য গেলাসের পরিবর্ত্তে মাটীর ভাঁড়ে চা বিক্রয় করা হইতে লাগিল।

তাহার পর সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে চায়ের মজলিস স্থায়ী রূপে বসাইবার বন্দোবস্ত হইল। বিদেশে রপ্তানী চায়ের উপর যে সেস্‌ বা কর ধার্য্য করা হয়, উহা হইতে চায়ের মজলিসের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে এই বাবদে পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে চায়ের উপর শুল্ক বাবদে সরকারের ১২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

এই স্থানে আমরা রয়্যাল কৃষি কমিশনের রিপোর্টের চতুর্থ ভাগের ৩৯৭ পত্রাঙ্ক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

বাজারের বিক্রেতাদের মারফতে চা বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য তহবিলের টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। চল্লিশ হাজারেরও উপর দোকানদারকে চা বিক্রয় করিবার জন্য প্রভাবিত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে মনোহর বিজ্ঞাপন সমূহ সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া চায়ের আধার, চা ওজন করিবার সরঞ্জাম এবং চায়ের মোড়কও বিনা পয়সায় দেওয়া হইয়াছে। খরিদ্দারগণকে দোকানে আকৃষ্ট করিবার নানারূপ প্রলোভনের উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু নদীর ষ্টিমারের যাত্রীদিগকে চা পান করাইবার উপায় করা হইয়াছে, পরন্তু পূর্ব্ববঙ্গ হাওড়া, বোম্বাই, বরোদা, মধ্য-ভারত, দক্ষিণ-ভারত রেলপথের বড় বড় জংশনে ও ষ্টেশনে গাড়ীর যাত্রীদিগকেও চা-খোর করিবার জন্য সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কমিটীর পরামর্শে ভারতের বড় বড় কল কারখানার সান্নিধ্যে চায়ের দোকান খোলা হইয়াছে। প্রায় ৩ শত সামরিক আড্ডায় চা-পান ও আমোদ-প্রমোদের স্থান প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

চা-প্রচার সমিতির কার্য্যপ্রণালীও অদ্ভুত। যে সকল স্থান দিয়া রেল-লাইন গিয়াছে, তাহার নিকটস্থ সহর ও পল্লী তাহাদের কার্য্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১৩৭টি সহরে চা-খানা স্থাপিত হইয়াছিল। বৎসরের শেষে উহা ৬৮০টিতে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া কেবল শুষ্ক চা বেচিবার জন্য ২ হাজার ৮ শত ৫৮টি দোকান খোলা হইয়াছিল। সম্বৎসরে ভারতের ৫২ হাজার ৪ শত ৩৩টি স্থানে চা প্রস্তুত করিয়া লোককে পরিবেশন করা হইয়াছে।

চায়ের বিজ্ঞাপনেও কম মস্তিষ্ক ও অর্থ নিয়োজিত হয় নাই। প্রচারকরা নানা প্রকারের বিজ্ঞাপন দ্বারা লোকের চিত্তাকর্ষণ করেন। যখন দেখেন যে, সহরে প্রায় শতকরা ৫০ জন লোক চা ধরিয়াছে, আর সহরেও চায়ের দোকানের অভাব নাই, তখন তাঁহারা অন্যত্র প্রচারকার্য্যের জন্য যাত্রা করেন। সেই সহরেও এই ভাবে টোপ ফেলা হয়। তবে যে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন, সে স্থানে বিক্রয় বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহাতেও দৃষ্টি রাখেন। টি সেস কমিটির বিবরণে প্রকাশ—এমন সহর নাই, যেখানে দুই এক বৎসর প্রচারের পর চায়ের কাটতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই।...

বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা দেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন এসেচে তার উত্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে, এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের ক্ষেত দিয়েচে ডুবিয়ে, তার জন্যে আমরা ভিক্ষা করতে ফিরুচি, কার কাছে? সেই ক্ষেতটুকু ছাড়া যার অন্নের আর কোন উপায় নেই, তারই কাছে। বাংলা দেশের সব চেয়ে সংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধন-হীনতার প্লাবন। এদেশের ধনীরা ঋণগ্রস্ত, মধ্যবিত্তেরা চিরদুশ্চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এদেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা সক্ষম, তারা যন্ত্র-শক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অঙ্গের বহু বিস্তার ঘটিয়েচে, তাই তারা জয়ী। এক দেহে তারা বহুদেহ। তাদের জন-সংখ্যা মাথা গণে নয়, যন্ত্রের দ্বারা তারা আপনাকে বহুগুণিত করেচে। এই বহুলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিরলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হয়ে পড়ে আছি।

সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অন্নের টানাটানি ঘটে তা নয়, হৃদয়ের ঔদার্য্য থাকে না। প্রভুমুখ-প্রত্যাশী জীবিকার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারিনে। বড়কে ছোট করতে চাই, একখানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যে-সব প্রবৃত্তি ভাঙন ধরাবার সহায়, সেইগুলিই প্রবল হয়, গড়ে তোলবার শক্তি কেবলি খোঁচা খেয়ে খেয়ে মরে।

দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী, তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্ররাজদের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হবে। মরতেই বসেচি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্রের থেকে ঠেলে ঠেলে বাঙালীকে কেবলি কোণ-ঠেসা করচে। বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা একা কাজ করে মানুষ—যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, আজ ডাইনে বাঁয়ে কেবলি তাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলি খাটাচ্চি পরীক্ষার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখ্‌তে।

একদিন বাঙালী শুধু কৃষিজীবী এবং মসীজীবী ছিল না; ছিল সে যন্ত্রজীবী. মাড়াই-কল চালিয়ে দেশ-দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েচে। তাঁত যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

অবশেষে আরও বড় যন্ত্রের দানব তাঁত এসে বাংলার তাঁতকে দিলে বেকার ক'রে। সেই অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার দিকে তাকিয়ে কেবলি মাটি চাষ ক'রে মরচি—মৃত্যুর চর নানা বেশে নানা নামে আমাদের ঘর দখল ক'রে বসলো।

তখন থেকে বাংলা দেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েচে কলম-চালনায়। ঐ একটি মাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেচে আপিসের বড়বাবু হবার রাস্তায়। সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর কোনো অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে, তার জন্যে যারা দায়িক তারা উপরে চোখ তুলে ভক্তিভরে বলে, জীব দিয়েচেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈরি না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত, তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিঁকতে পারবো।

এ কথা মানি, যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে

সমুদ্রমন্থনের মত সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসচে। তা ছাড়া অসৌন্দর্য্য, অশান্তি, অসুখ কারখানার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যেরই সামিল হয়ে উঠলো। কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তি-সম্পদকে দোষ দেবো না, দোষ দেবো মানুষের রিপুকে। খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেচে কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারেনি; উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্ব্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম ক'রে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু এই অধ্যবসায়ে সব চেয়ে তার বাধা ঘটচে কোন্‌খানে? যন্ত্রের সম্বন্ধে যেখানে সে অপটু ছিল সেখানেই। একদিন জারের সাম্রাজ্যকালে রাশিয়ার প্রজা ছিল আমাদের মত অক্ষম। তারা মুখ্যত ছিল চাষী। সেই চাষের প্রণালী ও উপকরণ ছিল আমাদেরই মত আদ্যকালের। তাই আজ রাশিয়া ধনোৎপাদনের যন্ত্রটাকে যখন সর্ব্বজনীন করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত তখন যন্ত্র যন্ত্রী ও কর্ম্মী আনাতে হচ্চে যন্ত্র-দক্ষ কারবারী দেশ থেকে। তাতে বিস্তর ব্যয় ও বাধা। রাশিয়ার অনভ্যস্ত হাত দুটো এবং তার মন না চলে দ্রুত গতিতে, না চলে নিপুণ ভাবে।

অশিক্ষায় ও অনভ্যাসে আজ বাংলা দেশের মন এবং অঙ্গ যন্ত্র-ব্যবহারে মূঢ়। এই ক্ষেত্রে বোম্বাই আমাদেরকে যে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেচে সেই পরিমাণেই আমরা তার পরোপজীবী হয়ে পড়েচি। বঙ্গবিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটেছিল, আবার যে-কোনো উপলক্ষ্যে পুনশ্চ ঘটতে পারে। আমাদের সমর্থ হ'তে হবে—সক্ষম হ'তে হবে, মনে রাখতে হবে যে আত্মীয়-মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মত কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।

সেই বঙ্গবিভাগের সময়ই বাংলা দেশে কাপড় ও সুতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। সমস্ত দেশের মন বড় ব্যবসায় বা যন্ত্রের অভ্যাসে পাকা হয়নি; তাই সেগুলি চল্‌চে নানা বাধার ভিতর দিয়ে মন্থর গমনে। মন তৈরি ক'রে তুলতেই হবে, নইলে দেশ অসামর্থ্যের অবসাদে তলিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মধ্যে বাংলা দেশ সর্ব্ব-প্রথমে যে-ইংরেজী বিদ্যা গ্রহণ করেচে, সে হ'ল পুঁথির বিদ্যা। কিন্তু যে ব্যাবহারিক বিদ্যায় সংসারে মানুষ জয়ী হয় য়ুরোপের সেই বিদ্যাই সব শেষে বাংলা দেশে এসে পৌঁছলো। আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতেখড়ি নিয়েচি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য্য জানেন কি ক'রে মার বাঁচানো যায়—সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল ক'রে নিয়েছিল। শুক্রাচার্য্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেচি—সে হ'ল হাতিয়ার বিদ্যার পাঠ। এই জন্যে পদে পদে হেরেচি, আমাদের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়লো।

বোম্বাই প্রদেশে একথা বল্‌লে ক্ষতি হয় না, যে, চরখা ধরো। সেখানে লক্ষ লক্ষ কলের চরখা পশ্চাতে থেকে তার অভাব পূরণ করচে। বিদেশী কলের কাপড়ের বন্যার বাঁধ বাঁধতে পেরেচে ঐ কলের চরখায়। নইলে একটি মাত্র উপায় ছিল নাগাসন্ন্যাসী সাজা। বাংলা দেশে হাতের চরখাই যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয়, তাহ'লে তার জরিমানা দিতে হবে বোম্বাইয়ের কলের চরখার পায়ে। তাতে বাংলার দৈন্যও বাড়বে, অক্ষমতাও বাড়বে। বৃহস্পতি গুরুর কাছে যে-বিদ্যা লাভ করেচি, তাকে পূর্ণতা দিতে হবে শুক্রাচার্য্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে। যন্ত্রকে নিন্দা ক'রে যদি নির্ব্বাসনে পাঠাতে হয়, তাহ'লে যে-মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই, তাকে সুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়ে হাতে-লেখা পুঁথির চলন করতে হবে। এ কথা মানবো যে, মুদ্রাযন্ত্রের অপক্ষপাত দাক্ষিণ্যে, অপাঠ্য এবং কুপাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেচে। তবু ওর আশ্রয় যদি ছাড়তে হয়, তবে আর কোনো একটা প্রবলতর যন্ত্রেরই সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে সেটা সম্ভব হতে পারবে।

যাই হোক, বাংলা দেশেও একদিন বিষম ব্যর্থতার

তাড়নায় 'বঙ্গলক্ষ্মী' নাম নিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেঁচে আছে। তার পরে দেখা দিল মোহিনী মিল, একে একে আরও কয়েকটি কারখানা মাথা তুলেচে।

এদের যেমন ক'রে হোক্ রক্ষা করতে হবে—বাঙালীর উপর এই দায় রয়েচে। চাষ করতে করতে যে কেবল ফসল ফলে তা নয়, চাষের জমিও তৈরি করে। কারখানাকে যদি বাঁচাই, তবে কেবল যে উৎপন্ন দ্রব্য পাবো তা নয়, দেশে কারখানার জমিও গড়ে উঠবে।

বাংলার মিল থেকে যে-কাপড় উৎপন্ন হচ্চে, যথাসম্ভব একান্ত ভাবে সেই কাপড়ই বাঙালী ব্যবহার করবে ব'লে যেন পণ করে। এ'কে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্ম-রক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালীর অন্নপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে এবং সেই জন্য বাঙালীর দুর্ব্বলতা যদি বাড়তে থাকে, তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। আমরা সুস্থ সমর্থ হয়ে দেহ রক্ষা করতে যদি পারি, তবেই আমাদের শক্তির সম্পূর্ণ চালনা সম্ভব হ'তে পারে। সেই শক্তি নিরশন-ক্ষীণতায় অবমর্দ্দিত হ'লে, তাতে, শুধু ভারতকে কেন, পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হবে।

বাঙালীর ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। আমাদের কোন্ কারখানায় কি রকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্চে বার-বার সেটা আমাদের সাম্‌নে আন্‌তে হবে। কলকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরের মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা, এবং বাঙালী যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো, যাতে বিশেষ ক'রে তারা বাঙালীর হাতের ও কলের জিনিষ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।

অবশেষে উপসংহারে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। বোম্বাইয়ের যে-সমস্ত কারখানা দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লায় কল চালিয়ে কাপড় বিক্রি করচে, তাদের কাপড় কেনায় যদি আমাদের দেশাত্মবোধে বাধা না লাগে, তবে আমাদের বাংলা দেশের তাঁতিদের কেন নির্ম্মম হয়ে মারি? বাঙালী দক্ষিণ-আফ্রিকার কোনো উপকরণ ব্যবহার করে না, করে বিলিতী সুতো। তারা বিলাতের আমদানি কোনো কল চালিয়ে কাপড় বোনে না, নিজেদের হাতের শ্রম ও কৌশল তাদের প্রধান অবলম্বন, আর যে তাঁতে বোনে সেও দিশি তাঁত। এখন যদি তুলনায় হিসাব ক'রে দেখা যায়, আমাদের তাঁতের কাপড়ের ও বোম্বাই মিলের কাপড়ের কতটা অংশ বিদেশী, তাহ'লে কি প্রমাণ হবে? তা ছাড়া কেবলি কি পণ্যের হিসাবটাই বড় হবে, শিল্পের দাম তার তুলনায় তুচ্ছ? সেটাকে আমরা মূঢ়ের মত বধ করতে বসেচি। অথচ যে-যন্ত্রের বাড়ি তাকে মারলুম, সেটা কি আমাদেরই যন্ত্র? সেই যন্ত্রের চেয়ে বাংলা দেশের বহু যুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত গরীবের হাত দুখানা কি অকিঞ্চিৎকর? আমি জোর করেই বল্‌বো, পূজোর বাজারে আমাকে যদি কিন্‌তে হয় তবে আমি নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ের বিলিতী যন্ত্রের কাপড় ছেড়ে ঢাকার দিশি তাঁতের কাপড় অসঙ্কোচে এবং গৌরবের সঙ্গেই কিনবো। সেই কাপড়ের সুতোয় বাংলা দেশের বহু যুগের প্রেম এবং আপন কৃতিত্ব গাঁথা হয়ে আছে।

অবশ্য সস্তা দামের যদি গরজ থাকে তাহ'লে মিলের কাপড় কিন্‌তে হবে, কিন্তু সেজন্য যেন বাংলা দেশের বাইরে না যাই। যাঁরা সৌখীন কাপড় বোম্বাই মিল থেকে বেশী দাম দিয়ে কিনতে প্রস্তুত, তাঁরা কেন যে তার চেয়ে অল্পদামে তেমনি সৌখীন শান্তিপুরী কাপড় না কেনেন, তার যুক্তি খুঁজে পাইনে। একদিন ইংরেজ বণিক্ বাংলা দেশের তাঁতকে মেরেছিল, তাঁতির হাতের নৈপুণ্যকে আড়ষ্ট ক'রে দিয়েছিল। আজ আমাদের নিজের দেশের লোকে তার চেয়ে বড় বজ্র হান্‌লে। যে-হাত তৈরি হ'তে কতকাল লেগেচে, সেই হাতকে অপটু করতে বেশী দিন লাগে না। কিন্তু স্বদেশের এই বহু কালের অর্চ্চিত কারুলক্ষ্মীকে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিতে কি কারও ব্যথা লাগবে না? আমি পুনর্ব্বার বলচি, কাপড়ের বিদেশী যন্ত্রে বিদেশী কয়লায় বিদেশী মিশাল যতটা, বিলিতী সুতো সত্ত্বেও তাঁতের কাপড়ে তার চেয়ে স্বল্পতর। আরও গুরুতর কথা এই যে আমাদের তাঁতের সঙ্গে বাংলা শিল্প আছে বাঁধা। এই শিল্পের দাম অর্থের দামের চেয়ে কম নয়।

এ কথা বলা বাহুল্য বাংলা তাঁতে স্বদেশী মিলের বা চরখার সুতো ব্যবহার করেও তাকে বাজারে চলনযোগ্য দামে বিক্রি করা যদি সম্ভবপর হয়, তবে তার চেয়ে ভাল আর কিছুই হ'তে পারে না। স্বদেশী চরখার উৎপাদন-শক্তি যখন সেই অবস্থায় পৌছবে, তখন তাঁতিকে অনুনয়-বিনয় করতেই হবে না; কিন্তু যদি না পৌছয়, তবে বাঙালী তাঁতিকে ও বাংলার শিল্পকে বিলিতী লৌহযন্ত্র ও বিদেশী কয়লার বেদীতে বলিদান করব না।

প্যারিসের অন্তর্জাতীয় ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

[শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুকে লিখিত]

International Colonial Exposition
Hindustan section
Paris, 27 th August, 1931.

সবিনয় নিবেদন,

আজ তিনমাসের বেশী হল পারিসে এসেছি। জেনে সুখী হবেন আমার একাদশবর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী অমলাকে সঙ্গে এনেছি। আমরা কলম্বো থেকে জাপানী লাইনের জাহাজে চেপে ১লা মে তারিখে নেপল্‌স নেমেছিলাম। তার পর পথে রোম, মিলন, লুজান, ব্রীগ প্রভৃতি ইটালী ও সুইজর্লণ্ডের প্রধান স্থানগুলিতে এক একটি দিন থেকে প্যারিসে পৌছেছি। পথে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই।

প্যারিসের এবারকার ইণ্টার ন্যাশন্যাল কলোনিয়াল একজিবিশনে বাংলার কয়েকটি বিশেষ শিল্পদ্রব্য দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। প্রথমে এসেই দেখলাম প্রায় সকল দেশের জন্য পৃথক পৃথক প্যাভিলিয়ন প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু আমাদের হিন্দুস্থান প্যাভিলিয়নটি অর্দ্ধসম্পন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অনুসন্ধানে জানলাম বোম্বাইবাসী কয়েকটি পার্শি হিন্দুস্থান মণ্ডপ প্রস্তুতের ভার নিয়েছিল, কিন্তু বেশী পরিমাণে ষ্টল হোল্ডার ভারত থেকে না আসায় টাকার অভাবে কার্য্য অসম্পন্ন রেখেই সরে পড়েছে। একজিবিশন কর্ত্তৃপক্ষগণ তারপর অন্য লোক বন্দোবস্ত করে অতিবিলম্বে হিন্দুস্থান বিভাগের বাড়ি প্রস্তুত করেছে। ৭ই মে সম্পূর্ণ একজিবিশন খোলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের হিন্দুস্থান বিভাগ খোলা হয়েছে ১১ই জুলাই তারিখে। একজিবিশনের এই প্রথম দুটি মাস আমরা কাজ করতে না পারায় আমাদের অনেক অসুবিধার কারণ হয়েছে।

আমরা ব্যতীত ভারতের আর একটি ব্যবসায়ী বোম্বাই থেকে এসেছেন। ইনি মোরাদাবাদ ও জয়পুরের নানাবিধ শিল্পদ্রব্য এনেছেন। এতদ্ভিন্ন ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নে আর আর প্রায় ৪০টি ভারতীয় ষ্টল হয়েছে; এদের অধিকাংশই য়ীহুদি এবং ইয়োরোপের নানা দেশে এদের ভারতীয় দ্রব্যের কারবার আছে। আমরা এবার আমাদের "ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের" অলঙ্কারাদি বেশী আনি নাই—আমরা মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের প্রস্তুত নানা প্রকার দ্রব্য এবং বাংলার নানা স্থানের কাঁসা ও পিতলের দ্রব্য বেশী এনেছি। এবার সকল দেশের আর্থিক অবস্থাই অতি মন্দ—বিশেষতঃ এদেশে ভারতীয় জিনিষ আনতে অনেক কাষ্টমস্ ডিউটী দিতে হয়, এজন্য আমাদের কারখানার অলঙ্কারাদি অতি সামান্যই এনেছি। সকলেই একবাক্যে বলছে হিন্দুস্থান বিভাগে আমাদের ষ্টলটিই সবচেয়ে ভাল হয়েছে।

পারিসের এই একজিবিশনটিতে যোগ দিয়ে সবচেয়ে লাভের বিষয় এই হচ্ছে—যে ইয়োরোপের নানাদেশের নানা জাতির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার এবং সেই সেই দেশের অনেক বিবরণ জানবার সুযোগ পাচ্ছি।

ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশেরই এক একটা বাড়ি এখানে প্রস্তুত হয়েছে এবং তাদের উপনিবেশ থেকে অনেক জিনিষ এনে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমেরিকার ইউনাটেড্ ষ্টেটস্ তাদের আগামী ১৯৩৩-এর শিকাগো একজিবিশন কেমন হবে তার মডেল ও অনেক বিষয় এখানে প্রদর্শন করছে। এই রকম নানাস্থানের বিষয় নিয়ে একজিবিশনটি খুবই দেখবার মত দাঁড়িয়েছে। হলণ্ড গবর্ণমেণ্ট জাভা দ্বীপের প্রদর্শনী নিয়ে এখানে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে বৃহৎ বাড়ি তৈরি করেছিল তা একজিবিশন আরম্ভের একমাস পরেই আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়। তারা আর দেড় মাসের মধ্যে নূতন বাড়ি তৈরি করে তেমনই আয়োজনে আবার জিনিষপত্রে পূর্ণ করেছে।

ফরাসীদের ইণ্ডোচায়নার ওক্কার মন্দিরের একটি সঠিক নমুনা এখানে অতি বৃহৎ আয়োজনে প্রস্তুত করেছে—এইটাই এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে বেশী দেখবার মত বিষয় হয়েছে। লণ্ডন থেকে অনেক বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ এই একজিবিশনটি দেখতে এসে থাকেন, এঁদের অনেকেই আমাদিগকে জানেন। তাঁদের অনেককে আমরা আমাদের বাসায় নিয়ে আনন্দ পেয়ে থাকি।

এখানে ইংরেজী ভাষায় কোন কাজ চলে না—ফরাসী ভিন্ন গতি নাই। প্রথম প্রথম আমরা এখানে এসেই একজন ফরাসী শিক্ষয়িত্রী রেখে সামান্য ভাবে ভাষা শিখেছিলাম। আমার কন্যা শ্রীমতী অমলা আমার চেয়ে একটু ভাল শিখেছে। একজিবিশনে আমাদের কার্য্যের জন্য আমরা একটি ফরাসী ও একটি জর্ম্মান মেয়ে নিযুক্ত করেছি। এরা দুজনেই ইংরেজী জানে এবং ইতালীয়, রুষীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি ইয়োরোপের প্রধান ভাষাগুলিতে বেশ কথাবার্ত্তা বলতে পারে। এদের মধ্যে জার্ম্মান মেয়েটি কুমারী এবং ফরাসীটি বিবাহিতা। বেশ মনোযোগের সঙ্গে আমাদের কাজ করছে। শ্রীমতী অমলা আমাদের ষ্টলের কোন কার্য্য করে না—খুব দেখেশুনে বেড়ায়। তাকে সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবার ব্যবস্থা করেছি। অমলা একাকী প্যারিসের সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে বেড়াতে পারে। অমলা দেশে ইংরেজীতে কথা কইতে শেখে নাই, এখানে এসে তিন মাসের মধ্যে বেশ ভাল ইংরেজী বলতে শিখেছে আর ফরাসী ভাষা বুঝতে পারে—সামান্য ভাবে বলতে পারে। একটি আশ্চর্য্য বিষয়—অমলা আমাদের কালো মেয়ে, কিন্তু এখানকার সব মেয়েরাই তাকে পরমাসুন্দরী বলে। আমাদের দেশের চোখ নাক মুখ চুল এরা অত্যন্ত সুন্দর দেখে। এটা নূতনত্বের দিক দিয়ে নয়—সত্যই এদেশের মেয়েদের চেয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের অনেকেরই গঠন সুন্দর। ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের নানা বিষয়ে যতটা পার্থক্য এই ফরাসীদের সঙ্গে ততটা নয়। ইংরেজ প্রভৃতি এ্যাংলো-সাক্সন জাতির ধারা অত্যন্ত স্বতন্ত্র রকমের। ফরাসীদের রীতিনীতির সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মিল আছে। রাশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের মিল আরও বেশী দেখতে পাচ্ছি। এবার অনেক দেখাশুনার সুযোগ পাচ্ছি।

অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত একজিবিশনটি থাকবে। তার পর আমরা জার্ম্মানীতে কিছুদিন থাকব, পরে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ দেখব। ১৯৩৩-এর শিকাগো একজিবিশনে যোগ দেবার আশা আছে, এটা এই যাত্রায়ই হবে, কি দেশে গিয়ে ফিরে এসে যোগ দেব তা এখনও ঠিক করি নাই।

আমরা সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছি। যখনকার যে সংবাদ পর পর জানাব। ইতি—

নিঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

ধ্রুবা

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পরলোকগত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ১৩৩৫ সালে আমাদিগকে দিয়াছিলেন। তাহারও প্রায় ৬ মাস পূর্ব্বে তিনি ইহা নাটকের আকারে আমাদিগকে প্রথমে দিয়াছিলেন। তাহারও কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর প্রত্যেকটি কথা ঐতিহাসিক না হইলেও, ইহার মুখ্য আখ্যানবস্তু ঐতিহাসিক এবং ইহার সমাজচিত্রও ইতিহাসসম্মত, এ-কথা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। এই চিত্রের মধ্যে হিন্দুরাজশক্তির পতনের অন্যতম কারণ লক্ষিত হইবে। অন্যান্য উপন্যাস আমাদের হাতে থাকায় এবং সেগুলির প্রকাশ ইতিপূর্ব্বে সমাপ্ত না হওয়ায় ইহা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নটী-পল্লী

সুন্দর পাটলিপুত্র নগরের নটীপল্লী অধিকতর সুন্দর। নটীরা সাধারণ দেহপণ্যজীবিনী ছিল না। নৃত্যগীতাদি কলায় কুশলতার জন্য যাহারা বিখ্যাত হইত, স্বাধীন প্রাচীন ভারতে তাহারা "গণিকা" আখ্যা লাভ করিত। অপেক্ষাকৃত কদর্থে এই শব্দের আধুনিক ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় উহার পরিবর্ত্তে নটী শব্দ প্রযুক্ত হইল। ইহারা স্বতন্ত্র পল্লীতে বাস করিত, এবং নগরাধ্যক্ষ এবং রাজধানীর মহাপ্রতীহার, তাহাদিগের মধ্য হইতে, তাহাদিগের সম্মতিক্রমে একজনকে মুখ্যা নির্ব্বাচন করিতেন।

এখন হইতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের শেষ দিকে নটীপল্লীর সহিত রাজপথের সংযোগস্থলে, নটীমুখ্যা মাধবসেনা অনেকগুলি নারী পরিবেষ্টিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতেছিল। সকলেই তাহাদের মুখ্যাকে রাজদ্বারে রামগুপ্ত নামক একব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে বলিতেছিল। উত্তরে মাধবসেনা বারবার বলিতেছিল, "ওরে, মহারাজ বৃদ্ধ, মহারাজ অসুস্থ।" সকলেই রামগুপ্তের ভয়ে আকুল, কেহই মুখ্যার কথা শুনিতে চাহিতেছিল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, রাজপথে নাগরিকগণের হস্তী ও রথ অধিক সংখ্যায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অসংখ্য দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মাধবসেনাদের পল্লী তখনও অন্ধকারময়। মাধবসেনা একজন নারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি আমাদের কারও ঘরে আলো জ্বলবে না?"

সে উত্তর দিল, "তোমার কি মনে নাই মাসী, আজ যে আবার কুমার রামগুপ্তের উদ্যানবিহার?"

"আবার আজ?"

"সেই জন্যে গলির মোড় থেকে সকল নাগরিকদের আজ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া মাধবসেনা বলিল, "সত্যই যদি কুমার রামগুপ্তের উদ্যানবিহার আরম্ভ হয়, তা হ'লে আমাদের সকলের কি দশা হবে?"

তরুণী রমণীরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'তোমায় ত বলছি মাসী, মহারাজের কাছে যাও।"

মাধবসেনা কি যেন উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত একজন খর্ব্বাকার যুবা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "এইবার!"

মাধবসেনা সভয়ে বলিয়া উঠিল, "কে, রামগুপ্ত?"

যুবক তখন মাতাল হইয়াছে, সে জড়িত কণ্ঠে বলিল, "চিনতে পাচ্ছ না? চাবুকের দাগ কি পিঠ থেকে মুছে গেছে?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, মাধবসেনার সঙ্গিনীরা সভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল। মাধবসেনা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "না, কিছুই মোছেনি। কুমার আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।"

অন্ধকার হইতে রামগুপ্তের একজন সঙ্গী বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "যতক্ষণ ভাল কথায় বলেছি, ততক্ষণ ত রাজী হওনি? এখন মজাটা টের পাচ্ছ?"

মাধবসেনা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামগুপ্তকে দূরে ঠেলিয়া দিল, সে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। মাধবসেনা নবাগতকে বলিল, "আমি এখনও বলছি, ব্রাহ্মণ, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। তুমি আমার অঙ্গস্পর্শ করো না রুচিপতি। ব্রাহ্মণ হলেও তুমি আমার কাছে চণ্ডালের অধম।"

রুচিপতি কিন্তু তাহার কথা শুনিল না, সে মাধবসেনার হাত ধরিয়া বলিল, "কেন বচন দিচ্ছ অপ্সরে, নগদ রূপচাঁদ পাচ্ছ, তাই ত যাচ্ছ? রুচিপতির ধারে কারবার নেই। রাজপুত্র যদি দুই এক ঘা দেয়, তাহ'লে সেটা রাজসম্মান ব'লে মেনে নেওয়া উচিত।"

মাধবসেনা বলিল, "তেমন ব্যবসা আমি করি না ব্রাহ্মণ, আমি আমার সমাজের মুখ্যা, রাজদ্বারে সম্মানিতা। যদি তোমার রাজপুত্রের পৈশাচিক অত্যাচার সহ্য করবার জন্য সামান্যা বারনারীর দরকার হয়, তাদের মুখ্যাকে ডেকে বল। দেখ কুমার, তুমি রাজপুত্র হলেও নটীপল্লীর অযোগ্য। চেয়ে দেখ, তোমার ভয়ে সদা সঙ্গীতরব-মুখরিত সহস্র দীপমালা সুসজ্জিত রাজধানীর নটীপল্লী আজ অন্ধকারময়, নীরব। রামগুপ্ত, তুমি সুরাপানে উন্মত্ত হ'লে পশুতে পরিণত হও, সেইজন্যে আমাদের মধ্যে কেউ তোমার সংস্পর্শে আসতে চায় না। গত পূর্ণিমায় তোমার উদ্যানে গিয়াছিলেম, কিন্তু তোমার প্রসাদলব্ধ কষাঘাতের চিহ্ন এখনও আমার অঙ্গে রয়েছে। আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গে যাব না।"

সুরাজড়িত কণ্ঠে রামগুপ্ত বলিল, "নিশ্চয় যাবি, ও-সব আমি বুঝি না। আমি আর কাউকে চাই না, কেবল তোকে চাই। তোকে যেতেই হবে।"

রুচি—"নিশ্চয় হবে, কুমার রামগুপ্ত যখন বল্‌ছেন, তখন বাবা মাধব, তোমায় যেতেই হবে। তুমি মুখ্যাই হও, আর যাই হও, ব্রহ্মবাক্য বেদবাক্য। কেন মিছা-মিছি গোলমাল করছ, রথে চড়ে ব'স। মাত্র এক দণ্ডের পথ, সেখানে গেলেই মেজাজ বদলে যাবে।"

মাধবসেনা—"না ব্রাহ্মণ, আমি যাব না, আমার রাজপ্রসাদের প্রয়োজন নাই। রামগুপ্ত রাজপুত্র হতে পারেন, কিন্তু প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার তাঁর অধিকার নাই। রাজমুদ্রাঙ্কিত আদেশ নিয়ে এস, যেখানে বল্‌বে সেখানে যাব।"

রুচি—"বাপ রামচন্দ্র, মাধবসেনা যে বড় লম্বা লম্বা কথা বলছে।"

রাম—"বলুক, চল রুচি, ওকে জোর করে টেনে নিয়ে যাই।"

দুইজনে যখন বল প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন উপায় না দেখিয়া মাধবসেনা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্, আমাকে রক্ষা কর্, কোথায় আছিস্, ছুটে আয়।" কিন্তু নটীপল্লী তখন জনশূন্য, দুরন্ত রামগুপ্তের রথ দেখিয়া রাজপথের লোকেরাও সরিয়া গিয়াছে, সুতরাং মাধবসেনার চীৎকারে কেহই আসিল না। মাধবসেনা একাকিনী দুইজন পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া পারিল না। তাহারা যখন রথের নিকট লইয়া গিয়াছে, তখন দূরে মশালের আলো দেখা গেল, ভয়ে রুচিপতি স্থির হইয়া দাঁড়াইল। নগরের চারিজন সশস্ত্র প্রতীহারের সহিত মহাপ্রতীহার রুদ্রভূতি নটীপল্লীতে প্রবেশ করিলেন। রুদ্রভূতি বৃদ্ধ, তিনি মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের আবাল্যসহচর। বিস্তৃত উত্তরাপথের সর্ব্বত্র রুদ্রভূতি সম্মানিত রাজপুরুষ, বৃদ্ধবয়সে জন্মভূমিতে ফিরিয়া তিনি মহানগর পাটলিপুত্রের নগর-রক্ষক বা মহাপ্রতীহার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

একজন প্রতীহার নটীপল্লীর মুখে আসিয়া বলিল, "প্রভু, এইখান থেকেই শব্দ আসছে।"

দ্বিতীয় প্রতীহার রুচিপতির মুখের সম্মুখে মশাল তুলিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "প্রভু এই যে রুচিপতি। এই ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার যখন এখানে উপস্থিত তখন যে গোলমাল হবে, তা আর আশ্চর্য্য কি?"

রুচিপতি বলিল, "সঙ্গে চন্দ্রের কলঙ্কের মত তোমাদের কুমার রামগুপ্তও যে উপস্থিত!"

সহসা রামগুপ্তের হাত ছাড়াইয়া মাধবসেনা রুদ্রভূতির পা জড়াইয়া ধরিল। সে বলিল, "মহাপ্রতীহার, আমায় রক্ষা করুন। কুমার রামগুপ্ত আমাদের উদ্যানে নিয়ে গিয়ে, আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন, সেইজন্যে কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চায় না। গত

পূর্ণিমায় তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম, এই দেখুন সে রাত্রির কষাঘাতের চিহ্ন। তিনি আমাকে বলপূর্ব্বক ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি কিছুতে যাব না। মহাপ্রতীহার আমাকে রক্ষা করুন। রামগুপ্ত রাজপুত্র বটে, কিন্তু আমরা কি ক্রীতদাসী ? প্রজার কি স্বাধীনতা নাই ?”

রাম—“না, নাই।”

রুদ্র—“কুমার আমি বৃদ্ধ, আপনার পিতৃবন্ধু, আমার সম্মুখে এরূপ আচরণ করা আপনার পক্ষে অশোভন। মাধবসেনা যখন স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে যেতে চায় না, তখন বলপ্রয়োগ রাজপুত্রের পক্ষে অনুচিত। বলপ্রকাশ করলে পৌরজন উত্তেজিত হয়ে উঠবে, এমন কি, ক্রমে একথা মহারাজের কানেও পৌছতে পারে।”

রুচি—“যা যা, ফোগ্‌লা বুড়ো, তোর আর ন্যাকাপনা করতে হবে না। তোর এখন গঙ্গাযাত্রার সময় হয়ে এসেছে, তুই এ সবের কি বুঝবি ?”

রুদ্র—“সাবধান রুচিপতি, মনে রেখো আমি মহা-প্রতীহার, তুমি ব্রাহ্মণ হলেও এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কুমার রামগুপ্ত আপনি সুরাপানে বিকল, প্রাসাদে ফিরে যান।”

রামগুপ্ত তখন উন্মাদ, সে অতি কুৎসিৎ ভাষায় বৃদ্ধ মহাপ্রতীহারকে গালাগালি দিল। রুচিপতির তখনও একটু জ্ঞান ছিল, সে বলিল, “রামচন্দ্র বাপধন, বড় বেগতিক। মাধবটাকে না হয় ছেড়ে দাও।”

রাম—“যাই হোক, মাধবসেনাকে ছাড়া হবে না।”

মাধব—“মহাপ্রতীহার আমাকে রক্ষা করুন, আজ রাত্রির মত রক্ষা করুন। আমি প্রভাতেই পাটলিপুত্র নগর পরিত্যাগ করে চলে যাব।”

রামগুপ্ত বলিল, “প্রভাত হতে যে এখনও সাড়ে তিন প্রহর বাকী আছে, অপ্সরি! এই সাড়ে তিন প্রহর আমার উদ্যানে থেকে তারপর কাল নগর পরিত্যাগ করে যেও।”

রুদ্র—“কুমার রামগুপ্ত, আপনি প্রাতঃস্মরণীয়, পরম-বৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সমুদ্র-গুপ্তের পুত্র। আমার সম্মুখে, এই প্রতীহারগণের সম্মুখে' প্রকাশ্য রাজপথে আপনার এরূপ নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ অত্যন্ত অন্যায়। আপনি মাধবসেনার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করবেন না। এখনই তার চীৎকারে সমস্ত নাগরিক উত্তেজিত হয়ে উঠবে। আমি আপনার পিতার ভৃত্য, সুতরাং আপনাকে শাসন করবার অধিকার আমার নাই। কিন্তু আমি ব'লে রাখ্‌ছি কুমার, এই অত্যাচারের কথা আপনার পিতার কানে উঠলে, তিনি আপনাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।”

রাম—“বুড়ো বেটার সঙ্গে বকে বকে গলাটা শুকিয়ে গেল। বাবা মাধব, এখন চল।”

রামগুপ্ত মাধবসেনার হস্তাকর্ষণ করিবামাত্র, রুচিপতি তাহার অন্যদিকে গিয়া দাঁড়াইল। প্রতীহারগণ রুদ্রভূতির দিকে চাহিল, কিন্তু মহাপ্রতীহার ইঙ্গিত করিয়া তাহা-দিগকে নিষেধ করিলেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া মাধবসেনা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, “ওরে তোরা কে আছিস্, ছুটে আয়, রামগুপ্ত আমার যম হয়ে এসেছে। আমাকে রক্ষা কর্। মহাপ্রতীহার, আপনি নগরের রক্ষাকর্ত্তা, এ অত্যাচারের কি প্রতীকার নাই ?”

অকস্মাৎ রাজপথে দুইজন মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে একজন মানুষ নটীপল্লীর মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, আর একজন ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “কি করছ কুমার ? এটা যে নটীপল্লী! তুমি রাত্রির অন্ধকারে এমন স্থানে এসেছ শুনলে, মহারাজ আত্মহত্যা করবেন। কোথায় কোন্ মাতাল আর্ত্তনাদ করছে, আর তুমি সেই শব্দ শুনে লাঞ্ছিতা নারীর উদ্ধারকল্পে ছুটে চলেছ।”

প্রথম যুবক বলিয়া উঠিল, “ছেড়ে দাও, জগদ্ধর, ছেলেমানুষী কোরো না। পুরুষ আর স্ত্রীলোকের গলার প্রভেদ কি আমি বুঝি না ? এরা কুলনারী না হলেও নারী ত ?”

সেই সময় মাধবসেনা আবার কাঁদিয়া উঠিল, যুবক জগদ্ধরের হাত ছাড়াইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেল। রুচিপতি বলিয়া উঠিল “রামচন্দ্র, ক্রমে লোক জুটে পড়ল, সরে পড় বাবা! মাধবী, সটান চলে আয় না বাবা, কেন গোলমাল করছিস ?”

যুবককে দেখিয়া মাধবসেনা সবলে রামগুপ্তের হাত ছাড়াইয়া নবাগতের পদপ্রান্তে পতিত হইল। সে বলিল, "কে তুমি জানি না, কিন্তু তুমি আমার পিতা, আমি অভাগিনী, সকলের ঘৃণিতা, জগতে আমার কেউ নাই। তুমি আজ রাত্রিতে এই নরপিশাচ রাজপুত্রের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর, আমি প্রভাতে এই পাপ রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাব।"

চন্দ্র—"কে তুমি নারী, সমুদ্রগুপ্ত জীবিত থাকতে তাঁর সাম্রাজ্যকে পাপরাজ্য বলছ? আমি সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত।"

রুদ্র—"শতায়ুঃ হও, বৎস। বৃদ্ধ রুদ্রভূতি অসহায় নারীর মত দাঁড়িয়ে তোমার জ্যেষ্ঠের অমানুষিক অত্যাচার দেখছে।"

রাম—"এ আপদটা আবার কোত্থেকে জুটল?"

রুচি—"সরে পড় রামচন্দ্র, তোমার ছোট ভাইটি বড় বেয়াড়া।"

কুমার চন্দ্রগুপ্ত রুদ্রভূতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকা, একি কথা? পিতা এখনও জীবিত, অথচ আপনি বলছেন যে, বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী মহানগরী পাটলিপুত্রের মহাপ্রতীহার আপনি অসহায়া নারীর মত দূরে দাঁড়িয়ে অপর নারীর প্রতি অত্যাচার দেখছেন?"

এই সময় রামগুপ্ত আসিয়া আবার মাধবসেনাকে ধরিল। মাধবসেনা ভয়ে চন্দ্রগুপ্তের পা জড়াইয়া ধরিতেই রুচিপতি অতি ইতর ভাষায় নানা প্রকার রসিকতা করিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রগুপ্ত তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "চুপ কর্ নরাধম। দাদা, তুমি কি জান না যে পিতা অসুস্থ? শীঘ্র প্রাসাদে ফিরে যাও, প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে এ কি করছ? তুমি কে নারী?

মাধব—"যুবরাজ, মহাপ্রতীহার সমস্তই দেখেছেন।"

রুদ্র—"যুবরাজ, এই নারী পাটলিপুত্রের নটীদের মুখ্যা মাধবসেনা। স্বয়ং মহারাজ এবং তোমার মাতা একে চেনেন। তোমার জ্যেষ্ঠ একে উদ্যানে নিয়ে গিয়ে যেতে চায় না। সেইজন্য রামগুপ্ত এবং তার সঙ্গী বলপূর্ব্বক একে নিয়ে যাচ্ছিল।"

চন্দ্র—"ভয় নাই মাধবসেনা, সমুদ্রগুপ্ত জীবিত থাকতে তাঁর রাজ্যে নারীর প্রতি কেউ বলপ্রয়োগ করতে পারবে না। কাকা, আপনি মহাপ্রতীহার হয়ে দাদার অত্যাচার নিবারণ করছেন না কেন?"

রাম—"তোরা আর মহাভারত আওড়াসনি বাবা। চন্দ্র, সরে যা বলছি। আমার যা খুশী করব, তাতে তোর বাবার কি?"

চন্দ্র—"আমার বাবার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে বলেই এই নারীকে রক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছি, দাদা। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমার বাবার আর তোমার বাবার প্রভেদ নাই।"

রুদ্র—"যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত, রাজভৃত্য হয়ে রাজপুত্রের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আছে কি-না জানি না। দীর্ঘকাল রাজসেবা করেছি, দীর্ঘকাল পাটলিপুত্র শাসন করেছি, কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ রাজপুত্রের অত্যাচার কখনও নিবারণ করতে হয়নি।"

জগদ্ধর—"ভাগ্যে মহানায়ক মহাপ্রতীহার এখানে উপস্থিত ছিলেন, তা না হলে হয়ত ভ্রাতৃরক্তপাত হয়ে যেত।"

চন্দ্র—"জগৎ, আজ রাত্রে এই নারীকে রাজপ্রাসাদে আশ্রয় দিতে হবে।"

রাম—"তোমাদের বক্তৃতার চোটে এমন বহুমূল্য নেশাটা ছুটে গেল।"

চন্দ্র—"মাধবসেনা তুমি নির্ভয়ে আমাদের সঙ্গে এস। দাদা জেনো, এ আমার আশ্রিতা। তুমি প্রাসাদে ফিরে যাও।"

রাম—"আমি মাধবসেনাকে নিয়ে যাব।"

চন্দ্রগুপ্ত জগদ্ধরকে বলিলেন, "তুই মাধবসেনাকে প্রাসাদে নিয়ে যা, আমি পরে আসছি।"

জগদ্ধর মাধবসেনাকে লইয়া অগ্রসর হইল। রামগুপ্ত যেমন তাহাকে ধরিতে গেল, অমনি চন্দ্রগুপ্ত তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। সুরামত্ত রামগুপ্ত মাটিতে

অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু রামগুপ্তের পতন দেখিয়া সে মাধবসেনার গৃহের অলিন্দের অন্ধকারে লুকাইল।

চন্দ্রগুপ্ত অদৃশ্য হইলে, রামগুপ্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন রুচিপতি আসিয়া তাহার অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দিল। রুদ্রভূতি নিজের অনুচরদের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "চল বাবা রামচন্দ্র, এ পাড়ায় আজ আর সুবিধা হবে না। বুড়ো বেটাকে দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে। পাটলিপুত্র নগরে ফুর্ত্তির অভাব কি?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমুদ্র-গৃহ

উজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সভামণ্ডপের নাম সমুদ্র-গৃহ। সমুদ্রগুপ্ত নির্ম্মিত সভাকুট্টিমের একপার্শ্বে শুভ্র মর্ম্মর নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ বেদী, তাহার উপরে সুবর্ণনির্ম্মিত মণিমুক্তাখচিত বৃহৎ সিংহাসন। বেদীর নিম্নে অসংখ্য চন্দন এবং বহুমূল্য কাষ্ঠনির্ম্মিত, হস্তীদন্তখচিত সুখাসন। বিশাল সভামণ্ডপ প্রায় জনশূন্য, চারিদিকে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, প্রতি দ্বারের বাহিরে সশস্ত্র প্রতীহার ও ভিতরে মূক-বধির অন্তঃপাল। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত গোপন পরামর্শের জন্য সাম্রাজ্যের মহানায়কদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

ভারতবিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত এখন বৃদ্ধ ও রুগ্ন, তিনি সিংহাসনে অর্দ্ধশয়ান। বেদীর নিম্নে সুখাসনে বৃদ্ধ মহানায়কগণ উপবিষ্ট। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী বা মহামাত্য রবিগুপ্ত, প্রধান সেনাপতি বা মহাবলাধিকৃত দেবগুপ্ত, প্রধান বিচারপতি বা মহাদণ্ডনায়ক রুদ্রধর, রাজস্ব-বিভাগের মন্ত্রী বা মহাসচিব বিশ্বরূপ শর্ম্মা, রাষ্ট্রীয়-বিভাগের মন্ত্রী বা মহাসন্ধিবিগ্রাহিক হরিষেন, মহাপ্রতীহার রুদ্রভূতি, সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া আছেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক মহানায়কগণ ইঁহাদের পশ্চাতে উপবিষ্ট। সমুদ্রগুপ্ত হরিষেনকে বলিতেছিলেন, "হরিষেন, ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, আমারও সন্ধ্যা হয়ে এল। প্রতিদিন বলহীন হচ্ছি, একহাতে গরুড়ধ্বজ এখনও মথুরায় শক প্রবল। সেই জন্য তোমাদের আহ্বান করেছি।"

বিশ্বরূপ বলিলেন, "বহুযুদ্ধ করেছেন সম্রাট, এখন মহাযুদ্ধের সময় আসছে। আমিও দীর্ঘকাল রাজসেবা করেছি, এখন ক্রমশ অচল হয়ে পড়ছি।"

দেব—"মহারাজ, আমিও বুঝতে পারছি যে, রাজকার্য্য আমাদের দিয়ে আর চলবে না। সাম্রাজ্যের মন্ত্রণাগারে কৃষ্ণকেশ যুবার প্রয়োজন।"

রবি—"সে প্রয়োজনটা আমি ক'দিন ধরেই বিলক্ষণ অনুভব করছি।"

সমুদ্র—"কেন রবিগুপ্ত?"

রবি—"মহারাজ, এই শুভ্রকেশ দিনের বেলায় পৌণ্ডিক বীথিতে শোভা পায় না, এই দন্তহীন মুখ প্রমোদভবনের অলিন্দে দেখাতে লজ্জা বোধ হয় বলে—"

সমুদ্র—"কার কথা বলছ, রবিগুপ্ত?"

রবি—"যে মস্তক কেবল আর্য্যপট্টের সম্মুখে নত হয়, তা সহজে—"

রবিগুপ্তের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে পট্টমহাদেবী দত্তদেবী ছত্রধারিণী, দুই জন চামরধারিণী ও তাম্বূলধারিণী দাসীর সহিত সমুদ্র-গৃহে প্রবেশ করিলেন, সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দত্তদেবী বেদী বা আর্য্যপট্টের নিম্নে সম্রাটকে প্রণাম করিয়া সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন। রবিগুপ্ত পুনরায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "সে মস্তক দাসীপুত্রের চরণতলে নত হয় না বলে, কেমন রবিগুপ্ত?"

বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধ সম্রাট বলিয়া উঠিলেন, "পট্টমহাদেবীর মুখে এ কি কথা?"

তখন হরিষেন কহিলেন, "কিন্তু সত্য কথা মহারাজাধিরাজ, মহাকুমার রামগুপ্তের অত্যাচারে পাটলিপুত্রবাসী জর্জ্জরিত।"

এই সময় টলিতে টলিতে প্রতীহার ও দণ্ডধরদের বাধা না মানিয়া রামগুপ্ত সমুদ্র-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ সমুদ্রগুপ্ত, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, বেগে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

জড়িতকণ্ঠে রামগুপ্ত বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবা, থুড়ি মহারাজ—চন্দ্রগুপ্ত বলপ্রকাশ ক'রে মাধবসেনাকে নিয়ে যায় কেন? আমি বিচার চাই।"

দত্ত—"কুমার রামগুপ্ত, প্রাসাদের সমুদ্র-গৃহ সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণ, পাটলিপুত্রের শৌণ্ডিকবীথি নয়। শীঘ্র নিজের মায়ের কাছে ফিরে যাও।"

রাম—"তা আর নয়! আমি বেটা ভ্যাবাগঙ্গারামের মত তোমার কথায় ফিরে যাই, আর তোমার নিজের ছেলেটি নিশ্চিন্তমনে যা খুশী তাই করুক। তা হচ্ছে না দেবী, রামগুপ্তও রাজপুত্র।"

রোষে দত্তদেবীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার ইঙ্গিতে দুইজন মূক দণ্ডধর রামগুপ্তকে ধরিল ও একজন বাহিরে চলিয়া গেল। অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সমুদ্রগুপ্ত রুদ্রভূতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাপ্রতীহার, জয়স্বামিনীর পুত্র এ কি বলে? তুমি কিছু জান কি?

রুদ্রভূতি—"জানি বইকি, ভট্টারক। মহাকুমার রামগুপ্ত যদি মহারাজাধিরাজের পুত্র না হতেন, তাহ'লে কাল রাত্রিতে এই বৃদ্ধ নটীপল্লীতে কষাঘাতে তার পৃষ্ঠ দীর্ণ করে দিত।"

সমুদ্র—"রুদ্র, তুমি না আমার বাল্যের সহচর, যৌবনের সঙ্গী, জীবনমরণের বন্ধু। আজ সমুদ্র-গৃহে বসে তুমিই আমাকে এই কথা শোনালে? যে রাজপুত্র রাত্রিকালে কুক্রিয়াসক্ত হয়েছিল, তুমি তার দণ্ডবিধান করনি কেন?"

বিশ্বরূপ—"মহারাজাধিরাজ, সাম্রাজ্যের সাধারণ দণ্ডবিধি রাজপুত্রের প্রতি প্রযোজ্য নয়।"

সমুদ্র—"সত্য, মহাদণ্ডনায়ক! এ বানর আমারই কুলকলঙ্ক। এটাকে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছে না কেন?"

দেব—"ভট্টারক, কুমার রামগুপ্ত সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে যে অভিযোগ উপস্থিত করেছেন, তার বিচার আবশ্যক।"

সমুদ্র—"বিচার আমার মুণ্ড। মহানায়কবর্গ আমার প্রতি দয়া কর।"

রুদ্র—"দেব, পট্টমহাদেবীর আদেশে দণ্ডধর কুমার চন্দ্রগুপ্তকে ডাকতে গিয়েছে, এখনই তাঁর মুখে সব শুনতে পাবেন।"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মূক দণ্ডধর কুমার চন্দ্রগুপ্তের সহিত ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যপট্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অসি কোষমুক্ত করিয়া তাহার অগ্রভাগ কপালে স্পর্শ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের জয়, পিতা স্মরণ করেছেন?"

সমুদ্রগুপ্ত বলিলেন, "বস চন্দ্র। তোমার জ্যেষ্ঠ তোমার বিরুদ্ধে এক কুৎসিত অভিযোগ উপস্থিত করেছেন, শুনেছ?"

চন্দ্র—"ভট্টারক, কাল রাত্রিতে আমি যখন মহাদণ্ডনায়ক রুদ্রধরের গৃহ থেকে প্রাসাদে ফিরে আসছি তখন পথে এক রমণীর করুণ আর্ত্তনাদ শুনে নিকটে গিয়ে দেখলাম, যে, কুমার রামগুপ্ত এক নটীমুখ্যাকে বলপূর্ব্বক উদ্যানে নিয়ে যাচ্ছেন। মহাপ্রতীহার রুদ্রভূতি আর কুলপুত্র জগদ্ধর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পিতা, আমি সেই অসহায়া নারীকে উদ্ধার ক'রে প্রাসাদে নিয়ে এসেছি।"

সমুদ্র—"উপযুক্ত কার্য্য করেছ, পুত্র।"

চন্দ্র—"পিতা, মাধবসেনা আর কুলপুত্র জগদ্ধর সমুদ্র-গৃহের দুয়ারে উপস্থিত আছে।"

সমুদ্র—"সাক্ষীর প্রয়োজন নেই, পুত্র। প্রজাপালনই রাজধর্ম্ম। বিশ্বরূপ, মাধবসেনাকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ সহস্র স্বুবর্ণ দিয়ে রাজকীয় রথে গৃহে পাঠিয়ে দাও। আর ব'লে দাও সে যেন ভুলে না যায়, বৃদ্ধ হলেও সমুদ্রগুপ্ত এখনও জীবিত।"

চন্দ্রগুপ্ত অভিবাদন করিয়া সমুদ্র-গৃহ ত্যাগ করিলেন। সম্রাটের ইঙ্গিতে দুইজন দণ্ডধর রামগুপ্তকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। তখন দেবগুপ্ত বলিলেন, "ভট্টারক, দেবী জয়স্বামিনী মাঝে মাঝে বলেন, যে, তাঁর পুত্রই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, একথা আমিও শুনেছি, মহারাজ।"

সমুদ্রগুপ্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন, চামরধারিণীরা বেগে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ সম্রাট মাঝে মাঝে থামিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অসম্ভব। পাগলের কথা, মাতালের কথা। বিশ্বরূপ, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, আর্য্যপট্টে যুবকের আবশ্যক।"

বিশ্বরূপ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ভট্টারক, আমি অনেক দিন থেকেই নিবেদন করছি, যে, কুমার চন্দ্রগুপ্তকে অবিলম্বে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা প্রয়োজন।"

সমুদ্রগুপ্ত কম্পিতপদে আর্য্যপট্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহানায়কবর্গ, সেইজন্যই আজ আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি। আপনাদের মতামত আমার অবিদিত ছিল না, তবু সাম্রাজ্যের রীতি অনুসারে যুবরাজের অভিষেকের পূর্ব্বে মহানায়কবর্গের অনুমতি প্রয়োজন।"

বিশ্বরূপ বলিলেন, "ভট্টারক, বিলম্বের প্রয়োজন নাই। শুভদিন নিরূপণের জন্য মহাপুরোহিতকে আহ্বান করুন।" রুদ্রভূতি ইঙ্গিত করিয়া মূক দণ্ডধরকে ডাকিলেন, সে তাঁহার আদেশে সম্রাটের নিকটে গেল, সম্রাট ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময় প্রধান বিচারপতি রুদ্রধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের জয়, আমার কন্যা ধ্রুবদেবীর সঙ্গে সাম্রাজ্যের যুবরাজ ভট্টারকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে আছে, এখন মহারাজের অনুমতি পেলেই বাগ্‌দত্তা কন্যা সম্প্রদান করি।"

সমুদ্র—"পুত্রবধূর মুখ দর্শনের ইচ্ছা আমার অপেক্ষা পট্টমহাদেবীর প্রবল। শুভকার্য্যে বিলম্ব অনাবশ্যক, শুনেছি ধ্রুবা পরম গুণবতী, এবং আর্য্যপট্টে উপবেশন করবার যোগ্যা।"

রুদ্রধর—"মহাশয়বর্গ, তোমরা সাক্ষী, যুবরাজ ভট্টারকের সঙ্গে আমার কন্যা ধ্রুবদেবীর বিবাহ দিতে মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত আজ অঙ্গীকার করলেন।"

সকলে সাধুবাদ করিয়া সাক্ষী হইলেন। এই সময় সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরোহিত সমুদ্র-গৃহে প্রবেশ করিলে সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরোহিত নারায়ণশর্ম্মা সম্রাটের আদেশ অনুসারে বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় যুবরাজের অভিষেক এবং পূর্ণিমায় তাঁহার বিবাহের দিন স্থির করিলেন।

এমন সময় সমুদ্রগৃহের তোরণে দাঁড়াইয়া একজন নারী বলিয়া উঠিল, "আমায় আটকাবি তুই? তোর

সমুদ্রগুপ্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জয়স্বামিনী।"

দন্তদেবী বলিলেন, "মাতাল অবস্থায়।" বলিতে বলিতে কম্পিতচরণে বিস্রস্তবসনা বৃদ্ধা মহাদেবী জয়স্বামিনী সমুদ্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। সমুদ্রগুপ্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখানে কেন? অন্তঃপুরে যাও।"

জয়স্বামিনী—"অন্তঃপুরে ত অনেকদিন আছি মহারাজ, আর ভাল লাগে না।"

সমুদ্র—"হরিষেন, শীঘ্র অন্তঃপুর থেকে চারজন প্রতীহারীকে ডেকে নিয়ে এস।"

জয়স্বামিনী উভয়হস্তে হরিষেনের পথরোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যাবে, একটু দাঁড়াও। মহানায়কবর্গ আমি সমুদ্র-গৃহে মাত্‌লামি করতে আসিনি। দ্বাদশ প্রধান যুবরাজ নির্ব্বাচন করবেন শুনে বিচার প্রর্থনা করতে এসেছি। প্রতীহারী কি হবে মহারাজ? আমি মদ খাই বটে, কিন্তু এখন আমি মাতাল নই।"

বিশ্বরূপ উঠিয়া বলিলেন, "মহাদেবী, বিধি অনুসারে দণ্ডধর বিচারে অশক্ত না হইলে, দ্বাদশ-প্রধান বিচার করিতে পারেন না।"

জয়—"আমাদের দণ্ডধর সমুদ্রগুপ্ত বিচারে অশক্ত বলেই আপনাদের কাছে এসেছি।"

দন্তদেবী—"মিথ্যা কথা, মহাদেবি!"

জয়—"ওরে দত্তা, একদিন তোর মত আমারও গণ্ডে সহস্রদল পদ্মের আভা ফুটত, জয়াকে দেখবার জন্যে পাটলিপুত্রের পথে লোক ছুটে আস্‌ত। তখন এই রাজা— এখন তোর রাজা—এই চরণের নূপুর হবার জন্যে পথে গড়াগড়ি যেত।"

দেব—"কি বিচার চাও মা? মহারাজ যে বিচারে অশক্ত, তার প্রমাণ কি?"

বস্ত্রমধ্য হইতে জীর্ণ শতখণ্ড ভূর্জ্জপত্র বাহির করিয়া জয়স্বামিনী বলিলেন, "মহারাজ, পঁচিশ বৎসর আগে আমি কুলকন্যা ছিলাম, সে কথা মনে আছে কি? আজ থেকে পঁচিশ বৎসর আগে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে, পাটলিপুত্রের জীর্ণ বাসুদেবের মন্দিরে, দেবমূর্ত্তি স্পর্শ ক'রে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে

সমুদ্র—"না।"

জয়—"তা থাকবে কেন? তার পরেই যে আমার গণ্ডের সহস্রদল শুকিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে দত্তার গণ্ডে শত স্থলপদ্ম ফুটে উঠল। মহানায়কবর্গ, চেয়ে দেখ মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত মিথ্যাবাদী—এই দেখ তাঁর নিজের হাতের লেখা, প্রতিশ্রুতি। জয়স্বামিনীকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করবার আগে সমুদ্রগুপ্ত আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করবেন ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—"

দত্ত—"মিথ্যা কথা।"

জয়—"মহানায়কবর্গ, বৃদ্ধ সমুদ্রগুপ্ত দণ্ডধারণে অশক্ত। তিনি এখন আমার সপত্নী দত্তার হাতের পুত্তলিকা মাত্র। মহামাত্য, মহাসচিব, মহাবলাধিকৃত, এই দেখ সমুদ্রগুপ্তের স্বাক্ষর।

দত্ত—"সত্য, দেব-প্রভু, এ যে তোমারই স্বাক্ষর? স্পষ্ট লেখা রয়েছে, 'স্বহস্তোয়ং মম মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তস্য'।"

সমুদ্র—"দেবি এ কি স্বপ্ন?"

জয়—"মহারাজের প্রতিশ্রুত বর আজ তাই চাইতে এসেছি। আমার পুত্র রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। আজ চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্ত্তে যৌবরাজ্য ও সিংহাসন রামগুপ্তকে দেওয়া হোক।"

সমুদ্র—"অসম্ভব।"

দেব—"এ যে রামায়ণের কৈকেয়ী!"

বিশ্বরূপ—"মহারাজাধিরাজের জয়! ভূর্জ্জপত্রে স্পষ্ট আপনার স্বাক্ষর রয়েছে। মহারাজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন কি-না তা আপনিই বিচার করুন।"

রবি—"সর্ব্বনাশ হবে, মহারাজ, রামগুপ্ত যুবরাজ হ'লে রাজ্য রসাতলে যাবে।"

বিশ্বরূপ—"আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, যে, অচিরে শক পাটলিপুত্রে নৃত্য করবে।"

হরি—"শকরাজ যদি বিশ্বনাথের কাশী রাখেন, তাহ'লে আমাদের পক্ষে কাশীবাস।"

দত্ত—"সমুদ্রগুপ্ত কখনও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন না, আজও করবেন না। মহাপ্রতীহার, সাম্রাজ্যের নগরে বৈশাখীর শুক্লা তৃতীয়ায় কুমার রামগুপ্ত রাজধানীতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন।"

সমুদ্র—"দেবি!"

দত্ত—"মহারাজাধিরাজ, আজীবন সত্যপালন ক'রে এসে বৃদ্ধবয়সে কিসের জন্য সত্যভঙ্গ করবেন? পুত্র, সে ত অঙ্গের ক্লেদ; পত্নী, পুরুষের ছায়া; রাজ্য, সমুদ্র-তরঙ্গের মুখে বালির প্রাকার। একমাত্র সত্যই নিত্য, সত্যানুরোধে রামচন্দ্র নিরপরাধা জানকীকে নির্ব্বাসন দিয়েছিলেন।"

সমুদ্র—"দত্তা, দীর্ঘজীবনের সঙ্গিনী তুমি—তুমি সমস্তই জান। মাতৃসত্য মনে আছে? যেদিন পাটলিপুত্র হতে শক দূরীভূত হয়েছিল, সেই দিন গঙ্গাতীরে মহাশ্মশানে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে, মগধে সন্তানের মাতা আর বিনা অপরাধে অশ্রু বিসর্জ্জন করবে না। সেই প্রতিজ্ঞা যে ভঙ্গ হবে, মহাদেবি!"

দত্ত—"না, না, হবে না মহারাজ, কিন্তু জয়ার পুত্রকে যদি সিংহাসন না দাও মহারাজ, তাহ'লে অরক্ষিত প্রতিশ্রুতির শোকে আর তার অশ্রুজলে তোমার সাম্রাজ্য ভেসে যাবে। আমার দিকে চেয়ে দেখ মহারাজ, এ চক্ষু শুষ্ক মরুভূমি—অনায়াসে মনের সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ রোধ করে রাখবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে আদেশ কর, প্রভু!"

রবি—"মহাদেবি, মা, কি বলছ বুঝতে পারছ কি? এ অপমান অভিমানের কথা নয় মা,—শতসহস্রের সর্ব্বনাশের কথা। যদি এই সুরামত্তা দাসীর পুত্র, মদ্যপ লম্পট, উচ্ছৃঙ্খল রামগুপ্ত এই আর্য্যপট্টে কোনদিন উপবেশন করে, তাহলে নবস্থাপিত মগধ-সাম্রাজ্য নিমিষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।"

জয়—"এই কি দ্বাদশ-প্রধানের বিচার?"

দত্ত—"না মহাদেবি, রাজমাতা হবে তুমি। প্রভু, বিলম্ব করছ কেন?"

বিশ্ব—"সমুদ্রগুপ্ত মুহূর্ত্তের জন্য আর্য্যপট্ট ভুলে যাও। গঙ্গাতীরে মহাশ্মশানে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কচের অনুরোধ স্মরণ কর। তুমি কে, আমি কে? নারায়ণের অনন্তচক্রের

দেয়,—কে জানে? তুমি নিমিত্তমাত্র, পট্টমহাদেবীর কথা সত্য, মগধ-সাম্রাজ্য যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তা'হ'লে ধর্ম্মই তাকে রক্ষা করবেন।"

দেব—"এ বাতুলের কথা ব্রাহ্মণ, রাষ্ট্রনীতির কথা নয়। এখনও মথুরায় শক প্রবল, এখনও পাটলিপুত্রের পৌরজন শকের নামে কম্পিত হয়। রামগুপ্ত কখনও এ রাজ্য রক্ষা করতে পারবে না।"

জয়—"এই কি দ্বাদশ-প্রধানের বিচার ?"

দত্ত—"না দেবি, সমুদ্রগুপ্ত চিরদিন সত্যরক্ষা ক'রে এসেছেন, আজও করবেন।"

সহসা বৃদ্ধ রুগ্ন সমুদ্রগুপ্ত আর্য্যপট্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহানায়কবর্গ, আমার আদেশ, কুমার রামগুপ্ত বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে। জয়া, যে আর্য্যপট্টে তোর গর্ভজাত পুত্র উপবেশন করবে, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত আর তা স্পর্শ করবে না।" বৃদ্ধ সমুদ্রগুপ্ত বলিতে বলিতে হতচেতন হইয়া আর্য্যপট্টে পড়িয়া গেলেন। দত্তদেবী তাঁহাকে না ধরিলে হয়ত সেইখানেই তাঁহার জীবনান্ত হইত। মহানায়কবর্গ অস্থির হইয়া উঠিলেন। কেহ বৈদ্য আনিতে ছুটিল, কেহ শিবিকা আনিতে গেল, কেহ জলসিঞ্চন করিতে লাগিল, কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের চেতনা ফিরিল না। শিবিকা আসিলে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল।

ক্রমশঃ

নয়া দিল্লী মহিলা সমিতির বিবরণ

শ্রীশৈলবালা দেবী

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল "নয়া দিল্লী মহিলা সমিতি"র সূত্রপাত হইয়াছে। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দেবীকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকটা পাড়ায় বাড়ি বাড়ি যাইয়া একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করি এবং ইহার উপকারিতা বুঝাইয়া বলি। ইহাতে কেহ কেহ আগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইতে রাজী হন। সেই অনুসারে ১৯২৮ সালের নভেম্বরের প্রথম হইতে প্রতিসপ্তাহে সোম অথবা বুধ বারে সমিতির অধিবেশন হইতে থাকে। সমিতির জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান না থাকাতে সুবিধা অনুযায়ী এক এক সভ্যার গৃহে সমিতির অধিবেশন হয়। সেলাই, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা ইহাই সচরাচর হইয়া থাকে। প্রথম অবস্থায় সমিতির ব্যয়ে কাপড় আনাইয়া সভ্যাগণ জামা ইত্যাদি সেলাই করিয়া নিজেদের মধ্যে বিক্রয় করেন এবং লভ্যাংশ সমিতিকেই দান করেন।

সমিতির নিজস্ব ছোট একটি লাইব্রেরী করিবার ইচ্ছায় কুড়ি বাইশ টাকার কিছু বই কিনিয়া রাখা হইয়াছে। সমিতির প্রারম্ভ হইতে এই তিন বৎসর অবধি "বঙ্গলক্ষ্মী" পত্রিকাও রাখা হইতেছে।

সমিতির মাসিক চাঁদা হইতে প্রতি মাসেই কোনও কোনও দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করা হয়। বাকী জমা থাকে। বিশেষ বিশেষ দানের জন্য সভ্যাগণ সাধ্যানুযায়ী সাময়িক চাঁদা দিয়া থাকেন। এখানকার দুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে পরিবারবর্গের অতি দুরবস্থা ঘটে। সমিতি হইতে তাঁহাদের দশ-বার টাকা সাহায্য করা হয়। সম্প্রতি একজনকে দশ টাকা দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন মহাশয়কে অনুন্নত জাতি-সমূহের শিক্ষার জন্য সমিতি হইতে দশ টাকা দেওয়া হইয়াছে। কয়েক জন দরিদ্রা বৃদ্ধাকেও দুঃস্থ পরিবারে কন্যা বিবাহের সাহায্যে প্রায় ৩০৲ দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৯ সালের বন্যায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট ২৫৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠানো হয়। একটি বালিকা-স্কুলে ৫৲ ও স্থানীয় কালীবাড়িতে ৪৲ অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের প্লাবনে সমিতির পক্ষ হইতে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া "সঙ্কট-ত্রাণ-সমিতি"তে আচার্য্য রায়কে ৮০৲ পাঠানো হইয়াছে। হিন্দু মহাসভায় শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরীকে ১৫৷৷০ ও নূতন পুরাতন কাপড় বন্যার সাহায্যার্থ পাঠানো হইয়াছে।

গত মার্চ মাসে একদিন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

গত ১৪ই জানুয়ারি সমিতির সভ্যাগণের চেষ্টায় একটি ছোট প্রদর্শনী খোলা হয়। তদানীন্তন উৎসাহী সভ্যা গায়ত্রী দেবী নিজগৃহে দুই দিন প্রদর্শনী বসাইবার স্থান দিয়া এবং অন্য নানা সুবন্দোবস্ত করিয়া সমিতির যথেষ্ট সাহায্য করেন। সভ্যাগণ নানা প্রকার সূচের কাজ, জামা, খদ্দর ও অন্য শাড়ী, সাবান তেল গন্ধদ্রব্যাদি, বই, খাগড়াই বাসন, আচার, বড়ি, খাবার, পুতুল খেলনা ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্যের দোকান করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু মহিলা ইহাতে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানটি সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অনেক জিনিষ ক্রয়-বিক্রয় হওয়াতে মহিলাদের পক্ষে উৎসবটি অতিশয় আনন্দদায়ক হইয়াছিল। সভ্যাগণ লাভের কিয়দংশ সমিতিকে দিয়াছেন।

আমাদের জীবনে আনন্দের পরিসর সঙ্কীর্ণ। সে অভাব পূরণ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও সমবেত আনন্দের কোন ব্যবস্থা আমরা করিয়া



নয়া দিল্লী মহিলা-সমিতি

...তে পারি নাই। তবে মধ্যে মধ্যে কোন সভ্যার গৃহে সকলে একত্র হইয়া জলযোগ ও সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের বর্ত্তমান সভ্যাসংখ্যা পঁচিশ-ত্রিশ জন। শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দেবী প্রাচীনা হইলেও অতিশয় উদ্যোগী এবং মেয়েদের উন্নতির জন্য তাহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা। সমিতির সকলেই তাঁহাকে মাতৃতুল্য শ্রদ্ধা করেন।

আমাদের সমিতি অতিশয় ক্ষুদ্র, এখন পর্য্যন্ত কোন বৃহৎ কার্য্যের যোগ্য হয় নাই। বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও যে আমরা এখানে একটি মিলনের কেন্দ্র গড়িতে পারিয়াছি এবং এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বাংলার ভাই-বোনকে দুঃখের দিনে কিছু সাহায্য করিবার সুযোগ পাইতেছি, ইহাই মঙ্গলময় বিধাতার একান্ত আশীর্ব্বাদ।

রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ

(১)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে সেখানকার প্রসিদ্ধ স্মিথ সনীয়ান ইনষ্টিটিউশনের পক্ষ হইতে আমার কলোরেডো এবং নিউ মেক্সিকোর রেড ইণ্ডিয়ানদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।* সে সময় তাহাদের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আলোচনা করিব। আশা করি পাঠকদের পক্ষে তাহা অনুপভোগ্য হইবে না।

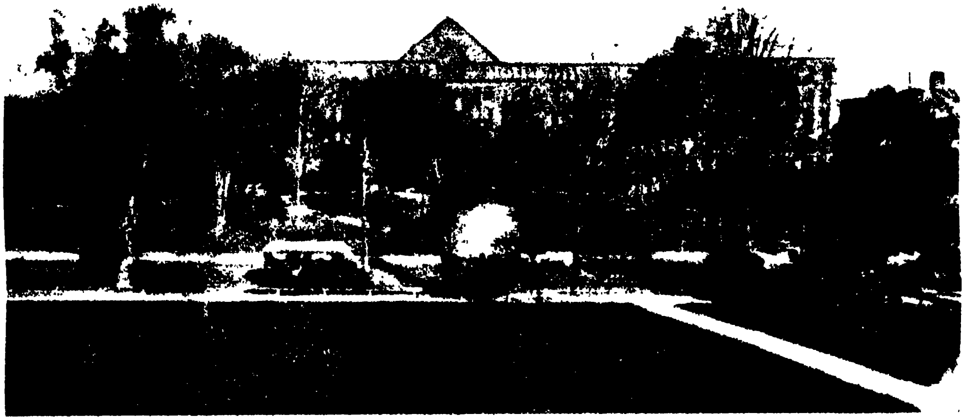
তখন ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগে সংবাদ আসিল যে স্মিথ্ সনীয়ান ইনষ্টিটিউশন কলোরেডো ও নিউ মেক্সিকোর যাযাবর জাতিদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ খুঁজিতেছেন। ফলে নৃতত্ত্বের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক রোল্যাণ্ড বি. ডিক্সন ঐ কার্য্যে বর্ত্তমান লেখককে নিযুক্ত করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মানুসারে বিদেশীয়েরা কোন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অধিকারী নহেন। এইজন্য আমার বর্ণ ও জাতি, এই কর্ম্মে নিয়োগের পক্ষে অন্তরায় হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা ছিল।

সৌভাগ্যের বিষয় তখন স্মিথ্ সনীয়ান ইনষ্টিউশনের নৃতত্ত্ব-বিভাগের বুরো অব্ এথ্নলজির অধ্যক্ষ ছিলেন। পরলোকগত ডাঃ জে, সী, ওয়ালটার ফিউক্স। ডাঃ ফিউক্স স্থির করিলেন যে, এরূপ অস্থায়ী পদে নিয়োগের বেলায় জাতিত্বের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তাঁহার মত ছিল, গায়ের রং যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; কার্য্যদক্ষতা থাকিলেই হইল! আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ সম্বন্ধে এদেশে অনেক ভুল ধারণা আছে বলিয়াই এ-কথার উল্লেখ করিলাম। অন্ততঃ বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ও অধিকাংশ শিক্ষিত মার্কিন ভদ্রলোকের কাছে দেহের বর্ণই মানুষকে বিচার করিবার একমাত্র উপায় নহে, ইহা স্বীকার না করিলে আমার মার্কিন বন্ধুদের প্রতি অবিচার করা হইবে। এ-কথা ঠিক যে মেসন্-ডিক্সন লাইন-এর* দক্ষিণে বর্ণবিদ্বেষ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু যে চারি বৎসর আমি আমেরিকায় ছিলাম ও নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, বর্ণবিদ্বেষজনিত কোন অসুবিধা কোথাও ভোগ করিতে হয় নাই।

যাহা হউক, ৫ই জুলাই সকাল বেলায় ওয়াশিংটন শহরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রীষ্মের দিন, তখন ছায়ায় উত্তাপ ৯৮° ডিগ্রী। র‍্যালে হোটেলে শীতল জলে স্নান করিয়া ও তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া স্মিথ সনীয়ান ইনষ্টিটিউশনে গেলাম। ডাঃ ফিউক্স অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং ডাঃ সোয়ান্টন, ডাঃ হারডলিস্কা, ডাঃ মাইকেলসন, ডাঃ হিউএট, পরলোকগত মিঃ মুনী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্গণের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। এ স্থলে ইঁহাদের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইঁহাদের মধ্যে ডাঃ ফিউক্স প্রথমে প্রাণিতত্ত্ববিৎ ছিলেন এবং হার্ভার্ডের সামুদ্রিক পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ পদে বহুবর্ষ অধিষ্ঠিত ছিলেন। মেডুসি, একিনোডেরমাটা, বেরমিস্ প্রভৃতি সামুদ্রিক জীবের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক গবেষণা আছে। আমেরিকার আদিমভাষাগুলির ফনোগ্রাফ রেকর্ড লইয়া তিনিই প্রথম তদ্বিষয়ে আলোচনার পথ উন্মুক্ত করেন। মেসা বার্ডি'র পার্ব্বত্য সভ্যতার আবিষ্কারও প্রধানতঃ তাঁহারই

*Annual Report of the Smithsonian Institution, 1922, pp. 20 and 71, Washington D.C.

* যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশ রাজনৈতিক হিসাবে এই কাল্পনিক রেখা দ্বারা বিভক্ত।



হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক মিউজিয়ম

কীর্ত্তি। তাঁহার অন্যতম সহযোগী ডাঃ সোয়ানটন সে সময়ে 'আমেরিকান্ য়্যানথ্রপলজিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের এবং কানাডার উত্তর-পশ্চিম উপকূলবাসী আদিম জাতিবৃন্দের সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান গভীর ও তাঁহার মতামত বিদ্বৎসমাজে শ্রদ্ধাসহকারে গৃহীত। ডাঃ হারডলিস্‌কা ফিজিক্যাল য়্যানথ্রপলজিষ্ট বলিয়া সুপরিচিত—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। ডাঃ মাইকেলসন নোবেল-পারিতোষিকে সম্মানিত মাইকেলসন মহাশয়ের পুত্র। ইনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও য়্যালগণকিন নামক আমেরিকার আদিম ভাষায় বিশেষজ্ঞ। ডাঃ হিউয়েট এবং মিঃ মুনী বিভিন্ন রেড ইণ্ডিয়ান জাতিদের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন।

ওয়াশিংটনে যে কয় দিন ছিলাম, ইঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশ ঘনিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের গভীর বিদ্যাবত্তার সহিত বিনয়ের সংমিশ্রণ দেখিয়া আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। যে জ্ঞানের পন্থা তাঁহারা নিজে অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথের নূতন যাত্রীদের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতিও ঐকান্তিক। বিশেষ করিয়া এ-কথা ডাঃ ফিউক্সসের সম্বন্ধে বলা চলে। তাঁহার ভিতর অগাধ পাণ্ডিত্য ও হৃদয়বত্তার অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছিল। ওয়াশিংটনে ফিউক্স দম্পতীর আবাসে তাঁহাদের আতিথ্যে ও সদালাপে যে সময় কাটাইয়াছি তাহার সুখকর স্মৃতি আজিও অন্তরে জাগরূক আছে।

যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া ৯ই জুলাই রেলযোগে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে রেড ইণ্ডিয়ান বসতির দিকে রওনা হইলাম। অন্তর্দ্দেশীয় বিভাগের অর্থাৎ ডিপার্টমেণ্ট অফ্ ইণ্টিরিয়রের সেক্রেটারী মহাশয় টোবো আক (কলোরেডো) এবং সিপ্‌রক্ (নিউ মেক্‌সিকো)-এর সংরক্ষিত ইণ্ডিয়ান্ মণ্ডলের বা ইণ্ডিয়ান্ রিজার্ভেসন-এর কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে আমার কার্য্যে সকল প্রকার সাহায্য করিবার জন্য দুইখানি পত্র দিয়াছিলেন। এইস্থলে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী কর্ম্মচারীদের ভ্রমণের ভাড়া ও ভাতা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। রেলের ভাড়ার পরিবর্ত্তে তাঁহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর পুলম্যান গাড়ীর 'পাস' পান ও বেতন ও পদনির্ব্বিশেষে তাঁহাদের সকলকে সমানভাবে খরচ বাবদ দৈনিক ৫ ডলার (=১৫ টাকা) করিয়া দেওয়া হয়। সরকারী কাজের জন্য যে ব্যয় হয়, উপযুক্ত সহি-করা রসিদ দাখিল করিয়া সেই টাকা লইতে হয়। অবশ্য যিনি ইচ্ছা করেন নিজের

টাকা হইতে ব্যয় করিতে পারেন; কিন্তু পদ ও বেতন যতই উচ্চ হউক, সরকারী তহবিল হইতে সকলের জন্য যে নির্দ্দিষ্ট হার ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করিবার অধিকার কাহারও নাই।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে যাইতে দুইটি প্রধান



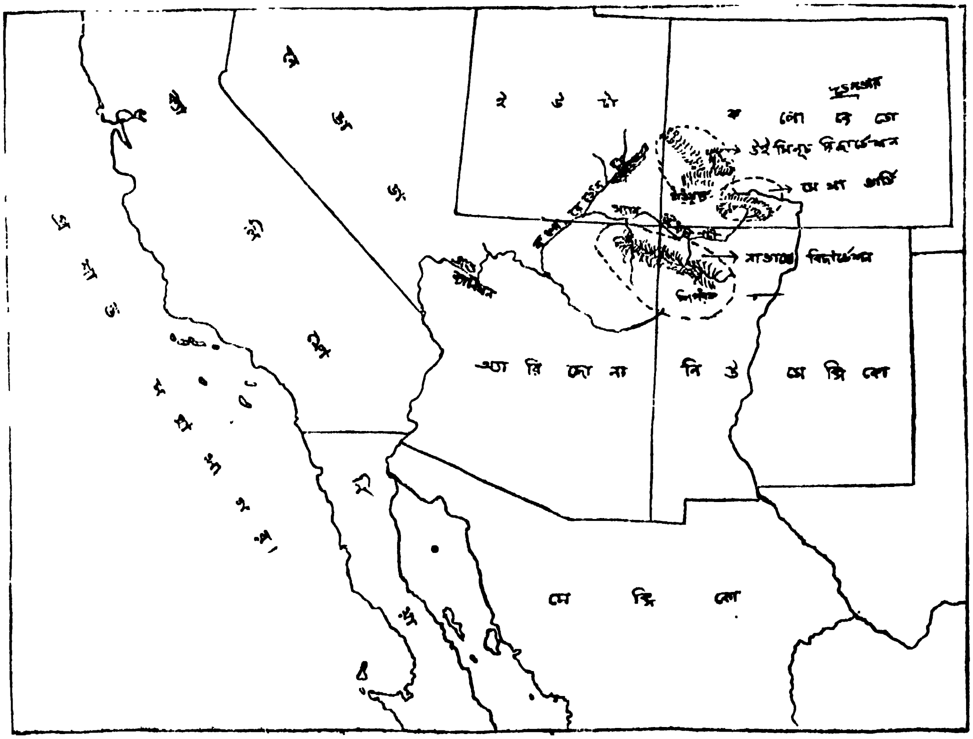
ইউমীন্‌চ্‌ ইউট্ স্ত্রী ও পুরুষ

রেলপথ আছে। ইহাদের একটি মিশৌরী ও ক্যান্‌সাস্ রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্য দিয়া, অপরটি উত্তরে শিকাগোর ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগে বলিয়া শেষোক্ত পথেই আমার যাত্রা স্থির হইয়াছিল। ওয়াশিংটন হইতে আমাকে প্রথমে ডেনভার যাইতে হয়। ডেনভার পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ রেলপথ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগ দিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই পথে গেলে দেশটাকে দেখিবার এবং বুঝিবারও সুবিধা হয়। দেখা গেল, ওয়াশিংটন হইতে শিকাগো পর্য্যন্ত ভূভাগ কেবল ঘন-সন্নিবিষ্ট কলকারখানায় যেন একটা বিরাট মৌমাছির চাক। শিকাগোর পশ্চিম হইতে কেবল শস্যক্ষেত্রের পর শস্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া আছে, তাহার যেন আর শেষ নাই। শরৎকালে গম ও ভুট্টার ফসলে ক্ষেত্রগুলিতে সোনালী রং-এর বান ডাকে। আমেরিকার পুলম্যান গাড়ীতে পাঠাগার, স্নানের জন্য ধারা-যন্ত্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য যে বিশেষ কামরার বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে দেশের এক সীমানা হইতে অপর সীমানা পর্য্যন্ত দীর্ঘদিনব্যাপী ভ্রমণের কষ্ট যথাসম্ভব লাঘব হয়।

রিয়োগ্রাণ্ড রেলওয়ের ডেনভারে ট্রেন বদল করিয়া আমাকে গাড়ীতে উঠিতে হইল। এই গাড়ীর কামরাগুলি ছোট ছোট, পুলম্যান গাড়ীর মত আরামদায়ক নহে। রকি পর্ব্বতের মধ্য দিয়া এবার আমাদের ট্রেন চলিল। পথের দুইধারে প্রকৃতিদেবী যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতে হয়। কলোরেডো প্রদেশের মাঝখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম কেবল গগনস্পর্দ্ধী শৈলশ্রেণী দিগ্বলয় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে ভূপৃষ্ঠভেদ করিয়া গভীর খাদ (কেনিয়ন) চলিয়াছে। প্রায়ই এ-গুলি ৩০০০ ফিট পর্য্যন্ত নীচু হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আর্কান্সাস নদীর বড় খাদের রয়াল গর্জটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই খাদের দুই পার্শ্বে স্তরবিন্যস্ত প্রস্তররাজির বর্ণসৌন্দর্য্য



একদল ইউমীন্‌চ ইউট ইণ্ডিয়ান

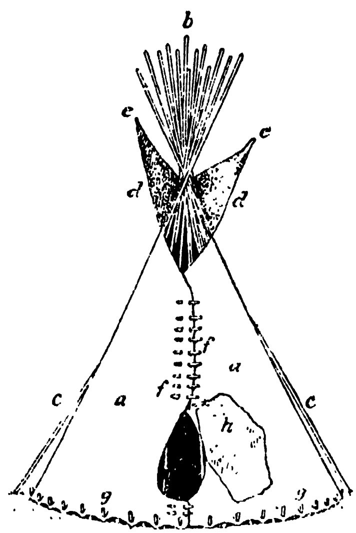


মার্কিন দেশের ইউট (Ute) এবং নাভাহো (Navaho) প্রভৃতি রেড ইণ্ডিয়ানদের রিজার্ভেশন।

অনুপম। লস প্রাইমোস্ নদীর টলটেক গর্জটির কিনারায় যুক্তরাষ্ট্রের বিংশতিতম সভাপতি জেমস্ গারফিল্ড মহাশয়ের উদ্দেশে একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপিত আছে। ১৮৮১ সালে গারফিল্ড এখানেই আততায়ীর দ্বারা নিহত হন। মাঝে মাঝে আমরা ১০,০০০ ফিট উচ্চ কয়েকটি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া গেলাম। দূরে কতকগুলি শৈলচূড়া নিরবচ্ছিন্ন তুষারে আবৃত হইয়া আছে দেখা গেল। ট্রেনের সময় এরূপভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, দিনের আলোতেই দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া লওয়া যায়। মাঝে মাঝে উল্লেখযোগ্য স্থানে পৌঁছিলেই ট্রেন কয়েক মিনিট করিয়া থামে ও যাত্রীরা গাড়ী হইতে নামিয়া দৃশ্যগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার সুযোগ পান।

১৪ই জুলাই মধ্যাহ্নে মানকোস্-এ পৌঁছান গেল। মানকোস্ পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পল্লী। এখান হইতে ইউট সংরক্ষিত মণ্ডল মোটরে দুই ঘণ্টার পথ। এখানে মিসেস্ রাইটম্যানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট হোটেলটিতে সাদাসিধা আহার্য্য সবসময়েই পাওয়া যায়। মানকোস্-এ আসিয়া আমি এইখানে এই প্রথম দুইটি খাঁটি রেড ইণ্ডিয়ান্ দেখিলাম। তাহারা এই হোটেলেরই পরিচারিকা—আমাদের খাইবার টেবিলে পরিবেশন করিয়া গেল। ডাঃ ফিউক্স আমাকে ন্যাশনাল পার্ক আপিসে যে পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন তাহা লইয়া কার সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। মিঃ কার আমার চেকগুলি ভাঙ্গাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যা ৬টায় টোবোয়াক্-এ পৌঁছিলাম। এই স্থানটি ইউট পর্ব্বতমালার প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু অতি উত্তম। এইখানেই রিজার্ভেসনের অধ্যক্ষ ম্যাকনীলি সাহেবের আপিস। যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট এখানে ইউটজাতীয় বালকবালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় ও রিজর্ভেসন্-এর কর্ম্মচারীদের জন্য আসবাব-পত্র সাজাইয়া একটি ভাল ‘মেস’ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অবশ্য বিবাহিত

কর্ম্মচারীদের জন্ত কয়েকটি স্বতন্ত্র বাংলোর বন্দোবস্ত আছে। সরকারী কাজে যাঁহাদের এই রিজার্ভেশনে-এ আসিতে হয়, তাঁহারাও অল্পব্যয়ে এখানে আহার ও বাসের সুবিধা পান। টৌবোআক্-এ আমাকে দুই সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে পাহাড়ের উপর ইউট জাতির প্রধান প্রধান আড্ডাগুলি ও তাহাদের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিশিষ্ট উৎসবাদি দেখিয়া আসিতে পারিয়াছিলাম। ম্যাকনীলি লোকটি বেশ সহৃদয়। তাঁহারই চেষ্টায় রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কাজ করিবার সময় ফ্র্যাঙ্ক



ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা ব্যবহৃত তাঁবু

পাইলকে আমার দোভাষীরূপে পাইয়াছিলাম। পাইল কাউ বয় অর্থাৎ তাহার বৃত্তি গোচারণ। এখানেই তাহার জন্ম ও এখানেই সে মানুষ হয়। এখানকার আদিম অধিবাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে তাহাদের ভাষা ও জীবন-পদ্ধতির সম্বন্ধে পাইলের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং তাহার সাহায্য পাইয়া আমার কার্য্যে বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। আদিম জাতিদের সম্বন্ধে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন যে, ইহাদের বিশ্বাস উৎপাদন না করিতে পারিলে ও ইহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য না করিলে ইহাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা কি দুরূহ ব্যাপার। রেড ইণ্ডিয়ানরা, বিশেষতঃ তাহাদের ইউট শাখাটি অপরিচিত বিদেশীয়দের সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ—সহজে কোন কথা ভাঙ্গিতে চাহে না। যাহা হউক, পাইলের মত বিচক্ষণ লোক সঙ্গে থাকাতে আমার এই অনুসন্ধান-কার্য্যে যে খুব সুবিধা হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

(২)

ইউটরা শোশোনিয়ান্ জাতির একটি প্রধান শাখা। এক সময় ইহারা নিউ মেক্সিকোর স্যান জুয়ান নদী বিধৌত ভূভাগের উত্তরাংশে ও কলোরেডো এবং ইউটা প্রদেশের বেশীর ভাগ জুড়িয়া বাস করিত। ইউটজাতির অধ্যুষিত বলিয়াই শেষোক্ত প্রদেশের নাম হইয়াছে ইউটা। অন্যান্য সমতলবাসী ইণ্ডিয়ান জাতিদের ন্যায় ইউটরাও অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ও বলদৃপ্ত ছিল। আমেরিকায় অশ্বের ব্যবহার প্রচলিত হইবার অল্পদিনের মধ্যেই ইহারা তাহা আয়ত্ত করিয়া লয় এবং বর্ত্তমান যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অধিকার বিস্তার করে। তাহাদের আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অপেক্ষাকৃত সভ্য ও স্থিতিশীল অন্যান্য রেড ইণ্ডিয়ান জাতিরা পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লয়। ইউটরা তখন যাযাবর জাতি,কৃষিকর্ম্মের কিছুই জানিত না, শিকার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; ইরোকোয়া প্রভৃতি অন্যান্য রেড ইণ্ডিয়ানদের ন্যায় ইহাদের সভ্য-জীবনও কেন্দ্রবদ্ধ হইয়া উঠে নাই। ইহারা তখন ছোট ছোট দল বাঁধিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত ও অপরাপর জাতির সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিত। যুদ্ধ ও যুদ্ধাভ্যাসের দ্বারাই ইহাদের জীবন-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইত। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মার্কিন সভ্যতার সংশ্রবে আসিয়াও ইহারা কৃষিকার্য্য শিখিল না, আজও ইহারা যাযাবর সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অনতিকাল পূর্ব্বেও ইহারা প্রতিবেশী জাতিদের মধ্যে লুটতরাজ করিয়াছে। বিজিত শত্রুদের মাথার ত্বক্ ছাড়াইয়া লওয়া ইহাদের একটি চলিত প্রথা ছিল।

টৌবোআক্-এর রিজর্ভেসনটিতে ইউট জাতির উপশাখা উইমীনচদের বাস। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই



বন্যা।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

এপ্রিল ইহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সন্ধি স্থাপন করে। এই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী কলোরেডো প্রদেশে ৪৮৩,৭৫০ একার পরিমাণ জমি ইহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ইহারা মার্কিন সরকারের নিকট হইতে খোরাক-পোষাকও পাইয়া থাকে।

এই সন্ধির পর হইতে উইমীনুচ ইউটদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। লুটতরাজ বন্ধ করিয়া ও মাথার ছাল ছাড়ানো প্রভৃতি হিংস্র প্রথা বর্জ্জন করিয়া ইহারা এখন শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছে। এখন কেবল ইহাদের বিচিত্র নৃত্য ও উৎসবগুলি ইহাদের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল ব্যাপারে ইহাদের প্রচুর উৎসাহও আছে। তথাপি এই শান্তিপূর্ণ জীবন, বাধ্যতাঃমূলক আলস্য ও দুই সপ্তাহ অন্তর বিনাশ্রমে প্রাপ্ত গভর্ণমেণ্টের খয়রাতী আহার্য্যে ইহাদের দৈহিক অবনতি ঘটিতেছে। এতদ্ব্যতীত আধুনিক সভ্যতার সহিত সংশ্রবের কুফল স্বরূপ ইহাদের মধ্যে যক্ষ্মা ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। এই সব কারণে ইহাদের লোকসংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে; এবং সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট ইউট ও অন্যান্য আদিম জাতিদের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদারনীতি অবলম্বন না করিলে ফল বড়ই শোচনীয় হইত।

আদিম জাতিদের অধ্যুষিত দেশভাগে যে সকল রেড্ ইণ্ডিয়ান বাস করে তাহাদের শাসনকার্য্য পূর্ব্বে একজন চীফ্ কমিশনারের অধীনে একটি স্বতন্ত্র ইণ্ডিয়ান কর্ম্ম বিভাগ (ব্যুরো অব ইণ্ডিয়ান এফেয়ার্স) কর্তৃক পরিচালিত হইত। এই বিভাগের কার্য্যে নানা দুর্নীতির প্রচলন ছিল ও সময় সময় রেড ইণ্ডিয়ানদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারও অনুষ্ঠিত হইত। ইহার সংশোধনার্থে মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ যে আন্দোলন করেন তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট রেড ইণ্ডিয়ানদের সুশাসনের জন্য দশ জন সদস্য লইয়া একটি বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ড পূর্ব্বোক্ত শাসন বিভাগের সহিত সহযোগিতায় কাজ করেন। কেবল মাত্র সম্ভ্রান্ত ও আদর্শ চরিত্রের লোকেরাই এই বোর্ডের সভ্য নিযুক্ত হইতে পারেন। সদস্য নিয়োগ সম্বন্ধে এরূপ বিশেষ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, সদস্যেরা উচ্চবংশজাত ও সাধু চরিত্রের লোক না হইলে নির্ভীকভাবে শাসন-কার্য্যের দোষ-ত্রুটি সমালোচনা করিতে পারিবেন না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পরলোকগত ডাঃ ইলিয়ট এক সময় এই বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই বোর্ড সৃষ্ট হওয়াতে রেড



ইউট্ ইণ্ডিয়ান

ইণ্ডিয়ান জাতিরা বিশেষ লাভবান হইয়াছে। তাহাদের উপর স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদিগের দ্বারা অন্যায় উৎপীড়নের পথ সমস্তই বন্ধ হইয়াছে। বোর্ডের চেষ্টার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট রিজার্ভেসনসমূহে বার্ষিক ৪০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে রেড ইণ্ডিয়ান বালকবালিকাদের জন্য নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা মোটামুটি রকম লেখাপড়া শিখিতে পারে। তদ্ব্যতীত তাহাদের প্রতিভা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী শিল্পকার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হয়। রেড ইণ্ডিয়ানরা প্রথমে কতকটা সন্দিগ্ধ হইলেও ক্রমশঃই এই সকল প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেছে।

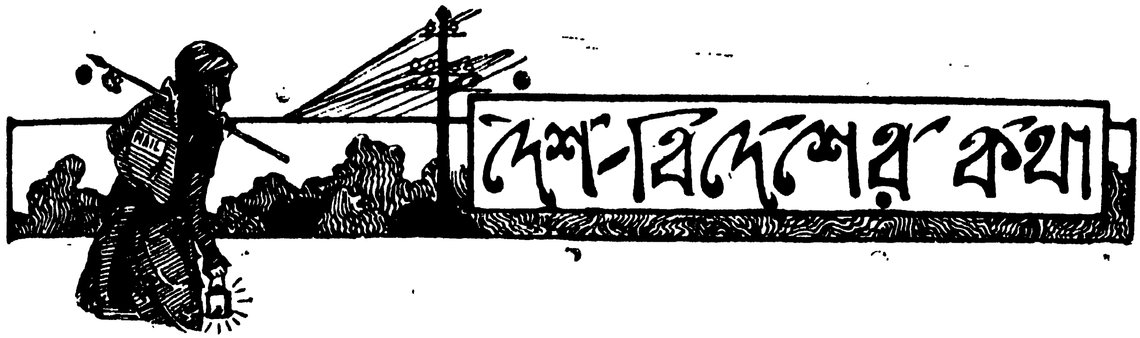
উইমীনুচরা যাযাবর জাতি। ইহারা ঘর বাঁধিয়া গৃহস্থালী করে না, ইহাদের বাসের জন্য কোন স্থায়ী গ্রামও নাই। ছোট ছোট দল বাঁধিয়া ইহারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের বাসের জন্য যে জমিটুকু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহারই চতুঃসীমানার মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া ইহারা সন্তুষ্ট নহে। অনুর্ব্বর প্রদেশে বাস

করার ফলে এবং অপরাপর ইণ্ডিয়ান জাতির সংস্পর্শে ইহাদের কৃষ্টির মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা যায়, যাহা খাঁটি সমতলবাসী ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে নাই। তথাপি ইহারা আজিও যাযাবর জাতির স্বেচ্ছাভ্রমণের অভ্যাসটি সংযত করিতে পারে নাই। অন্য সমতলবাসী ইণ্ডিয়ানদের ন্যায় উইমীনুচরাও টিপি বা একপ্রকার ত্রিকোণাকারের তাঁবু ব্যবহার করে। কিন্তু নবাহো প্রভৃতি আথাবাস্কাউ জাতির সংস্রবে আসিয়া ইহারা ব্রাশ, ম্যাট প্রভৃতি তৃণনির্ম্মিত কুটিরের ব্যবহার শিখিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে বাইসন্ তেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না, সুতরাং বাইসন্-এর মাংস ছাড়াও ইহারা হরিণ ও অন্যান্য ছোট জীবজন্তু শিকার করিয়া আহার্য্য সংস্থান করে। অন্যান্য সমতলবাসী ইণ্ডিয়ান্ জাতিদের মতই ইহারা অশ্বারোহণে সুপটু ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী জাতিদের অন্যতম। ছেলে বুড়া, স্ত্রীপুরুষ সকলেই এ কার্য্যে অত্যন্ত পারদর্শী। এমন কি, ইহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও নির্দ্দোষ আমোদ স্বরূপে জিন, রেকাব প্রভৃতি না লইয়া ঘোড়দৌড় খেলে ও অশ্বপৃষ্ঠে নানাবিধ দুঃসাহসের পরিচয় দেয়। অশ্বপৃষ্ঠেই ইহারা দল বাঁধিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়; জিনিষপত্রও ঘোড়াতেই বহিয়া লইয়া যায়।

পাইলকে সঙ্গে লইয়া আমি ইউট পর্ব্বতে উইমীনুচদের প্রধান প্রধান আড্ডাগুলি পরিদর্শন করিলাম। ইহাদের বয়স্ক নরনারীদের নিকট হইতে উইমীনুচের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত প্রচলিত রীতিনীতির সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করা গেল। উইমীনুচদের আড্ডাগুলি পরস্পর হইতে অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। সাধারণতঃ ছোট ছোট পাহাড়ী নদী কিংবা ঝরণার ধারেই ইহারা শিবির স্থাপন করে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও ইউটদের ট্রেল বা চলার পথগুলি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সদাসর্ব্বদা অশ্বারোহণের অভ্যাস না থাকিলে সারাদিনের ভ্রমণে শরীরে বেদনা হয়। আমি ও পাইল অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ইউটদের আড্ডায় চলিয়া যাইতাম; দিনের কাজ সারিয়া টোবোআক-এ ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত। আহারাদি বিষয়ে ইউটদের আতিথেয়তার উপর নির্ভর করা চলিত না, তাহাদের খাদ্যও আমাদের গলাধঃকরণ করা দুঃসাধ্য ছিল। এইজন্য আমরা নিজেদের সঙ্গেই ঝুরি করিয়া দুপুরের খাবার লইয়া যাইতাম। পাহাড়ের মধ্যে নানা-স্থানে পরিষ্কার ঝরণার জলের অভাব নাই।

ইউট পাহাড়গুলি সাধারণতঃ ৫,০০০ হইতে ৬,০০০ ফিট উচ্চ ও পাইন, কর্চ্চ, স্প্রুস, এবং ওক বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে দু-একটা ভালুক, নেকড়ে ও হরিণও দেখা যায়। ইউটরা সচরাচর ঝরণার ধারে ছায়ার মধ্যে শিবিরস্থাপন করে। আহার্য্য দুষ্প্রাপ্য বলিয়া এক একটি আড্ডায় বেশী লোকের সমাবেশ হয় না। শীতের দিনে টিপি বা তাঁবু ব্যবহার চলে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে বাসের জন্য তৃণপল্লব দিয়া ছাউনি প্রস্তুত করা হয়। ইউটদের সংসারে পুরুষেরাই মালিক ও প্রভু। সুতরাং তাঁবু গাড়া ও তোলার জন্য তাহারা মাথা ঘামায় না, ঘরকন্নার অন্য সকল কাজকর্ম্মের মত মেয়েদেরই সে সব করিতে হয়। অনেকদিনই দেখিয়াছি, হয়ত পুরুষেরা শুইয়া আরাম করিতেছে বা ধূমপানে রত আছে; এদিকে মেয়েরা তাঁবু খাটাইতেছে ও ঘরকন্না গুছাইতেছে। বেটাছেলেদের কাজ হইল শিকার, লুটতরাজ ও নৃত্যোৎসবে যোগদান। সামরিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নৃত্যগুলিতে মেয়েদের কোন স্থান নাই। পূয়েবলো ইণ্ডিয়ান বা দক্ষিণ পশ্চিমের অন্যান্য জাতির মত উইমীনুচদের মধ্যে মেয়েদের কোন বিশেষ অধিকার নাই।

ক্রমশঃ



বাংলা

হিন্দু-মিশনের কৃতিত্ব—

কত তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সামাজিক বাধাহেতু এবং ভূতোপাসকগণ বিধর্ম্মীর প্রচারের ফলে প্রতি বৎসর খৃষ্টান ও মুসলমান হইয়া যাইত। হিন্দু-মিশন তাহার গতি রোধ করিতেও অনেকাংশে সমর্থ হইয়াছেন। সেন্সস-রিপোর্ট হইতে আহৃত নিম্নের টেবিলেটি হইতে ইহা বুঝা যাইবে। সংখ্যাগুলি হাজার হিসাবে দেওয়া আছে,—

ধর্ম্ম	১৯২১	১৯৩১	পার্থক্য
হিন্দু	২০২,০৩	২১৫,৩৭	+১৩,৩৪
মুসলমান	২৫২২১	২৭,৫,৩০	+২৩,০৯
খৃষ্টান	১,৪৭	১,৮০	+ ৩৩
বৌদ্ধ	২,৬৫	৩,১৫	+ ৫০
ভূতোপাসক	৮,৫৫	৫,৪৪	— ৩,০১
বিবিধ	১৪	১৬	+ ২
মোট	৪৬৬,৯৫	৫০১,২২	+৩৪,২৭

দেখা যাইতেছে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীই কম বেশী বাড়িয়াছে, এক ভূতোপাসক ছাড়া। সাধারণ নিয়মে বর্দ্ধিত হইলে ভূতোপাসকগণের শত করা কুড়ি জন অর্থাৎ মোট দুই লক্ষ বাড়িবার কথা। তাহারা মহামারীতেও উজাড় হয় নাই। সুতরাং পাঁচ লক্ষ আন্দাজ লোকের অস্তিত্ব কোথায়? ও-দিকে হিন্দু বাড়িয়াছে প্রায় সাড়ে তের লক্ষ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেন্সসে সাধারণ ভাবে হিন্দু বাড়িত শত করা তিন জন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারও তাহা হইলে হিন্দু ছয় লক্ষ ছয় হাজারের বেশী বাড়িবার কথা নয়। আগে মুসলমান বাড়িত সাধারণ ভাবে (অর্থাৎ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত জন সমেত) শত করা তের জন, এবার তাহা নামিয়া নয় জনে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নব-দীক্ষিতদের দ্বারা মুসলমান সমাজও এবার তেমন পুষ্ট হয় নাই। বস্তুতঃ, হিন্দু-মিশনের প্রচারের ফলেই লক্ষ লক্ষ ভূতোপাসক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়াছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও অস্পৃশ্যতা-দলন প্রভৃতি কারণেও হিন্দুদের ধর্ম্মান্তরগ্রহণ কম হইয়াছে। আসাম অঞ্চলেও কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ ভূতোপাসক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু-মিশনের এই সার্থক প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

কলিকাতা অনাথ আশ্রমের আবেদন—

১২।১, বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজারস্থ কলিকাতা অনাথ আশ্রমের লক্ষ হইতে আমরা এই আবেদন পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

দুর্গোৎসব সমাগত; এই আনন্দের দিনে আপনাদের আশ্রিত কলিকাতা অনাথ আশ্রমের অনাথ বালকবালিকাগুলি আপনাদের স্নেহ-প্রদত্ত নব বস্ত্রাদি লাভ করিয়া যাহাতে তাঁহারা পিতামাতার অভাব বিস্মৃত হইয়া ৺পূজার আনন্দ অনুভব করিতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করিয়া জগজ্জননীর শুভ আশীর্ব্বাদ লাভ করেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

এক্ষণে কলিকাতা অনাথ আশ্রমে ৬৪ টি বালক ও ২৫ টি বালিকা বাস করিতেছে। নিম্নে তাহাদের বয়সের উপযোগী বস্ত্রের তালিকা প্রদত্ত হইল।

ধুতি				সাটি			
১০	হাত	১০	খানি	১০	হাত	৮	খানি
৯	"	১৩	"	৯	"	৩	"
৮	"	১৬	"	৮	"	১২	"
৭	"	১৬	"	৭	"	১	"
৬	"	৯	"	৬	"	১	"
৫	"	×	"	৫	"	×	"

বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে আর্থিক সাহায্যও সাদরে গৃহীত হইবে।"

আশ্রমবাসী অনাথাদের জামা কাপড়ের বড়ই অভাব। সম্পন্ন ও সহৃদয় ব্যক্তিরা বস্ত্র অর্থ দিয়া আশ্রমের অভাব দূর করিতে সাহায্য করিবেন নিশ্চয়।

সারদা-আইন—

বাল্য-বিবাহ নিবারণের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত হরবিলাস সারদা প্রবর্ত্তিত যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা যখন প্রস্তাব মাত্র ছিল, তখন বহু লোক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, সংবাদ পত্রের পাঠকমাত্রেই তাহা জানেন। কিন্তু সে বিরুদ্ধতা নিষ্ফল হইয়াছে। এখন আইনতঃ ১৪ বৎসরের কমবয়স্কা বালিকার ও ১৮ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকার বিবাহ দেওয়া দণ্ডনীয়। তবুও বিরুদ্ধবাদীদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। বালকবালিকাদের বিবাহের বয়স কমাইবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। সংশোধক একটি প্রস্তাব উঠিয়াছে।

বিবাহের সময় যত কম হইবে তত মেয়েদের ক্ষতিই বেশী, কারণ বাল্য-বিবাহের কুফল তাহাদেরই পরিপাক করিতে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এইজন্য নিখিল ভারতীয় নারী সম্মেলনের কলিকাতা শাখা এ বিষয়ে মেয়েদের মতই অধিক মূল্যবান বুঝিয়া কলিকাতার নানাস্থানে—বাগবাজার, টালা, শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ, কালিঘাট, গড়পার, মধ্য কলিকাতা, উল্টাডিঙি ও খিদিরপুরে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন মহিলা সভার অধিবেশন করাইয়াছেন। সর্ব্বত্রই হিন্দু মহিলারা সভানেত্রীর কাজ করিয়াছেন ও বক্তৃতা দিয়াছেন; অনেকে মেয়েদের বিবাহ বয়স ১৬ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই নয়টি সভাতে সারদা আইনের স্বপক্ষে চারটি করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবগুলির মোট বক্তব্য এই যে, শিশু মৃত্যু ও

প্রসূতির অকাল মৃত্যু নিবারণের জন্য, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের সুস্থ সবল করার জন্য, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের পথ বাধামুক্ত করিবার জন্য ও স্ত্রী-শিক্ষার বহুল প্রচারের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সারদা আইন রক্ষা ও প্রয়োগ করা উচিত।

নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের কলিকাতা শাখা আরও বলিতেছেন যে, এই সদ্য বিধিবদ্ধ আইন পরিবর্ত্তন করিলে সমগ্র পৃথিবীর কাছে ভারতবাসী হাস্যাস্পদ হইবে। ভারতবাসীর সম্মান রক্ষার জন্যও এই আইন অপরিবর্ত্তিত থাকা দরকার।

বাঙালী হিন্দু মহিলাদের এই সৎচেষ্টা প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।

শা

বালিকাদের সন্তরণ প্রতিযোগিতা—

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নারীদের দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক উন্নতির জন্য অধুনা নানারূপ প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ হইতে আমরা বালিকাদের সন্তরণ প্রতিযোগিতার সংবাদ সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি। পল্লীগ্রামে সংঘবদ্ধভাবে বালিকাদের সন্তরণ প্রতিযোগিতা বোধ হয় এই প্রথম।

কিশোরগঞ্জের অনতিদূরে মাজিঘাঙ্গইট· গ্রামের দীঘিতে বালিকাদের সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। আট হইতে বার বৎসর বয়স্কা ত্রিশটি বালিকা সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল।

কুমারী সাহেদাবানু নামে একটি মুসলমান বালিকাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।



সন্তরণে প্রতিযোগী বালিকাগণ

হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সী-আই-ই, এম্-এ, পী-এচ্-ডী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বিগত ১৩৩৫ সালের ২৯শে আষাঢ় তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী সার্থক গবেষণা স্মরণ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য চেষ্টা ও পূর্ব্বকথা আলোচনা বিষয়ে জাতির মুখপাত্র হিসাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক শাস্ত্রী মহাশয়কে সংবর্দ্ধনা করা হইবে। এই সংবর্দ্ধনা, মুখ্যতঃ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও গবেষকগণের মৌলিক রচনায় পূর্ণ 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধনা-লেখমালা' নামে একখানি পুস্তক প্রণয়নপূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সমর্পণ করা হইবে, ইহাও স্থিরীকৃত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে একটি 'হরপ্রসাদ-বর্দ্ধাপন-সমিতি' নামে শাখা-সমিতি গঠিত হয়, এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকদ্বয় এতাবৎ চল্লিশের কিছু অধিক প্রবন্ধ এবং মুদ্রণকার্য্যের জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করেন, সমস্ত 'লেখমালা' গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিতে কিছু বিলম্ব অপরিহার্য্য দেখিয়া এই বৎসর আষাঢ় মাসে বর্দ্ধাপন সমিতি স্থির করেন যে প্রথম ১৪টি প্রবন্ধ (সাকল্যে ২৭২ পৃষ্ঠা)



মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লইয়া সংবর্দ্ধন-লেখমালা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হইবে, এবং মুদ্রিত প্রথম খণ্ড ও অমুদ্রিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধাবলীর পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে সমর্পিত করা হইবে। তদনুসারে বিগত ১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট) সোমবার প্রাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ পরিষৎ-সংশ্লিষ্ট এবং 'লেখমালা' গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় মিলিত হইয়া শাস্ত্রীমহাশয়ের গৃহে গিয়া মাল্যচন্দন দ্বারা তাঁহার সংবর্দ্ধনা করেন ও লেখমালার প্রথম খণ্ড তাঁহাকে সমর্পণ করেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শাস্ত্রীমহাশয়কে খদ্দরের ধুতি চাদর উপহার দেন, ও একটি সুন্দর বক্তৃতায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বাঙালী জাতির অপরিশোধ্য ঋণের বিষয় বিবৃত করেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের কার্য্যচেষ্টা ও অনুপ্রাণনার ফলে যে বহু নবীন কর্ম্মী গবেষণা অনুশীলন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন সে বিষয়েও শাস্ত্রীমহাশয়ের কৃতিত্ব বর্ণন করেন। এতদ্ভিন্ন কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় নিজ শ্রদ্ধার উপায়ন স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন ও শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রশস্তিবাদ করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শাস্ত্রীমহাশয়ের নানামুখী প্রতিভার উল্লেখ করেন। শাস্ত্রীমহাশয় যথাযোগ্য উত্তরদানে পরিষদের তথা বাঙালী জাতির পক্ষ হইতে প্রদত্ত এই সংবর্দ্ধনা স্বীকার করেন।

—

বিদেশ

ইংলণ্ডে স্বর্ণমান রহিত—

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ও তৎপরে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এবং অন্যান্য কারণে ইংলণ্ড স্বর্ণের সহিত সকল সম্পর্ক বর্জ্জিত কাগজের মুদ্রার প্রচলন করিতে বাধ্য হন। তাহার ফলে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার হিসাবে প্রায় ১৫।১৭ শিলিং মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। ১৯২৫ সনে ইংলণ্ড আবার স্বর্ণমান প্রচলন করেন, যদিও স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপায় হিসাবে ইংলণ্ড বাজারে মুদ্রার পরিমাণ বিশেষ কমাইয়া ফেলেন কারণ বাজারে মুদ্রার পরিমাণ অনুসারে মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে ও কমে। মুদ্রা কমানোতে তাহার ক্রয় ক্ষমতা বাড়িল অর্থাৎ স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ হইল কিন্তু সকল দ্রব্যের মূল্য ভীষণ কমিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে ব্যবসা অচল হইবার সূচনা হইল। অন্যান্য দেশও ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিক দাম কমাইয়া বাণিজ্যে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। এদিকে ইংলণ্ড নিজ খাদ্য-দ্রব্য কাঁচা মাল প্রভৃতি বাহির হইতে আনিতে বাধ্য হইলেন এবং অপর জাতিকে যথেষ্ট পরিমাণে নিজের ফ্যাক্টরী-জাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে অক্ষম হওয়ায় পাওনা অপেক্ষা ইংলণ্ডের দেনা বেশী হইতে লাগিল এবং সেই দেনা স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া শোধ করিতে হইতে লাগিল। এই ভাবে বিগত কয়েক বৎসর ইংলণ্ডের বহু কোটি টাকার স্বর্ণ হাতছাড়া হইয়া যায়। অবস্থা খারাপ দাড়াইতে অল্পকাল হইল ইংলণ্ডকে আবার স্বর্ণ ছাড়িয়া কাগজ-মানে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। ফলে বাজারে পাউণ্ডের দাম খুব কমিয়া গিয়াছে এবং ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত আবদ্ধ থাকায় ভারতের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। ভারত পুরাকালে শতকরা ৭৫৲ টাকার কারবার ইংলণ্ডের সহিত করিত, এখন তাহার উল্টা অর্থাৎ শতকরা ৭৫৲ টাকার কাজই আমাদের ইংলণ্ডের বাহিরে। সুতরাং আমাদের টাকার বাজার পাউণ্ডের ধাক্কায় ওঠা নামা করাতে আমাদের বিদেশী বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের পাউণ্ডের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবেই স্বর্ণের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিলেই মঙ্গল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাতে ইংলণ্ডের স্বার্থের হানি হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

ভাগবত-কুসুমাঞ্জলিঃ—(দ্বাদশস্কন্ধে সম্পূর্ণ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ হইতে ভক্তিযোগসাধনাত্মক শ্লোকসমূহের সার-সঙ্কলন।) মূল ও স্বরচিত "ভক্তমনোরঞ্জনী" টীকা এবং তাৎপর্য্যব্যাখ্যাপূর্ণ বঙ্গানুবাদ সমন্বিত। রায়বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত। কলিকাতা ১১নং পটুয়াটোলা লেন "কমলকুঞ্জ" হইতে প্রকাশিত। ২০১, মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আমাদের জাতীয় সাহিত্যে এক অপূর্ব্ববস্তু, পুরাণগুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক পুরাণ। অন্যান্য পুরাণাদি সাধারণ সংস্কৃতগ্রন্থ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষা একটু কঠিন, অল্প সংস্কৃতের জ্ঞান লইয়া টীকা টিপ্পনীর সহায়তা ব্যতীত উহার আলোচনা সম্ভবপর হয় না। আলোচ্য 'ভাগবতকুসুমাঞ্জলি' পুস্তকখানি এই বিষয়ে সাধারণ পাঠককে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারিবে বলিয়া এইরূপ পুস্তকের বিশেষ উপযোগিতা আছে। পুস্তকের সঙ্কলয়িতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ সংগ্রহপুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাস্তবিকই একটী লোকহিতকর অনুষ্ঠান করিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত হিন্দী বাঙ্গালা ও ইংরেজীর একজন কৃতী লেখক, ভাগবতকুসুমাঞ্জলিতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভক্তিযোগ সংক্রান্ত ২০১টা শ্লোক টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। গীতা উপনিষৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মপদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ও উপদেশময় গ্রন্থের পার্শ্বে এই ভাগবতশ্লোক সংগ্রহকে স্থান দিতে হয়, ইহাকে নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ করিয়া লইতে পারা যায়, এইরূপ গ্রন্থ পাঠে চিত্তশুদ্ধি হয় ও উপাসনার কাজ হয়। আমাদের ছাত্র ও অন্য যুবকদের মধ্যে এই পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

খাদ্য-তত্ত্ব—ঢাকা গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক শ্রীবিধুভূষণ পাল, এল. এম. এস্, প্রণীত ও ১।১ আনন্দচন্দ্র রায় ষ্ট্রীট, ঢাকা হইতে শ্রীইন্দুভূষণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

ভূমিকায় লেখক কয়েকটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য কথা বলিয়াছেন। একথা খুবই সত্য যে আমরা কেবল জঠরানল নিবৃত্তি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই আহার করি না। যে খাদ্য আমাদের সুস্থ দেহে ও সুস্থ মনে বাঁচিয়া থাকিবার সহায়তা করে তাহাই আদর্শ খাদ্য। অতএব বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ ও কোন প্রকারের খাদ্য কি পরিমাণে ও কিরূপ সংমিশ্রণে খাওয়া উচিত, তাহা আমাদের জানা না থাকিলে উপযুক্ত খাদ্যের সন্ধান পাইব কি করিয়া?

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে খাদ্য-নির্ব্বাচন সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সকল সময়ের খাদ্যবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে অন্তঃসত্বাবস্থায় স্ত্রীলোকের ও বিশেষতঃ শিশুদের খাদ্য সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়ে একটি বিশেষ অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের উপাদান, পরিপাক ক্রিয়া ও গুণাগুণ সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙালীর খাদ্য-বিষয়ে বাঙালী চিকিৎসকগণের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকর্ষিত হইতেছে, ভরসার কথা সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আলোচনা যত বেশী হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

এই পুস্তকখানি আমরা সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি ও ইহা ছাত্রদের পুস্তক তালিকাভুক্ত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব। পুস্তকখানি ভাল কাগজে নির্ভুল ছাপা—গুণের হিসাবে মূল্যও অধিক নহে।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

(১) অঙ্গুষ্ঠ, (২) মনোদর্পণ, (৩) বঙ্গরণভূমে—শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রণীত এবং ৩২।৫।১ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রঞ্জন প্রকাশালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে দেড় টাকা, এক টাকা ও এক টাকা।

তিনখানিই কবিতার বই। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং হাস্য পরিহাস অবলম্বনে কবিতাগুলির রসসৃষ্টি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি রঙ্গ-কবিতা এবং কতকগুলি ব্যঙ্গ কবিতা। আর কতকগুলি কবিতায় অন্তরের রুদ্ধ বেদনা এবং ক্রুদ্ধ জ্বালা পরিহাসের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সাহিত্যে সমাজে অথবা রাজনীতিতে যাহাই অনাচার বলিয়া মনে হইয়াছে, লেখক দ্বিধা এবং মমতাশূন্য হইয়া তাহারই প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। লেখকের ছন্দের উপর আধিপত্য অসাধারণ। 'মৌরী বনেতে গৌরী-বধূর কৌড়ি হারাল কি রে!' অথবা 'মেঘল হইল দীঘল বদন মুঘল চিত্র-সম।' চমৎকার। গ্রন্থকার তরুণ। বলিতেছেন,

অবোধজনের লাঠির আঘাত গায়ে যদিই লাগে—
ক্ষমা যেন করেন তাঁরা একটু অনুরাগে;
আজকে শুধু গুরুজনের ঘাড় বাঁচিয়ে চলা—
বাড়াবাড়ি হয় যদি বা দু-একটা কানমলা।

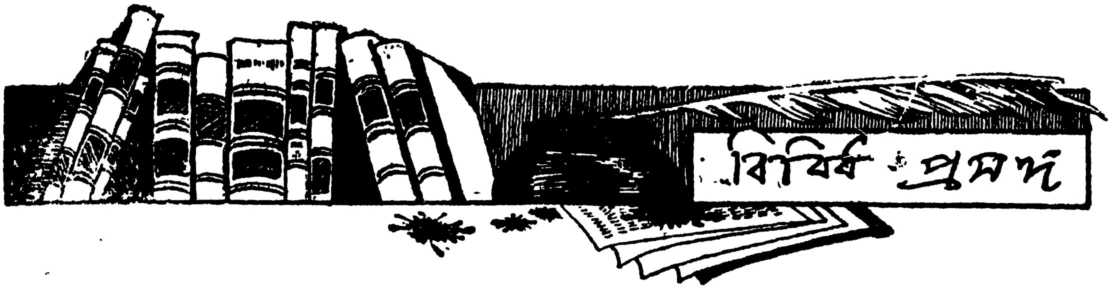
মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপহাস-বিদ্রূপের তীব্রতা স্থানে স্থানে সীমা ছাড়াইয়া গেছে। এগুলি ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, কাব্যত্রয় বিচিত্র সরস এবং উপভোগ্য রচনায় সমৃদ্ধ।

প্যারডিগুলিতে বৈশিষ্ট্য এবং নৈপুণ্য দুইই আছে। 'ভোরের স্বপ্নে', 'মনোদর্পণের' পুরস্কারে, 'বঙ্গরণভূমে'র 'রূপ-কথা' এবং 'যুগবাণী'তে লেখকের উচুদারের কাব্যকৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কারণে অকারণে আঘাত করিবার চেষ্টায় বিরত হইয়া কাব্যসাধনায় নিজের শক্তি প্রয়োগ করিলে লেখক যে সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবেন, এ কয়খানি কাব্যের অনেকগুলি কবিতা তাহারই সূচনা করিতেছে।

চিত্রগ্রীব—শ্রীধনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনূদিত। প্রকাশক—এম-সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

গ্রন্থকার আমেরিকা প্রবাসী প্রসিদ্ধ ইংরেজী লেখক। তাঁহার কাব্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনাই আমেরিকায় তাঁহাকে জনপ্রিয় লেখক করিয়া তুলিয়াছে। ইংরেজীতে চিত্রগ্রীব ও অন্যান্য গল্প লিখিয়া তিনি শিশুসাহিত্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বৎসরের সর্ব্বোত্তম শিশুসাহিত্যের পুস্তকরূপে এই বইখানি আমেরিকায় এক বৎসর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে। অনুবাদটি চমৎকার হইয়াছে। মনে হয় যেন কাহিনীটি আদৌ বাংলাতেই লেখা। চিত্রগ্রীব একটি পায়রার নাম। এই পায়রাটির অপূর্ব্ব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ছেলেমেয়েদের হৃদয় আকর্ষণ করিবে। পায়রাটি আমাদের বাংলা দেশেরই পায়রা এবং পায়রার অধিকারী একটি বাঙালী ছেলে। হিমালয়ে যুদ্ধে এবং নানা দেশ-বিদেশে একটি পারাবতের অসম সাহসিকতার কাহিনী পড়িতে পড়িতে ছেলেদের চোখের সম্মুখে কল্পনাজগতের দ্বার খুলিয়া যাইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা



মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন

গত ১৫ই আশ্বিন ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে এবং লণ্ডনে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ৬২ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় উৎসব হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে অন্য অনেকের মত আমরা তাঁহাকে টেলিগ্রাফ দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করিয়াছি। প্রবাসীতেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইতেছি। তিনি সমগ্র ভারতীয় জাতিকে স্বাধীনতা লাভের অহিংস নূতন সভ্যমানবোচিত পথ দেখাইয়া এবং সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং সেই পথের পথিক হইয়া জাতির মনে আশার সঞ্চার করিয়াছেন, এবং ভয়গ্রস্ত ও অবসাদগস্ত জাতিকে নির্ভয় ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বাবলম্বনের অমোঘতায় দৃঢ়বিশ্বাসী করিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে গোপন ছলচাতুরীর পরিবর্ত্তে প্রকাশ্য পন্থার অনুসরণ ও সত্যের অনুবর্ত্তিতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মকে ও আন্তরিক শুচিতাকে ব্যক্তির জীবনের মত জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তিনি অস্পৃশ্যতাকে জাতীয় মহাপাপ ঘোষণা করিয়া উহা দূরীকরণকে জাতীয় অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং স্বয়ং ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দরিদ্রদের জন্যই পূর্ণস্বরাজ সর্ব্বাগ্রে ও প্রধানতঃ আবশ্যক, ইহা তাঁহার অন্যতম মহাবাক্য। তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মকে আবর্জ্জনা মুক্ত করিয়া সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন তাঁহার জীবনের অন্যতম মহৎ প্রয়াস। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ধর্ম্মসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য, ইহাও তাঁহার জীবন ও চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য।

—

মহাত্মা গান্ধীর দাবি

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে বিলাতে পূর্ণস্বাধীনতার দাবি করিয়াছেন। অধীন ভারতে তাঁহার স্থান নাই, ইহা সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ভাষায় জানাইয়াছেন। দেশরক্ষা, দেশের আর্থিক সমুদায় ব্যাপার, এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অন্য সমুদায় ব্যাপারে তিনি ভারতীয়দের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের দাবি করিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতের অবস্থিতির তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী; কিন্তু ইংলণ্ডের সমান অংশীদাররূপে তাহার সহিত যুক্ত থাকিতে তিনি এই সর্ত্তে রাজী, যে, দরকার হইলেই ভারতবর্ষ এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে। আমরাও ইহাতে রাজী, বিন্দুমাত্রও কোন প্রকার অধীনতায় রাজী নহি।

—

মহাত্মাজী কাহাকে প্রণাম করিবেন

একখানা বিলাতী কাগজে এই মিথ্যা গল্প বাহির হয়, যে, মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ যুবরাজের নিকট নতজানু হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি দয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, ঐ গল্প সর্ব্বৈব মিথ্যা। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে পুরুষানুক্রমে "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়"দের উপর অত্যাচার হওয়ায় তিনি তাহাদের নিকট প্রণত হইতে পারেন। কিন্তু যুবরাজ কেন, ইংলণ্ডের রাজার নিকটও এই হেতু তিনি প্রণত হইতে পারেন না, যে, ইংলণ্ডেশ্বর বলদর্পের প্রতীক। তিনি বরং তাহা অপেক্ষা হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে রাজী। একটি পিপীলিকারও অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার নিকট প্রণত হইতে রাজী। মহাত্মাজীর চরিত্রে এই বজ্রের দৃঢ়তা ও কুসুমের কোমলতার এবং তেজস্বিতার ও দীনতার সমাবেশ বন্দনীয়।

—

নারীসমবায় ভাণ্ডার

নারীশিক্ষা সমিতির চেষ্টায় সম্প্রতি একটি নারীসমবায় মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। ১৮ বৎসরের ঊর্দ্ধ-

বয়স্কা নারীরা সমবায় মণ্ডলীর অংশ ক্রয় করিতে পারেন। মণ্ডলী বিক্রয়যোগ্য মনে করিলে অংশীদারদের কারু-শিল্পাদি বিক্রয়ের ভার লন। ৭২ই কলেজ ষ্ট্রীট ঠিকানায় ইঁহাদের সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে মেয়েদের ব্যবহারের উপযুক্ত শাড়ী জামা, বাসন-কোসন মণিহারি দ্রব্য ইত্যাদি নানা জিনিষ পাওয়া যায়। পূজার পূর্ব্বে মেয়েরা যদি নিজেরা গিয়া পছন্দমত জিনিষ কিনিতে চান, তাহা হইলে সমবায় ভাণ্ডারে তাহার অনেক সুযোগ পাইবেন। মেয়েরা স্বয়ং জিনিষ বিক্রয় করেন, সুতরাং নিজ রুচি ও প্রয়োজন মত জিনিষ নিজে কিনিয়া আনার সুবিধা সেখানে যথেষ্ট। আশা করি মহিলারা এখানে পূজার বাজার করিয়া নিজেদের এবং দোকানের উপকার করিবেন।

—

বঙ্গে নারীর প্রতি অত্যাচার

অনেক বৎসর হইতে বাংলা দেশে অনেক নারীর প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার হইয়া আসিতেছে। এই অত্যাচার অন্তঃপুরে পরিবারের লোকদের দ্বারা, এবং ঘরের বাহিরে অন্য লোকদের দ্বারা, দুই রকমই হয়। অন্তঃপুরের অত্যাচার লোকসমাজে খুব কম প্রকাশিত হইলেও, তাহারও কিয়দংশের জন্য আদালতে মোকদ্দমা হওয়ায় তাহার সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়া থাকে। ঘরের বাহিরে যে অত্যাচার হয়, তাহার খবর কিছু বেশী বাহির হইলেও, যত নারীর উপর অত্যাচারের খবর বাহির হয়, তাহার ৪।৫ গুণ বেশী নারী নিগৃহীতা হইয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এই সকল অত্যাচারের সংবাদ ও সংখ্যা খবরের কাগজ হইতে সঙ্কলন করা ভিন্ন উপায় ছিল না; পুলিসের বার্ষিক সরকারী রিপোর্টে এই প্রকার অপরাধের কোন আলাদা বৃত্তান্ত ও সংখ্যা থাকিত না। পরলোকগত পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর-জেনেরাল মিঃ লোম্যান ১৯২৯ সালের রিপোর্টে প্রথম ইহার বিবরণ দেন এবং বঙ্গের সর্ব্বত্র পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে এইরূপ অপরাধের তদন্ত ও

১৯৩০ সালের বার্ষিক পুলিস রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে যতগুলি অপরাধের কথা আছে, তাহা সম্ভবতঃ প্রকৃত সংখ্যার সিকিও নহে। কারণ, অধিকাংশ স্থলে নিগৃহীতা নারী ও তাঁহাদের আত্মীয়েরা লোকলজ্জা ও জাতিচ্যুতির ভয়ে, কখন কখন পশুপ্রকৃতি দুর্বৃত্ত অত্যাচারীদের ভয়ে, কখন কখন বা দারিদ্র্যবশতঃ, মোকদ্দমা করেন না।

১৯৩০ সালের বঙ্গীয় বার্ষিক পুলিস রিপোর্টের ২৯ পৃষ্ঠায় এইরূপ অপরাধ সম্বন্ধে যে অনুচ্ছেদটি আছে, তাহাতে দেখা যায়, যে, নারীহরণের ১৯৮টা এবং সতীত্বনাশের বা সতীত্বনাশার্থ বলপ্রয়োগের ৪১১টা মোকদ্দমা সত্য বলিয়া ঐ বৎসর গৃহীত হয়। নারী-হরণের ৬৮টা মোকদ্দমায় ১৭৯ জন অপরাধীর এবং সতীত্বনাশ বা তাহার চেষ্টার ১৩০টা মোকদ্দমায় ১৬০ জনের শাস্তির আদেশ হয়। বাকী মোকদ্দমাগুলার বিচার বৎসরের মধ্যে শেষ হয় নাই।

কোন্ জেলায় এইরূপ মোকদ্দমা কত হইয়াছিল, তাহার তালিকা ১৯৩০ সালের বার্ষিক পুলিস রিপোর্টের পরিশিষ্টে ৬৯,৭০, ৭২ ও ৭৩ পৃষ্ঠায় আছে। নীচের তালিকাগুলি তাহা হইতে সঙ্কলিত।

১৯৩০ সালে বঙ্গে নারীহরণের মোকদ্দমা।

জেলার নাম।	গত বৎসরের মূলতবি।	বর্ত্তমান বর্ষের।	এই বর্ষের মূলতবি।	সত্য মোকদ্দমা।	মিথ্যা মোকদ্দমা।	দং
২৪পরগণা	৫	২৪	৬	২৬	২	৭
নদীয়া	৬	১৩	১	১৩	—	৮
মুর্শিদাবাদ	—	—	—	—	—	—
যশোহর	১	৮	২	৪	—	[illegible]
খুলনা	২	৫	২	৩	১	[illegible]
মোট	১৪	৫০	১১	৪৬	৩	[illegible]
বর্দ্ধমান	১	৭	২	১৭	১	[illegible]
বীরভূম	—	৩	—	১	—	[illegible]
বাঁকুড়া	—	৩	—	২	—	
মেদিনীপুর	—	১	—	৪	—	[illegible]
হুগলী	—	৮	৩	৩	১	
হাওড়া	৫	৫	৪	৫	১	

জেলার নাম।	গত বৎসরের মুলতবি।	বর্ত্তমান বর্ষের।	এই বর্ষের মুলতবি।	সত্য মোকদ্দমা।	মিথ্যা মোকদ্দমা।	দণ্ড
রাজশাহী	৬	১০	৬	৯	—	২
দিনাজপুর	—	৫	২	৬	—	—
জলপাইগুড়ি	১	৩	১	১	—	১
রঙ্গপুর	১৮	৩১	১৭	১৭	৩	৫
বগুড়া	৪	২৫	১১	৫	৩	১
পাবনা	৩	৬	১	৫	—	২
মালদহ	১	১	২	—	—	—
দার্জ্জিলিং	১	৪	১	১	১	১
মোট	৩৪	৮৫	৪১	৪৪	৭	১২
ঢাকা	৩	৯	১	১২	২	১
ময়মনসিংহ	১৯	৭৩	২৯	৩৪	৩	৯
ত্রিপুরা	—	৬	১	৬	১	২
মোট	২২	৮৮	৩১	৫২	৬	১২
বাকরগঞ্জ	৪	১৮	৫	১৬	১	৫
ফরিদপুর	২	৭	৩	৬	—	১
নোয়াখালী	১	১	১	২	—	—
চট্টগ্রাম	—	৪	২	—	—	—
মোট	৭	৩০	১১	২৪	১	৬
সর্ব্বমোট	৮৩	২৮০	১০৩	১৯৮	২০	৫৮

সতীত্বনাশ বা তাহার চেষ্টার মোকদ্দমা

জেলার নাম।	গত বৎসরের মুলতুবি।	বর্ত্তমান বর্ষের।	বর্ত্তমান বর্ষের মুলতুবি।	সত্য মোকদ্দমা।	মিথ্যা মোঃ	দণ্ড।
২৪ পরগণা	৬	৩১	৪	৪৮	৩	১০
নদীয়া	৯	৩৮	২	৫০	—	১৫
মুর্শিদাবাদ	৪	৩	—	১৫	—	২
যশোহর	৪	১০	২	১১	—	৩
খুলনা	১	১১	—	৮	১	২
মোট	২৪	৯৩	৮	১৩২	৪	৩২
বর্দ্ধমান	—	৯	২	১৯	—	৩
বীরভূম	—	৬	১	১৭	—	২
বাঁকুড়া	—	২	—	৪	—	—
মেদিনীপুর	—	৭	২	১৪	—	১
হুগলী	—	৬	১	৩	—	১
হাওড়া	১	৭	—	১১	২	১
মোট	১	৩৭	৬	৬৮	২	৮
রাজশাহী	২	৭	১	৬	১	৪
দিনাজপুর	৪	১৬	৫	৩৮	২	৯
জলপাইগুড়ি	১	১	—	২	—	—
রঙ্গপুর	৩	১৯	৫	১৬	—	২
বগুড়া	১	৮	১	৭	—	৩
পাবনা	—	১০	—	১০	—	১
মালদহ	২	৬	—	৬	২	৪
দার্জ্জিলিং	—	৫	১	৬	—	—
জেলার নাম।	গত বৎসরের মুলতবি।	বর্ত্তমান বর্ষের।	এই বর্ষের মুলতবি।	সত্য মোকদ্দমা।	মিথ্যা মোকদ্দমা।	দণ্ড
ঢাকা	৫	১১	৩	৪০	১	৫
ময়মনসিংহ	৪	২৯	১	২৬	---	১৪
ত্রিপুরা	---	৪	১	৭	---	---
মোট	৯	৪৪	৫	৭৩	১	১৯
বাকরগঞ্জ	২	১৮	১	২৫	২	৩
ফরিদপুর	১	২	—	২	---	১
নোয়াখালী	---	৮	৩	১৭	—	১
চট্টগ্রাম	---	৬	২	৩	---	---
মোট	৩	৩৪	৬	৪৭	২	৫
সর্ব্বমোট---	৫০	২৮০	৩৮	৪১১	১৪	৮৭

নারীহরণের যতগুলি অভিযোগের তদন্ত হইতে বাকী ছিল, তাহার সংখ্যা ৩৬৩ ; সতীত্বনাশ বা তাহার চেষ্টার যতগুলি অভিযোগের তদন্ত হইতে বাকী ছিল, তাহার সংখ্যা ৩৩০ ; মোট ৬৯৩। এই সংখ্যাগুলি উপরের দুটি তালিকায় দেখান হয় নাই। কিন্তু সত্য বলিয়া গৃহীত উক্ত রূপ অপরাধের সংখ্যাই যথাক্রমে ১৯৮ ও ৪১১—মোট ৬০৯টা। এই ৬০৯টা সত্য মোকদ্দমার সংখ্যার সহিত তদন্ত করিতে বাকী ৬৯৩টা নালিশ যোগ করিলে মোট নালিশ দাঁড়ায় ১৩০২টা। এক বৎসরে বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচারের ১৩০২টা প্রকাশ্য নালিশ অতি ভীষণ ও লজ্জাকর ব্যাপার। যদি এরূপ অনুমান করা যায়, যে, প্রকাশ্য নালিশের চারিগুণ সত্য ঘটনা ঘটে যাহার সবগুলার জন্ম নালিশ পূর্ব্বে উল্লিখিত নানাকারণে হয় না—এবং এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে—তাহা হইলে বলিতে হইবে, নারীর উপর অত্যাচারের ঘটনা বঙ্গে বৎসরে পাঁচ হাজারের উপর হয়।

সম্পত্তি চুরি অপেক্ষা নারী চুরি নিঃসন্দেহ গুরুতর অপরাধ। যে-নারীর সতীত্ব বলপূর্ব্বক নষ্ট করা হয়, অনেকস্থলে তদ্দ্বারা তাঁহার প্রাণবধ অপেক্ষা অধিক ক্ষতি ও নিগ্রহ হয়। খুলিয়া বলা অনাবশ্যক। অথচ ১৯২৯ সালের আগে এই সব অপরাধের একটা আলাদা হিসাব পর্য্যন্ত সরকারী পুলিস রিপোর্টে থাকিত না। তাহা গবর্ণ্মেণ্টের

হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু শুধু গবর্ন্মেণ্টকে দোষ দিলে চলিবে না। এবিষয়ে দেশের স্ত্রীজাতীয় ও পুরুষজাতীয় লোকও উদাসীন। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের স্ত্রীজাতীয় ও পুরুষজাতীয় নেতা ও সভ্যেরাও উদাসীন।

মানুষের উপর অত্যাচারের অভিযোগ অপেক্ষা তাহার সম্পত্তিঘটিত অভিযোগকে যে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারা গুরুতর মনে করেন, তাহার অনুরূপ একটা দৃষ্টান্ত এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমগ্র ভারতে গান্ধী-আরুইন চুক্তিভঙ্গ যত প্রকারে হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল গুজরাটের একটি জেলার বারদোলি মহকুমার কয়েকটি গ্রামের প্রজাদের নিকট হইতে জোর করিয়া বেশী খাজনা আদায়ের অভিযোগের সরকারী তদন্তের অঙ্গীকারেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গের আটশত যুবককে যে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং মেদিনীপুর জেলায় স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচারের যে অভিযোগ হইয়াছিল, তাহাদের দুঃখের কথায় কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাতও করিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় নাই।

সরকারী পুলিস রিপোর্টে (২৯ পৃষ্ঠা) লিখিত হইয়াছে, যে, চব্বিশ পরগণা জেলায় নারীসম্পর্কিত সত্য অপরাধের সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী ছিল। তাহার একটা কারণ কলিকাতার সান্নিধ্য। কলিকাতা নারীদেহের পাপ ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। সরকারী রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, নদীয়া, মৈমনসিংহ, ঢাকা, দিনাজপুর এবং বাকরগঞ্জের সংখ্যাও অধিক। ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে এই জেলাগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

জেলা	হিন্দু	মুসলমান
চব্বিশ পরগণা	১৬,৮৭,৬৩৩	৯,০৯,৭৮৬
নদীয়া	৫,৮১,৭৬৩	৮,৯৫,১৯০
মৈমনসিংহ	১১,৭৪,০১৫	৩৬,২৩,৭১৯
ঢাকা	১০,৬৮,৯৪২	২০,৪৩,২৬৪
দিনাজপুর	৭,৫১,৮৬৮	৮,৩৬,৮০০

নারীর উপর অত্যাচার নিবারণের উপায়

নারীদের উপর অত্যাচার নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আমরা মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিয়াছি। সংক্ষেপে এ বিষয়ে কিছু বলা কঠিন।

কতকগুলি বিষয়ে যত দ্রুত সামাজিক পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহা করিতে হইবে। সেরূপ পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে এবং পরে, পুরুষদের চারিত্রিক উন্নতি ও প্রকৃত পৌরুষ বৃদ্ধি এবং নারীদের সাহস ও সতীত্ব-তেজ বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের ও নারীদের যেরূপ শিক্ষা হইলে পুরুষেরা নারীদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পারে, সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। নারীদের সাধারণ শিক্ষা এবং দৈহিক সামর্থ্যবৃদ্ধি ও অস্ত্রচালনে দক্ষতা উৎপাদনের নিমিত্ত শিক্ষা দেওয়া চাই। ঘরের বাহিরে আসিলেই বাঙালী মহিলারা সাধারণতঃ আড়ষ্ট এবং আকস্মিক কিছু ঘটিলে কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। এই দুর্ব্বলতা দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের স্বচ্ছন্দে বাহিরে চলাফিরার অভ্যাস জন্মান দরকার।

এই সকল দিকে নারীদের প্রগতি হইলে দুর্বৃত্ত পুরুষেরাও তাঁহাদিগকে সম্ভ্রমের চক্ষে—অন্ততঃ ভয়ের চক্ষে—দেখিবে।

নারীদের পরিচ্ছদে এরূপ অল্পতা বর্জ্জনীয় যাহাতে নারীদেহের বিশেষত্ব সহজে চোখে পড়ে; এরূপ পরিচ্ছদও বর্জ্জনীয় যাহা নারীদেহের বিশেষত্ব বেশী করিয়া লক্ষ্যের বিষয় করিয়া তোলে।

পল্লীগ্রামেও নারীদের কোন কোন প্রাকৃতিক কার্য্য যাহাতে গৃহপ্রাচীরের মধ্যে বা অন্য আবৃত স্থানে হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, বিধাতা শুভ উদ্দেশ্যে সেই প্রবৃত্তি দিয়াছেন। তাহার উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে। অবশ্য যে-সকল অল্পসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা নিজেদের ও সমাজের হিত সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় কৌমার্য্য অবলম্বন করিতে চান,

সাধারণতঃ বিবাহই ঐ প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহারের ও উহা সংযত রাখিবার উপায়। এই জন্য সকল ধর্মসম্প্রদায়েই বিবাহের যোগ্য কুমার কুমারী এবং বিপত্নীক ও বিধবাদের বিবাহের সুবিধা থাকা উচিত। কন্যাপণ ও বরপণ প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ একান্ত আবশ্যক। হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি ও জাতির মধ্যে বিবাহের প্রচলন সামান্য পরিমাণে হইতেছে। সেরূপ বিবাহের সকল বাধা দূর করা উচিত। বিবাহযোগ্যা হিন্দু বিধবাদের বিবাহ সামান্যই হইতেছে। এরূপ বিবাহের সমর্থকগণ আরও বেশী উদ্যোগী ও কর্ম্মিষ্ঠ হউন। বিধবাদের বিবাহ হইলে আরও কুমারী অবিবাহিতা থাকিয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ, বঙ্গে এবং সমগ্র ভারতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কম।

জোর করিয়া কাহারও বিবাহ দিবার কথা হইতেছে না। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, বালিকা ও যুবতী বিধবাদের বিবাহে বাধা দিলেই সতীত্বের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে ও থাকিবে।

বাদ্যযন্ত্রের তাঁত ও তার আলগা রাখিলেও তাহা সঙ্গীতের উপযোগী হয় না, খুব কষিয়া বাঁধিতে গেলেও তাহার উপযোগী না হইয়া তাহা ছিঁড়িয়া যায়। জড় পদার্থ তাঁত ও তারে যা সয় তাহাই যেমন বয় এবং তাহাই আদর্শস্থানীয়, মানব প্রকৃতিতেও তেমনি যা সয়, তাহাই বয়—তাহাই আদর্শ।

হিন্দু সমাজের লোকেরা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবেন, পুরুষ-নারীর আকর্ষণ সম্প্রদায়ভেদ ও জাতিভেদের বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ। অতএব প্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধনের ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া তাহাকে বৈধ পথে চালিত করিবার ব্যবস্থা সমাজের মধ্যেই রাখা আবশ্যক।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলমোহর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন শীলমোহরের কেন্দ্রস্থলে একটি পদ্মফুল এবং উপরে নীচে ইংরেজী ও বাংলা অক্ষরে "Advancement of Learning" ও নামও আছে। ইহা ঠিক হইয়াছে। বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরে বাংলা অক্ষরের ব্যবহারও সমীচীন হইয়াছে। অধ্যয়ন অধ্যাপন ও পরীক্ষার জন্য যতগুলি ভারতীয় ভাষার ব্যবহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা অনুমোদিত, অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা ততগুলি অনুমোদিত নহে। অতএব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বাপেক্ষা উদার, স্বাজাতিক এবং প্রাদেশিক সংকীর্ণতা-বর্জ্জিত।

—

ভারতে জাপানী চাউলের আমদানী

কিছু দিন হইতে ভারতবর্ষে জাপানী চাউলের আমদানী বাড়িয়া চলিতেছে। জাপানে জাপানী চাউলের যাহা মূল্য তাহার উপর জাহাজ ভাড়া দিয়া ও লাভ রাখিয়া ঐ চাউল এদেশে বিক্রী করিতে পারিলে তাহা স্বাভাবিক বাণিজ্য বলিয়া বৈধ বিবেচিত হইতে পারিত, যদিও সেক্ষেত্রেও আত্মরক্ষার জন্য জাপানী চাউলের উপর আবশ্যকমত আমদানী শুল্ক বসাইবার ন্যায্য অধিকার ভারতবর্ষের থাকিত। কিন্তু বাস্তবিক জাপানী গবর্ন্মেণ্ট ভারতে চাউল পাঠাইবার এরূপ নানা সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে দরকার হইলে জাপানে জাপানী চাউলের দামের চেয়ে কম দামেও লোকসান দিয়া ঐ চাউল এদেশে বিক্রী করা চলিতে পারে। ইহা স্বাভাবিক বাণিজ্য নয়, বাণিজ্য ব্যপদেশে যুদ্ধ। ইহার প্রতিকারার্থ, হয় এদেশে জাপানী চাউল আমদানী আইন দ্বারা বন্ধ করিতে হইবে, কিংবা উহার উপর খুব বেশী আমদানী শুল্ক বসাইতে হইবে।

—

"বিশ্বপ্রেম," "ভারতপ্রেম" ও প্রাদেশিক সংকীর্ণতা

বাংলা দেশে বাঙালীর উৎপন্ন জিনিষই সর্ব্বাগ্রে বাঙালীর কেনা উচিত (অবশ্য যদি তাহা ব্যবহারযোগ্য হয়), ইহা আমরা বরাবর মনে করিয়া ও বলিয়া আসিতেছি। তাহা যথেষ্ট না পাওয়া গেলে, তাহার

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩১শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

২য় সংখ্যা

বুদ্ধদেবের প্রতি

[সারনাথে নূতন বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ নামে একদিন ধন্য হ'ল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি॥
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক্, মুক্ত হোক্ মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নব প্রাতে উঠুক্ কুসুমি'॥

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক্ প্রাণবান।
খুলে যাক্ রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক্ শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্ত্তা শত কণ্ঠে উঠুক্ নিঃস্বনি'
এনে দিক্ অজেয় আহ্বান॥

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে আশ্রমবাসী আমরা সকলে আনন্দোৎসব করব। আমি আরম্ভের সুরটুকু ধরিয়ে দিতে চাই।

আধুনিক কালে এই রকমের উৎসব অনেকখানি বাহ্য অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েচে। খানিকটা ছুটি ও অনেকখানি উত্তেজনা দিয়ে এটা তৈরি। এই রকম চাঞ্চল্যে এই সকল উপলক্ষ্যের গভীর তাৎপর্য্য অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবার সুযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

ক্ষণজন্মা লোক যাঁরা তাঁরা শুধু বর্ত্তমান কালের নন। বর্ত্তমানের ভূমিকার মধ্যে ধরাতে গেলে তাঁদের অনেকখানি ছোট ক'রে আনতে হয়, এমনি ক'রে বৃহৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাশ্বত মূর্ত্তি প্রকাশ পায় তাকে খর্ব্ব করি। আমাদের আশু প্রয়োজনের আদর্শে তাঁদের মহত্ত্বকে নিঃশেষিত ক'রে বিচার করি। মহাকালের পটে যে-ছবি ধরা পড়ে বিধাতা তা'র থেকে প্রাত্যহিক জীবনের আত্মবিরোধ ও আত্মখণ্ডনের অনিবার্য্য কুটিল ও বিচ্ছিন্ন রেখাগুলি মুছে দেন, যা আকস্মিক ও ক্ষণকালীন তাকে বিলীন করেন, আমাদের প্রণম্য যাঁরা তাঁদের একটি সংহত সম্পূর্ণ মূর্ত্তি সংসারে চিরন্তন হয়ে থাকে। যাঁরা আমাদের কালে জীবিত তাঁদেরকেও এই ভাবে দেখবার প্রয়াসেই উৎসবের সার্থকতা।

আজকের দিনে ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রিক বিরোধ পরশু দিন হয়ত তা থাকবে না, সাময়িক অভিপ্রায়গুলি সময়ের স্রোতে কোথায় লুপ্ত হবে। ধরা যাক্, আমাদের রাষ্ট্রিক সাধনা সফল হয়েচে, বাহিরের দিক থেকে চাইবার আর কিছু নেই, ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করল— তৎসত্ত্বেও আজকের দিনের ইতিহাসের কোন্ আত্মপ্রকাশটি ধূলির আকর্ষণ বাঁচিয়ে উপরে মাথা তুলে থাকবে সেইটিই বিশেষ ক'রে দেখবার যোগ্য। সেই দিক থেকে যখন দেখতে যাই তখন বুঝি আজকের উৎসবে যাঁকে নিয়ে আমরা আনন্দ করচি তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর বিশিষ্টতা কোন্‌খানে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির মূল্য আরোপ ক'রে তাঁকে আমরা দেখ্‌ব না, যে দৃঢ়শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেচেন সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি, সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দলপাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েচে, কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর, জন্মান্তর ঘটে গেল। ইনি আসবার পূর্ব্বে দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন সঙ্কোচে অভিভূত ছিল, কেবল ছিল অন্যের অনুগ্রহের জন্য আবদার আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।

ভারতবর্ষের বাহির থেকে যারা আগন্তুকমাত্র তাদেরই প্রভাব হবে বলশালী, দেশের ইতিহাস বেয়ে যুগপ্রবাহিত ভারতের প্রাণধারা চিত্তধারা, সেইটেই হবে ম্লান, যেন সেইটেই আকস্মিক, এর চেয়ে দুর্গতির কথা আর কি হ'তে পারে? সেবার দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা মৈত্রীর দ্বারা দেশকে ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করবার বাধা ঘটাতে যথার্থই আমরা পরবাসী হয়ে পড়েচি; শাসনকর্ত্তাদের শিক্ষাপ্রণালী, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ওদের তলোয়ার বন্দুক নিয়ে ভারতে ওরাই হ'ল মুখ্য, আর আমরাই হলুম গৌণ, মোহাভিভূত মনে এই কথাটির স্বীকৃতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের সকলকে তামসিকতায় জড়বুদ্ধি ক'রে রেখেছিল। স্থানে স্থানে লোকমান্য তিলকের মত জনকতক সাহসী পুরুষ জড়ত্বকে প্রাণপণে আঘাত করেচেন, এবং আত্মশ্রদ্ধার আদর্শকে জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হয়েচেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এই আদর্শকে বিপুল ভাবে প্রবল প্রভাবে প্রয়োগ করলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি ক'রে তিনি অসামান্য তপস্যার তেজে নূতন যুগগঠনের কাজে নাম্‌লেন। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এতদিনে যথোপযুক্তরূপে আরম্ভ হ'ল।

এতকাল আমাদের নিঃসাহসের উপরে দুর্গ বেঁধে বিদেশী বণিকরাজ সাম্রাজ্যিকতার ব্যবসা চালিয়েচে। অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত ভাল ক'রে দাঁড়াবার জায়গা

পেত না যদি আমাদের দুর্ব্বলতা তাকে আশ্রয় না দিত। পরাভবের সব চেয়ে বড় উপাদান আমরা নিজের ভিতর থেকেই জুগিয়েচি। এই আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজী—নববীর্য্যের অনুভূতির বন্যাধারা ভারতবর্ষে তিনি প্রবাহিত করলেন। এখন শাসনকর্ত্তারা উদ্যত হয়েচেন আমাদের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করতে, কেন-না তাদের পরশাসনতন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলেচে, যে-ভিত্তি আমাদের বীর্য্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎসমাজে আমাদের স্থান দাবি করচি।

তাই আজ আমাদের জানতে হবে, যে-মানুষ বিলেতে গিয়ে রাউণ্ড টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্সে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েচেন, যিনি খদ্দর চরকা প্রচার করেন, যিনি প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না—এই সব মতামত ও কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যেই যেন এই মহাপুরুষকে সীমাবদ্ধ ক'রে না দেখি। সাময়িক যে-সব ব্যাপারে তিনি জড়িত তাতে তাঁর ত্রুটিও ঘটতে পারে; তা নিয়ে তর্কও চল্‌তে পারে—কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার করেচেন তাঁর ভ্রান্তি হয়েচে, কালের পরিবর্ত্তনে তাঁকে মত বদ্‌লাতে হয়েচে। কিন্তু এই যে অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুলেচে, এই যে অপরাজেয় সঙ্কল্পশক্তি এ তাঁর সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মত, এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে নিত্যপরিবর্ত্তনের ধারা ব'য়ে চলেচে, কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে যে মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'ল তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা ক'রতে শিখি।

মহাত্মাজীর জীবনের এই তেজ আজ সমগ্রদেশে সঞ্চারিত হয়েচে, আমাদের ম্লানতা মার্জ্জনা ক'রে দিচ্চে। তাঁর এই তেজোদ্দীপ্ত সাধকের মূর্ত্তিই মহাকালের আসনকে অধিকার ক'রে আছেন। বাধা বিপত্তিকে তিনি মানেন নি, নিজের ভ্রমে তাঁকে খর্ব্ব করে নি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তার উর্দ্ধে তাঁর মন অপ্রমত্ত। এই বিপুল চরিত্রশক্তির আধার যিনি তাঁকেই আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা নমস্কার করি।

পরিশেষে আমার বলবার কথা এই যে, পূর্ব্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্যধর্ম্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কারে কোনোদিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। মহাত্মাজী ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী অন্ধতা, মূঢ় আচারের বিরুদ্ধে যে-বিদ্রোহ একদিক থেকে জাগিয়ে তুলেচেন আমাদের সাধনা হোক সকল দিক থেকেই তাকে প্রবল ক'রে তোলা। জাতিভেদ, ধর্ম্মবিরোধ, মূঢ় সংস্কারের আবর্ত্তে যতদিন আমরা চালিত হ'তে থাকব ততদিন কার সাধ্য আমাদের মুক্তি দেয়। কেবল ভোটের সংখ্যা এবং পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা হিসাব গণনা ক'রে কোনো জাত দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায় না। যে-জাতির সামাজিক ভিত্তি বাধায় বিরোধে শতছিদ্র হয়ে আছে, যারা পঞ্জিকায় ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জ্জনা বহন ক'রে বেড়ায়, বিচারশক্তিহীন মূঢ় চিত্তে বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জলে পুরুষানুক্রমিক পাপক্ষালন করতে ছোটে, যারা আত্মবুদ্ধি, আত্মশক্তির অবমাননাকে আপ্তবাক্যের নাম দিয়ে আদরে পোষণ করচে তারা কখনও এমন সাধনাকে স্থায়ী ও গভীর ভাবে বহন করতে পারে না যে-সাধনায় অন্তরে বাহিরে পরদাসত্বের বন্ধন ছেদন করতে পারে, যার দ্বারা স্বাধীনতার দুরূহ দায়িত্বকে সকল শত্রুর হাত থেকে দৃঢ় শক্তিতে রক্ষা করতে পারে। মনে রাখা চাই বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন বীর্য্যের দরকার হয় না, আপন অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা। আজ যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করচি এই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েচেন, তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে তবে আজ আমাদের প্রশংসাবাক্য, উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবে। আমাদের সাধনা আজ আরম্ভ হ'ল মাত্র, দুর্গম পথ আমাদের সাম্‌নে পড়ে রয়েচে।

শান্তিনিকেতন

১৫ই আশ্বিন, ১৩৩৮

পত্রধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

কল্যাণীয়াসু

প্রথমেই ব'লে রাখি আমার সব কথা বলবার অধিকার নেই। যেখানে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব সেখানে যুক্তিতর্ক ক'রে বোঝা ছাড়া উপায় নেই। তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারি তুমি একটা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছ সেটাকে আমার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে যখন চেষ্টা করি তখন মনে সংশয় থেকে যায়। তবুও আমার দিক থেকে যেটা বলবার আছে সেটা বলা চাই।

বাংলা দেশে আমরা শাক্ত কিংবা বৈষ্ণবধর্ম্মে মুখ্যত রস সম্ভোগ করতে চাই। হৃদয়াবেগের মধ্যে তলিয়ে যাওয়াকেই সাধনার সার্থকতা মনে করি। এ'কে আধ্যাত্মিক বিলাস বলা যেতে পারে। সব রকম বিলাসের মধ্যেই বিকারের সম্ভাবনা আছে।

গ্রামে যখন বাস করতুম একজন বৈষ্ণব সাধকের সঙ্গে আমার প্রায় আলাপ হ'ত। আমি তাঁকে একদিন বললুম, ব্রাহ্মণপাড়ায় দুর্নীতি দুর্গতি ও দুঃখের অন্ত নেই। আপনি কেন তাদের মাঝখানে থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন না। শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন— এ-সব লোকদের সহবাস দূরে পরিহার করাই তিনি সাধনার পন্থা ব'লে জানেন, এতে রসভোগ-চর্চ্চায় ব্যাঘাত করে। দেবতা যদি নিতান্তই অতিমানুষ হন তাহ'লে তাঁকে নিয়ে কেবল হৃদয়াবেগের চর্চ্চা করলেই চলে। আমাদের কর্ম্মে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই— বুদ্ধি চাইনে, শক্তি চাইনে, চরিত্র চাইনে, কেবল নিরন্তর ভাবে ডুবুডুবু হয়ে থাকলেই হ'ল। অর্থাৎ তাঁকে দিয়ে হৃদয়ের সখ মেটাবার ব্যাপার। যেহেতু খেলার পুতুল সত্যকার মানুষ নয় এইজন্যে তাকে নিয়ে বালিকা আপন হৃদয়বৃত্তিকে দৌড় করায়—আর কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু সন্তানের মা'র দায় আছে, শুধু কেবল হৃদয় নেই—তাকে বুদ্ধি খাটাতে হয়, শক্তি খাটাতে হয়, সন্তানের সেবা পরিপূর্ণমাত্রায় সত্য ক'রে না তুললে চলে না। তাঁকে পুতুল সাজিয়ে ফাঁকির নৈবেদ্য দিয়ে ভোলাবে কে? মানুষের মধ্যে যে-দেবতার আবির্ভাব তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে পূর্ণ মানুষ হ'তে হবে। মানুরার দেবতা মানুষেরই গায়ের অলঙ্কার হরণ ক'রে নিয়ে মানুষের দেবতাকে বঞ্চিত করে। ঠাকুরকে এই রকম অলঙ্কার দিতে হৃদয়ের তৃপ্তি হয় মানি, কিন্তু ঠাকুরকে কেবল মাত্র হৃদয়তৃপ্তির উপলক্ষ্য করলে তাঁকে ছোট করা হয়, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধকে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ করা হয়। তুমি মনে কর ঠাকুরের ভাণ্ডারে এই যে প্রভূত ধন অলঙ্কার নিষ্ফলভাবে সঞ্চিত হচ্চে এ কোনো এক সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনে কাজে লাগবে। কখনও না, এ পর্য্যন্ত তার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিষয়ীলোকের ধনসঞ্চয়ের যে দুর্নিবার লালসা সেই লালসার তৃপ্তি দেবতার নামে আমরা করি—তার প্রধান কারণ দেবতার প্রতি আমাদের মানবদায়িত্ব নেই। জগন্নাথকে পুরোহিত স্নান করায়, কাপড় পরায়, পাখার হাওয়া করে, ওষুধ খাওয়ায়—যদি তার অর্থ এই হয় যে, মানুষের মধ্যে জগন্নাথেরই স্নানের, কাপড় পরার, ওষুধ খাওয়ার সত্যই প্রয়োজন আছে তাহ'লে এমনতর ব্যর্থভাবে নিজের দায় সেরে নিতে প্রবৃত্তি হয়? তাহ'লে সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত শক্তি নিয়ে মানবভগবানের অন্নবস্ত্র পানীয় পথ্যের আয়োজন না ক'রে থাকা যায় না। যুগে যুগে আমরা তাতে অবহেলা করেচি ব'লেই মন্দিরের ভগবান পাণ্ডা পুরুতের মধ্যেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠচেন লোকালয়ে তাঁর কঠোর হাড় বেরিয়ে পড়ল, তাঁর পরণে ট্যানা জোটে না।

দুঃখবেদনার অনুভূতি থেকে তুমি নিজেকে বাঁচাতে চেয়েচ। ভক্তি বা হৃদয়াবেগের নেশা দিয়ে ফল পাবে না। তোমার ভালবাসা যেখানে জ্ঞানে কর্ম্মে ত্যাগে তপস্যায় ষোলো আনা পূর্ণ সেইখানেই তোমার পরিত্রাণ। যে-সেবা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সত্য এবং যে-সেবায় তোমার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ সত্য হ'তে পারে সেইখানেই আনন্দ—সে-আনন্দ দুঃখকে স্বীকার ক'রে, তাকে এড়িয়ে নয়। মানুষের দেবতার কাছে তুমি

নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দাও—তিনি যদি তোমাকে দুঃখের মালা পরিয়ে দেন তবে সেই মালা দিয়েই তিনি তোমাকে বরণ ক'রে আপন ক'রে নেবেন—তার চেয়ে আর কি চাই?

তুমি প্রতীকের কথা লিখেচ, সত্য আছেন দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে, দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করচেন, যদি থাকি দ্বার বন্ধ ক'রে প্রতীককে নিয়ে, তার চেয়ে বিড়ম্বনা নেই। সব চেয়ে বিপদ হচ্ছে প্রতীক অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন সত্য হয়ে যায় পর। সত্যের দাবি কঠিন, প্রতীকের দাবি যৎসামান্য। সত্য বলে, অকল্যাণকে অন্তরে ঠেকাতে হবে প্রাণপণশক্তিতে; প্রতীক বলে, পাঁচ-সিকের পূজো দিয়েই ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ সত্য মানুষকে মানুষ হ'তে বলে, আর প্রতীক তাকে চিরদিন ছেলেমানুষ হ'তে বলে। প্রতীক মিথ্যা চোখরাঙানীতে ভারতের কোটি কোটি দুর্ব্বল চিত্তকে কাপুরুষ ক'রে তুলচে, সত্য তাকে যতরকম মিথ্যা ভয়ের মোহ থেকে উদ্বোধিত করতে চায়। প্রতীক দুশ্চরিত্র পাণ্ডার পায়ে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটায়, সত্য যথার্থ ভক্তির আলোয় মানুষের ললাটকে মহিমান্বিত করে।

তুমি তোমার যে-গুরুর মধ্যে পূর্ণ মানুষকে উপলব্ধি করেচ তিনি তো ফাঁকি নন, তাঁকে পেতে হ'লে তোমার সমস্ত মানবধর্ম্ম দিয়ে পেতে হবে, ছেলেখেলা ক'রে হবে না। বিরাট মানুষকে আমরা কোনো বিশেষ মানুষের মধ্যে দেখেচি তার সত্য প্রমাণ দেবার বেলায় প্রশ্ন উঠবে, যে, কি নৈবেদ্য তাঁকে দিলে? কেবল হৃদয়াবেগ? তাঁকে উদ্দেশ ক'রে তুমি মানুষের জন্যে কি করেচ—আপনাকে কতখানি বিশুদ্ধ ক'রে তুলতে পেরেচ? যে-বিরাট তাঁর মধ্যেই দেখা দিয়েচেন সেই বিরাটের সেবা কোথায়? তাঁর তৃপ্তির জন্যে যখন আপনাকে সত্য ভাবে ত্যাগ করবে, মানুষের দ্বারে, স্মৃতিমন্দিরের প্রাঙ্গণে নয়, তখনই জীবনে তাঁর সঙ্গে তোমার মিলন সার্থক হবে। ইতি

৪ বৈশাখ, ১৩৩৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি প'ড়ে আমি বিরক্ত হচ্চি এমন কল্পনা ক'রো না। যে-গভীর উপলব্ধির ভিতর দিয়ে তুমি গিয়েচ সেটা আমার জানতে ভালই লাগচে। আমার মনে পড়চে আমিও এক সময়ে স্বভাবতই যে সাধনাকে অবলম্বন করেছিলুম তার মধ্যে ভাবরসের অংশই ছিল প্রধান—সংসার থেকে হৃদয়ের যে-তৃপ্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়নি সেইটেকেই অন্তরের মধ্যে মথন ক'রে তোলবার চেষ্টায় ছিলুম। কিছুদিন এই রসস্রোতে গা-ঢালান দিয়েচি। কিন্তু সত্য তো কেবলি রসো বৈ সঃ নন, তাই এক সময় আমার ধিক্কার এল—সেই নিমজ্জন দশা থেকে তীরে ওঠাকেই মুক্তি ব'লে বুঝলুম। ভাবের মধ্যে সম্ভোগ, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে তপস্যা। এই তপস্যায় সেই মহাপুরুষের আহ্বান, যাঁকে ঋষি বলেচেন "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা।" কেবল তিনি বিশ্বরস এবং বিশ্বরূপ নন কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মে যোগ দিতে গেলেই বিশুদ্ধ হ'তে হয়, বীর্য্যবান হ'তে হয়, জ্ঞানী হ'তে হয়। বিশুদ্ধ কর্ম্মে সত্য সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হন—জ্ঞানে, রসে, তেজে—পূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সত্যকর্ম্মে, বিশ্বকর্ম্মে। একদা ছেলেবেলায় যখন দুধে বিতৃষ্ণা ছিল তখন ভৃত্যকে ব'লে দিয়েছিলুম ফেনায় পাত্র ভরিয়ে আনতে যাতে পিতা ফাঁকি না ধরতে পারেন। একদিন অন্তরের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলুম, রসের সাধনার অনেকটাই সেই ফেনা, বাষ্পোচ্ছ্বাস—যাঁর সামনে ধরি তাঁকেও ফাঁকি দিই, নিজেকেও। কর্ম্মের সাধনাতেও যথেষ্ট প্রবঞ্চনা চলে—অর্থাৎ দুধে ফেনা না মিশিয়ে জল মেশাবার পদ্ধতিও আছে—এমন ব্যবসায়ে অনেকেই পসার জমিয়ে থাকেন। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভোলাবার প্রলোভন এসে পড়ে—ষোলো আনা খাঁটি হওয়া সহজ নয়—কিন্তু তবু মনে জানি ভেজাল বাদ দিয়েও যেটুকু বাকী থাকে সেটা উঠে যাবার জিনিষ নয়। অন্তত আজ এটুকু বুঝেচি কর্ম্মের মধ্যে যে-উপলব্ধি, তাতে মনুষ্যত্বকে সম্মানিত করা হয়—তাতে বাইরে ব্যর্থতা ঘটলেও অন্তরে গৌরবহানি ঘটে না। ইতি

৮ বৈশাখ ১৩৩৮

ফাষ্ট´বুক ও চিত্রাঙ্গদা

শ্রীমনোজ বসু

রামোত্তম ঘোষ মহাশয়ের সেজছেলে ননী তিন বছরে তেরখানা ফাষ্ট´বুক ছিঁড়িল, কিন্তু ঘোড়ার গল্প ছাড়াইতে পারিল না।

ব্যাপারটা আর কোনক্রমে অবহেলা করা চলে না। অতএব পশু মাষ্টারের ডাক পড়িল।

পশুপতির নামডাক যেমন বেশী, দরও তেমনি কিছু বেশী। তা হউক। ছেলে আকাটমূর্খ হইয়া থাকে, সে জায়গায় দু-এক টাকার কম-বেশী এমন কিছু বড় কথা নয়।

সাব্যস্ত হইল, আট টাকা মাহিনা, তা ছাড়া ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতেই পশুপতি খাইবে, থাকিবে। পড়াইতে হইবে ফাষ্ট´বুক, শিশুশিক্ষা, সরল পাটীগণিত— সকালে একঘণ্টা, সন্ধ্যার পর দু-ঘণ্টা মাত্র।

বাহির-বাড়ির কাছারিঘরের পাশে ছোট্ট সঙ্কীর্ণ ঘরখানিতে এতদিন চুন ও সুরকী বোঝাই থাকিত, উহা পরিষ্কৃত হইয়া একপাশে পড়িল তক্তপোষ আর একপাশে একটি টেবিল ও ছোট বেঞ্চি একখানি। পড়াশুনা বিপুল বেগে আরম্ভ হইল।

লোকে যে বলে পশু মাষ্টার গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে পারে তাহা মোটেই মিথ্যা নয়। ছয় মাস না যাইতেই ননী শিশুশিক্ষা ছাড়াইয়া বোধোদয় ধরিল, পাটীগণিতের ত্রৈরাশিক সুরু হইয়া গিয়াছে, ফাষ্ট´বুকও শেষ হইবার বড় বেশী দেরি নাই।

আশ্বিন মাস, দেবীপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি।

অন্যান্য বার মহালয়ার সঙ্গেই স্কুল বন্ধ হইয়া যায়। এবার বছর বড় খারাপ, ছেলেরা মাহিনাপত্র মোটে দিতেছে না, তাই দেরি পড়িয়া যাইতেছে।

সকাল হইতে আকাশ মেঘলা। স্নান সম্বন্ধে বারোমাসই পশুপতি একটু বেশী সাবধান হইয়া চলে; এমন বাদলার দিনে ত আরোই। খাওয়াদাওয়া সারিয়া স্কুলের পথে পা বাড়াইয়াছে এমন সময়ে পিয়ন একখানা চিঠি দিয়া গেল।

খামের চিঠি। তাকাইয়া দেখিয়া পশুপতি পকেটে রাখিয়া দিল। খামের চিঠি হইলে কি হয়, স্কুলমাষ্টারের নামে আসিয়াছে—অতএব ভিতরে এমন কিছু থাকিতে পারে না যাহা না-পড়া পর্য্যন্ত প্রাণ আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে থাকে। এমনই আঁকাবাঁকা অক্ষরে ঠিকানা লেখা খাম পশুপতির নামে বহুকাল ধরিয়া আসিতেছে। বিবাহের পর প্রথম বছর তিন চারের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্ত্তী সকল চিঠির সুর একটি মাত্র। খাম না ছিঁড়িয়া পত্রের মর্ম্ম স্বচ্ছন্দে আগে হইতে বলিয়া দেওয়া যায় যে, প্রভাসিনী সংসার-খরচের টাকা চাহিয়াছে।

স্কুলে গিয়া স্থির হইয়া বসিতে-না-বসিতে ঘণ্টা বাজিল। প্রথমে অঙ্কের ক্লাস। ক্লাসে ঢুকিয়াই প্রকাণ্ড একটা জটিল ভগ্নাংশ বোর্ডে লিখিয়া পশুপতি হুঙ্কার দিল —খাতা বের কর্—টুকে নে। বলাটা অধিকন্তু, সকল ছেলে ইহা জানে এবং প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তারপর বোর্ডের উপর নক্ষত্রগতিতে অঙ্কের ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। পশুপতি কষিয়া যাইতেছে, মুছিতেছে, আবার কষিতেছে। জোর কদমে-চলা-ঘোড়ার ক্ষুরের মত খটাখট্ খটাখট্ ক্রমাগত খড়ির আওয়াজ, তা ছাড়া সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। ক্লাসের মধ্যে যেন কোন ছেলে নাই, কিংবা থাকিলেও হয়ত একেবারে মরিয়া আছে। প্রকাণ্ড খড়ির তাল দেখিতে দেখিতে জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হইয়া গেল। ছেলেরা একটা অঙ্কের মাঝামাঝি লিখিতে লিখিতে তাকাইয়া দেখে কোন্ ফাঁকে সেটা শেষ হইয়া আর একটি সুরু হইয়াছে; দ্বিতীয়টি না লিখিতে সেটা মুছিয়া তৃতীয় একটা আরম্ভ হয় এবং সেটা ধরিবার উপক্রম করিতে করিতে পরেরটি শেষ হইয়া যায়। গায়ে তাহার নীল খদ্দরের জামা। ইহারই মধ্যেই একটু ফাঁক

পায় পকেট হইতে নস্যের শামুক বাহির করিয়া এক টিপ নাকে গুঁজিয়া দেয়, তারপর নাকের বাহিরের নস্য ঝাড়িয়া হাতখানা জামার উপর ঘসিয়া সাফ করিয়া আরম্ভ করে—শেষ হ'ল ? ফের্ দিচ্ছি আর গোটা-আষ্টেক—

এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোকের মুখে পশু মাষ্টারের এত নামডাক শুধু শুধু হয় নাই, সে তিলার্দ্ধ ফাঁকি দেয় না। চারিটা ক্লাস পড়াইবার পর টিফিনের ঘণ্টা বাজিলে পশুপতি বাহির হইয়া আসিল। তখন নস্য ও খড়ির গুঁড়ায় জামার নীল রঙ ধূসর হইয়া গিয়াছে।

সিঁড়ির নীচে জানালাহীন ঘরখানিতে ক্লাস বসান যায় না। ইনস্পেক্টর মানা করিয়া গিয়াছে, সেখানে বসিলে ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাইবে। সেইটি মাষ্টারদের বসিবার ঘর। ইতিমধ্যেই সকলে আসিয়া জুটিয়াছেন। হুঁকা গোটা পাঁচ সাত—কোনটার গলায় কড়িবাঁধা, কোনটায় কেবলমাত্র রাঙাসুতা, একটির নলচের উপর আবার ছুরি দিয়া গর্ত্ত করিয়া লেখা হইয়াছে —'মা' অর্থাৎ মাহিষ্যের হুঁকা। নিজ নিজ জাতি বিবেচনা করিয়া মাষ্টারেরা উহার এক একটি তুলিয়া লইলেন। যাঁহাদের ভাগ্যে হুঁকা জুটে নাই তাঁহারা অনুকল্পে বিড়ি ধরাইলেন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছোট ঘরখানি অন্ধকার। রসালাপ ও প্রচণ্ড হাসি ক্রমশঃ জমিয়া আসিল। ক্ষণে ক্ষণে আশঙ্কা হয়, বুঝি-বা অত আনন্দের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া বহুকালের পুরানো ছাদ ভাঙিয়া-চুরিয়া সকলের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।

কিন্তু স্কুলের জন্মকাল হইতে এমনি আটত্রিশ বছর চলিয়া আসিতেছে, ছাদ ভাঙিয়া পড়ে নাই।

উহারই মধ্যে একটা কোণে বসিয়া পশুপতি খামখানা খুলিল। খুলিতেই আসল চিঠিখানা ছাড়া আর এক টুক্‌রা কাগজ উড়িয়া মেঝের গিয়া পড়িল। তুলিয়া দেখে—অবাক কাণ্ড! ইহা হইল কি করিয়া ?

এই সেদিন মাত্র সে খোকাকে ধরিয়া ধরিয়া অ-আ লেখাইয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে, এরই মধ্যে ছেলে নিজের হাতে পত্র লিখিয়াছে। কাহাকে দিয়া কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ কাটিয়া লইয়াছে, সেই ফাঁকের মধ্যে বড় বড় করিয়া লিখিয়াছে—বাবা, আমি পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছি ছবির বই আনিবে। ইতি—কমল।

একবার, দুইবার, তিনবার সে পড়িল। লেখা যেমনই হউক, অক্ষরের ছাঁদ কিন্তু বেশ—বড় হইলে খোকার হাতের লেখা ভারী সুন্দর হইবে। পশুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। এই ছেলে আবার বড় হইবে, তাহার দুঃখ ঘুচাইবে, বিশ্বাস ত হয় না! পরপর আরও তিনটি এমনি বয়সে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে সে কেমন যেন একটু উন্মনা হইয়া পড়িল।

পরক্ষণে খোকার চিঠি খামে পুরিয়া বাহির করিল প্রভাসিনী যে-খানি লিখিয়াছে। ছোট ছোট অক্ষরের সারি চলিয়াছে যেন সারবন্দী পিপীলিকা। বিস্তর দরকারী কথা—সাংসারিক অনটন, ধানচালের বাজার দর, গোয়ালের ফুটা চাল দিয়া জল পড়িতেছে, তারিণী মুখুয্যে বাস্তুভিটার খাজনার জন্য রোজ একবার তাগাদা করিয়া যায়,—ইত্যাদি সমাপ্ত হইয়া শেষকালে আসিয়া ঠেকিয়াছে কয়েকটি অত্যাবশ্যক জিনিষের ফর্দ্দ—ছুটিতে বাড়ি যাইবার মুখে খুলনা হইতে অতি অবশ্য অবশ্য সেগুলি কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে, ভুল না হয়।

পশুপতি ফর্দ্দখানির উপর আর একবার চোখ বুলাইল, তারপর পকেট হইতে পেন্সিল লইয়া পাশে পাশে দাম ধরিতে লাগিল।

কি ভাগ্য যে এতক্ষণ এদিকে কাহারও নজর পড়ে নাই। এইবার রসিক পণ্ডিত দেখিতে পাইল এবং ইসারা করিয়া সকলকে কাণ্ডটা দেখাইল। তারপর হঠাৎ ভারী ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল,—পশুভায়া, করেছ কি ? হাটের মধ্যে প্রেমপত্তোর বার করতে হয় ? ঢাকো—শিগগির ঢাকো—সব দেখে নিলে—

পশুপতি আপনার মনে ছিল, তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়া মুখ তুলিল।

হাসি চাপিয়া অত্যন্ত ভাল মানুষের মত রসিক কহিল —ঐ নকুড়চন্দোর বাবুর কাণ্ড, আড়চোখে দেখছিলেন।

নকুড়চন্দ্র বসিয়াছিলেন ঘরের বিপরীত কোণে। বুড়ামানুষ, কাহারও স্ত্রীর চিঠি চুরি করিয়া দেখিবার বয়স

তাঁহার নাই। পশুপতি বুঝিল, ইহাদের সুদৃষ্টি যখন পড়িয়াছে এখানে বসিয়া আর কিছু হইবে না। উঠিয়া পড়িল।

মন্মথ গড়াই অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল—মিছে কথা পশুপতিবাবু, কেউ দেখছে না। আপনি বসুন—বসুন। পণ্ডিত মশায়ের অন্যায়, ভদ্রলোকের পাঠে বাধা দিলেন। আপনি এই আমার পাশে এসে বসুন। গিন্নী কি পাঠ দিয়েছেন সেইটে একবার পড়ে শোনাতে হবে কিন্তু—

পশুপতি কোনদিন এই-সব রসিকতায় যোগ দেয় না। আজ তাহার কি হইয়াছে, বলিল,—এই কথা? তা শুনুন না—বলিয়া চিঠির উপর দৃষ্টি দিয়া মিছামিছি বলিতে লাগিল—প্রাণবল্লভ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়রঞ্জন,—আর সব ও পাতায় আছে। হ'ল ত! পথ ছাড়ুন মন্মথবাবু—বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

রসিক কহিতে লাগিল—দেখ্‌লে? তোমরা তর্ক করতে পশুপতি হাসতে জানে না—দেখলে ত? অন্যদিন বাড়ির চিঠি পেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে,—আজ যেন নবযৌবন পেয়েছে। ওহে মন্মথ, আজকের চিঠিতে কি আছে একবার দেখতে পার চুরি-চামারী ক'রে?

ঘরের বাহির হইয়াই কিন্তু পশুপতির হাসি নিবিয়া গিয়া ভাবনা ধরিল—পাঁচ টাকা দু-আনার মধ্যে প্রভাসিনীর শাড়ি, খোকার জামা, জিরামরিচ, পানে খাইবার চুন দু-সের, এক কৌটা বার্লি, বালতী এবং ছবির বই—এতগুলি কি করিয়া কুলাইয়া উঠে? তখন ছেলের দল হাসিয়া খেলিয়া চেঁচাইয়া লাফাইয়া স্কুলের উঠানটি মাত করিয়া ফেলিয়াছে। পশু মাষ্টারকে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। কিন্তু পশুপতির কোন দিকে নজর নাই, সে ভাবিতেছে।

স্কুলে পঁচিশ টাকা বলিয়া তাহাকে সহি করিতে হয়, কিন্তু আসল মাহিনা পনের টাকা। চিঠিতে ঐ যে তারিণী মুখুয্যের তাগাদার কথা লিখিয়াছে, এবার বাড়ি গেলে মুখুয্যের খাজনা অন্ততঃ টাকা তিন চার না দিলে রক্ষা নাই। আবার অগ্রহায়ণে নূতন ধান চাল উঠিবে, চাষীদের সহিত ঠিকঠাক করিয়া এখনই অগ্রিম কিছু দিয়া আসিতে হইবে, না হইলে পরে দেখিয়া শুনিয়া কে কিনিয়া দিবে? অতএব স্কুলের মাহিনার এক পয়সা খরচ করিলে হইবে না। ভরসা কেবল রামোত্তমের বাড়ির আটটি টাকা। তাহা হইতে বাড়ি যাইবার রেলষ্টীমার ভাড়া দুই টাকা চোদ্দ আনা বাদ দিলে দাঁড়ায় পাঁচ টাকা দু-আনা। সমস্ত পূজার বাজার ঐ পাঁচ টাকা দু-আনার মধ্যে।

হেডমাষ্টার কোন্ দিক দিয়া হঠাৎ কাছে আসিয়া ফিশ্ ফিশ্ করিয়া কহিলেন,—সেক্রেটারীর অর্ডার এসেছে, বন্ধ শনিবারে। ছেলেদের এখন কিছু বলবেন না, খালি ভয় দেখাবেন—কালকের মধ্যে যদি মাইনে সব শোধ না করে তবে একদম ছুটি হবে না। মাইনে-পত্তোর আদায় যদি না হয়, বুঝতে পারছেন ত?

ছুটির পর পশুপতি ও বুড়া নকুড়চন্দ্র পাকা রাস্তার পথ ধরিল। নকুড় কহিলেন,—বন্ধ তা হ'লে শনিবারে ঠিক? শনিবারেই রওনা হচ্ছ পশুবাবু?

সে কথার জবাব না দিয়া পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা নকুড়বাবু, ছবির বই একখানার দাম কত?

—কি বই তা বল আগে। ছবির বই কি এক রকম? দু টাকা তিন টাকার আছে, আবার বিনি পয়সাতেও হয়।

পশুপতি কাছে আসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—বিনি পয়সায় কি রকম? বিনি পয়সায় ছবির বই দেয় নাকি? কি বই?

নকুড় কহিলেন—ক্যাটালগ। ছেলে-ভুলানো ব্যাপার ত?—একখানা কবিরাজী ক্যাটালগ নিয়ে যেও। এই ধর, হাঁপানী সংহারক তৈল—পাশে দিব্যি ছবি, একটা লোক ধুঁকছে—কোলের উপর বালিশ—পাশে বউ তেল মালিশ করছে। ছেলেকে দেখিয়ে দিও।

যুক্তি পশুপতির পছন্দ হইল না, হাসি পাইল। কমলকে দেখেন নাই ত! সে যে বানান করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, তাহার কাছে চালাকী চলিবে না। কহিল,—না, তা'তে কাজ নেই—একখানা ছবির বই, সত্যি-সত্যি ছবির বইয়ের দাম কত পড়বে?

দু-টাকা তিন টাকা ও-সব বড় মানুষী কথা, খুব কমের মধ্যে কত লাগে?

নকুড় কহিলেন—বোধ হয় গণ্ডা-চারেক পয়সা নেবে, কিনিনি কখনও। মাষ্টারীর পয়সা—মুখে রক্ত-ওঠানো পয়সা। ও রকম বাজে খরচ করলে চলে?

পশুপতি তখন ফর্দ্দ বাহির করিয়া আর একবার পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল—আর, পাথুরে চুন দু-সের?

নকুড় কহিলেন—তিন আনা।

এবারে নকুড়ের হাতে কমলের চিঠিটুকু দিল। কহিল,—মজাটা দেখুন মশাই, ছেলে আবার চিঠি লিখেছে—ফরমায়েসটা দেখুন পড়ে একবার। বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বড় ফর্দ্দখানি দেখাইয়া বলিল—বড় সমস্যায় পড়েছি, একটা সৎযুক্তি দিন ত নকুড়বাবু। পুঁজি মোটে পাঁচ টাকা দু-আনা—ফর্দ্দের কোন্ কোন্‌টা বাদ দি?

দেখি—বলিয়া নকুড় চশমা বাহির করিয়া নাকের উপর পরিলেন। তারপর বিশেষ প্রণিধান করিয়া বলিলেন,—ছেলেপিলের ঘর, দুধ মেলে না বোধ হয়—তাই বার্লির কথা লিখেছে; ওটা নিয়ে যেও। তা জিরেমরিচ চুন-টুন সব বাদ দাও। ছবির বই পয়সা দিয়ে কিনে কি হবে? যা বললাম পার ত একখানা ক্যাটালগ নিয়ে যেও। তোমরা বোঝ না, ছেলেপিলে যখন আবদার করে মোটে আস্কারা দিতে নেই। তাদের শিখিয়ে দিতে হয়, এক আধলাও যাতে বাজে খরচ না করে। গোড়া থেকে মিতব্যয়িতা শিখুক, তবে ত মানুষ হবে—

মনে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু মোটের উপর নকুড়ের কথাটা ঠিক। পশুপতির স্মরণ হইল, সেও ক্লাসের একখানি বাংলা বহিতে সেদিন পড়াইতেছিল—'অপব্যয় না করিলে অভাব হয় না। হে শিশুগণ, তোমরা মিতব্যয়ী হইতে অভ্যাস করিবে। তাহা হইলে জীবনে কদাপি দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইবে না…' এমনি অনেক ভাল ভাল কথা। ছবির বই জিরামরিচ ও চুন কিনিয়া কাজ নাই তবে, বালতী বার্লি ও কাপড়জামা কিনিয়া লইলেই চলিবে।

নকুড় কহিতে লাগিলেন,—তিল কুড়িয়ে তাল। হিসেব ক'রে দেখ ত ভায়া, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা কত পয়সা অপব্যয় করেছি। সেইগুলো যদি জমানো থাকত তবে আজ দুঃখ কিসের? বাঙালী জাত দুঃখ পায় কি সাধে?

পশুপতি আর কথা না কহিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

গ্রামের মধ্যে কয়েক বাড়ি দেবীর ঘটস্থাপনা হইয়াছে। বড় মধুর সানাই বাজিতেছে, পশুপতির কানে নূতন লাগিল, এমন বাজনা সে অনেকদিন শোনে নাই। হঠাৎ সে হাসিয়া উঠিল। বলিল,—কথা যা বললেন নকুড় বাবু,—ঠিক কথা। আমরা কি হিসেব ক'রে চলি? আমাকে আজ দেখছেন এই রকম—সখ ক'রে আমিই একবার একখানা বই কিনি—সেও একরকম ছবির বই, স্কুল কলেজে পড়ায় না,—দাম পাঁচ টাকা পুরো।

নকুড় শিহরিয়া উঠিলেন,—পাঁচ টাকার বাজে বই—বল কি?

—হুঁ, পাঁচ টাকা। তখন কি আমার এই দশা? বাবা বেঁচে। পা'য় পম্প শু—মাথায় টেড়ি। কল্‌কাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম। মাসে মাসে টাকা আসে। ফুর্ত্তি কত? বইখানার নাম চিত্রাঙ্গদা—সেই যে অর্জ্জুন আর চিত্রাঙ্গদা—পড়েন নি?

নকুড় কহিলেন,—পড়িনি আবার—কতবার পড়েছি। বল যে মহাভারত। আজকাল সেই মহাভারত বিকুচ্ছে এগার সিকেয়।

পশুপতি কহিল,—মহাভারত নয়, তাহ'লেও বুঝতাম বই পড়ে পরকালের কিছু কাজ হবে। এমনি একখানা পদ্যের বই—পাতায় পাতায় ছবি। রাতদিন তাই পড়ে পড়ে মুখস্থ করতাম। এখন একটা লাইনও মনে নেই।

পশুপতির নির্ব্বুদ্ধিতার গল্প শুনিয়া নকুড় আর কথা বলিতে পারিল না। মহাভারত রামায়ণ নয়, মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুরের অনুমোদিত স্কুল বা কলেজ পাঠ্য বই নয়, এমন বই লোকে পাঁচ টাকা দিয়া কিনিয়া পড়ে!

সেই সব দিনের অবিবেচনার কথা ভাবিয়া পশুপতিরও অনুতাপ হইতেছিল। বলিল—তাও কি বইটা আছে? জানা নেই—শোনা নেই—পরন্তু পর একটা মেয়ে—নির্ব্বিচারে দামী বইটা তার হাতে তুলে দিলাম। কি বোকাই যে ছিলাম তখন! ও—আপনি ত এসে পড়েছেন একেবারে—আচ্ছা!

নকুড় বামদিকে বাঁশতলার সরুপথে নামিয়া পড়িলেন। সামনেই তাঁহার বাড়ি। কহিলেন,—কাল আবার দেখা হবে। শিগ গির শিগ গির চলে যাও পশুবাবু, চারিদিক থমথমা খেয়ে আছে, বিষ্টি নাম্‌বে এক্ষুণি।

তখন সত্যই চারিদিক নিষ্কম্প, বাতাস আদৌ নাই—গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। মাথার উপরে অতি ব্যস্ত আকাশ মেঘের উপর মেঘ সাজাইয়া নিঃশব্দে আয়োজন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

আজ পাঁচ টাকার মধ্যে সমস্ত পূজার বাজার সারিতে হইতেছে, আর বহু বৎসর পূর্ব্বে একদিন ঐ দামের একখানি নূতন বই নিতান্তই সখ করিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছিল, মনে একবিন্দু ক্ষোভ হয় নাই—চলিতে চলিতে কতকাল পরে পশুপতির সেই কথা মনে হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সে বাড়ি ফিরিতেছিল, অন্তর-ভরা আশা ও উল্লাস, হাতে চিত্রাঙ্গদা।

বনগাঁর পর দু-তিনটা ষ্টেশন ছাড়াইয়া—সে ষ্টেশনে ট্রেন থামিবার কথা নয়—তবু থামিল। ইঞ্জিনের কোথায় কি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা অনেকে নামিয়া পড়িল। প্লাটফরমের উপরে দক্ষিণ দিকটায় জোড়া পাকুড়গাছ ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার গোড়ায় ষ্টেশনের মরিচা-ধরা ওজনের কলটি। পাকুড়গাছের গুঁড়ি ঠেশ দিয়া দিব্য পা ছড়াইয়া কলটির উপর বসিয়া পশুপতি চিত্রাঙ্গদা খুলিয়া পড়িতে বসিল। লাইনের ওপারে অনেক দূরে সূর্য্য অস্ত যায়-যায়। কূয়ায় কলসী ভরিয়া আ'ল পথে গ্রামে ফিরিতে ফিরিতে বৌ-ঝিরা তাকাইয়া তাকাইয়া রেলগাড়ী দেখিতেছিল।

পশুপতি একমনে পড়িয়া চলিয়াছে। ঠিক মনে নাই, বোধ করি অর্জ্জুনের সাথে চিত্রাঙ্গদার প্রথম পরিচয়ের মুখটা—খাসা জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে সে অনুভব করিল, জোড়াগাছের পিছনে কেহ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে চিত্রাঙ্গদার আসিবার ত সম্ভাবনা নাই। পশুপতি ভাবিল, হয় পানিপাঁড়ে কি পয়েণ্টস্‌ম্যান্‌, নয় ত ছাগলে গাছের পাতা খাইতে আসিয়াছে। অতএব না ফিরিয়া পাতা উলটাইতে যাইতেছে, এমন সময়ে কাঁচের চুড়ি বাজিয়া উঠিল। তাকাইয়া দেখে, বছর আষ্টেকের একটি মেয়ে, মুখখানার চারিপাশে কালো কালো চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মেয়েটির বড় বড় চোখ দুটির উপর লেখা রহিয়াছে, সে ঐ পাতার ছবিগুলি ভাল করিয়া দেখিবে। আপিস-ঘরে টেলিগ্রাফের কল টক্‌টক্‌ করিয়া বাজিয়া যাইতেছিল এবং লাইনের উপরে ইঞ্জিন একটানা শব্দ করিতেছিল—ইস্‌ স্‌-স্‌। আজ পশুপতি ভাবিতেছে সে-সব নিছক পাগলামি, সেদিন কিন্তু সত্যসত্যই তাহার মনের মধ্যে এইরূপ একটা ভাবাবেশ জমিয়া আসিয়াছিল যেন সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ডও তাহার গতিবেগ থামাইয়া ম্লান অপরাহ্ণ-আলোয় মেয়েটির লুব্ধ ভীরু চোখ দুটিকে সমীহ করিয়া প্লাটফর্‌মের ধারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল—খুকী, ছবি দেখ্‌বে? দেখ না—কেমন খাসা খাসা সব ছবি। অনুরোধের অপেক্ষামাত্র। তৎক্ষণাৎ মেয়েটি সেই মরিচা-ধরা ওজন-যন্ত্রের উপর বিনাদ্বিধায় পশুপতির পাশে বসিয়া পড়িল।

পশুপতি ছবির মানে বলিয়া দিতেছিল, সে নিজেও পশুপতির পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা না রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বানান করিয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে ঘণ্টা দিল, ইঞ্জিন ঠিক হইয়াছে—এইবার ছাড়িবে। পশুপতির মনে হইল, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিয়া ইঞ্জিন ঠিক হইয়া গেল। মেয়েটির মুখখানিও হঠাৎ কেমন হইয়া গেল—তাহার ছবি দেখা তখনও শেষ হয় নাই সে-কথা মোটে না ভাবিয়া রেলগাড়ী তার সুদীর্ঘ জঠরে ছবির-বই-সমেত মানুষটিকে লইয়া এখনি গুড়গুড় করিয়া বিলের মধ্য দিয়া দৌড়াইবে—বোধ করি এইরূপ ভাবনায়। বইখানি মুড়িয়া নিজেই সে পশুপতির হাতে দিল, কোন কথা বলিল না।

পশুপতি সেই সময়ে করিয়া বসিল প্রকাণ্ড বে-হিসাবী কাজ। সেই চিত্রাঙ্গদা তাহার ডুরে শাড়ীর উপর রাখিয়া বলিল—এ বই তুমি রেখে দাও—ছবি দেখো, আর বড় হ'লে পড়ে দেখো—নূতন বই—প্রায় আনকোরা, পাঁচ পাঁচটা টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। কেবল নিজের নামটি ছাড়া কালির আঁচড় পড়ে নাই। কাহাকে দিল তাহার পরিচয়ও জানে না—হয়ত কোন রেলবাবুর মেয়ে কিংবা যাত্রীদের কেহ অথবা নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিনীও হইতে পারে।

* * *

রামোত্তম রায়ের বাড়ি বড়রাস্তার ঠিক পাশেই। রোয়াকে উঠিয়া পশুপতি ডাকিল,—ও ননী, এক গ্লাস জল দিয়ে যা ত বাবা।

ননী জল দিয়া গেল। তাকের উপরে কাগজের ঠোঙায় এক পয়সার করিয়া বাতাসা কেনা থাকে। তাহার দুইখানি গালের মধ্যে ফেলিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া সমস্ত জল খাইয়া পরম পরিতৃপ্তিতে কহিল—আঃ—

ইহাই নিত্যকার বৈকালিক জলযোগ।

তারপর এক ছিলিম তামাক খাইয়া চোখ বুজিয়া সে অনেকক্ষণ বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল; সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। রোয়াকের গোড়া হইতে একেবারে বড়রাস্তা অবধি উঠানের উপর দুই সারি সুপারি গাছ। গাছগুলি যেন মাথা ভাঙাভাঙি করিয়া মরিতেছে। জল গড়াইয়া উঠান ভাসাইয়া কল্‌কল্ শব্দে রাস্তার নর্দ্দমায় গিয়া পড়িতে লাগিল। কি মনে করিয়া পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জামার পকেট হইতে কমলের পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে চারিদিক আরও আঁধার করিয়া আসিল, আর নজর চলে না। রাস্তার ঠিক ওপার হইতে ধানভরা সবুজ সুবিস্তীর্ণ বিলের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরপারে অতি অস্পষ্ট খেজুর ও নারিকেল বন। সেইদিকে চাহিয়া তাহার মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। ঐ নারিকেল গাছের ছায়ায় গ্রামের মধ্যে চাষীদের ঘরবাড়ি। বৃষ্টি ও অন্ধকারে বাড়ি দেখা যাইতেছে না, অতি ক্ষীণ এক একটা আলো কেবল নজরে পড়ে। গ্রামটি ছাড়াইলে তারপর হয়ত আবার বিল। এমনি কত গ্রাম, কত খালবিল, কত বারবেঁকী কচিপাতা ও নাম-না-জানা বড় বড় গাঙ পার হইয়া শেষকালে আসিবে তাহার গ্রামের পাশের পশর নদী। ভাঁটা সরিয়া গেলে আজকাল চরের উপর বাঁধের ধারে ধারে শরতের মেঘভাঙা রৌদ্রে সেখানে বড় বড় কুমীর শুইয়া থাকে। বাবলা গাছে হলদে পাখী ডাকে। কমল মিহিসুরে অবিকল পাখীর ডাকের নকল করিতে পারে—বউ সরষে কোট্, বউ—এমন দুষ্ট হইয়াছে কমলটা!

তাহাদের গ্রামের ঘাটে ষ্টীমার আসিয়া লাগে সন্ধ্যার পর। ঘাটের কাছেই বাড়ি, অন্ধকার সাবেক কালের আম-বাগান এবং নাটা ও বেতের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরু পথ। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোনাকী পোকার মত একটি অতিশয় ছোট্ট আলো দূরে—বহুদূরে—পশুপতির স্তিমিত দৃষ্টির অগ্রে ঐ যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আলো ছোট হইলে কি হয় পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আচ্ছা, তাহাদের গ্রামেও কি এই রকম ঝড়বৃষ্টি হইতেছে? হয়ত নয়। হয়ত সেদেশে এখন আকাশভরা তারা এবং প্রভাসিনী এতক্ষণ রান্নার জোগাড় করিতে আলো লইয়া এঘর-ওঘর করিতেছে। আর চারদিন পরে পশুপতি সেই অপূর্ব্ব শীতল ছায়াচ্ছন্ন উঠানে গিয়া দাঁড়াইবে। খোকা?—সোনা মাণিক খোকন তখন কি করিতেছে? পাড়তেছে বোধ হয়—

পশুপতি ভাবিতে লাগিল, সে যেন পশর নদীর পারে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উঠিয়াছে; কমল শোবার ঘরে প্রদীপের আলোয় পড়া মুখস্থ করিতেছিল, বাপের সাড়া পাইয়া উঠানের উপর দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিল। এমন ছুটিতেছে—বুঝি-বা সে পড়িয়া যায়।—আস্তে আয়, ওরে পাগলা একটু দেখে-শুনে—অন্ধকারে হোঁচট্ খাবি, অত দৌড়ুস্‌নি—

ঘনান্ধকার দুর্য্যোগের মধ্যে বহুদূর হইতে কমল আসিয়া যেন দুই হাত উঁচু করিয়া ন্যুব্জদেহ অকালবৃদ্ধ স্কুল-মাষ্টারের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।...

রামোত্তম এতক্ষণ কাছারি-ঘরে কি কাজ-কর্ম্ম

করিতেছিলেন, এইবার বাড়ির মধ্যে চলিলেন। পশুপতিকে বলিলেন—মাষ্টার-মশায়, আপনিও চলুন—বাদলা-রাত্তিরে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ুন আর কি। এই বৃষ্টিতে আপনার ছাত্তোর আর আস্‌বে না। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পশুপতি সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। আলো নিবাইয়া দিল।

শুইয়া শুইয়া শুনিতে লাগিল, ঝড় দালানের দেওয়ালে যেন উন্মত্ত ঐরাবতের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে, রুদ্ধ দরজা জানালা খড় খড় করিয়া ঝাঁকাইতেছে, আকাশ চিরিয়া মেঘের ডাক, ছাদের নল হইতে ছড়্ ছড়্ করিয়া জলপড়ার শব্দ,···সমস্ত মিলিয়া ঝটিকাক্ষুব্ধ নিশীথিনীর একটানা অস্পষ্ট চাপা আর্ত্তনাদের মত শোনাইতেছে। পশুপতি আরাম করিয়া কাঁথা টানিয়া গায়ে দিল।

সেই অবিরল বাতাস ও বৃষ্টিধ্বনির মধ্যে পশুপতি শুনিতে লাগিল, গুন্‌গুন্ গুন্‌গুন্ করিয়া কমল পড়া মুখস্থ করিতেছে। কণ্ঠ কখনও উচ্চে উঠিতেছে, কখনও ক্ষীণ—ক্ষীণতর—অস্ফুটতম হইয়া স্বরের রেশটুকু মাত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেছে। তন্দ্রাঘোরে আঁধার আমবাগানের মধ্য দিয়া বাড়িমুখো যাইতে যাইতে সে শুনিতে লাগিল। মনে হইল, ঘরের দাওয়ায় কাঁখের পুঁটুলী নামাইয়া সে যেন ডাকিতেছে,—কই গো, কোথায় সব?

খোকা আসিয়া সর্ব্বাগ্রে পুঁটুলী লইয়া খুলিয়া ফেলিল। জিনিষপত্র একটা একটা করিয়া সরাইয়া রাখিতেছে, কি খুঁজিতেছে পশুপতি তাহা জানে। ম্লানমুখে কমল প্রশ্ন করিল,—বাবা, আমার ছবির বই?

পশুপতি উত্তর দিল,—সোনামাণিক আমার, বই ত আনতে পারি নি। না—না—আনলে আনতে পারতাম, ইচ্ছে ক'রেই আনি নি। অপব্যয় করতে নেই—বুঝ্‌লি খোকা, পয়সাকড়ি খুব বুঝে-সুজে খরচ করতে হয়।—তা হ'লে পরে আর দুঃখ পাবিনে।

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া সরিয়া বসিল। অবোধ বালকের অভিমানাহত মুখখানির স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে গভীর রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। প্রাণপণ বলে বারংবার কে যেন দ্বারে ধাক্কা দিতেছে। ঝড়ের বেগ আরও বাড়িয়াছে বুঝি। এ কি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড, দরজা সত্য সত্যই চুরমার করিয়া ফেলিবে না কি?

অন্ধকার ঘর। পশুপতির বোধ হইল, বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইতেছে,—দুয়োর খুলুন—দুয়োর খুলুন—

তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নাই। তাহার সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। ঝটিকা-মথিত দুর্য্যোগময় আঁধার বর্ষা নিশীথ। নির্জ্জন সুখসুপ্ত গ্রামের একপাশে, দিগন্তবিসারী বিলের প্রান্তে রামোত্তম রায়ের বাহির বাড়ির রোয়াকে দাঁড়াইয়া কে অমন আর্ত্তকণ্ঠে বারংবার দরজা খুলিয়া দিতে বলে!

শিকলের ঝন্‌ঝনানি অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। নিশ্চয় মানুষ! পশুপতি উঠিয়া খিল খুলিয়া দিতেই কবাট দুইখানি দড়াম্ করিয়া দেয়ালে লাগিল এবং ঝড়ের বেগেই যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল একটি পুরুষ, পিছনে এক নারী।

মেয়েটির হাতের চুড়ি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া ঈষৎ বাজিয়া উঠিল এবং কাপড়-চোপড় হইতে অতি কোমল মৃদু সুগন্ধ আসিয়া পশুপতি মাষ্টারের ঘর ভরিয়া গেল।

পুরুষ লোকটি আগাইয়া আসিতে গিয়া তক্তপোষে ঘা খাইল। পশুপতি কহিল,—দাঁড়ান, আলো জ্বালি।

হেরিকেন জ্বালিয়া দেখে, স্বাস্থ্য ও যৌবন-লাবণ্যে দু-জনেই ঝলমল করিতেছে। মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসে নাই, চৌকাঠের ওধারে ছাদের নলের নীচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পরম শান্তভাবে ভিজিতেছিল, মুখভরা হাসি। দেখিয়া যুবক ব্যস্ত হইয়া কহিল—অ্যাঁ, ওকি হচ্ছে লীলা, এ কি পাগলামি তোমার? ইচ্ছে ক'রে ভিজছ দুপুর রাত্রে?

সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া বধূ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

যবক আরও চটিয়া কহিল—বড্ড স্ফূর্ত্তি—না? এই

সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, আমি যত মানা করি তুমি মজা পেয়ে যাও যেন।

আঙুল তুলিয়া লীলা চুপি-চুপি তর্জ্জন করিয়া কহিল,—চুপ! তারপর ভিতরে ঢুকিল। ফিশফিশ করিয়া কহিল,—বাবারে বাবা, তোমার শাসনের জ্বালায় যাই কোথায়? সেই ত কাপড় ছাড়্‌তে হবে, তা একটুখানি নেয়ে নিলাম—বলিয়া আঁচল তুলিয়া মুখে দিল, বোধ করি তাহার হাসি পশুপতি দেখিতে না পায় সেইজন্য।

যাক্ গে,—আর একটা কথাও বল্‌ব না, মরে গেলেও না—বলিয়া যুবক গুম হইয়া রহিল। পরক্ষণে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল,—তুই কতক্ষণ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে ক'রে ভিজবি, এখানে এনে রাখ্।

উহাদের চাকর এতক্ষণ বাক্স মাথায় করিয়া রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরের মধ্যে আসিয়া বাক্স নামাইয়া দিল।

যুবক কহিল,—যদি ইচ্ছে হয় তবে দয়া ক'রে বাক্সটা খুলে শিগ্‌গির শিগ্‌গির ভিজে কাপড়চোপড়গুলো বদলান হোক্, আর ইচ্ছে যদি না হয় তবে এক্ষুণি ফিরে মোটরে যাওয়া যাক্। আমি আর কাউকে কিছু বলছি নে।

মেয়েটির হাসিমুখ আঁধার হইল, হেঁট হইয়া বাক্স খুলিতে লাগিল।

কাণ্ড দেখিয়া পশুপতি একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এতরাত্রে এই তরুণ দম্পতি কোথা হইতে আসিল এবং আসিয়া নিঃসঙ্কোচে পশুপতির ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই অমনি রাগারাগি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এতক্ষণ ইহাদের মধ্যে কথা বলিবার ফাঁকই পাইতেছিল না, এইবার বলিল,—আপনারা তবে কাপড় ছাড়ুন, আমি লোকটাকে নিয়ে কাছারি-ঘরে বসিগে।

যুবক যেন এইমাত্র পশুপতিকে দেখিতে পাইল। কহিল,—কাপড়টা ছেড়ে আমিও যাচ্ছি। বড্ড কষ্ট দিলাম আপনাকে। আমি এ বাড়িতে আরও অনেকবার এসেছি, রামোত্তমবাবু আমার পিসেমশাই হন। আপনাকে এর আগে দেখিনি। একটু আলাপ-টালাপ করব, তা মশায়, কাণ্ডটা দেখলেন ত? সেদিন অসুখ থেকে উঠেছে, কচি খুকী নয়—একটু যদি বুদ্ধি জ্ঞান থাকে! একেবারে আস্ত পাগল।

লীলা মুখ রাঙা করিয়া একবার স্বামীর দিকে তাকাইল। তারপর রাগ করিয়া খুব জোরে জোরে ট্রাঙ্ক হইতে কাপড়-চোপড় নামাইয়া ছড়াইয়া মেঝেয় রাখিতে লাগিল। কাপড়ের সঙ্গে আতরের শিশি ঠক্ করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

পশুপতি ও চাকরটি ততক্ষণ কাছারি-ঘরে গিয়া বসিয়াছে।

যুবক কহিল,—গেছে ত? তক্ষুনি জানি। আস্ত শিশিটা—এক ফোঁটাও খরচ হয়নি।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে লীলা কহিল,—আর ব'কো না; তোমার আতর আমি কিনে দেব—কালই। তারপর কথা যেন কান্নায় ভিজিয়া আসিল। বলিতে লাগিল—অজানা জায়গায় এসে লোকজনের সামনে কেবলি বকাবকি—কেন?—কিসের এত? আমি বিষ্টি লাগাব, খুব করব, অসুখ ক'রে যাই মরে যাব—তোমার কি?

পাশাপাশি দু'টি ঘর। কলহের প্রতিকথাটি পশুপতির কানে যাইতেছিল।

স্বামী উত্তর করিল,—আমার আর কি,—আমি ত কারও কেউ নই। ঘাট হয়েছে—আর কোনদিন কিছু বলব না।

কিছুক্ষণ আর কথাবার্ত্তা নাই। খুট্‌খাট্ আওয়াজ, বাক্সের ভিতরের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া হইতেছে।

লীলা বলিতে লাগিল,—মোটরের হুড উড়িয়ে যে ভিজিয়ে দিয়ে গেল তা'তে কিছু দোষ হয় না, আর আমি একটুখানি বাইরে দাঁড়িয়েছি অমনি কত কথা—আস্ত পাগল—হেনো-তেনো—কেন কি জন্যে বলবে?

অন্য পক্ষের সাড়া নাই।

পুনরায় বধূর কণ্ঠস্বর—ভিজতে আমার বড্ড ভাল লাগে। ছেলেবেলা এই নিয়ে মা'র কাছে কত বকুনি খেয়েছি। তা বকবে যদি তুমি আমায় আড়ালে বকলে না কেন? অজানা অচেনা কোথাকার কে একজন, তার সামনে ওগো, তুমি কথা বলবে না আমার সাথে?

স্বামী বলিল—না, বল্‌ব না ত। কেউ মরলে আমার কিছু আসে যায় না যখন—বেশ ত—আমি যখন পর—

বধূ কহিল—কতদিন ত সাবধান হয়ে আছি। ছড়ছড় ক'রে জল পড়ছে দেখে আজকে হঠাৎ কেমন ইচ্ছে হ'ল—। আমি আর করব না—কোন দিনও না। ওগো, তুমি আমায় মাপ কর—সত্যি করব না।

স্বামীর কণ্ঠ অভিমানে কাঁপিতে লাগিল, বলিল,—কথায় কথায় তুমি মরতে চাও—কেন? কি জন্যে? আমি কি করেছি তোমার?

বধূ কহিল,—না, মরব না।

—দিব্যি কর গা ছুঁয়ে যে কক্ষণো না—কোন দিনও না—

স্বামীকে খুশী করিতে বধূ দিব্য করিল সে কোন দিন মরিবে না।

আরও খানিকক্ষণ পরে যুবক কাছারি-ঘরে ঢুকিল। পশুপতি কহিল,—হয়ে গেছে? এবার চলুন বাড়ির মধ্যে, আমি আলো দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

যুবক কহিল—আজ্ঞে না। এক্ষুণি চলে যাব। সকালে পিসেমশাইকে বলবেন, জাগুলগাছির সুরেশ এসেছিল। থাক্‌লাম না ব'লে চটে যাবেন—

পশুপতি কহিল—তবে আর কি। আত্মীয়ের বাড়ি এসে পড়েছেন যখন দয়া ক'রে—

সুরেশ বলিল—দয়া ক'রে নয় মশায়, দায়ে পড়ে। ফাল্গুন মাসে ওঁর টাইফয়েড হয়, একত্রিশ দিন যমে-মানুষে টানাটানি ক'রে কোনগতিকে প্রাণটুকু নিয়ে চেঞ্জে পালিয়েছিলাম। সেই গেছলাম আর আজ এই ফিরছি। ষ্টেশনে নেমে বিষ্টি বাদলা দেখে বললাম—কাজ নেই লীলা, রাতটুকু ওয়েটিং-রুমে কাটান যাক্। তা একেবারে নাছোড়বান্দা—বলে, মোটরে হুড দেওয়া রয়েছে—এক ফোঁটা জল গায়ে লাগবে না; ঝড়-বাতাসের মধ্যে ছুটতে খুব আমোদ লাগে। শুনেছেন কখনও মশায়, ভূ-ভারতে এমন ধারা? এদেশের ট্যাক্সি—ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে বাতাসে হুড গেল উল্টে। ভিজে একেবারে জবজবে। এখানে উঠতে কি চায়? ভিজে কাপড় বদলাতে একরকম জেদ ক'রে ধরে নিয়ে এলাম।

পশুপতি কহিল—বেশ ত, ওদের সঙ্গে দেখাটেখা ক'রে অন্ততঃ রাতটুকু কাটিয়ে কাল সকালেই চলে যাবেন।

সুরেশ বলিল—বল্‌ছেন কাকে? ওদিকে একেবারে তৈরি। এরই মধ্যে দু-দু-বার দরজার উপর ঠক্‌ঠক্ হয়ে গেছে—শোনেন নি? বিষ্টি বোধ হয় ধরে গেল এইবার। আচ্ছা নমস্কার, খুব বিব্রত ক'রে গেলাম—

তরুণ-তরুণী পাশাপাশি গুঞ্জন করিতে করিতে এবং তাহাদের পিছনে চাকরটি ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া রাস্তার উপরের মোটরে গিয়া উঠিল।

তারপরে সেই রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি পশুপতি মাষ্টার আর ঘুমাইতে পারিল না। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তারা উঠিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার রমণীয়। শিশি ভাঙিয়া ঘরময় যে আতর ছড়াইয়া গিয়াছিল তাহার উগ্র মধুর মাদক সুবাসে পশুপতির মাথার মধ্যে রিম্‌ঝিম্ করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। এই ঘর তৈয়ারী হইবার পর বরাবর চুনসুরকীই পড়িয়া ছিল, এই প্রথম আতর পড়িয়াছে এবং বোধ করি দুর্য্যোগের রাত্রে বিপন্ন তরুণ-দম্পতি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়া আতরের সহিত তাহাদের কলহের গুঞ্জন রাখিয়া গিয়াছে।

হেরিকেনটা তুলিয়া লইয়া পশুপতি প্রভাসিনীর চিঠি-খানি গভীর মনোযোগের সহিত আর একবার পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সমস্ত অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল। একটা সোহাগের কথা নাই, অথচ সমস্ত চিঠি ভরিয়া সংসারের প্রতি ও তাহাদের সন্তানের প্রতি কতখানি মমতা ছড়ান রহিয়াছে। কোনদিন সে এসব ভাবিয়া দেখে নাই।

জানালা খুলিয়া দিয়া অনেকক্ষণ একাগ্রে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে পশুপতির মন চলিয়া গেল আবার সেই বহুদূরবর্ত্তী পশর নদীর পারে তাহার নিজের বাড়িতে...এবং সেখান হইতে চলিয়া গেল আরও দূরে, প্রায় বিশ বছরের ওপারে বিস্মৃতির দেশে—যেদিন প্রভাসিনীকে বিবাহ করিয়া গ্রামে ঢুকিয়া সর্ব্বপ্রথমে ঠাকরুণতলায় জোড়ে প্রণাম করিয়াছিল... তারপর কত নির্জ্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের মধুর স্মৃতি—

ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালে চুরি করিয়া চোখাচোখি—সুপ্তিমগ্ন জ্যোৎস্নারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া কাটানো—ভোর হইলে বউকে ডাকিয়া তুলিয়া দিয়া নিজে আবার পাশ ফিরিয়া শোওয়া…

এখন আর সে-সব কথা কিছু মনে পড়ে না, পৃথিবীতে কিন্তু তেমনি দুপুর সন্ধ্যা ও রাত্রি আসিয়া থাকে; পৃথিবীর লোকে গান গায়, কবিতা পড়ে, প্রেয়সীর কানে ভালবাসার কথা গুঞ্জন করে, আকাশে নক্ষত্র অচঞ্চল দীপ্তিতে ফুটিয়া থাকে, তারার আলোকে নারিকেলপাতা ঝিলমিল করিয়া দোলে। পশুপতি সে-সময় সংসারের অনটনের কথা ভাবে, জ্যামিতির আঁক কষে, নয়ত ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে জানালা আঁটিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

অকস্মাৎ তাহার বোধ হইল, চিত্রাঙ্গদার ভুলিয়া যাওয়া লাইনগুলি তাহার যেন মনে পড়িতেছে। ছেলেমানুষের মত মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া সে গুন্‌গুন্ করিতে লাগিল। এখনও ঠিক মনে পড়ে নাই, মনে হইল এমনি করিয়া রাত্রি জাগিয়া আর বহুক্ষণ অবধি যদি সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারে সমস্ত কবিতাগুলি তাহার মনে পড়িয়া যাইবে।

তারপরে হঠাৎ একটি অদ্ভুত রকমের বিশ্বাস তাহার মনে চাপিয়া বসিল। বহুকাল আগে একদিন ষ্টেশনে যে-মেয়েটির হাতে সচিত্র চিত্রাঙ্গদা তুলিয়া দিয়াছিল, সেই আজ আসিয়াছিল—এই বধূটি,…লীলা, এই ত সেই মুখ। ট্রাঙ্কে তাহার কাপড়চোপড় ছিল, আতর ছিল, সকলের নীচে ছিল চিত্রাঙ্গদা—পাঁচ টাকা দামের। লীলা আতরের শিশি ভাঙিয়াছে, হয়ত চিত্রাঙ্গদাও ফেলিয়া দিয়াছে। খুঁজিয়া দেখিলে এখনই পাওয়া যাইবে—কিংবা কাল সকালে…

পরদিন পশুপতির ঘুম ভাঙিতে বেলা হইয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখে ইতিমধ্যে ননী আসিয়াছে। বেঞ্চের উপর বসিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া সে ফার্ষ্টবুকের পড়া তৈরি করিতেছে—

One night, when the wind was high, a small bird flew into my room…একদিন রাত্রিবেলা যখন বাতাস প্রবল হইয়াছিল, একটি ছোট পাখী আমার ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসিয়াছিল।…

শুনিতে শুনিতে পশুপতি আবার চোখ বুজিল। ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসা ছোট্ট একটি পাখীর কল্পনা করিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল—রোদ উঠিয়া গিয়াছে, পাখীর ভাবনা ভাবিবার সময় আর নাই। এখনই হয়ত রামোত্তম ছেলের পড়ার তদারক করিতে আসিবেন। উঠিয়া বসিয়া হুঙ্কার দিল—"বানান ক'রে ক'রে পড়্।



শেষ আরতি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রদীপ হয়েছে জ্বালা !
বুঝেছি এবার এসেছে আমার শেষ আরতির পালা।
দূরে দূরে যত শিমুল-পলাশ-পারুল-শালের বনে
অঞ্জলি ভরি রাশি-রাশি ফুল ঝরাল কে আনমনে।
ফাগুন-শেষের বিরহবিধুর মধুপূর্ণিমা রাতি,
বকুলের শাখে পাপিয়া কাঁদিছে খুঁজিয়া আপন সাথী।
জ্যোৎস্নানিশীথে একা বসে গাঁথি ঝরাকুসুমের মালা
জানি দেবী, আজি মধুর লগনে হ'ল বিদায়ের পালা।
জীর্ণকেশর যে ফুলের সাথী হয়েছে পথের ধূলি
গোপনে যতনে অঞ্চল ভরি' নিলেম তাদের তুলি'।
মালা হয়ে যবে দুলিবে তাহারা বক্ষে তোমার, জানি,
ম্লানসৌরভে কহিবে নীরবে মোর মর্ম্মের বাণী।

আজও মনে পড়ে সেদিনের ভোর, তরুবীথিকার ছায়ে,
ললাটের 'পরে কুন্তল তব চঞ্চল মৃদুবায়ে।
সচকিত দুটি ভীরু নয়নের চেয়ে দেখা ফিরে ফিরে,
জাগিয়া রয়েছে আজও অমলিন মোর স্মরণের তীরে।
ধরণীর দ্বারে অতিথি তখন কি ঋতু, নাহিক মনে,
প্রথম জাগিল ফাল্গুন মম হৃদয়ের ফুলবনে।
তারপরে গেছে কত না সন্ধ্যা গোপন কথার মত,
রঙীন প্রভাত, নিশীথ নিবিড়, গোধূলি লগন কত।
শরৎ গিয়েছে শেফালির বনে আপনার লিপি রেখে
বরষা রেখেছে কেতকীর বুকে গোপন বাণীটি ঢেকে।
আরও কত ঋতু ধরণীর বুকে আনমনে গেল খেলি
দেখেছি দুজনে বসি কাছাকাছি, তৃষিত নয়ন মেলি।
শত কল্পনা কুসুম-সমান বক্ষে উঠেছে ফুটি,
আজি রজনীতে সকলি তাহার নীরবে পড়িল টুটি !

আঁখিপল্লব সিক্ত করার অবসর কোথা তব ?
মোর দু-নয়নে অশ্রুজলের অঞ্জন অভিনব !
তোমার ও দুটি উজল নয়নে অশ্রুর নাহি দেখা,
সঙ্গী আমার চক্ষের জল, আমি যে রহিনু একা !
কাহারও হিয়ার পাত্র ভরিছে নিত্যনূতন রসে,
কারো সম্বল কেবলি বেদনা, তাই লয়ে থাকি বসে।
চরণের তালে ফুল ফোটে যার, কি কুসুম দিব তারে,
তবু ওগো রাণী, বাঁধিনু তোমায় ঝরা পুষ্পের হারে।
যে-হৃদয় আজি পথে যায় ঝরে, তার পূজা ঝরা ফুলে
নিশি পোহাইলে না হয় তাহারে ছিঁড়িও মনের ভুলে।
আনন তোমার পূর্ণচন্দ্র স্বপনে দিয়েছে ঢাকি,
মাটির দীপের ম্লান আলো, বল, দিব কি সেথায় আঁকি ?
তোমারি নয়ন দীপ্তি দানিবে তাহারে, জানি তা মনে,
অন্তরে মোর আলো-উৎসব জাগাইবে শুভখনে।
ক্ষণকাল তরে দৃষ্টি তোমার রেখো মোর দু-নয়নে,
পূর্ণিমা-নিশা সার্থক হবে ফাল্গুন-ফুলবনে।
চন্দন নাহি, রিক্ত পূজারী আঁকিয়া কি দিবে ভালে,
শেষচুম্বন ললাটে আঁকিনু আজি বিদায়ের কালে।
শতচুম্বনে মুছে যাবে ? যাক্, মুছিও না হয় নিজে ;
তুমি বুঝিবে না স্মৃতি কি মধুর, মূল্য তাহার কি যে !

তারপরে কবে, বহুদিন পরে, আর কোনো ফুলবনে
শেষ-আরতির ক্ষীণ ছবিটুকু পড়িবে কি কভু মনে ?
ঝরাপলাশের আলপনা-আঁকা বনভূমিপানে চেয়ে,
বক্ষে সেদিন বেদনার সুরে কিছু কি উঠিবে গেয়ে ?
সেদিনের সেই কাননশাখার কোনো নামহীন পাখী
স্বপনের মাঝে আজিকার সুরে সহসা উঠিবে ডাকি ?
জানি, ওগো রাণী, তুমি ভুলে যাবে শেষ আরতির পালা,
ভাঙা দেউলের দুয়ারে হেথায় প্রদীপ নিত্য জ্বালা !

পোর্ট-আর্থারের ক্ষুধা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩

মানুষ-'বুলেট' বৃষ্টি

সাহসীর মৃতদেহে পাহাড়ের উপর পাহাড় তৈরি হইয়া উঠিল, উপত্যকায় রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্র সমাধিভূমিতে এবং পাহাড় ও উপত্যকা পোড়া মাটিতে রূপান্তরিত হইল। প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেণ্ডে জীবনের পর জীবন অনন্তের পথে প্রয়াণ করিতেছে। আক্রমণকারীর হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাগুলি থাকিলে শত্রুকে ভড়কান যায় বটে, কিন্তু লড়াই ফতে হয় কিরীচ আর রণহুঙ্কারে। শাণিত কিরীচ ও ভীষণ হুঙ্কারের জোরে শত্রু রণে ভঙ্গ দিল। "লণ্ডন ষ্ট্যাণ্ডার্ড"-এর জনৈক সংবাদদাতা যথার্থই লিখিয়াছিল—জাপানীদের রণহুঙ্কার রুশেদের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল!

সে যাই হোক সেই আক্রমণের কথা মনে পড়িলে চোখে জল আসে। প্রথম সমবেত আক্রমণের সময় কিরীচের ঝিলিক আর হুঙ্কারের ভীষণতা কিছুই টিকিল না, ক্রমেই সে সব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিল। অসংখ্য গোলা ছুটিল, অনেক মানুষ-'বুলেট' খরচ হইল, তবুও কেল্লা দখল হইল না। রুশেরা বলিত, সে সব কেল্লা অজেয়, সে-কথা অপ্রমাণ করা গেল না। পর পর আক্রমণে দেশভক্ত যোদ্ধাদের কেবল রক্তপাত হইল, অস্থি চূর্ণ হইল, কেল্লা যথাসম্ভব শীঘ্র দখল করিতে হইবে, তাই প্রচুর লোকক্ষয় সত্ত্বেও আক্রমণের পর আক্রমণ চলিতে লাগিল। সেই সব নিষ্ফল আক্রমণ শেষ পর্য্যন্ত সার্থকতার পথেই আমাদিগকে লইয়া গেল।

উনিশ তারিখ থেকে রুশ কেল্লার উপর—বিশেষ করিয়া আমাদের লক্ষ্য পূর্ব্ব-চিকুয়ানশান কেল্লাগুলির উপর অবিরাম গোলাবর্ষণের ফলে দেখা গেল শত্রুর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। একুশ তারিখ রাত্রে য়োশিনাগা ব্যাটালিয়নকে মার্চ্চ করিবার হুকুম দেওয়া হইল। আগে আগে চলিল একদল অসমসাহসিক ইঞ্জিনীয়ার তারের বেড়া ভাঙিবার জন্য। ভাগ্যক্রমে তাদের মরিয়া চেষ্টা সফল হইল—পদাতিক দলের জন্য একটু পথ পরিষ্কার হইল। তখন মেজর য়োশিনাগা তাঁর দলবলকে আদেশ করিলেন, কেহ একটি গুলি ছুঁড়িবে না, ফিসফিস করিয়া কথা কহিবে না, অন্ধকার রাতে গা ঢাকা দিয়া কেবল অগ্রসর হইবে। ফলে হঠাৎ শত্রুর প্রাচীরের একেবারে গা ঘেঁষিয়া একদল ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব। রুশেরা ভড়কাইয়া গিয়া যুদ্ধের চেষ্টামাত্র না করিয়া পলাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু কিছুদূর পিছু হটার পরই মস্ত একদল নূতন সৈন্য দেখা দিল, তাদের পিছনে 'মেশিন্-গানের' ভীষণ আওয়াজ। পলায়নপর রুশেদের আগুয়ান হইতে বাধ্য করিয়া একত্রে তারা পাল্টা আক্রমণ করিল। তাদের 'উলা' গর্জ্জনে আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। মেজর য়োশিনাগা হুকুম দিলেন তাঁর সেনাদল এক পা-ও পিছু হটিতে পারিবে না। ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। উভয় দলই ঘুষি কিরীচ ও বন্দুকের সাহায্যে মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। মেজর য়োশিনাগা একটা ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া সৈন্য চালনা করিতেছিলেন, বুকে গুলি লাগায় তিনি মারা পড়িলেন। কাপ্তেন ওকুবো তাঁর স্থান লইলেন, অচিরে তিনিও নিহত হইলেন। বদলীর পর বদলী মারা পড়িতে লাগিল, পরিশেষে কেবল নায়কেরা নয়, সৈনিকেরাও প্রায় সকলেই নিহত হইল। তাদের সাহায্যের জন্য কেহ আসিল না। শত্রুর গুলিবর্ষণের বহর ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, অল্প কয়েকজন অবশিষ্ট সৈনিক তারের বেড়ার নীচে গিরিসঙ্কটের মধ্যে হটিয়া গিয়া 'রিসার্ভ' সৈন্যের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল,

কিন্তু কেহই আসিল না। পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সঙ্গীদের মৃতদেহের সামনে দাঁড়াইয়া বৃথায় তারা অপেক্ষা করিতে লাগিল। শত্রুর ঠিক নীচেই তারা ছিল—তাদের থেকে বারো ফুট আন্দাজ তফাতে। সেইখানে রাইফ্‌ল্ শক্ত করিয়া ধরিয়া রুশেদের পানে চাহিয়া তেরো ঘণ্টা সময় কাটাইয়া দিল, কিছুই করিতে পারিল না।

বাইশ তারিখ রাতে তাকেতোমি ব্যাট্যালিয়ন ভাঙা তারের বেড়ার মাঝ দিয়া গিয়া ভীষণ আক্রমণে পূর্ব্ব রাতের ব্যর্থতা শোধরাইবার চেষ্টা করিল। কাপ্তেন মাৎসুওকা প্রথমে আহত হইলেন, উরু কাটিয়া উড়িয়া যাওয়ায় তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। গুলি লেফটেন্যাণ্ট মিয়াকের ফুসফুস ভেদ করিয়া গেল। ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল, রুশেরা এমন ভাব দেখাইল যেন তারা আমাদের অপেক্ষাতেই ছিল, আগের রাতের সফলতার জন্য তাদের বেজায় গর্ব্ব। তাদের সন্ধানী আলো ঘন ঘন ঘুরিয়া আক্রমণকারীদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিল, আমাদের মাথার উপর তাদের তারা-বাজি ফাটিতে লাগিল, তার ফলে আমাদের প্রতি গুলি চালানো সহজ হইয়া গেল। ছুটে গিয়ে আক্রমণ করো! আগে চলো! উ-ও-আ…বলিয়া চীৎকার করিয়া কাপ্তেন য্যানাগাওয়া নির্ভয়ে ছুটিয়া গেলেন, তারাবাজির আলোয় দেখা গেল তাঁর মুখের অর্দ্ধেকটা রক্তে লাল, ডান হাতে তিনি একখানা ঝকঝকে তলোয়ার আস্ফালন করিতেছেন। আবার তিনি হাঁকিলেন—ছুটে চলো! তাঁর নির্ভীক কণ্ঠস্বর সেই শেষবার শোনা গেল। অন্ধকারে সাদা অসিফলক ঝিলিক হানিতে লাগিল বাতাসে-দোলা নলখাগ্‌ড়ার মত। কিন্তু সেই ঝিলিক দেখিতে দেখিতে থামিয়া গেল, ক্ষণেক পূর্ব্বের উচ্চ চীৎকার আর শোনা গেল না—তার পরিবর্ত্তে দেওয়ালের পিছনে শত্রুর উল্লাসধ্বনি উঠিল। ঢিপির উপর উঠিয়া তারা আনন্দে নাচিতে লাগিল, আর আমাদের সৈনিকেরা মরিয়া কেবল মড়ার পাহাড় আর রক্তের নদীই সৃষ্টি করিল।

কাপ্তেন মাৎসুওকা সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন, বলিয়াছি। আহত উরুদেশ থেকে অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ফলে অচিরে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিল, তিনি বুঝিতে পারিলেন মৃত্যুর আর দেরি নাই, তখন পকেট থেকে গুপ্ত ম্যাপগুলি বাহির করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। শত্রুর কাঁটাতারের বেড়ায় জড়ানো অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হইল। যারা তাঁর দেহ আনিতে গেল তারাও সকলে মারা পড়িল, সাহসী কাপ্তেনের পাশে তারাও চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। কাপ্তেন য্যানাগাওয়া কয়েক স্থানে আহত হওয়া সত্ত্বেও চীৎকার করিতে করিতে শত্রুর পানে ছুটিয়া গেল, রুশেদের গড়-ঘেরা মাটির ঢিপিতে (rampart) লাফাইয়া উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় গুলি আসিয়া গায়ে বিঁধিল, শান্তিতে মরিবার জন্য 'র‍্যামপার্টের' আলিসায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, তা-ও শত্রুর সহ্য হইল না, তারা তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

শত্রুর দ্বারা বারংবার বিতাড়িত বিপর্য্যস্ত হইয়াও আমরা পণ করিলাম শত্রুর আঁতে ঘা দিবই। সেজন্য 'ব্রিগেড্' কেন, একটা গোটা 'ডিভিসন'ই ধ্বংস হইলেও ক্ষতি নাই। ২৪ তারিখ রাত তিনটায় আবার আক্রমণ করা স্থির হইল। কয়েক দিন ধরিয়া আমাদের দল য্যাংচিয়াকু গিরিসঙ্কটে জড়ো হইয়াছিল, ২৩ তারিখ রাতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া উচিয়াফ্যাঙে মিলিত হওয়া প্রয়োজন। তাই আমাদের কাপ্তেন তাঁর লেফটেন্যাণ্টদের ডাকিয়া বলিলেন—নমস্কার, বিদায়! আর কিছু বলবার নেই, স্থির করেছি কালকের যুদ্ধক্ষেত্রে দেহ রক্ষা করব। দীর্ঘ বিদায়ের জলের পেয়ালা দয়া করে' গ্রহণ কর!

কাপ্তেনের কথা শোনার আগেই আমরাও এবার মরিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। জলের বোতল থেকে পেয়ালা লইয়া তাহাতে জল ভরিয়া পরস্পরে আদান প্রদান চলিল, বলিলাম—আজ সন্ধ্যায় আমাদের জলের স্বাদ অমৃতের মত!

আমাদের দল নিঃশব্দে মিলন-স্থান ছাড়িয়া নদীতীরে অন্ধকার উইলোর তলে সারবন্দি দাঁড়াইল। একত্র বাসের এই শেষ বুঝিয়া কাহারও চোখের জল আর বাধা মানিল না। অচিরে 'মার্চ' সুরু হইল, তরুবীথিকার

মাঝ দিয়া চলার সময় চোখে পড়িল পর পর অসংখ্য 'ষ্ট্রেচার'—গত কয়েকদিনের আহত সৈনিকেরা তার উপর বাহিত হইতেছে।

চলিতে চলিতে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় লেগেছে?

আহত লোকটি উত্তর দিল, পা দুটো ভেঙে গেছে!

"সাবাস!"

আমাদের দল, হাতীর পিঠের মত এক পাহাড়ের ওপারে নদীর ধারে গিয়া পৌছিল। নিবিড় অন্ধকার, চোখে কিছুই দেখা যায় না। উচিয়াক্যাঙের দিকে হাতড়াইয়া পথ খুঁজিয়া চলিতে চলিতে এক জায়গায় মানুষের গলার আওয়াজ পাইলাম। চকিতে মাটিতে শুইয়া পড়িয়া ঘাড় তুলিয়া অন্ধকারের মাঝ দিয়া দেখি নদীতীরে আমাদের আহতেরা অনেকদূর পর্য্যন্ত পরপর শোয়ানো রহিয়াছে। আহতের সংখ্যা দেখিয়া মন খারাপ হইয়া গেল, তাদের অতিক্রম করিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল। তাদের কাতরানি, হাঁপানি, বেদনা ও কষ্ট; তার উপর এমনিভাবে রাতের হিমে অনাবৃত পড়িয়া থাকা—সব দেখিয়া শুনিয়া মন বিকল হইয়া গেল।

এদিকে আমরা পথ হারাইয়া উচিয়াক্যাং খুঁজিয়া পাইলাম না, ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ নবম 'ডিভিসনের' সদরে আসিয়া পৌছিলাম। দেখি কি, নায়ক জেনারেল ওশিমার পরণে শীতের কালো পোষাক—যদিও সময়টা শীতকাল নয়। তাঁর কোমরে রেশমী ক্রেপের 'ওবি' বা কোমরবন্ধ আঁটসাট করিয়া জড়ানো, তা থেকে এক লম্বা জাপানী তলোয়ার ঝুলিতেছে। দেখিয়া মনে হইল রোমান্সের রাজ্যে আসিয়া পৌছিলাম। যখন তাঁর 'ডিভিসন' পান্‌লুংশান দখল করে, তখন শোনা যায়, জেনারেল এই কালো পোষাক পরিয়া সৈন্যদলের সম্মুখে নিজেকে শত্রুর বন্দুকের সুস্পষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বিপদকে এইরূপে তুচ্ছ করিয়া আপন সৈন্যদলে তিনি সাহস ও বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

একজন কর্ম্মচারীর কাছে পথের নির্দ্দেশ জানিয়া লইয়া আমরা ফিরিলাম, কিন্তু তবুও ঠিক জায়গাটি বাহির করিতে পারিলাম না। আবার জিজ্ঞাসা করায় ডাহিনে যাইতে হইবে শুনিলাম, ডাহিনে গিয়া শুনি যেখান থেকে যাত্রা করিয়াছি সেখানে ফিরিতে হইবে, কোন্‌দিকে যে যাইব কিছুই বুঝিলাম না। একটার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া জড়ো হইবার কথা, সে সময়ের আর বেশি দেরী নাই। যথাসময়ে পৌছিতে না পারিলে বিষম লজ্জা—ব্যক্তিগত লজ্জার কথা ছাড়িয়া দিলেও আসন্ন আক্রমণে সৈন্যসংখ্যা যত বেশী থাকে ততই সুবিধা। তা ছাড়া, আমাদের বিলম্বে পৌছানর ফলে পরাজয়ও ঘটিতে পারে! কাপ্তেন ও আমরা সকলেই অত্যন্ত অধীর ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। ভাগ্যক্রমে সেই সময় ইঞ্জিনিয়ার দলের এক লোকের সঙ্গে দেখা, সে আমাদের বিশদভাবে বুঝাইয়া দিল কিরূপে উচিয়াক্যাং পৌছিতে হইবে—একটু আগে একটা পথ আছে, সেখানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারেরা 'ট্রেঞ্চ' খোঁড়ার কাজ করিতেছে, সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে। নির্দ্দেশমত চলিয়া অচিরে আমাদের অবরোধ-খাত দেখিতে পাইলাম, তার পাশে পাশে চলিয়া শেষে একটা ফাঁকের মুখে পৌছিলাম। সেটা পার হইয়া মাঠের মাঝ দিয়া শত্রুর দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া যাইতে হইল। ছুটিয়া চলিতেছি এমন সময় সন্ধানী আলোর ঝিলিক। হুকুম হইল—শুয়ে পড়! শুয়ে পড়! নিশ্বাস রুধিয়া শুইয়া পড়িয়া সেই মারাত্মক আলোর বিদায়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু 'সার্চ্চলাইট' আর সরে না। ওদিকে পিছনের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হইল। শেষ পর্য্যন্ত এক জায়গায় পৌছিলাম, অনুমান হইল, সেইখানেই সকলের জড়ো হইবার কথা। সেখানে আমাদের একজনও সৈনিক নাই, ইতস্ততঃ ছড়ান মৃতদেহ কালো দেখাইতেছে। সম্ভবত আমাদের সৈন্যদল ইতিমধ্যে পূর্ব্ব পান্‌লুং-কেল্লার পাদমূলে জড়ো হইয়াছে, কে জানে হয়ত সেইটাই আমাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। ঘড়িতে একটা বাজিয়া কয়েক মিনিট গত হইয়াছে। প্রধান দলকে খুঁজিয়া বার করিবার সকল চেষ্টা বৃথায় গেল। আমরাই কি দেরি করিয়া ফেলিলাম? কাপ্তেনের উদ্বেগের সীমা নাই—নৈরাশ্যের সে কি যন্ত্রণা! সমবেত আক্রমণে যোগ দিবার সুযোগ কি আমরা হারাইলাম? কাপ্তেন বলিল,

আত্মহত্যা করলেও আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে না!

কেবল তাঁর নয়, সকলেরই মনে হইতে লাগিল, এই যুদ্ধে যোগ দিতে না পারিলে চিরদিনের জন্ত আমাদের দলের মুখে কালি পড়িবে—সে-লজ্জার তুলনায় আমাদের একত্রে আত্মহত্যাও অকিঞ্চিৎকর।

চারিদিকে চর ছুটিল, কিন্তু কেহই কোনো খবর আনিতে পারিল না। আর সময় নাই, তাই স্থির হইল এখন পূর্ব্ব পান্‌লুঙের পুরানো কেল্লায় যাওয়াই কর্ত্তব্য। তেমন তেমন হইলে নিজেরাই লড়িব। আর যদি প্রধান দল সে সময়ের মধ্যে যুদ্ধ সুরু করিয়াই থাকে, তবে ত কথাই নাই, তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেই চলিবে। ঐ যে মাঝে মাঝে মেশিন্‌-গানের শব্দ—নিশ্চয়ই পান্‌লুং থেকে আসিতেছে। এক গিরিসঙ্কটও আবিষ্কার হইল, তার ভিতর দিয়া পাহাড়ে পৌঁছান যাইবে ভাবিয়া উচিয়াফ্যাং থেকে সেই গভীর সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া আমরা যাত্রা করিলাম!

প্রস্থে চার হাতেরও কম সেই গিরিসঙ্কট। পূর্ব্বদিন সেখানে নবম 'ডিভিসন' এবং দ্বিতীয় 'রিসার্ভ'-এর সপ্তম ও নবম দল দারুণ লড়িয়াছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার—'ষ্ট্রেচার' নাই, ওষুধ নাই, ইতস্তত কোণে ঘুঁজিতে হত ও আহত উপর উপর গাদা হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে, কেহ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, আর কেহ একেবারে স্থির নিস্পন্দ বিগতপ্রাণ। তাদের না মাড়াইয়া চলা দুষ্কর। মৃত ও প্রায়-মৃতে ভরা সে এক নরক! মৃত সঙ্গীকে মাড়াইবার ভয়ে ডাইনে চলিতে গিয়া বাঁয়ের আহতকে পদাঘাত করিয়া ফেলি। মাটির উপর চলিতেছি ভাবিয়া পা বাড়াইয়া দেখি খাকী রঙের মৃতকে মাড়াইয়া যাইতেছি। "মড়ার উপর পা দিয়ো না" বলিয়া অনুচরদিগকে সতর্ক করার মুহূর্ত্তেই দেখি নিজে মড়ার বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছি। তখন আর কি করি, অনুতপ্ত চিত্তে উদ্দেশে বলি—ক্ষমা কর ভাই, ক্ষমা কর! দেখতে পাইনি—এ অপমান অনিচ্ছাকৃত! দীর্ঘ সরু পথ মড়ায় ভরা—হতভাগা বাক্যহারা সঙ্গীদের না মাড়াইয়া চলি কিরূপে?

গিরিসঙ্কটের প্রায় শেষে আসিয়া পড়িয়াছি, আর কয়েক পা অগ্রসর হইলেই কাঁটাতারের বেড়ার সামনে আসিয়া পড়িব, এমন সময় ক্ষণেকের জন্ত থমকিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের বামে শত্রুর 'মেশিন-গান' অন্ধকার ভেদ করিয়া অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করিতে সুরু করিয়াছে। তখনই একটি গোলন্দাজ দলের শব্দ পাইলাম, আমাদের ছয়টি কামান সেই পথ দিয়াই পান্‌লুং উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই সঙ্কীর্ণ পথে পদাতিক ও গোলন্দাজ গাদাগাদি করিয়া রুশের 'মেশিন গান' এড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যে পাহাড় আমাদের লক্ষ্য এখন তার তলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, কিন্তু আমাদের প্রধান দলের চিহ্নমাত্র নাই। ব্যাপার কি, তারা গেল কোথায়? আক্রমণ স্থগিত রহিল না কি? অনেক চিন্তার পর কাপ্তেন স্থির করিলেন উচিয়াফ্যাঙে ফিরিয়া গিয়া নূতন আদেশের অপেক্ষা করিবেন। তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত অবশ্য আমরা মানিতে বাধ্য যদিও খুব অনিচ্ছায়। আবার সেই গলি, আবার সেই নরক অতিক্রম! একবার ভায়েদের মৃতদেহ মাড়াইয়া ক্ষমা চাহিয়াছি, আবার সেই বীভৎস কাজ করিতে হইবে।

অন্ধকারে আবার হতাহতকে হাতড়াইয়া চলিতে লাগিলাম। তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়, কারণ আমাদের পরে সেই পথ দিয়াই গোলন্দাজেরা গিয়াছে, কামানের গাড়ীর চাকা অনেক হতাহতকে পিষিয়া দিয়াছে। যে-প্রাণ ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছিল, লোহার চাকার তলে পড়িয়া তা থামিয়া গেছে; যে-দেহে প্রাণ ছিল না তা খণ্ডবিখণ্ড শতছিন্ন। চূর্ণ অস্থি, ছিন্ন মাংস এবং রক্তধারা ভাঙা তলোয়ার ও চৌচির বন্দুকের সঙ্গে একাকার হইয়া আছে।

আবার গিরিসঙ্কটের মুখে ফিরিলাম। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখিলাম অন্ধকারের মাঝ দিয়া দলের পর দল ছায়ার মত কাহারা আসিতেছে—এই আমাদের প্রধান দল—ইহাদের অপেক্ষাতেই এতক্ষণ কি উৎকণ্ঠায় কাটিয়াছে! আমাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। শুনিলাম, তারা যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট

স্থানে পৌঁছিতে পারে নাই—শত্রুর সন্ধানী আলোর উৎপাতে। সে যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত প্রধান দলের নাগাল পাইয়া আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলাম। আমরাই আক্রমণের সূত্রপাত করিব ভাবিয়া খুব আনন্দ হইল। এই জায়গাটা শত্রুর গোলাগুলি থেকে আমাদের আড়াল করে না, এমন প্রশস্তও নয় যে, অনেক লোক ধরিতে পারে; কেবল একটা খাড়া পাহাড় ইহাকে আগলাইয়া আছে—সেটা থাকায় শত্রু আমাদের পানে নীচু হইয়া চাহিতে পারে না। এখানে নায়কেরা যাঁহারা আছেন তাঁদের মধ্যে মেজর মাৎসুমুরা একজন। তাকুশান্ আমাদের দখলে আসার পর শত্রুর পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করেন। সে-সময়ে তাঁর ডান পা মচকাইয়া যায়, সেই আঘাতের জন্য তিনি ডাক্তারের সাহায্য লইতে রাজী হন নাই—তাঁর মতে সে-আঘাত অতি তুচ্ছ। তিনি এখনও বেতের লাঠির উপর ভর দিয়া ব্যাট্যালিয়ন চালনা করিয়া থাকেন। আজও তাঁর পায়ে যন্ত্রণা আছে, তবুও নিজের দলের আগে আগে লাঠিতে ভর দিয়া আসিলেন। আমার পাশে বসিয়া বলিলেন, এতদিনে সময় এসেছে!

কাপ্তেন সেগাওয়া, যিনি তাকুশানে ছোট ভাইয়ের কাছে শেষ বিদায় লইয়াছিলেন, তিনিও উপস্থিত। লেফটেন্যান্ট সোনে আসিল—হাতে বন্দুক এবং কোমরে কার্ত্তুজের বেল্ট। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ অপূর্ব্ব সাজ কেন? সে বলিল, কাল রাতে চরের কাজ করিতে গিয়া তলোয়ারখানি হারাইয়াছে, তাই সাধারণ সৈনিকের অস্ত্রই লইতে হইল! নায়কেরা সকলে একত্র হইয়া পরস্পরের সাফল্য কামনা করিয়া কিছুক্ষণ গল্পসল্প করিতে লাগিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে তাদের মধ্যে কয়জন ইহলোকে থাকিবে কে বলিতে পারে!

২৪

'নিশ্চিত-মৃত্যু' দল

খাড়া পাহাড়টার তলায় সকলে জড়ো হইয়া চলার আদেশের অপেক্ষায় আছি, এমন সময় এক টুকরা কাগজ হাতে হাতে আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিল। খুলিয়া পড়িলাম—"য়্যাসুকিচি হন্দা এ মাসের উনিশ তারিখে গুলির ঘায়ে মারা পড়েছে। আহত অবস্থায় তাকে যখন জল পান করতে দিলুম, তখন সে কাঁদতে লাগল, আর লেফটেন্যান্ট সাকুরাইকে বিদায়-নমস্কার দিতে বল্লে। ইতি—বুন্‌কিচি তাকাও।"

বছর খানেক আগে এই হন্দা আমার ভৃত্যের কাজ করিত। লোকটি বিশ্বাসী, তার জন্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, অথচ অন্তিমকালে সে আমাকেই নমস্কার জানাইয়াছে! ভাবিলে দুঃখ হয়, তার জীবদ্দশায় একটু বিদায়-সম্ভাষণও করিতে পারিলাম না!

আমার দলবলকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম—এবার তোমাদের সকলের কাছে বিদায় নেব। প্রাণপণ শক্তিতে লড়বে। পোর্ট-আর্থার দখল হবে কি-না তা এই যুদ্ধে বোঝা যাবে। এই নাও জল, ভাব এটা মৃত্যুক্ষণে পান করছ!

একটি পাত্র জলে ভরিলাম। সে-জল দুই একজন সৈনিক জীবন সঙ্কট করিয়া লইয়া আসিল। সেই একই পাত্র থেকে আমরা বিদায়-পান করিলাম। পান্‌লুঙের ধার দিয়া আধাপথ বরাবর একটা জায়গায় উঠিবার আদেশ আসিল। নিঃশব্দে চলিতে সুরু করিলাম—আমরা যারা একত্রে ক্ষণকাল পূর্ব্বে চিরবিদায়-পেয়ালা থেকে পান করিয়াছি, আমরা আবার সেই সাথীদের মৃতদেহে-ভরা ভয়ানক গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া চলিলাম। এই তৃতীয়বার এই পথ অতিক্রম করিতেছি, চতুর্থবার জীবিত অবস্থায় কেহই এ পথ অতিক্রম করার আশা রাখে না। সকলেরই ইচ্ছা ও সঙ্কল্প উদীয়মান-সূর্য্য-পতাকার তলে স্বদেশের প্রতি মহান্ কর্ত্তব্য সাধনকালে মৃত্যুলাভ। এই শেষ যুদ্ধ যাত্রার আগে আমরা সকলেই যথাসম্ভব হাল্কা হইলাম—দিন দুই তিন চলার মত শক্ত বিস্কুট সঙ্গে রহিল, বাদবাকি জিনিষ ফেলিয়া আসিলাম। কোমর বন্ধ থেকে ঝুলান একখণ্ড জাতীয় পতাকা আমার খাকী পোষাকের শোভা বাড়াইল, গলায় একখানা জাপানী তোয়ালে বাঁধিলাম। পায়ে জুতা নাই—কেবল নেকড়ার 'তাবি'।* অদ্ভুত সাজে আমার

* পায়ের গাঁট পর্য্যন্ত বিস্তৃত জাপানী মোজা

মূর্ত্তি হইল গ্রীসের পল্লী-উৎসবের নর্ত্তকের মত। এই বেশে তলোয়ার, জলের বোতল ও তিনখানা শক্ত বিস্কুট লইয়া মহান্ মৃত্যুর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে চলিয়াছি!

সেই গিরিসঙ্কটের কথা মনে পড়িলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। মড়ার গাদা মাড়াইয়া ডিঙাইয়া নাক চাপিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে একটা ঘুঁজির মধ্যে দেখি এক আহত সৈনিক বসিয়া বসিয়া যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে। কোথায় চোট লাগিয়াছে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তার দুই পা ভাঙিয়াছে, গত তিন দিনে কণামাত্র খাদ্য বা পানীয় জোটে নাই, তাহাকে লইবার জন্ম কোনো 'ষ্ট্রেচার' আসে নাই—যুদ্ধে আহত হইবার পর থেকে সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু এমনি কপাল যে মরণও তাহাকে ভুলিয়াছে!

আমার তিনখানা বিস্কুট তাহাকে দিলাম। বলিলাম, আপাতত এই খেয়ে ধৈর্য্য ধরে' বাহকের জন্তে অপেক্ষা কর! কৃতজ্ঞতায় আনন্দে সে হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে লাগিল, বারবার আমার নাম জানিতে চাহিল। মনটা কেমন হইয়া গেল, আশু বাড়িয়া চলিলাম, 'বিদায়' বলা ছাড়া আর কিছু তাহাকে বলা হইল না। এইবার আমরা পান্লুংশানের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে আসিয়া হাজির হইলাম।

পান্লুঙের এই কেল্লা নবম 'ডিভিসন' এবং দ্বিতীয় 'রিসার্ভ'-এর সপ্তম ও অষ্টম রেজিমেণ্টের রক্তমাংসের দ্বারা দখল হইয়াছে। এখন এ জায়গার খুব কদর, এখান থেকেই পূর্ব্ব-চিকুয়ান্ ও ওয়ান্তাইয়ের উত্তরের কেল্লাগুলোর উপর হানা দেওয়া হইবে। জেনারেল ওশিমার সৈনিকদের সাহস ও মারাত্মক যুদ্ধের ফলে এ জায়গা দখলে আসিয়াছে। গিরিসঙ্কটের ভীষণ দৃশ্যে সেই বিষাদময় কাহিনী প্রকাশিত।

তারের বেড়ার ফাঁক দিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম অনেক ইঞ্জিনিয়ার ও সৈনিক মরিয়া গাদা হইয়া পড়িয়া আছে—কেহ তারের বেড়ায় জড়াইয়া গেছে, কেহ বা দুই হাতে একটা খোঁটা বা বড় লোহার কাঁচি চাপিয়া আছে!

পান্লুঙের পার্শ্বদেশের মাঝামাঝি পৌঁছিয়া দেখি মাথার উপরে অন্ধকারে আমার বাহিত সেই পুরাণো পতাকা উড়িতেছে। দেখিয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল। হাতে পায়ে হামা দিয়া নিশানের কাছে উঠিয়া কর্নেল আওকির সামনে গিয়া পড়িলাম। দিনকয় আগে তাকুশানের তলায় তাঁর কাছে বিদায় লইয়া আসিয়াছি।

"কর্নেল! আমি লেফটেন্সাণ্ট সাকুরাই!"

তিনি আমার পানে চাহিয়া যেন অতীত দিনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। মুখে বলিলেন—ও, সাকুরাই! বেশ বেশ! তোমার সাফল্য কামনা করি!

এমন সময়ে শুনিলাম পাহাড়ের মাথা থেকে আমার নাম ধরিয়া কে যেন ডাকিতেছে। সেখানে গিয়া দেখি লেফটেন্সাণ্ট য়োশিদা একলা বসিয়া আছে। সে আমার বন্ধু, আমরা একই জেলার লোক। শুনিয়াছিলাম সে নবম ডিভিসনে আছে এবং পোর্ট-আর্থারের সামনে লড়িতেছে। তার সঙ্গে দেখা হইবে আশা ছিল না। ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়ার আগে পুরানো বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ বড়ই করুণ।

বিষণ্ণভাবে সে বলিল, সাকুরাই! গত দিনদুই তিন বড় ভয়ানক লড়াই গেছে, কি বল?

তার সেখানে থাকার হেতু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে একলা বসে করছ কি?

"মড়াগুলোর পানে একবার চাও!"

তার আশপাশে কালো কালো ছায়া—ভাবিয়াছিলাম সে-সব আমাদের রেজিমেণ্টের লোক। যখন দেখিলাম সেই খাকীপরা লোকের গাদা য়োশিদার দলের হত ও আহত সৈনিক, তখন অবাক হইয়া গেলাম। দুই তিন কোথাও বা চারটি করিয়া দেহ উপরে উপরে গাদা করা। শত্রুর কামানের উপর হাত রাখিয়া কেহ মরিয়া আছে, কেহ 'ব্যাটারি' অতিক্রম করিয়া গিয়া কামানের গাড়ি আঁকড়াইয়া মরিয়া আছে। মড়ার তলায় আহতেরা চাপা পড়িয়া গোঙাইতেছে। এই দুঃসাহসীর দল যখন সঙ্গীদের দেহ মাড়াইয়া শত্রুর কেল্লার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল তখন "মেশিন্-গান"-এর গুলি কেল্লার সন্নিকটে তাহাদিগকে নিঃশেষে সংহার করিয়াছে—আহতদের উপর মড়ার স্তূপ রচিত হইয়াছে। পিছনে

যারা ছিল তারা রাগের মাথায় সঙ্গীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্ম শত্রুর পানে ছুটিয়া গিয়া মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। লেফটেন্সান্ট য়োশিদা হতভাগ্য অনুচরদের ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই—তাহাদেরই দেহাবশেষের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে! পরে ২৭ অক্টোবর তারিখে এরলুংশানের ভীষণ যুদ্ধে সে মারা পড়ে। পান্‌লুঙের মাথায় এই দেখা আমাদের শেষ দেখা।

সকলে একত্র হইবার পর কর্নেল উঠিয়া শেষ উৎসাহ দিলেন। বলিলেন, এই যুদ্ধ আমাদের পক্ষে দেশসেবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ! আজ রাতে পোর্ট-আর্থারের আঁতে ঘা দিতে হবে! আমাদের কেবল মরতে কৃতসঙ্কল্প হলেই চলবে না; আমাদের মরাই চাই! আমি তোমাদের পিতৃস্থানীয়, বরাবর তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ করেছ, সেজন্য আমি যে কত কৃতজ্ঞ ব'লে বোঝাতে পারি না! সকলকেই বলি, যথাসাধ্য ক'রো!

ঠিক, জাপান ছাড়ার সময়ই আমরা মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হইয়াছি। অবশ্য, যারা যুদ্ধে যায় তারা প্রাণ লইয়া ফেরার আশা রাখে না। কিন্তু এই বিশেষ যুদ্ধে কেবল মরিতে প্রস্তুত থাকিলেই চলিবে না—'মরিবই' এই সঙ্কল্প চাই।

এবার এই আক্রমণের মহিমা ও ভীষণতা বিবৃত করি। আমি সামান্য লেফটেন্সান্ট মাত্র, আমার মনের মাঝে সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মত হইয়া আছে—আমার কাহিনী অন্ধকার থেকে জিনিষ খুঁটিয়া খুঁটিয়া তোলার মত হইবে। ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কেবল টুক্‌রা-টুক্‌রা স্মৃতিই দিতে পারিব। এই কাহিনী যদি আমার আপন কীর্ত্তির বড়াইয়ের মত শোনায়, তার কারণ ইহা নয় যে আমি নিজের গুণে আত্মহারা, তার কারণ এই যে, যে-সব ব্যাপার ব্যক্তিগত এবং আমার আশপাশে ঘটিয়াছে,আমি কেবল তাহাই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। এই খণ্ডিত বিবরণ যদি এই ভীষণ লড়াইয়ের গোটা গল্পটা অনুমানে সহায়তা করে, তবে আমার চেষ্টা সফল জ্ঞান করিব।

*

'নিশ্চিত-মৃত্যু' দলের লোকেরা কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি করে নাই, নির্ভয়ে তারা মৃত্যুমঞ্চে আরোহণ করিল। পান্‌লুংশান্ উত্তীর্ণ হইয়া গাদা-করা মড়ার মাথা দিয়া তাহারা পথ করিয়া চলিল। এক এক দলে পাঁচ ছয় জন করিয়া সৈনিক পরে পরে বেড়া-দেওয়া ঢালুতে গিয়া পৌঁছিল।

কর্নেলকে বলিলাম, আসি তবে কর্নেল!

বিদায় লইয়া চলিতে সুরু করিলাম। আমার প্রথম পদক্ষেপ এক মড়ার মাথার উপর। পূর্ব্ব-চিকুয়ানের উত্তরের কেল্লা ও ওয়াংতাই পাহাড় আমাদের লক্ষ্য।

শত্রুর skirmish খাতে বোমা লইয়া লড়াই সুরু হইল। আমাদের বোমাগুলো খাসা ফাটিতেছে—জায়গাটায় দেখিতে দেখিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া গেল। তক্তাগুলো ছিটকাইয়া পড়িতেছে, বালিভরা বোরাগুলো ফাটিতেছে, নরমুণ্ড শূন্যে উড়িতেছে, ধড় থেকে পা ছিঁড়িয়া আলাদা হইতেছে। ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের শিখা মিলিয়া একটা অদ্ভুত লাল আভায় আমাদের মুখ উদ্ভাসিত হইল, মুহূর্ত্তে সৈন্যশ্রেণী ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। আর আশা নাই ভাবিয়া শত্রু সেস্থান ছাড়িয়া পালাইতে সুরু করিল।

"চল, চল, আগে চল, এই অগ্রসর হওয়ার সুযোগ! ওদের তাড়া কর, এক লাফে জায়গা দখল কর!" বিজয়গর্ব্বে আমরা নির্ভয়ে অগ্রসর হইলাম।

কাপ্তেন কাওয়াকামি তলোয়ার উঠাইয়া বলিলেন, অগ্রসর হও! তখন আমি তার পাশে দাঁড়াইয়া হাঁকিলাম, সাকুরাইয়ের দল অগ্রসর হও!

এমনিভাবে চেঁচাইতে চেঁচাইতে আমি কাপ্তেনের বাঁ দিক ছাড়িয়া চলার পথের সন্ধানে গড়-ঘেরা ঢিপির (rampart) উপরের পথে চলিলাম। আমাদের চোখের সামনে ওই কালো পদার্থটা কি? উত্তর কেল্লার 'র‍্যাম্‌পার্ট'। পিছু ফিরিয়া দেখি একটি সৈনিকও নাই। তাই ত, দলছাড়া হইয়া পড়িলাম না কি? ভয়ে ভয়ে সাবধানে দেহটা বাঁয়ে হেলাইয়া বারো নম্বর কম্প্যানিকে ডাকিতে লাগিলাম।

যতবার ডাকি উত্তর আসে—লেফটেন্সান্ট সাকুরাই!

শব্দ লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া গিয়া দেখি কর্পোর‍্যালই তো সশব্দে কাঁদিতেছে।

"ব্যাপার কি? কাঁদছো কেন?"

কান্না থামিল না। কর্পোর‍্যাল আমার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাই, আপনি ত এবার মাতব্বর হলেন!

"কান্নার কি কারণ? খুলেই বল না!"

সে আমার কানে কানে বলিল, আমাদের কাপ্তেন মারা পড়েছেন!

শুনিয়া আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম। এই ত এক মুহূর্ত আগে তিনি হুকুম করিলেন, আগে চল! এইমাত্র যাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইল সেই কাপ্তেন আর ইহলোকে নাই? এক মুহূর্তে আমাদের কোমলপ্রাণ স্নেহময় কাপ্তেন কাওয়াকামি ও আমি দুই ভিন্ন জগতের জীবে পরিণত হইলাম। এ কি সত্য, না স্বপ্ন?

কর্পোর‍্যাল ইতো কাপ্তেনের দেহ দেখাইয়া দিল, নিকটেই র‍্যামপার্টে যাওয়ার পথের উপর পড়িয়া আছে। ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে সেই দেহ তুলিয়া লইলাম।

"কাপ্তেন! ..."

আর একটি কথাও মুখে সরিল না। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেও চলিবে না, কাপ্তেনের কাছে যে গুপ্ত ম্যাপ ছিল তাহা লইয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাঁকিয়া বলিলাম—এখন থেকে আমিই বারো নম্বর কম্পানির নায়ক!

হুকুম দিলাম, আহতদের মধ্যে কেহ কাপ্তেনের দেহ লইয়া যাক। একজন আহত সৈনিক দেহটি তুলিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় মোক্ষম স্থানে আঘাত পাইয়া কাপ্তেনের গায়ে ঢলিয়া সে মারা গেল। তার স্থান লইতে গিয়া সৈনিকের পর সৈনিক মারা পড়িতে লাগিল।

লেফটেন্যাণ্ট নিয়োমিয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সেকসন্'গুলো একত্র আছে ত?

সে বলিল, হাঁ।

কর্পোর‍্যাল ইতোকে আদেশ দিলাম, সৈন্যশ্রেণী যেন ঠিক থাকে, যেন জোড়ভঙ্গ হইয়া না যায়! বলিলাম, দলের মাঝখানে থাকিব আমি। অন্ধকারে জায়গাটার চেহারা দেখা যায় না, কোন্‌দিকে চলিতে হইবে তারও ঠিকানা নাই। অন্ধকার আকাশের গায়ে উত্তরের কেল্লা ও ওয়াংতাই পাহাড় খাড়া উঠিয়াছে। সামনে এক প্রাকৃতিক দুর্গ, আমরা আছি কটাহের মত নাবাল জমির মধ্যে, তবুও আমরা পাশাপাশি 'মার্চ' করিয়া চলিলাম।

"বারো-নম্বর দল, আগে চল!"

ডানদিকে ফিরিয়া স্বপ্নের ঘোরে যেন আগাইয়া চলিয়াছি। সে সময়ের কিছুই স্পষ্ট মনে পড়ে না।

"লাইন যেন না ভাঙে!"

এই আমার একমাত্র আদেশ। কর্পোর‍্যাল ইতোর গলা আর শুনিতে পাই না—সে আমার ডাইনে ছিল।

ক্রমশ



স্বর্ণমান

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, বি-এ (হারভার্ড)

নানা কারণে ও নানা ভাবে ভারতের স্বার্থ ব্রিটেনের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, সে দেশের রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের প্রকোপ আমাদের এ দেশেও পরিব্যাপ্ত হয়। যদিও আমাদের এবং ব্রিটেনের স্বার্থ এক নয়, তথাপি ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সেখানে যে-উপায় অবলম্বন করা হয়, আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন ধার না ধারিয়া এ দেশেও তাহাই অবলম্বন করা হয়। বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় দিন। সেদিন বাধ্য হইয়া সে তাহার স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে। লণ্ডন জগতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র, শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতির ভিত্তি এত সুদৃঢ় হইয়াছিল যে, প্রত্যেক সভ্য দেশই তাহাদের মোটা রকম মূলধন লণ্ডনে আমানত রাখিয়াছিল। তাহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, প্রয়োজনমত আমানত টাকা উঠাইয়া লইতে পারিবে। এইজন্যই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বেশীর ভাগ দেনা-পাওনা লণ্ডনে চুকান হইত। ইহার ফলে একে ত বিদেশীয়দের আমানতি অর্থে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা অল্প সুদে টাকা ধার পাইত, দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক এবং ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলি এই কারবার-সম্পর্কে যথেষ্ট লাভবান. হইত। স্বর্ণমান পরিত্যাগের ফলে যাহারা ব্রিটেনে মোটা রকম টাকা আমানত রাখিয়াছিল এবং গতানুগতিক মতে অন্য দেশের সঙ্গে কারবারও লণ্ডনের মারফতে করিত, রাতা-রাতি তাহাদের ব্রিটেনে গচ্ছিত অর্থের মূল্য প্রতি টাকায় চারি আনা হ্রাস হইয়া গেল। শত বৎসরের বিশ্বাস একদিনে ভঙ্গ হইয়া গেল, পৃথিবীর বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্যের সুগমতা করিয়া ব্রিটেনের যে মোটা রকম আয় হইত তাহা এখন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; ইহাই ছিল ব্রিটেনের একটি অদৃশ্য রপ্তানি, যাহা দ্বারা সে স্বদেশের রপ্তানির পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বেও বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার আমদানি করিতে পারিত।

ব্রিটেনের স্বর্ণমান পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বর্ণমানও পরিত্যক্ত হইল এবং ভারতের মালিক সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেট ফর্ ইণ্ডিয়া ইস্তাহার জারি করিলেন যে, টাকার বিনিময়ের মূল্য পূর্ব্বের হারে অর্থাৎ ১ শিলিং ৬ পেনিতে ষ্টারলিঙের সহিত গ্রথিত হইল। এরূপ করাতে আমাদের লাভ কি লোকসান হইল তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে। এখন স্বর্ণমান কি তাহা দেখা যাক্। যদিও অধুনা কোন দেশে স্বর্ণ চল্‌তি মুদ্রা নয় অর্থাৎ দৈনিক কেনা-বেচায় ইহা ব্যবহৃত হয় না, তথাপি প্রত্যেক সরকারই আইন অনুসারে নোটের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিতে বাধ্য। বিলাতে পাউণ্ডের মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছিল ১১৩ গ্রেণ স্বর্ণ, অর্থাৎ এই দরে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড ১৬০০ পাউণ্ড নোটের পরিবর্ত্তে ৪০০ আউন্স স্বর্ণ দিতে আইন অনুসারে বাধ্য ছিল। সেইরূপ এই দরে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডও স্বর্ণ কিনিতে বাধ্য ছিল। অধিকাংশ দেশেই এই প্রণালীর প্রচলন আছে। যেমন আমেরিকান ডলারের মূল্য ২৩.২২ গ্রেণ স্বর্ণ। অতএব যখন পাউণ্ড ও ডলারের মূল্য সমান (par) থাকে তখন এক পাউণ্ডের বিনিময়ের মূল্য হইবে ৪.৮৬৲ ডলার; এবং যতদিন উভয় দেশের মুদ্রা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন বিনিময়ের হার ইহা অপেক্ষা বিশেষ কম-বেশী হইবে না। যে-সব আমেরিকান বিলাতে পাউণ্ডের হিসাবে মাল বিক্রয় করিয়াছে তাহারা স্বভাবতই পাউণ্ডকে ডলারে বিনিময় করিতে চাহিবে

সেইরূপ যে-সব আমেরিকান বিলাতে মাল খরিদ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেনা চুকাইবার জন্য পাউণ্ড দিতে হইবে, ইহার জন্য বিক্রেতা এবং ক্রেতা মুদ্রা বিনিময়ের দালালদের মারফতে সেই সময়ের জন্য বিনিময়ের হার ধার্য্য করেন। যদি কোন বস্তুর বিক্রেতা অপেক্ষা ক্রেতার সংখ্যা কম হয় তাহা হইলে সেই বস্তুর মূল্য হ্রাস হয়, এমন হইতে পারে সেই বস্তু মাটির দরেও বিকাইবে। কিন্তু স্বর্ণমান বর্ত্তমান থাকায় পাউণ্ডের সেই অবস্থা হইতে পারে না, কেন-না, আমরা দেখিয়াছি যে, পাউণ্ড নোটের পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড স্বর্ণ দিতে বাধ্য এবং তাহা ডলারে বিনিময় করা যায়। কেন-না, যদি ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের মূল্য অধিক হ্রাস হয় তাহা হইলে আমেরিকানরা পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে লণ্ডন হইতে স্বর্ণ স্বদেশে চালান দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অধিক-সংখ্যক ডলার পাইবে। কাজেই যতদিন ইংলণ্ড স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের মূল্য অধিক হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারিত না। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশই স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সহজে এবং নিয়মিত হারে চলিতে পারিত, তাহাতে বিদেশে ক্রয়-বিক্রয়ে লাভক্ষতি কি হইবে তাহা পূর্ব্বেই একপ্রকার নিশ্চিত করা যাইতে পারিত। এখন ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করায়, যে দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদের মুদ্রার সহিত ব্রিটিশ মুদ্রা কি হারে বিনিময় হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য নিশ্চিতের পরিবর্ত্তে অনিশ্চিত হইয়াছে, ইহাতে যদিও সাময়িক সট্টাবাজ (speculator)দের সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু ন্যায্য ব্যবসা-বাণিজ্যের অশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

কি কারণে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে বিগত মহাযুদ্ধের পরিণাম বিবেচনা করিতে হইবে। মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধমত্ত দেশ সকল যুদ্ধের আনুষঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, বিদেশে মাল সরবরাহ করিতে পারিল না, সেই সুযোগে যুদ্ধনিরত দেশগুলি স্বদেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্বোক্তদের বাজার হস্তগত করিয়া ফেলিল। যুদ্ধ স্থগিত হওয়ার পর যখন পূর্ব্বোক্ত দেশ সকল শিল্প পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া এবং অনেক স্থলে বর্দ্ধিত করিয়া পূর্ণোদ্যমে মাল প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইল তখন চাহিদা অপেক্ষা মালের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হইল। আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা শোধ করিতে, হয় মালের আদান-প্রদান, নয় স্বর্ণের আমদানি রপ্তানি অথবা বিদেশে প্রাপ্য অর্থ সেদেশে বেশী অথবা অল্পদিনের জন্য ধার দিতে হয়। কিন্তু যে-সব দেশ যুদ্ধকালে স্বদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহারা যুদ্ধ বিরামে তাহা রক্ষা করিবার জন্য উচ্চ হারে আমদানির উপর শুল্ক চড়াইল। ইহার ফলে দেনদার দেশ সকল পাওনাদারদের নিকট অল্প সময়ের জন্য ধার করিতে বাধ্য হইল। ইহাতে ঘন ঘন মুদ্রা-বিনিময়ের জটিলতা বৃদ্ধি পাইল। যেহেতু পাওনাদারগণ উচ্চ শুল্ক ধার্য্য করিয়া দেনদারদিগের মাল গ্রহণে বাধা উৎপন্ন করিল এবং যেহেতু তাহারা দেনদারদিগকে আর বেশী ধার দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, সেই হেতু শেষোক্তদিগকে স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া ধার শোধ করিতে হইল। ফলে এই দাঁড়াইল যে, পৃথিবীতে যে-পরিমাণ স্বর্ণ মজুত আছে তাহার ⅔ অংশ আমেরিকা এবং ফ্রান্সে চালান হইল। অন্যান্য দেশে এইরূপে স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইল, অর্থাৎ ইহার অনুপাতে সমস্ত মালের মূল্য হ্রাস হইল। উপরিউক্ত দুই দেশে স্বর্ণ মজুত হওয়ার মুখ্য কারণ এই যে, তাহাদের বিক্রীত মালের পরিবর্ত্তে এবং লগ্নি টাকার সুদস্বরূপে দেনদারদিগের মাল গ্রহণে অসম্মতি। তদুপরি তাহাদের উপযুক্ত পরিমাণে দেনদারদিগকে ধার দেওয়ার অসম্মতিও ইহার অন্যতম কারণ। এরূপ অসম্মতির কারণ অনেকে রাজনৈতিক বলিয়াও মনে করেন। হইতে পারে যে, তাহারা দেনদারদিগের জামিন সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, কিন্তু ফ্রান্সের বিষয় ইহা বলা হয় যে, সে তাহার অর্থবলের সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের রাজনৈতিক প্রভাব এতটা খর্ব্ব করিতে চায় যে ভবিষ্যতে আর কখনও যেন

তাহারা ফ্রান্সের বিপক্ষে দাঁড়াইতে না পারে। ফ্রান্সের ধার দেওয়ার আপত্তি নাই, কিন্তু এই কড়ারে দিতে পারে যে, সন্ধি অনুসারে তাহার যে-সব দেশ হস্তগত হইয়াছে এবং যে কোন লাভ হইয়াছে, সে বিষয়ে ভবিষ্যতে ধারগ্রহণকারিগণ কোন প্রশ্ন উঠাইতে পারিবে না। যদি দেনদারেরা এইরূপ অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিতে রাজী হয় তবে ফ্রান্স ধার দিতে আজই প্রস্তুত। বস্তুতঃ, অর্থনীতি এবং রাজনীতি এরূপ ভাবে মিশ্রিত যে, তাহাদের আরম্ভ এবং শেষ কোথায় তাহা বলা কঠিন। সে যাহা হউক ধার দেওয়া-না-দেওয়া ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যদি কেহ ধার না দেয় তাহা হইলে তাহাকে সেরূপ করিতে কেহ বাধ্য করিতে পারে না। কিন্তু এই স্বার্থপরনীতি অবলম্বনের ফলে জগতের অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে যদি অবিলম্বে তাহার সমাধান না হয় তাহা হইলে শিল্প, বাণিজ্য এবং আমাদের সভ্যতার মূল ভিত্তির উপর এরূপ কুঠারাঘাত করা হইবে যে, তাহার ধাক্কা কেহ সামলাইতে পারিবে না। ইতিমধ্যেই জার্ম্মানি এবং অষ্ট্রিয়াতে অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে।

সহ্যেরও একটা সীমা আছে, যতদিন আশা থাকে ততদিন বুক বাঁধিয়া লোক কাজ করিতে পারে। ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতি হইবে ইহা ভাবিয়া বর্ত্তমানে অনেক ক্লেশ আমরা সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু যখন ধারণা বদ্ধমূল হয় যে ভবিষ্যতে অন্ধকার, যাহাই করি না কেন আর কোন আশা নাই, তখন লোক মরিয়া হইয়া উঠে এবং কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া অঘটন ঘটায়। অনেকে মনে করেন যে, জার্ম্মানির অবস্থা এইরূপ, সে সহ্যের সীমায় পৌছিয়াছে, যদি তাহাকে আরও পিষিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সে সোভিয়েটের দলে ভিড়িবে। জার্ম্মানির অরাজকতা ইউরোপের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তখন ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকিবে না, আমাদের বর্ত্তমান অর্থনীতির মূলমন্ত্র চূর্ণ হইয়া যাইবে। ইংলণ্ড, জার্ম্মানি এবং আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, গম, ধান, তুলা, পাট সব জিনিষই জলের দরে বিক্রয় হইতেছে, অথচ অর্থাভাবে অনেকে কিনিতে পারিতেছে না। বেকারের অন্ন জোটাইতে ইংলণ্ডের রাজকোষ শূন্য। ক্ষুধার্ত্ত লোক বাধা নিষেধ মানে না, বিশেষতঃ তাহারা রাজার জাত, অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া তাহাদের অভ্যাস নাই। যদি ব্যবসা-বাণিজ্য আরও মন্দা হয়, যদি বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়, যদি ক্ষুধার জ্বালা আরও তীব্র হয় তবে ইহাদিগকে থামাইবে কে? এই সমস্যা একের নয় সকলের। কাজেই প্রত্যেক দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য এক আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসিবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শত বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে লণ্ডন জগতের অর্থকেন্দ্র হইয়াছিল। অন্যান্য দেশ হইতে যদিও প্রয়োজন-মত স্বর্ণ রপ্তানি করা যাইত তথাপি সময়-বিশেষে ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি রপ্তানিতে বাধা দিত, শুধু ইংলণ্ড সব সময়ে সব অবস্থায় স্বর্ণের রপ্তানিতে কোন আঁট রাখে নাই, ইহার ফলে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই লণ্ডনে তাহাদের প্রভূত পরিমাণ অর্থ আমানত রাখিত। সেইজন্য লণ্ডনের উপর লিখিত হুণ্ডি সকলের নিকটেই আদরণীয় ছিল। ইহা একদিকে যেমন ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল, অন্য পক্ষে কোনও কারণে ইংলণ্ডের উপর বিশ্বাস ভঙ্গ হইয়া হঠাৎ আমানতি টাকা উঠাইয়া লইলে বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল। কয়েক বৎসর হইতে ইংলণ্ডের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছিল। একে ত যুদ্ধের সময় কৃত ঋণের সুদের বোঝা অত্যন্ত বাড়িয়াছে, তদুপরি ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দার জন্য তাহাদের রপ্তানি দিন-দিন কমিতেছে। ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য তাহার রপ্তানির উপরই প্রতিষ্ঠিত। রপ্তানি কমিয়া যাওয়াতে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের সাহায্য করিতে হইল। ইহার জন্য করের ভার আরও বৃদ্ধি পাইল, তাহাতে ইংলণ্ডের প্রস্তুত অনেক জিনিষের পড়্‌তা এত বেশী পড়িল যে, আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় সে আর

দাঁড়াইতে পারিল না। এইরূপে একদিকে যেমন রপ্তানি হ্রাস হইয়া আয়ের পরিমাণ কমিয়া গেল, অন্যদিকে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া খরচ বাড়িয়া গেল, ফলে তাহার বজেটে আয় ব্যয়ের তারতম্য রহিল না। ইহাতে ইংলণ্ডের পাওনাদারগণ তাহার উপর সন্দিগ্ধ হইল। তাহার আর্থিক ভিত্তি যে সুদৃঢ় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহার বিপুল অর্থ শিল্প-বাণিজ্যে খাটান হইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ইহার পরিমাণ কম পক্ষে ৩৪০ কোটি পাউণ্ড হইবে। এই অর্থ বিদেশে রেল কোম্পানী, ষ্টীমার কোম্পানী, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। চাহিলেই তাহা উঠাইয়া লওয়া যায় না। অথচ বিদেশীয়রা লণ্ডনে অল্প সময়ের জন্য যে টাকা আমানত রাখিয়াছিল তাহা চাহিবামাত্র সে দিতে বাধ্য। যাহারা বেশী হুঁসিয়ার তাহারা তাহাদের গচ্ছিত টাকা উঠাইয়া স্বর্ণে বিনিময় করিয়া স্বদেশে চালান দিতে লাগিল। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড সুদের হার বাড়াইল, যাহাতে টাকা উঠাইয়া লওয়া না হয়, কিন্তু ভবী ভুলিল না, যে যার টাকা দ্রুতগতিতে উঠাইতে লাগিল। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড, ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স এবং আমেরিকায় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট মোটা রকম ধার করিল, তাহাও ফুৎকারে উড়িয়া গেল। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের স্বর্ণের পরিমাণ ১৩৩ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইল, আবার আমেরিকা ও ফ্রান্সের নিকট ধার চাওয়া হইল, তাহারা আমল দিল না, কাজেই বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে হইল, অর্থাৎ যে-দেনা আইন অনুসারে সে স্বর্ণে দিতে বাধ্য এখন সে তাহা কাগজের নোটে দিবে।

বিলাতে কাহারও কাহারও ধারণা যে, স্বর্ণমান পরিত্যাগ এক প্রকারে শাপে বর হইয়াছে,কেন-না,ইহাতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে, আমদানি কমিবে আর মালের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া সকলেই লাভবান হইবে। ইতিমধ্যেই কোম্পানীর শেয়ার এবং অনেক মালের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এই ধারণা বলবতী হইয়াছে। যদি পাউণ্ডের দর প্রায় পাঁচ ডলার হইতে চার ডলারে নামিয়া যায় তাহা হইলে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী যদি আমেরিকার নিকট ১০০০ ডলারের মাল বিক্রয় করে তাহা হইলে পূর্ব্বে যেস্থলে সে ২০৬ পাউণ্ড পাইত সেস্থলে এখন সে ২৫০ পাউণ্ড পাইবে। সেইরূপ এখন আমেরিকার নিকট ১,০০০ ডলারের মাল খরিদ করিলে যদি পূর্ব্বে তাহার পড়তা পড়িত ২০৬ পাউণ্ড এখন পড়িবে ২৫০ পাউণ্ড। অর্থাৎ আমেরিকান মালের পড়তা বেশী পড়াতে সে ব্রিটিশ মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না—ফলে ইংলণ্ডে মালের আমদানি কমিয়া যাইবে। ইহার আর একটা দিকও আছে। ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী এবং কার-খানার মালিকগণ যাহাদের নিকট অনেক মাল মজুত আছে তাহারা সাময়িকভাবে যে লাভবান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইংলণ্ডকে প্রতি বৎসর প্রায় সত্তর কোটি পাউণ্ডের কাঁচা মাল এবং খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। তাহার মুদ্রার মূল্য স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রার তুলনায় শতকরা পঁচিশ টাকা হ্রাস হওয়াতে পূর্ব্বে যে-মাল সে এক পাউণ্ডে পাইত এখন সেস্থলে তাহাকে ১ পাউণ্ড ৫ শিলিং দিতে হইবে। কাঁচা মালের দর বাড়িলে তৈয়ারি মালের দরও বাড়িবে এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে জীবিকানির্ব্বাহের খরচ বাড়িবে। যদিও মজুরের মজুরি প্রকাশ্যভাবে কমান হইল না, তথাপি প্রত্যেক জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় প্রকারান্তরে তাহার আয়ই কমিয়া গেল। মোট কথা এই, যে-পর্য্যন্ত মালের চাহিদা না বাড়ে সে-পর্য্যন্ত মুদ্রা-বিনিময়ের হারের হ্রাস-বৃদ্ধিতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে না। আমাদের দেশে জিনিষপত্রের যে মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে বাস্তবিকপক্ষে তাহা মুদ্রার ঘাটতির মাপকাটি। স্বর্ণমান পরিত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে আমেরিকার কাঁচা মালের মূল্য তুলনা করিলে দেখা যায়, চিনি এবং রবার ছাড়া প্রায় প্রত্যেক জিনিষের মূল্য আরও কমিয়াছে, অর্থাৎ মালের চাহিদা, যাহার উপর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে তাহার কোন লক্ষণ এখন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না।

মন-ভোলান স্তোকবাক্য দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইতেছে যে, স্বর্ণমান পরিত্যাগ আমাদের মঙ্গল বই অমঙ্গলের কারণ নয়। ইহার অর্থ এই হয় যে, যখন আমরা দেনদারদের দেনা মিটাইতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া যাই তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হয়! সম্পত্তি গোপন করিয়া দেনদারদিগকে ঠকাইবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিলে ঐরূপ হইতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের মত কোন বড় দেশ সম্বন্ধে একথা কখনও খাটে না। ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের রাজনৈতিকগণ ষ্টারলিঙের মূল্য বাঁধিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, যদি ইহার ঘাটতি সৌভাগ্যের সোপান হয় তবে তাঁহারা কেন ঐরূপ করিবেন?

এখন দেখা যাক্ ইংলণ্ডের স্বর্ণমান পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বর্ণমান পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তা ছিল কি না। প্রথমতঃ, যে-ভাবে এই কার্য্য করা হইল তাহা ভাবিবার বিষয়। সেক্রেটারী অফ ষ্টেট ফর্ ইণ্ডিয়া, স্যর স্যামুয়েল হোর ভারত-সরকার অথবা এসেম্বলীর মেম্বরদের মতামত গ্রহণ না করিয়াই ইস্তাহার জারি করিয়া দিলেন যে, ভারত-সরকারের টাকার পরিবর্ত্তে যে ষ্টারলিং অথবা স্বর্ণ দেওয়ার বাধকতা ছিল তাহা অদ্য হইতে রদ হইল। এসেম্বলীর মেম্বরগণ যখন এই বিষয়ে আলোচনা করিতে চাহিলেন তখন বড়লাট হুকুম করিলেন যে, তাহা করিতে দেওয়া হইবে না। যদিও পরে আলোচনা হইয়াছিল এবং বেসরকারী প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের তীব্র প্রতিবাদ বহুমতে পাশ করিয়াছিলেন তথাপি ত্রিশ কোটি লোকের শুভাশুভ যাহার উপর নির্ভর করে এমন একটি প্রস্তাব—আমাদিগকে এমন কি জানাইবার অপেক্ষা না রাখিয়া আমাদের ভাগ্য-বিধাতারা বিলাতে বসিয়া তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমাদের স্বার্থ বলি দিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। ভারতের জনমতের মূল্য কি তাহার একটি চরম দৃষ্টান্ত। ইহার উত্তরে ইহা বলা হইয়াছে যে, কমন্স মহাসভার মতামত গ্রহণ না করিয়া বিলাতেও স্বর্ণমান পরিত্যাগ করা হইয়াছে, অতএব ভারতের ব্যবস্থা-পরিষদের মতামত গ্রহণ না করায় কোন অন্যায় করা হয় নাই। ইহা তর্কের কথা—যুক্তির কথা নয়, কেন-না ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল কমন্স মহাসভার প্রতিনিধি, এবং ইহাতে তিন দলের প্রতিনিধি থাকাতে তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিয়াই ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলে ভারতের কি কোন প্রতিনিধি আছেন প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তাঁহারা ভারতের মতামত জানিতে কি চেষ্টা করিয়াছিলেন, যদি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই কথার মূল্য কি?

১৯২৬ সালে যে কারেন্সী কমিশন বসিয়াছিল, তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে কোনও দেশ-বিশেষের মুদ্রা যদিও তাহা স্বর্ণের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত তথাপি তাহার সহিত ভারতের মুদ্রার হার বাঁধিয়া দিলে ভারতের পক্ষে তাহা বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে। এই কারণে ভারতের মুদ্রার বিনিময় ষ্টারলিঙের সহিত না বাঁধিয়া স্বর্ণের সহিত বাঁধিতে হইবে। কাজেই এখন ইহার বিপরীত কথা কহিলে, অর্থাৎ ষ্টারলিং বিনিময়ই ভারতের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর—বলিলে আমরা মানিব কেন? এ বিষয়ে তাঁহাদের মন্তব্য এতই সারবান যে, তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

"By an appropriate structure built on this foundation, the Indian system might be developed into a perfected sterling exchange standard, both automatic and elastic in its contraction and expansion, and efficient to secure stability. Such a system would involve the least possible holding of metallic reserves and would also be the most economical from the standpoint of the Indian tax-payers. But the system would have some defects. The silver currency would still be subject to the threat implied in a rise in the price of silver. Were sterling once more to be divorced from gold, the rupee, being linked to sterling, would suffer a similar divorce. Should

sterling become heavily depreciated, Indian prices would have to follow sterling prices to whatever heights the latter might soar, or, in the alternative, India would have to absorb some portion of such rise by raising her exchange. India has had the experience of both these alternatives and the evils resulting from these are fresh in her memory. We do not indeed regard the possibility of sterling again becoming divorced from gold as of much practical likelihood. It is unlikely to happen except in a world-wide catastrophe that would upset almost all currency systems. Nevertheless there is here a danger to be guarded against, which is real, however remote. There is undoubted disadvantage for India in dependence on the currency of a single country, however stable and firmly linked to gold. For these reasons, were the standard of India to be an exchange standard, it should undoubtedly be a gold exchange standard, and not a sterling exchange standard."

উপরে উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কারেন্সী কমিশন ভবিষ্যতে ভারতের মুদ্রা ষ্টারলিং কিংবা স্বর্ণের সহিত বাঁধা হইবে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যদি কখনও অর্থনৈতিক বিপ্লবের দরুণ ষ্টারলিঙের সহিত স্বর্ণের বন্ধন ঘুচিয়া যায় তাহা হইলে ভারতের মুদ্রা ষ্টারলিঙের ঘাটতি-বাড়তির উপর নির্ভর না করিয়া স্বর্ণের সহিত যুক্ত থাকিবে। কেন-না ষ্টারলিঙের সহিত স্বর্ণের বন্ধন ঘুচিয়া গেলে তাহার মূল্য ঘটিয়া প্রত্যেক মালপত্রের মূল্য সেই অনুপাতে বাড়িবে, এবং যদি আমাদের মুদ্রা ষ্টারলিঙের সহিত যুক্ত থাকে তাহা হইলে এদেশেও জিনিষপত্রের মূল্য মহার্ঘ হইবে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া আপিসে স্যর হেনরি ষ্ট্রেক্‌স্ এবং গোল টেবিল বৈঠকের কয়েকজন প্রতিনিধির মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে সরকারী নীতির সপক্ষে যে-যুক্তি অবতারণা করা হইয়াছিল তাহা আমাদের নিকট ন্যায্য বলিয়া মনে হয় না। স্যর হেনরী ষ্ট্রেক্‌স্ বলেন যে, ভারত তিন পন্থা অবলম্বন করিতে পারিত:—(১) টাকার বিনিময়ের মূল্য স্বর্ণের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া, (২) টাকার বিনিময়ের মূল্য ষ্টারলিঙের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া, এবং (৩) কোন বন্ধনে আবদ্ধ না করিয়া টাকাকে নিজের মূল্যের উপর প্রতিষ্ঠা করা। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যেহেতু বহুবর্ষব্যাপী শিল্পবাণিজ্যের মন্দার দরুণ আন্তর্জাতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে এবং যেহেতু ইংলণ্ডর বিদেশে তাহা প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে পারে নাই, অধিকন্তু তাহার দেয় টাকা দিতে গিয়া রাজকোষ প্রায় উজাড় করিয়া ফেলিয়াছে, সেই হেতু সে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে! অতএব যে-স্থলে ধনী এবং শক্তিশালী ইংলণ্ডকেই এইরূপ করিতে হইল সে-স্থলে ভারতের পক্ষে সেইরূপ করা অবশ্যম্ভাবী। যদি বল ইংলণ্ড ষ্টারলিঙের হার না বাঁধিয়াও বেশ চলিতে পারিল আর ভারতই বা কেন পারিবে না, তাহার উত্তরে তিনি বলেন যে, গ্রেট ব্রিটেন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় মহাজন, দেশবিদেশে তাহার বিপুল অর্থ খাটিতেছে, বিদেশে তাহার প্রায় কোন ধার নাই। অন্যপক্ষে ভারতের টাকা বিদেশে খাটে না, আমরা দেনদার, ইংলণ্ডের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। অর্থাৎ যদি টাকা ষ্টারলিঙের সহিত যুক্ত না হয় তাহা হইলে ব্রিটিশ মহাজনদের লোকসান হইবার সম্ভাবনা! ভারতের যে অবস্থা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ১৯২৬ সালে যখন কারেন্সী কমিশন বসিয়াছিল তখনও তাহাই ছিল, তবে কি বলিব যে, এই মোটা কথাটা তাহাদের স্মরণ ছিল না? আসল কথা এই যে, কারেন্সী কমিশনের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ভারত-সরকার স্বর্ণসম্পত্তি এত মজুত করিবেন যে ভবিষ্যতে যে-কোন অবস্থায় আমাদের মুদ্রা স্বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে। তাহাই হইত, যদি না নিজেদের সুবিধার জন্য গত কয় বৎসর যাবৎ এক্সচেঞ্জ

১ শিলিং ৬ পেনিতে আবদ্ধ রাখিবার জন্য ভারতের স্বর্ণ উজাড় করিয়া না দেওয়া হইত। তাহাদের সুবিধার জন্য, আমাদের আর্থিক অবস্থার অশেষ ক্ষতি করিয়া রাজকোষের বেশীর ভাগ স্বর্ণ উজাড় করিয়া এখন বলা হইতেছে যে, যখন ব্রিটেনই স্বর্ণমান বজায় রাখিতে পারিল না, তখন তোমরা পারিবে কি করিয়া। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কারেন্সী রিজার্ভে ৬৮ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ সম্পত্তি (gold resources) মজুত ছিল ; এক্সচেঞ্জের বিপাকে পড়িয়া তাহা আজ ৫ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। ইহার জন্য কে দায়ী তাহা কি এখনও বলিতে হইবে ?

আর এক কথা, যেমন ভারত ইংলণ্ডের নিকট ঋণী, তেমন ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাও ইংলণ্ডের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী, তাহা হইলে তাহারাই বা কেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিল না ? কারণ কি ইহাই নহে যে, তাহাদের শাসনের উপর ইংলণ্ডের কোন হাত নাই। আমাদের মুদ্রা ষ্টারলিঙের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করায় ইংলণ্ডের সুবিধা কি তাহা দেখা যাক্‌। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইংলণ্ডের পক্ষে অন্য দেশে ব্যবসা করা কঠিন হইয়াছে, এই অবস্থায় ভারতের বাজার তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ ভারত তাহার কাঁচা মালের একটি প্রধান আড়ত, সেগুলি আবার পাকা মালে রূপান্তরিত করিয়া ভারতের মোকামে মোকামে বিক্রয় করিতে পারিলেই তবে সে লাভবান হইতে পারে। আমাদের মুদ্রা ষ্টারলিঙের সহিত যুক্ত হইলে, কাঁচা মাল পূর্ব্বের মত সহজে এবং পূর্ণমাত্রায় বিলাতে চালান হইতে পারিবে। অধিকন্তু অন্যান্য দেশে এখনও স্বর্ণমান প্রচলিত থাকায়, সে দেশের মালের মূল্য এদেশে প্রায় শতকরা ২৫ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ আমাদের মুদ্রা ষ্টারলিঙের সহিত যুক্ত থাকায়, সেই অনুপাতে ব্রিটিশ মালের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার ফলে তাহাদের যে-সব প্রতিযোগী আছে—যেমন, জাপান—তাহারা ভারতে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। বিদেশী মালের দর অসম্ভব বৃদ্ধি পাইলে বাধ্য হইয়া আমরা বিলাতি জিনিষ কিনিব। ইহাই হইল তাহাদের মনের কথা এবং এইজন্যই স্যর স্যামুয়েল হোর রাতারাতি আমাদের মুদ্রা ষ্টারলিঙের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিলেন। হইতে পারে যে আমাদের যে-অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে টাকাকে ষ্টারলিঙের সঙ্গে যুক্ত করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না, কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, এই অবস্থা হওয়ার কারণ এক্সচেঞ্জ হার বজায় রাখিবার জন্য আমাদের স্বর্ণের অপচয়। ইংলণ্ডের সুবিধা আর আমাদের সুবিধা এক নয়, বরং যাহাতে অধিকাংশ স্থলে তাহাদের লাভ তাহাতে আমাদের লোকসানই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অর্থ-নৈতিক রক্ষাকবচ, যাহার জন্য ব্রিটিশ ব্যবসায়িগণ এবং আমলাতন্ত্র উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহা যদি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদের অশেষ অকল্যাণ হইবে। গোল টেবিল বৈঠকে safe-guards কি কি রাখা হইবে তাহা ব্রিটিশ সরকার এখনও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, তবে স্যর জন্‌ সাইমন, স্যর স্যামুয়েল হোর প্রমুখ নেতাগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান করা কঠিন নয় যে শতাব্দীব্যাপী যে-সব সুখ-সুবিধা তাহারা ভোগ করিয়াছেন সেগুলি সংরক্ষণের জন্য ভবিষ্যৎ শাসন-বিধিতে এমন সব আটঘাট রাখিবেন যে, নামে যাহাই হউক কার্য্যতঃ আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিব। অর্থনৈতিক দায়িত্ব স্বায়ত্তশাসনের মূলমন্ত্র, যদি সে দায়িত্ব হইতে আমরা বঞ্চিত হই তাহা হইলে রাজনৈতিক অধিকারের মূল্য কি ? যদি ব্রিটিশ বাণিজ্য পূর্ব্বের ন্যায় শোষণ নীতি বজায় রাখে তাহাতে দেশের কি উপকার হইবে ? আমরা চাই স্বদেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে, আমরা চাই ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে। যতদিন অর্থনৈতিক অধিকার আমাদের হাতে না আসিবে, যতদিন আমরা আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা করিতে না পারিব ততদিন আমাদের আর্থিক উন্নতির কোন আশা নাই। কাজেই গোল টেবিল বৈঠকের গবেষণার ফলে আমাদের "স্বার্থ" সংরক্ষণের জন্য যদি

ব্রিটিশ সরকার বজ্র আঁটন আঁটিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা সুনিশ্চিত যে, ভারত তাহা মানিবে না। আমাদের ভাল-মন্দের ভার তাহাদের হাতে তুলিয়া অনেক সময় আমাদের কি অবস্থায় পড়িতে হয় তাহা স্বর্ণমান পরিত্যাগ প্রসঙ্গে আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক শ্রীজ্ঞানেশ্বর

(১২৭৫—১২৯৬ খৃষ্টাব্দ)

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

(১)

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী—এই পাঁচ শত বৎসর কালকে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের 'অভ্যুদয় যোগ' বলা যাইতে পারে। এই পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে মহারাষ্ট্র প্রদেশে ন্যূনপক্ষে এমন পঞ্চাশ জন সাধু ভকতের আবির্ভাব হয় যাঁহাদের সাধনা ও পুণ্য চরিত্রের প্রভাবে মহারাষ্ট্রের জাতীয় জীবন অপূর্ব্বশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন নারী, কেহ কেহ ছিলেন হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত মুসলমান, প্রায় অর্দ্ধেক ছিলেন ব্রাহ্মণ আর অবশিষ্ট ভকতগণ নানা অন্ত্যজ সম্প্রদায় হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ দরজী, কেহ মালী, কেহ কুমার, কেহ সোনার, কেহ অনুতপ্ত বারবনিতা, কেহ ক্রীতদাসী এবং কেহ-বা ছিলেন অস্পৃশ্য মহার।

এই মহারাষ্ট্র ভকতগণের মধ্যে প্রাচীনতম হইলেন জ্ঞানেশ্বর। ঐতিহাসিক উপকরণের অসদ্ভাবহেতু জ্ঞানেশ্বরের জীবন-কাহিনী কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্ব, দিব্য সাধনাও অনাবিল ঈশ্বরপ্রেম সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের সমক্ষে জাগ্রত জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে যখন আমরা তাঁহার 'জ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতার অনুপম ভাষা টীকাটি পাঠ করি। রাণাডে মহোদয় বলেন, "এক তুকারামকে বাদ দিলে সমস্ত মার্হাট্টা সাধুদিগের মধ্যে জ্ঞানেশ্বরের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ জ্ঞানেশ্বরের জীবন-কাহিনীর সহিত তেমন ভাবে পরিচিত না হইলেও আজিও তাহারা পণ্ঢরপুরের সুপ্রসিদ্ধ বিঠোবার মন্দির অভিমুখে যাত্রাকালে "জ্ঞানো বা তুকারাম," "জ্ঞানো বা তুকারাম" বলিয়া মহারাষ্ট্রের উক্ত দুইজন শ্রেষ্ঠ ভকতের নামকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। তুকারাম সপ্তদশ শতাব্দী ও জ্ঞানেশ্বর ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইলেন নামদেব (চতুর্দ্দশ শতাব্দী)। জ্ঞানেশ্বর, নামদেব ও তুকারাম—এই তিন ব্যক্তিকে মহারাষ্ট্রের সামাজিক ও কার্ম্মিক অভ্যুদয়ের প্রবর্ত্তকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(২)

দাক্ষিণাত্যের যদু-বংশীয় শেষ স্বাধীন নৃপতি শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে জ্ঞানেশ্বরের আবির্ভাব হয়। তদীয় গীতার মারাঠী টীকার শেষে যে ভণিতা আছে তাহাতে তিনি এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

"কলিযুগে মহারাষ্ট্র দেশে, গোদাবরীর দক্ষিণতীরে, ত্রিভুবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র পঞ্চক্রোশ ক্ষেত্র আছে; সেখানে এই জগতের জীবনসূত্র-স্বরূপিণী মহালয়া বিরাজমানা। সেখানে যদুবংশ-বিলাস, সকল কলা নিবাস, ন্যায়ের সংরক্ষক শ্রীরামচন্দ্র নামক নৃপতি রাজত্ব করেন। সেখানে মহেশান্বয়-সম্ভূত নিবৃত্তিনাথের শিষ্য জ্ঞানদেব গীতাকে ভাষার অলঙ্কার পরিধান করাইয়াছিলেন।"*

* ঐসেঁ যুগীঁ পরি কলীঁ। আনি মহারাষ্ট্র মণ্ডলীঁ।
শ্রীগোদাবরী চ্যাকূলীঁ। দক্ষিণলীঁ॥ ১॥
ত্রিভুবনৈক পবিত্র। অনাদি পঞ্চক্রোশক্ষেত্র।
জেথ জগাচেঁ জীবনসূত্র। শ্রীমহালয়া অসে॥ ২॥
তেথ যদুবংশ বিলাস। জো সকল কলানিবাস।
ন্যায়াতেঁ পোষী ক্ষিতীশ। শ্রীরামচন্দ্র॥ ৩॥
তেথ মহেশান্বয় সম্ভূতেঁ। শ্রীনিবৃত্তিনাথ সুতেঁ।
কেলেঁ জ্ঞানদেবেঁ গীতেঁ। দেশীকার লেণেঁ॥ ৪॥

এই গ্রন্থ ১২১২ শকে অর্থাৎ ১২৯০ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। আমরা ইতিহাস হইতেও অবগত হই, এই সময় দেবগিরিতে যদু-বংশীয় রামচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন (১২৭১—১৩০৯ খৃষ্টাব্দ)। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারতে মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। জ্ঞানেশ্বর ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৯৬ খৃষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর, অর্থাৎ আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের দুই বৎসর পরে, দেহত্যাগ করেন।

(৩)

জ্ঞানেশ্বরের * পিতা বিট্‌ঠল পন্ত পণ্ঢরপুরের বিঠোবাদেবের পরমভক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভিতর ধর্ম্মভাব খুব প্রবল ছিল। পিতামাতা অল্পবয়সে ছেলের বিবাহ দিলেন, কিন্তু বিট্‌ঠল পন্তের মতিগতি ফিরিল না। পিতামাতার কাল হইলে শ্বশুরের আগ্রহাতিশয্যে বিট্‌ঠল পন্ত স্ত্রী রুক্মাবাঈকে লইয়া পুণার বারো মাইল উত্তরে আলন্দীতে শ্বশুরালয়েই বাস করিতে থাকেন। বিট্‌ঠল পন্ত সংসারের প্রতি ক্রমশঃ বীতরাগ হইতে লাগিলেন। বিবাহিত হইলে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে সন্ন্যাসগ্রহণ নিষিদ্ধ, এই কারণে তিনি বারংবার পত্নীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নিঃসন্তান রুক্মাবাঈ কিছুতেই স্বীয় স্বামীকে প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি দিলেন না। এরূপ কথিত আছে, একদিন পত্নী যখন কার্য্যান্তরে উন্মনা ছিলেন সে সময় বিট্‌ঠল পন্ত তাঁহাকে বলিলেন, আমি গঙ্গায় যাই।" পত্নী অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, যাও। তিনি ইহাকেই অনুমতি বলিয়া ধরিয়া লইয়া বরাবর কাশী চলিয়া আসিলেন এবং সেখানে বিবাহাদিঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়া স্বামীপদ্যাতেশ্বরজীর † নিকট সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন এবং চৈতন্যাশ্রম নামে পরিচিত হন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি গুরুর প্রীতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার একান্ত অনুগ্রহভাজন হইলেন।

স্বামী পদ্যাতেশ্বরজী তাঁহাকে মঠের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তীর্থভ্রমণব্যপদেশে বহির্গত হন। রামেশ্বরের পথে তিনি আলন্দী গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথাকার এক পিপ্পল বৃক্ষের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রামের নরনারী সাধু সন্দর্শনে আসিয়া নানারূপ বর প্রার্থনা করিতে লাগিল। একটি রমণীকে "পুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে রমণীটি শিহরিয়া উঠিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন—বহুদিন হইল তাঁহার স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। স্বামী পদ্যাতেশ্বরজী বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রিয় শিষ্য চৈতন্যাশ্রমই এই রমণীর স্বামী। শিষ্যের কপটতায় স্বামিজী অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং চৈতন্যাশ্রমকে তিরস্কার করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের আদেশ দিলেন। সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে পুনরায় প্রবেশ করিতে হইল।

একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুনরায় গৃহী হওয়া অত্যন্ত দূষণীয়। বিট্‌ঠল পন্তকে প্রতিবেশী-দিগের হস্তে বড়ই নির্যাতন ভোগ করিতে হইল। সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দুর্ব্বহ বোঝা মাথায় করিয়া দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে বিট্‌ঠল পন্ত জীবনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মিল। ছেলে তিনটির নাম নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানেশ্বর ও সোপানদেব। মেয়েটির নাম মুক্তা বাঈ।

ক্রমে ক্রমে ছেলেদের উপনয়নের বয়স হইল। বিট্‌ঠল পন্ত বহুচেষ্টা করিয়াও পুরোহিত সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত 'দেহান্ত'। বিট্‌ঠল পন্ত সর্ব্বত্র প্রত্যাখ্যাত হইয়া এবং সমাজের নির্ম্মমতায় একান্ত ব্যথিত হইয়া ঐ প্রায়শ্চিত্তই স্বীকারপূর্ব্বক সস্ত্রীক ত্রিবেণী-গর্ভে প্রবেশ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন। এই সময় নিবৃত্তিনাথের বয়স মাত্র দশ। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব সকল সম্পত্তি গ্রাস করিয়া তাহাদিগকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিল। পিতৃমাতৃহীন চারিটি অনাথ বালক-বালিকা জীবিকার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হইল।

---

* তিনি জ্ঞানদেব নামেও পরিচিত।

† কাহারও কাহারও মতে স্বামী রামানন্দ

পিতার আদর্শ ও উপদেশে তিন পুত্র ও কন্যা স্ব স্ব জীবন গড়িয়া তুলিতেছিল। ইহারা সকলেই শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্ম্মজ্ঞানে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ নিবৃত্তিনাথ সপ্তম বর্ষ বয়সেই নাসিকের নিকটবর্ত্তী ত্র্যম্বকেশ্বরে গৈনীনাথ নামক এক সাধুর নিকট দীক্ষালাভ করিয়া যোগসাধন করিতে আরম্ভ করেন। জ্ঞানেশ্বর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পিতামাতার শোচনীয় মৃত্যুতে নিবৃত্তিনাথ উপনয়ন গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন—"আমি পবিত্রতা-স্বরূপ, উপনয়নে আমার কি প্রয়োজন?" জ্ঞানেশ্বর সমাজধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি উপনয়ন গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আলন্দীর ব্রাহ্মণেরা বলিল, তোমরা যদি পৈঠনে যাইয়া সেখান হইতে শুদ্ধিপত্র লইতে পার তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে পুনরায় জাতিতে উঠাইব। পৈঠনের ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ সম্মত হইল না। পরে জ্ঞানেশ্বরের অনুষ্ঠিত কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়ায় তাঁহাকে অলৌকিক শক্তিধর মনে করিয়া তাঁহাদের উপনয়নে সম্মতি দিল।

প্রবাদ এই যে, জ্ঞানেশ্বর যোগশক্তি-প্রভাবে একটি বৃষকে দিয়া বেদপাঠ করাইয়াছিলেন, এবং শ্রাদ্ধকালে পিতৃপুরুষগণকে মূর্ত্তিমান করিয়া সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইয়াছিলেন।

বেদান্ত-চর্চ্চা, কীর্ত্তন, পুরাণপাঠ ও ভজনাদিতে তাঁহাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল, জ্ঞানেশ্বরের গভীর ধর্ম্মানুরাগে অনেক লোক তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল, তিনি তাহাদের শিক্ষার জন্য 'নেভস' নামক স্থানে (আহাম্মদনগর জিলার অন্তর্ভুক্ত) "ভাবার্থদীপিকা" নামে গীতার এক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, এই ব্যাখ্যাই "জ্ঞানেশ্বরী" নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। জ্ঞানেশ্বর নেভসের মন্দিরে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে ভাবাবেশে গীতার ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন, আর তাঁহার প্রিয় শিষ্য সচ্চিদানন্দ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।

এইভাবে গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র ১৫। জ্ঞানেশ্বর এই গ্রন্থদ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, অতুলনীয় কবিত্বের সহিত দার্শনিকতার অপূর্ব্ব সমাবেশে 'জ্ঞানেশ্বরী' মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মহাকবি দান্তে ইতালীয় ভাষার জন্য যাহা করিয়াছিলেন জ্ঞানেশ্বর মারাঠী ভাষার জন্য তাহা করিয়া গিয়াছেন। রাণাডে মহোদয় বলেন, "মারাঠীতে যাহা কিছু শোভাসম্পদ ঐশ্বর্য্য —এই সবই জ্ঞানেশ্বরের দান। মারাঠী ভাষার ভিতরে কতটুকু গভীরতা, কতটুকু তাৎপর্য্য নিহিত আছে উপলব্ধি করিতে হইলে জ্ঞানেশ্বরী পড়িতে হইবে।"

'ভাবার্থদীপিকা'র পরে জ্ঞানেশ্বর 'অমৃতানুভব' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুইখানি গ্রন্থদ্বারা জ্ঞানেশ্বর সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া উঠিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি কতকগুলি পদ ও অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর জ্ঞানেশ্বর মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য এক ভক্ত বাহিনী গঠন করিতে প্রয়াসী হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ, ভগিনী, অনেক বন্ধু ও শিষ্য এই দলে যোগদান করিল। স্বর্ণকার নরহরি, কুম্ভকার গোরা, মালী সবং প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভক্তি সাধনার এত উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন যে, মহারাষ্ট্রের গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের নামগ্রহণ করিয়া থাকেন।

পণ্ঢরপুরে জ্ঞানেশ্বর পরিচালিত ভক্তবাহিনীর সহিত প্রভু বিঠোবার পরমভক্ত নামদেব আসিয়া সম্মিলিত হন। নামদেবের পিতা দরজীর কাজ করিতেন। নামদেব ও জ্ঞানেশ্বরের প্রচারের ফলে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে এক অভূতপূর্ব্ব ভক্তির বন্যা বহিতে লাগিল।

তীর্থভ্রমণ-ব্যপদেশে জ্ঞানেশ্বর যে-সময় বারাণসীধামে উপনীত হন সে সময় সেখানে মুদ্গলাচার্য্য নামক এক সাধুপুরুষ এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। ঐ উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ সমবেত হইলেন। কাহাকে অগ্রপূজার সম্মান দেওয়া যায় এই লইয়া তুমুল তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইল। পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, একটি হস্তিনীর শুঁড়ে পুষ্পমাল্য জড়াইয়া দেওয়া হউক। হস্তিনী স্বেচ্ছায় যাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিবে তিনিই অগ্রপূজার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। হস্তিনী জ্ঞানেশ্বরের কণ্ঠেই ঐ মালা

পরাইয়া দিল, সুতরাং তিনিই এই সম্মানভাজন হইলেন। কাশীর বিশ্বেশ্বর তাঁহারই হাতে যজ্ঞের পুরোভাগ গ্রহণ করিলেন।

তৎপর জ্ঞানেশ্বর উত্তর-ভারতের সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়া মারবাড় হইয়া পণ্ঢরপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীবিট্‌ঠলের দর্শন লইয়া ভ্রাতা ভগ্নী সমেত আলন্দীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত আলন্দীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তীর্থপর্য্যটনে তাঁহাদের কত বৎসর লাগিয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে অনুমান হয় তিন চারি বৎসর লাগিয়া থাকিবে। তাঁহারা কেহই বিবাহ করেন নাই। ভগবানের নাম-কীর্ত্তন ও জীবসেবাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন।

জ্ঞানেশ্বরের সম্বন্ধে এই সময়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। চঙ্গদেব নামে এক যোগসিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানেশ্বরের শক্তিপরীক্ষার জন্য এক ভীষণ ব্যাঘ্রে আরোহণ করিয়া তাহাকে সর্পের দ্বারা কষাবাত করিতে করিতে আলন্দীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানেশ্বরও তাঁহার দৈবশক্তিবলে এক প্রকাণ্ড দেওয়ালে চড়িয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। চঙ্গদেব জ্ঞানেশ্বরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

১২৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর, অর্থাৎ আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের দুই বৎসর পরে, জ্ঞানেশ্বর দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র বাইশ বৎসর। তাঁহার দেহত্যাগের এক বৎসরের মধ্যেই ভগিনী ও ভ্রাতারা মৃত্যুর কবলিত হন।

প্রবাদ এই যে, জ্ঞানেশ্বর জীবিত সমাধি লইয়াছিলেন। ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে তিনি একটি গুহা তৈয়ার করেন। সেখানে কার্ত্তিকী একাদশীতে অনেক সাধু মিলিয়া খুব ভজন কীর্ত্তন করেন। দ্বাদশীতে পারণ হয়। ত্রয়োদশীতে জ্ঞানেশ্বর তুলসীপত্র ও বিল্বপত্রের আসন প্রস্তুত করিয়া সমাধিতে বসিবার জন্য প্রস্তুত হন। অন্যান্য সাধুরা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে পর তিনি সমাধিস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া সব সাধুদের জয়ধ্বনির মধ্যে গুহার ভিতর প্রবেশ করেন। শ্রীনিবৃত্তিনাথ হাতে ধরিয়া তাঁহাকে আসনে বসাইলেন। শ্রীজ্ঞানেশ্বর চক্ষু নিমীলিত করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা বিশ্বাস করেন শ্রীজ্ঞানেশ্বরের সমাধি নিত্য, তাঁহার স্ফূর্ত্তি সদাজাগ্রত এবং জনগণকে সত্যমার্গে প্রবৃত্তি দিতে সতত সমর্থ।

(৪)

আমরা শ্রীজ্ঞানেশ্বরের বহির্জ্জীবনের ঘটনা-পরম্পরা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের ক্রমবিকাশ, অন্তর-রাজ্যের দ্বন্দ্বসংঘাতের কোনো বিবরণই পাওয়া যায় না। তাঁহার সহিত কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার সংযোগ দেখা যায়; তাহার দুই-একটা আমরা জীবন-কথায় যথাস্থলে বিবৃত করিয়াছি। যুক্তিবাদী সমালোচকের নিকট অতিপ্রাকৃত ঘটনার কোনো মূল্য নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই কিশোর সাধক যে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে জ্ঞানেশ্বরীর মত অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অতিপ্রাকৃত ঘটনা। কিশোর জ্ঞানেশ্বর সাধনার দিব্য আলোকের দ্বারা সমগ্র মহারাষ্ট্রকে ছয় শতাব্দী যাবৎ উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; মহারাষ্ট্রের অন্তররাজ্য জয় করিয়া তাহাতে প্রভু বিঠোবার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতে পণ্ঢরপুর মহারাষ্ট্রের অধ্যাত্মজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। যে-সময় শাস্ত্রজ্ঞান শুধু পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সে সময় শ্রীজ্ঞানেশ্বর মাতৃভাষার ভিতর দিয়া বেদের গভীর সত্যসমূহ আপামর-সাধারণের ভিতর ছড়াইয়া দেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করের অনুবর্ত্তী এবং স্বয়ং যোগসিদ্ধ হইয়াও তিনি সমাধির আনন্দকে উপেক্ষা করিয়া লোকহিতার্থ কর্ম্মস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানবাদী হইলেও ভক্তি ও কর্ম্মের প্রয়োজন অস্বীকার করেন নাই। তিনি যে ধর্ম্ম-আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা হেতু পরবর্ত্তী দুই শতাব্দী যাবৎ উহার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইলেও একনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঐ আন্দোলন বিশেষ শক্তিলাভ করে এবং মহারাষ্ট্রের দূরতম প্রান্তেও উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই

ধর্ম্মের জাগরণ হইতেই রাষ্ট্রীয় জাগরণের সূত্রপাত হয়। মহারাষ্ট্রে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার গৌরব শিবাজী ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের প্রাপ্য হইলেও এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, যে জাতীয়তাবোধ হইতে মহারাষ্ট্রে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল, মহারাষ্ট্র ভক্তগণের ধর্ম্ম-আন্দোলনেই তাহা পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

(৫)

মারাঠী ভাষা এই মহারাষ্ট্রীয় ভকতগণের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। মারাঠী সাহিত্যের ভিতর বর্ত্তমানে যে শক্তি সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি নিহিত, তাহা ইঁহাদিগেরই একাগ্র সাধনার ফল। পণ্ডিত-সমাজে ভাষা সাহিত্যের আদর ছিল না। পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে সরকারী দপ্তর হইতেও ইহার নির্ব্বাসন হয়। পণ্ডিত ও রাজসভা হইতে প্রত্যাখ্যাত হইলেও ভাষালক্ষ্মী মহারাষ্ট্রীয় ভকতগণের নিকট হইতে সাদর অভ্যর্থনা পাইলেন এবং তাঁহাদেরই সেবাযত্নে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া অচিরে স্বকীয় মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন। ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতসমাজও ইহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন এবং মাতৃভাষার ভিতর দিয়া কবিযশপ্রার্থী হইয়া ইহার যথাযথ অনুশীলন করিতে লাগিলেন। এই সকল মহারাষ্ট্রীয় ভক্তগণ প্রচুর রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার অতি সামান্য অংশই আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একা নামদেবই ছিয়ানব্বই কোটি অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল মহারাষ্ট্রীয় ভকতগণের রচনাবলীতে পুনরুক্তি, অসামঞ্জস্য প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষ থাকিলেও রচনার সর্ব্বত্র যে একটা সাবলীল ছন্দ, আন্তরিকতা ও ভাবোন্মাদনা ওতপ্রোত হইয়া আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ইঁহাদের রচনাবলীকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) বেদান্ত ব্যাখ্যা—জ্ঞানেশ্বরের অমৃতানুভব, একনাথের ভাগবৎ প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনার অন্তর্গত। এ সব গ্রন্থই কবিতায় লিখিত।

(২) ধর্ম্মসঙ্গীত—ইহারা সংস্কৃত অনুষ্টুপের অনুকরণে 'অভঙ্গ' ছন্দে রচিত।

(৩) নীতিমূলক রচনা—এ সকলও অভঙ্গ ছন্দে রচিত।

(৪) রামায়ণ ও মহাভারতীয় রচনা—এ সকল নানা-ছন্দে রচিত। শ্রীধর, মুক্তেশ্বর, মোরোপন্থ এই প্রকার রচনায় অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

(৬)

জ্ঞানেশ্বরের সময় পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয় নাই। উত্তর-ভারতের বহুস্থান কিন্তু ইতিমধ্যেই দেশ ও ধর্ম্মরক্ষার্থ সমবেত ভারতবাসীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে মুসলমান আক্রমণের গতিবেগ উত্তর-ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া মহারাষ্ট্র প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মুসলমান একহাতে অসি ও অপর হাতে কোরাণ লইয়া অগ্রসর হইল। জাতিকে ধর্ম্মগত ও রাষ্ট্রীয় এই দ্বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তৎকালীন রাষ্ট্রনেতাদের অক্ষমতা হেতু আক্রমণকারীরা সহজেই নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু ধর্ম্মের ক্ষেত্র তাহারা এত সহজে অধিকার করিয়া লইতে পারিল না। যদিও এই সময় মহারাষ্ট্র নানাপ্রকার ধার্ম্মিক ও দার্শনিক সম্প্রদায়ে বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ সঙ্ঘর্ষের ফলে পরধর্ম্মের প্রবেশপথ অনেকটা উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি এই সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, উদার মতাবলম্বী এমন কয়েকজন ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল যাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান সম্প্রদায়গুলির ভিতর সমন্বয়ের বাণী প্রচারের দ্বারা সেগুলিকে ধর্ম্ম-ভ্রাতৃত্বের একতা সূত্রে গ্রথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহারা ঘোষণা করিতে লাগিলেন,—শিব বড়, কি বিষ্ণু বড়, অদ্বৈতমত সত্য, কি দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মত সত্য এ লইয়া ঝগড়া-বিবাদের সময় এখন আর নাই। তোমার যে দেবতাকে ইচ্ছা পূজা কর, তুমি হিন্দু থাকিলেই হইল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে শিবাজী দক্ষিণ-ভারতে হিন্দুজাতির ভিতর রাষ্ট্রীয়

একতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই এ সকল মহারাষ্ট্রীয় ভকতগণ সমাজ ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে একতা সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রের এই ধর্ম্ম-আন্দোলনকে নিছক ধর্ম্মান্দোলন বলিয়া বুঝিলে ভুল করা হইবে।

এই ধর্ম্মোচ্ছ্বাস উৎসারিত হইয়াছিল জাতীয়তার মর্ম্মস্থল হইতে। রাষ্ট্রীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-প্রচারকগণের ভিতরেও জাতীয়তার ভাব ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। রামদাসের মধ্যে আমরা ধর্ম্ম ও জাতীয়তা—এই উভয়বিধ আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। তুকারাম এই জাতীয় আন্দোলনের স্রোতে রামদাসের মত নিজকে ভাসাইয়া না দিলেও ইহার প্রতি যে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শিবাজী যখন শিষ্যভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত, তিনি রামদাসের নাম করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম গুরুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই কথাগুলি মনে করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব এই আন্দোলনটি কেন সমন্বয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, কেন ব্রাহ্মণেরাই পৌরহিত্যের কাজে একাধিপত্য করিতেছিল এবং কেনই, বা আচার-অনুষ্ঠানগুলির খুঁটিনাটি তখনও বিশেষ গোঁড়ামির সহিত মানিয়া চলা হইতেছিল। মহারাষ্ট্রীয় ভকতগণ যে-কাজের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে জনসাধারণের ভিতর একটা জাগরণ আনয়ন এবং ঈশ্বরপ্রীতি ও ধর্ম্মপ্রীতির বনিয়াদের উপর জাতীয় একতা সংস্থাপন।

তাঁহারা অদ্ভুত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিতই একাজে লাগিয়াছিলেন এবং ইহাতে সাফল্যও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, তুকারাম, একনাথ ও রামদাস প্রমুখ ভকতগণের প্রচারের ফলেই মহারাষ্ট্র প্রদেশে মুসলমান ধর্ম্ম শিকড় গাড়িতে পারে নাই।

ফেরিওয়ালা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

গ্রীষ্মকালে জায়গায় জায়গায় যে-ইছামতী হেঁটে পার হ'তে হয়, বর্ষায় আবার তাকে দেখ্‌লে মনে মনে ভয় ক'রতে থাকে। তখন আবার খেয়াঘাটে পয়সা দিয়ে পারে যেতে হয়। মানুষের যেতে এক পয়সা, আসতে এক পয়সা। কিন্তু গরু গাধা ঘোড়া প্রভৃতি দু-আনা, গরুর গাড়ী, পাল্কী, ডুলি, আট আনা। এরই অজস্র বাঁকের একটার কোলে এই গাঁ খানা। দোষেগুণে মানুষের মত ঝোপে জঙ্গলে খানায়-ডোবায় ফসলে জিইয়ে বাঁচার মত কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে আছে।

তার নাম শয়লা। ভাল ক'রে অনুসন্ধান করলে বলে, কি জানি কি ছিল!—কেউ বলে, ওর নাম ছিল শ্যামা, কেউ বলে সতীশ, সত্য, এমনি সব। ওর বয়েস হবে বিশ-একুশ, কিন্তু ও নিজে বলে, পঁচিশ। ওর দেহখানা যেম্‌নি লম্বা, তেম্‌নি রোগা আর কালো।

সকালবেলা গুড়-তেঁতুল আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পান্তা খেয়ে ও চ্যাঙারী মাথায় বেরিয়ে পড়ে। কোঁচোড়ে চিঁড়ে বাতাসা বেঁধে নেয়, দুপুরের জলযোগের জন্যে।

ওর মত,—ভদ্দর পাড়ার খদ্দের কখন ভাল হয় না। কারণ তারা দরদস্তুর করে যত বেশী, জিনিষ কেনে তার চেয়ে ঢের কম। যাও বা কেনে, জোর ক'রে তার এমন দাম দেবে যে কিছু লাভ ত থাকেই না উল্টে লোকসান। তার উপর ধার! আজ দেব, কাল দেব—তাগাদা ক'রে ক'রে পায়ের তলা খইয়ে ফেল তবু সেই,—আজ নয়, কাল আসিস্! শুধু কি তাই, উঠোউঠি

তাগাদা করলে উল্টে চটে যায়। বলে—এমন ছোট-লোক ত দেখিনি, তাগাদার পর তাগাদা—ভারী আস্পদ্দা হয়েছে! কেন আমি কি চাল কেটে পালাচ্ছি যে খেতে-শুতে সময় দিবিনে, তাগাদা লাগিয়েচিস্। অভাবে অভাবে ছোটলোক ব্যাটাদের নজরও ছোট হয়ে গেছে। আটগণ্ডা পয়সা যেন লক্ষ্মীছাড়ার প্রাণ।

তাড়াতাড়ি দরজার মাথার উপর থেকে আড়াইটে পয়সা এনে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে,—নে রে ব্যাটা, কাবুলিঅলা, কিন্তু আর ছ'মাসের এদিকে কোনোদিন যদি তাগাদা দিতে এস তাহ'লে ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেব, হুঁ।

মনে মনে সেই আড়াইটে পয়সাকে নমস্কার ক'রে বলে,—হে মা লক্ষ্মী, তুমি ত অন্তর্যামিনী, সবই দেখ্‌তে পাও—ঐ ব্যাটা চণ্ডাল রাগিয়ে দিলে তাই না, পয়সা ছুঁড়ে দিলুম, অপরাধ নিও না মা।

শয়লা মুখনীচু ক'রে পয়সা কুড়িয়ে নেয়।

কিন্তু ছোটলোক যারা, চাষী বাগদী জোলা গয়লা,—অমন করে না। পয়সা থাকলে কেনে, নইলে দুপুর বেলা আস্‌তে বলে। তখন ঘরে কর্ত্তারা থাকে না, তাই ধানচাল ডিম দুধদই চিঁড়েমুড়ি গুড়, এমনি সব জিনিষের বদলে বেচাকেনা উভয় পক্ষের ভারি সুবিধে। তাই, শয়লা মনে মনে স্থির করেচে যে ভদ্রপল্লীর দিকে আর ঘেঁষবে না।

কাজেই ওকে তার বাইরে গিয়ে গলা ছাড়তে হয়—চাই বেলোয়ারী চুড়ি—চিরুণী, ঘুন্সী নেবে গো।

এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে আশপাশের দশ-বিশখানা গাঁয়ের সবাইকার সঙ্গে ওর অল্পবিস্তর আলাপ হ'য়ে গেছে।

তাই ও ডেকে জিজ্ঞাসা করে—ও কালোর মা, চুড়ি পরবে নি? চুলবাঁধার ভাল ফিতে আছে, নেবে না কি গো?

শয়লার গলার সাড়া পেলেই ছোট ছোট উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল ওর চ্যাঙারির পানে চেয়ে পিছন পিছন চলতে থাকে। ইচ্ছেটা,—চ্যাঙারি নামিয়ে বসলে ভিতরটা একবার দেখ্‌বে—কত কি রয়েচে।

গরিবের ঘরের বউয়ের হাতে কোনোদিনই একটা পয়সা পড়ে না, অথচ মনে মনে সাধও ত হয়, কাজেই শয়লাকে ডাকে। ও উঠনে চ্যাঙারি নামিয়ে বসে। ছেলেমেয়েগুলো হেঁট হয়ে উঁকি মারে। শয়লা চুপচাপ থেকেথেকে হঠাৎ খুব জোর একটা ধমক দিয়ে ওঠে। ওরা ভয়ে পিছিয়ে যায়, ছোটগুলোর মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে ওঠে। এই সামান্যতে ওদের এত ভয় পেতে দেখে শয়লার আমোদের আর শেষ থাকে না, তামাক-খাওয়া কালো ঠোঁটের ভিতর থেকে বড় বড় দাঁত বার ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে একেবারে কষিয়ে যায়। ওর মুখের হাসিতে ছেলেদের ভয় ভাঙে, আবার ওরা ঝুঁকে পড়ে চ্যাঙারির দিকে। চাষাবউরা হাত ভরে কাঁচের রং বে-রঙের চুড়ি পরে, তারপর পালি ক'রে ধান মেপে দেয়। চ্যাঙারির ভিতর থেকে একখানা কাপড় বার ক'রে শয়লা ধান বেঁধে নেয়। এমনি ক'রে ও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে।

দুপুরে একটা গাছতলায় বসে কোঁচড়ের গেরো খুলে চিঁড়ে বাতাসা খায়। পুকুরে নেমে দু-হাত দিয়ে জলের উপরকার ময়লা কাটিয়ে তার ফাঁক থেকে আঁজলা ভরে জল পান করে। তারপর চ্যাঙারি থেকে টিনের একটা কৌটো বার ক'রে তার থেকে গোটাকতক পান একসঙ্গে মুখে পূরে দেয়। হুঁকো বার ক'রে তাতে তামাক সেজে, এক টুকরো নারকেল ছোব্‌ড়া থেকে তার আঁস ছিঁড়ে নুটি পাকায়। তামাক টান্‌তে টান্‌তে ঝিমুনি আসে, তারপরেই চোখের পাতা জুড়ে আসে যেন। হুঁকোটা গাছের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে শয়লা গামছা পেতে গাছের ছায়াতেই শুয়ে পড়ে।

গায়ে রোদ্দুর লাগ্‌লে তবে ওর ঘুম ভাঙে। চ্যাঙারি মাথায় তুলে নিয়ে ও আবার চলতে সুরু করে। ও গানের মহাভক্ত। তার জন্যে ও নিজে অনেক চেষ্টাও করেছে, কষ্টও সইতে কখনও না করেনি। এদিকের ঝোঁকটা যেন ওর স্বভাবেরই অঙ্গ।

একবার ক'রে চীৎকার করে—চুড়ি পরবে গো, ও বোয়েরা। তারপরেই গান ধরে—'দীন—তারিণী তা-আ-রা-আ।' খানিকটা গেয়ে গানের সুরের টানের

সঙ্গে সঙ্গেই বলে, ভাল ভাল পট আছে—কেষ্টরাধার, শিবদুগ্‌গার, লক্ষ্মীনারায়ণের, জিব বার-করা শ্যামার,—ব'লে নিজের রসিকতায় নিজে ব্যাকুল হয়ে হেসে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে—'জাল গুটিয়ে নে মা শ্যা-আ-মা-আ—'

এমনি ক'রে হাঁকতে হাঁকতে সেদিন জোলাপাড়ায় প্রথম পা দিতেই কানে এল হারমনিয়মের তীব্র একটা আওয়াজ। ব্যবসার কথা ওর আর বিন্দুমাত্র স্মরণ রইল না; চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করতে লাগল, আওয়াজটা আসছে কোথা থেকে! তারপর এগিয়ে গিয়ে সোজা একেবারে হরি জোলার দাওয়ায় চড়ে বসল, একপাশে চ্যাঙারি নামিয়ে রেখে। হরির ছেলের সঙ্গে ওর বিশেষ আলাপ ছিল না, তবে মুখ-চেনা বটে। সে কি-একটা গৎ বাজাচ্ছিল। শয়লা ওর পাশে বসে পিঁড়িখানা কোলের উপর তুলে নিয়ে দু-হাতে পিটতে সুরু করলে। হরির ছেলে প্রথমটা কিছু বিস্মিত হ'ল, কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গৎ পেয়ে তার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কাজেই সঙ্গীত তৎক্ষণাৎ জলদে নাচতে লাগল। শয়লার কি মাথানাড়া! শমের মাথায় শেষ ক'রেই দু'জনে দু-জনের দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে হাসলে। তারপর আলাপ। কিন্তু আলাপ কি তখন জমে! শয়লার অন্তরের সঙ্গীত নেচে নেচে উঠেচে তখন। ও তাড়াতাড়ি হারমনিয়মটা টেনে নিয়ে পিঁড়িখানা ওর কোলে তুলে দিলে। তারপরেই সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল। চোখ বুজে, গলা ছেড়ে শয়লার চীৎকার—যেন তপস্যা, তা সে যন্ত্রের সুরে মিলুক আর নাই মিলুক, তাতে ওর বড়-একটা যায় আসে না। হরির ছেলে ওকে আর একটা গাইতে বললে। শয়লার গলাটা ওর ভারী ভাল লেগেছে। একখানা গাইতে বললে ও পাঁচখানা গায়। থামতে বললে, গানের মধ্যেই বাঁ-হাতখানা তুলে ঝাড়া দেয়।

তারপর তামাক খেতে খেতে গল্প হয়। শয়লা খোঁজ করে, হারমনিয়মটার দাম কত?

ওর অনেকদিন ইচ্ছে একটা হারমনিয়ম কেনবার, পয়সার অভাবে তা হ'তে পায় না। আবার গান হয়। শেষে সন্ধ্যা হয়ে আসে, শয়লার খিদে পায়। আবার পরের দিন আসবার আশা রেখে ও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

সেবারে রামপুরের মেলায় ও অনেক জিনিষপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সাতদিন ধরে মেলা, থিয়েটার যাত্রা বায়স্কোপ পুতুলনাচ—খুব জোর চলে। নানা দেশ থেকে নানা রকমের মানুষ আসে। হাজার হাজার লোক, খুব বিক্রি—কাজেই দর চড়াতে হয়, তাই কিছু মোটা রকমের লাভ থাকে। কিন্তু লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে,—কি রকম লাভ হ'ল রে? তার উত্তর আসে, আর কি সেদিন আছে রে ভাই, এখন কোনো রকমে খরচটা তুলে নেওয়া, আর কিছুই নেই। সবাইকার মুখেই এই কথা। কেউ ভুলেও বলে না, বেশ লাভ হয়েচে দু-পয়সা।

মেলাতে খুব বড়-একটা খাবারের দোকানের পাশে শয়লা জায়গা ক'রে নিয়ে দোকান পেতে বসল। খাবারের দোকানটায় চিঁড়ে মুড়কী বাতাসা দই চিনি, বেগুনী ফুলুরী আলুরদম, ডালপুরী নিমকি কচুরী সিঙাড়া, ত্রিবেগজা দুঃশীগজা চিনির কদমা, চিনির বাতাসা, গুড়ে জিলিপি বোঁদে—এমন সব নানা রকমের ভাল ভাল খাবার পর্ব্বতপ্রমাণ জড় করেছে। ওদের দশটা লোক ক্রমাগত খেটেও পেরে ওঠে না। এত বড় দোকান মেলায় সেবারে আর আসে নি। অন্য যা দু-একটা খাবারের দোকান পেতেছে তাহাদের সাধ্য কি ওদের সঙ্গে পাল্লা দেয়! বেশ ক'রে দোকান গুছিয়ে নিয়ে শয়লা বসল। ভাবে,—ভারি সুবিধে হয়েছে—খাওয়া-দাওয়ার জন্যে হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না, পাশেই অমন খাবারের দোকান। তা নইলে, একলা মানুষ, দোকান ফেলে অন্য জায়গায় খেতে যাওয়া, উঃ, কি মুস্কিলই হ'ত। এখন বিক্রিটা ভাল রকম হ'লেই ওর মনের বাসনা পূর্ণ হয়। ও মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে।

তারপর হুঁকো ক'লকে বার ক'রে তামাক সাজতে বসল। কলকেতে তামাক সাজিয়ে দিয়ে বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে আস্তে আস্তে একটু চাপে আর ভাবে, আগুন মিলবে কোথায়? হঠাৎ খাবারের দোকানের দিকে নজর পড়তে ওর মন বেজায় খুশী হয়ে উঠল। মনে ভাবলে

অতগুলো চুলোর ঐ গন্‌গনে আগুন, কি তামাকটাই খাব চৌপর দিন! আগুনের জন্যে উঠে ওদের উনুনের কাছে গেল। তামাক সেজে নিজে দুটান দিয়ে ওদের হুঁকোয় কলকে পরিয়ে দিয়ে বললে, টানো দাদা।—ব'লেই ফিক্ করে একটুখানি হাসি।

অত কাজের ভিড়ে তামাক সাজবার সময় ওদের হয় না, অথচ গলা শুকিয়ে আসে,—তাই হাতের কাছে সাজা তামাকটুকু পেয়ে গিয়ে ওরা শয়লার উপর ভারি খুশী হয়ে উঠল। শয়লা ভারি মিশুক, তাই ওদের সঙ্গে আলাপ জমতে বেশী দেরি হ'ল না। কিন্তু ওদের দোকানে বিক্রি যত ভিড়ও তত,কাজেই বিশেষ কথাবার্ত্তা হ'তে পায় না। ওদের তামাক টানা শেষ হ'লে কলকেটা নিজের হুঁকোর মাথায় বসিয়ে ওর দোকানে ফিরে এল। তামাক পুড়ে গেলে, হুঁকো নামিয়ে রেখে, চৌকি আর কেরোসিন কাঠের বাক্স বাজিয়ে গান ধরে—"ওগো রাধারাণী, তোমার ত-অ-অ-রে কেষ্টো-ও-ধন কেঁ-এঁ-এঁ-দে মরে, কেঁদে মরে—" ওগো তুমি এসো গো, মা-আ-আ-ন ভেঙে এ্যকবার এসো গো।" গানের অর্থটা মনে মনে অনুভব ক'রে ও হেসে অস্থির হয়ে উঠল, হাসতে হাসতে একেবারে চোখমুখ লাল ক'রে ফেললে। অথচ প্রথম দুটো দিনে ওর মাত্র ছ-পয়সা বিক্রি হ'ল। তার জন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখ ত ওর ছিলই না, স্বাভাবিক আনন্দেও ওর কোনো ভাবান্তর লক্ষিত হ'ল না। সমান তালে গান বাজনা চালিয়ে যেতে লাগল। খাবারের দোকানের মালিকরা ওর গান শুনে বেজায় খুশী। কাজের মধ্যে গানের সুর ওদের ভারি ভাল লাগল। মাঝে মাঝে শয়লার দিকে চেয়ে ওরা ভাবে,—কিছুই বিক্রি নেই, অথচ এত স্ফুর্ত্তি ওর আসে কোথা থেকে!

খাবারের দোকানে এদিকে বিক্রি ক্রমশই বাড়ছে; ওরা নিজেরাই আর সামলে উঠতে পারছে না—ভিড়ের মধ্যে কেউ পয়সা না দিয়েই সরে পড়ে, কেউ বা একটা দুআনি দিয়ে বলে সিকি দিয়েছি, পয়সা ফেরৎ দাও, তাড়াতাড়িতে পয়সা গুনতে ভুল হয়! শয়লারও বিক্রি নেই, তাই ওর সঙ্গে সর্ত্ত হ'ল, চিঁড়ে মুড়কী বাতাসা ও বিক্রি করবে, মোটারকম বখরা মিলবে। শয়লা খুব রাজী। একদমে খানিকটা হেসে নিয়ে দোকানের মালিককে বললে,—কিন্তু খুড়ো, আমি ভারি পেটুক মানুষ, হাতের কাছে খাবার রেখে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারি না,—বিক্রিও করব গালেও ফেলব, তা ব'লে রাখছি।

ওর কথাবার্ত্তায় ওরা একেবারে মজে গেছে।

খুশী হয়ে অধিকারী বলে, আলবৎ, খাটবে, খাবে বই কি!

সেদিনটা শয়লা খুব স্ফূর্ত্তি ক'রে বিক্রি করলে, কিন্তু আর চলল না। ও ভেবে দেখলে, খাবারের দোকানে কাজ করায় ওর মান থাকে না, তার চেয়ে নিজের যা বিক্রি হয় সেই ভাল। এই মনে করে ও দোকানীকে বল্‌লে, আজ শরীরটা ভাল নেই খুড়ো। ব'লে নিজের দোকানে কেরোসিন কাঠের বাক্সে চেপে বসল।

সেদিন মেলা খুব জমেছে, লোকের আনাগোনাও যথেষ্ট বেড়েছে। তখনও বেলা চারটে হবে। খাবারের দোকানে একটাও লোক নেই। দোকানীরা খেয়ে দেয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে, আবার সন্ধ্যা থেকে বিক্রি আরম্ভ হবে। শয়লা কাঠের বাক্সটার উপর ব'সে চারিদিকে চেয়ে দেখলে সবাইকারই কিছু-না-কিছু বিক্রি হচ্ছে, কেবল ওর বেলাতেই ফক্কা! দেখ্‌লে, ওর দোকানের দিকে লোকই আসে না! শয়লার এ-পাশে এক কাঁসারী দোকান পেতেছে। তারও অবস্থা শয়লার মতন। শয়লা ওর দিকে চুপ ক'রে চেয়ে রইল। দেখলে কাঁসারী দু-তিনটে ঘোড়ার পিঠে বাসন থলে ভর্ত্তি ক'রে এনেছে। ঘোড়াগুলোর পানে চেয়ে চেয়ে ওর মনে হ'ল, মাথায় ক'রে চ্যাঙারি ব'য়ে বেড়ানর চেয়ে অম্‌নি একটা ঘোড়া থাক্‌লে ভারী সুবিধে! মেলার ওদিকটায় বিক্রির জন্যে অনেক ঘোড়া এসেছে, তা শয়লা ওবেলা দেখে এসেছে। কিন্তু বিক্রি নেই যে এক পয়সাও!

শয়লা হঠাৎ উঠে বাসনের দোকান থেকে একখানা কাঁসর তুলে নিয়ে, খাবারের দোকান থেকে ডালপুরী-বেলার বেলনটা খপ ক'রে তুলে নিলে। তারপর এই তিনখানা দোকানের সামনে লম্বা লম্বা পা ফেলে

পায়চারি করতে করতে সজোরে কাঁসি বাজাতে লাগল—ঢং ঢং ঢং, ঢঢং ঢঢং ঢঢং, ঢং—ং—।

খাবারের আর বাসনের দোকানের দোকানীরা ত অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল। শয়লার এ'দিকে প্রায় দম আট্‌কে এল, এমনি হাসির বেগ। সব তাতেই ও রস বোধ করে, এবং না হেসেও পারে না।

হঠাৎ দিনদুপুরে মেলার মধ্যে কাঁসির আওয়াজ শুনে ছেলেমেয়ে মা-বাপ ভাই-বোন সব ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি ক'রে ছুটে আস্‌তে লাগল, মেলার মধ্যে নতুন কোনো মজা এসেছে মনে ক'রে। দোকানের সামনে ভয়ঙ্কর ভিড় জমে গেল।

শয়লা কাঁসর বাজানো বন্ধ ক'রে, ওর দোকান থেকে দু-মুঠো জিনিষ তুলে নিয়ে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল—এই টায়রা দেখছ, এ স্বয়ং একেবারে সেই সাতসমুদ্দুর তের নদী পার,—বোম্বাই দেশের পাশে নন্‌ডন্ সওর থেকে উড়োজাহাজে ক'রে আনা,—এই দেখ নেকা ওয়েচে, মেড্ ইন্ জারমানী। বিশ্বাস না হয় নেকা দেখে জিনিষ নাও।

উড়োজাহাজে ক'রে আনা জিনিষ দেখতে ওরা ঝুঁকে পড়ে। কাঁচের টায়রার জরির সুতোর ছোট্ট একটা টিকিটে ছাপা-অক্ষরে লেখা, ওটার মূল্য। অনেকে ঝুঁকে পড়ে লেখাটা দেখতে চাইলে। জনকয়েক মিলে পরামর্শ এবং পরীক্ষা ক'রে সবাইকে বল্‌লে, দোকানী যা বলেচে একেবারে খাঁটি সত্যি কথাটি!

তারপর শয়লা আরম্ভ করলে, এ টায়রা যে রোমুনী মাথায় পরবে, তার উপ্ তিনগুণ বেড়ে যাবে, না বাড়ে ত দাম ফেরৎ। আমার সব সামিগ্‌গিরি উড়োজাহাজে ক'রে বিলেতের দেশ থেকে আসে। নন্‌ডনে মেমসাহেবরা যেসব মাথার চিরুণী, সিঁদুরকৌটো, কাঁচপোকার টিপ, ঘুন্সী, তরল আল্‌তা পরে সেই সব জিনিষ আমার কাছে পাবে—দেখ নেকা ওয়েচে, মেড্ ইন্ নন্‌ডন্!

টক্‌টকে লাল কয়েক জোড়া কাচের দুল আর বেলোয়ারি চুড়ি দুহাতে উঁচু ক'রে তুলে ধরে শয়লা বল্‌লে, এই যে দুল দেখ্‌তেছ, এটা মেড ইন্ জাপানী—চুড়িও তাই। পিথিবীতে এমন শেষ্ঠ মাল আর পাওয়া যায় না, দাম খুব শস্তা—চলে এস খদ্দের—।

ঢং ঢং ঢঢং ঢঢং—ং—ং।

আবার বলে, তোমাদের ক্ষিধে পেলে, এই পাশেই দোকান। আর থালাবাসন, ঐ ত—মেলায় এসে থালা ঘটী না কিন্‌লেই চল্‌বে না,—ও-সবও মেড ইন্ নন্‌ডন্, উড়োজাহাজে ক'রে এয়েচে। বেগুনী ফুলুরী জিবে গজা দুঃখী গজা, চিঁড়ে, দই, সবই মেড্ ইন্ জারমানী!

নিজের এই রসিকতাটায় শয়লা খুব আমোদ পায়। মেড ইন্ জারমানী, মেড ইন্ নন্‌ডন্, মেড ইন্ জাপানী মানে ও বোঝে। কলকাতায় একবার সওদা করতে গিয়ে ও এইসব শিখে এসেছে তাই চিড়ে দই পর্য্যন্ত মেড্ ইন জারমানী ব'লে ওর আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। আরও একটা কথা ও শিখেছে তাতে ওর ভারী আমোদ, সে হ'ল, কালকাট্টা,—অথচ কথাটা এরা কেউ বোঝে না। এক-একটা জিনিষকে ও ইচ্ছে ক'রে বলে, এটা মেড ইন কাল্‌কাট্টা। খদ্দের হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে, কিছুতেই বুঝতে পারে না যে কাল্‌কাট্টা হ'চ্চে কলকাতা, অথচ মিথ্যেটাও যে ওরা ধরতে পারে না, এই হ'ল শয়লার আনন্দের কারণ। মেয়েরা সব ওর দোকানে ঝুঁকে পড়েছে।

কেউ বলছে, মেমরা যে-সিঁদুর পরে, তাই এক পয়সার দাও। কেউ বা বল্‌ছে, উড়োজাহাজের ছাঁদা আধ্‌লা ঘুন্সীতে পরবার জন্যে, তা পাওয়া যাবে না? শয়লার কপাল ফিরে গেল। হু হু ক'রে ওর দোকানে বিক্রী হতে লাগল। মেলার পাঁচদিনের দিন ওর দোকানের সমস্ত জিনিষ বিক্রী হয়ে গেল। হিসেব ক'রে দেখলে, খুব মোটা রকমের লাভ হয়েছে। ওর দুঃখের আর শেষ নেই, এমন জান্‌লে যে ঢের বেশী বেশী মালপত্র আন্‌ত। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে, গভীর রাতে যখন মেলা থেমে এসেছে তখন ও ঘুরতে বেরল। অন্য সব দোকান থেকে কিনেকেটে রাতারাতি দোকান সাজিয়ে ফেল্‌লে। সে-সবগুলো পরের দিনেই শেষ হয়ে গেল। তার উপর চিঁড়ে

মুড়কী বেচার বখরা পেয়ে ওর হাতে হল প্রায় সওয়া'শ টাকা। পঞ্চাশ মূলধন, আর পঁচাত্তর থাঁটি লাভ আর রোজগার। শয়লার মন খুশী হয়ে উঠল, মেলার শেষ দিনটা একটু আমোদ-আহ্লাদ ক'রে বেড়াবে, এই ঠিক করলে।

খালি চ্যাঙারিটা দোকানীর কাছে রেখে ও মেলায় আমোদ করতে বেরিয়ে পড়ল। বায়স্কোপ থিয়েটার দেখে, নানারকম খেয়ে ওর হঠাৎ মনে পড়ল ঘোড়ার কথা। তাড়াতাড়ি ঘোড়ার জায়গায় গিয়ে দেখলে তখনও পাঁচসাতটা বাকী আছে। সাদা ধপ্‌ধপে ঘোড়াটা দেখে শয়লার আর লোভের সীমা নেই। টাট্টুর মতন ছোট্ট, কি তেজী, কি রকম ঘাড় তুলে চেয়ে থাকে। গায়ের লোমগুলো রূপার মত চকচক্ করছে।

একটু গায়ে হাত দিয়ে দেখবার আশায় ও কাছের দিকে এগিয়ে যেতে ঘোড়াটা এমনি জোরে নাক ঝাড়লে যে, শয়লাকে সাত হাত দূরে লাফিয়ে পালিয়ে আসতে হ'ল। দাম শুনে ও হতাশ হয়ে পড়ল, চার কুড়ি টাকা। এক পয়সা কম হবে না।

কি দরকারের ঘোড়া ওর চাই, ঘোড়াওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে।

শয়লা বললে, এই জিনিষপত্র বইবার জন্যে।

একটা লাল ঘোড়া ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে ঘোড়াওয়ালা বললে, ওসব চড়বার ঘোড়া, তার চেয়ে এইটেই নিয়ে যাও, এ আসল টাট্টুর বংশ। কেবল সুমুখের বাঁ পাখানা যা একটু ল্যাংড়া, তা তোমার কাজ খুব ভাল চলবে। ল্যাংড়া হ'লে কি হয়, তেজখানা দেখছ, তীরের মত ছুটতে পারে।

ছুট করান হ'ল। শয়লা ওর দৌড় দেখে মনে মনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। শুধু ঐ একটা দোষের জন্যে শয়লার মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। দাম জিজ্ঞাসা ক'রে জানলে, দশ টাকা।

শেষে ওর হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে শয়লা বললে, আজ রাতটা ভেবে দেখি, যদি হয় তাহ'লে কালই, ন'লে টাকাটা ফেরৎ দিতে হবে। সমস্ত রাত ভেবেচিন্তে পরের দিন গিয়ে দর-কষাকষি আরম্ভ ক'রে দিলে। দশ থেকে সাতে নাম্‌ল। আর কমে না। কাজেই শয়লা তাতে রাজী হ'ল। ঘোড়াটা কিনেই ও তার পিঠে চেপে ব'স্‌ল, ইচ্ছেটা সোজা খাবার-ওয়ালার সুমুখে উপস্থিত হবে। কিন্তু ঘোড়াটা আনাড়ি সোয়ার পেয়ে একদিকে হঠাৎ এমন দৌড় দিলে যে, শয়লা তার পিঠ থেকে ছিট্‌কে পড়ে গিয়ে আর তক্ষুনি উঠতে পারলে না। ওদিকে কেনা ঘোড়া দৌড়তে লাগল। মেলার লোকেরা শয়লাকে মাটি থেকে তুলে ওর ঘোড়া ধরে এনে দিলে। ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে ঘোড়াকে পোষ না মানিয়ে আর চড়ছে না। তারপর মেলা ভাঙবার আগেই ও ঘোড়ার দড়ি হাতে ক'রে বাড়ির মুখে রওনা হ'ল।

ভদ্রপাড়া থেকে ও শুনেছে আরবী ঘোড়াই শ্রেষ্ঠ। তারা অদ্ভুত ছোটে আর দেখতেও তেমনি সুন্দর। ঘোড়াটা কিনে এনে পর্য্যন্ত ওর আর কাজের শেষ নেই। মেলায় অনেক লাভ হয়েছে তাই আর কিছুদিন গাঁয়ে ঘুরবে না স্থির করলে। ঘোড়াটাকে নিয়ে একেবারে উঠে-পড়ে লেগে গেল। গাঁয়ের অন্য যাদের ঘোড়া আছে তাদের কাছ থেকে সমস্তই শিখে এসেছে। বাঁশ থেঁত্‌লে, ছ্যাঁচার বেড়ায় ছোট্ট একটা আস্তাবল ক'রে ফেল্‌লে। কাদা দিয়ে সমস্ত বেড়াটা এমনি ক'রে লেপে দিলে যে, আলো আসবার মত এতটুকু ফাঁক কোথাও রইল না। আস্তাবলের যে দরজাটা করলে তাতেও বিন্দুমাত্র ফাঁক রাখলে না। এই গাঢ় অন্ধকার ঘরে ও ঘোড়াটাকে চব্বিশ ঘণ্টাই পুরে রাখলে।

জিজ্ঞেস করলে বলে, ঘোড়ার চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধকারে রাখলে ওর তেজ তবে বাড়বে, দেখো সিঙ্গির মত গর্জ্জন করবে। তারপর দিনের আলোয় যখন চোখ খুলে বাইরে আনব ঘোড়া একেবারে নাচতে লাগবে।

চৌকো একখানা কাগজে, নিজের হাতে, মেড ইন্ আরবী লিখে ওর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছেটা, পুরোপুরী আরবী ঘোড়া ব'লে বাইরে পরিচয় দেবে। খুব ছোট ছোট ক'রে খড় কুচোয়, মাঠ থেকে ভাল ভাল ঘাস কেটে আনে, আর ছোলা ত আছেই।

সারাদিন ও আস্তাবলের দরজা এতটুকু ও ফাঁক করে না। সন্ধ্যের অন্ধকার হ'লে তখন গিয়ে খাবার দিয়ে আসে। ওর আরবী সারারাত্রি ধরে খায়। তারপর রাত চারটের সময় শয়লা ঘুম ভেঙে উঠে ঘোড়া বার ক'রে আনে। ঘোড়াটার সুমুখের ও পিছনের পায়ের হাঁটুর উপর ক'রে চওড়া শক্ত ফিতে টানা দিয়ে বাঁধে। তারপর ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে তাকে কদম, বাঙলা প্রভৃতি সব চাল শেখায়। শুকনো খানার কাছে নিয়ে গিয়ে লাফ দিতে অভ্যাস করায়। ভোরের আলো ফোট্‌বার আগেই ও আবার চোখ বেঁধে ওকে আস্তাবলে পুরে ফেলে। এমনি ক'রে দিন-পঁচিশেক কাটবার পর ঘোড়ার চেহারাও ফিরল তেজও সত্যি বাড়্‌ল। তার চাটের ঘায়ে যে-দিন আস্তাবলের একদিক্‌কার দেয়াল ভেঙে পড়ল, সে শয়লার একটা বড় আনন্দের দিন, ও সকলকে ডেকে ডেকে ব'লে বেড়াতে লাগল। শয়লা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে পিঠে একটা থাবড়া মেরে বল্‌লে, আর্‌বী! আরবী ওর গলার স্বর আর স্পর্শ খুব চিনেছে। মাটিতে পা ঠুকে, কান খাড়া ক'রে, নাক ঝেড়ে আরবী সাড়া দিলে। আনন্দে শয়লা একেবারে দিশেহারা। তারপর শয়লা ঘোড়া বার ক'রে দিনের বেলায় চড়তে সুরু করলে। প্রথমটা আরবী বেশ তেজের সঙ্গে ধনুকের মত ঘাড় বেঁকিয়ে খানিকটা কদমে, খানিকটা বাঙলায় চল্‌ল। কিন্তু আনন্দের মাত্রাধিক্যে শয়লার হাতের চাবুক আরবীর পিঠে পড়তেই এত-দিনকার শিক্ষা সব গুলিয়ে গেল। খানা-ডোবা আঁদার-পাঁদার লোকের উঠোন উর্দ্ধশ্বাসে পার হ'য়ে গিয়ে আরবী মাঠে পড়ল। মাঠ ছেড়ে ঝোপঝাড় ঠেলে তার সেই সতেজ দৌড় চলল। দড়ির লাগাম টেনে, আল্‌গা ক'রে কিছুতেই শয়লা ওকে বাগে আন্‌তে পারলে না। চারা বাবলার জঙ্গল, ময়না কাঁটার ঝোপ্‌, ফণী মন্‌সার ঝাড় ঠেলে আরবীর সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হ'ল, শয়লার পা দুখানা দিয়ে ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়ে পায়ের উপরেই শুকিয়ে গেল, তবুও আরবীর ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ মোড় বেঁকতে গিয়ে শয়লা আরবীর পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য্য, আরবীও তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। শয়লার কোমরে হাঁটুতে রীতিমত ঘা পেলে। নিজের পা দুখানা দেখেই ওর কান্না আসছিল। কোনোক্রমে উঠে ঘোড়ার দড়িটা ধরে ফেল্‌লে। তারপর একটা খেজুর ছড়ি ভেঙে বেদম প্রহার আরম্ভ ক'রলে। হঠাৎ খোঁচা লেগে আরবীর বাঁ চোখটায় ঘা লেগে গেল। সুমুখের দু-পা তুলে চিঁহি শব্দে আরবী কাঁদতে লাগল। ওর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামতে দেখে শয়লা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল! ঘোড়ার কান্না আর থামে না। শয়লার বুকের ভিতর হুহু ক'রে উঠতে লাগল। ওর আর তখন নড়বার অবস্থা ছিল না, তবুও দড়িটা ধরে প্রাণপণে গাঁয়ের দিকে ছোটবার চেষ্টা করলে। আরবী ওর পিছনে, মাথা নাড়তে নাড়তে চিঁ-হি শব্দে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুটে চল্‌ল।

সন্ধ্যার মুখে শয়লা গাঁয়ে ঢুকল ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে। কোনক্রমে একটা ঘোড়া জোগাড় ক'রে তখুনি শয়লা পাঁচ ক্রোশ দূরে রেল ষ্টেশনের কাছে ঘোড়ার ডাক্তার ডাকতে ছুটল। সেই রাত্রেই শয়লা ত্রিশ টাকা খরচ ক'রে ফেল্‌লে। আরও দশবিশ টাকা খরচ ক'রে ও গাঁয়ের ওস্তাদদের কাছ থেকে গাছগাছড়া শিকড়বাকড় সংগ্রহ ক'রে আনলে। অনেক সেবা যত্নের পর আরবী সেরে উঠল, কিন্তু চোখটা আর ফিরে পেলে না। সেই থেকে আরবীর উপর ভালবাসাটা ওর যেন বেড়ে গেছে।

এর পর অনেক দিন কেটে গেছে। আরবী আর সে ঘোড়া নেই, এখন গাধার অধম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন খাটে – শয়লার ব্যবসার চ্যাঙারি বয়, ধান চাল চিঁড়ে মুড়কী বয়। সন্ধ্যাবেলা ছাড়া পেয়ে সারারাত কারও ধানক্ষেত, কারও কড়াই ক্ষেত, এই ক'রে চরে খায়। পরের দিন সকালে পাড়ায় ট'ল দিতে বেরিয়ে শয়লা ওকে ধরে নিয়ে আসে। ঘরে বসে ঘাস ছোলা খড় খাওয়ার দিন ওর গেছে। এখন রাতে রাতে মানুষের ছোলা ভুট্টার ক্ষেতে গিয়ে না পড়তে পারলে, সমস্ত দিন উপোষ দিতে হবে, তবু শয়লা নিজের হাতে কিছুই জোগাড় ক'রে দেবে না।

হাটের দিন। শয়লা [illegible]

জিনিষপত্র কিন্‌বে। পথে দেখা নায়েব-মশায়ের সঙ্গে। তিনি চলেছেন কোন্ কাজে। এ অঞ্চলে নায়েবের ঘোড়া বিখ্যাত, যেমনি লম্বা, বড়, তেমনি চালবাজ।

শয়লা ভক্তিভরে নমস্কার ক'রে কুশল জিজ্ঞাসা করল।

উনি পকেট থেকে একটা চুরুট শয়লাকে উপহার দিলেন। কাপড়ের খুঁটে সেটা বেঁধে নিয়ে ট্যাকে গুঁজে রাখলে। ওর মত,—এই সব ভালফাল জিনিষের সেবা তোয়াজ ক'রে করতে হয়, এমন ঘোড়ার পিঠে চড়ে কখন হয়?

শয়লা বললে,—নায়েব-মশাই আমাকে একটা জিনিষ দেবেন, আপনার তাতে বিশেষ লোকসান হবে না।

কথাটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

নায়েব প্রশ্ন করলেন।

ও বললে, আসুন, আমরা ঘোড়া দুটো অদল-বদল করি।

আবার তেমনি হাসির বেগে চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

নায়েব হেসে প্রশ্ন করলেন,—হাঁ রে শয়লা তোর ঘোড়াটা উত্তর দিকে চলছে, কিন্তু ওর মুখ আর সমস্ত দেহটা এখন পূর্বদিকে কাৎ করা যেন ও ঐ পাশের জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে, অথচ ঠিক উত্তরেই ত চলেচে,—কেন রে?

ওর যে একটা পা ল্যাংড়া আর এক চোখে দেখতে পায় না, শয়লা তার গল্প বল্‌লে।

নায়েব সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে বললেন, যদি ল্যাংড়া না হ'ত তাহ'লে বেশ ভাল দরের ঘোড়া হ'ত রে!

শয়লা বললে, ল্যাংড়া তাতে কি নায়েব-মশাই, আপনার ঘোড়া আমার আরবীর সাথে ছুট্‌তে পারবে নি।

নায়েব ত হেসেই অস্থির। শয়লা রীতিমত জেদা-জেদি আরম্ভ করলে রেস্ লড়বার জন্যে।

নায়েবের রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। নির্জ্জন মধ্যাহ্নের কাঁচা রাস্তা। ধূলোর কথা মনে ক'রে নায়েব-মশায়ের মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠছিল, কিন্তু শয়লার তাগাদায় সে-সব বাছ-বিচার সহজ হ'ল না।

দুই ঘোড়া পাশাপাশি দাঁড়াল, একটা যেমনি সুন্দর তেজী ও বড়, অপরটা তেমনি অঙ্গহীন বেতো এবং বেঁটে।

নায়েব বললেন, তুই আমার চেয়ে পাঁচ হাত এগিয়ে থাক্। শয়লা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ব'ললে,—তা কি হয়!

নায়েব বললেন, ভাল, কিন্তু প্রথম থেকেই খুব দৌড় করাবার দরকার নেই, একটু একটু ক'রে জোর বাড়ালেই হবে।

ও মাথা নেড়ে বললে,—তা কি হয়? যার যেমন সুবিধে।

শয়লা একসঙ্গে ঘা-পঁচিশেক চাবুক আরবীর পিঠে কষে লাগিয়ে দিলে। এতদিন পরে আবার চাবুক খেয়ে আরবী তীরবেগে ছুটল।

নায়েব ঘোড়া নামিয়ে থানা দিয়ে নেমে চললেন। চীৎকার ক'রেও শয়লাকে থামান যায় না। অথচ আর অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব, এমনি ধুলোর মেঘ সমস্ত পথটুকু আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

আরবী যখন আস্তে চলে তখন ল্যাংড়া পা খানা কোনোক্রমে সাম্‌লে নেয়। কিন্তু ওকে যখন বেগে দৌড়তে হয় তখন ওই ল্যাংড়া পা-খানাই মাটিতে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে চলে। কাজেই কাঁচা রাস্তার ধুলো রীতিমত লাঙলের মত ঠ্যালা পেয়ে জেগে উঠে আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলে। নায়েবের চোখে মুখে নাকে ধুলো ঢুকে দম বন্ধ হবার জোগাড় হ'ল। চীৎকার ক'রে ডেকে কোনই ফল হ'ল না। অবশেষে সেই ধুলোর ভিতর দিয়ে নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শয়লার কাছে এসে ওকে ঘোড়া থামাতে বললেন, নিজের হার স্বীকার করলেন।

হেসে শয়লা বললে,—দেখলেন ত বললুম, আমার আরবীর সঙ্গে দৌড়ে পারবে এমন ঘোড়া আমি এ তল্লাটে দেখি না।

নায়েব হেসে সায় দিলেন।

অনেক দিন পরে শয়লা সেদিন আবার আরবীকে ছোলা খেতে দিলে, গায়ে গোটাকতক থাবড়া মারলে। তারপর সন্ধ্যাবেলা খেয়ে দেয়ে ভুষো মাখানো হ্যারিকেনটা

হাতে নিয়ে পাড়ায় বেরিয়ে পড়্‌ল, ঘোড়দৌড়ের গল্পটা পাঁচজনকে বলবার জন্যে।

সেদিন সকালে ও আর কোনোমতেই আরবীকে খুঁজে পেলে না। অনেক ঘোরাঘুরি ডাকাডাকি খোঁজাখুঁজির পর চামার পাড়ার নীলার কাছে দেখলে আরবী শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখলে, পেটটা তার ফুলে উঁচু হয়ে উঠেছে, সমস্ত দেহ তার শক্ত কাঠ, কতক্ষণ মরে পড়ে আছে, কে জানে। তার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে শয়লা ছোট ছেলের মত ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। পাথরের মত ঠাণ্ডা গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কান্না আর থামে না। ক্রমশঃ লোক জমে গেল। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হঠাৎ ওর একটা কথা মনে পড়ল। ও তাড়াতাড়ি চামার পাড়ায় এসে উপস্থিত হ'ল। ছোট একটা মেয়ে তখন উঠনের বাঁশে বেঁধে কাপড় শুকতে দিচ্ছিল।

তাকে ধম্‌কে ও জিজ্ঞেস করলে,—আমার আরবীকে তোর বাবা বিষ খাইয়েছে কি-না বল!

সে নিতান্ত আপত্তি ক'রে বলল—না কক্ষনো নয়।

শয়লা এমনি করে দু-হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌ল—কে বিষ খাইয়েচে? কে বিষ খাইয়েচে?

কিন্তু কেউই তার উত্তর দিতে পারলে না।

শয়লার কান্না তখন থেমে গেছে, মুখখানা সিঁদুরবর্ণ হ'য়ে ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো যেন রক্তজবা।

ও বললে,—তোমরা বললে না, কে আমার আরবীকে বিষ খাইয়েচে? আচ্ছা, দেখে নেব আমিও।

এ গাঁয়ে কিছুদিন থেকে উঠোউঠি অনেকগুলো বলদ গাই অপঘাতে মরতে সুরু করেছে। অনুমান,—চামারেরা ফ্যানের সঙ্গে বিষ খাইয়ে দেয়।

তাই গরু ঘোড়া মরলেই কারণে অকারণে মানুষ চামারদেরই আগে সন্দেহ করে। আর কোনো কারণ আছে কি নেই কেউ ভাবে না।

সহজিয়া

("আঁখ না মুদু কান না রুধুঁ"—কবীর)

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

মুদ্‌ব না চোখ, রুধ্‌ব না কান,
করব না ক্লেশ অত,—
সহজ চাওয়ায় আরতি তাঁর
করব যে সতত।

জপ—হবে মোর মুখের কথাই,
স্মরণ—হবে শুনব যা' তাই,
যা-কিছু কাজ—হবে সেবায়
পূজায় পরিণত;
যেখানে যাই—তাই হবে মোর
পরিক্রমার মত।

মাটির স্বর্গ*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক আমাকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন যে, তাঁর এই বইয়ের সমালোচনাটা যেন ইঞ্চির মাপে না হয়ে গজের মাপে হয়।

দুর্লভ অবকাশে মানুষ হঠাৎ একটা দুঃসাধ্য কর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম ক'রে বসে, কিছুদিন হ'ল সেই রকম অবকাশেই কোনো এক গল্পের বইয়ের প্রমাণসই সমালোচনা লিখে বসেছিলুম।

পল্লীগ্রামে থাকতে দেখেছি সম্বৎসর টানাটানির পরে পাটবিক্রির টাকা হাতে আসতেই চাষী হঠাৎ মরীয়া হয়ে জুতো, ছাতি, কাঁঠাল ও ইলিশ মাছ কিনে তার পরমাসের জন্যে অনুতাপ সঞ্চয় করতে থাকে। আমার ক্ষণিক অবকাশটা ঐরকম পাটবিক্রির টাকার মত।

সেদিনের পর থেকে বিস্তারিত অভিমতের অনুরোধ অনেক আসচে। মান্য না পণ ক'রে বসেছিলুম। এমন সময় এই "মাটির স্বর্গ" বইখানি এসে আমার পণভঙ্গ করলে। এই লেখকের পূর্ব্বরচিত ছোট ছোট গল্পওয়ালা বই সম্বন্ধে প্রশংসাবাক্য ব'লেছিলুম। সেটাই অত্যুক্তি, না এই বইটাই আমার প্রশংসাকে বিদ্রূপ করবার অভিপ্রায়েই বাণীবিধাতার বিশেষ সৃষ্টি, ঠাহরাতে পারলুম না।

আমি গত শতাব্দীর মানুষ,—আধুনিক নই সে কথা বলা বাহুল্য। তাই মনে একটা সংশয় থেকে যায় পাছে আমার সেকালের দৃষ্টির সঙ্গে একালের দৃশ্যের সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়ে থাকে, তখনকার দিনের চিত্তের অভ্যাস নিয়ে এখনকার প্রতি পাছে অবিচার ঘটে। এই আশঙ্কার থেকে ফল হয়, ভাল লাগার দিকেই অতিশয় ঝোঁক দিয়ে অনেকটা পরিমাণে অন্ধতার সৃষ্টি করি! কিছুই সহজে ভাল লাগে না ব'লে কোনো কোনো মানুষ অহঙ্কার ক'রে থাকেন, ভাল লাগ্‌তে না পারায় আমার মন সঙ্কুচিত হয়। বিচারবুদ্ধির পক্ষে প্রথমোক্ত মনোভাবটাও যেমন ভাল নয়, শেষেরটাও তেমনি।

যাই হোক্ অনেক সময়ে অনবধানে অপরাধ করে থাকি অথচ সেটা আবিষ্কার করবার অবকাশ পাওয়া যায় না। এবারে লেখক স্বয়ং তাঁর "মাটির স্বর্গ" বইখানিকে বিশেষ তাগিদের দ্বারা আমার লক্ষ্যগোচর করাতেই সেদিনকার অবকাশটুকুর জন্য আমি অনুতপ্ত।

"মাটির স্বর্গ" নামটাতেই বোঝা যায়, যে, মাটি দিয়ে গড়া স্বর্গের পরিচয় লেখক আমাদের কাছে উপস্থিত করেচেন। তাতে কোনো ক্ষতি নেই, স্বর্গ যদি মাটি না হয়ে থাকে। মাটির মর্ত্ত্য জিনিষটাও দোষের নয় যদি সেটা সত্যকার জিনিষ হয়ে ওঠে। কিন্তু মাটির স্বর্গে একটা স্বতোবিরোধ আছে ব'লেই তার দাম বেড়ে যায়। বুদ্ধিমান পাঠক খাঁটি স্বর্গকে সহজে বিশ্বাস করে না, জানে ওটা বানানো। কিন্তু মাটির মসলা যদি যথেষ্ট থাকে তাহ'লে কোনো কথা থাকে না। সাক্ষ্য যদি সম্পূর্ণ ত্রুটিবিহীন হয় তাহ'লেই তাকে সন্দেহ করা যায়, সত্যসাক্ষ্যে প্রামাণিকতার ত্রুটি থাকে ব'লেই সেটাকে বিশ্বাস করা সহজ। অতএব মাটি জিনিষটা স্বর্গের পক্ষে একটা সার্টিফিকেট ব'লুলেই হয়।

তাই যখন দেখা গেল হীরু ঠাকুর গাঁজার আড্ডার মালিক—বত্রিশ ছিলিম ক'রে গাঁজা রোজ খায় তখন আর সন্দেহ রইল না যে, লোকটা মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত, গাঁজার ধোঁয়ায় ঢাকা মহদাশয় লোক। আমাদের কালে সাহিত্যের একটা চলতি সংস্কার ছিল, যারা ভাল লোক তারা গাঁজা খায় না। চন্দ্রশেখরকে বঙ্কিম গাঁজা ধরান নি, এটা লেখকের দুর্ব্বলতার লক্ষণ ব'লেই গণ্য করা যেতে পারে। কমলাকান্তকে আফিম ধরিয়ে তিনি কতকটা আপন মান বাঁচিয়েচেন। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় এ আফিম ভাবের আফিম, আবগারী-বিভাগের বাইরে। দেবেন্দ্রের আসরে তিনি মদের আমদানি করেচেন সেটা ওর বিকার দেখাবারই জন্যে, মহত্ত্বের ছবি সমুজ্জ্বল ক'রে তোলবার জন্যে নয়। এখনকার দিনে ভালর ভালত্বটা গাঁজার কড়া ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে নিজেকে জোরের সঙ্গে সপ্রমাণ করে। ক্ষতি নেই। কিন্তু এও হয়ে উঠচে একটা ফাঁকা কৌশলের মত। রিয়ালিজ্‌মের নকল অলঙ্কার।

ওদিকে গ্রামে এক নাপিত আছে, সে নিজের ব্যবসা চালিয়ে এবং ভালমানুষী ক'রে সংসারের উন্নতি ও গ্রামসুদ্ধ লোকের মনোরঞ্জন করেচে। নিজের ছেলে নেপালকে ইস্কুলে পড়িয়ে শিক্ষিত করবার দিকে হঠাৎ তার খেয়াল গেল। গেঁজেল হীরু ঠাকুর বল্‌লে নাপিতের ছেলে ইংরেজী শিখে অধঃপাতে যাবে। ঠাকুর স্বয়ং আই-এ পর্য্যন্ত পড়েচেন, তার উপরে সংস্কৃত টোলে প'ড়ে গীতা আয়ত্ত ক'রে নিয়েচেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ। পাঠক লক্ষ্য ক'রে দেখবেন গাঁজার সঙ্গে গীতা মিশিয়ে এই মানুষটির চরিত্রকে কি রকম বাস্তব পরিচয়ের উচ্চস্তরে তোলা হয়েচে।

নাপিত ম'লো ম্যালেরিয়ায়। তার পূর্ব্বেই ছয় সাত বছরের এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ সমাধা ক'রে দিয়েচে। নেপাল ফেল করতে করতেই ম্যাট্রিক সাধনার উপসংহার করলে। চাষবাসে মন দিল না, জাতব্যবসাকে উপেক্ষা কর্‌লে, গেল কলকাতায় জীবিকা সন্ধানে।

ষোলো বছরের নেপাল এখন আটাশ বছরের। তার বুড়ী মা এখনও বেঁচে কিন্তু তার স্ত্রী যে কোনোখানে বর্ত্তমান তার কোনো প্রমাণ নেই। এরকম দীর্ঘকালব্যাপী দায়িত্ববিহীন বিলুপ্তির সমাজপ্রথাসঙ্গত কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু এই আশ্চর্য্য গল্পে এ মেয়েটির দায় গৃহস্থালীর সম্বন্ধে নয়, এর একমাত্র পবিত্র দায়িত্ব মাটির স্বর্গরচনায়। সেই রচনার চমৎকৃতি-সাধনের জন্যেই আজ পর্য্যন্ত তার নামটা পর্য্যন্ত চাপা রইল।

কলকাতায় এসেই নেপাল পড়ল গয়ারাম নামধারী এক ব্রাহ্মণের হাতে। বি-এ পাস করা, থাকে তার বাড়িওয়ালী বেশ্যা সুখদার আশ্রয়ে। রিয়ালিজ্‌মের একটা অকাট্য প্রমাণ জোগাবার জন্যেই

* মাটির স্বর্গ।—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক, বরেন্দ্র লাইব্রেরী। দাম দুই টাকা।

সে সাহিত্য-সংসারে অবতীর্ণ। লেখাপড়া এবং ভদ্রবংশ সত্ত্বেও জুয়াচুরিতে সে স্বয়ংসিদ্ধ। ম্যাট্রিক ফেল করা নেপাল তার সঙ্গে প্রতারণা সমবায়ে ভিড়ে গেল। বলাইচরণ প্রভৃতি ভাল ভাল লোকের সর্ব্বনাশের ফন্দি জ'মে উঠ্চে।

এমন সময় নেপাল রাস্তায় ভবতোষ নামক এক অত্যন্ত ভাল লোকের মোটর গাড়ীর ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল; মাটির স্বর্গের সঙ্গে কোলিশন হ'ল এই সুযোগে। চৈতন্য হয়ে থামকা দেখে উনিশ কুড়ি বছরের অজানা মেয়ে শিয়রের কাছে ব'সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। নাম তার অর্চ্চনা। নামেই বোঝা যায় স্বর্গরচনায় এর হাতযশ হবে।

এই মেয়েটি ভবতোষ নামক সেই ভাল লোকের পালিতা মেয়ে। তিনি এত আশ্চর্য্য ভাল যে অর্চ্চনার অনুরোধ শোনবামাত্র তখনই নেপালকে নির্ব্বিচারে তাঁর জমিদারীর ম্যানেজার ক'রে দিলেন। এত বড় ভাল লোকের বিষয়-সম্পত্তি অনেক কাল আগে সম্পূর্ণ উবে যাওয়া উচিত ছিল—যায় নি যে সে কেবলমাত্র মাটির স্বর্গ গড়তে যে ব্যাঙ্কনোটের দরকার তারই দোহাই মেনে।

গল্পটা প'ড়ে মনে পড়ল একদা পরের মোটরে চড়ে আসচি এমন সময় গাড়ীর ধাক্কা লেগে এক হিন্দুস্থানী প'ড়ে যায়। তাকে সেই গাড়ীতেই তুলে নিয়ে ডাক্তারের বাড়ি এনে আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিই, হাতে কিছু নগদ টাকাও দিয়ে থাকব। কিন্তু অনেক ভেবে দেখলুম অর্চ্চনার মত কোনো আত্মীয়া যদিবা আমার থাকত তবু তার অনুরোধে তখনই এর জিম্মায় আমার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ ক'রে পরম সন্তোষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতুম না। আমার কথা ছেড়ে দেওয়া যাক,—পৃথিবীতে ভাল লোক নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু প্রার্থনা করি যে-পরিমাণে তাদের ভালত্ব সেই পরিমাণ বুদ্ধিও যেন তাদের থাকে যাতে তারা টিঁকে যেতে পারে।

ভবতোষ খাটের পাশে অর্চ্চনাকে বসিয়ে যে ক-টি কথা বল্‌লেন তা স্মরণীয়। "নেপালের সঙ্গে এ ক-দিন কথাবার্ত্তা ক'য়ে নানা দিক লক্ষ্য ক'রে দেখলুম ছেলেটি সব দিকেই ভাল। * * কবে টপ্ ক'রে শমনের ডাক এসে পৌঁছুবে, মা, এখানকার জন্যে একজন ভাল লোক রেখে যেতে পারলে মনটা তবু একটু নিশ্চিন্ত থাকে। * * তুই স্ত্রীলোক, তায় ছেলেমানুষ। একজন ভাল অভিভাবকের হাতে- ।"

কয়দিন মাত্র কথাবার্ত্তা! পালিত কন্যার অভিভাবকতা মুহূর্ত্তে মঞ্জুর। এত বড় ভাল লোকে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু পালিত কন্যা!

ভবতোষ একসময়ে অর্চ্চনাকে ডেকে নেপাল সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আমার পঁয়ষট্টি বছরের অভিজ্ঞতায় লোক চেনবার যে শক্তিটুকু পেয়েচি তাতে ক'রে ওর ঐ সুন্দর চোখের শান্ত দৃষ্টির ভেতর দিয়ে আমি একটি নিষ্কলঙ্ক পবিত্র অন্তরেরই পরিচয় পাই।"

চরিত্ররচনায় এই আর একটি বাহাদুরীর লক্ষণ। নেপালের মিথ্যে কথা বলতে বাধে না, জুয়াচুরি ব্যবসাতেও অনেকটা সে মাথামাখি করেচে কিন্তু অন্তরটা শুধু নিষ্কলঙ্ক নয় পবিত্র!

এই ভাবে গল্প চলেচে। সে অনেক কথা। মাটি জমেচে কম নয় স্বর্গও উঠচে অভ্রভেদী হ'য়ে। স্বর্গে একটা বিপদের সম্ভাবনা ঘটে উঠেছিল। ম্যানেজার নেপালবাবুকে অর্চ্চনা যে ভালবাসে সেটা বিনা ঘোষণাতেই স্পষ্ট আন্দাজ করা যায়। কিন্তু চাপা আগুন। কেননা, অর্চ্চনা জানে নেপাল বিবাহিত। নেপাল সে কথা গোপন করে না কেবল স্ত্রীর বিবরণ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রভাবে অকারণে ও সকারণে বার-বার মিথ্যে কথা বলে।

ভাবনা ঘরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বর্গ অটল আছে। নেপালের মৃত্যুর পরে প্রকাশ পেল যে অর্চ্চনাই সেই ব্রজরাণী, যার সাত বছর বয়সে নেপালের সঙ্গে বিবাহ, কেবল সাত দিন মাত্র যার সঙ্গে তার ক্ষণিক দেখা, তা'র পর শ্বশুরবাড়ি থেকে যে একেবারে বিনা কৈফিয়তে ফেরার, আর ভাবী স্বর্গরচনার অলৌকিক অনুরোধে, নেপালও যার কোনো সন্ধান করেনি, অথচ যার শিশুমুখের সৌন্দর্য্য স্মৃতি তার মনের মধ্যে চমক দিয়েচে।

যা'ক, স্বর্গের ফাঁড়াটা কেটে গেল। দুষ্মন্ত যখন কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলাকে ভালবেসেছিলেন তখন জানতেন না শকুন্তলার জাত কুল। যখন জানা গেল তখন স্পষ্টই প্রমাণ হ'ল যে দুষ্মন্তের মত মানুষের পক্ষে ভ্রমক্রমেও ঋষিকন্যাকে ভালবাসা অসম্ভব হ'ত। এখানেও তাই ঘটল। সাধু ভবতোষ যেমন দুদিনের কথাতেই সহজেই বুঝেছিলেন নিষ্কলঙ্ক নেপালকে বিনা সংশয়েই অর্চ্চনার অভিভাবক করা যেতে পারে, তেমনি সহজেই সতীত্বের শুভ্র আলোকে অর্চ্চনার মন প্রথম থেকেই ঝুঁকে পড়তে পেরেছিল।

এই স্বর্গের খাতিরেই একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে থেকে যায়। ভবতোষ কি জাতিতে নাপিত? তিনি কি অর্চ্চনার হাতের রান্না কোনোদিন খেয়েছিলেন? যদি নাপিত না হন এবং যদি খেয়ে থাকেন তবে পুণ্য ভারতবর্ষে সাধুলোকের এরকম রীতিবিভ্রম সম্ভব হয় কি ক'রে? স্বর্গের দশা কি হবে?

শেষকালে একটা কথা ব'লে রাখি। বাইরে যে মানুষ অনেকখানি দাগী ভিতরে সে মানুষ ভাল হ'তে পারে না এমন কোনো কথা নেই। শরৎচন্দ্র এই জাতের মানুষকে যখন স্পষ্ট ক'রে দেখিয়েচেন তখন কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি। কোনো রচনাকে সত্য ক'রে তোলবার সৃষ্টিমন্ত্র যে কি তা কে বলতে পারে? ক্ষমতাশালীদের ভাণ্ডার থেকে আহরণ করা উপকরণ জোড়া দিলেই কল পাওয়া যাবে এমন যদি কারও বিশ্বাস থাকে তবে তাঁকে অনুরোধ করি তিনি যেন নভেল বানানোর একটা পাকপ্রণালী প্রকাশ করেন।

দার্জ্জিলিং, কার্ত্তিক ১৩৩৮

ধ্রুবা

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমুদ্রগুপ্তকে অজ্ঞান অবস্থায় অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই রামগুপ্ত মুক্তি পাইল। রুচিপতি তাহার সন্ধানে চারিদিকে ফিরিতেছিল, মুক্তির সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ চর্ম্মনির্ম্মিত আধারে মদ্য লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রামগুপ্ত তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কারাগারে নিয়ে বিশ কলসী জল ঢেলেছে, সকল অঙ্গ হিম হয়ে গেছে।"

রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "এই যে মহারাজ, যুবরাজ ব'লে আর মিছে বিলম্ব করি কেন? বুড়ো বেটা আর কতক্ষণ বা?"

রাম। রুচি, সঙ্গে কিছু আছে?

রুচি। এ যে নূতন গুড়ের টাট্‌কা সোমরস।

রাম। জিতা রহ, মহামাত্য।

রুচি। তুমি ত রাজা হ'লে রামচন্দ্র, এখন আমায় কি করছ বল দেখি?

রাম। রুচি, তুমি আমার একাধারে সব, মহামাত্য থেকে মহাবলাধিকৃত।

দূরে প্রাসাদের অঙ্গনের আর এক কোণে দাঁড়াইয়া পট্টমহাদেবী দত্তদেবী তাহাদিগকে দেখিতেছিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই। সহসা রুচিপতির কর্কশ কণ্ঠস্বরে তাঁহার চিন্তাস্রোত বাধা পাইল, তিনি শুনিলেন রুচিপতি বলিতেছে, "ও বাবা রামচন্দ্র, বুড়ী বেটীর কথা ত ভুলে গেছলুম। ও বেটী রায়বাঘিনী, ও বেঁচে থাকতে যাকে খুশী উদ্যানবিহারে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ও বেটীকে দূর কর। আমি এখন সরে পড়ি।" দত্তদেবীর ভয়ে রুচিপতি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, রামগুপ্ত তাহাকে ধরিতে পারিল না।

তাহাদের কথা শুনিয়া দত্তদেবী বুঝিতে পারিলেন, যে, তাঁহার পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ হইতে বিদায় হইবার সময় নিকটবর্ত্তী। এই সময় কুমার চন্দ্রগুপ্ত আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন। মাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার পর, কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, পিতা না কি পীড়িত?"

উত্তর হইল, "জীবনের আশা নাই।"

"রামগুপ্ত না কি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে?"

"হাঁ বৎস, কাল জয়স্বামিনীর পুত্রের অভিষেক।"

"কি বল্‌চ, মা, পিতা যে আমাকে নিজে বলেছেন, তাঁর কথা আমি কেমন ক'রে অস্বীকার করব?"

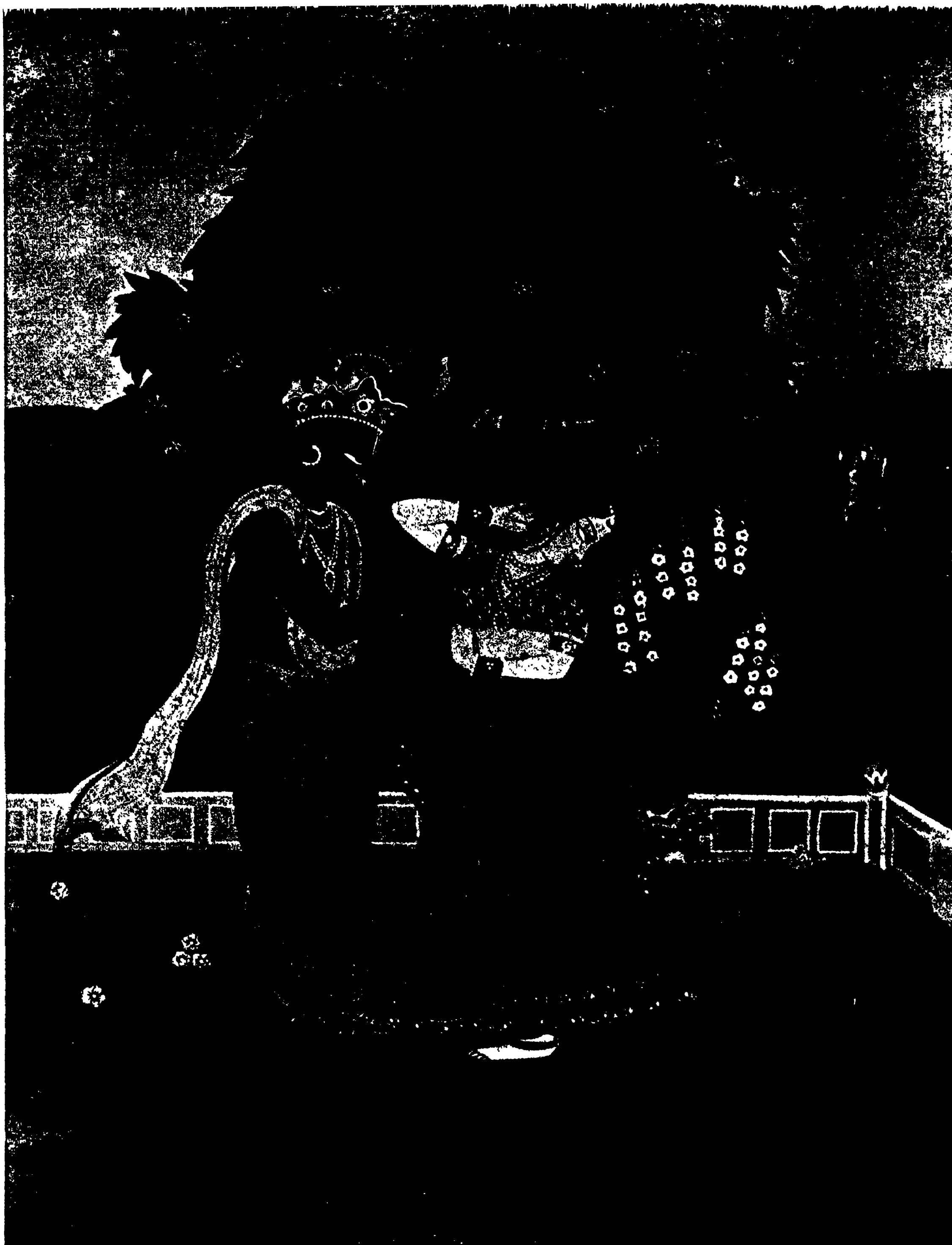
"কেবল তোমায় বলেন নি, আমায় বলেছেন, সাম্রাজ্যের দ্বাদশ মহানায়ককে বলেছেন, রুদ্রধরকে বলেছেন, পাটলিপুত্রের মুখ্য রাজপুরুষদের বলেছেন, আজ সকালই বলেছেন—কিন্তু আবার সন্ধ্যাকালে মত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছেন।"

"কিন্তু, মা, রামগুপ্ত যে জয়স্বামিনীর পুত্র, তিনি ত রাজপুত্রী নন?"

"এখন সকল কথা ভুলে যাও, চন্দ্র। মৃত্যুর করাল ছায়া তোমার পিতার শয্যার চারিদিকে ঘন হয়ে আসছে। এখন আর কোনো কথা বলে তাঁর মনে ব্যথা দিও না। দুদিনের জন্য রাজ্যসম্পদ লোভ ভুলে যাও পুত্র, শুধু পুত্রের কর্ত্তব্য পালন কর।"

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "কিন্তু মা, পাটলিপুত্রের জনে জনে যে রামগুপ্তকে চেনে। পিতার আদেশ শুন্‌লে পৌরজন হয়ত বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, রাজ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হবে। পশ্চিমে শকগণ এখনও যে প্রবল?"

পট্টমহাদেবী বলিলেন, "আমি তোর মা হয়ে বল্‌ছি চন্দ্র, এখন সকল কথা ভুলে যা। তোর পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত, এখন অপমান, অভিমান, শোক, দুঃখ ব্যথা ভুলে গিয়ে পুত্রের কর্ত্তব্য পালন কর।"



রাধা-কৃষ্ণ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"তুমি যখন আদেশ করছ মা, তখন তাই হবে। এ তবে রহস্য নয়?"

"না চন্দ্র। যৌবনে ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে মহারাজ জয়স্বামিনীর কাছে সত্যবদ্ধ হয়ে যে অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিয়েছিলেন, সে কথা তাঁর একেবারে মনে ছিল না। কাল মন্ত্রণাগারে মহানায়কেরা যখন তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করবার প্রস্তাব করছিলেন, তখন জয়স্বামিনী সেই অঙ্গীকার-পত্র দেখিয়ে মহারাজকে সত্যানুরোধে বাধ্য করে রামগুপ্তকে যুবরাজ নির্ব্বাচন করতে স্বীকার করিয়েছে। শোন্ চন্দ্র, স্বামীর মনের অবস্থা বুঝে, তাঁর মনের ভাব অনুভব করে, মনের বলে অশ্রুর উৎস শুষ্ক করে হাসিমুখে সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য করে নিয়েছি। তুই আমার পুত্র, আমি জানি তোর মনের বল অপরিসীম, হাসিমুখে তোর পিতার কাছে যা। অবনতমস্তকে তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ নিয়ে আয়, রাজ্যসম্পদ ধন মান, সমস্তই তুচ্ছ, কেবল ধর্ম্মই সত্য। পুত্র, পিতার কাছে যাও।"

"তোমার আদেশ চিরদিন মাথা পেতে নিয়েছি মা, আজও নিলাম। আমি যাচ্ছি। পিতা আমার মুখে বিষাদের চিহ্নও দেখতে পাবেন না।"

চন্দ্রগুপ্ত প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। সমস্ত শুনিয়া রামগুপ্ত স্তম্ভিত হইয়া ধীরপদে চোরের ন্যায় পলায়ন করিল। দত্তদেবী তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। অজ্ঞাতসারে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার জীবনে কি ঘোরতর বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি সেই কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। দীর্ঘকাল ভাবিয়া বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী স্থির করিলেন যে, প্রথমে স্বামী, তাহার পরে সমস্ত জগৎ, এই তাঁহার কর্ত্তব্য। দত্তদেবী বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথই অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন। পুত্রের ক্ষতি হইল, সিংহাসন তাহার হস্তচ্যুত হইল, হয়ত সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইল তাহা হউক। তাঁহার মন তাঁহাকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিল, ভবিষ্যতের উপায় ভগবান।

একজন দণ্ডধর আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "পরমেশ্বরী, পরম—"

দত্তদেবী বিরক্ত হইয়া, বাধা দিয়া বলিলেন, "উপাধিতে প্রয়োজন নেই, কি চাও? মহারাজ পীড়িত।"

দণ্ডধর অবনতমস্তকে বলিল, "মহাদেবি! রবিগুপ্ত প্রভৃতি মহানায়কগণ দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন।"

দত্তদেবী বলিলেন, "নিয়ে এস।" বলিয়াই দত্তদেবী আবার চিন্তাসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত জগৎ একত্র হইয়া, মুমূর্ষু বৃদ্ধের মৃত্যুকাল ঘনতমসায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে চায় কেন? রাজা অপরাধ করিয়াছেন, প্রথম জীবনের অপরাধের জন্য সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিদিন প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, আর কেন? অপরাধীর শাস্তি কি অনন্ত? প্রধানেরা আসিতেছেন পদত্যাগ করিতে, মুমূর্ষুর মৃত্যুযাতনা শতগুণ বর্দ্ধন করিতে, তাঁহারা রামগুপ্তের অধীনে রাজসেবা করিবেন না। দত্তদেবী কি করিবেন, তিনি আর কতক্ষণ? যে-সিংহাসনে স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছেন, হয়ত কালই সেই সিংহাসনের পাদপীঠে তাঁহার ছিন্নমুণ্ড লুণ্ঠিত হইবে। সপত্নীপুত্র যদি বড় অধিক দয়া করে তাহা হইলে তীর্থ-বাসে যাইতে পারিবেন।

এই সময় দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত, বিশ্বরূপশর্ম্মা ও হরিষেন ধীরে ধীরে আসিয়া দত্তদেবীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। মহাদেবী তখনও ভাবিতেছিলেন, প্রধানদিগকে গিয়া বলিবেন যে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, তাঁহার স্থান এখন বৃদ্ধ স্বামীর শয্যাপার্শ্বে। সহসা একটা নূতন স্রোত আসিয়া দত্তদেবীর চিন্তাসমুদ্রে নূতন তুফান উঠাইয়া দিল, তাঁহার মন বলিল "না না, তোমার আর একটা মহাকর্ত্তব্য আছে, তোমার বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুশয্যায় জগতের ক্ষুদ্র কোলাহল তাঁহার কর্ণে যাইতে দিও না। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পট্টমহাদেবীর কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও।"

এই সময় রবিগুপ্ত ডাকিলেন, "পরমেশ্বরী, পরম,—

চমকিত হইয়া তীব্রবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দত্তদেবী বলিলেন, "আর না, ক্ষমা কর, মহানায়ক। মহারাজের যে অন্তিমকাল উপস্থিত। যে কর্ণ পট্টমহাদেবীর উপাধিচ্ছটা শোনবার জন্য অধীর হয়ে থাকত, সে কর্ণ যে বধির হয়ে আসছে, রবিগুপ্ত।"

বিশ্বরূপ। তবে সংবাদ সত্য ?

দত্ত। ধ্রুব, হে ব্রাহ্মণ, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত আর কখনও আর্য্যপট্টে উপবেশন করিবেন না।

রবি। সেই সংবাদ শুনেই এসেছি, মহাদেবী, আমি গুপ্তবংশজাত, চন্দ্রগুপ্তের অন্নে প্রতিপালিত, সমুদ্রগুপ্তের দাস, আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে।

দেব। মহাদেবী, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত আমাদের উপর যে ভার অর্পণ করেছিলেন—

দত্ত। সেই ভার আর বহন করতে পারছ না দেবদত্ত ? যা সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে স্বেচ্ছায় অবহেলায় স্বচ্ছন্দে বহন করে এসেছ, তা হঠাৎ এই তিনপ্রহরের মধ্যে অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি নারী, কিন্তু আমিও যে পঞ্চাশ বৎসর আর্য্যপট্টে উপবেশন করে এসেছি, এখন কোথায় যাচ্ছি জান ? শ্মশানে !

হরি। মগধের ইতিহাস যে এক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল !

দত্ত। তা কি আমি বুঝি না মহানায়ক ? কে এসেছে, কিসের জন্যে এসেছে, যে মুহূর্ত্তে দণ্ডধর এসে বলে গেল যে তোমরা এসেছ, সেই মুহূর্ত্তেই বুঝেছি। কি বলতে চাও বল, বৃদ্ধ রুদ্রভূতি। রামগুপ্তের কবল থেকে চন্দ্রগুপ্ত বিশিষ্টা নটীকে উদ্ধার করে এনেছে, আর তুমি চিত্র-পুত্তলির মত দণ্ডায়মান ছিলে। তাই বুঝতে পেরেছ যে ভাবে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য এতদিন চলেছে, আর সে-ভাবে চলবে না, তাই অভিমান করে পদত্যাগ করতে এসেছ, মহাপ্রতীহার ?

রবি। কেবল মহাপ্রতীহার নয়, মহাদেবী, আমরা সকলেই রাজকীয় মুদ্রা ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

দত্ত। বল্‌তে লজ্জা হ'ল না বৃদ্ধ ? সমুদ্রগুপ্ত যে এখনও জীবিত, এরই মধ্যে তাঁর সমস্ত ঋণ বিস্মৃত হয়ে গেলে ? রাজা, প্রভু, অন্নদাতা, দীর্ঘজীবনের সহচর, এখন মহাপ্রস্থানের পথিক। প্রচণ্ড দণ্ডধরকে এখন দোর্দ্দণ্ড যমদূত বেষ্টন করে ধরেছে, সহস্র আলোক সত্ত্বেও মৃত্যুর ঘনঘোর কৃষ্ণচ্ছায়া বৃদ্ধের নয়নপথ থেকে দূর হচ্ছে না—আর সেই সময়ে তাঁর চিরজীবনের সখা, বাল্য কৈশোর ও যৌবনের অনুচর, সাম্রাজ্যের প্রধান পুরুষগণ মরণকাতর বৃদ্ধের মৃত্যুযন্ত্রণা বাড়াতে এসেছে ? এই কি বন্ধুপ্রেম, রবিগুপ্ত ? এই কি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান, বিশ্বরূপ ?

বিশ্ব। আর ব'লো না, মা, আর লজ্জা দিও না।

হরি। কিন্তু আমরা কি করব মা ?

দত্ত। কি করবে ? হরিষেন, মানুষ হও। সমুদ্রগুপ্ত ভুল করেছিল, কিন্তু ভেবে দেখ সংসারপথে কার চরণ স্খলিত হয়নি ? সারাটা জীবন সমুদ্রগুপ্ত ক্ষণিক উত্তেজনার প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। জীবনের শেষ দিনেও বৃদ্ধ সত্যরক্ষা করেছেন। যে-বল সংগ্রহ করে সমস্ত জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভরসা বিসর্জ্জন দিয়ে সমুদ্র-গুপ্তকে সিংহাসন রামগুপ্তকে দিতে হয়েছে, তার ফলে নির্ব্বাণপ্রায় দীপের সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। আর কেন ? ক্ষমা কর, মরণকাতর বৃদ্ধের মুখ চেয়ে সারা জীবনের স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি স্মরণ করে, শান্তিতে বৃদ্ধ সম্রাটকে পরপারে যেতে দাও।

সহসা বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী নতজানু হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মহানায়কবর্গ, স্বামী মরণকাতর শক্তিহীন, আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী, পট্টমহিষী, সেই অধিকারে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করছি" দত্তদেবীকে নতজানু হইতে দেখিয়া সকল মহানায়ককে বাধ্য হইয়া নতজানু হইতে হইল। তাঁহারা সমস্বরে কহিলেন, "ক্ষমা কর মহাদেবি ! আমরা এখনই এইস্থান পরিত্যাগ করছি।"

দত্তদেবী উঠিয়া বলিলেন, "না, তা হবে না। চির-জীবনের সঙ্গীকে যে-ভাবে এতদিন অভিবাদন করে এসেছ, আজ শেষ দিনে, সেই ভাবে সম্ভাষণ করে যাও, বৃদ্ধের শেষ মুহূর্ত্ত কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।"

রবি। চন্দ্রগুপ্তের মাতা হয়ে তুমি এই আদেশ করছ, মহাদেবী ?

দত্ত। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে উদ্বেলিত অশ্রুর উৎস শুষ্ক করে চন্দ্রগুপ্তকেও এই আদেশ করেছি।

প্রধানগণ সকলে নতজানু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য তুমি, মহাদেবি ! আর্য্যপট্টে যদি আর কখনও মহাদেবী উপবেশন করে, তবে সে যেন তোমার মত হতে পারে।"

দত্তদেবী আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "সকলে একে একে সম্রাটের শয্যাপ্রান্তে যাও, দেখতে পাবে যে দত্তার রাজ্যহীন পুত্র শুষ্কনেত্রে পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে গেছে। চল, আমিও যাই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাগদত্তা

পাটলিপুত্র নগরপ্রান্তে বিস্তীর্ণ উদ্যানমধ্যে ধর-বংশের প্রকাণ্ড প্রাসাদ গঙ্গার উত্তর তীর হইতে দেখা যাইত। ধর-বংশ গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত। যেদিন সন্ধ্যাকালে মহানায়কবর্গ সমুদ্র-গুপ্তের নিকট শেষ বিদায় লইতে গিয়াছিলেন, তাহার পরদিন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের যুবরাজ ভট্টারকের বাগদত্তা পত্নী ও মহানায়ক রুদ্রধরের কন্যা কুমারী ধ্রুবদেবী উদ্যানে বসিয়া ছিলেন। গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র সরোবরে অসংখ্য মৃণাল ফুটিয়াছিল, সেই সরোবরের শুভ্র মর্ম্মর নির্ম্মিত সোপানাবলীর উপরে একটি বহুদূরবিস্তৃত যুথিকালতা ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। উদ্যানপাল বহুযত্নে যুথিকা লতাটিকে বিতানে পরিণত করিয়াছিল। সেই যুথিকা বিতানের নিম্নে, সর্ব্বোচ্চ সোপানের উপরে, উভয় দিকে এক একটি ক্ষুদ্র শুভ্র মর্ম্মরের বেদী ছিল। বামদিকের বেদীর উপর বসিয়া ধ্রুবদেবীর সখী নাগশ্রী ফুল সাজাইতে ছিলেন এবং ধ্রুবদেবী নিজে উদ্যানের নানাস্থান হইতে নানাজাতীয় ফুল সঞ্চয় করিতেছিলেন। ফুল সাজাইতে সাজাইতে নাগশ্রী অবিরাম আপন মনে কথা বলিয়া যাইতেছিলেন, ধ্রুবদেবী তাহা কখনও শুনিতেছিলেন, কখনও বা অন্যমনস্ক হইতেছিলেন। নাগশ্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কত রকম গুজবই যে উঠে, ধ্রুবা! আমায় আজ বলে গেল রামগুপ্ত নাকি যুবরাজ হবে। সেটা একটা মাতাল, লম্পট—"

ধ্রুবা। তা হলে চন্দ্রগুপ্ত বোধ হয় বনে গিয়েছেন।

নাগ। রামগুপ্তের মত রত্ন যে স্বামীরূপে কার ললাটে উদয় হবেন, ভগবানই জানেন। সে নারী না জানি কত তপস্যাই করেছে!

ধ্রুবা। রহস্য নয়, নাগিনী, রত্ন হয়ত তোর ললাটেই উঠবে।

নাগ। তাহলে আমাকে তখনই আত্মহত্যা করতে হবে।

এই সময় বৃদ্ধা মহল্লিকা আসিয়া ধ্রুবদেবীকে বলিল, "ধ্রুবা, তোর আর্য্যপুত্র এসেছে।"

এই মহল্লিকা শৈশবে ধ্রুবাকে লালনপালন করিয়াছিল, সুতরাং সে ধ্রুবার মাতৃস্থানীয়াই হইয়া উঠিয়াছিল। ধ্রুবদেবী ব্যস্ত হইয়া অঞ্চলের ফুলগুলি নাগশ্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন. "তুই তাঁকে নিয়ে এলি না কেন? তিনি আবার কবে থেকে অনুমতি নিতে আরম্ভ করলেন? আমি যে বড় উৎকণ্ঠায় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি। সম্রাট কেমন আছেন, শুনেছিস?"

মহল্লিকা বলিল, "ধ্রুবা, যুবরাজ আজ সত্যসত্যই তোমার অনুমতির প্রতীক্ষায় দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যখন বল্লাম যে এ গৃহ আপনার, কারণ আপনি ধ্রুবার স্বামী আর আমার ভবিষ্যৎ প্রভু, তখন তিনি বললেন যে কালের পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছে।"

ধ্রুবা। মহল্লিকা, তোর কথা শুনে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠছে। তুই যা, শীঘ্র আর্য্যপুত্রকে এইখানে ডেকে নিয়ে আয়। নাগিনী, তুইও যা, আমার প্রাণ বড় উতলা হয়েছে।

মহল্লিকা ও নাগশ্রী চলিয়া গেল। ধ্রুবদেবী ভাবিতে লাগিলেন, কেন এলেন না,—কি হ'ল? একদিনে এমন কি পরিবর্ত্তন হতে পারে? তবে কি আর্য্যপুত্রের মনোভাবই পরিবর্ত্তিত হয়েছে? না, চন্দ্রগুপ্ত তেমন মানুষ নয়। রামগুপ্তের মত পশুর পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু দত্তদেবীর পুত্রের পক্ষে অসম্ভব।

এমন সময় মহল্লিকা ও নাগশ্রী চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। বেদী হইতে বহুদূরে দাঁড়াইয়া শুষ্কমুখে চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "দেবি, বিদায় নিতে এসেছি।"

ধ্রুবদেবী তাঁহার দিকে ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু মুখের ভাব দেখিয়া, সাহস করিয়া স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদায়? এ কি অশুভ কথা, আর্য্যপুত্র? আপনার এ বেশ কেন? আপনি

আজ নিতান্ত অপরিচিতের মত অনুমতির অপেক্ষায় দুয়ারে দাঁড়িয়েছিলেন কেন? সম্রাট কি তবে নাই?"

চন্দ্রগুপ্ত ধ্রুবদেবীর মুখের দিকে না চাহিয়া বলিলেন, "এখনও আছেন, তবে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় পিতার জীবন-প্রদীপ নিবে যাবে। বিদায় নিতে এসেছি, দেবি!"

ধ্রুবা। আবার ও-কথা কেন? আমি কি অপরাধ করেছি? কি হয়েছে বলুন? আমি যে আর সংশয় চেপে রাখতে পারছি না। আর্য্যপুত্র, আপনাকে বিদায়—

চন্দ্র। দেবি! কাল প্রভাতে যার ছিন্নমুণ্ড পাটলিপুত্রের শ্মশানে লুণ্ঠিত হতে পারে, সে কোন্ সাহসে পরমভট্টারকপদীয় মহানায়ক, মহাসামন্ত, রুদ্রধরের জামাতা হতে চাইবে? সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের শেষ আদেশ, কুমার রামগুপ্ত যুবরাজ, অর্থাৎ কাল সকালে সম্রাট আর আমি পথের ভিখারী, হয়ত নূতন সম্রাটের শরীররক্ষী সেনা, বন্য পশুর মত আমাকে পাটলিপুত্রের রাজপথে হত্যা করবে। যদি তা না করে—

ধ্রুবা। যেখানে তুমি সেখানে আমি। যুবরাজ—না না, কুমার, আমি যে তোমার বাগদত্তা পত্নী।

চন্দ্র। স্বপ্ন! ভুলে যাও, দেবি! মনে কর চন্দ্রগুপ্ত মৃত। অতীতের কথা মন থেকে মুছে ফেলে দাও।

ধ্রুব। তা হয় না, আর্য্যপুত্র। অন্যপূর্ব্বা কন্যা তা পারে না। শাস্ত্রমতে আমি তোমার স্ত্রী। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে কোথায় যাবে? সুখের দিনে আমাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে গ্রহণ করেছিলে, আর আজ তোমার দুঃখের দিনে আমি সে কথা ভুলে যাব? আর্য্যপুত্র, রুদ্রধরের কন্যা কি গণিকা?

চন্দ্র। তুমি কুলকন্যা ধ্রুবা, এখনও অবিবাহিতা। তোমার পায়ে ধরি, মিনতি করি, আমায় ভুলে যাও। কাল সন্ধ্যা থেকে লক্ষ লক্ষ নাগপাশ আমাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে ধরেছে, তার উপর আবার তুমি এস না। তোমাদের ভুলতে হৃদয় ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে, কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে, তাও করতে হবে।"

ধ্রুবা। না, আর্য্যপুত্র, আমার মুখের দিকে ত তুমি চাইছ না, একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা কও, তা হলে ও-কথা তোমার মুখে আসবে না। তুমি চেয়ে দেখছ না কেন? একবার চাও। চেয়ে দেখ ধ্রুবা দ্বিচারিণী হতে পারবে কি না। ধর-বংশের কন্যা যেমন ভাবে হীরামুক্তাখচিত পথে চলতে পারে, আবার তেমন ভাবেই স্বামীর ভিক্ষালব্ধ অন্নে হাসিমুখে জীবনধারণ করতে পারে।

চন্দ্র। চেয়ে দেখলাম, কিছু যে বলতে পারছি না ধ্রুবা? মিনতি করি, ভুলে যাও, চন্দ্রগুপ্ত মৃত।

ধ্রুবা। তবে রুদ্রধরের কন্যা চন্দ্রগুপ্তের বিধবা।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রুদ্রধর বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা।" রুদ্রধর যূথিকা-বিতানের নিকট আসিয়া, অত্যন্ত অভদ্রভাবে, কর্কশ স্বরে বলিলেন, "রুদ্রধরের কন্যা গুপ্তকুলের বাগদত্তা পত্নী। কুমার চন্দ্রগুপ্ত, তুমি আমার বিনা অনুমতিতে, আমার কন্যার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছ কেন?"

চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি দেবীর অনুমতি নিয়ে এসেছি মহানায়ক, নিত্য যে-ভাবে আসি, আজও সেইভাবে এসেছি।"

রুদ্র। কাল তুমি যা ছিলে, আজ আর তা নও চন্দ্রগুপ্ত, তুমি কাল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ যুবরাজ ছিলে, আজ তুমি অন্নহীন, বিত্তহীন, একজন সামান্য রাজপুত্র।

ধ্রুবা। পিতা, কুমার চন্দ্রগুপ্ত যে আমার স্বামী, আমি যে তাঁর বাগ্‌দত্তা পত্নী।

রুদ্র। আবার বল্‌ছি, মিথ্যা কথা। আমার কন্যা, গুপ্তসাম্রাজ্যের যুবরাজের বাগদত্তা পত্নী, কুমার চন্দ্রগুপ্তের নয়। ধর-বংশের কন্যা কখনও সম্রাটকুলে দাসীবৃত্তি করেনি। আজ রামগুপ্ত যুবরাজ। ধ্রুবা, তুমি যুবরাজ ভট্টারক রামগুপ্ত দেবের বাগদত্তা পত্নী। আমার অথবা তোমার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

ধ্রুবা। না হয় নি। শোন পিতা, তুমি পিতা, গুরু, আমি তোমার কন্যা, কিন্তু আমি গণিকা নই। পাটলিপুত্রের কুলকন্যা আজ কুক্কুরীর মত উচ্চ মূল্যে বিক্রয়

হবে? কখনও নয়। রামগুপ্ত আমার স্বামী? কেমন করে? তিনি আমার ভাসুর!

রুদ্র। কুমার চন্দ্রগুপ্ত, এই দণ্ডে তুমি আমার গৃহের সীমা পরিত্যাগ কর, নতুবা—

চন্দ্র। নতুবা কুক্কুরের মত আমাকে পদাঘাতে বিদায় করবে, মহানায়ক? তার প্রয়োজন হবে না, আমিও সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝে তোমার কন্যার কাছে চিরবিদায় নিতে এসেছিলাম। বিদায়, ধ্রুবদেবি!

ধ্রুবা। আর্য্যপুত্র, চন্দ্রগুপ্ত, স্বামী, আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে রক্ষা কর।

"বিদায়, ধ্রুবা" বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। ধ্রুবদেবী তাঁহার পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতেছিলেন, স্বয়ং রুদ্রধর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। বহুদূর পর্যন্ত অনাথা কুমারীর আর্ত্তনাদ চন্দ্রগুপ্তের কর্ণে পৌছিল। রুদ্রধর প্রতীহারী ডাকাইয়া ধ্রুবাকে বাঁধিয়া তাঁহাকে নাট্যশালার নেপথ্য-গৃহে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। যাইবার সময় তিনি বলিলেন, "জেনে রাখ, আর্য্যাবর্ত্তে কন্যা পিতার সম্পত্তি।" উন্নত-শির কন্যা কহিল, "পিতা জেনে রাখ, আর্য্যাবর্ত্তে নারী স্বামীর সম্পত্তি, ধ্রুবা চন্দ্রগুপ্তের ধর্ম্মপত্নী, সুতরাং এখন আর আমাতে তোমার কোনো অধিকার নাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আর্য্যপট্ট

পরদিন উষাকালে হতচেতন বৃদ্ধ সমুদ্রগুপ্ত বিনশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। অবশ্য রামগুপ্ত যখন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তখন পাটলিপুত্রে নিত্যনূতন দৃশ্য দেখা যাইবে একথা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধ সমুদ্রগুপ্ত তনুত্যাগ করিতে-না-করিতেই রাজপ্রাসাদে যে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল, তাহাতে পাটলিপুত্রবাসীর চক্ষু ফুটিয়া গেল।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর চারিদিক হইতে আত্মীয়-স্বজনের সমাগম হইল, সৎকারের আয়োজন চলিতে লাগিল। সম্রাটের দেহ সুবর্ণের খট্টায় রাখিয়া নানাবিধ রত্নালঙ্কারে ও পুষ্পসজ্জায় সাজান হইল। একদল লোক গিয়া গঙ্গাতীরে শ্বেত রক্ত চন্দনের বিশাল চিতা যোজনা করিল। যখন গঙ্গাযাত্রা করিবার উদ্যোগ হইল, তখন দেখা গেল যে, রামগুপ্ত অনুপস্থিত। দেবগুপ্ত ও রবিগুপ্ত নূতন সম্রাটের সন্ধানে শৌণ্ডিক-বীথি ও বারবনিতা পল্লীতে অশ্বারোহী পাঠাইলেন, দত্তদেবী ও চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের মৃতদেহের পাশে বসিয়া রহিলেন। বিশ্বরূপ বিশাল প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে নূতন সম্রাটকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন যে, সমুদ্রগৃহের দ্বার রুদ্ধ, অথচ একজন প্রতীহার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, নূতন সম্রাট এবং তাঁহার নূতন অমাত্য ভিতরে আছেন। বিশ্বরূপ একাকী রত্নদ্বয়ের সম্মুখে না গিয়া মহানায়কবর্গকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, স্বর্গগত সম্রাটের গঙ্গাযাত্রা প্রস্তুত, নূতন সম্রাটকে উঠিতে হইবে। হঠাৎ রুচিপতি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আর্য্যপট্ট তাহলে শূন্য থাকবে?"

বিশ্বরূপ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "যুবরাজ, আপনি এখন অশুচি, অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধ হবেন, তারপর আপনার অভিষেক হবে। অশুচি অবস্থায় আর্য্যপট্ট স্পর্শ করলে, বেদী ভেঙে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রাম। এ ক'দিন তাহলে আর্য্যপট্টে বস্‌বে কে?

বিশ্ব। রাজ্যের দ্বাদশ প্রধান।

রুচি। মরে যাই আর কি, আর আমরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছি। রামচন্দ্র, ও বুড়োগুলোর কথা শুনো না, বাপ, চেপে বসে থাক। তুমি রাজা থাক বা না থাক, আমি ত এখন থেকেই মন্ত্রী হচ্ছি।

রবি। হে ব্রাহ্মণ, আর্য্যপট্ট অশুচি করবার প্রয়োজন নেই। নূতন সম্রাট যদি আপনাকে অমাত্যপদে বরণ করেন, তাহলে যথাসময়ে রাজমুদ্রা আপনাকে অর্পিত হবে, কিন্তু এ কদিন আমরা আপনার আদেশমত সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করব।

রুচি। বেড়ে গাইছ বটে বুড়ো রসিক। কিন্তু এ যে ধ্রুপদ, আমি এতদিন কেবল খেম্‌টাই শুনে আস্‌ছি।

এই সময় জয়স্বামিনী বেগে প্রবেশ করিয়া একজন

দণ্ডধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা গেল সে কুলাঙ্গার?' নূতন সম্রাট ইতিমধ্যেই আর্য্যপট্টে উঠিয়া বসিয়াছেন, এই সংবাদ প্রাসাদে এবং নগরে বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। পৌরসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ, অমাত্যবর্গ, কুলপুত্রগণ, প্রতীহার, দণ্ডধর ও দৌবারিকে সমুদ্রগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। একজন দণ্ডধর নূতন রাজমাতার কথা শুনিয়া জনান্তিকে বলিল, "কুলাঙ্গারই বটে।" জয়স্বামিনী পুত্রকে আর্য্যপট্টে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, "তুই হতভাগা এখানে এসে বসে আছিস, আর ওদিকে যে সম্রাটের গঙ্গাযাত্রা হচ্ছে না!"

রাম। ব্যস্ত কেন মা? সম্রাট যখন মরেছেন, তখন গঙ্গাতীরেও যাবেন, দগ্ধও হবেন।

রুচি। সিংহাসনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল কি না মা, তাই আগে থেকে অধিকার হয়েছে।

রাম। আর দত্তঠাকুরাণী যাতে হীরা মুক্তাগুলি এই ফাঁকে সরিয়ে ফেলতে না পারেন, তার ব্যবস্থা করছি।

জয়। তোকে এ বুদ্ধি কে দিল?

রাম। কেন, আমার মন্ত্রী রুচিপতি।

জয়। তোর রুচি, যমের অরুচি। ওরে কুলাঙ্গার, তোর পিতার মৃতদেহ প্রাসাদের অঙ্গনে পড়ে আছে, জ্ঞাতিবর্গ তোর প্রতীক্ষায় বসে আছে, আর তুই কি-না অশুচি অবস্থায় সিংহাসনে চড়ে বসে আছিস?

রাম। তুমি বুঝছ না মা, আগে সিংহাসনটাতে পাকা হয়ে নি। পরে পিতাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাব।

রুচি। মহারাজের ভয় হচ্ছে মা, পাছে আর্য্যপট্ট থেকে পিছলে পড়েন।

এই সময়ে দত্তদেবী সমুদ্রগৃহে প্রবেশ করায় সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল, এবং অভিবাদন করিল। তিনি রুচিপতির কথা শুনিয়াছিলেন, উত্তরে বলিলেন, "কোনো ভয় নাই ব্রাহ্মণ, মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত তনুত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আদেশ প্রতিপালন করতে আমি আছি। পুত্র, তুমি নেমে এস, সিংহাসন থেকে তোমার পদ স্খলিত হবে না। মহারাজের দেহ অনেকক্ষণ অঙ্গনে পড়ে আছে, তীব্র রৌদ্রে দেহ বিকল হবে, আমার মনে হচ্ছে তাঁর কষ্ট হবে।"

রুচি। এর পরে তোমার ছেলে যদি তোমার কথা না শোনে?

দত্ত। ব্রাহ্মণ, কে তুমি জানি না। আমার পুত্র সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। সে পিতার আদেশ অবহেলা করবে না।

রুচি। বিশ্বাস কি?

দত্ত। কে আছিস, চন্দ্রগুপ্তকে সমুদ্রগৃহে নিয়ে আয়।

একজন দণ্ডধর চলিয়া গেল। রামগুপ্ত পট্টমহাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রাসাদের হীরে মুক্তোগুলো কোথায় রেখেছেন, ঠাকরুণ?"

লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "সমস্তই আছে, সমস্তই তোমার, পুত্র, কিছু নিয়ে যাব না।"

সমুদ্রগৃহের সমস্ত লোক রুষ্ট হইয়া উঠিল, হরিষেন বলিয়া ফেলিলেন, "ছি, ছি, একি অভদ্র ব্যবহার! মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে নারী সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরী ছিলেন, স্বামীর শোকে যিনি এখনও বিহ্বলা, কোন্ প্রাণে তাঁর অঙ্গের অলঙ্কার চাইছ, যুবরাজ?" শত শত অসি কোষে ঝঙ্কৃত হইল, পৌরসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ ও মহানায়কগণ দত্তদেবীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। রামগুপ্ত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "প্রাসাদের সমস্ত মণিমুক্তাই ওঁর কাছে আছে, পরে যদি কিছু না মেলে সেই জন্যে আগে থাকতে বলে রাখছি। অঙ্গের অলঙ্কারের কথা কি আমি বলতে পারি?"

জয়স্বামিনী উপস্থিত জনসঙ্ঘের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "রাম, এখন ও-সব কথা তুলে কাজ নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া দত্তদেবী বলিলেন, "লজ্জা কিসের দিদি, প্রাসাদ থেকে কিছু নিয়ে যাব না, তোমার সম্মুখে অঙ্গের বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে যাচ্ছি।" ক্ষিপ্রহস্তে সর্ব্বাঙ্গের বহুমূল্য অলঙ্কার আর্য্যপট্টের প্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া দত্তদেবী আবার কহিলেন, "লজ্জা নিবারণের জন্য কেহ আমাকে একখানা বস্ত্র ভিক্ষা দাও।"

আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ রবিগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা, ভিক্ষা করবে তুমি? তোমার স্বামীর অন্নে আমার মত শত শত কুকুরের দেহ পুষ্ট—এতদিন পুত্রের মত লক্ষ লক্ষ প্রজা প্রতিপালন করেছ তুমি, তুমি আজ ভিক্ষা করছ? এও আমাকে শুন্‌তে হ'ল? সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত বস্ত্র নাও, মা।"

রবিগুপ্তের উত্তরচ্ছদ ও উষ্ণীষের সহিত রামগুপ্ত ও রুচিপতি ব্যতীত সেই দণ্ডে সমুদ্রগৃহে উপস্থিত সমস্ত নাগরিকগণের উত্তরচ্ছদ ও উষ্ণীষ বৃদ্ধা পট্টমহাদেবীর চরণপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহার নয়নকোণে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। দত্তদেবী এক দণ্ডধরকে বলিলেন, "তুমি আমার ভাণ্ডারীকে ডেকে নিয়ে এস। পুত্র, সামান্য একটু বিশ্রাম কর, অন্তরালে গিয়ে অঙ্গের বস্ত্র খুলে দিচ্ছি।"

দত্তদেবী অন্তরালে যাইবামাত্র রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "সঙ্গে একজন লোক দিলে ভাল হ'ত না?"

ক্রুদ্ধ হইয়া একজন নাগরিক উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওরে এ বেটা কে রে? এর জিব্‌টা টেনে উপড়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে করছে।"

নগরশ্রেষ্ঠী বলিল, "সংযত হও, এ ব্যক্তি পূর্ব্বে যাই থাক, এখন হয়েছে মহানায়ক মহামাত্য রুচিপতি শর্ম্মা।" নাগরিক বলিল, "জয়নাগ, ও যাই হোক, মাতা পট্ট-মহাদেবীর সম্বন্ধে যেন সংযত হয়ে কথা বলে।"

এই সময় দত্তদেবী রবিগুপ্তের উষ্ণীষ পরিধান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আর্য্যপট্টের সম্মুখে পূর্ব্ব বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "পুত্র, এই নাও বস্ত্র।" তাঁহার ভাণ্ডারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহাকে সমস্ত চাবি জয়স্বামিনীকে দিতে আদেশ করিলেন। ভাণ্ডারী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনার নিজস্ব রত্নপ্রকোষ্ঠের চাবি?" আদেশ হইল, "আমার পিতৃদত্ত বসনভূষণও সম্রাটকে দিয়ে গেলাম।"

এই সময় চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দত্তদেবী আদেশ করিলেন, "পুত্র, অঙ্গের সমস্ত বসনভূষণ অলঙ্কার আর্য্যপট্টের সম্মুখে রাখ।"

অলঙ্কারগুলি চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহার পর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, বসন কেমন করে দেব।"

দত্তদেবী বলিলেন, "ভিক্ষা করে বসন নিয়ে আয়।"

যাহারা পূর্ব্বে উষ্ণীষ ও উত্তরচ্ছদ খুলিয়া দিয়াছিল, তাহারা সকলে আবার বস্ত্রগুলি চন্দ্রগুপ্তের পদপ্রান্তে রাখিল। বহুমূল্য বারাণসীর কৌষেয় অন্তরালে পরিত্যাগ করিয়া, চন্দ্রগুপ্ত যখন সমুদ্রগৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পশ্চাৎ হইতে একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল, "উঃ, কি ভীষণ মনের বল!"

জয়নাগ বলিল, "এমন না হ'লে এতদিন সাম্রাজ্য শাসন করে এসেছে?" শুভ্রবসন পরিহিত মাতা পুত্র যখন ভূষণহীন হইয়া আর্য্যপট্টের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন সমুদ্রগৃহের অনেকেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া দত্তদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দ্র, আমাকে স্পর্শ করে বল, সিংহাসন সম্বন্ধে তোমার পিতার আদেশ কি?"

চন্দ্র। সকলের সম্মুখে পিতা আর্য্য রামগুপ্তকে সিংহাসন দিয়ে গিয়েছেন।

দত্ত। পুত্র, তোমার জ্যেষ্ঠের মনে এখনও সন্দেহ আছে।

চন্দ্র। তোমাকে স্পর্শ করে শপথ করছি মা, মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত জীবিত থাক্‌তে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যপট্ট স্পর্শ করবে না।

জয়নাগ। আর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, শপথ করবেন না—শপথ করবেন না। পাটলিপুত্রীক পৌরসঙ্ঘ এবং মাগধজানপদ-সঙ্ঘ কুমার রামগুপ্তকে সম্রাটরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

চন্দ্র। নগরশ্রেষ্ঠী, শপথ যে করে ফেলেছি।

জয়নাগ। শপথ ভঙ্গ করতে হবে কুমার, চিরশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববরণীয় পাটলিপুত্রীক পৌরসঙ্ঘের আদেশ, কুমার রামগুপ্ত দণ্ডধারণের অযোগ্য এবং আপনিই সাম্রাজ্যের উপযুক্ত সম্রাট।

চন্দ্র। শোন নাগরিকগণ, আর্য্য পৌরসঙ্ঘ পূজনীয়, কিন্তু আমিও সমুদ্রগুপ্তের পুত্র, পিতার সম্মুখে যে-প্রতিজ্ঞা

করেছি, এইমাত্র মাতৃদেহ স্পর্শ করে যে-শপথ করেছি, তা ভঙ্গ করা চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সম্ভব নয়। ভ্রাতা, সিংহাসন তোমার, আমি ভিক্ষা করে খাব। তুমি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, পিতৃসংকারের যথার্থ অধিকারী, এইবার চল।

দত্ত। নিশ্চিন্তমনে চল রামগুপ্ত। আমরা মাতা-পুত্রে তোমার প্রাসাদ থেকে বাহির হয়ে যাচ্ছি, আর ফিরব না।

রুচি। এইবার যাওয়া যেতে পারে, রামচন্দ্র।

এতক্ষণে পরমেশ্বর, পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের সংকারের উপায় হইল।

ক্রমশঃ

তাজমহল

শ্রীকৃষ্ণধন দে

বল আজি তাহাদের কথা,—
মর্ম্মরের বুকে যারা লিখে গেছে ব্যথার বারতা,
যৌবনের কত ব্যর্থ গান! কত গভীর নিঃশ্বাস
রেখে গেছে তৃষাদগ্ধ জীবনের মৌন ইতিহাস
শুভ্র পাষাণের গায়ে! সত্য বল,—এ তাজমহল
কা'দের বেদনাস্তূপ? কা'দের সঞ্চিত অশ্রুজল?
কোন্ তীব্র অভিশাপ যৌবনের সুখস্বপ্নহারা
আজিও ফিরিছে হেথা? সীমাহীন কোন্ সে সাহারা
আজিও নিসাড়বক্ষে জ্বালিয়াছে মিথ্যা-মরীচিকা—
কোন্ যুগযুগান্তের অনির্ব্বাণ প্রেমবহ্নিশিখা!

বল আজি তাহাদের কথা,—
বাইশ বৎসর ধরি ভাঙিয়াছে যারা নীরবতা
হেথা মৌন ধরণীর! ঐশ্বর্য্যের মণিময় দ্বারে
ঢেলে দিয়ে গেছে যারা নিঃশেষে উজাড়ি আপনারে
তুচ্ছ মুদ্রা-বিনিময়ে! কত শান্ত বসন্ত-সন্ধ্যায়
নির্ম্মম পাষাণপ্রান্তে লুটাইয়া অসহ তৃষ্ণায়
কত তপ্ত দীর্ঘশ্বাস রেখে গেছে দক্ষিণ বাতাসে!
সে বেদনা অভিশাপ লেখা নাই কোনো ইতিহাসে।
কত যৌবনের ফুল ঝরে গেছে কে রাখে সন্ধান,
সহস্র হৃদয় ভাঙি গড়েছে এ তাজ শাজাহান!

বল আজি তাহাদের কথা,—
কঠিন পাষাণ-বুকে ফুটায়েছে যারা পুষ্পলতা
যৌবনের পুষ্পবিনিময়ে! কোন্ দুরান্ত-প্রিয়ায়
কর্ম্ম-অবসরে তারা স্মরিয়াছে এমনি সন্ধ্যায়
যমুনার কলগীতিমাঝে! তন্দ্রাহীন মধ্যরাতে
নিঃশব্দে পাঠায়েছিল বিরহের তীব্র বেদনাতে
রচি কোন্ মেঘদূত? কোন্ উষা-তারকার সাথে
কহেছে প্রিয়ার কথা? কোন্ অলক্ষিত অশ্রুপাতে
নীরবে আনতমুখে পাষাণ কাটিয়া থরে থরে
আপনারি প্রেমস্মৃতি এঁকে গেছে পাষাণ-অক্ষরে!

বল আজি তাহাদের কথা,—
যে মোহন যাদুদণ্ডে ফুটিয়াছে বিরহীর ব্যথা,
যুগযুগান্তের বুকে মর্ম্মরের শুভ্র শতদল,—
সীমাহীন নভোতলে মৃত্যুহীন প্রেম অচঞ্চল
অম্লান মূরতি ধরি,—সে কি শুধু একা-নৃপতির?
যে মন্ত্রে চেতনা লভি দাঁড়ায়েছে তুলি উচ্চশির
অপূর্ব্ব প্রেমের স্বপ্ন,—সে কি শুধু রাজার আদেশ?
শিল্পীর হৃদয়তলে যে কামনা হয়েছে নিঃশেষ
দিশাহীন হাহাকারে,—সে কি শুধু পাষাণের গায়ে
মিথ্যা-ইতিহাসে আজও অলক্ষিতে রহিবে লুকায়ে?



"গীতা"

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে "গীতা"-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় একস্থলে লিখিয়াছেন যে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গীতা-ব্যাখ্যার 'প্রথমাংশে যে উৎকর্ষ ও বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, শেষ পর্য্যন্ত তাহা রক্ষিত হয় নাই।"

এই অসঙ্গতির কারণ কি তাহা যদি গিরীন্দ্রবাবু ইঙ্গিতে বা স্পষ্ট ভাবে লিখিতেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। এই বিষয়ে আমি যাহা জানি তাহা লিখিতেছি। ন্যূনাধিক কুড়ি বৎসর হইল একখানি চটি বই কলিকাতার রাস্তায় কিনিয়া দেখিলাম যে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাসহ গীতার প্রথম চারি অধ্যায়। তাহার ভূমিকাতে এই উক্তি ছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু চারি অধ্যায়ের অধিক লিখিতে পারেন নাই। যদি সেই পুস্তকের উক্তি সত্য হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত ভূমিক সংবলিত যে-গীতা দেখিতে পাই তাহার পঞ্চম অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত এবং সেই ভূমিকাটি সমস্তই প্রকাশকের প্রক্ষেপ বা জাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশকের আর একটি কার্য্যের বা কাণ্ডের সংবাদ শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র না কি লিখিয়াছেলেন যে তাঁহার সময়ে দুইজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিলেন—১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২। কেশবচন্দ্র সেন। প্রকাশক না কি কেশবচন্দ্র সেনের নামটা কাটিয়া দিয়াছেন।

শ্রীবীরেশ্বর সেন

—

"শরৎচন্দ্র"

আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "শরৎচন্দ্র"-শীর্ষক নিবন্ধে প্রথম দিকে এই মর্ম্মে লেখা আছে যে, আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম আবির্ভাব বঙ্গদর্শনে। এর পূর্ব্বে বাঙালীর আপন মনের ভাষা সাহিত্যে স্থান পায় নাই। আমার মনে হয় কথাটি ঐতিহাসিক বিচারসহ নহে। বঙ্গদর্শনের বহুপূর্ব্বে যে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আধুনিক বাংলা ভাষার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা যে-কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক পুরাতন সংখ্যাগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে এই তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন।

আধুনিক ভাষা বলিতে রবীন্দ্রনাথ যদি কথিত ভাষা বুঝিয়া থাকেন তবে তাহাও 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং ঐ সকল গ্রন্থের যে বঙ্গসাহিত্যে রীতিমত স্থান আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীকল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

মণ্টেসোরী শিক্ষা-প্রণালী

প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যায় ৭০৪ পৃষ্ঠায় মণ্টেসোরী শিক্ষা প্রণালীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে—

"লণ্ডনে একটি মন্তেশরী সঙ্ঘ আছে; হ্যামষ্টেড্ পল্লীতে তাহার প্রধান কেন্দ্র। এই স্থানে প্রতি বৎসর একটি ক্লাস খোলা হয় এবং কুমারী মন্তেসরী নিজে আসিয়া এই ক্লাসের অধ্যাপনার কাজ করেন। "রোস্ক" ছাড়া আর কোথাও এখন এইরূপ ক্লাস নাই, সেজন্য ইউরোপ হইতে অনেক শিক্ষয়িত্রী লণ্ডনে আসিয়া ডিপ্লোমা লইয়া যান।"

আমার মনে হয় "রোস্ক" শব্দটি মুদ্রাকরের ভুল এবং উহা "রোম" (ইতালি) হইবে। মণ্টেসোরী শিক্ষাপ্রণালী শিখিবার সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে দু চারিটি কথা বলিতে চাই।

লণ্ডনে মণ্টেসোরী শিক্ষাপ্রণালী শিখিবার সুবিধা অসুবিধার সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত খবর জানি না। আমি রোম যখন ডাঃ মণ্টেসোরীর আন্তর্জ্জাতিক বিদ্যালয়ে যাই, তখন দেখি যে অনেক আমেরিকান্ ইংরেজ জার্ম্মান, অষ্ট্রিয়ান্ ও বিভিন্ন দেশীয় শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা উক্ত বিদ্যালয়ে ডাঃ মণ্টেসোরীর তত্ত্বাবধানে পড়িতেছিলেন। গত বৎসর চার জন ভারতীয় মহিলা, তিন জন হিন্দু ও এক জন মুসলমান উক্ত বিদ্যালয়ে পড়িতেছিলেন। গত জুন মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'-এ "নূতন ইতালি ও বৃহত্তর ভারত" প্রবন্ধে আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি। এই চার জন ভারত-মহিলা গত জুন মাসে পরীক্ষা পাস করিয়া ডিপ্লোমা পাইয়াছেন।

ডাঃ মণ্টেসোরী ইতালিয়ান্ ভাষায় বক্তৃতা দেন—উক্ত বক্তৃতা উপযুক্ত শিক্ষকরা ইংরেজী, জার্ম্মান ও অন্যান্য ভাষায় তরজমা করিয়া দেন। তারপর অপেরা মণ্টেসোরী নামক বিদ্যালয়ে হাতে কলমে শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। যে-সমস্ত ভারতবাসীরা মণ্টেসোরী প্রথা শিখিবার জন্য বিদেশে যাইতে চান, তাঁহারা ইতালির "রোমে" গেলে ভাল হয়।

ভারতের এমন দুর্দ্দশা যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে যাহা শিখিবার আছে তাহা শিখিবার জন্য সকলে ইংলণ্ড যাইতে মহাব্যস্ত। ইংরেজেরা কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, বাজনা, চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি শিখিবার জন্য ইতালিতে যায়। শত শত ইংরেজ বিজ্ঞানবিশারদেরা জার্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে মিলিয়া গবেষণা করে, কিন্তু ভারতবর্ষের যুবক যুবতীরা ইংলণ্ডে যাইতে পারিলে কৃতার্থ মনে করেন। ভারতের এমন দুর্দ্দশা যে, কয়েকদিন হইল শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলিয়াছেন যে, তিনি ইংলণ্ডকে তাঁহার "intellectual home" (শিক্ষা ও দীক্ষার আবাসভূমি) বলিয়া মনে করেন। এ কথা লণ্ডনের Sunday Times-এ ছাপা হইয়াছে।

ইতালি, জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে আমাদের যুবক যুবতীদের যাওয়া উচিত। এ সমস্ত দেশে জাতিবিদ্বেষ কম। ইংরেজের দেশে ভারতবাসী নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তারপর ইতালি অপেক্ষাকৃত গরম দেশ। ইংলণ্ডের মত খারাপ

নয় এবং থাওয়া থাকার খরচ কম। যাঁহারা বিদেশে শিক্ষার জন্য আসিতে চাহেন, তাঁহারা দেশে যতদূর সম্ভব শেখা যায় তাহা পূর্ণ করিয়া বিদেশে গেলে অল্প সময়ে কম খরচে বিশেষ জ্ঞানলাভের সুযোগ পাইবেন।

যাঁহারা ভারত হইতে ইউরোপে ভ্রমণের জন্য আসেন তাঁহারা ইংরেজী জাহাজে না বেড়াইয়া—জাপানী, জার্ম্মান বা ইতালিয়ান্ জাহাজে প্রথমে ইতালিতে নামিয়া ইতালি, সুইজারলণ্ড, জার্ম্মানি ও অন্য দেশ হইয়া ইংলণ্ড গিয়া পরে ফ্রান্স দিয়া দেশে ফিরিয়া গেলে ইউরোপের লোকদের সম্বন্ধে বেশী জ্ঞানের সম্ভাবনা। তারপর ইউরোপের অন্যান্য দেশ দেখিলে পরে ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনা করিবার সুবিধা হয়। শুধু তাহাই নয়, বাংলার আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করিবার জন্য ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দূরদর্শী, বিজ্ঞ, স্বদেশপ্রাণ লোকের যাওয়া দরকার।

বিদেশের কাছে চিরকাল ছাত্রের মত শিক্ষা করিতে হইবে এমন কথা নয়। বিদেশের মত দেশেও শিক্ষার সুযোগের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহার জন্য উপযুক্ত যুবক-যুবতীদের বিদেশে যাওয়া দরকার। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের ট্রেনিং বিভাগে শ্রীমতী সোম যে মন্টেসোরী শিক্ষাপ্রণালী শিখাইতেছেন তার ফল খুব ভাল হইবে এবং আশা করি, বাংলায় এমন দিন আসিবে যে, কোন বিষয়ের সাধারণ শিক্ষার জন্য ভারতের যুবক-যুবতীদের বিদেশে যাইতে হইবে না।

শ্রীতারকনাথ দাস
মিউনিক, জার্ম্মানি

—

শিল্প-সমবায়

যে দেশের আর্থিক সচ্ছলতা প্রচুর, সে দেশের শিল্পেরই চরম উন্নতি লাভ হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অর্থ-সাহায্য ব্যতিরেকে কোন শিল্পই বেশী দিন টিঁকিতে পারে না। শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি জনসাধারণের সুনজরও শিল্পরক্ষার অন্যতম প্রধান কারণ। দেশের অর্থবল কমিয়া গেলে, প্রয়োজনীয় জিনিষসমূহও বিলাসদ্রব্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ সাধারণে এই সকল ব্যবহার করেন না। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে শিল্পীদের দুর্দ্দশার ইহাই প্রধানতম কারণ।

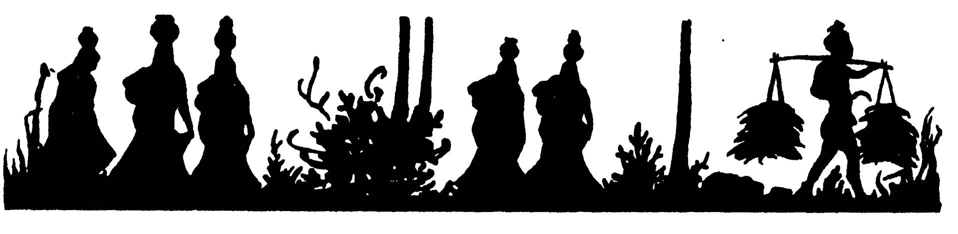
অবশ্য কতকগুলি শিল্পজাত দ্রব্য আছে, যাহা সকল অবস্থাতেই আমাদের প্রয়োজন। যেমন, কাপড়। কিন্তু অভাবের দিনে অর্থকৃচ্ছ্রতাবশতঃ নিতান্ত ঠেকায় না পড়িলে কেহ কাপড়ও ক্রয় করেন না। কাজেই কাপড়ের কাট্‌তি কমিয়া যায় এবং শিল্পের অবনতি ঘটে। আসবাব-পত্রাদি দরকারী হইলেও ভাত বা কাপড়ের ন্যায় দরকারী নহে। সুতরাং যখনই অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়, লোকে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া ভাত কাপড়ের বন্দোবস্তই সর্ব্বাগ্রে করিয়া থাকে—আসবাব-পত্রাদির কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে না।

এইজন্যই দেখা যায় যে, কর্ম্মকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পীশ্রেণী বর্ত্তমানে বিষম বিপদে পড়িয়াছেন। অবশ্য অন্যান্যের কষ্টও কম নয়, কিন্তু যাঁহাদের শিল্প ব্যতিরেকে অন্য কোনও উপার্জ্জনের পথ নাই, তাঁহাদের অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। বিশেষ অসুবিধার কারণ এই যে ব্যবসায়সূত্রে শিল্পীদের মধ্যে কোন ঐক্য নাই। অনেক শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে চালান দিয়া হয়ত বেশ দু-পয়সা উপায় হইতে পারে, কিন্তু সমবায়ের অভাবে তাহা হইবার জো নাই। কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী"র ১৬০ পৃষ্ঠায় "বঙ্গের ছোট ছোট পণ্যশিল্প" শীর্ষক মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

বিগত জুলাই মাসে বঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ফরোকি সাহেবের চেষ্টায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক শিল্পে সরকারী সাহায্যদান সম্পর্কিত যে বিলটি পাস হইয়াছে, ধ্বংসোন্মুখ শিল্পের রক্ষা ও নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন ও গঠন কার্য্যে সহায়তা করাই ইহার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বকালে গজদন্তের নানাবিধ সুন্দর জিনিষ এই জেলায় প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমানে সেই সব শিল্পীরা কোথায়? গজদন্ত-নির্ম্মিত চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি অনেক রাজদরবারের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। বিদেশে এই সকল চালান দিয়া অর্থাগমের পথ সহজেই করা যায়। ঢাকার মস্‌লিন বস্ত্র এককালে জগদ্বিখ্যাত ছিল। সরকারী সাহায্য পাইয়া যাহাতে এই সকল শিল্প পুনরায় সভ্যজগতের আদর লাভ করিতে পারে সেই দিকে শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টিপাত করা উচিত। আরও এমন অনেক লুপ্ত শিল্প আছে, যাহা বাস্তবিকই পুনরুদ্ধারযোগ্য।

সকল প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহাতে এই সুবিধা হইবে যে, বিভিন্ন স্থানে জিনিষের কাট্‌তি অনুসারে সহজে জিনিষপত্র প্রেরণ করা যাইবে এবং পৃথক্ পৃথক্ জিনিষেরও তারতম্যানুসারে এক একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্দেশ করা যাইবে। সুতরাং শিল্পীকে নিতান্ত দায়ে পড়িয়া অল্প মূল্যে কষ্টোৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইবে না। এই বিষয়ে ব্যবসা-বুদ্ধিবিশিষ্ট শিল্পীদের মতামত ত্রিপুরা জেলা সূত্রধর সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়, বানাসুয়া, কুমিল্লা, এই ঠিকানায় জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট দুই এক বৎসরে দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায় না; সুতরাং এই মামুলী প্রথায় ব্যবসা চালাইলে শিল্পী জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য।

শ্রীপ্রাণবল্লভ সূত্রধর চৌধুরী, বি-এ
অস্থায়ী সভাপতি, ত্রিপুরা জেলা সূত্রধর সমিতি



তপস্যার ফল

শ্রীসীতা দেবী

মন্মথ কোনোদিনই শান্ত স্বভাবের জন্য বিখ্যাত নয়, আজ তাহার মেজাজ বিশেষ করিয়া বিগড়াইয়াছে। আপিসে পা দিবামাত্র ঘোষালবাবু তাহার কানে সুখবরটি তুলিয়া দিলেন। রিট্রেঞ্চমেণ্ট!

সেই অবধি, এই খবরটাই সে নানাভাবে নানাজনের কাছে শুনিতেছে। টিফিনের ছুটিটা সব ক'জন কর্ম্মচারী খালি এই ব্যাপারের আলোচনাতেই আধটা ঘণ্টা কাটাইয়াছে। চাকরি যাইবে অনেকের, যাহাদের বা থাকিবে, তাহাদেরও মাহিনা কমিবে দারুণ রকমের। ন'টার সময় খাইয়া বাবুরা সব আপিসে আসে, দেড়টা কখন বাজিবে সেই আশায় হাঁ ক'রিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া থাকে। দেড়টা বাজিবামাত্র পকেট হইতে এলুমিনিয়মের কৌটায় রক্ষিত টিফিন বাহির হয়। বিশেষ কিছু নয়, হাতগড়া রুটি আর একটু তরকারি, যে-ব্যক্তি বিশেষ ভাগ্যবান তাহার এক আধটা মিষ্টি থাকে, রুটির বদলে পরোটা থাকিতেও পারে। ইহারই চর্চ্চায় এবং বিড়ি ও সস্তা সিগারেটের সাহায্যে টিফিনের ঘণ্টাটা মহানন্দেই কাটিয়া যায়।

আজ যেন কাহারও টিফিন খাইতেও রুচি ছিল না। বড়বাবু রামকমল মিত্র মশায় ছেলেছোক্‌রার দলে বড় মেশেন না। আজ ব্যথার টানে তিনিও শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। মিষ্টিটা মাত্র খাইয়া বাকী সব খাবার ছোক্‌রা ঝাড়ুদারকে দান করিয়া দিয়া দুইটা পান মুখে দিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা দিন দেখে জন্মেছিলুম ভায়া আমরা, বাপ খুড়ো ঠাকুর্দ্দা সব এই আপিসে কাজ ক'রে গেছে, কখনও তাদের এসব কথা কানে শুন্‌তে হয় নি। রামরাজত্ব ছিল তখন। আর যেমনি বেটারা আমরা এসেছি অম্‌নি যেন ত্র্যহস্পর্শ! যুদ্ধ, ট্রেড ডিপ্রেশন্, নন্-কোঅপারেশন, সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স, সব যেন আমাদের মুখ চেয়ে বসেছিল।"

টাইপিষ্ট বিশ্বনাথ বলিল, "তা বল্‌লে কি আর হয় মশায়, আমরা গ্লোরিয়স্ টাইম্‌সে জন্মেছি, এই চোখে হয়ত স্বাধীন ভারত দেখে যাব।"

হেডক্লার্ক নিমাইবাবু চটিয়া বলিলেন, "দুত্তোর স্বাধীন ভারত! নিয়ে ধুয়ে খাব, চাকরি গেলে? স্বাধীন ভারতে বিনা পয়সায় আমার মেয়ে ঘরে নেবে কেউ? আর বিশ বছর পরে ভারত স্বাধীন হ'লে চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যেত?"

বেচারা নিমাইবাবু সংসার-ভারে বড়ই পীড়িত, কাজেই তাঁহার কথার খুঁৎটা কেহ ধরিল না, আর এই সময় টিফিনের ঘণ্টাও শেষ হইল, কাজেকাজেই আলোচনা চাপা দিয়া যে যাহার পথ দেখিল।

মন্মথ এতক্ষণ এক কোণে বসিয়া রাগে ফুলিতেছিল। সে সাহেবী মেজাজের মানুষ, পকেটে করিয়া খাবার আনার নামে মূর্চ্ছা যায়, স্ত্রী স্যাণ্ডউইচ করিয়া দিতে রাজী, তাহাতেই যদি জাত রক্ষা হয়। কিন্তু স্যাণ্ডউইচ বহন করিয়া আনিতেও মন্মথের মনে ঘা লাগে। অর্দ্ধেক দিন সে না-খাইয়াই থাকে, অর্দ্ধেক দিন কাছের একটা রেষ্টরেণ্টে গিয়া চা খাইয়া আসে। বাপ ছিলেন বড়মানুষ, ছেলে সুতরাং অধিকতর বড়মানুষী মেজাজ লইয়া জন্মিয়াছে। বাল্য ও কৈশোর বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল, কিন্তু পিতা হঠাৎ মারা গিয়া তাহাকে অকুলপাথারে ফেলিয়া গিয়াছেন। রাখিয়া কিছুই যান নাই, উপরন্তু একটি গরিব ঘরের সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা মেয়ে দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। প্রথম প্রথম মন্মথ এ ব্যবস্থায় বেশ খুশীই ছিল, কারণ সুষমার মত মেয়েকে বিবাহ করিলে খুশী মানুষে হইতেই বাধ্য। কিন্তু এখন মন্মথর মত একটু বদ্‌লাইয়াছে। স্ত্রীর কাছে বলিতে ভরসা হয় না, তবে মনে মনে শ্বশুরের দারিদ্র্যটাকে সে একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে আরম্ভ

করিয়াছে। বিপদে আপদে যার মেয়ে-জামাইকে আধ পয়সা দিয়া সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার আবার মেয়ের বিবাহ দেওয়া কেন? স্ত্রীকে কথা শুনাইতে সাহস হয় না বলিয়া তাহার মেজাজ আরও চড়িতে থাকে। স্ত্রীও ত বসিয়া খায় না? তাহার মত সুন্দরী সুশিক্ষিতা মেয়ে, সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া হাড় কালি করিতেছে, একটা ঠিকা ঝি মাত্র তাহার সম্বল। অত আদরের মেয়ে বুঁচু, তাহার আয়া-সুদ্ধ বিদায় হইয়াছে। কাজেই এ অবস্থায় সুষমাকে আর কি করিয়া কথা শোনান চলে? তাহা হইলে উত্তরে আবার একটার জায়গায় দশটা কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। কারণ সুষমার রূপ গুণ যতই থাক, রসনাটি বেশ তীক্ষ্ণ, সে যখন বচনবিন্যাস করে, তখন তাহার ভিতর ব্যাকরণ বা লজিকের ভুল বিশেষ বাহির করা যায় না। বড়মানুষ আত্মীয়স্বজন সুপারিশ্ করিয়া এই একশ' পঁচিশ টাকার কাজটা করিয়া দিয়াছিল তাই, না-হইলে এতদিন বোধ হয় মন্মথকে সপরিবারে আত্মহত্যা করিতে হইত। এখন পর্য্যন্ত সংসারে মাত্র তিনটি প্রাণী, তাই রক্ষা। ইহার ভিতর আবার "রিট্রেঞ্চমেণ্ট"!

আপিসের ছুটি হইবামাত্র টুপীটা টানিয়া লইয়া মন্মথ গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। অন্যদিন বিশ্বনাথের জন্য অপেক্ষা করে, তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে খানিকটা দূর গিয়া তবে ট্রামে ওঠে, আজ আর তাহার মনুষ্য-জাতীয় কোনো জীবের মুখ দেখিতেই ইচ্ছা করিতেছিল না। এতগুলা হতভাগা মানুষ জগতে থাকিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? যত লোকের আহারের সংস্থান হয়, সেই ক'টা থাকিলেই ত পারিত? তাহা হইলে কথায় কথায় এত চাকরি যাওয়ার ভয়ে সবাই মূর্চ্ছা যাইত না। ভারতবর্ষে অন্ততঃ মানুষ কমা নিতান্ত দরকার। এই বিষয়ে 'য়্যাড্‌ভান্সে' একটা প্রবন্ধ লিখিবে, তাহার জন্য চোখা-চোখা বাক্যবাণ মনে মনে সাজাইতে সাজাইতে মন্মথ বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল।

আগে ছোট একটা ফ্ল্যাট লইয়া বাস করিত, এখন অভাবের তাড়নায় তাহারও অর্দ্ধেকটা ভাড়া দিতে হইয়াছে। একখানি ঘর মাত্র সম্বল, সেটাকে পার্টিশন্ করিয়া ছোট এক টুকরা বসিবার ঘর সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই কোনো মতে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চলা যাইতেছে। বারান্দা ছিল এক ফালি, সুষমা তাহাতেই চিক্ খাটাইয়া রান্না-খাওয়া সব চালাইয়া লয়। ইক্‌মিক্ কুকারের রান্না, হাঙ্গাম কম, জায়গাও জোড়ে কম।

শয়নকক্ষে ঢুকিয়া মন্মথ টুপিটা খাটের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বুঁচু বাপকে দেখিয়া ছোট গোল হাতখানি প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেই তাহাকে এক ঠেলায় সরাইয়া দিল। মেয়ে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুষমা বারান্দায় ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল গরম করিতেছিল, মাথাটা আজ ধরিয়া আছে, কাজেই মেজাজ কিছু বিরক্ত। মেয়ের কান্নার শব্দে তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, "হ'ল কি আবার, এসেই মেয়েটার উপর বীরত্ব ফলাচ্ছ কেন?"

মন্মথ ঝাঁঝিয়া বলিল, "সারাদিন খেটে দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে, এখন মেয়ে নিয়ে সোহাগ করবার ক্ষমতা নেই।"

সুষমা বলিল, "বাপ রে! চল বুঁচু আমরা যাই, অমন অরসিকেষু রসস্য নিবেদনে আমাদের কাজ নেই। যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ, শাস্ত্রে বারণ আছে।"

মন্মথ খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "খুব ত বচন ঝাড়ছ, এর পর যখন আর হাঁড়ি চড়বে না, তখন অত বচন কোথা থেকে আসবে?"

সুষমা বলিল, "এই শ্রীমুখ থেকেই আসবে। কিন্তু হঠাৎ হাঁড়ি চড়া বন্ধ হবে কেন? বাংলা দেশের কুমোররা কি পার্‌মানেণ্ট হরতাল করছে?"

মন্মথ বলিল, "এখন ওসব বাজে রসিকতা রেখে একটু চা-টা দেবে? আমায় আবার সন্ধ্যাবেলা বেরুতে হবে কাজের খোঁজে।"

সুষমা এতক্ষণে একটু দমিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তোমার কাজের কি হ'ল যে আবার অন্য কাজের খোঁজ করবে!"

মন্মথ মুখ উৎকট রকম গম্ভীর করিয়া বলিল, "আর কাজ, কাজের দফায় ইতি। যা রিট্রেঞ্চমেণ্টের ঘটা লেগেছে।"

সুষমার হাসিমুখ আঁধার হইয়া আসিল। অর্থহীনতা, আশ্রয়হীনতার বিভীষিকা নারীর কাছে অতি ভয়াবহ। শিশুকে যে জন্ম দিয়াছে, তাহার অন্তরে ত নিত্য আশঙ্কা বাসা বাঁধিয়া আছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাজ সম্বন্ধে কোনো কথা উঠেছে না কি? কাজ যাবার কোনো রিস্‌ক্‌ আছে?"

মন্মথ জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে বলিল, 'সবাই-কার বিষয়েই যখন কথা উঠেছে তখন আমার বিষয়েই বা না উঠবে কেন? ওটা ত আমার মামার বাড়ি নয়?"

সুষমা মেয়েকে খাটে বসাইয়া চায়ের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। তাহার বুকে ইহারই ভিতর দুশ্চিন্তার পাষাণভার চাপিয়া বসিয়াছিল। মা গো, কাজ গেলে কি উপায় হইবে? তাহার ত এই কচি মেয়ে লইয়া হাত-পা বাঁধা, কোথাও যে চাকরি করিয়া খাইবে সে উপায়ও নাই। মন্মথ বক্তৃতা যতই করুক, কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। নিজে এক গেলাস জল গড়াইয়া খাইবার ক্ষমতাও নাই। স্ত্রীকে দাঁতের খড়িকাটি, সিগারেটের দেশলাইটি পর্যন্ত হাতে হাতে যোগাইয়া দিতে হয়। এ মানুষ অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে কেমন করিয়া?

ঘরে তৈয়ারী গজা ও রুটি মাখন সহযোগে চা পান করিয়া মন্মথর মাথা এবং মেজাজ কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইল, সে বুচুকে কোলে করিয়া বসিবার ঘরে গিয়া সিগারেট ধরাইল, সুষমা ওদিকে কুকার সাজাইয়া রাত্রির রান্নার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কাজকর্ম সে সকাল সকাল সারিয়া ফেলে, সন্ধ্যাটায় একটু অবসর উপভোগ করে। কোনোও দিন বা বাপের বাড়ি বেড়াইতে যায়।

সিগারেট টানিতে টানিতে হঠাৎ মন্মথ খাড়া হইয়া বসিল। তাই ত, পিসে-মহাশয়ের খোঁজ একবার করিলে হয়। তাঁহার নামে নানাদিকে নানাকথা মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে, সঠিক খবরটা জানিয়া রাখা ভাল। পিসে-মহাশয় ভাগ্যবান পুরুষ, না হইলে এত বয়সে এমন কপাল খোলে? ইহার সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া মন্মথ ভাল কাজ করে নাই। টাকাওয়ালা আত্মীয় জগতে অতি দুর্লভ জিনিষ, হইলেই বা তাহার মতামত বিভিন্ন এবং আচার ব্যবহার রুক্ষ? তবু তোয়াজে পাষাণও গলে বলিয়া শুনা যায়।

বুঁচুকে কোলে করিয়া ভিতরে গিয়া সুষমাকে ডাকিয়া বলিল, "একে ধর না, আমায় বেরতে হবে তখন বল্‌লাম না?"

সুষমা উঠিয়া আসিয়া মেয়েকে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যাচ্ছ কোথায়?"

"সম্প্রতি জগুর ওখানে, তবে অন্য দু-এক জায়গায়ও যেতে হ'তে পারে।"

সুষমা মুখ ভার করিয়া বলিল, "যাও, কিন্তু বেশী রাত করো না, পাশের ঘরের ওরাও আজ বায়স্কোপে গেছে, আমি বেশী রাত একলা থাকতে পারব না বাপু।"

মন্মথ বলিল, "দেরি ত আর আমি সাধ ক'রে করব না, তবে যদি কার্য্যগতিকে হয়ে যায়।" সে পাঞ্জাবী পরিয়া চুলটা একটু আঁচড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

জগু হতভাগা থাকে কি এ রাজ্যে? চোরবাগানের কোন্ এক এঁদোপড়া গলি, হাঁটিতে হাঁটিতে মন্মথর পা ব্যথা করিতে লাগিল। বাড়ি যখন খুঁজিয়া বাহির করিল, তখন রাস্তায় আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সদর দরজা ভাল করিয়া বন্ধ, মন্মথ দরজায় ঘা দিয়া ডাকিল, "জগা বাড়ি আছিস্ রে?"

দরজাটা হড়াৎ করিয়া খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া এবং নর্দমার বিকট গন্ধ আসিয়া মন্মথর চক্ষু ও নাসিকাকে পরিতৃপ্ত করিয়া গেল। অতিশয় ময়লা একখানা ধুতি পরা একজন প্রৌঢ়া মহিলা দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন, "কে গা ডাকাডাকি করছ? ওমা মনু, তা এস বাছা ভিতরে। জগুকে খুঁজছ, তা সে হতভাগা আবার এমন সময় বাড়ি থাকে কবে? ঐ পালিতদের বৈঠকখানায় দেখ গিয়ে বসে তাস পিটছে।"

মন্মথ বলিল, "তবে সেইখানেই যাই জ্যাঠাইমা। ওকে বড় দরকার আজ, আর একদিন এসে বসব।" বলিয়া আবার পালিতদের বাড়ির সন্ধানে চলিল। বৈঠকখানা হইতে উচ্চ চীৎকার এবং হাসির গর্‌রা তাহাকে শীঘ্রই বাড়ি চিনাইয়া দিল। এ বাড়ির লোকদের সঙ্গে তাহার

পরিচয় নাই, সুতরাং একটু ভদ্রভাবে ডাক দিল, "জগু আছ না কি হে?"

জগু ওরফে জগন্নাথ চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। পর মুহূর্ত্তেই দ্বারপথে দণ্ডায়মান মন্মথকে চিনিতে পারিয়া লাফাইয়া উঠিল, "আরে মোনা সাহেব যে? তুমি কোথেকে?" মন্মথ বলিল, "তোর কাছে এসেছিলাম একটু কাজে, তা তুই ত ব্যস্ত আছিস্ দেখছি।"

জগুর উঠিবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে বলিল, "না কাজ আর কি, এই একহাত খেল্‌ছি। তা তুই একটু বোস্ না, আমার এখনি হয়ে যাবে।"

মন্মথ বলিল, "আচ্ছা, তা আমি একটু ঘুরে আস্‌ছি না হয়।"

জগু অগত্যা সঙ্গীদের বিরক্তি উপেক্ষা করিয়া উঠিয়া পড়িল। চটি পরিতে পরিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার বল দেখি? চল, আমাদের বাসাতেই বসবে চল।" বলিয়া মন্মথকে লইয়া আবার ফিরিয়া সেই এঁদো গলিতে প্রবেশ করিল।

বাড়িতে মানুষ যতগুলি, সে তুলনায় ঘর অত্যন্ত কম, কাজেই দুজনে গিয়া জগুর শোবার ঘরেই বসিল। মন্মথ সাহেব-মানুষ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এখানে বস্‌লে তোর বউয়ের অসুবিধা হবে না ত?"

জগু ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "রাত এগারটার আগে কোনোদিন সে এ ঘরে ঢোকে না কি? তার আবার অসুবিধে! আমাদের বউ ত নয়, 'গ্লোরিফায়েড' রাঁধুনী।" মন্মথ অগত্যা বসিল, তবে খাটে না বসিয়া একখানা জলচৌকী ছিল, সেইটা টানিয়া লইল। জগু জিজ্ঞাসা করিল, "চা খাবি? করতে বল্‌ব।"

মন্মথ বলিল, "না হে না, চা আমি খেয়েই বেরিয়েছি, বরং দুটো পান দিতে বল।"

জগু পানের জন্য হাঁক দিয়া বলিল, "তারপর কি মনে করে হে? বছর-খানেক হয়ে গেল, কোনোদিন ত ছায়াও মাড়াও নি?"

একটি বছর-দশের মেয়ে আসিয়া পান রাখিয়া গেল। মন্মথ দুইটা পান তুলিয়া লইয়া বলিল, "আর ভায়া, আস্‌তে কি আর চাই না? যা আপিসের খাটুনি, জিব একেবারে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি এসে আর নড়বার ক্ষমতা থাকে না। তাও ত সেদিকেও শনির দৃষ্টি পড়েছে।"

জগু বলিল, "রিট্রেঞ্চমেণ্ট বুঝি? আর বোলো না, একেবারে জান হায়রাণ করে তুলেছে। মানুষে এর পর কি ক'রে যে প্রাণ বাঁচাবে, তার ঠিকানা নেই। আমার রোজগার ত অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। তা তোদের কত পার্সেণ্ট ক'রে কাটছে রে?"

মন্মথ বলিল, "আর কত পার্সেণ্ট। সব না কেটে দিলেই বাঁচি। তা যাক সে কথা, এ ত ঘরে ঘরেই আজকাল লেগে আছে। আমি এসেছিলাম অন্য এক খোঁজে। পিসে-মশায়ের খবর কি রে? তাঁর নামে ত নানারকম শুনছি।"

জগু হাসিয়া বলিল, "শুন্‌ছ ঠিকই, তবে সে বড় শক্ত ঘানি। সেখানে কিছু সুবিধা হবে না চাঁদ।"

মন্মথ বলিল, "সত্যি, অনেক টাকা পেয়েছেন না কি?"

জগু বলিল, "টাকার অভাব কি? টাকা তার আগেও ঢের ছিল, তা এমন নরপিশাচ যে কোনোদিন কেউ ঘূণাক্ষরে তা জানে নি। এখন ত আবার বুড়ী দিদিমার সম্পত্তি সব পেয়েছে। ওই একমাত্র 'লিগেল্ এয়ার' কি না? বুড়ী এতদিনে তবে মরল। বছর নব্বই অন্ততঃ বয়েস হয়েছিল। এ প্রায় এডওয়ার্ড সেভেন্‌থের রাজা হওয়া আর কি? পিসে-মশাই ত বল্‌ত, "গঙ্গাযাত্রার 'রেসে' কে কা'কে হারাতে পারি, দেখা যাক্।"

মন্মথ বলিল, "তবে সুবিধে হবে না বল্‌ছিস্ কেন? পিসে-মশাইয়েরও ত নবযৌবন নয়, বছর পঁয়ষট্টি বয়স হবে। তার ত ছেলেপুলে কেউ নেই, রিলেটিভ বলতে ত আমরা ক'জন আছি। তা সমান সমান শেয়ার পেলেও ত বেশ কিঞ্চিৎ হয়। তিনি এখন কোথায় বল্ দেখি, একবার কপাল ঠুকে দেখেই নি।"

জগু বলিল, "কপাল ঠুকে ঠুকে আব বের ক'রে ফেল্‌তে পার, কোনো লাভ হবে না। তিনি এখন ভয়ানক বৈষ্ণব হয়েছেন। বৈরাগী আর কীর্ত্তনীয়া, আর বাবাজীদের ভিড়ে বাড়ির ত্রিসীমানায় পা বাড়াবার জো

নেই। পাশের কোন এক পুকুর থেকে এক কেষ্টো না বিষ্টু, কিসের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে, তাকে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা ক'রে, তাই নিয়ে তিনি একেবারে তন্ময় হয়ে আছেন। স্বপ্নে নাকি কি-সব আদেশও পেয়েছেন। তোমার মত মুরগীখোরকে তারা চৌকাঠ পার হ'তে দেবে মনে করেছ ?"

মন্মথ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, "একপাল 'সুইণ্ডলারে' মিলে আমাদের ন্যায্য পাওনা ঠকিয়ে নেবে, আর তাই তোরা সব বসে বসে দেখবি ?"

জগু বলিল, "তা কি আর করি বল ? কাজকর্ম্ম ফেলে সেখানে গিয়ে ত বসে থাকতে পারি না ? তাহ'লে উপস্থিত হাঁড়ি চড়বে কি করে ? আর পিসে-মশায় যদি দিদিমার সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুটিও 'ইন্‌হেরিট' ক'রে থাকেন, তাহলে আমাদের ত কোনো ভরসাই নেই। যা শরীরের দশা হয়েছে।"

মন্মথ বলিল, "আচ্ছা, ঠিকানাটা দে, দেখা যাক, কিছু করতে পারি কি না।"

জগু ঠিকানা বলিল, মন্মথ সেটা নোটবুকে টুকিয়া লইয়া বলিল, "উঠি তবে, বউয়ের আজ শরীর ভাল নেই, বেশী রাত করা চল্‌বে না।"

জগুও উঠিয়া পড়িল। পালিত-বাড়ির আড্ডা এখনও অনেকক্ষণ চলিবে। বলিল, "তোমরা সব 'মডেল হাস্‌ব্যাণ্ড' বাবা। আচ্ছা এস, খবর দিও কিছু সুবিধা হয় কি না।"

মন্মথ সারাপথ নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি আসিয়া পৌছিল। বুঁচু তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সুষমা একখানা ইংরেজী উপন্যাস হাতে করিয়া পড়িতেছে। স্বামীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, কিছু সুবিধা হ'ল ?"

মন্মথ বলিল, "রোসো, অমনি চোখের নিমেষ ফেল্‌তে ফেল্‌তে হয়ে যাবে ? এখনও ঢের কাঠখড় পোড়ান দরকার। আচ্ছা, খুব গোঁড়া বৈষ্ণব দেখেছ কখনও ক্লোস্ কোয়ার্টারসে ?"

সুষমা বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তার কি দরকার ?"

মন্মথ বলিল, "দরকার না থাকলে কি আর শুধু শুধু জিগ্‌গেস্ করছি ? দেখেছ কি না বল না ?"

সুষমা বলিল, "না বাপু, কলকাতা শহরে ও-সব কোথায় দেখব ? মাঝে মাঝে ভিখারী বৈরাগী দেখেচি বটে, তা অত খুঁটিয়ে দেখিনি। এখন খাবে চল দেখি, ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আস্‌ছে।"

মন্মথ খাইয়া শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু মাথাটা তখন তাহার চিন্তায় ঠাসা, ঘুম কিছুতেই হইল না। নানারকম আজগুবি ফন্দী আঁটিতে আঁটিতে রাত ভোর হইয়া গেল।

পরদিন রবিবার, আপিসের উৎপাত ছিল না। চা খাইয়া মন্মথ স্ত্রীকে বলিল, "একবার বেহালার দিকে যেতে হবে, আমার ফিরতে দেরি দেখলে, খেয়ে-দেয়ে নিও, বসে থেক না।"

স্বামীর কাজ যাইবার কথা শুনিয়া অবধি সুষমা গম্ভীর হইয়া ছিল, সে সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা।"

মন্মথ একখানা খবরের কাগজ কিনিয়া ট্রামে চড়িয়া বসিল। পৌছিতে লাগিবে ত বিস্তর সময়, ততক্ষণ কি হাঁ করিয়া বসিয়া থাকা যায় ? পিসে-মশায়ের আগের বাড়ি সে চিনিত বটে, তবে এই নূতন বাড়িতে কখনও আসে নাই। তাঁহার দিদিমা মারা যাওয়ার পর পিসে-মশায় গত বৎসর হইতে এখানে উঠিয়া আসিয়াছেন। বাড়ি বড়ই না কি, সঙ্গে বাগান পুকুর, কিছুরই অভাব নাই।

বেহালার কাছাকাছি আসিয়াই সে ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল। ইহার পর বাড়ি খুঁজিয়া লইতে হইবে, সে হাঁটিয়াই চলিল। বেশী ঘোরাঘুরি তাহাকে করিতে হইল না। একটা মুদীর দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়াই সে পিসে-মশায়ের সন্ধান পাইয়া গেল। বেশ বড় বাড়ি বটে, তবে অতি পুরাতন ধাঁচের। ভিতরে না ঢুকিয়া সে চারিধার ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। খোল-কর্ত্তাল এবং কীর্ত্তনের প্রচণ্ড রব তাহাকে সাবধান করিয়া দিল। এখন এই বেশে গিয়া কোনো লাভ নাই, মাঝ হইতে কেস্ কাঁচা হইয়া যাইবে। গোয়ালে অনেকগুলি সুপুষ্ট গাভী দেখিয়া ভাবিল, "সাধে বুড়ী নব্বই বছর বেঁচেছে ? এই রেটে দুধ-ঘি খেলে মানুষ মরে কখনও ?"

একটা লোক ঝুড়িতে করিয়া গোবর লইয়া বাহির

হইয়া আসিল। মন্মথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা দুধ বিক্রি টিক্রি কর নাকি হে? গোয়ালভরা গরু দেখছি।"

লোকটা বলিল, "বিক্রি করব কি মশায়, আমাদের এর উপর এক একদিন দুধ কিন্‌তে ছুট্‌তে হয়। বৈরাগী বাবাজীদের পরমান্ন আর মাল্‌পোতে কম দুধটা যাচ্ছে?"

মন্মথ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তামশায় নিজে কেমন আছেন? বহুদিন তাঁর খবর পাই নি, আগে ওদিকে থাকতে বেশ যাওয়া-আসা ছিল।"

চাকরটা বলিল, "তাঁর ত অসুখ যাচ্ছে, তবে যতটা বাড়িয়েছিল, এখন একটু সামাল দিচ্ছে।"

মন্মথ ভাবিল আর দেরি নিতান্তই করা চলে না, এর পর কোন্‌দিন একেবারে হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

আর একটু ঘোরাঘুরি করিয়া দুই চারিটা খবর সংগ্রহ করিয়া সে আবার ট্রামে গিয়া বসিল। বাড়ি পৌছিতে বেলা তিনটা বা জয়া গেল। সুষমা ঘুমাইতে পারে নাই, নিদ্রিত বুঁচুর পাশে শুইয়া ছিল। স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার দেব?"

মন্মথ বলিল, "দাঁড়াও, স্নানটা করে নি, রোদে ঘুরে ত ভূত হয়ে এসেছি।"

স্নান করিয়া, খাইতে বসিয়া মন্মথ বলিল, "দেখ, একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে, কিন্তু আমাকে মাস-দুই তার জন্যে খাটতে হ'তে পারে। তুমি যদি কিছুদিন ও-বাড়িতে গিয়ে থাক, তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখি। ঘরটা না হয় ছেড়ে দেব।"

সুষমা বলিল, "দু-মাস আমি না হয় বাপের বাড়ি গেলাম, তোমার আপিসের কি হবে? তারাও কি তোমায় ছুটি দেবে?"

মন্মথ বলিল, "একমাস 'উইথ্ পে' ছুটি ত আমার পাওনাই রয়েছে, সেইটে নিয়ে ত প্রথম দেখি। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।"

সুষমা বলিল, "তা বেশ, আমার আর যেতে কি? গেলে ত দুদিন হাড় জুড়োয়।"

কথাটার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন অভিযোগ ছিল, মন্মথ চটিয়া বলিল, "যাতে তোমার আরামের ব্যবস্থা ভাল ক'রে হয়, তার জন্যেই ত আমার চেষ্টা। নইলে আমার কি এত দায় পড়েছে? একলা মানুষের আর কত খরচা।"

সুষমা বলিল, "হাঁ, যত খরচ সব ত আমিই করছি, তা আর কি জানি না?" বলিয়া থালা বাসন তুলিয়া লইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু স্ত্রী যতই রাগারাগি করুক, মন্মথ নিজের মতলব ছাড়িল না। আপিসে গিয়াই ছুটির দরখাস্ত করিল, খোঁজ করিয়া ঘরেরও একজন ভাড়াটে জোগাড় করিল, নহিলে আবার একমাস নোটিসের ধাক্কায় পড়িতে হয়। আপিস হইতে সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে একজন নাপিত। সুষমা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নাপিত কি হবে গো?"

মন্মথ গম্ভীর মুখে বলিল, "নাপিতে যা হয়, চুল ছাঁটবে।"

সুষমা বলিল, "হঠাৎ এমন সুমতি যে? সেলুনগুলো কি অপরাধ করল?"

মন্মথ উত্তর না দিয়া চেয়ার টানিয়া বসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে অমন সাধের সাহেবী কাটের চুল একেবারে পরিষ্কার কদম ছাঁটে পরিণত হইল। ঠোঁট একটু পুরু বলিয়া মন্মথ গোঁফটা একেবারে বিসর্জ্জন দেয় নাই, অল্প একটু রাখিয়া চলিত, সেটার তোয়াজ ছিল কত। আজ সেটার মায়াও সে ত্যাগ করিল। নাপিতকে পয়সা দিবার জন্য যখন সে ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন সুষমা একেবারে শিহরিয়া উঠিল, "মাগো মা, চেহারাটাকে কি করেছ? একেবারে যে মুখের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না!"

মন্মথও যে একটু কাতর বোধ না করিতেছিল তাহা নয়, তবু বীরত্ব দেখাইয়া বলিল, "ওতে আর কি আসে যায়? কাজ হাসিল করতে পারলে, অমন ঢের গোঁফ পরে রাখা চল্‌বে।"

নাপিত বিদায় হইল, তখন আল্‌মারি খুলিয়া মন্মথ নিজের কাপড়চোপড় ঘাঁটিতে আরম্ভ করিল। সাহেবী পোষাকই বেশী, ধুতি নিতান্ত দু-একখানা আছে। মন্মথ আপিসে যায় সাহেব সাজিয়া, রাত্রে ঘুমায় সাহেবী রাত-কাপড় পরিয়া, মাঝে বিকালটুকুও রাত্রির কাপড়েই

প্রায় কাটাইয়া দেয়, সুতরাং ধুতি চাদরের আর দরকার কি? তবু দু-একটা বাহিরে যাইবার জন্য ছিল। পাঞ্জাবীগুলি অতি মিহি আদ্দীর তৈয়ারী, তাহার আবার চুড়িদার হাত। মন্মথ হতাশ হইয়া বলিল, "এতে ত হবে না, ধোয়া লংক্লথ নিয়ে আসছি, গোটা দুই তিন ফতুয়া সেলাই করে দিতে পার?"

সুষমা মুখ ভার করিয়া বলিল, "পরশু ত আমি চলেই যাচ্ছি, আবার ফতুয়া সেলাই করব কখন?"

মন্মথ বলিল, "আহা না করলে নয়, নইলে তোমায় বল্‌তে যায় কে? আমি কাপড় আন্‌ছি, তুমি বসে যাও, না-হয় এবেলা ইক্‌মিক্ কুকারের ঠেলা আমিই সাম্‌লাব।" সে তাড়াতাড়ি কাপড় আনিতে ছুটিল। ঘণ্টাখানেক পরে লংক্লথ, একজোড়া ক্যাম্বিশের জুতা এবং মাঝারি গোছের একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ লইয়া সে ফিরিয়া আসিল। সুষমা নীরবে সব দেখিতে লাগিল। মন্মথ যখন সুষমাকে কিছু বলিতেছে না, তখন রাগ করিয়া সেও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। মন্মথ সত্যই ইক্‌মিক্ কুকার সাজাইতে বসিল দেখিয়া সুষমাও সেলাইয়ের সরঞ্জাম লইয়া ফতুয়া সেলাই করিতে বসিয়া গেল।

পরদিনই গোছগাছ করিয়া সুষমা বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। একতলার একটি ছোট ঘরে আসবাবপত্র সব মন্মথ বোঝাই করিয়া তালা বন্ধ করিল, নিজে দিন-দুই মেসে থাকিবে ঠিক করিল, তাহার ভিতর ছুটি মিলিয়া যাইবে। খানকয়েক ধর্ম্মপুস্তক, বেশীর ভাগই বৈষ্ণব পদাবলী, যোগাড় করিয়া পড়াশুনাও খানিকটা করিয়া লইল। গলা ছিল মন্দ নয়, গানও দু-একটা শিখিয়া লইল।

ছুটি মিলিয়া গেল। পরদিন সকালেই মন্মথ জিনিষ-পত্র গুছাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। একখানা চিঠি আগেই পিসে-মহাশয়কে লিখিয়া দিয়াছিল, তাহার আগমন প্রত্যাশা করিতে। তিনি অবশ্য তাহার কোনো উত্তর দেন নাই।

মন্মথ বাড়িতে জায়গা পাইল অবশ্য, তবে পিসে-মশায় তাহাকে দেখিয়া খুব যে খুশী হইলেন, তাহা নয়। তিনি তখন শয্যাগত, খুব উৎসাহ সহকারে খুশী বা অখুশী প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। মন্মথ প্রণাম করিয়া বসিতেই তিনি একটিবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলেন, মিনিটখানেক পরে বলিলেন, "শ্রীগুরু তোমায় সুমতি দিয়েছেন। বোসো।"

মন্মথ বাবাজীদের দলে ভিড়িয়া গেল। দিনরাত গদ্‌গদ্ ভাব ধারণ করিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মুখে পক্ষাঘাত হইবার উপক্রম করিল। মাছ মাংস ডিম ছাড়া আর কোনো জিনিষ যে ভদ্রলোকে খায়, তাহা সে ভাবিতে অভ্যস্ত ছিল না, কাজেই খাওয়াদাওয়াও এক রকম ঘুচিয়া গেল। কীর্ত্তনের সময় গলা সকলের উপরে না তুলিলে পিসে-মহাশয়ের কানে যাইবে না, সুতরাং চীৎকার করিয়া করিয়া গলাও ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তবু মন্মথ দমিবার ছেলে নয়। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন, এই প্রতিজ্ঞা লইয়াই সে ঢুকিয়াছিল, সে টিকিয়াই রহিল।

বাবাজীদের দলটি তাহার প্রতি বেশী খুশী ছিল না, কাজেকাজেই মন্মথ বেচারাকে বেশীর ভাগ সময় একলা কাটাইতে হইত। চাকর-বাকরদের সঙ্গে মিশিলে মানহানি হয়, নয়ত মাঝে মাঝে গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিবার ইচ্ছাও তাহার হইত। সঙ্গীহীন হইয়া মানুষ কি করিয়া বাঁচে? কিন্তু লোচনদাস বাবাজীর চোখ এড়াইবার জো ছিল না, তিনি দক্ষ ডিটেক্‌টিভের মত সর্ব্বদাই মন্মথের পিছনে ঘুরিতেন। একদিন বাড়িতে একটা ডিমের খোলা পাওয়া গেল। কি করিয়া এমন অঘটন ঘটিল, তাহা কিন্তু বহু চেষ্টাতেও আবিষ্কার করা গেল না। মন্মথ এবং লোচনদাস দুজনেই আরও বেশী সাবধান হইয়া উঠিল।

সুষমা স্বামীর কোনো খোঁজ-খবর পাইত না। বাপের বাড়িতে কাজকর্ম্ম বেশী ছিল না, সারাদিন ভাবনা-চিন্তা লইয়াই তাহার সময় কাটিত। চিঠি লিখিবার অদম্য আগ্রহ তাহাকে পাইয়া বসিত, কিন্তু অভিমান করিয়া সেটা দমন করিত। বুচুকে বুকে চাপিয়া সে দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া ফেলিত। হঠাৎ একদিন সকাল-বেলা মন্মথ আসিয়া হাজির। সুষমা খবরের কাগজ

পড়িতেছিল, খবরগুলা নয়, কর্ম্ম খালির বিজ্ঞাপনগুলি। স্বামীকে দেখিয়া বেশী খুশী হইল, না চটিল তাহা বলা শক্ত। জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ কি মনে ক'রে?

অন্য সময় হইলে এমন শুষ্ক অভ্যর্থনায় মন্মথ চটিয়াই খুন হইত। কিন্তু কিছুকাল বৈষ্ণব-সংসর্গে বাস করিয়া তাহার মেজাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে দেখা গেল। বলিল, "বল্‌ছি, আগে এক পেয়ালা চা দাও দেখি। মালপোয়া আর পরমান্ন খেয়ে খেয়ে ত ডিস্‌পেপসিয়া ধরে গেল। চা না খেয়ে খেয়ে ক্রনিক মাথা-ধরার ব্যারাম দাঁড়িয়ে গেছে।"

সুষমা চা আনিয়া দিল, বলিল, "এ সব অভিনয় করে লাভ হচ্ছে কিছু, না শুধু শুধু শরীরটা মাটি করছ?"

মন্মথ বলিল, "তা শেষ অবধি না দেখে কি ক'রে বলি? এতদিন কেউ বুড়োর কাছে ঘেঁসে নি, এখন আমার দেখাদেখি যত ভাগ্নে, ভাইপো, ভাগ্নী জামাই এসে জুটেছে। পিসে-মশাইয়ের শক্ত জান, সহজে টাঁস্‌বে ব'লে ত মনে হয় না। বাবাজীরাও শকুনীর মত আগ্‌লে বসে আছে।"

সুষমা বলিল, "পরের মরণ চিন্তা না ক'রে, নিজের কাজের চিন্তা কর। আর দশ দিন পরেই ত তোমার ছুটি ফুরবে। তখন আপিস 'জয়েন্‌' করবে না?"

মন্মথ বলিল, "দেখা যাক্‌, ব্যাপার কত দূর গড়ায়। হয়ত আরও ছুটি নিতে হতে পারে। এবার অবশ্য দিলে 'উইদাউট্‌ পে' দেবে। তোমার একটু মুস্কিল হবে আর কি? মাসখানেক চালিয়ে নিতে পারবে না?"

সুষমা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "তোমার টাকার আশায় আমি ত হাঁ করে আছি। আমার খেটে খাবার ক্ষমতা আছে।"

মন্মথ বলিল, "থাকা ত উচিত। তোমরা এত ইকোয়ালিটির' দাবি কর, স্বামীর অপেক্ষায় থাকবেই বা কেন?"

সুষমা বলিল, "কে আছে তোমার অপেক্ষায়? ঝাড়া হাত পা থাকলে আমার ভাব্‌নাটা ছিল কি? নিয়ে যাও না তোমার মেয়ে, তারপর আমি উপার্জ্জন করতে পারি কি না দেখিয়ে দিচ্ছি।"

বেগতিক দেখিয়া মন্মথ আর কথা বাড়াইল না। বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, এক মাসের ত বড়-জোর মাম্‌লা, তার জন্যে অত কেন? তার ভিতর কিছু হয়ে গেলে ত কথাই নেই। যাই, আমার আবার পিসে-মহাশয়ের জন্যে একটা হোমিওপ্যাথী ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে হবে।"

সুষমা একটু নরম হইয়া বলিল, "খেয়ে যাও না? ইলিশ মাছ আছে।"

মন্মথ জিব কাটিয়া বলিল, "আমার তপোভঙ্গ কোরো না, মুখে পেঁয়াজের গন্ধ পেলে লোচন বাবাজী আর রক্ষে রাখবে? ভগবান দিন দেন ত মুরগী ছাড়া একমাস আর কিছু খাবই না।" বুঁচুকে আদর করিয়া সে চলিয়া গেল।

পিসে-মশাইয়ের অসুখ কিছুতেই বাগ মানিতেছিল না। নিরামিষ আহার ও নিরামিষ ঔষধের গুণে রোগটা তাঁহাকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলিবার সুবিধা পাইতেছিল না। তবে সারিয়া উঠিবেন যে, সে সম্ভাবনাও বিশেষ ছিল না, কারণ চারিদিকেই শুভাকাঙ্ক্ষীর দল। পথ্যের সঙ্গে কত কি যে বৃদ্ধের পেটে যাইত, তাহার ঠিকানা নাই, হোমিওপ্যাথী ঔষধ বাড়িতে অনবরত আমদানি হইত বটে, তবে তাঁহার পেটে যাইত শুধু জল। আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলেই যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়া ছিল। পিসে-মশায়ের দিদিমাকে স্মরণ করিয়া আরও তাহাদের বুক দমিয়া যাইত। পাড়ার একজন উকীলকে প্রায়ই ছুতানাতা করিয়া পিসে-মশায়ের ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত, কিন্তু উইল করিতে তিনি মোটেই রাজী হইতেন না। বলিতেন, "আমাদের গুষ্টির পক্ষে পঁয়ষট্টি আবার একটা বয়স? এখনও বিশ বছর আমার বাল-গোপালের সেবা করে যাব।"

মন্মথ ঔষধ লইয়া ফিরিবার পথে মাথাটা একেবারে কামাইয়া ফেলিল। তাহার পর গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া চলিল। ঔষধটা ফেলিয়া শিশিতে জল ভরিয়া লইল।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল মহা হুলস্থুল ব্যাপার। পিসে-মশায় ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিছু খাইতেছেন না, কাহাকেও ঘরে ঢুকিতে দিতেছেন না।

মন্মথ একটা চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার হে ?"

চাকর বলিল, "স্বপ্নে নাকি কি-সব আদেশ পেয়েছেন।"

মন্মথ সাহসে ভর করিয়া বৃদ্ধের শুইবার ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "পিসে-মশায় ওষুধ এনেছি "

বৃদ্ধ কনুইয়ের উপর ভর করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "নতুন ভেক নিয়েছিস্ হতভাগা, ওতে আমি ভুলি না। খা দেখি তোর ওষুধ তুই। অর্দ্ধেকটা খা একেবারে।"

মন্মথ নিশ্চিন্তমনে ঢক্ করিয়া আধশিশি ওষুধ পার করিয়া দিল। পিসে-মশাই মিনিট-পাঁচ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, মন্মথর মুখে মরণের কোনো চিহ্ন না-দেখিয়া বলিলেন, "হুঁ, আচ্ছা দে ওষুধ।" মন্মথ আধ বাটি জলে এক ফোঁটা জল মিশাইয়া, তাঁহাকে খাওয়াইয়া বাহির হইয়া আসিল।

লোচনদাস অল্পদূরেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল, "এরই মধ্যে হ'ল কি যে পিসে-মশাই একেবারে মারমূর্ত্তি ?"

লোচনদাস বলিল, "এ সংসারে জ্ঞাতি যার নেই, সে-ই সুখী। জ্ঞাতির বাড়া শত্রু আছে। নরেন কর্ত্তাকে কিসের গুঁড়ো মিশিয়ে ঘোল দিচ্ছিল, গৌরাঙ্গের কৃপায় ধরে ফেলেছেন।"

মন্মথ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন কোথায় এখন ?"

বাবাজী বলিল, "সে কি আর এদেশে আছে ? কোথায় পালিয়েছে।"

মন্মথর এইবারে কপাল ফিরিল, রাত্রিদিন তাহার আর অবসর রহিল না। পিসে-মশাই ঔষধ, পথ্য কিছুই তাহার হাত ছাড়া খাইতে চান না। কিন্তু রোগ এইবার বৃদ্ধকে বড় জোরে চাপিয়া ধরিল। পাড়ার উকীলবাবুর এইবার ডাক প'ড়ল।

উইল লেখা হইবে! বাড়িসুদ্ধ একেবারে উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বালগোপালের কথাসুদ্ধ সবাই ভুলিয়া গিয়াছে, খোল-কর্ত্তাল একেবারেই নীরব। খালি রুদ্ধদ্বার ঘরটার কাছে সকলের মন পড়িয়া আছে।

বেলা একটা আন্দাজ, উকীলবাবু দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন। সবাই একেবারে একজোটে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। প্রশ্নের উপর প্রশ্নের চোটে তাঁহার দুই কান বোঝাই হইয়া গেল।

তিনি সকলকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া সরাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "এত সব ব্যস্ত কেন ? কর্ত্তা কি অন্যায় করবার মানুষ, সবাইকে কিছু-না-কিছু দিয়েছেন।"

মন্মথ আবার সবাইকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল, "আমার ভাগে কি পড়ল মশায় ? স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর করি, 'নিভী' মানুষ।"

উকীলবাবু বলিলেন, "আপনার উপর ওঁর খুব আস্থা আছে, বল্লেন, "আর সব ক'টা খুনে টাকার লোভে গলা কাটতে এসেছে। টাকাই ওদের দিলাম, যদি এর পর সৎপথে থাকে—"

মন্মথ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমায় দিলেন কি ঘোড়ার ডিম ?"

উকীলবাবু বলিলেন, "বালগোপালের সেবার ভার আপনার উপর। কর্ত্তা বল্লেন, 'যথার্থ ভক্তি ওর আছে। গোপাল ওর সেবায় তুষ্ট হবেন।' সামান্য একটু দেবোত্তর রেখে যাচ্ছেন। গোপালের সেবা তাতেই চল্বে।"

"চুলোয় যাক্ গোপাল," বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া মন্মথ একলাফে দালান হইতে নামিয়া পড়িল। নেড়া মাথায় চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল, "ওরে আমার জাতও গেল, পেটও ভরল না। আমি রাজ্যের অকাল কুষ্মাণ্ডের জন্যে খেটে মরলাম!"

সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, লোচনবাবাজী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল, "তুমি তবে সেবাইৎ হবে না ?"

মন্মথ তাকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "রামঃ কহ। আমি চল্লাম বাড়ি, মাসখানেক একবেলা শুধু মুরগী খাব, আর একবেলা শূয়োর, তবে যদি আমার জানটা ঠাণ্ডা হয়!"

লোচনদাস দুই কানে হাত দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

মধ্য-ভারতের মন্দির

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

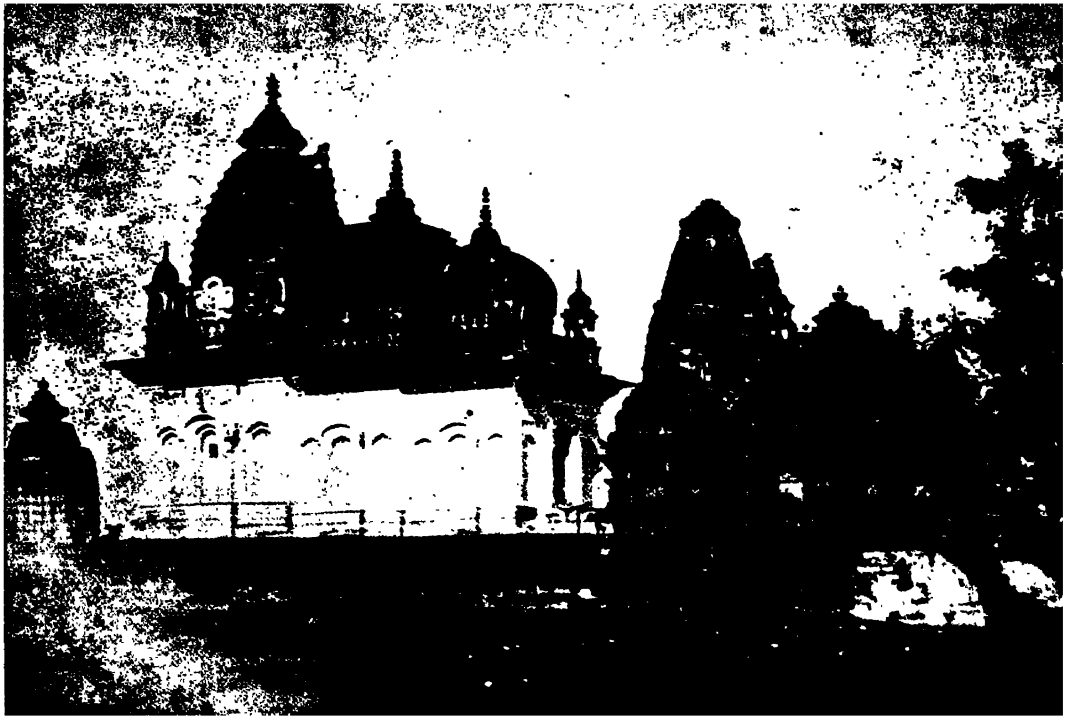
উত্তর-ভারতে গঙ্গা যমুনা ও অন্যান্য নদীর আশপাশে যত দেশ আছে সেগুলি বাংলা দেশের মত একেবারে সমতল। মাঝে পাহাড় পর্ব্বত কিছুই নাই। নদীর কল্যাণে দেশ যেমন উর্ব্বরা, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তাহার ভিতর দিয়া যাতায়াতেরও তেমনই কোন অসুবিধা নাই। বেশী ভারী মাল হইলে নৌকা বোঝাই করিয়া নদীপথে লইয়া যাওয়া চলে, আর অল্পস্বল্প মাল হইলে গরুর গাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। এমনধারা দেশ, যাহার চারিপাশে কোন পাহাড়-পর্ব্বত বা অন্য কোন প্রাকৃতিক ব্যবধান নাই, তাহা শিল্প-বাণিজ্য বা কৃষির দিক হইতে যেমন খুবই উন্নতিশীল হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের দিক দিয়াও তেমনই আবার কমজোর হইয়া পড়ে। কোন শত্রুর পক্ষে গঙ্গা-তীরবর্ত্তী দেশ জয় করা যত সহজ, হিমালয়ের ভিতরের দেশগুলি অথবা গঙ্গারই দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরির মধ্যে রাজ্য জয় করা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন।

মুসলমানেরা যখন উত্তর-ভারতে দিল্লীর নিকট হইতে ক্রমে চারিদিকে নিজেদের রাজ্য বাড়াইতে লাগিলেন, তখন অনেক ক্ষত্রিয় নরপতি গঙ্গা-যমুনার পাশাপাশি দেশ ছাড়িয়া দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মধ্য-ভারত বলিতে রাজপুতানার পূর্ব্বদিক হইতে প্রায় ছোটনাগপুরের নিকট পর্য্যন্ত যে-সকল সামন্ত রাজ্য আছে, সেইগুলিকে বুঝায়। সমস্ত দেশটি পাহাড় ও অরণ্যে ঢাকা। দক্ষিণ দিকে বিন্ধ্যগিরি ও কাইমুর পর্ব্বতশ্রেণী থাকায় জমি উত্তর দিকে ঢালু এবং সেইজন্য মধ্য-ভারতের ভিতর দিয়া চম্বল, বেত্রবতী, টোঁস, কেন, প্রভৃতি যে-সকল নদী বহিয়া গিয়াছে সেগুলি সবই উত্তরবাহিনী। তাহারা পর্ব্বত ও জঙ্গল ভেদ করিয়া অবশেষে গঙ্গা, যমুনা বা শোন নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। এই সকল নদীর দুইধারে বেশ উর্ব্বরা জমি থাকায় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে এমন দেশকে সহজে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করা যায় বলিয়া মধ্য-ভারত বহুকাল অবধি হিন্দু সামন্ত নরপতিগণের করায়ত্ত আছে। পূর্ব্বে উড়িষ্যা, উত্তরাখণ্ডে কাংড়া ও পশ্চিমে রাজপুতানার মত এখানেও আমরা উত্তর-ভারতময় মন্দির নির্ম্মাণের যে-শৈলী প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন পাই।



পান্না ও ছত্রপুর রাজ্যের মধ্যস্থিত কেন নদী

যুক্ত-প্রদেশ হইতে দুইটি রাস্তা দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। একটি এলাহাবাদ হইতে কিছুদূর দক্ষিণে পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়া অবশেষে টোঁস নদীর পার ধরিয়া আরও দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। অপরটি কানপুর হইতে কিছু দক্ষিণে নামিয়া বেত্রবতী বা বেটোয়া নদীর পার ধরিয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। এই দুই দক্ষিণ-পথের মাঝখানে বুন্দেলখণ্ডের সামন্ত নরপতিগণের বাস। মহারাজা শিবাজীর সময়ে ছত্রসাল নামে একজন বিখ্যাত নরপতি



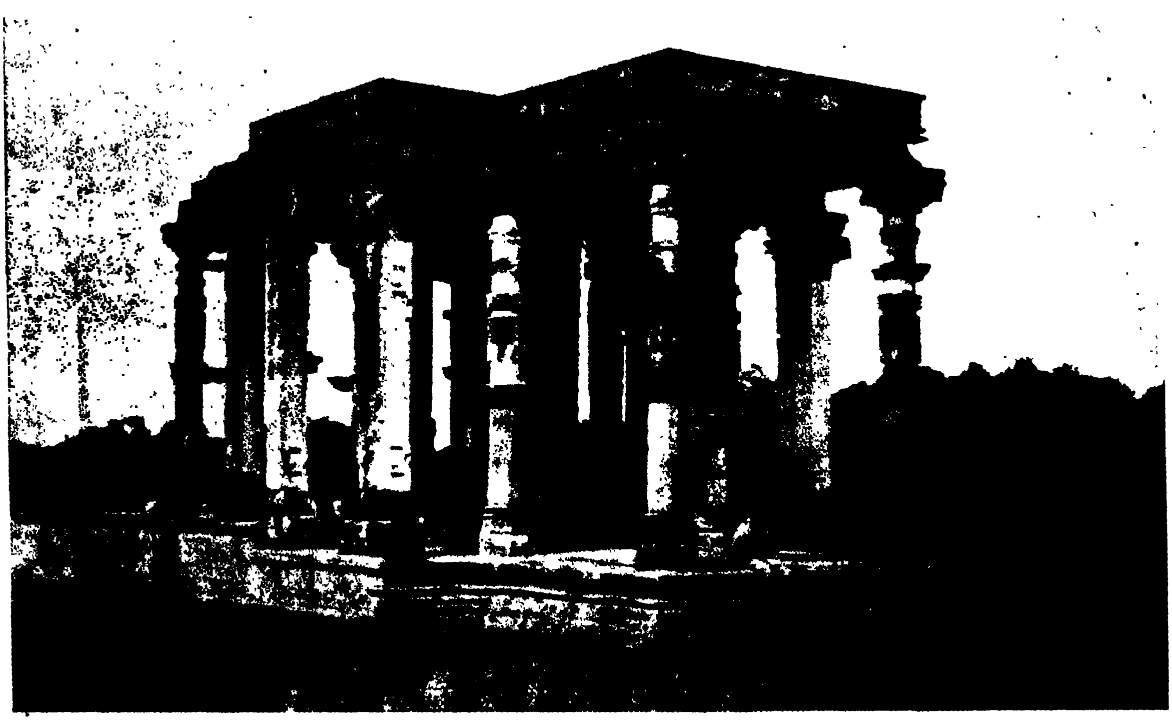
বামন-মন্দির ও একটি আধুনিক কালের মন্দির—খাজুরাহো

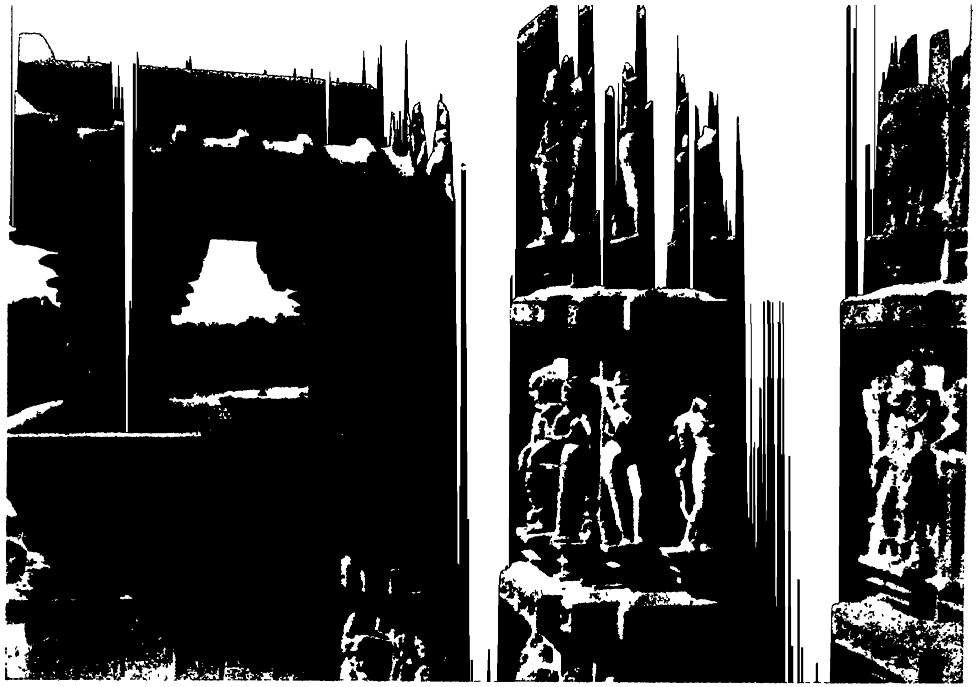


রেখ-দেউল, খাজুরাহো



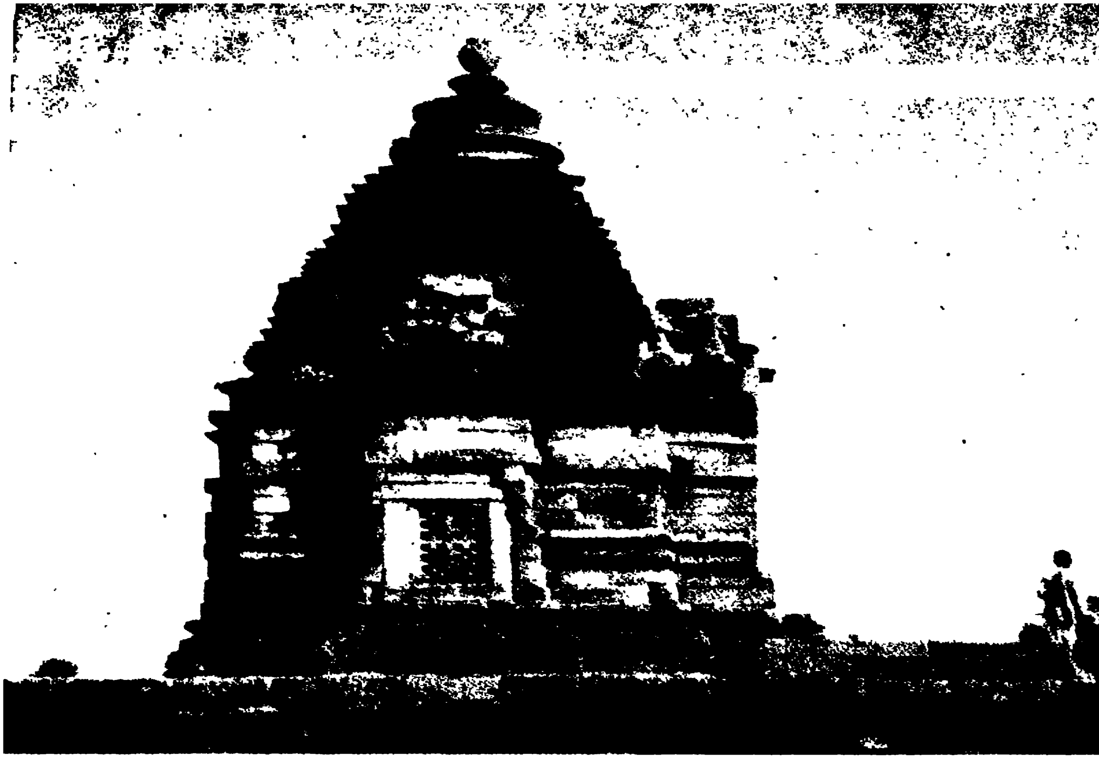
রেখ-মন্দিরের সম্মুখস্থিত ভদ্র-দেউলের-গণ্ডী ও মস্তক





মন্দিরগাত্রে মূর্ত্তিশ্রেণী ও বসিবার জন্ত খোলা বারান্দা





একটি ভদ্র-দেউল—খাজুরাহো



[illegible]

এইখানে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহারই দরবারে হিন্দী সাহিত্যে খ্যাতনামা ভূষণ কবি থাকিতেন। ভূষণের কবিতা বীররসে পরিপূর্ণ। তিনি যাঁহাদের জন্য কবিতা লিখিতেন, তাঁহারা ছিলেন ক্ষত্রিয় যোদ্ধার বংশ। আশ-পাশের দেশকে জয় করিয়া ঘরে ধনসম্ভার আনা তাঁহাদের চিরকালের পেশা ছিল। বহুকাল ধরিয়া এমনই ভাবে তাঁহারা যে অর্থ সঞ্চয় করিতেন, তাহা দেবতার মন্দির-গঠনে অথবা রাজপথ-নির্ম্মাণ বা পুষ্করিণী-খননে ব্যয় করিতেন। এই ভাবে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে বহুকাল ধরিয়া অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু বুন্দেলখণ্ড নয়, বেত্রবতী নদীর পশ্চিমে গোয়ালিয়র, ওড়্চা প্রভৃতি রাজ্যে বা ইন্দোরের দক্ষিণে নর্ম্মদা-তীরে ওঁকারেশ্বর প্রভৃতি স্থানেও আমরা প্রায় একই ধরণের অনেকগুলি মন্দির দেখিতে পাই। মন্দিরগুলির গঠনে কোন কোন লক্ষণ রাজপুতানার মত, কোনটি বা উড়িষ্যার মত, আবার এমন কতকগুলি লক্ষণও আছে, যাহা মধ্য-ভারত ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এইরূপ নানাবিধ লক্ষণে অলঙ্কৃত মন্দিরের বিশ্লেষণ করিয়া আমরা মধ্য-ভারতের শিল্পকলার ইতিহাসের কিছু কিছু সংবাদ পাইতে পারি।

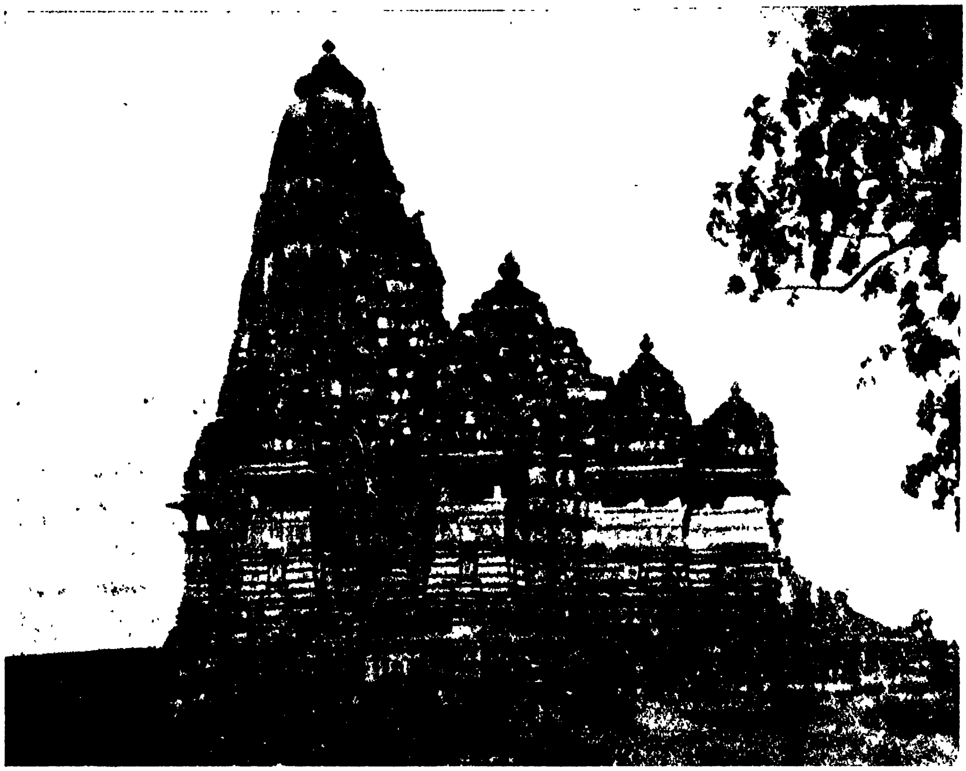


ওঁকারেশ্বর তীর্থে পুরাতন শৈলীতে রচিত বসতবাটী



খাজুরাহো যাইবার পথে কয়েকটি রেখমন্দিরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি

যুক্ত-প্রদেশে সারনাথ, মির্জ্জাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক সময়ে ছোট ছোট রেখ-দেউলের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। যাঁহাদের পয়সা বেশী নয়, অথচ মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা হয়ত এইরূপ ছোট-খাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। বুন্দেলখণ্ডে ছত্রপুর রাজ্যের মধ্যে খাজুরাহো নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মিত হয়। পান্না হইতে খাজুরাহো যাইবার পথের ধারে রেখ-দেউলের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি দেখিলেই এই অঞ্চলে রেখ-দেউলের কি রকম গড়ন প্রচলিত ছিল তাহা বুঝা যাইবে। ছোট হইলেও একটি জিনিষ ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করিবার



কাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দির —খাজুরাহো

আছে। মন্দিরের গায়ে মাঝখানে কিছু অংশ একটু মেলিত (projected) করিয়া দেওয়া উত্তর-ভারতের মন্দির মাত্রের রীতি ছিল। এইরূপ মেলানের দ্বারা মন্দিরের এক এক পার্শ্ব কয়েকটি পগে (segments) বিভক্ত হইয়া পড়ে। মন্দিরের যতখানিকে গণ্ডী বলা হয় তাহার উপরে মন্দিরের বেকি, আঁলা প্রভৃতি অংশ থাকে। উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে মাঝখানের পগটিকে গণ্ডী ছাড়াইয়া আরও উচ্চ কখনও করা হয় না। মধ্যের এই পগকে শিল্পশাস্ত্রের ভাষায় রাহা, রাহাপগ বা মধ্যরথ বলা হয়। মধ্য-ভারতের বহু মন্দিরে, বিশেষতঃ খাজুরাহোর মন্দিরগুলিতে, আমরা দেখিতে পাই যে রাহাকে গণ্ডী হইতে আরও উর্দ্ধে বাড়াইয়া আঁলার নীচে ঠেকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহা মধ্য-ভারতের বিশেষত্ব, আর কোথাও এমন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। খাজুরাহোর সমস্ত মন্দিরে কিন্তু এই লক্ষণটি নাই। উড়িষ্যা বা রাজপুতানার মত সেখানে কয়েকটি মন্দিরে পগ-বিভাগ গণ্ডীকে ছাড়াইয়া উর্দ্ধে আর উঠে নাই। যাহাই হউক, খাজুরাহোর রেখ-মন্দিরটিতে আমরা আরও দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত পাই। প্রথম, ইহার সম্মুখ দিকে রাহাপগটি অন্য তিন দিকের রাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মেলিত, এবং মন্দিরের ঠিক সম্মুখে একটি থাম দেওয়া ছোট বারান্দা আছে। রাজপুতানায় আমরা এইরূপ বারান্দার খুব ব্যবহার দেখিতে পাই; কিন্তু খাজুরাহোয় এই বারান্দা রাজপুতানার মত তত বিস্তৃত নহে। উড়িষ্যায় দু-একটি মন্দিরে অনুরূপ বারান্দার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি আরও অল্প বিস্তৃত।

খাজুরাহোর কাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে ছোট রেখ-মন্দিরটির মত কতকগুলি লক্ষণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার সম্মুখে পর পর

তিনটি ভদ্র-জাতীয় দেউল যোগ করিয়া উড়িষ্যার সহিত খাজুরাহোর যোগ আরও নিবিড় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে উড়িষ্যায় যেমন স্তরের পর স্তর পিঢ়া সাজাইয়া পিরামিডের আকৃতিবিশিষ্ট ভদ্র-দেউল রচিত হইত, এখানেও সে রীতি বেশ প্রচলিত ছিল। কিন্তু উড়িষ্যার ভদ্র-দেউলের সহিত একটি বিষয়ে খাজুরাহোর প্রভেদ আছে। উড়িষ্যায় ভদ্র-দেউলের মস্তকে হাণ্ডি বা ঘ্রাহি নামক একটি অঙ্গ থাকে, তাহা মস্তকের ঘণ্টাকৃতি অঙ্গের নীচে স্থাপিত হয়। খাজুরাহোয় তাহার অভাব আছে।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলিতে মাঝামাঝি প্রদেশের আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। রাজপুতানায় ওসিঁয়ার সম্পর্কে যেমন বলা হইয়াছিল যে মন্দিরের মণ্ডপের ধারে হেলান দিয়া বসিবার জন্য এক প্রকার বাঁকা গড়নের ছোট প্রাচীর দেওয়া হইত, খাজুরাহোর মন্দিরেও তাহা খুব দেখিতে পাওয়া যায়। এ জাতীয় বারান্দা খাজুরাহো হইতে আরও পূর্ব্বদিকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলি রাজপুতানায় ওসিঁয়ার মন্দিরের মত একটি বিস্তীর্ণ মহাপিঠের উপরে স্থাপিত। উড়িষ্যায় মন্দির একটি ক্ষুদ্র পিঠের উপরে স্থাপিত হইয়া থাকে। প্ল্যাটফর্ম্মের মত মহাপিঠের ব্যবহার সেদিকে একেবারে



মহাকালের মন্দির—উজ্জয়িনী

খাজুরাহোর রেখ-মন্দিরে আঁলার গঠনেও বৈচিত্র্য আছে। উড়িষ্যায় একটিমাত্র আঁলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আঁলার উপরে কলস বসান হয়। কিন্তু আঁলার উপর আবার আঁলা বসানোর রীতি প্রচলিত নাই। খাজুরাহোর প্রায় সকল রেখ-মন্দিরেরই ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রায় সর্ব্বত্র প্রধান আঁলার পরেও কয়েকটি ক্ষুদ্র আঁলা স্তরে স্তরে সাজান হয়। রাজপুতানায় কতকগুলি মন্দিরে, এমন কি অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে—উজ্জয়িনীর মন্দিরে পর্য্যন্ত এইরূপ আঁলার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রচলিত নাই। অতএব এই লক্ষণগুলি খাজুরাহোর সহিত পশ্চিমবর্ত্তী দেশগুলির সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া দিতেছে। এইভাবে আমরা খাজুরাহোর মন্দিরগুলিতে কখনও পূর্ব্বের সহিত, কখনও পশ্চিমের সহিত সম্বন্ধের অনেকগুলি সূত্র খুঁজিয়া পাই। উত্তর-কালে যখন দেশে শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা আরও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, তখন খাজুরাহোর শিল্পিগণ উত্তর বা পশ্চিম হইতে মুসলমানগণের কাছে গম্বুজ-নির্ম্মাণের রীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। চিত্রে অল্পদিন পূর্ব্বে রচিত

একটি মন্দির দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। উল্লিখিত মন্দিরে পুরাতন রীতির সহিত নূতন রীতি একত্র মিশিয়া একটি বিচিত্র কিন্তু কদর্য্য বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা যে রেখ ও ভদ্র-দেউলের আলোচনা করিলাম, তাহা ছাড়াও অপর একপ্রকার মন্দির নির্ম্মাণের রীতি বোধ হয় মধ্য-ভারতে প্রচলিত ছিল। ওঁকারেশ্বরের মন্দিরটি তাহার প্রমাণ। ওঁকারেশ্বর ইন্দোর হইতে কিছু দক্ষিণে নর্ম্মদার তীরে অবস্থিত। এখানে খাঁটি রেখ-শৈলীর অনেকগুলি পুরাতন মন্দির থাকিলেও, ওঁকারেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি একটি বিচিত্র শৈলীতে গঠিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। ওঁকারেশ্বর ভিন্ন উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দিরটিও একটি বিচিত্র ধরণের। ইহার মস্তক রেখ-দেউলের মত, কিন্তু গম্ভীর গড়ন ভদ্রের মত, পিরামিড আকৃতি। গায়ে আবার কোথাও কোথাও গৌড়ীয় শৈলীর গবাক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এত মিশ্র গঠনের যে কোন খাঁটি মন্দির নির্ম্মাণ রীতির মধ্যে ইহাকে স্থান দেওয়া কঠিন। মুসলমানগণের দ্বারা উত্তর-ভারত-বিজয়ের পরে পুনরায় যখন হিন্দুগণ স্বীয় আধিপত্য স্থাপনা করিতে লাগিলেন তখন শিল্পের ধারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল বলিয়া এইরূপে বহু মিশ্র ও শিল্পের দিক হইতে অসম্বদ্ধ ও অসুন্দর গড়নের মন্দির রচিত হয়। ওঁকারেশ্বর ও মহাকালের মন্দিরের মত তাহারা নানা অদ্ভুত ধরণের হইলেও তাহাদের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে শিল্পীর সৃষ্টিশক্তির বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় না। কিন্তু মধ্য-ভারতের শিল্পধারা যখন সত্যই স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর ছিল, তখনকার বৈচিত্র্যের মধ্যে মন সতত আরাম পায় ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ঐরূপ সময়ে রচিত খাজুরাহোর ঘণ্টাই-দেউল দেখিলে মন সত্যই আনন্দে ভরিয়া যায়। ঘণ্টাই-দেউল প্রচলিত রেখ, ভদ্র প্রভৃতি কোনও শৈলীর অন্তর্গত নহে। ইহা কি জন্য, কবে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাও জানা নাই। মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘণ্টার প্রতিকৃতি আছে বলিয়া স্থানীয় লোকে ইহাকে ঘণ্টাই নাম দিয়াছে। মন্দিরটির গঠনে এমন একটি সুচারু মনের পরিচয় পাওয়া যায় যে, ইহার রচয়িতাকে স্বতঃই অন্তর হইতে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে।



ইণ্টারন্যাশন্যাল কলোনিয়াল একজিবিশন প্যারিস ১৯৩১

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

বিগত ১৯২৪ সালে লণ্ডনে ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশন নামে বৃহৎ আয়োজনে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল উহাতে আমি আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের অলঙ্কারাদিসহ যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। প্যারিসের বর্ত্তমান ইণ্টারন্যাশন্যাল কলোনিয়াল একজিবিশনটির আয়োজনের সংবাদ সেই সময় হইতেই শুনিয়াছিলাম এবং ইহা অতি বিরাট আয়োজনে হইবে জানিয়া দেখিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। ভগবানের অনুগ্রহে সে-ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে

আমি বাংলার বিভিন্ন স্থানের কতকগুলি শিল্পদ্রব্য লইয়া প্যারিসের এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছি। আমার একাদশবর্ষীয়া কন্যা অমলা আমার সঙ্গে আসিয়াছে। মে মাসের প্রথমে প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে, নবেম্বর মাসের শেষভাগে সমাপ্ত হইবে। এটি প্রকৃতই এত বড় আয়োজন হইয়াছে যে, এ-পর্য্যন্ত জগতের আর কোন প্রদর্শনীই ইহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দৈনিক গড়ে সাড়ে তিন লক্ষ লোক নানা দেশ হইতে এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিতেছে।

প্যারিস শহরের বাহিরে Vincennes নামক বৃহৎ উপবনের একাংশে ২৭৫ একর জমির উপর এই প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়াছে। ইহা লণ্ডনের বিগত ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনের দ্বিগুণ পরিমাণ জমি লইয়া হইয়াছে। বনটির সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। প্রদর্শনীর ভিতরে রমণীয় হ্রদ, তাহার মধ্যে দুইটি দ্বীপ। দ্বীপ দুইটির উপর একজিবিশন-সংক্রান্ত নানা প্রকার আমোদ উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে। কয়েকটি সেতু করিয়া দ্বীপের সহিত প্রদর্শনীর যোগাযোগ করা হইয়াছে। বনের ভিতরে খুব ফাঁক ফাঁক ভাবে বৃহৎ আকারে বিভিন্ন গঠনে বিভিন্ন দেশীয় বাড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ ও ইয়োরোপের কয়েকটি বড় বড় দেশ তাহাদের নিজস্ব প্যাভিলিয়ন গঠন করিয়া নিজ নিজ উপনিবেশ সমূহের দর্শনীয় বিষয়সমূহ উপস্থিত করিয়াছে। ফরাসী রাজত্বের



শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী ও তাঁহার কন্যা অমলা

প্যারিস প্রদর্শনীতে উৎসব-গৃহে প্রাচীন ভারতীয় মন্দির-নৃত্য ও বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি দেখাইয়া অমলা বিশেষ প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করিয়াছে

ইণ্ডোচীনের সুবিখ্যাত ওঙ্কার মন্দিরের অনুকরণে যে-বাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে সেইটিই প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় দর্শনীয় জিনিষ হইয়াছে।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ এখানে কয়েকটি বাড়ি প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, হাওয়াই, আলাস্কা প্রভৃতির প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যসমূহ উপস্থিত করিয়াছে। আগামী ১৯৩৩ সালের শিকাগো প্রদর্শনী কি ভাবে হইবে তাহার মডেল গঠন করিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। হলাণ্ড তাহাদের অধিকৃত

ভারত-মহাসাগরীয় বোর্নিয়ো, সুমাত্রা, জাভা, বলীদ্বীপ প্রভৃতির দর্শনীয় বিষয় উপস্থিত করিয়াছে। অতি দুঃখের বিষয়, প্রদর্শনী আরম্ভের পর এই বৃহদায়তন প্যাভিলিয়ন অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া ইহার বহুমূল্য দ্রষ্টব্য-সমূহ নষ্ট হইয়াছে। পরে দেড় মাস কাল মধ্যে নূতন বাড়ি তৈরি হইয়া নূতন আয়োজনে উহাকে সজ্জিত করা হইয়াছে।



হিন্দুস্থান প্যাভিলিয়ন্

ইটালী, পোর্টুগাল, ডেনমার্ক, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিজ নিজ দেশ ও উপনিবেশ-সমূহের জন্য পৃথক পৃথক প্যাভিলিয়ন প্রস্তুত করিয়াছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপনিবেশগুলির জন্য যে-সকল প্যাভিলিয়ন প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার মধ্যে ইণ্ডোচীন, মাদাগাস্কর, মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিস্, সোনালী উপকূল, মধ্য-আফ্রিকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়ন নামে একটি বাড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহার দ্বারদেশে দুই দিকে দুইটি হস্তিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া উহার শোভাবর্দ্ধন করা হইয়াছে। উহার মধ্যে পণ্ডিচেরী, কারীকল, মাহে প্রভৃতি স্থানের দ্রব্যসমূহ রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের বাংলার চন্দননগরের কিছু কিছু দ্রব্যও উহাতে স্থান পাইয়াছে।

[illegible]

নামে একটি বাড়ি তৈরি হইয়াছে, ইহা আগ্রার ইৎমাদ্-উদ্দৌল্লার সমাধির অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে। যে-সকল ব্যবসায়ীর ইউরোপের নানা স্থানে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের কারবার আছে তাঁহারা অনেকে এখানে স্থান লইয়াছেন। বোম্বাইবাসী একটি ব্যবসায়ী এখানে ভারতীয় শাল ও রেশমী বস্ত্রাদি উপস্থিত করিয়াছেন। পঞ্জাববাসী এক সওদাগর জয়পুর ও মোরাদাবাদের প্রস্তর ও ধাতুশিল্প লইয়া আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে আমরা আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের স্বল্প মূল্যের অলঙ্কারাদি, বাংলার বিভিন্ন স্থানের ধাতুশিল্প এবং মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্তের প্রস্তুত দ্রব্যসমূহ এখানে উপস্থিত করিয়াছি। এই তিনটি ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ হইতে আসেন নাই। কাষ্টম্‌স্ ডিউটী অর্থাৎ বাণিজ্য-শুল্ক অত্যন্ত অধিক হয় বলিয়া আমরা আমাদের মূল্যবান অলঙ্কারাদি আনিতে পারি নাই।

প্রদর্শনীটিতে City of Information নামে একটি বৃহদায়তন বাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় সমগ্র জগতের প্রধান প্রধান জাতি শিল্পবাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যালয় স্থাপিত করিয়াছে। তন্মধ্যে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্, গ্রেট বৃটেন, হলাণ্ড, বেলজিয়ম, পোর্টুগাল, ডেনমার্ক, ইটালী, গ্রীস, পারস্য, আর্জ্জেণ্টাইন, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে ঐ ঐ দেশ সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ক সন্ধান লওয়ার সুবিধা হইয়াছে।

ফরাসী-রাজ্যের শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্ট সম্বন্ধে তিনটি বড় বড় বাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে, এইগুলি বিশেষ দর্শনীয়।

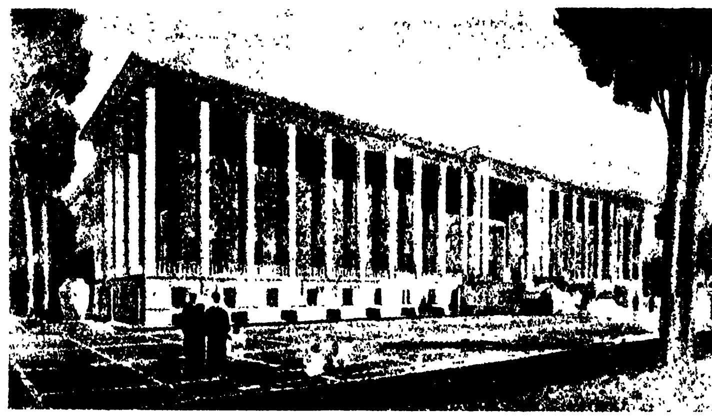
"কলোনিয়াল মিউজিয়ম" নামে যে বাড়িটি তৈয়ারী হইয়াছে উহা চিরস্থায়ী ভাবে রক্ষিত হইবে। ফরাসী উপনিবেশগুলির বহু দ্রব্য উহাতে রক্ষিত হইয়াছে।

প্রদর্শনীর অন্তে নানাস্থানের দ্রব্যসমূহ হইতে মনোনীত করিয়া দ্রব্য লইয়া ইহাকে আরও অধিকতর সৌষ্ঠবময় করা হইবে।

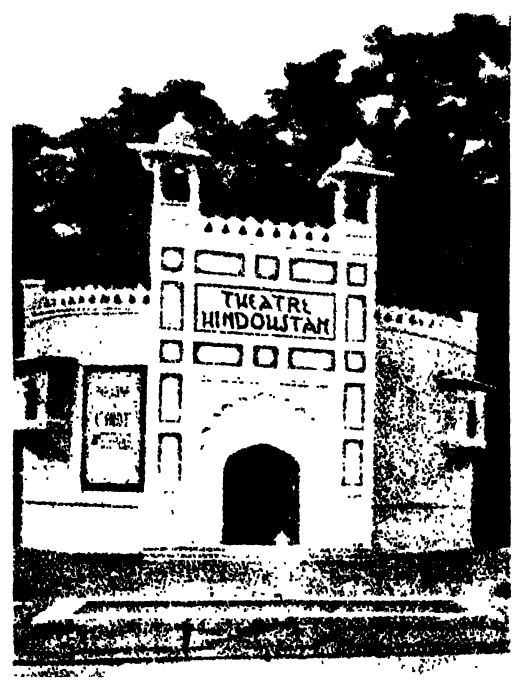
প্রদর্শনীতে দুই শতের অধিক ভোজনাগার এবং অসংখ্য প্রকার দ্রব্যের দোকান হইয়াছে। প্রত্যেক দেশী প্যাভিলিয়নের সঙ্গে সেই সেই দেশীয় ভোজনাগার প্রস্তুত হইয়াছে। ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নের সহিত ইণ্ডিয়া রেস্তোরা নামে ভোজনাগার প্রস্তুত হইয়াছে; কিন্তু কোন ভারতবাসী উহার তত্ত্বাবধানের ভার না লওয়ায় একজন ফরাসী ব্যবসায়ী উহার ভার লইয়াছে; এখানে সম্ভব-মত কিছু কিছু ভারতীয় খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙালীর প্রধান ভক্ষ্য ভাত এখানে আমরা পাইয়া থাকি। ইণ্ডিয়ান থিয়েটার বলিয়া যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে উহাও ফরাসীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। পণ্ডিচেরী হইতে নৃত্যকুশলা মহিলা ও মান্দ্রাজ হইতে জাদুবিদ্যা-প্রদর্শক এখানে আনা হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত আরবী নর্ত্তক, বাদ্যকর প্রভৃতি এখানে নানা প্রকার রঙ্গ দেখাইয়া থাকে। ইহার সম্মুখে একস্থানে ভারতীয় হস্তী, সর্প, বাংলার ব্যাঘ্র দেখান হইতেছে।

প্রদর্শনীর সৌন্দর্য বর্দ্ধনার্থ নানা দেশের নানা ভাবের দৃশ্য, বাড়ি-ঘরের নমুনা, লোকজনের আকৃতি-প্রকৃতি দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেকগুলি বড় বড় ফোয়ারা এখানে গঠন করা হইয়াছে। প্যারিস নগরী ফোয়ারার জন্য বিখ্যাত হইলেও এই প্রদর্শনীর নানা ভাবের ফোয়ারাগুলি প্যারিস শহরের সৌন্দর্য্যকেও পরাস্ত করিয়াছে। রাত্রিতে এত বিভিন্ন প্রকারের আলোক দ্বারা সজ্জিত করা হয় যে, দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ফোয়ারাগুলির উপর যে-সকল আলোকপাত করা হইয়াছে উহা প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বর্ণের আলোকে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বনের বৃক্ষাদিতে এবং প্রধান প্রধান প্যাভিলিয়নগুলিতে এমনই কৌশলে আলোকপাত করা হইয়াছে যে, উহার মূল আলোক দর্শকগণের দৃষ্টিপথে পড়ে না, অথচ উহার প্রতিফলিত দীপ্তি ঐ জিনিষগুলির উপর পড়িয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে।

প্রদর্শনীতে বহু দেশ-বিদেশের নানাবিষয়ক থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখান হইয়া থাকে। সিটি অফ্ ইনফরমেশ্যনের বাড়িতে এবং কলোনিয়াল মিউজিয়মের



আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশিক প্রদর্শনী—প্যারিস, ১৯৩১



হিন্দুস্থান নাট্যশালা

বাড়িতে দুইটি বড় বড় উৎসব-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে নানা দেশীয় উৎসবাদির আয়োজন হইয়া থাকে এবং সপ্তাহে একদিন ভারতীয় বিষয় দেখান হইয়া থাকে। আমাদের বাংলার বিখ্যাত নর্ত্তক উদয়শঙ্কর এবং বিখ্যাত নৃত্যকুশলা নিয়োতা ইনিয়োকা এখানে ভারতীয় নৃত্যাদি দেখাইতেছেন। নিয়োতা ইনিয়োকা যে সকল নৃত্য দেখাইতেছেন তাহার মধ্যে বৌদ্ধ উৎসব-মন্দিরে বিষ্ণুপূজার অভিনয় অতি চমৎকার হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় মন্দির-নৃত্য দেখাইবার জন্য নিয়োতা ইনিয়োকা আমার কন্যা অমলাকে শিক্ষা দিয়া লইয়াছেন এবং তাহার দ্বারা এই নৃত্য দেখাইতেছেন। অমলার নৃত্য বাস্তবিকই সুন্দর হইতেছে।

এই অভিনয়-গৃহ দুইটিতে ইণ্ডোচীন, মাদাগাস্কর, মরক্কো, হাওয়াই দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন বিষয়াদির চমৎকার অভিনয় হইয়া থাকে। ১০০ ফ্রাঙ্ক হইতে ৫০ ফ্রাঙ্ক (১০৲ টাকা হইতে ৫৲) দর্শনী দিয়া সহস্র সহস্র লোক প্রতিদিন এই সকল উৎসব দেখিতেছে।

প্যারিসের এই প্রদর্শনীতে যেরূপ নানা জিনিষ স্থান পাইয়াছে তাহাতে ইহাকে সমগ্র জগতের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। এত বিভিন্ন দেশীয় জিনিষ, এত বিভিন্ন দেশীয় লোকের সম্মিলন এই প্যারিস শহর ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভবপর হয় না।

জগদ্ব্যাপী এই অর্থসঙ্কটের দিনে এই প্রকার ব্যয়-বহুল স্থানের প্রদর্শনীতে বাংলার শিল্পদ্রব্যাদি উপস্থিত করিয়া আমরা বাংলার শিল্পকে জগতের সম্মুখে কতটুকু স্থান দিতে পারিব বলিতে পারি না, কিন্তু এই বিরাট প্রদর্শনীতে যে-অভিজ্ঞতা লাভ করিব তাহার মূল্যকে আমি নিতান্ত ছোটখাট মনে করিতে পারি না। টাকা-পয়সার হিসাবে ইহার মূল্য তুলনা করা চলে না। এইরূপ বিরাট ব্যাপার দর্শনই ইহার সার্থকতা।

বোম্বাই-প্রবাসী বাঙালী

জনৈক বোম্বাই-প্রবাসী

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে বোম্বাই-প্রবাসী বাঙালীদের পরিচয় শ্রীইন্দুভূষণ সেন অতি অল্পই দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার লেখায় কয়েকটা ভুলও আছে :—

১। শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বোম্বাইয়ে পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ থাকেন না, তাঁহার বয়সই বোধ হয় পঁয়ত্রিশ বৎসরের বেশী হইবে না।

২। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক মাস হইল দিল্লীতে চলিয়া গিয়াছেন।

৩। শ্রীযুক্ত নলিনাশঙ্কর সেন মহাশয় অধুনা ঝাঁসির অধিবাসী।

৪। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চৌধুরী মহাশয় আজকাল বোম্বাইয়ে থাকেন না।

৫। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কিছুকাল জি. আই. পি. লেবরেটরীর একটিং এসিষ্টাণ্ট কেমিষ্ট ছিলেন।

*   *   *

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব হাই-কমিশনার স্যর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা ডাঃ এস. সি. চট্টোপাধ্যায়, এম-ডি, এম-আর-সি-পি, ডি-পি-এইচ মহাশয় কিছুদিন হইল জি. আই. পি.র অফিশিয়েটিং চিফ মেডিকেল অফিসার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। গত মহাযুদ্ধে তিনি মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ফ্রান্সে কাজ করিয়াছেন।



শ্রীসুধীরচন্দ্র দত্ত

ডাঃ সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, এম-আর সি-পি, এম-আর-সি-এস, ডি-পি-এইচ, ডি-টি-এম মহাশয় জি. আই. পি. রেলের ডিপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার আদি নিবাস খুলনা



উপর হইতে নীচে—(বাম পার্শ্বে) ১। শ্রীশ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীঅন্নদা মুন্সী, ৩। শ্রীগণেশচন্দ্র মিত্র। (দক্ষিণ পার্শ্বে) ১। ডাঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীবিনয়ভূষণ গোস্বামী, ৩। শ্রীধীরেশলোচন সেন; (মধ্যে)—শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ

বাগেরহাটে। তিনি প্রায় তের বৎসর যাবৎ ভুবোয়াল ও নাগপুরে ডি. এম. ও. ছিলেন।

লেপ্টেনাণ্ট ডাঃ অনিলচন্দ্র গুপ্ত, এফ-আর সি-এস্, আই-এম-এস মহাশয় প্রায় এক বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন। তাঁহার নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরে।

শিক্ষাবিভাগে স্যর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের পুত্র ডক্টর শ্রীযুক্ত



ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিশ্বাস ও তাঁহার পত্নী

বি. এন. শীল, এম-এ, পি-এইচ-ডি, আই-ই-এস মহাশয় প্রায় এক বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন। তিনি বোম্বাইয়ের এলফিন্‌ষ্টোন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক।

বোম্বাই য়ুনিভারসিটির ইকনমিক্‌সের রীডার মিঃ ঘোষ, এম-এ, বার-এট-ল মহাশয় প্রায় এক বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন।

কেমেষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে শ্রীযুক্ত ধীরেশলোচন সেন, এম-এস-সি টেক্ (ম্যাঞ্চেষ্টার , এম-এস-সি (বোম্বে) এ-আই-আই-এস্-সি, এ-আই-সি (লণ্ডন) মহাশয় ইণ্ডিয়ান কটন রিসার্চ লেবরেটরীর সিনিয়ার কেমিষ্ট ভাবে আজ প্রায় সাত বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন। তাঁহার চেষ্টায় বোম্বাই ফিউমিগেশন ডিপার্টমেণ্ট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খোলা হইয়াছে। তাঁহার নিবাস ঢাকা সোনারগাঁয়।

শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মিত্র এম-এস-সি, এম-আই-মেট (লণ্ডন), মহাশয় আজ প্রায় নয় বৎসর যাবৎ বোম্বাই টাঁকশালে ডেপুটি অ্যাসে-মাষ্টার ভাবে আছেন। তিনি পূর্ব্বে কলিকাতা টাঁকশালে একটিং অ্যাসে-মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার নিবাস হাওড়ায়।

অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, বি-এস-সি (কলিকাতা), বি-এস-সি টেক্ (ম্যাঞ্চেষ্টার) ভারতবর্ষের ওয়েষ্ট ওয়ারলেস্ ডিভিশনের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার ভাবে কয়েক মাস হইল বোম্বাইয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদে তিনিই একমাত্র ভারতবাসী, বিশেষত বাঙালী, নিযুক্ত হইলেন।

বর্ত্তমান পোষ্টেল ডিপার্টমেণ্টে বোম্বাই প্রবাসী একমাত্র বাঙালী শ্রীযুক্ত করীন্দ্রনাথ ঘোষাল, বি-এ মহাশয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পোষ্ট অফিসেস্ ভাবে কাজ করিতেছেন। তাঁহার নিবাস বীরভূমের রায়পুর গ্রামে।

ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টস্ সারভিসে শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র গুপ্ত, এম-এস-সি মহাশয় প্রায় ছয় মাস যাবৎ বোম্বাইয়ে এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টেণ্ট জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিবাস ঢাকা মানিকগঞ্জে।

রেলওয়ে অডিট ডিপার্টমেণ্টের একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, এম-এ মহাশয় প্রায় দুই বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন। তাঁহার নিবাস নোয়াখালী। তিনি পূর্ব্বে দিল্লীতে ছিলেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্ বিভাগের শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রায় এক বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন। তাঁহার নিবাস কলিকাতায়।

শ্রীযুক্ত সরোজ চৌধুরী, ডব্লিউ, এইচ, ডিথ্ কোম্পানিতে ম্যানেজার ভাবে প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন। তাঁহার নিবাস ময়মনসিংহে।

সিলেট কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, আই-ই-এস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এল-ই-ই (অনার্স) মহাশয় প্রায় তিন বৎসর যাবৎ জি. আই. পি.র ট্রেন একজামিনার ভাবে চাকুরি করিতেছেন। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রামে।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এস-সি, এল-ই-ই মহাশয় প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন। তিনি জি. আই. পি.র হেড্ ট্রেন একজামিনার। তিনি কাশীনিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।

বোম্বাই শহরে ভারতের হলিউডে একমাত্র খ্যাতনামা বাঙালী ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ, বি-এ মহাশয় প্রায় তিন বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন। তাঁহার তৈয়ারি "হাতিম তাই" বিশেষ নাম করিয়াছে। তিনি এখন সাগর ফিল্ম কোম্পানীতে আছেন।

এতদ্ব্যতীত বোম্বাই শহরে সুপরিচিত গায়ক শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অন্নদা মুন্সী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রায় তিন বৎসর যাবৎ বোম্বাইয়ে আছেন। তাঁহার গানে এক বাঙালী কেন পার্শী, গুজরাটি ও মরাঠীরা বিশেষ আকৃষ্ট। তাঁহার নিবাস নদীয়ায়। শ্রীযুক্ত মুন্সী পাব্লিসিটি অঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী। তাঁহার নিবাস যশোহর জেলায়। ইঁহারা উভয়েই হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ করেন। বোম্বাই ব্রডকাষ্টিং ষ্টুডিওতে ইঁহারা উভয়েই বাংলা গান গাহিয়া থাকেন। এদেশের লোকে বাংলা গানের মৌলিকতার প্রশংসা করে।

ইহা ছাড়া বোম্বাই শহরে প্রায় দুই হাজারেরও অধিক বাঙালী থাকেন।

নিষ্কলুষ

শ্রীনিরঙ্কুশ ভদ্র

১

পল্লীগ্রামের হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার। পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে এম্‌-এ পাস খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, সুতরাং খাতির একটু বেশী পাই বইকি। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে মন ইহাতে সুস্থ হয় না। একশত টাকার রসিদ দিতে হয়, কিন্তু পাই মাত্র ষাটটি টাকা। যদিও এই চুক্তিতে স্বীকার করিয়াই কাজ লইয়াছি, তবু ছলনার প্রশ্রয় দেওয়ায় মনটা মাঝে মাঝে ঘিন্‌ঘিন্‌ করিয়া উঠে।

কর্তৃপক্ষের গ্রাহ্য নাই। এম্‌ এ পাস মাষ্টার আনিয়া দিয়াছে তাহারা—আর ভাবনা কি! ইহারই মধ্যে বাড়াইয়া গুছাইয়া স্কুলটি কায়েম করিতে পারেন ভাল—না পারিলে এম্‌-এ পাসের মূল্য থাকে কোথায়?

সুতরাং আমাকেই সব করিতে হয়। প্রত্যহ ছেলের খোঁজে বাহির হই—আশে পাশের গ্রামগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াই—শিকারীর দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি বাড়ন্ত শিশুর দিকে চাহিয়া দেখি, হিসাব করি আর কতদিন পর তাহার হাতেখড়ি হওয়া সম্ভব।

—ওহে খোকা, শোন তো দেখি। ...মাঠের আ'ল ধরিয়া চলিয়াছি—সামনের সাত আট বছরের বালককে দেখিয়া, তাহার পথ আগলাইয়া বলি—কি পড় হে তুমি?

বালকটি ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া থাকে, জবাব খুঁজিয়া পায় না।

—তোমাদের বাড়ি কোন্‌টা হে? বাপের নাম কি? ও হারাধন মুদির ছেলে? বেশ, বেশ।

হারাধন মুদি দোকানের ঝাঁপ খুলিয়া ছোট্ট গণেশের মূর্ত্তির কাছে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ...আজ্ঞে মাষ্টার-মশায় যে! পায়ের ধুলা দিন—আজ আমার সুপ্রভাত।

একে ব্রাহ্মণ, তার উপর এম্‌-এ পাস হেড্‌মাষ্টার—সুপ্রভাত বইকি! সুতরাং পায়ের ধুলা দিতেই হয়। কিন্তু মনে মনে আমি এম-এ পাস হইলেও উহারই পায়ের ধুলা সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া লই। মুদি হইলেও এই লোকটির সাধুতার সুনাম আমি শুনিয়াছি।

—বলি হারাধন, তোমার ছেলেটিকে আজ দেখলাম, বেশ ছেলেটি।

হারাধন অত্যন্ত খুশী হইয়া বলে—আজ্ঞে সে আপনাদের আশীর্ব্বাদে। মতিগতি ওর ভাল হোক—ওর হাতে দোকানটি তুলে দিতে পারলে——

বাধা দিয়া বলি—সে তো বটেই। কিন্তু একটু লেখা-পড়া শিখাবে না হারাধন? বেশী না পড়াও—ম্যাট্রিকটা পর্য্যন্ত পড়ুক ও। আজকাল ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলেও কিছু বিদ্যে থাকা চাই কি-না। ...তারপর কথার পর কথা গাঁথিয়া তাহার মন ভিজাইবার চেষ্টা করি, এমন কি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বসি—লেখাপড়া শিখাইলে তাহার পুত্র একটা মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিবে, এমন কি এম-এ পাস করিতেও তাহার বাধিতে না পারে।

হারাধন মুদি অবশেষে পুত্রকে স্কুলে দিতে স্বীকার করে, পায়ের ধুলা লইয়া বলে—ওকে আপনার হাতেই দেব তাহ'লে। নিজের মত ক'রে গড়ে তুলবেন মাষ্টার-মশায়। তাহার চোখে আনন্দাশ্রু উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

মুখে বলি—সে তুমি দেখে নিও হারাধন। ও ছেলে তোমার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট না হয়ে যায় না।

সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করি—১০৭ সংখ্যা ১০৮-এ দাঁড়াইল। মুনাফা বাড়িল—বার আনা।

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে স্কুলটি বাড়াইয়া তুলিতেছি। মাসিক 'পেমেণ্টে'র দিন মাষ্টার-পণ্ডিতদের উৎসাহ দিয়া বলি, আপনাদের আমি—বুঝলেন কি-না পণ্ডিত-মশায়—এ হীনতা থেকে উদ্ধার করব। টাকার রসিদের আর পাওনার মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকবে না—এ আপনারা দেখে নেবেন। ছেলের সংখ্যা কেমন বাড়ছে দেখছেন তো?

পণ্ডিত মহাশয় অপ্রসন্ন মুখে একবার নিজের খেকেটটা দেখিয়া লইলেন—তাঁহার পাওনা ১৭৬১০ আনা ঠিক আছে কি-না।

—এ কি রামহরিবাবু যে—কি খবর? আপনার ছেলে আজ মাসখানেক ইস্কুল কামাই করছে কেন মশায়? অসুখ-বিসুখ করেনি সে আমি জানি। মাঝে মাঝে দেখাও হয়। আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেই সরে পড়ে। ব্যাপার কি বলুন তো? এমন করলে তার নাম রাখি কি ক'রে? দু-মাসের মাইনেও সে দেয় নি। এতে ডিসিপ্লিন থাকে না—বুঝ্‌লেন?

রামহরিবাবু গ্রামের মহাজন। তাঁহার ধনের পরিমাণ লইয়া অনেককে তর্কবিতর্ক করিতেও শুনিয়াছি, কেহই কিছু কিনারা করিতে পারে না তাহাও জানি। কিন্তু তাহা হইলেও এম-এ পাস হেডমাষ্টার হইয়া একটু কড়া কথা বলিতে পারিব না?

কিন্তু রামহরিবাবুর জবাব পাইয়া আমার মুখ শুকাইল। কহিলাম—ট্রান্সফার সার্টিফিকেট চাই?…অতি-কষ্টে ১২১-এ দাঁড় করাইয়াছ—১২০-তে নামিয়া যাইবে? দেখুন, আমাদের ইস্কুলে যেমন ইণ্টারেষ্ট নিয়ে পড়াই, এমন আপনি কোথায়ও পাবেন না ব'লে দিচ্ছি। হলুদ-গাঁয়ের স্কুলে দেবেন? তা বেশ তো। কিন্তু আপনি একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। নিজের গ্রামে ইস্কুল—সব সময়ে ছেলেকে চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছেন—এ আপনার ভাল লাগল না? ও, সেখানে হাফ-ফ্রি পাচ্ছেন? বেশ, নিন্‌ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট। আপনার ছেলে যদি লেখাপড়ায় একটু ভাল হত—তবু না-হয় এ-সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে দেখতাম। যাক্‌, যখন একেবারেই মনস্থ করে ফেলেছেন—আচ্ছা আসবেন কাল, দেখা যাবে!…এই বলিয়া তাড়াতাড়ি এ্যাটেণ্ডেন্স রেজিষ্টার লইয়া একটা ক্লাসে ঢুকিয়া পড়িলাম।

…রোল নম্বার ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর—আরে গজেনের কি হয়েছে বলতে পার? এক-দুই-তিন চার - আরে পাঁচ দিন absent যে।

—স্যার, তার পেটের অসুখ।

পেটের অসুখ? তবু রক্ষা। স্কুল না ছাড়িলেই বাঁচি! আমার ষাটটি টাকা আদায়ের যন্ত্র ইহারা। ইহাদের কাহাকেও দুই একদিন অনুপস্থিত দেখিলেই মনটা কাঁদিয়া ওঠে। এম-এ পাসের মূল্য ইহাদের উপরই কড়ায় গণ্ডায় উশুল করিয়া লইতে হইবে তো!

২

সেদিন স্কুলের আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিতেছি—এমন সময় একটি বার-তের বৎসরের বালক নমস্কার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। মুখ তুলিতেই সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িল—তাহার উজ্জ্বল চোখ দুটি। প্রথম দৃষ্টিপাতেই মনে হইল এম্‌নি চোখ দুটি যেন পূর্ব্বে—অনেক পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি, যেন এই চোখের দৃষ্টিকে আমি চিনি। গ্রামে গ্রামে ছেলে সংগ্রহ করিতে ঘুরিয়া বেড়াই, প্রত্যেকের মুখ চোখের দিকে চাহিয়া প্রতিভার নিদর্শন খুঁজিবার ব্যর্থ চেষ্টা করি। আজ ইহাকে দেখিয়া মনে হইল - ইহাকে যেন এতদিন আমি চাহিয়াছি।

বলিলাম—কি চাও তুমি?

সে কহিল—ইস্কুলে ভর্ত্তি হইতে চাই স্যর।

গা ঝাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলাম—বেশ তো। তোমার নাম কি খোকা?

—শ্রীঅমলকুমার চৌধুরী।

—এর আগে কোথায় পড়তে?

—আমি বাড়িতেই পড়েছি এতদিন।

—কোন্‌ ক্লাসে ভর্ত্তি হতে চাও তুমি?

—মা বলে দিয়েছেন—খুব সম্ভব সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হবার উপযুক্ত। আপনি পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন।

জড়তাহীন স্পষ্ট কথাগুলি। আমি মুগ্ধ হইলাম, কহিলাম—হ্যাঁ, পরীক্ষা করেই দেখব। কি কি বই তুমি পড়েছ?

—ইংরেজী অনেক বই পড়েছি—যেমন Tales from Shakespeare, Folk Tales of Bengal, Palgrave's Golden Treasury—

—আচ্ছা, মার্চ্চেণ্ট অফ ভেনিসের গল্পের সারটা ইংরেজীতে বল্‌তে প্যার, অমল?

—পারি স্যার। অতি সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে সে গল্পটি বলিয়া গেল।

আমি কহিলাম—শাইলকের চরিত্র তোমার কেমন লাগে? গল্পটি পড়ে তোমার কি মনে হয়?

বালক একটু হাসিল,—মা বলেন, শাইলকের উপর যত অত্যাচার হয়েছে, ম্যান্টোনিয়োর উপর ততটা হয়নি। জু'দের উপর খ্রীষ্টিয়ানদের অত্যাচাব যেন এতে অনেক স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। যদিও স্থূলদৃষ্টিতে সেটা বোঝা যায় না।

বালকের কথায় বিস্মিত হইলাম। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, institution মানে কি?

—প্রতিষ্ঠান।

—Intuition?

—সহজজ্ঞান।

অপত্যস্নেহেব ইংবেজী কি?

—Philoprogenitiveness.

—রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতা আবৃত্তি করতে পাব?

—পারি স্যার। বঙ্গমাতা কবিতাটি বলি?

"পুণ্য পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমাব সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি। তব গৃহক্রোড়ে
চিবশিশু কবে আর রাখিও না ধরে'।
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধেব ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে করে।"

বালকের কণ্ঠস্বরে যেন জাদু আছে! কহিলাম বেশ, বেশ, তোমাকে সেকেণ্ড ক্লাসেই ভর্ত্তি করে নেব। আজই কি ভর্ত্তি হবে?

—আজই ভর্ত্তি হতে চাই, স্যাব?

—তোমার বাবা?

—তিনি এখানে নাই। মা-ই আমার অভিভাবক।

কথাটা কেমন যেন বেসুরা লাগিল। কহিলাম—বেশ তো, আজই ভর্ত্তি করে নিচ্ছি, অমল।

ভর্ত্তি করিয়া অমলকে লইয়া ক্লাসে গেলাম। ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া কহিলাম—তোমাদের ক্লাসে এই নতুন ছাত্রটি ভর্ত্তি হয়েছে। ক্লাসে কত দূর পড়া হয়েছে দেখিয়ে দাও। আর অমল, আমি আশা করি তুমি পড়াশোনায় অমনোযোগী হবে না। আমি শীগ্‌গির জানতে চাই, এই ক্লাসের কোন্ ছাত্র ইস্কুলের সুনাম রাখতে পারবে।

অমল কৌতুকের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ঘাড় নত কবিল। দেখিলাম ক্লাসের সকল ছাত্রই অমলের দিকে চাহিয়া আছে।

যতদিন যায় অমলের গুণে মুগ্ধ হইলাম। এমন বুদ্ধি, এমন প্রতিভা, এমন মেধা আমি কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে প্রত্যহ তিনমাইল দূর হইতে স্কুলে আসে, অথচ একদিনও তাহার বিলম্ব হয় না। পড়ায় সে সকলের অগ্রণী—প্রথম শ্রেণীতেও কেহ তাহার সমকক্ষ নাই। অমল যে বিদ্যালয়ের গৌরববর্দ্ধন করিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না।

পড়াইতে পড়াইতে ইহার চোখের দিকে তাকাই—এমনিটি আর কোথায় দেখিয়াছি ভাবিতে চেষ্টা করি।

অথচ অমলের পারিবারিক ইতিহাসের কথা আমি সমস্তই শুনিয়াছি। অমলের পিতা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসী—নারীহত্যার অপরাধে। তাহার জননী সত্যই তাহার অভিভাবক। যে জননী শৈশব হইতে এই বালককে পালন কবিয়া, শিক্ষা দিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছে—সে যে কত বড় মহিয়সী মহিলা ইহা আমার বুঝিতে বাকী নাই। অমলকে দেখিয়া তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারি। কিন্তু বাঙালীর ঘরে, এই পল্লীগ্রামে এমন বস্তু কোথা হইতে আসিল?

স্কুলের ছুটির পর সেদিন বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে মাঠের রাস্তায় অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি, ফিরিব মনে করিতেছি—এমন সময় অমলের সঙ্গে দেখা। সে কহিল—অনেক দূব এসেছেন স্যার। আমাদের বাড়ী একবার চলুন না। ঐ দেখা যাচ্ছে।

সহাস্যে কহিলাম—বেশ তো চল।

অমল অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিল—মা একদিন আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে আসবার কথা

বলেছিলেন। আচ্ছা স্যর, আপনাদের বাড়ী রঘুনাথপুরে তো ?

চলিতে চলিতে কহিলাম—হ্যাঁ, কেন বল তো ?

—না স্যর, এমনি বলছিলাম।...এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে অমলদের বাড়ি পৌছিলাম। ক্ষুদ্র গৃহ বটে কিন্তু অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। অমলের পড়িবার কক্ষে গিয়া বসিলাম। ছোট্ট টেবিলের সম্মুখে একখানি চেয়ার। দেওয়ালে ঝোলানো বইয়ের সেল্‌ফ বই, খাতা, দোয়াত, কলম সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। অমলের বইয়ের সেল্‌ফ হইতে টানিয়া টানিয়া বই বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলাম—স্কুলপাঠ্য ছাড়াও অনেক বই তাহার আছে। অনেকদিনই যে কথা মনে হইয়াছে আজও তাহাই মনে পড়িতে লাগিল, যে জননী সন্তানকে এমনি ভাবে পালন করিতেছে—সে কেমন ?

—দাদা চিন্‌তে পার ?

চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখি—সম্মুখে একজন মহিলা। সে সহাস্যে কহিল—আমি আগেই ঠিক পেয়েছিলাম। যখন শুনেছি এম-এ পাস হেডমাষ্টারটির বাড়ি রঘুনাথপুর—তখনই জানি এ আমাদের জ্যোতি-দা না হয়ে যায় না।

বিস্মিত হইলাম বটে, কিন্তু আনন্দও যেন আর চাপিয়া রাখিতে পারি না, মুখ দিয়া বাহির হইল—কে ? শোভা ? তুমি এখানে ? তুমি অমলের মা ?

চাহিয়া দেখি অমল হাসিতেছে। অমলের মা ও যেন হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

—হ্যাঁ দাদা, আমিই অমলের মা। বস জ্যোতি-দা। অমল, ও ঘর থেকে মোড়াটা নিয়ে আয় তো বাবা। আচ্ছা কতদিন পরে দেখা বল তো ? পনের বছর হ'ল, না ? তবু তোমাকে দেখবামাত্রই চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু তুমি পারনি জ্যোতি-দা।

সত্যই পারি নাই কি ? কিন্তু না পারিবারও কথা না। যে ছিল শৈশবের সহচরী, কৈশোরের বন্ধু, প্রথম যৌবনের স্বপ্ন—তাহাকে কি যুগ-যুগান্তর পর দেখিলেও চেনা যায় না ?

শোভার গল্প আর ফুরাইতে চায় না। সেই কবে তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া কপাল কাটিয়া দিয়াছিলাম সে কথাটাও তার মনে আছে।

কিন্তু আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না। তাহার চোখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, এখনও ইহার চোখ দুটি তেম্‌নি উজ্জ্বল, চোখের দৃষ্টি তেম্‌নি তীক্ষ্ণ মধুর রহিয়াছে।

শোভা কহিল—আচ্ছা, অমলকে মানুষ করে তুলতে পারবে তো দাদা ?

কথাটি বলিতে গিয়াই সে যেন একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেল। তাহার অন্তরের ভাষা আমি পড়িয়া ফেলিলাম, সহাস্যে বলিলাম—শোভা, জননী হওয়ার সত্যকারের ব্যথা যে বুঝেছে সন্তানের মর্ম্ম সে জানে। তোমার ছেলে মানুষ না হয়ে যায় না।

সন্ধ্যার অনেক পর ফিরিলাম। শোভা বলিয়া দিল, সময় পেলেই মাঝে মাঝে এস, দাদা। বেশী কিছু ভা'বতে পারিলাম না। মাথার মধ্যে কেবল এই কথাটাই ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতে লাগিল অমলের মা—শোভা ? অমলের চোখের দিকে চাহিয়াই কি চিনিতে পারি নাই ?

৩

১৯৩০ সাল, ভূমিকম্প অথবা প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির অবস্থা যেমন হয় চারিদিকের আবহাওয়া যেন তেম্‌নি। শঙ্কিতচিত্তে স্কুলের গৃহ, স্কুলের ছাত্র, স্কুলের শিক্ষকদের দিকে তাকাই—যে ঝড় আসিবে বলিয়া মনে হইতেছে, আমার নিজ হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানটি খাড়া থাকিবে ত ?

ক্লাসে পড়াইতেছি—হঠাৎ অমল বলিয়া উঠিল—স্যার, মহাত্মা গান্ধী যে লবণ আইন ভঙ্গ করবেন বলেছেন এতে কি কোনও ফল হবে মনে করেন ?

অমলের অবান্তর প্রশ্নে বিরক্তি বোধ করিলাম, কহিলাম, ক্লাসে তোমার সঙ্গে রাজনীতি চর্চ্চা করতে আসিনি, অমল।

অমলের মুখে মৃদু হাসি লক্ষ্য করিলাম। ক্লাসের

সমস্ত ছাত্র অমলের মুখের দিকে বিস্মিতদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল।

—আপনি কি মনে করেন স্কুলের ছাত্রদের দেশের কোনও আন্দোলনে যোগ দিতে নাই ?

স্তম্ভিত হইয়া এই অসীম সাহসিক বালকের দিকে চাহিলাম—কিছুক্ষণ আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ভাবিলাম ঝড় কি আসন্ন ?···কিন্তু পরক্ষণেই ক্রুদ্ধস্বরে কহিলাম—অমল, তোমার মত বয়সের ছেলের এতটা পাকামি ভাল নয়। দেশের কথা ভাববার অনেক লোক আছে, ও চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।

অমল মস্তক নত করিল। আমি পুনরায় পড়াইতে লাগিলাম বটে, কিন্তু কি জানি কেন কোনো ছাত্রের দিকেই মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না।

লাইব্রেরীতে বসিয়া খবরের কাগজ উল্টাইতেছি—মহাত্মাজীর অভিযান সুরু হইয়াছে—দেশে অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়াছে—ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ, নর-নারী এই অভিযানে যোগ দিয়াছে। পড়িতে পড়িতে এই কথাই মনে হইল—আমি কি করিতেছি ?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—ব্যাপার সুবিধের নয় হেডমাষ্টার-মশায়। শুনলাম—সোনার গাঁ স্কুলের সব ছেলে বেরিয়ে এসেছে।

চাহিয়া দেখি তাঁহার মুখে আতঙ্কের চিহ্ন। হাসিয়া কহিলাম—নিশ্চিন্ত থাকুন পণ্ডিত-মশায়। এ ইস্কুলে ওসব হাঙ্গামা হতে দেব না আমি। রাজনীতি-চর্চ্চার বয়স ওদের হয় নি।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—সে ত বুঝি মাষ্টার-মশায়, কিন্তু এসব হুজুগে ছেলেদের মাথা ঠিক রাখাই কঠিন কি না।

ঠিক করিলাম, যেমন করিয়াই হোক আমার হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠানটিকে আমি ভাঙিতে দিব না। সব ছাত্রদের কাছে কাছে রাখিব, নিত্য তাহাদের উপদেশ দিব—রাজনীতি হইতে দূরে রাখিব।

সেইদিন বৈকালে অমলদের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। শোভাকে কহিলাম—শোভা, অমলের উপর এখন থেকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মনে হচ্ছে—দেশের এ আন্দোলন সম্বন্ধে সে একটু মাথা ঘামাচ্ছে।

শোভা মৃদু হাসিয়া কহিল—এ কি তুমি দোষের মনে কর, দাদা ?

কহিলাম—করি। এখনও এমন বয়স হয় নি যাতে দেশের কথা ও সংযত চিত্তে ভাবতে পারে। আমার মনে হয় জ্ঞান আহরণ করবার চেয়ে বড় কাজ ছাত্রদের অন্য কিছু নেই. এ কাজ শেষ হ'লে তারা দেশের কথা ভাল ভাবে ভাব্‌তে পারে।

শোভা কি যেন চিন্তা করিল, তারপর কহিল—আমি অমলকে এ কথা বলব।

মনে হইল—অমলের মা আমার কথায় ততটা আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই।

শোভা কহিল—ছাত্রদের সম্বন্ধে তোমার মতামত জানা গেল। কিন্তু আমাদের এই মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার কি মত ? এই আন্দোলনে মেয়েদের যোগ দেওয়া উচিত কি না বলত, দাদা।

বুঝিলাম—শুধু ছেলের নয়, মায়েরও মাথা ঘুরিয়াছে। সহাস্যে কহিলাম—শোভা, ছেলেবেলার কথা একবার মনে করে দেখ। পুরুষ আর নারীর সমানাধিকার নিয়ে তখন থেকেই মাথা ঘামিয়েছি। এখন যদি বলি স্ত্রীলোকদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত নয়—তাহলে তুমি ভাববে কি ?

শোভা কহিল—কথাটা তুমি ঘুরিয়ে বললে। তোমার মনের ভাব ঠিক বুঝলাম না। আচ্ছা, আমি যদি বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করি তাতে তোমার আপত্তি নেই ?

কহিলাম—আপত্তি ? কিছুমাত্র না। ছোটবেলায় যখন দুইজন একসাথে পুকুরে সাঁতার কেটেছি—তুমি গিয়েছ আগে পুকুর পেরিয়ে—পেয়ারা গাছের আগডালে পেয়ারা পাক্‌লে গাছের ঐ সরু ডালে ওটা সম্ভব হবে কিনা যখন আমি গবেষণা করতাম—তখন তুমি কোমরে কাপড় জড়িয়ে সেই পেয়ারা অবলীলাক্রমে পেড়ে আনতে। তখন যদি আমার পৌরুষে আঘাত না লেগে থাকে—তবে এখনও লাগবে না।

অমলদের বাড়ি হইতে যখন ফিরি—রাত্রি অনেক হইয়াছে। মনে হইতেছিল—বহুদিন পরে আবার যেন শৈশব ফিরিয়া পাইয়াছি।

৪

চারিদিকের প্রবল আন্দোলনের মধ্যে কি করিয়া স্কুলটিকে খাড়া রাখিয়াছি—ইহা আমার কাছেই বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া মনে হয়। সংবাদ নিত্য পাই—কোন্ স্কুলের কতটি ছাত্র বাহির হইয়া গেল—কোন্ স্কুলটি উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে। এ সব সংবাদে আমার আত্ম-গরিমাই বাড়ে; ভারী, উপযুক্ত কর্ণধার বলিয়া আমার প্রতিষ্ঠানটিকে এই আন্দোলন আঘাত করিতে পারিল না। মাঝে মাঝে অমলের দিকে চাই। বুঝিতে পারি অনেক সময় সে-ও জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকে—কিন্তু কিছুই বলিতে পারে না।

ছেলেদের মন অন্য দিকে ফিরাইতে এই সময় পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করিলাম। ঠিক হইল—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিব। সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন শুনিলেন—এই বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রও আন্দোলনে যোগ দেয় নাই—তখন তিনি সানন্দে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

ছেলেদের লইয়া মাতিয়া উঠিলাম। পুরস্কারের জন্য বই বাছাই করা, ছেলেদের রেসিটেশনে তালিম দেওয়া, স্পোর্টিংয়ে তাহাদের নানা কসরৎ শেখানো—এই-সব কাজে সবাই লাগিয়া গেলাম।

যথাসময়ে পুরস্কার বিতরণের দিন আসিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিলেন, সমস্ত ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত খুসি হইলেন, আমার বিদ্যালয়ে যে কাজ ভাল হইতেছে, ইহা তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যক্ত করিলেন। আমার মন উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। ভাবিলাম, একশত টাকার সরকারী সাহায্য কোনও রকমে দ্বিগুণ করিয়া লওয়া যায় কি না।

পুরস্কার বিতরণ হইয়া গেল। প্রতি বিষয়ে—লেখা পড়ায় পারদর্শিতায়, স্কুলে নিয়মিত হাজিরায়, সচ্চরিত্রতায় ও ব্যায়াম-কুশলতায়, এমন কি ইংরেজী ও বাংলায় সুন্দর আবৃত্তির জন্য অমল যখন প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করিল—সাহেব আমার দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন—মাষ্টার, এ ছাত্রটি তোমার স্কুলের নাম রক্ষা করিবে।

গর্ব্বে আমার মন ভরিয়া উঠিল। শোভার পুত্র—আমার ছাত্র—আমার প্রতিষ্ঠানটির শুধু নাম রাখিবে না, নামটি উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে—ইহা অপেক্ষা আর আমার গৌরবের বস্তু কি হইতে পারে!

পুরস্কার বিতরণের পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। তিনি পরিষ্কার বাংলায় বলিতে লাগিলেন, আমি এই সভায় যোগ ডিটে পারিয়া অর্ট্যন্ট সণ্টুষ্ট হইয়াছে। এই বিড্ডালয়টির কার্য্য খুব ভাল চলিতেছে। আমি কিচ্ছু বেশী বলিটে পারিবে না—টবে ছাট্রদের সম্বন্ধে এই বলিটে পারে যে তাহারা ভাল করিয়া লেখা পড়া করিবে, লেখাপড়া করিয়া টাহারা জ্ঞানী হইবে, জ্ঞানী হইলে ডেশের উপকার হইবে, ডেশের উপকার হইলে ডেশ বড় হইয়া যাইবে। আমার কঠা সব বুঝিটে পারা গেল?

সাহেব জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে একবার ছাত্রদের দিকে চাহিলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন—এখন বড় খারাপ আণ্ডোলন চলিটেছে। এই আণ্ডোলনে যোগ দিলে কক্‌খনো ডেশের ভাল হইটে পারে না। আমি বড় ভারী সণ্টুষ্ট হইয়াছে যে এই ব্ডিডালয়ের কোনও ছাট্র এই আণ্ডোলনে যোগ ডেয় নাই। বণ্ডেমাটরম যাহারা করিটেছে—টাহারা ডেশের শট্রু। এই লোকডের ডারা ডেশের কিছু মাট্র উন্নটি হইবার আশা ঠাকে না—উন্নটির আশা না ঠাকিলে দেশ কি করিয়া বড় হইটে পারে? আমার কঠা বেশ বুঝিতে পারা যাইটেছে?

সাহেব আর একবার জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ছাত্রদের মুখের দিকে চাহিল। কিছুদূরে অমল এবং আরও কয়েকজন ছাত্র সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলাম অমল ঘন ঘন তাহার সঙ্গীদের দিকে চাহিতেছে—চোখে তাহার অদ্ভুত দীপ্তি!

সাহেব পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—টোম্‌রা ভাল

করিয়া লেখাপড়া কর, সকলে ডয়ালু হও, পরের ডুখ্খ ডুর করো—বণ্ডেমাটরম্ যাহারা করিতেছে—ঈশ্বর টাহাদের ভালবাসে না—টাহারা ঈশ্বরের অবাধ্য ছেলে। টাহারা ডুষ্ট লোক—টাহাদের সঙ্গে টোমরা মিশিবে না। আমার আডেশ্ টোমরা কেউ বণ্ডেমাটরম করিও না।

সকলে নিস্পন্দ হইয়া সাহেবের বক্তৃতা শুনিতেছিল—সাহেব থামিবামাত্র কে যেন বলিয়া উঠিল—বন্দেমাতরম্। চাহিয়া দেখি—অমল। সমবেত ছাত্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—বন্দেমাতরম্!

আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সাহেবের রক্তবর্ণ মুখ নিরীক্ষণ করিলাম, সাহেব ঘূর্ণিত চক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি মাষ্টার? এ কিরূপ ষড়যন্ত্র? এ কিরূপ অপমান আমাকে করা হইতেছে?

জবাব দিব কি—কণ্ঠতালু আমার শুকাইয়া উঠিয়াছিল। মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সভাস্থল তখনও ধ্বনিত হইতেছিল। সাহেব অত্যন্ত ক্রোধভরে একবার চারিদিকে চাহিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। আমি স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর জ্ঞান ফিরিবামাত্র হাঁকিলাম—অমল!

অমল নিকটে আসিলে বলিলাম—এ সব কি? এমন কাজ কেন করলে?

মৃদু হাসিয়া অমল কহিল—কিছুই করিনি স্যর। 'বন্দেমাতরমে'র মানে সাহেব জানে না—তাই সেটা বুঝিয়ে দিলাম। আমার ক্রোধের সীমা পরিসীমা ছিল না। যে-বেত কোনো দিন হস্তে ধারণ করি নাই ছুটিয়া লাইব্রেরী ঘর হইতে তাহাই লইয়া আসিয়া উন্মাদের মত অমলের দেহে আঘাত করিতে লাগিলাম। অমল স্থির হইয়া তাহা সহ্য করিতে লাগিল, মনে হইল মুখের হাসিটুকুও যেন তাহার লাগিয়া আছে। বেত ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল—আমি স্পন্দিতচরণে লাইব্রেরী কক্ষে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। যেন একটি ভোজবাজি হইয়া গেল।

চাহিয়া দেখি—রক্তাক্ত দেহ অমলের পশ্চাতে স্কুলের সমুদয় ছাত্র সারি দিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে:—

"বন্দেমাতরম্ ব'লে ডাক দেখি ভাই প্রাণ খুলে।"

পরের দিন বিদ্যালয়ে আসিলাম, দেখিলাম—কোনও ছাত্রই স্কুলে আসে নাই। শুনিলাম অমলের নেতৃত্বে স্কুলের ছাত্রেরা মদ গাঁজা ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং সুরু করিয়া দিয়াছে।

স্কুলটি কি ভাঙিয়া গেল? মাষ্টার পণ্ডিতেরা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া নানা অনুযোগ করিতে থাকেন—আমি জবাব খুঁজিয়া পাই না। কেবলই মনে হইতে থাকে—একখানি মোটা বেত একটি বালকের অঙ্গে বর্ষিত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে।

মাষ্টারেরা সাহস দেন—কোনও চিন্তা নাই হেডমাষ্টার মশায়। আপনি সব গুছিয়ে যদি সাহেবকে লিখে দেন—তাঁর রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। অমলের সঙ্গে আর জনকয়েক গুণ্ডাগোছের ছেলেকে রাষ্টিকেট করলেই ফ্যাসাদ মিটে যাবে। আর ছাত্র? দু-চার দিন যাক্ না, আবার সুর সুর করে আসতে পথ পাবে না।

দিন তিনেক পর সংবাদ শুনিলাম—অমলের সঙ্গে আরও জনকয়েক ছাত্রকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। কয়েকদিন পর আবার সংবাদ আসিল—পিকেটিং করিবার অপরাধে অমলের ছয় মাসের জেল হইয়াছে। চোখ মুদিয়া অমলের সেই হাসিমাখা মুখখানি মনে করিতে চেষ্টা করিলাম—যে মুখ আমার নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতেও এতটুকু বিকৃত হয় নাই।

কি জানি কেন মনে হইল—শোভার সঙ্গে দেখা করিবার কথা। মনে হইবামাত্র বাহির হইয়া পড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম—অমলের জননী তাহার পুত্রের দুর্গতির প্রধান কারণ তাহার জ্যোতিদাকে দেখিয়া কি বলিবে!

শোভা আমাকে দেখিয়া কলহাস্যে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিল—আচ্ছা দাদা, এ কয়দিন আসনি কেন বলত? ইস! ভারী রোগা হয়ে গিয়েছ দেখছি যে! অমলের খবর শুনেছ ত? ইস্কুলে কি এখনও ছেলে আসছে না? এ কয়দিন একলা থাকতে মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল—একটা যুক্তি যে নেব এমন লোকটি পর্য্যন্ত নেই। আমার এখন কি করা উচিত বল দেখি? যেদিন অমল

বেরিয়ে গেল খাবার পর্য্যন্ত খেয়ে যায় নি। গরম গরম লুচি খেতে ও ভালবাসে—সেদিন সবেমাত্র লুচি বেলে কড়া চাপিয়েছি ছেলের দল আসিতেই ও বেরিয়ে গেল। ওর উৎসাহে আমি কোনও দিনই বাধা দিই নি কি না। লুচি আমার তেমনি পড়ে আছে দুটা মাস—এ আর এমন বেশী কথা কি? না, তুমি শুধু চুপ করে থাকলে ত চলবে না দাদা।

এই সদ্যবিচ্ছেদকাতর জননীকে আমি কি বলিব? কি করিয়া মুখ দিয়া উচ্চারণ করিব—তাহার দুর্গতির প্রধান কারণ আমি। শোভা যে কত বিচলিত হইয়াছে তাহা আমার অন্তর দিয়াই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এই মহিমময়ী জননীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব?

শোভা আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—সত্যি দাদা, আমার মন একেবারে জুড়িয়ে গিয়েছে। কোনও দুঃখ আমার নাই—এ তুমি বিশ্বাস কর। বিয়ে হবার পর থেকে অনেক গ্লানি জমে ছিল—অমলকে বুকে পাবার পর তা ধীরে ধীরে মুছে গিয়েছিল। শুধু একমাত্র ভয় আমার ছিল ছেলে আমার মানুষ হয়ে জন্মেছে কি না, মানুষ হয়ে সে গড়ে উঠবে কি না। আচ্ছা দাদা, তুমি একবার মুখফুটে বল দেখি—আমার আশা কি সার্থক হয়েছে?

স্থিরকণ্ঠে কহিলাম—শোভা, ছেলেবেলা থেকে তোমার সাথে কোনও বিষয়েই সমকক্ষ হতে পারিনি—যদিও গায়ের জোরে প্রমাণ করতে চেয়েছি যে সব বিষয়েই আমি শ্রেষ্ঠ! আজই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? তবে আজ অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করছি বোন্, ছেলে তোমার মানুষ হয়েছে, কালে সে আরও বিরাট হয়ে উঠবে। সেদিন বলেছলে—আমার হাতে তাকে দিয়েছ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠবার জন্য। কিন্তু সে ন্যস্ত ভার আমি কেমন রক্ষা করেছি শুনেছ নিশ্চয়। কিন্তু তুমি যে তিলে তিলে এমন করে গড়েছ—এ আমি যখনই উপলব্ধি করলাম আনন্দে আমার সমস্ত ক্ষুদ্রতা ধুয়ে মুছে গেল। শোভা, স্কুল আমি ছেড়ে দিলাম—কিন্তু ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া আমি ছাড়ব না। আবার নতুন উদ্যম নিয়ে আমার নতুন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাব। প্রার্থনা কর শোভা, যে-শিক্ষা তুমি আমাকে দিয়েছ, দেশের ছেলেদের যেন তাতে সত্যিকার মঙ্গল হয়।



গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

প্রথম অধ্যায়

[গীতার অনুবাদ আমার অগ্রজ শ্রীরাজশেখর বসু কৃত।

মূলে যাহা উহ্য আছে, তাহা অনুবাদে [ ] ব্রাকেটে দেওয়া হইয়াছে। যথা—[হে] সঞ্জয়। মূলের শব্দ যথাসম্ভব অনুবাদে রাখা হইয়াছে। যে শব্দ বাংলায় একবারে অপ্রচলিত, অনুবাদে তাহার যথাসম্ভব সদৃশ প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। যাহা অল্প প্রচলিত, অনুবাদে তাহা রাখিয়া পার্শ্বে ( ) ব্রাকেটে বাংলা প্রতিশব্দ বা অর্থ দেওয়া হইয়াছে। যথা—প্রমুখে অবস্থিতাঃ=সম্মুখে অবস্থিত। অনার্যজুষ্ট (অনার্য ব্যক্তির আচরিত)। অনুবাদের বাচ্য প্রায়ই মূলানুযায়ী রাখা হইয়াছে। ইহাতে অনেকস্থল অনুবাদ শ্রুতিকটু হইলেও অর্থবোধ কঠিন হইবে না আশা করা যায়। মূল শ্লোক বোঝা সহজ হইবে এই উদ্দেশ্যেই বাচ্য যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। যথা—ইদং তে কদাচন অতপস্কায় বাচ্যং ন=ইহা তোমার কদাচ তপস্যাহীনকে (অসাধককে) বক্তব্য নয়।]

১।১ স্বীয় বংশধরগণের পরস্পর বিবাদের পরিণাম জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র নিজে অন্ধ। কথিত আছে যে, তাঁহার পার্শ্বচর সঞ্জয় ব্যাস কর্তৃক দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিয়াও সমস্ত ঘটনাবলী দেখিতে পাইয়াছিলেন। দিব্যদৃষ্টি বাস্তবিক সম্ভব কি-না সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের জানা নাই। আমাদের দেশে দিব্যদৃষ্টির অস্তিত্বে অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং পাশ্চাত্যেও অনেক মনীষী ক্লেয়ারভয়েন্স বা দিব্যদৃষ্টিতে বিশ্বাসবান। আমি এ-পর্যন্ত দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে যতগুলি প্রমাণ আলোচনা করিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি হওয়া-না-হওয়ার উপর গীতার উপদেশের মূল্য নির্ভর করে না। মহাভারতের অন্য অংশ বাদ দিলে সঞ্জয়ের যে দিব্যদৃষ্টি হইয়াছিল কেবলমাত্র গীতার মধ্যে এমন কথা নাই। ১৮।৭৫ শ্লোকে আছে—

> শুনিনু ব্যাস প্রসাদে মহাগুহ্য যোগ এই
> সাক্ষাৎ সে যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং কৃষ্ণ মুখেতেই।

এই শ্লোকে 'সঞ্জয়ের' দিব্যদৃষ্টিলাভ বলা হয় নাই।

১।২—২০ শঙ্করভাষ্যে গীতার ২০ শ্লোক পর্যন্ত কোনও ব্যাখ্যা নাই, শঙ্কর যে-উদ্দেশ্যে গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে-হিসাবে এই শ্লোকগুলির কোনও মূল্য নাই। শঙ্করবাদ প্রমাণের জন্য যে যে শ্লোক প্রযোজ্য শঙ্কর তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২ হইতে ২০ শ্লোকের মধ্যে মহাভারতীয় যুদ্ধ ব্যাপারের কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আমরা পাই। তখন যুদ্ধের পূর্ব্বে উভয় পক্ষ সজ্জিত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইত ও নির্দ্ধারিত সময় ব্যতীত যুদ্ধ হইত না। এই কারণেই অর্জ্জুনের পক্ষে উভয় সৈন্যের মধ্যগত হইয়া কুরু-সৈন্য পরিদর্শন করা সম্ভব হইয়াছিল। প্রত্যেক বড় বড় যোদ্ধাই যুদ্ধের পূর্ব্বে শঙ্খ বাজাইতেন ও প্রত্যেকেরই শঙ্খনাদে বিশেষত্ব থাকিত। যুদ্ধকালে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য নানাপ্রকার তূরী, ভেরী, ঢক্কা ইত্যাদি নিনাদিত হইত। শঙ্খের নাদে শত্রুপক্ষের ভীতি উৎপাদিত হইত। এই শঙ্খনাদ আধুনিক শঙ্খনাদের মত বলিয়া মনে হয় না। বাজাইবার কৌশলে যে সাধারণ শঙ্খ হইতেও ভীতি উৎপাদক ধ্বনি নির্গত হইতে পারে, তাহা আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। ১।১২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ শঙ্খনাদের সহিত উচ্চ সিংহনাদ করিলেন। মনুষ্য-কণ্ঠোত্থিত এই সিংহনাদও যে কত ভীষণ হইতে পারে তাহা না শুনিলে অনুমান করা যায় না। এখনও ডাকাতেরা আক্রমণের পূর্ব্বে হুঙ্কার করিয়া লোককে ভয়াভিভূত করে।

তিলক ১।১০ শ্লোকের 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দের ব্যাখ্যা অপরিমিত ও 'পর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ পরিমিত করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাই সমীচীন, অন্যথা সাধারণ প্রচলিত গীতার ব্যাখ্যায় এই শ্লোকের যে অর্থ দেওয়া হয় তাহাতে অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ "দুর্যোধন বলিতেছেন

উহাদের সৈন্য বেশী, আমাদের কম।" তিলকের ব্যাখ্যা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—"উহাদের 'পর্য্যাপ্ত' অর্থাৎ পরিমিত বা কম ও আমাদের 'অপর্য্যাপ্ত' অর্থাৎ বেশী।" এই শেষোক্ত ব্যাখ্যারই অর্থসঙ্গতি হয়। আধুনিক বাংলায় 'পর্য্যাপ্ত' ও 'অপর্য্যাপ্ত' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; যথা—ভোজে পর্য্যাপ্ত আয়োজন হইয়াছে—ভোজে অপর্য্যাপ্ত আয়োজন হইয়াছে। একই কথা যে অনেক সময় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বাংলায় 'পর্য্যাপ্ত' ও সংস্কৃতের 'পর্য্যাপ্ত' তাহার প্রমাণ। ভাষাবিদ্‌গণ একই শব্দের বিরুদ্ধ অর্থ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এখানে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

১।১১ শ্লোকে আছে "আপনারা সর্ব্বপ্রকারেই ভীষ্মকে রক্ষা করুন।" দুর্য্যোধন মহাযোদ্ধা ভীষ্মের রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত কেন তাহা অনুধাবনযোগ্য। ভীষ্ম সেদিনকার যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি সেজন্য তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। শিখণ্ডীকে দেখিলে ভীষ্মের অস্ত্রত্যাগের প্রতিজ্ঞা থাকায় তাঁহার অন্যায় যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্য রক্ষার আবশ্যক। যে দুর্য্যোধন পরে অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে এইরূপ আশঙ্কা স্বাভাবিক।

১।২১-২৩ অর্জ্জুন অপর পক্ষে কোন্ কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধকামী হইয়া আসিয়াছেন জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উভয় সেনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে রথস্থাপনের আদেশ দিলেন।

১।২৪ শ্রীকৃষ্ণ আদেশমত রথস্থাপনা করিয়া বলিলেন,—

দেখ ধনঞ্জয় সমবেত কৌরব নিচয়।

এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে "গুড়াকেশ" বলা হইয়াছে। "গুড়াকেশ" শব্দের অর্থ টীকাকারেরা নানাভাবে করিয়াছেন। তিলক বলেন, "গুড়াকেশ" শব্দের অর্থ যাহার ঘন কেশ এইরূপ হইতে পারে। কিন্তু অর্জ্জুনের এই নাম এখানে কেন ব্যবহৃত হইল তাহা বিবেচ্য। "গুড়াকেশে"র অপর অর্থ—নিদ্রা বা আলস্য বিজয়ী। তিলক বলেন, এমন ভাবিবার কোনই কারণ নাই যে, গীতাকার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার যখন যে নাম ইচ্ছা হইয়াছে তখন তাহাই দিয়াছেন। এই যুক্তি আমার সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আমার মতে গীতাকারের মত শক্তিশালী লেখকের পক্ষে বিনা প্রয়োজনে কোনও শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব নহে। আমি মনে করি "আলস্য বা নিদ্রা বিজয়ী" অর্থই ঠিক অর্থ। যে অর্জ্জুন যুদ্ধের আয়োজনে নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে "নিদ্রা-বিজয়ী" বিশেষণ উপযুক্ত। এত পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করার পর কে কে লড়িতে আসিয়াছে দেখিতে যাওয়া অর্জ্জুনের পক্ষে স্বাভাবিক এবং এই জন্যই এই স্থলে তাঁহাকে "গুড়াকেশ" বলা হইয়াছে। 'হৃষীকেশ' শব্দের অর্থ "ইন্দ্রিয়বিজয়ী"। তিলক 'হৃষীকেশ' শব্দের অর্থ করেন—যাঁহার প্রশস্ত কেশ। এ অর্থ সন্তোষজনক নহে। অর্জ্জুন রথচালনার আদেশ দিবার সময় শ্রীকৃষ্ণকে "অচ্যুত" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অচ্যুত ও ইন্দ্রবিজয়ী এই দুই নামই শ্রীকৃষ্ণের অবিচলিত মানসিক অবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৯ শ্লোকেও হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ শব্দের প্রয়োগ আছে—

পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষীকেশে হেন কয়ে
যুদ্ধ করিব না গোবিন্দে বলিয়া
রহিলা নীরব হয়ে।

এখানে অর্জ্জুনকে পরন্তপ ও 'গুড়াকেশ' বলা হইয়াছে; যে-অর্জ্জুন শত্রুকে তাপ দেন ও যিনি নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন, তিনি বলিলেন কি-না যুদ্ধ করিব না। এ অর্থ মানিলে গুড়াকেশ শব্দের সার্থকতা বুঝা যাইবে।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১

সঞ্জয় উবাচ—
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন।—(১) হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসু (যুদ্ধাভিলাষী) মদীয় [পুত্র]গণ এবং পাণ্ডবগণ কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন।—(২) তখন পাণ্ডব-অনীক (সৈন্য) ব্যূহিত দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের (দ্রোণের) সমীপে গিয়া বচন বলিলেন।—

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্ ।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

(৩) হে আচার্য্য, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) দ্বারা ব্যূহিত পাণ্ডুপুত্রগণের এই মহতী চমূ (সৈন্য) দেখুন। (৪) এখানে শূর মহাধনুর্ধর, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনসম যুযুধান, এবং বিরাট, এবং মহারথ দ্রুপদ (৫) ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, এবং বীর্য্যবান কাশিরাজ, এবং কুন্তিভোজ পুরুজিৎ, এবং নরপুঙ্গব শৈব্য (৬) এবং বিক্রান্ত (পরাক্রান্ত) যুধামন্যু, এবং বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র, এবং দ্রৌপদিপুত্রগণ,—সকল মহারথই [আছেন]।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

(৭) হে দ্বিজোত্তম, আমাদেরও যে সকল বিশিষ্ট 'আমার' সৈন্যের নায়কগণ [আছেন] তাঁহাদের জানুন; আপনাকে জ্ঞাপনার্থ তাঁহাদের [নাম] বলিতেছি।—(৮) আপনি এবং ভীষ্ম এবং কর্ণ এবং যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা এবং বিকর্ণ, এবং সৌমদত্তি (সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা)। (৯) এবং অন্য বহু শূর আমার জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত; সকলে[ই] নানাশস্ত্রে সশস্ত্র যুদ্ধবিশারদ।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বমেব হি ॥ ১১
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

(১০) ভীষ্মদ্বারা রক্ষিত আমাদের ঐ বল (সেনা) অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু এই ইহাদের ভীমদ্বারা রক্ষিত বল পর্য্যাপ্ত। (১১) সর্ব-ব্যূহদ্বারেই যথাভাগে (স্ব স্ব বিভাগ অনুযায়ী) অবস্থান করিয়া আপনারা সর্বপ্রকারেই ভীষ্মকেই রক্ষা করুন। (১২) [এমন সময়ে] তাঁহার দুর্য্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) সিংহনাদ নাদিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শংখ বাজাইলেন।

'অপর্য্যাপ্ত'—অপরিমিত। 'পর্য্যাপ্ত'—পরিমিত। অথবা উল্টা অর্থ হইতে পারে। 'অপর্য্যাপ্ত'—অপ্রচুর। 'পর্য্যাপ্ত'—প্রচুর।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক গোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫

(১৩) তখন শংখ এবং ভেরী এবং পণব (ঢাক?) আনক (মৃদঙ্গ?) গোমুখ (শিঙা?) সহসা বাদিত হইলে সেই শব্দ তুমুল হইল। (১৪) তখন (যুগল) শ্বেতহয়যুক্ত মহা স্যন্দনে (রথে) স্থিত মাধব এবং পাণ্ডব (অর্জ্জুন)ও দিব্য শংখ বাজাইলেন। (১৫) হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর মহাশংখ পৌণ্ড্র বাজাইলেন।

শংখের নামকরণ হইত।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

(১৬) কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় এবং নকুল সহদেব সুঘোষ [ও] মণিপুষ্পক [নামক শংখ] বাজাইলেন। (১৭) এবং পরম-ধনুর্ধর কাশ্য (কাশিরাজ), এবং মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট এবং অপরাজিত সাত্যকী, (১৮) হে পৃথিবীপতে (ধৃতরাষ্ট্র), দ্রুপদ এবং দ্রৌপদিপুত্রেরা, এবং মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র, সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শংখ বাজাইলেন।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।
হৃষীকেশং তদাবাক্য মিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োমধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১

(১৯) সেই তুমুল নির্ঘোষ নভ এবং পৃথিবী অনুনাদিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। (২০) অনন্তর, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ব্যবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রসম্পাত আসন্ন হওয়ায় কপিধ্বজ পাণ্ডব (অর্জ্জুন) ধনু উঠাইয়া—(২১) হে মহীপতে (ধৃতরাষ্ট্র), তখন হৃষীকেশকে এই বাক্য বলিলেন— অর্জ্জুন কহিলেন।—হে অচ্যুত, উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর—

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্য মস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

(২২) যতক্ষণ আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি—এই রণসমুদ্যমে (আসন্ন রণে) কাহাদের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে। (২৩) যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি ধার্ত্তরাষ্ট্রের (দুর্য্যোধনের) প্রিয়চিকীর্ষু (প্রিয়সাধনেচ্ছু) যাঁহারা এখানে সমাগত, সেই সকল যুদ্ধার্থীগণকে আমি দেখি। সঞ্জয় কহিলেন।—(২৪) হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র) গুড়াকেশ (অর্জ্জুন) কর্ত্তৃক এইপ্রকারে উক্ত (অনুরুদ্ধ) হইয়া হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে রথোত্তম স্থাপন করিয়া—

১।২৫-২৮ . অর্জ্জুন তাঁহার বিপক্ষে সমবেত আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতিকে দেখিলেন। দেখিয়া পরম করুণাগ্রস্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে যাহা বলিলেন তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে দ্রষ্টব্য। যুদ্ধ করিতে গিয়া অর্জ্জুনের দুঃখ স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহার "কৃপা" হইল কাহার উপর, এবং কেনই বা হইল? অর্জ্জুন নিজ শক্তিতে এতই আস্থাবান্ যে. তাঁহার নিজের অনিষ্ট সম্ভাবনা না মনে আসিয়া তাঁহার হস্তে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুশঙ্কা প্রথমেই মনে উঠিল। এইজন্যই তাঁহার মনে দয়া আসিল। ১।৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭ শ্লোকে স্বজনদিগের মৃত্যু ও তাঁহার বিজয়লাভের কথাই মনে আসিতেছে। ইহার পরও নানারূপ পাপের সম্ভাবনা মনে আসিল। শেষে ১।৪৫ শ্লোকে অর্জ্জুন বলিলেন. "আমি না লড়াই করিলে উহারা যদি আমাকে মারিয়াও ফেলে তবে তাহাও ভাল।" নিজের মৃত্যুর কথা অনেক পরে অর্জ্জুনের মনে পড়িল।

যুদ্ধে নামিবার পূর্ব্বে যে তাঁহাকে আত্মীয়-কুটুম্বের সহিত মারামারি, কাটাকাটি করিতে হইবে অর্জ্জুন তাহা জানিতেন না এমন নহে; কাজেই পরবর্ত্তী শ্লোকে যুদ্ধ না-করিবার যে-সব কারণ দেখাইয়াছেন সেগুলি তাঁহার পূর্ব্বেই ভাবা উচিত ছিল। যুদ্ধে স্বজন-বধ হইবে, কুলধর্ম্ম নষ্ট হইবে তজ্জন্য পাপ স্পর্শ করিবে, নরকে বাস করিতে হইবে, ইত্যাদি আপত্তির কথা তাঁহার বহু পূর্ব্বেই বিচার করা উচিত ছিল। হয় অর্জ্জুন লোভপরবশ হইয়া সমস্ত ফলাফল না ভাবিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিংবা আত্মীয়-স্বজনের সম্মুখীন হওয়ায় তাঁহাদের বধাশঙ্কাজনিত দুঃখে বিচলিত হইয়া এই সকল আপত্তি তুলিয়াছিলেন। বাস্তবিক আপত্তিগুলি অর্জ্জুনের অন্তরের কথা নহে। দুঃখের বশে যুদ্ধ করিতে বীতরাগ হওয়ায় নিজ কার্য্য সমর্থনের জন্য এইগুলি ছুতামাত্র। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের সমস্ত কার্য্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই মানিয়া লইয়াছিলেন। অতএব এখনকার অনিচ্ছা দুঃখপ্রসূত মাত্র, সমাজ-ধ্বংসভয় বা পাপ-ভয় হইতে উৎপন্ন নহে। অবশ্য ইহাও সম্ভব যে নিজের কুলাচারের দোষ ও কুলাচার পালনে পাপের সম্ভাবনা চিরকালই অর্জ্জুনের ভিতরের মনে লুক্কায়িত ছিল। কার্য্যকালে তাহা পরিস্ফুট হইল।

যুদ্ধ না-করার কারণ দেখাইয়া পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে অর্জ্জুন যে-সকল আপত্তি তুলিয়াছেন তাহা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম আপত্তি আত্মীয়স্বজন-বধে দুঃখ-বোধ। ইহা অর্জ্জুনের ব্যক্তিগত আপত্তি। দ্বিতীয় বাধা সামাজিক। যুদ্ধে সমাজ-বন্ধন শিথিল হয়, এই জন্য যুদ্ধ করিব না। তৃতীয় আপত্তি অলৌকিক বা religious। মনুষ্যবধ করিলে নরকগামী হইতে হয়। নরক যে আছে তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই এবং কেহ সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এমন কথাও জানা নাই। অতএব নরকের ভয় যুক্তির অতীত, বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত মাত্র।

'রিলিজন্' কথাটার বাংলা ঠিক 'ধর্ম্ম' বলিতে প্রস্তুত নহি। যে-জিনিষ বুদ্ধিবিচারের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না অথচ আমরা অনেকেই যাহা বিশ্বাস করি ও যাহা দ্বারা জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করি, সেই অলৌকিক পদার্থই 'রিলিজন্'। পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তিও অলৌকিক। একাদশীর দিন বিধবা অন্নগ্রহণ করিলে তাহার পাপ হইবে, এবং ইহকালে বা পরকালে সেই পাপের ফলভোগ করিবে—এই যে বিশ্বাস ইহাও অলৌকিক। খুন করিলে ধরা পড়িয়া ফাঁসি যাইব, এই সামাজিক শাস্তির ভয় অলৌকিক নয়—লৌকিক, কিন্তু খুন করিলে নরকে পচিব ইহা অলৌকিক বিশ্বাস। সমস্ত পাপের কল্পনার ভিত্তিই অলৌকিক। সামাজিক ব্যভিচারকেও পাপ বলা হয়, কারণ সেইরূপ ব্যভিচারের বুদ্ধিগম্য ফলাফল ব্যতীত যে একটা অলৌকিক ফলাফলও আছে তাহা অনেকে জানেন। অর্জ্জুন যখন বলিতেছেন যে কুলধর্ম্ম নষ্ট করিলে নরকবাস হয়, তখন সেই সঙ্গেই এই কথাও বলিতেছেন যে আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

> জনার্দ্দন। মানবের কুলধর্ম্ম হলে, লয়
> শুনেছি নিয়ত নাকি নরকে নিবাস হয়। (১।৪৪)

১।২৯-৩৬ অর্জ্জুন প্রথমেই নিজের দুঃখজনিত ব্যক্তি-গত আপত্তির কথাই বলিতেছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকের আপত্তিগুলি এক হিসাবে অর্জ্জুনের নিজেকে ঠকাইবার

ছুতামাত্র। পূর্ব্বেই একথা বলিয়াছি। দুঃখের আপত্তিই মূল আপত্তি।

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ভ্রাতৄন্পুত্রান্ পৌত্রান্সখীংস্তথা ॥ ২৬
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্যসকৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ॥ ২৭

(২৫) ভীষ্ম দ্রোণ এবং সমস্ত মহীপতিগণের সম্মুখীন হইয়া এই বলিলেন—হে পার্থ এই সমবেত কুরুগণকে দেখ। (২৬) অনন্তর পার্থ তথায় উভয় সেনাতেই পিতৃ (পিতৃতুল্য ব্যক্তি), পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র এবং সখা, শ্বশুর, এবং সুহৃদ অবস্থিত দেখিলেন। (২৭) কৌন্তেয় সেই সকল বন্ধুজনকে অবস্থিত দেখিয়া—

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃ'ষ্ট্বমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ॥ ২৮
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০

(২৮) পরম কৃপায় আবিষ্ট [এবং] বিষণ্ণ হইয়া এই বলিলেন।—অর্জ্জুন কহিলেন।—হে কৃষ্ণ, এই সকল যুযুৎসু স্বজনগণকে সমবেত দেখিয়া (২৯) আমার গাত্র (অঙ্গ) সকল অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে, এবং আমার শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ হইতেছে। (৩০) হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত হইতেছে, এবং ত্বকও পরিদগ্ধ হইতেছে। অবস্থান করিবাব আর শক্তি নাই, আমার মন যেন ঘুরিতেছে।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥ ৩১
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেনবা ॥ ৩২
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
তে ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩

(৩১) এবং হে কেশব, বিপরীত লক্ষণসকল দেখিতেছি। আহবে স্বজন হত্যা করিয়া শ্রেয়ও দেখিতে পাইতেছি না। (৩২) হে কৃষ্ণ বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না রাজ্য এবং সুখসকলও নয়। হে গোবিন্দ, আমাদেব রাজ্যে কি [প্রয়োজন], ভোগ সকলে বা জীবনে কি [প্রয়োজন]? (৩৩) যাহাদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগসকল এবং সুখসকল আকাঙ্ক্ষিত সেই তাহারা প্রাণ ও ধন [এর মায়া] ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে অবস্থান করিতেছে।

আচার্য্যাঃ পিতরঃপুত্রা স্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ॥ ৩৫
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতি স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবা শ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬

(৩৪) আচার্য্যগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, এবং পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ এবং সম্বন্ধীগণ—(৩৫) হে মধুসূদন, মহীর নিমিত্ত কি (পৃথিবীর জন্য দূরে থাক), এমন কি ত্রৈলোক্যরাজ্যের হেতু,—নিহত হইয়াও ইঁহাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। (৩৬) হে জনার্দ্দন, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে হত্যা করিয়া আমাদের কি প্রীতি হইবে? এই সকল আততায়ীগণকে হত্যা করিলে আমাদের পাপই আশ্রয় করিবে।

১।৩৭-৩৯ এই সকল শ্লোকে যুদ্ধের সামাজিক বিষময় ফল দেখান হইয়াছে। ব্যক্তিগত আপত্তির পরেই ১।৩৬ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ হইতে এই সামাজিক পাপের আভাস দেখা যাইতেছে। আততায়ী ধার্ত্তরাষ্ট্রদের বধ করিলে পাপ হইবে। পরে বলিতেছেন স্বজনবধ করিয়া কি সুখ হইবে। তৎপরে কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহের কথা উঠিতেছে। তৎপরে কুলধর্ম্ম নষ্টের কথা ও কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্মের প্রভাব ও তৎফলে বর্ণশঙ্করের উৎপত্তির কথা বলা হইল।

১।৪০-৪১ শ্লোকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কথা আছে।

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম হয় হত।
ধর্ম্মক্ষয়ে হয় কুল অধর্ম্মেতে অভিভূত।
কুলস্ত্রী অধর্ম্মবশে দুষ্টা হয় হে কেশব।
দুষ্টা স্ত্রী হইতে বর্ণশঙ্করের সম্ভব।

এই দুইটি শ্লোকে যদিও মুখ্যত কুলধর্ম্মের কথাই বলা হইল তথাপি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কথাটা যে সামাজিক হিসাবে ন্যায় ও অন্যায় আচার (socially right ও socially wrong convention or code) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায়। ধর্ম্ম কথাটার মধ্যে এই সামাজিকতার আদর্শ পরেও অন্যান্য শ্লোকে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

১।৪২-৪৬ এখানে অলৌকিক পাপফলের কথাই প্রধানতঃ বলা হইল। ১।৪৩ শ্লোকে জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম দুইটা কথা আছে। এখানেও ধর্ম্মের অর্থ সামাজিক আচার বা convention করা যাইতে পারে। সামাজিক আচাব নষ্ট হইলে পাপের উৎপত্তি হয়।

গত ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় স্ত্রীলোক-দিগের ভিতর সতীত্বের আদর্শ যে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন। 'ওয়ার বেবীদে'র জন্য পৃথক

ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। অর্জ্জুনের কথাতেই বোঝা যায় যে, পুরাকালে যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশেও এইরূপ অবস্থা ঘটিত। যুদ্ধ সর্ব্বপ্রকার সামাজিক বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, একথা মুখবন্ধেই বলিয়াছি।

১।৪৭ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া শোকার্ত্ত অর্জ্জুন রথে বসিয়া পড়িলেন। তখনকার দিনে রথের উপর দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে হইত, এইজন্যই বসিয়া পড়িলেন বলা হইল। তিলক বলেন—"মহাভারতের কোন কোন স্থলে রথের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের সমসাময়িক রথ প্রায় দুই চাকার হইত। বড় বড় রথে চার চার ঘোড়া জোতা হইত এবং রথী ও সারথি উভয়ে সম্মুখভাগে পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বসিত। রথ চিনিবার জন্য প্রত্যেক রথের উপর একপ্রকার বিশেষ ধ্বজা লাগান হইত। ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, অর্জ্জুনের ধ্বজার উপর স্বয়ং হনুমানই বসিয়া থাকিতেন।" রামের হনুমান যে মহাভারতের যুদ্ধকালেও বাঁচিয়াছিলেন ও অর্জ্জুনের রথে বসিতেন তাহা অবশ্য বিনা প্রমাণে আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। যুদ্ধে কোনও জন্তুকে 'ম্যাস্কট'-রূপে রেজিমেণ্ট সহিত লইয়া যাওয়ার প্রথা এখনও আছে। মোটরকারেও 'ম্যাস্কট' বসান হয়।

এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে "শোক সংবিগ্নমানসঃ" অর্থাৎ যাঁহার মন শোকে উদ্বিগ্ন হইয়াছে, বলা হইয়াছে। শোকই যে অর্জ্জুনের যুদ্ধত্যাগের প্রধান কারণ এখানে তাহাই সূচিত হইল।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৯

(৩৭) অতএব, সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে হত্যা করিতে আমরা যোগ্য নহি; কারণ, হে জনার্দ্দন, স্বজন হত্যা করিয়া কিরূপে সুখী হইব? (৩৮) যদিও লোভে হতচিত্ত ইহারা কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতেছে না, (৩৯) [তথাপি] হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষদ্রষ্টা আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্তির জ্ঞান কেন হইবে না?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩

(৪০) কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম প্রনষ্ট হয়; ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম সমস্ত কুলকেই অভিভূত করে। (৪১) হে কৃষ্ণ, অধর্মের অভিভব (আক্রমণ) হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়। হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণি-বংশোদ্ভব), স্ত্রী দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মায়। (৪২) সঙ্করজাতি কুলঘ্নগণের এবং কুলের নরকের হেতুস্বরূপই; ইহাদের পিণ্ডোদক-বর্জ্জিত পিতৃগণ নিশ্চয় পতিত হয়। (৪৩) কুলঘ্নগণের এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষের জন্য শাশ্বত জাতিধর্ম ও কুলধর্ম সকল উৎসাদিত হয়।

উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

ইতি অর্জ্জুনবিষাদযোগঃ।

(৪৪) হে জনার্দ্দন, উৎসন্ন-কুলধর্ম [মনুষ্য-]গণের নরকে নিয়ত বাস হয়—ইহা [আমরা] শুনিয়াছি। (৪৫) হায়, আমরা মহৎ পাপ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি—যখন রাজ্যসুখলোভে স্বজনহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। (৪৬) যদি শস্ত্রপাণি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রতিকার-বিমুখ অশস্ত্র [অবস্থায়] আমাকে রণে হনন করে, তাহা[ও] আমার মঙ্গলতর হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন।—(৪৭) যুদ্ধে (যুদ্ধকালে) এই প্রকার বলিয়া শোকে উদ্বিগ্নচিত্ত অর্জ্জুন সশর ধনু বিসর্জ্জন করিয়া রথের উপর উপবেশন করিলেন।



শিল্প-শিক্ষার একটি কথা

বিলাতের রয়েল কলেজ অব্ আর্টসের অধ্যাপক ল্যানটারী ক্রমাগত শিষ্যদের মনে করিয়ে দিতেন—Individuality makes an artist। এইখানে চারুকলা (Fine Art) ও কারুকলা (Crafts বা ব্যবহারিক) তার তফাৎ। ব্যবহারিক শিল্পের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, তা' একই ছাঁচে ঢালাই হয়ে চলেচে অগুন্তি। কিন্তু আর্টের সত্য সেইখানেই যেখানে সে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে ফুটে ওঠে। দেখা যায়, ইউরোপে এক এক জন বড় বড় রথীশিল্পীরা এক এক যুগ-সন্ধি এনেচেন শিল্পকলায়। কিন্তু এটাও ঠিক্ যে তাঁদের আবির্ভাবে তাঁদের চেয়েও কম ভাগ্যবান শিল্পীদের ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব কখনও লোপ পায়নি, আর যেখানেই তা ঘটেচে সেইখানেই তা তখন নকলনবিশী নক্সা-হিসেবে বিস্মৃতির অতলগর্ভে স্থান পেয়েচে। অবনীন্দ্রনাথের মত এঁরাও সব সময় আপন আপন পথ কাটবার পন্থা দেখিয়ে গেছেন মাত্র, পরবর্ত্তী যুগের শিল্পীদের জন্যে দাগা বুলিয়ে মক্স করবার 'চার্ট' প্রস্তুত করে রেখে যাননি। ভাল গাইয়েদের নিকট গান শিখতে গিয়ে সুশিষ্য গুরুর গলার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতার নকল করেন না, করেন ওস্তাদের সুরসৃষ্টির পন্থার রূপটি ধরতে। তেমনি শিল্প-শিক্ষায় দরকার অঙ্কন-কৌশলটি নকল না করে কি-ভাবে অঙ্কন প্রেরণা গুরুর মাথায় আসে তারই সাধনা করা। ভারতবর্ষের প্রাচীন চিত্রাবলীতেও এইরূপই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে অজন্তা, বাঘ সিগিরিয়ার পাহাড়ের গায়ে আজও চিত্রশিল্প বেঁচে আছে। এক্ষেত্রে গুরুর নামের পরিচয় পাবার কোনোই উপায় নেই—কিন্তু তুলির টানের পার্থক্যে এবং অঙ্কন-পদ্ধতির ছাঁদের বিভিন্নতার ভেতরও ওস্তাদের হাতের প্রতীক বেশ স্পষ্ট পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞতা-অভিমানী কখন শিল্পী বা শিল্প-শিক্ষক হবার যোগ্য নয়। শিল্পী আত্মভোলা, তার কাছে চেলা ও গুরুর আসন একই মাটির উপর। এই কথাই প্রাচীনকালের জাপানের কোন এক প্রবীণ শিল্পীর মৃত্যুকালে তিনি যে পুনরায় নতুন জীবনলাভ করে নতুন করে শিল্প-শিক্ষা আরম্ভ করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন তা' থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

শিল্প-শিক্ষক প্রধানতঃ শিষ্যদের কাছে প্রাচীন শিল্পীদের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দেবেন, তা থেকে নানান উপায় উদ্ভাবনার সহায়তালাভ করবার জন্যে। তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজের দ্বারা সর্ব্বদা একটা আবহাওয়ার সৃজন করা শিল্প-শিক্ষার পক্ষে অনুকূল। প্রাচীনকালে শিষ্যরা তাই গুরুগৃহে বাস ক'রে তাঁর নিত্যকর্ম্মে সহায়তা করে তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। কল্পনাশক্তির বিকাশের দিকেই ছিল গুরুর লক্ষ্য। তাই অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন ভিত্তি চিত্রে দেখা যায় সাবলীল লীলাভঙ্গিতে আঁকা ছবিগুলিতে এক অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি ফুটে আছে। তার পরিচয় আধুনিক শিল্পীদেরও কি ভাবে অনুপ্রেরণা যোগাচ্চে তা' দেখলে অবাক হ'তে হয়। চেলা ও গুরুর সম্বন্ধ আধুনিক পাঠশালার গুরুমশাইদের আদর্শ থেকে যে স্বতন্ত্র তা' সহজেই অনুমান করা যায়, প্রাচীন চিত্রে দেখা যায় শিল্পীদের কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার অনুশীলন কতদূর এগিয়েছিল। তাঁদের প্রত্যেক কাজ প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা উজ্জ্বল। একটি পীপিলিকা থেকে সুরু করে আটচালা বাঁধবার বেণীরচনার ধরণ-ধারণের খুঁটিনাটির পারিপাট্যে। এ সব দেখলে বোঝা যায় যে শিল্পের পক্ষে নতুন নতুন ভাবের সূক্ষ্ম রসবোধের উপায় গুরু কি ভাবে যে জাগিয়ে তুলেচেন তা' একেবারে আশ্চর্য্যের বিষয়।

কোনো শিল্পীই তাঁর রচনা-পদ্ধতিটিকে একই রাস্তায় নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে চান না।—প্রাণবান জীব যেমন লোহার লাইনের উপর সহজভাবে সোজা চলে যেতে পারেন না তাকে চলার পথে পরিবেষ্টনটির উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা অবস্থার সঙ্গে তালে তালে চলতে হয়,—তেমনই শিল্পীরও তাই পথ বদলায়। কোনো গুরুর কড়া শাসনে তা ঠেকিয়ে রাখা চলে না। 'এ্যাকাডামীর' একটা ছাঁচ যা ইউরোপে আজও বনেদী দলেরা বজায় করে রেখেচেন, উদারপন্থী সহজিয়া শিল্পীরা তা' বহুকাল থেকে বার বার ভেঙে-চুরে চলেচেন। প্রাণের পরিচয় দেবার জন্যে ইউরোপীয় শিল্পীদের ত্রুটি নেই। কিন্তু আমরা এদেশে এখনও গোঁড়ামীর গোলাম হ'য়ে গোলে হরিবোল দিয়ে গড্ডলিকা চালে চিরকাল চলবার যে চলনসই ধারা প্রবর্ত্তন করতে চাই তা আর এখন কখনই চলতে পাবে না।

তবে, এক্ষেত্রে একটা কথ এই যে, অতি আধুনিকতার ভাণ ক'রে শিক্ষানবিশীর দুঃস্বপ্নকে দূর করে যে সব 'অবাক কাণ্ড' দেখাবার চটকদার শিল্পীরা যা চেষ্টা করচেন তার ভিতরকার দুঃখ থেকে যেন শিল্পীরা বাঁচেন এই আমাদের কামনা।

(উত্তরা, ভাদ্র ১৩৩৮) শ্রীঅসিতকুমার হালদার

—

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র বাঙালীর সমাজকে দেখিয়াছেন, দেখাইয়াছেন ভিতর হইতে। বাহির হইতে দর্শকে যে ভাবে দেখে, সে রকমের চিত্র আগে অনেকেই দিয়াছেন - তাহাতে দর্শনের নৈপুণ্য সত্যতা, এমন কি আন্তরিকতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেন ভিতরকে উল্টাইয়া বাহিরে ব্যক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার জগতে বস্তু ঘটনা চরিত্র যাহা, তাহাদের বাস্তব রূপায়নটি প্রধান কথা নয় - প্রধান কথা তাহাদের প্রাণের গতি, সেই গতির তোড়। জিনিষের একটা সম্পূর্ণ নিটোল মূর্ত্তি তাঁহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। ঘটনার অব্যর্থ পারম্পর্য্য, ব্যক্তির অঙ্গে অঙ্গে অটুট সঙ্গতি, আবহাওয়ায়

একটা সহজ স্বাভাবিকতা অনেক সময়েই হয়ত পাইব না—তাঁহাতে জাগ্রত মুখরিত জিনিষের অন্তরের প্রেরণা, আবেগ, আশা, আকাঙ্ক্ষা। বাঙালীর সমাজের বা ব্যক্তিজীবনের যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, বাস্তবের সহিত মিলাইয়া দেখিলে হয়ত দেখিব সেখানে আছে কেমন অত্যুক্তি আতিশয্য, অতিরঞ্জন, সত্য হইলেও সত্যকে অনাবশ্যক জোরে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার প্রয়াস—ফলে একটা, অনেকে যাহার নাম দিবেন, ঠাট বা ঢঙ। কিন্তু গোটা বস্তুকে ত শরৎচন্দ্র দেখাইতে চাহেন নাই, তাঁহার হাতে বাজিয়াছে বস্তুর অন্তরের একটা তন্ত্রী—দেহ নয়, তাঁহার লক্ষ্য দেহগর্ভস্থ নাড়ীর ধমনীর চঞ্চল স্নায়ু। বাঙ্গালীর সমাজের প্রাণময় লোকে—রক্তের ধারায় কি আবেগ কি সত্য উৎকণ্ঠিত অধীর হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরের দেহ-চেতনার অচলায়তনের চাপে কি কথা মুখ ফুটিয়া যাহার বলা হইতেছে না, উহাই শরৎচন্দ্রের কথা।

শরৎচন্দ্রের একটি মানুষ উত্তেজনার বশে হঠাৎ একটা বিসদৃশ কিছু করিয়া ফেলিয়া শেষে লজ্জিত হইয়া ভাবিতেছেন, "কি অভিনয় আমি এই করিলাম?" এই "অভিনয়"ই এক হিসাবে শরৎচন্দ্রের শিল্প রচনার একটা মূল সূত্র দিয়াছে বলা যায়। তাঁহার সৃষ্টির যে চাল, যে ছন্দ প্রাণের যে গতিভঙ্গী তাহা অনেকখানি আসিয়াছে এই জিনিষটিকে ধরিয়া। কথায় কথায় কাঠ হইয়া, নির্ব্বাক হইয়া, স্তব্ধ হইয়া যাওয়া—হঠাৎ ছুটিয়া পলায়ন করা—বিস্ময়ের ব্যথার ভীতির সীমা-পরিসীমা না থাকা—গভীর অবসাদ—চিত্ত জুড়িয়া বিদ্রোহের জ্বালা—ঝর ঝর চোখের জল—অথবা প্রয়োজন মত যে ঘটনাটি যেখানে যে সময়ে ঘটিলে চমকপ্রদ হয় তাহার ব্যবস্থা—এই মত প্রকার Deus ex machina, শরৎচন্দ্রের পাতায় পাতায় তাহা ছড়াইয়া আছে।

কিন্তু রহস্যের কথা এই, এতখানি melodrama বা অতি অভিনয়ের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি কিছু মাত্র আড়ষ্ট বা কৃত্রিম হইয়া পড়ে নাই। বরং এই সকলের কল্যাণেই তাঁহার সৃষ্টি পাইয়াছে তাহার স্বকীয় তীব্রতা, উগ্রতা। মনে হয় একটা জগৎ আছে যেখানে এই ধরণের অভিনয়ই হইল সেই জগতের সত্যের স্বাভাবিক ও জীবন্ত প্রকাশ। শরৎচন্দ্র সেই জগতেরই অধিবাসী, সেই জগতেরই স্রষ্টা।

আর একদিক দিয়া আবার কিন্তু শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি যেমন সজীব সচল আমাদের গোচর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি পাইয়াছে একটা বৃহত্তর ছন্দেরই দোল; যেহেতু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খেলিয়াছে একটা আধুনিক মনকে আশ্রয় করিয়া। তাঁহার বিষয়, উপকরণ ক্ষেত্র পাত্র অনেকখানি প্রাচীন পুরাতন—প্রাচীন সমাজ, পুরাতন সংস্কার সামাজিক মানুষে মানুষে গতানুগতিক সম্বন্ধ, ব্যক্তির মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক বৃত্তি। এই সকলেরই উপর তিনি ফেলিয়াছেন, আধুনিক বুদ্ধির আলোক, ইহাদিগকে দেখিয়াছেন, দেখাইয়াছেন বর্ত্তমান যুগের জিজ্ঞাসাকে ধরিয়া।...

দাম্পত্য ও একান্নবর্ত্তিতা—আমাদের সমাজ-বন্ধনের এই দুটি মূল সূত্র শরৎচন্দ্রের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। একান্নবর্ত্তিতার যে কি দোষ কি ত্রুটি, ব্যক্তি-জীবন এবং সামাজিক জীবনে কি বিষ তাহা আনিয়া দিতেছে, তাহার চিত্র যত স্পষ্ট হইতে পারে, তাহা তিনি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা অবশ্য আধুনিক সকল বিদ্রোহ বা iconoclasmএর কাজ, বিদ্রোহী হিসাবে শরৎচন্দ্র কাহারও পিছনে নহেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার তেমনি দরদ দিয়া নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন এই সুপ্রাচীন ব্যবস্থাটির সত্য কোথায়, সৌন্দর্য্য কোথায়—ইহাতেও ফুটিয়া উঠিতে পারে কি মহত্ব। বিবাহের সংস্কার বা দাম্পত্য সম্বন্ধ একদিক দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন কেমন প্রাণহীন প্রথা, গোষ্ঠীজীবনের কাছে ব্যক্তির আত্মবলি; কিন্তু এই অনুষ্ঠানেরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, ইহাকেও গভীর সত্যে সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তোলা যায়, উন্নীত করা যায় একটা জীবন্ত উদাত্ত চেতনার স্তরে—প্রাচীন হিসাবে নয়, সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ প্রভৃতি কোন মানসিক আদর্শের আজ্ঞায় নয় কিন্তু (কিম্বা হয়ত ইহারও পশ্চাতে ছিল একটা) অধুনা সম্মত প্রাণের সত্যকার যে দাবি তাহার কল্যাণে। একই বস্তুর মধ্যে এই যে দ্বিধা প্রকৃতি, ইহাই অনেক সময়ে শরৎচন্দ্রের রচনায় দিয়াছে তাহার dramatic interest, ঘটনায় ঘটনায় চরিত্রে চরিত্রে একটা তীব্র সঙ্ঘাত।

শরৎচন্দ্রের অনেক মানুষের মধ্যে আবার পুরাতনের ও নূতনের যুগপৎ সমাবেশও পাই। কাঠামোটা পুরাতন কিন্তু তাহাতে তিনি ভরিয়া দিয়াছেন নূতন জীবনের উগ্র সুরা। তাঁহার অনেক নারী আধুনিক স্বাধীনার মতি গতি পাইয়াছে, যদিও সে মতি গতি খেলিয়াছে পুরাতন আবেষ্টনে, গতানুগতিক ব্যবস্থায়। পরে ("পথের দাবী"তে ও "শেষ প্রশ্নে") এই আবেষ্টনও তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন—তবে নূতন আধার তিনি দেন নাই, কেমন বোধ হয় সেখানে মুক্ত প্রাণটি অশরীরী হইয়া ত্রিশঙ্কুর মত হাওয়ায় ঘুরিতেছে—জীবন্ত দেহ, বাস্তব আয়তন তাহা পায় নাই, কেবল মস্তিষ্কের চিন্তাকে জল্পনাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

(বিচিত্রা, কার্ত্তিক ১৩৩৮) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত



যাত্রা

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বাঙ্গালা দেশে অনেক দিন হইতে অভিনয় হিসাবে যাত্রা চলিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ যাত্রা হইতেই আমাদের দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যাত্রা নূতন জিনিস নয়! ইহার অস্তিত্ব প্রাচীন কাল হইতেই আছে। প্রাচীন কালে যাত্রার অর্থ দেবতা-বিশেষের লীলা বা চরিত্রের অংশ-বিশেষ সাধারণের হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য কোনও উৎসব। গ্রীক মেগাস্থেনেসের বিবরণে আছে, আজকালকার যাত্রাভিনয়ের মত যাত্রার গান পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের সভায় হইত। ভরত-নাট্যশাস্ত্রেও যাত্রার উল্লেখ আছে। ভবভূতির মালতী-মাধবে 'ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের যাত্রা'ভিনয়ের কথা আছে। এই যাত্রা উৎসবার্থে এবং পারিভাষিক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উৎসব হিসাবে মহাভারতে ঘোষযাত্রার কথা আছে। হরিবংশে বন-যাত্রার কথা আছে। বন-যাত্রা বন-ভোজন। ইহাতে নৃত্য-গীতের ব্যবস্থার কথা আছে। তার সঙ্গে একরকম অভিনয়েরও কথা আছে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও পৌরাণিক বিষয় লইয়াই যাত্রার অভিনয় হইত। শিবযাত্রা সকলের চেয়ে পুরাতন। তারপর রামযাত্রার প্রবর্ত্তন হয়। হিন্দু রাজত্বের সময় হইতেই রামযাত্রার প্রচলন দেখা যায়। রামযাত্রার অনেক পরে কৃষ্ণযাত্রার উদ্ভব। ভাগবতে লীলাভিনয়ের কথা আছে। ধর্ম্মোৎসব বা সামাজিক উৎসবে এই সকল অভিনয় হইত। যাত্রায় দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থা ছিল না। সঙ্গীত ও উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করা হইত। আমাদের যাত্রায় তখন সঙ্গীতের প্রভাব বড় বেশী ছিল। আর ভারতের সকল জায়গাতেই দেবলীলা-কীর্ত্তনে গীতবাদ্য দেখিতে পাওয়া যাইত, এখনও যায়। বেশ প্রকাশ্যস্থানে স্ত্রী-পুরুষ বেশভূষা করিয়া এই ব্যাপার করিত।

চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক অবস্থা এখনকার মত ছিল না। তখন দেশে অশনবসনের অভাব ছিল না, অন্নচিন্তাও চমৎকারা ছিল না। কাজেই লোকে সহজে উৎসবে-আমোদে কাল কাটাইতে চাহিত। ভদ্রসমাজে বিদ্যা ও শাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল। তাহাদের লক্ষ্য ছিল—সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাবের বিকাশ করিয়া তোলা। এ কার্য্যে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইত না, কেন-না, তখন ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য নিয়ন্ত্রিত হইত। লোকেও বড় অনুষ্ঠানপ্রিয় ছিল। তাহারা ছিল বেশ সরল-বিশ্বাসী, অথচ দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্। তাহারা বৃক্ষ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিত; জলাশয় খনন, বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। অন্নদান, জলদান, ভূমি-দানে প্রচুর আনন্দ পাইত। কথকতা ও কীর্ত্তন লোক-শিক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিল। লোকে সাংসারিক বিপদ এড়াইবার জন্য মঙ্গল-চণ্ডীর গান করিত, সচ্ছল অবস্থায় থাকিবার জন্য সত্য-নারায়ণের পূজা করিত, পাছে সর্প ভয় হয় তজ্জন্য মনসা, পদ্মা বা বিষহরির গান করিত, জর ও ফোড়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শীতলার গান, শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুর মাতা কার্ত্তিকেয় ও তাঁহার শক্তি ষষ্ঠীর গান, মাতৃকাপূজার জন্য বাসলী ও গজলক্ষ্মীর গান করিত। আর এই সমস্ত পালা শুনিতে সকলেই ভালবাসিত। এই সমস্ত দেবতার পূজায় তাহাদের আনন্দও খুব হইত। করতাল ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া এই সমস্ত দেব-দেবীর গান তাহারা করিত। অবস্থাবিশেষে বাদ্যকরেরা ঢাক, ঢোল, ডম্ফ, বীণা, সানাই, বাঁশী, কাঁশি প্রভৃতি বিয়াল্লিশ রকমের বাজনা বাজাইত। সময়ে সময়ে সংকীর্ত্তন করিয়াও তাহা

প্রেমাশ্রু বর্ষণ * করিত। কীর্ত্তন এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যেই হইত। নৃত্য, গীত, বাদ্য লোকের মনোরঞ্জন করিত। বৌদ্ধধর্ম্মের হিন্দু-সংস্করণ ধর্ম্মের গাজন ও শিবের গাজন তখনকার বঙ্গে বেশ জাঁকাল উৎসব ছিল। কিছু পরে মালদহ অঞ্চলে 'গম্ভীরা উৎসব' শিব ও ধর্ম্মের সমন্বয় ঘটাইয়াছিল। ইহাও লোককে আমোদ দিত। লোকে সূর্য্যের পাঁচালী, শনির পাঁচালী গাহিত। মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর ছড়া গাহিয়া রাত্রি জাগরণ করিত। ইহার পরই শ্রীচৈতন্যের যুগ। এই যুগের প্রাক্কালেই শ্রীচৈতন্য প্রচলিত কীর্ত্তনের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া এক অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি করিলেন। ইহার সুর ও ভাবে দেশবাসী মুগ্ধ হইল। নবদ্বীপ—শান্তিপুরে সংকীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া গেল। পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্ত্তনের আখড়া খোলা হইল। ক্রমশঃ কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যে কীর্ত্তনের নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইল। মান, মানভঞ্জন প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার অঙ্গগুলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবকীর্ত্তন ও রস-কীর্ত্তনে লোকে মাতোয়ারা হইতে লাগিল। কৃষ্ণকীর্ত্তন বঙ্গে বদ্ধমূল হইল। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে পূর্ব্ব হইতেই শিব-সঙ্গীত ও শক্তিসঙ্গীত প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে অপরদিকে আর এক সম্প্রদায়ের কতক লোক কালী কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিল। এই সময় শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ-লীলা-সঙ্গীত-তরঙ্গে সমগ্র বঙ্গ-দেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাভিনয় করিতে লাগিল। বৈষ্ণব-শাস্ত্র পাঠে বেশ বোঝা যায়, শ্রীচৈতন্যই সংকীর্ত্তন ও কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাভিনয় বিশেষ ভাবে প্রচার করেন। ইহার পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় যাত্রাভিনয় ছিল, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে যাত্রার আসরে নামিয়া অভিনয় ব্যাপারের প্রবর্ত্তক মহাপ্রভু। আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখরের * আঙ্গিনায় আসর করিয়া শ্রীচৈতন্য নিজে স্ত্রীবেশে, শাড়ী, হার, বলয়, নূপুরাদি অলঙ্কার ও কৃত্রিমবেণীতে সুসজ্জিত হইয়া সখীভাবে নাচিয়া গাহিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাত্রিতেই এই যাত্রাভিনয় হইয়াছিল, চারিদিকে দর্শকের স্থান হইয়াছিল। তাঁহার এই কীর্ত্তনের একটু পরিচয় দিই—

"একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
আজি নৃত্য করি অঙ্কের বিধানে॥
সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু "কাচ সজ্জ কর গিয়া॥
শঙ্খ, কাচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর' সভাকার॥
গদাধর কাচিবেন—রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ী—সখী সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ-কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।"
'শিরড়িয়া ছাড়ি মুঞি' বোলয়ে শ্রীমান॥
অদ্বৈত বোলয়ে "কি করিব পাত্র কাচ?"
প্রভু বোলে "পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ॥
সত্বর চলহ বুদ্ধিমন্ত খান! তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া, নাচিবাঙ আমি॥"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য ৮ম অধ্যায়

* যাহারা মহীপাল রাজার গীত গাহিত তাহাদের দ্বারাই কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছিল। কীর্ত্তনের সুর বাঙ্গালার নিজস্ব—এ সম্পত্তির গৌরব বাঙ্গালা বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কীর্ত্তনের করুণ সুর সকলেরই প্রাণ স্পর্শ করিত। মহীপালের গীত সকলকেই আকৃষ্ট করিত। বাঙ্গালার বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ 'বৌদ্ধগান ও দোহা' কীর্ত্তনের সুরেই গাহিত। জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী কীর্ত্তন সুরেই গীত হইত। ক্রমশঃ উত্তরকালে এই সুরের বাহার খুলিল গড়ানহাটি গরানহাটি) রেনেটি ও মনোহরসাহীতে। এই তিনটীই কীর্ত্তনাঙ্গের প্রধান সুর বলিয়া সাব্যস্ত হইল। কীর্ত্তনে করুণ কাহিনী গাহিতে মনোহরসাহী সুর বঙ্গের সর্ব্বত্র আদৃত হইল। এই তিনটী কীর্ত্তনাঙ্গ তিনটী পরগণার নামে বিখ্যাত। (১) গড়ানহাটী পরগণা জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত। এখানে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। আর ইনিই এই গড়ানহাটী গানের সৃষ্টিকর্ত্তা। (২) মনোহরসাহী পরগণা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত। মনোহরসাহীর সৃষ্টিস্থান—শ্রীপাট বড় কান্দরা ওরফে রামজীবনপুর। এই গানের সৃষ্টিকর্ত্তা সম্প্রতি স্বর্গগত নৃসিংহপ্রসাদ ঠাকুরের প্রপিতামহ শ্রীবদনচাঁদ ঠাকুর। (৩) রেনেটি=রাণীহাটী। এই পরগণা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত। এই গানের সৃষ্টিকর্ত্তার নাম জানা যায় নাই।

* আচার্য্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবী ভাবে নাচেন ঈশ্বর॥

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাহিয়া।
ঘরেতে আইলা প্রভু আনন্দিত হইয়া॥

—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

শ্রীচন্দ্রশেখর ভাগ্য তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিল এ মহিমা॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত

কাচ বলিলে "ছদ্মবেশ," "অভিনয়ের বেশ," "সাজ" বোঝায়।

শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতেও 'রাসযাত্রা,' 'উত্থান-দ্বাদশীযাত্রা,' 'দীপাবলীযাত্রা'র কথা আছে :—

"বিজয়া দশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানর সৈন্ত হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥
হনুমান্ বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ॥
"কাঁহা রে রাবণা" প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে ॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয় জয় বলে বার বার ॥
এই মত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি ॥"

—শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত

শ্রীচৈতন্যের সময়ে রায় রামানন্দও যাত্রাভিনয় করিতেন। তিনি ছিলেন নাট্যাচার্য্য। তাঁহার যাত্রায় আবার স্ত্রী অভিনেত্রী ছিল। চরিতামৃতে আছে, তিনি নির্বিকারচিত্তে যুবতী অভিনেত্রীদিগের পাঠ মুখস্থ করাইয়া অভিনয় করাইতেন। শ্রীবাস, গদাধর, অদ্বৈতাদি অভিনয়ে যোগদান করিতেন। সময়ে সময়ে মহাপ্রভু স্বয়ং যোগদান করিতেন।*

শ্রীচৈতন্যের অনুগত প্রতাপরুদ্রও যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যাদি যে-সমস্ত যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কোন পালার বই পাওয়া যায় না। তবে সে-সময় 'শেখরীযাত্রা' বলিয়া কায়স্থ চন্দ্রশেখর দাসের যাত্রার পালা ছিল বলিয়া বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন। এই চন্দ্রশেখর শ্রীঅদ্বৈতের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কায়স্থ চন্দ্রশেখর 'হরিবিলাস' প্রভৃতি যাত্রার পালা লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আর ইহার পূর্ব্বে কেহ যাত্রার পালা রচনা করেন নাই। কিন্তু ইহার কোন নজির পাওয়া যায় না। একমাত্র প্রমাণ 'শেখরী যাত্রা'র একটী নমুনা—

দশ দিক নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস ॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বোলয়ে মধুর।
দ্রাক্ষা ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সনে লুকয়ল তারাপতি ॥
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলয় সত্বর ॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মান ডর ॥
শেখরে শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হৈয়া সাধু জায়া রহিলা শুতিয়া ॥

পূর্ব্বে যাত্রাকে দেবলীলা বলিত। বৈষ্ণবদের সময় হইতে কৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রার নাম দেওয়া হয়—কৃষ্ণলীলা। এই সব যাত্রায় ছিল কীর্ত্তনাঙ্গ সুরেরই বেশী প্রভাব। প্রথমে মহড়া দেওয়া হইত, তারপর 'গৌরচন্দ্র'-পাঠ, অতঃপর কৃষ্ণের নৃত্য হইত, তারপর "মণি গোসাঞি" আসিত। পরবর্ত্তী কালে শুধু কৃষ্ণবিষয় লইয়া নহে, পুরাণ ও কাব্যের বহু ব্যাপার যাত্রার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা তো ছিলই, তাহাদের সঙ্গে জুটিল মনসার ভাসান যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রভৃতি।

প্রাচীন যাত্রার পালায় ছিল কালিয়দমন অভিনয়। সকলেই জানে যে কালিয়দমন বলিলে কৃষ্ণকর্ত্তৃক যমুনায় কালিয় নাগের দমন বুঝায়। কিন্তু সেকালে তাহা বুঝাইত না। কৃষ্ণলীলার যাহা কিছু সব কালিয়দমনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালিয়দমন বলিলে বুঝাইত গোষ্ঠ, রাস, দোল, নৌকাবিহার, মান, মানভঙ্গ, কংসবধ, প্রভাস ইত্যাদি। ঐ সমস্ত যাত্রা অভিনয়ে মহড়া দিবার পর "গৌরচন্দ্র" পাঠ হইত। লোকে বলিত "গৌরচন্দ্রী পাঠ"। তারপর, কালে এই যাত্রার প্রভাব কমিতে থাকে, তখন পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতি কয়েকটী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। পাঁচালী ও কীর্ত্তনে লোক এত মাতিয়া উঠিল যে, যাত্রা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। এই সময় ভারতচন্দ্র

---

* সকল বৈষ্ণব মেলি প্রেমের প্রসার ডালি
পসারিল অপরূপ হাট।
* * *
এখনে কহিব শুন সাবধানে সব জন
গোপিকা-আবেশ-বশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচলি ধরে, শঙ্খ কঙ্কণ করে
দু'টী আঁখি রসে ডুবু ডুবু ॥
পট্ট সে বসন পরে নূপুর চরণে ধরে
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।
রূপে ত্রিজগৎ মোহে উপমা দিবাও কাঁহে
গোপী বেশে ঠাকুর আপনি ॥
—শ্রীচৈতন্তমঙ্গল (লোচনদাস)

'বিদ্যাসুন্দর' ও 'চণ্ডী-নাটক' রচনা করেন। চণ্ডীনাটক সম্পূর্ণ হয় নাই। বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় পরিণত হইল। লোকে যাত্রার আনন্দ পুনরায় পাইতে লাগিল।

রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের সময়ে কেদেলীগ্রাম-নিবাসী শিশুরাম অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় খুব নাম করিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে যাত্রার উপর লোকের রুচি কমিয়া আসিতেছিল। শিশুরাম ইহার নানারূপ উন্নতিসাধন করিয়া যাত্রার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। লোকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

কলিকাতায় যোড়াসাঁকোর বীরনৃসিংহ মল্লিক বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল খোলেন। সিঙ্গুরের ভৈরবচন্দ্র হালদারকে দিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করিয়া ল'ন। দুই বৎসর ধরিয়া যাত্রার পালা সাধা হয়। কিন্তু যাত্রার অভিনয় হইয়াছিল মাত্র তিন রাত্রি। এই যাত্রার আয়োজন-ব্যাপারে মল্লিক মহাশয়ের লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। গোপাল উড়ে* এই দলে মালিনী সাজিয়াছিল। তার হাবভাব-বিলাসে ও সুমধুরকণ্ঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। গোপাল উড়ে ছিলেন মল্লিক মহাশয়ের যুগপৎ ভৃত্যকে ভৃত্য, বয়স্যকে বয়স্য।† তিনি এই পালাটী মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়া দশ বৎসর স্বাধীনভাবে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা করেন।† স্ত্রীলোক সাজিলে কেহ তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না। ইহার দলের নামডাক খুব রটিয়াছিল। গোপাল উড়ের দলে উমেশ ও ভুলো (ভোলানাথ দাস) গান করিত। প্রথমে রূপো, তারপর কাশী মালিনী সাজিত, ভুলো সাজিত বিদ্যা এবং উমেশ সাজিত সুন্দর।‡ গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার গান একটীও গোপালের রচিত নয়। নানা জায়গার কবি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ওস্তাদেরা সুর সংযোগ করিয়া দেন, আর যাত্রার অধিকারী* গোপালের নামে সেগুলি বিকায়। টপ্পা-জাতীয় বলিয়া গোপাল উড়ের গানগুলিকে লোকে গোপাল উড়ের টপ্পা বলিত। টপ্পাগুলি লোকে বড়ই পছন্দ করিত। গোপালের মৃত্যুর পর উমেশ ও ভুলো দুইজনে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দুইটী দল পরিচালনা করে। উমেশের দল উঠিয়া যায়। ভুলোর দলের বেশ পসার হয়। ভুলোর মৃত্যুর পর তাহার দুই ছেলে গগন ও পূর্ণচন্দ্র দুটী দল চালায়।

ঢাকায় কৃষ্ণকমল গোস্বামী† কৃষ্ণযাত্রায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। স্বপ্নবিলাস তাঁহার প্রথম যাত্রা

* গোপাল দাস উৎকলের জাজপুর গ্রামবাসী। জাতিতে করণ। গোপাল কৃষিজীবী মুকুন্দের মধ্যম পুত্র। ৪০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

† কাহারও কাহারও মতে কলিকাতা বহুবাজারের ধনাঢ্য রাধামোহন সরকার বিদ্যাসুন্দরের এক পালা সংগঠন করিতেছিলেন। গোপাল উড়ে নামক এক সুন্দর যুবক ফেরিওয়ালা তাঁহার নূতন যাত্রার দলভুক্ত হয়। ইহা অমূলক।

† গোপাল উড়ের সময়ে গুরুচরণ সেন কলিকাতার একজন বড় ধনী ছিলেন। তাঁহার ভাইপো শ্রীনাথ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটা সখের দল গঠন করেন। ঐ দলে মোহনচাঁদ বসু ও গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত গান বাঁধিতেন। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অনেকগুলি হইয়াছিল। এই সময় ধনেখালির নিকটে বোসো গ্রামে এক সখের দল হয়। এক বাগ্দী বিদ্যাসুন্দর সাটের গান বাঁধিয়া দিত। কালিয়দমন যাত্রা যখন চলিতেছিল সেই সময়ে কলিকাতা ও তাহার উত্তরে-দক্ষিণে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা চলিতেছিল। ১৮২৯ সালে বরাহনগরের রামজয় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসুন্দরের এক দল প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, নিমাই মিত্র, রামমোহন চট্টোপাধ্যায়—ইঁহারা সাজিতেন, দলও চালাইতেন। রামধন মিস্ত্রি ঢোল বাজাইত। অমন ঢুলী আর ছিল না। ঐ সময় জনাই-এও যাত্রা হয়। বরাহনগরে ঠাকুরদাসের দলের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হয়। এই দলে ঠাকুরো যুগী, শিবে যুগী দাঁড়াইয়া খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপর ইহাদের দল উঠিয়া গেলে কৈলাস বারুই সেই সব লোক লইয়া যাত্রার দল গড়ে। কৈলাস ছিল চুটকী রাগিণীর ওস্তাদ। কৈলাস ও গোপাল উড়েতে পাল্লাপাল্লি চলিত। ভবানীপুরে বেলতলায় শিবুঠাকুরের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হয়। পরে বেলতলায় প্যারীমোহনের যাত্রার দল ছিল। বৌবাজারের ধনী সম্প্রদায় আট দশ বৎসর পরে সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করেন।

‡ এই বেশে মালিনী হইতেই খেমটা নাচের উৎপত্তি। গোপাল উড়ের সময় সুরও ছিল মিশ্র।

* যিনি যাত্রার দলের সর্ব্বেসর্ব্বা তাঁহাকে অধিকারী বলা হইত।

† কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের ভজনঘাটে বৈদ্য গোস্বামি-বংশে ১৮১০ সালে (১২১৭ বঙ্গাব্দে) রথযাত্রার দিন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুরলীধর, মাতার নাম যমুনা দেবী। কৃষ্ণকমলের প্রথম গ্রন্থ 'নিমাই-সন্ন্যাস' নবদ্বীপে যাত্রায় অভিনীত হয়। সুনাম অর্জ্জন করিয়া তিনি ঢাকায় গমন করেন। সেখানে তাঁহার যাত্রার আসর বেশ জমিল। ভাগবত পাঠও করেন। লোকে বিপিন বসাকের যাত্রা শুনিতে ভালবাসিত। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণকমল ইহাকেও হারাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের মৃত্যু হয় চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে ১২৯৪ সালে ১২ই মাঘ (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ)।

পুস্তক। ১৮৩৫ বা ইহার কাছাকাছি এখানি ছাপা হয়। অল্পদিনেই ২০,০০০ খণ্ড বিক্রয় হইয়া যায়। সে সময়ে লোকে অনুপ্রাস-বহুল স্বপ্নবিলাস যাত্রা শুনিতে পাগল হইত। তাঁহার বিচিত্র বিলাস, রাই উন্মাদিনী, নন্দহরণ, নিমাই-সন্ন্যাস,সুরথসংবাদ, গোষ্ঠ ও ভরতমিলন তৎকালীন বঙ্গবাসীর বিশেষ প্রিয় ছিল।

শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল অধিকারী। ইঁহার সমসাময়িক লোচন অধিকারী 'অক্রূর-সংবাদ' ও 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতেন। কুমারটুলির বনমালী সরকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী তাঁহার কয়েকবার যাত্রা হইয়াছিল। লোচন অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

তারপর বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় খুব নাম করেন। পরমানন্দ শ্রীদাম সুবলের শিষ্য। তিনি দূতী সাজিয়া 'তুক্কো'য় আসর জমাইতেন।

হুগলী জেলায় কৃষ্ণনগর জাঙ্গীপাড়া-নিবাসী গোবিন্দ অধিকারী পরমানন্দের শিষ্য। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। জন্ম ১২০৫, মৃত্যু ১২৭৭। ইনি যাত্রা, কীর্ত্তন ও কথকতায় বিশেষ নাম করিয়াছিলেন। প্রথমে গোলোকদাস অধিকারীর নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করেন, কীর্ত্তনেরও একটা দল খোলেন। পূর্ব্ববঙ্গে জগদীশ গাঙ্গুলীর যাত্রার দল ছিল। নিজেই তিনি পালা রচনা করিতেন। গোবিন্দ বাল্যকালে ইঁহার দলে কিছু দিন গান করেন। তারপর বদনের দলে গান করিতেন। শেষে 'কালিয়-দমন' যাত্রার দল গঠন করেন। গোবিন্দ নিজে দূতী সাজিতেন। নিজে অনেক গান রচনা করেন। ইঁহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য, ইঁহার গান ও "ঘটকালী"* শুনিবার জন্য বহুদূর দেশ হইতে লোক আসিত। ইঁহার 'শুকশারীর পালা' 'চূড়ানূপুরের দ্বন্দ্ব' তখনকার আমলে 'বিশেষ দ্রষ্টব্যে'র মধ্যে ছিল।

নাথানিএল জন হালহেড (Nathaniel John Halhed) বৈয়াকরণ হালহেডের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি কতিপয় প্রাচ্যভাষায় বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, কখন কখন তিনি ছদ্মবেশে আমাদের দেশী কাপড় পরিয়া আপনাকে দেশী লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সহসা কেহ বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। যখন তিনি পাঁচ জনের সঙ্গে তামাক খাইতেন, তখন তাঁহাকে ইয়ুরোপীয় বলিয়া চেনা দায় হইত। বর্দ্ধমান রাজবাড়ীতে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার অভিনয়ে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।*

১২৩৪ সালের (১৮২৭ খৃঃ) কাছাকাছি ভবানীপুরে 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল ছিল। এই যাত্রার দল করিতে বিপুল অর্থব্যয় হয়। রামবসু যাত্রার গান রচনা করিয়া দেন। ১০।১৫ আসর গানের পর যাত্রাটী বন্ধ হইয়া যায়।

গোবিন্দের শিষ্য নীলকণ্ঠ (মুখোপাধ্যায়) ও নারায়ণ দাস। নীলকণ্ঠের জন্ম ১২৬৮ সালে বর্দ্ধমান জেলায় ধরণী-গ্রামে। মৃত্যু ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে। ইনি স্বগ্রামের নিকট গোবিন্দ অধিকারীর গান শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হ'ন ও বহু মহাজন পদ শিক্ষা করেন। গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার দল দুইভাগে বিভক্ত হয়—নীলকণ্ঠ ও নারায়ণ দুই দলের অধিকারী হ'ন। অল্পকাল পরে নারায়ণের মৃত্যু হইলে নীলকণ্ঠ দলের কর্ত্তা হ'ন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদে ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি।†

রাধাকৃষ্ণ, নবীন গুঁই, ফরাসডাঙ্গার মহেশ চক্রবর্ত্তীও যাত্রার দল খুলিয়াছিলেন। পাঁচালীকার রসিক রায় ইঁর গান বাঁধিয়া দিতেন।

পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী পরমানন্দের সমসাময়িক—'মহীরাবণবধ' পালায় ও রামযাত্রায় খুব পটু। খরকাটায়ও একজন প্রেমচাঁদ ছিলেন।

---

* যাত্রার বক্তৃতার যে অংশ অভিনীত হইবার পরে তাহার মর্ম্ম গান গাহিয়া ব্যক্ত করা হয় তাহার নাম 'ঘটকালী'। মনে করুন বৃন্দা আসিয়া রাধাকে বুঝাইলেন। বুঝান শেষ হইলেই গান করিয়া আবার সেই মর্ম্ম বুঝান হয়। বৃন্দার বক্তৃতা 'ঘটকালী'। এ বক্তৃতারও কিছু মূল্য থাকিত।

*Friend of India, Aug 9, 1838.

† নীলকণ্ঠের পালা যখন বেশ চলিতেছিল সেই সময় বোধ হয় ১২৯৪।৯৫ সালে রসিকলাল চক্রবর্ত্তী 'বালক সঙ্গীত' যাত্রা খোলেন। এই রসিক অধিকারীর বাড়ী যশোহরে—কালীগঞ্জ থানার এলাকায় রায় গ্রামে।

বাঁকুড়ার আনন্দ অধিকারী, জয়চাঁদ অধিকারীও রামযাত্রায় খুব নাম করেন।

প্রেমচাঁদের শিষ্য বদন অধিকারী তুক্কোয় খুব উন্নতি করেন। বদনের 'দান', 'মান', 'মাথুরে'র খুব নাম। বদন থাকিতেন শালিখায়। গোড়ায় গোড়ায় গোবিন্দ অধিকারী বদনের দলে গান করিতেন।

বিশ্বনাথ মাল বলিয়া দুইজন যাত্রাওয়ালা ছিল। বাঁকুড়া জেলায় ওন্দা থানায় একজনের বাড়ী। আর একজন বহুপরবর্ত্তী, ১২৯৭ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি গোবিন্দ অধিকারীর গ্রামবাসী ও সমসাময়িক। ইঁহার কালিয়দমন যাত্রার দল ছিল।

প্রাচীন যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে রামময় দাস, রাজ নারায়ণ দাস, মহেশ ঠাকুর, কান্ততেলী, রঘু তামুলী খুব নাম করিয়াছিলেন। পটলডাঙ্গার নীলকমল সিংহের দলও বেশ পুষ্ট ছিল। পালা ছিল প্রহ্লাদচরিত্র। এই দল ভাঙ্গিয়া নারায়ণ দাসের দল হয়। পরবর্ত্তী-কালে কাটোয়ানিবাসী পীতাম্বর অধিকারী ও বিক্রম-পুরের কালাচাঁদ পাল কৃষ্ণযাত্রায় সুনাম অর্জ্জন করেন। 'কালিয়দমন' পালা ইঁহার রচনা।

চন্দননগরে মদন মাষ্টারের সখের দল ছিল, পরে পেশাদারী হয়। যাত্রার পালা ছিল—দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, ধ্রুবচরিত্র। বালকদের গান ছিল কীর্ত্তনাঙ্গ। মদন মাষ্টার যাত্রার দলে জুড়ীর গানের প্রবর্ত্তক। জুড়ীর সুর ছিল কবিগান-ভাঙ্গা। মদনের সময় ছোকরারাই গায়িত। যার গান সেই গায়িত। রাগরাগিণী গায়িবার জন্য ছিল জুড়ী। বিখ্যাত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার দলে ঢোল বাজাইতেন। পরে নিজে দল করেন। মদনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নবীন দল পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী নিজেই দল চালান—দলের নাম হয় বৌ-মাষ্টারের দল। কালী ও কৃষ্ণ নামে দুই ভাই ঐ দল পরিচালন করিত। বৌ-মাষ্টারের অনুকরণে নবদ্বীপের যাত্রার দলের অধিকারী নীলমণি কুণ্ডের স্ত্রী যাত্রার দল চালান। নাম হয় বৌ-কুণ্ডুর দল। যাত্রা হইত কলিকাতায়। রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের দলে 'নন্দবিদায়' যাত্রা হয়। এই 'নন্দবিদায়' যাত্রার একটী সংবাদ ৬ই বৈশাখ ১২৫৬ সালের ভাস্করে এইরূপ বাহির হয়:—'নন্দবিদায় যাত্রা'— ৩রা বৈশাখ শনিবার ১২৩৬ সাল (১৮৪৯—April)- শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে নন্দবিদায় যাত্রা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাত্রার মূল ছিলেন।

কেদার ঘোষ, ধুলো উমেশ, ভদ্রকালীর বনমালী ঘোষ, শিবু যুগী, ব্রজ (মোহন) রায়, খোঁড়া নন্দ (আসল নাম— শিবরাম চট্টোপাধ্যায়—ইনি পাঁচালীকার খোঁড়ানন্দের পরবর্ত্তী) প্রভৃতি অনেক নামজাদা যাত্রাওয়ালা ছিল। ইঁহাদের মধ্যে ব্রজ রায় ১২৭৯ সালে পাঁচালীর দল উঠাইয়া দিয়া যাত্রার দল গড়েন। চারিবৎসর ভালরূপে পরিচালনা করিবার পর ইঁহার মৃত্যু হয়। তারপর তাঁহার সহোদর গোপীমোহন আট বছর এই দল চালাইয়াছিলেন।

ব্রজ অধিকারীরও একটী দল ছিল। তিনি নিজেই পালা রচনা করিতেন।

বেণীমাধব ডাফিৎ জাতিতে ময়রা ছিল—কিন্তু রাবণ-বধ ও মান-ভঞ্জনের পালা রচনা করিয়া বেশ নাম করিয়াছিলেন।

গঙ্গার ভট্টাচার্য্য জমীদারদের সখের যাত্রার দল ছিল। টাকীর রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীদের, হাওড়ায় কোণার জমীদার দীননাথ চৌধুরীর,উলুবেড়িয়ার নিকট ফুলেশ্বরের আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর সখের দল ছিল। আশুতোষ চক্রবর্ত্তী শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পেশাদারী দল চালান।

হাড়কাটাগলি-নিবাসী দত্তবংশীয় কায়স্থ দুগো ঘড়েলের (দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল) যাত্রার দল নামজাদা। ইনি বয়োবৃদ্ধ দোয়ারের স্থানে বালক দোয়ার আট জন রাখেন। সকল বড়লোকের বাড়ীতেই তাঁর যাত্রা হইয়াছে। বেণেপুকুরের লোকা ধোবা (লোকনাথ দাস— চাষাধোবা) ও কালীনাথ হালদার ইঁহার দলে গায়িতেন। ইঁহারা তখন দুগোর-দলের ছোকরা, শেষে তাঁহারা নিজের নিজের দল করেন। লোকা ধোবা যাত্রা করিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।

গোপাল উড়ের চেলা খবড়ার কৈলাস বারুই-এর দল, মাকড়দহের বেণীমাধব পাত্রের পেশাদারী দল, সাধু ও

বকো মুসলমানের দল খুব নাম করিয়াছিল। পরে ইহাদের দল ভাঙ্গিয়া দুই দল হয়। বহুবাজারের ঝড়ুদাস অধিকারী, কোণার গোপীনাথ দাস যাত্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

শিবপুরনিবাসী উমাচরণ বসুর সখের দলেরও নাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই দল ১৮৭২ সালে গঠিত হয়।

অনেকগুলি দলের জন্য পালা রচনা করিয়া দিতেন উত্তর-ব্যাঁটরার ঠাকুরদাস দত্ত। পালা রচনায় ইহার শক্তি ছিল অসাধারণ। একই পালা তিনি চারি পাঁচ রকমে রচনা করিতে পারিতেন। তাঁর নিজেরও যাত্রার দল ছিল। তিনি বিদ্যাসুন্দরের পাঁচ রকম পালা রচনা করেন। একটী নিজের দলে (১২৩৭।৩৮ সালে) [ব্যাঁটরার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এই দলে মালিনী সাজিয়াছিলেন], একটী গঙ্গার জমীদারের দলে, একটী টাকীর মুনসীদের দলে, একটী কালী হালদারের দলে এবং একটী কৈলাস বারুই-এর দলে অভিনীত হয়। পাঁচখানি বিদ্যাসুন্দরের পালার কোনখানির সঙ্গে কোনখানির আদৌ মিল নাই। এরূপ অদ্ভুত রচনাশক্তি বিরল। ইহার রচিত অন্যান্য পালাও বিভিন্ন দলে অভিনীত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে একটী তালিকা দিলাম :—

	পালার নাম	যে দলের জন্য রচিত
১।	হরিশ্চন্দ্র *	দীননাথ চৌধুরীর দলের জন্য
২।	লক্ষ্মণবর্জন [নিজের দলেও একটী স্বতন্ত্র পালা ছিল]	আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর ,,
৩।	শ্রীবৎসচিন্তা	উমাচরণ বসুর ,,
৪।	নলদময়ন্তী, কলঙ্ক-ভঞ্জন, শ্রীমন্তের মশান	দুগোঘড়েলের ,,
৫।	রাবণবধ	কালী হালদারের ,,
৬।	অক্রুর-সংবাদ, দুর্গামঙ্গল	বেণীমাধব পাত্রের ,,
৭।	ধ্রুব-চরিত্র	সাধু ও বকোর * ,,
৮।	শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন	গোপীনাথ দাসের ,,
৯।	অক্রুর আগমন, রাবণ বধ	—ঝড়ুদাসের ,,
১০।	শ্রীমন্তের মশান †	লোকা ধোপার ,,

ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন ও চণ্ডী যাত্রা গায়িতেন। তারপর, তাঁর ছেলে ব্রজবল্লভ অধিকারী গায়িতেন। আর মনসার ভাসানের পালা গায়িতেন—বর্দ্ধমানের লাউসেন বড়াল। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পালাও গায়িতেন। কিন্তু সেটা জমে নাই। লাউসেন অদ্বিতীয়। বর্দ্ধমান ভাতশালার মতিলাল রায়ের যাত্রাও খুব নাম করিয়াছিল।* মতিলালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্ম্মদাস রায় বাণীকণ্ঠ দল চালান। ইনি 'কবচ-'সংহার' প্রভৃতি রচনা করেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছিলেন ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী।

হুগলী—গোপীনাথপুরের কৃত্তিবাস মণ্ডলের গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ পালা মন্দ ছিল না।

কৃষ্ণযাত্রায় নাম কিনিয়াছিলেন—দুর্লভদাস (শাহনগর), মাধবদাস (সিঙ্গুর—পলাশপাই) ও রাইচরণ বেরা (মহাকালপুর)।

বলাই ঠাকুরের কালিয়দমন,—গোবিন্দ পাঠকের হরিশ্চন্দ্র, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, কীচকবধ, দানপরীক্ষা ও নরমেধযজ্ঞ,—পীতাম্বর পাইনের কংসবধ, হরিশ্চন্দ্র, বকেশ্বর পাইনের নরমেধযজ্ঞ, নবীন ডাক্তারের সীতার পাতাল প্রবেশ, এবং শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর লক্ষ্মণের শক্তিশেল—এগুলি বেশী পুরাতন না হইলেও মন্দ ছিল না।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে শ্রীবাস দাস নামে একজন পণ্ডিত

* এই পালার ৩১ খানি গান ছিল। দুইখানি গানের নমুনা সাহিত্যে (১৩১৫ চৈত্রে, পৃঃ ৬৬৩-৬৬৪) দ্রষ্টব্য।

* ইহার অপর নাম—বকোশেখ (বক্স ইলাহি) বা বকাউল্লা শেখ (সেখ বকাউল্লা), হুগলী জেলায় ইঁহার জন্ম। অনুপ্রাসে গীত রচনায় খুব দক্ষ ছিলেন।

† তিনটী গান, নলদময়ন্তীর একটী ও কলঙ্কভঞ্জনের একটী গান সাহিত্যে (১৩১৫, চৈত্র, পৃঃ ৬৬১-৬৬৩) দ্রষ্টব্য।

* মতিলালের গ্রন্থাবলী—সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ, নিমাইসন্ন্যাস, ভীষ্মের শরশয্যা, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ, বিজয়চণ্ডী, রাবণবধ, ভরতমিলন, লক্ষ্মণভোজন, পাণ্ডব-নির্ব্বাসন, কর্ণবধ, ব্রজলীলা, শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য।

ছিলেন। তিনি এত ভাল 'সুবলসংবাদ' যাত্রা করিতেন যে লোকে বলিত নীলকণ্ঠ তেমন পারিতেন না। নীলকণ্ঠের কবিত্ব, আর শ্রীবাসের পাণ্ডিত্য।

(বাঁকুড়া) বিষ্ণুপুরে নটবর দাস "কৃষ্ণলীলা" যাত্রা করিতেন। বিষ্ণুপুরের নিকট রাধানগরে রামেশ্বর শর্ম্মা 'রাবণবধ' ও 'রামলীলা' যাত্রা করিতেন। বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব মহৎদাস 'কৃষ্ণলীলা' যাত্রা করিতেন। চন্দ্রকোণায় আর একজন গোবিন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রা করিতেন।

অধিক দিনের কথা নয় ভূষণ দাস যাত্রা করিয়া বেশ নাম করিয়াছিলেন। যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় 'দক্ষযজ্ঞ' 'সতীনাটক' যাত্রা করিতেন। অভয় দাসের 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' ও 'অভিমন্যু'র পালা বেশ জাঁকিয়াছিল।

মেদিনীপুর পাটনা বাজারের অক্রূর প্রামাণিকের যাত্রা খুব বিখ্যাত; মেদিনীপুর কোতবাজারের পূর্ণেন্দু সাহার যাত্রাও নাম করিয়াছিল। মেদিনীপুর-শ্রীমন্তপুর-নিবাসী শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ও গিরিশ চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণযাত্রা বিখ্যাত ছিল।

ঝালকাটির মথুর সাহার 'লক্ষবলি' পালা খুলনা, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে অভিনীত হইয়া খুব নাম করিয়াছিল। বারাসাতেও একজন মথুর সাহা ছিল।

মৈমনসিংহে গৌরমোহন অধিকারী প্রাচীন যাত্রা-ওয়ালা। তিনি ধ্রুবচরিত্র, নিত্যমিলন, নরমেধযজ্ঞ, মার্কণ্ডেয়ের হরিপাদপদ্মলাভ অভিনয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিখ্যাত ইন্দ্রমোহন নট (নট্ট—নর) তাঁহার বায়েন ছিলেন। ইঁহার মত বায়েন পূর্ব্ববঙ্গে বিরল। সনাতন অধিকারী মৈমনসিংহে মতি রায়ের যাত্রাভিনয়ের পালা গাহিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতেন।

ফরিদপুরের চন্দ্রকান্ত অধিকারীর মত ভাবপ্রবণ যাত্রাওয়ালা বড় বেশী নাই। মাদারিপুরে কালীনাথ ভট্টাচার্য্য ও গোবিন্দ (কীর্ত্তনীয়ার) নট্টের ডাক-নাম খুব ছিল। গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র পালং গ্রাম-নিবাসী ব্রজবাসীও ভাল যাত্রা করিতেন।

বরিশালের নাগ কোম্পানির ব্রজবাসী অধিকারী নিপুণ যাত্রাওয়ালা ছিলেন। বরিশালের অন্তর্গত মাহিলাড়া গ্রামনিবাসী গোবিন্দ ধুপী যাত্রার ঢঙে ঢপ গান করিতেন।

শ্রীহট্টে গিরিশচন্দ্র চৌধুরী যাত্রাভিনয় করিতেন। ইঁহার যাত্রা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে উমানাথ ঘোষাল, অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য-রচিত 'সুরথউদ্ধার' তুলসীলীলা, দণ্ডীপর্ব্ব, উত্তরা-পরিণয়, বোধনে বিসর্জ্জন, রাই উন্মাদিনী ও রামাশ্বমেধ পালা অভিনয় করিতেন।

এ ছাড়া সাতরা কোম্পানী, নারায়ণ দাস প্রভৃতি আরও অনেক যাত্রাওয়ালা ছিল। কত নাম করিব।

ওড়িষা ও আসাম-প্রদেশে অনেক দিন হইতে যাত্রা চলিয়া আসিতেছে। আসামের শঙ্করদেব-শিষ্য মাধব-দেব-রচিত 'নামঘোষা' হইতে আসামে কতকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালাযাত্রার উপকরণ পাওয়া যায়। ওড়িষার বর্ত্তমান যাত্রা বঙ্গদেশের অনুকরণে সংস্কৃত হইতেছে। ওড়িষার প্রাচীন যাত্রায় দেখিবার মত জিনিস 'মুখোস'। পূর্ব্বে মুখোস না হইলে ওড়িষায় যাত্রা হইত না, এখনও মুখোসের রীতি অপ্রচলিত হয় নাই।

সেকালের যাত্রায় যেখানে কৃষ্ণলীলার গান দিতে হইত, সেখানে যাত্রাদলের ছোট ছোট ছেলেরা পায়ে ঘুমুর বাঁধিয়া নাচিত। তাহারা গায়িবার সময় তালে তালে পা ফেলিত। তাহাতে ঝুমুর ঝুমুর মিঠে আওয়াজ হইত। এই গানের নাম ছিল 'ঝুমুর'। এই ঝুমুর গান হইতে পরবর্ত্তী কালের ঝুমুরের দলের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

সেকালে যাত্রার আসরে নাচের ব্যবস্থাটা কিছু গুরুতর ছিল। পাত্র পাত্রী সকলকেই নাচিতে হইত। রাধা-কৃষ্ণ, বিদ্যা, সুন্দর, অভিমন্যু, উত্তরা, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী —কেহই নাচ হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। শ্রোতা-দের তুষ্টি সম্পাদনের জন্য সকলকেই একবার নাচিতে হইত।

যাত্রায় সং দেওয়া একটা অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। তা সে সং হউক, কেলুয়া ভলুয়া হউক, বা মট্‌রুই হউক। মট্‌রু সেকালে তারিফের সং।

পুস্তক পরিচয়

বেদের ঐতিহাসিকতা—শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকারের সাধু উদ্যম প্রশংসার যোগ্য। ইনি নিবেদনে প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থাগারে সংগৃহীত নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে ভারতে আর্য্যসভ্যতার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহপূর্ব্বক তৎসহ প্রাচীন যুগের শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালীর বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বঙ্গভাষায় এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। ভিতরে একটু মতলব আছে। সেটি পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা-বিভাগের ইতিহাস-শ্রেণীর ছাত্রদের সাহায্য করা।

পুস্তকখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ভারতে আর্য্যসভ্যতার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতির বিবরণ; দ্বিতীয় খণ্ডে সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্ম এবং তৃতীয় খণ্ডে শাসন-প্রণালী। এগুলিতে লেখক ৩১১ পৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছেন।

পুস্তকখানিতে পড়িবার জিনিস অনেক আছে। ভারতের অতীত ইতিহাস ৫ পৃষ্ঠায়। ৫ পৃষ্ঠায় ভারতের ইতিহাস ও বেদ। ৮ পৃষ্ঠায় প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর ভৌগোলিক বিবরণ। ৮ পৃষ্ঠায় বেদের 'বয়সকাল' বা আর্য্যসভ্যতা কত প্রাচীন। এইরূপ বহু বিষয়। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকারের বহু পরিশ্রমলব্ধ সিদ্ধান্তের তথা প্রমাণের অনেকগুলিই নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারা যায় না। এই গ্রন্থখানির বহু স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের Rigvedic India গজ গজ করিতেছে। অধুনা-প্রচলিত (দুষ্প্রাপ্য নয়) ইংরেজী ভাষায় লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থোপকরণের সাহায্যে এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত বলিয়াই মনে হয়। তাহার ফলে এবং লিপ্যন্তর-রীতি-কৌশলে গ্রন্থকার অভ্যস্ত না থাকায় অনেক বৈদিক নাম অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। আমরা এতদিন জানিতাম অনু, দ্রুহ্য, তুর্ব্বশ, যদু, পুরু—ইহারাই "পঞ্চজনাঃ"। গ্রন্থকারের দৌলতে দেখা গেল—"তুর্ব্বাসা (?), যদু, অনু, দ্রুহ (?), পুরু (?) প্রভৃতি (?) পঞ্চজাতি (পঞ্চজনাঃ)।" পৃঃ ৬৪। অন্যত্রও, তুর্ব্বাসা' (ইনি 'দুর্ব্বাসা'র কেহ না কি)। তুর্ব্বাসা, দ্রুহকে বেদে বা বৈদিক সাহিত্যে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তারপর পুরু (?) প্রভৃতি—এ 'প্রভৃতি' কাহারা? পাঁচের উপর প্রভৃতি লাগাইয়াও পাঁচ হয় কি? ৬৮, ৭৪, ১১০, ১২১ পৃষ্ঠায় পণিগণের পরিবর্ত্তে দেখি পাণিগণ'; ৭৪ পৃষ্ঠায় চোল (চোড়), পাণ্ড্য জাতি লেখকের হাতে পড়িয়া 'চোলা', 'পাণ্ডি' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ৯৩ পৃষ্ঠায় 'ধিশন' (জলপাত্র)। চারিখানি বেদে এ শব্দ নাই, আছে 'ধিষণা' (ঋগ্বেদ, ১, ১০২, ৭; ৩, ৩২, ১৪ ইত্যাদি) অর্থ সোম তৈয়ী করিবার পাত্র। বেদে পান করিবার পাত্রকে 'পাত্র'ই বলা হয়। ঐ পৃষ্ঠায় 'আসন্দী';—এটি লেখকের 'কেদারা', 'চেয়ার'; আমরা ইহার অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতায়, ঐতরেয় ও শতপথব্রাহ্মণে আছে 'আ-সন্দী' অর্থ বসিবার আসন, কেদারা কি না জানি না। ১৬৩ পৃষ্ঠায় অশ্বালায়ন, ১৬৫ পৃষ্ঠায় বিশ্ববরা, অপলা, লোপমুদ্রা।—নিশ্চয়ই এগুলি আশ্বলায়ন, বিশ্ববারা, অপালা, লোপামুদ্রা। ইংরেজীর অনুকরণের চেষ্টায় 'শ্রেষ্ঠীণ' (পৃঃ ৩০৩), রুদ্রদমন (পৃঃ ৩০৪) [রুদ্রদামন্ হইলেও রক্ষা ছিল] 'শ্রেষ্ঠী' ও 'রুদ্রদামা'র এই দুর্গতি হইয়াছে। গ্রাম ও বাসগৃহের অধ্যায়ে (পৃঃ ৯০) লিখিয়াছেন—"অক্ষু (জাল), ইত (মাদুর), তৃণ প্রভৃতি সাহায্যে...গৃহাচ্ছাদন (ছাদ) প্রস্তুত করাইয়া লইতেন।"—'ইত' কি? ইহা 'ইট' হইবে—আর 'ইটে'র মানে 'মাদুর' নয় (অথর্ব্ববেদ ৯. ৩. ১৮)। বেশভূষায় অধ্যায়ে (পৃ. ৯৬) লেখক বলিয়াছেন "নারীগণ ওপাশ (?), কুরীর, কুম্ব (?) অর্থাৎ শৃঙ্গ, জাল বা কুম্ভের ন্যায় কবরী বন্ধন পূর্ব্বক..."। ইংরেজী হইতে 'ওপশ' ও 'কুম্ব' ঐরূপে পরিণত করিয়াছেন, ৯৭ পৃষ্ঠায় 'নিষ্ক' ও 'রুক্ম'—'নিক্ষ' ও 'রুক্ষ' রূপ ধরিয়াছে। ১৭১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় "রাজা ত্রসদস্যু কাণব ঋষিকে... পঞ্চাশটি স্ত্রী দান করিয়াছিলেন..."। কাণব বলিয়া কোন ঋষি নাই। ইনি কণ্বের পুত্র কাণ্ব সোভরি। আর কত নাম করিব? যাক্। গ্রন্থকার পুস্তক আরম্ভ করিয়াই লিখিতেছেন "অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তে সর্ব্বপ্রথম ইহার [ইতিহাসের] উল্লেখ পাই।" মামুলী কথা। ৯০ পৃষ্ঠায়ও অথর্ব্ববেদের সূক্ত। অথর্ব্ববেদের বিভাগ কাণ্ডে, প্রপাঠকে ও অনুবাকে। অথর্ব্ববেদের সূক্ত হয় না, হয় অনুবাক। ইহাও ইংরেজীর মাহাত্ম্য। তারপরই 'যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি (?) প্রাচীন গ্রন্থে ইতিহাস, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ...ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান প্রভৃতি(?)র ন্যায় সেই মহান্ ভূতের নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে'। শতপথের নজির দেওয়া হইয়াছে ১৪।৬।১১।৬—এটি ভুল। হইবে—১৩.৪.৩.১২.১৩। আবার এখানেও 'প্রভৃতি'। অনেক সময় যেখানে আর জানা থাকে না সেখানেই প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। কিন্তু যেখানে 'প্রভৃতি'র দরকার সেখানে নির্দ্দিষ্ট একমেবাদ্বিতীয়ম্। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্; ২য় পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা [ইতিহাস] 'পঞ্চমবেদ' নামে অভিহিত হইয়াছে।" নজির দেন নাই—নাই দিলেন; কিন্তু এখানে প্রভৃতির দরকার, কেন-না—ইতিহাসের বেদত্ব অন্যত্রও স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র (১৬.২.২১.২৭), গোপথ ব্রাহ্মণ (১.১০), শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩.৪.৩.১২.১৩)। লেখকের ইতিহাসের ব্যাখ্যা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ।

আর্য্যসভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র লিখিতে গিয়া লেখক আশা করিয়াছেন—"দূর ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধান ও গবেষণা যে প্রাচীন ভারতভূমিকেই আর্য্যসভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া নির্ণয় করিবে" (পৃঃ ৩৬)। আমরাও বলি, 'তথাস্তু'। কিন্তু তাঁহার গবেষণার তেমন প্রমাণ পাইলাম না। যাহা পাইলাম তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের Rigvedic India-র বেজায় গন্ধ।

অতি অল্প উপকরণ লইয়াই এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। কোন বিষয়েরই আলোচনা গবেষণামূলক, সুষ্ঠু, যথেষ্ট হয় নাই। প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনায় গ্রন্থকার শাস্ত্র ও ইতিহাসের উপর যে দৌরাত্ম্য করিয়াছেন তাহার শাসনে আমাদের এ অস্ত্র সানাইবে না।

ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বৈদিক বিষয়ের উপকরণ ভাল করিয়া আলোচনা করাও চাই। বর্ত্তমান গ্রন্থকার অবশ্য মাঝে মাঝে সংবাদপত্র হইতে স্বর্গগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত মোহেঞ্জোদড়োর বিবরণ, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অভিভাষণের অংশবিশেষ, মাসিকপত্রের এক আধ টুকরাও আস্বাদন করাইয়াছেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বেসান্ট-জীবনী (ডাক্তার আনী বেসান্টের জীবনী)—কলিকাতা মহামান্য হাইকোর্টের উকিল শ্রীসুদর্শন দাস-প্রণীত। প্রকাশক শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার, ২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য ৷৷৹ বারো আনা মাত্র।

ডাঃ আনী বেসান্তের কার্য্য ও গ্রন্থাবলীর সহিত পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত থাকা সত্ত্বেও আমরা এই বইখানা পড়িয়া অতিশয় আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। আশা করি ইহার পাঠকমাত্রেই এই আনন্দ ও উপকার লাভ করিবেন। লেখক ভক্তিমান্ ব্যক্তি, তিনি ভগবদ্‌ভক্ত এবং ডাঃ বেসান্তেরও ভক্ত। লোকোত্তর ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত ভক্তদের দ্বারা লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আনী বেসান্তের ধর্ম্মমত বিবৃত করিতে যাইয়া লেখক থিয়সফি এবং উচ্চতর হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেক পাঠক তাঁহার মত গ্রহণ না করিতে পারেন, বিশেষতঃ তাঁহার বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলী এবং মহাপুরুষদিগের জন্মজন্মান্তরের বিবরণ অনেকের নিকট আত্যন্তিক বিশ্বাসপ্রবণতা-মূলক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের রসাস্বাদনে বিশেষ ব্যাঘাত হইবে না। লেখকের ভাষা সাধারণতঃ বিশুদ্ধ ও ওজস্বী, কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে চলিত ভাষা ও ওকালতি পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সমালোচক এরূপ মিশ্রণের পক্ষপাতী নহেন। পুস্তকখানা অনেকগুলি চিত্রে অলঙ্কৃত। শ্রীমতী বেসান্তের বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, অতি-বার্দ্ধক্য, সকল বয়সের প্রতিকৃতিই ইহাতে আছে। তদ্ব্যতীত ম্যাডাম্ ব্লাভেট্‌স্কী ও শ্রীমান্ কৃষ্ণমূর্ত্তির ছবিও আছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার আকাঙ্ক্ষা করি।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ

দেশ-বিদেশের গল্প—শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা প্রণীত। প্রকাশক—সন্তোষ লাইব্রেরী, ঢাকা। ১০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা।

লেখকদ্বয় ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, "গল্পের ভিতর দিয়া শিশু-শিক্ষার্থীরা নানা দেশের ইতিহাস, ভূগোল, রীতিনীতি অতি সহজে শিখিতে পারে, এবং ইহাতে শিশুদের মনের প্রসারতাও অনেক বাড়িয়া যায়।" কথাগুলি অত্যন্ত সত্য। পাশ্চাত্য প্রদেশে ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গল্প ও বৃত্তান্ত লইয়া চিত্তাকর্ষক ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রতি বৎসরে প্রকাশিত হয় ও ছেলেমেয়েরাও সেই সব পুস্তক একান্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করে। তাহাতে গল্পপাঠ ও শিক্ষালাভ দুই কার্য্যই হয়। আমাদের দেশে এইরূপ পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই বইখানিতে সাতটি দেশের কথা আছে ও লেখকদ্বয় তাহা বেশ সহজ ও সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। যাদুকরের দেশ, মিশরের মমী, পিরামিড, ফিংক্স, চীনের মহাপ্রাচীর ও তৎসম্পর্কীয় নানা রহস্যজালজড়িত ও আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ও সামাজিক রীতিনীতি ছেলেদের খুবই উপভোগ্য হইবে। বইখানিতে পঞ্চাশখানি ছবি আছে কিন্তু কাগজ অত্যন্ত পাতলা বলিয়া অস্পষ্ট ও ছাপা অপর পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকের নাম দেশবিদেশের গল্প, কিন্তু এক লঙ্কাদ্বীপ ছাড়া সমস্তগুলিই বিদেশের গল্প; আমাদের ভারতবর্ষের কোন কাহিনীই ইহাতে স্থান পায় নাই। যাই হোক্, লেখকদ্বয়ের উদ্যম প্রশংসনীয়। আমরা এই শ্রেণীর আরও পুস্তকের আশা করিয়া রহিলাম। ছাপার ভুল একটিও চোখে পড়িল না।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

অসমাপিকা—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত, এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

বইখানির বাঁধাই চমৎকার। ছাপা ও কাগজ ভাল। উপন্যাসখানির নামকরণে নূতনত্ব আছে। রচনারীতি উপভোগ্য। লিখিবার ভঙ্গী হয়ত স্থানে স্থানে 'বীরবল'কে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু লেখকের লেখায় 'ষ্টাইল' আছে। গল্পটি সংক্ষেপে এই:—একটি সাহিত্যিক ছেলে বি-এ পরীক্ষা দিয়া পুরীতে দিদির বাড়ি বেড়াইতে গেল। দিদির সতেরো বৎসরের ননদটির কয় মাস মাত্র বিবাহ হইয়াছে। সেই শিক্ষিতা সুন্দরী ননদের সহিত সাহিত্যিক ছেলেটির ভাব এবং প্রেম হইল। মেয়েটির স্বামী ছিল অন্যে প্রণয়াসক্ত। মেয়েটি ছিল অন্তঃসত্ত্বা। নায়িকাকে লইয়া নায়ক কলিকাতায় পলাইয়া আসিল এবং ফিরিঙ্গিপাড়ায় ফিরিঙ্গিবেশে সংযতচিত্তে বাস করিতে লাগিল। অজ্ঞাতবাস-কালে নবশিশুর আবির্ভাবে সামঞ্জস্য নষ্ট হইল। নায়ক নায়িকাকে আবার পুরী ষ্টেশনে ফিরাইয়া দিয়া আসিল।—উপন্যাসে একটি সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে বোঝা গেল। সমস্যাটি কি? বিবাহ-বিচ্ছেদের? না—না-চাওয়া শিশুর জন্মের? একটি মেয়েকে ঘরের বাহির করিবার জন্য এই উৎকট আগ্রহ এবং রঙ্গস্থলে অবাঞ্ছিত শিশুর আগমনে প্রেমিকাকে পরিত্যাগ করার অপূর্ব্ব কাপুরুষতা,—আধুনিকতার মাপকাঠিতে ইহার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য সমস্যা নয়,—দারুণ প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনোবিদ্‌গণের কাছে শুনিয়াছি, ভিতরে ভিতরে যাহা চাই-না, বাহিরে সেই অনিচ্ছা নানা যুক্তির আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া দারিদ্র্য পরিহারের গ্লানির উপর প্রলেপ মাখাইয়া দেয়। অসামঞ্জস্য বোধের অস্বস্তি একরূপ মনোবিকার। গ্রন্থকারের ক্ষমতা আছে। ক্ষমতার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগে প্রভেদ স্বর্গ-নরক। ফ্যাশন চলিয়া যায়, সমস্যা মিটিয়া যায়, প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি বাঁচিয়া থাকে।

কাজলী—উমা দেবী প্রণীত, এবং এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

'কাজলী' উপন্যাস। ব্যর্থ প্রেমের এই করুণ কাহিনীটি পাঠকের মনে এক বেদনার সুর সৃষ্টি করে। উপন্যাসখানি পড়িয়া বোঝা যায়, শুধু কবিতা নয়, গদ্য রচনায়ও লেখিকার কিরূপ হাত ছিল। রচয়িত্রীর কবিমনের সহানুভূতি স্থানে স্থানে রচনা ও ঘটনাকে কাব্যের কোঠায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

ব্রতী—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল প্রণীত এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে কমলা বুক ডিপো কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

উপন্যাসখানির নামটি ভাল, এবং লেখক খ্যাতিমান্। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাঁহাদের নাম আছে, দেখিতেছি অর্জ্জিত খ্যাতি বজায় রাখিবার চেষ্টা তাঁহারা অনাবশ্যক বলিয়াই মনে করেন। বইখানি দুইবার পড়িয়াছি। স্বীকার করিতেছি, গ্রন্থকার নামকরা সাহিত্যিক না হইলে ইহা একবারও আগাগোড়া পড়িতাম কি-না সন্দেহ। উপন্যাস লিখিবার দুই উপায় আছে। এক চরিত্রকে ফুটাইয়া তোলা, আর এক ঘটনার পরিণতি দেখানো। ঘটনাপ্রধান কথাসাহিত্যে গল্পের পরিকল্পনা মুখ্যবস্তু। চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে ঘটনার অসামান্যতা অপ্রয়োজনীয়। সেখানে গল্প ঘোরালো না হইলেও চলে, চরিত্র বিবর্ত্তিত হইয়া চলিতে চলিতে সামান্য ও সুপরিচিত ঘটনাবলীকে আপনার চারিপাশে সুসমঞ্জসভাবে সংস্থাপিত করিয়া লয়; ঘটনারাশি অতিক্রম করিয়া কৌতূহল চরিত্রের উপর গিয়া পড়ে। 'ব্রতী' এই উভয়বিধ উপন্যাসের কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। এই মনে হইল রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশে গল্পটি বুঝি রোমান্টিক হইয়া ওঠে, পরেই হঠাৎ দেখা গেল অনুপযুক্ত ঘটনা, অনাবশ্যক মতবিবাদ এবং জোর করিয়া মোড় ফিরানো প্লটের অকিঞ্চিৎকরতার মধ্যে পথ হারাইয়া কাহিনী সম্পূর্ণ কৌতূহলশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই শুষ্ক বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া চরিত্রগুলি সহসা অসহায় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রতী'র নায়ক কে তাহা হঠাৎ ঠাহর করা কঠিন। সম্ভবতঃ মৈনাক। বিজলী সিংহ ওরফে অনিল মুকুয্যেও হইতে পারে নরেনেরও হইবার বাধা নাই। মৈনাককে বোধ হয় অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সে হইয়া উঠিয়াছে একটি একগুঁয়ে নির্বোধ। যে-বাড়িতে সে পড়ায়, সে-বাড়ির স্নেহশীলা গৃহিণী তাহাকে জলখাবার খাইতে অনুরোধ করিলে তাহার মর্য্যাদাবোধে আঘাত লাগে এবং সে আত্মগর্ব্বে তাহাকে অপমানিত করে, কিন্তু একজন অজানা পথের লোককে জীবনের পরমোদ্দেশ্যসাধনের গুরু স্বীকার করিয়া তাহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতে একটুকু সঙ্কোচবোধ করে না। অনিল শহরের জানা বড়লোক এবং ব্যারিষ্টার হইলেও কেন-যে নিজেকে বিজলী সিংহ নামে পরিচিত করে এবং নিজের বাড়িতে লোককে লইয়া আসিয়াও নিজের নাম অকারণে গোপন রাখে, তাহা বোঝা একান্ত কঠিন। অনিল বিপ্লববাদী দলের নেতা। এই নির্বোধ, স্ত্রীর প্রতি সর্ব্বদা সন্দেহপরায়ণ লোকটি কেমন করিয়া কেন নেতা হয়, তাহা কিছুই বোঝা যায় না। বিলাত-ফেরৎ, শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে হইয়াও স্ত্রীর সহিত সে কথা কয় নিম্নোক্ত প্রকারে, "যাও, দূর হও, আর ছেনালী করতে হবে না। দূর হও।" তারপর প্রতিমার অদ্ভুতভাবে মনোপরিবর্ত্তন এবং আরও অদ্ভুতভাবে নরেনের নিরুদ্দেশ হওয়া। বাস্তব ও রোমান্সের এই উৎকট সমন্বয় বাস্তবিক অপূর্ব্ব। ইউনিয়ন বোর্ডের গুণকীর্ত্তনের কথা আর নাই বলিলাম। চরিত্র হইতে ঘটনা পর্য্যন্ত উপন্যাসের সব জিনিষই যেন জোর করিয়া 'আন্ রিয়াল' করা হইয়াছে। এই অপ্রাকৃত আবহাওয়ার মধ্যে মন হাঁপাইয়া ওঠে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পথের মেয়ে—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। পৃঃ সঃ ১৫৭। মূল্য এক টাকা। দেব সাহিত্য কুটীর।

লেখকের ভাষাটি বড় মধুর। এবং বনবালিকা বেলার প্রেমচিত্রটি বেশ নিখুঁতভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু বাংলায় এই এক ধরণের উপন্যাস আজকাল রাশি রাশি বার হয়; বাস্তবের ভিত্তি যতই আলগা হউক না কেন, নানা সম্ভব অসম্ভব কারণ দর্শাইয়া দুটি তরুণ তরুণীকে একত্র করিতে পারিলেই যেন লেখকের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। এ বইখানিও তেমনি বালির বাঁধের ওপর দাঁড়াইয়া আছে—লেখক উপন্যাসের ঘটনাস্থলটি লইয়া গিয়া ফেলিয়াছেন কোথাকার এক অরণ্যের মধ্যে। বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় এ কোন্ দেশের অরণ্য? না বাংলা, না বিহার, না সাঁওতাল পরগণা, না কোথাও। এ যেন থিয়েটারের ষ্টেজের সাজানো গাছপালার বন। এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে ওঠে—সত্যিকার অরণ্য কি লেখক কখনও দেখিয়াছেন?

বইখানির ছাপা বাঁধাই ভাল।

কল্পনা দেবী—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী। পৃঃ সঃ ১৪০। মূল্য এক টাকা। দেব সাহিত্য কুটীর।

উপরোক্ত উপন্যাসখানির দোষ এই বইখানিতে নাই। এর ঘটনাগুলি স্বাভাবিক, কল্পনা আরও হৃদয়গ্রাহী। কয়েক পাতা না পড়িতেই গল্পটি জমিয়া ওঠে, শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া ছাড়া যায় না। অজয় পণ্ডিতের চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে—অজয়ের দৃঢ়তা ও পবিত্রতা মনে দাগ রাখিয়া যায়। শোভনার চিত্রটি বড় মধুর ও জীবন্ত। কিন্তু শেষের দিকে ও-ধরণের অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ লেখক কেন করিলেন, তাহা বুঝিলাম না। ইন্দিরা অত্যন্ত কাঁচা। বোধ হয় লেখক ইন্দিরার দিকে ততটা মনোযোগ দিবার সুযোগ পান নাই। ছাপা ও বাঁধাই ভাল হইয়াছে।

মানস সরোবর ও কৈলাস—ভ্রমণকাহিনী। শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। মূল্য দেড় টাকা।

লেখক ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার মানস সরোবর ও কৈলাসযাত্রার বিবরণ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করিতেন এইবার উহা পুস্তকাকারে বাহির হইল। পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যাঁহারা এ পথে যাইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। তবে লেখা নিতান্ত মামুলি ধরণের হিমালয়ের দুর্গম অধিত্যকা, অরণ্যানী, তুষারমৌলি শিখররাজির বর্ণনায় লেখক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই—ভাষার ও ভাবের দৈন্য পদে পদে পরিস্ফুট। দেবাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের প্রতি সুবিচার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কেদার ও বদরী ভ্রমণের উল্লেখ করিতেছি। অত সুন্দর বর্ণনা বাংলায় খুব বেশী পড়ি নাই। আর মনে পড়িতেছে ৺ইন্দুমাধব মল্লিকের 'চীন-ভ্রমণ'-এর কথা। কি সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এই লেখাতে পাইয়াছি। নতুন দেশে নতুন চোখ ফোটে, কিন্তু সকলেরই কি ফোটে?

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নারী-তীর্থ—আহ্‌মদর রহমান। মোহাম্মদ মুছা, ১২।১ নং এস্‌প্লানেড্ ঈষ্ট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹

এই কবিতার বহির লেখকের বেশ কবিত্বশক্তি আছে, এবং নানা প্রকার ছন্দের উপর তাঁহার দখল প্রশংসনীয়। বহির তিনি যে নাম দিয়াছেন, নারীজাতির প্রতি তাঁহার মনের ভাব তাহার উপযোগী। "মতিচুর" ও পদ্মরাগে'র রচয়িত্রী মিসেস্ আর্ এস্ হোসেন মহাশয়া যে ভূমিকাটি লিখিয়াছেন তাহাও বেশ হইয়াছে। নারীর দুর্দ্দশার অনেক সামাজিক কারণ এই গ্রন্থপাঠে বেশ বুঝা যায়। কেবল সপত্নীবিশিষ্টা নারীর দুঃখ সম্বন্ধে কবি কিছু লেখেন নাই।

পুস্তকটির ভাষা ও বানান সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিতে চাই। ভূমিকার লেখিকা মহোদয়া দন্ত্য "স"এর জায়গায় "ছ" না লিখিয়া ঠিকই করিয়াছেন। কবিও "ছ"এর জায়গায় অকারণ "স" ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, তিনি এমন কতকগুলি আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা বাঙালী মুসলমান সমাজে হয়ত প্রচলিত ও সহজবোধ্য, কিন্তু তাহার বাহিরের বাঙালীরা বুঝে না। এরূপ শব্দের ব্যবহারে আপত্তি করিতেছি না। বাংলায় অনেক আরবী ফারসী তুর্কি ইংরেজী প্রভৃতি শব্দ চলিয়া গিয়াছে; এই প্রকারে আবশ্যকমত আমাদের ভাষার শব্দ-সম্পদ আরও বাড়িতে পারে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান সকল শিক্ষিত বাঙালী যাহা বুঝে না, এরূপ শব্দ ব্যবহার করিলে পুস্তকের শেষে সেগুলির অর্থ ছাপিয়া দেওয়া ভাল। বাংলা বহির হিন্দু লেখকেরা কঠিন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে তাহার মানে বাংলা অভিধানে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ আরবী ফারসী শব্দসমূহের মানে বাংলা অক্ষরে লেখা অভিধানে পাওয়া যায় না। এইজন্য তাহাদের অর্থ পুস্তকের শেষে দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

চ.

ব্রহ্মদেশের শিবাজী আলঙফয়া—শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী, এম্ এ, বি-এল। প্রকাশক যুগবাণী সাহিত্যচক্র, ১৪· কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্। ৩২ পৃঃ। দাম দশ আনা।

ভিক্ষু উত্তমের ভূমিকা-সম্বলিত ব্রহ্মবীর আলঙফয়ার জীবন-কথা, ছেলেদের জন্য লেখা। আজকালকার দিনে ছেলেদের জন্য এরূপ পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। লেখকের রচনাভঙ্গী ভাল। বইখানির ছাপা ও বাঁধা সুন্দর।

বীণা—শ্রীঅমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ৬২ পৃঃ, দাম দশ আনা।

কাব্যগ্রন্থ। বোম্বের্ কালীতে চমৎকার করিয়া ছাপা, একত্রিশটি কবিতা।

ঘাসের চাপড়া—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর। প্রকাশক এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। ১১৪ পৃঃ, দাম এক টাকা।

তিনটি গল্পের সমষ্টি। লেখক ইচ্ছা করিলে গল্প তিনটিকে ত্রিশ পাতায় শেষ করিয়া ফেলিতে পারিতেন। লাল কাপড়ে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা; ছাপাও ভাল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

মহিলা-সংবাদ

বিগত আইন-অমান্য-আন্দোলনের সময় বাঁকুড়ার পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবিকার অধিনায়কত্ব করিয়া এবং বাঁকুড়া ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বন্ধ ব্যাপারে ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।



শ্রীযুক্তা নন্দরাণী সরকার



ভারতবর্ষ

আদম-সুমারী—

সমগ্র ভারতবর্ষের মোট জন সংখ্যা ৩৫,১৯,৮৬,৮১৬। পুরুষ ১৮,০৯,২১,৯১৪, স্ত্রী ১৭,১০,৬৪,৯৬২।

বিগত দশ বৎসরে ১০.৬ শতকরা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র ভারতে হিন্দু ২৩৮৩৩০৯১৭ ; মুসলমান ৭,৭৭৪৩৯২৮ ; শিখ ৪৩,০৬৪৪২ ; এবং খৃষ্টান ৫৯,৬১৭৯৪।

প্রদেশ হিসাবে লোকসংখ্যা :—

আজমীর (মাড়ওয়াড়)—মোট লোক সংখ্যা ৫৬০২৯২। হিন্দু ৪৩৪৫০৯ ; শিখ ৩৪১ ; জৈন ১৯৪৯৭ ; মুসলমান ৯৭১৩৩; খৃষ্টান ৬৯৪৭।

আসাম—মোট লোকসংখ্যা ৮৬২২২৫১। হিন্দু ৪৯৩১৭৬০ ; শিখ ২৪৯৭ ; জৈন ২৬০৬ ; বৌদ্ধ ১৪৯৫৫ ; মুসলমান ২৭৫৫৯১৪ ; খৃষ্টান ২০২৫৮৬।

বেলুচিস্থান—মোট লোকসংখ্যা ৪৬৩৫০৮। হিন্দু ৪১৪৩২ ; শিখ ৮৩৬৮ ; মুসলমান ৪০৫৩০৯ ; খৃষ্টান ৮০৪৪।

বঙ্গদেশ মোট লোকসংখ্যা ৫০১২২৫৫০। হিন্দু ২১৫৩৭৯২১ ; বৌদ্ধ ৩১৫৮০১ ; মুসলমান ২৭৫৩০৩২১ ; খৃষ্টান ১৮০৫৭২।

বিহার ও উড়িষ্যা—মোট লোকসংখ্যা ৩৭৬৭৬৫৭৬। হিন্দু ৩১০০০৬৬০ মুসলমান ৪২৬৪৭৭৬ ; খৃষ্টান ৩৪১৭১০।

বোম্বাই—মোট লোকসংখ্যা ২১৮৫৪৮৯১। হিন্দু ১৬৬১৯৮৬৬ ; শিখ ২০৭৭২ ; জৈন ১৯৯৯৭৯ ; বৌদ্ধ ১৮৯০ ; পার্শী ৮৯৫৪৩ ; মুসলমান ৪৪৫৭০৩৩ ; খৃষ্টান ৩১৭০৪২ ; ইহুদি ১০৪৪৩।

ব্রহ্মদেশ—মোট লোকসংখ্যা ১৪৬৪৫৯৬৯। বৌদ্ধ ৮২১৪৫৩৬ ; হিন্দু ৫৭৪৬৯৭ ; জৈন ৭৭৮৯৫ ; মুসলমান ৬০৬৮৪১।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—মোট লোকসংখ্যা ১৫৫০৭৭২৩। হিন্দু ১৩৪৬০১০৫ ; মুসলমান ৬৮২৮৫৪ ; খৃষ্টান ৫০০৮৪।

কুর্গ—মোট লোকসংখ্যা ১৬৩৩২৭। হিন্দু ১৪৬০০৭ ; মুসলমান ১৩৭৭৭ ; খৃষ্টান ৫৪১০।

দিল্লী—মোট লোকসংখ্যা ৬৩৬২৪৬। হিন্দু ৩৯২৮৬৩ ; মুসলমান ২০৬৯৬০ ; খৃষ্টান ১৬৯৮৯ ; শিখ ৬৪৩৭ ; জৈন ৫৩৪৫।

মাদ্রাজ—মোট লোকসংখ্যা ৪৬৫৭৫৬৭০। হিন্দু ৪০৩৯২৯০০ ; মুসলমান ৩৩০৬০৮৩ ; খৃষ্টান ১৭৭০৩২৮।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—মোট লোকসংখ্যা ২৪২৫০৭৬। হিন্দু ১৪২৯৭৭ ; শিখ ৪২৫১০ ; মুসলমান ২২২৭৩০৩ ; খৃষ্টান ১২২১৩।

পঞ্জাব—মোট লোকসংখ্যা ২৩৫৮০৮২। হিন্দু ৬৩২৮৫৮৮ ; শিখ ৩০৬৪১৪২ ; জৈন ৩৫২৮৪ ; বৌদ্ধ ৫৭২৩ ; মুসলমান ১৩৩৩২৪৬০ খৃষ্টান ৪১৪৭৮৮।

যুক্ত প্রদেশ আগ্রা ও অযোধ্যা—মোট লোকসংখ্যা ৪৮৪০৮৭৬৩। হিন্দু ৪০৯০৫৫২৩ ; শিখ ৪৬৫০০ ; জৈন ৬৭৯৫৪ ; মুসলমান ৭১৮১৯২৭ ; খৃষ্টান ২০৫০০৯।

— ইণ্ডিয়া গেজেট, সিমলা, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১।

পদব্রজে ভারত-পরিক্রমা—

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ভাটপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য পদব্রজে ভারতবর্ষ পরিক্রমণের মানসে ১৯৩০ সনের ৩রা ডিসেম্বর যাত্রা করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া বরাবর পূর্ব্ব উপকূল দিয়া গমন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও কুমারিকা অন্তরীপও



শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য

অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সবসমেত তিনহাজার মাইল চলা হইয়াছে। এখন তিনি পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া মহীশূর হইয়া বোম্বাই প্রদেশের ভিতর দিয়া চলিতেছেন। সারাভারত পরিক্রমণে তাঁহার দশ হাজার মাইল হাঁটিতে হইবে। দুর্গাপদবাবু যে-যে স্থান দিয়া গমন করিতেছেন সেই সেই স্থানের অধিবাসীদের দ্বারা, বিশেষতঃ তথাকার বাঙালীদের দ্বারা, বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইতেছেন। এই সকল স্থানের দর্শনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়-



মহীশূরের পথপার্শ্বস্থিত একটি ঝরণা

গুলির চিত্রও তিনি তুলিতেছেন। এইরূপ একটি চিত্র এখানে দেওয়া হইল। এই ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁহার দুই বৎসর সময় লাগিবে।

শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন মল্লিক—

শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন মল্লিক ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ



শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন মল্লিক (ডান দিকে

পাট-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র হামবুর্গে, প্রায় দেড় বৎসর কাল অবস্থান করিয়া পাট সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন।

ডাঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

বাঁকুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাত হইতে এম্-আর-সি-এস (ইং) এবং এম্ আর সি পি (লণ্ডন) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত এম্-বি পাশ করিয়া বারোটি



ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। তিনি ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের ব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন।

পরলোকে অবতারচন্দ্র লাহা—

প্রবীণ সাহিত্যিক অবতারচন্দ্র লাহা গত ২রা কার্ত্তিক সোমবার পঁচাত্তর বৎসর বয়সে কাশীধামে পরলোক গমন করিয়াছেন। অবতার বাবু সুলেখক ছিলেন। "আনন্দলহরী", "আমার ফটো", "শুভদৃষ্টি" প্রভৃতি নামে তাঁহার কয়েকখানি সুরচিত উপন্যাস আছে। তাঁহার লেখা রসপূর্ণ, এবং রঙ্গরচনায়ও তাঁহার যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। নূতন বিষয় জানিবার জন্য শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভূত আগ্রহ ছিল। তাঁহার পাঠানুরক্তি এত প্রবল ছিল যে, বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বই না হইলে একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না। বিগত সাহিত্যিক হইলেও নবীন লেখকদের ভাল লেখা তিনি সাগ্রহে পাঠ

করিতেন। প্রবীণ বয়সে রচিত 'আমার কাটা' তিনি নবীন লেখকদের নামে উৎসর্গ করেন। যৌবনে তাঁহার সাহসের অন্ত ছিল না। এদেশে



অবতারচন্দ্র লাহা

তিনিই প্রথম বেলুনে উঠিতে উদ্যোগী হন। অবতারচন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন সুসাহিত্যিক এবং মিষ্টভাষী পরোপকারী মধুর প্রকৃতির লোক হারাইল।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন—

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশন এই বৎসর বড়দিনের অবকাশে প্রয়াগে হইবে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীলালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, অধ্যাপক শ্রীনলিনবিহারী মিত্র কোষাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ কার্য্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সৎকার্য্যে দান—

জলপাইগুড়ি মাড়োয়ারী সমাজের অন্যতম নেতা ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত তনসুক রায় মাহেশ্রী গান্ধী-সপ্তাহ উপলক্ষে চরকা প্রচারকল্পে ৫০৲ টাকা এবং শহরের যুবক ও বালকগণের শারীরিক উন্নতি ও অনুশীলনকল্পে আরও ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে বিধবা-বিবাহ—

স্থানীয় হিন্দুসভার উদ্যোগে ও ব্যয়ে গত ২৯এ শ্রাবণ তারিখে কিশোরগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী বাসাবাটিয়া গ্রামের পরলোকগত বাবু দুর্গানাথ রায় মহাশয়ের রেণুকণা নাম্নী ১৬ বৎসর বয়স্কা বিধবা-কন্যাকে কায়স্থপল্লীগ্রামের রাজেন্দ্রকুমার দত্ত-রায়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। বালিকাটি এক বৎসর পূর্ব্বে বিধবা হয়। মাতা ছাড়া তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না। কায়স্থপল্লীতেই এই বিবাহ হয়। বিবাহে শহর ও আশ-পাশের গ্রামের বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। এতদঞ্চলে ভদ্রলোকের মধ্যে এই প্রথম বিধবা-বিবাহ হইল। এই বিবাহে সকল শ্রেণীর হিন্দুর বিশেষ সহানুভূতি দেখা গিয়াছে।

কৃতী শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস—

সাহা সমাজের কৃতী সন্তান ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস বিলাতের আই-সি-এস্ পরীক্ষায় ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা গত মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। নবগোপাল বাবু ১৯২৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম হন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ



শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস

হইতে ১৯২৮ সনে আই-এস-সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৩০ সনে অর্থনীতিতে প্রথম হইয়া বি-এ পাশ করেন। নিখিল-ভারত রচনা প্রতিযোগিতায় যে ভাইসরয় পদক দেওয়া হয়, বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নবগোপাল-বাবুই ইহা লাভ করেন। ইহা ছাড়া আরও রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

কর্ম্মকার-সমাজে বিধবা-বিবাহ—

গত ২৪এ শ্রাবণ পাবনা জেলার তামাইগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন কর্ম্মকারের ১৮ বৎসরের বিধবা কন্যার সহিত উক্ত গ্রামের শ্রীমান উমেশচন্দ্র কর্ম্মকারের বিবাহ বালোবেরা গ্রামে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিবাহ বালোবেরা যাদব-সমিতির উদ্যোগে শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল ঘোষ যাদব মহাশয়ের বাড়ীতে সম্পন্ন হয়। গুনইগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল মহাশয় পৌরোহিত্যের কার্য্য করেন। বিবাহ-বাসরে স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বহু সংখ্যক কর্ম্মকার জাতি উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ কার্য্যে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। এতদঞ্চলে কর্ম্মকার জাতির মধ্যে এই প্রথম বিধবা বিবাহ।

পুরী মহিলা সমিতি—

পুরীতে একটী মহিলা সমিতি তিন বৎসরের কিছু অধিক হইল স্থাপিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জনের পত্নী শ্রীযুক্তা গৌরী দেবীর উদ্যোগে প্রথম এই সমিতিটি গঠিত হয়। তাহার পর পরলোকগত সম্পাদিকা ননীবালা দাসগুপ্তার কর্ম্মনৈপুণ্যে ইহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বাঙ্গালী, ওড়িয়া সকল শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে মেলামেশা, সদ্ভাবস্থাপন এবং সদ্বিষয় পাঠ ও আলোচনাদি দ্বারা দেশের ও জগতের বর্ত্তমান চিন্তাধারার সহিত তাঁহাদের পরিচয় সাধন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। সমিতির অধিবেশন পনের দিন অন্তর হইয়া থাকে। প্রতি অধিবেশনেই মহিলাদের মধ্যে সঙ্গীতেরও চর্চ্চা হয়। মধ্যে মধ্যে ইহা হইতে আমোদানুষ্ঠানের আয়োজন দ্বারা সমিতির জন্য বা অন্য সৎকার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে একবার একটি আনন্দবাজার ও ছোট মেয়েদের অভিনয় মহিলাদের মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। মহিলাদের চাঁদা হইতে একটি লাইব্রেরীও ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। মহিলারা তাহা হইতে পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি আগ্রহের সহিত লইয়া পাঠ করিয়া থাকেন।

—

বিদেশ

চীন-জাপান সংগ্রাম—

প্রায় তিন মাস হইল, উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় চীন ও জাপানে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে জনৈক জাপানী সেনানীকে হত্যা করায় জাপানীরা চীনাদের উপর ক্ষেপিয়া গিয়া মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেন অধিকার করিয়া লয় ও উভয় দলের সংঘর্ষে অনেকে হতাহত হয়। চীন-সরকার অগত্যা জাপানীদের হঠকারিতার প্রতিবাদ করিয়া বিশ্ব রাষ্ট্র-সংঘে নিবেদন পেশ করেন। রাষ্ট্র-সংঘ এ যাবৎ ইহার বিশেষ প্রতিকার করিতে পারেন নাই। তবে গত দু'তিন মাসে বিশেষ কোনও উপদ্রব হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই :

সম্প্রতি সপ্তাহখানেক ধরিয়া মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপার বড়ই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র জগতের দৃষ্টি এখন প্রাচ্যখণ্ডে মাঞ্চুরিয়ার দিকে। মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলকোম্পানী জাপানী সম্পত্তি। এই কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ ১৯২৭ সনে নন্নী নদীর উপর পুল তৈরি করিয়া দেয়। চীনারা নির্ম্মাণের মূল্য দিতে না পারায় পুলটি জাপানী কোম্পানীর আয়ত্তে আসে। সেপ্টেম্বরের সংঘর্ষের পর চীন-জাপানের মনোমালিন্যের কোন বহিঃপ্রকাশ না হইলেও চীনারা তাহাদের অপমান ভুলিতে পারে নাই। এ দিকে রাষ্ট্র-সংঘের নিকট হইতেও আশু প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাই গত অক্টোবর মাঝামাঝি তাহারা নন্নী নদীর পুল ভাঙিয়া ফেলে। জাপানীরা নন্নী নদীর পুল কোনমতেই হস্তচ্যুত হইতে দিতে রাজি নয়, সৈন্যদল সহ তাহারা পুল পুনঃ তৈরি করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই হেতু জাপানী ও চীনাদের মধ্যে ৫ই নবেম্বর ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ও উভয় দলে বহু সৈন্য হতাহতও হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর এরূপ সংগ্রাম নাকি আর হয় নাই।

মাঞ্চুরিয়ার নন্নী নদীর পুল সম্পর্কে জাপানী ও চীনাদের মধ্যে কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই মন কষাকষি চলিয়া আসিতেছিল। নন্নী নদীর পুল হাতে রাখিতে পারিলে জাপানীদের যে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যেরই সুবিধা তাহা নয়, সোভিয়েট প্রভাবও মাঞ্চুরিয়ায় ঢুকিবার পথ রুদ্ধ হইতে পারে, এবং মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদের আক্রমণ হইতেও তাহারা নিজেদিগকেও রক্ষা করিতে পারে। এই সকল কারণে নন্নী নদীর পুলের জন্য জাপানীদের এত দরদ।

৫ই নবেম্বরের সংঘর্ষের পর রাষ্ট্র-সংঘের সভাপতি মসিয় ব্রিয়াঁ উভয় সরকারকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে আদেশ দিয়াছেন। জাপানীরা নন্নী নদীর পুলের উপর তাহাদের অধিকার জানাইয়া সাত মাইল দক্ষিণে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র-সংঘের ক্ষমতার সদ্ব্যবহারে চীন-জাপানের বিবাদের মূল কারণগুলি দূরীভূত হইলেই মঙ্গল।

পার্লামেণ্টের নূতন নির্ব্বাচন—

গত আগষ্ট মাসে শ্রমিক মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিলে মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে যখন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয় তখন সাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ব্রিটেন যত বিপদের অছিলায়ই সাধারণ নির্ব্বাচন বন্ধ রাখিয়া সর্ব্বদলের প্রতিনিধি লইয়া জাতীয় মন্ত্রসভা গঠন করুক না কেন তথায় সাধারণ নির্ব্বাচন অবিলম্বে হইবেই হইবে। হইয়াছেও তাহাই। দুই মাস যাইতে না যাইতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ভাঙিয়া দিতে হইয়াছে এবং গত ২৮এ অক্টোবর সাধারণ নির্ব্বাচনও হইয়া গিয়াছে। এই নির্ব্বাচনের ফলে শ্রমিকদলের মাত্র পঞ্চাশ জন পার্লামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। উদার-নৈতিক দলের সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ এবং বাকী পাঁচ শতাধিক সভ্য রক্ষণশীল দলের লোক। উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল সকলেই সরকার পক্ষ সমর্থক। এবারেও মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের অধিনায়কত্বে কুড়ি জন সভ্য লইয়া মন্ত্রী সভা গঠিত হইয়াছে। এই কুড়ি জনের মধ্যে এগার জনই রক্ষণশীল। কাজেই রক্ষণশীল দলের মত অনুযায়ীই যে বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্ট চলিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রমিকদলের এইরূপ অসম্ভব রকম পরাজয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া উদারনৈতিক নেতা স্যর হার্বার্ট স্যামুয়েল বলিয়াছেন, শ্রমিকদল দেশের স্বার্থ ভুলিয়া শ্রমিক-সংঘ-সংহতির (Trade Unionism) দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায়ই ইহার এইরূপ হীন পরাজয় হইয়াছে। বিলাতের উদারনৈতিক দলের মুখপত্র ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান বলেন শ্রমিকদলের গেল দুই বৎসরের উপযুক্ত কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বনে সাহসের অভাব—এক কথায় অকর্ম্মণ্যতাই ইহার পরাজয়ের কারণ। এই কাগজখানি কিন্তু ইহা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সভ্যসংখ্যা অনুপাতে শ্রমিক দল ঢের বেশি ভোট। (অর্থাৎ ভোটদাতৃগণের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভোট) পাইয়াছেন।

রেড্ ইণ্ডিয়ানদের দেশে

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ

৩

'সমতলবাসী' (Plains Indian) ইণ্ডিয়ানদের আসিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে যে সকল অপেক্ষাকৃত সভ্য ও স্থিতিশীল জাতি বাস করিত তাহারা পুয়েব্লো (Pueblo) ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত। অশ্ব চালনায় দক্ষ, রণদুর্ম্মদ 'সমতলবাসী' ইণ্ডিয়ানদের অভিযানের ফলে পুয়েব্লো জাতির বসতিগুলি উৎসন্ন হইয়া যায়। এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা সন্নিহিত পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়া পুয়েব্লো কৃষ্টির 'অন্তিম পর্ব্ব" (cliff culture) রচনা করে। সভ্যতায় হীন, কিন্তু বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর যুদ্ধোপকরণে সমৃদ্ধজাতি, যে স্থিতিশীল সভ্যতর জাতিকে পরাজিত করে, এইরূপ ঘটনা পৃথিবীর অনেক স্থানেই দেখা গিয়াছে। মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু উপত্যকার ন্যায় যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের এই 'সমতলবাসী' জাতিদের বিজয়কাহিনী হইতে আরও বুঝা যায় যে, অশ্বের দ্বারা ত্বরিত যাতায়াতে ও ভার-বহনের সুবিধা হওয়াতে পৃথিবীর অনেক জাতির শত্রুজয়ে কতখানি সহায়তা হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যদের ও সাইবেরিয়ার প্রাচীন ইনিসি (Yenesei) নদীতটবাসীদের মধ্যে যে অশ্বপূজার প্রচলন ছিল, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।

এই সকল 'সমতলবাসী' যাযাবর জাতিদের মধ্যে ঠিক কোন্‌টির পর কোন্‌টি যে দক্ষিণ-পশ্চিম দেশে আগমন করে তাহা বলা কঠিন। তবে নেভ্যাহো (Navaho) ও কোম্যাঞ্চি-রা (Komanchi) যে প্রথমে আগমন করে তাহা একরূপ সুনিশ্চিত। ইউটা (Utah) এবং কলোরেডো (Colorado) প্রদেশের অধিবাসী ইউট জাতি তাহাদেরই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া স্যান জুয়ান (San Juan) নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করে। । ইউটারা পুয়েব্লো সভ্যতার লোকদের মৌকি (Mawki) নামে অভিহিত করে। তাহাদের মধ্যে যে-সকল জনশ্রুতি ও ঐতিহ্য প্রচলিত আছে, তাহাতে মৌকিদের সহিত সংঘর্ষের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। অধিকাংশই নেভ্যাহো ও কোম্যাঞ্চিদের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধের কাহিনীতে পূর্ণ। অন্ততঃ নেভ্যাহোদের তুলনায় ইউটদের জীবন-প্রণালীতে পুয়েব্লো কৃষ্টির প্রায় কোন প্রভাবই দেখা যায় না। ইউট জাতির বৃদ্ধদের নিকট হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই* সমর্থিত হয়; এবং ইহাও সুস্পষ্ট দেখা যায় যে, যাযাবর জাতির মধ্যে সর্ব্বশেষে উইমিনুচ ইউটরাই ধ্বংসের স্রোত বহাইয়া স্যান জুয়ান নদীর উপত্যকায় অধিকার বিস্তার করে।

যাযাবর জাতিদের স্বভাবানুযায়ী ইউটদেরও সঙ্ঘ-জীবন দৃঢ়ভাবে কেন্দ্রবদ্ধ ছিল না। তবে এক সময়ে ইউটার সাতটি ইউট শাখা একই শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধীন ছিল। কলোরেডোর অন্তঃপাতী ফোর্ট লুই রিসার্ভেসনের (Fort Lewis Reservation) উইমিনুচ ইউটদের শেষ দলপতি ইগ্‌ন্যাশিওর (Ignacio) মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে একটি নাতিদৃঢ় রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘের অস্তিত্ব ছিল। আজকাল তাহারা ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কোন দলপতি নাই অথবা জাতিটিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোন সঙ্ঘও নাই। অবশ্য নৃত্য ও উৎসবাদির সময়ে তাহারা মিলিয়া-মিশিয়া কাজ ও দলের বৃদ্ধদের সম্মান করে ও তাহাদের আদেশ পালন করিয়া চলে। বর্ত্তমানে তাহারা লুঠতরাজ, যুদ্ধ প্রভৃতি বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের সঙ্ঘজীবন

---

* Annual Report of the Smithsonian Institution 1922, p. 71.

ভাঙিয়া গিয়াছে। নৃত্য ও উৎসবাদির মধ্যে যে কয়েকটি অবশিষ্ট আছে তাহাতে তাহাদের গর্ব্বিত স্বাধীন দিনের ক্ষীণ ছায়ামাত্র দেখা যায়।

সৌভাগ্যের বিষয় সেকালের লুণ্ঠনাভিযানে ও উৎসবাদিতে যোগ দিয়াছে উইমিনুচদের মধ্যে এরূপ অনেক বৃদ্ধ আজিও জীবিত আছে এবং আমি তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের প্রাচীন রীতিনীতির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। মার্কিন পশুচারকেরা (cowboys) ইউটের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নানাপ্রকার অদ্ভুত নাম দিয়া থাকে, যেমন, লালকুর্ত্তা (Red Jacket), হলদে কুর্ত্তা (Yellow Jacket), ইত্যাদি। দেখা যায় উহারাও এই সকল নাম খুব পছন্দ করে। যৌবনে তাহারা যে সকল অভিযানে যোগ দিয়াছে, যে সকল বন্দীর মাথার ত্বক ছাড়াইয়া (scalping) লইয়াছে, বেশ গর্ব্বিতভাবেই সে-সব কাহিনী আমাকে বলিয়াছিল। তাহাদের বংশধরেরা যে এই সকল পুরুষোচিত রীতিনীতি বর্জ্জন করিয়া কতকগুলি নিরীহ নৃত্য ও উৎসবে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেছে ইহার জন্য তাহারা আন্তরিক দুঃখিত।

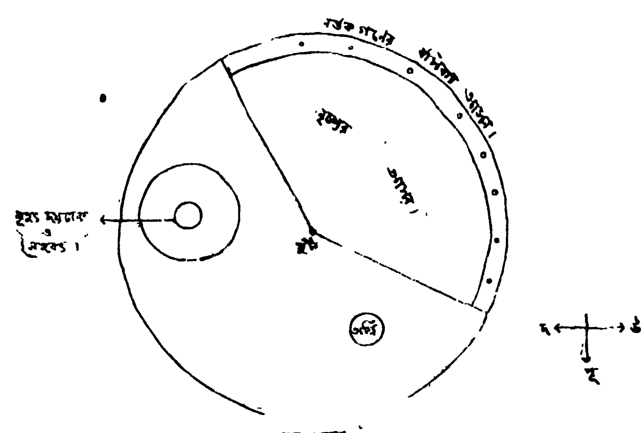
খুব সমৃদ্ধির দিনেও উইমিনুচদের সামাজিক জীবন সুপ্রণালীবদ্ধ ছিল না। শীতকালে তাহারা পাহাড়ের ভিতর টিপি তাঁবুর (dewikan) আশ্রয়ে কতকটা বিশ্রামের জীবন যাপন করিত। গ্রীষ্মকালে তাহারা যে বাইসন মারিয়া আনিত তাহারই মাংস শুকাইয়া (gooche) রাখিয়া আহার করিত। তাহা ছাড়া হরিণ (deery) খরগোস (tabootch) প্রভৃতি জন্তুও শিকার করিত। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া গিয়া পার্ব্বত্য পথ সমূহ সুগম হইয়া গেলে তাহারা সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া তৃণ কাষ্ঠ ইত্যাদির দ্বারা ছাউনি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। এই সময়েই তাহারা নেভাহো, কোম্যাঞ্চি প্রভৃতি শত্রু জাতির বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া অভিযান করিত। তাহাদের নৃত্য ও অন্যান্য উৎসবগুলিও এই সময় অনুষ্ঠিত হইত।

নৃত্যগুলির মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল; অবশিষ্টগুলি কেবলমাত্র সামাজিক উৎসব উপলক্ষ্যে আচরিত হইত। সমরনৃত্যগুলির মধ্যে কামেয়াগা (kameyaga) নাচটি প্রসিদ্ধ। যুদ্ধে জয়ী হইলে বিজয়োৎসবস্বরূপে ইউটরা এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিত। নাচের সময় তাহারা বেশ জাঁকজমকের সহিত অঙ্গসজ্জা সম্পাদন করিত। পায়ে চামড়ার জুতা (moccasson) ও মাথায় বিচিত্র রঙের পালকশোভিত টুপী (kushivenop) লাগাইবার রেওয়াজ ছিল—এগুলি কোমর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত। নাচ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাটির উপর তীর ছোঁড়া হইত। যুদ্ধ অথবা লুণ্ঠনের ফলে যাহাদের বন্দী (Geewii) করিয়া আনা হইত তাহাদের মাঝখানে রাখিয়া এই অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত পুরুষেরা ছয় আটজনে দল বাঁধিয়া চক্রাকারে নৃত্য করিত। স্ত্রীলোকেরা এই নাচে যোগ দিত না, তবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত নিকটে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিত। নৃত্যের শেষে বন্দীদের হত্যা করিয়া তাহাদের মাথার ত্বক্ ছাড়াইয়া লওয়া হইত। পরে এগুলি ধুইয়া লাল ও সাদা রং মাখান হইত। শত্রুদের ছাউনিতে পুনরায় অভিযানের সময় অশ্বারোহীরা আপন আপন বন্দীদের মাথার ছাল লাঠির আগায় করিয়া বহিয়া লইয়া যাইত। লালকুর্ত্তা (Red Jacket) মহাশয় সগর্ব্বে আমায় জানাইয়া দিলেন কেমন করিয়া এক অভিযানের সময় তিনি একটি নেভাহো রমণীকে বন্দী করিয়া নিজেদের আড্ডায় লইয়া আসেন। পরে কামেয়াগা নৃত্য শেষ হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া মাথার ত্বক্‌টি ছাড়াইয়া লওয়া হয়।

তাহাদের রণশায়ী বীরদের স্মরণার্থে ইউটরা যে নৃত্যের অনুষ্ঠান করে তাহা সূর্য্যনৃত্য (Sun Dance) নামে পরিচিত। ইহা ইউটদের নিজস্ব অনুষ্ঠান নহে। 'সমতলবাসী' ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ইহার বহুল প্রচলন আছে। অনুমান ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সিউরা (Sioux) এই নৃত্যটি ইউটদের মধ্যে প্রচার করে। বয়োবৃদ্ধ ইউটরা ইহা পছন্দ করে না। আজকাল সমরাভিযান বন্ধ হওয়ার ফলে ইউমিনুচরা সাধারণভাবে মৃতের স্মরণার্থে ইহার অনুষ্ঠান করে। গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি ইহার লগ্ন নির্দ্দিষ্ট হয়। উইলো গাছের ডালপালা দিয়া বেড়া (corrall) বাঁধিয়া কতকটা জায়গা ঘিরিয়া

লওয়া হয়। কটন উড্ (cotton wood) গাছের গুঁড়ি হইতে একটি খুঁটি প্রস্তুত করিয়া ইহার মাঝখানে পোঁতা হইয়া থাকে। এই খুঁটির অগ্রভাগ দুইটি ফলার আকারে (sawarevitoch) রচিত। উইলো এবং কটন উড ব্যবহারে বিশেষ কোন তাৎপর্য্য আছে কি না বোঝা যায় না। আমার প্রশ্নের উত্তরে নারুমসুকিৎ (Narum-sukit) ওরফে ওয়াল্টার লোপেজ নামক একজন তীক্ষ্ণধী বৃদ্ধ বলে যে, ঐ দুইটি বৃক্ষই বেশ রসাল ও কাটা হইলে অনেকদিন তাজা থাকে, এতদ্ব্যতীত ঐ কাষ্ঠ ব্যবহারের অন্য কোন বিশেষ অর্থ নাই।

ঘেরা স্থানটির প্রবেশমুখে পূর্ব্বদিকে একটি প্রবেশদ্বার; পূর্ব্বদিকে খুঁটাটির দিকে মুখ করিয়াই নৃত্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে, এই কারণেই ইহাকে সূর্য্যনৃত্য (Sun Dance) বলা হয়। ইহা হইতে মনে হয় নৃত্যটির অন্য কোনরূপ তাৎপর্য্য আছে এবং লিঙ্গ-পূজার সহিত ইহার কোন সংস্রব থাকা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ তখন দেখা যায় যে, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত প্রদেশে রেড্ ইণ্ডিয়ান সমাজে লিঙ্গপূজার প্রচলন আছে। এই নৃত্য উপর্য্যুপরি তিন চারিদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। আমি যেটিতে উপস্থিত ছিলাম তাহা ১৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি ৮টার সময় আরম্ভ হইয়া ১৯শে আগষ্ট শুক্রবার সকাল ১১টায় সমাপ্ত হয়। যাহারা নৃত্যে যোগ দেয় তাহাদের মাথায় কয়েকটি পালক এবং কোমরে মখ্‌মল্ বা কিংখাপের একটু কটিবাস ছাড়া আর কোন পরিচ্ছদ থাকে না। কিন্তু তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাল ও সাদা রংয়ের মাটি দিয়া চিত্রিত করা হয়। নাচ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নৃত্যকারীরা পানাহার কিছুই করিতে পারে না, তবে ধূমপান করিতে কোন বাধা নাই। খুব বলিষ্ঠ ও কষ্ট-সহিষ্ণু লোকেরাই এই নাচে যোগ দেয়। সাধারণতঃ সকালবেলাই নৃত্য আরম্ভ হয়; মধ্যাহ্নকালে নৃত্যকারীরা ঘণ্টা দুই ঘুমাইয়া লইতে পারে। এই সময়টা অন্য লোকে পানাহার করিতে যায়। রাতভোর নাচ চলিতে থাকে, সকলে মিলিয়া একসঙ্গে নাচিবার নিয়ম নাই। দুই এক জন লোক নৃত্য করিতে থাকে, অন্যেরা সন্নিহিত মঞ্চগুলিতে বসিয়া বিশ্রাম করে। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐকতানবাদন চলে, তাহাতে মেয়েরাও যোগ দেয়। চতুর্থ দিনে নাচ শেষ হইলে একটা বিরাট ভোজ (ট-কৃভাবনী) দেওয়া হয়। ইহাতে সকলেই যোগ দিতে পারে। কয়েকজন ইউটের কাছে শুনিয়াছিলাম যে, এই এই নৃত্যটি কেবল মৃতব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হয় না, লুণ্ঠনাভিযানের সময় দলের লোক যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের পুনরুজ্জীবনই ইহার উদ্দেশ্য। সে

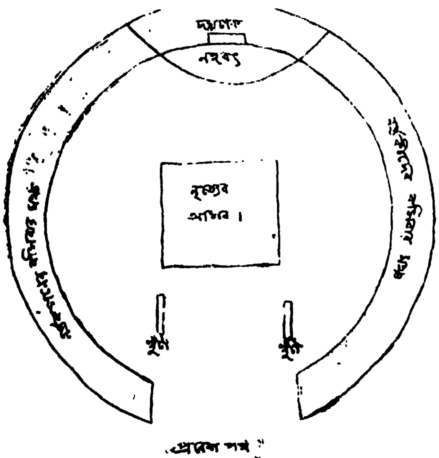


সূর্য্য-নৃত্য (Sun-dance) বৈঠকের পরিকল্পনা

যাহাই হউক নৃত্যের অনুষ্ঠান খুব শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

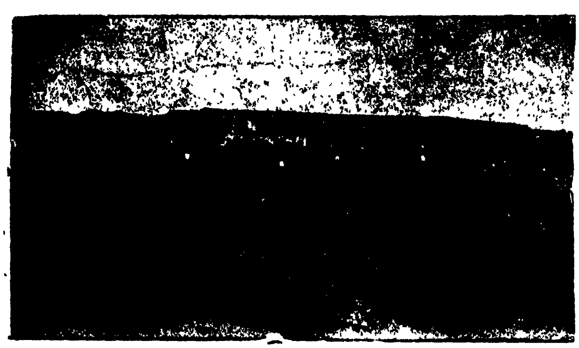
কেবল উৎসবের জন্য যে সব নাচ হয় ভল্লুক নৃত্যটি (Bear Dance) তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। প্রকৃতপক্ষে ইহা বসন্তোৎসবের নাচ। এপ্রিল কি মে মাসে যখন মাঠগুলি সবুজ ঘাসে ছাইয়া থাকে, বৃক্ষলতা পুষ্পপল্লবে ভরিয়া যায় তখনই এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। এই নাচের মধ্যে তরুণীরাই আপন আপন সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। কিংবদন্তী আছে যে, ভিষকবর (Medicine Man) বোওয়াটু একটি ভল্লুকের মেয়েকে বিবাহ করে। শীতভোর দুইজনে একসঙ্গে থাকে। বসন্ত ঋতুতে

ভল্লুকবধূর ঘুম ভাঙিবার আগেই বোওয়াট তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া আসে। ভল্লুকদের নাচের ঢঙে এই নাচটি রচনা করিয়া সে-ই ইউটদের মধ্যে প্রচার করিয়া দেয়। এই জন্যই ইহার নাম ভল্লুক-নাচ। এই উপলক্ষে



ভল্লুক-নৃত্য (Bear-dance) বৈঠকের পরিকল্পনা

তৃণ দিয়া কতকটা যায়গা (carrall) ঘিরিয়া লওয়া হয়। চার পাঁচ দিন ধরিয়া নাচ চলিতে থাকে। প্রবেশ-দ্বারের পিছনেই দুইটি খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে ভল্লুকের ছবি আঁকা বড় বড় কাপড় টাঙাইয়া দেওয়া হয়।



ভল্লুক-নৃত্যের বেষ্টন

বেষ্টনীর অপর প্রান্তে নহবৎ বসে, এখানে করোগেট্ টিনের উপর একটি বড় জয়ঢাক রাখা হয়, ডুগ্‌ডুগিও বাজে। দুইপাশে নৃত্যকারীদের জন্য লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতিয়া দেওয়া হয়। যেদিকে পুরুষেরা বসে তাহার উল্টাদিকে মেয়েদের আসন। ঠিক মাঝখানে নাচের আসর। চার পাঁচ দিনের পূর্ব্বে নৃত্য শেষ হয় না। সাধারণতঃ অপরাহ্ণে দুইটা কি তিনটার মধ্যে নাচ সুরু হইয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। কেবল শেষ দিনটিতে সারা রাত্রি উৎসব হয়। বিশেষ করিয়া



ভল্লুক-নৃত্য—প্রথম অবস্থা

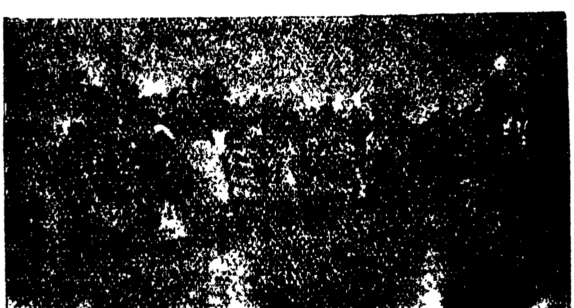
মেয়েরাই নৃত্য করে, পুরুষদের দিকে আগাইয়া গিয়া উত্তরীয় দিয়া আঘাত করিয়া তাহারা আপন আপন সঙ্গী নির্ব্বাচন করে। নির্ব্বাচিত পুরুষদের এইরূপ সঙ্গিনীদের সহিত নাচিতে গররাজী হইবার উপায় নাই। তবে অনভিপ্রেত না হইলে প্রত্যেকবার নাচের পালা আরম্ভ হইলে নূতন করিয়া সাথী নির্ব্বাচন করা যায়। নাচের সময় মেয়েপুরুষে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক নারী তাহার নির্ব্বাচিত সঙ্গীর দিকে মুখ



ভল্লুক নৃত্য - দ্বিতীয় অবস্থা

ফিরাইয়া থাকে। মেয়েরা দুই পা আগাইয়া আসে এবং তাহার পরই তিন পা পিছাইয়া যায়। আবার পুরুষেরা যখন এইরূপে আগাইয়া আসে, সেইটিই মেয়েদের পিছাইবার সময়, ফলে কেহ কাহাকেও ছুঁইতে পারে

না। ও সবের শেষদিন নাচের রীতি বদলাইয়া যায়। সেদিন আর তাহারা বিপরীত দিকে শ্রেণিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আগুপিছু যায় না। মেয়েরা নির্ব্বাচিত সঙ্গীদের কাঁধের উপর ডানহাতখানি রাখিয়া দেয়। পুরুষেরাও সঙ্গিনীদের কটি বেষ্টন করিয়া জোড় বাঁধিয়া দাঁড়ায়। ইহাকে ইহারা মেয়ে-নাচ (momontkhai) বলে। নাচের পালা শেষ হইলে কয়েকটি হরিণ অথবা বাছুর মারিয়া একটি বড় ভোজ দেওয়া হয়। রোজ সকালের দিকে নাচের পূর্ব্বে ঘোড়দৌড় খেলা হয়। রাত্রে নাচের শেষে স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া জুয়া খেলে। নৃত্যের সময় লাঠি হাতে একজন পুরুষ সর্দ্দারী করিয়া আসরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি কেহ সারি হইতে পিছাইয়া পড়ে তাহাকে লাঠি দিয়া স্পর্শ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। ইউটদের ভাষায় ভল্লুকের নাম—কোয়াকজেৎ। এই জন্য ভল্লুক-নাচের আসরকে কোয়াকজেৎ-কিৎ বলে। নাচের পর তরুণ-তরুণীরা কিয়ৎপরিমাণে অসংযত হইয়া পড়া বিরল নহে, তবে দেখা যায় যে, এই নৃত্যের সঙ্গিনীরাই পরে বধূরূপে ইউটসংসারে প্রবেশ করে।



ভল্লুক-নৃত্য—তৃতীয় অবস্থা

উইমিনুচদের মধ্যে বিবাহের জন্য কোন বিশেষ অনুষ্ঠান নাই। তাহাদের ভাষায় বীর্য বলিয়া যে কথাটি আছে তাহার অর্থ কেবল একটি মেয়ে নির্ব্বাচন করিয়া তাহার সহিত ঘরকন্না করা। অবশ্য মেয়ের নিজের মত না থাকিলে এরূপ হইতে পারে না। ঘটনাস্থলে দেখা যায় যে দুইটি তরুণ তরুণীর যদি পরস্পর পরস্পরকে ভাল লাগে, তাহারা গিয়া সোজাসুজি স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করিতে থাকে। ইউটদের সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্য (matriarchy) নাই; ফলে বধূরাই সাধারণতঃ স্বামীর সংসারে ঘর করিতে আসে। তবে জামাতারও বধূর পিত্রালয়ে যাইয়া বাস করিতে কোন বাধা নাই, এবং তাহা যে



ভল্লুক-নৃত্য—চতুর্থ অবস্থা

সচরাচর ঘটে না এরূপও নহে। বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে চরিত্রের অসংযম গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং তজ্জন্য বিবাহচ্ছেদ হওয়াও রীতি নহে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সহিত বনিবনা না হইলেই কেবল বিবাহচ্ছেদ হইতে পারে এবং এ বিষয়ে উভয়েরই সমান অধিকার। সন্তানাদি থাকিলে বিবাহচ্ছেদের পর তাহারা মাতাপিতার মধ্যে যাহার কাছে সুবিধা তাহার কাছেই থাকিতে পারে। এ বিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই।

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নীই তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হয়। মাতার অবর্ত্তমানে অথবা তাহার মৃত্যুর পর ছেলেমেয়েদের অধিকার সাব্যস্ত হয়। স্ত্রীধনে স্বামীর উত্তরাধিকারবিষয়েও ঐরূপ নিয়ম। স্ত্রী বা সন্তানাদি কিছু না থাকিলেই কেবল পিতা বা অন্যান্য আত্মীয়ের সম্পত্তিতে অধিকার জন্মায়।

ইউটদের উদ্বাহ-প্রথা রক্তসম্পর্ক (kinship) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পিতামাতার কুলে অধস্তন তিন পুরুষের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। ভ্রাতৃবধূ অথবা শ্যালিকার সহিত বিবাহও সচরাচর ঘটিতে দেখা যায়। শ্বশ্রূর সহিত বিবাহেও কোন নিষেধ নাই, অবশ্য তাহা কদাচিৎ ঘটে।

ইউটদের বিশ্বাস মৃত্যু কেবল ইহলোক

পরলোকের মধ্যবর্ত্তী একটা অবস্থা। পৃথিবীতে মরিয়া গিয়া লোকে পরলোকে যেন ঘুমের পর জাগিয়া ওঠে। শবগুলি দাহ করা হয় না। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে মৃত ব্যক্তিকে তাহার কম্বল দিয়া ঢাকিয়া কোন বড় পাথরের



ভল্লুক-নৃত্য—পঞ্চম অবস্থা

নীচে রাখিয়া দেওয়া হয়। মৃত অথবা মৃতার শবের চারিদিকে অশ্বটিকে প্রদক্ষিণ করান হইলে তাহাকে নিহত করা হয় এবং নিহত অশ্বটিও জিন, লাগাম প্রভৃতি সহ মৃতদেহের পার্শ্বে রক্ষিত হয়—যাহাতে পরলোকে গিয়াও মৃতব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে অক্ষম না হয়। ইউটদের ধারণা পরলোকে অপর্য্যাপ্ত শিকার মিলিয়া থাকে। তাই তাহারা মৃতদেহের কাছে আহার্য্য ও রন্ধনপাত্রাদি রাখিয়া আসে না। পরলোকে কোন শাস্তির ব্যবস্থা নাই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সকল দুঃখ কষ্ট ও অভাবের অবসান হইয়া যায়। মৃত্যুর পরে ছোট বড় সকলেই সমান হইয়া যায়। প্রত্যেকেই সুখে স্বচ্ছন্দে আরামে জীবন অতিবাহিত করে। উইমিনুচদের ধারণা নেকড়ে (sinov = ছীন্ অভ্) দেবতাই সকলের রক্ষাকর্ত্তা—তাহারা সকলেই এই নেকড়ের সন্তানসন্ততি। এই জন্য তাহারা নেকড়ে শিকার করে না, পরন্তু হরিণ প্রভৃতি জন্তু মারিয়া তাহার আহারের জন্য পাহাড়ের উপর রাখিয়া আসে। টটেমিজম্ (Totemism) হইতেই এরূপ সংস্কার উদ্ভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের টটেমিজম্ অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার জাতিদের মধ্যে প্রচলিত টটেমিজম্ নহে। যুক্তরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জাতিদের মধ্যে totem কে যে রক্ষাকর্ত্তা-রূপে দেখা হয়, ইহা তাহারই অনুরূপ।

ক্রমশঃ

পল্লী-পঞ্চায়েৎ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ-কেন্দ্র পল্লীগ্রাম। ভারতের জনসাধারণ বংশানুক্রমে পল্লীতেই বাস করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের প্রাণের ইচ্ছা ও বিচিত্র কর্ম্ম পরস্পরের সহযোগে এখানে চিরদিন রূপ ধরিয়াছে।

সভ্যতার মুখ্য অঙ্গে আছে জীবন, গৌণ অঙ্গে জীবিকা। অনুভূতির বিকাশ হইতে জীবনের স্ফূর্ত্তি,—জীবনধারণের উপায় লইয়া জীবিকা। প্রধানতঃ জীবিকার এই স্থূল প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া শহরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ নদীবহুল এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এখানে ভূমির উর্ব্বরতাহেতু কৃষিই প্রধান উপজীবিকা এবং আব হাওয়াজাত ঔদাস্যহেতু ভাবপ্রবণতা এ দেশবাসীর মনের বিশেষ ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষিকর্ম্মের প্রসারিত স্থান, কাল এবং প্রয়াসের আবশ্যক হয়। তাহাতে মানুষের মনও স্বভাবতঃই স্থিতিশীল হইয়া পড়ে। মনের এই স্থিতিশীলতা এবং ভাবপ্রবণতার দরুণ পূর্ব্বকালে ভারতবাসী অনুভূতিময় জীবন্ত পল্লীসমাজে অনুরাগে অবস্থিত ছিল; তাহারা প্রতিযোগিতাপূর্ণ নাগরিক জীবনের অস্থিরতার সহিত মনে মনে বিযুক্ত হইয়া রাজদ্বার হইতে দূরে থাকিতেই স্বস্তি বোধ করিত। পল্লীতে সামাজিক রীতিনীতি, বিষয়কর্ম্মের বিচার ব্যবস্থা ও শাসনাদি প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে কাজে রাজাকে না ডাকিয়া পল্লীবাসী নিজেরাই একটি বিশেষ অনুষ্ঠান গড়িয়াছিল। তাহার নাম পল্লীপঞ্চায়েৎ বা ষোলআনা। ষোলআনা যে সর্ব্বসাধারণের সমান দায়িত্বের জিনিষ—একথা উহার নামটিই বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছে।

স্বাবলম্বন এবং সহযোগিতায় পরস্পরাপেক্ষিক ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতিমূলক সৃষ্টিকাজ লইয়া এই পল্লীপঞ্চায়েতের সার্থকতা। দেশের রাষ্ট্র বা রক্ষণশক্তি যখন দেশের অন্তঃপ্রকৃতির অনুগত ছিল, তখন এই পঞ্চায়েৎই পল্লীবাসী তথা ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের শ্রীবিধান করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রনির্লিপ্ত দেশের বক্ষে যেদিন অতর্কিতে উহার ধারাবিযুক্ত শিক্ষা ও শোষণশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হইল, সেইদিন হইতেই পঞ্চায়েৎ প্রথায় ক্ষয় ধরিয়া সহস্র সহস্র পল্লী ও অগণিত জনগণের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। আজ দেশে প্রবল অর্থাভাব, অশিক্ষা, এবং তদানুষঙ্গিক স্বাস্থ্য ও নীতির অবনতি। দুঃসহ দুঃখ প্রত্যেককে তাহার আপন স্বার্থের প্রতি সচকিত করিয়া তুলিয়াছে। ফলে দেখা দিয়াছে স্বার্থপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং জীবিকা লইয়া নির্ম্মম প্রতিযোগিতা। ভারতীয় স্থিতিশীল পল্লীসমাজে স্বেচ্ছাচার ও বহির্মুখীভাব জাগাইয়া সামাজিক যোগবন্ধন ছিন্ন করিবার উহাই অন্যতম কারণ।

কিন্তু এই দুর্গতির মধ্যেই সৌভাগ্যের সূচনা ঝলকিত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বনহেতু একদিকে জাগিতেছে কর্ম্মের তাগিদ,—অন্যদিকে, দেশজোড়া দুঃখের জগদ্দল পাথর না সরাইয়া বিচ্ছিন্ন শক্তিতে একের দুঃখ লাঘব করা যে কি দুঃসাধ্য,—এই কঠোর সত্যের উপলব্ধি হইতে জাগিতেছে সমশত্রুর প্রতিরোধে বেদনাযুক্ত সংঘবদ্ধ গণ-অভিযান। দেশে এখন এমন শিক্ষাই দরকার যাহা মানুষকে স্বাবলম্বী ও সমবায়পন্থী করিয়া সৃজন কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং বিশ্ববোধের উদ্দীপনায় তাহার সংঘবল ও হৃদয়-উদারতা বৃদ্ধি করিতে পারে।

পার্থিব দুঃখের সমাধানে আজ বিভিন্ন নামে ও রূপে এক গণতন্ত্রই দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যুক্তিমূলক অর্থ ও রাষ্ট্রনীতির ধারাতে ইহাদের মূল আন্দোলন প্রবাহিত। ভারতে যে পল্লীপঞ্চায়েৎ সুদীর্ঘ কাল চলমান ছিল, উহাও গণতন্ত্রেরই এক বিশিষ্ট মূর্ত্তি বটে; কিন্তু উহার ভিত্তি হইতেছে ভাবমূলক ধর্ম্মবুদ্ধির উপর। দশের কল্যাণ-অনুগত ব্যক্তির যে স্বাভাবিক প্রকাশবৃত্তি তাহাই ধর্ম্ম। গোড়াতেই ধর্ম্ম থাকায় ভারতে জীবিকা হইতে জীবন, রক্ষণ হইতে সৃজন, খণ্ড হইতে সমগ্র ও নশ্বর হইতে চিরন্তনের দিকেই লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে বেশি। তাহাতে এ দেশে শিল্পসাহিত্যের বিচিত্র সৃষ্টিলীলায় মনুষ্যত্বের সার্থকতা ঘটিয়াছে বিলক্ষণ, কিন্তু বিষয়দৃষ্টি ন্যূন হওয়াতে বাস্তব জীবন এখানে বিড়ম্বিতও হইয়াছে কম নয়।

অনুভূতিজাত সৃষ্টিই মানবসভ্যতার আদর্শ ফল। লোকে লোকে, কালে কালে, দেশ হইতে দেশান্তরে এই আদর্শেই মানুষ জীবনের সার্থকতা খুঁজিবে। কিন্তু শুধু কেবল সৃষ্টি হইলেই চলে না, কিছু গড়িতে বা তাহাকে স্থিতিশীল করিতে হইলে বৈষয়িক সুব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। অর্থ ও রাষ্ট্রনীতি এই প্রয়োজনেই কাজে লাগে। কিন্তু ভারতের বাহিরে তাহা স্বার্থের সংঘাতমূলক প্রতিযোগিতায় পড়িয়া জীবনের বৈষয়িক দৃষ্টিকেই তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের শাশ্বত সৃষ্টি তাহাতে ব্যাহত। অনুভূতির ফল্গুপ্রবাহতলে না থাকিলে অনতিকালগত পাশ্চাত্যের মত তাহা কেবল ছল ও কলের সাহায্যে জগতকে শুষিয়া শ্রেণী-সমস্যার অনাসৃষ্টি ঘটাইতে পারে। কিন্তু রাশিয়া, প্যালেষ্টাইনের মত জনসাধারণের মুমূর্ষ দেহকে প্রাণবন্যায় উর্ব্বর করিতে পারে না।

রাষ্ট্র ও অর্থনীতির আধুনিক মোট কার্য্যকারিতা দাঁড়াইয়াছে জনগণের মধ্যে 'সংঘাভিযান' জাগাইয়া তোলা। পাশ্চাত্যে এই অভিযানের মধ্যে হিংসা, ক্রূরতা এবং পশুবলের প্রবর্ত্তনা থাকায় উহা পার্থিব প্রকৃত শান্তি বিধানে অসমর্থ। কিন্তু ইদানীং ভারতবর্ষে যে নিরুপদ্রব আন্দোলন চলিয়াছে, সৃজনশীল প্রেমানুভূতি উহার প্রধান অস্ত্র হওয়ায় ভাব ও বাস্তব জীবনকে পরস্পরের সহিত সুসঙ্গত করিয়া উহা মনুষ্যত্বকে চিরন্তন সার্থকতার পথে চালাইতে অধিকতর সক্ষম। সার্ব্বজনীন কল্যাণ নীতির পরিপন্থী অন্যায় কোনোরূপ বল প্রয়োগই ইহাতে বিহিত নহে, কিন্তু বিহিত আছে তাহার অনুগত সত্য সাধনার জন্য সংঘবদ্ধ আপ্রাণ প্রতিরোধ। এই আন্দোলনের দুইটি দিক,—একদিকে ইহার গঠন-ক্রম স্বাবলম্বন, অন্যদিকে সংঘাভিযান। একদিকে জীবন বিকাশ, অপরদিকে

জীবনরক্ষার যুক্ত প্রয়াস। তাই মনে হয়, ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধর্ম্মপ্রাণ পল্লীপঞ্চায়েতের মধ্যে এই ধর্ম্মানুগত সৃজনমুখী রাষ্ট্রসাধনা খুবই সুসঙ্গতি লাভ করিতে পারে।

আগে ভারতের জনগণের মধ্যে স্বাবলম্বন ছিল, সহযোগও ছিল, ছিল না কেবল সংঘবদ্ধ প্রতিরোধচেষ্টা। এই জন্যই অভিজাত শ্রেণীর দুই চারিজন ধুরন্ধর ব্যক্তি কালে কালে জাতির ভাগ্য লইয়া অবাধে 'ছিনিমিনি' খেলিতে পারিয়াছে। পরিণামে যাহা ঘটিয়াছে, এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

মানবসভ্যতায় আধুনিক জগতের নূতন উপহার এই ব্যূহবদ্ধ নিরুপদ্রব গণ আন্দোলন। আজ ইহা মুখ্যতঃ রাষ্ট্র অধিকার লাভের উপায় স্বরূপে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, বিশেষ দেশকালের বিশেষ প্রয়োজন সাধনায় ইহা খণ্ডরূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু ইহার যে ঐ মূল ভাবরূপ, উহা সর্ব্বকালের সার্ব্বজনীন সত্য। ঐ ব্যূহবদ্ধ আন্দোলনের ভাবে বিচিত্র শক্তিকেন্দ্র পল্লীপঞ্চায়েৎকে ঢালিয়া গড়িয়া উহাকে বাস্তবের নানা বিরুদ্ধ সমস্যার সংঘাতমুখে অটল প্রতিষ্ঠা দান করা আজ বিশ্বহিতের অন্যতম সাধন অঙ্গ।

এতদিনের কাজ ছিল, অপরিণত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া এক একটি বিশিষ্ট পল্লীকেন্দ্রে সমবায় যোগে সৃষ্টি। এখনকার কাজ হইবে, সেই সৃষ্টির উপরেও পরিণত অভিজ্ঞতার প্রসারে ন্যায্য অধিকার আচরণের জন্য বিরাট জনসংঘের সংযুক্ত অভিযান চালনা। ইহার জন্য একদিকে লোকশিক্ষা, অন্যদিকে লোকমত সংগঠন, এই দুই বিভিন্ন রকম সংহত ও ব্যাপক কর্ম্মের যে আয়োজন আবশ্যক, তাহাও মোটামুটি এখানে আলোচনা করা হইতেছে।

দুই

স্থানীয় অবস্থা বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া পল্লীর হিতসাধনে পল্লীবাসীর বিবেক ও উদ্যম জাগান—এক কথায় পল্লীপঞ্চায়েৎ সংগঠনই পল্লীসেবকদিগের মুখ্য কাজ। পল্লীবাসীর প্রত্যেকের স্বার্থ যে সকলের স্বার্থে জড়িত, সকলের কল্যাণেই যে প্রত্যেকের কল্যাণ নিহিত, সকলের বলই যে প্রত্যেকের বল, সকলের মধ্যে যে বৃহৎ একই প্রতিষ্ঠিত—এই মহৎ জ্ঞানই পল্লীপঞ্চায়েতের প্রাণ। পল্লীতে এমন কতকগুলি কর্ম্মানুষ্ঠান চাই, যেখানে মিলিত হইয়া প্রত্যেকে তাঁহার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সেই জ্ঞানকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। এই-সব অনুষ্ঠান দেহস্বরূপ হইয়া পল্লী-প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখে ও প্রসারিত করে।

জীবনযাত্রার উন্নত প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য প্রধান কেন্দ্রে কৃষি, গোশালা, কারুকর্ম্মশালা, পল্লীপোষণাগার, ধর্ম্মগোলা, শিক্ষাসত্র, ব্রতীদল, স্বাস্থ্যসদন প্রভৃতি অনুষ্ঠান থাকিবে। আসল উদ্দেশ্য সংঘসৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য। জীবনের এই মুখ্য চারি অঙ্গের সুগঠন উপলক্ষ্যে শাখাকেন্দ্রের কর্ম্মিগণ পল্লীবাসীদের হাতে সেখানকার উদ্ভাবিত সুফলপ্রদ সাধনাগুলি ধরাইয়া দিবেন।

পল্লীতে এইরূপ প্রবর্ত্তনের কাজ বহু থাকিলেও সর্ব্বত্র সকল কাজের সম্ভাবনা সমান থাকে না। কিন্তু একটি কাজ সর্ব্বত্রই করণীয়। সেটি **পল্লীপরীক্ষণ বা পল্লীতথ্য** সংগ্রহ। গ্রামে কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, না হয় সঙ্গে সঙ্গে, ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী সেখানকার স্থান-স্থিতি লোকসংখ্যা, জীবিকা, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, কৃষি, শিল্প, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদতথ্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবেন এবং একখানি পুস্তিকায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। গ্রামের অবস্থানুসারে ব্যবস্থাকার্য্যে পরে সেই পুস্তিকা কাজে লাগিবে।

কিন্তু অর্থই যেখানে ঈপ্সিত বেশী, সেখানে কৃষি, সব্জীবাগান, মৎস্যচাষ, গোপালন, তাঁত-চরখা ও স্থানীয় অন্যান্য কুটীরশিল্প প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমবায়-প্রণালীতে যৌথ কারবার খুলিয়া আর্থিক আয়বৃদ্ধির সূত্রে সকলকে এক করিবার শ্রেয়ঃপথ হইবে **ধর্ম্মগোলা ও সমবায় ভাণ্ডার**।

যেখানে শিক্ষায় লোক অনুরাগী, সেখানে **বিদ্যালয়, পাঠাগার**, পুস্তকপুস্তিকা, সাময়িকপত্র, বক্তৃতা আলোচনাদির ব্যবস্থা করিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সকলকে মিলাইতে হইবে।

কোথাও লোক স্বভাবতঃই একটু ধর্ম্মপ্রবণ—সেখানে চাই ধর্ম্মসভা। তাহার সাপ্তাহিক অধিবেশনে কীর্ত্তন, পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা উপলক্ষ্যেই সংঘ গড়িয়া উঠিবে।

যেখানে রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক, সেখানে **স্বাস্থ্য-সমিতির** কাজে অর্থাৎ ডোবা বুজান, রাস্তা-ঘাট-পুষ্করিণী পরিষ্করণ, আবহাওয়া-খাদ্য বাসস্থানের সুব্যবস্থা, সংক্রামক পীড়ার পূর্ব্বপ্রতিকার স্বরূপ টীকা, ইন্‌জেকশন ও কুইনাইন গ্রহণ, কেরোসিন-নিক্ষেপে মশক ধ্বংস, পীড়াতে সেবা-শুশ্রূষা, ঔষধ বিতরণ, ও ছায়াচিত্র-সংযোগে বক্তৃতা দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলির নিয়মিত প্রচারেই সকলের মধ্যে সংঘবোধ বাড়িবে।

সকলের মধ্যে সংঘের ভাব শুধু জাগাইলেই হইবে না, তাহার আন্দোলনকে আরও প্রসারিত এবং আরও শক্তি-শালী করিতে হইবে। বিরাট জনসংঘ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা জানিবে। সুবিপুল সংঘবলে নিজেদের অপরাজেয় বিশ্বাস করিয়া তাহারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিপক্ষের সহিত সুনিয়ন্ত্রিত সংগ্রাম করিবে। ভালমানুষের মত কেবল নির্ঝঞ্ঝাটে বাঁচা নয়, নদী যেমন অপ্রতিহতবেগে গিরি-কান্তারের দুস্তর বাধা ভেদ করিয়া নিমেষে নব নব দেশে নব অভিযানের সহিত নূতন সৃষ্টিতে নবীনের জয়গান করিয়া চলে, তেমন, চলিবে ইহাদের জীবনস্রোত। গতির এই উদ্দীপনা সৃজনের জন্য সর্ব্বপ্রথম চাই নবীনদলকে। **ব্রতীদলের** শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া ড্রিল, ব্যায়াম, সঙ্গীত, দুঃস্থসেবা, আত্ম-কর্ম্ম, ভ্রমণ, প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ, পাঠ, আলোচনা, রচনা যোগে ভাববিনিময় ইত্যাদি কার্য্যে তাহাদিগকে নামইতে হইবে। ইহাতে তাহারা বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা গতানুগতিক দিনগুলির ভিতরে মুক্ত ও বৃহত্তর আদর্শের স্পর্শ পাইয়া দেহে ও মনে জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

বড়দের মধ্যে গড়িতে হইবে, সালিশী পঞ্চায়েৎ। এই পঞ্চায়েৎই সকল অনুষ্ঠানের পত্তন ও পরিচালনার কাজ করিবেন। উহা পল্লীর সামাজিক বা বৈষয়িক অন্তর্ব্যবস্থাই যে সম্পাদন করিবে এমন নহে,—প্রয়োজন হইলে পল্লীর সাধারণ বা ব্যক্তিগত যে-কোনো স্বার্থরক্ষার্থে বহির্বাধা প্রতিরোধে তৎপর হইবেন।

ইহা ছাড়া সাময়িক সভা সম্মেলন ও বৈঠক বসাইয়া করিতে হইবে ভাব প্রচার,—কোথাও তাহা ছায়াচিত্র সংযোগে বক্তৃতায়, কোথাও কবি-কথকতায়, কোথাও বা গানে অভিনয়ে বৈঠকী আলাপে। নিজেদের প্রাচীন গৌরব ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় সকলকে সচেতন করিয়া ভাবী উন্নত জীবনের শ্রেয়ঃ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করাই হইবে **প্রচার-বিভাগের** অন্যতম উদ্দেশ্য।

আর একটি অনুষ্ঠান **ষাণ্মাসিক লোকশিক্ষাশ্রম।** ইহা স্থাপিত হইবে প্রধান কেন্দ্রে। গ্রামে গ্রামে প্রচার-বিভাগের কাজে যাইয়া কর্ম্মিগণ আদর্শপ্রবুদ্ধ কৃষক শিক্ষার্থী সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। তাহারা প্রধান কেন্দ্রেই থাকিবে এবং বৎসরের যে ছ' মাস কৃষির কাজ স্বল্প থাকে সেই ছ'-মাসের মত পাঠক্রম স্থির করিয়া শিক্ষাশ্রম হইতে তাহাদিগকে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, নীতি-ধর্ম্ম ও জনপদ-ব্যবস্থাবিধানের সহিত কিছু কিছু সাহিত্যিক পাঠও আয়ত্ত করান হইবে। শিক্ষার্থিগণ পাঠান্তে গ্রামে ফিরিয়া নিজেরাই নব পল্লীব্যবস্থা ও আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এবং পরিচালক হইবেন। কালে ইহাদের হাতে শাখাকেন্দ্রগুলির ভার পড়িলে অনুষ্ঠানের যোগ্য কর্ম্মীর অভাব মিটিবে।

এখানে একটি কথা বিশেষ বিবেচ্য। বিদ্যালয়ে দেখা যায়, অধ্যাপনা ব্যাপারকে একবার কোনক্রমে শিক্ষকেরই গরজের কাজ বলিয়া বুঝিতে পারিলে, স্বভাবতঃ অমনোযোগী ছাত্রের অধ্যয়নের জন্য আত্মউদ্যম আরও যেন শিথিল হইয়া পড়ে; তেমনি শাখাকেন্দ্রগুলির ঘন ঘন স্থিতি, তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে কর্ম্মীদের দীর্ঘকালীন উপদেশ বর্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গীন অকল্যাণ দূর করার 'গায়ে-পড়া' প্রচেষ্টা যদি কোথাও কোনক্রমে পল্লীবাসীদের মনে "বাবুদেরই গরজ" বলিয়া ভ্রান্তবিশ্বাসের উদ্রেক করে, তবে সেখানে পঞ্চায়েতের প্রাণশক্তি নিস্তেজ হইবারই আশঙ্কা বেশী। এমন স্থলে সতর্কতা প্রয়োজন। তাই প্রধান কেন্দ্রের আশে-পাশে ঘন ঘন শাখাকেন্দ্র না রাখিয়া প্রধান কেন্দ্রেরই বিশেষ বিশেষ অনুবিভাগ নিজ নিজ

সকল উদ্যোগগুলি সাধ্যমত তথায় প্রবর্ত্তন করিবেন। এই ব্যবস্থায় প্রধানকেন্দ্রস্থিত অনুবিভাগীয় কর্ম্মীদেরও একটা ব্যাপক কর্ম্মের সুযোগ সৃষ্টি হইবে। প্রতি জেলায় একজন স্থিতিশীল যোগ্যকর্ম্মীর হাতে প্রধান কেন্দ্রের অনুরূপ একটি করিয়া 'হাতে কলমের' শাখা—উদ্যমাগার স্থাপিত রাখিলেই যথেষ্ট।

প্রধান পরিচালক মহাশয় বিভাগের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন; প্রচার, অর্থসংগ্রহ, চলিত ও নূতন কর্ম্মব্যবস্থায়ও তিনি আংশিক তৎপর থাকিবেন। তাহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় লোকশিক্ষাশ্রম তাঁহার তত্ত্বাবধানে চলিবে। একেত্রে আরও একজন যোগ্য কর্ম্মী থাকা দরকার। প্রধান পরিচালকের সহকারীরূপে থাকিয়া কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের দপ্তর-ভারও ইনিই লইবেন। দুইজন থাকিবেন প্রচারক। তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক, একটি ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ দেওয়া হইবে। এক জন শিক্ষা, নীতি, স্বাস্থ্য ও অর্থ ইত্যাদি সাধারণ বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন এবং সঙ্গে বালক ও যুবকদের মধ্যে ব্রতীদল, সেবাসমিতি, বিদ্যালয়, পাঠাগার, ব্যায়ামের আখড়া, প্রভৃতি গড়িয়া যাইবেন। অন্য জন বড়দের মধ্যে পল্লীসংগঠন ও স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি এবং ধর্ম্মসভা গড়িয়া তাহাদের কাজ নিয়মিত তদারক করিবেন। একজন থাকিবেন শিক্ষাব্যবস্থাপক। তাঁহার কাজ হইবে, প্রথম প্রচারক স্থাপিত যাবতীয় শিক্ষানুষ্ঠানগুলি চালাইয়া লওয়া। প্রচারকদের কাছে চাঁদার রসিদবহি থাকিবে। তাঁহারা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহ করিবেন। প্রধান কেন্দ্রের অনুবিভাগীয় উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যগুলির বিক্রয় এবং প্রচারার্থ এজেন্টের কাজও ইহাদের দ্বারাই চলিতে পারে।

শাখাকেন্দ্রে অনুষ্ঠানের নিজস্ব তৈরি কর্ম্মী এবং ভিতর ও বাহির হইতে এই ভাবের অর্থ সংগ্রাহক প্রচারক থাকিলে উহার ব্যয়নির্ব্বাহ যে অনেক সহজ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই ভাবে কাজ চলিলে, আশা করা যায়, যে-কোন পল্লীসেবা বিভাগ অচিরকালমধ্যে আদর্শ পল্লীপঞ্চায়েৎ স্থাপন করিয়া হৃতগৌরবের সহিত নবীন শ্রীসম্পদ ও সংঘ শক্তিতে দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিবে।

হিজ্‌লীর কথা

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম্‌-এ, বার-এট্‌-ল,

ব্যারিষ্টার হিসাবে হিজ্‌লীর তদন্তে বন্দী যুবকদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য আমার ডাক্ পড়েছিল। তাই ব্যাপারটা, খবরের কাগজে যতটা পাওয়া যায়, তার চাইতেও একটু তলিয়ে এবং নানান দিক দিয়ে বুঝবার আমার সুযোগ এবং সুবিধা হয়।

যে অমানুষিক অত্যাচার ১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে হিজ্‌লীর বন্দীদের প্রতি করা হয়েছিল, তার তুলনা আজ্‌কের দিনে সভ্য জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ অত্যাচার শুধু হিজ্‌লীর বন্দীদের প্রতি অত্যাচার নয়, শুধু বাঙ্গালীর প্রতি অত্যাচার নয়—এ অত্যাচার মানুষের মনুষ্যত্বকে আক্রমণ। তাই এ অত্যাচার অমানুষিক।

কেবল একটি মাত্র উদাহরণ দি। বন্দী তারকেশ্বর সেন ছিলেন রুগ্ন, সুতরাং নিরস্ত্র এবং অসহায়; কিন্তু সুস্থকায় বন্দীদের চেয়ে তিনি ছিলেন আরও উপায়হীন। দ্বিতলের বারান্দায় সহসা যখন অকারণ গুলির আঘাতে এই রুগ্ন যুবকটি ধরাশায়ী হলেন তখন তাঁরই দুই-এক জন বন্ধু প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে, গুলির মুখে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নিয়ে এলেন ঘরের মধ্যে—শুশ্রূষার জন্য। কিন্তু তাতেও পরিত্রাণ হ'ল না। বন্দুকধারী সিপাহীরা ঘরের মধ্যে পর্য্যন্ত এসে হাজির। তখন আহত তারকেশ্বর তাঁরই কোন একটি বন্ধুর কোলে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় শায়িত, এবং প্রমাণে পাওয়া গেল, এই অজ্ঞান আহত যুবকটির উপর সেই অবস্থাতেও নির্ম্মম লাঠির আঘাত পড়েছিল, এবং ফলে যেটুকু প্রাণ তাঁর শরীরে অবশিষ্ট ছিলও বা, তার আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না।

অনেকগুলির মধ্যে এ শুধু একটা উদাহরণ, এবং

তদন্তের মন্তব্যে তদন্তকারী দুইজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী একথা অস্বীকারও করেন নি।

এই রকম নির্ম্মম অত্যাচারের পোষকতায় কোনও কারণ বা যুক্তি দেখান চলে না—তদন্তকারী রাজকর্ম্মচারিদ্বয় এই মর্ম্মেই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁরা বলেছেন সেইদিন রাত্রে সিপাহীদের উত্তেজনার কিছু কারণ হয়ত ঘটেছিল। কি যে কারণ, সে বিষয়ে সন্তোষজনক কোনও প্রমাণ কমিটীর সামনে উপস্থিত করা হয় নি। এই কারণ নির্দ্ধারিত করতে গেলে, যে-সমস্ত সিপাহীদের কথায় বিশ্বাস করতে হয়, তদন্তের ফলে তাদের অবিশ্বাসই করা হয়েছে। তা সত্বেও, অবশ্য এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার পোষকতায় কতকগুলি যুক্তি রাজকর্ম্মচারিদ্বয় দেখিয়েছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করেছেন যে, এ যুক্তিগুলির প্রত্যেকটিই অনায়াসে খণ্ডন করা যেতে পারে।

কাজেই দেখা গেল, তাঁদের এই বিশ্বাস বিশেষ কোনও অখণ্ডনীয় প্রমাণ বা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ বিশ্বাস মাত্র, এবং এই বিশ্বাসের প্রতিকূলে বলবারও অনেক কথা আছে।

এই সম্পর্কে বিশেষ ক'রে বিবেচনা করা উচিত ছিল—'ফাল্‌তু'দের সাক্ষ্য কমিটির সামনে। এ বিষয় একটু পরিষ্কার ক'রে বলা দরকার। কতকগুলি সাধারণ জেলের কয়েদীকে রাখা হয়েছিল বন্দী যুবকদের চাকর হিসাবে। এদেরই চলতি ভাষায় হিজ্‌লীতে 'ফাল্‌তু' বলা হয়। এই রকম কয়েকজন 'ফাল্‌তু'র সাক্ষ্য নেওয়া হয় কমিটির সামনে। এরা কোনও বিশেষ পক্ষের লোক নয় এবং একদিক দিয়ে দেখতে গেলে যদিও বন্দী যুবকদের কাজের জন্যই এদের হিজলীতে রাখা, তবুও সিপাহীরাই এদের মনিব। তাদের হুকুম অমান্য করার সাহস, স্পর্দ্ধা বা শক্তি এদের নেই।

আমি উপস্থিত ছিলাম, তাই আমি জানি, কমিটির সভ্যদ্বয় কয়েকজন বন্দী যুবকের সাক্ষ্য নেওয়ার পরই সহসা স্থির করলেন, কয়েকজন 'ফাল্‌তু'র বিবরণ নেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয় পূর্ব্বদিন কিছুই স্থির ছিল না, এমন কি কোনও ইঙ্গিত পর্য্যন্ত ছিল না যে, 'ফাল্‌তু'দের কাছ থেকে কোনও রকম সাক্ষ্য নেওয়া হবে। তাই কোনও পক্ষেরই এদের পক্ষসমর্থনে হস্তক্ষেপ করবার কোনও কারণ বা হেতু ছিল না।

কিন্তু এই 'ফাল্‌তু'রা যখন এল,—একজন নয়, পর পর তিন চার জন—তখন তারা সকলেই সমস্বরে বন্দী যুবকদের কথারই সমর্থন ক'রে গেল। সিপাহীদের উত্তেজিত হওয়ার যে কোনও কারণ সেদিন রাত্রে ঘটেছিল, একথা তারা কেউ স্বীকার করলে না। কিন্তু দেখে একটু আশ্চর্য্য এবং দুঃখিত হয়েছি যে, তদন্তের রিপোর্টে নিরপেক্ষ সাক্ষীর তালিকায় এই ফাল্‌তুদের নাম করা হয় নি এবং এদের প্রমাণের উপরে বিশেষ যে কিছু আস্থা স্থাপন করা হয়েছে—এমনও মনে হয় না। কেবল দুই একজন ফাল্‌তুর একটি কথা কমিটির সদস্যদ্বয় এই সম্পর্কে বিবেচনা করেছেন। তাদের কথা অনুসারে সন্ধ্যার পরে রাত্রে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বন্দীদের মধ্যে কেউ কেউ কারাগারের মধ্যে ময়দানে পায়চারি করে থাকেন। অতএব এদেরই কারও কারও সঙ্গে সিপাহীদের কোনও একটা গোলযোগ হয়ে থাকবে—কমিটির সদস্যদের এই রকম বিশ্বাস। কিন্তু 'ফাল্‌তু'রা সে-রকম কোনও গোলযোগের কথা জানে না।

এই সব 'ফাল্‌তু'র প্রমাণের মূল্য সব চেয়ে যে-দিক দিয়ে বেশী সেই দিক দিয়েই কমিটির মন্তব্যের সঙ্গে এদের কথার মিল নেই। 'ফালতু'দের কথা অনুসারে এই অযথা গুলি-বর্ষণের পোষকতার কোনও কারণ ত ছিলই না, পরন্তু সিপাহীরা উত্তেজিত হ'তে পারে এমন কিছুই বন্দীরা করেন নি সেদিন রাত্রে। অন্তত তারা কিছুই জানে না। কিন্তু এটা অতি সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যদি কারাগারের মধ্যে সেরূপ কিছু ঘট্‌ত তাহলে তা ফাল্‌তুদের অগোচর থাকত না। এবং এই সম্পর্কে 'ফালতু'দের অবিশ্বাস করবার বিশেষ যে কিছু কারণ থাকতে পারে তা জানি নে।

প্রশ্নটা হচ্ছে এই—ব্যাপারটা ঘট্‌ল সিপাহীদের মধ্যে পূর্ব্বের ষড়যন্ত্রের ফলে, না হঠাৎ উত্তেজনার বশে? তদন্তের মন্তব্যের সঙ্গে যদিও এবিষয় আমার মতের মিল নেই, তবুও আমার মনে হয়, এ প্রশ্ন এ ব্যাপারে এমন

কিছুই বড় প্রশ্ন নয়। যে-প্রশ্নটা সব চেয়ে বড় ব'লে আমার মনে হয়েছিল, সেটা হচ্ছে এই—যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সেদিন রাত্রে সিপাহীদের উত্তেজিত হওয়ার কিছু কারণ ঘটেছিল, তবুও এটা যখন স্থিরনিশ্চিত যে, তার ফলে এমনতর নিষ্ঠুর কাণ্ড করার পোষকতায় সিপাহীদের সপক্ষে কিছুই বলা চলে না, তখন বন্দীদের প্রতি সিপাহীদের এ মনোভাবের মূল উৎস কোথায়? বন্দীদের প্রতি এতখানি বিরাগ এতখানি ঘৃণা সিপাহীদের মনে উৎসারিত হ'ল কোথা থেকে? এবং তার জন্য দায়ীই বা কে?

তদন্তের মন্তব্যে এর কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না। একটা ঘটনা প্রমাণে পাওয়া গেল, এবং সে ঘটনার কথা রিপোর্টেও প্রকাশ পেয়েছে যে, যেদিন রাত্রে এই ব্যাপার হয় তার পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে সিপাহীদের সঙ্গে জনকয়েক বন্দীর একটা গোলমাল হয় কারাগারের সদর ফটকের কাছে। এই গোলমালের বিবরণ সিপাহী এবং বন্দীদের মুখে কমিটির সামনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। সে যাই হোক, প্রমাণে পাওয়া যায়, এর ফলে সেইদিনই বিকেলে সিপাহীরা দল বেঁধে বন্দীদের মারধর করবার জন্য ভিতরে যাবার চেষ্টা করেছিল, এবং হিজ্‌লীর বড়সাহেব বেকারের (Mr. Baker) সময়োপযোগী উপস্থিতির দরুণ ব্যাপারটা ঘট্‌ল না। তদন্তের মন্তব্যে প্রকাশ যে, বেকার সাহেব সেখানে উপস্থিত না থাকলে সেই দিনই হয়ত পরের দিনের ঘটনা ঘট্‌ত। সিপাহীদের কথা অনুসারে ফটক্-রক্ষীর সঙ্গে কয়েকজন বন্দীর বচসা হওয়ার দরুণ তাঁকে জনকয়েক বন্দী মেরেছিল। বন্দীরা অবশ্য এ কথা অস্বীকার করেন এবং বলেন অপমানিত হয়েছিলেন তাঁরা, ফটক্-রক্ষী নয়।

যাই হোক, যদি ফটক্-রক্ষীর বিবরণই সত্য হয় তাহলেও এটা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, সে সরকারের চাকর, হিজ্‌লীতে তার উপরওয়ালার অভাব নেই, এবং সরকারের চাকর হিসাবে সরকারের কড়া নিয়মকানুন মেনে চল্‌তে সে বাধ্য; এ অবস্থায় যদি তার প্রতি কোনও অত্যাচারও হয়ে থাকে তবে উপরওয়ালার কাছে নালিশ রুজু করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষত সব উপরওয়ালাই, এমন কি স্বয়ং বড় সাহেবও, সেখানে উপস্থিত। তা না ক'রে সিপাহীরা দলবদ্ধ হয়ে অত্যাচারের প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য নিজেরাই, উপরওয়ালার বিনা হুকুমে, ফটকের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল—তাদের এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার মূল ভিত্তি কি শুধু সেইদিনকার বিকেল বেলার ঘটনার মধ্যেই? এতে ক'রে এই কথাটাই মনে হয় নাকি যে, এ বিরাগ শুধু সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত নয়? এ যেন অনেক দিনের সঞ্চিত বিদ্বেষের অভিব্যক্তি।

কিন্তু এ ব্যাপারের ফলে অপমানিত হলেন বন্দীরাই। বড়সাহেব বেকার সদর-রক্ষী সিপাহীর কথানুসারে তাকে সঙ্গে নিয়ে বন্দীদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়িয়েছেন—যদি সে কাউকে সনাক্ত করে। কাজেই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা পরেও যে সেই রাগে সিপাহীরা হঠাৎ এমনতর ভীষণ এবং নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নেবে এ কথা মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজী হয় না।

কাজেই আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, বন্দীদের প্রতি সিপাহীদের এই যে বিদ্বেষ, এ শুধু দুই-এক দিনের সঞ্চিত বিদ্বেষ নয়। যে-বিদ্বেষের ফলে তারা মানুষ হয়েও ক্রোধোন্মত্ত পশুর মত ব্যবহার করেছে, তার মূল কারণ যথার্থ নির্ণয় করতে গেলে একটু তলিয়ে দেখা দরকার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তদন্তে বন্দীদের সঙ্গে সিপাহীদের আর কোনও রকম বিরোধের কোনও কারণ ঘটেছে ব'লে কিছুই প্রকাশ পায় নি।

তদন্তে যে-কথাটা বারে বারে প্রকাশ হ'ল, সেটা হচ্ছে এই যে, ঘটনার পূর্ব্বে বিরাগ যদি কোথাও হয়ে থাকে তবে সেটা হয়েছে বন্দীদের সঙ্গে উপরওয়ালাদের—বিশেষ ক'রে বড়সাহেব বেকারের সঙ্গে। বন্দীদের কথা অনুসারে গালিক হত্যার পর ডালহৌসী ইন্‌ষ্টিটিউটে যে সভা হয়, তার ফলে বেকার সাহেবের ব্যবহার বন্দীদের প্রতি ক্রমেই অযথা অশোভন হয়ে উঠতে লাগল। তিনি বন্দীদের সহিত পূর্ব্বের মত মেলামেশা ছেড়ে দিলেন এবং স্বাভাবিক ভদ্রতার নিয়মও তিনি বন্দীদের সঙ্গে মেনে চলতেন না। বেকার সাহেব

এতটা স্বীকার না করলেও কতকটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু এই নয়; গার্লিক হত্যা এবং আসাহুল্লা হত্যার ফলে বন্দীরা হিজ্‌লীর কারাগৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত করেছিল—বেকারের মনে এই বিশ্বাস হওয়ার দরুণ বন্দীদের প্রতি মাসহারার টাকা কমে যায়। হুকুম অবশ্য এসেছিল গভর্ন্মেন্টের কাছ থেকে। বন্দীদের কাছ থেকে প্রমাণে পাওয়া গেল যে, তাঁরা কারাগৃহ প্রায়ই এইরূপ আলোক-মালায় সাজাতেন এবং তার সঙ্গে গার্লিক বা আসাহুল্লা হত্যার কোনও সংশ্রব নেই।

বিশেষ ক'রে ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের ঘটনার অব্যবহিত পরে বেকারের কার্য্যকলাপে এই ভাবই মনে দৃঢ় হয় যে, বেকারের মনোভাব বন্দীদের প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিল না। দুই একটি উদাহরণ দিই।

প্রথমত আগের দিনই বেকার সাহেব লক্ষ্য করে-ছিলেন যে, সিপাহীরা বন্দীদের প্রতি অত্যাচার করার জন্য উৎসুক। তা সত্ত্বেও পরের দিন সন্ধ্যাবেলা বেকার সাহেব কোনও রূপ ব্যবস্থা না ক'রে সিপাহীদের হাতে বন্দীদের একেবারে ছেড়ে দিয়ে হিজ্‌লী শহর ত্যাগ ক'রে খড়গপুর যাওয়ার সপক্ষে বেকারের পোষকতায় কোনও যুক্তি পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, বন্দীদের কথা অনুসারে ঘটনার অন্তত আধ ঘণ্টা পরে বেকার সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁর ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, বন্দীদের দুর্দ্দশার কাহিনী শুনেও তিনি বন্দীদের কথায় বিশ্বাস করেন নি। এমন কি, ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে তিনি যখন ফিরে আসেন তখন ডাক্তারকে পর্য্যন্ত তিনি বন্দীদের গুরুতর জখম এবং দুজন বন্দীর মৃত্যু খবর বলেন নি। ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে এলেন stethoscope. তাঁর ধারণাই ছিল না যে, গুরুতর জখমের রোগী দেখবার জন্যে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং বন্দীদের কথা অনুসারে বেকার সাহেব তাদের কথায় বিশ্বাস না ক'রে তাদের জখম খুলে দেখাতে বাধ্য করেছিলেন। আরও দেখতে পাই, ঘটনা ঘটে রাত সাড়ে ন' টার সময়, কিন্তু প্রথম আহত বন্দীকে খড়গপুর [illegible]

এগারটা পঞ্চান্ন মিনিটের সময়। মোটরে হিজ্‌লী কারাগার থেকে গড়্গপুর মাত্র দশ-বার মিনিটের পথ।

তারপর বেকার সাহেব স্বচক্ষে বন্দীদের অবস্থা দেখেও গভর্ন্মেন্টে যে সংবাদ পাঠিয়েছেন তাতেও বন্দীদের উপর দোষ চাপিয়ে সিপাহীদের বাঁচাবার চেষ্টাই করেছেন।

এই রকম দৃষ্টান্ত আরও দেখান যেতে পারে।

এই ত গেল বেকার সাহেবের কথা। উপরওয়ালাদের মধ্যে আর একজন সাহেব আছেন। তাঁর নাম মার্শাল। তিনি পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর। তাঁর সঙ্গে যুবকদের বহুদিন ধ'রে মনোমালিন্য চল্‌ছিল, তদন্তে এই কথাই প্রমাণ হ'ল। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে মনোমালিন্য এতটা গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে, বেকার সাহেব কারাগারের মধ্যে মার্শাল সাহেবের প্রবেশ নিষেধ পর্য্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করেন নি। কিন্তু মার্শাল সাহেবের প্রতি এই নিষেধ প্রত্যাহার হ'ল যেদিন রাত্রে এই ঘটনা ঘটে তার ঠিক পূর্ব্বদিনই এবং তারপর তিনি ১৫ই এবং ১৬ই এই দু-দিনই একাধিকবার কারাগারের ভিতর প্রবেশ করেছেন। ঘটনার দিক দিয়ে এই যোগাযোগ হয়ত বা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কিন্তু তবুও মনকে ভাবিয়ে তোলে।

এই ত গেল মোটামুটি বেকার-মার্শালের কথা। কিন্তু সিপাহীদের সঙ্গে পূর্ব্বে থেকেই কোনও মনোমালিন্য বন্দীদের সঙ্গে চলছিল, কই এমন ত কিছু কমিটির সামনে প্রকাশ হ'ল না। তবুও হঠাৎ যে দারুণ বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া গেল এর মূল কারণ কোথায়, এ সম্বন্ধে তদন্তের মন্তব্যে কোনই বিচার করা হয় নি।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই মনে যে-প্রশ্ন ওঠে তা এই যে, বেকার এবং মার্শালের সঙ্গে বন্দীদের যে মনোমালিন্য চল্‌ছিল সিপাহীদের এ বিদ্বেষের মূল কি তারই মধ্যে নিহিত? সিপাহীদের এ বিরাগ কি তাদের মনের উপর বেকার মার্শালের মনোভাবেরই ক্রিয়া? সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ [illegible]

আমি এ-কথা বলতে চাই না যে, বেকার কিংবা মার্শাল সিপাহীদের উত্তেজিত ক'রে গুলি চালাবার আদেশ দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎভাবে সে রকম কিছু করেছিলেন ব'লে তদন্তে কোনও প্রমাণ উপস্থিত হয় নি। অন্তত বেকারের সম্বন্ধে কোনও প্রমাণই নেই। মার্শালের বিষয় অবশ্য অনেক বন্দীর মুখে শোনা গেল যে, তিনি স্বকর্ণে শুনেছিলেন, মার্শাল ঘটনারই দিন সন্ধ্যাকালে গুলি করার জন্য সিপাহীদের উত্তেজিত করছিলেন। কমিটি অবশ্য এ প্রমাণ বিশ্বাস করেন নি।

যাই হোক্, ও-কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এ-কথা কোনও রকমেই অস্বীকার করা চলে না যে, সাক্ষাৎ ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বেকার-মার্শাল প্রভৃতি উপরওয়ালারাই এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। বন্দীদের প্রতি এদের মনোভাবে এদের ব্যবহারেই সিপাহীরা উৎসাহিত হয়েছে, এবং ভিতরের মনোভাব যাই হোক্, যতদিন বেকার সাহেবের বাইরের ব্যবহার বন্দীদের প্রতি ভদ্র ছিল ততদিন সিপাহীদের সাহস সীমালঙ্ঘন করে নি। গার্লিক হত্যার পরে বন্দীদের প্রতি বেকার সাহেবের ব্যবহারই সিপাহীদের প্রাণে এই দুর্জ্জয় সাহসের সঞ্চার করেছে।

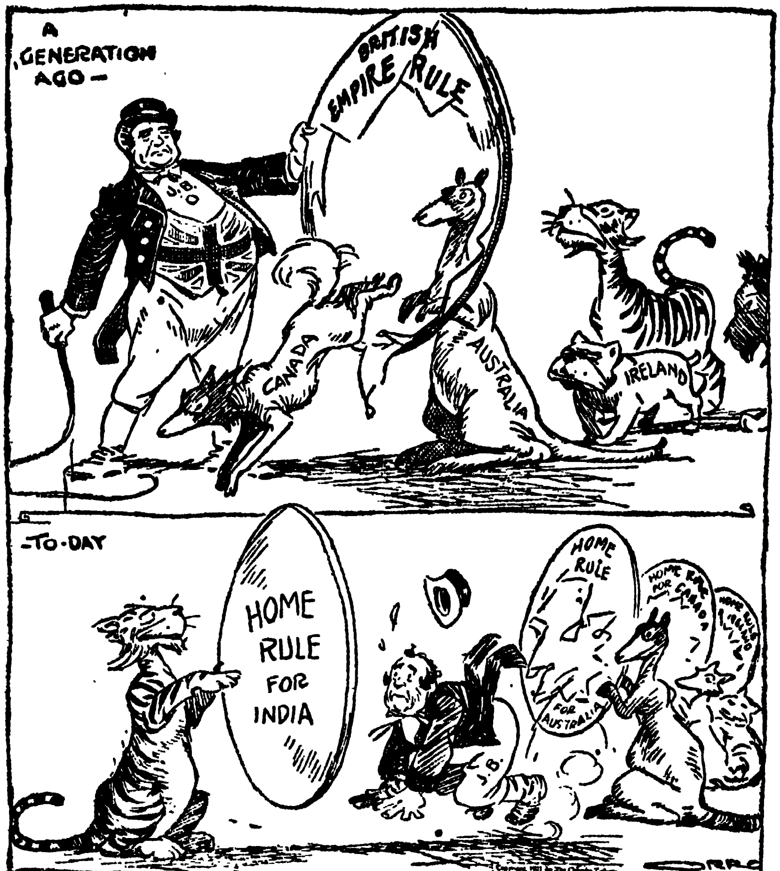
প্রমাণে পাই বা না পাই, এটা ঠিক্ই যে সিপাহীদের মনোভাব বন্দীদের প্রতি কোনও কালেই সহজ ছিল না। তারা জানে এই সব বন্দী সাধারণ আসামী নয়। এরা ভদ্রসন্তান এবং শিক্ষিত। তথাপি তারা দেখছে যে, এদের বেলায় পাহারার এবং নিয়মকানুনের যতটা কড়াক্কড় বন্দোবস্ত, সাধারণ কয়েদীদের বেলায় ততটা হয় না, এবং এরা নিশ্চয়ই শুনেছে যে, এই সব বন্দী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। এরা প্রাণের মায়া করে না এবং অতি সহজেই পরের প্রাণ নিতে জানে। শুধু কি এই, এরা স্পষ্ট বুঝেছিল যে, সরকার এই সব বন্দীকে শত্রু বলেই মনে করেন, তাই সরকার এদের বেলাই এত সাবধান। এই সব অশিক্ষিত সিপাহীর মনে এই সব ধারণা হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়, এবং তার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান। হয়ত বা স্পষ্টভাবেই এই সব মন্ত্র এদের কানে দেওয়া হয়েছিল।

কাজেই, এই সব বন্দী যখন সরকারেরই শত্রু, সরকার এদের নির্যাতনে সুখী বই দুঃখিত হবেন না, মূর্খ সিপাহীদের মনে এ ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পরে যখন এরা শুনলে যে, এই সব বন্দীরই দলের লোক সরকারের বড় বড় সাহেবদের গুলি ক'রে মারছে, তখন এই ধারণা ওদের মনে আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠল, এবং গার্লিক্ হত্যার পর বেকার সাহেবের ব্যবহার-পরিবর্ত্তনে এরা পেয়েছিল একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এই সব শিক্ষিত ভদ্রসন্তান যে, কোনরূপ বিচারে কোন দিন দোষী সাব্যস্ত হয় নি—এতটা বিচার-শক্তি এই সব সিপাহীর কাছ থেকে আশা করা যায় না।

আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, এই সব 'যো-হুকুম' সান্ত্রীর দল যে একেবারে বিনা হুকুমে এত বড় অনর্থ ঘটাতে পারে—এটা বিশ্বাস করা কঠিন। হুকুম তারা পেয়েছিল, সাক্ষাৎ ও স্পষ্টভাবে না হলেও, উপরওয়ালাদের ব্যবহারে, ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে।

আজ যে অত্যাচার হিজ্‌লীতে সংঘটিত হয়েছে, এর মূলে একটা প্রকাণ্ড বড় কথা রয়েছে। বিচারে মানুষ দোষী সাব্যস্ত হ'লে তার শাস্তি হয়—এটা স্বাভাবিক মন এ শাস্তি সহজেই মেনে নেয়। কিন্তু বাংলার ভবিষ্যৎ যারা, সেই সব বাংলার যুবকদের দলে দলে বিনা বিচারে বন্দী ক'রে রাখা শুধু যে বাংলার প্রতি অবিচার তা নয়—মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি অবমাননা। এ স্বাভাবিক নয় এ অস্বাভাবিক। তাই যে প্রতিষ্ঠান অস্বাভাবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, মাঝে মাঝে যে পরস্পরবিরোধী ঘাত প্রতিঘাতে সেখানে অমানুষিক উৎপাতের সৃষ্টি হবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি!

"তাহারা ও আমরা"



জনবুল ও ভারতীয় 'হোমরুল'

অন্যান্য উপনিবেশের বেলায় জনবুল নিজেই ঔপনিবেশিক স্বরাজ দিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় ঠিক তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ কিছুতেই জনবুলকে এই খেলা দেখাইতে প্রবৃত্ত করিতে পারিতেছে না।

—চিকাগো ডেলী ট্রিবিউন



গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মাজী

মহাত্মাজীর অভ্যর্থনায় ভারতীয় রাজন্যদের উষ্মা

—'চিকাগো ডেলী ট্রিবিউন' হইতে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গে মুসলমানের ও হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধি

বিলাতী ষ্টেটস্‌ম্যান্স্‌ ইয়্যারবুকে এবং ভারতবর্ষের সরকারী সেন্সাস্‌ রিপোর্টের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রদত্ত বঙ্গের হিন্দুদের সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তাহার কারণ, কোথাও ব্রিটিশ-শাসিত বঙ্গের সংখ্যা, কোথাও বা ত্রিপুরা-কুচবিহার সমেত বঙ্গের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং কোথাও ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজীদিগকে হিন্দুদের মধ্যে ধরা হইয়াছে, কোথাও তাহা ধরা হয় নাই। এই কারণে, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রদত্ত সংখ্যা লওয়ায়, এবং গণনার ও ছাপার ভুলে আমরা কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'র ১৪৩ পৃষ্ঠায় বঙ্গে মুসলমান ও হিন্দুদের বৃদ্ধি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে ভুল আছে—নীচে ঠিক্ অঙ্ক ও তথ্য দেওয়া হইল।

১৯২১ সালের বাংলা দেশের সেন্সাস রিপোর্টের প্রথম ভাগের ১৭২ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, ঐ সালে কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যদ্বয় সমেত বঙ্গে হিন্দু ছিল ২,০৮,০৯,১৪৮ জন ও মুসলমান ছিল ২,৫৭,৮৬,১২৪ জন এবং ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে হিন্দু কমিয়াছিল শতকরা '৭ জন (হাজারকরা ৭ জন) ও মুসলমান বাড়িয়াছিল শতকরা ৫'২ জন (হাজারকরা ৫২ জন)। (Census of India, 1921, Volume V. Bengal, Part 1, p. 172.)।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বরের গেজেট অব্ ইণ্ডিয়ার সাপ্লিমেণ্টে ১৯৩১ সালের সেন্সাসের যে চুম্বক দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই, এই সালে কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যদ্বয়সমেত বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ২,২১,৭৯,৮১৩ (ব্রিটিশ-শাসিত বঙ্গে ২,১৫,৩৭,৯২১ + কুচবিহার-ত্রিপুরার ৬,৪১,৮৯২) এবং মুসলমানের সংখ্যা ২,৭৮,৪২,৯৪০ (ব্রিটিশ-শাসিত বঙ্গে ২,৭৫,৩০,৩২১ + কুচবিহার ত্রিপুরায় ৩,১২,৬১৯)। সুতরাং ১৯২১ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে হিন্দুরা বাড়িয়াছে শতকরা ৬'৫৮ জন (হাজারকরা ৬৫'৮ জন) এবং মুসলমানেরা বাড়িয়াছে শতকরা ৯'২৪ জন (হাজারকরা ৯২'৪ জন)।

১৯১১-১৯২১ দশ বৎসরে হিন্দুদের বৃদ্ধি না হইয়া শতকরা '৭ হ্রাস হইয়াছিল। ১৯২১-১৯৩১ দশ বৎসরে সেই হ্রাস বন্ধ হইয়া হিন্দুদের শতকরা ৬'৫৮ বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং আগেকার দশ বৎসরের চেয়ে এবারকার দশ বৎসরে হিন্দুদের বৃদ্ধির হার শতকরা ৭'২৮ (হাজারকরা ৭২'৮) বেশী হইয়াছে।

১৯১১-১৯২১ দশ বৎসরে মুসলমানেরা বাড়িয়াছিল শতকরা ৫'২ জন, ১৯২১-১৯৩১ দশ বৎসরে বাড়িয়াছে শতকরা ৯'২৪ জন। সুতরাং আগেকার দশ বৎসরের চেয়ে এবারকার দশ বৎসরে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার শতকরা ৪'০৪ (হাজারকরা ৪০'৪) বেশী হইয়াছে।

—

পাঁচটি প্রদেশে মুসলমান-কর্ত্তৃত্ব

রাষ্ট্রনৈতিক মত অনুসারে ভারতীয় মুসলমানেরা দুটি প্রধান দলে বিভক্ত। একটি দল কংগ্রেসের সহিত যোগ রাখেন এবং আপনাদিগকে ন্যাশন্যালিষ্ট অর্থাৎ স্বাজাতিক বলিয়া থাকেন; অন্য দলটি কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক রাখেন না এবং খোলাখুলি মুসলমান সমাজের স্বতন্ত্র স্বার্থ ও অধিকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দ্বারা রক্ষা করিতে যত্নবান। এই উভয় দলই ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের যে-পাঁচটি প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা অন্য সব ধর্ম্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশী, তাহাতে স্থায়ী মুসলমান কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চান—যদিও উভয় দল যে-যে উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চান, তাহা কিছু ভিন্ন। তাঁহারা সকলেই বলেন, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের যে-সব

প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় অধিকতম, তথায় তাহারা যেমন কর্তৃত্ব করিবে, তদ্রূপ মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানেরাও কর্তৃত্ব করিতে চায়। যে মনের ভাব হইতে এইরূপ যুক্তি উৎপন্ন তাহা স্বাজাতিকতার (ন্যাশন্যালিজমের) অনুকূল ও পরিপোষক কি না, তাহার বিচার না করিয়া আমরা কেবল ইহাই বলা আবশ্যক মনে করি, যে, হিন্দুরা যে-যে প্রদেশে সংখ্যায় অধিকতম তথাকার ব্যবস্থাপক সভাদিতে তাহাদের প্রতিনিধি প্রভৃতির সংখ্যা স্থায়িভাবে অধিকতম হওয়া চাই-ই, রাষ্ট্রবিধিতে তাহারা এরূপ কোন নির্দ্দেশ চায় না; ভোট দিবার অধিকারের যোগ্যতারও এরূপ কোন সংজ্ঞা বা নির্দ্দেশও রাষ্ট্রবিধিতে চায় না যাহার দ্বারা তাহাদের প্রতিনিধি প্রভৃতির সংখ্যা স্থায়িভাবে অধিকতম হইতে পারে। দেশসেবায় আপনাদের যোগ্যতা ও তৎপরতা দ্বারা তাহারা ব্যবস্থাপক সভাদিতে আপনাদের যথাযোগ্য স্থান ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়; দেশসেবায় যোগ্যতা ও তৎপরতার ন্যূনাধিক্য ও সাময়িক হ্রাসবৃদ্ধি যেমনই হউক, স্থায়ী হিন্দুপ্রাধান্য আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হউক, হিন্দুরা এরূপ দাবি করে না। মুসলমান-প্রধান পাঁচটি প্রদেশে মুসলমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে কত হিন্দু তাহাদের শাসনের অধীন হইবে, নীচের তালিকায় ১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে তাহা দেখান হইল।

প্রদেশ।	মুসলমানের সংখ্যা।	হিন্দুর সংখ্যা।
বাংলা	২৭৫৩০৩২১	২১৫৩৭৯২১
পঞ্জাব	১৩৩৩২৪৬০	৬৩২৮৫৮৮
সিন্ধু	২৮৩০৮০০	১০১৫২২২
বালুচিস্থান	৪০৫৩০৯	৪১৪৩২
উ.-প. সী	২ ২৭৩০৩	১৪২৯৭৭
মোট	৪৬৩২৬১৯৩	২৯০৬৬১৪০

পাঁচটি প্রদেশে রাষ্ট্রবিধি দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে স্থায়ী মুসলমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে ২,৯০,৬৬,১৪০ জন হিন্দু ৪,৬৩,২৬,১৯৩ জন মুসলমানের শাসনের অধীন হইবে। অন্যদিকে যদি ধরা যায়, যে, বাকী প্রদেশগুলিতে মুসলমানদিগকে হিন্দু শাসনের অধীন হইতে হইবে, তাহা হইলে দেখা যায়, যে, ২,০৭,৫৯,৩১৭ জন জন মুসলমানকে ১৪,৭৮,৬৮,২৯৫ হিন্দুর শাসনের অধীন হইতে হইবে।

উপরের গণনাতে হিন্দুদের মধ্যে বৌদ্ধ শিখ আদিম-নিবাসী প্রভৃতির সংখ্যা এবং দেশী খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির সংখ্যা ধরা হয় নাই। তাহা ধরিলে দেখা যাইবে, যে, যত অমুসলমানকে মুসলমান শাসনাধীন করিবার দাবি মুসলমান-নেতারা করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক কম মুসলমান হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে বাস করে। কেবল হিন্দুদের সংখ্যা ধরিয়াই দেখা যাইতেছে, যত হিন্দুকে মুসলমান শাসনাধীন করিতে চাওয়া হইতেছে, হিন্দুপ্রধান প্রদেশসমূহে মুসলমানের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

—

বাঙালী চিত্রকরদের কৃতিত্ব

লণ্ডনে নূতন ইণ্ডিয়া হাউসের প্রাচীরগাত্রে ছবি আঁকিয়া তাহা অলঙ্কৃত করিবার ভার গবর্ন্মেণ্ট কয়েকজন বাঙালী চিত্রকরের উপর দেন। তাঁহারা সেই কাজ সুসম্পন্ন করিয়াছেন। লণ্ডনে সাউথ্ কেন্সিংটন্‌স্থিত আর্টস্ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিখ্যাত চিত্রকর স্যর উইলিয়ম রোটেন্সটাইন এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছেন :—

"Your old pupil Barman has done his work at India House admirably. He is a charming fellow and very gifted. I hope, when he returns, work of a like kind will be found for him. Indeed all the young artists have done their work well and they should prove useful servants to India."

"আপনার পুরাতন ছাত্র বর্ম্মন ইণ্ডিয়া হাউসে তাহার কাজ অতি প্রশংসনীয়রূপে করিয়াছে। সে মানুষটি শিষ্টস্বভাব, এবং খুব প্রতিভাশালী। আমি আশা করি, যখন সে দেশে ফিরিয়া যাইবে, এখানে তাহার করা কাজের অনুরূপ কাজ তাহাকে জুটাইয়া দেওয়া হইবে। বস্তুতঃ সমুদয় তরুণ শিল্পীরাই তাহাদের কাজ উত্তমরূপে করিয়াছে, এবং তাহাদের ভারতবর্ষের নিপুণ সেবক হইবার কথা।"

—

সারনাথে নূতন বৌদ্ধ বিহার

বারাণসীর নিকটে যে-স্থানটি এখন সারনাথ নামে পরিচিত, তাহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মৃগদাব নামে পরিচিত ছিল।

এইখানে বুদ্ধদেব তাঁহার প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। এই পবিত্র ও মহৎ ঘটনা বৌদ্ধশাস্ত্রে "ধম্ম চক্ক পবত্তন" অর্থাৎ ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন নামে বর্ণিত। এই মৃগদাবে বুদ্ধদেবের সমকালীন শিষ্যেরা "গন্ধকুটি", অর্থাৎ সুবাসিত কক্ষ, নাম দিয়া তাঁহার জন্য বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মৃগদাবে সম্রাট অশোক ও তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক বৌদ্ধ বহুসংখ্যক স্তূপ, বিহার ও চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরীর এক সেনাপতি এখানকার বিহারাদি পুড়াইয়া ও অন্য প্রকারে বিধ্বস্ত করে। প্রাচীন অনেক বৌদ্ধ কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া গিয়াছে। প্রায় আট শতাব্দী পরে এখানে আবার বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে বুদ্ধদেবের গন্ধকুটি ছিল বলিয়া তাহারই নাম অনুসারে বিহারটির নাম "মূলগন্ধকুটি বিহার" রাখা হইয়াছে। এই বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কার্ত্তিক মাসের ২৫, ২৬, ও ২৭ তারিখে সারনাথের উৎসবে যোগ দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, শ্যাম, চীন, সিকিম, ভুটান, তিব্বত, নেপাল, জাপান, ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশ হইতে বৌদ্ধগণের এবং বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তিমান অন্য অনেকের সমাগম হইতেছে। অতঃপর প্রাচীনকালের মত এই স্থানটি পৃথিবীর নানা দেশের লোকদের অন্যতম মিলনকেন্দ্র হইলে তাহা হইতে ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে এই সুখকর আশা পোষণ করা যাইতে পারে।

সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু অনাগারিক দেবমিত্র ধর্ম্মপাল মহাশয়ের উৎসাহ ও শ্রমে প্রধানতঃ এই বিহার-নির্ম্মাণ সম্ভবপর হইয়াছে। স্বর্গীয়া মেরী ফস্‌টার ইহার জন্য প্রভূত অর্থ দান করেন। গবর্ন্মেণ্টও নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন।

মূলগন্ধকুটি বিহারের অভ্যন্তর প্রাচীরাচিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে। ব্রিটিশ মহাবোধি সোসাইটীর উপসভাপতি ব্রাউটন সাহেব ইহার সমুদয় ব্যয়নির্ব্বাহের ভার লইয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে জাপানী চিত্রকরদিগকে এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে। জাপানী চিত্রকরদিগের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু বিহারটি ভারতবর্ষে অবস্থিত এবং ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মেরই মন্দির। এই জন্য ভারতীয় শিল্পীদিগের দ্বারা ইহা ভূষিত হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য ভারতবর্ষে যোগ্য শিল্পী না থাকিলে অন্যদেশ হইতে শিল্পী আনানো দোষের বিষয় হইত না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় তরুণ শিল্পীরা যখন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস প্রশংসার সহিত অলঙ্কৃত করিতে পারিয়াছেন, তখন বিহারটিও তাঁহারা চিত্রিত করিতে পারিতেন। যে বর্ম্মন নামক যুবকের প্রশংসা রোটেন্‌স্টাইন সাহেব করিয়াছেন, তিনি শান্তিনিকেতনস্থিত কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের শিষ্য। নন্দলাল বাবু ও তাঁহার শিষ্যবর্গ আবশ্যক হইলে, বিহারটি বিনা পারিশ্রমিকেও চিত্রিত করিতে রাজী ছিলেন। বিহারটি ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা চিত্রিত না হওয়ায় ভবিষ্যতে সারনাথ-তীর্থদর্শকেরা ভাবিতে পারে, ভারতবর্ষে শিল্পী ছিল না। এই চিন্তা পীড়াদায়ক।

—

বাঙালীর রাখীবন্ধনের দিন

কার্জ্জনের আমলে যখন বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়, তখন বাঙালীরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যত দিন বাংলা দেশ আবার অখণ্ড না হয়, ততদিন ৩০শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর প্রতি বৎসর রাখীবন্ধন হইবে এবং অন্যান্য যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করা হইবে। বঙ্গের অধিকাংশ অখণ্ড হইয়া যাওয়ায় বাঙালীরা নিশ্চিন্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন যত দিন জীবিত ছিলেন তাঁহার দ্বারা রাখীবন্ধন অনুষ্ঠিত হইত। এখন তিনি পরলোকে। এখন নূতন করিয়া কোন কোন প্রদেশ গঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বংলা দেশের যে-সকল অংশ এখ সরকারী বঙ্গ প্রদেশের বাহিরে রহিয়াছে, সেইগুলিকে বাংলা দেশের সামিল করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করা সকল বাঙালীর কর্ত্তব্য। ভাঙাগড়ার কথা যখন চলিতেছে, তখন অন্য অনেকে যেমন তাহার সুযোগ পাইবে আমাদেরও তাহা পাওয়া উচিত। অতএব যাহাতে শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, মানভূম, সিংহভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা, ও পূর্ণিয়ার কিয়দংশ সরকারী

বঙ্গের অন্তর্ভূত হয় তাহার জন্য আমাদের যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। মেদিনীপুরের দক্ষিণ অংশ উৎকলীয় ভ্রাতারা দাবি করিতেছেন। ইহার কোন কোন গ্রামের লোকদের অধিকাংশ ওড়িয়াভাষী এবং উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত হইতে ইচ্ছুক থাকিলে, তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু খবরের কাগজে দেখিতেছি, মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের লোকদের বঙ্গের সহিত সম্পর্ক ত্যাগে বিশেষ আপত্তি। এরূপ আপত্তি থাকিতে তাঁহাদিগকে অন্য প্রদেশ ভুক্ত করা ন্যায়সঙ্গত ও রাষ্ট্রনীতিসঙ্গত হইবে না। অসন্তুষ্ট কতকগুলি লোককে উড়িষ্যাভুক্ত করিলে ওড়িয়াদেরও তাহাতে সুখশান্তির ব্যাঘাত হইবে।

—

হিজলী সরকারী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

হিজলীতে বিনা বিচারে বন্দীদের উপর পাহারাওয়ালারা গুলি-চালানতে ও বেয়নেট ব্যবহার করায় তাঁহাদের দুজন হত ও কুড়ি জন আহত হন। গবন্মেণ্ট এই ব্যাপারের তদন্ত করিবার জন্য একজন বাঙালী সিবিলিয়ান ও একজন ইংরেজ সিবিলিয়ানকে নিযুক্ত করেন। হাইকোর্টের জজ বাঙালী সিবিলিয়ান মহাশয় এই কমিটির সভাপতি হন। তাঁহারা সাক্ষ্যগ্রহণ ও উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্ট হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, ঘটনাগুলির সরকারী বর্ণনা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কমিটি হিজলীর বন্দী-শিবিরের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীদের কোন দোষ বা কর্ত্তব্যের ত্রুটি দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের এই নির্দ্ধারণ আমরা ঠিক মনে করি না। তাঁহারা, যে, শিবিরের তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্ত খারাপ বলিয়াছেন, তাহা সত্য। কারণ কর্ম্মচারীরা শিবির হইতে এক, দেড় বা দুই মাইল দূরে বাস করিতেন; রাত্রিকালে এবং দিবাভাগের অধিকাংশ সময় কতকগুলি পাহারাওয়ালা ও হাবিলদারের উপর শিবিরের ভার থাকিত। কমিটি কোন কোন গুরুতর বিষয়ে পাহারাওয়ালাদের সাক্ষী সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; তথাপি তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তও করিয়াছেন, যে, বন্দীরা সকলে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব ব্যবহার করে নাই। এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। কারণ, এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কমিটি নিম্নমুদ্রিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

……there was, in our opinion, no justification whatever for the indiscriminate firing (some 29 rounds were found to have been fired) of the sepoys upon the building itself, resulting in the death of two of the detenus and the infliction of injuries on several others. There was no justification either for some of the sepoys going into the building itself and causing casualties of various kinds to some others of the detenus."

"সিপাহীরা যে বন্দীদের বাসগৃহের উপর নির্ব্বিচারে গুলি চালাইয়াছিল (দেখা যাইতেছে, যে, তাহারা একযোগে উনত্রিশ বার গুলি ছুঁড়িয়াছিল), যাহার ফলে দুজন বন্দী নিহত হয় এবং অন্য অনেকে নানাপ্রকারে আহত হয়, আমাদের মতে তাহার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের ও সমর্থনের কোনই কারণ নাই। সিপাহীদের কয়েক জন যে বন্দীনিবাস গৃহে গিয়াছিল এবং সেখানে অন্য কয়েকজন বন্দীকে জখম করিয়াছিল, তাহাও সমর্থন করিবার ও ন্যায্য মনে করিবার কোনই কারণ নাই।"

কমিটির এই সিদ্ধান্তের মানে এই, যে, আইনে যাহাকে 'মার্ডার' বা পূর্ব্বচিন্তিত নরহত্যা বলে, সিপাহীরা সেই অপরাধ করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের বিচার এবং দোষ প্রমাণ হইলে, বিচারান্তে ইহাদের শাস্তি হওয়া উচিত। বেসরকারী অনেক লোকে মিলিয়া এইরূপ নরহত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, আদালত ঠিক্ কাহারা কাহারা দোষী তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করেন এবং প্রধান দোষীদের উচ্চতম শাস্তি এবং অন্যদের লঘুতর দণ্ড দিয়া থাকেন। এক জনের প্রাণ বধ করিবার অপরাধে একাধিক আসামীর ফাঁসী হইবার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। আমরা প্রাণদণ্ডের সমর্থক নহি। কিন্তু গবন্মেণ্ট যখন সমর্থক, তখন বেসরকারী লোকদের যে রকম অপরাধে যে শাস্তি হয়, সরকারী লোক সেইরূপ অপরাধ করিলে তাহাদেরও সেইরূপ শাস্তি গবন্মেণ্টের দেওয়া উচিত। রক্ষক ঘাতক হইলে তাহার অধিকতর শাস্তি ন্যায়সঙ্গত।

বেসরকারী লোকেরা পুলিসের লোকদের প্রাণবধ করিলে নিহত পুলিস কর্ম্মচারীর স্ত্রীপুত্রাদি শ্রাদ্ধাদির টাকা এবং পেন্স্যন পাইয়া থাকে। পুলিসের লোকে হিজলীতে অকারণ দুজন ভদ্রসন্তানের প্রাণবধ করিয়াছে। ইঁহাদের পরিবারবর্গকে নগদ কিছু টাকা ও পেন্স্যন দেওয়া গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য। যাঁহারা আহত হইয়াছেন, তাঁহাদের জখমের গুরুত্ব অনুসারে বেশী কম ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া উচিত।

গবর্মেণ্ট যখন বিনা-বিচারে-বন্দীদের প্রাণরক্ষা করিতে এবং জখম নিবারণ করিতে অক্ষম, তখন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সাধারণ আইন অনুসারে রীতিমত বিচারে যতক্ষণ কেহ অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগকে নির্দ্দোষ মনে করা উচিত। এই হেতু, উক্ত বন্দীদের হয় বিচার, নয় মুক্তি হওয়াই ন্যায়সঙ্গত।

বন্দী-শিবিরের কর্ম্মচারীরা আমাদের বিবেচনায় নির্দ্দোষ নহে। বন্দীদের উপর গুলি-চালান আগে হইতেই স্থির ছিল, বন্দীদের ধারণা ঐরূপ। তাহা সত্য বা মিথ্যা, কিছুই বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু নির্বিচারে গুলি-চালান সম্বন্ধে সিপাহীরা কেন ব্যগ্র ও বেপরোয়া হইল, বাবুদের প্রাণের চেয়ে সরকারী বন্দুকের কুঁদা মূল্যবান এরূপ ধারণা তাহাদের একজনেরও কেন হইল, ১৫ই সেপ্টেম্বর একজন কর্ম্মচারী সিপাহীদিগকে "তোমরা কেন গুলি করিলে না" বলায় তাহারা আস্কারা পাইয়াছিল কি না, ইত্যাদি বিষয়ে কমিটি কেন আলোচনা করেন নাই?

—

চট্টগ্রাম ও হিজলী সম্বন্ধে সভা

চট্টগ্রামের অরাজকতা ও হিজলীর খুনজখম সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত কলিকাতার আলবার্ট হলে স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রতিবাদ খুব জোরের সহিত হইয়াছিল এবং প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণের দাবিও হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পরিষ্কার ভাষায় নাম উল্লেখ করিয়া চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে একাধিকবার অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহার (সেনগুপ্ত মহাশয়ের) নামে মোকদ্দমা করিয়া তাঁহার উক্তির সত্যতা বা অসত্যতা প্রমাণ করিতে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে বা গবর্মেণ্টকে আহ্বান করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ম্যাজিষ্ট্রেট বা গবর্মেণ্ট কিছু করেন নাই। ইহার কারণ দু-রকম হইতে পারে—(১) সেনগুপ্ত মহাশয়ের কথা সত্য, এইজন্য তাঁহাকে আসামী রূপে আদালতে হাজির করিতে সাহসের অভাব; কিংবা (২) এরূপ গুরুতর ও সুস্পষ্ট অভিযোগেরও কোন নোটিস না লইয়া অবজ্ঞার সহিত তাহা অগ্রাহ্য করিবার সাহসের অস্তিত্ব। যে কারণটাই প্রকৃত বলিয়া মনে করা হউক, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, যে, সরকার বাহাদুর সভার নির্দ্ধারিত কোন প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিবেন না। কিন্তু সত্য ন্যায় ও শান্তির দাবি আপাত-দুর্ব্বল পক্ষের মুখ হইতে নিঃসৃত হইলেও তাহা মানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। যাহাদের মুখ দিয়া দাবি বাহির হয়, তাহারা দুর্ব্বল বিবেচিত হইলেও সত্য ন্যায় ও শান্তি কদাচ দুর্ব্বল নহে। ইতিহাসও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইতিহাস ইহাও বলিতেছে, যাহারা সত্য ন্যায় ও শান্তির পক্ষে, তাহারা বরাবর দুর্ব্বল থাকে না।

—

আবার খুনের চেষ্টা

অনেক খবরের কাগজ তাহাদের লেখা দ্বারা সোজাসুজি বা ঠারেঠোরে সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদিগকে এবং সরকারী ভারতীয়দিগকে খুন করিতে উত্তেজিত করে বলিয়া উত্তেজনাপ্রবণ অল্পবয়স্ক যুবকেরা খুন করিতে প্রবৃত্ত হয়, সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের মত এইরূপ। মানিয়া লওয়া যাক্, যে, আগে আগে অনেক কাগজ ঐরূপ উত্তেজনা দিয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে নূতন প্রেস আইনের খসড়ার তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, তখন হইতে ঐসব কাগজও উত্তেজক লেখা হইতে বিরত আছে। সে কয়েক মাস আগেকার কথা। তারপর প্রেস আইন বিধিবদ্ধ এবং জারি হইয়াছে। তখন হইতে ও তাহার আগে হইতে পুলিস সন্দেহবশতঃ বিস্তর লোককে গ্রেপ্তারও করিয়াছে। যাহাতে

রাজনৈতিক হত্যার নিন্দা হয় নাই, এমন খবরের কাগজ আমাদের চোখে পড়ে নাই। তথাপি অল্পদিন আগে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটকে ও ইউরোপীয় সভার মিসটার ভিলিয়ার্সকে খুন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সুতরাং ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে, যে, খবরের কাগজের উত্তেজক লেখা পড়িয়া মাথা গরম হইলেই কোন কোন বালক ও যুবক গুলি চালাইয়া বসে। তর্কের অনুরোধে এমন কথা উঠিতে পারে, যে, প্রেস আইনের খসড়ার তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে-সব উত্তেজক লেখা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল,তাহার ফল এতদিনে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু শুধু তত আগেকার উত্তেজনার ধাক্কা এতদিন থাকিবার কথা নয়; আরও কিছু কারণ থাকিবার সম্ভাবনা।

কারণ যাহাই হউক, আমরা এরূপ অবস্থা উৎপন্ন হওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী যাহার দরুণ কাহারও সরকারী বা বেসরকারী কাহাকেও মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হয়। এ বিষয়ে আমাদের মনের ভাবের ও চিন্তার সহিত এদেশী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের মনের ভাবের ও চিন্তার তফাৎ আছে। তাঁহারা কেবল ইংরেজের ও সরকারী দেশী লোকের হত্যার বিরোধী। হিজলীতে যে-খুনজখম হইল তাহাতে তাঁহাদের কোন কষ্ট হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় নাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের "অহিংসা" এক তরফা। আমাদের "অহিংসা" দুই তরফা এবং ব্যাপক।

মিঃ ডুরুনো ও মিঃ ভিলিয়ার্সের হত্যার চেষ্টার পর গবর্ন্মেণ্ট পুলিসকে আরও বেশী লোককে অনায়াসে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত নূতন এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। দেশী নেতারা এবং সম্পাদকেরা বরাবর বলিয়া আসিতেছেন, যে, শুধু দমন-নীতির দ্বারা দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে না; অসন্তোষ নিবারণের চেষ্টাও করিতে হইবে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ বরাবরই মনে করিয়া আসিতেছেন, যে, দমননীতিরূপ ঔষধের মাত্রাটা কম থাকায় এবং যথেষ্ট দীর্ঘকাল ধরিয়া ঔষধটার প্রয়োগ না হওয়ায় ফল হয় নাই। এই জন্য চণ্ড হইতে চণ্ডতর দমন ব্যবস্থিত হইতেছে। পুলিস যথাসাধ্য যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা গ্রেপ্তার করার পরও হত্যা বা হত্যা-চেষ্টা হওয়ায় প্রমাণিত হইতেছে, যে, ঠিক্ সকল লোককে ধরা হয় নাই। তথাপি পুলিসকে গবর্ন্মেণ্ট আরও বেশী লোক ধরিবার ক্ষমতা দিতেছেন। ইহার ভিতরকার যুক্তি এবং আশা বোধ করি এই, অনেক নিরপরাধ লোককে ধরিতে ধরিতে ভাগ্যক্রমে অপরাধী দু-একজনও ধৃত হইতে পারে। এত বেশী নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করাতে যে গভীর ও ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হইতেছে এবং রাজশক্তির ন্যায়বুদ্ধির প্রতি লোকে আস্থা হারাইতেছে, শাসকরা তাহার অনিষ্টকারিতার প্রতি মন দিতেছেন না।

সাধারণ আইন অনুসারে সাধারণ আদালতে বিচারদ্বারা অপরাধী প্রমাণিত লোকদের শাস্তিকে আমরা দমন-নীতির দৃষ্টান্ত মনে করি না।

কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখাতেই যদি দমননীতি পর্য্যবসিত হইত, তাহা নিন্দনীয় হইলেও, যাহা বার-বার হইতেছে বলিয়া খবরের কাগজে বিস্তারিত বর্ণনা বাহির হইয়াছে, তাহা আরও নিন্দনীয়। মিঃ লোম্যান ও মিঃ হডসনের প্রতি গুলি নিক্ষেপের পর ঢাকায় যেমন খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার উপলক্ষ্যে গৃহস্থ নরনারী এবং মেসের ছাত্রদের উপরে মারপিট ও অন্য অত্যাচার এবং তাহাদের জিনিষপত্র ভাঙাচুরা ও অপহরণের খবর কাগজে বাহির হইয়াছিল, চট্টগ্রামের অরাজকতার সময় গৃহে গৃহে যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল, ডুরনো সাহেবকে গুলি মারার পর গ্রেপ্তারের হিড়িকে সেইরূপ অত্যাচারের সংবাদ কাগজে পড়িতেছি। এই সব অভিযোগের যথাযোগ্য তদন্ত ও প্রতিকার গবর্ন্মেণ্ট আগেও করেন নাই, এখনও করিতেছেন না। গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রায় কি জানি না। বেদম প্রহার ও আনুষঙ্গিক অত্যাচারের দু-রকম ফল হইতে পারে—অত্যাচরিত লোকেরা একেবারে পিষ্ট ও নির্জীব হইয়া যাইবে, কিংবা তাহা না হইয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইবে। কিন্তু বোধ হয় ইহা অনুমান করাই অপেক্ষাকৃত অধিক মানবচরিত্রজ্ঞান-সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত, যে, খুব ভীরুর দেশেও কতক লোক

একেবারে নির্জীব হইয়া যাইবে, অন্যেরা ক্রুদ্ধ হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ, উভয় পক্ষ ক্রোধ সংযত করিয়া ধীরভাবে ন্যায়ানুগত ব্যবহার না করিলে শান্তির সম্ভাবনা নাই। উভয় পক্ষের মত ঐরূপ হইলে সুফল ফলিবে। গাছ হইতে বীজ হয়, না, বীজ হইতে গাছ হয়, এ প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা না করিলে যেমন কোন ক্ষতি নাই, তেমনি উভয় পক্ষের মধ্যে কাহার নীতি ও কার্য্য অশান্তির জন্য প্রথমতঃ দায়ী, সে আলোচনা আপাততঃ ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত থাকিতে পারে।

—

গ্রেপ্তার কখন গ্রেপ্তার নয়

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কিছুদিন আগে শ্রমিক সভায় যোগ দিবার জন্য যখন জগদ্দল যাইতেছিলেন, তখন পুলিস তাঁহাকে একটা থানায় আটক করিয়া রাখে, নিজেরা তাঁহাকে খাদ্য পানীয় কিছু দেয় নাই, তাঁহার বাড়ির লোকদিগকেও তাঁহাকে খাদ্যপানীয় দিতে দেয় নাই। অথচ পরে সরকারী জ্ঞাপনী বাহির হয়, যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই! তাঁহার ভাগ্যে আবার সেইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। আলবার্ট হলের এক সভায় ঢাকার অত্যাচারের অভিযোগের তদন্তের জন্য যে বেসরকারী কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহার অন্য কোন কোন সভ্যের সহিত তিনি ঢাকা যাইতেছিলেন। পথে জোর করিয়া তাঁহার গতিরোধ করা হইয়াছে। ইহাও অবশ্য গ্রেপ্তার নয়! কিন্তু নামে কিছু আসিয়া যায় না। যতক্ষণ কেহ কিছু আইনবিরুদ্ধ কাজ না করে বা করিবার চেষ্টা না-করে, ততক্ষণ তাহার স্বাধীনতাহরণ বেআইনী ও গর্হিত কাজ। শাসকদের ও পুলিসের সুপরিচিত ওজুহাত, "অমুক ব্যক্তি অমুক জায়গায় গেলে শান্তিভঙ্গ হইবে, অতএব তাহাকে নিষেধ করা হইয়াছে," অতি স্বচ্ছ।

সুভাষ বাবুর ঢাকা-গমনে বাধা দেওয়ায় লোকের এই ধারণা দৃঢ় হইবে, যে, ঢাকা সম্বন্ধে যাহা শুনা যাইতেছে সব সত্য। সাম্রাজ্যবাদীরা বলিবেন, তোমাদের দৃঢ় ধারণাকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি।

"রয়্যালিষ্ট"

কিছুদিন হইতে এদেশী ইংরেজরা—সকলে না হউক, অনেকে—"রয়্যালিষ্ট" (রাজপক্ষসমর্থক) নাম লইয়া একটা দল পাকাইয়াছে। তাহারা কি করিতে চায়, খুব খুলিয়া না বলিলেও অনুমান করা কঠিন নয়! ভিলিয়ার্স সাহেবকে কে একজন গুলি করায় তাহারা একটা লাল হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া বিলি করিয়াছে। তাহাতে তাহাদের বিবেচনায় রাজনৈতিক কারণে হতাহতের একটা ফর্দ্দ দিয়া, তাহারা বলিতেছে—"We want action." দেশী সম্পাদকেরা ইহার এই অর্থ করিয়াছেন, যে, তাহারা প্রতিহিংসাত্মক কাজ চাহিতেছে। এই ব্যাখ্যা দেশী অনেক কাগজে বাহির হওয়ায় তাহারা বলিতেছে, তাহা আমাদের অভিপ্রেত নয়—আমরা গবন্মেণ্টকে রাজনৈতিক হত্যা ও হত্যাচেষ্টা বন্ধ করিবার নিমিত্ত কিছু করিতে বলিয়াছিলাম। ইহা অতি হাস্যকর ব্যাখ্যা। গবন্মেণ্টকে কিছু করিতে অনুরোধ করিবার প্রচলিত রীতি আবেদন-প্রেরণ কিংবা সভা করিয়া তাহাতে প্রস্তাব নির্দ্ধারণ—লাল কাগজে হ্যাণ্ডবিলে হর্ষবিস্ময়াদিসূচক (!!!) চিহ্নের ছড়াছড়ি করিয়া সেই পত্রী রাস্তায় রাস্তায় বিতরণ সে রীতি নয়।

—

বিনা-বিচারে-বন্দীদের অবস্থা

এমন দিন যায় না, যেদিন খবরের কাগজে কোন-না-কোন বিনা বিচারে বন্দীকৃত ব্যক্তির রোগ, চিকিৎসার অভাব, অন্যান্য অসুবিধা কিংবা তাঁহার পরিবারবর্গের উপার্জ্জকের অভাবে দুর্দ্দশার বর্ণনা খবরের কাগজে থাকে না। অথচ এই লোকগুলির কোন দোষ প্রমাণ হয় নাই। তাঁহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিবার মত প্রমাণ পুলিসের হাতে থাকিলে কয়েক শত লোককে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইত না। ইহাদের অনেকে কংগ্রেস দলভুক্ত। কিন্তু কংগ্রেস ও তাহার স্বাধীনতা-লাভ চেষ্টা মরিবে না।

বিনা বিচারে বন্দী লোকেরা নিরপরাধ কি না

আইনের একটি সূত্র আছে, যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ দোষী প্রমাণিত না হইতেছে, ততক্ষণ তাহাকে নির্দ্দোষ মনে করিতে হইবে। কেবল এই নিয়ম অনুসারেই যে বিনা-বিচারে বন্দীকৃত লোকেরা নিরপরাধ বিবেচিত হইবার যোগ্য তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে কম করিয়া অর্দ্ধেকের উপর লোক যে নির্দ্দোষ, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে অন্য যুক্তি আছে।

এই বন্দীরা যেরূপ অপরাধের সহিত জড়িত বলিয়া সন্দেহে তাঁহারা ধৃত হইয়াছেন, আদালতে তাহার বিচার হইলে তাঁহারা দায়রা সোপর্দ্দ হইতেন। দেখা যাক্, দায়রার বিচারে শতকরা কত জন অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তি পায়।

বঙ্গীয় পুলিস-বিভাগের গত বৎসরের (১৯৩০ সালের) রিপোর্টের ২২ পৃষ্ঠায় দায়রার বিচার সম্বন্ধে আছে :—

"The total number of persons tried was 4,663 against 3,992, and 48.9 per cent against 49·6 in 1929, were convicted."

"১৯৩০ সালে ৪,৬৬৩ ব্যক্তির বিচার হইয়াছিল। তাহার মধ্যে শতকরা ৪৮.৯ জনের দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল।"

অর্থাৎ অর্দ্ধেকের উপর নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পাইয়াছিল।

পুলিস যখন প্রকাশ্য আদালতে বিচারের জন্য আসামী চালান করে, তখন জানে, যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল তাহার বিরুদ্ধপক্ষের সাক্ষীদিগকে জেরা করিবে এবং অন্যবিধ প্রমাণ পরীক্ষা করিবে; বিচারকও বিচারকার্য্যে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ ব্যক্তি। এই জন্য তাহারা সচরাচর কেবলমাত্র সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিকে দায়রা সোপর্দ্দ করাইতে চেষ্টা করে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অর্দ্ধেকের উপর অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পায়। বিনা-বিচারে বন্দীদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত করিতে হয় না, অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন উকীল ব্যারিষ্টারকে তাহা পরীক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা যে অন্যায় হইয়াছে তাহা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম। এই জন্য তাহাদের গ্রেপ্তারে পুলিসের বেশী সাবধান হইবার কথা নয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় এই সব রাজবন্দীদের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোককে নিশ্চয় নির্দ্দোষ মনে করা বিন্দুমাত্রও অযৌক্তিক নয়। শতকরা ৭৫ জনকে নিশ্চয় নির্দ্দোষ বলিয়া গণনা করিলেও হিসাবে ভুল হয় না। আমরা বাকী অর্দ্ধেক বা সিকি লোককেও অপরাধী মনে করিতেছি না—সকলকেই নির্দ্দোষ মনে করিতে আমরা বাধ্য। আমরা কেবল, পুলিসের বার্ষিক রিপোর্টের নজীর অনুসারে কত লোককে নির্দ্দোষ মনে করা সঙ্গত, তাহাই বলিতেছি।

এইরূপ অন্যায় উপদ্রব যে দেশে নিত্য ঘটিতেছে, সে-দেশে কেবল চণ্ডনীতি দ্বারা রাজপুরুষেরা ও বেসরকারী ইংরেজরা শান্তি স্থাপন করিতে চান। ইংরেজীতে "war to end war," "যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য যুদ্ধ," একটা শব্দসমষ্টি আছে। তাহা, আগুন জ্বালিয়া আগুন নিবান, এবং জলে চুবাইয়া শীত নিবারণের মত সুসঙ্গত ব্যাপার। চণ্ডনীতির সমর্থকদের প্রয়াসও এই জাতীয়।

—

ঢাকার অবস্থা

ঢাকায় বিস্তর লোককে ধরপাকড় করায় এবং তাহার আনুষঙ্গিক নানা অত্যাচারের অভিযোগ ও গুজব ছড়াইয়া পড়ায় সেখানকার অনেক লোক শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, অনেকে বাড়ির মেয়েছেলেদিগকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিতেছে। ঢাকাতে যেমন অরাজকতা আগে হইয়া গিয়াছে, আবার তেমনি কিছু একটা হইবে এইরূপ গুজবও ঢাকাবাসীদের আতঙ্কের কারণ। ঢাকা-বিভাগের কমিশনার গ্রেহাম সাহেব তাহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন, যে, সর্ব্বসাধারণকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা গবর্ন্মেণ্টের আছে। তাঁহার দ্বারা ইচ্ছা ও ক্ষমতা এই দুটি শব্দের প্রয়োগে লোকে স্বভাবতই ভাবিতে পারে, আগে যে-অরাজকতা ঘটিয়াছিল, তাহা কি গবর্ন্মেণ্টের প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার অনিচ্ছাবশতঃ, না অক্ষমতাবশতঃ, না ইচ্ছা ও ক্ষমতা উভয়েরই অভাববশতঃ।

সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব

এ বৎসর কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের অনেক জায়গায় সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে টালার ময়দানে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের দুটি বৃত্তান্ত আমরা পাইয়াছি, এবং সে বিষয়ে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমরা ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না। ইহার সামাজিক দিক সম্বন্ধে কিছু বলিব।

টালার উৎসবের একটি বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে :—

"ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার উদ্যোগিগণ দেবীর পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগরন্ধন, প্রসাদ গ্রহণ ও বিতরণ প্রভৃতি সকল বিষয়েই সকলকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। সকল শ্রেণী হইতেই পুরোহিত নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। নমশূদ্র-বংশীয় শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত কাব্য-সাংখ্যতীর্থ, সাহা-বংশীয় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চৌধুরী কাব্যতীর্থ, কায়স্থ-বংশীয় শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঘোষ বর্ম্মণ এবং পূজাদি কার্য্যে সুনিপুণ ব্রাহ্মণ-বংশীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ পূজায় পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। হিন্দু জাতির পক্ষে ইহা একটি অভূতপূর্ব্ব অনুষ্ঠান।

"পূজার তিন দিবসই সর্ব্ব জাতিকে পূজা করিবার, অঞ্জলি দিবার, দেবীর পদ স্পর্শ করিবার ও ভোগরন্ধন সব কার্য্যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। মেথর হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই ছুঁৎমার্গ পরিহার করিয়া একত্রে উপবেশন ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবের বন্যায়, দর্শকরূপে উপস্থিত কোন কোন গোঁড়া ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্যগণের সহিত একত্রে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা জাতিভেদ ভাঙিবার অনেক সাহায্য হইবে। পূজা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে যে বলিয়াছিলেন, "পৌরোহিত্যের গণ্ডী ও অস্পৃশ্যতাই নব হিন্দুজাতি গঠনের প্রধান অন্তরায়," তাহা অংশতঃ সত্য। সমুদয় হিন্দুজাতির মধ্যে ঔদ্বাহিক আদান-প্রদান আবশ্যক। *হিন্দু মিশন তাহা উপলব্ধি করিয়া একাধিক* অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছেন। হিন্দুজাতি গঠনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক বিশুদ্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস ও তদনুযায়ী আচরণ। উপনিষদুক্ত ধর্ম্মোপদেশ অনুসরণ করিলে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

রেঙ্গুনে বাঙালী ছেলেদের শ্রমসহিষ্ণুতার প্রতিযোগিতা

ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুনের বাঙালী স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হয়, যে, কে কতক্ষণ না থামিয়া, না নামিয়া বাইসিক্‌ল্‌ চালাইতে পারে। এস্‌ এন্‌ দে নামক একটি বালক সকলের চেয়ে বেশী সময়, ৪০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট, বাইসিক্‌ল্‌ চালাইয়াছিল। সে আরও কয়েক ঘণ্টা চালাইতে পারিত, কিন্তু এই প্রতিযোগিতার জন্য সাধারণ রাজপথ ব্যবহার করিবার অনুমতি পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট না লওয়ায় একজন পুলিস কর্ম্মচারীর আদেশে বালকটি থামিতে বাধ্য হয়।

নাগপুরের প্রবাসী বাঙালী সমিতি

নাগপুরের প্রবাসী বাঙালীরা একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, দীননাথ বাঙালী বালক বিদ্যালয়, বাঙালী বালিকা বিদ্যালয়, সারস্বত সভা প্রভৃতির উন্নতিসাধন, বাঙালীদের কল্যাণের জন্য আবশ্যক-মত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-স্থাপন, বাঙালীদের সামাজিক জীবন জ্ঞানালোক ও বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ দ্বারা পরিপুষ্ট-করণ, বিপন্ন বাঙালীদিগের সেবা, এই সমিতির উদ্দেশ্য।

ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্র ও বঙ্গদেশ

ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের (Federated India-র) যে ব্যবস্থাপক সভা স্যাঙ্কি কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা দুই কক্ষে (chamber-এ) বিভক্ত। উহার যে-অংশ বিলাতী হাউস অফ্‌ কমন্সের মত, তাহাতে কোন্‌ প্রদেশ কত প্রতিনিধি পাঠাইবে, সে-বিষয়ে কমিটি এই উপক্ষেপ (suggestion) করিয়াছেন, যে, প্রতিনিধি-সংখ্যা প্রদেশ-

গুলির লোকসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী হওয়া উচিত। ইহা সমীচীন। তাহার পর বলিতেছেন, বোম্বাইয়ের বাণিজ্যিক গুরুত্ব এবং পঞ্জাবের সাধারণ গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে ঐ অনুপাতের অতিরিক্ত কিছু প্রতিনিধি দেওয়া উচিত। তদনুসারে তাঁহারা বলিতেছেন, পঞ্জাব, বোম্বাই, ও বিহার-উড়িষ্যার প্রত্যেককে ২৬ জন প্রতিনিধি, মান্দ্রাজ বাংলা ও আগ্রা-অযোধ্যার প্রত্যেককে ৩২, মধ্যপ্রদেশকে ১২, আসামকে ৭, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে ৩ এবং দিল্লী, আজমের, কুর্গ ও বালুচীস্থানকে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি দেওয়া হউক। এইরূপ প্রস্তাবে বড় প্রদেশগুলির প্রতি, বিশেষতঃ বাংলা দেশের প্রতি কিরূপ অবিচার করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের নিম্নলিখিত লোকসংখ্যা হইতেই বুঝা যাইবে :—

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	প্রস্তাবিত প্রতিনিধি
বাংলা	৫০১২২৫৫০	৩২
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৮৪০৮৭৬৩	৩২
মান্দ্রাজ	৪৬৭৪৮৬৪৪	৩২
বিহার-উড়িষ্যা	৩৭৫৯০৩৫৬	২৬
পঞ্জাব	২৩৫৮০৮৫১	২৬
বোম্বাই	২২০৫৯৯৭৭	২৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৫৪৭২৬২৮	১২
আসাম	৮৬২২২৫১	৭
উ. প.-সীমান্ত প্রদেশ	২৪২৫০৭৬	৩
দিল্লী	৬৩৬২৪৬	১
আজমের-মেরোআরা	৫৬০২৯২	১
বালুচীস্থান	৪৬৩৫০৮	১
কুর্গ	১৬৩০৮৯	১

বাংলা দেশের লোকসংখ্যা পঞ্জাবের ও বোম্বাইয়ের দ্বিগুণেরও বেশী, অথচ বাংলা পাইবে ৩২ জন প্রতিনিধি এবং পঞ্জাব ও বোম্বাই পাইবে ২৬ জন করিয়া! বঙ্গের প্রতি এই অবিচারের প্রতিবাদ কেবল গোলটেবিল বৈঠকে ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের প্রতিনিধি গ্যাভিন জোন্স সাহেব করেন। তিনি বলেন, "আগ্রা-অযোধ্যার—বিশেষতঃ বাংলার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। বোম্বাই অপেক্ষা বাংলা বাণিজ্য ও পণ্য কারখানার বড় কেন্দ্র; সুতরাং বাণিজ্যিক গুরুত্ব হিসাবে বোম্বাইকে কেন অতিরিক্ত প্রতিনিধি দেওয়া হইবে তাহা আমি বুঝিতে অসমর্থ।" মিঃ জিন্না আর কোন অবিচার দেখিতে পান নাই, কেবল বলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তিন জন প্রতিনিধিতে সন্তুষ্ট হইবে না! শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম রাও জয়াকর বলেন, যে, বাণিজ্যিক কারণে বোম্বাইকে অতিরিক্ত প্রতিনিধি দেওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে তাঁহার মত এখনও স্থির করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী অন্য কোন কোন বিষয়ে নিজের ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, কিন্তু এই বিষয়টিতে নহে।

মিঃ গ্যাভিন জোন্স যে বাংলাকে বোম্বাইয়ের চেয়ে বড় বাণিজ্য ও পণ্যকারখানা কেন্দ্র বলেন, তাহা সত্য। বোম্বাইয়ে সূতা ও কাপড় বেশী হয়, কিন্তু বঙ্গে পাটের জিনিষ বেশী হয়, এবং তা ছাড়া কয়লার কারবার আছে। বঙ্গের আমদানী রপ্তানী বোম্বাইয়ের চেয়ে বেশী। বোম্বাইয়ের বাণিজ্য ও পণ্যকারখানা যেরূপ বেশী পরিমাণে দেশী লোকদের হাতে, বাংলার তাহা নহে। কিন্তু তাহার জন্য বোম্বাই অতিরিক্ত প্রতিনিধি পাইতে পারে না। টাকার চেয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা নিকৃষ্ট নয়। বঙ্গে উচ্চশিক্ষার বিস্তার বোম্বাই অপেক্ষা অধিক।

বাংলার প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ মহাত্মাজীর করা উচিত ছিল। কংগ্রেসের মতে এবং তাঁহার মতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর ভোট দিবার অধিকার থাকা উচিত। ইহার মানে এই, যে, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে ধনীনির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নিরক্ষর-লিখনপঠনক্ষম, শক্তিমান্-দুর্ব্বল, বুদ্ধিমান-নির্বোধ, কৃষক কারখানার শ্রমিক ও ধনিক, দোকানদার চাষীর মধ্যে কোন অধিকারের তারতম্য থাকিবে না। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে বোম্বাইয়ে শতকরা বেশী ধনিক বণিক দোকানদার কারখানার শ্রমিক আছে বলিয়া ঐ প্রদেশ কেন অতিরিক্ত প্রতিনিধি পাইবে? পঞ্জাব হইতে অধিকসংখ্যক সৈন্য ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট গ্রহণ করেন বলিয়াই বা পঞ্জাব কেন অতিরিক্ত প্রতিনিধি পাইবে? অন্যান্য প্রদেশ হইতে সৈন্য পাওয়া যাইত না, বা তথাকার সৈন্যেরা যুদ্ধে কম নিপুণ ছিল না বলিয়া যে গবর্ন্মেণ্ট পঞ্জাব হইতে বেশী সৈন্য লইতে আরম্ভ করেন, তাহা নহে। প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের লোক-সংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট প্রতিনিধি নাই। আমরা ইহা বার-বার আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিকে দেখাইতেছি। বাঙালী কোন সম্পাদক বা নেতা আমাদের কথার সমর্থন করেন নাই—অবাঙালী কোন সম্পাদক বা নেতা আমাদের যুক্তির সমর্থন বা প্রতিবাদ করেন নাই। ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্র গঠিত হইলেও যে বঙ্গের প্রতি অবিচার থাকিয়া যাইবে, তাহার সূত্রপাত হইতেছে। এখন "ব্যবসাগত" এবং "দেশসেবাসম্বন্ধীয়" ঈর্ষ্যাদ্বেষ ভুলিয়া সব বাঙালী প্রস্তাবিত অবিচারের প্রতিবাদ করিলে ভাল হয়।

আর একটি গুরুতর বিষয়ে বঙ্গের প্রতি অবিচারের প্রস্তাব গোলটেবিল বৈঠকের দুটি সব্‌কমিটি দ্বারা হইয়াছে। বাংলা দেশ হইতে যত পাট এবং পাটনির্ম্মিত জিনিষ রপ্তানী হয়, তাহার উপর শুল্ক বসাইয়া গবন্মেণ্ট প্রতি বৎসর অনেক কোটি টাকা পান। গত ১৪ বৎসরে এই শুল্ক হইতে গবন্মেণ্ট পঞ্চাশ কোটি টাকা রাজস্ব পাইয়াছেন। কিন্তু ইহা ভারত-সরকার লইয়াছেন, বাংলাকে দেন নাই। অথচ প্রায় সমস্ত পাটই বাংলা দেশে উৎপন্ন হয়, বাংলার চাষী জলে ভিজিয়া রোদে পুড়িয়া ইহা উৎপন্ন করে। পাট পচাইতে বাংলার জলই দুর্গন্ধ হয়। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং বাংলা দেশের খবরের কাগজে এই অবিচারের প্রতিবাদ বার-বার করা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও প্রস্তাব হইয়াছে, পাট-শুল্ক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পাইবে, বাংলা দেশ পাইবে না। গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গের প্রতিনিধি স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র এবং মিঃ আবু হালিম গজনবী উপযুক্ত ও সত্যমূলক কারণ দেখাইয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের মতভেদ নাই। বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের সহিত একমত হইয়া মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য প্রতিনিধিরা বঙ্গের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ করিলে প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা প্রতিবাদ করিবেন, আশা হইতেছে না।

অন্যেরা কিছু করুন বা না-করুন, বঙ্গের প্রতি প্রস্তাবিত অবিচারের যে দুটি দৃষ্টান্ত দিলাম, আশা করি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যন, ভারত সভা, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ্ কমার্স, এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তাহার প্রতিবাদ করিবেন এবং প্রতিবাদের অনুলিপি টেলিগ্রাফ করিয়া বিলাতে প্রধান মন্ত্রী, ভারত-সচিব, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে পাঠাইবেন। বহরমপুরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স হইবে, তাহাতেও এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা হওয়া এবং যথাযোগ্য প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। তাহাও টেলিগ্রাফযোগে বিলাতে প্রেরিত হওয়া উচিত।

—

শুধু প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব ?

বিলাতে এইরূপ একটা সংবাদ বাহির হইয়াছে এবং গুজব রটিয়াছে, যে, আপাততঃ ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষকে কেবল প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব দিবেন, যুক্তরাষ্ট্র পরে গঠিত হইবে, কেন্দ্রীয় ভারত-গবন্মেণ্টকে ব্যবস্থাপক সভার মারফতে লোকমতের নিকট দায়ী করিবেন না। একটা কাগজে ইহার প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহা সত্য মনে হয়। কারণ, নূতন ভারত-সচিব স্যর সামুয়েল হোর আগেই বলিয়া দিয়াছেন, সৈন্যদলের উপর, রাজস্বের উপর এবং বৈদেশিক ব্যাপারের উপর কর্তৃত্ব ব্রিটিশ গবন্মেণ্টেরই থাকিবে। রাজা পঞ্চম জর্জও বলিয়াছেন, যে, ভারত গবন্মেণ্টকে ক্রমে ক্রমে জনমতের নিকট দায়ী করা হইবে—আপাততঃ কেবল প্রদেশগুলিকে কর্তৃত্ব দেওয়া হইবে।

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ সাতাশ জন প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডন্যাল্ডকে এ বিষয়ে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন, যে, গোড়া হইতেই ভারত-গবন্মেণ্টকে নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার মধ্য দিয়া লোকমতের নিকট দায়ী করিতে হইবে, এবং যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে, শুধু প্রাদেশিক কর্তৃত্ব দিলে হইবে না; সংখ্যান্যূন সম্প্রদায়গুলির সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার জন্য পূর্ণমাত্রায় দায়ী গবন্মেণ্টের ব্যবস্থা স্থগিত রাখা উচিত নয়; ঐরূপ দায়ী গবন্মেণ্ট

প্রতিষ্ঠা দ্বারাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

প্রধান মন্ত্রী ইহার জবাব দিয়া থাকিলে কি জবাব দিয়াছেন, এখনও (৯ই নবেম্বর) জানিতে পারি নাই।

—

হিজলীর হত্যাকাণ্ড ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

হিজলীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সরকারী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন, তাহা যথাযোগ্য হইয়াছে। মিথ্যা জ্ঞাপনী বাহির করা প্রভৃতি বিষয়ে কমিটি গবন্মেণ্টকে দোষী করিয়াছেন, এবং অপরাধী ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দিতে ও আহত ব্যক্তিদিগের ক্ষতিপূরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কমিটির প্রস্তাবের এই অংশের প্রতি আমাদের মনোনিবেশের আবশ্যক নাই। কিন্তু উত্তেজনার কারণ সত্ত্বেও বাংলা দেশের লোকদিগকে যে নিরুপদ্রব থাকিতে এবং সংঘবদ্ধভাবে একযোগে কাজ করিতে কমিটি অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করিতেছি। এই অনুরোধ পালন করা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু একান্ত আবশ্যক।

—

হিন্দু অবলা আশ্রম

হিন্দু অবলা আশ্রমের পরিচালন ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে কমিটির সভ্য শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী এবং শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতানের স্বাক্ষর নাই। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী এবং শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিমৎসিংকা কমিটির কার্য্যপ্রণালী ও রিপোর্ট সম্বন্ধে খবরের কাগজে আলাদা আলাদা চিঠি লিখিয়াছেন। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া, আশ্রমের পরিচালনায় কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা এবং আশ্রমবাসিনী কাহারও কাহারও প্রতি অত্যাচার দুর্ব্যবহার হইয়া থাকিলেও, রিপোর্টে লিখিত সব কথা সত্য মনে হয় না। এই ধারণাও হয়, যে, কমিটিতে আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈনের প্রতি আগে হইতেই বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোক ছিলেন। ইহা ঠিক হয় নাই।

ইহা নিশ্চয়, যে, আশ্রমটি এ পর্য্যন্ত যেভাবে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়া চালান যাইতে পারে। সুপরিচালিত একটি আশ্রম একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সে-বিষয়ে আমাদের বাঙালী হিন্দু নেতাদের ও সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আগে ছিল না—এখন অনেকে এ কাজে অর্থ সময় ও শক্তি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কি না, জানি না। হইয়া থাকিলে ভাল।

সম্প্রতি স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে হিন্দু অবলা আশ্রম সম্বন্ধে যে জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অসহায়া হিন্দু নারীদিগের জন্য একটি আশ্রমের ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর উপর দেওয়া হইয়াছে। যে আশ্রমটি এখন আছে, তাহার সম্বন্ধে তদন্ত কমিটির নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলির আমরা সমর্থন করি।

যে সকল বালিকাকে বেশ্যালয় বা ঘৃণ্য স্থান হইতে আনয়ন করা হয়, অথবা যাহারা ঘৃণিত জীবন যাপন করে, তাহাদিগকে অন্যান্য বালিকা হইতে পৃথক করিয়া রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহাতে অবশ্য ব্যয় বেশী হইবে, কিন্তু সম্ভবপর হইলে হিন্দু সমাজের উহা বহন করা কর্ত্তব্য।

(১) ম্যানেজিং কমিটিতে যাহাতে অধিকসংখ্যক মহিলা যোগদান করিয়া আশ্রমের কার্য্য সুপরিচালিত করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য।

(২) কম-বয়স্কা বালিকাদিগকে প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। ইহাতে আশ্রমের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ঐ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৩) অপেক্ষাকৃত উত্তম ও সুবিধাজনক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। শহরের জনবহুল স্থানে উহা রাখা উচিত নহে।

(৪) আশ্রমে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যবস্থা করা দরকার। আশ্রমবাসিনীদের অবস্থানকালের স্থিরতা না থাকায় সম্ভবতঃ এই কার্য্য কঠিন হইবে, কিন্তু ইহার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয়।

(৫) আশ্রমে অপেক্ষাকৃত উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে মাত্র অল্পবয়স্কা বালিকাদের শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা আছে।

(৬) আশ্রমবাসিনীদের মন হইতে কারার ভয় দূর করিতে হইবে। শারীরিক শাস্তিবিধান নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

(৭) কতিপয় বাহিরের মহিলাকে আশ্রম পরিদর্শনের কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত।

(৮) সম্ভবপর হইলে আশ্রমে সকল সময়ের জন্য একজন সম্পাদক রাখিতে হইবে।

(৯) সর্ব্বোপরি আশ্রমে নৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

উল্লিখিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কাজ করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক হইবে, কিন্তু প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এজন্য হিন্দু সমাজের প্রস্তুত হওয়া উচিত।

বর্ত্তমান আশ্রমটি যদি টিকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবগুলি অনুসারে কাজ করিলে ফল ভালই হইবে। উহা যদি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে যে আশ্রম স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা উদ্ধৃত প্রস্তাবাবলী অনুযায়ী নিয়ম অনুসারে চালাইতে হইবে।

—

রুশীয় টেলিগ্রাম ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর

কয়েক দিন হইল, রুশিয়া হইতে অধ্যাপক পেট্রভ রবীন্দ্রনাথকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। কর্ত্তৃপক্ষ যে-ব্যক্তিই হউন, উহার কোন কোন অংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিলে তাঁহার অকল্যাণ হইবে এবং উহা প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের ও গ্রেট ব্রিটেন সমেত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অমঙ্গল হইবে, ঐ ব্যক্তির এই আশঙ্কায় তিনি (অর্থাৎ ঐ সর্ব্বজন অভিভাবক) টেলিগ্রামটির কোন কোন অংশ বাদ দিয়া বাকী রবীন্দ্রনাথকে ডাকঘরের মারফৎ প্রেরণ করেন। ছাঁট বাদে উহা এইরূপ :—

To

Rabindranath Tagore.

Santiniketan, India.

What is your explanation of gigantic growth of U. S. S. R. industry; its high tempo of development; setting up of extensive collectivized, mechanized agriculture; liquidation of illiteracy; tremendous increase in number of scientific institutions, universities, schools; and cultural upheaval of U. S. S. R. in general?

What problems will confront you in your work during next five years and what obstacles?

Please telegraph for Soviet press, Moscow Kultviaz.

Petrov. V. O. K. S., Moscow.

রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাফে ইহার এই উত্তর দিয়াছেন :—

To Professor Petrov, V. O. K. S., Moscow. Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity.

Our obstacles are social and political inanity, bigotry and illiteracy.

Rabindranath Tagore.

—

স্বদেশীর ক্রেতা ও বিদেশীর বিক্রেতা

গোলটেবিল বৈঠক হইতে স্বরাজলাভের উপায় হউক বা না-হউক, দেশের মঙ্গলের জন্য, আমাদের প্রত্যেকের হিতের জন্য স্বদেশী প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রস্তুত করিতে ও তাহা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা সবাই যদি স্বদেশীর ক্রেতা হই, তাহা হইলে দোকানদাররা বিদেশী জিনিষ রাখা বন্ধ করিবে। অতএব বিদেশী জিনিষ বিক্রেতা দোকানে পিকেটিং অনাবশ্যক না হইলেও, দেশের প্রত্যেক মানুষকে স্বদেশী জিনিষ কিনিতে ইচ্ছুক করা পিকেটিঙের চেয়ে অনেক বেশী দরকার। আমাদের সকলের যথাসাধ্য নিজ নিজ সুযোগ অনুসারে স্বদেশী জিনিষের প্রচারক হওয়া কর্ত্তব্য—আচরণ দ্বারা এবং লেখা ও কথা দ্বারা।

—

"ভারতবন্ধু"

দিল্লীর ইংরেজী দৈনিক হিন্দুস্থান টাইমসের লণ্ডনস্থ বিশেষ সংবাদদাতা তার করিয়াছেন, যে, যে-সব ইংরেজ আপাততঃ ভারতবর্ষকে কেবল প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব দিয়া কেন্দ্রীয় ভারত-গবর্ন্মেণ্টকে জনমতের নিকট দায়ী করার প্রশ্ন ও সমগ্র ভারতবর্ষকে যুক্ত-রাষ্ট্রে (Federated India-তে) পরিণত করার প্রশ্ন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে চান এবং যাঁহারা ইংরেজ ও ভারতীয় ইংরেজদিগকে এই মতে আনিবার জন্য দেখাসাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতবন্ধু বলিয়া পরিচিত লর্ড আরুইন ও লর্ড ল্যাংকী আছেন। মানুষ চেনা সোজা নয়।

—

প্রবাসী বাঙালী সম্মেলন

এবার প্রবাসী বাঙালী সম্মেলন এলাহাবাদে হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, মাননীয় বিচারপতি লালগোপাল মুখোপাধ্যায়। এই নির্ব্বাচন সকলের অনুমোদনযোগ্য। সম্মেলন খৃষ্টমাসের ছুটিতে হইবে। ঐ ছুটিতে রবীন্দ্রজয়ন্তী হইবে। এই জয়ন্তীতে সকল জায়গার বাঙালীরা আসিলে অত্যন্ত

আনন্দের বিষয় হয়। এই জন্য প্রবাসী বাঙালী সম্মেলন অন্য সময়ে করা চলে কিনা, বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

—

বাঙালী মুসলমান রসায়নাধ্যাপক

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্‌সি উপাধি প্রাপ্ত ডক্টর কুদ্রৎ-ই-খোদা প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যোগ্য লোক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

—

বন্যায় বিপন্ন লোকদের সংখ্যা

উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে বন্যায় বিপন্ন লোকদিগকে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে হইবে। যে-সব সমিতি সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের হাতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সাহায্য দিবার মত টাকা নাই। "সঙ্কট ত্রাণ সমিতি" দেড় লক্ষের উপর টাকা পাইয়াছেন। তাহার অর্দ্ধেকেরও উপর তাঁহাদের হাতে আছে। এই সমিতি ও অন্য কোন কোন সমিতি সম্ভবতঃ চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সাহায্য দিতে পারিবেন। হিন্দুসভার সাহায্য সমিতি সামান্য দশ এগার হাজার টাকা মাত্র পাইয়াছেন। তাহার অধিকাংশ খরচ হইয়া গিয়াছে। আরও কোন কোন সমিতি এইরূপ সামান্য টাকা পাইয়াছেন। ইহাঁদের কাজ শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে হইলে আরও টাকা আবশ্যক হইবে। হিন্দুসভা যেখানে যেখানে সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়াছেন, তথাকার বিপন্ন অহিন্দুদিগকেও সাহায্য দিতেছেন। হিন্দুসভার হাত দিয়া যাঁহারা সাহায্য দিতে চান, তাঁহারা, ৯ নং উইলিয়ম্‌স্ লেন, শিয়ালদহ, কলিকাতা, ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে টাকা পাঠাইলে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

—

ইংলণ্ডেশ্বরের দরবারে "অর্দ্ধনগ্ন" মানুষ

ইংরেজদের ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে আহারাদি ভিন্ন ভিন্ন কাজের ও নানা উপলক্ষ্যের পোষাক সম্বন্ধে কড়া আদব-কায়দা প্রচলিত আছে। দরবারে পোষাকের ত এক চুলও এদিক ওদিক হইবার জো নাই। সুতরাং ইংলণ্ডের রাজা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রাসাদে গোলটেবিল বৈঠকের সভ্যদের অভ্যর্থনায় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার খাট খদ্দরের ধুতি পরিয়া যাওয়াতে যে কোন আপত্তি হয় নাই, ইহাতে তাঁহার অসামান্য শক্তি প্রভাব ও চরিত্র-গৌরবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

—

কংগ্রেস কমিটি ও গান্ধীজীর ইউরোপ-ভ্রমণ

দেশের অবস্থা অতি দ্রুত সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে বলিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মাজীকে, ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সত্বর ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

দেশের অবস্থা নিশ্চয়ই সঙ্গীন। কিন্তু যদি আবার নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন আরম্ভ করিতে হয়, তাহাতে একমাস বা দুই মাস দেরি হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। সে-পর্য্যন্ত দেশের কাজ চালান এবং কর্ম্মীদিগকে দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া গান্ধীজী ভিন্ন অন্য নেতাদের সাধ্যাতীত হওয়া উচিত নয়। ইউরোপের যে-সব দেশ মহাত্মা গান্ধীকে আহ্বান করিয়াছে, সেখানে গেলে পৃথিবীর উপকার হইবে, মানব জাতির মধ্যে যুদ্ধোন্মুখতার পরিবর্ত্তে অহিংস মীমাংসার প্রবৃত্তি বৃদ্ধির সাহায্য হইবে, পাশব বলের চেয়ে আধ্যাত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠতার কিছু সাক্ষাৎ পরিচয় ইউরোপীয়েরা পাইবে, এবং ভারতবর্ষের প্রভাব ও ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি বাড়িবে। এই সব কারণে তাঁহার ইউরোপ-ভ্রমণে আপত্তি না-করাই উচিত। (১০ই নবেম্বর লিখিত)

—

হিন্দু মহাসভা ও বাংলা দেশ

বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভায় আইন দ্বারা অর্দ্ধেকের উপর প্রতিনিধির পদ স্থায়ী ভাবে মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখার বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু মহাসভা কোন কালে ইহাও চান নাই, যে, হিন্দুপ্রধান প্রদেশ সকলের এবং হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভা সকলের

অধিকাংশ প্রতিনিধির পদ হিন্দুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হউক। কোন সম্প্রদায়ের জন্যই অধিকাংশ সভ্যের পদ নির্দ্দিষ্ট রাখা উচিত নয়। ইহা গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন নীতির বিরোধী।

যে-সব ওড়িয়াভাষী অঞ্চল এখন উড়িষ্যার বাহিরে আছে তাহাদিগকে উড়িষ্যাভুক্ত করিবার জন্য যেমন সরকারী কমিটি বসিয়াছে, বাংলাভাষী অথচ বর্ত্তমানে বঙ্গের বহির্ভূত অঞ্চলগুলিকে সেইরূপ বঙ্গভুক্ত করিবার জন্য একটি সরকারী সীমা কমিশন নিয়োগ করিতে হিন্দু মহাসভার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

—

এলাহাবাদে সঙ্গীত সম্মেলন

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত সভার উদ্যোগে এলাহাবাদে সঙ্গীত কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং সভাপতি হইয়াছিলেন এলাহাবাদ ডিভিসনের কমিশনার শ্রীযুক্ত বিনয়েক মেহ্‌তা। মেহ্‌তা মহাশয় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় এবং ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষার জন্য সঙ্গীতকে একটি বৈকল্পিক শিক্ষণীয় বিষয় করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে,

"The credit of reviving music in public for respectable women goes to Bengal and the Brahmo Samaj. In Gujarat and Rajputana the custom of caste and mohalla group singing kept up the old tradition."

"ভদ্রমহিলাদের প্রকাশ্য স্থানে গান গাওয়ার পুনঃপ্রচলনের প্রশংসা বঙ্গদেশের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাপ্য। গুজরাট ও রাজপুতানায় এক এক জা'তের ও মহল্লার মেয়েদের দল বাঁধিয়া গান করিবার রীতি দ্বারা পুরাতন প্রথা সংরক্ষিত হইয়াছে।"

কন্‌ফারেন্সে কাশীর সৌখীন ওস্তাদ শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু বীণা বাজাইয়াছিলেন। বালকবালিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গীতের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি), রায়-সাহেব পণ্ডিত সত্যানন্দ জোষী, শ্রীযুক্ত আর. সি. রায় এবং শ্রীযুক্ত এ. সি. মুখুজ্যে বিচারক কমিটির সভ্য ছিলেন। যে সব ওস্তাদ কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে "লীডার" কাগজে ইনায়ৎ খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, নারায়ণ রাও ব্যাস, পর্ব্বত সিং, বীরু মিশ্র, নাজিম খাঁ, জহুর খাঁ, দলমুখ রাম, আফতাব উদ্দীন, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

—

হিজলীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

হিজলীর ব্যাপার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ইংরেজী বহু দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি 'প্রবাসী'র জন্য বাংলাতে তাঁহার বক্তব্য এইরূপ লিখিয়া দিয়াছেন :—

হিজলী-কারার যে রক্ষীরা সেখানকার দু-জন রাজ-বন্দীকে খুন ক'রেচে তাদের প্রতি কোনো একটি এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র খৃষ্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেচেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের 'পরে এত বেশী অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচার-বুদ্ধিসঙ্গত স্থৈর্য্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এই-সব অত্যন্ত চড়া নাড়ীওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মান ভোগ ক'রে থাকে, এদের বাসা আরামের, আহার-বিহার স্বাস্থ্যকর;—এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই সব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্ব্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দ্দিষ্টকালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতি-নিয়ত পীড়িত করচে। সম্পাদক তাঁর সকরুণ প্যারাগ্রাফের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ ক'রে সেই হত্যাকারীদের পীড়িত চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চার করেচেন।

অধিকাংশ অপরাধেরই মূলে আছে স্নায়বিক অভিভূতি, এবং লোভ, ক্লেশ, ক্রোধের এত দুর্দ্দম উত্তেজনা যে তাতে সামাজিক দায়িত্ব ও কৃত কার্য্যের পরিণাম সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়। অথচ এ রকম অপরাধ স্নায়ুপীড়া বা মানসিক বিকার থেকে উদ্ভূত হ'লেও আইন

তার সমর্থন করে না,—করে না ব'লেই মানুষ আত্মসংযমের জোরে অপরাধের ঝোঁক সামলিয়ে নিতে পারে। কিন্তু করুণার পীযূষকে যদি বিশেষ যত্নে কেবল সরকারী হত্যাকারীদের ভাগেই পৃথক ক'রে জোগান দেওয়া হয়, এবং যারা প্রথম হতেই অন্তরে নিঃশাস্তির আশা পোষণ করচে, যারা বিধিব্যবস্থার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হ'য়েও বিধিব্যবস্থাকে স্পর্দ্ধিত আস্ফালনের সঙ্গে ছারখার ক'রে দিল, যদি সুকুমার স্নায়ুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদেরই জন্যে একটা স্বতন্ত্র আদর্শের বিচারপদ্ধতি মঞ্জুর হ'তে পারে, তবে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র ন্যায়বিচারের যে মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েচে তাকে অপমানিত করা হবে, এবং সর্ব্বসাধারণের মনে এর যে ফল ফলবে তা অজস্র রাজদ্রোহ প্রচারের দ্বারাও সম্ভব হবে না।

পক্ষান্তরে এ কথা মুহূর্ত্তের জন্যেও আশা করিনে যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রনৈতিক যে-সব গোঁড়ার দল যথারীতি প্রতিষ্ঠিত আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হবে তারা যেন ন্যায়দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায়—এমন কি, যদিও-বা চোখের সামনে রোমহর্ষক দৃশ্যে ও কাপুরুষ অত্যাচারীদের বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণে তাদের স্নায়ুপীড়ার চরমতা ঘটে থাকে। বিধর্ষিত আত্মীয়স্বজন ও নিজেদের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যদি তা'রা কোনো কঠোর দায়িত্ব কল্পনা ক'রে নেয়, তবে সেই সঙ্গে একথাও যেন মনে স্থির রাখে যে, সেই দায়িত্বের পুরো মূল্য তাদের দিতেই হবে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা য়ুরোপীয় ইস্কুল-মাষ্টারদের যোগেই পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতালাভের ইতিহাসটিকে বিধিমতে হৃদয়ঙ্গম ক'রে নিয়েচে, এবং এও বলা বাহুল্য যে, সেই ইতিহাস রাজা প্রজা উভয়পক্ষের দ্বারা প্রকাশ্যে বা গোপনে অনুষ্ঠিত আইনবিগর্হিত বিভীষিকায় পরিকীর্ণ,—অনতিকাল পূর্ব্বে আয়র্লাণ্ডে তার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত।

তথাপি বেআইনী অপরাধকে অপরাধ বলেই মানতে হবে এবং তার ন্যায়সঙ্গত পরিণাম যেন অনিবার্য্য হয় এইটেই বাঞ্ছনীয়। অথচ এ কথাও ইতিহাসবিখ্যাত যে যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্ব্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ ক'রে ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্তিতার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নীতি শেষ পর্য্যন্ত সফল হ'তে পারে না।

পরিশেষে আমি বিশেষ ভাবে গবর্মেণ্টকে এবং সেই সঙ্গে আমার দেশবাসিগণকে অনুরোধ করি যে অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডব নৃত্য এখনি শান্ত হোক্। ক্রোধ ও বিরক্তিপ্রকাশকে বাধামুক্ত ক'রে দেওয়া সাধারণ মানবপ্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা শাসক শাসয়িতা কারও পক্ষেই সুবিজ্ঞতার লক্ষণ নয়। এ রকম উভয় পক্ষে ক্রোধমত্ততা নিরতিশয় ক্ষতিজনক—এর ফলে আমাদের দুঃখ ও ব্যর্থতা বেড়েই চলবে এবং এতে শাসনকর্ত্তাদের নৈতিক পৌরুষের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসহানি ঘটবে, লোকসমাজে এই পৌরুষের প্রতিষ্ঠা তার ঔদার্য্যের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

বাংলার সর্ব্বত্র এবং বিশেষ করিয়া হিজলী, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির প্রকোপ চলিতেছে। এ অবস্থায় বাংলার জনসাধারণের কর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য আগামী ৫ই ও ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের এক বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় শিল্পের একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন হইতেছে।

—

বঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যু

১৯৩০ সালের বার্ষিক পুলিস রিপোর্ট হইতে কলিকাতা ছাড়া বঙ্গের অন্য সব জায়গার আত্মহত্যা প্রভৃতি হইতে মৃত্যুর সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

আত্মহত্যা—

	১৯২৯	১৯৩০
পুরুষ	১২১৩	১৩০৪
স্ত্রীলোক	১৯৩৫	১৮২২
বালক-বালিকা	৩৮	৪২
মোট	৩১৮৬	৩১৬৮

জলে ডুবা—

পুরুষ	১০২৫	৮৭৭
স্ত্রীলোক	৯৬১	৮৯৮
বালক-বালিকা	৭১৬৫	৬৬৪৭
মোট	৯১৫১	৮৪২২

সাপের কামড়—

পুরুষ	১৩৫৮	১২৯৮
স্ত্রীলোক	১৪৮৫	১৩৮১
বালক-বালিকা	৮৪৬	৭৫০
মোট	৩৬৮৯	৩৪২৯

হিংস্রজন্তুর আক্রমণ—

পুরুষ	৫৮	৪৭
স্ত্রীলোক	২৬	১৬
বালক-বালিকা	৮১	৫১
মোট	১৬৫	১১৪

ঘর ভাঙিয়া পড়া—

পুরুষ	১১৯	৯৯
স্ত্রীলোক	৪৫	৩৫
বালক-বালিকা	৫৫	৩০
মোট	২১৯	১৬৪

অন্যান্য কারণে—

পুরুষ	৯৭৫	১১১৩
স্ত্রীলোক	৫২০	৪৮৪
বালক-বালিকা	৫৪২	৫০২
মোট	২০৩৭	২০৯৯

পাশ্চাত্য যে-সব সভ্য দেশে আত্মহত্যার হিসাব পাওয়া যায়, তাহাতে সাধারণতঃ দেখা যায় পুরুষেরাই বেশী আত্মহত্যা করে। তাহার কারণ, স্ত্রীলোকদের চেয়ে তাহাদের জীবন-সংগ্রাম কঠিনতর এবং তাহাদের ঝঞ্ঝাট বেশী। বাংলা দেশে পুরুষদের চেয়ে অনেক স্ত্রী-লোকের জীবন বেশী দুঃখময় বলিয়া তাহাদের মধ্যে আত্মহত্যা বেশী। ইহা আমাদের সামাজিক কলঙ্ক।

জলে ডুবিয়া মৃত্যুর সংখ্যা দেখিলে সাঁতার দিতে শিখিবার প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধ হইবে।

পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ বেশী ঘরে থাকে। সাপ ঘরে অপেক্ষা ঘরের বাহিরে বেশী। এই জন্য, সাপের কামড়ে স্ত্রীলোকদের অধিক মৃত্যুর কারণ আলোচনা আবশ্যক।

—

মূলগন্ধকুটি বিহারের প্রাচীরগাত্রের চিত্র

আমরা আগামী সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সারনাথ বিহারের উন্মোচন সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিব আশা করি। ঐ বিহারের দেয়ালের চিত্রাবলী সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিবার পর পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও আমাদের সহিত অনাগারিক দেবমিত্র ধর্ম্মপাল মহাশয়ের এ-বিষয়ে আলোচনা হয় এবং ধর্ম্মপাল মহাশয় বলেন যে, যাহাতে মূলগন্ধকুটি বিহারের দেয়ালের চিত্রাবলী বাঙালী চিত্রকরদের দ্বারা অঙ্কিত করানো হয়, তাহার চেষ্টা করা হইবে।

পঞ্চশস্য

মল্লযুদ্ধে জিম ম্যাকমিলন—

কলেজের ছেলেরা এতকাল ফুটবল, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি খেলাই খেলিয়া আসিয়াছে। গেল বৎসর তাহারা মল্লযুদ্ধে মন দিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। মল্লযুদ্ধ এতকাল অকলেজীয় স্থূলকায় লোকদিগের একরূপ একচেটিয়া ছিল। কলেজের ছেলেরা কিন্তু আসর হইতে তাহাদিগকে হটাইয়া দিতেছে এবং প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, এ খেলায় স্থূল বপুর মোটেই প্রয়োজন নাই। শুধু ক্ষিপ্রকারিতা, অঙ্গচালনার কৌশলাদিই এ খেলায় যথেষ্ট। গেল বৎসর কলেজীয় ছাত্র জিম ম্যাকমিলন মল্লযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া সম্মান লাভ করিয়াছেন।



কুস্তীর দুইটি কসরৎ



রবারের চাষ—

প্রাচ্যখণ্ডে ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপে, এবং জাভা, সুমাত্রা, ডচ বোর্ণিও এবং নেদারল্যাণ্ডস্ ইন্ডিয়া প্রভৃতি ওলন্দাজ উপনিবেশগুলিতে জগতের দশ ভাগের নয় ভাগ রবার চাষ হয়। ভারতীয় তামিল শ্রমিকদেরই রবার উৎপাদন কার্য্যে এযাবৎ একাধিপত্য ছিল। ইদানীং চীনা শ্রমিকরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে। কারণ, আমিষভোজীরাই নাকি



রবার-বৃক্ষের চাষের জন্য জঙ্গল কাটা হইতেছে



রবার-রস 'বলে' পরিণত করা হইতেছে। ইহাকে বিস্কুট বলে



শ্রমিকরা রবারের বীজ বপন করিতেছে



৭।৮ বৎসর পরে রবার বৃক্ষে ক্ষরণ আরম্ভ হইলে
শ্রমিকরা রবারের রস সংগ্রহ করে



সেকার পরে বিস্কুটগুলিকে একদিন রোদে রাখা হয়



দুই বৎসর পরে রবার গাছগুলি বড় হইয়া সুরম্য উদ্যানে পরিণত হইয়াছে



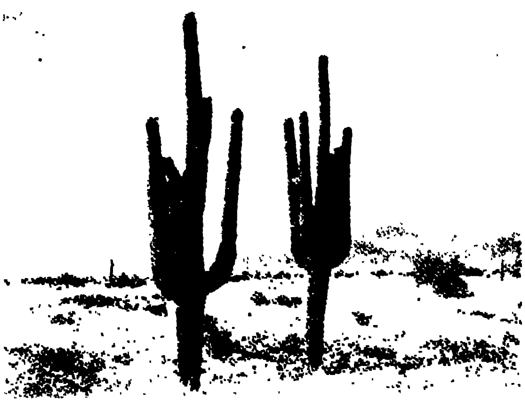
কাঁচা রবার বিস্কুট করিয়া জগতের বিভিন্ন
কারখানায় পাঠানো হয়

একার্য্যে অধিকতর তৎপর। নিরামিষাশী, অল্পভোজী লোকেরা ত
পরিশ্রম করিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া রবার-চাষের কর্ত্তাদের ধারণা

মরুভূমি উদ্ধার—

জগতের লোকসংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে





মরুভূমি উদ্ধার করিয়া গাছ-পালা জন্মান হইয়াছে

মরুভূমি উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। মার্কিনে এইরূপ চেষ্টা চলিয়াছে। মরুভূমি উদ্ধার করার পরে সেখানে জাত গাছপালার ছবি এখানে দেওয়া যাইতেছে।

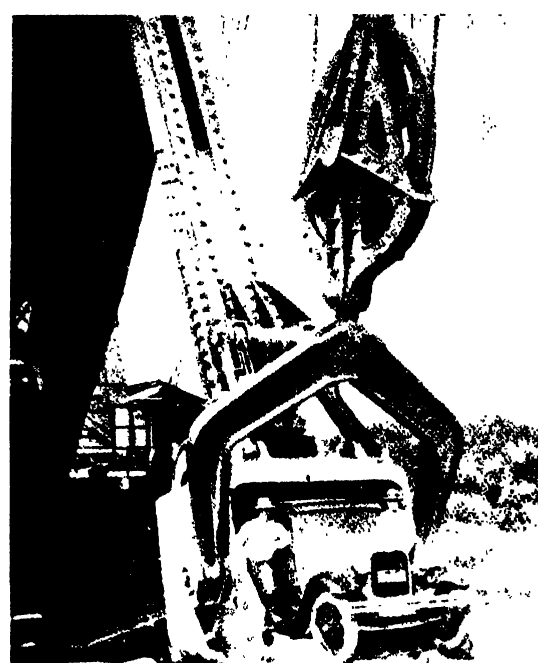
প্রথম ফোর্ড মোটরকার—

সঙ্গের ছবিটি দেখিয়া আজকালকার লোকে হয়ত বুঝিতেই পারিবেন না যে যানটি কোন্ জাতীয়। চেয়ার, না কোন নূতন ধরণের ট্রাইসাইক্ল, বলা শক্ত। আসলে কিন্তু এটি প্রথম ফোর্ড মোটর কার। নির্ম্মাতা হেনরী ফোর্ড স্বয়ং বৃদ্ধ জন বরোজের সহিত গাড়ীতে সগর্ব্বে উপবিষ্ট। আজকালকার মোটর গাড়ীর পাশে রাখিলে হাস্যকর দেখাইবে বটে, কিন্তু ইহা বর্ত্তমান যুগের সুন্দর সুন্দর মোটর গাড়ীরই পিতামহের (না, পিতার ?) ফটোগ্রাফ।



হেনরী ফোর্ড (দক্ষিণে) ও জন বরোজ।
প্রথম ফোর্ড কারে আসীন।

কয়লা তুলিবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র—

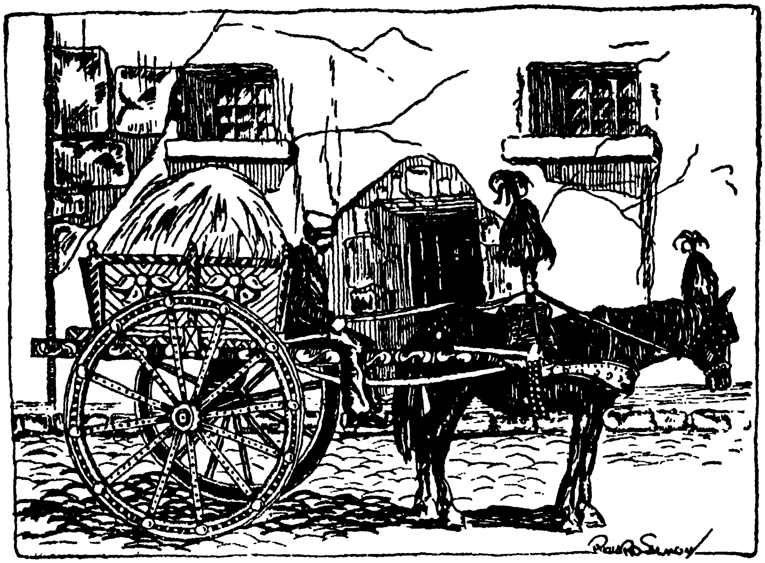


কয়লা তুলিবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র

এই যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে স্বল্পব্যয়ে খনি হইতে কয়লা কাটা হইয়া থাকে।

ইতালীর কথা—

মুসোলিনীর আমলে ইতালীর নানা দিকে উন্নতি হইতেছে। ইহাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টাও হইতেছে প্রচুর। এই জন্য বিলাসিতা বর্জ্জন ও কর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নের একটি ছবিতে ইহার আভাস পাওয়া যাইবে।



চিত্রিত দুই-চাকা গাড়ী



ইতালীর একটি অসমাপ্ত গৃহ। সমাপ্ত গৃহের উপর কর অধিকতর

প্রথম যুগের মোটরকার—

১৮৯২ সনে চলিবার মত মোটর গাড়ী মার্কিনে প্রস্তুত হয়।



১৯০৪ সনের ঘণ্টায় ১০ মাইল চলার একখানি মোটর গাড়ী

পরে ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইতে থাকে। প্রথম যুগের একখানি গাড়ীর চিত্র এখানে দেওয়া গেল।

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বাতায়ন-তলে

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন-গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩১শ ভাগ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৩৮ | ৩য় সংখ্যা

জন্মদিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার প্রথম জন্মদিন
এনেছে মর্ত্ত্যের ঘাটে যে-প্রাণ নবীন,
চিরন্তন মানবের মহাসত্তামাঝে
এলো কোন্ কাজে ?
এক আমি-কেন্দ্র ঘিরে
ফিরে ফিরে
মুহূর্ত্তের দল অগণন
সৃষ্টির নিগূঢ় শক্তি করিয়া বহন
দিন রাতি
কী গাঁথনি তুলিতেছে গাঁথি'
আলোয় ছায়ায়,
বিচিত্র বেদনাঘাতে ঝঙ্কৃত কায়ায়,
রূপে রসে বর্ণে নৃত্যে গন্ধে গানে বেষ্টিত মায়ায়।

যে ক্ষুধা চক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে,
স্পর্শের যে ক্ষুধা ফিরে দিকে দিকে বিশ্বের আহ্বানে,

উপকরণের ক্ষুধা কাঙাল প্রাণের,
ব্রত তা'র বস্তু সন্ধানের,
মনের যে ক্ষুধা চাহে ভাষা,
সঙ্গের যে ক্ষুধা নিত্য পথ চেয়ে করে কার আশা,
যে ক্ষুধা উদ্দেশহীন অজানার লাগি'
অন্তরে গোপনে রয় জাগি'
সবে তা'রা মিলি' নিতি নিতি
নানা আকর্ষণ বেগে গড়ি' তোলে মানস-আকৃতি।
কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,
কত না সংশয় তর্ক, কত না বিশ্বাস,
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা,—
মন-গড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিনে ভেঙে করে ঢেলা.
অতীতের বোঝা হ'তে আবর্জ্জনা কত
জটিল অভ্যাসে পরিণত,
বাতাসে বাতাসে ভাসা বাক্যহীন কত না আদেশ
দেহহীন তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ,
হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি
কত স্বপ্নমূর্ত্তি আঁকে দেয় পুনঃ মুছি,'
কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব তরে
কত না আকাশ-যাত্রা কল্প-পক্ষ ভরে,
কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্ম বিড়ম্বনা,
কত জয় কত পরাভব
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
ভালো মন্দ শাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্ত্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয় ॥

জন্মদিনে জন্মদিনে গাঁথনির কর্ম্ম হবে শেষ,
সুখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্লেশ,

আরব্ধ ও অনারব্ধ সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ,
তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ
তুমি-রূপে পুঞ্জ হ'য়ে, শেষে
কয়দিন পূর্ণ করি' কোথা গিয়ে মেশে।
যে চৈতন্যধারা
সহসা উদ্ভূত হ'য়ে অকস্মাৎ হবে গতি-হারা,
সে কিসের লাগি,—
নিদ্রায় আবিল কভু, কখনো বা জাগি'
বাস্তবে ও কল্পনায় আপনার রচি' দিল সীমা,
গড়িল প্রতিমা।
অসংখ্য এ রচনায় উদ্ঘাটিছে মহা ইতিহাস,—
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস॥

জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি' প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য ক'রে জানা।
আছো আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আপন গদগদ বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
বাধা পায় প্রকাশ-আগ্রহে,
মাঝখানে থেমে যায় মৃত্যুর শাসনে।
তোমার যে সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলেরে নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তা'র শেষ সার্থকতা।
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা।
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তা'র এত দ্বন্দ্ব কেন?

ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি' উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তা'র হবে কি অনন্ত পরাজয়॥

শুধু প্রাণরক্ষা আর বংশরক্ষা কাজে
তোমার চিত্তের শক্তি সাঙ্গ হয় নাই আত্ম মাঝে,
যা রহিল বাকি
ধূলি তা'রে ফাঁকি দিবে না কি।
সে চিত্ত অসীম পানে বাতায়ন দিয়েছিল খুলি',
প্রত্যহের আপনাবে ভুলি'
নিত্যের নৈবেদ্য থালে
আপনার শ্রেষ্ঠ দান ভরি' দিয়াছিল কালে কালে।
অসীম প্রাণের বার্ত্তা যবে এসেছিল কানে
মর-প্রাণ তুচ্ছ ক'রেছিলে আত্মদানে,
অর্থ তা'র কোথাও কি হবে না সমাধা,
মৃত্যু তা'রে দিবে বাধা,
ধূলায় কি হবে ধূলি
মহাক্ষণগুলি।

জন্মদিন এই বাণী
দিক তব চিত্তে আনি',—
—মর্ত্ত্যের জরায়ু
আপনাতে বন্ধ করি' লুপ্ত করিবে না তব আয়ু,—
অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রাণ—
এ গর্ভ বন্ধনে তা'র নহে অবসান,—
আরবার নব জন্ম ল'বে
পূর্ণের উৎসবে॥

দার্জ্জিলিং
১৯৩১

গল্প

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

[শব্দের মধ্যের শূন্য ' অক্ষর, ঈষৎ ই। য-ফলা = য়-ফলা। অক্ষরের দক্ষিণ কোণে বিন্দু অকারান্ত-জ্ঞাপক।]

আমরা শৈশবে 'শোলোক' শুনতাম। শোলোক ব'লবার জন্যে পিসী জেঠাই আয়ীকে ধ'রতাম, মিনতি ক'রতাম। অনেকে জানতেন, কিন্তু ব'লতে জানতেন না। প্রবীণা প্রাচীনারা ব'লতে পারতেন। দুধ খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে মাকেও শোলোকের লোভ দেখাতে হ'ত, কিন্তু সে শোলোক আসল নয়; বাজে, মন-গড়া। শোলোক নাম হবার কারণ, তাতে শ্লোক থাকত। শ্লোকই শোলোকের প্রাণ। একটার একটু মনে আছে। সেটা "কন্‌কাবতী"র,

কন্‌কাবতী মাগো ঘরকে এস না।
ভাত হ'ল কড়-কড়ো বেন্নন হ'ল বাসি
আমরা কন্‌কাবতী মায়ের জন্যে তিনদিন উপবাসী।

শেষ চরণটা ঠিক মনে প'ড়ছে না। আমি শৈশবে শুনেছি, পরে আর শুনি নি। কিন্তু আশ্চর্য, আজিও শ্লোকটি মনে আছে। এইরূপ শ্লোক শিশুর কানে কি মধু ঢেলে দেয়, তা সে ব'লতে পারে না, কিন্তু শুনতে শুনতে সে তার আখটি' ভুলে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে। শিশু শ্লোকটি মনে রাখতে চায়, পারে না; 'কথা'র অল্প পারে, বেশীর ভাগ পারে না। এই কারণে একই শোলোক বার বার শুনতে তার বিরক্তি আসে না। আর, যে শোলোক মনে না রইল, সে শোলোকই নয়। আমার বোধ হয়, কোনও অঞ্চলে তিন চারিটার বেশী শোলোক চলিত্ নাই। কন্‌কাবতী, রাজপুত্র ও কোটালপুত্র, সুআ রাণী ও দুআ রাণী, ব্যঙ্গমা ও ব্যঙ্গমী, আমাদের অঞ্চলে এই কয়টি শুনতে পেতাম।

শোলোক শুনবার বয়স আছে। শিশুর সাত আট বছর পর্যন্ত। তারপর উপকথা শুনবার বয়স। শোলোকে সম্ভাব্য অসম্ভাব্যের বিচার নাই, এদেশ সে দেশের ব্যবধান নাই, কালেরও নাই। উপকথায় কার্য-কারণের যৎকিঞ্চিৎ যোগ আছে, কিন্তু স্থায়িভাব এখানেও বিস্ময়। দেশভেদে উপকথাকে 'রূপ-কথা' বলে। সে দেশে 'আশু' নামের মানুষটি 'রাশু' হয়। কেহ কেহ মধুর বাল্য-স্মৃতিবশে 'রূপকথা' নামই রুচির মনে করেন, কেহবা এই নামের সার্থকতাও দেখতে পান। আমার ভাগ্যে আমাদের অঞ্চলের প্রচলিত উপকথা শোনা ঘটে নি। তখন দেশের দুর্দিন, মেলেরিয়ার আকস্মিক ভীষণ আবির্ভাবে লোকের আর্তনাদে শোকের কথাই শুনতে পেতাম। রত্নাবতীর কথা, নীলাবতীর কথা, বেহুলার কথা, দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু শুনতে পাই নি। মনে পড়ে, নয় বৎসর বয়সে রামায়ণ নিয়ে কাড়া-কাড়ি করেছি। বছর পাঁচ ছয় পরে রামায়ণ-কথা প্রথম শুনি। সে কি আনন্দ! কথকঠাকুরের বাক্যচ্ছটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু তা-তে কিছুই এসে যেত না, খেই হারাত না।

তখন ইস্কুলে পড়ি। তখনকার দিনে "বিজয় বসন্ত" নামে এক গল্পের বই ছিল। বইখানা সুবোধ্য ছিল না, এখন বিন্দুমাত্র মনে নাই। "আরব্যোপন্যাস"ও ছাপা হয়েছিল। ইস্কুলের ছুটির সময় গ্রামে এসে গল্প শুনতে পেতাম। এক গোমস্তা ছিলেন, বিদ্যা পাঠশালা পর্যন্ত, কিন্তু এত গল্প জানতেন ও ব'লতে পারতেন যে লোকে তাঁকে গল্পের 'ধুকড়ী' ব'লত। পরে দেখেছি, তাঁর লোম-হর্ষণ গল্পের কোনটা "দশকুমার চরিতে"র, কোনটা "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র, কোনটা "বত্রিশ সিংহাসনে"র। ভোজ ও ভানুমতীর ইন্দ্রজাল বিদ্যার কাহিনী কোথায় পেয়েছিলেন, জানি না। তিনি মুখে মুখে শিখেছিলেন। নায়ক-নায়িকার নামে ভুল হয়েছিল, কিন্তু কাহিনীর বস্তু প্রায় একই। স-সে-মি-রা কাহিনীতে শুনেছিলাম বিক্রমাদিত্যের মহিষী

তিলোত্তমার উরুতে তিল ছিল; রাজমন্ত্রীর বধূবেশে কবি কালিদাস রাজপুত্রকে চারি শ্লোক শুনিয়ে উন্মাদ-রোগ হ'তে মুক্ত করেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, সে চারি শ্লোক গোমস্তার মুখস্থ ছিল, ভাষায় কিছু কিছু ভুল ছিল, কিন্তু অর্থ বুঝতে বিঘ্ন হ'ত না। বিক্রমাদিত্যের সাহস ও বীরত্ব, একবার শুনলে মনে গাঁথা রয়ে যায়। সে সব কথা আরব্যের নয়, পারস্যের নয়। এ দেশেরই ধর্মবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর, দানবীরের কথা। শুনলে উৎসাহ হয়, চিত্তের প্রসার হয়, জড়তা দূর হয়। হাসির গল্পও ছিল। গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা, নাপিতের ধূর্ততা, তাঁতীর মূর্খতা, চোরের বুদ্ধিমত্তা, ইত্যাদি অনেক গ্রামে প্রচলিত ছিল। একটা গল্পও নূতন-গড়া নয়, কোন্ অতীত কাল হ'তে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে দেশবাসীর নিকটে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামায়ণ, ভারত, ও ভাগবত পাঠ, রামায়ণ মহাভারত ও চণ্ডীর গান, কৃষ্ণযাত্রা ও শ্যামাযাত্রা-গান, বৈষ্ণবের কীর্তন, বাউলের গান, আর এই সকল কাহিনী গ্রামবাসীকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিত। সে-সব দিন কোথায় গেল, আর আসবে না। এখন বই পড়ে গল্প শিখতে হ'চ্ছে।

কিন্তু গল্পের গুণ যদি চারি আনা, কথকের গুণ বার আনা। দেবদত্ত শক্তি না থাকলে কথক হ'তে পারা যায় না। সাত আট বছর পূর্বে একবার কলিকাতায় কয়েক মাস ছিলাম, বৈকালে গোলদীঘিতে বেড়াতে যেতাম। দেখতাম দীঘির দক্ষিণ পাড়ের মণ্ডপে একটি লোক কি ব'লত, বিশ-পঁচিশ জন একমনে শুনত। কথক কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স। গা খোলা, উড়ানী কখনও কোলে, কখনও ভূমিতে প'ড়ত। দক্ষিণ বাহু কখনও প্রসারিত, কখনও বক্ষঃ-লগ্ন; স্বর কখনও উদাত্ত, কখনও অনুদাত্ত হ'ত। লোকটির দেবদত্ত শক্তি নিশ্চয় ছিল, নইলে এতগুলি লোক প্রত্যহ শুনতে আসত না। আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় দ্বারা কথা জীবন্ত হয়ে উঠত। গল্প-লেখকের সে সুবিধা নাই। লেখককে ভাষা দ্বারা কথক হ'তে হয়।

গ-ল্প শব্দটি বেশী দিনের নয়। দুই-এক শত বছরের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। শব্দটির দুই অর্থ আছে। আমরা গল্প 'করি,' গল্প 'বলি'। বন্ধু পেলে গল্প 'করি,' গল্পে-সল্পে দু-দণ্ড কাটাই। এই গ-ল্প,—জল্প, জল্পন; দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে অসম্বদ্ধ কথন। গ-ল্প-স-ল্প শব্দের স-ল্প, বোধ হয় সু-লপ। লপ ধাতুর অর্থ লপন, ভাষণ। পূর্ববঙ্গে বলে, গা-ল—গ-ল্প। গা-ল, বোধ হয় সং গল্‌ভ, প্রগল্‌ভতা। যে গল্পিয়া, গল্পো, গপ্পো, সে প্রগল্‌ভ, বাচাল। যখন কেহ গল্প 'বলেন', আমরা শুনি, তখন সে গল্প, সং কল্প। কল্প,—কল্পনা, মানসিক রচনা, নির্মাণ। এই গ-ল্পের জুড়ী, ট-ল্প; যেমন, গল্প-টল্প।

পূর্বকালে ছিল, 'কথা'। অমরকোষে, কথা প্রবন্ধ-কল্পনা; প্রবন্ধের কল্পনা, মানসিক রচনা। তখনকার 'কথা'য় নায়ক-নায়িকার নাম সত্য থাকত, হয়ত বৃত্তেরও কিছু সত্য থাকত। এই হেতু কেহ কেহ 'কথা'র লক্ষণে ব'লতেন, কথা-রচনায় অল্প সত্য, বহু অসত্য থাকে। কথার প্রসিদ্ধ উদাহরণ পদ্যে রামায়ণ, গদ্যে কাদম্বরী। 'কথা' ছোট হ'লে 'কথানক'। ক-থা-ন-ক বাংলা অপভ্রংশে কা-হি-নী। 'কথায়' কিছু সত্য থাকে, 'উপকথা'য় কিছুই থাকে না। 'কথা' বিস্তারিত হ'লে 'পরিকথা'। কথা, উপকথা, পরিকথা, গদ্যে লেখা হ'ত। এই লক্ষণ ছেড়ে দিলে রামায়ণকে পরিকথা ব'লতে পারা যায়। যাঁরা রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সত্য মনে করেন, তাঁরা রামের চরিতকে 'আখ্যায়িকা' ব'লতেন। দৃষ্ট বিষয় অবশ্য সত্য, দৃষ্টবিষয়-বর্ণন 'আখ্যায়িকা,' বা 'আখ্যান'। পৌরাণিকদের বিবেচনায় দ্বৈপায়ন ব্যাস ভারত-'আখ্যান' লিখেছেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয় "আখ্যান-মঞ্জরী" লিখেছিলেন, তিনি কয়েক জনের চরিত-বর্ণন করেছেন। বহুশ্রুত বিষয়ের বর্ণন, 'উপাখ্যান'। নলচরিত বহুশ্রুত, কিন্তু দৃষ্ট নয়। এই চরিতের কত সত্য, কত অসত্য, তা কেহ জানত না। মহাভারতে অসংখ্য 'উপাখ্যান' আছে, রামোপাখ্যানও আছে। সে সব, উপকথা নয়, কথা নয়, উপাখ্যান। উপাখ্যানের মধ্যে 'কথা' থাকতে পারে। যেমন "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা"য় ভোজরাজ-কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত সিংহাসন-

প্রাপ্তি, এক উপাখ্যান ; এবং এক এক পুত্তলিকা-কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য বর্ণন, এক এক 'কথা'।

বাংলায় কে 'উপন্যাস' নামটি প্রচলিত করেছেন, জানি না। যিনিই করুন, তিনি উ-প-ন্যা-স শব্দের অর্থচিন্তা করেন নাই। ন্যা-স, স্থাপন, রাখা। টাকা ন্যাস, ন্যস্ত করা, টাকা জমা, গচ্ছিত রাখা। অঙ্ক কষিবার সময় রাশি-গুলি যথাস্থানে ন্যাস ক'রতে হয়, বাংলায় বলি 'পাতন'। অঙ্গ ন্যাসে এক এক অঙ্গ এক এক দেবতার আশ্রয়ে রাখা হয়। উ-প-ন্যা-স, সমীপে স্থাপন। বাক্যের ও প্রবন্ধের 'উপন্যাস,' উপক্রম, আরম্ভ। উ প ন্যা-স ইংরেজী suggestion-ও বটে। এই ইংরেজী শব্দের বাংলা শব্দ পাই না। কেহ কেহ 'ইঙ্গিত' লেখেন, কিন্তু 'আকার-ইঙ্গিত' যে একেবারে ভিন্ন। বাংলা উপন্যাস, বৃত্ত-কল্পনা। দ্রাবিড় ভাষায় ও মরাঠীতে novelকে বলে কাদম্বরী,হিন্দী ও ওড়িয়াতে বলে কহানী। বাংলায় 'নব-ন্যাস', 'রম-ন্যাস' নামও দেখেছি। 'রম-ন্যাস' ইংরেজী romance অর্থে ব'লবার যুক্তি 'রম' টুকু ছাড়া কিছু পাই না। সে দিন দেখছিলাম শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর romance-কে 'কাহিনী' বলেছেন। বর্ণনীয় বিষয় ও ভাব চিন্তা ক'রলে এই নাম ঠিক। কিন্তু এই নামে লেখকের মন উঠবে না 'কাহিনী' নামে নবীনতা কই ?

এখন দেখি, 'ছোট গল্প,' 'বড় গল্প,' 'উপন্যাস', এই তিন নামে গল্প চলেছে। সংস্কৃত নাম ব'লতে হ'লে, কথা, অতিকথা, পরিকথা। কিন্তু এই তিনের লক্ষণ কি ? লক্ষণ না ক'রলে সংজ্ঞা চলে না। বাংলা ভাষায় ক-থা শব্দের নানা অর্থ আছে। শব্দটি না থাকলে 'কথা কওয়া' অসম্ভব হ'ত। বিদ্যাসাগর-মহাশয় "কথামালা" লিখেছেন। বাঘ-ভালুকে কথা কয়, এ যে বিষম কথা। এখানে কথা, কল্পিত কথা, সব অসত্য। সংস্কৃতে রূপকে "হিতোপদেশ"। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "যজ্ঞ-কথা" লিখেছেন। তিনি কথক হ'য়ে যজ্ঞ ব্যাখ্যান করেছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের গল্প, কালিদাসের গল্প, পাখীর গল্প, আকাশের গল্প, ইত্যাদি গল্প বই কথা নাই। কালিদাস-সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত ছিল, তিনি যৌবনেও জড়বুদ্ধি মূর্খ ছিলেন, 'উষ্ট্র' উচ্চারণ ক'রতে পারতেন না। তাঁর গল্প সত্যানৃত-মিশ্রিত প্রবন্ধ। কিন্তু 'পাখীর গল্প.' বোধ করি, পাখীর স্বভাব-বর্ণন। আ'জকা'ল বালকেরা বলে, আকবারের 'গল্প,' অর্থাৎ আকবারের চরিত।

'শিশু-সাহিত্য' নামে কতকগুলি বই হয়েছে। একবার বছর সাতেক পূর্বে এক শিশুর নিমিত্তে একখানা বই খুঁজতে হয়েছিল। শিশুর বয়স ৭।৮ বৎসর, বাংলা প'ড়তে পারত, কিন্তু থমকো থমকো প'ড়ত, যা প'ড়ত তা গুছিয়ে ব'লতে পারত না। তার এক বিশেষ দোষ ছিল, শব্দের আদ্য ও অন্ত্য অক্ষর প'ড়ত, মাঝের অক্ষর ছেড়ে যেত। বালকটির পিতা না মাতা হাসি-খুসি দ্বারা বাল-শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। এরই ফলে এই দোষ ঘটেছিল। এখানে (বাঁকুড়ায়) বই-এর দোকানে বার-তের খানা বই পেলাম। পদ্য বাদ দিতে হ'ল ; কারণ, পদ্যের ছন্দের গতিকে বর্ণ-পরিচয় রসাতলে যায়। বিশেষতঃ, পদ্যগুলি নানা রঙ্গে ছাপা ; সাদা কাগজে কালীর অক্ষর পরিস্ফুট হয়, অন্য রঙ্গের হয় না। রাক্ষস-খক্কস, ভূত-প্রেতের বই বাদ দিতে হ'ল ; কারণ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর হ'তে পারি না, ভূত-ভীত করে চিরকাল ভীরু ক'রতে পারি না। শেষে একখানি "শিয়াল পণ্ডিত" ও হরিশচন্দ্র কবিরত্ন-কৃত "চাণক্য-শ্লোক" কিনে আনি। "শিয়াল-পাণ্ডিতে"র দোষ আছে। 'পাণ্ডিত' দীর্ঘ হয়েছে, স্থল-বিশেষে শিশুর অবোধ্যও হয়েছে। চাণক্য-শ্লোক পঞ্চাশটি বেছে দিয়েছিলাম। সংস্কৃত শ্লোক, প্রত্যেক অক্ষর শুদ্ধভাবে প'ড়তে হ'ত, বর্ণ-(উচ্চারণ-) জ্ঞান হ'ত। বাজে পদ্যের বদলে শ্লোক মুখস্থ ক'রলে চিরজীবন ধর্মের ন্যায় সুহৃদ হয়ে থাকে। বাল্যকালে পাঠশালায় আমাকে চাণক্য শ্লোক মুখস্থ ক'রতে হয়েছিল। সে বিদ্যা এখনও কাজে লাগছে।

'শিশু সাহিত্যে'র পর 'বাল-সাহিত্য'। দশ হ'তে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকার নিমিত্ত বাল-সাহিত্য। এদের নিমিত্তে অনেক বই হ'য়েছে। বিদ্যালয়-পাঠ্য অসংখ্য, গৃহ পাঠ ও অনেক। বিদ্যালয়-পাঠ্য বই ফরমাইসী বই, প্রায়ই মাধুর্যহীন। এই হেতু বালক-বালিকারা প'ড়তে চায় না। গৃহপাঠ্য বইতেও সে দোষ

নাই, এমন নয়। তথাপি গ্রন্থবিস্তার হেতু সে দোষ কতকটা কেটে যায়। ইদানী দেশের পুরাতন উপাখ্যানের প্রতি গ্রন্থকর্তাদের দৃষ্টি পড়েছে। এটি বাল-শিক্ষার পক্ষে শুভ। কারণ প্রথমে স্বদেশী, আর, প্রত্যেক উপাখ্যানেই হিতোপদেশ আছে। বাজে গল্প থাকে না। মহৎ লোকের চরিতও লেখা হয়েছে। অনেকে 'চরিত' ব'লতে চান না; বলেন, 'জীবন-চরিত'। অনাবশ্যক 'জীবন' জুড়িবার কারণ, ইংরেজীতে bio-graphy, যার bio মানে জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা 'চরিতে'র আগে 'জীবন' জুড়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণচরিত" লিখেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর "চরিতকথা" শুনিয়েছিলেন। এঁরা নূতন কিছু করেন নি। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ "চৈতন্য-চরিত-অমৃত" লিখেছিলেন। সংস্কৃতের ত কথাই নাই। ইদানী 'জীবনী' নামও দেখতে পাই। কারণ ইংরেজী life শব্দের একটা অর্থ 'চরিত' আছে। কিন্তু 'জীবন' ও 'জীবনী' একই। এক জীবন-সংগ্রামেই আমাদের জীবনান্ত হ'চ্ছে, তদুপরি দাম্পত্য জীবন, বিবাহিত জীবন, পারিবারিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন, জাতীয় জীবন, জুটলে কতদিক সামলানো যাবে। শব্দের অর্থ-প্রসারণে দোষ নাই, যদি তদ্দ্বারা ভাষা সঙ্কুচিত না হয়।

'বাল-সাহিত্যে'র পর 'তরুণ-সাহিত্য'। তরুণ-সাহিত্যে গল্পের আসন প্রথম। গল্প-নামে উপন্যাসও ধ'রছি। বাজারে যে কত গল্প বেরিয়েছে, তা ব'লতে পারি না। আমার গল্প-পড়ার বাতিক ছিল না, খবরও রাখি না। তা ছাড়া, ইচ্ছা হ'লে গল্প বেছে প'ড়তে পারি। কিন্তু মাসিকপত্র পাঠককে বাছতে দেয় না, গল্প না চাইলেও ঘরে এসে হাজির হয়। তখন গৃহস্থকে চোখ বুলিয়ে দেখতে হয়, কি জানি সুন্দর প্রচ্ছদ-পটের ভিতরে কি আছে। কখন কখন সাপ লুকিয়ে থাকে। গুণিন মন্ত্র জানেন, ভয় নাই; কিন্তু গৃহস্থ ত্রস্ত হ'য়ে পড়েন।

'মাসিক পত্র',—পত্র না গ্রন্থ? এ বিচারে না গিয়ে 'মাসিকী' বলি। মাসিকীর দুই ভাগ ক'রতে পারি। কতকগুলি এক এক সমাজ বা সঙ্ঘের কর্ম প্রচার ও উদ্দেশ্য সাধন করে। এগুলিকে 'সঙ্ঘ মাসিকী' ব'লতে পারি। অপরগুলি সাধারণ পাঠকের জ্ঞান ও আনন্দ-পিপাসা তৃপ্ত করে। এগুলিকে 'বার মাসিকী' বলা যে'ত পারে। (বার, অবসর ও সমূহ।) "ব্রাহ্মণ সমাজ" নামে এক 'মাসিকী' আছে, নামেই প্রকাশ এখানি সঙ্ঘ-মাসিকী। এতে গল্প ও পদ্য থাকে না, থাকবার কথাও নয়। কারণ, গল্প ও পদ্য দ্বারা ব্রাহ্মণ সমাজের কি হিত হবে? ব্রাহ্মণেই র'চবেন, প'ড়বেন, তাও ত নয়। সঙ্ঘ-মাসিকীর কর্তা, সঙ্ঘ। কিন্তু বার-মাসিকী মণিহারী দোকান। ক্রেতা যেমন, দোকানের দ্রব্যও তেমন রাখতে হয়, নইলে দোকান চলে না। চিত্র, পদ্য, গল্প না থাকলে ক্রেতা জুটে না, দোকানও ভরে না। দোকান ছোট ক'রতেও মন সরে না। বার-মাসিকীর বাহুল্য-হেতু সম্পাদককে পাঠকের মন জুগিয়ে চ'লতে হয়। আর, সচিত্র তিন শত পৃষ্ঠার একখানা বই আট আনায় বেচাও সোজা নয়।

কিন্তু গল্প-রচনা ভারি কঠিন। বাংলা ভাষা, সালঙ্কারা ভাষা লিখতে পারলেই গল্প র'চতে পারা যায় না। পদ্য রচনা ঢের সোজা, মাসখানেক অভ্যাস ক'রলে পদ্য লিখতে পারা যায়। অবশ্য সে পদ্য, কাব্য নয়। কবি দুর্লভ, ক্ষণ-জন্মা। দৈবী শক্তি না পেলে কবি হ'তে পারা যায় না। যে-সে পদ্যকে কবিতা ব'ললে কাব্যকে খাট করা হয়। কবির ভাব, কবিতা; কবিতাই, কবির প্রমাণ। ছন্দোবিশিষ্ট বাক্য, পদ্য। পদ্য-কার ছান্দসিক। কবি পদ্যে ও গদ্যে, বাক্যের দ্বিবিধ রূপেই তাঁর কবিতা প্রকাশ ক'রতে পারেন। অতএব কাব্যও দ্বিবিধ, পদ্য-কাব্য ও গদ্য কাব্য। উত্তম গল্প, কাব্য। গল্প পদ্যে ও গদ্যে দুই রূপেই লিখতে পারা যায়।* যে গল্পে কবিতা নাই, সেটা গল্প নয়, বাজে বকা।

* এখন পদ্য গল্পের নাম 'গাথা' দে'তে পাই। নামটি ঠিক কি? সংস্কৃত 'গাথা' একটি কি দুটি শ্লোক, যা লোকে গাইত, স্মরণার্থে কীর্তন ক'রত। সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষায় "গাথা সপ্তশতী"; এখানেও একটি একটি শ্লোক, যদিও সংস্কৃতে নয়। পালি ভাষায় "থেরীগাথা" বৌদ্ধ স্থবিরার বৃত্ত কিন্তু গেয়। বাংলাতেও গাথা ছিল; যেমন পশ্চিম-দক্ষিণ রাঢ়ের "লীলাবতী" বা "লীলাবতী",

নানা মাসিকীতে মাসে মাসে কত গল্প প্রকাশিত হ'চ্ছে, কেহ গণ্যেছেন কি না জানি না। শতাবধি হবে। সাপ্তাহিক বার্তাপত্রেও গল্প থাকে। বোধ হয় গল্প-লেখক, বা গল্পক এক সহস্র হবেন। পদ্যরচনার নিয়ম আছে। ইংরেজীতে গল্প লিখবার ধারা-পাত আছে। কেনই বা না থাকবে? কোন্ কর্মের নাই? বাংলাতে পত্র লিখবার ধারা-পাত আছে। কিন্তু তা দিয়ে পত্রের আরম্ভ ও শেষ শিখতে পারা যায়, পত্রের বস্তুর বর্ণন শিখতে পারা যায় না। সে কর্ম পত্র-লেখকের।

গল্প ও উপন্যাসে তফাৎ কি? বাংলায় কিছুই দেখতে পাই না। প্রয়োগে দেখি, গল্প ছোট, উপন্যাস বড়। যখন দেখি, এটি 'ছোট গল্প', ওটি 'বড় গল্প', তখনই বুঝি এই ভাগ বাহ্যিক। উপন্যাসেরও দৈর্ঘ্যের সীমা নাই; কোনটা শত পৃষ্ঠা, কোনটা পাঁচ শত পৃষ্ঠা। ক্রেতা পেলে হাজার পৃষ্ঠাও হ'তে পারত। যদি ইংরেজী story ও novel, বাংলার গল্প ও উপন্যাস মনে করি, তা হ'লে গল্পের 'বন্ধ' (plan) ঋজু, উপন্যাসের সঙ্কুল (complicated)। সঙ্কুল বটে, কিন্তু দৈবাৎ নয়, লেখকের ইচ্ছাকৃত কূটবন্ধ (plot)। রস-হিসাবে উপন্যাস নানা রকম। বীর ও অদ্ভুত রস থাকলে ইংরেজী romance, রোমাঞ্চন। পৌরাণিক-প্রবর লোমহর্ষণ অদ্ভুত কথা শোনাতেন। ইংরেজী মতের গল্প ও উপন্যাসের প্রকৃতি ঐ রকম হ'লেও সংসারে বিকৃতি-ই বহু। তাতে দুঃখই বা কি? রাগিণী বেহাগ মিষ্ট, কিন্তু বেহাগ-ড়া ত কম নয়। কলার হানি হ'লে কোনটাই মিঠে নয়। গল্পে কলাই প্রধান। বস্তু ও বন্ধ অবশ্য চাই, কিন্তু 'তাজমহল' পাথরের পাঁজা নয়, নির্মাণের গুণে অপূর্ব আনন্দ উদ্রেক করে। সে গুণের নাম কলা (art)। পূর্বকালের চৌষট্টি কলার মধ্যে "কাব্যক্রিয়া" একটা কলা ছিল। কাব্যকলা, চিত্রকলা শব্দের প্রয়োগ আছে। কলা, চাতুরী, ছল (fraud)। লোকে বলে, "লোকের ছলা-কলা", "লোকটার কলা (গ্রাম্য, 'কল্লা') দেখে বাঁচি না।" কলা কৃত্রিমকে অকৃত্রিম দেখায়, মিথ্যাকে সত্যভ্রম করায়। এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পটে। কোথায় গাছ, কোথায় বা পাহাড়; আমরা পটে গাছ-পাথর দেখি। চিত্রকর রং দিয়ে ইন্দ্রজাল রচনা করেন, কবি ভাষার শব্দ দিয়ে করেন। কবির ইন্দ্রজাল, কবিতা। এটি তাঁর স্বভাবজ। কখন-কখন অন্যেও কবিতা অনুভব করেন, প্রকাশও ক'রতে পারেন। কিন্তু সেটা ঔপাধিক, অবস্থা-বিশেষে স্ফুরিত হয়।

ইংরেজীর মাপ-কাঠিতে চ'লতে হবে, কিম্বা গল্প ও উপন্যাসের বন্ধ শুদ্ধ রাখতে হবে, এমন কথা কি আছে। পাঠক চান, আনন্দ, রসই আনন্দের হেতু। কার্যকারণ এক হয়ে আনন্দ ও রস সমার্থ। প্রাচীন কাব্যরসিক খুজে খুজে নয়টি রস পেয়েছিলেন, একটি বাড়াবার কমাবার নাই। *

নয়টা রসের একটা-না-একটা না থাকলে কাব্য হবে না, এমন নয়। এর দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা"। এটি গল্প না উপন্যাস? এতে উপন্যাসের ফন্দি বিলক্ষণ আছে। কালাদীঘির ডাকাতেরা বেহারা ও ভোজপুরী দরোয়ানকে ঠেঙ্গিয়ে ইন্দিরার অলঙ্কার কেড়ে নিতে পারত, ইন্দিরা বি-গাঁয়ে হারিয়ে যেত না। "ইন্দিরা"য় স্থায়িভাব কিছুই

মধ্যরাঢ়ের রাজা রণজিৎ রায়ের 'গাথা', রণজিৎ রায়ের বৃত্ত। এ সকল পদ্য গাওয়া হ'ত। গাথক—গায়ক। সর্পবৈদ্যেরা লখিন্দরের কথা গায়। সেটি গাথা। গোপিচাঁদের গীত, গাথা। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গের কয়েকটি গাথা সংগ্রহ করেছেন। গাথা সত্যমূলক। গাথাকে 'পল্লীগীতি' বলা ঠিক নয়। পল্লী, গ্রাম, নগর নাম ভেদে গাথা হয় না। আর, বাউলের গান, গীতি বটে, কিন্তু গাথা নয়।

* আশ্চর্য বিশ্লেষণ-শক্তি। আরও আশ্চর্য, নয়টা রসের আদি, প্রধান, একটি। সেটির নাম আদিরস। অপর আটটি,—বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস, শান্ত। শান্তরসে কর্মের অভাব। দৃশ্যকাব্যে এ রসের স্থানও নাই। কেহ কেহ বাৎসল্য নামে আর এক রস স্বীকার করেন, কিন্তু ভক্তি সখ্য প্রভৃতিকে রস না বল্যে 'ভাব' বলেন। ভাবের সংখ্যা নাই। অনুরাগ ও বিরাগ, এই দুই ভাব, সকল ভাবের ও রসের মূল। প্রাচীন রস-বেত্তারা আদিরসকে নায়ক-নায়িকার প্রেমে বন্ধ রেখে অনুরাগের ক্ষেত্র খর্ব্ব করেছেন। নইলে এই রসকে মধুর রস বল্যেও বাৎসল্য, সখ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দাস্য প্রভৃতিকে মধুর রসের অবান্তর ভাবতে পারতেন। পাত্র-ভেদে মধুর রস নানাবিধ; বিরাগও নানাবিধ। অনুরাগ-বিরাগের অন্তর্ধানে শান্তরস। সেটি নবম। অন্যদিকে, ষড় রিপুর আদি রিপুও কাম। কাম হ'তে লোভ। কাম্যের লাভে মদ, অ-লাভে ক্রোধ। ক্রোধ হ'তে মোহ ও মাৎসর্য। কবি যে পথেই যান, এই ছয় পথে ঘুরতে থাকেন। এই ঘূর্ণি-পাকে নব-রসের উৎপত্তি। বাংলা গল্পে কোন্ রিপুর প্রাবল্য, কিম্বা রস থাকলে কোন্ রস অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তা বিবেচনার বিষয়।

নাই। ইহার আরম্ভ বিস্ময়ে; পরিণতি, কৌতুক বা হাস ভাবে। "রাধারাণী"তেও কোন স্থায়িভাব নাই। রচনার মাধুর্য-গুণে গল্পটি মনোহারী হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি রোমাঞ্চন। আমরা বীর ও অদ্ভুত রসে সহজে মুগ্ধ হই। মহাভারতের বিরাটপর্ব এই ভাবে বিরাটই বটে! বোধ হয়, এই কারণে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় বিরাট-পাঠের বিধি হয়েছে।

যাঁর কবিতা স্বভাবজ নয়, তিনি গল্প লিখলে দুই একটি পারেন, বেশী পারেন না; ঔপাধিক গুণ-প্রকাশের ক্ষেত্র অল্প। তথাপি কেহ কেহ একটি গান, একটি পদ্য-কাব্য, একটি উপন্যাস, একটি গল্প লিখে যশস্বী হয়েছেন। একটিতেই তাঁদের অনুভূতির উৎস নিঃশেষ হয়েছে। এমন গল্পের একটা উদাহরণ মনে প'ড়ছে। সন ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় "আগন্তুক" নামে এক গল্প লিখেছিলেন। আমার মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে। গল্পের বস্তু যৎসামান্য। এক গ্রামের চক্রবর্তীর এক জামাই বিবাহ পরে বিদেশে চাকরি ক'রতে গেছলেন। কয়েক বৎসর পরে ছুটি পেয়ে শ্বশুরমশায়কে না জানিয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত। সেদিন দৈবাৎ চক্রবর্তী গ্রামান্তরে গেছলেন, বাড়ীতে পুরুষ কেহ ছিল না, শাশুড়ী ও বনিতা, কমল, মাত্র ছিলেন। চাকরো যুবা; বেশে অবশ্য ভদ্রলোক। বাড়ীর এক কৃষাণ ধান ঝাড়ছিল, কলিকায় তামাক সেজে ভদ্রলোককে তামাক ইচ্ছা ক'রতে দিলে। লোকটি তামাক খায় না, চক্রবর্তী বাড়ীতে নাই শুনেও উঠল না! চক্রবর্তীনীর এমন বিপদ কখনও ঘটে নি। স্নানের বেলা হ'লে আগন্তুক এমন কাণ্ড ক'রলেন যে চক্রবর্তীনী স্তম্ভিত। কমল ঘড়া ও তেলের বাটী পুকুর ঘাটে রেখে সইকে ডাকতে গেছে, ভদ্রবেশী যুবকটি সে বাটীর তেল নিয়ে মেখে স্বচ্ছন্দে স্নান ক'র। এমন আস্পর্ধা সইবার নয়; এ যে দিনে ডাকাতি! আগন্তুক সব শুনতে পেলেন। মধ্যাহ্ন হ'ল, লোকটাকে অভুক্ত রেখে গৃহস্থ খেতে পারে না। অগত্যা চক্রবর্তীনী ঘোমটা টেনে ভাতের থালা রেখে গলেন। আহারান্তে পাড়ার গিন্নীবান্নীর সভা ব'সল, ডাকাতকে ঝাঁটা মেরে তাড়াবার পরামর্শ হ'ল। কিন্তু মারে কে? সন্ধ্যার সময় চক্রবর্তী বাড়ী এসে জামাই দেখে খুসী। ভিতরে গিয়ে গিন্নীকে ব'লতেই তাঁর যে কি দশা হ'ল, তিনিই জানেন। লজ্জা, বিস্ময়, ক্রোধ, ব্যস্ততা, জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারি ভাবের সমাবেশে হাস্যরস ঘনীভূত হয়েছে। গল্প-কার পরে "প্রবাসী"তে দুই তিনটা গল্প লিখেছিলেন, কিন্তু একটাও ভাল হয় নাই।

গল্পের ক্ষেত্র ছোট, উপন্যাসের বড়। কিন্তু গল্পের ক্ষেত্র অসংখ্য, উপন্যাসের অল্প। অধিকাংশ উপন্যাসে নিয়তির জয় ঘোষিত হয়। সংসারে তাহাই বটে। কথাই আছে, মানুষের ভাগ্য দেবতাও জানেন না। সোনার মৃগ হয় না, হ'তে পারে না, জেনেও রামচন্দ্র সে মৃগ অনুসরণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির এত জ্ঞানী; তবু কপট-দ্যূতে আসক্ত হ'লেন; নীতিজ্ঞ হ'য়েও দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন। মহাভারতে অদৃষ্টের ফল পুরুষকারকে হারিয়ে দিয়েছে। অদৃষ্ট, পূর্বজন্মার্জিত ফল; পুরুষকার এ জন্মের। বহু প্রাচীন কাল হ'তে এ দুই নিয়ে বহু বিচার হ'য়ে গেছে। কেহ কেহ 'কাল', আর এক কারণ বলেছেন। কাল অনুকূল না হ'লে মানুষের যত্ন সফল হয় না। এ ত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ ক'রছি। সেইরূপ দৈব অনুকূল না হ'লে কাল ও যত্ন কিছুই ক'রতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষে" তিনই দেখতে পাই। নগেন্দ্রনাথ নৌকায় যেতে যেতে ঝড়ে প'ড়বেন, অনাথা কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয় দিবেন, এ ত দৈবের ঘটনা। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর "অভিশপ্ত সাধনা" উপন্যাসে দৈববল ও কর্মবলের পরীক্ষা করেছেন। কুন্দনন্দিনী স্বপ্নে জেনেছিল, কে তার বিপদের কারণ হবে, তথাপি সে বিপদেই পড়েছিল। "অভিশপ্ত সাধনায়" কর-রেখা ও জন্ম-কোষ্ঠী দ্বারা নায়িকাও তার দয়িতকে প্রাণসংহারক জানতে পেরেছিল, তথাপি তার হাতেই প'ড়ল! মনে হ'তে পারে, এ সব কল্পনা। কিন্তু কে না জানে প্রতিদিন নিয়তির খেলা চ'লছে। চ'লছে বলেই লোকে ফল-জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। গান্ধীজী মহাত্মা হ'লেন; কই আর কেহ হ'তে পারলেন না। তিনি তপস্যাই বা কেন ক'রতে গেলেন?

এই প্রবৃত্তি কোথা হ'তে এল? উপন্যাসের বন্ধ, নিয়তির বন্ধ। আমরা অ-প্রত্যাশিত ফল দেখে মুগ্ধ হই, বিমূঢ় হই। কোথা হ'তে কি যে হয়, বিশ্বকর্ত্রীই জানেন।

এক গল্প-কীট ব'লতেন, "গল্প চারি প্রকার। যথা, কোনটা দৈবাৎ ঘন আবর্তিত দুগ্ধ; খেলে বুঝতে পারি, হাঁ, কিছু খেয়েছি, অনেক দিন মনে থাকে। কোনটা জলো দুধ, পানসে ঠেকে, এ বেলা খেলে ওবেলাকে মনে থাকে না। কোনটা পিঠালীর গোলা, দুধের গন্ধও নাই, কেবল দেখতে শাদা। কোনটা পচা ছেনার জল, গন্ধেই বমি উঠে।" গল্পের সমালোচনা হ'লে গল্প-কার দোষ-গুণ বুঝতে পারতেন। "সাহিত্যে" অল্প-স্বল্প সমালোচনা থাকত, লেখক ও পাঠকের উপকার হ'ত। সমালোচক, বিচারক। অর্থী লেখক; প্রত্যর্থী পাঠক। স্বীয় রচনার প্রতি সকলের মমতা হয়, বন্ধুজনের প্রতি বিচারকেরও মমতা হয়। কিন্তু উভয়েই মমতা ত্যাগ ক'রতে না পারলে পাঠকের প্রতি অবিচার হয়। আমি গল্প কদাচিৎ পড়ি। গল্পের আরম্ভ ভাল লাগলে পড়ি, নইলে সেখানেই ছাড়ি। এত অল্প জ্ঞান নিয়ে গল্পের সমালোচনা সাজে না। দু-একটা দোষ চোখে ঠেকেছে, লিখি। দেখি, কোনটার আরম্ভ বেশ, বন্ধও বেশ, কিন্তু শেষে হত-ইতি-গজঃ। মনে হয় যেন লেখক পাতা গ'ণছিলেন, হঠাৎ দেখলেন পাতা বেড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি সমাপ্তি করে ফেলেন। এর ফলে ভাব-ভঙ্গ ঘটে। দ্বিতীয় দোষ, গল্পের অনাবশ্যক বাহুল্য। স্বগতোক্তি অল্প হ'লেই ফলোৎপাদক হয়। মনের বিতর্ক দীর্ঘ হ'লে পাঠকের ধৈর্য লোপ হয়। পদ্যকাব্যে অলঙ্কার-বাহুল্য ঘটে, গদ্য-কাব্যেও ঘটে। তখন প্রতিমার রূপ দেখতে পাই না, কিঙ্কিণীর ঠুন্-ঠুন্ ধ্বনি-মাত্র কর্ণগোচর হয়। তৃতীয় দোষ, অশিষ্টেরা বলে, "বিদ্যা ফলানা"। বিদ্যার পরিপাক না হ'লে, উদ্গার ওঠে। পাঠক এ দোষ সইতে পারেন না। দৃষ্টান্ত ও উপমার নিমিত্ত বাঙ্গালী পাঠককে বিলাতে যেতে হ'লে তিনি পর্যাকুল হয়ে পড়েন। চতুর্থ দোষ, 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত,' প্রসঙ্গ-বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র "ইন্দিরা"র শেষে এই দোষ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এ পরিচ্ছেদটি না লিখলেও লিখতে পারতাম।" তাঁকে বরের বাসর ঘরের একটি চিত্র দিবার বাসনা" ভ্রান্ত করেছিল। তিনি এ বাসনা অন্যস্থলে মিটাতে পারতেন।

তিনি রসিক ছিলেন, কিন্তু কুত্রাপি অশ্লীলতা করেন নাই। যে বাক্যে শ্রী শোভা লক্ষ্মী নাই, সেটা অশ্রীল, অশ্লীল। যে বাক্য শুনলে লজ্জা ও ঘৃণা হয়, সেটা সমাজের অমঙ্গল-জনক। 'সাহিত্য' শব্দের অর্থেই প্রকাশ, এতে অ-সামাজিকতা থাকবে না, পরন্তু সমাজের হিতেচ্ছা থাকবে।* প্রত্যেক সমাজেই ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, সুপ্রবৃত্তি-কুপ্রবৃত্তির ভেদ আছে। গল্পে সে ভেদ না মানলে গল্পটা সমাজ-বিদ্বেষ্টা হয়; পাঠকের অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ হয়। গল্প পড়ে জুগুপ্সার উদয় হ'লে গল্প নিষ্ফল। সে গল্পে রচনাশক্তি থাকলে পাঠক ভাবতে থাকেন, লেখকটি কে, তাঁর চরিত্রই বা কিরূপ। পদ্যকাব্যে ও গদ্যকাব্যে এমন কি তুচ্ছ গল্পেও লেখক স্বচিত্তই প্রকাশ করেন, তাঁকে চিনতে কষ্ট হয় না। কলার জন্যে কলা-চর্চা,—এটা আত্ম-বঞ্চনা।

---

* সাহিত্যের লক্ষণ নিয়ে কলহ হয়। এর কারণ কেহ সাহিত্য শব্দের সংস্কৃত অর্থ ধরেন, কেহ "সাহিত্য দর্পণ" অনুসরেন, কেহ ইংরেজী literature শব্দের এক বিশেষ অর্থ স্মরণ করেন। কোন্ পথে চলেছেন ব'ললে, গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে না। আমি সাহিত্য শব্দের মূলার্থ ভাবছি, কারণ সে অর্থ ধরলে বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 'সহিতে'র ভাব, সাহিত্য। 'সহিত' শব্দের দুই অর্থ আছে। (১) সমভিব্যাহৃত, (company, association)। পূর্বে বলা হ'ত, 'লোকের সমভিব্যাহারে,' (গ্রাম্য) 'সমিভ্যারে'। আমরা এখন বলি, লোকের সহিত'। 'সহিতে,' সঙ্গে; পূর্ববঙ্গে বলে সাথে। 'সহিত' সঙ্গী, সেথো। "শূন্যপুরাণে" "সহিতর দানপতি" সেথোর কর্তা। অর্থাৎ, সহিত, সমাজ, গোষ্ঠী। সাহিত্য, মাঠে গোঠে জন্মে না। কতকগুলি সমধর্মী লোকের গোষ্ঠী নিমিত্ত সাহিত্য এরা অবশ্য নিজের হিতেচ্ছায় 'সহিত', সংযুক্ত হয়। সে হিত যে কি, তারাই জানে; কেহ মিছামিছি দল বাঁধে না। দৈবাৎ 'সহিত' শব্দ হ'তে এ অর্থও আসে। স-হিত, সহ-হিত, হিতযুক্ত। অতএব ব'লতে পারি, জ্ঞানীর জ্ঞান-সাহিত্য, রসিকের রস-সাহিত্য, ধার্মিকের ধর্ম-সাহিত্য, তরুণের তরুণ-সাহিত্য, গাণিতিকের গণিত-সাহিত্য, ইত্যাদি। সাহিত্য শব্দের বিশেষ অর্থে কাব্য-সাহিত্য। কিন্তু কবি না হ'লেও সাহিত্যিক আখ্যা লাভ হ'তে পারে। সমাজে যাঁর রচনা আদৃত, তিনি সাহিত্যিক। কবি-সমাজে যিনি সাহিত্যিক, তিনি অন্য সমাজে অ-সাহিত্যিক হ'তে পারেন।

"প্রবাসী"-সম্পাদক ১৩৩৬ সালে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত গল্পের ভাল তিনটি বাছতে গ্রাহকগণকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, পাঠকেরা কি প্রকার গল্প ভালবাসেন। তাঁর কামনা সফল হয় নাই, মাত্র সাতাত্তর জন নিজের নিজের মত জানিয়েছিলেন (১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী")। এই ঔদাসীন্যের নানা কারণ থাকতে পারে। হয়ত অল্প গ্রাহক গল্প পড়েন। হয়ত যাঁরা ভাল-মন্দ বিচার ক'রতে পারেন, তাঁরা পড়েন না। হয়ত বা কোন গল্প তাঁদের ভাল লাগে নি। কারণ যাই হ'ক, ঐ সালের তিনটি গল্প আমার মনে আছে। তন্মধ্যে দু-টি পুরস্কৃত হয়েছে। একটি পরশুরামের "গল্পিকা," অন্যটি "রাণুর প্রথম ভাগ"। পুরস্কৃত তৃতীয় গল্প, "চাপা আগুন"। এটি পড়ি নাই। এখন পড়ে্য দেখলাম। বোধ হয় এর প্রথম 'পেরা' পড়্যেই ছেড়েছিলাম। এ যে ভাবের মাথায় লাঠি মারা। রচনা স্বাভাবিক নয়, আগা-গোড়া কৃত্রিম, কলা-হীন। এই দোষে "আগুন" খুঁজে পাওয়া যায় না। যে তৃতীয় গল্প আমার মনে আছে, সেটির নাম "সন্ধ্যামণি" (দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯০ পৃষ্ঠা)। গল্পটি 'সত্যাকৃত' (realistic), আদিরসেরও বটে। কিন্তু লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ধর্মাধর্ম-বিবেককে পরাভূত করে নাই। এই কারণে করুণরসে পাঠকের চিত্ত দ্রব হয়।

এত যে গল্প লেখা হ'চ্ছে, পড়ে কে? বৃদ্ধ বৃদ্ধা পড়েন না, প্রৌঢ় প্রৌঢ়াও পড়েন না। তাঁরা সংসারে অনেক সত্য গল্প দেখেছেন, ভুগেছেন, মিথ্যা গল্পের প্রয়োজন পান না। পড়ে, যুবা বয়সের নরনারী।

এর কারণ আছে। গল্পে মানব-চিত্তচাতুর্য বর্ণিত হয়। দক্ষতা, নিপুণতা চাতুর্য বটে, চারুতা রমণীয়তাও চাতুর্য। যৌবনের ধর্মে মানুষ পরচিত্ত-চকোর হয়, সুপেয় রস অন্বেষণ করে। সংসার-জ্ঞান নাই, গল্প পড়ে্য জ্ঞান-পিপাসাও তৃপ্ত ক'রে। ভুক্তান্ন-রস সর্বদেহে চ'রলেও হৃদয়ে তার স্থান। চিত্ত-রসের স্থানও হৃদয়। তরুণের হৃদয় আছে; কাব্য সহৃদয় পাঠকের নিমিত্ত রচিত হয়। তরুণ অপেক্ষা তরুণী কাব্যরসে অধিক আকৃষ্ট হয়। কারণ, তার জ্ঞান-বৃত্ত হ্রস্ব, বাইরের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা ক'রতে পায় না। এদের নিমিত্ত গল্প লিখতে হ'লে সবিশেষ ভাবতে হয়। যে গল্প প'ড়লে চিত্তের প্রসাদ ও প্রসার হয়; ক্ষণিক উদ্দীপনা নয়, পবিত্রভাব স্থায়ী হয়; অবসাদ নয়, উৎসাহ হয়; সে গল্পের অসংখ্য ক্ষেত্র আছে।

বৎসর গণ্যে তারুণ্য নিরূপিত হয় না। কারও অল্প বয়সে তারুণ্য আরম্ভ হয়, কারও পঞ্চাশ বৎসরেও শেষ হয় না। না হ'লেও যৌবনকাল পঁচিশ ত্রিশ বৎসর। কবির কবিতার বয়সেরও এই সীমা। আমাদের দেশে এ সীমা কদাচিৎ অতিক্রান্ত হয়। কালিদাস কত বয়সে "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" লিখেছিলেন? আমরা সে বয়স জানি না বটে, কিন্তু ব'লতে পারি পঞ্চাশের অনেক আগে, ত্রিশের সময়ে। পঞ্চাশের পরে যদি তিনি কোন কাব্য লিখে থাকেন, সেটা অভ্যাসের গুণে, হৃদয়ের রস-প্রভাবে নয়।

পোর্ট-আর্থারের ক্ষুধা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকারে কিরীচগুলো ঝিকমিক করিতেছিল, সেগুলো আর তেমন দেখিতে পাইতেছি না। অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল এখন মাত্র কয়েকজনে আসিয়া ঠেকিল। সহসা মাটির উপর তালগোল পাকাইয়া পতন—যেন মুগুরের ঘায়ে আহত হইয়াছি। ডানহাতে চোট লাগিয়াছে। শত্রুর চমৎকার ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ আলো ঝিলিক দিয়া উঠিল, সেই আলোয় মড়ার গাদা দেখিতে পাইলাম। আহত হাত-খানা তুলিয়া দেখি কব্জির কাছে ভাঙিয়াছে। হাতখানা ঝুলিতেছে, তা থেকে হু হু করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। তৈরি ব্যাণ্ডেজ বার করিয়া ত্রিকোণ টুকরা দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিলাম। তার উপর একখানা রুমাল জড়াইয়া উদীয়-মান্ সূর্য্যপতাকা দিয়া গলা থেকে ঝুলাইয়া দিলাম—সেই পতাকাই শত্রুর কেল্লার উপর বসাইবার পণ করিয়াছিলাম!

মাথা তুলিয়া দেখি আমার ও ওয়াংতাই পাহাড়ের মাঝে কেবল একটি উপত্যকা—পাহাড়ের মাথা যেন প্রায় আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে। দারুণ তৃষ্ণা, কোমর হাতড়াইয়া দেখি জলের বোতল নাই—কেবল তার চামড়ার বন্ধনীটা আমার পায়ে জড়াইয়া আছে। সৈনিকদের গলার আওয়াজ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ওদিকে ঘৃণ্য শত্রুর 'রকেটের' চোখ-ঝলসানো আলো আর তোপের শ্রবণ-বিদারী আওয়াজ বাড়িয়া চলিয়াছে। আস্তে আস্তে পা-গুলো ঘসিয়া দেখি সেগুলো অক্ষত আছে, তখন উঠিলাম। তলোয়ারের খাপ ফেলিয়া দিয়া তলোয়ারখানা বাঁ হাতে লাঠির মত করিয়া ধরিয়া ঢালু বাহিয়া নামিয়া চলিলাম—যেন স্বপ্নে চলিতেছি! মাটির দেওয়াল ডিঙাইয়া ওয়াংতাই পাহাড়ে চড়িতে সুরু করিলাম।

সামনে দীর্ঘাকার অতিকায় কামানগুলো উঁচু হইয়া আছে—আমার দলের কজনই বা এখনও বাঁচিয়া আছে কে জানে! যারা বাঁচিয়া আছে তাদের উদ্দেশে চীৎকার করিয়া বলিলাম—আমাকে অনুসরণ কর; কিন্তু কেহই আমার ডাকে সাড়া দিল না। মনে হইল, অন্য দলগুলোর অবস্থাও নিশ্চয়ই এমনি—ভাবিয়া বুক যেন দমিয়া যাইতে লাগিল। তাজা সৈন্যদল আসিয়া সাহায্য করিবে, সে আশা নাই; তাই একজন সৈনিককে আদেশ দিলাম—র‍্যাম্‌পার্টে উঠে সূর্য্য-পতাকা বসিয়ে দাও! কিন্তু হায়, চোখের নিমিষে গুলির ঘায়ে সে মরিল—মুখ দিয়া একটা আওয়াজও সরিল না।

হঠাৎ আমার চারিদিক দিয়া একটা বিকট শব্দ উঠিল—যেন লোকান্তর থেকে।

পাল্টা আক্রমণ!

র‍্যাম্‌পার্টের উপর কালো কাঠের দেওয়ালের মত আবির্ভূত হইল একদল শত্রু। নিমেষে আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া উল্লাসে তারা চীৎকার করিয়া উঠিল। এমনভাবে আছি যে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়, তা ছাড়া আমরা সংখ্যায় এত কম যে তাদের সঙ্গে লড়াও যায় না। খাড়া পাহাড় বাহিয়া পিছু হটিতে হইল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি শত্রু পিছু পিছু ধাওয়া করিয়া গুলি ছাড়িতেছে। পূর্ব্বে যে মাটির গড়ের কথা বলিয়াছি, তার কাছে পৌঁছিয়া শত্রুর মুখোমুখি ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম। বিষম সোরগোল বীভৎস হত্যাকাণ্ড সুরু হইয়া গেল।

কিরীচে কিরীচে ঠোকাঠুকি বাধিল, শত্রু একটা 'মেশিন্-গান্' বাহির করিয়া আমাদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালাইতে লাগিল—দু-পক্ষেই মানুষ পড়িতে লাগিল কাস্তের মুখে ঘাসের মত। সে-দৃশ্যের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারিব না, কারণ তখন আমার আচ্ছন্ন অবস্থা। কেবল মনে আছে ভীষণ আক্রোশে তলোয়ার ঘুরাইতেছি, মাঝে মাঝে মনে হইল শত্রুকে কাটিয়া ফেলিতেছি। মনে পড়ে একটা এলোমেলো লড়াই, সাদা ফলকের উপর

সাদা ফলকের আঘাত, 'শেলের' শিলাবৃষ্টি, ধাক্কাধাক্কি, কাটাকাটি, মারাত্মক হাতাহাতি। শেষে গলা এমন ধরিয়া গেল যে, আর চেঁচাইতে পারি না। হঠাৎ সশব্দে আমার তলোয়ার ভাঙিয়া গেল—আমার বাঁ হাত বিদীর্ণ হইয়াছে। পড়িয়া গেলাম। উঠিবার আগেই একটা 'শেল্' আসিয়া আমার ডান পা গুঁড়া করিয়া দিল। সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মনে হইল যেন ভাঙিয়া পড়িতেছি—সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে মাটিতে হুড়মুড় করিয়া পড়িলাম।

এক সৈনিক আমাকে পড়িতে দেখিয়াছিল। সে বলিল, লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাই! আসুন আমরা একসঙ্গে মরি!

বাঁ হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। চারিদিকে হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছে—অক্ষম অসহায় পড়িয়া পড়িয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। মনে দারুণ উন্মাদনা, কিন্তু দেহ অচল অবশ!

২৫

মৃত্যুর মাঝে জীবন

উভয় পক্ষের হতাহতে-ভরা যুদ্ধক্ষেত্রের উপর ২৪শে আগষ্ট তারিখের দিবাগম হইল। যাহাকে জড়াইয়া আছি, সে কেন্সুকে-ওনো—এ সৈনিক আমার কাছেই শিক্ষা পাইয়াছে। তাহার ডান চোখের পাশ দিয়া গুলি বিঁধিয়াছিল। মৃত্যু নিশ্চিত ভাবিয়া সে আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া আমারই সঙ্গে মরার প্রস্তাব করে। বেচারা! তাহাকে জড়াইয়া আমার বাঁ হাত, তাহাতে গাঢ় রক্তের ছোপ—ওনোর গলার উপর দিয়া সেই রক্ত বহিয়া যাইতেছে। ওনো সন্তর্পণে আমার হাত সরাইল, নিজের ব্যাণ্ডেজ বাহির করিয়া আমার বাঁ হাত বাঁধিয়া দিল।

এমনিভাবে সাংঘাতিক আহত অবস্থায় শত্রু-পরিবৃত হইয়া পড়িয়া রহিলাম—মুক্তির কণামাত্র আশা দেখিতে পাইলাম না। মৃত্যু যদি না হয় তবে নিঃসন্দেহ অচিরে শত্রুর হাতে পড়িব—সে-দুর্ভাগ্য মৃত্যুর চেয়ে ঢের বেশি অসহনীয়। সেই অপমান এড়াইবার জন্য মন আত্মহত্যা করার জন্য ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে কোনো অস্ত্র নাই, হাতও নাই যে অস্ত্র পাইলে ধারণ করিতে পারে! দুঃখে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

"ওনো, ভাই, আমাকে মেরে ফেল, তারপর এখান থেকে ফিরে গিয়ে এখানকার অবস্থা তাদের জানাও"—এই বলিয়া তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। কত কাকুতি-মিনতি করিলাম, কিন্তু সে শোনে না। সে প্রায় অন্ধ, তার দুই চোখই রক্তে ঢাকা পড়িয়াছে, তবুও সে বন্দুক চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমি রক্ষা করব…

তার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিলাম, আমাদের অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম। শত্রুর মতিগতির বদল হইয়াছে, তারা পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে, আমাদের ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, কাল রাত থেকে আমরা শত্রুর এলাকার অনেকটা ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছি, এমনি অসহায় অবস্থায় থাকিলে নিশ্চয়ই আমাদের বন্দী করিবে—তাহাকে কত মতে বুঝাইলাম। তারপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রুশের হাতে বন্দী হইতে কেমন লাগিবে? আমি অচল অনড় অবস্থায় পড়িয়া আছি, হাত পা নাড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই, আমাকে এখনি মারিয়া ফেলিলেই আমার সবচেয়ে বেশি উপকার করা হইবে, তারপর তুমি পালাইতে পারিবে—তাহাকে বলিলাম। কিন্তু ওনোর কাণ্ডজ্ঞান নাই, সে কেবল বলিতে লাগিল—আমি রক্ষা করব!

নিরুপায় বোধে হাল ছাড়িয়া দিয়া সেখানেই মরিতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু তবুও ওনোকে পাঠাইয়া যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা জানাইবারও জন্য অধীর হইলাম। বলিলাম—যাও তবে, 'ষ্ট্রেচার' নিয়ে এস, আমি যাব! চটপট কর! বেশ জানি 'ষ্ট্রেচার'-বাহক এই গিরিসঙ্কটে কিছু পৌঁছিতে পারিবে না—এই শত্রু-পরিবৃত স্থানে আসার ত কথাই নাই। কেবল আশা—এইরূপে ওনো জীবিত অবস্থায় আমাদের প্রধান দলের কাছে ফিরিবার সুযোগ পাইবে এবং আমার মৃত্যুর খবরটাও দিতে পারিবে!

আমার কথা শুনিয়া ওনো পাগলের মত লাফাইয়া উঠিল। আচ্ছা থাকুন এখানে, আসচি—বলিয়া মাটির

দেওয়ালের পানে ছুটিয়া গিয়া অদৃশ্য হইল। শত্রুর বাধা ভেদ করিয়া সে কি আমাদের প্রধান আড্ডায় পৌছিতে পারিবে?

ওনো চলিয়া গেল, মৃত ও মৃতপ্রায় সৈনিকদের মাঝে আমি একলা পড়িয়া রহিলাম। আমার জীবনে এই সময়টি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—গভীরতম দুঃখের ও চরম হতাশার মুহূর্ত্ত। নেল্‌সনের কথা আপন মনে বলিতে লাগিলাম—ভগবানের অশেষ করুণা, আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি! ব্যর্থ হইলেও সারা জীবনের কাজ করিয়াছি—এই ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম। আর কিছুই ভাবি নাই। এই কথাটি কেবল বুঝিলাম যে পঁচিশ বছর বয়সের এক যুবকের হৃদিরক্ত দ্রুতগতি ঝরিয়া ঝরিয়া অচিরে নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের ক্ষতের বেদনা মোটেই অনুভব করিলাম না। অদূরে রুশেরা খাতের মধ্যে যাওয়া-আসা করিতেছে, আমাদের দলে যারা এখনও বাঁচিয়া আছে তাদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতেছে, প্রত্যেকে পালা করিয়া পাঁচ ছয়টি বন্দুক ব্যবহার করিতেছে। চাহিয়া চাহিয়া তাদের কীর্ত্তি দেখিতেছি, এমন সময় তাদের একজন লক্ষ্য করিল যে, আমি তখনও বাঁচিয়া আছি। অপর রুশেদের সে সঙ্কেত করিল, অমনি তিন চারিটা গুলি আমার পানে ছুটিয়া আসিল। বন্দুকের মাথায় কিরীচ চড়াইয়া লাফাইয়া তারা আমার দিকে ধাবিত হইল। চোখ বুজিলাম—এবার আমাকে হত্যা করিবে! প্রথমত, আমার দেহ লোহা বা পাথরে তৈরি নয়, তার উপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়াছে—শত্রুকে বাধা দিবার বা তাহাকে তাড়া করিবার শক্তি নাই। 'নেকড়ে'গুলোর বিষাক্ত দংশন থেকে পরিত্রাণ কোথায়? কিন্তু ভগবান এখনও আমাকে ত্যাগ করেন নাই। এই সঙ্কটে নিকটেই একটা হাতাহাতি লড়াইয়ের শব্দ পাইলাম, কিন্তু কোনো অজানা বর্ব্বরের কিরীচের ডগা আমার গায়ে বিঁধিল না। আমার পানে যেই তারা ছুটিয়া আসিল অমনি আমাদের জন পাঁচ ছয় লোক তাদের সঙ্গে লড়িতে সুরু করিল এবং সকলেই মারা পড়িল। আমি নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া কিছুই আশা করি নাই, তবুও আমার প্রাণ দুর্ভাগা সঙ্গীদের প্রাণের মূল্যে রক্ষা পাইল! এইরূপে আমার ক্ষীণ নিশ্বাস-প্রশ্বাস তখনও চলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে এক সৈনিক চীৎকার করিয়া মাটির দেওয়ালের উপর লাফাইয়া উঠিল তলোয়ার আস্ফালন করিয়া। কে এই বীর, একাকী শত্রুর খাত দখল করিতে চায়? তার দুঃসাহসে চমক লাগিল। কিন্তু হায়, কোথা থেকে একটা গুলি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আঘাত করিল, হুড়মুড় করিয়া সে আমার ডানদিকে পড়িয়া গেল। অতি সহজে অসঙ্কোচে সে মৃত্যুর গহনে প্রবেশ করিল, যেন বাড়ি ফিরিতেছে! মৃত্যুর সন্ধানেই ত সে সেখানে একলা নির্ভয়ে লাফাইয়া উঠিয়াছিল এবং বিজয়-হুঙ্কারে শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল!

কিছুক্ষণ পরে আমাদেরই সৈন্যদলের নিক্ষিপ্ত গোলা আমাদের মাথার উপরে ঘন ঘন ফাটিতে সুরু করিল। চারিদিকে percussion গোলা পড়িয়া ধোঁয়া ও রক্ত একত্রে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কালো কালো টুকরা টুকরা হাত পা গলা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হাল ছাড়িয়া দিয়া চোখ বুজিলাম। কামনা করিতে লাগিলাম—মুহূর্ত্তে আমার দেহ শতখণ্ডে চূর্ণ হোক, অচিরে আমার যন্ত্রণার অবসান হোক! তবুও আমার অস্থিমাংস চূর্ণ করিতে কোনো গোলা আসিল না; আসিল কেবল গোলার ছোট ছোট টুকরা আমার আহত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নূতন আঘাত হানিবার জন্য। পাশেই এক আহত সৈনিকের মুখে সেই ভয়ঙ্কর গোলার একটা টুকরা আসিয়া বিঁধিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া সে মরিয়া গেল। প্রতি মুহূর্ত্তে আমিও হয় অমনি এক পরিণাম, নয় অর্দ্ধমৃত অর্দ্ধজীবিত অবস্থায় সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষুধার্ত্ত কুকুর বা নেকড়ের মুখে যাইবার আশা করিতে লাগিলাম। উত্তরের ভয়ঙ্কর 'ঈগল' আমাকে একটু একটু করিয়া খুঁটিতেছে। মাথার কাছে শুনিলাম কে 'নিপ্পন্ বান্‌জাই' * বলিয়া হাঁকিল। চোখ মেলিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিলাম এক হতভাগ্য আহত

* 'জাপানের জয়'।

সেনা। মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গেছে, তবুও স্বদেশের জন্য 'বান্‌জাই' হাঁকিতে ভোলে নাই। সে বারবার 'বান্‌জাই' বলিতে লাগিল, কখনও বা বলিতেছে—এস এস জাপানী সেনাদল! যতক্ষণ না অবসন্ন হইয়া পড়িল ততক্ষণ উন্মাদের মত নাচিয়া-কুঁদিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তারপর তার ঠোঁটে ঠোঁট বসিয়া গেল, মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। চোখ বুজিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—শান্তিতে তার মরণ হোক!

ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্তে আমার সারাদেহ লালে-লাল হইয়া গেছে। কেবল দুই বাহুতে ব্যাণ্ডেজ, বাদ-বাকি ক্ষত সমস্তই অনাবৃত। কখনও কখনও শান্ত মনে চোখ বুজিতেছি, কখনও চোখ মেলিয়া চারিদিক লক্ষ্য করিতেছি। বাঁ দিকে দেখি 'উদীয়মান সূর্য্য'-পতাকা উড়িতেছে, তার তলে দুজন জাপানী সেনা মরিয়া পড়িয়া আছে। সম্ভবত পতাকাটি ঐ দুই বীর সৈনিকই সেখানে পুঁতিয়াছে। আমাদের লোকেরা যদি ওদিকে অগ্রসর হয়, তবে শত্রু তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিবে; আর রুশেরা যদি ঐ জায়গা পুনরধিকারের চেষ্টা করে, তারাও নিশ্চিত আমাদের গোলন্দাজের হাতে মারা পড়িবে। নির্ভীক সেনাদ্বয় মরিয়াও জায়গাটি দখলে রাখিয়াছে, আর তারা নিশ্চয়ই সফলতার গৌরবে হাসিমুখে তৃপ্তমনে প্রাণ দিয়াছে!

তাহাদের মৃত্যুর মহিমার কথা ভাবিতে ভাবিতে মন যখন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক তখন এক বর্ব্বর নৃশংস কাণ্ড চোখে পড়িল। লক্ষ্য করিতেছিলাম, এক রুশ কর্ম্মচারী বারবার তার আহত পা দেখাইয়া হাতের ইসারায় সাহায্য চাহিতেছে। দেখিলাম, এক জাপানী হাসপাতালের আরদালি, সেও আহত, উক্ত রুশের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। আপন ক্ষতের পরিচর্য্যা না করিয়া সে কোমরের থলি থেকে ব্যাণ্ডেজ বার করিয়া সযত্নে রুশের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল! আহত শত্রুর প্রতি এই দয়ার প্রতিদান রুশ কর্ম্মচারী কিরূপে দিল? কৃতজ্ঞতার অশ্রুমোচন করিয়া?—না। করমর্দ্দন করিয়া ধন্যবাদ দিয়া?—না। তবে করিল কি? আরদালির ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যেই শেষ হইল অমনি সেই রুশ ইজেরের পকেট থেকে রিভলভার বাহির করিয়া এক গুলিতে সেই জাপানীর প্রাণ সংহার করিল!

নির্ম্মম অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইলাম, কিন্তু কিছুই করিতে পারি না, আমি যে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছি। কেবল চোখ বুজিয়া দাঁত কিড়মিড় করিতে লাগিলাম। শীঘ্রই শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল। মনে হইল প্রাণবায়ু দ্রুতগতি শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় কে একজন আমার কোট ধরিয়া আমাকে শূন্যে তুলিল, মিনিট খানেক পরে আবার রাখিয়া দিল। ঈষৎ চোখ খুলিয়া অস্পষ্টভাবে দেখি দু-তিনজন রুশ পাহাড়ের উপর উঠিয়া যাইতেছে। বন্দী হইতে হইতে বাঁচিয়া গেছি! যে মুহূর্ত্তে আমাকে তুলিয়া ধরিয়া নামাইয়া রাখিল সেই মুহূর্ত্তটি জীবন ও মৃত্যুর, সম্মান ও অপমানের সীমারেখা। হয়ত তারা ভাবিল আমি মরিয়াছি। তেমন ভাবা বিচিত্র নয়, কারণ আমি রক্তে মাখামাখি অবস্থায় ছিলাম।

তারপর কে একজন নিঃশব্দে আমার পাশে ছুটিয়া আসিয়া একটি কথাও না বলিয়া ধুপ করিয়া পড়িয়া গেল। মরিয়াছে না কি? না, মৃত্যুর ভাণ করিতেছে? কিছুক্ষণ পরে সে আমার কানে কানে বলিল—চলুন ফিরে যাই! আমি আপনাকে সাহায্য করব!

হাঁপাইতেছি, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে, তারই মাঝে লোকটির পানে তাকাইলাম। অচেনা লোক—একজন সাধারণ সেনা, তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

তার সদয় প্রস্তাবের উত্তরে বলিলাম, এ অবস্থায় জীবিত ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব! তুমি বরং আমাকে মেরে ফেলে পার তো নিজে চলে' যাও!

সে বলিল, আমাকে জীবিত অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার আশা সে রাখে না, তবে অন্তত সে আমার দেহ লইয়া যাইবে—শত্রুর মাঝে ফেলিয়া যাইবে না! এই কথা বলিয়াই সে আমার বাঁ হাত ধরিয়া তার কাঁধের উপর রাখিল। ঠিক সেই সময়ে আমার ডানদিকে যে নির্ভীক লোকটি পড়িয়া পড়িয়া কিছুক্ষণ থেকে গোঙাইতেছিল, সে অশ্রুরুদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, লেফটেন্যাণ্ট, শেষবার আমাকে একটু জল দিয়ে যান!

শুনিয়া বুক ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল, আমার সাহায্যকারীর হাত ছাড়াইয়া তার পাশে পড়িয়া গেলাম। কে জানে, এই দুর্ভাগা হয় ত আমারই দলের লোক, আমাকেই শেষ বিদায় দিতে বলিতেছে! আহা বেচারা! হতভাগ্য সঙ্গীকে একলা ফেলিয়া কেমন করিয়া যাইব!

সাহায্যকারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জল আছে তোমার কাছে? সে তার জলের বোতল বার করিয়া আমার বুকের উপর দিয়া ডিঙাইয়া মৃতপ্রায় ব্যক্তির মুখে ঢালিয়া দিল। তখন সে মিনতির ভঙ্গীতে ভাঙা-চোরা হাত দুখানি জোড়া করিল, তারপর অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—নামু-আমিদা-বুৎসু, নামু-আমিদা-বুৎসু! * বলিতে বলিতে তার শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল!

হত ও আহত অন্যান্য সেনাকে ফেলিয়া বিপদ থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু আমার দয়ালু বন্ধু আমার বাঁ হাত চাপিয়া ধরিয়া আমাকে পিঠে তুলিয়া লইল, তারপর একলাফে মেটে গড় পার হইয়া গেল। দুজনে ধুপ করিয়া নীচে পড়িলাম। চট্ করিয়া একটা ওভারকোট তুলিয়া লইয়া তার দ্বারা আমাকে ঢাকিয়া ফেলিয়া সে নিজে আমার পাশে শুইয়া পড়িল। এইভাবে এক অজানা সেনার পিঠে খাত থেকে মুক্তি লাভ করিলাম। তার পিঠে থাকার সময় গড়ের এক কোণে পা ঠেকিয়া গেল—সেই সর্ব্বপ্রথম ভয়ঙ্কর বেদনা বোধ করিলাম।

কিছুক্ষণ কাটিয়া যায়। সে আবার ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, ঘন ঘন গুলি আসছে, খানিক অপেক্ষা করতে হবে!

সে খাপ থেকে কিরীচ খুলিয়া লইয়া তোয়ালে দিয়া আমার ভাঙা পায়ে splint-এর মত করিয়া বাঁধিয়া দিল। বিষম তৃষ্ণা—জল খাইতে চাহিলাম। তার বোতলে যেটুকু জল বাকি ছিল সমস্ত দিয়া বলিল, বেশি খাবেন না। প্রায়ই সে আমাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে বলিতেছিল, বেশি নয়, একটুখানি ধৈর্য্য ধরে' থাকুন! চারিধারে দেখিতেছি অনেক সৈন্য গোঙাইতেছে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমার দয়ালু বন্ধু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জলের বোতল কুড়াইয়া লইয়া তাদের জল দিতে লাগিল। শত্রুর চোখ এড়াইবার জন্য প্রায়ই সে মরার ভাণ করিয়া চট্ করিয়া আমার উপর শুইয়া পড়িতেছে।

এখন পর্য্যন্ত এই অদ্ভুত মানুষটির নাম পর্য্যন্ত জানি না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি?

সে ফিসফিস করিয়া বলিল, আমার নাম তাকেসাবুরো কোন্দো।

"কোন্ রেজিমেণ্ট?"

"কোচি রেজিমেণ্ট।"

এই যে সাহসী সেনা আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছে, এ আমার তাঁবেদারও নয়, আমার রেজিমেণ্টের লোকও নয়—ইহাকে আগে কখনও চোখেও দেখি নাই। অদৃষ্টের এ কোন্ রহস্যময় সূত্রে দুজনে বাঁধা পড়িলাম!

রক্ষা পাইবার কয়েক ঘণ্টা পরে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই মনে পড়িল কোন্দোর প্রিয় নাম।

নির্ভীক তাকেসাবুরো! সেই আমাকে ওয়ান্‌তাইয়ের শত্রু-ব্যূহের বাহিরে আনিয়াছে, কিন্তু জাপানী এলাকায় পৌঁছিতে এখনও দেরী আছে। প্রকাশ্য দিবালোকে রুশেদের 'মেশিন্-গান' এড়াইয়া ফিরিতে হইবে। লোকটি ত নিজেও আহত! আমার প্রাণরক্ষা হওয়া অনিশ্চিতেরও বাড়া—আমাকে ফেলিয়া একলা নিরাপদ স্থানে পালাইতে পারিলে তার এমন দুর্ভোগ হইত না। কিন্তু সে পণ করিয়াছে আমাকে সাহায্য করিবে—তার কাছে সে প্রতিজ্ঞার মূল্য আপন প্রাণেরও অধিক। সে সকল বিপদ তুচ্ছ করিল, সকল অসুবিধা সহ্য করিল, অদ্ভুত চতুরতা ও বুদ্ধির সহিত আমার উদ্ধারের জন্য কত রকমের উপায় অবলম্বন করিল, অথচ আমার সঙ্গে ত ব্যক্তিগতভাবে কোনো বাধ্যবাধকতা তার ছিল না।

কিছুক্ষণ নিজের দেহ দিয়া ঢাকিয়া সে আমাকে

* বুদ্ধকে প্রণাম করি।

রক্ষা করিল। তারপর বলিল, এখনও আমাদের চারিদিকে যথেষ্ট গুলি পড়ছে বটে, তবুও এখানে রাত পর্য্যন্ত থাকা সঙ্গত নয়, কারণ তা হ'লে শত্রু এসে নিশ্চয় আমাদের মেরে ফেলবে! এখনি আমাদের যেতে হবে! ভাবুন আপনি মারা পড়েছেন!

একটি ওভারকোট দিয়া সে আমাকে মুড়িয়া ফেলিল, তারপর নিকটের এক সৈনিককে ইসারায় ডাকিল। আহত লোকটি হামা দিয়া আমার পাশে আসিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি না লেফটেন্যাণ্ট সাকুরাই?

সে যে কে আমি তাহা জানিতাম না, কিন্তু সে যখন আমাকে চেনে তখন নিশ্চয়ই আমাদের রেজিমেণ্টের লোক। আমাকে দেখিয়া সে বলিল, ইস, বেজায় জখম হয়েছেন দেখছি! বলিয়া তাকেসাবুরোর সঙ্গে ফিসফিস করিয়া কথা কহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তারা দুজনে আমাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। ওয়ান্‌তাই পিছনে ফেলিয়া হতাহত সঙ্গীদেরকে ছাড়িয়া একলা চলিয়াছি, সারাক্ষণ সেই লজ্জা কাঁটার মত মনে বিঁধিতে লাগিল। আমার দুই বাহক পাঁচ দশ পা চলে আর শুইয়া পড়ে—যেন মারা গিয়াছে! এইরূপে শত্রুর চোখে ধূলা দেয়। বাহিত হইবার সময় বেদনা বোধ করি নাই, তবে ভাঙা হাড়ের মড়মড়ানি অস্বস্তিকর। কাঁটাতারের বেড়া পার হইয়া, বক্ষঃপ্রমাণ প্রাচীর পার হইয়া, মধ্যাহ্নের জলন্ত উগ্র রোদের মাঝ দিয়া বাহিত হইয়া শেষে এক গিরিসঙ্কটে আসিয়া পৌঁছিলাম তারের বেড়ার কিছু নীচে। মনে হইল জায়গাটা চিকুয়ানের পাদদেশ।

সেখানে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নামাইয়া রাখিল। শরীর অবসন্ন, মাথা ঘুরিতেছে, ক্রমে সমস্তই, ঘুমের মধ্যে যেমন, তেমনি আমার চেতনার বাহিরে চলিয়া গেল। অতিরিক্ত রক্তস্রাবই ইহার হেতু। পরে শুনিয়াছি, এই সময়ে আমি মৃত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলাম। আমার মৃত্যুসংবাদ বাড়িতে পৌঁছিলে আমার শিক্ষক মুরাই-মহাশয় আমার লেখা একখানি পোষ্টকার্ড বাস্তুপীঠে রাখিয়া আমার আত্মার উদ্দেশে ধূপধুনা ও ফুল নিবেদন করিয়াছিলেন!

গিরিসঙ্কটে কয়েক ঘণ্টা একরকম মড়ার মত পড়িয়া রহিলাম, কিন্তু পরলোকের দ্বার তখনও আমার জন্য খোলে নাই, তাই আবার শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। প্রথম শব্দ যাহা কানে পৌঁছিল তাহা একটা বিকট বিরাট শব্দ—একটা বড় কামানের গোলা আমার কাছে পড়িয়া নুড়ি ও বালি উড়াইল। আমি ধূলায় ঢাকা পড়িলাম।

মনে হইল কামানগর্জ্জন আমার আত্মাকে ইহজগতে ফিরাইয়া আনিল। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। ডান পা'খানা ওরই মধ্যে একটু ভালো, নাড়িবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু একটুও নড়িল না। তা থেকে হুহু করিয়া রক্ত বার হইয়া উপরে জমিয়া গেল। দেখিলাম আমার মুখের উপর একখানি সূর্য্য পতাকা সামিয়ানার মত বিস্তারিত—তাকেসাবুরো কোন্দো তখনো আমার পাশে বসিয়া।

চার-পাঁচ জন আহত সৈনিক আসিয়া পৌঁছিল। যে-ওভারকোটে আমি জড়ানো ছিলাম তাহাতে বাঁশ বাঁধিয়া আমাকে প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরে লইয়া যাইবার জন্য সে তাহাদের সাহায্য চাহিল। যে-নিশানে আমার মুখ ঢাকা ছিল তার একটা কোণ তুলিয়া সে বলিল, লেফটেন্যাণ্ট, মনে হচ্ছে আমার আঘাত মারাত্মক নয়, আমি আর ফিরে যাব না। আপনার অবস্থা খুব খারাপ। সাবধানে থেকে সুস্থ হয়ে উঠবেন আশা করি! এই বলিয়া সে অবশেষে বিদায় লইল। আর তাহাকে দেখি নাই।

তার আশ্চর্য্য সেবা ও সাহসের জন্য তার হাতখানা ধরিয়া তাহাকে কি ধন্যবাদ দিলাম? আমার অচল হাতে তাহা করা সম্ভব হইল না। তার দয়ার জন্য অসীম কৃতজ্ঞতায় কেবল চোখের জল ফেলিলাম, প্রার্থনা করিলাম—ভগবান ওকে রক্ষা ক'রো! কথায় বলে, একই গাছের ছায়ার ভাগ লইলে, একই জলধারা থেকে তৃষ্ণা মিটাইলে লোকান্তরে মিলন নিশ্চিত হয়! কিন্তু সে স্বেচ্ছায় বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করিয়াছে—আমার এ নবজীবন যথার্থই তারই দান। আমার বর্ত্তমান জীবন

মোটেই আমার নয়। ওয়ানুতাইয়ে নিঃসন্দেহে আমার মৃত্যু ঘটিত. আমি যে এখন বাঁচিয়া আছি, সে কেবল কোন্দোর অনুগ্রহে। সে কথা যখন ভাবি, তখন দুঃখে কাঁদিতেও পারি না, মনের ভাব কাহাকেও বুঝাইতেও পারি না—কথা আর কান্না দুই-ই কণ্ঠে জমিয়া যায়!

রাত্রে চার পাঁচজন আহত সেনা অন্ধকারের সুযোগে শত্রুর সম্মুখদেশ অতিক্রম করিয়া অনেক কষ্টে প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবির খুঁজিয়া বাহির করিল। সেখানে যখন পৌছিলাম আমি তখনও অবসন্ন, একটা আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে আছি, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারি না। কেবল মনে পড়ে, ওভারকোট ও বাঁশগুলো না খুলিয়াই আমাকে ষ্ট্রেচারের উপর রাখা হইল। ষ্ট্রেচারে বহন করিয়া যেখানে আমাকে নামাইল, সেখানে দেখিলাম লোকেরা ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে। বাস্তবিক সেইটাই. প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবির। যেই সে-কথা বুঝিতে পারিলাম অমনি বলিয়া ফেলিলাম—সার্জন্ য়্যাসুই এখানে আছেন কি? আর সার্জন্ আন্দো?

তখনি জবাব পাইলাম—আমিই আন্দো! য়্যাসুইও এখানেই আছেন!

সেখানে বন্ধুদের দেখা পাইব আশা করি নাই, কেবল তাদের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম যেন স্বপ্নঘোরে, যে নাম আমার এত প্রিয়। কিন্তু সেই অদ্ভুত রহস্যময় সূত্র যাহা আমাদিগকে বন্ধুত্বে বাঁধিয়াছিল, তাহাই আমাকে সেখানে টানিয়া আনিয়া তাদেরই চিকিৎসাধীনে রাখিয়া দিল! ছাড়াছাড়ি হওয়া, ছড়াইয়া পড়া যুদ্ধক্ষেত্রের সাধারণ বিধি—সেখানে এ ব্যাপার কিছুতেই ঘটান যাইত না। বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিবে, যখন দরকার ঠিক সেই সময়েই তাহাদের দেখা পাইলাম। তাদের অপ্রত্যাশিত গলার আওয়াজ শুনিয়া আমার বুক দ্রুততালে নাচিয়া উঠিল—সার্জন্ য়্যাসুই! সার্জন্ আন্দো!

তাহারা আসিয়া আমার হাত ধরিল, কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কহিল—সাবাস ভাই···খুব করেছ!

দেখিতে পাইলাম আমার ব্যাট্যালিয়নের নায়ক মেজর উয়েমুরার দেহ বামদিকে শায়িত, আর অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত সেই নির্ভীক যোদ্ধার দেহ জড়াইয়া ধরিয়া তাঁর ভৃত্য তারস্বরে কাঁদিতেছে। আমার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শীঘ্রই শেষ হইল। তখন অনিচ্ছায় আমার দুই ডাক্তার বন্ধুর কাছে বিদায় লইলাম। আমাকে তাহারা পিছনে পাঠাইয়া দিল।

পরে সার্জন্ য়্যাসুইয়ের মুখে শুনিয়াছি—"যে প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরে তোমাকে আনিয়াছিল, সেখানে আমাদের দলের আহত সেনা আসিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস ছিল না; তবুও তোমার শুশ্রূষা করা সম্ভব হইল ইহাই সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার। আহতেরা আসিয়া পৌছতে লাগিল, তোমার কথা জিজ্ঞাসা করায় তারা বলিল তুমি নিশ্চয়ই মারা পড়িয়াছ! এমন কি একজন জোর করিয়া বলিল যে, তুমি চিকুয়ানে তারের বেড়ার তলে নিহত হইয়াছ। মানিয়া লইলাম, তোমাকে আর ইহজগতে দেখিতে পাইব না। কিন্তু তোমার দেহ উদ্ধার করা চাই, তাই কোন্‌খানে তুমি মারা পড়িয়াছ সে-সম্বন্ধে বিশেষভাবে খোঁজখবর করিলাম, কিন্তু কোনো ফল হইল না। পরে সাদাওকা নামে এক সার্জেণ্ট আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তুমি চিকুয়ানের গিরিসঙ্কটে মারা পড়িয়াছ। তখন কয়েকজন আরদালিকে তোমার দেহ ষ্ট্রেচারে আনিবার জন্য পাঠাইলাম। কিন্তু তখন বেজায় অন্ধকার আর শত্রুর গুলিও খুব চলিতেছে, তাই তারা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি স্থির হইতে পারি না, কিছু পরে আবার দ্বিতীয় দল আরদালি পাঠাইলাম, তাহারা তোমাকে জীবন্ত ফিরাইয়া আনিল! আমাদের বিস্ময়ও যেমন, আনন্দও তেমান, কিন্তু প্রথম দর্শনে মনে হইল তোমার আয়ুষ্কাল বড় জোর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। সার্জন্ আন্দো ও আমি সদুঃখে পরস্পরের পানে চাহিলাম, তোমাকে বড় হাসপাতালে পাঠাইবার সময় ভাবিলাম সেই আমাদের চিরবিদায়···

"এই ঘটনার মাসখানেক পরে একদিন আমাদের প্রাথমিক শুশ্রূষা-শিবিরের সম্মুখ দিয়া এক সৈনিক শাবল কাঁধে করিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ সে উঁচু পানে মুখ করিয়া পড়িয়া গেল, ছুটিয়া গিয়া দেখি সে তোমারই পরিত্রাতা

তাকেসাবুরো। সে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র, কারণ আমি জানিতাম সে-ই তোমাকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করিয়াছিল। তখনও মৃদু নিশ্বাস বহিতেছে, আমার বোতল থেকে তার মুখে একটু জল ঢালিয়া দিলাম। ঠোঁটে একটু হাসির আভাস দেখিলাম, তারপর মৃত্যু···শান্ত নিরুদ্বেগ!"

এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—ঝড় থামিয়াছে! এই শান্তি আসিল অযুত যোদ্ধার রুধিরের স্রোত বাহিয়া। অনাগত যুগে হয় ত এমন সময় আসিবে যখন পোর্ট-আর্থারের সুকঠিন গিরিশ্রেণী ধূলার সঙ্গে মিশিবে, যখন লিয়াওতুঙের নদী শুকাইয়া যাইবে! কিন্তু দেশভক্ত লক্ষ লক্ষ সেনা, যারা সম্রাট ও দেশের জন্য প্রাণ দিল, তাদেরও নাম বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিবে—এমন সময় কখনও আসিতে পারে না! তাদের সে-নামের সৌরভ যুগযুগান্তে ছড়াইয়া পড়িবে, অনাগত জাপানী চিরদিন তাদের গুণগরিমা কৃতজ্ঞ অন্তরে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে!

শেষ

নিত্য ও অনিত্য

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আনন্দে দহিল ধূপ গন্ধে ভরে পূজার প্রাঙ্গণ,
ফুল ঝরে যায় তবু গন্ধ ঢালে মাতাইয়া বন।
আনন্দে কাঁদিল সুর বীণাযন্ত্রে উঠিল ঝঙ্কার,
বেদনার গন্ধ ঢালি ছিন্ন হয়ে থেমে যায় তার
আনন্দে হইয়া দগ্ধ বর্ত্তিকা সে করে আলো দান,
আনন্দে ফুটেরে পদ্ম ভৃঙ্গ হায় করে মধুপান।

বসন্ত থাকে না হায় তবু যে রে গেয়ে ওঠে পিক্,
শিশির শুকায়ে যায় ক'রে ওঠে তবু ঝিকমিক্!
যৌবন টুটেরে তবু ভাঙেনারে দেহের সে মায়া,
দাঁড়ায়ে মৃত্যুর তীরে চিত্ত তবু চাহে হায় কায়া।
অনিত্য সে ঝরে যায়, গন্ধ সে যে নিত্য হয়ে জাগে;
মিথ্যা সে দহিয়া কাঁদে সত্য যে রে জলে আগে আগে
গলে জীবনের বাতি—জ্বলে ওরে মরণের দীপ,
অনন্ত চেতনা ওরে মাঝখানে করে টিপটিপ!



দলাদলি

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ

বর্ত্তমান ভারতে, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে, জাতীয় মহা-মিলনের আহ্বান একদিকে যেমনই যুগশঙ্খে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, অমনই অন্যদিকে সে আহ্বানের বিরোধী ভেদবুদ্ধিও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমি শুধু সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা বলিতেছি না; শুধু হিন্দু-মুসলমানে নয়, শুধু বাঙালী-উড়িয়া-বেহারী-আসামীর প্রাদেশিক ভেদ নয়, স্বার্থত্যাগী দেশভক্ত কর্ম্মীদের মধ্যেও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান লইয়া, নেতৃত্ব লইয়া, স্বাতন্ত্র্য লইয়া কারণে অকারণে বিরোধ আজ সমাজদেহের সর্ব্বত্র দেখা দিতেছে। সুতরাং দলাদলির কথা আমাদের কাছে নিতান্ত কেতাবী কথা নহে, অত্যন্ত প্রয়োজনের কথা, সম্ভব হইলে অত্যন্ত শীঘ্র সমাধানের বস্তু। বারো বৎসর পূর্ব্বে মদীয় বন্ধু অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার মহাশয়, সঙ্ঘ ও তাহার অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে, দলাদলির প্রয়োজনীয়তা ও অত্যাচার সম্বন্ধে, রাষ্ট্রনীতি-শাস্ত্রে বিচক্ষণ চিন্তাশীল মনস্বী লাইবার কি বলিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; লাইবারের উক্ত মন্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। প্রথমে দলের, প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া, 'দল বাঁধা কেন' তাহার কৈফিয়ৎ দিয়া পরে দলের অত্যাচারের কথা বলিব। পুস্তকের কথায় বাস্তবজগতে কোনও কাজ হয় কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর থাকিলেও, যাহারা বিশ্বাস করে যে মানুষের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ও ধারণা পুস্তকের সাহায্যে প্রচার করা যায় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহা সুফলের সৃষ্টি করে, তাহাদের পক্ষে ছাপার অক্ষর অবহেলা করা সম্ভব নয়।

দল বাঁধা কেন ?

দলাদলির কথা বলিতে গিয়া বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। মনের ধারণা আলোচনায় পরিষ্কার হইয়া গেলে কার্য্যও সহজ হওয়ার সম্ভাবনা; আলোচনায় গলদ থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রেও ত্রুটি রহিয়া যাইবে। প্রায়ই দেখি,—রাষ্ট্রের ব্যাধিকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ ক'রে, স্বাস্থ্যের চিহ্নকে ভাবি রোগের লক্ষণ;—বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমাদের যেন এরূপ ভুলত্রুটি না হয়।

'দল' অর্থে আমরা বুঝি কতকগুলি মানুষ যাহারা—ক্ষণেকের জন্য নয়, দীর্ঘকালের জন্য—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোনও মতবাদ, স্বার্থ বা কল্যাণবিধানের জন্য আইন-সঙ্গত উপায়ে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত, সুতরাং তাহারা মূল ন্যায়ের গণ্ডী অতিক্রম করে না এবং সমগ্র রাষ্ট্রের সাধারণ হিতকল্পে কাজ করে, তা সে হিত প্রকৃতই হউক আর তাহাদের কল্পনা-অনুযায়ী হউক। এই দুইটি জিনিষই থাকা উচিত; ইহাদের কোনওটির অভাব ঘটিলে, অর্থাৎ যদি এই জনসঙ্ঘ বা কর্ম্মীসঙ্ঘ ন্যায়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অবৈধ উপায় অবলম্বন করে কিংবা হীন স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকাশ্যে কি গোপনে সমগ্র রাষ্ট্রের অহিতকল্পে কার্য্য করে তবে তাহাদের চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

প্রথমতঃ, ইতিহাসে এমন কোনও সময়ের কথা শোনা যায় কি না যখন কোনও স্বাধীন দেশে দলাদলির ভাব ছিল না ?

দ্বিতীয়তঃ, কোনও স্বাধীন দেশে দল থাকিবে না, এমন আশা করা সম্ভব কি ?

তৃতীয়তঃ, এমন আশা (স্বাধীন দেশে দল থাকিবে না) বাঞ্ছনীয় কি ?

এ সব প্রশ্ন বাস্তবজগতের কথা, কবির কল্পলোকের নয়, শুধু ইতিহাস হইতেই ইহাদের উত্তর দেওয়া যায়,

এবং এ বিষয়ে যাহাতে কোনও ভুলভ্রান্তি না হয় সে জন্য স্বাধীন দেশ বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার।

যেখানে দেশের রীতি বা নিয়ম অনুসারে প্রজার সহিত শাসনকর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, সত্যকার যোগ আছে, যেখানে রাজনৈতিক কর্ম্ম সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত, সেই দেশকেই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন বলা যায়।

যতদূর জানা গিয়াছে, এমন কোনও স্বাধীন দেশের কথা শুনি নাই যেখানে দল নাই। দেশ বাহিরে স্বাধীন বলিয়া মনে হইলেও, গঠন সাধারণতন্ত্রমূলক হইলেও, প্রকৃত স্বাধীনতা না-ও থাকিতে পারে। স্বচ্ছন্দ রাজনৈতিক অধিকার আছে কি না তাহাই প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য, তাহারই উপর রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ভর করিতেছে। অবশ্য অনেক স্বাধীন দেশের ইতিহাসে এমন সব ক্ষণস্থায়ী যুগ আসে যখন ঘটনাচক্রের বশে সকল প্রকার প্রভেদের সাময়িক নিবৃত্তি ঘটে। কিন্তু রাষ্ট্রবিধির চিন্তাশীল অধিনায়কদের মত এই যে, এমন কোনও স্বাধীন দেশ কখনও ছিল না,—যাহা ন্যায় ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের সমস্যায় সমধিক আগ্রহ বোধ করিত, যাহার রাষ্ট্রীয় বিধি যুগোপযোগী পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, যাহার রাজনৈতিক অধিকারবোধ তীব্র ছিল,—অথচ যাহার কোনও দল ছিল না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মুক্তকণ্ঠে বলিতেই হইবে যে, দল বিনা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকিতে পারে না, থাকা একেবারে অসম্ভব। রাষ্ট্রের বা বিজ্ঞানের বা কলাবিদ্যার ক্ষেত্রে যেখানেই কর্ম্মপথে সাধারণের অবাধ গতি, যেখানেই লোকে কোনও সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে, ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে বা কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, সেখানেই যাহারা একমতাবলম্বী, যাহারা এক পথের পথিক তাহারা একত্র চলিতে চায়, সকলের চেষ্টা যত্ন শক্তি একত্র করিয়া পরস্পরে যোগসূত্র বাঁধিতে চায়। কোনও জড় বাধা দূর করিতে গেলে কতকগুলি শক্তির সংযোগসাধন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে; তেমনি সভ্যতার পথে বাধা দূর করিতে হইলে কিংবা বাস্তবজীবনে কোনও সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অনেক সময়ে ঐক্য ও সমবায় ছাড়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। যেখানে সমবেত ও স্বয়ং-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অবসর আছে, সেখানে দলাদলিরও স্থান থাকিবে,—একথা শুধু রাষ্ট্রে নয়, যে সব ক্ষেত্রে মানুষের স্বচ্ছন্দ বা স্বাধীন মত আছে সে সকল স্থলেই প্রযোজ্য।

তৃতীয়তঃ, দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের বিরোধ ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধ প্রয়োজন; এইরূপ প্রতিরোধের অভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে শান্তি ও সুশাসন দুর্লভ ছিল। এই প্রতিরোধকে কার্য্যকর করিতে গেলে, ধীরভাবে সংযতভাবে চালাইতে গেলে, স্থায়ী করিতে গেলে, প্রতিরোধ যাহারা করিবে তাহাদের দলবদ্ধ হওয়া চাই। দল না থাকিলে, বহু সুচিন্তিত বিধান বিধিবদ্ধ হইতে পারিত না, সদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি বৈষম্যপূর্ণ থাকিয়া যাইত, অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনও সংসাধিত হইত না, স্বাধীন রাজ্যের নীতির কোনও স্বাধীনতা থাকিত না, সমাজ চপলমতি উচ্চাকাঙ্ক্ষীর ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়াইত। বিশেষতঃ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নির্ভর করে ইচ্ছামত কর্ম্ম করিবার শক্তির উপর; সে শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে প্রজাদের মধ্যে সমবায়ের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে থাকা চাই, নতুবা ভ্রান্ত, উন্মত্ত, অত্যাচারী যখন স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করিতে থাকিবে, তখন বিরোধী দলের সৃষ্টি না হইলে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে কে? সহযোগিতা ব্যতীত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান অন্যায় শাসন-নীতির পরিবর্ত্তন, কেমন করিয়া সম্ভবে?

মোটামুটি দুই শ্রেণীর দল দেখিতে পাই, স্থায়ী ও অস্থায়ী। কোনও কোনও দল দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কতকগুলি রাষ্ট্রীয় ভাবে সাধনায় যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা ব্যাপৃত, তাহাদের নীতি বারবার কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হইয়া আসিতেছে। সনাতন ভাবের তাহারা প্রতিনিধি। সমস্ত জাতিটা শুধু তাহাদের কথার নয় কার্য্যপ্রণালীর সহিতও সুপরিচিত, তাহাদের উপযুক্ত আদর করিতে জানে। ইংলণ্ডের হুইগ ও টোরি এইরূ

দলের দৃষ্টান্তস্থল। অস্থায়ী দলের সৃষ্টি হয়, হয়ত কোনও একটি বিধি প্রণয়ন করিবার জন্য, কোনও শাসননীতি পরিবর্ত্তনের জন্য; কিংবা শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যেক প্রস্তাবেই যদি দুই দলের বিভেদ দেখাইতে হয়, প্রস্তাবের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার না করিয়া একদল 'হাঁ' বলিলে অপর দল যদি 'না' বলে, তবে দেশের নৈতিক অবস্থা বড় শোচনীয় বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ দলাদলির চিহ্ন দাঁড়ায় লোকের স্থিতিশীল ও গতিশীল প্রবৃত্তির ভেদে,—একদল চায় যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাকে স্থির রাখিতে, গতানুগতিক হইয়া চলিতে, অন্যদল চায় তাহা ভাঙিয়া ওলট্‌পালট্ করিয়া নূতন একটা কিছু করিতে। উভয় দলই সামাজিক বিপ্লবের কোন-না-কোনও ভাবে সহায়ক। জনৈক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, নাশ করা যেমন বিপ্লবের ব্যাপার, রক্ষা করাও তেমনি বিপ্লবের কারণ। এক দলের মূলমন্ত্র স্থিতি, যাহা মন্দ, যাহা সমাজের অনিষ্টকর, তাহাও রাখিয়া দিতে চায়, রক্ষণশীলতার এই অতিমাত্রা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই; আবার অন্যদল ভুলিয়া যায় যে, মূলকে অতিক্রম করা, ঐতিহাসিক ধারাকে ক্ষুণ্ণ করা অসম্ভব, ক্রমবিকাশই মানব সমাজের মূলনীতি; তাহারা উন্নতির জন্য পরিবর্ত্তন চায় না, পরিবর্ত্তনের জন্যই পরিবর্ত্তন চায়। মানব মনের এই দুই পৃথক ধারা শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়,—ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, রুচি, সর্ব্বত্রই দেখা দেয়।

এই মূলগত পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাই, প্রকৃত প্রস্তাবে হিতকর সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে হইলে তাহার মূলে চাই মহৎ উদ্দেশ্য, সে মহৎ উদ্দেশ্য জটিল হইবে না, তাহার সরল অর্থ সাধারণ লোকে অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, পারিয়া প্রয়োজন হইলে দলে দলে লোক আসিয়া সঙ্ঘের পতাকাতলে সমবেত হইবে। এরূপ সঙ্ঘ এমন ভাবে গঠিত হওয়া উচিত যে, জাতির সঙ্গে যেন অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশিয়া যাইতে পারে, অসম্ভব বা অন্যায় বা অসঙ্গত কোনও আদর্শে ইহার সঙ্গে জনসাধারণের বিচ্ছেদ যেন না ঘটে। যাহারা দলভুক্ত হইবে, মনের মিল হইবে তাহাদের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র, কিন্তু জড়-শক্তিতেও দল যেন দুর্ব্বল না হয়। যাঁহারা দল গড়িবেন তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, তাঁহাদের দলই দেশের সব নয়, দেশের সর্ব্ব ব্যাপারে নিয়ন্তা নয়, যাহারা বিবেকবুদ্ধি চালিত হইয়া সেই সব দলে যোগ দিবে না তাহাদিগকে নিপীড়ন করিবার কোনও ক্ষমতা দলের নাই।

উপরের এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার উপযুক্ত। সকল যুগে একদল লোক জাতীয় হিতের জন্য, জাতির মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ সঙ্কল্প করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, কিন্তু তাঁহারাই আবার নূতন করিয়া জাতিকে শৃঙ্খল পরাইবার নিমিত্ত-মাত্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, কার্য্যগতিকে ব্যাপার দাঁড়ায় এইরূপ। ফরাসী বিপ্লবে যাহারা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়া বাস্তিল দুর্গের এক এক খানি ইট খসাইয়াছিল, ঈশ্বরের প্রতীকরূপে চিরপূজিত সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি যাহাদের দুর্ব্বার বেগে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিল, নিয়তির উপহাসে তাহারাই আবার জাতির ইহকাল-পরকালের নাগপাশ হইয়া দাঁড়াইল, আচারের বন্ধন খুলিয়া তাহাকে অনাচারের বন্ধন পরাইল। সকল দেশে, মুক্তিমন্ত্রের সকল আহ্বানেই, এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং সে-পথের পথিককে এ বিষয়ে সতর্ক বাণী শুনান প্রয়োজন।

কোন্ দলে যাই ?

সঙ্ঘ হইতে, কিংবা সঙ্ঘশক্তির অপপ্রয়োগে দলাদলির ভাব বাড়িয়া উঠিলে, কোন্ কোন্ বিপদের সম্ভাবনা তাহা আলোচনা করা যাক। বিপদের আশঙ্কা মনে জাগিলে হয়ত বা প্রতিকারের একটা উপায়ও খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে।

যদি কেহ নিবিষ্টচিত্তে কোনও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে যত্নবান হয়, তাহার পক্ষেই অন্য সকল আবশ্যকীয় বস্তু অবহেলা করিয়া "একদেশদর্শী" হইয়া উঠা সম্ভব। বিজ্ঞানই বল আর কলাবিদ্যাই বল, ধর্ম্মই বল আর

রাজনীতিই বল, ধন সম্পৎ বল আর শিক্ষা বা সাহিত্য বল, সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার। কোন বিষয় সমগ্রভাবে দেখিবার শক্তি আমাদের যতই কম হইবে, পথের বাধা যতই বেশী হইবে, একদেশমাত্র দেখিবার এই প্রবৃত্তিও ততই বাড়িয়া উঠিবে। এক দল গড়িয়া ওঠে অন্য কাহাকেও বাধা দেওয়ার জন্য, কোনও বিশেষ প্রবৃত্তি বা অনুষ্ঠান নষ্ট করিবার জন্য। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া লোকে অনেকের চেষ্টা, যত্ন ও শক্তি একত্র করে। সুতরাং যাহারা স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিপুল আগ্রহে সাধনারত, তাহাদের অপেক্ষা, এইরূপ বিক্ষিপ্ত দুই একজন কর্ম্মীর অপেক্ষা, একটা সমস্ত দলের পক্ষে একদেশদর্শী হইবার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

আর একটি বিপদ আছে, ইহাও বড় কম নয়—দলে পড়িয়া মানুষ তাহার নৈতিক স্বাধীনতা বা আপন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিতে পারে, দলের বাঁধুনী যতই আঁট হইবে, যতই দৃঢ় হইবে, ততই অন্যান্য দলের সহিত পার্থক্য পরিষ্কার হইয়া দেখা দিবে, আবার দলে কলহের ভাবটা বাড়িয়া উঠিতে পারে, আমরা আমাদের দলের মতকেই জাতির মত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য—বিবাদ প্রশমিত করা, যথাসাধ্য আত্মকলহ নিবারণ করা। জীবনে ভিন্ন ভিন্ন দল ত থাকিবেই, ধর্ম্মগত ভেদ, সামাজিক ভেদ, বৃত্তিগত ভেদ, কত ভেদ আছে, তবে সকল বৃত্তির মধ্যে সকল লোকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় বন্ধন যতদিন না দেখা যায় ততদিন রাষ্ট্রের সেবা বা দেশের কাজ মুখের কথাই থাকিবে। আমাদের বিচার-বুদ্ধি অথবা নৈতিক ভাব বিকৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিবার, ভুলভ্রান্তি হইলে তাহা সংশোধন করিয়া লইবার উপায় আছে। ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য, জন্মগত অধিকার, দেশের ধন-সম্পদ—ইহাদের উপরই সকল রাজনীতির প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত, এই সমস্ত তুচ্ছ করিয়া মনগড়া আদর্শ লইয়া যেন দলের কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে না বসি। তাহা হইলে পথ ও লক্ষ্য এই দুইয়ের মধ্যে গোল বাধিবে, আমাদের মনগড়া আদর্শের সঙ্গে সত্যের মিল হয় কি না তাহা দেখিয়া সত্যকে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি জাগিবে। দল মুখ্য নয়, সমাজ রাষ্ট্র, দেশ, ইহারাই প্রধান, দল ত একটা উপায় মাত্র, ইহাদের তুলনায় অতি গৌণ বস্তু। এই ভাবে সাধন ও সাধ্যে যে গোল পাকাইয়া যায়, যে-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত ব্যবহারিক জীবনে বার বার দেখিতে পাই। সেনাপতি যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যুদ্ধকেই পরম কর্ত্তব্য মনে করেন, উকীল-ব্যারিষ্টার অপরাধীর মুক্তি বা দণ্ডের জন্যই চেষ্টিত থাকেন, সুবিচার করাই যে আইনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা ভুলিয়া যান। ইউরোপে খ্রীষ্টান সমাজে প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক অহি নকুল সম্পর্কে আবদ্ধ; কিন্তু রোমান ক্যাথলিকদের ধর্ম্মব্যাপারে শীর্ষ স্থানীয় পোপ চতুর্থ পল্ আত্মকলহে ব্যাপৃত হইয়া প্রটেষ্টাণ্টদের সাহায্য চাহিয়াছিলেন, এমন কি বিরোধী নেপল্‌স ও সিসিলির আক্রমণের জন্য খ্রীষ্টান সমাজের বাহিরে গিয়া তুরস্ক রাজশক্তিকে প্ররোচিত করেন! এই ভাবে দলের মোহ মানুষকে বিপথে লইয়া যায়, সত্য নিরূপণ করিতে দেয় না, অনর্থক অন্তরের পশুশক্তিকে জাগাইয়া তোলে। ফরাসী বিপ্লবের জনৈক ঐতিহাসিক তখনকার একজন বিপ্লবীর কথা বলিতে গিয়া এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—তিনি এমন একজন লোক যাঁহার মধ্যে দলাদলির ভাব অন্য সকল বৃত্তি অপেক্ষা প্রবল ছিল; দল ছাড়া আর কিছুই তিনি চোখের সামনে দেখিতেন না; তাঁহার উৎসাহ ছিল ধর্ম্মোন্মাদের উৎসাহ; মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ভুক্ত হইলে তিনি বিধর্ম্মীকে পোড়াইয়া মারিতেন; প্রাচীন রোমের অধিবাসী হইলে তিনি কেটো বা রেগুলাসের উপযুক্ত অনুচর হইতেন; ফরাসী সাধারণতন্ত্রের যুগে তাঁহার জন্ম, তাই রাজবংশ ধ্বংস করিতে তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল,—এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে অন্যের উপর অত্যাচার কিংবা নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন, কিছুতেই তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না।—এই বর্ণনা আমাদের সমসাময়িক কত কর্ম্মীর বিষয়ে অক্ষরে অক্ষরে সত্য!

এরূপ কলহ বিবাদে দেশে যে কত কুফলের সৃষ্টি হয়, তাহা কি আমরা একবারও ভাবি? ভাবিলে দলাদলির বিষ যাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে

আদৌ প্রবেশ না করে তাহার জন্ম চেষ্টা করিতাম। যেখানে উভয়ের মধ্যে মতের ঘোরতর বিরোধ সত্ত্বেও বন্ধুত্ব অটুট রহিয়াছে, পরস্পর ব্যবহারে ভদ্রতা ও সৌজন্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সে দৃশ্য কি সুন্দর! উদারতায় কি সমুজ্জল! যেস্থানে স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই, সে-স্থলেই এরূপ ঘটা সম্ভব, কারণ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারে ইহাই প্রভেদ;—স্বাধীনতা মানুষকে অন্যের মতে শ্রদ্ধা রাখিতে অভ্যস্ত করে, আর স্বেচ্ছাচার তাহার উদারতা দূর করিয়া দেয়, তাহাকে এতই অনুদার করিয়া তোলে যে, কোন কারণে একবার বিবাদ বাধিলে তাহা তীব্র, উগ্র, স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়, যে বিরোধী সে হয় শত্রু। তাই দলাদলির সকল চিহ্ন শান্তির সময় ত্যাগ করা উচিত; চিহ্ন ত শুধু বিরোধের প্রতীক, বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ; ফ্রান্সের ত্রিবর্ণ পতাকার তলে দলে দলে নরনারী দাঁড়াইয়া সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, নেদার্ল্যাণ্ডে একদিন ভিক্ষার ঝুলি ও নির্ব্বোধের টুপি স্বাধীনতার পথে নবীন পথিকের আগমন সূচিত করিয়াছিল; শ্বেত বা লাল গোলাপে, কি দক্ষিণে বা বামে পালক ধারণ করিলে এককালে যে প্রচণ্ড বিরোধের আভাস পাওয়া যাইত, ঐতিহাসিক বিবরণে তাহার কথা এখনও জাগরূক রহিয়াছে। বিপ্লবের সময় ইহাদের প্রয়োজন আছে, অলসকে ইহারা উৎসাহী করে, কর্ম্মীর নিষ্ঠা দৃঢ় করে, কিন্তু যত দিন দেশে শান্তি অটুট রাখা যায় ততদিন এরূপ দলাদলির চিহ্ন বর্জ্জনই বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান যুগে ব্যক্তিত্বের মূল্য আমাদের নিকট অধিক; আমরা চলি প্রতিনিধিমূলক শাসনযন্ত্রের ভিতর দিয়া; তাই দলাদলি হইতে আমাদের এখন প্রাচীন কালের মত অতখানি আশঙ্কা করিবার কিছু নাই। তথাপি বিপদ এখনও একেবারে কাটিয়া যায় নাই, এবং যতদিন না মানুষ এক দিকে ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতাকে, অন্যদিকে ভগবানের ইচ্ছাকে, শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে ততদিন এ বিপদ কিছু-না-কিছু থাকিবেই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—কল্যাণকামী ব্যক্তির পক্ষে কোনও বিশেষ দলে যোগ দেওয়া উচিত কি না; যদি উচিত হয়, তবে সে দলের সঙ্গে একাত্মভূত হইয়া কতদূর চলা যায়; কোন্ সময়ে দল বর্জ্জন করা চলিতে পারে;—রাজনীতির সঙ্গে যাঁহাদের ব্যবহারিক জগতে কিছু মাত্র সম্বন্ধ আছে তাঁহারা সকলেই এ সব প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন।

গ্রীক ব্যবস্থা-প্রণেতা সোলোন নিয়ম করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে, রাজবিদ্রোহের সময়ে, যে নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকিবে তাহার প্রজাস্বত্ব কাড়িয়া লওয়া হইবে; প্লুটার্ক এ বিধিকে অদ্ভুত বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু সোলোন এই বিধির সাহায্যে কলহবিবাদ নিবারণের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখনকার দিনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রে দেশ বিভক্ত ছিল বলিয়া কলহবিবাদের প্রাদুর্ভাব হইত। হাঙ্গামা-ফ্যাসাদে পড়িবার ভয়, যখন বহুসংখ্যক সদ্বুদ্ধি-চালিত দেশবাসীকে রাজনীতি হইতে দূরে রাখে, তখন দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা বিপৎসঙ্কুল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; তখন সমগ্র দেশ দুষ্ট ও অস্থিরমতি লোকের বশে, তাহারা যেন-তেন-প্রকারেণ নিজেদের অন্যায় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। এক সময় হাভানায় দিন দুপুরে প্রকাশ্য জনপদে হত্যাকাণ্ড খুবই বাড়িয়াছিল। তাহার কারণ—পথে হত্যাকাণ্ডের গোলমাল শুনিলেই প্রত্যেকে যথাসম্ভব দ্রুত পলায়ন করিত; তাহাদের ভয় ছিল, পাছে সাক্ষী মানা হয় বা হত্যাকারীর সঙ্গীরা দর্শকের কোনও অনিষ্ট করে! সাধারণতঃ এই নিয়মই সাধু বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, বিশেষ কোনও কারণ না থাকিলে, রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশবাসী সকলের কোন-না-কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অবশ্য এমন অনেকে আছেন যাঁহারা রাজনীতির সর্ব্বথা বহির্ভূত বিষয়ে ডুবিয়া অন্য চিন্তায় নিমগ্ন, বাস্তবিকপক্ষে নিষ্ঠার সহিত কোনও না-কোনও দলে যোগ দিলে সপরিবারে শুধু বিপন্ন হইবেন; কিংবা যাঁহারা স্বভাবতঃ চিন্তায় ও কর্ম্মে ভীরুপ্রকৃতি; তাঁহাদের স্বভাবই এমন যে, রাজনীতির সহিত কোনও সম্পর্ক না থাকিলে সমাজের হিতকারী সভ্য হইতে পারেন, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে টানিয়া আনিলে তাঁহারা

ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করেন; তাঁহারা মনে মুখে নির্জ্জনতার প্রয়াসী। এই উভয় শ্রেণীর লোক ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ বিধি সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য।

দলে ঢুকিলেই হইল না, দলের সঙ্গে কি ধরণের সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা লইয়াও গোল বাধিতে পারে। যে-ব্যক্তি নিরপেক্ষ হইতে পারে এবং দলছাড়া থাকে তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, ইহারা কোনও নির্দ্দিষ্ট দলভুক্ত নয়, দলের কড়াকড়ি বাঁধনে ইহারা ধরা পড়ে নাই; কিন্তু দলের দিক্ হইতে নয়, সমগ্র দেশের দিক হইতে দেখিলে যে-সব প্রশ্ন সমাধানযোগ্য বলিয়া মনে হয় সেই সব প্রশ্নের সমাধানে তাহারা কোন দলের সহিত ভোট দিতেই হইবে এরূপ মনে করে না, তাহারা মনে করে যাহা ভাল বুঝিবে তাহার সমর্থন করিতে তাহাদের পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা আছে; এরূপ লোক সমাজের অতি মূল্যবান্ অঙ্গ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও দলাদলির অত্যাচার হইতে দেশকে মুক্ত রাখিতে ইহারা যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, কোনও একজন লোকের পক্ষে প্রত্যেক বিষয়ে সম্যকভাবে বিচার করিবার মত সময় ও শক্তি থাকা আদৌ সম্ভবপর নহে; সুতরাং যাহারা নিজেকে স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা প্রায়ই অহমিকা-পরিচালিত হইয়াই এইরূপ আখ্যা গ্রহণ করে। বন্ধুদের ধারণা, অনুকূল বা প্রতিকূল জনমত, মিত্রগোষ্ঠীর প্রবৃত্তি,—লোকের উপর ইহাদের যে একটা প্রভাব থাকা স্বাভাবিক, এ কথা পূর্ব্বোক্ত অহমিকা বিশিষ্ট লোকেরা স্বীকার করিতে চায় না। কিন্তু দলেরও ক্রমোন্নতি দেখা যায়, এবং আমাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধি যে সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট তাহা না-ও হইতে পারে, একথা যেন আমরা না ভুলি; আমাদের অহং যেন সরল সত্যকে বক্র করিয়া না তোলে। কোনও আত্ম-সম্মান বিশিষ্ট লোকই দলের নিকট নিজেকে এমন বন্দী মনে করিবেন না যে, তাঁহার বিচারশক্তিও অন্য কাহারও হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। আর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে, নেতার বা অন্য কোনও সভ্যের মত সর্ব্বৈব সমর্থন করিতে হইবে, এরূপ মনে করারও কোনও প্রয়োজন নাই। সাময়িক উত্তেজনার বশে দল এমন দাবী করিয়া বসিতে পারে বটে; সে-দাবী যে মানিতেই হইবে তাহার কোনও কারণ নাই, কারণ উহা দলের ও দেশের উভয়েরই অহিতকর।

অনেকে অবশ্য নিজেকে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের তথাকথিত স্বাধীনতা দ্বৈধীভাব-সমাশ্রিত, চিত্তদৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত, প্রকৃতিগত বৈষম্য-জনিত, স্বার্থপ্রণোদিত। এই-সব 'স্বাধীন' লোকদের কথায় ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ ফক্স বলিয়াছেন, 'যাহাদের উপর depend করা যায় না তাহাই independent,' যাহারা কখনও এ দলের অধীন, কখনও অন্য দলের অধীন, তাহারাই 'স্বাধীন'। আর যাহারা ইহাদের চেয়েও এক কাঠি সরেশ, যাহারা কি করিবে না করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না, তাহাদিগকে অন্য ক্ষেত্রের ন্যায় রাজনীতিক্ষেত্রেও বর্জ্জন করা উচিত, কারণ তাহাদের না আছে অধ্যবসায়, না আছে মনুষ্যত্ব।

আশীর্ব্বাদ

পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী
নন্দলালকে
সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা
রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

নন্দন-নিকুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা
জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী অভিনব
লাগায়ে দিল নয়নে তব,
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা॥

এনেছে তব জন্মডালা অমর ফুলরাজি,
রূপের লীলা-লিখন-ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছ তুলি',
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি'॥

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙীন উপহাসে যে হাসে
রং-জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে॥

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইসারা করে কত,
তুমিও তা'রে ইসারা দাও আপন মনোমত।

বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইসারা অবিরত ॥

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপল মায়া ক'রেছ তুমি জয়।
তব আঁকন-পটের পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হ'য়ে রয় ॥

চির-বালক ভুবন-ছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা পরে ॥

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক-জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তা'র ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তা'রে, ছুটেচে মন তোমার পথে যেতে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাসপূর্ণিমা
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

পত্রধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে খুবই ভুল বুঝেছ তাই আমাকে লিখতে হ'ল। আমি কখনও কাউকে আদেশ করি নে, তার কারণ আমি গুরু নই আমি কবি। তোমার সঙ্গে আমি কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেচি, কদাচ সেটাকে অনুশাসন ব'লে গ্রহণ ক'রো না। সত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমাদের নিজেদের স্বভাবের পথে। তোমার স্বভাবের অনুগত হয়ে তুমি যে উপলব্ধি সংগ্রহ করেচ আমার কাছে সে জিনিষটি নেই সুতরাং তোমাকে কখনই বলতে পারব না যে আমি যে-সাধনায় যে-অনুভূতিতে এসেচি সেইটি তুমি যদি গ্রহণ না কর তবে আমি রাগ করব। এ রকম অদ্ভুত জবরদস্তি একেবারেই আমার স্বভাববিরুদ্ধ। অবশ্য যেখানে ধর্ম্মের নামে স্পষ্টতই অন্যায় অত্যাচার এবং অধর্ম্ম চলচে সেখানে তাকে আমি কোনো কারণেই স্বীকার ক'রে নিতে পারিনে। কিন্তু যেখানে আধ্যাত্মিক রসসম্ভোগে কোন ক্ষতি নেই সেখানে জোর ক'রে প্রতিবাদ করা গোঁয়ারের কাজ।

আমি কেবল নিজের কথাই বলতে পারি—আমার মন কোনো প্রতীককে আশ্রয় করতে স্বভাবতই অক্ষম। সহসা মনে হ'তে পারে এটা কবিজনোচিত নয়। ভাবকে রূপ দেওয়া আমার কাজ—আমার সেই সৃষ্টিতে আমার আনন্দ। সেখানে রূপ আগে নয় ভাব আগে, রূপের সঙ্গে ভাব নিজেকে বাইরে থেকে মেলায় না—নিজের রূপ-দেহ সে নিজেই সৃষ্টি করে—আবার তাকে অনায়াসে ত্যাগ ক'রে নূতন রূপের মধ্যে প্রকাশ খোঁজে। কোনো ধর্ম্মগত প্রথা যে-সব রূপকে বাহির থেকে বদ্ধ করে রেখেচে, আমার চিত্তের ধ্যান তার মধ্যে বাধা পায়। শুধু তো মূর্ত্তি নয় তার সঙ্গে আছে কাহিনী—তাকে রূপক জোর ক'রে বলি—অভ্যস্তভাবে তাকে গ্রহণ করি, ভাবকে যেখানে প্রতিবাদ করে সেখানেও। আমার বুদ্ধি আমার কল্পনা আমার রসবোধ সবই আঘাত পায়। যদি বল ভগবান যখন অসীম তখন সকল রূপেই সকল কাহিনীতেই তাঁকে খাপ খাওয়ায়। এক হিসাবে এ কথা সত্য—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভালমন্দ সুশ্রী কুশ্রী সবই আছে অতএব কেবল ভাল কেবল সুন্দরের গণ্ডীর মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখলে তাঁর অসীমতার উপর দোষারোপ করা হয়। ঠগীরা মানুষ খুন করাকে ধর্ম্মসাধনা ব'লে গ্রহণ করেছিল—ভগবান তো নানা রকম করেই মানুষকে মারেন—সেই খুনী ভগবানকেই বা পূজা করতে দোষ কি ?

কিন্তু আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন। মানুষের নরকও আছে—সেইখানে মূঢ়তা সেইখানে অত্যাচার সেইখানে অসত্য। সেই নরকও আছে কিন্তু সেই থাকাটা না-এর দিকে, হাঁ-এর দিকে নয়। সে কেবলই হাঁ-কে অস্বীকার করে কিন্তু কিছুতে তাকে বিলুপ্ত করতে পারে না। অস্বীকার করার দ্বারাই সে সেই চিরন্তন ওঁ-কে প্রমাণ করতে থাকে। এই জন্যেই, ভগবান অসীম বলেই তাঁকে সব কিছুতেই আরোপ করলে চলে এ কথা আমি মানতে রাজী নই। যেখানে জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই তাঁকে উপলব্ধি না করলে ঠকতে হবে।

কিন্তু তুমি যে করচ না এ কথা বলিনে—তোমার অভিজ্ঞতা আমার অভিজ্ঞতা নয় অতএব আমার পক্ষে কোনো উপদেশকে বেদবাক্য ক'রে তোলবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। এই কথাটুকু বোধ হয় বলা যায়, দুই রকম চিত্তবৃত্তি আছে—এক রকম মন প্রতীককে

আশ্রয় করে—আর এক রকম মন করে না। অনেক মহাপুরুষ প্রতীককে অবলম্বন করে মনে মনে তাকে ছাড়িয়ে গেছেন আবার অনেকে—যেমন কবীর দাদু নানক—প্রতীকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও নিজের ধ্যানের মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতিতে আত্মানন্দের রসেই পরম সত্যকে পূর্ণ ক'রে ভোগ করেন—অন্য পথ তাঁদের পক্ষে অসাধ্য।

গুরুকে আমি প্রতীক শ্রেণীতে ফেলিনে। মানবের মধ্যে যেখানে পূর্ণতা মানবের দেবতার সেখানে প্রত্যক্ষ আবির্ভাব একথা আমি মানি।

রচনা করবার অসামান্য শক্তি তোমার আছে এই জন্যেই তোমার চিঠি পড়ার আনন্দ আমাকে চিঠি লেখায় প্রবৃত্ত করে। ইতি ১০ বৈশাখ ১৩৩৮।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির উত্তরে যা আমার বলবার ছিল তা বোধ হয় ব'লে শেষ করেচি। একটা কথা পূর্ব্বেও বলেচি পুনরায় বলা দরকার, আমাকে কোনো অংশেই গুরু ব'লে গণ্য করলে ভুল করা হবে। তোমার অন্তরতম প্রয়োজন যে কি তা নিশ্চিত নির্ণয় ক'রে দেবার অধিকার আমার নেই। আমি আমার নিজের পথে চলি—সে-পথে শেষ পর্য্যন্ত কোথায় পৌছব কিনা তাও জানিনে। আমার চিত্তের স্বভাবই হচ্চে নদীর মত চলা, চল্‌তে চল্‌তে বলা—সে-ধারা একটানা চলে না—নানা বাঁকে বাঁকে চলে। আমি জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে বাণী জোগাব এই ফরমাস নিয়ে সংসারে এসেচি—কোথাও এসে স্থুরু হলেই আমার কাজ ফুরোবে। যাঁরা গুরু তাঁরা সমুদ্রের মত আপনার মধ্যে আপনি এসে থেমেচেন, তাঁদের বাণী তরঙ্গিত হয় তাঁদের গভীরতা থেকে। আমার ধ্বনি ওঠে জীবনের বিচিত্র সংঘাত হ'তে, তাঁদের বাণী জাগে অন্তরাত্মার স্বকীয় আন্দোলনে। তুমি তোমার গুরুর কাছ থেকে এমন কিছু যদি পেয়ে থাক যা কেবলমাত্র আলাপ নয় যা আদেশ যা নির্দ্দেশ, যা তোমার আত্মাকে গতি দিয়েচে তা হ'লে তার উপরে আর কথা চলে না। কেন-না আমি তো কেবলমাত্র কথাই দিতে পারি, গতি জোগাতে পারিনে তো। আজ পর্য্যন্ত কাউকে তো আমি কোনো ঠিকানায় পৌছিয়ে দিই নি। সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে চলতে অনেককে খুশী করেচি এই পর্য্যন্ত। আবার অনেকে আমাকে পছন্দই করে না—কেন-না তারা আন্দাজ করতে পারে যে, আমার নগদ তহবিল নেই—যদি বা কোনো মতে ভোজের আয়োজন করতে পারি দক্ষিণা পর্য্যন্ত পৌছয় না।

তুমি একটি রসলোকে প্রবেশ করেচ—সেখানে তুমি নানা উপকরণে আনন্দ মন্দিরের ভিৎ গাঁথচ। বিশ্ব-বিধাতা যেমন, মানুষও তেমনি, আপন স্বকীয় সৃষ্টিতেই তার যথার্থ বাস—অন্য জীবেরা থাকে বাসাবাড়িতে, কেবল ভাড়া দেয়। ভাড়াটে বাসার মানুষও অনেক আছে কিন্তু মানুষের আনন্দ হচ্চে স্বকীয় ধামে—সত্যকে সে নিজের জীবনে নিজের চিত্তে মূর্ত্ত ক'রে তোলে—তখন সে স্থায়ী আশ্রয় পায়। কিন্তু যখন সে এমন কিছু গড়তে থাকে যার মধ্যে উপকরণ অনেক আছে কিন্তু সত্য যথেষ্ট নেই তখন সে পীড়িত হয়, তখন তার আশ্রয় হয় তার বোঝা। এই দুর্ম্মূল্য ব্যর্থতার সঙ্গে অনেক লড়তে হয়েচে—উপকরণ জমাতে লেগেচি সদর দরজা দিয়ে, খিড়কি দরজা দিয়ে সত্য দিয়েচেন দৌড়।

তুমি থেকে থেকে আশঙ্কা করেচ আমার মতের সঙ্গে তোমার মিল হচ্চে না ব'লে আমি রাগ করেচি। লেশমাত্র না। মত নিয়ে যারা অন্যের 'পরে জবরদাস্ত করে আমি সে জাতের মানুষ নই। তোমার উপলব্ধির 'পরে আমার মনে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই। জীবনে তুমি একদা যে আনন্দধারায় আত্মনিবেদন করেচ সেই আনন্দ শেষ পর্য্যন্ত পরম সার্থকতায় নিয়ে যাক এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। ইতি ১৫ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

তুমি নিজেকে অকারণ পরিতাপে পীড়িত করচ।

তোমার জীবনে যা গভীরতম উপলব্ধি তার সৌন্দর্য্য ও সততা আমি মনে বেশ বুঝতে পারি। আমার নিজের পথ তোমার থেকে পৃথক বলেই তোমার অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনতে আমি এত ঔৎসুক্য অনুভব করি। আমি চিন্তা করি, তর্ক করি, আলাপ করি ব'লেই নিজেকে তোমার চেয়ে সাধনায় শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করিনে—কেন না সাধনার চেয়ে আমার ভাবনা ও কল্পনাই বেশী। আমি অনুভব করব, প্রকাশ করব এই কাজের জন্যেই আমাকে গড়া হয়েচে। আমি ব'লে যাব, গেয়ে যাব তোমাদের ভাল লাগবে এইটুকু হলেই আমার কাজ সারা হ'ল। আমার কাছে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ বোধ হয় তা নিয়ে তর্কও করব—কিন্তু সেটা উপরের বেদীতে চ'ড়ে ব'সে নয়। তোমাদের ভাবিয়ে দিতে পারলেই আমার আর কিছু দরকার নেই। আমার কাছে আদেশ উপদেশের দাবি করলেই বুঝতে পারি আমাকে ভুল বুঝেচ। যখন মনে কর আমার কথা না শুনলে রাগ করি তখনও জানি আমাকে চেন নি। চিরদিন আমি গুরুমশায়কে এড়িয়ে এসেচি, ইস্কুল পালানো আমার অভ্যাস—অবশেষে আমি নিজেই গুরুমশায় সেজে বসব এর চেয়ে প্রহসন কিছু হ'তে পারে না। বলা বাহুল্য গুরুমশায় আর গুরু একজাতের নয়। গুরু যাঁরা তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ গুরু—আর গুরুমশায় সেই, যে চোখ রাঙিয়ে টঙে চ'ড়ে ব'সে গুরুগিরি করে। আমি উক্ত দুই জাতেরই বার।

যাই হোক্ তুমি মনে নিশ্চিত জেন তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলেচ ব'লে আমি তিলার্দ্ধ ক্ষুব্ধ হইনি। আমি কথার যাচনদার, কথা যেখানে অকৃত্রিম ও সুন্দর সেখানে আমি মত বিচার করিনে—সেখানে আমি প্রকাশের রূপটিকে রসটিকে সম্ভোগ করতে জানি। তুমি অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার সাধনায় প্রবৃত্ত থাক—তাতেই তুমি চরিতার্থতা লাভ ক'রবে। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৩৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিকিনে একদিনের কথাবার্ত্তা

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

এই অনুবাদিত প্রবন্ধটিতে ধর্ম্মের প্রতি চীনদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাবের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

চীনা অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—'আপনি কি সত্য-সত্যই মনে করেন পূর্ব্ব ও পশ্চিমের জীবনযাত্রার মধ্যে এই যে পার্থক্য ইহা ধর্ম্মগত? আপনাদের ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বিষয়ই আমার খুব ভাল লাগে—যেমন আপনাদের শিক্ষালয়, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ মোটর গাড়ী, টিনে-রক্ষিত মাছ, মাংস প্রভৃতি।'

ইউরোপ ও আমেরিকার সুখ পার্থিব সুখ, আরাম ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ দার্শনিক-প্রবরের চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—'সর্ব্বাপেক্ষা আমার আশ্চর্য্য মনে হয় দেশ হইতে আপনাদের রোগ দূর করিবার ক্ষমতা। আপনাদের ভাষার ছোট্ট দুইটি কথা—পাব্লিক হেল্‌থ (Public health)—দেশ হইতে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্, বসন্ত, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ প্রায় সমূলে বিনাশ করিয়াছে। তবে আপনাদের এমন অন্য কতগুলি বিষয় আছে যাহা আমি মোটেই প্রশংসাযোগ্য বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তাহাদের সহিত ধর্ম্মের কোন যোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।'

চীনদেশের একটি প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরে বাসযোগ্য একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আমাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা

হইতেছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনচার জন ইংরেজ ও আমেরিকাবাসী, একজন জাপানী দৌত্যকার্য্যাভিজ্ঞ (diplomat) ও কয়েকজন চীনদেশীয় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য বিষয়, মানুষের মধ্যে জাতিগত অমিল ও মানবসমাজে ধর্ম্মের প্রভাব। একজন বিশিষ্ট খৃষ্টান মিশনরী মানব-সমাজে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবের কথা পঞ্চমুখে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার চীন ও আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ বিভিন্ন যুক্তিদ্বারা তাঁহার মত খণ্ডন করতঃ তর্কে তর্কে তাঁহাকে একেবারে কোণঠাসা করিয়া ফেলিলেন।

চীনের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ উ-টিঙ বলিলেন—'চীন ও আমেরিকার জীবনযাত্রার পার্থক্য আমিও স্বীকার করি, কিন্তু ইহা জাতিগত; ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন যোগ নাই—আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সামাজিক ও প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইহার জন্য দায়ী।'

আমেরিকাবাসী মিশনরী মহাশয় বলিলেন—'এই যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা বলিলেন, ইহা কি ধর্ম্মের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত নয়? খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবেই কি ইউরোপ ও আমেরিকার সামাজিক জীবন আজ এতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হয় নাই?'

ডঃ উ-টিঙ বলিলেন—'আপনার এই উক্তির প্রমাণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর সত্য সত্যই ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করিত তাহা হইলে চীন, শ্যাম, আরমেনিয়া প্রভৃতি দেশেও মানুষের উপর খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবের পরিচয় পাইতাম। কিন্তু চীন সম্বন্ধে বলিতে পারি—এদেশীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আপনাদের ধর্ম্মের কোন প্রভাব আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি অনেক চীনদেশীয় লোককে জানি যাদের জীবন সম্পূর্ণ দোষমুক্ত, যারা সর্ব্বদাই পরসেবায় নিযুক্ত; কিন্তু তারা কেহই খৃষ্টিয়ান নহে। আমি দুই-চারজন এমন এদেশীয় খৃষ্টানকেও জানি, যাদের জীবন, চীনের প্রাচীন ধর্ম্ম কনফুসিয়াস ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের জীবন অপেক্ষা কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মোটেই স্বীকার করা যায় না।'

উপস্থিত সকলেরই মুখ হইতে তাহার এই উক্তির প্রতিবাদ উত্থিত হইল। অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন—'বেশ, আপনারা এদেশবাসী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এমন একজন লোকেরও নাম করুন যাহার জীবন খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে কোন-না-কোন বিষয়ে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে এবং তাহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইয়াছে।'

যখন অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াও তেমন একজন লোকের নাম করা গেল না তখন উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। যে দুই একজনের নাম করা হইল তাহারা খুবই সম্প্রতি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে—তাহাদের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। তবু তর্কদ্বারা সকলেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, চোখের সামনে প্রমাণ উপস্থিত না থাকিলেও ধর্ম্মের প্রভাব যে মানব-সমাজে অত্যন্ত গভীর তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

ডঃ উ-টিঙ বলিলেন—'আপনাদের এ উক্তিও আমি সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। মানুষের ধর্ম্ম ও তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে মিল অপেক্ষা বরং অমিলই বেশী। ধর্ম্মের সহিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই যে বিরোধ ইহাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় অভাবপূরণের চেষ্টা (law of compensation) বলা যাইতে পারে।

এই বলিয়া অধ্যাপক মহাশয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার নূতন মত উপস্থিত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।—'কোন বিশেষ ধর্ম্মমত বা বিশ্বাসের দ্বারা মানুষের জীবন খুব অল্পই নিয়ন্ত্রিত হয়। মানব-সমাজে ধর্ম্ম মানুষের বাহ্যাবরণ মাত্র—ইহা মানুষের আত্মতৃপ্তি বা আত্মপ্রবঞ্চনার সহায়। সেই জন্যই মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত মানুষের ধর্ম্মের এত অমিল, এত বিরোধ।'

তাঁহার এই মত সমর্থনের জন্য তিনি উদাহরণ-স্বরূপ জগতের দুইটি বৃহৎ ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হইলেন। একটি ইসলাম্, অন্যটি খৃষ্টধর্ম্ম। দুই-ই এশিয়া মহাদেশের ধর্ম্ম; দুইয়ের আবির্ভাবের মধ্যে কেবল কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান।

তিনি বলিতে লাগিলেন—'খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিশেষ অনুশাসন কি? না, জগতে ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা, অহিংসা, নির্লোভ, আগামীকল্যের জন্ম নির্ভাবনা, অর্থ-সঞ্চয়ে বৈরাগ্য, সাংসারিক জীবন অপেক্ষা ধর্ম্ম-জীবনের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসপরায়ণতা।

'পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা কোথায় বেশী হইয়াছে? ইউরোপ ও আমেরিকায় নয় কি? সেই সকল দেশে আমরা কি দেখিতে পাই? তথাকার অধিবাসীরা কি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী যুদ্ধপ্রিয় নয়? অর্থসঞ্চয়ে, গতকল্যের জন্ম ভাবনায়, যুদ্ধ, পার্থিব সুখ, ঐশ্বর্য্য, আরাম প্রভৃতির জন্ম অতিমাত্রায় ব্যস্ততা তাহাদের মধ্যে কি অন্য সকল জাতি অপেক্ষা বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না? জগতের ঐশ্বর্য্যরাশি কাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী একত্রে স্তূপীকৃত করিয়াছে? নরডিক্ (Nordic) জাতির শ্রেষ্ঠতায় কে আজ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গর্ব্বিত, উদ্ধত?'

ডঃ উ-টিঙ বলিতে লাগিলেন—'যুদ্ধপ্রিয়তা, সুখ আরাম ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তি, পরজাতি-বিদ্বেষ, পরধন লুণ্ঠনের দ্বারা স্বদেশের ধনবৃদ্ধি প্রভৃতিকে আমি দূষণীয় বলিয়া মনে করি না। ইহা দ্বারাই পাশ্চাত্য জাতি আজ জগতের অন্য সমুদয় জাতির উপর অধিকার-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মমতের সহিত তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন সামঞ্জস্যই নাই।'

উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর ভিতর হইতে একজন ইংরেজ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—'যাহারা কোন বিষয়েই খৃষ্টের বাণীর অনুবর্ত্তী নয়, এমন কি যাহারা নিজেদের খৃষ্টধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই স্বীকার করে না, তাহাদের মত কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কথা ও কাজ হইতে ধর্ম্মকে বিচার করিলে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি কি অবিচার করা হইবে না?'

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর ভিতর হইতে একজন আমেরিকাবাসী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'কিন্তু যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে নিজেদের খৃষ্ট-শিষ্য বলিয়া প্রচার করেন তাঁহাদের জীবনও কি একইভাবে গঠিত নয়? নিউইয়র্ক শহরের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত গির্জ্জাভুক্ত পল্লীটি ধনী-সম্প্রদায় দ্বারা কি গঠিত নহে? ঋণদান, বন্ধকী কাগজ প্রভৃতি বিক্রি করাই কি তাহাদের ব্যবসা নহে? তাছাড়া গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড আমেরিকা ও জার্ম্মানীর ধর্ম্মযাজকগণ উচ্চকণ্ঠে যুদ্ধের মহিমা কীর্ত্তন করেন নাই কি? সর্ব্বসাধারণের ন্যায় তাঁহারাও কি মিথ্যাপ্রচারে রত ছিলেন না? বলিতে কি, জগতে ভ্রাতৃভাব প্রচারে মিশনরীগণ যেমন অন্তরায় এমন আর কেহই নহে। যাঁহারা দেশ-দেশান্তরে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত আছেন, যাঁহারা কালা ও পীত জাতির আত্মার উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, তাঁহাদের মধ্যে এই পরজাতি-বিদ্বেষ ও নিজেদের শ্রেষ্ঠতার দম্ভ সত্যসত্যই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।'

(২)

সমালোচক মহাশয় পর পর আরও কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা তাঁহার বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—'আপনারা সকলেই চীনের কুলিঙ্গ নামক স্থানটির নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইহা ইয়াংসি নদী হইতে প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। চীনে খৃষ্টান মিশনরীদের গ্রীষ্মাবাসের জন্য পাহাড়ের উপর এই শহরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থান নির্ব্বাচনের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও এইরূপ দুর্গম প্রদেশে শহর-নির্ম্মাণের বাধা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা পাশ্চাত্য জাতিতেই সম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যদিও শহরটি চীনদেশে অবস্থিত খৃষ্টান মিশনরীদের দ্বারাই নির্ম্মিত এবং শহরের পরিচালনভার তাহাদের উপরই ন্যস্ত, তবু সেই শহরে চীনদেশীয় কোন ব্যক্তির গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবার অধিকার নাই। মিশনরীদের দ্বারাই শহরের এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

'চীনদেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রভুত্ব ও ঔদ্ধত্য প্রতিদিনের ঘটনা, সাংহাইয়ের ন্যায় এমন একটি শহরের পরিচালনভার সম্পূর্ণ বিদেশীদের হাতে। বিদেশীর দ্বারা নিযুক্ত যে ভারতীয় শিখদের চীনবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা

বেশী ঘৃণা করে, তাহারাই শহরের শান্তিরক্ষক। হেংকাউ শহরের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান নদীর ধারটি বিদেশীদের অধিকৃত। সে স্থানে বিদেশীদের আয়া ও আরদালী ভিন্ন দেশীয় লোকের প্রবেশ নিষেধ।* কিছুদিন পূর্ব্বেও সাংহাইয়ের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পার্কের প্রবেশদ্বারে যে বিজ্ঞাপন ঝুলানো থাকিত তাহা আপনারা সকলেই জানেন—'কুকুর ও চীনবাসীর প্রবেশ নিষেধ।'

'পৃথিবীতে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখন বিদেশে খৃষ্টান মিশনরীদের মধ্যেও এই প্রভুত্ব-প্রিয়তা ও ঔদ্ধত্য দেখা যায়, তখন মনে যে গভীর ক্ষোভের উদয় হয় তাহার তুলনা হয় না।'

উপস্থিত মিশনরীদের ভিতর হইতে একজন আমেরিকাবাসী মিশনরী যিনি সবেমাত্র দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তিনি হঠাৎ আলোচনায় যোগ দিয়া বলিলেন,—'গত শীতের সময় আমি যখন কেনটাকি প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন একজন মিশনরীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের দক্ষিণাংশবাসী। তাঁহার সহিত পূর্ব্বেও আমার পরিচয় ছিল। তিনি এমন প্রকৃতির লোক যে একদিন বরং অনাহারে থাকিবেন তবু কোন নিগ্রোর সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিবেন না; তাঁহার ভগ্নীকে কোন নিগ্রোর সহিত একত্রে নৃত্য করিতে দেখা অপেক্ষা বরং তিনি তাহাকে হত্যা করিতে পারেন।'

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন?'

তিনি উত্তর করিলেন—'জানেন না? দীর্ঘ অবকাশে এইমাত্র আমি দেশে ফিরিয়াছি। আমি ও আমার ভগ্নী বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত আছি।'

আমি বলিলাম—'চমৎকার। আপনার কার্য্যস্থল কোথায়?'

তিনি বলিলেন—'মধ্য-আফ্রিকায়।'

'ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই ব্যক্তিও কি-না জগতে ভ্রাতৃভাব প্রচারের জন্য আফ্রিকায় গমন করিতে পারে? জীবিতকালে যাদের শতহস্ত দূরে রাখিবার চেষ্টা, মৃত্যুর পর তাদের স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য মিশনরীদের মধ্যে এই যে আগ্রহের ঘটা, ইহার তাৎপর্য্য আমাকে কে বুঝাইয়া বলিবে?

'আপনারা কি মনে করেন স্বর্গরাজ্যে গেলেও তাদের ভৃত্যের প্রয়োজন হইবে? তাহারা কি মনে করে, স্বর্গরাজ্যে কুলির অভাব হইতে পারে? স্বর্গরাজ্যে যদি সোনার রাস্তা ঘষিবার, মাজিবার জন্য লোক না পাওয়া যায়? পুণ্যের বোঝা বহন করিবার জন্য যদি কুলির অভাব হয়? দুষ্ট দেব-দূতদের দমন করিবার প্রয়োজন হইলে কে তাহাদের সাহায্য করিবে? অথবা এই প্রভুত্ব-প্রিয় শ্বেতাঙ্গ মনিবগণ কি স্বর্গরাজ্যেও সাদা কালোর প্রভেদ দেখিতে ইচ্ছুক? স্বর্গরাজ্যে যদি কোন নিগ্রো দেব-দূত কেনটাকির মিশনরীর ভগ্নীকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন?'

উপস্থিত সকলেই তাঁহার এই ব্যঙ্গোক্তির প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত জোরের সহিতই বলিলেন এ তাঁহার মোটেই ব্যঙ্গোক্তি নয়, ব্যঙ্গোক্তি করিবার তাঁহার অভিপ্রায়ও নাই। সত্যসত্যই তিনি মিশনরী জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালীর মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ।

প্রথমোক্ত আমেরিকাবাসী ভদ্রলোকটি বলিলেন—'আমারও ঠিক এই মত। চীন, ভারতবর্ষ, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের শ্বেতাঙ্গ মিশনরীদের মনোভাব চিরদিনই আমার নিকট রহস্যপূর্ণ। মানব-চিত্তের জটিলতা ও অসঙ্গতি চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রাচ্যদেশে মিশনরীদের দেশীয় লোকদের প্রতি একই সময়ে নাসিকাকুঞ্চন ও সেই সঙ্গে অত্যন্ত দরদের সহিত চীনের কুলি ও মালয়-দ্বীপের অধিবাসীদের দুই আঙুলের ঠেলায় স্বর্গরাজ্যে তুলিয়া ধরিবার আগ্রহ জগতে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার।'

সমবেত ব্যক্তিদের ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন—'সম্ভবতঃ ডঃ উ-টিঙ ইহার উত্তর দিতে

* সম্প্রতি চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের চাপে এই নিয়ম রদ করিতে হইয়াছে।

পারিবেন। অধিকাংশ মিশনারীই বিশেষত্বহীন সাধারণ শ্রেণীর লোক। তাহাদের মন যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি আত্মাভিমানী। ভগবানের বাণী, উপদেশ মুখে প্রচার করিলেও তাহাদের মন কোন বিষয়েই সংস্কারবর্জ্জিত নহে। ব্যবসায়ীদের ন্যায় তাহারাও জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পরস্পরের সহিত মিশিতে অক্ষম। পাশ্চাত্য জগতে যাঁহারা বৃহৎ আদর্শের জন্য সুখ, ঐশ্বর্য্য, আরাম প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেরই নমস্য ও শ্রদ্ধার পাত্র। মিশনারীগণও যে দেশদেশান্তরে জ্ঞানদানের জন্য শিক্ষালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া মানব-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে খৃষ্টধর্ম্মের যাহা মূলকথা—জগতে ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা—সে সম্বন্ধেই মিশনরীগণ আস্থাহীন। পূর্ব্বোক্ত কেন্টাকির মিশনরীর কথাই ধরা যাউক। খুব সম্ভব কালা আদমীর প্রতি তাঁহার মন আন্তরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণায় পূর্ণ ছিল। সেই জন্যই হয়ত কোন এক সময়ে মনের আকস্মিক আবেগবশে তিনি তাহাদের আত্মার ত্রাণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার বর্জ্জন করিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহার পক্ষে এই নিগ্রো-বিদ্বেষ খুবই স্বাভাবিক।'

(৩)

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ডঃ উ-টিঙ নির্ব্বাক ছিলেন। সকলের কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, 'আপনাদের বলা শেষ হইলে আমি সাধারণভাবে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্বে উল্লিখিত মন্তব্যের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইলেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন—এইবার ইসলাম ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় ইহারও জন্ম এশিয়ার পশ্চিম অংশে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে যিশু-খৃষ্ট যে-সকল স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন মহম্মদও সেই সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তথাপি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার লাভ করিল পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে—যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী যুদ্ধপ্রিয়, ধনের প্রতি যাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোভ, কর্ম্মের প্রতি যাহাদের একান্ত অনুরাগ। আর মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিল পৃথিবীর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অংশে।

ইসলাম ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস খৃষ্টধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যুদ্ধাভিযান, অর্থসঞ্চয়, কর্ম্মে অনুরাগ মুসলমান ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত, ইসলাম ধর্ম্মে যাহারা নিষ্ঠাবান তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমুদয় খুঁটিনাটিই ধর্ম্মানুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নমাজের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকায় যথাসময়ে তাহাদের শয্যাত্যাগ ও শয্যাগ্রহণ করিতে হয়; নমাজের পূর্ব্বে হাত পা ও শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ধোওয়া প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুসলমানের অবশ্যকর্ত্তব্য। আহারে মিতাচার তাহাদের ধর্ম্মজীবনের অঙ্গ; অর্থ-সঞ্চয়ে তাহাদের ধর্ম্মে বাধা নাই। তলোয়ারের জোরেই প্রথম ইসলাম ধর্ম্ম জগতে বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ কিংবা অবিশ্বাসীদের দমন করিবার জন্য সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ইসলাম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। লুণ্ঠিত দ্রব্যের বণ্টন ও বিজিত জাতির প্রতি ব্যবহারের ব্যবস্থাও কোরানে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। মহম্মদের নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা যাউক—

'তোমার জীবন ও তোমার সম্পত্তিকে পবিত্র স্বরূপ জ্ঞান করিবে; পৃথিবী যতদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইবে ততদিন ইহা অন্যের স্পর্শাতীত।'

'দেহের শুচিতার উপর ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্ম-জীবনের ইহাই আট আনা অংশ ও ধ্যানের অর্গল মুক্ত করিবার ইহাই চাবি।'

'স্বর্গ ও নরকে প্রবেশ করিবার চাবি তলোয়ার; ভগবানের জন্য একবিন্দু রক্তপাত কিংবা তলোয়ার হাতে একরাত্রি জাগরণ, দুমাস উপবাস বা প্রার্থনা অপেক্ষাও অধিক পুণ্য কর্ম্ম।'

'যুদ্ধোন্মত্ততা, কর্ম্মে উৎসাহ, পার্থিব দ্রব্যে আসক্তি, দেহের শুচিতা, প্রভৃতি যে ধর্ম্মের বিধি সে ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিল প্রাচ্য ও আফ্রিকা মহাদেশের জাতিসমূহের

মধ্যে—যাহারা দেহের শুচিতায় সম্পূর্ণ উদাসীন, কর্ম্মে যাহাদের বৈরাগ্য, যাহারা যুদ্ধ কিংবা কাজের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সম্পূর্ণ অপারগ, ধন-লিপ্সা ও সঞ্চয়স্পৃহা যাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ।

'আরব অশ্বারোহীদের প্রথম যুদ্ধাভিযানের পর বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম্ম মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে নাই। উত্তর-আফ্রিকা কিংবা পশ্চিম-এশিয়ার মুসলমানগণ পূর্ব্বেরই ন্যায় অলস, দেহের শুচিতায় উদাসীন, কর্ম্মে অপটু, রোগ দূরীকরণে অসমর্থ। পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্ম্ম পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে শান্তিপ্রিয়, পার্থিব দ্রব্যে উদাসীন, কিংবা তত্ত্বান্বেষী করিতে পারে নাই।

'ধর্ম্ম তাহাদের জীবনের বাহ্যাবরণ মাত্র, ধর্ম্মের আচার ও অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে তাহাদের আন্তরিকতার একান্ত অভাব; নিজেদের জাতিগত দোষ ও দুর্ব্বলতাকে আচার ও অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আবরণে ঢাকিবার প্রয়াস মাত্র।

'প্রাচ্যদেশবাসীরা সম্ভবতঃ নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের আরামপূর্ণ জীবন, কর্ম্মে অলসতা, প্রভৃতিকে দূষণীয় বলিয়া মনে করিত। সেই জন্যই যে-ধর্ম্মে স্নান, আহার, উঠাবসা প্রভৃতিতে কেবলি বিধি-নিষেধ, লড়াই, সম্পত্তি অর্জ্জন প্রভৃতি যে-ধর্ম্মের বিধি তাহারা সেই ধর্ম্মই গ্রহণ করিল। ইহা দ্বারা তাহারা বাহ্যতঃ ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠানগুলি মাত্র গ্রহণ করিল, তাহাদের জীবনের গতি পূর্ব্ববৎই রহিল।

'পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশসমূহে মানুষ পরস্পর মারামারি, কাটাকাটি, লড়াই, দ্বন্দ্ব, অর্থসঞ্চয়ে ব্যস্ততা, ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ প্রভৃতিতে অন্তরে শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া খৃষ্টের শান্তিপূর্ণ বাণীকে সমাদরে গ্রহণ করিল এবং জগতের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল ইহাই তাহাদের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাস। কিন্তু অন্তরে তাহারা খৃষ্টের বাণীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল।'

এইস্থলে একজন খৃষ্টান মিশনরী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—'আপনি যাহাই বলুন, আপনার কথায় ত ইহাই প্রমাণ হইতেছে; অন্তরের অপূর্ণতা, শূন্যতা হইতেই ইহার জন্ম। আপনি ইহাকে মানুষের জাতিগত দোষ, দুর্ব্বলতা ঢাকিবার প্রয়াস বলিতে পারেন, কিন্তু আমি ইহাকে মানুষের প্রাণের ক্ষুধা, আত্মার অতৃপ্তি বলিব। যখন দেখি মানুষ টাকার গদিতে বসিয়াও মানুষের মধ্যে যে-সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র, লাঞ্ছিত তাহার সঙ্গলাভে ব্যাকুল, বহু-সমরজয়ী সেনানায়কও খৃষ্টের শান্তিপূর্ণ বাণীতে আস্থাবান তখন সত্যসত্যই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে।'

ডঃ উ-টিঙ বলিলেন—'কিন্তু এই বিশ্বাসের দ্বারা মানুষের হৃদয়ের যদি কোন পরিবর্ত্তনই সাধিত না হইল, তাহা হইলে ইহাকে আপনি যাহা খুশী বলিতে পারেন।' এই বলিয়া তিনি আমেরিকায় খৃষ্টান জনসাধারণের নিগ্রো-পীড়ন ও গত মহাসমরে পরজাতি-বিদ্বেষের কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিলেন।

'এই প্রসঙ্গে আমি কিছু বলিতে চাই' এই বলিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর ভিতর হইতে একজন ইংরেজ তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—'গতবার আমেরিকা-ভ্রমণের সময় আমি একজন লোকের কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি নিগ্রোদের মধ্যে নানাবিধ হিতকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাস করিবার জন্য উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা তিনি অনেক বিষয়েই নিগ্রোদের সাহায্য করিতেছিলেন। অথচ তিনি খৃষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত কেহই নহেন—তিনি একজন ইহুদী। অনেক খৃষ্টানও যে দান, দয়া, দাক্ষিণ্যাদিদ্বারা নিগ্রোদের সেবায় নিযুক্ত না আছেন এমন নহে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা, যাহারা দলবদ্ধ হইয়া নিগ্রো-পীড়নে নিযুক্ত তাহাদের তুলনায় কত সামান্য! ইহা কি খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে?'

'খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়' ইহা বলিয়া ডঃ উ-টিঙ ইহুদী ধর্ম্মের আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই বলিলেন, ইহুদী ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যদিও খুব বেশী নহে তবু ইহার একটি বিষয় বরাবরই তাঁহার মনে বিস্ময় আনয়ন করিয়াছে। তাহা এই—ইহুদীরা বরাবর

নিজেদের ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত জাতি (chosen people) বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের ধর্ম্মের যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারাও নিজেদের স্বতন্ত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

'ইহুদীরা এখনও তাঁহাদের প্রাচীন মহাপুরুষদের বাণীতে বিশ্বাসী। খৃষ্টকে তাঁহারা কোন দিনই তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা বা ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তথাপি অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা দান ও পরোপকারে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মুক্তহস্ত। আমেরিকা ও ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহুদীরা তাহাদের স্বজাতি ও অন্যান্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার ও হাসপাতাল প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দান করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ অন্যান্য জাতির সহিত আন্তরিক যোগসূত্রে আবদ্ধ থাকাই তাহাদের মনের যথার্থ অভিপ্রায়। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতে তাহাদের মত এমন নির্যাতিত জাতি পৃথিবীতে আর কেহই নাই। খুব সম্ভব নিজেদের এই জাতিগত দুর্গতিকে ঢাকিবার জন্যই তাহারা ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে—তাহারা স্বতন্ত্র, তাহারা ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত জাতি।

এই স্থানে একজন আমেরিকান উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমি মোটেই বিশ্বাস করি না, ইহুদী জাতি অন্যান্য জাতিসমূহ হইতে পৃথক, স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে ভালবাসে। নিজেদের জাতিগত দুর্গতিকে ঢাকিবার জন্যই তাহাদের এই প্রয়াস। স্কুলে কলেজে যেখানে তাহাদের প্রবেশের পথ মুক্ত সেখানে সকলের সহিত একত্রে শিক্ষালাভ করিতে তাহারা সর্ব্বদাই ইচ্ছুক; খৃষ্টান প্রতিবেশীর গৃহে যাতায়াত করিতে, অন্য জাতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে তাহাদের কিছুমাত্র বাধা নাই। এমন কি প্রয়োজন বোধ করিলে নিজেদের নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়াও তাহারা অন্যের সহিত মিলিত হইয়াছে এরূপও দেখা গিয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মের "ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত জাতি' এই কথাটি মোটেই তাহাদের অন্তরের কথা নয়, নিজেদের জাতিগত দুর্গতিকে ঢাকিবার জন্য ইহা তাহাদের ধর্ম্মের বাহ্যাবরণ মাত্র।'

জাপানী রাজদূত বলিলেন—'আজকাল জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের খুব প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।'

ডঃ উ টিঙ বলিলেন—'তাই হবে। বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্ম জগতের এক মহাধর্ম্ম; যাঁহারা কিছুকাল প্রাচ্যদেশে বাস করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন, অন্তরের কি গভীর বৈরাগ্য হইতে এই ধর্ম্মের উদ্ভব। গভীর বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তকে জয় করিয়া শান্ত, সমাহিত চিত্তে জীবন-যাপন করাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ।

'কিন্তু আজকাল হঠাৎ জাপানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি এই অনুরাগ নিতান্ত অর্থহীন নহে। বলা বাহুল্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে, যুদ্ধ, ধনসঞ্চয় প্রভৃতিতে প্রাচ্যদেশের মধ্যে একমাত্র জাপানই পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে সম্পূর্ণরূপ অনুবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানীর সৈন্যবল যেরূপ ছিল বর্ত্তমান সময়ে জাপানের সৈন্যবল তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। জাপানের রেলপথের ন্যায় এমন সুপরিচালিত রেলপথ জগতের অন্যত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে ষ্টেশনে গাড়ীর আসা যাওয়া হইতে নির্ভয়ে ঘড়ি মিলাইতে পারা যায়। জাপানের রাজধানী টোকিও শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যর কর্ম্মব্যস্ততা লণ্ডন কিংবা নিউইয়র্ক শহর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

'বর্ত্তমানের এই কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে জাপান তাহার পূর্ব্বের সহজ, সরল জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ হারাইয়াছে। সেই অভাব পূরণের জন্যই জাপান আজ জগতের সম্মুখে নিজেদের বুদ্ধ-ভক্ত বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেছে। ইহা শুধু তাহারা যাহা হারাইয়াছে তাহা যে হারায় নাই, ইহাই বলিবার জন্য মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা।'

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর ভিতর হইতে তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিতে কেহই আর অগ্রসর হইলেন না। কিছুক্ষণের জন্য ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

ডঃ উ-টিঙ তাঁহার বক্তব্য সংক্ষেপ করিবার জন্য বলিলেন—'ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাসের দ্বারা কোন জাতির ঠিক অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় না; ইহা দ্বারা মানুষের

দৈনন্দিন জীবন খুব অল্পই নিয়ন্ত্রিত হয়। অধিকাংশ স্থলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত ধর্ম্মমতের মিল অপেক্ষা অমিল ও বিরোধই বেশী। ধর্ম্মমত জাতিসমূহের বাহ্যাবরণমাত্র—অজ্ঞাতসারে নিজেদের দোষ ও দুর্ব্বলতা ঢাকিবার প্রয়াস।'*

* ১৯৩০ সালের নবেম্বর মাসের অ্যাট্‌লান্টিক মন্থ্‌লী হইতে।

প্রতিদিন ও একদিন

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

আরম্ভের সূত্রটুকুর কথা আর তেমন মনে পড়ে না; শুধু অর্দ্ধবিস্মৃত দিনগুলির স্বপ্ন-কুহেলির মধ্য হইতে একটি করুণ শানাইয়ের সুর মাঝে মাঝে স্মরণে আসে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কোলাহল, স্বচ্ছন্দ অশ্রু-হাসিতে উজ্জ্বল দীর্ঘ জীবন-যাত্রা হঠাৎ বাঁক ঘুরিয়া এমন একদিকে আসিয়া পড়িয়াছে, যেখান হইতে পিছনের দিকে তাকাইলে সবই অর্দ্ধ-কুয়াসাচ্ছন্ন মনে হয়।

ঠিক এখন এই পথে যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে বিশ্বনাথ—সঙ্গে যে আসিল সে মিনু, অবলম্বনের মধ্যে একটি শিশু—বুলু। আরও কয়েকটি অবলম্বনের নাম করা যাইতে পারে—সেগুলির মূর্ত্তি নাই, কিন্তু তাহারা এত জীবন্ত যে, তাহাদের উপেক্ষা করা নিতান্তই অনুচিত হইবে। তাহাদের নাম যথাক্রমে—নিদারুণ আত্মসম্মান-বোধ, কঠিন অভাবজ্ঞান এবং এ দুয়ের একান্ত সম্পর্কের ফলস্বরূপ—নিষ্করুণ দারিদ্র্য।

বিশ্বনাথ এই পর্য্যন্ত আসিয়া একরকম নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দর্শনের শেষ পরীক্ষা আর দেওয়া হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলে—দর্শন? বন্ধুরা বলে,—কেন হে, কি ব্যাপার? উত্তরে বিশ্বনাথ বলে—বঙ্কিমের 'Utility' পড়া হয় নি?—Utility বা উদর দর্শন? আমি সেই উদর-দর্শন পড়ছি—পরীক্ষা দিই নি—ফেল হবার ভয়ে।

কিন্তু মিনুর চলা শেষ হয় নাই—সকাল হইতে সন্ধ্যা—সন্ধ্যা হইতে অর্দ্ধরাত, মিনুর চলার শেষ নাই। দুটি ছোট ছোট সংকীর্ণ ঘর—সামান্য আয়োজন—কিন্তু তাহারই মধ্যে মিনুর অবিশ্রাম সংস্কার চেষ্টা যেন কোনো বাধা মানিতে চায় না। অন্ধকার ঘর দুটি; বেলা দুই প্রহরের সময় সামান্য একটু আলোর আভাস দেখা যায়। সেই স্বল্প-আলোকে সুনিপুণ কিন্তু নিরাভরণ গৃহ-সজ্জার দিকে চাহিয়া থাকা দুঃসাধ্য—এত সতর্কতা আর এত শৃঙ্খলা—মনে হয়, যদি কোথাও অসাবধানী হস্তের স্পর্শ লাগে, তৈজস-পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আসবাব যেন একসঙ্গে ঘন-ঝঙ্কারে চীৎকার করিয়া উঠিবে।

এই সমস্ত সাবধানতার মধ্যে বুলু যেন মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ। সেদিন বুলু একখণ্ড বিস্কুট চিবাইবার নিষ্ফল প্রয়াসে বিরক্ত হইয়া যে-ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, সে-ঘরে বিশ্বনাথ নিঃশব্দে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা উল্টাইতেছিল। পুত্রও পিতার নিঃশব্দতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটাইয়া নিঃশব্দে তেলের ভাঁড়, ডালের ঠোঙা আর মশলাপাতি প্রভৃতি মেঝেতে ফেলিয়া গম্ভীরভাবে কতক উদরে, কতক মুখে মাখিয়া ঘাড় দুলাইতে দুলাইতে কোন অসাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষায় নিযুক্ত হইল।

হঠাৎ পিছনে কিসের শব্দ হওয়ায় বিশ্বনাথ মুখ ফিরাইয়া যে ব্যাপার দেখিল, তাহা সে একা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মিনুকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

—কি? অমন মুখ ভার ক'রে এসে দাঁড়ালে যে?

—দেখবে এস, তোমার ছেলে কি কাণ্ড করেছে।

মিনু রান্না করিতেছিল,—'কি করেছে আবার!'—

বলিয়া তাড়াতাড়ি রান্নার হাত ধুইয়া বিশ্বনাথের পিছনে পিছনে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের অবস্থা দেখিয়া মিনুর এক সঙ্গে রাগ, দুঃখ আর হাসি পাইতে লাগিল। বুলুর কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—এমনি অখণ্ড মনোযোগ। মিনু ডাকিল—এই!

বুলু হঠাৎ মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুখ তুলিল। একবার মায়ের দিকে একবার বাপের দিকে চাহিয়া উভয়ের নিঃশব্দতার কারণ কিছু বুঝিতে পারিল না। নিতান্ত অপরাধীর মত ছোট দুটি হাত একত্র করিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল।

—হয়েছে, হয়েছে, আর অভিমান করতে হবে না, নাও ওঠ,—বলিয়া মিনু ছেলেকে উঠাইয়া লইল।

বনের ঘনসন্নিবিষ্ট পাতার আড়াল হইতে যেমন আলোর সামান্য ঝিকিমিকি—এই দুটি প্রাণীর অন্তরেও তেমনি সামান্য সুখের অনুভূতি মুহূর্তের জন্য, কিন্তু সেটুকুর পিছনে বনের অন্ধকারের মত আড়াল করিয়া আছে ছোট সংসারের ছোট ছোট দুঃখ, অসুবিধা আর অজস্র অভাব।

বিশ্বনাথ ভাবে, অভাবের মূল কোথায়?—মূল ত মনে, তাই সে মনকে জয় করিবার সাধনা করে, কিন্তু এই মনকে জীবন্ত জাগ্রত রাখিবার জন্য মানুষের যেটুকু অভাব-বোধ থাকে, বিশ্বনাথ সেটুকুকেও আমল দেয় না; যৌবনের প্রথমদিকে নানা দ্বন্দ্ব আর কোলাহল হইতে সরিয়া সরিয়া সে বইয়ের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, সে বই বিশ্বনাথ এখনও ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিল না।

সামান্য যা পুঁজি ছিল, একদিন তা শেষ হইবেই—বিশ্বনাথ অবশ্য সে কথা জানে। কি করিয়া এই পুঁজিকে শেষ হইতে অশেষের পথে চালিত করা যায়, বিশ্বনাথ আকাশ পাতাল ভাবিয়া তাহা আর স্থির করিতে পারে না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া সে বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসে।

মিনু ক্রমে ক্রমে নিরাশ হইয়া পড়ে। বিশ্বনাথকে সে কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। ঐ যে মানুষটির হাসি হাসি মুখ সে প্রথম হইতে দেখিয়া আসিতেছে, সে মুখে হয়ত একদিন ব্যথার ছায়া পড়িবে, কিন্তু মিনু স্বেচ্ছায় সে ব্যথা তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে আনিতে চায় না। কোথায় যেন বাধে। এইটুকু মিনুর দুর্বলতা।

বুলু একদিন ছোট একটি বিড়াল-ছানার লেজ ধরিয়া প্রাণপণে টানিতেছিল। পশুটিও সিমেন্টের মেঝের উপর যথাশক্তি নখ বসাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় বারে বারে বিফল হইয়া মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিতেছিল।

শীতের সকাল। বিশ্বনাথ ঘুরিতে ঘুরিতে মিনুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—দেখ, দেখ, বুলুটা বড় রোগা হ'য়ে যাচ্ছে, নয়?

মিনু তরকারী কুটিতে বসিয়াছিল। বঁটি হইতে মুখ না তুলিয়াই শুধু বলিল—হুঁ, হচ্ছে ত!—হবে না! যে খোলো দুধ দেয় গয়লাটা!

মিনু আর কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার 'হুঁ, হচ্ছে ত' কথা কয়টি বিশ্বনাথের সমস্ত ভাবনার সূত্র ছিঁড়িয়া দিল। ঐ কথা কয়টিকে লইয়া বিশ্বনাথ ভাবিতে বসিয়া গেল। ভাবনা যেন সমুদ্র। বিশ্বনাথ কূল পাইল না—অবশেষে মিনু হঠাৎ ঘরে আসিয়া বলিল, —ওঠো দেখি, আর ভাবতে হবে না, ওঠো। ভেবে ত সবই হবে!

—কিসে হবে বলতে পার মিনু!

মিনু সে কথা জানিত না; জানিবার প্রয়োজন কখনও হয় নাই। তাহার কল্পনার সীমা ছিল ছোট একটু সংসার—সে সংসারের মধ্যে একান্ত যে আপনার তাহাকে সে সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাইবে—আর তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া যাইবে—আর যে কিসে কি হয়—কার্য্যকারণসূত্রের এই গোলমেলে প্রশ্ন তাহার মনে কখনও উঠে নাই। তাই সে বিশ্বনাথের কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—তুমি এত-ও ভাব!

বিশ্বনাথ না ভাবিয়া পারে কি? ভাবিতে ভাবিতে

সমস্ত ব্যবধান যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভাবনাই তাহার কাছে কাজ বলিয়া মনে হয়। তবু প্রশ্নের শেষ নাই; যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অন্তরের গভীর অতৃপ্তির অর্থ কি?

নিদ্রিত মিনুর মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ ভাবে—কি সুন্দর, কি পবিত্র! কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বনাথের মনে শান্তি আসে—চিন্তা বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরক্ষণেই সে ভাবে,—কিন্তু এ কতদিনের? সে ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহার বিপুল প্রসারের মধ্যে সব সৌন্দর্য্য, সব সুখ নিমেষের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে! তারপর? বন্ধুরা বলে চিন্তাবিলাসী, নিষ্কর্ম্মা! কিন্তু এই 'তারপরে'র, এই ঘর্ম্মসলিলপ্ত চিন্তালেশহীন জীবনযাত্রার কথা ভাবিতে বিশ্বনাথ শিহরিয়া উঠে। চোখের সম্মুখে ষ্টেশনের রূপ ভাসিয়া উঠে, অজস্র লোক্যাল ট্রেন, আর সহস্র সহস্র ডেলিপ্যাসেঞ্জার—গরম কোট, গলাবন্ধ, মলিনমুখ, কপি আর ইলিশমাছের পুঁটুলি! ভাবিতে ভাবিতে মনে হয়, সে বুঝি ঐ রকম একটা চাকুরি করিতেছে—ভোরে গঙ্গার ধারের কলের বাঁশীগুলি বাজিয়া উঠিলেই মিনুর বাহু-বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে হইবে, তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া কোনো রকমে কিছু গলাধঃকরণ করিয়া খোয়া-উঠা রাস্তায় দৌড়িয়া ট্রেন ধরিতে হইবে। সমস্ত দ্বিপ্রহরের রৌদ্র কত পাণ্ডুর, কত বিশীর্ণ মনে হইবে! ভাবিতে ভাবিতে সেই নিঃশব্দ রাত্রে বিশ্বনাথ বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারী আরম্ভ করিল।

সকাল আটটা হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত প্রায় তিন চার জন লোক বিশ্বনাথকে খোঁজ করিয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথ বাড়ি ছিল না; ভোরে উঠিয়া কোথায় গিয়াছিল। বেলা ১১টার সময় বিশ্বনাথ বাড়ি ফিরিলে মিনু আসিয়া বলিল,—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তিন চার জন লোক ডেকে ডেকে হয়রাণ হ'য়ে ফিরে গেল!

—কে তা'রা বল ত? কি জন্যে এসেছিল?

—বা রে! তা আমি কি ক'রে জানব? আমি ত আর সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারি নে!

গেল। তাহারা যে কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াই সে কথা মিনুর কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। মিনুর-ও বিশেষ কোন কৌতূহল নাই, তাই সেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

পরদিন ভোর হইতে-না-হইতেই একজন ডাকিল—বিশ্বনাথ বাবু বাড়ি আছেন? বিশ্বনাথবাবু!—'এই যে, যাই'—বলিয়া বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে গিয়া—'বড় মুস্কিলে পড়েছি', 'হাতে এক পয়সা নেই', 'দু-চার দিন পরে এসে নেবেন' প্রভৃতি বলিয়া কহিয়া এক-রকমে তাহাকে বিদায় করিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার একজন আসিয়া উপস্থিত—'অনেক দূর থেকে আস্‌ছি মশায়, রোজ রোজ কি ফেরানো ভাল? বুড়ো মানুষ, বেতো রুগী মশায়, কাঁহাতক আর হাঁটি বলুন? যা হয় কিছু দিয়ে দিন্। আজ আর ফেরাবেন না—হাতে যা ওঠে—'

—কি ক'রে তা হয় বলুন, হাতে কিছু থাক্‌লে কি আর?—প্রভৃতি বলিতেও বৃদ্ধ শুনিতে চাহে না! তবু আধঘণ্টা টানাটানির পর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

আবার সেই অভিনয়। বেলা দশটা পর্য্যন্ত এইরূপে ক্রমাগত ঘর-বাহির করিয়া বিশ্বনাথ ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মিনু এ সব দেখিয়াছে কি না, সে কি ভাবিতেছে—এ সব প্রশ্ন তখন আর তাহার মনে আসিবার অবকাশ পাইল না। মিনু চা লইয়া আসিল।

—কি, আবার শুলে যে? শরীর ভাল নেই বুঝি!

বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল—না, না, কিছুই হয় নি, কৈ, চা দাও! অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব এসেছিল, তাঁদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে,—তা ছাড়া চা-ও খাওয়া হয় নি আজ সকালে!

মিনু একটু হাসিয়া বলিল—এত সকালে সব এসেছিলেন! একটু বস্‌তে বল্‌লে না কেন? চা খেয়ে যেতেন!

—তা'রা সব কাজের লোক—তা'রা কি বস্‌তে পারে ?

কিন্তু মিনুর সঙ্গে অভিনয় করা যায় কি ? ভ্রমরের মত কালো দুটি চোখের তারা—একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল ছোট কপালখানি বেষ্টন করিয়া—সুগভীর স্থির সরল দৃষ্টি ; বিশ্বনাথ পূর্ব্বের মত দুটি হাতে তাহার মুখখানিকে আপনার মুখের কাছে আর তুলিয়া ধরিতে পারে না। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ, একটা অপরাধের ভয় তাহার সমস্ত মনকে গ্লানিতে ভরিয়া তোলে।

বিশ্বনাথের এই চিন্তাক্লিষ্ট অবসন্ন মনের খবর কি আর মিনুর কাছে পৌঁছে নাই ? কেন এ চিন্তা, আর কিসের এ অবসাদ জানিবার জন্য মিনুর ব্যাকুলতার আর অন্ত ছিল না। মিনুর মনে পাছে আঘাত লাগে, এই ভয়ে বিশ্বনাথ সর্ব্বদা সন্তর্পণে কথা বলিতে যায়—আর মিনু তাহার সমস্ত সত্তা, সমস্ত হৃদয় দিয়া জানিতে চায়—তোমার যা দুঃখ, তোমার যা চিন্তা, তা তুমি আমাকে জানাইবে না কেন ?

অবশেষে মিনু একদিন রাগ করিয়া বসিল,—কিন্তু মুখে বলিল,—'বুলু কথা কইতে শিখেছে, বাবার কাছে আমায় নিয়ে চলো, বুলুকে দেখিয়ে আন্‌ব।'

বিশ্বনাথ কিছু না ভাবিয়াই বলিল—চল।

—পনের দিন পরে আমাকে নিয়ে আস্‌তে হবে কিন্তু! বেশী দিন আমি সেখানে থাকব না।

—আচ্ছা! বলিয়া বিশ্বনাথ একদিন মিনুকে তাহার পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ষ্টেশন, ভিড়, সারারাত ট্রেনের একটানা শব্দ, সকালে ষ্টীমার, মুটের কলরব, গরুর গাড়ী, ধূলা—উঁচুনীচু অসমতল রাস্তা—তারপর মিনুর বাপের বাড়ি। মিনুর মা নাই, পিতা প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়—অনেকগুলি ভাই। বড় ভাইটি মিনুর চেয়ে ছোট—কলিকাতায় কলেজে পড়ে।

বেশ বড় গ্রাম—শহরের সুবিধাও আছে। মিনুরা সন্ধ্যার একটু আগে পৌঁছিল। একপাল ছেলেমেয়ে বাড়ির সম্মুখের মাঠে খেলা করিতেছিল। 'ওরে মিনুদি এসেছে', 'জামাইবাবু এসেছে', 'খোকা এসেছে' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহারা দুইজনকে এক রকম ঘিরিয়া বাড়ি লইয়া চলিল।

'ও বঙ্কু, মিনু এসেছে, বিশ্বনাথ এসেছেন—এদিকে এস !'—বলিয়া মিনুর বাবা বৈঠকখানা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বুলু বিশ্বনাথের বুকের উপর সমস্ত দিন আর রাত্রির ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। 'এস, দাদু এস' বলিয়া বৃদ্ধ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

চমৎকার! জীবন-যাত্রার গ্লানি নাই—উদ্বেগ নাই ; নিশ্চিন্ত আরামে অর্দ্ধনিমীলিতচক্ষে এখানে শুইয়া থাকা যাইতে পারে। প্রচুর আলো—জানালা, দরজা, দেওয়াল সবই স্পষ্ট ; চোখে ধাঁধা লাগে না, কানে তালা ধরে না ; বাঁশীর একটানা করুণ সুমিষ্ট সুরের মত জীবন এখানে নিতান্ত সহজ স্বচ্ছ অনুভূতিতে ভরা। বিশ্বনাথ যেন বাঁচিয়া গেল।

পাড়ার অনেকে মিনুর বাবার বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পরে বেড়াইতে আসেন। একটু বেশী রাত অবধি নানা আলোচনা তর্কবিতর্ক হয়। বিশ্বনাথ জামাই—কাজেই ফরাসের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অনেক কথাবার্ত্তার পর একে একে সকলে উঠিয়া গেলেন। জামাতার কাজকর্ম্মের কোন সুবিধা হইল কি না, এবং সংসার কিরূপ চলিতেছে—এই ধরণের দুই-একটা প্রশ্ন মিনুর বাবা বিশ্বনাথকে করিতে যাইবেন, এমন সময় সম্মুখের দরজা খুলিয়া বঙ্কু ভিতরে আসিল। বঙ্কুকে দেখিলে মনেই হয় না যে, সে এ বাড়ির ছেলে। তাহার মাথার কেশের প্রসাধন পরিপাটি, জুল্‌পি গাল অবধি নামানো। পাঞ্জাবীর বোতাম কাঁধের একপ্রান্তে গুটি দুই দেখা যায়। বাঙালী বাবুদের মত সম্মুখে কোঁচার কোনো চিহ্ন নাই—মালকোঁচা দিয়া কাপড়পরা, কিন্তু তাহাতে উগ্রতার কোনো আভাস দেখা যায় না—বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার আকৃতি ; দেখিলে বেশ চালাক-চতুর বলিয়াই মনে হয়।

কর্ত্তা বলিলেন,—আয় বঙ্কু, বিশ্বনাথ এসেছেন, মিনু এসেছে, দেখেছিস্‌! কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?—'ও, বিশ্বনাথবাবু এসেছেন না কি ? ও, আপনি যে ঐ

কোণে একেবারে গেঁয়ো লোকের মত চুপ্‌চাপ ব'সে আছেন দেখছি, তারপর সব খবর ভাল ত ?

বিশ্বনাথ ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, তাহারা ভাল আছে। কিন্তু মিনুর বাবা একেবারে সচকিত হইয়া বলিলেন—আরে, তুই হলি কি বল্ দেখি? বড় ভগ্নীপতি,—প্রণাম করা উচিত, তা'র সঙ্গে ঐ রকম ভাবে কথা বল্‌তে আছে ? যা যা প্রণাম কর্‌গে যা—

বঙ্ক একেবারে অট্টহাস্য করিয়া বলিল—হ্যাঁ, প্রণাম ! প্রণাম-ট্রণাম ও সব সেকেলে ! তুমি জান না বাবা আজকালকার ফ্যাসান্—আজকাল দুটো হাত জোড় ক'রে কপালে রাখলেই হয় ! তা-ও ক্রমশঃ উঠে যাচ্ছে !

বিশ্বনাথ বঙ্ককে ছোট দেখিয়াছিল ; তাহার হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন তাহার চোখে ভাল লাগিল না। অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই—কাজেই পিতাপুত্রের মতদ্বৈধের মাঝখানে কোনো কথা বলা অসঙ্গত হইবে মনে করিয়া সে আর কিছু বলিল না।

মিনুর বাবা অন্যদিন হইলে হয়ত বিশেষ কিছু বলিতেন না ; আজ বিশ্বনাথের সম্মুখে বঙ্কর এইরূপ আত্মপ্রকাশ তিনি সহ্য করিবেন কেন ? তিনি বিশ্বনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দেখছ বাবাজী, কল্‌কাতায় থাকার ফল দেখছ ? ওটার পেছনে রাশরাশ খরচা কর্‌ছি—বেটা দিন দিন একেবারে সেপাই হ'য়ে উঠছে—ফের যদি—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বঙ্ক চেঁচাইয়া উঠিল—ফের যদি কি আবার ? আমার দোষটা কি হ'ল ? আজকাল মানুষের সময় কম, বুঝলে ? পঞ্চাশজনকে প্রণাম করবার দিন চলে গেছে ! এখন সব সংক্ষেপে সারতে হবে—

—বেরো, বেরো বল্‌ছি নচ্ছার পাজী—বেরো এখান থেকে তুই ! বলিয়া মিনুর বাবা আল্‌বোলার নল লইয়া বঙ্ককে তাড়াইতে উঠিলেন—অমনি বিশ্বনাথ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—আহা করেন কি ? করেন কি ? ছেলেমানুষ,—

বঙ্ক গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল।

—দেখ্‌লে বাবাজী, ওটা একেবারে ব'য়ে গেছে,—তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ঐ রকম হয়েছে ! কল্‌কাতায় থাকে, অভিভাবক নেই, কিছু নেই—টাকাগুলো নিয়ে যা খুশী তাই করে ! আমি খবর পেয়েছি—বেটা রোজ বায়োস্কোপ দেখে,—আমি ওকে সায়েস্তা কর্‌ব, তুমি দেখে নিও !

এত বড় একটা বিপ্লব বিশ্বনাথ স্বপ্নেও আনিতে পারে নাই ! শুধু বলিল—ছেলেমানুষ, নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারলে শুধ্‌রে নেবে !

—আর শুধ্‌রেছে ! আমি ম'লে ! বুঝ্‌লে বাবাজী ! হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলাম !—হঁয়ে, তোমার কাজ-কর্ম্মের কিছু সুবিধে হ'ল কি ?

—কাজকর্ম্ম ! আজ্ঞে না, কাজকর্ম্মের কোনো সুবিধেই হয় নি !

—এই দেখ, তবেই ত মুস্কিলের কথা বাবাজী ! যা দিনকাল পড়েছে, এতে আর কা'রো কিছু ক'রে খাবার উপায় নেই ! আমাদের টাইমে কিন্তু এতটা ছিল না ; তোমরা সব over-qualified হ'য়ে যাচ্ছ বাবাজী ; করে খাচ্ছে অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিতেরা ! এ আমার দেখ্‌তা—কত বি-এ এম্-এ ব'সে আছে—কোনো সুবিধে কর্‌তে পার্‌ছে না ! কিন্তু কেন পার্‌ছে না—সে খবরটা নিয়েছ কি বাবাজী—শিক্ষা তা'রা পায় নি একেবারে—নোট মুখস্থ ক'রে ক'রে পাশ করেছে—স্বাস্থ্যহীন, দুর্ব্বল weaklings—they can't support their family, whereas—বিশ্বনাথ নিঃশব্দে বসিয়াছিল —কোন্‌টা সত্য, আর কোন্‌টা মিথ্যা, কি করিলে ভাল হয়—সব মিলিয়া মিশিয়া তাহার মাথায় তাল-গোল পাকাইয়া যাইতেছিল। শ্বশুর মহাশয় অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন—বঙ্কর দুর্ব্ব্যবহারের উত্তাপ তিনি যেন বকিয়া বকিয়া শান্ত করিবেন এই অভিপ্রায়। হঠাৎ কখন তিনি চুপ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও সে জানিতে পারে নাই—অবশেষে,—'ভেতরে যাও বাবাজী, পরিশ্রান্ত হয়েছ !'—শুনিতেই সে চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

সম্মুখের জানালাটি খোলা ছিল। শব্দহীন গ্রামের শান্ত গাছপালার উপর দিয়া ঝির্‌ঝিরে বাতাস বহিয়া

আসিতেছিল। পথের ক্লান্তিতে বিশ্বনাথ আর জাগিয়া থাকিতে পারে না। পরিষ্কার ধবধবে বিছানার এক-প্রান্তে বুলু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তন্দ্রায় চোখ ঢুলিয়া আসিয়াছে, এমন সময় খুট করিয়া একটু শব্দ—কান ও গালের কাছে কা'র উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ আর দু-টি কি তিনটি কথা—ঘুমুলে না কি?

বিশ্বনাথ জাগিয়াই ছিল, বলিল—না, ঘুমুইনি—তোমার যে এত দেরি হ'ল!

—বঙ্কুর সঙ্গে গল্প করছিলাম; বঙ্কু কেমন চমৎকার গল্প সব বলে—বেশ লাগে শুনতে!

বিশ্বনাথ কিছু বলিল না।

মিনু বলিল—বঙ্কুর সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার? বঙ্কু কত বড় হ'য়েছে দেখেছ?

—দেখেছি বঙ্কুকে। কিন্তু বঙ্কুকে দেখে বড় কষ্ট হ'ল; তোমার বাবা ত ওর ওপর খুব চটা।

—ও চিরকালই ঐ রকম; ছোটতে কি দস্যিপনাই না করত! বড় হ'য়েও সেটা যায় নি। বাবা ত ওসব পছন্দ করেন না—তাই বোধ হয় রাগ করেন। কিন্তু তোমরা জানো না, বঙ্কু আমার কাছে কক্ষণো দুষ্টুমি করে নি।—এখনও করে না।

—তাই না-কি? তা হ'লে তুমি তাকে একটু বুঝিয়ে বল না! বাবার সঙ্গে যেন খারাপ ব্যবহার না করে—এখন বয়স হচ্ছে ত!

রাত্রি গভীর হইল। যেখানে যতটুকু শব্দ ছিল, সব-ই যেন ক্রমশঃ সেই বিপুল নিঃশব্দতার মধ্যে আত্ম-গোপন করিল। ম্লান চাঁদের আলোয় বহুদূরে ঝাপসা বন-সীমা হইতে কোন্ এক অজানা পাখীর 'কুক্' 'কুক্' শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মিনুর কপালের উপর কতকগুলি এলোমেলো চুল আসিয়া পড়িয়াছে—বিশ্বনাথ সেগুলি বড় সন্তর্পণে গুছাইয়া দিল—বলিল,—আমি কাল যাচ্ছি।

মিনু একটু হাসিয়া বলিল—কেন, শ্বশুরবাড়িতে বুঝি বেশী দিন থাকতে নেই?

বিশ্বনাথের মনের কথাটি মিনু টানিয়া বাহির করিয়াছে। বিশ্বনাথ আর অভিনয় করিল না—এমন সুন্দর রাত্রে প্রসন্ন মনে অভিনয় করা যায় না; যত কথা বলা হয় নাই, আর যত কথা বলিতে হইবে, সব যেন বুকের মধ্যে তোলপাড় করে। শুধু বলিল—ঠিক বলেছ তুমি, আমি এখানে বেশীদিন থাক্‌তে পারি না—আমাকে ফিরে যেতে হ'বে; কিন্তু সেখানেও তোমাকে ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পার্‌ব না আবার আমাকে এখানে আস্‌তে হ'বে, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

মিনু দুষ্টামি করিয়া বলিল,—কেন, না নিয়ে গেলে চল্‌বে না বুঝি! তারপর কাঁকণ-পরা একখানি হাতে বিশ্বনাথের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া মুখের খুব কাছে মুখ লইয়া আসিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—যদি না যাই!

তিন দিনের দিন বিশ্বনাথ সত্য সত্যই চলিয়া গেল। কলিকাতা সেখান হইতে কতদূর;—বুলু নাই, মিনু নাই; মরুভূমির মত ছোট বাসায় বিশ্বনাথ কেমন করিয়া থাকে? বেশী দিন আগেকার কথা নয়—বাড়িতে তখন বিশ্বনাথকে একা থাকিতে হইত না। কত লোকজন, কত ব্যস্ততা! নিমেষের মধ্যে কোথা হইতে এক ঘূর্ণী হাওয়ার ঝাপটে সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছে। বইগুলিও আর তাহাকে ঠিক্ পূর্ব্বেকার মত সঙ্গ দিতে পারে না। কর্ম্মহীন দীপ্ত মধ্যাহ্নে একা একা বিশ্বনাথ কেন যে মুহ্যমান্ হইয়া পড়ে, ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। রৌদ্রের যেন ক্ষুধাতুর মূর্ত্তি—কাকগুলির কণ্ঠ কি কর্কশ—শুধু এক গম্ভীর প্রকৃতির প্রৌঢ়া ঝি বিশ্বনাথের শূন্য ঘর দুইখানির মধ্যে দুই একটা ছোট ছোট কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে।

বিশ্বনাথ যখন চলিয়া যায়, মিনু তাহাকে বারে বারে মনে করাইয়া দিয়াছে যে, সে এখানে কিছুতেই পনেরো দিনের বেশী থাকিবে না। বিশ্বনাথ শুধু তাহার উত্তরে একটু হাসিয়াছিল, বলিয়াছিল,—আচ্ছা, তাই হবে। মিনু কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারে না—কলিকাতার সেই অপরিসর গলির ভিতরে অন্ধকার দু-খানি ঘর তাহার সমস্ত মনকে এমন করিয়া অধিকার করিল কেন? এখানে যেন সাত আট দিনের বেশী কিছুতেই মন বসে না। এই ত সেদিন ছোট বয়সের খেলার

সাথী খাঁদু আসিয়াছিল—সে ত অনায়াসে এক বৎসরের বেশী বাপের বাড়িতে কাটাইয়া দিতেছে। কেমন নিশ্চিন্ত সে—বলে,—তা'তে কি হয়েছে, যখন সময় হবে, তখন সব আপনি-ই ছুটে আস্‌বে, দরকার হ'লে কেউ কি চুপ ক'রে বসে থাকে না কি? জানিস্—আমি ত জোর ক'রে এখানে আসি, সেধে কক্ষনো যাই না, নিজেই ছুটে এসে নিয়ে যায়!

চিন্তালেশহীন কলহাসি—স্বচ্ছন্দ গতি; মিনু খাঁদুর দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে! ছোটতেও ও অমনি ছিল, একরোখা, জেদী—কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করে না। দেহে অলঙ্কার-সংস্থানের অভাব নাই; একমুখ পান, আর দোক্তার কৌটা সদাসর্ব্বদা সঙ্গে। কথা-কহার মধ্যে এমন একটি সবল ভঙ্গী আছে, যে, দূর হইতে শুনিলেও মনে হয়, সে প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জনী তুলিয়া হাত নাড়িয়া কথা বলিতেছে। এত বয়স অবধি সন্তান হয় নাই, লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বুলুকে দেখিলেই কোলে টানিয়া লয়; চোখ-মুখের প্রখরতা এক নিমেষে শান্ত স্নিগ্ধ হইয়া আসে।

সেদিন সে আসিয়া-ই বুলুকে কোলে টানিয়া লইয়াছে। মিনু একটু দূরে করতলের উপর মুখখানি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। খাঁদু বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করিল, —বলি হ্যাঁ লা, ছেলেটা এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটুও কি কাছে নিতে নেই! আমি বলি, কি না কর্‌ছে—ওমা, এসে দেখি ঠিক ছবির দময়ন্তীর মত গালে হাত দিয়ে ভাবনা চল্‌ছে!

মিনু গাল হইতে হাত নামাইয়া একটু হাসিয়া বলিল —না ভাবিনি ত কিছুই; একা একা ভাল লাগে না ভাই, তুমি কখন আস্‌বে তাই ভাবছিলাম।

—ওমা, কোথা যাব, ভাবছ বরের কথা, আমি কোথাকার কে হেঁজিপেজি, আমার কথা ভাবতে যাবে! —বলিয়া একটু কাছে সরিয়া আসিয়া মিনুর চিবুকে হাত দিয়া বলিল,—অত বরের কথা ভাবতে নেই, বুঝ্‌লি গোমড়ামুখী!

মিনু আস্তে তাহার হাতখানি সরাইয়া দিয়া বলিল— দূর, আমি তা ভাবতে যাব কেন? আর বুঝি কোনো ভাবনা নেই!

খাঁদু একটু স্থির হইয়া মিনুর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, এই অবসরে বুলু কখন ছট্‌ফট্ করিতে করিতে উঠিয়া পলাইয়াছে। কোথা হইতে অশ্রু আসে কে জানে? চাহিয়া চাহিয়া খাঁদু চোখ মুছিল, বলিল—কি ভাবছ তা জানি, কেন, মুখে কি বুলি নেই? মেয়ে মানুষের কোনো সম্বল নেই জানিস্! আছে শুধু ঐ মুখখান; তাকেও খুইয়ে ব'সে আছে পোড়ারমুখী! তোমার কিসের অভাব, কি তোমার নেই, একথা পুরুষ মানুষ জান্‌বে কি ক'রে—তুমি যদি চন্দ্রবদনে সে কথা তা'কে না শুনিয়ে দাও। শুধু এই মুখখানির জোরে বেঁচে আছি বুঝলি! শুধু এই মুখখানির জোরে—বলিয়া খাঁদু হাত দুটি প্রসারিত করিয়া গহনাগুলি মিনুকে দেখাইল। তারপর হাত নাড়িয়া বলিল,—বলতে হয়, সব বলতে হয়, না ত শেষকালে চোখের জলে, নাকের জলে হবে।

খাঁদুর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মিনু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল,—ও সব কি বল্‌ছিস ভাই—আমি ত' কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। কাকে কি বলতে হবে, কেন বল্‌তে হবে, কিছুই ত বুঝলাম না।

—না বোঝো ত মরো। নেকী, কিনা! জানো না কিছুই! বলি চাকরি কি তুই কর্‌বি না কি লা! বিশুবাবু চাক্‌রি করে না, জমিদারী নেই—সে কথা তোকে বুঝিয়ে বল্‌তে হ'বে না? তুই না বল্‌লে, বল্‌বে কে শুনি?

মিনুর কাছে ব্যাপারটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এখানে আসার পর কই ঘুণাক্ষরেও বিশ্বনাথের কথা ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। কলিকাতায় থাকিতে বিশ্বনাথের মানসিক দুশ্চিন্তার ব্যাপার সে লক্ষ্য করিয়াছিল। তাই ত সে একটু এখানে ঘুরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, একটু যদি পরিবর্ত্তনের হাওয়া লাগে এই আশায়! জীবনের রুক্ষ দিক্‌টার সঙ্গে

তাহার যে পরিচয় নাই—তাহার বুদ্ধি শুধু যে আভাস ইঙ্গিতের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়, একথা আজ যেন তাহার কাছে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল।

থাঁদুর পরামর্শকে সে দূরে সরাইয়া দিতেও পারে না, আবার তাহা গ্রহণ করিয়া কি ভাবে চলিতে হইবে—তাহা ত তাহার জানা নাই। মনের এই জটিল দ্বন্দ্বের মুহূর্ত্তে মিনু একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। এমন সময়ে থাঁদুর ঋজুকঠিন কণ্ঠে তাহার চেতনা হইল—আবার ভাবতে লাগ্‌লি—আমি যা বলি, তা শোন্—বলিয়া খুব কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদু স্বরে বলিল—এ ছাড়া আর উপায় নেই—তোদের ও প্রেম-পীরিত আমি বুঝি নে! যা সত্যি, তাই বল্‌তে হবে; সেখানে লজ্জা করতে গেলে মারা পড়বি,—এই ব'লে গেলাম, জেনে রাখিস্।

ঝড়ের মত কোথা হইতে বঙ্কু ছুটিয়া আসিল—রোরুদ্যমান বুলুকে সে কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে। 'দিদি' 'দিদি' হাঁকিতে হাঁকিতে ঘরের মধ্যে আসিয়া বুলুকে নামাইয়া দিয়া বলিল,—তোমরা ত বেশ এখানে গল্প জুড়ে দিয়েছ, ওদিকে ছেলে আমার পড়ার ঘরে গিয়ে সব ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে যে এলো, তা'র কি?

মিনু বুলুকে কোলে টানিয়া বঙ্কুর দিকে চাহিয়া বলিল, কখন গিয়েছে, ভাই, কিছুই ত জানতে পারি নি!

—তা জান্‌বে কেন? তোমরা গল্পে মেতেছ, তোমাদের কি সেদিকে খেয়াল আছে? ছেলে ত সব নষ্ট ক'রে মেঝের উপর ব'সে কাঁদছে আর বল্‌ছে—বাবা, বাবা, বাবা কই? আমি ত ঘরে ছিলাম না—এসে দেখি ঐ কাণ্ড! তা তোমরা সারা দুপুর ত বেশ গল্প করছ দেখছি, কি গল্প হচ্ছে থাঁদু-দি বলো ত শুনি!—বলিয়া বঙ্কু খাটের উপর বসিয়া পড়িল, পা দোলাইয়া বিলাতী গানের সুরে শিস্ দিতে লাগিল।

থাঁদু কর্কশ-কণ্ঠে বলিল—বেরো তুই এখান থেকে, এখানে এসেছে বখামি করতে! বঙ্কুও তেমনি বলিল,—হ্যাঁ, তোমার কথাতেই আমি যাচ্ছি কি না! বল গল্প, নইলে এমন জ্বালাতন করব!

বঙ্কুর জ্বালাতন করিবার প্রথা ছিল নানা রকমের। থাঁদু ভয় পাইয়া বলিল—না বাপু, জ্বালাতন করবার আর দরকার নেই, গল্প আর কি হবে মাথামুণ্ডু, এই তোমাদের বিশ্বনাথবাবুর কথা হচ্ছিল! তা' সে কথায় তোমার দরকার কি?

—আছে আমার দরকার। বিশ্বনাথবাবুর কথার কি হচ্ছিল বল শীগ্‌গির।

—কথা আবার কি? তোমার জামাইবাবুকে চাকরি ক'রে আন্‌তে বল্‌তে পারো না? তোমার দিদির কি হাল হ'য়েছে দেখ দেখি; যে ক'দিন এসেছি—মুখখানা শুক্‌নো, শরীর খারাপ হ'য়ে গেছে—তোর জামাইবাবু এলে বলিস্!

মিনু ঠিক বুঝতে পারে নাই—ব্যাপারটা ঘুরিয়া হঠাৎ যে এরূপ ভাবে দেখা দিবে তাহা কে জানিত? তাই সে ভীত সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—না না, বল্‌বে কি আবার—কিছু বল্‌তে হবে না! বঙ্কুর দিকে চাহিয়া বলিল,—যা যা বঙ্কু, তুই এখান থেকে যা।

বঙ্কু উঠিয়া দাঁড়াইল—'ঠিক বলেছ থাঁদু দি, বল্‌ব বইকি, একশ'বার বল্‌ব—বঙ্কু তেমন ছেলেই নয়; জানি কি না—দিদিকে দেখেই আমি এবার বুঝেছি—তুমি বলবার আগেই আমি ঠিক করেছি, এবার বিশ্বনাথ-বাবু এলে আমি তাঁকে সব বল্‌ব।' তুমি বললে, ভালই হ'ল!

মিনু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল—বলিল,—না বঙ্কু, তুমি কিছু বল্‌তে পারবে না! বঙ্কু দিদির দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল—কেন?

—না।

পনের দিন কবে শেষ হইয়াছে। বিশ্বনাথ আজ যাই, কাল যাই, করিয়া আর মিনুকে আনিতে যাইতে পারে নাই। এদিকে একা এই নির্জ্জন দুটি ঘরে তাহার মন টিকিতেছিল না। অভাব চিরদিন আছে এবং থাকিবে, কিন্তু যাহাদের জন্য অভাব-বোধ তাহাদের অভাবে বিশ্বনাথের সবই যেন শূন্য মনে হয়। অবশেষে একদিন বিশ্বনাথ মিনুদের আনিতে যাইবার জন্য বাহির হইল। পথে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, মিনুকে

লইয়া আসিয়া সে এবার নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবে। প্রতিদিনের জড়তাকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া যথার্থ পুরুষের মত সে আপনার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বাহিরের জগতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। কর্ম্মের অবকাশহীন ক্লান্তি আর তার পরের মধুর বিশ্রামের কথা বিশ্বনাথ মনের মধ্যে ছবির মত আঁকিয়া লইল।

মিনুর বাবা সেদিন কি কার্য্যোপলক্ষ্যে বাহিরে গিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ যখন পৌঁছিল তখন স॰ ॥। বাহিরের ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে, এবং তাহারই সম্মুখে বসিয়া বঙ্কু কি একখানি বইয়ের পাতা উল্টাইতেছে।

বিশ্বনাথ নিঃশব্দে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। বঙ্কু দেখিতে পায় নাই।

বিশ্বনাথ কহিল—বঙ্কু, আমি এলাম হে।

—ও, কে!—বিশ্বনাথবাবু যে, আরে আসুন, আসুন! বসুন, বা, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

বিশ্বনাথ চৌকিতে বসিয়া বলিল—আমার চিঠি পাও নি! তোমার বাবা কোথায়, বাড়ি আছেন ত?

—কই চিঠি ত পাই নি! বাবা বাড়িতে নাই, দিদিকে নিয়ে আমার মামার বাড়ি গেছেন!

বিশ্বনাথ চকিত হইয়া বলিল—তাই না কি? কবে ফিরবেন?

—দেরী আছে, দিন-দশেকের কম নয়। সে সব পরে হ'বে—আপনি বিশ্রাম করুন, ট্রেন জার্ণি,—ক্লান্ত হ'য়েছেন।

—তা ত হ'ল বঙ্কু, আমি যে তোমার দিদিকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম।

—তার জন্যে ভাবনা কি? থাকুন না এখানে কিছুদিন, দিদিরা এলে পরে নিয়ে যাবেন! আর নিয়ে গেলেই ত দিদির শরীর খারাপ হবে। তার চেয়ে বরং একটা চাক্‌রি-বাক্‌রি জুটিয়ে কল্‌কাতায় থাকার একটা ভাল ব্যবস্থা করে ওদের নিয়ে যাবেন—সেই ত পচা কাণা গলি—অন্ধকার ড্যাম্প ঘর—কি হবে নিয়ে গিয়ে?

অন্য সময় হইলে হয় ত কিছুই হইত না—বঙ্কুর অসংযত অপ্রিয় কথা শুনিতে বিশ্বনাথ আহত হইল। পথের পরিশ্রমের কথা বিশ্বনাথ ভুলিয়া গেল। চৌকী হইতে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল—বলিল,—তা'হলে আমি চললাম বঙ্কু। তোমার দিদি এলে বলো, আমার একটা ভাল ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার দিদি এখানেই থাকবে।

—আরে, আপনি চটে গেলেন না কি? ওকি ওকি—বলিতে বলিতে বঙ্কু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথ তখন ঘর ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়া দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বঙ্কু সত্যই বিস্মিত হইয়া গেল। সে ইচ্ছা করিয়া দুষ্টামি করিতে গিয়াছিল। কিন্তু ফল বিপরীত হইল দেখিয়া সে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। ছুটিয়া গিয়া যে বিশ্বনাথকে ধরিয়া আনিবে, এমন ক্ষমতাও তাহার রহিল না।

মিনুর বাবা ফিরিয়া আসিলেন। মিনু তাঁহার সঙ্গে যায় নাই। অস্থির চিত্তে যাহার প্রতীক্ষায় সে গৃহকোণে কাল কাটাইতেছিল, সে যে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, একথা সে তখনও জানিতে পারে নাই। বঙ্কু সে কথা তাহার বাবার কাছে বলিল না। শুধু যাহার কাছে না বলিয়া থাকা যায় না, তাহার কাছে গিয়া নিঃশব্দ নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

বঙ্কু যখন ছোট ছিল, দোষ করিলে তাহার মার কাছে অমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিত। মা নাই কিন্তু দিদি আছে—

মিনু তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল—কি হয়েছে বঙ্কু? কা'র কি চুরি করেছ, বল দেখি!

বঙ্কু মুখ তুলিল না; রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে দিদি, বিশ্বনাথবাবু এসেছিলেন, কিন্তু—

মিনুর মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। শুধু বলিল—কিন্তু কি?

—কিন্তু আমার ভুলে তিনি ফিরে গেছেন।

মিনু সভয় শুষ্ককণ্ঠে বলিল—তুমি কি কিছু বলেছিলে?

—না, এমন কিছু নয়—ঠাট্টা করতে গিয়ে কি যে হ'য়ে গেল দিদি, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

—এতেই তিনি চলে গেলেন ?

—হ্যাঁ।

মিনু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ম্লান হাসিয়া বলিল—তাতে কি হ'ল ? তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—কিন্তু আমাকে যেতে হ'বে বঙ্কু, বাবাকে ব'লে আমাকে নিয়ে কল্‌কাতা যাবে তুমি।

এত সহজে ব্যাপারটির মীমাংসা হইবে, বঙ্কু আশা করে নাই। তাই উল্লসিত হইয়া বলিল—বেশ হবে দিদি, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।

মিনুরা যখন কলিকাতা পৌঁছিল, তখন রাত্রি হইয়াছে। বিশ্বনাথ তাহার অনেক পূর্ব্বেই কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিয়াছে; উদ্বেগে আর উত্তেজনায় তাহার শরীর-মন সুস্থ ছিল না। হঠাৎ বঙ্কুর উচ্চ কণ্ঠস্বর, গাড়োয়ানের বক্‌শিষ প্রার্থনা, ট্রাঙ্ক বিছানাপত্র নামানোর ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দে সে উঠিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে হাসিমুখে বঙ্কু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—সমস্ত অভিমানের জটিলতা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া বিশ্বনাথ বঙ্কুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল—কিছু মনে করো নি ত ভাই !

চোখ মুখ হাসিতে উচ্ছল—মিনু বুলুকে কোলে লইয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। অপ্রতিভ বঙ্কু শুধু বলিল—না, মনে আর করব কি ? তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,—কিন্তু আমি যদি আপনারই মত একটুও এখানে না বসে রাগ ক'রে চলে যাই তা হ'লে ?

বিশ্বনাথ উচ্চ হাসিয়া বলিল—কেন, তা যাবে ?—বলিয়া একরকম জোর করিয়া বঙ্কুকে ধরিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

বঙ্কু কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া ফিরিয়া গেল। বিশ্বনাথ ও মিনুর আবার সেই প্রতিদিনের জীবন। জড়তার দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বিশ্বনাথের জীবন ক্রমেই সমস্যাবহুল হইয়া উঠিল। খাঁদুর এত উপদেশ সত্ত্বেও মিনুর মুখে কিন্তু কথা ফুটিল না। খরগোস যেমন আসন্ন বিপদের সম্মুখে চোখ বুঁজিয়া নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে, বিশ্বনাথেরও হইল তাহাই। মিনুকে আনিতে যাইবার সময় তাহার মনে যে সঙ্কল্পের আভাস দেখা গিয়াছিল, সে সঙ্কল্প দুই একবার চেষ্টার ব্যর্থতায় আর মাথা তুলিতে পারে নাই। যে প্রতিদিনের জীবন বিশ্বনাথের একান্ত পরিচিত, সে জীবন হইতে স্খলিত ভ্রষ্ট হইয়া বিশ্বনাথ আর নবজীবনের সৃষ্টি করিতে পারিল না। দিনের পর দিন শুধু তাহাদের পূর্ব্বপরিচিত দাহ, বিষণ্ণতা আর জড়তা লইয়া একের পর এক কালসাগরে জীর্ণপুষ্পের মত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অভাবের পাংশু পাণ্ডুর মূর্ত্তি ক্রমশঃ চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। নরনারীর প্রতিদিনের জীবনে আমরা যাহাকে প্রেম বিশ্বাস নিষ্ঠা বলিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করি, আমরা জানি না যে, দারুণ সঙ্কটের দিনে ঠিক ভূমিকম্পের মত এইগুলির ভিত্তি একেবারে উৎক্ষিপ্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তাই মিনুর সাবধানতার আর অন্ত ছিল না, অত্যন্ত গোপনে বৃদ্ধা ঝির হাত দিয়া দুই একখানি অলঙ্কার সরাইয়া সরাইয়া টাকা আনার ব্যবস্থা মিনু ক'রিয়াছিল—কিন্তু এ আর কতদিন ?

কোথায় যেন সুর কাটিয়া যাইতেছে—জীবনযাত্রার ছন্দে যেন কোথায় তালভঙ্গ হইতেছে।

সেদিন বিশ্বনাথ ভাবিল, আজ সে মিনুকে সংসারের সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিবে; টাকার পর টাকা সে কেবলি ধার করিয়া গিয়াছে, আজ যে তাহাকে কেহ টাকা ধার দিতে চাহে না,—এ কথা ত মিনুকে সে বলে নাই ! আজ বলিয়া কহিয়া যাহা হয়, একটা পরামর্শ স্থির করিয়া ফেলিতে হইবে।

মিনু ভাবিল আজ একবার সাহস করিয়া সে সংসারের ভিতরের কথা সমস্তই বিশ্বনাথকে বলিবে। আর সে কোনো সঙ্কোচ করিবে না—দৃঢ়তার যদি প্রয়োজন হয়, কেন সে প্রয়োজনকে সে অস্বীকার করিবে ?

রাত্রি গভীর হইল। কিন্তু দুইজনের একজনও কোনো কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে মিনু কখন ঘুমাইয়া

পড়িয়াছে, তাহা সে নিজেও জানে না। বিশ্বনাথ কিন্তু কথা বলিবার অবসর খুঁজিতেছিল। অবশেষে সে পাশ ফিরিয়া দেখিল মিনু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথা আর বলা হইল না; বহুদিন মিনুর ঘুমন্ত মুখের দিকে সে চাহিয়া দেখে নাই। ঘরে একটি আলো মিটিমিটি জ্বলিতেছিল। সেই আলোতে বিশ্বনাথের মনে হইল, মিনু অনেকখানি রোগা হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বনাথ বিছানায় থাকিতে পারিল না। উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারে বারে মিনুর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ মিনুর কণ্ঠের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু আন্দোলনে মিনুর গলার হারগাছি সামান্য আলোয় মাঝে মাঝে চিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া বিশ্বনাথের ভাবনা হঠাৎ অন্যদিকে ফিরিয়া গেল। মিনুকে সমস্ত কথা বলিয়া হারটি যদি সে চাহিয়া লয়, তাহা হইলে আপাততঃ দেনা হইতে একটু নিস্তার পাওয়া যাইবে। কিন্তু তারপর? তারপর আর কি? দিন কি চিরকাল এমনি যাইবে? একগাছি হার মিনুকে গড়াইয়া দিতে কতক্ষণ? সেই কথাই ভাল। কিন্তু মিনু যদি—আপত্তি করে! কখনও ত এমন ঘটনা হয় নাই—এ যে একেবারে নূতন! তার পর মিনু যদি ইহার মধ্যে আবার বাপের বাড়ি যায়—তাহা হইলে?

হারিকেনের আলো; হঠাৎ একবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গেল। রাত্রি যখন গভীর, কোথাও যখন কোনো শব্দ নাই—কোনো কর্ম্মের উপর লোকচক্ষু যখন জাগ্রত নাই, তখন হঠাৎ এলোমেলো চিন্তার মাঝখানে একটি প্রবলতর চিন্তা কোথা হইতে জাগিয়া উঠে, কে জানে! বিশ্বনাথের মনে হইল মিনুর হারটি সে পাইয়াছে—পাওনাদারের দেনা সব শোধ হইয়া গিয়াছে; তারপর একদিন ঠিক সেইরকম আর একগাছি হার লইয়া হাসিতে হাসিতে সে মিনুকে দিল। মিনু যেন অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে!

এমনি ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বনাথ সেই অন্ধকারে এক পা দুই পা করিয়া বিছানার দিকে আগাইয়া আসিল! অন্ধকার; কিছুই দেখা যায় না; বিশ্বনাথ বিছানায় বসিয়া হাতখানি অনুমানে মিনুর গলার দিকে বাড়াইয়া দিল। হাত ঠিক গলার দিকে গেল না। বিশ্বনাথের হাত মিনুর বাহু স্পর্শ করিল মাত্র। মিনু একবার উস্‌খুস্‌ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, বিশ্বনাথ ঠিক চোরের মত সসঙ্কোচে হাতখানি টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে বহুক্ষণ তাহার চোখে ঘুম আসিল না।

সকালে মিনু জাগিয়াই ভাবিল, তাইত কিছুই ত বলা হইল না। অত শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়ার জন্য নিজেকে সে ধিক্কার দিল। তারপর গৃহস্থালীর অজস্র কাজকর্ম্মের মাঝে ভাবিতে ভাবিতে সে একটি সঙ্কল্পে পৌঁছিল; এবার আর সে ঘুমাইয়া পড়িবে না কিংবা ভুলিয়া থাকিবে না। এ সঙ্কল্প সে কার্য্যে পরিণত করিবেই।

বিশ্বনাথ আজ আর মিনুর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই। কোনো প্রকারে আহারাদি করিয়া বাহিরে গিয়া বসিয়াছিল।

দ্বিপ্রহর বেলা। মিনুর কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। বুলুও মায়ের পিছনে পিছনে আসিয়া বাবার চেয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিনু একেবারে বিশ্বনাথের খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথের মনে তখন প্রবল আন্দোলন চলিতেছে—তাহার মনে হইতেছে বোধ হয় মিনু কাল রাত্রের সমস্ত ব্যাপার কোনো উপায়ে জানিয়া ফেলিয়াছে।

মিনু কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বিশ্বনাথ তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—কিছু মনে করো না মিনু, আমার মন ভাল ছিল না—

মিনু খুব ধীরে ধীরে বলিল—তোমার মন ত এখনও ভাল নেই; কিন্তু অত ভেবে কোনো লাভ নেই—বলিয়া ডান হাতের মুঠার মধ্যে যাহা ছিল, তাহা বিশ্বনাথের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—এই নাও,



জননী

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

এটি আমার শেষ—বলিতেই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

বিশ্বনাথ অত্যন্ত বিস্ময়ে হাতখানি খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মিনুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—এঁ্যা, এ কি ?

কিছুই নয়—মিনু তাহার গলার হারটি খুলিয়া বিশ্বনাথকে দিয়াছে। মিনু নিঃশব্দে নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল। বিশ্বনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইল—মিনুর অশ্রুভরা চোখ দুটি মুছাইয়া দিল। তারপর কম্পিত-হস্তে হারগাছি মিনুর গলায় পরাইয়া দিল। শুধু বলিল—ঢের হয়েছে মিনু, এবার আর নয়। বলিয়া নিমেষ মধ্যে চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া মিনুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ভয় ক'রো না লক্ষ্মীটি, স্ত্রীপুত্রের জন্যে যেখানে যে পথে সবাই যায়, আমিও সেই পথে চল্‌লাম !—বলিয়া দ্রুতপদে রৌদ্রদগ্ধ নগরের রাজপথে বাহির হইয়া গেল।

মাটির ঘর

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নিভৃত সানুর প্রতিধ্বনি
কাঁপে ক্ষীণ ঝরণার নীরে ;
হিমস্পর্শে মর্ম্মরিত লজ্জাবতী বন !
অঙ্গনাব সীমন্তের মণি,
শেষ-তারা হারাল শিশিরে—
ঘন দূর্ব্বাদলে চলে পতঙ্গ-গুঞ্জন !

*

অঘ্রাণের উন্মদ সুরভি,
শিহরিছে পীত-রৌদ্রকরে ;
হিরণ্যপাণির স্নেহ ধরেছে ধরণী !
সাগরের করুণ ভৈরবী,
ধ্বনিত পূরব নীলাম্বরে—
তৃণ-কুসুমেরা শোনে কা'র করধ্বনি ?

মধ্যদিনে, বেতসের বনে,
জেগে ওঠে, নিঃসহ যৌবন—
বকের পাখায় নামে ঘন নীল ছায়া !
সুদূর স্মৃতির সমীরণে,
কাঁপিছে পল্লব-বাতায়ন
দীর্ঘপক্ষ্ম আঁখিকোণে দীঘিজল-মায়া !

সোনালি রৌদ্রের ক্ষীণতারে,
সেতারের সোহিনী মূর্চ্ছিত ;
মাটির সে ঘর শোনে পূরবিয়া বেণু !
পশ্চিম-দিগন্ত—পরপারে,
মাধবীর শোণিমা অঙ্কিত,—
পাটল পল্লীর সন্ধ্যা ; ফিরে আসে ধেনু।

*

গোধূলি-গোখুর-রেণুজালে,
বিষণ্ণ যে দিবার নিশ্বাস—
ওঠে তারা,—ইন্দুপাণ্ডু কিশোরীর মত।
পরিম্লান, কোমল কপালে,
কৃষাণীর কৃষ্ণ কেশপাশ !
আত্মার অপার তৃপ্তি, প্রণামে আনত।

ছায়াচ্ছন্ন সে মাটির ঘরে,
কাঁপে ক্ষীণ প্রদীপের ধূম—
দুরন্ত শিশুর মত ফিরিছে সমীর ;
দূরাগত চকিত মর্ম্মরে,
নেমে আসে নিশীথ নিঝুম !—
সানুতে, নির্ঝরে, মাঠে ঘনাল তিমির

গীতা*

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

দ্বিতীয় অধ্যায়

২।১-৩ অর্জ্জুন যখন ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন, "তোমাতে এইরূপ তোমার অনুপযুক্ত মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠ—যুদ্ধ কর।" কোথা হইতে অর্জ্জুনের এই দৌর্ব্বল্য আসিল বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ যে তাহা বোঝেন নাই এমন নহে। তিনি অর্জ্জুনের দুঃখ দূর করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। সখা সখাকে যেভাবে উৎসাহিত করে শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তাহাই করিতেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার মোটেই অতিমানবের মত নহে। তিনি সাধারণভাবেই "buck up অর্জ্জুন" বলিতেছেন। এইরূপ পিঠ চাপড়াইবার ফলে কিছু উপকার হইল।

২।৪-৯ অর্জ্জুন বলিলেন—"আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আমার কি করা উচিত হইবে। হে কৃষ্ণ! তুমিই আমাকে উপদেশ দাও।" অর্জ্জুনের মন যুদ্ধে এখন আর তত অনিচ্ছুক বলিয়া মনে হইতেছে না। কিন্তু পরক্ষণেই অর্জ্জুনের আবার মনে আসিল যে শ্রীকৃষ্ণ যদি যুদ্ধ করিতে বলেন তবে যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও আমার এই ভয়ানক শোক কিসে যাইবে? আমি শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিব না, যুদ্ধ করিব না; এই বলিয়া পুনরায় তিনি (২-৯) যুদ্ধ করিব না বলিয়া চুপ করিলেন।

২।১০ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে শুধু উৎসাহ দিয়া ফল হইল না। উৎসাহে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অনেক সময় শ্লেষে কার্য্যোদ্ধার হয়। সাধারণ লোকের মতই শ্রীকৃষ্ণ এইবার শ্লেষের আশ্রয় লইলেন। আমার মতে এই শ্লেষোক্তি ২-৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত চলিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অন্যান্য সকল ব্যাখ্যাকারই মনে করেন যে ২।১১ শ্লোকেই এই শ্লেষ শেষ হইয়াছে ও পরের শ্লোকগুলি

* ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতা ও সঙ্গতি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ও পাঠের সুবিধার জন্য মূল শ্লোকগুলি ছোট অক্ষরে পাদটীকায় দেওয়া হইল। মাসিক পত্রে স্থানাভাব সেজন্য অন্বয় ও অনুবাদ পরিত্যক্ত হইল। যে-ক্ষেত্রে আমি প্রচলিত অর্থ মানি নাই কেবল সেই ক্ষেত্রেই মূল প্রবন্ধের ভিতরে অন্বয় ও অনুবাদ দিলাম। অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রভেদ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সঞ্জয় উবাচ—
তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ—
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩
অর্জ্জুন উবাচ—
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্॥ ৫
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ
তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬
কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপিচাধিপত্যম্॥ ৮
সঞ্জয় উবাচ—
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুডাকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতিগোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক বা serious উক্তি। আন্তরিক উক্তি হিসাবেই তাঁহারা এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্লেষোক্তির উদ্দেশ্য অপরকে নিজমতে আনয়ন করা, এজন্য সব সময়ে তাহা সত্য না হইতেও পারে। পরস্পর-বিরোধী কথা বলিয়াও যদি কাহাকেও নিজমতে আনা যায় তবে শ্লেষপ্রয়োগকারী তাহা বলিতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু যিনি কোন বিষয়ের সঠিক মর্ম্ম বিচারের দ্বারা বুঝাইতে চাহেন তিনি কখনই পরস্পর-বিরোধী বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। শ্লেষ-হিসাবেও সত্য কথা যে বলা হয় না তাহা নহে, তবে তাহার উদ্দেশ্য কার্য্যসিদ্ধি—সত্যপ্রচার নহে। কেন আমি ২।৩৮ শ্লোক পর্যান্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তিকে শ্লেষ বলিয়া ধরিতেছি শ্লোকগুলির অর্থ বিচারের পর তাহার আলোচনা করিব। অর্জ্জুনেরও যেমন যুদ্ধ না করিবার শোক ভিন্ন অন্যান্য কারণগুলি নিজের মনকে ঠকাইবার উপায় মাত্র, এই সব আপত্তির উত্তরও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক উক্তি না হইয়া শ্লেষোক্তি মাত্র। এই শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে অর্জ্জুনের ব্যক্তিগত, সামাজিক, ও অলৌকিক আপত্তিগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

২।১১ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি অবিজ্ঞোচিত কার্য্য করিতেছ অথচ বিজ্ঞের মত বড় বড় কথা বলিতেছ—বিজ্ঞেরা কাহারও মরা-বাঁচার জন্য কখনও কি শোক করেন?" তারপর শ্রীকৃষ্ণ যে-সব কথা বলিলেন তাহা বিজ্ঞজনেরা কি বলেন সেই হিসাবেই। অর্জ্জুনের কথা ও কার্য্যের অসামঞ্জস্য দেখাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য এ জন্য শ্লেষ-হিসাবেই এই সকল কথা বলা হইয়াছে।

২।১২-১৮ "যাঁহাদের মারিবার ভয় খাইতেছ তাঁহারা পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন, দেহ বা আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, বীর ব্যক্তি তাহাতে দুঃখ পায় না, দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি আত্মার নহে তাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্বিষয়ের সংযোগেই উৎপন্ন হয় এজন্য তাহার কোন স্থায়ী মূল্য নাই; তুমি কষ্ট হইলে তাহা সহ্য কর—যাঁহার সুখ দুঃখ সমান হইয়াছে তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। যাহা নাই তাহা চিরকালই নাই—যাহা আছে তাহা চিরকালই আছে; এমন হয় না যে কোন বস্তু আজ আছে কাল নাই। এই সমস্ত জগৎ যাহা দ্বারা ব্যাপ্ত আছে সেই আত্মা অবিনাশী অর্থাৎ চিরকাল আছে, কিন্তু এই দেহ বিনাশশীল অতএব তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। আত্মাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না অতএব তুমি যুদ্ধ কর।"

২।১৬ শ্লোকে তত্ত্বদর্শীরা এই সবের মর্ম্ম অবগত আছেন বলা হইয়াছে, ইহা হইতেও বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মত-ই বলিতেছেন। পরের ১৯-২০ শ্লোকও এইরূপ উদ্ধৃত মত। তর্কে কোন ব্যক্তিকে পরাস্ত করিয়া নিজের মতে আনিতে হইলে নিজে মানি বা না মানি আমরা সুবিধা-মত অপরের মত উদ্ধার করিয়া থাকি।

২।১৯-২০ এই দুই শ্লোক কঠোপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লীর ১৮ ও ১৯ শ্লোকের অনুরূপ। কঠোপনিষদে আছে।—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি--
> ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> নহন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ১৮-কঠ।২
> হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতেহতম্।
> উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।
> ১৯—কঠ।২

শ্রীভগবানুবাচ—

> অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
> গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১
> ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ
> ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২
> দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনংজরা।
> তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩
> মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
> আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥
> যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
> সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫
> নাসতো বিদ্যতেভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
> উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬
> অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
> বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭
> অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

গীতায় এই দুই শ্লোকে যে পারম্পর্য্য আছে, কঠোপনিষদে তাহার বিপরীত। "নজায়তে" শ্লোক কঠোপনিষদে প্রথম ও গীতায় দ্বিতীয়। গীতা ও কঠোপনিষদের শ্লোকগুলি ঠিক একরূপ নহে; কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে যে কঠোপনিষদ হইতেই এই দুই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কঠোপনিষদের কোন সংস্করণেই এই শ্লোক দুইটি ঠিক গীতার ভাষায় নাই। শ্লোকের গীতানুযায়ী পাঠ কঠোপনিষদের সময় প্রচলিত থাকিলে কোন-না-কোন সংস্করণে তাহা পাইবার সম্ভাবনা ছিল। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে পরের মত উদ্ধৃত করে, সে অপরের ভাষা ও ভাব বিশুদ্ধভাবে বলিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী হয় না। কঠের শ্লোকে 'বিপশ্চিৎ" কথা আছে ও সেই স্থানে গীতায় "কদাচিৎ" আছে। "বিপশ্চিৎ" মানে মেধাবী, জ্ঞানবান, অর্থাৎ জ্ঞানবান আত্মার জন্মমৃত্যু নাই। কঠে আছে যে এইরূপ আত্মা কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং ইহা হইতেও অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই। জ্ঞানবান আত্মা মায়া দ্বারা অভিভূত নহে। কাজেই তাহা পুনঃ পুনঃ শরীরে জন্মগ্রহণও করে না, মরেও না ও তাহা হইতে বহির্ব্বস্তুরূপ কিছু উৎপন্নও হয় না। শ্রীকৃষ্ণ শ্লোকটি বদ্‌লাইয়া বলিলেন—"কোন আত্মাই কখনও জন্মায় না, আর মরেও না। ইহাও নহে যে ইহা একবার হইয়া আর হইবে না।" (তিলক) শ্রীকৃষ্ণ নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই শ্লোকটি বদ্‌লাইয়া ছিলেন মনে হয়। অবশ্য আমি এমন কথা বলিতেছি না যে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে মিথ্যাকথা বলিয়াছেন।

২।২১-২৫ "আত্মা অবিনাশী, সে কাহাকেও মারে না বা তাহাকে মারা যায় না—সে জীর্ণ বস্ত্রের মত এক শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরীর ধারণ করে মাত্র—ইহাকে অস্ত্রাদির দ্বারা নষ্ট করা যায় না—ইহা নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য ও ইহার বিকার নাই—এই কারণে ইহার জন্য শোক অনুচিত।"

২।২৬-৩০ "আত্মাকে যদি তুমি অবিনাশী মনে না করিয়া তাহার জন্ম ও মৃত্যু আছে এইরূপ মনে কর তাহা হইলেও শোকের কারণ নাই; জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত অতএব এরূপ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারে শোক করিবার কিছুই নাই। জন্মিবার পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরে আত্মা যে-অবস্থায় থাক তাহা অব্যক্ত, অর্থাৎ তাহা কেহ জানে না—আত্মার সকল ব্যাপারই আশ্চর্য্য এবং কেহই ইহাকে অবগত নহে। এই অবধ্য আত্মার জন্য শোক করিও না।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রথমে বলিলেন আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই, পরে ২।২৬ শ্লোকে বলিলেন যদি-বা জন্ম মৃত্যু আছে মনে কর তত্রাপি শোক উচিত নহে। এই প্রকার তর্ক কেবল কাহাকেও নিজ মতে আনিবার জন্যই আমরা করিয়া থাকি। আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই ও আত্মার জন্ম মৃত্যু আছে,—এ দুই-ই সত্য হইতে পারে না। যিনি সত্যকথা বুঝাইতে চাহেন তিনি একই কথা বলিবেন যেদিক দিয়াই যাও আমি ঠিক বলিতেছি—এ কথা কার্য্যোদ্ধারের কথা। দুই পরস্পর-বিরোধী প্রতিজ্ঞা (proposition) মানিয়া লইয়া তর্ক করিতে যাওয়া সত্য নির্দ্ধারণের অনুকূল নহে।

ক্ষণবিধ্বংসী বস্তুর বিনাশে শোক স্বাভাবিক। এরূপ শোক উচিত নহে বলিলেই সে শোক কাহারও যায় না

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্। ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ। ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি। ২৫

শরীর স্বভাবতঃই নষ্ট হয় জানিয়াও শরীরের ধ্বংসে শোক যাইবার নহে। শ্রীকৃষ্ণ এখন পর্য্যন্ত এমন কোন উপায়ই দেখাইতে পারেন নাই যাহাতে এই শোক দূর হয়। তিনি যেন-তেন-প্রকারে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এতক্ষণ অর্জ্জুনের বড় বড় কথার বড় বড় জবাব দিলেন মাত্র। চিরকাল হাত দিয়া খাদ্যগ্রহণে অভ্যস্ত থাকিয়া কেহ যদি হঠাৎ বলে "আমি আর হাতে করিয়া ভাত খাইব না, কারণ হাতে বেরিবেরির বীজাণু আছে" এবং তখন যদি তাহাকে বোঝান যায় যে "হাতে কখনও বেরিবেরির বীজাণু থাকে না, আর যদিই-বা থাকে মনে কর, পাকস্থলীর অম্লরসে তাহা যে নষ্ট হয় তাহা কি তুমি জান না," তবে এই জবাব শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের অনুরূপ হইবে।

২। ৩১-৩৮ এতক্ষণ অর্জ্জুনের ব্যক্তিগত শোকের আপত্তির জবাব দিয়া এইবার শ্রীকৃষ্ণ সামাজিক ও অলৌকিক (religious) আপত্তির উত্তর দিতেছেন। "তুমি যুদ্ধ করিলে কুলধর্ম্ম লোপ হইবে বলিয়া ভয় করিতেছ, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই স্বধর্ম্ম এবং তাহা না করিলেই তোমার পাপ হইবে—লোকে তোমাকে কাপুরুষ বলিবে—তোমার সামাজিক মানহানি হইবে; যুদ্ধে মরিলে তোমার স্বর্গলাভ ও জিতিলে রাজ্যলাভ, অতএব কোন দিকেই তোমার ক্ষতি নাই—তুমি সুখ দুঃখ, লাভ, অলাভ জয় পরাজয় সমান মনে করিয়া যুদ্ধ কর।"

২।৩১ শ্লোকে "স্বধর্ম্ম" কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩।৩৫ শ্লোকে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" কথার মানে লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক আছে। ১৮।৪৭ শ্লোকেও স্বধর্ম্ম কথা আছে। শেষোক্ত দুইটি শ্লোকে স্বধর্ম্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইলেও ২।৩১ শ্লোকের স্বধর্ম্মের 'সামাজিক কর্ত্তব্য'(social duty) অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ সমীচীন হয় না। অতএব আমি সর্ব্বস্থলেই স্বধর্ম্মের এই অর্থই করিব।

স্বজন-বধে পাপ হয়, এ কথার উত্তর না দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করাই ধর্ম্ম বলিলেন, কারণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য—তিনি তর্কে সুবিধামত নিজের দিকটাই দেখাইলেন। ২।৩৭ শ্লোকে বলিলেন, "মরিলে স্বর্গলাভ, জিতিলে রাজ্যলাভ, অতএব যুদ্ধ কর"—অর্জ্জুন ইহার উত্তর দিতে পারিতেন "জিতিলে আত্মীয়বধের পাপে নরকবাস ও মরিলে রাজ্যনাশ।" বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের তর্কের ফাঁকি জানিতেন না তাহা মনে করিবার কারণ নাই। তিনি কার্যসিদ্ধির জন্যই এইরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমি কেন ২।১১ হইতে ২।৩৮ শ্লোককে শ্লেষোক্তি বলিয়াছি এইবার তাহা পরিস্ফুট হইবে। ২।৩৯ শ্লোক হইতে শ্রীকৃষ্ণ আন্তরিক সত্য কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাই আমার মত। শ্লেষোক্তির প্রমাণগুলি পুনরায় উল্লেখ করিলাম :—

(১) ২।১০ অর্জ্জুন চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের হাস্য শ্লেষের পরিচায়ক হইতে পারে। অবশ্য ২।৩৮ শ্লোকের পর শ্রীকৃষ্ণ হাসি বন্ধ করিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই।

(২) ২।১১ "তুমি বিজ্ঞের মত কথা বলিতেছ" বলিয়া ঠাট্টার ছলে শ্রীকৃষ্ণ জবাব আরম্ভ করিলেন।

(৩) ২।১৮-১১ কঠোপনিষদের শ্লোক দুইটি পরিবর্ত্তিত করিয়া উদ্ধৃত করিলেন।

(৪) ২।৩৩ আত্মার জন্ম মৃত্যু হয় মানিয়া লইলেন।

(৫) ২।৩১-৩৩ আত্মীয়বধের পাপের কথা উল্লেখ না করিয়া যুদ্ধ না-করা পাপ বলিলেন।

(৬) ২।৩৭ ফাঁকির বোঝান বুঝাইলেন—মরিলে স্বর্গলাভ ও জিতিলে রাজ্যলাভ।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি। ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা। ২৮

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। ২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ৩০

(৭) শোক দূর করিবার কোন কার্য্যকর উপায় এখন পর্য্যন্ত দেখাইলেন না।

(৮) ২।৩৭ এই শ্লোকে স্বর্গলাভের লোভ দেখাইয়াছেন, কিন্তু ২।৪৩ শ্লোকে স্বর্গকামীদের নিন্দা করিয়াছেন।

(৯) ২।৩১ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম্ম একথা বলিলেন, কিন্তু যে ধর্ম্ম শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রুতিকে ২।৫৩ শ্লোকে নিন্দা করিলেন।

(১০) শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তগুলিকে যথার্থ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের কথা বলিয়া মানিলে পূর্ব্ববর্ণিত উপাখ্যানে শর্ব্বীলকের ব্যবহার ও তর্ক অনুমোদন করিতে হয়।

(১১) পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা দেখিলেও এই শ্লেষ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আমি যে ভাবে এই সব শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। সমস্ত শ্লোকগুলির সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আমার ব্যাখ্যার যাথার্থ উপলব্ধি হইবে।

২।৩৯ তিলক এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—'সাংখ্য অথাৎ সন্ন্যাস নিষ্ঠা অনুসারে তোমাকে বুঝাইলাম এখন যে বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধন ছাড়িবে সেই কর্ম্মযোগের কথা তোমাকে বলিব।'

আমার মতে ভাবার্থ এরূপ হইবে।

"এতক্ষণ তোমাকে বড় বড় জ্ঞানীদের বড় বড় বুদ্ধির কথা বা সিদ্ধান্ত বলিলাম—এসব কথা ছাড়িয়া দাও—কর্ম্মযোগ বিষয়ে বুদ্ধি বা সিদ্ধান্ত বুঝিবার চেষ্টা কর—এই বুদ্ধিদ্বারাই তুমি কর্মবন্ধ এবং তদনুষঙ্গিক শোক, মোহ, পাপ পুণ্য ইত্যাদির উপরে উঠিবে।"

শ্লোকে "যোগে তু ইমাং শৃণু" আছে। এখানে "তু" নিরর্থক নহে ও কেবল পাদপূরণে ব্যবহৃত হয় নাই; "বড় বড় জ্ঞানের কথা বলিলাম কিন্তু এইবার কর্ম্মযোগ বিষয়ে বুঝিবার চেষ্টা কর" এইরূপ মানে করিলে "তু" কথার সার্থকতা বুঝা যায়।

এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী অনেক শ্লোকে "বুদ্ধি" কথা আছে। বুদ্ধি কথাটার সোজাসুজি 'বুদ্ধি' বা 'বিচারবুদ্ধি' মানেই করিয়াছি। তিলক এখানে "জ্ঞান" অর্থ করিয়াছেন ও পরে কোথাও 'বাসনা' ও কোথাও বুদ্ধির অর্থ বুদ্ধিই করিয়াছেন।

২।৪০ "আমি এখন তোমাকে যে ধর্ম্ম বা সাংসারিক জীবনযাত্রা বিধির কথা বলিব তাহার কালক্রমে ফলক্ষয় হেতু বারবার আরম্ভের আবশ্যকতা নাই বা অনুষ্ঠানের দোষে সমুদায় ফলহানির কিংবা পাপের সম্ভাবনা নাই। যাগ যজ্ঞাদির ফল ক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে পতন হয় ও অনুষ্ঠানের ত্রুটিতে যাগযজ্ঞাদি সম্পূর্ণ বিফল হয় কিন্তু এ ধর্ম্ম সেরূপ নহে। ইহার অল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে তুমি শোকতাপ ইত্যাদির মহৎ ভয় হইতে উদ্ধার পাইবে।"

পূর্ব্বের শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বেদপন্থীদের কথাও বলিয়াছেন, কাজেই ২।৩৯ শ্লোকে যে সাংখ্যবুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে বেদবাদও তাহারই অন্তর্গত হইল। অতএব এস্থলে সাংখ্য মানে আধুনিক সাংখ্যযোগ মাত্র না বুঝিয়া সাধারণ জ্ঞানীদের কথা বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে; নচেৎ স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানমার্গ বা সাংখ্যযোগকে ২।৪০ শ্লোকে কর্ম্মযোগের তুলনায় অনেক ছোট করা হইল। কিন্তু যদি ২।৩৯ শ্লোকের আমার ব্যাখ্যা মানা হয়, অর্থাৎ "বড় বড় জ্ঞানের

স্বধর্ম্মপপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য নবিদ্যতে ॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বার মপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি। ৩৩
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম ॥ ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসিস্বর্গং জিত্বাবা ভোক্ষসেমহীম
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাসস্তি ॥ ৩৯

কথা ছাড়িয়া দাও" এই অর্থ ধরা হয়, তবে কোন গোলই থাকে না! পরের শ্লোকগুলিতেও এই কথা প্রমাণিত হইবে।

২।৪১ "অব্যবসায়ীদের অর্থাৎ আনাড়ীদের বুদ্ধি নানা দিকে ধাবিত হয়। আসল কাজ তাহাদের দ্বারা সাধিত হয় না। কিন্তু ব্যবসায়ী বুদ্ধি মানুষকে একই অভীষ্ট পথে লইয়া যায়।"

অর্জ্জুন শোক দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি চান। তিনি বেদবাদীদের কথামত চলিলে তাঁহার অভীষ্ট লাভ হইবে না। কিসে নানাপ্রকার ভোগ ঐশ্বর্য্য লাভ হয় বেদমার্গীরা তাহারই নানা পন্থা দেখাইতে পারেন, কিন্তু আসল কথা শোক দূর করার উপায় তাঁহারা জানেন না, অতএব এ বিষয়ে তাঁহারা অব্যবসায়ী।

তিলক 'এক' মানে একাগ্র করিয়াছেন ও শ্লোকের অর্থ ভিন্ন প্রকারের করিয়াছেন। "হে কুরুনন্দন! এই মার্গে ব্যবসায়বুদ্ধি অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নির্ণায়ক (ইন্দ্রিয়-রূপী) বুদ্ধি এক অর্থাৎ একাগ্র রাখিতে হয়; কারণ যাঁহার বুদ্ধি (এই প্রকার এক) স্থির না হয়, তাঁহার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনা সকল নানা শাখাতে যুক্ত ও অনন্ত (প্রকারের) হয়।"

পরের শ্লোকে ভোগৈশ্বর্য্য ও স্বর্গকামীদের নিন্দা আছে। এই নিন্দার উদ্দেশ্য আমি যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা ব্যতীত সন্তোষজনকরূপে উপলব্ধি হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে "তুমি আত্মীয়স্বজনবধে পাপভোগ ও নরকবাসের কথা বলিয়াছিলে ও আমি তোমাকে ধর্ম্মযুদ্ধে স্বর্গলাভের কথা বলিয়াছি। বেদে বা শ্রুতিতে কিসে স্বর্গলাভ ও কিসে নরকবাস হয় ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বেদনির্দ্দিষ্ট স্বর্গলাভেও তোমার শোক-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে না, অতএব যাহারা বেদের কথা বলিয়া তোমার মনকে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত করিতেছে তাহাদের কথা শুনিও না। আমি তোমাকে এমন এক মার্গ নির্দ্দেশ করিব যাহাতে তোমার অভীষ্টফল লাভ হইবে।"

উপরিউক্ত অর্থ মনে রাখিলে বুঝা যাইবে কেন শ্রীকৃষ্ণ বেদবাদীদের অব্যবসায়ী ও বহুশাখা বুদ্ধিযুক্ত বলিয়াছেন। নচেৎ হঠাৎ বেদনিন্দার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

২। ৪২-৪৪ বেদবাদীদের বাক্যে মোহিত হইয়া যাহারা নানাপ্রকার সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি ধাবিত হয় সমাধিসাধনে তাহাদের ব্যবসাবুদ্ধিলাভ হয় না। অর্থাৎ তাহারা এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না।

গীতাতেই যে কেবল বেদ-নিন্দা আছে তাহা নহে। এই শ্লোকগুলির অনুরূপ শ্লোক মুণ্ডক উপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম॥
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়ন্তি॥ ১।২।৭

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ১।২।৮

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে
মং লোকং হীনতরং বাবিশন্তি॥ ১।২।১০

অর্থাৎ "এই অষ্টাদশাঙ্গ অর্থাৎ ষোড়শ পুরোহিত যজমান ও তৎপত্নী এই অষ্টদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ, যাহাতে শাস্ত্র কর্ত্তৃক অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়, যে সকল মূর্খ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয় মনে করিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ৭

যাহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা জরা রোগাদি অনর্থ সমূহ দ্বারা অতিশয় পীড়্যমান হইয়া অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করে। ৮

অজ্ঞানী লোকেরা ইষ্ট অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্ম ও পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপীকূপ খননাদি কর্ম্মকে প্রধান মনে করে এবং অন্য শ্রেয়ঃ জানে না। (নান্যদস্তীতি বাদিনঃ—গীতা) তাহারা নিজ

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১

পুণ্যকর্ম্মলব্ধ স্বর্গের উপরিস্থানে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া পুনরায় এই লোক কিংবা ইহা অপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে।" ১০ (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ)

২। ৪৫-৪৬ "বেদ ত্রিগুণ বিষয়ক এবং যতক্ষণ ত্রিগুণ আছে ততক্ষণ শোক তাপের হাত হইতে উদ্ধার নাই। অতএব তুমি বেদের কথা ছাড়িয়া দিয়া ত্রিগুণাতীত হও। ত্রিগুণাতীত হইলে তুমি নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও শীতোষ্ণাদিরূপ যে দ্বন্দ্ব, নির্যোগক্ষম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্তি ইচ্ছারূপ যে যোগ ও প্রাপ্ত বস্তর রক্ষাকরণরূপ যে ক্ষেম তাহার অতীত হইবে ও নিত্যসত্ত্বস্থ ও আত্মজ্ঞানবান হইবে।"

"বেদের শিক্ষা ছাড়িয়া দিলেও তোমার কোনই ভাবনা নাই। সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে কূপের যেমন আবশ্যকতা থাকে না সেইরূপ আমার উপদেশ-মত চলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে বেদের আবশ্যকতা থাকিবে না।" এই অর্থ বঙ্কিমকৃত অন্বয়ের অনুরূপ। ত্রিগুণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। গীতায় ৮।২৮ শ্লোকেও এই ভাবের কথা আছে—

> বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
> দানেষু যৎ পুণ্য ফলং প্রদিষ্টম্।
> অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা
> যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্। ৮।২৮

অর্থাৎ বেদে যজ্ঞে তপস্যায় ও দানে যে পুণ্যফল দেখান হইয়াছে ইহা জানিলে যোগী সে-সমুদয় অতিক্রম করিয়া আদ্য পরম স্থান লাভ করেন।

২।৪৭ "তোমার কর্ম্মের অধিকার,ফলের নাই" হঠাৎ এ কথা কেন বলিলেন এবং ইহার কথার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সঙ্গতিই বা কি? হিতলাল মিশ্র বলেন—"যদি এমত বল তবে সমস্ত কর্ম্মের ফল সকল পরমেশ্বর আরাধনার দ্বারা সিদ্ধ হইবেক, এই বিবেচনায় ভগবদারাধনাতে প্রবৃত্ত হই, অন্য কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা করিয়া তাহা নিবারণপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন।" তিলক বলেন "এক্ষণে জ্ঞানী ব্যক্তির যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় কেহ কেহ এই যে অনুমান করেন যে, এই সকল কর্ম্ম জ্ঞানী ব্যক্তি করিবেন না, সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন, এই কথা গীতার সম্মত নহে।"

আমার মতে শ্লোকের অর্থ অন্যরূপ হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "হে অর্জ্জুন! তুমি বেদবিহিত ভোগৈশ্বর্য্য-ফলপ্রদ কর্ম্মের আচরণ করিও না। ত্রিগুণ বিষয়ক বেদের উপরে উঠ। ব্রহ্মজ্ঞানীর বেদে আবশ্যকতা নাই।" এই শ্লোকে সেই কথাই অন্যপ্রকারে বুদ্ধিদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"দেখ ফলাফল অনিশ্চিত, তাহা মনুষ্যের অধিকারে বা আয়ত্তে নহে; বেদ বিহিত কর্ম্মেরও ফলাফলের নিশ্চয়তা নাই। ফল আশা করিয়া যে কর্ম্ম করে কোনও কারণে সেই ঈপ্সিত ফললাভ না হইলে তাহাকে দুঃখ পাইতে হয়। অতএব তুমি ফলের আশা রাখিয়া কোন কাজ করিও না। এমনও মনে করিও না যে ফলের আশা যদি নাই রহিল তবে কাজ করিয়া লাভ কি; কাজের সমস্ত আগ্রহ পরিত্যাগ করাই ভাল।" "সঙ্গ" মানে আমি 'জোড়,' 'আসক্তি' 'আগ্রহ' বা interest ধরিয়াছি। ২।৬২ শ্লোকেও 'সঙ্গ' কথা আছে। সেখানেও এই মানেই করিব। ব্যাখ্যায় আমি শ্লোকের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য শ্লোকে যাহা নাই এমন কথাও বলিলাম। "কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই" এখানে অধিকার মানে শাস্ত্রীয় অধিকার বা ধর্ম্মের অধিকার বা moral right নহে। কর্ম্মফলে অধিকার নাই মানে তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। কর্ম্মফল কর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। ১৮।১৪ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিতেছেন যে কর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠান পাঁচটী কারণের উপর নির্ভর করে যথা (১) অধিষ্ঠান বা যে দ্রব্য লইয়া কর্ম্ম (object (২) কর্ত্তা (subject) (৩) করণ বা সাধন দ্রব্য

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। ৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি। ৪৩

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াঽপহৃত চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। ৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগ ক্ষেম আত্মবান্। ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ। ৪৬

(instrument) (৪) শক্তি বা সাধন দ্রব্য উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা (capacity) এবং দৈব (unknown factor)। এই কারণ বা factorগুলির মধ্যে দৈব একেবারেই অধিকারের বাহিরে। এই শ্লোকের বিশদ আলোচনা যথাস্থানে করিব।

২।৪৮ "ফললাভের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর।" এখানে যোগস্থ কথায় 'ধ্যানস্থ' বা রাজযোগ বা হঠযোগ প্রভৃতি উদ্দিষ্ট হয় নাই। যোগের সাধারণ প্রচলিত অর্থ এখানে ধরিলে চলিবে না। পাছে এইরূপ ভুল হয় সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে এবং ২।৫০ শ্লোকে 'যোগ' শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়কে সমান মনে করিয়া কাজ করার নাম যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা।

২।৪৯ আমার মতে এই শ্লোকের অন্বয় এইরূপ হইবে—"হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগাৎ (দূর শব্দযোগে পঞ্চমী) দূরেণ কর্ম্ম অবরং হি, (তস্মাৎ) বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ। ফলহেতবঃ কৃপণাঃ। অর্থাৎ হে ধনঞ্জয় বুদ্ধিযোগ হইতে দূরে থাকিলে বা বিচ্ছিন্ন হইলে কর্ম্ম নিকৃষ্ট হয়। অতএব বুদ্ধির শরণ লও। ফল- লাভের আশায় যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা দীন।"

সাধারণ প্রচলিত অর্থ অন্যরূপ। "কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধির সাম্যযোগ শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি। আমার ব্যাখ্যায় বুদ্ধি কথাটার সোজাসুজি মানে ধরিলেই যথেষ্ট।

২।৫০-৫১ "যে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ফলাফলে সমজ্ঞান রাখিয়া কর্ম্ম করে সে পাপ পুণ্যের উর্দ্ধে উঠে। অতএব যোগযুক্ত হও। যোগ আর কিছুই নহে, উপযুক্তভাবে কর্ম্ম করিবার কৌশল মাত্র। কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত বুদ্ধিলাভ হইলে মনীষিরা ফলত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হন।"

২।৫২ "তোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ কালুষ্য হইতে মুক্ত হইবে তখন তুমি যাহা কিছু শুনিয়াছ বা যাহা কিছু শুনিবে সকল বিষয়েই নির্ব্বেদ অর্থাৎ সুখ-দুঃখ বোধহীন হইবে। "মোহ" শব্দের অর্থ বিষয়ে অন্যায় আসক্তি ধরিলে অর্থ সুগম হইবে। "কলিল" কথার অরণ্য অর্থ না করিয়া শঙ্করানুযায়ী "কালুষ্য" করিয়াছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে "কলিল" কথা আছে। এস্থলে "কলিলের" সঙ্গত অর্থ "অবিদ্যা" বলিয়া মনে হয়। যথা—

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।

অনাদি অনন্ত অবিদ্যা মাঝে
বিশ্বের স্রষ্টা বহুরূপে রাজে
বিশ্বের এক পরিবেষ্টিতারে,
জানিলে সর্ব্ব পাশ বিদারে।

২।৫৩ "শ্রুতির অমুক কর্ম্মের অমুক ফল, অমুকে পাপ অমুকে পুণ্য, এই সকল কথায় তোমার বুদ্ধি বিকল হইয়াছে ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। শ্রুতি অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টা না করিয়া বুদ্ধিকে স্থির ও নিশ্চল কর। এইরূপ স্থিরবুদ্ধি হইলে তোমার যোগ-প্রাপ্তি ঘটিবে।"

বেদের নিন্দা করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের বক্তব্য শেষ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বেদের উপর এই আক্রোশ কেন? পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকেও এই আক্রোশ দেখা গিয়াছে। ইহার উত্তরে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই বলেন

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩

যে সমগ্র শ্রুতিকে নিন্দা করা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে। যে-সকল শ্রুতিবচনে স্বর্গ ফলাদির উল্লেখ আছে কেবল সেই সকলেই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রযোজ্য। আমার মতে শ্রীকৃষ্ণের বেদ নিন্দার উদ্দেশ্য এই যে বেদকে জীবন-যাত্রার প্রদর্শক করিও না। বুদ্ধিকে জীবনযাত্রার নিয়ামক কর। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিলেন তাহার সার মর্ম্ম দাঁড়াইতেছে এই যে বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের বশীভূত না হইয়া সহজ বুদ্ধিতে নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা কর। উপযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইলে তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্যের উপরে উঠিবে ও সংসারে সর্ব্বকষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলাভ করিবে। জীবনযাত্রা বিধির অলৌকিক ভিত্তি (religious code of life) না মানিয়া বুদ্ধির উপর (rational code of life) নির্ভর কর।

এই ব্যাখ্যা হয়ত অনেকের অনুমোদিত হইবে না, কিন্তু সমস্ত শ্লোকগুলির সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ বিচার্য্য। কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে 'সাংখ্যবুদ্ধি' বলিতেছিলেন তখন বার বার বলিতেছিলেন 'ন শোচিতুমর্হসি' কারণ অর্জ্জুনের দুঃখ দূর করাই উদ্দেশ্য। অতএব আশা করা যাইতে পারে যে যখন তিনি নিজের প্রিয় ও অনুমোদিত 'যোগবুদ্ধির' ব্যাখ্যা করিলেন তখন নিশ্চয়ই দুঃখ দূর করিবার উপায়ও দেখাইলেন। ২। ৫২ শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মার্গে কেবল যে আত্মীয় বধ ও যুদ্ধজনিত শোক তাপ দূর হইবে তাহা নহে কিন্তু তাবৎ সাংসারিক দুঃখেরই অবসান হইবে। কথাটা অত্যন্ত অদ্ভুত। এজন্যই অর্জ্জুনের মনে প্রশ্ন উঠিল স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকার ব্যক্তি। পরে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধ করিব না বলিয়া অর্জ্জুন যে সব আপত্তি করিয়াছিলেন যথা আত্মীয় বধে শোক ও পাপ, সমাজে ব্যভিচার, নরকবাস ইত্যাদি তাহাতে বোঝা যায় যে তিনি বেদবিহিত ও সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্দ্দিষ্ট লোকযাত্রা বিধির বশে চলিতেছিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন ভোগৈশ্বর্য্যের দিকেই বেদের ঝোঁক, তাহাতে তুমি বিভিন্ন সুখের পথে চালিত হইবে বটে কিন্তু তাহার দ্বারা সংসার যাত্রার নানাবিধ অবশ্যম্ভাবী শোক দুঃখ কি করিয়া দূর হইবে? এই উপায়ে তুমি যাহা চাও তাহা পাইবে না; আনাড়ীদের মত নানাদিকে বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইবে, আসল কাজ হইবে না। আমি যাহা বলিতেছি সেই মত লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে সর্ব্বপ্রকার শোক কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবে।

গীতার অন্যান্য অধ্যায়েও দেখা যাইবে যে উপরিউক্ত ব্যাখ্যাই সঙ্গত ব্যাখ্যা।





"যাত্রে"

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাত্রা সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।—

বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন (পৃ. ২৬৩):—

"১২৩৪ সালের (১৮২৭ খৃঃ) কাছাকাছি ভবানীপুরে 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল ছিল। এই যাত্রার দল করিতে বিপুল অর্থব্যয় হয়। রামবসু যাত্রার গান রচনা করিয়া দেন।"

এই 'নলদময়ন্তী' যাত্রার গানগুলি যে রাম বসুর রচিত তাহা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত "৺রাম বসু" প্রবন্ধ হইতেও জানিতে পারিতেছি। তাহাতে আছে:—

"কলিকাতার নিজ্ দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল করিয়াছিলেন. অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে, রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন। তাহার দুইটী গানের কিয়দংশ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

যথা।

"কেনেগো. সজনী আমার, উড়ু উড়.
করে মন্।
পিঞ্জরের পাখি যেমন, পলাবারি
আকিঞ্চন॥"

তথা।

"নল্ নল্ নল, বলিস্ কি, তা বল।
দাবানল, মনানল, প্রেমানল, কি অনল,
কি সেই, কুল-মজ্জানে কামানল্॥"

(সংবাদ প্রভাকর ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪। ১ আশ্বিন ১২৬১)

ভবানীপুরের এই যাত্রার দল কবে গঠিত হয়, তাহার সঠিক তারিখ পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করা যায়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার তারিখ দিয়াছেন "১২৩৪ সালের (১৮২৭ খৃঃ) কাছাকাছি।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারিখটি হইবে—"১২২৯ সাল (১৮২২ খৃঃ)।" ১৮২২ সালের ৪ মে (২৩ বৈশাখ ১২২৯) তারিখের 'সমাচার দর্পণ' নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রে পাইতেছি:—

"নূতন যাত্রা।—মহাভারতপ্রসিদ্ধ নলদময়ন্তীর উপাখ্যান যে আছে সে অতি সুশ্রাব্য ও মনোরম এবং নব রসসম্পূর্ণ প্রসঙ্গ অতএব শ্রীহর্ষপ্রভৃতি কবির স্বীয় স্বীয় শক্ত্যনুসারে তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করাতে মহা কবিত্বে খ্যাত ও মান্য হইয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতি ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই প্রসঙ্গের এক যাত্রা সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা আপনারদিগের মধ্য হইতে বিভবানুসারে কেহ পঁচিশ কেহ পঞ্চাশ কেহ শত টাকা ইত্যাদিক্রমে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাতে ঐ যাত্রা বহুকাল চলিতে পারে এমত সংস্থান হইয়াছে এবং সেই ধনদ্বারা যাত্রার ইতিকর্ত্তব্যতা বেশভূষা বস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।"

প্রবন্ধের অপর একস্থলে (পৃ. ২৬৪) বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের দলে 'নন্দবিদায়' যাত্রা হয়। এই 'নন্দবিদায়' যাত্রার একটী সংবাদ ৬ই বৈশাখ ১২৫৬ সালের ভাস্করে এইরূপ বাহির হয়:—নন্দবিদায় যাত্রা'—৩রা বৈশাখ শনিবার ১২৩৬ [?] সাল (১৮৪৯—এপ্রিল)—শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে নন্দবিদায় যাত্রা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাত্রার মূলে ছিলেন।"

কিন্তু 'নন্দবিদায়' যাত্রার প্রথম অভিনয় হয় ইহার পূর্ব্ব বৎসরে—১২৫৫ সালের চৈত্র মাসে। তাহার উল্লেখও 'সম্বাদ ভাস্করে' আছে; সম্ভবতঃ ইহা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নজরে পড়ে নাই। ১২৫৫ সালের ১৮ই চৈত্র (৩০ মার্চ্চ ১৮৪৯, শুক্রবার) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' নন্দবিদায় যাত্রার প্রথম দুই অভিনয় সম্বন্ধে "বাহির শিমলা নিবাসিনঃ" যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"...যোড়া সাঁকো নিবাসি শ্রীযুত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় নন্দ বিদায় নামক যে এক নূতন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে সুর ও গীত প্রস্তুত করেন তাহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসাধারণ গোচরার্থে আমি এই পত্র লিখিলাম...। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা মহানগরে যাত্রার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং যদ্যপিও তাহাতে অনেকে সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছে তথাচ পেসাদারিতা প্রযুক্ত ভদ্র বিদ্বান লোক তাহারদের মধ্যে না থাকাতে কোন সম্প্রদায় যথার্থ রূপে উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই. এবং বোধ করি শ্রীযুত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই বিবেচনাতেই সঙ্গীত বিদ্যায় গুণান্বিত কয়েক জন ভদ্র সন্তান লইয়া যাত্রা করিতে মানস করিয়াছিলেন. তাঁহার পক্ষে এ বিষয় সুকঠিন নহে, যেহেতুক তিনি যোড়া সাঁকোর হাফ আখ্ড়াই দলের প্রথমাবস্থাবধি সম্পাদকতা করিতেছেন, এবং কবী ও নিজেও সুরসিক, ধনাঢ্য, কবিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার প্রচুর বুৎপত্তি আছে, এবং ঐ পাড়ার তাবতে তাঁহার অতিশয় সম্মান করেন। জ্ঞাত হইলাম এক বৎসর হইল ঐ হাফ আখ্ড়াই দলের প্রধান লোক লইয়া এবং ৪।৫ হাজার টাকা-ব্যয়ে নন্দবিদায় যাত্রার সূত্র করেন এবং পূর্ব্বগত তৃতীয় শনিবার রাত্রে ঐ যাত্রার প্রথম বৈঠক হয়,...গত পূর্ব্ব শনিবারে যাত্রার দ্বিতীয় বৈঠকে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী বড় নহে. তন্নিমিত্ত অনেক দর্শকের সমাগমে অতিশয় জনতা হইয়াছিল...।

"সমস্ত রাত্রি এবং বেলা চারি দণ্ড পর্য্যন্ত যাত্রা হইয়াছিল, যাত্রা যে অতি উত্তম তাহার কোন সন্দেহ নাই,...। তাঁহারা যে গান করিলেন বোধ করি এপ্রকার গান সচরাচর শুনা যায় নাই তাঁহারদের হাফ আখ্ড়াইর সুরে পয়ার কাটান বড় চমৎকৃত হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বোপরি ছিদাম নাম্নী এক বালিকার গানে তাবৎকে মোহিত এবং চমৎকৃত করিয়াছে, ছিদামের বয়স ঊর্দ্ধ ১৩ বৎসর,...তাহার সুরের ন্যায় মিষ্ট সুর আমি আর কখন শ্রবণ করি নাই,...। অন্যান্য বালকেরা এবং আর একটী বালিকাও অতি উত্তম গান করিয়াছিল।"

এই 'নন্দবিদায়' যাত্রা উপলক্ষে বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটি কাজের কথা বলিতে ভুলিয়াছেন। নন্দবিদায় যাত্রা গতানুগতিক যাত্রা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। এই যাত্রায় স্ত্রীচরিত্র মেয়েরা অভিনয় করিত। প্রচলিত যাত্রায় তখন ভদ্রসমাজ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ২৮ জুন ১৮৪৮ (১৬ আষাঢ় ১২৫৫) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন :—

"এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের স্থায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদ প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না,…।"

এই কারণে তখন প্রচলিত যাত্রাও মার্জ্জিত রূপ ধারণ করিতেছিল। 'নন্দবিদায়' যাত্রার তৃতীয় অভিনয় সম্বন্ধে (ইহারই উল্লেখ বিদ্যাভূষণ মহাশয় করিয়াছেন) ১৭ এপ্রিল ১৮৪৯ (৬ বৈশাখ ১২৫৬, মঙ্গলবার) 'সম্বাদ ভাস্কর' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে :—

"নন্দবিদায় যাত্রা।—গত শনিবাসরীয় রজনীযোগে শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে নন্দবিদায় যাত্রা হইয়াছিল,… কলিকাতা নগরীয় এবং ইতস্তত নানা স্থানীয় প্রায় তাবৎ প্রধান লোক, ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,…একাদশ বর্ষীয়া এক বালিকা কুব্জা সাজিয়া যে প্রকার সুস্বরে গান করিল বোধ হয় এপ্রকার সুস্বর বহু কাল কর্ণ গোচর হয় নাই, হীরা নাম্নী প্রসিদ্ধা গায়িকা যাহাকে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর দুর্গোৎসব সময়ে সহস্র মুদ্রা বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন বোধ করি ইহার স্বরে তাহার স্বরকেও লজ্জিত করিতে পারে,…এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এযাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার, এবং শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাত্রার বিষয়ে গানশক্তি, কবিতাশক্তি, বাদনশক্তি, আদিরস, ভক্তিরস ইত্যাদি তাবৎ প্রকাশ করিয়াছেন।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধে কোনরূপ 'প্রমাণ-পঞ্জী' পাইলাম না। বিভিন্ন যাত্রার দলগুলির প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ করাও উচিত ছিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার কুটীর শিল্প ও পাট

আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে বাংলার "কুটীর শিল্প ও পাট" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন, "প্রায় প্রত্যেক পাটের চাষীই পাটের সূতা কাটিয়া থাকে। এক সময়ে বাংলা দেশে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পাটের সূতা প্রস্তুত হইত এবং গ্রামে গ্রামে তাঁতিরা এই সূক্ষ্ম সূতা হইতে বহুল পরিমাণে ছালা বুনিত। ক্রমে বহু পাটের কল স্থাপিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে পাট বয়ন শিল্পও লোপ পাইল। এখন বোধ হয় একমাত্র দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জিলাতেই এই শিল্প টিঁকিয়া আছে।" লাহিড়ী মহাশয়ের এই কয়টি পংক্তি সম্বন্ধে আমার এক বক্তব্য আছে।—বাংলা দেশের প্রত্যেক পাট চাষীই পাটের সূতা তখন কাটিত কি না জানি না। তবে এদেশে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় যে বিশেষ বিশেষ শিল্পের অধিকারী ছিল সে প্রথা আজও একেবারে লোপ পায় নাই। যেমন তাঁতি, নাথ বা যোগী সম্প্রদায়ের বস্ত্রবয়ন, সূত্রধর বা মেস্তরীদের কাঠের কাজ, কর্ম্মকার বা কামারদের লৌহশিল্প, কৈবর্ত্ত বা জেলেদের শনসূতা কাটা ও জালবুনা, নমশূদ্র, পাটনী-ডোম প্রভৃতির বেত বাঁশের কাজ, সেরূপ কপালী ও কাপ সম্প্রদায়ের পাটের সূতা কাটা ও ছালা চট্ ইত্যাদি বুনার কার্য্য ছিল। ত্রিপুরা জেলার কপালী সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও এই শিল্পটি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আজও অশীতিপর বৃদ্ধা পাটের সূতা কাটিতেছে ও চট্ বুনিতেছে। তাহাদের মুখে শুনিয়াছি পাট যে মুহূর্ত্তে এ দেশে জন্ম লইয়াছিল সেই সময় হইতেই তাহারা এই শিল্পের অধিকারী। আজও তাহারা অতীব গৌরবের সহিত পাটের সূতা কাটিতেছে ও বুনিতেছে। কাজেই লাহিড়ী মহাশয়ের একথা ঠিক হয় নাই যে একমাত্র রংপুর, দিনাজপুর, ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই এই শিল্প টিঁকিয়া আছে।

১৯২৯ সালের ১৯শে ও ২০শে জানুয়ারি তারিখে সমবায় সমিতির উদ্যোগে কুমিল্লা শহরে যে বিভাগীয় শিল্প সম্মিলনী (Divisional Industrial Conference) হইয়াছিল তখন আমার যতটুকু স্মরণ হয় শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ও সে কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাহা আমার স্মরণ নাই। সেই সভায় আমি ত্রিপুরা জেলার পক্ষ হইতে এ জেলার পাট-শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম। যদিও কেহ কেহ পাটের কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই সব টিঁকিবে না বলিয়া যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তথাপি কুটীর-শিল্প হিসাবে যে শিল্পটি এতাবৎ কাল সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া আছে তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে ইত্যাদি বলাতে আমার প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল, এবং তাহা "ভাণ্ডার" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কন্‌ফারেন্সের বিবরণ ও প্রস্তাবাবলী ভাণ্ডার পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার কথা ছিল, তৎপর কি হইয়াছিল জানি না। সেই সম্মিলনীর সঙ্গে একটি শিল্পপ্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাতে এই বিভাগের নানা স্থানের নানা শিল্পের সমাবেশ হইয়াছিল। কিন্তু হাতের বুনা পাটের ছালা, চট, ডেক্‌চেয়ারের উপযোগী ক্যানভাস্ ইত্যাদি পাটের জিনিষ (আমাদের অঞ্চলের কাপালী মেয়ের হাতে বুনা) আমরাই দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। হয়ত সুধীরবাবু এতদিনের কথা ভুলিয়া যাওয়াতেই তাঁহার প্রবন্ধে ত্রিপুরা জেলার কথা উল্লেখ করেন নাই।

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "বাংলা দেশের অন্তত দুইটি স্থানে পাটকে অবলম্বন করিয়া কুটীর-শিল্পের প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছে।" এ সম্বন্ধেও লাহিড়ী মহাশয়ের একটু অনুসন্ধানের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইল। তিনি রাজশাহী ও রংপুর জেলারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জানেন না যে, ত্রিপুরা জেলার "কুণ্ডা শিল্প বিদ্যালয়ে" তাঁহার ফর্দ্দানুযায়ী সব জিনিষ প্রায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদুপরি "jute cotton mixed" পাট তুলার সূতার সংমিশ্রণে বিছানা ঢাকনা (bed cover) ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। এ সম্বন্ধে বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "প্রবাসী"তে পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয় তাঁহার বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য পত্রিকায় এবং বিগত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের ফ্রি প্রেসের সংবাদে "অমৃতবাজার" প্রভৃতি পত্রিকায় উল্লেখ আছে।—ইতি

শ্রীসত্যভূষণ দত্ত

সম্পাদক, কুণ্ডা শিল্প বিদ্যালয়

কুণ্ডা—ত্রিপুরা

সৎমার সন্তান

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি—

বৃদ্ধ বয়সে পিতা তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করলেন এবং ক'রেই চক্ষু বুজলেন। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের রাবণের গুষ্টি—তাদের দেখা আগলাবার জন্যই ত! ভার কে নেয়? তাই বিয়ে করা। নইলে মরত সব আপোষে ঝগড়া ক'রে।

সেই অবধি ইনিই গিন্নি। রূপ গুণ এঁর খুব। খুঁৎ পাওয়া শক্ত। সতীনদের ছেলেপিলে নাতিপুতিদের খাওয়া-দাওয়া ভবিষ্যতের ভাবনা সব খুঁটিয়ে দেখেন। একটু কেবল বাপের বাড়ি ঘেঁষা।

মেজ-মারও রূপ গুণ খুব ছিল,তবে এমন 'চারচৌকস' ছিলেন না। ঢিলেঢালা সাদাসিদে অথচ রাগী মেজাজী ছিলেন, বাপের বাড়ির ওপর কোনো বাড়াবাড়ি ঝোঁক ছিল না। সতীনপো সতীনের ঘরকন্না নিয়েই থাকা কাজ,—না রাগ্‌লে তারা কষ্ট পায় না।

ছোটমার মুখে অমৃতমধুর কথা; রাণীর মত ভারিক্কে চাল; তবুও সকলের সঙ্গে কথা কওয়া, খোঁজ নেওয়া আছে। কিন্তু ভালমন্দ খবর থেকে জিনিষপত্র অবধি সব বাপের বাড়ি পাঠান; ফলে সৎমার ভাইরাই বাড়ির কর্ত্তা, সর্ব্বেসর্ব্বা।

সারাবছরের সমস্ত আয়টি থাকে ছোটমার হাতে; আর তাঁর ভাইরাই সব ব্যবস্থা ক'রে দেয়। কার কি লাগবে,—মেজ-মার ছেলেরই বা কি—আর বড়মার ছেলেরই বা কি? কখানি কাপড়—কোত্থেকে তা আসবে, ঘি তেল, ওষুধ-বিষুধ, নুন-চিনি সব—রুগীর পথ্যি অবধি। যত্নের উপমা হয় না, তুলনা নেই।

মাঝে মাঝে তারা বোনকে দুঃখ ক'রে বলে, 'দেখ্, ওরা যদি ওই গমের ভুষি না ছেঁকে রুটি খায়, আর যদি আকাঁড়া চালই খায়, তাহলে স্বাস্থ্য যা হয়—(সস্তাই কি কম হয়? সাড়ে তিন টাকায় এক মাসের খোরাক হয়)।'

সৎমা মুখ বেঁকিয়ে বলেন, 'আপনার হিত যে আপনি বোঝে না দাদা, তার তোমরা কি করবে,—যে ওঁদের ন্যাট।!'

ছোটমার ভাইরা জিনিষপত্র আনায় আর পাঠায় অনেক। সৌখীন জিনিষ, খেলনা, পুঁতির মালা, চিরুণী, আরসি, গো-হাড়ের বাঁট-দেওয়া ছুরি, রংকরা টিনের খেলনা—কত কি।

মেজ-মার ছেলেরা দোকান করে, সব বেচে। বড়র নাতিপুতিরা কি তেমনি 'আদেখ্‌লে'—যা দেখে, তা-ই দু-চক্ষু দিয়ে গ্রাস করে। একজন যদি কিন্‌লে ত রাবণের গুষ্টিতে সবাই কিনবে। ধার করেও কেনে, যার পয়সা কম। অনেক কাল মা মরেছে সুশিক্ষা কুশিক্ষা কিছুই পায় নি। পুঁতি, কাঁচকাটি, জামাকাপড়, খেলনা, পুতুল, কাঠকাঠরা, সুতী শাল দোশালা, সব সমান উৎসাহে কেনে।

সৎমা হাসেন, ভক্ত ছেলেদের বলেন, 'দেখছ—মামারা কত ভালবাসে। তবু বিশ্বাস করে না ওই ওরা (পূবে আর দক্ষিণ দিকে দেখিয়ে দেন)। গায়ে কি ওদের আঁচটি লাগতে দেয়? এই সব তৈরি করা—পাঠানো কি সোজা? ওই ওরা গোটাকতক চেংড়া আর গোটা-কতক ছোট মনের চাঁই! কিছু মানতে চায় না।'

ভিড়ের মধ্যে দুচার জন মাথা নীচু করে নেয়।

অন্য সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, 'জয় মাতাজীকী ভাইয়োঁ কী জয়।'

* *

প্রথম পক্ষের পৌত্রের অসুখ।

মা, একবার দেখ না খোকাকে!

সৎমা খুব ব্যস্ত হয়ে এলেন, সঙ্গে এল ছোট বোন, ভাইরা, সাতটা ঝি।

'আহা মরে যাইরে, এ যে কালাজ্বর!'

বড় ছেলের দল পাঙাশ ! 'সে কি জর মা ?'

এই পচা জলে নাওয়া, না-খাওয়া-দাওয়া (জিব কেটে) এই অনিয়মে খাওয়া-দাওয়া !—বৌমারা ত সুশিক্ষা পায় নি। আমার ভাইপো-বৌদের দেখ যদি—হ্যাঁ ! নিয়মকানুন সব জানে।

'সে কি মা ? তুমি যা দিচ্ছ তাই ত ওরা খায়। যা-তা পাবে কোথায় ? চিরকালই ত ওই সব খাচ্ছে। তবে এখন কেমন আর ভাল জিনিষ বেশী পাই না।'

ছোটমা ভাইদের দিকে চান, ভাবটা কিছু বল। কোলে খোকা শুয়ে, পাঙাশ হলদে মুখচোখ, পেটজোড়া পিলে, যকৃত, অগ্রমাস।

ভাই বল্‌লেন, 'মেজদা একটা পেটেণ্ট ওষুধ তৈরি করেছেন, দাম এগার টাকা। ওষুধ যাকে বলে। সব আছে—ঘুমের, হার্টের শান্ত থাকার, আবার হজমের, যা মনে করে খাওয়াবেন। আর একটা পেটেণ্ট ফুডও তিনি বের করছেন, সেটা সাড়ে তিন টাকা ক'রে। তাতে ঐ এ বি সি ডি ইত্যাদি যতগুলো ভিটামিন দরকার সব আছে, তাই আনিয়ে কিছু দিন খাওয়ান।'

প্রথম পক্ষের ছেলে বল্‌লেন, 'ভিটামিন' কি মশায় ? আর এ বি সি ডি-ই বা কি ?'

ছোটমার ভাই বললেন, 'ভিটামিন জানেন না ? খাবারের গিয়ে প্রাণ হ'ল সে !'

'খাবারের প্রাণ ! না প্রাণীর মাংস ? সে কি বস্তু বোঝা গেল না ; আপাততঃ খোকার প্রাণের দিকে চেয়ে মাথা গুলিয়ে গেছে।'

নিরামিষাশী বড় ভাই বললেন,'কিসের তৈরি মশাই ?'

'ঐ কাঁইয়ের মশাই। কি রকম যে সস্তা জিনিষ আর কি কঠিন আবিষ্কার সে আর কি বলব। এখন তার দর হয়েছে কত ! খাইয়ে বুঝবেন' ছোটমার ভাই বললেন।

বড়ছেলের দলরা বোকার মতন আবার বললে, 'কাঁই কি ?'

সৎমা বল্‌লেন, 'তোমরা বাবা, আছা মুখ্‌খু !'

'কাঁইবিচি জান না, এই বারমাস তেঁতুলের অম্বল খাও ? ফেলে দাও যে সব ! বলে 'যাকে রাখ সেই রাখে।' আমি সেবারে পাঠিয়েছিলাম, দাদার শালা সেই কি 'সেন' যেন নাম, সেটার রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই উপাদান দেখে বলেছেন তোমাদের শরীরে খুব খাটবে ওর গুণ।'

'কাঁইবিচি !' বড়ছেলের গুষ্টি চুপ করেই রইল।

সৎমার ছোটভাই উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'পনের দিনে এক পাউণ্ড ওজন বাড়বে যদি হজম করতে পারে। একটু পেটের দোষ হ'তে পারে প্রথমটা। সয়ে গেলে কিন্তু,—আপনি নিজে খেয়ে দেখুন না কি উপকারটা পান। বলবেন তখন। ওহে দাসু, এসো না দিই গে।'

এ বি সি ডি থেকে জেড্‌ অবধি ভিটামিনওয়ালা ছোটমার ভাইদের তৈরি ফুড্‌ এল, ওষুধ এল দামী দামী।

কিন্তু কাঁইবিচির হালুয়া খোকার সহ্য হ'ল না, খোকার অন্য উপসর্গ দেখা দিল। খোকা বিদায় নিল।

* *

বড়ছেলের মস্ত সংসার, সে খোকার পর আবার সব যারা আছে, কেউ-না-কেউ পড়েই থাকে। কেবলই কাঁদে খোকাদের মা-রা। কাতর হয়ে চুপ করে বসে থাকেন, সব কটা ভাইতে জটলা ক'রে মাথাগুঁজে দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, শাস্ত্রী, কাপড়ওয়ালা, জহরৎওয়ালা, দোকানদার, দাস সব্বাই !

মেজভাই রাগী মানুষ, সে একদিন ডেকে বললে, 'ছোট-মা, খাবার ব্যবস্থা একটু ভাল কর, নইলে এগুলোও মরবে।'

ছোট-মা গুম হয়ে গেলেন, তারপর বল্‌লেন, 'বলছ বটে মরবে, যেন আমিই দোষী। কিন্তু মেজদির আমলেও ত দেখেছি. কি সুখে ছিলে বাছা ? তখন ত কথা কইতে না।'

স্পষ্ট বক্তা মেজভাই বল্‌লে, 'পেট ভরে খেতে পেতুম, ছেলেগুলো শুকিয়ে মরত না। মেজ মার দোষ কেন থাকবে না, কিন্তু সব সে বাপের বাড়ি পাঠাত না। বউদের গয়না ছিল হীরে মুক্তোর—কত, টাকা ছিল সিন্দুকে, আর দিত কত লোককে।'

'তা' ত বলবেই বাবা। মেজদির সব ভুলে গেছ

দেখছি, সে সব অত্যাচার। গায়ে কাঁটা দেয় মনে করলে (শিহরিয়া) আর তুষ্ছ বটে—কিন্তু চাল বাড়িয়েছ কত বাবা? সৌখীন জিনিষে ঘর ভর্ত্তি, মোটর না হ'লে চলে না, আবার এরোপ্লেন চড়ছ। দাদারা সেখান থেকে একটি একটি করে সব পাঠান তবে তোমাদের চর্ষে! এখন কি না আমাকেই বলছ। তখন গরুর গাড়ী, ঘোড়ার ডাক ভুলে গেছ সবই!' ভৃত্যকে বললেন, 'দেখিস ঠিক্ করে বাঁধ, যেন নষ্ট না হয়। সে পার্শেল সেলাই করছিল। মেজছেলের কেবলই মনে হতে লাগল কি যেন উত্তর আছে। কিন্তু কি যে তাহার মনে আসে না, কেবলই মুখে আসে, পেটে খেতে না পেয়ে ছেলেগুলো মরে গেল।' রেগেই ছিল, বললে, 'কি পাঠাচ্ছ,—কাঁইবিচি?'

'না, রসে পাক করা ফল। ওদের কাঁইবিচি পেটে সইবে না, বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে!'

'ওতে কি হয়?' মেজছেলে জিজ্ঞাসা করলে।

'ওতে কাঁচা ফলের ভিটামিন অনেকটা পাওয়া যায়।'

'কাঁইয়ের হালুয়ার ভিটামিন অত নষ্ট হয়?'

'না, ওদের যে সহ্য হয় না। এই দেখ্, শালগম, এই স্যালাড, এই তোদের পটল ডুমুর। সব তাতেই ভিটামিন আছে কম বেশী; কাঁচাতে বেশী।' বিদুষী ছোট-মা সব জানেন, প্রত্যেকখানি বই পড়েন। প্রচুর অবসর,—বন্ধ্যা মানুষ। থালায় কোটা তরকারি ছিল, 'খাবি দু-খানা? তেল ঢেলে রেঁধে বৌমারা সব নষ্ট করে দেয়।' খানচারেক শালগম ছেলের হাতে দিলেন।

ছেলে রাগে গর্ গর্ করতে করতে চলে গেল, 'হনুমান পেয়েছে!'

সহ্য করার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সকল ঘরে জ্বর, কালাজ্বর, পিলে, লিভার অতিসার, ন্যাবা। আহারের ব্যবস্থা সেই, বরং আরও মোটামুটি। ঘরে কাপড়-চোপড় আর সৌখীন খেলনা কিন্তু অনেক।

'এ আর খাওয়া যায় না, সওয়াও যায় না। তুমি আমাদের হিসেব আর চাবি দাও আমরা ভাঁড়ার দেখি।' পূবদিকের ছেলেরা দক্ষিণ থেকে বাপ খুড়োদের ডেকে এনে দোরের কাছে হল্লা লাগাল।

সৎমা অগ্নিমূর্ত্তি। 'দেখ না হিসেব, আমার কি? নিজেরা সব মরণ-রোগে-ধরা শরীর! ক্ষ্যামতা নেই কিছু, ডাকাত পড়লে লুটে নেবে,—তাই লোকজন রেখে তোমাদের সামলাচ্ছি! কলির ভাল করতে নেই। খরচ কি কম হয় তাতে?'

'দাও, আমাদের হাতেই দাও। লোক আমাদের চাই না। আমরাই আমাদের আগলাব।' ছেলের দল ক্ষেপে উঠল।

সৎমা অকৃত্রিম রাগে কৃত্রিম অট্টহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলেন। 'অবাক! শোনো কথা! ওই শরীরে কি ক'রে পারবি? ওসব ছেলেমানুষী করে না। চল, দেখিগে ভাঁড়ার, ছোট ভাঁড়ারে কি আছে যে!'

লোহার সিন্দুকওয়ালা বড় ভাঁড়ারের চাবি পাওয়া গেল না—সৎমার দাদার কাছে।

ছোট ভাঁড়ারে শুক্‌নো নালতে শাকের গোড়া, আর তুলোর বস্তা।

'বাপু, আমাকে দোষো, দেখ না কি আছে?' সৎমা গম্ভীর মুখে বললেন, 'নিজেরাই পাঠিয়েছ সব।'

ছেলেরা ফিরে গেল। আপনার লোকজনকে ডেকে বললে, 'ধানের গমের ক্ষেতে যেতে।

৫

হঠাৎ একদিন কি হ'ল, বড় সতীনের রাগী মেজ নাতি এল। 'তা না-চাবী দেবে না-ই, নিজের ব্যবস্থা আমরা নিজেরা করব। শুধু তোমার ওই ভাইপোরা, খোকারা যেন মারামারি করতে না আসে। আর মারলেই আমি মারব। আজকে মেরেছে সয়ে গেছি।'

বড়ছেলে ছিলেন সঙ্গে, বললেন, 'আহা না না, রাগিস্ কেন? শুধু তুমি মা, মারতে বারণ করে দিও। আমরা কারুকে মারব না, শুধু দে—দেখব কি উপায় হয়।'

জ্যেঠার কথায় ছেলে রেগে আগুন হয়ে চুপ ক'রে রইল।

সৎমা গেলেন ক্ষেপে, 'খোকা? আমার ভাইপোরা? কক্ষনো মারেনি, আর মারলেও নিশ্চয় তোমরা ওর

কাছে দাঁড়িয়ে ভিড় করেছ! ও গরম সইতে পারে না, জানো তবু—'

'আমরা কেন ওর কাছে যাব?' ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে একজন বললে।

'মুখের ওপর চোপা!' সৎমা ভেতরে চলে গেলেন। যাবার সময় কি ব'লে গেলেন কাকে বোঝা গেল না। মেজমার ছেলেরা একেবারে "দীন" "দীন" ক'রে ছুটে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর? সে অনেক কাণ্ড। ওরা আবার জেঠতুতো খুড়তোত বোন ভাজ মানে না; একেবারে দুঃশাসনের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ!

সৎমার বড় ভাইরা ছুটে এলেন এদিক থেকে লাঠি-সোঁটা নিয়ে, ওদিক থেকে এলেন বড় সতীনের বড় বড় ছেলেরা। 'ব্যাপার কি? এ কি কাণ্ড?' মেজমার দু-একজন ছেলেও এলেন।

সৎমার ভাইয়ের লাঠির ঘায়ে বড় সতীনের ছোট ছোট দৌহিত্র পৌত্র কটি মারা পড়েছে,—মেজমার ছেলেরাও মেরে পালিয়ে গিয়েছিল।

বুড়ো বড়ছেলে কাতর হয়ে বললেন, 'আহা জোয়ান ছেলেরা কেন মারলে বল ত?'

'আমরা বুঝি? ওই তোমাদেরই লোকজন ভাই।'

সৎমার ভাইয়েরা বললেন—মেজমার ছেলেদের দিকে দেখিয়ে 'ছোট মাকে মান না, দেখ না কাটাকাটি করছ সত্যি কি না? আমরা না থাকলে তুমিও থাকতে না।'

বড়ছেলের দল ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'মামা, একটা হাতিয়ার আমাদের দাও না? ওদের পা ভেঙে দি, মাথায় মারব না।'

সৎমা উচ্চকিত হয়ে ছুটে এলেন, 'না, না, ও দাদা, এমন কাজও কোরো না, আপনারা কাটাকাটি ক'রে মরে যাবে। (জনান্তিকে) আর কোন্ দিন দেবে আমার কি তোমার মাথায় এক ঘা।'

তারপর বললেন, 'বাবা বোঝ না ত, দেখলে ত কি কাণ্ড। মাঝে থেকে ওরা মেরে গেল। বাছারে! ঘরে ঢোক্।'

বড়ছেলেরা বললে, 'মা, একবারটি একটকোনো হাতিয়ার যদি দাও? না হয় মরব।'

'ওমা সে কি কথা? আমার কি অসাধ দিলে ওদেরও কিন্তু দিতে হবে। আর তোমাদের সব গতি-বিরোধ, গায়েও সব ওদের জোর বেশী—ওই মেদির ছেলেদের মাঝে থেকে এই দুধের ছেলেরা তোমাদেরই বাছারা সব মারা পড়বে!' সৎমা বুঝিয়ে বললেন সতীনপোদের, 'আয়িত্বি' মমত্ব সৎমার নেই একথা যে বলে সে অধার্ম্মিক।

কিন্তু দেখ না, ওরা ত কোত্থেকে পেয়ে মেরে যায়। আমরা ত শুধু শুধু মারব না, শুধু ভয় দেখাব। নইলে আমাদের বাঁচবার উপায় কি? ছেলেরা অনুনয় ক'রে বললে।

সৎমা বললেন, 'এই সব কি যে ধরণ হয়েছে! ওরে ওসব জিনিষ নিয়ে খেলা করা কি যায়? আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, এ বুঝবে না? অস্ত্র হাতে দিলে ওরা যে তোদেরই খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল্‌বে! আমি আছি তাই পারে না। দাদাদের দোষ দাও, ওরা ছিল তাই—'

হতাশ হয়ে ছেলেরা ফিরে গেল।

* *

প্রবীণ বড়ছেলেরা মেজমার দু-একজন ছেলেকে নিয়ে মেজমার ছেলেদের কাছে গেলেন।

পশ্চিমে মুখ ক'রে তারা পূজো করছিল।

'ভাই-সাহেব, আমরা একমার সন্তান না-হই, ভাই ত! একদেশ একঘর একজায়গায় থাকবও; তা কেন এ রকম করা?'

'কারা একদেশের?' ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে' ভাই-সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেন তোমরা এদেশের নও, কোথাকার তবে?' আশ্চর্য্য হয়ে এঁরা প্রশ্ন করলেন।

অস্তমান সূর্য্যের মত রাঙা চোখ করে সুদূর পশ্চিমে তারা বাহু প্রসারিত করে দিলে।

আমাদের দেশ—৫০০০ বৎসর আগে

শ্রীশান্তা দেবী

আমাদের দেশে মোহেন-জো-দাড়োতে খৃঃ পূঃ ৩০০০ বছরের যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার কথা কেহ প্রায় জানিতই না। সিন্ধুনদের কাছে এইরূপ সভ্যতার একটি কীর্ত্তিভূমি আবিষ্কারের সম্ভাবনা ছিল। পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এইখানে একটি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কার সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ সমন্বিত মোহেন-জো-দাড়োর বনজঙ্গলাকীর্ণ ঢিপিগুলি খুঁড়িতে আরম্ভ করেন। যাহা পাইবার আশায় কাজ সুরু হয়, খুঁড়িতে খুঁড়িতে দেখা গেল তাহার চেয়ে বহু প্রাচীন অনেক জিনিষ বাহির হইয়া পড়িল। ভারতের ইতিহাস অকস্মাৎ নূতনরূপে দেখা দিল। ভারতের এই অপঠিত ইতিহাস মাটির অক্ষরে পড়িবার সখ অনেক দিন ছিল। ভারত-বর্ষের একেবারে সীমান্তে, বালুচীস্থান বলিলেই চলে এই দেশটিকে, তবু ইহা দেখিবার আশা ছাড়ি নাই। কালী-পূজার ছুটিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কলিকাতা হইতে দিল্লী, দিল্লী হইতে জয়পুর, জয়পুর হইতে যোধপুর, যোধপুর হইতে সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদ, সর্ব্বশেষে সেখান হইতে সিন্ধুনদের পরপারে সিন্ধুদেশের প্রান্তে ছোট্ট ডুকরী ষ্টেশনে ১৭৩৮ মাইল রেলপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া পৌঁছিলাম।

সিন্ধুনদ পার হইবার পর হইতেই মনে হয় ভারত-ভূমিকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মানচিত্রে যতই ভারত বলিয়া আঁকা থাকুক, এদেশের চেহারা দেখিয়া আর স্বদেশ বলিয়া চেনা যায় না। ডুকরীর কিছু আগে তীর্থ লকী (তীর্থ লক্ষ্মী?) ষ্টেশন হইতেই কেমন যেন সবই চোখে বিজাতীয় ঠেকিতে লাগিল। যোধপুর হায়দ্রাবাদ সবই অদেখা অজানা রাজ্য, তবু সেখানে সবই চেনা মনে হয়। এদিকে মানুষগুলি অনেকেই খুব লম্বা, ঘোরানো ঘোরানো একখান কাপড়ের বিশাল পায়জামা পরা, রং অধিকাংশের বেশ ঘন কৃষ্ণ, নাক খুব উঁচু কিন্তু ডগাটা অত্যন্ত চওড়া, বস্ত্র প্রায়ই কালো রঙের, ধরণধারণ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন নোংরা, উচ্ছিষ্টের বিচার পর্য্যন্ত নাই। ষ্টেশনে বালতি করিয়া খাবার জল দেওয়া হইতেছে, বালতির ভিতরেই জল খাইবার গেলাস ডোবানো। যে চায়, হাত ডুবাইয়া সেই গেলাসে জল খাইয়া আ-ধোয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র আবার পানীয় জলে ডুবাইয়া রাখিতেছে।

দেশটা বালির দেশও নয়, কাদার দেশও নয়, শুধু যেন মাটির দেশ। সাদাটে মাটির মস্ত মস্ত চাংড়া প্রকাণ্ড পাথরের মত চাপ বাঁধিয়া নানা জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে। শুধুই মাটি, পাথর দেখা যায় না, গাছের শিকড় ইত্যাদিও নাই; তবু ভাঙে না, গুঁড়া হয় না, বেশ দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে মাটির অথবা রোদে শুকানো কাঁচা ইটের বাড়ি; তাহার উপর মাটি, খড়-কুটা ও বোধ হয় গোবরের প্রলেপ এত পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যে দেখিলে পঙ্খের কাজ মনে হয়, যেন ডিমের খোলার মত পালিশ। অনেক জায়গায় পোড়া ইটের বাড়ির উপরও এবং ছাদে এই রকম প্রলেপ দেওয়া। কোথাও সব বাড়িটা মাটির, কিন্তু খিলান, দরজার দুই পাশ থাম ইত্যাদি পোড়া ইটের; সবই মাটির প্রলেপে ঢাকা। এই মাটির রাজ্য দেখিয়া বোঝা যায় এদেশ এক কালে নদীগর্ভে ছিল। ক্রমে নদী সরিয়া সরিয়া গিয়াছে, পিছনে পলিমাটি পড়িয়া আছে।

সিন্ধু পার হইয়া আসিবার ৭৮ মাইল পরে আবার রেল লাইন সিন্ধুর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। লাইন নদীগর্ভ হইতে অনেক উঁচুতে; এখান হইতে পূর্ব্বদিকের দৃশ্য নয়ন মন মুগ্ধ করে। মাটির পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া লাইন ক্রমেই উপরে উঠিয়াছে, কোথাও পথ কাটিয়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া লাইন চলিয়াছে। পূর্ব্বদিকে নীচে দিগন্তের কাছে যেন ভারতভূমি পড়িয়া আছে, সিন্ধুনদের পরপারে। স্বদেশের নিকটে থাকিয়াই এমন করিয়া দেশকে দূর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কখনও দেখি নাই। মন বিষাদে ভরিয়া আসে, সত্যই মনে হয় শ্যামলা জন্মভূমি আমাদের জননীরই মত প্রিয়। যেন মার স্নিগ্ধ কোল ছাড়িয়া কোন মরুপর্ব্বতে বর্ব্বর দেশে চলিয়া আসিয়াছি।

সিন্ধুর গা দিয়া একটি উপনদী বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোল হইতে সিন্ধুর দৌহিত্রীর মত আরও একটি ছোট্ট নদী ছুটিয়া চলিয়াছে। তিনটি নদী একই সঙ্গে চোখে পড়ে, যেন মানচিত্রে আঁকা। ছোট নদীর কাছে পলি-পড়া মাটির কোলে অতি দরিদ্র ছোট একটি গ্রাম; কাঠির বেড়া দেওয়া চালাঘর মাত্র সম্বল,

তারই ভিতর মানুষ গরু মহিষ, সকলের স্থান। স্ত্রী ও পুরুষের কাপড় প্রায় সকলেরই বর্ণ-ও-বৈচিত্র্যহীন কালো পাজামা।

পথে মানুষ অনেক রকম দেখা যায়:—বালুচ, পাঠান,



মৃৎনির্ম্মিত বৃষ

ব্রাহুই, আরব, কয়েকটা মিশ্রজাত, সিন্ধি, রাজপুত, একজন বাঙালীও দেখিলাম। পুরুষদের চার-পাঁচ রকম টুপি ও পাগড়ী। এখানকার বেশীর ভাগ পুরুষ কি ভীষণ লম্বা! ঘাড় অনেকখানি না ঘুরাইয়া মুখের দিকে চাওয়া যায় না। ডুকরীর খানিকটা আগে একজন পঞ্জাবী সার্ভে অফিসার আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার কাছে ডুকরীর সব খবর পাওয়া গেল। রাত ৯॥ টায় ট্রেন পৌঁছায়, মাত্র দুই মিনিট থামে। যথাসময়ে পৌঁছিয়া দেখি, ষ্টেশনে প্লাটফর্ম পর্য্যন্ত নাই। কোনো রকমে অর্দ্ধেক ঝুলিয়া অর্দ্ধেক লাফাইয়া নামিয়া পড়িতে হইল। পঞ্জাবী ভদ্রলোকটি এক-মানুষ উপর হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া দিলেন। তিনি দুই ষ্টেশন আগে হইতেই ডুকরীতে টেলিফোন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই সব জিনিষ নামাইয়া ফেলিবার পর অতি তৎপরভাবে একটা ওভারকোট-পরা লোক সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিল। ওয়েটিং-রুমে পাশাপাশি দুটি ঘর, সামান্য কেরোসিনের একটা মাত্র আলো, কিন্তু মানুষ অনেকগুলি। আমরা আলোটা সমেত ছোট ঘরটিতে আশ্রয় লইলাম। আর একদল সিন্ধি অন্ধকারে বড় ঘরটি দখল করিয়া রহিল। এখানে খাদ্য পানীয় কিছু মেলে না। কষা এক গেলাস জল মিলিল। সারা রাত্রি পিস্থর কামড়ে কাটাইয়া সকালে চায়ের চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করিয়া দুজনের জন্য এক কেট্‌লি চা ও একটিমাত্র হাতলহীন পেয়ালা জুটিল। চা খাইতে ত এখানে আসি নাই, মনে করিয়া একটা পেয়ালাতেই খুশী হইলাম।

এইবার আসল মোহেন-জো-দাড়ো যাত্রা। একটা খোলা টাঙ্গা জুটিল, অতি নোংরা তার গদি ইত্যাদি, তেমনি নোংরা তার আধা-বালুচ আধা-সিন্ধি গোছের চালক। মানুষটি বলিল, এখানকার লোকে পুরাতন শহরটিকে বলে মোহন-গা-দড়া (অর্থাৎ মোহনের স্তূপ)। ষ্টেশনের পর বাজার পার হইয়া মাইল দুই দূরে পোষ্ট অফিস হইতে টিকিট ইত্যাদি কিনিয়া থানা ইস্কুল ইত্যাদি পার হইয়া ধূলা উড়াইতে উড়াইতে চলিলাম। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় দিশী নিম, ঘোড়া নিম, তেঁতুল, খেজুর ও বাব্‌লা গাছ। কিছু দূরেই মস্ত একটা খাল কাটিয়া ক্ষেতের জন্য জল আনা হইয়াছে, ছোট ছোট অনেক খালও কাটা হইয়াছে এবং হইতেছে। এখানে ধান হয়, চালের কলও রহিয়াছে। তিন-চার মাইল পরে এই সব শেষ হইয়া সুরু হইল কেবল মনসা ও বাব্‌লা ঝোপ এবং বন, আকন্দ ঝোপেরও অভাব নাই। তিন মাইলের বেশী এই রকম বনজঙ্গল। মাইল-দেড়েক থাকিতে ঢিপি-খোঁড়া শহর ইত্যাদির চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল, সবসুদ্ধ ৮॥ মাইল রাস্তা। ক্রমে খড়পাতা রাস্তার উপর দিয়া টাঙ্গা ছুটাইয়া বাংলা ও তাঁবুর কাছে আসিয়া হাজির হইলাম। এখানে-সেখানে ৫০০০ বছর আগের ইট কুড়াইয়া চৌকিদার প্রভৃতির ঘর তৈয়ারী হইয়াছে। তাহারা নির্ব্বিবাদে অনধিকারচর্চ্চা করিতেছে, মালিক ত আর আসিবে না।

তাঁবুর কাছে শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সরকার ও কেদারনাথ পুরী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল, পরে আপিসে ম্যাকে সাহেবের সাক্ষাৎ মিলিল। পুরী ও সরকার মহাশয় আমাদের তন্ন তন্ন করিয়া এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার কীর্ত্তিভূমি দেখাইলেন।

তাঁবুর কাছের খনন-ক্ষেত্রে ঢিপির চূড়ায় একটি কাঁচা ইটের (রোদে শুকানো ইট) বৌদ্ধস্তূপ, ইহা প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কুষান সাম্রাজ্য কালের কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই এখানে কোনো ধর্ম্মপীঠ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। সেই পরিত্যক্ত পুরাতন পীঠস্থানের উপর তাহারই মালমশলা লইয়া বৌদ্ধরা স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, বোঝা যায়। গড়া জিনিষ হাতে পাইলে সকলেই তাহার প্রয়োজনমত "সদ্ব্যবহার" করিয়া লয়। স্তূপের উপর উঠিলে বহুদূরে একটানা বনজঙ্গলের পারে দিগন্তের কাছে একদিকে সিন্ধুনদ আর একদিকে সুলেমান পর্ব্বতশ্রেণী।

খনন-ক্ষেত্রের নীচের তলায় স্তূপের পশ্চিম দিকে ঘর-বাড়ির একেবারে মাঝখানে মস্ত বড় একটি চতুষ্কোণ কুণ্ড; মাপ ৩৯ ফুট × ২৩ ফুট, তাহার মাথার উপরটি খোলাই ছিল। কুণ্ডে নামিবার উঠিবার জন্য ইহার চারিপাশে চওড়া কিন্তু নীচু নীচু ধাপের ইট-বাঁধানো সিঁড়ি। কুণ্ডের গর্ভটিও ইট দিয়া বাঁধানো। সিঁড়ির পর চারিদিকে

উঁচু দালানের উপর ছোট ছোট স্নানের ঘর, কাপড় ছাড়িবার ঘর, ছোট চৌবাচ্চা ইত্যাদি। স্নানের ঘরে আজকাল যেমন জল ফেলিবার জায়গার পাশে নীচু আল দেওয়া থাকে, সেখানেও তেমনি। মেঝেগুলি একদিকে ঢালু এবং



তাম্রনির্ম্মিত নর্ত্তকী মূর্ত্তি



মোহেন-জো-দাড়োর একটি রাস্তা

এমন এক রকম মশলা দিয়া ইটে ইটে জুড়িয়া করা হইয়াছে যে সবসুদ্ধ জুড়িয়া যেন পাথর হইয়া গিয়াছে, কোথাও জল ঢুকিবার উপায় নাই। আজ পর্য্যন্ত কোনো ফাটল দেখা যায় না। স্নানের ঘর হইতে জল বাহিরে যাইবার ছোট নর্দ্দমা প্রতি ঘরে আছে। সেই ছোট খোলা নর্দ্দমা দিয়া জল বাহিরে গিয়া বড় নর্দ্দমায় পড়িবে। বড় নর্দ্দমাগুলি ইট দিয়া বাঁধানো কিন্তু পাথর দিয়া আগাগোড়া ঢাকা। আধুনিক বালীগঞ্জের মত কুদৃশ্য খোলা নর্দ্দমা নয়। অথচ সেদেশে পাথর হয় না। স্নানের ঘর প্রভৃতি যে সব জায়গায় জল বেশী পড়ে, সে সব জায়গার দেয়ালে স্যাঁতা ধরিয়া দেয়াল যেন নষ্ট হইয়া না যায়, সে দিকেও স্থপতিদের লক্ষ্য ছিল। দেয়ালে এক সারি ইটের পর আর্দ্রতা-নিবারক (damp-proof) একটা মশলা দিয়া তারপর কাঁচা ইট এক থাক দিয়া আবার ইট গাঁথা হইত। এই মশলার পুরু একটা স্তর অনেক দেয়াল হইতে খুলিয়া দেখিলাম।

বড় কুণ্ডটির মাথা রৌদ্র হাওয়া লাগিবার জন্য খোলাই থাকিত। কুণ্ডের বাড়তি জল বাহির হইয়া যাইবার সুন্দর পথ আছে। এখনও অবিকল ঠিক এই রকম কুণ্ড আমরা নানা তীর্থস্থানে দেখিতে পাই। কুণ্ডের জল বাহির হইয়া যে পথে চলিয়া যাইবে তাহার মাথায় মস্ত খিলান। দুই দিক দিয়া একটির পর একটি ইট ক্রমশঃ আগাইয়া এই খিলানটির সমস্ত মাথা ঢাকিয়া তৈয়ারী করা। আধুনিক প্রথা তখন জানা ছিল না, যদিও খিলানের প্রয়োজন-মত ইট কাটা ও জোড়া দেওয়া তারা জানিত। এই খিলান-পথের ভিতর দিয়া অনায়াসে

মানুষ হাঁটিয়া যাইতে পারে। আমরা তাহার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছি। এইরূপ বড় নর্দ্দমা আরও আছে।

খনন-ক্ষেত্রে দুটি পায়খানা ঠিক যথাযথভাবে বাহির হইয়াছে। এগুলি দেখিতে আধুনিক খাটা পায়খানার



পিলানযুক্ত নর্দ্দমা

মতই, বরং তাহার চেয়ে উন্নত প্রণালীর বলা যায়। সম্মুখে জল গড়াইয়া পড়িবার ঢালু জায়গা বাঁধানো। পিছনে বাহিরের দিকে মেথরের পরিষ্কার করিবার খোলা মুখ। তাহার পিছনে লম্বা গলি।

দেখিয়া মনে হয় স্নানাদি সব ব্যাপারে ছোট ছোট ঘর ছিল একতলায়। আর দোতলায় ছিল আর এক সারি একটু বড় বড় ঘর। সেগুলি বেশ মানুষ থাকিবার মত। আজকাল উত্তর কলিকাতায় ভাড়াটে বাড়ির শয়নগৃহের চেয়ে ঘরগুলি অনেক বড় এবং উঁচু। এই সব ঘরের দেওয়ালের দুই দিকে কড়ি বসাইবার মত গর্ত্তকাটা।

মাঝখানের উঁচু জমির এই ধর্ম্মপিঠটিকে ঘিরিয়া অর্দ্ধচক্রাকারে পুরাতন শহর। স্তূপের উপর হইতে সমস্তই চোখে পড়ে। শহরের বড় রাস্তা বেশ চওড়া, তাহার দুই পাশে সব সারি সারি বাড়ি পাশাপাশি, প্রায় গায়ে গায়ে কিন্তু প্রত্যেকটি পৃথক। এই রাজপথটি সেকেলে শহরের রাস্তার মত সরু কিংবা আঁকাবাঁকা নয়। চোখের আন্দাজে মনে হয় ১০০ ফুট চওড়া এবং বেশ সিধা।

বাড়িগুলি একেবারে রাস্তার উপর হইতেই সুরু হইয়াছে। রাস্তার উপরেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি তারপর কাশী, যোধপুর ইত্যাদি শহরের পুরানো বাড়ির মত উঁচু ভিতের উপর ঘর। সিঁড়িগুলিও যোধপুরের মত ছোট ছোট। লম্বাচওড়া দেখিতে না হইলেও উচ্চতার বেলায় বেশ আধুনিক রীতিসঙ্গত, উঠিতে একটুও কষ্ট হয় না। বড় রাস্তার দুই পাশ দিয়া খানিকটা সরু ধরণের গলি দুই দিকে পরে পরে সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। সেই সব গলির ধারে উঁচু দেওয়াল দেওয়া সারি সারি বাড়ি। গলিগুলিও আঁকাবাঁকা নয়। রাস্তা হইতে সমকোণভাবে বাহির হইয়া সোজা লাইনে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তা ঘরবাড়ি দেখিলে মনে হয় যেন ভাল করিয়া জ্যামিতি পড়িয়া মাপজোক করিয়া সব তৈয়ারি। রাস্তা সোজা, ঘর চৌকা, দেওয়াল ঠিক খাড়া, কোণগুলি সমকোণ, কোথাও ভুল কি গোঁজামিল নাই। গাঁথুনিও এত ভাল এবং ইট সাজাইবার ও মশলা দিবার কায়দা এমন ঝরঝরে যে এক লাইন গাঁথুনিও আজ পর্য্যন্ত সরু মোটা কি বাঁকাচোরা দেখায় না। শেষের দিকে গাঁথুনি তবু বাড়ি বসিয়া যাইবার সময় কিছু কিছু বাঁকিয়া এলোমেলো হইয়া গিয়াছে, গোড়াতে কিন্তু সব একেবারে নিখুঁত। মাঝে মাঝে দেওয়াল উপর দিকে দুই পাশ দিয়া ক্রমশঃ সামান্ত সরু হইয়া পিরামিডের মত উঠিয়াছে। সেই ক্রমশঃ সরু দেওয়ালের সমান্তরাল লাইনগুলিতে কোন ভুল নাই।

এই সব বাড়িগুলি ছোট ছোট, গলির ধারে মেয়েদের রান্নাঘর সব পাশাপাশি। এ-বাড়ি ও-বাড়ি বোধ হয় বেশ গল্প চলিত। রান্নাঘরের আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য গলির দিকে নর্দ্দমার মুখে কোথাও ছোট চৌবাচ্চা কাটা, কোথাও বড় জালা মাটিতে বসানো। এই প্রথা আজও অনেক জায়গায় দেখা যায়। রান্নাঘরের পিছনের জালার ভিতর নাকি হাড়, মাছের কাঁটা ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছিল।

শহরের প্রায় প্রত্যেক বাড়ির লাগাও এক একটি ছোট বাঁধানো কূয়া সদর রাস্তার দিকে। এই কূয়া হইতে



মোহেন-জো-দাড়োর একটি বাড়িতে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল

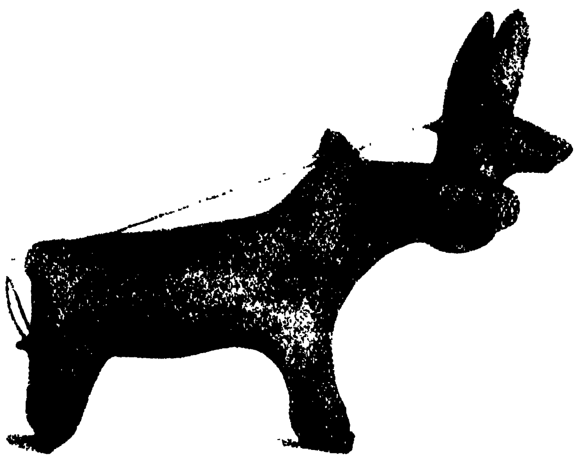
রাস্তার লোক এবং বাড়ির লোক সকলেই জল লইতে পারিত।

একটা পাড়ার ভিতর মাঝখানে মস্ত বড় গভীর ইঁদারা। ইঁদারার পরিধি খিলানের মত একদিক সরু ইঁট দিয়া বাঁধানো। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মত অনেক নীচে জল, ভিতর দিকে চাহিলে মাথা ঘোরে, বোধ হয় ৬০।৭০ ফুট গভীর হইবে। ইঁদারার চারিদিকে অনেকখানি জায়গা ইঁট দিয়া বাঁধানো। অনেকটা পথ হাঁটিবার পর এক জায়গায় দেখিলাম শহরের বেশ মাঝখানে অনেক ঘরবাড়ির মধ্যে একটি মস্ত দরবার গৃহের মত ঘর। চোখের আন্দাজে মনে হয় ৫০ ফুট × ৭০ ফুট হইতে পারে। এই হলঘরটির খুব কাছেই একটা অন্ধকূপের মত চারিদিকে দেওয়াল দেওয়া দরজা-জানালাহীন গভীর ঘর। বড় ঘরটি বিচারালয় বলিয়া আন্দাজ করা হয়, সুতরাং ছোটটিকে কয়েদীর ঘর মনে করাই সম্ভব। এই ঘরের কাছেই একটা বাড়িতে সতেরটি মনুষ্যকঙ্কাল বিভিন্ন ভঙ্গীতে পাওয়া গিয়াছিল। অন্য বাড়ির সিঁড়ি যেমন রাস্তার উপর হইতে গাঁথা বড় হলের সিঁড়ি তেমন নয়। ভিড় দেখিয়া মনে হয় সম্মুখে কয়েকটি দ্বারীদের ঘর গাঁথা, তারপর ভিতরে বিচারালয় একটু লুকানো।

সাধারণ ঘরের উচ্চতা প্রায় ১২,১৩,১৪ ফুট। আজ-কাল এতটা উচ্চতা খুব ভাল বাড়িতে ছাড়া হয় না। স্বাস্থ্যরক্ষার আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়ম যাহারা জানিত না, ৩০।৩৫ বৎসর আগে তাহারা সকলেই ইহার চেয়ে নীচু বাড়ি তৈয়ারী করিত। মোহেন-জো-দাড়োর ঘর মাপে মোটামুটি ১২ ফুট × ১৪ ফুট। কলিকাতার বাঙালী ভাড়াটে ঘর ১০ ফুট × ১০ ফুট সচরাচর হয়। একটা বাড়িতে দেখিলাম বড় একটা ঘরের মেঝেতে গামলার ধরণের গর্ত্ত করিয়া ইঁট দিয়া বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। গর্ত্তের কেন্দ্রগুলি সরু, পরিধির দিকে বেশ চওড়া। এইগুলি জালা বসাইবার জায়গা তাহা বোঝা যায়; কারণ মোহেন-জো-দাড়োর বিশাল জালাগুলি দাঁড়ায় বসাইবার মত নয়। প্রথমতঃ জালাগুলির আকার অতি বৃহৎ; দ্বিতীয়তঃ জালাগুলির নীচের দিক সব লাটিমের মত ছুঁচলো। সুতরাং এইরূপ ঘর কাটিয়া না বসাইলে খাড়া রাখা যায় না। এই ঘরটি কেহ বড় মানুষের ভাণ্ডার মনে করেন; কেহ বলেন জলছত্র। পাশের দিকে ছোট

একটা চৌবাচ্চার মত আছে। তাহা ভাণ্ডারীর ঘর অথবা জিনিষ কি জল সঞ্চয়ের স্থানও হইতে পারে। ঘর হইবার পক্ষে সেটি এত ছোট, যে, ভাণ্ডারীর ঘর বলিয়া আমার মনে হয় না, তাহাতে কোনো দরজার স্থানও নাই।

জালা বসাইবার মত, ঘটি হাঁড়ি বসাইবার কাটা ঘরও দুই এক জায়গায় মেঝেতে দেখা যায়। সেকালে বোধ হয় কোনো জিনিষ অযথাস্থানে রাখা নিয়ম ছিল



মাটির খেলনা—ইহার মাথাটি নড়ে

না। যার যা স্থান, তা একেবারে মাটিতে খোদাই করা। ইহাদের সব কাজই গুছাইয়া করা।

বহু প্রাচীন আরও দুই-চারিটি শহরের মত এখানেও একটি বিস্ময়কর জিনিষ দেখা যায়। চার পাঁচ তলা বাড়ি সবাই দেখে, কিন্তু চার-পাঁচ তলা শহর কয় জন দেখিয়াছে? উপর দিক হইতে খুঁড়িয়া একটি শহর বাহির করার পর যতই খোঁড়া হইয়াছে, ততই আরও প্রাচীনতর এক এক থাক বাড়িঘর তাহার নীচে বাহির হইয়াছে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক এক পুরুষ অথবা এক এক যুগের শহর ক্রমে পরবর্ত্তী যুগের শহরের নীচে দেখা দিয়াছে। এক এক তলা শহরের নীচের তলাগুলি পরবর্ত্তী যুগের জানা ছিল, বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়; কারণ, দুটি তলার মধ্যে মাটির স্তর অতি সামান্য এবং পুরানো শহরের দেওয়ালগুলির ঠিক উপরেই যেন একই দেওয়াল, এইভাবে নূতন দেওয়ালগুলি গাঁথা। সরু মোটা বাঁকাচোরা কি স্থানবিচ্যুতি কিছুই নাই। কেবল দরজাগুলি প্রতিথাকে বিভিন্ন দিকে। আমরা হয়ত ঢুকিলাম পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়া, কিন্তু দেখিলাম ১৪ ফুট উপরে মাথার উপর সেই একই ঘেরাওটির দরজা দক্ষিণ কোণে; তাহারও ১৪ ফুট উপরে পশ্চিম দিকে আর একটি তলার দরজা দেখা যাইতেছে। এক এক সময়ের গাঁথুনি তার চেয়ে পুরানো গাঁথুনি হইতে যে বিভিন্ন, চোখে দেখিলেই তাহা বোঝা যায়; মাটি চাপা স্তরের একটা লাইনও দেখা যায়। শহরের বাড়িগুলির লাগাও যে কূয়া ছিল, সেগুলিও প্রতি যুগে সেই একই বেষ্টনী ও পরিধি লইয়া ক্রমশঃ উঁচু হইয়া চলিয়াছে। এখন অনেক তলা পর্য্যন্ত তাহার চারিপাশ খুঁড়িয়া ফেলাতে, আমরা যে জমি দিয়া হাঁটিতেছিলাম সেখান হইতে এই রকম অনেক-তলা কূয়াকে গোল এক একটা চিমনীর মত দেখায়।

এই অনেক-তলা শহর ও বিশেষ করিয়া এই অনেক-তলা কূয়া দেখিয়া মনে হয়, যুগে যুগে নদীর জল অথবা নদীগর্ভ ক্রমে উঁচু হইয়া উঠাতে শহরে জল ঢুকিয়া যাইত, তাই বার-বার মানুষ নীচের তলা মাটিচাপা দিয়া উপরে নূতন করিয়া বাড়িঘর তৈয়ারী করিয়া উপর দিকে উঠিয়া আসিত। এক যুগের মানুষ তার আগের যুগের শহরের ভিত্তিভূমির সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিল, ঠিক একই দেওয়াল ক্রমে উঁচু হইতে দেখিয়া তাহা বোঝা যায়।

এই শহরে কেবল যে সমভূমির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল তাহা নহে, ছাদের মত উঁচু জায়গার জল গড়াইয়া নীচে নামিবার ঢালু পথও ছিল দেখা গেল। তা ছাড়া দেখি, আমাদের অতি-আধুনিক জলপড়া নলও (rain water pipe) একটা রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। সেকালের লোকেরা অনেক বিষয়ে আমাদের পিতামহদের চেয়ে আধুনিক ছিলেন বলিতে হইবে। শহরের এক জায়গায় মাঝখানে গোল ফুটা করা বড় বড় যাঁতার পাটার মত গোল এবং কয়েকটা চৌকা পাথর পাওয়া গিয়াছে। এগুলির প্রয়োজন জানা যায় নাই। ঘণ্টা তিন ক্রমাগত হাঁটিয়া এবং উঠিয়া নামিয়া আমরা





বৃষের ছবিযুক্ত দুইটি শীলমোহর

প্রাচীন শহর দেখা শেষ করিলাম। না-খোঁড়া কয়েকটি উঁচু উঁচু ঢিপি দূরে দেখিলাম; জানি না তাহার ভিতর আরও কি আশ্চর্য্য ব্যাপার আবিষ্কৃত হইবে।

শহরের ঘরবাড়ি থাকিলেই তাহার আনুষঙ্গিক

সভ্যতার আরও অনেক আসবাব থাকে। ভূমিগর্ভে যে সব অস্থাবর জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে একটি মিউজিয়ম করিয়া তাহা সাজানো আছে। কিছু জিনিষ কলিকাতার জাদুঘরেও আসিয়াছে। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই তাহা দেখিতে পারেন। কতক খুব মূল্যবান জিনিষ লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়াছে।

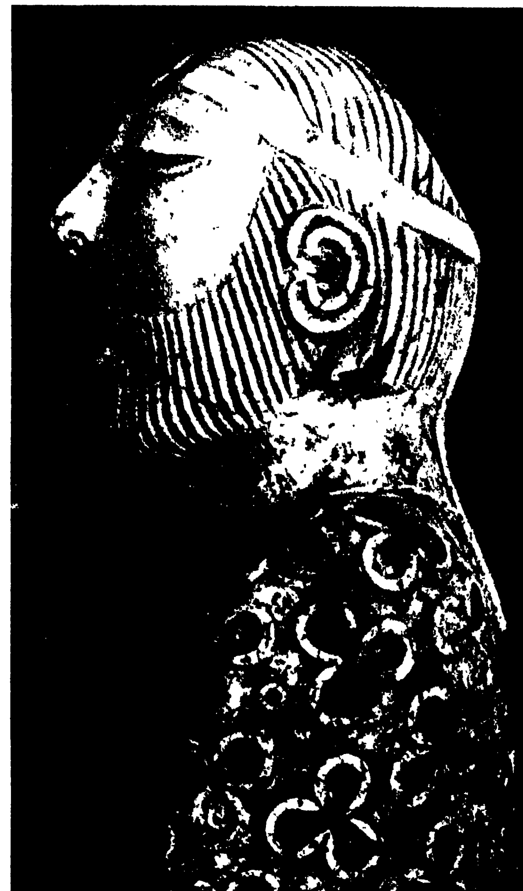
ম্যাকে সাহেবের গৃহিণীর আতিথ্যে দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া আমরা ওখানকার মিউজিয়ম দেখিতে গেলাম। মিসেস্ ম্যাকে তাঁহার লিখিত কয়েকটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আমাদের দিলেন। মোহেন-জো-দাড়োর এই প্রবন্ধ বিষয়ে কিছু সাহায্য তাহা হইতে পাইয়াছি।

সেকালের সভ্যতা কোন্ স্তরের ছিল, তখনকার জিনিষপত্রের সাহায্যে তাহা অনেকখানিই বোঝা যায়। লিখিত ইতিহাস না থাকিলে এই ভাবেই ইতিহাস রচিত হইয়া আসিয়াছে। জিনিষগুলিকে কয়েকটি বড় ভাগে ভাগ করিয়া তারপর ক্ষুদ্রতর বিভাগে বিভক্ত করা যায়। মিউজিয়মে আছে প্রধানতঃ

অস্ত্র	গহনা	লেখা
বাসন	খেলনা	ছবি
শীল	মূর্ত্তি	ওজন
কাপড়	প্রসাধনদ্রব্য	গণনাচিহ্ন

মানুষের জীবনযাত্রায় অস্ত্রের প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম। মোহেন জো-দাড়োর মানুষ কুড়ুল ও টাঙ্গি একত্রে ব্যবহার করিত, দুইমুখো এইরূপ একটি অস্ত্র দেখিয়া তাহা বোঝা যায়। ইহা ছাড়া তাহাদের ছোরা, তীরের ফলক, তলোয়ারের বাঁট ইত্যাদিও দেখিলাম। ম্যাকে সাহেব একটি করাত দেখাইলেন। করাত দিয়া কাঠ কাটা ইহাদের অজানা ছিল না বোঝা যায়। এই সমস্ত অস্ত্রই তামা এবং ব্রঞ্জের। পাথরের অস্ত্রও আছে।

বাসন জাতীয় জিনিষ প্রচুর। মাটির বাসনেরই ঘটা বেশী। মাটির বড় বড় জালাগুলির তলা লাট্টুর মত ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। উচ্চতায় আমাদের একগলা হইবে। ইহার চেয়ে ছোট অনেক আছে, বড়ও দুই একটা। একটি বড় গোল তলা-চেপ্টা মাটির টব টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল, আগা গোড়া নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। টবটি এত মস্ত যে একসঙ্গে তিনজন বসিয়া স্নান করিতে পারে, মাটির হাঁড়ির তলাও বেশীর ভাগ ছুঁচলো। মাটির লম্বা গলা কুঁজো, ছোট ঢাকা দেওয়া কৌটা, তলায় নল ও উপর দিক খোলা গাড়ুর মত, বোধ হয় শিশু ও রোগীদিগকে পান করাইবার পাত্র (feeding cup) দেখিলাম। শেষোক্তটিতে এক পোয়া দুধ ধরিতে পারে। পিতল কাঁসার এইরকম গাড়ুজাতীয় বাসনে বাংলা দেশে কোথাও কোথাও ছেলেদের দুধ খাওয়ায় শুনিয়াছি। পাশের দিকে চৌকোনা একটু মুখকাটা ছোট ৪ ইঞ্চি আন্দাজ উঁচু ঢাকা-দেওয়া কৌটা কয়েকটি দেখিলাম;



মোহেন-জো-দাড়োতে আবিষ্কৃত মানুষের প্রস্তরমূর্ত্তি

তাহাতে কি হইত জানি না। মাটির চাল-ধোওয়া চালুনীর মত লম্বাটে একরকম পাত্র রহিয়াছে। সেগুলির কি প্রয়োজন ছিল আবিষ্কর্ত্তারা বলিতে পারেন না। কিন্তু সারা গায়ে ছোট ছোট ফুটা দেখিয়া চাল-ধোওয়া চালুনীই আমাদের মনে হয়. এগুলি খুব ছোট এবং খুব বড় নানা মাপের আছে। কতকগুলির তলায় বড় একটা ফাঁক, সেগুলি আলো রাখিবার পাত্র মনে হইতেছিল।

থালা, কড়া, গামলা, হাতা, ঘটি, গেলাস, হাঁতা, শাঁখ-চেরা চামচ অথবা কোষা, মাটির চামচ, মাটির বিঁড়া, নোড়াশিল, বিরাট পাথরের খল ইত্যাদি রান্নাবাড়ির সব সরঞ্জামই আছে। গৃহিণীরা রন্ধনবিদ্যায় সুপটু ছিলেন বোঝা যায়। থালা কড়া হাতা ইত্যাদি তামা ও ব্রঞ্জের। শাঁখ-চেরা চামচ ছাড়া মাটির অবিকল সেইরকম চামচও দেখা যায়; এগুলি বোধ হয় পরে তৈয়ারী। একটা আস্ত শাঁখ এইভাবে দুই টুকরা করিয়া কাটা আজকাল দেখা যায় না।

একটি গেলাস আছে সবুজ মার্ব্বেল পাথরের। এই পাথর যোধপুর ছাড়া নিকটে আর কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই সেই দেশ হইতে আনা।

রূপার ঝাঁপি সোনা ও মূল্যবান পাথরের গহনা রাখিবার জন্য ব্যবহার করা হইত। গহনা সমেত একটি এইরূপ ঝাঁপি পাওয়া গিয়াছিল। সেটিকে এখন সযত্নে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। ঝাঁপিটি সরপোষের মত লম্বা ও ঢাকা দেওয়া।

শীলমোহরের চলন তখন বোধ হয় রবার ষ্ট্যাম্পের মতই ছিল। বহু বিভিন্ন প্রকারের শীল সংগ্রহ করা হইয়াছে। এইগুলি সভ্যতার ইতিহাসে মহামূল্য রত্ন, কারণ এগুলির গায়ে ছবি ও অক্ষরে মিশ্রিত যে ভাষা খোদাই করা আছে, তাহার পাঠোদ্ধার হইলে সুদূর অতীতের বহু যুগ আমাদের চোখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এগুলির গড়ন নানারকম; বেশীর ভাগ চৌকা, পিঠের দিকে দুটি ফুটা করা আংটার মত বোধ হয় দড়িতে ঝুলাইবার জন্য। শাদা পাথরেই প্রায় সব খোদাই। অধিকাংশ শীলেই জানোয়ারের মূর্ত্তি, তার মুখের কাছে যাবের পাত্র এবং উপর দিকে কয়েকটি প্রাচীন অক্ষর। কোন কোন অক্ষর প্রায় ছবির মত। হাতী, মহিষ, দুই শিং যুক্ত সবুজ ষাঁড় ও এক শিংওয়ালা জন্তু, কুমীর, গণ্ডার, পশুযুগ্ম, পশুগণ ইত্যাদি কত রকমের শীল আছে। উট ও ঘোড়ার চেহারা কিন্তু কোথাও দেখিলাম না। বাঘ হরিণ ইত্যাদিও বাদ যায় নাই। একশিংওয়ালা জন্তুটি অনেক শীলেই আছে। পাশ ভাবে আঁকার জন্য বোধ হয় একটি শিং দেখা যাইতেছে না। প্রথম দেখিয়াই আমার ইহা মনে হইয়াছিল। মিসেস্ ম্যাকেও তাহাই লিখিয়াছেন। মানুষের মূর্ত্তি বেশী পাওয়া যায় নাই শুনিলাম। আমরা মাত্র দুই তিনটি দেখিলাম। একটিতে মানুষ ধনুক টানিতেছে। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—উচ্চ রাজাসনে উপবিষ্ট মানুষ, তাহার মাথায় চূড়া শিং দেওয়া শিরোভূষণ, দুই হাত আগাগোড়া বালার মত গহনায় ঢাকা, বসিবার ভঙ্গী সিধা ও আসন করিয়া, এই রাজমূর্ত্তির দুইপাশে মাথার কাছে হাতী বাঘ মহিষ ও গণ্ডারের মূর্ত্তি। হাতীর মুখ উল্টা দিকে। ভবিষ্যতে হয়ত ইহা কোনো রাজা কি সর্দ্দারের শীল বলিয়া প্রমাণ হইবে। আর একটি আছে অর্দ্ধব্যাঘ্র অর্দ্ধনর (বা নারী) মূর্ত্তি। ইহার পেট পর্য্যন্ত বাঘের মত, চারিটা পা-ও আছে, উপর দিক মানুষের মত, তার বেণী উড়িতেছে, বেণীর শেষে গ্রন্থি বাঁধা, মাথায় দুইটি শিং। শীলগুলি পলস্তারার উপর ছাপিয়া দেখিয়াছি, সুন্দর ছাপ উঠে।

তখনকার দিনে আধুনিক রকম কাপড় ছিল কি না এবং থাকিলেই বা কার্পাস কি অন্য কিছুর, ইহা একটা ভাবিবার বিষয়। রূপার ঝাঁপির গায়ে জড়ানো এক টুকরা জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল; অণুবীক্ষণের সাহায্যে তাহা কার্পাস বস্ত্র বলিয়া বোঝা গিয়াছে মিসেস্ ম্যাকে লিখিয়াছেন। এই জিনিষটি দেখিতে পাই নাই বলিয়া দুঃখ আছে। তবে পাথরের মানুষের মূর্ত্তির গায়ে কাপড় খোদাই দেখিয়া ও মাটির পুতুলের পায়ে মাটির কাপড় চাপা দেখিয়া কাপড় যে ছিল তাহা বোঝা যায়। একটি ছোট ব্রঞ্জ পুতুল দেখিয়াও মনে হয় তাহার কোমর হইতে অধোদেশ কাপড় জড়ানো। খনন ভূমির এক জায়গায় অতি জীর্ণ জালের মত বহু পুরাতন একটি জিনিষ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা পুরানো কাপড় মনে হয়।

মানুষ চিরকালই অলঙ্কারপ্রিয়। সেকালের মানুষ ত আমাদের চেয়েও বেশী বোঝা বহিত, আমরা অতটা পারি না। মোহেন-জো-দাড়োর ধনী দরিদ্র সবাই অষ্টাঙ্গে অলঙ্কার পরিত। তাহার প্রমাণ সত্যকারের অলঙ্কার ও পুতুলের গায়ের অলঙ্কারে আছে। মিউজিয়মে আছে সোনা ও 'জেডে'র হার, সোনা ও কর্ণেলিয়ানের হার, রূপার গমদানা হার, সোনার ফাঁপা বালা, সোনার মটর মালা, সোনার সরিষা-দানা-চিক বা তাবিজ, সোনা ও পাথরের মেখলা, সোনার কিতার শিরোভূষণ, তামার ও পাথরের মেখলা, মাটির মেখলা, মাটির বালা, কানের সোনা, মাটি ও পাথর ইত্যাদির গহনা, সোনা রূপার আংটি, রূপার শীল আংটি ইত্যাদি।

গলা ও কোমরের সব গহনাই সরিষা মটর গম ও যবের মত দানা, পয়সা আধলার মত চাকতি, শুক্‌না পটলের মত লম্বাটে ডাঁটি বা দানা এদিক ওদিক ফুটা করিয়া নানা ভাবে সাজাইয়া গাঁথা। গাঁথুনির মাঝে মাঝে আধুনিক মুক্তার গহনা গাঁথার ভঙ্গীতে একটি ৫।৭ ছিদ্রওয়ালা ডাঁটি আড়ভাবে দেওয়া, সবকটি লহরের সূতা তাহার ভিতর দিয়া চালাইয়া সেটিকে ঠাস ও খাড়া রাখা হয়, তারপর আবার নূতন গাঁথুনি সুরু। হার বা

মেখলার দুই দিকে শেষে এখনকার পাঁচ লহর ইত্যাদির মত দুটি ত্রিভুজ খামি আড়ভাবে দেওয়া। ত্রিভুজের দুটি লাইন একটু ঘোরানো। সোনার গহনা গাঁথার অধিকাংশ স্থলেই পাথর ও সোনা বেশ মানানসই করিয়া সাজানো। গহনাগুলিতে কোথাও কোনো নক্সার কাজ নাই, ইহা বিস্ময়কর লাগে। সোনার কানফুলগুলিতে ধারে ছোট ছোট গুটি গুটি তোলা আছে। ইহা বোধ হয় ভিতর দিক হইতে ঠেলিয়া তোলা। তখন পালিশের কাজ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু ছাঁচে ঢালাই ও নকসাকাটা হইত কি না বুঝিলাম না। সোনার ফিতাটি আশ্চর্য্য রকম পাতলা, হঠাৎ দেখিলে সোনালী কাগজ মনে হয়। হারে যে সোনার চাকৃতিগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা চীনা পয়সার মত মাঝখানে ফুটা এবং আধুনিক রূপার দুয়ানিরও অর্দ্ধেক পাতলা। হারে ব্যবহৃত পাথরগুলি চৌকা, গোল, ও যবাকৃতি, এই তিন ভাবেই বেশী কাটা। মেখলায় লম্বাটে পটলের মত দামী পাথর আছে। ধাতুনির্ম্মিত এই লম্বা জিনিষ দেখি নাই, কিন্তু মাটির অনেক আছে। সাদা এক রকম পাথরের সরিষাদানা হার দেখিলাম, হঠাৎ দেখিলে বীজমুক্তার মালা মনে হয়। হারে একক ধুক্‌ধুকির চলন ছিল না। তবে সামনে একসঙ্গে পাঁচ সাতটা পাথর লম্বাভাবে ঝালরের মত ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। এই ঝুলানো পাথরগুলির মুখে ছুঁচলো আধ ইঞ্চি লম্বা একটি করিয়া সোনা কি রূপার নল গাঁথা থাকিত, তাহাতে ঝালরের ভাবটা আরও সুস্পষ্ট দেখায়। এখনকার দেশী গহনায় বড় পাথর লম্বাভাবে ঝুলাইলে মুখে একটা পুঁতি দেওয়া হয়। একটার বদলে পাঁচ ছয়টা পুঁতি লম্বা দিকে গাঁথিয়া ঝুলাইয়া দিলে মোহেন-জো-দাড়োর গহনার মত দেখাইতে পারে। চুণো পাথর ইত্যাদির কানফুলে ধারের দিকে ছুঁচলো করিয়া পাপড়ি কাটা।

শিশুহীন মনুষ্যসমাজ ত হয় না, কাজেই খেলনার প্রয়োজন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ছিল। এই খেলনার ভিতর দিয়া মানুষের অনেক পরিচয় আপনি পাওয়া যায়। মিউজিয়মটিতে মাটির খেলনাই বেশী আছে, চুণো পাথর এবং ধাতুনির্ম্মিত জিনিষও কিছু কিছু আছে। মাটির খেলনাগুলিতে খুব বেশী শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় নাই। অনেক খেলনা-পুতুল বাংলা দেশের হিঙুল পুতুলের মতই দেখিতে। মাথা নাক হাত পা কোমর সবই আঙুলের সাহায্যে মাটি টিপিয়া তৈয়ারী মনে হয়। কতক পুতুলে তাহার চেয়ে নিপুণতার পরিচয় একটু বেশী। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার ও মাথায় শিরোভূষণ-পরা দুটি পুতুলের মধ্যে একটির চেহারা বেশী করিয়া চোখে পড়ে। মাথার চূড়ার দুইপাশে বন্ধনী দিয়া কানের উপর দুইটি ছোট হাঁড়ির মত পাত্র ঝুলানো। হয়ত এই ভাবে কিছু বহন করা হইত। এই পুতুলগুলি হইতে মেখলা ও হার পরিবার ভঙ্গী বুঝা যায়। চন্দ্রহারের চাকতির মত বড় একটা গোল চাকতি সাম্‌নে পেটের কাছে রহিয়াছে। পুতুলের খাট দেখিব আশা করি নাই, কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়িল মাটির একটি চারপায়া খাটে মাটির মা ছেলে বুকে করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছে; তাহার কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত একটা



মৃৎনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি

মোটা (মাটির) কাপড় চাপা দেওয়া আছে। একটি স্ত্রীমূর্ত্তির কোমরে কলসী, দেখিলে মনে হয় বাঙালী মেয়ের মত জল লইয়া যাইতেছে। আর একটি মা-পুতুল ছেলে কোলে দাঁড়াইয়া। একটি মেয়ে দুই হাতে কুলা ধরিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া আছে, দেখিলেই চাল ঝাড়িতেছে মনে হয়। হাস্যরস উদ্রেক করিবার চেষ্টাও বেশ ছিল। অনেক পুতুলেই দেখি ভীষণ পেট-মোটা মানুষ দুই হাতে পেট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আসন্না-প্রসবা নারীমূর্ত্তি গড়িয়া অভদ্র তামাসাও পুতুলে আছে। পাখীর মত মুখ-ওয়ালা মানুষ-পুতুল এদিকে ওদিকে চোখে পড়ে।

মানুষ ছাড়া আরও আছে মাটির পাখী, জিব বা'র-করা কুকুর, গরুর গাড়ী, পাখী (মুরগী) গাড়ী, বাঘের মুখোস ইত্যাদি। একটা ষাঁড়ের (?) লেজ ধরিয়া

টানিলে তাহার ঘাড়টা নড়ে। বর্ষায় এই রকম খিল-দেওয়া খেলনা কাঠে তৈয়ারী হয় আজকালও। পাখী-গুলির দুইদিক ফুটা, কাজেই মুখে দিয়া বাজানো যায়। খেলনার রকমারি দেখিলে বোঝা যায় সেকালের মাতারা শিশুদের আনন্দ-বিধান করিতে আমাদের চেয়ে বেশীই তৎপর ছিলেন।

চুণো পাথর ও রঙীন পাথরের এবং ব্রঞ্জের যে কয়েকটি খেলনা আছে সেগুলি সত্যই নিপুণ শিল্পীর তৈয়ারী। এগুলি দেখিলে সেকালের মানুষদের শিল্পজ্ঞানহীন মনে করা অত্যন্ত ভুল। অনেক ইংরেজ এই মত পোষণ করেন। আমার মনে হয়, এখনও যেমন হিঙুল পুতুল এবং কৃষ্ণনগরের পুতুল দুই-ই আছে,তখনও তেমনি ছিল। তাছাড়া, ভালগুলি দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া অনেক কুড়াইয়া পাওয়া যায় নাই। চুণো পাথরের ভেড়া ও কুকুর দুটিতে জীবজন্তুর শরীর শিল্পীরা পর্যবেক্ষণ করিয়া হুবহু নকল করিত স্পষ্ট বোঝা যায়। রঙীন পাথরের একটি ছোট্ট বাঁদর উঁচু হইয়া বসিয়া আছে, রঙীন পাথরেরই ছোট্ট কাঠবিড়ালী লেজ তুলিয়া বসিয়া দুই হাতে মুখে খাবার পুরিতেছে। এই দুইটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গড়িয়া আধুনিক কারিগরও গর্ব্ব অনুভব করিতে পারিত।

ব্রঞ্জের একটি তিন ইঞ্চি লম্বা মহিষের মূর্ত্তি ঘাড়টা ঈষৎ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাতে মহিষের শরীরগঠন ও সগর্ব্ব ভঙ্গী সমস্তই আশ্চর্য্য সুন্দর ফুটিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি পরিমাণ মূর্ত্তিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত দেখিতে।

ব্রঞ্জের দুইটি ছোট ছোট নর্ত্তকী মূর্ত্তি আছে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত বড়টি দীর্ঘ দুই হাতে আগা-গোড়া চুড়ি পরা, গলায় একটা মোটা হার, বস্ত্র নাই, ঠোঁটপুরু, নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া, একটা হাত কোমরে। ছোট মূর্ত্তিটিরও নাচের ভঙ্গী, কিন্তু কোমর হইতে তলদেশ কাপড় জড়ানোর মত।

কয়েকটি বড় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, বোধ হয় চুণো পাথরের। সবগুলিই সাদা এবং ভাঙা। ফিতা ও কাঁটা দিয়া খোঁপা বাঁধা একটি দাড়িওয়ালা পুরুষের মাথার শরীরটা নাই। চুল দাড়ি বেশ পরিপাটি করিয়া আঁচড়ানো, কপালের উপর দিয়া খোঁপা পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া ফিতা বাঁধা। আর একটি পুরুষমূর্ত্তির মাঝখানে সিঁথিকাটা। পরিপাটি চুল পিছনে বেণী হইয়া পড়িয়া আছে, দাড়ি সযত্নরক্ষিত, গায়ে ত্রি-পত্র ছিটের চাদর এক কাঁধের উপর দিয়া জড়ানো, কপালের উপর ফিতা দিয়া গোল একটি গহনা বাঁধা। এ ছাড়া হাঁটুগাড়িয়া-বসা মানুষ, এবং শিরোহীন যোগাসনে উপবিষ্ট হাঁটুতে হাত দেওয়া মানুষ দুইটি আছে। দ্বিতীয়টির গায়ে কাঁধের উপর দিয়া চাদর বাঁধা এবং পিঠে ছোট বেণী দুলিতেছে।

প্রসাধন-দ্রব্যের মধ্যে চোখে পড়িল একটি দুইমুখো সাঁওতালী চিরুণী এবং গা ঘসিবার পাতলা লম্বা সছিদ্র ঝামা।

লেখার পরিচয় শীলে প্রচুর আছে, আর কোথাও দেখি নাই।

ছবি আছে মাটির হাঁড়ির গায়ে,বেশীর ভাগ আলপনার আমপাতা, ফুল, মাছ ইত্যাদি—লাল সাদা নীল নানা রঙে আঁকা। দুই একটির রং এনামেলের মত চকচকে, সেগুলি ভাঙা ছোট টুক্‌রা, কিসের জানি না। হাঁড়ির গায়ে লেজখাড়া ধূর্ত্ত শৃগাল ও বড় গাধা দেখিলে পঞ্চ-তন্ত্রের গল্প মনে হয়। দাবার ছক, মাছের আঁশ ইত্যাদি নক্‌সাও দেখা যায়। জলের ঢেউ লাইন এবং কম্পাসে আঁকা বৃত্তের সাহায্যে ফুলও হাঁড়ির গায়ে খুব ছিল।

ওজন করিবার বাটখারার মত ছোট বড় নির্দ্দিষ্ট মাপের চৌকা কতকগুলি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি একটি আর একটির ভগ্নাংশ বেশ ধরা যায়।

পাশাখেলার ছক আঁকা এবং ঘুঁটি ইত্যাদি দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব যে কত প্রাচীন সহজেই বলা যায়। গুটিটির গায়ে ১, ২, ৩, ৪, ঠিক এখনকার মত ফুটা করিয়া আঁকা।

আর কতকগুলি উল্লেখযোগ্য জিনিষ দেখিলাম মাটির ও পাথরের দুই রকম জালিকাজ, হাতীর দাঁতের ক্রুশ ও স্বস্তিক, আর একটি খেলার জন্য ব্যবহৃত হাতীর দাঁতের কাঠি। এই খেলার নাম জানা যায় নাই।

মোহেন-জো-দাড়ো যত বড় শহর এবং সভ্যতার যেরূপ পরিচয় ইহাতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির জন্য ইহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে মানুষের বহু আসবাব ও সম্পত্তি এখানে পড়িয়া থাকিত। কিন্তু এত বড় শহরের পক্ষে যে অল্প পরিমাণ জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় নগরবাসীরা নিজ নিজ সম্পত্তি লইয়া সুব্যবস্থা করিয়া স্বেচ্ছায় নগর ছাড়িয়া যায়। শহরে শত্রুর ভাঙাচোরা পোড়ানো কি লুটপাট করার কোনো চিহ্ন নাই।

যাই হউক, সামান্য যা জিনিষ এবং শহরের ঘরবাড়ি নর্দ্দমা, রাস্তা, কূয়া, স্নানের ঘর, জলকুণ্ড, ইত্যাদি যা-কিছু আমাদের চক্ষে এত যুগ পরে পড়িতেছে তাহার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া এবং সভ্যতার সহিত তাহার যোগ ব্যাখ্যা করা, নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠার মধ্যে আমাদের মত অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে শক্ত। আমরা মোটামুটি ক্যাটালগের মত নীরস বর্ণনা দিয়া সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলিয়া শেষ করিব।

মোহেন-জো-দাড়োর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর আবিষ্কার তাহার জল-নিষ্কাশন প্রণালী। স্নানের ঘরের মেঝে সর্ব্বদা একদিকে ঢালু এবং একপাশে আল-দেওয়া। ঘর হইতে বাহিরে যাইবার ছোট নর্দ্দমা, আবার পথের দুই ধারে বড় ঢাকা নর্দ্দমা শহরময় রহিয়াছে। কূয়ার চারিপাশ সর্ব্বদাই বাঁধানো। ছাদ হইতে জল পড়িবার বাঁধানো ঢালু পথ, মাটির লম্বা নল ও ছোট মুরি, দেওয়ালের ভিতর দিয়া ইট কাটিয়া উপরের জল নীচে নামিবার পথ, সবই আধুনিক যুগেও বিস্ময়কর ঠেকে। এই সব দেখিয়া মনে হয় সে যুগে বৃষ্টি প্রচুর হইত। তা ছাড়া জাতিটি খুব পরিচ্ছন্ন ছিল। সর্ব্বদা জল না হইলে তাহাদের চলিত না, স্নানেরও খুব আড়ম্বর ছিল নিশ্চয়। না হইলে ঘরে ঘরে কূয়াও স্নানাগার থাকিবে কেন ? বৃষ্টির প্রাচুর্য্য না থাকিলে এক মানুষ গভীর বড় ড্রেনের প্রয়োজন বিশেষ থাকে না।

কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে প্রচুর কাঁচা ইটের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় তখন বৃষ্টির অত ঘটা ছিল না। তাহা হইলে কাঁচা ইট এতদিন টিঁকিত না এবং জল জমা করিয়া রাখিবার এত চৌবাচ্চা, জালা ইত্যাদিও তৈয়ারী হইত না।

অধিকাংশ নরনারী মূর্ত্তির স্বল্প বাস দেখিয়া দেশটা গরম ছিল বোঝা যায়। অতিরিক্ত স্নানাদিও গরম দেশের লক্ষণ। গরমের জন্যই মাথায় টুপি কি পাগড়ী পরিত না মনে হয়। চুল বাঁধা, সিঁথি কাটা, মাথায় গহনা পরা ইত্যাদিতেও পুরুষের খুব টান ছিল প্রমাণ রহিয়াছে।

ধনী দরিদ্র স্ত্রীপুরুষ সকলেই অলঙ্কার ভালবাসিত। তাই মাটির অলঙ্কার হইতে সোনা স্ফটিক ও রূপার অলঙ্কার কিছুরই অভাব নাই।

শহরের নক্সা আগে হইতে ভাল করিয়া করিবার মত জ্ঞানী লোক ছিল। না হইলে এমন সুবিন্যস্ত পরিপাটি পথ ঘাট গলি দেখা যাইত না। শহরের বাড়ি ও পথের সুব্যবস্থা ইহার দ্বিতীয় বিস্ময়।

এই জাতিতে নানা উপজীবিকার মানুষই ছিল প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

শীলেতে ধনুক হাতে মানুষের মূর্ত্তি এবং অন্যত্র ধাতুনির্ম্মিত তীরের ফলা, পাথরের অস্ত্র তৈয়ারী করার জিনিষ, পালিশ করিবার শাণ দেখিয়া বোঝা যায় যে শিকারীর অভাব ছিল না।

চাষবাস ত নিশ্চয়ই ছিল, না হইলে লাঙ্গলের ফাল, কুলা-হাতে পুতুল কোথা হইতে আসিবে ? তাছাড়া গহনাতে সরিষা, মটর, যব গমের অনুকরণ আছে।

পশুপালন তো গরুর গাড়ী, মহিষের মূর্ত্তি ইত্যাদিই প্রমাণ করে। তবে উট আর ঘোড়া দেখা যায় না। দেশে বড় বড় মহীরুহের জঙ্গল ছিল; তাই মরুভূমির উটের বদলে জঙ্গলের হাতী গণ্ডারের পরিচয় বেশী। এখন সিন্ধুদেশে হাতী গণ্ডার নাই, উট আছে।

বনের কাঠ কাটিয়া কড়িকাঠ ইত্যাদি তৈয়ারী হইত,



চিত্রিত পাত্র

হয়ত হাতীর পিঠে বোঝাই হইয়া যাইত। করাত দেখিয়া এবং খাটের অনুকৃতি ও কড়ি রাখার ঘর কাটা দেখিয়া ছুতারের কাজ যে ছিল তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। গরুর গাড়ীও নিশ্চয় কাঠ দিয়াই তৈয়ারী হইত।

মুরগী ছিল গৃহস্থের প্রিয় জিনিষ, তাই ছেলেদের খেলনায় মুরগী-গাড়ী, মুরগী-বাঁশী মাটিতে গড়া হইত।

স্যাকরারা পাথর ও সোনার দানা তৈয়ারী করিতে পালিশ করিতে ও ফুটা করিতে এবং সুতা (?) দিয়া গাঁথিতে জানিত।

কুমোরেরা হাঁড়ি ঘড়া শুধু গড়িত না, মাটির গহনাও গড়িত। এই সব জিনিষ রং করা হইত। রঙেরও একটা ব্যবসায় ছিল। রং-মাড়া খল পাওয়া গিয়াছে।

নানা আকারের ও মাপের ইট তৈয়ারী করিয়া পাজা পোড়ানো হইত।

রাজমিস্ত্রীরা এখনকার চেয়ে ভাল বই মন্দ ছিল না। তাহাদের মালমশলাও ছিল আশ্চর্য্য।

ধাতুনির্ম্মিত বাসন, অস্ত্র, গহনা, পেরেক তৈয়ারী করাও একদল লোকের কাজ ছিল।

দরজি বোধ হয় ছিল না। কাটা কাপড়ের কোনো পরিচয় নাই। তবে কাপড়ে ফুল তোলা হয়ত হাতে হইত। ছাপার ছাঁচ ও রং-মাড়া শিল দেখিয়া মনে হয় কাপড় রং করা এবং ছাপাও চলিত। চুণো পাথরের মূর্ত্তিটির গায়ের চাদরে যে ফুল কাটা, তাহা ছাপা বলিয়াই মনে হয়।

শিল খোদাই, মূর্ত্তিগড়া, লেখা, আঁকা ইত্যাদি উচ্চ দরের কাজেরও অনেক নমুনা আছে।

নরসিংহ, পশুনারী, পশুগণ, অশ্বত্থ ও জোড়া সাপ, রাজদণ্ড, ধ্যানমুদ্রা এবং কোষাকুষিতে পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখানে কবরের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মৃতদেহ সম্ভবত পোড়ানোই হইত। হরপ্পাতে কবর পাওয়া গিয়াছে। মোহেন-জো-দাড়োতে ভূতপ্রেত যমদূত ইত্যাদির কোনো পরিচয় নাই।

যুদ্ধবিগ্রহেরও বিশেষ পরিচয় দেখি না, অস্ত্রশস্ত্র বোধ হয় শিকারের জন্যই ব্যবহার হইত। ইহাদের জীবন-যাত্রা মোটের উপর শান্তই ছিল।

নানা দেশের সহিত এদেশের যে আদান-প্রদান চলিত, তাহা এই সব জিনিষের সাহায্যেই প্রমাণ হইয়াছে। এখানকার মত শীল মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। আবার এলাম সুমার ও বালুচীস্থানের হাঁড়িকুড়ি, হারের দানা, ও যন্ত্রপাতির সহিত এখানকার ঐসব জিনিষের বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। সিন্ধুনদতীরবাসী এই প্রাচীন জাতিটি যে ঐ তিন দেশে জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত করিত তাহা নিঃসন্দেহ।

সিন্ধুতীরের এই পাতালপুরীটি ভারত ইতিহাসের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে, জগতের চক্ষে ভারতের সভ্যতাকে বহু উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছে। আশা করা যায়, আরও আবিষ্কার এবং গবেষণার সাহায্যে এই প্রাচীন সভ্যতার পীঠটি আরও বহু স্থলে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব অচিরে প্রমাণ করিবে।

মোহেন-জো-দাড়োর অধিবাসীদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক-দের অনেক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকিলেও এখন পর্য্যন্ত ইঁহাদের জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষা ঠিক কি ছিল প্রমাণ হয় নাই। যে নরকঙ্কালগুলি এখানে পাওয়া গিয়াছে ঐতিহাসিকেরা বলেন তাহা অনেক পরবর্ত্তী অর্থাৎ আধুনিকতর যুগের। সুতরাং জাতি ধর্ম্ম ও ভাষার উদ্ধারের জন্য অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োজন আছে।

ভারতের বহু সভ্যতার চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত মিশর, ক্রীট, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে ধার-করা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভারতবাসীর আশা আছে মোহেন-জো-দাড়োর ঐতিহাসিক সমস্ত তথ্য ভাল করিয়া জ্ঞানী জনের তৌল দাঁড়িতে মাপা হইয়া গেলে আমাদের এই ঋণের অপবাদ ঘুচিয়া যাইবে। হয়ত আমরাই নানা ক্ষেত্রে মহাজন হইয়া দাঁড়াইতে পারি। আজিকার পদদলিত ভারতবাসী এই মনে করিয়া আপন পূর্ব্ব মর্য্যাদা ফিরাইয়া আনিতে উৎসাহী হইতে পারেন। অবশ্য এই সঙ্গে আর্য্যামীর অহঙ্কারও ছাড়িতে হইবে। অনার্য্য হওয়ার অহঙ্কারই আমাদের বনিয়াদের লক্ষণ।





বেতারের ইতিহাস

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আলো এবং শব্দ দুই-ই তরঙ্গবিশেষ (wave motion)। যদি একটা ঢিল জলে ফেলা যায় তা হ'লে আমরা দেখতে পাই যে ঢিলটিকে কেন্দ্র ক'রে চারিদিকে বৃত্তাকারে ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ঢিলটিকে যদি অনবরত নাড়ান যায় তা হ'লে ক্রমাগতই কেন্দ্র থেকে ঢেউ ছড়িয়ে প'ড়তে থাকবে। কোন জিনিষ যখন শব্দ করে তখন তাকে কেন্দ্র ক'রে বাতাসে চারিদিকে শব্দের ঢেউ প্রসারিত হ'তে থাকে। এই তরঙ্গিত বায়ুপ্রবাহ আমাদের কর্ণপটহে আঘাত ক'রলেই আমরা শুনতে পাই। শব্দবাহী তরঙ্গ সেকেণ্ডে প্রায় ১২০০ ফুট যায়। বহুদূরস্থিত সূর্য্য বা তারার আলো একেবারে শূন্যস্থান অতিক্রম ক'রে আসে; সেখানে বাতাসের লেশমাত্রও নেই, কাজেই আলোর বাহক বাতাস হ'তে পারে না।...বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ইথার নামক এক পদার্থে পূর্ণ। ইথারে কম্পন হ'লে আলোর সৃষ্টি হয়। যে কোনরূপ স্পন্দনেই আলোর সৃষ্টি হয় না। সেকেণ্ডে চার কোটি থেকে সাড়ে সাতকোটির মধ্যে স্পন্দন সংখ্যা (frequency) হওয়া চাই। এই ইথার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য—অর্থাৎ এক তরঙ্গের মাথা থেকে পরের তরঙ্গের মাথা পর্য্যন্ত; এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগেরও কম। আলোর তরঙ্গের চেয়ে বড় তরঙ্গের উত্তাপকারী শক্তি আছে। এই তরঙ্গের বেগ অতি ভীষণ। আলো সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল যায়; এক সেকেণ্ডে সাত বারেরও বেশী পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে আসতে পারে।

লর্ড কেল্‌ভিন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গণিতসিদ্ধ প্রমাণ দেন যে, কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎভাণ্ড (Leydenjar) থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উৎপত্তি হ'তে পারে। এর পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ চার বছর পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ফেডারসেন দেন। তিনি বিদ্যুৎভাণ্ডের স্ফুলিঙ্গ ঝলককে (spark) সবেগে ঘূর্ণায়মান আরসিতে প্রতিবিম্বিত ক'রে দেখেন। সরল আলোর রেখার পরিবর্ত্তে তিনি দেখলেন যে প্রতিবিম্বটি ছোট ছোট ভাগে ভেঙ্গে গেছে। এই থেকে প্রমাণ হয় যে স্ফুলিঙ্গটি স্পন্দনশীল (oscillatory)।

আলো ও বিদ্যুতের মধ্যে যে কোন যোগসূত্র আছে তা প্রথম দেখান বিখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিদ্ ক্লার্ক্ ম্যাক্সওয়েল। এর আগে ফ্যারাডে পরিকল্পনা করেন যে, সমস্ত বৈদ্যুতিক ঘটনার কারণ ইথারে টান (strain) পড়া। এই পরিকল্পনারই গণিতসিদ্ধ প্রমাণ ম্যাক্সওয়েল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল সোসাইটির নিকট এক প্রবন্ধ পাঠ ক'রে জানান এবং তাঁর সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। ম্যাক্সওয়েল আরও প্রমাণ করেন যে, ইথারে টান পড়ার দরুণ বৈদ্যুতিক ঢেউ সৃষ্টি হ'তে পারে, এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও আলোর মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবলমাত্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে (wave length) ও স্পন্দন সংখ্যা উভয়েই একই বেগে অর্থাৎ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ধাবিত হয়।

ম্যাক্সওয়েলের পরিকল্পনার পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হাইন্‌রিশ হার্ৎস্ নামে এক জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক দেন। তিনি রুম্‌কর্ফ কুণ্ডলীর (Ruhmkorff Coil) স্পার্ক্ গ্যাপের (spark gap) দুইদিকে দু'খানা ধাতব-পাত লাগান ও এইরূপে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করেন। নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা তিনি দেখান যে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আলোর সহধর্ম্মী, দুইই একই বেগে ধাবিত হয় এবং আলোর ন্যায় বিদ্যুৎ-তরঙ্গের পরাগ্‌বর্ত্তন (reflection), তির্য্যক্ বর্ত্তন (refraction) প্রভৃতি গুণ আছে।

হার্ৎসের পরীক্ষা প্রকাশিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত জগতের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে সঙ্কেত পাঠানোর কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। এর সাহায্যে যে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, বিনা যোগসূত্রে ও সহজেই সঙ্কেত পাঠান যেতে পারে, তা ভারতবর্ষে জগদীশ বসু ও ইংলণ্ডে অলিভার লজ্ প্রথমে প্রদর্শন করান। এঁদের পরীক্ষা বিশেষ কৃতকার্য্য হয় নি, কারণ এঁরা খুব ছোট ছোট ঢেউ দিয়ে সঙ্কেত পাঠাবার চেষ্টা করেন। জগদীশ বসু এত ছোট দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপাদন করতে সমর্থ হন যে, তাঁহাকে অদৃশ্য আলো বললেই ভাল হয়।

নৈসর্গিক বজ্র ও পরীক্ষাগারে উৎপাদিত বিদ্যুতের যে একই স্বরূপ, তা আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ প্রথমে প্রমাণ করেন। কিন্তু আকাশে যে বৈদ্যুতিক স্পন্দনেরও অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ দেন রুষ বৈজ্ঞানিক আলেক্‌জাণ্ডার পোপোফ। তিনি একটি উঁচু মাস্তুলে তার লাগিয়ে আকাশ থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করেন ও এই পরীক্ষা ক্রোনষ্টাটের সামরিক পরিষদে (Millitary Academy at Kronstadt) প্রদর্শন করেন। পোপোফের এই পরীক্ষা থেকেই আধুনিক আকাশ-তারের (aerial) সৃষ্টি হয়েছে।

ফরাসীদেশে এডুয়ার্ড ব্রাঁলি আবিষ্কার করেন যে, আল্‌গাভাবে রক্ষিত কোন বিদ্যুৎ পরিচালক (electrical conductor) চূর্ণের উপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পাতে উহাদের পরিচালন ক্ষমতা (conductivity) হঠাৎ বেড়ে যায়। এই আবিষ্কারের উপর নির্ভর ক'রে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধরবার যে যন্ত্র তৈয়ারী হ'ল স্যার অলিভার লজ্ তার নাম দিলেন Coherer বা "সম্বন্ধকারী" (Cohere শব্দের অর্থ একসঙ্গে লেগে থাকা বা সম্বদ্ধ হওয়া)।

পরীক্ষাগারে পরীক্ষার স্তর পেরিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ব্যবহারিক ভাবে প্রথম কাজে লাগাতে সমর্থ হন মার্কনী। মার্কনী জাতিতে ইটালিয়ান। ইনি প্রথমে বোলোঞা (Bologna) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রিঘির নিকট কাজ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইটালিতে মার্কনী বেতারবার্ত্তা প্রেরণে সমর্থ হন। তিনি হার্ৎসের যন্ত্রের একদিকে উঁচু তার লাগালেন ও অপর দিক মাটির সঙ্গে সংযোগ ক'রে দিলেন, কারণ ধাতুর ন্যায় মাটির ও বিদ্যুতের পরিচালক উঁচু আকাশ-তার লাগানোর দরুণ বিদ্যুৎতরঙ্গ অনেক দূর অবধি প্রসারিত হ'তে পারে। সাধারণতঃ আকাশ তারের উচ্চতার উপরই তরঙ্গের দূর গমন নির্ভর করে।

বৈদ্যুতিক সঙ্কেত ধরবার জন্য মার্কনী ব্রাঁলির Coherer-এর সাহায্য গ্রহণ ক'রলেন। Coherer-এর এক দোষ যে একবার বিদ্যুৎতরঙ্গ তার উপর পড়বার পরেও যন্ত্রের দানাগুলো সম্বদ্ধই থাকে, যতক্ষণ

না কোনরূপ আঘাত দিয়ে তাকে পুনরায় কার্য্যক্ষম ক'রে তোলা হয়। এই কারণে মার্কনী Coherer-এর সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ছোট হাতুড়ি যোগ ক'রে দেন। প্রেরক যন্ত্রে যেমন আকাশ-তারের আবশ্যক হয়, গ্রাহক যন্ত্রেও সেইরূপ উহার আবশ্যকতা আছে। যখনি কোন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ কোনও পরিচালকের উপর পতিত হয় তখন পরিচালকের মধ্যে ঠিক্ প্রেরিত তরঙ্গের অনুরূপ তরঙ্গ উৎপাদন করে। গ্রাহক যন্ত্রের আকাশ-তার পোপোফের পরীক্ষার ন্যায়, বিদ্যুৎ সঞ্চরে সাহায্য করে। মোটামুটিভাবে আকাশে ঢেউ তোলা ও কোনও উপায়ে সেই ঢেউ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করা বেতারের মূলসূত্র।

বিদ্যুৎ—কার্ত্তিক, ১৩৩৮] নাগার্জ্জুন

—

মীরকাসিমের শেষজীবন

বাংলার নবাবি হইতে বিতাড়িত মীরকাসিমের শেষজীবন কি ভাবে কাটিয়াছিল, ইতিহাস এতদিন সে-বিষয়ে একপ্রকার নীরব ছিল। পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের গ্রন্থ বাংলা-পাঠকদের পক্ষে মীরকাসিমের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা তথ্যের আকর। গ্রন্থশেষে তিনি বলিয়াছেন,—"মীরকাসিমের কি হইল? সে করুণ কাহিনী বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই।" সৌভাগ্যের বিষয়, এ অসুবিধা দূর হইয়াছে, ভারত গভর্ন্মেণ্টের দপ্তরখানার ফার্সী-বিভাগে রক্ষিত কতকগুলি কাগজপত্রের সাহায্যে মীরকাসিমের শেষ জীবনের ইতিহাস অনেকটা জানা যায়।...

পলাতক মীরকাসিম অনেক দিন অবধি আশা করিতেছিলেন যে ইংরেজদের বাংলা হইতে তাড়াইতে পারিবেন। রোহিলখণ্ডে গিয়া তিনি রোহিলাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে তাহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু শেষে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করাই সঙ্গত বলিয়া স্থির করিল। গোহদের রাণা এবং যাজীউদ্দীন প্রমুখ ছোটখাট সর্দ্দারেরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল। এমন কি মীরকাসিম মারাঠা এবং হিন্দুস্থানের অন্যান্য রাজন্যবর্গকে একত্র করিয়া ইংরেজদের বাংলা হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন।...

মীরকাসিমের সকল চেষ্টা একে একে ব্যর্থ হইল। নিজাম এবং আহমদ শাহ আবদালীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও কোনো ফল হইল না। শেষ উপায়-স্বরূপ তিনি দিল্লীযাত্রা করিলেন।...

মীরকাসিম দিল্লী শহরের বাহিরে বাসা লইয়া মোগল-বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ আলাপের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।...

অদৃষ্ট কাসিম আলীর বিরুদ্ধে। তাঁহার অনুচরেরা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল এবং সম্রাটের সহিত গোপনে সাক্ষাতের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল।...

একদা লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রভু মীরকাসিম যে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহা একজন সমসাময়িক সাহেবের পত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—

"কাসিম আলী খাঁ নানা বিপদের মধ্য দিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া অবশেষে পালোয়ালে বাস করিতেছে। পালোয়াল এখান হইতে বিশ ক্রোশ দূরে, আগ্রা হইতে দিল্লীর পথে অবস্থিত। সেখানে দুইটি জীর্ণ প্রাচীর-ঘেরা এক ছিন্ন তাঁবুর মধ্যে জনপঞ্চাশ অনুচরসহ কাসিম আলী অতি দুর্ভাগ্য জীবন যাপন করিতেছে; পাছে চোর-ডাকাত অর্থলোভে তাহাকে আক্রমণ করে, এইজন্য বাহিরে দরিদ্র এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত রূপে প্রতীয়মান হইবার তাহার যথেষ্ট চেষ্টা। আমার বিশ্বাস, গোপনে সে নজফ খাঁর নিকট হইতে সামান্য কিছু বৃত্তি পায়। তদ্দ্বারা, এবং মাঝে মাঝে নিজের কিছু কিছু জিনিষপত্র বেচিয়া সে জীবিকানির্ব্বাহ করে। তাহার কতকটা সময় নিজের খানা তৈরি করিতে (এ কাজে সে অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করে না) এবং চিঠিপত্র লিখিতে কাটিয়া যায়, এবং অবশিষ্ট সময় সে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় ব্যয় করে। নক্ষত্রের অবস্থান দেখিয়া সে নিজের কার্য্য নিয়মিত করে এবং তাহার স্থিরবিশ্বাস, নক্ষত্রের প্রভাব এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভের দ্বারা কোন-না-কোনদিন বিক্রমে এবং গৌরবে সে বাংলা অথবা দিল্লীর—যেখানকার হোক না কেন—মসনদে আরোহণ করিতে পারিবে। সেই মধুর আশায় সে থাকুক। ইহা অসম্ভব নয়, অবিলম্বে কেহ-না-কেহ হয়ত তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে তাহাকে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিবে। সহোদর কিংবা সম্পর্কে তাহার ভ্রাতা বু আলী খাঁ এখানে রহিয়াছে; অন্য কিছুর জন্য না-হোক, এ পর্য্যন্ত আমি এতটা উদাসীনের ভাব রাখিয়াছি যে আমার বিশ্বাস সে পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে সন্দেহ করে না।"

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাক্ষাৎলাভের জন্য মীরকাসিম আর একবার চেষ্টা করিলেন; তিনি বাদশাকে এই মর্ম্মে নিবেদনপত্র পাঠাইলেন:—

"রাজসিংহাসনের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপিত করিবার আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছে। আশ্রিত কয়েকজন অনুচরের বিশ্বাসঘাতকায় ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছে, সে কারণে দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। আজ দ্বাদশ বর্ষ সে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত, এবং আশ্রয় অনুসন্ধানকালে নবাব শুজা-উদ্দৌলার প্ররোচনায় নিজের বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যদের দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। রাজদরবারে কোনো কর্ম্ম তাহাকে দেওয়া হউক, ইহাই প্রার্থনা করে।" (আগষ্ট ১৭৭৬)

দিল্লীর সম্রাট এবং অযোধ্যার নবাব প্রমুখ স্বধর্ম্মিগণের এবং তাঁহার নিজের লোকজনের সাহায্যের উপর মীরকাসিম বড় বেশী নির্ভর করিয়াছিলেন। বিপদে কেহই সাহায্য করিল না দেখিয়া তাঁহার বুক ভাঙিয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া মীরকাসিম পুনরায় ইংরেজদের বন্ধুত্ব লাভ করিতে ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু সে-চেষ্টা বৃথা।

জন্মভূমি হইতে দূর-বিদেশে নির্ব্বাসিত—দুর্ব্বহ জীবন-ভারে পীড়িত মীরকাসিম এখন সকল জ্বালা-যন্ত্রণাহারী মৃত্যুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। রক্ত মাংসের দেহে আর কত সয়? কিছুদিন হইতে তিনি উদরী রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন—এই কালব্যাধি তাঁহাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর করিয়া দিল। ১৭৭৭ সালের ৭ই জুন তারিখে শাহজহানাবাদে (দিল্লীতে) তাঁহার আত্মা জীর্ণ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল।

বাংলার মুসলমান রাজত্বের শেষ তেজীয়ান্ পুরুষ অন্তর্ধান করিলেন। প্রজার স্বার্থ রক্ষা করিতে আত্মসুখের প্রতি যিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই, সেই প্রজাহিতৈষী নবাব সুদূর প্রবাসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বদেশের শিল্পবাণিজ্য সংরক্ষণ করিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি

দেশীয় বণিকগণকে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসায়ীর তুল্য অধিকার দিবার মানসে সকলেরই শুল্ক উঠাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। প্রজার মঙ্গল কামনা করিতে গিয়া অবশেষে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাসিম রাজ্য ধন মান—সকলই হারাইয়া পথের ভিখারী সাজিলেন। অদৃষ্ট অন্তিমকালেও তাঁহার প্রতি ক্রূর পরিহাস করিল। শেষ অঙ্গাবরণখানি বিক্রয় করিয়া তাঁহার শবাস্তরণ ক্রয় করা হইল।

ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

অসবর্ণ-বিবাহ

সেকালের শাস্ত্রে লোকাচারে দেখা যায়, হিন্দুদের আট রকমের বিবাহ প্রথা ছিল—আর্ষ, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, পৈশাচ, পাশব, আসুর ও রাক্ষস।...

প্রথম চারটীতে তিন রকম ভাগ ছিল, (১ম) সবর্ণ বিবাহ, (২য়) অনুলোম, আর (৩য়) প্রতিলোম। অনুলোম হচ্ছে—উচ্চবর্ণের পুরুষের নিম্ন বর্ণের মেয়েকে বিবাহ করা; আর প্রতিলোম হচ্ছে,- উচ্চ বর্ণের মেয়ের নিজের চেয়ে নিম্ন বর্ণের পাত্রকে বিবাহ করা। সবর্ণ মানে তো জানাই আছে, স্বজাতে বিয়ে।...এই সব বিবাহ-প্রথা কবে অবধি, অর্থাৎ কতদিন আগে পর্য্যন্ত, আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তা' ঠিক বলা যায় না...

সেকালে আমাদের দেশের বিবাহ প্রথা য়ুরোপের বা মুসলমান সমাজের মত না হোক্—নানাজাতি ও বর্ণভেদ সত্ত্বেও খুব বৃহৎ পরিসর নিয়ে প্রচলিত ছিল। সেকালের সংহিতা মতে যে সব বিবাহ সম্প্রদান বা কন্যাদান হিসাবে চল্‌ত, যেমন প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম, আর্ষ, তাতে অনুলোম-প্রতিলোম সবর্ণ-অসবর্ণ সমস্যা তোলা বড় একটা হ'ত না। ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়েরা কন্যাদান করেছেন, ব্রাহ্মণকন্যা অন্যজাতিকে বরণ করেছেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহে তো নানাজাতের পাত্র পাত্রীর স্বমতের কথা। আর যদিও সবর্ণ-বিবাহ শাস্ত্রের মতে প্রশস্ত, কিন্তু অসবর্ণকেও অসিদ্ধ তাঁরা বলতেন না। প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম, আর্ষ, **এই** যে কটী বিবাহ-প্রথা, যা মা বাপ স্বজন গুরুজনের মতে হ'ত,—তাতেও সবর্ণা শ্রেষ্ঠা; কিন্তু অসবর্ণও সিদ্ধ।...

প্রাচীনকালে সংহিতাকার শাস্ত্রকারদের মতে যে আট রকমের বিবাহ প্রথা ছিল, তাতে শেষ চার রকম অর্থাৎ আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ ও পাশব বিবাহ অনেকটা বোধ হয় নিন্দিত শ্রেণীর সংখ্যা যাতে অতিরিক্ত না হয়,—পুরুষের প্রবলতায় বা অনাচারে—তারই জন্য। ঐ বিবাহ-প্রথা যদি প্রচলিত থাক্‌ত, তাহলে যে সমস্ত হৃতা অপহৃতা মেয়ের বিবরণ আমরা পড়ি, আর তাদের ভবিষ্যৎ জীবন যে কি হবে নিশ্চয় জানি, তার ইতিহাস অন্য রকম হ'ত মনে হয়।...

যাঁরা শাস্ত্রসঙ্গত শাস্ত্রানুগত করে, প্রাচীন পুরাণ উদ্ধৃত করে সব বিষয় ভাবতে, সংস্কার আলোচনা করতে ভালবাসেন, তাঁরা একটু খুঁড়চেড়ে দেখলেই সবই দেখতে পাবেন। আর যাঁরা সাময়িক লোকাচারকে শাস্ত্র মনে করে অনেক রকম কথা বলেন, তাঁরাও নানারকম প্রথা-পদ্ধতি দেখবেন। কিন্তু যাঁরা নিজেদের মতে, বিবেচনায় আস্থা রাখেন, যুগপরিবর্ত্তনকে অস্বীকার করেন না, তাঁরাও কোনো পথ নিতে পারেন না। তাঁদের ভাবা উচিত, যুগে যুগে লোকাচার যা নিষেধ করে, পরবর্ত্তীযুগ সেইটেই প্রতিপাল্য মনে করে। কিন্তু অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রতিযুগেই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। আর সেইটেই হ'ল আসল কথা; প্রাণের জীবনের পরিচয়।

যদি সমাজ অথবা সমষ্টি বা বহুজনমত বিবাহ বিষয়ে সংস্কার করতে চান, তা হলে শাস্ত্রমতে যাকে অনুলোম ও প্রতিলোম বলে সেই প্রথাই নেওয়া ভাল। কেন-না অসবর্ণ সম-আচার-ব্যবহার সম্পন্ন একপ্রদেশবাসীতে বিবাহসম্পর্ক মনে হয়, অভ্যাস আচার, সংস্কারের দিক্ থেকে ভাল এবং সুবিধার। প্রীতির কথা বল্‌লাম না কেন-না প্রীতি বা পূর্ব্বরাগ স্বদেশ বিদেশ স্বভাবী অন্তভাবী না বাছতে পারে; এবং প্রীতি চিরন্তনী, সে থাক্‌বেই, বাধাও না মানতে পারে মিলনাকাঙ্ক্ষায়।

ভারতবর্ষের সমস্ত জাতকে যদি রাজনীতিক অভিসন্ধিতে এক করে বাঁধ্‌তে হয়—তো সেটা হিন্দু মুসলমানের বিবাহ বন্ধনে সম্ভবও নয়, প্রয়োজনীয়ও তত নয়, যতটা সম্ভব সবর্ণ-অসবর্ণ সম আচার-সম্পন্ন বিবাহে। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ আর অন্য উচ্চবর্ণে এত ভেদ আর নেই যে, বৈশ্য মহাত্মাজী, বা কায়স্থ বিবেকানন্দ যে কোনো ব্রাহ্মণের প্রণম্য নমস্য না হতে পারেন। রাজনৈতিক লাভের দিক দিয়ে হিন্দু মুসলমানে বৈবাহিক সম্বন্ধ হ'লে, যে অদ্ভুত ভেদনৈতিক্ ভেদসমস্যার জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে ওঠা গেছে, হয়ত্রো সেটার মীমাংসা হয়। কিন্তু মুসলমানী স্ত্রী ও হিন্দুস্বামী অথবা মুসলমান স্বামী ও হিন্দু স্ত্রী, 'গোবর গঙ্গাজল' 'মোগলাই খানা' 'পূজা আহ্নিক' 'নেমাজ ওজুতে' খাপ খাইয়ে নিতে পরস্পরকে পারবেন বলে বিশেষ সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয় একেবারে অত চরমপন্থায় না গিয়ে, আপাততঃ একপ্রদেশবাসী অসবর্ণ বা বিভিন্ন প্রদেশীয় সবর্ণ, অথবা সম-আচারশিক্ষা-সম্পন্ন জাতে বৈবাহিক সম্বন্ধ চলন হলে ঐক্যও হতে পারে এবং মহত্তর বৃহত্তর একহিন্দু জাতিও সৃষ্টি হতে পারে। আর কথা এই যে, আমরা ছোট সবর্ণ-অসবর্ণ ভাঙ্‌তে পারছি না—একধর্ম্ম এক পৌরাণিক জাতি সংস্কার সত্ত্বেও, সেক্ষেত্রে হিন্দু হিন্দুর আর মুসলমানের সমস্ত পারিপার্শ্বিককে, সংস্কারকে, স্বভাবকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন আশা করাই যেন দুরাশা মনে হয়। সংস্কার উভয় পক্ষেরই দৃঢ়মূল।

কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ আর সবর্ণ বিয়েতে সে বাধা নেই। তাছাড়া চরিত্র, পৌরুষ, স্বাস্থ্য, শ্রী বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যকুশলতা হিসেবে এক এক দেশের এক একটা বিশিষ্টতা আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভাগে যা নেই, উত্তর-পশ্চিমবাসীর হয়ত তা আছে; আবার উত্তর-পশ্চিমবাসীর যে-সব গুণের অভাব আছে, পূর্ব্ব দক্ষিণবাসীর হয়ত তা অনেকটা আছে; সেটা বিবাহসম্পর্কে বংশানুসর হতে পারে।

জয়শ্রী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

—

কবি নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্ত্তী

মেদিনীপুর জেলার কংসাবতী নদীর যে-শাখা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া তমোলুক মহকুমার কাশীজোড়া পরগণার সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রূপনারায়ণ নদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে সেই শাখার দক্ষিণ তীরস্থ থয়রা-কানাইচক গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত কবি নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্ত্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশীজোড়া-ধিপতি রাজা রাজনারায়ণের সময়ে (১৭৫৬-১৭৭০ খ্রীঃ অব্দ) জীবিত ছিলেন। তিনি উক্ত কাশীজোড়ারাজ রাজনারায়ণের সভাসদ

ছিলেন। রাজসভায় তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং রাজাও তাঁহাকে অনেক নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। কাশীজোড়া রাজবংশের অষ্টমরাজা নরনারায়ণ ১৭৪১ খ্রীঃ অব্দে রাজপদ লাভ করেন। ১৭৫৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র রাজনারায়ণ রাজা হন এবং ১৭৭০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনিই ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথজীউর মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক রঘুনাথবাড়ী গ্রাম প্রকাশ করিয়া তথায় মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করেন এবং হরিদাস বাবাজী নামক এক বৈষ্ণবকে মহন্তপদে অভিষিক্ত করিয়া কতকটা জমিদারী দান করেন। কবি তাঁহার রচিত শীতলা-মঙ্গল-নামাতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"কাশীজোড়া ষাটি পাড়া অতি বিচক্ষণ
রাম তুল্য রাজা তাহে রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ কবি কয় পয়রায় ঘর।
বিদ্যাবন্ত নয় কিন্তু শীতলা কিঙ্কর॥"

"শীতলার পদতলে, কবি নিত্যানন্দ বলে,
সাকিন কানাইচকে ঘর॥"

"ভণে দ্বিজ নিত্যানন্দ গীত মধুক্ষর
কাশীজোড়া সাকিনে কানাইচকে ঘর॥

"শ্রীকাশীজোড়াতে, হরশঙ্করেতে,
রাজনারায়ণ রায়।
তস্য পোষ্য জনে, নিত্যানন্দ ভণে
পশ্চিম শ্মশান গায়।"

"কাশীজোড়া মহাস্থান, মহারাজা নরনারায়ণ
রাজনারায়ণ তাহার নন্দন।
তাহার সভায় রৈয়া শীতলা-আদেশ পাইয়া
দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষণ।"

সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ভবানী মিশ্র কবির বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন। ভবানী মিশ্রের পুত্র মনোহর মিশ্র, মনোহর মিশ্রের পুত্র চিরঞ্জীব মিশ্র, চিরঞ্জীব মিশ্রের পুত্র রাধাকান্ত মিশ্র, রাধাকান্ত মিশ্রের পুত্র চৈতন্য মিশ্র। এই চৈতন্য মিশ্র কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

কবি যে সমস্ত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শীতলামঙ্গল ইন্দ্রপূজা, সীতাপূজা পাণ্ডবপূজা, বিরাটপূজা লক্ষ্মীমঙ্গল, কালুরায়ের গীত ইত্যাদির ছিন্ন হস্তলিপি দৃষ্ট হয়। তাঁহার কোন কোন পুঁথি আবার তালপত্রে উৎকলাক্ষরে লিখিত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এদেশে ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী ভাষার প্রবলতা ছিল না। তিনি নিজ দক্ষতানুসারে বঙ্গভাষায় গ্রাম্য ভাষাদি প্রয়োগ করিয়া যাহাতে তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি তৎকালোচিত রুচিকর হয়, সেইরূপ করিয়া প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাংলা ভাষা পরিমার্জ্জিত হয় নাই; বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল। ফার্সি, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। এখনও মেদিনীপুর অঞ্চলে ঐ সকল শব্দের যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলন আছে। এই জন্য ইঁহার রচিত গ্রন্থাদিতে অনেক ফার্সী হিন্দী ও উর্দ্দু কথা পাওয়া যায়। অধিকন্তু এ সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতে মেদিনীপুর অঞ্চলে উড়িয়া ভাষার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এই জন্য ইঁহার গ্রন্থমধ্যে উড়িয়া শব্দও দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে; উহা গ্রাম্যতা দোষে অপকৃষ্ট না হইয়া উৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রযুক্ত গ্রাম্য শব্দগুলি প্রযোক্তব্য স্থলে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে ও পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে।

এই অঞ্চলে এমন গ্রাম অতি অল্পই আছে, যে-গ্রামে শীতলা দেবীর মন্দির নাই। গ্রামবাসিগণ শারদীয়া পূজা উপলক্ষে, বাসন্তী পূজা উপলক্ষে ও বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে বিবাহ, অন্নপ্রাশনাদি অনুষ্ঠানে মহাসমারোহের সহিত শীতলা দেবীর পূজার আয়োজন করিয়া থাকেন। এই সব অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শীতলার গানের ব্যবস্থাও অদ্যাপি হইয়া থাকে। এই সমস্ত পাঁচালী-গায়কদের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি অদ্যাবধি কবি নিত্যানন্দের নাম করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মস্তক অবনত না করেন।

ইঙ্গিত—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্তরায়



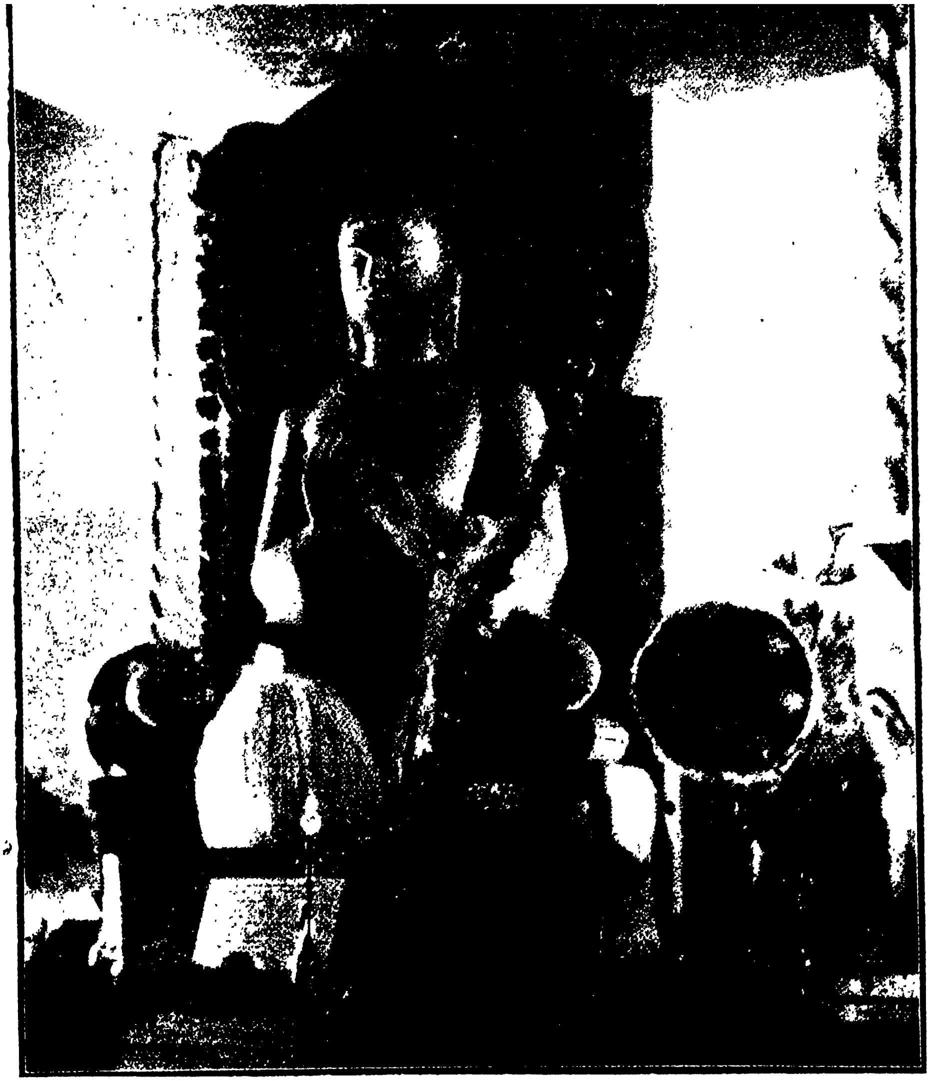
সারনাথে নূতন বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা

শ্রীশিবনারায়ণ সেন

যে নিগূঢ় সত্য যুগ যুগ ধরিয়া আবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় অধিকারীর মধ্যে সেই সত্যকে সাধারণের সমক্ষে প্রথম প্রকাশ করিলেন কে? গৌতম বুদ্ধ। সেই শাক্যসিংহ বছরের পর বছর কঠোর তপস্যা করিয়া যখন বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন তখন তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত মহাসত্য "মজ্‌ঝিম পাটিপদ" প্রচার করিতে আসিলেন **"ইসিপতনে"**—আধুনিক যুগের **সারনাথে**। এখানে আসিয়া তিনি পাইলেন পাঁচজন আয়ুষ্মানকে যাঁহারা প্রথম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রথম প্রচার শুনিলেন। এইস্থানেই তিনি প্রথম প্রচার করিলেন—"মধ্যমপথই শ্রেষ্ঠ পথ।" এই স্থানেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার ধর্ম্মচক্রে গতি সংযোজনা করিলেন—যে গতি আজও অক্ষয়, অমর। এই অমেয় প্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিতে শত শত যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সংসার-মোহ ত্যাগ করিয়া "পত্তচীবর"কে চিরসাথী করিয়া জগতের বুকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহাদের জয়যাত্রার পথে অনুপ্রেরণা লইয়া আসিল "তথাগতের" সেই অমূল্য বাণী "চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুসসানাং। দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদি কল্লাণং মজ্‌ঝে কল্লাণং পরিয়োসান কল্লাণং সাথথং সব্যঞ্‌ঞং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেথ।" (মহাভাগ্য বিনয় পিটক)

বৌদ্ধ ইতিহাসে "ইসিপতন মিগদায়" প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে দুই কারণে। এই সেই স্থান যেখানে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে "কস্‌সপ" বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধ প্রথম তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। আবার এই স্থান জৈনদের একটি তীর্থস্থানও বটে। কারণ একাদশ তীর্থঙ্কর "অমরনাথ" এই স্থানেই নাকি তাঁহার তীর্থঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "ইসিপতন" ও "মিগদায়" সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন এইস্থান ঋষিদিগের পত্তন বা বাসস্থান ছিল। আবার কেহ বলেন, "পচ্চেকবুদ্ধ"দিগের শরীর পতিত হইয়াছিল বলিয়াই এই স্থানের নাম ঋষিপতন বা ইসিপতন (পালি)। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'মহাবাস্তু' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, একদা পাঁচ শত "পচ্চেকবুদ্ধ" (অর্থাৎ যাঁহারা অপরের সাহায্য না লইয়াই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন কিন্তু অপরকে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সাহায্য করিতে অসমর্থ) তাঁহাদের স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্য আকাশমার্গে উত্থিত হইলেন এবং নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর তাঁহাদের দেহসমুদয় এই বনে পতিত হইল বলিয়া এই স্থানের নাম ঋষিপতন বা ইসিপতন। "মৃগদাব" বা "মিগদায়" (পালি) এই সম্বন্ধে "সারঙ্গ মৃগ জাতকে" যাহা লেখা আছে তাহা সংক্ষেপে এই:—

গৌতমবুদ্ধ তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বারাণসীর অদূরে সারঙ্গ নামধারী মৃগরাজ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় কাশীনরেশ ব্রহ্মদত্ত প্রত্যহ স্বীয় আহারের জন্য হরিণ শিকার করিতে আসিয়া এই বনে অযথা মৃগ নষ্ট করিতেন। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব মৃগরাজ রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, অদ্য হইতে প্রত্যহ স্বেচ্ছায় একটি মৃগ সূপকার সান্নিধ্যে আত্মবলি দিতে যাইবে। ইহাতে রাজা সম্মত হইলেন। একদিন কোন একটি গর্ভবতী মৃগীর আত্মবলিদানের পালা উপস্থিত হইলে মৃগী মৃগরাজের সম্মুখে এই আবেদন করিলেন যে, অদ্য আমি গেলে অযথা আমার গর্ভস্থ সন্তান নিধনপ্রাপ্ত হইবে। ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব স্বয়ং সূপকার সমীপে আগত হইলে রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অবগত হইলে পর মৃগহিংসা পরিত্যাগ করিলেন এবং এই বন মৃগদিগকে স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়াইবার জন্য দান করিলেন। সেই



সারনাথের বিহারে স্থাপিত নূতন বুদ্ধ মূর্ত্তি

হইতে এই বনের নাম "মৃগদাব" বা "মিগদায়"। সারনাথ সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক মতবাদ আছে। অনেকে বলেন বর্ত্তমান "সারঙ্গনাথ" নামক শিবলিঙ্গের নাম হইতেই এই গ্রামের নাম "সারনাথ" হইয়াছে। মন্দিরটি বেশী দিনের পুরাতন নয়।

সে যাহাই হউক আমরা দেখিতে পাই ত্রিপিটকের অন্তর্গত "দীঘনিকায়ের" মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তে এইরূপ লিখিত আছে—একদা এক বৈশাখী পূর্ণিমারাত্রে তথাগত তাঁহার উপস্থায়ক আনন্দকে বলিতেছেন—অদ্য রাত্রির শেষযামে আমি নির্ব্বাণ লাভ করিব, তোমার প্রতি আমার শেষ উপদেশ এই :—

হে আনন্দ, শ্রদ্ধাবানদের জন্য চারটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। প্রথম, তথাগতের জন্মস্থান (লুম্বিনী), দ্বিতীয় বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির স্থান (বুদ্ধগয়া), তৃতীয় প্রথম প্রচারের স্থান

(সারনাথ), চতুর্থ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তির স্থান (কুশিনগর)।

এইরূপ নানা কারণে সারনাথ বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। "পিয়বগ্গের" একটি গাথা হইতে জানা যায় যে "নন্দিয়" নামে কোন এক শ্রেষ্ঠী প্রথম এই স্থানে বিহার নির্ম্মাণ করান। ইনি বুদ্ধের সমসাময়িক। তৎপরেই বোধ হয় আসিলেন মহারাজ ধর্ম্মাশোক (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৫০)। সুঙ্গ এবং কুষান রাজারাও আসিয়াছিলেন। সবাই যাঁর যাঁর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ফা হীয়েন সারনাথে আসিয়া চারিটি বড় স্তূপ এবং দুটি বিহার দেখতে পাইয়াছিলেন। এই সময়ে গুপ্তরাজেরাও আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্বেত হূনদের নেতা মিহিরকুল সারনাথের অনেক বিপত্তি সাধন করে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সারনাথে প্রায় ৩০টি বিহার এবং ১৫০০ দেড় হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিতে পান। তাঁহারা সবাই "থেরবাদ" সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আর দেখিয়াছিলেন প্রায় শতাধিক হিন্দু দেবদেবীর মন্দির। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘোরী এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে কুতুবুদ্দীন আসিলেন এক ধ্বংসের খেলা খেলিতে। শুধু দুটি কি তিনটি স্তূপ ছাড়া তাঁহারা সব ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেলেন। মহম্মদ ঘোরীর পরে এবং কুতুবুদ্দীনের কিছুদিন আগে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বৌদ্ধ রাণী কুমার দেবী "ধর্ম্মচক্রজিন বিহার" এবং একটি সুরঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করান। ইহাই সারনাথের শেষ বৌদ্ধকীর্ত্তি। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশী-নরেশ চেৎ সিংহের দেওয়ান জগৎ সিংহ, মহারাজ অশোক নির্ম্মিত ধর্ম্মরাজিক স্তূপটি ধ্বংস করিয়া সেই মালমসলাদ্বারা "জগৎগঞ্জ" নির্ম্মাণ করেন। এই স্তূপটি ধ্বংস করার সময় মনুষ্যাস্থি পরিপূর্ণ একটি প্রস্তরাধার পাওয়া যায়। জগৎ সিংহ এই প্রস্তরাধারটি গঙ্গা বক্ষে নিক্ষেপ করেন। অনেকে ঐ অস্থিকে পবিত্র বুদ্ধ ধাতু বলিয়া সন্দেহ করেন। এইরূপে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্ব্বোধদের অত্যাচারে সারনাথ শ্মশানে পরিণত হয় এবং কালে মৃত্তিকাবৃত হইয়া পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হয় এবং বন্যপশু-কলরব-মুখরিত হইয়া উঠে। বৌদ্ধ ধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে ভারত হইতে প্রায় নির্ব্বাসনলাভ করে। রাণী কুমারদেবীর পর এইরূপ প্রায় অষ্ট শতাব্দী ধরিয়া সমস্তই কালের গর্ভে নিহিত থাকে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মেকেঞ্জি, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্যর



বিহার-তোরণের সম্মুখে মিছিল

আলেক্জান্দার ক্যানিংহাম এবং তৎপরে মেজর কিটো ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত সারনাথে খননকার্য্য করিয়া নানাবিধ মূর্ত্তি, বিহারের ভগ্নাবশেষ প্রভৃতির পুনরুদ্ধার করেন। তৎপরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নিয়মিতরূপে খননকার্য্য আরম্ভ করেন এবং প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত এবং একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে হইতে সারনাথে পুনরায় অল্প অল্প জনসমাগম হইতে লাগিল। খননকার্য্য আরম্ভ হইবার পরেই ইতিহাস-রসগ্রাহীরা কেহ কেহ সারনাথের লুপ্ত গৌরব দেখিতে আসিতেন।

বৌদ্ধস্মৃতি এবং অর্ব্বাচীনের ধ্বংসের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে,—(১) "চৌখণ্ডি স্তূপ"। অনেকের মতে এই স্থানেই প্রথমে পাঁচজন ভিক্ষুর সঙ্গে বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ হয়। ইহার নির্ম্মাতার নাম এবং তারিখ এখনও জানা যায় নি। ১৫৮৮ সালে বাদশাহ আকবর এই স্তূপের শীর্ষদেশে একটি অষ্টকোণাকার স্তম্ভ নির্ম্মাণ করান। (২) "ধামেক স্তূপ"—অনেকে বলেন এইস্থানেই বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়কে ভবিষ্যৎ বুদ্ধত্বের আশ্বাসবাণী

দান করিয়াছিলেন এবং পরে গুপ্তরাজেরা ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়ের সম্মানার্থ এই স্তূপটি নির্ম্মাণ করান। (৩) অশোকস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ। এই স্তম্ভটি অশোক প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার গাত্রে এখনও অশোকের আদেশ



মিছিলের এক অংশ

ব্রাহ্মী-লিপিতে খোদিত আছে। সমস্ত স্তম্ভটি প্রায় ৩৬ ফুট উঁচু ছিল এবং একখানা পাথর হইতে খোদাই করা, ইহার পালিশ এখনও মৌর্য্যরাজদের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

(৪) ভিক্ষু-আবাস এবং বুদ্ধ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ইহা ছাড়া জৈনদেরও একটি মন্দির আছে, তবে সেটি আধুনিক।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তীর্থাভিলাষী হইয়া সুদূর লঙ্কাদ্বীপ হইতে এক তরুণ বৌদ্ধ পবিত্রস্থান "ইসিপতন মিগদায়" দর্শন করিতে আগমন করেন। বৌদ্ধতীর্থের একান্ত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যুবার মনে যে বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই বেদনার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তরুণ তাপস শপথ গ্রহণ করিলেন, "সারনাথের লুপ্ত গৌরব আবার ফিরাইয়া আনিব।" এই কঠিন প্রতিজ্ঞাপালন করিবার জন্য তিনি তাঁর জীবন পণ করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিয়াছিলেন, যেস্থানে একদিন শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকার আবাস ছিল, সেই স্থান শূকর এবং তাহার পালকদিগের আবাসে পরিণত হইয়াছে। এই তরুণ সিংহল-নিবাসী ধনকুবের ডন্ ক্যারোলেস হেবতিরত্নের পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ অনাগারিক ধর্ম্মপাল। ইনি ব্রহ্মচারী অবস্থায় এই নাম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল ডন্ ডেভিড হেবতিরত্ন। ইঁহারা খাঁটি সিংহলী। ডচ্‌দের প্রভুত্বকালে কারণবশতঃ সিংহলী-দিগকে ইউরোপীয় নাম লইতে হইত। ১৮৯১ সালের



সারনাথের ধ্বংসাবশেষ—মধ্যস্থলে ধামেক স্তূপ

জানুয়ারি মাসে তিনি সারনাথে আসিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া গিয়া সেই বৎসরেই মে মাসে কলিকাতা মহা-নগরীতে "ভারতবর্ষে বুদ্ধধর্ম্মের প্রচার, বৌদ্ধসাহিত্যের অনুবাদ, অজ্ঞ গ্রামবাসীদিগকে স্বাস্থ্য, গৃহশিল্প, প্রাথমিক শিক্ষা, বৌদ্ধশিল্পকলার পুনরুদ্ধার, অনাথালয় স্থাপন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, প্রচারক শিক্ষাকেন্দ্র বৌদ্ধবিহার, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রচারক প্রেরণ—ইত্যাদি অন্যান্য মহৎ উদ্দেশ্য" লইয়া তিনি মহাবোধি সোসাইটি নামে এক সমিতি স্থাপন করিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে "দি মহাবোধি" নামে ইংরাজী ভাষায় একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি "পার্লে-মেণ্ট অব রিলিজ্যনে" যোগদান করিবার জন্য আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময়ে

তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। আমেরিকায় তিনি মিসেস্ মে ফষ্টার নাম্নী এক ধনী মহিলার সঙ্গে পরিচিত হন। উত্তরকালে তিনি তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি মহাবোধি সোসাইটিকে দান করেন। এখন তিনি স্বর্গগতা। ১৯০১ সালে ধর্ম্মপাল মহাশয় পুনরায় সারনাথে আসেন এবং তিন বিঘা জমি ক্রয় করিয়া একটি আবাস নির্ম্মাণ করান। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী ফষ্টার কর্তৃক প্রেরিত অর্থদ্বারা সারনাথে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেন। এইবার সূত্রপাত দেখা দিল। ক্রমে ক্রমে তিনি কলিকাতায় একটি বিহার-নির্ম্মাণে সমর্থ হইলেন, এইসঙ্গে তিনি গয়া, বুদ্ধগয়া এবং সারনাথে যাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বারকয়েক ইউরোপ এবং আমেরিকা গমন করেন। তিনি শেষবার ১৯২৫ সালে ইংলণ্ডে একটি বৌদ্ধমিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংলণ্ডে প্রথম বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া জমিও ক্রয় করেন। এখনও সে বিহার নিৰ্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় নাই।

১৯২২ সালে তিনি তাঁর যৌবনের স্বপ্নকে রূপ দিবার প্রয়াসে সারনাথে এক বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠাকল্পে যুক্ত-প্রদেশের তদানীন্তন গভর্ণর দ্বারা ভিত্তি স্থাপনা করান। সেদিন নব বৌদ্ধ ইতিহাসের এক অভিনব সূচনা। ভারত-সরকার এই সাধু প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ৪০বিঘা জমি বিনামূল্যে মহাবোধি সোসাইটিকে দান করেন। ভগবান বুদ্ধদেব যে প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন, শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাহার নাম ছিল "মূলগন্ধকুটি"। এইজন্য এই নবকল্পিত বিহারের নাম "মূলগন্ধকুটি" রাখা হইল। অনেক দুর্যোগ, অভাব অনটনের মধ্যে ১৯৩০ সালে এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। মন্দিরের প্রধান চূড়াটি ১১০ ফিট উঁচু। মন্দির মধ্যস্থিত দেওয়ালসমূহে বুদ্ধের জীবনী চিত্রিত হইবে। এই মন্দির-নির্ম্মাণে প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে এবং অধিকাংশ টাকাই চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রধান দেশ এবং অন্যান্য স্থানের বুদ্ধ ভক্তদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। চাঁদার পরিমাণ উর্দ্ধে ত্রিশ সহস্র হইতে নিম্নে এক আনা পর্য্যন্ত আছে। সবাই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। মন্দিরের বাহ্য উপাদান প্রস্তর বটে কিন্তু ফলতঃ ইহা ভক্তির দেউল। আধুনিক বৌদ্ধ ইতিহাসে ইহাই "শতক ভক্ত দীনের দান।"

গত ১১ই নভেম্বর ১৯৩১ সালে মূলগন্ধকুটি বিহারের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। তিন দিন পর্য্যন্ত



মিছিলের আর একটি অংশ

এই উৎসব স্থায়ী ছিল। উৎসবের কার্য্যবিবরণী যথাক্রমে :—

প্রথম দিবস·· পবিত্র বুদ্ধধাতু মিছিল করিয়া মন্দিরে আনয়ন ও স্থাপনা এবং ভিক্ষুগণ কর্তৃক মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, পরে সভা।

দ্বিতীয় দিবস···অনুরাধাপুর (সিংহল) হইতে আনীত বোধিদ্রুম রোপণ এবং বৌদ্ধসম্মেলন।

তৃতীয় দিবস···"ভারত বৌদ্ধধর্ম্মের ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎপরে জলযোগ এবং লামা নৃত্য।

সিংহল, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, লণ্ডন, জার্ম্মানী এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় ৯০০ বৌদ্ধ এবং কতিপয় অবৌদ্ধ যাত্রী এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ আহার এবং বাসস্থানের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাসস্থানের জন্য তাঁবুর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কাশীনরেশের সৌজন্যে এই সকল তাঁবু সংগ্রহ করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। যাত্রীদিগকে

বাসস্থান বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছিল—আহারের ব্যবস্থার জন্য বেনারসের কোন এক হোটেলওয়ালা হোটেল খুলিয়াছিলেন এবং যাত্রীরা ইচ্ছামত খরচ করিয়া নিরামিষ খাদ্য পাইতেন। অধিকাংশ যাত্রীই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইতেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ বেশ নিপুণতার সহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা এবং বদান্যতা সকলকেই প্রীত করিয়াছে। বারাণসী-নিবাসী হিন্দুরা সকলে সহযোগিতা করিয়াছিলেন বলিয়াই সারনাথের মত



অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহাশয় বিহারে গমন করিতেছেন

গণ্ডগ্রামে সর্ব্ববিধ সুখ-সুবিধার আয়োজন সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহা হিন্দুসমাজের উদারতার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কতিপয় মুসলমান এবং জৈন ভদ্রলোকও এই অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন। "এইরূপ সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে" বুদ্ধমূর্ত্তির অভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

যাত্রীসমাগম সুরু হইয়াছিল ৮ই নভেম্বর হইতে এবং ১০ই তারিখ রাত্রে সারনাথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। গণ্ডগ্রাম সারনাথ শহরের রূপ ধারণ করিল। দোকান, হোটেল, ডাক্তারখানা, পোষ্ট আপিস, গ্যাসের বাতি, কলের জল, গাড়ি-ঘোড়া, কিছুরই অভাব ছিল না। এই ঐতিহাসিক উৎসবে যোগদান করিতে ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছিলেন লণ্ডনের মিঃ ব্রাউটন, জার্ম্মেনী হইতে ব্রহ্মচারী গোবিন্দ এবং তাঁর মাতা, চীন দেশীয় চারজন ভিক্ষু, দুইজন জাপানী মহিলা এবং একজন জাপানী ভিক্ষু, সিংহল দেশ হইতে আসিছিলেন প্রায় ৪০০ জন যাত্রী এবং ৮০ জন ভিক্ষু। তিব্বত হইতে আসিয়াছিলেন প্রায় ১৬ জন লামা এবং ১৫ জন স্ত্রীপুরুষ। সিকিম হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ১০ জন। এতদ্ব্যতীত নেপাল, ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম হইতে শত শত যাত্রী এবং ভিক্ষুরা আসিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ভিক্ষুদের জন্য বিনামূল্যে আহারের সংস্থান করিয়াছিলেন। সমস্ত রকম সম্ভবপর সুখ-সুবিধার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন।

হিন্দুমহাসভা, বৃহত্তর ভারত পরিষদ, ভাণ্ডারকর গবেষণা মন্দির, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন।

উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিল, পৃথিবীর প্রায় সব দেশই। তন্মধ্যে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, নিকোলাস রয়েরিক্ (বিখ্যাত বৌদ্ধ সাহিত্য প্রণেতা), জর্জ্জ গ্রীম্, লর্ড রোনাল্ডসে (বাংলার ভূতপূর্ব্ব শাসন-কর্ত্তা), বর্ত্তমান বড়লাট এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

১১ই নভেম্বর সকাল হইতেই কর্ম্মকর্ত্তাদের ব্যস্ততায় এবং যাত্রীদের কলকোলাহলে সারনাথ মুখরিত হইয়া উঠিল। বেলা ১২টা হইতে শহর হইতে "ঝাঁকে ঝাঁকে লোক পক্ষী সমান" সমাগত হইতে লাগিল। সারনাথ এক অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। বেলা দুইটার সময় কার্য্য-সূচী অনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ হইল।

প্রথমে সারনাথের জাদুঘর প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহানি মহাশয় ভারত-সরকারের তরফ হইতে প্রদত্ত পবিত্র বুদ্ধাস্থি মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি স্বনামধন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক অনারেবল জাষ্টিস্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদান করেন এবং বুদ্ধাস্থির ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই অস্থি তক্ষশিলা খননের সময় একটি মন্দিরের ভিত্তি হইতে পাওয়া যায়। প্রস্তরাধারের মধ্যস্থিত একখণ্ড রৌপ্য-

পাত্রে এইরূপ লেখা দেখিতে পাওয়া যায় যে মহারাজা কনিষ্কের স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া এই পবিত্র বুদ্ধাস্থি এই মন্দিরে স্থাপন করা হয়। সন যাহা লেখা ছিল তাহা ইংরাজী মতে ৭৯ খৃষ্টাব্দে। কথিত আছে মহারাজা অশোক বিভিন্ন চৈত্য এবং স্তুপ খনন করিয়া এই সকল অস্থির পুনরুদ্ধার করেন এবং নবনির্ম্মিত চৈত্য মধ্যে স্থাপনা করেন। তৎপরে মহারাজা কনিষ্ক পুনরায় খনন করিয়া নবনির্ম্মিত স্তুপমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন।

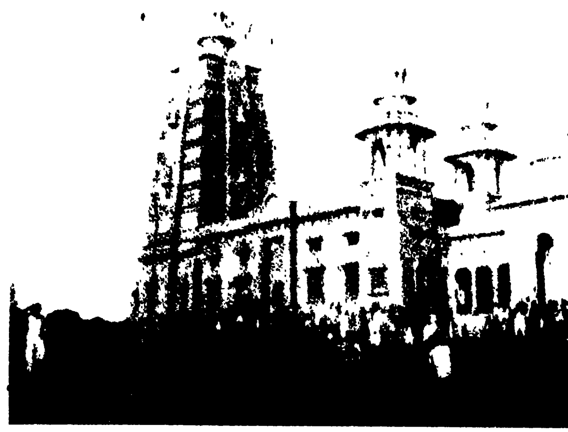
তৎপরে সিংহল-নিবাসী ধনী যুবক রাজসিংহ হেবতিরত্ন সভাপতির নিকট হইতে পবিত্র অস্থি প্রাপ্ত হইয়া হস্তীতে আরোহণ করেন এবং মিছিল করিয়া মন্দিরাভিমুখে রওনা হন। মিছিলের প্রথমেই ছিলেন সর্দ্দার বাহাদুর লাডেন্ লা, তৎপরে লামা বাদ্য, আশা, বল্লম ইত্যাদি এবং সজ্জিত হস্তী। মিছিল মন্দিরকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রধান ফটকে উপস্থিত হইলে ভিক্ষু-সঙ্ঘের নেতা মহানায়ক রত্নসার ভিক্ষু বুদ্ধাস্থি গ্রহণপূর্ব্বক মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করতঃ মন্দির বেদীতে বুদ্ধাস্থি স্থাপন করেন। চতুর্দ্দিক 'সাধু, সাধু' ধ্বনিতে নিনাদিত হইতে লাগিল, ভিক্ষুরা 'জয়মঙ্গল গাথা' পাঠ করিতে লাগিলেন। দীপ ও ধূপে মন্দির-প্রকোষ্ঠ আলোকিত ও সুগন্ধিত হইয়া উঠিল। যে মূর্ত্তিটি মন্দিরমধ্যে স্থাপনা করা হইয়াছে তাহা জয়পুর-নিবাসী কোন এক ভাস্কর কৃত। মূর্ত্তিটি বর্ত্তমান



তিব্বতীয় মিছিল

সারনাথ জাদুঘরে রক্ষিত গুপ্ত রাজাদের কৃত বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন মূর্ত্তির অনুকরণে করা হইয়াছে।

তৎপরে সবাই সভাস্থলে আসিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় সভামণ্ডপটি লোকানুপাতে অতি ছোট



সারনাথের নূতন বিহার

হইয়াছিল এবং স্থানাভাব হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য সভায় বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। উৎসুক নরনারীর দল, মণ্ডপ বাহিরে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সভার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সভামণ্ডপটি বেশ সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল।

সভাপতি হইলেন মহানায়ক রত্নসার ভিক্ষু, তিনি ইংরেজী ভাষা জানেন না বলিয়া সভা পরিচালনা করিলেন ভিক্ষু নারদ। সভার প্রারম্ভে বৌদ্ধ রীতি অনুযায়ী পঞ্চশীল পঠিত হইলে পর থিওসফিকেল সোসাইটির বালিকাদিগের দ্বারা একটি সঙ্গীত গীত হইল। তৎপরে বেনারসের কালেক্টার যুক্তপ্রদেশের শাসক মহোদয় কর্ত্তৃক উপহৃত একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত আমলকী ফল সমিতির সম্পাদককে হস্তান্তরিত করেন। এইবার অভ্যর্থনার পালা সুরু হইল। মহাবোধি সমিতির পক্ষ হইতে ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীদেবমিত্র ধর্ম্মপাল মহাশয় সকলকে আহ্বান করিলে পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজা মতিচাঁদ বারাণসী-নিবাসীদের পক্ষ হইতে সকলকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিলেন। অতঃপর শুভেচ্ছাজ্ঞাপক লিপিসমূহ পঠিত হইল ও তাহার পর বক্তৃতা আরম্ভ

হইল। সবাই যথারীতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক বক্তৃতার পালা শেষ করিলে পর সভার কার্য্য রাত্রি ৭॥টায় সাঙ্গ হয়। সমস্ত সারনাথ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া এক দিব্যশ্রী ধারণ করিয়াছে। আবার শত শত বৎসর পরে স্তূপ-পাদমূলে দীপশিখার আবির্ভাব হইল। সমস্ত মন্দির দীপমালায় শোভিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে 'সাধু সাধু' ধ্বনি। রাত্রি আট ঘটিকার সময় ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক 'ত্রিপিটক' পাঠ হইল।

যথারীতি ১২ই নবেম্বরের প্রভাত সমাগত হইলে পর যাত্রীরা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলেন। ভক্তের সরল হৃদয় প্রত্যেক ধূলিকণার মধ্যে বুদ্ধাস্তিত্ব অনুভব করিয়া প্রেমাশ্রু সংবরণে অসমর্থ হইল। স্তূপের আশেপাশে এখানে-ওখানে কত উপাসক, উপাসিকা তাঁহাদের উপাস্যকে অর্ঘ্য প্রদানে ব্যস্ত। ভক্তহৃদয় পূজা করিয়া তৃপ্ত হয়। অদ্য দুইটার সময় বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান। সিংহল দেশস্থিত অনুরাধাপুর হইতে আনীত তিনটি 'বোধিবৃক্ষ' (অশ্বত্থগাছ) মিছিল করিয়া একটি বেদীসান্নিধ্যে আনীত হইলে পর শ্রীদেবমিত্র ধর্ম্মপাল মহাশয় প্রেমাশ্রু পুলকিতনেত্রে গদ্‌গদ্ ভাষায় জগৎবাসী এবং সারনাথবাসীর মঙ্গল কামনা করিয়া দুইটি বৃক্ষ রোপণ করিলেন, অপরটি রোপণ করিলেন শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনি মহাশয়। রোপণকালে তিনি 'মহাবোধির' ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। মহারাজ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা বুদ্ধগয়া হইতে বোধিবৃক্ষের শাখা লইয়া সিংহলে যাত্রা করিলেন ভিক্ষুণীর বেশ ধারণ করিয়া, এবং সিংহলে পৌঁছিয়া বৃক্ষ রোপণ করিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। আজ আবার সেই বৃক্ষ পুনরায় ভারতে আনীত হইল। ইহার পর আন্তর্জ্জাতিক বৌদ্ধ সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইল। সভাপতি ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্ত মহাশয়। অদ্যও যথারীতি পঞ্চশীল গৃহীত হইবার পর সভাপতি তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন এবং অতঃপর বৌদ্ধশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ স্ব স্ব রচনা পাঠ আরম্ভ করিলেন। সমস্ত রচনা পাঠ সম্ভবপর হয় নাই। শুধু যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের স্বীয় রচনাবলীর সারাংশ পাঠ করিলেন মাত্র। অতঃপর সভা ভঙ্গ হইলে পর পুনরায় দীপসজ্জা এবং "পরিত্ত" পাঠ আরম্ভ হইল।

১৩ই নবেম্বর। অদ্য সারনাথে বিজয়া সম্মিলনী। সবাই গমনোন্মুখ। অদ্য উৎসবের শেষ দিন। সবাই সাজ সাজ রবে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বেলা তিনটার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। সভাপতি ছিলেন মিঃ ব্রাউটন। ধর্ম্মপাল মহাশয় নিজের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করিবার পর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন এবং অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম্ম হিতৈষিগণ প্রচারের বিশদ আলোচনা করিলে পর সভা ভঙ্গ হয় এবং যথারীতি জলযোগ আরম্ভ হয়। রাজা মতিচাঁদ সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। মিষ্টান্ন বিতরণ-ক্রিয়া সমাপন হইবার পর আরম্ভ হইল লামা-নৃত্য। নূতন ধরণের তিব্বতী নাচ দেখিয়া সবাই তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সমস্ত সারনাথ আবার নির্জ্জন পুরীতে পরিণত হইল। চতুর্দ্দিকেই আজ অবসাদ এবং বিচ্ছেদবেদনা সুস্পষ্ট। আজ সারনাথে লোক-কোলাহল নাই বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয় সমস্ত সারনাথকে মথিত করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের সারনাথ আর নাই। আবার সারনাথ পূর্ব্বস্মৃতি ফিরাইয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র।

এখন যাত্রীরা আসেন, দর্শকরা আসেন—নিজ নিজ অর্ঘ্য প্রদানান্তে চলিয়া যান নিজ নিজ ঘরে। শ্রমণেরা সন্ধ্যায় দীপ জ্বালে, বিশ্ববাসীর মঙ্গলহেতু পরিত্ত পাঠ করে, উপাসনা করে। শুধু এই বলে—

"সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু।"

ধ্রুবা

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাধবসেনা নৃত্যগীতের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। সে এখন গৃহহীন ও অন্নহীন চন্দ্রগুপ্তের জন্য তাহা মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে লাগিল। দত্তদেবী ও চন্দ্রগুপ্তকে প্রাসাদ হইতে তাড়াইতে রামগুপ্ত বা রুচিপতি ভরসা করে নাই, কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের শ্রাদ্ধের পরেই দত্তদেবী স্বেচ্ছায় পাটলিপুত্রের মহাশ্মশানে এক জীর্ণ শিবমন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কুমার চন্দ্রগুপ্তকে মাধবসেনা নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের গৃহে লইয়া গিয়াছিল। নূতন রাজা রামগুপ্ত ও তাহার নূতন মন্ত্রী রুচিপতি যখন উল্লাসে উন্মত্ত, তখন তাহাদের ভয়ে পৌর-সঙ্ঘের শত শত সশস্ত্র নাগরিক দিবারাত্রি মাধবসেনার গৃহ রক্ষা করিত। তাহাদিগের ভয়ে রুচিপতি বা তাহার অনুচরবর্গ নটীবীথিতে আসিত না।

মাধবসেনা দিবারাত্রি কুমার চন্দ্রগুপ্তের চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা করিত। নৃত্য, গীত, সমাজ প্রভৃতি নিত্য উৎসবে তাহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনরাশি ব্যয় হইতে লাগিল, কিন্তু গভীর চিন্তার কুটিল রেখা চন্দ্রগুপ্তের ললাট পরিত্যাগ করিল না। মাধবসেনা মধ্যে মধ্যে কুমারকে জিজ্ঞাসা করিত, "কুমার, কি হয়েছে?" তখন চন্দ্রগুপ্তের মুখের কোণে ম্লান হাসির রেখা দেখা দিত, তিনি বলিতেন, "কিছুই না মাধবসেনা।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ের কোণ হইতে প্রবাহিত হইত তাহাতে সেই ঈষৎ হাসির ক্ষীণ রেখা, সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে বালির বাঁধের মত ভাঙিয়া পড়িত। মাধবসেনা বৈদ্য, সন্ন্যাসী, গ্রহবিপ্র প্রভৃতি বহুজনের পরামর্শ লইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে এক বৃদ্ধা নটী আসিয়া বলিল, "মাধবী, তুই কুমারকে মদ ধরা, তাহ'লে সব সেরে যাবে।"

মাধবসেনা আশায় বুক বাঁধিয়া চন্দ্রগুপ্তের কাছে প্রস্তাবটা উঠাইল। ভাবিয়াছিল যে কুমার কখনও অতিরিক্ত মাত্রায় সুরাপান করিতে সম্মত হইবেন না, কিন্তু কুমার শুনিবামাত্র আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কি বলিলে মাধবী, ভোলা যায়? সত্য বলছ? আমার শপথ ক'রে বলছ? সত্য বল, ভোলা যায়? কি অসহ্য যাতনা, তুমি বোঝ না মাধবী। তোমরা ভাব, চন্দ্রগুপ্ত বিশাল পিতৃরাজ্যলোভে পাগল। বোঝ না, জান না, বড় ভুল কর। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—যেদিন অসি ধারণ করব, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। তা নয়, তা নয় মাধবী, এ স্মৃতি ধ্রুবার, আমার ধ্রুবার। মুছে দাও, ধুয়ে দাও, অসহ্য যন্ত্রণা! মদ খাব, ক্ষতি কি? সমুদ্রগুপ্তের পুত্র পাটলিপুত্রের নটী-বীথিতে, নটীর অন্নে দেহ পুষ্ট করছে, মদ্যপান কি তার চেয়ে হেয়? মাধবী আন বিষ আন, এ যন্ত্রণার চাইতে হলাহলও মধুর।"

গৌড়ী, মাধ্বী, কাদম্বী প্রভৃতি বহুবিধ সুরা কাচ ও চর্ম্ম পাত্রে আসিল, সুবর্ণ ও রজতের পানপাত্র বহুমূল্য আস্তরণের উপর ছড়াইয়া পড়িল, রূপসী ও প্রধানা নটীরা নৃত্য ও গীতে পাটলিপুত্রের নটীবীথি দিবারাত্র উৎসবময় করিয়া রাখিল। কিছুদিন কাটিয়া গেল, হঠাৎ এক রাত্রিশেষে চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "আর ভাল লাগছে না, মাধবী।"

"আমি শ্রীচরণের দাসী দেব, অনুমতি করুন।"

চন্দ্রগুপ্ত অধীরভাবে বলিয়া উঠিলন, "মাধবী, তুমি মিথ্যাবাদিনী। ভোলা যায় না, কিছুতেই ভোলা যায় না, হৃদয়ের গভীর কোণে, ক্ষুদ্রতম কথাও কি গভীর ঝঙ্কারের সূত্রপাত করে দেয়—তা তুমি জান না মাধবী। সেদিন, সেই শেষ দিন, যূথিকাবিতানে, তার কবরীতে শত শত কদম্ব ফুটেছিল, সেই একদিন, আর এই একদিন। যে

যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত নিশীথ রাত্রির গভীর অন্ধকারে নটীপল্লীতে পদার্পণ করতেও লজ্জাবোধ করত, সেই চন্দ্রগুপ্তই আজ নটীর দুয়ারে ভিখারী !"

মাধবসেনা চন্দ্রগুপ্তের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "ছি ছি, ও কথা মুখে আন্‌তে নেই, তুমি যে আমার মহারাজ প্রভু, তুমি যে আমার রাজাধিরাজ, আর আমি তোমার চরণযুগলের দাসী।"

চন্দ্রগুপ্ত শুনিতে পাইলেন না, সুখাসনে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে একজন গায়িকা গান আরম্ভ করিয়াছিল, সে চন্দ্রগুপ্তের ভাব দেখিয়া গান বন্ধ করিয়া বলিল, "মাধবসেনা কুমারের বোধ হয় নেশা হয়েছে, আজকার মত গানবাজনা বন্ধ হোক্।"

কথাটা চন্দ্রগুপ্তের কানে পৌঁছিল, তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "না, মাতাল হইনি, মদ খাচ্ছি বটে, কিন্তু মাতাল ত হ'তে পারছি না। মাধবী, মাধবী, কোথায় তুমি?" মাধবী নিকটে আসিলে চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "কই ভোলা ত গেল না, তুমি যে বলেছিলে আমার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেবে? যন্ত্রণা না ভুলে তীব্র হ'তে তীব্রতর করে তুলছে। তার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ, কদম্বমালায় বিজড়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি, তার প্রফুল্ল কমলের মত মুখখানি ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়।"

"যুবরাজ, আমরা মনে করেছিলাম তুমি সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষ হ'লে তুমি এতদিনে ভুলতে পারতে, তাহ'লে তুমি মাতাল হতে। কিন্তু যুবরাজ, বিধি তোমায় সাধারণ মানুষ ক'রে গড়েন নি। কুমার, ভগবান কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তোমায় এত কষ্ট দিচ্ছেন, আমি সামান্যা স্ত্রীলোক, আমি সে কথা কি ক'রে বুঝব?"

একজন দাসী আসিয়া ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল, মাধবসেনা তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। দাসী তাহার বিরক্তি দেখিয়া বলিল, "মা, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে আসতাম না, একজন অতি গোপনীয় সংবাদ দিয়ে গেল।"

"এমন কি গোপনীয় সংবাদ, বল্?"

"পৌরসঙ্ঘের মুখ্য জয়কেশী ব'লে গেল, যে, মহানায়ক মহাপ্রতীহার রুদ্রধর ধ্রুবদেবীকে বিবাহের পূর্ব্বেই রুচিপতির হুকুমে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

মত্ততা দূর হইল, দুশ্চিন্তায় অবসন্ন দেহে সহসা অযুত হস্তীর বলসঞ্চার হইল। চন্দ্রগুপ্ত সুখাসন হইতে একলম্ফে মাধবসেনার নিকটে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি, কি বল্‌লি?" দাসী ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া পলায়ন করিল।

মাধবসেনা বহু চেষ্টায় চন্দ্রগুপ্তকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া, দাসীকে আবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়কেশী কি ব'লে গেল, ঠিক করে বল্, তোর কোন ভয় নেই। ধ্রুবদেবী যুবরাজের পরমাত্মীয়া কি না, তাই যুবরাজ অত বিচলিত হয়ে পড়েছেন, তুই ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা বল্।"

দাসী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "জয়কেশী ব'লে গেল যে পাছে নূতন মহারাজ আর কাউকে বিয়ে ক'রে ফেলেন, এই ভয়ে বিয়ের আগেই মহানায়ক রুদ্রধর ধ্রুবদেবীকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নূতন মন্ত্রী রুচিপতি ঠাকুর রুদ্রধরকে পরামর্শ দিয়েছেন, যে, নূতন মহারাজের আশে-পাশে থাকলে ধ্রুবদেবীর উপর মহারাজের মন পড়তে পারে, তাহ'লে বিয়েটা শীঘ্র হয়ে যাবে।"

চন্দ্রগুপ্ত দাসীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন, "মাধবী, আমার অসিচর্ম্ম?"

মাধবসেনা দৃঢ়মুষ্টিতে চন্দ্রগুপ্তের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কোথা যাবে প্রভু? এ অসময়ে এ অনর্থপাত ক'রো না, স্থির হও, বিবেচনা কর।"

"তুমি বুঝতে পারছ না, মাধবী, বৃদ্ধ রুদ্রধর লোভে পড়ে কি সর্ব্বনাশ করছে। সিংহাসন পাছে তার হস্তচ্যুত হয়, সেই ভয়ে ব্রাহ্মণকুলাঙ্গার রুচিপতির পরামর্শে ধ্রুবাকে একাকিনী প্রাসাদে পাঠিয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ না, মাধবী, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ধ্রুবা ব্যাকুল হয়ে আমাকে ডাকছে। অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও, আর আমায় পাগল ক'রো না, পথ ছাড়!"

মাধবসেনা বলপূর্ব্বক কুমারকে সুখাসনে বসাইল, এবং অতি ধীরে কহিল, "কুমার, সত্যই তুমি পাগলের মত

ব্যবহার করছ, সহস্র সহস্র রক্ষীপরিবৃত প্রাসাদে তুমি একা একখানা অসি নিয়ে কি করবে ?"

"ধ্রুবাকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিতে পারব ত ?"

"এ পাগলের কথা যুবরাজ, কুমার চন্দ্রগুপ্তের মুখে শোভা পায় না।"

"কিন্তু—কিন্তু মাধবী, অসহায়া ধ্রুবা রুচিপতির হাতে ? ছেড়ে দাও, পথ ছাড় !"

"শোন, ব'সো, তুমি একা কিছুই করতে পারবে না, যদি বেঁচে থাক, পরে উপায় হ'তে পারবে।"

"আমি ত কোন উপায় দেখছি না, মাধবী।"

"এখন তুমি কিছুতেই দেখতে পাবে না। এখনও প্রাসাদে দত্তদেবীর অন্নে প্রতিপালিত শত শত দাসী আছে। এখনও শত শত রাজভৃত্য তোমার নাম ক'রে চোখের জল ফেলে। তাদের দিয়ে কাজ হবে। আমি যাচ্ছি।"

'তুমি যাবে মাধবী, একাকিনী, ব্যাঘ্রগহ্বরে ?"

"কেন যাব না যুবরাজ ? মাধবীকে কি দুর্দ্দশা থেকে তুমি রক্ষা করেছ, তা কি এর মধ্যে ভুলে গেলে ? জেনে রাখ যে, মাধবী জীবিত থাকতে তোমার ধ্রুবদেবীর পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধবে না।"

"মাধবী, আজ গুপ্ত-সাম্রাজ্যে আমার বলতে কি আর কেউ নেই ?"

"আছে, সহস্র সহস্র আছে। বাতায়ন-পথে চেয়ে দেখ, পৌরসঙ্ঘের শত নাগরিক তোমাকে দিবারাত্র রক্ষা করছে। যুবরাজ, আর সময় নষ্ট করব না, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আজ আর তুমি রাজপথে বেরিও না।"

প্রণাম করিয়া মাধবসেনা চলিয়া গেল। তখন যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় একাকী সেই কক্ষে দ্রুত পদচারণা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রুদ্রধরের প্রায়শ্চিত্ত

যে রাজদণ্ড আর্য্য সমুদ্রগুপ্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা শিথিলমুষ্টিতে ধৃত হইলেও, প্রজা তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বাহিরের প্রচ্ছন্ন শত্রু সহসা প্রবল হইয়া উঠিল। মথুরায় কণিষ্কের বংশধরেরা তখনও রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রবল সমুদ্রগুপ্তের সম্মুখে অবনত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। মথুরা হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সৌরসেন, মালব, লাট ও সৌরাষ্ট্র জনপদ তখনও শক-রাজাদিগের অধিকারভুক্ত। রামগুপ্তের সিংহাসনলাভের এক মাসের মধ্যে তিন দিক হইতে শকগণ গুপ্তরাজ্য আক্রমণ করিল। মহারাজ রামগুপ্তের ব্যবহারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া সমুদ্রগুপ্তের পুরাতন কর্ম্মচারিবর্গ একে একে হয় তীর্থবাস করিয়াছিলেন, না-হয় সত্বর পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। নূতন সেনাপতি নয়নাগ নটী চন্দনার ভ্রাতা, তিনি অসি অপেক্ষা বীণা ধারণে অধিক পটু, সুতরাং বিনা বাধায় দক্ষিণে কৌশাম্বী এবং উত্তরে কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া শকগণ প্রয়াগের দিকে অগ্রসর হইল। ভারতবাসীর প্রতি শকের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা তখনও মধ্যদেশবাসী ভোলে নাই, সুতরাং গুপ্ত-সাম্রাজ্যের নগরে নগরে আবার আর্ত্তনাদ উঠিল। শত শত উপরিক বা রাজপ্রতিনিধি নিত্য সাহায্যের জন্য অশ্বপৃষ্ঠে দূত পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা রাজধানীতে আসিয়া সম্রাট মহামন্ত্রী অথবা সেনাপতি কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না, কারণ সম্রাট সতত উদ্যানে, মহামন্ত্রী তাঁহার চিরসঙ্গী এবং নূতন মহাবলাধিকৃত বা প্রধান সেনাপতি অদৃশ্য।

সেদিনও সম্রাট উদ্যানে, চম্পকবিতানে সুবর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে সুখাসনে নূতন মহামন্ত্রী, চারিদিকে সুরাভাণ্ড ও পাত্রহস্তে অর্দ্ধবিবসনা সুন্দরী দাসী। মহামন্ত্রী বলিতেছেন, "যুদ্ধ করা সেনাপতির কাজ, নইলে বেটারা বেতন ভোগ করে কেন ? রাজাই যদি যুদ্ধ করতে যাবে, তবে সেনাপতি কি করবে ?"

বিষণ্ণবদনে রামগুপ্ত কহিলেন, "ঠিক বলেছ বটে রুচি, কিন্তু দেবগুপ্ত কর্ম্মত্যাগ করেছে, এবং তখন থেকে সেনাদলের সমস্ত বিভাগে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে।"

রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "ওসব কিছু না, ওসব কিছু না। নয়নাগের বেতন বৃদ্ধি ক'রে দাও, রামচন্দ্র, স্বচ্ছন্দে মথুরা জয় ক'রে আসবে।"

এই সময় একজন দণ্ডধর আসিয়া বলিয়া উঠিল, "মহা-রাজাধিরাজের জয়! মহাসামন্তাধিপতি মহানায়ক মহাদণ্ডনায়ক রুদ্রধরদেব দুয়ারে উপস্থিত।"

রামগুপ্ত। রুচি, বুড়ো বেটা আবার এসেছে হে!

রুচি। বিয়েটা করে ফেল না ভাই?

রাম। হাঃ, বেটার বামুনে বুদ্ধি কি না? সে বেটী প্রেমালাপ করতে গেলেই বলে, তুমি স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃসম। যেন ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক! একটা প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে মেয়ে বিয়ে ক'রে, সারাটা জীবন জ্বলে মরি আর কি? তার উপর কাল রাত্রে চন্দনার মাথা ছুঁয়ে দিব্য করেছি যে, তাকেই পট্টমহিষী করব! ধ্রুবাটা দেখতে শুন্‌তে নিতান্ত মন্দ নয়, তাই তাকে হাতছাড়া করিনি, তার উপর তার বাপ যখন উপযাচক হয়ে তাকে প্রাসাদে দিয়ে গেছে, তখন মা বেটী আবার অধর্ম্ম হবে ব'লে ভয় দেখায়। একে মায়ের মুখে ধর্ম্মের কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, তার উপর যদি ধ্রুবার মত স্ত্রী জোটে, তাহ'লে এখনই গলায় দড়ি দিতে হবে।"

রুচি। বল কি রামচন্দ্র, চন্দনা হবে তোমার মহিষী? তোমার ছাতিটা চওড়া বটে। প্রথমতঃ চন্দনা নটী, তার উপর সে তোমার চাইতে বেশ কিছু বয়সে বড়। এ হেন চন্দনাকে যদি সমুদ্রগুপ্তের আর্য্যপট্টে বসাতে পার, তাহ'লে একটা নূতন কাজ করবে বটে। আর্য্যাবর্ত্তে বা দক্ষিণাপথে এতখানি সাহস কোন রাজপুত্র দেখাতে পারেনি।

দণ্ড। মহারাজাধিরাজ!

রাম। জ্বালাতন করলে বেটা, যা বুড়োকে ডেকে নিয়ে আয়।

দণ্ডধর চলিয়া গেল। রামগুপ্ত রুচিপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়ো বেটাকে কি বলি ভাই? ঠিক বাবার মত লম্বা লম্বা কথা কয়। আর মেয়েটিও বাপের উপযুক্ত, কথা শুন্‌লে মনে হয় যেন জুতিয়ে দিচ্ছে।"

রুচিপতি বলিল, "বল্‌বে আর কি? বল হচ্ছে—হবে—তাড়াতাড়ি কি? এখন সময়টা বড় গরম, আবার বসন্ত কাল ফিরে না এলে শুভকার্য্য কি ক'রে সম্পন্ন হয়?"

এই সময় দণ্ডধর মহানায়ক রুদ্রধরের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। রামগুপ্ত সুখাসনে অঙ্গ এলাইয়া দিয়া বলিলেন, "মহানায়ক, আমার শরীরটা বড় অসুস্থ, কি বলতে এসেছেন, শীঘ্র বলে ফেলুন।" রুচিপতি বলিল, "মহানায়ক আসন গ্রহণ করুন।"

রুদ্রধর দূরে দাঁড়াইয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের জয়, মহারাজ বড়ই বিপন্ন হয়ে আপনার শরণাগত হয়েছি. এমন অবস্থায় না পড়লে, প্রভাতে অসময়ে কখনই আপনাকে বিরক্ত করতে ভরসা করতাম না।"

রুচি। মহানায়ক, আসন গ্রহণ করুন।

রুদ্র। ব্রাহ্মণ, এ গৃহের স্বামী রাজা, আপনি ন'ন। রাজা অনুমতি না করলে কেমন ক'রে আসন গ্রহণ করি। মহারাজ, বাগ্‌দত্তা কুমারী কন্যা, বড় আশায় স্বেচ্ছায় প্রাসাদে এনে দিয়েছি, সে তিন মাস এখানে বাস করেছে, তার বিবাহ না দিলে, জনসমাজে আর যে মুখ দেখাতে পারছি না মহারাজ। মন্দ লোকে মন্দ কথা বলতে আরম্ভ করেছে, আত্মীয়স্বজন আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে।

রাম। মহানায়ক, পিতার মৃত্যুর পর থেকে শরীরটা বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছে, তার উপর এখন ভীষণ গরম।"

রুচি। তা ত বটেই, তা ত বটেই। রাজ্যেশ্বরের বিবাহ, তার উপর এই প্রথম বিবাহ।

রুদ্র। মহারাজাধিরাজ, ধর-বংশ সাম্রাজ্যে সম্রান্ত, কুলমর্য্যাদায় ধরকুল গুপ্তকুল হ'তে হীন নয়। আবহমান কাল এই ধর-বংশ রোহিতাশ্ব-দুর্গে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষা ক'রে এসেছে। ধ্রুবা আমার একমাত্র কন্যা, স্বর্গগত মহারাজাধিরাজ পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করবেন মনস্থ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর আপনার আদেশে প্রাসাদে এনে দিয়েছি।

রাম। একটু সংক্ষেপে বলুন না, আমার শরীরটা বড় অসুস্থ।

রুচি। হাঁ হাঁ, বক্তৃতা করেন কেন?

রুদ্র। ক্ষমা করুন, মহারাজ, বৃদ্ধের বাচালতা মার্জ্জনা

করুন। লোকনিন্দা শুনে ব্যাকুল হয়ে আপনার পদপ্রান্তে আশ্রয় ভিক্ষা করছি। পাটলিপুত্রের দুষ্ট নাগরিক, পথে পথে বলে বেড়াচ্ছে, যে, রুদ্রধরের কন্যা মহারাজাধিরাজের রক্ষিতা, ধ্রুবা নিত্য সন্ধ্যায় রামগুপ্তের সঙ্গে উদ্যান-বিহারে যায়। মহারাজাধিরাজ, কুমারী কন্যার কলঙ্ক অপেক্ষা মরণ শ্রেয়, বাগ্‌দত্তা কন্যা, অন্যপূর্ব্বা, কোন কুলপুত্র তাকে গ্রহণ করবে না। আপনি তাকে বিবাহ করুন, তারপরে উদ্যানে নিয়ে যান, যা খুশী করুন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

রাম। আপনার কন্যা যদি সহজে উদ্যানে যেতে চাইত, তা হলে কোনো গোলই থাকত না।

রুচি। মহানায়কের কন্যাটি যে বিদ্যাবাচস্পতি। বলে, আমি কুলকন্যা, গণিকার সঙ্গে উদ্যানে যাব কেন?

রুদ্র। সাবধান ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়। মহারাজাধিরাজ বৃদ্ধের প্রতি দয়া করুন, বৃদ্ধের কুল রক্ষা করুন, লোক-নিন্দা হ'তে পরিত্রাণ করুন। (জানু পাতিয়া) রামগুপ্ত, আমি তোমার পিতার বয়স্য, সম্পর্কে পিতৃতুল্য, তথাপি জানু পেতে তোমার সম্মুখে ভিক্ষা চাইছি। আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা কর। দয়া কর, বৃদ্ধকে আত্ম-ঘাতী ক'রো না।

দুই তিনবার জৃম্ভন করিয়া, বিরক্ত হইয়া রামগুপ্ত রুচিপতিকে বলিলেন, "বুড়ো বেটা বড় জ্বালালে রুচি।"

রুচিপতি রুদ্রধরকে বলিল, "মহানায়ক বেশী ঘ্যান্‌ঘ্যান্ কর কেন বাবা? তোমার মেয়েটি যে ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত, কথায় কথায় মহারাজকে বলে, চন্দ্রগুপ্ত তার স্বামী, সুতরাং মহারাজ তার ভাসুর, পিতৃতুল্য। এমন মেয়ে দু-চারদিন উদ্যান-বিহারে না গেলে শিষ্ট হবে কেন?"

সহসা বৃদ্ধের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, দীর্ঘ শুভ্র কেশ যেন দাঁড়াইয়া উঠিল, বৃদ্ধ রুদ্রধর বলিয়া উঠিলেন, "কর্ণ বধির হও। ভগবান ভবানীপতি, আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের পুত্রের মুখে এই কথা শোনবার জন্যই কি বৃদ্ধ রুদ্রধরকে এতদিন জীবিত রেখেছিলে?"

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক রহিলেন, পরে রুদ্রধর সহসা রামগুপ্তের দিকে ফিরিয়া করযোড়ে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আমি এখনও সাম্রাজ্যের মহানায়ক। আমি আবেদন করছি, আদেশ করুন"

রামগুপ্ত ধীরে ধীরে কহিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? দুদিন যাক না? একটু ঠাণ্ডা পড়ুক।" সঙ্গে সঙ্গে রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "রাজাদেশ কি এত সহজে বেরোয় বাবা? দুদিন অপেক্ষা কর, মেয়েটাকে সুমতি দাও, মহারাজ-ধিরাজের সেবা করুক, দু-চারদিন আমি উদ্যানে নিয়ে গিয়ে শিষ্টাচার শিক্ষা দিই।"

বৃদ্ধ মহানায়ক আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গন্ধতৈলসিক্ত পুষ্পমালা-সুশোভিত রুচিপতির দীর্ঘকেশ ধারণ করিয়া তাহাকে সুখাসন হইতে উঠাইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তবে রে ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার, আমার কন্যা শিষ্টাচার শিক্ষা করতে তোর সঙ্গে উদ্যান-বিহারে যাবে? তুই না ব্রাহ্মণ, তুই না গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অমাত্য?" রামগুপ্ত ও রুচিপতি একসঙ্গে "দণ্ডধর, দণ্ডধর, প্রতীহার, প্রতীহার!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রতীহার ও দণ্ডধরগণ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। রামগুপ্ত তাহাদের দেখিয়া সাহস পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "রুদ্রধরকে বন্দী কর।" প্রতীহার ও দণ্ডধরগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "এ-কার্য্য আমাদের পক্ষে অসম্ভব মহারাজ।" তাহারা সকলেই এই কয় মাসে মহানায়ক মহামাত্য রুচিপতিকে উত্তমরূপে চিনিয়াছিল।

তখন ঘনকৃষ্ণ মেঘান্তরালে দীপ্ত বিদ্যুল্লতার ন্যায় মলিনবসনা এক সুরসুন্দরী দণ্ডধর ও প্রতীহারগণের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে নারী ধ্রুবদেবী। সে একজন দণ্ডধরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্য, অনুগ্রহ করে বল, এখানে কি আমার পিতা এসেছেন? আমি যেন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম?" দণ্ডধর দীর্ঘকাল রাজসেবা করিয়াছিল এবং সকলকেই চিনিত, লজ্জায় ও ক্রোধে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, সে অশ্রুমোচন করিয়া কহিল, "হাঁ মাতা, কিন্তু আপনি দূরে সরে যান।" ধ্রুবা সরিল না, পাষাণপ্রতিমার মত নিশ্চল হইয়া রহিল। তখনও রুচিপতি চীৎকার করিতেছিল, "মেরে ফেললে

রামচন্দ্র, মেরে ফেল্‌লে, বুড়ো বেটার হাত মাখনের মত নরম।" রুদ্রধর বলিয়া উঠিলেন, "আর বৃদ্ধের পা শিরীষের মত কোমল। দূর হয়ে যা।" পদাঘাতে রুচিপতি দূরে গড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ তখন সিংহের মত রামগুপ্তের সম্মুখে গিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামগুপ্ত, মগধের অদৃষ্ট-দোষে তুই আজ মহারাজা—তুই ধর-বংশের যে অপমান করলি, মগধের অজ্ঞাতকুলশীল পর্য্যন্ত সে অপমান অবনত মস্তকে সহ্য করবে না। আজ এইখানে ধর-বংশের পবিত্র রক্তের স্রোত প্রবাহিত করে গেলাম, এই রক্তের প্রতি অণু পরমাণু ধর-বংশের অপমানের প্রতিশোধ নেবে।"

বৃদ্ধ কোষবদ্ধ দীর্ঘ অসি বাহির করিয়া আমূল নিজ বক্ষে বসাইয়া দিলেন। উষ্ণ নর-রক্তের উৎস প্রবাহিত হইল, তাহার তীব্রধারা রামগুপ্তের ও রুচিপতির সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্ত পরে বৃদ্ধের দেহ সশব্দে ভূমিতে পতিত হইল। তখন সেই মলিনবসনা সুরসুন্দরী সবলে দণ্ডধর ও প্রতীহারগণকে দূরে সরাইয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া শবের উপর আছড়াইয়া পড়িল। রক্তধারায় তাহার মলিন বসন রঞ্জিত হইয়া গেল। রামগুপ্ত ও রুচিপতি সভয়ে দ্রুতপদে পলায়ন করিল। মৃত পিতার বক্ষের উপরে পতিতা রক্তরঞ্জিতা ধ্রুবাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডধর ও প্রতীহারের দল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রুদ্রধরের আত্মহত্যার সময়ে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণের সম্মুখে বহু নাগরিক সমবেত হইয়া একত্র কোলাহল করিতেছিল। অনেকগুলি দণ্ডধর ও প্রতীহার উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তাহারা কেহই কোলাহল নিবারণের চেষ্টা করিতেছিল না। সকলেই রুদ্রধরের প্রাসাদে আগমনের কথা আলোচনা করিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে একজন পরিচারক প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইল। সংবাদ শোনা গেল মহানায়ক রুদ্রধর নিহত হইয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া নাগরিকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ প্রস্তাব করিল প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রুদ্রধরের দেহ বাহিরে বহন করিয়া আনা হউক, কেহ বা বলিল সম্রাট জীবিত থাকিতে এরূপ কার্য্য রাজবিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবে, কেহ বলিল যে এখন ত অরাজকতা, রাজা কোথায় যে বিদ্রোহ হইবে?

জনতার ভিতর হইতে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "যেমন ক'রে হোক, মহানায়কের সৎকার ত করতে হবে? আমরা চলে গেলে, নয়নাগ বৃদ্ধের দেহ পরিখার জলে টেনে ফেলে দেবে।"

এই সময় রক্তসিক্তবসনা ধ্রুবদেবীকে প্রাসাদের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখ রক্তমাখা একটি স্ত্রীলোক ছুটে আস্‌ছে।" একটি অল্পবয়স্ক যুবক জনতার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল, সে নাগরিকের কথা শুনিয়া তোরণের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। ততক্ষণে রক্তাক্তবসনা ধ্রুবদেবী তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনতা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ধ্রুবদেবী করজোড়ে মিনতি করিয়া সকলকে বলিলেন, "দয়া ক'রে পথ ছেড়ে দাও, আমি অশুচি, গঙ্গাতীরে যাব।" জনসঙ্ঘ উত্তরে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় পট্টমহাদেবী ধ্রুবদেবীর জয়।"

উভয় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া ধ্রুবদেবী বলিলেন, "না, না, ওকথা ব'লো না। আমি পট্টমহাদেবী নই, রুচিপতি আমাকে উদ্যান-বিহারে নিয়ে যেতে চায়, মগধের মহাদেবী কখনও বিট ব্রাহ্মণের সঙ্গে উদ্যান-বিহারে গিয়েছে শুনেছ কি? আমি চন্দ্রগুপ্তের ধর্ম্মপত্নী। মহারাজ রামগুপ্ত আমার ভাসুর। তিনি আমাকে রুচিপতির সঙ্গে উদ্যান-বিহারে যেতে আদেশ করেন।"

একজন বৃদ্ধ নাগরিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সে ধ্রুবদেবীর কথা শুনিয়া ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনেশে কথা। মহানায়ক রুদ্রধর কি তবে নিহত হয়েছেন?"

ধ্রুবা। না, না, আত্মহত্যা করেছেন। আমার পিতা, মহানায়ক রুদ্রধর হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। তিনি আমাকে কুমার চন্দ্রগুপ্তের বাগ্‌দত্তা ধর্ম্মপত্নী জেনেও সিংহাসনে বসাবার আশায় প্রচার করেছিলেন যে আমি সাম্রাজ্যের যুবরাজের বাগ্‌দত্তা পত্নী, কুমার

চন্দ্রগুপ্তের নই, আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে যাতে মহারাজা রামগুপ্ত আমাকে গ্রহণ করেন, সেই আশায় পিতা আমাকে রাজপ্রাসাদে এনে দিয়েছিলেন। এই তার পরিণাম। দয়া কর, পথ ছাড়। দেখতে পাচ্ছ না, মহানায়ক মহাদণ্ডনায়ক রুদ্রধর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন? এই দেখ রুদ্রধরের প্রায়শ্চিত্তের চিহ্ন। এই রক্তরাশির প্রতি অণু পরমাণু ধর-বংশের প্রবল প্রতিহিংসার তৃষ্ণা চীৎকার ক'রে জানাচ্ছে।"

সেই বৃদ্ধ আবার বলিল, "মহাদেবী—" কিন্তু ধ্রুবদেবী তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ওকথা আমাকে আর শুনিও না, ধর-বংশের কুলকন্যা আর যেন কখনও গুপ্ত-বংশের মহাদেবী হ'তে না আসে। ভদ্র, তোমার কি কন্যা নাই? ঘরে কি বধূ নাই? কোন্ মাতা তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছিল?" বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "ক্ষমা কর মা, পথ মুক্ত, আদেশ কর। মাধবী, তুই মাতার সঙ্গে যা।" সেই অল্পবয়স্ক যুবক ধ্রুবদেবীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, ধ্রুবদেবী কিন্তু পথ পাইয়াও নড়িলেন না। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বাবা?" বৃদ্ধ বলিল, "আমি নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ।"

ধ্রুবা। যদি পার, পিতার দেহের সৎকার ক'রো।

জয়। অবশ্য করব, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে মা?

ধ্রুবা। দেখতে পাচ্ছ না, জলে যাচ্ছি, সর্ব্বাঙ্গে পিতৃরক্ত, জাহ্নবী জল ভিন্ন এ অনন্ত জ্বালা প্রশমিত হবে না। ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে ধরি, এখনই কে এসে ধরে নিয়ে যাবে।

জয়নাগ সরিয়া গেল, সেই দিবা দ্বিপ্রহরে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া রক্তসিক্তবসনা কুলকন্যা জাহ্নবীর দিকে ছুটিল, আর মহানগরী পাটলিপুত্রের শত শত নাগরিক তাহার সঙ্গে চলিল। বাতায়নপথ হইতে অসংখ্য কুলকন্যা যে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিল, নগরের তোরণ হইতে তোরণ পর্য্যন্ত এই দৃশ্য দেখিয়া পাটলিপুত্রবাসী স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রাজপ্রাসাদের তোরণে আর একজন নাগরিক বৃদ্ধ জয়নাগের হাত ধরিয়া বলিল, "নগরশ্রেষ্ঠি, একি পাটলিপুত্র, না মহানরক? কুলকন্যা নটীপল্লীর রিটের সঙ্গে উদ্যান-বিহারে যাবে?" জয়নাগ বলিল, "সমস্তই ত শুনতে পাচ্ছ।"

আর একজন নাগরিক উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "অসি মুক্ত কর, এ পাপ-রাজ্যের অবসান হোক্।"

জয়নাগ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "খানিক অপেক্ষা কর, রাজ্য যে ভাবে চল্‌ছে, তাতে শীঘ্রই অবসান হবে।" উত্তেজিত নাগরিকরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়!"

তখন জয়নাগ বলিল, "এখন মহানায়ক রুদ্রধরের সৎকার কার্য্য আবশ্যক। চল প্রাসাদের ভিতরে যাই।" কতক নাগরিক জয়নাগের সহিত প্রাসাদে প্রবেশ করিল, কিন্তু অনেকে তখনও বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই মুহূর্ত্তে মহানগরী পাটলিপুত্রের প্রান্তে, শোন নদ যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইত, তাহার নিকটে একটি অতি পুরাতন পাষাণ-নির্ম্মিত মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া এক সদ্যস্নাতা শুভ্রবসনা বৃদ্ধা পূজা করিতেছিলেন, আর দূরে দুইজন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন। এই দুই বৃদ্ধ রবিগুপ্ত ও দেবগুপ্ত। রবিগুপ্ত বলিতেছিলেন, "সমুদ্রগুপ্তের পট্টমহিষীর কি এই পরিণাম?"

দেব। সাম্রাজ্যের পরিণতি শোনাটা অবশিষ্ট আছে রবিগুপ্ত। এ পাপ পাটলিপুত্র যত শীঘ্র পরিত্যাগ করি ততই মঙ্গল।

রবি। পরিত্যাগ করতেই ত এসেছি। কেবল প্রভুপত্নীর কাছে বিদায় নিতে যা বিলম্ব।

দেব। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে আবার কি শুনব? আবার কি দেখব? শুনছি আজ প্রভাতে সমুদ্রগৃহে রুদ্রধর আত্মহত্যা করেছে।

রবি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, দেবগুপ্ত। আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইনি। সমুদ্রগুপ্তের চরণস্পর্শ ক'রে যে রুদ্রধর কন্যাকে চন্দ্রগুপ্তের করে সম্প্রদান করেছিল, সে যেমনই শুনল যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী রামগুপ্ত, তখনই ব'লে বসল যে তার কন্যা সাম্রাজ্যের যুবরাজের বাগ্‌দত্তা, চন্দ্রগুপ্তের নয়। এ মহাপাপের প্রতিফল ফলবে না?

দেব। শুনেছি নূতন মহারাজাধিরাজ বাগদত্তা পত্নীকে উদ্যান-বিহারে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

রবি। আর শুনিও না দেবগুপ্ত। মনে একটা ভীষণ উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। এ পাপ পাটলিপুত্র ত্যাগ ক'রে চল, আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। মহাদেবী আর কতক্ষণ বিলম্ব করবেন?

দেব। ঐ যে উঠছেন।

বৃদ্ধা পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "শেষ কর হে অনন্ত, হে অন্তর্যামী, আমার অন্তরের বেদনা বুঝে, এই অনন্ত বেদনার শেষ কর। আর শুনতে চাই না, আর দেখতে চাই না, কতদিনে মহাশান্তি পাব বলে দাও প্রভু।" সঙ্গে সঙ্গে রবিগুপ্ত ও দেবগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "আমরাও আর শুনতে চাই না মহাদেবী। বিদায় নিতে এসেছি। হরিষেণ গিয়েছে, আমরাও পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করতে চাই।"

বৃদ্ধা পট্টমহাদেবী দত্তদেবী, তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধদ্বয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রবিগুপ্ত? দেবগুপ্ত? তোমরা শ্মশানে কেন?" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

দত্ত। আমার কাছে বিদায়? আমার কাছে কেন?

রবি। আমরা যে পুরাতনের ধারা, মহাদেবি! আমাদের মহারাজাধিরাজ স্বর্গে, মহাদেবী শ্মশানে।

দেব। নূতন পাটলিপুত্রে পুরাতনের স্থানাভাব।

রবি। তাই তীর্থবাসে যাব মহাদেবী।

সহসা দত্তদেবী দেখিতে পাইলেন, যে, একটি নারী দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি দেবগুপ্ত ও রবিগুপ্তকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। রক্তাক্তবসনা ধ্রুবদেবী গঙ্গা-তীরে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মা, মা, কোন্‌খানে, তোর শ্যামল স্নিগ্ধক্রোড়ের কোন্‌খানে আমাকে স্থান দিবি, মা?" ধ্রুবদেবী যখন গঙ্গার উচ্চতীর হইতে জলে লম্ফ প্রদান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন দত্তদেবী তাঁহাকে উভয় হস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। উন্মাদিনী বলিয়া উঠিল, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও।"

দত্ত। ধ্রুবা, ধ্রুবা, মা কি হয়েছে?

ধ্রুবা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

দত্ত। ধ্রুবা তুই যে আর্য্যপট্টের রত্ন, গুপ্তকুলের বধূ—কি হয়েছে মা, আমাকে চিন্‌তে পারছ না? আমি যে দত্তদেবী?

ধ্রুবা। না, না, আমি চিনতে পারছি না, আমি চিনতে চাই না। তুমি আমার কেউ নয়। বড় পিপাসা—আমার নয়, এই পিতৃরক্তের, এই রক্তরাশির প্রতি অণু-পরমাণুর, ছেড়ে দাও, গঙ্গায় যাব।

একা ধ্রুবদেবীকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া দত্তদেবী চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "রবিগুপ্ত, দেবগুপ্ত, শীঘ্র এস, এ নারী উন্মাদিনী নয়, পট্টমহাদেবী, ধ্রুবদেবী, সে আত্মহত্যা করতে চায়।" বৃদ্ধদ্বয় ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া উন্মাদিনীকে ধরিয়া ফেলিলেন। তখন দত্তদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্রুবার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত কেন?" রবিগুপ্ত বলিলেন, "বুঝতে পারছি না, মা। পট্টমহাদেবী, কি হয়েছে?" ধ্রুবা সম্বোধন শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, আমি পট্টমহাদেবী নই, আমি অতি অধম, নইলে রুচিপতি আমাকে উদ্যান-বিহারে নিয়ে যেতে চায়?"

দত্ত। রবিগুপ্ত কে এই রুচিপতি? ধ্রুবা, ধ্রুবা, মা আমার, কি হয়েছে বল? রামগুপ্ত কি তোকে প্রহার করেছে?

ধ্রুবা। না, না, তিনি যে ভাসুর, তিনি আমাকে স্পর্শ করেন না। কেবল উদ্যান-বিহারে যেতে চাই না ব'লে রুচিপতি আমাকে প্রহার করতে আসে।

দত্ত। তোমরা কিছু বলছ না কেন?

দেব। শুনতে চেও না, মা।

ধ্রুবা। মা, সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে। ধর-বংশের রক্তরাশির এ অনন্ত পিপাসা, জাহ্নবীর অগাধ জল ভিন্ন শান্ত হবে না, ছেড়ে দাও মা।

দত্ত। স্থির হও ধ্রুবা, চিন্‌তে পেরেছিস্ আমি কে? দেবগুপ্ত, কে এই রুচিপতি?

দেব। মুখে বল্‌তে লজ্জা হয় মা, বিট ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার রুচিপতি আজ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য।

দত্ত। রবিগুপ্ত, সাম্রাজ্যে এখনও বৃদ্ধের প্রয়োজন আছে, তোমাদের তীর্থযাত্রা অসম্ভব।

রবি। এই সকল কথা শুনবার জন্যেই কি আমাদের পাটলিপুত্রে রাখতে চাও?

এই সময় একজন নাগরিক ও পূর্ব্বোক্ত অল্পবয়স্ক যুবা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাগরিক ইহাদিগকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "নারায়ণ রক্ষা করেছেন, ঐ যে ধ্রুবদেবী, এ কে? তবে নারায়ণ পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করেন নি, চেয়ে দেখ মাধবী, স্বয়ং রাজমাতা রাজলক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছেন।" দত্তদেবী যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

যুবক উত্তর দিল "আমি নটীমুখ্যা মাধবসেনা।"

"বলতে পার, আমার পুত্র কোথায়?"

"আমার গৃহে, মহাদেবি!"

"চন্দ্রগুপ্ত নটীর গৃহে?"

"আদেশ হ'লে দেখিয়ে দিতে পারি।"

এই সময় বহু নাগরিকের সহিত পৌরসঙ্ঘের প্রতিনিধি ইন্দ্রদ্যুতি আসিয়া উপস্থিত হইল। নাগরিকগণ দত্তদেবী, ধ্রুবদেবী, রবিগুপ্ত ও দেবগুপ্তকে দেখিয়া বার-বার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ইন্দ্রদ্যুতি দত্তদেবীর সম্মুখে নতজানু হইয়া কহিল, "রাজলক্ষ্মী নগরে ফিরে চল, মা। তুমি যে পাটলিপুত্রের মা। তোমার অভাবে সোনার পাটলিপুত্র নগর শ্মশানে পরিণত হ'তে চলেছে। অভিমানভরে সন্তানকে ভুলে কতদিন শ্মশানে থাকবে, মা?"

দত্ত। যাব, ফিরে যাব! মনে করেছিলাম, যাব না, কিন্তু বধূর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে যাব। দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত আমার সঙ্গে পাটলিপুত্রে ফিরে চল। যে-রাজ্যের নটীপল্লীর বিট পট্টমহাদেবীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে চায়, সে-রাজ্যে দত্তদেবীর এখনও প্রয়োজন আছে। সে রাজ্য রবিগুপ্ত, দেবগুপ্ত ও বিশ্বরূপ ভিন্ন চলবে না। নাগরিক, সমুদ্রগুপ্ত যখন জীবিত ছিলেন, তখন যে-ভাবে আমার আদেশ পালন করতে, এখনও কি তাই করবে?"

ইন্দ্র। একবার পরীক্ষা করে দেখ মা।

দত্ত। তবে তোমরা এখানে থাক,—দেবগুপ্ত, যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি ততক্ষণ বধূকে রক্ষা কর। মাধবী, আমাকে তোর গৃহে নিয়ে চল্।"

মাধবী। আমার গৃহে, মহাদেবি!

দত্ত। লজ্জা কি, পাটলিপুত্রের নটী কি সমুদ্রগুপ্তের প্রজা নয়?

মাধবী। চলুন, কিন্তু সেখানে যে আপনার পুত্র আছেন?

দত্ত। আমাকে গৃহের দ্বারে রেখে তুমি পুত্রকে সংবাদ দিতে যেও।

মাধবসেনা ও নাগরিবগণের সহিত দত্তদেবী নগরাভিমুখে চলিয়া গেলে, দেবগুপ্ত ও রবিগুপ্ত ধ্রুবদেবীকে স্নান করাইতে লইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

জন্মদিনে

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কথা যে কহিতে পারে শুভদিনে সে কহুক কথা,—
গান যে গাহিবে গা'ক গান ;
তুমি আজ ক্ষমা ক'রো অক্ষম আমার নীরবতা,—
প্রাণ দিয়া বুঝো শুধু প্রাণ।
যে ছবি হয়নি আঁকা আজও কোনো পটের উপরে,—
যে শোভার খোলেনি গুণ্ঠন,—
প্রকৃতির যে কুসুমে মানুষের মনোমধুকরে—
আজও মধু করেনি লুণ্ঠন,—
যে স্বপ্ন দেয়নি ধরা আজও তব শিল্পের সীমায়—
তোমার তুলির ইন্দ্রজালে,—
বর্ণ-রেখা-আলো-ছায়া-অতীত অতনু মহিমায়
আভাসে যে ফিরে অন্তরালে
দুরাশার কল্প-লোকে একান্তে আত্মার অন্তঃপুরে,—
তারি মত অর্ঘ্য মহত্তম
এ মোর সঙ্কোচে মরে স্পর্দ্ধিত কণ্ঠের উচ্চসুরে,—
ভাষায় কুণ্ঠিত হয় মম।
যে ফুল গহনে ফুটে বাতাসের অন্তর ভুলায়—
জনতা বোঝে না তার দাম।
যে পূজা প্রাণের পূজা—সাজে না তা হাটের ধূলায় ;
দিবালোকে সাজে না প্রণাম।

হে চির-তরুণ পান্থ, বিচিত্রের জয়গান গাহি
জীবন-উৎসের তীর্থপথে
দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর আলোকে আঁধারে অবগাহি—
হাসি অশ্রু শিশিরে শরতে
তুমি এলে আজিকার হেমন্তের হৈমরবি-করে
পূর্ণিমার পরিপূর্ণতায়,—
আপনার সার্থকতা বিলাতে বিশ্বের ঘরে ঘরে ;
কথা দিয়া—মুখের কথায়,—

তোমারে কি পূজা দিব ? কোন্ কাম্য করিব প্রার্থনা
কার কাছে আজি তব তরে ?
যেই দিন এ ধরণী তোমারে করেছে অভ্যর্থনা
আপন বিজন খেলাঘরে,—
প্রকৃতি দিয়েছে সাড়া যেই দিন তোমার আহ্বানে,—
মুক্ত করি রহস্যের দ্বার
অনন্ত সৌন্দর্য্যলোকে—দেখায়েছে যা আছে যেখানে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মহৈশ্বর্য্য তার,—
কল্যাণী সে কলালক্ষ্মী যেদিন তোমারে বরি নিল,—
পাঠাল প্রাণের আশীর্ব্বাণী,—
তোমা লাগি মানুষের সর্ব্বশুভকামনা ফিরিল
সেইদিন পরাজয় মানি।

তোমার সৃজন-যজ্ঞে বাহিরে পেয়েছি নিমন্ত্রণ—
অহঙ্কার সাজে না তা ল'য়ে,
আমরা লভেছি স্থান—এ মোদের গর্ব্ব চিরন্তন—
তপস্যার নিভৃত আলয়ে
শিল্পীর অন্তর ক্ষেত্রে,—রাত্রিদিন চলিয়াছে যথা—
অমৃতের আনন্দ-আরতি,
জাগ্রত মানুষ যেথা খোঁজে তার জাগ্রত দেবতা।
হে গুরু, তোমারে করি নতি
দুরূহ সৌভাগ্যে সহে স্মিতহাস্যে বিশ্বের ভ্রূকুটি
তাই আজ যে তোমারে চিনে,
তোমার তপস্যাবলে সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে উঠি
সর্ব্ব ভয়—সর্ব্ব দৈন্য জিনে।
সত্যের সন্ধানে তাই জীর্ণ সংস্কারের পরপারে
শিষ্যদল চলিয়াছে তব ;
চির-তারুণ্যের উৎস একবার দেখায়েছ যারে—
দুঃসাহস তার নিত্য নব।

তুচ্ছ করি বাস্তবের কোটি কুশাঙ্কুর যাত্রী ধায়
রসলোকে নিত্য দিগ্বিদিকে,
একখানি পরিপূর্ণ জীবনের ধ্রুবতারা চায়
যাত্রাপথ-উর্দ্ধে অনিমিখে।

হে স্রষ্টা, হে সত্যদ্রষ্টা, আজি তব শুভ জন্মদিনে
লহ মুগ্ধ ভক্তের প্রণাম।
অরূপেরে রূপে বাঁধি মানুষের আঁখির অধীনে
যাহারা রচিবে কল্পধাম
মরমর্ত্ত্যে কালে কালে,—তব ঋণ মুক্তকণ্ঠে মানি—
যারা যাবে পূজা-অর্ঘ্য বহি
শিল্পের অমরপুরে তোমার কল্যাণ-তীর্থে,—জানি,—
আমি তাহাদের কেহ নহি।

ধূলিতলে র'বে জাগি যাহাদের নিদ্রাহীন আঁখি
নিত্য তব পাদপীঠ ছায়ে,—
মূঢ় ম্লান যাহাদের বার বার সঙ্গে লবে ডাকি—
তবু যারা পড়িবে পিছায়ে,—
ফাল্গুনের ফল্গুধারা যাহাদের চিত্তের নিভৃতে
আঁধারে মরিবে কাঁদি মিছে,—
অনেক পেয়েছে যারা—কিছু তবু পারিবে না দিতে,—
তাহাদের সবাকার পিছে
আমি র'ব মুগ্ধমৌন তোমারে জানাতে নমস্কার ;
হে গুরু, লবে কি মোর নতি ?
কিছু কি ঘুচাবে লজ্জা আমার বিপুল ব্যর্থতার
স্নেহচক্ষে চাহি ভক্ত প্রতি ?

রাস-পূর্ণিমা

রক্ত-খদ্যোত

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যার সময় রোজকার অভ্যাসমত গুটিকয়েক সভ্য ক্লাব-ঘরের মধ্যে সমবেত হইয়াছিলাম। একটা গল্প উঠিয়া পড়িবার আশায় সকলে উৎসুক।

বরদা সিগারেটের ক্ষুদ্র শেষাংশটুকুতে লম্বা একটা সুখটান দিয়া সেটাকে সযত্নে য়্যাশ-ট্রের উপর রাখিয়া দিল। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল,—ভূতের গল্প তোমরা অনেকেই শুনেছ, কিন্তু ভূতের মুখে ভূতের গল্প কেউ শুনেছ কি ?

অমূল্য এক কোণে বসিয়া একখানি সচিত্র বিলাতী মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতেছিল। বলিল,—অসম্ভব একটা কিছু বরদার বলাই চাই। যার যেমন ধাত।

বরদা বলিল,—আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা অসম্ভব ব'লে মনে হ'তে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, তবে বলি শোন—

অমূল্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—না, না, বাজে গল্প রাখ। আজ যে আমাদের সাহিত্য-সভার অধিবেশন। অতুল, তোমার 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র' প্রবন্ধটা তাহ'লে—

সুধী বলিল,—কাল হবে। বস্তুতন্ত্রের চেয়ে বড় জিনিষ আজ এসে পড়েছেন। বরদা, তোমার গল্প আরম্ভ হোক্।

অমূল্য অস্থির হইয়া বলিল,—আজ তাহ'লে নেহাতই বরদার কতকগুলো মিথ্যে কথা শুনে সন্ধ্যাবেলাটা কাটাতে হবে ?

প্রশান্তকণ্ঠে বরদা বলিল,—কথাটা শুনে তারপর সত্যিমিথ্যে বিচার করা উচিত। তাহ'লে আরম্ভ করি। গত বৎসর—

অমূল্যর নাসারন্ধ্র হইতে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

বরদা বলিল,—গত বৎসর আমার প্ল্যাঞ্চেটে ভূত নামাবার সখ হয়েছিল, বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। যারা জানে-শোনে তাদের পক্ষে ভূত-নামানো অতি সহজ ব্যাপার। দরকারী আসবাবের মধ্যে কেবল একটি তেপায়া টেবিল!

অমূল্য বিড় বিড় করিয়া বলিল,—আর একটি গুলিখোর।

বরদা ওদিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল,—একদিন একটা ছোট দেখে তেপায়া টেবিল জোগাড় করে সন্ধ্যের পর আমাদের তেতালার সেই নিরিবিলি ঘরটায় বসে গেলুম—আমি, আমার বউ আর পেঁচো—

অমূল্য বলিল,—এই বয়স থেকেই ছোট ভাইটির মাথা খাচ্ছ, বেশ বেশ। বউয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিই, কারণ যেদিন তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সেদিনই তার যা হবার হয়ে গেছে—

বরদা বলিল,—পেঁচোকে না নিয়ে কি করি? তিন জনের কমে যে চক্র হয় না। তাছাড়া সে ছেলে-মানুষ, সুতরাং মিডিয়ম হবার উপযুক্ত। সে যাক্, মেঝের উপর টেবিল ঘিরে ত বসা গেল—কিন্তু ভাবনা হ'ল কাকে ডাকি! ভূত ত আর একটি-আধটি নয়, পৃথিবীর আরম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত যত লোকের ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটেছে সকলের দাবি সমান। এখন কাকে ফেলে কাকে ডাকি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বরদা বলিল,—আমাদের সুভাষকে চেন ত—জুনীয়র উকিল; তার ভগিনীপতি সুরেশবাবু হাওয়া বদলাতে এসে গত শীতকালে নিউমোনিয়ায় মারা যান, বোধ হয় তোমাদের স্মরণ আছে। অমূল্য, তুমি ত পোড়াতে গিছলে। হঠাৎ সেই সুরেশবাবুকে মনে পড়ে গেল। তখন তিনজনে, আলোটা কমিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর আঙুল আঙুলে ঠেকিয়ে সুরেশবাবুর ধ্যান সুরু করে দিলুম। বেশীক্ষণ নয় ভাই, মিনিট-পাঁচেক চোখ বুজে থাকবার পর চোখ চেয়ে দেখি পাঁচুটা কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছে,—কশ বেয়ে নাল গড়াচ্ছে, চোখ শিবনেত্র, বিজ বিজ করে কি বকছে! 'কি রে!' বলে তাকে একটা ঠেলা দিলুম—কাত হয়ে পড়ে গেল! বউ ত 'মাগো' ব'লে চীৎকার ক'রে আমাকে খুব ঠেসে জড়িয়ে ধরলে।

হৃষী বলিল,—বস্তুতন্ত্র এসে পড়েছে। এবার আসল গল্পটা আরম্ভ কর।

বরদা বলিল,—বুঝলুম ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। পেঁচোকে অনেক প্রশ্ন করলুম, কিন্তু সে জড়িয়ে জড়িয়ে কি যে উত্তর দিলে বোঝা গেল না। বড়ই মুস্কিল। তখন আমার মাথায় এক বুদ্ধি গজাল। কাগজ পেনসিল এনে পেঁচোর হাতে ধরিয়ে দিলুম। পেনসিল হাতে পেয়ে পেঁচো সটান উঠে বসল। উঠে বসে লিখতে আরম্ভ করে দিলে। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! পেঁচোর চোখ বন্ধ, মুখ দিয়ে নাল গড়াচ্ছে, আর প্রাণপণে কাগজের ওপর লিখে যাচ্ছে।

পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া বলিল,—আবার হাতের লেখা দেখে অবাক হয়ে যাবে, দস্তুরমত পাকা হাতের লেখা। কে বলবে যে পেঁচো লিখেছে?

অমূল্য তাড়াতাড়ি লেখাটা তদারক করিয়া বলিল,—পেঁচো লিখেছে কেউ বলবে না বটে, কিন্তু তোমার লেখা ব'লে অনেকেরই সন্দেহ হতে পারে।

বরদা বলিল,—এই লেখা হাতে পাবার পর আমি সুভাষের বাড়ি গিয়েছিলুম। সুরেশবাবুর পুরণো একখানা চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম অবিকল তাঁর হাতের লেখা। বিশ্বাস না হয় তোমরা যাচিয়ে দেখতে পার।

অমূল্য বলিল,—অবশ্য দেখ্‌ব।

হৃষী বলিল,—সে যাক্। এখন তুমি কি বলতে চাও যে ঐ কাগজের তাড়াটা সুরেশবাবুর প্রেতাত্মার জবানবন্দী?

বরদা বলিল,—এটা হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর ইতিহাস। পুরোপুরি সত্যি কি না সে-কথা কেউ বল্‌তে পারে না, কিন্তু গোড়ার খানিকটা যে সত্যি তা সুভাষ সেদিন স্বীকার করেছিল।

এইবার তবে আসল গল্পটা শোন—এই বলিয়া বরদা কাগজের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

যাঁহারা মুঙ্গের শহরের সহিত পরিচিত তাঁহারা

জানেন যে উক্ত শহরে 'পিপর-পাঁতি' নামক যে বিখ্যাত বীথিপথ আছে, তাহার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার কূলে মুসলমানদের একটি অতি প্রাচীন গোরস্থান আছে। বোধ করি এই গোরস্থানের সব গোরগুলিই শতাধিক বর্ষের পুরাতন। স্থানটি অনাদৃত। কাঁটাগাছ ও জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে অস্থিপঞ্জর প্রকট করিয়া এই কবরগুলি কোনও রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

এই গোরস্থানের এক কোণে একটি কষ্টিপাথরের গোর আছে। এই গোরটি সম্বন্ধে শহরে অনেক ভূতুড়ে গল্প প্রচলিত ছিল। এই-সব আজগুবি গল্প শুনিয়া আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালক বলিলেন যে, গোরটা সজীব। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে না-কি এক সাহেব ঐ গোর লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিল। গুলির আঘাতে পাথর ফাটিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিয়াছিল; সে রক্তের দাগ এখনও মিলায় নাই, গোরের গায়ে তেমনি শুকাইয়া গড়াইয়া আছে। আর যে নাস্তিক সাহেব গুলি করিয়াছিল সেও প্রাণে বাঁচে নাই, সেই রাত্রেই ভয়ঙ্কর ভাবে তার মৃত্যু হইয়াছে।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় শ্যালককে সঙ্গে লইয়া গোরটি দেখিতে গেলাম। শ্যালক আমারই সমবয়সী, প্রেত-যোনিতে অটল বিশ্বাস। আমি কিছুদিন যাবৎ মুঙ্গেরে আসিয়া শ্যালক-মন্দিরেই বায়ুপরিবর্ত্তন করিতেছিলাম। সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন।

গোরস্থানের নিকটে গিয়া দেখিলাম স্থানটি কাঁটা গাছের বর্ম্মে প্রায় দুর্ভেদ্য হইয়া আছে। অনেক যত্নে অনেক সাবধানে পা ফেলিয়া এবং কাপড়চোপড় বাঁচাইয়া সেই ভূতুড়ে গোরটির সম্মুখীন হইলাম। কাল পাথরের গোর, আপাতদৃষ্টিতে ভৌতিকত্ব কিছুই চোখে পড়িল না।

হঠাৎ, যখন আমরা গোরটির একেবারে নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছি,তখন সেই কাল পাথরের উপর শায়িত আরও কাল একটা জন্তু বোধ হয় আমাদের পদশব্দে জাগিয়া উঠিয়া, একবার আমাদের মুখের উপর তাহার চক্ষু দুটা মেলিয়া ধরিয়া, আস্তে আস্তে গোরের অন্তরালে মিলাইয়া গেল।

দেখিলাম একটা কুকুর। রং কুচকুচে কাল, শরীর যে হিসাবে লম্বা সে হিসাবে উঁচু নয়—পা-গুলা বাঁকা বাঁকা এবং অত্যন্ত খর্ব্ব। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ তাহার চক্ষু দুটা—হল্‌দে রঙের সহিত ঈষৎ রক্তাভ এবং মণিহীন। পলক ফেলিলে মনে হয় যেন অন্ধকার রাত্রে খদ্যোত জ্বলিতেছে।

শ্যালক বলিলেন,—লোকে বলে ওই কুকুরটাই সাহেবের টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলেছিল।

আমি বলিলাম,—পঞ্চাশ বছর আগে? কিন্তু কুকুরটাকে ত অত প্রাচীন বলে বোধ হ'ল না।

আমরা কবরটার একেবারে পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম কুকুরটা যেস্থানে শুইয়া ছিল ঠিক সেই স্থানে পাথরের খানিকটা চটা উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহারই চারি পাশে লাল রঙের একটা পদার্থ শুকাইয়া আছে—হঠাৎ রক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। যেন ঐ কুকুরটা সমাধির রক্তাক্ত ক্ষতটাকে বুক দিয়া আগলাইয়া থাকে।

শ্যালক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রকম বোধ হচ্ছে?

আমি বলিলাম,—আশ্চর্য্য বটে। আমার মনে হয় খুব গরম একটা ধাতু দিয়ে এই পাথরে আঘাত করা হয়েছিল তাতেই এই রকম হয়েছে।

আমার মন্তব্য শুনিয়া শ্যালক আধ্যাত্মিকভাবে একটু হাসিলেন। বলিলেন, 'তা হবে।' কিন্তু তাহা যে একেবারেই হইতে পারে না তাহা তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে বেশ বুঝা গেল।

কোনও একটা তর্কাধীন বিষয়ের আলোচনায় মানুষ যখন উচ্চ অঙ্গের হাসি হাসিয়া এমন ভাব দেখায় যেন অপর পক্ষের সঙ্গে তর্ক করাটাই ছেলেমানুষী, তখন অপর পক্ষের মনে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আমারও একটু রাগ হইল। কিন্তু যে-লোক তর্ক করিতে অসম্মত তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। তাই আমি বলিলাম,—আচ্ছা এক কাজ করা যাক, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। এই পাথরটা ভেঙেই দেখা যাক না, ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরোয় কি না। প্রত্যক্ষের বড় ত আর প্রমাণ নেই—

নিকটেই একখণ্ড পাথর পড়িয়া ছিল, আমি সেটা তুলিয়া লইয়া গোরে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছি এমন সময় সেই কুকুরটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একটা বিশ্রী রকমের চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া অত্যন্ত হিংস্রভাবে আমাকে শাসাইয়া দিল।

শ্যালক আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন,—চলে এস, চলে এস। কি যে তোমার পাগলামি—

কুকুরটার আকস্মিক আবির্ভাবে আমার শ্যালক মহাশয় যতটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন বাস্তবিকপক্ষে আমি ততটা হই নাই। অথচ একটা হিংস্র কুকুরকে অযথা ঘাঁটানো বিশেষ যুক্তির কাজ নয়। তাই পরীক্ষা-কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া আমরা যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম তখন তুমুল তর্ক বাধিয়া গিয়াছে; কুকুরের জীবনের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের শাণিত যুক্তিগুলি শ্যালকের কুসংস্কারের বর্ম্মের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া আসিতেছে।

বাড়ি ফিরিতেই আমার শালাজ এবং যাঁহার সম্পর্কে শালার সহিত সম্বন্ধ তিনি আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিলেন। দুজনেই নবীনা, বিদুষী—প্রতীচ্যের আলোক তাঁহাদের চোখে সোনার কাঠি স্পর্শ করাইয়াছে—তাঁহারা আসিয়াই আমার পক্ষে যোগদান করিলেন। শ্যালক বেচারীর বর্ম্ম তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল।

তর্কে যে ব্যক্তি হারে তাহার জিদ বাড়িয়া যায়। যুক্তির দিকে তখন আর তাহার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। শ্যালক শেষে চটিয়া উঠিয়া বলিলেন,—মান্‌তে না চাও মেনো না। কিন্তু দুপুর রাত্রে একলা ঐ জায়গায় যেতে পারে এমন লোক ত কোথাও দেখি না।

শালাজ উৎসাহদীপ্ত চক্ষে কহিলেন,—আচ্ছা, এমন লোক যদি পাওয়া যায় যে যেতে পারে তাহ'লে ত মান্‌বে যে তোমার ভূত শুধু তোমার ঘাড়েই ভর ক'রে আছে—আর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই?

শ্যালক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন,—একলা রাত্রে সেখানে যেতে পারে এত সাহস কারুর নেই। আর যদি-বা কেউ যায়, সে যে ফিরে আস্‌বে এমন কোনও সম্ভাবনা দেখি না।

আমি বলিলাম,—সকলের সাহস এবং সম্ভাবনা সমান নয়। আমি যেতে প্রস্তুত আছি।

শ্যালক অতি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া বলিলেন,—তুমি—প্রস্তুত আছ? রাত্রি বারটার সময় একলা—

তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—নিশ্চয়। খোট্টার দেশে বেশী দিন থাকিনি বলেই বোধ হয় আমার সে সাহসটুকু আছে। তাহ'লে আজই ভাল। আজ বোধ হয় অমাবস্যা। শাস্ত্র অনুসারে রাজ্যের ভূতপ্রেত দৈত্যদানা আজ সবাই এই মর্ত্ত্যভূমিতে ফিরে এসে দিগ্বিদিকে নৃত্য ক'রে বেড়াবেন। অতএব এ সুযোগ ছাড়া অনুচিত।

শ্যালক ভীত চক্ষে চাহিয়া বলিলেন,—গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রো না সুরেশ, ভারি খারাপ জায়গা। এ সব বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা নেই—

তীব্র হাস্যোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে শালাজের নিকট হইতে প্রতিবাদ আসিল,—ভয় পাবেন না সুরেশবাবু, আপনার জন্য একটা খুব ভাল প্রাইজ ঠিক করে রাখলুম। আপনি জয়লাভ ক'রে ফিরে এলেই এ বাড়ির কোনও একটি মহিলা তাঁর বিম্বাধরের রক্তিমরাগে আপনার কপালে লাল টিকা পরিয়ে দেবেন। ভূতজয়ী বীরের সেই হবে রাজটীকা।

আমি উৎসাহ দেখাইয়া বলিলাম,—লোভ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মহিলাটি কে শুনি?

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—তাঁর সঙ্গে কারুর তুলনাই হয় না।—বলিয়া আমার গৃহিণীর দিকে কটাক্ষপাত করিলেন।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—ঐ জাতীয় প্রাইজ যদিও আমার ভাগ্যে খুব দুর্লভ নয়, (গৃহিণী জনান্তিকে,—আঃ, কি বকৃছ—দাদা রয়েছেন) তবু অধিকের প্রতি আমার বিরাগ নেই। তাহ'লে চুক্তি পাকা হ

গেল—আজ রাত্রেই যাব। কিন্তু আমি যে সত্যি সত্যিই কবরের কাছে গিয়েছি, এদিক-ওদিক ঘুরে বাড়ি ফিরে আসিনি, এ কথা শেষকালে আপনাদের বিশ্বাস হবে ত?

শালাজ অতি দূরদর্শিনী, বলিলেন,—আপনার মুখের কথা আমরা বিশ্বাস করব নিশ্চয়, কিন্তু যাঁকে বিশ্বাস করানো দরকার তিনিই হয়ত করবেন না। অতএব আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। খড়ি দিয়ে গোরের ওপর নিজের নাম লিখে আস্‌তে হবে।

'তথাস্তু,' গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—তোমার দাদার প্রেততত্ত্বের মাথায় বজ্রাঘাত ক'রে দিয়ে আসা যাক্—কি বল?

অল্প দ্বিধাজড়িত হাসি ভিন্ন আর কোন জবাব পাওয়া গেল না।

শ্যালক বলিলেন,—ফাজলামি ছাড়। আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।

শ্যালকের কথা শুনিলাম না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যত সহজ, পশ্চাৎপদ হওয়া তত সহজ নয়।

রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় গরম জামায় আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া একটা কড়া গোছের বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া বাহির হইলাম। এতক্ষণে গৃহিণীর মুখ ফুটিল। প্রতীচ্য বিদ্যায় জলাঞ্জলি দিয়া বলিলেন,—থাক্, গিয়ে কাজ নেই।

আমি হাসিয়া উঠিলাম,—পাগল! ভাই বোন দুজনকার ধাত একই রকম দেখ্‌ছি।

শ্যালক নিরতিশয় ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন,—তুমি এমন একগুঁয়ে জান্‌লে কোন শালা তর্ক কর্‌ত।

* * *

এমন বিশ্রী অন্ধকার বোধ করি আর কখনও ভোগ করি নাই। একটা গুরুভার পদার্থের মত অন্ধকার যেন চারিদিকে চাপিয়া বসিয়া আছে। পথ চলিতে চলিতে পদে পদে মনে হয় বুঝি পরমুহূর্ত্তেই একচাপ অন্ধকারে ঠোকর লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইব।

চুরুটে লম্বা লম্বা টান মারিয়া মনে প্রফুল্লতা ও উৎসাহ সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অজ্ঞাতসারে এমন সতর্ক ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল যে নিজের পদধ্বনি শুনিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিলাম। মনে হইল কে যেন চুপি চুপি পিছন হইতে আমার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু তথাপি অকারণে ভয় পাইবার পাত্র আমি নই। মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম দ্বিপ্রহর রাত্রির এই অন্ধকার, এই স্তব্ধতা, এই বিজনতা সকলে মিলিয়া আমার আন্তরিক সাহসকে একটা দুশ্ছেদ্য ষড়যন্ত্রের জালে ধীরে ধীরে জড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। একটা অলৌকিক মায়া যেন আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। মাকড়সা যেমন শিকারকে প্রথমে সূক্ষ্ম তন্তুর সহস্র পাকে জড়াইয়া পরে ধীরে ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলে, তেমনি এই অদৃশ্য শক্তি আমার সহজ সত্তাকে ক্রমে ক্রমে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

ক্রমে 'পিপর-পাতি' রাস্তার পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া পড়িলাম। ইহারই অপর প্রান্তে কবরস্থান। রাস্তার দুইপাশে বড় বড় গাছ, মাথার উপর বহু উর্দ্ধে তাহাদের শাখাপ্রশাখা মিলিয়াছে। অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়া আসিল।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের মত একটা স্পর্শ পাইলাম। শরীরের সমস্ত রোম শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। পরক্ষণেই একটা খুব লঘু পদার্থ পিঠের উপর দিয়া খড়্‌খড়্ শব্দে নীচে গড়াইয়া পড়িল। বুঝিলাম ভয় পাইবার মত কিছু নয়, মাথার উপর যে ঘনপল্লব শাখাগুলির আলিঙ্গনকে নিবিড় বিচ্ছেদবিহীন করিয়া রাখিয়াছে তাহারই একটি শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে। আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিতে লাগিলাম।

লম্বা টানের চোটে চুরুটটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অন্য সময়ে হইলে ফেলিয়া দিতাম, কিন্তু আজ সেটাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিলাম না। তাহার অগ্নিদীপ্ত প্রান্তটুকুতে যেন একটু প্রাণের সংস্রব ছিল। এই নিঃসঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যখন সঙ্গীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, তখন ওই

ক্ষীণ রশ্মিটুকুই জীবন্ত সঙ্গীর মত প্রাণের মধ্যে ভরসা জাগাইয়া রাখিয়াছিল। ওটাকে ফেলিয়া দিলে যে অনেকখানি সাহসও চলিয়া যাইবে তাহা বেশ বুঝিতেছিলাম।

কিন্তু ক্রমে যখন আঙুল পুড়িতে লাগিল তখন সেটাকে ফেলিয়া দিতেই হইল। একবার বেশ ভাল করিয়া টানিয়া লইয়া সম্মুখের দিকে কিছু দূরে ফেলিয়া দিলাম।

ফেলিয়া দিবামাত্র মনে হইল, যে-আঙুল দুটা দিয়া চুরুট ধরিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কোনও ছিদ্র পাইয়া খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আমার দৃষ্টি ছিল নিক্ষিপ্ত চুরুটটার উপর—সেটা মাটিতে পড়িবামাত্র আগুন ছিট্‌কাইয়া উঠিল। তারপর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। ছিট্‌কানো আগুনটা মধ্যপথে দুটা আকৃতি ধরিয়া পাশাপাশি একসঙ্গে নড়িতে আরম্ভ করিল। মাটি হইতে প্রায় একহাত উপরে থাকিয়া পরস্পরের চারি আঙুল ব্যবধানে এই ক্ষুদ্র অগ্নিগোলক দুটা একজোড়া লাল জোনা কির মত সম্মুখ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং মাঝে মাঝে মিটমিট করিতে লাগিল।

আমার মাথা বোধ হয় গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কি জানি কেন আমার ধারণা জন্মিল যে, ওই মিট্‌মিট্ করা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দুটা আর কিছুই নয়, দুটা চক্ষু, আমার পানে তাকাইয়া আছে, এবং এই চক্ষু দুটার পশ্চাতে একটা খর্ব্বাকৃতি কুকুরের কালো রং যে অন্ধকারে মিশাইয়া আছে তাহা যেন মনে মনে স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

চলিতে চলিতে কখন দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলাম লক্ষ্য করি নাই, চক্ষু দুটাও সম্মুখে কিছুদূরে দাঁড়াইল। তারপর কতক্ষণ যে নিস্পলকভাবে আমার মুখের দিকে দৃষ্টি ব্যাদান করিয়া রহিল জানি না, মনে হইল বহুক্ষণ পরে সেই চক্ষুর পলক পড়িল। তখন সেটা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দেহের উপর তখন কোনও অধিকারই নাই। স্বপ্নে বিভীষিকার সম্মুখ হইতে পলাইবার ক্ষমতা যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, আমিও তেমনি নিতান্ত নিরুপায়ভাবে ওই চক্ষুর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম। স্বাধীন ইচ্ছা তখন একেবারে জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, আছে কেবল সমস্ত চেতনাব্যাপী দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ভয়।

কতক্ষণ এই অগ্নিচক্ষুষ্মান আমাকে তাহার আকর্ষণ প্রভাবে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল আমার ধারণা নাই। একবার চেতনার অন্তরতম প্রদেশে যেন ক্ষীণ অনুভূতির ছায়া পড়িয়াছিল যে পাকা রাজপথ দিয়া চলিতেছি না; আর একবার মনে হইয়াছিল বুঝি একটা গাছের মোটা শিকড়ে ঠোকর খাইলাম। কিন্তু সে-সব আমার ইন্দ্রিয় উপলব্ধির বাহিরে।

হঠাৎ একটা বড় রকমের ঠোকর খাইলাম। এটা বেশ স্মরণ আছে। তারপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াই নীচের দিকে গড়াইতে সুরু করিলাম। কোথায় পড়িতেছি কোনও ধারণাই ছিল না; অন্ধকারে দেখাও অসম্ভব। কিন্তু এই পতন যে অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে এবং পতনের লক্ষ্যও যে একটা অতলস্পর্শ স্থানে লুকাইয়া আছে তাহা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অথচ কি নিদারুণ সেই পতন! গড়াইতে গড়াইতে এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে পড়িতেছিলাম এবং প্রত্যেক স্তরে অবরোহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অস্থিগুলা যেন একবার করিয়া ভাঙিয়া যাইতেছিল।

এই অবরোহণের শেষ ধাপে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন জ্ঞান বিশেষ ছিল না; কিন্তু একটা অনন্ত যন্ত্রণার পথ যে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা সমস্ত শরীর দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মেলিলাম। সেই দেহহীন লাল চক্ষু দুটা আমার মুখের অত্যন্ত নিকটেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন নিরীক্ষণ করিতেছে। দেহের রক্ত ত জল হইয়া গিয়াছিল, এবার তাহা একেবারে বরফ হইয়া গেল। একটা অসহ্য শীতের শিহরণ সমস্ত দেহটাকে যেন ঝাঁকানি দিয়া গেল। তারপর আর কিছু মনে নাই।

সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে জ্ঞান হইল। কল্যকার রাত্রি যে স্বাভাবিকভাবে কাটে নাই এই চিন্তা লইয়া চক্ষু



কমলিনী

শ্রীকুলজারঞ্জন চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মেলিলাম। ঘাসের উপর শুইয়া আছি দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গেলাম—উঃ! গায়ে দারুণ বেদনা। আবার শুইয়া প’ড়লাম। তখন ক্রমশঃ সব মনে পড়িল। ঘাড় না নাড়িয়া যতদূর সাধ্য দেখিয়া বুঝিলাম, ‘পিপর-পাতি’ রাস্তার পাশে পাশে কেল্লার যে শুষ্ক গড়খাই গিয়াছে তাহারই তলদেশে বাব লা গাছের ঝোপের মধ্যে পড়িয়া আছি।

সূর্য্য উঠিল। এখানে সমস্ত দিন পড়িয়া থাকিলেও কেহ সন্ধান পাইবে না ইহা স্থির। শরীরে ত নড়িবার শক্তি নাই। প্রচণ্ড এক হেঁচকা মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম; চক্ষু হইতে আরম্ভ করিয়া দেহের সমস্ত রোম বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। কিন্তু বাড়ি গিয়া পৌঁছিতেই হইবে। অসীম বলে মৃতপ্রায় দেহটাকে টানিতে টানিতে কি করিয়া যে বাড়ি গিয়া পৌঁছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য আমার নাই। বাড়ি যাইতেই সকলে চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল এবং উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে আমার ক্ষীণ চেতনা আবার লুপ্ত করিয়া দিবার যোগাড় করিল। শ্যালক সকলকে সরাইয়া দিয়া আমাকে একটা ইজিচেয়ারে বসাইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সারা রাত কোথায় ছিলে? আমরা সকলে তোমার জন্যে—

উত্তর দিতে গেলাম, কিন্তু কি ভয়ানক! গলার স্বর একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। শ্যালক আমাকে দুধ ও ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

ডাক্তার যখন আসিলেন তখন বিছানায় শুইয়া আছি—ভয়ানক কম্প দিয়া জ্বর আসিতেছে। স্ত্রী ও শালাজ মলিন মুখে মাথার শিয়রে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—দুটো লাঙ্গস্ই য়্যাফেক্ট করেছে—নিউমোনিয়া।

তারপর আবার অচেতন হইয়া পড়িলাম।

* * *

ঘুম ভাঙিয়া দেখি শরীর বেশ ঝর্‌ঝরে হইয়া গিয়াছে—কোথাও কোনও গ্লানি নাই।

কে একজন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন বোধ হচ্চে?

ফিরিয়া দেখি বিনোদ,—আমার ছেলেবেলার স্কুলের বন্ধু। অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। বলিলাম,—বেশ ভালই বোধ হচ্ছে ভাই। বুকের ওপর যে একটা ভার চাপানো ছিল সেটা আর টের পাচ্ছি না।

বিনোদ মৃদু হাসিয়া বলিল,—প্রথমটা ঐ রকম বোধ হয় বটে। আমার যখন কলেরা হয়—

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—তাই ত। বিনোদ ত আজ দশ বৎসর হইল কলেরায় মরিয়াছে; আমি স্বহস্তে তাহাকে দাহ করিয়াছি। তবে সে এখানে আসিল কি করিয়া! মহাবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—বিনোদ, তুমি ত বেঁচে নেই—তুমি ত অনেক দিন মারা গেছ!

বিনোদ আসিয়া আমার দুই হাত ধরিল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—তুমিও আর বেঁচে নেই বন্ধু!

রেড্ ইণ্ডিয়ানদের দেশে

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ

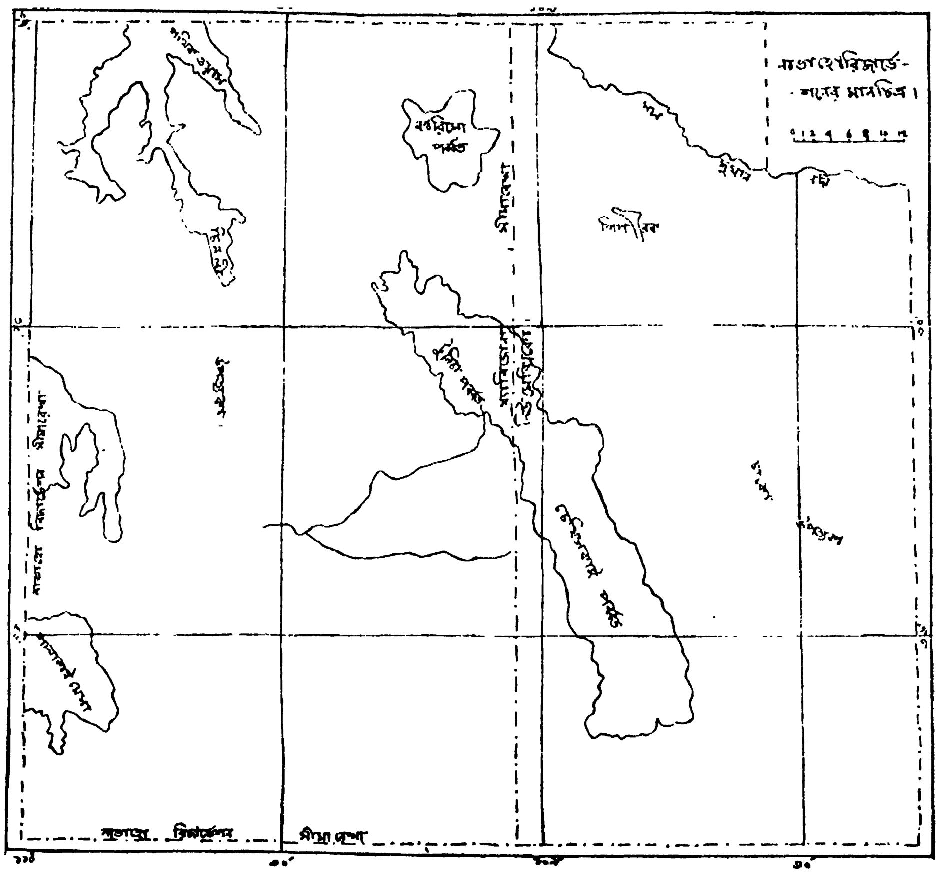
৪

২২শে জুলাই আমি টৌয়াক (Towoac) হইতে নেভ্যাহো রিজার্ভেশনের (Navaho Reservation) সদর শিপ্‌রকে (Shiprock) যাত্রা করিলাম। এই পথটুকু প্রায় ৫০ মাইল হইবে, তবু মোটরে যাইতে আমাদের চার ঘণ্টা লাগিল। অসমান বালুকাময় মালভূমির উপর দিয়া স্যান জুয়ান (San Juan) নদী পার হইয়া আমাদিগকে যাইতে হইল। গ্রীষ্মের দিনে স্যান জুয়ান নদীর জলস্রোত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। মিঃ ও মিসেস্ ম্যাকনীলি ও জনৈক মার্কিন-পর্য্যটক সস্ত্রীক এই সঙ্গে চলিলেন। শিপ্‌রকে পৌঁছাইতে অপরাহ্ণ হইল।

'নেভ্যাহো' কথাটির মূল অর্থ 'আবাদী জমি'। স্প্যানিয়ার্ড ঔপনিবেশিকেরা যখন এই প্রদেশটি অধিকার করেন, তখন তাঁহারা যাযাবর য়্যাথাপাস্কান (Athapascan) জাতিটিকে অন্যান্য য়্যাপ্যাশি (apache) জাতি হইতে নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য apaches de Navahos নামে অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই জাতি নিজেদের মধ্যে ডিনে (Dine-people) নামে পরিচিত। এখন অবশ্য এই কথাটির প্রচলন নাই।

মানচিত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে য়্যারিজোনা (Arizona) রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব হইতে নিউ মেক্সিকোর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত নেভ্যাহো রিজার্ভেশনটির পরিমাণ প্রায় ১১,০০০ হাজার বর্গ মাইল। এই রিজার্ভেশনের অন্তর্গত ভূভাগ কেবল একটি সুবিস্তৃত বালুকাপূর্ণ সমতলভূমি; টুনিচা-চৌইস্‌কাই (Tunicha-Choiskai) নামক পর্ব্বতমালা উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই পর্ব্বতমালা সাধারণতঃ সাত কি আট হাজার ফুট উচ্চ; [illegible] হইবে না। পাহাড়ের চূড়াগুলি প্রায় সমতল—পাইন, ওক, সেডার প্রভৃতি বৃক্ষে আচ্ছন্ন ও ছোট ছোট পার্ব্বত্য তটিনী ও ঝর্ণায় পরিপূর্ণ। পর্ব্বতমালার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সমভূমির যে দুইটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, সে দুইটি যথাক্রমে চ্যাকো (Chaco) ও চীন্‌লী (Chinlee) উপত্যকা নামে পরিচিত। এখানকার মৃত্তিকা বড়ই ঊষর। পাহাড়তলীতে ঝর্ণা ও নদীর ধারে সামান্য কিছু জমি ছাড়া আর সবই চাষের অযোগ্য। সমুদ্র হইতে এই সমভূমির উচ্চতা প্রায় ৩,০০০ হাজার ফুট। মাঝখানে দুস্তর পাহাড় থাকায় চ্যাকো ও চিন্‌লী প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা নাই। ফলে নেভ্যাহো জাতি প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নেভ্যাহোরা য়্যাথাপ্যাস্কান (Athapascan) জাতির একটি শাখা; যুক্তরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে এখানে আসিয়া বসতি করে। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে স্প্যানিশ-পর্য্যটক জরাতি স্যাল্‌মেরন (Zarate Salmeron) তাহাদের এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা দেখিয়া গিয়াছেন; অতএব তাহারা যে নিতান্ত অল্পদিন পূর্ব্বে এখানে আসে নাই তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। য়্যাথাপ্যাস্কান জাতির আর একটি শাখা ক্যালিফোর্ণিয়ায় এখনও বাস করে; সুতরাং মনে হয়, নেভ্যাহোরা কোন সময়ে স্বজাতীয় মূল শাখা হইতে বিচ্যুত হইয়া এই দেশে আসিয়া পুয়েব্লো (Pueblo) কৃষ্টি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত আচারপদ্ধতির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ইউটদের মত একেবারে যাযাবর না হইলেও, তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া বাস করিবার অভ্যাস এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অবশ্য নেভ্যাহোদের অধ্যুষিত প্রদেশটি যে-রকম ঊষর ও জলশূন্য, তাহার জন্যই মনে হয় এরূপ অভ্যাস বজায় রহিয়া গিয়াছে। স্যান জুয়ান নদীর



নেভ্যাহো রিজার্ভেশুনের মানচিত্র

পার্শ্বেই জলাভাব নাই বলিয়া কেবল স্থায়ী বসতি সম্ভব হইয়াছে। যাহা হউক এই দেশে আসিয়া নেভ্যাহোরা ক্রমশঃ ঝর্ণার ধারে ধারে অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর জমিগুলিতে অল্পস্বল্প গম, তরমুজ ও পীচ প্রভৃতির চাষ করিতে শিখে। এই প্রদেশটি যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হইবার পূর্ব্বে তাহারা প্রধানতঃ পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান ও প্রত্যন্তবাসী মেক্সিক্যান ঔপনিবেশিকদের সহিত যুদ্ধ ও লুণ্ঠন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই উপায়ে যে-সকল মেষাদি পশু সংগ্রহ হইত, তাহাদেরই পরিচর্য্যা করিয়া নেভ্যাহোরা ক্রমে যুদ্ধপ্রধান ও শিকারী জাতি হইতে মেষপালকে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন অবশ্য অতি ধীরে ধীরে সংসাধিত হয় এবং অবস্থাগতিকে এইরূপ হইতে তাহারা অনেকটা বাধ্যও হইয়াছে।

১৮৬৩ সালে কর্ণেল কিট্ কারসন (Kit Carson) নেভ্যাহোদের সমস্ত পালিত পশুগুলি মারিয়া ফেলিয়া তাহাদের পদানত করেন। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও উহাদের উৎপাতে এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করা দুরূহ ছিল। ১৮৬৮ সালের ১লা জুন তারিখে নিউ মেক্সিকোর অন্তর্গত ফোর্ট সুম্নেরে (Fort Sumner) যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে নেভ্যাহোরা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে। অপরপক্ষে মার্কিন গভর্ণমেণ্টও ৩০,০০০ মেষ ও ২,০০০ ছাগল উপঢৌকন দিয়া নেভ্যাহোদের বর্ত্তমান বাসভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তাহার পর হইতেই ইহারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কেবল নেভ্যাহো জাতিটিই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং সংখ্যাতেও

বাড়িতেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের লোকসংখ্যা ছিল ২০,০০০ হাজার; তাহার পর এই ত্রিশ বৎসরে তাহারা সংখ্যায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

নেভ্যাহোদের পৌরাণিক আখ্যায়িকায় তাহারা যে হইল। তাহারা তৃতীয় লোকে আসিয়া দেখিতে পাইল যে অতিকায় বন্যজন্তু ও রাক্ষসরা মানুষ মারিয়া খাইতেছে। উহারা ইতিমধ্যেই অনেককে বধ করিয়া যত্রতত্র অবাধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এইজন্য



নেভ্যাহো পুরুষ



নেভ্যাহো স্ত্রীলোক

পৃথিবীর তলদেশ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে এইরূপ বর্ণনা আছে। এই অধঃলোক চারিটি স্তরে বিভক্ত :—

১ ন্যাস্‌নাডোভোথিল্ বা কৃষ্ণলোক।

২ ন্যাস্‌নাডোভোক্লিস্ বা নীললোক।

৩ ন্যাস্‌নাক্লিটসো বা পীতলোক।

৪ ন্যাস্‌নালাগাই বা শ্বেতলোক বা পৃথিবী।

ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি নশ্বর লোকে নানা অসুবিধার জন্য নেভ্যাহোরা ঊর্দ্ধে পৃথিবীর দিকে আসিতে বাধ্য ওলাইকেসন বা শ্বেত-শঙ্খ-বালার (white-shell woman) গর্ভজাত ও সূর্য্যের (জুনাকের) দুই পুত্র নাইয়েনেসগণি ও টোবাইডিশিনি (ইহারা ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাত্র চারি দিনের মধ্যেই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছিল) তাহাদের পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কিরূপে নরখাদক রাক্ষস ও বন্যজন্তু সংহার করা যায় তাহার উপায় বলিয়া দিতে বলিল। 'সূর্য্য' তাহাদের বিদ্যুতসংযুক্ত একটি তীর (ইটুইকা) প্রদান করিলেন এবং তাহার দ্বার

উহারা সকল রাক্ষস ও বন্যজন্তু সংহার করিতে সমর্থ হইল।

শ্বেতলোক বা পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে নেভ্যাহোরা পীতলোকে ঝো: (Jhow) নদীর তীরে দুইজন দলপতির অধীনে বাস করিত। পুরুষেরা না-তা-নি নামক একজন পুরুষের অধীনে ও স্ত্রীলোকেরা সা-না-ত্যান্ নাম্নী এক নারীর অধীনে ছিল। একদিন পুরুষেরা নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে মৃগয়ায় গেলে পর, না-তা-নি পর্ব্বতচূড়ার উপর হইতে দেখিল যে তাহার স্ত্রী নকুলিয়াহিকৃষ্ট্র তাহার প্রণয়ীকে সম্ভাষণ করিতেছে। প্রণয়ী নৌকাযোগে নদী বাহিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া না-তা-নি



সপ্ররকে একদল নেভ্যাহো



একজন নেভ্যাহো গায়ক

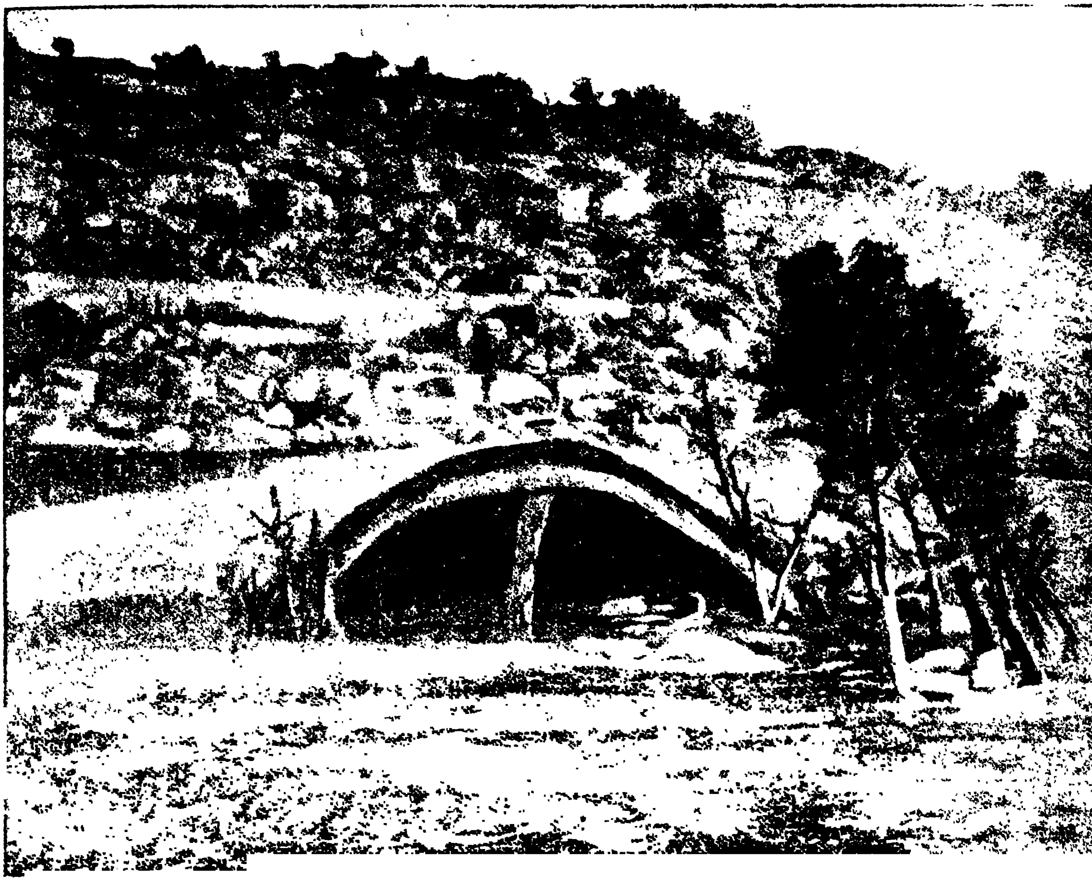
অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, তাহার স্ত্রী পীড়ার ভাণ করিয়া যেন বেদনায় প্রপীড়িত হইয়া কাঁদিতেছে। পর্ব্বতচূড়ার উপর হইতে সে যাহা দেখিয়াছিল সমস্তই তাহাকে বলিল এবং অতঃপর আর যাহাতে তাহার দ্বারা প্রতারিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে বলিয়া শাসাইল ও এক টুকরা কাঠ উঠাইয়া তাহার দ্বারা স্ত্রীকে কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। না-তা-নির স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মায়ের নিকট গিয়া সকল কথা বিবৃত করিল। সন্ধ্যার সময় না-তা-নির শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীলোকেরা সকলে একত্র হইয়া পুরুষদের গালাগালি দিয়া এই বলিয়া বড়াই করিতে লাগিল যে, তাহারা পুরুষদের সংসর্গ ব্যতিরেকে অধিকতর সুখেই জীবনযাপন করিতে পারিবে। অপরপক্ষে পুরুষেরাও যখন তাহাদের দলপতির কাহিনী শুনিল তখন তাহারা স্ত্রীলোকের সংসর্গ ছাড়িয়া নদীর অপর পারে বসবাস করা স্থির করিল ও ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র সব স্ত্রীলোকদিগকে প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। এইভাবে সুদীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নদীর দুই পার্শ্বে পৃথক পৃথক বসবাস করিল। অবশেষে স্ত্রীলোকেরা দেখিল যে, শিকারের অভাবে তাহারা পর্য্যাপ্ত আহার পাইতেছে না ও তাঁহাদের পরিধেয় বসন জীর্ণ ছিন্নকন্থায় পরিণত হইয়াছে। পুরুষেরাও তাহাদের পত্নীদের সেবা-



একটি নেভ্যাহো হোগান বা বাসস্থান

যত্নের অভাব বিলক্ষণ বোধ করিতে লাগিল ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তিন বৎসরের স্বেচ্ছাকৃত বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতায় দুই পক্ষই বুঝিতে পারিল যে পরস্পরের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে পুরুষ কি স্ত্রী কাহারও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপায় নাই। ফলে তাহাদের পুনর্মিলনের জন্য একটি শুভদিন স্থির করা হইল। এইদিনে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সাহায্যে নদী পার হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে পুরুষেরা তাহাদের জন্য যে-সব কাপড়চোপড় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, মেয়েরা স্নান সারিয়া সেই সব পরিধান করিল। অতঃপর সব গোলযোগের অবসান হইল।

ইহার পর নেভ্যাহোরা সুখেই জীবন যাপন করিতেছিল। কিন্তু একদিন একটি কয়োট (coyote) (এক জাতীয় শৃগাল) নদীতীর হইতে একটি ব্যাজারকে (Badger) ধরিয়া সকলের অলক্ষ্যে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়া দিল। এই ঘটনার পর হঠাৎ এক শীতের দিনে পাখীদের সন্ত্রস্ত ভাবে তরুশাখা ছাড়িয়া আকাশে উড়িতে দেখা গেল এবং চারিদিক হইতে লোকজনেরাও দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য একজনকে ডেবেণ্টশাহ (Debentsah) পাহাড়ের চূড়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সে আসিয়া খবর দিল যে, শুভ্রোজ্জ্বল পূর্ব্ব (Lakaidanbilvow), পীতবর্ণ পশ্চিম (Khlibsodanbilvow), কৃষ্ণবর্ণ উত্তর ও নীলবর্ণ দক্ষিণ দিক হইতে খরবেগে বন্যার প্রবাহ আসিতেছে। অগত্যা নেভ্যাহোরা ডেবেণ্টশাহ পাহাড়ের শিখরে আশ্রয় লইল। ক্রমে চারিদিক হইতে বন্যার জল আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। জল যেমন বাড়িতে



নেভ্যাহোদের গ্রীষ্মাবাস

লাগিল, পাহাড়টও তেমনি উঁচু হইয়া উঠিতে উঠিতে শেষে জলে ভাসিতে আরম্ভ করিল। গতিক দেখিয়া নেভ্যাহোরা জীবনের আশাভরসা ছাড়িয়া দিল। অবশেষে তাহাদের আসন্থুণ্টির (ahsounulti, the Turquoise) তরুণ পুত্রদ্বয় হ্যাস্জেল্‌ট (Hasjelti) ও হষ্টোঘনের (Hostjoghon) কথা মনে পড়িয়া গেল। ইহারা বাঁশী বাজাইয়া গান করিতে খুবই ভালবাসিত। যাহা হউক শরণাপন্ন নেভ্যাহোদের পরিত্রাণের জন্য হ্যাস্জেল্‌ট ও হষ্টোঘন ভ্রাতৃদ্বয় ঐ পাহাড়ের চূড়ায় তাহাদের খাগের বাঁশী (Dvilnee) দুট পুতিয়া দিয়া সকলকে বাঁশীর ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিল। নেভ্যাহোরা একে একে বাঁশীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে পর, বাঁশীটিও ক্ষিপ্রগতিতে উঁচু হইতে হইতে শেষে পৃথিবীর তলদেশে গিয়া ঠেকিল। তখন বাঁশী দুইটি যাহাতে নেভ্যাহোদের লইয়া উপরে উঠিয়া আসিতে পারে এজন্য উইপোকা (Uneshchnidih) পৃথিবীর মধ্য দিয়া গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। গর্ত্ত খোঁড়া শেষ না হইতেই পাতিহাঁস (Chnisthnaibhai) চারিবার পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারিদিক হইতে আসিয়া একটি তীর গলাধঃকরণ করিয়া পেট ফুঁড়িয়া বাহির করিয়া ফেলিল এবং উইপোকাকে কসরৎটি দেখাইতে আহ্বান করিল। না পারিলে সে তাহাকে গর্ত্ত খুঁড়িতে বাধা দিবে, ইহাও জানাইয়া দিল। উইপোকা তীরটি লইয়া আড়ভাবে বুকের ভিতর দিয়া বাহির করিয়া বাহাদুরী দেখাইল। পাতিহাঁস এই কসরৎ দেখাইতে না পারিয়া [illegible]



চেলী ক্যানিয়নের একটি হোগান

নেভ্যাহোরা সেই পথে পৃথিবীতে উঠিতে আরম্ভ করিল; তখনও কিন্তু জল তাহাদের পিছনে পিছনে আসিতেছিল। ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য তাহাদের এক সভা বসিল। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল যে, শেয়াল, ব্যাজারকে চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। ব্যাজার জলের অত্যন্ত প্রিয় জন্তু; সুতরাং তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই যে জল এমন করিয়া চারিদিক হইতে তাড়া করিয়া আসিতেছিল তাহা বুঝা গেল। ফলে শেয়ালকে ব্যাজারটিকে ফিরাইয়া দিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে বন্যাও থামিয়া গেল।

পৃথিবীতে আসিয়া নেভ্যাহোরা দেখিতে পাইল ছয়টি পাহাড়ে তাহাদের চারিদিক ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অধস্তন লোকের ছয়টি পাহাড়ের নামেই এইগুলির নামকরণ হইল। এই পর্ব্বতগুলিকেই তাহারা নিজেদের সীমানা (Penkshinosto) স্থির করিয়া ঐ স্থানে বাস করিবার সঙ্কল্প করিল। জল তাহাদের পিছনে পিছনেই আসিয়াছিল এবং সঙ্গে করিয়া আগুনও (Hancinekshii) তাহারা আনিয়াছিল। কিন্তু ঘর তৈয়ারী করিবার কৌশল তখনও তাহারা জানিত না। অবশেষে উষার দেবতা (Quasticiyalci) এবং সূর্য্যাস্তের দেবতা (Quastciquagan) দুইজনে মিলিয়া মাটি ও কাঠ দিয়া তাহাদের ঘর বাঁধিতে শিখাইয়া দিলেন। শেষোক্ত দেবতার নাম হইতেই ঘরগুলিকে Quogan বলা হয়। ঘর তৈয়ারী করিবার সময় আজিও নেভ্যাহোরা এই দেবতাদের নিকট ভক্তিভরে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ

পুস্তক পরিচয়

হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা—প্রথম খণ্ড সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৮

পণ্ডিতদের সংবর্দ্ধনার জন্য তাঁহাদের বন্ধু, শিষ্য ও গুণগ্রাহী অন্য পণ্ডিতদের পক্ষে নিজ নিজ গবেষণা একত্র করিয়া শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন হিসাবে অর্পণ করা আমাদের দেশে চিরাচরিত প্রথা নয়, কিন্তু ইহাতে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যে বাষ্পাকারে বাহির না হইয়া বস্তুতে ফুটিয়া উঠে এবং জ্ঞানের আরাধনায় জ্ঞানীকে যে প্রকৃত সম্মানিত করা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাদের দেশে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সে স্থান পূরণ করিবার মত আর কেহ নাই; সে যুগের শেষ চিহ্ন তিনিই ছিলেন, এবং বঙ্গ-সাহিত্য ও ভারতের সর্ব্বাঙ্গ ইতিহাসের পুনরুদ্ধারে তাঁহার দান যে কতখানি তাহার পরিমাণ করা প্রয়োজন। সুখের বিষয়, আমাদের দেশে সাধারণতঃ যেরূপ হয় এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, আমরা নানারূপ ধাক্কা খাইয়া গুণের আদর অন্ততঃ এবার করিতে পারিয়াছি; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে শাস্ত্রী মহাশয়ের ৭৫ বৎসর প্রান্তে বর্দ্ধাপন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন এবং সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছে,—আমরা সংবর্দ্ধন-লেখমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত দেখিলাম, শাস্ত্রী মহাশয়ও ইহা দেখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, সুতরাং সম্পাদকদ্বয়ের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। সাহিত্য ইতিহাস দর্শন প্রত্নতত্ত্ব নানা বিভাগ হইতে খ্যাতনামা লেখকদের দিয়া রচিত প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে, কৃতবিদ্য লেখকদের নাম পড়িলেই ইহার সারবত্তা বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। সাহিত্য-পরিষদের এই সাধু চেষ্টা বাঙালী পাঠকসাধারণের নিকট নিশ্চয় সমাদর লাভ করিবে।

বর্ত্তমান খণ্ডে ১৪টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। 'ফল্গুনী-পূর্ণমাস' প্রবন্ধে লেখক তৈত্তিরীয় সংহিতার বর্ষব্যাপী সত্রের দীক্ষা সম্বন্ধীয় উপদেশ আলোচনা করিয়া তিলক মহারাজের সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর এই গণনা সম্বন্ধে রিপণ কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমতও দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অয়ন-চলনের পরিমাণ আরও সূক্ষ্মভাবে দেওয়া আছে। শিল্পশাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রবাবু 'নর্ত্তন-নির্ণয়ম্' নামে এক অপ্রকাশিত পুথির পরিচয় দিয়াছেন; প্রবন্ধটি অত্যন্ত দ্রুত লিখিত বলিয়া মনে হইল, কারণ কথ্য ও লেখ্য উভয় রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, এবং সময় সময় বাংলা লিখিয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে তাহার পরে ইংরেজী দেওয়া আছে, যেমন 'হিন্দু-পারসীক (Indo-Persian),' 'পদ্ধতি (School),' 'পুথির বিবরণ (Catalogue),' 'লক্ষণ (Definition)' ইত্যাদি; ১০ পৃষ্ঠায় একখানি প্রতিলিপি 'সম্মুখের পৃষ্ঠে ছাপা হ'ল' বলিয়া লেখা আছে, দুঃখের বিষয় তাহা কিন্তু ৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে ছাপা হইয়াছে; এরূপ উপাদেয় প্রবন্ধে কোনও ত্রুটি না থাকিলেই ভাল ছিল। 'বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা'য় প্রাণীদের কোথায় ও কি ভাবে উল্লেখ আছে তাহা দেওয়া হইয়াছে, খানিকটা পরে প্রায় সবগুলিরই ইংরেজী সংজ্ঞা বসান আছে। 'তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য' সুন্দর প্রবন্ধ,—তন্ত্রসম্বন্ধে যেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব প্রচলিত তাহাতে সাধারণ পাঠকের ইহা উপকারে লাগিবে। তাৎপর্য্যই যে অস্তিত্ব, উহা যে সত্তারই চরম অবস্থা, সে কথা 'অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্য' প্রবন্ধে যথাসম্ভব দার্শনিক পরিভাষার সাহায্য লইয়াই বোঝান হইয়াছে। 'ধর্ম্মমঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্ম্মদেবতার প্রাচীনতা' প্রবন্ধে (৯৫ পৃঃ) 'ঋত'কে right-এর সমান করা হইয়াছে,—ইহা ঠিক হয় নাই; নাসদীয় সূক্তে যাবতীয় দেবগণের অসত্তা স্বীকার করিয়া একা ঋষি বৈদিক যুগে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা বলা দুঃসাহসের পরিচয়; ১০৪ পৃঃ 'আপনি সিরজিল' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি শ্লোকের আকারে না লেখায় দৃষ্টিকটু হইয়াছে। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'ধনুর্বেদ' প্রবন্ধটি অর্থগৌরবে এবং স্থান-গৌরবেও লেখমালার মধ্যমণি, ইহাতে প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টি একত্র মিলিয়াছে। 'বঙ্গের পল্লীগীতিকা' বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতার উপভোগ্য প্রবন্ধ; অনাদৃত উপেক্ষিত পল্লীসমাজে যে কবিহৃদয় জাগিয়া আছে ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু ১৪৫ পৃঃ কয়েক পঙ্‌ক্তি বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা গদ্যের মত অবিরামভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৪টি 'কিন্তু' পাশাপাশি ঠাসাঠাসি বসিয়াছে, ১৫৫ পৃঃ পুরাতন বাংলাকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া সংস্কৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছে, ১৬২ পৃঃ 'লুকাইত' লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শনস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। 'অদ্ভুত তাম্রশাসন,' প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ইন্দ্রপাল বর্ম্মদেবের দ্বিতীয় তাম্রশাসনের কথা; ইহাতে অন্যান্য তাম্রশাসনের অধিক "শ্রীমৎ পরমেশ্বর পাদানাং" অর্থাৎ দেশাধিপতির ৩০টি নাম, নামের শেষে এক পঙ্‌ক্তিতে শঙ্খ চক্র পদ্ম ও গরুড়ের (?) ছবি ও ছবিগুলির বামদিকে পর পর তিনটি শব্দ রহিয়াছে। 'অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্বয়' অর্থাৎ বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ এই উভয়ের সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম জড়িত আছে, বিশেষতঃ শেষেরটি তাঁহারই পাওয়া ও তাঁহারই সম্পাদকতায় প্রকাশিত; সুকুমারবাবু অশ্বঘোষ ও কালিদাসের ভাবগত ও উপমাগত মিল, অশ্বঘোষের কয়েকটি শ্লোকে ভগবদ্গীতার আভাস, এবং তাঁহার কাব্যে (সম্ভবতঃ অযত্নবশতঃ) পুনরুক্তিদোষ, তাহাদের ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ—এ সকলের দৃষ্টান্তসহ পরিচয় দিয়াছেন। 'কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাঠমণ্ডুর প্রাচীনত্ব' প্রবন্ধে প্রবোধবাবু ১৪১১ খৃঃ এক পুথিতে কাষ্ঠমণ্ডপ নগরের নাম পাইয়াছেন, এবং দশম শতাব্দীর নেওয়ারী ও তিব্বতী প্রতিশব্দ হইতে অনুমান করেন যে নেওয়ার জাতির দেওয়া নামই কাঠমণ্ডুর সব চেয়ে প্রাচীন নাম। 'মহাযানবিংশকে' অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ হইতে নাগার্জ্জুনের মহাযানবিংশক নামক মূল সংস্কৃত গ্রন্থ টীকাটিপ্পনী, পাঠান্তর তুলনা, বিবৃতি ও বঙ্গানুবাদ সহ পুনরুদ্ধার করিয়াছেন; এই নামের, অথচ একেবারে ভিন্ন, দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে এবং মহামহোপাধ্যায়ই সে দুইখানি প্রকাশ

করিয়াছিলেন। 'বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের' পরিচয় দিয়া শ্রীযুত নগেন্দ্রবাবু উৎকলে ভীম-ভোই-প্রচারিত নবীন বৌদ্ধধর্ম্মের কথাও বলিয়াছেন; শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন,—ইহা তাঁহার অনুরূপ অর্ঘ্য হইয়াছে। সর্ব্বশেষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত প্রদেশে একদা-প্রচলিত অধুনালুপ্ত আপ্তী চিহ্ন যে কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধগতির প্রতিকৃতি তাহা দেখাইয়াছেন এবং সে প্রসঙ্গে অনুরূপ চিহ্নাদিরও আলোচনা করিয়াছেন। 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী স্বয়ং সনাতনী ব্রহ্মময়ী। যতই অধঃপতন হউক, মূলচ্ছেদ হইবে না'—তাঁহার এই আশা জয়যুক্ত হউক।

এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে প্রথম খণ্ড লেখমালার মর্য্যাদা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন; নানা রত্নসম্ভারে মূল্যবান্ হইলেও সমাজে বহুল প্রচার জন্য ইহার মূল্য মাত্র ২৷৹ (বাঁধাই) ও ২৲ (কাগজের মলাট) ধার্য্য করা হইয়াছে; গ্রন্থ ক্রয় করিয়া বঙ্গভাষী জনসাধারণ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইবেন এবং সম্পাদকদ্বয়ের এই সাধু চেষ্টা সার্থক করিয়া তুলিবেন আশা করি। আমরা সাগ্রহে দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রহিলাম।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

জীবনী-কোষ—পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, এবং তাঁহার দ্বারা ৮১ নং ওয়েষ্ট কমাউট, পোষ্ট আপিস কমাউট, রেঙ্গুন, ব্রহ্মদেশ হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

ইহা একখানি জীবনচরিতবিষয়ক বিস্তৃত অভিধান। ইহা চারি অংশে বিভক্ত। (১) ভারতীয় পৌরাণিক, (২) ভারতীয় ঐতিহাসিক, (৩) বিদেশীয় পৌরাণিক, এবং (৪) বিদেশীয় ঐতিহাসিক। ভারতীয় পৌরাণিক অংশ প্রকাশিত হইতেছে। উহা সাত সংখ্যায় "অংশ" হইতে "নেদিষ্ট" পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বত্রিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে তাহা প্রকাশ করিতে ব্যাপৃত আছেন। তিনি উদ্যোগী ব্যক্তি। ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে কমাউট নামক স্থানে তিনি বাসগৃহের সন্নিকটে "বাঙ্গালী" প্রেস নাম দিয়া একটি প্রেস স্থাপন করিয়াছেন। বাঙালী কম্পোজিটর লইয়া গিয়া তিনি ঐ প্রেসে জীবনীকোষ ছাপাইতেছেন। তাহাতে ব্যয় অনেক পড়িলেও তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। তাঁহাতে একাধারে পাণ্ডিত্য, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও উদ্যোগিতার একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহার গ্রন্থখানি সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের পাঠকদিগের বিশেষ কাজে লাগিবে। এইজন্য ইহা বাংলা দেশের এবং বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের সমুদয় লাইব্রেরীতে, স্কুলে, কলেজে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্থান পাইবার যোগ্য। যাঁহাদের গৃহে নিজের লাইব্রেরী আছে, তাঁহাদেরও ইহা রাখা উচিত। গ্রন্থকার ইহার ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। আমরা তাঁহাকে তাহার আগে হিন্দী সংস্করণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। তাহার কারণ দুটি। প্রথম, হিন্দীতে ঠিক এরূপ বহি নাই; সুতরাং ইহা হিন্দী সাহিত্যের একটি অভাব পূর্ণ করিবে এবং সম্ভবতঃ হিন্দীভাষী উৎসাহ-দাতাও জুটিবে। দ্বিতীয়, তিনি ইহা না করিলে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ও বিনা অনুমতিতে ইহা অনুবাদ করিয়া নিজের বলিয়া চালাইবার লোক হিন্দী পুস্তক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেক আছে।

চ

উদাসীর মাঠ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৩। মূল্য এক টাকা।

ছয়টি গল্প আছে; "উদাসীর মাঠ" প্রথম। লেখকের, প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পগুলি সোজাসুজি বলিয়া যাইবার বেশ একটি ক্ষমতা আছে, আর তাহার সঙ্গে হাস্যরসের অবতারণা করিবার শক্তি থাকায় বইটি কোথাও একঘেয়ে হইয়া উঠিতে পারে নাই। "উদাসীর মাঠ" —এ আমাদের সমাজে নারীর চিরন্তন দুঃখের দিকটা, আর "ট্যারা"-য় নারীকে লইয়া নিষ্ঠুর নিয়তির সঙ্গে লঘুচিত্ত পুরুষের ষড়যন্ত্র মনটাকে বড় ব্যথিত করিয়া তোলে; অপরদিকে "উর্দ্ধরেখা", "হোঁদল কুৎকুতে"-র বেশ খানিকটা হাসির খোরাক আছে। মোটের ওপর বইখানি হাসি-অশ্রুতে বেশ সজীব।

"ট্যারা"র মার চরিত্রটি প্রথমের দিকে দু-এক জায়গায় যেন অহেতুকভাবে রূঢ় হইয়া গিয়াছে। এক এক স্থানে ছাপার দোষ থাকিয়া গিয়া একটু গোলযোগ করিয়াছে; বিশেষ করিয়া যতি-চিহ্ন সম্বন্ধে।

পূর্ব্বাপর—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—নাথ ব্রাদার্স। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪৬। দাম পাঁচ সিকা।

চারিটি গল্পের সমষ্টি,—"পূর্ব্বাপর", "অপরাজিতা", "পূর্ব্বরাগ", "চিরাচরিত"। গল্পাংশ সবগুলির প্রায় এক—চারিটিতেই সেই প্রেমের হা-হুতাশ, তিনটিতে সেই অবশ্যম্ভাবী মিলন, "চিরাচরিত"-এ নায়ক প্রত্যাখ্যাত। এইজন্য, আর মাঝে মাঝে অল্প বিষয়-ভাগের ওপর অযথা ফেনানোয় বইখানি একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ-ভাবে ছোট গল্পের বইয়ে পাঠক একটু বিচিত্রতা আশা করে।

"পূর্ব্বরাগ" গল্পটি চরিত্রচিত্রণ আর পারিপার্শ্বিক—দুইদিক দিয়াই অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। নায়ক নায়িকা কথাবার্ত্তা, চালচলন হিসাবে সুশিক্ষিত অতি-আধুনিকদের কোঠায় পড়ে; অথচ নায়ক মাত্র ফেরী-ঘাটের মাঝি, আর "চুমু দেওয়ার অধিকার" দেওয়ার পর বোঝা গেল নায়িকাও ঐ শ্রেণীর।

গল্পের ভাষাটা বেশ সতেজ করিবার চেষ্টা আছে এবং মোটামুটি লেখক এ-বিষয়ে সফলও; তবে এক এক জায়গায় সেটা ঘোলাটে, এমন কি অসঙ্গতও হইয়া পড়িয়াছে। দু-একটা না তুলিয়া দিয়া পারিলাম না—

"নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার যে-সময়ের প্রয়োজন হইত সে প্রয়োজন শেষ হইয়াছে।" ১৮ পৃঃ।

"এই চাপা মানুষটার সুবিধে অসুবিধে জগতে আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, তুমি যে বোঝ না, তা তোমার মনকেও বোঝাতে পারবে না।" ১৯ পৃঃ

—বোঝার চেষ্টা একটা যেন বোঝা হইয়া দাঁড়ায়—

"আমার বাহিরের রক্ত চক্ষু ত ভিতরের গোপন-সত্তাটিকে কিছুমাত্র দমিত করিতে পারে নাই।" ২১ পৃঃ

—নিজের ভিতরের গোপন-সত্তাটিকে দমাইতে হইলে অন্তরের রক্ত চক্ষুই প্রয়োগ করিতে হয়। "নিশ্চিহ্ন দাড়িগোঁফের তলায় সবুজ আভা।' ১৩৪ পৃঃ

—প্রথমাংশটা—যেন 'মাথা নেই তা'র মাথা ব্যথা' গোছের শোনায়। আর 'আভা'টা কি একটা 'চিহ্ন' নয়?

তবে একথা বলিতেই হয় যে মোটের ওপর লেখকের ক্ষমতা আছে; দোষগুলির ওপর নজর রাখিলে ভবিষ্যতে তাঁহার প্রচেষ্টা সব দিক দিয়াই ভাল হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অজ্ঞাত জগৎ—স্যর আর্থার কনান ডয়েল রচিত The Lost World উপন্যাসের বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায় কৃত। ২৯৭ পৃষ্ঠা, কয়েকখানি চিত্র সম্বলিক, পিচবোর্ডের বাঁধাই, মূল্য ১৸৹। এম্. সি. সরকার এণ্ড্ সন্স্-এর পুস্তকালয়, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায় মহাশয়ের লিখিত ছেলেদের উপযোগী পুস্তকগুলি বাঙ্গালায় সুপরিচিত। সম্প্রতি তাঁহার এই নূতন বইখানি বাহির হইয়াছে। ইংরেজী উপন্যাস সাহিত্যে কনান্ ডয়েল-এর নাম সুপরিচিত। কনান ডয়েল-এর The Lost World বইখানি একেবারে নূতন ধাঁজে লেখা, বাস্তব ও কল্পনামিশ্র অতি কৌতুকের উপন্যাস। ইংরেজী বই বাঙ্গালা অনুবাদে আজকাল পড়া হইয়া উঠে না—ছেলেবেলায় অবশ্য নানা ডিটেক্‌টিভ ও অন্য বাজে উপন্যাসগ্রন্থ, বাঙ্গালা অনুবাদ বলিব না, বাঙ্গালার অনুকরণে পুনর্লিখিত রূপে পড়িয়াছি। এই বইখানি পাইয়া আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছি। গল্পটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক—দক্ষিণ আমেরিকার একপ্রান্তে লেখক কর্তৃক কল্পিত এক অজ্ঞাত ভূগোল-বহির্ভূত দেশে, প্রাচীন যুগের অতিকায় পশু পক্ষী নরবানর এবং আদিম জাতীয় মানবগণের মধ্যে কতকগুলি ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের অদ্ভুত ভ্রমণ ও বিপৎসঙ্কুল অভিজ্ঞতার কথা। এইরূপ বই ছেলেদের খুবই ভাল লাগিবে—ইহাতে একাধারে আমোদও প্রাচীন যুগের প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা বেশ সুস্পষ্ট ধারণা অতি সহজেই হইবে। এইজন্য বইখানিকে বিশেষ করিয়া ছেলেদের উপযোগী বলিয়া ধরিলেও প্রবীণেরাও এই বই পাইলে ইহাকে এক নিঃশ্বাসে শেষ না করিয়া পারিবেন না। আজকালকার উপন্যাস-জগতের দূষিত বাষ্পের মধ্যে বইখানিকে স্বাস্থ্যকরই বলিতে হয়। "ছেলেদের" বা "ছোটদের" জন্য সাধারণতঃ যে ফরমায়েসী দায়িত্ববোধবিহীন সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহা প্রায়ই অসহ্য ন্যাকামীতে ভরা হইয়া থাকে, এ বই সেরূপ নয় বলিয়া নিঃসঙ্কোচে ইহাকে ছেলেদের হাতে দেওয়া যায়। অনুবাদটি সাধারণতঃ বেশ সুন্দর হইয়াছে, পড়িতে কোথাও বাধে না, প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য ভাষার গুণে বইখানি মূল পুস্তকের মতই লাগে। এইরূপ বইয়ের যথোপযুক্ত প্রচার হওয়া উচিত।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

লীলাবাস (উপন্যাস)—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্রাউন ৮ পেজী, ৩৩৪ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা; দাম দুই টাকা।

এই উপন্যাসখানিতে গ্রন্থকার এমন কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সমাজের বুকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া সংস্কার রূপে চলিয়া আসিতেছে। সংস্কার—সে যতই ক্ষতিকর হউক, অথবা যতই অত্যাচারমূলক হউক, কেবল সংস্কার বলিয়া মানুষ গা নাড়ে না। ইহা জীবনের লক্ষণ নহে। গ্রন্থকার এই সব সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, নির্যাতিত ও নির্জ্জীব সমাজকে জাগরণের বাণী শুনাইয়াছেন। গ্রন্থের চরিত্রাঙ্কনের জন্য গ্রন্থকার যে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, আধুনিক যুগে, হিন্দু সমাজকে সংস্কার-মুক্ত করিবার জন্য,—হিন্দু মুসলমানে মিলনের জন্য, বিশেষ করিয়া মানুষে মানুষে মিলনের জন্য তাহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। হানিফ, মোহনলাল ও লীলার মুখ দিয়া গ্রন্থকার যে সব কথা বলাইয়াছেন তাহা যদি সত্যিকার ভাবে আজকালকার সাধারণ মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইত তাহা হইলে বোধ হয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও শ্রেণী-বিদ্বেষ অতীতের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। যাহা হউক গ্রন্থকার গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ মহৎ। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। পুস্তকের মধ্যে যে সব সামান্য ভ্রম আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল, তা উপেক্ষণীয়। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। বইখানিতে কয়েকখানি হাফটোন ছবিও আছে।

মুজীবর রহমান

মধ্য-এশিয়ায় বলশেভিক—শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার প্রণীত। সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা, দাম পাঁচ সিকা, পৃঃ ১২৪।

সমানাধিকারবাদ আজ জগতের মধ্যে একটি শক্তিশালী আদর্শ। য়ুরোপের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আবহাওয়ায় যাহার উদ্ভব, তাহাকে এশিয়ার চাষী ও পশুপালক কয়েকটি জাতির মধ্যে কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইতেছে, কি কি বাধা লোকের মনের ও পূর্ব্বতন সামাজিক অবস্থার দিক হইতে পাওয়া যাইতেছে, এইগুলি আমাদের শিক্ষার বিষয়। কিন্তু বইখানিতে তাহার পরিবর্ত্তে যুদ্ধবিগ্রহের নানা খুঁটিনাটি ঘটনার এরূপ সমাবেশ হইয়াছে, যে, পড়ার শেষে কিছুই শিখিলাম না—এইরূপ একটা ধারণা থাকিয়া যায়।

কেবল "লোকশিক্ষা" নামক অধ্যায়ে 'সমবায়-পাঠশালা'র সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে আমাদের শিক্ষার বিষয় আছে। অল্প খরচে অথচ ছোটছেলেদের প্রাণ বাঁচাইয়া কি করিয়া পাঠশালা চালান যায়, তাহা আমাদের এই দরিদ্র দেশে অনুকরণের যোগ্য মনে হইল।

বিজয়ী বাংলা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম দশ আনা। পৃঃ ১০৮।

ললিতাদিত্যের সময়ে কাশ্মীর ও গৌড়ের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই একজন নায়ককে লইয়া লেখক ছোট ছেলেদের জন্য একটি গল্প লিখিয়াছেন। সেনাপতি জয়ন্তের বীরত্বপূর্ণ জীবনকাহিনী ছেলেদের খুব ভাল লাগিবে আশা করি। ছাপাও বেশ ভাল হইয়াছে।

শিখের কথা—শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ প্রণীত। গোল্ডকুইন এণ্ড কোং, কলিকাতা। দাম ১৷৹। পৃঃ ১৯২।

শিখগুরুগণের জীবনকাহিনী, শিখজাতির উত্থান-পতনের কথা, কেমন করিয়া একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় ক্রমে সমরকুশল জাতিতে পরিণত হইল, এই সকল বিষয় লেখক অতি মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। উপরন্তু, অনেকগুলি সুন্দর ছবি থাকায় বইখানি সব দিক দিয়া উপভোগ্য হইয়াছে।

দেশবন্ধু স্মৃতি—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম আট আনা। পৃঃ ৬১।

লেখক বহুদিন দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ছিলেন। ছোট ছোট ঘটনার সাহায্যে তিনি দেশবন্ধুর চরিত্রের একটি চিত্র দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল ঘরোয়া ঘটনার মধ্যেও দেশবন্ধুর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, তাঁহার রণকুশলতা, আশ্রিতজনের প্রতি মমতা ও সকলের উপর বাংলা দেশের প্রতি তাঁহার একান্ত মমতা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জায়গায় জায়গায় লেখকের স্বীয় ব্যক্তিত্ব একটু উগ্রভাবে ফুটিয়া ওঠায় চিত্রটি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তবু মোটের উপর বেশ বই।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

পূজোর বাজার

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

১

দেওয়ালঘেঁষা টেবিলের সামনে ব'সে গিরিধর কলমটা সবে বাগিয়ে ধরেছে, অমনি পিছন হ'তে গিন্নী এসে ঝড়ের মত ঝঙ্কার দিয়ে ঝড়ো হাওয়ার দুটো বুলি ঝেড়ে দমকা বাতাসের ভঙ্গীতেই মুহূর্ত্তে ঘর হ'তে গেলেন বেরিয়ে। যা ব'লে গেলেন সে খরস্রোত কথার সবটা বোঝা না গেলেও গিরিধর এটুকু আবিষ্কার করলেন যে, কবি নিছক কাল্পনিক নারীর মুখে ফোটান নি এ বুলি—

"রচিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব
মাথা ও মুণ্ড ছাই ও ভস্ম,
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব--
না মিলে শস্যকণা ?
অন্ন জোটে না কথা জোটে মেলা ;
নিশিদিন ধরে এ কি ছেলেখেলা !
ভারতীরে ছাড়ি ধর এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা "

২

গিরিধরের মনোবৃত্তির স্রোতটা একটানা ছিল বি-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত। তার পরেই মনটা ত্রিধারায় বিভক্ত হয়েছে। প্রথম ধারা সিধা রাস্তায় এম্-এ ক্লাসের ময়দানে পৌঁছেই গেছে থিতিয়ে। দ্বিতীয়, বি-এল-এর হাজিরা—ছিল যেন হাতের পাঁচ। তৃতীয় ধারাটাই হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই বড় জোরে বইতে লাগল। আই-এ পরীক্ষার পরেই যদিও শুভদৃষ্টি হয়েছিল তবুও পিতা ও শ্বশুরের মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলে বহুকাল বহু দৃষ্টি পাবার সুযোগ মেলেনি। তারপর একদিন বধূ এসেছে গৃহে। বহুদিনকার রুদ্ধস্রোত মুক্তি পেয়ে প্রবল হয়েছে। বি-এ ক্লাসে বসে বসে কবিতা লিখবার যে সাময়িক উদ্‌গত আকাঙ্ক্ষাকে, কবুতরের গলা টিপে ধরবার মত করে অনেকদিন পিষে দমিয়ে রেখেছিল, এখন তাকে একটা নাড়া দিয়ে ছেড়ে দিলে। কূজন গুঞ্জরণে গৃহ মুখরিত হ'ল, শুভ্র কাগজের বক্ষে লেখনী-প্রস্ফুরিত পুষ্পরাজি বিরাজ করতে লাগল। মিলনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি মাসিকের কাব্য-সম্পদকে বাড়িয়ে তুলল—সম্পাদককুল উৎফুল্ল হয়ে তাকালে।

৩

বছর-তিনেক পরে আজ গৃহে দৃশ্যপট কিছু পরিবর্ত্তিত। যে অবলম্বন তরুটিকে আশ্রয় ক'রে পরগাছা গজিয়ে ওঠে, তারই প্রাণকে একদিন নিঃশেষ ক'রে সেই দারুদানব নিজের প্রাণের পুষ্টিসাধন করে। বহু মাসিকের কলেবর আজ গিরিধরের গল্প উপন্যাসে পরিপুষ্ট—গৃহে কিন্তু গৃহিণীর সোহাগ আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। প্রেমিক যুগলের প্রেমগুঞ্জরণের পরিবর্ত্তে যুগল শিশুর ক্রন্দনেই গৃহ থাকে নিনাদিত।

গিন্নির ঝঙ্কারটা অন্তরকে বড়ই বিশৃঙ্খল ক'রে দিয়ে গেল। মাথাটা চেয়ারের পিঠে হেলে পড়ল। সামনের দেওয়ালে পেরেকে টাঙানো ছিল। একটা গোড়ের মালা। দৃষ্টি পড়ল গিয়ে মালাটির দিকে। আজ দুদিন হ'ল একটা স্কুলের দু-বছরের থার্ড মাষ্টারিটা ছাড়তে হয়েছে গিন্নিরই তাড়নায়। থার্ড মাষ্টারির থার্ড ক্লাস আয়ে কখনও সংসার চলে? হাতের পাঁচ বি-এল-টা পাস ক'রে কি হাতের তেলোতেই রেখে দেবে চিরটা কাল? মক্কেল ঠকানোর আশায় ছেলে ঠ্যাঙানো ছাড়তে হ'ল। কিন্তু ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, অবসরের দুঃসময়েই না কি দানব এসে মানব-মস্তিষ্কে ভর করে। স্কুল ছেড়ে মামলা জুটোবার বিপুল ব্যবধানের অবসরটির সুযোগ সাহিত্য-দানব হারাল না। নারীর তীব্র প্রতিবাদকেও যেন হার মানতে হ'ল।

স্কুলের ছেলেরা ঐ মালাটি দিয়েছে বিদায় অভিনন্দনের দিনে। শ্বেত, রাঙা, পীত—যেন ঐ

প্রত্যেকটি ফুল কচি কচি ছেলেদের বুকের অভিব্যক্তি। তরুণ প্রাণের দাম কি খাঁটি! ভবিষ্যতে যে কারবারে সে নামতে যাচ্ছে সেখানকার মালমশলা ঠিক বিপরীত। যেতে ঠিক মন সরছে না। তাই এই মধ্যপথের সাহিত্যচর্চ্চাকে যেন মধ্যস্থ ক'রে মনের আক্ষেপটা যত পারে বলে মনকে হাল্কা করতে চায়।

গিন্নির পুনঃপ্রবেশ। "এখনও ঐ মালার দিকেই তাকিয়ে হাঁ করে বসে আছ! আর ওদিকে বাড়িওয়ালা যে দোরে এসে হত্যা দিয়েছে তার খবর রাখ? গেল মাসে তো ফাঁকি ফুঁকি দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছ—এখন দু-মাসের ভাড়া, কি করবে কর গে। এমন নিশ্চিন্দি মানুষ দেখিনি।"

গিরিধর প্রমাদ গণলেন। ব্যাপারটা গুরুতরই বটে। কলকাতার বাড়িওয়ালা ত নয় যেন ছিনে জোঁক। আর বাড়ির একটা দ্বিতীয় দরজাও হতভাগা রাখে নি, যে চম্পট দেওয়া চলে। একটা মাত্র সদর দরজা, আর তাই জুড়ে বসে আছে যেন কাবুলিওয়ালা। কি করা যায় এখন? ওঃ বাবা! এ যে হেঁড়ে গলায় চেঁচাতে সুরু করলে—সমস্ত পাড়াটা যেন ফেটে পড়ে!

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গিরিধর সাড়া দিল, "যাচ্ছি মশাই—বসুন।"

টেবিলের ডেস্ক, জামার পকেট, খোকার টিনের বাক্স এই রকম সাত পাঁচ জায়গা হাতড়ে বেরুলো পাঁচটি টাকা। পঞ্চাশ টাকা ক'রে দু-মাসের এক-শ টাকা ভাড়া'র মধ্যে নগদ পাঁচ টাকা হাতে করেই গুটি গুটি পা বাড়িয়ে মহাশঙ্কায় চললেন মহাজনের কাছে।

হঠাৎ খুব খানিকটা সাহসের বাতাস বুকে পুরে নিয়ে বললেন, "আজ এই পাঁচটা—"

দুই চোখ কপালে তুলে বাড়িওয়ালা চেঁচিয়ে উঠলেন —"মশায় কি তামাসা করছেন?"

যাই হোক অবশেষে দেনাদায়ের শেষ অবলম্বন 'কালের' শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। কথা রইল—যেমন করেই হোক কাল সব টাকা চুকিয়ে দিতেই হবে। কারণ এটা পুজোর মাস।

ছিনে জোঁকের কবল হ'তে মুক্তি পেয়ে অন্দরে ঢুকতেই অন্দরলক্ষ্মীর জেরা—"বলি পুজোর মাস কি ওর একলারই? আমাদের পুজোর মাস নয়? আমাদের বাছাদের পরণে ছেঁড়া জামা-কাপড়, চোখেও দেখেছ, তোমায় কতবার বলেওছি, কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। আর এক কথায় অমনি ওকে তুমি কালই এক-শ টাকা দিয়ে দিচ্ছ। কোথায় এক-শ টাকা আন দেখি। আমাকে ভাঁড়িয়ে এক-শ টাকা কোথাও রাখা হয়েছে বুঝি?"

"আরে, তুমি কি পাগল হ'লে না কি? এক-শ টাকা আমি কোথায় পাব? কোন রকমে চব্বিশ ঘণ্টার মেয়াদ ক'রে নেওয়া গেল।"

নীচে থেকে হাঁক এল, "গিরিধরবাবু আছেন?" প্রতিমা শঙ্কিত হয়ে বললে, "ঐ আবার এসেছে কর্ম্ম-নাশার দল—আমি যাই ব'লে পাঠাই—এখন দেখা হবে না, যত সব—"

"আহা কর কি, ছিঃ ছিঃ—ভদ্রলোকেরা এসেছেন। দাশুবাবু! আসুন, সোজা ওপরেই চলে আসুন।"

প্রতিমা মহারোষে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন।

দাশুবাবু ঘরে ঢুকলেন, বন্ধু সন্তোষ বাবুকে নিয়ে। সাহিত্য-গুণ বিচারে একা সুবিধা হয় না। ইজিচেয়ারের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দাশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার সেটার কত দূর?" গিরিধর উৎসাহিত হয়ে বললেন, "এই ত দেখুন না, সকালে উঠে আপনার লেখা নিয়েই বসেছিলাম, তা লক্ষ্মীঠাকরুণ যদি নিতান্তই অপ্রসন্ন থাকেন সরস্বতীর সেবা করা যে দায় হয়ে উঠছে দেখছি। ভোর হ'তেই লোকের টাকার তাগাদা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। পুজোর বাজারে না কি সকলেরই জোর তাগাদা।"

দাশু হেসে বললেন, "সত্যই তাই, আমিও যে পুজোর মধ্যেই আপনার বইখানা বার করতে চাই।"

"হাঁ, তা দেব, প্রায় হয়ে এল লেখা।"

"না না, এখন আর 'প্রায়' বললে, চলবে না—আমাকে কালই দিয়ে ফেলবেন একটু মেহনৎ করে।"

গিরিধর ঘরটা কাঁপিয়ে হেসে বললে, "আপনারও কালই দরকার? আজ যে আসছে সেই আবার কালও

আস্‌বে। কাল একটা যজ্ঞ করা যাবে আমার বাড়িতে, যত লোক আপনাদের মত তাগাদা করতে আসবে সব এক এক ক'রে ধরে ধরে যজ্ঞাগ্নিতে উৎসর্গ করা যাবে, কি বলেন—হা-হা।" কিন্তু দাশুবাবুকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। বাড়িওয়ালার চেয়ে সেই নিয়ে গেল বেশী পাকা কথা যে, টাকার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এই একটা দিন গিরিধর লেখাতেই সব মনটা লাগিয়ে রাখ্‌বে।

দাশু বেরিয়ে যেতেই প্রতিমা এবার বাড়িওয়ালার পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে লাগ্‌ল।

"টাকার চেষ্টায় বের হও। ও সব অনাছিষ্টি লেখা এই লক্ষ্মীমাসে করো না—করো না।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে? ভূতে পেয়েছে যে—লেখার ভূত। দেনার কথা ভোলানাথ ভুলেই রইলেন। লেখা ছুটে চল্‌ল।

৪

আধমরা মাছিটার মাথা কামড়ে ধরে পিঁপড়ে বীর, পিঁপড়েকে ধরে ধরে খায় চড়ুই পাখী, বিড়াল বসে তাক্ করে চড়ুইটার দিকে। পূজোর বাজারে বলির ধুম। পূজোবাড়িতে পাঁঠা বলি, কারবারের বাজারে দেনাদারের পিছনে ছুটেছে পাওনা-অলা রক্তমলাট কেতাবের খাঁড়া হাতে ক'রে, চাষীরা হত্যা দিয়েছে ফড়ের দ্বারে, ফড়েরা ফিঙ্গের মত দোকানে দোকানে লেগেছে, দোকানীরা পাটহাট ক'রে রেখে হতাশ হয়ে হাঁক দিচ্ছে ছোট বড় বাবুদের দরজায়। তাগাদার চোটে ছোট বাবুদের মাথার ঠিক নেই। বড়বাবুরা দরজায় খিল দিয়ে পূজোর ছুটিতে কোথায় হাওয়া মিঠে, তারই গবেষণায় লেগেছেন।

গিরিধরের বাড়িওয়ালার বিশেষ দোষ ছিল না। বাড়ি মেরামতি ঠিকেদারের পাওনা ছিল ষাট, এ মাসে সওয়া শ'য়ে পৌঁছেচে। এই বাড়িভাড়ার টাকাটা পেলেই তাকে অনেকটা চুকিয়ে দিতে হবে—পূজোর মাস বাকী রাখতে নেই। ঠিকেদারকে তাগাদা দিচ্ছে নটবর। সে একখানি খোলার ঘরের একদিকে রাখে খানকতক ইট সাজিয়ে, তারই পাশে সেই আলগা ইটেরই দেয়াল তুলে রেখেছে খানিকটা চুন, আরও এক সারি ইটের পরে রয়েছে মগরাই লাল বালি। এই নটবরের চুন, বালি, ইটের দোকান। নটবরেরও পাওনা এক-শ'র কম নয়। ঠিকেদার আশ্বাস দিয়েছে তার পাওনা টাকা পেলেই নিজে এসে দোকান বয়ে নটবরকে পুরো টাকা শুধে দেবে। আশ্বিনের আধবছরি দেনা সে রাখে না।

নটবরের খোলার ঘরের অপর অংশটা বলাই মুদির দোকান। বলাইয়ের দোকানটা নিছক মুদিদোকান নয়। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে দুইখানি বড় আলমারি রেখেছে। তাতে আছে খানকতক রামায়ণ, মহাভারত, নূতন পঞ্জিকা, থিয়েটার সঙ্গীত ও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। পেটের খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে মাথার খোরাকের এই উপকরণও বলাইয়ের বিক্রী মন্দ হয় না। নটবর চাল ডাল পাশের বলাইয়ের কাছ থেকেই নেয়—অবশ্য ধারে।

পাশাপাশি দোকান—হাত বাড়িয়েই জিনিষ লওয়া চলে, কিন্তু হাতে হাতেই কি আর পয়সা দেওয়া যায়? পয়সার দেনা টাকায় গড়ায়। সেদিন বলাই খাতা খুলে দেখ্‌লে নটবরের কাছে পাওনা হয়েছে শ-দেড়েক। তাগাদা দিতেই নটবর জানিয়েছে—"হ্যাঁ, ভাই জানি, আমার হিসাব আছে। এই দেখ না, ঠিকেদার দিই-দিচ্ছি ক'রে রোজই ঘোরাচ্ছে। তা দিয়ে দেবে। সে দিতে এলেই যে-হাতে তার কাছ থেকে নেব সেই হাতেই তোমায় দিয়ে দেব। ও টাকা আর ঘরে তুল্‌ব না। আশ্বিন—পূজোর পুণ্যি মাস, আমি বুঝি না কি আর?"

বলাই-মুদিও ভেবে রেখেছে এই টাকাটা পেলেই বইওয়ালার ধারটা শুধে দিতে হবে। সেদিন বাবু বড় কড়াকড় শুনিয়ে গেছে—নূতন পঞ্জিকা পুরণো হ'তে চল্‌ল তবু আমার টাকা দিলে না। নাঃ, এবার দিয়েই ফেলব। নটবরকে হেঁকে বলে, "কাল নিশ্চয় ক'রে দিও টাকাটা।"

নটবর জবাব দেয়, "দোবো, দোবো।"

কিন্তু সকলেই যে যার প্রাপ্য টাকার উপরই নজর রেখে পাওনাদারকে আশ্বাস দেয়। নিজের পাওনা

টাকাটা পেলে তবে না দেবে! ঘর থেকে কে আর বার করে বাজারের টাকা শুধবে?

(৫)

পরদিন প্রত্যূষে গিরিধর আবার খাতা কলম নিয়ে বসেছেন। কিন্তু লেখায় বিশেষ কিছু অগ্রসর না হতেই বাড়িওয়ালার ফের হাঁক এল। বোধ হয় লোকটা রাতে ঘুমোয় নি। কিন্তু যাদের রাত্রের ঘুম সম্বন্ধে গিরিধর সন্দিহান ছিল না তারাও আজ প্রত্যূষে আসা সুরু ক'রে দিল। গয়লা কোনো দিন সকালে টাকার তাগাদা করে না—আজ ব্যতিক্রম। ধোপার মুখ সকালবেলা দেখ্‌তে নেই—সেও কি ছাই নিজের জাতের কথা ভুলে গেছে? বিজলী বাতির বিল মেটাতে না পারায় গত মাস হ'তে যে কেরাসিন তেলওয়ালাকে ঠিক করা হয়েছে সেও আজ এসেছে তাগাদায়। সকলেরই পূজোর উৎসব লেগেছে।

যাই হোক সকলকেই "কাল সকালে"র বরাদ দিয়ে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। কাগজ কলম তুলে রেখে দুটি ভাতে ভাত মুখে দিয়ে গিরিধর বেরুলো টাকার চেষ্টায়। সমস্ত দিন সমস্ত শহর ঘুরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলে। টাকা জুটল না একটিও। ম্লান মনে ভাবতে লাগ্‌ল, টাকা ধারের চেষ্টায় নানা জায়গায় না ঘুরে যদি আদালতেও যেত তবে দিনকার ব্যয়ের রোজগারটা অন্তত হয়ে যেত। কিন্তু এই যে বাকীর বোঝা, এ বড় বিষম বোঝা। লোককে এগোতে দেয় না। দিনকার রোজগারের ফুরসুৎ পাওয়া যায় না। যেন চোরাবালির ফাঁদ—যতই চলতে যাবে ততই তলিয়ে যাবে।

রাত্রের আহার আজ বন্ধ। মুদি আর ধার দেবে না বলেছে। অনাহারে চিন্তার ধারা খরস্রোতা। বিছানায় শুতে না গিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসেছে আকাশ পাতাল। কত দিন থেকে ভেবে আসছে দেনাটা শোধ করতে পারলেই সে দাঁড়াতে পারে; কিন্তু দেনা আর কিছুতেই শোধ হয় না। আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

গিরিধর ভাবপ্রবণ। সাহিত্যক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতা লেখায় একটা রঙীন রেখার আঁক কাটতে পারে। কিন্তু পাওনাদারদের প্রবল তাগাদা ভাবপ্রবণতার সাহায্য পেয়ে মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটিয়ে দিতে পারে। সমস্ত দিনের অর্থপ্রাপ্তির আশা ও পরিশ্রমের পর রাত্রিতে নিরাশা ও অবসাদ একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। বাড়ির কারও আহার জোটে নি। এও কি আর দেখা যায়? গিরিধর মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা আজ সবই নির্ব্বাপিত। স্ত্রীর ভালবাসা, শিশুদের কচি মুখ দেখার আনন্দ, সাহিত্যের চর্চ্চা—সবই আজ বিলুপ্ত এক দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে। আর সেই দারিদ্র্যের কারণ না কি ভারতীর উপাসনা। পূজোয় অনেক বলি হবে। এবার পূজোয় বাগ্‌দেবীর চরণে সেও নিজেকে বলিদান করবে। একটা দারুণ শিহরণ তার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের স্পর্শ লাগিয়ে গেল। কিন্তু তার পরক্ষণেই যেন মহা শান্তির আশ্রয় লাভ করলে। আঃ—মায়ের কোলই বটে!

গিরিধর কতক্ষণ টেবিলের উপর মাথা রেখেছিল ঠিক মনে ছিল না, হঠাৎ লাফিয়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল আজই শেষরাত্রি।—সব শেষ ক'রে দিতে হবে। পাওনাদাররা আসবার পূর্ব্বেই সূর্য্য পূর্ব্ব-গগনে চোখ না মেলতেই নিজের চোখ বুজতে হবে। কিন্তু জীবন শেষ করবার আগে জীবনের শেষদান দেবীর চরণেই রেখে যেতে হবে। সাহিত্যকে তার মনের নানা ভাব দিয়ে এত কাল সেবা ক'রে এসেছে, কিন্তু এই শেষের রাত্রির—এই আসন্ন আত্ম-বলিদানের পূর্ব্বেকার অভিনব মনোভাব—এ দান ক'রে যেতে হবে নিদয়া বাগ্‌দেবীরই চরণে।

তাই শেষবার কলম ধরল জীবনের শেষ অঙ্ক লিখ্‌তে। যে গল্পটা লিখ্‌ছিল দাশুবাবুর জন্যে, তার নায়ককে এনে ফেল্‌ল বিষম বিপাকে। তার পর তাকে দিয়ে নিজের মতই আত্মহত্যা করাবে। তার মুখে নিজের বাণী ফুটিয়ে তুলতে লাগল,—মৃত্যুর পূর্ব্বেকার মনের অবস্থা। নিজের জীবনের যবনিকা নিজে ফেলা যে কেমন, তা এমন ক'রে এঁকে কেউ দেখায় নি বোধ হয়।

লেখা শেষ হ'ল। ছোট্ট এক টুকরা স্লিপে

লিখল—যত পাওনাদার আসবে তাদের মধ্যে যে ভারতীর দূত, তাকে দেবে এই লেখাটা। আর লক্ষ্মীর সেবক যারা আসবে, তাদের খুলে দেখিও আমার এই মৃতমুখ।

তখনও প্রভাতের বিলম্ব আছে। ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে দুটি কচিমুখের উপর দুটি চুম্বন আর দু-ফোঁটা অশ্রু রেখে দিল। এইবার জীবনসঙ্গিনীর কাছ হ'তে জীবনের মত বিদায় নেবার পালা। কম্পিত হস্ত বিস্তার ক'রে বুঝলেন বিছানার সেই স্থানটুকু শূন্য! এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে দেখল প্রতিমা বাড়িতে নেই! দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখল দরজা খোলা। হঠাৎ প্রাণের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। যে সঙ্কল্প গিরিধরকে পেয়েছে, সেই সঙ্কল্পই প্রতিমাকেও আগেই পেয়ে বসেনি ত? কি করবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে হতাশভাবে ঘর-বাহির করতে লাগল।

খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল প্রতিমা।

"এ কি, এত রাতে কোথেকে এলে?"

প্রতিমা একটু হেসে বললে, "রাত কোথায়?—দেখছ না ভোর হয়েছে।"

"না, বলছি এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে?"

প্রতিমা আবার হেসে বললে, "বেশী রাতে যাইনি, সন্ধ্যা রাতেই গিয়েছিলাম।"

রহস্য ভেদ করবার তাগাদা গিরিধরের ছিল না। প্রতিমাকে ফিরে পেয়েই সে নিশ্চিন্ত।

বললে, "আচ্ছা এখন ঘরে চল।" কিন্তু মনে মনে আশ্চর্য্য হ'ল—প্রতিমা এত হাসি কোথা থেকে নিয়ে এল। যে অবস্থায় সে নিজে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হচ্ছে, সেই অবস্থাতেই থেকে কি হ'ল প্রতিমার হাসির অবকাশ! অনেক দিন তার মুখে হাসি দেখতে পায় নি। আশ্চর্য্য হলেও, আজ বিদায়-বেলায় প্রতিমার মুখের হাসিটুকুন বিধাতা দয়া করেই আজ তার ভাগ্যে জুটিয়েছেন। তাই প্রতিমাকে আর বৃথা প্রশ্ন না ক'রে তার স্মিত বদনখানির দিকে তৃষিতনেত্রে তাকিয়ে রইল।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল,"তোমার লেখা শেষ হয়েছে?"

"হ্যাঁ, লেখা শেষ ক'রে দিয়েছি। একেবারেই শেষ করেছি। আর লিখব না কখনও।"

"না, না, লেখার উপর রাগ ক'রো না। আমি একটা ফন্দী তোমায় বাৎলে দেব। তাতে ক'রে আর লেখাকে দোষ দিতে হবে না।"

"কি ফন্দী?"

"আমি শুনেছি বাংলা লিখেও আজকাল অনেকে বেশ দু-পয়সা রোজগার করে। বিশেষতঃ যে-সব উকিল ব্যারিষ্টার আইন-ব্যবসায়ে পসার জমাতে পারে না, তারাই বাংলা লেখায় বেশ গুছিয়ে নেয়। তা তুমি যে এত লিখছ, তাই বা মিছামিছি যায় কেন? তুমি যে দাশুবাবুর জন্যে গল্পটা লিখছো তার একটা দাম চেয়ে নিও।"

গিরিধর উদাসভাবে বললে, "তা আমি চেয়েছিলাম, দাশু বললে—এখন কিছুই দেবার উপায় নেই। তবে তিনি না কি কার কাছে টাকা পান, সেই টাকাটা পেলেই আমায় দিয়ে দেবেন। কিন্তু আশা বিশেষ আছে ব'লে মনে হয় না। এদিকে বাড়িওয়ালা ত আজ বাড়ি হ'তে বারই করে দেয় না অপমান করে কে জানে।"

প্রতিমা আঁচল হ'তে দুখানি নোট বার ক'রে বললে, "এই এক-শ টাকার নোটখানা এনেছি বাড়িভাড়া দিতে, আর এই দশটি টাকা এনেছি মুদিকে থামিয়ে রাখতে। শেষ গয়না যা ছিল তাই দাদাকে দিয়ে বাঁধা রাখিয়ে এনেছি।"

সকালবেলা বাড়িওয়ালা এক-শ টাকার নোটখানা পেয়েই ঠিকাদারকে দিল। ঠিকাদার নটবরকে দিতেও দেরি করল না। নটবর নোটখানা হাত বাড়িয়ে বলাই মুদির হাতে দিল।

দাশুবাবুর বেরুতে একটু দেরি হ'ল। ইচ্ছা করেই করছিলেন একটু দেরি—গিরিধরকে দেখবার একটু অবসর দিচ্ছিলেন। গিরিধর টাকার কথা বলেছিলেন তা মনে ছিল। কিন্তু বাক্সে যা ছিল তার অন্যভাবে খরচ করবার সব বজেট হয়ে রয়েছে, নড়চড় হবার জো নেই। যাবার সময় তাই বলাই মুদিটার দোকান ঘুরে

চললেন—যদিই লোকটা দিয়ে দেয় টাকা, অমনি গিরিধর বাবুকে দিয়ে আসা যাবে!

লেখাটা হাতে নিয়ে দাশুবাবু প্রথমে খানিকটা খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। গিরিধর সামনে বসেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। তার পর মাঝের পাতাগুলো তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে হাত বুলিয়ে চললেন। শেষের দিকে গিয়ে আবার মন নিবিষ্ট করলেন। হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে বললেন—"বাঃ এ বড় চমৎকার ত, এই যে আত্মহত্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের মনের অবস্থা বর্ণনা, এ একেবারে বিস্ময়কর—পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে যেন আমিই যাচ্ছি করতে আত্মহত্যা! আপনি এ লিখলেন কি ক'রে গিরিধরবাবু? আপনার লেখনীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এই নিন এই বইটার জন্যে আপাততঃ এক-শ—সেই লোকটা দিয়েছে আজ। পরে ছাপা হয়ে বিক্রী হ'তে থাকলেই আপনাকে দিতে থাকব। এ বইটা খুব কাটবে। ভারি খুশী হলাম। আচ্ছা এখন উঠি। নমস্কার।"

প্রতিমা বললে "এ কি! ঠিক এই নোটই যে আমি নিয়ে এসেছিলাম—এই যে সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কের মোহর রয়েছে, এই ত নম্বর ঠিক তাই। এইখানাই তুমি বাড়িওয়ালাকে দিলে গো। এই দু-ঘণ্টার মধ্যেই দেখো ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। দাও দাও ঐ দিয়েই আমি আমার ঘরের গয়না ঘরে ফিরিয়ে আনি।"

এবার পূজোয় একটা উদ্যত বলি বেঁচে গেল।

মহিলা-সংবাদ

নয়া দিল্লী বালিকা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা শ্যামাশশী ঘোষ লিখিতেছেন,

কিছু দিন হইতে স্থানীয় মহিলাসমিতির কতিপয় সভ্যা একটি বালিকা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে এই চেষ্টা সফল হয় নাই। সংবাদ পত্রের মারফৎ বাংলার মেয়েদের নানা রকম দেশ হিতকর বা সাহসের কার্য্যের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু নয়া দিল্লীর বাঙালী মেয়েরা কেবলমাত্র সেলাই ও কিছু কিছু লেখাপড়া করিয়াই তাহাদের সময় কাটাইয়া দেন। বর্ত্তমান সময়োপযোগী ভাবে নিজেদের গঠন করিবার উদ্দেশ্য বা আগ্রহ তাহাদের নাই। কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সকল বিষয়ে জাতির যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে সে সমস্ত গ্রহণ করিতে এখানকার অধিকাংশ অভিভাবকেরাই ইচ্ছুক বা সক্ষম নহেন। কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল এই বালক-বালিকাদিগকে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ করিয়া রাখিলে তাহার ফল কখনই শুভ হইবে না। ইহা বিবেচনা করিয়া ও যাহাতে স্থানীয় বালিকারা মানসিক ও শারীরিক উন্নতি সাধন করিতে পারে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন কোন জনহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে একটি বালিকা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করা স্থির হয়।

বালিকাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ সমিতি গঠনের পক্ষে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল। বাংলার বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে যখন সরকারী কর্ম্মচারীরা আপিসে আপিসে ঘুরিয়া এবং মহিলা সমিতির সভ্যারা গৃহে গৃহে ঘুরিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কোন কোন সমিতিতে প্রেরণ করিতেছিলেন সেই সময় বালিকারাও এই সকল জনহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়। কয়েকজন মহিলার বিশেষ চেষ্টায় ও বালিকাদের প্রবল আগ্রহে গত আগষ্ট মাসে এই বালিকা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময় চট্টগ্রামের হৃতসর্ব্বস্ব ও নিরন্ন ভাই বোনদের মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনী দিন দিন বালিকা-সমিতির



নয়া দিল্লী বালিকা-সমিতি

গোচর হইতে থাকে। এই সকল দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য বালিকারা সঙ্কল্প করেন। তাহাদের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মমূলক নাটক "জয়দেব" অভিনয় করিয়া তাহারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে এবং অদ্যাবধি ১১০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন।

অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। দর্শকদের মধ্যে কয়জন মাননীয় ভদ্রলোক ও তিনটি নাট্য সমিতি অভিনয়ে প্রীত হইয়া উনিশখানি পদক উপহার দিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন নয়া দিল্লী মহিলাসমিতি বালিকা-সমিতির প্রত্যেক সভ্যকেই পারিতোষিক দিয়াছে। এই অভিনয়ে শ্রীকল্যাণী দেবী, শ্রীযুক্তা শক্তিরূপা দেবী ও শ্রীযুক্তা অসীমা দেবী বালিকাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্রী।

অভিনয় বা নাট্যকলার অনুশীলন এই বালিকা-সমিতির উদ্দেশ্য নয়। বর্ত্তমানে এই অভিনয়ে সমিতির প্রতিষ্ঠানের প্রচারকার্য্যের কতকটা সহায়তা হইয়াছে বটে, তবে ভবিষ্যতে নাট্যকলা অপেক্ষা জনহিতকর কার্য্যের দিকেই সমিতির দৃষ্টি অধিকতর থাকিবে।

—

শিলং প্রবাসী ৺ কালিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা



শ্রীমতী প্রতিভা চৌধুরী



শ্রীমতী আহ্ সি মজিদ



শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ

শ্রীযুক্তা প্রতিভা চৌধুরী সর্ব্বপ্রথম মন্তেসরী শিক্ষা প্রণালী শিখিবার জন্য লণ্ডনস্থ মন্তেসরী বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। শ্রীমতী মায়ালতা সোম বাঙালী ও প্রবাসী বাঙালী উভয় একত্র ধরিলে লণ্ডনে মন্তেসরী শিক্ষাপ্রণালী অধ্যয়নরতা বাঙালী নারীগণের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। গত ভাদ্রমাসের প্রবাসীতে ভ্রমক্রমে তাঁহাকেই প্রথমস্থানীয়া বলা হইয়াছে।

—

বিহার-উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ বিলাত হইতে শিক্ষা বিষয়ে উপাধি লাভ করিয়া সংপ্রতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

—

ব্রহ্মদেশস্থ আকিয়ব প্রবাসী শ্রীযুক্ত এ, মজিদের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আহ্ সি মজিদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।



ভারতবর্ষ

কংগ্রেসে পণ্ডিত মতিলালের দান—

ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন কল্পে পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহার আবাস-গৃহ আনন্দ-ভবন কংগ্রেসের হস্তে অর্পণ করেন ও ইহার স্বরাজ-ভবন নামকরণ করেন। ভারতবাসীর জ্ঞান-বিবর্দ্ধন স্বাস্থ্য সামাজিক ও আর্থিক হিত-সাধন ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন, নারীদের অবস্থার উন্নতি এবং অবনমিত লোকদের এবং কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থান্তর ঘটান প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য মৃত পিতার ইচ্ছানুসারে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কংগ্রেসকে সংপ্রতি এক দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছেন। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অছি নিযুক্ত হইয়াছেন—ডাঃ এম্ এ. আনসারী (দিল্লী) মিসেস পেরেন বাঈ ক্যাপ্টেন (বোম্বাই), শেঠ যমুনালাল বাজাজ (ওয়ার্দ্ধা), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (কলিকাতা) ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু।

কারাবরণে সত্যাগ্রহী—

১৯৩০-৩১ সনে ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যাঁহারা কারাবরণ করিয়াছিলেন, ভারত-সরকার ইতিপূর্ব্বে তাহার একটা হিসাব ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করেন। সংপ্রতি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কারাবরণকারীদের সঠিক সংখ্যা সংবাদ পত্রের মারফত প্রকাশ করিয়াছেন। ঠিক সংবাদ পাওয়া না যাওয়ায় এই তালিকাতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশের কারাবরণকারীদের সংখ্যা ধরা হয় নাই। তবে ১৯৩০ সনের নবেম্বর পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ২,৩২৮ জন কারাবরণ করেন। তালিকাটি এই—

আজমীর	১৫০
অন্ধ্র	২,৮৭৮
আসাম	১,৪৫৯
বিহার	১৪,২৫১
বাংলা	১৫,০০০
বেরার	১,৭৫৬
বোম্বাই	৪,৭০০
সি পি. হিন্দুস্থানী	২,২৫৫
সি পি মরাঠী	৯০৭
দিল্লী	৪,৫০০
গুজরাট	৩৫৪৯
কর্ণাটক	১,৯০০
কেরল	৪৫০
মহারাষ্ট্র	৪,০০০
পঞ্জাব	১২,০০০
সিন্ধু	৭২৪
তামিল নাড়ু	২,৯৯১
আগ্রা-অযোধ্যা	১২ ৬৫১
উড়িষ্যা	১ ০০৯
মোট	৮৭,১২৪

পরলোকে ইমাম সাহেব—

গত ৯ই ডিসেম্বর আহ্‌মাদাবাদ সবরমতী আশ্রমে ইমাম সাহেব আবদুল কাদের বাওয়াজী পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আমরণ মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তিনি একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়াও গান্ধীজীর সহযোগিতা করিয়াছেন। তিনি সবরমতী আশ্রমের সহকারী সভাপতি ছিলেন। গত বৎসর ধরসানার লবন গোলা আক্রমণেও তিনি নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন খাঁটি সেবক হারাইল।

প্রবাসে ভাইস্-চ্যান্সেলার পদে বাঙালী—

অতিরিক্ত জুডিসিয়াল কমিশনার শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর নিয়োগী নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ৩২টি ভোট হইয়াছিল এবং স্যর হরি সিং গৌর ২৫টি ভোট পাইয়াছিলেন।

—

বাংলা

বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী—

বাংলার সর্ব্বত্র ধরপাকড় এবং বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম, হিজলী ও ঢাকায় অমানুষিক উপদ্রবের পর বাঙালী জনসাধারণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন গত ৫ই ৬ই ডিসেম্বর হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন বহরমপুর নিবাসী উকীল মৌলভী আবদুস সামাদ ও মূল সভাপতি হইয়াছিলেন চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয়। সম্মিলনীতে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে প্রধানটি এই মর্ম্মে পাশ হইয়াছে,—পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্যই সরকারের কার্য্যাকার্য্যের প্রতীকারের একমাত্র উপায় এই প্রস্তাবেই আসন্ন সংগ্রামের জন্য দেশবাসিগণকে আহ্বান করিয়া সম্মিলনী নিম্নের কার্য্যতালিকা অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন—(১) সর্ব্বপ্রকার ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন, (২) ইংরেজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ বয়কট এবং ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহ বর্জ্জন। (৩) বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ এবং (৪) মদ্য ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বর্জ্জন।

এই প্রস্তাব পাশ হইয়া গেলে বিলাতে পালামেন্ট সভায় এ-বিষয় প্রশ্ন তোলা হইয়াছিল, এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পীপ্রধানেরা ভারত-সচিবের সঙ্গে গোপন বৈঠক করিয়াছিল।

সম্মিলনীর সঙ্গে প্রদর্শনী ও প্রাদেশিক মহিলা সম্মিলনীরও অধিবেশন হয়।

চরখা ও টেকো প্রতিযোগিতায় মহিলা—

মেদিনীপুরের অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানার ৯ নং ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে গত ২০এ সেপ্টেম্বর গোদামবাড়ী গ্রামে চরখা ও টেকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১০৭ জন চরখা (মাত্র ১৭ জন পুরুষ) ও ৪০ জন টেকো কাটুনী প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী মহেশ্বরী প্রধান ১৫ মিনিটে ১৫৯ গজ ২ ফিট ৪০ নম্বর সূতা কাটিয়া ১ম স্থান অধিকার করেন।

পুরস্কৃতা মহিলাগণের মধ্যে শ্রীমতী মহেশ্বরী প্রধান, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দাস, শ্রীমতী বুদ্ধিমতী সাহু, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, শ্রীমতী শোভাময়ী মান্না, শ্রীমতী দুর্গাময়ী প্রধান, শ্রীমতী বাসবালা মাইতি এবং শ্রীমতী চিন্তামণি প্রধান প্রাপ্ত পুরস্কারগুলি দরিদ্রদিগকে দিবার জন্য স্থানীয় কংগ্রেসে দান করেন।

জঙ্গলবাড়ী পল্লীমঙ্গল সমিতির সাধু প্রচেষ্টা—

জঙ্গলবাড়ী পল্লীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে বিগত ১৮ই ও ২০এ কার্ত্তিক জাফরাবাদ ও জঙ্গলবাড়ী গ্রামে হিন্দুসমাজ সংস্কার সম্বন্ধে দুইটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। এই সব সভার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় ১৬।১৭ গ্রামের হিন্দুসন্তান যোগদান করেন।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর উপনয়ন সংস্কার ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন ইত্যাদি প্রস্তাবাবলী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম.এ. বি-এল উকিল জজকোর্ট ময়মনসিংহ (জঙ্গলবাড়ী), শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী, মোক্তার, ময়মনসিংহ (জঙ্গলবাড়ী), শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেনাপতি, বি-এ (করিমগঞ্জ), শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (জঙ্গলবাড়ী) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিয়া সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

খাসমহলে খাজনা বৃদ্ধি—

এই ভীষণ দুর্দ্দিনে বাখরগঞ্জ জেলার খাসমহলে খাজনা অস্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে মুসলমান ও নমঃশূদ্র কৃষককুলের কষ্টের অন্ত অবধি নাই। তাই বরিশালহিতৈষী বড় দুঃখে লিখিয়াছেন যে, মিঃ ফজলল হক প্রভৃতি বাখরগঞ্জের নেতৃস্থানীয় মুসলমানেরা যখন স্বরাজের বখরা ও সরকারের সহযোগিতা করিতেই ব্যস্ত, এদিকে স্ব-জিলায় সেই সরকারকর্ত্তৃকই যে কৃষককুলের লাঞ্ছনার একশেষ হইতেছে সে দিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। নিম্নের তালিকাটি হইতে বাখরগঞ্জের খাসমহলের খাজনা বৃদ্ধির বহর সম্বন্ধে পাঠকগণের একটা ধারণা হইবে। তালিকাটি বরিশালহিতৈষী হইতে গৃহীত—

বরগুণামহলে	৫০০৮		
২ নং হাওলা	১৩২১৸৶	স্থলে	২১১৪৷৴
৯৫নং হাওলা	৯১১।০	„	১৪৬৬৷০
১০১নং হাওলা	১০১৩৲	„	১৫৫১৸/
৫ নং হাওলা	৩২৭৲	„	৬৩২৲
১০নং হাওলা	৪৬৪৲	„	১৫১৭৲
১১নং হাওলা	১৮৭৪৲	„	১৬৬২৲
২৯নং হাওলা	৩১৬৬৶	„	৫৫৫২৸৶
২৮৮নং হাওলা	৫২৬৸	„	৮৬৫৲
২৪৫ জোত	২২৭৸/	„	৩৯৮৶
২৪২ জোত	২১৫৷৶	„	৩৭১।৶

কৃতী বাঙালী যুবক—

ফরাসী বৈজ্ঞানিক জর্জ্জ ক্লড 'নিয়ন লাইট' আবিষ্কার করেন। নিয়ন গ্যাস হইতে আলো হয় বলিয়া এইরূপ নাম। আমেরিকায় নিয়ন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেখানে নিয়ন লাইটের খুব চলন হইয়াছে। ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট অপেক্ষা ইহার উজ্জ্বলতা বেশি হওয়ায় বিজ্ঞাপন ও জাহাজের সার্চ্চ লাইটে ইহা বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে।

পাবনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবতোষ লাহিড়ী দীর্ঘকাল আমেরিকায়



শ্রীভবতোষ লাহিড়ী

থাকিয়া এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সংপ্রতি স্বদেশে ফিরিয়াছেন। তিনি স্বাধীনভাবে কলিকাতায় নিয়ন লাইটের কারখানা খুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার এই উদ্যোগ সত্যই প্রশংসনীয়।

বিজ্ঞানশিক্ষায় বাঙালী—

শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাধারণ শিক্ষালয় ত্যাগ করিয়া যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রবেশ করেন, এবং সেখান হইতে পাঁচ বৎসর পরে কেমিকেল ইন্‌জিনীয়ারিঙের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯২৮ সনে বিলাত যান এবং লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কেমিষ্ট্রী' বিষয়ে এম্-এস-সি পাশ করেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার দুই মাস পরে করুণা বাবু 'এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ডের একটি বৃত্তি পান এবং সরকারী ব্যয়ে

ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের অনেক কারখানা পরিদর্শন করিয়া তথায় কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি হাই-কমিশনার অব ইণ্ডিয়া



আপিস হইতেও একটি বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি সংপ্রতি দেশে ফিরিয়া বাঙ্গালোরে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান পরিষদে (Indian Institute of science) গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

—

বিদেশ

গোলটেবিল বৈঠক ও ভারতবর্ষের স্বরাজ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা—

১৯৩০ সনে প্রথম বার এবং এ বৎসর দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের জনমতের মুখপাত্রগণকে লইয়া গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। প্রথম বারের বৈঠকে এবং এ বৈঠকেও এক কংগ্রেস ছাড়া, মুখপাত্রগণ জনমত কর্তৃক নির্ব্বাচিত না হইয়া ভারত-সরকার কর্তৃকই মনোনীত হইয়াছিলেন। কাজেই ইঁহাদিগকে জনগণ প্রতিনিধি বলিলে ভুল হইবে। সে যাহা হউক, প্রথম বার অধিবেশন হইয়া গেলে বিগত ১৯এ জানুয়ারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করেন যে, ভারতে স্বায়ত্ত শাসন অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার জনমতের নিকট দায়ী হইবে, তবে গবর্ণমেণ্ট সুপরিচালনার জন্য দেশ-রক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি সাময়িক রক্ষণীর-ও ব্যবস্থা হইবে। প্রথম বারে কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রতিনিধি সমেত দেশনায়কগণ যাহাতে দ্বিতীয় বারের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন এরূপ একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাও ঐ ঘোষণার মধ্যে নিহিত ছিল। গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান সম্ভব হইল এবং দ্বিতীয় বার গোলটেবিল বৈঠক আহূত হইলে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধী ইহাতে যোগ দিবার জন্য বিলাত গমন করিলেন। এই বৈঠকে সম্মিলিত ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল শিখা তিনি যে কত উচ্চে ধারণ করিয়া বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই বৈঠক-ও সংপ্রতি শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ১লা ডিসেম্বরের এক ঘোষণায় ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তগুলির এক ফিরিস্তি দিয়াছেন। ভারতবর্ষে এক দল ইহার মধ্যে সত্যকার স্বরাজের ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের জনমত এবং ইহার মুখপাত্র মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ নায়কগণ, এমন কি জিন্নার মত সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতা ইহার মধ্যে আশু স্বরাজলাভের সম্ভাবনা খুঁজিয়া পান নাই।

মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের ঘোষণা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষের খাটি স্বরাজের ভিৎ ইহার মধ্যে নাই, একটা মেকী স্বরাজের আভাস আছে মাত্র। এই মেকী স্বরাজ স্থাপনেও আবার অন্যূন পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। স্বরাজের মূল ভিত্তি স্থাপিত হইবে তখনই যখন দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও রাজস্বের ভার ভারতবাসীর হাতে আসিবে। প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় এই তিনটি অতি সন্তর্পণে বাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, গোলটেবিল বৈঠকের একটি কার্য্যকরী সমিতি ভারতবর্ষে কার্য্য করিবে। এই সমিতি ব্রিটিশ-ভারত ও ভারতীয় ভারতের সমস্যাগুলি মীমাংসা করিয়া যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে, নির্ব্বাচন ও ভোট প্রদান সমস্যার সমাধান করিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইতিমধ্যে, অবিলম্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে এবং সচ্ছলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সিন্ধু দেশকেও নিয়মানুগ স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হইবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। উক্ত সমিতির কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করিবার জন্য আবার তৃতীয় বার গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা হইবে।

এত ঘটা করিয়া যে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন হইয়াছিল তাহার এই পরিণতি দেখিয়া রেভারেণ্ড সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রমুখ নিঃস্বার্থ বিদেশী ভারতবন্ধুগণ বিস্মিত হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর এই ঘোষণার পর, এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের তর্কাতর্কেও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে ভারতবর্ষ এখনও ইংরেজের জমিদারী বলিয়াই পরিজ্ঞাত হইতেছে এবং ইংলণ্ডের কর্ণধারগণই ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক ভাগ্যনিয়ন্তা।

শ্রীহট্টে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের অভিভাষণ

[শারদীয়া পূজার ছুটিতে প্রতি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বৎসর উহার একচত্বারিংশ অধিবেশন শ্রীহট্টে হইয়াছিল। কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণের কোন কোন অংশ নীচে মুদ্রিত হইল]

শ্রীহট্ট মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্মভূমি, অদ্বৈত প্রভুর পৈতৃক নিবাসও এই অঞ্চলেই ছিল। ইহা শ্রীহট্টের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আমি বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, এখানকার অধিবাসীরা স্বভাবতঃই সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের অনুরাগী, তাই মনে হয় এটি স্বভাবতঃই ভক্তি-সাধনার অনুকূল স্থান। পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণিও এইখানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব জ্ঞানচর্চ্চার অভাবও এখানে ছিল না। এই সকল ভক্ত ও জ্ঞানী মহাপুরুষের স্মৃতির আলোক অনুরঞ্জিত এই সরস শ্যামল ভূমিতে আসিয়া আমরা তীর্থদর্শনের ফল লাভ করিলাম।

আজ দেশের সকল দিকের সকল কাজে, সকল বিপদ ও দুর্গতি দূর করিবার জন্য মিলিত আগ্রহ চিন্তা, প্রার্থনা ও প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। যে যাহার আপন প্রাণ, আপন পরিজন, আপন সুখ-সুবিধা ও ধর্ম্ম বাঁচাইয়া চলুক তবেই জাতি সমাজ ও দেশ বাঁচিবে, জগতে শান্তি হইবে একথা যে মিথ্যা তাহা আমরা বুঝিয়াছি। কি ব্যক্তিগত ভাবে, কি জাতিগত ভাবে, স্বতন্ত্র স্বার্থ লইয়া আমরা বেশী দিন বাঁচিতে পারি না। আমার কৈশোরে, সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া, যে সত্যটি পদ্যে বিবৃত করিয়াছিলাম—

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

ইহার যাথার্থ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। সকলের তরে সকলে আমরা এ-কথা কেবল নিজ পরিবারে নিজ সমাজের সম্বন্ধেই নয়, আরও ব্যাপকভাবে দেশ ও জাতিসমূহের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। আপন সুখ-সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের সকল মানুষের সুখ-সুবিধা হইলেই প্রকৃত মঙ্গল ও শান্তির সম্ভাবনা, অন্যথা নহে। দেশের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। বহুকাল হইতে দেশের অনুন্নত শ্রেণীকে অনুন্নত থাকিতে দিয়া দেশকেই হীনবল করা হইয়াছিল;



শ্রীযুক্তা কামিনী রায়

শ্রেণীবিশেষের হাতে শাস্ত্রচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্মের রাজকোষ ও কোষাধ্যক্ষ করিয়া বিদ্যা ও গুণ নির্ব্বিচারে আচার্য্য ও পুরোহিত হইবার জন্মগত অধিকার দিয়া তাহাদিগকে অলস, অর্থলোলুপ, স্বার্থপর ও অত্যাচারী হইবার পথ প্রশস্ত করা হইয়াছিল, শাস্ত্রচর্চ্চা লোপ পাইয়া কুসংস্কারের আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। নারীকে অবরোধে আবদ্ধ এবং জ্ঞানানুশীলনে বঞ্চিত রাখিয়া মূর্খ দুর্ব্বল ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ করা হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে

পুরুষ যথেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শতাব্দী কালের মধ্যেই আমরা ধনী ও মধ্যবিত্তেরা বিদেশী পণ্যে সস্তায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গিয়া দেশের বহু শিল্প নষ্ট হইতে দিয়াছি এবং কেবল শিল্পীদের নহে, নিজেদের দুরবস্থার কারণ হইয়াছি। এই বাংলা দেশে হিন্দুরা মুসলমান ভাইদের হীন চক্ষে দেখিয়া কালে তাহাদের হৃদয়ে উৎকট বিদ্বেষ-বিষ সঞ্চিত হইতে দিয়াছি, সে বিষের জ্বালায় আজ আমরা সকলে জর্জ্জরিত। সমাজ-দেহের বা দেশের এক অংশের ক্ষতিতে সমগ্র দেশের ক্ষতি। এক জাতির ক্ষতিতে সকল জাতির ক্ষতি।

এ-যুগে রাজর্ষি রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ, তাঁহার সময়ে না হউক, পরবর্ত্তীকালে জাতিভেদ ও ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অস্বীকার, নারীর অবরোধমোচন, নারীর উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তন ইত্যাদি সামাজিক কল্যাণকর্ম্মে সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হন। ক্রমে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পূর্ণ একমত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ এক পথে না গিয়াও দেশের কল্যাণকল্পে এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। খৃষ্টান মিশনরীদের এবং বর্ত্তমানে থিওসফিষ্টগণের চেষ্টাও এ সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতাসহকারে উল্লেখনীয়। উজ্জ্বলতর জ্ঞানালোকে, ও পাশ্চাত্য জাতিসকলের নিকটতর ও বিস্তৃততর সংস্পর্শে, অনেক ক্ষতি সত্ত্বেও নৈতিক সাধনায় আমরা যথেষ্ট লাভবান হইয়াছি। মানুষে মানুষে অবাধ মিলনে জ্ঞান বৰ্দ্ধিত এবং হৃদয় প্রশস্ত হয়, আত্মগরিমা সঙ্কুচিত হইয়া আসে। সকলের ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে মনোযোগ ও সম্ভ্রমের সহিত পাঠ করিলে মূলে আশ্চর্য্য ঐক্য অনুভূত হয়। সকল সাধু মহাপুরুষের সাধনা ও লক্ষ্যের মধ্যে আশ্চর্য্য মিলন। ব্রাহ্মসমাজের মতের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর খুব অমিল আছে কি? আজ এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ রাজনীতির মঞ্চ হইতে অবিদ্বেষ, ক্ষতি-সহিষ্ণুতা, অহিংস অসহযোগ, নিরস্ত্র সংগ্রাম, বিশ্বপ্রীতি সংযুক্ত স্বদেশ-প্রেম, ভারতে হিন্দুমুসলমান-মিলিত একজাতীয়তা প্রচার করিতেছেন, অগণ্য দেশবাসীর তিনি নেতা ও পুরোহিত, সর্ব্বদেশের সাধুজনের নমস্য। তাঁহার প্রচার মুখ্যতঃ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের উন্নতিকল্পে বলিয়াই আপাততঃ মনে হয়, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাই অসংখ্য দেশবাসী ও বহু বিদেশীর চিত্তের উপর তাঁহারা যে আশ্চর্য্য প্রভাব তাহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা। নিরস্ত্র, নিরীহ, শীর্ণকায় এই মানুষটির ভিতরে আত্মার প্রভাব ছাড়া আর কোন প্রভাব আছে? কিন্তু এমন অসীম সাহসে দুর্জ্জয় রাজশক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইবার বল তাঁহার কোথা হইতে আসিল? ধর্ম্ম-বিশ্বাস হইতেই। আজ হউক, কাল হউক, ধর্ম্মের জয় হইবেই এই বিশ্বাস হইতে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধনবল, জনবল দুঃসাধ্য সাধন করিতে পারে, কিন্তু পূতচরিত্র মহাপুরুষের অদম্য অনম্য ন্যায়-নিষ্ঠা বা সত্যাগ্রহরূপ শক্তিতে অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপার সকল সংঘটিত হয়। তবু প্রকৃত সত্যাগ্রহ আজিও দেশমধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচার হইতে পারিতেছে না। তাহার জন্য প্রয়োজন অমানুষিক ধৈর্য্য ও ত্যাগ।

বর্ত্তমানে চারিদিকে কি অশান্তি, কি বিক্ষোভ! কেবল এদেশে নয়, সকল দেশেই এক অভূতপূর্ব্ব চিত্ত-কম্প ও চিন্তান্দোলন চলিয়াছে। এমন করিয়া সমস্ত সভ্য জগৎ একই কালে কখনও বোধ হয় নড়িয়া উঠে নাই। পাতালে বসিয়া পুরাণ-বর্ণিত সহস্রশীর্ষ বাসুকী-নাগ ধরণীর ভারে ক্লান্ত হইয়া যেন সবগুলি মাথা এক সঙ্গে নাড়া দিয়াছে। তাই সকল দেশ কম্পিত, ত্রস্ত, আত্মরক্ষার জন্য উন্নিদ্র। সব দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি নিজেদের দেশ, এই নানা সম্প্রদায়ের জননী বিপুল ভারতভূমির দিকে দৃষ্টি করি, দেখি বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্বার্থহানির ভয়ে কত অস্থির, পদ প্রভুত্ব লাভের জন্য কত ব্যগ্র! অতি নিকটে, অতি প্রিয় বঙ্গভূমির দিকে চাহিয়া দেখি কত উপদ্রব! এক দিকে মানুষের উপর জড়শক্তির নিষ্ঠুর আক্রমণ—বন্যা, জলপ্লাবন, আর একদিকে মানুষের উপর মানুষের বিদ্বেষের অগ্নিবর্ষণ; অবিচার ও অত্যাচারের

ফলে নৃশংস প্রতিহিংসা। কত বিচ্ছেদ দুঃখ ও মৃত্যুশোক, দারিদ্র্য ও অপমান, ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দেশবাসীদের পেষণ করিতেছে, কত দুষ্কৃতি ও অকল্যাণ পৌনঃপুনিক দশমিকের কতকগুলি সংখ্যার মত বার-বার ফিরিয়া আসিতেছে।

এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজ কি উদাসীন দ্রষ্টা হইয়া থাকিবেন, কিংবা দুর্নীতি দুরীতি দূর হউক, কেবল মনে মনে এই প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন? এখন কি গভীর ভাবে চিন্তা করিবার, উদ্যমসহকারে শান্তির চেষ্টা ও কল্যাণ কর্ম্মে বাহির হইবার আবশ্যক নাই? বেদনা ও মৃত্যুর ভয় যাহাদের ভাঙিয়া গিয়াছে, আইনের ভয় তাহাদের বিচলিত করিবে না। কোন ভয়ে নহে, কিন্তু প্রবল কোন আকর্ষণে তাহাদের চালাইতে হইবে। সে কি আকর্ষণ যাহা দৃঢ় অথচ মধুর, অনিন্দ্য ও কল্যাণপ্রদ, যাহা ইহাদের উৎসাহ-চঞ্চল অশান্ত উদ্দীপ্ত মনকে সংযমের পথে টানিয়া রাখিয়া দেশের নানা দুর্গতি দুর্নীতির বিনাশে ও প্রকৃত স্বরাজ ও স্বাধীনতা অর্জ্জনে নিযুক্ত করিতে পারে? সে আকর্ষণ হইবে উন্নত আদর্শের। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ, ধর্ম্মজগতের আদর্শ। কিন্তু তাহার জন্য শিক্ষা চাই। সে কঠিন শিক্ষা কে কাহাকে দিতেছে? যখন কিছুকালের জন্য অহিংস অসহযোগ, আইনলঙ্ঘন বা নিরস্ত্র বিদ্রোহ চলে, তখন অত্যাচারের ফলে প্রতিহিংসার অনলেও ঘন ঘন আহুতি পড়ে। সে অনল এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। কেহ কেহ স্পষ্টই বলেন পলিটিকস্ ধর্ম্মনীতির অন্তর্গত নহে। কিন্তু এ কথা কি সত্য? জীবনের সকল কাজই ত ধর্ম্মসঙ্গত হওয়া চাই, সমাজের প্রত্যেক বিধি ব্যবস্থা ধর্ম্মেরই অনুশাসনে হওয়া চাই, নহিলে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, সামাজিক জীবনের ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল বিভাগেই ধর্ম্মের শাসন ও অনুমোদন আবশ্যক। ধর্ম্মকে কেবল নির্জ্জন ও সামাজিক উপাসনার ব্যাপার করিয়া রাখিলে এবং অন্য সময়ে তাহার অনুশাসন লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্মের ধারণ-শক্তি রহিল কোথায়? ধর্ম্মনামই ব্যর্থ হইল। সমাজনীতির ন্যায় রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও ব্রাহ্ম কর্ম্মীর আবশ্যক। ব্রাহ্ম পিতা মাতা ব্রাহ্ম শিক্ষকদের একান্ত কর্ত্তব্য তরুণদের চিন্তা ও চেষ্টা উচ্চ স্তরের রাজনীতির দিকে আকর্ষণ করা। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীকে বিলাতে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি রাজনীতিক্ষেত্রে কেন নামিলেন? তিনি উত্তর করিলেন—রাজনীতিকে পঙ্কিলতা মুক্ত করিবার জন্য। ব্রাহ্ম কর্ম্মীরও লক্ষ্য হইবে জীবনের সকল দিক্ ধর্ম্মানুগত ও পঙ্কিলতামুক্ত করিবার চেষ্টা।

কেবল সন্তানদের জন্য ধনোপার্জ্জন করিলে চলিবে না, কেবল তাহাদের আরামের কথা ভাবিলে চলিবে না। সময়-বিশেষে তাহারা যাহাতে ঐশ্বর্য্য ও আরাম ছাড়াও চলিতে পারে, যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করে তাহা কথায় এবং কর্ম্মে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে এবং তজ্জন্য দুঃখ গ্রহণ ও সুখ বিসর্জ্জন করিতে ভীত না হয়, সে শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে। অতি স্নেহবশতঃ আমরা অনেক সময়ে দুঃখ ও কঠোর সংগ্রাম হইতে তাহাদের আড়ালে রাখি। তাহাদের কাছে সাধুতা বিষয়ে যে উপদেশ দিই, জীবনের ছোটবড় কাজে তাহাদের নিকট হইতে সে সাধুতার নিদর্শন পাইতে চেষ্টা করি না। নিজেরাও নিজ নিজ আচরণে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি না। বাচনিক নৈতিক শিক্ষা হইতে জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়াই প্রশস্ত। ধনীর সন্তান পিতার অর্থে কাহাকেও সাহায্য করিয়া অনেক সময়ে ধনগর্ব্বে স্ফীত হয়, তাহাকে দরিদ্র প্রতিবেশীর রোগের সেবায় নিয়োজিত করিলে, কোন অভাবগ্রস্ত বালককে নিজের হাত-খরচের টাকা হইতে দান করিয়া কষ্টস্বীকার করিতে শিখাইলে অধিকতর সুফল ফলিবে।

যাঁহারা অনুন্নত বলিয়া আজকাল ব্যাখ্যাত এবং এত-কাল হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অস্পৃশ্য ছিল এবং যাহারা সম্পূর্ণ অহিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছ যবনাদি নামে অভিহিত এবং যাহাদের অন্নজল হিন্দুর অখাদ্য ও অপেয়, ব্রাহ্মসমাজ তাহাদের ঘৃণা বা অবজ্ঞা করেন নাই; অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইল তাহাদের অন্নজল গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতেছিলেন। কয়েক

বৎসর হইল অনুন্নতদের উন্নয়নের জন্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে একটি 'মিশন'ও গঠিত হইয়াছে। খাসিয়াদের জন্যও হইয়াছিল। তথাপি অর্থাভাবে এবং লোকাভাবে ইহাদের প্রতি সমুচিত কর্ত্তব্য সাধিত হইতেছে না একথা বার-বার শুনা যাইতেছে। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রবল সেখানে ধনবল ও লোকবল না আসিয়া যায় না। তাই অনুন্নত শ্রেণীর জন্য ব্রাহ্মসমাজের যুবকদের মধ্য হইতে যাঁহারা হৃদয়বান কর্ম্মকুশল ও ত্যাগস্বীকারে সমর্থ তাঁহারা সাহস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। কেবল দল বাড়াইবেন বলিয়া নহে, কিন্তু যাহা সত্য ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন তাহারই প্রচারের জন্য, অবজ্ঞাতকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য, অশিক্ষিতকে শিক্ষা দিবার জন্য, অবিচার ও অত্যাচার দূরীকরণের জন্য।

আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ যে যে-নাম লইয়া সুখী হই না কেন, সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ যে উদার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম তাহা হইতেছে ঈশ্বরপ্রীতি ও মানব-প্রীতির সাধনা, মানব চরিত্রের আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রয়াস। সাধনার আরম্ভে, জীবন গঠন ও সমাজ গঠনের জন্য নামের একান্ত আবশ্যক, কিন্তু কালে সাধক এমন অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন যেখানে তাঁহার সাম্প্রদায়িক নামের আসক্তি ও বন্ধন কাটিয়া যায়, যখন তিনি জানেন, আমার পিতাও একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর আর আমার ভাইও সেবার অধিকারী বিশ্বমানব।

আমরা কাহারও হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব, খৃষ্টানত্ব ইত্যাদি বংশক্রমাগত, চিরপোষিত নাম চিহ্ন বলপূর্ব্বক বর্জ্জন করাইবার বিরোধী, কিন্তু সকল বিভিন্নতা মিলাইয়া লইয়া এক মহামানবত্ব ক্রমে আসিবে এই আশায় আশ্বস্ত। সেদিন কি আসিবে না?

পরস্পরের ধর্ম্মের অবান্তর (non-essential) সাময়িক ও আপেক্ষিক বিষয়ে বিবাদ বর্জ্জন করিয়া গুরুতর (essential) মূলগত চিরন্তন সত্য বিষয়ে ঐক্য স্বীকার পূর্ব্বক সকলে সকলের দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিলে, মনের সঙ্গে মন মিলাইয়া দেখিলে, কত নূতন বল সঞ্চিত হইবে, কত নূতন আনন্দের অধিকারী হইব।

মান্দ্রাজে চিত্র-প্রদর্শনী

গত নভেম্বর মাসে মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর উদ্যোগে তাঁহার ভবনে একটি চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতে স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যক্ষের হাতের অনেক কাজ দেখান হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে ছবি ও মূর্ত্তি উভয়বিধ শিল্পের নিদর্শনই ছিল। অধ্যক্ষের হাতের 'পোর্ট্রেট বাষ্ট' ও চিত্র প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে বলাই বাহুল্য। ছাত্রদের কাজেরও সুখ্যাতি সেখানকার কাগজে বাহির হইয়াছে।

"হিন্দু" লিখিয়াছেন—বছর দুই আগে পর্য্যন্ত মান্দ্রাজের চিত্র-প্রদর্শনীতে স্কুলের ছাত্রদের আঁকা অচল পদার্থের প্রতিলিপি দেখিতে দেখিতে হাঁফ ধরিয়া গিয়াছিল, এই প্রদর্শনী দেখিয়া মন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। ইহা যেমন অভিনব তেমনি প্রাণবন্ত। ছাত্রদের কাজে আর সে বাঁধা রীতির ছাপ নাই—সৌন্দর্য্যের সন্ধান ও আবিষ্কারের পথে এখন তারা নিজেরাই যাত্রা করিয়াছে। ছাত্রকে স্বাধীনতা দেওয়া অধ্যক্ষের দুঃসাহসিকতা সন্দেহ নাই, কিন্তু ফল দেখিয়া বলিতে হয় ইহার প্রয়োজন ছিল। মান্ধাতার আমলের নিরর্থক নীরস আঁচড় কাটা বা রকমারি জিনিসপত্রের স্তূপ নকল করার দায় হইতে ছাত্রেরা নিষ্কৃতি পাইল। অতঃপর তাহাদের নব নব কল্পনার অবকাশ মিলিবে। নূতন অধ্যক্ষের পরিচালনায় অল্পকাল মধ্যে স্কুলের কত উন্নতি হইয়াছে এই প্রদর্শনী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কয়েক বৎসর আগে এমন একটি চিত্র-প্রদর্শনী কেহ কল্পনাও করিতে পারিতে না, সম্ভব করিয়া তোলা ত দূরের কথা।

ইংরেজদের কাগজ "মান্দ্রাজ মেল" লিখিয়াছেন—এই স্কুলে চিত্রশিল্প-শিক্ষা পদ্ধতির কত উন্নতি হইয়াছে তাহা এই প্রদর্শনী চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। বর্ত্তমান উন্নতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে এখান হইতে কীর্ত্তিমান চিত্রকর ও ভাস্করের উদ্ভব হইবে।



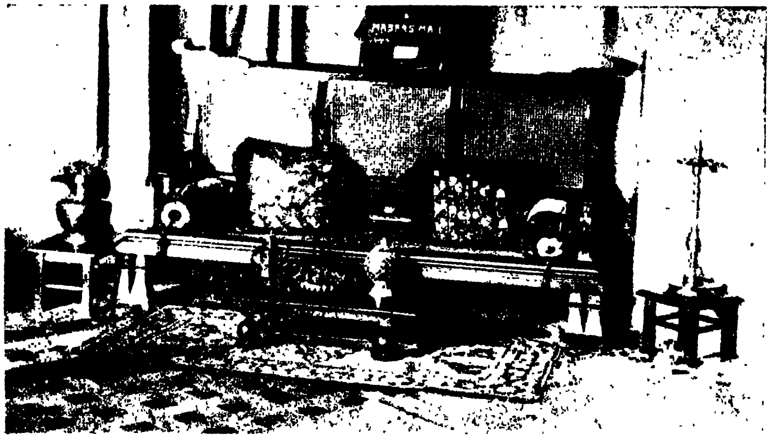
মাতৃমূর্ত্তি
শ্রীসুব্বা রাও



পায়ের কাঁটা
শ্রীগোরস্বামী আচার্য্য



তরুতলে
শ্রীগোবিন্দরাব



শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক পরিকল্পিত গৃহসজ্জা



ক্ষত্রিরাণী
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী



মধ্যাহ্নের রৌদ্রে
শ্রীরসিকলাল পারেখ



অপ্সরা



নির্ব্বাণ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

অঙ্কিত



উতকামন্দ
শ্রীবীরভদ্র রাও চিত্রা



ঝড়ের পর
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী



দেবদাসী
শ্রীদেবলিজম্ কর্ত্তৃক গঠিত

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ

৭৮ বৎসর বয়সে গত ১লা অগ্রহায়ণ রাত্রি ১১ ঘটিকার জগদ্‌বিখ্যাত পণ্ডিত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ তথা সমস্ত ভারতবর্ষের যে কতদিক্ হইতে ক্ষতি-হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। তিনি যে কেবল একজন প্রকাণ্ড সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে—তিনি একজন আদর্শ অধ্যাপক ছিলেন—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সকল বিভাগে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল—বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার রচনাভঙ্গী ছিল অতুলনীয়।

বাঙ্গালার এক সুপরিচিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে হরপ্রসাদের জন্ম। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গের অনেক পণ্ডিতের গুরু বা অধ্যাপক। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় একবার প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছিলেন—'বঙ্গের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গের অধিকাংশ এই বংশের শিষ্য।' উত্তরকালে হরপ্রসাদ পূর্ব্ব-পুরুষগণের এই কীর্ত্তি অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গের আধুনিক সংস্কৃত অধ্যাপক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রায় সকলেই হরপ্রসাদের সহিত গুরুশিষ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ—কেহ কেহ মুখ্যতঃ তাঁহারই শিষ্য, কেহ কেহ বা তাঁহার শিষ্যের শিষ্য। এ বড় কম গৌরবের কথা নহে।

অধ্যাপক হিসাবে হরপ্রসাদ একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। সাহিত্যের অধ্যাপনে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয় বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যের রসবিচার ও সমালোচনা তিনি অতি সুন্দরভাবে করিতেন। ছাত্রদিগের সহিত আত্মীয়তাও ছিল তাঁহার অসামান্য। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন স্কুলের ছাত্রদিগের সহিতও তাঁহার পরিচয়ের অভাব ছিল না। তিনি তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন।

কি ছাত্র কি সাধারণ লোক সকলের সহিতই ব্যবহারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। যাহার সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে কোন দিনই দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে অত্যন্ত রূঢ় বলিয়া মনে হইত সত্য—তবে যাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ভাল ছিল, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার কোমলতা ও সদ্‌ব্যবহারের অন্ত ছিল না। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য তাঁহাকে অযথা দাম্ভিক বা অসামাজিক করিয়া তোলে নাই। তিনি সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহার অনন্যসুলভ রসিকতা সকলকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিত। তিনি যে স্থানে কথা বলিতেন, উৎকট গাম্ভীর্য্য সেস্থানকে ভীষণ করিয়া তুলিতে পারিত না—হাসির ফোয়ারা উহাকে স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া তুলিত।

হরপ্রসাদ আজীবন ছাত্রের মত ছিলেন, সাংসারিক সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অভিযোগের মধ্যে তিনি কখনও পড়াশুনার প্রতি অবহেলা করেন নাই। বাল্যকালে অভাবের নিষ্পেষণে তিনি অতিকষ্টে লেখাপড়া করেন। এই সময়ে 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' মহাশয়ের সাহায্য তাঁহার বিশেষ উপকার করিয়াছিল। কলেজের শিক্ষা সমাপ্তির পরও তাঁহার অভাব দূরীভূত হইয়াছিল বলিতে পারা যায় না। হেয়ার স্কুলের সাধারণ শিক্ষক হিসাবে তাঁহাকে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রেও তিনি ছাত্রের মত পড়াশুনা করিতে কোন দিনও ত্রুটি করেন নাই। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিয়মিত অধ্যয়নের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। ইহারই ফলে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য—বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার মত অধিক পড়াশুনা খুব কম লোকেরই ছিল।

তাঁহার বিপুল জ্ঞান কেবল মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অপ্রকাশিত বহু সহস্র হস্তলিখিত দুর্লভ পুঁথি দেখিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত তিনি প্রথম পুঁথির কার্য্য আরম্ভ করেন। মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি সরকার কর্ত্তৃক পুঁথি অনুসন্ধানের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি যে-সকল পুঁথি দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ Notices of Sanskrit Manuscripts নামক গ্রন্থে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারের পক্ষ হইতে তিনি নেপালের দরবারের বিশাল পুঁথিশালার পরীক্ষা করেন এবং ঐ পুঁথিশালার পুঁথিগুলির বিবরণ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই স্থানে তিনি কতকগুলি বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার পুঁথির সন্ধান পান। এখানকার পুঁথিগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকারীদিগের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্।

অক্স্ফোর্ডে ম্যাক্স্-মূলার মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি কতগুলি দুর্লভ বৈদিক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নেপালের মহারাজা সার চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর অক্স্ফোর্ডের বোডলিয়ন লাইব্রেরীতে প্রায় ১০০০ সংস্কৃত পুঁথি দান করিয়াছিলেন। এইগুলির তালিকা প্রস্তুত ও দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল—এ কথা ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন স্বহস্তলিখিত এক পত্রে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া, সরকারের পক্ষ হইতে হরপ্রসাদ বিশপস্ কলেজের পুঁথিগুলির এক বিবরণ প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোটের উপর তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময় প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার ফলে তিনি যে জ্ঞান আহরণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অমূল্য। তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় তিনি এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts এর ছয় খণ্ডের বিস্তৃত ভূমিকা হইতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার এই বিশাল গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। *এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে ইহার ভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইত।*

শাস্ত্রী মহাশয় যে কেবল পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন এমন নহে। তিনি কতকগুলি দুর্লভ প্রয়োজনীয় পুঁথি এশিয়াটিক্ সোসাইটি এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে 'রামচরিত' এবং 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য সাধারণকে জানাইয়া দিয়াছে। আর দ্বিতীয়খানিতে পূর্ব্বভারতের প্রাচীন প্রাদেশিক ভাষার অনেক নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এত অধিক এবং এত বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত যে, তাহাদের স্বল্প পরিচয়ও একটি প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার কৃত কার্য্যের ব্যাপকতা ও বিশালতার ধারণা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত হইলে তাহা হইতে পাওয়া যাইতে পারিবে। আশা করা যায়, 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই তালিকা প্রদত্ত হইবে।

প্রাচীন পুঁথির আলোচনা দ্বারা হরপ্রসাদ কেবল যে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান মাত্র সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। তিনি ইতিহাসে কতগুলি নূতন মত খাড়া করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুই একটি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ মতবাদ এই যে—বঙ্গের তথাকথিত অস্পৃশ্য নীচ জাতি বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইলেও তাহারা প্রকৃত হিন্দু নহে—বঙ্গে বৌদ্ধপ্রাধান্যের সময় তাহারা বৌদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ-প্রাধান্যহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সমাজের নিম্নস্তর অধিকার করিয়াছে। ডোম প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মপূজা বুদ্ধপূজার নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার এই মত Discovery of Living Buddhism in Bengal নামক তাঁহার প্রথম বয়সে লেখা পুস্তকে প্রচারিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের কথা তিনি তাঁহার অনেক লেখার মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের জাতীয় সভ্যতায় বাঙ্গালীর দান সম্বন্ধে তিনি Bihar & Orissa Research Societyর পত্রিকায় বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আজ যতই অবজ্ঞাত হউন না কেন, একদিন সমাজে তাঁহাদের প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাই জীবনের সায়াহ্নে হরপ্রসাদ এক এক করিয়া এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের জীবনী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কয়েকজনের জীবনী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধ অপ্রকাশিত অবস্থায় সাহিত্য-পরিষদে রহিয়াছে।

হরপ্রসাদের কীর্ত্তির মধ্যে বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় হইতেছে তাঁহার বাঙ্গালা রচনা-ভঙ্গী। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার লেখায় 'পণ্ডিতি' ভাব আদৌ ছিল না। তাঁহার বাঙ্গালা লেখায় একটা অনন্যসাধারণ প্রাঞ্জলতা বর্ত্তমান ছিল। ইতিহাসের খুঁটিনাটি ঘটনার তালিকা সাধারণতঃ লোকের আদৌ রুচিকর নহে। হরপ্রসাদ কিন্তু এই বিষয়টির মধ্যে একটা সঞ্জীবতা সঞ্চার করিতে পারিতেন। তাহার ফলে তাঁহার লেখা ঐতিহাসিক বিষয় উপন্যাসের মত সাধারণকে আকৃষ্ট করিত। মোটের উপর কঠিন বিষয়কে সরল ও সরসভাবে সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার তাঁহার যে রচনাকৌশল জানা ছিল তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন না হইলেও আদর্শস্থানীয় সন্দেহ নাই।

কালক্রমে নূতন আবিষ্কারের ফলে হরপ্রসাদের ঐতিহাসিক আবিষ্কারের মূল্য কমিয়া যাইতে পারে—তাঁহার মতবাদ ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সুন্দর রচনারীতি বাঙ্গালীর সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে—বাঙ্গালীকে চির আনন্দ দান করিবে। তাঁহার এই রচনাভঙ্গী তাঁহার 'বেণের মেয়ে' 'কাঞ্চনমালা' প্রভৃতি উপন্যাসে, 'বাল্মীকির জয়' প্রভৃতি গ্রন্থে কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিদের কাব্য সমালোচনাময় প্রবন্ধসমূহে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার রচিত 'বাল্মীকির জয়' এক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি দেশীয় ও বৈদেশিক সাহিত্যরসিকগণ মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদের দিকে তিনিই প্রথম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৌদ্ধ গান



মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ও দোঁহার আবিষ্কার ও প্রকাশের দ্বারা তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগের উপর যে আলোকসম্পাত করিয়াছেন সেজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ থাকিবে।

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককালব্যাপী সাহিত্যারাধনার আংশিক পুরস্কার-স্বরূপ হরপ্রসাদ সরকারের নিকট হইতে মহামহোপাধ্যায় ও সি-আই-ই এই দুই উপাধি পাইয়া-

ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে ডি-লিট উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যশাস্ত্রানুশীলন সমিতি—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯১৯ ও ১৯২০ এই দুই বৎসর সভাপতির গৌরবময় পদে তাঁহাকে বসাইয়াছিলেন। এই সমিতি কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে তিনি আজীবন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। সুদীর্ঘ সপ্তবিংশ বর্ষকাল তিনি সভাপতি ও সহকারী সভাপতি রূপে এই পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শুধু বাঙ্গালা দেশ বা ভারতবর্ষের মধ্যেই হরপ্রসাদের সম্মান ও খ্যাতি আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল সমস্ত জগদ্‌ব্যাপী। বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে সম্মানিত সদস্য তালিকায় স্থান দিয়াছিল। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মাত্র ত্রিশ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন।

বাঙ্গালীর গৌরব প্রচার, বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যে যিনি জীবনব্যাপী সাধনা করিয়া গিয়াছেন সেই পরলোকগত পণ্ডিত হরপ্রসাদের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা বাঙ্গালীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয় শুধু তৈলচিত্র স্থাপনের দ্বারা একার্য্য সাধিত হইবে না। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহকে বিস্মৃতির করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাই কি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নহে? তাহা যদি হয়, তবে তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র—এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পত্রিকাদিতে বিক্ষিপ্ত তাঁহার রচনাসমূহ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। আশা করি, বাঙ্গালী তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টায় যথোচিত সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

ভ্রম-সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে 'বাঙালী মুসলমান রসায়নাধ্যাপক' নিবন্ধটিতে "লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্‌সি উপাধি প্রাপ্ত ডক্টর কুদ্রৎ-ই-খোদা" স্থানে "লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সি উপাধি প্রাপ্ত ডক্টর কুদ্রৎ-ই-খোদা" হইবে।

বর্ত্তমান সংখ্যার ৪৩৬ পৃষ্ঠায় ছবির নিম্নে "শ্রীকরুণা দাসগুপ্ত" স্থলে "শ্রীকরুণাদাস গুহ" হইবে।





রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রীতি

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সকল মহাদেশ হইতে প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি পাইতেছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁহার নিজের হৃদয়ের আত্মীয়তাবোধ নিতান্ত আধুনিক নহে। উহা তাঁহার অনেক পুরাতন কবিতাতেও প্রকাশ পাইয়াছে। ১৩০৭ সালের ৩রা ফাল্গুন তিনি "প্রবাসী" শীর্ষক যে কবিতা রচনা করেন এবং যাহা এই মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়, তাহার গোড়াতেই আছে :

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই,
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।"

বিশ্বপ্রীতিব্যঞ্জক ইহা অপেক্ষাও আগেকার কবিতা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে থাকিতে পারে।

—

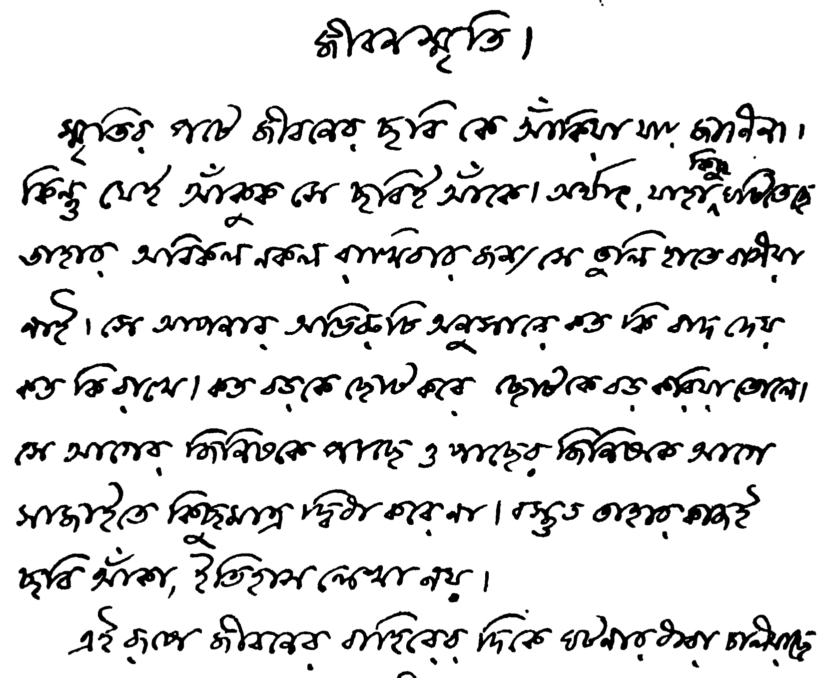
রবীন্দ্র-জয়ন্তী

১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হয়। তখন আমরা লিখিয়াছিলাম, "বর্ত্তমান বৎসর বৈশাখ মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া একান্ন বৎসরে পদার্পণ করেন। তদুপলক্ষে বোলপুরে তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সবান্ধবে তাঁহার জন্মোৎসব করেন এবং তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করেন। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদের এমন আদান-প্রদান আমরা কখনও দেখি নাই।" এ বৎসর তাঁহার সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। এবারও তাঁহার জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এবং তাঁহার নানাদেশাগত ভক্তবৃন্দ আন্তরিক অনুরাগ ও বাহ্য শোভার সহিত সুসম্পন্ন করেন। তাহার কিছু বৃত্তান্ত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দিয়াছিলাম।

১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের যে জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে হইয়াছিল, সেই উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার "জীবন-স্মৃতি" গ্রন্থ বিভিন্ন অতিথিসমষ্টিকে আগাগোড়া পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। পরে উহা সেই বৎসরের ভাদ্র মাস হইতে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার তখনকার হাতের লেখা যে প্রায় এখনকার মতই ছিল, তাহা ঐ বহির পাণ্ডুলিপির প্রথম কয়েকটি পংক্তির প্রতিলিপি হইতে বুঝা যাইবে।

এবার যেমন রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলিকাতার টাউন হলে কবির সংবর্দ্ধনার জন্য সভা হইবে, ১৩১৮ সালের জন্মোৎসবেও সেইরূপ ঐ স্থানে সভা হইয়াছিল। তখন আমরা লিখিয়াছিলাম :

"স্ট্যাণ্টন-নিবাসী ফ্লেচরের লেখায় এইরূপ একটি মত প্রকাশিত হইয়াছে, যে, কোন মানুষ যদি কোন জাতির সমুদয় কথা ও কাহিনী এবং গান রচনা করিতে পান, তাহা হইলে উহার আইনগুলি কে প্রণয়ন করে, তাহার খোঁজ লইবার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। সোজা কথায় ইহার মানে এই দাঁড়ায়, যে, লোকপ্রিয় সাহিত্য জাতীয় চরিত্র জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় ভবিষ্যৎ যেমন করিয়া গঠিত ও নির্দ্ধারিত করিতে পারে, আইনে তাহা পারে না। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত জাতীয় চরিত্রকে যে ভাবে গড়িয়াছে, কোন্ শাসনকর্ত্তা নিজের প্রভাব সেই প্রকারে, তেমন স্থায়ী ভাবে, বিস্তার করিতে পারিয়াছেন? সুতরাং কবির সম্মান স্বাভাবিক, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। অনেক স্থলে কবির জীবদ্দশায় সম্মানলাভ ঘটে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালে অনেক কবি জীবিতকালেই বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। নরওয়ে দেশের বিখ্যাত কবি ইবসেন যখন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করেন, তখন তাঁহার স্বদেশবাসীরা ত তাঁহাকে অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াইছিল; অধিকন্ত পৃথিবীর নানা দেশ হইতে তাঁহার নিকট উপহার এবং সাদর অভিনন্দন প্রেরিত



জীবনস্মৃতি।

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানিনা। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা-কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয় কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এই রূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুইয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দুইটি ঠিক এক নহে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে আমাদের অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্র-শালায় [illegible] হইবে তাহা কে বলিতে পারে।

হইয়াছিল।* 'মাছিমারা কেরানী'কে সকলে উপহাসই করিয়া থাকেন; সুতরাং আশা করি অন্ধ অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া নরওয়ের উদাহরণ হইতে কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন না, যে সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইলে কোন কবিকে তাঁহার জীবিতকালে সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে।"

এখন আর এরূপ কথা বলিবারও দরকার নাই। আমাদের সকলের সৌভাগ্য-ক্রমে বঙ্গের কবির সত্তর বৎসর বয়সও পূর্ণ হইয়াছে।

১৩১৮ সালে ১৪ই মাঘ কলিকাতার টাউন হলে কবির যে সম্বর্দ্ধনা হয় তাহার সম্বন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম:

"টাউনহলে এই উপলক্ষে এরূপ জনতা হইয়াছিল, যে, যাঁহারা অল্প মাত্র বিলম্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিম্বা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সভাস্থলে আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের জন্য যাঁহারা সুপরিচিত, যাঁহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী, যাঁহারা চিত্রে সঙ্গীতে বাণীর বর লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও জ্ঞানানুশীলনে নিরত, যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার প্রদীপ এখনও নিবিতে দেন নাই, যাঁহারা ব্যবহারাজীবের কাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা রাজনীতিকুশল, যাঁহারা বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যাঁহারা শিল্প বাণিজ্যে বঙ্গে নবযুগের প্রবর্ত্তক, যাঁহারা আভিজাত্যে ও ঐশ্বর্য্যে বঙ্গে অগ্রণী, তাঁহাদের স্বস্বশ্রেণীর প্রতিনিধিকল্প বহু কৃতী পুরুষ ও মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গমাতার কন্যাগণও কবিকে প্রীতিভক্তিকৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন নাই। গৃহকর্ম্মে নারীর সহকারিতা ব্যতিরেকে আর্য্যের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয় না। সমাজধর্ম্মেও এই নিয়ম অনুসৃত হইতেছে, ইহা অতি সুলক্ষণ। জাতীয় কবির সম্বর্দ্ধনা ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই মত পবিত্র। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়াছিল বঙ্গের যুবকগণ। তাঁহাদের উৎসাহদীপ্ত মুখশ্রী হলের সর্ব্বত্রই

* "On the occasion of his seventieth birthday (1898) Ibsen was the recipient of the highest honours from his own country and of congratulations and gifts from all parts of the world. A colossal bronze statue of him was erected outside the new National Theatre, Christiania, in September, 1899." *The Encyclopædia Britannica*, 11th edition.

হইতেছিল। শ্রেষ্ঠ কবিরা আমাদিগকে আশার বাণী শুনান, সেই স্বপ্নলোকের কথা বলেন যাহা ক্রমাগত মানুষের অন্তরে ও বাহিরে বাস্তবে পরিণত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে বাস্তব হইয়া যাইতেছে না। সুতরাং আশা ও উৎসাহ যাঁহাদের প্রাণ, স্বপ্নলোকে বিচরণ যাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ, সেই তরুণবয়স্কেরা যে হাজারে হাজারে বঙ্গের কবি শিরোমণির সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

কুড়ি বৎসর আগেকার কবিসম্বর্দ্ধনার আমাদের বর্ণনার এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছিলাম, "তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্ম বাঙ্গালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত না।" কুড়ি বৎসরে কবি আরও কীর্ত্তিমান্ এবং যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর বিকাশ হইয়াছে। এখন তাঁহার যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান পৌষ মাসের ৯ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত তাঁহার যে সম্বর্দ্ধনা হইবে, তাহাতে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা কি করিতে পারিবেন জানি না। প্রাকৃতিক শক্তি ও রাজশক্তির প্রভাবে দেশের দুরবস্থা হইয়াছে। সহস্রাধিক যুবক বন্দী দশায় কষ্টে দিনযাপন করিতেছেন। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদের মন দুঃখভারাক্রান্ত। অপর দিকে, বিশ বৎসর আগেকার চেয়ে নারীসমাজে অধিকতর জাগৃতি দেখা দিয়াছে। এবং যুবকগণও কবির সম্বর্দ্ধনায় উদ্যোগী হইয়াছেন। বাহিরের আয়োজনের ত্রুটি যাহাই থাকুক, আমরা আবালবৃদ্ধবনিতা কবিকে অন্তরের অর্ঘ্য উপহার দিতে সমর্থ হইব আশা করিতেছি।

—

কবির প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী রচনা

বাল্যকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখাপড়া শিখিতেছিলেন, তখন প্রথমে বাংলা এবং পরে ইংরেজী রচনার অভ্যাসও অবশ্য করিয়াছিলেন। এ লেখাগুলি গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে। তাঁহার কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের অনেক বাংলা রচনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন কোনটির পুনর্মুদ্রণ ও স্থায়িত্ব তিনি চান না। তাঁহার ইংরেজী যে-সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তই প্রৌঢ় বয়সের। সেগুলির মধ্যে তিনি কোন্ কোন্‌টি সর্ব্বাগ্রে লিখিয়াছিলেন, কোন্‌গুলিই বা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, তাঁহার ইংরেজী গীতাঞ্জলি তাঁহার প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী রচনা নহে। আমরা যতদূর জানি, তাঁহার কবিতার স্বকৃত প্রথম ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম যেগুলি ছাপা হইয়াছিল, তৎসমুদয় কোন্ বৎসরের কোন্ মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপা হইয়াছিল, নীচে তাহার তালিকা দিতেছি।

The Far Off ("সুদূর")—February, 1912.
ইহার হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।
Sparks from the Anvil ("কণিকা" হইতে)—April, 1912.
হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।
The Infinite Love ("অনন্ত প্রেম")—September, 1912.
হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।
The Small—September, 1912.
হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।
Youth—September, 1912.
হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।
Inutile—November, 1912.
Poems ("কণিকা" হইতে)—November, 1913.
হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

এই শেষোক্ত কবিতাগুলি ১৯১২ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত ছোট কবিতাগুলির সহিত একই সময়ে অনুবাদিত এবং একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজেই লিখিত।

১৯১১ সালের শেষে কিংবা ১৯১২-র গোড়ায় আমি কবিকে তাঁহার বাংলা কবিতা অনুবাদ করিতে অনুরোধ করি। তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং ছাত্রাবস্থার পর হইতে যে ইংরেজী রচনার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে পরিহাসচ্ছলে তাহাই জানাইবার জন্য আমাকে লেখেন :—

"বিদায় দিয়েছি যারে নয়ন-জলে
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে ?"

কিন্তু তাঁহার প্রতিভার প্রেরণা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না। তিনি "কণিকা" হইতে কতকগুলি ছোট কবিতা অনুবাদ করিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক ভবনের দুতলার বৈঠকখানার একটি কামরায় আমাকে সেগুলি দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে এই মর্ম্মের কথা বলিলেন, "দেখুন তো মশায়, এগুলো চলে কি না—আপনি তো অনেকদিন ইস্কুলমাষ্টারী করেচেন !" এইরূপ পরিহাস উপভোগ আমার মত অন্য কোন কোন ইস্কুলমাষ্টারের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। এই অনুবাদগুলিই মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার আরও অনেক ইংরেজী কবিতা ও গদ্য রচনা মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে ছাপা হইয়াছে। সেগুলি ইংরেজী গীতাঞ্জলির পরের রচনা বলিয়া তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না।

—

বঙ্গে দমন-নীতির প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি

বাংলা দেশে অনেক দিন ধরিয়া গবর্ন্মেণ্ট যে নীতি অনুসারে কাজ করিতেছেন, তাহাকে প্রচলিত কথায় দমন-নীতিই বলিতেছি। কিন্তু উহা বাস্তবিক দমন-নীতি নহে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন—ইহাই

রাজধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে নীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, যাহার প্রচণ্ডতা সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং যাহার অনুসরণে নূতন অর্ডিন্যান্স ও নিয়মাবলী প্রণীত হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেবল দুষ্ট বলিয়া প্রমাণিত লোকেরই শাস্তি হইবে না; তার চেয়ে অনেক বেশী-সংখ্যক লোকের নিগ্রহ হইবে। বস্তুতঃ এই অর্ডিন্যান্স ও নিয়মাবলীর দরুণ যাহারা কষ্ট পাইবে—এমন কি মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে পারে, তাহারা যে বাস্তবিক দোষী তাহা বিশ্বাস করা চলিবে না। কারণ, সাধারণ আইন ও সাধারণ বিচারপ্রণালী তাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না।

সাধারণ আইন ও সাধারণ বিচারপ্রণালী অনুসারে অপরাধী বলিয়া নির্দ্ধারিত লোকের শাস্তি হইলে তাহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকে না। কিন্তু সেরূপ স্থলেও ইহা বলা আবশ্যক, যে, কেবল দণ্ডবিধান দ্বারাই রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক অপরাধের প্রাদুর্ভাব দূরীভূত হইতে পারে না। কোন দেশে যদি অল্প বা অধিক দিন ধরিয়া চুরি ডাকাইতি হইতে থাকে, তাহা হইলে চোর ডাকাত ধরিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিলেই কেবল তাহার দ্বারাই এই অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে না। দোষীদিগকে শাস্তি অবশ্য দিতে হইবে, কিন্তু অল্পকালস্থায়ী অন্নকষ্ট বা দীর্ঘকালব্যাপী দারিদ্র্যের জন্য এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে কি-না, তাহারও অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং অনুসন্ধান দ্বারা যে কারণ নির্ণীত হইবে, সেই কারণ যথাসাধ্য বিনষ্ট করিতে হইবে। সেইরূপ, বিপ্লবচেষ্টা বা অন্য রাজনৈতিক আইনভঙ্গ ঘটিলে, যাহারা আইন লঙ্ঘন করিতেছে, সাধারণ আইন অনুসারে তাহাদের বিচার অবশ্য করিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে কারণে মানুষ বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থাতে অসন্তুষ্ট তাহাও দূর করিতে হইবে। নতুবা সুফললাভের কোনই সম্ভাবনা নাই।

—

লোকমতের সরকারী কদর

বাংলা দেশে নূতন অর্ডিন্যান্স জারি হইবার আগে তাহার আগমনবার্ত্তা সম্বন্ধে গুজব রটিয়াছিল। বেসরকারী ইংরেজরা গবর্ন্মেণ্টকে যেরূপ পরামর্শ ও উত্তেজনা দিতেছিল, তাহাতে সেই গুজব সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। অর্ডিন্যান্স প্রকাশিত হইবার প্রাক্‌কালে স্কচজাতির রক্ষাগুরু সেণ্ট এণ্ড্রুজের ভোজে বঙ্গের লাট সাহেবের বক্তৃতায় অর্ডিন্যান্সের আবির্ভাবের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। এরূপ বক্তৃতায় রাজপুরুষেরা প্রচণ্ড তথাকথিত দমননীতির সপক্ষে যাহাই বলিয়া থাকুন, আমরা সে সম্বন্ধে কোন তর্ক করিব না। ইংরেজদের প্রভুত্ব ও আর্থিক স্বার্থের ব্যাঘাত যাহাতে ঘটিতে পারে, সেরূপ বিষয়ে তর্ক করা বৃথা। এসব বিষয়ে তাহারা কেবল একটি যুক্তি মানে। তাহাদিগকে যদি দেশের লোকদের এরূপ শক্তির প্রমাণ দিতে পারা যায়, যে, তাহারা এদেশের লোকমত দ্বারা চালিত না হইলে তাহাদের আর্থিক স্বার্থের আরও বেশী ব্যাঘাত ঘটিবে এবং প্রভুত্ব থাকিবেই না, তবে তাহারা সেই যুক্তি মানিতে পারে।

কিন্তু রাজপুরুষেরা যখন কোন বিষয়ে—যেমন দমননীতির প্রয়োগে—সাফল্যলাভের জন্য লোকমতের সাহায্য আবশ্যক বলেন, তখন আমাদের বক্তব্য বলা দরকার মনে করি। কারণ, লোকমত সেইসব লোকের মত যাহাদের মধ্যে আমরাও আছি।

রাজপুরুষেরা বাস্তবিক লোকমতের কদর করেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কদর করিলে তাঁহারা সেই মত অনুসারে চলিতেন। কিন্তু যেখানে তাঁহাদের নিজের মত ও লোকমতের পার্থক্য হইয়াছে, এরূপ কোন স্থলেই তাঁহারা লোকমত গ্রাহ্য করেন নাই। ইহার প্রমাণের জন্য দূর অতীত কালে যাইতে হইবে না। ঢাকায় ও চট্টগ্রামে যে অরাজকতার অভিযোগ লোকেরা করিল, গবন্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করিয়াছেন কি? হিজলীতে যে বিনা-বিচারে বন্দীদের উপর অত্যাচার হইল, যাহার প্রতিকার লোকমত চাহিতেছে, এবং সরকারী কমিটিও যাহাকে অত্যাচার বলিয়া মানিতে বাধ্য হইয়াছে, গবন্মেণ্ট সেস্থলেও হত ও আহত বন্দীদিগকেই দোষী স্থির করিয়াছেন। এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, লোকমতের উপর গবন্মেণ্টের কোন আস্থা নাই। গবন্মেণ্ট সেই তথাকথিত "লোকমত" চান, যাহা সর্ব্বদাই বলিবে, "হুজুরেরা যখন যাহা বলিবেন করিবেন, তাহাই ঠিক।" তাহার উপর ভারতবর্ষের সাধারণ ও অসাধারণ আইন এরূপ, যে,গবন্মেণ্টের অপ্রীতিকর কোন্ কথাটা বলা রাজদ্রোহ নহে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় প্রকাশিত লোকমত যে ক্ষমতাশালী রাজপুরুষদিগকে খুশী করিবার উপায়মাত্র নহে, তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে?

বঙ্গের গবর্ণর স্যার ষ্টানলী জ্যাকসনের সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজের বক্তৃতাতে অসঙ্গতিও লক্ষিত হয়। তিনি প্রথমে বলিতেছেন:

> But I feel strongly that the most effective and certain remedy against a moral, social and political evil like terrorism is the formation and open manifestation of a united public feeling against it It is the lack of such manifestation that forces

Government to take the only course open to them, consistent with their duty to their officers and the public, namely, to adopt and exercise such special powers as may from time to time be necessary.

একথা সত্য নহে, যে, টেরারিজম্ বা ভয়োৎপাদন-চেষ্টার বিরুদ্ধে লোকমত প্রকাশ পায় নাই। কোন ইংরেজ রাজপুরুষ রাজনৈতিক কারণে হত বা আহত হইয়াছে এই সংবাদ বাহির হইবামাত্র গত সিকি শতাব্দী ধরিয়া সংবাদপত্রসমূহে এবং প্রকাশ্য অনেক সভায় তাহা গর্হিত বলিয়া ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। সরকারী লোকেরা যদি বলেন, ইহা লোক-দেখান মত, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কোন্টা লোকদেখান ও কোন্টা প্রকৃত লোকমত, তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে?

বঙ্গের লাট প্রথমে যাহা বলিয়াছেন, উপরে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি—তাহাতে তিনি বলিয়াছেন টেরারিজমের বিরুদ্ধে সম্মিলিত লোকমনোভাব প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত হয় নাই বলিয়াই উহা দমিত হয় নাই। তাহার পর তিনি বলিতেছেন:

"As far as terrorism is concerned, I know that the vast bulk of the people of this province disapprove of and detest it."

"টেরারিজম্ সম্বন্ধে আমি জানি, এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক—প্রায় সমস্ত লোক—উহা দূষণীয় মনে করে এবং নিরতিশয় ঘৃণা করে।"

লাট সাহেবের অনেক বিদ্যা থাকিতে পারে, কিন্তু লোকের অব্যক্ত মনের কথা জানা নিশ্চয়ই তাহার অন্তর্গত নহে। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাই তিনি জানিতে পারেন। সুতরাং যদি বঙ্গের প্রায় সব লোক টেরারিজমকে ঘৃণা করে বলিয়া তিনি জানেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ ঘৃণা ব্যক্ত হওয়াতেই তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন। অতএব টেরারিজমের বিরুদ্ধে লোকমনোভাব ব্যক্ত হয় নাই, উহার "ওপন্ ম্যানিফেস্টেশুন্" হয় নাই, বলা কি প্রকারে সত্য হইতে পারে? অবশ্য তিনি বলিতে পারেন, যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা "ইউনাইটেড" অর্থাৎ একতাপন্ন লোকমনোভাব নহে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে কি, যেখানে কোন বিষয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকটি মানুষের প্রকাশিত বা গোপন মত সম্পূর্ণ এক?

আমরা বিশ্বাস করি, যে, গবন্মেণ্ট সত্য সত্যই লোকমত গ্রাহ্য করিলে টেরারিজম্ অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে লোকমত প্রধানতঃ দুটি জিনিষ চায়। বেসরকারী টেরারিজমের তিরোভাব এবং সরকারী অনেক লোকের গুণ্ডামির যুগপৎ তিরোভাব চায়, এবং তাহার উপায় স্বরূপ দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সকল ব্যাপারে দেশের লোকের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অবিলম্বে চায়। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা মনে মনে কি চান জানি না, কিন্তু তাঁহাদের আচরণ ও কার্য্যপ্রণালী হইতে অগত্যা এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, যে, তাঁহারা বেসরকারী টেরারিজমের তিরোভাব চান, সরকারী কতকগুলা লোকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গুণ্ডামি তাঁহারা যেন দেখিয়াও দেখেন না, এবং দেশের সব ব্যাপারে দেশের লোকদের কর্তৃত্বে তাঁহারা কোন্ ভবিষ্যৎ যুগে রাজী হইবেন, তাহা "দেবা ন জানন্তি কুতো মানবাঃ"। সত্য কথা যখন এই, তখন রাজপুরুষেরা লোকমতের সহযোগিতা চান যত কম বলেন ততই ভাল। তাঁহারা বাস্তবিক চান দেশের লোকদের দ্বারা তাঁহাদের নিজের মতের অন্ধ অনুবর্তন।

বঙ্গের লাট তাঁহার আলোচ্য বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, টেরারিজমের পুনরাবির্ভাবের হেতু কতকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ("various factors political and economic")। সেই কারণগুলি দূর করিবার কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। গবন্মেণ্ট কেবল দণ্ডবিধান দ্বারা কাজ হাসিল করিতে চান।

—

বিশ হাজার লাঠি সরবরাহের ফরমাইস

"বঙ্গবাণী"র নয়া দিল্লীর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, যে, সরকারী মাল সরবরাহ বিভাগ সম্প্রতি বিশ হাজার লাঠির ফরমাইস্ পাইয়াছে। এই লাঠিগুলি ঠেকা দিয়া গান্ধী-আরুইন চুক্তি খাড়া রাখা হইবে।

—

বঙ্গে অন্য নামে সামরিক আইন

বাংলা দেশে যে নূতন অর্ডিন্যান্স জারি হইয়াছে, তাহা নামে সামরিক আইন না হইলেও কাজে তাই। বার্নার্ড শ তাঁহার "জনবুলস্ আদার আইল্যাণ্ড" নাটকের ভূমিকায় বলিয়াছেন, যে, সামরিক আইন লিঞ্চ আইনেরই কেবল একটা পারিভাষিক নাম ("Martial law is only a technical name for Lynch law")। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে কখন কখন শ্বেত জনতা বিনা-বিচারে সাধারণতঃ কালা আদমীদেরই যে প্রাণদণ্ড দেয়, তাহাকে চলিত কথায় লিঞ্চ ল বলে।

অর্ডিন্যান্সটা দ্বারা যে স্পেশ্যাল আদালতসমূহকে যে-সব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং অন্য যে-সব নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। তাহা স্বাধীন সভ্য কোন কোন দেশের পক্ষে অসাধারণ হইলেও ভারতবর্ষের ও বঙ্গের পক্ষে অসাধারণ নহে।

বিনা ওয়ারাণ্টে গ্রেপ্তার ইত্যাদি ত হইয়াই থাকে, এখন না-হয় সেটা ছাপার অক্ষরে অর্ডিন্যান্স বা নিয়মাবলীর মধ্যে উঠিল। হত্যা করিবার চেষ্টার জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন নয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এরূপ আইন আছে এবং তাহার জোরে একজন মুসলমানের ফাঁসী কয়েক মাস পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। ইহা ঐ প্রদেশের বিশেষ আইন অনুসারে হইয়াছিল। কিন্তু সমুদয় ভারতবর্ষের জন্য অভিপ্রেত ইণ্ডিয়ান পীন্যাল কোড অনুসারেও, লাহোরে গবর্ণরকে হত্যা করিবার চেষ্টার অভিযোগে তিন জনের গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়, যথা—

(Associated Press of India.)

Lahore, Sept. 9.

Judgment was delivered unexpectedly this afternoon in the Punjab Governor shooting conspiracy case, in which three men, Durgadas, Ranbir Singh and Chamanlal, were charged with conspiracy and abetment of murder in connexion with the recent attempt upon the life of the Governor of the Punjab.

Mr. Gordon Walker passed orders, sentencing all of them to death and ordered that they should be supplied with copies of the judgment after five days.

কোন বেসরকারী ইংরেজকে বা কোন ইউরোপীয় বা দেশী সরকারী চাকরোকে কেহ মনে মনে খুন করিবার কল্পনা করিয়াছিল, এইরূপ অভিযোগেও ফাঁসী হইতে পারিবে—এই প্রকার অর্ডিন্যান্স জারি করিলে তবে তাহা ভারতবর্ষের পক্ষেও সম্ভবতঃ নূতন হইবে।

—

জজের চেয়ে পাহারাওয়ালার সাংঘাতিক ক্ষমতা বেশী

বিনা-বিচারে মানুষকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কয়েদ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা বঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিসের আগে হইতেই ছিল, এখন তাহা বাড়িয়াছে। সুতরাং বন্দীশালাও বাড়াইতে হইয়াছে। বহরমপুরের আগেকার পাগলাগারদ এখন বিশেষ জেলে পরিণত হইয়াছে। সেখানে বিনা-বিচারে বন্দীকৃত লোকদিগকে রাখা হইবে। তাহাদের সম্বন্ধে যে-সব নিয়ম করা হইয়াছে, ঐরূপ নিয়ম আগে হইতে বক্সা দুর্গে আটক ঐরূপ কয়েদীদের জন্য আগে হইতেই আছে। বহরমপুরের বিশেষ জেলের কয়েকটি নিয়মের বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

বহরমপুর বন্দীনিবাসে আবদ্ধ কোন রাজবন্দী বা রাজবন্দীগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে হইবে :

(১) কোন রাজবন্দী পলায়নপর হইলে কিংবা পলায়নের চেষ্ট করিলে যে-কোন পুলিস অফিসার কিংবা কনষ্টেবল তলোয়ার, সঙ্গীন আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা অন্য যে-কোন অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্ত উহার সর্ত্ত এই থাকিবে, যে, উক্ত অফিসার কিংবা কনষ্টেবলের এরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা চাই, যে, সে অন্য কো প্রকারেই বন্দীর পলায়নে বাধা দিতে সমর্থ ছিল না।

(২) যদি কোন রাজবন্দী দলবদ্ধভাবে কোন হাঙ্গামা বাধাইবা সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, কিংবা বন্দীনিবাসের কোন ফটক, দ্বার বা দেওয়া জোর করিয়া ভাঙিবার বা খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তবে যে-কো পুলিস অফিসার বা কনষ্টেবল তলোয়ার, সঙ্গীন, আগ্নেয়াস্ত্র বা অ যে-কোন অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে, এবং যতক্ষণ এই হাঙ্গাম ও চেষ্টা চলিতে থাকিবে, ততক্ষণ উক্ত অস্ত্রগুলি ব্যবহার করা চলিবে।

(৩) বন্দীনিবাসের কোন অফিসার বা লোকের বিরুদ্ধে যদি কো রাজবন্দী হিংসাত্মক বলপ্রয়োগ করে, তবে যে-কোন পুলিস অফিসা কিংবা কনষ্টেবল তাহার বিরুদ্ধে তলোয়ার, সঙ্গীন, আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা অ যে-কোন অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু উহার সর্ত্ত এই, যে, ঐ অফিসারের এরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা চাই যে বন্দীনিবাসের অফিসার কিংবা অন্য কোন লোকের জীবন বা শরীরে কোন অঙ্গ গুরুতররূপে বিপন্ন হইবার কিংবা তাহার নিজের সাংঘাতিক আঘাত পাইবার সম্ভাবনা ছিল।

(৪) কোন রাজবন্দীর বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে পুলিস অফিসার বা কনষ্টেবল এরূপ সতর্ক করিয়া দিবে, যে, সে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছে।

(৫) যখন কোন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিবেন এবং তাঁহা সহিত পরামর্শ করা সম্ভব হইবে, তখন কোন পুলিস অফিসার কিংব কনষ্টেবল কোন রাজবন্দীর বিরুদ্ধে হাঙ্গামা কিংবা পলায়নের চেষ্টা সময় কোন প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না, যদি সে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদেশ না পায়।

যাহাদিগকে বিনা-বিচারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে বা হইবে, তাহারা যে কোন দোষ করিয়াছে, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। বঙ্গের লাট সেণ্ট এণ্ড্রুজের ভোজে সেদিন ত বলিয়াছেন, they are under "preventive detention", "তাহারা পাছে কোন অপরাধ করে তাহা নিবারণের জন্যই তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে"। কিন্তু তাহারা যে অপরাধ করিতে উদ্যত ছিল বা অভিপ্রায় করিয়াছিল, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? সরকার পক্ষ হইতে বার-বার বলা হইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীদের হত্যা যাহাতে না হয়, সেই জন্য তাহাদের প্রকাশ্য বিচার করা হয় না, নতুবা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ যথেষ্ট আছে। এটা নিতান্ত মিথ্যা কথা। রাজনৈতিক হত্যা ডাকাতি প্রভৃতির জন্য ত অন্য অনেক লোকের বিচার এবং তাহার পর ফাঁসী বা অন্য শাস্তি হইয়াছে, এখনও অনেকের বিচার চলিতেছে। তাহাদিগকে ত বিনা-বিচারে বন্দী রাখা হয়

নাই। যাহারা বিনা-বিচারে কয়েদ আছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই বলিয়াই তাহাদিগকে আদালতের সমক্ষে আনা হয় নাই; প্রমাণ থাকিলে আনা হইত।

এই যে নির্দ্দোষ লোকগুলি, একজন পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাণবধ পর্য্যন্তও করিতে পারিবে, যদি তাহার এরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, যে, তাহারা পলাইবার চেষ্টা ইত্যাদি করিতেছিল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র না চালাইলে সে চেষ্টা নিবারিত হইত না। যে অন্যের প্রাণ লইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, আইনে তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। কিন্তু দোষী বলিয়া অপ্রমাণিত বা নির্দ্দিষ্ট কোন দোষের জন্য অনভিযুক্ত সুতরাং নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য কোন লোক কোন মানুষের প্রতি বলপ্রয়োগ না করিয়াও স্বাধীনতা লাভের জন্য পলাইবার চেষ্টা করিলে তাহার প্রাণবধ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে, ইহা বড় উৎকট নিয়ম। সে যে পলাইবার ইত্যাদি চেষ্টা করিতেছিল, তাহার কোন প্রমাণ চাই না, পাহারাওয়ালার বিশ্বাসই প্রমাণ! তাহার উপর অস্ত্র না চালাইলে তাহাকে নিরস্ত করা যাইত না, তাহারও কোন প্রমাণ চাই না; পাহারাওয়ালার "যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস"ই তাহার প্রমাণ! পাহারাওয়ালাদের মতিগতি বুদ্ধি ও যুক্তিপরায়ণতা যে কিরূপ, হিজলীর কাণ্ডে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কিংবা বড়লাটও বিনা-প্রমাণে, কেবল নিজের বিশ্বাসবশে, কাহারও প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত শাস্তি দিতে পারেন না; কিন্তু বিনা-বিচারে বন্দীদের জেলের পাহারাওয়ালারা তাহা পারিবে। নিয়মে এ কথা কোথাও লেখা নাই, যে, অন্ততঃ পলায়নচেষ্টা স্থলে অস্ত্রপ্রয়োগ শরীরের পায়ের দিকে করিতে হইবে, প্রাণবধের জন্য নহে। এরূপ লেখা থাকিলে নিয়ম-রচয়িতাদের ন্যায়বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যাইত।

—

চট্টগ্রামে সৈনিক ও পুলিস সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ

চট্টগ্রাম শহর ও জেলার উপর নূতন অর্ডিন্যান্স প্রথম প্রয়োগ করিয়া যে-সব নিয়ম জারি করা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি এই, "কোন সংবাদপত্র কোন সৈন্যদল বা পুলিসবাহিনীর সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিবে না। কোন সংবাদপত্র তাহা করিলে উহার মালিক, সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর সকলেই দণ্ডার্হ বিবেচিত হইবে।"

বিদ্রোহের সময় বা অন্য রকম যুদ্ধের সময় সেনাদলের গতিবিধির সংবাদ প্রকাশ করিলে বিদ্রোহী বা অন্য শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবার পক্ষে বাধা জন্মে। সেই জন্য তখন ঐরূপ সংবাদ প্রকাশ বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়া সঙ্গত, অন্য সময়ে নহে। কিন্তু, সরকার পক্ষ যাহাই বলুন, চট্টগ্রামে বিদ্রোহ হয় নাই, যুদ্ধও চলিতেছে না। সুতরাং সেনাদলের বা পুলিসবাহিনীর গতিবিধির সংবাদ প্রকাশিত হইলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি স্বীকার করা যায়, যে, চট্টগ্রামে বিদ্রোহ বা বিদ্রোহের আয়োজন চলিতেছে, তাহা হইলেও কেবল ফৌজ ও পুলিসের গতিবিধির কুচকাওয়াজের খবর প্রকাশই নিষেধ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া ব্যাপকভাবে বলা হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে যে-কোন রকম সংবাদ প্রকাশই দণ্ডার্হ হইবে। ইহার ফল এই হইবে, যে, তাহাদের দ্বারা যদি কোথাও লোকদের বিশেষ অসুবিধা সংঘটিত হয় বা কাহারও উপর অত্যাচার হয়, তাহাও প্রকাশিত হইবে না। এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইলেই যে প্রতিকার বা অন্ততঃ অনুসন্ধান হইয়া থাকে, তাহা নহে। কিন্তু প্রকাশ দ্বারা মানুষের মনের কষ্ট অল্পপরিমাণেও কমে, এবং সরকার পক্ষের ইচ্ছা থাকিলে প্রতিকারচেষ্টা হইতে পারে।

নিয়মটা নানা কারণে করা হইয়া থাকিতে পারে। সরকার পক্ষ মনে করিয়া থাকিবেন, সিপাহী ও পুলিসের লোকেরা এমন সাধু, সবজান্তা, বিবেচক ও দরদী, যে, তাহাদের দ্বারা কাহারও কোন অসুবিধা বা কাহারও উপর অত্যাচার হওয়া অসম্ভব। অন্য একটা কারণও অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না থাকায় তাহার উল্লেখ করা উচিত মনে করি না।

বোধ হয় সরকার পক্ষের মনে কোন রকম একটু দ্বিধা হইয়াছে। তাই এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে এই মর্ম্মের খবর দেওয়া হইতেছে, যে, চট্টগ্রামের লোকেরা অসুবিধা বোধ করিতেছে না।

—

অর্ডিন্যান্স অপ্রযুক্ত রাখা বা কিঞ্চিৎ মৃদু করা

গুজব উঠিয়াছে, বিলাতী কর্ত্তারা নূতন অর্ডিন্যান্সটা কিছু নরম করিয়া দিতে চান। কোন কোন বিখ্যাত ভারতীয় নেতার মতে উহা অপ্রযুক্ত রাখিলেই চলিবে।

বাঙালীরা উহার সম্পূর্ণ রদ চায়, তাহার কমে সন্তুষ্ট হইবে না।

—

বাঁকুড়ায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ

বাঁকুড়া শহরে বৈদ্যুতিক আলোক, পাখা, এবং কলের মোটরের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার জন্য গবন্মেণ্ট উপযুক্ত ব্যক্তি বা কোম্পানীকে অনুমতি দিবেন। যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিঙের অধ্যাপক ডক্টর জে এন বসু ১৯৩০ সালের নবেম্বর মাসে এই অনুমতির জন্য দরখাস্ত করেন। তিনি বার্লিন-শার্লোটেনবুর্গে শিক্ষালাভ করিয়া এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় ডক্টর উপাধি প্রাপ্ত হন। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ বিষয়ে তিনি জ্ঞানবান্। তিনি বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী এবং স্থানীয় অভিজ্ঞতা তাঁহার আছে। আর্থিক ব্যবস্থাও তিনি করিতে পারিবেন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটী এবং ভদ্র ও প্রভাবশালী লোকদের সহযোগিতা তিনি পাইবেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে অনুসন্ধানের পর তাঁহার অনুকূলে রিপোর্টও পেশ হইয়াছে। অতএব এখন বাংলা গবন্মেণ্টের বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ সত্বর তাঁহাকে অনুমতি দিলে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইবে। স্থানীয় যোগ্য লোক থাকিতে অন্য জায়গার কাহাকেও কাজের সুবিধা দিয়া ফেলা উচিত নয়। বিদেশী বিজাতীয় কোন কোম্পানীকে দেওয়া ত সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়।

—

হিজলীর ব্যাপারের সরকারী সাফাই

হিজলীতে অনেক বিনা বিচারে বন্দীর উপর বন্দুক, সঙ্গীন প্রভৃতি প্রয়োগের ফলে দুজনের মৃত্যু হয় এবং অন্য কয়েক জন গুরুতর আঘাত পায়। এবিষয়ে প্রকাশ্য সভায় লোকমত ব্যক্ত হওয়ার পর সরকারী অনুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটির রিপোর্ট সম্পূর্ণরূপে লোকমতের অনুযায়ী না হইলেও সিপাহীদের বন্দুক ও সঙ্গীন ব্যবহারের অনৌচিত্য সম্বন্ধে তাহাতে পরিষ্কার তীব্র মন্তব্য ছিল। রিপোর্টের উপর বাংলা গবন্মেণ্টের মন্তব্যে এটুকুও উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুজন বন্দীর প্রাণনাশ ও অন্য অনেকের গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তির জন্য বন্দীদের দুর্ব্যবহারকেই দায়ী করা হইয়াছে—যদিও অনুসন্ধান-কমিটির সমক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্যে কোন দুর্ব্যবহারের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহারা গুলি করিয়াছিল, সঙ্গীন ব্যবহার করিয়াছিল, গবন্মেণ্টের মতে তাহাদের কেবল নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব হইয়াছিল এবং তাহার জন্য তাহাদিগের বিভাগীয় শাস্তির—বোধ হয় মৃদু তিরস্কার বাক্য এবং পদোন্নতির—ব্যবস্থা করা হইবে।

গবন্মেণ্টের মন্তব্যটা এমন অসার ও ভিত্তিহীন, যে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা অনাবশ্যক। হিজলীতে বিনা-বিচারে বন্দীদের উপর তাৎকালিক নিয়ম অনুসারে যে যে কারণে পাহারাওয়ালারা অস্ত্র চালাইতে পারিত, গবন্মেণ্ট দেখাইতে পারেন নাই, যে, সেরূপ কোন কারণ ঘটিয়াছিল। ঐ নিয়মগুলা কোন সভ্য দেশের আইন অনুযায়ী নহে; তথাপি বন্দীরা সেরূপ নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে প্রমাণ করিতে পারিলে, মানিতাম, যে, তাহারা গুলি ও সঙ্গীনের খোঁচা খাইবার উপযুক্ত কিছু করিয়াছে। বন্দীরা সেরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করে নাই বলিয়াই সম্ভবতঃ পাহারাওয়ালারা, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এইরূপ যুক্তি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাহাদের মিথ্যাবাদিতা সরকারী অনুসন্ধান-কমিটির সভ্য দুজন (দুজনই সিভিল সার্ভিসের লোক) ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বাংলা দেশের লোকমত এই, যে, বেসরকারী হত্যাকারীদের ও আঘাতকারীদের যেমন বিচার হইয়া থাকে, হিজলীর বন্দীশালার সরকারী হত্যাকারীদের ও আঘাতকারীদেরও সেইরূপ বিচার হওয়া উচিত ছিল। অনুসন্ধান-কমিটির দুজন সভ্যের মধ্যে একজন অভিজ্ঞ হাইকোর্টের জজ এবং অন্য ব্যক্তিও অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান। তাঁহারা সাক্ষ্য লইয়া, সাক্ষীদের সত্যবাদিতা বা মিথ্যাবাদিতা ও আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া রিপোর্টে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্যতার সহিত লাট সাহেবের সেক্রেটারিয়েট দপ্তরখানায় আসীন কোন ইংরেজ মুন্‌শীর মুসাবিদা করা রেজলিউশ্যনের বিশ্বাস-যোগ্যতার তুলনা হইতে পারে না। আর একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। হিজলীর ব্যাপার সম্বন্ধে উক্ত দপ্তরখানা হইতে যে একাধিক সরকারী কম্যুনিকে বা জ্ঞাপনী বাহির হইয়াছিল, তাহার অসত্যতা অনুসন্ধান-কমিটির রিপোর্টে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। অতএব, মানবচরিত্রজ্ঞ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আশা করিতে পারেন না, যে, যে-দপ্তর খানার সত্যানুসরণের অক্ষমতা অনুসন্ধান-কমিটির রিপোর্টে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সেই দপ্তরখানা হইতে নিঃসৃত সরকারী মন্তব্য উক্ত রিপোর্টের সমর্থন ও গুণগান করিবে। উক্ত মন্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া আমরা কমিটির এই মতই সমর্থন করিতেছি, যে,

> There was, in our opinion, no justification whatever for the indiscriminate firing (some 29 rounds were found to have been fired) of the sepoys upon the building itself, resulting in the death of two of the detenus and the infliction of injuries on several others. There was no justification either for some of the sepoys going into

the building itself and causing casualties of various kinds to some others of the detenus.

এবং সেইজন্য বলিতেছি, নরহত্যার অভিযোগে ফৌজদারী আদালতে সিপাহীদের বিচার হওয়া উচিত ছিল।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী

খবরের কাগজে দেখিলাম, বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশনে অনেক প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাটনার বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ, আকোলার শ্রীযুক্ত মাধবরাও শ্রীহরি আনে এবং বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত নরিমান আসিয়াছিলেন। অনেক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। মহিলাকর্ম্মীরা উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর সমুদয় কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সংবাদপত্রে যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে সভাপতি শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয়ের বক্তৃতা তাঁহার অভিজ্ঞতা ও খ্যাতির উপযুক্ত হইয়াছিল। তিনি বক্তৃতা ইংরেজী না বাংলায় করিয়াছিলেন, জানি না। বাংলা কাগজে দেখিলাম, তিনি এই তথ্যের ঘোষণা করেন, যে,

"যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এক শ্রেণীর নূতন মানুষ জন্মিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঐ শ্রেণীর মানুষ জন্মিতেছে। তাহারা হিন্দু নহে, মুসলমান নহে, শিখ নহে, খৃষ্টান নহে, তাহারা সর্ব্বাগ্রে মানুষ বলিয়া আত্মপ্রকাশ ও আত্মাভিমান করিতেছে। মানবধর্ম্ম তাহাদের ধর্ম্ম। তাহাদের মরণের ভয় একেবারে নাই, তাহাদিগকে মৃত্যুঞ্জয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহারা মৃত্যুকে ভ্রূক্ষেপ করে না, জগতের কোন পশুশক্তিই তাহাদের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারে না। প্রহ্লাদ যতই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইতেছিল, মৃত্যু ততই পিছনের দিকে হটিতেছিল। প্রহ্লাদের মনে মৃত্যুভয় ছিল না বলিয়াই মৃত্যু প্রহ্লাদকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। নবপর্য্যায়ের মানুষেরাও সত্য উদ্ধার, সত্যরক্ষা, সত্যপালন জন্য সর্ব্বদা, কাহাকেও বধ না করিয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। তাহাদের নিকট মানুষের মনুষ্যত্বই একান্ত সত্য। মনুষ্যত্বহীন মানুষকে তাহারা মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহে। পরাধীন ভারতে নবপর্য্যায়ের মানুষ মরুভূমিতে শ্যামল ভূমিখণ্ডের ন্যায় অতীব বিরল; কিন্তু কালস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহারা ভারতের এই স্বাধীনতা সমরে নিজকে বিলাইয়া দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। নবপর্য্যায়ের মানুষেরাই প্রকৃতপ্রস্তাবে পৃথিবীর ভাবী উত্তরাধিকারী।

তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

দানে কখনও স্বাধীনতার আদানপ্রদান হয় না। বিশেষতঃ লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকের ন্যায় বৈঠকে স্বাধীনতা আদান-প্রদানের প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক। গোলটেবিল বৈঠকের অর্থই সমানশক্তিসম্পন্ন স্বাধীন সমকক্ষ প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য সম্মিলন। মনোনীত অধীন ব্যক্তিগণ ও প্রভুজাতির প্রতিনিধিগণের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক হয় না। লণ্ডন গোলটেবিল বৈঠকে তাহাই বা কোথায়? ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভাই তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ভারতের নিমন্ত্রিত তথাকথিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা বিরোধী লোকও আছেন। কেহ কেহ রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য ভারতবাসীদিগকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিতেও ছাড়িতেছেন না। সাম্প্রদায়িকতার বেদীতে মানবের অমূল্য ধন স্বাধীনতা বলি দেওয়া হইতেছে। বিদেশী শাসকেরা যে শাসন-মিষ্টান্ন ভোগ করিতেছেন, তৎসমস্ত যদি বজায় থাকে, তবে সেই মিষ্টান্নের অধিকাংশ ভোগের জন্য ভারতবর্ষের কোন শ্রেণীবিশেষের অদৃষ্টেও যদি ঘটে, তাহা হইলেও ৩৫ কোটি ভারতবাসীর দাসত্বের অবসান হইবে না। রাজসেবায় মধু মিষ্টান্ন থাকিলেও রাজসেবায় স্বাধীনতা নাই। দাসত্বেও মধু মিষ্টান্ন আছে। তাই বলিয়া স্বাধীনতার সহিত দাসত্বের তুলনা হয় না। স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার, এই কথা বলিলেই স্বাধীনতা সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয় না। স্বাধীনতাই মানবের ধর্ম্ম—"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—কে বাঁচিতে চায়।"

স্বাধীনতা আমাদের অর্জ্জন করিতে হইবে, তজ্জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যা নানা অবস্থার ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে, যে, আমাদের বাঁচিতে হইলে জয়লাভ করিতেই হইবে নতুবা মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে। শ্রীভগবান গীতোপদেশে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

অর্ডিন্যান্স ও বিনাবিচারে আটক করিবার কুনীতিকে নাগ মহাশয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক বিপুল বিঘ্ন মনে করেন। তাঁহার মতে,

মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাকামী যুবক অধৈর্য্য হইয়া দ্রুত কার্য্যসিদ্ধির ভ্রান্তধারণায় হিংসা-নীতিকে আশ্রয় করিয়াছে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির এই বিপথগামিতাকে উপেক্ষা করিবার শক্তি কংগ্রেসের ছিল এবং আছে; কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অনাচারের সুযোগ গ্রহণ করিয়া, বিপ্লব দমনের ছলনায় প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকেই প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিতেছেন। কংগ্রেসের বহু খ্যাতনামা কর্ম্মী আজ বিনা বিচারে বন্দী। দেশ জানে, আমরাও জানি, তাঁহাদের অপরাধ—তাঁহারা স্বাধীনতাকামী,—তাঁহারা স্বদেশপ্রেমিক; কিন্তু গুপ্তচর সংগৃহীত গুপ্ত বিবরণ প্রকাশ না করিয়া গবর্ণমেণ্ট বলেন—প্রমাণ আছে। সে প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করা হয় না কেন? উত্তরে বলা হয়, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাহারা প্রমাণ দিবে, তাহাদের জীবন বিপন্ন হইবে। ইহা যে কত মিথ্যা, তাহা বহুতর রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মামলায় প্রকাশ্য আদালতের বিচারেই প্রমাণ হইয়াছে। রাজসাক্ষী কোথাও তো বিপন্ন হইতেছে না। মোট কথা, দমন-নীতিকে নিছক বিভীষিকা সৃষ্টির অস্ত্ররূপে পরিচালন করিতে হইলে প্রকাশ্য আদালতে সাধারণ বিচারপদ্ধতি দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। রাজবন্দীগণের মধ্যে অনেকে আমার পরিচিত, কেহ কেহ আমার সংকর্ম্মীও ছিলেন। তাঁহারা একেবারে নিরপরাধ বলিয়াই বিশ্বাস করি; কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? নব নব অর্ডিন্যান্সের ক্ষুধা চরিতার্থ করিবার জন্য কারাযন্ত্রণা তাঁহাদের ভোগ করিতেই হইবে। বিনা পাপে বহুজনের এই নির্ম্মম নির্যাতন, কোন দেশই প্রসন্নতার সহিত সহ্য করিতে পারে না।

তিনি আরও কয়েকটি বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করেন।

খবরের কাগজে তাঁহার বক্তৃতা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সমুদয় বাংলাভাষাভাষী লোকদের বাসস্থানগুলি সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি এবং তাহার দ্বারা বেকার সমস্যার কতকটা সমাধান, নারীহরণ প্রভৃতি যে-সকল বিষয় আজকাল বাঙালীর আলোচনার বিষয়, তৎসমুদয়ের উল্লেখ তিনি করেন নাই বোধ হইতেছে। সকল বিষয়েই কিছু বলিতে হইবে, এমন নয়। কিন্তু এই সকল বিষয়ে তাঁহার মত জানিতে হয়ত অনেকের কৌতূহল ছিল।

—

মৌলবী আবদুস সমদের বক্তৃতা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বহরমপুরে বিশেষ অধিবেশনে মৌলবী আবদুস সমদ সাহেব অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় প্রধানতঃ গান্ধী-আরউইন সন্ধি ও গোলটেবিল বৈঠক, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, সরকারের ভেদনীতি এবং মিশ্র বনাম পৃথক্ নির্ব্বাচন, এই বিষয়গুলি যোগ্যতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু আমরা স্থানাভাবে কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিব।

গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

আজ প্রথমেই মনে পড়ে গান্ধী-আরউইন সন্ধির কথা। সরকারের সহিত কংগ্রেসের পূর্ণ এক বৎসর যে যুদ্ধ চলিয়াছিল তাহার শেষের দিকে সরকার বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অর্ডিন্যান্স ও নিষ্পেষণ দ্বারা চিরকাল কোন দেশ শাসন করা চলে না। সরকার ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসই দেশের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান,—কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে দেশে চিরকালই অশান্তি থাকিয়া যাইবে। তাই রাজ-প্রতিনিধি লর্ড আরউইন দেশ-প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধীর সহিত কয়েকদিনব্যাপী আলোচনার পর এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করিলেন। উহার ধারাগুলি আপনারা অবগত আছেন। ইহাও আপনারা জানেন যে, মহাত্মা গান্ধী সত্যপরায়ণ মহাপ্রাণ ব্যক্তি। সন্ধির মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়, তজ্জন্য তিনি দেশবাসীকে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতাবৎ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সন্ধির কোন সর্ত্ত লঙ্ঘিত হয় নাই। কিন্তু সরকার ঐ সন্ধিপালনে যে শৈথিল্য ও উদাসীনতা দেখাইয়াছেন তাহাতে সরকারের আন্তরিকতার উপর দেশবাসীর আস্থা একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। ঐ সন্ধিপত্র বিদ্যমান অবস্থাতেই বিনা-বিচারে বন্দীর দল বাড়িয়া চলিল, চট্টগ্রাম ও হিজলীর দুর্ঘটনা ঘটিল, এবং একের পর একটি অর্ডিন্যান্স জারি দ্বারা সরকারের দমন-নীতি প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। ইহা অপেক্ষা প্রকাশ্য সন্ধিপত্রের অমর্য্যাদা আর কি হইতে পারে? নিজেদের মনে প্রভুত্বের ভাব পূর্ণমাত্রায় রাখিয়া সরকার দেশবাসীর নিকট বিবেকহীন বশ্যতা চাহেন, কিন্তু দেশবাসী তাহা দিতে পারে না। সরকারের হৃদয় পরিবর্ত্তন না হইলে দেশবাসীর হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আশা করা ভুল। গবর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতির প্রতিক্রিয়ায় যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দ্বারাই উহার ব্যর্থতা প্রমাণিত হইতেছে। কংগ্রেস অহিংস-নীতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, এবং দেশবাসীর মধ্যে ইহার মহিমা প্রচারের জন্য কংগ্রেস আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সরকারের ধর্ষণ-নীতি এরূপ প্রচণ্ডভাবে চলিয়াছে যে, কংগ্রেসের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন কোন যুবকের মন হইতে আমরা এখনও হিংসামূলক চিন্তা সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে পারিতেছি না। ইহার জন্য দায়ী কে? কংগ্রেস-সেবক আমরা—একবাক্যে বিপথগামী অসহিষ্ণু যুবকদের নিন্দাবাদ করিতেছি। কিন্তু তাহার জন্য আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না, সরকারের পরামর্শ-দাতাগণ তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বাংলার যুবক আর কিছু না হইলেও বুদ্ধিমান্। তাহাদের জানা উচিত যে, কয়েকটি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে হত্যা করিলে বা হত্যার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিলে দেশোদ্ধার হইবে না, বরং তাহা ভারতের স্বরাজ অর্জ্জনের পথে নিয়ত বাধা প্রদান করিতে থাকিবে। কিন্তু সরকারেরও জানা কর্ত্তব্য যে, উৎপীড়ন, নিষ্পেষণ ও রুদ্রনীতি হিংসামূলক বিপ্লব আন্দোলন দমনের জন্য প্রকৃষ্ট উপায় কখনও হইতে পারে না। উহা রোগের আসল নিদান নহে—লক্ষণ মাত্র। উহার জন্য দরকার সরকারের হৃদয় পরিবর্ত্তন ও দেশবাসীর রাজনৈতিক দাবি পূর্ণ করিয়া স্বরাজের ভিত্তি সংস্থাপন করা। নচেৎ বে-পরোয়াভাবে অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া ও অনবরত ধরপাকড় দ্বারা নিরীহ ও অহিংস দেশবাসীর হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। সেদিন আর নাই।

গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে তাঁহার মত এই :—

মহাত্মা গান্ধী বিলাতে গিয়া ব্রিটিশ সরকারকে স্পষ্টই বলিয়াছেন :—আমাদের নিজেদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, আমরা তাহা মীমাংসা করিয়া লইব, কিন্তু সরকার সাম্প্রদায়িক বিরোধের অছিলায় মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। সরকার বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি উৎকট সাম্প্রদায়িক নেতাকে তথায় প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা সমগ্র ব্যাপারকে এমনি অসরল ও চক্রান্তময় করিয়া তুলিলেন যে, তাহাতে নিরপেক্ষ অ-ভারতীয়ের এই মনে হইবে যে, যে-ভারতবাসীরা নিজেদেরই ঘরওয়া বিবাদ মিটাইতে পারে না, তাহারা স্বরাজ লাভ করিবে কি করিয়া? সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিগণ বিলাতে গিয়া গোলটেবিল বৈঠকে যে খেলা খেলিলেন তাহাতে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আপন আপন সমাজের নাম দিয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থকে স্বাধীনতার ঊর্দ্ধে স্থান দিয়া দেশের স্বার্থকে টেমস্ নদীর অগাধ জলে ডুবাইয়া দিলেন। যদি তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের দাবি পেশ করিতেন, তাহা হইলে গোলটেবিলের শেষকাল কখনই এরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করিত না।

ফলকথা, ভারতীয় বুরোক্রেসী ও ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল তথাকথিত মুস্‌লিম ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সাহায্যে নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া লইলেন এবং ভারতের স্বাধীনতালাভের চেষ্টাকে সাময়িকভাবে ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইলেন। মুস্‌লিম প্রতিনিধিগণের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া উমিচাঁদের কথা মনে পড়ে। সিরাজের ধ্বংস-সাধন গুপ্তমন্ত্রণা-বৈঠকে উমিচাঁদ আপন ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা তুলিয়া ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে অস্বীকার করায় লর্ড ক্লাইভ তাহাকে বলিয়াছিলেন "আপনি ওরূপ কাজ করিবেন না, আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইলে আপনাকে এমন পুরস্কার দিব যে আপনি 'চমৎকৃত' হইয়া যাইবেন।'

জানি না গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ব্বে মুসলিম প্রতিনিধিগণের সহিত ব্যুরোক্রেসীর এরূপ কোন গুপ্তমন্ত্রণা-বৈঠক বসিয়াছিল কি না। তবে দেখা যায় যে তাঁহারা আগাগোড়া ব্যুরোক্রেসীর খেলা খুব দক্ষতার সহিতই খেলিয়াছেন এবং তাহার সুবিচারও উমিচাঁদের ন্যায় পাইয়াছেন। মুসলিম প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইয়া মাননীয় আগা খাঁ সাহেব প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের নিকট যে মায়া-কান্না কাঁদিয়াছেন তাহা শুনিয়া বাস্তবিক সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি বলিয়াছেন আমরা দেশে গিয়া কি করিয়া মুখ দেখাইব? আমরা ১৪ দফা ত পাইলাম না, এবং তাহা না পাওয়ার অজুহাতে আপনারা কেন্দ্রে দায়িত্ব দিতে অসম্মত। এখন কেন্দ্রে কিছু দায়িত্ব দিন নচেৎ লোকে আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিবে। আগা খাঁ সাহেবের যুক্তির তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি কি জানেন না যে তাঁহাদের ১৪ দফার দাবী অন্ততঃ পৃথক নির্ব্বাচনের দাবী ও দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী ও একসঙ্গে চলিতে পারে না। ইহা কাহারও বুঝিতে বাকী নাই যে, তিনি ভারতবাসীর চক্ষে ধূলি দিবার উদ্দেশে কেন্দ্রে দায়িত্বের দাবী করিতেছেন। তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা স্বরাজ চাহেন না। চিরকাল ব্যুরোক্রেসীর আওতায় লালিতপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া এক্ষণে উক্ত আওতার বাহিরে যাইতে তাঁহাদের ভয়ানক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল ও তাঁহাদের পরামর্শে পরিচালিত মুসলিম প্রতিনিধিগণ অচিরে তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা দেখিবেন যে, মুসলিম ভারতও জাগিয়াছে এবং তাঁহারা বিধিসঙ্গত উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিতে কদাচ পশ্চাৎপদ হইবেন।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে তিনি অংশতঃ বলিয়াছেন :—

হায়! যে দেশের কোটি কোটি লোক অনাহারে, অল্পাহারে দিনপাত করিতেছে যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ভীষণ ব্যাধির গ্রাসে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে আত্ম-বলিদান করিতেছে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি যে দেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া জাতিকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে, যে দেশের শিল্প বাণিজ্য বৈদেশিক বণিকের প্রতিযোগিতায় ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে— সে দেশের মূল সমস্যা কি নির্ব্বাচনে হিন্দু ও মুসলমান কত অধিক আসন অধিকার করিবে তাহাই? দেশের মূল সমস্যা হইতেছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, আর্থিক স্বাধীনতা, জমিদার ও মহাজনের কবল হইতে রাইয়ত ও শ্রমিকের স্বাধীনতা লাভ, এবং তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান ও স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন :—

যে কোন কারণে হউক, অনেক হিন্দু অনেক মুসলমানকে, এবং অনেক মুসলমান অনেক হিন্দুকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকে। হিন্দুর চক্ষে মুসলমান অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছ; আবার মুসলমানের চক্ষে হিন্দু কাফের ও নারকী। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই পরলোকগত মৌলানা মোহম্মদ আলীর মত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি একজন পাপাচারী মুসলমানকেও জগৎবরেণ্য ন্যায় ও সত্যের প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর ঊর্দ্ধে স্থান দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই প্রকার সঙ্কীর্ণ ধারণা সর্ব্বতোভাবে আমাদের উভয়কে পরিহার করিয়া চলিতে হইবে।

এই বিষয়ে তিনি যে বলিয়াছেন,

এক শ্রেণীর হিন্দু প্যান-এরিয়ানিজমের চিন্তায় বিভোর হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে অহিন্দু জাতি, বিশেষ করিয়া মুসলমানগণকে, বিতাড়িত করিবার নাকি স্বপ্ন দেখেন। অপর দিকে তেমনি এক শ্রেণীর মুসলমান প্যান্-ইসলামিজমের মোহে অবিষ্ট হইয়া ভারতে মুস্লিম রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য অ-মুস্লিম সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য স্থাপনের দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করেন। বিংশ শতাব্দীর উন্নত যুগে এই প্রকার ধারণা যে আকাশকুসুমবৎ তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইহাতে, আমরা যতটুকু জানি, কিছু ভুল আছে। আমরা এরূপ কোন শ্রেণীর হিন্দুর অস্তিত্বের কথা জানি না, শুনিও নাই, যাহারা সমুদয় অহিন্দুকে, বিশেষ করিয়া মুসলমানগণকে, বিতাড়িত করিবার কল্পনা করেন। ছত্রপতি শিবাজীর আমলে যখন হিন্দুর পরাক্রম খুব বাড়িয়াছিল, তখনও এরূপ চেষ্টা বা কল্পনা হিন্দুদের হয় নাই। এখন ত হইতেই পারে না। এক শ্রেণীর হিন্দু যাহা কল্পনা করেন, তাহা অন্য জিনিষ— তাহা সমুদয় অহিন্দুকে হিন্দু করা। ইহা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য হইলেও, ইহা ঐ শ্রেণীর হিন্দুরই একটা বিশেষত্ব নহে। সকল গোঁড়া ধর্ম্মবলম্বীই অন্য সব ধর্ম্মের সকল লোককে নিজের ধর্ম্মে আনিতে চায়। আমাদের নিজের ধারণা এই, যে, পৃথিবীর বা কোন দেশের সমস্ত লোককে কখনও বাস্তবিক ঠিক্ একই ধর্ম্মাবলম্বী করা যাইবে না, এবং সমুদয় মানুষের একধর্ম্মাবলম্বী হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নহে। তাহা হইলে মানবজাতির পক্ষে সত্যের সমগ্র উপলব্ধি বর্ত্তমান অপেক্ষাও দুর্লভ হইবে, এবং মানবজীবনের পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যে বাধা জন্মিবে। সব মানুষ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান, শিখ, ব্রাহ্ম, বা আর কিছু হইলে যে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে, তাহাও নহে। কারণ ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অতীতে ঝগড়া বিবাদ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও চলিতেছে। সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে সার সত্যে অধিকতম আস্থা, ঔদার্য্য, এবং বাহ্য ও অবান্তর বিষয়ে পরমত-সহিষ্ণুতা বাড়িলে মানবজাতির কল্যাণ হইবে।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে মৌলবী সাহেবের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য :—

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মব্যাপারে একটি অদ্ভুত মনোভাব দেখা যায়। ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে হিন্দুরা খুবই উদার, কিন্তু আবার মানুষের সহিত আচরণে তাঁহারা খুবই গোঁড়া। হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মকে ঘৃণা করে না, কিন্তু ঘৃণা করে মুসলমান মানুষটিকে। তাই দেখা যায় যে, হিন্দু মুসলমানের দরগায় সিন্নি দেয়, মসজিদ ও আস্তানায় মানত দেয়। কিন্তু হিন্দুর যত সঙ্কোচ, যত ছুঁই-ছাঁই মুসলমান মানুষটিকে লইয়া,—তাহার স্পর্শেই নাকি হিন্দু একেবারেই অপবিত্র হইয়া যায়! আবার মুসলমানের অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। মুসলমান মানুষ হিসাবে হিন্দুকে তত ঘৃণা করে না, যত করে তাহার ধর্ম্মকে। সাধারণতঃ প্রত্যেক মুসলমান হিন্দুর ধর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ও তাহাকে নারকী বলিয়া বিবেচনা করে। এই প্রকার

ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ দুই জাতির মধ্যে মিলনের পক্ষে ঘোর অন্তরায়। তাই মিলনের শুভলগ্নে স্পষ্টভাবে খোলাখুলি করিয়া মনের কথা বলিয়া রাখা ভাল। মানুষ হিসাবে, মুসলমানকে হিন্দুরা যে ঘৃণা করিয়া থাকে তাহা তাহাদের ঘোর অন্যায়। হিন্দুকে এইভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে—এই অন্যায় অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে। কংগ্রেসের মধ্য দিয়া ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে। সেইরূপ যে মুসলমান পৌত্তলিক বলিয়া হিন্দুর ধর্ম্মকে ঘৃণা করে, তাহাকেও সেইভাব দূর করিতে হইবে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ইহুদীদিগের ন্যায় নিজেদেরকে 'ভগবানের একমাত্র আদরের আমরা' (Chosen people of God) বলিয়া গৌরব করিবার দিন মুসলমানের আর নাই—সে মোহ এখন কাটাইতে হইবে। ধর্ম্মান্ধতার দিন বহুকাল হইল গত হইয়াছে, এখন দিন আসিয়াছে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের।

সরকারের ভেদনীতি সম্বন্ধে মৌলবী সাহেব বলেন :—

যে কয়েকটি বিষয়ে ভেদনীতি দ্বারা আমরা পৃথক রহিয়াছি তন্মধ্যে দুইটি প্রধান—শিক্ষায় ভেদনীতি ও নির্ব্বাচনে ভেদনীতি। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া সরকার হয়ত এক শ্রেণীর মুসলমানের প্রিয়ভাজন হইতেছেন, কিন্তু উহাতে যে দেশের ও মুসলমান সমাজের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। একই বিদ্যালয়ে একই বিষয় পাঠ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাবের ও কালচারের আদানপ্রদান হইলে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের অন্তরায়গুলি ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইতে থাকিবে।

পৃথক্ নির্ব্বাচনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার অসারত্ব ও ইহার পশ্চাতে কোন্ ইঙ্গিতে কার্য্য চলিতেছে তাহা প্রতীয়মান হইবে। মুসলমানেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পৃথক নির্ব্বাচন পাওয়ার প্রার্থনা করেন প্রথমে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এই সময় স্যর আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানদিগের একটি ডেপুটেশন সিমলা শৈলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সমীপে উপস্থিত হইয়া সমাজের পক্ষ হইতে এই দাবী উপস্থাপিত করেন। ভিতরকার রহস্য যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে মুসলমান পক্ষ এই ডেপুটেশনের উদ্যোগ প্রথমে করে নাই। বরং তৎকালীন বড়লাট সাহেবের পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারেই মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই ডেপুটেশনের আয়োজন করেন, এবং মুসলমানদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি প্রার্থনা করিতে হইবে, এমন কি তাঁহাদের প্রার্থনাপত্রের মুসাবিদাও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়।

ইঁহারা হিন্দু সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি যেরূপ অহৈতুক দরদ ও আগ্রহ দেখাইতেছেন, তদ্রূপ দরদ ও আগ্রহ ইঁহারা স্বসমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি কখনও দেখাইয়াছেন কি? ইহা সর্ব্বজন-বিদিত যে হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলমান সমাজেও অনুন্নত সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে।

পৃথক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মৌলবী সাহেবের মত এই, যে,

পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। সিংহল আমাদের মতই ইংলণ্ড কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাকার মুসলমানগণ পৃথক নির্ব্বাচনের বিষময় ফল সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়া তাহা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করতঃ মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন।

বহরমপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী

বহরমপুরের সম্মেলনে গৃহীত প্রধান কয়েকটি প্রস্তাব নীচে উদ্ধৃত হইল।

গবর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছেন এবং ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায় ও এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজসমূহের অনুপ্রেরণার ফলে ৯ নং এবং ১১ নং অর্ডিনান্স জারি করিয়া বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরের কারাগারসমূহে বিনাবিচারে অনিশ্চিত কালের জন্য যুবকদিগকে আটক রাখিবার নীতি দ্বারা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম, হিজলী ও ঢাকাতে যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং ঐ সব অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য জনসাধারণ সর্ব্ববাদি-সম্মতভাবে সংবাদপত্রের মারফতে ও জনসভাসমূহে যে দাবী করিয়াছে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট উদাসীনতা এবং নিতান্ত ভ্রুক্ষেপহীনতা দেখাইয়াছেন; বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র বেপরোয়া ধরপাকড় চলিতেছে কংগ্রেস কর্ম্মীগণ এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে আটক করা হইতেছে। সর্ব্বশেষে যে অর্ডিন্যান্স জারি করা হইয়াছে, তাহা জঙ্গী আইনেরই সামিল। এই সমস্ত কারণে এই সম্মিলনী এই মত প্রকাশ করিতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা দেশের সম্পর্কে গান্ধী-আরউইন চুক্তি খতম করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং সম্মিলন এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করিবার সময় আসিয়াছে। পূর্ণস্বাধীনতাই এই সব অন্যায়ের একমাত্র প্রতীকার। সম্মিলনী আসন্ন সংগ্রামের জন্য বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। ইত্যবসরে অবিলম্বে নিম্নলিখিত কর্ম্মতালিকা কার্য্যে পরিণত করা হইবে।—(১) সর্ব্বপ্রকার ব্রিটিশ পণ্য তীব্রভাবে বয়কট; (২) ইংরেজদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক, ইন্সিওর কোম্পানী, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ বয়কট এবং ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহ বয়কট; (৩) বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন এবং (৪) মদ্য ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করিবার আন্দোলন।

ওয়ার্কিং কমিটির নিকট হইতে আবশ্যক অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য এবং এই সম্পর্কে আবশ্যক ব্যবস্থা সমূহ অবলম্বনের জন্য এই সম্মিলন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন।

অহিংস নীতিই স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রধান উপায় বিধায় দেশবাসীর এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে এবং যাহারা হিংসাপন্থী তাহাদিগকে এই পথ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মী হিন্দু-মুসলমানের একতা বিধানের জন্য চেষ্টা করিবেন।

মেদিনীপুরের কতকাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

যেহেতু গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের কাছে দায়ী নহেন এবং যেহেতু দেশের অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার জন্য হিজলী, চট্টগ্রাম ও ঢাকার ব্যাপার সংঘটিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং যেহেতু যতদিন পর্য্যন্ত শাসকগণ জনসাধারণের রাজনৈতিক সহযোগ উপর নির্ভর করিবেন, ততদিন এই সব অত্যাচার চলিতে থাকিবে—তজ্জন্য এই সম্মেলন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতিকে বাঙ্গলা দেশে

কৃষকের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে কৃষকসমিতি গঠনের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

এই সকল প্রস্তাব যাঁহারা পেশ ও সমর্থন করেন, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। দীর্ঘতম প্রস্তাবটি শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী সভার সমক্ষে উপস্থিত করেন।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় যে-যে বিষয়ের অনুল্লেখ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাতেও সেগুলির কোন আলোচনা নাই, সেগুলির সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবও উপস্থিত হয় নাই। উভয় সভাপতির বক্তৃতায় এবং একটি প্রস্তাবে হিন্দু মুসলমানের মিলন ও ঐক্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস দলের লোকেরা অনুভব করেন কিনা জানি না, যে,

বঙ্গে নারীহরণ

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের একটি অন্তরায়। উহা যদি ওরূপ অন্তরায় না হইত, তাহা হইলেও নারীরক্ষা একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইত। কেবল হিন্দুনারীরাই যে অত্যাচরিত হন, তাহা নহে; অন্যধর্ম্মাবলম্বী নারীরাও অত্যাচরিত হন। নারীহরণাদি দুষ্কর্ম্ম কেবল যে মুসলমান সমাজের দুর্বৃত্ত লোকেরাই করে, তাহাও নহে; অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দুষ্ট লোকেরাও করে। সুতরাং এই জাতীয় কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান মনে করা উচিত নয়। কিন্তু যদি ইহা সত্য হইত, যে, কেবল মুসলমান সমাজের দুর্বৃত্ত লোকদের দ্বারাই এইরূপ দৌরাত্ম্য হয়, তাহা হইলেও নারীদিগকে অত্যাচার ও অপমান হইতে রক্ষা করা কংগ্রেস-দলের এবং অন্য সব রাজনৈতিক দলের লোকদের কর্ত্তব্য হইত। কতকগুলি হিন্দু জাতির লোকদিগকে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় মনে করিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা, নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা এবং স্থলবিশেষে তাহাদের উপর অত্যাচার করা "উচ্চ শ্রেণী"র হিন্দুদেরই কাজ। কিন্তু তথাপি কংগ্রেস অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছেন। সুতরাং নারীহরণাদি দুষ্কর্ম্ম যদি কেবল মুসলমানদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলেও ইহা নিবারণের চেষ্টা করা কংগ্রেসের কর্ত্তব্য হইত। কিন্তু এই জাতীয় দৌরাত্ম্য অমুসলমানরাও করে। সেইজন্য কোন ওজরে ইহার প্রতীকার-চেষ্টা হইতে বিরত থাকা উচিত নয়। অবশ্য, কংগ্রেস এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব ধার্য্য করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে মনে করি না; বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত দীর্ঘকাল চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তদ্রূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে অন্ততঃ লোকে বুঝিবে, কংগ্রেস এ বিষয়ে উদাসীন নহেন, এবং যে-সকল ন্যাশন্যালিষ্ট অর্থাৎ স্বাজাতিক যুবক দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত, তাঁহারা নারীরক্ষার কার্য্যেও প্রাণপণ করিতে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন।

—

শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও বেকারসমস্যা

বাঙালীর সম্মুখে যদি বিপ্লবপ্রয়াস-সমস্যা ও বেকার-সমস্যা না থাকিত, তাহা হইলেও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার সাধনের চেষ্টা করা সকলের সুতরাং কংগ্রেসেরও কর্ত্তব্য হইত। কিন্তু বিপ্লবীদের হিংসাত্মক কার্য্যে কংগ্রেসের অহিংস চেষ্টার ব্যাঘাত ঘটিতেছে এবং একজন একটা হিংসাত্মক কাজ করিলে তাহার জন্য বিস্তর লোকের নানা প্রকার ক্ষতি লাঞ্ছনা অত্যাচারভোগ ঘটিতেছে। এইরূপ নানা কারণে কংগ্রেস বিপ্লবপ্রয়াস বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হিংসাত্মক বিপ্লবচেষ্টার উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইলে, তাহার কারণ নির্ণয় করা দরকার। তাহার কারণ শুধু রাজনৈতিক নহে—দেশ স্বাধীন নহে বলিয়াই যে যুবকেরা বিপ্লবী হইতেছে, তাহা নহে। অনেক স্বাধীন দেশেও বিপ্লবীরা হিংসাত্মক কাজ করে। ধনের অন্যায় রকমের ভাগ, দারিদ্র্য এবং বেকার অবস্থাও বিপ্লবচেষ্টার পরোক্ষ কারণ। এই জন্য কংগ্রেসকে বিপ্লব-বাদের অর্থনৈতিক কারণের দিকেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা করিলেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ ও প্রতিনিধিগণ বুঝিতে পারিতেন, যে, উহার দুই সভাপতির বক্তৃতায় এবং সম্মেলনের কোন কোন

প্রস্তাবে হিংসাত্মক বিপ্লবচেষ্টার নিন্দা এবং অহিংসতার প্রশংসা থাকাই যথেষ্ট নহে। বিপ্লবীদিগকে তাহাদের নির্ব্বাচিত পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে যেমন তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে, যে, অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা লব্ধ হইবে, তেমনি ইহাও বিশ্বাস করাইতে হইবে, যে, বিপ্লব ব্যতিরেকেও, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি দ্বারা বেকার-সমস্যা প্রভৃতির সমাধান হইবে।

এই সকল কারণে আমরা বহরমপুরের সম্মেলনে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার এবং বেকার-সমস্যার সমাধানের কিছু আলোচনা হইলে তাহা সন্তোষের কারণ মনে করিতাম।

—

সকল বাঙালীকে এক প্রদেশে আনা

সিন্ধুদেশকে স্বতন্ত্র সুবায় পরিণত করিবার প্রস্তাবে কংগ্রেস সায় দিয়াছেন এই বলিয়া, যে, একভাষাভাষী লোকদের এক একটি প্রদেশভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য, মুসলমানেরা বাস্তবিক সে কারণে সিন্ধুকে গবর্ণরশাসিত আলাদা প্রদেশ করিতে বলেন নাই – তাঁহারা মুসলমান-প্রধান প্রদেশের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য উহা চাহিয়াছেন। একভাষাভাষীদের অধ্যুষিত ভূখণ্ড একপ্রদেশভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া কংগ্রেস-দলের লোকেরা সকল ওড়িয়ার, সকল তেলুগু ভাষীর এবং সকল কন্নাড়-ভাষীর এক এক প্রদেশভুক্ত হওয়ার চেষ্টার সমর্থন করিতেছেন। অতএব, সব বঙ্গভাষাভাষীর এক-প্রদেশভুক্ত হইবার চেষ্টাও কংগ্রেসের অনুমোদিত হওয়া উচিত। বাংলা দেশের কংগ্রেস-দলের খবরের কাগজ ও অন্য খবরের কাগজে এই চেষ্টা সমর্থিত হইয়েছে। কিন্তু বহরমপুরের রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতি-দ্বয়ের বক্তৃতায় কিংবা কোন প্রস্তাবে এ বিষয়ের উল্লেখ বা আলোচনা দেখিলাম না। ইহার কারণ সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি।

আমরা শুনিয়াছি, সকল বঙ্গভাষাভাষী স্থানগুলিকে বাংলার সামিল করার সপক্ষে একটি প্রস্তাব বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটিতে অনুমোদিত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক জন মুসলমান প্রতিনিধি এই বলিয়া উহার বিরোধী হন, যে, উহা বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য কমাইবার চেষ্টা। সেই জন্য প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়। আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতেছি না। সুতরাং কোন ন্যায্য প্রস্তাব, মুসলমানদের আপত্তি সত্ত্বেও, অনুমোদিত হওয়া উচিত, এমন কথা বলিতে চাই না। কারণ, তাহার উত্তরে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বলিতে পারেন, হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত স্বাধীনতা-সংগ্রাম তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। তথাপি, আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলিব। বর্ত্তমান বাংলা প্রদেশের বাহিরে স্থিত যে সব জেলা বা মহকুমাকে বঙ্গের সামিল করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে, সেগুলির অধিকাংশ লোক বাংলা বলে ও বুঝে এবং সেগুলি পূর্ব্বে বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ইহা একটি ঐতিহাসিক তথ্য, যে, লর্ড কার্জ্জন হিন্দু বাঙালীদিগকে হীনবল করিবার জন্য বাংলা দেশকে এমন ভাবে বিভক্ত করেন, যাহাতে পূর্ব্বদিকের অংশে তাহারা মুসলমান বাঙালীদের চেয়ে সংখ্যায় অল্প হইয়া পড়ে এবং পশ্চিম দিকের অংশে বিহারী ও ওড়িয়াদের চেয়ে সংখ্যায় কম হইয়া পড়ে। তাহার পর যখন কাটা বাংলাকে জোড়া দিবার ছলে আবার নূতন করিয়া প্রাদেশিক বিভাগ হইল, তখনও তাহা এমন করিয়া করা হইল, যে, বঙ্গে হিন্দুবাঙালীরা সংখ্যায় কম রহিল। এখন সব বাঙালীকে একত্র করিবার চেষ্টা সফল হইলে হিন্দু বাঙালীরা সংখ্যায় মুসলমান বাঙালীদের চেয়ে বেশী হইবে কি না, তাহার কোন বিস্তারিত হিসাব পাই নাই বা করি নাই। এই একত্রীকরণের ফল যাহাই হউক, ইহা স্বাভাবিক বলিয়া ইহা চাহিতেছি। একটি জেলা সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিত, যে তাহা বঙ্গের সহিত যুক্ত হইলে বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বাড়িবে। তাহা শ্রীহট্ট। তথাপি আমরা বঙ্গের সহিত তাহার যুক্ত হওয়ায় আপত্তি করিতেছি না। যদি শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, ধলভূম, ও পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমা বঙ্গের সামিল হয়, তাহা হইলেও হয়ত হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশী থাকিবে। ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু মুসলমানেরা সন্দেহ করেন,

যে, তাহা হইলে তাঁহাদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে কম হইবে। এইজন্য তাঁহারা সব বঙ্গভাষাভাষী স্থানগুলি বঙ্গের সহিত যুক্ত হইবার বিরোধী। তাহা হইলে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায়, যে, বাঙালী হিন্দুদিগকে সংখ্যান্যূন ও হীনবল করিবার জন্য লর্ড কার্জন এবং পরে লর্ড হার্ডিং বঙ্গদেশকে যে অন্যায় ও কৃত্রিম উপায়ে বিভক্ত করিয়াছিলেন, মুসলমান বাঙালীরা সেই কৃত্রিম ও অন্যায় বিভাগের সমর্থক, কিন্তু যাহা ন্যায্য ও স্বাভাবিক সকল বাঙালীর সেই একত্রীকরণের তাঁহারা বিরোধী।

আমাদের বিবেচনায় সব বাঙালী একপ্রদেশভুক্ত হইলে বাঙালীর শক্তি ও প্রভাব বাড়িবে এবং তাহার সুফল সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাঙালীরাই ভোগ করিবে। হিন্দু বাঙালীরা কৃত্রিম উপায়ে সংখ্যাধিক হইতে চাহিতেছে না। কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে সংখ্যান্যূন করা হইয়াছে। যাহা স্বাভাবিক, সেই অবস্থা পুনরানীত হইলে যদি তাহারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইয়া পড়ে, তাহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত নয়।

—

বয়কটের প্রস্তাব

বহরমপুর রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে বিলাতী সকল রকম পণ্য এবং ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানী, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করিবার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ন্যায্যতার দিক্ দিয়া তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার না থাকিলেও সাধ্যতার দিক্ দিয়া তাহা বিবেচ্য। সকল রকমের বিলাতী পণ্য বর্জ্জন করা সদ্য সদ্য সম্ভবপর না হইতেও পারে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যেগুলি নিশ্চয় বর্জ্জন করা যায়, তাহার একটি তালিকা কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশিত করিলে সুবিধা হয়। ব্যাঙ্ক আদি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও ইহা বিবেচ্য। সর্ব্বোপরি, অহিংস থাকা আবশ্যক।

—

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে অন্যত্র যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, তাহা হইতে পাঠকেরা তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান কার্য্যের পরিচয় পাইবেন। তাঁহার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত লিখিত হওয়া আবশ্যক। কোন কোন বিষয়ে বাঙালীর কৃতিত্বের অনেক অংশ তাঁহারই কৃতিত্ব। বাঙালীর আয়ু আজকাল যেরূপ তাহাতে তাঁহাকে দীর্ঘজীবী বলিতে হইবে; কিন্তু অন্য অনেক সভ্য দেশের অনেক মনীষী যেরূপ দীর্ঘজীবী হন, তাহাতে তিনি অনেক বৎসর জীবিত থাকিয়া বঙ্গের, ভারতের ও পৃথিবীর জ্ঞান বৃদ্ধি করিবেন, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ আশা করা অসঙ্গত হইত না।

—

কয়েক জন হিতকর্ম্মীর মৃত্যু

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনার‍্যালের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর আতুরাশ্রমের সম্পাদকতা প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্য করিতেন। এটর্নী শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত নানাপ্রকারে শিক্ষার ও পণ্যশিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেন এবং পরিচ্ছদ ও চালচলনে অতিশয় নিরাড়ম্বর ছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী ছিলেন। ইঁহাদের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

—

অধ্যাপক পার্সিভ্যাল

প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পার্সিভাল সাহেবের সম্প্রতি লণ্ডনে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ অতিক্রম করিয়াছিল। চট্টগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার নাম ইউরোপীয় হইলেও তিনি ইংরেজ ছিলেন না। তাঁহার গায়ের রং শ্যামবর্ণ ছিল এবং দেখিতে তিনি বাঙালীর মত ছিলেন। জন্মভূমি ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। তিনি পাণ্ডিত্যে এবং অধ্যাপনায় দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ছাত্রদের তিনি প্রিয় ছিলেন এবং ছাত্রদিগকেও তিনি ভালবাসিতেন।

—

মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যাবর্ত্তন

গোলটেবিল বৈঠক হইতে মহাত্মা গান্ধী খালি হাতে ফিরিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাঁহার বিলাতযাত্রা নিষ্ফল হইয়াছে মনে করা ভুল হইবে। তিনি নিজেও তাহা মনে করেন না। বিলাতে থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দাবি বিশদভাবে ইংরেজদিগের এবং পৃথিবীর অন্য সভ্য লোকদিগের গোচর করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক নানা আদর্শের কথাও সভ্য জগৎকে জানাইতে পারিয়াছেন। সর্ব্বোপরি তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছেন, কটিবাসপরিহিত স্বল্পাহারী কৃশ একজন ভারতীয় তপস্বী পরিশ্রমে, রাজনীতিকুশলতায়, যুক্তিতর্কে, ধৈর্য্যে, সৌজন্যে, সাহসে এবং দৃঢ়চিত্ততায় অন্য কোন দেশের কোন মানুষের চেয়ে কম নহেন। ইংলণ্ডের রাজকীয় দরবারে নগ্নপদ কটিবাসপরিহিত মানুষের প্রবেশ ও সমাদর লাভ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। চরিত্র জয়ী হইয়াছে।

মহাত্মাজী ভারতবর্ষের দাবি সাতিশয় সংযত ভাষায় অথচ দৃঢ়তার সহিত বার-বার জানাইয়াছেন। দেশের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রবিষয়ক যে-সকল ক্ষমতা স্বাধীনতার অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহা তাঁহার বিবৃতি হইতে একবারও বাদ পড়ে নাই, যদিও তিনি বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের হিতের জন্য আপাততঃ যে-যে বিষয়ে ঐ সব ক্ষমতার সাময়িক সঙ্কোচ আবশ্যক বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহাতে তিনি সম্মত আছেন।

—

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা

গত জানুয়ারী মাসে প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডন্যাল্ড সাহেব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ব্রিটিশ নীতির ব্যাখ্যান করেন, এবার ডিসেম্বরের গোড়াতেও তাহাই ঠিক্ আছে বলিয়াছেন। পার্লেমেণ্টের কমন্স ও লর্ডস্ দুই বিভাগে তাঁহার বর্ণিত নীতির সংশোধক প্রস্তাবও গৃহীত হয় নাই। ব্রিটিশ রাজনীতির এই সব চা'ল আমাদের কাছে অভিনয়ের মত ঠেকে। কতকগুলি লোক বলিতেছেন, "ভারতবর্ষকে এই এই চীজ দেওয়া হইবে।" অপর কতকগুলি লোক বলিতেছেন,"না না অত বড় জিনিষ দিও না, ভারতীয়েরা উহার যোগ্য নহে", কিংবা "উহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যাইবে," ইত্যাদি। এরূপ চা'লে আমরা প্রতারিত হইব না। ভারতবর্ষ কি যে পাইবে, তাহাই ত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বলেন নাই। কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টকে ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী করা হইবে বলা হইতেছে। কখন্, কতটুকু দায়ী করা হইবে? বর্ত্তমান অবস্থা হইতে শেষ অবস্থায় পৌছিবার মধ্যেকার পরিবর্ত্তনের সময়ে কতকগুলি বিষয় ব্রিটিশ পক্ষ স্বহস্তে রাখিবেন বলা হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন-যুগটা কতকালব্যাপী হইবে? সিকি, আধ, এক, না দুই শতাব্দী? যদি সৈন্যদল, রাজস্ব, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সব ক্ষমতা এবং বৈদেশিক সব ব্যাপারের ক্ষমতা ব্রিটিশ পক্ষের হাতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য থাকে, তাহা হইলে এরূপ স্বরাজের মত ফক্কিকা উল্লেখেরও অযোগ্য।

কতকগুলা কমিটি আবার ভারতবর্ষে কাজ করিবে, আবার তৃতীয় বার গোলটেবিল বৈঠক বসিবে। কতকগুলা টাকার আবার অপব্যয় হইবে।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্য এই হইয়াছে, যে, গবন্মেণ্ট কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের অন্য কতকগুলা ইংরেজের হাতে গড়া দল উপদলের সমান একটা দল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এবং ইংরেজদের হাতের পুতুল কতকগুলা লোকের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষে দলাদলি এত বেশী, যে, এদেশে সর্ব্ববাদিসম্মত কোন ন্যূনতম দাবিও নাই। কিন্তু সত্য কথা বাস্তবিক তাহা নহে। কংগ্রেসের ক্ষমতার কাছ দিয়া যায়, এমন ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষে নাই, এবং উল্লেখযোগ্য যতগুলি দল আছে, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ তাহাদের ন্যূনতম দাবি।

ম্যাকডন্যাল্ড সাহেবের ঘোষণা অন্তঃসারশূন্য, অতএব আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ হউক, ইহা বলা অন্যের পক্ষে সহজ। কিন্তু যাঁহাকে অহিংস সত্যাগ্রহ অভিযান

চালাইতে হইবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ও অন্য ফলাফলের জন্য দায়ী হইতে হইবে, সেই মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে তাহা বিশেষ চিন্তা না করিয়া বলা সহজ নহে। এই জন্য তিনি ঠিক করিয়া এখনও কিছু বলেন নাই।

—

দমননীতি সম্বন্ধে লর্ড আরুইন

পার্লেমেণ্টের লর্ডস্ সভায় সম্প্রতি গবন্মেণ্টের ভারতীয় নীতি সম্বন্ধে যে তর্কবিতর্ক হইয়াছে, তদুপলক্ষ্যে লর্ড আরুইন বলিয়াছেন, তিনি গবর্ণর-জেনারাাল থাকা কালে, দমনের নানা কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা ভারতবর্ষকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া তাহার নাম শান্তি দেওয়া উচিত কিনা, বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেরূপ দমননীতিতে সিদ্ধিলাভ হইবে না বুঝিয়া তিনি কংগ্রেসের সহিত চুক্তি করেন। কথাটা আংশিক সত্য। চিন্তনীয় বা কল্পনীয় সব রকম কঠোর ব্যবস্থা তিনি করেন নাই সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য, যে, যাহা বর্ত্তমানে ইংরেজের সাধ্যাতীত তাহাই তিনি করেন নাই, কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শক্তির যাহা সাধ্য তাহা করিতে কসুর করেন নাই। যখন আর পারিয়া উঠিলেন না, তখন মহাত্মা গান্ধীর সহিত সন্ধি করিলেন।

লর্ডস্ সভায় লর্ড আরুইনের মত লর্ড লোথিয়ানও বলিয়াছেন, যে, দমননীতি সফল হয় না। কথাগুলো শুনিতে ভাল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দমননীতি চালানও ত হইতেছে।

—

যুক্তপ্রদেশে দমননীতি

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশে রায়তেরা খাজনার পরিমাণ ও খাজনা রেহাই প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা চাহিয়াছিল, তাহা না পাওয়ায় লক্ষাধিক রায়ত খাজনা না দেওয়া স্থির করিয়াছে। গবন্মেণ্টও কতকটা চট্টগ্রামে জারি অর্ডিন্যান্সের মত একটা অর্ডিন্যান্স সেখানে জারি করিয়াছেন। ইহাতে ফল ভাল হইবে না। বাংলা দেশে নীলকর হাঙ্গামায় যেমন শেষ পর্য্যন্ত নীলকর ও সরকার পক্ষের পরাজয় হইয়াছিল, হিন্দুস্থানের এই কিষাণ-অবাধ্যতাতেও সেইরূপ গবন্মেণ্টকে হারিতে হইবে। বলপ্রয়োগ দ্বারা যদিই বা সরকারপক্ষ কৃষকদিগকে "ঠাণ্ডা" করিতে পারেন, তাহা হইলেও সরকারী অন্যতম যে প্রধান উদ্দেশ্য যথেষ্ট রাজস্ব আদায়, তাহা সিদ্ধ হইবে না। অসন্তুষ্ট, দরিদ্র, নিষ্পেষিত কৃষককুলের নিকট হইতে বৎসরের পর বৎসর পূর্ণমাত্রায় খাজনা পাওয়া অসম্ভব।

—

অরাজনৈতিক কয়েদী খালাস

কোন কোন জেল হইতে অনেক অরাজনৈতিক কয়েদীদিগকে তাহাদের মুক্তির সময়ের আগেই খালাস দেওয়া হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য জায়গা খালি করা। গবন্মেণ্ট ধরিয়া রাখিয়াছেন, যে, সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে, এবং অনেক লোককে জেলে পাঠাইতে হইবে।

—

ডাকমাশুল বৃদ্ধি

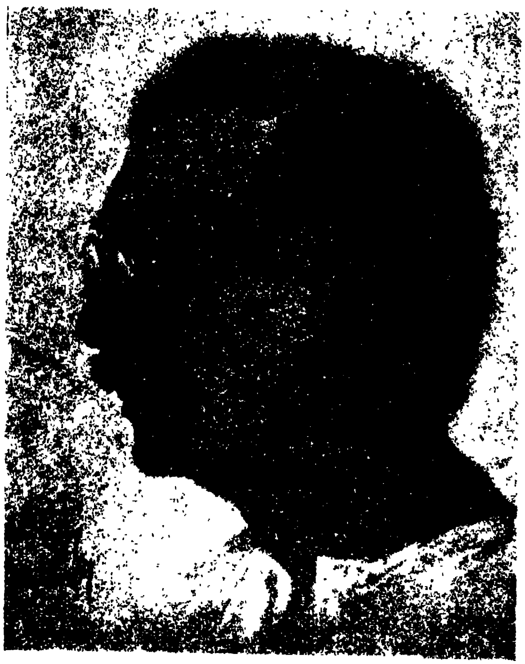
পোষ্টকার্ডের দাম তিন পয়সা এবং খামের টিকিটের ন্যূনতম দাম পাঁচ পয়সা হইল। এখন হইতে আমাদিগকে যথাসাধ্য পোষ্ট কার্ডেই কাজ চালাইতে হইবে। যাঁহারা প্রবাসীর সম্পাদকীয় বা বৈষয়িক বিভাগের সহিত পত্রব্যবহার করিবেন, তাঁহারা জবাবের জন্য অনুগ্রহ করিয়া তিন পয়সার টিকিট লাগান রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড পাঠাইবেন। যাঁহারা অমনোনীত রচনা ফেরত চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া যথেষ্ট ডাকমাশুল রচনার সঙ্গে পাঠাইবেন।

—

নন্দলাল বসুর সম্বর্দ্ধনা

কলাকুশল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের পঞ্চাশ

বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ



শ্রীনন্দলাল বসু

যে কবিতা উপহার দিয়া তাঁহাকে প্রীতি জানাইয়াছেন, তাহা অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

আমরা নন্দলাল বাবুর মানবিক সদ্‌গুণ, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার হাতের নৈপুণ্য এবং শিক্ষকের কাজে তাঁহার অনুরাগ ও দক্ষতার জন্য তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট খুন

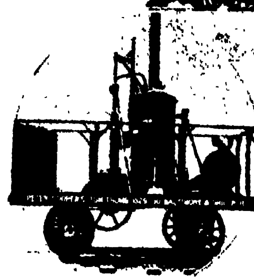
বিবিধ প্রসঙ্গ শেষ করিবার সময় কাগজে দেখিলাম, দুটি বালিকা কুমিল্লার ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলি করিয়া খুন করিয়াছে। কি উদ্দেশ্যে বা কারণে খুন করিয়াছে, জানা যায় নাই। সাধারণতঃ উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সত্য কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, যে, এইরূপ হত্যাকাণ্ড দ্বারা কোন দেশ স্বাধীন হইতে পারে না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অধিকন্তু কংগ্রেসের অহিংস প্রচেষ্টায় ইহাতে বাধা পড়ে, এবং অগণিত লোক সন্দেহবশতঃ নিগৃহীত হয়। দেশের ইহা অতিশয় শোচনীয় অবস্থা যে বালিকারা পর্য্যন্ত হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইতেছে। এরূপ অবস্থার বিলোপ এবং হত্যাকাণ্ড ও অন্য বিধ হিংসাত্মক কার্য্য হইতে পুরুষ ও নারীর নিবৃত্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

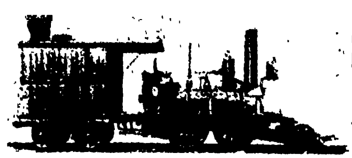


এক শত বৎসর পূর্ব্বের ইঞ্জিন ও রেল—

এক শত বৎসর পূর্ব্বের ইঞ্জিন ও রেলের নমুনা মার্কিনের অন্তর্গত বাল্টিমোরের নিকট হেলথর্ষ্ট নামক স্থানের প্রদর্শনীতে দেখানো হইতেছে।







উপরে—১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সেই উপত্যকায় চালিত প্রথম ইঞ্জিন
মধ্যে—বি এণ্ড ও কোম্পানীর সর্ব্বপুরাতন "টম থাম" ইঞ্জিন
নীচে—জন বুল নামে পেন্‌সিলভেনিয়া কোম্পানীর প্রথম ইঞ্জিন

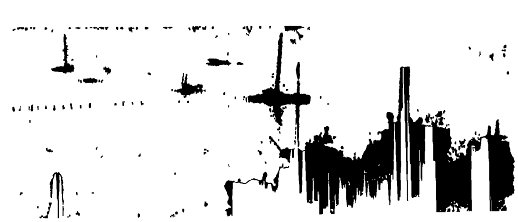
অপরাধ নিবারণে রেডিও—

মার্কিনে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চোর ধরিবার যেমন ব্যবস্থা হইতেছে চোরেরাও চৌর্য্যকর্ম্মে তেমনি বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিতেছে। পুলিস এখন রেডিওর সাহায্যে চোর ধরিতে সমর্থ হইতেছে।



মেরাকাইবো হ্রদে তৈল ড্রিল করা হইতেছে—

লাটিন আমেরিকায় ভেনেজুয়েলায় মেরাকাইবো নামে একটি হ্রদ আছে। এই হ্রদে ভেনেজুয়েলা রউৎপন্ন তৈল ড্রিল করা হয়।



পার্শ্বের চিত্রে তৈল তুলিবার কৌশল দেখা যাইবে। এই জাহাজখানিতে তৈল তোলা হইতেছে।

—

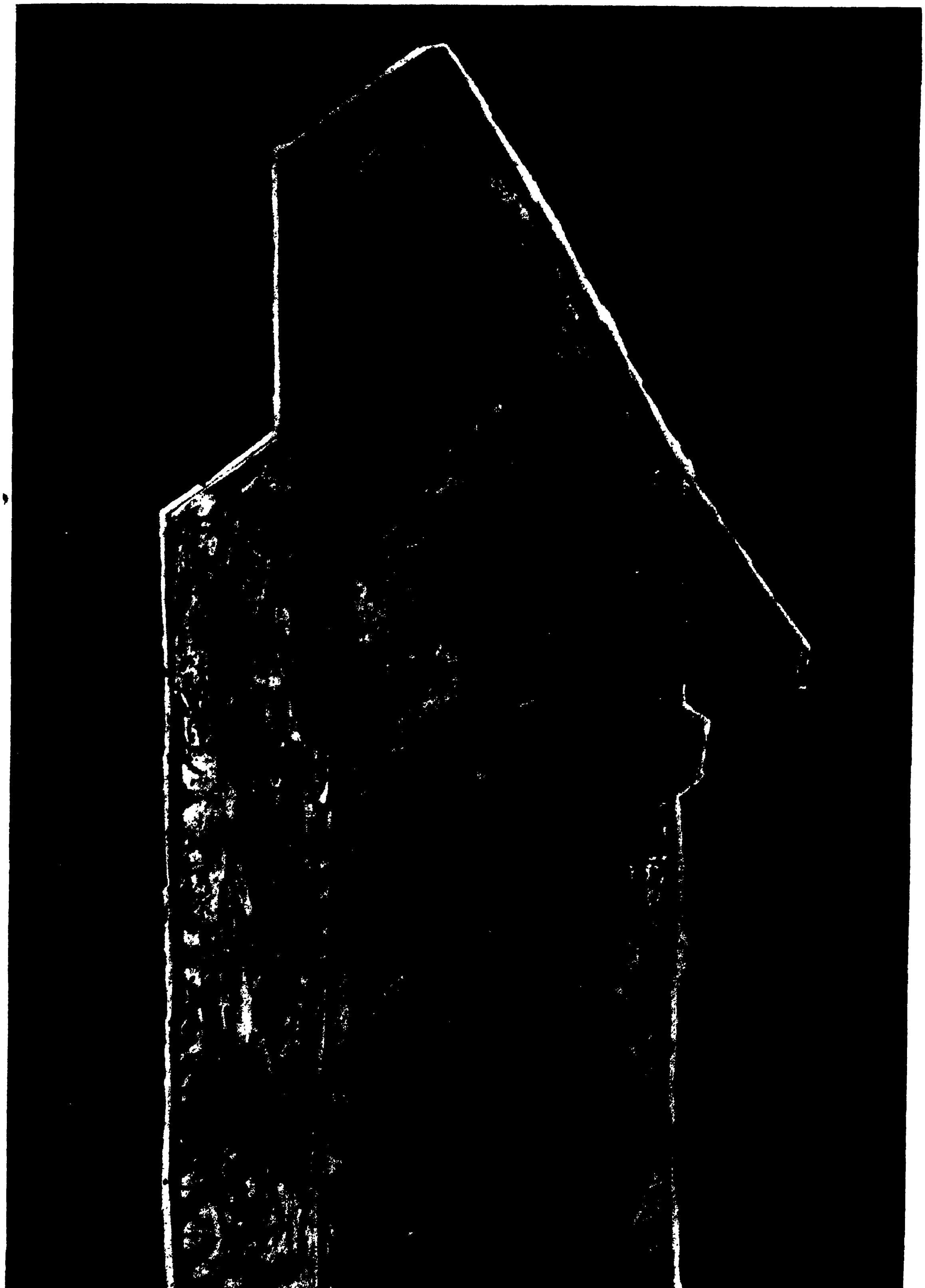
জাপানের বিরুদ্ধে চীনা ছাত্র—

জগতের সর্ব্বত্র দেশের ও দশের সেবায় মন-প্রাণ ঢালিয়া ছাত্র সম্প্রদায় যতটা কাজ করিয়া থাকে এরূপ কচিৎ কদাচিৎ অন্য কেহ





করিতে পারে। তাহারা মিশরে, চীনে, ভারতবর্ষে ও অন্যত্র সকল পরাধীন দেশে কি স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টায়, কি অন্যবিধ দেশহিতকর কার্য্যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। প্রাচী ও প্রতীচীর অর্থলোলুপ জাতিরা স্বদেশজাত মালপত্র চীনে এতকাল বিক্রয় করিয়া ধনবান হইয়াছে। ও-দিকে চীন কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরে। সংপ্রতি চীনারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা থাকিলেও দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে সর্ব্বদা সসঙ্কোচে চলিতে হইবে। তাই চীনারা বিদেশী মাল বর্জ্জন আন্দোলন চালাইতে তৎপর হইয়াছে। সজোর মিছিলের চিত্র দুইটিতে জাপানের বিরুদ্ধে চীনা ছাত্রগণের বর্জ্জন আন্দোলন চালানোর আভাস পাওয়া যাইবে।



প্রবাসী

৩১শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩৮

৪র্থ সংখ্যা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

প্রশ্ন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা ব'লে গেল ক্ষমা ক'রো সবে,, ব'লে গেল ভালবাসো;
অন্তর হ'তে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।—
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দ্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সঙ্গীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

পত্রধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কল্যাণীয়াসু

আমাকে তুমি মনে মনে অনেকখানি বাড়িয়ে নিয়ে নিজের পসন্দসই করবার চেষ্টা করচ। কিন্তু আমি তো রচনার উপাদান মাত্র নই, আমি যে রচিত। তুমি লিখেচ এখন থেকে আমার বই খুব ক'রে পড়বে—এমন কাজ ক'রো না—অত্যন্ত বেশী ক'রে পড়তে গেলে কম ক'রে পাবে। হঠাৎ মাঝে মাঝে একখানা বই তুলে নিয়ে সাতের পাতা কি সতেরোর পাতা কি সাতাশের পাতা থেকে যদি পড়তে সুরু ক'রে দাও হয়ত তোমার মন ব'লে উঠবে—বাঃ, বেশ লিখেচে তো। রীতিমত পড়া অভ্যাস কর যদি তা হ'লে স্বাদ নষ্ট হ'তে থাকবে—কিছুদিন বাদে মনে হবে এমনই কি। আমাদের সৃষ্টির একটা সীমানা আছে সেইখানে বারে বারে যদি তোমার মনোরথ এসে ঠেকে যায় তবে মন বিগড়ে যাবে। মানুষের একটা রোগ আছে যা পায় তার চেয়ে বেশী পেতে চায়—সেটা যখন সম্ভব হয় না তখন চেক বইয়ে নিজের হাতে বড় অঙ্ক লেখে, তারপরে যখন ভাঙানো চলে না তখন ব্যাঙ্কের উপর রাগ করে। তোমার প্রকৃতিকে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তি দিতে পারে আমার রচনা থেকে এমন প্রত্যাশা ক'রো না। কিছু তোমার ভাল লাগবে কিছু অন্যের ভাল লাগবে—কিছু তোমার মনের সঙ্গে মিলবে না অথচ আর একজন ভাববে সেটা তারই মনের কথা। নানা ভাবে নানা সুরে নানা কথাই বলেছি—যেটুকু তোমার পছন্দ হয় বাছাই ক'রে নিয়ো। পাঠকেরও রসগ্রহণ করবার একটা সীমা আছে; তোমার মন অনুভূতির একটা বিশেষ অভ্যাসে প্রবলভাবে অভ্যস্ত, সেই অভ্যাস সব কিছু থেকে নিজের জোগান খোঁজে। কিন্তু কবিতায় কোনো একটা বিশেষ ভাব বড় জিনিষ নয়, এমন কি খুব বড় অঙ্গের ভাব। কবিতার মুখ্য জিনিষ হচ্চে সৃষ্টি—অর্থাৎ রূপভাবন। বিশ্বকাব্যেও যেমন, কবির কাব্যেও তেমনি,—রূপ বিচিত্র—কোনোটা তোমার চোখে পড়ে, কোনোটা আর কারও। তুমি খুঁজচ তোমার মনের একটি বিশেষ ভাবকে তৃপ্তি দিতে পারে এমন কোনো একটি রূপ - অন্যগুলোও রূপের মূল্যে মূল্যবান হলেও হয়ত তুমি গ্রহণ করতে চাইবে না। কিন্তু কাব্যের যারা যথার্থ রসজ্ঞ, তারা নিজের ভাবকে কাব্যে খোঁজে না—তারা যে-কোনো ভাব রূপবান হয়ে উঠেচে তাতেই আনন্দ পায়। তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েচে একটা বিশেষ খাদে তোমার চিন্তাধারা প্রবাহিত—সেইটেই তোমার সাধনা। আমরা কবিরা কেবল সাধকদের জন্য লিখিনে, বিশেষ রসের রসিকদের জন্যেও না। আমরা লিখি রূপদ্রষ্টার জন্যে—তিনি বিচার করেন সৃষ্টির দিক থেকে—যাচাই ক'রে দেখেন রূপের আবির্ভাব হ'ল কি না। আমার রূপকার বিধাতা সেইজন্যে আমাকে নানা রসের নানা ভাবের নানা উপলব্ধির মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান—নিজের মনকে নানান্‌খানা ক'রে নানা চেহারায়ই গড়তে হয়। যেই একটা কিছু চেহারা জাগে ওস্তাদজী তখন আমাকে চেলা বলে জানেন। আমি যে-সব কর্ম্ম হাতে নিয়েচি তার মধ্যেও সেই চেহারা গড়ে তোলবার ব্যবসায়। উপদেশ দেওয়া উপকার করা গৌণ, রচনা করাই মুখ্য। সেইজন্যেই আমি সবাইকে বার-বার ক'রে বলি, দোহাই তোমাদের, হঠাৎ আমাকে গুরু ব'লে ভুল ক'রো না। আমি কর্ম্মীও বটে—কিন্তু যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে বুঝতে পারে আমি কারুকর্ম্মের কর্ম্মী। আমি কবিতা লিখি, গান লিখি, গল্প লিখি, নাট্যমঞ্চেও অভিনয় করি, নাচি নাচাই, ছবি আঁকি, হাসি, হাসাই, একান্তে কোনো একটা মাত্র

আসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবার উপায় রাখিনে। যারা আমাকে ভক্তি করতে চায় তাদের পদে পদে খটকা লাগে। আমার এই চঞ্চলতা যদি না থাকৃত তবে কোনদিন হয়ত হাল-আমলের একজন অবতার হয়ে উঠে ভক্তব্যূহের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়তুম। অবতার-শিকারে যাদের সখ তারা কাছাকাছি এসে নাক সিটকে চলে যায়। তুমি আমার লেখা পড়তে চেয়েচ, প'ড়ো কিন্তু কবির লেখা বলেই প'ড়ো। অর্থাৎ আমি সকলেরই বন্ধু, সকলেরই সমবয়সী, সকলেরই সহযাত্রী। আমি কিন্তু পণ্ডিত নই। পথ চলতে চলতে আমার যা-কিছু সংগ্রহ। যা-কিছু জানি তার অনেকখানি আন্দাজ। যতখানি পড়ি, তার চেয়ে গড়ি অনেক বেশী। ইতি ১৯ বৈশাখ ১৩৩৮।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

রঙীন ভাবরসবাষ্পের মেঘমণ্ডলে নিবিড় ক'রে ঘেরা একটি জগতে তুমি বাস কর—তোমার চিন্তা চেষ্টা তোমার আকাঙ্ক্ষা অভিরুচি সেইখানকারই রঙে রঙানো রসে রসানো, সেইখানকারই উপাদানে তৈরি। তোমার চিঠিগুলি থেকে সেইখানকার বার্ত্তা পাই; সেইখানকার ভাষারও পরিচয় পেতে থাকি। বুঝতে পারিনে তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বুঝি আমি ও-জায়গার মানুষ নই। তোমাদের জীবনের লক্ষ্যকে একটি বিশেষ রূপে মূর্ত্ত ক'রে প্রতিষ্ঠিত করেচ, একটি সুনির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে বিবিধ উপচার-সহ তাকে প্রদক্ষিণ করচ। ওখানে বাসা বাঁধবার মত প্রকৃতিই আমার নয়। তুমি মনে করতে পার যে, এর কারণ আমার মন ব্রাহ্মসংস্কারে চালিত—একেবারেই নয়, নূতন বা পুরাতন কোনো প্রচলিত সংস্কারে আমাকে কোনোদিন বাঁধেনি। মাঝে মাঝে ধরা দিতে গিয়ে ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে চলে এসেচি—আমার জায়গা হয়নি।

কোনো সনাতন বা অধুনাতন ছাঁচে-ঢালা উপজগতের মধ্যে নিজেকে ধরাতে পারলুম না। আমি কেবলই চলতে চলতে পাই এবং পেতে পেতে চলি, এম্‌নি ক'রেই এতদিন কেটেচে। তুমি যে পাকা ইটের প্রাচীর তোলা রসলোকে বাস করচ আমার পথের এক অংশে একদা আমি তার মধ্যেও প্রবেশ করেছিলুম—কিন্তু আমার যে-পথ আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়েছিল সেই পথই আমাকে সেখান থেকে বের ক'রে নিয়েও এল—যদি ওখানে আমাকে কোনো কারণে থাকতেই হ'ত—বাসিন্দা হয়ে থাকতে পারতুম না, বন্দী হয়ে থাকতুম।

আমি যাঁকে পাই বা পেতে চাই কেবলই এগিয়ে গিয়ে তাঁকে পেতে হয়, আড্ডা গেড়ে বসলেই গ্রন্থিটাকে পাই সোনাটাকে ফেলে দিয়ে। নানারকম চিহ্ন দিয়ে চেহারা দিয়ে কাহিনী দিয়ে সদরের গেট ও খিড়কির প্রাচীর দিয়ে তোমাদের পাওয়াটাকে খুব পাকা ক'রে নিয়ে তোমরা ভোগ করতে চাও—আমি দেখি আমার যিনি পাওয়ার ধন ঐ সমস্ত পাকা প্রাচীরই তাঁর পালাবার বড় রাস্তা। মন্দির থেকে দৌড় মারবার জন্যেই তাঁর রথযাত্রা। আমার সম্পদকে সুনির্দ্দিষ্ট সুরক্ষিত করবার জন্যে আমি আমার পিতামহদের লোহার সিন্ধুকটাকে কাজে লাগাতে চাইনে, ওজনদরে সে সিন্ধুক যতই ভারী ও কারিগরিতে যতই দামী হোক্ না।

আমার সম্পদ রয়ে গেল আকাশে আলোতে বাতাসে আর অন্তরাকাশে, আর তাঁর পরিচয় রইল পৃথিবীর সকল কবির কাব্যে, কলারসিকের চিত্রে, নৃত্যে গানে, মনীষীর মননে, কর্ম্মীর কর্ম্মে, পৃথিবীর সকল বীরের বীর্য্যে, ত্যাগীর ত্যাগে। এরা যে চলেচে তাঁরই সঙ্গে যুগে যুগে তাঁরই পথে পথে। কোনো বাঁধা বাক্যে তারা ধরা দেয় না, বাঁধা মতে আটক পড়ে না, বাঁধা রূপের শিকল পরে না। একজন যদি বা পথরোধ ক'রে হাঁকতে থাকে চরমে এসেচি, আর একজন অট্টহাস্যে সে বাধা চুরমার করে দেয়। এটা অত্যুক্তি হবে যদি বলি কোনো বাঁধা মতে আমাকে পেয়ে বসে না—কিন্তু সে-সব বাঁধনের গ্রন্থি আল্‌গা—যখন টান পড়ে তখন আপনিই খোলে, গলায় ফাঁস লাগায় না।

তুমি লিখেচ আমার সম্বন্ধে এক সময়ে তোমার ও তোমাদের অনেকের একটা বিরুদ্ধতা ছিল। এই বিরুদ্ধতা প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যভাবে আমার দেশের ভিতরেই

আছে। আমার স্বভাব দেশের প্রচলিত ধারার সঙ্গে ছন্দ মেলাতে পারেনি। যাদের আমি বন্ধুভাবে গণ্য করেচি, হঠাৎ দেখি আমার সম্বন্ধে তাদের প্রতিকূলতা নিদারুণ ভাবে তীব্র হয়ে উঠেচে। বুঝতে পারি আমি যেখানকার লোক সেখানকার সঙ্গে আমি বেখাপ। এক জায়গায় এরা আমার কাছাকাছি এসে হুঁচট খেয়ে পড়ে—সেটা আমার স্বভাবের দোষে, না তাদের চলনের ত্রুটিতে সে তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই—এবং তর্কে জিতলেও কোনো সান্ত্বনা নেই।

বাল্যকাল থেকে তুমি যে-সব বাংলা বই পড়েচ তোমার চিত্ত এবং রুচি যে সাহিত্যরসে সাড়া দিতে অভ্যস্ত তোমার চিঠিতে তারও বিবরণ দেখলুম। তুমি নিশ্চয় এটা দেখেচ আমাদের সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে নানাপ্রকার সমালোচনার আমি লক্ষ্য কিন্তু আমি পারত-পক্ষে সমালোচনার আসরে কলম হাতে নিয়ে নামিনে। নিজেকে একঘরে ক'রে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে আরামের ও নিরাপদ।

নিশ্চয়ই দেখবে সাহিত্যক্ষেত্রেও তোমার সঙ্গে আমার সুরের মিল হবে না। নিশ্চয় জেন, সাহিত্যের দিক থেকে তোমার লেখায় বারে-বারে আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত করেচে। কিন্তু সাহিত্য বিচারবুদ্ধিতে তুমি যে প্রশস্ত আদর্শ পেয়েচ তা আমি মনে করিনে। না পাবার প্রধান কারণ, বাংলা সাহিত্যকে তুমি বাংলা সাহিত্যের বাহির থেকে দেখতে পাওনি। য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের যে প্রকাশ আছে ঘটনাক্রমে তার পরিচয় তোমার কাছে নেই। অথচ আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে-ভিতের উপর বাসা ফাঁদচে সে ভিৎটা য়ুরোপীয়। তার গল্প, তার কাব্য, তার নাটক, প্রাচীন রীতির আশ্রয়ে তৈরি হয়নি—সেই কারণেই য়ুরোপীয় সাহিত্যবিচারের আদর্শে তাকে বিচার করা ছাড়া অন্য পন্থা নেই। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এখানে খাটবে না।

এত বড় চিঠি লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কিন্তু যে আমাকে সত্যই বুঝতে চায় সে আমাকে পাছে ভুল বুঝে অস্থানে অর্ঘ্য আহরণ করে এটাতে আমার একান্ত অনভিরুচি ব'লেই এতটা লিখতে হ'ল। হয়ত কিছু অহঙ্কারের মত শোনাচ্ছে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমার ধারণা যদি অহঙ্কৃত ধারণাই হয় সেটাও প্রকাশ হওয়াই ভাল। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৩৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



অধ্যাপক চণ্ডীদাস

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

বাশুলী বাঁকুড়ার গ্রাম্য-দেবী। ইনিই বৌদ্ধদেবী বাহুল্যা। বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে পূজিতা হন বলিয়া বাশুলী গ্রাম্য-দেবী নহেন, নিয়ত রসিকগ্রামে বসতি করেন বলিয়াই ইনি গ্রাম্য-দেবী। ইঁহার আসন কনকবেদী; একারণ ইনি বাঁকুড়ায় কোথাও আবার 'স্বর্ণাসনী' বা সোনাসিনী। এক কালে বাঁকুড়ায় বৌদ্ধধর্মের প্লাবন বহিয়াছিল। বাংলার আদি কবি চণ্ডীদাস বাশুলী-পূজক ছিলেন। বাঁকুড়ার ছাতনায় চণ্ডীদাসের সমাধি আছে। সেখানে বাশুলী আছেন, চণ্ডীদাসের সাধন-গুরু রামী ধোবানীর ভিটাও সেখানে আছে। ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত,পদ্মলোচন শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত বাসলি-মাহাত্ম্য হইতে জানা গিয়াছে—বুধবর নিত্য-নিরঞ্জন চণ্ডীদাসের পিতা ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল বিন্ধ্যবাসিনী। তাঁহার অগ্রজ দেবীদাস, ছাতনার শ্রীহামীর উত্তর রাজা কর্ত্তৃক বাশুলীর পূজারী নিযুক্ত হন। চণ্ডীদাসও ছাতনায় থাকিতেন। একবার এক দস্যুদল কর্ত্তৃক নগর আক্রান্ত হইলে তিনি বাশুলীর স্তব করেন। তাহার ফলে বাশুলী নিজে যুদ্ধ করিয়া অবরুদ্ধ রাজাকে মুক্ত করেন। রাধানাথ দাসের বাসলি-বন্দনায় চণ্ডীদাসের উল্লেখ নাই, দেবীদাসের আছে। ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণের 'মাসিক বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস মহাশয় আর একখানি পুঁথির সংবাদ দিয়াছেন। তাহাতে চণ্ডীদাস ও রামীর প্রণয়োল্লেখ আছে। তিনখানি পুঁথিই ছাতনা হইতে আবিষ্কৃত।

আমি একখানি পুঁথি পাইয়াছি। ইহারও কোন নাম নাই। পুঁথিখানি খুব ছোট; কিন্তু সম্পূর্ণ। ইহার আকার সাধারণ পুঁথির এক তৃতীয়াংশ-রূপ। সর্ব্বসুদ্ধ পাঁচটি পাতা আছে। দু-এক জায়গায় পোকায় কাটিয়াছে। পুঁথিখানি বাঁকুড়ার তিন-চার মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে দারুয়া গ্রামের কোনও বৈষ্ণবের বাড়িতে কতকগুলি পরিত্যক্ত পুঁথির গাদার মধ্যে ছিল। ঐ গ্রামের কয়েক ঘর অধিবাসী বাশুলী উপাধিধারী। সেখানে বাশুলী-বাঁধ আছে। বাশুলীকে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। পুঁথিখানি সম্যক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

শ্রীরতি উদয় মণি।
সদা চিত্ত মোর উদয় করিহ : দয়া না ছাড়িহ তুমি ॥
জনমে জনমে : এ তুয়া চরণে : মরণ করিলু সার।
তুমি রসনিধি : প্রেমের অম্বুধি : তুমাতে রাখ্যাছি ভার ॥
তু জবে নবিন মণ্ডলে জাবি।
সেখানে রামারে থুবি ॥
নবিন কানন : নব বৃন্দাবন : কনক রাণন বেদি ॥
সে ত কনক আসন বেদি।
তাহাতে বসিয়া : বিভোল হইয়া : সাধিবে আপন সিদ্ধি ॥
এতেক করণ : প্রেম আচরণ : মনেতে বাধ্যাছি রামি।
রসিক দাশ : কহত পাস : রতি জগাইয় তুমি ॥ ১ ॥

প্রথম পদটিতেই রসিক দাশ ভণিতা পাইতেছি। বাকি পদগুলির কোনটিতেই এরূপ ভণিতা নাই। দু-একটিতে চণ্ডীদাস ভণিতা রহিয়াছে। কোনটিতে বা ভণিতা নাই। রসিক দাশ—চণ্ডীদাস বিভিন্ন ব্যক্তি মনে করিতে পারিলাম না। রসিক দাশ বলিয়া কোনও পদকর্ত্তার নাম শুনি নাই। বাউলমতি চণ্ডীদাস নিজেকে রসিক দাশ বলিয়া ব্যক্ত করিবেন—বিচিত্র নয়। একই পুঁথিতে একাধিক প্রথায় নিজেকে ব্যক্ত করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। শিবায়ণের 'রামকৃষ্ণদাস' 'কবিচন্দ্র' একই ব্যক্তি। একই পুঁথিতে 'কেতকাদাস' 'ক্ষেমানন্দ' ভণিতা পাওয়া যায়। চণ্ডীকাব্যের 'কবিকঙ্কন' 'মুকুন্দ' বিভিন্ন নহেন। দ্বিতীয় পদটি এই :—

বসি রাজ গতি পরি : পড়ুয়া পঠন করি :
হেনকালে য়েক রসের নাগরি দরশন দিল মোরে।
সে চাহিল নওান কনে : হানিল নওান বানে :
সেই হোত্যে মন : করে উচাটন : ধৈরজ না রহে প্রাণে ॥০॥

চণ্ডিদাস জুড়ি করে : বাস্থলির পায় ধরে :
বিনতি করিয়া পুছে বানি।

স্থন মাতা স্থদ্ধ সতি : বাউল হইল মতি :
কেমনে স্থদ্ধ হবে প্রানি॥

করজোড় করি বলি : শুন মাতা তু বাস্থলি :
কিবা বস্তু রজকের স্থতা।

তুমি কৈছে পরকিয়া : জান মাতা কহ ইহা :
তবে জায় রিদঅের বেথা॥

হাসিয়া বাস্থলি কয় : স্থন কবি মহাশয় :
য়ামি থাকি রশীক নগরে।

সে গ্রাম-দেবতা আমি : ইহা জানে রজকীনি :
জিজ্ঞাসিহ জতনে তাহারে॥

সে দেসে রজক নারি : সেহ রস অধিকারি :
কিশোরি স্বরূপ তার প্রান।
তুমি তার রমণের গুরু।
সেহ রস কল্পতরু : সদা তার দাসি অভিমান॥

তুমি মনে য়েক ক্ষণ : না হইয় য়চেতন :
চেতনে সদাই জেন জাগে।
তবে সত্য দুই জনে : পাবে নিত্য বৃন্দাবনে :
নব লেহ প্রীত য়নুরাগে॥

চণ্ডিদাস কহে মাতা : কহিলে সাধন কথা :
রামি সত্য প্রাণ প্রিয় হৈল।
নিশ্চয় সাধনে গুরু : সেহ রস কল্পতরু :
তার প্রেমে চণ্ডিদাস মৈল॥২॥

এই পদটি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, চণ্ডীদাস রাজবাড়িতে থাকিয়া পড়ুয়া পঠন করিতেন। রাজবাড়িতেই তিনি রামীকে প্রথম দেখেন এবং তাঁহার প্রেমে পড়েন। ইহার পরের পদটিতে রামীর সহিত চণ্ডীদাসের কথাবার্ত্তা।

কহিছে ধবিনি রামি : শুন চণ্ডিদাস তুমি :
নিশ্চয় মরমে বুঝিয়া জান।

বাস্থলি কহিল জহা : সত্য করি জান্ত তাহা
বস্তু য়াছে দেহে বর্ত্তমান॥

আমি সে আশ্রয় হৈই : বিসয়ি তোমারে কোই :
রমন সময় গুরু আমি।

য়ামার স্বভাবে মন : তোর রতি রশ গুন :
তাথে তোরে গুরু করী মানি॥

সহজ মানুস হব : নবিন মণ্ডলে জাব :
রহিব প্রণয় রস ঘরে।

শ্রীরাধা মোহন রাজা : হইব তাহার প্রজা :
ডুবিব রসের সরোবরে॥

সেই সরোবর মাঝে : মদন ভ্রমর রাজে :
ডুবি তাহা সদা পান করে।

তাহাতে মানুষ গন : তারা হয় পদ্মবন :
কিঞ্জুলক প্রনয় কলেবরে॥

সেই সরোবরে গিঞা : মনপদ্ম প্রবেসিঞা :
হংস প্রায় হইয়া রহিব।

শ্রীরাধা মাধব সঙ্গে : রতি যুদ্ধ রস রঙ্গে :
জনম মরণ তুমা পাব॥

স্থন চণ্ডিদাস প্রভু : সাধন না ছাড্য কভু :
মনের বিকারে ধর্ম্ম নাস।

মধুর-শ্রীঙ্গার রস : সাধনে মানুস বশ :
নিত্য নিলা দেহেতে প্রকাস॥

প্রাম দেবি বাস্থলিরে : জিজ্ঞাসিহ কর জোড়ে :
রামি কহে শ্রীঙ্গার সাধনে।

সরূপ য়রূপ জার : রসিক মণ্ডল তার
প্রাপ্তি হবে মদন মোহনে॥৩॥

চতুর্থ পদে চণ্ডীদাস কহিতেছেন :—

নিবেদন স্থন রজক স্থতা।
কেমন মানুস কহ না কথা॥

কেমন নগর কেমন দেহ।
কোন রাগ রশ কেমন লেহ॥

কেমন জনম মরণ তার।
কহ রজকীনি ভজন সার॥

চণ্ডিদাস কহে গুরু সে তুমি।
সিক্ষা দেহ পথ বুঝিব য়ামি॥৪॥

এইখানে পুঁথির প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রথম পদটিতে নূতন বিষয় রহিয়াছে। এই পদটির মাঝখানের কয়েকটি কথা উদ্ধার করিতে পারা গেল না। ঐ স্থানটি পোকায় কাটিয়া একদম নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। পদটি এই :—

কাহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডিদাস।
চাতকি পিয়াসি গণ : না পাইয়া বরিসন :
নওানের না গেয়ো পিয়াস॥

কি করিলে রাজা গৌড়েস্বর!
না জানিঞা প্রেম লেহ : ব্রেথাই ধরিয়ে দেহ :
বধ কৈলে প্রাণের দোসর॥

কেনে বা সভাতে কৈলে গান।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালপুর : আকোই গেয়ো বন্ধু চণ্ডিদাস চোর
* * * * * মানিনির না রহিল মান॥
গান স্থনিল রাজার বেগম।

য়স্থির হইল মন : ধৈর্জ্য নহে একক্ষন :
রাজারে কহে জানিঞা মরম॥
রানি মনের কথা রাখিতে নারিল।

চণ্ডিদাস সনে প্রীত করিতে বাড়ল চিত
তার প্রেমে য়াপনা খুয়াল্য॥

রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।
তরাম্বিতে হস্তি য়ানি পিষ্টে পেলী বাঁধ টানি:
তরাম্বিতে বোরিছ: রামি অনাথিনি নারি
মাধরির ডাল ধরি:
উচ্চস্বরে ডাকি প্রাণ নাথ।
হস্তি চলে অতি ঘোরে ভালস্তে না দেখি তোরে:
মাথেতে পড়িল বজ্রাঘাত॥
রামি কহে ছাড়িয়া না জায়্য।
দেখিতে প্রাণ: তার দেহে সন্ধান:
দুহু প্রাণ একত্রে মিলিল॥১॥

পদটির প্রথমার্দ্ধ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাস সুগায়ক ছিলেন। গৌড়ের রাজসভায় তিনি গান করিয়াছিলেন। তখন গৌড়ে মুসলমান রাজা। রাজার বেগম চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া তাঁহার প্রেমে পড়ায় রাজা তাঁহাকে বধ করেন। শেষার্দ্ধটি সহজবোধ্য নয়। পরবর্ত্তী পদটি পড়িলে ইহার অর্থ কতকটা পরিষ্কার হয়।

সুন গো জননী: কি হল্য না জানি:
কলঙ্ক হইল মোর।
ছাড়াইলে পদ: অমুল্য সম্পদ
এ কোন বিচার তোর॥
ভাই বন্ধুগনে: বলে কুবচনে:
ভালে উপদেস দিলে।
কি জানি পিরিতি: কান্দি নিতি নিতি
রহিতে না দিলে কুলে॥
রাত্রি দিন মনে: রজকিনি বিনে
সুয়াস্ত না পাই য়ামি।
পিরিতি সঙ্কট: মরন নিকট:
এই দসা কৈলে তুমি॥
করপুটে বলি: জা কৈলে বাসুলি
দস দসা পর গেস।
দেহ পদধূলি: মোর মাথা তুলি:
য়ার কি জিবনে য়াস॥
কহে চণ্ডিদাস: মনের লালস:
কি হল্য বিশম ব্যাধি।
রজক কিশোরি　প্রেমের গাগরি:
সেই শে মোর ঔসধি॥২॥

এই পদটিতে পাইতেছি চণ্ডীদাসের 'পিরিতি সঙ্কট মরণ নিকট' হইয়াছিল। কাজেই বুঝা যাইতেছে, ইহার আগেকার পদটিতে যে গৌড়-রাজের 'হস্তি য়ানি পিষ্টে ফেলা'র হুকুম, তাহা বেচারা চণ্ডীদাসেরই উপর জারি হইয়াছিল। প্রথমটা হস্তীটির চণ্ডীদাসকে ভাল করিয়া না দেখায় এবং পরে হস্তীটির মাথায় বজ্রাঘাত হওয়ার জন্যই হউক, কি অন্য কোন কারণেই হউক চণ্ডীদাসের সে-যাত্রা কোনও রকমে প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এই পদটি হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, রামী ধোবানীর সঙ্গে প্রেম করার অপরাধে তাঁহাকে রাজবাড়ির পড়ুয়া-পঠন চাকরিটিও হারাইতে হইয়াছিল।

ইহার পর আর দুইটি পদে পুঁথিটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। চণ্ডীদাস বাশুলিকে বলিতেছেন:—

কহ কেমনে সাধিব বল।
জেখুনি দেখিলুঁ　গুরু করি নিলুঁ
আশ্রয় আমার হল্য॥
সাধনের কথা　কহিবে বেবস্থা:
য়ামি ত না জানি মনে।
পুন সেবি তোমা　সব কহ আমা:
জেন থাকি একাসনে॥
দেবি কহে পুন　সুনহ বচন
রমন করিবে জবে।
তুমি শে বিসয়　সেই জে আশ্রয়
এই কথা সত্য হবে॥
রামির স্বরূপে য়ামি।
জখন চাহিবে: তখন দেখিবে:
মনেতে ভাবিহ তুমি॥
জন্ম জন্মান্তরে: সংশার ভিতরে
তিনেতে একত্রেরই।
বাসুলি পায়: চণ্ডিদাসধ্যায়:
নিরবধি জেন হই॥৩॥

বাশুলি উত্তর দিতেছেন:—

বাসুলি য়ানন্দে কয়:
সুন চণ্ডিদাশ মহাশয়:
য়ামার ভজন: দৃঢ় করি মান:
দুঃখ বিনে সুখ নয়॥

তোরে স্ফূর্ত্তি করাইল জেই।
নাগর মোহিনি সেই :
বড় এই কথা : জানিহ সর্ব্বথা :
মনের মরম কই ॥
অখণ্ড পিরিতি রশ :
তাহাতে হইলে বশ :
এ তিন ভুবনে : রসিক স্বজনে
গাইব তোমার জস ॥
তুমি কায়াস্তে সাধিলে কাজ।
আর কি রাখিলে লাজ ॥
ধোবিনি সঙ্গে থাক রসরঙ্গে
পাইবে রশিক রাজ ॥
তুনারে স্মরিবে কেবা।
নিত্য করে রাত্রি দিবা ॥
চিনিতে নারিলু : ফাপর হইলু
ইশ্বর মানুস কিবা ॥
বাশুলি কহয়ে ইহা।
কর চণ্ডিদাস লেহা ॥
রজকিনি সঙ্গে : প্রেমের-তরঙ্গে
মিলিবে নবিন দেহা ॥ ৪ ॥

পুঁথিখানি যে চণ্ডীদাসের নিজের রচিত সে-বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ দেখি না। চণ্ডীদাসের অগ্রজ দেবীদাস ছাতনায় বাশুলীর পূজারী ছিলেন। চণ্ডীদাসও সেখানে থাকিতেন। তিনি যে সেখানে এমনি বসিয়া থাকিতেন এমন হইতে পারে না। তাঁহার মত পণ্ডিতের রাজবাড়িতে অধ্যাপনা কাজ—খুবই বিশ্বাস-যোগ্য। তাই যদি হয় তাহা হইলে রাজবাড়িতে অধ্যাপকতা করিবেন একজন বিদেশাগত পণ্ডিত—ইহা কেমন কথা! বাঁকুড়ায় কি পণ্ডিত ছিলেন না? 'শূন্য-পুরাণে'র রামাই পণ্ডিত, 'ধর্ম্মমঙ্গলে'র কবি ময়ুরভট্ট ত বাঁকুড়ার লোক। উপরে উদ্ধৃত পদগুলি পড়িয়া চণ্ডীদাসকে বিদেশাগত ভাবিবার কিছু দেখিতে পাইতেছি না। বরং উহাতে এমন অনেক কথা রহিয়াছে, যাহাতে চণ্ডীদাসকে বাঁকুড়াবাসী বলিয়াই বেশী মনে হয়।

দেবী বাশুলীর কথা কি মিথ্যা হইতে পারে! চণ্ডী-দাসকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে চিনিতে হইলে, তাঁহাকে ভাবিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। এখনও বাঁকুড়ায় বৈষ্ণব আছে, বৈরাগীর আখ্ড়া আছে, সহজিয়া আছে, বাউল আছে। সকলের গৃহে গৃহে এখনও দুই বেলা পুঁথি পূজা হইতেছে। সেই সব পুঁথি-সমুদ্রে ডুব দিতে পারিলে কি মণি আবিষ্কৃত হইবে তাহা কে বলিতে পারে?





আলোকের সন্ধানে

শ্রীকণ্ঠ দেশাই

প্রবাসী প্রেস

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন যে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সকল বিষয় দেখিবার চেষ্টা করিলে নির্ব্বেদ প্রাপ্তি হয়, তখন দুঃখাবিষ্ট অর্জ্জুনের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিল যে শ্রীকৃষ্ণ কথিত স্থিরবুদ্ধি লোক নিশ্চয়ই অদ্ভুত ব্যক্তি হইবে। তাহার লাভালাভ জ্ঞান নাই, শোক দুঃখ নাই, কর্ম্মে আসক্তিও নাই, অনিচ্ছাও নাই, এ আবার কি প্রকার! অর্জ্জুনের মনে এখন শোকের বদলে কৌতূহল উঠিয়াছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

২।৫৪ "সমাধিস্থ অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মিকা একমার্গী স্থিতপ্রজ্ঞের বা স্থিরবুদ্ধিযুক্ত লোকের লক্ষণ কি? এইরূপ লোক কি সাধারণ লোকের মতই কথাবার্ত্তা বা চলাফেরা করে, না তাহাদের ব্যবহার অন্যপ্রকারের?" 'সমাধি' কথার অর্থ ২।৪৪ শ্লোকের অনুযায়ী করিয়াছি। অর্জ্জুনের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন সমস্ত গীতায় তাহাই সার কথা। পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে কি করিয়া এই স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থায় পৌছিতে পারা যায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়াছেন। ২।৫৫ হইতে ২।৭২ পর্য্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞের কথা আছে। এই শ্লোকগুলির পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করিয়া পরে ইহাদের সারাংশ উদ্ধৃত করিব। তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে পরবর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য কেন আসিয়াছে।

২।৫৫-৫৭ "যাহার মনোগত সমস্ত কামনা ত্যাগ হইয়াছে এবং যে আপনাতে আপনি তুষ্ট, যাহার দুঃখে কষ্ট নাই, সুখে আসক্তি নাই, কোনও বিষয়ে স্পৃহা নাই, ভয় নাই, ক্রোধ নাই, যে সর্ব্বত্র স্নেহবর্জ্জিত, নিজের ইষ্টানিষ্টে আগ্রহান্বিত বা বিরক্ত হয় না, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

২।৫৮ "কচ্ছপ যেরূপ নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শরীরের মধ্যে গুটাইয়া লইয়া বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া নিজের আবরণের মধ্যে স্থির থাকে, সেইরূপ যে ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটাইয়া লইতে পারে তাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত বা স্থির হইয়াছে।"

কঠোপনিষদে আছে—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ—
দাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ ৪।১
পরাচঃ কামানন্বয়ন্তি বালা
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ৪।২

পরমুখী হ'ল দ্বার স্বয়ম্ভুবিধানে
দৃষ্টি পরমুখী নহে অন্তরাত্মা পানে।
কদাচিৎ কোন ধীর অমৃত সন্ধানে
আবরিয়া চক্ষু দেখে প্রত্যক আত্মনে।
পর কাম লোভে ধায় বালমতি যার
বিস্তৃত মৃত্যুর পাশে পড়ে বার-বার।
কিন্তু ধীর জন সদা অমৃতে জানিয়া
অধ্রুবে না বাঞ্ছা করে ধ্রুবকে মানিয়া॥

অর্থাৎ, স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়-দ্বারসমূহকে বহির্মুখ করিয়া বিধান

অর্জ্জুন উবাচ—
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

শ্রীভগবান উবাচ—
প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করার কথা নাই। 'নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।' তাহাদের বশে আনিতে হইবে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ বা অন্তর্মুখ হয়, 'বশে' কথার ইহাই উদ্দেশ্য। স্থিতপ্রজ্ঞের অনুভূতির ক্ষমতা নষ্ট হয় না। 'মৎপর' কথাটার অর্থ—"আমার দিকে মন"। তিলক বলেন, "এস্থলে ভক্তিমার্গের আরম্ভ হইল।" শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে এই প্রথম ভগবান বলিলেন। সাধারণ হিসাবে কথাটা বড়ই অহঙ্কারের কথা। শ্রীকৃষ্ণের কথার যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিলে কথাটাকে ভক্তিমার্গের বা অহঙ্কারের কথা বলিয়া মনে হইবে না। ২।৫১ শ্লোকে বলিয়াছেন, বুদ্ধিযুক্ত হইলে অনাময় পদলাভ হয়। ২৫৯ শ্লোকে বলিয়াছেন, বুদ্ধিযুক্ত হইলে পরমতত্ত্ব লাভ হয় ও বিষয়-বাসনা রহিত হয়। বিষয়-বাসনা রহিত হইলে মন অন্তর্মুখ হয় ও তখন আত্মদর্শন হয় ও মন আত্মাতেই তৃপ্ত থাকে। আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ (২-৫৫)। ইন্দ্রিয়-সংহরণের ফলে আত্মদর্শন হয়, এ কথা কঠোপনিষদেও আছে দেখাইয়াছি। এইজন্য আত্মদর্শন বা নিজেকে জানা, ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মকে জানা বা পরমতত্ত্ব বা অনাময় পদলাভ সব একই কথা। "মৎপরায়ণ হও" বলাও যা, নিজেকে জান বলাও তা। ইহাতে কোনই অহঙ্কারের কথা নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে (৪।৪।১৩) :—"এই গহন শরীরে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ করিয়াছেন তিনিই বিশ্বকৃৎ, তিনিই সকলের কর্ত্তা। স্বর্গাদিলোক তাঁহারই এবং তিনিই এই সমুদায় লোক।" (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ)। রাজশেখর বসু বলেন :—

"সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়া যখন উপযুক্ত শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ দেন, তখন যদি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত আপনাতে আরোপ করিয়া কথা কহেন, তবে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কোন বিরাট প্রতিষ্ঠান বা সমবায়ের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মী যখন বলেন—"আমরা এই করি, এই আমাদের নিয়ম"—তখন তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান আপনাতে আরোপিত করিয়াই কথা কহেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত নহেন, অঙ্গ মাত্র, সেজন্য 'আমি' বলিতে পারেন না; অপরাপর অঙ্গের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিয়া বহুবচনে বলেন—'আমরা'। কিন্তু ব্রহ্ম অদ্বিতীয় sui generis; কোনও প্রতিষ্ঠান, কোনও সত্তা ব্রহ্মের সহিত উপমেয় নহে। বিশ্বের সহিত, তথা ব্রহ্মের সহিত একীভূত মানব যদি কেহ থাকেন, তিনি নির্ভয়ে নির্লজ্জায় বলিতে পারেন—'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা' (৭।৬)

রামমোহন রায় লিখিয়াছেন :—

"অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশকালে বক্তারা আত্মতত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন।...অতএব অধ্যাত্ম উপদেশে পরমাত্মাস্বরূপে বক্তার যে কথন, তাহার দ্বারা সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বিশেষে তাৎপর্য্য না হইয়া পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহার মীমাংসা বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩০ সূত্রে করিয়াছেন।... কৌষীতকি উপনিষদে ইন্দ্র উপদেশ করেন 'মামেব বিজানীহি' কেবল আমাকেই জান।...বামদেব কহিতেছেন যে 'আমি মনু হইয়াছি ও সূর্য্য হইয়াছি' (শ্রুতিঃ)। শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ভগবান্ কপিল কহিতেছেন 'তাবৎ অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যে বিশ্বস্বরূপ আমাকে যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তির দ্বারা ভজন করে তাহাকে আমি সংসার হইতে তারণ করি।' এই মীমাংসা তাবৎ অধ্যাত্ম উপদেশে ঋষিরা ও আচার্য্যেরা করিয়াছেন।" (গ্রন্থাবলী, ২৯৫)

২।৬২-৬৩ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সংহরণের আবশ্যকতা কি ? বিষয় উপলব্ধি হইলই বা। তাহাতে লাভ বই লোকসান কোথায় ? কি কি অবস্থায় বিষয়জ্ঞান দোষের হয় (২।৬২-৬৩) এবং কি অবস্থায় বিষয়োপ-লব্ধিতে দোষ হয় না (২।৬৪-৬৬) তাহা দেখাইয়াছেন।

ইন্দ্রিয় বহির্মুখ হইয়া বিষয়ের উপলব্ধি হইলে কি দোষ হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন।

এই দুই শ্লোকের শঙ্কর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই। তিলকের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিলাম, ইহা শঙ্করানুযায়ী :—"বিষয়ের চিন্তা যে ব্যক্তি করে, তাহার এই বিষয়সমূহে আসক্তি বাড়িয়া যায়; আবার এই আসক্তি হইতে এই বাসনা উৎপন্ন হয় যে আমার কাম (অর্থাৎ ঐ বিষয় লাভ) করিতে হইবে। এবং (এই কামের তৃপ্তি বিষয়ে বিঘ্ন হইলে) ঐ কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়—ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ অবিবেক আসে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে (পুরুষের) সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়।" এই অর্থ অনুসারে প্রথমে বিষয়-চিন্তা, তৎপরে বিষয়াসক্তি বা প্রীতি, তৎপরে বিষয়-কামনা, তৎপরে ক্রোধ, তৎপরে সম্মোহ অর্থাৎ 'অবিবেক অর্থাৎ কার্য্য ও অকার্য্য বিষয়ে বিভ্রম," তৎপরে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ শাস্ত্র

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩

এবং আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট অর্থ বিস্মৃতি এবং শেষে বুদ্ধিনাশ বা "কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অবিবেকতা, অযোগ্যতাই অন্তঃকরণের বুদ্ধিনাশ" হয়।

২।৬২ শ্লোকে 'ধ্যান' ও 'সঙ্গ' কথা আছে। ধ্যান মানে 'চিন্তা' ধরিলে গোল বাধে; বিষয়-চিন্তা হইতে বিষয়-আসক্তি আসে, না আসক্তি হইতে চিন্তা আসে? আসক্তি ও কামনায় পার্থক্যই বা কি? আবার সম্মোহ মানেও কার্য্যাকার্য্য বিষয় বিভ্রম, বুদ্ধিনাশ মানেও তাই। অতএব উপরের ব্যাখ্যার অর্থ পরিষ্কার হইল না। ইংরাজীতে কথা আছে "wish is father to the thought," এখানে কি তাহার বিপরীত বলা হইল? মনোবিদেরা বলিবেন এবং সাধারণেও বলিবে, আগে কামনা পরে তদনুযায়ী চিন্তা। আমার মতে বিষয়ধ্যান মানে বিষয়-চিন্তা নহে, বিষয়বোধ বা perception। পূর্ব্বের শ্লোকে ইন্দ্রিয়-সংহরণের কথা বলা হইয়াছে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগই বিষয়ধ্যান বলিয়া ধরিলে পূর্ব্বের শ্লোকের সহিত অর্থের সঙ্গতি থাকে। ১৩।২৫ শ্লোকে 'ধ্যান' কথা আছে। সেখানে শঙ্কর মানে করিয়াছেন "তৈল ধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ো ধ্যানম্" অর্থাৎ তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই ধ্যান (প্রমথনাথ তর্কভূষণ)। মনোবৃত্তি মাত্রই চিন্তন নহে। বহির্বিষয়-সংস্পর্শে বস্তুর প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় ইচ্ছাকৃত নাও হইতে পারে। বার-বার বস্তুর প্রত্যয় হইতে থাকিলে তাহাতে অবিচ্ছিন্নতা আসে ও তখন সেইরূপ প্রত্যয়কে ধ্যান বলা যায়। এখানে ইচ্ছাকৃত ধ্যানের কথা বলা হয় নাই। ইচ্ছাকৃত ধ্যানের মূলে কামনা আছে। সঙ্গ মানে attachment বা জোড়া লাগা। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের বার-বার সংযোগ হইতে থাকিলে পরস্পরের একটা বন্ধন হয়, এই বন্ধনই সঙ্গ। যে জিনিষ প্রত্যহ দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহার অভাব হইলে মনে একটা কষ্ট হয়। সঙ্গচ্ছিন্ন হওয়ায় এই কষ্ট। এই কষ্ট হইতেই জিনিষটি আবার দেখিবার বা শুনিবার কামনা জন্মে, এবং কামনা ক্রমে বৃদ্ধিও পাইতে পারে। যিনি পূর্ব্বে কখনও চা খান নাই, এমন কোন ব্যক্তিকে যদি চা খাওয়ানো যায়, তবে প্রথমে তাঁহার তাহা নাও ভাল লাগিতে পারে। কিন্তু প্রত্যহ খাইতে খাইতে, অর্থাৎ চায়ের স্বাদের প্রত্যয় হইতে থাকিলে 'সঙ্গ' জন্মিবে। তখন ক্রমে তাঁহার চা না-পাইলে কষ্ট হইবে, চা-পানের কামনা মনে উঠিবে। এই কামনা ভাল চা খাইব, গরম চা খাইব, ভাল বাটীতে খাইব, দিনে দুইবার খাইব, তিনবার খাইব ইত্যাদি নানাদিকে বর্দ্ধিত হইবে। সঙ্গের সহিত কামনার পার্থক্য এই যে, সঙ্গের অস্তিত্ব অমনি বোঝা যায় না,—বিষয়প্রাপ্তির অভাবের কষ্টে তাহা বোঝা যায়। সঙ্গকে কামনার negative phase বলা যাইতে পারে। কামনা বস্তুপ্রাপ্তির স্পষ্ট ইচ্ছা। কামনা বাধা পাইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ৩।৩৭ শ্লোকে কাম ও ক্রোধকে একই রিপু বলা হইয়াছে। সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কাম ও ক্রোধের সম্বন্ধ বিচার করিব। ক্রোধ হইতে 'সম্মোহ' হয়। আমার মতে সম্মোহ মানে কোনও বিশেষ কার্য্যে মোহ বা অতিরিক্ত ঝোঁক। কাহারও প্রতি ক্রোধ হইলে তাহাকে মারিবার ইচ্ছা সম্মোহজনিত। সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানলোপ। সামাজিক রীতিনীতি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই স্মৃতিলোপ হইলে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি। বুদ্ধি আমাদিগকে যেখানে নানাভাবে কার্য্য হইতে পারে সেখানে কোনও একটি বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়; যথা—কেহ আমাকে মারিল, আমি তাহাকে তিরস্কার করিব, কি মারিব, কি ক্ষমা করিব তাহা বুদ্ধিদ্বারা স্থির করি। সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানের বশেই আমরা বুদ্ধিকে চালনা করি। এইজন্যই বলা হইল স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধিনাশ হয়, এবং বুদ্ধিনাশের ফলে এমন কার্য্য করিয়া বসি যাহাতে নিজের অনিষ্ট হয়।

উপরে যে ব্যাখ্যা দিলাম তাহাতে এখনও গোল মিটিল না; এখানে বলা হইল বিষয়বোধ হইতে সঙ্গ, ও সঙ্গ হইতে কামনার উৎপত্তি। আমার মতে ভিতরে কামনা না থাকিলে বিষয়বোধই হইবে না। এবিষয় অন্যত্র আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। আধুনিক মনোবিদেরা বলেন, প্রত্যেক বিষয়বোধ বা

perception-এর একটা অর্থ আছে; এই অর্থ কি তাহা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। ছুরির প্রত্যক্ষ হইল অর্থাৎ জিনিষটা কি ও তাহার অর্থ বা উদ্দেশ্য কি ও ছুরির দ্বারা কি কাজ হইতে পারে, ছুরির প্রত্যক্ষের মধ্যে এই সব অর্থই আছে। মনোবিদেরা বলেন, এই অর্থ ক্রিয়ামূলক। ছুরি দেখিলে তাহার দ্বারা কি কাজ হয় তাহা অজ্ঞাতসারে মনে আসে। প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যেই একটা ইচ্ছা বা কামনা আছে। অবশ্য অনেক সময় আমরা এই ইচ্ছার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। এই ইচ্ছা না থাকিলে ক্রিয়ামূলক অর্থ আমরা বুঝিতেই পারি না এবং অর্থ না থাকিলে বিষয়ের প্রত্যক্ষই হইল না। আর এক দিয়াও প্রত্যক্ষের মধ্যে ইচ্ছার বা কামনার অস্তিত্ব বুঝা যাইতে পারে। যখন আমরা কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করি, তখন সেই বিষয়মাত্র জানিতে ইচ্ছা করি ও অপর কিছু জানিতে চাই না; এই অবস্থার অপর বিষয়ের প্রত্যক্ষই হয় না। লেখাতে মন দিলে ঘড়ি-বাজার শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না।

বিষয়বোধ হইতে সঙ্গ, ও সঙ্গ হইতে কামনা বলা কি তাহা হইলে ভুল? শাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন, কামনাই প্রথম। কি করিয়া সৃষ্টি হইল বা বহির্জগতের উৎপত্তি হইল বা বহির্বস্তুর প্রত্যক্ষ হইল, সে-সম্বন্ধে ঋক্‌বেদে নাসদীয় সূক্তে আছে :—(১০ম মণ্ডল ১২ সূক্ত)

> কামনার হল উদয় অগ্রে যা হ'ল প্রথম মনের বীজ;
> মনীষী কবিরা পর্য্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ
> নিরূপিলা সবে মনীষার বলে উভয়ের সংযোগের ভাব,
> অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব।
> —শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

ইহাতে স্পষ্টই বলা হইল মনীষীরা নিজের নিজের মন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে কামনাই প্রথম। ঐতরেয়োপনিষদে প্রথমেই আছে, "এই জগৎ পূর্ব্বে এক আত্মা মাত্র ছিল। নিমেষক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না।" তিনি ভাবিলেন "আমি কি লোক সকল সৃষ্টি করিব?" এখানেও কামনাকে প্রথম বলা হইল।

গীতার শ্লোকে যে-কামনার কথা বলা হইয়াছে তাহা পরিস্ফুট অবস্থার কামনা। উপনিষদে ও ঋক্‌বেদের শ্লোকে যে-কামনার কথা বলা হইয়াছে তাহা পরিস্ফুট কামনা নহে—অজ্ঞাত কামনা; মনীষীদের নিজ নিজ হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া ইহার অস্তিত্ব বুঝিতে হইয়াছিল, সোজাসুজি তাহা ধরা পড়ে নাই। বিষয়বোধের মূলে আমিও যে-কামনার কথার উল্লেখ করিয়াছি তাহাও অজ্ঞাত কামনা। এই কামনা অজ্ঞাত বলিয়াই বিষয়-বোধের পূর্ব্বে গীতায় ইহার উল্লেখ নাই; শ্রীকৃষ্ণ ইহার কথা বলেন নাই।

২।৬৪-৬৫ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা বিষয়-বোধ থাকিলেও কি অবস্থায় দোষ হয় না, এই দুই শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। "স্ববশীভূত আত্মা যার, এরূপ ব্যক্তি রাগ-দ্বেষ হইতে মুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করিয়া প্রসাদ প্রাপ্ত হন। প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে সকল দুঃখ দূর হয় ও প্রসন্নচেতা ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়।" এখানে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। চিত্ত প্রসন্ন হইলে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিবার উপায় রাগ-দ্বেষ-বিযুক্ত হইয়া বিষয়ভোগ। বিষয়ভোগ ব্যতীত চিত্তের প্রসন্নতা হয় না, কারণ মানুষের ধাতুগত প্রবৃত্তি বিষয়াভিমুখী। বিষয়বোধ না থাকিলে পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত ইন্দ্রিয়-সংহরণেরও কোন অর্থ থাকে না। কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়া বল্লী ২০ শ্লোকে আছে :—

> অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম।
> তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥

"সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ আত্মা এই প্রাণি-সমূহের হৃদয়ে অবস্থিত। অকাম ও বীতশোক ব্যক্তি ধাতুপ্রসন্ন হইলে আত্মা ও আত্মার মহিমার দর্শনলাভ হয়।" ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ ইত্যাদি কারণে ধাতু অপ্রসন্ন হইলে মন চঞ্চল হয় ও বুদ্ধি স্থির হয় না। উপযুক্তভাবে বিষয়ভোগে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি প্রশমিত হইয়া ধাতু প্রসন্ন হয় ও শরীরে ও মনে উদ্বেগ থাকে না। 'প্রসাদ' শব্দের অর্থ প্রসন্নতা, স্বাস্থ্য (শঙ্কর)।

> রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
> আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪

> প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
> প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

২।৬৬ চিত্ত প্রসন্ন না হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার আশা বৃথা।

"অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই ও ভাবনা নাই, ভাবনার অভাবে শান্তি নাই। অশান্তের সুখ কোথা।" 'অযুক্ত' অর্থে যে যোগ প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ যে কর্ম্মের কৌশল জানে না, অর্থাৎ যে রাগদ্বেষবিমুক্ত হয় নাই। ভাবনা অর্থে তৃপ্তি (রাজশেখর বসু) বা কোন বিষয়ে অভিনিবেশ (শঙ্কর)। যাহার ক্ষুধার জ্বালা প্রবল, তাহার পক্ষে চিত্তের প্রসন্নতা ও বুদ্ধি স্থির করা অসম্ভব। এজন্যই ধাতুর প্রসন্নতার কথা বলা হইয়াছে। "গীতাকার ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে বলেন না, সংযত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিতে বলেন,—তাহাতেই চিত্তপ্রসাদে উৎপন্ন হয়। 'ভাবনার' অর্থ তৃপ্তি করা হইয়াছে, কারণ ৩।১১-১২ শ্লোকে "ভাবয়ত', 'ভাবিত' শব্দও তৃপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে" (রাজশেখর)। ৩।১১-১২ শ্লোকে ভাবনার অর্থ শঙ্করও 'তৃপ্তি'ই করিয়াছেন।

২।৬৭ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে যাহার মন তাহার পশ্চাৎ দৌড়িতে চাহে, তাহার প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি বায়ুচালিত নৌকার ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়।

২।৬৮ সেজন্য হে মহাবাহো অর্জ্জুন, যাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাম তত্তৎ বিষয় হইতে নিগৃহীত বা 'সংহরিত' হইয়াছে তাহারই প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

২।৬৯ সকল লোকের যাহা রাত্রি অর্থাৎ সাধারণ লোকের পক্ষে যাহা অন্ধকার, তাহাতে সংযমী (অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়গণকে নিজ অধীনে রাখিয়াছেন) জাগৃত থাকেন। সংযমীর আত্মদর্শন হয়, কিন্তু আত্মা সাধারণের কাছে অন্ধকারে নিহিত। সাধারণের যাহাতে জাগরণ, অর্থাৎ বহির্বিষয়ে সাধারণের যে প্রবৃত্তি, মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট তাহা অন্ধকারময়। তিনি সেদিকে আকৃষ্ট হন না।

২-৭০ প্রবাদ আছে, সমুদ্র নিজ বেলাভূমি অতিক্রম করেন না। "সমুদ্রে শত শত নদী প্রবেশ করিলেও যেমন সমুদ্র অচল প্রতিষ্ঠ থাকে অর্থাৎ উপচাইয়া উঠে না, সেইরূপ সমস্ত কাম অর্থাৎ ভোগবস্তু অর্থাৎ তজ্জনিত প্রত্যয় যে-ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মনকে উদ্বেলিত করে না, সেই শান্তি পায়। যাহার মন কামকামী, অর্থাৎ বিষয়ানুভূতি হইলে তৎপ্রতি কামনাযুক্ত হইয়া ধাবিত হয়, অর্থাৎ বিষয়ভোগ ইচ্ছাজনিত বিক্ষোভ যাহার মনে উপস্থিত হয়, সে শান্তি পায় না।" এই শ্লোকে প্রথমে 'কাম' ও পরে 'কামকামী' শব্দ আছে। শঙ্কর প্রথম 'কাম' শব্দের অর্থ করেন 'বিষয় সন্নিধানে সকল প্রকারে তাহার ভোগের জন্য ইচ্ছা' ও দ্বিতীয় 'কাম' শব্দের অর্থ করেন 'কামনার বিষয়ীভূত বস্তু; সেই কামকে যে কামনা করে সে কামকামী'। শঙ্কর-মতে প্রথম কাম শব্দের অর্থ হইল 'ইচ্ছা', ও দ্বিতীয় কাম শব্দের অর্থ হইল 'বস্তু'। আমার মতে উভয় কাম শব্দের একই অর্থ ধরিতে হইবে। এখানে কাম শব্দে 'ইচ্ছা' না বুঝাইয়া 'কামনার বিষয়ীভূত বস্তু এবং তৎসন্নিধানে সেই বিষয়জনিত প্রত্যয় বা বস্তুবোধ' উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিশেষ অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্যই শেষ পদে 'কামকামী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপমার বিশিষ্টতা আলোচনা করিলেও এই অর্থই সঙ্গত দেখা যাইবে। বহির্বস্তু প্রত্যয়ই, সমুদ্রে নদীজলের ন্যায়, বাহির হইতে ক্রমাগত মনের ভিতরে প্রবেশ করে। ইচ্ছা বাহির হইতে আসে না। তাহা মনে উৎপন্ন হইয়া মনকে উদ্বেলিত করিয়া বহির্মুখ হয় অর্থাৎ বহির্বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। পূর্ব্বের শ্লোক-সমূহের অর্থ বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই আসিবে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্। ৬৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি। ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬৮

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। ৬৯
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী। ৭০

২-৭১ যে-পুরুষ সমস্ত কামনা ছাড়িয়া দিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিষয়ে বিচরণ করেন এবং যাঁহার মমত্ব ও অহঙ্কার নাই, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন।

এখানে অহঙ্কার কথার অর্থ বড়াই নহে। আমি করিতেছি এই যে জ্ঞান ইহাই অহঙ্কার। অহঙ্কার সম্বন্ধে পরে আলোচনা আছে। মমত্ব মানে মমতা বা বস্তুপ্রীতি।

২।৭২ "হে পার্থ, ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহা পাইলে মনুষ্য মোহগ্রস্ত হয় না, এবং ইহাতে থাকিয়া অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণ পায়।" সাধারণ প্রচলিত অর্থ "অন্তিমকালেও যদি ইহা লাভ হয়, ত ব্রহ্মনির্ব্বাণ মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।" উপরের অনুবাদ রাজশেখর বসু কৃত। তাঁহার মতে অন্বয় এইরূপ হইবে:—[হে] পার্থ, এষা ব্রাহ্মীস্থিতি; এনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ন; অপি অস্যাং স্থিত্বা অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ঋচ্ছতি।

২।৫৫ হইতে ২।৭১ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই:—

বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া দেখ, কোন কর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত হইতে পার না, কর্ম্মের ফলের উপর তোমার অধিকার নাই; অর্থাৎ কর্ম্মফল তোমার আয়ত্তে নাই, অতএব তুমি ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া কর্ম্ম কর। রাগদ্বেষবিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করার কৌশলকে যোগ বলে। তুমি যোগযুক্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যোগযুক্ত ব্যক্তি বেদোক্ত পাপপুণ্যে বিচলিত হয় না, যোগযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। স্থিতপ্রজ্ঞের কোন কামনা বা কোন বিষয়ে রাগদ্বেষ নাই বহির্বিষয়ে তাহার মন ধাবিত হয় না। বিষয়-সংযোগেও যোগীর বুদ্ধি বিচলিত হয় না, বরং চিত্ত প্রশান্ত হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাঁহার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ঘটে। তিনিই শান্তি লাভ করেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম বিষাদযোগ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সাংখ্যযোগ। তিলক বলেন, "এই অধ্যায়ের আরম্ভে সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাস-মার্গের আলোচনা, এই কারণে ইহার সাংখ্যযোগ নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে এমন বুঝিতে হইবে না যে-সমস্ত অধ্যায়ে ঐ বিষয়ই আছে। যে-অধ্যায়ে যে-বিষয় উহাতে মুখ্য তদনুসারেই ঐ অধ্যায়ের নামকরণ হইয়াছে।"

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২
ইতি সাংখ্যযোগঃ।



ট্রেনে

শ্রীসুধাকান্ত দে

১৩৩২ সনের চৈত্র মাস। তখনও হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গার জের চলিতেছে। এমনি একটা দিনে শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ দত্ত মহাশয় চিরদিনের জন্য নিজের আবাস ত্যাগ করিবেন মনস্থ করিলেন ও কন্যা কল্যাণীকে লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক কামরা লাল টুপিতে ভরিয়া গিয়াছে।

যে আত্মীয় তাঁদের উঠাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "গতিক বড় ভাল দেখিতেছি না। ওদের সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে সাপের সঙ্গে এক ঘরে থাকা ভাল। মুসলমানের মত খল ও হৃদয়হীন জাত দুনিয়ায় দুটি নাই।" এই বলিয়া মুসলমানদের উদ্দেশ্যে একটা গালাগালি দিলেন এবং নিজের অভিজ্ঞতার এক গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। বলা বাহুল্য, চুপে চুপে।

অভয়াচরণ ক্ষুব্ধচিত্তে কন্যা লইয়া ফিরিয়া যাইবেন, এমন সময় দেখিলেন, এক "দুসরা দরজা" কামরাতে একটি মাত্র আরোহী রহিয়াছে। তার মাথায় লাল টুপি নাই। গায়ে তসরের পাঞ্জাবী, পরণে খদ্দরের ধুতি এবং পায়ে বর্ম্মী চটি জুতা। আ! এতক্ষণে হিন্দুর ছেলের মুখ দেখিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা হইল। অভয়াচরণ তাড়াতাড়ি একগাড়ী জিনিষপত্র কামরার ভিতরে উঠাইয়া লইলেন। আত্মীয়টি গাড়ীর মধ্যে নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মুসলমানেরা এবার আচ্ছা শিক্ষা পাইয়াছে। বাঙ্গালীর ছেলের হাতে মার খাইয়া বাছাধনেরা বুঝিয়াছে, সে বড় শক্ত ঠাঁই। এখন দল বাঁধিয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে। বাপ! আজ যেদিকে তাকাই, লাল টুপি আর লাল টুপি। কিন্তু এখানে একটি হিন্দুর ছেলে রহিয়াছে কিনা, অমনি আর কেহ মাথাটি ঢুকাইতে সাহস করে নাই।" এই বলিয়া অপরিচিতের দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন।

অপরিচিত বলিল, "কিন্তু মুসলমানেরা কি বাঙালী নহে?"

আত্মীয় সে-প্রশ্নের আর উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না। গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। কল্যাণী নতমুখে তাঁকে প্রণাম করিল। তিনিও সাবধানে যাইবার উপদেশ দিয়া নামিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

অভয়াচরণ অপরিচিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাওয়া হইতেছে?"

"পাটনা।"

"কি উপলক্ষ্যে?"

"সাহিত্য-সম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্য।"

"পাটনায় সাহিত্য-সম্মিলন? কই শুনি নাই ত। কি করা হয়?"

"সাহিত্য-চর্চ্চা।"

"না, জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি কাজকর্ম্ম করা হয়।"

"কোন কাজ করি না।"

"পড়াশোনা শেষ হয় নাই?"

"শেষ হইয়াছে।"

"পাস—"

"এম-এ পাস করিয়াছি।"

"তবু কোন কাজ করা হয় না, সে কি হয়?"

যুবক শান্ত অথচ মধুর স্বরে বলিল, "আমি সাহিত্যের সেবায়, সৌন্দর্য্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে চাই।" তার চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। যেন সে কোন ভালবাসার জনের কথা বলিতেছে।

বৃদ্ধ একটু আশ্চর্য্য হইলেন। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নামটা কি জানিতে পারি?"

যুবক চুপ করিয়া রহিল।

"কোন আপত্তি আছে?"

যুবক হাস্য করিয়া উত্তর দিল, "মাপ করিবেন,

বলিব না। আমার নাম জানিয়া আপনাদের কোন লাভ হইবে না।"

অভয়াচরণ অপরিচিতের সুন্দর পরিষ্কার মুখের দিকে তাকাইলেন। সে-মুখে এমন কিছু মাখান ছিল, যে জন্য তাকে তাঁর অত্যন্ত ভাল লাগিল। সে যে নাম বলিল না ইহাতেও তিনি কিছু মনে করিতে পারিলেন না।

ক্রমে রাত্রি হইল। অভয়াচরণ, কল্যাণী ও অপরিচিত যুবক কিছু খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইবার বন্দোবস্ত করিলেন। অভয়াচরণ ও কল্যাণী শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। যুবকের ঘুম আসিল না। সে একটা বই বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। অনেক রাত্রে বই বন্ধ করিয়া আকাশপাতাল ভাবিল। তারপর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল।

ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। আধোআলো আধো-ছায়ার মধ্যে গাছগুলিও দৌড়াইতেছে। আকাশে চাঁদের আলোমাখা সাদা মেঘগুলি ভাসিয়া যাইতেছে। কখনও চাঁদকে আড়াল করিতেছে, কখনও সরিয়া যাইতেছে। আর সমস্ত প্রকৃতি হাসিয়া উঠিতেছে। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ ভাসিয়া চলিয়াছে। যুবকের সমস্ত মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিল, উন্মুখ হইয়া উঠিল। কি যেন সে চায়! কিসের জন্য যেন তার মন কাঁদে!

বাহির হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিল, অভয়াচরণ ও কল্যাণী অকাতরে ঘুমাইতেছে। কল্যাণীর মুখের ঘোমটা সরিয়া গিয়াছে। লাবণ্যময় সুন্দর নিটোল মুখখানি। ফরসা নয়। কিন্তু মমতাভরা নিদ্রিত দুই চোখ। যেন পদ্মের পাপড়ি। সুন্দর কপাল। যেন বুকের সমস্ত পবিত্রতা ঐ কপালে ঐ মুখে কে আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে। সেখানে ভায়ের জন্য, মায়ের জন্য, পিতার জন্য, স্বামীর জন্য কত প্রীতি, কত স্নেহ! পাতলা রাঙা নরম দুই ঠোঁট। তার উপর বাতির আলো পড়িয়া যেন স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিতে চায়। যুবক ভাবিল, "পৃথিবীতে এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য, এ কিসের জন্য, কার জন্য? এই-সব ভুলিয়া মানুষ ভায়ে ভায়ে কেন ঝগড়া করে?"

যুবক ভাবিতে লাগিল। কল্যাণীর কপালে কিছু কিছু ঘাম জমিয়াছিল। সে আস্তে উঠিয়া পাখা চালাইয়া দিল। কল্যাণীর কোঁকড়ান চুলগুলি বাতাসে উড়িতে লাগিল। সে আরামে ভাল করিয়া বাতাসের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল।

পরদিন সকাল বেলা একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই তারা তিন জন চা খাইতে লাগিল। চা খাওয়ার পর ট্রেন ছাড়িতে দেরি আছে দেখিয়া যুবক পায়চারি করিতে করিতে একটু দূরে চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, তিন জন গোরা আসিয়া কামরার মধ্যে উঠিয়াছে। অভয়াচরণকে কি বলিতেছে ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে। কল্যাণী এক কোণে জড়সড় হইয়া ঘোমটার মধ্যে কাঁপিতেছে। গোরা তিনটা এক একবার বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে চাহিতেছে।

যুবক গাড়ীতে উঠিয়াই বলিল, "দিদি! তোমার অমন সুন্দর মুখ ঘোমটা দিয়া কেন ঢাকিতেছ? তুমি সদর্পে মধুর মূর্ত্তি লইয়া এদের সামনে দাঁড়াও দেখি। এরা কুকুরের মত পলাইয়া যাইবে।"

অভয়াচরণ বলিলেন, "বড় বিপদে পড়িয়াছি। এরা আমাকে নামিয়া যাইতে বলে। এখন এই মালপত্র লইয়া—. গাড়ীও ছাড়ে।"

যুবক কহিল, "আমি ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি নিজের জায়গায় বসিয়া থাকুন।" তার পর গোরাদের দিকে ফিরিয়া: "তোমরা কি চাও?"

"আমরা বসিবার জায়গা চাই।"

"জায়গা ত যথেষ্ট আছে। ইচ্ছা করিলে বসিতে পার। কিন্তু আমি বলি কি, তোমরা অন্যত্র চেষ্টা দেখিলে ভাল করিতে। দেখিতেছ ত একটি মহিলা রহিয়াছেন।"

"তুমি ত বেশ ইংরেজী বলিতে পার। কিন্তু তোমরা অন্য গাড়ীতে উঠিয়া যাও।"

"কেন?"

"আমরা এই কামরায় থাকিব।"

"আমরাও মাশুলের টাকা গণিয়া দিয়াছি।"

"আমরা সাহেব। তোমাদের সহিত যাইব না।"

"কে তোমাদের মাথার দিব্য দিয়াছে? স্বচ্ছন্দে অন্য কামরায় যাইতে পার।"

"তোমরা যদি স্বেচ্ছায় না নাম, আমরা জোর করিয়া নামাইয়া দিব।"

যুবক হাস্য করিল : "ভাবিয়াছ, ভীরু বাঙালীর ছেলে, ভয় দেখালেই কাবু হইবে। আমি কে তোমরা জান না। তাই জোর করিয়া নামাইবার কথা মুখে আনিয়াছ। তোমরা আমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিতে চাও? বেশ, এস। আমি রাজী আছি।"

গোরারা তার একথায় একটুও ভয় পাইল না। কিন্তু সম্ভবতঃ তাদের শুভবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তাই তারা যুবকের করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিতে ভুলিল না, "তোমার সাহস দেখিয়া প্রীত হইলাম।"

গাড়ী পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলে অভয়াচরণ কহিলেন, "তোমার গায়ে কি খুব জোর আছে?"

কল্যাণীও প্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাইল।

যুবক হাসিয়া কহিল, "জোর থাকিলেও ওদের তিনটার সঙ্গে পারিতাম না নিশ্চয়।"

"ধন্য সাহস বটে।"

"পথ চলিতে সাহস না থাকিলে চলিবে কেন?"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পাটনা যাইবে বলিয়াছিলে না?"

"আমি মত বদ্‌লাইয়াছি। আমি এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইব। সেখানকার একটা কাজ সারিয়া পাটনায় যাইব।"

"বেশ, বেশ, তা হইলে তুমি অনেক দূর অবধি আমাদের সঙ্গে যাইতেছ।"

ইতিমধ্যে কল্যাণী ষ্টোভ জ্বালিয়া ভাতে ভাত চড়াইয়া দিল। তরকারী কুটিয়া রান্না করিল। সমস্ত প্রস্তুত হইলে অভয়াচরণকে বলিল, "বাবা, তোমরা দুজনেই খাইতে বস। আমি রাঁধিয়াছি।" এবং যুবকের দিকে তাকাইল।

যুবকের ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার কোন ওজর শোনা হইবে না।"

"কিন্তু আপনি শেষ অবধি না শুনিয়া—"

"আমি কোন কথা শুনিতে চাই না।"

"আমি বলিতেছিলাম কি—"

"পরে বলিলেও চলিবে।"

"আমি যদি ছোট—"

"আমরা জাত মানি না। আর ট্রেনে ত নয়ই।"

"দেখুন—"

"পরে দেখিলেও চলিবে।"

"আমি মু—"

"চুপ।"

"আপনি আমাকে আমার কথাই বলিতে দিতেছেন না। আমার কিন্তু কোন দোষ নাই।"

"তোমার আবার দোষ কি? আমাদের সঙ্গে চারটি খাইবে, এতে দোষ কোথায়? আমরা তেমন গোঁড়া নই। বিশেষ তোমার সম্বন্ধে।"

যুবক কল্যাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল সে দুই চোখে মিনতি ভরিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তার সরল চোখ যেন বলিতেছে, "তুমি যদি না খাও, আমি বড়ই দুঃখিত ও ব্যথিত হইব।"

যুবক কি ভাবিল কে জানে। নীরবে অন্ন গ্রহণ করিল। কিন্তু নিরানন্দ মনে। নিজের সম্বন্ধে যখনি কোন কথা বলিতে যায়, অভয়াচরণ বাধা দেন। মনে করেন ছেলেটা অসাধারণ লাজুক ও সরল। তিনি ততই তার উপর প্রীত হইয়া উঠেন।

যুবক বেশী কথা বলিল না। তাতে কিছু যায় আসে না। কল্যাণী তাকে পরম আদরে, পরম যত্নে খাওয়াইতে লাগিল। যেন তার ভাই। কোন্ নারী না নিজের হাতের রান্না খাওয়াইয়া গর্ব্ব অনুভব করে?

কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর হইতে যুবক কেমন বিমনা হইয়া বসিয়া রহিল। কারও সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করিতে চাহিল না। কিন্তু মানুষের স্বভাব এই, যে-বিষয়ে সে বাধা পায় সে-বিষয়েই তার আগ্রহ জন্মে। সুতরাং অভয়াচরণ অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁর নিজের ও কল্যাণীর কোন কথা জানিতে তার আর বাকী রহিল না। কিন্তু তাঁর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হইয়াও সে দুই একটি মাত্র কথার জবাব দিতে লাগিল। অভয়াচরণ যুবকের মনের মেঘ দূর করিতে সমর্থ হইলেন না।

তখন কল্যাণী অগ্রসর হইয়া তার নিকট বসিল। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হইয়াছে ?"

যুবকের হাসি পাইল। যেন কল্যাণী কত বুড়া মানুষ, আর সে বালকমাত্র। অথচ সে বয়সে এই মেয়েটির চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড় হইবে।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাদের কাছে গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। তোমরা ক্ষমা করিতে পারিবে কি ?"

কল্যাণী কহিল, "তুমি কখনই অপরাধ করিতে পার না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

অভয়াচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অপরাধ করিয়াছ শুনি ?"

"আপনাদের জাত মারিয়াছি।"

কল্যাণী বলিল, "আমাদের জ "

অভয়াচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন: "এই কথা ? তুমি ত শুনিলে, আমি এই মাত্র বলিয়াছি, এত বয়স পর্য্যন্ত আমার মেয়ের বিবাহ দিই নাই বলিয়া আগেই আমার জাত গিয়াছে। সুতরাং সে জাত তুমি কি করিয়া আর মারিবে ? কি করিয়া মারিয়াছ, বল ত ?"

"লোভে পড়িয়া।"

অভয়াচরণ কহিলেন, "সমস্ত কথা ভাঙিয়া বল।"

যুবক কহিল, "কাল আপনারা গাড়ীতে উঠিবার সময় আপনাদের আত্মীয়টি মুসলমানদের সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিতেছিলেন, আপনারা কি সে-সব বিশ্বাস করেন ? মুসলমান কি বাঙ্গালী ও মানুষ নয়—"

"কিন্তু সে-কথার সহিত তোমার সম্পর্ক কি ?"

"আমি জাতিতে মুসলমান।"

যদি সে সময়ে সেখানে বজ্রপাত হইত, তবে অভয়াচরণ অধিক আশ্চর্য্য হইতেন না। এই যুবক মুসলমান ! বলে কি ? ইহার সঙ্গে খাদ্য যে তিনি অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়াছেন ! সেই কথা এখন সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল, এবং তাঁর সমস্ত চিত্ত হায় হায় করিয়া উঠিল।

তাঁর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া যুবক বলিল, "আমার এ অপরাধ আপনারা ক্ষমা করিবেন না, জানি। কিন্তু লোভে পড়িয়া আমি এ কাজ করিয়াছি। আপনার কন্যার পবিত্র মুখখানি আমাকে এমন আকর্ষণ করিয়াছে যে, সেই টানে আমি এলাহাবাদ অবধি যাইতেছি।"

সুধু মুসলমান নয়, বেয়াদপও বটে।

কল্যাণীর সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে বাপের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "বাবা, মানুষের চেয়ে কি জাত বড় ? এই মুসলমান যুবকের সহৃদয়তার অনেক পরিচয় তুমি কি ইতিমধ্যে পাও নাই ? তুমি কি বলিবে ইনি কোন হিন্দুর ছেলের চেয়ে নিকৃষ্ট ?"

অভয়াচরণের চৈতন্য হইল। মৃদুস্বরে বলিলেন, "বুড়া হইয়া আমার মতিভ্রম হইয়াছে, মা। তাই এই উপকারী ব্যক্তিকে অপমান করিতে যাইতেছিলাম।" তারপর সেই যুবকের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া (ততক্ষণে তার মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে) : "আমায় ক্ষমা কর, বাবা। আমার আজ জাত নাই। তুমি সেই দুঃখময় মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়াছ। তবু দেখ নিজের সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।"

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও মহিলাদের কর্ত্তব্য

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়ের আমল থেকে আমাদের সমাজেও কত কত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। আমাদেরই পূর্ব্ব পিতামহগণ তাঁদের মা মাসি বোন স্ত্রী প্রভৃতিকে স্বামীর চিতায় জীবন আহুতি দিতে প্রোৎসাহিত কর্‌তেন, আমাদেরই পূর্ব্ব পিতামহী মাতা-মহীগণ তাঁদের সন্তান নদীতে সাগরে ভাসিয়ে দিতেন, এসব কথা এখন আমাদের বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা হয় না, তাঁদের আচরণে আমরা এখন লজ্জা ও দুঃখ বোধ করি। কিন্তু যখনই কোনো সংস্কারক সমাজের কোনো ত্রুটি সংশোধনের জন্য চেষ্টা করেছেন তখনই একদল লোক মহা কোলাহল ক'রে তাতে বাধা দিতে অগ্রসর হয়েছেন। যে-দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তি যত বেশী সে দেশে সমাজ-সংস্কার তত সহজ হয়েছে। শিক্ষা ও বিদ্যা প্রচারের দ্বারা সমাজে চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে যাঁরা শিক্ষিত চিন্তাশীল তাঁদের উপর গুরু দায়িত্ব নিহিত আছে। প্রত্যেক মানুষকে বল্‌তে হবে যে, আমি আমার দেশ ও সমাজকে যে অবস্থায় পেয়েছিলাম তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ক'রে রেখে গেলাম। ভগবানকে যেন আমরা বল্‌তে পারি যে—

"দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার"—

সে ভার আমি কথঞ্চিৎ লাঘব ক'রে গেলাম।

আমাদের দেশের সকল কর্ম্মসাধনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। পুরুষ ও স্ত্রী নিয়ে সমাজ, সকল কর্ম্মে স্ত্রীলোকের সাহায্য ও সমর্থন না পেলে কোনো কর্ম্ম সুসম্পন্ন হ'তে পারে না। নারী হচ্ছেন সমাজের কেন্দ্রশক্তি, তিনি বিরূপ বা উদাসীন থাক্‌লে ত সমাজ অগ্রসর হ'তে পারবে না। সমাজের সকলের সমবেত অভিজ্ঞতায় যত কিছু ত্রুটি ধরা পড়্‌বে, তারই সংশোধনের ভার নিয়ে সকলে মিলে সমাজ-রথকে অগ্রসর ক'রে দিতে হবে।

পরমেশ্বর সম্পূর্ণ, আর তাঁর সৃষ্টি অপূর্ণ। পরিবর্ত্তন প্রাণ-ধর্ম্ম, যা জায়মান তা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হয়, পরিবর্ত্তিত না হওয়া জড়ধর্ম্ম। তাই ব্যার্গ্‌সঁ বলেছেন সদাপরিবর্ত্তন-শীলতাই জীবনের সাক্ষ্য।—Change, Change, constant change is Life. পরমেশ্বর তাঁর সৃষ্টি অপূর্ণ রেখে মানুষের উপর ভার দিয়েছেন তাকে পূর্ণতর ক'রে তুল্‌তে হবে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।
আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও।
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

মানুষ অপূর্ণ, পূর্ণতর হয়ে ওঠ্‌বার নিরন্তর চেষ্টাতেই তার মাহাত্ম্য। মানুষের সকল কর্ম্ম অসম্পূর্ণ, তার সকল সৃষ্টিকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখে দেখে ক্রমাগত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন ক'রে চলাতেই মানুষের গৌরব। সমাজবিধি মানুষের উদ্ভাবন; মান্ধাতার আমলের বিধি মনুর আমলে বদল হয়েছে, মুশার আমলের বিধি মহম্মদের আমলে বদল কর্‌বার প্রয়োজন হয়েছে। এইরূপে মানুষ ক্রমাগত নিজের কর্ম্মশোধন কর্‌তে কর্‌তে অগ্রসর হয়ে চ'লে এসেছে।

যে-জাতি যত কালধর্ম্মকে মেনে তার সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে পেরেছে সে-জাতি তত কালোপযোগী হয়েছে, তারাই জগতের গতির নিয়ন্তা হয়ে জগন্নাথের রথকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের দিকে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে।

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয়নি বল্‌লেই হয়। আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষে কেবলমাত্র নিজের নামটা লিখ্‌তে আর প্রথম ভাগ পড়্‌তে পারেন এমন লোকদের লেখাপড়া-জানা ব'লে ধ'রে নিয়েও তাঁদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২২।২৩ জন। আমাদের বাংলা দেশে লেখাপড়া-জানা স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা টেনেটুনে মাত্র ৩ জন। বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ পশুর থেকে পৃথক হয়। জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি হ'লে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত হিতাহিত বুঝ্‌তে পারে, নিজের পরিবারের ও সমাজের কল্যাণ কিসে তা উপলব্ধি করতে পারে। অতএব আমাদের দেশের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে শিক্ষার প্রসার করা। শিক্ষার আলোকে অন্ধ কুসংস্কার সঙ্কীর্ণতা স্বার্থপরতা ক্ষুদ্রতা দূর হয়ে যায়, মানুষ মনুষ্যনামের যোগ্যতা লাভ করে।

কিন্তু না চাইলে কিছুই পাওয়া যায় না। সৃষ্টির প্রধান মন্ত্র হচ্ছে "আমি চাই।" তাই জিসাস্ ক্রাইষ্ট বলেছেন—

Ask, and it shall be given you ; seek, and ye shall find ; knock, and it shall be opened unto you.—St. Matthew, 7. 7.

আমরা বৈদিক মন্ত্ররচনাকারিণী মহিলাঋষি বিশ্ববারা ঘোষা অথবা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী কিংবা বিদ্যাবতী খনা লীলাবতী প্রভৃতির নাম উল্লেখ ক'রে যতই গর্ব্ব প্রকাশ করি না কেন, একথা সুনিশ্চিত যে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার অতি অকিঞ্চিৎ ছিল। যে-সব মহিলার নাম আমরা ইতিহাসে পাই তাঁরা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র, তাঁরা নিয়মের সাক্ষী নন। আমাদের দেশের শাস্ত্রে মহিলার সম্বন্ধে দু-একটি স্তুতিবাদ দেখে আমরা অনেক সময় ভ্রম ক'রে বসি যে আমাদের দেশে রমণীদের অবস্থা অতি সম্মানজনক ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাঁরা গৃহে ও সমাজে কোনো বিশেষ অধিকার পান নি, এখনও তাঁদের অধিকারের দাবি বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠেনি।

মহাত্মা বেথুন যখন কলিকাতায় প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন বিদ্যালয়ের গাড়ীর [illegible] শ্লোকটি লিখে দিতে হয়েছিল—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় অতিযত্নে সুশিক্ষা দিয়ে পালন করতে হবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতন সাহসী মনস্বীর প্ররোচনায় তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দুই কন্যা বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু তাঁদের সমাজে লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা যে পথ প্রমুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন তার জন্য আমরা চিরকাল তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে ঋণী হয়ে থাকব। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমাদের দেশের প্রত্যেক গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, এবং শতকরা অন্ততঃ ৯৯ জন বালিকাকে শিক্ষিত ক'রে তুল্‌তে হবে। এ কাজ এতদিন পুরুষে ক'রে এসেছে; এখন নারী-সমাজের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধানের ভার নিতে হবে নারীদের।

অশিক্ষা কুশিক্ষা দূর না হ'লে মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয় না। আমরা এখনও দেখি জ্বর হ'লে অনেক ভদ্র-মহিলা মনে করেন গায়ে বাতাস লেগেছে অর্থাৎ ভূতে পেয়েছে, ভয়ে ভূতের নাম না ক'রে বলা হয় বাতাস। হিষ্টিরিয়া হ'লে ওঝা ডাকা খুব প্রচলিত আছে। তাঁদের আচার-বিচার এখনও বিচারকে ত্যাগ ক'রে কেবল অন্ধ সংস্কার হয়ে রয়েছে। অতএব মানুষ হ'তে হ'লে প্রথম চাই শিক্ষা। তারপর স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা সকল মানুষেরই বিশেষ আবশ্যক। শরীর আমার, অতএব শরীরের হিতাহিত কিসে তা আমার জানা না থাকলে পদে পদে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে, এবং তা কখনও বাঞ্ছনীয় নয় এবং সম্ভবও নয়। বিদ্যালয়ে বালিকা-দের স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুস্থ সবল কর্ম্মঠ করতে হবে, তাদের উত্তম মাতা করতে হবে, তারা সুস্থ সবল সন্তানের জননী হয়ে দেশের কল্যাণের নিদান হবে।

আমাদের দেশের মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার কতগুলি অন্তরায় আছে, সেগুলি দূর না করলে শিক্ষা কখনও অধিকদূর অগ্রসর হ'তে পারবে না। স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান বাধা মেয়েদের অতি অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া। সারদা-আইনের কল্যাণে আমাদের দেশের মেয়েদের বাল্যবিবাহ অনেকটা বাধা প্রাপ্ত হবে বো

হয়। কিন্তু সে আইন বন্ধ কর্‌বার জন্য আমরা হিন্দু-মুসলমানে মিলে মহা কোলাহল সুরু ক'রে দিয়েছি। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, পূর্ব্ববঙ্গ স্ত্রীশিক্ষায় অনেক অধিক অগ্রসর, এদেশে মেয়েদের বিবাহও অপেক্ষাকৃত একটু বেশী বয়সে হয়ে থাকে, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গ এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এক জায়গায় আলোক জ্বাল্‌লে যেমন তার প্রভা অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি দেশের একাংশে জ্ঞানের বিকাশ হ'লে অন্য অংশগুলিও আর অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে পারে না। যাঁরা শিক্ষার অমৃত আস্বাদ পেয়েছেন তাঁদের কর্ত্তব্য যাতে আর-সকলে ঐ অমৃত আস্বাদন ক'রে নবজীবন লাভ কর্‌তে পারে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ কর্‌লে যে নবজীবন লাভ হয় তা আমাদের দেশ বিশেষভাবে জেনেছিল, তাই বিদ্যার্থীদের নাম হয়েছিল দ্বিজ অর্থাৎ নবজীবন-প্রাপ্ত। সকলকেই এই দ্বিজত্ব লাভ কর্‌বার সুযোগ দিতে হবে।

স্ত্রীশিক্ষার আর একটি অন্তরায় হচ্ছে পর্দ্দানশীন হয়ে থাকাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লক্ষণ ব'লে ভুল করা। আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমাদের দেশের মহিলারা এত দিন ধ'রে এই অপমান নীরবে শুধু সহ্য যে ক'রে এসেছেন তা নয়, তাঁরা একে সম্মানের বিষয় ব'লে গৌরব অনুভব করেছেন। ভগবানের অযাচিত দান আলোক ও বাতাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা নিজেদের হীনত্ব যে কেমন ক'রে স্বীকার ক'রে নিতে পেরেছেন তা ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। অভ্যাস এমনি জিনিষ যে অপমানও শেষে আর মনকে পীড়িত করে না। চীনদেশ অধিকার ক'রে মাঞ্চুজাতি দাসত্বের চিহ্ন-স্বরূপ চীনাদের দীর্ঘ বেণী ধারণ কর্‌তে বাধ্য করে-ছিল। এই হীনতার চিহ্ন তাদের শেষকালে গৌরবের বিষয় হয়ে উঠেছিল। মনস্বী সুন-ইয়াৎ-সেন দেশের মনে তাদের হীনতা সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চার ক'রে দিলেন, আর এক দিনে চীনেরা তাদের বেণী কেটে মুক্ত হ'ল। আমাদের দেশের একজন অধুনাবিস্মৃত পুরাতন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছিলেন, নারীগণ—

শৃঙ্খল বলয় পরে
বুঝাতে বিমূঢ় নরে
আমি তব নিগড়িতা দাসী।

মিসেস্ হোসেন তাঁর 'মতিচুর' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে নারীর এই-সব হীনতায় মর্ম্মাহত হয়ে সকল নারীর নামে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। স্বেচ্ছাকৃত সেবার মধ্যে মাধুর্য্য আছে, মাহাত্ম্য আছে, কিন্তু বেগারখাটার মধ্যে না আছে শোভা আর না আছে মর্য্যাদা। সমাজ যত বলশালী হোক না কেন, তার অন্যায় অত্যাচার সহ্য না-করার মত মনের বল আমাদের অর্জ্জন কর্‌তে হবে। মানুষের জন্মগত অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে থাক্‌ব না, এই পণ কর্‌লে দৃঢ় সঙ্কল্পের সম্মুখে কোনো বাধাই অধিক দিন টিঁকে থাক্‌তে পারে না।

বাল্যবিবাহ যদি না হয়, গ্রামে গ্রামে ও শহরের পাড়ায় পাড়ায় যদি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, আর মেয়েরা যদি অবাধে চলাফেরা কর্‌বার অধিকার ও সাহস পান, তবে দেশের অনেক সমস্যার সত্বর সমাধান হয়ে যেতে পারে।

মেয়েদের কেবল নিজেদের শিক্ষা লাভ ক'রে তৃপ্ত হ'লে চল্‌বে না, তাঁদের শিক্ষা-দানের ব্রত গ্রহণ কর্‌তে হবে। কেবল লেখাপড়া শিখলেই চল্‌বে না, শিল্প সঙ্গীত চিত্র স্বাস্থ্যতত্ত্ব চিকিৎসাবিদ্যা ধাত্রীবিদ্যা রোগী-সেবা রন্ধনবিদ্যা খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা করা ও দেওয়া তাঁদেরই কাজ, এও তাঁদের অধিগত কর্‌তে হবে এবং সমাজে এই-সব জ্ঞান প্রসারিত ক'রে সমাজকে উন্নত সুস্থ সুন্দর কর্‌তে হবে। গৃহকে আনন্দনিলয় কর্‌তে হবে।

আমাদের দেশের শিক্ষা দীক্ষা এতদিন অতি ধীর-মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়েছে। আমরা ইউরোপ আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে প্রায় এক শতাব্দী পিছিয়ে আছি। তাই এখন আমাদের দেশের বালিকাদের মধ্যেই শিক্ষা নিবদ্ধ থাকলে চল্‌বে না, আমাদের দেশের বয়স্কা স্ত্রীলোকদের মধ্যেও শিক্ষাবিস্তারের কঠিন সাধনা আমাদের কর্‌তে হবে। দেশে অনেক বিধবা পরের গলগ্রহ হয়ে অশেষ দুর্গতি ভোগ কর্‌ছেন, তাঁদের অবস্থার সংশোধনের একমাত্র উপায় তাঁদের স্বাধীন সম্মানজনক জীবিকা অর্জ্জনের উপযুক্ত ক'রে তোলা। যাঁরা

পুনর্ব্বার বিবাহে সম্মতা তাঁদের সেই সুযোগও ক'রে দেওয়া সমাজের কর্ত্তব্য।

দেশে যদি স্ত্রীশিক্ষার জন্য যথেষ্ট-সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয় তবে বালক-বালিকাদের একত্র প্রাথমিক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্বতন্ত্রভাবে হয়ে শেষে উচ্চ শিক্ষাও একত্র হ'তে পারবে।

বড়ই সুখের বিষয় যে সকল ক্ষেত্রেই বহু মহাপ্রাণ পুরুষ ও মহিলা কর্ম্মের সূত্রপাত করেছেন। বোম্বাই পুণা প্রভৃতি শহরে পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের সারদাসদন, মুক্তিসদন, রমাবাঈ রাণাড়ের সেবাসদন, অধ্যাপক কার্বের মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় ও বনিতাবিশ্রাম বা বিধবাশ্রম, গুজরাটস্ত্রীমহামণ্ডল ও ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল, আর্য্যমহিলা-সমাজ এবং বাংলার অবলাশ্রম বিধবাশ্রম ও সরোজনলিনী আশ্রম, অনাথ-আশ্রম, শিশুমঙ্গলালয় প্রভৃতি ভারতজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের অভাবের তুলনায় এই-সব অনুষ্ঠান অতি সামান্য।

মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করতে হ'লে তাঁদেরই নিজের অভাব সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে, এবং তাঁদেরই প্রতিকারের ভার নিতে হবে। প্রথম প্রথম তাঁদের বহু বাধার সম্মুখীন হয়ে সকল প্রতিকূলতা জয় করতে হবে। আমরা যদি ইউরোপীয় নারীদের অধিকার লাভের জন্য সংগ্রামের ইতিবৃত্ত আলোচনা করি তা হ'লে দেখতে পাব তাঁরা কি কঠিন তপস্যার দ্বারা একটি একটি ক'রে অধিকার অর্জ্জন করেছেন। তপস্যা বিনা কোনো মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। ভগবান স্বয়ং সৃষ্টি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়ে তপস্যা করেছিলেন, আমাদের উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন—সস্তপস্তপ্যত ; ইউরোপে সাফ্রেজিষ্ট্ মহিলাদের অগ্রণী মিসেস্ প্যাঙ্কহার্ষ্ট্ একদিন লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর জয় ঘোষণা করেছে। অল্প দিন আগে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে নারীর অধিকার লাভের সকল রকম চেষ্টা উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় যখন দেশের সকল সক্ষম পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বাধ্য হ'ল, তখন তাদের স্থান নেবার জন্য মেয়েদের দরকার হ'ল, এবং দেখা গেল পুরুষের সকল কাজই মেয়েরা পরম দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করতে পারছে, তারা পুরুষের চেয়ে কোনো বিষয়ে হীন নয়। এই স্পষ্ট প্রমাণের পরে আর নারীকে অবলা ব'লে অবহেলা করা চল্‌ল না। তখন ১৯১৯ সালে ইংলণ্ডে Sex Disqualification Removal Act পাস হ'ল এবং তার পর থেকে রমণীগণ সকল প্রকার কাজের যোগ্য ব'লে গণ্য হয়েছেন।

সমাজের ও রাষ্ট্রের কাজে নারীর স্থান হয়েছে। কিন্তু পরিবারে তাঁদের অবস্থা এখনও পুরুষের সমকক্ষ হয় নি। সমাজে পুরুষ কোনো অপকর্ম্ম করলে তার প্রতি সমাজ তত লক্ষ্য করে না, কিন্তু কোনো রমণী যদি ভ্রম ক'রে বসেন, তবে সমাজ তাঁকে ক্ষমা করতে পারে না। একই প্রকার অপরাধের জন্য উভয়ের বেলা ভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী যদি কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে স্ত্রী তার কাছ থেকে বিবাহ-বন্ধন-মুক্ত হতে পারবে না যদি সে প্রমাণ করতে না পারে যে স্বামী মন্দ স্বভাবের জন্য স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার উৎপীড়নও ক'রে থাকে। কিন্তু স্ত্রীর একটু চরিত্রস্খলন হ'লে স্বামী অতি সহজেই বিবাহ বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এই রকম বিভিন্ন ব্যবস্থা বদল করবার জন্য আধুনিক ইংরেজ মহিলারা আন্দোলন আরম্ভ করেছেন।

আমাদের দেশেও সমাজে পুরুষ ও নারীর অধিকারে অত্যন্ত তারতম্য আছে। এর প্রতিকারের জন্য নারীর মনে আগ্রহ সঞ্চারিত হ'লে এই বৈষম্য বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না। আমাদের দেশের হিন্দু পুরুষ যত খুশী বিবাহ করতে পারে ও যথেচ্ছা কারণে বা অকারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনো মুক্তি-পথ খোলা নেই, স্বামী যতই দুষ্ক্রিয় হোক না কেন স্ত্রীকে তার সঙ্গে ঘর করতেই হবে, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ ক'রে যায় তা হ'লে সে আর খোরপোষও পেতে পারে না। স্ত্রীলোকদের আর্থিক সঙ্গতি না থাকাতেই তাঁদের পুরুষের হাততোলা হয়ে তাদের প্রসন্নতার দিকে তাকিয়ে অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকতে হয়। এ রকম জীবনে কোনো মর্য্যাদা নেই। স্ত্রীলোক যদি আর্থিক সঙ্গতিতে স্বাধীন হ'তে পারেন এবং

তিনি পতির প্রতি প্রেমানুরাগের বন্ধনে তার পরিচর্য্যায় নিজেকে নিযুক্ত ক'রে দিতে পারেন তবে সেই সেবার তুলনা নেই। স্বামীও তা হ'লে স্ত্রীকে কখনও কোনো রকম অসম্মান করতে সাহস করবে না। স্বামীর মৃত্যু হ'লে বাংলা দেশের স্ত্রীরা স্বামীর সম্পত্তি থেকে যাবজ্জীবন ভরণপোষণ পাবার অধিকারিণী হন, কিন্তু ভারতের অন্য প্রদেশের স্ত্রীদের সে অধিকারও নেই। কিন্তু বাঙালী স্ত্রীর যে সামান্য অধিকার আছে তাও তাঁদের পুত্রদের অনুগ্রহসাপেক্ষ, যদি পুত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি থাকে তবেই তিনি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন, নতুবা তাঁর কষ্টের অন্ত থাকে না। আমাদের দেশে আগে একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল। এখন নানা কারণে সেই পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের স্ত্রীলোকের ত কোনো অধিকারই ছিল না, এখন একান্নবর্ত্তী পরিবার ভেঙে গেলেও স্ত্রীলোকের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নি। আগে অপমান সহ্য ক'রে হোক বা লাঞ্ছিতা হয়ে হোক তাঁরা পরিবারে দাসীবৃত্তি ক'রে দুবেলা দুমুঠি খেতে পেতেন, কিন্তু এখন স্বামী নিঃস্ব অবস্থায় মারা গেলে তাঁরা একেবারে অসহায় হয়ে পথে দাঁড়াতে বাধ্য হন। এই-সব ভেবে চিন্তে ফ্রান্সের আইন-প্রণেতেরা আইন করেছেন যে, বিবাহ হওয়া মাত্র স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অর্দ্ধেকের মালিক অংশীদার হয়ে যান। এই নিয়মটি অতিশয় সঙ্গত নিয়ম। যিনি পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী, তাঁর সেই পুরুষের সম্পত্তিরও অর্দ্ধাংশের মালিকানা স্বত্বে অধিকারিণী হওয়া সঙ্গত। আমাদের দেশের মহিলারা যদি আপনাদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম ক'রে দেশের আইন সংশোধনের জন্য আন্দোলন করতে আরম্ভ করেন, তবে এই সমস্ত দাবি অধিককাল উপেক্ষিত হয়ে থাকতে পারবে না।

স্ত্রীলোকদের সকল প্রকার দুর্গতির অবসান হয়ে যায় যদি তাঁরা আর্থিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারেন। যদিও আমাদের শাস্ত্র বলেছেন—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি।' আর্থিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হ'লে কেবল মাত্র পরের অর্থের অংশভাগিনী হয়ে স্বচ্ছন্দতা ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করব এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। পঞ্চায়েতে সকল স্ত্রীলোকদেরও অর্থ উপার্জ্জনের যোগ্যতা লাভ করতে হবে, এবং এই যোগ্যতার মূলে যে বিদ্যাশিক্ষা তা বলাই বাহুল্য, শিশু ও স্ত্রীলোকদের বিচারক হবেন নারীগণ; সমাজের শুচিতা রক্ষার ভারও গ্রহণ করবেন মহিলা পুলিস। তবেই সমাজে শ্রী শান্তি শৃঙ্খলা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে।

স্ত্রী হবেন স্বামীর—

> গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
> প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

গৃহের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, সংশয়কালের মন্ত্রী, নর্ম্মকালের সখী ও বিপদের আশ্রয়, এবং ললিতকলায় প্রিয়শিষ্যা। এ যে কত বড় দায়িত্ব তা মহিলারা একটু চিন্তা করলেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। এর জন্য তাঁদের প্রস্তুত হ'তে হবে, এই যোগ্যতা তাঁদের অর্জ্জন করবার সাধনা করতে হবে। এবং সেই সাধনার ফলে আমাদের সমাজে যে-সব গৃহলক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে তাঁরা হবেন মহর্ষি বাল্মীকির ধ্যানকল্পনার ভাবমূর্ত্তি, যাঁদের একজন প্রতিনিধির কথা রাজা দশরথের মুখ দিয়ে ঋষি বলিয়েছেন—

> যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীবচ্ চ সখীব চ।
> ভার্য্যাবদ্ ভগিনীবচ্ চ মাতৃবচ্ চোপতিষ্ঠতে।

তাঁরা কৌশল্যার মতন স্বামীর নিকটে একাধারে রমণীর সকল ভাবের সকল সম্পর্কের প্রতিমূর্ত্তি হবেন, দাসী সখী ভার্য্যা ভগিনী এবং মাতা।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদের মনে করা হ'ত দাসী, অথবা যাঁরা একটু সহৃদয় তাঁরা সম্মান দেখিয়ে বলতেন দেবী। কিন্তু আধুনিক মহিলারা বলছেন আমরা পুরুষের দাসীও নই, আমরা পুরুষের কাছে দেবী হয়ে থাকতেও চাই না, আমরা পুরুষের সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী হয়ে সমকক্ষতা লাভ করতে চাই। তাঁরা আজ যে কথা বলছেন ঠিক সেই কথা ভবিষ্যদ্দর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ বহু কাল পূর্ব্বে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র চিত্রাঙ্গদাকে দিয়ে বলিয়েছিলেন—

> আমি চিত্রাঙ্গদা।
> দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
> পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
> পিছে সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো

মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

এই যোগ্যতা অর্জ্জনের সোনার কাঠি হচ্ছে বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা। বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাই কর্ম্মের যোগ্যতা লাভ করা যাবে। এবং উপনিষৎ যে মুক্তিমন্ত্র বিশ্বের জন্য রেখে গেছেন তা জীবনে উপলব্ধি করা সহজ হবে—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্ তদ্ বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতম্ অশ্নুতে॥

যিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ই অনুষ্ঠেয় ব'লে জানেন, তিনি কর্ম্মের দ্বারা মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা পেয়ে বিদ্যার দ্বারা অমৃত আস্বাদন করেন।

যে-সব মহিলা জ্ঞানে কর্ম্মে দক্ষতা লাভ করেছেন তাঁদের দায়িত্ব অতিশয় গুরু। তাঁরা এখন নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোক দেখিয়ে তাঁদের অল্পভাগ্য ভগিনীদের পথ নির্দ্দেশ করুন। যাঁরা রোগে শোকে অভাবে উৎপীড়নে দুঃখিনী তাঁদের তাঁরা আশ্বাস প্রদান করুন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি আমাদের অভাগা দেশ তাঁদের শুভ প্রচেষ্টায় জ্ঞানে কর্ম্মে উন্নত হয়ে বিশ্বসভায় একটি সম্মানিত আসন লাভ করুক। এবং সেই সব সমাজ-সেবিকা কল্যাণীদের জন্য সকল কালের সকল দেশের মহাকবির বাণী উদ্‌ঘোষিত হচ্ছে—

"সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।" *

* ঢাকার মহিলা-পরিষদে পঠিত

অনাহূত

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জীবনের মর্ম্মমাঝে, হে জীবন-স্বামী,
বিচিত্র সম্পদরূপে রহিয়াছ তুমি
আমারি লাগিয়া। আমি পাইনি সন্ধান,
ভিখারীর মত তাই প্রকৃতির দ্বারে
গিয়াছিনু তুচ্ছ সুখ সম্পদের লাগি।
দেখাইল দম্ভভরে মহা আড়ম্বরে
ঐশ্বর্য্য অতুল তার প্রকৃতি আমারে
প্রবেশিতে নাহি কিন্তু দিল অন্তঃপুরে।
দাঁড়ায়ে বাহিরে সুদীর্ঘ দিবসব্যাপী
হেরিয়াছি ক্ষুধাতুর অতৃপ্ত নয়নে
সুষমা সম্ভার; ভেবেছিনু বার-বার
সাধিয়া তাহারে মাগিয়া লইব ভিক্ষা
জীবনের খাদ্য পেয়। বহু সাধনায়
যা পেয়েছি তুচ্ছ তাহা, কৃপণের দান।
বুঝিয়াছি হায় নাহি সেথা নাহি কিছু
তার অন্তঃপুরে, ভাণ্ডার তাহার রিক্ত।
ব্যয় করি সমগ্র সম্পদ রচিয়াছে
ভূষণ আপন, নিঃসম্বল এবে তাই।

নিরাশায় দিগ্ধ প্রাণে আসিয়া ফিরিয়া
ভাবিতেছি দৈন্য মোর ঘুচাব কেমনে,
সহসা আমার অন্তরের দ্বার খুলি,
বাহিরিলে তুমি, হেরিয়া চকিত আমি।
মুগ্ধ আঁখি মধুমত্ত ভ্রমরের মত
নিবদ্ধ রহিল পদে। জিজ্ঞাসিনু যবে
"হে সুন্দর, হে অপরিচিত, অলক্ষিতে
আমার অন্তর মাঝে পশিলে কেমনে?
খুঁজি নাই কভু আমি ডাকি নাই তোমা,
অনাহূত এলে আজি অচেনা বান্ধব!"
সুমধুর হাস্যে তব রঞ্জিল আনন,
প্রীতি স্নিগ্ধ স্বরে তুমি কহিলে আমারে
"অনাহূত নহি আমি, আমি বরাহূত
ডাকিয়াছ বার-বার সুখ দুঃখ মাঝে।
অন্তরেতে না চাহিয়া খুঁজেছ বাহিরে।
কবে যে ডেকেছ মোরে মনে নাই তব।
লও মোরে ঘুচে যাক সকল বেদনা
ঘুচে যাক ব্যর্থতার পরম লাঞ্ছনা।"

পুরানা গল্প

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

নূতন গল্প করেছি।* একটু পুরানা গল্প করি।

গল্প শুনবার দিন চলে গেছে, সে পাট উঠে গেছে। পুরানা গল্প এখন বই পড়ে শুনতে হ'চ্ছে। পুরানা গল্পের বই কলিকাতার কলেজ-ষ্ট্রীটে পাওয়া যায় না, "বঙ্গবাসী," "হিতবাদী," "বসুমতী"র সাহিত্য-প্রচার আপিসেও না। পেতে হ'লে কলিকাতার বটতলায় যেতে হয়, অন্য নগরে মণিহারীর দোকানে খুজতে হয়। বটতলার প্রকাশকেরা দেশের যে কি উপকার করেছেন, ক'রছেন, তা আমরা ভুলে যাচ্ছি। তাঁরা কীট-দংশন হ'তে কত পুথী রক্ষা করেছেন, তা ব'লবার নয়। সেকালে বইর এত দোকান ছিল না, আর, কে বা কলিকাতা গিয়ে বই আনবে? গাঁয়ে গাঁয়ে বই বিক্রির লোক ফিরত, যার ইচ্ছা হ'ত, সে দশখানা দেখত, খানিক খানিক প'ড়ত, তার পর কিনত। এখানে ওখানে জাত ব'সত, বইর দোকানও ব'সত। গ্রাম্য জন দু-আনা চারি-আনা আট-আনা পয়সা নিয়ে জাত দেখতে যেত, বইর পাতা উল্টে বই কিনত। যারা গাঁয়ে বই বেচতে আসত, তারা ছাপা বইর বদলে গাঁ হ'তে পুথী নিয়ে যেত। এমনই করে বটতলার প্রকাশকেরা নূতন নূতন পুথী পেতেন, ছাপাতেন. তাঁরা সংস্কৃত পুথী বাংলা ছন্দে অনুবাদও করাতেন। কাগজ খারাপ, ছাপায় ভুল থাকে। তা থাক। কে এত সস্তায় বই দিতে পারত? কে বা রামায়ণ মহাভারত প'ড়তে পেত? কাগজ খারাপ হ'লেও দু পুরুষ টেকে। গরীব গাঁয়ে পাকা ঘর নাই, পাকা ঘরেও উই আর ইঁদুর খলতা ছাড়ে না।

আমার গল্পের "ধুকড়ি" এখন জীবিত থাকলে প্রায় এক-শ বছর দেখতেন। তখন "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও "বত্রিশ সিংহাসন" পয়ারে ছাপা হয়ে থাকবে।* কিন্তু "দশকুমার চরিত" পয়ারে দেখিনি। "ধুকড়ি"র একটা গল্প এক কুমারের চরিত। সেটা দুষ্টা স্ত্রীর গল্প। তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? হয়ত সে গল্প অন্য বইতেও ছিল। গ্রামে "শতস্কন্ধ রাবণবধ" পুথী প'ড়তে দেখতাম। রামচন্দ্র রাবণবধ ক'রতে পারেন নি, সীতা কালীরূপা হ'য়ে রাবণের মুণ্ড ছেদন করেন। বিদ্যাপতিকৃত "পুরুষ পরীক্ষা" হ'তেও গল্প শুনেছি। যখন শুনেছি, তখন অবশ্য এ সকল বইর নাম জানতাম না। আর একখানি বই হ'তে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। বইখানির নাম "শুক বিলাস," বাংলা ছন্দে রচিত। "শুক সংবাদ" নামে না কি এক খানি সংস্কৃত বই আছে। আমার কাছে যে "শুক বিলাস" আছে তাতে লেখা আছে, "শুক বিলাস অর্থাৎ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা-

---

* "প্রবাসী"র এক পাঠিকা আমার "গল্প" প্রবন্ধে দু-তিনটা ভুল দেখিয়েছেন। ১৩০৭ সালের "সাহিত্যে"র "আগন্তুক" গল্পের লেখক শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় নহেন। তাঁর নাম শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি সে বছরের "সাহিত্যে" আর দুটা গল্প লিখেছিলেন, "প্রবাসী"তে নয়। দেখছি, আমার বিস্মরণ হয়েছিল। এখন মনে প'ড়ছে, শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় "প্রবাসী"তে লিখেছিলেন। পাঠিকা লিখেছেন, "কন্‌কাবতী মায়ের "জন্যে" নয়, মায়ের তরে' হবে। 'তরে'ই ঠিক। 'তরে,' 'নিমিত্তে,' 'জন্যে,' এই তিনের অর্থে ভেদ আছে। 'তার তরে ভাবনা'—তাকে তরে অন্তরে অন্তঃকরণে করে, স্মরণ করে ভাবনা। 'তার নিমিত্তে ভাবনা'—সে আমার ভাবনার নিমিত্ত কারণ, সেকি ক'রতে কি করে ফেলবে। 'তার জন্যে ভাবনা'—সে আমার ভাবনা 'জন্য' উৎপন্ন ক'রছে, কি জন্মে ক'রছে, তা স্পষ্ট নয়। 'দুদিনের জন্যে আসা'—এখানে অভিপ্রায় বুঝে 'তরে' কিম্বা 'নিমিত্তে' হবে।

* দেখছি, "বসুমতী সাহিত্য মন্দির" হ'তে প্রকাশিত 'মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী"র মধ্যে "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" প্রবেশ করেছে। একি ভ্রমের কর্ম্ম, না কিম্বদন্তী আছে? অন্য বহু প্রমাণ অগ্রাহ্য ক'রলেও সপ্তমোপাখ্যানে "হেমাদ্রি প্রতিপাদিত দানখণ্ড" দেখলেই বুঝি, "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" হেমাদ্রির পরে রচিত। হেমাদ্রি বিখ্যাত দাক্ষিণাত্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ "চতুর্বর্গচিন্তামণি" ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল। অতএব "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" চতুর্দশ শতাব্দের পূর্বে কিছুতেই হ'তে পারে না, কালিদাসের পারে না।

ধিরাজ বিক্রমাদিত্যের লীলা-বর্ণন এবং শুক-সংবাদ।" সন ১৩২০ সালে সপ্তম সংস্করণ হয়েছিল। শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীচুণীলাল দাসের আদেশে রচ্যেছিলেন। পুস্তকশেষে লিখিত আছে,

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নে আজ্ঞা পায়।
বিক্রমাদিত্যের কথা বিরচিল তায়॥
নিবাস ধুলুক সুদমণি অধিকারে।
সদা আশীর্ব্বাদ করি সভাতে যাহারে॥
শরীরে বাহন মাস দিয়া পারাবার।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ লোকচক্ষু বার॥
নৈত্র পৃষ্ঠে বাণ চন্দ্র শক নিরূপণ।
সাঙ্গ কৈল ইতিহাস স্মরি জনার্দ্দন॥

লিপিকারেরা শকাঙ্ক লিখতে ভুল ক'রতেন। এখানেও ভুল করোছেন। 'শরীরে বাহন মাস' না হয়ে, হবে 'শরের বাহন মাস'। খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গলেও 'শরের বাহন মাস' আছে। এর অর্থ শরাসন, ধনুমাস। 'দিয়া পারাবার'—দিনে পারাবার, সপ্তম দিবসে। 'নৈত্রপৃষ্ঠে' না হয়ে, হবে 'মৈত্রপৃষ্ঠে', মৈত্র = ১৭। অতএব নন্দকুমার ১৭৫১ শকে, প্রায় এক শ বৎসর পূর্ব্বে, বিক্রমাদিত্যের লীলা বর্ণন করোছিলেন। আর ছাপা হবার পাঁচ সাত বছরের মধ্যে বইখানা দূরগ্রামে গিয়ে পঁহুছেছিল।

"শুকবিলাসে" বিক্রমাদিত্যের কীর্তিকাহিনী আছে। কীর্তিকাহিনীগুলি বড়, শেষ ক'রতে সময় লাগে। বেতালের প্রশ্ন ও পুত্তলীর কথা ছোট। শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু গল্প শোনার তৃপ্তি হয় না। ছোট গল্পের দোষই এই। কমলিনীর কাহিনীতে বিক্রমাদিত্য পশ্চিম সমুদ্রের সে পারে শাল্মলী দ্বীপে গেছলেন। সে দ্বীপে কঙ্কাল পুরে 'কেলি' নামে নরাধিপ ছিলেন। কমলিনী তাঁর কন্যা। কাহিনী থাক, দেখা যাচ্ছে শুক-সংবাদ-লেখক পুরাণের শাল্মল-দ্বীপ ঠিক স্থানে বুঝেছিলেন, এক অসম্ভাব্য দেশ মনে করেন নি। সংস্কৃতে কিরূপ আছে জানতে ইচ্ছা হয়। নৃপতির নাম 'কেলি', এ নামও যেন ইতিহাসে পাবার। এখন বিখ্যাত স্বনামধন্য মুস্তফা-কেমাল-পাষা শাল্মল-দ্বীপের অধিপতি।

আমি ভানুমতী ও ভোজরাজার অসাধারণ ইন্দ্রজাল-বিদ্যার কাহিনী সম্পূর্ণ কোথাও পাইনি। ইন্দ্রজাল-বিদ্যা নূতন নয়। বহুকাল হ'তে এই বিদ্যা চল্যে আসছে। বোধ হয়, অসুররা এই বিদ্যায় পাকা ছিল, আর্য্যেরা হতভম্ব হ'তেন। এর প্রাচীন নাম মায়া। অসুরর মায়াবী ছিল। তাদের গুরু শুক্রাচার্য্য মায়া-বিদ্যা জানতেন, দেবতার গুরু বৃহস্পতি জানতেন না। সম্বর নামে এক অসুর মায়া-বিদ্যায় বিখ্যাত হয়েছিল। মহাভারতে শাম্বরাজা মায়াতে নিপুণ ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পেরে উঠতেন না। রাক্ষসেরাও জানত। রাক্ষসীপুত্র ঘটোৎকচ রাক্ষসী মায়া ক'রতেন। অবশ্য সকলেই জানত না। মারীচ রাক্ষস জানত। সে-ই মায়া-মৃগ হয়ে সীতা ও রামচন্দ্রকে ভুলিয়েছিল। ইন্দ্রজিৎ মায়া-বলে ইন্দ্রকে বন্দী করোছিলেন। কেহ কেহ মায়া ও ইন্দ্রজালে প্রভেদ ক'রতেন। মায়া, কুহক, সর্ব্বৈব মিথ্যা; ইন্দ্রজাল কৈতব, "চালাকি"। ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রের জাল চোখে প'ড়লে, রজ্জুতে সর্পভ্রম জন্মে। ভেল্‌কি এই। সেকালে মায়া ও ইন্দ্রজাল, দুই-ই যুদ্ধের অঙ্গ ছিল, কৌটিল্য দুই-ই লাগাতেন। তাঁর কালে ইন্দ্রজাল নাম হয় নাই। ইদানীর যুদ্ধেও মায়া প্রকাশ চ'লছে।

আশ্চর্য ব্যাপার নানা রকমে হ'তে পারে। যেটা নূতন দেখি, যার কারণ খুজে পাই না, সেটাই আশ্চর্য। অন্যে সে ব্যাপার ঘটালে তাকে ঐন্দ্রজালিক ভাবি। বিজ্ঞানে কত শত ইন্দ্রজাল আছে, যে বারম্বার দেখেছে সেও বিস্ময়ে অভিভূত হয়, যে না দেখেছে তার ত কথাই নাই। জলন্ত অঙ্গারের উপর চল্যে যাওয়া, কি অঙ্গার ফাব্‌ড়া-ফাব্‌ড়ি করা, আশ্চর্য কথা বটে, কিন্তু ভেলকি নয়, সত্য। এখানে বাঁকুড়া নগরের উপকণ্ঠে একতেশ্বর শিবের গাজনে প্রায় প্রতিবর্ষে অগ্নি-সন্ন্যাসীকে আগুনের উপর চ'লতে দেখা যায়।* আমি পুরীতে এক কুনবী বামুনকে (মান্দ্রাজের)

* রোগ-পীড়িত হয়ে লোকে মানসিক করে। কেহ বিশ হাত, কেহ দশ হাত মানসিক করে। রোগমুক্ত হ'লে শিবের মাড়োতে এসে অঙ্গনে চুলী কেটে অঙ্গারের আগুন করে। চুলীর দুই দিকে পুকুরের গুড়ো শেঅলা (যে শেঅলা দিয়ে গুড় হ'তে দলুয়া করা হয়) ও এক গর্তে কলাপাতা দিয়ে দুধ রাখে। দুধে পা ভিজিয়ে শেঅলায় দাঁড়িয়ে গন্‌-গন্যে আগুনের উপর দিয়ে চল্যে যায়। সেখানে আবার শেঅলায় ও দুধে পা দেয়, আবার আগুনের উপর দিয়ে চল্যে আসে। অনেকে একেবারে বিশ হাত পারে না, দশ হাত দশ দু বারে চলে। অনেকে তাও পারে না, পাঁচ হাত চলে, থামে, চলে। কেহ কেহ তাও পারে না, আড়াই হাত, চারি বার চল্যে দশ হাত করে। আশ্চর্য এই, পায়ে ফোস্কা পড়ে না।

কচ্-কচ করো কাচ চিবিয়ে খেতে, লোহার পেরেক গিলতে দেখেছি। সে সাপ খেতে পারে, বিষও খেতে পারে, কিন্তু কে এই মারাত্মক পরীক্ষা ক'রতে চাইবে। একবার আমার গ্রামের বাড়ীতে সকাল বেলায় এক পশ্চিমা ও তার স্ত্রী সাত-আট বছরের এক সিপ্-সিপে লেঙ্গটি-পরা মেয়েকে দিয়ে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়েছিল। মেয়েটি চোখ মুদে যোগাসনে এক হাঁটুর নীচে ছোরার ডগায় বসেছিল, এক মিনিট হবে। প্রথমে তিন স্থানে তিনটি ছোরা ছিল, পরে দুটা খসিয়ে নেয়। ছোরার অগ্রস্পর্শ নাম মাত্র। কোথায় বা মাধ্যাকর্ষণ, কোথায় বা ভারকেন্দ্র! হস্ত-লাঘব নয়, ইন্দ্রজালও নয়। যোগের লঘিমা কিনা, জানি না। সে এই একটি বিদ্যা জানত। কেহ কেহ পাকা দোতলার ঘরে সাপ দেখায়। হস্ত-লাঘব নয়, যোগও নয়, মায়া ব'লতে হয়। মনসার ঝাঁপানে দুই দলের মায়া পরীক্ষা হ'ত, বহু লোকের মুখে শুনেছি। এক দলের গুনিন অন্য দলের গুনিনের গায়ে মুড়কি ছুঁড়ে দিত, গুনিনকে ভীমরুলে কামড়াত; ঝেঁটা-কাটি ছুঁড়ে দিত, সাপ হয়ে আক্রমণ করত।* কিন্তু দুই-ই মিথ্যা। শুনলে বিশ্বাস হয় না। দেখলেও হ'ত না। আত্মারাম-সরকার মায়াবিদ্যায় প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি একালের সম্বর-সিদ্ধ ছিলেন। একবার আমাদের গ্রামে এক বিদেশী মায়িক খেলা দেখাতে এসেছিল। লোকে দেখছে, শূন্যে দোড়ী ঝুলছে, এক ছোকরা দোড়ী বেয়ে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় গুনিনের মুখ শুখিয়ে গেল, খেলা বন্ধ হ'ল। পরে জানা গেল সেখানে আত্মারাম-সরকারের এক শিষ্য ছিল, গুরুকে নমস্কার ক'রলে না দেখে, গুনিনকে অপদস্থ করেছিল। আমি দেখিনি, কিন্তু অবিশ্বাসও করি না। কারণ যা দেখেছি, যা শুনেছি, তা না-কে হাঁ-করাই বটে। "রত্নাবলী" নাটকের ঐন্দ্রজালিক রাজার অন্তঃপুর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, একজন নয় চারি পাঁচ জন আগুন ও ধুঁয়া দেখেছিল। বিদ্যাপতি তাঁর "পুরুষপরীক্ষা"য় ইন্দ্রজালে মেষ ও কুক্কুট-যুদ্ধ দেখিয়েছেন। ইদানী ইন্দ্রজাল-বিদ্যা লোপ পাচ্ছে। এখন ভোজ-বিদ্যা ও ভানুমতি-বিদ্যার দুই সম্প্রদায় আছে। প্রত্যেকের একটি একটি খেলাই, সে বিদ্যা। আর যে সব, সে সবের কোনটা হস্তলাঘব, কোনটা কৈতব। দক্ষিণের নিজাম হাইদারাবাদে এক সম্প্রদায় ভোজ-বিদ্যা দেখায়, জালে-বাঁধা পেঁড়ায়-পোরা বালককে অদৃশ্য করায়। মধ্যভারতের এক সম্প্রদায় ভানুমতী-বিদ্যা দেখায়, আমের আঁঠি পুঁতে গাছ করো আম ফলায়।

ভোজ-বিদ্যার দেশে সে বিদ্যা যে গল্পের বস্তু হবে, তাতে আশ্চর্য কি? শুক-বিলাসের কাহিনী বলি। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর সভায় প্রিয় মন্ত্রী-স্বরূপ শুককে জিজ্ঞাসলেন "এখন রাণী ভানুমতী কি ক'রছেন?" "রাণী বিনা সুতায় হার গাঁথছেন।" রাজা অন্দরে লোক পাঠিয়ে জানলেন, তাই বটে। তিনি পুনরপি জিজ্ঞাসলেন "হার গাঁথবার কারণ কি?" শুক ব'ললে, "আজ রাত্রে ভানুমতীর ভগিনী তিলোত্তমার বিবাহ, ভানুমতী বরের গলায় হার পরিয়ে দেবেন।" রাজা ও সভাজন শুনে অবাক্, উজ্জয়িনী হ'তে ভোজপুরী মাসেকের পথ, রাণীর যাওয়া যে অসম্ভব। "দুই ডাকিনী গাছ চালিয়ে ভানুমতীকে নিতে আসবে।" রাজা রাত্রে শীঘ্র শীঘ্র ভোজন করো মটকা মেরে শুয়ে রইলেন। রাজা ঘুমিয়েছেন ভেবে ভানুমতী অন্য ঘরে হার আনতে গেলেন, রাজা চুপি চুপি গাছের এক ডালে চড়ো ব'সলেন। পরে ভানুমতী গাছের যথাস্থানে ব'সলেন, গাছও নিমেষে ভোজপুরের অন্দরের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াল। রাণী ভিতরে গেলেন। রাজা অতঃপর কি ক'রবেন, ভাবছেন, এমন সময় মল্ল-অধিপতি ভূরিমল্লের পুত্র বর-বেশে রাজ-ভবনে আসছিলেন।* বিক্রমাদিত্য বরযাত্রীর দলে মিশে যাবার বুদ্ধি ক'রলেন। কিন্তু সে বুদ্ধি ঘ'টল না, বরযাত্রীরা মারতে গেল। মল্ল-অধিপতি বিবাদ মিটাতে গিয়ে ব'ললেন, "বাপু, এক কাজ ক'রতে পার? আমার পুত্র, কুৎসিত, কুব্জ। তাকে দেখলে ভোজরাজা কন্যা দিবেন না। তুমি বর-বেশে চল, বিবাহ হয়ে গেলে, রা'ত থাকতে চলো যাবে, তখন

* ১৩৩৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মেদিনীপুরের ঝাঁপানের কথায় এই রূপ কথা আছে।

* ভূরিমল্ল কি বিষ্ণুপুরের রাজা বীরমল্ল?

আমি বউ নিয়ে দেশে চ'লো যাব।" রাজা সম্মত। বরের রূপ দেখে সবার আহ্লাদ। বিবাহ হ'ল। বাসর-ঘরে ভানুমতী ভগিনীপতির সহিত কৌতুক ক'রলেন। রা'ত থাকতে রাজা হারটি নিয়ে গাছে চড়ো ব'সলেন, ভানুমতী পরে এলেন, গাছ চ'লল। উজ্জয়িনীর রাজ-পুরীতে এসে রাণী বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রতে গেলেন, সেই অবসরে রাজা নিজের ঘরে শয্যায় শুয়ে প'ড়লেন। রাণী দেখলেন, রাজা ঘুমাচ্ছেন। রাজা বাসর-ঘর হ'তে চলো আসবার সময় তিলোত্তমাকে বলোছিলেন, "দেখ, আমি বর নই, তোমার বর ভোরবেলায় আসবে।" ভোর হ'লে কুব্জ বাসর-ঘরে ঢুকবার উপক্রম ক'রলে। তিলোত্তমা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ঘরের ওল-তলায় ফেলে দিলে। সে কেঁদে উঠল। মল্ল-ভূপতি ভোজের কাছে তার তনয়ার অত্যাচারের প্রতিকার চাইলেন, মেরে পিঠে কুব্জ করো দিয়েছে! ভোজরাজ কন্যাকে জিজ্ঞাসলেন। সে ব'ললে, এই কুব্জের সঙ্গে বিবাহ হয়নি, বর চলো গেছেন। এই কলহের বিচার কে করে? অগত্যা দুই রাজা কন্যা ও পুত্র সহ উজ্জয়িনীতে গিয়ে বিক্রমাদিত্যকে বিচার ক'রতে ব'ললেন। বিক্রমাদিত্য সুযোগ পেলেন, শ্বশুরকে মিষ্ট ভৎসনা ক'রলেন, "কন্যার বিবাহ দিলে, মোরে নাই নিমন্ত্রিলে, কহ রাজা কিসের কারণ। এক ঘোড়া বড় আর, কি ক্ষতি হইল তোমার, ভয় হৈল করিতে বরণ॥"* তিলোত্তমাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। "শুনি তিলোত্তমা কয়, ও পতি কখন নয়, কুব্জ ও কুচ্ছিত অতিশয়। বিবাহ করিল যেই, পরম সুন্দর সেই, তনু তার অতি রসময়॥" কিছু নিশান আছে? রাজা নিজেই বিনা সুতার হার দেখালেন, সব প্রকাশ হয়ে প'ড়ল। ভানুমতীর লজ্জার সীমা রইল না।

ভানুমতীর এই গাছ-চালার গল্প আরও কোথায় আছে। কিন্তু গাছ-চালা ডাকিনী-বিদ্যা। যেখানে যত অ-চেনা গাছ আছে, সে সব অ-জানা দেশ হ'তে ডাকিনীর আনা। যেতে যেতে রাত পুইয়ে গেছল, গাছ রয়ে গেছে। ডাকিনী-বিদ্যা ইন্দ্রজাল নয়। আমি যে গল্প শুনেছি সেটা আশ্চর্য ইন্দ্রজাল। রাজা বিক্রমাদিত্য চরমুখে শুনলেন, ভোজরাজা তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ভানুমতীর স্বয়ংবরে বিবাহ দিবেন, কিন্তু কি কারণে বিক্রমকে নিমন্ত্রণ ক'রলেন না। ইতিপূর্বে ভোজের জ্যেষ্ঠা কন্যা তিলোত্তমার সহিত বিবাহ হয়েছে। রাজা মৃগয়া-ছলে তিলোত্তমাকে না জানিয়ে ভোজপুরের দিকে যাত্রা ক'রলেন, এবং যথাদিবসে ছদ্মবেশে ছদ্মনামে ভোজ-সভায় উপস্থিত হ'লেন। নানা দেশের অনেক রাজপুত্র এসেছেন, বিক্রমও তাঁদের কাছে ব'সলেন। অপরাহ্ণ হ'ল, ভোজরাজা ভানুমতীকে সভায় আসতে ব'ললেন। কিন্তু এক ভানুমতী নয়, শত ভানুমতী! সকলের এক রূপ, এক বেশ, এক চলন, এক ভঙ্গি! ভোজ ব'ললেন, যিনি ভানুমতীর গলে মালা দিবেন তিনিই কন্যা পাবেন। রাজপুত্রেরা কন্যা নিরীক্ষণ করে, পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে। বিক্রম বিহ্বল হয়ে বেতালকে স্মরণ ক'রলেন। এই সঙ্কেত হ'ল, বেতাল যার মুখের কাছে ভ্রমরগুঞ্জন ক'রবে, সেই ভানুমতী। এখন আর চিন্তা নাই। বিক্রম ভানুমতীর গলায় মালা দিলেন, তৎক্ষণাৎ অপর উনশত ভানুমতী অদৃশ্য!

রাজপুত্রেরা অধোবদন হয়ে স্ব স্ব দেশে যাত্রা ক'রলেন। ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বিক্রমের সহিত ভানুমতীর বিবাহ হ'ল। রাত্রি হ'লে তিলোত্তমা দাস-দাসীর অগোচরে গাছ চালিয়ে ভোজপুরীতে এলেন, বরের সহিত হাসি-তামাসা ক'রলেন, রাত্রি-শেষে ফিরে গেলেন। পরদিন প্রাতে বিক্রম স্বীয় পরিচয় দিলেন, তাঁর মৃগয়ার অনুচরেরা এসে জুটল। বর-কন্যা বিদায় হ'লেন। ভোজের দুই প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক ছিল, কুব্জ ও কুব্জী। ভানুমতী সে দু জনকে যৌতুক চেয়ে নিলেন। কিন্তু রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হ'লেন। রাজ-মহিষীর দাস-দাসী কিনা কুব্জ ও কুব্জী! ভানুমতীর ইঙ্গিতে কুব্জ কুব্জী রথে চড়ো ব'সল, রাজা রথ চালাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে কুব্জ কুব্জীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তিনি চটো উঠেন, কিন্তু ভানুমতীর ভয়ে কিছু ব'লতে পারেন না।

* অর্থাৎ "জামাই বরণ ক'রতে একটা ঘোড়া দিতে হ'ত, সেটা আর বড় কথা কি।" শত বৎসর পূর্বে গাঁয়ে গাঁয়ে দল-টাটু দেখা যেত। এখন শহরেও ঘোড়-সওয়ার দেখতে পাই না। মোটরের কল্যাণে রথের অশ্বও অদৃশ্য হচ্ছে।

কুব্জ কুব্জী বুঝতে পারলে, রাজা তা-দিকে সামান্য লোক মনে ক'রেছেন, শিক্ষা দিতে হবে। ভানুমতী সম্মত হ'লেন। বেলা এক প্রহর। রাজা দেখলেন, চতুরঙ্গ দলে পূর্ব দিনের মনোহত রাজপুত্রেরা যুদ্ধং দেহি ক'রতে ক'রতে তাঁর পথ ঘিরে দাঁড়িয়ে। রাজার সেনার সহিত ঘোর যুদ্ধ। সে যুদ্ধে রাজার যাবতীয় সেনা, সেনা-নায়ক হত হ'ল। তিনিও যুদ্ধ ক'রলেন, তাঁর তূণীরের শর ফুরিয়ে গেল। তখন হতাশ হয়ে শোকে অশ্রুবর্ষণ ক'রতে লাগলেন। কুব্জ ব'ললে, "মহারাজ, একি, কাঁদছেন কেন? বিবাহের পরদিন কান্না? এমন অমঙ্গল কর্ম ক'রবেন না।" এই উপহাসে রাজার শোক দ্বিগুণ উথলে উঠল। চোখ মুছলে দেখেন, কোথাও কিছু নাই, পথে জনমানব নাই! তাঁর নিক্ষিপ্ত শর পথে ছড়িয়ে আছে, অনুচরেরা পেছুতে বহুদূরে আসছে। তাঁর এমন ভ্রম কখনও হয় নি। তিনি লজ্জায় হেঁটমুখ হ'লেন। কুব্জ কুব্জী বুঝলে, শিক্ষা হয় নাই, আরও কিছু চাই। মধ্যাহ্ন হ'ল, স্নানের সময়! রাজা দেখলেন এক রমণীয় সরোবর, কত জলচর বিহঙ্গ, কত পদ্ম ও সুঁদী শোভা পাচ্ছে। তিনি রথ থামিয়ে, জলে অবগাহন ক'রতে গেলেন, জলে নামতেই তাঁর অঙ্গ রক্তাক্ত হ'তে লাগল। ভাবছেন, কি আশ্চর্য। এমন সময় কুব্জ ব'ললে, "মহারাজ, ক'রছেন কি? শরবনে এ কি ক'রছেন?" রাজা দেখলেন, সত্যই ত শরবন! তিনি সসাগরা পৃথিবীর মহারাজাধিরাজ, ভোজরাজ যাঁর এক সামান্য সামন্ত ভূপ। তাঁর কন্যা রাজার বুদ্ধির পরিচয় পেলেন! কুব্জ কুব্জীও উপহাস ক'রলে! তিলোত্তমাও শুনতে পাবেন! সন্ধ্যার সময় উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হ'লেন। তিলোত্তমা শুনলেন, রাজার মৃগয়া নয়, বিবাহ-যাত্রা। তাঁর অভিমান হ'ল। কিন্তু ভগিনীকে দেখে, যার বিবাহে তিনিও বরের সহিত হাস্য পরিহাস ক'রেছেন, তাঁর অভিমান আহ্লাদে মিশিয়ে গেল। রাজা কুব্জ কুব্জীকে দাস দাসীর ঘর দেখিয়ে দিলেন। ভানুমতী ব'ললেন, তা হবে না, তারা তাঁর আবাসের পাশে থাকবে, কুব্জ সভায় গিয়ে ব'সবে। রাজা চটে আগুন। পথে যা করার [illegible]

না। আবার মন্ত্রণা হ'ল, রাজার শিক্ষা হয় নি। পরদিন রাজা সভায় বসেছেন, পাত্র-মিত্র-সভাসদ সকলে বসেছেন, সভা গম্-গম্ ক'রছে, এমন সময় এক বৃহৎ অশ্বে এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে সমুখে বসিয়ে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত এক বীর এসে ব'ললেন, "মহারাজার জয় হউক। আপনার যশঃ-কীর্তি ন্যায়-বিবেক ও ধর্ম-বুদ্ধি অবগত হয়ে আপনার নিকট এক প্রার্থনা ক'রতে এসেছি। আমি পৃথিবী ঘুরে এলাম, একজন বিশ্বাসী রাজা দেখতে পেলাম না, যাঁর আশ্রয়ে আমার এই বনিতাকে একদিনের নিমিত্তে রাখতে পারি। ইন্দ্র আমায় যুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তাঁর দর্প অবশ্য চূর্ণ ক'রব। আপনি দয়া ক'রে আমার বনিতাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিন।" সভাসহ রাজা বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'লেও তথাস্তু ব'লে যুবতীকে অন্দরে পাঠিয়ে দিলেন। "আপনার কোন চিন্তা নাই, দেবী তিলোত্তমা স্বয়ং ওঁর তত্ত্বাবধান ক'রবেন।" "মহারাজার জয় হউক", এই ব'লে অশ্বারূঢ় শূর শূন্যমার্গে অন্তর্হিত হ'লেন। রাজা ও সভাজন অবাক্ হয়ে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বিস্ময় লঘু হ'তে না হ'তে অশ্বের এক কাটা পা সভার সমুখে প'ড়ল। কি কি ক'রতে না ক'রতে আর এক পা, ক্রমে শূরের রক্তাক্ত বাঁ হাত, ডা'ন হাত, মাথা ধড় প'ড়ল! এতক্ষণে পাত্রমিত্রের মুখে কথা ফুটল। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ! উন্মাদগ্রস্তই বটে! সভায় ঘোর কোলাহল। সে কল-কল শব্দ অন্দরে পঁহুছিল। "কি হ'ল, কি হ'ল" আর্তনাদ ক'রে যুবতী ছিন্ন দেহের উপরে লুটিয়ে প'ড়ল। কিয়ৎকাল পরে শোক সম্বরণ ক'রে যুবতী রাজাকে সহমরণের ব্যবস্থা ক'রে দিতে ব'ললেন। তা ত অবশ্য কর্তব্য। নগর-প্রান্তে সহমরণ হয়ে গেল। সভাজন ও পুরবাসী এক দুঃস্বপ্ন বোধ ক'রতে লাগলেন। এমন সময় আকাশে অশ্বের হ্রেষণ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বীর সভায় নেমে এলেন। "মহারাজার জয় হউক। ইন্দ্রের রণ-বাসনা মিটিয়ে এসেছি। এখন অনুমতি করুন, বনিতাকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করি।" সভায় বজ্রাঘাত হ'ল, সকলে অধোমুখে নিঃশব্দ। "মহারাজ, বিলম্ব ক'রবেন না।

বিখ্যাত। আপনার ন্যায় ধর্ম্মবীর অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। যদি প্রত্যুপকার গ্রহণ করেন আমি যথাসাধ্য নিশ্চয় সম্পাদন ক'রব। আমার বনিতাকে ডাকতে পাঠান। আমি ক্লান্ত হয়েছি।" "একি সকলে নীরব কেন? মহারাজ, আপনি নীরব কেন?" রাজা বজ্রাঘাত আর সইতে না পেরে সহমরণ পর্যন্ত সব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত ব'ললেন। অশ্বারোহী শুনে হা-হা-হা হাস্য ক'রে ব'ললেন, "মহারাজ, আমি অনেক জনপদ, অনেক রাজপুরী দেখেছি, এমন বাতুলপুরী কোথাও দেখিনি। আমি যুদ্ধে হত হয়েছি! অহো সভাজনকে ধিক্, আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে ধিক্। আমার বনিতাকে অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখে আপনি ব'লছেন, তিনি সহমৃতা হয়েছেন!" রাজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অন্তঃপুরে রয়েছেন, আপনি যেয়ে দেখুন। "মঞ্জুলা এস, এই অবিশ্বাসী রাজার ঘরে ক্ষণকালও থাকা নয়।" যেমন আহ্বান, নূপুর গুঞ্জন ক'রতে ক'রতে মঞ্জুলা সভায় এসে অশ্বে আরোহণ ক'রলেন। তৎক্ষণাৎ সব অদৃশ্য! সকলে ব'লতে লাগল, মহৎ আশ্চর্য মহৎ আশ্চর্য। কেবল কুব্জ ও কুব্জীর মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

পরদিন হ'তে বিক্রমাদিত্যের সভায় কুব্জের আসন প'ড়ল। তাঁর সভায় ঐন্দ্রজালিক ছিলেন না, নবরত্নে দশমরত্ন যুক্ত হ'ল।

কথকের গুণে এই কাহিনী চিত্তচমৎকারিণী হয়। অথচ ইন্দ্রজালের আশ্চর্য ব্যাপারে অসম্ভব কিছু নাই। কাল-মাহাত্ম্যে আশ্চর্যের দিন চ'লে গেছে। মণি-মন্ত্র-ওষধির গুণ হ্রাস পেয়েছে, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য লুপ্ত হয়েছে। গ্রামে নূতন নূতন গল্পের আলম্বন আর কই? রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ ছিলেন, তিনি অলৌকিক কর্ম্মও ক'রেছিলেন। দুই একজন পিশাচ-সিদ্ধ কিছুদিন পূর্বেও ছিলেন। আমি বহুকাল পূর্বে একজনকে দেখেছিলাম, তাঁর বিদ্যার পরিচয় নেবার বুদ্ধি তখন ঘটে নি। এফ-এ পরীক্ষার পর দেশের বাড়ীতে ছিলাম। একদিন বেলা ১১টা ১২টার সময় কোথা হ'তে এক রুক্ষ-কেশ, শীর্ণ-দেহ, মলিন-বেশ লোক এসে উপস্থিত হন। তিনি কিছুতেই আসনে ব'সলেন না, মাটিতে ব'সলেন কি অভিপ্রায়ে এসেছেন তাও কিছু ব'ললেন না। শুধু ব'ললেন, কোন বিদ্যা জানি, চিন্তা নাই। আমি ইতিহাসে কাঁচা ছিলাম, মাঝে মাঝে এই নিয়ে চিন্তা হ'ত। তিনি একটু পরেই উঠে চ'লে গেলেন, অর্থ কি ভোজ্য প্রার্থনা ক'রলেন না। আমার পাশে গ্রামের একজন ছিলেন, তিনি উঠে বাইরে খুঁজে এলেন, দেখতে পেলেন না। ইনি পিশাচ-সিদ্ধের লক্ষণ জানতেন। সিদ্ধেরা সর্বদা শঙ্কিত মাটি-ছাড়া কখনও থাকেন না। আমাদের গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পিশাচ সিদ্ধ ছিলেন। তিনি ফাঁড়িদারি কর্ম্ম ক'রতেন, রাত্রে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতেন। নদীতে প্রবল বন্যা, খেয়া বন্ধ; ফাঁড়িদার খড়ম পায়ে দিয়ে নদী পেরিয়ে যেতেন। অনেকদিন পরে কটকে এক পিশাচ-সিদ্ধের অলৌকিক শক্তির গল্প শুনি। এক প্রৌঢ় ডেপুটি ব'লেছিলেন। তিনি পুরীতে ছিলেন, সন্ধ্যার পর আটদশ জন বন্ধু জুটেছিলেন। এমন সময় এক জন এসে কিছু বিদ্যা জানি ব'লে পরিচয় দিলে। পুরীতে পান কিছু দুষ্প্রাপ্য। এঁরা পান চাইলেন। একখানি বস্ত্র দ্বারা ঘর বিভক্ত করা হ'ল। সিদ্ধ ভিতরে ঢুকলেন, আর, কোথা হ'তে এক থালা পান সুপারী মসলা তাঁদের সামনে উপস্থিত হ'ল। ডেপুটি বাবুর পরিবার সে পান মসলা দুতিন দিন ধ'রে খেয়েছিলেন।

যোগী ও সিদ্ধ পুরুষ দেখতে পাই না। যাঁরা আছেন তাঁরা ভক্তের নিকটেই দর্শন দেন। ভক্তেরা গুরুর মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন না। এখানে শুনি, ভদ্রঘরের এক বিধবা আজ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর কিছুমাত্র পানাহার না ক'রে কাল কাটাচ্ছেন। গৃহস্থালির সকল কর্ম্ম করেন। অনেকে চরকর্ম্ম ক'রেও তাঁকে কখনও কিছু খেতে দেখেন নি, জলও না।*

গ্রামে আর কবি নাই, ভাবুক নাই। গল্প বাঁধবার লোক নাই। কিন্তু এখনও রোমাঞ্চন লিখবার

* এই বিধবার নিবাস বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসের দিকে। বাংলা পত্রেও এঁর সম্বন্ধে একবার কিছু বেরিয়েছিল। এখন শীর্ণ হ'য়ে গেছেন, কিন্তু কর্মে অপটু হন নাই। বর্ত্তমান বয়স প্রায় পঞ্চা

উপাদান আছে। কত রাজার গড় আছে, অসুরের কীর্ত্তিও আছে, বড় বড় দীঘি ও বড় বড় পাথর। কিছুদিন পরে কিম্বদন্তীও থাকবে না।* বাঁধনি না পেলে কিম্বদন্তী স্থায়ী হয় না। এখন যাঁরা গল্প লিখছেন, তাঁরা ইংরেজী-পড়া, অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না। ইংরেজী-পড়া পাঠকও করেন না। বিজ্ঞানের প্রবল বন্যায় হাথীও থল পায় না, হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। যৌবন-কালে "রাসেলাসে"র কাহিনী প'ড়বার সময় মনে হ'ত, যদি মানুষ সত্য সত্য উড়তে পারে, তা'হলে অন্তঃপুরের 'অন্তঃ' কাটা যাবে, লোককে লোহার জাল দিয়ে ছাদ ঘিরতে হবে। এখন গ্রাম্যজনও দেখছে, পক্ষী-যান মাথার উপর দিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। আদি, বীর, করুণ ও অদ্ভুত রস, এই চারি রস নিয়ে কাহিনী। কিন্তু বীর ও অদ্ভুত রস মনকে সহজে মুগ্ধ করে। এই দুই রসের বস্তু দুষ্প্রাপ্যও বটে। সংসারে অন্য দুই রসের অভাব নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যে আদিরসের পরাকাষ্ঠা হয়ে গেছে। তার উপরে উঠা সোজা নয়। এখন করুণরস একমাত্র রসে ঠেকেছে। নানা কারণে গল্পকের বহির্মুখ শূন্য, যা কিছু কৃতিত্ব অন্তর্মুখে। এই কারণে গল্প-রচনা ভারি কঠিন হয়েছে।

গল্প হ'তে দেশের আচার ব্যবহার জানতে পারা যায়। মনের গতিও বুঝতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখ এই, দেখতে ব'সলেই গল্পের রস শুখিয়ে কাঠ হয়ে যায়। ব্যবচ্ছেদ কর্ম্মটাই নিষ্ঠুর, মধু-র কি, ফুলেরই বা কি। ব্যবচ্ছেদে মধু-র মিষ্টতা নষ্ট হয়, ফুলের শোভা নষ্ট হয়। কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনা ক'রতে দেখলেই কবির তরে দুঃখ হয়, সেটা যে কবিকে ব্যবচ্ছেদ। পুরাতন কাব্যের দীর্ঘ ব্যাখ্যা আবশ্যক হ'তে পারে, কিন্তু পাঠকের সমকালীন কাব্যের রস-ব্যাখ্যা ক'রলে তাঁকে রসাস্বাদ হ'তে বঞ্চিত করা হয়। পরের মুখে ঝাল খেলে তৃপ্তি হয় কি ?

* বেত্রগড়ে (গড়বেতায়) বকদ্বীপের বকাসুরের হাড় আছে। অনেক দিন হ'ল, সে বৃহৎ হাড়ের এক টুকরা পেয়েছিলাম। কুড়াল দিয়ে কাটতে হয়েছিল। হাড়খানি শিলাভূত বৃ কঙ্কর।

মোহভঙ্গ

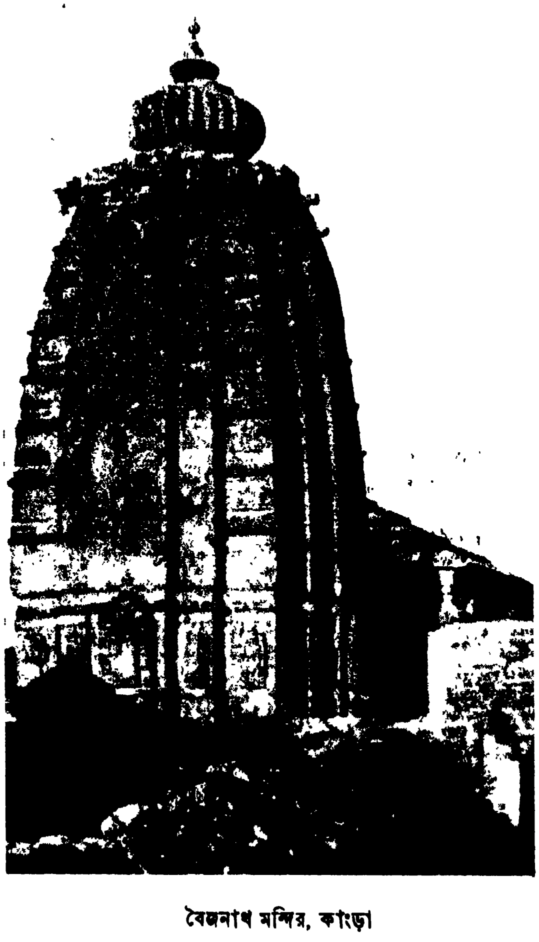
শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বয়স চলিয়া যায় ছুটি অতিক্রুত চঞ্চল-চরণে,
মোহমগ্ন মানবের প্রাণ আধ তন্দ্রা আধ জাগরণে।
'সহসা চমকি মেলি আঁখি ভীত অতি কম্পিত ভাষায়,
আকুল আবেগে কাঁদি ডাকে—"রে বয়স, ফিরে আয় আয়।
ফিরে আয় ফিরে আয় ওরে, হৃদয়ের সব ধন দিয়া,
এবার বাসিব ভাল তোরে বুকে বুকে রাখিব মাখিয়া।'
ভগ্নকণ্ঠে কহিল বয়স—"ওই কাল ডাকিতেছে ভাই,
বহুদূর যেতে হবে মোরে মাঝখানে কেমনে দাঁড়াই ?"

হিমালয় অঞ্চলের মন্দির

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

মধ্যভারত বা রাজপুতানার মত হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যেও অনেকগুলি সামন্তরাজ্য বহুদিন অবধি স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। তাহারা অনেকেই মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে নাই, এবং মাত্র ইংরেজ-শাসনের পরে করদ-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।



বৈজনাথ মন্দির, কাংড়া

পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে চম্বা, মণ্ডি, সুকেত, বনেদ প্রভৃতি রাজ্য ও যুক্তপ্রদেশে টিহরি, গাড়োয়াল প্রভৃতি ইহাদের থাকায় আর্য্যাবর্ত্তে যত প্রকার মন্দির গড়ার রীতি প্রচলিত ছিল, এখানে তাহার সবগুলির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা পঞ্জাবের অন্তর্গত চম্বা, মণ্ডি ও বৃটিশ-শাসিত কাঙ্গড়া জেলার মন্দিরগুলির আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতে যুক্তপ্রদেশের মধ্যস্থিত আলমোড়া জেলা ও টিহরি ও গাড়োয়াল রাজ্যের মন্দির-গুলির পর্য্যালোচনা করিব।

প্রথমে দেশটির সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। হিমালয় কয়েকটি সমান্তরাল গিরিশ্রেণীর দ্বারা রচিত হইয়াছে। সব চেয়ে দক্ষিণে শিবালিক পর্ব্বতমালা, তাহার পর ধওলাধার গিরিশ্রেণী ও তাহারও পরে হিমালয়ের অভ্রভেদী প্রধান শ্রেণী বিদ্যমান। পঞ্জাবে গুরুদাসপুর জেলায় ডালহৌসী নামে যে শহর আছে, সেখান হইতে এই তিনটি পৃথক শ্রেণীকে অতি স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে দেখা যায়। পশ্চিমে ও দক্ষিণে নীচে শিবালিক পর্ব্বত-মালা মাটির ঢিপির মত সামান্য মনে হয়। কিন্তু উত্তরে ও পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী অতি চমৎকার দেখায়। ডালহৌসী হইতে স্তরে স্তরে পাহাড়ের ঢেউ যেন উত্তর দিকে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। চক্রবালরেখার কাছে এই সকল পর্ব্বত এত উচ্চ যে, তাহাদের চূড়ায় চিরকাল বরফ থাকে। অনেকগুলি শুভ্র তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ মন্দিরের মত মেঘের শ্রেণী ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়!

সম্মুখে যে-সকল পাহাড় তাহার মাঝখান দিয়া খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী বহিয়া গিয়াছে। নদীর পাশে কৃষকগণের কুটীর। পাহাড়ের সমস্ত গা বাহিয়া গম, ভুট্টা বা ধানের ক্ষেত দেখা যায়। এখানকার চাষীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। পাহাড়ের ধারে খাঁজ কাটিয়া তিন-চার হাত



চম্বা শহরের নিকট পর্ব্বতগাত্রে সমতল-ক্ষেত্র

হয় যেন পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কাটিয়া রাখা হইয়াছে। নদীর ধারে এই সকল ক্ষেত্রে ধান জন্মায়, কিন্তু আরও উপরে গম, ভুট্টা, বাজরা প্রভৃতি ফসল হইয়া থাকে। চম্বা রাজ্যের মধ্যে কোন কোন উপত্যকায় বৃষ্টি বেশী হয়। সেখানে পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল আছে। যাহারা জঙ্গলে থাকে, তাহাদের পক্ষে চাষ করা কঠিন। তাহারা জঙ্গলে কাঠের কাজ করে। গাছ কাটিয়া তাহাকে চিরিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। বিশ-ত্রিশ মাইল দূরে যে সকল কাঠের বাজার আছে সেখানে তাহাদের অন্য লোকে এই সকল কাঠ ধরিয়া তুলিয়া লয়। যাহারা কাঠের ভারি বোঝা জঙ্গল হইতে লইয়া যাতায়াত করে তাহাদের মধ্যে কাশ্মীরী মুসলমান অনেকে আছে। শুনিলাম ইহাদের মত পরিশ্রমী ও ভারবহনে সমর্থ আর কেহ নাই। চাষ এবং কাঠের কাজ ভিন্ন চম্বা, মণ্ডি, কুলু প্রভৃতি প্রদেশে একটি চমৎকার ব্যবসায় প্রচলিত আছে। নদীগর্ভের মধ্যে অনেকে পাথর দিয়া ছোট একখানি দোতলা ঘর নির্ম্মাণ করে। এই ঘরের মেঝের ভিতর দিয়া একটি কাঠের গুঁড়ি নীচে পর্য্যন্ত নামাইয়া দেওয়া হয়। গুঁড়িটির নীচের দিকে ইলেকট্রিক পাখার ব্লেডের মত অনেকগুলি পাখী আটকান থাকে ও উপরে দোতলায় একটি যাঁতাও বাঁধা থাকে। নদীর জল জোরে পাখীগুলিকে আঘাত করিলে যাঁতাও ঘুরিতে থাকে এবং একজন লোক সেই যাঁতার দ্বারা গম, ছোলা অথবা ভুট্টা পিষিয়া আটা করিয়া লয়। একমণ মাল পিষিয়া দিলে যাহার যাঁতা সে দুই-তিন সের আটা বানি হিসাবে লাভ করে। আটা সরু-মোটা করিবার জন্য অথবা দানাগুলিকে ধীরে অথবা বেগে একটি ঝুড়ি হইতে যাঁতার মধ্যে ফেলিবার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

যাহাই হউক, চাষ বাস, কাঠের কাজ ও পানচক্কীর দ্বারা আটা-পেশাই ছাড়া হিমালয়ের এই প্রদেশে আরও দু-একটি বৃত্তি প্রচলিত আছে। উত্তরদিকে পাহাড় যেখানে খুব উচ্চ হইয়া গিয়াছে সেখানে চাষ সম্ভব নহে। বৃষ্টিপাত খুব কম বলিয়া পাহাড়ের গায়ে কেবল ঘাস জন্মিয়া থাকে। সেই জন্য এক শ্রেণীর লোক এই স্থানে মেষ ও ছাগলের পাল লইয়া বাস করে। শীতের দেশ বলিয়া পশুগুলিরা গায়ে খুব ঘন ও লম্বা লোম জন্মায় এবং মেষপালকগণ বৎসর বৎসর লোম কাটিয়া তাহা বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা



পাহাড়ের গায়ে চাষ এবং চাষীদের কুটীর

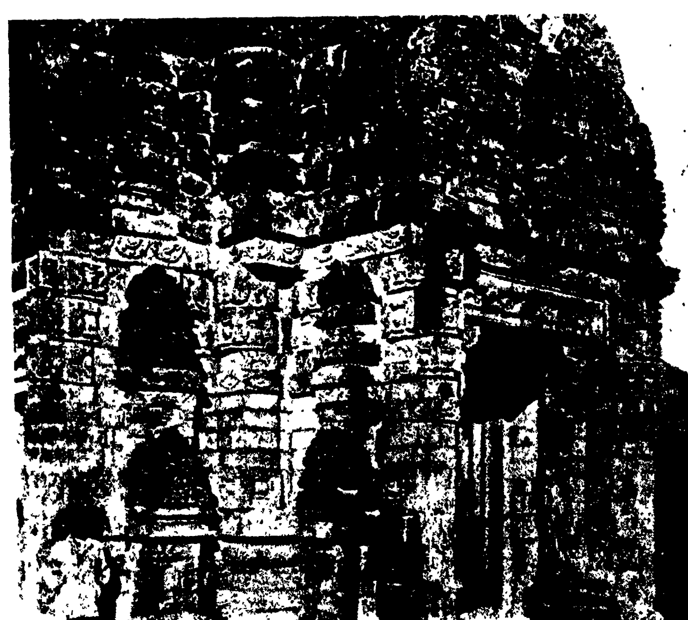
শুনা যায় তিনি নাকি নগরকোটের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া কয়েক কোটি টাকার জিনিষপত্র লইয়া যান। সে মন্দির অবশ্য এখন নাই। তাহার স্থানে পরবর্ত্তী কালে যে মন্দির রচিত হইয়াছিল তাহাও ১৯০৫ সালে দারুণ ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া যায়। কয়েক বৎসর হইল অমৃতসরের কয়েকজন উদ্যোগী পুরুষের চেষ্টায় সেইস্থানে আবার একটি মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে।

হিমালয় প্রদেশে পুরাকালে কিরূপ মন্দির প্রচলিত ছিল তাহা দেখিতে হইলে চম্বা শহরে যাওয়া প্রয়োজন। চম্বা শহর ইরাবতী নদীর তীরে সমতল ভূমিখণ্ডের উপরে অবস্থিত। শহরে কয়েকটি রেখমন্দির বর্ত্তমান। ইহাদের গঠন মানভূমের তেল-কুপি গ্রামের মন্দিরের মত। সম্মুখে পিঢ়া-দেউল

নির্ব্বাহ করে। শীতকাল হইলে এই প্রদেশে তুষারপাত হয় এবং মেষপালকগণ পশুর পাল এবং বিক্রয়ার্থ পশম লইয়া কুল্লু, মণ্ডি প্রভৃতি শহরের দিকে নামিয়া আসে।

দেশের স্বাস্থ্য বেশ ভাল, কিন্তু একটি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পাহাড়ীদের মধ্যে অনেকের গলগণ্ড দেখা গেল। ইহা হয় ত পাহাড়ী জলের দোষে হয়। হিউএন-সঙ বহুকাল পূর্ব্বে এই দেশের ভিতর দিয়া যখন যান তখন তিনিও দেখিয়া গিয়াছিলেন যে, গলগণ্ড রোগে নগরকোট নিবাসী অনেকে পীড়িত। অতএব রোগটি বেশ পুরাতন বলিতে হইবে।

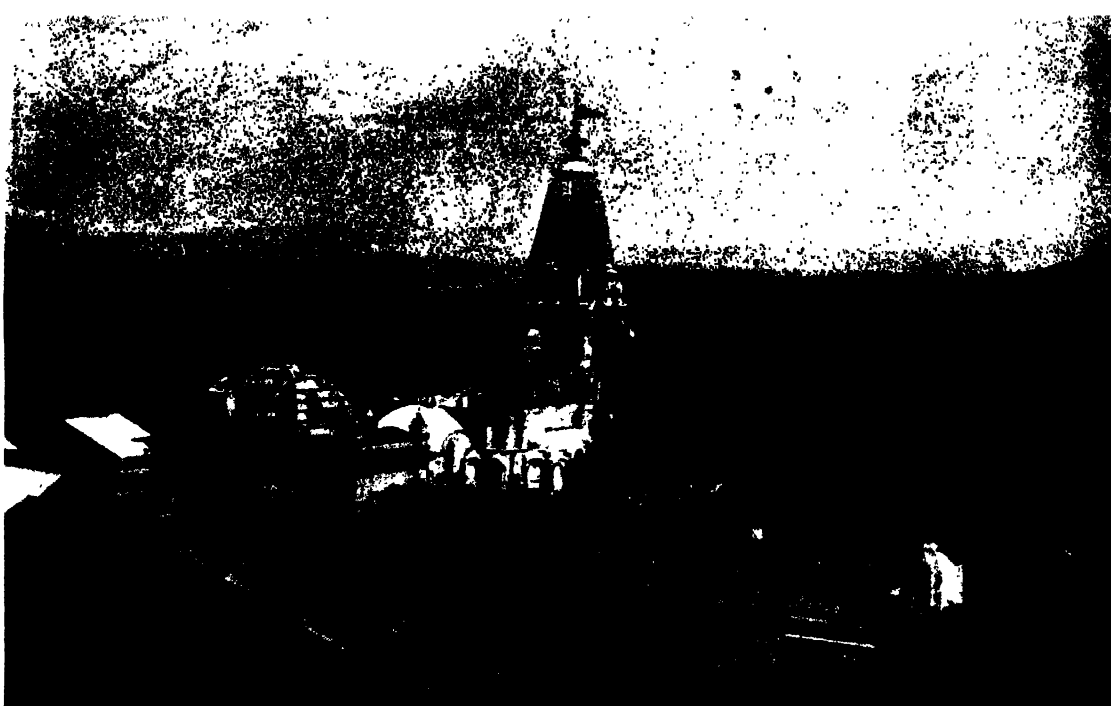
বর্ত্তমান কালে যেখানে কাঙ্গড়া শহর তাহাই পূর্ব্বে নগরকোট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। নগর কোটের বজ্রেশ্বরী দেবীর মন্দির খুব প্রসিদ্ধ। মহমুদের নগরকোট লুণ্ঠন ত' ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যাপার।



বজৌরা মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার



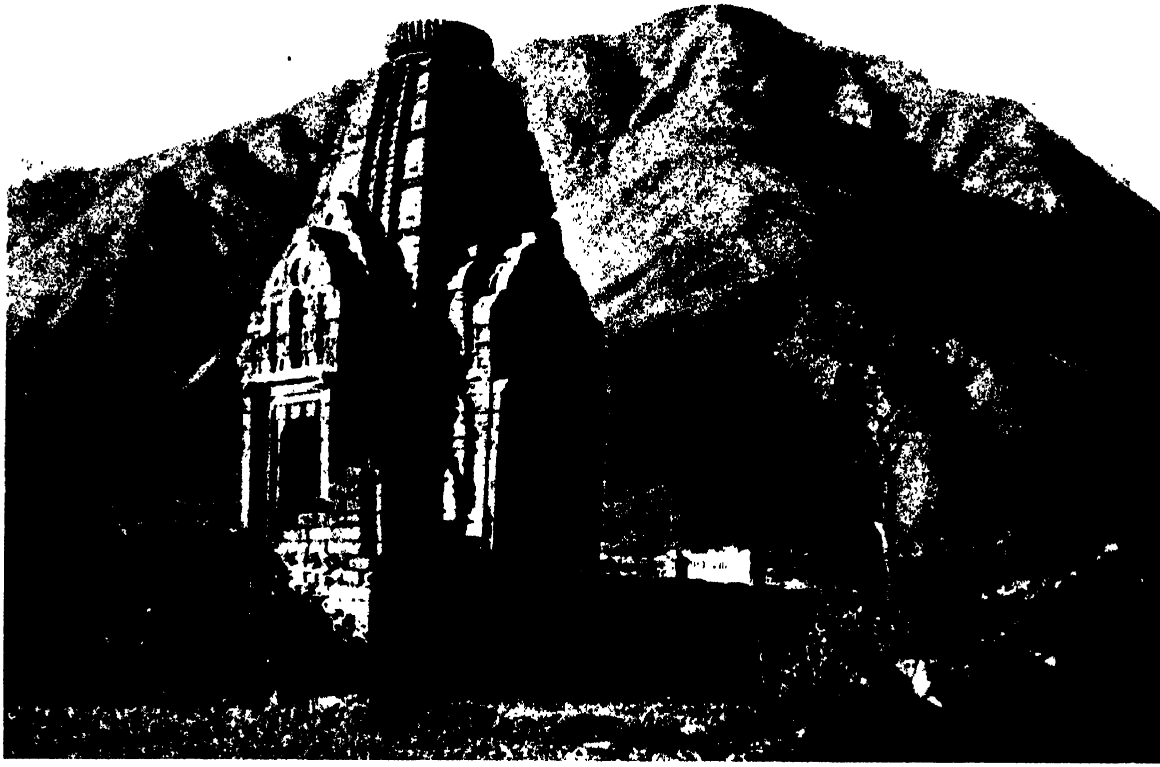
বৈজনাথ-মন্দির হইতে হিমালয়ের দৃশ্য





চম্বাতে দুইটি রেখ-মন্দির





বজৌরাতে শিবমন্দির



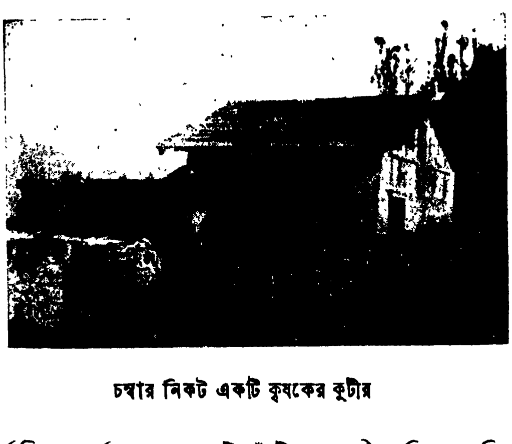


চম্বার নিকটে একটি পিঢ়া-মন্দির



বা মণ্ডপ নাই। ইহাদের দেহ উড়িষ্যার মত পঞ্চরথ এবং বাড় তিনকাম-বিশিষ্ট। বাড় ও গণ্ডীর মধ্যে ব্যবধানটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। গণ্ডীতে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে; কনিক-পগে ভূমি-অঁলাগুলি গোলাকার না হইয়া চতুষ্কোণ। ব্রজেশ্বরের মন্দির ও মসরূরের একটি মন্দির ভিন্ন এখানে অপর সমস্ত মন্দিরে ভূমি-অঁলা চতুষ্কোণ। ইহার কারণ কি তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের রেখ-মন্দিরের তুলনা করিলে তবে ইহার প্রকৃত অর্থ ধরা পড়িবে। অঁলায় উড়িষ্যা হইতে এক বিষয়ে পার্থক্য আছে। রাজপুতানায় বহু মন্দিরে অঁলার মধ্যস্থলে যেমন একটি বন্ধনীর মত কাম বর্ত্তমান, এখানেও তাহার অস্তিত্ব দেখা যায়।

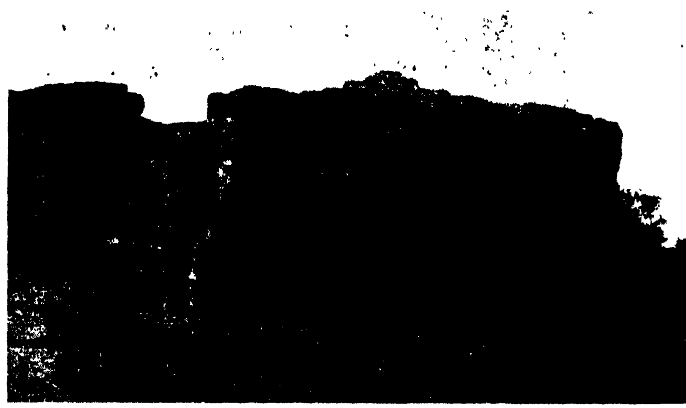
চম্বার উত্তর বা পূর্ব্বদিক হইতে নেপালী প্রভাব কিছু কিছু কাজ করিয়াছে। বস্তুতঃ, কুলুর সন্নিকটে বজৌরার



চম্বার নিকট একটি কৃষকের কুটীর

পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতশৃঙ্গে একটি খাঁটি নেপালী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। চম্বায় নেপালী রচনা-পদ্ধতির প্রভাবে রেখ-মন্দিরের গণ্ডীর শেষে এবং অঁলার মাথায় দুইটি ছাতার মত জিনিষ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এগুলি কাঠের তৈয়ারী এবং ছোট ছোট স্লেটের টুকরা দিয়া ছাওয়া। লক্ষ্মী-নারায়ণজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে সমস্ত মন্দিরে এইরূপ ছাতা যোড়া হইয়াছে। ইহাতে চম্বার সহিত উত্তর দেশের যোগাযোগের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

চম্বা শহরে অনেকগুলি বড় আকারের রেখ-মন্দিরে আমরা উড়িষ্যার সহিত একটি আশ্চর্য্য মিল দেখিতে

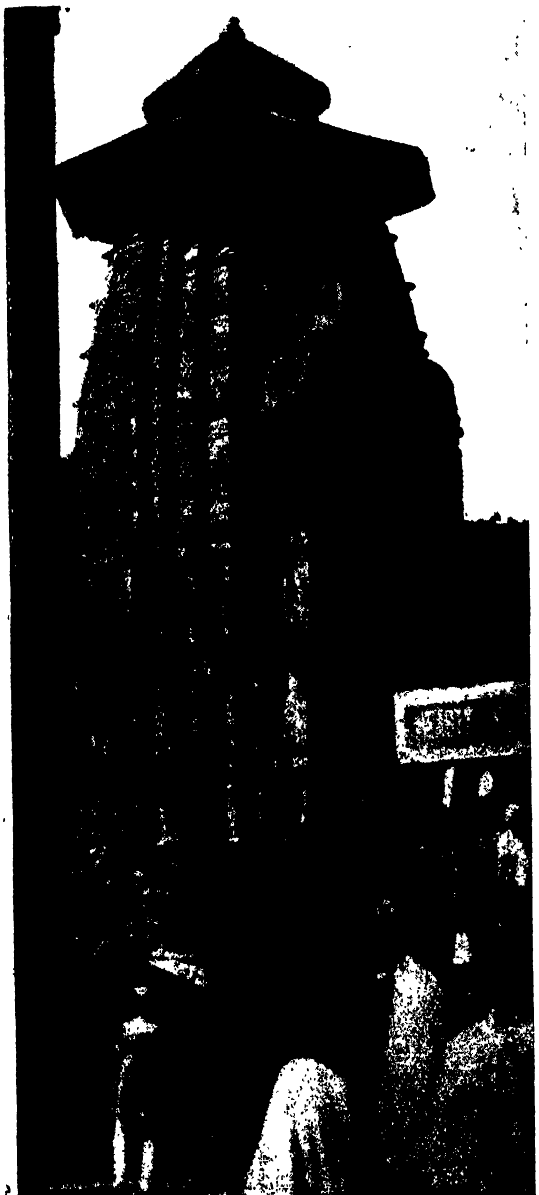


নূরপুর দুর্গমধ্যস্থ ভাঙা মন্দির

পাই। উড়িষ্যায় উত্তরকালে ত্রি-অঙ্গ বাড় ছাড়িয়া সমস্ত মন্দিরের বাড়কে পাদ-তলজাংঘ-বান্ধনা-উপর জাংঘ-বরণ্ডি এই পাঁচ অঙ্গে বিভক্ত করা হইত। উড়িষ্যার বাহিরে খাজুরাহোতে ইহার সমতুল্য রচনা দেখা যায়। কিন্তু চম্বায় অথবা কাঙ্গড়া জেলায় বৈজনাথের মন্দিরের বাড়কে যেভাবে পঞ্চাঙ্গে ভাগ করা হইয়াছে তাহার সহিত উড়িষ্যার আরও অনেক বেশী সাদৃশ্য বর্ত্তমান। চম্বার মন্দিরগুলিতে দুই জাংঘে কেবল পিঢ়া ও খাখর-মুণ্ডির পরিবর্ত্তে রেখ-ও পিঢ়া-মুণ্ডি স্থাপিত হইয়া থাকে।

বৈজনাথের মন্দিরটি দেখিলে প্রথমে ভ্রম হইতে পারে যে, ইহা উড়িষ্যার মন্দির কি না। আর বস্তুতঃ ইহার বাড়ে যেমন উড়িষ্যার সহিত মিল আছে, মণ্ডপের সহিতও তেমনি একটি লক্ষণে মিল আছে। ভুবনেশ্বরে বৈতাল-দেউলের সম্মুখে মণ্ডপের চারকোণে চারিটি ছোট রেখ-দেউল বর্ত্তমান। বৈজনাথের মন্দিরে তাহার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়. আর কোথাও এরূপ আছে বলিয়া জানা নাই।

বজৌরার রেখ-মন্দির কারুকার্য্যে চম্বা, মণ্ডি, বৈজনাথ প্রভৃতি সকল মন্দিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইহার গঠনে একটি-



চম্বা শহরের একটি মন্দির

বৈচিত্র্য আছে। পরশুরামেশ্বর-জাতীয় মন্দিরের সম্মুখভাগে রাহা-পগের খানিক অংশ অতিমেলিত থাকে। বজৌরার মন্দিরে শুধু একদিকে নহে, চারিদিকেই গণ্ডীর গায়ে ঐরূপ অতিমেলিত তোরণসদৃশ বস্তু বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার বাড়ে স্থাপিত খাখরমুণ্ডির সহিত পরশুরামেশ্বরের অনুরূপ খাখরমুণ্ডির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

এই ত গেল রেখ-দেউলের কথা। হিমালয়-অঞ্চলে যদিও পিঢ়া-দেউল রেখের সম্মুখে জগমোহন-হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই, তবু পৃথক মন্দিররূপে পিঢ়া-দেউল বিরল নহে। চম্বা শহরের নিকট ইরাবতীর অপর পারে পর্ব্বতশৃঙ্গে ঐরূপ একটি মন্দির আছে। চম্বাতে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রাঙ্গণেও আর একটি পিঢ়া-দেউল দেখা যায়। প্রথম মন্দিরটিতে এ অঞ্চলে প্রচলিত রেখ-দেউলের মত কয়েকটি স্তম্ভ ও ঈষৎ-মেলিত একটি বারান্দা আছে। পিঢ়া-দেউলের মস্তকে ঘণ্টা থাকিলেও উড়িষ্যার মত হাণ্ডির ব্যবহার নাই। খাজুরাহোতেও আমরা ঐরূপ শুধু ঘণ্টার ব্যবহার দেখিয়াছিলাম।

রেখ ও পিঢ়া ভিন্ন খাখরা-জাতীয় দেউলের দর্শন পঞ্জাব অঞ্চলে একেবারে পাওয়া যায় না। কিন্তু আলমোড়া জেলায় যজ্ঞেশ্বর গ্রামে নবদুর্গার যে মন্দির আছে তাহা উড়িয়া শিল্পশাস্ত্রে উল্লিখিত খাখরা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯১৩-১৪ সালের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে ইহার একটি চিত্র প্রকাশিত হয়। ছবি দেখিলেই মনে হয় যেন কেহ ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের একটি প্রতিকৃতি গড়িয়া রাখিয়াছে, কেবল তাহাতে ভুবনেশ্বরের মত অলঙ্কারবাহুল্য নাই। শুধু তাহাই নহে, শিল্পশাস্ত্রে এরূপ মন্দিরের মাথায় মধ্যস্থলে একটি কলস ও দুই পাশে দুই সিংহমূর্ত্তি স্থাপনার বিধি আছে। নবদুর্গার মন্দিরে সে লক্ষণ বর্ত্তমান। কি করিয়া হিমালয়ের সহিত সুদূর উড়িষ্যার এত মিল হয়, শুধু মূল রূপে নহে, ছোটখাট অলঙ্কারের ব্যবহারে পর্য্যন্ত, তাহা ভাবিবার বিষয়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ১১ই পৌষ (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩১) রবিবার অপরাহ্ণকালে কলিকাতা টাউন হলের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহার সংবর্দ্ধন করা হয়। বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে পুষ্প ও পল্লবে সুসজ্জিত বেদীর উপর কবির আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সভাক্ষেত্রে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। বাংলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে মেয়র শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় কবিকে লইয়া টাউন হলের মধ্য দিয়া সোপানশ্রেণী বাহিয়া সভাস্থলে আগমন করেন। সমবেত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া কাঁবকে অভ্যর্থনা করেন, তৎপরে মেয়র কবিকে সঙ্গে করিয়া বেদীর উপর তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে লইয়া যান।

কলিকাতার নাগরিকবর্গের অভিনন্দন

প্রথমে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মেয়র শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় কবিকে মাল্যে বিভূষিত করেন এবং নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন :—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের করকমলে—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবিপ্রতিভা সমগ্র সভ্যজগতকে মুগ্ধ করিয়াছে এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিকল্প জনকের ধর্ম্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্ম্মক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে-বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে, শিষ্টাচার ও সদালাপে সমগ্র সজ্জনসমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন—তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জনসমাজের সমাদর লাভ করিয়া তুমি কলিকাতাবাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনাপ্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙ্গলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে, এবং তোমার লেখনীনিঃসৃত অমৃতধারা বাঙ্গালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গ-ভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞানগুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। বন্দে মাতরম্।

তোমার গুণগর্ব্বিত কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যবৃন্দের পক্ষে শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মেয়র।

কবির উত্তর

একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজমহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্যই কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবিকীর্ত্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণিজন অখ্যাত—রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবিসম্বর্দ্ধনার ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত

করিল না, অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে আরোগ্যে আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক, ইহার প্রবর্ত্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্ব্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন করিয়া দিক,—পুরবাসীদের দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভবুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক এই আমি কামনা করি।

অর্ঘ্যদান

অতঃপর রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কবিকে অর্ঘ্যদান করেন। কবিকে ধূপ, দীপ, শঙ্খ, দূর্ব্বাদল, চন্দন এবং সচন্দনে পুষ্পোপচারে অর্ঘ্য প্রদত্ত হয়; কয়েকটি বালিকা অর্ঘ্যসম্ভারপূর্ণ থালিগুলি কবির নিকট বহন করিয়া লইয়া যান এবং সেগুলি কবি স্মিতহাস্যসহকারে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন।

এতচ্চন্দনমত্র শীলমিব তে চন্দ্রোজ্জ্বলং শীতলং
দীপোঽয়ং প্রতিভাপ্রভাব ইব তে কান্তঃ স্থিরং দীপ্যতে।
ধূপোঽয়ং তব কীর্ত্তিসঞ্চয় ইবামোদৈর্দিশো ব্যশ্নুতে
মাল্যং নির্মলকোমলং তব মনস্তুল্যং সমুদ্ভাসতে॥
কম্বুস্থাপিতমেতদম্বু সরসং কাব্যং ত্বদীয়ং যথা
পুষ্পশ্রেণিরিয়ং গুণালিরিব তে পশ্যজ্জনাকর্ষিণী।
অর্ঘ্যং তাবদিদং কৃতং তব কৃতে দূর্বাঙ্কুরাদ্যন্বিতং
নম্বেতৎ প্রতিগৃহ্যতাং করুণয়া স্বস্ত্যস্তু তে শাশ্বতম্॥

—আপনার শীলের ন্যায় এই চন্দন চন্দ্রের মত উজ্জ্বল ও শীতল, আপনার রমণীয় প্রতিভাপ্রভাবের ন্যায় এই দীপ স্থিরভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে। আপনার কীর্ত্তিরাশির ন্যায় এই ধূপ সৌরভে সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করিতেছে। আপনার মনের ন্যায় নির্ম্মল ও কোমল এই মাল্য উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। আপনার কাব্যের ন্যায় সরস এই জল শঙ্খে স্থাপিত করা হইয়াছে, এবং আপনার গুণসমূহের ন্যায় এই কুসুমগুলি দর্শকগণকে আকর্ষণ করিতেছে। দূর্ব্বার অঙ্কুর প্রভৃতির দ্বারা আমরা আপনার জন্য এই অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। আপনি করুণা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন। আপনার শাশ্বত কুশল হউক!

প্রশস্তিপাঠ

ভেদো যস্য ন বস্তুতোঽস্তি ভুবনে প্রাচী প্রতীচীতি বা
মিত্রত্বং প্রকটীকৃতং চ সততং যেনাত্মনঃ কর্মণা।
বিশ্বং যস্য পদং প্রসিদ্ধমনিশং সত্যে চ যস্য স্থিতি
ভূয়াৎ তস্য জয়ো রবেরবিরতং তেনাস্তু তৃপ্তং জগৎ॥

—যাঁহার প্রাচী ও প্রতীচী বলিয়া ভুবনে বস্তুতঃ কোনো ভেদ নাই, যিনি সতত নিজের কর্ম্মের দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন যে তিনি মিত্র, বিশ্বই যাঁহার প্রসিদ্ধ স্থান এবং সত্যেই যিনি নিয়ত অবস্থান করেন, সেই রবির অবিরামে জয় হউক ও তাহা দ্বারা জগৎ তৃপ্তি লাভ করুক!

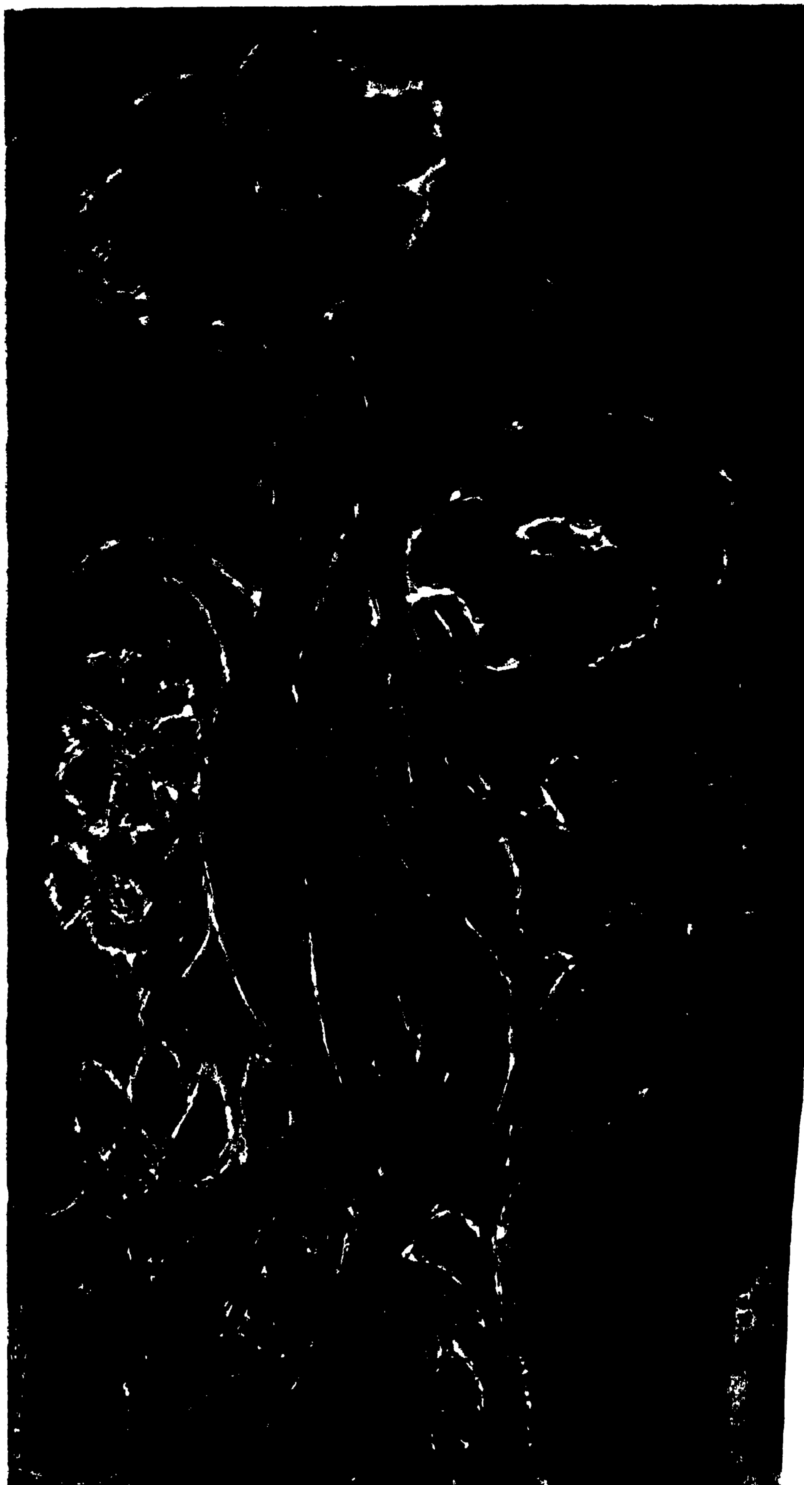
শান্তিপাঠ

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ
শান্তি রোষধয়ঃ
শান্তিবিশ্বে নো দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়ামোবয়ং
যদিহ ঘোরং
যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং
সর্বমেব শমস্তনঃ॥

—পৃথিবী শান্তিময় হউক! অন্তরীক্ষ শান্তিময় হউক! দ্যুলোক শান্তিময় হউক! জল শান্তিময় হউক! ওষধি-সমূহ শান্তিময় হউক! বিশ্বদেবগণ আমাদের জন্য শান্তিময় হউন! এখানে যাহা কিছু ভয়ানক, যাহা কিছু ক্রূর, যাহা কিছু পাপ, তাহা আমরা সেই সকল শান্তি দ্বারা, সমস্ত শান্তির দ্বারা উপশমিত করি! তাহা শান্ত হউক! তাহা শিব হউক! সমস্তই আমাদের কল্যাণকর হউক!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অভিনন্দন

অতঃপর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে কবিকে নিম্নলিখিত প্রশস্তি প্রদান করেন:—



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত

চিত্রকরের সৌজন্যে

হে কবীন্দ্র, বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদিগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবদীয় সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে, সাদরে ও সগৌরবে আপনাকে বরণ করিতেছে।

কিশোর বয়সেই আপনি বঙ্গবাণীর অর্চ্চনায় আত্মনিয়োগ করেন। তদবধি ব্রতধারী তপস্বীর ন্যায়, সুচিরকাল নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত-অকুণ্ঠ ভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন। হে তাপস, আপনার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে—দেবী আপনার শিরে অমর-বর বর্ষণ করিয়াছেন—আপনার ত্রিতন্ত্রীতে তাঁহার অমৃত বীণার অভয় মূর্চ্ছনা সঞ্চারিত করিয়াছেন। হে বরাভয়মণ্ডিত মনীষী, আপনি শতায়ু হইয়া এই মোহ-নিদ্রায় নিষণ্ণ জাতির প্রাণে বীর্য্য ও বলের প্রেরণা দ্বারা, তাহার সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করুন এবং প্রতিভার কল্পলোকে বিরাজ করিয়া মুক্তহস্তে প্রাচ্যকে ও প্রতীচ্যকে নব নব সুষমা ও সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও আনন্দ বিতরণ করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনচত্বারিংশ বৎসর ব্যাপিয়া আপনার উপচীয়মান শুভ সাহিত্য-সম্পদে বিপুল গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আপনার বক্তৃতার মন্ত্রে ইহার আদ্য বার্ষিক উৎসব মন্দ্রিত হইয়াছিল। আপনার পঞ্চাশৎ-বর্ষ পূর্ণ হইলে পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। আবার আপনার স্মরণীয় ষষ্টিতম জন্মদিনে সম্বর্দ্ধনার সম্ভার সজ্জিত করিয়া, পরিষৎ আপনাকে সম্ভ্রমের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিল। কবি-জীবনের সেই সেই সন্ধি-ক্ষণে উচ্চারিত পরিষদের উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনার কীর্ত্তি-ভাতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া আজ সফলতার তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে। সু-ধন্য আপনি, মানবের বিনশ্বর দুঃখ-সুখের মধ্যে সত্যের শাশ্বত স্বরূপকে দর্শন করিয়াছেন, এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়া, যুগ-যুগান্ত-লব্ধ ভারতের সনাতন আদর্শকে ভাগীরথী-ধারার ন্যায় মর্ত্ত্যে আবার অবতীর্ণ করাইয়াছেন। হে সত্যদ্রষ্টা, আপনাকে শত শত নমস্কার।

হে বাণীর বরপুত্র, হে বিশ্ববরেণ্য কবি, 'বর্ণ-গন্ধ-গীতময়' এই বিচিত্র বিশ্ব যাঁহার সুরভি-শ্বাস, কবি-কোবিদের 'ধী'র অভ্যন্তরে মুখরিত প্রেম-প্রজ্ঞা-প্রতাপ যাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রচ্ছন্ন আভাস, সেই শঙ্কর বিশ্বম্ভর বিশ্বকবি আপনার চির-স্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন; যদ্ ভদ্রং তদ্ ব আ সুবতু; আর, স বো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥

কবির উত্তর

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম আরম্ভ কালেই এই প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল এ কথা তাঁহারা সকলেই জানেন যাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তক। আমার অকৃত্রিম প্রিয় সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই পরিষদকে স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশৎবার্ষিকী জয়ন্তী-সভায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় তাঁহারই স্নিগ্ধ হস্ত হইতে আমার স্বদেশদত্ত দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ত্তমান জয়ন্তী-উৎসবের সূচনা-সভায় সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসাবাদের দ্বারা আমাকে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া গিয়াছেন। আমি অনুভব করিতেছি এই মানপত্রে আমার পরলোকগত সেই সহৃদয় সুহৃদদের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে—যাঁহাদের হস্ত অদ্য স্তব্ধ, যাঁহাদের বাণী নীরব।

অদ্য পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি সর্ব্বজনবরেণ্য জননায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই যে মানপত্র সমর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিলেন এই পত্রে সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গ-ভারতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্তকালকে উজ্জ্বল করিলেন এই কথা বিনয়নম্র আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম।

হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের অভিনন্দন

তৎপরে পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দনের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করেন। কবি হিন্দীতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের উত্তর দিয়াছিলেন :—

কবি-ভাষণ

আজ হিন্দী ভারতী তাঁহার সহোদরা বঙ্গ-ভারতীকে সম্মানিত করিলেন। দৈব কৃপাতে আমি যে এই শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ হইতে পারিয়াছি, এজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। কবির হৃদয় কখনও আপনার জন্মস্থানের সীমার ভিতর বদ্ধ থাকিতে পারে না, আর যদি তাঁহার যশ ঐ সীমা পার করে, তাহা হইলে তিনি সৌভাগ্যবান। হিন্দী-সাহিত্যের দূতরূপে আপনারা আমার এই সৌভাগ্য বহন করিবার জন্য আসিয়াছেন, এজন্য আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অভিনন্দন

ইহার পর প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী কবিকে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন এবং নিম্নলিখিত কবিতাটির দ্বারা অভিনন্দিত করেন :—

হে কবি ! জয়ন্তী-অর্ঘ্য নিয়ে হাতে তোমার স্মরণে
সুদূর প্রবাস হ'তে এই পথে, কবি-নিবেদনে,
এলো যারা, সে কি তারা বয়সের দাবী শুনে তব ?
তা তো নয়, দেখি রূপ, অপরূপ, চির-অভিনব ;
বয়সের সীমা তব, নিত্য নব নর্ত্তনের কোলে,
সপ্ততি বৎসর বুকে, সাত বৎসরের শিশু দোলে
সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন ; সময়ের হিসাব না রাখে,
বিস্মিত বিশ্বের মন তার পানে চেয়ে শুধু থাকে।
কার চোখে এত দীপ্তি ? কার বাণী নিত্য বহমান ?
কার প্রীতি নিতি নিতি, রচি চলে বিশ্বের কল্যাণ
অফুরন্ত প্রাণ-রসে ;—সে যে এই শিশু চিরন্তনী,
যুগে যুগে হে প্রবীণ ! গাহ নবীনের জয়ধ্বনি।
বাঙ্গালার বুকের দুলাল ! সত্যদ্রষ্টা ! হে অমর কবি !
কালক্ষয় করে তুমি জয় গেয়ে যেও সুরের পূরবী।
চির-সবুজের সমারোহ নিত্য হোক জীবনে তোমার,
প্রবাসের ভালবাসা-ভরা, ধর এই অর্ঘ্য উপচার।

আমেরিকাবাসীর শ্রদ্ধানিবেদন

ইহার পর আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার হেকিন্স আমেরিকাবাসীর পক্ষ হইতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

জয়ন্তী-উৎসব পরিষদের অভিনন্দন

অতঃপর জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় নিম্নলিখিত অর্ঘ্যপত্র পাঠ করেন।

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম-বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি জীবনবিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন ; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন ; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি। ইতি—

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদ পক্ষে
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, সভাপতি

কবির উত্তর

বিপুল জনসঙ্ঘের বাণীসঙ্গমে আজ আমি স্তব্ধ। এখানে নানা কণ্ঠের সম্ভাষণ, এ যে আমারই অভিবাদনের উদ্দেশে সম্মিলিত, একথা আমার মন সহজে ও সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। সূর্য্যের আলোক বাষ্পসিক্ত ধূলিবিকীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়, কোথাও বা সে ছায়ায় ম্লান, কোথাও বা সে অন্ধকারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কোথাও বা সে বাষ্পহীন আকাশে সমুজ্জ্বল, কোথাও বা পুষ্পকাননে বসন্তে তাহার অভ্যর্থনা, কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে শরতে তাহার উৎসব। দৈবকৃপায় আমি কবিরূপে পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু সেই পরিচয়ের স্বীকার দেশবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে অনবচ্ছিন্ন নহে, তাহা স্বভাবতই বাধাবিরোধ ও সংশয়ের দ্বারা কিছু-না-কিছু অবগুণ্ঠিত। তাহাকে বিক্ষিপ্ততা হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই জয়ন্তী অনুষ্ঠান নিবিড় সংহতভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া দিল—সেই সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম দেশের প্রীতিপ্রসন্ন হৃদয়কে তাহার আপন অপ্রচ্ছন্ন বিরাটরূপে। সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখিলাম পরম বিস্ময়ে, আনন্দে, সম্ভ্রমের সঙ্গে, মস্তক নত করিয়া।

অদ্যকার এই প্রকাশ কেবল যে আমারই কাছে অপরূপ অপূর্ব্ব তাহা নহে, দেশের নিজের কাছেও। উৎসবের আয়োজন করিতে গিয়াই দেশশ্রী সহসা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার গভীর অন্তরের মধ্যে কতটা আনন্দ, কতটা প্রীতি নানা ব্যবধানের অন্তরালে অজস্র সঞ্চিত হইতেছিল। আবাল্যকাল দেশমাতার প্রাঙ্গণে গাহিয়াই আমার কণ্ঠসাধনা। মাঝে মাঝে যখন মনে হইত উদাসীন তিনি, তখনও বুঝি-বা তাঁহার অগোচরেও স্বর পৌঁছিয়াছিল তাঁহার অন্তরে; যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন তখনও হয়ত তাঁহার শ্রবণদ্বার রুদ্ধ হয় নাই। ভাল ও মন্দ, পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিসূত্রে গাঁথিয়া লইতেছিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর বয়সে যখন আমার আয়ু উত্তীর্ণ হইল, যখন তাঁহার সেই মালায় শেষ গ্রন্থি দিবার সময় আসন্ন, তখনই আমার দীর্ঘজীবনের চেষ্টা তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণপ্রায়। সেইজন্যই তাঁহার এই সভায় আজ সকলের আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধস্বরে তাঁহার এই বাণী আজ উচ্চারিত—"আমি গ্রহণ করিলাম।" সংসার হইতে বিদায় লইবার দ্বারের কাছে সেই বাণী স্পষ্ট ধ্বনিত হইল আমার হৃদয়ে। ত্রুটি বিস্তর আছে, সাধনার কোন অপরাধ ঘটে নাই ইহা একেবারে অসম্ভব। সেইগুলি চুনিয়া চুনিয়া বিচার করিবার দিন আজ নহে। সে সমস্তকে অতিক্রম করিয়াও আমার কর্ম্মের যে সত্যরূপ, যে সম্পূর্ণতা প্রকাশমান তাহাকেই আমার দেশ তাঁহার আপন সামগ্রী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকারই এই উৎসবের মধ্য দিয়া আমাকে বর দান করিল। আমার জীবনের এই শেষ বর, এই শ্রেষ্ঠ বর।

অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতই, উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অদ্যকার এইদিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না, তাহাই বিধাতার মহৎ দান—দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।

অতঃপর "গোল্ডেন বুক অব ঠাকুর কমিটি"র পক্ষ হইতে উক্ত কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবিকে উক্ত গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনস্থিত রবীন্দ্রপরিচয় সমিতির দ্বারা প্রকাশিত "জয়ন্তী-উৎসর্গ" নামক গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন।

অতঃপর "বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল" গানটি সুমধুর কণ্ঠে গীত হইবার পর অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

চিত্র ও কলা প্রদর্শনী

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা টাউন-হলে চিত্র ও কলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গত ৯ই পৌষ (২৫এ ডিসেম্বর) শুক্রবার ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীযুক্ত বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মাণিক্য বাহাদুরের পিতামহ ও প্রপিতামহের বন্ধু ছিলেন তিনি প্রসঙ্গতঃ তাহার উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—

"ত্রিপুরার মহারাজকে এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং তিনি এই কলাপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে রাজী হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দের সহিত এখানে আসিয়াছি। এই রাজপরিবার সম্পর্কে আমার দুইটি বাল্যস্মৃতির উল্লেখ করিতেছি। অল্প বয়সে যখন আমি মাসিক কাগজে লিখিতাম, তখন একদা বর্ত্তমান মহারাজার প্রপিতামহের নিকট হইতে এক জন দূত আসিয়া আমাকে বলেন যে, আমার লেখা পড়িয়া মহারাজা সুখী হইয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে তখন কাসিয়াঙে নিমন্ত্রণ করা হয়। তথায় গেলে মহারাজা আমাকে পরম আগ্রহে অভ্যর্থনা করেন। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং আমার রসসৃষ্টির প্রশংসা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত বিষয়েও আমার পরামর্শ চাহিতেন। আমি তাঁহাকে যথাশক্তি পরামর্শ দিতাম।

প্রাচীন ভারতে রাজন্যবর্গই চিত্র, কলা, সঙ্গীত, কাব্য ইত্যাদির পোষক ছিলেন। বর্ত্তমানে এ-বিষয়ে দেশীয় নৃপতিগণের তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায় না। তথাপি ত্রিপুরা রাজ-পরিবারে কলাবিদ্যার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়, ইহা বড়ই আনন্দের কথা।

গীত-উৎসব

গত ৯ই ও ১০ই পৌষ রজনীযোগে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে গীত-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত সঙ্গীত সমষ্টির মধ্য হইতে পঁয়ষট্টিটি সঙ্গীত উৎসবে গীত হইয়াছিল। সঙ্গীতগুলির প্রথম চরণ আমরা এখানে উদ্ধার করিলাম। বেদগান দ্বারা গীত-উৎসবের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

প্রথম রজনী

"যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতে অদ্রিবঃ"

(বেদগানটির প্রথম চরণ)

"যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই চঞ্চল অন্তর,"

(রবীন্দ্রনাথ কৃত বেদগানটির অনুবাদ)

"ভুবনেশ্বর হে, মোচন কর বন্ধন সব, মোচন কর হে।"
"তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম,"
"হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে।"
"বিপুল তরঙ্গ রে সব গগন উদ্বেলিয়া"
"মন্দিরে মম কে আসিলে হে।"
"স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে,"
"সুধাসাগর-তীরে হে এসেছে নরনারী সুধারস-পিয়াসে।"
"বিমল আনন্দে জাগরে।"
"কার মিলন চাও বিরহী! তাঁহারে কোথা খুঁজিছ—"
"মোরে বারে বারে ফিরালে।"
"আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে,"
"আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে,"
"এমন দিনে তা'রে বলা যায়,"
"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।"
"আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে।"
"মরি লো মরি, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে।"

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে।"
"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।"
"বেদনা কি ভাষায় রে,"
"আমি কান পেতে রই ও আমার
আপন হৃদয় গহন দ্বারে ;"
"বারে বারে পেয়েছি যে তারে,
চেনায় চেনায় অচেনারে।"
"শুকপাতার সাজাই তরণী,"
"মনরে ওরে মন"
"চৈত্র পবনে মম চিত্ত-বনে"
"প্রখর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।"
"আমার নয়ন ভুলানো এলে,"
"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।"
"নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।"
"দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে।"
"কেন আমায় পাগল করে যাস্" .
"দে পড়ে দে আমায় তোরা"
"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না।"
"আসা যাওয়ার মাঝখানে"
"দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী,"

দ্বিতীয় রজনী

"বাজাও তুমি কবি তোমার সঙ্গীত সুমধুর"
"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে"
"যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে,"
"তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে,"
"হৃদয়বাসনা পূর্ণ হলো, আজি মম পূর্ণ হলো"
"শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনীরে"
"আমার প্রাণের পরে চ'লে গেল কে,"
"তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, আমার সাধের সাধনা,"
"বাজিল কাহার বীণা মধুরস্বরে"
"সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল"
"ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল ক'রেছ,"
"বড় বিস্ময় লাগে হেরি' তোমারে।"
"তুমি যেয়ো না এখনি।"
"অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী,"
তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে"
"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে"
"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।"
"আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয়"
"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,"
"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,"
"ফিরবে না তা জানি,"
"তুমি একলা ঘরে বসে বনে কি সুর বাজালে"
"ঝরঝর বরিষে বারিধারা।"
"শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আম্‌লকির এই ডালে ডালে।"
"আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা যাওয়া।"
"এই শরৎ আলোর কমল বনে"
"তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চ'লে।"
"কান্না-হাসির দোল-দোলানো পোষ-ফাগুনের পালা,"
"প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর,"
"কোন্ সুদূর হ'তে আমার মনোমাঝে"

ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন

সেনেট হলে ছাত্র ও ছাত্রীগণ কবির যে সংবর্দ্ধনা করেন, তাহার উত্তরে কবি প্রথমে মুখে মুখে কিছু বলিয়া পরে এই মুদ্রিত প্রতিভাষণ পাঠ করেন।

প্রতিভাষণ

যে-সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলীর মত, চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘর-বাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধেনি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্ব্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে-পড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুর দালান, তিন চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার

মোটা মোটা জালা সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্ব্বযুগের নানা পালপার্ব্বণের পর্য্যায় নানা কলরবে সাজেসজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল ক'রেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেচি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েচে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌছয়নি।

এ বাড়ি থেকে এদেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে, তেমনি পূর্ব্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকী ছিল দহন-শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণসমাকীর্ণ পূর্ব্বকালের আমোদ প্রমোদ বিলাস সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকী যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

এই নিরালায়, এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক,—মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মত। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কল্‌কাতার লোক যাকে ইসারা ক'রে ব'লত ঠাকুর বাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়ে মহলে ঠেলে রেখেছিলেন, সদরে ব্যবহার হ'ত ইংরেজী,—চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন কি, মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘট্‌তে পারেনি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেচি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণতঃ বাংলাদেশে ধর্ম্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্ত্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওয়াল্টর স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশ-প্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকলীর মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়," গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে," বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।" জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন ক'রেচেন, একটি পোড়োবাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এই সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ ক'রেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল, হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসেনি।

কল্‌কাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধান হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল-কলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনও কালী পড়েনি। ইমারৎ-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্য্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেল বেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরণার মত ঝরে পড়ত আমাদের

দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পাল্কী বেহারার হাঁইহুঁই শব্দ আসৃত কানে, আর বড় রাস্তা থেকে সহিসের হেইও হাঁক, সন্ধ্যাবেলায় জ্বলৃত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনৃতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।

আরও একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিইনি, পাস করিনি, মাষ্টার আমার ভাবী কালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হা-ঘরেদের মত বেরিয়ে পড়েছিল।

ইতিপূর্ব্বেই কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত হ'ত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকার-বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর, ছয় অক্ষর, দশ অক্ষরের চৌকো-চৌকো কত রকম শব্দ ভাগ নিয়ে চল্‌ল ঘরের কোণে আমার ছন্দ ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সাম্‌নে।

এই লেখাগুলি যেমনি হোক্ এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে—সে হচ্চে একটি বালক, সে কুণো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হাল্‌কা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্ত্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানৃতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরাননি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেচি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেচি বয়স্যের মত। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করৃতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্ত-বিকাশের সহায়তা করেচেন। তিনি আমার 'পরে কর্ত্তৃত্ব করৃবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তাহ'লে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়ত ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হ'ত, কিন্তু আমার মত একেবারেই হ'ত না।

সুরু হ'ল আমার ভাঙাছন্দে টুক্‌রো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মত; বালকের যা'-তা' ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত। এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ আমার ভাগ্যক্রমে সেকালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য—প্রতিযোগিতার উত্তেজনা উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠেনি। বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার অপ্রিয় আঘাত নামৃত, কিন্তু কটূক্তি ও কুৎসার উত্তেজনা তখনও সাহিত্যে ঝাঁঝিয়ে ওঠেনি।

সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সব চেয়ে ছোট, শিক্ষায় সব চেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেননি,—আধ-আধ বাধো বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাবসত্ত্বেও বিরুদ্ধরীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।

সেদিনকার খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। প্রকৃতির শুশ্রূষা ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনচ্ছায়ায় ছিলেম ব'সে। কখনও কাটিয়েছি তেতালার ছাদের প্রান্তে কর্ম্মহীন অবকাশে মনে মনে আকাশ-কুসুমের মালা গেঁথে, কখনও গাজিপুরের বৃদ্ধ নিমগাছের তলায় ব'সে ইঁদারার জলে বাগান সেঁচ দেবার করুণধ্বনি শুনতে শুনতে অদূর গঙ্গার স্রোতে কল্পনাকে অহৈতুক

বেদনায় বোঝাই ক'রে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে। নিজের মনের আলো-আঁধারের মধ্য থেকে হঠাৎ পরের মনের কনুয়ের ধাক্কা খাবার জন্যে বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে এমন কথা সেদিন ভাবিওনি। অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশী আবিল হ'য়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মত আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি। এও আমার খ্যাতি-পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি যে, প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেচে, কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করেনি। এছাড়া আমার দুর্গ্রহ কালো বর্ণের এই যে পটটি ঝুলিয়েছেন এরই উপরে আমার বন্ধুদের সুপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়, সে কথা বুঝতে পারি আজকের এই অনুষ্ঠানেই। বন্ধুদের কাউকে জানি, অনেককেই জানিনে, তাঁরাই কেউ কাছে থেকে কেউ দূরে থেকে এই উৎসবে মিলিত হয়েচেন সেই উৎসাহে আমার মন আনন্দিত। আজ আমার মনে হচ্চে তাঁরা আমাকে জাহাজে তুলে দিতে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েচেন—আমার খেয়াতরী পাড়ি দেবে দিবালোকের পরপারে তাঁদের মঙ্গল ধ্বনি কানে নিয়ে।

আমার কর্ম্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধূলি বেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌঁছল। আলো ম্লান হবার শেষ মুহূর্ত্তে এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মূল্য স্বীকার করবেন।

ফসল যতদিন মাঠে ততদিন সংশয় থেকে যায়। বুদ্ধিমান মহাজন ক্ষেতের দিকে তাকিয়েই আগাম দাদন দিতে দ্বিধা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। ফসল যখন গোলায় উঠল তখনি ওজন বুঝে দামের কথা পাকা হ'তে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফলন-শেষের হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।

যে মানুষ অনেককাল বেঁচে আছে সে অতীতেরই সামিল। বুঝতে পারচি আমার সাবেক বর্ত্তমান এই হাল বর্ত্তমান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। যে সব কবি পালা শেষ ক'রে লোকান্তরে, তাঁদেরই আঙিনার কাছটায় আমি এসে দাঁড়িয়েচি তিরোভাবের ঠিক পূর্ব্বসীমানায়। বর্ত্তমানের চল্‌তি রথের বেগের মুখে কাউকে দেখে নেবার যে অস্পষ্টতা সেটা আমার বেলা এতদিনে কেটে যাবার কথা। যতখানি দূরে এলে কল্পনার ক্যামেরায় মানুষের জীবনটাকে সমগ্রলক্ষ্যবদ্ধ করা যায় আধুনিকের পুরোভাগ থেকে আমি ততটা দূরেই এসেচি।

পঞ্চাশের পরে বানপ্রস্থের প্রস্তাব মনু করেচেন। তার কারণ মনুর হিসাবমত পঞ্চাশের পরে মানুষ বর্ত্তমানের থেকে পিছিয়ে পড়ে। তখন কোমর বেঁধে ধাবমান কালের সঙ্গে সমান ঝোঁকে পা ফেলে ছোটায় যতটা ক্লান্তি ততটা সফলতা থাকে না, যতটা ক্ষয় ততটা পূরণ হয় না। অতএব তখন থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে সেই সর্ব্বকালের মোহানার দিকে যাত্রা করতে হবে যেখানে কাল স্তব্ধ। গতির সাধনা শেষ ক'রে তখন স্থিতির সাধনা।

মনু যে-মেয়াদ ঠিক ক'রে দিয়েচেন এখন সেটাকে ঘড়ি ধ'রে খাটানো প্রায় অসাধ্য। মনুর যুগে নিশ্চয়ই জীবনে এত দায় ছিল না, তার গ্রন্থি ছিল কম। এখন শিক্ষা বল, কর্ম্ম বল, এমন কি আমোদ-প্রমোদ খেলা-ধূলা, সমস্তই বহুব্যাপক। তখনকার সম্রাটেরও রথ যত বড় জমকালো হোক্, এখনকার রেলগাড়ির মত তাতে বহুগাড়ির এমন দ্বন্দ্বসমাস ছিল না। এই গাড়ির মাল খালাস করতে বেশ একটু সময় লাগে। পাঁচটায় আপিসে ছুটি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বটে, কিন্তু খাতাপত্র বন্ধ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাড়ি-মুখো হবার আগেই বাতি জ্বালতে হয়। আমাদের সেই দশা। তাই পঞ্চাশের মেয়াদ বাড়িয়ে না নিলে ছুটি মঞ্জুর অসম্ভব। কিন্তু সত্তরের কোঠায় পড়লে আর ওজর চলে না। বাইরের লক্ষণে বুঝতে পারচি আমার সময় চল্‌ল আমাকে ছাড়িয়ে—কম ক'রে ধরলেও অন্তত দশ বছর আগেকার

তারিখে আমি বসে আছি। দূরের নক্ষত্রের আলোর মত, অর্থাৎ সে যখনকার সে তখনকার নয়।

তবু একেবারে থামবার আগে চলার ঝোঁকে অতীতকালের খানিকটা ধাক্কা এসে পড়ে বর্ত্তমানের উপরে। গান সমস্তটাই শমে এসে পৌছলে তার সমাপ্তি; তবু আরও কিছুক্ষণ ফরমাস চলে পালটিয়ে গাবার জন্যে। সেটা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি। এর পরে বড়-জোর দুটো একটা তান লাগানো চলে, কিন্তু চুপ ক'রে গেলেও লোকসান নেই। পুনরাবৃত্তিকে দীর্ঘকাল তাজা রাখবার চেষ্টাও যা আর কই মাছটাকে ডাঙায় তুলে মাসখানেক বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাও তাই।

এই মাছটার সঙ্গে কবির তুলনা আরও একটু এগিয়ে নেওয়া যাক। মাছ যতক্ষণ জলে আছে ওকে কিছু কিছু খোরাক জোগানো সৎকর্ম্ম, সেটা মাছের নিজের প্রয়োজনে। পরে যখন তাকে ডাঙায় তোলা হ'ল তখন প্রয়োজনটা তার নয়, অপর কোনো জীবের। তেমনি কবি যতদিন না একটা স্পষ্ট পরিণতিতে পৌছয় ততদিন তাকে কিছু কিছু উৎসাহ দিতে পারলে ভালই—সেটা কবির নিজেরই প্রয়োজনে। তার পরে তার পূর্ণতায় যখন একটা সমাপ্তির যতি আসে তখন তার সম্বন্ধে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে সেটা তার নিজের নয়, প্রয়োজন তার দেশের।

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃণ্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাব-দিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হ'ল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারী বীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্য কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।

তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে, মরুবালুতলে ভূমির মত।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাবান প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্ব্বজনসমক্ষে নিজের ব'লে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ্য রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

আমার জীবনের সমাপ্তিদশায় এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনোভাবে নিজেকে লাভ না ক'রে থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন। যদি কেউ এ কথায় অহংকারের আশঙ্কা ক'রে আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হন তবে তাঁদের উদ্বেগ অনাবশ্যক। যে-খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশী হয় ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে। ভুল মস্ত হয়েই দেখা দেয়, চুকে যায় অতি ক্ষুদ্র হয়ে। আতসবাজির অভ্রবিদারক আলোটাই তার নির্ব্বাণের উজ্জ্বল তর্জ্জনী সঙ্কেত।

এ কথায় সন্দেহ নেই যে পুরস্কারের পাত্র নির্ব্বাচনে দেশ ভুল করতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষণমুখরা খ্যাতির মৌনসাধন বার-বার দেখা গেছে। তাই আজকের দিনের আয়োজনে আজই অতিশয় উল্লাস যেন না করি এই উপদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। তেমনি তা নিয়ে এখনি তাড়াতাড়ি বিমর্ষ হবারও আশু কারণ দেখি না। কালে কালে সাহিত্য-বিচারের রায় একবার উলটিয়ে আবার পালটিয়েও থাকে। অব্যবস্থিত-চিত্ত মন্দগতি কালের সব-শেষ বিচারে আমার ভাগ্যে যদি নিঃশেষে ফাঁকিই থাকে তবে এখনি আগাম শোচনা করতে বসা কিছু নয়। এখনকার মত এই উপস্থিত অনুষ্ঠানটাই নগদ লাভ। তারপরে চরম জবাবদিহির জন্যে প্রপৌত্রেরা রইলেন। আপাততঃ বন্ধুদের নিয়ে আশ্বস্তচিত্তে আনন্দ করা যাক, অপর পক্ষে যাঁদের অভিরুচি হয় তাঁরা ফুৎকারে বুদ্বুদ বিদীর্ণ করবার উৎসাহে আনন্দ করতে পারেন।

এই দুই বিপরীত ভাবের কালোয় সাদায় সংসারের আনন্দধারায় যমের কন্যা যমুনা ও শিবজটা-নিঃসৃতা গঙ্গা মিলে থাকে। ময়ূর আপন পুচ্ছগর্ব্বে নৃত্য ক'রে খুশী, আবার শিকারী আপন লক্ষ্যবেধগর্ব্বে তাকে গুলি ক'রে মহা আনন্দিত।

আধুনিককালে পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্যে কলাসৃষ্টিতে লোকচিত্তের সম্মতি অতি ঘন ঘন বদল হয় এটা দেখা যাচ্চে। বেগ বেড়ে চলেচে মানুষের যানে বাহনে, বেগ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্চে মানুষের মন প্রাণকে।

যেখানে বৈষয়িক প্রতিযোগিতা উগ্র সেখানে এই বেগের মূল্য বেশী। ভাগ্যের হরির লুট নিয়ে হাটের ভিড়ে ধূলার 'পরে যেখানে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি, সেখানে যে-মানুষ বেগে জেতে মালেও তার জিৎ। তৃপ্তিহীন লোভের বাহন বিরামহীন বেগ। সমস্ত পশ্চিম মাতালের মত টলমল করচে সেই লোভে। সেখানে বেগবৃদ্ধি ক্রমে লাভের উপলক্ষ্য না হয়ে স্বয়ং লক্ষ্য হয়ে উঠ্‌চে। বেগেরই লোভ আজ জলে স্থলে আকাশে হিসটীরিয়ার চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরলো।

কিন্তু প্রাণ পদার্থ তো বাষ্প বিদ্যুতের ভূতে তাড়া করা লোহার এঞ্জিন নয়। তার একটি আপন ছন্দ আছে। সেই ছন্দে দুই এক মাত্রা টান সয় তার বেশী নয়। মিনিট কয়েক ডিগবাজি খেয়ে চলা সাধ্য হ'তে পারে, কিন্তু দশ মিনিট যেতে-না-যেতে প্রমাণ হবে যে মানুষ বাইসিক্‌লের চাকা নয়, তার পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে। গানের লয় মিষ্টি লাগে যখন সে কানের সজীব ছন্দ মেনে চলে। তাকে দুন থেকে চৌদুনে চড়ালে সে কলা-দেহ ছেড়ে কৌশল-দেহ নেবার জন্যই হাঁসফাঁস করতে থাকে। তাগিদ যদি আরও বাড়াও তাহ'লে রাগিণীটা পাগলা-গারদের সদর গেটের উপর মাথা ঠুকে মারা যাবে। সজীব চোখ তো ক্যামেরা নয়, ভাল ক'রে দেখে নিতে সে সময় নেয়। ঘণ্টায় বিশ পঁচিশ মাইল দৌড়ের দেখা তার পক্ষে কুয়াসা দেখা। একদা তীর্থযাত্রা ব'লে সজীব পদার্থ আমাদের দেশে ছিল। ভ্রমণের পূর্ণস্বাদ নিয়ে সেটা সম্পন্ন হ'ত। কলের গাড়ির আমলে তীর্থ রইল, যাত্রা রইল না, ভ্রমণ নেই পৌঁছনো আছে, শিক্ষাটা বাদ দিয়ে পরীক্ষাটা পাস করা যাকে বলে। রেল কোম্পানীর কারখানায় কলে-ঠাসা তীর্থ-যাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দামের বটিকা সাজানো, গিলে ফেল্‌লেই হ'ল—কিন্তু হ'লই না যে সে কথা বোঝবারও ফুরসুৎ নেই। কালিদাসের যক্ষ যদি মেঘদূতকে বরখাস্ত ক'রে দিয়ে য়েরোপ্লেনদূতকে অলকায় পাঠাতেন তাহ'লে অমন দুই সর্গভরা মন্দাক্রান্ত ছন্দ দুচারটে শ্লোক পার না হ'তেই অপঘাতে মরত। কলে-ঠাসা বিরহ তো আজ পর্য্যন্ত বাজারে নামেনি।

মেঘদূতের সেই শোকাবহ পরিণামে শোক করবে না এমনতর বলবান পুরুষ আজকাল দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে। কেউ কেউ বল্‌চেন, এখন কবিতার যে আওয়াজটা শোনা যাচ্চে সে নাভিশ্বাসের আওয়াজ। ওর সময় হয়ে এল। যদি তা সত্য হয় তবে সেটা কবিতার দোষে নয় সময়ের দোষে। মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে বাঁধা, কিন্তু তার কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দ-ভাঙা।

আঙুরের ক্ষেতে চাষী কাঠি পুঁতে দেয়, তারই উপর আঙুর লতিয়ে উঠে আশ্রয় পায়, ফল ধরায়। তেমনি জীবনযাত্রাকে সবল ও সফল করবার জন্যে কতকগুলি রীতিনীতি বেঁধে দিতে হয়। এই রীতিনীতির অনেকগুলিই নির্জ্জীব নীরস; উপদেশ অনুশাসনের খুঁটি। কিন্তু বেড়ায় লাগানো জিয়ল কাঠের খুঁটি যেমন রস পেলেই বেঁচে ওঠে তেমনি জীবনযাত্রা যখন প্রাণের ছন্দে শান্ত গমনে চলে তখন শুকনো খুঁটিগুলো অন্তরের গভীরে পৌঁছবার অবকাশ পেয়ে ক্রমেই প্রাণ পেতে থাকে। সেই গভীরেই সঞ্জীবনরস। সেই রসে তত্ত্ব ও নীতির মত পদার্থও হৃদয়ের আপন সামগ্রীরূপে সজীব ও সজ্জিত হয়ে উঠে, মানুষের আনন্দের রং তাতে লাগে। এই আনন্দের প্রকাশের মধ্যেই চিরন্তনতা। একদিনের নীতিকে আর-একদিন আমরা গ্রহণ নাও করতে পারি, কিন্তু সেই নীতি যে-প্রীতিকে যে-সৌন্দর্য্যকে আনন্দের সত্য ভাষায় প্রকাশ করেচে সে আমাদের কাছে নূতন থাকবে। আজও নূতন আছে মোগল সাম্রাজ্যের শিল্প—

সেই সাম্রাজ্যকে, তার সাম্রাজ্যনীতিকে আমরা পছন্দ করি আর না করি।

কিন্তু যে-যুগে দলে দলে গরজের তাড়ায় অবকাশ ঠাসা হয়ে নিরেট হয়ে যায় সে যুগ প্রয়োজনের, সে যুগ প্রীতির নয়। প্রীতি সময় নেয় গভীর হ'তে। আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরি পানার মতই সাহিত্য-ধারার মধ্যেও ভূরি ভূরি ঢুকে পড়েচে। তা'রা বাস করতে আসে না, সমস্যাসমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলঙ্কৃত হোক্ তবু সে খাঁটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবি মিটলেই তার অন্তর্দ্ধান।

এমন অবস্থায় সাহিত্যের হাওয়া বদল হয় এবেলা ওবেলা। কোথাও আপন দরদ রেখে যায় না, পিছনটাকে লাথি মেরেই চলে, যাকে উঁচু ক'রে গড়েছিল তাকে ধূলিসাৎ ক'রে তার 'পরে অট্টহাসি। আমাদের মেয়েদের পাড়ওয়ালা শাড়ি, তাদের নীলাম্বরী, তাদের বেনারসী চেলি মোটের উপর দীর্ঘকাল বদল হয়নি—কেন-না ওরা আমাদের অন্তরের অনুরাগকে আঁকড়ে আছে। দেখে আমাদের চোখের ক্লান্তি হয় না। হ'ত ক্লান্তি, মনটা যদি রসিয়ে দেখ্‌বার উপযুক্ত সময় না পেয়ে বে দরদী ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে উঠ্‌ত। হৃদয়হীন অগভীর বিলাসের আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশানের বদল। এখনকার সাহিত্যে তেমনি রীতির বদল। হৃদয়টা দৌড়তে দৌড়তে প্রীতি সম্বন্ধের রাখী গাঁথতে ও পরাতে পারে না। যদি সময় পেত সুন্দর ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে গাঁথত। এখন ওকে ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর। সুন্দর পুরোনো, সুন্দর সেকেলে। আনো একটা যেমন-তেমন ক'রে পাক-দেওয়া শণের দড়ি—সেটাকে বল্‌ব রিয়ালিজ্‌ম—এখনকার দুদ্দাড় দৌড়ওয়ালা লোকের ঐটেই পছন্দ। স্বল্পায়ু ফেশান হঠাৎ-নবাবের মত উদ্ধত—তার প্রধান অহঙ্কার এই যে সে অধুনাতন, অর্থাৎ তার বড়াই গুণ নিয়ে নয়, কাল নিয়ে।

বেগের এই মোটর কলটা পশ্চিম দেশের মর্ম্মস্থানে। ওটা এখনও পাকা [illegible] আমাদের নিজস্ব হয়নি। তবে আমাদেরও দৌড় আরম্ভ হ'ল। ওদেরই হাওয়া-গাড়ির পায়দানের উপর লাফ দিয়ে আমরা উঠে পড়েচি। আমরাও খর্ব্বকেশিনী খর্ব্ববেশিনী সাহিত্যকীর্ত্তির টেকনীকের হাল্ ফ্যাশান নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি, আমরাও অধুনাতনের স্পর্দ্ধা নিয়ে পুরাতনের মান হানি করতে অত্যন্ত খুশী হই।

এই সব চিন্তা করেই বলেছিলুম আমার এ বয়সে খ্যাতিকে আমি বিশ্বাস করিনে। এই মায়ামৃগীর শিকারে বনে বাদাড়ে ছুটে বেড়ানো যৌবনেই সাজে। কেন-না সে-বয়সে মৃগ যদি বা নাও মেলে মৃগয়াটাই যথেষ্ট। ফুল থেকে ফল হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে, তবু আপন স্বভাবকেই চাঞ্চল্যে সার্থক করতে হয় ফুলকে। সে অশান্ত, বাইরের দিকেই তার বর্ণ গন্ধের নিত্য উদ্যম। ফলের কাজ অন্তরে, তার স্বভাবের প্রয়োজন অপ্রগল্‌ভ শান্তি। শাখা থেকে মুক্তির জন্যেই তার সাধনা,—সেই মুক্তি নিজেরই আন্তরিক পরিণতির যোগে।

আমার জীবনে আজ সেই ফলেরই ঋতু এসেচে। যে-ফল আশু বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষা করে। এই ঋতুটির সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হ'লে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের শান্তি স্থাপন চাই। সেই শান্তি খ্যাতি অখ্যাতির দ্বন্দ্বের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়।

খ্যাতির কথা থাক। ওটার অনেকখানিই অবাস্তবের বাষ্পে পরিস্ফীত। তার সঙ্কোচন প্রসারণ নিয়ে যে মানুষ অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হ'তে থাকে সে অভিশপ্ত। ভাগ্যের পরম দান প্রীতি, কবির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাই। যে-মানুষ কাজ দিয়ে থাকে খ্যাতি দিয়ে তার বেতন শোধ চলে, আনন্দ দেওয়াই যার কাজ প্রীতি না হ'লে তার প্রাপ্য শোধ হয় না।

অনেক কীর্ত্তি আছে যা মানুষকেই উপকরণ ক'রে গড়ে তোলা। যেমন রাষ্ট্র। কর্ম্মের বল সেখানে জন-সংখ্যায়—তাই সেখানে মানুষকে দলে টানা নিয়ে কেবলই দ্বন্দ্ব চলে। বিস্তারিত খ্যাতির বেড়াজাল ফেলে মানুষ ধরা নিয়ে ব্যাপার। মনে কর, লয়েড জর্জ্জ। তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর শক্তিকে অনেক লোকে যখন মানে [illegible]

বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে, মানুষ-উপকরণ পুরোপুরি জোটে না।

অপর পক্ষে কবির সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করেনি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজারদরের ক্ষতি হয়, কিন্তু সত্যমূল্যের কম্‌তি হয় না।

ফুল ফুটেচে এইটাই ফুলের চরম কথা। যার ভাল লাগল সেই জিৎল, ফুলের জিৎ তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড় বলে যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেচে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠ্‌চে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালবেসেচে সে তার সাহিত্য দেখ্‌লেই বুঝতে পারি। এই ভালবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।

বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনটা সোনার, কোনোটা তামার, কোনটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হাল্কা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্তধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলি নে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্য্যবান ও বিশুদ্ধ করে। ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েচে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাব্যের গভীরের মধ্যে বসে আছে ত্যাগের মানুষ আপন একতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমবায়েই রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও মানবজীবনেও। দূরকাল ও বহুজনকে যে-সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়িভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকায় বা মাটির গাম্‌লায় তো তার বোঝাই সইবে না। আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বল্‌তে পারেন এ সব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিল্‌চে না—তা যদি হয় তাহ'লে সেই আধুনিক কালটারই জন্যে পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে সে চিরকালই আধুনিক থাক্‌বে এত আয়ু তার নয়।

কবি যদি ক্লান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিককালে পুরোনো হয়ে গেছে তাহ'লে বুঝ্‌ব আধুনিক কালটাই হয়েচে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুরাগের রস পৌঁছচ্চে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না। যে-কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখ্‌তে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনায় যার রুচি মরেচে চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোনো একটা আজগবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

আজ সত্তর বছর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেচে। তাই আশা করি যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেচেন এতদিনে অন্ততঃ তাঁরা একথা জেনেচেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনও তাতে ক্লান্ত হ'ল না, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি। চরাচরকে বেষ্টন ক'রে অনাদিকালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েচে, মনে হয়েচে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোট শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ দূতগুলি বিচিত্র-রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনদিন আলস্য করিনি। প্রতিদিন উষাকালে

অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয় সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশীতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশী হয়ে উঠচে—ব'লে উঠ্‌চে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টান্‌বে, এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে; যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ ক'রে বিদ্যমান ব'লেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগ্‌লামি ব'লে হেসে উঠলুম না।

যাঁর লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চ'লেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
যাঁর লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক, মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, তুচ্ছের কুৎসার তলে
প্রত্যহের বীভৎসতা।
যাঁর পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
যাঁহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার-বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েচে, বার-বার নিজেকে বলেচি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ; আনন্দ কর তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেচে, যা রয়েচে তোমার চারিদিকে, তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ ক'রো না। কাব্য সাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মত জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ ক'রে দেয়, তাতে গ্লানি আসে ক্লান্তি আনে। কেন না আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন ক'রে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মত অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্য্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজে দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

অনেকদিন থেকেই লিখে আসচি, জীবনের নানা পর্ব্বে নানা অবস্থায়। সুরু করেচি কাঁচা বয়সে—তখনও নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জ্জনীয় জিনিষ ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে বাকী যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে আমি ভালবেসেচি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেচি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেচি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্যঅভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্ম্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেচি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েচি প্রসাদ। আমি এসেচি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা-কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্ত্তে আমি প্রীতি কামনা করি আর কিছু নয়। এ কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য পেয়েচি, সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেচেন সমস্ত জীবন আমি কি চেয়েচি, কি পেয়েচি, কি দিয়েচি, আমার অপূর্ণ জীবনে অসমাপ্ত সাধনায় কি ইঙ্গিত আছে।

সাহিত্যে মানুষের অনুরাগ-সম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেন-না প্রীতিই সমগ্র ক'রে দেখে। আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েচেন তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিদ্র সন্ধান বা ছিদ্র খনন করতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আজ পর্য্যন্ত অতি বড় সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মাননি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখ-বিকৃতি করা, যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়।

মর্ত্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠদান এই প্রীতি আমি পেয়েচি এ কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েচি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে—তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন ক'রে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেচে আমার ললাটে,—আমার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক্।

আর আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতি-নিকটের অতি-পরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালবাসতে পেরেচেন, আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁদেরই বহুযত্নরচিত অর্ঘ্য সজ্জিত। তাঁদের সেই ভালবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমিষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা॥
হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকী॥
যা-কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছিয়া রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে॥



মাতৃঋণ

শ্রীসীতা দেবী

বহু বৎসর আগের কথা। তখন কলিকাতায় ঘোড়ার ট্রাম উঠিয়া গিয়া সবে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈদ্যুতিক পাখা এবং আলো তখনও তাকাইয়া দেখিবার জিনিষ। এরোপ্লেনের নামও তখনও কেহ শোনে নাই, এবং সিনেমা কাহাকে বলে তাহা নিতান্ত ইংরেজী ও ফরাসী নবিশ ভিন্ন কেহই জানে না।

কিন্তু তখনও ভারতবর্ষে রামরাজত্ব ছিল না। অন্নবস্ত্রের চিন্তায় বাঙালীর বুকের রক্ত প্রায় এখনকার মতই শুকাইয়া উঠিত। যাহারা সোজাসুজি দরিদ্র, তাহারা তবু একটু শান্তিতে থাকে, তাহাদের দশের কাছে নিজেদের রিক্ততা প্রকাশ করিতে কোনো লজ্জা নাই। কিন্তু চিরকালই বিপদ তাহাদের, যাহাদের দারিদ্র্য প্রকাশ করিবার উপায় নাই। তাহারা যে উচু জাত, তাহারা যে ভদ্রলোক! সুতরাং উপবাসক্লিষ্ট দেহকে একখানা ফরসা কাপড়ে অন্ততঃ মুড়িয়া রাখিতে হয়। এঁদো গলির ভিতরে, রোদবাতাসহীন হইলেও পাকাবাড়ির একখানা ঘরে থাকিতে হয়, এবং পরিবারে ছয়টি প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোক থাকিলেও একাকী বৃদ্ধ পিতাকে উপার্জ্জনের ভার গ্রহণ করিতে হয়, কারণ ভদ্রঘরের মেয়ের বাহিরে গিয়া কাজ করা সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ।

পৌষ মাসের মেঘলা সকালে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের এক কোণের একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া একটি শীর্ণকায় যুবক একখানা খবরের কাগজ উল্টাইতেছিল। বেঞ্চিটাতে আর একজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনি প্রৌঢ়, খবরের কাগজখানি তাঁহারই সম্পত্তি। শীতে বোধ হয় তিনি একটু বেশী কাতর, কারণ মোটা ওভারকোটের উপরেও তিনি একখানা শাল জড়াইয়াছেন, মাথায় নাইট ক্যাপ্, গলায় কম্ফর্টার।

যুবক মন দিয়া কি একটা পড়িতেছিল, প্রৌঢ় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ও সব ওয়াণ্টেড্-ফোয়াণ্টেড সব বাজে ভায়া। কখনও কাউকে ত বিজ্ঞাপন পড়ে কাজ পেতে দেখলাম না। কাজ যখন হবার তখন নিজের থেকেই হবে।"

যুবক বলিল, "এমনি হবার ত কোনো লক্ষণ দেখছি না। একটা প্রাইভেট ট্যুইশনের বিজ্ঞাপন রয়েছে। দেখ্ব একটা য়্যাপ্লিকেশন্ করে?"

প্রৌঢ় বলিলেন, "তা দেখ করে। ঠিকানা দিয়েছে কি?"

যুবক বলিল, "হ্যা, ভবানীপুরের ঠিকানা। পদ্মপুকুর রোড।"

প্রৌঢ় ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "তবেই হয়েছে। ধর যদি পাওই, তোমার লাভটা হবে কি? মাইনে দেবে বড়-জোর দশ কি পনেরো টাকা। এর বেশী আর আজকাল একটা স্কুলের ছেলে পড়াতে কে কবে দেয়? স্কুলেরই ছেলে ত?"

যুবক প্রতাপ বলিল, "ইস্কুলেরই, তবে উঁচু ক্লাসের হবে, নইলে গ্রাজুয়েট চাইবে কেন?"

প্রৌঢ় উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আহা বুঝছ না, কম করে কেউ লেখে নাকি কখনও? দেখো এখন এই কাজের জন্যে এম-এ পাসই পাঁচ গণ্ডা য়্যাপ্লাই করবে। তা পনেরো টাকাও যদি দেয়, তার দশ টাকা ত তোমার ট্রাম খরচাই লাগবে। কোথায় মাণিকতলা আর কোথায় পদ্মপুকুর, সে কি এ-রাজ্যি? পাঁচটা টাকা শুধু হাতে থাকবে, তার জন্যে এই খাটুনি খাটবে?"

প্রতাপ বলিল, "যা দশা, পাঁচ টাকাই বা কম কি? আর আগে পাই ত কাজ। যদি পাই, তখন ঐদিকে কোথাও উঠে গেলেই হবে, মাণিকতলায় ত আর আমার পৈত্রিক বাড়ি নয়।"

উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ওদিকে এত সস্তায় বাসা তুমি পাবে? পেতে আর হয় না। ভবানীপুর,

বালীগঞ্জ, ওসব দিকে কি গরিব মানুষে থাকে? যত সব জুড়ে বড়লোকের আড্ডা। তার চেয়ে ঐ কার্ত্তিক যা বলছিল সেই কাজেই লাগলে পারতে। দু-পয়সা পরে পাবার আশা ছিল।"

প্রতাপ বলিল, "লাভটা আর কি? সারাদিন খাটতে হ'ত, কুড়ি টাকার জন্যে। পরে যে দু-পয়সার কথা বলছেন, তার সিকি পয়সাও আমার পকেটে আসত না। তিনি ত বলেই নিচ্ছেন বইয়ে আমার নামও থাকবে না এবং কোনো স্বত্বও তাতে আমার থাকবে না।"

উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তবু ঘরের কাছে ছিল, যাওয়া-আসার খরচ লাগত না। আর সকাল সাতটা থেকে কাজে লাগতে বলেছে যখন, তখন চা-টা ত ওখানেই হয়ে যেত। আমি জানি ত তাকে, সাড়ে সাতটা, আটটার আগে কোনো দিন তাদের বাড়ি চায়ের পাট চোকে না। এদিকে যতই কঞ্জুষ হোক, বাড়ি গেলে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ে না।"

প্রতাপ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "যাক সে যখন হবে না, তখন অত শত ভেবে আর কি করব? দাদার কাজ গিয়ে বাড়ির যা অবস্থা হয়েছে, সে বর্ণনা ক'রে বোঝান যায় না। নিতান্ত বাড়িটা ছিল, তাই সকলে গাছতলায় দাঁড়ায়নি, নইলে তাই করতে হ'ত। এখন যেমন ক'রে হোক আমাকে পঁচিশটা টাকা বাড়ি পাঠাতে হবে, এখানে নিজের খরচও চালাতে হবে। সুতরাং পঞ্চাশ টাকা না হলেই আমার চলবে না। কুড়ি টাকার জন্যে সারাদিন বন্ধ হয়ে থাকব কি করে?"

উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আরে বাবা, দরকারের কি আর শেষ আছে? এই যে আমার দুশো টাকা আয়, আমারও আরও দুশো হ'লে তবে একটু গুছিয়ে সংসারটা চলে, কিন্তু তাই কি আর আমি পাচ্ছি? যা দিনকাল, যা হাতে পাওয়া যায়, তাই ভগবানের কৃপা। সেই জন্যেই বল্‌ছিলাম আর কি।"

যুবক আর কোনো উত্তর না দিয়া বিজ্ঞাপনের ঠিকানাটা এক টুকরা কাগজে টুকিয়া লইয়া কাগজটা উপেন্দ্রবাবুকে ফিরাইয়া দিল। বলিল, "আজ দিনটা কি বিশ্রী করেছে দেখেছেন? এক ফোঁটা রোদ নেই, সাড়ে আটটা বাজতে চলল। সারাদিনই কাজের চেষ্টায় ঘুরি, বৃষ্টি হ'লে ভিজে মরতে হবে, ছাতা কিনবার সামর্থ্যও নেই।"

প্রতাপ চলিয়া যাইতেই উপেন্দ্রবাবুও উঠিয়া পড়িলেন, এবং খবরের কাগজ, লাঠি, নস্যের কৌটা প্রভৃতি গুছাইয়া লইয়া বাড়ির পথ ধরিলেন।

প্রতাপের বাড়ি যশোহর জেলার এক গ্রামে। পিতা বহুকাল মারা গিয়াছেন। মা এবং চারটি ছোট ভাইবোন গ্রামের বাড়িতেই থাকে। তাহারা বড় দুই ভাই শৈশব কাহাকে বলে, তাহা এক রকম বুঝিতেই পারে নাই। পিতা মারা যাওয়ার পর হইতেই অভাবের তাড়নায় তাহাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। বড় ভাইটি, মায়ের অল্প দুচারখানি গহনা যাহা ছিল, তাহাই ভাঙিয়া এফ্‌-এ. পর্য্যন্ত পাস করিয়াছিল, তাহার পর বাধ্য হইয়া পড়া ছাড়িয়া দেশের এক জমিদারী সেরেস্তার কাজে ঢুকিয়াছিল। তাহার উপার্জ্জনে সংসার এক রকম করিয়া চলিয়া যাইত বলিয়া প্রতাপ আর একটু পড়াশুনা করিবার অবসর পাইয়াছিল, যদিও খরচ সমস্তই তাহার নিজের চেষ্টায় জোগাড় করিতে হইত। ছেলে পড়ান, প্রেসের প্রুফ্‌ দেখা, স্কুল-কলেজের মানের বই লেখকদের সাহায্য করা প্রভৃতি নানা কাজ করিয়া সে নিজের থাকার এবং পড়ার খরচ চালাইত। থাকাটা অবশ্য একটা মেসের একতলার একটি অন্ধকার ঘরে হইত, এবং খাবার খরচও পুরা দিতে পারিত না বলিয়া, আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য জলখাবার এক বেলাও খাইত না। আশা ছিল, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া এম্‌-এ-টা পাস করিয়া যাইতে পারিলে ভাল কাজ জুটিবে। তখন বিধবা মা এবং ছোট ভাইবোনদের দুর্গতির অবসান করিতে পারিবে। বোন দুটিই বড় হইয়া উঠিয়াছে, নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই এতদিনেও তাহাদের বিবাহ হয় নাই। ইহা লইয়া অবশ্য পল্লীসমাজে প্রতাপের মায়ের লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। কিন্তু উৎপীড়নে আর সব হয়, শুধু টাকার আমদানি হয় না, কাজেই মেয়েদের বিবাহ তিনি এখনও দিতে পারেন নাই।

প্রতাপ বি-এ পাস করিল ভাল করিয়াই, এম্-এ পড়িবার জন্ত ভর্ত্তিও হইল। কিন্তু ঠিক এই সময় একটা কি গোলমাল হইয়া তাহার বড়ভাইয়ের চাকরিটি গেল। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় প্রতাপের সমস্ত প্ল্যান একেবারে আগাগোড়া বদ্‌লাইয়া গেল। এম্-এ পড়া রহিল মাথায়, মাকে কি করিয়া মাসান্তে পঁচিশটা টাকা পাঠাইবে, ইহা ভাবিয়াই সে অস্থির হইয়া পড়িল। নহিলে যে নিতান্তই তাঁহাকে ছেলেমেয়ে লইয়া অনাহারে মরিতে হইবে। যে-কোনোরকম কাজের সন্ধানে সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। নিজের খরচ আরও কমাইয়া ফেলিল। মেসের ম্যানেজারকে বলিল, সে এক জায়গায় সন্ধ্যায় কাজ পাইয়াছে, রাত্রের খাওয়া সেইখানেই খাইয়া আসিবে, অতএব তাহার জন্ত রাত্রে মেসে যেন রান্না করা না হয়। ম্যানেজার ব্যাপার বুঝিয়াও কিছু বলিলেন না, কারণ প্রতাপের পকেট যতই খালি থাক, মনটি আত্মমর্য্যাদায় পূর্ণ ছিল।

আজ এই ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপনটি লইয়া, নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, নানা প্রকার আশা করিতে করিতে সে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। দিন দুপুরেও ঘরখানি ছায়াচ্ছন্ন থাকে, শীতের মেঘ্‌লা প্রভাতে ইহার ভিতর প্রায় আলোর চিহ্নমাত্র ছিল না। তবু প্রতাপের চোখে সহিয়া গিয়াছে, সে ভিতরে ঢুকিয়া ছেঁড়া র‍্যাপারটা একটা দড়িতে ঝুলাইয়া রাখিল, তাহার পর তক্তপোষে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। এখনই স্নান করিয়া তাহাকে বাহির হইতে হইবে। দুই-চার জায়গায় খুচ্‌রা খুচ্‌রা কাজ সারিয়া সাড়ে তিনটার সময় ভবানীপুরে পৌছিতে হইবে। বিজ্ঞাপনে নিজে গিয়া দেখা করারই কথা লেখা ছিল। শুধু লিখিত আবেদনকে বিজ্ঞাপনদাতা যথেষ্ট বিশ্বাস করেন না বোধ হয়। নিজের কাপড় জামার দিকে তাকাইয়া প্রতাপের মন দমিয়া গেল। এইরূপ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়া গেলে, তাহারা তাহাকে দরজার গোড়া হইতেই বিদায় করিবে বোধ হয়। কি করা যায়? তাহার দুইখানি ধুতি এবং দুইটি পাঞ্জাবীতে ঠেকিয়াছিল, নিতান্ত শীত বোধ হইলে ছেঁড়া একটা র‍্যাপার ছিল, সেইটা গায়ে জড়াইয়া বাহির হইত।

মেসের সকলের সহিতই তাহার সদ্ভাব আছে, চাহিলেই ফরসা কাপড় জামা এখনই জোগাড় হইতে পারে, কিন্তু এখানেও তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া পিছাইয়া গেল। তাহার সহিত অন্তেরা ত সমানভাবে মেশে না। যে কাপড় ধার দিবে সে করুণা করিয়াই দিবে, প্রতাপের কাপড় চাহিয়া পরিবার কথা তাহারা মনেও করিবে না, এ ক্ষেত্রে সে কি করিয়া কাপড় চাহিতে যাইবে?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, সে জুতার ফিতাটা আবার বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পকেটে হাত দিয়া কয়টা পয়সা তাহাতে আছে, একবার ভাল করিয়া গণিয়া লইল, তাহার পর রাস্তায় বাহির হইয়া, দু-পয়সা দিয়া একটুক্‌রা সাবান কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। স্নানের ঘর, চৌবাচ্চার ধার এখন পর্য্যন্তও শূন্য, শীতকালে সকালে স্নানের উমেদার একজনও থাকে না। সে স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত তাহার কাঁপুনি ধরিয়া গেল, কিন্তু সেদিকে খেয়াল করিবার তাহার অবসর ছিল না। ঠাণ্ডা কন্‌কনে জলে স্নান, কাপড় জামা কাচা শেষ করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। শীতের কুয়াসা এতক্ষণে কাটিয়া গিয়া চারিদিক সূর্য্যালোকে ভরিয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত যেন একটা মধুর উত্তাপে প্লাবিত হইয়া গেল। কাপড় জামা রোদে মেলিয়া দিয়া রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আমার ভাতটা একটু চট্ ক'রে দিতে পারবে?

নটবর ঠাকুর ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, শুধু ডাল ভাত হয়েছে, মাছ এখনও বাজার থেকে আসেনি।"

প্রতাপ বলিল, "ওতেই হবে, একটা বেগুন-টেগুন পুড়িয়ে দিও।" বলিয়া সে ঘরে গিয়া টিনের ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে এক বাণ্ডিল প্রুফ্ বাহির করিল। এইগুলি সব দেখিয়া দশটার ভিতর প্রেসে পৌঁছাইতে

দিতে হইবে। ঘরের ভিতর আলোর অভাব, শীতও প্রচণ্ড, সেখানে চোখেই দেখা যায় না। উঠানে একটা প্যাকিং বাক্স পড়িয়াছিল, তাহারই উপর বসিয়া প্রতাপ প্রুফ দেখিতে লাগিল। মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া কাপড়-জামা কতদূর শুখাইল, তাহারও তদারক করিতে লাগিল। একবার উঠিয়া গিয়া জামাটার আর একপিঠ রোদের দিকে ঘুরাইয়া দিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিল, "ভাগ্যে রোদ আর বাতাসটা এখনও পৃথিবীতে বিনি পয়সায় পাওয়া যায়, নইলে আমার মত হতভাগারা একদিনের জন্যেও এখানে টিকে থাকতে পারত না।"

ঠাকুর ডাকিয়া বলিল, "বাবু, ভাত বেড়েছি, আসুন।"

প্রুফের তাড়া পকেটে গুঁজিয়া প্রতাপ খাইতে চলিল। ডাল ভাত আর বেগুনভাজা। বেগুনটা না পুড়াইয়া একটু তেল খরচ করিয়া সে ভাজিয়া দিয়াছে। অন্য বাবুরা সারাক্ষণ রান্নার খুঁৎ ধরিয়া তেল ঘিয়ের খরচের বাহুল্য বিষয়ে মন্তব্য করিয়া নটবরকে বড়ই উত্যক্ত করিয়া তোলে। প্রতাপের এ সব উৎপাত ছিল না বলিয়া ঠাকুরের তাহার উপর একটু কৃপাদৃষ্টি ছিল।

খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া প্রতাপ দেখিল কাপড়টা শুখাইয়াছে বটে, জামাটা তখনও একটু ভিজা আছে। আবার উঠানে বসিয়া প্রুফ দেখিতে লাগিল। কাছের কোথার এক ঘড়িতে ৯টা বাজিয়া গেল। আর দেরি করা চলে না। উঠিয়া পড়িয়া ভিজা জামা রান্নাঘরের উহুনের আঁচে তাড়াতাড়ি শুকাইয়া লইল, তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। চুলটা ভাঙা চিরুণী দিয়া যথাসাধ্য ভাল করিয়া আঁচড়াইল, জুতাটা পরিত্যক্ত কাপড় দিয়া ভাল করিয়া মুছিয়া লইল। এক জায়গায় শেলাই ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু মুচিকে পয়সা দিতে গেলে, আজ ভবানীপুর পর্য্যন্ত তাহাকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। থাক্, জুতাও কি আর অত করিয়া কেহ দেখিবে? সে কাগজপত্র গুছাইয়া লইয়া দরজাটা টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ঘরে তালা লাগাইবার প্রয়োজন তাহার কোনোদিনই হয় না।

সারা দুপুর এখানে-সেখানে নানা কাজে ঘুরিয়াই তাহার কাটিয়া গেল। আড়াইটা বাজিবার কয়েক মিনিট পরেই ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সে ভবানীপুরের ট্রামে উঠিয়া পড়িল। এই কাজটা যদি হয়, আর ইহাতে গোটা-পনেরো টাকা যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে সামনের মাস হইতে একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। খাটিতে তাহার আপত্তি নাই, বরং বসিয়া থাকিলেই তাহার মনে হয় সে অত্যন্ত অন্যায় করিতেছে, কিন্তু দুশ্চিন্তার চাপে তাহার যেন নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসে। সামনের মাসে তাহারই এক পরিচিত যুবক কিছুদিনের জন্য স্কুলের কাজে ছুটি লইয়া দেশে যাইতেছে। প্রতাপ তাহারই জায়গায় অর্দ্ধবেতনে কাজ করিবে। সেদিকে পঁচিশ, এদিকে পনেরো, এই চল্লিশ, আর প্রুফ দেখার দশ টাকা ত ধরাই আছে। ইহা হইলে মাস-ছয়ের মত তবু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ততদিনেও কি বড় ভাইয়ের কাজ জুটিবে না? ভগবান জানেন। যাক্, অত সুদূর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া কি হইবে, দিনান্তের অন্ন জুটিলেই সে বাঁচিয়া যায়।

ট্রাম গন্তব্যস্থানে পৌছিল, প্রতাপ তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। খানিকটা তাহাকে হাঁটিতে হইবে নিশ্চয়ই। এদিকে বিশেষ যাওয়া-আসা তাহার ছিল না, সুতরাং পাড়াটা মোটের উপর অপরিচিত, ঠিকানা দেখিয়া বাড়ি চিনিয়া লইতে তাহাকে খানিকটা খোঁজাখুঁজি করিতেই হইবে। ঠিকানাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, —নং পদ্মপুকুর রোড্। খুব ধনী না হইলেও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নিশ্চয়ই হইবেন, নহিলে কি আর স্কুলের ছেলের জন্য প্রাইভেট টিউটার রাখিতেছেন? পাড়ার লোকে অবশ্যই তাঁহাকে চিনিবে। এখন প্রতাপকে তাঁহাদের মনে ধরিলে হয়। একবার কাজে ঢুকিলে সে যে নিজগুণেই টিকিয়া যাইবে, সে বিষয়ে তাহার কোনো সন্দেহ ছিল না। সেই এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিবার পর হইতে গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিবার কাজে সে হাত একেবারে পাকাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং এ ছেলে যদি পাগল অথবা জড়বুদ্ধি না হয়, তাহা হইলে প্রতাপের হাতে

পড়িয়া একটু-না-একটু উন্নতি লাভ তাহাকে করিতেই হইবে।

এই ত পদ্মপুকুর রোড্। তখনও এ অঞ্চলে বাড়ি-ঘরের এত বাহুল্য ছিল না, দুচারখানা বাড়ি, তারপর অনেক দূর অবধি খোলা জমি বা দরিদ্রের বস্তি ভবানীপুর বালীগঞ্জের সর্ব্বত্রই দেখা যাইত। প্রতাপ বাড়িগুলির নম্বর দেখিতে দেখিতে সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বাড়ি খুঁজিয়া পাইতে বেশী দেরি হইল না। তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য ফুটপাথে দণ্ডায়মান একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণবাবুর বাড়ি ?"

ছেলেটি চট্ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হাঁা, কেন আপনি কি তাঁকে খুঁজছেন ?"

প্রতাপ অনুমান করিল, ছেলেটি এই বাড়িরই হইবে। উত্তর দিল, "আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি। তিনি বাড়ি আছেন ত ?"

ছেলেটি বলিল, "হাঁা, আছেন, কিন্তু আর বেশীক্ষণ থাকবেন না। চলুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

প্রতাপ ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাড়িটি দোতলা বটে, বিশেষ বড় যদিও নয়। তবে সামনে পিছনে জমি আছে, সামনের জমিটুকুতে সুদৃশ্য বাগান, ছোট্ট একটু 'লন্'ও রহিয়াছে। আর কিছু দেখিবার আগেই তাহাকে একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িতে হইল। ঘরখানি সম্ভবতঃ আপিস-ঘর রূপেই ব্যবহৃত হয়, তাহাতে বড় একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল্ এবং কয়েকটি চেয়ার ভিন্ন আর কিছুই নাই। দেওয়ালের গায়ে একটা বড় ঘড়ি এবং একটা ক্যালেণ্ডার। একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক বসিয়া একমনে একখানা চিঠি পড়িতে-ছিলেন।

ছেলেটি ঘরে ঢুকিয়াই ডাকিয়া বলিল, "বাবা, এই ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক চিঠিটা রাখিয়া চশমা-জোড়া কপালের উপর ঠেলিয়া তুলিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। তাহার পর একখানা চেয়ার প্রতাপের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, "বসুন। বেঙ্গলীর বিজ্ঞাপন দেখে এসেছেন ?"

প্রতাপ নমস্কার করিয়া বসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁা।" নৃপেন্দ্রবাবু একবার ভাল করিয়া প্রতাপকে দেখিয়া লইলেন। প্রতাপের অবশ্য রূপের গর্ব্ব কোনোকালেই ছিল না, তবে সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলের চেহারা যেমন হয়, তাহার চেহারাটা তাহার চেয়ে কিছু খারাপ ছিল না। ভালভাবে থাকিলে হয়ত বা চেহারা ভালই দাঁড়াইত।

যাহা হউক সে বিয়ের কনে নয়, সুতরাং চেহারার পরীক্ষায় বোধ হয় পাসই হইল। নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমি একজন ইয়ং লোকই খুঁজছিলাম, ছেলেটির কম্প্যানিয়নের বড় অভাব, সে অভাবটাও যাতে খানিকটা মেটে। পাড়ার ছেলেরা অতি বদ, তাদের সঙ্গে ওকে মিশতে দেওয়া হয় না। কালও দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, ভাল ভাল সার্টিফিকেট দেখালেন। তবে তাঁদের খাঁই বড় বেশী, আর এল্ডারলী মত, তাই বিশেষ সুবিধা হল না।"

শেষের কথাটা শুনিয়া প্রতাপ একটু দমিয়া গেল। ইনি কি পাঁচ টাকায় টিউটার পাইতে চান না কি ? কি ভাবে কথাটা পাড়িবে ভাবিতেছে, এমন সময় নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা দেখুন আপনি গ্রাজুয়েট নিশ্চয়ই। আমি চাই দশ টাকা মাইনে আর থাকবার জায়গা দিতে, তাতে কি আপনার সুবিধা হবে ?"

প্রতাপ নিরুৎসাহভাবে বলিল, "আজ্ঞে, টাকা-পনেরো হলেই আমার সুবিধা হ'ত। থাকবার জায়গার আমার দরকার নেই, আমার বাসা ঠিকই আছে।"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন "হুঁ। তা দেখুন আজকালকার দিনে সব মানুষেরই টাকার কি রকম টানাটানি জানেন ত ? যদি আপনি রবিবারেও একঘণ্টা সময় দেন, তাহ'লে না হয় পনেরো টাকাই দি। সেদিন অবিশ্যি পড়াতে হবে না, সঙ্গে ক'রে এধার-ওধার একটু ঘুরিয়ে আনা আর কি ? পাড়ার ছেলেরা অতি বদ, তাদের সঙ্গে ও মেশে না ত। অথচ য়্যামিউজমেণ্টও দরকার গ্রোইং বয়ের পক্ষে।"

প্রতাপ একটু ভাবিয়া বলিল, "আজ্ঞে, তা না হয় আসব, রবিবারে।" নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "বেশ তাহ'লে কাল থেকেই কাজে লেগে যান। চারটেয় আসবেন আর কি। এখন তবে আমি উঠি, আমার আর সময় নেই।" প্রতাপও উঠিয়া পড়িল।

২

প্রতাপ বাহিরে আসিতেই, ছেলেটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। একটু নীচু গলায় বলিল, "দেখুন, আপনি হয়ে ভালই হ'ল। বুড়োমানুষ হ'লে আমি ত তার সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারতাম না। আর বাবার জ্বালায় আমার কারও সঙ্গে কথা বলবারও জো নেই, কোথাও যাবারও জো নেই, ক্লাসে স্যর খালি তাড়া দেয় 'আউট বুক' পড়বার জন্যে, তাও বাবা কিচ্ছু পড়তে দেবেন না রবিন্সন্ ক্রুসো ছাড়া।"

ছেলেটিকে পিতৃচর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

ছেলেটি বলিল, "মিহিরকুমার সরকার।" প্রতাপ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?"

"এই ত এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠলাম, গতবার ফেল হয়েছিলাম তাই, নয়ত এবার এণ্টান্স ক্লাসেই আমার উঠবার কথা। ইংরেজীতে আমি একটু উঈক, সেই ত হয়েছে মুস্কিল।"

প্রতাপ মিহিরকে উৎসাহ দিয়া বলিল, "সে সব ঠিক হয়ে যাবে, কোনো ভাবনা নেই। দেখো এখন সেকেণ্ড ক্লাস থেকে তুমি রীতিমত প্রাইজ্ পেয়ে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠবে।"

ছেলেটি বলিল, "হওয়া খুব শক্ত নয়, ম্যাথ্ম্যাটিক্স্-এ আমি বেশ ভালই মার্ক পাই। ইংরিজীটা সামলে নিলে কোনই ভাবনা থাকে না।"

এমন সময় একটা চাকর বাহিরে আসিয়া বলিল, "খোকাবাবু, মেমসাহেব তোমায় ডাকছেন।"

ছেলেটি চলিয়া গেল। গৃহিণীকে মেমসাহেব নামে উল্লেখ করা হয় দেখিয়া প্রতাপ বুঝিল ইহারা পুরাদস্তুর সাহেবী চালেই চলেন। তার নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের উন্নতিসাধন নিতান্তই দরকার, তাহা না হইলে এ বাড়িতে তাহার মান থাকিবে না।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গিয়া সে আবার বাড়িটার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। বাড়িটি সত্যই সুন্দর, ভিতরটাও নিশ্চয়ই বেশ সুসজ্জিত, তবে এখান হইতে জানালার বিলাতী ছিটের বাহারে পরদা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

প্রতাপ ট্রাম ধরিবার জন্য হাঁটিয়া চলিল। এই দিকেই কোথাও তাহাকে আড্ডা গাড়িতে হইবে, না হইলে মাণিকতলা হইতে ভবানীপুর আসা-যাওয়া করিতেই তাহার পনেরো টাকা প্রায় শেষ হইয়া যাইবে। থাকিবার জায়গা অবশ্য নৃপেন্দ্রবাবু দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ধনী ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন পরিবারে থাকিবার মত অবস্থা বা শিক্ষাদীক্ষা তাহার নয়। পদে পদে তাহাকে লজ্জা পাইতে হইবে, নিজের হীনতা উপলব্ধি করিতে হইবে। মান বাঁচাইয়া চলিতে হইলে দূরে থাকাই ভাল।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, ভবানীপুরেই তাহার এক দূর সম্পর্কের পিসিমা থাকেন। ভাইপোর সঙ্গে আত্মীয়তা করিলে সে পাছে সাহায্যপ্রার্থী হয় এই ভয়ে পিসিমা বা তাঁহার পুত্রেরা প্রতাপের বড়-একটা খোঁজখবর করেন না। বিজয়া দশমীর দিন একবার ডাক পড়ে বটে। প্রতাপও যাচিয়া কোনোদিন যায় নাই। খরচ দিয়া থাকিতে চাহিলে তাঁহারা কি অরাজী হইবেন? তাঁহাদেরও ত টানাটানির সংসার, দু-দশ টাকা পাইলে সাহায্য হইতে পারে। একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। আজকার দিনটা মাত্র তাহার হাতে আছে, কাল হইতে কাজে লাগিতে হইবে, সুতরাং ব্যবস্থা যাহা কিছু করিবার তাহা আজই করিয়া লইলে ভাল।

পিসিমার বাড়ির পথেই চলিল। গলির মধ্যে ছোট একখানি বাড়ি, তবে তিনতলা বটে। কিন্তু একতলায় অন্য ভাড়াটে থাকে। দোতলায় দুখানি এবং তেতলায় একখানি ঘর পিসিমার অধিকারে আছে।

কড়া নাড়িতেই ছোট একটা ছেলে আসিয়া দরজা

খুলিয়া দিল, প্রতাপকে দেখিয়া মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল, "ঠাকুমা প্রতাপকাকা এসেছে, ও ঠাকুমা!"

প্রতাপ বলিল, "আরে থাম থাম, অত চেঁচাতে হবে না। পিসিমা কোথায়?"

পিসিমা এই সময় দোতলার সরু বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "এস বাবা, উপরেই উঠে এস। কানু দরজাটা ভাল ক'রে বন্ধ করে আসিস্, যা দিনকাল পড়েছে।"

প্রতাপ কানুকে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। পিসিমা একখানা মাদুর পাতিয়া কাঁথা শেলাই করিতে বসিয়াছেন, চারিদিকে ছেঁড়া পাড় এবং রং-বেরঙের সুতার পুঁটুলি ছড়ানো।

প্রতাপ বলিল, "আপনার ত এখনও বেশ চোখের তেজ আছে দেখি, পিসিমা?"

পিসিমা বলিলেন, "তা আর থাকবে না বাছা, পাড়াগেঁয়ে মানুষ। শহরের ধোঁয়া আর ধুলো আর বিজ্‌লি বাতি এই সবেই ত চোখ্ নষ্ট হয়।"

পিসিমার শহরের সব জিনিষের প্রতি অসীম অবজ্ঞা, একবার এ বিষয়ে কথা আরম্ভ হইলে তাহার আর শেষ থাকে না। সুতরাং সে-প্রসঙ্গ চাপা দিয়া প্রতাপ বলিল, "সেজদা বাড়ি নেই বুঝি? বৌদি কি করছে?

পিসিমা বলিলেন, "ওমা, সবে চারটে, এখন কি সে বাড়ি আসে? তার বাড়ি আসতে যার নাম সন্ধ্যে ছ'টা। রাস্তার আলো জ্বলে যায়, তবে বাছা বাড়িতে পা দেয়। বড় খাটুনি। বৌমা আর কি করবেন, ঘুমুচ্ছেন। তোমাদের একালের শহুরে মেয়ে, দুপুরে তারা কি আর বসতে পারে? ছেলেটাকে সুদ্ধ ছেড়ে দেয় আমার ঘাড়ে।"

উপর হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাক আসিল, "কানু, শীগ্‌গির উপরে আয় বল্‌ছি।"

পিসিমা গলা সামান্য একটু নামাইয়া বলিলেন, "এমনিতে ত হাজার ডাকে সাড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু নিজের নামে একটা কথা হয়েছে কি, অমনি কানে গেছে। তা যাক্‌গে, আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না।"

প্রতাপ বলিল, "পিসিমা, আমায় এখানে একটু জায়গা দিতে পারেন? মাণিকতলাটা বড় দূর পড়ছে, এইদিকে একটা কাজ পেয়েছি, কাছাকাছি থাকলে তবু করা চলে, নইলে ট্রামের খরচা জোগাতে হ'লে একেবারেই অসম্ভব।"

পিসীমা অত্যন্ত নিরুৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, "দেখছ ত বাবা, আমরা কি ভাবে আছি। নেহাৎ কোনমতে মাথা গুঁজে থাকা। সে ক্ষ্যামতা থাকলে তোমাকেই বা যেচে বলতে যেতে হবে কেন? আমরা নিজেরাই আদর ক'রে ডেকে আন্‌তাম। আহা, হরিদাদা যে আমার নিজের ভাই নয় তা কেউ কোনদিন বিশ্বাস করত না, ঠিক যেন এক মায়ের পেটের। তা ভগবান যে দিনকালের সৃষ্টি—"

প্রতাপ বাধা দিয়া বলিল, "সে আর কি না জানি, ভুক্তভোগী ত আমরা সবাই। কে কাকে দেখবে বলুন, সে-সব আজকালকার দিনে আশা করাই বৃথা। আমি বলছিলাম রাজুর ঘরটায় সে ত একলাই থাকে, আমিও যদি একপাশে থাকি, তা হ'লে কি বেশী অসুবিধা হয়? খাওয়ার খরচটা কিন্তু আপনাকে নিতে হবে পিসিমা, নইলে আমি কিছুতেই আসতে পারব না।"

পিসিমা একটু থামিয়া বলিলেন, "তুমি ঘরের ছেলে ঘরে থাকবে, তাতে আবার অসুবিধে কি? তবে গজুকে একবার ব'লে নিলে হ'ত। জান ত বাবা আজকাল ছেলেরাই হয়েছে কর্ত্তা, মায়ের কথায় ত কাজ হয় না।"

প্রতাপ বলিল, "আমি তাহ'লে বসি একটু পিসিমা, আর একবার যে ঘুরে আসব, সে সময় আমার নেই। আজকের মধ্যে সব ঠিক ক'রে, কাল দুপুরের মধ্যে আমায় গুছিয়ে বসতে হবে। বিকেল থেকে কাজে লাগতে হবে।"

পিসিমা বলিলেন, "বোস্ বোস্, এইখানেই চা-টা খা। রাজু গজুও এই এসে পড়ল ব'লে। কোথায় কাজ নিলি এ পাড়ায় আবার? আপিস্ আদালত কিছু ত ইদিকে নেই?"

প্রতাপ হাসিয়া বলিল, "আপিস আদালত করবার মত কপাল নিয়ে কি আর জন্মেছি পিসিমা? কোনমতে দিনমজুরী করেও যদি পেটে খেতে পাই, তাহ'লে সেটাকেই ভাগ্য বলে মানি। এ ছেলে-পড়ানোর কাজ।

এ পাড়াতেই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার ব'লে এক ভদ্রলোক আছেন, তাঁর ছেলেকে পড়াতে হবে।"

পিসিমা বলিলেন, "ওমা, এই কাজ? আমি বলি সাহেবী আপিসে কাজ পেয়েছিস।" তাঁহার দুই পুত্রই এক মার্চেণ্ট আপিসে কাজ করে, ইহা তাঁহার এক পরম গৌরবের বিষয়।

প্রতাপ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "সে-সব কি আর সকলের অদৃষ্টে জোটে? কানুটা গেল কোথায়?"

পিসিমা বলিলেন, "কোথায় আবার যাবে? উপরে গিয়ে উঠেছে মায়ের কাছে। ও কানু, ওরে কেনো, আয় না নেমে, এই তোর কাকা কি বলছে শুনে যা।"

কানু লাফাইতে লাফাইতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। পিছনে তাহার মা-ও অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া নামিয়া আসিলেন, ছেলেপিলের মা হইয়াছেন, এখন আর লজ্জাসরম লইয়া বাড়াবাড়ি করেন না। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ ঠাকুরপো?"

প্রতাপ বলিল, "ভালই আছি, একটু চা-টা খাওয়ান?"

"এই যে যাই," বলিয়া শাশুড়ীর দিকে ফিরিয়া বধূ বলিলেন, "রান্নাঘরের চাবিটা দিন ত মা।"

ইহাদের রান্নাঘরটি দোতলা এবং একতলার মাঝামাঝি একটি স্থানে, সবাই সেটাকে দেড়তলা নাম দিয়াছেন। একতলার ভাড়াটিয়া পাছে অনধিকারপ্রবেশ করে, এই ভয়ে সেটি সারাক্ষণই তালাবদ্ধ থাকে, যখন অবশ্য রান্নার কাজ না থাকে।

পিসিমা কাপড়ের পাড় বাঁধা একটা চাবি বধূর দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, "চায়ের জলটা এখনি বসিয়ে দাও গে, প্রতাপ বোধ হয় কোন্ সাত সকালে খেয়ে বেরিয়েছে। খানকয়েক লুচি কর গে না, ও-বেলার কপির তরকারী আছে, তাই দিয়ে খাবে।"

প্রতাপ বলিল, "আমি এমন কি এক কুটুম এলাম যে আমার জন্যে এত আয়োজন? ও সবে দরকার নেই বৌদি, শুধু চা হ'লেই হবে। গরম মুড়ি নেই? কতকাল যে টাট্‌কা ভাজা মুড়ি খাইনি, তার আর ঠিক ঠিকানা নেই।"

পিসিমা বলিলেন, "পোড়া কপাল, মুড়ির আবার অভাব! সে একদিন খাস্, এখন, আজ দুখান লুচিই খা না। কোথাকার এক মেসে থাকিস পড়ে। যত্ন-আত্তি ক'রে কি আর তারা খাওয়ায়, টাকাই লুটে নিতে জানে শুধু।"

প্রতাপের হাসি পাইল। তাহার নিকট হইতেও টাকা লুটিয়া লইবে, এমন মেসের ম্যানেজার আছে কোথায়? আর যত্ন-আত্তি? দুইবেলা খাইতে পাইলেই সে বাঁচিয়া যাইত, তাহা যতই অযত্ন-দত্ত হউক না কেন? কিন্তু একবেলা খাইয়া যে তাহাকে দিন কাটাইতে হয়, তাহা কে-ই বা জানে? তাহার জানাইবারও অধিকার নাই। মানুষ বড়জোর পিতামাতার উপর দাবি করিতে পারে, আর কাহারও কাছে নিজের দুঃখ জানাইতে যাওয়াও যে উৎপাত করা। সকলেই এখানে নিজের ভাবনায় বিব্রত, কে কাহাকে সাহায্য করিবে?

কানু হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "কাকা, আমায় নিয়ে চল না হিপোড্রম সার্কাস দেখাতে। বাবাকে হাজার বল্‌লেও বাবা নিয়ে যায় না।"

কানুর ঠাকুরমা বলিলেন, "হ্যাঁ, সে আসে সারাটা দিন তেতে পুড়ে, তারপর তোমাকে নিয়ে ঐ সব প্যাখনা করুক্।"

পিসিমার কাঁথা শেলাই এবং কথা সমানে চলিতে লাগিল, প্রতাপ বসিয়া বসিয়া দুই-একবার হুঁ, হাঁ' করিতে লাগিল। কানু তিনতলা, দোতলা, দেড়তলা, সর্ব্বত্র লাফাইয়া বেড়াইতে লাগিল। শীতকালের বেলা, দেখিতে দেখিতে রোদ নামিয়া পড়িল।

গজু এবং রাজু অতঃপর আসিয়াই পড়িল। তখন হুড়াহুড়ি লাগিয়া গেল, পিসি-মা কাঁথা ফেলিয়া উঠিলেন, কানুর মা-ও জলখাবার এবং চায়ের জল বহন করিয়া দোতলায় আবির্ভূত হইলেন। গজু ওরফে গজেন্দ্র প্রতাপকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রতাপ, কি মনে ক'রে হে? না ডাক্‌লে তোমার ত দেখাই পাওয়া যায় না।"

প্রতাপ বলিল, "তোমাদেরই বা দেখা কে পায় বল?"

চা এবং জলখাবার আসিয়া পড়ায় অন্য আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

চা খাওয়া শেষ হইতেই পিসিমা কথাটা পাড়িলেন। "ও গজু, প্রতাপের এ দিকে কাজ হয়েছে, সে এ বাসায় থাকার কথা বল্‌ছিল। তা বিদেশ বিভুঁয়ে আপনজন কাছাকাছি থাকাই ভাল। রাজুর সঙ্গে থাকবে এখন, ও ঘরের ছেলে, ওর জন্যে ত আর আলাদা ঘর দিতে হবে না।"

গজু বুঝিল মা যখন এতটা উৎসাহ দেখাইতেছেন, তখন অসুবিধা বিশেষ নাই বোধ হয়। বলিল, "বেশ ত, আমি ত কতদিন আগেই বলেছি, ও এখানে এসে থাকলে ভাল। অসুখ-বিসুখও মানুষের আছে ত, কোথায় একলা মাণিকতলার মেসে পড়ে থাকে।"

পিসিমা বলিলেন, "তাহ'লে সকালেই জিনিষপত্র নিয়ে চলে এস বাবা, এখানেই খাবে।"

প্রতাপ বলিল, "আচ্ছা। আমি তাহ'লে যাই এখন। জিনিষপত্রের সংখ্যা যদিও মোটেই বেশী নয়, তবু গোছ-গাছ একটু করতে হবে বইকি ?"

কানু চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার জন্যে বাঁশী এনো কিন্তু, সেবার যেমন এনেছিলে।"

তাহার মা শাশুড়ীর দৃষ্টি বাঁচাইয়া ছেলের পিঠে এক চড় মারিয়া বলিলেন, "খালি আদেখলাপণা। খেল্‌না কখনও তোমার জোটে না, না ?" গজু মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রতাপ খরচপত্তর দেবে ত ? তা না হ'লে দেখছ ত দিনকাল, খরচ চালাতে জিব বেরিয়ে পড়ে।"

পিসিমা বলিলেন, "নে নে, সেদিনকার ছেলে, উনি আবার আমায় বুদ্ধি দিতে এলেন ! কিসে কি হয়, তা আর আমি জানি না। খরচ দেবে বইকি ?"

প্রতাপ পথ চলিতে চলিতে ভাবিতেছিল, যা হোক একটু সুব্যবস্থা এবার হইল। পিসিমার বাড়িতে তবু একটু পারিবারিক জীবনের আস্বাদন পাওয়া যাইবে, আদর-যত্ন অতিরিক্ত মাত্রায় নাই জুটুক। এতদিন যেন সে ভবের পান্থশালায় বসিয়াছিল, কেহ তাহার আপন নয়, কাহারও উপর তাহার দাবি নাই। যে-স্থানটিতে তাহাকে বাস করিতে হইত, তাহা প্রায় জেলখানার 'সেল্‌' বলিলেও চলে। প্রতাপের শরীর মন দুই-ই এই ঘরখানিতে ঢুকিলে তখনই ঝিমাইয়া পড়িত; কোনো আশা উৎসাহ আর তাহার থাকিত না।

মেসে পৌছিতে পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাস্তার আলো জ্বলিয়া উঠিল বটে, কিন্তু উত্তর-কলিকাতার সান্ধ্য ধূম্রসাগরে তাহাদের অস্তিত্ব বড়ই ম্লানভাবে চোখে পড়িতে লাগিল। প্রতাপ মনে মনে ভাবিল শহরে বাস করার কি সুখ, বিশেষ করিয়া দরিদ্র ব্যক্তির। যাহা কিছু এখানে লোভনীয়, প্রায় সবের জন্যই মূল্য দিতে হয়, কিন্তু বিনামূল্যে পাওয়া যায় ধোঁয়া, দূষিত বায়ু, রোগ-বীজাণু, আরও কত কি। এই কয়েক বৎসর কলিকাতাবাসের ফলে তাহার ফুসফুসের ভিতর ক' সের কালি জমা হইয়াছে কে জানে ? বাবা, কি ঘন ধোঁয়া, যেন মুঠা করিয়া ধরা যায়। সকালে ধোয়া কাপড় পরিয়া বাহির হইয়াছিল, ইহারই ভিতর তাহার রং ধূসর হইয়া আসিয়াছে।

মেসের ম্যানেজারকে প্রতাপ সব কথা খুলিয়া বলিল। উঠিয়া যাইবার আগে যথোপযুক্ত সময়ের নোটিস তাহার দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে ক্ষমতা প্রতাপের নাই। তাঁহারা যেন কিছু মনে না করেন।

ম্যানেজারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার ও ঘরখানির ক্যাণ্ডিডেট্ চট্ ক'রে ত জুটবে না মশায়, কাজেই নোটিস না দিলেও আমাদের খুব বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। ওটা বছরখানিক ত পড়েই থাকবে।"

প্রতাপ বলিল, "টাকাকড়ি যা বাকী আছে, তা আসচে মাসে এসে চুকিয়ে দিয়ে যাব। এখন আমার হাতে দুটো টাকা ছাড়া কিছুই নেই।" ম্যানেজার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা।"

প্রতাপ আর কিছু না বলিয়া, তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢুকিল। আর এ ঘরে তাহার থাকিতে হইবে না মনে করিয়া যেমন একটু মুক্তির আনন্দ অনুভব করিল, তেমনি সামান্য একটু বেদনাও বোধ করিল। হাজার হউক, ইহা তাহার একলার ঘর ছিল, দরজা বন্ধ করিয়া বসিলে কেহ তাহার নির্জ্জনতার ব্যাঘাত ঘটাইতে আসিত না। এখন তাহাকে পরের ঘরের একটা কোণ আশ্রয়

করিতে হইবে, হউক না সে ঘর ভাল। রাজু হয়ত কত সময় তাহার নিকট-সান্নিধ্যে বিরক্ত হইবে, অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিবে না।

যাক, এখন আর অতশত ভাবিয়া লাভ কি? যাহা হইবার হইবেই। দরিদ্রের জন্য পৃথিবীতে সহস্র রকম জ্বালাযন্ত্রণা লেখাই আছে, তাহা সহ্য করিবার মত শক্তি মনে রাখা ভিন্ন উপায় নাই।

অকেজো কাগজপত্র সব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাকী জিনিষ প্রতাপ নিজের টিনের বাক্সের মধ্যে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার কাজ শেষ হইয়া গেল।

পরদিন মেসে সকলের কাছে বিদায় লইয়া, মুটের মাথায় জিনিষ চাপাইয়া সে বিদায় হইয়া গেল। তাহার যাওয়ায় দুঃখ করিল একমাত্র নটবর ঠাকুর। ক্ষেন্তী ঝিকে বলিল, "ভারি ভদ্দর মানুষ ছিল বাবু। কখনও উঁচু গলায় কথা বলেনি। অন্য বাবুদের কথা আর বোলো না, ব্রাহ্মণকে তারা একেবারে মান্য করে না।"

যতদূর সম্ভব হাঁটিয়া গিয়া প্রতাপ গাড়ী করিল। সারাটা পথ গাড়ী করিতে হইলে তাহাকে পকেটের সব ক'টি টাকাই তখন খরচ করিতে হইত। একটি অতি জীর্ণ থার্ড ক্লাস গাড়ী চড়িয়া বাকী পথটুকু অতিক্রম করিয়া সে পিসিমার বাড়ি গিয়া উঠিল।

ইহারই মধ্যে সেখানে আপিসে যাইবার তাড়া লাগিয়া গিয়াছে, শাশুড়ী বৌ দুইজনে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়াও তাল সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। গজু প্রতাপকে দেখিয়া বলিল, "এই যে, বসে যাও আমাদের সঙ্গেই। বাক্সটা ওখানেই থাক, পরে ঘরে তুলো।"

প্রতাপ তাড়াতাড়ি বাক্স বিছানা ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়া গেল। কানুর মা পরিবেশন করিতেছিলেন, প্রতাপের মনে হইল অন্ন-ব্যঞ্জনের মাধুর্য্য যেন তাহাতে শতগুণ বাড়িয়া গেল। কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, গৃহ তাহার নাই, মা-বোন কেহই কাছে নাই। ভবঘুরে ছন্নছাড়ার জীবন যাপন করিতে করিতে তাহার বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া উঠিতেছিল। নারীহস্তের সামান্য একটু সেবার স্পর্শে তাহার সমস্ত হৃদয়টা যেন সরস হইয়া উঠিল। গজু রাজু তাড়াতাড়িতে ফেলাছড়া করিয়া খাইতেছে দেখিয়া সে মনে মনে পীড়া বোধ করিতে লাগিল। আদরযত্ন যাহাদের কাছে সুলভ, তাহাদের কাছে কি উহার কিছুই মূল্য নাই?

দুই ভাই তাড়াতাড়ি করিয়া খাইয়া উঠিয়া পড়িল, প্রতাপও উঠিতে যাইতেছিল, পিসিমা বাধা দিলেন, বলিলেন, "তুই বোস্, তোর এত তাড়া কিসের? মাছটায় বেশ ডিম ছিল আজ, বৌমাকে বল্‌লাম টক্ করতে, তা চড়িয়েছে, আর দু-ফুট হলেই হয়ে যায়, তা হতভাগারা তড়বড়িয়ে উঠে পড়ল। খেতেও আসে যেন ঘোড়ায় চড়ে। তুই বোস্ বোস্। বৌমা, টক্ দিয়ে যাও প্রতাপকে।"

বৌদিদি আসিয়া প্রতাপের পাতে টক দিলেন। বহুকাল সে এমন তৃপ্তির সহিত খায় নাই। গ্রামের ছোট খড়ের ঘর, মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ তাহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল।

ক্রমশঃ



ভারতীয় দর্শনে বাঙ্গালীর দান

...আমি ঐতিহাসিক দার্শনিক যুগে বাঙ্গালী মনীষার দর্শনশাস্ত্রে দান বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।...

আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এক জন বৌদ্ধ আচার্য্যের আবির্ভাব হয়। তাঁহার নাম শান্তরক্ষিত। তিনি বিক্রমশিলা নামক তাৎকালিক প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় বৌদ্ধ-বিহারে আচার্য্য-পদে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

নেপাল রাজের প্রার্থনানুসারে তিব্বতে গমন করিয়া তথায় তিনি সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামে একখানি গ্রন্থ কিছুদিন হইল বরদা ষ্টেট লাইব্রেরী হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে বাঙ্গালী-মাত্রেরই হৃদয় গৌরবে ও আনন্দে স্ফীত হইয়া থাকে। কুমারিলভট্ট, শবরস্বামী প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের উদ্ভাবিত যুক্তি ও প্রমাণ-সমূহকে তিনি যে ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন ও খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধমত-সমূহ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে দার্শনিকমাত্রেই বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হইবেন। বাঙ্গালা দেশ তখন বৌদ্ধপ্রধান থাকায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মমূলক বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি সাধারণতঃ লোকের শ্রদ্ধা নিতান্তই কমিয়া গিয়াছিল, বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান একেবারে কমিয়া গিয়াছিল, এবং প্রসারণশীল বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনের প্রতি সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সকল কারণে আচার্য্য শান্তরক্ষিতের আস্তিক দর্শন খণ্ডনের জন্য এই তত্ত্বসংগ্রহ নামক প্রভাবশালী গ্রন্থের প্রণয়ন তৎকালে বঙ্গীয় মনীষিগণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল, এবং তাহা বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের প্রতি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে আচার্য্য শঙ্করের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া শ্রুতিমূলক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনর্গঠনবিষয়ে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিল, বঙ্গদেশে, নেপালে ও তিব্বত প্রভৃতি সত্যধর্ম্মহীন দেশে বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে ও স্থাপনায় সেইরূপ প্রভাবই যে বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আচার্য্য শান্তরক্ষিতের পর বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে বহু আস্তিক-মতাবলম্বী দার্শনিকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদিগের মধ্যে ন্যায়দর্শনে শ্রীধর আচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য্য ও বিশ্বনাথ প্রভৃতির নাম বঙ্গের দার্শনিক ইতিহাসে চিরদিনের জন্য সমুজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। বেদান্তদর্শনে পাশ্চাত্য বৈদিককুলভূষণ আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' 'গীতার্থসন্দীপনী' ও 'ভক্তিরসায়ন' নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া সমগ্র ভারতে দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালী নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ যিনি অধ্যয়ন করেন নাই, বর্ত্তমান সময়ে তিনি যেমন নৈয়ায়িকরূপে সমাদৃত হইতে পারেন না, সেইরূপ আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি নামক সুবিদিত গ্রন্থের রসাস্বাদনে যিনি অসমর্থ, তিনি কিছুতেই বর্ত্তমান সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে প্রবেশলাভ করিতে হইলে, বাঙ্গালী দার্শনিক আচার্য্যগণের প্রণীত কতিপয় গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি একান্ত আবশ্যক। ঐ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে, ইহা ধ্রুব সত্য এবং সংস্কৃত দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও ইহা সুবিদিত। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি-স্থানীয় ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে বাঙ্গালী দার্শনিকগণের যে দান, তাহা অপর সকল দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের দান অপেক্ষা কোন অংশেই অল্প নহে। প্রত্যুত কোন কোন অংশে ঐ দান যে অতুলনীয়, তাহা বলিতেও কোন দ্বিধা বোধ হয় না।...

(মাসিক বসুমতী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮) শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

—

জাতীয় জাগরণে রবীন্দ্রনাথের দান

...আজ জাতীয় জাগরণের দিনে জাতির সঙ্গে বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন, মুখ্য হলেন আমাদের কবিসার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ।...

সমস্ত ভারতচিত্ত মথিত করে যে গান উঠেছে, যে গান ভারতকে মাতিয়ে তুলেছে, তাকে এক অখণ্ড জাতীয়তার রূপ দিয়েছে, সে এই কবিরই গান। আসমুদ্র হিমাচল ও সমুদ্রের অপর পারের কনক-লঙ্কাও আজ এক কণ্ঠে সুর মিলিয়ে ভারত-ভাগ্য-বিধাতারই জয়গান করছে—'যাঁর করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে'—যাঁর আশীর্ব্বাদ সকল প্রদেশ একত্র হয়ে নতশিরে মাগে।—যখন অবসাদ আসে, যখন মনে হয় ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন-আচার-যুক্ত আমরা এক সঙ্গে চলব কি করে, তখন যে ভারত-রূপ চিত্তে জেগে উঠে সেই ভারতের রূপখানি নয়ন সম্মুখে আঁকল কে? সে তো এই কবি!

বন্দেমাতরম্ গানে বাঙালীর চিত্ত নেচে ওঠে, বাঙ্গালীর প্রাণেই তার সাড়া জাগে—কারণ সে নিতান্তই বাংলার গান। সে দেশ

'কখন মা তুমি ভীষণ দৃপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।'

তাকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা রূপ দিলে মরুপ্রদেশবাসী যে, তার চিত্তে সাড়া জাগে কি? তাকে যদি চন্দন শীতলা বলি তবে "লু"এর তপ্ত নিঃশ্বাস যে সহ্য করে সে কি মাকে চিন্‌তে পারে? বাংলার শরৎ-রাণী বর্ষার নিবিড় মেঘজালরূপী অসুরদলনী যে হেমকান্তি হৈমবতী তাঁর রূপ কি কঙ্করময় বালুময় প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ ধারণায় আনতে পারে? তাই সে গান বাঙালীর চোখে জল আনে, চিত্ত-কমলকে গন্ধে ভরিয়ে তোলে, সে গান সমস্ত

ভারতকে মাতায় না। ও গান যে একান্ত বাঙালীরই নিজস্ব গান—ও গান যে বাঙালীর চিন্তায়, মননে আনন্দ-মঠের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতের যে রূপ ভারতের গণ-সম্প্রদায়ের চোখে নিত্য উদ্ভাসিত, ভারতের জনগণ যে রূপকে মেনে নিয়েছে, আপনার প্রতিভূ বলে যে মানব-শ্রেষ্ঠকে স্বীকার করে নিল তাঁর মধ্যে যে রূপ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, সেই রূপ তো এই কবিই তাঁর ঋষির দৃষ্টিতে আজ সিকি শতাব্দীর পূর্ব্বে দেখে আমাদের চিত্তে শব্দ-তুলিকার রেখা দিয়ে এঁকে দিয়েছিলেন—

"রাজা তুমি নহ, হে মহা-তাপস তুমিই প্রাণের প্রিয়।"

এঁরই কণ্ঠে উদাত্ত সুরে উচ্চারিত হয়েছিল যে বাণী সেই বাণীই তো জাতীয়তাবাদী ভারতকে আজ জাগিয়ে তুলে বললে অস্পৃশ্যতাকে পরিহার কর। সেই তো তার অবলুপ্ত চেতনার মধ্যে যে রক্তের সম্বন্ধ নিবিড় হয়ে লুকিয়েছিল তার জ্ঞানকে জাগ্রত চেতনার মধ্যে এনে দিল। তাই ভারতের মহা-মানব জান্‌ল যে প্রতি প্রদেশবাসীর দেহরক্তের মধ্যে—

"হেথায় আর্য্য, হেথায় অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"

তাই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করা আজ হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজ শুধু সেই ক্ষোভের বাণী নয়, সেই ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অশুভ যে এল তার জন্য সাবধান বাণী নয়—যা আজ দেশসেবকের প্রাণে দেশবাসীমাত্রকেই ভাই বলবার প্রেরণা দিচ্ছে, আজ এক রক্ত যে শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে সেই জ্ঞানই সবাইকে একত্র করছে। নীচে যাকে রাখা হয় সেও যে উপরে যারা চেপে বসে তাদেরকে নীচে টানে, অপরের মনুষ্যত্বকে অপমান করলে পরে যে নিজের মনুষ্যত্বও অপমানিত হয়, এই সাবধান বাণী আজ শুধু মানুষকে সাবধান করছে না, মানুষ আজ অন্তরে সত্যকে উপলব্ধি করেই বলতে চাচ্ছে—

'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।'

কবির কণ্ঠে সুর মিলিয়ে মানুষ বললে 'ওমা, আমার যে ভাই, তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী।' অত্যাচরিত পঞ্জাবের অপমান-বেদনায় যেদিন ভারতবাসী পাগলের মত হয়ে উঠ্‌ল সেইদিন কবি যখন আপন হাতে অত্যাচারী শাসক-বৃন্দের প্রতীকরূপে যে সম্রাট সিংহাসনে বসেন তাঁর দেওয়া সম্মান—কবি প্রতিভার প্রতি রাজার যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন—তা ফিরিয়ে দিয়ে নিদ্রোত্থিত সিংহের মত গর্জ্জে উঠে বাণী প্রেরণ করলেন, দেশবাসী সেই বাণীতে পথের আলো দেখতে পেল। কবি তার পরেই নেমে এলেন রাজনীতি ক্ষেত্রে—রাজার কর্ত্তব্যের কোথায় ত্রুটি, প্রজার দাবি কি, তাই নিয়ে আলোচনা করতে।

দেশকে স্বাধীন যারা করতে চেয়েছে এবং তারই জন্য দুঃখময় দণ্ড-ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছে তাদেরকে কবি ভোলেন নাই। তাই কারাগারের অন্তরালে তাদেরই দলনায়ককে কবি আপনার নমস্কার প্রেরণ করবার সাহস রেখেছিলেন

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি।"

সেই সাহসে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ দেশবাসী, দেশমাতৃকার চরণতলে যে-সমস্ত অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন হয় তাদেরকে শ্রদ্ধানিবেদনের স্পর্দ্ধা রাখে। কবির মুখ থেকেই উচ্চারিত বাণী নিয়ে, তাঁরই দেওয়া নাম দিয়ে দেশবাসী আজ আত্মবলিদানকারীদের নাম করে বলেন 'অমূল্য।'

প্রাণের ভিতরে যা-কিছু দেশ উপলব্ধি করে, কিন্তু যা-কিছু ভাষায় প্রকাশ করতে পারে নি, মনের মধ্যে যা-কিছু তার মেঘের মত ভেসে ভেসে গিয়েছে কিন্তু সমস্ত কাজে, চিন্তায় প্রাণে রসধারা রূপে প্রকাশ পায় নি সেই সমস্তকে কবি আপনার অপূর্ব্ব ভাষায় ও ছন্দে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁর লেখা পড়ে, গান শুনে ও গেয়ে আমাদের চিত্ত আপনা হতেই বলে ওঠে "এই-ই তো আমার মনের কথা ছিল, আমার মনের গোপন নিভৃতে তুমি তাকে টেনে এনে দাঁড় করালে কবি বিশ্বজনের চোখের কাছে।"

কবি দেশসেবকের মনকে তাঁর কাছে খুলে ধরেছেন—তার যে বলবার কথা তা চিত্তোন্মাদকারী ভাষায় সুরে ছন্দে বেঁধে দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আজ তাঁরই বাঁশীর সুরে বেজে উঠ্‌ছে দেশনায়কদের গভীর বাণী—

'কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ
তারা এস এস—'

তাই দেশ আজ জেগে উঠেছে। ভৈরবের আহ্বান বাঁশরীর সুরে কানে এসে পৌঁছিয়েছে।...

(জয়শ্রী—পৌষ, ১৩৩৮). শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

—

মহিলা-কবি 'ঠাকুরাণী দাসী'

(সংবাদ প্রভাকর, ১লা বৈশাখ ১২৬৫। ১৩ই এপ্রিল ১৮৫৮)

"আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে বিশেষ বিশেষ দিবসে সুরাগ-সূচক-স্বাভিপ্রায়-সম্বলিত বিশেষ বিশেষ কুলকন্যার গদ্য পদ্যময়-প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, অদ্য নূতন বৎসরের নূতন দিবসের অধীন হইয়া 'ঠাকুরাণী' নাম্নী নূতন রচনাপ্রেরিকা কবিতাকারিণী এক ভদ্র কুলবালার কবিতা অবিকল পশ্চাদ্ভাগে প্রকটন করিলাম।...

লঘু ত্রিপদী

নম প্রভাকর, মম শঙ্কা হর,
কিঙ্করীরে কৃপা কর।
যে তব মহিমা, কে জানিবে সীমা,
তুমি সর্ব্বগুণাকর।
তোমার বর্ণনা, করিতে রচনা,
ইচ্ছুক পামর মন।
কিন্তু আমি নারী, প্রকাশিতে নারি,
সাহস না করে পণ।
পুরাণাদি যত, সর্ব্ব শাস্ত্র মত
তুমি ব্রহ্ম তেজোময়।
স্থূল সূক্ষ্ম অতি, তুমি গ্রহপতি,
তোমাতে সকলি হয়।
জগৎ রক্ষণ, তুমি সে কারণ;
তুমিতো জগৎ সার।

সর্ব্ব জীবোপর, ওহে দিবাকর,
আছে তব সুবিচার।
অচলে প্রকাশ, সদা শূন্তে বাস,
এক চক্র-রথে গতি।
যাও অস্তাচল, তেজি ধরাতল,
প্রিয়া-জায়া ছায়াপতি॥
বেদের বচন, জ্যোতির গঠন,
মস্তকে মাণিক ধরা।
আহা কিবা রূপ, না দেখি স্বরূপ,
লোহিত-বসন-পরা॥
জগৎ নয়ন, সত্য সনাতন,
স্মরণে কলুষ নাশ।
যুগ যুগান্তর, আছ নিরন্তর,
কভু নাহি বৃদ্ধি হ্রাস॥
জগৎ পালক, দিবা প্রকাশক,
সুরলোক সহ স্থিতি।
তিমির নাশক, সলিল শোষক,
নলিনী তোষণে প্রীতি॥
অতি খরকর, পোড়ে কলেবর,
জর জর জীব তাপে।
ধরণী বিদরে, অসহ্য অন্তরে,
কুমুদিনী ভয়ে কাঁপে॥
হেরে তব ভাত, কার সুপ্রভাত,
কেহবা অকূলে ভাসে।
লয়েছি স্মরণ, অনল বরণ,
চরণ কমল আশে॥
ঠাকুরাণী দাসী।…

(সংবাদ প্রভাকর, ১লা মাঘ ১২৬৫, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৯)

কোনো পুজ্যপাদ মহামান্ত ব্রাহ্মণের কন্যা, যিনি "ঠাকুরাণী দাসী" প্রকাশ্যে এই নাম প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদাই সুমধুর গদ্য-পদ্য-পরিপুরিত-প্রবন্ধপুঞ্জ প্রচরন পূর্ব্বক প্রভাকর পত্রে প্রকটন করিয়া থাকেন।… ইনি দয়াময়ী-দৈবশক্তি দেবীর দয়াবলে অতি উচ্চ উৎকৃষ্টরূপ রচনা-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক সাতিশয় সমাদর সহকারে সদা সদালোচনায় ও শাস্ত্রালাপে সংলিপ্তা থাকায় নিকট সম্বন্ধীয় কোনো প্রাচীন পুরুষ ইঁহার প্রতি প্রতিকূল ভাবে দ্বেষাভাস প্রকাশ করাতে দারুণতর দুঃখিনী হইয়া লেখনী ধরিয়া যতদূর পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের আক্ষেপ বর্ণনা করিতে হয়, তাহাই করিয়া একখানি গদ্য পদ্যময়ী রচনা আমারদিগের নিকট প্রেরণ করেন, আমরা গত ২১ অগ্রহায়ণ দিবসীয় প্রভাকরে সেই পত্রখানি প্রকটিত করিয়া তাঁহাকে প্রচুরতর প্রমাণ প্রয়োগে প্রকৃষ্টরূপ প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় প্রকাশচ্ছলে নিন্দাকারিদিগের নিন্দাবাদ খণ্ডন করি। জননী তৎপাঠে সীমাশূন্য সন্তোষসাগরে প্লাবিত হইয়া সাধারণ সমাজে আপনার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশার্থে অপর একটি আনন্দ প্রকাশক প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছেন,…

অদ্যকার প্রকাশিত পদ্য মধ্যে শেষ পদের প্রথম অর্দ্ধভাগ কি সুন্দররূপে বিন্যাস করিয়াছেন। যথা—

"ছোট ছোট তরুবর, ধরে বেশ মনোহর,
গলে পরি জোনাকির হার।"

আমরা একাল পর্য্যন্ত কত কত প্রাচীন কবির প্রচরিত "সন্ধ্যাবর্ণন" পাঠ করিলাম, কিন্তু তরুণ তরু গলদেশে জোনাকির হার ধারণ পূর্ব্বক সুচারু শোভা সঞ্চার করিতেছে, এমত সুন্দর দৃষ্টান্ত তাহার কোনো কবিতাতেই দেখিতে পাই নাই। সুতরাং এই দৃষ্টান্তটিকে নূতন দৃষ্টান্তই বলিতে হইবে।…

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতিরা সংপ্রতি বিদ্যালোচনা পূর্ব্বক রচনার সূচনা করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা অধিক আহ্লাদকর ব্যাপার আর কি আছে! ইঁহারা বিদ্যাবতী হইলেই দেশের সমস্ত দুর্দ্দশা, দুর্গতি এবং দুর্নাম দূর হইবে তাহাতে আর সংশয় কি?…

(পঞ্চপুষ্প, আশ্বিন ১৩৩৮) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাম সংগঠন

বাংলার গ্রাম আজ মরিতে বসিয়াছে। গ্রামের দুঃখ দুর্দ্দশার তালিকা দিতে গেলে আর শেষ করা যায় না। সেই দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞান, আধি ব্যাধি প্রভৃতি দূর করিবার জন্য আমরা কত না বকিতেছি, কতই ভাবিতেছি—আর ঝিনুক দিয়া সমুদ্র সেচিবার মত করিয়া সামান্যভাবে তার প্রতিকারের চেষ্টাও করিতেছি।…

ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে গ্রামবাসীর অর্থসম্পত্তির বৃদ্ধির উপায় যে একেবারে নাই তাহা মনে করা যায় না। আমাদের যে সম্পদ আছে তাহাই সুনিয়ত ভাবে ব্যবহার করিলে আমরা প্রচুর পরিমাণে ধনবান হইতে পারি। তার জন্য প্রয়োজন শুধু সংগঠন, শুধু চেষ্টা, সমবায়।…

প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে যদি কৃষকদের এক একটি করিয়া পঞ্চায়েৎ গঠিত হয় এবং সেই পঞ্চায়েৎ যদি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ লইয়া তাঁহাদের চাষ আবাদ নিয়ন্ত্রিত করেন, তবে তাঁহারা সকলেই প্রভূত পরিমাণে ধনবান হইতে পারেন। এক পাটের আবাদ নিয়ন্ত্রণ করিয়াই তাঁহারা বৎসরে অন্যূন ২৫ হইতে ৫০ কোটি টাকা বেশী অর্জ্জন করিতে পারেন। তা ছাড়া অবশিষ্ট জমীতে ধান এবং বাজারের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আলু, তরকারী, যব, গোধূম, ইক্ষু প্রভৃতি যেখানে যে বস্তুর চাষ সুবিধা হয় সেখানে সেই ফসল অর্জ্জন করিলে কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে ও সমগ্রভাবে বর্ত্তমান অবস্থার চেয়ে অনেক উন্নত অবস্থা করিতে পারেন।

গ্রামের কৃষকগণ এইরূপ ভাবে পঞ্চায়েতে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে কেবল শস্য-নির্ব্বাচন ছাড়া আরও অনেক উপায়ে আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন।

চাষীরা এখন চিরাচরিত রীতি অনুসারে ফসল অর্জ্জন করেন এবং নিকটবর্ত্তী হাটে বাজারে বা মহাজনের কাছে তাঁদের ফসল বিক্রয় করেন। মহাজনেরা তাঁদের ফসল লইয়া বাজার ফিরাইয়া বিক্রয় করিয়া বিস্তর লাভ করিয়া থাকেন। চাষীরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন তবে তাঁরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ফসল বিক্রয় না করিয়া সমবায় সমিতির দ্বারা তাঁদের ফসল বিক্রয় করিতে পারেন। আমার গ্রামের সমস্ত ফসল যদি বিক্রয়ের জন্য গ্রামের সমবায় সমিতির হাতে গিয়া জমে, এবং এমনি অন্যান্য সমস্ত গ্রামের সমবায় যদি তাঁদের মাল কোনও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির দ্বারা বিক্রয় করেন, তবে প্রত্যেকের মাল যেখানে সবচেয়ে বেশী মূল্য পাওয়া যাইতে পারে সেই বাজারে বিক্রয় হইতে পারে। এবং

তাহাতে যে অতিরিক্ত লাভ হইবে তাহা আবার চাষীর ঘরেই ফিরিয়া আসিবে।

যেমন, ময়মনসিংহের এক গ্রামে পাট জন্মে। চাষীরা সে পাট বাজারে হয়ত পাঁচ টাকা দরে বেচেন। মহাজন সেই পাট কিনিয়া কলিকাতায় রপ্তানী করিয়া হয়ত দশ টাকা দরে বেচিতে পারেন। এখানে চাষীরা যদি মহাজনের কাছে পাট না বেচিয়া সমবায় সমিতির দ্বারা বিক্রয় করেন তবে এই যে অতিরিক্ত মণকরা পাঁচ টাকা, তাহার সমস্তটাই খরচ খরচা বাদে চাষীরাই শেষে পাইবেন।

ইহা ছাড়া আরও অনেক উপায়ে গ্রামবাসীদের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার আয়োজন করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী চাষী বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকার অধিক মূল্যের গরু ও বলদ পশ্চিম-দেশীয় বেপারীদের নিকট হইতে কিনিয়া থাকেন। একটু চেষ্টা ও যত্ন করিলে এই গোধন বাংলা দেশেই জন্মিতে পারে। আমাদের দেশে গরুর যত্ন নাই, তাদের বংশের উন্নতিসাধনের কোনও চেষ্টা নাই বলিলেই চলে। অথচ যদি গোজাতির উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য আমরা সামান্য চেষ্টা ও যত্ন করি, তবে তাহা হইতেই আমাদের গ্রামবাসীদের বহু অর্থাগম হইতে পারে।

পাড়াগাঁয়ে গরুর দুধের মূল্য অধিক হয় না, সুতরাং দুধ বেচিয়া যে লাভ হয় সেটা লোকে বড় হিসাবের মধ্যে আনে না। কিন্তু যদি যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট দুগ্ধ গ্রামে জন্মে তবে সেই দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত মাখন, ঘৃত, পনীর প্রভৃতি বস্তু বড় বড় শহরে সমবায় প্রণালীতে বিক্রয় করিলে প্রভূত পরিমাণে অর্থাগম হইতে পারে।

ভাল জাতের গরু কিনিয়া তাহাদিগকে ভালরূপে খাওয়াইবার ও যত্ন করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহারা দিনে আট দশ সের পর্য্যন্ত দুধ দিতে পারে। একটি গ্রামে যদি এমন ১০০ গাভী থাকে তবে তাহা হইতে ৬।৭ শত সের দুধ রোজ পাওয়া যাইতে পারে, এবং সেই ৬।৭ শত সের দুগ্ধ হইতে মাখন, ছানা, ঘৃত পনীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রপ্তানী করিলে দৈনিক অন্ততঃ ১০০।১৫০৲ টাকা গ্রামে আসিতে পারে।

তা ছাড়া মুরগীর চাষ, শূকরের চাষ প্রভৃতি বিস্তর লাভজনক ব্যবসা করিয়া গ্রামবাসিগণ নিজ নিজ সম্পদ বহু পরিমাণে বাড়াইতে পারেন।

এ সমস্তই অনায়াসে করায়ত্ত হইতে পারে যদি গ্রামবাসিগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান নিজ নিজ অবস্থার উন্নত করিতে। এ সমস্তই সমবায় বা কো-অপারেশন দ্বারা সহজে সম্পন্ন হইতে পারে।...

(পল্লী-স্বরাজ—পৌষ, ১৩৩৮) শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

আলেয়া

শ্রীমনোজ বসু

সেই কোন্ সকালে পঞ্চানন চারিটি নাকেমুখে গুঁজিয়া জেলেদের লইয়া বাহির হইয়াছিল। পাশাপাশি দুইটা গ্রামের তিন চারিটা পুকুরে সন্ধ্যা অবধি মোট আড়াই মণের উপর মাছ ধরা হইয়াছে। গ্রাম-সীমায় বিলের ধার দিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিতেছিল—আগে পঞ্চানন, পিছনে পিছনে মাছের ঝুড়ি ও জাল লইয়া জেলেরা। জ্যোৎস্না রাত্রি।

হঠাৎ পেঁচা ডাকিয়া উঠিল।

রাখহরি জেলে অমনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—শুনতে পাচ্ছেন, বাবু?

পঞ্চানন তখন অন্যমনা, বাড়ির লোকদের নিদারুণ অত্যাচারের কথা ভাবিতেছে। এই মাছ ধরিবার কাজটা ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া সারাদিন তাহাকে এমন ভাবে বাড়িছাড়া করিয়া রাখা তাঁহাদের কোনক্রমে উচিত হয় নাই—তা' কাল বাড়িতে যত বড় ভারী ক্রিয়াকর্ম্ম থাকুক না কেন। বিরক্ত হইয়া বলিল—চল্ চল্, তোরা দাঁড়াসনে—

কিন্তু পিছনে চাহিয়া দেখে চলিবার লক্ষণ কাহারও নাই। এই বিলের মাঝখান দিয়া অনেককাল আগে বোধ করি কোন একটা রাস্তা ছিল; এখন আছে কেবল এখানে ওখানে খানিকটা করিয়া উঁচু জমি; তাহাতে খেজুর গাছ, মাঝে মাঝে এক আধটা বাঁশঝাড়। সেই দিক দিয়া ডাক আসিতেছিল।

রাখহরি সেই দিকে আঙুল তুলিয়া বলিতে লাগিল—উ-ই যেখানে পেঁচা ডাকছে—দেখুন একবার কাণ্ডটা বাবু, দেখছেন? মিলে গেল না?

পঞ্চানন কহিল—তোরা থাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আমি চল্লাম—

বলিয়া রাগে রাগে কয়েক পা আগাইয়া শুনিতে পাইল, উহারা বলাবলি করিতেছে—আ'লচোরা,

আ'লচোরা! কৌতুহলবশে সে বিলের দিকে তাকাইল। তাই ত! উহাই হয়ত আলেয়া! দেখিল, যেদিক হইতে পেঁচার ডাক আসিতেছে তাহারই অনেকটা পূবে বিলের মাঝামাঝি পাঁচ সাত জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে আবার নিবিয়া নিবিয়া যাইতেছে।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বিলের কাছাকাছি বসতি, এই আ'লচোরার গল্প পঞ্চানন আশৈশব শুনিয়া আসিতেছে। আ'লচোরা একরকম অপদেবতা, ভূত-প্রেতের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হইবে হয়ত, তাহাদেরই মত মানুষের রক্তের উপর ঝোঁকটা কিছু বেশী। শিকারও বছরে জোটে নিতান্ত মন্দ নয়। আরও হয়ত ঢের বেশী জুটিত, কিন্তু আ'লচোরাদের মস্ত অসুবিধা এই যে কিছুতেই ডাঙায় উঠিয়া আসিতে পারে না। বিলের যে-অংশ বড় নাবাল, কয়টা খাল ডালপালা মেলিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং বারমাসের মধ্যে কখনও জল শুকায় না তাহারই নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সারারাত্রি ইহারা শিকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। মুখের ভিতরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলে, যখন মুখ মেলে সেই আগুনের হল্কা বাহির হইয়া আসে, মুখ বন্ধ করিলে আগুন আর দেখা যায় না। যদি কোন পথিক তেপান্তরের বিলে রাত্রিবেলা একবার পথ হারাইয়া ফেলে আ'লচোরারা অমনি তাহা বুঝিতে পারে, দলে দলে নানাদিকে মুখ মেলিয়া আগুন জ্বালাইয়া পথহারাকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। পথিক মনে করে, বুঝি সেই দিকে গ্রাম, মানুষের বসতি—তা নহিলে আগুন জ্বলিতেছে কেন? আকুল হইয়া ছুটিয়া যায়। হঠাৎ সামনের আগুন নিভিয়া অন্ধকার হয়, পিছনে খানিক দূরে জ্বলিয়া উঠে। আশায় আগ্রহে আবার সে সেই দিকে ছুটে। এমনি করিয়া নির্জ্জন নিশীথে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় আর আ'লচোরারা ভুলাইয়া ভুলাইয়া ক্রমশঃ তাহাকে জলার কাছাকাছি লইয়া ফেলে। তারপর ভয়ে ক্লান্তিতে অশক্ত হইয়া যদি একবার মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে—আর রক্ষা নাই—অমনি মুহূর্ত্তে রক্ত-বুভুক্ষু অপযোনির দল চারিদিক হইতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার রক্ত শুষিতে আরম্ভ করে।

রাত্রিকালে বহুবিস্তৃত বিলের মাঝখানে, যেখানে কাঁদিয়া চেঁচাইয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিলেও মানুষের সাড়া মেলে না কেবল সুবিপুল নিঃসঙ্গতা হিমশীতল বাতাসে মিলিয়া থমথম করিতে থাকে—হঠাৎ খানিক দূরে আলো দেখিলে বিপন্ন মানুষের সুদৃঢ় ধারণা হয়, উহা নিশ্চয় গ্রামের আলো। কোন্‌টা গ্রামের আলো আর কোন্‌টা যে জলাভূমির, নজর করিয়া তাহা চিনিবার উপায় নাই। কিন্তু চিনিবার একটা উপায় সর্ব্বমঙ্গলা মহালক্ষ্মী সদয় হইয়া করিয়া দিয়াছেন। কোন্ কালে কি কারণে তুষ্ট হইয়া তিনি বর দিয়াছিলেন, সেই অবধি তাঁর বাহন পেঁচা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া বিল পাহারা দেয়। আ'লচোরার পিছনে যদি কেহ ছুটে-অমনি নিশ্চয় তাহার মাথার উপর পেঁচা ডাকিয়া উঠিবে। তবে আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া সকলে এই সঙ্কেত ধরিতে পারে না।

এমন অনেক দিন হইয়া থাকে, নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, আশপাশের সমস্ত অঞ্চল নিষুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে হয়ত কোন গ্রাম-জননী হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া শুনিতে পান বিলের দিক হইতে লক্ষ্মীপেঁচার কর্কশ আওয়াজ আসিতেছে। কোন এক অপরিচিত দুর্ভাগ্য পথিকের বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠে। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া আকুল কণ্ঠে অনেকক্ষণ ডাকিতে থাকেন—নারায়ণ! নারায়ণ!···

ইহার পর চলিতে চলিতে আ'লচোরার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। পঞ্চানন তার কলেজে-পড়া বিদ্যা অনুসারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে এই আলেয়া এক রকম বাতাস, তাহাদের পেটে চোরাবুদ্ধি কিছু নাই; কিন্তু অপর পক্ষ বিশ্বাস করিতেছিল না। এইবার বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে চুপ করিল, হঠাৎ মনে অন্যপ্রকার আশঙ্কা জাগিতে লাগিল। এখন রাত্রি কত হইয়াছে কে জানে? আবার আগের দিনের মত কাণ্ড ঘটিয়া না বসে!

বাড়ি আসিয়া খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া সে আর তিলার্দ্ধ দেরি করিল না, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিবার

মতলবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময়ে বড়দাদা কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—মাছগুলো নিয়ে এলে, এখন কোটা হচ্ছে—নজর রেখো, বুঝলে? যত পাজীলোক নিয়ে কারবার—

রাগে পঞ্চাননের ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে রাগ যে প্রকাশ করিবার নয়। বলিল—আমার বস্‌বার যো নেই, মাথা ধরেছে—

সমস্ত দিন জেলেদের সঙ্গে যে-রোদে-রোদে ঘুরিয়াছে তাহাতে মাথাধরা বিচিত্র নয়। কাতর অবস্থা দেখিয়া বড়দাদা বলিলেন—তবে একটুখানি দাঁড়াও, খেয়ে আসি দুটো—

বড়দাদার আবার তামাকের অভ্যাস আছে, খাওয়া শেষ করিয়া এক ছিলিম সাজিয়া লইয়া অবশেষে ধীরে-সুস্থে আসিয়া চৌকির উপর বসিলেন। তখন সে ছুটি পাইল।

ঘরের প্রবেশ দরজায় দাঁড়াইয়া যে দৃশ্য পঞ্চানন দেখিল আগের রাত্রিতেও ঠিক তাই দেখিয়াছিল। সুষমা শয্যার উপর যথারীতি নিস্পন্দভাবে লম্ববান। কুলুঙ্গির মধ্যে রেড়ির তেলের দীপটি মিট মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

গত মঙ্গলবারে বিবাহ হইয়াছে, নববধূ আসিয়া পৌছিয়াছে মাত্র তিন দিন। ঠিক অন্যান্য বধূর মত সুষমা নয়, লজ্জা সরম যেন কিছু কম। কথাবার্ত্তা কহিবার ফাঁক বড় বেশী এখনও মিলে নাই; সেই পরশু রাত্রে বেড়ার ধারে এখানে-ওখানে আড়িপাতা মেয়ে-ছেলের কান বাঁচাইয়া সামান্য যা দুই চারিটি হইয়াছে তাহারই মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছে কথা বলিতে গিয়া সুষমা ঘাড় নাড়িয়া এক রকম অদ্ভুত ভঙ্গী করে, সে দেখতে বড় মজা। কিন্তু কাল উহাকে যে কি ঘুমে ধরিয়াছিল, সারারাত্রির মধ্যে কিছুতে চোখ মেলিল না। আজও এই দশা।

খানিক এমনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া তারপর জোরে জোরে চটি জুতার শব্দ করিয়া পঞ্চানন খাট অবধি গেল। শুইতে গিয়াও আবার শুইল না, হঠাৎ পাঠলিপ্সা বাড়িয়া উঠিল। মেডিকেল কলেজে থার্ড ইয়ারে সে পড়ে। প্রদীপ উস্কাইয়া কুলুঙ্গি হইতে দেলকো-সুদ্ধ বিছানার পাশে রাখিল এবং মিনিটখানেক ধরিয়া মোটা একখানা ডাক্তারী বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

যেখানে সে প্রদীপ রাখিয়াছে ঠিক তাহার পাশটিতে সুষমা চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গোড়ায় তাহার ভয়ঙ্কর রাগ হইয়াছিল, কিন্তু চাহিতে চাহিতে সেই রাগ গিয়া হঠাৎ অনুকম্পায় বুক ভরিয়া উঠিল। আহা, নিতান্ত অসহায়ের মত করুণ মুখখানি উহার, কতটুকুই বা আর বয়স, ভিন্ন জায়গায় আসিয়াছে…চেনা জানা কাহাকেও দেখিতে পায় না…সারাদিন হয়ত মুখ শুকনা করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজকর্ম্মের ভিড়ে কেউ নজর রাখে না…এখন কেমন একেবারে বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে! সবুজ রঙের শাড়ীখানি সুন্দর সুগৌর ছোট তনুটিকে বেষ্টন করিয়া আছে, সর্ব্বাঙ্গে গহনার বাহুল্য প্রদীপের ক্ষীণালোকে ঝিকমিক করিতেছে, খোঁপা এলোমেলো হইয়া কয়েক গোছা চুল খাট হইতে মাটিতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অতি যত্নে চুলগুলি লইয়া, কি খেয়াল হইল, সুষমার মুখের দু-পাশ দিয়া পটুয়ার মত যেন প্রতিমা সাজাইতে লাগিল।

আরও যে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু এই সময়ে কেমন সন্দেহ হইল সুষমা ঘুমায় নাই, চোখ মিটমিট করিয়া তাহাকে এক-একবার দেখিয়া লইতেছে। হঠাৎ ফিক করিয়া একটু হাসি। পঞ্চানন তাড়াতাড়ি চুল ছাড়িয়া মুখ ফিরাইয়া পুস্তকে মন দিল, আর ওদিকে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে সুষমা যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

গভীর মনোযোগের সহিত পঞ্চাননের অধ্যয়ন চলিয়াছে, দুষ্ট মেয়ে ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিবাইয়া আবার হাসিতে সুরু করিল। দক্ষিণের জানালা খোলা, ঘরময় জ্যোৎস্না লুটাইয়া পড়িল।

বই বন্ধ করিয়া পঞ্চানন কহিল—যাঃ পড়তে দিলে না—

সুষমা কহিল—ইস্, তা বইকি? পড়াশুনো যা তোমার—সব দেখেছি, দেখেছি। তোমার বিদ্যে হবে না হাতী হবে—

পঞ্চানন যেন ভারী চিন্তিত হইয়া পড়িল। বলিল—হবে না? সর্ব্বনাশ! তাহ'লে উপায়?

সুষমা কহিল- উপায় আর কি? মাছ ধ'রে খেও—বলিয়া সেই অপরূপ ভঙ্গীতে মুখ নাড়াইয়া ছড়া আবৃত্তি করিতে লাগিল—

লিখিব পড়িব মরিব দুখে
মৎস্য মারিব খাইব সুখে—

পঞ্চানন কহিল—তাহ'লে মাছ ধ'রে খাওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় নেই? ও সুষমা, আজকে মাছ ধ'রে এনেছি—এই এত বড় বড়—দেখেছ ত? ছাই দেখেছ, তুমি তখন নাক ডাকাচ্ছিলে তার—

বধূ প্রতিবাদ করিয়া কহিল—না, দেখিনি আবার। তুমি আসা মাত্তোর দেখে এসেছি। কতক্ষণ ধ'রে দেখেছি—ঠিক তোমার পাশটিতে দাঁড়িয়ে। বল ত কোথায়?

পঞ্চানন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কোথায়?

বড় কাঁঠাল গাছটার আড়ালে। তুমি যখন মাছ-কোটার সময় চৌকীর উপর ব'সে ছিলে তখনও দাঁড়িয়ে আছি, কেউ দেখতে পেল না—

কি সর্ব্বনাশ! যে বনজঙ্গল, স্বচ্ছন্দে সাপ-টাপ থাকিতে পারিত। লোকে দেখিলেই বা বলিত কি? পঞ্চানন কহিল—ছি ছি, নতুন বউ তুমি—তোমার কি এতটুকু বুদ্ধি জ্ঞান নেই? ঐ রকম যায় কখনও?

সুষমা তাহার মুখের দিকে বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—যেতে নেই?

নীরস কণ্ঠে পঞ্চানন কহিল—এও শিখিয়ে দিতে হবে? এরই মধ্যে বাড়িতে আত্মীয়-কুটুম্বর মধ্যে যে টি টি পড়ে যাচ্ছে, সবাই বল্‌ছে বউ বেহায়া বেলাজ—

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। শাশুড়ীর নিকট হইতে আজও এই কারণে বধূর গোপন তর্জ্জন লাভ হইয়াছে। মুখখানি অত্যন্ত ম্লান করিয়া সুষমা নীচের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

পঞ্চানন বলিতে লাগিল—আর কক্ষণো কোন দিন অমন যেও না—বুঝলে? তোমার বাপের বাড়ির লোক সব কি রকম? কেউ বলেও দেয় নি?

সুষমা কি বলিতে গেল, কিন্তু অনেকক্ষণ বলিতে পারিল না। ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। শেষে কহিল—তোমার পায়ে পড়ি, আর বোকো না; আমার মা নেই যে—বলিতে বলিতে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

এইটুকুতেই যে কেহ কাঁদিতে পারে পঞ্চানন তাহা ভাবে নাই। ভারী অপ্রতিভ হইল। বাস্তবিক ইহার মা নাই যে। সংসারের কাণ্ডজ্ঞানহীন এক ফোঁটা অবোধ মেয়ে, আশৈশব বাপের আদরে মানুষ, কেই বা তাহাকে বুঝাইয়া সমঝাইয়া শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবে? মা থাকিলে কি এমনটি হইতে পারিত? একা বাপ তাহার পক্ষে যে মা বাপ দুজন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম সেই বাপকে ছাড়িয়া পরের বাড়ি আসিয়াছে। যখন বরকনে বিদায় হইয়া আসে তাহার ঘণ্টাখানেক আগে বাপে মেয়েয় একথালে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাত খাইতেছিল, হঠাৎ পঞ্চানন সেখানে গিয়া পড়ে। শ্বশুর তাহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সব পঞ্চাননের মনে পড়িতে লাগিল।

এই অবস্থায় কি যে করিবে হঠাৎ বুঝিতে পারিল না। আবার আলো জ্বালিল। তারপর সস্নেহে দুই তিনবার সে সুষমার চোখের জল মুছাইয়া দিল। আস্তে আস্তে কহিল—আমি আর বকবো না, সত্যি আর বকবো না কোনদিন— বলিয়া কোলের উপর বধূর মাথা টানিয়া লইল।

সুষমার কান্না আর থামে না।

পঞ্চানন কহিতে লাগিল—বাপরে বাপ, এক কথা কখন কি বলেছি— বললাম ত যে আর কোনোদিন কিছু বলব না—বলিয়া ঘাড় নীচু করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ সুষমা, আমি বকেছি ব'লে এখনও কষ্ট হচ্ছে তোমার?

সুষমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

—তবে?

নীরবে সজল চক্ষু মেলিয়া সে স্বামীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

পঞ্চানন কহিল—বাবার জন্যে প্রাণ পুড়ছে, না?

অমনি পঞ্চাননের কোলের মধ্যে আবার মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চানন কহিল—এ সবে তিনটে দিন এসেছ—কালকে তোমার বউভাত, কত লোকজন আসবে, আমোদ-আহ্লাদ হবে—এ সব চুকে যাক, তারপর আমি নিজে রেখে আসব। অমন ক'রে কাঁদে না। কই, চুপ কর। তবু?

সুষমা বলিতে লাগিল—না, আমি যাব—গিয়ে তক্ষুনি চলে আসব—একবার বাবাকে দেখেই অমনি চলে আসব—বাবা ঠিক মরে গেছে—

পঞ্চানন হাসিয়া উঠিল। বলিল—মরবেন কেন? বালাই ষাট। তোমার বাপের বাড়ি কি এখানে যে বললেই অমনি ফস্ করে যাওয়া যায়?

জানালার ওধারে একখানা উলুর জমি ছাড়াইলেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত বিল। সেইদিকে আঙুল তুলিয়া সুষমা কহিল—কেন ওই ত ঐ বিলের ওপার, আমি বুঝি জানি নে? আসবার সময় পাল্কীতে বসে বসে সমস্ত পথ দেখে এসেছি—

পঞ্চানন কহিল—বিলটাই হবে যে পাঁচ-ছ কোশ—অত বড় বিল এ জেলায় আর নেই—

অবুঝ বধূ তবু জেদ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—না, ও তোমার মিছে কথা—আমি যাব—যাব—তোমার দুখানি পায় পড়ি—। বলিয়া সত্য সত্যই পা ধরিতে যায়।

পা সরাইয়া লইয়া গম্ভীরভাবে পঞ্চানন কহিল—পাগল না কি? লোকে বলবে কি?—শোও ভাল হয়ে শোও—এমন ত দেখিনি কখনও—

ধমক খাইয়া শিষ্ট শান্ত হইয়া সুষমা শুইয়া পড়িল। একেবারে চুপচাপ। দেওয়ালের ঘড়ি টক্‌টক্ করিয়া চলিতেছে।

পঞ্চানন তাকাইয়া দেখিল। চালের গায়ে আড়ার ফাঁকে গোলাকার হইয়া প্রদীপের আলো পড়িয়াছে, ঘন-পল্লব চোখ দুটি একদৃষ্টে সেইদিকে মেলিয়া সুষমা চুপ করিয়া শুইয়া আছে। এরকম মৌনতা বেশীক্ষণ সহ্য হয় না। রাগ করিয়া কহিল—ওঠ, চল—এক্ষুনি রেখে আসি—

সুষমা কহিল—যাবে?

—হুঁ—

অমনি তড়াক করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—কই, তুমি ওঠ—

এমনি নিরীহ বোকা যে আর একজন রাগ করিয়াছে, তাহাও বুঝিবার বুদ্ধি নাই, সুষমা বলিল—চল না—।

পঞ্চাননের রাগ থাকিল না, হাসিয়া ফেলিল। কহিল—এখন ঘুম পাচ্ছে, কাল সকালে যাব।

সুষমা কাঁদকাঁদ হইয়া কহিল—এই যে বললে এক্ষুনি যাবে—

পঞ্চানন কহিল—আচ্ছা, তুমি কাপড়চোপড় প'রে নাও—বাক্স পেঁটরা গোছাও, আমি ততক্ষণ এক ঘুম ঘুমিয়ে নি—

এবার তাহার সন্দেহ হইল; বলিল—মিছে কথা, তুমি যাবে না—

পঞ্চানন কহিল—ঘুম পাচ্ছে, এখন যাব না—কাল সকালে নিয়ে যাব। দেখেছ ত কত খেটেছি? দুপুরের রোদ্দুর গিয়েছে মাথার উপর দিয়ে। এখন মাথা ধরেছে, উঃ—বলিয়া সে চোখ বুজিল।

একটু পরে পঞ্চানন চোখ বুজিয়া বুজিয়াই অনুভব করিতে লাগিল, ঝিন মিন করিয়া গহনা বাজাইয়া সুষমা পাশে আসিয়া বসিয়াছে। তারপর তাহার অত্যন্ত কোমল কচি আঙুল কটি দিয়া সে তাহার কপালের দুই পাশ টিপিয়া দিতে লাগিল। চুপ করিয়া খানিকক্ষণ পঞ্চানন উপভোগ করিল শেষে চোখ মেলিয়া কহিল—আর না, থাক এখন—

—আর একটু দিই।

—কই, কাপড়চোপড় পরা হ'ল তোমার? এখন যাবে না?

সুষমা কহিল—না, কালকে যাব। এখন তোমার কষ্ট হচ্ছে যে—

সেদিন পঞ্চানন ঘুমাইয়া পড়িলেও কত রাত্রি অবধি সুষমা জাগিয়া বসিয়া রহিল। চুপি চুপি জানালার ধারে গিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। উলুক্ষেতের এক দিকে একটি শীর্ণ নারিকেল গাছ, গোড়ায় রাখাল-ছিটার



চিত্রকরের সৌজন্যে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত

ঝোপ, তার উপরে তেলাকুচা ও বন-পুঁয়ের লতা দীর্ঘ গাছটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া অনেক দূর অবধি উঠিয়াছে। সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রি। ক্রমে চাঁদ ডুবিয়া আস্তে আস্তে চারি দিক অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। আকাশের তারা উজ্জ্বলতর হইল এবং সুষমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রায়ান্ধকার বিল সুবিপুল দেহ এলাইয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। বলের ঐ ওপারে লাল ভেরেণ্ডায় ঘেরা উঠান ছাড়াইয়া গোল সিঁড়ি ছাড়াইয়া চিলে কুঠরীর পাশে দোতলার ঘরটিতে তার বাবা এতক্ষণ কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।···

ভোর হইতে না হইতে কাজের বাড়িতে হৈ চৈ ডাক-হাঁকের অন্ত নাই। পঞ্চাননের ঘুম ভাঙিবার অনেক আগে সুষমা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। নানা কাজে অনেক বার পঞ্চাননকে বাড়ির মধ্যে যাওয়া-আসা করিতে হইল, একবার গোয়ালাদের দইয়ের হাঁড়ি রাখিবার জায়গা দেখাইয়া দিতে, একবার ঘি বাহির করিয়া দিতে; আর একবার কে-একজন বুঝি পান চাহিয়াছিল, পান লইবার জন্য নিজেই সে সকলের আগে ছুটাছুটি করিয়া আসিল। আসিয়া এঘর-ওঘর পান খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ দেখিল ভাঁড়ার ঘরের পাশে ছোট কামরাটিতে সুষমা আপনার মনে বসিয়া সন্দেশ পাকাইতেছে। ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাত · চুড়ি ঝুন ঝুন করিতেছে···শাড়ীর খানিকটা মেঝের ধূলায় মাখামাখি, সেদিকে নজরই নাই।

ঠিক পিছনটিতে গিয়া পঞ্চানন চুপি চুপি বলিল—আমায় একটা দাও না—

সুষমা প্রথমটা চমকাইয়া উঠিল। তারপর বলিল—না, ভোজের আগ ভেঙে অমন—

কিন্তু কে কার কথা শোনে? পঞ্চানন খপ্ করিয়া গোটা-দুই সন্দেশ তুলিয়া লইয়াই দৌড়।

সুষমা চেঁচাইয়া উঠিল—ব'লে দেব, দিয়ে যাও—ওদিদি; দিদিগো, সব চুরি হয়ে গেল –

পঞ্চানন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—চেঁচাচ্ছো? নতুন বউ না তুমি?

এই সময়ে বড়বৌদিদিও কোথা হইতে আসিয়া হাজির। বলিলেন—কি রে ছোট বউ, কি হ'ল?

ছোট বউ ততক্ষণে সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া লজ্জাবতী হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চানন নিতান্ত ভাল মানুষের মত মুখ করিয়া কহিল—ও একলা ব'সে সন্দেশ পাকাচ্ছিল আর খাচ্ছিল বৌদি, আমি এসে তাই দেখলাম।

বড় বধূ মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন—তা থাক্, ওর পেছনে তোমার আর লাগতে হবে না, নিজের কাজে যাও দিকি—

পঞ্চানন বলিল—বিশ্বাস করলে না? এখনও গাল বোঝাই, তাই কথা বল্‌তে পারছে না।

বড়বধূ কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিলেন—যাও তুমি এখান থেকে বলছি—। বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন বলিলেন—ওর বউভাতের নেমন্তন্ন, ও মোটে খাবে না বুঝি? সেই কোন্ সকাল থেকে লক্ষ্মীর মত আমার কত কাজ ক'রে দিচ্ছে। তুমি কাজ কর দিদি, ওর কথা শুনো না—।

ঘোমটার মধ্যে সুষমার তখন ভারী মুস্কিল। দিদি হয়ত সত্য সত্যই তাহাকে সন্দেশচোর বলিয়া ভাবিলেন, কিন্তু আসল চোর যে কে তাহা ঐ সাধুমানুষটির হাতের মুঠা খুলিলেই ধরা পড়িবে। একথা জানাইয়া দিবার নিতান্ত দরকার যে গাল তাহার বোঝাই নয়, সে কথা কহিতে পারিতেছে না—নতুন বউ হইয়া বরের সামনে কথা সে বলে কি করিয়া?

বাহিরে পান পৌছাইয়া দিয়া পঞ্চানন আবার ফিরিয়া আসিল। এবার সুষমা সাবধান হইয়াছে। পায়ের শব্দ পাইয়া সমস্ত সন্দেশ হাঁড়িতে তুলিয়া ফেলিল।

পঞ্চানন কহিল—শোন—

কাপড়ের নীচে হাঁড়িটি অতি সাবধানে ঢাকিয়া সুষমা মুখ তুলিয়া চাহিল।

—সকাল বেলা সেই যে তোমায় বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার কথা ছিল, যাও ত চল—

সুষমা বিরক্ত হইয়া কহিল—দেখছ না, কাজ করছি—

—একাজ হয়ে গেলে?

—তারপর কিসমিস বাছতে হবে, দিদি ব'লে দিয়েছেন।

—তার পরে ?

সুষমা গিন্নীমানুষের মত পরম গম্ভীরভাবে কহিল—তারপরে? তোমার মোটে বুদ্ধি নেই। কাজকর্ম্মের বাড়ি, কত লোকজন আসবে, খাওয়া-দাওয়া হবে—আমার কি আজ মরবার ফাঁক আছে ?

বলিবার ধরণ দেখিয়া পঞ্চাননের বড় কৌতুক লাগিতেছিল। বলিল—তাহ'লে বল যে মোটেই বাপের বাড়ি যাবে না। আমার দোষ নেই তবে—

এবার সুষমা সহসা কোন জবাব দিল না, কি ভাবিতে লাগিল। তারপর বলিল—এখন এত সব কাজ ফেলে কেমন ক'রে যাই বল ত ? রাত্তিরে যাব—ঠিক যাব—

—তখন কিন্তু আমার ঘুম পাবে।

না—বলিয়া সুষমা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া সকরুণ মিনতির স্বরে কহিল—রাত্তির হ'লে আমার বড্ড মন কেমন করে, সত্যি বলছি—তুমি আমায় নিয়ে যেও—

বোকা বধূটের পায় নাই কথাবার্ত্তার মধ্যে কখন হাঁড়ির ঢাকনি সরিয়া গিয়াছে। পঞ্চানন সুযোগ বুঝিয়া ছোঁ মারিয়া আবার একটা সন্দেশ তুলিয়া লইয়া ছুটিল। এই করিতে সে আসিয়াছিল। দরজার কাছে গিয়া বলিল—বড় যে সাবধান তুমি, কেমন ?

কিন্তু সুষমা এবারের অপরাধ আমলে আনিল না, আগের কথাই পুনরাবৃত্তি করিল—ওগো, যাবে ত নিয়ে ?

পঞ্চানন কহিল—তোমার দাদাকে ব'লে দেখো, তিনি ত আসবেন আজ নেমন্তন্নে। আমার ঘুম পায়—।

বিকাল বেলা সুষমা চুল বাঁধিয়া কপালে টিপ আঁটিয়া মহাআড়ম্বরে আলতা পরিতে বসিয়াছে এমন সময়ে নির্ম্মল আসিয়া সরাসরি বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। আলতা ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে সে বলিতে লাগিল—এসেছ দাদামণি ? দেখ দিকি আমি কত ভেবে মরি—বেলা যায় তবু আসা হয় না—বাবা এসেছেন ? বলিতে বলিতে আগাইয়া আসিয়া দেখে পঞ্চানন তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া সুষমা পিছাইয়া গেল।

পঞ্চানন বলিল—আমি আর কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসুবিধে ঘটাই, আমি চললাম—। বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, আবার ফিরিয়া কহিল—আর সে কথাটারও একটা বোঝাপড়া যেন হয়ে যায় ভাই, সন্ধ্যে হ'লেই তোমার বোনটি বাপের বাড়ির বায়না ধরেন—সারারাত কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলান—আমায় ঘুমুতে দেন না—

সুষমার মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—সত্যিরে ? অ খুকী সত্যি ?

সুষমা চাহিয়া দেখিল পঞ্চানন চলিয়া গিয়াছে। ঘাড় নাড়িয়া মহাপ্রতিবাদ করিতে লাগিল—না দাদা, সব মিছে কথা—অমন মিথ্যুক তুমি মোটে দেখ নি। আজকে অমনি সন্দেশ নিয়ে—বলিতে বলিতে কথার মাঝখানে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা এসেছেন ?

নির্ম্মল কহিল—বাবা আসবেন কি করে ? মেয়ের বাড়িতে এলে আর-জন্মে কি হয় তা শুনিস্ নি ?

সুষমা দুই হাতে নির্ম্মলের বাহু জড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল—বাবা কি মরে গেছেন ? ও দাদামণি সত্যি কথা বল—আমি খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

নির্ম্মল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।—খুকী, কি পাগল তুই ? এই ক'দিন দেখিস্‌নি অমনি বুঝি মরে গেল ? তাহ'লে আমায় কি এই রকম দেখতিস ?

তখন সুষমা ভয়ানক জেদ ধরিল—ওরা কেউ আমায় নিয়ে যাবে না দাদা, মিছে কথা ব'লে ফাঁকি দেয়। আমি আজ তোমার সঙ্গে চ'লে যাব, আজই—

হাসিতে হাসিতে নির্ম্মল কহিল—আজই ?

হ্যাঁ—

—পাল্কী-টাল্কী করতে হবে না ?

সুষমা বলিল—পাল্কী কি হবে ? ভারী ত পথ, এক ছুটে যাওয়া যায়। ঐ ত বিলের ওপার—ঐ গাছপালা-গুলো যেখানে। আমি তোমার পিছু পিছু চলে যাব। রাত্তিরে যাবার সময় আমায় ডেকো—ডেকো—ডেকো কিন্তু। ডাকবে ত ?

নির্ম্মল কহিল—আচ্ছা—

দাদা যে এত সহজে রাজী হইয়া গেল, তার উপর হাসি মুখ—সুষমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া অবিশ্বাসের সুরে বলিতে লাগিল—হুঁ বুঝেছি, তোমার চালাকী—আমায় না ব'লে তুমি অমনি রাত্তির বেলা—। সে হবে না, কিছুতেই হবে না—

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার একরকম চুকিয়া গেল, কয়েকজন মাত্র বাহিরের লোক বাকী ছিল, তাহারাও এইবার বসিয়া গিয়াছে। নির্ম্মল নূতন দাবাখেলা শিখিয়াছে, পঞ্চাননকে কহিল—আর কি, এইবারএ কহাত হোক, তুমি ছক্‌টা নিয়ে এস যাও—

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে, খোড়ো ঘরগুলির ছায়া দীর্ঘতর হইয়া উঠান অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু নির্ম্মল শুনিল না, একরকম জোর করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল।

ছক ও বোড়ে লইয়া যাইবার মুখে পঞ্চানন দুষ্টামি করিয়া ঘুমন্ত মানুষের নাক ধরিয়া নাড়া দিল। ধড়মড় করিয়া সুষমা উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—দাদা? দাদামণি চলে গেছে না কি?

পঞ্চানন জবাব দিল না, সকৌতুক স্নেহে চাহিয়া রহিল।

সুষমা ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল—কখন—কতক্ষণ বেরিয়েছেন?

পঞ্চানন বলিল—তুমি যেমন ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আর ঘুমুবে? আচ্ছা, আমি আসছি এখনি—শোও—বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু সুষমা শুইল না। ঘুমচোখে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দক্ষিণের দরজা খুলিয়া ফেলিল। সামনেই উলুক্ষেতের সীমান্ত দিয়া বৈশাখ মাসের শস্যহীন শুষ্ক শূন্য বিল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় ঝকমক্ করিতেছে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে উঁচু টিলা, তার উপর দীর্ঘাকার পত্রঘন দুই চারিটা গাছ। চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া সেই জ্যোৎস্নার আলোকে সুষমা দেখিল—স্পষ্টই দেখিতে পাইল—কিছুদূরে যে বড় টিলাটা তাহারই ছায়ায় ছায়ায় কে-একজন ধীরে ধীরে যেন ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছে, সাদা কাপড়ের উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। ঘর হইতে এক দৌড়ে ছুটিয়া উলুক্ষেত ছাড়াইয়া বিল কিনারায় দাঁড়াইয়া সে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। মুক্ত বাতাসে আঁচল উড়িতে লাগিল। সে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল—না, এখন কেহ চলিতেছে না, কিন্তু ঐ যে—নিশ্চয় সেই মানুষটাই খেজুর-গুঁড়ির আড়ালে বসিয়া তাহাকে দেখিতেছে, তাহাকে দেখিয়াই ঠিক ঐখানে অমনি বসিয়া পড়িয়াছে। দাদামণি গো—বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বিল ভাঙিয়া সে ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে ছায়াচ্ছন্ন টিলার উপর গিয়া উঠিল। কেহ কোথাও নাই, গাছের ফাঁকে একটুখানি জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, গাছ দুলিতেছে, ছায়া কাঁপিতেছে। তবু বিশ্বাস হইল না, বার-বার এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, সে ভুল জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে, এ সে জায়গা নয়, এ গাছ নয়, আরও ডাইনে…ঐ…ঐ…এখনও ঠিক তেমনি বসিয়া আছে। সারি সারি পাঁচ সাতটা কুয়া, পাড়ের উপর শোলার ঝোপ, ঝিঁঝি ডাকিতেছে…ও দাদা, ও দাদা গো, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ঝোপ-জঙ্গলের পাশ দিয়া নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যযামে বিলের ভিতর দিয়া সে চলিল। পিছনে গ্রামান্তরালে আস্তে আস্তে চাঁদ ডুবিল, দূরে কোথায় শিয়াল ডাকিতে লাগিল, চারিদিক অস্পষ্ট হইয়া আসিল। হঠাৎ সুষমার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল, মাথার উপর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া এক ঝাঁক কালো কালো পাখী উড়িয়া যাইতেছে। আর না আগাইয়া সে ফিরিয়া যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু পথ-রেখা নাই। ধানক্ষেতের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, সেখানে যাতায়াতের পথ পড়ে নাই, কোন্ দিকে গ্রাম আব্‌ছা অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাইতেছিল না; পিছন ফিরিয়া কেবল দাদা—দাদা—বলিয়া গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

হঠাৎ দেখিতে পাইল—আলো জ্বলিতেছে…কাহারা যেন লণ্ঠন জ্বালিয়া এই দিকে আসিতেছে, এক দুই তিন চার…অনেকগুলি। অনেকগুলি আলো সারি বাঁধিয়া

নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ভয়ে সুষমার কণ্ঠরোধ হইল। সমস্ত নিরীক্ষণ-শক্তি দুই চক্ষে পুঞ্জিত করিয়া অন্ধকারের মধ্যে সে দেখিতে লাগিল। বোধ হইল ঐ আলোকের প্রতিটির পিছনে এক একটি সুবিপুল নিকষ-কৃষ্ণ দেহ রহিয়াছে, সারবন্দী আলেয়ারা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া গুটি-গুটি চলিয়া আসিতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণের আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া সুষমা দৌড়াইতে লাগিল

চাষ আরম্ভের আর দেরি নাই, তাই ক্ষেত সাফ করিতে চাষারা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিবার মুখে ধানের শুক্‌না গোড়ায় আগুন ধরাইয়া দিয়া যায়। ছুটিতে ছুটিতে সেই পোয়ালপোড়া ছাই উড়িয়া সুষমার মুখে চোখে পড়িতে লাগিল। একটা ক্ষেতে তখনও ভাল করিয়া আগুন নিবে নাই। এক ঝাপটা বাতাস আসিল আর অমনি একসঙ্গে বিশ পঞ্চাশ জায়গায় দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পিছনে তাকাইয়া দেখে সেদিকের আলোগুলি এখনও পিছন ছাড়ে নাই, ধরিয়া ফেলিল আর কি! চোখ বুজিয়া সে সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনুভব করিতে লাগিল, তাহাকে ঘিরিয়া ডাহিনে বামে সম্মুখে পিছনে সংখ্যাতীত আগুনের গোলা লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে। সেইখানে সে লুটাইয়া পড়িল।

বিলুপ্তাবশেষ চেতনার মধ্যে সুষমা শুনিতে লাগিল, অনেক দূরের এক একটা ডাক—খুকী…খুকী…কাহারা যেন কথা কহিতেছে…অনেকগুলি লোক…চীৎকার কোলাহল, ব্যস্ততা। সে চোখ মেলিতে পারিল না, সাড়া দিতে পারিল না। কিন্তু চোখ না মেলিয়া দেখিতে লাগিল, বড় বড় কালো মেটের মত আলেয়ার দল মুখ মেলিয়া দ্রুতবেগে গড়াইয়া গড়াইয়া আসিতেছে, আগুন লাগিয়া সমস্ত বিল জ্বলিতেছে; সেই আলোকে অস্পষ্ট যেন দেখা যাইতে লাগিল, বিলপারের লাল ভেরেণ্ডার বেড়া, গোল সিঁড়ির একটুখানি, চিলেকোঠা…

নিষ্প্রাণ

শ্রীসুকুমার সরকার

যৌবন বিস্মৃত মোর; অধর হাসিতে নাহি জানে
কণ্ঠে নাহি গান!
মনের বাসর-গেহ কারওঃ কোনো গোপন আহ্বানে
নাহি দেয় কান!
ভুলিয়াছি ধরণীরে ভুলিয়াছি তার রূপ-রেখা
কে দিল ভুলায়ে!
আমার মানস-বধূ স্বপ্নে মোর নাহি দেয় দেখা
মালিকা দুলায়ে!
ধরার চিন্ময়পাত্র হয়ে গেছে আজিকে মৃণ্ময়
নাই সুধা নাই!
বিচ্ছেদের ব্যথা আছে; মিলনের মোহন বিস্ময়
কোথা গেলে পাই!
বেদনা উতল হ'ল; ভাবি মনে গেল কোথা সব
কোন্ কল্প-পুরে!
নারীর নীলাভ দৃষ্টি চরণের চঞ্চল উৎসব
দূরে কত দূরে!

কে মোরে এনেছে হেথা, স্বপ্নহীন নিদ্রাহীন রাত
নামে ধীরে ধীরে!
আপনারে চিনি নাকো; কত দূরে পুরানো প্রভাত
যৌবনের তীরে!
আকাশে নীলিমা আছে; নাই তার আনন্দ তরুণ
বাতাসে বাতাসে;
পূরবীর রিক্ততায় ওঠে মৃদু সঙ্গীত করুণ
মোর চারি পাশে!
ধরণীর শ্যাম তনু ধূলি-রুক্ষ বর্ণ ছন্দ হীন
নিমেষে নিমেষে
কুসুমেরা ফুটে উঠে সাজে নাকো সে চির-নবীন
কাননের কেশে!
মৃত্যু তার মায়া-অঙ্কে জীবনের বসন্ত ব্যাকুল
গ্রাস করিয়াছে!
সুন্দরের খেলা-ঘরে সৃষ্টির এ পারিজাত ফুল
ধীরে ঝরিয়াছে।

ধ্রুবা

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাধবসেনার শূন্যগৃহে শুষ্ক মাল্যপুষ্প, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহুমূল্য আস্তরণ, ভগ্ন কাচপাত্র ও সুরাভাণ্ডের মধ্যে চিন্তাকুল কুমার চন্দ্রগুপ্ত পাদচারণ করিতেছিলেন। দিবসের তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়, তথাপি গৃহের কোণে কোণে ঘৃত ও গন্ধতৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল। দুয়ারে দুয়ারে এক এক জন নেপালী ক্রীতদাস দাঁড়াইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত ভাবিতেছিলেন, সুরা মিথ্যাবাদী, ইহার সাহায্যে কিছুই ভোলা যায় না। কে বলে সুরা বিস্মৃতি আনিয়া দিতে পারে? সেও মিথ্যাবাদী। সুরা কেবল মত্ততায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া দিয়া অন্তরের কোন গভীর প্রচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে অতীত বিষাদের ছবি মনে ফুটাইয়া তোলে। জাগরণে যে ছবির ছায়া অস্পষ্ট থাকে, অর্দ্ধ-সুষুপ্তিতে সুরার কৃপায় তাহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে। কিছুই ভোলা যায় না, ভোলা অসম্ভব। মানুষ ঘুমায়, কিন্তু তাহার মস্তিষ্কে স্মৃতি দিবারাত্রি জাগিয়াই থাকে। বহুমূল্য সুবর্ণমণ্ডিত কাচপাত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া কুমার চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "যাও, মিথ্যাবাদী, দূর হও।"

দূরে সোপানের উপর দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে একজন ক্রীতদাস কাচপাত্রের শব্দ শুনিয়া ভিতরে আসিল। তখন দুয়ারে দাঁড়াইয়া মাধবসেনা কহিল, "যুবরাজ আমি।"

জড়িতকণ্ঠে চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "কে যুবরাজ, আর কে আমি?"

"যুবরাজ, আমি মাধবসেনা।"

"এসেছ মাধবী? আজ তোমার সপত্নীকে পরিত্যাগ করেছি। মাধবী, তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব, বল ত?"

মাধবসেনা বলিল, "যুবরাজ, অনুগ্রহ করে যে সম্বোধন ইচ্ছা করেন, তাই করতে পারেন।"

"পারি না, পারি না, ইচ্ছা করলেও পারি না। চেতনে অথবা অচেতনে একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র নটীর গৃহে বাস করে, নটীর অন্নে জীবন ধারণ করে, কিন্তু আর বেশী দূর অগ্রসর হতে যখন যায়, তখন সেই শক্তি এসে বলে দেয় যে আমি মানব, কিন্তু তুমি দেবী, আমার অস্পৃশ্যা। কিন্তু তুমি কি বলতে এসেছিলে মাধবী?"

"যুবরাজ, আপাদমস্তক শাদা কাপড়ে ঢাকা একটি মহিলা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।"

"ভাল কথা—আর মদ খাব না, মাধবী। সুরা মিথ্যাবাদী। বিস্মৃতি আনে না, ভোলা যায় না, কেবল জাগরণের অস্ফুট ছবি অর্দ্ধসুষুপ্তিতে স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।"

"যুবরাজ, মহিলা মহীয়সী কুলকন্যা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত।"

"বেশ, তুমি যখন বলছ, তখন নিয়ে এস।"

মাধবসেনা চলিয়া গেল, কুমার চন্দ্রগুপ্ত আবার দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চায়, এমন হতভাগিনী কুলনারী পাটলিপুত্রে কে আছে? হয়ত কোন রূপসী কুলবধূ নূতন সম্রাটের অত্যাচারে জর্জ্জরিতা হইয়া ভাবিয়াছে যে, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ভিন্ন কেহ আর তাহাকে রামগুপ্তের অত্যাচার হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। এমন সময় মাধবসেনা দত্তদেবীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাঁহার দিকে না চাহিয়াই চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "কে তুমি নারী? নটীর ভিক্ষায় পুষ্ট সমুদ্রগুপ্তের পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন? রামগুপ্ত অত্যাচার করেছে? সে অত্যাচার প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। মহাপ্রতিহারের কা।

যাও, সাম্রাজ্যের দ্বাদশ প্রধানের কাছে যাও—কিছু না হয় অবশেষে দেবতার দুয়ারে যাও। চন্দ্রগুপ্ত অন্নহীন, বলহীন, গৃহহীন। নারী, তোমায় কোথায় দেখেছি? তোমার ঐ উচ্চশির কখনও মানুষের কাছে নত হয়নি। বুঝতে পারছি, দীর্ঘ জীবনের অশেষ ঝঞ্চাবাত সহ্য করেও ঐ উচ্চশীর্ষ অবনত হয়নি। যার মস্তক এত উচ্চ, সে কেন নটীর অন্নে প্রতিপালিত চন্দ্রগুপ্তের কাছে আসে?"

শুভ্রবস্ত্রের আবরণ দূরে ফেলিয়া দিয়া সজল নয়নে দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "কেন আসে, চন্দ্র?" সে কণ্ঠস্বর তীব্র তড়িৎরেখার ন্যায় জড় চন্দ্রগুপ্তের প্রতি-ধমনীতে প্রবাহিত হইল, তিনি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মা, মা, এখানে কেন এসেছ মা? দেশত্যাগ করে যাবে বলে কি পুত্রের কাছে চিরবিদায় নিতে এসেছ? দেখ তোমার পুত্রের কি পরিণাম। এই পুত্রকে যখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে গিয়েছিলে তখন কি ভেবেছিলে যে তোমার পুত্র নটী মাধবসেনার অঙ্গনে পড়ে থেকে কুকুরের মত তার উচ্ছিষ্ট ভোজনে জীবন ধারণ করবে?

দত্ত—চন্দ্র, ওঠ, আমি প্রাসাদে ফিরে যাব।

চন্দ্র—উঠেছি ত মা। কোথায় যাবে? প্রাসাদে? কার প্রাসাদে? তুমি কি পাগল হলে মা?

দত্ত—পাগল হইনি চন্দ্র, তুই ভুলে যাচ্ছিস্ আমি কে? এখনও দত্তা সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী দত্তদেবী। রামগুপ্ত এখনও ধর্ম্মবিবাহ করেনি, সুতরাং শাস্ত্রানুসারে আমি এখনও পট্টমহাদেবী, দ্বাদশ প্রধানের মুখ্য। আমার প্রাসাদে আমি ফিরে যাব, তুই কেবল আমার সঙ্গে আয়।

চন্দ্র—নিতান্তই ফিরে যাবে মা? যাবে, চল। কিন্তু মা, যে অধিকার নিজ হাতে জাহ্নবীর জলরাশিতে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছ, সে অধিকারে আবার কোন্ মুখে ফিরে যাবে?

দত্ত—সে কথা আমি বুঝব চন্দ্র, তুই আমার সঙ্গে আয়। দেখ চন্দ্র, পথের কুক্কুর রুচিপতি গুপ্তবংশের কুল-বধূর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে চায়। জয়া নাকি তা শুনেও শোনে না। মৃতপিতার তপ্ত রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে ধ্রুবা গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল, আমি তাকে নিবারণ করে এসেছি। চন্দ্র, তোর পিতৃকুলগৌরব রক্ষা করতে হবে।"

বজ্রমুষ্টিতে মাতার হস্ত ধারণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বললে মা? আর একবার বল! ধ্রুবা, ধ্রুবস্বামিনী, মহানায়ক রুদ্রধরের কন্যা? কে তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে চায়? রুচিপতি? রামগুপ্ত কি করছে? ধ্রুবা ত রামগুপ্তের স্ত্রী, তার পট্টমহিষী—"

"রামগুপ্তের আদেশে ধ্রুবা রুচিপতির সঙ্গে উদ্যান-বিহারে যেতে চায়নি বলে রামগুপ্ত তাকে গ্রহণ করেনি।"

সহসা চন্দ্রগুপ্তের শুভ্রমুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মস্তকের দীর্ঘকেশ ফুলিয়া উঠিল, তিনি আবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌লে মা? আমি যেন কিছু বুঝতে পারছি না, কানের কাছে সহস্র বজ্র নির্ঘোষ হচ্ছে, কোথা যেতে হবে, কখন যেতে হবে? কোথায় সে রুচিপতি?"

"আমার সঙ্গে এস।"

"মাধবী, আমার অস্ত্র দাও।"

মাধবসেনা চলিয়া গেল, দত্তদেবী চন্দ্রগুপ্তের হাত ধরিয়া বসাইলেন, পুত্রের অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "শান্ত হও, স্থির হও চন্দ্র, তোমার আমার সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। তোর পিতার উপর অভিমান ক'রে বড় ভুল করেছি, মহাপাপ করে ফেলেছি চন্দ্র। কেমন করে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব, তা ত বুঝতে পারছি না। মহানগরী পাটলিপুত্র রামগুপ্তের অত্যাচারে শ্মশান হতে বসেছে, সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ, কে যে একে রক্ষা করবে, তা-ও বুঝতে পারছি না। ধ্রুবার অবস্থা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এখন প্রাসাদে ফিরে যেতেই হবে চন্দ্র, সাম্রাজ্য যে তাঁর, তোর পিতার, রামগুপ্তের নয়। পাটলিপুত্র যে তাঁর রাজধানী—আমার বক্ষপঞ্জর, বুঝতে পারছি না কেমন করে ছেড়ে ছিলাম।"

"আমিও বুঝতে পারছি না, মা। যখন ছেড়ে গিয়ে ছিলে, তখনও যে কোন্ প্রাণে গিয়েছিলে তাও ত বুঝতে পারিনি। এখন আমার একমাত্র চিন্তা রুচিপতি, গণিকা-পল্লীর বিট রুচিপতি, সেই রুচিপতি ধ্রুবাকে উদ্যান-

বিহারে নিয়ে যেতে চায়—মা, মা, অন্য চিন্তা এখন তোমার পুত্রের পক্ষে অসম্ভব।"

এই সময় মাধবসেনা কুমারের অস্ত্র ও বর্ম্ম লইয়া ফিরিল। ক্ষিপ্রহস্তে বর্ম পরিয়া শিরস্ত্রাণ বাঁধিতে বাঁধিতে চন্দ্রগুপ্ত মাধবসেনাকে বলিলেন, "কোনোদিন তোমায় ভুলতে পারব না, মাধবী। আবার আসব, উপস্থিত একবার রুচিপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসি। চল মা।"

মাতা-পুত্র কক্ষ পরিত্যাগ করিবার সময়ে দেখিলেন, মাধবসেনা বর্ম্মাবৃতা, তাহার কটীবন্ধে ক্ষুদ্র অসি। বিস্মিত চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ, মাধবী?"

মাধবসেনা চন্দ্রগুপ্তের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাঁহার চরণতলে মাথা রাখিয়া বলিল, "যদি অনুমতি কর প্রভু, সহসা আজ এ গৃহ শূন্য হয়ে গেল, যুবরাজ, আমি যে তোমার কুক্কুরী—"

পায়ের উপর তপ্ত অশ্রুপাতে চন্দ্রগুপ্তের চেতনা ফিরিয়া আসিল, তিনি হাত ধরিয়া মাধবসেনাকে উঠাইয়া বলিলেন, "ছি মাধবী, এ দুর্ব্বলতা তোমার শোভা পায় না। আমি রুচিপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি, তার অর্থ কি জান মাধবী?"

"জানি প্রভু, তার অর্থ যুদ্ধ, রক্তপাত, নরহত্যা। কিন্তু প্রভু, প্রভু যখন মৃগয়ায় যায় কুক্কুরী কি তখন গৃহে বসে থাকে?"

সস্মিতবদনে চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "তবে এস।" বর্ম্মাবৃত কুমার চন্দ্রগুপ্ত এবং অবগুণ্ঠনমুক্তা মহাদেবী দত্তদেবীকে দেখিয়া নটীবীথির পথের উপর সহস্র সহস্র নাগরিক তীব্রকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দত্তদেবীর প্রত্যাবর্ত্তন

দীর্ঘকালব্যাপী মহোৎসবের পরে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ সহসা নীরব ও নিরানন্দ হইয়া উঠিয়াছে। সকলে ভীত, রাজকর্ম্মচারীরা অনুচ্চস্বরে কথা কহিতেছে। পরিচারক ও রক্ষীরা অতি ধীরে পথ চলিতেছে। সকলেই মনে করিতেছে একটা আকস্মিক বিপদ উপস্থিত, অথচ তাহার কারণ কেহই জানে না। দত্তদেবী ও কুমার চন্দ্রগুপ্ত যেদিন মাধবসেনার গৃহ পরিত্যাগ করেন, সেই দিন দিবসের দ্বিতীয় প্রহরের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে প্রাসাদের সমুদ্র-গৃহের নিকটে মন্ত্রগৃহে তিনজন মানুষ বসিয়া ছিল। গৃহটি অতি ক্ষুদ্র এবং তাহার চারিদিকে চারিটি দুয়ার। কক্ষের চারিদিকে একটি প্রশস্ত অলিন্দ এবং তাহার চারিদিকে চারিটি দীর্ঘকক্ষ। বিশেষ গোপনে মন্ত্রণা করিবার জন্য বৃদ্ধ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এই মন্ত্রণাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অলিন্দের বাহিরে চারিটি কক্ষে অসংখ্য সশস্ত্র রক্ষী শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সম্রাট রামগুপ্তের অনুমতি ব্যতীত কেহই আর মন্ত্রগৃহের দিকে আসিতে পারিতেছিল না। অলিন্দ জনশূন্য, কেবল মন্ত্রগৃহের চারটি দ্বারে চারজন মূক দণ্ডধর দাঁড়াইয়া আছে।

আজ কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির জন্য এত সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু রক্ষী ও দণ্ডধরগণ সম্রাটকে মন্ত্রগৃহে বসিতে দেখিয়া, অভ্যাসমত যথানিযুক্ত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মন্ত্রগৃহের মধ্যস্থলে একখানা ক্ষুদ্র হস্তিচর্ম্ম নির্ম্মিত সুখাসনে রামগুপ্ত উপবিষ্ট, অদূরে মৃগচর্ম্ম আচ্ছাদিত দ্বিতীয় সুখাসনে নূতন মহামন্ত্রী রুচিপতি, এবং আরও কিঞ্চিৎ দূরে নূতন মহাসেনাপতি ভদ্রিল দণ্ডায়মান।

রামগুপ্ত বিমর্ষ, রুচিপতি চিন্তাকুল এবং ভদ্রিল ভয়ে বিবর্ণ। সম্রাট রামগুপ্ত হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "সীমান্ত রক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল?"

ভদ্রিল ত্রস্তভাবে উত্তর দিল, "কোনো ব্যবস্থাই ত করা হয়নি, মহারাজ।"

"কেন হয়নি? তুমি না মহাসেনাপতি?"

তখন রুচিপতি সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিল, "ভদ্রিল ছেলেমানুষ, ও কি অত কথার উত্তর দিতে পারে? মহারাজ, এতদিন ধরে ত কেবল আপনার অভিষেকের উৎসবই চলছে, রাজ্যশাসনের কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি।"

বিস্মিত হইয়া রামগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "বল কি রুচিপতি? শকেরা মথুরা ছেড়ে এসে কৌশাম্বী অধিকার করলে, প্রয়াগ পর্য্যন্ত তাদের হস্তগত, আর

সে সংবাদ কি-না এইমাত্র রাজধানীতে পৌছল? এই ভাবে কি তোমরা রাজ্য শাসন করবে?"

"এইবার হবে, ক্রমশঃ হবে, বুঝলে বাবা রামচন্দ্র? সোজা কথা বলি, এতদিন ধরে ত কেবল তোমার জন্যে ভাল ভাল—এই কি বল্‌তে কি বল্‌ছিলাম, তোমার সেবায় ব্যস্ত ছিলাম, রাজ্যশাসন ত এই সবে শিখ্‌ছি। আমি বলছি কি যে স্ত্রীলোকটিকে একেবারে শকরাজের দূতকে দিয়ে ফেলা হোক্, আর সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় আদেশ প্রচার করা হোক্ যে, শকেরা যেন তৎক্ষণাৎ প্রয়াগ আর কৌশাম্বী ছেড়ে মথুরায় ফিরে যায়।"

"কিন্তু এ যে ভীষণ অপমান, রুচিপতি! যে শকরাজ হাতজোড় করে পিতার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকত, সেই শকরাজ কি-না আজ আমাকে আদেশ করে পাঠিয়েছে যে আমি যেন আমার পট্টমহিষীকে তার পদসেবা করতে মথুরায় পাঠিয়ে দিই। এ অপমান অসহ্য!"

"ধ্রুবা ত এখনও তোমার পট্টমহিষী হয়নি।"

"কিন্তু দেশবিদেশের লোক জানে যে, ধ্রুবা আমার পট্টমহিষী। শকরাজ বাসুদেব যদি জান্‌ত যে ধ্রুবা এখনও আমার পট্টমহিষী হয়নি, তা হলে সে কখনও নাম করে ধ্রুবাকে চেয়ে পাঠাত না। সে কেবল আমাকে অপমান করবার জন্যে ধ্রুবদেবীকে মথুরায় পাঠাতে আদেশ করেছে।"

"বৎস রামভদ্র, এ দেখ্‌ছি এই সিংহাসনখানার দোষ। ক্রুদ্ধ হও কেন? যতদিন এই দীন ভৃত্য রুচিপতিকে কর্ণধার করে নিশীথ রাত্রিতে অস্থানে অন্ধকারে ভ্রমণ করতে এবং পিতার ভয়ে মৃন্ময় পাত্রে অমৃত সেবন করতে, তত দিন ত এ ভাব ছিল না। যেই আর্য্যপট্টে চড়ে বসেছ, অমনি ক্ষত্রিয়ের বুলি ধরেছ?"

"আমি কি সমুদ্রগুপ্তের পুত্র নই?"

"কে বলছে নও? একবার, দশবার, শতবার, এই বারের শেষ সহস্রবার। কিন্তু বাপধন, আমি ত রবিগুপ্ত নই? কোন্ সুরার কি স্বাদ তা বলতে পারি, কিন্তু খড়্গ দেখলেই মূর্চ্ছা যাই।"

"তুমি মহামন্ত্রী, যুদ্ধ করা ত তোমার কাজ নয়।"

"কিন্তু বৎস রামভদ্র, তোমার যে মহাসেনাপতি ভদ্রিল, সে যে চন্দনার মাসতুতো ভাই! এতদিন ধরে নৃত্যের সময় মৃদঙ্গ ও খঞ্জনী বাজিয়ে এসেছে, তার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষে কেহ কখনও যুদ্ধক্ষেত্রের ত্রিসীমায় যায়নি, তাকে হঠাৎ শকরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালে চলবে কেন? যুদ্ধের সময় চক্রব্যূহ রচনা করতে বল্‌লে, সে হয়ত বলে বসবে, তেরে কেটে তাক্ ধিন্ তা ধিন্।"

"ছি ছি রুচিপতি, আমার বাক্‌দত্তা পত্নীকে শকরাজার আদেশে মথুরায় পাঠালে উত্তরাপথের রাজন্যসমাজে মুখ দেখাব কি করে?"

"বাপধন ও চন্দ্রবদন না হয় কিছুদিন নাই দেখালে? অনেক সময় কীল খেয়ে কীল চুরি করতে হয়, রামচন্দ্র। চন্দ্রগুপ্তের বদলে তুমি সিংহাসনে বসেছ দেখে তোমার পিতার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরা কর্ম্মত্যাগ করে চলে গেল—আমরা বিশ্বস্ত হলেও নূতন। আমাদের দুর্ব্বলতা বুঝে শকরাজা কৌশাম্বী আর প্রয়াগ অধিকার করে বসল, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার পট্টমহিষীকে চেয়ে পাঠাল, এখন উপায় কি বল? ভাগ্যিস্ ধ্রুবাটাকে পট্টমহিষী করা হয়নি, তাহলে ত্রিভুবন চিরদিন তোমার অপযশ ঘোষণা করত। এখন বলা যাবে যে ধ্রুবা ত পট্টমহিষী হয়নি, শকরাজা তাকে ভিক্ষা করেছিল বলে স্ত্রীলোকটিকে অর্পণ করা হয়েছে। শকরাজের দূতকে বলা যাক যে, আমাদের পট্টমহিষী নেই, তবে তোমাদের রাজা ধ্রুবদেবীকে চেয়েছেন, নিয়ে যাও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াগ আর কৌশাম্বী ছেড়ে দাও।"

"রুচি, চিরদিন ভারতবর্ষের লোক কাপুরুষ রামগুপ্তের অপযশ ঘোষণা করবে।"

"করে করুক না প্রভু, চিরদিন তুমিও থাকবে না, আমিও থাকব না, সুতরাং চিরদিন সে অপযশ আমরা শুনতে আসব না। সুন্দর আছি বাবা, রামচন্দ্র। তোমার রাজ্য রামরাজ্য, সুরায় সমুদ্র, নিত্য উদ্যানবিহার। প্যান্ প্যানে ঘ্যান্ ঘ্যানে মেয়েমানুষটাকে ছেড়ে দাও না বাবা।"

"রুচি, শকরাজার কথায় পট্টমহাদেবীকে মথুরায় পাঠাচ্ছি শুনলে পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা কি বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌বে না?"

ক্ষিপ্রহস্তে ভদ্রিলের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া রুচিপতি রামগুপ্তের সম্মুখে করজোড়ে জানু পাতিয়া বসিল এবং গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিল যে, শকরাজা প্রবল শত্রু, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাটলিপুত্রের দরিদ্র নাগরিকদের সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং তাহারা নাগরিকদের প্রতিভূস্বরূপ সম্রাট-সকাশে নিবেদন করিতে আসিয়াছে যে, সম্রাট যেন পাটলিপুত্রের নাগরিকগণের অনুরোধে ধ্রুবদেবীকে মথুরায় প্রেরণ করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা দূর করেন।

রুচিপতি নিজে উঠিয়া ভদ্রিলকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল এবং বলিল, "এইবার কথা কয়টা বলে ফেল বাপধন! বাইরে দাঁড়িয়ে মথুরার দূত বেটা বড় লম্বা চওড়া বচন দিচ্ছে। তাকে বলিগে, যা বেটা যা, ধ্রুবদেবীকে নিয়ে যা।" রামগুপ্ত সন্দিগ্ধচিত্তে বলিলেন, "রুচি নাগরিকেরা কি তোমার কথা শুনবে?"

"সে ভার আমার, কিছু পয়সা খরচ করতে পারলে, লোকমত গড়ে তুলতে পারি।"

"তবে তাই কর।"

"জয় হোক্ বাবা রামভদ্র, প্রজার অনুরোধে ভগবান রামচন্দ্র লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। প্রজার অনুরোধে অনেক রাজাকেই অনেক কুকাজ করতে হয়। তুমি এখন এক কাজ কর, সকাল বেলায় যে কাণ্ড হয়ে গিয়েছে তার কিছু প্রায়শ্চিত্ত কর। রক্ষী আর দণ্ডধর সঙ্গে দিয়ে শিবিকা পাঠিয়ে দাও, ধ্রুবদেবীকে প্রাসাদে ফিরিয়ে আন। উপস্থিত আমি ভদ্রিলের সঙ্গে নগরে লোকমত গড়ে তুল্‌তে চললুম।"

রুচিপতি ও ভদ্রিল মন্ত্রগৃহ পরিত্যাগ করিলে সম্রাট রামগুপ্ত মূক দণ্ডধরকে ইঙ্গিত করিলেন। সে বাহিরে গিয়া একজন রক্ষীকে ডাকিয়া আনিল। রক্ষীর উপরে আদেশ হইল যে সে যেন দশজন প্রতিহার, দশজন দণ্ডধর, ছত্রধারী, চামরধারী ও সুবর্ণ শিবিকা লইয়া গিয়া মহাদেবী ধ্রুবদেবীকে প্রাসাদে ফিরাইয়া আনে। আদেশ পাইয়াও রক্ষী বাহিরে গেল না, সে সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজাধিরাজের জয়, পরমেশ্বরী পরম ভট্টারিকা পট্টমহাদেবী দত্তদেবী মন্ত্রগৃহের দুয়ারে দণ্ডায়মান।" চম্‌কাইয়া উঠিয়া রামগুপ্ত বলিলেন, "কি বললি? দত্তদেবী?"

রক্ষী মিনতি করিয়া বলিল, "পরম ভট্টারক, আমি রাজবংশের পুরাতন ভৃত্য, মিথ্যা বলি নাই।" সঙ্গে সঙ্গে অলিন্দ হইতে দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "পুত্র, দণ্ডধর মিথ্যা বলেনি, সত্যসত্যই আমি দত্তদেবী।" বলিতে বলিতে দত্তদেবী ও জয়স্বামিনী মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। রামগুপ্ত কম্পিতপদে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলেন এবং ভয়ের ভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া দত্তদেবীকে বলিলেন, "মা, এ প্রাসাদে আপনি কার অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন, এ প্রাসাদ আপনার।"

এ কথার উত্তর না দিয়া বৃদ্ধা পট্টমহাদেবী বলিয়া উঠিলেন, "পুত্র, তুমি সমুদ্রগুপ্তের সন্তান, তোমার এ কি আচরণ?"

জয়স্বামিনী—"বল্‌লে বোঝে না ভাই, আমি এখন বুড়ো হয়েছি, কোনো কথা বল্‌তে গেলে হেসে উড়িয়ে দেয়।"

রাম—"অপরাধ ক্ষমা কর মা, ধ্রুবার কথা বলছ? আমি তার প্রতি পশুর মত আচরণ করেছি। কিন্তু মা, আমি নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি, এই মাত্র প্রতিহার ও দণ্ডধরদের সঙ্গে শিবিকা দিয়ে পট্টমহাদেবী ধ্রুবদেবীকে সসম্মানে প্রাসাদে ফিরিয়ে আন্‌তে পাঠিয়েছি।"

রামগুপ্তের উত্তর শুনিয়া দত্তদেবী চিন্তিতা হইলেন, তাঁহার মনে হইল, এ কি ধ্রুবার ভুল না তাঁহার নিজের ভুল? তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "রাম, সত্যই কি তুমি ধ্রুবাকে ফিরিয়ে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছ?"

তখন রামগুপ্তের মস্তিষ্ক বিকার দূর হইয়াছে, তিনি দত্তদেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া উভয় পদ ধরিয়া বলিলেন, "তোমার গর্ভে জন্মাইনি বটে, কিন্তু জন্ম অবধি

জানি যে, তুমিই আমার মা, তোমার পবিত্র চরণ স্পর্শ করে বল্‌ছি যে এই মাত্র আমি দশজন দণ্ডধর, দশজন প্রতীহার ও স্বর্ণ শিবিকা ধ্রুবদেবীর সন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

বিশেষ চিন্তিতা হইয়া দত্তদেবী জয়স্বামিনীকে বলিলেন, "জয়া, এ তবে আমারই ভুল, ধ্রুবা আমার অনুমতি না পেলে ফিরবে না। আমি তবে ফিরে যাই।" রামগুপ্ত তখনও সেই অবস্থায় বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মা, অনুগ্রহ করে যদি নিজের প্রাসাদে ফিরে এসেছ তবে মর্য্যাদা আবার ফিরিয়ে নাও। তুমি এখনও পট্টমহাদেবী, তোমার যানবাহন সমস্তই প্রস্তুত আছে।"

"না পুত্র, আশীর্ব্বাদ করি তুমি জয়ী হও, আমার আর মর্য্যাদায় প্রয়োজন নাই। ধ্রুবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে বড় অভিমানিনী, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'রো। আর জয়া, তোর পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বি।"

দত্তদেবী ও জয়স্বামিনীর সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীও চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে রামগুপ্ত হাসিতে হাসিতে সুখাসনের উপর গড়াইয়া পড়িলেন এবং আপন মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "এমন সময় রুচিপতি কোথায় গেল? কি সুন্দর অভিনয় করলাম! কিছুই দেখতে পেল না।"

তখন কাচপাত্রে কাশ্মীর দেশীয় সুরা আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মথুরা যাত্রা

পট্টমহাদেবী দত্তদেবী যখন মন্ত্রগৃহ পরিত্যাগ করিলেন, তখন অসংখ্য নাগরিক প্রাসাদের দক্ষিণ তোরণ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দেবগুপ্তের দীর্ঘ শ্মশ্রু ও রবিগুপ্তের শুক্ল কেশ দেখা যাইতেছিল। পাটলিপুত্রের নগরপ্রধান ইন্দ্রদ্যুতি ও নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ এবং পৌরসঙ্ঘের অধিনায়ক জয়কেশী সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তোরণের প্রতীহার ও দণ্ডধরগণ বিদ্রোহের আশঙ্কায় অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু কোনো নাগরিকই তাহাদিগের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেছিল না। একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল, "আমার নাতি এই মাত্র প্রয়াগ থেকে ফিরে এসেছে, সে বললে যে "শকসেনা প্রয়াগদুর্গ অধিকার করেছে।"

দ্বিতীয় নাগরিক বলিল, "গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী শকরাজার পদসেবা করতে মথুরায় যাবেন, এও কানে শুন্‌তে হ'ল? আজ কোথায় সমুদ্রগুপ্ত? তোমার বংশের শেষে এই পরিণাম?

মনের আবেগে তৃতীয় নাগরিক বলিয়া উঠিল, "এমন সময় যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত কোথায় গেলেন?"

দেবগুপ্ত স্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, তিনি ক্রোধদমন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সমস্তই মিথ্যা কথা, এ সকল কথা যে রটনা করছে, তার জিহ্বা সমূলে উৎপাটন করে ফেল্‌ব।"

তৃতীয় নাগরিক উত্তরে বলিল, "প্রভু, যে সকল নাগরিক এখানে উপস্থিত আছে, তারা সকলেই এ কথা শুনেছে। দণ্ডধরেরা বলচে যে শকরাজের দূত একটু আগে প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে ধ্রুবদেবীকে এখনই মথুরায় পাঠাতে আদেশ করে গেছে।"

রবিগুপ্ত এখন স্থির হইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন, তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "নাগরিকগণ, চেন আমি কে? সমুদ্রগুপ্ত গিয়েছেন বটে, কিন্তু আমি বিষম মায়ায় জড়িত হয়ে এখনও তোমাদের পরিত্যাগ করতে পারিনি। এ সকল কথা নিজের কানে শুনলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। নিশ্চয় এ কোনো ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফল। সাম্রাজ্যের কোনো ভীষণ শত্রু নিজের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করবার জন্যে এই সকল মিথ্যা কথা রটাচ্ছে। মহাদেবী ধ্রুবদেবী প্রাসাদে ফিরে এসেছেন। মহারাজ রামগুপ্ত যা-কিছু অন্যায় করেছিলেন, এইবারে তা সমস্তই সংশোধিত হয়ে যাবে।"

জয়নাগ বলিল, "পট্টমহাদেবী দত্তদেবী কিন্তু গঙ্গাদ্বারের পথে প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছেন।"

শুনিয়া বিস্মিত হইয়া দেবগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "সে সংবাদ ত এখনও আমরা জানি না।"

পিছন হইতে একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল, "এই যে নূতন মন্ত্রী আর সেনাপতি এলেন।"

সুবর্ণদণ্ডধর প্রতিহার পরিবৃত রুচিপতি ও ভদ্রিল নগর হইতে প্রাসাদে ফিরিতেছিল, সম্মুখে জনতা দেখিয়া রুচিপতি নগর ঘোষকের মত উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল, "নাগরিকগণ, তোমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মহারাজা রামগুপ্ত অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হলেও শকরাজার অনুরোধে পট্টমহাদেবী ধ্রুবদেবীকে মথুরায় পাঠাতে সম্মত হয়েছেন। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও, আর যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই।"

রবিগুপ্ত ক্ষিপ্ত হইয়া রুচিপতির গ্রীবা ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌লি নরাধম?" রুচিপতি দেবগুপ্ত ও রবিগুপ্তকে ভাল করিয়াই চিনিত এবং বিষম জনতার মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীতও হইয়াছিল। সে অতিধীরে বৃদ্ধের হাত ছাড়াইয়া অতি নম্রভাবে বলিল, "ভদ্র, রাজ আদেশ নাগরিকদের জ্ঞাপন করছি মাত্র। আপনি কে তা জানি না, তবে আপনি বয়সে বড়, সুতরাং আপনার কটু সম্ভাষণ আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ। আমি রাজভৃত্য মাত্র, রাজ আদেশে এই আনন্দ-সংবাদ নগরের পথে পথে জ্ঞাপন করে বেড়াচ্ছি। পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা শকরাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা দেখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল সেইজন্য তাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে, মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত তাঁর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা মহিষী ধ্রুবদেবীকে মথুরায় প্রেরণ করতে সম্মত হয়েছেন।"

রুচিপতির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নাগরিকগণের মধ্যে ভীষণ কলরব উঠিল, একজন বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা," আর একজন বলিয়া উঠিল, "কে বলে পাটলিপুত্রের নাগরিক যুদ্ধে কাতর?" তৃতীয় জন বলিল, "মহারাজের কাছে কে অনুরোধ করতে গিয়েছিল?"

জয়নাগ জিজ্ঞাসা করিল, "সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর পাটলিপুত্রের কোনো পল্লীর কোনো নাগরিক প্রাসাদে এসে মহারাজের নিকট আবেদন করতে গিয়েছিল।" কেহ কোনো উত্তর দিল না। পশ্চাৎ হইতে একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল, "হায়, হায়, এমন সময় যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?"

ইন্দ্রদ্যুতি তাহাকে বলিল, "তিনি এইমাত্র রুচিপতির সন্ধানে প্রাসাদে এসেছিলেন।"

রুচিপতি ভদ্রিলের দিকে চাহিয়া জনান্তিকে বলিল, "ঠিক সময় বেড়িয়ে পড়া গিয়েছে হে।" তাহার পর সাম্‌লাইয়া লইয়া নাগরিকদিগের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাপ সকল, আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, বিশ্বাস ক'রো না। আমি রাজভৃত্য, মহারাজাধিরাজের আদেশ তোমাদের জানিয়ে গেলাম। এস হে ভদ্রিল।"

রুচিপতি ও ভদ্রিল তোরণের ভিতরে গিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তখন দেবগুপ্ত বাহিরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি রুচিপতি?"

জয়নাগ উত্তর দিল, "হাঁ প্রভু, ইনিই আপনার উত্তরাধিকারী মহানায়ক মহামাত্য রুচিপতি শর্ম্মা।"

রবিগুপ্ত—চল দেবগুপ্ত, দণ্ডদেবীর সন্ধানে যাই।"

জয়নাগ—প্রভু, বলে দিন এ অবস্থায় আমরা কি করব?

রবি—নূতন সম্রাটের মতিচ্ছন্ন ধরেছে, নগরশ্রেষ্ঠী। প্রতি পল্লীতে নাগরিকগণকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বল, গুপ্ত-সাম্রাজ্যের এত বড় বিপদ অনেক দিন হয় নি।

জয়—প্রভু, যে-দিন রামগুপ্ত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, সেই দিন থেকে এই দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় কেবল পাটলিপুত্রের পল্লীতে পল্লীতে নয়, সাম্রাজ্যের প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে সকলে দিবারাত্রি প্রস্তুত আছে। আজ কিন্তু দেশে নেতার অভাব। মনে করেছ কি যারা তোমার অধীনে অস্ত্র ধরেছে, তারা রুচিপতি, আর চন্দনার ভ্রাতা ভদ্রিলের অধীনে যুদ্ধ করবে?

রবি—চিন্তা ক'রো না বৃদ্ধ জয়নাগ, ভগবান আছেন। কুমার চন্দ্রগুপ্তের কাছে যাও। আবশ্যক হলে বৃদ্ধ রবিগুপ্তও ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্রধারণে পরাঙ্মুখ হবে না।"

নাগরিকগণ চন্দ্রগুপ্তের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ আবার কহিল, "প্রভু, পৌরসঙ্ঘ স্বর্গগত মহারাজের মৃত্যুর পরেই যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বরণ করেছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

অমান্য করবে না, কিন্তু পিতৃভূমি রক্ষার জন্য দেহের শেষ শোণিতবিন্দু পর্য্যন্ত উল্লাসে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যয় করবে।"

ইন্দ্র—প্রভু, আমরা যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের কাছে যাচ্ছি, কিন্তু আপনারা?

রবি—আমরা কি?

ইন্দ্র—আমরা শুনেছি যে মহানায়ক হরিষেন আর রুদ্রভূতির মত আপনারও পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন।

রবি—মনে করেছিলাম যাব, কিন্তু দত্তদেবীর আদেশ, সাম্রাজ্যে এখনও বৃদ্ধের প্রয়োজন আছে।

সহসা জয়নাগ রাজপথের ধূলায় জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার দীর্ঘ শুভ্র কেশপাশ রবিগুপ্তের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইল। তাহা দেখিয়া উপস্থিত সকলে এমন কি রামগুপ্তের দণ্ডধর ও প্রতিহার পর্য্যন্ত ধূলায় বসিয়া মস্তক অবনত করিল। বৃদ্ধ নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "পিতা, আমাদের রক্ষা কর, পাটলিপুত্র আজ অনাথ, কেবল সাম্রাজ্য নয়, আজ ভরতের ভারতবর্ষের প্রতি নগর তোমার মত বৃদ্ধের আশায় পথ চাহিয়া আছে।"

বৃদ্ধ সেনাপতিও অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, তিনি বলিলেন, "না যাব না, যতদিন সমুদ্রগুপ্তের নগর রক্ষায় প্রয়োজন আছে, ততদিন বৃদ্ধ দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করবে না।"

সকলে বৃদ্ধদ্বয়ের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন রবিগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কে আছে?"

ইন্দ্রদ্যুতি উত্তর দিল, "কেবল নটীমুখ্যা মাধবসেনা।"

রবি—তোমরা একদল চন্দ্রগুপ্তের শরীর রক্ষায় যাও। ইন্দ্রদ্যুতি, তুমি শত নাগরিক নিয়ে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের নিকটে যাও। জয়নাগ, প্রত্যেক পল্লীর সমস্ত সুস্থ নাগরিক একত্র করে অস্ত্র সংগ্রহ কর, আমরা দুজনে মহাশ্মশানে দত্তদেবীর কাছে যাচ্ছি।

ক্রমশঃ

মহাদূত

("ফজরমেঁ যব্ আয়া যল্চি"—গিয়ানদাস বঘেলি)

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

প্রভাতে প্রথম এলে দূত তুমি
সোনালি পোষাক পরিধান,—
চিত্ত জাগিল তব নিশ্বাস্-
নিঃসৃত বাস্ করি পান।
দূর-হ'তে-দূর দিগন্ত ছেপে
দীপ্ত কি ব্যথা পড়িল সে ব্যেপে,
মধ্যদিবার রৌদ্রে উঠিল
কি ব্যাকুলতায় ভরি প্রাণ।

প্রদোষে পুরিলে প্রগাঢ় বিরাগে
গেরুয়া রাগিণী করি গান,-
মৃত্যুর মত রাত্রি নামিল
কালো কাগজের বিরাট পত্র—
তারার হরফে রচিত ছত্র;
তুমি যাঁর দূত—এত সমারোহে
হে দূত, তিনি যে পরিম্লান!

"মহাসভা তাঁর—" দূত কহে হাসি,
"হে ধীমান, কর প্রণিধান,
মহা-উৎসব—তুমি যে তাহার
অতিথি একক মহীয়ান।
মহান্ অতিথি মহান্ স্বামীর—
মহাদূত আমি—গর্ব্বিত শির,
মেলিয়া ধরেছি লোকে লোকে সেই

জার্ম্মেনীতে শিশু ও মাতৃমঙ্গল

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী

মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল জার্ম্মেনীতে আজকাল অতি সুবিস্তৃত এবং সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। এই কাজ এখন কেবলমাত্র দরিদ্রের সাহায্য কল্পেই আবদ্ধ নাই, দেশের সকল জননী ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজেও প্রসার লাভ করিয়াছে। এ কাজের সূত্রপাত হইয়াছিল অতি সহজ ও সাধারণ ভাবে—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দরিদ্রের সাহায্যের কাজে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে এক সভা হয়; সেই সভায় মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সংক্রান্ত কাজের সকল সমস্যার আলোচনা হইয়া স্থির হয় যে, সমগ্র জার্ম্মেনীর মাতা ও শিশুর মঙ্গলের কাজ আইন করিয়া

ফলে যে আইন পাস হয় তাহার বিধান অনুসারে প্রতিটি জার্ম্মান শিশুর শারীরিক উন্নতি, মানসিক পরিণতি ও সামাজিক জ্ঞানের উন্মেষের জন্য রাষ্ট্রশক্তি দায়ী।

এই দায়িত্বকে এখন কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে। তাহাদের কাজ—

১। মাতা ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা।

২। স্কুলে যাইবার বয়স হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশুর লালন-পালন করা।

৩। এবং স্কুলে যাইবার বয়স উত্তীর্ণ হইলে তাহাদের যত্ন করা।



ইউনিভার্সিটি কিণ্ডারক্লিনিক, ট্যুবিঙ্গেন

শৃঙ্খলীভূত করা দরকার। এই মঙ্গলের কাজ যে জাতির হিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সে সত্য তখনই প্রথম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ফলে শিশু ও মাতৃমঙ্গল কাজ রাষ্ট্র-

মাতা ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জার্ম্মেনীর প্রতি শহরে ও গ্রামে মাতৃমঙ্গল আশ্রম খোলা হইয়াছে। রোগী পরীক্ষা করিবার জন্য একটি টেবিল, রোগীর

আরও কয়েকটি ছোটখাট দরকারী জিনিষ—এই অতি সাদাসিধা রকমের আসবাবপত্র লইয়া আশ্রমগুলি তৈরি। একজন ডাক্তার আর একজন নার্স একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আশ্রমে উপস্থিত থাকিয়া দেশের সব



শিশুদের দিনের বেলায় খেলা করিবার ঘর শার্লোটেনবুর্গ

ভাবী জননীকে পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার বিবরণ তালিকাভুক্ত করিয়া রাখেন। এই-সব জায়গায় কোন চিকিৎসা হয় না; চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে এখান হইতে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ডাকিয়া পাঠাইলে নার্সেরা ঘরে ঘরে যাইয়াও রোগ পরীক্ষা করিয়া থাকে। এই-সব আশ্রম শিশুর জন্মের পর একটি ঝুড়িতে করিয়া শিশুর জন্য এক প্রস্থ পোষাক, স্নানের একটি টব, সাবান, মাতার জন্য একটি রাত্রির পোষাক প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। সাবান, রাত্রির পোষাকটি এবং আর কয়েকটি ক্ষুদ্র সামগ্রী ছাড়া অন্যগুলি প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে আশ্রমকে ফিরাইয়া দিতে হয়। আশ্রমে মাঝে মাঝে মাতৃত্ব, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং প্রদর্শনী খোলা হয়। এই-সব বিষয়ে জ্ঞানবিস্তারের কাজ অবশ্য আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় মেয়েদের স্কুলের শিক্ষার ভিতর দিয়া প্রত্যেক স্কুলেই মেয়েদের অতি বিশদ এবং নিপুণ ভাবে সন্তান লালন পালনের কাজ শিখিতে হয়। গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের বিধান অনুসারে প্রত্যেক মেয়েকে স্কুলে পড়িবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়।—

১। শিশুর বিছানা এবং পোষাক-পরিচ্ছদ।

২। শিশুর স্নান।

৩। শিশুকে পাউডার এবং তেল মাখান।

৪। শিশুর শুশ্রূষা।

৫। তাহাকে স্তন্য পান করান।

৬। তোলা দুধ খাওয়ান।

৭। একমাত্র দুধে যারা পরিপুষ্ট নয় তাহাদের খাদ্য।



সুহ্বাবিং হাসপাতালের শিশুগৃহ, ম্যুনিক

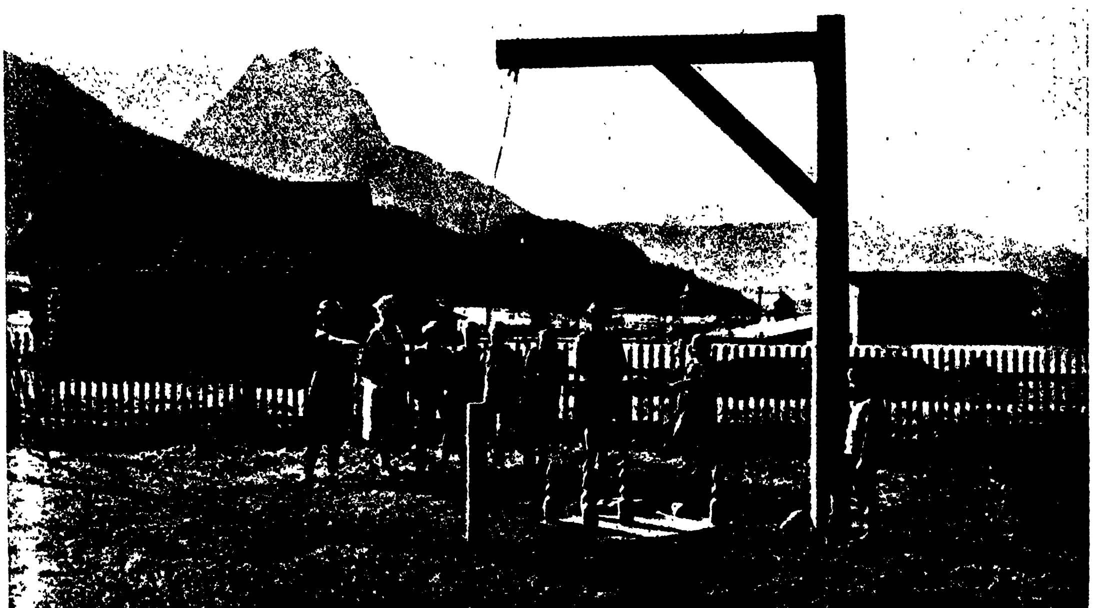
৮। দুই বছর বয়সের শিশুর আহার।

৯। শিশুর প্রথম দুই বৎসরের জীবন।

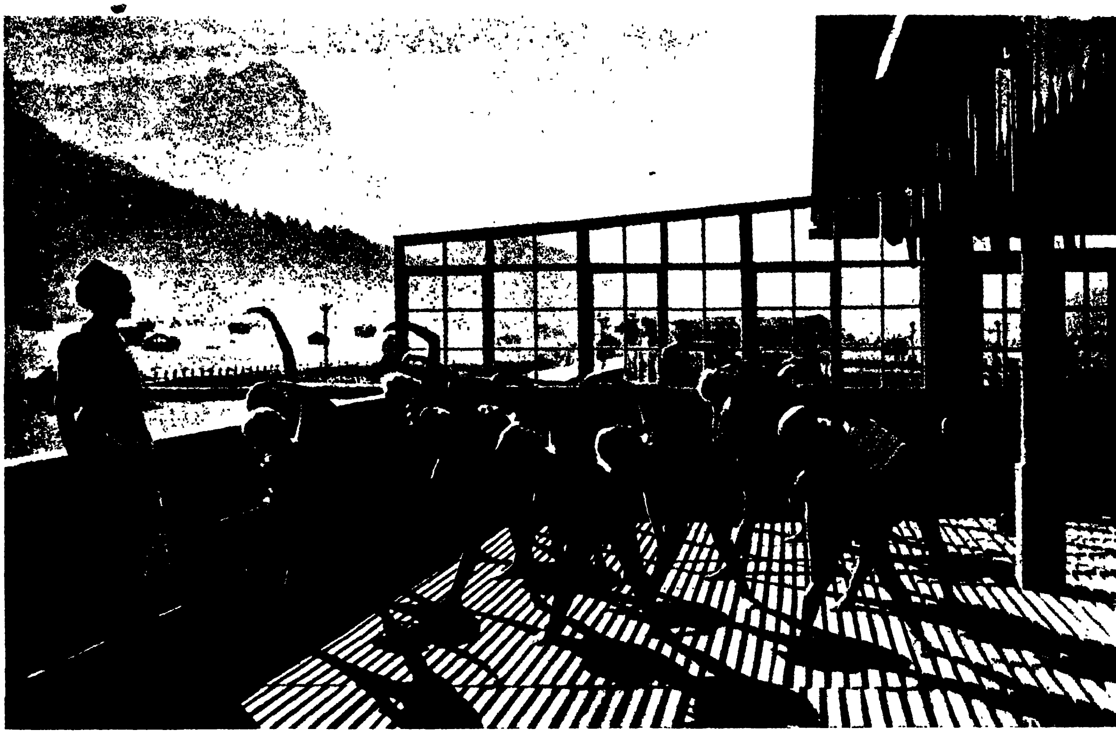
মাতৃমঙ্গল আশ্রমের আরও দুইটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ আছে—জননীদের আইন আদালতের কাজে সাহায্য



মুক্ত প্রাঙ্গণে শিশুদের ভোজনালয় হালে শহরের ম্যুনিসিপ্যালিটি



ল্যাণ্ডেসফেরাইনের আশ্রমে শিশুগণের খেলা। পারটেনকিরকেন



ল্যাণ্ডেসফেরাইনের আশ্রমে শিশুরা ব্যায়াম অভ্যাস করিতেছে



ফেরাইন হ্বালডেরহোলুঙের অরণ্য-বিদ্যালয়ে শিশুদের স্না :

করা এবং গভর্ণমেন্টের কাছে মাতাদের যে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্য তাহা উদ্ধার করিয়া দেওয়া।

আশ্রমে নিয়মিত ভাবে পরীক্ষার ফলে যে সব রোগীর সন্ধান পাওয়া যায় তাহাদের চিকিৎসা করা যায়, কিংবা প্রসব কালে স্থান দেওয়া যাইতে পারে সেই দেশে এমন সাত রকমের জায়গা আছে, যেমন তেইশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্ত্রীলোকদের হাসপাতাল, ধাত্রীবিদ্যালয়, মিউনিসিপালিটি কিংবা গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত প্রসূতি হাসপাতাল এবং লোকহিতকর সমিতি ও জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল। সমস্ত জার্ম্মানীতে ভাবী জননীদের সব শুদ্ধ ২৭৮টি আশ্রয় আছে এবং সেখানে ৭,৫৭১ জনের স্থানসঙ্কুলান হয়।

মাতৃমঙ্গল কাজ সুসম্পন্ন করিতে হইলে মাতার স্বাস্থ্য এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বিধান প্রয়োজন। তাই জার্ম্মেনীতে স্ত্রীলোকদের চিনি ও সীসার কারখানা, খনি প্রভৃতি স্বাস্থ্যহানিকর জায়গায় কাজ করা আইন করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। রাত্রি ৮টা হইতে ভোর ৬টার মধ্যে কাজ করা এবং দিনে ৮ ঘণ্টার বেশী কাজ করাও স্ত্রীলোকদের পক্ষে আইনবিরুদ্ধ। ৮ ঘণ্টা কাজের মধ্যে আবার আধঘণ্টা করিয়া ছুটি দিতে হয়। সন্তান জন্মিবার ছয় সপ্তাহ পূর্ব্ব এবং পর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা পূর্ণ বেতনে ছুটি পায় এবং ছয় সপ্তাহ পরে কাজে যোগ দিলে কোম্পানীকে ছয় মাস পর্য্যন্ত দিনে দুইবার শিশুকে স্তন্য পান করাইবার জন্য মাতাকে আধ ঘণ্টা করিয়া ছুটি দিতে হয়। সন্তান প্রসবের জন্য মাতার যদি কোন রোগ দেখা দেয় তবে পরেও কোম্পানী সেই কর্ম্মিনীর সমস্ত অনুপস্থিতি কালের জন্য মাহিনা দিতে বাধ্য। সমস্ত স্ত্রীলোক কর্ম্মীকেই জীবনবীমা করিতে হয় এবং সেই জীবনবীমার অর্দ্ধেক প্রিমিয়াম মনিবকে দিতে হয়; বাকি অর্দ্ধেক শ্রমিক নিজে দেয়।

পারিবারিক বৃত্তির যে সব আইন কানুন আছে তাহার বিধি অনুযায়ী জীবনবীমা হইয়াছে এমন কোন স্ত্রীলোকের মেয়ে, সৎমেয়ে, পালিতা মেয়ে সকলেই সন্তান জন্মিবার কালের জন্য বৃত্তি পাইয়া থাকে—অবশ্য যদি তাহারা পৃথক ভাবে নিজেদের জীবনবীমা না করিয়া থাকিয়া থাকে। ইনকাম ট্যাক্সের আইন ও শিশু এবং মাতার স্বার্থকে একেবারে উপেক্ষা করে নাই, যে সব



কাইজার ভিক্টোরিয়া হাউসে শিশু-মঙ্গল কেন্দ্র, শার্লোটেনবুর্গ

পরিবার অত্যন্ত ভারগ্রস্ত তাহারা কতকটা ইনকাম ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পায়, কিন্তু যাহারা অবিবাহিত থাকে তাহাদের ততটা অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হয়।

শিশুমঙ্গল এবং মাতৃমঙ্গল কাজ সকল জায়গায়ই যে পৃথকভাবে চলিতেছে তাহা নয়; পরস্পরের মধ্যে সংযোগ থাকাতে অনেক মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান শিশুরও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। অবশ্য কতকগুলি বিশেষ ভাবে শিশুর মঙ্গল কাজেই নিযুক্ত আছে। শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কাজ তিন রকমের—শিশুর সম্বন্ধে শিক্ষা এবং উপদেশ বিস্তার করা, টাকা পয়সা কিংবা জিনিষপত্র দিয়া শিশুর অভিভাবককে শিশুর লালন পালনের জন্য সাহায্য করা এবং শিশুকে অবিচারের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আইন আদালতের সাহায্য দেওয়া; প্রয়োজন হইলে সে কাজ চালান। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই আশ্রমগুলি কেমন দ্রুত বাড়িয়া উঠিয়াছে নীচের অঙ্কগুলি তাহারই পরিচয় দেয়—

খ্রীষ্টাব্দ		আশ্রমের সংখ্যা
১৯০০	মোট	৩

১৯০১—১৯১০		৩৫৪
১৯১১—১৯১২		২৬৪
১৯১৩—১৯১৪		২২১
১৯১৫—১৯১৫		২৫৪
১৯১৭—১৯১৬		১০২৪
১৯১৯—১৯২০		১৬৪৪
১৯২১—১৯২২		৭২৭
১৯২৩	মোট	৪৪৯১

মাতৃমঙ্গল আশ্রমের মত এই-সব আশ্রমেও কোন চিকিৎসার ভার লওয়া হয় না; :কেবলমাত্র শিশুকে পরীক্ষা .করিয়া সেই পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই আশ্রমগুলি অতি যত্নে এবং যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত শিশুর মাতাকে পরীক্ষাদি করিয়া থাকে। কোন পিঠচাপড়ান ভাব নাই বলিয়াই ইহারা নিজেদের কাজে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কোন প্রকার ভুলচুকের জন্য মাতাদের সমালোচনা কিংবা তিরস্কার সহ্য করিতে হয় না। ভুলটি শুধু ভাল কথায় বুঝাইয়া দিবার ফলেই সে ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হইতে দেখা যায় না।



বাড়িতে স্বাস্থ্য-পরিদর্শক

ষ্টিল্ ক্রিপেন (Still Krippen) নামে শিশুদের যে সব রাখিবার স্থান আছে, সে-গুলি শিশুমঙ্গল কাজের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। যে পিতামাতাকে কাজের দরুণ সমস্তদিনের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া থাকিতে হয় তাহারা ষ্টিল ক্রিপেন-এ সন্তানকে রাখিয়া যায়। দিনে কয়েক ঘণ্টার জন্য ষ্টিল্ ক্রিপেন শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করে। সন্তানকে উপযুক্তভাবে লালনপালন করিবার মত যাহাদের অবস্থা নয় অথবা যাহাদের বাড়ি শিশুর বাসের অনুপযুক্ত তাহারাও সন্তানকে ষ্টিল্ ক্রিপেন্-এ রাখিতে পারে।

জননী-আবাস, শিশুমঙ্গল আশ্রম এবং শিশু হাসপাতাল এই তিন স্থানেই শিশুকে রাখা এবং চিকিৎসা করা চলে। বোর্ডিংএ সাধারণতঃ শিশুরা পিতামাতার অভাব অনুভব করে; এমন জায়গায় শিশুকে রাখা আজকাল সকলেই অননুমোদিত মনে করেন। সেই অভাব পূরণ করা যায় পালক পিতামাতার দ্বারা। কোন পালক পিতামাতার সন্ধান পাওয়া গেলেই শিশুকে বোর্ডিং হইতে পালক পিতামাতার বাড়িতে লইয়া আসা হয়। বাড়ির অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য কিংবা বাড়িতে কোন সংক্রামক রোগ থাকার জন্য অথবা মাতাপিতার অতিরিক্ত পান দোষ থাকার জন্য ও যখন শিশুকে বাড়ি হইতে সরাইয়া লওয়া হয় তখনও যাহাতে শিশু পিতা মাতার সঙ্গলাভ করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়।

কোলের শিশুদের যেমন পরীক্ষাকেন্দ্র আছে স্কুলে যাইবার পূর্ব্বের বয়সের অর্থাৎ তিন হইতে ছয় বছর বয়সের শিশুদের জন্যও তেমনি কতকগুলি পরীক্ষা-কেন্দ্র আছে। তবে দুই-এর দৃষ্টি থাকে দুই দিকে। স্তন্যপুষ্ট কোলের শিশুদের আহারের রীতিনীতির দিকে বেশী নজর রাখা দরকার, কিন্তু বড়দের গলার নালীর অসুখ এবং রিকেট প্রভৃতি রোগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। আবার ইহাদের মনের দিকটাও ভুলিলে চলে না; কারণ মনের প্রভাবেই ইহাদের মধ্যে অনেক সময় বিছানা অপরিচ্ছন্ন করার মত কতকগুলি খারাপ অভ্যাস দেখা দেয় অথবা কোনো কোনো মানসিক অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়। এই সব প্রতিষ্ঠানে পাঠাইবার জন্য পিতামাতার উপর কোনো জোর-জবরদস্তি করিতে হয় না, তাঁহারা স্বেচ্ছায় সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাহাকে আশ্রমে পাঠাইয়া দেন। আশ্রম হইতে নার্সেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সেখানকার অবস্থা শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন প্রকারে হানিকর কিনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। এই পর্য্যবেক্ষণের মূল্য যথেষ্ট,



মহিলা-কর্ত্রীকে শিশু অভিবাদন করিতেছে
কিণ্ডারক্লিনিক্—ত্যুবিঙ্গেন

কেন-না নার্সদের বিচারের উপর নির্ভর করিয়াই শিশুকে বাড়ীতে রাখা হইবে, না আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে স্থির করা হয়। আশ্রমগুলি দুই রকমের—



স্বাবিং হাসপাতালে শিশুরা 'সান্-বাথ' লইতেছে। ম্যুনিক্

"রেসিডেনসিয়েল" এবং "নন্-রেসিডেনসিয়েল"। ইহাদের কাজ বহুবিধ। নীচে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

১। তিন হইতে ছয় বছর বয়সের শিশুর জন্য কিণ্ডারগার্টেন তৈরি করা।

যে সব বালকাশ্রম বর্ত্তমান তাহাদের উন্নতি করা।

২। সে সব বালক-বালিকা বয়সের তুলনায় মানসিক পরিণতিতে পিছনে পড়িয়া আছে তাহাদের জন্য "স্কুল কিণ্ডারগার্টেন" তৈরি করা।

৪। জনসাধারণের মধ্যে শিশুদের সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার করা।

৫। কিণ্ডারগার্টেন-এর জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী তৈরি করা।

রেসিডেন্‌সিয়েল আশ্রমগুলি অতি সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গায় অবস্থিত। 'হুয়বার্গ' নামে একটি জায়গায় যে আশ্রমটি আছে তাহাকে এই ধরণের আশ্রমের আদর্শস্থল বলা যাইতে পারে। এই-সব প্রতিষ্ঠান খুব গভর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া গিয়াছে। শিশুদের শিক্ষা লাভ করিবার অধিকারকে কার্য্যকরী করা হইয়াছে দুইটি উপায়ে—চৌদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা বাধ্যবাধক করিয়া এবং ১৪ বছরের কম বয়সের বালক-বালিকাকে কোন ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত করা শাস্তিযোগ্য করিয়া। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে যে আইন আছে তাহারও মূলে রহিয়াছে সমস্ত জাতির কল্যাণকামনা। সেই দেশে সকলেই টীকা লইতে বাধ্য; কোথাও কোনো সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে তাহার প্রসারের পথ সেখানে খুব ভাল করিয়াই বন্ধ করা চলে; বিকলাঙ্গ এবং মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের রক্ষণাবেক্ষণের



পেস্তালোৎসি আশ্রমে শিশুদের গৃহস্থালী। বার্লিন

ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া এ-গুলিতে খুব বেশী দিন বালক-বালিকাদের রাখা নিয়ম নয়। আবার বেশী দিন বাড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কতকগুলি শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতার লক্ষণও দেখা দেয়।

জার্ম্মেনীতে শিশুর হিতের জন্য যে সব আইন-কানুন আছে সেগুলি চার ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি আইন রাষ্ট্রের উপর শিশুর কি দাবি তাহাই স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আইন শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে; তৃতীয় দফা আইনগুলি শিশুর স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য প্রয়োজন, আর চতুর্থভাগে শিশুর সকল রকম মঙ্গলকাজের জন্য অর্থের ব্যবস্থা আছে। শিশুমঙ্গলের যা-কিছু আইন সকলেরই গোড়াপত্তন হইয়াছে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মানীর রিপাব্লিক রাষ্ট্রতন্ত্রের শাসন বিধির মধ্যেই। তখন হইতেই মাতা, শিশু, বালক-বালিকা এবং যুদ্ধে বিকলাঙ্গদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গভর্ণমেণ্ট নিজের হাতে লইয়া একদল চিররোগীর জন্ম হইতে জাতিকে রক্ষা করিয়াছে। শিশু এবং অপরিণত বয়স্কদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক মঙ্গল বিধানের জন্য যা-কিছু অর্থ প্রয়োজন সবই গভর্ণমেণ্ট সরবরাহ করে। শিশুদের মঙ্গলচিন্তা সে দেশে কত প্রবল, তার আর একটি প্রমাণ এই যে, প্রতি



পেস্তালোৎসি-ফ্রেবেল আশ্রমে শিশুদের অধ্যয়ন। বার্লিন

শিশুর জীবন স্কুলে, খেলায়, ব্যায়ামে অথবা পিক্‌নিক প্রভৃতি আমোদে-প্রমোদে, কোনো দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইন্‌সিওর করা আছে। এমন কি স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য যে শিশুরা ছুটিতে বেড়াইতে যায় তার জন্যও তাহাদের জীবন বীমা করা থাকে।

স্বাভাবিক এবং সুস্থ শিশুদের জন্য যেমন স্কুল আছে তেমন বয়সের অনুপাতে অপরিণত অন্ধ, বোবা প্রভৃতির জন্যও পৃথক স্কুল আছে। অপরিণতদের শিক্ষার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে, তার নাম 'মান-হাইম' পদ্ধতি। এই পদ্ধতির গোড়ার কথা হইল—প্রত্যেককে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে যাহা প্রাপ্য তাহাই দেওয়া, সকলকে সমান অধিকার দেওয়া নয়। এই পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া যে সব স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সব স্কুলের ক্লাসের নানা রকম পর্য্যায় আছে, যেমন—

১। স্বাভাবিক শিশুদের জন্য ৮টি ক্লাস

২। অপরিণত শিশুদের জন্য ৬টি কিংবা ৭টি প্রাথমিক ক্লাস

৩। তার চেয়ে বেশী অপরিণতদের জন্য আরও ৪টি অতিরিক্ত ক্লাস

৪। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বালক-বালিকাদের জন্য সাধারণ স্কুলের পঞ্চম বর্ষ হইতে সুরু করিয়া ৪টি শ্রেণী। এই ৮টি শ্রেণীর মধ্যে আবার উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম কিম্বা ৮ম শ্রেণীতে চলিয়া যাইবার সুযোগ দিবার জন্য মধ্যে দুইটি ক্লাস।

৫। কালা কিন্তু অন্য সব রকমে সুস্থ ছেলেদের জন্য ৮টি ক্লাস

৬। অপরিণদের জন্য 'কিণ্ডারগার্টেন' স্কুল।

অর্দ্ধকালা এবং ক্ষীণদৃষ্টি ছেলেদের জন্যও স্বতন্ত্র স্কুল আছে। যে-সকল শিশু স্কুলে যাইবার শক্তি রহিত তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় বাড়ি বাড়ি শিক্ষক পাঠাইয়া, এমন কি হাসপাতালে শিক্ষা দিতেও সে-দেশে কসুর করা হয় না। ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিকে স্কুলে খুব কড়া নজর থাকে। নিয়মিত ভাবে স্কুলে ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং সে পরীক্ষা কেবল সাধারণ সুস্থতার পরীক্ষাতেই আবদ্ধ থাকে না; চোখ, কাণ, দাঁত প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃথক ভাবে পরীক্ষা হয়; মানসিক সুস্থতাও সে পরীক্ষা হইতে বাদ পড়ে না। ছেলেদের খাদ্যের দিকটাও স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষই দেখেন। নামমাত্র মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য স্কুল হইতে সরবরাহ করা হয়।

বনবিদ্যালয় জার্ম্মেনীর আর একটি বিশিষ্ট ধরণের স্কুল। বহির্জ্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচয় করিবার সুযোগ দেওয়াই এই স্কুলগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যোন্নতির দিক হইতেও ইহাদের যোগ্যতা কাহারও অপেক্ষা কম নয়, কারণ সাধারণতঃ রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর জায়গাতেই এই স্কুলগুলি অবস্থিত থাকে।

আর একটি মনোরম জিনিষের আজকাল চলন দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা ছেলে-মেয়েদের দেশে দেশে ভ্রমণ। জার্ম্মানীর বিখ্যাত ব্ল্যাক ফরেষ্টে, ব্যাভেরিয়া, এবং অষ্ট্রীয়ার নিবিড় জঙ্গলে, টিরল এবং সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস্‌ পর্ব্বতের মধ্যে পিঠে বোঁচকা, কাঁধে ক্যামেরা, হাতে কম্পাস্‌ লইয়া ছেলেমেয়েদের পরম উৎসাহে ঘুরিয়া বেড়ানোর দৃশ্য একবার দেখিলে ভোলা যায় না। *

---

* জার্ম্মেনীর নানা শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান দেখিতে দিবার জন্য লেখক এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই প্রবন্ধের সহিত সে-সকল চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে সে-গুলির জন্যও তিনি বার্লিনের ডয়চে আর্কিভ ফ্যুর ইয়ুগেণ্ডভোলফার্ট, মুনিকের ডয়চে আকাডেমী, শার্লোটেনবুর্গের কাইজারিন ভিক্টোরিয়া হাউস ও টিউবিঙ্গেনের কিণ্ডারক্লিনিকের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়া শ্রীমতী অমলিনী—
প্রথম বার্ষিক জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ

তোমারে জননী ধরা
দিল রূপে রসে ভরা
প্রাণের প্রথম পাত্রখানি,
তাই নিয়ে তোলাপাড়া,
ফেলাছড়া নাড়াচাড়া,
অর্থ তার কিছুই না জানি!
কোন্ মহা রঙ্গশালে
নৃত্য চলে তালে তালে,
ছন্দ তারি লাগে রক্তে তব।
অকারণ কলরোলে
তাই তব অঙ্গ দোলে,
ভঙ্গী তার নিত্য নব নব।
চিন্তা-আবরণহীন
নগ্নচিত্ত সারাদিন
লুটাইছে বিশ্বের প্রাঙ্গণে।
ভাষাহীন ইসারায়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়
যাহা কিছু দেখে আর শোনে।
অস্ফুট ভাবনা যত
অশোক পাতার মত
কেবলি আলোয় ঝিলিমিলি।
কি হাসি বাতাসে ভেসে
তোমারে লাগিছে এসে,
হাসি বেজে ওঠে খিলিখিলি।
গ্রহ তারা শশি রবি
সমুখে ধরেছে ছবি
আপন বিপুল পরিচয়।
কচি কচি দুই হাতে
খেলিছ তাহারি সাথে
নাই প্রশ্ন, নাই কোনো ভয়।

তুমি সর্ব্ব দেহে মনে
ভরি লহ প্রতিক্ষণে
যে সহজ আনন্দের রস,
যাহা তুমি অনায়াসে
ছড়াইছ চারি পাশে
পুলকিত দরশ পরশ,
আমি কবি তারি লাগি'
আপনার মনে জাগি,
বসে থাকি জানালার ধারে।
অমরার দূতীগুলি
অলক্ষ্য দুয়ার খুলি
আসে যায় আকাশের পারে।
দিগন্তে নীলিম ছায়া
রচে দুরান্তের মায়া,
বাজে সেথা কি অশ্রুত বেণু।
মধ্যদিন তন্দ্রাতুর
শুনিছে রৌদ্রের সুর,
মাঠে শুয়ে আছে ক্লান্ত ধেনু।
শুধু চোখে-দেখা দিয়ে
দেহ মোর পায় কি এ!
মন মোর বোবা হয়ে থাকে।
সব আছে আমি আছি
এই দুইয়ে কাছাকাছি
আমার সকল-কিছু ঢাকে।
যে-আশ্বাসে মর্ত্ত্যভূমি
হে শিশু, জাগাও তুমি,
যে নির্ম্মল যে সহজ প্রাণে,
কবির জীবনে তাই
যেন বাজাইয়া যাই
তারি বাণী মোর যত গানে।

ক্লান্তিহীন নব আশা
সেই তো শিশুর ভাষা,
সেই ভাষা প্রাণ-দেবতার,
জরার জড়ত্ব ত্যেজে
নব নব জন্মে সে যে
নব প্রাণ পায় বারম্বার।
নৈরাশ্যের কুহেলিকা
উষার আলোক টীকা
ক্ষণে ক্ষণে মুছে দিতে চায়,
বাধার পশ্চাতে কবি
দেখে চিরন্তন রবি
সেই দেখা শিশু-চক্ষে ভায়।
শিশুর সম্পদ বয়ে
এসেছে এ লোকালয়ে
সে সম্পদ থাক্ অমলিনা।
যে বিশ্বাস দ্বিধাহীন
তারি সুরে চিরদিন
বাজে যেন জীবনের বীণা।

দার্জ্জিলিং
৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

দীপান্বিতায় জয়পুরের আভাস

শ্রীশান্তা দেবী

অপরিচয়ের অঞ্জন যতদিন চোখে থাকে, ততদিন পৃথিবীতে কল্পনার খোরাক খুব মিলে। কিন্তু পরিচয়ের পর দুনিয়াটা বড় বেশী সসীম হইয়া দেখা দেয়। পৃথিবীতে সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যের অভাব নাই, কিন্তু আমরা মনে তাহা যত বেশী করিয়া দেখি, চোখে ততখানি দেখা যায় না। ভারতবর্ষ একটা মহাদেশের মত বিরাট দেশ, এখানে মানুষের ভাষা, পরিচ্ছদ, চেহারা, খাদ্য, বাসস্থান কত বিচিত্র রকমের। কিন্তু তবু ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে যখন এই বিচিত্রতার সংস্পর্শে আসি তখন মনে হয় ধরণীর মাটির কোল সর্ব্বত্রই মা'র কোলের মতই পরিচিত। নূতনত্ব ও বিচিত্রতা চোখে লাগে বটে, কিন্তু তবু যেন মনে হয় এ সবই কবে কোথায় দেখিয়াছি। আধুনিক যুগে ছায়াচিত্র ও মুদ্রাযন্ত্র আমাদের সমস্ত জগতের সঙ্গেই পরিচয়-সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে, ইহা নূতন নূতন দেশে গিয়া অনেক ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। তাহার উপর বাল্যকালে প্রয়াগ তীর্থে বর্ত্তমানে এত বড় একটা শহরে থাকাতে মনুষ্য গোষ্ঠীর সকলের সঙ্গেই যেন আত্মীয়তা হইয়া গিয়াছে। তীর্থস্থানে যায় অনেকে, ব্যবসায় বাণিজ্য ও রাজনীতির কেন্দ্রভূমিতেও আসে অনেকে। এতদিক্ দিয়া পরিচয় থাকিলেও কিন্তু ভারতের নানাস্থান, বিশেষ করিয়া রাজপুতানা নয়ন-মনকে নব নব আনন্দ পরিবেশন করিতে কার্পণ্য করে না।

পূজার ভ্রমণে বঙ্গবাসীদের বেশীর ভাগের পশ্চিম দিকে সীমারেখা পড়ে মোগল সরাইয়ের পর কাশীতে। হাওড়ায় পঞ্জাব মেলের গাড়ীতে এক তিল ঠাঁই নাই দেখিলাম; কিন্তু পঞ্জাব আসিবার বহুপূর্ব্বেই গাড়ী একেবারে খালি হইয়া গেল। ষ্টেশনে ষ্টেশনে দুটি চারিটি করিয়া ভার লাঘব করিতে করিতে মোগল সরাইয়ে আসিয়া বাঙালী, বেহারী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, ফিরিঙ্গি, গোরা সব কটিকে ট্রেন যেন উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তারপর পথে পথে নূতন দুটি চারিটি কুড়াইয়া হাল্কা চালে দৌড়।

এলাহাবাদের পর হইতে আর একটি মস্ত পট-

পরিবর্ত্তন। গাড়ীতে ধূলার চোটে বসা যায় না। দুই ষ্টেশন না যাইতেই লোক ডাকিয়া কামরা ঝাঁট দেওয়াইতে হয়। আরও নূতনত্বের যে অভাব আছে তাহা নয়, তবে তাহাদের দিকে মন বেশী আকৃষ্ট হইতে দিলে রাজপুতানা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভ্রমণ-কাহিনীতে মানুষের অরুচি হইয়া যাইবে।

কানপুর আলিগড় ইত্যাদি পার হইয়া ক্রমে হিন্দু-আবেষ্টন হইতে মুসলমান-আবেষ্টনের ভিতর দিয়া আমরা দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলাম। নানা ভাষা, নানা পরিচ্ছদ, নানা যানবাহনের এমন ছড়াছড়ি অল্প দেশেই দেখা যায়। দিল্লী শহরও একটা নয় সাতটা; এখন আবার তাহাকে দশটাও বলা চলে। সেগুলি আবার নানা কালে বিভক্ত। অতি প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে হিন্দু, পাঠান, মোগল, কোম্পানীর, মহারাণীর এবং আধুনিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা সময়ের নানা ফ্যাশানের ছাপই দিল্লীর এক দিক হইতে আর এক দিকে দেখা যায়। কলিকাতার পর এই প্রথম এত রকম পোষাক এক জায়গায় চোখে পড়ে। রাজপুতানীর বিপুল ঘাঘরা, পঞ্জাব-দুহিতার ঘোরানো পায়জামা, হিন্দুস্থানীর বাঁ-কাধে শাড়ী, বঙ্গ-ললনার ঢাকাই শাড়ীর উপর বিলাতী ওভার কোট এবং খাস মেমসাহেবের ফ্রক পথে ও ষ্টেশনে একবার দশ মিনিট চোখ বুলাইলেই দেখা যায়। কলিকাতায় একসঙ্গে সব সময় এত রকম রূপ দেখা যায় না। শুধু চোখে দেখিতে বেশ লাগে বটে; কিন্তু বিপদ হয় তখন যখন একসঙ্গে পঞ্জাবী, কাশ্মীরী, সুইস্, ইংলিশ ইত্যাদি দশ-পনের রকম হোটেলের আড়কাঠিরা আসিয়া কথা ও গায়ের জোরে মানুষকে তাহাদের হোটেলে টানিয়া লইতে চায়।

ইহাদেরই একজনের হাতে আটক্ পড়িয়া একটা রাত হোটেলে কাটাইয়া আমরা পরদিন আদত রাজপুতানার গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম।

দিল্লীর পর প্রকৃতিদেবীর রূপ বদ্‌লাইয়া গেল। এতক্ষণ ছিল বড় বড় মহীরুহের রাজ্য। ঘন সবুজ মাথা তুলিয়া পথের দুই ধারে নিম, শিশু ও আম গাছ পথিকের শ্রান্তি দূর করিতেছিল। দারুণ দ্বিপ্রহরে ট্রেনের ভিতর হইতেও এই গাছগুলির দিকে তাকাইলে চোখ জুড়াইয়া যায়। কিন্তু রাজপুতানার পথ ধরিতেই প্রকৃতির শ্যামলতা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। রেল লাইনের দুই ধারে ছোট ছোট বাবলা গাছ, তাহাতে পাতার চেয়ে কাঁটা বেশী; আর আছে শর ও কাশের বন। ঘাসের রংও সবুজ নয়, যেন খর রৌদ্রে সমস্ত ঝলসিয়া গিয়াছে। শত মাইল পথ চলিয়া গেলেও কোথাও নদী খাল কি বিলের জলধারা অথবা কাদামাটি চোখে পড়ে না।

এখান হইতেই জমি খুব উঁচু, এক একটা জায়গায় পাহাড়ের মত দেখিতে। অনেক মাইল দূরে দূরে ছোটছোট কেল্লার মত উঁচু পাঁচিল-ঘেরাও করা বাড়ি; বাংলা ও বেহারের খোলামেলা সাদাসিধা বাড়ির পর এগুলি চোখে খুব নূতন ঠেকে। বাড়িগুলি সচরাচর সবচেয়ে উঁচু জমির উপর, সেখান হইতে চারিপাশ বেশ চোখে পড়ে। একে ত এখানে শ্যামলতার অভাব, তারপর আবার বিষাদ ঘনাইয়া তুলিবার জন্য আছে মরুপ্রায় নির্জ্জন মাঠের মাঝে মাঝে বহু পুরাতন ভাঙা সমাধি। সুদীর্ঘ পথ জুড়িয়া পুরানো মসজিদ বাড়ি ঘর ফটক ইত্যাদির ধ্বংসস্তূপ এই দেশটার প্রাচীন ইতিহাস সারাক্ষণ মনে জাগাইয়া রাখে। আমাদের বাংলা দেশের সুজল সুফল শস্যশ্যামল রূপের আড়ালে তাহার সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সে চিরনবীন।

মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিস না থাকিলে সেখানে মানুষের বসবাস চলে না। দিল্লীর পরে সমাধি-শ্মশান ও ধ্বংসের রাজ্য দেখিয়া যখন মনের ভিতরটা শুকাইয়া উঠে তখন পতৌদি রোড্ ষ্টেশনের কাছে হঠাৎ বড় বড় বুনো ঝাউগাছ ও বড় বাবলার বন এবং তারপর খানিকটা সবুজ শস্যক্ষেত্র দেখিয়া শ্যামলতায় চোখ দুটি একটু জুড়ায়। মানুষের বসবাস থাকিলেই যানবাহনের প্রয়োজন হয়। দেখিলাম সারি সারি উট লাইন বাঁধিয়া একটি চালকের পিছনে তরঙ্গমালার মত চলিয়াছে। ক্ষেতে মাঠে ও ষ্টেশনে সর্ব্বত্র ওড়না উড়াইয়া মেয়েরা ঘুরিতেছে। তাহাদের অধোবাস ঘোরানো পায়জামা ও মস্ত রঙীন ঘাঘরা। ঘাঘরাগুলির ঘের এত বেশী যে বয়স্কা কাজের মেয়েরা তাড়াতাড়ি হাঁটিবার সুবিধার জন্য অনেকে

সামনের দিকে গুটাইয়া চলে। না হইলে দোলায়মান ঘাঘরার নৃত্যের ভিতর লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলা মোটের মাথায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ছবিতে রাজপুত ছাঁদের পাথরের বাড়ি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু প্রথম চোখে পড়িল রেওয়ারি জংশনের ষ্টেশনে। ডালিমের দানার মত লাল রঙের পাথরের সঙ্গে বাদামী পাথর মিলাইয়া রাজপুত ধরণে বাড়িটি গাঁথা। হয় শাদা নয় গেরুয়া চুনকামে অভ্যস্ত আমাদের চোখে পাথরের বন্ধুর গাত্রের এই স্বভাবজ রং দুটি বড় সুন্দর লাগিল। বাংলা দেশে একটা অমন বাড়ি থাকিলে লোকে দাঁড়াইয়া দেখিত ! সে-দেশে ইহা অতি সাধারণ।

রাজপুতানা হিন্দুদের রাজ্য অথচ দিল্লীর কাছাকাছি সর্ব্বত্রই মুসলমান অধিবাসী খুব বেশী। তাই এই সব ষ্টেশন হইতেই হিন্দু ও মুসলমানের মেশামেশি খুব চোখে পড়ে। রাজপুতানায় প্রকৃতির রঙের খেলা প্রায় নাই বলিয়াই মানুষের পোষাকে রঙের ইন্দ্রধনু এইখান হইতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদেরই পোষাকের পারিপাট্য বেশী। সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যকর লাগে এখানে বাঙালীর সাজ-পোষাক। আমাদের গাড়ীতে একদিকে গোঁড়া বাঙালী ব্রাহ্মণ আর একদিকে খাঁটি তুর্কী মুসলমান মৌলবী এবং রাজপুত মুসলমান। মৌলবীটির দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণে দুগ্ধ-শুভ্র লুঙ্গী, পাঞ্জাবী, পাতলা উড়ুনি ও সাদা ফুলকাটা টুপি ভারি চমৎকার মানাইয়াছিল। তাঁহার কালো দাড়ি ও চুল ছাড়া আর কোথাও বর্ণ লেশ নাই। হঠাৎ দেখিলে কুড়ি বৎসর আগেকার রবীন্দ্রনাথ বলিয়া ভ্রম হয়। অন্য মুসলমানটির যোধপুরী সূক্ষ্ম ছিটের সুন্দর পাগড়ী ও ঘন সবুজ রাজপুত পোষাক তাহার উন্নত শরীরে মন্দ দেখাইতেছিল না। তাহারই পাশে খর্ব্বাকৃতি দুটি বাঙালীর কালো বিলাতী কোট ও হিন্দু বঙ্গ-ললনার মলিন তসরের শাড়ী যেন লজ্জায় ম্লান হইয়াছিল। একই ছোট কামরার ভিতর সকলের স্নান আহার পূজা নমাজ সবই চলিয়াছিল। হিন্দুর ভাতের হাঁড়ি ও মুসলমানের মাংসের কাবাব বেঞ্চির তলায় গায়ে গায়ে ঠেলিয়া রাখা হইল, জলের ঘটি ও বদনার মধ্যে এক ইঞ্চি ফাঁকও সব সময় থাকিতেছিল না; তবু জাতিধর্ম্ম কাহারও যায় না। অথচ এদিকে সর্ব্বত্র দেখিলাম প্রতি ষ্টেশনে হিন্দুর জল ও মুসলমানের জল মার্কামারা আলাদা কুঠুরীতে রহিয়াছে। গাড়ী হইতেই নাম দেখা যায়।

আমাদের সহযাত্রী বাঙালীরা পাঁচটি শিশু সন্তান লইয়া দ্বারকায় তীর্থ করিতে যাইতেছিলেন। ছোট মেয়েটির বয়স মাত্র এক বৎসর। ষ্টেশনে সব জায়গায় তাহার দুধও মেলে না। রাজপুতানার পথে রেল ষ্টেশনে খাদ্য পাওয়াও বিশেষ সহজ নয়। দেশে আমরা যা খাই, যাওয়া-আসার পথে একদিনও সে রকম কিছু পাই নাই। তবে চা জিনিষটা সর্ব্বত্রই জুটিয়াছে, ইহার কোনো দেশকাল জাতিবিচার নাই দেখিলাম।

দেখিয়া আশ্চর্য্য লাগিল যে, এ দেশে সুবিস্তৃত নদীও আছে। কিন্তু জলহীন বিরাট নদীগর্ভে শুধু বালি ধূ ধূ করিতেছে। মাঝে মাঝে ছোট নদীও আছে, কিন্তু সবই জলহীন। এ দেশে সব চেয়ে প্রাচুর্য্য দেখি বালিরই। নদীগর্ভেও বালি, বিস্তীর্ণ মাঠেও বালি। রেলের গাড়ীতে কাচ, খড়খড়ি, জাল তিনপ্রস্থ জানালা-আবরণী ভেদ করিয়া ভিতরে এত বালি ঢুকিতেছে যে পাঁচ মিনিট একটা জায়গা পরিষ্কার থাকে না। অনেক জায়গায় দেখিলাম ষ্টেশনে শুধু বালি দিয়া বাসন মাজিয়া ঝাড়িয়া আনিতেছে।

ছোট ছোট গ্রাম অনেক দূরে দূরে চোখে পড়ে। উঁচু একটা ঢিপির মত জায়গা, তাহার সব চেয়ে উপরে ঠিক মাঝখানে খানিক কেল্লা ধরণের একটা পাকা বড় বাড়ি, তাহারই চারিপাশে মাটির ছোট ছোট ঘর; বোধ হয় জমিদার ও প্রজাদের এমনি করিয়া একত্রে জড় করা হইয়াছে। পাহাড়ে ধরণের জমিতে এই ঢিপিগুলি বেশীর ভাগ প্রস্তরবহুল। এখানে কিন্তু উঁচু টিলার উপর শক্ত মাটির ছাদ দেওয়া বাড়িও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

খইরথাল ষ্টেশন পাহাড়ের প্রায় গায়ে। এখান হইতে সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। ঘাসের রং ত এ দেশে খড়েরই মত, মাঝে মাঝে তাহাও

জ্বলিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে। মনে হয় ইন্দ্রদেব এ দেশের জলপিপাসার কথা একেবারেই ভুলিয়া আছেন। তপস্বিনী ধরণী সূর্য্যতাপে নিরাভরণা বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। পত্র পুষ্প শস্য কোনো অলঙ্কার তাঁর অঙ্গে নাই। শূন্য মাঠে জনপ্রাণী নাই। থাকিয়া থাকিয়া যেন জীবনের পরিচয় দিবার জন্য মাঠেরই মাঝখানে দল বাঁধিয়া হরিণ দেখা দিতেছে। আবার সেই বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন শূন্যতা। চোখ যখন রঙের পিপাসায় আকুল হইয়া উঠে, তখন দেখা যায় হয়ত দিগন্তজোড়া রৌদ্রদগ্ধ মাঠের ভিতর নীলকণ্ঠ ময়ূর ময়ূরী।

আলোয়ারের কাছে পর্ব্বতশ্রেণীর প্রতি চূড়ায় এক একটি স্তম্ভ, যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিলে অবজ্ঞাভরে একবার চাহিয়া দেখে, কোন্‌টা কি কিছুই বলে না। এইখানেই রাজগড় ষ্টেশনে অকস্মাৎ যেন প্রকৃতির শ্যামরূপ চোখ জুড়াইয়া দিল। বর্ণহীন প্রান্তরের উপর অন্তহীন রৌদ্রের স্রোত দেখিয়া যখন চক্ষু শ্রান্তিতে ঢুলিয়া আসিতেছিল, তখন যেন কে চক্ষে মায়া-অঞ্জন বুলাইয়া দিল। একেবারে বেহারের ঘন পত্রবহুল শ্যাম মহীরুহ সারি সারি দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তাহারই পাশে পাহাড়ের উপর মস্ত একটি পুরানো কেল্লা। একজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই কি রাজগড় কেল্লা? ভদ্রলোক ভ্রূক্ষেপও করিল না। তাহাদের নিত্য-দেখা একটা পাথরের বাড়ি যে মানুষের কৌতূহল জাগাইতে পারে ইহা তাহাদের মনে আসে না। ষ্টেশন শেষ হইতে না হইতে আবার সেই ধূ ধূ মাঠ ও কাঁটাবন। দুই একটি বড় গাছ তবু এখনও দেখা যায়, তাহারই তলায় রাজপুতানী একটু দাঁড়াইয়া ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া লইতেছে, অথবা তাহার গরু-মহিষকে একটু বিশ্রাম দিতেছে।

অবশ্য গরু মহিষ বেশী দেখা যায় না। যানবাহন বলিতে ত উট ও রোগা রোগা ঘোড়া। রাখালেরা শূন্যপ্রায় মাঠের কাঁটাবনে মাঝে মাঝে ছাগল চরাইতে আসে। গরু নিতান্তই বিরল। বাব্‌লা বনে কাঁটার ভিতর খাদ্য অন্বেষণ করিতে দুই-এক জায়গায় আপনমনে উট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ট্রেনের শব্দে তাহারা অষ্টাবক্র মুনির মত হেলিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া কোনো রকমে ছুটিতে চেষ্টা করে। সারি বাঁধিয়া যখন চালকের পিছনে ধীরে চলে ইহাদের ঐরূপেও একটা শ্রী ফুটিয়া ওঠে। কিন্তু শূন্য মাঠে সঙ্গীহীন ভীত উট বড় কুশ্রী দেখিতে লাগে। অত বড় শরীরে হাতীর মত গুরুগম্ভীর ভাব থাকিলে মানাইত। তাহার বদলে শীর্ণ হাড়-আল্‌গা ভীত ত্রস্ত মূর্ত্তি।

আমরা আশা করিয়াছিলাম রোদ থাকিতেই জয়পুর পৌছিব, পৌছিলামও তাই। কিন্তু সেখানে কাহাকেও চিনি না; ষ্টেশনের লগেজ-রুমে জিনিষ জমা দিতে, রাত্রে ওয়েটিং-রুমে থাকিবার অনুমতি লইতে এবং বেড়াইবার জন্য গাড়ী ঠিক করিতে সূর্য্য অস্ত গেলেন। সেদিন দীপান্বিতা। ভাবিলাম দিনের আলোয় জয়পুর ত অনেকেই দেখিয়াছে, আমরা রাজপুতানীর প্রদীপের আলোতেই ইহার রূপজ্যোতি দেখিয়া যাইব।

সূর্য্যের শেষ রশ্মি মিলাইতে মিলাইতে গোধূলির ম্লান আলোয় দেখিলাম, রাস্তার ওপারে পাথরের জালিকাটা ছাদে ও ছোট ছোট অলিন্দে লালকালো ছিটের চুনুরি ওড়না উড়াইয়া ঘাঘরা দোলাইয়া মেয়েরা প্রদীপ সাজাইতে সুরু করিয়া দিল। সেই অস্পষ্ট আলোয় আকাশের গায়ে তাহাদের কালো আঁচলের মৃদু দোলা ও অবনত দেহযষ্টির ধীর গতি অদ্ভুত রহস্যময় দেখাইতে-ছিল। মরু-প্রান্তর পার করিয়া কোন্ আলাদিনের দৈত্য যেন আমাদের উপকথার রূপময় রাজ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে।

দিল্লী হইতে জয়পুর পর্য্যন্ত পথটা যেন পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন দেশ। এখানে মোটর, ট্রাম, বাস, গাড়ী জুড়ি, হ্যাট, কোট, গাউন কিছুই চোখে পড়ে না। জোয়ারি কি ভুট্টার ক্ষেতে শুষ্ক খড়ের চূড়াকৃতি স্তূপের পাশে মাঝে মাঝে রাজপুত কৃষক-কন্যার কর্ম্মরতা মূর্ত্তি দেখা যায়। মনে পড়িয়া যায় বীর হাম্বিরের মাতার কথা। পাহাড়ের উপর কেল্লা ও স্তম্ভের ঘটা দেখিয়া কেবলই মনে হইতেছিল যেন রাজস্থানের চঞ্চলকুমারী দেবলদেবী পদ্মিনীদের যুগে ফিরিয়া আসিয়াছি।

জয়পুর আধুনিক শহর, কিন্তু তাহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাগুলির অনেকটা পুরাতন ছাঁদে গড়া। তাই

দীপান্বিতার আলোকমালায় আমাদের মনে প্রাচীনতার ছাপটা অটুট রহিল। দিনের আলোয় আধুনিকতা যেখানে উগ্র হইয়া উঠিতে পারিত সন্ধ্যায় তাহা অন্ধকারের আড়ালে চাপা পড়িয়া গেল।

এক টাকায় তিন-চার ঘণ্টার জন্য সুন্দর একটি জুড়ি ফীটন গাড়ী ভাড়া করিয়া জয়পুরের সুবিস্তীর্ণ পরিচ্ছন্ন সুন্দর রাজপথে আমরা আলো দেখিতে বাহির হইলাম। দোকান, বাজার, মন্দির, পুস্তকাগার, পুরাতন প্রাসাদ, সংস্কৃত কলেজ, নহরগড়—সব আলোয় আলো। হিন্দুরাজ্য বলিয়া সরকারী বাড়িঘর, ঘড়ির স্তম্ভ কোনো কিছুই আলোকসজ্জা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। ইহার উপর আবার সেইদিন জয়পুরের রাজকুমারের জন্মদিন-উৎসব। সুতরাং অমাবস্যার আকাশের নক্ষত্রমালাকে হার মানাইয়া প্রদীপমালায় রাজধানী আলোকিত করিবার ঘটা লাগিয়া গিয়াছিল। দুর্গাপূজায় বাংলা দেশে যেমন আনন্দ ও উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়, রাজপুতানায় তেমনি হয় দেওয়ালীর সময়। আজ কাহারও মুখ মলিন নয়, কাহারও কর্ম্মে ব্যস্ততা নাই, কোথাও দীনতা কি দারিদ্র্যের চিহ্ন নাই। প্রকৃতি রাজপুতানায় বর্ণহীন মরুভূমি, তাই মানুষ সেখানে বস্ত্রে, অলঙ্কারে, তৈজসপত্রে ঘরবাড়িতে রঙের হোরি খেলিয়াছে। এ দেশের মত রঙের ছড়াছড়ি পৃথিবীতে আর কোনো দেশে আছে কি-না জানি না। মেয়েদের এক একটা পোষাকেই সাত আটটি রঙের খেলা। ঘাঘরার রঙীন জমির উপর অন্য রঙের কাঠের ব্লকের ছিট, ওড়নায় উজ্জ্বল হলুদের উপর লাল চুনরী পাড় ও সেই রকম বুটি বুটি মধ্যচিত্র, অথবা কালোর উপর লাল ও হলুদ, কিংবা লালের উপর কালো ও হলুদ! গায়ের ছোট আঙ্গিয়াতে আর এক রং। এক একটি মানুষ যেন এক একটি সম্পূর্ণ চিত্র। মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ কিংবা বাংলা দেশেও রঙীন পোষাক আগাগোড়াই এক রঙের, বড় জোর অন্য রঙের পাড় একটা। কিন্তু এ দেশের বিশেষত্ব নানা রঙের ছিট বুটি ও তাহাদের অপূর্ব্ব মিশ্রণে। দীপালির আলোয় এমনি নূতন পোষাকে সাজিয়া যাহারা পথে পথে উৎসব করিয়া ফিরিতেছিল তাহাদের সামান্য কার্পাস বস্ত্র যেন মণিখচিত পট্টবস্ত্রের মত ঝলসিয়া উঠিতেছিল। এইসব পোষাকে কোথাও রেশম জরি কি চুম্‌কির চিহ্ন নাই, শুধু রঙের মণির গা হইতেই আলো ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল। কচিৎ সস্তা বিলাতী জরির চওড়া পাড় ঘাঘরার প্রান্তে দেখা যায়, কিন্তু এই বর্ণসুষমার পাশে সে চোখজ্বলা জরি চোখকে পীড়াই দেয়।

পুরুষের পাগড়ীতে এত রঙের খেলা ও বুটির বাহার কোনো দেশে নাই। ছিটের নক্সা ওড়নার চেয়ে পাগড়ীতেই বহু বিচিত্র রকমের।

মেয়েদের কাপড়ে নীল, আসমানি, ও সবুজ চোখেই পড়ে না, গোলাপী ও বেগুনি অতি সামান্য! ঘাঘরায় লাল ও খয়ের এবং ওড়নায় হলুদ, কাল, ও লাল খুব বেশী। ছিটের নক্সায় ময়ূরের পেখমের সকলের চেয়ে অধিক প্রভাব। এখানকার পিতলের বাসন প্রসিদ্ধ। তাহাতে ময়ূরের চিত্র ও ময়ূরের রঙের মীনার কাজে যে কত রকমারি করিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। মেয়েদের পোষাকের মতই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাসনের দোকান। "ভূনাগ রাজার রাণীর একশত বাঁদীর" মত মেয়েরা প্রায় সর্ব্বত্রই দল বাঁধিয়া চলিতেছিল। তাহাদের চলার ছন্দে যখন

"পায়ে পায়ে ঘাঘরা উঠে দুলে
ওড়না উড়ে দক্ষিণা বাতাসে,"

তখন মনে হয় যেন সুন্দরীদের চরণাঘাতে পথে সহস্র রঙের ফোয়ারা ছড়াইয়া পড়িতেছে। জয়পুরের পথে তিন ঘণ্টা ঘুরিয়া মানুষের মুখ একটাও মনে পড়ে না, কেবল মনে পড়ে প্রাসাদবহুল আলোকোজ্জ্বল রাজপথে চলচঞ্চলা রমণীদের ঘূর্ণ্যমান রঙীন ঘাঘরা ও দোলায়মান রঙীন ওড়না এবং পুরুষদের রঙীন সূক্ষ্ম উষ্ণীষ। বাজারে দোকানের মাথা হইতে ফুটপাথ পর্য্যন্ত পিতলের বিচিত্র বাসন স্তরে স্তরে সাজানো। তাহার গড়ন রং নক্সা মীনার কাজ অসংখ্য রকমের। পথের বাঁকে বাঁকে আনন্দের কোলাহল; আলোকে বর্ণে, ছন্দে গতিতে মানুষের প্রাণের প্রাচুর্য্য যেন উপচিয়া পড়িতেছে।

আমরা সকলের প্রথমে জয়পুরের উদ্যানে গেলাম। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে—ভিতরে প্রচুর আলো সর্ব্বত্র নাই, কাজেই ভাল করিয়া দেখা হইল

না। কিন্তু তবু মরুভূমির দেশে এত বড় বাগানে এত বড় বড় গাছ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাগানটি সযত্নে সুরক্ষিত। ইহারই ভিতর যাদুঘর। বাড়িটির সুন্দর রাজপুত গম্বুজ আধ-অন্ধকারেও চক্ষুকে তৃপ্তি দেয়। ইহার পাথরের জালি কাজ, নানা রঙের পালিশ করা পাথরের থাম, পাথরের প্রকাণ্ড চত্বর, পিতলের উঁচু নক্সা করা পেরেক বসান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের দরজা সব এইখানেরই কারিগরদের দুই-তিন পুরুষের কীর্ত্তি। সবগুলি দাঁড়াইয়া দেখিবার মত। সেদিন দেওয়ালির ছুটি, কাজেই ভিতরে ঢুকিতে পাইলাম না, চারিপাশের বারাণ্ডায় দেয়ালের গায়ে দময়ন্তী স্বয়ম্বর প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত মহাভারতের প্রাচীন ছবি পুরাতন ছাত্ররা বড় করিয়া আঁকিয়া রাখিয়াছে. তাহাই দেখিলাম। ছবি সবই প্রায় রাজপুত ছাঁদের। একটা কোণের বারান্দায় দেখিলাম ইটালীর খৃষ্টীয় ছবিও প্রকাণ্ড করিয়া দেয়ালে নকল করা।

যাদুঘর হইতে বাহির হইয়া দেখি দূরে নহরগড়ে আলোর মালা হাতীর পিঠের মত আকারে জ্বলিতেছে। লাল পাথরে তৈয়ারী অতি বিরাট রথের মত পুরাতন রাজপ্রাসাদে ছোট ছোট দীপ সাজানো। কিন্তু সেখানে এত পায়রার বাসা যে, প্রাসাদের বিশেষ যত্ন নাই বোঝা গেল। একটি পুরাতন মন্দিরের ঢালু পথে সারি সারি আলো সাজানো; মন্দিরের সিঁড়ি নাই, এই ঢালু পথ বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। ইহারই ভিতর সংস্কৃত কলেজ ও কয়েক শত ছাত্রের বাসস্থান। লাইব্রেরী ভবনটিও অতি বৃহৎ।

এখানকার পথঘাট ভারি পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল; আমাদের ব্রিটিশ-রাজ্যের অনেক শহরেই এমন রাস্তা নাই। রাস্তার দুই ধারের দোকান বাজার হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানের গৃহ সবই প্রায় এক ধরণের। কলিকাতার মত প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের পাশেই খোলার বাড়ির বস্তি চোখে পড়িল না। সব বাড়িই দেখিতে প্রাসাদতুল্য। উৎসবের দিনে মানুষের সাজসজ্জাও সুন্দর; কাজেই একদিনের দেখায় মনে হয় যেন এদেশে দীন দরিদ্র কেহ নাই, সকলেই উপকথার রাজ্যের মত রাজপুত্র, কোটালের পুত্র ও সওদাগর-পুত্র এবং সকলেই সাত মহলা রাজপ্রাসাদে রাজবেশে বসিয়া অক্ষয় আনন্দ ভোগ করে। অবশ্য শহরের সব দিক আমরা দেখি নাই বলাই বাহুল্য। যাহা দেখিলাম তাহাতে সব বাড়ির মধ্যে (বোধ হয় আদালত-গৃহ) একটি বাড়ির বিলাতী স্থাপত্য চোখে বিসদৃশ লাগিল। আর সবই রাজপুত স্থাপত্য। তবে বাড়িগুলির গায়ে গোলাপী রং না দিয়া যদি পাথরের আসল রংটি রাখা হইত তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

এখানে শ্বেতপাথর পিতল, মিনা ও হাতীর দাঁতের কাজ খুব সস্তায় সুন্দর হইয়া থাকে। নানা রকমের মণি ও স্ফটিক ব্যবসায়ীরা পায়ের কাছে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দেখায়।

রাত্রি প্রায় দশটায় গাড়োয়ানকে একটি মাত্র টাকা ভাড়া দিয়া আমরা ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। ষ্টেশন-মাষ্টার আমাদের দেখিয়াই বাংলা কথাবার্ত্তা সুরু করিলেন। তাঁহার পোষাক ও পাগড়ী দেখিয়া তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া কেহ চিনিবে না। মহিলাদের ওয়েটিং-রুমে রাত্রে ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। অন্য কোনো মহিলা না থাকিলে রাত্রে যাত্রী মহিলার স্বামীকেও এই ঘরে থাকিতে দেওয়া যায় ষ্টেশনেই জানা গেল। হাওড়া ষ্টেশনে এই সকল ব্যাপার লইয়া খুব গোলমাল করে। কেহ সঙ্গী না থাকিলেও মেয়েরা রাত্রির গাড়ীতে একলা যাইতে বাধ্য। নিদ্রার একটা ব্যবস্থা করিয়া আমরা খাদ্যের অন্বেষণে গেলাম। ষ্টেশনের ঠিক বাহিরেই একটা ছোট মুশাফিরখানা আছে। সেখানে ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙালীর মেয়ে বসিয়া খাইয়াছে কি-না ঘোরতর সন্দেহ। একটি মাত্র মানুষ সে-ই ম্যানেজার, পাচক ও পরিবেষ্টা। ফাইফরমাস খাটিবার জন্য ছিন্নবাস একটি আট-দশ বছরের ক্ষুদ্র বালক। দুইজনের জন্য, দুইটি ডিম, তিন রকম তরকারী, দুই পেয়ালা চা ও নয়খানা রুটির বিল হইল ৷৵৫। বাকি ৵১৫ বালকটিকে বকশিস দেওয়াতে সে খুশী হইয়া আমাদের দুই একটা কাজ করিয়া দিল। দূরে মিষ্টান্নের দোকান হইতে সোনালী ও রুপালী পাতে মোড়া চার আনার মিঠাই আনাইয়া আমাদের রাত্রির আহার শেষ হইল।



বঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যু

অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে বঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যুর আলোচনা প্রসঙ্গে, সাপের কামড়ে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মৃত্যু-সংখ্যার বেশীর কারণ সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যকতার কথা লিখিত হইয়াছে। আমার যতদূর মনে হয় তাহার কারণগুলি এইরূপ,—

১। গোখুরা-জাতীয় কতকগুলি বিষাক্ত সর্প সাধারণতঃ বাহির অপেক্ষা ঘরেই বেশী থাকে। মাটির পুরাতন কোঠাঘর বা পুরান ভাঙা দালান ইহাদের উত্তম আশ্রয়স্থল। ইহারা নিজে গর্ত্ত করিতে পারে না বলিয়া ইন্দুরের গর্ত্ত অথবা দেয়ালের ফাটল ইত্যাদিতে আশ্রয় লইয়া থাকে। গোলাঘরের নীচে, এঁদো কোণায় ও অন্ধকারময় মাচার নীচে ইহারা ইন্দুর আরশুলা ইত্যাদি খাদ্য অন্বেষণে যাইয়া থাকে এবং দিনের বেলায় সেখানেই লুকাইয়া থাকে। অনেক সময় ইন্দুর ইত্যাদি তাড়া করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকেরা এই সব স্থান হাত দিয়া পরিষ্কার বা লেপিতে যাইয়া অতি সহজেই আক্রান্ত হইয়া থাকে। অনেক সময় ইহারা এই সব গর্ত্তে নির্ব্বিবাদে হাত চালায় এবং দংশিত হইয়াও মৃত্তিকা মধ্যস্থ ভাঙা খোলার আঘাত অথবা বিছা ইন্দুর বা সামান্য পিপীলিকার কামড় মনে করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসার আশ্রয় লয় না।

পল্লীগ্রামে অনেক সময়, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, মেয়েছেলেরা মাটিতে মাদুর পাতিয়া শুইয়া থাকে আর ঐ সব দিনে রাত্রিতে সাপ গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া থাকে এবং ঘুমের ঘোরে কাহারও নিকট হইতে সামান্য আঘাত পাইলেই দংশন করিয়া থাকে। আবার অনেক সময় এমন সব অংশে দংশন করে যে তাহার আর কোন চিকিৎসাই চলে না।

৩। অনেক সময় মেয়েছেলেরা সাপের কামড় সন্দেহ করিয়াও অথবা নিশ্চিত জানিতে পারিয়াও, বন্ধন অথবা অস্ত্র-চিকিৎসার ভয়ে সে-কথা প্রথমতঃ প্রকাশ করে না।

৪। আমাদের দেশে পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত থাকায় ও মেয়েছেলের জীবনের মূল্য কম বিবেচিত হওয়ায় অনেক সময় পুরুষের চিকিৎসায় যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হয়, মেয়েছেলেদের সম্বন্ধে সেরূপ করা হয় না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা

কুলী

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন

পল্লীগ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষক বিপিন-বাবুর চরিত্রের একটা দিক লক্ষ্য করিয়া সকলে তাঁহার প্রতি বরাবর একটা অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া আসিয়াছে। বাস্তবিকই ভদ্রলোক বড় অগোছালো; কোনো কাজে একটা আঁটসাঁট মোটে নাই। কাজেই যাহারা সকল দিকে চতুর এবং হুঁসিয়ার, তাহারা যে ইহা লইয়া বিপিনবাবুকে প্রায় বিদ্রূপ করিয়া থাকে, ইহা মোটেই অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নহে।

দেড় টাকায় যে জামাটা পাওয়া যায় সেটা হয় ত বিপিনবাবু সাড়ে তিন টাকা দিয়া কিনিয়া বসিয়াছেন। শুনিয়া অন্যান্য শিক্ষক-বন্ধুগণের মনের ভিতর কেমন একটা ক্ষোভ জাগে; তাঁহারা ভাবেন লোকটির এত বয়স হইলে এখনও পদে পদে এইরূপ ঠকিতে থাকিবেন, এ তাঁহারা মুখ বুজিয়া সহ্য করিবেন কেমন করিয়া? কাজেই বন্ধুরা বিদ্রূপ করেন,—"সত্যি! এ জামার কাপড়টা অতি উচ্চাঙ্গের। এরূপ কাপড় সচরাচর দেখা যায় না।" বিপিন-বাবুও দমিবার পাত্র নহেন, তিনিও সমানেই বলিয়া যান,—"শুধু তাই নয় সেলাইটাও হাতের, মজবুত সেলাই। তা ছাড়া জিনিষটা দেশী, গ্রামের দোকানদার দাম নেবে তিন চার মাস পরে, ধারে জিনিষটা দেবে দু-পয়সা নেবে না!" বন্ধুরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসেন। বাড়িতে খাইবার লোক দুইটি মাত্র, তথাপি

এক টাকা দিয়া একটা গোটা মাছই হয়ত কিনিয়া বসিলেন। কোনো বন্ধুর নজরে পড়িলে বিপিন-বাবু আপনা হইতেই কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করেন, "আহা বেচারা! অন্য কোন দিন বড় একটা হাটে আসে না। আজ বুঝি কেমন করে একটা মাছ পেয়েছে, এটা বিক্রী না হ'লে ওর চলে কি করে।" এইরূপে নানাদিকে ঠকিয়া পয়সা নষ্ট করিয়া হয়ত মাসের অধিকাংশ দিন মাত্র ডাল-ভাত খাইয়া কাটাইতে হয়, তথাপি স্বভাব কিছুতেই যায় না।

বিদ্যালয়ের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হয়। স্কুলে এতগুলি সুচতুর কাজের লোক থাকিতে ঐ অচতুর ভদ্রলোককেই যে বার-বার কেন পাঠানো হয়, এ রহস্য অন্যে ভেদ করিতে পারে না। সে-কথা শুধু তিনিই জানেন যিনি বার বার তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠান,—স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। হয়ত বিপিন-বাবু কয়েকটামাত্র জিনিষ আনিতে এক টাকা রিক্স-ভাড়া এবং এক টাকা কুলীর জন্য খরচ করিয়া বসিবেন,—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই;—তবু তাঁহাকেই পাঠানো চাই। দরিদ্র বিদ্যালয়ের টাকাগুলার এমন অনর্থক অপব্যয় দেখিয়া শিক্ষকবর্গের মন কর্‌কর্‌ করে; এমন কি স্বয়ং প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও ঐ বিষয় লইয়া সকলের সমক্ষে বিপিন-বাবুকে বিদ্রূপ করিয়া মিতব্যয়ী হইতে উপদেশ দেন; কিন্তু তিনি স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না।

সেবার স্কুলের প্রাইজ উপলক্ষে পুস্তক, খাতাপত্র, ডাম্বেল,ডেভেলপার, মুদ্গর, ঘড়ি, আলো প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য কিনিবার জন্য বিপিন-বাবুকে কলিকাতায় পাঠানো হইল। তিনি প্রাতের ট্রেনেই কলিকাতায় গিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তিন চারিটি পুস্তকের দোকান ঘুরিয়া বাছা বাছা ইংরেজী গল্পপুস্তক, উপন্যাস, ডিক্সনারী, পাটীগণিত, মহাপুরুষগণের জীবনচরিত, বাংলা নানা রকমের গল্পপুস্তক,আখ্যায়িকা, জীবনচরিত, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্যগ্রন্থ, গীতা, পুরাণ, এবং অন্যান্য নানাবিধ ছেলেভুলানো রঙীন্ সচিত্র শিক্ষাপ্রদ পুস্তকের রাশি কিনিয়া ফেলিলেন। পুস্তকের দুইটি বৃহৎ বোঝা বাঁধিয়া দোকানেই জিম্মা রাখিয়া অন্যান্য দোকান হইতে বিবিধ ক্রীড়াসামগ্রী এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রমে ক্রমে কিনিয়া সেই পুস্তকের দোকানে সেগুলিকে জমা রাখিয়া অন্যান্য কার্য্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সারা দিন ভয়ানক পরিশ্রম হইয়াছে। পুস্তকাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য কিনিয়াছেন প্রায় দুইশত টাকার। পাঁচটার ট্রেনে বাড়ি ফিরিবার আশায় একখানা রিক্স ডাকিয়া তাহার উপর দ্রব্যাদি তুলিয়া নিজেও গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। দুই পার্শ্বে এবং পদতলে দ্রব্যরাশির বোঝা, মধ্যস্থলে বিপিন-বাবু, তাঁহার পক্ষে যতদূর সম্ভব, সে-গুলিকে গুছাইয়া সামলাইয়া লইয়া যাইতেছেন। প্রসন্ন-বদনে বিরক্তির চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না।

হাওড়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া রিক্স থামিল। বিপিন-বাবু মনিব্যাগ হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া রিক্সওয়ালার হাতে দিয়া আট আনা ভাড়া বাদে বাকী ফেরত চাহিলেন। রিক্সওয়ালা কহিল, "পৈসা ত নেহি হ্যায় বাবু, আপকো ত বহুনি কিয়া না!" তিনিও ঠিক এইরূপ উক্তিই প্রত্যাশা করিতেছিলেন, কারণ পূর্ব্বে আরও দুই দিন দুই জন রিক্সওয়ালার মুখে ঠিক এরূপ কথাই শুনিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার নিকট খুচরা থাকা সত্ত্বেও তিনি উহাকে টাকা দিয়াছিলেন। এখন টাকাটি ফেরত লইয়া মনিব্যাগ হইতে খুচরা বাহির করিয়া দিলেন। রিক্সওয়ালা প্রাপ্য গুনিয়া লইয়া সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

এবার কুলীর পালা। মোট দেখিয়া একজন হিন্দুস্থানী কুলী উপস্থিত হইয়াছিল। বিপিন-বাবু দুই জন কুলীর আবশ্যকতা অনুভব করিয়া তাহাকে আর এক জন কুলী ডাকিতে বলিলেন। ইহারা বোধ করি মুখ দেখিয়াই লোক চিনিতে পারে। কুলী কহিল, "নোহ হুজুর! হাম এক আদ্‌মি তামাম্ চীজ লেনে সেকেগা। বারা আনা পয়সা দিজিয়ে হুজুর, সব লে যা'গা।" কোনো চতুর ব্যক্তি হইলে চারি আনার বেশী কোনো মতেই দিতে চাহিত না, কিন্তু বিপিন-বাবু নেহাৎ গোবেচারা, এক কথায় বার আনাই দিতে স্বীকৃত হইলেন। কুলী অপর একজন কুলীর সাহায্য লইয়া

ক্ষিপ্র হস্তে সবগুলা মোট কতক মাথায়, কতক হাতে, কতক বা স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইল। তার পরে লগেজের হাঙ্গামা। কিছু খরচ করিলে সেটা আর হাঙ্গামা কি! কুলীই অধিকাংশ কাজ সারিয়া লইল। বিপিন-বাবু শুধু লগেজ ভাড়ার টাকাটা দিয়া রসিদ লইলেন। রিটার্ণ টিকেট করাই ছিল, সুতরাং সে হাঙ্গামাটা আর ভোগ করিতে হয় নাই।

কুলীকে সঙ্গে লইয়া বিপিন-বাবু ট্রেনের সন্ধানে চলিলেন; গোছানো লোক হইলে কোন্ গাড়ী, কোন্ প্ল্যাটফর্ম্ হইতে কখন্ ছাড়িবে পূর্ব্বেই সে-সংবাদ ঠিক করিয়া রাখিতে পারিতেন, কিন্তু বিপিন-বাবু সে ধাতুতে গঠিত নহেন। তিনি প্ল্যাটফরমের ফটকের কাছে যেখানে একটা প্রকাণ্ড টাইম বোর্ডে ট্রেন-সম্বন্ধীয় সমাচার দেওয়া আছে সেইটায় একবার চোখ বুলাইতে গেলেন। পিছন ফিরিয়া দেখেন, কুলী নাই! কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র এদিক ওদিক চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, কুলী নাই! চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম্ হইতে ট্রেন ছাড়িবে, আর বড় বিলম্ব নাই। কুলীটা ভুলিয়া দশ নম্বরে গেল না ত। কিছুদিন পূর্ব্বে এ-গাড়ী দশ নম্বর হইতেই ছাড়িত বটে। বিপিন-বাবু ব্যাকুল নেত্রে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে দশ নম্বরের দিকে ছুটিলেন। কই! কোথায় কুলী! হায়, দুই শত টাকার মাল যে! পরের জিনিষ! সর্ব্বনাশ! বিপিন-বাবুর যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা রাখিলেও অত টাকা মিলিবে কি না সন্দেহ। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ এ দুর্ঘটনার কথা বিশ্বাসই করিবেন না হয় ত! আর বিশ্বাস করিলেই বা কি! দুই শত টাকা কি তাঁহারা ছাড়িয়া দিবেন! হায়! যদি কুলীর নম্বরটাও দেখিয়া রাখিতেন। বন্ধু-বান্ধবের সাবধান বাণী এতদিন উপেক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহার ফল ফলিল। না, যতদূর দেখা যায় দশ নম্বরে তাঁহার কুলী নাই। আবার পাগলের মত ছুটিলেন চার নম্বরে। তাঁহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ উঠিল। চার নম্বরের গেটের কাছে দুইজন বাঙালী মুসলমান যুবক দাঁড়াইয়া যেন কৌতূহল-ভরে তাঁহারই পানে চাহিতেছে। তবে কি ওরা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়! আমার কুলী দেখেছেন? মাথায় মোট, হাতে মোট, দু-কাঁধে দু-জোড়া মুগুর! তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। বুঝিল লোকটি বিপন্ন। একজন অপরের গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল, "কুলী দেখেছিস্, কুলী?" অপরজন মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, "কুলী দেখব না আবার! কুলী রে ভাই কুলী!" নিরাশ বিপিন-বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিলেন দশ নম্বরের দিকে। সেখানে গেটের কাছে একজন বাঙালী রেল কর্ম্মচারীকে দেখিয়া ব্যাকুলভাবে কহিলেন,—"স্যর, কোন কুলী যদি জিনিষপত্র নিয়ে পালায়, তবে কার কাছে খবর দিতে হবে?" কর্ম্মচারী প্রথমটা বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কি বকিল ভাল বোঝা গেল না। বিপিন-বাবু কহিলেন,—"আজ্ঞে স্যর! এমন কি হ'তে পারে। কুলী সব জিনিষপত্র নিয়ে পালায়?" কর্ম্মচারী কহিলেন,—"প্ল্যাটফর্মের কুলী? দেখুন খুঁজে। কোথায় যাবেন আপনি?" বিপিন-বাবু একটু আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানের নাম করিলেন। কর্ম্মচারী কহিলেন, "দেখুন চার নম্বরে।" বিপিন-বাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন, "ভগবান্!"

ফটকে আসিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন চক্ষু হইয়া খুজিতেছে,—কুলী! কুলী! মাথায় মোট, হাতে মোট, কাঁধে মুগুর,—সেই কুলী! যেন মনশ্চক্ষে সেই কুলীর ছবিই দেখিতে লাগিলেন। সহসা এক স্থানে চোখ পড়িল,—মুগুরের মত না! সত্যই ত মুগুরই ত বটে। দু-জোড়া মুগুর এবং তাহার নিকটেই সেই সুপরিচিত মোট লইয়া বসিয়া রহিয়াছে সেই কুলী! চোখের ভ্রম নয় ত!

কুলী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "কাঁহা গিয়াথা বাবুজী? হাম্ চার লম্বর টিরিণ যাকে সব কামরা ঢুঁড় কর্ ঘুম্ আয়কে হিঁয়া বৈঠা রহা। কি ধার গিয়াথা আপ, বাবু?" বিপিন-বাবু যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। আশীর্ব্বাদের ভাবে এক হাত উচ্চে তুলিয়া কহিলেন, "ভগবান্ আচ্ছা রাখে বাবা! তোম্ বহুত আচ্ছা আদমি

মুলাকাত্ নেহি মিলে গা !" কুলী কহিল,—"রাম কহো বাবুজী। এয়সা কভ্ হি নেহি হো সকতা ! চলিয়ে বাবুজী, টিরিণ খাড়া হ্যায়।"

বিপিন-বাবুর ধড়ে প্রাণ আসিল। তিনি আনন্দে ট্রেনের উদ্দেশ্যে চলিলেন ; মাটিতে পা পড়ে কি পড়ে না। কোথা হইতে সেই দুটি মুসলমান যুবক আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের একজন এক গাল হাসিয়া কহিল, "এই যে বাবু কুলী মিলল ? কোথা ভেগেছিল ?" বলিতে বলিতে আনন্দের আবেগে প্রায় বিপিন-বাবুর পিঠ চাপড়াইতে যায় আর কি ? বিপিন-বাবুর কিন্তু তখন আর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপ্যায়িত হইবার মত অবস্থা নয়। তিনি তাহাদের সহিত কোনো কথা না কহিয়া ট্রেনে উঠিয়া পড়িলেন। মোট-ঘাট নামাইয়া খুচরা বার আনা বাহির করিয়া কুলীকে দিলেন। কুলী 'রাম-রাম' সারিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বিপিন-বাবু আবার তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। মনিব্যাগ হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া কুলীকে দিতে গেলেন। কুলী বিস্ময়ে কহিল,—"পৈসা ত মিল্ গিয়া বাবুজী ! ফিন্ রূপেয়া কেয়া ওয়াস্তে ?" বিপিন-বাবু কহিলেন,—"তোমরা বক্‌সিস্।" কুলী কহিল,—"বহুত খুব বাবুজী ! লেকিন্ এইসা হাম লোগ লেনে নেই সকতা বাবুজী। এ আপ্‌কা পাশ রাখ দিজিয়ে।" কুলী বক্‌সিসের টাকা ফেরত দিতে চায় দেখিয়া গাড়ী শুদ্ধ লোক বিস্মিত কৌতূহলে ব্যাপারটা দেখিতে লাগিল। কুলী কিছুতেই টাকা লইবে না। অবশেষে বিপিন-বাবু কহিলেন,—"দেখ ভাই, হামারা দু'শত্ত রূপেয়াকা চীজ মিল্ গিয়া—একঠো রূপেয়া কেয়া বড়ি বাত ? ও রূপেয়া তোম্ নেহি লেনেসে হামারা দিল্ একদম্ খারাপ হো যায়েগা।" কুলী ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"দো শও কা বাত কেয়া বাবুজী, দো লাখ হোনেসে ভি হাম্‌লোগ নেহি লেতা। গরীব আদ্‌মি হ্যায়, হামলোগ লেকিন্ চোরি করকে বড়া আদ্‌মি হোনে নেহি মাঙ্গতা বাবুজী।" ট্রেন ছাড়িল। কুলী রাম-রাম জানাইয়া পিছন ফিরিল। বিপিন-বাবু ভাবিয়াছিলেন টাকাটা বক্‌সিস্ করিয়া তাঁহার মন বেশ প্রসন্ন থাকিবে। কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল বক্‌সিস্ দিতে গিয়া তিনি তাহাকে অপমান করিয়াছেন মাত্র।

মাটির প্রতিমা

শ্রীজীবনময় রায়

তোমার নয়নমাঝে, তোমার ললিত বাহুডোরে,
যৌবন পুষ্পিত অঙ্গে রাখিয়াছ যে মাধুরী ধ'রে
তোমার হৃদয়-উৎস উৎসারিত যে রাগ রঙ্গিমা
ক্রন্দনে উচ্ছ্বাসে হাস্যে উৎসারিছে ছন্দ-তরঙ্গিমা
মানসীর ছবি মোর সে-মাধুরী তারে বাসি ভালো,
লাবণ্য-অঞ্জলি-দীপে কণামাত্র তারি শিখা জ্বালো
বর্ণে রসে দীপ্তিময়ী, তুমি বন্ধু, মাটির প্রতিমা
আমার মানস স্বর্গে লভিয়াছ প্রাণের দীপ্তিমা।
নিখিল সৌন্দর্য্যলোকে যাত্রী আমি যার অভিসারে
সৃজন-রহস্য-মায়া-সমাচ্ছন্ন স্তোক অন্ধকারে
দেখেছিনু তারে কবে। সেই হ'তে চির মৃত্যুহীন—
চিত্তমাঝে জ্বালি ল'য়ে দুরাশার দীপ পরিক্ষীণ—
অজানার পথ বাহি অতিক্রমি যুগ যুগান্তর
চলিয়াছি,—চলিয়াছি তারি অন্বেষণে নিরন্তর।
শেষ নাহি সে চলার, সে পথের নাহি অবসান
অনন্ত এ চিত্তে জানি একদা সে মিলিবে সন্ধান
সেই নিত্য অজানার, সেই মোর চিত্ত-হরণীর
অবসান হবে এই দীর্ঘ অভিসার সারণির।
হয়ত পাইব দেখা সৃজনের প্রলয়ের ক্ষণে
বজ্রাগ্নির দীপ্ত খড়্গ দীর্ণ দীর্ণ করিবে গগনে
ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে যবে দিগ্বধূর স্খলিত অঞ্চল,
কেশপাশ মুক্ত করি উড়াইবে দিগন্তে চঞ্চল,
অবিন্যস্ত স্রস্তবাসে, বিপর্য্যস্ত বিধ্বস্ত কুন্তলে
মত্ত-ঝঞ্ঝাবাত-ছিন্ন মূর্চ্ছিত সে লুণ্ঠিবে ভূতলে

আসন্ন ধ্বংসের ক্রুদ্ধ অনিরুদ্ধ রুদ্র আলিঙ্গনে।
হয়ত মিলিবে দেখা পরিচয় নিবিড় বন্ধনে
উৎসন্নের উপকূলে, সেই মোর চির বাঞ্ছিতের
প্রলয়ার্ত্ত সন্ধিক্ষণে। সর্ব্বহারা দীন লাঞ্ছিতের
ললাট চর্চ্চিয়া দিবে সেইক্ষণে বিজয় তিলকে
গৌরবে প্রফুল্ল হবে দীপ্ত দামিনীর ললামকে।
হয়ত পাইব দেখা শান্তোজ্জ্বল বসন্ত-প্রভাতে
অরুণ কিরণ-স্নাত, পরিপূর্ণ যৌবন শোভাতে
ধরিত্রী সাজিবে যবে পুষ্প পত্র খচিত দুকূলে
সুরভি দক্ষিণ-বায়ু মায়া আবরণ দিবে খুলে
সুগন্ধ গুগ্‌গুলে তার ভরি দিবে স্খলিত অঞ্চল
কান্তারে প্রান্তরে শৈলে সঞ্চরিবে উল্লাস-চঞ্চল
পরশ রভসে। মুগ্ধ বনানীর শ্যামপত্র জালে
শুনা যাবে স্তব্ধতার মূক যবনিকা অন্তরালে
ধরিত্রীর হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিত আনন্দ চঞ্চল
আমার হৃদয় ছন্দে। হিমসিক্ত মুগ্ধ স্নিগ্ধোজ্জ্বল
নির্ম্মল প্রভাতরশ্মি মন্ত্রময় বল্লকী ঝঙ্কারে
গলাইবে স্বর্ণগীতে নীলিমার মূঢ় আশঙ্কারে
জলস্থল চরাচর ভরিয়া উঠিবে মধু স্রোতে
যুগান্তের অভিসার লব্ধকাম হবে সে আলোতে।
হয়ত পাব না দেখা ; মোর এই ব্যর্থ অন্বেষণ
আমারে ঘেরিয়া শুধু বিরচিবে মায়া আবর্ত্তন।
চলিতে চলিতে পথে থমকি দাঁড়াব বারে বারে
ক্ষণিক পথের সাথী দেখা দিবে পথের কিনারে
মানসীর ছদ্মরূপে। বারে বারে ভাঙিবে সে ভুল ;
আবার হইবে সুরু যাত্রা মোর নিত্য নিরাকুল।
ওগো বন্ধু, এই নিঃস্ব নিরাশার প্রদোষ আঁধারে
তোমার দীপের আলো ক্ষণেক এ হৃদয়মাঝারে
পথপার্শ্বে আতিথেয় তব বাতায়নতল হ'তে
নিমন্ত্রণলিপি মোরে পাঠায়েছ জনতার স্রোতে
গিয়েছি তোমার দ্বারে—চমকিয়া হয়েছে স্মরণে
ঐ চোখে সেই চাওয়া আছে বুঝি মায়া আবরণে।
তোমার নিখিল অঙ্গে হেরিয়াছি সে লাবণ্য-দ্যুতি
তোমারে দিয়েছি তাই ক্ষণিক এ মানসীর স্তুতি

তুমি রচিয়াছ মোর দু-দিনের স্বর্গ মরীচিকা,
জুড়ায়েছ পান্থ-চিত্ত ক্ষণতরে হে মোর ক্ষণিকা।
হে মোর মানসীর তুমি বন্ধু মাটির প্রতিমা
ক্ষণেক এ চিত্ত-দীপে লভিয়াছ দেবীর দীপ্তিমা।
আমার এ অন্বেষণ দিকে দিকে গিয়াছে ছড়ায়ে
নিখিল অন্তর টুটি অশ্রু হয়ে পড়িছে গড়ায়ে।
পবনে গগনে বনে উচ্ছ্বসিত তারি দীর্ঘশ্বাস
নিবিড় বেদনা বহি তপ্তবায়ে ভরিছে আকাশ।
মোর মুগ্ধ ব্যাকুলতা মানবের চিত্তমাঝে জাগে
যুগ হ'তে যুগান্তরে ; জানে না সে কার অনুরাগে
সন্ধান করিয়া ফিরে—কারে চায় কারে ভালবাসে
বক্ষ তার ভরি উঠে অকস্মাৎ উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে
জ্যোৎস্না নির্ঝরসিক্ত দূর দিগন্তের পানে চাহি
কেন অকারণে। শ্যামায়িত প্রাবৃটের মেঘে অবগাহি
কেন চক্ষু ভরে উঠে ভাষাহারা রুদ্ধ বেদনায়।
কেন চিত্তে অকারণে ক্ষণে ক্ষণে আঁধার ঘনায়।
সৃজনের আদি হ'তে যুগে যুগে নিখিলের বুকে
আমারি চলার ছন্দে স্পন্দিত হয়েছে সুখে দুঃখে
মোর আশা নিরাশায় মন্থিত মানস অভিসারে ;
ভুবনে ভুবনে জাগে আবেদন এ-মুগ্ধ তৃষার।
বন্ধু, তুমি পাঠায়েছ তোমার আমন্ত্র লিপিখানি
তব দীপ্ত সৌন্দর্য্যের সুবর্ণের থালে। নাহি জানি
কোন্ নীলিমার মন্ত্রে নয়নে পড়েছে সেই ছায়া,
উদয় সিন্ধুর কূলে কোন্ নব অরুণের মায়া
লিখিয়াছে সেই কান্তি। সপ্তসিন্ধু-তরঙ্গ চঞ্চল
দিয়াছে কি তব অঙ্গে পরিপূর্ণতায় সমুচ্ছল
যৌবনের লাবণ্যসম্ভার স্তরে স্তরে। যেন আজি
প্রকৃতির যাদুমন্ত্রে স্বপ্ন মোর আসিয়াছে সাজি
মানসী প্রতিমা রূপে। তাই আজি তোমার আহ্বানে
আনিয়াছে দ্বারে তব, অজানার ব্যাকুল সন্ধানে।
শ্রান্ত এ পান্থরে তুমি ভুলায়েছ লাবণ্য-সঙ্গীতে
যে মোর বিরহী চিত্তে চিরদিন রহে তরঙ্গিতে।
তবু জানি, জানি বন্ধু, এ তোমার লাবণ্য দীপ্তিমা
মোর মানসীর ছায়া—তুমি শুধু মাটির প্রতিমা।



'বাস্তবিকা'—দিবাকর শর্ম্মা প্রণীত।

রিয়ালিজমের প্রভাব অন্যদেশে যাই হোক্, আমাদের দেশে ন্যাকামির বিকৃত আকারে জিনিষটা সাহিত্য, সমাজ, এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া জাতির মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া দিতে বসিয়াছে। বইখানি এই অসহ্য ন্যাকামির উপর কষাঘাত। পাণ্ডা হরিকুমার, আর তাঁর শিষ্যবর্গকে আমরা খুবই চিনি;—এঁদের সর্ব্বদাই 'সখি ধর ধর' ভাব, কথায় কথায় মিহিসুরে 'ব্যথা' 'বেদনা', বাক্যের চিরন্তন বাঁধুনী ভাঙিয়া সেগুলিকে নড়বড়ে করিয়া উচ্চারণ করা, আর সর্ব্বোপরি কামুকতা সম্বন্ধে এঁদের অভিনব দৃষ্টিকোণ,—এই সব লইয়া এঁরা "কচুরিপানার" মতই দেশটা ছাইয়া ফেলিতেছেন। ইঁহাদের উপর তীব্র সন্ধানী আলোক ফেলিয়া, ইঁহাদের চিনাইয়া দিয়া দিবাকর শর্ম্মা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

ব্যঙ্গরচনা হিসাবে বইখানি ভাষায়, চরিত্রচিত্রণে খুবই উপাদেয় হইয়াছে। তবে 'মুক্তিসেনার' এই Free-lance Chivalry-র যথেষ্ট অভাব দেখাইয়াছেন, আর 'ক্যাপ্ চারিটি এসোসিয়েসন্'-এ মনটা ব্যক্তিগত কটাক্ষের আভাস পাইয়া ব্যথিত হয়,—বইয়ের শেষের জবাবদিহি সত্ত্বেও।

চরিত্রের নামকরণ প্রায় পরশুরামীয় পদ্ধতিতে,—'দোদুল দে' 'নীলিমা পাল' প্রভৃতিকে মনে করাইয়া দেয়। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ভাল।

'নন্দিনী'—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

বইখানি 'নন্দিনী' আর 'জননী' এই দুইটি গল্প লইয়া ১৬৩ পাতায় সম্পূর্ণ।

বাংলার মেয়ের দুর্দ্দশার কথা বলা লেখকের উদ্দেশ্য। সেই দুর্দ্দশার যে-কয়টা মুখ্য কারণ,—অপাত্রে বিবাহ, বৈধব্য, পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারহীনতা—সেইগুলি একত্রে সমাবেশ করিয়া 'নন্দিনী' গল্পটা। গল্পাংশ জমিয়াছে মন্দ নয়, তবে উদ্দেশ্য ফুটাইবার চেষ্টায় একটু জবরদস্তি থাকায় রস মাঝে মাঝে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। 'জননী' গল্পটিতে এত তোড়জোড় না থাকিলেও আমাদের এইটিই ভাল লাগিল বেশী। বধূ-শঙ্করীর দুঃখের অভিজ্ঞতা জননী-শঙ্করীর আশঙ্কার বেশ একটি সহজ পরিণতি লাভ করিয়াছে। গল্পের শেষে বিপুল আশ্বাসের মধ্যে তাহার চক্ষে যে আনন্দের অশ্রু জমিয়া উঠিল তাহা পাঠকের চক্ষুকেও শুষ্ক থাকিতে দেয় না।

বইখানির সাজগোজ বেশ ভালই।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ-মিশেলি—শ্রীঅবনীনাথ রায় প্রণীত এবং ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ডি. এম. লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বইখানিতে রবীন্দ্রনাথ ও অচলায়তন, ফাল্গুনী, বিন্দুর ছেলে প্রভৃতি দশটি প্রবন্ধ আছে। অচলায়তন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া প্রবন্ধকার কবির সম্বন্ধে নিজের স্মৃতির কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ফাল্গুনী' প্রবন্ধটি সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়। মুখপত্রে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বলিতেছেন, "তাঁর যে বলবার কথা আছে, আর তিনি যে তা বলতে পারেন এই ধারণা বশতঃই আমি তাঁর প্রবন্ধ সবুজ পত্রে প্রকাশ করি।" বিন্দুর ছেলে, বিরাজবৌ, চরিত্রহীনের আলোচনা মনোজ্ঞ। অন্য লেখাগুলিতেও চিন্তার ছাপ আছে। লেখকের বলিবার ধরণ চিত্তাকর্ষক।

হা-ডু-ডু-ডু—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ প্রণীত এবং ১ রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার, কলিকাতা হইতে ছাত্র সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থখানিকে বাংলায় খেলাধূলার প্রথম পুস্তক বলিলেও চলে। শুধু পুস্তক লিখিয়া নয় 'চারুচন্দ্র স্মৃতি ফলকে'র সাহায্যে লেখক দেশের এই পুরাতন খেলাটির বহুল প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। লেখক বলিতেছেন, "বিদেশীরা তাহাদের প্রাণের খেলাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতেছে, আর আমাদের দেশের খেলা অন্ততঃ আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা কি আশা করা একেবারেই দুরাশা?" গ্রন্থকারের আশা সফল হউক। বইখানিতে এই খেলার সম্বন্ধে সকল প্রকার তথ্য মনোহর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মন্দাকিনী—(গানের বই) শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় প্রণীত, প্রকাশক শ্রীঅনিমেষচন্দ্র রায় গুপ্ত, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৷৷৹ আনা।

গানগুলিকে কবিতার ন্যায় সাজাইয়া খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতার ছাঁচে প্রত্যেকটির নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক গানে সুর ও তাল বসাইয়া গ্রন্থকার এই গ্রন্থের গানগুলি গাহিবার পক্ষে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের কাগজ ও বাঁধাই আধুনিক যুগের রুচিসঙ্গত নহে, অবশ্য ইহা বহিরঙ্গের কথা। বইখানি ক্ষুদ্র হইলেও গানগুলি পবিত্র এবং সুরচিত।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ব্রহ্মবিদ্যা—(কঠোপনিষদের দার্শনিক ও যৌগিক ব্যাখ্যা)—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তি-বিবৃতা। ৯-বি, রামতনু বসুর লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আমরা বিবৃতি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থকার আপনার কথা বিবৃত করিয়াছেন। তবে তাঁহার সকল ব্যাখ্যাই যে সকলের মনঃপূত হইবে তা আশা করা যায় না। তাহাতে তাঁহার আক্ষেপেরও কারণ নাই। তবে আমরা তাঁহার সঙ্গে একেবারেই

একমত নই. যে, যদি কেহ তাঁর ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেয় তবে সে "আপন স্বার্থ. দুর্ব্বলতা ও অসত্য পোষণার্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। নিজের মস্তকে তাঁর এত আক্রান্ত মনে করিবার কি হেতু আছে যে তাঁহারা যে যাহার ইচ্ছামত শ্রুতি-স্মৃতির মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া, আপন ভ্রান্ত মত প্রচার করিতে ব্যস্ত" এরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। উপনিষদের ঋষিদের মধ্যেও যখন মতভেদ দেখা যায় এবং শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যেরাও যখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তখন আধুনিক ব্যাখ্যাকারদের উপর এরূপ কঠোর মন্তব্য নিতান্তই অন্যায় বলিয়া মনে হয় এবং বিবেচনা-সঙ্গতও নহে। গ্রন্থকার নিজে যখন একজন ব্যাখ্যাকার তখন ইহা বুদ্ধিমানের কাজও নহে। বরং কাচের ঘরে বাস করিয়া অন্যের উপর লোষ্ট্রনিক্ষেপের ন্যায় নির্ব্বুদ্ধিতারই কাজ। বিশেষতঃ তিনি যখন "শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রদর্শিত পথে" উপনিষদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর যে একজন সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকার তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং তাঁহার পথ বহুপূর্ব্ব হইতে আর এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৃদ্ধমেব তৎ" বলে ধিকৃতই আছে। সে পথ অনুসরণ করিলে অনেক স্থলেই যে স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট হতে হয় এবং প্রত্যক্ষলব্ধ সত্যকে অসত্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত গ্রন্থকার নিজেই দিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মকে "জড়জগৎ হইতে পৃথক" (মুখবন্ধ) বলিয়াছেন, অথচ বলিয়াছেন "সর্ব্বব্যাপ্ত"। তাঁহার "সর্ব্ব" কি এই "জড়জগৎ" নয়? যাহাকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তাহা হইতে পৃথক্ কি করিয়া হয়? যদি বলা যায়, বায়ুমণ্ডল যেমন পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম কোন প্রকারের সূক্ষ্ম জড়বস্তু; আত্মবস্তুর সর্ব্বব্যাপ্তিতে এরূপ পৃথকত্বের সম্ভাবনা নাই। মতের খাতিরে একটা তত্ত্বকে অনুভূতিলব্ধ তত্ত্বের সঙ্গে পাশাপাশি রাখিতে গিয়া এই স্ববিরোধিতা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের খাতিরে যদিও "ঊর্দ্ধমূলো বাক্‌শাখ" এই প্রসিদ্ধ শ্রুতির ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন (পৃঃ ১২৭)--পরমপুরুষকে সংসার হইতে পৃথক্‌ভাবে দর্শন করতঃ সংসার মুক্ত হইতে হইবে (আচার্য্যের "পরমাত্মা হি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে" ইহারই অনুসরণ) কিন্তু তাঁহার নিজের ব্যাখ্যা হইতে ঐ অর্থ আদৌ হয় না এবং উক্ত শ্রুতিটি যদি পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে বিচার করা যায় তবে ঋষি যে ঠিক বিপরীতভাব প্রকাশ করিতেছেন তাহাই উপলব্ধ হয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ

দি ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড ফাইন্যান্স্ ইয়ার বুক্ এণ্ড ডিরেক্টরী—১৯৩০-৩১—প্রথম খণ্ড—ইন্‌সিওরেন্স। প্রথম সংস্করণ। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মৌলিক সম্পাদিত এবং মেসার্স রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক ১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পরিষ্কার পুরু কাগজে সুন্দর ছাপা, ডিমাই অষ্টাংশিত প্রায় তিনশত পৃষ্ঠা, কাপড়ের উৎকৃষ্ট বাঁধাই, সোনার নামাঙ্কন। মূল্য তিন টাকা।

ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত বীমা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের যতগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বইটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য প্রকাশক যত্ন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের যত্ন এবং অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে।

বইখানি আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বিগত বৎসরের ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা, ভারতীয় বীমা কোম্পানী-সমূহের নামধাম, এবং ভারতে বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত অভারতীয় বীমা কোম্পানী-সমূহের নামধাম, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বীমা সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা দেশের মনীষিগণের উক্তি, বীমা-বিষয়ক শব্দার্থসংগ্রহ, চক্রবৃদ্ধি সুদের হার কষিবার তালিকা. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জীবনবীমার তুলনামূলক পরিমাণ, আয়ুর গড়, প্রভৃতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে জীবনবীমার মূলনীতিগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জিনিষটির এই ধরণের ব্যাখ্যা আমাদের দেশে একটি নূতন জিনিষ।

সপ্তম এবং অষ্টম অধ্যায়গুলিতে অনেক নূতন তথ্য নিহিত আছে। বীমা ব্যবসায়ে যাঁহারা লিপ্ত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি অতি প্রয়োজনীয় হইবে।

ভারতীয় এবং বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির কোনটির প্রিমিয়মের হার কিরূপ তাহাও এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ইহাতে বীমা-কর্ম্মীদের অনেক অসুবিধা দূর হইবে।

ভারতীয় এবং বিদেশী যতগুলি বীমা কোম্পানী এখন ভারতবর্ষে কাজ করিতেছে, এই বইখানিতে তাহাদের একটি ডাইরেক্টরী দেওয়া আছে। সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই ইহাতে পাওয়া যাইবে।

পুস্তকখানি প্রণয়নে নিউ ইণ্ডিয়া এসিউরেন্স কোম্পানীর জীবন-বীমা বিভাগের সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত এস্, সি, রায়ই প্রধান উদ্যোক্তা এবং প্রধানতঃ তাঁহার সহায়তাতেই এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে বইটি প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে।

শ্রীনীহাররঞ্জন পাল

বেদান্তদর্শন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত বঙ্গানুবাদ-সহ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মাদারীপুর জ্ঞানসাধন মঠ হইতে প্রকাশিত। প্রভিন্সিয়াল পাবলিশিং ডিপো, পাটনা এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত ৫৫৫টি ব্রহ্মসূত্র এবং শাঙ্কর ভাষ্য অবলম্বন করিয়া গুরু শিষ্য সংবাদক্রমে একটি বিশদ এবং অতি সরল বঙ্গানুবাদ আছে। ইহার পূর্ব্বভাগে অনুবাদক কর্ত্তৃক একটি ৫ পৃষ্ঠা-ব্যাপী নিবেদন, একটি ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী অবতরণিকা, একটি ৮ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সাধারণ সূচীপত্র এবং গ্রন্থশেষে ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী অকারাদি-ক্রমে একটি বিশেষ সূচী এবং তৎপরে অকারাদিক্রমে ২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সূত্র সূচী আছে। অনুবাদ অংশ ৬৪২ পৃষ্ঠা মোট ৭১৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ বা তদবলম্বনে সূত্রের ব্যাখ্যা, আদি ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় হইতে এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ গ্রন্থের বিশেষত্ব—সরলতা ও সুগমতা। এই সরলতার অনুরোধে অনুবাদক মহাশয় সূত্রগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহার ফলে সূত্রার্থ পাঠ মাত্রই অনেকটা বুঝা যায়। তৎপরে পূর্ব্বপক্ষের সূত্র প্রায় শিষ্যের মুখে এবং সিদ্ধান্ত সূত্র প্রায়ই গুরুর মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে একটি সূত্র মধ্যে যখন পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষ উভয় থাকে, সেস্থানে সূত্রটি ভাঙিয়া পূর্ব্বপক্ষের অংশটি শিষ্যমুখে এবং সিদ্ধান্ত অংশটি গুরুমুখে

প্রকাশও করিয়াছেন। ইহার ফলেও সূত্র-সম্পর্কিত বিচারটি বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ব্যাখ্যার ভাষা অতীব সরল, যেন সাধু ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতেছে বোধ হয়। এতদপেক্ষা সরল বোধ হয় আর সম্ভবপরই নহে। এজন্য যাঁহারা পূর্ব্বে বেদান্তদর্শন পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা উপন্যাস পাঠের মত সরল ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা ইহার সরলতা দেখিয়া এক প্রকার মুগ্ধ হইয়াছি। যাঁহারা সংস্কৃতের মধ্য দিয়া বেদান্তদর্শন পড়িবার ইচ্ছা করেন না, বা সুযোগ পান না, এই গ্রন্থ তাঁহাদের পক্ষে আশাতীত উপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই। আজকাল বেদান্তের কথা প্রায় আবালবৃদ্ধবনিতার মুখেই শোনা যায়, এই গ্রন্থ প্রচার দ্বারা, ইহা যে তাদৃশ সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সহায়তা করিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় হয় না।

বিচারের দিক্‌টাও দেখা গেল, আশাতীত সুগম হইয়াছে। বহু কঠিন বিচারগুলি অতিশয় সুখপাঠ্যই হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে বলা যায়। আমাদের মনে হয়, এ গ্রন্থের আদর সাধারণ পাঠকবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকই হইবে। আমরাও অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করিয়াছি, কিন্তু এত সরল করিতে পারি নাই। এই সব কারণে আশা হয় অতি সত্বর এই গ্রন্থ নিঃশেষিত হইবে, আর তজ্জন্য ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। লেখনী ধারণ করিলেই ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তাহার নিবারণ-চেষ্টাই প্রশংসনীয়। অতএব এইবার এই গ্রন্থের দোষের বিষয় উল্লেখ করিব।

১। সূত্রগুলি বিসন্ধি করায় সূত্র পাঠের অসুবিধা হয়। সূত্রের সন্ধিবিচ্ছেদ করিতে নিষেধও আছে। অতএব সূত্রগুলি যথাযথভাবে প্রদান করিয়া পরে সন্ধিবিচ্ছেদ করাই ভাল।

২। একটি সূত্রকে খণ্ডিত করিয়া গুরু শিষ্য মুখে প্রকাশ করা ব্যাখ্যা মধ্যে রাখিয়া সূত্রটি অখণ্ডিত রাখাই ভাল।

৩। এক বা একাধিক সূত্র লইয়া বেদান্তদর্শনে যে ১৯২টি অধিকরণ হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক অধিকরণের আদিতে বা অন্তে সরল রীতিতে সাজাইয়া দেওয়া ভাল। ইহাতে গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিচারগুলি উত্তমরূপে আয়ত্ত হয়।

৪। সরলতার অনুরোধেই বোধ হয় কতিপয় স্থলে ভ্রান্তিও ঘটিয়াছে, এজন্য মনে হয়, গ্রন্থকারের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত পঠন পাঠনশীল অধ্যাপকের বিচক্ষণতা মিলিত হইলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

৫। ব্যাখ্যা মধ্যে বিভিন্ন বিচারগুলি শিরোনামার দ্বারা নির্দ্দেশ করা মন্দ নহে। ইহাতে পক্ষাপক্ষ ও খণ্ডন মণ্ডনগুলি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

৬। অপর মতের সহিত শাঙ্কর মতের ব্যাখ্যার তুলনা অল্প কথায় দিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়।

নিবেদন ও অবতরণিকা মধ্যে অনুবাদক মহাশয় যেরূপ নিরপেক্ষ ভাব এবং সত্যানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যথার্থ পণ্ডিতোচিতই হইয়াছে।

যাহা হউক গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম। এরূপভাবে সহজপাঠ্য করিবার চেষ্টা করিয়া শাস্ত্রগুলি প্রকাশিত হইলে সাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারই হইবে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতের প্রতি এই অনাদরের দিনে এরূপ উদ্যম সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ব্যথার বাঁশী—শ্রীসুব্রতকুমারী দেবী প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৯০, মূল্য এক টাকা।

আজকালকার আধুনিক কবিতার তুলনায় ইহার প্রত্যেক কবিতাটিই হয়ত ছন্দের ও মিলের অসঙ্গত ত্রুটিহেতু পাঠকের মনকে অযথা বিড়ম্বিত করিয়া তুলিবে। কিন্তু ভাষার মাধুর্য্যে, ভাবের সরল প্রকাশ-কৌশলে, লেখার অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য্যে, বেদনাক্লিষ্ট শোকাহত হৃদয়ের সুসংযত অনুভূতি-সমৃদ্ধিতে গানগুলি বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বসমেত ১৬২টি গান আছে—সবগুলির যেমন সুসংযত ভাব, তেমনি অনুরূপ ভাষা। পতিবিয়োগবিধুরা এই বঙ্গ-মহিলার অন্তরবেদনার ঘনীভূত উচ্ছাসগুলে মাঝে মাঝে মনটা বিষণ্ণ হইয়া ওঠে।

আমাদের দেশের বিধবা মহিলারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অসীম তৃপ্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

কলিকাতার কথা—(আদিকাণ্ড) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, এম্, আর, এ, এস্, ভারত-বাণীভূষণ প্রণীত। শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আড়াই শত পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাকা।

প্রাচীন কলিকাতা-পরিচয় সংগ্রহ করিতে যে সময় আমাকে ইংরেজী বাংলা বহু গ্রন্থ ঘাঁটিতে হইয়াছে তখনই "সুবর্ণ-বণিক সমাচার" পত্রিকায় কলিকাতার কথা নামে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত মল্লিক মহাশয়ের প্রবন্ধগুলির কোন কোন অংশ পাঠ করিবার ও তথা হইতে তথ্য-সংগ্রহের সুযোগ হয়। তখনই বুঝিয়াছিলাম এই প্রবন্ধগুলি শুধু কলিকাতার কথায় পূর্ণ নহে, অফুরন্ত ঐতিহাসিক তথ্যের ভাণ্ডার। কলিকাতার বিষয় সম্বলিত কত পুস্তক দেখিলাম, কিন্তু ঠিক ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায় সেরূপ ধারাবাহিক কলিকাতার ইতিহাস কি ইংরেজী, কি বাংলায় একখানিও নয়নগোচর হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানিও ঠিক ধারাবাহিক ইতিহাস নহে; অবশ্য নামেও সে পরিচয় নাই। কিন্তু এ কথা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, ঐতিহাসিক উপাদানে ইহা অমূল্য। ইহা নামে কলিকাতার কথা হইলেও, ইহা ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস, ভারতে ইংরেজ অভ্যুদয়ের ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। জব্ চার্ণকের কলিকাতায় আগমনের বহু পূর্ব্বের অবস্থা হইতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের দেওয়ানি লাভের সময় পর্য্যন্ত লেখা প্রসঙ্গে উক্ত সকল বিষয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বাংলার বহু বিষয়ের বহু তথ্যের আধার। ইহা পাঠে অনেক অজানা কথা জানা যায়। বহু পরিশ্রম ও ব্যয়লব্ধ মাত্র ইতিহাসের তথ্যেই ইহা পূর্ণ নহে, ইহাতে গ্রন্থকারের গবেষণা, চিন্তাশীলতা ও মনীষার পরিচয় যথেষ্ট আছে। এই সকল কারণে এই গ্রন্থে ধারাবাহিকতা না থাকিলেও, কলিকাতার কথায় যাহা অপ্রাসঙ্গিক এমন বহুল বিষয় সম্বলিত হইলেও, যে প্রণালী ও যে ভাষায় ইহা রচিত হইয়াছে তাহা কতকটা মৌলিক, বেশ স্বচ্ছ, সরল, পাঠ করিতে সাধারণ পাঠকের কোনরূপ বিরক্তি উৎপাদন করে না। এই ভাবেই অবশিষ্ট কাণ্ডগুলি প্রকাশিত হইলেও ইহা ইতিহাস সাহিত্যে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ হইয়া বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হইবে। পুস্তকের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলিও সুনির্ব্বাচিত ও সুন্দর।

শ্রীহরিহর শেঠ

প্রারম্ভে

শ্রীশৈলেশ ভট্টাচার্য্য

রাত্রির অন্ধকার ফিকা হইয়া আসিল। দু-একটা কাকের ডাকও শুনা যাইতেছে। কর্ত্তা দু-একবার এপাশ-ওপাশ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। উঠিতেই ত হইবে। সদর দরজাটা খুলিয়া দিতে হইবে। ঝিটা আবার আসিয়া ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিবে। এ কাজ তাঁহাকে রোজই করিতে হয়। ছেলেরা সকালে হাজার ডাকাডাকিতেও উঠে না। ওদের মাও সকালে উঠিতে বিরক্ত হয়। যদি পীড়াপীড়ি করা হয় তবে বলে,—কেন সতর বছর বয়সে তোমাদের বাড়ীতে এসে অবধি বার মাস তিরিশ দিন ঝিকে দরজা খুলে দিয়েছি। বুড়ো বয়সেও নিস্তার নেই? চুপ করিয়া থাকিতে হয়। কথা কহিলেই কথা বাড়ে। কিশোর অঘোরে ঘুমাইতে থাকিল।

বারান্দায় ঝুলান অরকিড গাছগুলিতে জল দিতে হইল। তারপর প্রাতঃকৃত্য করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সরু আঙুলের মত রোদ আসিয়া সবুজ জান্‌লার উপর পড়িয়াছে। কিশোর ঘুমাইতেছে। ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসির আভাস। রাত্রিশেষের স্বপ্নের রেশ বুঝি তখনও ঠোঁটে লাগিয়া আছে। কর্ত্তা ডাকিলেন ওরে কিশে, ওঠ্, ওঠ্, বেলা হয়ে গেছে। ঘুম ভাঙিয়া গেল। তবু চোক বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। রোজই এম্‌নি শুনিতে হয়। কর্ত্তা স্বর উচ্চতর করিয়া ডাকিলেন, ওরে হতভাগা ওঠ্। বেলা আটটা বাজতে চল্‌ল এখনও ঘুম।—কিশোর উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল। কর্ত্তা বলিয়া চলিলেন, এমনি কর্‌লে কি আর লেখাপড়া হয়? আমরা সেই অন্ধকার থাক্‌তে উঠে হিস্‌ট্রি মুখস্থ করেচি। যা পড়গে যা।

কাপড়টা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে সে পূব দিকের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। উঁকি মারিয়া দেখিল বিছানা খালি পড়িয়া আছে। দাদা উঠিয়া গিয়াছে। তার উপর একটু শুইয়া পড়িল। পর্দ্দার ফুটার মধ্য দিয়া খানিকটা রোদ গোল হইয়া আলমারির উপর পড়িয়াছে, কিশোর তার দিকে চাহিয়া ভাবিল, ঐ চাঁদ উঠেছে, ঐটা আকাশ, আলমারির ঐ গায়ে ঐ আঁচড়গুলো মেঘ—বেশ মনে হয় কিন্তু। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল কালরাত্রির অসমাপ্ত গল্পটার কথা। অখিল ট্রেন হইতে কাশীতে নামিয়াছে, কতকগুলো গুণ্ডা তাহার পিছু লইয়াছে, তারপর কি? আগ্রহে সে টেবিলের উপর হইতে বইখানা লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। আলমারির উপর রোদের গোল চেহারাটা মিলাইয়া গেল। আশেপাশে ফাঁক দিয়া রোদ আসিতে লাগিল।

হঠাৎ পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি বইখানা রাখিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। দাদার সাম্‌নে পড়িয়া গেল।

কি লাটসাহেবের ঘুম হ'ল? আর খানিক পড়ে থাক্‌লেই ত হত? এর মধ্যে ওঠবার কি দরকার ছিল।

সে ধীরে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। নীচে চায়ের কেট্‌লি ও বাটির শব্দ শুনিতে পাইল। তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বলিল, আমায় একটা বাটি দাও না দিদি।

দিদি তার চেয়ে দু-বছরের বড়। বলিল, এত বেলায় উঠে বাবুর চা খাওয়া হবে!

কিশোর বলিল,—বেশ করব, তোমার তাতে কি?

দিদি রাগিয়া বলিল, চা দেবে না আরও কিছু? এস না, চা খেতে দোব'খন।

কিশোর বলিল, দেবে না? ওঃ, কেমন না দাও দেখব। নিজের ত বেলা সাতটার সময় ওঠা হ'ল। তারপর দাদাদের কথাগুলো আবৃত্তি করিয়া বলিল, তারপর নাওয়া, খাওয়া, আর সাড়ে আটটার সময় বাসে ওঠা, লেখাপড়ার নাম নেই। দিদি চেঁচাইয়া বলিল,—বেশ তোর তাতে কি, অসভ্য ছেলে। মা দেখ না, সকালে উঠেই কিশে আমার সঙ্গে লেগেছে। মা বলিলেন, কিশে

তোমায় পড়তে হবে না? সকালে উঠতে-না-উঠতেই খুন্‌সুড়ি আরম্ভ করেচ?

কিশোর গিয়া পড়িতে বসিল। কি পড়িবে ভাবিয়া পায় না, হিস্‌ট্রি পড়িতে এখন ভাল লাগে না। ইংরেজীটা রাত্রে একরকম পড়িয়াছে, বাংলাও পড়িয়াছে, অঙ্ক কসিতে হইবে। হোমটাস্ক আছে, মোটা বইখানা খুলিয়া অঙ্ক কসিতে বসিল।

কলতলায় বাল্‌তিতে জল ভরিতেছে। জলের স্বরটা কি রকম সরু ও জোর হইতে আস্তে ও মোটা হইয়া আসে তাই শুনিতেছিল। উঠানের উপর একটা কাক আসিয়া বসিল, চারিদিক তাকাইয়া হঠাৎ কি একটা মুখে করিয়া উড়িয়া গেল, কিশোর বুঝিতে পারিল না। হাতের পেন্সিলটা থামিয়া আসিল।—আজ বিকালে সে এমন খেলিবে যে লোকে হাঁ করিয়া দেখিবে। পায়ের তলা দিয়া ছুটিয়া, ঘাড়ের উপর দিয়া লাফাইয়া কিশোর বল লইয়া যাইতেছে। লোকে চোখ বাহির করিয়া দেখিতেছে। কিশোর এ দৃশ্য মনে মনে বেশ দেখিতে পাইল।…কর্ত্তা বাজার থেকে আসিয়া পড়িলেন। একটা হতাশাসূচক শব্দ করিয়া বলিলেন, এই হচ্চে, হুঁঃ, বই খাতা খুলে হাঁ করে বসে আছে, তবু পড়বে না। কিশোর তাড়াতাড়ি খাতার উপর পেন্সিল ঘসিতে আরম্ভ করিল।

সাড়ে ন'টার সময় আসিয়া বলিল, মা ভাত দাও। মা বলিলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটুখানি সবুর কর। একলা ক'দিকে সামলাই? যে দিন ভাত বেড়ে বসে থাক্‌ব, সে দিন ডেকে ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না। আর ঠিক যে দিন হাঁফ ছাড়বার সময় থাকে না সেই দিনই ভাত চাই ব'লে তাগাদা সুরু হয়।

কিশোরের মনটা কেমন বাঁকিয়া গেল। ভিতরটা যেন ভারী হইয়া আসে। ভাত খাইয়া ইস্কুলে চলিয়া গেল। ইস্কুলে ঢুকিতেই সাম্‌নে বিপিনটা দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে কি দেখিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই বলিল, কিশোর তোর কাছে সুতো আছে? ঐ দেখ, ঐ ঘুড়িটা ডিল্‌লজর কর্‌ব। বলিয়াই তাহার পকেটের ভিতর হাত চালাইয়া দিল। কিশোর হাত ছুটো জোরে ছুঁড়িয়া দিয়া ক্লাসে চলিয়া গেল। একটা ছেলে ঘুরন্ত ফ্যানের উপর কাগজ পাকাইয়া ছুঁড়িয়া মারিতেছিল। কাগজের কুণ্ডলীটা ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িতেছিল। অন্য ছেলেরা হাসিতেছিল। কিশোর বায়স্কোপের একটা বিজ্ঞাপন লইয়া ছুঁড়িয়া দিল। কাগজটা দু'তিন পাক ঘুরিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল। ছেলেরা হাসিয়া ঘরটা ফাটাইবার উপক্রম করিল। কিশোর সব ভুলিয়া গেল। আবার ছুঁড়িয়া মারিল।

ঘণ্টা পড়িয়া গেল। মাষ্টার আসিয়া পড়িলেন। পণ্ডিত সুর করিয়া কি একটা সংস্কৃত স্তোত্র পড়িয়া প্রার্থনা করেন। ছেলেরা কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে বলিয়া যায়। কিশোরের স্তোত্র মুখস্ত নাই। নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ অন্তর একবার করিয়া সবাই বলে, জয় জগদীশ হরে। কিশোরের খুব ভাল লাগিতেছিল। সেও তাহাদের সহিত সুর মিলাইয়া বলিল, জয় জগদীশ হরে। হঠাৎ সব থামিয়া গেল, ছেলেরা সব বসিয়া পড়িল। কিশোর অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বলিল, জয় জগদীশ হরে। ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন কি পণ্ডিত মশায়ও দাঁতের ফাঁক দিয়া হাসি প্রকাশ করেন। কিশোর লাল হইয়া উঠিয়া অপ্রস্তুত ভাবে বসিয়া পড়িল। মনটা আবার পূর্ব্বের মত হইয়া গেল। পণ্ডিতমশাই তখন গণ্ডার আণ্ডার গল্পটা নানা রসে রসাইয়া আরম্ভ করিলেন। তারপর পড়া সুরু হয়। কিশোর পড়া বলিতে পারিল না। পণ্ডিতমশাই বলিলেন, কি জয় জগদীশ হরে? ছেলেরা হাসিয়া উঠিল। কিশোরের পড়া না বলিবার অপরাধের সঙ্কোচটা বিরক্তিতে পরিণত হইয়া গেল। কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রথমে একটা ছেলে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গেল, তারপর একজন, তারপর আর একজন—ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসের ছেলেরা বাহির হইয়া গেল। ছুটির ঘণ্টা পড়িয়া গেল। স্রোতের মত ছেলের দল বাহির হইয়া বিভিন্ন দিকে বিভক্ত হইয়া গেল। পথে আসিতে আসিতে শঙ্করের সঙ্গে গল্প চলিল। শঙ্কর বলিল, জানিস্ কিশোর,

কাল একখানা ঘুড়ি কত সুতোর মাথায় কেটে যাচ্ছিল। ঘুড়িটা এই-ই-টুকু, মিন্ মিন্ করুচে। খুব কম করে দেড় কাটিম সুতো হবে! কিশোর বলিল, আমি কাল একখানা ঘুড়ি ধরেছিলুম, ঘুড়িখানা কি 'রাইট', দাদা এসে ছিঁড়ে দিল। শঙ্কর অনুকম্পার সুরে বলিল, আমারও একখানা দু'তে ঘুড়ি মেজদা ইচ্ছে ক'রে ছিঁড়ে দিল। এমন রাগ হয়…

কিশোর বাড়িতে ঢুকিয়া বইগুলা ধপাস্ করিয়া টেবিলে ফেলিয়া জুতো খুলিয়া ছুঁড়িয়া কোণে ফেলিয়া দিল। মা বলিলেন, কিশে, ঐ যে ওখানে খাবার ঢাকা আছে নে। খাবার খাইয়া দোকান যাইতে হয়। তারপরে খেলার মাঠে গিয়া হাজির হইল। কমল বলিল, এসো, এসো, এত দেরি করুলে কেন? এতক্ষণে একবার খেলা হ'য়ে যেত। কিশোর বলিল, কেন, ঠিক সময়েই ত এসেছি। কমল বলিল, আরেকটু আগে আস্‌তে হয়। খেলিতে নামিয়া কিন্তু পায়ের তলা দিয়া ঘাড় ডিঙাইয়া বল লইয়া যাইতে পারিল না। গোলে বল মারিতে আউট করিয়া ফেলিল, 'পাস' করিতে গিয়া বল হাতছাড়া করিল। সঙ্গীরা বলিল, কিরে, একটা ভাল ক'রে শটও মারুতে পারিস্ না? তোর জন্যে খেলাটা সব মাটি হ'ল।

কখন আকাশের লাল মেঘগুলা কালো হইয়া গিয়াছে, ওধারে গাছের পাশে ছায়া জমিতে সুরু হইয়াছে। কিশোর বাড়ি ফিরিয়া আসিল। দেখিল দিদি টেবিলে বসিয়া মানুষের মুখ আঁকিতেছে। মুখ টিপিয়া হাসিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, দিদি, নাকটা চেপটা হয়ে গিয়েছে যে, আরেকটু লম্বা করে দাও। দিদি গলা নীচু করিয়া ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, বেশ হয়েছে, তোমার তাতে কি? পাশের ঘর হইতে মা ডাকিলেন,—কিশে, এধারে এসো। স্বরের কাঠিন্য লক্ষ্য করিয়া কিশোরের মুখের ভাব নিমেষে বদলাইয়া গেল। দিদি হাসিয়া নীচু গলায় বলিল, কেমন? কিশোরের মাথাটা ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। কথা বাহির হয় না, তবু দিদির দিকে চাহিয়া একবার মুখ ভেঙচাইল। ঘর হইতে আবার গম্ভীর স্বর আসে,—কথা শুন্‌তে পাচ্চো না? কিশোর মার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। মা বলিলেন, কটা বেজেচে, একবার ঘড়ির দিকে তাকাও। কিশোর দাঁড়াইয়া রহিল।

মা বলিলেন, শুন্‌তে পাচ্চো না? ক্ষীণস্বরে কিশোর বলিল, সাতটা।

—কেন এত দেরি কেন? তোমাকে কি দিন বলা হয়েচে না, সন্দের আগে বাড়ি ফিরে আসবে, সকাল সকাল বাড়ি আস্‌তে পার না? কোথায় গিয়েছিলে?

কিশোর বলিল, খেল্‌তে।

—ফের ঐ বদ্ ছেলেগুলোর সঙ্গে তুমি খেল্‌তে যাও? আর যে দিন শুনুব সে দিন তোমায় আস্ত রাখব না। পড়াশোনার নাম নেই, রাত্তির আটটা অব্দি বাইরে থাকবে। যাও পড়গে যাও।

কিশোরের গলার উপর যেন কি উঠিয়া আসিল, বুকের উপর যেন পাথর চাপাইয়া দিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া পড়িতে একটুও ইচ্ছা করে না। মন তিক্ত হইয়া উঠে। দাদা বেড়াইয়া আসিল। দেখিতে পাইয়া বলিল, কি এখনও বইটা খুল্‌তে ইচ্ছে হচ্চে না? পড় শীগগীর। তবুও পড়ে না। হঠাৎ মাথার উপর একটা প্রচণ্ড চড় পড়িল। দাদা বলিল, পড়বে না? কেমন না পড় দেখব। মারের চোটে সব ঠিক ক'রে দোবো। খোলো শীগ্‌গীর বই। কিশোরের নিঃশ্বাস আটকাইয়া আসিল, ভিতরে কি একটা যেন বই খুলিতে দেয় না। দাদা বলিল, এখনও বই খুল্‌লে না? কিশোর সমস্ত বুকটা জোরে চাপিয়া বই খুলিল। দাদা চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, এবার হাকিং ষ্টিক দিয়ে চাবকাব, কেমন না পড়া হয় দেখবো। কিশোর ঠায় বসিয়া রহিল। আর কেহ আসিল না। খানিক পরে খাইতে গেল। খাইতে বসিয়া আবার একচোট হইল। কিশোর কি রকম হইয়া গেল। রাগও হয় না, কান্নাও পায় না, বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

ঘুম পাইতে লাগিল। উপরে উঠিয়া আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়া পড়িল। অন্ধকার ঘর, চোখ বুজিলে আরও অন্ধকার হইয়া যায় মনে হয়। বুকের ভিতরটা কিসে ভরিয়া আসে, আপনি চোখ দিয়া জল পড়িতে

থাকে। হঠাৎ-মুদ্রিত চোখে দেখিতে পাইল, একটা উজ্জ্বল আলো সন্ধ্যাতারার মত অন্ধকার ভেদিয়া জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। ছোট তীক্ষ্ণ আলো বড় হইতে থাকে, উজ্জ্বলতর হয়, ধীরে ধীরে কাছে আসিতে থাকে। কাছে, আরও কাছে···তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণতর···চোখ ঝলসিয়া যায়, সমস্ত ডুবাইয়া দেয়, শুধু আলোর আলো, দু'খানি হাত তাকে তুলিতেছে বুকের কাছে,···আঃ—জুড়াইয়া যায়, চোখের জল বাধা মানে না। তার মধ্যে ধীরে ধীরে আপনি অদৃশ্য হইয়া যায়।

জাগিয়া উঠিল, সকাল হইয়া গিয়াছে। দেখে কর্ত্তা ডাকিতেছেন, বেলা হ'য়ে গেছে, এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস্। ওঠ্, পড়্‌গে যা।

বর্ত্তমান পূর্ব্বদিনেরই আবৃত্তি।

বিকালে ইস্কুল হইতে আসিতেই মা বলিলেন, কিশোর আজ আর কোথাও যাবি না। বাড়িতে থাক্।

বাহির হইবার জন্য দু-একবার উসখুস করিল। কিন্তু যাইতে হইলে সেই মার সামনে দিয়া যাইতে হইবে। দু'এক বার এধার ওধার ঘুরিল। বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে না। পাঁচিলের গায়ে রোদ লাল হইয়া আসিল। শেষকালে মিলাইয়া গেল। নীচে রান্নার শব্দ হইতেছে, উঠানে বাসন মাজার শব্দ,···দিনের উজ্জ্বলতা নাই, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারও আসে নাই। কিশোর ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারিল না, প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিল।

ছাদে উঠিয়া গেল। এখানে যেন তবু একটু নিঃশ্বাস ফেলা যায়। আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে এক টুকরাও মেঘ নাই। শুধু নীল আকাশ,—দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে। পিছন দিকে তাকাইয়া দেখিল উত্তর দিগন্তে কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, আকাশময় এত নীলিমার দিকে চাহিলে মনে হয় যেন এত নীল নির্ম্মলতার মধ্যে কোথাও কালো মেঘ থাকিতে পারে না, থাকা তাহার সঙ্গত নয়। সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে; দূর গাছের মাথায়, বাড়ির ছাদের উপর, রাস্তার উপর—সমস্ত ব্যাপিয়া ধোঁয়ার মত যেন একটা নীল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, উনান ধরিবার ঠিক আগে যেমন খুব অস্পষ্ট নীল ধোঁয়া বাহির হইতে থাকে, ঠিক সেই রকম। আলো-জ্বালা গ্যাসের চারিধারে এই নীল যেন বেশী করিয়া রহিয়াছে। অস্পষ্ট। চোখ বড় করিয়া স্পষ্ট করিয়া দেখিতে গেলে তাহা মিলাইয়া যায়। ঐ তেল কলটার চিম্‌নী থেকে যে ঘন কালো ধোঁয়া উঠিতেছে তাহার মত নয়। বাতাসে কাদের বাড়ি হইতে ঘড়ির আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, দু-একটা শাঁখের শব্দ যেন নরম শ্যাওলার উপর দিয়া চলিয়া কানে বাজিতেছে। কিশোরের কি রকম মনে হইতে লাগিল, ঠিক বুঝিতে পারিল না। শুধু এমন সন্ধ্যা, নীল আকাশ, আর ঐ ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট নীল—দেখিলেই তার যেন মা'র কথা মনে পড়িয়া যায়। ধমক-দেওয়া মূর্ত্তি মা নয়—যে মা'র মূর্ত্তি সে এখন দেখে সে মা নয়—এ যেন করসা শাড়ী পরা বিশেষ সুরে স্তোত্র পাঠ-রতা মা। একটা জিনিষ চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। বেশ মনে পড়ে এই ত সেদিন, দেশের বাড়িতে থাকিতে সন্ধ্যা আসিয়াছে, ঠিক এইরকম অস্পষ্ট নীল চারিদিকে যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক স্তব্ধ। শুধু ঘোষেদের বাগানের ঐ গাছগুলার মাথায় একটা সজীব অন্ধকার পড়িয়া রহিয়াছে। সে আর মা দক্ষিণ দিকের বারান্দায়, মার কোলে মাথা রাখিয়া সে চুপ করিয়া শুইয়াছিল, মা তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে কেমন এক বিশেষ সুরে স্তোত্র পড়িতেছিলেন। সে সুর তাহার এখনও মনে আছে। দাদাকে—দাদাও তখন ছোট ছিল তাহার মত—দাদাকে লইয়া শত্রুঘ্ন চাকর বেড়াইতে গিয়াছে। ঘোষেদের বাগানের অন্ধকারের পার হইতে দাঁয়েদের ঠাকুরবাড়ির আরতির শব্দ হইতেছিল, ঘড়ি বাজিতেছিল, ঘণ্টা বাজিতেছিল। শব্দ যেন সেই সন্ধ্যার মত শান্ত ঐ অন্ধকারের মাথার উপর দিয়া পা টিপিয়া আসিতে-ছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ। আকাশের গায়ে একটা বড় তারা কেবল মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহারও আলো যেন এই সন্ধ্যার সহিত খাপ খাইয়া গিয়াছিল। ···কেবল সে আর মা সেদিন সন্ধ্যায় সেখানে বসিয়াছিল, দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল,—সে আর মা ···

কিশোর একদৃষ্টে আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল, বুক

যেন কিসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তারপর চোখ নামাইতেই নজরে পড়িল একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। সিঁড়ির কাছে আসিতে দেখিল মা রান্নাঘরের দিকে যাইতেছেন। কিশোরের ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া মাকে এক্ষুণি জড়াইয়া ধরে। কিন্তু...

মা'র তার উপর চোখ পড়িল, বলিলেন, কি হচ্ছিল এতক্ষণ হাঁ করে ছাতে? লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বাড়ি থাকলেও কি ঠিক সময়ে পড়্‌তে বস্‌তে নেই? ঘড়ির দিকে একবার তাকাও, দেখ সাড়ে সাতটা বেজেচে।

মন্দির নিমেষে ভাঙিয়া চুরিয়া বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ভরা বুক এক ফুঁয়ে যেন শূন্য, উষর হইয়া গেল। ধ্বংসের একটা কণাও থাকিল না। মা বলিলেন—কি, এখনও হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েচ? ধড়মড় করিয়া টেবিলে গিয়া বসিল। কিন্তু বসিয়া থাকিলে চলিবে না, পড়িতে হইবে, এগ্‌জামিনে পাশ করিতে হইবে।

যাত্রারম্ভের পথপার্শ্বের সম্পদ শুকাইয়া মরিতে থাকে। তাহাতে কি?

দিন চলিতে থাকে।

মধ্যযুগে দক্ষিণ-ভারতে বাঙালীর প্রভাব

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

বাঙালী বহুকাল দক্ষিণীদের নিকট যুদ্ধে ও ক্ষাত্রবলে পরাজিত হইয়াছে। চালুক্য-বংশ-গৌরব প্রথম কীর্ত্তিবর্ম্মণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারতে বাদামীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। মহাকূটের স্তম্ভলিপি* হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি এক সময়ে বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বাদামীর চালুক্যদের অধঃপতনের পর রাষ্ট্রকূটেরা দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য স্থাপন করে। উক্ত বংশের নৃপতি ধারাবর্ষ উত্তরাপথ আক্রমণ করিলে পাল-সম্রাট ধর্ম্মপাল (খ্রীঃ ৭৭০-৮১৫) গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের ভিতর দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।† ধারাবর্ষের পরবর্ত্তী রাজা তৃতীয় গোবিন্দ (খ্রীঃ ৭৯৫-৮১৪) পুনরায় উত্তর-ভারত আক্রমণ করিলে ধর্ম্মপাল ও তাঁহার আশ্রিত কনৌজের অধিপতি চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূটাধীশ্বরের নিকট মস্তক অবনত করেন।‡ এই ধর্ম্মপালের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট বাংলা দেশে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। গোবিন্দের উত্তরাধিকারী অমোঘবর্ষের (খৃষ্টীয় ৮১৪-৮৭৮) সমসাময়িক ছিলেন ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল। সিরুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপি* হইতে পাঠোদ্ধার হইয়াছে যে বঙ্গাধীশ (দেবপাল), অমোঘবর্ষকে বিশেষ সম্মান দেখাইতেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চালুক্যেরা রাষ্ট্রকূটদের ধ্বংসসাধনপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে পুনরায় তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করে। এই বংশের নৃপতি ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (খ্রীঃ ১০৭৬-১১২৬) তৃতীয় বিগ্রহপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন।† তাঞ্জোরের অধিপতি রাজেন্দ্র চোল (খ্রীঃ ১০১২-১০৫২) রাঢ় ও বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে পাল-সম্রাট মহীপাল হস্তী হইতে অবতরণপূর্ব্বক রণে ভঙ্গ দেন এবং বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্র পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন।‡ এইরূপে কয়েক শতাব্দী পরাভূত হইবার পর বাঙালী অবশেষে দক্ষিণীদের দাসত্ব স্বীকার করে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ম্মণ-বংশীয় রাজগণ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা কলিঙ্গের

* *Bombay Gazetteer*, Vol. I, part II, p. 345.
† Sanjan Copper Plate of Amoghavarsa, *Epigraphia Indica*, Vol. XVIII, p. 252.
‡ *Ibid.*, p. 254.

* *Indian Antiquary*, Vol. XIII, p. 215.
† বিহ্লন কৃত বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৭৪ শ্লোক।
‡ *Epigraphia Indica*, Vol. IX, p. 233.

অন্তর্গত সিংহপুরের অধিপতি ছিলেন।* সেন-বংশীয় রাজগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার রাজা ছিলেন।† তাঁহারাও কর্ণাটদেশ হইতে তথায় আগমন করিয়াছিলেন।

ছয় শত বৎসরের ইতিহাস বাঙালীর দক্ষিণীদের কাছে পরাজয়ের কথাই বলিয়া যাইতেছে—দক্ষিণীদের আধিপত্য ও রাজনৈতিক প্রভাব বাঙালী সহ্য করিয়াছে, কিন্তু বিজিত বাঙালীকে দক্ষিণীরা ধর্ম্ম ও কৃষ্টি সাধনায় গুরু বলিয়া অনেকবার মানিয়া লইয়াছে, এবং একজন বাঙালী আচার্য্যের পদতলে ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছে। এই চিরস্মরণীয় বাঙালীর নাম বিশ্বেশ্বর শম্ভু। তিনি গৌড় দেশের অন্তর্ভুক্ত রাঢ়ের অন্তঃপাতী পূর্ব্বগ্রামের (বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়) অধিবাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্বেশ্বর শম্ভুর আবির্ভাব হয়। তিনি নিষ্ঠাবান শৈব ছিলেন এবং নর্ম্মদাতীরে ডাহল মণ্ডলের প্রখ্যাত গোলকি মঠের আচার্য্য পদ লাভ করিয়াছিলেন। ডাহল-মণ্ডলের শৈবাচার্য্যদের আদিগুরুর নাম দুর্ব্বাস শৈবাচার্য্য সদ্ভাব শম্ভু সুপ্রসিদ্ধ গোলকি মঠ স্থাপন করেন এবং ত্রিপুরীর কলচুরি-রাজ প্রথম যুবরাজের (খ্রীঃ ৯২৫-৯৫০) নিকট হইতে তিন লক্ষ গ্রাম দান-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মঠের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ঐ গ্রামসকল উৎসর্গ করেন। তৎপর রামশম্ভু, শক্তিশম্ভু, কেরল-নিবাসী বিমলশম্ভু ও তাঁহার শিষ্য ধর্ম্মশম্ভু গোলকি মঠের আচার্য্য হইয়াছিলেন, আর এই ধর্ম্মশম্ভুর শিষ্যই বাঙালী বিশ্বেশ্বর শম্ভু। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্বার্দ্ধে বিশ্বেশ্বর শম্ভুর ন্যায় বিখ্যাত জনপ্রিয় শৈবাচার্য্য আর কেহই ছিলেন না। কাকতিয়-বংশের রাজা গণপতি (খ্রীঃ ১২১৩-১২৫০) তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রভূত সম্মান দানে তাঁহাকে নিজরাজ্যে আনিয়া রাখেন। তিনি পিতৃজ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতেন। চোল, মালব এবং কলচুরি-রাজগণও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। এই বিদ্যোৎসাহী গণপতিরাজ গৌড় দেশ হইতে আগত বহুসংখ্যক শৈবাচার্য্য ও কবিবৃন্দকে প্রচুর উপহার-দানে ভূষিত করেন।

কর্ণভূষণে অলঙ্কৃত, সোনালি রঙের জটাজুটে মস্তক মণ্ডিত এবং কণ্ঠাবরণে ভূষিত বিশ্বেশ্বর শম্ভু যখন গণপতি রাজপ্রাসাদস্থ বিদ্যামণ্ডপে উপবিষ্ট থাকিতেন তখন শত শত নরনারী "শম্ভু" জ্ঞানে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইত। ১১৮৩ শকাব্দে, খ্রীঃ ১২৬১ অব্দে গণপতিরাজ-দুহিতা রুদ্রদেবী বিশ্বেশ্বর শম্ভুকে মন্দার গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাহা বেল-নানরু বিষয়ের অন্তঃপাতী কণ্ডুবাটীর অন্তর্গত ছিল। মন্দার গ্রামের বর্ত্তমান নাম মন্দোদম। বেলঙ্গপুণ্ডি গ্রামও তাঁহাকে দান করা হইয়াছিল।

বিশ্বেশ্বর পরহিতব্রত ও ধর্ম্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। মন্দার গ্রামে তিনি গোলকি-সম্প্রদায়ের জন্য একটি মন্দির, একটি বিহার ও একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করেন এবং সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ আনিয়া স্থাপন করেন। তিনি গ্রামটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "বিশ্বেশ্বর গোলকি" রাখেন এবং এই গ্রামে ও বেলঙ্গপুণ্ডি গ্রামে ষাট ঘর দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ স্থাপন করেন। উক্ত ব্রাহ্মণদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ভূমি দান করা হয়। উল্লিখিত গ্রাম দুইটির অবশিষ্টাংশ সাধারণ শৈবমঠের পরিপোষণার্থ, শুদ্ধ শৈবমঠের ছাত্রবর্গের ভরণপোষণের জন্য, সন্তান-প্রসবের ও অন্যান্য হাসপাতালের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রদান করা হয়। গ্রামে গোলকি মঠ ভিন্ন একটি সাধারণ ও আর একটি শুদ্ধ শৈব মঠ অবস্থিত ছিল।

বিশ্বেশ্বর প্রসূতিদের সাহায্যার্থ গ্রামে একটি মেয়ে-হাসপাতাল খুলিয়াছিলেন। গ্রামস্থ কালামুখ শৈবদের ভরণপোষণেরও তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষকদের ভরণপোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি দান করেন। ঋক্‌, যজুঃ, সাম বেদ অধ্যাপনার জন্য পাঁচ জন শিক্ষক তিনি নিযুক্ত করেন। দশজন নর্ত্তকী, আটজন বাদ্যকর, একজন কাশ্মীরী গায়ক, চতুর্দ্দশজন সাধারণ গায়িকা, একজন পাচক ব্রাহ্মণ এবং চারি জন ভৃত্য সাধারণ শৈবমঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চোলদেশ হইতে আগত কতিপয় লোককে গ্রামের

---

* *Indian Historical Quarterly*, Vol V. pp. 224 *ff.*
† *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. V. (N. S.), p. 471.

চৌকিদার নিযুক্ত করা হয়—ইহাদের বীরভদ্র বলা হইত। অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত স্বর্ণকার, তাম্রকার, মিস্ত্রি, কুম্ভকার, রাজমিস্ত্রি, সূত্রধর, ও ক্ষৌরকার বসবাস করিত।

বিশ্বেশ্বরের জন্মভূমি রাঢ়ের পূর্ব্বগ্রাম হইতে বহু বাঙালী আসিয়া বিশ্বেশ্বর গোলকি গ্রামে বাস করেন। এই বাঙালীদের মধ্য হইতে কতিপয় ব্যক্তি গ্রামের আয়-ব্যয় তত্ত্বাবধানের ও হিসাবরক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল বর্ণের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তিনি অন্নসত্র খুলিয়া দিয়াছিলেন।

বিশ্বেশ্বর আদেশ দিয়াছিলেন যে মন্দির, ধর্ম্মশালা, বিহার ও গ্রামের অন্যান্য অনুষ্ঠানের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক গোলকি-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবে। অন্যায় কর্ম্মের জন্য তত্ত্বাবধায়ককে অপসৃত করা ও উপযুক্ত লোককে সেই পদে পুনর্নিয়োগ করার ক্ষমতা সমগ্র শৈবধর্ম্মাবলম্বীদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বর শম্ভুর দানপত্রের সর্ত্তগুলি সুচারুরূপে পালন করার জন্য একজন কর্ম্মচারীকে এক শত 'নিষ্ক' বেতনে নিযুক্ত করা হয়। বিশ্বেশ্বরের কর্ম্মানুষ্ঠান মন্দার গ্রামের বাহিরে অন্ধ্র দেশের অনেক স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। অন্ধ্র দেশের বহুস্থানে তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কালীশ্বর গ্রামে তিনি একটি বিহার স্থাপন করিয়া উহার নাম উপলমঠ রাখেন; উহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত পোন্নগ্রাম দান করেন। মন্ত্রকূটে বিশ্বেশ্বর মঠ নামে একটি মঠ স্থাপন করিয়া তিনি উহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দির ও তৎসংলগ্ন অন্নসত্রের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মানেপল্লি ও উটপল্লী গ্রামদ্বয় দান করেন। তিনি চন্দ্রবল্লি নগরীতে আরও একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থানীয় একটি দীঘিকার আয়তন বৃদ্ধি করেন এবং তাহার আয়ের অর্দ্ধেক উক্ত শিবমন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রদান করেন। বিশ্বেশ্বর প্রাচীন আনন্দপদ নগরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় নামানুযায়ী উহার নাম রাখেন বিশ্বেশ্বর নগরী। এই স্থানে তিনি একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে মুনিকুটপুর এবং আনন্দপুর দান করেন।

কোম্মগ্রামে এবং উত্তর-সোমশিলায় তিনি আরও দুইটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ঐত্তপ্রোলু গ্রাম অর্পণ করেন। শ্রীশৈলের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত এনিশ্বরপুরে তিনি একটি মঠ স্থাপন করেন। কাকতিয়-বংশের গণপতিরাজ এই মঠের অন্তর্ভুক্ত অন্নসত্রের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অবারী-গ্রাম দান করেন এবং দক্ষিণা-স্বরূপ স্বীয় গুরু বিশ্বেশ্বরকে পলিনাড়ু বিহারের অন্তর্গত কণ্ডুকোট গ্রাম দান করেন। বিশ্বেশ্বর শম্ভু যে-মঠের আচার্য্য সেই গোলকি মঠের প্রভাব তাঞ্জোর ও টিনেভেলি জিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার দেহরক্ষার পর প্রিয় শিষ্য কাশীশ্বর গোলকি মঠের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করেন। বিশ্বেশ্বর শম্ভুই দক্ষিণ-ভারতে প্রথম বাঙালী ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন না। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে গৌড়ের অধিবাসী বাঙালী বৌদ্ধশ্রমণ অবিঘ্নাকর* কোঙ্কন প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। তৎকালীন কোঙ্কন প্রদেশ রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের (৮১৫-৮৭৯ খ্রীঃ) করদরাজ্য কপর্দ্দিনের অধীনে ছিল। অবিঘ্নাকর স্বীয় প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তিতে কোঙ্কনের অন্তর্গত কৃষ্ণগিরিতে কতিপয় বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অনেক অর্থ দান করেন।

বিশ্বেশ্বর শম্ভুর নাম আজ বাঙালী ভুলিয়া গিয়াছে। সেই মহাপুরুষ বাঙালীর অধ্যাত্ম সাধনা, কর্ম্মশক্তি, জনসেবার আদর্শ সুদূর দাক্ষিণ দেশেও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং তথাকার অধিবাসীদের শৈব-সাধনায় দীক্ষা দিয়াছিলেন। মধ্যযুগে যেমন দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান বাংলার সভ্যতার প্রদীপ তিব্বতে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন সেইরূপ বিশ্বেশ্বর শম্ভু বাংলার জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত আলোকিত করিয়াছিলেন।†

* *Indian Antiquary*, Vol. XIII, p. 134.

† বিশ্বেশ্বর শম্ভুর জীবন বৃত্তান্ত মাদ্রাজের গাণ্টুর জেলার অন্তর্গত মালবনপুরম গ্রামে আবিষ্কৃত অপ্রকাশিত স্তম্ভলিপি অবলম্বনে লিখিত। *Cf. Annual Report of the South Indian Epigraphy*, 1917, p. 123.

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের একটি কবিতা

কলিকাতার সেনেট হাউসে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তাঁহার বাল্যকালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

ইতিপূর্ব্বেই কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত হ'ত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ ব'লে গণ্য। পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকার-বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম।......ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।

এই প্রতিভাষণের অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন :—

দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকলীর মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত। তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়," গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কী ক'রে," বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।"

সেই হিন্দু মেলার যুগে সাতান্ন বৎসর পূর্ব্বে তের বৎসর কয়েক মাস বয়সে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রচিত একটি কবিতা ১২৮১ সালের ১৪ই ফাল্গুন (২৫এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকা হইতে নীচে উদ্ধৃত হইল। তখন অমৃত বাজার পত্রিকা দ্বিভাষিক (ইংরেজী ও বাংলা) কাগজ ছিল। শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষের নিকট রক্ষিত পুরাতন অমৃত বাজারের ফাইল হইতে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিতাটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

হিন্দুমেলায় উপহার

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা ;
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল ;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূরণিমা রাত—চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর, কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেনরে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির,
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

৬

তখন ও হাসি লেগেছিলো ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিলো ভাল,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেত্রের মত।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

৮

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুসি আর লাগে না ভাল।

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক্ মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্;

১০

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১১

চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্ম-ভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

১২

দেখেছি সে দিন যবে পৃথিরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

১৩

দেখেছি সে দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীর বালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময়;
যদিও তাদের চিতা ভস্মরাশি
মাটীর সহিত মিশায়ে গেছে!

১৫

আবার সে দিন (ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ ভারতভূমি
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন!
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে,)
স্বাধীন নৃপতি আর্য্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা!

১৭

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি,
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে!

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবিরে পুনঃ,
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতি পটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

২০

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক মেঘে নিগমন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

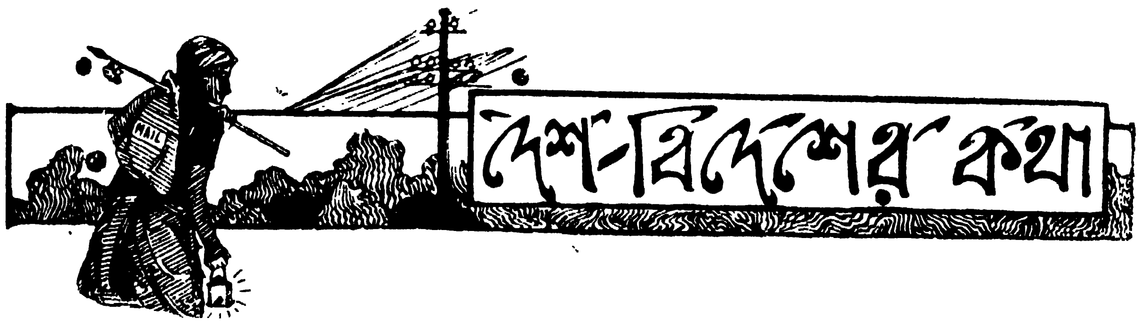
২১

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



ভারতবর্ষ

কংগ্রেস ও সরকার—

গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধীর যোগদান এবং ইহার শোচনীয় পরিণতির কথা আমরা গত মাসে বিবৃত করিয়াছি। ভারতবর্ষের অসহিষ্ণু অত্যাগ্রগর দল স্থানে স্থানে রাজকর্ম্মচারীদের হত্যা ও হত্যার চেষ্টা করায় মহাত্মা গান্ধীর বিলাত-প্রবাস কালেই বাংলা দেশে অতিরিক্ত অর্ডিন্যান্স জারি হয় এবং ইহাতে সাধারণের স্বাধীনতার অবশেষটুকুও নষ্ট হইয়া যায়। ১৯৩০ সনে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীদের কেহ কেহ ধৃত না হওয়ায় বাংলা সরকার এক বিশেষ অর্ডিন্যান্স দ্বারা চট্টগ্রামের অন্যূন পঞ্চাশটি গ্রামে—যেখানের অধিবাসীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী আসামীদের কাহাকে কাহাকে ও আশ্রয় প্রদান করিয়াছে বলিয়া সন্দিগ্ধ—পিটুনি পুলিশ ও সৈন্য মোতায়ন করা হইয়াছে। গ্রাম হইতে শহরে গমনাগমনকারীদের বাসে-গাড়ীতে পর্য্যন্ত সার্চ্চ করা হইতেছে। চট্টগ্রাম হইতে কোনও সংবাদ বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত বহির্জগতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার রীতি উঠিয়া গিয়াছে। ও-দিকে আগ্রা-অযোধ্যার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অবস্থাও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। বারদোলী ও যুক্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে অনাদায়ী খাজানা আদায় করিতে গিয়া সরকার দিল্লীর গান্ধী-আরুইন চুক্তি ভঙ্গ করিলে কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। তখন কংগ্রেসের মুখপাত্র মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট লর্ড উইলিংডনের মধ্যে এই মর্ম্মে আপোষ-নিষ্পত্তি হয় যে, বারদোলীতে সরকারের কর্ম্মচারীদের অনাচারের প্রকাশ্য তদন্ত হইবে, এবং যুক্তপ্রদেশের কৃষককুলের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর আদায় করা হইবে। মহাত্মা গান্ধীর বিলাত গমনের পর বারদোলীর তদন্ত কমিটি আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু তদন্তকারী মিঃ গর্ডনের সঙ্গে কংগ্রেস পক্ষীয় উকীল শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইর মতান্তর হওয়ায় কংগ্রেস আর তদন্ত ব্যাপারে যোগদান করেন নাই। বার বার অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও যখন সরকার কর্ত্তৃক যুক্ত প্রদেশের কৃষক-কুলের দুর্দ্দশা অপনোদনের কোনরূপ ব্যবস্থা হইল না তখন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, মিঃ সেরবানি প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা কর-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভের আয়োজন করেন। যুক্তপ্রদেশের সরকার বাংলা অর্ডিন্যান্সের অনুযায়ী অর্ডিন্যান্স করিয়া আন্দোলন বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং নেতারাও অবিলম্বে কারারুদ্ধ হইলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৌলানা আব্দুল গফ্ফুর খাঁ (যিনি 'সীমান্তের গান্ধী' বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত) স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। ইহা সরকার মোটেই পছন্দ করিলেন না। আব্দুল গফ্ফুর গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা প্রতিপাদন করিয়া জনসভায় বক্তৃতা করেন। সীমান্তের চীফ্ কমিশনার আব্দুল গফ্ফুর খাঁকে এক দরবারে আহ্বান করিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; এই সকল কারণে সীমান্ত সরকার আব্দুল গফ্ফুর খাঁকে ২৫এ ডিসেম্বর (১৯৩১) গ্রেপ্তার করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মিটকিনাতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, এবং সেখানকার কংগ্রেস কমিটি, কংগ্রেসের অন্তর্গত 'রেড্ সার্টস্' নামধেয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী এবং যুবসমিতিগুলি সীমান্ত অর্ডিন্যান্স দ্বারা বেআইনী ঘোষিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সরকারের শক্তি যখন এইরূপ ভীষণাকারে প্রকটিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ২৮এ ডিসেম্বর তারিখে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই অবতরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের গুরুতর অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও বসে। মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই পৌঁছিয়াই বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য তার প্রেরণ করেন। বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটরী মহাত্মাকে জানান যে, দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য যে সমুদয় অর্ডিন্যান্স জারি করা হইয়াছে সে বিষয় আলোচনা করিতে বড়লাট রাজি নন, তবে গোলটেবিল বৈঠকে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান বিষয়ে সাহায্যার্থ গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে তিনি প্রস্তুত আছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টই বুঝিলেন, সরকারের মনোভাব গান্ধী-আরুইন চুক্তির সময় অপেক্ষা এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইতে সরকার এখন আর ইচ্ছুক নহেন। মহাত্মা গান্ধী যে গোলটেবিল বৈঠকে প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন যে, সেখানে কংগ্রেসকে জাতির প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান মনে না করিয়া একটা দলীয় সমিতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, গান্ধীজীর তারের উত্তরে বড়লাট তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কংগ্রেস উপায়ান্তর না দেখিয়া অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাবসহ আবার বড়লাটকে তাঁহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া তার প্রেরণ করেন। বড়লাটের উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আন্দোলন আরম্ভ স্থগিত থাকিবে, এবং উত্তর সন্তোষজনক হইলে আন্দোলন পরিত্যাক্ত হইবে ইহাও তারে উল্লিখিত ছিল। বড়লাট মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রাজি হইলেন না, উপরন্তু তাঁহাকে জানান হইল যে, নিরুপদ্রব আন্দোলনের জন্য তিনি ও কংগ্রেসই পুরাপুরি দায়ী হইবেন। বড়লাটের উত্তর পাইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনই একমাত্র পন্থা বলিয়া ধার্য্য করিলেন এবং সর্দ্দার বল্লভভাই পাটেলকে সর্ব্বাধ্যক্ষ (dictator) নিযুক্ত করিলেন।

কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর সরকার আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত আইন অমান্য আন্দোলন নির্ম্মূল করিবার জন্য বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতা ফিরিবার মুখে বোম্বাইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ধৃত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইয়াছেন। গত ৩রা জানুয়ারি রজনীযোগে মহাত্মা গান্ধী ও

...দার বল্লভভাই পাটেলকে ১৮২৭ সনের ৩ আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া যারবেদা জেলে আটক রাখা হইয়াছে। কংগ্রেসের পরবর্ত্তী ...ধ্যক্ষ বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ডাঃ আনুসারি একে একে ধৃত হইয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটি, জিলা ও তালুক কমিটি ও বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান (যথা—কলিকাতায় জাতীয় নারী-সংঘের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধাত্রীমণ্ডল ও নিমতলা ব্যায়াম সমিতি, এবং গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি) ও শ্রমিক দল (যথা—কলিকাতা জমাদার ইউনিয়ন) বেআইনী ঘোষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র নরনারী ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইতেছেন। অর্ডিন্যান্সের কৃপায় সংবাদপত্রেরও আজ মুখ বন্ধ। বিভিন্ন স্থানের আইন অমান্য আন্দোলনের সংবাদ আর পাওয়া একরূপ অসম্ভব। শান্তিপূর্ণ পিকেটিংও এখন বেআইনী।

কংগ্রেস কমিটিগুলি বেআইনী ঘোষণা করিয়াই সরকার ক্ষান্ত হন নাই, কংগ্রেসের মূল উচ্ছেদের জন্য তাহার টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ও বোম্বায়ের ব্যাঙ্কগুলির উপর গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে, কংগ্রেসের গচ্ছিত টাকা যেন হস্তান্তর না করা হয়।

এদিকে বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি প্রদেশের শাসন কর্ত্তারা দেশী-বিদেশী বণিক প্রধানগণকে দরবারে আহ্বান করিয়া নানা হিত কথা শুনাইতেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় তাঁহাদের সমূহ ক্ষতি, বয়কট আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রধানতম অন্তরায় ও সমাজস্থিতির মূলে কণ্টক প্রভৃতি নানা কথায় বণিকগণ চমৎকৃত হইতেছেন। সরকারের উদ্যোগ-আয়োজন দেখিয়া মনে হয়, মহাত্মা গান্ধীর ভারতবর্ষ ত্যাগের পর হইতেই মহামান্য সরকার বাহাদুর কংগ্রেসকে ধ্বংস করিবার নানা ফন্দী আঁটিয়াছিলেন।

বিলাতে বারট্রাণ্ড রাসেল, লাস্কি প্রমুখ মনীষিগণ এবং পার্লামেণ্টের মুষ্টিমেয় শ্রমিক সদস্য ভারত-সরকারের রুদ্রনীতির প্রতিবাদ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রক্ষণশীল দল ও রক্ষণশীল কাগজগুলি লর্ড উইলিংডন ও তাঁহার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মতৎপরতার জন্য এইন প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রক্ষণশীল দল যতদিন পার্লামেণ্টের কর্ণধার ততদিন ভারত-সরকারের নীতির পরিবর্ত্তনের আশা দুরাশা মাত্র।

মহাত্মা গান্ধী ও "অস্পৃশ্য" সমাজ—

বোম্বাইতে প্রায় পঞ্চাশটির অধিক অস্পৃশ্য সম্প্রদায় হইতে মহাত্মা গান্ধীকে অভিনন্দন পত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। মহাত্মাজীর উপর সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহারা বলেন,—"আমাদের এই বিশ্বাস, আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি এবং আপনিই আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা। আমরা অন্য হিন্দুদের পাশে দাঁড়াইয়া কংগ্রেসের নীতিকা প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্ব ভার বহন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি।"

মিঃ হাসান ইমামের সঙ্কল্প—

পাটনার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ হাসান ইমাম সাহাবাদ জেলার ...তে কৃষি-কার্য্য করিবার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার বিঘা জমী দিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঐ স্থানে যুবকগণকে উন্নত প্রণালীতে কৃষি-শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ভারতবর্ষে বিদেশী মাল কাট্‌তির বহর—

সহযোগী 'পল্লীবাসী' ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর যত বিদেশী মাল কাট্‌তি হয় তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন,—

প্রতি বৎসর আমরা বিদেশী সূচ কিনি ৫০ লক্ষ টাকার আর গুটী সুতা কিনি ২॥০ কোটী টাকার। আমাদের মা, বোনদের সধবার চিহ্ন সিঁথির সিঁদুরটুকু বজায় রাখিতে তাঁরা বিদেশকে দেন প্রতি বৎসর একুশ লক্ষ টাকা।

বিলাস ও বাবুগিরির জন্য ব্যয়—

সাবান	৭০	লক্ষ টাকার
সুগন্ধি তেল	১৬	" "
স্নো	১৪	" "
পাউডার	২২	" "
এসেন্স	১৫	" "
মাথার ফিতে	৮॥০	" "
চুলের কাঁটা	১৫	" "
সেফটিপিন	৩॥০	" "
তাস	২১	" "
চুলের ব্রাস	৩॥০	" "
টুথ ব্রাস	২॥০	" "
পুঁতির মালা ও ঝুটামুক্তা	৭৭	" "
বিদেশী চুড়ী	৭৭	" "
লজেঞ্জেস	২৭	" "
বিস্কুট ও কেক	৫৭	" "

নেশার বহর—

সিগারেট	২	কোটি টাকার
সিগার	৬	লক্ষ টাকার
চুরুটের মসলা	৬০	" "
চুরুটের সরঞ্জাম	৪॥০	" "

বিদেশী বাসনকোসন—

চীনা বাসন	৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার	
এনামেল	৪॥০ লক্ষ টাকার	
এলুমিনিয়ম	২॥০ " "	
চায়ের বাসন	১॥০ " "	

অন্যান্য বিদেশী জিনিষ—

কাপড়	৬২ কোটি টাকার	
বারুদ	৫ লক্ষ টাকার	
বোতাম	৫২ " "	
চিরুণী	২৬ " "	
জুতার ফিতা	১৬॥০ " "	
কাপড় কাচা সাবান	১॥০ কোটী টাকার	
কাগজ	৩ " "	
চিনি	১৮ " ২০ লক্ষ টাকার	
ছাতা	১০ লক্ষ টাকার	
ছাতার সরঞ্জাম	৫১ " "	
হারিকেনের কাঁচ	২৫ " "	
ষ্টোভ	১১	
টর্চ্চ	১০	
ব্লটিংপেপার	৩॥০	
চিঠির কাগজ ও খাম	৩৬	

রুলপেন্সিল	১১	লক্ষ টাকার
শ্লেট পেন্সিল	২৷৷০	” ”
শ্লেট	৬৷৷০	” ”
কলম	১০	” ”
চুরী	৩৪	” ”
কাঁচি	১০	” ”
জুতার কালি	১৭	” ”
গঁদ	২১	” ”
শাঁক	২৷৷০	” ”
কড়ি	১	” ”
জমাট দুধ হর্‌লিকস্ ইত্যাদি	১ কোটী ৫ লক্ষ টাকার	
বিদেশী শিশুখাদ্য	১ কোটী ১০ লক্ষ টাকার	
গুড়	২৫ লক্ষ টাকার	
লেসবোনা সূতা	৩০	” ”
তালা	১৷৷০ কোটী টাকার	
লোহার সিন্দুক	৩০ লক্ষ টাকার	
শিশি বোতল	৩৬	” ”

—

বাংলা

মুসলমান মহিলার নেতৃত্ব—

বেগম কুলসুম খাতুন সাহেবা সিরাজগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ নেতা সৈয়দ আসাদউদ্দৌলী সিরাজী সাহেবের সহধর্ম্মিণী। সম্প্রতি ইনি স্বামীর পরিবর্ত্তে পঞ্জাব রিফর্ম্ম ইউনিয়নের বাৎসরিক অধিবেশনে সভানেতৃ পদে বৃতা হইয়াছেন। ইনিই প্রথম বাঙালী মুসলমান মহিলা যিনি বাংলার বাহিরে রাষ্ট্রীয় কার্য্যে যোগদান করিবেন। ইনি সংস্কৃত লইয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলায় ওড়িয়ার সংখ্যা—

শ্রীযুক্ত রামানুজ কর আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ওড়িয়ারা আন্দোলন করিতেছেন। গত সেন্সাসে মেদিনীপুর জেলার ওড়িয়ার সংখ্যা কত হইয়াছে জানিতে পারিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মেদিনীপুর জেলার কোন অংশের উপর উড়িষ্যার দাবী টিকিতে পারে না।

গত ১৯৩১ সালে মেদিনীপুর জেলায় লোক-সংখ্যা ছিল, ২৭,৯৯,০৯৩। ইহার মধ্যে ওড়িয়ার সংখ্যা ৪৫,১০১ অর্থাৎ এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে ওড়িয়া ১৬ জন মাত্র। মেদিনীপুর জেলা ৫টি মহকুমায় বিভক্ত। এই সকল মহকুমার লোক সংখ্যার অনুপাতে ওড়িয়ার সংখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মহকুমা	লোকসংখ্যা	ওড়িয়ার সংখ্যা	হাজার প্রতি ওড়িয়ার সংখ্যা
সদর	৮,৫৫,৩৮৫	৩১,৯৭৩	৩৭
ঝাড়গ্রাম	৩,৮৮,৫০২	৭,০৫৭	১৮
কাঁথি	৬,৩২,৮৬৪	৪,৪২৬	৭
তমলুক	৬,৪২,৯৫২	১,০১৯	২
ঘাটাল	২,৭৩,৩০১	১৩৪	০

কয়েকটি থানার সংখ্যাও দেওয়া হইল

মেদিনীপুর	৭৪,৪২৩	৯৬৬	১৩
মেদিনীপুরসহর	৩১,৫০৯	৯০৩	২৯
খড়্গপুর	১,৩৩,৬৫৩	৪,৫২৭	৩৪
নারায়ণগড়	৬৫,৯২১	১,০৩৫	১৬
দাঁতন	৮৭,৪৯৮	২৩,৫৯০	২৭০
মোহনপুর	২৮,১০২	৮৮০	৩৭
নয়াগ্রাম	৫০,৯৯৩	৪,৬৭৬	৯৩
গোপীবল্লভপুর	১,২১,১৮৫	১,৫৫২	১৩
কাঁথী	১,৬৬,৮৪৭	১,০২৪	৬
রামনগর	৮,৪৮১৮	১,৬০১	১৯
পটাশপুর	৯৫,১৪৩	৭২১	৮
ভগবানপুর	১,১৪,৭৯১	৬৯৬	৬

মেদিনীপুর জেলায় ওড়িয়ার সংখ্যা পুরুষ ২৩,৬৮৪ স্ত্রীলোক ২১,৪১৭ ; সদর মহকুমায় পুরুষ ১৭,৫৯৩, স্ত্রীলোক ১৪,৩৮০ ; ঝাড়গ্রাম মহকুমায় পুরুষ ৩,৩০৪, স্ত্রীলোক ৩,৭৪৭ ; তমলুক মহকুমায় পুরুষ ৭০৩, স্ত্রীলোক ৩,১৬, কাঁথীতে পুরুষ ১,৬৭৭, স্ত্রী ২,৭৪৯ ; ঘাটালে পুরুষ ১২৮ স্ত্রী ৬ ; দাঁতন থানায় পুরুষ ১২,১২৫, স্ত্রী ১১,৪৬৫ ; মোহনপুরে পুরুষ ৫৩৬, স্ত্রী ৩৪৪ ; গোপীবল্লভপুর পুরুষ ৫৮৮, স্ত্রী ৯৬৪ ; নয়াগ্রামে পুরুষ ২,২৪৮, স্ত্রী ২,৩৯২।

মেদিনীপুর থানায় ৯৬৬ জন ওড়িয়ার মধ্যে ৯০৩ জন মেদিনীপুর শহরে বাস করে। খড়্গপুর থানার ৪,৫২৭ জন ওড়িয়ার মধ্যে ৩,১২৬ জন খড়্গপুর রেলওয়ে উপনিবেশে এবং ১,১২০ জন খড়্গপুর শহরে বাস করে।

শ্রীমতী জাহান্ আরা বেগম চৌধুরী—

গত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে শিশুদের পক্ষ হইতে শ্রীমতী জাহান্ আরা বেগম চৌধুরী কলিকাতা সেনেট হলের সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে এক অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।



শ্রীমতী জাহান্ আরা বেগম চৌধুরী

বিলাতে বাঙালী অধ্যাপক—

শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, এম্‌-এ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা



শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, এম-এ

কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত "স্কুল অব অরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজ" বিভাগে বাংলার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে বাঙালী নিয়োগ এই প্রথম।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ—

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন হইতে শিক্ষকতা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য সুইডেনের 'পেডাগোগিক্যাল স্লাস্ সেমিনারিয়াম' নামক শিক্ষক-কলেজে গত ১৯২৮ সনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ডাঃ হোমের তত্ত্বাবধানে স্লোয়ড সিস্টেম (Slojd system) এক বৎসর অধ্যয়ন



শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

করিয়াছেন। এ বিষয় শিক্ষায় ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই অগ্রণী। সুইডেন সরকারের সাহায্যে তথাকার অন্ততঃ দুই শত শহর দর্শনের এবং নানা লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সুইডেনবাসীর শিক্ষা ও কৃষ্টি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছে। এই সময়ে অন্তর্জাতিক ভাষা এস্‌পেরান্টো শিক্ষা করায় তিনি ইউরোপের নানা স্থানে, বিশেষতঃ মধ্য ইউরোপের পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক রাজ্য-গুলিতে ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। লক্ষ্মীশ্বর বাবু ব্রিটিশ এস্‌পেরান্টো সমিতির একজন সভ্য।

মহিলা-সংবাদ

আহ্‌মেদাবাদ বনিতা-বিশ্রাম—

১৯০৫ সনে মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় পতি-বিয়োগ হইলে শ্রীমতী সুলোচনা দেশাই সমাজ-সেবায় মনোনিবেশ করেন। পর বৎসর তিনি দশ বৎসরের একটি বিধবা বালিকাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া বিধবাশ্রমের পত্তন করেন। তিনি সরস্বতী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় এক জন পণ্ডিতের সহায়তায় নারীগণের মধ্যে ভগবদ্‌গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনার সূত্রপাত হয়। এই সরস্বতী-মন্দিরই কিছুকাল পরে বনিতা-বিশ্রামে পরিণত হয়।



শ্রীমতী সুলোচনা দেশাই



শ্রীমতী রেণুকা সেন, বি-এ

পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় এই মাসে বনিতা-বিশ্রামের জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার আশী হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি আছে। বনিতা-বিশ্রাম বালিকাদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

বনিতা-বিশ্রামের অন্তর্গত বিধবাশ্রমে বহু বিধবা বিনা পয়সায় অবস্থান করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। বিধবাশ্রম তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যয়ভারও বহন করেন।

বালিকাদের শরীর-চর্চ্চার জন্য একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বড়োদায় শিক্ষাপ্রাপ্তা একজন শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে বালিকারা ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকে।

ঢাকার শ্রীমতী লীলা নাগ ও শ্রীমতী রেণুকা সেন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ইহাদের সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।



শ্রীমতী লীলা নাগ, এম্‌-এ

বিবিধ প্রসঙ্গ

দমন-নীতির সফলতার অর্থ

আমাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের বর্ত্তমান দমন-নীতি সফল হইবে না; এ কথার অর্থ বুঝিতে হইলে দমন-নীতির উদ্দেশ্য বুঝা আবশ্যক। ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের উদ্দেশ্য সব ইংরেজ ঠিক এক রকম বলে না। অনেক ইংরেজ বলে, ইহার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের লোকদের উপকার করা। কেহ কেহ বলে, বাণিজ্যসূত্রে ও অন্যান্য উপায়ে ইংরেজদের দেশকে সমৃদ্ধ করা ও রাখা ইহার উদ্দেশ্য। তাহারা বা তাহাদেরই সদৃশ মত যাহাদের, তাহারা আরও বলে যে, ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব গেলে ইংরেজদের সাম্রাজ্য টিকিবে না; সেই কারণে এই প্রভুত্ব সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা চাই।

ভারতবর্ষের লোকদের উপকার করা যদি ইংরেজ-রাজত্বের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে দমন-নীতি দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের উপকার মানে, প্রথমতঃ, এই দেশের লোকদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং শক্তি ও আয়ু বৃদ্ধি। তাহার জন্য দরিদ্রতা দূর করা আবশ্যক। ভারতের দরিদ্রতা যে কমিতেছে না, তাহার প্রমাণ ভারতবাসীদের গড় আয়ু বাড়িতেছে না;—উহা অনেক সভ্য দেশের লোকদের গড় আয়ুর অর্দ্ধেকেরও কম। দ্বিতীয়তঃ, স্বাস্থ্য, শক্তি ও আয়ু ছাড়া, জ্ঞান বিষয়েও ভারতীয়দের উন্নতি আবশ্যক। তাহাও যথোচিত হইতেছে না। দমন-নীতি দ্বারা ভারতীয়দের স্বাস্থ্য, শক্তি, আয়ু, জ্ঞান কোন বিষয়ে উন্নতি হইতে পারে না।

যাহাদের উপকার করিতে হইবে, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপকার করা যায় না। ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট শুধু যে কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন, তাহা নহে; ভারতীয় ছোট বড় কোন রাজনৈতিক দলেরই অভিলষিত নীতি গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক অনুসৃত হইতেছে না। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না—পরাধীন কোন জাতির যথোচিত উন্নতির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন জাতি নিজেদের সব কাজ নিজেরা ভাল করিয়া করিতে পারিলে তবে তাহাদিগকে উন্নত বলা যায়। কিন্তু, যেমন জলে না-নামিলে সাঁতার দিবার সামর্থ্য লব্ধ ও পরীক্ষিত হয় না, তেমনি স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হইলে কোন জাতির জাতীয় সব কাজ করিবার শক্তি উৎপন্ন ও প্রমাণিত হইতে পারে না। এই কর্ম্মশক্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি জাতীয় উন্নতির অন্যতম বাহ্য লক্ষণ, যথেষ্ট খাইতে-পরিতে পাওয়া এবং ভাল ঘরে বাস করিতে পাওয়াই, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও এরূপ অবস্থা পরাধীনতার মধ্যে ঘটিতে পারে না! বৈদেশিকদের ইচ্ছার অধীন কোন দেশে সেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, পৃথিবীতে এমন কোন জাতি ছিল না ও নাই যাহারা নিজেদের অধীন অন্য কোনো জাতির কল্যাণসাধনের উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানবান এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হিতৈষণা দ্বারা প্রণোদিত।

অন্য যে-সব ইংরেজ বলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা এবং গ্রেট ব্রিটেনের শক্তি ও ধনশালিতা রক্ষা করা ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের উদ্দেশ্য, তাহাদের সেই উদ্দেশ্য দমন-নীতির দ্বারা সিদ্ধ হইবে কি না, তাহাও বিবেচ্য।

ইংরেজদের প্রভুত্ব চিরকালের জন্য শান্তিতে রক্ষা করিতে হইলে ভারতীয় সমুদয় মানুষের মন হইতে স্বাধীনতার ইচ্ছা নষ্ট করা প্রয়োজন। কিন্তু কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ লোককে বন্দী করিয়া রাখিলে পঁয়ত্রিশ

কোটি লোকের স্বাধীনতার ইচ্ছা নষ্ট হইতে পারে না। পঁয়ত্রিশ কোটি ত দূরের কথা; যাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইতেছে, তাহাদেরই স্বাধীনতার ইচ্ছা বন্ধনদশার দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না। বিনষ্ট যে হয় না, তাহার প্রমাণ এই যে, অনেক লোককে রাজনৈতিক কারণে একাধিক বার বন্দী করা হইতেছে। যদি একবার দুইবার বার-বার বন্দী করিলে কাহারও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কমিত বা লুপ্ত হইত, তাহা হইলে তাহাকে পুনঃ পুনঃ বন্দী করিবার আবশ্যক হইত না। যদি কতকগুলি লোককে বন্দী করিয়া রাখিলে অন্য সব লোকের স্বাধীনতা-প্রিয়তা কমিত বা লুপ্ত হইত, তাহা হইলে নিত্য নূতন লোককে বন্দী করা দরকার হইত না। যত লোকের স্বাধীনতাপ্রিয়তা আছে সকলকে খানাতল্লাসী দ্বারা নিঃশেষে আবিষ্কার করিয়া যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখা, কিংবা, এমন কি তাহাদের সকলের প্রাণদণ্ড দেওয়া, যদি ইংরেজ গবর্মেণ্টের সাধ্যায়ত্ত হইত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষ হইতে স্বাধীনতাপ্রিয়তা নির্ম্মূল হইত না। কারণ, অবন্দীদের মনে যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা নাই বা জন্মিতে পারে না, তাহার প্রমাণ কি? যথাসাধ্য যত লোককে সম্ভব গ্রেপ্তার করিয়া রাখিলেও বাকী লোকের স্বাধীনতা-প্রিয়তা লুপ্ত হইবে না; এবং তাহা লুপ্ত না হইলে কোন-না-কোন প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিবেই। বর্ত্তমান-কালে জীবিত ভারতবর্ষের সব মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করা যদিও অসম্ভব, তথাপি যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, ইংরেজরা তাহা লুপ্ত করিতে সমর্থ, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে, নূতন নূতন যত শিশুর আবির্ভাব হইতেছে এবং হইতে থাকিবে, তাহাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তা কে বিনষ্ট করিতে পারে? এমন শক্তিমান্ কেহ আছে কি?

অতএব, স্বাধীনতাপ্রিয়তা থাকিবেই, এবং তাহা নানাপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রভুত্বপ্রিয় ইংরেজদের উদ্বেগ ও অসোয়াস্তি জন্মাইবেই। নিরুদ্বেগে আরামে প্রভুত্ব দখল করিয়া থাকিয়া তাহার সুখ সুবিধা সম্ভোগ যদি দমন-নীতির উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

বাণিজ্যাদিসূত্রে ইংরেজদের ধনাগমের উপায় অটুট রাখা যদি দমন-নীতির উদ্দেশ্য হয়, তাহাও সফল হইবে না। বিদেশীবর্জ্জন এবং পিকেটিংকে কার্য্যতঃ বেআইনী করা হইয়াছে। এরূপ আইন লঙ্ঘন করায় অনেকে দণ্ডিতও হইতেছে। কিন্তু তাহাতে বিলাতী কাপড়ের ও অন্যান্য বিলাতী জিনিষের কাট্‌তি বাড়িতেছে কি? কেবল বয়কট ও পিকেটিং বিষয়ে ভারতীয়দের কর্ম্মিষ্ঠতার দ্বারাই বিলাতী মালের কাট্‌তি হ্রাস পাইতেছে বলিতেছি না। শুধু ভারতবর্ষে নহে, নানা দেশে লোকদের আর্থিক দুরবস্থা ঘটিয়াছে। তাহার জন্য লোকে দেশী বিদেশী কোন জিনিষই যথেষ্ট কিনিতে পারিতেছে না। তাহার উপর জাপানে, ভারতবর্ষে, চীনে সুতা ও কাপড় ক্রমশঃ বেশী উৎপন্ন হইতেছে। বয়কট এবং পিকেটিঙেও বিলাতী কাপড়ের কাট্‌তি কিছু কমাইয়াছে।

মিঃ বার্লো বিলাতের কার্পাস সূত্র ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সভার সভাপতি। তিনি সম্প্রতি বলিয়াছেন, "অবস্থা খুব ভাল হইলেও আমরা মহাযুদ্ধের আগেকার মত বেশী জিনিষ আর কখনও বেচিতে পারিব না।" ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্সের কোরা কাপড় বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে, বিলাত হইতে বঙ্গে ১৯২৯ সালে ৪৮৯ নিযুত গজ কাপড় আসিয়াছিল, ১৯৩০ সালে তাহা অর্দ্ধেকের বেশী কমে। সে সালে আসে ২১৮ নিযুত গজ। ১৯৩১ সালে বিলাতী কোরা কাপড়ের বঙ্গে আমদানী খুব বেশী কমিয়া এগার মাসে মোটে ২৬ নিযুত গজ হইয়াছে।

বয়কট ও পিকেটিংকে কার্য্যতঃ বেআইনী করিয়া গবর্মেণ্ট কিরূপ ফল লাভ করেন, দেখিতে বাকী আছে। ১৯৩১ সালের ১১ মাসে ২৬ নিযুত গজ আমদানী হইয়াছিল, সম্বৎসরে ধরা যাক ৩০ নিযুত গজ আসিয়াছে। দমন-নীতির ফলে ১৯৩২ সালে ১৯৩১-এর ৩০ নিযুত গজের জায়গায় ১৯২৯-এর ৪৮৯ নিযুত বা ১৯৩০-এর ২১৮ নিযুত গজও কি আসিবে? তাহা ত মনে হয় না। ক্রেতাদের সহিত সদ্ভাব বৃদ্ধির দ্বারাই দোকানদারের বিক্রী বাড়ে, অসদ্ভাব বৃদ্ধির দ্বারা বাড়ে না।

ইংরেজ বণিকেরা বলিতে পারে, "তোমরা যে আমাদের জিনিষ বিক্রীতে বাধা দিতেছ; সেই বাধা দূর

করিতে চাই।" তাহার উত্তরে বলি, "তোমরা আমাদের ভারতীয় জিনিষ বিক্রীতে বাধা দিয়া অতীতকালে আমাদের নানা পণ্যশিল্প নষ্ট করিয়াছিলে; তখন তোমাদের সুবুদ্ধি কোথায় ছিল?" বর্ত্তমান সময়েও ইংরেজরা তাহাদের দেশে বিদেশী সব জিনিষ অবাধে আসিতে দিতেছে না, আইন করিয়া অনেক আমদানী বিদেশী দ্রব্যের উপর খুব বেশী বেশী ট্যাক্স বসাইয়াছে। তাহারা স্বশাসক বলিয়া আইন করিয়া বিদেশী দ্রব্যের আমদানী ও কাট্‌তিতে এই বাধা দিতেছে। ভারতীয়েরা স্বশাসক নহে বলিয়া এরূপ আইন করিতে না পারায় বয়কট ও পিকেটিং অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু বলপ্রয়োগ দ্বারা বয়কট ও পিকেটিং চালান হইতেছে, এই অভিযোগ অধিকাংশ স্থলে মিথ্যা। যদি ইংরেজ বণিকেরা ভারতবর্ষে তাহাদের জিনিষের কাট্‌তির বাধা দূর করিতে চায়, তাহা হইলে বলি, সকলের চেয়ে বড় বাধা স্বদেশী জিনিষের প্রতি অনুরাগ। ইহা সকল দেশে, তাহাদের নিজের দেশেও, আছে। সাক্ষাৎ ভাবে আইন দ্বারা ইহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে এখনও বাকী আছে। যদি ইংরেজ বণিকেরা এরূপ আইন করাইতে পারে, যে, ভারতবর্ষের দেশী জিনিষ যাহারা বিক্রী করিবে ও কিনিবে তাহাদের শাস্তি হইবে এবং বিলাতী জিনিষ যাহারা বেচিবে কিনিবে তাহাদের বকশিস মিলিবে, তাহা হইলে এই চরম উপায়টার ফলপ্রদতার পরীক্ষা হইয়া যাইবে।

—

দেশী জিনিষ বিক্রী

পূজার ছুটির আগে কলিকাতায় দেশী জিনিষের প্রদর্শনী হইয়াছিল। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলিকাতার টাউন হলে দেশী জিনিষের প্রদর্শনী কয়েকদিন পূর্ব্বে শেষ হইয়াছে। বড়বাজার অঞ্চলে একটি প্রদর্শনী এখনও চলিতেছে। মফস্বলেও অনেক জায়গায় এই প্রকার প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, এবং হয়ত এখনও কোথাও কোথাও হইতেছে। এই সব প্রদর্শনী হইতে বুঝা যায়, নানা রকম জিনিষ তৈরি করিবার নৈপুণ্য দেশের লোকদের আছে এবং সেরকম জিনিষ দেশে প্রস্তুতও হইতেছে। সেগুলি কি পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। বাংলা দেশে ঐ রকম জিনিষের যত প্রয়োজন, তত কিংবা তার চেয়ে বেশী উৎপন্ন হইতেছে কি? উৎপন্ন যতই হউক, তাহা বিক্রী করিবার বন্দোবস্ত কিরূপ আছে? উৎপত্তিস্থান হইতে রেলে ও ষ্টীমারে অন্যত্র চালান দিয়া এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রীর দোকানদারদিগকে যথেষ্ট কমিশন দিয়া লাভ থাকিতে পারে কি? উৎপাদকগণ কতদিনের জন্য কত টাকার জিনিষ দোকানদারদিগকে ধারে দিতে পারেন? এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্য যথেষ্ট দেশী ব্যাঙ্ক আছে কি?

এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে অনুসন্ধান কোন সমিতির দ্বারা হওয়া উচিত। ইহার জন্য নূতন সমিতি স্থাপন একান্ত আবশ্যক হইলে তাহা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু হয়ত বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার এই কাজ করিতে পারেন। যিনিই করুন, দেশী যত রকম ছোট বড় জিনিষ উৎপন্ন হয়, প্রাপ্তিস্থান ও মূল্যনির্দ্দেশসমেত সেগুলির একটি তালিকার বহি প্রকাশিত হইলে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই বিশেষ সুবিধা হয়।

—

জিনিষ ফেরী করাইবার ব্যবস্থা

কলিকাতা শহরে বাংলা দেশের বাহির হইতে অন্য প্রদেশের ভারতীয় লোকে আসিয়া নানা রকম জিনিষ ফেরী করিয়া বিক্রী করে। ভারতবর্ষের বাহির হইতে চীন দেশের অনেক লোক আসিয়া জিনিষ ফেরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাঙালী ফেরিওয়ালাও যে না-আছে, এমন নয়। কিন্তু আরও বেশী বাঙালী এইরূপ কাজের দ্বারা রোজগার করিতে পারে। ইহা করিতে হইলে ধৈর্য্য ও শ্রমশীলতার প্রয়োজন। কিন্তু তাহা বাঙালীদের মধ্যে বিরল নহে।

অনেক দরিদ্র ছাত্র কাজ খুঁজিয়া বেড়ান। নিজের সুবিধা-মত সময়ে কিছু কাজ করিবার মত কাজ তাঁদের সহজে জুটে না। সেই জন্য নানা দিকে নানা রকম চেষ্টা করা আবশ্যক। আমরা স্বয়ং করিয়া দেখিয়া থাকিলে দু-একটা ঠিক্ উপায় বলিতে পারিতাম;

কিন্তু সে রকম অভিজ্ঞতা না থাকায় আনুমানিক কিছু লিখিতেছি। ছাত্রেরা সকালে পড়াশুনা করিবেন এবং পরে কলেজে যাইবেন। কলেজ হইতে আসিয়া, যাঁহাদের স্বাবলম্বী হওয়া দরকার, তাঁহারা কতকটা সময় কোন কোন জিনিষ ফেরী করিতে পারেন। ছাত্রদেরই দরকারী কাগজ কলম পেন্সিল খাতা কালি ছুরি কাঁচি বোতাম জুতার পালিশ জুতার ফিতা দাঁতের মাজন সাবান কাপড় জামা মোজা গেঞ্জী ইত্যাদি অনেক জিনিষ তাঁহারা ফেরী করিতে পারেন। তা ছাড়া গৃহস্থদের বাড়িতেও ফেরী করিতে পারেন। যাঁহারা ফেরী করিবেন, তাঁহারা সঙ্গে একটি খাতা রাখিতে পারেন। ফেরীওয়ালা ছাত্রের নিকট যে জিনিষ নাই, কেহ সেইরূপ জিনিষের ফরমাইস খাতায় লিখিয়া দিলে পরদিন তিনি তাহা আনিয়া দিতে পারেন।

কাপড়ের কথাই ধরুন। ফেরীওয়ালা ছাত্র হউন বা না-হউন, তাঁহার কাছে সব মাপের সব রকম কাপড় থাকিবার কথা নয়। তিনি কয়েক রকম খদ্দর, দেশী মিলের কাপড় ও হাতের তাঁতের কাপড় রাখিতে পারেন। তা ছাড়া দেশী অন্য কোন রকম কাপড়ের কেহ ফরমাইস দিলে তাহা আনিয়া দিতে পারেন। এইরূপ করিতে করিতে অভিজ্ঞতা বাড়িলে ক্রমশঃ রোজগার বাড়িতে পারে। এই কাজে ধৈর্য্য ও শ্রমশীলতা চাই, আগেই বলিয়াছি। তা ছাড়া, কেহ 'আপনি' না বলিয়া 'তুমি' বলিলে তাহা এবং তত্তুল্য অসম্মান সহ্য করিতে পারা চাই।

যে সব ছাত্র অভাবগ্রস্ত, ইহা যে কেবল তাঁহাদেরই কাজ, এবং কেবল উপার্জ্জনার্থ কাজ, তাহা নহে। এইরূপ কাজ দ্বারা দেশের সেবাও হইতে পারে। সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে বাংলা দেশে যখন স্বদেশী প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন অনেক গ্র্যাজুয়েট ও অন্যান্য ছাত্র এবং যুবক দেশী কাপড়ের মোট বহিয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া দেশী কাপড় সহজপ্রাপ্য করিয়াছিলেন। এখনও বহুসংখ্যক লোক এই উপায় অবলম্বন করিলে দেশী কাপড় ও দেশী অন্যান্য জিনিষের কাটতি বাড়িতে এবং দেশী নানা পণ্যশিল্পের উন্নতি হইতে পারে। একটি কো-অপারেটিভ দোকান খুলিয়া এইরূপ ফেরীর কাজ চালান যায় কিনা, ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদিগকে তাহা বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

ছাত্র বা অন্য যাঁহারা ফেরীওয়ালার কাজ করিবেন, তাঁহারা অবশ্য দস্তুরমত লাইসেন্স লইয়া করিবেন।

—

দেশী জিনিষের বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন

যাঁহারা কম মূলধন লইয়া নানা রকম দেশী জিনিষ প্রস্তুত করেন এবং বিজ্ঞাপন দিলে কোন ফল হইবে কি না স্থির করিতে না পারায় বিজ্ঞাপন দেন না, তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা আপাততঃ দুই মাস অর্থাৎ ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের প্রবাসীতে তাঁহাদের জিনিষের পাঁচ পংক্তি করিয়া বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে ছাপিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে কাহারও সুবিধা হইলে পরে দীর্ঘতর সময়ের জন্যও এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি। পাঁচ পংক্তিতে গড়ে পঁয়ত্রিশটি শব্দ ধরে। এই পঁয়ত্রিশটি কথায় সংক্ষেপে জিনিষের নাম, বর্ণনা, দাম ও প্রাপ্তিস্থান দেওয়া চলিবে। বড় অক্ষরে কিছু ছাপা চলিবে না। কেহ দীর্ঘতর বিজ্ঞাপন পাঠাইলে তাহা আমরা না-ছাপিতে কিংবা সংক্ষিপ্ত করিয়া ছাপিতে পারিব। আমাদের বিবেচনায় যাহা অনিষ্টকর এরূপ বিজ্ঞাপন ছাপিব না। বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন বিষয়ে চিঠি লেখালেখি করিতে পারা যাইবে না। কেহ টিকিট বা পোষ্টকার্ড পাঠাইলেই যে নিশ্চয়ই এই বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর পাইবেন, এরূপ যেন মনে না করেন।

—

কয়েক জন খ্যাতনামা প্রবাসী বাঙালীর মৃত্যু

৮৩ বৎসর বয়সে ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রাজকুমার সেন মহাশয়ের সম্প্রতি কাশীতে মৃত্যু হইয়াছে। গণিত বিদ্যায়, বিশেষতঃ জ্যোতিষে, তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পঞ্জিকা-গণনার জন্য যে সারণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহা প্রকাশিত করিবেন।

রাঁচীর উকীল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তথাকার

পরিসভার সংস্থাপক, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, এবং কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ছিলেন। সকল সৎকার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ছিল। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য আমরা যখন চাঁদা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তখন তিনি স্বয়ং চাঁদা দিয়া ও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া আমাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

পাটনার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সি সি দাস মহাশয় সেখানকার সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে উৎসাহের সহিত সহযোগিতা করিতেন। সৌজন্যের জন্য তিনি খ্যাতিমান্ ছিলেন। তাঁহার কন্যারা তত্রত্য সমাজে গীত অভিনয় প্রভৃতির জন্য আদৃতা।

—

স্যর বসন্তকুমার মল্লিক

পাটনা হাইকোর্টের একজন ইংরেজ জজ পরলোক-গত স্যর বসন্তকুমার মল্লিক সম্বন্ধে বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটীর ত্রৈমাসিক জর্ন্যালে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে মল্লিক মহাশয়ের নয় বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সিবিল সার্বিসে প্রবেশ এবং ক্রমশঃ উচ্চপদ প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আছে। মৃত্যুকালে স্যর বসন্তকুমার লণ্ডনে ভারতসচিবের কৌন্সিলের সভ্য ছিলেন। ১৯২৬ সালে যখন লীগ অব্ নেশ্যন্সের নিমন্ত্রণে আমি জেনিভা যাই, তখন স্যর বসন্তকুমার লীগের সভায় ভারত গবর্ন্মেণ্টের অন্যতম ডেলিগেট রূপে যোগ দিয়াছিলেন। জেনিভায় তাঁহার সহিত পরিচয় হয়। তিনি খুব উচ্চপদস্থ লোক হইলেও তাঁহার কথাবার্ত্তা ও আচরণে কোন অহমিকা লক্ষিত হইত না, সৌজন্যেরই পরিচয় পাওয়া যাইত। সেবার ভারতবর্ষের পক্ষের ডেলিগেট ছিলেন কপূরথলার মহারাজা, স্যর উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট এবং স্যর বসন্তকুমার মল্লিক। ইঁহাদের সেক্রেটরী ইণ্ডিয়া আফিসের মিঃ প্যাট্রিক আমাকে বলিয়াছিলেন, স্যর বসন্তকুমার ভারতবর্ষের পক্ষের কথা যোগ্যতার সহিত বলিতেছেন। তাঁহার বয়স তখন ৫৮, কিন্তু তার চেয়ে কম দেখাইত।

বিনা বিচারে বন্দিনী প্রথম মহিলা

এত দিন সরকারী চর ও অন্য সরকারী ভৃত্যেরা কেবল তাহাদের সন্দেহভাজন পুরুষদেরই বিনা বিচারে বন্দীদশা ঘটাইত। শুধু এইরূপ পুরুষদিগকেই আটক করিয়া রাখিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিরাপদ থাকিবে না, এখন তাহাদের বা গবর্ন্মেণ্টের সিদ্ধান্ত এইরূপ হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের প্রথম ফল কুমারী লীলাবতী নাগ এম্-এ ও কুমারী রেণুকা সেন, বি-এর গ্রেপ্তার। তাহার মধ্যে কুমারী লীলাবতী নাগকে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক করিয়া রাখার হুকুম হইয়া গিয়াছে। কুমারী রেণুকার সম্বন্ধে এখন (২৫শে পৌষ) পর্য্যন্ত শেষ হুকুম জানিতে পারি নাই। ইহাদের পর অন্য কোন কোন মহিলাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিরূপ মহিলা গবর্ন্মেণ্ট দ্বারা বিনা বিচারে দণ্ডার্হ বিবেচিত হইয়াছেন, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

শ্রীমতী লীলাবতীর পৈত্রিক নিবাস শ্রীহট্ট জেলায়। তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র নাগ যখন গোয়াল-পাড়ার মহকুমা-হাকিম, তখন ১৯০০ সালে সেখানে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত তিনি বাড়িতে শিক্ষা পান। তার পর তাঁহার পিতা ঢাকায় বদলী হইলে তিনি তথাকার ইডেন ইস্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় সকল বিষয়েই তিনি পারদর্শিতা দেখান, গণিতে শতকরা ৯৯ নম্বর পান। ১৫ টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি কলিকাতায় বেথুন কলেজে পড়িতে আসেন। ১৯১৯ সালে প্রথম বিভাগে ফার্ষ্ট আর্টস্ পাস করিয়া ২০ টাকা বৃত্তি পান। ১৯২১ সালে ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত বি-এ পাস করেন এবং পদ্মাবতী মেড্যাল পান। তাহার দুই বৎসর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম্-এ পাস করেন।

তাঁহার পিতা পেন্স্যন লইবার পর ঢাকা শহরেই স্থায়ী বাসিন্দা হন। সুতরাং লীলাবতীও সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন—বংশগৌরব, সচ্ছল অবস্থা, চারিত্রিক

শুচিতা, বিদ্যা, শ্রী—লীলাবতী সমুদয়েরই অধিকারিণী হইয়াও আরামের জীবনের দিকে আকৃষ্ট হইলেন না। পাটিয়ালা ও অন্যান্য জায়গা হইতে তিনি উচ্চ বেতনের চাকরির প্রস্তাবও পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ সকলের প্রতি বিমুখ হইয়া তিনি শ্রমসাধ্য সমাজসেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্রায় প্রথমেই "দীপালী" নামক মহিলা-সমিতি স্থাপন করেন। ইহার নামেই বুঝা যায়, বঙ্গের অন্তঃপুরসমূহ হইতে অন্ধকার দূর করা ইহার উদ্দেশ্য। ১৯২৩ সালে বার জন সভ্য লইয়া ইহার আরম্ভ হয়। ঢাকার মহিলাদিগকে দেশের সেবায় দলবদ্ধ করিতে ইহা চেষ্টা করে। শীঘ্রই ইহার কাজের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়ে, এবং দীপালী নাম দিয়া কলিকাতায় ও অন্যত্র কয়েকটি সমিতি ঐ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। ঢাকার মহিলাদের উপর দীপালীর প্রভাব ইহার প্রায় এক হাজার সভ্য-সংখ্যা হইতে বুঝা যায়। ঢাকায় প্রসিদ্ধ লোকদের আগমন হইলে দীপালী তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথকেই তাঁহারা প্রথম অভিনন্দন-পত্র দেন। সেই উপলক্ষ্যে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে দুই হাজার মহিলা সমবেত হন। কবি সাতিশয় প্রীত হন এবং বলেন, তিনি অন্য কোথাও একত্রসমাবিষ্ট এতগুলি মহিলার অভিনন্দন পান নাই। তিনি লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি শান্তিনিকেতনে কাজ করিতে সম্মত আছেন কিনা। কিন্তু তিনি ঢাকাকেই নিজের কার্য্যক্ষেত্র স্থির করায় সেখানে যান নাই। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তও তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির ভার লইতে বলেন। উক্ত কারণে তাহাতেও তিনি সম্মত হন নাই।

দীপালী স্থাপনের সময় লীলাবতী দেখেন, ঢাকার উচ্চশিক্ষালাভার্থিনী মেয়েদের জন্য একটি মাত্র উচ্চ-বিদ্যালয়, ইডেন স্কুল, যথেষ্ট নয়। সেই জন্য তিনি বিনা বেতনে কাজ করিয়া আর একটি উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার নাম ছিল দীপালী হাইস্কুল। তিনি এখানে তিন বৎসর বিনা বেতনে কাজ করিয়া ইহার স্থায়িত্ব বিধান করেন। এখন ইহা কমরুন্নেসা হাই স্কুল নামে পরিচিত। কেবল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা বঙ্গীয় নারীজাতির নিরক্ষরতা দূর হইবে না বলিয়া লীলাবতী বিবাহিতা অন্তঃপুরিকাদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি "নারী-শিক্ষামন্দির" স্থাপন করেন। উচ্চ বিদ্যালয়, বয়ঃস্থা মেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, এবং পরীক্ষায় পাস করাইবার জন্য পড়াইবার ব্যবস্থা, এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত। অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার মেয়েদের জন্য শিল্প শিখাইবার বন্দোবস্তও নারী-শিক্ষামন্দিরে আছে। গ্রেপ্তার হইবার সময় পর্যন্ত কুমারী লীলাবতী নারী-শিক্ষামন্দিরের প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি চারি বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়াছেন। ইহাতে চারি শত ছাত্রী শিক্ষা পায়। এই প্রতিষ্ঠানটিকে খাড়া করিবার জন্য শ্রীমতী লীলাবতীকে বিশেষ পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে, এবং সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতারও বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্বার্থত্যাগ সত্ত্বেও ইহা এখনও নিজের ব্যয়নির্ব্বাহে সমর্থ হয় নাই। ১৯৩০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও ইহার খুব ক্ষতি হয়। তাহাতে ইহার ছাত্রী-সংখ্যা ও আয় কমিয়া যায়। কিন্তু লীলাবতী ভীত হন নাই। তাঁহার পিতা তাঁহার শিক্ষার সমস্ত খরচ দিতেন বলিয়া তাঁহার বৃত্তির টাকাগুলি সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা থাকিত। এই টাকাগুলির শেষ টাকাটি পর্য্যন্ত তিনি নারী-শিক্ষামন্দিরের জন্য ব্যয় করিলেন। তাঁহার পিতাও যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রায় ৫০০০ টাকা দেনা হইল। এই দেনা শোধ করিবার জন্য তিনি টাকা সংগ্রহ করিতে গত পূজার ছুটির সময় কলিকাতা আসেন এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করেন। তখন আফিস স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় কলিকাতায় বেশী কিছু আদায় হয় নাই। ডিসেম্বরের শেষে তিনি টাকা তুলিবার জন্য বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজবন্দী

হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। নারীশিক্ষা-মন্দিরের কাজে অবিরাম ব্যস্ত থাকিলেও লীলাবতী, সমাজের দরিদ্রতম যাঁহারা শিক্ষার ব্যয় দিতে অক্ষম, তাঁহাদের অভাব ভুলিয়া ছিলেন না। ঢাকা মিউনিসিপালিটীর কয়েকটি প্রাথমিক পাঠশালা আছে বটে, কিন্তু সেগুলি বালকদের জন্য। লীলাবতী ঢাকায় ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বালিকাদের জন্য দীপালী সমিতির দ্বারা পরিচালিত প্রায় বারটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি শিক্ষা দিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। শহরের সর্ব্বত্র নারীদের কুটীরশিল্পের দ্বারা পণ্যদ্রব্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করেন, এবং উৎপন্ন দ্রব্য-সমূহ বিক্রয়ের জন্য প্রতিবৎসর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। দীপালী সমিতি স্থাপনের পর হইতে প্রতি বৎসরই এই রূপ প্রদর্শনী হইয়া আসিতেছে। ১৯৩১ সালের প্রদর্শনী ১৮ই ডিসেম্বর খোলা হয়। কুমারী লীলাবতীর সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে পরিচিত কেবল তাঁহারাই জানেন, এই প্রদর্শনীটিকে সম্পূর্ণ সফল করিবার জন্য তিনি কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন। ১৯শে ডিসেম্বর তিনি প্রায় রাত্রি ১১টার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া প্রদর্শনী হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসেন ও ঘুমাইয়া পড়েন। ভোর প্রায় ৪টার সময় পুলিসের ভারী ভারী বুটের শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে—এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পায়।

কুমারী লীলাবতী গত বৈশাখ মাসে "জয়শ্রী" নামক মাসিক পত্র স্থাপন করেন। এই কয় মাসেই ইহার সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রভৃতি স্বাধীনচিত্ততার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের যে-কোন অঞ্চল হইতেই হউক, বিপন্নের দুঃখের আহ্বান লীলাবতীকে বিচলিত করিত এবং তিনি যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতেন।

লীলাবতী অবগত হন, যে, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে-সকল বালিকা কলিকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসে, তাহারা সকলে সহজে ছাত্রীনিবাসে স্থান পায় না। তাহাদের জন্য তিনি ১১নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে ছাত্রীভবন নাম দিয়া একটি ছাত্রীনিবাস স্থাপন করেন। ইহা দুই বৎসর আগে স্থাপিত হয়, এবং ছাত্রীদের বাসের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

—

শ্রীমতী রেণুকা সেন

কুমারী লীলাবতী নাগের সহিত কুমারী রেণুকা সেনও গ্রেপ্তার হন। তিনি বিনা বিচারে বন্দী থাকিবেন, না তাঁহার বিচার হইবে, এখনও (২৫শে পৌষ পর্য্যন্ত) তাহার খবর পাই নাই। বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন। তাঁহার পিতামহ মুন্সীগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেনের সস্নেহ যত্নে তিনি মানুষ হন। গ্রেপ্তারের সময় রেণুকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পরীক্ষার জন্য অর্থনীতি পড়িতেছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার পুলিসের নিগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। কলিকাতার লালদীঘির নিকট বোমা নিক্ষেপ উপলক্ষ্যে যে মোকদ্দমা হয়, তাহার সংস্রবে তাঁহার প্রথম গ্রেপ্তার হয়। এক মাস হাজতে বাসের পর নির্দ্দোষ বলিয়া তিনি খালাস পান। তিনি তখন বেথুন কলেজে বি-এ পড়িতেছিলেন। ঢাকা ফিরিয়া যাইবার পথে তাঁহাকে পুলিস আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নারায়ণগঞ্জে খানাতল্লাস করে। নির্দ্দোষ বলিয়া তিনি এই সমস্তই হাসিমুখে সহ্য করেন, এবং তাহাতে ইউরোপীয় পুলিস কর্ম্মচারীরা বিস্মিত হয়। তিনি ঢাকার দীপালী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন হইতে দীপালীর সহিত তাঁহার সংস্রব। পড়াশুনা, সমাজসেবার নানা কাজ, প্রভৃতিতে তাঁহার উৎসাহ লক্ষিত হইত। অভিনয়েও তাঁহার নৈপুণ্য দেখা গিয়াছে। একবার রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর অভিনয়ে নন্দিনী সাজিয়া তিনি প্রশংসা লাভ করেন। ইডেন কলেজ হইতে তিনি আই-এ পাস করেন এবং পারদর্শিতা অনুসারে পঞ্চদশ-স্থানীয়া হন। কলিকাতায় তিনি দীপালীর একটি শাখা স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ইহার জন্য চাঁদা তুলিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশী টাকা পান নাই। তিনি বাল্যবিবাহনিষেধক আইনের সমর্থন করিয়া কলিকাতার আলবার্ট হলে একটি তেজোগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি দীপালীর কুটীরশিল্প-বিভাগের সংস্রবে উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। তিনি শ্রীমতী লীলাবতী নাগের প্রতিষ্ঠিত "জয়শ্রী" মাসিক পত্রের একজন সহকারী সম্পাদক।

—

ম্যাজিষ্ট্রেট-হত্যার মোকদ্দমা

কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টীভেন্স সাহেবকে হত্যা করার অভিযোগে যে-দুটি বালিকা ধৃত হইয়াছে তাহাদের বিচার কলিকাতায় হইবে বলিয়া সংবাদ বাহির হইয়াছে।

এইরূপ সংবাদও বাহির হইয়াছে, যে, তাহাদের বিচার একসঙ্গে না হইয়া আলাদা আলাদা হইবে। ৯ই জানুয়ারী নিউ ইয়র্ক-তে এই গুজবেরও উল্লেখ দেখিলাম, যে, তাহাদের একজন উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা কি সত্য? এবং সত্য হইলে ইহাই কি আলাদা বিচার ব্যবস্থার কারণ? একটি বালিকার উন্মাদের খবর সত্য হইলে ব্যাধির কারণ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান হওয়া উচিত। কেহ কোন অভিযোগে ধৃত হইলেই তাহাকে নিশ্চয়ই দোষী বলিয়া মনে করা উচিত নয়, কিংবা দোষী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নয়। আইন অনুসারেও, বিচারাধীন কোন ব্যক্তির দোষিতা বা নির্দোষিতা সম্বন্ধে কিছু বলা অকর্ত্তব্য। কিন্তু খবরের কাগজে শীঘ্র সংবাদ বাহির করিবার চেষ্টায় অনেক সময় পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে নিয়মভঙ্গ ঘটিয়া থাকে। এই ত্রুটি হইতে আমরাও মুক্ত নহি।

কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা যে বা যাহারাই করিয়া থাকুক, কাজটা গর্হিত হইয়াছে। কিন্তু ধৃত বালিকা দুটিই যে হত্যা করিয়াছে, ইহা ধরিয়া লইয়া বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের বিরুদ্ধে কিংবা বঙ্গের নারীদের বিরুদ্ধে কিছু লেখা বে-আইনী ও অন্যায়। একখানি বাংলা সাপ্তাহিকে ধৃতা বালিকাদের "শান্তি" ও "সুনীতি" নামের উপর পর্য্যন্ত সবিলাপ মন্তব্য বাহির হইয়াছে। তাহারা বিচারে নিঃসন্দেহ দোষী প্রমাণ হইয়া গেলে তবে এরূপ মন্তব্য সমীচীন হইতে পারে। কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির গত অধিবেশনে যে-সব প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, তাহাতেও এ বিষয়ে অসাবধানতা লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে কমিটি তাঁহাদের নির্দ্ধারণে বলিয়াছেন :—

"The Working Committee marks the deep national humiliation over the assassination committed by two girls in Comilla and is firmly convinced that such a crime does great harm to the nation, especially when, through its greatest political mouthpiece, Congress,---it is pledged to non-violence for the attainment of Swaraj."

কমিটি যে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন, হত্যার কাজটা দুটি বালিকার দ্বারা হইয়াছে, এ উক্তি আইন-অনুযায়ী নহে। বালিকারা ইহা করিয়া থাকিতে পারে, না-করিয়া থাকিতেও পারে। কমিটির নির্দ্ধারণে পরোক্ষভাবে ইহাও ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যে, হত্যার কাজটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে। এ অনুমানও প্রমাণসাপেক্ষ। সরকারী কর্ম্মচারীরা কেবলমাত্র সরকারী কর্ম্মচারী নহে। তাহারা অন্য সব মানুষের মত মানুষ, এবং সরকারী কর্ম্মচারিরূপে ছাড়া সাধারণ মানুষ হিসাবেও তাহাদের আচরণ তাহাদিগকে অপরের প্রিয় বা অপ্রিয় করিতে পারে। সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে কৃত কোন অপরাধ যে নিশ্চয়ই সরকারের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত, তাহা বিনা প্রমাণে নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এরূপ অপরাধ রাজনৈতিক হইতে পারে, না হইতেও পারে—যদিও উভয়ক্ষেত্রেই তাহা দণ্ডার্হ।

চট্টগ্রামে পুলিসের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ

কিছুদিন হইল, সরকারী হুকুম বাহির হইয়াছে, যে, চট্টগ্রামের পুলিস ও সৈনিকদের সম্বন্ধে কোন খবর কেহ বা কোন সংবাদপত্র বাহির করিতে পারিবে না। তথাকার কমিশনার যাহা বাহির করিতে দিবেন, তাহা অবশ্য বাহির করা চলিবে। সম্প্রতি এরূপ একটা খবর বাহির হইয়াছে। নোয়াপাড়া গ্রামে তিনজন কনষ্টেবল এক ভদ্রলোকের বাড়িতে খানাতল্লাস করিতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সতীত্বনাশ করায় তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ হইয়াছে। অভিযোগ এইরূপ।

সম্ভবতঃ ঘটনাটা লইয়া মোকদ্দমা হওয়ায় কমিশনার ইহার সংবাদ ছাপিতে অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু এরূপ অভিযোগ আরও আছে কি না, এবং পুলিস ও সৈনিকদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়ায় অভিযোগগুলা গবন্মেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের অগোচর থাকিয়া যাইতেছে কি না, কে বলিতে পারে?

নিখিল-ভারতীয় মুসলিম লীগ

নিখিল-ভারতীয় মুস্লিম লীগ বা সঙ্ঘ একটা খুব জাঁকাল নাম। ইহার নামে যাঁহারা কথা বলেন, সকলে মনে করিতে পারে তাঁহারা ভারতবর্ষের ছয় সাত কোটি লোকের না হউক, ছয় সাত লক্ষ লোকের, ন্যূনকল্পে ছয় সাত হাজার লোকের প্রতিনিধি। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ইহার অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা এত কম, যে, এখন আর এরূপ মনে করা চলে না। ইহার গত অধিবেশন দিল্লীতে এবং তাহার আগেকার অধিবেশন এলাহাবাদে হইয়াছিল। কোন সভার নিয়ম অনুসারে তাহার অধিবেশনে ন্যূনকল্পে যত সভ্য উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য্য চলিতে পারে তাহাকে ইংরেজীতে কোরাম্ বলে। নিখিল-ভারতীয় মুস্লিম লীগের কোরাম ভারতবর্ষের মত বড় দেশের মুসলমানদের মত সংখ্যাবহুল সম্প্রদায়ের পক্ষে খুব কম—মোটে পঁচাত্তর জন মাত্র। কিন্তু এলাহাবাদের অধিবেশনে পঁচাত্তর জনও উপস্থিত ছিল না—যদিও তাহার সভাপতি ছিলেন স্যর মুহম্মদ

...বালের মত প্রসিদ্ধ কবি। দিল্লীতে যে গত অধিবেশন ...য়েক দিন পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তাহার উদ্যোক্তারা তাহা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রকাশ্য স্থানে করিতে পারেন নাই—মুসলমানদের মধ্যেই এত বেশী লোক উহার বিরোধী ছিল। এইরূপ বিরোধিতাবশতঃ অধিবেশন এক জন ...ধান্ত মুসলমানের বাড়িতে পুলিসের রক্ষকতায় ...ইয়াছিল। উপস্থিত এক জন সভ্য সভাপতিকে এই সন্দেহাত্মক প্রশ্ন করেন, কোরাম্ আছে কি না। সভাপতি উপস্থিত সভ্যদের সংখ্যা গণনা না করিয়া বলেন, সম্পাদক গুণিয়াছেন, কোরাম্ আছে। কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, প্রায় এক শত লোক উপস্থিত ছিল। দিল্লীর এই অধিবেশনে কোরাম্ সম্বন্ধে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—অতঃপর পঞ্চাশ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কোরাম্ ...ইবে এবং নিখিল-ভারতীয় মুস্লিম সঙ্ঘের কাজ চলিতে ...রিবে। কোরাম্ কমাইয়া দেওয়াতেই বুঝা যাইতেছে, ...সলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই লীগ বা সঙ্ঘের প্রভাব ...ত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

—

মৌলানা শৌকৎ আলির অভিযোগ

মৌলানা শৌকৎ আলি কিছুদিন হইল অভিযোগ ...রিয়াছিলেন, যে, হিন্দু খবরের কাগজগুলাতে মুসলমান ...প্রদায়ের পক্ষের সংবাদ বাহির হয় না। ইহা কি ...রিমাণ সত্য, বলিতে পারি না। কিন্তু সম্প্রতি ত ...িয়াছি, যে, নিখিল-ভারতীয় মুস্লিম লীগের যে ...ধিবেশনে পুরা এক-শ জন লোকও উপস্থিত ছিল কি না ...হ, তাহার অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতির বক্তৃতা ...ং সভাপতির বক্তৃতা হিন্দুদের সম্পাদিত ও হিন্দুদের ...পত্তি অনেক দৈনিকে আদ্যোপান্ত অনেক স্তম্ভ জুড়িয়া ...দ্রিত হইয়াছে। অধিবেশনের নির্দ্ধারণগুলিরও বৃত্তান্ত ...ওয়া হইয়াছে। অথচ নানা প্রদেশে হিন্দুসভার ...ধিবেশনে উহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক উপস্থিত ...কিলেও তাহাদের সভাপতিগণের সমগ্র বক্তৃতা ঐ সব ...গজে ছাপা হয় নাই। প্রকৃত কথা এই, যে, দৈনিকগুলি ...দুদের হইলেও, যে-কারণেই হউক, তাহারা সংবাদ-...দান বিষয়ে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক সভা আদির ...ত মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সভা আদি অপেক্ষা ...বে পক্ষপাতিত্ব করে না—যদিও তাহাদের মুসলমান ...হক ও পাঠক অপেক্ষা হিন্দু গ্রাহক পাঠক অনেক ...বী। সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেস সম্বন্ধে এবং কংগ্রেসের ...বংক্ত বিষয় সম্বন্ধে বেশী সংবাদ ও আলোচনা ...প্রকাশ করে। তাহা ন্যায়সঙ্গতও বটে। কারণ, কংগ্রেস ...শের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ... প্রতিষ্ঠান এবং ইহা সকল সম্প্রদায়ের ও অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান।

—

গত সত্যাগ্রহে মুসলমানদের দুঃখভোগ

মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা স্বাজাতিক অর্থাৎ ন্যাশ্যনালিষ্ট, তাঁহাদের ত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকিতেই পারে না। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত, তাঁহারাও পণ্ডিতজীকে হিন্দু মহাসভার প্রচ্ছন্ন পাণ্ডা বা অনুচর কখনও বলেন নাই। অতএব পণ্ডিত জবাহরলাল গত ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহে মোট সত্যাগ্রহী বন্দী ও মুসলমান সত্যাগ্রহী রাজবন্দীর যে আনুমানিক সংখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে মুসলমানদের দুঃখভোগ জ্ঞাতসারে কমান হইয়াছে, এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন না। তাঁহার মতে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মোট বন্দী হইয়াছিল এক লাখ, তাহার মধ্যে মুসলমান বার হাজার; অর্থাৎ মুসলমানেরা মোট বন্দীদের সংখ্যার শতকরা বার জন। মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত প্রবল ও সংখ্যাবহুল এক দলের মধ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রবল মত আছে, তাহাতে এত মুসলমানের যোগদান তাহাদের মধ্যে সত্যাগ্রহের প্রতি অনুরাগই প্রমাণ করে।

এবারকার সত্যাগ্রহে সম্ভবতঃ মুসলমানদের অনুপাত আগেকার চেয়ে বেশী হইবে। অধ্যাপক ডক্টর শফাৎ আহমদ খাঁরও আশঙ্কা এইরূপ। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই সকলের চেয়ে বেশী মুসলমানের বাস। এখানে ইতিমধ্যেই অনেক মুসলমান নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে এক জন মুসলমান মহিলাও আছেন।

—

মিঞা স্যর মোহম্মদ শফী

সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে মিঞা মোহম্মদ শফী পঞ্জাবের একজন কৃতী ও প্রসিদ্ধতম আইনব্যবসায়ী ছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষেও তাঁর চেয়ে অধিকতর দক্ষ ও বিচক্ষণ আইনজীবী বেশী ছিলেন না। তিনি পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। সভ্যের কাজ তিনি যোগ্যতার সহিত করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হন এবং পুরা মিয়াদ যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। সম্প্রতি মিঞা স্যর ফজলী ...

তাঁহার জায়গায় আবার বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকের দুই অধিবেশনেই তিনি অন্যতম সভ্য মনোনীত হন। মুসলমান দলের নেতা রূপে তাঁহাকে দলের কথা বলিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা মনে করেন সাম্প্রদায়িকতাকে স্বাজাতিকতার একটা ধাপ-স্বরূপ ব্যবহার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কেহ কেহ এরূপও মনে করেন, যে, তাঁহার বুদ্ধিমতী ও বাগ্মিনী কন্যা বেগম শাহ নেওয়াজ গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িকতার ঝাঁজ-বর্জ্জিত স্বাজাতিকতাঘেঁসা যে-সব বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পিতার মনের গতি প্রদর্শন করে। মিঞা স্যর মোহম্মদ শফী সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে তিনি যে এরূপ সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার চারিত্রিক সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ষাটের কিছু বেশী হইয়াছিল।

—

শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী

শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী তাঁহার শ্বশুর পরলোকগত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এবং স্বামী শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরীর মৃত্যুর পরও "নব্যভারত" মাসিক পত্রখানি বাঁচাইয়া রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অন্য নিদারুণ শোকও পাইতে হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি বাড়িতে পড়াশুনা করিয়া ক্রমে ক্রমে বি-এ পর্য্যন্ত পাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বেশ মননশক্তি ও রচনার ক্ষমতা ছিল। অকালে তাঁহার মৃত্যু না হইলে বঙ্গসাহিত্য তাঁহার সেবায় উপকৃত হইতে পারিত; অন্য দিকেও দেশের উপকার তাঁহার দ্বারা হইতে পারিত।

—

নেপালের মহারাজাকে অভিনন্দন

গত শনিবার ২৪ শে পৌষ নেপালের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি মহারাজা ভীম শম্‌শের জঙ্গ রাণা বাহাদুরকে নিখিলভারতীয় হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ইংরেজীতে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। উহা প্রবাসীর সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত হয়। মহারাজা বাহাদুরের উত্তর তাঁহার সেক্রেটারী পাঠ করেন। এই উত্তরের সর্ব্বশেষ কথা, "কালের গতিতে সবই পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, 'ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্‌', এই সত্য উক্তি আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।"

প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিই কার্য্যতঃ উহার নৃপতি। হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রধানতঃ এই কারণেই অভিনন্দন দেওয়া হইয়া থাকিলেও, সৌম্যমূর্ত্তি মহারাজা ভীম শম্‌শের জঙ্গ রাণা বাহাদুর ব্যক্তিগত ভাবেও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। নেপালের শাসনভার গ্রহণের পর অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি লবণকর, কার্পাসকর, এবং গোচারণের মাঠের উপর কর রহিত করেন, এবং গোচারণের জন্য অনেক জমী আলাদা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন। অন্য নানা দেশে যখন নূতন ট্যাক্স বসিতেছে ও পুরাতন ট্যাক্সের হার বাড়িতেছে, তখন নেপালে এই সব ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়া কম কৃতিত্ব ও প্রশংসার কথা নহে। প্রজাদের যথেষ্ট জল পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য মহারাজা বাহাদুর অনেক লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। কেবলমাত্র চরম রাজ-দ্রোহের জন্য ব্যতীত অন্য সব অপরাধের জন্য তিনি প্রাণদণ্ড রহিত করিয়াছেন। এই ব্যতিক্রমও পরে অনাবশ্যকবোধে রহিত হইবে আশা করা যায়। মানব-জীবনের মূল্য তিনি বুঝেন। নেপালে পণ্যশিল্পের উন্নতির জন্য তিনি যত্নবান্‌। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে যে-সব গরিব নেপালী জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম, তিনি তাহাদের বসবাসের ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নূতন জমী বন্দোবস্ত করাইয়া দিয়াছেন। রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ বাড়াইয়া দিয়াছেন। কৃষিবিজ্ঞান, পক্ষীপালন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ছোট ছোট বহি তিনি অনুবাদ করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য একটি নূতন সরকারী কার্য্যবিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। নেপালে কাপাসের চাষের চেষ্টাও তিনি করাইতেছেন। তিনি ধার্ম্মিক ব্যক্তি, অনাড়ম্বর সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন করেন।

তাঁহার সেক্রেটারী তাঁহার উত্তর পড়িবার পর তিনি তাঁহার পূর্ব্বাবধি পরিচিত ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার মহাশয়কে আস্তে আস্তে নিজের হৃদ্‌গত কথা কিছু জানাইলেন এবং উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে তাহা জানাইতে বলিলেন। ডাক্তার মহাশয় তাহা বাংলায় সকলকে বলিলেন। কথাগুলি মহারাজা বাহাদুরের আন্তরিক প্রীতি ও সৌজন্যের পরিচায়ক।

—

ভারতবর্ষীয় উদারনৈতিকদের প্রভাব

এলাহাবাদের এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ 'পাইয়োনিয়ার' সেদিন দুঃখ করিয়া লিখিয়াছে, যে, তার এমন

মডারেট নেতাও প্রকাশ্য সভাতে বক্তৃতা করিয়াছেন (cannot recall a single occasion on which even one of the so-called Moderate leaders has sought a platform before a public audience in India)। অবশ্য ইহা রাজনৈতিক বক্তৃতা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। পাইয়োনিয়রের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও মোটের উপর সত্য। তাহার কারণও সুবিদিত। মডারেট নেতাদের মধ্যে বিদ্বান, বাগ্মী, বিচক্ষণ বা সৎলোকের একান্ত অভাব নাই। কিন্তু তাঁহারা অনুচরশূন্য নেতা। তাঁহারা বক্তৃতা করিতে রাজী, কিন্তু শুনিবে কে? ইহা দেশের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাহাই হউক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর তাঁহাদের প্রভাব অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এই অবস্থা অনেক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং তাঁহাদের প্রভাব ক্রমশঃ কমিতেছে। অথচ ভারতসচিব লর্ড মর্লী যে মডারেট-দিগকে সরকারের পক্ষে টানিবার ("rallying the Moderates") নীতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, এখনও গবর্ন্মেণ্ট-মহলে তাহার প্রভাব লক্ষিত হইতেছে মনে হয়। মডারেটদের মধ্যে অনেকে সরকারের পক্ষে যাইতে রাজী থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের সাহায্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশের কাজ নির্ব্বিঘ্নে চালান অসম্ভব। কংগ্রেস ও দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক-মতিবিশিষ্ট লোক যাহা চায়, মডারেটরাও গবর্ন্মেণ্টকে যদি কতকটা সেইরূপ পরামর্শ দিতেন, তাহা হইলে দেশে তাঁহাদের প্রভাব বাড়িতে পারিত; কিন্তু সে পরামর্শ ত গবর্ন্মেণ্টের মনঃপূত হইত না, এবং তাঁহারাও আর মডারেট-পদবাচ্য থাকিতেন না।

—

বঙ্গের লাটের নূতন উপাধি

বঙ্গের লাট স্যর ষ্টান্‌লি জ্যাকসনের কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইতে যাইতেছে। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর অব্ ল" অর্থাৎ আইনের আচার্য্য উপাধি দিয়াছেন। আইনের বিশিষ্টরকম কোন জ্ঞান না থাকিলেও সম্মান প্রদর্শনের জন্য উচ্চপদস্থ লোকদিগকে এইরূপ উপাধি দিবার রীতি আছে।

ডক্টরের চলিত বাংলা ডাক্তার কথাটি নানা বিদ্যায় পারদর্শী লোকদের প্রতি 'আচার্য্য' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে সাধারণ লোকেরা কখন কখন ভ্রমেও পড়ে। এলাহাবাদে এক বার এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বিজ্ঞানের ডক্টর উপাধি পাইবার পর ডাঃ (Dr.) অক্ষর-যুক্ত একটি নিজের নামের তক্তা দ্বারদেশে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক গরিব দুঃখী লোক চিকিৎসার জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইত। তাঁহার ভৃত্যকে অনেক কষ্টে তাহাদিগকে বুঝাইতে হইত, যে, তাহার মনিব চিকিৎসা-বিদ্যার ডাক্তার নহেন, হিসাবের ডাক্তার; কেন-না, ভদ্রলোকটি গণিত-বিজ্ঞানে ডি এস্-সি উপাধি পাইয়াছিলেন।

বাংলা দেশে যদি লোকেরা মনে করে, যে, এ দেশে আইন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং স্যর ষ্টানলী জ্যাকসন আইনের সেই রোগের চিকিৎসক, তাঁহার চিকিৎসার গুণে বঙ্গে আইন আবার স্বাভাবিক সুস্থ প্রকৃতি লাভ করিবে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে। কারণ, এদেশের আইনকে চিকিৎসা দ্বারা নীরোগ করিয়া সুস্থ ও সভ্যজনোচিত করিবার মত জ্ঞান তাঁহার থাকিতেও পারে, কিন্তু ক্ষমতা নাই। সে ক্ষমতা আছে বড়লাটের। কিন্তু তিনি আজকাল অন্যবিধ কাজে ব্যস্ত আছেন। সম্প্রতি যখন তিনি কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তখন সেই সুযোগে তাঁহাকে ডি-অর্ড (D. Ord.) অর্থাৎ ডক্টর অব্ অর্ডিন্যান্স বা অর্ডিন্যান্সাচার্য্য উপাধি দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাহবা লইতে পারিতেন। কিন্তু সে সুযোগ হারাইয়াছেন।

—

মিঃ ভিলিয়ার্সের ইঙ্গিত বা আদেশ

ইউরোপীয় সমিতির সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্স বিলাতী একটা কাগজের মারফতে এই ইঙ্গিত, অনুরোধ বা আদেশ ইংরেজ জাতিকে জানাইয়াছেন, যে, মহাত্মা গান্ধীকে ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও নির্ব্বাসিত করা উচিত যেমন ইংরেজরা নেপোলিয়নকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল; কারণ মিঃ ভিলিয়ার্সের মতে মহাত্মা গান্ধী দেশের শান্তির পক্ষে ভয়ঙ্কর বিঘ্ন। ভারতবর্ষের জেলে বন্ধ করিয়া রাখিলেও যদি গান্ধীজি ভয়ঙ্কর হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিদেশে রাখিলেও তিনি ভয়ঙ্কর থাকিবেন। যদি স্বাভাবিক বা কৃত্রিম কারণে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলেও তিনি যে মনোভাব ভারতীয় জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন, সেই মনোভাব ভিলিয়ার্স-জাতীয় জীবদের পক্ষে ভয়ঙ্কর হইবে।

মিঃ ভিলিয়াসের কথার জবাবে যদি ভারতীয়েরা বলে, যে, তিনি ও তাঁহার সমিতি শান্তির বিঘ্ন উৎপাদক বলিয়া তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করা উচিত, তাহা হইলে এরূপ মন্তব্য ন্যায়সঙ্গত হইলেও তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ ভারতীয়দের কথা কর্ত্তৃপক্ষ শুনিবেন না। কিন্তু তি

ভিলিয়ার্সের উক্তিতে ভারতবর্ষে ও জগতে অশান্তি ঘটিতে পারে। কারণ, গবর্মেণ্ট ইংরেজ বণিকদের কথা শুনেন; তাঁহাদের কথা অনুসারে গান্ধীজীকে নির্ব্বাসিত করিলে ভারতবর্ষে অশান্তি বাড়িবে বই কমিবে না। এবং ইহা নিশ্চিত, যে, ভারতবর্ষের শান্তির সহিত পৃথিবীর শান্তি জড়িত।

গান্ধীজীকে নির্ব্বাসিত করিলে ভারতবর্ষের স্বরাজ-প্রচেষ্টা নির্ব্বাপিত হইবে, এরূপ কোন আশঙ্কা করিয়া আমরা এসব কথা লিখিতেছি না। উহা কখন ম্লান কখন সতেজ হইতে পারে, কিন্তু নিবিবে না।

বোম্বাই অঞ্চলের ইংরেজদের কাগজ 'টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া' মিঃ ভিলিয়ার্সের ইঙ্গিতের সমর্থন না করিয়া নিন্দা করিয়াছে। এই কাগজে প্রশ্ন করা হইয়াছে, মিসর হইতে আরবী পাশাকে সিংহলে এবং জগলুল পাশাকে মাল্টা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়া কিছু লাভ হইয়াছে কি? মিসরের স্বাজাতিকরা বরং মনে করিয়াছে, যে, নির্ব্বাসন দ্বারা তাঁহাদিগকে গৌরবমণ্ডিতই করা হইয়াছে। 'টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া'র মতে মিঃ ভিলিয়ার্সের সংযত ভাবে কথা বলা দরকার।

—

বঙ্গীয় গ্রন্থালয় কন্‌ফারেন্স

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় গ্রন্থালয়সমূহের কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে হইয়াছিল, বড়োদা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত নিউটন মোহন দত্ত তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার পিতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত ডাক্তার এবং লণ্ডনে প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক ছিলেন, এবং মাতা ছিলেন ইংরেজ মহিলা। তাঁহার অভিভাষণে প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে গ্রন্থালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলে গ্রন্থালয় স্থাপন ও তাহার উন্নতি কিরূপ হইতেছে। তাহার উল্লেখও অভিভাষণে আছে। এই অধিবেশনে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের অভিভাষণও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। গ্রন্থালয়সমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি ও উন্নতি কিরূপে হইতে পারে, সে-বিষয়ে তাঁহার অভিভাষণে অনেক উপক্ষেপ আছে। তিনি বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র লাইব্রেরী স্থাপন ও তৎসমুদয়ের সুবন্দোবস্তের জন্য একটি বিল্ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন।

—

বঙ্গে পুরুষদের প্রাচীন নৃত্য

বাংলা দেশে পুরুষদের মধ্যে পৌরুষব্যঞ্জক যে সব নৃত্য অতীত কালে প্রচলিত ছিল, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত তাহার পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার দ্বারা বীরভূমের রায়বেঁশে নৃত্যের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। ইহা অনেক স্থলেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন অনিষ্টকর বিলাসবিভ্রম হাবভাব নাই। এরূপ নৃত্যে দেহমনের স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়, এবং ইহা বিশুদ্ধ আত্মপ্রকাশ ও আমোদেরও উপায়।

—



বঙ্গীয় গ্রন্থালয় কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ও সদস্যবর্গ

নৌচালন-দক্ষতার জন্য পুরস্কৃত বাঙালী বালক

বোম্বাই উপকূলে 'ডাফরিন" নামক জাহাজে প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কতকগুলি ভারতীয় বালককে বাণিজ্যজাহাজ চালাইবার বিদ্যা



শ্রীমান এ. চক্রবর্ত্তী

শিখাইবার নিমিত্ত লওয়া হয়। সম্প্রতি শ্রীমান্ এ. চক্রবর্ত্তী নামক একটি বালক তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাবিক বিবেচিত হওয়ায় বড়লাটের মেড্যাল পুরস্কার পাইয়াছে। এই ছেলেটির পুরা নাম ও পরিচয় জানা থাকিলে তাহা লিখিয়া দিতাম।

—

গান্ধী-উইলিংডন সংবাদ

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পর দিন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশদ্বয় এবং বঙ্গের অবস্থা অবগত হইয়া বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল, বড়লাট সম্মত হইলে তাঁহার সহিত দেখা করিবেন। বড়লাটের উত্তরে গান্ধীজীকে প্রায় স্পষ্ট করিয়াই বলা হয়, যে, কংগ্রেস-নেতারা সীমান্ত প্রদেশে ও আগ্রা-অযোধ্যায় যাহা করিয়াছেন গান্ধীজী তাহার জন্য নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করুন ও নিজ সহকর্ম্মীদিগকে পরিত্যাগ করুন; তাহা করিলে বড়লাট তাঁহার সহিত দেখা করিবেন। কিন্তু গান্ধীজী সহকর্ম্মীদের প্রতি এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ও হীনতা স্বীকার করিয়া বড়লাটের সহিত দেখা করিতে রাজী হইলেও বড়লাট আর একটা সর্ত্ত করেন, যে, উক্ত তিন প্রদেশে গবর্মেণ্ট যে দমন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন ও তাহা সফল করিবার নিমিত্ত অর্ডিন্যান্স আদি যাহা জারি করিয়াছেন, সাক্ষাৎকারের সময় গান্ধীজী সে-সব বিষয়ের কোন আলোচনা করিতে পারিবেন না! বড়লাটের উত্তরের সুরটা হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতাজনোচিত কড়া ছিল, সুতরাং তাহাতে সৌজন্য ছিল না। মহাত্মাজী ইহার একটি দীর্ঘ উত্তর প্রেরণ করেন। তাহাতে বড়লাটের সব কথার খণ্ডন ছিল। কোন অসৌজন্য ছিল না। এই উত্তরে একটি কথা ছিল যাহা কাহারও কাহারও মতে গান্ধীজী উহাতে না লিখিলে ভাল করিতেন। কথাটি এই। তিনি লিখিয়াছিলেন:—অপ্রতিবাদিত গুজবএবং গবর্মেণ্টের অধুনাতন কার্য্যকলাপ হইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই ধারণা হইয়াছে, যে, তাঁহাকে শীঘ্রই বন্দী করা হইবে এবং তিনি সর্ব্বসাধারণকে চালিত করিবার আর সুযোগ পাইবেন না; এই জন্য কমিটি তাঁহার পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজন হইলে অবলম্বনের জন্য নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘনের পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি নির্দ্ধারণ গ্রহণ করেন; তাহার একটি নকল বড়লাটকে পাঠান হইতেছে; বড়লাট যদি তাঁহার সহিত দেখা করিতে রাজী হন, তাহা হইলে আপাততঃ এই নির্দ্ধারণ অনুসারে কাজ করা স্থগিত থাকিবে—এই আশায় স্থগিত থাকিবে, যে, গান্ধীজীর সহিত বড়লাটের আলোচনার ফলে ঐ নির্দ্ধারণ অনুসারে কাজ করা অনাবশ্যক হইতে পারে।

বড়লাট গান্ধীজীর টেলিগ্রামের এই অংশটির ভয়-প্রদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, এবং বলেন, কোন গবর্মেণ্ট ধমকের প্রভাবে কোন সর্ত্তের অধীন হইতে পারেন না। গান্ধীজীর টেলিগ্রামের ঐ অংশটির ঐরূপ ব্যাখ্যা হইতেই পারে না, বলা যায় না; কোন কোন ভারতীয় সম্পাদকও উহার ঐরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবপর মনে করিয়া থাকিবেন। গান্ধীজী তাঁহার সর্ব্বশেষ প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাহারও এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না, যে, তিনি ধমক দিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার প্রকৃতিও নহে। তাঁহার শেষ টেলিগ্রামের মূল ইংরেজীটি—তদভাবে তাহার যথার্থ অনুবাদ—পড়িলেই ইহা বুঝা যাইবে। অধিকন্তু আমাদের বক্তব্য এই, যে, আমাদের মত অন্য অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন, যে, ভিতরে ভিতরে গবর্মেণ্ট দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান যুগপৎ সুরু করিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, এবং কোথাও কোথাও তাহা গান্ধীজীর প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে আরম্ভও হইয়া গিয়াছিল; এরূপ স্থলে কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভারও তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী স্থির করা অনিবার্য্য হইয়াছিল; এবং কার্য্যপ্রণালী স্থির হইয়া গেলে তাহা গবর্মেণ্টকে জানান ও তদনুসারে কাজ করাও যে দরকার

হইতে পারে, তাহাও গবর্মেণ্টকে জানান, গান্ধীজীর চিরাচরিত অভিপ্রায়-অগোপনের অনুযায়ীই হইয়াছিল। না জানাইলে পরে কথা উঠিতে পারিত, যে, তিনি গোপনে গোপনে অহিংস যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি যখন ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহের সূত্রপাত স্বরূপ লবণ-আইন ভঙ্গ করিতে মনঃস্থ করেন, তখন কোথায় কি করিবেন তাহা প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বসাধারণকে ও গবর্মেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। সব দেশের গবর্মেণ্টের পক্ষে মন্ত্রগুপ্তি, কার্য্যপ্রণালীগুপ্তি আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে। মহাত্মাজী নিজের ও নিজের দলের পক্ষে তাহা কখনও আবশ্যক মনে করেন নাই। কেন-না, কংগ্রেস গুপ্তসমিতি নহে, ইহার কার্য্যপ্রণালীও গোপনীয় নহে।

এ বিষয়ে আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা লিখিলাম। পাঠকেরা উভয় পক্ষের মূল টেলিগ্রামগুলি পড়িয়া আমাদের মন্তব্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিজ নিজ মত স্থির করিতে পারিবেন। ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে লর্ড আরুইনকে গান্ধীজী যে-দুখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেইগুলির মত আলোচ্য টেলিগ্রামগুলি ঐতিহাসিক দলিল। কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির শেষ নির্দ্ধারণগুলিও ঐতিহাসিক দলিল। তৎসমুদয়ের ঔচিত্যানুচিত্য যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতা বুঝিতে হইলে দলিলগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

—

গবর্মেণ্ট ও জনগণ

গান্ধী-উইলিংডন টেলিগ্রামগুলি পড়িলে লক্ষ্য করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে, যে, বড়লাটের পক্ষ হইতে প্রেরিত জবাবগুলির ভিতর এই ধারণা নিহিত রহিয়াছে, যে, শাসক পক্ষ অতি উচ্চস্থানীয় এবং শাসিত পক্ষ তাঁহাদের নির্দ্ধারণ ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য; ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে কেহ যে জনগণের প্রতিনিধিরূপে শাসকদের সঙ্গে সমানে সমানে কথাবার্ত্তা চালাইবে, এটা যেন তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য। অথচ এই প্রতিনিধি যথেষ্ট শিষ্টাচারের সহিতই নিজের বক্তব্য বরাবর বলিয়াছেন। যাঁহারা দুদিনের তরে শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, তাঁহারা ইহা মনে রাখিলে তাঁহাদেরই উপকার ও সুনাম হয়, যে, ভবিষ্যতে যখন তাঁহারা বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলাইয়া যাইবেন, মহাত্মাজীর মত জননায়ক তখনও অমরকীর্ত্তি হইয়া থাকিবেন।

ইংলণ্ডের অন্যতম বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন সম্বন্ধে একটা গল্প আছে, যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীরূপে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত একদা রাষ্ট্রীয় কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় মহারাণী তাঁহার স্পষ্টবাদিতায় অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন, আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন আমি ইংলণ্ডের মহারাণী।" তাহার উত্তরে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বলেন, "মহিমময়ী আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, আমি ইংলণ্ডের লোকসমষ্টি।" জনগণপ্রতিনিধি যে মহারাণীর চেয়ে নিম্নস্থানীয় কেহ নহেন, গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ভিক্টোরিয়াকে তাহাই জানাইয়া দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের পঁয়ত্রিশ কোটি লোক আমরা নগণ্য, আমাদের মহত্তম নেতা ও প্রতিনিধি নগণ্য; সর্ব্বেসর্ব্বা হচ্চেন আগন্তুক ভারতপ্রবাসী শাসক ও বণিক-সম্প্রদায়ের অগ্রণীরা। এই অস্বাভাবিক অবস্থা কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

—

মহাত্মাজী কারাগারে

মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হইয়াছেন, গান্ধী-উইলিংডন সংবাদের ফলে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গে ও পরে ধৃত অন্য অনেকের গ্রেপ্তার একটি আগে হইতে সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালীর অঙ্গ বলিয়া বহু পূর্ব্ব হইতে অনুমিত হইয়াছিল। তাঁহার ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের ফ্রী প্রেস জর্ণালে লণ্ডনস্থ ফ্রীপ্রেসের প্রতিনিধির প্রেরিত এই সংবাদ প্রকাশিত হয়, যে, গবর্মেণ্ট আগেকার সত্যাগ্রহের দশ হাজার কর্ম্মীর নামধাম স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; দরকার হইবা মাত্র তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে। এই সংবাদ অক্ষরে-অক্ষরে সত্য না হইলেও সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন মনে হয় না।

শ্রীমতী এনী বেশান্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া'র ৭ই জানুয়ারীর সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে—

The ordinances bear out the information telegraphed to *The Madras Mail* by its Special Correspondent at Delhi, that the Government's plan is to crush the Congress and all other defiant organizations at once, "instead of the machinery of the law gathering momentum by the process of use." The plan has been ready, according to the same source of information, for some time, so that the Government has not been taken by surprise by the recent developments either in the U. P. and the Frontier Province or at the Congress Working Committee's meeting.

তাৎপর্য্য। "মাদ্রাস্ মেলের দিল্লীস্থ বিশেষ সংবাদদাতা ঐ কাগজে যে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন, যে, গবর্ন্মেণ্টের সঙ্কল্পিত কার্য্যপদ্ধতি হইতেছে কংগ্রেসকে এবং অন্য সকল স্পর্দ্ধিত অবাধ্য দলকে অবিলম্বে একেবারে পিষিয়া ফেলা—আইন-যন্ত্র তাহাদের বিরুদ্ধে চালাইতে চালাইতে উহার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে উহার গতিবেগ ও পেষণশক্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রেত নহে, অর্ডিন্যান্সগুলি সেই টেলিগ্রামের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। সেই সংবাদদাতা যেখান হইতে খবর পাইয়াছেন তদনুসারে, এই কার্য্যপদ্ধতি কিছু কাল হইতে প্রস্তুত হইয়াই ছিল; এই হেতু সম্প্রতি সীমান্ত প্রদেশে এবং যুক্ত-প্রদেশদ্বয়ে অথবা কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ হঠাৎ গবর্ন্মেণ্টের নিকট পৌছিয়া গবর্ন্মেণ্টকে বিস্মিত করে নাই, গবর্ন্মেণ্ট তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।"

বোম্বাইয়ের ফ্রী প্রেস জর্ন্যালের ১২ই জানুয়ারীর সংখ্যায় গত ১লা জুলাইয়ের যে "গোপনীয়" সরকারী চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে গবর্ন্মেণ্টের অন্ততঃ ছয় মাস আগে হইতে আয়োজনের কতক প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া ফ্রী প্রেসকে ইংরেজীতে যে মন্তব্য প্রেরণ করেন, নীচে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

"গবর্ন্মেণ্ট ও মহাত্মাজীর মধ্যে পরস্পর বুঝাপড়ার কোন সুযোগ মহাত্মাজীকে না দিয়াই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহা হইতে ইহাই বুঝা যায়, যে, আমাদের শাসকদের মতে, ভারতবর্ষের ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার কাজে ব্যাপৃত দুই সহযোগীর মধ্যে অন্যতর সহযোগী ভারতবর্ষের জনগণ দৃপ্ত-অবজ্ঞা-ভরে উপেক্ষিত হইতে পারে। যাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে, এবং আমাদিগকে জগতের নিকট প্রমাণ করিতে হইবে, যে, ভারতের ভাগ্য যে দুই পক্ষের কার্য্য ও প্রভাবের উপর নির্ভর করে, তাহাদের মধ্যে আমরা গরীয়ান—অপর যে পক্ষের ভারতবর্ষে বিদ্যমানতা চিরন্তন নহে, আকস্মিক মাত্র, তাহাদের চেয়ে আমরা গরীয়ান। কিন্তু যদি আমরা মাথা খারাপ করি এবং অন্ধ আত্মঘাতী রাজনৈতিক উন্মাদ দ্বারা হঠাৎ আক্রান্তের মত আচরণ করি, তাহা হইলে একটি মহৎ সুযোগ হারাইব। নৈরাশ্য হইতেই আমাদের পাওয়া উচিত শক্তিমত্তার গভীর স্থৈর্য্য এবং সেই নিষ্করুণ প্রতিজ্ঞা যাহা বালকোচিত ভাবোচ্ছ্বাস এবং আত্মব্যর্থতাজনক ধ্বংসপরায়ণতা দ্বারা নিজের সম্বল অপচয় না করিয়া নীরবে নিজের সঙ্কল্পসিদ্ধি সম্পন্ন করে। এই সেই মুহূর্ত্ত যখন আমাদের স্বজনগণের বিরুদ্ধে আমাদের সমুদয় পুঞ্জীভূত পূর্ব্বসংস্কার ভুলিয়া যাওয়া সহজ হওয়া উচিত; যখন, যাহারা রূঢ়তার সহিত আমাদের সাহচর্য্য-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহাদিগেরও সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেমের সহিত একযোগে কাজ করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য; যখন আমাদিগকে আমাদেরই নিজেদের নিকট হইতে আমাদের জাতির সকল অংশের সহিত সহযোগিতার প্রগাঢ় প্রেরণা দাবি অবশ্যই করিতে হইবে। ইহা সেই প্রকারের বিপত্তি যাহা ক্বচিৎ কোন জাতির নিকট উপনীত হয়—উপনীত হয় এরূপ সংঘাতের সহিত যাহা আমাদের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জকে এককেন্দ্রাভিমুখ করে এবং আমাদের স্বাধীনতা গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় আমাদের সৃজনচেষ্টার প্রতিবন্ধকগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচিত করে।

"আইনকর্ত্তাদের আদিমযুগোচিত উচ্ছৃঙ্খলতার আমাদিগকে বলপূর্ব্বক সেই প্রেমেই আমাদের মুক্তির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা উচিত, যে-প্রেম এরূপ শক্তির সম্মুখেও আপনার পরাজয় মানে না যাহা সেই অবিচারিত সন্দেহের বেড়ার পশ্চাতে আত্মরক্ষার জন্য আপনাকে স্থাপন করে, যে-সন্দেহ হইতে উৎপন্ন অন্ধ আতঙ্ক তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশে অসমর্থ। ইহাই সেই সময় যখন, সেই সব লোকদের চেয়ে আমাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব আমাদের কখনও ভুলা উচিত নয়,

যে-সব লোকের বাহুশক্তির পরিমাণ এত বেশী যে তাহা তাহাদিগকে মানবিকতা অগ্রাহ্য করাইতে পারে।"

যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা এই অনুবাদ অপেক্ষা মূল ইংরেজীটি অধিকতর সহজে বুঝিতে পারিবেন। নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন নামে পরিচিত সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে সত্যাগ্রহীদিগকে কি করিতে হইবে, কি করিতে হইবে না, তাহা মহাত্মাজীর পরামর্শ অনুসারে কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। যাহারা সত্যাগ্রহ করিবে না, তাহাদের জন্য তাহাতে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বাহ্য কোন্ কোন্ কার্য্য করণীয় বা অকর্ত্তব্য, কি কার্য্যপ্রণালী অবলম্বনীয়, তৎসম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ উপদেশ নাই। কিন্তু তাহাতে কেবল সত্যাগ্রহীদের নহে, সমগ্র জাতির অনুধাবন ও গ্রহণের যোগ্য গভীরতর বাণী আছে।

আমরা নীচে মূল ইংরেজীটিও দিতেছি।

"Mahatmaji has been arrested without having been given a chance of coming to a mutual understanding with the Government. It only shows that of the two partners in the building of the history of India the people of India can be superciliously ignored according to our rulers. However, the fact has to be accepted as a fact, and we must prove to the world that we are important, more important than the other factor which is merely an accident. But if we lose our head and give vent to a sudden fit of political insanity, blindly suicidal, a great opportunity will be missed. The despair itself should give us the profound calmness of strength, the grim determination which silently works its own fulfilment without wasting its resources in puerile emotionalism and self-thwarting destructiveness. This is the moment when it should be easy for us to forget all our accumulated prejudices against our kindreds, when we must do our best to combine our hands in brotherly love even with those who have roughly rejected our call of comradeship, when we must claim of us an intense urge of co-operation with all different parts of our Nation. This is the kind of catastrophe which rarely comes to a people, with a shock that brings to a focus our scattered forces and shortens the difficulties of our creative endeavour in the building of our freedom.

The primitive lawlessness of the law-makers should forcibly awaken us to our own ultimate salvation in a love which owns no defeat in the face of a power which barricades itself with an indiscriminate suspicion that its blind panic cannot define. This is the time when we must never forget our responsibility to prove ourselves morally superior to those who are physically powerful in a measure that can defy its own humanity."

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কণ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চারিটি ছবির প্রতিলিপি প্রবাসীর এই সংখ্যায় দিলাম। ছবিগুলির কোন নাম কবি দেন নাই, দেওয়া যায়ও না। কারণ, সেগুলি কোন বাস্তব মনুষ্য বা অপর জীব বা অপর জন্তুর প্রতিরূপ নহে, সম্পূর্ণরূপে কবির মানসসৃষ্টি। এই সব ছবি অন্য কোন চিত্রকর বা চিত্রকর-সম্প্রদায়ের ছবির মত নহে; কারণ কবি কোন চিত্রবিদ্যালয়ে বা বাড়িতে কোন চিত্রকরের নিকট শিক্ষালাভ করেন নাই। লিখিবার সময় যে কাটকুট হয় সেইগুলিকে রেখা দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিবার অভ্যাস থাকায় তাহা করিতে করিতে এই সকল রেখার সংযোগে নানাবিধ ছক উৎপন্ন হইত। ইহাই তাঁহার চিত্রাঙ্কণ-অভ্যাসের উৎপত্তির ইতিহাস। তাঁহার ছবিগুলিকে তিনি তাঁহার রেখার ছন্দোবন্ধ ("my versification in lines") বলিয়াছেন। তিনি কলম দিয়া আঁকেন, তুলি দিয়া নহে। কখন কখন কলমের বাঁটের দিক্‌টাও ব্যবহার করেন, আঙুল দিয়াও রং দেন।

ছবির নাম দেওয়া সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীর সম্পাদককে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন :—

"ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি; আমি কোন বিষয় ভেবে আঁকিনে—দৈবক্রমে কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক রাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব।—কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল—বিশেষত সে নাম যখন বিষয়-

সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি—তারা অনাহূত এসে হাজির—রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন, তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন,—নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন। অনাথাদের জন্যে কত আপিল বের করেন, অনামাদের জন্যে করতে দোষ কি? দেখবেন যেখানে এক নামের বেশী আশা করেন নি সেখানে বহুনামের দ্বারা ছবিগুলো নামজাদা হয়ে উঠবে। রূপসৃষ্টি পর্য্যন্ত আমার কাজ, তারপরে নামবৃষ্টি অপরের।"

কবির সমুদয় চিন্তা ও ভাব প্রকাশের জন্য তাঁহার প্রচুর শব্দসম্পদ ও যথেষ্ট লিপিনৈপুণ্য আছে। তাহা সত্ত্বেও যদি শব্দের দ্বারা ছাড়া তাঁহার অন্তরের কিছু জিনিষ রেখা ও রঙের সংযোগে উৎপন্ন রূপের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহা অপেক্ষা শব্দসম্পদে দরিদ্র কেহ কথার দ্বারা কেমন করিয়া ব্যক্ত করিবে? শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিবার হইলে তিনি নিজেই তাহা করিতেন।

অন্য দু-একটা কথা বলি।

প্যারিসের চিত্রশালা লুভ্রে লেওনার্দো ডা ভীঞ্চির আঁকা মোনা লীজা নাম্নী মহিলার যে বিখ্যাত চিত্র আছে, তাহা কিংবা তাহার প্রতিলিপি আমাদের দেশের অনেকে দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আঁকা যে নারীমূর্ত্তিটির প্রতিলিপি এবার ছাপিয়াছি, তাহার মুখের ভাব মোনা লীজার রহস্যাচ্ছন্ন হাস্য আমার মনে পড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই নারীর মুখ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, বলা আরও কঠিন। ইহা কেবল হাসি নয়, কেবল কৌতুক নয়, কেবল বিরাগ নয়, ব্যঙ্গ নয়।

দীর্ঘ বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট ছবিটিতে কি ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির উপর একই বংশীধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দেখান হইয়াছে? এই বাঁশী কে বাজাইতেছেন?

—

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের শাস্তি

ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জকে ভারতবর্ষের সম্রাটত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার অভিযোগে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিচার চলিতেছিল। সম্প্রতি তাহা শেষ হইয়াছে। এসেসর চারিজনের মধ্যে দুজন তাঁহাকে নির্দ্দোষ এবং দুজন অপরাধী বলেন। বিচারক মিঃ হ্যামিল্টন রায়ে বলিয়াছেন, যে, মানবেন্দ্রনাথের অপরাধের প্রবল প্রমাণ মনকে অভিভূত করে। সেই জন্য তিনি তাঁহাকে বার বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য আমাদের সম্মুখে না থাকায় দণ্ডবিধান ঠিক হইয়াছে কি না বলিতে পারিতেছি না; কিন্তু বিচারের যে বৃত্তান্ত মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে বাহির হইত, তাহা হইতে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে, যে, মানবেন্দ্রনাথ আত্মপক্ষ-সমর্থনের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পান নাই।

—

সত্যাগ্রহীদের প্রতি সরকারী ব্যবহার

১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহের সময় জনতার প্রতি যে পরিমাণে লাঠিবৃষ্টি হইয়াছিল, এবার এখনও তত হয় নাই; কিন্তু যাহা হইতেছে তাহাও নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। গুলির আঘাতে অনেকের মৃত্যুও কোন কোন স্থানে হইয়াছে।

সত্যাগ্রহ যদিও সশস্ত্র যুদ্ধ নহে, তথাপি সশস্ত্র যুদ্ধের সহিত ইহার এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সশস্ত্র যুদ্ধে সেনানায়কদের চেয়ে সাধারণ সৈনিকরাই বেশী হত ও আহত হয়, এবং বন্দী হইলে শত্রুর হাতে তাহারা তেমন ভাল ব্যবহার পায় না যেমন সেনানায়কেরা পাইয়া থাকেন। হত আহত বা বন্দী যে-সব সৈনিক হয় না, তাহারাও সেনানায়কদের মত আরামে থাকে না।

অহিংস সংগ্রামেও নেতাদের চেয়ে অনুচরদের কষ্ট বেশী। লাঠির ঘা কচিৎ দু-এক জন নেতার উপর পড়ে, কিন্তু সাধারণ সত্যাগ্রহীদের উপর বেশী পড়ে। নেতা এক জনও বোধ হয় এ পর্য্যন্ত বন্দুকের গুলিতে মারা

পড়েন নাই। কারারুদ্ধ হইলে নেতারা অবশ্য বাড়িতে নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে যতটা আরামে থাকেন, জেলে তত আরামে থাকেন না, কিন্তু মোটের উপর সাধারণ সত্যাগ্রহীদের চেয়ে ভাল ব্যবহার পান।

এই সকল পার্থক্যের জন্য অবশ্য নেতারা দায়ী নহেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সংগ্রামে লিপ্ত হন, তাঁহাদিগকেই নেতা বলিতেছি। তাঁহারা আপনাদিগকে বিপদ হইতে দূরে রাখেন না। তাঁহারা জানেন, যে, সাধারণ সত্যাগ্রহীরা মনুষ্যত্বে তাঁহাদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় নহেন।

কুষ্ঠরোগীদের হিতার্থ মিশন

কুষ্ঠরোগীদের হিতার্থ মিশনের কাজ যাঁহারা চালাইতেছেন, তাঁহারা সকলের অবিমিশ্রপ্রশংসাভাজন। আমরা পুরুলিয়ায় ইহাদের জন্য শালবনের মধ্যে নির্ম্মিত হাঁসপাতাল আশ্রম প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই মিশনের ১৯৩০ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩১ আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের সুমুদ্রিত সচিত্র রিপোর্ট পাইয়া প্রীত হইয়াছি। ভারতবর্ষে এই মিশনের কার্য্যে ঐ এক বৎসরে ৮,৩৬,৬৩৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সরকারী সাহায্য, সর্ব্বসাধারণের দান, প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। চাঁদা হইতে প্রাপ্ত ২৩৮৩৪৮৭৭র মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী টাকা (২৪০০৲) আসিয়াছে রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুরের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতে। ইহা ছাড়া দেশী লোকদের দান আরও আছে, কিন্তু বিদেশীদের দানই বেশী। এক টাকা পর্য্যন্ত দান স্বীকৃত হইয়াছে। পুরুলিয়ার কুষ্ঠরোগী বালকদের দেওয়া তিনটি টাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিশনের সেক্রেটারীর নাম ও ঠিকানা, এ ডোনাল্ড মিলার, পুরুলিয়া, মানভূম।

অরাজনৈতিক সভাসমিতি

গান্ধীজী দেশে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তারের পর দেশে ধরপাকড় খব বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহার আগেও কোন কোন অর্ডিনান্স জারি হইয়াছিল, এবং লাঠি ও গুলি চলিয়াছিল, গ্রেপ্তার হইতেছিল, অনেকে অর্ডিন্যান্সগ্রস্তও হইয়াছিলেন। এই রকম গোলমাল সত্ত্বেও কিন্তু বিদ্বান্ লোকদের ও শিক্ষাদাতাদের কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স যথাসময়ে হইতেছে। খ্রীষ্টীয়ানদের বড়দিনের আগে পাটনায় দার্শনিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং তাহাতে অনেক দার্শনিক সন্দর্ভ পঠিত হয়। আলোচনাও কিছু হইয়াছিল। তাহার পর মান্দ্রাজে বিজ্ঞান-কংগ্রেস হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতেও অনেক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাআদি হইয়াছে। বাঙ্গালোরে শিক্ষাবিষয়ক কন্‌ফারেন্সও হইয়া গিয়াছে। মুসলমানদের শিক্ষাবিষয়ক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন ইতিমধ্যে হইয়াছে। কোন কোন প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রাষ্ট্রনীতির চাপে তাহাতে জরুরি আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্রনৈতিকই ছিল। বর্ণাশ্রমীদের কন্‌ফারেন্সও কলিকাতায় হইয়াছে। ইহাঁরা বংশাৎ ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি চান; সুতরাং ইহাঁদের এ যুগের পরিবর্ত্তে অতীত কোন একটা সময় বাছিয়া লইয়া তাহাতে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। ইহাঁরা বর্ণাশ্রমবিহিত স্বরাজ চান। এখন বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই। বর্ণাশ্রম মানে না (অন্ততঃ কার্য্যতঃ মানে না) এরূপ হিন্দু বহুকোটি আছে; তা ছাড়া অহিন্দুর সংখ্যাও অনেক কোটি। এ অবস্থায় বর্ণাশ্রমবিহিত স্বরাজটি কি প্রকার চীজ হইবে, তাহা বোধাতীত। কোন কোন দেশী রাজ্যের প্রজারাও তাঁহাদের অভাব অভিযোগ ও দাবি সম্বন্ধে কন্‌ফারেন্স করিয়াছেন।

নিখিল-ভারতীয় মহিলা-কন্‌ফারেন্স

গত ২৮শে ডিসেম্বর মান্দ্রাজের সেনেট হাউসে মহিলাদের নিখিলভারতীয় শৈক্ষিক ও সামাজিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। কলিকাতার ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা সরলা রায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। অভ্যর্থনা-কমিটির নেত্রী বেগম নাজির হুসেনের বক্তৃতাটি বেশ হইয়াছিল। তাহা হইতে

জানিয়া আশান্বিত হইলাম, যে, মান্দ্রাজে বালকবালিকা উভয়ের জন্যই আবশ্যিক শিক্ষাবিধিতে মুসলমান বালিকাদিগকে যে বাদ দেওয়া আছে, মান্দ্রাজের মুসলমান সম্প্রদায় তাহা রদ করিয়া তাঁহাদের বালিকাদের জন্যও আবশ্যিক শিক্ষার দাবি করিয়াছেন। বেগম সাহেবা তাঁহার অভিভাষণে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন,

"ইহা বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে, এখন যখন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশী সদ্ভাব ও সামঞ্জস্যের দরকার, তখন আমরা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এই বিবাদমেঘের কালিমার ভিতরও রৌপ্যের আস্তর দেখা যাইতেছে;—সকলের-পক্ষে-সাধারণ একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল সম্প্রদায়ের নারীদিগকে এই কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজ করিতে দেখা যাইতেছে, ইহা কম সুখের বিষয় নহে। ইহা আমাদের পুরুষজাতির অনুসরণের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদি তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধনে অসমর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে আমাদিগকে আমাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং আমাদের প্রত্যেককে আমাদের স্বামী, ভ্রাতা ও সন্তানদিগকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত পূর্ণ প্রীতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য করিতে হইবে। ইহা না করিতে পারিলে, ভারতবর্ষ নাম করিবার মত কোন উন্নতি করিতে পারিবে না।" (অনুবাদ)।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি তাঁহার সকল ভগিনীকে দেশী পণ্যশিল্পের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক হইতে অনুরোধ করেন।

"ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীতে দরিদ্রতম দেশ, এবং গত দুই বৎসরের পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুরবস্থা আমাদের চাষী ও কারিগরদিগের প্রায় সর্ব্বনাশ করিয়াছে। প্রিয় ভগিনীগণ, আমরা যখন আমাদের নিজের ও সন্তানদের জন্য সুন্দর সুন্দর পোষাক কিনিতে যাই, তখন কি আমাদিগের কারিগর শ্রেণীর আমাদের সেই সব অভাগিনী ভগিনীদের ও তাহাদের সন্তানদের কথা মনে রাখা উচিত নয় যাহাদের প্রতি একটু মনোযোগ তাহাদিগকে অনাহার হইতে রক্ষা করিতে পারে? ইহা অত্যন্ত অন্যায়, যে, আমাদের নিজের ভাইবোনেরা না-খাইতে পাইয়া মরিবে এবং আমরা আমাদের সাজসজ্জার জন্য বিদেশী বণিকদের সিন্দুক পূর্ণ করিব। আমি বিশেষ করিয়া আমার মুসলমান সম্প্রদায়ের ভগিনীদিগকে আমার অনুরোধ জানাইতেছি, যাঁহারা অনাহারক্লিষ্ট ভারতীয়দের দারুণ অভাব পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করেন নাই। আমি চাই, যে, তাঁহারা অন্ততঃ সেই পরিমাণে ভারতীয় পণ্যশিল্পসমূহকে উৎসাহ প্রদান করুন, যে পরিমাণ উৎসাহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভগিনীরা দিতেছেন।" (অনুবাদ)।

সর্ব্বশেষে তিনি বরপণ প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, "এই প্রথা ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে প্রচলিত, কিন্তু সকলের-[...]য়ে বেশী মারাত্মক।" [illegible]

পদ্য লিখিতে ওস্তাদ বাঙালী বরেরা ও বরের বাপেরাই এ বিষয়ে সকলের উপর টেক্কা মারিতে পারেন।

সভানেত্রী শ্রীমতী সরলা রায় তাঁহার অভিভাষণে বালিকাদের শিক্ষার উৎকর্ষবিধান সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। বাল্যবিবাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ইহা আরও বেশী আবশ্যক হইয়াছে। শিক্ষার যে-অংশ চরিত্র-গঠন, তাহার প্রয়োজন খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর, তিনি সকল বিদ্যালয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নানা ধর্ম্মের লোকদের বালিকারা যেখানে পড়ে, সেখানে বিশেষ বিশেষ কোন ধর্ম্মমত ও ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা দেওয়া যায় না, কিন্তু এমন শিক্ষা দেওয়া যায় যাহাতে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধাভক্তির ভাব, পূজার ভাব, নিয়মানুবর্ত্তিতা, নীচ ও পার্থিব বিষয়ের অতিরিক্ত কিছুর অনুসন্ধিৎসা, এবং আত্মবিশ্লেষণের সত্য মননের ও ধ্যানের শক্তি জন্মে—এক কথায় আদর্শানুগামিতা জাগ্রত হইতে পারে।

—

ভারতবর্ষে দেশীদের ও বিদেশীদের সংবাদপত্র

এখনও ভারতবর্ষে ভারতীয় অনেক লোক কেন যে ভারতবর্ষে বিদেশীদের দ্বারা অধিকৃত ও চালিত খবরের কাগজ কেনে ও পড়ে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহারা বিদেশীদের ঐ সব কাগজের রাষ্ট্রনৈতিক মত ভালবাসে, তাহাদিগকে কিছু বলা বৃথা। যাহারা বিদেশীর মুখে ভারতীয় মানুষদের ও ভারতীয় নানা বিষয়ের ও জিনিষের নিন্দা কুৎসা ভালবাসে বা অন্ততঃ সহ্য করিতে পারে, তাহাদিগকেও কিছু বলা বৃথা। যাহারা তাহাদের বড় সাহেবকে জানাইতে চায়, যে, তাহারা অমুক এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ কেনে ও পড়ে, তাহারা কৃপার পাত্র। কিন্তু জগতের খবরের জন্য, ভারতবর্ষের খবরের জন্য, বিশেষ করিয়া যে-সব খবর ভারতীয়দের জানিতে বিশেষ আগ্রহ সেই সব খবরের জন্য, দেশী কাগজগুলিই যথেষ্ট। বাংলা দেশের কথাই ধরুন। এখানকার এংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিকে আমাদের জ্ঞাতব্য খবর যাহা [illegible]

অনেক বেশী থাকে। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজে যাহা থাকে, তাহাও অনেক সময় বিকৃত আকারে থাকে। দেশী লোকেরা ইংরেজদের ধামাধরা না হইলে তাহাদের রাজনৈতিক বক্তৃতা এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজে হয় ছাপেই না, কিংবা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত আকারে ছাপে। খেলাধূলার খবর ও বর্ণনা দেশী কাগজেও থাকে। সকল দেশের রয়টারের তারের খবর, এসোসিয়েটেড প্রেসের খবর, ফ্রী প্রেসের দেশী ও বিদেশী খবর (যাহা এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজে থাকে না), বাণিজ্যিক সংবাদ, টাকার ও শেয়ারের বাজারের খবর, প্রভৃতিও দেশী কাগজে থাকে। সচিত্র প্রবন্ধ কোন-না-কোন দেশী দৈনিকে পাওয়া যায়। একখানি দেশী দৈনিকের ছবির ছাপা এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজের চেয়ে ভাল বই মন্দ নয়; তাহার রোটারি মেশিন বসিলে ছাপা আরও ভাল হইবে। সুযুক্তিপূর্ণ নির্ভীক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও টিপ্পনীও দেশী কোন-না-কোন কাগজে পাওয়া যায়। তার কোনটির সঙ্গেই পাঠক-বিশেষের মত এক না হইতে পারে, আমাদেরও কখন কখন হয় না, কিন্তু এমন কোন কাগজ আছে কি যাহার প্রত্যেকটি মতের সহিত প্রত্যেক পাঠক একমত?

এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজের ক্রেতারা বলিতে পারেন, "মশায়, এমন ইংরিজিটুকু দিশী কাগজে পাওয়া যায় না।" তাঁহাদিগকে বলা দরকার, আধুনিক ভাল ইংরেজী শিখিতে হইলে আধুনিক উৎকৃষ্ট ইংরেজী সাহিত্য পড়া আবশ্যক। আর যদি একেবারে আজকালকার ভাল ইংরেজী শিখিতে হয়, তাহা হইলে বিলাতী উৎকৃষ্ট সংবাদ-পত্র—যথা, ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়্যান, স্পেক্টেটর ইত্যাদি—পড়া আবশ্যক ও যথেষ্ট।

বার্ষিক থিয়সফিক্যাল সম্মেলন

থিয়সফিক্যাল সোসাইটির শাখা পৃথিবীর সব সভ্য দেশে আছে। ডক্টর এনি বেসাণ্ট ইহার সভাপতি। তিনি অশীতিপর হওয়া ও অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও মান্দ্রাজে সোসাইটীর বার্ষিক সম্মেলনে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিতা ও বাগ্মিতা সহকারে তাঁহার বাণী সভ্যদিগকে ও তাঁহাদের মারফৎ অন্য সকলকে শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার বাণীর প্রধান কথা ছিল, নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন। তিনি বলেন :—

"তোমার মধ্যে ঐশী যাহা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা কর। উহাতেই তোমার প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে। তুমি ঐশ। ঐশের অন্বেষণে উর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকাইবার তোমার আবশ্যক নাই; ভিতরে তোমার হৃদয়ের দিকে তাকাও; ঐশ বস্তু তোমার মধ্যে প্রাণবান হইয়া আছেন। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই উর্দ্ধ হইতে যে জীবন আসে, তাহা তোমাদের চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে পার। সংশয়াকুল হইও না। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব তোমার কার্য্য-সামর্থ্যকে বিষমূচ্ছিত করে। উপরে আকাশে স্থিত ঈশ্বরের উপর যতটা নির্ভর কর, কিংবা নীচে পৃথিবীতে অন্য কোথাকারও ঈশ্বরের উপর—তুমি জান না কোথাকার—যতটা নির্ভর কর, তার চেয়ে অধিক নির্ভর করিও তোমার মধ্যস্থ ঈশ্বরের উপর। তোমার অন্তরের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিও। তিনি সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন; কারণ তোমার হৃদয়ই সর্ব্বদা তোমার মধ্যস্থিত প্রাণ, এবং সেই প্রাণ ঐশ।"

ভারতবর্ষের সমাজবিধি, রাষ্ট্রবিধি, শিল্পবাণিজ্যাদি-ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি—নানা বিধিব্যবস্থার বন্ধন আমাদিগকে এরূপ আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যে, এখন আমাদের প্রকৃত স্ব-রূপ উপলব্ধি করিয়া সকল চিন্তাক্ষেত্রে ও কার্য্যক্ষেত্রে নিজের সেই "স্ব"-এর উপর নির্ভর করিয়া তাহার অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য শ্রীমতী এনি বেসাণ্টের স্মারক কথাগুলি বিশেষভাবে সময়োপযোগী হইয়াছে।

মাঞ্চুরিয়া ও জাপান

মাঞ্চুরিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া চীন-সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। চীন যখন সাধারণতন্ত্র হইল, তখনও মাঞ্চুরিয়া চীনের অন্তর্গত ছিল, এখনও ন্যায়তঃ আছে। কিন্তু জাপান শক্তিশালী বলিয়া এখন যুদ্ধ দ্বারা উহা দখল করিতে চাহিতেছে। চীনের গৃহবিবাদ এবং জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষজনিত দুরবস্থা জাপানকে দস্যুতার বিশেষ সুযোগ দিয়াছে। চীন ও জাপান উভয়েই লীগ্ অব্ নেশুনের সভ্য; কিন্তু লীগ্ চীনের উপর এই আক্রমণ নিবারণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অক্ষমতার কারণও সুস্পষ্ট। লীগের প্রবল সভ্যেরা সবাই পরদেশ দখল করিয়া আছে। সুতরাং পরদেশ দখল কার্য্যে নিযুক্ত জাপানকে তাঁহারা ঘাঁটাইবে কোন্ মুখে? ঘাঁটাইতে গেলে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাও সোজা নয়।

আমেরিকা চাহিতেছেন মাঞ্চুরিয়ায় "ওপন্ ডোর" অর্থাৎ বাণিজ্য করিবার জন্য খোলা দরোয়াজা। জাপান তাহাতে রাজীও হইতে পারে। জাপান বলিতে পারে, "আমরা সব জাতিকেই মাঞ্চুরিয়াতে বাণিজ্য করিবার সমান ও অবাধ সুযোগ দিব।" সব প্রবল বণিক জাতি ভাবিতেছে, জাপান মাঞ্চুরিয়ার ধন "আহরণ" করিবে, আমরা পাইব না? সুতরাং "আহরণ" কার্য্যে ভাগ পাইলেই তাহারা খুশী হইয়া যাইবে। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার ও চীনের তাহাতে কি লাভ? কি সান্ত্বনা? চীনকে ছিন্নাঙ্গ ও মাঞ্চুরিয়াকে যে পরাধীন করা হইতেছে, পৃথিবীর অতি সভ্য জাতিদের কাছে সেটা যেন সম্পূর্ণ তুচ্ছ ব্যাপার। সে কথাটা কেহই তুলিতেছে না। মাঞ্চুরিয়াকে জাপান একা শাসন ও শোষণ করিবে, ইহাই যেন মস্ত বড় অপরাধ, সকলে মিলিয়া তাহাকে শোষণ করিলে যেন অপরাধটা পুণ্যে পরিণত হইবে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বিবরণ

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর যে বর্ণনা অন্যত্র ছাপা হইয়াছে, তাহাতে প্রধান প্রধান সমস্ত অনুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে। ভারতীয় প্রাচ্য কলা সভা কর্ত্তৃক অভিনন্দনের বৃত্তান্তটি অতিবিলম্বে পাওয়ায় ছাপিতে পারা গেল না।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে খাজনা মাপ

সরকার কর্ত্তৃক এবং বে-সরকারী কাহারও কাহারও দ্বারাও এইরূপ খবর প্রচারিত হইয়াছে, যে, আগ্রা-



রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে কবিকে অর্ঘ্যপ্রদান

অযোধ্যা প্রদেশের কংগ্রেস দলের লোকেরা সেখানে চাষীদিগকে জমীর খাজনা দিতে নিষেধ করিয়াছিল। প্রকৃত কথাটা ঠিক এ রকম নয়। অজন্মা ও অন্তবিধ কারণে চাষীদের দুরবস্থা হওয়ায় কোথাও কোথাও তাহাদের কেহ কেহ খাজনা দিতে একেবারেই অসমর্থ, কেহ বা অল্প অংশ দিতে পারে। এ অবস্থায় কংগ্রেস-দলের লোকেরা, খাজনা কোথায় কি পরিমাণে রেহাই দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে গবন্মের্ণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন, এবং কথাবার্ত্তা শেষ না-হওয়া পর্য্যন্ত রায়তদিগকে খাজনা দেওয়া স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মিঃ শেরোয়ানী সরকারপক্ষকে ইহাও বলিয়াছিলেন, যে, গবন্মের্ণ্ট যদি আপনা হইতেই, কর্ত্তাবার্ত্তা শেষ না-হওয়া পর্য্যন্ত, খাজনা আদায় বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে কংগ্রেসও রায়তদিগকে প্রদত্ত পরামর্শ প্রত্যাহার করিবেন। কিন্তু গবন্মের্ণ্ট তাহা না করিয়া, কোথাও কোথাও অল্পস্বল্প খাজনা মাপ করিয়া সর্ব্বত্র খাজনা আদায় করিতে থাকেন, এবং কংগ্রেস-কর্ম্মীদের উপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন—যাহার ফলে পণ্ডিত জবাহরলাল প্রমুখ বিস্তর লোকের কারাদণ্ড হইয়াছে।

যাহা হউক, এখন পরোক্ষভাবে প্রমাণ হইতেছে, যে, রায়তদের জন্য কংগ্রেসপক্ষের দাবিই ঠিক্। কারণ, অনেক জায়গায় গবন্মের্ণ্ট আগে যে-পরিমাণ রেহাই দিতে চাহিয়াছিলেন, এখন তাহার তিনগুণ রেহাই দেওয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা আগে করিলে অনেক অশান্তি ও অনেকের শাস্তি নিবারিত হইত। কিন্তু তাহা করিবার বাধাও ছিল। তাহা করিলে কংগ্রেস-পক্ষের কথা যে ঠিক্ তাহা স্বীকার করিতে হইত, এবং গবন্মের্ণ্ট যে খুব শক্তিমান্ তাহার কার্য্যগত প্রমাণ দিবার সুযোগ মিলিত না।

বঙ্গের আর্থিক দুরবস্থা

বর্ত্তমান সময়ে অনেক ভূসম্পত্তি নিলামে উঠায় বঙ্গের আর্থিক দুরবস্থার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পাবনা জেলায় বেশী পরিমাণে ইহা ঘটিতেছে, অন্যত্রও হইতেছে।

এমন দুর্গতির দিনে যাহাতে বাংলার টাকা বাহিরে না-যায় সে চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। যথাসাধ্য দেশী জিনিষ, বিশেষ করিয়া বঙ্গে বাঙালীদের প্রস্তুত জিনিষ, আমাদের কেনা উচিত। অনেক বিলাসের ও আরামের জিনিষ আছে যাহা একান্ত আবশ্যক নহে। সেগুলা বিদেশী হইলে না-কিনিলেই চলে।

অর্ডিন্যান্সের আধিক্য

আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে না। এমন দেশে, "আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতার ওজর অগ্রাহ্য," বলিয়া যে একটা কথা আছে তাহা কার্য্যতঃ ক্রূর বিদ্রূপের মত শুনায়। যাহা হউক, যাহা দুর্নীতি তাহাই বে-আইনী, সাধারণতঃ এইরূপ ধরিয়া লওয়ায় এবং আমাদের দেশের লোক ধর্ম্মনীতি জানিয়া তাহার অনুগত হওয়ায়, তাহারা আইন না-জানিলেও সাধারণ আইনের বিপরীত কিছু করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু বিশেষ আইন এমন কিছু কিছু হইয়াছে যেগুলি এবং অর্ডিন্যান্সগুলি ধর্ম্মনীতির সমতুল্য নহে। খুব নীতিমান্ ও ধার্ম্মিক লোকেও অজ্ঞতা বশতঃ সেগুলি লঙ্ঘন করিয়া ফেলিতে পারেন। যাঁহারা জানিয়া-শুনিয়া কর্ত্তব্যবোধে সেগুলি লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাদের কথা এখন বলিতেছি না। অর্ডিন্যান্সের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি এত লম্বা, যে, ইংরেজী-জানা লোকেরাও সব পড়িয়া মনে রাখিতে পারে না। সেগুলা কিনিয়া পড়াও অল্প লোকেরই ঘটিয়া উঠে। অতএব, আমাদের প্রস্তাব এই, যে, সরকার বাহাদুর অর্ডিন্যান্সগুলির সস্তা ইংরেজী সংস্করণ বাহির করুন এবং প্রধান প্রধান দেশী খবরের কাগজে তাহার (দাম দিয়া) বিজ্ঞাপন দিন। তদ্ভিন্ন, প্রধান প্রধান দেশভাষায় তৎসমুদয়ের অনুবাদ করাইয়া যথাসাধ্য শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে বিতরণ করুন, এবং তাহা পড়িয়া শুনাইবার জন্য বেতনভোগী সরকারী লোক কিংবা তদ্ভাবে অবৈতনিক লোক নিযুক্ত করুন। হুকুমটা কি তাহা লোকে জানিতে পারিবে না, অথচ হুকুম না মানিলে শাস্তি হইবে, ইহা অতি অসঙ্গত ব্যাপার।

পক্কশস্য

ইউরোপের যুদ্ধ সরঞ্জাম—

কিছুকাল অন্তর অন্তর ইউরোপে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতেছে। ; তাহাতে কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুদ্ধ সরঞ্জাম কমিয়াছে না বাড়িয়াই য়াছে ? বিগত মহাযুদ্ধের পরে মারণ-যন্ত্রের উদ্ভাবন ও প্রচলনের ত্তরেই ইহার জবাব রহিয়াছে। এই চিত্রগুলি দর্শনে বুঝা যাইবে, কত দ্রুত ও কত রকমের মারণ-অস্ত্রের উদ্ভাবন ও প্রচলন হইতেছে। আকাশ হইতে আক্রমণের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্ত মার্কিন কি করিয়াছে সঙ্গের দুইখানি চিত্রে তাহা বুঝা যাইবে। আর একখানি চিত্রে ব্রিটিশ সাবমেরিন এয়ারোপ্লেন লইয়া যাইতেছে। চতুর্থ চিত্রে জার্ম্মান পদাতিক গ্যাস-প্রতিষেধক মুখোস পরিধান করিয়া রহিয়াছে।



রাত্রিতে আকাশ হইতে আক্রমণকালের দৃশ্য

মার্কিনে মোটর গাড়ীর সঙ্গে এইরূপ সার্চ্চ লাইট যুক্ত করা হইয়া থাকে যাহা দ্বারা আকাশে এয়ারোপ্লেন দেখা যায়। আবার ইহাতে শ্রবণ-যন্ত্রও সংযোজিত হইয়াছে তাহা দ্বারা এয়ারোপ্লেনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে হয়



গুরু গোবিন্দ ও গুরু নানক

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩১শ ভাগ, ২য় খণ্ড — ফাল্গুন, ১৩৩৮ — ৫ম সংখ্যা

তমিস্রা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে রাত্রিরূপিণী,
আলো জ্বালো একবার ভাল ক'রে চিনি।
দিন যার ক্লান্ত হ'ল তা'র লাগি কি এনেছ বর
জানাক্ তা তব মৃদুস্বর।
তোমার নিঃশ্বাসে
ভাবনা ভরিল মোর সৌরভ আভাসে।
বুঝি বা বক্ষের কাছে
ঢাকা আছে
রজনীগন্ধার ডালি।
বুঝি বা এনেছ জ্বালি
প্রচ্ছন্ন ললাটনেত্রে সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা,—
গোপন আলোক তারি, ওগো বাক্যহারা,
পড়েছে তোমার মৌন পরে,—
এনেছে গভীর হাসি করুণ অধরে
বিষাদের মত শান্ত স্থির।

দিবসের আলো তীব্র, বিক্ষিপ্ত সমীর,
নিরন্তর আন্দোলন,
অনুক্ষণ
দ্বন্দ্ব-আলোড়িত কোলাহল,—
তুমি এস অচঞ্চল,
এস স্নিগ্ধ আবির্ভাব,
তোমার অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক্ যত ক্ষতি লাভ,
তোমার স্তব্ধতাখানি
দাও টানি
অধীর উদ্‌ভ্রান্ত মনে।—
যে অনাদি নিঃশব্দতা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে
বহ্নিদীপ্ত উদ্যমের মত্ততার জ্বর
শান্ত করি করে তারে সংযত সুন্দর,
সে গম্ভীর শান্তি আন তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।

তব প্রেমে
চিত্তে মোর যাক্ থেমে
অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ,
দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ।
সপ্তর্ষির তপোবনে হোম হুতাশন হ'তে
আন তব দীপ্ত শিখা, তাহারি আলোতে
নির্জ্জনের উৎসব আলোক
পুণ্য হবে, সেইক্ষণে আমাদের শুভদৃষ্টি হোক্।
অপ্রমত্ত মিলনের মন্ত্র সুগম্ভীর
মন্দ্রিত করুক্ আজি রজনীর তিমির মন্দির॥

৭ই মাঘ
১৩৩৮

রাজবন্দীদের রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন

Censored

শ্রীকবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের

করকমলে

হে গুণি,

হিজলী বন্দী-নিবাসের রাজবন্দীদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্রটি তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি। নানা প্রকার অভাব অভিযোগ আমাদের সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ গতিকে পদে পদে প্রতিহত করে বলিয়াই উহা তোমার নিকট পাঠাইতে বিলম্ব হইল। বন্দীর দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করিও।

প্রণত

শ্রীসুধীরকিশোর বসু

সম্পাদক, রবীন্দ্র জয়ন্তী-উৎসব সমিতি

১০ই জানুয়ারি ১৯৩২ হিজলী বন্দী-নিবাস

হিজলী রাজবন্দীগণের অভিনন্দন

বাংলার একতারায় বিশ্ববাণীর ঝঙ্কার তুলিয়াছ তুমি, হে বাউল কবি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে প্রণাম করি।

সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ-সঙ্কুচিত দ্বন্দ্বপর বিশ্বসমাজকে মৈত্রী, করুণা ও কল্যাণের মন্ত্র দান করিয়াছ তুমি, হে বিশ্বকবি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বন্ধন-বিমূঢ় অবমানিতের মর্ম্মবেদনায় ভাষা দান করিয়াছ তুমি, হে দরদী, তোমার জন্মদিনে আজ তোমার কল্যাণ কামনা করি।

বিশ্বদেবতার চরণে গীতাঞ্জলি দান করিয়া বিশ্বের বরমাল্য লাভ করিয়াছ তুমি, হে গুণি, তোমার জন্মদিনে আজ তোমাকে অভিনন্দিত করি।

এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তুমি গ্রহণ কর। ইতি

১৬ই পৌষ ১৩৩৮ রাজবন্দীগণ

রবীন্দ্রনাথের উত্তর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, কারান্ধকার থেকে উচ্ছ্বসিত তোমাদের অভিনন্দন আমার মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত ক'রেচে। কিছুতে যাকে বদ্ধ করতে পারে না সেই মুক্তি তোমাদের অন্তরের মধ্যে অবারিত হোক্ এই আমি কামনা করি। ইতি

সমব্যথিত

২২ জানুয়ারি ১৯৩২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পত্রধারা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক

শান্তিনিকেতন

এতটুকু একটুখানি জ্বর রক্তের মধ্যে লুকোচুরি ক'রে বেড়াচ্চে—ডাক্তার তাকে চিনে উঠ্‌তে পারে না। দার্জ্জিলিঙের হাওয়ায় তাকে ঝাড়িয়ে নেবার জন্যে পরামর্শ দিচ্চে। অবশেষে হার মেনে সেইদিকে পা বাড়িয়েচি। কাল রবিবারে কলিকাতায় যাত্রা করব। তার পরে দুই-একদিন ডাক্তাররা নানাবিধ যন্ত্রের দ্বারা সওয়াল জবাব ক'রে দেহটার কাছ থেকে তার গোপন অপরাধের বিষয় ও আশ্রয়টার কথাটা কবুল করিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রবে। জানি পারবে না। অবশেষে হিমাচলের উপর ভার পড়বে শুশ্রূষার।

আমার মধ্যে বৈষ্ণবকে তুমি খোঁজো। সে পালায় নি। কিন্তু তার সঙ্গেই আছে শৈব,—ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশিও বাজে নটরাজের নৃত্যও হয়—যমুনায় নৌকা ভাসান দিয়ে শেষকালে পড়ি গিয়ে সেই গঙ্গায় যে-গঙ্গা গৈরিক প'রে চলেচেন সমুদ্রে।

দুই

দার্জ্জিলিং

তোমার চিঠিগুলিতে খাটি বাঙালী ঘরের হাওয়া পাই। হাসি পায় যখন তোমার চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ কর যে আমার রাগ হচ্চে। তুমি কি মনে কর মতামতের দ্বন্দ্ব নিয়ে গদাযুদ্ধ করা আমার স্বভাব? যেখানে আমি রস পাই, সেখানে তর্কের বিষয়টা আমার কাছে গা-ঢাকা দেয়, সেখানে কিছুই আমার পক্ষে বেগানা নয়। বৈষ্ণব যেখানে বোষ্টম নয় সেখানে আমিও বৈষ্ণব, খৃষ্টান্ যেখানে খেষ্টান্ নয় সেখানে আমিও খৃষ্টান। আমাদের দেবপূজায় বিদেশী ফুলের স্থান নেই, কিন্তু আমার মনের কাছে সব ফুলই ফুল, সোলার ফুল ছাড়া। নিজের মধ্যে যা খাটি বিশ্বের সত্যকে তা স্পর্শ করে।

ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি এল, এইবার চিঠি বন্ধ করা যাক্। ইতি ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

তিন

দার্জ্জিলিং

বাহির থেকে যতটা পীড়া পাও তাই যথেষ্ট, কিন্তু অন্তর থেকে স্বরচিত পীড়া তার সঙ্গে যোগ ক'রো না। বিধাতা যেখানে দাঁড়ি টেনে দেন তোমার মনকে ব'লো তার পিছনে মোটা কলমে আরও একটা দাঁড়ি টেনে খতম ক'রে দিতে। আমাদের দেশে অন্ত্যেষ্টি সৎকারের তত্ত্বটা ঐ—মৃত্যু যখন দেহটাকে সংহার করে তখন সেটাকে কবরে জমাবার চেষ্টা না করে আগুন জ্বালিয়ে সেটার উপসংহার করাই শান্তির পথ। সংসার আমাদের অনেক কিছু দিয়ে থাকে, কিন্তু তার চরম দান হচ্চে বঞ্চিত হবার শিক্ষা দান। যা পাওয়া যায় তার উপরে একান্ত নির্ভর করার অভ্যাসেই আমাদের সাংঘাতিক ফাঁকি দেয়, যা হারায় বা না পাওয়া যায় সে ফাঁকির মধ্যে প্রবঞ্চনা নেই,—সেটার উপলক্ষ্য সংসারে পদে পদেই ঘটে তবু তাকে সহজে গ্রহণ করবার শিক্ষাটা কিছুতেই পাকা হ'তে চায় না। যেখানে আপিল খাটে না সেখানে নালিশ করার মত অপব্যয় কিছুই নেই।

অন্তরের মধ্যে ক্ষতিপূরণের একটা ভাণ্ডার আছে—কিন্তু আমরা সেই ভাণ্ডারের কুলুপে মর'চে ধরিয়ে ফেলি, তাই সান্ত্বনার সম্পদকে অন্তরে আবদ্ধ রেখে তাকে পাইনে। আমাদের উৎস আছে তার মুখে পাথর চাপানো—সংসারের নিষ্ঠুরতা বার-বার কঠোর কণ্ঠে এই কথাই বলে, ঐ পাথরটাকে ঠেলে সরিয়ে দাও। বাহিরটা

বিশ্বাসঘাতক, তাকে জোর ক'রে আশ্রয় করতে গেলেই আশ্রয় ভাঙে—সেই ভাঙনেই যদি অন্তরের পথ দেখিয়ে না দেয় তবে দুদিক থেকেই ঠকতে হয়। আমার মুখে উপদেশ শুনে মনে ক'রো না যে আমিই বুঝি বাহিরের মর্ত্ত্যলোক ডিঙিয়ে অন্তরের অমরাবতীতে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েচি। যখন সংসার থেকে তাড়া খাই তখন সংসার পেরবার রাস্তা সাফ করতে লেগে যাই—ফাঁড়া কেটে গেলে আবার কুড়েমিও ধরে। অতএব উপদেষ্টাকে অযথা ভক্তি করবার কারণ নেই। ইতি ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

চার

দার্জ্জিলিং

আমার জীবনটা তিন ভাগে বিভক্ত—কাজে, বাজে কাজে, অকাজে। কাজের দিকে আছে ইস্কুলমাষ্টারী, লেখা, বিশ্বভারতী, ইত্যাদি, এইটে হ'ল কর্ত্তব্য বিভাগ। তার পর আছে অনাবশ্যক বিভাগ। এইখানে যত কিছু নেশার সরঞ্জাম। কাব্য, গান এবং ছবি। নেশার মাত্রা পরে পরে তীব্রতর হয়ে উঠেচে।

একদা প্রথম বয়সে কবিতা ছিলেন একেশ্বরী—ধরণীর আদিযুগে যেমন সমস্তই ছিল জল। মনের এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত তারই কলকল্লোলে ছিল মুখরিত। নিছক ভাবরসের লীলা, স্বপ্নলোকের উৎসব। তার পর দ্বিতীয় বয়সে এল কাজের তাগিদ। এই উপলক্ষে মানুষের সঙ্গে কাছাকাছি মিল্‌তে হ'ল। তখনি এল কর্ত্তব্যের আহ্বান। জলের ভিতর থেকে স্থল মাথা তুল্‌ল। সেখানে জলের ঢেউয়ে আর উনপঞ্চাশ পবনের ধাক্কায় ট'লে ট'লে কেবল ভেসে বেড়ানো নয়, বাসা বাঁধার পালা, বিচিত্র তার উদ্যোগ। মানুষকে জান্‌তে হ'ল, রঙীন্ প্রদোষের আবছায়ায় নয়, সে তার সুখ দুঃখ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল বাস্তবলোকে। সেই মানব অতিথি যখন মনের দ্বারে ধাক্কা দিয়ে ব'ললে, অয়মহং ভোঃ, সেই সময়ে ঐ কবিতাটা লিখেছিলুম, এবার ফিরাও মোরে। শুধু আমার কল্পনাকে নয়, কলাকৌশলকে নয়, দাবি করলে আমার বুদ্ধিকে চিন্তাকে সেবাকে আমার সমগ্র শক্তিকে, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বকে।

তখন থেকে জীবনে আর এক পর্ব্ব সুরু হ'ল। একটা আর একটাকে প্রতিহত করলে না—মহাসাগরে পরিবেষ্টিত মহাদেশের পালা এল। মাতামাতি ঐ রসসাগরের দিকে, আর ত্যাগ ও তপস্যা ঐ মহাদেশের ক্ষেত্রে। কাজেও টানে, নেশাতেও ছাড়ে না। বহুদিন আমার নেশার দুই মহল ছিল বাণী এবং গান, শেষ বয়সে তার সঙ্গে আর একটি এসে যোগ দিয়েচে—ছবি। মাতনের মাত্রা অনুসারে বাণীর চেয়ে গানের বেগ বেশী, গানের চেয়ে ছবির। যাই হোক্ এই লীলাসমুদ্রেই আরম্ভ হয়েচে আমার জীবনের আদি মহাযুগ—এইখানেই ধ্বনি এবং নৃত্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ, এইখানেই নটরাজের আত্মবিস্মৃত তাণ্ডব। তার পরে নটরাজ এলেন তপস্বী-বেশে ভিক্ষুরূপে। দাবির আর শেষ নেই। ভিক্ষার ঝুলি ভরতে হবে—ত্যাগের সাধনা কঠিন সাধনা।

এই লীলা এবং কর্ম্মের মাঝখানে নৈষ্কর্ম্ম্যের অবকাশ পাওয়া যায়। ওটাকে আকাশ বলা যেতে পারে, মনটাকে শূন্যে উড়িয়ে দেবার সুযোগ ঐখানে—না আছে বাঁধা রাস্তা, না আছে গম্য স্থান, না আছে কর্ম্মক্ষেত্র। শরীর মন যখন হাল ছেড়ে দেয় তখনি আছে এই শূন্য। সম্প্রতি কিছুদিন এই অবকাশের মধ্যে ছিলুম, আপিসও ছিল বন্ধ, আমার খেলাঘরেও পড়েছিল চাবী। এই ফাঁকের মধ্যেই তোমার চিঠি এল আমার হাতে, পড়তে ভাল লাগল—ভাল লাগার প্রধান কারণ, এই চিঠির মধ্যে তোমার একটি সহজ আত্মপ্রকাশ আছে, এই সহজ প্রকাশের শক্তি একেবারেই সহজ নয়। অধিকাংশ লোক আছে যারা প্রায় বোবা, আর এক দল আছে যারা কথা কয় পরের ভাষায়, যারা নিজের চেহারা দাঁড় করাতে চায় পরের চেহারার ছাঁচে। তোমার সমস্ত প্রকৃতি কথা কয়, ঝরণা যেমন কথা কয় তার সমস্ত ধারাটিকে নিয়ে। আমি বুঝতে পারি আমাকে চিঠি লেখায় তোমার আন্তরিক প্রয়োজন আছে, তার উপলক্ষ্য চাই। আমি স্নেহের সঙ্গে শুনচি জেনে তুমি মনের আনন্দে অবাধে কথা কয়ে যাচ্চ। আমাকে তুমি দেখ নি, স্পষ্ট ক'রে জান না, সেও একটা সুযোগ। কেন-না, তোমার শ্রোতাকে তুমি নিজের মনে গ'ড়ে নিয়েচ। তার

অনতিস্ফুট পরিচয়ই একটা আবরণ, তার অন্তরালে অসঙ্কোচে আপন মনে কথা ব'লে যেতে পার।

ছুটি ছিল,—না টেনেছিল আসল কাজে, না জমেছিল বাজে কাজ। তাই আমিও তোমাকে চিঠি লিখতে পেরেচি। কিন্তু যখন নাম্‌বে বর্ষা, কাজের বাদল, তখন আর সময় দিতে পারব না। আর বেশী দেরি নেই। ইতিমধ্যেই একদিন ছবি আঁকার পাকের মধ্যে পড়েছিলুম, ভুলেছিলুম পৃথিবীতে এর চেয়ে গুরুতর কিছু আছে। যদি পুরোপুরি আমাকে পেয়ে বসত তাহ'লে আর কিছুতেই মন থাকত না। ওদিকে কাজেরও দিন এল ব'লে, তখন সময়ের মধ্যে ফাঁক প্রায় থাকবে না। আমার সময়ের উপর আমার ব্যক্তিগত অধিকার খুব কম, অবকাশের তহবিল সম্পূর্ণ আমার জিম্মায় নেই, তাকে যেমন খুশী ব্যয় করতে পারি নে।

তোমাদের পূজার্চ্চনার সঙ্গে বিজড়িত দিনকৃত্যের যে ছবি দিয়েচ, তার থেকে নারী প্রকৃতির একটি সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পেলুম। তোমরা মায়ের জাত, প্রাণের 'পরে তোমাদের দরদ স্বাভাবিক ও প্রবল। জীবদেহকে খাইয়ে পরিয়ে নাইয়ে সাজিয়ে তোমাদের আনন্দ। এর জন্য তোমাদের একটা বুভূক্ষা আছে। শিশুবেলাতেও পুতুল-খেলায় তোমাদের সেই সেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। ঠাকুরের সেবার যে বর্ণনা করেচ তাতে স্পষ্ট দেখতে পাই সেই মাতৃহৃদয়েরই সেবার আকাঙ্ক্ষাকে পূজা-চ্ছলে পরিতৃপ্তি দেবার এই উপায়। ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোলা, কাপড় পরানো, পাছে তাঁর পিত্তি পড়ে এই ভয়ে যথাসময়ে আদর ক'রে খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারের বাস্তবতা আমার মত লোকের কাছে নেই, তোমাদের কাছে আছে তোমাদের স্ত্রী প্রকৃতির নিরতিশয় প্রয়োজনের মধ্যে—যেমন ক'রে হোক্ সেই প্রকৃতিকে চরিতার্থতা দেবার মধ্যে। প্রাণের বেদনা যে আমার প্রাণেও বাজে না, তা নয়, কিন্তু সে বেদনা যথাস্থানেই কাজ খোঁজে, কাল্পনিক সেবায় নিজেকে তৃপ্ত করবার চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। মন্দিরেও আমার ঠাকুর নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়,—আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে—সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে—যে-দেবতা স্বর্গের তাঁর মধ্যে এসব কিছু সত্য নয়।

মানুষের মধ্যে যে-দেবতা ক্ষুধিত তৃষিত রোগার্ত্ত শোকাতুর, তাঁর জন্যে মহাপুরুষেরা সর্ব্বস্ব দেন, প্রাণ নিবেদন করেন, সেবাকে ভাববিলাসিতায় সমাপ্ত না ক'রে তাকে বুদ্ধিতে বীর্য্যে ত্যাগে মহৎ ক'রে তোলেন। তোমার লেখায় তোমাদের পূজার বর্ণনা শুনে আমার মনে হয় এ সমস্তই অবরুদ্ধ অতৃপ্ত অসম্পূর্ণ জীবনের আত্মবিড়ম্বনা। আমার মানুষরূপী ভগবানের পূজাকে এত সহজ ক'রে তুলে তাঁকে যাঁরা বঞ্চিত করে তারা প্রত্যহ নিজে বঞ্চিত হয়। তাদের দেশে মানুষ একান্ত উপেক্ষিত, সেই উপেক্ষিত মানুষের দৈন্যে ও দুঃখে সে দেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পৃথিবীর সকল দেশের পিছনে প'ড়ে আছে। এ সব কথা ব'লে তোমাকে ব্যথা দিতে আমার ইচ্ছে করে না—কিন্তু যেখানে মন্দিরের দেবতা মানুষের দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে দেবতার নামে মানুষ প্রবঞ্চিত সেখানে আমার মন ধৈর্য্য মানে না। গয়াতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলেম তখন পশ্চিমের কোন্ এক পূজামুগ্ধা রাণী পাণ্ডার পা মোহরে ঢেকে দিয়েছিলেন—ক্ষুধিত মানুষের অন্নের থালি থেকে কেড়ে নেওয়া অন্নের মূল্যে এই মোহর তৈরি। দেশের লোকের শিক্ষার জন্যে অন্নের জন্যে আরোগ্যের জন্যে এরা কিছু দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থ সামর্থ্য সময় প্রীতিভক্তি সমস্ত দিচ্চে সেই বেদীমূলে যেখানে তা নিরর্থক। মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌৎসুক্য, এত ঔদাসীন্য অন্য কোনো দেশেই নেই, আর সেই জন্যেই এ দেশে হতভাগা মানুষের সমস্ত প্রাপ্য দেবতা অনায়াসে নিচ্চেন হরণ ক'রে। ইতি

৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

গ্রীকের এবং হিন্দুর বিদ্যার আদান-প্রদান

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

হিন্দু-দর্শনের অনেক মতের সহিত গ্রীক-দর্শনের অনেক মতের সাদৃশ্য আছে; আবার হিন্দু-শিল্পের কোন কোন অঙ্গের সহিত গ্রীক-শিল্পের অঙ্গ-বিশেষের সাদৃশ্য আছে। এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রীকেরা হিন্দুদিগের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী, আবার শিল্পের ক্ষেত্রে হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। এই দুইটি কথা যদি বাদী বিবাদী উভয় পক্ষে মঞ্জুর করিয়া লয়েন, তবে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমকে বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি (East is East and West is West) বলা চলে না, এবং ভবিষ্যতে দুইয়ের ঐক্য সম্ভব কি না তাহার হিসাব-কিতাব কতকটা সহজ হয়। কিন্তু এই দুইটি বিবাদে বাদী বিবাদীর মধ্যে আপোষের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রীকেরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে কিছু ধার করিয়াছিলেন কি-না এই প্রশ্ন লইয়া তর্ক চলিতেছে অনেক দিন ধরিয়া। এই তর্কের নিষ্পত্তি হইতে পারে কি উপায়ে বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহাই আলোচিত হইবে।

যাহারা হিন্দু-দর্শনের নিকট গ্রীক-দর্শনের দেনা অস্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, কেবল দুইয়ের মতের কতক সাদৃশ্য দেখিয়া দেনা-পাওনা স্বীকার করা যায় না। কোন্ পথে যে এই দেনা-পাওনা ঘটিয়াছিল এ পর্য্যন্ত তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।* যে সাদৃশ্য দেখিয়া দেনা-পাওনা অনুমিত হয়, তাহা দেনা-পাওনার ফল নহে, স্বতন্ত্র কেন্দ্রে স্বতন্ত্র সৃষ্টির ফল। যে দার্শনিক তত্ত্ব হিন্দুরা একবার উদ্ভাবিত করিয়াছেন, সেই তত্ত্বটিই প্রয়োজনের অনুরোধে, সুযোগ অনুসারে, স্বাধীন চিন্তার ফলে স্বতন্ত্র ভাবে গ্রীকদিগকে আবার উদ্ভাবিত করিয়া লইতে হইয়াছে।*

দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রীকেরা হিন্দুর নিকট হইতে কিছু ধার করিয়াছিলেন কি-না এই তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে প্রধানতঃ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ এবং পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিকগণের কতকগুলি মতামত সম্বন্ধে। এই যুগের গ্রীক দার্শনিক-গণের রচনার অতি অল্প অংশই এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল ভগ্নাংশে, কোন্ মত কোথা হইতে আসিল, তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সুতরাং মতামতের উৎপত্তি এবং দেনা-পাওনা সম্বন্ধে অনুমানের আশ্রয় ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু কোন বিধিবদ্ধ রীতি অনুসারে বিচারে ব্রতী না হইলে রাগ-দ্বেষ অর্থাৎ অনুরাগ-বিরাগ অনুমানকে বিপথগামী করে। আদিম সভ্যতার বা আদিম স্তরের সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া নৃতত্ত্ববিদ্গণ (anthropologists) এইরূপ রীতি বিধিবদ্ধ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। উন্নত সভ্যতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব, যেখানে অনুমান ভিন্ন উপায় নাই, সেখানে নৃতত্ত্ব-বিভাগের এই বিচার-রীতির অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। তাই এখানে এই রীতির একটু বিস্তৃত পরিচয় দিয়া লইব।

পরস্পরের বহুদূরবাসী অনুন্নত জাতিনিচয়ের মধ্যে শিল্পে বা আচারে বা বিশ্বাসে সাদৃশ্য দেখিলে সহজেই মনে

* The nature and extent of eastern influence on Greek speculation before Alexander have been alternately exaggerated by pan-Babylonian fanaticism and undervalued by the prejudice of the Hellenist. Jewish religion may be entirely excluded, and it has not been made out by what channel Indian ideas chould have travelled so far.---F. M. Conford—in *The Cambridge History of India*, Vol. IV, (1926), p. 539.

* We have in fact to admit that the human spirit, in virtue of its character, is able to produce in different parts of the world systems which agree in large measure, without borrowing by one side from the other.—Keith, *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads*, (1925), p. 613.

হয়, এই সাদৃশ্য স্বতন্ত্র কেন্দ্রে স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কারের ফল। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করিতেন মূলতঃ সকল মানুষের মন একই রকম; সকল মানুষের মনে একই রকম মতিগতির বীজ বিদ্যমান আছে। সুতরাং বাহ্য অবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলে, বার-বার একই রূপ বস্তুর আবিষ্কার অবশ্য ঘটিবে। মানব সভ্যতা নূতন নূতন আবিষ্কারের পরিপোষক বাহ্য অবস্থার সৃষ্টি। এই মতের প্রতিবাদ প্রথম আরম্ভ করেন জর্ম্মান পণ্ডিত রাট্‌জেল (Ratzel) ১৮৮৬ সালে। তিনি বলেন, মানুষ জড়পদার্থের বা ইতর প্রাণীর মত কেবল নৈসর্গিক নিয়মের হাতের খেলনা নহে, অসভ্য মানব-সমাজেরও ইচ্ছাকৃত একটা ইতিহাস আছে। সুতরাং মানুষের সভ্যতার উৎপত্তি এবং উন্নতি কিরূপে হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে কেবল নৈসর্গিক নিয়মের এবং বাহ্য অবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসাব করিলে যথেষ্ট হইবে না, বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর ইতিহাস, বিশেষতঃ দলবদ্ধ হইয়া নানাস্থানে বিচরণের বৃত্তান্তও, খুঁজিতে হইবে। বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন জাতির ব্যবহৃত কোন হাতিয়ারের আকারগত সাদৃশ্য দেখিলে রাট্‌জেল বিচার করিতেন, এই সাদৃশ্য ঐ হাতিয়ারের স্বাভাবিক লক্ষণমূলক কি-না (যেমন তীরের সরু অগ্রভাগ), অথবা যে উপাদানে ঐ হাতিয়ার তৈয়ারী করা হইয়াছে সেই উপাদানের স্বাভাবিক লক্ষণমূলক কি-না (যেমন বাঁশের গিঁট)। যদি তিনি দেখিতেন যে, একাধিক জাতির ব্যবহৃত হাতিয়ার-বিশেষের আকারগত সাদৃশ্য স্বাভাবিক নহে,—কৃত্রিম, তবে সিদ্ধান্ত করিতেন, এইরূপ হাতিয়ার ব্যবহারকারী জাতিগুলি এখন পরস্পরের অজানাভাবে দূরে দূরে বাস করিলেও এক সময় তাহারা একত্র বাস করিত, অথবা অন্য কোন উপায়ে এক সময়ে তাহাদের মধ্যে বিদ্যার দেনা-পাওনা চলিত। আফ্রিকার নানা স্থানে ব্যবহৃত ধনুকের ইতিহাসের অনুসন্ধান করিতে গিয়া রাট্‌জেল প্রথম এই রীতির সার্থকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।*

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কয়েকজন জর্ম্মান নৃতত্ত্ববিৎ রাট্‌জেলের প্রবর্ত্তিত রীতিতে আদিম সভ্যতার ইতিহাস অনুশীলন করিয়া ইহার উপযোগিতা দেখাইয়া দেওয়ায় ইউরোপের এবং আমেরিকার নৃতত্ত্ববিৎ-সমাজে প্রায় সর্ব্বত্র এই রীতি এখন অল্পাধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে।* এই রীতির নামকরণ হইয়াছে ঐতিহাসিক রীতি (historical method), এবং এই রীতি অনুসারে বিচার করিলে সভ্যতার উন্নতির নিদান সম্বন্ধে যে মত সিদ্ধ হয় তাহার নাম বিস্তৃতিবাদ (theory of diffusion)। অর্থাৎ সভ্যতার এক একটি উপকরণ এক এক কেন্দ্রে আবিষ্কৃত হইয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে বিস্তৃত হইয়াছে, এবং এইরূপে বিস্তৃত বিভিন্ন উপাদান লইয়া বিভিন্ন দেশে উচ্চ হইতে উচ্চতর সভ্যতা গঠিত হইয়াছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বাহ্যাবস্থার একান্ত প্রভাববাদী (extreme environmentalists যে একেবারে না আছেন এমন নহে।† কিন্তু প্রায় সকল নৃতত্ত্ববিৎই এখন সভ্যতার গঠনে বিস্তৃতির কার্য্যকারিতা স্বীকার করেন। তবে ইহাদের মধ্যেও দুই দল আছে। এক দল একান্ত বিস্তৃতিবাদী। তাঁহারা বলেন, সভ্যতার ছোট-বড় কোন উপাদান বা কোন উপাঙ্গই একবারের বেশী আবিষ্কৃত হইতে পারে না। সেই একবারের আবিষ্কারে বাহ্য অবস্থার প্রভাব থাকিলেও তারপর নিরবচ্ছিন্ন বিস্তৃতি চলিতে থাকে। আর এক দল নৃতত্ত্ববিৎ বাহ্যাবস্থার প্রভাবে স্বতন্ত্র আবিষ্কারের, এবং একবার মাত্র আবিষ্কৃত পদার্থ-বিশেষের বহু বিস্তৃতি, এই দুই স্বীকার করেন। এই প্রকার মতাবলম্বী, আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ডিক্‌সন "সভ্যতা নির্ম্মাণ" (*The Building of Culture*) নামক ইংরেজী পুস্তকে সভ্যতার

* W. Schmidt, *The Origin and Growth of Religion*, translated into English by H. J. Rose, London, 1931, pp. 220-221.

* এই বিষয়ে যে-সকল প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে বাদানুবাদ চলিয়াছে তাহার বিবরণের জন্য, Schmidt, *The Origin and Growth of Religion*, Chapter XIV. এবং R. B. Dixon, *The Building of Culture* (New York, 1928), Chapter VII দ্রষ্টব্য।

† Wissler, C., *The Relation of Nature to Man in A original America*. New York, 1926. এই মতের সমালোচনার জন্য Dixon, *The Building of Culture*, chapter I দ্রষ্টব্য।

ইতিহাস অনুশীলনের বিভিন্ন রীতি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সভ্যতার উপাদান দুই প্রকার— এক জড়, আর এক চিন্তাপ্রসূত মতামত। এই দুই প্রকার উপাদান আবিষ্কার (discovery) বা সৃষ্টি (invention) করিতে হইলেই তিনটি বিষয় একত্র হওয়া চাই—

(১) সুযোগ বা অনুকূল বাহ্য অবস্থা।

(২) নূতন কিছুর অভাববোধ।

(৩) আবিষ্কারের বা নূতন সৃষ্টির উপযোগী মানসিক শক্তি বা প্রতিভা।

একাধিক কেন্দ্রে, ঠিক সমান ওজনে, এই তিনটি বিষয়ের মিলন যখন যখন সম্ভব হয়, তখন তখন একাধিক কেন্দ্রে একই পদার্থের স্বতন্ত্র আবিষ্কারও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ মিলন দুর্লভ। সুতরাং একই পদার্থের বার-বার আবিষ্কার বা সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব, যদিও একেবারে অসম্ভব নহে। যে-পদার্থের আবিষ্কারের সুযোগ-সুবিধা সুলভ, যে-পদার্থের অভাব অনুভূত হয় সহজে এবং অনুভব করে অনেকে, সেই পদার্থের আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ মানসিক শক্তি বা প্রতিভার দরকার হয়। যেহেতু এইরূপ অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিভাশালী লোক অনেক দেখা যায়, সুতরাং অনেকের অনুভূত সহজ অভাব পূরণের উপায় সুবিধামত অনেক স্থলে স্বতন্ত্র ভাবে উদ্ভাবিত হইবে এইরূপ আশা করা যায়। পক্ষান্তরে যে-পদার্থের অভাব অনুভব করা সহজ নহে, এবং অনুভূত হয় অতি অল্প লোকের দ্বারা, এবং যে-পদার্থের আবিষ্কারের সুযোগ সুলভ নহে, সেই পদার্থের আবিষ্কারের বা সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ অঙ্গের প্রতিভাশালী লোকের দরকার। এইরূপ দেশকালপাত্রের যোগাযোগ অতি দুর্লভ বলিয়াই উচ্চ অঙ্গের আবিষ্কারের বার-বার ঘটন কার্য্যতঃ অসম্ভব। কিন্তু সহজ আবিষ্কারের বার-বার ঘটন বেশ সম্ভব।*

অধ্যাপক ডিক্‌সন নিজের দলের নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতামত সম্বন্ধে পুনরায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

যেখানে সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যাতায়াত থাকার বলবৎ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়, অথবা যেখানে বিদ্যার আদান-প্রদানের ভৌগোলিক বা অন্য প্রকার বাধা দেখা যায় না, সেখানে অপর দলের নৃতত্ত্ব-বিদেরা বিদ্যার বিস্তৃতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। আধুনিক বিস্তৃতবাদিগণের মত ইঁহারা নিজেদের এমন মত সম্বন্ধে গোঁড়া বা অবিবেচক নহেন। আধুনিক বিস্তৃতবাদীরা জোর করিয়া বলেন যে, পাথরের টুকরা ভাঙিয়া হাতিয়ার তৈয়ার করা বা দুই টুকরা কাঠ বাঁধিয়া ভেলা তৈয়ার করার মত অতি সহজ কাজেরও দুই বার নূতন করিয়া আবিষ্কার অসম্ভব। অপর দলের পণ্ডিতেরা সভ্যতার উপাদানগুলিকে দুই ভাগ করেন। এক ভাগে ফেলেন সহজ আবিষ্কার বা কাজ, এবং আর এক ভাগে ফেলেন জটিল কাজ, এবং মনে করেন, সহজ কাজগুলি নানা স্থানে বার-বার নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু জটিল কাজগুলি খুব সম্ভব এক কেন্দ্রে একবার আবিষ্কৃত হইয়া সেখান হইতে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।†

নৃতত্ত্ববিদগণ বহু প্রমাণ অবলম্বনে, অনেক বাদানুবাদের পর এই সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া সভ্যতার ইতিহাস অনুশীলন করিতে গেলে মস্ত ভুল হইবে। দার্শনিক মতের উদ্ভাবন অতি জটিল কাজ। বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে, যে জটিল দার্শনিক তত্ত্ব একবার নিরূপণ করিয়াছেন একজন হিন্দু, সেই তত্ত্ব নূতন করিয়া আবার নিরূপণ করিয়াছেন একজন গ্রীক, এ কথা স্বীকার করা যায় না। বিশ্বনিয়ন্তার বিধিব্যবস্থার রহস্য যতটা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায়, বিশ্ব ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত নূতন সৃষ্টির সংখ্যা খুব কম, নিয়মের শাসনই প্রবল। সভ্যতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে যাঁহারা একই পদার্থের পুনঃ পুনঃ আবিষ্কারবাদী তাঁহারাও অবশ্য নিয়মের শাসন মানিতে গিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। সেই নিয়মটি হইতেছে, বাহ্য অবস্থার ফলে সভ্যতার পরিণতি (evolution)। কিন্তু এই প্রকার

* Dixon, *The Building of Culture*, pp. 57-58.

† Dixon, *The Building of Culture*, p. 183.

পরিণামবাদ (theory of evolution) মানিতে গেলে একই পদার্থের পদে পদে নূতন করিয়া সৃষ্টির অবকাশও মানিতে হয়। সৃষ্টিশক্তির এইরূপ অপব্যয় প্রকৃতির রীতিসম্মত নহে। ইউরোপের দর্শন-বিজ্ঞানের ইতিহাস যতদূর জানা আছে তাহাতে কোন বড় আবিষ্কার বা বড় সৃষ্টি একাধিক নামের সহিত জড়িত দেখা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাপ্রণালী, পুস্তকালয়, যন্ত্রাগার প্রভৃতি আবিষ্কারের বা সৃষ্টির সুযোগ সভ্যজগতের প্রায় সকল দেশেই সমান। যে-সকল তত্ত্বের উদ্ভাবন বা যে-সকল যন্ত্রের সৃষ্টি এখনও বাকী আছে বিশেষবিৎ মাত্রই তাহা জানেন, এবং বিশেষবিৎ মাত্রই আপন আপন ক্ষেত্রে সেই অভাব পূরণের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও কয়টি উচ্চ মতের আবিষ্কার স্বতন্ত্র ভাবে একাধিক বার ঘটিতে দেখা যায়?

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ায় এশিয়া-মাইনরের উপকূলস্থিত যবন দেশের (Ionia) অন্তর্গত মিলেটাস নগরে থেলিস (Thales) নামক পণ্ডিত দর্শন-বিজ্ঞানের অনুশীলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের এবং যবন দেশের মধ্যে বিদ্যার আদান-প্রদানের কোন বাধা দেখা যায় না, বরং ক্রমশঃ সুবিধার বৃদ্ধি দেখা যায়। তখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশ বর্ত্তমান সীমায় আবদ্ধ ছিল না, আফগানিস্থানের পূর্ব্বাংশ হিন্দুস্থানের অন্তর্গত ছিল। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিরোডোটাস (৩।১০২) লিখিয়া গিয়াছেন—

"Other Indians dwell near the town of Caspapyrus (or Caspatyrus) and the Pactyc country, northward of the rest of India; these live like the Bactrians; they are of all Indians the most warlike"

কাস্পাপাইরাস নগর বোধ হয় বর্ত্তমান কাবুলের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। পাক্‌টাইক পখ্‌তন (পাঠান) নামের গ্রীক অপভ্রংশ। ঋগ্বেদে পখ্‌তনগণ উল্লিখিত হইয়াছে। পারসীক সম্রাট দারয়বৌর (Darius) (খৃঃ পূঃ ৫২২-৪৮৬) শিলালিপিতে পখ্‌তনের স্থানে গন্দার বা গন্ধারের নাম আছে, অর্থাৎ তখন পাঠান দেশ গান্ধারের সামিল ছিল। পরাক্রান্ত মিডীয়া রাজ্য পূর্ব্বদিকে খুব সম্ভব গান্ধারের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত হেলিস্ (Halys) নদী ছিল মিডীয়া-রাজ্যের পশ্চিম সীমা। হেলিস নদীর অপর পারে লিডীয়া-রাজ্য অবস্থিত ছিল। মিলেটাস লিডীয়ারাজের অনুগত ছিল। খৃঃ পূঃ ৫৯০ সাল হইতে লিডীয়-রাজ অলিয়াটিস (Alyattis) এবং মিডীয়-রাজ উবখ্‌ষত্রের (Cyaxares) মধ্যেও যুদ্ধ চলিতেছিল। থেলিস গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, খৃঃ পূঃ ৫৮৫ সালের ২৮ মে সূর্য্যগ্রহণ হইবে। এই সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে লিডীয়ার এবং মিডীয়ার যুদ্ধের নিবৃত্তি হইয়াছিল এবং মিডীয়া-রাজের পুত্র অষ্টিয়গেস (Astyages) লিডীয়া-রাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লিডীয়া এবং মিডীয়া রাজ্যের ভিতর দিয়া গন্ধারের এবং মিলেটাসের মধ্যে পণ্যের এবং বিদ্যার আদান-প্রদান অসম্ভব ছিল না।

আনসানের করদ-রাজা কম্বুজীয় (Cambysis)* স্বীয় অধিরাজ মিডীয়ারাজ অষ্টিয়াজেসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কম্বুজীয়ের এই পত্নীর গর্ভজাত পুত্র কুরু পারসীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। খৃঃ পূঃ ৫৫০-৫৪৯ সালে কুরু মাতামহকে পরাজিত করিয়া মিডীয়া-রাজ্য (ইরাণ, বর্ত্তমান পারস্য দেশ) অধিকার করিয়াছিলেন। তার পর উপস্থিত হইল লিডীয়া-জয়ের পালা। তখনকার লিডীয়ার রাজা ক্রীসাস (Crœsus) তৎপূর্ব্বেই যবন দেশে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রীসাসের রাজধানী ছিল সার্ডিস (Sardis) নগর। হিরোডোটাস লিখিয়াছেন (১।২৯)—

"There came to the city all the teachers from Hellas who then lived, in this or that manner; and among them came Solon of Athens"+

* এই প্রস্তাবে শিলালিপির মূলের পাঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া পারসীক সম্রাটগণের মূল ফার্সি নাম ব্যবহৃত হইল। Cambysis-এর মূল কম্বুজীয়। Cyrus নামের মূল কুরু, প্রথমার এক বচনে কুরুষ্। Darius নামের মূল দারয়বৌ, প্রথমার এক বচনে দারয়বোষ্।

+ হিরোডোটাসের বচনগুলি *Herodotus* translated by A. D. Godley (Loeb Classical Library) হইতে উদ্ধৃত হইল।

সেকালে হেলাস দেশে (গ্রীসে) যাঁহারা শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁহারা সকলেই আসিয়া সার্ডিস নগরে মিলিত হইয়াছিলেন। এই দলে এথেন্সের ব্যবস্থাপক সোলন ছিলেন। ক্রীসাস রাজত্ব করিয়াছিলেন খৃঃ পূঃ ৫৬১ হইতে ৫৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ে গ্রীসের প্রধান শিক্ষাগুরু ছিলেন মিলেটাসের দার্শনিকত্রয়—থেলিস, এনক্সিমন্দর Anaximander) এবং এনক্সিমিনিস (Anaximenes)। ইঁহারা নিশ্চয়ই সার্ডিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিডীয়াবাসীর যোগে সার্ডিসে হিন্দুর খবর পৌছান তখন অসম্ভব ছিল না। সুযোগ পাইলে এই সকল দার্শনিক যে হিন্দুর মতামত জানিবার চেষ্টা করিতেন ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে। কুরু শীঘ্রই লিডীয়া আক্রমণ করিবেন এই আশঙ্কায়, আগেভাগে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য, খৃঃ পূঃ ৫৪৭ সালে ক্রীসাস্ মিডীয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সসৈন্য হেলিসের তীরে উপনীত হইয়া তিনি নদী পার হওয়ার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার শিবিরে তখন থেলিস উপস্থিত ছিলেন। থেলিস একটি খাল কাটাইয়া নদীর জল কমাইয়া দিয়া লিডীয়ার সেনার নদী পার হওয়ার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। এবারে কুরুর এবং ক্রীসাসের সেনার মধ্যে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকিলেও পরের বৎসর (খৃঃ পূঃ ৫৪৬) কুরু লিডীয়া আক্রমণ করিয়া সার্ডিস অধিকার করিলেন এবং ক্রীসাসকেও বন্দী করিলেন। ক্রমে লিডীয়া-রাজ্য তাঁহার পদানত হইল। যে সর্ত্তে যবন দেশের অধিবাসীরা ক্রীসাসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা সেই সর্ত্তে কুরুর প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। কুরু মিলেটাস ভিন্ন আর কোন যবন নগরের সহিত সেই সর্ত্তে সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন না, এবং এশিয়া-মাইনরের উপকূলস্থ যবন নগরগুলি এবং নিকটবর্ত্তী যবনদিগের অধিকৃত দ্বীপগুলি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার ব্যবস্থা করিয়া লিডীয়া পরিত্যাগ করিলেন।

তারপর কুরু যে-সকল দেশ জয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে হিরোডোটাস লিখিয়াছেন (১।১৫৩):—

"For he had Babylon on his hands and the Bactrian nation and the Sacae and Egyptians."

কুরু বেবিলন আক্রমণ করিয়াছিলেন ছয় বৎসর পরে, খৃঃ পূঃ ৫৪০ সালে, এবং ইজিপ্ত জয় করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র কম্বুজীয় খৃঃ পূঃ ৫২৫ সালে। কুরু খৃঃ পূঃ ৫৪৬ হইতে ৫৪০ সাল—এই ছয় বৎসর কি করিয়াছিলেন ? কুরুর সেনাপতি হার্পেগাস কর্ত্তৃক এশিয়া-মাইনরের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত লাইসিয়া প্রভৃতি জনপদ অধিকারের বিবরণ লিখিয়া হিরোডোটাস লিখিয়াছেন (১।১৭৭):—

"In the upper country Cyrus himself subdued every nation, leaving none untouched. Of the greater part of these I will say nothing, but will speak only of those which gave Cyrus most trouble and are worthiest to be described."

ইরাণের উত্তর দিকের জনপদের লোকেরা দিগ্বিজয়ী কুরুকে বিশেষ বাধা দিতে পারে নাই বলিয়া হিরোডোটাস ঐ সকল জনপদের বিজয়কাহিনী বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। দারয়বৌর সাম্রাজ্যলাভের অল্পকাল পরে খোদিত বিহিস্তানের শিলালিপিতে ঐ সকল জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই কয়টি ইরাণের (সাবেক মিডীয়া-রাজ্যের) বাহিরে ছিল—বাক্ত্রিস (Bactria), সুগুদ (Sogdiana) গন্দার (গান্ধার), শক (Scythia), থতগুস বা সতগুস।

বাক্ত্রিস (Bactria) এবং শকদেশ (Sacae) হিরোডোটাস আগেই স্বতন্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই দুই জনপদে কুরুকে যতটা বাধা পাইতে হইয়াছিল, গান্ধারে এবং সতগুসে তত বাধা ঘটে নাই। অথচ হিরোডোটাস লিখিয়া গিয়াছেন, হিন্দুদিগের মধ্যে পাক্‌টাইকি বা পখ তনেরা সর্ব্বাপেক্ষা সমরপ্রিয় ছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, গান্ধারবাসীদিগের সহিত পূর্ব্বাবধি মিডীয়া-রাজ্যের কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল, এবং এই কারণেই তাঁহারা সহজে কুরুর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। থতগুসের অবস্থাও বোধ হয় সেইরূপই ছিল। দারয়বৌর (Darius) ফার্সি লিপির "থতগুস,"

এলামের ভাষার প্রতিলিপিতে "সত্তকুস," এবং বেবিলনীয় প্রতিলিপিতে "সত্তগুউ" বানান করা হইয়াছে। হিরোডোটাস বানান করিয়াছেন "সত্তগিডয়।" অধ্যাপক হার্জফেল্ড মনে করেন, "সত্তগুসেরা" পাঞ্জাবে বাস করিত।* সংস্কৃত "সপ্তের" প্রাকৃত আকার "সত্ত"। ঋগ্বেদে পাঞ্জাবের অংশবিশেষ "সপ্তসিন্ধবঃ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। "সত্তগুস" "সপ্তগো"র অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। গো শব্দ ভূমি এবং জল উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং "সপ্তগো" অর্থ কাবুল, সিন্ধু, ঝিলাম, চেনাব, রাভি, সাত্‌লেজ, সরস্বতী এই সাতটি নদীও হইতে পারে, অথবা এই সাতটি নদীর তীরের সাত খণ্ড ভূমি, অর্থাৎ পাঞ্জাবের উত্তরাংশ বুঝাইতে পারে। গান্ধার এবং পাঞ্জাব খৃঃ পূঃ ৫৪৬-৫৪০ হইতে আলেকজাণ্ডারের অভিযান পর্য্যন্ত (খৃঃ পূঃ ৩২৬) পারসীক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই ছিল। এই সময়ে হিন্দুর এবং গ্রীকের মধ্যে বিদ্যার আদান-প্রদানের যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই সময়ে হিন্দু এবং যবন যে পরস্পরের সুপরিচিত ছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দে গ্রীকদের হিন্দুদিগকে জানিবার কিরূপ সুবিধা ছিল তাহার খবর পাওয়া যায় হিরোডোটাসের ইতিহাসে। এই শতাব্দের মাঝামাঝি হিরোডোটাস তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। হিরোডোটাস লিখিয়াছেন (৪।৪৪), সিন্ধু নদী কোনখানে সমুদ্রে মিশিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য দারয়বৌ (Darius) স্কাইলক্‌স (Scylax) নামক কেরিয়াবাসী যবনকে কয়েক জন বিশ্বাসী লোকের সহিত নৌকাযোগে সিন্ধু নদীর মোহানার দিকে পাঠাইয়াছিলেন। স্কাইলক্‌স সমুদ্রে পৌঁছিয়া সমুদ্রপথে সম্ভবতঃ সুয়েজ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। হিরোডোটাস লিখিয়াছেন—

"After this circumnavigation Darius subdued the Indians and made use of the sea."

দারয়বৌর হামাদান, পার্সিপলিস এবং নক্‌স-ই-রুস্তম লিপিতে হিন্দু নামক স্বতন্ত্র জনপদ উল্লিখিত হইয়াছে। এই ফার্সি "হিন্দু" সংস্কৃত "সিন্ধুর" অপভ্রংশ, অর্থাৎ হিন্দু বলিতে বিশেষভাবে সপ্তগোর দক্ষিণে স্থিত সিন্ধু নদীর দুই তীরবর্ত্তী জনপদ বুঝাইত। এই সিন্ধু জনপদকেই হিরোডোটাসও এখানে "ইণ্ডিয়ান" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। দারয়বৌ খৃঃ পূঃ ৫১৮ হইতে ৫১৫ সালের মধ্যে সিন্ধু জয় করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্কাইলক্‌স সিন্ধু নদ দিয়া সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন। সিন্ধু-বিজয়ের পর সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে এবং পারসীক সাম্রাজ্যে যাতায়াতের পথ খুলিয়া গিয়াছিল। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ সুবিধাজনক ছিল। হিরোডোটাস আরও বলেন, (৭।৬৫-৬৬) খৃঃ পূঃ ৪৮০ সালে দারয়বৌর পুত্র সম্রাট খ্‌ষয়ার্ষন (Xerxes) যে বিপুল সেনা লইয়া ইউরোপীয় গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুইজন সেনাপতির অধীনে হিন্দী (সিন্ধী) এবং গান্ধারী এই দুই দল ভারতবর্ষীয় সৈন্য ছিল। সুতরাং তৎকালের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু গ্রীকেরা হিন্দুদর্শন-তত্ত্বের পরিচয়লাভের যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন।

এইরূপ প্রমাণ এক তরফা নহে। সেকালের হিন্দুরাও গ্রীকদিগকে চিনিতেন। এশিয়া-মাইনরের উপকূলবাসী গ্রীকেরা আপনাদিগকে বলিতেন আইয়বন (Iovanas), যাহার ইংরেজী অপভ্রংশে (Ionian)। সংস্কৃত ভাষায় ইহাদিগকে বলা হইয়াছে "যবন," প্রাকৃত ভাষায় "যোন" এবং প্রাচীন ফার্সি লিপিতে "যৌন"। হিন্দুরা পারসীক-দিগের সহিত পরিচিত হইবার পরে অবশ্য যবনদিগের পরিচয় পাইয়াছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত এবং প্রাকৃত সাহিত্যে পারসীকেরা কোন্ নামে পরিচিত? অতি প্রাচীন সংস্কৃত এবং প্রাকৃত সাহিত্যে পারসীক নাম পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় "কম্বোজ" নাম। প্রাচীন পারসীকেরা যে "কম্বোজ" নামে পরিচিত ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোকের ত্রয়োদশ শিলাশাসনে (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৫০) "যোনকম্বোজেষু" একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। পালি মজ্‌ঝিম নিকায়েরও একটি সুত্তে (৯৩) "যোন-কম্বোজেষু" পাঠ আছে। এইখানে বলা হইয়াছে যোনদিগের এবং কম্বোজদিগের মধ্যে, এবং সীমান্তের বাহিরে স্থিত অন্যান্য জনপদে,

* E Herzfeld. *A New Inscription of Darius from Hamadan* (Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 34, Calcutta, 1928).

চতুর্বর্ণ ভেদ নাই, প্রভু এবং দাস এই দুই বর্ণ মাত্র আছে। এই সকল দেশে প্রভু দাস হইতে পারে এবং দাসও প্রভু পদ লাভ করিতে পারে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, কম্বোজেরা যবনদিগের প্রতিবেশী এবং অহিন্দু ছিলেন। অশোকের শিলাশাসন লেখার সময়ে, এবং পার্থব (Parthian) বা পহ্লবগণের পারস্য-জয়ের পূর্ব্বে, এশিয়ার পশ্চিম খণ্ডে যবনদিগের স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং যবন-পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিল মেসিডন হইতে আগত গ্রীকগণ। এই নবাগত যবনগণের পরে ঐ অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ জাতি ছিল পারসীকেরা। সুতরাং অনুমান হয়, আদৌ পারসীকগণকেই "কম্বোজ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

এইরূপ অনুমানের অনুকূল প্রমাণ যাস্কের নিরুক্তে এবং পাণিনির ব্যাকরণে পাওয়া যায়। যাস্ক লিখিয়াছেন (২।২)—

"অথাপি প্রকৃতয় একৈকেষু ভাষ্যন্তে বিকৃতয় একেষু। শবতি র্গতিকর্ম্মা কম্বোজেষ্বেব ভাষ্যতে।... বিকারমস্যার্য্যেষু ভাষ্যতে। শব ইতি।"

অর্থাৎ এক এক দেশে ধাতু প্রকৃতি অনুসারে ক্রিয়ার মত ব্যবহৃত হয়; এক এক দেশে সেই ধাতু বিকৃত আকারে নামের মত ব্যবহৃত হয়। কম্বোজগণের মধ্যে শব (শবতি) ধাতু গমন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর্য্যগণের (ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের) মধ্যে শব বিকৃত আকারে নাম রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা শব (মৃতদেহ)।

দারয়বৌর শিলালিপিতে ব্যবহৃত প্রাচীন ফার্সি ভাষায় গমনার্থ "ষিয়ু" ধাতু আছে, "ষিয়ব," "অষিয়ব" প্রভৃতি যাহার বিভিন্ন রূপ। যাস্কের গমনার্থক কম্বোজ ভাষার "শব" ধাতু এই "ষিয়ু"র রূপান্তর এবং প্রাচীন ফার্সি ভাষার সহিত যাস্কের পরিচয় ছিল এইরূপ মনে হয়।*

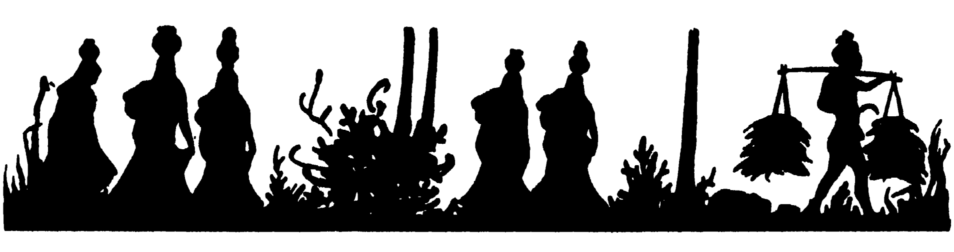
সংস্কৃত ভাষায় ক্ষত্রিয়ের গোত্র-বিশেষের বা রাজবংশের নামানুসারে জনপদের বা রাজ্যের নামকরণ দেখা যায়। যেমন বহুবচনান্ত "পঞ্চালাঃ" (পঞ্চালগণ) বলিলে পঞ্চাল-বংশীয় ক্ষত্রিয় বুঝাইত এবং পঞ্চাল-বংশীয় রাজার অধিকৃত জনপদ বা রাজ্যও বুঝাইত। এই শ্রেণীর শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। যথা, পঞ্চাল+অঞ্ = পাঞ্চাল অর্থাৎ পঞ্চাল-বংশীয় ক্ষত্রিয়। এই সকল স্থলে অপত্যসূচক প্রত্যয় যোগে আবার "তদ্রাজ," সেই জনপদের রাজাও বুঝায়। যথা, পঞ্চাল+অঞ্ = পাঞ্চাল বা পঞ্চালগণের রাজা। পাণিনির এই "তদ্রাজ" প্রকরণে একটি সূত্র আছে (৪।১।১৭৫)—"কম্বোজাল্লুক্"। এখানে বহুবচনান্ত "কম্বোজাঃ" (কম্বোজগণ) শব্দ কম্বোজ রাজবংশ এবং কম্বোজগণের জনপদ বা রাজ্য এই দুই বুঝায়। এই সূত্রে বিহিত হইয়াছে, অপত্য এবং তদ্রাজ অর্থে কম্বোজ শব্দের উত্তর যে অঞ্ প্রত্যয়ের ব্যবস্থা আছে তাহার লোপ হয়, অর্থাৎ কম্বোজ-বংশীয় ক্ষত্রিয়ের পুত্র বা কম্বোজ-রাজ্যের রাজা বুঝাইবার জন্য "কম্বোজ" পদই হইবে, প্রত্যয়ের লোপের ব্যবস্থা আছে বলিয়া কাম্বোজ পদ হইবে না। কম্বোজ নামক রাজবংশ এবং কম্বোজ রাজ্য বা জনপদ যদি পাণিনির জানা না থাকিত, তবে তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন না। সেই রাজ্যে আবার রাজার পুত্রের এবং রাজার নাম অবিকৃত "কম্বোজ"ই ছিল। কতকটা এই প্রকার নামকরণ খৃঃ পূঃ ৫৫০ হইতে ৫২২ সালের মধ্যে কেবল মাত্র প্রাচীন পারসীক সাম্রাজ্যে দেখা যায়। পাণিনি গান্ধারবাসী ছিলেন, একথা সকলেই স্বীকার করেন। খৃঃ পূঃ ৫৪০ সালের পূর্ব্বে যিনি (কুরু) গান্ধার এবং সপ্তগো জয় করিয়াছিলেন তাঁহার পিতার নাম ছিল কম্বুজীয়, যাহার হিন্দু অপভ্রংশ কম্বোজ। সুতরাং হিন্দুদের পক্ষে পারসীক রাজবংশকে কম্বোজ-বংশ নাম দেওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের রীতি অনুসারে কম্বোজ-বংশের শাসিত জনপদের নামও অবশ্য কম্বোজই হইয়াছিল। সেকালে বর্ত্তমান পারস্যের একটি ছোট অংশকে পার্স (Persis) বলিত, কিন্তু সমস্ত ইরান দেশের কোন বিশেষ নাম ছিল না। তাই হিন্দুরা কম্বোজ রাজবংশের নামানুসারে রাজ্যের নাম দিয়া থাকিবেন কম্বোজ। সম্রাট কুরুর পুত্র এবং উত্তরাধিকারীর নামও ছিল কম্বুজীয়। হিন্দুর ব্যাকরণ মতে অবিকল বংশের নামানুসারে অপত্যের নাম হইতে পারে

* Tolman, *Ancient Persian Lexicon and Texts*, New York, 1908. ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই খবরটি দিয়াছেন।

তদ্ধিত প্রত্যয় লোপ করিয়া। কুরুর পুত্র কম্বুজীয়ের উত্তরাধিকারী দারয়বৌ কুরুর জ্ঞাতি বিষ্টাস্পের (Hystaspes) পুত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণের মধ্যে কাহারও কম্বুজীয় নাম দেখা যায় না। পারসীক রাজবংশের দুই শাখার আদি পুরুষ ছিলেন হখামনিষ (Achaemenes)। হখামনিষের নাম হইতে গ্রীক-লেখকেরা এই বংশকে একিমিনিড বলিতেন। অনুমান হয় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দে পার্থব বা পহ্লবগণ কর্ত্তৃক পারস্য-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু-লেখকেরা পারস্য দেশকেই কম্বোজ নামে অভিহিত করিতেন। পাণিনির সূত্রে যেভাবে কম্বোজ শব্দের বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ আছে তাহাতে অনুমান হয় পাণিনি কম্বুজীয়ের পুত্র কুরুর এবং কুরুর পুত্র কম্বুজীয়ের সমসময়ে অথবা অল্পকাল পরে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন।

পাণিনির ৪।১।৪৯ সূত্রে বিহিত হইয়াছে, যবন+আনুক +ঙীষ=যবনানী। কাত্যায়ন এই সূত্রের একটি বার্ত্তিকে বলিয়াছেন, লিপি অর্থে যবনানী শব্দ ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ পাণিনি গ্রীক-লিপির সহিত পরিচিত ছিলেন। হেকিমী চিকিৎসা এখনও ইউনানী বা যবনানী নামে কথিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পাণিনিকে এত প্রাচীন মনে করেন না। কিন্তু কেহই তাঁহাকে খৃঃ পূঃ ৩৫০ সালের পরে ফেলিতে প্রস্তুত নহেন। পাণিনি যদি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের পরিবর্ত্তে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহার পূর্ব্বেও যে গান্ধার দেশীয় হিন্দু পণ্ডিতেরা কম্বোজ এবং যবনগণ সম্বন্ধে অনেক খবর রাখিতেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বাবধি বিভিন্ন অর্থে প্রচলিত কম্বোজ শব্দ, এবং বিশেষ অর্থে প্রচলিত যবনের স্ত্রীলিঙ্গ যবনানী শব্দ সিদ্ধ করিবার জন্যই পাণিনি সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাণিনি যে সময়ের লোকই হউন, কম্বোজ নামের সৃষ্টি হইয়াছিল খুব সম্ভব কম্বুজীয়ের পুত্র কুরুর সময়ে। যবনানী শব্দ তদপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারে।

অতএব এশিয়ার পশ্চিম খণ্ডের খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাসের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, এই শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হিন্দুর এবং গ্রীকের মধ্যে বিদ্যার আদান-প্রদানের বাধা ছিল না, এবং শেষার্দ্ধে কম্বুজীয়ের পুত্র কুরু যখন সপ্তগো এবং গন্ধার হইতে যবন দেশ (Ionia) পর্য্যন্ত বিস্তৃত একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তখন উভয় প্রান্তের তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের মধ্যে তত্ত্ব কথার আদান-প্রদানের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। সেকালের অনেক যবনই অবশ্য ফার্সি ভাষা শিখিতেন এবং অনেক পারস গ্রীক ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন। সংস্কৃত ভাষার সহিত একিমিনিড নৃপতিগণের শিলালিপির ফার্সির সাদৃশ্য এত বেশী যে পার্সি দোভাষী মধ্যবর্ত্তী করিয়া হিন্দু-যবনে কথাবার্ত্তার কোন অসুবিধা হইতে পারিত না। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তৎকালে হিন্দুর এবং গ্রীকের মধ্যে দার্শনিক মতামতের আদান-প্রদান চলিয়াছিল কি-না তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, প্রধানতঃ বিচার করিতে হইবে হিন্দু-দর্শনের এবং গ্রীক-দর্শনের জটিল সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি-না। যদি থাকে, তবে স্বীকার করিতেই হইবে এই সাদৃশ্যের কারণ স্বতন্ত্র উদ্ভাবন নহে; এক দেশ হইতে আর এক দেশে বিদ্যার বিস্তৃতি এই সাদৃশ্যের কারণ।



মল্লিকা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

এক

কাল সন্ধ্যা। আপিস হইতে ফিরিতেছি। শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত মন।

বাড়িটার সম্মুখে অতি সঙ্কীর্ণ এক গলি, অন্ধকারে মনে হইতেছে যেন পাতালপুরীর পথ। পার হইয়া ঘরের দরজায় পা দিতেই কানে আসিল, বড় মেয়ে সুধা বলিতেছে, "মা, খুকুর গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।"

সংবাদ শুভ। দরিদ্রের ঘরেই রোগের বাসা। "মা" কিন্তু ছুটিয়া আসিলেন না, রন্ধনশালা নামক অপরিসর বদ্ধ স্থানটুকুতে বসিয়া রন্ধন করিতে লাগিলেন। এখনই কর্ত্তা আসিবেন যে! বেচারী! সংসার ও স্বামী এই দুইটি তাহার সকল অবসর কাড়িয়া রাখিয়াছে। রাত্রি তখনও শেষ হয় না, কলের "ভোঁ" শুনিয়া শয্যা ছাড়ে, আবার রাত "নিশুতি" হইলে শুইতে যায়। ইহার মধ্যে সে না-পায় একটু বিশ্রাম, না-পায় সন্তানগুলিকে বুকে ধরিয়া আদর করিতে। তাহাদের প্রতি অনিচ্ছাকৃত অযত্ন, অবহেলা তাহার অন্তরতলে নিশিদিন বেদনার ফল্গুধারা বহাইয়া রাখিয়াছে। সে-কথা মুখ ফুটিয়া সে বলে না; কিন্তু কাজের পাকে ধূলিম্লান, ছিন্নবাস সন্তান-গুলির শীর্ণগণ্ডে গাঢ় স্নেহাতুর চকিত চুম্বন দেখিয়াই বুঝিতে পারি।

যাহা হউক, আমার পদশব্দে সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বসিবারও অবসর দিল না, চারজনে চারদিক হইতে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমাদের লজেঞ্জস্ এনেছ বাবা?"

খুকুকে কোলে তুলিয়া লইয়া উত্তর দিলাম, "না রে আজও—"

কথাটা শেষ করিতে দিল না, চারটিতেই অনুযোগ জুড়িয়া দিল, কৈফিয়ৎ তলব করিল, পরিশেষে দুইটিতে মানভরে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সামান্য জিনিষ, তথাপি প্রতিশ্রুতি আমি কোনদিনই পালন করিতে পারি না। নিত্যকার মত আজও প্রতিশ্রুতি দিবার পূর্ব্বেই সিক্ত হাত দুইখানি ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতে মুছিতে মল্লিকা আসিল। খুকুকে আমার কোল হইতে লইয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিতে দিতে ধমক দিল, "সব চুপ্। ঘরে এসেও মানুষের নিস্তার নেই। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর কোথায় একটু বিশ্রাম করবে, তা না, 'এ দাও', 'সে দাও'।"

হাসিয়া কহিলাম, "আমি হাড়ভাঙা খাটুনি খাটি, মণি; কিন্তু তুমি যে জীবন-ভাঙা খাটুনি খাটছ—"

"আমরা মেয়েমানুষ। সব সয়।"

"তা সত্যি। না হ'লে এতখানিতেও—"

"আচ্ছা, এখন ওসব রাখ। আগে হাতমুখ ধোও, চা খাও। তারপর যত পার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হট্টগোল জুড়ে দিও।" বলিয়া সে আমারই জন্য কাপড়-গামছা ঠিক করিতে বাহির হইয়া গেল।

এই কাজটির জন্য তাহার সহিত কতদিন কত বচসা হইয়াছে, তথাপি তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি নাই। সে বলে, "আমার যা ভাল লাগবে, তাই করব।"

উত্তরে বলি, "কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগে না।"

"সব জিনিষই যে তোমার ভাল লাগবে এমন ত কথা নেই।" বলিয়া সে নিজের কাজে মন দেয়। আশ্চর্য্য এই নারী! ইহার মধ্যে কি আনন্দ সে লাভ করে সেই জানে।

মল্লিকা চলিয়া গেলে, সুধা আবার অনুযোগ করিল, আমি তাহাদের ভালবাসি না। পাশের বাড়ির অন্নু, লক্ষ্মী, পদ্ম—ইহারা পিতার কাছ হইতে কত কি পাইয়া থাকে। তাহারা এমন করিয়া না-চাহিতেই উপহারগুলি স্বতঃই বর্ষিত হয়, আর—। মেয়েকে কহিলাম, "মা, আমি যে গরিব। পয়সা নেই—"

কথাটা তাহার শিশুমন বিশ্বাস করিতে পারিল না। কহিল, "আমি বুঝি দেখি না? তুমি এতগুলো ক'রে

টাকা আন।" বলিয়া হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া দিল। হাসিলাম; প্রতিশ্রুতি দিলাম, কাল নিশ্চয় আনিব।

তারপর—

রাত্রি তখন গভীর হইয়া আসিতেছে। ছেলেমেয়ে-গুলি নিদ্রামগ্ন। মল্লিকার কাজ তখনও সারা হয় নাই, আমি আহারান্তে শয্যায় পড়িয়া চিন্তা করিতেছি—কাল পয়লা। মাহিনাও পাইব; কিন্তু পঁয়তাল্লিশটি টাকায় কি হইবে? পনের টাকা ঘরভাড়া, বাকী টাকায় গোয়ালা, মুদী ও প্রতিদিনের বাজার আদি। ঋণভার ক্রমেই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি পোহাইলেই উত্তমর্ণ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইবে। ইহার উপর কাহারও অঙ্গে বস্ত্র নাই। যেগুলি আছে শত ছিন্ন, গলিত ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচিত্র। সম্মুখে দুরন্ত শীত। এই স্যাঁতসেঁতে ঘর, চিররুগ্ন ছেলেমেয়েগুলি, অনুপযুক্ত শয্যা। কাহারও শীতবস্ত্র বলিতে কিছু নাই। আবার দুইটি ছেলেমেয়ে অসুস্থ হইয়া পড়িল। তাহারা না পাইতেছে উপযুক্ত পথ্য, না দিতে পারিতেছি ঔষধ। হাসপাতাল আছে—আমার মত দরিদ্রের তাহা পরম সহায়। কিন্তু মিথ্যা অহঙ্কার ঠেলিয়া তাহার দরজায় গিয়া দাঁড়াইতে পারি না। রোগ ও দারিদ্র্য দেহ-মনকে নিষ্পেষিত করিতেছে, মৃত্যুর পদশব্দে সহসা চমকিত হইয়া উঠি। তথাপি অন্তরভরা সাধ, আশা, অহঙ্কার। ইহারা মরে না, জীবনকে কখনও গভীর-মর্ম্ম-পীড়ায় দুর্ব্বিষহ, কখনও আনন্দোচ্ছল করিয়া তোলে। জীবনের এ রহস্য—সহসা চিন্তায় বাধা পড়িল। তাকাইয়া দেখি পাশে মল্লিকা। ম্লান দীপালোকে তাহার ম্লান মুখখানি আরও ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আয়ত চোখ দুইটিতে স্নিগ্ধতার ধারা টল্ টল্ করিতেছে।

সে কহিল, "কি ভাবছ?"

"নতুন কিছু নয়—"

সে ধীরে আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল; তারপর কহিল, "এত ভাব কেন? এ দুঃখ কি কেবল আমাদের একলার?"

"জানি মণি। দেশজোড়া হাহাকার—"

"আমাদের দিন তো চলে যাচ্ছে"

"তা যাচ্ছে। মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে, দিন তার চলে যায়ই। কিন্তু এর নাম কি বেঁচে থাকা? সময় সময় আমার সন্দেহ হয়, আমরা মৃত্যুলোকে বাস করছি না ত? যাক—একটা শুভ খবর দিই।"

"কি?"

"একটা মাষ্টারীর সন্ধান পেয়েছি। ছেলেটি শ্যামবাজারে থাকে। দু-বেলা পড়াতে হবে, দক্ষিণা বারো টাকা।"

মল্লিকা চট্ করিয়া উঠিয়া বসিল। মুখখানিকে আরও কঠিন করিয়া কহিল, "না কিছুতেই তা হবে না। এত খাটুনির ওপর আবার দু-বেলা মাষ্টারী?"

হাসিয়া ফেলিলাম, কহিলাম, "এই জন্যেই তোমায় আগেভাগে বলতে চাইনি। আচ্ছা, এত খাটুনি তুমি দেখলে কোথায়? তোমার খাটনির কাছে—"

"তোমার ঐ এক কথা। আমায় তুমি এত বড় ক'রে দেখ কেন?"

"আর আমিই কি এত ছোট? পারব না? সব পারব। দরিদ্র যারা তারা না পারে কি?"

"জানি, জানি গো, জানি। সবই তাদের সইতে হয়, বইতে হয়। তাই তোমার দিকে, ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকাই আর একথাটা মনে মনে ভাবি।" স্বর ব্যথিত, চোখ দুইটি দেখিতে পাইলাম না, বলিতে বলিতে সে খুকুকে বুকে জড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

দুই

পরদিন তখন প্রাসাদারণ্যশিরে রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ছেলেটির বাড়ির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

যেন ইন্দ্রপুরী। প্রকাণ্ড ফটক, ঢুকিতে ভয় করে। এ দুইয়ের মাঝে সযত্নরোপিত ফুলের বাগান ও সবুজ শষ্প-কোমল একটি লন্। কিন্তু কোন্ পুণ্যবলে জানি না প্রবেশকালে তেমন বাধা পাইলাম না এবং সুপারিশের জোরে কাজেও বহাল হইলাম।

গৃহস্বামী বৃদ্ধ। বিপুল ঐশ্বর্য্য—নানাদিকে নানারূপে চমকিত। ছাত্রটিও বেশ গৌরকান্তি, নধর দেহ, বালক বয়স। পাঠ অপেক্ষা বেশভূষা ও আহার্য্যেই মন অধিক। ইতিমধ্যেই সে অর্থকে চিনিয়া ফেলিয়াছে।

বৃদ্ধের বিত্তভার ভোগ করিতে সে ছাড়া আর কেহ নাই। না-পড়াইলেও চলিত। কিন্তু দেশের হাওয়া আজকাল বিপরীতমুখী। বৃদ্ধ কহিলেন—"তাই।"

উত্তরে কহিলাম, "ঠিকই ত। দেশে বিদ্যার বান ডাকছে।"

তার পর হইতে নিয়মিত যাই আসি। মল্লিকা কিন্তু খুশী হইল না।

সেদিন সকালে ছাত্র পড়িতেছে—"Strike the nail hard."

ছাত্রটি বার-দুই পড়িয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার-মশায়, বইয়েতে খুব জোরে পেরেক ঠুকতে বলছে কেন? আমি তো কোথাও পেরেক ঠুকলেই দাদামশায় বকেন। আবার বইয়ে বল্‌ছে পেরেক ঠোক—তবে?"

সমস্যা বটে। গ্রন্থকারকে হয়ত একদা সজোরেই পেরেক ঠুকিতে হইয়াছিল। তিনি সেই দিনটি স্মরণ করিয়া সুকুমার-মতি বালকগণকে বলিয়াছেন, "বাবা, সজোরে পেরেক ঠোক।" কিন্তু দাদামশায় বিনা আয়াসেই থাম বসাইয়াছেন, তাঁহার আপত্তি হইবারই কথা। কহিলাম, "বাবা, ও কথাটা মুটে-মজুর, চাষাভুষো আর আমাদের মত গরিব দুঃখীদের বলা হয়েছে। তুমি দাদামশায়ের কথা মেনেই চল।"

চতুর ছাত্র; ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মুটে-মজুররা কি বই পড়ে?"

"তা পড়ে না বটে, কিন্তু বই পড়েও অনেকে মুটে-মজুরের মত হয়।"

"তবে আপনি কি?"

"কেরাণী।"

"আমাদের সরকারটার বাপের মত?"

"হাঁ বাবা।"

"ওঃ।"

কহিলাম, "ওর মানে সুযোগ কখনও ছেড়ো না, বুঝলে? এই এখন থেকে যদি তুমি মন দিয়ে পড়াশুনো না কর ত মানুষ হবে কি করে?"

সে হঠাৎ হাতের বইখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর চলিয়া যাইতে যাইতে কহিল, "আজ আপনার ছুটি। আমি এখন মাসীর বাড়ি যাব, সেখানে নেমন্তন্ন।"

আমাকেও দ্রুত বাড়ি ফিরিতে হইবে। রাত্রি হইতে সুধা খুকু ও সম্ভব জ্বর। রকমটাও ভাল নয়—চোখমুখের চেহারা ও পেটের অবস্থা দেখিয়া ভয় করে। ছুটি পাইয়া পথ দিয়া দ্রুত চলিতে লাগিলাম।

অশান্ত মন। হঠাৎ পিছনে মোটরের "হুমকি" ও "ড্যাম," "ফুল" হুঙ্কার—একসঙ্গে মোটর ও সাহেব! চমকাইয়া উঠিলাম। ত্রস্তে সরিয়া ফিরিয়া দেখি—প্রকাণ্ড মোটর হাঁকাইতেছেন এক বিপুল দেহ বাঙালী বাবু। পার্শ্বে তাঁহার পোষাক-পরা শোফার, পিছনে পাগড়ী মাথায় তকমা-আঁটা বংশ-যষ্টি হাতে দারোয়ান। তিনজনেরই চোখে রোষাগ্নি।

বাবুর মুখখানি যেন চেনা-চেনা। মোটরখানি পাশ দিয়া চলিয়া গিয়া অদূরে "হেয়ার কাটিং সেলুনে"র সম্মুখে দাঁড়াইল। বাবুটি নামিয়া পড়িলেন, এবং কোনদিকে না তাকাইয়া হেলিতে দুলিতে সেলুনের দরজায় দেহখানি প্রবেশ করাইলেন। এবার চিনিলাম সতীর্থ হিমাংশু। বন্ধুদের অনেক বিত্ত, অনেক মান। কর্ত্তাদের নামের দুই প্রান্তে দুই তিনটি দীর্ঘ ছাপ।

মনে পড়িল, দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন আমি তালতলার মেসে। পাঠ্যাবস্থা। আমার ঘরটি ছিল আড্ডাখানা। বন্ধু প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে হাজিরা দিতেন। তাঁহার কণ্ঠনিনাদে সারা মেস উদ্বাস্ত, এমন কি পার্শ্বের বাড়িটি অবধি উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত।

তারপর—পাঠ্যাবস্থার শেষ। দুই বৎসর চাকরির উমেদারী, তাহার শেষে চাকরি ও উদ্বাহ এবং আরও পরের যাহা তাহারই কথা বলিতেছি—

সাত দিন হইল এক আনকোরা নূতন ডাক্তার পাড়ায় ডিসপেনসারী খুলিয়া বসিয়াছেন। বিনা দক্ষিণায় রোগী দেখেন, ব্যবস্থা দেন, তারপর—তার পরের টুকু রোগীকেই বহন করিতে হয়। তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম। লোকটি ভাল, তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া চলিলেন। তিনজনকেই সযত্নে পরীক্ষা করিলেন, বিধিমত ব্যবস্থা ও আশ্বাস দিলেন

এবং অবিলম্বে তাঁহার উপদেশ পালনের জন্য কোমল অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া মল্লিকাও সব শুনিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে কহিল, "অসুখ কি খুব কঠিন? ভয়ের কিছু নেই?"

"হ'তে কতক্ষণ?" কথাটা অন্যমনস্কের মত বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, তাহা পাংশু। আঘাতটা মর্ম্মমূলেই লাগিয়াছে! সান্ত্বনার সুরে কহিলাম, "এখন থেকেই ওষুদ-পত্তর দেওয়া দরকার, তাই ডাক্তারবাবু অমন ক'রে বললেন, ভেব না।"

কিন্তু ভাবনা-ভারে আমার সারা মন তখন নুইয়া পড়িয়াছে—টাকা? মল্লিকাও এ কথাটি ভাবিতেছিল, মুখে না বলিলেও অন্তরে তাহার স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম। কহিলাম, "তুমি ওদের কাছেই থেকো। আমি একবার আমার ছাত্রের দাদামশায়ের কাছ থেকে ঘুরে আস্‌ছি। কিছু টাকা আগাম বা ধার—" বলিতে বলিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথেই আপিসের বড়বাবুর বাড়ি। কয়েক ঘণ্টা ছুটিরও দরকার। তাঁহার দ্বারস্থ হইলাম। অপেক্ষা করিতে হইল না, দেখি বহিরাঙ্গণে একটি জলচৌকীর উপর তিনি বসিয়া, ভৃত্য তাঁহার বিপুল দেহে তৈলমর্দ্দন করিতেছে। আর্জ্জিখানি পেশ করিয়া জোড়করে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তিনি স্বভাবসুলভ মধুমাখা কণ্ঠে কহিলেন, "বারমাসই ত তোমার ঐ সব লেগে আছে হে। এ রকম করলে চাকরি করা চলে না বাপু। এত যদি, তবে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরে বসে থাক্‌লেই পার। আপিসে যাবার দরকার কি? ওদিকে বড়সাহেব ত তোমার ওপর খাপ্পা হয়ে আছেন।"

কহিলাম, "আপনার স্নেহ থেকে কোনদিন বঞ্চিত হইনি, আমার সেই এক পরম ভরসা—"

"থাম হে থাম। যত ঝঞ্ঝাট সবই কি আমার ঘাড়ে? সব হতভাগাগুলোই কি এই আপিসে জুটেছে? যাও না—দাঁত বার ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

সেখান হইতে দ্বিতীয় মনিবের কাছে একরূপ ছুটিয়াই উপস্থিত হইলাম। তিনি বিষয়ী লোক। আমার কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। তাঁহার লোল ওষ্ঠকোণে ঈষৎ হাসি ফুটিল। ধীরে কহিলেন, "হুঁ-হুঁ টাকা। টাকারই ত অভাব। আমার অবস্থাটাও যদি বলি, এ বুড়োর ওপর আপনার দয়া হবে। আয় কমে গেছে বিস্তর, অথচ ব্যয় আছে ঠিক সেই। যারা গরিব, তারাই দেখছি আমাদের চেয়ে ভাল আছে। নেহাৎ মুখ্‌খু হয়ে থাকবে, তাই নাতিটাকে পড়ানো। তাও বেশী দিন যে পারব, মনে হয় না। পাঠশালার পণ্ডিত হ'লেই চলত—তবে কিনা—"

ছাত্রের অধীত ছত্রট মনে পড়িল—"Strike the nail hard."

কহিলাম, "আজ মাসের পঁচিশে, দশটি টাকা যদি আগাম পেতাম, ছেলেমেয়েগুলো বাঁচত।"

"তা ত বুঝলাম। কিন্তু এখন একটি টাকাও যে হাতে নেই। তা ছাড়া আপনি তো পুরো মাইনে পাবেন না। আমার নাতির সাত দিন অসুখ হয়েছিল, সে পড়েনি—"

"কিন্তু—"

"হাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু অসুখটা ত আমি তার শরীরে ঢুকিয়ে দিই নি, আর সেও কিছু অসুখটাকে নিজের থেকে ডেকে আনে নি।"

সময় অল্প; কলহেও প্রবৃত্তি ছিল না। কহিলাম, "যা বিচারে হয় করবেন, কিন্তু এখনকার মত—দোহাই আপনার—বড় বিপন্ন আমি।"

Strike, strike, strike, hard.

কর্ত্তা হাঁকিলেন, "রামবিরিজ, সরকার বাবুকো বোলাও—"

পেরেক বসিয়াছে! উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। কৃতজ্ঞতায় সারা অন্তর ভরিয়া গেল। বৃদ্ধের দেহ শুষ্ক, কিন্তু হৃদয় আজও দয়া ও মমতায় সরস। সরকারবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন; চোখে কৌতূহল কিন্তু সারা দেহ বিনয়ে নত হইয়া পড়িয়াছে। কর্ত্তা কহিলেন, "এঁকে আঠারো দিনের মাইনে ফেলে দাও। খোকাবাবুর জন্যে

আজই নতুন মাষ্টার নিয়ে আসবে। হা-ঘরের হাতে ছেলে খারাপ হয়ে যাবে।"

পেরেকের মাথা চটিয়া গেল। কর্ত্তা ত কাঠ নয়। দুঃখ হইল। কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই। টাকা-কয়টি হাতে লইয়া ঘরে ফিরিলাম; মল্লিকাকে প্রাপ্তির ইতিহাসটুকু বলিতে পারিলাম না।

তারপর, সেটুকু আর বলিতে ইচ্ছা হয় না, একটি মাস নিদারুণ দারিদ্র্য, মৃত্যু ও সীমাহীন আশার বিপুল সংগ্রাম চলিল। মানুষের হাতে ঐটুকুই আছে। কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না—আগে খুকু, তারপর সন্ত, তারপর সুধা চলিয়া গেল। সংসার-পথে গতিটা সহজ ও লঘু করিতে বিধাতা বুঝি আমার ভারাতুর অবসন্ন দেহ হইতে অবয়বগুলি একটি একটি করিয়া ছিন্ন করিয়া লইলেন। আর মল্লিকা? মা? ফল-ফুল-পল্লববঞ্চিতা রৌদ্রদগ্ধ লতা শীর্ণ, নীরস ও বর্ণহীন। তাহার সে মুখের দিকে তাকাইতে পারি না, অন্তরের পানে দৃষ্টিপাত করিতেও শিহরিয়া উঠি! সেখানে যে কূলহীন অশ্রু-বন্যা নিশিদিন হাহাকার করিয়া ছুটিতেছে।

তিন

আবার দিন যায়। কিন্তু দেখি, কাজের মাঝে মল্লিকা উন্মনা হইয়া পড়ে। কান পাতিয়া কি যেন শোনে, এদিকে ওদিকে চকিতে তাকায়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "কিছু না।"

মনের আশঙ্কা চাপিয়া রাখিতে পারি না। আমার নব-জীবনের প্রভাত-বেলায় সে ফুটিয়াছে। অন্তরের সৌরভ ও মধু নিঃশেষে দান করিয়া এবার কি তাহারও ঝরিবার পালা? তবুও তাহাকে ভুলাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করি।

ঘরের পূর্ব্বধারে ছোট একটি জানালা। তাহার বাহিরে ছোট একটি মাঠ। সেই ফাঁকে আলো আসে, বাতাস আসে, আকাশের একটি ভাগ দেখা যায়। এক এক রাত্রে সে আমার কোলে মাথা রাখিয়া তারাচঞ্চল আকাশ-কোণে তাকাইয়া থাকে। বলি, "কি দেখছ মণি?"

"ঐ তারাগুলোকে—"

"ওদের মধ্যে আমাদের সন্ত, খুকু ও সুধা হাত ধরাধরি ক'রে ফুটে আছে।"

সে-ই উন্মুখ হইয়া বলে, "কই? কোন্‌টা গো? আমি ত কাউকে চিন্‌তে পারছি না।"

"ঐ যে দূরে এক কোণে তিনটি তারা সারি সারি—লাল, সাদা, সবুজ। একটা বড়, একটা ছোট, আর একটা তার চেয়েও ছোট। ঐ দেখ, ওরা আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে—"বাবা, মা, এস। ওদের পাশে আমরাও একদিন ফুটে উঠব—"

সে নিমেষহীন চোখে সেইদিক পানে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ চীৎকার করিয়া ওঠে, "সুধা, খুকু, সন্তবাবা"—তাহার এ মর্ম্মভাঙা আহ্বান সুদূর নক্ষত্র-লোকে পৌঁছে কি না জানি না। তাহাকে নিরস্ত করিতে নীলাকে তাড়াতাড়ি বুকের কাছে ঠেলিয়া দিই। তাহাকে সে জড়াইয়া ধরে। বলে, "ভগবান একদিন এটাকেও হয়ত কেড়ে নেবেন।"

"ভগবান? এখনও তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর মণি?"

"করি, করি গো, করি—।" তাহার মুখে-চোখে অপরূপ দীপ্তি ফুটিয়া ওঠে; স্পর্শে আমার অন্তরের অন্ধকার জ্বালাইয়া তোলে।

তাহারই আলোকে দুর্গম পথ পার হইয়া চলিতেছি;—কিন্তু প্রতি পায়ে ভয় জাগে, সেটুকুও হয়ত বা কোন্‌দিন এক ফুৎকারে নিবিয়া যাইবে!

ঢাকার আনন্দ-আশ্রম

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

নারীশক্তি আজ আর কল্পনার শক্তিরূপা নহে, নারীর কর্ম্মশক্তি আজ নারীর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণে শক্তি নিয়োগ করিয়াছে।

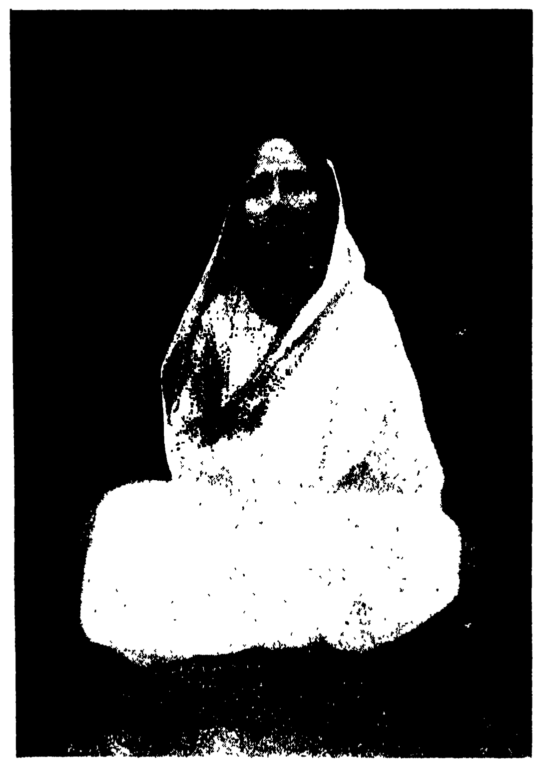
বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকা নগরীতে যে মহিলা মঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিতেছে সে-সম্বন্ধে দেশবাসীকে কিছু জানান সঙ্গত বোধ করিতেছি। প্রতিষ্ঠানটির নাম আনন্দ-আশ্রম। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিখ্যাত কর্ম্মী শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আমেরিকাস্থ বেদান্ত কেন্দ্র ও আনন্দ-আশ্রমেরই শাখা এই ঢাকা আশ্রম।



স্বামী পরমানন্দ

মানুষের জীবনে শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিতেছে শিক্ষাসমস্যা। মানুষকে দেহ-মনে-আত্মায় সবল সতেজ করিতে হইবে, মানুষের বিবিধ প্রয়োজন একটা বিশিষ্ট আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া সার্থকতা লাভ করিবে,—শিক্ষিত মনের এই যে একান্ত কামনা ইহাই শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষাসমস্যারও সৃষ্টি করিয়াছে। মহিলাদের সম্পর্কেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এদেশে নারীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারই বড় কথা ছিল। ছিল কেন, আজও আছে; কিন্তু ইহাও সত্য যে, এদেশেও মহিলাদের শিক্ষা-বিস্তার-'সমস্যা' দেখা দিয়াছে।

এদেশে নারীশিক্ষার পথে (বিশেষ করিয়া) বিঘ্ন অনেক। নারীর অর্থনৈতিক বশ্যতা নারীর বহু সদ্‌গুণ বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থ করিয়া দেয়, স্বাবলম্বনের অভাব, অর্থ-



শ্রীমতী চারুশীলা দেবী

নৈতিক বশ্যতা, সামাজিক প্রথার জন্য নারীকে বহু দুর্গতি যে 'হজম' করিতে হয় ইহা আমরা জানি, এবং এই অর্থনৈতিক বশ্যতা ও সামাজিক প্রথা নারীকে যে কত সহজে নিরাশ্রয়, অসহায়, আশ্রয় পাইলেও বহুক্ষেত্রে 'গলগ্রহ' করে—নারী সম্বন্ধে হিন্দু সমাজে অনেক উচ্চ ভাব আদর্শ কর্ত্তব্য নির্দেশ সত্ত্বেও ইহা আমরা কে না জানি? অবশ্য কোন কোন যথার্থ শিক্ষিত, উচ্চভাবাপন্ন পরিবারে বিধবা

পতিপরিত্যক্তা, নিরাশ্রয়া নারী সত্যই হয়ত নিজেকে অসহায় মনে করেন না ; কিন্তু বহু পরিবারে যথার্থ শিক্ষার অভাব, আদর্শভ্রষ্টতা, স্বার্থবুদ্ধি, অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্যই নারীকে দুর্গতিগ্রস্ত ও বিপন্ন করিয়া তোলে।

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী মহিলাদের স্বাবলম্বী করিতে, তাহারা যাহাতে স্বাবলম্বন দ্বারা সতেজ, উচ্চ শিক্ষার দ্বারা আনন্দলাভে সমর্থা হন, নিজেদের অসহায় ভাবিতে বাধ্য না হন—এই উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তিনি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন যে, আমাদের সাধারণ শিক্ষালয়গুলিতে একপ্রকার পুরুষেরই অনুকরণে যে ধর্ম্ম ও উচ্চাদর্শহীন শিক্ষার ব্যবস্থা এদেশে আছে, তাহাতে এদেশের নারীর যথার্থ কল্যাণ সম্ভব নহে।

বহু ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি মাত্র জনকয়েক অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহেই সম্ভব এবং ঐ শিক্ষার আড়ম্বরপূর্ণ জীবন দেশের অর্থনৈতিক সঙ্গতি, আদর্শ ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপছাড়া হইয়া অস্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাতে নারীর কল্যাণ নাই। সেই কারণে আশ্রমে রাখিয়া এবং আশ্রমসংলগ্ন বিদ্যাপীঠে উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে স্বাবলম্বন, অনাড়ম্বর জীবন যাহাতে গড়িয়া উঠে, শিক্ষার্থীদের জীবনটি যাহাতে মনুষ্যোচিত মহিমায় পরিপূর্ণ হইয়া দেহ-মন-আত্মার পূর্ণতা দ্বারা শিক্ষার আদর্শকে সার্থক করিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন।

আশ্রমের উদ্দেশ্য—"বিশুদ্ধ জীবন গঠন, জ্ঞান অর্জ্জন, স্বাবলম্বন। যত মত তত পথ—এই মহাবাক্যই আশ্রম ধর্ম্মের আদর্শ।" আশ্রমের উপাসনা-গৃহটি সকলের আপনার। ভাব ও রুচি অনুযায়ী সাকার নিরাকার যে-কোন ভাবে উপাসনা চলিতে পারে। ভালবাসার ভিতর দিয়াই আশ্রম-জীবনের সাধনা। মহিলারা পরস্পর ভগিনী স্নেহে দৈনন্দিন প্রতিকার্য্যে পরস্পরের সহায়-স্বরূপ হইবেন এইরূপই শিক্ষার ব্যবস্থা।

আশ্রমের প্রাণস্বরূপ সেবাধর্ম্মে-সমর্পিতপ্রাণা শ্রীমতী চারুশীলা দেবী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন



রঞ্জনশিল্প-বিভাগ

করিয়া ইডেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদ আর গ্রহণ করেন নাই। বাংলার মহিলাদের কল্যাণসাধনই জীবনের ব্রত-স্বরূপ গ্রহণ করেন এবং একান্ত ভগবৎ বিশ্বাসে একপ্রকার নিজেরই জলন্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ঢাকা গেণ্ডেরিয়াতে আশ্রমটির সূচনা করেন। আশ্রমটির সূচনা হইতেই, এমন কি যখন এই আশ্রমটি শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবীর মনের পরিকল্পনা মাত্র তখন হইতেই, আমি ইহাকে লক্ষ্য করিয়াছি। বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও



দিয়াশলাই-বিভাগ

প্রায় এই এক বৎসরে ইহার অভাবনীয় উন্নতি বস্তুতঃ আনন্দের বিষয়।

এই আশ্রমসংলগ্ন বিদ্যাপীঠে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করানই মাত্র এই বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য নহে, যাহাতে সত্যকার জ্ঞান লাভ

হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষাব্যবস্থা হইয়াছে। নানাবিধ শিল্পশিক্ষা দ্বারা স্বাবলম্বী করাও এই বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য।



সত্যপ্রাণা বয়ন-বিভাগ

আশ্রমবালিকা ব্যতীত বিদ্যাপীঠে বাহিরের বালিকারাও অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি এবং বিশেষ করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সন্তানপালন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিদ্যাপীঠে আছে। স্থানীয় গৃহিণী ও বয়স্কা বধূদের অবসর সময়ে জ্ঞানার্জ্জন ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাও আছে এবং অনেকে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন।



ঊষাকালে ভজন ও পাঠ

বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত বিভাগে শিক্ষা ব্যবস্থা হইয়াছে।—

১। রঞ্জন বিভাগ—এই বিভাগে কাপড়ে পাকা রং ও ছাপ শিক্ষার অতি সুন্দর ও সহজ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাসায়নিক বিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞ একজন এই বিভাগে অধ্যাপনা করান।

২। দিয়াশলাই বিভাগ—এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যটি মেয়েরা নিজহস্তে প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া থাকেন।

৩। সত্যপ্রাণা বয়ন বিভাগ—এই বিভাগটি আমেরিকার জনৈক মহিলার (সত্যপ্রাণা) দানে আরম্ভ হইবার সুযোগ পাইয়াছে। এই বিভাগে মেয়েরা সতরঞ্চি, আসন, চাদর, জামার থান ও গালিচা প্রভৃতি প্রস্তুত শিক্ষা করেন।



দর্জ্জি-বিভাগ

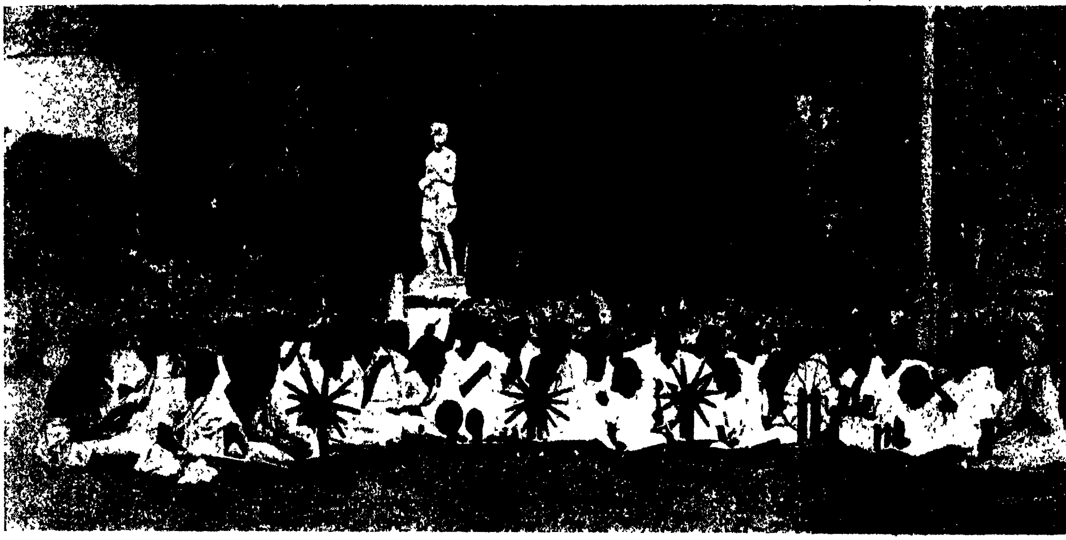
৪। দর্জ্জি বিভাগ—এই বিভাগে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দর্জ্জির যাবতীয় কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষক একজন শিক্ষিত বাঙালী।

৫। সূচিশিল্প বিভাগ—এইবিভাগে অতি উচ্চ অঙ্গের এমব্রয়ডারি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

৬। মিষ্টান্ন বিভাগ—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন (সন্দেশ, রসগোল্লা, সীতাভোগ, মিহিদানা প্রভৃতি) তৈরি শিক্ষা দেওয়া হয়।

৭। সঙ্গীত বিভাগ—শিক্ষিত, খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত ও এস্রাজ শিক্ষা দিয়া থাকেন।

অনাড়ম্বর বিশুদ্ধ জীবন, জ্ঞানার্জ্জন, স্বাবলম্বন প্রভৃতি



সুতাকাটায় নিরত ছাত্রীগণ

মনুষ্যোচিত উচ্চশিক্ষা দানের জন্য যাঁহারা নিজ কন্যা ও আত্মীয়াদের আশ্রমে রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রতিমাসে আশ্রমকে মাত্র ৮৲ টাকা সাহায্য করিতে হয়। আশ্রম-বাসিনীর যাবতীয় খরচ, আহাৰ্য, বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থার ভার আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেক দরিদ্র ও নিরাশ্রয় মেয়েও আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন। তাঁহাদের ব্যয়ভার আশ্রমই বহন করেন। দেশের আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছাত্রীদের বেতন অনেক কম করা হইয়াছে। বেতনের হার ১ম ও ২য় মান।০, ৩য় ও চতুর্থ মান ৷৷০, ৫ম ও ৬ষ্ঠ মান ৸০, ৭ম ও ৮ম মান ১৲, ৯ম ও ১০ম মান ১৷৷০

যে-সকল দরিদ্র ও নিরাশ্রয় বালিকা-আশ্রমে আছেন কয়েক মাস মাত্র আশ্রম-জীবন যাপন করিয়া তাঁহারা যেন জীবনে পথ পাইয়াছেন। স্বাবলম্বনের দীপ্ত তেজে তাঁহাদের চোখ মুখ উদ্ভাসিত, অনাড়ম্বর জীবনের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা ও আদর্শ তাঁহাদের যেন মহিমান্বিত করিয়াছে। আশ্রম ও বিদ্যাপীঠের আবহাওয়ায় অল্পবয়স্কা বালিকারাও যেন শিক্ষার উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে।



যোধপুর

শ্রীশান্তা দেবী

শেষ রাত্রে সাড়ে তিনটায় জয়পুরের ওয়েটিং-রুম হইতে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ফুলেরা জংশনের ট্রেন ধরিতে ছুটিলাম। ফুলেরা হইতেই যোধপুরের ট্রেন ধরিতে হইবে। গাড়ী ভর্ত্তি মানুষ মোটা মোটা লেপে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, নাকের ডগা কি চুলের টিকিও দেখা যায় না। আমরা তাহাদের পায়ের তলায় বসিয়া কোনো প্রকারে পথ কাটাইয়া দিলাম। ফুলেরা মস্ত ষ্টেশন, কিন্তু এখানকার জলের ব্যবস্থা অতি অপরূপ। সকাল আটটার সময় মুখ ধুইতে গিয়া দাঁতে মাজন ঘসিয়া দেখি, প্রথম শ্রেণীর স্নানাগারে বড় বড় স্নানের টব, মুখ ধোবার গামলা, তিন চারটা করিয়া জলের ট্যাপ; কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা জল নাই। কেহ এক বিন্দু জল ধরিয়াও রাখে না। রুমালে মুখ মুছিয়া অগত্যা বাহির হইতে হইল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম সারি সারি মানুষ দাঁতন, ঘটী, আধমাজা বাসন লইয়া প্লাটফরম জুড়িয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সিকি মাইল জোড়া ষ্টেশনে কোথাও জল মিলিতেছে না। যাহার নিতান্ত প্রয়োজন, সে ঘটী হাতে করিয়া ষ্টেশনের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটা-ছুটি করিতেছে, কিন্তু ফুলেরায় ট্রেন ছাড়িবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেখিলাম তাহার ঘটী যেমন শূন্য ছিল তেমনই শূন্য আছে। মরুভূমি বটে!

ফুলেরায় আমাদের গাড়ীতে জয়পুরের রাণীর কোষাগারের এক কর্ম্মচারী উঠিলেন। মানুষটি ইংরেজী জানেন না, হিন্দীতেই কথাবার্ত্তা বলেন। রাজকুমারের জন্মদিন উপলক্ষে যোধপুর হইতে মাতুলালয়ের যে-সকল নিমন্ত্রিতরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার সৌজন্যের জন্য ইনি যোধপুর যাইতেছিলেন।

জয়পুর ও যোধপুর সংক্রান্ত অনেক খবর ইঁহার নিকট হইতে পাওয়া গেল। যোধপুরে জয়পুরের রাজার শ্বশুরবাড়ি। রাণীর অলঙ্কার তৈয়ারী ও রক্ষণাবেক্ষণ যে করে, তাহারই কাজ রাণীর টাকাকড়ির হিসাব রাখা। জন্মোৎসবের পর ইহারা চলিয়াছে যোধপুরে।

ইঁহার সহিত তৃতীয় শ্রেণীতে যে-সব ভৃত্যবর্গ আছে আহারের সময় কর্ম্মচারীটি তাহাদেরই গাড়ীতে গিয়া খাওয়া-দাওয়া করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঈ সাহেবের" খাওয়া-দাওয়া হইয়াছে কি না।

ফুলেরা হইতে কিছু দূরে সম্বর ষ্টেশন। গাড়ী থামিতেই চোখে পড়িল সাদা পাথর না চুনের উচ্চ বাঁধ। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই; তাহার পর ষ্টেশনের নাম চোখে পড়িতেই বুঝিলাম লবণের বাঁধ। দূরে হ্রদের চারিধারে বিস্তীর্ণ বালুচর, তাহার দুই দিক পাহাড় দিয়া ঘেরা, মাঝখানে বিরাট লবণ-হ্রদ। হ্রদের পাশ দিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের মেয়েরা কলসী মাথায় সারি বাঁধিয়া কোথায় চলিয়াছিল। পাহাড় ও হ্রদের পটভূমিতে যেন ছবি আঁকা। গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। খোলা গরুর গাড়ী করিয়া গ্রাম্য বর বধূ শাশুড়ী ননদ ট্রেন ধরিতে আসিল। ক্ষুদ্র বধূর দীর্ঘ অবগুণ্ঠন। তাহাকে গাড়ী হইতে প্রায় কোলে করিয়াই নামাইল। কিশোরী সুন্দরী ননদিনী এক লাফে গাড়ীর উপর হইতে মাটিতে নামিল। তাহার পর গহনা কাপড় সমেত ষ্টেশনের রেলিং এক লাফে ডিঙ্গাইয়া ছুটিয়া ট্রেনে উঠিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার দীর্ঘ চঞ্চল নয়নযুগলের সকৌতুক দৃষ্টি ও আনন্দউচ্ছল হাসি দেখিয়া মনে হইতেছিল, এই বুঝি পুরাকালের চঞ্চলকুমারী। মণিবন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত হাতীর দাঁতের ও সোনার চুড়ি, পায়ে মল, মাথায় সোনার সিঁথির উপর ওড়না; কিন্তু এত ভারেও তাহার চাঞ্চল্য ও নৃত্যশীল গতি কিছুমাত্র বাধা পায় নাই।

সম্বর হ্রদের মাঝখান দিয়া রেল-লাইন চলিয়াছে। লাইনের একধারে হ্রদের জল, অন্য ধারে আধজমা, সিকিজমা, রক্তাভ লবণের ঘন হ্রদ। এই অর্দ্ধতরল লবণের হ্রদে কত যে রঙের খেলা তাহার ঠিক নাই;

আকাশে সূর্য্যাস্তের মেঘেও এত রং দেখা যায় না। বেশীর ভাগ তরমুজের সরবতের মত উজ্জ্বল কিন্তু ফিকা লাল; তাহা কোথাও ক্রমে ডালিম, বেগুনীফুলী হইতে ঘন বেগুনী, কোথাও বা ইস্পাত কি ময়ূর কণ্ঠের মত নীলাভ হইয়া গিয়াছে। এক রং হইতে আর এক রং কোথায় যে সুরু হইয়াছে, কলি টানিয়া দেখানো যায় না।

পাহাড়গুলির সব বালির রং, তাহার গায়ে অনেক দূরে দূরে ছোট ছোট কাঁটা-ঝোপ। দেখিলে মনে হয় যেন বিরাটাকৃতি ওল।

ইহার পর শাদা পাথরের পাহাড়। এই ষ্টেশন হইতে বড় বড় শ্বেত পাথর চালান যাইতেছে। প্রকাণ্ড শাদা পাথরের চাঁই চারিদিকে পড়িয়া আছে। বড় বড় ও ছোট শাদা খলনুড়ি ও চাকিও বিক্রী হইতেছে এবং



সর্দ্দার, মিউজিয়াম যোধপুর

হ্রদ শেষ হইয়া যাইবার পরও কিছু দূর পর্য্যন্ত কঠিন লবণ পদ্মরাগ ও হীরক খণ্ডের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তাহার পর আবার বিস্তীর্ণ বালুচর। এখানে শুধু বালুর উপরেই ঘন মনসার বন হইয়াছে। গাছের গোড়ায় মাটি চোখেই পড়ে না, অতি সামান্য মাটি-মিশ্রিত বালি।

সম্বরের পর আসল যোধপুর-রাজ্য। আমাদের সহযাত্রী নায়েব বলিলেন, "সম্বরের অর্দ্ধেক জয়পুরের, অর্দ্ধেক যোধপুরের অর্থাৎ মাড়বারের। এখানে মাটি আরও বেলে, সারি সারি উট সাদা ও খোড়ো শরবনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। মক্‌রানা ষ্টেশনের আগে পাহাড়ের চেহারা এক রকম, পরে রূপ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। আগের চালান যাইতেছে। এখানে ভাল কারিগর নাই বলিয়া মোটা মোটা সাদাসিধা জিনিষ ছাড়া আর কিছু তৈয়ারী হয় না। ভাল ও সূক্ষ্ম কাজের জন্য পাথর জয়পুরে যায়। শিল্পী ও বাজার দু-ই সেখানে রাজপুতানার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

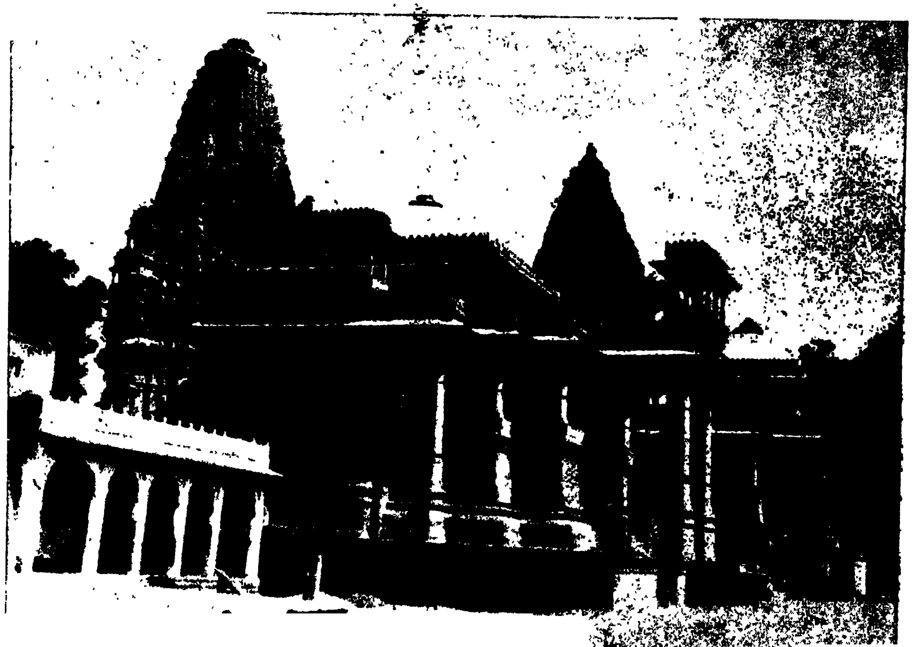
যোধপুরের পথ অর্থাৎ মাড়বার-রাজ্য একেবারে মরুভূমি। এখানে অনেক মাইল পরে পরেও শস্যক্ষেত্র কি গ্রামের বড় গাছ চোখে পড়ে না। সম্বরের বালির পর খালি বালি ও কাঁটাগাছের বন। বাংলা দেশে রেল-লাইনের দুধারে শস্যক্ষেত্র, এখানে দুধারে মরুপ্রায় পোড়ো জমি। তাহারই ভিতর উট চরিতেছে, মাঝে মাঝে ছাগলের পাল ও ক্বচিৎ গরু মহিষ। পথে খাদ্য-

দ্রব্য বলিতে ছোট ছোট তরমুজ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। আমাদের ত মধ্যাহ্ন-ভোজন বাদই পড়িয়া গেল। বেলা প্রায় তিনটায় মেট্রা রোডে নামিয়া ওয়েটিং-রুমে শুধু চা পাওয়া গেল। চায়ের বাসনগুলি খুব ফ্যাশনদুরস্ত। ষ্টেশনে এরকম প্রায় দেখা যায় না। বাসনের রূপ দেখিয়াই আবার গাড়ীতে উঠিতে হইবে ভাবিতেছি, এমন সময় এক রাজপুতানী কিছু পুরী ও মিঠাই ফিরি করিতে আসিল। একটি মাত্র পসারিণী আর এদিকে এক ট্রেন বোঝাই ক্ষুধার্ত্ত যাত্রী। তাহাদের ঠেলাঠেলি করিয়া আমরাও কিছু কিনিয়া লইলাম। যোধপুর রেলওয়ের সর্ব্বত্রই ভাল করিয়া দুধচিনি সাজাইয়া দেওয়া চায়ের দাম দুই আনা পেয়ালা। ওয়েটিং-রুমে দাম লেখা থাকে। ঈ. আই. রেলওয়েতে এইরূপ চা চারি আনা পেয়ালা।

গা হইতে চাঁই চাঁই পাথর কাটিয়া লওয়ার চিহ্ন দেখিলাম।

আদত যোধপুর আসিবার আগেই একটা ছোট যোধপুর ষ্টেশন আছে। অনেক যাত্রী এইখানেই নামিয়া পড়িল। আমাদের সহযাত্রী নায়েব দুই ষ্টেশন আগে হইতে জুতা জামা, রুমাল পাগড়ী সব বদ্‌লাইয়া একেবারে দরবারী সাজ করিতে লাগিলেন। প্রসাধনের কোনো অঙ্গ বাকী রহিল না।

বড় ষ্টেশনে পৌছিবার অনেক আগেই দূর হইতে আদালতবাড়ি ইত্যাদির রাজপুত স্থাপত্য চোখে পড়িল। আশে-পাশে বহু পুরাতন ভগ্নপ্রায় অখ্যাত বাড়ির সুন্দর স্থাপত্য দেখিয়া বুঝিলাম, আগ্রা দিল্লীতে মোগলের প্রাসাদে যে-সব গঠন ও নক্সা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি, তাহা এই সব হইতেই নকল করা। মোগল-কেল্লায় বেগম

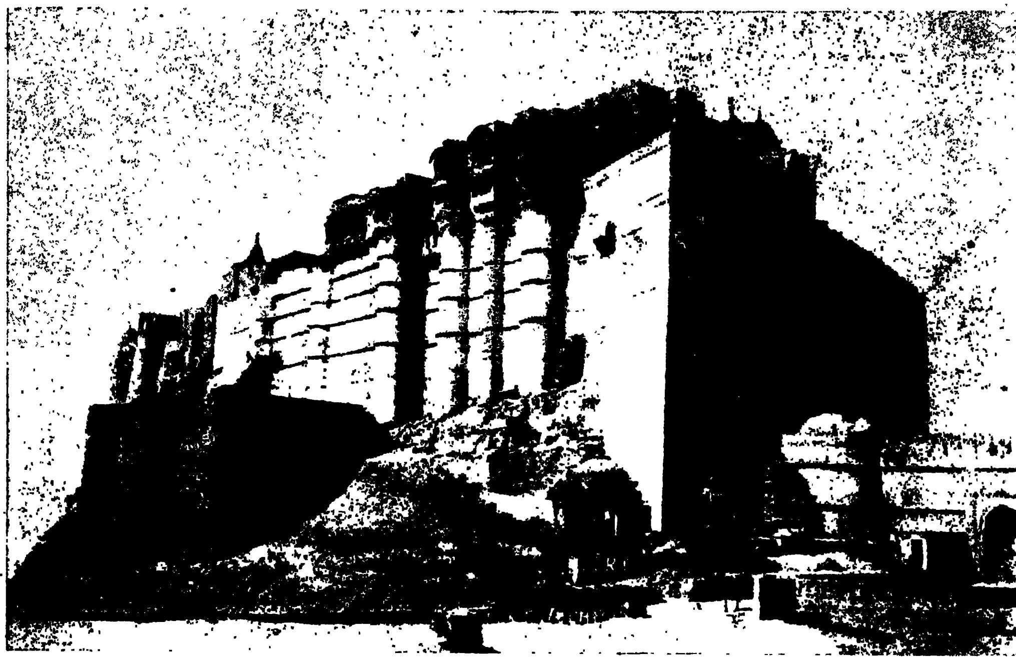


মাণ্ডোরে মহারাজাদের স্মৃতি-মন্দির, যোধপুর

শ্বেত পাথরের রাজ্যের পর আবার কিছুদূর ওলমাথা বেলে পাহাড়, তাহার পর সুরু হইল রাঙা পাথরের রাজ্য। পাহাড়ে মাটি দেখা যায় না, কেবল বিরাটাকৃতি রক্তাভ পাথর। যোধপুরের অনেক আগে হইতেই পাহাড়ের

যোধাবাঈ যে সব লাল পাথরে আপনার মহল বানাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই পিতৃভূমির বিশেষত্ব।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেই দূরে পাহাড়ের গায়ে যোধপুর কেল্লায় দীপান্বিতার আলোর মালা জ্বলিয়া উঠিল।



যোধপুরের দুর্গ ও প্রাসাদ

নির্ম্মল ঘন নীল আকাশের গায়ে বিরাট কঠিন বন্ধুর পাহাড়ের কেল্লার গম্ভীর রূপ জ্বলিয়া উঠিল। দেখিবা-মাত্র জয়পুরের সহিত ইহার পার্থক্য বুঝা যায়। জয়পুরের স্থাপত্যে হাল্কা সূক্ষ্ম কাজের ও আধুনিক পালিশের ছাপ বেশী, যোধপুর এখনও প্রকৃতির কোলে। তাহার রক্তাভ সুবিস্তীর্ণ পর্ব্বতমালার স্বভাবগম্ভীর বিরাট সৌন্দর্য্যের সহিত কেল্লা ও প্রাসাদের রূপ বেশ মিশিয়া গিয়াছে। পাথরের গায়ে ভারী বাটালির ঘা দিয়া কাটিয়া সব বাহির করা। তাহার উপর গোলাপী রং মাখানো নাই। জয়পুরের শিল্পীদের সমস্ত উপকরণই প্রায় যোধপুর যোগাইয়াছে। তাই দেখিলেই বোঝা যায় যোধপুরকে প্রকৃতি তাঁহার বিরাট তুলিকা দিয়া সাজাইয়াছেন। জয়পুর মানুষের সূক্ষ্ম তুলিকার স্পর্শে সজ্জিত। সেখানে প্রকৃতিকে সহজে দেখা যায় না।

ষ্টেশনে আসিতেই একগাড়ী মানুষ বালিঢালা প্লাটফরমের উপর হুড়মুড় করিয়া নামিয়া পড়িল; গাড়ীর উপর হইতে তাহাদের হাজার রঙের পাগড়ীতে আলো হাসিয়া উঠিল। যেন মরুভূমির উপর অকস্মাৎ আকাশ হইতে সহস্র পারিজাত বৃষ্টি হইয়া গেল। কেল্লার উপর ইংরেজী অক্ষরে যদি আলো দিয়া 'শুভ দীপাবলীর অভিবাদন' ('Auspicious Deepavali Greetings') লেখা না থাকিত, তাহা হইলে কয়েক শত বৎসর আগে যোধাবাঈয়ের বাপের বাড়ি আসিয়াছি বেশ মনে করিতে পারিতাম।

যোধপুরে টাঙ্গা ছাড়া আর কোনো গাড়ী পাওয়া যায় না। আমরা এখানেও ষ্টেশনে লগেজ-রুমে আমাদের জিনিষপত্র রাখিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। টাঙ্গার ভাড়া কিন্তু জয়পুরের ফিটনের চেয়ে বেশী। আর কিছু যখন জুটিবে না, তখন তাহাতেই রাজী হইতে হইল। বারো-তেরো বছরের ছোট একটি অনাথ মুসলমান বালক হইল আমাদের চালক ও একমাত্র সহায়।

যোধপুর ষ্টেশন হইতে শহরে যাইবার রাস্তাটি বেশ চওড়া; মনে করিয়াছিলাম জয়পুরেরই মত। কিন্তু একটু অগ্রসর হইতেই বিরাট নগর-দরওয়াজা দেখা গেল। এটি পার হইয়া তবে শহরে ঢুকিতে হয়। শহরের ভিতরের রাস্তা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

সেগুলিকে গলি বলিলেই চলে। অধিকাংশ পুরানো দিশী শহরের মত এখানের এই গলিগুলিও বড় বড় পাথর দিয়া বাঁধানো। গলির দুইধারে ঠাসাঠাসি ছোটবড় উঁচুনীচু নানা রকমের বাড়ি। জয়পুরে যেমন সব বাড়িরই একটা বিশেষ ছাঁচ আছে, এখানে ঠিক তাহার উন্টা। বাড়িগুলি সবই রাজপুত স্থাপত্যের নিদর্শন, কিন্তু তাহাদের ছাদ, অলিন্দ, কার্ণিশ, ব্রাকেট শত রকমের। পাথরে-কাটা নানা রকমের ব্রাকেট ও কাঠ খোদাইয়ের মত সূক্ষ্ম রেলিং দেওয়া ছোট ছোট বিচিত্র অলিন্দ হঠাৎ যেখানে-সেখানে অপ্রত্যাশিত জায়গায় যেন উড়িয়া আসিয়া পড়ে। দেখিয়া বুঝা যায় এগুলি আধুনিক জয়পুরের ঘরবাড়ি অপেক্ষা অনেক পুরানো। ইহাদের গায়ে ইংরেজী এমন কি মুসলমানী ছাপও খুবই কম। গলিতে গলিতে এই যে সব অজানা অখ্যাত পুরাতন শিল্পরচনা আধুনিক বাড়ির আনাচে-কানাচে দেখা যাইতেছে এগুলির মধ্যে অনেক-গুলিই বোধ হয় মুসলমান যুগের আগের। পরে ঘরবাড়ি ভাঙিয়া অনেক বদল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু টুকরাটাকরা কাজ থাকিয়া গিয়াছে। যোধপুর পার্ব্বত্য দেশ বলিয়াই বোধ হয় প্রশস্ত পথ ত নাই-ই, সোজা পথও নাই। গলিগুলি ক্রমাগত সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। এত তাড়াতাড়ি রাস্তার মোড় ফিরিতে হয় যে একটা বাড়ির আধখানা দেখিতে-না-দেখিতে পথের বাঁকে তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়। টাঙ্গায় সচরাচর একজন যাত্রীকে সম্মুখে ও একজনকে পিছনে বসানো হয়। সুতরাং আমরা যখন একজন আর একজনকে উৎসাহ করিয়া কিছু দেখাইতে যাইতেছিলাম, তখন একজন দেখিতেছিলেন সম্মুখার্দ্ধ এবং আর একজন পশ্চাতর্দ্ধ, কখনও বা একজনের চোখে যাহা দেখা যাইতেছিল আর একজনের চোখে তাহা অদৃশ্য। জয়পুরের সোজা লম্বা রাস্তার টানা লম্বা বাজারের গোলাপী বাড়ি, এখানে প্রতি বাঁকে নূতন নূতন রূপ।

পার্ব্বত্য সঙ্কীর্ণ পথ, তাই মানুষ অধিকাংশই পদাতিক, বিশিষ্ট কেহ কেহ ঘোড়সওয়ার। গাড়ী খুবই কম চলে। আমাদের টাঙ্গার পিছনে একজন সুবেশ ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিলেন, রাস্তায় বহুলোক তাঁহাকে নমস্কার করিতেছিল; তিনিও করজোড়ে প্রতিনমস্কার করিতেছিলেন। বাংলা দেশে ঘোড়সওয়াররা মিলিটারী কায়দায় ছাড়া অভিবাদন করে না; নমস্কার করা দেখিতে তাই অতি সুন্দর লাগিতেছিল। টাঙ্গা অতি ছোট গাড়ী, কাজেই ইহার চলিতে সুবিধা। ইহা ছাড়া আছে মোটর সাইকেল, সাধারণ সাইকেল, ছোট্ট মোটর গাড়ী, উট এবং ঘোড়া। উটকে লইয়াই মহা বিপদ, চওড়ায় সে বিশেষ বড় নয় বটে, কিন্তু তার লম্বা শরীরটিকে যেখানে-সেখানে মোড়-ফেরানোয় বাহাদুরি চাই। আমাদের চালক সন্ধ্যার আবছায়া আলোয় মহাউৎসাহে টাঙ্গা ছুটাইয়া চলিতেছিল, হঠাৎ ঝড়াং করিয়া থামিয়া গেল। গাড়ী হইতে ছিটকাইয়া পড়িতে পড়িতে খোঁজ করিলাম ব্যাপার কি? না, ওদিক দিয়া একটি উট আসিতেছে, আরোহী উটের ঘাড় প্রায় দুমড়াইয়া কোনো রকমে গলির বাঁক ঘুরাইয়া লইল।

টাঙ্গায় উঠিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র সহায়টিকে বলিয়া-ছিলাম, "দেখ্, এদেশে দেখবার মত যা আছে একটু ব'লে দেখিয়ে দিস।" সে বলিল, "আলবৎ।" গলিতে গলিতে যেখানেই গ্রামোফোন, ফোটোগ্রাফ কি আর্ট সিল্কের দোকান পড়ে, সেখানেই বালক তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠে, "বাঈ সাহেব, ইয়ে দেখিয়ে বহুৎ উম্‌দা হয়।" একটা ছোট বায়োস্কোপের বাড়ির সাম্‌নে সে ত দাঁড়াইয়াই পড়িল। আমাদের আগ্রহের অভাব দেখিয়া বেচারী নিশ্চয় আমাদের পাগল মনে করিয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, যত সাতকেলে পুরানো ভাঙিয়া-পড়া বাড়িঘর সম্বন্ধে আমাদের অত্যুগ্র কৌতূহলও ছিল আর একটা পাগলামির পরিচয়।

এখানে দোকানে দোকানে নানারকম বিলাতী জিনিষের খুব ভিড়। দেশী রাজ্যে স্বদেশী-প্রচার বোধ হয় বেশী হয় নাই। বিলাতী গৃহসজ্জা আরও চক্ষুপীড়াকর। সুন্দর কারুকার্য্য করা পাথরের বাড়িতে হঠাৎ কোথাও বিলাতী লোহার রেলিং, সবুজ খড়খড়ি কি লর্যাল-রীদ-শোভিত থাম দেখিলে ভাঙিয়া ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করে। সুখের বিষয়, অধিকাংশ বাড়ির দরজাও কারুকার্য্যশোভিত কাঠের এবং রেলিং-জাতীয় জিনিষ প্রায়ই পাথরের।



ফতে সাগরের অন্য একটি দৃশ্য, যোধপুর

সেদিনও ছিল উৎসবের দিন, তাই পথে লোকজনের পোষাকের খুব ঘটা। পথের লোকের মেলায় রাজপুত ছিটের ঘাঘরার ভিড়ে হঠাৎ দেখিলাম বিলাতী নকল সিল্কের ছিটের ঘাঘরা ও সস্তা জালের মত পাতলা জরিদার বেনারসী পরা দুইটি মেয়ে। সংখ্যায় নগণ্য বলিয়াই ইহারা বিসদৃশভাবে চোখে পড়ে।

রাত্রে মহল্লা ঘুরিয়া আর এক বড় গেট দিয়া ঘুরিয়া আমরা ষ্টেশনে আসিলাম। গেটে লোহা-বসান দরওয়াজা। ষ্টেশনে খাবার নাই। কাজেই দ্বিতীয়বার আহারের সন্ধানে শহরে ঢুকিতে হইল। টাঙ্গাওয়ালা এক মুসলমানের দোকানে লইয়া গেল। সেখানে একখানা মাত্র ঘরে একজন রন্ধন করিতেছে, দুই জন পরিবেশনে ব্যস্ত, আর অতি পুরাতন একটা টেবিলের চারিধারে একটা কেরোসিন বাক্সের কাঠের বেঞ্চি পাতিয়া জন-পনের কুড়ি নানা শ্রেণীর মানুষ রুটিমাংস খাইতে বসিয়াছে। তাহাদের কাহারও জীর্ণ লুঙ্গি ও গেঞ্জিমাত্র সম্বল, কাহারও বা উপরি একটা ময়লা কোট ও টুপি, দুই-একজনের মাথায় পাগড়ী। অনেকে বসিতেছে না, ৵০ কি ১০ আনা পয়সা দিয়া একটা বাটী পাতিয়া খাবার কিনিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে। একটি বাঙালী মহিলা ও বাঙালী ভদ্রলোককে টাঙ্গা চড়িয়া এমন সময় এই দোকানে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত সস্মিত ও উদ্‌গ্রীব দর্শকের ভিড় লাগিয়া গেল। ভোক্তারাও কেহ বা অর্দ্ধসমাপ্ত খাবার ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কেহ ভোজনান্তের খোসগল্প ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল। এই অপরিচিত রাজ্যের মানুষ দুটি কি চায়? দশ-বারো জন একসঙ্গেই প্রশ্ন করিতে ও উপদেশ দিতে লাগিল। "কি চাই? বাসা নাই? খাদ্য নাই? বাসন নাই?" "আমাদের উপরের ঘরে বাঈসাহেবাকে লইয়া চলুন।" "একলা বসিবার জায়গা আছে", ইত্যাদি। সকলেই সাহায্য করিতে ব্যস্ত। বাড়ির আশেপাশে কেবল দলে দলে অপরিচিত মুসলমান পুরুষ দেখিয়া উপরে আর গেলাম না। উৎকৃষ্ট রকম কিছু খাবার চাওয়াতে দোকানদার হাসিয়া বলিল, "হিঁয়া কোই খানেওয়ালা নহি হয়, সাহব। ইয়ে লোগ খালি দহিবড়া খাতা হয়।" অগত্যা যা মিলিল তাই দোকানের ধারকরা

বাসনে একটি ক্ষুদ্র বালকের স্কন্ধে চাপাইয়া লইয়া চলিলাম। বালকটি পরদিনের খাবার দিয়া যাইবে ও বাসন লইয়া আসিবে বলিয়া জায়গা চিনিতে আমাদের সঙ্গে আসিল।

পরদিন সকালে ওয়েটিং-রুমের প্রকাণ্ড উষ্ণীষধারী দরোয়ানের সাহায্যে চায়ের সন্ধান করা গেল। এখানেও একটি ক্ষুদ্র সাত আট বৎসরের বালক আমাদের জন্য চা-দানে মাপা দুই পেয়ালা চা ও বারকোশে চারটি বিস্কুট,কিছু চিনি ও দুধ লইয়া আসিল। বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত কম চা কেন?" সে বলিল, "দুধ চিনি ঠিক হয়!" বালক বোধ হয় ভাবিল একপোয়া দুধ ও একপোয়া চিনি থাকা সত্ত্বেও সামান্য জলটার জন্য এরা এত ব্যস্ত কেন! স্নানের জন্য ষ্টেশনেই গরম জল পাইলাম, তবে বাগানের মালির ঝারিতে জলটা আসিল এবং সঙ্গে ছোট মগ কি ঘটী কিছুই ছিল না। টাঙ্গাওয়ালা বালকটি আসিয়া সরু গলায় চেঁচাইতে লাগিল, "বাবুজী, আট বজ গিয়া, জল্‌দী, জল্‌দী।" আমরা আবার ভ্রমণে বাহির হইলাম। কাল টাঙ্গার পিছনে বসায় গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, আজ তাই চালক শিশুর পাশে সম্মুখের দিকে বসা ঠিক করিলাম।

সারর্দ্ধ মিউজিয়মে খবর পাইলাম কয়েক মাইল দূরে মান্দোরে এখানকার কয়েকটি দ্রষ্টব্য মন্দির আছে। টাঙ্গায় সেই দিকে যাত্রা করা গেল। এদিকে ঘরবাড়ি কম। রাস্তাগুলি বড়, দুই ধারে গাছ। মাঝে মাঝে বড় বাড়ি আধুনিক বিলাতী প্রথায় তৈয়ারী, যোধপুরের ফ্যাশানেবল বড়লোকেরা এই দিকে থাকেন দেখিয়া মনে হইল। যোধপুরের মহারাজা পোলো খেলার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এক সময়। পথে দেখিলাম তাঁহার প্রকাণ্ড পোলো খেলার জমিতে পাইপ দিয়া জল ছড়াইয়া ঘাসের যত্ন হইতেছে। জমির পাশে অল্প ফুলের বাগান এবং একেবারে শেষ প্রান্তে লাল পাহাড়ের কোলে একটি লাল বাংলা, বোধ হয় অতিথিদের জন্য। এদেশে এতবড় ঘাসের জমি আর ফুলের কেয়ারী তৃষিত চাতকের কাছে মেঘের রূপের মত সুন্দর লাগে।

আমাদের পথখরচ ফুরাইয়া গিয়াছিল, সঙ্গে ছিল কয়েকটি ভ্রমণকারীর চেক্। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়া সে চেক ভাঙানো যায় না। যোধপুরে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক নাই দেখিলাম ব্যাঙ্কের তালিকা খুলিয়া। এক জায়গায় দেখি সারি সারি তিন চারটি লালবাড়ির সম্মুখে বন্দুক-কাঁধে সুদীর্ঘ রাজপুত প্রহরী ঘুরিতেছে। টাঙ্গাচালক বলিল, 'খাজাঞ্চিখানা, আফিস আদালত'। হঠাৎ চোখে পড়িল একটা দরজার গায়ে ছোট একটি পিতলের ফলকের উপর লেখা 'Imperial Bank' 'ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক'। পথে আটক পড়িবার ভয়টা কাটিল তাহ'লে। নিতান্ত অসহায় অবস্থা দেখিয়া যেন দেবতা কৃপা করিলেন। এমন ধূলার দেশেও এই বাড়িগুলি আশ্চর্য্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সযত্ন-রক্ষিত। গেটের সামনে বড় বড় কয়েকটি গাছ ও ভিতরে ছোট ছোট ফুল ও ক্রোটনের বাগান। দেশী রাজ্যের আপিস আদালতের কাছে ব্রিটিশ-রাজ্যের আপিস আদালত অত্যন্ত শ্রীহীন মনে হইল। মন্দিরের কাছটা ক্রমেই নির্জ্জন হইয়া আসিয়াছে। মান্দোর একেবারে লাল পাহাড়ের কোলে। চারিদিকে পরিখাবেষ্টিত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সারি সারি গুটি পাঁচ ছয় লাল মন্দির। পাহাড়ে মাটি একেবারে দেখা যায় না, কিন্তু তাহারই ভিতর মনসা গাছ জন্মাইয়াছে। সকলের চেয়ে বড় মন্দিরটি সকলের চেয়ে আধুনিক, মাত্র ১৫০ বৎসর আগের। যেটি যত পুরানো সেটি তত ছোট। প্রাচীনতমটি ৩৪০ বৎসর আগের। সব কয়টি মন্দিরই পরিত্যক্ত, কিন্তু মন্দিরের গায়ে শ্বেত পাথরে প্রতিষ্ঠাতা রাজাদের নাম, জন্ম ও মৃত্যুর সময় লিখিত আছে। সব কয়জন রাজাই "মরুধরাধিপতি।" অনেক ধাপ সিঁড়ির পর মন্দিরগুলির ভিতর একটি করিয়া বিগ্রহের ঘর ও তাহার সাম্‌নে দর্শক ও উপাসকদের জন্য চতুষ্কোণ একটি দালান। বড় মন্দিরটির দুই দিকে থাম ও ছাদ দিয়া আরও খানিকটা জায়গা বাড়ানো। মন্দিরের চূড়া পশ্চিমের প্রাচীন শিবমন্দিরের ধরণের ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র। মন্দিরগাত্রে অসংখ্য প্রস্তর মূর্ত্তি বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া ও বসিয়া। অনেকগুলি মূর্ত্তি দেখিয়া মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বিগ্রহের দরজার দুই পাশে ছোট ছোট দ্বাদশটি মূর্ত্তি। কোনো মন্দিরে দেবমূর্ত্তি নাই, ভিতরটা অপরিচ্ছন্ন পড়িয়া আছে। পূজার বেদীর দুই পাশে প্রতি মন্দিরেই মেঝেতে লতার ভিতর



ফতে সাগর, যোধপুর

পদ্মকুঁড়ির মত দুইটি শঙ্খ এবং বেদীতে কাঁধ দিয়া দুটি বামন, তাহাদের পেট খুব মোটা এবং মুখ কীর্ত্তিমুখের মত। প্রাচীনতম মন্দিরের মেঝে অনেক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় লতা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবু বোঝা যায়। বোধ হয় চতুর্থ মন্দিরটির পিছনে অতি সূক্ষ্ম জালিকাজ করা রাজপুত ঝরোকা দেওয়া একটি মন্দিরের (?) মাথায় আধুনিক ধরণের মুসলমানী গম্বুজ। ইহার দরজায় চাবি বন্ধ। কোনো যোধপুর-দুহিতা মোগল অন্তঃপুর হইতে এইখানে পূজা দিতে আসিতেন কি না কে জানে? মন্দিরের পিছনে অনেক দূরে অতিথিশালা সম্ভবতঃ ছিল। বাঁধানো পথ ও ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া তাহাই মনে হয়। প্রাচীন মরুধরাধিপতিরা ইহাকে অতি যত্নে রক্ষা করিতেন, চারিদিকের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও চওড়া গভীর পরিখা দেখিয়া মনে হয়। পরিখার এক এক জায়গায় অল্প জল আছে। প্রাঙ্গণের বাহিরে সুরক্ষিত বাগান ও কতকগুলি আধুনিক অর্দ্ধ হস্তের বৃহৎ চিত্রাদি আছে। চুনের দেওয়ালের গায়ে রং দিয়া রাজাদের মূর্ত্তি আঁকা।

এই বাগানে কয়েকটি বাঙালী মেয়ে বিলাতী রেশমের কাপড়জামা পরিয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। দেশী রং এবং ছিট যে এই সব পোষাকের কাছে সৌন্দর্য্য ও সুষমায় কত উঁচুদরের, বাংলা দেশে আমরা তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। রাজপুতানায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইলেই রঙের দৃষ্টি বদলাইয়া যায়। তাই এই সব দেখিয়া নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারি।

মান্দোর হইতে যাওয়া ও আসার পথে পাহাড়ের উপর কেল্লা, রাজপ্রাসাদ, নূতন বাংলা, মন্দির ইত্যাদি অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। বাড়িগুলি যেন পাহাড়েরই গা হইতে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের রং পাহাড়েরই মত লাল, গঠন ভারী ভারী, পাহাড়ের গায়ে ঠিক মানায়, কোন্‌খানটা পাহাড় কাটিয়া বাহির করা আর কোন্‌টা গাঁথিয়া তোলা একদৃষ্টিতে ধরা যায় না। পাহাড়ের গা দিয়া লাল পথ বাঁকিয়া বাঁকিয়া বহু দূর চলিয়া গিয়াছে; প্রাসাদশ্রেণীর প্রাচীরবেষ্টনী অনেকখানি বিস্তৃত। আকাশের পটে এই রক্তাভ নগরীর ছবি বড় সুন্দর দেখায়। ঘরবাড়ি যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পরও কতদূর পর্য্যন্ত পাথর কাটার চিহ্ন। যে-সব পাহাড়ের গা হইতে চারিদিক দিয়া পাথর কাটিয়া লইয়াছে, ক্রমাগত বাটালির ঘায়ে তাহা আপনি মন্দিরাকৃতি হইয়া গিয়াছে। এইজন্য

যোধপুরে। প্রকৃতি ও মানুষের মিলন বড় নিকট মনে হয়। মানুষ যেন শ্রান্ত প্রকৃতিরই হাতের অসমাপ্ত কাজ শেষ করিয়া আপনিও সেইখানে বিশ্রাম করিতেছে।

পথে দুইবার বর্ত্তমান মহারাজা ফতেসিংকে দূর হইতে ছোট মোটরে দেখিলাম। সাদাসিধা পোষাক, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। ফিরিবার পথে ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙানো হইল। টাঙ্গায় বড় রোদ লাগিতেছে দেখিয়া বন্দুকওয়ালা প্রহরী চালককে বলিল গাছতলায় গাড়ীটা দাঁড় করা। আমাদের দেশের পুলিস কি ব্যাঙ্কের প্রহরীকে কেহ এরূপ ভদ্রতা করিতে দেখিয়াছে মনে হয় না।

হঠাৎ আকাশে দুইটি উড়ো জাহাজ দেখা দিল। আমাদের চালক ক্ষেপিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল, "বাবু, বাবু, উড়ন্ জাগাজ দেখিয়ে।" বাবুর একান্ত অনুৎসাহ দেখিয়া বিস্ময়ে বালকের বাক্যস্ফূর্ত্তি বন্ধ হইয়া গেল।

এখানকার মিউজিয়মের নাম সর্দ্দার মিউজিয়ম। সুন্দর ত্রিতল বাড়িটি লাল পাথরে গড়া। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ফুলগাছ ও অন্যান্য গাছ। উটের পিঠে করিয়া আনিয়া বাগানে জল দিতেছে দেখিলাম। এই মিউজিয়মের রাজপুত চিত্রশালাই উল্লেখযোগ্য। যোধপুরের প্রাচীন রাজারা শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু এখন এ সব ছবির তেমন যত্ন নাই। পুরাতন প্রাসাদে এই-সব ছবি গুদামে রাশীকৃত পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান অধ্যক্ষ সেখান হইতে যথাসাধ্য উদ্ধার করিয়া আনিয়া মিউজিয়মে রাখিয়াছেন। জয়পুর-চিত্রশিল্পের সঙ্গে বাহিরের অনেকটা পরিচয় হইয়াছে, অনেক ছবিরই বহুল প্রচার হইয়াছে বলিয়া। কিন্তু যোধপুর-চিত্রকলা এখনও যোধপুরের অন্তঃপুরেই অবগুণ্ঠিতা পড়িয়া আছে। অসংখ্য সুন্দর ছবি এখানে গুণীদের দৃষ্টির আড়ালে লুকাইয়া আছে।

রাজা বখতসিংহ বোধ হয় খুব চিত্রানুরাগী ছিলেন। তাঁহার রাম পূজা, শিকার খেলা, গান শোনা, একক ও সস্ত্রীক কত যে ছবি তাহার সংখ্যা নাই। রাজকুমারীদের পোলো খেলা, শিকার করা ইত্যাদির ছবি আছে। যোধপুরের ছবিতে ভূদৃশ্য ভারি সুন্দর। আমি ছবির পটভূমিতে এত বড় বড় ঘন বাগান, এত রকমের গাছ ও পাতার নক্‌সা আর কোনো রাজপুত কি মোগল ছবিতে দেখি নাই। হাওয়ার মত সূক্ষ্ম ওড়না ও জামা পরা মেয়েদের ছবিতে তুলির কাজ আশ্চর্য্য নিপুণ। হাস্যোদ্দীপক ছবি অনেক আছে। আপিংখোরের ইঁদুর শিকার ছবিটি উল্লেখ-যোগ্য। মেম সাহেবদের সখের দিশী সাজ পরা ছবি মন্দ নয়। বাদশাহ, যোধপুরের রাজবৃন্দ, সর্দ্দারগণ, রাওবংশ, রাজকুমারগণ ইত্যাদির এক এক সারি ছবি সাজানো আছে। নানা যুগের রাজা সর্দ্দার প্রভৃতির বেশভূষা মুখভাব নানা রকমের দেখিতে কৌতূহল হয়। প্রতিকৃতি অঙ্কনে যে তখনকার শিল্পীরা দক্ষ ছিল তাহা দুর্গাদাসের শান্ত উদার মুখ, বীরবলের বাঁকা ঠোঁটের কোণের মৃদু হাসি, মানসিংহের ধূর্ত্ত দৃষ্টি এবং জাহাঙ্গীরের বাহুপাশে নূরজাহানের সস্মিত মুখ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। রাজকুমারীদের প্রেম-উপাখ্যানের অনেক চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাজাইয়া রাখিবার স্থান নাই বলিয়া অনেক ছবি তিন হাত লম্বা ও সওয়া হাত উচ্চ এলবামে বন্ধ করিয়া রাখা আছে। তাহার দুই তিনটি ছবি উপর হইতে দেখা যায়। রামায়ণ, পঞ্চতন্ত্র, কৃষ্ণলীলা, শিবরহস্য, নাথকথা, পার্ব্বতীর কথা, মহাভারত ইত্যাদির এক একটি স্বতন্ত্র এলবাম।

কোষ্ঠীর মত করিয়া পাকানো সচিত্র ভাগবতে খুব ছোট ছোট বিন্দুর মত লেখা এবং তাহারই মাঝে মাঝে রঙীন অতি ক্ষুদ্র ছবি। জাপানী ছবির মত খুলিয়া দেখিলে লেখা ও ছবি সবগুলিতেই শিল্পীর নিপুণ হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। মিউজিয়মে এদেশের শেলাই, গালার কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ ইত্যাদি আছে। যোধপুর কাপড় রং করা ও ছাপানোর জন্য বিখ্যাত। তাহারও অনেক নমুনা দেখিলাম। উটের চামড়ার উপর গালার কাজ করিয়া বহু গন্ধ- ও পুষ্প-পাত্র তৈয়ারী হয়। সেগুলিও দেখিবার মত। রূপার কাজ সুন্দর। যুদ্ধের সময় ঘি সঞ্চয় করিবার জন্য উটের চামড়ার একটি বিরাট পাত্র দেখিলাম। তাহাতে তিন-চারটি মানুষ লুকাইয়া রাখা যায়। এদেশে ঘিটাই তখন ছিল আসল খাদ্য। আধুনিক রাজাদের বিলাতী পোষাক পরা বড় বড় তৈলচিত্র দেখিতে ভাল লাগিল না। তাহাদের তুলনায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ছবি মীনার কাজের মত জ্বল জ্বল করে।

মিউজিয়ম দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়াই সাক্ষাৎ হইল

সেই হোটেলের ছোট্ট বালকটির সঙ্গে। আজ তাহার প্রভু অনেক পোলাও, পরোটা, চাটনী ইত্যাদি করিয়া পাঠাইয়াছে। দাম লইল মোট ২৲ টাকা মাত্র। ছেলেটিকে সাতটা পয়সা বকশিস দেওয়াতে সে বলিল, "কাগজে ইহা লিখিয়া দিও না, তাহা হইলে মনিব কাড়িয়া লইবে।"

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার বাহির হইলাম বাজারে কিছু জিনিষ কিনিতে। তামাকু বাজারে ছিটের কাপড়ের দোকান। গলির দুধারে উঁচু ভিতের উপর ছোট ছোট দোকান। কেনা-বেচা যাওয়া-আসা সবই সেই পথের উপর। কাপড় রং করার কাজও খানিকটা পথে খানিকটা ঘরে চলিতেছে। পথগুলি দেখিয়া আজ কাশীর পুরানো গলির সঙ্গে সাদৃশ্য লাগিতেছিল। দিনের আলোতে মানুষের মুখগুলি আজ একটু স্পষ্ট দেখিলাম। এদেশের মানুষের রূপ আছে। স্ত্রীপুরুষ কাহারও অতিশীর্ণ কি অতিস্থূল অসুস্থ চেহারা সহজে চোখে পড়ে না। মেয়েদের মুখশ্রী ছবির মত, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, আয়ত চক্ষু কত যে দেখিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। ইউরোপের জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রী ও নর্ত্তকীদের অপেক্ষা ইহাদের সহজশ্রী অনেক বেশী। রেল ষ্টেশনের পুরুষ ভৃত্যদেরও এমন সুশ্রী চেহারা, উন্নত দেহ ও গর্ব্বিত পদক্ষেপ যে তাহাদের চাকর বলিয়া ফরমাস করিতে সঙ্কোচ হয়। একেবারে কালো রং দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

এখানকার মাড়োয়ারীদের যে শুধু স্থূল বপুর অভাব তাহা নয়, অসভ্যতারও অভাব। পট্টিতে দোকানে দোকানে ঘুরিয়াও দেখিলাম তাহারা আশ্চর্য্য ভদ্র।

পাগড়ীর কাপড় ও ওড়না রং করা যোধপুরেরই কাজ। শাড়ী এদেশের মেয়েরা পরে না, তবে আমেদাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি জায়গায় গুজরাটি মেয়েদের জন্য ইহারাই ছাপা শাড়ী সরবরাহ করে। সব ১০ হাত লম্বা ও ৫২ ইঞ্চি বহর। আমি শাড়ী কিনিব শুনিয়া টাঙ্গার চারিধারে পনের-কুড়ি জন কাপড়ওয়ালা বস্তা বস্তা কাপড় লইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। দর্শকও কম জুটিল না। কত রকম সুন্দর সুন্দর নক্সা ও রঙের কাপড়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাগড়ী প্রভৃতির কাপড়ে অনেক বিলাতী নক্সাও ঢুকিয়াছে। আমি কিনিলাম মাত্র দু-তিন খানা কাপড়। একজন দোকানদার যাচিয়া তাহার ঠিকানা দিল। অন্যদের কাছে চাহিয়াও পাইলাম না। কার্ডের ধার তাহারা ধারে না।

কয়েকটা গহনার দোকানে ভাল গহনা দেখিতে চাওয়াতে তাহারা বিলাতী প্যাটার্ণের ভুল দুই-একটা দেখাইল। আমাদের বাংলা দেশের গহনা দেখিয়া স্যাকরারা মুগ্ধ হইয়া তারিফ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের দেশী জিনিষের যে কিছু মূল্য আছে তাহা তাহারা জানে না। অনেক কষ্টে বুঝাইয়া একটা যোধপুরী ধুক্‌ধুকি বাহির করা গেল। জয়পুরের দোকানদাররা গার্ণেট, রুবি, ডায়মণ্ড, য়্যাম্বার, পেণ্ডেণ্ট, নেক্‌লেস্ কত হাজার রকম ইংরেজী নাম হড় হড় করিয়া বলিয়া যায়,—এখানের জহুরীদের সাচ্চা আর ঝুটা ছাড়া আর কিছু বুঝানই শক্ত। এটা যে দোকান বাজার ব্যবসার দেশ এখনও হয় নি তাহা সহজেই বোঝা যায়। জয়পুর অনেক দিক দিয়া অনেক রকম বাজারের কেন্দ্র। যোধপুরের দোকান ঘরগুলি অত্যন্ত ছোট, দরজা পর্য্যন্ত এত নীচু ও সঙ্কীর্ণ যে খাঁচা মনে হয়। এইখানে সোনা-রূপার বার হাতে করিয়া জহুরীরা পরস্পরকে দেখাইতেছে; গলিতে দাঁড়াইয়াই দেখাশুনা কথাবার্ত্তা চলিতেছে। দিনে দেখিয়া বুঝিলাম এখানেও পাথরের রংটা সেকেলে বলিয়া অনেকের অপছন্দ হইয়া যাইতেছে। অনেক বাড়িকেই পাথরের সাদা চুনকাম করিয়া ভদ্র করা হইয়াছে।

গোটাকয়েক ছবি কিনিয়া আমরা ফিরিয়া ষ্টেশনে চলিলাম। ছবি এখানে ভাল পাওয়া যায় না। টাঙ্গাচালক বালক সারাদিনের ভ্রমণের জন্য ২৸৵ লইয়া প্রস্থান করিল।

রাজপুতানায় চিতোর উদয়পুর দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মোহেন-জো-দাড়ো না দেখিয়া ফিরিব না বলিয়া এবারকার মত সে ইচ্ছা ছাড়িতে হইল। সন্ধ্যা ৬৷৷টায় যোধপুরের ট্রেন ধরিয়া লুনীর দিকে চলিলাম।

ট্রেন ছাড়িবার পূর্ব্বে মিউজিয়মের অধ্যক্ষ বিশ্বেশ্বরনাথ রাও প্রভৃতি কয়েকজন পরিচিত ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ মিলিল তাঁহারা দুঃখ করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা থাকিয়াও আমাদের যোধপুর দেখানোর ভার লইতে পারিলেন না।

ভবিষ্যতে কখনও গেলে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধাটা ছাড়িব না। এবারকার মত অনেক জিনিষ না-দেখার ও না-বোঝার দুঃখ লইয়াই ফিরিতে হইল।

ধ্রুবা

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবার মন্ত্রগৃহ, সিংহাসনে রামগুপ্ত, সম্মুখে রুচিপতি ও ভদ্রিল। নূতন সম্রাট বলিতেছিলেন, "দত্তদেবীর সামনে কি সুন্দর অভিনয়টা করলাম, একবার দেখলে না হে?"

রুচিপতি শুষ্কমুখে কহিল, "পিলে চমকে গেছে, বাপধন, এখন কি আর চোখে দেখতে পাচ্ছি? শুনছি চন্দ্রগুপ্ত নগরের ঘরে ঘরে আমার সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে,—বলছে, যে ধ্রুবাকে উদ্যানবিহারে নিয়ে যেতে চায়, সে রুচিপতিটা কে? একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। বাপ!"

রাম। তুমি যে ভয়েই অস্থির হে? এত দণ্ডধর, এত প্রতীহার? এর মধ্যে একা চন্দ্রগুপ্ত এসে তোমার কি করবে? এইবার ঠাকরুণটিকে সটান মথুরায় প্রেরণ! তিনি কোথায়?

রুচি। পাশের ঘরে বন্ধ।

রাম। বিলম্বে প্রয়োজন কি? যাও না হে ভদ্রিল, এখানে নিয়ে এস না?

ভদ্রিল বাহির হইয়া গেল, তখন রুচিপতি আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "দেখ মহারাজ, এই চন্দ্রগুপ্তটাকে শীঘ্র পরপারে পাঠাতে না পারলে, রুচিপতির উদ্যান-বিহারে অত্যন্ত অরুচি হয়ে যাবে।"

উত্তরে রামগুপ্ত বলিলেন, "ভয় কি, গুরু? কালই তার ছিন্নমুণ্ড প্রাসাদের দক্ষিণ তোরণে টাঙিয়ে দেব।"

রুচি। রামভদ্র, কাজটা যত সোজা মনে করছ, ততটা নয়। পাটলিপুত্রের সমস্ত লোক এখনও চন্দ্রগুপ্তের কথায় মরে বাঁচে।

এই সময়ে ভদ্রিল ধ্রুবদেবীকে সঙ্গে করিয়া মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে রুচিপতি সুখাসন ছাড়িয়া বলিল, "মহারাজ, দাম্পত্য প্রেমালাপটা নিভৃতেই ভাল, আমি এখন সরে পড়ি।"

রুচিপতি চলিয়া গেলে রামগুপ্ত ধ্রুবদেবীর দিকে দুই হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "এস প্রাণেশ্বরী, আজ বিষম বিপদে পড়ে তোমাকে মন্ত্রগৃহে ডাকতে বাধ্য হয়েছি।"

ধ্রুবদেবী প্রণাম করিয়া, জানু পাতিয়া করজোড়ে বলিলেন, "আর্য্য, আপনি আমার ভাসুর, সুতরাং পিতৃতুল্য। আমাকে অসংযত সম্বোধন আপনার শোভা পায় না।"

এ-কথায় কর্ণপাত না করিয়া, রামগুপ্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "প্রিয়ে, আমি তোমার অযোগ্য। আমি এত দিন তোমার মূল্য বুঝতে পারিনি, তোমার সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করেছি। প্রিয়তমে, তুমি আমার আঁধার হৃদয়ের পূর্ণচন্দ্র,—" এই সময়ে অতিরিক্ত সুরাপানে মহারাজ রামগুপ্তের হিক্কা আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রেম-সম্ভাষণের ভয়ে ধ্রুবদেবী পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বাগ্‌দত্তা পত্নী, আপনার কুলবধূ। অসহায়া, অনাথা নারীর প্রতি অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগে ফল কি?"

রাম। মহাদেবী, আজ অসহায় হয়ে তোমার শরণাগত হয়েছি।

ধ্রুবা। আর্য্য, আমি আপনার কুলবধূ মাত্র, মহাদেবী নই, সুতরাং রাষ্ট্রনীতির কিছুই বুঝি না। যদি পরামর্শের প্রয়োজন হয় মহাদেবী দত্তদেবী আছেন।

রাম। প্রিয়ে, আজ তুমি ভিন্ন রামগুপ্তের অন্য গতি নাই।

ধ্রুবা। অনাথা, অবলা নারীর প্রতি অনুচিত ভাষা প্রয়োগ ক'রে যদি তৃপ্তিলাভ করেন পিতা, তাহ'লে আমি উপায়হীনা। আমি মহারাজের দাসানুদাসী।

রাম। দেবি, পিতার মৃত্যুর পরে শকরাজা সহসা প্রবল হয়ে উঠেছে। সে হঠাৎ কৌশাম্বী আর প্রয়াগ অধিকার ক'রে দূতমুখে বলে পাঠিয়েছে যে, গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী

ধ্রুবদেবীকে মথুরায় না পাঠালে সে পাটলিপুত্র নগর ধ্বংস করবে।”

অকস্মাৎ ধ্রুবদেবী অন্ধকার দেখিলেন, তিনি সোদ্বেগে বলিয়া উঠিলেন, “মহারাজ, পিতা, আমি মথুরায় ?”

রাম। প্রিয়তমে, একথা বলতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা শকরাজার আক্রমণের ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠেছে, তাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমি তোমাকে মথুরায় পাঠাতে অঙ্গীকার করেছি।

নিরপরাধা অবলা নারীর পায়ের তলা হইতে সহসা যেন মেদিনী সরিয়া গেল, ধ্রুবদেবী বসিয়া পড়িয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, “মহারাজ, আমি অবলা নারী, দয়া করুন, ক্ষমা করুন।”

রামগুপ্ত সে কথা কানে না তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, “প্রেয়সি, পট্টমহাদেবি, সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা, তোমার পতিভক্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপরে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তুমি যে আমার নয়নের মণি, বক্ষের পঞ্জর, তোমাকে মথুরায় পাঠিয়ে আমি কি আর জীবিত থাকব ? কিন্তু উপায় নেই,—রাজার কর্ত্তব্য অতি কঠোর—”

অভাগিনী ধ্রুবদেবী জ্ঞান হারাইয়া লুটাইয়া পড়িলেন। ভদ্রিল গণিকাপুত্র হইলেও রামগুপ্ত বা রুচিপতির মত পশু হইয়া উঠে নাই। ধ্রুবদেবীকে ভূমিশয্যাগ্রহণ করিতে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, “মহারাজ, ইনি যে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছেন !”

মহারাজ ইঙ্গিত করিলেন এবং একজন মূক দণ্ডধর বাহিরে চলিয়া গেল। তখন ভদ্রিল আবার কহিল, “মহারাজ, এখন আর কিছু না বললেই ভাল হয়।” ইহার পরেই মূক দণ্ডধর একজন দাসীকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। রামগুপ্তের আদেশে সে ধ্রুবদেবীর মুখে জল ছিটাইয়া বাতাস করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান হইলে, তিনি দাসীর মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দাসী মৃদুস্বরে বলিল, “ভয় নাই দেবী।”

ধ্রুবদেবী অতি ধীরে বলিলেন, “মথুরায় পাঠাচ্ছে। যদি পার, আমার স্বামীকে---কুমার চন্দ্রগুপ্তকে সংবাদ দিও।” এই সময় রামগুপ্ত দাসীকে চলিয়া যাইতে আদেশ করাতে সে উঠিয়া গেল।

সে দাসী নটীমুখ্যা মাধবসেনা।

ভদ্রিল কহিল, “ধ্রুবদেবীর চেতনা ফিরেছে মহারাজ।” উঠিয়া বসিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে ধ্রুবদেবীর মুখ হইতে বায়ু-বিক্ষুব্ধ স্রোতরাশির ন্যায় বাক্য বহিল, “মহারাজ, আমি ত আপনার পট্টমহাদেবী নই, তবে কেন আমায় মথুরায় পাঠাচ্ছেন ? আমি যে আপনার ভ্রাতৃবধূ! শকরাজার পদসেবা করতে আমাকে মথুরায় পাঠালে, ত্রিভুবন যে যুগ-যুগান্তর ধরে আপনার অপযশ ঘোষণা করবে ? মহারাজ, আপনি রাজা, প্রভু, আপনি পিতৃতুল্য, আপনি যদি বলপ্রয়োগ করে মথুরায় পাঠান, তাহ’লে আমার কোনই উপায় নেই, কিন্তু মহারাজ, একবার আপনার পিতার নাম স্মরণ করুন, বংশগৌরবের কথা স্মরণ করুন, আপনি যে ক্ষত্রিয় ?”

“কি করব, মহাদেবী !”

“কি করবে ? তুমি না ক্ষত্রিয় ? ক্ষত্রিয়ের কাছে যে স্ত্রী, অসি বা অশ্ব কামনা করে, সে যুদ্ধ প্রার্থনা করে। যুদ্ধ কর মহারাজ, অসি কোষমুক্ত কর। পাটলিপুত্রের সহস্র সহস্র নাগরিক সানন্দে তোমার সঙ্গে অনন্ত যাত্রা করবে। মথুরা জয় ক’রে পাটলিপুত্রে ফিরে এস।”

রাম। অসম্ভব মহাদেবি ! রাজ্য বিশৃঙ্খল, ভাণ্ডার অর্থশূন্য, সেনাদল নায়কহীন, শকরাজা প্রবল।

তীব্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধ্রুবদেবী দ্রুত বলিতে আরম্ভ করিলেন, “মহারাজ, একবার নারীর কথা শোন। প্রাসাদের তোরণে দাঁড়িয়ে একবার উচ্চকণ্ঠে বল, ‘পাটলিপুত্রে পুরুষ কে আছ ? মগধে মাতার পুত্র কে আছ ? আমি আর্য্যনারীর মর্য্যাদা রক্ষা করতে মথুরায় যাব, তোমরা আমার সঙ্গে এস।’ মাগধ জাতিকে তুমি এখনও চেননি মহারাজ, সহস্র বর্ষ ধরে যে-জাতি ভারতবর্ষ শাসন ক’রে এসেছে, সে এখনও নির্বীর্য্য হয়নি।”

রাম। প্রিয়ে, আমি সকল দিক বিবেচনা ক’রে তবে তোমাকে মথুরায় পাঠাতে অঙ্গীকার করেছি। তুমি

পাটলিপুত্র নগর রক্ষা কর। আমি এক বৎসরের মধ্যে মথুরা জয় ক'রে তোমাকে ফিরিয়ে আনব—

ধ্রুবা। ছি ছি পিতা, একথা তোমার অযোগ্য! তুমি না ক্ষত্রিয়? তুমি না রাজা? তুমিই না সমুদ্রগুপ্তের পুত্র? ছিঃ, তুমি এক বৎরের মধ্যে মথুরা জয় করবে? তুমি রাজা নও, তুমি পুরুষ-নামের অযোগ্য, তুমি দাসীপুত্র।

রাম। - তোর যত বড় মুখ না তত বড় কথা? ভদ্রিল একে বাঁধ।

ভদ্রিল হাত তুলিবার পূর্ব্বেই দুইজন প্রতীহার ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত, রুদ্রভূতি, বিশ্বরূপ প্রভৃতি সাম্রাজ্যের দ্বাদশ প্রধান মহানায়কবর্গ সমুদ্রগৃহের দুয়ারে দণ্ডায়মান।"

রামগুপ্ত অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বল, যে আমার সঙ্গে এখন দেখা হবে না, আমার আদেশ ভিন্ন কেহ যেন সমুদ্রগৃহ হ'তে মন্ত্রগৃহে আস্‌তে না পারে।"

প্রতীহারেরা সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। তখন ভদ্রিল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "মহারাজ, ধ্রুবদেবী রমণী, আমি কেমন ক'রে তাঁর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করব?"

রামগুপ্ত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রতীহার দুইজন আবার ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, অসংখ্য নাগরিক ও পৌরসঙ্ঘের সৈন্য নিয়ে পট্টমহাদেবী দত্তদেবী মন্ত্রগৃহে আসছেন, কেউ তাঁকে নিবারণ করতে পারছে না।"

এইবার রামগুপ্তের প্রাণে ভয় আসিল, তিনি হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন যে সিংহাসনে বসিয়া মুকুট ধারণ করিলেই সর্ব্বত্র যথেচ্ছাচার করা যায় না। মুখের শিকার পাছে দত্তদেবী কাড়িয়া লইয়া যান, সেই ভয়ে রামগুপ্ত আবার ধ্রুবদেবীকে বাঁধিতে আদেশ করিলেন। ভদ্রিল দ্বিতীয়বার অস্বীকার করিল। তখন হতাশ হইয়া মহারাজা রামগুপ্ত বলিলেন, "তবে আমিই বাঁধি।"

তখন সাহস পাইয়া ধ্রুবদেবী সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আপনাকে এত কষ্ট করতে হবে না মহারাজ। অভাগিনী অবলা নারীর প্রতি মহারাজাধিরাজের যখন এত অসীম দয়া, তখন আমি স্বেচ্ছায় মথুরায় যাব।"

সহসা মন্ত্রগৃহের দ্বারে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শব্দ হইল, "কাকে বাঁধছ রামগুপ্ত? মহাদেবী ধ্রুবদেবী কোথায়?"

দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃ মহারাজাধিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধ্রুবা ঝড়ের বেগে ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধা দত্তদেবীর বুকের উপর পড়িল, আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "মা, মা!"

দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "ধ্রুবা, ধ্রুবা, মা আমার।" রামগুপ্ত বুঝিলেন, হয়ত বা এই মুহূর্ত্তেই সিংহাসন হইতে গড়াইয়া পড়িতে হইবে। তখন সমুদ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র তীব্র কর্কশ ভাষায় দত্তদেবীকে বলিলেন, "আপনি কার অনুমতিতে মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করেছেন?"

রামগুপ্তকে পিছনে রাখিয়া, সিংহাসনকে অভিবাদন করিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ কি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত জানেন, দত্তদেবী কে?"

"আপনি আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন।"

"ওরে কুক্কুর, ভুলে গিয়েছিস, কে তোকে ঐ সিংহাসনে বসিয়েছিল? ওরে দাসীপুত্র, কার সিংহাসনে বসে আছিস্ তা জানিস্? জানিস্, আমি তোর মাতার মত সমুদ্রগুপ্তের উপপত্নী নই, আমি পট্টমহাদেবী। আর্য্যপট্ট থেকে নেমে আয়।"

"কে আছিস, এই বুড়ীকে বাঁধ।"

সিংহীতুল্যা বৃদ্ধা মহাদেবীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবার ভরসা কাহারও হইল না। তখন দত্তদেবী আদেশ করিলেন, "পাটলিপুত্র মহানগরে পুরুষ কে আছ?" সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া অগণিত সশস্ত্র নাগরিক মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিল এবং সভাকুট্টিম ভরিয়া ফেলিল। আবার আদেশ হইল, "এই কুলাঙ্গারকে আর্য্যপট্ট থেকে নামিয়ে বন্দী কর।"

বৃদ্ধ নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ, ইন্দ্রদ্যুতি ও জয়কেশীর সহিত ধ্রুবদেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। জয়নাগ এক লম্ফে আর্য্যপট্টে উঠিয়া রামগুপ্তের হাত ধরিয়া কহিল, "নেমে এস রামগুপ্ত।"

ইন্দ্রদ্যুতি রামগুপ্তের আর এক হাত ধরিয়া টানিতে

টানিতে বলিল, "ও জায়গাটায় পথ ভুলে উঠেছিলে, ক'মাস বড় জালিয়েছ।"

সহসা ভীষণ জয়ধ্বনিতে পাষাণময় প্রাসাদের সর্ব্বাংশ কাঁপিয়া উঠিল, "জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়!" জনতা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল, মাধবসেনার সহিত চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। ধ্রুবদেবী তখন দত্তদেবীর পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত ডাকিয়া উঠিলেন, "ধ্রুবা, ধ্রুবা!" পশ্চাৎ হইতে মাধবসেনা বলিয়া উঠিল, "যুবরাজ, এই যে ধ্রুবদেবী, মহাদেবী দত্তদেবীর পিছনে।" চন্দ্রগুপ্ত আবার বলিয়া উঠিলেন, "ভয় নেই, ভয় নেই, আমি এসেছি।" পরে মাতাকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "এই যে মা! এসেছ?"

মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় বৃদ্ধা পট্টমহাদেবী পুত্রকে দেখিতেছিলেন, এতক্ষণে তাঁহার অধরপ্রান্তে হাসি ফুটিল, তিনি চন্দ্রগুপ্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চন্দ্র, এই সিংহাসন তোমার, আমি অভিমানভরে বড় ভুল করেছি, এখন সে ভুল সংশোধন করতে চাই। সিংহাসনে উপবেশন ক'রে দণ্ড ধারণ কর। শকরাজা প্রয়াগ অধিকার করেছে, তাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "তোমার সকল আদেশ অবনত মস্তকে প্রতিপালন করব মা, কেবল এই আদেশটি পরিহার কর। তোমার আদেশে সিংহাসনের পথ পরিত্যাগ করেছি, তোমার পবিত্র চরণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, রামগুপ্ত জীবিত থাকতে আর্য্যপট্ট স্পর্শ করব না, সে কথা কি বিস্মৃত হয়েছ মা? তুমি যে মা আমার সমস্ত জীবনীশক্তির মূল—তুমি ভুলে যেতে পার, কিন্তু আমি ত পারি না।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বৃদ্ধা দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "জয়নাগ, ইন্দ্রদ্যুতি, রামগুপ্তকে হত্যা কর, সিংহাসনের কণ্টক দূর কর, তা নইলে সাম্রাজ্য রসাতলে যাবে। পাটলিপুত্র ধ্বংস হবে।"

দত্তদেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া, অথচ মুক্ত অসি হস্তে ইন্দ্রদ্যুতির গতিরোধ করিয়া, চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "মা, হঠাৎ কি ভুলে গেলে যে আমিও সমুদ্রগুপ্তের পুত্র? আমার সামনে একজন সামান্য নাগরিক আমার ভ্রাতাকে হত্যা করবে, আর আমি নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত তাই দাঁড়িয়ে দেখব? এ অসম্ভব আদেশ কেন দিচ্ছ মা? তার আগে আমাকে হত্যা করতে আদেশ কর।"

অনন্ত আকাশ যদি সমুদ্রগুপ্তের বৃদ্ধা মহিষীর মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িত, তাহা হইলেও তিনি এত বিস্মিতা হইতেন না। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন গ্রহণও করিবে না এবং সিংহাসনের কণ্টকও দূর করিতে দিবে না। রাজ্য বিশৃঙ্খল, চিরশত্রু শকরাজা সাম্রাজ্যের তোরণে দাঁড়াইয়া পাটলিপুত্রের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে। দত্তদেবীর অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "তবে কি হবে, চন্দ্র?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "মা যতদিন রামগুপ্ত জীবিত আছে, সাম্রাজ্য ততদিন তাঁর। সমুদ্রগুপ্তের আদেশ তোমার আদেশে প্রতিষিদ্ধ হ'তে পারে না। জয়নাগ, মহারাজাধিরাজের বন্ধন মোচন কর।" তখন প্রাণভয়ে কম্পমান রামগুপ্তের দিকে ফিরিয়া, কুমার চন্দ্রগুপ্ত অসি ফিরাইয়া তাঁহাকে সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া হাত ধরিয়া আর্য্যপট্টে বসাইয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, তোমার দীন প্রজার অভিবাদন গ্রহণ কর। স্বচ্ছন্দে এই সিংহাসন উপভোগ কর, কিন্তু মনে রেখ মহারাজ, যতক্ষণ প্রজার মঙ্গলবিধান করবে, ততক্ষণ রাজ্য তোমার। অত্যাচারী রাজার পরিণাম মনে রেখ। চলে এস, মা।"

হঠাৎ ধ্রুবদেবী অগ্রসর হইয়া, চন্দ্রগুপ্তকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, অনুমতি কর, রাজ আদেশে মথুরায় যাব।"

ভয়ে ব্যস্ত হইয়া রামগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "এখন আর দরকার হবে না।"

ধ্রুবা আর্য্যপট্টের সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিল, "মহারাজ, ধর-বংশের কন্যা সহজে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। যখন সিংহাসনের প্রান্তে পড়ে মিনতি করেছি, বলেছি আমি অসহায়া, অবলা, অনাথার উপর অত্যাচার ক'রো না, তখন শোন নি। বলপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে

প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে ছেড়েছ। এখন আমি প্রতিশ্রুতা, সুতরাং নিশ্চয়ই মথুরায় যাব।"

এতক্ষণে যেন চন্দ্রগুপ্তের চমক ভাঙিল, তিনি উভয় হস্তে ধ্রুবদেবীর স্কন্ধ ধারণ করিয়া তীব্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি বললে? তুমি মথুরায় যাবে? তুমি ধ্রুবা, রুদ্রধরের কন্যা, সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী? আমার অনুমতি চাও? ধ্রুবা, আমি অনুমতি দেবার কে?"

ধ্রুবা। স্বামী, তুমি অনুমতি না দিলে কে দেবে? সত্য করেছি, সত্যরক্ষা কর প্রভু।

চন্দ্র। সত্য? সমস্ত সত্য ঘোর মিথ্যা। সংসারের মধ্যে পুঞ্জীভূত মিথ্যা, সত্য ও শাস্ত্রের আকার ধরে বেড়ায়। ধ্রুবা, বিশ্বসংসার জান্‌ত যে তুমি আমার। তোমার পিতা বৃদ্ধ মহানায়ক রুদ্রধর ধ্রুবাকে আমাকে দিতে বাগদত্ত হয়েছিলেন, দেবতা সাক্ষী, পাটলিপুত্রের লক্ষ নাগরিক সাক্ষী, আমার প্রাণ সাক্ষী। কিন্তু ধ্রুবা, সংসারে সত্য আর ব্যবহারশাস্ত্র কি বললে জান? বললে, তুমি সাম্রাজ্যের যুবরাজের বাগদত্তা পত্নী, আমার নয়।

ধ্রুবা। অসহ্য যন্ত্রণা, নারকীয় ব্যবহার, অশ্লীল ভাষা, সমস্ত সহ্য ক'রেও আমি তোমারই দাসী। রুচিপতি আমাকে উদ্যান-বিহারে ধরে নিয়ে যেতে চায়, তা শুনেও আমি তোমার চরণ ধ্যান করি। কিন্তু, কিন্তু, ঐ দাসীপুত্র রাজা, আমাকে মথুরায় যেতে অঙ্গীকার করিয়েছে। আমি রুদ্রধরের কন্যা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারব না।"

চন্দ্র ধ্রুবা, পিতার মর্য্যাদা আর মাতার আদেশ স্মরণ ক'রে রক্তমাংসের হৃৎপিণ্ডটাকে জড় পাষাণ ক'রে ফেলেছিলাম, কিন্তু স্রোতের মুখে সে পাষাণ ভেসে গেল। ধ্রুবা, তুমি জান, তুমি আমার কে। কিন্তু এখন তুমি মহারাজের বাগদত্তা পত্নী, আর আমি পথের ভিখারী। কিন্তু পথের ধূলায় কুক্কুরের মত পড়ে থেকেও নটীর ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করেও ভুলতে পারিনি ধ্রুবা আমার।"

সহসা কুমার চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আত্মসম্বরণ করিয়া যখন তিনি মুখ তুলিলেন, তখন ধ্রুবদেবীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দত্তদেবী নিঃশব্দে রোদন করিতেছিলেন। এক রামগুপ্ত ব্যতীত মন্ত্রগৃহের সকলেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত। মাতার নয়নে অশ্রু দেখিয়া চন্দ্রগুপ্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা, ক্ষমা কর। তোমার আদেশে সুখের ক্রোড়ে লালিত রাজপুত্রের কোমল হৃদয় গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়ে উদরান্নের জন্য ভিক্ষা করি, কিন্তু তবু ভুলতে পারিনি যে, ধ্রুবা আমার। জীবনে কখনও মদ্যপান করিনি, শেষে ধ্রুবাকে ভোলবার জন্যে আকণ্ঠ সুরা পান করেছি, উন্মত্ত হয়েছি, কিন্তু অবশেষে সুরাও ব'লে দিয়েছে, ভোলা যায় না। নানা প্রকার অনাচার করতে গিয়েছি, কিন্তু অশরীরী কুয়াসার মত স্বচ্ছ ব্যবধান আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, তা থেকে ধীরে ধীরে ধ্রুবার অস্পষ্ট অপ্রতিম মূর্ত্তি ভেসে ওঠে, কিন্তু স্পর্শ করতে গেলে আলোকে মিশিয়ে যায়। সেই ধ্রুবা, সে আমি। আমি জীবিত থাকতে ধ্রুবা মথুরায় যাবে? অসম্ভব মা।"

দত্তদেবীর কোলে মুখ লুকাইয়া ধ্রুবদেবী বলিলেন, "কখনও তোমার আদেশ অবহেলা করিনি প্রভু, কিন্তু তুমি আজ অনুমতি কর, এ পাপ পাটলিপুত্র নগর পরিত্যাগ করে যাই। দেবতা সাক্ষী, তুমি আমার স্বামী, কিন্তু তুমি ত আমাকে গ্রহণ করনি, বিপদে রক্ষা করনি? তোমার জ্যেষ্ঠ, মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত আমার ভাসুর। তিনি নিত্য আমাকে অনাথা অবলা দেখে অযথা প্রেম-সম্ভাষণ করেন। তাঁর মন্ত্রী রুচিপতি আমাকে উদ্যান-বিহারে নিয়ে যেতে চায়। পিতা দেহের রক্তে ঐ আর্য্যপট্ট প্লাবিত ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেছেন। আমার কাছে এ পাটলিপুত্র নরক, এর তুলনায় মথুরা স্বর্গ, তাই অঙ্গীকার করেছি মথুরায় যাব।"

চন্দ্রগুপ্ত অর্দ্ধক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি তীব্রকণ্ঠে রামগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি ধ্রুবাকে মথুরায় যেতে আদেশ করেছেন?"

রাম। কি করি ভাই? তোমরা কেউই ছিলে না। শকরাজা প্রবল, প্রয়াগ অধিকার ক'রে ব'লে পাঠিয়েছে যে ধ্রুবদেবীকে না পাঠালে পাটলিপুত্র ধ্বংস করবে।

চন্দ্র। কি ভীষণ কথা মহারাজ। এখনই শকরাজার এই ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করা উচিত।

রাম। ভাই, রাজভাণ্ডার অর্থশূন্য, সেনাদল বিশৃঙ্খল,

নাগরিকেরা বিদ্রোহী, ধ্রুবদেবীকে আজই মথুরায় না পাঠালে, পাটলিপুত্রের আর রক্ষা নাই।

এক লম্ফে আর্য্যপট্টে আরোহণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্ তোকে ক্ষত্র কুলাঙ্গার, ধিক্ রামগুপ্ত, শত ধিক্! তুই কি ভেবেছিস্ যে চির-শত্রুর আদেশে কুলনারীকে মথুরায় পাঠিয়ে তুই চিরদিন নিশ্চিন্ত মনে পাটলিপুত্রের আর্য্যপট্টে বসে থাকবি?"

ভয়ে রামগুপ্ত আর্য্যপট্ট হইতে উঠিতে গিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেলেন এবং চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইতে গেলে প্রাণভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মেরো না, প্রাণে মেরো না।"

রামগুপ্তকে আবার সিংহাসনে বসাইয়া এবং সামরিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের জয়! আমি মহারাজের অতি দীন প্রজা, শ্রীচরণে আমার দু'টি ভিক্ষা আছে।"

রাম। ভিক্ষা কি ভাই? তুমি যা বলবে, তাই হবে। সাম্রাজ্য কি তোমারও পিতার সাম্রাজ্য নয়? তোমার আদেশ এখনই নগরে নগরে প্রতিপালিত হবে।

চন্দ্র। মহারাজ, প্রথম ভিক্ষা এই যে বংশের চিরশত্রুর আদেশে কুলবধূকে অরিপুরে পাঠিয়ে গুপ্ত-রাজবংশের উচ্চশির রাজন্যসমাজে অবনত ক'রো না। দ্বিতীয় ভিক্ষা, চন্দ্রগুপ্ত জীবিত থাকতে ধ্রুবার অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'রো না। রুদ্রধরের কন্যা অঙ্গীকার করেছে যে, রাজাদেশে সে মথুরায় যাবে, সে অঙ্গীকার রক্ষা হবে কিন্তু আংশিক মাত্র, সম্পূর্ণরূপে নয়। ধ্রুবার বেশ যাবে, কিন্তু সে বেশে যাবে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র, চন্দ্রগুপ্ত। মহারাজ, শকরাজার দূতকে ডেকে বলে দাও যে, মহাদেবী ধ্রুবদেবী সন্ধ্যার অন্ধকারে মথুরায় যাত্রা করবেন। ধ্রুবা, আমার আদেশ, মাতার সঙ্গে যাও। যদি কখনও ফিরে আসি, তবে সাক্ষাৎ হবে। তোমার অঙ্গীকার রক্ষা হবে, তোমার বেশ মথুরায় যাবে, কিন্তু সে-বেশে যাবে চন্দ্রগুপ্ত।

আকস্মিক উত্তেজনা শেষ হইলে ধ্রুবদেবী দত্তদেবীর কোলে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি হ'ল মা?" নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত প্রমুখ বৃদ্ধ মহানায়ক-গণ মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। ধ্রুবদেবীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বাদশ বৃদ্ধ কুমার চন্দ্রগুপ্তকে বেষ্টন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত, তুমি একাকী মথুরায় যেতে পাবে না। সমুদ্রগুপ্তের অন্নে প্রতিপালিত পাটলিপুত্রের অনেক কুক্কুর তোমার সঙ্গে যাবে।" দ্বাদশ বৃদ্ধের দ্বাদশ অসি প্রখর সূর্য্যালোকে ঝলসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রগৃহের প্রত্যেক পুরুষ সামরিক প্রথায় কোষমুক্ত অসি দিয়া বীরের সম্মান প্রদর্শন করিল। সহস্র অসিফলকের ঝলকে ভীত মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত পলাইতে গিয়া দ্বিতীয়বার সিংহাসন হইতে পড়িয়া গেলেন। তখন চন্দ্রগুপ্ত মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা, তবে মগধ এখনও মরেনি? মহারাজাধিরাজ, পট্টমহা-দেবী ধ্রুবদেবী কি একাকিনী মথুরায় যেতে পারেন? আদেশ করুন পঞ্চশত কুলকামিনী তাঁর সঙ্গে যাবে।" বৃদ্ধ জয়নাগ নাচিতে নাচিতে বলিল, "পঞ্চশত কুলকামিনীর বেশে পঞ্চশত মাগধ পুরুষ।"

রাম। যা ইচ্ছা কর ভাই, এ রাজ্য তোমারই।

চন্দ্র। কেবল একজন নারী চাই।

মাধবসেনা। কুমার, পুরস্কার প্রার্থনা করি।

দত্তদেবী। তুমি, নটীমুখ্যা, তুমি?

মাধব। হাঁ, আমি। মহাদেবী, নটীকে যদি নারীত্বের অধিকার দাও, তাহ'লে নটী মাধবসেনা কুক্কুরীর মত প্রভুর সঙ্গে যাবে।

তখন চন্দ্রগুপ্ত দত্তদেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া মাতৃ-পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, অনুমতি কর মা। যদি মরণ আসে, পিতার মুখ স্মরণ ক'রে একবার হেসো।

সিংহীসদৃশ বৃদ্ধা মহাদেবীর চক্ষু শুষ্কই রহিল, তিনি অকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, জয়ী হও, কুলগৌরব রক্ষা কর। এমন মা তোকে গর্ভে ধরেনি, চন্দ্র, যে বীরের কার্য্যে পুত্রের বিপদ আশঙ্কা ক'রে বিদায়কালে চোখের জল ফেল্‌বে।"

চন্দ্রগুপ্ত উঠিয়া বলিলেন, "বিদায় মা, বিদায় ধ্রুবা।"

পরে রামগুপ্তকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "বিদায় মহারাজ।"

সকলে মন্ত্রগৃহ পরিত্যাগ করিলে ধ্রুবদেবী বলিলেন, "মা, আমার উপর স্বামীর আদেশ শুনেছ? মহাশ্মশানে তোমার ভিক্ষালব্ধ অন্নের এক কণা দিও, দাসীর পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

সন্ধ্যায় প্রখর রবিরশ্মিপাত মন্দীভূত হইলে সমুদ্রগুপ্তের লুপ্ত গৌরব আসন্ন অন্ধকারের ম্লানছায়ায় পাটলিপুত্র নগর পরিত্যাগ করিল। ভাস্কর অস্তমিত হইয়া আবার আদিত্যরূপে উদিত হইলেন, কিন্তু সে রামগুপ্তের রাজত্বের অবসানের পরে।

তৃতীয় প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কালিন্দীর কালো জলে বিধৌত চরণতল ভীষণদর্শন রক্তাশ্মনির্ম্মিত কুষাণ-বংশীয় সম্রাটগণের প্রাসাদে আজ মহা সমারোহ। সম্রাট প্রথম কনিষ্ক শতাব্দীত্রয় পূর্ব্বে যখন চীনবাহিনী বিধ্বংস করিয়া মথুরায় ফিরিতেছিলেন, তখনও এত সমারোহ দেখা যায় নাই। কারণ ধ্রুবদেবী আসিতেছেন। যে গুপ্তসম্রাটের অঙ্গুলিহেলনে ষাহীষাহানুষাহী দেবপুত্র শকরাজ কম্পিত হইতেন, সেই সমুদ্রগুপ্তের পুত্র আজ শকরাজের ভয়ে বিবাহিতা পট্টমহাদেবী ধ্রুবদেবীকে মথুরায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। এতদিনে শকজাতির চিরলুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। মথুরায় এমন মহা মহোৎসব অতিবৃদ্ধেরও স্মরণাতীত।

পথে শত শত শক-ললনা সুসজ্জিত হইয়া লাজপাত্র হস্তে শ্রেণী বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শক-বালকগণ খেলার ধনুঃশর লইয়া গুপ্ত-সম্রাট রামগুপ্তকে ক্রীড়াচ্ছলে বধ করিতেছে। কিন্তু মথুরার হিন্দু অধিবাসীদের মুখে কালিমার দীর্ঘরেখা পড়িয়াছে। কারণ ধ্রুবদেবীর মথুরায় আগমন আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুজাতির অপমানের সূচনা। ধ্রুবদেবী গুপ্ত-বংশের কন্যা নহেন যে, শকরাজ তাঁহার পাণিপীড়ন করিবেন। গুপ্তবংশের সম্রাট রামগুপ্ত তাঁহার পরিণীতা পত্নী ও পট্টমহিষীকে শকরাজের ভয়ে তাঁহার পদসেবা করিতে মথুরায় পাঠাইয়াছেন।

অতি প্রত্যূষে মহারাজাধিরাজ দেবপুত্র, কুষাণপুত্র ষাহি সপ্তম বাসুদেব বিস্তৃত সভামণ্ডপে ধ্রুবদেবীর অপেক্ষায় আসন গ্রহণ করিয়াছেন। মালব ও সৌরাষ্ট্র হইতে অগণিত শকরাজা ও শকসেনানীগণ মাগধ যুদ্ধের প্রারম্ভে মথুরায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সমুদ্রগুপ্তের বংশের এই দারুণ অপমান দেখিবার জন্য সভামণ্ডপে সমবেত হইয়াছেন। সৌরাষ্ট্রের রাজা মহাক্ষত্রপ পৌরস্বামী রুদ্রসিংহ, উজ্জয়িনীর রাজা স্বামী ক্ষত্রপ জয়দাম প্রভৃতি স্বাধীন রাজারা শকজাতির লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য বহুকাল পরে শক-সাম্রাজ্যের রাজধানী মথুরায় আসিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা একজন বাসুদেবের সিংহাসনের বামপার্শ্বে অপরজন দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছেন। বিস্তৃত সভামণ্ডপে অসংখ্য সুখাসনে পঞ্চনদ, সৌরসেন, আনর্ত্ত, কুকুর, অশ্মক, অপরান্ত, মালব প্রভৃতি দেশের শক-সামন্তমণ্ডলী উপবিষ্ট। সকলেই বুঝিয়াছেন যে, সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক অপহৃতা শক-রাজলক্ষ্মী আজ আবার শকরাজপুরে ফিরিয়া আসিতেছেন। সেইজন্য তোরণে তোরণে মঙ্গলবাদ্য, মণ্ডপের পথ গন্ধবারিসিক্ত ও পুষ্পাচ্ছন্ন। এই মহোৎসবের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারী ও অনুচরেরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া আছে।

সহসা একজন শক-সৈনিক সিংহাসনের কাছে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ রাজাধিরাজের জয়! পরমেশ্বরী পরমভট্টারিকা মগধের পট্টমহাদেবী ধ্রুবদেবী পাঁচ শত কুলমহিলা সঙ্গে লইয়া সভামণ্ডপের দুয়ারে উপস্থিত।"

বাসুদেব। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র যে এত সহজে অধীনতা স্বীকার করবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

স্বামী রুদ্রসিংহ। মগধের গুপ্ত-বংশ যে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

জয়দাম। রামগুপ্ত যে এতদূর কাপুরুষ, তা কেউ বুঝতে পারে নি। সে নির্ব্বোধ, নিজের পট্টমহিষীকে পাঠিয়ে প্রয়াগ আর কৌশাম্বী ফিরে চেয়ে পাঠিয়েছে।

দামসেন। মহারাজ, যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, হিমালয় থেকে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত সমস্ত শকপ্রধান মহারাজের

আদেশে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, নাসীরগণ প্রয়াগে আর কৌশাম্বীতে মহারাজের আদেশের অপেক্ষা করছে।"

বাসুদেব। আমি আশা করেছিলাম যে পট্টমহাদেবীকে মথুরায় পাঠাতে বল্‌লে রামগুপ্ত ক্রোধে অন্ধ হয়ে দূতের প্রতি কটুভাষা প্রয়োগ করবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেনা দুই দিক থেকে মগধ আক্রমণ করবে। সমুদ্রগুপ্তের কুলাঙ্গার পুত্র যে আমার আদেশ পাওয়ামাত্র তার ধর্ম্মপত্নীকে মথুরায় দাসীবৃত্তি করতে পাঠিয়ে দেবে, তা কখনও আমার মনে স্থান পায়নি।

জয়দাম। মহারাজ, সমুদ্রগুপ্ত না নিজেকে ক্ষত্রিয় ব'লে পরিচয় দিত, এই কি ক্ষত্রিয়ের আচরণ?

বাসু। আবহমানকাল থেকে শুনে আসছি যে, ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ের কাছ থেকে অসি, অশ্ব ও স্ত্রী কামনা করা যুদ্ধ ঘোষণা করার সমান। রামগুপ্ত যে রাজ্যের ভয়ে নিজের ধর্ম্মপত্নীকে দাসীবৃত্তি করতে মথুরায় পাঠিয়ে দিয়েছে, একথা শুনলে লজ্জায় ভারতের ক্ষত্রিয়সমাজ মস্তক অবনত করবে।

রুদ্র। মহারাজ, গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী যে দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইলেন?

বাসু। মহাক্ষত্রপগণ, আমি বিষম বিপদে পড়েছি। আমি ত রামগুপ্তের মহিষীকে অন্তঃপুরে স্থান দেব ব'লে চেয়ে পাঠাই নি? কেবল রামগুপ্তকে অপমান করবার জন্যে এই কথা ব'লে পাঠিয়েছিলাম। এখন এই বালিকাকে নিয়ে করি কি?

দাম। সে যদি সুন্দরী হয়, তাহ'লে প্রাসাদে নর্ত্তকী হ'তে পারে।

জয়দাম। না, তাহ'লেও যথেষ্ট অপমান করা হবে না। ধ্রুবদেবীকে গুরুতর অপমান ক'রে পাটলিপুত্রে ফিরিয়ে দেওয়া যাক। আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করা হউক।

বাসু। যুদ্ধঘোষণার আর বাকী কি জয়দাম? কৌশাম্বী আর প্রয়াগ অধিকার করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠান দুর্গ অবরুদ্ধ। তথাপি বেত্রাহত কুক্কুরের মত রামগুপ্ত মহাদেবীকে মথুরায় পাঠিয়ে দিলে। এখন কি করা যায়?

রুদ্রসিংহ। মহারাজ, বিষধর সর্প দেখলেই মারতে হয়। আপনি রামগুপ্তের কাতরতা দেখে ভুলবেন না। সমুদ্রগুপ্ত মহারাজকে কি ভীষণ অপমান করেছিল, মনে নেই কি? ভারতবর্ষ থেকে এই অবসরে গুপ্ত-রাজ্যের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত মুছে ফেলতে হবে।

বাসু। দেখ রুদ্রসিংহ, শরণাগত বিনাশ রাজধর্ম্ম নয়। যে-রাজা আদেশমাত্র নিজের ধর্ম্মপত্নীকে শত্রুপুরে পাঠিয়ে নিজের হাতে কুলকলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নেয়, সে শরণাগত সৈনিক, তুমি মগধের মহাদেবীকে সিংহাসনের কাছে নিয়ে এস।

সৈনিক। মহারাজ, মগধরাজের দণ্ডধর সভামণ্ডপের দুয়ার পর্য্যন্ত এসেছে।

বাসু। দণ্ডধরকে নিয়ে এস।

সৈনিক চলিয়া গেলে মহাক্ষত্রপ স্বামী রুদ্রসিংহ উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে জানু পাতিয়া করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, এ সময়ে দুর্ব্বল হবেন না। অসহায়া, অবলা নারীকে দেখে যদি গুপ্ত-বংশ ধ্বংসের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন, তাহ'লে শক-রাজবংশ আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না।"

পশ্চাৎ হইতে দামসেন বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, অনুমতি করুন, ধ্রুবদেবী আসবামাত্র তাঁকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি।"

এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত সৈনিক মাগধ দণ্ডধরকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। মাগধ দণ্ডধর সভামণ্ডপের নিয়মানুসারে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, "মহারাজ, রাজাধিরাজ দেবপুত্র, কুষাণপুত্র, সাহীষাহানুষাহী শ্রী শ্রী শ্রী বাসুদেবের জয়! মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর, পরমভট্টারক শ্রীরামগুপ্ত দেবের আদেশে পরমেশ্বরী, পরমবৈষ্ণবী, পরমভট্টারিকা পট্টমহাদেবী শ্রীমতী ধ্রুবদেবী মহারাজের চরণ দর্শনে মথুরায় আগমন করেছেন।"

মগধের দণ্ডধর প্রণাম করিলে বাসুদেব বলিলেন, "দামসেন, মগধের পট্টমহাদেবীকে এইখানে নিয়ে এস।"

তখন মগধের দণ্ডধর আবার প্রণাম করিয়া বলিল, "মহারাজ, মগধের পট্টমহাদেবী রাজসম্মানের যোগ্যা।"

সঙ্গে সঙ্গে স্বামী রুদ্রসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "রামগুপ্তের স্ত্রী দাসীবৃত্তি করতে মথুরায় এসেছে, মথুরায় দাসীরা রাজসম্মান পায় না।"

মগধের দণ্ডধর অত্যন্ত বিনয়ের সহিত প্রণাম করিয়া জয়দামের সহিত বাহিরে চলিয়া গেল। তখন বাসুদেব বলিলেন, "শুনছি রামগুপ্তের স্ত্রী পাঁচ শত কুলমহিলা নিয়ে এসেছেন, সকলকে ত এখানে ধরবে না?"

স্বামী রুদ্রসিংহ বলিলেন, "কতকগুলো আসুক না?" এই সময়ে জয়দাম ও মগধের দণ্ডধরের সহিত স্ত্রীবেশী চন্দ্রগুপ্ত, দেবগুপ্ত রবিগুপ্ত প্রমুখ শতাধিক পুরুষ ও মাধবসেনা সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, সবার সম্মুখেই চন্দ্রগুপ্ত ও মাধবসেনা। চন্দ্রগুপ্তকে দেখিয়া বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মধ্যে ধ্রুবদেবী কে?"

তখন চন্দ্রগুপ্ত অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিলেন। জয়দাম একটা কুৎসিত পরিহাস করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, স্ত্রীলোকটি বড় স্থুলকায়া।"

রুদ্রসিংহ বলিলেন, "রামগুপ্ত কি অন্ধ? দেখে শুনে এমন কুৎসিৎ স্ত্রীলোককে কি ব'লে পট্টমহিষী করলে?"

দামসেন। মহারাজ, রাজাধিরাজের আদেশ?

বাসুদেব। এই স্থুলাঙ্গী কুৎসিতা স্ত্রীলোকটিকে কিছুতেই অন্তঃপুরে স্থান দিতে পারা যায় না। বৎস দাম, মগধের পট্টমহিষীকে দাসগৃহে নিয়ে যাও।

বৎসদাম। মহারাজ, এই দাসীটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করব কি?

এই সময়ে মাধবসেনা বলিয়া উঠিল, "মহারাজ রাজাধিরাজের জয়! পরমেশ্বরী, পরমভট্টারিকা, পরমবৈষ্ণবী, পট্টমহাদেবী ধ্রুবদেবী কিঞ্চিৎ স্থুলকায়া বটেন, তথাপি তিনি মগধের পট্টমহাদেবী। দাসগৃহ কি তাঁর যোগ্য স্থান?"

রুদ্র। মহারাজ, রামগুপ্ত যতগুলি পাঠিয়েছে তার মধ্যে এইটিই প্রাসাদে স্থান পাবার যোগ্য। অবশিষ্টগুলিকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক।

মাধবসেনা বলিল, "মহারাজ, ধ্রুবদেবী রাজচরণে কিছু নিবেদন করতে চান। কি বল্‌বে, এগিয়ে এসে বল না ঠাকরুণ?"

চন্দ্রগুপ্ত অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি কুলকন্যা, সমুদ্রগুপ্তের পুত্রবধূ, মগধের পট্টমহাদেবী, স্বামীর আদেশে আপনার চরণসেবা করতে এসেছি।"

বৎসদাম। বাছার যেমন রূপ, তেমনি গলা!

দাম। মগধের নারীকণ্ঠের মত অলঙ্কার শিঞ্জন কি মধুর!

তখন প্রত্যেক অবগুণ্ঠনের মধ্যে অসি ও বর্ম্ম বাজিয়া উঠিয়াছে।

বাসু। আর শুনতে চাই না। দামসেন এই কুৎসিতা নারীর কর্কশ কণ্ঠস্বর আমার অসহ্য, তুমি এখনই এদের প্রাসাদ থেকে দূর ক'রে দাও।

চন্দ্রগুপ্ত। মগধকুলমহিলা কখনও এ অপমান সহ্য করবে না।

মুহূর্ত্তমধ্যে সকল মাগধ-বীর অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া অসি গ্রহণ করিল। বৃদ্ধ সপ্তম বাসুদেব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসঘাতকতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কে আছ?"

রুদ্রসিংহ চীৎকার করিয়া প্রতীহারদের ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ভয়ে জয়দাম, বৎসদাম প্রমুখ শকপ্রধানদের মুখ শুকাইয়া গেল। তখন চন্দ্রগুপ্ত অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধ সপ্তম বাসুদেবকে বলিলেন, "সে কি কথা, প্রাণেশ্বর? আমাকে প্রাসাদ থেকে দূর ক'রে দেবে? তোমার বিশাল হৃদয় আলিঙ্গন করবার জন্যে আমার অসি যে নৃত্য করছে?"

রবিগুপ্ত। পট্টমহাদেবী ধ্রুবদেবীকে পেয়েছ মহারাজ বাসুদেব?

বাসুদেব। এ যে মহাবলাধিকৃত রবিগুপ্ত!

রুদ্রসিংহ। আর আমাদের গুপ্তচরেরা বল্‌লে কি না যে সমুদ্রগুপ্তের পুরাতন কর্ম্মচারীরা সকলেই পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করেছে।

দেবগুপ্ত বলিলেন, "কি বন্ধু, কেমন আছ? যমুনার যুদ্ধ এত শীঘ্র ভুলে গেছ?"

রুদ্রসিংহ। সর্ব্বনাশ! বৃদ্ধ শৃগাল দেবগুপ্ত! মহানায়ক দেবগুপ্ত, এই কি ক্ষত্রিয়ের আচরণ?

রবিগুপ্ত। যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রে গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ, প্রয়াগ অধিকার, প্রতিষ্ঠান অবরোধ, মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ, এ সমস্তই ক্ষত্রিয়ের আচরণ!

বাসুদেব। ক্ষান্ত হও, রুদ্রসিংহ। তোমরা কোন্ সাহসে সভামণ্ডপে প্রবেশ করেছ?

চন্দ্রগুপ্ত। যে-সাহসে শক-কুক্কুর গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পট্ট-মহাদেবীকে প্রার্থনা করেছিল। যে-কুক্কুর বার-বার লেলিহান জিহ্বাদ্বারা সমুদ্রগুপ্তের পদলেহন ক'রে আত্ম-রক্ষা করেছিল, তার মুখে এ কথা শোভা পায় না। ওরে শক কুলাঙ্গার, তুই ভেবেছিলি যে মগধের অবলা নারী, অসহায়া দাসী পরিবৃতা হয়ে তোর চরণসেবা করতে আসছে।

বাসুদেব। তুমি কে তা জানি না। যদি ক্ষত্রিয় হও, ক্ষত্রিয়াচার রক্ষা কর।

চন্দ্রগুপ্ত। বাসুদেব, আমি পট্টমহাদেবী দত্তদেবীর গর্ভজাত সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। আমি তোমাকে গুপ্ত হত্যা করতে আসিনি, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে এসেছি।

তাহার পর কথা শেষ হইয়া গেল। যখন অসির কার্য্যও শেষ হইল, তখন শক-প্রধানেরা ধূলিশয্যায়। বৃদ্ধ দেবগুপ্ত প্রস্তাব করিলেন যে, এইবার ফিরিয়া যাওয়া উচিত। তখন চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার চরণধারণ করিয়া বলিলেন, "তাত, যখন পাটলিপুত্র ছেড়ে এসেছিলে, তখন কি ভেবেছিলে আবার ফিরে যেতে পারবে? আমরা সকলেই বৈষ্ণব, এ মথুরা ভগবানের পুণ্য লীলাক্ষেত্র। মথুরামণ্ডলে এখনও সহস্র সহস্র বৈষ্ণব আছে, তারা বহু শত বৎসর ধরে বর্ব্বর শকের পদতলে পড়ে আছে। তাত, চল একবার মথুরার রাজপথে দাঁড়াই, ভগবান বাসুদেবের নাম ক'রে দেখি, সৈন্য সংগ্রহ হয় কি না। যদি না হয়, তাহ'লে এই কৃষ্ণচরণরেণুপূত মথুরায় এ দেহ পাত ক'রে যাব।"

অশ্রুসিক্তনয়নে বৃদ্ধ রবিগুপ্ত বলিয়া উঠিল, "ভগবান তোমাকে ব্রতী করেছেন, সুতরাং আমাদের পরামর্শ নেবার প্রয়োজন নেই। এ দেবকার্য্য, পুত্র, এ ব্রতে তুমি পুরোহিত।"

প্রাসাদের তোরণে দাঁড়াইয়া মাধবসেনা যখন মধুকৈটভারি কৃষ্ণের স্তুতি আরম্ভ করিল, তাহার দশ দণ্ডের মধ্যেই মথুরা মুক্ত হইল।

জীবন-নাট্য

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

হাসিতে হাসিতে হায় আসে ওরে মিলন-বাসর,
একটি নিশার শেষে কেঁদে কেঁদে মাগেরে বিদায়;
হাসিতে হাসিতে ওরে আসে হেথা মধুর যৌবন,
পূর্ণিমার স্বপ্ন সম অন্ধকারে পুনঃ মিশে যায়।
বসন্ত নিমেষে আসি কুঞ্জে কুঞ্জে করে তোলপাড়,
কোকিল পাপিয়া ভৃঙ্গ গাহে সেথা মিলনের গান;
নিদাঘ দুর্ব্বাসা সম পিছে আসে চোখ রাঙাইয়া;
বৈশাখের তপ্ত-শ্বাসে ঝরে যায় আনন্দের প্রাণ।
কবি যবে কাব্য-স্বপ্নে রহে ওরে সংসার ভুলিয়া,
দারিদ্র্য পিছন থেকে শাসাইয়া ছাড়ে হুহুঙ্কার;
সুখের পিছনে দুঃখ হাসে হায় আসেরে লুকায়ে,
আলোক-সৈকত চুমি গর্জ্জিতেছে অনন্ত আঁধার!
এ দেহের কান্তি-তলে জরা সে গোপনে ওঠে কাঁদি,
জীবনের পদ্মকোষে মৃত্যু হায় আছে বাসা বাঁধি!

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, সমাজ ও চিন্তাধারার কথা, অথবা সে-যুগের মহাপুরুষগণের চরিত-কথা জানিতে হইলে সেকালের সাময়িক পত্রগুলি অপরিহার্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর উপাদান দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে,—কোন পুরাতন বাংলা কাগজেরই সম্পূর্ণ ফাইল পাইবার উপায় নাই। যাহা পাওয়া যায় তাহাও আবার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে। নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া আমি অনেকগুলি সাময়িক পত্রের অসম্পূর্ণ ফাইল দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহা হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধৃত করিলাম; উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-লেখকের নিকট এ-গুলির মূল্য থাকিতে পারে।—

বিদুষী বঙ্গমহিলা

(সম্বাদ ভাস্কর, ১৯ এপ্রিল ১৮৫১। ৭ বৈশাখ ১২৫৮)

শ্রীযুত বেথুন সাহেব শুভক্ষণে কলিকাতা নগরে বালিকা শিক্ষার সূত্র সঞ্চার করিয়াছিলেন তাঁহার উৎসাহ দর্শনে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরাও স্থানে২ স্ত্রীশিক্ষালয় করিতে উদ্যোগী হইলেন, বারাসত, নিবাধই প্রভৃতি কতিপয় গণ্ডগ্রামে বালিকা শিক্ষালয় হইয়াছে, তেলিনীপাড়ার ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগের [অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়] বিদ্যালয় হইলেই অন্যান্য মহাশয়েরাও ঐ সকল মান্যবরদিগের কার্য্যের পশ্চাৎ শোভা করিবেন।

অদূরদর্শিরা কহেন মহিলারা অবলা, তাহারদিগকে শিক্ষা দিলেও সুশিক্ষা করিতে পারিবেক না, কেহ২ ইহাও বলেন স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা দান করিয়া উপকার কি, আমরা এক স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিপক্ষ পক্ষের এই দুই আপত্তির উত্তর করি, অনুভব হইতেছে আমারদিগের প্রস্তাব পাঠে বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা ঐ স্ত্রীলোককে দেখিতে উৎসাহ প্রকাশ করিবেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রাম নিবাসি ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীযুত চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী দ্রবময়ী দেবী বালিকাকালে বিধবা হইয়াছিলেন, আমারদিগের অনুভব হইতেছে ইংরেজাদি পাঠক মহাশয়েরা অনেকে ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে তাহা জানেন না অতএব এই বিষয়টাও সংক্ষেপে লিখিয়া যাই।

বৃদ্ধ পরম্পরা শ্রুত আছে ব্যাসদেব ব্রাহ্মণবোধে এক ধীবরকে নমস্কার করিয়াছিলেন তাহাতে ধীবর ভীত হইয়া কহিল মহাশয় আমি জালজীবী, ব্রাহ্মণ নহি, আমাকে কি জন্য মহাশয় নমস্কার করিলেন, তাহাতেই ব্যাস তাহাকে যজ্ঞোপবীত দেন, সেই ব্যক্তির বংশেরাই ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা কৈবর্ত্ত জাতির পুরোহিতের কর্ম্ম করেন, কিন্তু ব্যাস ধীবর কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য মাতৃকুল ব্রাহ্মণ করিয়াছেন ইহাও হইতে পারে।

দ্রবময়ী বালিকা কালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সাতখানা মূল সাতখানা টীকা এবং অভিধান পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার স্বকন্যার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং ন্যায় শাস্ত্রের কিয়দংশও শিক্ষা দিলেন, পরে দ্রবময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভাগবতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণে দ্রবময়ীর বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর, পুরুষেরা বিংশতি বৎসর শিক্ষা করিয়াও যাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, দ্রবময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫।১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার টোলে ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার, ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন, দ্রবময়ী কর্ণাট রাজার মহিষীর ন্যায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার করেন না, আপনি এক আসনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মস্তক এবং মুখ নিরাবরণ থাকে, তিনি চার্ব্বঙ্গী যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালীন অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, গৌড়ীয় ভাষায় বিচারেতেও পরাস্ত হয়েন, দ্রবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিম্বা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায়, এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার উৎসাহ না হয় এবং তাঁহার আহারাচ্ছাদনাদির সাহায্যার্থ কোন দয়াশীল মহাশয় ব্যাগ্র হইবেন না, প্রত্যক্ষের অপলাপ নাই, যাঁহার ইচ্ছা হয় বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রবময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন আমরা দ্রবময়ীর বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয় তবে আমারদিগকে মিথ্যাজল্পক বলিবেন, এরূপ সতী বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।*

বাঙালীর রাষ্ট্র-চেতনা

(সংবাদ প্রভাকর, ২ মার্চ্চ ১৮৫২। ২০ ফাল্গুন ১২৫৮)

আমরা অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নস্থ বিষয় অবিকল প্রকাশ করিলাম।—

---

* শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ মহাশয়ের সৌজন্যে এই সংখ্যা 'সম্বাদ ভাস্কর' দেখিবার সুবিধা হইয়াছে।

"এতদ্দেশীয় লোকেরা বহুকালাবধি পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে স্বাধীনতার রসাস্বাদন একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন, রাজকীয় বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করেন না, ব্যবস্থাপক সভা হইতে সময়েং যে সমস্ত নিয়মাদি প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার দোষ গুণ বিবেচনা জন্য কোন ব্যক্তিই বিশিষ্টরূপ মনোযোগী নহেন, যাঁহারা গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত কোন কার্য্যের প্রতীক্ষা রাখেন তাঁহারাই তাহার কোনং অংশ পাঠ করিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত রাজ্যের কুশল অভিলাষে কেহই নিয়মাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, রাজকীয় বিষয়ে প্রজাদিগের এপ্রকার অমনোযোগ ও অনবধানতা অবলোকন করিয়া গবর্ণমেন্টও এক প্রকার স্বেচ্ছাচারি হইয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ নিয়মাদি প্রস্তুত করত অবাদে তাহা নির্দ্ধারিত করিতেছেন, কৌন্সেলর মেম্বরদিগের মধ্যে যদ্যপি কোন মহাশয় কোন প্রকার অন্যায্য নিয়মের প্রতি কোন আপত্তি করেন, অধিকাংশ মেম্বরের অনভিমত জন্য তাহা প্রায় অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার সকল পরিশ্রম পঙ্ক মধ্যে পতিত হয়, এবং তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়াও লজ্জিত হয়েন, এতদ্দেশীয় লোকেরা যদ্যপি রাজকীয় বিষয় সকল চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন তবে অন্যায় ক্লেশকর নিয়মাদি কদাচ নির্দ্ধারিত হইত না, কোন প্রকার নিন্দনীয় নিয়মের পাণ্ডুলিপি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইলে প্রজারা ঐক্য বাক্য হইয়া তাহার প্রতি আপত্তি করিলে ব্যবস্থাপকদিগেরও চৈতন্য হইত, তাহারা যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে সেই আপত্তিপুঞ্জ নিষ্পত্তি করণে অপারগ হইয়া তন্নিয়ম প্রচলিত করণে অক্ষম হইতেন, আর রাজকীয় বিষয়ে প্রজাদিগের বিহিত মনোযোগ দৃষ্টি করিয়া ব্যবস্থাপক মহাশয়ের অন্তঃকরণেও বিবেচনার উদ্রেক হইত এবং কোন প্রকার নূতন নিয়মের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে হইলে তিনি অতি সাবধানে লেখনী সঞ্চালন করিতেন, আমরা দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন হইয়াছি বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার অধীন হই নাই, মহাসভা পার্লিয়ামেন্টের মহামান্য মেম্বর মহাশয়েরা স্বদেশীয় রাজনিয়মের সুচারু বিধানমতে রাজকীয় বিষয়াদি বিবেচনা করণে আমারদিগের সম্যক্ ক্ষমতা দিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর মহাশয়েরা কোন প্রকার নিয়মাদি নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের ঘোষণা পত্রে তাহার পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়া প্রজাদিগের অভিমত গ্রহণ করিবেন, তাহাতে কোনরূপ আপত্তি উপস্থিত না হইলে তাহা পুনর্ব্বার রাজকীয় সভায় পাঠ করিয়া নির্দ্ধারিত করিবেন,এই বিধানমতে রাজকার্য্য পরিচার্য্য বিষয়ে প্রজাদিগের ক্ষমতা রক্ষা করা হইয়াছে, ফলতঃ কি আক্ষেপ। ঐ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে এতদ্দেশীয় লোকদিগের এমত অমনোযোগ যে এতাদৃশ ক্ষমতা স্বত্বেও তাঁহারা তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বদেশের কল্যাণ বর্দ্ধনে অনুরাগী হয়েন না, কেবল দাসত্ব স্বীকার করণেই ব্যগ্রচিত্ত, যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের অধিকারি, গবর্ণমেন্টের নিকটে মান্যরূপে প্রতিপন্ন, তাঁহারা প্রায় তাবতেই আহার বিহার আমোদ প্রমোদে মত্ত রহিয়াছেন, উত্তম বাড়ী সুদৃশ্য গাড়ি ও উদ্যান হইলেই পরম সুখ বোধ করেন, এবং আলস্যে দিনযাপন করিয়া চরিতার্থ হয়েন, বাবুদিগের বড়ং বৈঠকখানায় কেবল বড়ং গালগল্পের কাঁদুনি হইয়া থাকে বাবুরা তাহা শ্রবণ করিয়াই পুলকালোকে পরিপূর্ণ থাকেন, রাজ্যের অবস্থা বিষয়ে তাঁহারদিগের বিহিত মনোযোগ হইলে এই দেশ ক্রমেং কদাচ বিবিধ প্রকার ক্লেশকর নিয়মের অধীন হইত না, রাজপুরুষেরাও অতিসাবধানে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

ইংরাজেরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করেন একারণ এতদ্দেশে প্রবাসি হইয়াও উত্তম নিয়মের অধীনে আছেন, প্রদেশীয় জজ মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা নাই যে কোন অপরাধি ব্রিটিস প্রজার প্রতি দণ্ড বিধান করিতে পারেন, যদিও এই নিয়ম নিতান্ত রাজনীতি বিরুদ্ধ অধিবাসি ও প্রবাসিদিগের নিমিত্ত পৃথকং নিয়ম করাই অন্যায়, তথাচ বহুকালাবধি প্রচলিত রহিয়াছে, বিজ্ঞবর ব্যবস্থাপক শ্রীযুত তামস বেবিংটন মেকালি সাহেব ঐ অন্যায় নিয়মের উচ্ছেদ জন্য সুনিয়মের সূচনা ও তদ্বিষয়ে অতি বাহুল্যরূপে আপন অভিমত ব্যক্ত করাতে সাহেবেরা একেবারে দণ্ডবদ্ধ হইয়া গুরুতর আপত্তি করিয়াছিলেন, টৌনহালে ও অন্যান্য স্থানে বড়ং সভা হইয়াছিল বক্তৃতার ধুমধামের সীমা ছিল না, সকল স্থানে চাঁদার অনুষ্ঠান হইয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল, কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়েরা এইরূপ ধুমধামে ভীত হইয়া ঐ ব্যবস্থা সকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কৌন্সেলের, আলমারিতে রাখিয়াছিলেন, পরিশেষ মেং বেথুন সাহেবও ঐ নিয়মাবলি পুনঃ প্রকটন পূর্ব্বক তন্নির্দ্ধারণে যত্নবান হইয়া সেই প্রকার আপত্তিতে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধে ও টৌনহালে ও প্রদেশীয় অনেক স্থানে সভা হইয়াছিল মেং ডিকেন্স সাহেব টেবিলের উপর চেয়ার দিয়া তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, প্রাগুক্ত নিয়মের প্রতি সাহেবদিগের আপত্তির কিছুমাত্র নিবৃত্তি হয় নাই, কিন্তু কি পরিতাপ! স্বধর্ম্মত্যাগি নেটিব খ্রীষ্টানদিগের পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হইবার অন্যায় নিয়ম প্রচলিত হইয়া গেল, তাহার প্রতি বিশেষ আপত্তি কিছুই হইল না, কৌন্সেলের নিকটে প্রজারা যে আবেদন পত্র প্রদান করিলেন রাজপুরুষেরা এক বুসবি সাহেবের লিখিত পত্র দেখাইয়াই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, পরে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যাবাসি প্রজাদিগের স্বাক্ষরিত অপর যে আবেদন পত্র বিলাতে গিয়াছে তাহার ভাগ্যে কি হয় বলা যায় না, স্থলপথগামি ডাকযোগে তাহার কোন সংবাদ এপর্য্যন্ত আইসে নাই, যদ্যপি ঐ আবেদন পত্র পার্লিয়ামেন্টে অর্পিত হয়, তথাচ চার্টরের সময়ের মধ্যে তাহার কোন বিবেচনা হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে।

"পরন্তু কেহ এমত বলিতে পারেন যে স্বদেশীয়দিগের প্রতি ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের সম্যগনুরাগ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দ্বেষ আছে একারণ মেং মেকালি সাহেবের প্রস্তাবিত পুলিস নিয়ম রহিত এবং ল্যাক্সলোসি নামক ঘৃণিত নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু এই পক্ষপাতের প্রতীকারার্থ কোন প্রকার বিশেষ চেষ্টা না করিয়া আমরা যদ্রূপ দোষি হইয়াছি রাজপুরুষেরা তদ্রূপ দোষাস্পদ হয়েন নাই, এতদ্দেশীয় লোকেরা যদ্যপি রাজকীয় বিষয়ের চিন্তা করিতেন তাঁহারদিগের পরস্পর ঐক্য থাকিত এবং তাঁহারা কোন বিশেষ সভা করিয়া প্রথমতঃ কৌন্সেলের নিকট পরিশেষ বিলাতে আবেদন করিয়া ঐ পক্ষপাতের নিরাকরণ করণে যত্নবান হইতেন তবে অবশ্য তাহার প্রতীকার হইত, গবর্ণমেন্ট যাহা করেন প্রজারা তাহাতে সম্মত হয়েন একারণ পক্ষপাত মূলক নিয়মাদি অবাদে প্রচলিত হইয়াছে।

"ঐক্যই সকল দেশের সৌভাগ্য শুভোন্নতির মূল হইয়াছে যেদেশে ঐক্যর অভাব আছে সেই দেশই পরজাতির অধীন এবং সেই দেশেই অসভ্যতা ও অজ্ঞানতার আতিশয্য, ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরা কেবল একতার বলেই অবনীর অধিকাংশ অধিকার করিয়াছেন, এবং তদ্বিচ্ছেদে আমরা দিন ২ দীনতাকে প্রাপ্ত হইতেছি, যে সকল ব্যক্তি কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন পূর্ব্বক ইংরাজ জাতির কল কৌশল এবং রাজবুদ্ধির তাৎপর্য্য গ্রহণে পারগ হইয়াছেন তাঁহারাও একতার অভাবে কোন প্রকার চেষ্টা করিতে পারেন না, ঐক্যমতে সভা স্থাপনা পূর্ব্বক স্বদেশের সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করণের প্রথা এখানে অতি বিরল, সতী রীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে হিন্দুরা ঐক্যমতে যে এক ধর্ম্মসভা করিয়াছিলেন তাহাতে একতা বন্ধন হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহার উচ্ছেদ হইয়াছে, ঐ সভার কল্যাণেই দলাদলির ঢলাঢলি কাণ্ড এই বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পিতাপুত্রের

বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, জাতিমারণ, বিষ্ণুস্মরণ, গোময় ভক্ষণ, ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অনিষ্টের সূচনা হইয়াছে, ধর্ম্মসভার পরে রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক, ঐ সভায় মৃত মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সি-আমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি সুচারু বিচার হয়, জিলা নদীয়ার বর্ত্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচারু বিচার হইয়াছিল ঐ সময়ে সম্বাদ ভাস্কর পত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই, কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে. রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা ব্রহ্মসভা পক্ষে থাকাতে ধর্ম্মসভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, ঐ সভার পরে মৃত মহাত্মা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রযত্নে ভূম্যধিকারি সভা নামে অপর এক সভা স্থাপিত হয়, মেম্বর মহাশয়েরা যদি অনেক প্রকার সৎকর্ম্ম সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত গবর্ণমেণ্টের পত্রাদি লেখা চলিয়াছিল, দশ বিঘা পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্র ছাড় দিবার নিয়ম ঐ সভার উদ্যোগেই হইয়াছে, তথাচ তাহা স্থায়ি হয় নাই, দ্বারকানাথ বাবুর পতনেই সভার পতন হইয়াছে।

"বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্যোগী হইয়া দেশ হিতৈষিণী সভা নামে এক সভা করিয়াছিলেন ঐ সভায় সমুদয় বাঙ্গালা পত্র সম্পাদক-দিগের সংযোগ হইয়াছিল, যোড়াসাঁকোর ৺কমল বসুর বাটীতে যে কয়েকবার তাহার প্রকাশ্য সভা হয়, সেই সকল বারেই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোকেরা আগমন করিয়াছিলেন, নিয়মাদি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু কি অক্ষেপ ঐ সভার দ্বারা এমত কোন কার্য্য হয় নাই যদ্দারা তাহা আমারদিগের স্মরণীয় হইতে পারে, তদনন্তর ইয়ং বাঙ্গাল মতাবলম্বিদিগের দ্বারা বাঙ্গাল ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সভা স্থাপিত হয়, মান্যবর মেং জর্জ তামসন সাহেব এখানে আসিয়া ঐ সভায় কয়েকদিবস বক্তৃতা করিয়া মহা ধুমধাম করিয়াছিলেন, বাঙ্গাল স্পেক্টেটর নামে ঐ সভার মত পোষক একখানা পত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সাধারণের সাহায্য ও সংযোগ বিরহে তাহাও স্থায়ি হইল না, ইতিপূর্ব্বে বাগবাজার নিবাসি মৃত বাবু কাশীনাথ বসু ভূম্যধিকারি সভার পুনর্জ্জীবন দানে দৃঢ় সংকল্প করিয়া যে উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন তাহার শুভ চিহ্নের মধ্যে বসু বাবু রাজদত্ত আশাসোঁটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অন্য উপকার কিছুই দর্শে নাই, এইরূপ এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য যে কয়েকটা সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন একতা ও যত্নের অভাবে তত্তাবতেরই পতন হইয়াছে, রাজকীয় বিষয়ের চিন্তা করা যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরা অতি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন এবং তাহার প্রতি তাঁহারদিগের মনোযোগ থাকিত তবে ঐ সকল সভার পতন না হইয়া বরং তাহার স্থায়িত্ব হওয়া সম্ভব হইত। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

[ইহার পরবর্ত্তী সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকর' আমার হস্তগত হয় নাই]

রাধাপ্রসাদ রায়ের পরলোকগমন

(১২ মার্চ্চ ১৮৫২। শুক্রবার ৩০ ফাল্গুন ১২৫৮)

৺বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।—আমরা বিপুল শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া রোদনবদনে প্রকাশ করিতেছি ব্রহ্মলোকবাসি মৃত মহাত্মা ৺রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র বহুগুণান্বিত মহানুভব ৺রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয় জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া গত মঙ্গবাসরে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিয়াছেন, এই মহাশয়, অতি ধার্ম্মিক, সদ্বিদ্বান্, প্রিয়ভাষী, নির্ব্বিরোধী উদার চিত্ত, পরোপকারী, সদালাপী এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কখনই কোন বিষয়ে কাহার সহিত তাঁহার কোনরূপ বিবাদ দেখা যায় নাই, সকলের সঙ্গেই সতত প্রণয়ভাবে কালযাপন করিতেন, ইঁহার মহতী মূর্ত্তি মুহূর্ত্ত মাত্র নিরীক্ষণেই অন্তঃকরণে অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদের সঞ্চার হইত। কারণ চক্ষুঃ এবং মুখের ভঙ্গিমায় এমত বোধ হইত যে, জগদীশ্বর যেন সুশীলতাকে প্রণয়রসে আর্দ্র করত তাঁহার শরীরের উপর মর্দ্দন করিয়াছেন। ঐ মহাশয় কিছুদিন দিল্লীশ্বরের সভাসদের পদে অভিষিক্ত থাকিয়া অতি উচ্চতর সম্মানের কার্য্য সুসম্পাদন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে এক প্রধান রাজার প্রধান কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, রাধাপ্রসাদ বাবু স্বজাতীয় এবং ভিন্নজাতীয় বহু বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, অতএব তাঁহার লোকান্তর গমনে মনুষ্য মাত্রেই শোকাকুল হইয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি?

রামমোহন রায় ও বাংলা ভাষা

(সংবাদ প্রভাকর, ১৩ মার্চ্চ ১৮৫৪। ১ চৈত্র ১২৬০)

সংবাদ পত্র ও দেশীয় ভাষা এবং রচনা।—যখন যে জাতির ব্যবহারের বর্ত্মে সভ্যতার সমাগম হয় তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে, এই উৎকৃষ্ট নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আমরা বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যথোচিত যত্ন করণে উৎসুক হইয়াছি,......

অধুনা বঙ্গভাষায় গদ্য রচনার যদ্রূপ সুপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্রূপ ছিল না, কেবল মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় রচনার এক নূতন সূচনা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে সাধুভাষায় কিরূপে শব্দ সংযোগ করিতে হয় তাহা বড় বড় পণ্ডিতেরাও জানিতেন না; সচরাচর পত্র লিখিতে হইলে "যাতায়াতে তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক। আমরা ভাল আছি তাহাতে ভাবিত নহিবেন" ইত্যাদি। বিষয়ি লোকেরা কতক হিন্দি, কতক বাঙ্গালা, কতক পার্সি মিশ্রিত করিয়া পত্র লিখিতেন, যথা "বাপা হে, তুমি একবার খবরটা লও না, আজ্ সাত রোজ হল প্রাণাধিক বাবাজির ব্যাম হয়েছে, কবিরাজ তিন ওক্ত তিকিচ্ছে করছেন, এখানে দাওয়াই ভাল নাই, তুমি একটু বিষ্ণু তোল পাঠাবা" ইত্যাদি। গদ্য রচনার এইরূপ শ্রী ছিল, নতুবা প্রায় হেয়ালী দ্বারা তাবৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইত, যথা "সদানন্দ আনন্দ পাইয়া যার দল" "পর্ব্বত শিখর পরে গঙ্গার তরঙ্গ" তথা "আগা ঝম্‌ঝম্ গোড়া মোও" ইত্যাদি। দুঃখের কথা কি কহিব, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, যিনি অতি সুপণ্ডিত ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন তিনি নানা শাস্ত্রাধ্যাপক বহুবিধ পণ্ডিত কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াও ভাষা লেখনের ব্যবহারে শুদ্ধ প্রহেলিকা দ্বারা আমোদ প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ তৎকালীন সংস্কৃত ভাষার কিঞ্চিৎ সমাদর ছিল; রাজা রামমোহন রায় সমাচার পত্র প্রকাশ ও পুস্তক রচনা দ্বারা স্বাভিমত ব্যক্ত করণে প্রবৃত্ত হইলে মহানুভব বিদ্যাতৎপর ৺নন্দলাল ঠাকুর মহাশয় তদ্বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন, তৎকালে উভয় দলে অনেক সাহায্যকারি পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, উভয় পক্ষের বিবাদে ভাষার বিস্তর উন্নতি হয়। পাদ্রি সাহেবদিগের সহিত প্রথম পক্ষের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং

আমরা ঐ সময়কেই বঙ্গভাষা অনুশীলনের আদি সময় এবং মৃত রাজাকে তাহার একজন সূত্র সঞ্চারক বলিয়া উল্লেখ করিব। এই মহাত্মা প্রপঞ্চ শরীর পরিহার করিলে কিছুদিন আলোচনার পথ এককালীন অপরিষ্কৃত হইয়াছিল, এইক্ষণে পুনর্ব্বার তদপেক্ষা সদবস্থা হইয়াছে; অনেকেই লেখা-দ্বারা ও বক্তৃতা দ্বারা তর্ক বিতর্ক করিতে ও মনের ভাব ব্যক্ত করিতে উৎসুক হইয়াছেন, বিদ্যার্থিগণ বাল্যক্রীড়া ত্যাগ করিয়া অনুশীলনের ক্রীড়ায় আমোদ করিতেছে, সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয় লিখিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছে। এইক্ষণে ঘুড়ির লক্, দাবার চক্, পাশার পাট্টি, ইয়ারের ফষ্টি, তবলার খিড়িং, সেতারের পিড়িং, গেরাবুর ছক্কা, লোটন লক্কা, ইত্যাদি শুদ্ধ প্রাচীনদিগের আমোদের অলঙ্কার হইয়াছে। যুবকেরা বেকনের এসে, সেক্সপিয়রের প্লে, কালিদাসের কাব্য, গীতার শ্লোক, শ্রুতির অর্থ এবং বস্তুনির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় সদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছে। এই সকল দৃষ্টে পুণ্যাত্মা রামমোহন রায়ের জীবিতাবস্থা স্মরণ হইবায় মন শোক-মিশ্রিত-কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতেছে। আহা! যে ব্যক্তি এই বঙ্গভাষা লেখনের সুরীতি সঞ্চার করেন —যে ব্যক্তি স্বদেশীয় মানব মণ্ডলীর মানসক্ষেত্রে বিদ্যার বীজ বপন করণে বহু ব্যয় ও যত্ন করেন—যে ব্যক্তির উদ্যোগ দ্বারা সম্ভাবের সহযোগে সভ্যতা কতিপয় লোকের স্বভাব-সিংহাসন অধিকার করিতেছে—যে ব্যক্তির কৃপায় বেদান্ত ধ্বান্তকূপ হইতে মুক্ত হইয়া কলিকাতাস্থ শান্ত স্বভাব মনুষ্য সমূহের হৃদয়পদ্ম প্রফুল্ল করিতেছেন—এবং যে ব্যক্তির স্থিরতর যুক্তিযুক্ত বিচার বাণে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি ধার্ম্মিকেরা পরাভব হওত পরধর্ম্ম বিনাশ বিষয়ে প্রায় পরাঙ্মুখ হইয়া ঘোষণা-ঘরের আলোক নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন, অধুনা সেই দেশোজ্জ্বলকারি মহাপুরুষের বিরহে অন্তঃকরণে কি দারুণ যন্ত্রণার ভোগ হইতেছে! যাহা হউক, যদিও তিনি জীবিত নহেন, তথাচ আপনার মহৎকার্য্য ও কীর্ত্তি দ্বারা আমারদিগের নয়নাগ্রে প্রত্যক্ষের ন্যায় বিরাজমান্ রহিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় যৎকালে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অনুরাগী হয়েন তাহার অল্প দিন পূর্ব্বে সিবিলদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত পণ্ডিতবর মৃত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার বিরচিত "প্রবোধ চন্দ্রিকা" এবং সুপণ্ডিত ৺হরপ্রসাদ রায় প্রণীত "পুরুষ পরীক্ষা" এই দুইখানি পুস্তক প্রকটিত হইয়াছিল। ইহার প্রথমোক্ত গ্রন্থে যদিও অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে, কিন্তু তাহার ভাষার অধিকাংশই কঠিন ও কর্কষ, তাহাতে রস ও মধুরত্ব নাই। শেষোক্ত পুস্তকের রচনা অতি সহজ, ভাষা অতি কোমল, দেওয়ানজীর* ভাষার সহিত অনেকাংশেই তাহার তুলনা হইতে পারে। যাহা হউক, বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ করিলে ইঁহারা উভয়েই আদি গ্রন্থকর্ত্তারূপে গণ্য হইবেন। মহাপ্রভু পাদ্রি কেরি প্রভৃতি শ্বেতাবতারেরা ঐ সময়ে বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক কয়েক খানা পুস্তক প্রকটন করেন, তাহাতে কেবল সাহেব সাহেব গন্ধই নির্গত হইত। দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না। ৺বাবু উমানন্দন ঠাকুর, যিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি "পাষণ্ড পীড়ন" প্রভৃতি যে কয়েক খানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা সর্ব্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য এবং মাধুর্য্য প্রচুর্য্য সর্ব্বদিগেই উত্তম হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।

ইদানীন্তন বঙ্গভাষা নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়ে যাঁহারা অনুশীলন কল্পে অনুরাগি হইতেছেন তাঁহারা অনায়াসেই অভিপ্রেত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহাতে দেশের অশেষ প্রকার উপকার সম্ভাবনা। সংপ্রতি মধ্যে মধ্যে দুই একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গদ্য-পুরিত-ভাষা-পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, আমরা তৎপাঠে আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, যখন তরু মুকুলিত হইয়াছে তখন ফলবান ও বলবান হইবে তাহাতে সংশয় কি?

* মৃত রাজা রামমোহন রায়।

জনহিতকর কার্য্যে রাণী রাসমণি

(সংবাদ প্রভাকর, ১৪ মার্চ্চ ১৮৫৩। ২ চৈত্র ১২৫৯)

আমরা পরমানন্দে প্রকাশ করিতেছি, সুশীলা দানশীলা দয়াময়ী শ্রীমতী রাসমণি জানবাজার হইতে মৌলালির দর্গা পর্য্যন্ত জল-প্রণালী নির্ম্মাণার্থ নগরের শোভাবৃদ্ধিকারক দ্বিতীয় ভাগের কমিস্যনরের হস্তে ২৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় তৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আর বড় বিলম্ব হইবেক না। এ বিষয়ে শ্রীমতী সাতিশয় যশস্বিনী হইয়াছেন। অপিচ, ইনি বহুলোকের উপকারার্থ হুগলির ঘোলঘাটের পার্শ্বে, বহু ব্যয় পূর্ব্বক যে এক নয়ন-প্রফুল্লকর মনোহর ঘাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে দর্শক মাত্রেই সন্তোষ-সাগরে অভিষিক্ত হইয়া অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

আমরা শুনিতেছি উক্তা গুণযুক্তা শ্রীমতী আগামি বৈশাখীয় পূর্ণমাসি তিথিতে দক্ষিণেশ্বরে মহতী কীর্ত্তি স্থাপিতা করিবেন, অর্থাৎ ঐ দিবস গুরুতর সমারোহ সহযোগে কালীর নবরত্ন, দ্বাদশ শিবমন্দির, ও অন্যান্য দেবালয়, এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি উৎসর্গ করিবেন, এতৎ পবিত্র কর্ম্মোপলক্ষে কত অর্থ ব্যয় এবং কত ব্যক্তি উপকৃত হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়।

বিধবা-বিবাহের উৎসাহ-দাতা—কালীপ্রসন্ন সিংহ

(সংবাদ প্রভাকর, ২২ নভেম্বর ১৮৫৬। ৮ অগ্রহায়ণ ১২৬৩)

বিজ্ঞাপন

বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১৭৭৭ শকীয় উনবিংশ সভায় সভার অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রতি বিবাহে এক২ সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ পত্রে স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সঙ্কল্পিত অর্থ প্রদান করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

বীটন কলেজের গোড়ার কথা

(সংবাদ প্রভাকর, ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৭। ১ মাঘ ১২৬৩)

কলিকাতা ও তৎসান্নিধ্যবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন।—বীটন প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। যে নিয়মে বিদ্যালয়ের কার্য্য সকল সম্পন্ন হয় এবং বালিকাদিগের বয়স ও অবস্থার অনুরূপ শিক্ষা দিবার যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত আছে, হিন্দুসমাজের লোকদিগের অবগতি নিমিত্ত আমরা সে সমুদায় নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

উক্ত বিদ্যালয় এই কমিটির অধীন। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক বিবি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষাকার্য্যে

তাঁহার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আর দুই বিবি ও একজন পণ্ডিতও নিযুক্ত আছেন।

বালিকারা যখন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে, প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতির স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে, নিযুক্ত পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পান না।

ভদ্রজাতি ও ভদ্রবংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না। যাবৎ কমিটির অধ্যক্ষদের প্রতীতি না জন্মে অমুক বালিকা সদ্বংশজাতা, এবং যাবৎ তাঁহারা নিযুক্ত করিবার অনুমতি না দেন, তাবৎ কোন বালিকাই ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হয় না।

পুস্তক পাঠ, হাতের লেখা, পাটীগণিত, পদার্থজ্ঞান, ভূগোল ও সূচীকর্ম্ম, এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে। সকল বালিকাই বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করে। আর যাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইঙ্গরেজী শিখাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা ইঙ্গরেজীও শিখে।

বালিকাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা ও বিনা মূল্যে পুস্তক দেওয়া গিয়া থাকে। আর যাহাদের দূরে বাড়ী, এবং স্বয়ং গাড়ী অথবা পাল্কী করিয়া আসিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিবার ও বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ও পাল্কী নিযুক্ত আছে।

হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের যথোপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা হইলে, হিন্দুসমাজের ও এতদ্দেশের যে কত উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে অধিক উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যাঁহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানালোক দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন ইহা কত প্রার্থনীয় যে যাঁহার সহিত যাবজ্জীবন সহবাস করিতে হয় সেই স্ত্রী সুশিক্ষিত ও জ্ঞানাপন্ন হন এবং শিশু সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন; আর স্ত্রী ও কন্যাগণের মনোবৃত্তি প্রকৃতরূপে মার্জ্জিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকে এবং যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে পারে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।

অতএব আমরা এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় নিরূপিত রহিয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার ফলভাগী হউন। এই সকল উদ্দেশ্য সাধন হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়ী ও হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন।

সিসিল বীডন,	সভাপতি।
রাজ শ্রীকালীকৃষ্ণ বাহাদুর,	সভ্য
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ,	"
শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ,	"
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র,	"
শ্রীপ্রাণনাথ রায় চতুর্ধুরীণ,	"
শ্রীরামরত্ন রায়,	"
শ্রীরাজেন্দ্র দত্ত,	"
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বসু,	"
শ্রীভবানীপ্রসাদ দত্ত,	"
শ্রীরমাপ্রসাদ রায়,	"
শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষ	

কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।
২৪ ডিসেম্বর। ১৮৫৬ সাল। সম্পাদক

কবি দাশরথি রায়ের মৃত্যু

(অরুণোদয়, ১৬ নভেম্বর ১৮৫৭। ২ অগ্রহায়ণ ১২৬৪)

এতদ্দেশীয় সুবিখ্যাত কবি দাশরথী রায় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। গীতাদি রচনায় তাঁহার কিপর্য্যন্ত অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আমাদের পাঠকবর্গের অনেকেই তাহা জ্ঞাত আছেন। আমরা ভরসা করি দাশরথীর গীত সকল কোন বিদ্যানুরাগি ব্যক্তিদ্বারা একত্রে সংগৃহীত হইবে।

কবিওয়ালা "লোকে কাণা"

(মিত্র-প্রকাশ, ১৫ আগষ্ট ১৮৭০। শ্রাবণ ১২৭৭)

৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস।—কলিকাতার ঠঠনে নিবাসী কায়স্থ কুলোদ্ভব ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, যিনি সাধারণের নিকট "লোকে কাণা" নামে বিখ্যাত ছিলেন। এই বঙ্গদেশে তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার নাম না জানেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই। ইনি পেসাদারি পাঁচালীর দল করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁরি দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিল। কারণ ইনি অতি সুকবি ছিলেন। তৎকালে এই বিশ্বাসের অপেক্ষা রহস্য-ঘটিত কবিতা রচনা বিষয়ে অপর কেহই পারদর্শী ছিলেন না। লক্ষ্মীকান্ত শুদ্ধ কবি ছিলেন এমত নহে। সংগীত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন, খেয়াল ও ধ্রুপৎ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া যে সমস্ত পাঁচালীর সুর প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। এইক্ষণকার পাঁচালী সম্প্রদায়দিগের তৎসমুদয় ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়াছে, তাহাই লইয়া তাবতে নাড়াচাড়া করিতেছেন।

বিশ্বাস অতিশয় সদ্বক্তা ছিলেন, ইনি যথার্থই একজন উপস্থিত বক্তা। ভাঁড়ামি ব্যাপারে "গোপাল ভাঁড়" হইতে বড় ন্যূন ছিলেন না। উপস্থিত মতে ইনি যে সকল কথা কহিতেন, ও যে যে কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেন তচ্ছ্রবণে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তাবতেই কুতুহলে পরিপূর্ণ হইতেন, হাসিতে হাসিতে পেট ফুলিয়া উঠিত। অদ্য যাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছে, শোকে অত্যন্ত কাতর, চক্ষের জলে পৃথিবী আর্দ্রা হইতেছে, তিনি লক্ষ্মীকান্তের মুখ নির্গত কৌতুকজনক একটি কথা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ অমনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক হাস্য আস্য হইতেন। গোপাল ভাণ্ড কেবল ভাণ্ডই ছিল, তাহার অপর কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বিশ্বাস অতি-সুগায়ক, সৎকবি এবং সুবক্তা ছিলেন।

ইনি সকলেরি প্রিয় ছিলেন, ধনিমাত্রেই ইঁহাকে স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন ও আদর করিতেন, এবং অনেকেও ভয় করিতেন। ভয় করিয়া সর্ব্বদাই অর্থ দিতেন, ইহার কারণ, ভাঁড়ের মুখ, কি জানি, কখন কি বলিয়া বসে, এই ভাবিয়াই ধনদানে সন্তুষ্ট ও বাধ্য করিয়া রাখিতেন। ... ...

অপিচ কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দিবস লক্ষ্মীকান্তকে আপনার বাগানে বনভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিশ্বাস উদ্যানে গিয়া উক্ত বাবুর সহিত এরূপ করিয়া উদর ভরিয়া আহার করিলেন, যে, পাতে শতান্নও রাখিলেন না বাবুর বাবুআনা আহার; পত্রে প্রায় সমুদয় দ্রব্যই পড়িয়া রহিল, আহারান্তে যখন উভয়ে আচমন করেন, তখন ভৃত্য পত্র ফেলিয়া দিল, বিশ্বাসের পাতে কিছুই নাই। অন্য জন্তু দূরে থাকুক, বিশ্বাসের ভোজনে পিপীড়াও বিশ্বাস করিতে পারে না, আশ্বাস করিয়া আইলে তাহাকে নিশ্বাস ছাড়িয়া তনু ত্যাগ করিতে হয়। বাবুর পাতে সমস্তই রহিয়াছে, একারণ কুক্কুর আসিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে আহার করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বাবুজী শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "ছি, বিশ্বাস। দেখ তোমার পাতে কুক্কুরেও আহার করে না"—এই বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মীকান্ত তৎক্ষণেই এই সদুত্তর করিলেন, "মহাশয়! এ কুক্কুর ভিন্ন গোত্রে আহার করে না।"

হে পাঠকগণ! এই স্থলে জিজ্ঞাসা করি আপনারা উক্ত ব্যক্তির বাক্ পটুতা ও অত্যাশ্চর্য্য সদ্বক্তৃতা বিষয়ে কিরূপ প্রশংসা করিবেন ?— প্রস্তাব মাত্রেই বিনা চিন্তায় তখনি এমত সদুত্তর প্রদান করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন। যাঁহারা এই ব্যক্তিকে লইয়া সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া নানাবিধ বাক্‌কৌশল পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন তাঁহারাই যথার্থ সুখসম্ভোগ করিয়াছেন।

শোভাবাজার নিবাসী পাঁচালীওয়ালা ৺গঙ্গানারায়ণ নস্কর ইঁহার প্রতিযোগী ছিলেন, সেই নস্কর কর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কবি ছিলেন না। এক দিবস কোন সভায় উভয়েই সভাস্থ হইয়াছেন, বিশ্বাস একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া পায়চারি করিতেছেন, একস্থানে স্থির হইয়া উপবেশন করেন নাই। নস্কর তাহা দেখিয়া ব্যঙ্গপূর্ব্বক কহিলেন "কেমন হে বিশ্বাস! বড় যে জোয়ারের জলে ভাসিতেছ"—বিশ্বাস উত্তর করিলেন, "সাবধান, সাবধান, দেখো যেন তোমার তর্পণের কোশার মধ্যে না উঠি।"

এক দিবস কোন সভায় বিশ্বাস বসিয়া আছেন, এমতকালে নস্কর আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে "কাঁদে বাড়ি ধ" করিয়া বসিলেন, নস্কর কথোপকথনে অন্য মনে রহিয়াছেন, ইহার কিঞ্চিৎ পরে বিশ্বাস আস্তে আস্তে উঠিয়া পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া নস্করের মস্তকে "তেপুঁটুলে শ" করিয়া বসিয়া পড়িলেন। ইহাতে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বিশ্বাসকেই জয়ধ্বনি প্রদান করিলেন।

এই প্রকার দোষাশ্রিত ও দোষহীন রহস্য ও কৌতুকের কথা কত আছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

লক্ষ্মীকান্ত কেবল কৌতুকের কবিতায় প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রচার করিয়াছেন। পরমার্থ ও ভক্তিরসের ব্যাপার যাহা রচিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যার যোগ্য নহে। তন্মধ্যে কেবল হাস্য পরিহাসের কথা প্রয়োগ করিয়াছেন।— প্রভাকর।

ঢাকায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বর্দ্ধনা

(অমৃত বাজার পত্রিকা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২। ১৮ ফাল্গুন ১২৭৮)

শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাঁহাকে একখানি আড্রেস দেন। তখন একজন বক্তৃতা কালীন বলেন যে "আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।" মাইকেল মধুসূদন ইহার উত্তরে বলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি সুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।"

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতগুলিতে উপরি উদ্ধৃত অংশ স্থান পাইবার যোগ্য। যোগীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোম উভয়েই মাইকেলের ঢাকা-গমনের তারিখ ১৮৭৩ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সালটি যে ভুল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

মল্লিনাথ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

একখানা নভেল লেখার পর বাজারে খুব নাম বাহির হইয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ বাংলা ভাষার দু-একজন সাহিত্যিক হইতে কয়েকজন আই-সি-এস্ ও অবসরভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আর 'ইংলিশম্যান,' 'ষ্টেটসম্যান' পর্য্যন্ত যাঁহার কাছেই এক একখানি কপি পাঠাইয়াছিলাম সকলেই পরোয়ানা দিলেন যে, নভেল-বন্যাবিধ্বস্ত বাংলা-সাহিত্যে এ যুগে এমন বই আর বাহির হয় নাই। ইহাদের মধ্যে আমার শ্বশুরের মতটা ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ, এবং এমন চমকপ্রদ যে, পড়িয়া বুঝিতে পারা গেল আমি নিজেকে নিজেই এতদিন ঠিকমত চিনিয়া উঠিতে পারি নাই। আদেশ ছিল যেন বিজ্ঞাপন দিবার সময় সেইটিকে শীর্ষস্থান দেওয়া হয়।

বাজারে কাটতি কিরূপ হইল এবং ফলস্বরূপ আমি সর্ব্বস্বান্ত হইবার দাখিল হইলাম কি-না সে-সব অবান্তর কথা লিখিয়া আর কি হইবে? মোট কথা, আমার উৎসাহটা হাউইয়ের মত সাঁ সাঁ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, সামান্য একটা প্রতিকূল বায়ুর চাপে কি সে-উৎসাহ দমন করিতে পারে? যত্নের সহিত নথি-করা প্রশংসাপত্রগুলি যখন এক একটি করিয়া পড়িতাম তখন বুকটা সাত

হাত হইয়া যাইত, এবং এরূপ পড়া দিনের মধ্যে কম-সে-কম দুই তিনবার করিয়া হইতই বলিয়া সেই প্রসারিত বক্ষ কখনই নিজের স্বাভাবিক উনত্রিশ ইঞ্চির অবস্থায় আসিয়া পড়িবার অবসর পাইত না। হায়, তখন কি জানিতাম যে হাউইয়ের এই উন্মত্ত গতি দ্রুত নির্ব্বাণেরই পূর্ব্বসূচনা, এবং বক্ষেরও সেই গল্পকথিত মণ্ডুক প্রসারের পর শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক ?

আর একটি প্লটের জন্য চেষ্টা করিতেছি।...আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যসেবী, অর্থাৎ নভেল লেখেন, তাঁহারা দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন—ওরকম আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া গল্পসৃষ্টি হয় না। বাংলা-সাহিত্যের উপযোগী কত বাছা বাছা প্লট যে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বউবাজার ষ্ট্রীট, বীডন ষ্ট্রীট প্রভৃতি রাজপথে নিত্য মারা যাইতেছে এবং কত ভাল ভাল 'চরিত্র' যে গোল-দীঘিতে, হেদোয়, বিডন পার্কে ধরা দিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সে-সন্ধান যদি রাখিতেন ত আয়েসের নেশা ছুটিয়া যাইত, এবং যুগ-সাহিত্যের সমস্ত যশটা যে একজনই একচেটে করিয়া লইবার উপক্রম করিতেছে এর জন্য অত ঈর্ষারও প্রয়োজন থাকিত না।

পকেটে নোটবহি ও হাতে একটি পেন্সিল লইয়া হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের চৌমাথায় দাঁড়াইয়াছিলাম। ...ওপারের ফুটপাথে উনি তসরের পাঞ্জাবী গায়ে ফিটফাট হইয়া অমন উদাসভাবে দাঁড়াইয়া যে বড়!—ও উদাস ভাব যে আমি খুব চিনি। ওঁর ওই পরম শান্তির অন্তরালে প্রতীক্ষার যে তীব্র উদ্বেগ, আর সেই উদ্বেগের মূলে যে সেই চিরন্তনী ক্ষুধার দাহ তাহা কি আমার দৃষ্টিকেও বঞ্চিত করিবে ?...আজ ওভারটুন হলে বক্তৃতা—মেয়ে পুরুষে দলে দলে প্রবেশ করিতেছে, ওঁর ওই উদাসীনতা ভেদ করিয়া যে তীব্র অথচ সতর্ক দৃষ্টি মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে সে যেন কাহাকে খোঁজে...

একটি দীর্ঘ সিডানবডি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। আমার নায়কের মুখে সেই সুপরিচিত—'এই যে পেয়েচি' ভাব দেখিয়া আমি রাস্তার ওপারে গিয়া কিছু দূরে একটা লোহার থামের আড়ালে দাঁড়াইলাম। গাড়ী থেকে নামিলেন একজন বৃদ্ধ, একজন মাঝ-বয়সী স্ত্রীলোক, সম্ভবত তাঁহার স্ত্রী, একটি যুবতী, একটি ছোট মেয়ে আর একটি ১৬।১৭ বছরের ছোকরা। যুবতীটি নামিয়াই একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল—যেন কাহার সঙ্গে দেখা হইবার কথা।...আমি মনে মনে হাসিয়া বলিলাম—"স্থিরা ভব, অধীন হাজির।"

দলটি গিয়া ভিড়ে মিশিল। নটবরও গতিবান হইলেন।—অর্দ্ধেক প্লট ত জমিয়া উঠিয়াছে। ওভারটুন হলে বসিয়া আরও মালমসলা সংগ্রহের জন্য হর্ষিতচিত্তে পিছনে পিছনে অগ্রসর হইলাম।

... ...

লিখিতেও লজ্জা করে।—লোকটা একটা গাঁটকাটা। সিঁড়ির মোড়ে শেষ যখন দেখিলাম তখন বৃদ্ধের পকেটের মধ্যে সমস্ত হাতটা চালাইয়া দিয়াছে। বিরক্তিতে আর দারুণ নিরাশয় সেইখান হইতেই ফিরিলাম।

আজ গোড়াতেই এই রকম বাধা পাইয়া মনটা একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। নোটবই পেন্সিল পকেটে ফেলিয়া কৃষ্ণদাস পালের মূর্ত্তিটির পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। মেয়া সাহেব পুরান পুস্তকের দোকানটা খুলিবার উপক্রম করিতেছে। আমি পুরাতন খরিদ্দার, গিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কি গো, নূতন কিছু এনেছ ?"

"হ্যাঁ, অনেকগুলো নূতন আমদানী আছে কর্ত্তা, দ্যাখেন।" বলিয়া সামনে কতকগুলা বই ধরিয়া দিল। এক-শ বার এই বইগুলা দেখাইয়াছে, প্রত্যেক বারেই বলে নূতন আমদানী!

ও ফুটপাথে প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙের পাশে যে লোকটা বসে সেও নিজের সমস্ত বই সাজাইয়া তৈয়ার। ও লোকটার সঙ্গে আমার তেমন বনে না।...রেলিঙের নীচে একটার পর একটা করিয়া প্রায় বিশ-পঁচিশ গজ পর্য্যন্ত বই সারবন্দী করিয়া কোথায় একপ্রান্তে নির্লিপ্তভাবে বসিয়া থাকে। একটা বই পছন্দ করিয়া যদি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলাম ত প্রায়ই এমন অসম্ভব রকমের একটা দাম বলিয়া বসিবে যাহা অনেক সময় নূতন অবস্থার দামকেও টপকাইয়া যায়! এইখানেই শেষ নয়,—ঐ রকম গোছের একটা দাম হাঁকিয়া আমার মনটাকে ধৈর্য্যের শেষ সীমানায় ঠেলিয়া দিয়া

আবার নিতান্ত অবহেলার সহিত সঙ্গীদের সঙ্গে অন্য বিষয়ে আলোচনা জুড়িয়া দিবে। যেন কন্যাদায়ের জন্য চাঁদা চাহিতে আসিয়াছি!...মনে মনে বলি কিসের তোর এত গুমোর রে বাপু?—বেচিস ত খানকতক বস্তাপচা বই—তাও বেশীর ভাগই বটতলার ক্লাসের—যার কোনখানেই কাটতি নেই...

ভাবিলাম—যাই খানিকটা গোলদীঘিতে বসা যাক্ গিয়া।—ওখানেও গাদাখানেক 'চরিত্র' দীঘির চারিদিকে পাক্ খাইয়া মরিতেছে,—সংসার-আবর্ত্তের একটা খুব সজীব দৃষ্টান্ত। স্থির করিলাম ওই ফুটপাথ দিয়াই যাইব; বই না-হয় নাই কিনিলাম, দেখিতে দোষ কি?

মন্থরগতিতে বইগুলার উপর নজর বুলাইয়া যাইতেছি। ...এর বিক্রয় নাই; সেই সব একই বই সেই একই স্থানে—তাঁবাটে কাগজ, বখাটে নাম—'চুম্বনে গুমখুন' 'মেকি মোহান্ত'—এই সব।...অনেক ক্ষেত্রে বাহিরে ভিতরে সম্বন্ধ নাই।—একটা জীর্ণ বইয়ের ওপর একটা রঙীন ছবির মলাট সাঁটা—নায়িকা নায়কের পিছন হইতে সকৌতুকে চোখ টিপিয়া ধরিয়াছে—নীচে পেন্সিলে নাম লেখা—"সটীক পুরোহিত দর্পণ।"

হঠাৎ একখানির ওপর নজর পড়িতে জড়বৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি সর্ব্বনাশ, এ যে আমারই যুগান্তরকারী নভেল! তাহার স্থান এইখানে—বকের দলে হংসের সমাবেশ! হায় রে, শেষে এই দেখিতে হইল!

কিন্তু এ অঘটন ঘটিল কিরূপে? মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—ভুল দেখিতেছি না-ত?...নাঃ, ঐ ত স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে—

প্রেমের নেশা

বা

হেমন্তকুমারের জীবন্ত সমাধি

শ্রীধুরন্ধর দেবশর্ম্মা প্রণীত

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি,—বইটা পিতৃদত্ত নামে ছাপি নাই, নিজেরই মনগড়া একটা নাম বসাইয়া দিয়াছিলাম। তাহার অনেক কারণের মধ্যে একটা এই যে, 'বাড়িতে এঁরা সব' নভেল লেখার ওপর অত্যন্ত চটা। আমার খুড়শ্বশুর নাকি এই করিয়া ধনেপ্রাণে মারা যাইবার মত হইয়াছিলেন, শেষে আমার খুড়শাশুড়ীর কড়া নজরের পাহারার মধ্যে থাকিয়া সামলাইয়া উঠেন।

স্ত্রীজনসুলভ এই অজ্ঞতায় মনে মনে হাসি। কিন্তু মিথ্যা গৃহবিরোধ করায় ফল কি? তাই এই নামের অন্তরাল খাড়া করিয়া দিয়াছি। জানি—একদিন আসিবেই যখন খুড়শ্বশুরের ভাইঝির পতিদেবতাটি সাহিত্যস্বর্গের ইন্দ্রচন্দ্র গোছের একটা কেহ হইয়া দাঁড়াইবে। সেই আত্মপ্রকাশের শুভ অবসর। আজ যে হস্তের তর্জ্জনী বিক্ষেপের ভয়ে নিরস্ত হইলাম সেদিন সেই হস্ত হইতেই প্রীতির পারিজাত মাল্য এ-কণ্ঠে নামিয়া আসিবে।

থাক্ সে কথা। আপাতত স্বীয় মস্তিষ্কের প্রথম সন্তানটিকে অনাথের মত রাস্তার ধারে এমন ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখায় যে নিদারুণ আঘাতটা লাগিয়াছিল তাহার প্রথম ঝোঁকটা কাটিয়া গেলে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর যুক্তি আসিয়া দেখা দিল।—ভাবিলাম, কেন, সাহিত্যগুরু শেক্সপীয়রকেও কি এখানে প্রায় দেখা যায় না? ঐ ত নিট্শের একখানা রাজসংস্করণ! এমন কি রবীন্দ্রনাথও ত বাদ পড়েন না। আমিই ত নিজের হস্তে সেদিন তাঁহার একখানা ভলুম কিনিয়া লইয়া গেলাম। কি প্রমাণ হয় এ সবে?—এ-ই প্রমাণ হয় না কি যে, ইঁহাদের আর স্থানের সঙ্কুলান হইয়া উঠিতেছে না, তাই সনাতন আশ্রয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছেন? ভাবজগতে, সাহিত্য-জগতে আবার আভিজাত্য? হইলই বা পুরাতন পুস্তকের আশ্রয়হীন দোকান। চাণক্য কি বলেন নাই?—নহি সংহরতি জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডাল বেশ্মনি!

২

দোকানীটার প্রতি প্রথমে অতিশয় চটিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম—না, লোকটা জোগাড়ে নেহাৎ মন্দ নয়, আর ওর পছন্দর মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে বইকি; তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। দু-একখানা ওরকম বটতলা-চটতলা থাকিবেই, সব রকম খরিদ্দার আছে ত, না আমিই একা?

সুতার বন্ধনীর ভিতর হইতে স্নেহকম্পিত হস্তে বইখানি বাহির করিয়া লইলাম। মলাট উল্টাইতে প্রথমেই ইংরেজীতে লেখা,—'মিস্ সবিতা দেবী, সেকেণ্ড ক্লাস, করোনেশন গারল্‌স্ স্কুল।'

প্রথমটা একটু হাসি পাইল।…অল্পকে আশ্রয় করিয়াই স্ত্রীজাতির কি দম্ভ। সামান্য সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে সেটুকু নভেলে পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে, দেখ তো!…

কিন্তু আসল কথা—কে এই সবিতা দেবী? কিরূপেই বা ইহার কমলকরচ্যুত হইয়া তাহার বড় সাধের এই পুস্তক রত্নখানি নীড়ভ্রষ্ট শাবকের মত এখানে আসিয়া পড়িয়াছে? তাহার ব্যথিত নয়ন দুটি কল্পনা করিয়া আমার মনটাও সহানুভূতির বেদনায় ভরিয়া উঠিল। যদি আবার বেচারী তাহার হারানিধি ফিরিয়া পায় ত তাহার বিষাদমলিন মুখখানি কেমন-না প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে! কি মধুর না সেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি! আবার সে দৃষ্টিতে আরও না কত অমিয় বর্ষিত হইবে যখন শুনিবে পুস্তকখানি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে স্বয়ং লেখকই, আবার যখন…

"কি বাবু, দেখা শেষ হ'ল? দেখি কোন্ বইখানা? আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দোকানীটা হস্ত হইতে বইখানা একরকম কাড়িয়াই লইল। নাড়িয়া-চাড়িয়া ভিতরের কয়েকখানা পাতা উল্টাইয়া আবার আমায় ফেরত দিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"দেড় টাকা।"

একেবারে থ হইয়া গেলাম, বলিলাম—"সে কি গো, এর নতুনের দাম যে এক টাকা মাত্র! এই ত স্পষ্ট লেখা রয়েছে"—বলিয়া দামের নীচে বুড়া আঙুলের নখটা টিপিয়া তাহার চোখের সামনে ধরিলাম। লোকটা তাহার দক্ষিণ চক্ষুর তলদেশটা বাম হাতের তর্জ্জনীর দ্বারা টানিয়া বলিল, "আমারও সোখ আসে, মশায়, এই ছ্যাখেন। বলি কেতাবটা একবারটি উল্টিয়ে ছ্যাখেন—আগাগোড়া লোট লেখা। স্রেফ সক্-সকেটি হ'লেই কেতাবের দাম হয় না।"

উল্টাইয়া দেখিলাম সত্যই পাঁচ-ছয় পাতা অন্তর খুব খুদে খুদে অক্ষরে পাতার পাশের জমির ওপর কি সব লেখা! দু-একটা পড়িয়া দেখিলাম—বড় কৌতূহল হইল—ভারী মজা ত!…দোকানীকে বলিলাম, "হাঃ, নোট ত ভারী, দু-এক অক্ষর কি আগড়ম-বাগড়ম লিখেছে বটে, খালি নষ্ট করেচে বইটাকে। নাও, বল কত নেবে।"

লোকটা আস্তে আস্তে বইখানি আমার হস্ত হইতে লইয়া যথাস্থানে খুব যত্নের সহিত ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রাখিয়া দিল, বলিল, "জানি বাবু আপনি লেবার মানুষ লন্; তা সারা আমার বেসাও ভাল দেখায় না। একটি বদ্দল্লোক পসন্দ ক'রে গেসেন—স্রেফ কাপড়-চোপড়ের বদ্দল্লোক লয়, কথার বদ্দল্লোক। আনা দুই পয়সা কমতি হয়েসিলো সেইডা আনতি গেলেন। তবে লেহাৎ আপনি বল্লেন, কি করি খাতিরে পড়ে গেলাম—কিন্তু ওর কমি হবে না।"

অন্য সময় কথাটা বিশ্বাস করিতাম কি না জানি না; কিন্তু সে-সময় নিজের সেই গ্রন্থের সামনে দাঁড়াইয়া, সেই অপরিচিতা সবিতা দেবীর নামের মোহে মোটেই সন্দেহ করিবার জো ছিল না যে আমার সেই পুস্তকখানিকে লইয়া বাজারে কাড়াকাড়ি জেদাজেদি পড়িয়া গিয়াছে। ইংলিশ্‌ম্যান'এর জয়পত্র; খুড়শ্বশুরের সেই ঢালা প্রশংসা সমস্তই আসিয়া আমার আত্মপ্রসাদের সহায়ক হইল। লোকটাও এমন নির্লিপ্তভাবে আপনার আসনখানিতে গিয়া বসিল যে, তাহার কথার প্রত্যেকটি অক্ষরে সত্যের দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল—ওই বুঝি সেই দুই আনা কমের ভদ্রলোকটি আসিয়া পড়িল। আরও যাহারা আশেপাশে পুস্তক পরীক্ষা করিতেছিল তাহারাও যেন আড়ে আড়ে আমার পুস্তকখানিরই প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হানিতেছে—এইরূপ সন্দেহ হইতে লাগিল।

অনেক বলিয়া-কহিয়া দুই আনা কম করিয়া বইখানি কিনিয়া লইলাম। লোকটা পয়সা গুণিতে গুণিতে অনুযোগের অনুনাসিক স্বরে বলিতে লাগিল—"বদ্দল্লোকের কাসে কথার খেলাফ হতি হ'লো। কি আর করবো, বলতি হবে—কোনো জোসসোরে হাতসাফাই করেসে। আপনি ত বদ্দল্লোক—খাতিরে পড়ে গেলাম…"

এইরূপে, শুধু খাতিরের জোরে বইখানি লইয়া একখানি মোটরবাসে গিয়া উঠিলাম। পড়িবার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকিলেও উপায় ছিল না। রেস্ ডে, গাড়ীতে অত্যন্ত

ভিড়;—কোন রকমে প্রাণপণে একটা শিক্ ধরিয়া পা-দানের উপর দাঁড়াইয়া ঝাঁকানি খাইতে খাইতে চলিলাম। তবুও একবার চেষ্টা যে না করিয়াছিলাম এমন নয়। কয়েকটা লোক মানা করিল। তাহারা মানা করিতে ঘরোয়া বাংলায় যে শ্লেষ বিদ্রূপের সুললিত পদগুলি প্রয়োগ করিল তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা চলে না এবং তাহা শোনার পরও সেই কাজ করিতে পারে এমন লোক দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না।

মনে খালি সবিতা দেবীর কথা উদয় হইল। কে এই সবিতা দেবী? খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। প্রথমে করোনেশন গারল্‌স্ স্কুলের ঠিকানাটা চাই। তাহা নয় পাওয়া গেল, তাহার পর?···সে পরের ভাবনা পরে; মোট কথা এই রসটুকু হইতে যদি নিজেকে বঞ্চিত করি ত বুঝিতে হইবে যে সাহিত্যিক হিসাবে আমার মধ্যে আর পদার্থ নাই।···চমৎকার নামটি—সবিতা! কি মোলায়েম! আমার রচিতমান দ্বিতীয় গ্রন্থের নায়িকার লবঙ্গলতিকা নামটাও মোলায়েম নিশ্চয়ই, কিন্তু একটু যেন লম্বাটে। বদলাইয়া সবিতা রাখিলে হয় না? লবঙ্গলতিকা—সবিতা, লবঙ্গলতিকা—সবিতা···না, সবিতা-টিই একটু যেন বেশী মিষ্ট। তাহা হইলে সুধু সবিতা দেবী না, সবিতা সুন্দরী দেবী?···

বাড়িতে গিয়া বইটা আবার একটু আড়ালে রাখিতে হইবে—অপর স্ত্রীলোকের নাম পর্য্যন্ত বাড়িতে ঢুকিবার জো নাই।···আস্কারা দিয়া দিয়া মাথায় উঠিয়াছে সব! ছিল ভাল সেকালে—দশটা বিশটা করিয়া সতীন—কর কত ঝটাপটি করিবে···

ওঃ, একটু অন্যমনস্ক হইয়াছি আর বাড়ি ছাড়াইয়া প্রায় পোয়াটাক রাস্তা আনিয়া ফেলিয়াছে! "আরে, বাঁধকে—বাঁধকে, বাঁধো!···

আচ্ছা বেহুস ড্রাইভার ত!

৩

উপর ঘরে গিয়া আগ্রহভরে বইখানি পকেট হইতে বাহির করিলাম। প্রথম পাতা উল্টাইতেই মিস্ সবিতা দেবীর নাম পরিচয়াদি লেখা—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। খাড়া ইংরেজী লেডি হাণ্ড, বেশ প্রাণবন্ত অক্ষরগুলি।

তাহার পরের পাতায় লেখকের 'নিবেদন'। তাহাতে প্রকৃত প্রেম সম্বন্ধে চলতি ধারণা হইতে আমার ধারণার কি প্রভেদ তাহার সবিস্তারে আলোচনা করিয়া অবশেষে মামুলি প্রথামত জানাইয়াছি যে, কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের আগ্রহাতিশয্যে পুস্তকখানি ছাপাইতে বাধ্য হইলাম।

পড়িলাম—ইহার পাশে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে—পোড়াকপাল এমন বন্ধুদের।

ইহাতে উৎসাহ বাড়িবার কথা নয় তবে কৌতূহল বাড়িল বটে,—বলে কি!

পরের পৃষ্ঠায় আমার প্রকাশকের একখানি হাফটোন ছবি ছিল।—তাহার উপর খুব চাপ দিয়া একটা ঢেরা কাটা!

বলিতে কি, ইহাতে আমার বেশ একটু আনন্দই হইল—এই জন্য যে প্রকাশকের ছবি বইয়ে থাকা আমার মোটেই রুচিকর হয় নাই। খাটিয়া মরিল লেখক, আর ছবি বাহির হইবে প্রকাশকের? আর, অমুকের বইয়ের জন্য দেশটা লালায়িত একথাটার একটা সঙ্গত মানে আছে; কিন্তু কে আর কাহার বদখৎ চেহারা দেখিবার জন্য আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে?

কথাগুলা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি নাই বলিয়া মনে মনে আপশোষ করিতেছিলাম, এখন অনেকটা তৃপ্ত হইলাম। একবার যদি তাহাকে দেখাইতে পারিতাম তাহার চেহারা সম্বন্ধে মিস্ সবিতা নাম্নী কোন এক যুবতীর অভিমতটা কি, আর সে অভিমতটা কিরূপ ক্রূর সঙ্কেতের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে আর কোন দুঃখই থাকিত না।

কিন্তু হায় রে কপাল, এ আনন্দকণিকাটুকুও স্থায়ী হইল না। পরে জানিলাম পাঠিকা, না-প্রকাশক, না-লেখক, না-চরিত্রসমষ্টি কাহারও প্রতি সদয় নহেন। উগ্র প্রহরণ হস্তে প্রলয় মূর্ত্তিতে নামিয়াছেন পরশুরামের মত ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করা গোছের একটা পক্ষপাতশূন্য উদ্দেশ্য লইয়া।···সেই দুঃখের কথাই আজ বলিতে বসিয়াছি।

আখ্যায়িকার প্রারম্ভটা যদি একবার জমাইয়া ফেলিতে পারা যায় ত আর কিছুই দেখিতে হয় না, সে আপনার বেগে আপনি সমাধানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

এই গূঢ়তত্ত্বটি বোধ হয় কাহারও জানা নাই। আমি সেই জন্য প্রথম অধ্যায়টা খুব লোমহর্ষণ গোছের দাঁড় করাইয়াছিলাম। বাংলা-সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শনটা সাধারণত বড় সাদাসিদে ব্যাপার, নেহাৎ যেন ঘরোয়া গোছের, তাহাতে পরস্পরের হৃদয়ে এমন একটা ঝাঁকানি লাগে না যাহাতে অন্তর্নিহিত প্রেমের সুপ্তিতে আঘাত করিতে পারে।

আমার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ হয় একটা খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যে। জমিদার-তনয় দ্বাবিংশতি বয়স্ক যুবক হেমন্তকুমার মৃগয়া করিয়া মোটরযোগে ফিরিতেছেন। একলা; সঙ্গিগণ পিছনে মৃগয়ালব্ধ ব্যাঘ্র ভল্লুক বালহাঁস প্রভৃতি লইয়া আসিতেছে। এমন সময় তুমুল ঝড়, মুষলধারায় বৃষ্টি আর অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু করকাপাত। নিকটে আশ্রয় নাই—মোটরে হুড নাই, ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বর্ষাস্ফীত নদীর কিনারা দিয়া ভাঙাচোরা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে; হেমন্তকুমার ঘণ্টায় ৬০ মাইল হিসাবে তাহারই উপর দিয়া মোটর চালাইয়াছেন। হঠাৎ গাড়ীর আলো নিবিয়া গেল; গাড়ী কিন্তু পূর্ব্ববৎই ধাবমান।...ধন্য হেমন্তকুমার, ধন্য তোমার শিক্ষা!

হঠাৎ একটা কিসে এক ভীষণ ধাক্কা—সঙ্গে সঙ্গে মোটর চুরমার। হেমন্তকুমার ছিট্‌কাইয়া গিয়া কিনারার নীচেয় খানিকটা নরম ভিজা বালির উপর পড়িলেন। জিমন্যাষ্টিক করা শরীর—কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না!

কিন্তু একি!—হেমন্তকুমারের পার্শ্বেই সেই চড়ার উপর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এসে এক পরমাসুন্দরী রমণীমূর্ত্তি! হেমন্তকুমার বিস্মিত, চমকিত হইলেন; কিন্তু খুব প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি বলিয়া পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন, এই ঝড় তুফানে কোন নৌকা ডুবি হইয়াছে। অহো, কি সুন্দর সেই নারী-মূর্ত্তি! এ কি জলদেবী নদীগর্ভ ত্যাগ করিয়া বালুকাতটে বিশ্রাম লইতেছেন, না চঞ্চলা সৌদামিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরণীতে অবরোহণ করিয়াছেন?...হেমন্তকুমার জীবনে এই প্রথম অন্তরে এক তীব্র আবেগ অনুভব করিলেন; সে আবেগ কি ভালবাসার?

এই অধ্যায়টির শেষে সবিতা দেবী লিখিয়া রাখিয়াছেন "গাঁজাখুরি নম্বর এক।"

রাগে আমার গা রি রি করিতে লাগিল। গাঁজাখুরি? কোন্‌খানটায় গাঁজাখুরি হইল?—ঝড় গাঁজাখুরি, হেমন্তকুমার গাঁজাখুরি, মোটর গাঁজাখুরি, না সেই রমণীমূর্ত্তি গাঁজাখুরি? ইস্, কি ধৃষ্টতা এই মেয়েজাতটার! ইহারা ফিপ্‌থ ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াই ভাবে দিগগজ্ হইয়া পড়িয়াছি।...এতদিন একেবারে গণ্ডমূর্খ হইয়াছিলে; আজকাল দু-অক্ষর পড়িতে শিখিয়া দু-একখানা করিয়া নভেল পড় তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু নভেল-লেখার কি জান? আর্টের কেরামতি কি বোঝ? হাঁড়ি খন্তি ছাড়িয়াছ, কিন্তু ফোড়ন দেওয়ার অভ্যাসটা ত এখনও যায় নাই।

ইহার পরের অধ্যায়ে ঝড়বৃষ্টি থামিয়া, মেঘ অপসারিত হইয়া জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। একটা তুমুল বিক্ষোভের পর প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ঝড়ের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের বদলে পাখীদের আনন্দকোলাহলে আকাশ ভরিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে আবার একটা কোকিলের আওয়াজ সকলের উপর আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

আমার মতে গল্পের প্রয়োজনানুযায়ী প্রাকৃতিক অবস্থা বায়স্কোপের ছবির মত সট্ সট্ বদলাইয়া ফেলা দরকার। যে-দৃশ্যটি যে-ভাবের পরিপোষক সেটাকে তৎক্ষণাৎ আনিয়া ফেলিতে হইবে। তুমুল ঝড় তুফানের যখন প্রয়োজন ছিল তখন ছিল, এখন নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রেমসঞ্চারের সময়; সুতরাং খানিকটা জ্যোৎস্না, একটু মৃদু মন্দ হাওয়া এবং একটু কোকিলের তান চাই-ই।

হেমন্তকুমার উঠিয়া বসিয়া সেই আর্দ্রবস্ত্রমণ্ডিত অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে একটু মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিলেন। দেহ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন দেহে তখনও উত্তাপ বর্ত্তমান। এখন চেতন-সঞ্চারের কি উপায়? তাঁহার জানা ছিল—এক বিশেষ পদ্ধতিতে জলমগ্নের হস্ত ও পদ সঞ্চালিত করিয়া বদনে ফুঁ দিলে চেতনা ফিরিয়া আসে। কিন্তু সেই অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর অধর স্পর্শ করিয়া ফুৎকার দিতে সুশিক্ষিত যুবকের শীলতায় বাধে। অথচ সাঙ্গোপাঙ্গ সব পিছনে—দেরি করাও বিপজ্জনক। তাই নিতান্ত বাধ্য হইয়াই

হেমন্তকুমার সেই মুমূর্ষুর অধরে অধর স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে রমণীর চোখের পাতা ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল।

প্রথম অধ্যায়ের শেষে সবিতা দেবী যে মন্তব্যটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা তবুও কোন রকমে সহ্য করা গিয়াছিল, কিন্তু আমার নায়িকাকে সঞ্জীবিত করিবার এই যে বন্দোবস্ত করিয়াছি তাহার পার্শ্বে যে টিপ্পনী কাটিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও এমনই উগ্র যে আর স্থির থাকা যায় না—চন্ চন্ করিয়া একেবারে তীব্র বিষের মত মাথার ব্রহ্মতলে গিয়া ওঠে। লেখা আছে—'কলম না সিঁদকাঠি ?'

কেন, এক গোবিন্দলালই অধরে অধর দিয়া বাঁচাইবার প্রথমটা পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছিল না কি? সেই জনশূন্য নদীর ধারে আমার নায়িকাকে বাঁচাইবার আর কি উপায় ছিল। বরং বঙ্কিমবাবু অমন বেহায়াপনা না করাইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন, কেন-না, গোবিন্দলালের বাড়ি খুবই কাছে ছিল; একটা হাঁক দিলেই উড়ে মালী ছাড়া আরও হাজার লোক জড় হইতে পারিত। আমার সেখানে কি ছিল, শুনি ?

এই রকমই বরাবর সবিতা দেবী বিদ্যা জাহির করিয়া গিয়াছেন, সমস্ত তুলিয়া দিতে গেলে এ অপ্রীতিকর কাহিনী আর এখন শেষ হয় না। লবঙ্গলতিকা কায়স্থ কন্যা আর হেমন্তকুমার ব্রাহ্মণ তনয়, অথচ উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় সঞ্জাত হইয়াছে এবং আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হেমন্তকুমার বিবাহের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। কিন্তু সমাজ খড়্গহস্ত,—সে অসবর্ণ বিবাহ হইতে দিবে না।

এখানে হিন্দুসমাজকে খুব একচোট লইয়াছি। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, যে-লেখককে সাহিত্যজগতে নবভাবের ভাগীরথী বহাইয়া নূতন যুগ সৃষ্টি করিতে হইবে তাহার এ অধিকারটুকু আছে।

কিন্তু ইহার উপরও আমার ভুঁইফোঁড় সমালোচিকা দাঁত ফুটাইতে ছাড়েন নাই। পাশে একরাশ ক্রুদ্ধ নোট! আমার যুক্তির খণ্ডন করিতে পারেন নাই—চেষ্টাও করেন নাই,—তবে মেয়েদের স্বভাবলব্ধ যে গালির বন্যা নামাইয়াছেন তাহাতে আমার গুরু যুক্তিগুলি লঘু তৃণখণ্ডের মতই ভাসিয়া গিয়াছে।...

নানান কারণে বাংলাভাষার লেখকদের ধৈর্য্যের বাঁধ সাধারণ মানবের ধৈর্য্যের বাঁধের অপেক্ষা অনেক দৃঢ়তর, কিন্তু সবিতাদেবীর বিষম উচ্ছ্বাসে এ বাঁধও শেষে ভাঙিল।

মনে মনে বলিলাম—'তবে যুদ্ধং দেহি'। আমিও প্রত্যেক রূঢ় মন্তব্যের প্রতিমন্তব্য লিখিয়া তবে এই দুঃসাহসিকার হস্তে পুস্তকখানি ফেরত দিব; বুঝিবে, হাঁ পাল্লায় পড়িয়াছি বটে!...পুরুষের পৌরুষকে আর এভাবে পদদলিত হইতে দিব না।

গোড়ায়, সেই যে লেখা আছে—"পোড়াকপাল এমন বন্ধুদের" সেইখান হইতে আরম্ভ করিলাম। মনের মধ্যে এরূপ উৎকট উৎকট প্রত্যুত্তর আসিয়া জড় হইতে লাগিল যে, নির্ণয় করা দায় হইল—কোনটাকে রাখিয়া কোন্‌টাকে বসাইব এবং সমস্তগুলার সংঘর্ষণে কলমটা যেন একখানি লৌহশলাকার মত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

* * *

ব্যাপারটা অনেকটা শকুন্তলা নাটকের গোড়ার দিকটার মত হইয়া গেল।—"এই মনে করিয়া মহারাজা দুষ্মন্ত সেই হরিণশিশুকে বধ করিবার জন্য শরাশনে শরসংযোগ করিলেন। এমন সময় অদূরে শব্দ হইল—'মহারাজ নিরস্ত হউন, নিরস্ত হউন; আপনার বাণ আর্ত্তের রক্ষার জন্য, নির্দ্দোষীর সংহারের জন্য নহে......"

আমিও কলমটি বাগাইয়া ধরিয়াছি এমন সময় চমকিত হইয়া শুনিলাম—"কি গো, লুকিয়ে লুকিয়ে কি পড়া হ'—?"

আর লেখা হইল না এবং বইটাকে যে কিরূপে কোথায় লুকাইয়া ফেলিব তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম, কারণ বক্তা স্বয়ং আমার স্ত্রী, এবং পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি ইনি এক 'গৃহিণী' ভিন্ন, সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—এগুলার কোন পর্য্যায়েই পড়েন না; তাহা ছাড়া আমার দুরদৃষ্টবশত ধাত পাইয়াছেন একেবারে আমার খুড়শাশুড়ীর।

কিন্তু লুকান তখন অসম্ভব; বইখানা আমার হস্তেও রহিল না।...অতঃপর যে কথাবার্ত্তা হইল তাহার একটা

সংক্ষিপ্তসার নীচে দিলাম। কেন যে আর লিখি না, তাহার কারণ ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে।—

তিনি। (বইটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সবিস্ময়ে) "একি! এ যে সবির বই ; তুমি পেলে কোত্থেকে ?

আমি (বিস্ময় দমন করিবার চেষ্টা করিয়া) "সবিটি কে ?"

তিনি। কেন আমার খুড়তুতো বোন, তুমি জান না?···তা দেশসুদ্ধ লোক বেচারাকে গেঁড়ী ব'লে ডাকবে ত তুমি আর আসল নাম জানবে কোত্থেকে ?

আমি। (স্বগতঃ) দেশসুদ্ধ লোক চিনেচে ঠিক,—যেমন পাকঘাঁটা অভ্যেস তা'তে 'গেঁড়ী' নামই শোভা পায়। (প্রকাশ্যে) তা গেঁড়ী সুন্দরী বইটার ওপর এত অত্যাচার করেচেন কেন ?"

তিনি। "পোড়া কপাল, সে করতে যাবে কেন, করেচি আমি। ও আর হয়েচে কি, লেখককে একবার সামনে পেতাম ত লেখার সখ এক্কেবারে মিটিয়ে দিতাম।"

গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। তবুও বলিলাম—"গেঁড়ী নিশ্চয় বইটাকে ভাল জেনেই কিনেছিল···"

তিনি। আঃ আমার পোড়া কপাল, কিনতে যাবে কেন ? কাকার আগে ঐসব বিদ্‌কুটে সক্‌টক্ ছিল কি না—তাই অনেক বই ওঁর কাছে ওরকম আসে, মত দেবার জন্যে। আসবামাত্র সবি নাম লিখে দখল ক'রে বসে। তার মধ্যে এই রকম হতচ্ছাড়া বইও থাকে, আবার···

আমি। হতচ্ছাড়া!···অথচ তোমার কাকা ত খুব প্রশংসা ক'রেচেন···

তিনি। ওমা, কোথায় যাবো! কাকা কি একবর্ণও পড়েচেন না কি ? পড়ি আমরা, উনি জিগ্যেস ক'রে নেন, তারপর বানিয়ে বানিয়ে চিঠি লিখে দেন। আমায় জিগ্যেস করলেন—মোক্ষদা, বইটা কেমন পড়্‌লি মা ?'···বল্‌লাম—'বটতলা বলে আমি পদে আছি'···তখন একটু হাসলেন।···ওমা দিন-কতক পরে একটা কাগজে বিজ্ঞাপনে দেখি ঢালা সুখ্যাতি ক'রে বসে আছেন! কাউকে ত আর নিরাশ করেন না।

খুড়শ্বশুরকে ধন্যবাদ যে, আমিই যে লেখক একথাটা মেয়েমহলে জানান নাই ;—অবশ্য সেটা নিজের অভিজ্ঞতার ফলেই। কিন্তু শেষে এই তাঁহার কীর্ত্তি! তাঁহার প্রশংসার এই মূল্য!

তিনি। (সন্দিগ্ধভাবে) তা পেলে কোথায় বইটা সবি বুঝি বইটই পাঠায় ? তাই 'সবি' কে জিগ্যেস ক'রে আমার কাছে চালাকি হচ্চে ?

একবার প্রলোভন হইল ঈর্ষানলে আহুতি দিয়া বলি—"হ্যাঁ, আমিও তাকে নতুন বই সব পাঠাই" কিন্তু শুধু বলিলাম—"না, পুরানো বইয়ের দোকানে।"

তিনি। তা তুমি কড়ি দিয়ে সেই ভাগাড় থেকে কিনে নিয়ে এলে কেন ?—ঠিক জায়গায়ই ত পড়েছিল। মরুক গে, বাজে কথা নিয়ে অনেক সময় গেল। একবার চাবিটা দাও ত, খুকীর বিস্কুট ফুরিয়েচে, এক টিন আনতে দিইগে।···আচ্ছা, সবাই আজকাল কলম ধরতে যায় কেন বল দিকিন ? মুয়ে আগুন—মুয়ে আগুন···

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

৫

তৃতীয় অধ্যায়

৩।১-২ "হে জনার্দ্দন, যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হইল তবে বৃথা কেন আমাকে এই নিষ্ঠুর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছ। গোলমেলে কথা বলিয়া তুমি আমার বুদ্ধি নষ্ট করিতেছ; ঠিক কি করিলে আমার মঙ্গল হয় তুমি তাহাই বল।"

'কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ' অর্জ্জুন এই কথা বলিলেন। দুই বস্তুর তুলনা করিতে হইলে তাহারা একই বর্গের হওয়া আবশ্যক। "জ্ঞানযোগের" সহিত "কর্ম্মযোগের" তুলনা হইতে পারে, কর্ম্মের সহিত অকর্ম্মেরও তুলনা হইতে পারে (যেমন ৩।৮ শ্লোকে) কিন্তু বুদ্ধির সহিত কর্ম্মের তুলনার অর্থ কি? বুদ্ধি ও কর্ম্ম এক প্রকারের বস্তু নয়। বুদ্ধির দ্বারাই আমরা স্থির করি কি কর্ম্ম করিতে হইবে। ফলকামনায় যে কর্ম্ম করা হয় শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন তাহাতে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, কেন-না, কর্ম্মের ফল কাহারও আয়ত্ত নহে। ফলেই যদি আগ্রহ না রহিল তবে কর্ম্ম করায় লাভ বা আবশ্যকতা কি? ফলাফল সমান হইলে কর্ম্ম না হয় নাই করিলাম অথচ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কর্ম্ম না করিবারও আগ্রহ করিও না (২-৪৭)। কর্ম্মের ফলাফল যদি সমান হয় এবং বুদ্ধির দ্বারা যদি সেই সমত্ব লাভ হয় তবে বুদ্ধি যাহাতে স্থির হয় তাহার চেষ্টা করিলেই হইল, কোন বিশেষ কর্ম্মের দরকার কি? এই অর্থেই অর্জ্জুন বুদ্ধিকে কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলেন এবং অর্জ্জুনের প্রশ্নেরও উদ্দেশ্য ইহাই। ৩-৪২ শ্লোকেও এইরূপ অর্থেই বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ।

শঙ্করের মতে এই শ্লোকে বুদ্ধির অর্থ জ্ঞান। অতএব তাঁহার মতে প্রশ্ন দাঁড়াইল, কর্ম্ম হইতে যদি জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, কর্ম্মমার্গ ভাল না জ্ঞানমার্গ ভাল। শঙ্কর-মতে জ্ঞানমার্গই সাংখ্যমার্গ বা সন্ন্যাসমার্গ। জ্ঞানমার্গে কর্ম্মত্যাগ বিধেয়। শঙ্করমতে কৃষ্ণ কেবল জ্ঞানেই শ্রেয়ঃ এই কথাই গীতায় বলিয়াছেন। যেখানে অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন সেখানে অর্জ্জুনের জ্ঞাননিষ্ঠাতে অধিকারের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই। [তৃতীয় অধ্যায়ের শঙ্কর ভাষ্যের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।] শঙ্কর তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্বাচার্যাদের জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদ খণ্ডনে ব্যস্ত। ৫।১ শ্লোকে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন কর্ম্মযোগ ভাল, না কর্ম্ম-সন্ন্যাস ভাল। শঙ্করের ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে বলিতে হয়, অর্জ্জুন একই প্রশ্ন দুইবার করিয়াছেন। আমি এই ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে করি না। আমার মতে বুদ্ধির অর্থ সোজাসুজি বুদ্ধি রাখিতে হইবে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন, নিষ্ঠুর কর্ম্ম কেন পরিত্যাগ করিব না। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন, সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্ম কেন পরিত্যাগ করিব না।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নের সহিত পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নের সম্পর্ক কি বুঝিতে হইলে দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের প্রশ্নের পারম্পর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের ধারা লক্ষ্য করা আবশ্যক। বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম। দেখা যাইবে যে, অর্জ্জুনের প্রশ্নে পুনরুক্তি দোষ নাই। এই প্রশ্নোত্তর-সংক্রান্ত ৩।৯ শ্লোকের অর্থ সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যার অনুরূপ করি নাই। প্রশ্নোত্তরে যে কথা উহ্য আছে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছি।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ কর্ম্মযোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের প্রশ্নের পারম্পর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

২।৭ অর্জ্জুন। আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আমার যুদ্ধ করা উচিত কি না, আমার কিসে শ্রেয়ঃ হয় বল।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যুদ্ধের কথায় শোক ও পাপভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়াছ ও বড় বড় কথা বলিতেছ; সে সব ছাড়িয়া বুদ্ধির শরণ লও। বেদবাদীদের কথায় মোহিত হইও না। কর্ম্মফল তোমার আয়ত্ত নহে। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হইয়া অসঙ্গচিত্তে কর্ম্ম কর। ইহাতে স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভ হইবে। [অর্জ্জুনের প্রশ্নে (২।৫৪ শ্লোকে কৃষ্ণ) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিলেন।] অসঙ্গচিত্তে বিষয়ভোগে ধাতু প্রসন্ন হয় (২।৬৪) ও ফলে বুদ্ধি শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। অতএব ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া যুদ্ধ কর।

৩।১ অর্জ্জুন। যে বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা যায় তাহাই যখন প্রধান কথা, তখন নিষ্ঠুর কর্ম্ম কেন করিব? [এথানে সাধারণ কর্ম্মের কথা বলা হয় নাই। অর্জ্জুনের প্রশ্নের অর্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কাছে সব কর্ম্মই যখন সমান ও যখন এই আদর্শই বড় তখন নিষ্ঠুর কর্ম্ম না-হয় নাই করিলাম, বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি ভাল কাজই করি ও ক্রুর কাজ পরিত্যাগ করি।]

শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমে বুঝ যে একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিবার উপায় নাই। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গ আছে সত্য, কিন্তু যে মার্গই অবলম্বন কর না কেন, কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম বিনা জীবনযাত্রাও চলিবে না। যদি মনে করিয়া থাক যজ্ঞকর্ম্ম নির্দ্দোষ তাহাও ভুল। যজ্ঞেরও বন্ধন আছে। অতএব অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর। ইহাতে পরম লাভ হইবে। আরও দেখ, লোক-শিক্ষার জন্যও কর্ম্ম দরকার। প্রকৃতিই মানুষকে কর্ম্ম করায়। তুমি যুদ্ধ করিব না বলিলে কি হইবে, প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাইবেই। বুঝিয়া চলিলে নিষ্ঠুর কর্ম্মেও বন্ধন নাই। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের দিকে তোমার প্রবৃত্তি স্বভাবজ। কেবল মোহবশেই যুদ্ধ করিব না বলিতেছ। মযুদ্ধ সাজ্ঞ-অনুমোদিতও বটে। এই জন্য তাহা তোমার স্বধর্ম্ম। অতএব ক্রুর কর্ম্ম করিব না বলিয়া লাভ নাই। স্বধর্ম্ম বিগুণ বোধ হইলেও নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ কার্য্য ভয়াবহ। সেরূপ কার্য্যে ধাতু অপ্রসন্ন থাকে ও শ্রেয়লাভ হয় না।

৩।৩৬ অর্জ্জুন। তুমি বলিতেছ প্রকৃতি আমাকে যুদ্ধ করাইবেই। কাহার বশে অর্থাৎ প্রকৃতির কোন্ গুণের জোরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে? কাহার বশে মানুষে পাপ কাজ করে? [এখনও অর্জ্জুনের যুদ্ধকে পাপ বলিয়া মনে হইতেছে।]

শ্রীকৃষ্ণ। কাম অর্থাৎ কামনাই মনুষ্যকে পাপ কর্ম্ম করায়। কাম অতি প্রবল ও তাহা পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে। যদি মনে কর যে, তাহা হইলে কামেরই জয়জয়কার হয় না কেন ও পৃথিবী পাপে ভরিয়া যায় না কেন, তাহার উত্তর এই যে, পাপ বৃদ্ধি পাইলে ও ধর্ম্মের গ্লানি হইলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তাহার প্রতিকার করেন। অবতারতত্ত্ব জানিলে কর্ম্মবন্ধন হয় না (৪।১৪)। তুমি যুদ্ধকে ক্রুর কর্ম্ম বলিতেছ, কিন্তু কি কর্ম্ম কি অকর্ম্ম আর কি বিকর্ম্ম সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরাও একমত নহেন। কর্ম্মে যে অকর্ম্ম দেখে সে-ই বুদ্ধিমান (৪।১৮)। অসঙ্গ হইয়া শরীরই কেবল কর্ম্ম করিতেছে এই জ্ঞানে কর্ম্ম করিবে। বাস্তবিক মনুষ্যেরা যে কাজই করুক না কেন, আমার বশেই তাহা করিয়া থাকে। যজ্ঞের মত ভাল কাজেও বন্ধন আছে। অতএব বিবিধ যজ্ঞাদিও এই ব্রহ্মবুদ্ধিতেই করা উচিত। উপযুক্ত জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের অবসান হয় (৪।৩৩)। যাহাকে পাপ কাজ মনে করিতেছ তাহাও জ্ঞানে দগ্ধ হয়। জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই (৪।৩৬-৩৮)।

৫।১ অর্জ্জুন। তোমার কথা না হয় মানিলাম; ক্রুর কর্ম্ম হইলেও স্বধর্ম্ম আচরণীয়। আর ব্রহ্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে নিষ্ঠুর কর্ম্ম ও যজ্ঞকর্ম্মে প্রভেদ নাই। কিন্তু তুমি নিজেই বলিয়াছ যে, কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দুই প্রকার সাধনাই লৌকিক। অতএব নিষ্ঠুর কর্ম্ম ভাল কর্ম্ম সবই পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে আপত্তি কি? কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুইটির ভিতর কোন্‌টি বাস্তবিক ভাল?

শ্রীকৃষ্ণ। উভয়ের ফল একই। কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস

কষ্টকর ইত্যাদি। (পঞ্চম অধ্যায়ের বক্তব্য যথাস্থানে আলোচনা করিব)।

৩।৩-৫ ক্রুর কর্ম্ম কেন করিব অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে "তোমাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তির দুই প্রকার উপায় আছে। সাংখ্যেরা বা জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগীরা কর্ম্মযোগের দ্বারা ব্রহ্মলাভ করেন। কিন্তু মনে রাখিও যে, জ্ঞানযোগের দ্বারা বুদ্ধি স্থির হইলেও এবং ইচ্ছা করিয়া কোন কর্ম্ম না করিলেও বাস্তবিক নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না এবং কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহাও নহে। জানিবে যে প্রকৃতি নিজগুণে সমস্ত মনুষ্যকেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য করায়। বাস্তবিক পক্ষে নিষ্কর্ম্ম অবস্থায় কেহই ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না, অতএব কেবল বুদ্ধি দ্বারাই সিদ্ধি হইবে, কর্ম্ম করিব না একথা বলা বৃথা।" শঙ্কর নিষ্কর্ম্ম্য অর্থে নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি করিয়াছেন। ইহা সমীচীন নহে। নৈষ্কর্ম্ম অর্থ কর্ম্মের অভাব বা কর্ম্মত্যাগের ভাব। 'কর্ম্ম' কথাটার অর্থ এখানে খুবই ব্যাপক, যাহা কিছু করা যায় তাহাই কর্ম্ম। এমন কি চিন্তা করাও কর্ম্ম। আহার, বিহার, নিদ্রা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি সমস্তই কর্ম্ম। আমি ইচ্ছা করি বা না করি আমার শরীরে ও মনে নানা ব্যাপার চলিতে থাকে, প্রকৃতির বশেই এই সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। আমরা যে নানা প্রকার কামনা বা ইচ্ছা করি তাহাও সমস্তই প্রকৃতির বশে। স্বাধীন ইচ্ছা (free will) বলিয়া কিছুই নাই। পরে বলা হইয়াছে অহঙ্কারে বিমূঢ় হইলে আমি কর্ত্তা এইরূপ মনে হয়। এই বিষয় মনে রাখিলে বুঝা যাইবে যে কাজ করা বা না করার কোন অর্থ হয় না। কেন-না, আমার বা আত্মার সহিত কাজের কোনই সম্পর্ক নাই। সিদ্ধাবস্থাভিন্ন এই ভাব অনুভূত হয় না। অতএব সাধারণ মনুষ্য যখন নিজেকে কর্ত্তা মনে করিবেই তখন শ্রীকৃষ্ণের মতে সিদ্ধভাবের অনুকূল অবস্থা রাগদ্বেষ ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা; ইহাই কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগে বিশেষ কোনই পার্থক্য রহিল না। কর্ম্মযোগে যে বুদ্ধি বিকশিত হয় তাহাই জ্ঞান-যোগ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ষষ্ঠাধ্যায়ে ১৩ শ্লোকেও এই দুই মার্গের কথা আছে "তৎকারণং সাংখ্য যোগাধিগম্যং"। পরে গীতায় নানা প্রকার মার্গের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত জানা দরকার, কারণ তাহা না জানিলে অনেক স্থলে গীতার ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হইবে না। এই অধ্যায়ের শেষে এই সকল মার্গের আলোচনা করিব।

৩।৬-৮ "যে কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযত রাখে অথচ মনে মনে বিষয়ভোগের অভিলাষ করে সে মূঢ় মিথ্যাচারী। অতএব যখন কর্ম্ম করিতেই হইবে তখন ইন্দ্রিয়-সকলকে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ সংহরণ করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা অসঙ্গ হইয়া কর্ম্ম কর। এইরূপ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়ত এইভাবে কর্ম্ম করিতে থাক। অকর্ম্ম হইতে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেন-না, অকর্ম্মের চেষ্টা করা ও মিথ্যাচার একই কথা। বাস্তবিক একেবারে সমস্ত কর্ম্ম বন্ধ হইলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।"

"নিয়তং" কথার অর্থ যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম। অধিকাংশ ভাষ্যকারই এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমি 'নিয়ত' কথার একটু ব্যাপক অর্থ করিতে চাহি। শ্রীকৃষ্ণ যাগযজ্ঞ করিবার উপদেশ দিতেছেন এমন নহে। "নিয়ত" কথার বাংলা অর্থ সতত। সমস্ত নিত্যকর্ম্মই নিয়ত কর্ম্ম। পূর্ব্বের শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ বিচার করিলে এই অর্থই সমীচীন বোধ হইবে। এখানে নিয়ত মানে যে সতত তাহার আরও প্রমাণ আছে; ৩।১৯ শ্লোকে সতত কার্য্য কর বলা হইয়াছে। যজ্ঞকে শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে দেখাইয়াছেন। তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে ২৩ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই অধ্যায়ে ও ১৮ অধ্যায়ে যজ্ঞ শব্দ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩
ন কর্ম্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮

যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ৩।৯-১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহাই অনুসরণ করিব।

৩।৯ তিলক এই শ্লোকের অর্থ করেন—"যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার অতিরিক্ত অন্য কর্ম্মের দ্বারা এই লোক আবদ্ধ আছে। তদর্থ অর্থাৎ যজ্ঞার্থ (কৃত) কর্ম্ম (ও) তুমি আসক্তি বা ফলাশা ছাড়িয়া করিতে থাক।" প্রায় অধিকাংশ ভাষ্যকারই এই ব্যাখ্যার অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার মতে এ ব্যাখ্যা ঠিক নহে। ৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে তখন যে অসঙ্গচিত্তে কর্ম্ম করে সেই শ্রেষ্ঠ। ৮ শ্লোকে বলিলেন, "অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম ভাল। অতএব তুমি সতত কর্ম্ম কর। কারণ কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাই চলিবে না।" উদ্দেশ্য শরীরযাত্রা-সংক্রান্ত কর্ম্মেও অসঙ্গ থাকা শ্রেয়ঃ। ৯ শ্লোকে বলিতেছেন, শরীর যাত্রা ব্যতীত লোকরক্ষার জন্যও তুমি যে যজ্ঞ কর তাহাতেও কর্ম্মবন্ধন আছে এবং সেই সংক্রান্ত পাপপুণ্য আছে। অতএব যজ্ঞও যদি করিতে হয় তবে তাহাও মুক্তসঙ্গ হইয়া করিবে।

৮ ও ৯ শ্লোকে কর্ম্মের চরম প্রকারভেদ দেখান হইল। একটিতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসরূপ ব্যক্তিগত শারীরিক কর্ম্মের উল্লেখ করা হইল ও অপরটিতে সমষ্টিগত যজ্ঞ উল্লিখিত হইল। যজ্ঞকার্য্য সমগ্র সৃষ্টির সহিত সম্পর্কিত।

আমি ৯ শ্লোকের যে ভাবার্থ দিলাম তাহাতে ৭।৮ শ্লোকের সহিত সঙ্গতি থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যে বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন তাহার সহিত কোন বিরোধ হয় না। পরের শ্লোকগুলিতেও আমার ব্যাখ্যারই সার্থকতা দেখা যাইবে। তিলকের ও সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যা মানিলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বেদবিহিত যজ্ঞাদি-কর্ম্মের নিন্দার সহিত বিরোধ ঘটে এবং পরের শ্লোকগুলির সহিতও সামঞ্জস্য থাকে না। ৯ শ্লোকের আমি এইরূপ অন্বয় করিতে চাই।

অন্যত্র, যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ কৌন্তেয় তদর্থং মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্ম সমাচর।

"অন্যত্র অর্থাৎ অপরদিকেও (শরীরযাত্রা ব্যতীত) দেখ যজ্ঞার্থ কর্ম্ম হইতে এই লোক কর্ম্মবন্ধনযুক্ত হয় অতএব যজ্ঞার্থ কর্ম্মও মুক্তসঙ্গ হইয়া অনুষ্ঠান কর। লোকরক্ষার জন্য যজ্ঞকর্ম্ম অতএব তাহাতে আসক্তি দোষের নয় এরূপ মনে করা ভুল।"

যজ্ঞার্থ কর্ম্মে যদি বন্ধনই না থাকে তবে "তদর্থ অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কর্ম্ম মুক্তসঙ্গ হইয়া কর" এ কথার কোন সার্থকতা থাকে না। আবার পরবর্ত্তী ১২, ১৩ শ্লোকে যজ্ঞ কর্ম্মের সহিত পাপপুণ্যের সম্পর্ক দেখান হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পাপপুণ্যের ঊর্দ্ধে উঠিতে বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। যজ্ঞকর্ম্মের বন্ধন সম্বন্ধেই পরবর্ত্তী শ্লোকের আলোচনা।

৩।১০-১৬ এই শ্লোকগুলির অর্থ বুঝিতে হইলে যজ্ঞ কি তাহা জানা দরকার।

পুরাকালে বৈদিকযুগে ও মহাভারতের সময়েও সাধারণের মধ্যে ধারণা ছিল যে, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি মনুষ্যের কার্য্যাকার্য্যের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনারই পৃথক পৃথক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছিল। জলের দেবতা বরুণ বা ইন্দ্র। ঝড়ের দেবতা পবন ইত্যাদি। এখন পর্য্যন্তও এইরূপ ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, যথা বসন্তরোগের দেবতা শীতলা, কলেরার ওলাবিবি, সাপের মনসা, শিশুমঙ্গলে ষষ্ঠী ইত্যাদি। এই সকল দেবতা মনুষ্যের কার্য্যাকার্য্য বিচার করিয়া তাঁহাদের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করেন। ইন্দ্রদেব পূজা না পাইলে রুষ্ট হইয়া বৃষ্টি বন্ধ করেন, সেজন্য

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১
ইষ্টান্‌ভোগান্‌হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

এখনও ইন্দ্র পূজার দ্বারা অনাবৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। শীতলা পূজায় আমরা অনেকে আশা করি বসন্তের প্রকোপ নিবারিত হইবে। মা ষষ্ঠীকে খুশী না রাখিলে শিশুসন্তানের অমঙ্গল হইবে। ভগবানের সৃষ্টি অর্থাৎ লোক নির্ব্বিঘ্নে চলিতে হইলে মনুষ্যেরও সাহায্য আবশ্যক। এইরূপ অনুষ্ঠানই পুরাকালে যজ্ঞ নামে অভিহিত হইত। যজ্ঞের দুই উদ্দেশ্য। প্রথম,কোনও বিশেষ দেবতাকে খুশী রাখিয়া সৃষ্টিচক্র প্রবর্ত্তিত রাখা ও দ্বিতীয় নিজ অভীষ্টফল লাভ। যজ্ঞে যে কেবল যজমানেরই স্বর্গলাভ হয় তাহা নহে পরন্তু যজ্ঞধূমে মেঘ উৎপন্ন হইয়া বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মিয়া থাকে। এইরূপ ধারণা হইতেই বলা হইত যে যজ্ঞ কর্ত্তব্য। মানুষ নিজেকে সৃষ্টিচক্রের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। সৃষ্টিচক্রের অপরাপর অংশের কার্য্যের শৃঙ্খলা মানুষের কাজের উপর নির্ভর করে কেন-না মানুষের স্বার্থ ও এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে ব্যাপাশ্রিত (inter-related and inter-dependent)। এই সৃষ্টি-চক্র প্রবর্ত্তিত রাখিয়া মানুষ নিজের যদি কিছু সুবিধা করিতে পারে তবে সে তাহা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে পারে। অন্যথা সৃষ্টিচক্র প্রবর্ত্তনে সাহায্য না করিয়া কেহ যদি কেবল নিজেই ফলভোগ করে তবে সে অন্যান্য অংশের প্রাপ্য জিনিষ নিজেই লইল এবং এই জন্যই সে চোর। আমরা এখন মিউনিসিপ্যালিটিকে যেভাবে দেখি তখন সমগ্র সৃষ্টিকে ও ত্রিলোককে সেইভাবে দেখা হইত। আমি যদি আমার বাড়ি দুর্গন্ধময় ও অপরিষ্কার রাখি তবে তাহা আমার প্রতিবেশীর পক্ষে অনিষ্টকর এজন্য আমার তাহা কর্ত্তব্য নহে, আমি যদি দেয় কর না দিয়া কলের জল ব্যবহার করি বা স্ফূর্ত্তি করিয়া ইডেন গার্ডেনে বেড়াই তবে আমি চোর, কেন-না, যে টাকার জোরে এই সব চলিতেছে তাহাতে আমার ন্যায্য দেনা না দিয়াই সুখভোগ করিতেছি। কর দিলে আমি মিউনিসিপ্যালিটি রক্ষারও সাহায্য করিলাম এবং নিজের সুখভোগেরও বন্দোবস্ত করিলাম। এইরূপ সুখভোগ তখন আমার ন্যায্য পাওনা।

যে যে কারণে মনুষ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বা পুরাকালে হইত গীতাকার তাহারই আলোচনায় যজ্ঞের কথা আনিয়াছেন, তিনি নিজে যজ্ঞের উপকারিতা মানিতেন কি না এখানে সে প্রশ্ন উঠিতেছে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, গীতার উপদেশ-সকল মার্গের ব্যক্তির প্রতিই প্রযোজ্য, এজন্য গীতাকার নিজে এ সকল কথা না মানিয়াও লিখিতে পারেন; তিনি যে যজ্ঞের বিশেষ পক্ষপাতী নহেন তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়েই দেখা গিয়াছে। এই অধ্যায়েও ১৭ শ্লোকে বলিয়াছেন আত্মরত ব্যক্তির কোন কার্য্যই নাই। ১৮।৫ শ্লোকে যজ্ঞসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিজ মত ব্যক্ত হইয়াছে; তিনি বলিতেছেন যজ্ঞ, দান, তপ পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই; তাহাতে মনীষীরা পবিত্র হন। এই সকল ক্রিয়ায় ইহার অধিক উপকার শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন নাই।

এইবার ১০ হইতে ১৬ শ্লোকের ভাবার্থ দেখা যাক্ :—

"প্রজাপতি পূর্ব্বে যজ্ঞসহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা তোমাদের বৃদ্ধি হউক এবং এই যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টফলদাতা হউক। তোমরা দেবতাদের সন্তুষ্ট করিলে তাঁহারা তোমাদের ঈপ্সিত ফল দিবেন, ইহাতে উভয়েরই শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। দেবতাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহাদের না দিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত ফল যে ভোগ করে সে চোর। যজ্ঞের অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণে সকল পাপ মোচন হয়, কিন্তু কেবল নিজ সন্তোষের জন্য প্রস্তুত ভোগ্য দ্রব্য সেবনে পাপ হয়। অন্ন হইতে জীব-সকল জন্মে, অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয় এবং বৃষ্টি মেঘ হইতে হয়। এই মেঘ যজ্ঞধূমে জন্মে এবং যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভব। কর্ম্মের উদ্ভব প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে এবং ব্রহ্মা অক্ষর পুরুষ হইতে উৎপন্ন, অতএব যজ্ঞেও সর্ব্বগত ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। অর্থাৎ যজ্ঞ করিলেই যে দোষ হয় তাহা নহে, যজ্ঞেও ব্রহ্মলাভ হয় যদি অসঙ্গ চিত্তে তাহা আচরিত হয়। এই প্রকার চক্রের নিয়মে না চলিয়া কেবল নিজের ইন্দ্রিয়সুখের বশে চলিলে পাপ হয়।" শ্রীকৃষ্ণের কথার তাৎপর্য্য এই, যদি তুমি যজ্ঞের উপকারিতা মান তাহা হইলে নিষ্কর্ম থাকা চলে না এবং যজ্ঞ না করিয়া কেবল নিজের সুখের জন্য কর্ম্ম করিলে তস্করের ন্যায় আচরণ হয়। যজ্ঞ যদি করিতেই হয় তবে নিঃসঙ্গ চিত্তে কর—যজ্ঞের কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ও পাপপুণ্যের উপরে উঠিবে। বাস্তবিক যাহার বুদ্ধি

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার যজ্ঞের আবশ্যকতা নাই। পরের শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে।

৩।১৫ শ্লোকে 'ব্রহ্মোদ্ভব' শব্দের অর্থ তিলক 'ব্রহ্ম' হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন। অগত্যা 'ব্রহ্ম' মানে প্রকৃতি বলিতে হইয়াছে। আমি 'ব্রহ্মোদ্ভব' শব্দের অর্থ "ব্রহ্মা" হইতে উৎপন্ন এইরূপ করিয়াছি। যে-হিসাবে যজ্ঞে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন বলা হইল সেই হিসাবে প্রত্যেক কর্ম্মেই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন বলা যায়, অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজে যজ্ঞের কোন বিশেষ সার্থকতা মানিলেন না।

৩।১৭-১৯ পূর্ব্ব শ্লোকে বলিলেন যজ্ঞ করিয়াও অসঙ্গচিত্ত থাকিলে বন্ধন হয় না। এই শ্লোকে বলিতেছেন যে স্থিতপ্রজ্ঞের যজ্ঞ করিবার বা অন্য কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। এই শ্লোকে "কার্য্য" মানে "কর্ম্ম" নহে। কার্য্য "কর্ত্তব্যকর্ম্ম" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'কার্য্য' অর্থাৎ করণীয়। স্থিতপ্রজ্ঞের কোনও কর্ম্ম নাই একথা হইতে পারে না। কেন-না, কর্ম্ম বিনা শরীরযাত্রাও চলে না।

"কিন্তু যে-মানবের বিষয়ে রতি না হইয়া আত্মাতেই রতি বা প্রীতি হয়, যাহার আকাঙ্ক্ষা বহির্বিষয়ে তৃপ্ত না হইয়া আত্মরতিতেই তৃপ্ত হয় এবং যে এইরূপে তৃপ্ত হইয়া সন্তুষ্টচিত্ত হওয়ায় অপর কোনও বিষয়ের কামনা করে না, তাহার কোনই কর্ত্তব্য নাই। তাহার কোনও কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইল বা না হইল ইহাতে কিছুই যায় আসে না। এবং সর্ব্বভূতের কাহারও সহিত তাহার কোন প্রয়োজন বা অবলম্বন বা সম্পর্ক থাকে না। অতএব তুমি যাহাতে এই অবস্থা পাইতে পার তাহার জন্য অসঙ্গচিত্তে নিয়ত বা সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। শরীরযাত্রার জন্য কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম অসঙ্গচিত্তে করিলে পরম বা ব্রহ্মলাভ হয়। কর্ম্ম করিব না একথা বলিতে হয় না। জনক প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছিলেন।" সর্ব্বভূতের সহিত সম্পর্ক থাকে না বলার উদ্দেশ্য যে এইরূপ ব্যক্তি যজ্ঞচক্রের বাহিরে। তাঁহার পক্ষে যজ্ঞের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেক মনুষ্যের সর্ব্বভূতের সহিত বা সমগ্র লোকের সহিত যে আদান-প্রদান আছে, যজ্ঞ তাহারই নিদর্শন। অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহিত করিতেছেন। কারণ এই অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন যুদ্ধরূপ ক্রূর কর্ম্ম কেন করিব প্রশ্ন করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তর পরে আসিতেছে।

৩।২০-২৪ "কর্ম্ম করিয়াই জনকাদি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। লোকসংগ্রহ বা সাধারণের উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য ও তাহাদের শিক্ষার জন্যও কর্ম্ম করা উচিত, কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা করে সাধারণে না বুঝিয়াও সেইরূপ আচরণ করে। তিনি যাহা প্রমাণ (standard—রাজশেখর) স্থাপন করেন লোকে তাহার অনুবর্ত্তন করে। আমার নিজের কোন কর্ত্তব্যই নাই তথাপিও আমি কাজ করিতেছি, কারণ আমি যদি আলস্যবশে কর্ম্ম না করি তবে লোকে আমারই পথে চলিবে ও উৎসন্ন যাইবে; ফলে বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হইবে ও প্রজার সর্ব্বনাশ ঘটিবে।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন স্থিতপ্রজ্ঞের কোন কর্ত্তব্যই নাই তখন অর্জ্জুনের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে "তবে তুমি যুদ্ধকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছ কেন ও নিজে যুদ্ধে যোগ দিয়াছ কেন?" শ্রীকৃষ্ণ নিজে একজন প্রধান ব্যক্তি, প্রধানেরা নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলে প্রজা ধ্বংস হয়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিজেকে ভগবান মনে করিয়া কথা বলিতেছেন এমন ভাবিবার কোন কারণ নাই। তিনি প্রধান এজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, প্রজারা তাঁহারই আদর্শে চলিবে ইহাই বলা উদ্দেশ্য। সমগ্র গীতাতে সামাজিক আদর্শকে যে কত বড় করিয়া ধরা হইয়াছে তাহা এই সকল শ্লোকে বোঝা যায়।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্যকার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্ত মবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্ উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

৩।২৭-২৬ "অবিদ্বানগণ যেমন আসক্তিবশে কর্ম্ম করে বিদ্বান সেইরূপ লোকসংগ্রহার্থে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন। বিদ্বানগণ যেরূপ আচরণ করেন সাধারণেও তাহাই করে, অতএব বিদ্বানগণের এমন কোন কাজ করা উচিত নহে যাহাতে লোকশিক্ষার আদর্শ ক্ষুন্ন হয়। যাহাদের কর্ম্মে আসক্তি আছে তাহাদের 'পাপপুণ্য সমান', 'স্থিত প্রজ্ঞের কোন কর্ত্তব্য নাই', ইত্যাদি বলিয়া বুদ্ধি বিচলিত করিতে নাই,কারণ আসক্তিবশে তাহারা মন্দ কার্য্য করিবে ও তাহাতে সামাজিক অনিষ্ট সম্ভাবনা। বিদ্বান লোকসংগ্রহের জন্য নিজে অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিবেন ও ও পরকে করাইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নের (কি করা উচিত ? লাভালাভ যখন সমান বলিতেছ তখন যুদ্ধে কেন প্রবৃত্ত করিতেছ ?) যে উত্তর এই অধ্যায়ে দিয়াছেন এবার তাহার বিচারকরিব।

কেন কর্ম্ম করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ তাহার এই-সকল কারণ দেখাইলেন—

(১) ইচ্ছা করিয়া কর্ম্ম না করিলেই যে কর্ম্ম বন্ধ হয় তাহা নহে।

(২) কর্ম্ম না করিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহাও নহে।

(৩) ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতি তাহাকে কর্ম্ম করাইবেই।

(৪) জোর করিয়া কর্ম্ম বন্ধ করিলেও মন বিষয়-চিন্তা করিবে। এ অবস্থায় কর্ম্ম বন্ধ করা মিথ্যাচার মাত্র।

(৫) যখন কর্ম্ম করিতেই হইল ও যখন কর্ম্ম না করিলে বাঁচিয়া থাকাও সম্ভব নহে, অথচ কর্ম্মই যখন বন্ধনের কারণ, তখন ইহার একমাত্র উপায় অসঙ্গচিত্তে কর্ম্ম করা।

(৬) যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্রুর কর্ম্ম করিব না, কেবল সৃষ্টি-চক্র প্রবর্ত্তিত রাখিবার জন্য যজ্ঞ করিব ও তদুৎপন্ন ফলমাত্র ভোগ করিব এইরূপ মনে করাও ভুল। যজ্ঞ, কর্ম্মসম্ভূত এবং বন্ধনের কারণ। যজ্ঞসংক্রান্তও পাপপুণ্য আছে।

(৭) তোমাকে যদি যজ্ঞ করিতেই হয় তবে অসঙ্গচিত্তে তাহা কর। আর আমি যাহা বলিতেছি যদি সেই অবস্থায় পৌছিতে পার তবে যজ্ঞ প্রভৃতি কোনও কার্য্যেরই আবশ্যকতা থাকিবে না।

(৮) অতএব যুক্তসঙ্গ হইয়া সমস্ত কার্য্য কর। এইরূপে কার্য্য করিয়াই জনকাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

(৯) অসঙ্গচিত্ত হইলে কোনও কার্য্যে বা অকার্য্যে যখন দোষ থাকে না তখন কার্য্য না-হয় নাই করিলাম এবং ইচ্ছামত যদি কুকার্য্যই করি, তাহাতেই বা কি ?—এরূপ মনে করা ভুল। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন সাধারণে তাঁহারই দৃষ্টান্তে চলে। অতএব এমন কোন আচরণ উচিত নহে যাহাতে লোক উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে বা যাহাতে সমাজ-বন্ধন শিথিল হয়। সাধারণের কাছে এমন কোন কথা বলিবে না বা এমন কোন কাজ করিবে না যাহাতে তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি বা সামাজিক আদর্শ ক্ষুন্ন হয়।

(১০) ইহাও জানিবে যে বাস্তবিক তুমি কর্ম্ম করিতেছ, না প্রকৃতিই কর্ম্ম করিতেছে। তোমার আত্মা নির্লিপ্তই আছে।

(১১) প্রকৃতি যখন তোমাকে তোমার স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করাইবেই তখন নিজের সামাজিক আদর্শ অনুসারে অর্থাৎ স্বধর্ম্মে থাকিয়া কার্য্যই শ্রেয়ঃ। তোমার যুদ্ধই কর্ত্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তরগুলিতে একটু গোল বাধিল। শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই ও সকল অবস্থাতেই সামাজিক আদর্শ মানিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া অর্থাৎ যে-অবস্থায় কোনও কামনা নাই। মানুষ নিজে নিজেতেই তৃপ্ত হয়। এই অবস্থায় পৌছিলে সমাজ বজায় থাকুক এমন ইচ্ছাই হইবে কেন? ও এইরূপ ইচ্ছার মূল্যই বা কি? স্থিতপ্রজ্ঞের কেনই বা লোকসংগ্রহের অর্থাৎ লোকশিক্ষার আগ্রহ থাকিবে। এইরূপ আগ্রহ থাকা মানেই যে সমাজরক্ষাকর্ম্মে স্থিত-প্রজ্ঞের সঙ্গদোষ যায় নাই। সমাজরক্ষা করিতে গিয়া স্থিতপ্রজ্ঞত্ব রহিল না। আর যদি সমাজরক্ষায় স্থিতপ্রজ্ঞ অনাসক্ত হন তবে সমাজ থাকিলেই বা কি, যাইলেই বা কি? প্রকৃতির বশে স্থিতপ্রজ্ঞের যাহা খুশী ব্যবহার হউক না কেন, তাহাতে তাঁহার কি আসে যায়? শ্রীকৃষ্ণ নিজে স্থিতপ্রজ্ঞ। বলিলেন আমার কোন কর্ত্তব্যই নাই, অথচ সমাজরক্ষাকেই বা কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন কেন?

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্‌যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

আরও গোল আছে। ৩।১৭ শ্লোকে বলা হইল আত্মরত, আত্মতৃপ্ত মানবের কোন কর্ম্মই নাই। আমরা অবশ্য আশা করি যে কোনও উপনিষদের সহিত গীতার বিরোধ থাকিবে না। মুণ্ডকোহপনিষদে তৃতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড, ৪র্থ শ্লোকে আছে—

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ

"যিনি সমুদায় ভূতের আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রাণস্বরূপ, তাঁহাকে যিনি জানেন সেই বিদ্বান অতিবাদী হন না অর্থাৎ ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হন অর্থাৎ পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই আনন্দিত হন এবং ক্রিয়াবান অর্থাৎ সৎকার্য্যশালী হন, ইনিই ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

মুণ্ডকে বলা হইয়াছে ব্রহ্মবিৎ ক্রিয়াবান হন। তাঁহার কার্য্য নাই অথচ তিনি ক্রিয়াবান এ কিরূপে সম্ভব হয়? শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের ক্রিয়াবান হওয়ার যে কারণ দেখাইয়াছেন আমি তাহার অযৌক্তিকতা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই বিরোধের সমাধান কি? আমার মতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে কোনও বিরোধ নাই এবং গীতার শ্লোক ও মুণ্ডকের শ্লোকেও বাস্তবিক কোন অসামঞ্জস্য নাই।

শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, প্রকৃতি আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। আত্মা বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকে। মনঃবুদ্ধি অহংকারচিত্ত প্রভৃতি কিছুই আমি নহি। "মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তানিনাহম্।" মায়াবশেই আমরা মনে করি যে আমিই কর্ম্ম করিতেছি। আমরা যে প্রকৃতির বশেই চলি এবং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া যে কিছুই নাই তাহা সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না। আমি ইচ্ছা করিলেই হাত তুলিতে পারি বা না পারি, অতএব আমার ইচ্ছা স্বাধীন। কিন্তু শাস্ত্রকারের মতে আমার মনে হাত তুলিব কি না তুলিব এই যে দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে হাত তুলিব ইহাই যদি ইচ্ছা হয় তবে তাহার সমস্তটাই প্রকৃতির বশে হইয়াছে। উদাহরণের দ্বারা বিষয়টা স্পষ্ট হইবে। ঘড়ির যদি চৈতন্য থাকিত এবং সে যদি মনে করিত আমি ইচ্ছামত আমার ছোট কাঁটাটাকে আস্তে চালাইতেছি এবং বড়টাকে জোরে চালাইতেছি, পাঁচটার দাগে ছোট কাঁটাকে রাখিয়া বড় কাঁটাকে বারটার কাছে লইয়া গিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি বাজিব কি না, পরে ইচ্ছামত পাঁচটা বাজিলাম, ইচ্ছা করিলে নাও বাজিতে পারিতাম বা ছোট কাঁটাকে চারিটার দাগে আনিয়া পাঁচটা না বাজিয়া চারিটা বাজিতে পারিতাম—তবে ঘড়ির অবস্থা অনেকটা আমাদের মত হইত। আমাদের ইচ্ছার নানারূপ বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই মনে করি ইচ্ছা স্বাধীন। সাধারণ মনুষ্যই হউন আর স্থিতপ্রজ্ঞই হউন, আমার এইটা কর্ত্তব্য ও এইটা কর্ত্তব্য নহে মনে করাটাই ভুল। তবে সাধারণ হিসাবে বলিতে গেলে ঘড়ি যেমন বলিতে পারে চারিটার দাগে আসিলে চারিটা বাজা উচিত, পাঁচটা বাজা উচিত নহে, সেইরূপ আমরা বলি ইহা কর্ত্তব্য, ইহা কর্ত্তব্য নহে। কেহ যদি স্থির চোখে ধীরমনে ঘড়ি দেখে সে যেমন বলিতে পারে ঘড়িতে এইবার পাঁচটা বাজিবে, এইবার বড় কাঁটা ছোট কাঁটাকে ছাড়াইয়া যাইবে, সেইরূপ আমরাও স্থিরচিত্তে মনুষ্যচরিত্র আলোচনা করিলে কতকটা বলিতে পারি প্রকৃতি কোন্‌দিকে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে। অবশ্য আমাদের জ্ঞান এমন পূর্ণ হয় নাই যে বলিতে পারি কোন্ মনুষ্য কোন্ অবস্থায় কি কার্য্য করিবে, কিন্তু সাধারণ হিসাবে মোটামুটি কোন কোন স্থলে পূর্ব্ব হইতেই বলা যায় যে, আমরা কিরূপ অবস্থায় পড়িলে কিরূপ ব্যবহার করিব।

ব্যক্তিগত প্রকৃতির লীলা না বুঝিলেও এবং সে-সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী না করিতে পারিলেও সাধারণভাবে প্রকৃতি আমাদিগকে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে বুঝিতে পারি। পাঠক মনে রাখিবেন স্বাধীন ব্যবহার না থাকিলে তবে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। স্রোত দেখিলে যেমন বলা যায় যে অধিকাংশ কুটাই স্রোতের বশে ও স্রোতের দিকেই ভাসিয়া যাইবে সেইরূপ প্রকৃতির বশে মানুষের সামাজিক আদর্শে যে অধিকাংশ ব্যক্তিই চলিবে এ কথা বলা যায়। আদর্শ মানেই যেদিকে ঝোঁক বেশী, অর্থাৎ যেদিকে প্রকৃতির স্রোতের মূলধারা প্রবাহিত হইতেছে। সব কুটাই যে স্রোতের বশে চলিবে এমন নহে। কুটা ভারি হইলে জলে ডুবিয়া যাইবে। স্রোতে চলা যেরূপ প্রকৃতির কার্য্য জলে ডোবাও সেইরূপ। অধিকাংশ কুটা হাল্‌কা বলিয়াই স্রোতের বশে যায়। ভারি কুটার স্রোতের বশে যাওয়ার

ঝোঁক ছাড়াও নীচে ডোবার ঝোঁক আছে। মনুষ্য-ব্যবহার বিচার করিয়াই আমরা বুঝিতে পারি প্রকৃতির কর্ম্ম করাইবার মূল ঝোঁক কোন্‌দিকে? প্রাণিবিৎ (biologist) যাহাকে সহজ সংস্কার (instinct) বলেন তাহা প্রকৃতির স্রোতের এক একটি ধারা। সহজ সংস্কার বশে যে কাজ হয়, ব্যক্তিগত হিসাবে তাহা স্বাধীন ইচ্ছার বশে হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়। প্রাণীদের নানা প্রকার-সহজ সংস্কার আছে; ইহাদের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে যে-যে প্রবৃত্তির বা ঝোঁকের উৎপত্তি হয় তাহাই ব্যক্তিগত হিসাবে সামাজিক আদর্শ বলা যাইতে পারে। প্রাণিবিৎ বলিতে পারেন বহুসংখ্যক নরনারী একত্রে মিলিত হইলেই তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রেমে পড়িবে ও সংসার পাতিবে, কতক সংখ্যক মারামারি করিবে ইত্যাদি; প্রাণিবিৎ জানেন প্রকৃতির মূল ধারাগুলি কোন্ দিকে চলিতেছে। এই সকল বিভিন্ন স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে সামাজিক ও যৌথপ্রবৃত্তি (social instinct or herd instinct) সমূহের উৎপত্তি ও তাহারই বশে সামাজিক আদর্শ কল্পনা। যে-মানুষ প্রেমে পড়ে ও সংসার পাতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে না যে, সে অন্ধ সংস্কারের বশে চলিয়া এমন কাজ করিয়াছে। সে প্রেমাস্পদের নানাগুণ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে, কর্ত্তব্য হিসাবে সে বিবাহ করিয়াছে, ভাল লাগে বলিয়া ছেলে-মেয়েকে আদর করিতেছে, ইত্যাদি। যেদিন আমরা প্রকৃতির সবটা বুঝিব সেদিন প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক ব্যবহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিব। সবটা জানি না বলিয়াই বলিতে পারি না সামাজিক মূলধারার বিরুদ্ধে কেনই বা কোন কোন ব্যক্তি যায়, কেনই বা দুই চারিটা ফুটা ভারি ও জলে ডোবে, কেনই বা বিভিন্ন মনুষ্যের ব্যবহার বিভিন্ন। সামাজিক আদর্শের বশে বা কর্ত্তব্যবোধে ভাল কাজ করি ও পাপ ইচ্ছা বশে খারাপ কাজ করি বলাও যা, ঐ সকল কাজে প্রকৃতির বশে করিতেছি বলাও তা; বাস্তবিক কাহারও কোন দায়িত্বই নাই, যে পাপ করে তাহারও নয় যে শাস্তি দেয় তাহারও নয়। প্রকৃতির কোন্ গুণের বশে একটা ফুটা স্রোতের মুখে চলে অর্থাৎ সামাজিক আদর্শ মানে আর কোনটা ডোবে অর্থাৎ আদর্শ মানে না তাহার বিচার সম্ভব। এরূপ কৌতূহল হওয়াতেই অর্জ্জুন ইহার পরেই ৩।৩৬ শ্লোকে প্রশ্ন করিলেন "কিসের বশে মানুষ পাপ করে?"

যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁহার নিজের কোন কামনা নাই, অর্থাৎ কোন বিশেষ দিকে ঝোঁক নাই। নদীতে একটি ষ্টীমার ও একটি কর্ণধারহীন নৌকা ভাসিতেছে। ষ্টীমারের ষ্টীমের জোরে নিজের মতে চলিবার একটা ঝোঁক আছে; সব সময় সে স্রোতের বশে চলে না, কিন্তু কর্ণধারহীন নৌকা স্রোতের বশেই চলে—ইহাতে তাহার কোনই আয়াস নাই; স্রোতকে সামাজিক আদর্শ ধরিলে এইরূপ কর্ণধারহীন অর্থাৎ কামনাবিহীন মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা সামাজিক আদর্শানুযায়ী চলিবে। সে-ই সকলের অপেক্ষা ক্রিয়াবান হইবে। ষ্টীমারও বাষ্পের (steam) ঝোঁকে স্রোতের বশে চলিতে পারে, কামনাযুক্ত মনুষ্যও ক্রিয়াবান হইতে পারে। কিন্তু এই দুই ক্রিয়াবানের মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন অসঙ্গচিত্তে কাজ করেন ও অপর জন আগ্রহের সহিত সেই কাজ করেন। উভয়কে যদি উঠাইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও উল্টা আদর্শের সমাজের মধ্যে ফেলা যায়—এইরূপ দুই অহিংস ধর্ম্মী বৈষ্ণবকে যদি শাক্ত সমাজে ফেলা যায়, তবে স্থিতপ্রজ্ঞ বৈষ্ণব সহজেই শাক্ত আদর্শমতে চলিতে পারিবেন, কিন্তু অপর বৈষ্ণবের দারুণ অশান্তি হইবে। স্থিতপ্রজ্ঞের প্রতিযোজন ক্ষমতা বা সর্ব্বাবস্থায় নিজেকে মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা (adaptibility) বেশী; কোন অবস্থায় তাহার কষ্ট নাই; মরিলেও নয়। সামাজিক মূল স্রোতের বিরুদ্ধে চালিত হইলেও তাহা প্রকৃতির বশেই হইতেছে বুঝিতে পারিলে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়; এরূপ ব্যক্তি মনে করেন প্রকৃতিই তাঁহাকে পাপ করাইতেছে—তিনি বাস্তবিক নির্লিপ্ত; এরূপ অবস্থায় বাস্তবিক কোন পাপ নাই; সামাজিক হিসাবে দুই প্রকার ব্রহ্মবিৎ হইলেন—একজন ভাল ও একজন মন্দ। এইজন্যই মুণ্ডকের শ্লোকে ক্রিয়াবান ব্রহ্মবিদকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের অসঙ্গচিত্ত হওয়ার কথা ও সামাজিক কর্ত্তব্য-পালনের কথায় কোনই বিরোধ নাই। উপরে যাহা বলিলাম পরের শ্লোকে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে।

তীর্থের ফল

(চিত্র)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

এবারকার তীর্থযাত্রায় আমরা সর্ব্বসুদ্ধ ছিলাম দশ জন। যাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে এই যাত্রা, তাঁহারা সকলেই অন্তঃপুরচারিণী—এ কথা বলাই বাহুল্য। 'অম্লমধুরে'র 'পিক্‌লু' ছিলেন না—'কাঁসর' ছিলেন; এবং আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা কোন স্বরগ্রামের পর্য্যায়ে পড়েন না, সুতরাং কাঁসরের বাদ্যটা এবার সেরূপ শ্রুতিমধুর হয় নাই।

রাঙামামীর সংসারে দুই পুত্র, পুত্রবধূ এবং অনেকগুলি পৌত্র পৌত্রী। বয়স ষাটের কাছাকাছি। স্বামী-বিয়োগের পর হইতেই আজ পনের বৎসর যাবৎ পুণ্য-সঞ্চয় ও শোক-নিবারণের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রার আয়োজন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা-না-একটা বিঘ্ন ঘটিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। এবার পাড়ার আর পাঁচ জনকে বাহির হইতে দেখিয়া পণ করিলেন—যেমন করিয়াই হউক পুণ্যসঞ্চয় করিবেনই করিবেন।

যাত্রার কয় দিন পূর্ব্ব হইতেই নাতিনাতিনীগুলিকে কাছে বসাইয়া নিজের হাতে খাবার খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। কত খেলানা কিনিয়া দিলেন ও দিবারাত্র আদর-চুম্বনে তাহাদের কচি মুখগুলিকে রাঙা করিয়া তুলিলেন। ছেলেদের বার-বার আশীর্ব্বাদ করিলেন, পুত্র-বধূদের সংসার সম্বন্ধে কত স্নেহসতর্ক উপদেশ দিলেন। অবশেষে যাত্রা-দিনে পোঁটলাপুটুলী লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের সঙ্গে ট্রেনে আসিয়া উঠিলেন।

অপর সহযাত্রিণীদের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। আত্মীয়-স্বজনবিচ্ছেদে সকলেই কিছুক্ষণের জন্য ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন।

ট্রেন চলিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ক্ষণপূর্ব্বের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। পরস্পর পরস্পরের সুখদুঃখের তত্ত্ব লইতে লাগিলেন। সুখদুঃখের কাহিনী ক্রমেই উঁচু পর্দ্দায় উঠিতে লাগিল।

ট্রেন না হইলে অনায়াসে ভাবা যাইত এটা একটা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের চণ্ডীমণ্ডপ। জাতিপাতের পূর্ব্বসূচনা স্বরূপ গ্রামপতিদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা চলিয়াছে ঘোর রবে। সেই কলরব কোলাহল ভেদ করিয়া শুধু কয়েকটি কথার সারমর্ম্ম আমার শ্রুতিগোচর হইল,—সংসারটা মোটেই সুখের স্থান নহে। যে যাহার স্বার্থ লইয়া সর্ব্বক্ষণ সতর্ক এবং গুরুজনদের সমীহ করিয়া চলিবার প্রবৃত্তি এই কালের কোনও কল্যাণীয়দের মনেই জাগে না! সকলেরই পুত্র, পুত্রবধূ অথবা দূর নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় আত্মীয়া এই সকল ভাল মানুষগুলিকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিবারাত্র অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছেন। কালের দোষ ছাড়া আর কি?

একটি বধূ আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া এই-সব পূজনীয়াদের পরম রুচিকর আলাপ আলোচনা শুনিতেছিল এবং কোলের ছোট ছেলেটির পানে চাহিয়া হয়ত বা মনে মনে ভাবিতেছিল,—আমার মণ্টুর বউ হইলে কখনই আমি এমন করিতে পারিব না। আমার বড় আদরের ছেলে, তার বউ—মাগো!

বধূ হয়ত জানিত না, তার স্বামীর বাল্যকালে এই-সব বর্ষীয়সীরা ঠিক এইরূপই মনে করিতেন। তাঁহারাও এক সময়ে নবীনা মা ছিলেন এবং সন্তানকে প্রাণের অধিক ভাল-বাসিতেন। কিন্তু গোল ওই প্রাণের সঙ্গে ভালবাসাবাসির মধ্যেই বাসা বাঁধে। মায়েরা মনে করেন—ছেলে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি। কাল্পনিক বধূর উপর যথেষ্ট স্নেহমমতা দেখাইলেও রক্তমাংসের শরীর লইয়া বধূ যেদিন সংসারে পদার্পণ করে, সেদিন অধিকাংশ মা-ই এই সম্পত্তিকে

হারাইবার ভয়ে সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে গৃহলক্ষ্মীকে কোলে টানিয়া লইতে পারেন না। স্বার্থের সূক্ষ্ম একটু রেখা এত সোহাগ হর্ষের মাঝখানেও কাচের দাগের মত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাই কয়েক মাসের মধ্যেই মা হইয়া উঠেন শাশুড়ী ও সংসারের সংঘাত এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ঝটিকায় বাড়িয়াই চলে।

কথাটা রূঢ় হইলেও সত্য। শাশুড়ীর স্নেহমমতা—বধূর জন্য দরদ সবই আছে, কিন্তু অন্তর্নিহিত সত্যের ছায়া এ সকলের পশ্চাতে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঠিক যেমন সূর্য্যের বিপরীত দিকে মানুষের ছায়া।

বধূর কর্ম্মপটুতার মধ্যে, চালচলনে, হাসি ও রূপের বিশ্লেষণে প্রতিদিনই এই সকল স্বার্থকলুষ আত্মপ্রকাশ করে। কোন সংসারে ঝড় উঠে, কোথাও বা শীতের মেঘের মত নিঃশব্দেই মিলাইয়া যায়। বুদ্ধি দিয়া কেহ ঢাকিতে পারেন, কেহ বা সরল মনের কাহিনী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পাঁচজনের সাক্ষাতে বলিয়া তাহাদের কৌতুক-কৌতূহল বৃদ্ধি করেন।

ট্রেন চলিতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় নামবেন প্রথমে?"

দক্ষিণপাড়ার বিন্দুবাসিনীর অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে বিশেষ রকমেরই ছিল। বলিলেন, "আগে পৈরাগ। কথায় বলে,—

পৈরাগে মুড়ায়ে মাথা—
যাকৃগে পাপী যেথাসেথা।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না বিন্দুদি—এতগুলি লোককে আমি কখনই পাপী মনে করতে পারি না।"

মাথা নাড়িয়া বিন্দু দিদি বলিলেন, "পাপী নয় ত কি? আর জন্মে কত পাপ করেছিলাম তাই—" একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া সমাপ্তির ছেদ টানিলেন।

বিন্দুদির অবস্থা ভাল। কন্যাদের লইয়া সংসার; তাহারা মায়ের অর্থ-মহিমায় বাধ্য এবং বশীভূত। পাপের মধ্যে এক—স্বামী নাই। তা সেজন্য দুঃখ বিন্দুদি কোন কালেই করিতেন না। আজ সহসা হয়ত সেই কথাই স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

রাঙামামী বলিলেন, "পাপের কথা আর ব'লো না, বাবা। তিনি গিয়ে ইস্তক—বাড়ির দুয়োরে ষাঁড়েশ্বর একদিন দর্শন করতে পারি নি!"

কাঁসর বলিলেন, "পাপের শরীল না হ'লে আম্বলের ব্যায়রামে এত কষ্ট পাই।" বলিয়া হেউ করিয়া একটা ঢেকুর তুলিয়া মুখবিকৃতি করিলেন।

উত্তরপাড়ার হ'রের মা সানুনাসিক স্বরে বলিলেন, "পাপিষ্ঠী যদি না হব ত এক ছেলে বউ নিয়ে 'ভেন্ন' হ'ল কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে বাকী সকলে পাপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে শত-মুখ হইয়া উঠিলেন।

ভাগ্যে বধূটির কথা বলিবার কোন সুযোগ মিলিল না এবং কোলের কচি ছেলেটিও পাপপুণ্য সম্বন্ধে অজ্ঞান, নতুবা মনে হইত ধর্ম্মরাজের পুরীর কোন এলাকা-বিশেষের মধ্যে জীবন্ত আমরা কি করিয়া আসিলাম?

স্থির করিলাম পাপভার মোচনের জন্য আমাদের সর্ব্বপ্রথম নামিতে হইবে এলাহাবাদে।

সুতরাং নামিলাম এলাহাবাদে।

শোনা গেল ধর্ম্মশালা এখানে অনেকগুলিই আছে। যমুনার ধারে ছোট্ট একতলা যে ধর্ম্মশালাটি আছে এক্কাওয়ালা আমাদের সেইখানে লইয়া চলিল।

'এক্কা' জিনিষটি কি তাহা চর্ম্মচক্ষে অনেকেই দেখিয়াছেন ও কবির ভাষায় শুনিয়াছেন, 'বেহারে বেঘোরে চড়িনু এক্কা'; কিন্তু দেখাশোনার মধ্যেও যিনি কৃপা করিয়া ইহার গদীপৃষ্ঠে কখনও দেহভার রাখেন নাই তাঁহাকে ইহার স্বরূপ বুঝাইতে যাওয়া বৃথা।

সর্ব্বাঙ্গে আড়ষ্ট ব্যথা লইয়া এক্কা হইতে নামিলাম। পয়সা দিবার সময় টাঙ্গার সুখাসনের প্রতি বারেক মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া মনে হইল, এক্কার উচ্চাসনই ভাল। শুধু গতরের উপর দিয়াই কষ্টটুকু যায়—থলির মর্ম্মাশ্রয় করে না।

গোছগাছ করিয়া বলিলাম, "কে কে স্নানে যাবেন, চলুন।"

স্নান মানে শ্রাদ্ধ তর্পণ ও মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি।

যাঁহারা পাপের মহিমা কীর্ত্তনে শতমুখ হইয়াছিলেন সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যমুনা বেগবতী। নদীবক্ষে পুণ্যকামীর নৌকা চলিয়াছে সারি সারি। আমরাও সেই সারিমধ্যে শ্রেণী রচনা করিয়া চলিলাম।

সঙ্গমস্থলে গঙ্গা যমুনার ছুটি ধারা স্পষ্ট দেখা যায়। সরস্বতী লুপ্তা। বিস্তীর্ণ বালুতীরে পাণ্ডাদের বিবিধ বর্ণের পতাকাশোভিত অসংখ্য অস্থায়ী কুটীর। নৌকা তীরে লাগিতেই মোটা মোটা খাতা লইয়া বিশাল দেহ প্রয়াগী পাণ্ডারা ছুটিয়া আসিল। আমাদের কয়টির পক্ষে একে ত তাহাদের বিশাল দেহই যথেষ্ট, তদুপরি চোখে ভ্রূকুটিময় হাসি,হাতে লাঠি ও অসংখ্য পত্রসমষ্টিতে পরিপূর্ণ বৃহদাকার খাতা। ঐ একখানা খাতা ছুঁড়িয়া মারিলেই ভবপারের তরণী সম্মুখে আসিয়া তর্ তর্ করিয়া নাচিতে থাকিবে—মুক্তি-আলোও ফুটিয়া উঠিবে!

কিন্তু পাণ্ডারা অকরুণ নহেন!

খাতা খুলিয়া সারি দিয়া বসিলেন ও আমরা ত তুচ্ছ, আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের নামধাম লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।

পাকা ছুটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল—স্বর্গগতদের কোন সন্ধানই মিলিল না। উপরের রৌদ্র হইয়া উঠিল খরতর এবং মাথার মধ্যে সেই অগ্নিকণার স্পর্শ অত্যন্ত সুশীতল বলিয়া বোধ হইল না।

রাঙামামী বলিলেন, "ওরে বাছা, ক্ষ্যামা দে—ক্ষ্যামা দে।"

কাঁসর বলিলেন, "আ-মরণ! মিন্সেদের রকম দেখ না।"

'মিন্সেরা' কিন্তু অত সহজে দমিবার পাত্র নহে। আরও কয়েক ঘণ্টা নাড়াচাড়া করিয়া ক্ষুৎপিপাসাতুর আমাদের পরিত্যাগ করিয়া নূতন শিকারের অন্বেষণে ধাবিত হইল। একটি পেটমোটা পাণ্ডা মধুর বচনে আমাদের পরিতৃপ্ত করিয়া কহিলেন, "বিশোয়াস করিয়ো না বাবু—ওরা সব ভাল আদমী না আছে। হামির সাথে আস, তীরথ করম সব করিয়ে দেবে।"

শ্রান্তিতে সর্ব্বদেহ ভাঙিয়া পড়িতেছিল। পাণ্ডাজীর ভাঙা বাংলা বুলি নেহাৎ মন্দ লাগিল না। তাহারই সঙ্গে চলিলাম।

নাপিত আসিল মাথা মুড়াইতে, শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ আসিলেন মন্ত্র পড়াইতে, ফুল লইয়া দেখা দিল এক ব্যক্তি,—পাণ্ডারই অনুচর বোধ হয়। 'ফুলের মধ্যে একটা ছোট শুষ্ক নারিকেল ছিল যাহা ইতিমধ্যেই প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

মাথা মুড়াইয়া আবক্ষ গঙ্গাজলে প্রোথিত হইয়া অতি কষ্টে মন্ত্র পাঠ করিতেছি (প্রোথিত বলিলাম এইজন্য যে, যেখানে স্নানার্থ নামিয়াছিলাম সেখানে জলের চেয়ে কাদাই বেশী) এমন সময় তীরে ঢং ঢং করিয়া কাঁসর (আমাদের সহযাত্রিণী নহেন) ও ডুম্ ডুম্ করিয়া বাজনা বাজিয়া উঠিল। ব্যাপার কি?

অতি শীর্ণকায় একটি গরু, গলায় তার মোটা দড়া, দেখিলে বোধ হয় আহা, বৃথাই উহাকে দড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া ভবপারের শস্যশ্যামল প্রান্তরের মোহ হইতে শাসন করিয়া রাখা হইতেছে—একটু সময় ও সুযোগের অপেক্ষামাত্র ও উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া সেইদিক পানেই দৌড়াইবে, করুণ নয়নে আমাদের পানে চাহিয়া আছে।

গরুদান—মূল্য এক টাকা মাত্র।

রাঙামামী বলিলেন, "চার আনায় হয় না?"

বিন্দুদি বলিলেন, "আমি গরিব মানুষ, দেখ যদি ছু-আনায় হয়।"

পাণ্ডার বোধ করি এক পয়সায়ও আপত্তি ছিল না।

গোদানে পুণ্যসঞ্চয়ের নেশা সকলকেই পাইয়া বসিল। তীরে উঠিয়া বৃত্তাকারে বসিয়া সকলেই চারি, ছুই, বা এক আনায় গো-দান করিয়া কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারিণী হইলেন! আমার মনে হইল, পুণ্য নহে—প্রকাণ্ড একটা চড়—ঝড়ের মত ইঁহাদের গাল-গুলির উপর দিয়া বহিয়া গেল।

গো-দান শেষে বাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং শীর্ণকায় গাভী সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া দড়াতে একটা হেঁচ্‌কা টান দিল। লোকটার হাত হইতে দড়া খুলিয়া গেল,—গাভীও উর্দ্ধলাঙ্গুল হইল। তারপর আরম্ভ হইল ছুটাছুটি।

এদিকে দক্ষিণান্ত করিবার সময় পাণ্ডার নিমীলিত চক্ষু ক্রমেই বিস্ফারিত হইতে লাগিল। তর্পণ, দক্ষিণা, চরণপূজা, সুফল ইত্যাদির দাবিতে পাণ্ডা ঠাকুরের মুখখানি ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া আসিল। মেয়েরা সাষ্টাঙ্গে সেই

নগ্ন শ্রীচরণে মাথা ঠেকাইয়া সিকি দুয়ানি আধুলি ইত্যাদি দিয়া পাণ্ডার প্রসন্নতা অর্জ্জনের জন্য কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডা হাসিয়া কহিলেন, "মাজী,—গঙ্গা জল মে—তীবথমে শপথ করিয়াছে—তোমার ধরম···"

রাঙামামী বলিলেন, "আর বাবা, অনাথা, গরিব, পাপিষ্ঠী এই সিকিটি নিয়ে···"

বিন্দুদি বলিলেন, "বিধবা মানুষ···"

কাঁসর বলিলেন, "কেন, এত জুলুম কিসের ?"

অন্যান্য সকলে সমস্বরে, "ও মা—গো !"

পাণ্ডা বুঝিলেন, যেখানে দাঁত বসাইতে তিনি উদ্যত হইয়াছেন, সেটা ইতিপূর্ব্বে সঙ্কল্পের জন্য আনীত পুরাকালের ঝুনা নারিকেলের মতই বহিরাবরণ সার হইয়াছে। শক্তির অপপ্রয়োগে দন্তশূলের সম্ভাবনা বুঝিয়া হাসিমুখে সিকি দুয়ানিগুলা ট্যাকস্থ করিয়া বিড় বিড় করিয়া আশীর্ব্বাদ (?) বর্ষণ করিয়া কহিলেন, "হামারা ভোজন কা বাস্তে ?"

এবার কতকগুলি পয়সা আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিল।

পুণ্যের অনুষ্ঠান ত মিটিল, উদরমধ্যে অগ্নিদেব এইবার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন।

বলিলাম, "আর কেন,—ফেরা যাক।"

বিন্দুদি বলিলেন, "অক্ষয় বট দেখ্‌ব না ?"

পুণ্যকার্য্যে ফাঁকি দিবার যো নাই। চলিলাম কেল্লার পথে—সুরঙ্গমধ্যে—সিন্দুর-চন্দন-চর্চ্চিত দেহ—কাঠের কি পাথরের জানি না, ঐ নারিকেলের মতই পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত, ব্রাহ্মণের সংসারকে নির্ব্বিঘ্ন করিয়া কোন্ আদিযুগ হইতে তিনি অক্ষয় হইয়া আছেন। পয়সা কিছু দিতে হইল।

এইখানে মেয়েদের সাংসারিক দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় সরু গেঁজিয়াতে ভর্ত্তি হইয়া যে রজত মুদ্রাগুলি তাঁহাদের স্থূল কোমর আশ্রয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করিতেছে—দূর ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া তাহাদের নিদ্রা ভাঙাইতে ইঁহাদের মমতার যেন অবধি নাই।

অতঃপর পুণ্যের দ্বিতীয় পর্ব্ব !

ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া বলিলাম, "রান্নার জন্য বাজার থেকে কি কি আনতে হবে, বলুন—এনে দি।"

রাঙামামী বলিলেন, "অবেলায় আর কিছু খাব না, বাবা, চিঁড়ে্য় জল দিইছি।"

বিন্দুদি বলিলেন, "মরুক গে একটা দিন বইত না।"

কাঁসর বলিলেন, "আমার জন্য কিছু পুরী তরকারী—"

হরের মা ছোট একখানা পিতলের সরা বাহির করিয়া কহিলেন, "একমুঠো ফুটিয়ে নিতে হবে বইকি। তুমি দুখানা কাঠ শুধু এনে দাও, বাবা। চাল ডাল আলু তেল সবই আছে।"

দেখিলাম, এই কথার সঙ্গে সঙ্গে রাঙামামী, কাঁসর, বিন্দুদি প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব পুঁটুলি হইতে ছোট ছোট হাঁড়ি বাহির করিয়া ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন।

বলিলাম, "এত আলাদা হাঙ্গামায় দরকার কি? একটা বড় মাটির হাঁড়ি কিনে আনি—চাল-ডাল একসঙ্গে ফুটিয়ে নিন।"

এই কথায় সকলেরই মুখভাব কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বিন্দুদি বলিলেন, "ওমা বিধবা মানুষ—তাকি হয় ?" কেন যে হয় না বুঝিলাম না। বিধবা ত সকলেই। যে দু-একজন সধবা আছেন তাঁহাদের আপত্তি থাকিতেই পারে না।

অবশেষে রহস্য প্রকাশ পাইল।

রাঙামামী হাসিয়া বলিলেন, "পাগল ছেলে, তাকি হয় ? আমাদের কত বাচবিচের ক'রে চলতে হয়—তা তোরা কি বুঝবি ? শোন—" বলিয়া আমাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিলেন, "বিধবার কি কারও হাতে খেতে আছে ? যে যার রান্না ক'রে খেতে হয়। তীর্থস্থান, জানিস্ ত, পুণ্যিই করতে এসেছি।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "সে কি রাঙামামী, কেউ ত ছোট জাত নন।"

রাঙামামী বলিলেন, "তবু সকলের স্বভাব-চরিত্তির—

যাক্—যাক্—বোকা ছেলে কোথাকার। কেউ কারও হাতে খেয়ে কি পরকাল নষ্ট করতে পারি ?"

ছিঃ ছিঃ, কি জঘন্য সন্দেহ।

তীর্থস্থানে পুণ্যসঞ্চয়ের নেশা—হাঁ, নেশা বইকি—অন্য কোনো নেশার চেয়ে কিছুমাত্র উচ্চ ও সুন্দর বলিয়া বোধ হইল না।

বিস্তীর্ণ ভারতে অসংখ্য জাতির গণ্ডীরেখা উর্ণনাভের মত সম্প্রসারিত। তার চেয়ে সূক্ষ্ম তন্তুজাল অন্তঃপুরের বাতায়নে বিলম্বিত। একই গ্রামের পাশাপাশি বাড়ির দুবেলা দেখা অতি পরিচিত লোকগুলির মধ্যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি কোন ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করে তাহার তথ্য কে নির্ণয় করিবে ?

শেষ অবধি আটটা ইঁটের উনান তৈয়ারী হইল, আট জায়গায় হাঁড়ি চাপিল এবং পুণ্যতীর্থে পুণ্যকে রক্ষা করিয়া পৃথক পৃথক্ পাত্রে গল্পে আনন্দে আহার-পর্ব্ব সমাধা হইল।

পবিত্র প্রয়াগে সকল পাপের বোঝা ফেলিয়া আমরা হাল্‌কা হইয়া ট্রেনে উঠিলাম। গন্তব্যস্থান—পুষ্কর।

ট্রেনে উঠিয়াই রাঙামামীর সে কি কান্না! বিন্দুদি, কাঁসর, হ'রের মা প্রভৃতি তাঁহাকে সান্ত্বনা-বাক্যে ভুলাইতে গিয়া খানিক খানিক অশ্রু অপব্যয় করিয়া বসিলেন। ব্যাপার আর কিছুই নহে, মনটা তাঁহার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীর জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছে। অশ্রুসিক্তকণ্ঠে বার-বার বলিতেছেন, "দেখ না বিন্দু মেয়ে, এমন সময় আমার পটলা, গুট্‌কে ইস্কুল থেকে এসে খাবার চায়। পোড়ার-মুখী মায়েরা কি ওঠে? যে ঘুম আবাগীদের। আমি-ই দুধটুকু গরম ক'রে দি, রুটি দুখানা একটু গুড় দিয়ে বাছাদের হাতে দি, হ'ল বা মুড়িটা মুড়কীটা। তারপর রাত্তিরে আমার কাছেই তারা শোয়—গল্প শুনবে ব'লে। ডানদিক বাঁ দিক নিয়ে কত কাড়াকাড়ি মারামারি।"

বিন্দুদি সান্ত্বনা দিতে গিয়া এক ফোঁটা চোখের জল বাহির করিয়া কহিলেন, "আহা! আমার ছোটমেয়ের ছেলেটাও অমনি ন্যাওটো,—দিদা-দিদা ব'লে অজ্ঞান। তা প্রাণে পাষাণ বেঁধে এসেছি তীর্থ করতে। ঠাকুরের কাছে দিবে রাত্তির প্রার্থনা করছি,—হে ঠাকুর, বাছাদের আমার গায়ে পায়ে ভাল রেখ, ফিরে গিয়ে যেন ভাল দেখতে পারি সব।"

হ'রের মা শুষ্ক চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া কি বলিলেন বোঝা গেল না।

ট্রেন যেন এই সকলকে উপহাস করিয়াই ছুটিতেছিল; পথে আগ্রার তাজ আমাদের আকর্ষণ জানাইল। নামিয়া পড়িলাম।

পুণ্যতীর্থ-ভ্রমণ-মুখে মানব-রচিত শ্রেষ্ঠ তীর্থের ধূলি-রেণু কোন্ প্রকৃত মানবাভিমানিনী আত্মার না চির-অভিলাষের বস্তু ?

মেয়েরা তাজ দেখিয়া নমস্কার করিতেছিলেন।

বিন্দুদি বলিলেন, "পোড়াকপাল! মোচলমানের রাজ্যে না ঠাকুর, না দেবতা।"

অমনই সকলের যুক্তকর অবনমিত মস্তকের সঙ্গে সোজা হইয়া গেল। মুখে ফুটিয়া উঠিল—আতঙ্ক-বিহ্বল ভাব। জাতিপাতের আশঙ্কায় সকলে একসঙ্গে কলরব করিয়া উঠিলেন।

আমি মর্ম্মরভিত্তিগাত্রে শ্রদ্ধাপুলকিত আনমিত মস্তক স্পর্শ করিয়া ভাবিতেছিলাম, এই তীর্থ ত জাতির গণ্ডীবেরা পুণ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বৃন্দাবনে যাঁর প্রেমময় মূর্ত্তি অন্তরমন লীলা-তরঙ্গে, আবেগে উচ্ছ্বাসে ভরিয়া তোলে, এখানেও সেই মহাম্বুধির একটি তরঙ্গলেখা অনাদি কালের জন্য মানবমনের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতেছে ও করিবে। সংসারের এই যে বাড়িঘর ইটকাঠ আরামশ্রম সুখ-আনন্দের আসনখানি পাতা রহিয়াছে, শুধু ইহারই স্পর্শে সে সকলের একটা স্পষ্ট সার্থকতা বা রূপ আমরা অনুভব করিতে পারি। সুতরাং অন্তর-দোলায় চিরদোলায়মান সেই সুন্দরকে শ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দনে নিত্য চর্চ্চিত করিয়া হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন করিব ইহা আর বিচিত্রই বা কি ? অশুভ ও অশুচির গণ্ডীর বাহিরে ইহার ভিত্তি।

তাঁহারা কেহ ভিতরে নামিলেন না। মৃত্যুহীন মরণকে উপেক্ষা করিয়াই পাষাণ-চত্বরে বসিয়া হয়ত বা আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "মাগো, কি কাণ্ড! এত টাকা খরচ ক'রে—"

তাঁহাদের বাড়িঘর পুত্রকন্যা নাতিনাতিনীর জন্যই যাহা খরচ হয় তাহাই অর্থের সদ্ব্যয়।

সেই সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া সকলেই স্নান করিলেন। সভয়ে ভাবিলাম, মাথায় থাক্ আমার মানবকীর্ত্তি-দর্শনে অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন-বাসনা। এতগুলি বিকারগ্রস্ত প্রাণীর অন্তর অহরহ এই বিতৃষ্ণা ও পুণ্য শুচি-বাইয়ের শঙ্কা লইয়া যে-কোনো মুহূর্ত্তে অভিনব বিপত্তি ঘটাইতে পারে। অবেলায় স্নান, অসময়ে আহার, মানুষের শরীর ত বটে! একটা কিছু ঘটতে কতক্ষণ? সুতরাং অতৃপ্ত বাসনা অন্তরে চাপিয়া সেই রাত্রিতেই পুষ্করের দিকে চলিলাম।

পুণ্যতীর্থ পুষ্কর। বালুর রাজ্য—গ্রামখানি যেন মরুভূমির মাঝে ওয়েশিস্। দূরে সাবিত্রীমায়ের পাহাড়।

বালুপ্রান্তরে সুবিস্তীর্ণ জলরাশি বুকে লইয়া পুণ্য হ্রদ পুষ্কর। জলবক্ষে অসংখ্য কুম্ভীর ও সর্প। তীর্থ দুষ্করই বটে!

এখানে ওখানে ময়ূরময়ূরী নাচিয়া বেড়াইতেছে। মেঘ নাই তথাপি কলাপ-বিস্তারে রামধনুর বিচিত্র বর্ণ-সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিংসাহীন প্রকৃতির মাঝে আসিয়া সত্যই তৃপ্তি পাইলাম।

দীর্ঘাকার পাণ্ডা আসিলেন—সাড়ে তিন ভাই। বিবাহ না হইলে তাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গ না কি পূরণ হয় না। বলিলেন "জলুম নাই, পীড়ন নাই, ধর্ম্মশালায় থাক, পুণ্য কর। পরে যাহা খুশী আমায় দিও।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আর কিছু হইল না,—শুধু স্নান।

পরদিন মেয়েদের ডাকিয়া পাণ্ডা পুষ্করের দুষ্করত্ব সম্বন্ধে খুব খানিকটা বুঝাইলেন। ব্রহ্মার যজ্ঞ, সাবিত্রীর অভিমান, গায়ত্রীকে পত্নী রূপে লইয়া যজ্ঞ সম্পাদন ও অভিমানিনী সাবিত্রীর পাহাড়ে অবস্থিতির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "এই তীর্থে স্নান তর্পণ ভোজ্যদান করিলে যে অক্ষয় পুণ্যের সঞ্চার হয়, সংসারে এমন কোন প্রচণ্ড পাপ নাই যাহার তীক্ষ্ণধারে সেই পুণ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করিতে পারে। পরকালেও অনন্ত স্বর্গের পাকা বন্দোবস্ত—"

কিন্তু ইহকাল পুত্রকলত্রের হাসিকান্নায় অশান্তি-আনন্দে ও সুখে-শোকে যে স্বর্গ রচনা করে—মানব-মন তাহারই ছায়ায় উদ্বেগ আশঙ্কা লইয়া বাস করিতে ভালবাসে।

বিন্দুদি হিসাবী লোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও সব করতে কত পড়বে, বাবা?"

পাণ্ডা বলিলেন, "ধরুন, ভুজ্যি একটা পাচ টাকা—"

সকলে সমস্বরে কলরব করিলেন, "ওমা! পাচ টা—কা! না বাবা, অত পারব না। কমে সমে—"

পাণ্ডা হাসিয়া বলিলেন, "না মায়ী, তোমরা রাজালোক—যা দেবে তার চারগুণ গিয়ে স্বগগে পাবে। জান ত অযোধ্যা মথুরা মায়া…কম দিয়ে কেন পরকালে গিয়ে কষ্ট পাবে?"

আমি বলিলাম, "ঠাকুর, পরকাল ত পরে, আপাতত ইহকালের সম্বল খোয়ালে রেল-সমুদ্র পাড়ি দেওয়া কঠিন হয়ে উঠবে।"

পাণ্ডা কি ছাড়িতে চান। কহিলেন, "ধরুন বাবুজী, থালা গেলাস বাটা চাল ডাল কাপড় ঘি তেল নুন তরকারী—দামটা ধরুন একবার।" বিন্দুদি বলিলেন, "কেন, মূল্য ধরে নাও না। আমি বাপু স-পাচ আনার বেশী দিতে পারব না।"

পাণ্ডা দেখিলেন—সব কাঁচিয়া যায়। চাঁদার খাতায় সর্ব্বাগ্রে যে সহিটা থাকে, তাহা দৃষ্টে যেমন নিম্নের স্বাক্ষর-কারীরা নির্ব্বিঘ্নে অঙ্কপাত করিয়া যায়, শত অনুরোধ-উপরোধেও আর অঙ্কবৃদ্ধি করে না, ইহাও অনেকটা সেইরূপ।

তাড়াতাড়ি রাঙামামীর পানে চাহিয়া পাণ্ডা বলিলেন, "তুমি-ই ভেবে দেখ মায়ী, পাচ আনায় একখানা কাপড় হয়? এ যে দেওয়া-না-দেওয়া সমান।"

রাঙামামীর দয়ার শরীর। বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "তবে পাচ সিকে ক'রে নাও বাপু, আর খিটিমিটি ক'রো না। মাথার ব্যামো, এক খাবলা জল না দিলে এখনি আবার মাথা ধ'রে উঠবে।"

পাণ্ডার মুখে হাসি ফুটিল।

যদিও তিনি বুঝিলেন; পাচ আনায় যাহা হয় না পাচ সিকাতেও তাহা অসম্ভব। এ কেবল মনকে চোখ ঠারা বই ত না। একই থালা, বাটী, গেলাস, একই চাল

ডাল, কাপড়—বার বার উৎসর্গীকৃত হইবে—মাঝে হইতে পাচ সিকা করিয়া ট্যাঁকে আসিবে।

তিনি যাহা সহজে বুঝিলেন তাহা পুণ্যকামীরাও হয়ত বুঝিলেন, কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না। এখানে পুণ্য যেন পাণ্ডার কথার অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহাদের আচরণের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক মাত্র নাই।

স্নান হইল, তর্পণ হইল; ভোজ্যদান, গো-দান, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি পুণ্যসঞ্চয়ের যত কিছু কলকৌশল ছিল, একে একে সকলগুলিই সুসম্পন্ন হইল।

আকাশে সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ ঢালিয়া হয়ত হাসিতেছিলেন, পুকুরে মৃদু তরঙ্গে হয়ত বা এই পুণ্য-কাহিনীর প্রশংসাধ্বনি মর্ম্মরিত হইতেছিল। এবং অলক্ষ্যে বসিয়া কোন্ দেবতা এই-সব পুণ্যার্থীর জন্য ভাবী বাসস্থান নির্ম্মাণ-প্রচেষ্টায় সেই মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতেছিলেন, তাহা আমাদের চর্ম্মচক্ষু বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইল না।

অন্তর দেবতাও হাসিলেন। পুণ্যসঞ্চয়ের এই উদগ্র কামনাকে তিনি ত বুঝিতে ভুল করেন নাই।

তীরে অনেকগুলি ভিখারী দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা সত্যই গরিব। ক্ষুধার্ত্ত কণ্ঠে হাত পাতিতেই রাঙামামীর মাথা গরম হইয়া উঠিল (যদিও সময়-মত সেখানে এক থাব্‌লা জল পড়িয়াছিল)।

অন্যান্য সকলেও মহাজনের পন্থা অবলম্বন করিলেন। পাণ্ডা তাঁহার মোটা লাঠি লইয়া ভিখারিগণকে তাড়া করিলেন, "ভাগ,—শালা লোক্।"

পাণ্ডার ট্যাঁকের পানে চাহিয়া বলিলাম, "শালা লোক ভাগলেও ওটা মোটা হবার আর আশা নেই, পাণ্ডাজী—পাক্ না গরিবরা দু-চার পয়সা।" বলিয়া কয়েকটি পয়সা ছুঁড়িয়া দিলাম।

পাণ্ডা কিছু না-বুঝিয়াই হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মায়েদের অঞ্চলের গ্রন্থি খুলিয়া গেল,—পাই পয়সা অনেকগুলিই পড়িল। পুণ্যসঞ্চয়ে প্রতিযোগিতাও বড় কম নহে। কম পুণ্যসঞ্চয় করিয়া কেহ কি স্বর্গের এক টাকার আসনে বসিবেন। সকলেই চান বক্স—ড্রেস সার্কেলে বসতে।

অপরাহ্ণে রাঙামামী বলিলেন, "এখানে কি কি পাওয়া যায় রে? আমার পটলা, গুটকে, পুঁটীর জন্যে খেলনা-পত্তর কিছু নিয়ে যাব। দু-একখানা ছবি-টবি, আসন থালা—তবু তীর্থের একটা চিহ্ন ত? মরে গেলে ছেলেরা বলবে—মা তীর্থে গিয়ে এইগুলো এনেছিলেন।"

ছবিওয়ালা, পুতুলওয়ালা, বাসনওয়ালা প্রভৃতি যত ওয়ালা ছিল,—আসিল। জিনিষপত্র যাহা কেনা হইল, তাহার সঞ্চয় পুণ্যের চেয়ে হয়ত ঢের বেশী। দরদস্তুর টানাটানি করিলেও কিনিতে কেহ কার্পণ্য করিলেন না। আমি ভাবিতেছিলাম, পাঁচ সিকার ভোজ্য, দু-আনার ব্রাহ্মণভোজন, চারি আনার গো-দান, এক পাইয়ের ভিক্ষুক বিদায় এবং অক্ষমতার কাতর কাকুতি!





সাকী

শিল্পী বিহারীলাল সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



"যাত্রা"

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনেক নূতন কথার আলোচনা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অনেক পেশাদারী ও সখের যাত্রা সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে ভবিষ্যতে আলোচ্য বিষয়ের ইতিহাস সঙ্কলনের পন্থা সুগম হইতে পারে বিবেচনায় এই আলোচনার অবতারণা।

যশোহর জেলার রায়গ্রামনিবাসী রসিকলাল চক্রবর্ত্তীর নাম ফুটনোটে সামান্য ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। রসিকলাল চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বালক সঙ্গীতের স্রষ্টা, প্রথমতঃ তিনি সামান্য ভাবে "নিমাই সন্ন্যাস" পালা লইয়া আসরে অবতীর্ণ হন, সাজপোষাক কিছুই নাই, গৈরিক বস্ত্র মাত্র সম্বল কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীতের মাধুর্য্যে সাধারণে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বালক সঙ্গীত সম্প্রদায় তৎকালীন যাত্রা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত প্রশংসা ও আদর লাভে সমর্থ হইয়াছিল। প্রভাস মিলন, কংশবধ ইত্যাদি পালা জনসাধারণ আগ্রহের সহিত উপভোগ করিত। "চণ্ডে পাগল" প্রহসনে সমাজের উপর এরূপ কষাঘাত প্রযুক্ত হইয়াছিল যে, একাধারে হাসি ও কান্নার সহিত শ্রোতৃমণ্ডলী তাহা পরিপাক করিয়া যাইত। সঙ্গীত রচনায় রসিকলাল চক্রবর্ত্তীর অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি নিজে একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় আলয়ে রাধারাণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভাগিনেয় সুরেন্দ্র দল চালাইয়াছেন, বর্ত্তমানে উহার অস্তিত্ব নাই।

নড়াইল মহকুমার কালনা গ্রামের গৌর প্রামাণিকের দল এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

মীরাপাড়া গ্রামের যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে রসিকলাল চক্রবর্ত্তীর ভাঙ্গা দল চালাইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বড় বড় পল্লীতে ছোটবড় অনেক সখের যাত্রাদলের অভিনয় আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এখনও দেখা যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় গুণী লোকের অভাব হইয়া আসিতেছে। সারুলিয়া ও চণ্ডীবরপুর গ্রামে আমরা যে দুইটি সখের দল দেখিয়াছি তাহা মফঃস্বলের যে-কোন ব্যবসায়ী দলের সহিত উপমিত হইতে পারে। সারুলিয়ার দল স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এবং চণ্ডীবরপুরের দল স্বর্গীয় প্রিয়নাথ রায় পরিচালনা করিতেন।

নড়াইল মহকুমার মল্লিকপুরনিবাসী পণ্ডিত অঘোরনাথ কাব্যতীর্থের নাম আজ সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সামান্য কয়েকখানি গীতাভিনয়ের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, তাঁহার রচিত কল্কি অবতার, মগধবিজয়, পুত্র-পরিচয়, মরুত্তযজ্ঞ, হরিশ্চন্দ্র, অনন্ত মাহাত্ম্য, অদৃষ্ট, সমুদ্রমন্থন, চিত্রাঙ্গদা, তরণীর যুদ্ধ, বিজয় বসন্ত, ধাত্রীপান্না, সতী, অকালমৃগয়া, চন্দ্রকেতু, সংসারচক্র, মহাসমর, সপ্তরথী, তারকাসুর, মিবারকুমারী, সরমা, নহষ-উদ্ধার, লক্ষবলি, রাধাসতী, নর্ম্মদা, কুরুপরিণাম, পাপের পরিণাম, বাসববিজয়, শান্তি, মহামিলন, সুনন্দা, ধর্ম্মের জয়, সাবিত্রী, শ্রীবৎস, বেহুলা, অনিরুদ্ধ, শ্রীমন্ত, ও দময়ন্তী গীতাভিনয় কলিকাতা ও মফঃস্বলে বিভিন্ন দলে বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইতেছে।

এতাধিক গীতাভিনয় অন্য কোন লেখকের লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন

"অধ্যাপক চণ্ডীদাস"

গত মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় "অধ্যাপক চণ্ডীদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধকার মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে যে সব মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার দু-একটির সহিত আমাদের মতের অনৈক্য আছে।

১। চণ্ডীদাস অধ্যাপক ছিলেন কি না? প্রবাসীর ৪৬৯ পৃঃ মুদ্রিত দ্বিতীয় পদটির নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিটি পাঠ করিয়াই বোধ হয় প্রবন্ধকার চণ্ডীদাসকে অধ্যাপক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

বসি রাজ গতি পরি : পড়ূয়া পঠন করি :
হেন কালে য়েক রসের নাগরি দরশন দিল মোরে।
সে চাহিল নঙান কনে : হানিল নঙান বানে :
সেই হোত্যে মন : করে উচাটন : ধৈরজ না রহে প্রাণে ॥০॥

ঠিক এই কয় পংক্তিই সামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কার্ত্তনের সম্পাদকীয় বক্তব্যে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইয়াছে

বসিয়া অবন্তিপুরে পড়ূয়া পড়ন পড়ে।
হেন কালে এক রসের নায়রি দরশন দিল মোরে ॥
সে যে চাহিল আমার পানে
তায় হানিল মদন বাণে।
সেই হৈতে মন করে উচাটন ধৈরয না মানে প্রাণে ॥

'বসি রাজ গতি পরি" ও 'বসিঞা অবন্তি পুরে,' এই বিভিন্ন পাঠের মধ্যে কোন্‌টা শুদ্ধ তাহা বিশেষজ্ঞেরাই বিচার করিবেন। তবে "পড়ূয়া পঠন করি" ও "পড়ূঞা পড়ন পড়ে" এই দুই পাঠ হইতে ইহাই জানা যায় যে, চণ্ডীদাস পড়ূয়া হিসাবেই পড়িতেন, অধ্যাপক হিসাবে পড়াইতেন না। এই কয় পংক্তির অর্থ এই, চণ্ডীদাস অবন্তিপুরে পাঠাভ্যাস করিতেন, এমন সময় এক রসের নাগরী আসিয়া দেখা দিল, সে দৃষ্টিমাত্রই পড়ূয়াটিকে সুতীক্ষ্ণ মদনবাণ হানিল, সে সময় হইতে পড়ূয়াটি চঞ্চল হইলেন, ধৈর্য্য হারাইলেন।

২। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে "কাহা গেলো বন্ধু চণ্ডীদাস···" পদটি মুদ্রিত করিয়াছেন। ঠিক এইপদটিই শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় আরও কয়েকটি পদের সহিত প্রায় ২০০ বৎসরের পুরাতন একখানি পুঁথিতে আবিষ্কার করেন। নবাবিষ্কৃত এই সমস্ত পদ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেন। (সা॰ প॰ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, সন ১৩২৬, পৃ॰ ৭৯)। ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনও এই পদ কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, পৃ॰ ২০৯)। প্রবন্ধকার মহাশয় উপরোক্ত পদটি উদ্ধৃত করিয়া

বলিতেছেন—'পদটির প্রথমার্দ্ধ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাস সুগায়ক ছিলেন…শেষার্দ্ধটি সহজবোধ্য নয়।' তিনি পরবর্ত্তী পদটি অর্থাৎ-"সুন গো জননী : কি হল্য না জানি :" ইত্যাদি পড়িয়া উপরোক্ত পদের শেষার্দ্ধের অর্থ 'কতকটা পরিষ্কার' করিয়াছেন। তিনি যে অর্থকে 'কতকটা পরিষ্কার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের একটু খট্‌কা লাগিয়াছে। তিনি যে ভাবে পদটির শেষার্দ্ধ পাইয়াছেন তাহাতে অর্থ করা কষ্টকর, তবে এ পদের যে পাঠ সাহিত্য পরিষৎ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহিত মিলাইলে অর্থ বাহির করিতে কোনও বেগ পাইতে হয় না।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবাবুর পাঠ—

রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।
তরাম্বিতে হস্তি যানি পিষ্টে পেলী বাঁধ টানি :
তরাম্বিতে বোরিছা রামি অনাথিনি নারি
মাধবির ডাল ধরি
উচ্চস্বরে ডাক প্রাণনাথ।
হস্তি চলে অতি বোরে ভালস্তে না দেখি তোরে :
মাথেতে পড়িল বজ্রাঘাত ॥
রামি কহে ছাড়িয়া না জায্য।
দেখিতে প্রাণ : তার দেহে সন্ধান :
দুহু প্রাণ একত্রে মিলিল ॥১॥

সাহিত্য পরিষৎএর পাঠ—

রাজা কহে মন্ত্রীরে ডাকিয়া।
তরাম্বিতে হস্তি আনি পিষ্ঠে পেলি বান্ধ টানি
পিষ্টখুদে বৈরী ছাড় গিয়া ॥
আমি অনাথিনী নারী মাধবির ডালে ধরি
উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ।
হস্তি চলে অতি জোরে ভালস্তে না দেখি তোরে
মাথাত্র পড়িল বজ্রাঘাত ॥
রানি কহে ছাড়িয়া না জায়।
কহিতে কহিতে প্রাণ আর দেহ সমাধান
দুহুঁ প্রাণ একত্রে মীলায় ॥ ১ ॥

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবাবু এ পদের অর্থ করিয়াছেন—"গৌর-রাজের হস্তি য়ানি পিষ্টে ফেলা'র হুকুম, তাহা বেচারা চণ্ডীদাসেরই উপর জারি হইয়াছিল। প্রথমটা হস্তীটির চণ্ডীদাসকে ভাল করিয়া না দেখায় এবং পরে হস্তীটির মাথায় বজ্রাঘাত হওয়ার জন্যই হউক, কি অন্য কোন কারণেই হউক চণ্ডীদাসের সে-যাত্রা কোনও রকমে প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এই পদটি হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, রামী ধোবানীর সঙ্গে প্রেম করার অপরাধে তাঁহাকে রাজবাড়ির পড়ুয়া-পঠন চাকরিটি ও হারাইতে হইয়াছিল।" এ অর্থ হইবে না, অর্থ হইবে এই—রাজা মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, সত্বর হস্তী আনিয়া চণ্ডীদাসকে তাহার পিঠের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধ, এইরূপে পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়া শত্রু বধ কর, (রাণী বলিতেছে) আমি অনাথিনী মাধবীর (মাধবির, মাধরির নহে) ডাল ধরিয়া উচ্চৈস্বরে প্রাণনাথ তোমাকে ডাকিতেছি। হস্তী দ্রুত চলিয়াছে, তোমাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। রাণী—"আমাকে ছাড়িয়া যাইও না" বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিল। দুই জনের প্রাণ (চণ্ডীদাস ও রাণীর) একসঙ্গেই শেষ হইল। রাণী যে সেই দিনই এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দর্শনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় আমরা অন্য একটি কবিতাতেও পাই। যথা—

"চণ্ডিদাস করি ধ্যান। বেগম তেজিল প্রাণ।
সুনি শ্রৌ ধবিনি ধায়। পড়িল বেগম পায় ॥"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ২১২, ৫ম সংস্করণ)

৩। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার আবিষ্কৃত পুঁথি সম্বন্ধে সর্ব্বশেষে লিখিতেছেন, "পুঁথিখানি যে চণ্ডীদাসের নিজের রচিত সে-বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ দেখি না।" কিন্তু আমরা যে এ বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়াছি, তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে। প্রথমতঃ যে ৮টি পদ লইয়া এ পুস্তক, তাহার 'দু একটিতে চণ্ডীদাস ভণিতা রহিয়াছে। কোনটিতে বা ভণিতা নাই।' আবার প্রথম পদটির ভণিতাতে 'রসিক দাসে'র নাম পাইতেছি। প্রবন্ধকার বলেন—"রসিকদাস চণ্ডীদাস বিভিন্ন ব্যক্তি মনে করিতে পারিলাম না।" আজ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস, দীনহীন চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রভৃতি বিভিন্ন ভণিতা যুক্ত চণ্ডীদাসের বহু পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাস নিজেকে 'রসিকদাস' বলিয়া কখনও পরিচয় দিতেন কি না এ বিষয় শেষকথা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন। তবে আমরা সহজিয়া গ্রন্থ রচয়িতা এক রসিকদাসের পরিচয় জানি।

দ্বিতীয়তঃ 'কাহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস'…পদটি এতদিন রামীর রচিত বলিয়া চলিতেছিল, চণ্ডীদাস যদি মারাই যান তাহা হইলে কি ভাবে এ পদটি লিখিলেন? এ অবস্থায় 'রসিকদাস' ভণিতাযুক্ত প্রথম পদ "কাহাগেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস" (৫ম পদ) ও

কহিছে ধবিনি রামি : শুন চণ্ডীদাস তুমি :
নিশ্চয় মরমে বুঝিয়া জান।

* * *

সুন চণ্ডীদাস প্রভু : সাধন না ছাড়্য কভু :
মনের বিকারে ধর্ম্ম নাস। (৩য় পদ)

সম্বলিত যে ক্ষুদ্র পুঁথি তাহাকে নিঃসঙ্কোচে চণ্ডীদাসের স্বরচিত বলিতে সংশয় হয়।

৪। 'বাশুলী বাঁকুড়ার গ্রাম্য দেবী' (পৃঃ ৪৬৯, ১ম পংক্তি) এ মন্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধেও আমরা সন্দিহান। কারণ বাশুলী কেবল এক বাঁকুড়াতেই নয় বহুত্রই পূজিতা হন। "নিয়ত রসিক গ্রামে বসতি করেন বলিয়াই ইনি গ্রাম্য দেবী।" যদি তাহাই হয়, তবে বাঁকুড়ার গ্রাম্যদেবী বলার সার্থকতা কি?

৫। প্রবন্ধকার চণ্ডীদাসকে বাঁকুড়ার ছাতনার কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয় পণ্ডিতেরা একমত নহেন। অনেকের মতে তিনি বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর (পূর্ব্বনাম সাঁকুলীপুর) থানার অদূরে এবং সিউড়ী সদর হইতে প্রায় ২৬৷২৭ মাইল পূর্ব্বাংশে অবস্থিত 'নান্নুর গ্রামের কবি। ছাতনার উল্লেখ কোন পদে পাওয়া যায় না, তবে নান্নুরের উল্লেখ বহুস্থলেই আছে।

পদকর্ত্তা একাধিক চণ্ডীদাস ছিলেন বলিয়া অনেকের মত। যদি একাধিক চণ্ডীদাসই হন, তাহা হইলে একজনের বাড়ি বীরভূমের নান্নুরে ও অপরের বাড়ি বাঁকুড়ার ছাতনায় হওয়া অসম্ভব নহে। চণ্ডীদাস নামধারী আরও দুই-চারি জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এ দেশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। একজন ছিলেন বিখ্যাত আলঙ্কারিক, বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণে ইহাকে স্বগোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অপর ব্যক্তি সংস্কৃত ভক্তি গ্রন্থ ভাবচন্দ্রিকা রচয়িতা। নরোত্তমেরও এক শিষ্যের নাম ছিল চণ্ডীদাস।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

মার্সেইয়ে মহাত্মা গান্ধী

বিলাত যাইবার পথে মহাত্মা গান্ধী প্রথম যখন মার্সেই শহরে পদার্পণ করেন তখন তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে অভিনন্দিত করেন সর্ব্বজন-বিদিত ফরাসী লেখক শ্রীযুক্ত রলাঁর ভগিনী শ্রীমতী মাদলেন রলাঁ এবং তাঁহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তার প্রিভা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী। শ্রীযুক্ত রলাঁ অসুস্থতা-নিবন্ধন শত ইচ্ছা সত্ত্বেও নিজে আসিতে পারেন নাই। মার্সেই শহরে মহাত্মা গান্ধীর অবস্থান সময়ে অনেক প্রবন্ধাদি সেখানকার কাগজে বাহির হইয়াছে। নিম্নে ডাক্তার প্রিভার একটি লেখার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে। লেখাটি সর্ব্বপ্রথম ডাঃ প্রিভা সম্পাদিত 'এস্পেরান্টো' নামক কৃত্রিম বিশ্বভাষায় লিখিত। শ্রীযুক্ত প্রিভা ইউরোপের শান্তিদূতদের মধ্যে একজন বিশেষ অগ্রণী এবং পৃথিবীর সকল দেশের শান্তিবাদীদের নিকট সুপরিচিত। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদকে সুপরিচিত করিবার জন্য তিনি অক্লান্তভাবে খাটিয়াছেন। শ্রীযুত দেশাই (মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী) লিখিতেছেন—"জাতীয়তাবাদে অহিংসনীতি প্রয়োগ এক নূতন জিনিষ। শ্রীযুক্ত প্রিভা তাঁহার 'জাতীয়তাবাদে অরাজকতা' শীর্ষক গ্রন্থে প্রেমধর্ম্মের প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত, সমাজগত ও জাতিগত ভাবে প্রচলনের প্রয়োজন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ফরাসী ভাষার বইখানার নাম Le choc des Patriotismes। বইখানি তিনি গান্ধীকে উপহার দিয়াছেন।"

মার্সেই বন্দরে পূর্ব্বে কখনও সাংবাদিকগণের ও ফটোগ্রাফারদের এমন পঙ্গপালের মত সমাগম হয় নাই, যেমন সেই ভোরবেলার অন্ধকারে ভারত হইতে আগত মহাত্মা গান্ধীর আগমনে হইয়াছিল।

বৃষ্টি পড়িতেছিল—যেন তাহার আর শেষ নাই। বন্দর আঁধারে ঢাকা। সূর্য্যদেবও যেন উঠিতে চান না। বন্দরের মালপত্রের আশেপাশে প্রতীক্ষায় সমাগত দর্শনাভিলাষী জনতা কেবল বাড়িয়াই চলিল।

অবশেষে রবির সোনার রেখা রাশীকৃত মেঘমালাকে ভেদ করিল!—শান্ত মূর্ত্তি যেন ধ্যানমগ্ন এশিয়ার প্রস্তর মূর্ত্তি। বন্দরে জাহাজ ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্ত্তিও দৃষ্টিতে ক্রমেই বড় হইতে লাগিল।

ধবধবে সাদা কাপড়ে ঢাকা তাম্রবর্ণদেহ সেই মূর্ত্তি গতিশীল যাত্রিবাহিনীর মধ্যে দণ্ডায়মান।

চলনশীল ইউরোপীয়গণ, সবুজ পাগড়ী পরিহিত ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ, ভিয়েল রঙের শাড়ী-পরিহিতা ভারতীয় মহিলারা, জাহাজের যাত্রিগণ পূর্ব্বদেশ হইতে——

হঠাৎ জয়ধ্বনি—গান্ধী! গান্ধী! সকলেই যেন তাঁহাকে চেনে। রেলিঙের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান তিনি নিস্তব্ধ! তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত।

সক্রেটিসের মত চিন্তামগ্ন! হঠাৎ সুবিমল হাসি তাঁহার মুখখানিকে আলোকিত করিয়া তুলিল এবং তাঁহার হাত দু-খানা একত্র হইল জনতাকে নমস্কার জানাইবার জন্য। তিনি ভিড়ের মাঝে তাঁহার পুরাতন বন্ধু তাঁহাকে আগাইয়া লইবার জন্য আগত এণ্ড্রুজকে চিনিয়া লইলেন। জাহাজও ইতিমধ্যে ঘাটে ভিড়িয়াছে।

জাহাজে উঠিবার অপ্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া ভিড় করিয়া সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ যেন উড়িয়া চলিল, এবং গোল চস্‌মা পরিহিত ছোট মানুষটিকে চাপিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। ওঃ, সে কি ভীষণ চাপ! প্রশ্নের ধারা বহিয়া ছুটিল—যেন তাঁহাকে খাইয়া ফেলিবে। তিনি কিন্তু উত্তর দেন সুরসিকতায় পরিপূর্ণ ধীরভাবে! তাঁর অন্তরের শান্ত জ্যোতি সকলকেই শান্ত করে, এমন কি যেন দিনটাকেও!

কয়েকজন বন্ধুকে তিনি জাহাজের নীচের তলায় অবস্থিত নিজের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় নিমন্ত্রণ করিলেন। আমরা তিন জনে (শ্রীমতী রলাঁ ও সস্ত্রীক ডাক্তার প্রিভা) একসঙ্গে তাঁহার বিছানার উপর বসিলাম। অন্যদিকে আরও দুইটি বিছানা, একটির উপর আর একটি। তাঁহার পুত্র দেবদাস ও সেক্রেটারী দেশাই দুজনে মিলিয়া জিনিষপত্র ও সুতা কাটিবার তকলীগুলি গুটাইতে লাগিলেন। দুজনেরই আনন্দ—যেন তাঁরা আপন ভাই, দুজনেই সদ্য ভারত-কারাগার হইতে প্রত্যাগত।

মহাত্মা গান্ধী নীচের দিকে পা দুখানা রাখিয়া তার উপরই বসিলেন। তাঁহার গায়ের কাপড়ের উপর একটা বড়

ঘড়ি ঝুলান। এইভাবে তিনি আমাদের সামনেই একজনের পর একজন করিয়া, শতাধিক দর্শনাভিলাষীকে অভ্যর্থনা করিতেছনে। প্রথমে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে—প্রত্যেকের জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিয়া। তাহাদের মধ্যে কতক ইংরেজ, কতক আমেরিকান। তাহারা প্রশ্ন করে—প্রশ্ন তুলিয়া আলোচনা করিতে চায়। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ একজন সুন্দরী ফরাসী রমণী—আধুনিক টুপিতে তাঁর মাথা ও ডান কান ঢাকা—বলিয়া গেলেন, "ও মসিয় গান্ধী, এদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিজেকে ক্লান্ত ক'রে তুলবেন না। আমি আপনার সম্বন্ধে জানি—রলাঁর বই পড়েছি—শুধু আপনাকে দেখে নিজেকে ধন্য করতে এসেছিলাম।"

তার পর ব্রিটিশ কনসাল নিজের গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় চিঠি লইয়া হাজির—তখনই তার উত্তর দিতে হইবে। তারপর একে একে জাহাজের যাত্রীরা, নীল রঙের পোষাক পরা জাহাজের চালকেরা, ভারতীয় খালাসীরা ও পার্শ্ববর্ত্তী জাহাজ হইতে সকলেই দর্শনাকাঙ্ক্ষী। একে একে ভিতরে আসিয়া সকলেই নমস্কার করিয়া যায়। গান্ধী প্রাপ্ত টেলিগ্রামরাশি পাঠে রত। অনেকে করমর্দ্দন করিয়া যায়—সকলেরই চোখেমুখে দীপ্ত আনন্দের ফোয়ারা। এই ভাবে সকলেই চলিয়া গেল।

আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। গান্ধী আমাদের বসিবার সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এত ভোরে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া চা ও খাবার আনাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রশ্নের উত্তরও দিতে লাগিলেন। অন্তরের পরিপূর্ণতা তাঁর চোখে বিরাজ করিতেছে।

একই ধরণের শান্ত অথচ দৃঢ় স্বর পূর্ব্বেও একবার শুনিয়াছিলাম। কোথায়? কখন? কাহার?

ঠিক যেন ডাক্তার জামেনহফের (Dr. Zamenhof)!

আবার খালাসীর দল,মাথায় তাহাদের লাল রঙের পাগড়ী, গালগুলি তামার রঙের, চোখগুলি তাদের কালো। তারা মুসলমান। সকলেই সেলাম করিল। গান্ধীও সেলাম করিয়া উর্দ্দুতে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আকৃতিতে এত ছোট মানুষটি কী? তাঁহার মাঝে কি জিনিষটি সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—কোটি কোটি লোককে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? তাঁহার মাঝে কোনো লুকান রহস্য নাই, উদ্দামতা নাই, কোন গুরুগিরি নাই! তিনি সহজ, তাঁহার পথ ও বাণী সরল, সুস্পষ্ট—কিন্তু দৃঢ় সত্যে অধিষ্ঠিত। তাঁহার সারল্যপূর্ণ হাসি অতি মধুর। এর মাঝে আপাতচিত্তহারী কিছুই নাই। পূর্ণ সহৃদয়তা, এই শব্দটি তাঁর সত্যিকার প্রতিচ্ছবি হইতে পারে।

তাঁর সহৃদয়তা এমন যে দেখিবামাত্র তুমি আপনাকে তাঁর সত্যকার বন্ধু বলিয়া অনুভব করিতে পার। অহিংসায় তাঁর দৃঢ়তা এমন যে তাঁর সঙ্গ তোমার কাছে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তার কারণ মনে হইবে। ইহাতেই তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলা হইল। আমাদের ধরিত্রী মাতা আজ মানুষের নৃশংস বলপ্রয়োগে, মিথ্যায়, রক্তপিপাসায়, শুধু আপন স্বার্থ-প্ররোচিত ও কুৎসিত ডিপ্লোমেসির জ্বালায় ভারাক্রান্ত। অন্য দিকে এখানে দেখিতেছি ক্ষুদ্রকায় একটি মানুষ, ভীষণ তাঁর কর্ম্মশক্তি—কিন্তু একটি পিপীলিকার জীবনও লইতে তিনি অনিচ্ছুক। আবার তাঁর ধীশক্তি ও বুদ্ধি প্রখর, কিন্তু ক্ষুদ্রতম চাটুবাক্য বলিতেও তিনি নারাজ। অস্ত্রহীন তাঁর যুদ্ধ এবং সত্যই তাঁর রাজনীতি।

পূর্ব্বে কখনও এমন একটি মানুষ ইতিহাসে দেখা যায় নাই। পৃথিবীর লোক এমন অনেক সত্যিকার সন্ন্যাসীর জীবনী শুনিয়াছে—যাঁরা আপন সন্ন্যাস-জীবনের জন্য সংসারের বাহিরে বা উপরে থাকিয়া জীবনযাপন করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ একজন নাগরিক আজ সততা ও সত্যের অর্ঘ্য লইয়া পূতিগন্ধময় রাজনীতির গৃহে আসিয়াছেন। এইটিই জগতের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের অপূর্ব্বত্ব। তার জন্য চাই সত্য শক্তি ও চিত্তপ্রশস্তি।

গান্ধীর বাণী ঠিক এইভাবে অপরকেও প্রভাবান্বিত করে। তিনি আমাদিগকে বলিতেছিলেন, "অহিংস-অস্ত্র সত্য শক্তিমান্ মানুষের জন্য—কাপুরুষের জন্য নয়। যখন কেউ মৃত্যু বা অন্য কিছুকেই ভয় করে না, তখন সত্য যুদ্ধ করিবার জন্য তার আর রিভলভারের প্রয়োজন হয় না। শুধু সত্যই যথেষ্ট। হিংসামূলক নীতি কখনও

তার মীমাংসা করিতে পারে না। চাই হিংসাবাদীদের অন্তরে এই সত্য জিনিষকে ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে নূতন শ্রদ্ধার জন্ম দেওয়া। তরুণ ভারতের এইটিই লক্ষ্য—যার জন্ম তাঁরা সর্ব্বপ্রকার মারপিটের লাঞ্ছনায় ও বন্দীশালায় আপনাদিগকে সহাস্ত মুখে দান করিতেছেন।"

এই জিনিষটি আজ অনেক ইংরেজও বুঝিতে আরম্ভ করিতেছে। গান্ধী ইচ্ছা করেন যে, যেন পৃথিবীর অন্য দেশের লোকেরাও ভারতের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে—নিজেদের রক্তাক্ত বীভৎস জগৎ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া দেখে।

সেই শুভ প্রাতে দীর্ঘ সময় গান্ধীর সঙ্গে বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া যে-সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এবং বিশেষ করিয়া প্রত্যেক দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ভাবের যে আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল সে-সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার রহিল। ইচ্ছা হয়, এমন দিন যেন আবার আসে, কারণ একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হইলে চিরকালের জন্ম মনে তাঁর জন্য টান থাকিয়া যায়।

*　　*　　*　　*

মার্সেই শহরে তাঁহার জন্ম বিশেষ ভোজসভার যে আয়োজন করা হইয়াছিল, তিনি তাহা ও গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকার ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু ছাত্রদের সভায় তাহাদের ক্লাব-ঘরে বক্তৃতা দিতে সম্মত হইলেন। সেই প্রসঙ্গে ছাত্রভাইদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বিশ্বাস ক'রো না যে, পুথির বিদ্যার ভারে নিজের মাথাকে বোঝাই করা একমাত্র শিক্ষা। অভিজ্ঞতা বলে যে, সত্যকার বিদ্যার চরম উদ্দেশ্য হইল চারিত্রিক ক্রমোন্নতি। সত্য শক্তি অন্তরে নিহিত—তাহা মানুষের মাংসপেশীতে নয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমি অনেক নিগ্রো দেখিয়াছি—তাদের এমন মাংসপেশী, যে, সচরাচর ইউরোপে তেমন দেখা যায় না। কিন্তু ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের হাতে রিভলভার দেখিতে পাইলে তাহাদের সমস্ত শরীরে ভয়ের কম্পন ধরিত; কারণ তাহারা মরণের ভয়ে ভীত। যখন কেহ কিছুকেই ভয় না-করিতে শিখে, তখনই সে মারামারি কাটাকাটি না করিয়া আপনার জন্মগত সত্য স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। অপরের কোন মতকে স্বীকার করা-না-করা সম্বন্ধে কেহ কাহারও দাস নয়। আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা ভারতের সেই সব তরুণতরুণীদের আত্মশিক্ষার অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে বিচার কর—যারা হাসিমুখে অপরের লাঠির মারপিট ও কারাগারের কাছে আপনাদিগকে তুলিয়া আত্মদান করিয়াছে, এবং দেখ, সেই সব তরুণ ভারতীয়দের মাঝে যে আত্মশিক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে এমন কোন সাহায্য পাওয়া যায় কি না যাহা দ্বারা অন্য জাতিরা অসত্যের বিরুদ্ধে অভিযানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও কাটাকাটির পথ আশ্রয় না করিয়া বড় উচ্চতর মানবিক উপায় অবলম্বন করিতে পারে। সংকীর্ণ জাতীয়তা মোটেই চলে না। আমাদের ভারতের আন্দোলনের সার্থকতা ততটুকু, যতটুকু দিয়া সে সমস্ত বিশ্বমানবতাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে।"

এক ভদ্রলোক লণ্ডনে তাঁর চেষ্টার সফলতা কামনা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ তরুণোচিত উৎসাহে উত্তর দিলেন—"সফলতার মানে কাজ করিয়া যাওয়া।" যদিও তাঁহার আশাশীলতা অদম্য, তবুও তিনি খুব আশার কারণ দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতে চান। তিনি আপন বন্ধুদের মতই বিরোধী সেই সব লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবেন, যাঁহারা ভারতের সত্যকার অবস্থা বুঝিতেছেন না, অথচ নিজেদের মতে খাঁটি এবং ভালবাসার পাত্র। যদি তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে আবার ভারতে ফিরিয়া যাইবেন।

তাঁহার সাহস, সত্যের উপর নির্ভর ও অসীম প্রেমের প্রবাহ সকলকেই প্রভাবান্বিত করে। তাঁহার জীবনে স্পষ্টভাবে দুইটি গতি পরিলক্ষিত হয়। একটি রাজনৈতিক—যেখানে তিনি বিশ্বস্তভাবে ভারতীয় রাজনৈতিক মহাসম্মিলনীর প্রতিনিধি-স্বরূপে করাচীর প্রোগ্রাম সমর্থন করিতে সচেষ্ট। দ্বিতীয়টি সামাজিক—যেখানে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বেশী। এই ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছা করেন সকলের আগে দারিদ্র্যে প্রপীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারীর

দুঃখ মোচন করিতে, এবং বিশ্বজগতের লোকের কাছে এই প্রমাণ বহিয়া আনিতে, যে, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও অপঘাত মৃত্যুর পথ হইতেও সেই সব সমস্তা সমাধানের উচ্চতর পথ রহিয়াছে।

তিনি যে এরই জন্ত বাঁচিয়া আছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বোঝা যায়। তাঁহার সরল জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যে লোক-দেখানো কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বজনে ভ্রাতৃপ্রেম সকলকে আশ্চর্য্য রকমে প্রভাবিত করে—বিশেষ করিয়া তাহাদের জন্ত প্রেম যাহারা অর্থলোলুপ সামরিক সভ্যতার ভোজের ভাঙা পিয়ালার বোঝা সমাজের নিম্নস্তরে দাঁড়াইয়া মাথার উপর বহন করিতে বাধ্য হইতেছে।

সমবায়-প্রথায় বাণিজ্য

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাঙালীরা সমবায়-প্রণালীতে তাঁহাদের ব্যবসায়ের যে প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রথাই ভাটিয়াদের বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। বাঙালীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ব্যবসায় করিতেন। রেল এবং ষ্টীমারের বহুল প্রচলন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়িগণ নৌবাণিজ্য করিতেন। ব্যবসায়ি-প্রধান গ্রাম মাত্রেই (নদী বা খালের তীরবর্ত্তী) তিন শত হইতে আট শত মণ মালবহন-ক্ষম বহু নৌকা থাকিত। নৌকার একজন বা একাধিক মালিক থাকিত। নৌকার মালবহনের শক্তি-অনুসারে লাভের শতকরা দুই হইতে ছয় অংশ নৌকার মালিক পাইতেন। তিন-চারি শত মণ নৌকার মাঝি দেড় অংশ, পাঁচ-ছয় শত মণে দুই অংশ ও সাত-আট শত মণ নৌকার মাঝি তিন অংশ পাইতেন। নৌকার অপর সকলকে মাল্লা বলা হইত। উঁহারা প্রত্যেকে এক অংশ পাইতেন। অধিকাংশ সময়ে এইরূপ সমবায়ের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশমত মূলধনের অর্থ দিতেন। অন্তথায় সমবায়ের দায়িত্বে গ্রাম্য মহাজনের নিকট পণ্যের অংশ ও লাভের অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া অথবা সুদ কড়ারে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্যযাত্রা করিতেন।

ইঁহারা বঙ্গোপসাগরের কূল বাহিয়া পূর্ব্বদিকে মগের মুল্লুক (আরাকান), পশ্চিম দিকে সাগরতীর্থ হইয়া কলিকাতা এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ, গঙ্গা বাহিয়া বালিয়া, বক্সার, গোগরা নদীর ভিতরে বহ্বৃহজ, গণ্ডক নদীর ভিতর দিয়া ত্রিহুতের দক্ষিণ দিক্, মহানন্দার ভিতর দিয়া পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত, ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া সমগ্র আসাম করতোয়ার ভিতর দিয়া বগুড়া, বরাল নদীর ভিতরে নওগাঁ (রাজসাহী), মেঘনা এবং ইহার উপনদী সুরমার ভিতর দিয়া সিলেট কাছাড়ের বিভিন্ন অংশে বাণিজ্য করিতেন। ইঁহারা নদী বা খালের তীরবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে গিয়া গ্রামের প্রয়োজনীয় পণ্য নৌকা হইতে গ্রামবাসীদের দিতেন। গ্রামের রপ্তানীর দ্রব্য নৌকায় ভরিয়া অন্যত্র লইয়া যাইতেন। এইরূপে গ্রামে গ্রামে পণ্যসম্ভার লইয়া বেড়াইতেন বলিয়া সাধারণতঃ ইঁহাদিগকে 'গাঁওয়াল' বলিত।

এই গ্রাম্য সমবায়ে প্রত্যেক সভ্যকে নৌকা বাহিতে, ভাত রাঁধিতে এবং মাল বহন করিতে হইত। কেহ কাহাকেও ছোট বা বড়, সভ্য বা অসভ্য জ্ঞান করিতেন না। নির্ব্বাচিত মাঝির দায়িত্ব বেশী, সুতরাং তিনি দেড়া দ্বিগুণ বা তিনগুণ অংশ পাইতেন বলিয়া কাহারও ঈর্ষ্যা করিবার মত কিছু থাকিত না। ইঁহারা প্রত্যেকেই হিসাব করিতে জানিতেন।

এইরূপ ভাবে নানাস্থানে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেস্থান তাঁহাদের কাহারও কাহারও পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া মনে হইত, সেস্থানে তাঁহারা স্থায়ী কারবার করিয়া

বসিতেন। ভাত রাঁধিয়া, মোট বহিয়া, নিজহাতে ওজন করিয়া পণ্য ক্রয়বিক্রয় করিয়া, দেনা-পাওনার হিসাব করিয়া ব্যবসায়ে অতি পরিপক্ব জ্ঞান হইত। বঙ্গদেশ ভ্রমণে নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আলাপ পরিচয়ে সামাজিক জ্ঞান যথেষ্ট হইত। সকলেই সদালাপী হইতেন। লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মিত। অনাত্মীয় গ্রামবাসী এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের লোকদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকার দরুণ হৃদ্যতা সখ্যতা বৃদ্ধি পাইত, সদ্‌বুদ্ধি বাড়িত। সমবায়-প্রথায় বাণিজ্য করা হেতু ব্যবসায়ী মাত্রের উপর মমত্ব-বোধ বাড়িত। সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ছিল ইহাদের সমবায়-প্রথা। বাণিজ্যলব্ধ অর্থ বহু ভাগে বিভক্ত হইত।

পণ্যসম্ভার লইয়া দেশে দেশে ফিরিয়া যে-সব স্থান স্থায়ী ব্যবসায়ের উপযোগী মনে হইত, সেখানেও কেহ একা কোন কারবার করিতেন না। কারবারের গদিতে একজন নির্ব্বাচিত গদিয়ান থাকিতেন বটে, কিন্তু মালিক থাকিত বহু। রামকানাই-ঈশ্বর-হরিমোহন-রাজচন্দ্র ইত্যাদি নাম এই সমবায় প্রথার কিঞ্চিৎ পরিচয় এখনও দেয়। ভৈরবের সাত তহবিল এবং বরিশাল-গলাচিপার পাঁচ তহবিলের গদির মত সমবায়-প্রথায় বাংলার সর্ব্বত্র বাণিজ্য চলিত। ব্যবসায় মাত্রেই ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কোন কারবার একেবারে ধ্বংস না পায় সেই পন্থাও ইহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এই সমবায়-প্রণালী দ্বারা। মহাজনদের ব্যক্তিগত মূলধন একই কারবারে না রাখিয়া তাঁহারা বহু কারবারে পরস্পর পরস্পরের অংশীদার হইতেন। কোন কারবারে ক্ষতি হইলে একাকী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ধ্বংস পাইতেন না। পক্ষান্তরে প্রত্যেকটি কারবারের ভুলভ্রান্তি ভিন্নভাবে দেখাইয়া দিবার জন্য অনেক সজাগ-চক্ষু আশেপাশে পাহারা দিত। আপদে বিপদে সকলে আসিয়া প্রত্যেকে নিজের কারবার মনে করিয়া সাহায্য করিতেন।

ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, ওলন্দাজ ইংরেজ ঠিক একই প্রণালীতে ব্যবসা করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন। বিশেষত্বের মধ্যে ছিল সমুদ্রে যাইবার উপযোগী পালের জাহাজ এবং তাহার মাল বহন করিবার [illegible] ক্ষমতা। তাঁহারা তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রথার উৎকর্ষ সাধন করিয়া পৃথিবীর বাণিজ্যপ্রধান জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান পাইলেন। যাহারা আমাদের দেশের রক্তমোক্ষণ করিতেছে আমরা আজ তাহাদের নিকট অন্নের কাঙাল হইয়া রহিয়াছি।

প্রথমতঃ ইংরেজদের মালবহনকারী কোম্পানী-সমূহ (India GeneralSteam Navigation and Ry. Co., Rivers Steam Navigation, Calcutta Steam Navigation, Assam Steamship Co.) বাঙালী নৌবাণিজ্যকারীদের ব্যবসায়ে প্রবল বেগে ধাক্কা দেয়। পূর্ব্বে মহাজনগণ সমবায়-প্রথায় কাজ করিতেন। ষ্টীমার হইলে অতি সামান্য মালও একস্থান হইতে অন্য স্থানে রপ্তানি দেওয়ার অসুবিধা রহিল না। যাঁহার যেমন সংগ্রহ তিনি তেমনি ভাবে অল্প মূলধন লইয়া চালানি কাজ আরম্ভ করিলেন। সমবায়-প্রথা ভাঙিয়া গেল। দ্বিতীয় কারণ হইল বাঙ্গালীর দূরদৃষ্টির অভাব। ইহারা ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রণালী এবং প্রবল প্রতাপশালী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ের প্রণালী একই ছিল। আমরা যাহাকে নৌকার মাঝি বলিতাম, তাঁহারা তাহাকে ক্যাপটেন বলিতেন। আমরা মাল্লা বলিতাম, তাঁহারা ক্রু বলিতেন! আমাদের নৌবাণিজ্যের ব্যবসায়ী-সমবায় যে-প্রণালীতে মূলধন সংগ্রহ করিত, তাহাদেরও পন্থা ঠিক তদ্রূপই ছিল, অধিকন্তু উহাদের দেশে তৎকালে জমিদার বা রাজাদের প্রভাব বেশী ছিল বলিয়া ব্যবসায়ী-সমবায়কে বিদেশে বাণিজ্য করিবার সনদ দিবার অজুহাতে কিছু অংশ গ্রহণ করিতেন।

ইংরেজদের কারবারের ভ্রান্ত অনুকরণের ফলে আমাদের পুরাতন সমবায়-বাণিজ্যপ্রথা নষ্ট হইল। পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই জীবনের বিকাশ। ইহা ব্যক্তির জীবনে যেমন সত্য, সামাজিক জীবনেও তেমনই সত্য। যে-ব্যক্তি তাহার জীবনের পরিবর্ত্তনটাকে কাজে লাগাইতে পারে না, সে অকেজো। সামাজিক জীবনেও কালোপ-যোগী না হইলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। ইংরেজ তাহার [illegible]

হইল ; আর আমরা আমাদের সমবায়-প্রথা ভাঙিয়া দিয়া পরপদলেহনে প্রবৃত্ত হইলাম !

এখনও বঙ্গের ব-দ্বীপের (Bengal Delta) এবং মেঘনা ও পদ্মাতীরবর্ত্তী বাণিজ্য-কেন্দ্রসমূহে পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় সমূহের বংশধরগণ তাঁহাদের বাণিজ্য এমন ভাবে ধরিয়া বসিয়াছেন যে, মাড়োয়ারীগণ অনেক স্থানেই চেষ্টা করিয়াও প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। যে-প্রণালীর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া আমরা উত্তর-বঙ্গ এবং আসাম ভিন্নপ্রদেশবাসীর নিকট বিকাইয়া দিলাম, সেই প্রণালীর ব্যবসা ব্যাপকভাবে ধরিয়া ভাটিয়ারা আরব-সাগরের উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত-মহাসাগর বাহিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রাপূর্ব্বক প্রশান্তে পৌঁছিয়া শান্ত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে ভারতের বাণিজ্য বলিয়া যাহা কিছু আছে, তাহা পার্শী, ভাটিয়া এবং নাখোদাদের। ভারতের উপকূল বাণিজ্যে ইহারা একচ্ছত্র সম্রাট। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী ইহাদের বৃহত্তম বিকাশ। ভাটিয়ারা ভারতবাসী বলিয়া ইহাদের গর্ব্বে আমরা গর্ব্ব অনুভব করি, কিন্তু তাহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হই না। পেটে হাত পড়িলে উপবাস করিয়া শুধু গাল দিই।

প্রকৃতির কি দারুণ অভিশাপ !

ভাটিয়াদের ব্যবসায়ের রীতি এই যে মূলধন বহু বহু কারবারে বিভক্ত রাখিবে। কখনও কখনও ইহাদের কারবারের মূলধন শতাধিক অংশে বিভক্ত হইতে দেখা যায়। মূলধনের পরিমাণ এবং ব্যবসায়-বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ইহারা বৈঠকে বসিয়া অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়। ইহারা সাধারণত চালানি কাজ—ব্যাপকভাবে এক দেশ হইতে অন্যত্র মাল চালান দেওয়ার ব্যবসাই বেশী করে। সুতরাং বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে কারবার কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখিয়া হিসাবান্তে যাঁহারা সত্ত্ব ত্যাগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিয়া পুনরায় সত্ত্ব গঠন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ঝগড়া কলহ মোটেই বৃদ্ধি পায় না। কারণ, যিনি সত্ত্ব ত্যাগ করিলেন, তিনিও অচির ভবিষ্যতে, অপর দশটি কারবারের সভ্যরূপে, এই পরিত্যক্ত কারবারেরই অপর দশ জনের সহিত ভাগ্যপরীক্ষা করিবেন। এক বা একাধিক ব্যবসায়ে সাময়িক ক্ষতি ঘটিলেও অপর ব্যবসায় সমূহ তাহাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে ঠিক ধরিয়া রাখে।

বাঙালীর বর্ত্তমান ব্যবসায়ের প্রথা ইহার ঠিক বিপরীত। সমবায় ভাঙিয়া দিয়া একা ব্যবসায় করিবার ঝোঁক তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। একার কাজে ঝক্কি বেশী, ভুলভ্রান্তি বেশী হওয়ার সম্ভাবনা ; সুতরাং সত্ত্ব-শক্তিতে যাহারা ব্যবসা করে, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় একার শক্তি পরাজিত হইবেই।

"যখন ঝরিবে পাতা"

শ্রীক্ষিতীশ রায়

জানি আমি তুমি আসিবে যেদিন
পত্র ঝরিবে বনে
খুঁজি' লবে মোর সমাধি-শয়ন
গোরস্থানের কোণে।
শিয়র তাহার ভরা রবে প্রিয়া
আমার বুকের ফুলে
তারই ছুটো ফুল গুঁজে দিও সখি !
তোমার সোনার চুলে।
যত গান মোর পায়নিক' সুর,
যে ভাষা না পেল বাণী,
আবেগ তাহার ফুটে ছেয়ে গেছে
আমার কবরখানি !*

* ইটালিয়ান হইতে



বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। ২৭।৩ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹

মানুষের অন্তরের ও বাহিরের জীবনে যাহা কিছু আছে, তাহার মধ্যে অসত্য অন্যায় অসুন্দর মলিনতা থাকিলেও তাহা ভাল, ইহা যিনি স্বীকার না করিয়া, মন্দ যাহা তাহার বিনাশসাধন পূর্ব্বক শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন মোটামুটি তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থে মানুষের আন্তরিক ও বাহ্য সমুদয় বিষয় সম্বন্ধে বিদ্রোহী। এই পুস্তকের লেখক বলিয়াছেন :—

"রবীন্দ্রনাথের বহুপূর্ব্বের লেখা হইতে আরম্ভ করিয়া অতিআধুনিক লেখা 'রাশিয়ার চিঠি' পর্য্যন্ত নানা পুস্তক হইতে এমন সব অংশ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে যেগুলি কবির বিপ্লবাত্মক চিন্তা প্রতিফলিত করিয়াছে।...বিদ্রোহী সে-ই, মিথ্যা জীর্ণ সংস্কারকে যে আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিত্তে নব নব চিন্তাধারা আনিয়া দিয়াছেন। সেই সকল চিন্তা সতেজ, সবল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ভয়ঙ্কর। তাহারা জাতি-চিত্তকে মিথ্যার গণ্ডী হইতে সত্যের মুক্তি দিয়াছে।" লেখক শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। নিজের ব্যাখ্যানও দিয়াছেন। এই জন্য বহিখানি উপাদেয় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাণীসমূহের একটি দিক্ বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ সাহায্য করিবে। রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে দেখাইবার চেষ্টা আগে কেহ করেন নাই। বহিখানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্প্সাম্-রচিত

বাঙ্গালা ব্যাকরণ—বাঙ্গালা অনুবাদ ও উক্ত পাদ্রির বাঙ্গালা-পোর্ত্তুগীস শব্দসংগ্রহ হইতে নির্ব্বাচিত শব্দাবলী সমেত মূল পোর্ত্তুগীস গ্রন্থের যথাযথ পুনর্মুদ্রণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কর্ত্তৃক ভূমিকা সহ সম্পাদিত ও অনূদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রাযন্ত্রে ইংরেজী ১৯৩১ সালে মুদ্রিত এবং তথা হইতে প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই বইখানি "বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ, এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রথম দুইখানি মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে একখানির প্রথম খণ্ড; এবং পরিশিষ্ট হিসাবে এই বইয়ের শেষে এই প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড বাঙ্গালা-পোর্ত্তুগীস শব্দকোষ হইতে গৃহীত বহু শব্দ দেওয়া হইয়াছে। এই বই ১৭৩৪ সালে রচিত হইয়া খ্রীষ্টীয় ১৭৪৩ সালে পোর্ত্তুগাল দেশের রাজধানী লিসবন নগরীতে রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল।" এই ব্যাকরণ ও শব্দকোষ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ভাষা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিবার জন্য অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই জন্য ইহা মূল্যবান্। পাদ্রি মহাশয়ের সমগ্র শব্দসংগ্রহটি পুনর্মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। সম্পাদকদ্বয় তাঁহাদের কাজ পাণ্ডিত্য ও নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। পোর্ত্তুগীস হইতে অনুবাদ অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন করিয়াছেন। "প্রবেশক"টি অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। পাদ্রি মানোএলের লেখা "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" নামক একখানি অনুবাদ পুস্তকের বাংলার কিছু কিছু নমুনাও সম্পাদকদ্বয় দিয়াছেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত—একাদশ সংস্করণ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২১৪ পৃষ্ঠা। মূল্য বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য। কাগজের মলাটের মূল্য ১৸৶০ মাত্র। মূল্য যথাসম্ভব কম। কাগজ ও ছাপা ভাল।

এই সংস্করণের শেষ গানটির সংখ্যা ২০১৩। কিন্তু কীর্ত্তনের গানের পৃথক পৃথক অংশগুলি গণনা করিলে মোট গানের সংখ্যা ২১৫০-এর কিঞ্চিৎ অধিক হয়। ইহাতে বাংলা গান ছাড়া সংস্কৃত হিন্দী ও উর্দ্দু গানও কতকগুলি আছে। আধুনিক কালের সঙ্গীত-রচয়িতাদের গান ছাড়া ইহাতে বৈদিক যুগের মন্ত্ররচয়িতা ঋষিগণের রচনা এবং মধ্যযুগের কবীর, নানক, মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্তগণের গান আছে। ব্রাহ্মসমাজের রচয়িতাদিগের গান ছাড়া দাশরথি রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির কয়েকটি গান আছে। প্রায় পাঁচ শত গান রবীন্দ্রনাথের রচনা। অনেক গানের স্বরলিপি কোথায় পাওয়া যায়, তাহা লিখিত হইয়াছে। অন্য সব গানের তাল সুর আদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মানুষের মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী এবং ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্য ও অনুষ্ঠানের উপযোগী গান শ্রেণিবদ্ধ করা হইয়াছে।

আগেকার সমুদয় সংস্করণ অপেক্ষা বর্ত্তমান সংস্করণ সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। বস্তুতঃ, ধর্ম্মসঙ্গীতের এই সংগ্রহটি সকল আস্তিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণের সহচর হইবার যোগ্য।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জয়ন্তী-উৎসর্গ—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, মূল্য ৩৷৹ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-পরিচয় সভা বাংলা দেশের বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সংগ্রহ আরম্ভ করেন। পরে বিশ্বভারতী সেই ভার সম্পূর্ণ করিয়া জয়ন্তী-উৎসবের শুভ দিবসে এই পুস্তকখানি কবিকে নিবেদন করেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি ও বাঙালীর গৌরব। সুতরাং তাঁহার সপ্ততিতম জন্মোৎসবে বাঙালীর লেখনীগ্রথিত এই জয়মাল্য তাঁহার উপযুক্ত উপহার। তবে লেখক ও প্রকাশক সমষ্টির অধ্যবসায় উৎসাহ ও অনলসতা আরও অধিক হইলে বইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিত। বাংলার বহু সুপরিচিত লেখককে নানা কারণে এই উৎসর্গ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত দেখিতেছি। তাই বলিয়া ইহাতে সারগর্ভ প্রবন্ধ কি সরস কবিতার অভাব আছে এমন কথা কিছুতেই বলা চলে না।

এই পুস্তকে রাজশেখর বসুর ভাষা ও সঙ্কেত, অতুলচন্দ্র গুপ্তের রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য, ইন্দিরা দেবীর সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র সেনের বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কবিকথা, কালিদাস রায়ের "পঞ্চভূত", চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান সুর, অবনীন্দ্রনাথের যাত্রা ও থিয়েটার এবং রামানন্দ-চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

অতুলচন্দ্র লিখিয়াছেন, "কালিদাসের কাব্য ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আর একটি যোগ * * * প্রচ্ছন্ন নাড়ীর যোগ। সে হচ্ছে, এই

রস ও বৈচিত্র্যকে একটা গভীর শান্তরসে ঘিরে আছে, যাহা সমস্ত রকম আতিশয্য ও অসংযমকে লজ্জা দেয়। * * * কালিদাসের কাব্য কখনও সংযমের ছন্দ কেটে সৌন্দর্য্যের যতি ভঙ্গ করে না। ইউরোপীয় অলঙ্কারের ভাষায় কালিদাসের কাব্যে ক্লাসিসিজম্‌ ও রোমান্টিসিজমের অপূর্ব্ব মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা এই মিলন-পন্থী। পৃথিবীর লিরিক কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সম্ভবত সবার উপরে।"

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সঙ্গীতরাজ্যে বিচরণের একটা ধারাবাহিক স্মৃতিমালা দেখিতে পাই। ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক গীতি-উৎসব ও গীত-সঙ্গত-গুলি যে বাংলা দেশের আধুনিক সঙ্গীত-ভাণ্ডারকে কত সম্পদ দান করিয়াছে এবং কত নব নব সুর, লয় ও তানের খেলার প্রবর্ত্তন করিয়াছে ইহা হইতে তাহা বোঝা যায়। ইংরেজী গান ও ইয়োরোপীয় সঙ্গীত এককালে রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় ছিল—এ কথা অনেকেই জানেন না। "বিদেশী সঙ্গীতের স্রোতে তিনি যে গা ভাসিয়ে দেন নি, তার কারণ ছেলেবেলা থেকে তাঁদের বাড়িতে ভাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবেত্তার যাতায়াত ছিল। * * আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত সকল প্রকার হিন্দী সুরের একটি রত্নাকর-বিশেষ * * তার দ্বাদশ ভাগের শেষ নয় ভাগের অধিকাংশ গানই বোধ হয় রবীন্দ্র-রচিত।"

'বাংলা ছন্দ' বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র সেনের ২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি বাংলার এবং বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ছন্দের আলোচনা বহু দিক্ হইতে নিপুণতার সহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "এই বৈচিত্র্য-বহুলতাই রবীন্দ্রনাথের ছন্দের আসল কথা নয়; আসল কথা এই যে, তিনিই বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সর্ব্বপ্রথম ও যথার্থ আবিষ্কারক। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা ভাষার মজ্জাগত স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা ছন্দের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করেছেন; তাঁর এ আবিষ্কার পৃথিবীর ভাষাগত কোনো আবিষ্কারের চেয়ে কম নয়। * * * সেদিন থেকেই বাংলা ছন্দ সার্থকতা ও ঐশ্বর্য্য লাভের পথের সন্ধান পেয়েছে। * * * সেদিন দেখা গেল, বাংলা ছন্দের শক্তিও ক্ষীণ নয় এবং তার সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বল্পপরিসর নয়।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী চরিত্র প্রবন্ধে নিরুপমা দেবী কবির কাব্য ও উপন্যাসের বিচিত্র নারী-প্রকৃতির আলোচনা করিয়াছেন।

কবির "পঞ্চভূত" লইয়া আজকাল বড় কেহ আলোচনা করে না। এই চিত্তাকর্ষক বিষয় আলোচনায় অগ্রণী হইয়া শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। "চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোলোকে যে চিন্তাবৈচিত্র্যের নাট্যাভিনয় চলিতেছে, তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ দান করিবার জন্য মনোলোকের চিন্ময় পাত্র-পাত্রীগুলিকেই কবি পঞ্চভূতে রূপদান করিয়াছেন।" ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের সমষ্টি আমরা সকলেই। এক মানুষের মধ্যে এই পঞ্চভূতের বাদপ্রতিবাদ লইয়া আলোচনা করিবার স্থান ইহা নয়। ইহাতে যে মাধুর্য্য ও আনন্দ পাওয়া যায় পাঠক আপনি তাহা সংগ্রহ করিয়া লইবেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের ও নানা সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক নূতন কথা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে আছে। কবির ইংরেজী রচনান্তরের কথাগুলি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কবির কৈশোর হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত পথচলার আনন্দ তাঁহার সকল বয়সের কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন। "তিনি আকৈশোর আজ পর্য্যন্ত চলারই মাহাত্ম্য ঘোষণা করে এসেছেন। * * * কবিচিত্ত সপ্ত-তন্ত্রী বীণার মতো, তাতে কত সুর কত মূর্চ্ছনাই বেজেছে; কিন্তু আমার কানে এই গতির বাণীটিই খুব বেশী করে

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা প্রবন্ধে বলিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথের বাংলাসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে। * * * বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর সাহিত্য, বাঙ্গালীর চিত্ত যতখানি আজ আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে তাহার সব না হোক বেশির ভাগ যে একা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ঘটিয়াছে এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় যাত্রা ও থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত সরস বর্ণনায় দুটি জিনিষের প্রভেদ সহজেই চোখে পড়ে।

জয়ন্তী-উৎসর্গ পুস্তকে আরও বহু সুলেখকের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। সবগুলির পরিচয় দেওয়া এখানে অসম্ভব, তাই থামিতে হইল। এই পুস্তকখানি রবীন্দ্র-সাহিত্য-অনুরাগীদের অনেক কাজে লাগিবে। আমরা ইহার বহুলপ্রচার কামনা করি।

আলোচ্য পুস্তকখানির স্থানে স্থানে ছাপার ভুল নজরে পড়িল। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক নিবন্ধটিতে কয়েকটি ভুল আছে,—যথা ৯ম পৃষ্ঠায় 'আচরণ' স্থলে 'আবরণ' এবং ১১শ পৃষ্ঠায় 'দৃঢ়' স্থলে 'দুর' ও 'ধরিয়াছেন' স্থলে 'করিয়াছেন' ছাপা হইয়াছে।

শ্রীশান্তা দেবী

আধুনিকী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণেতা, প্রকাশক মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজী ১১৮ পৃষ্ঠা। এন্টিক কাগজে পাইকা টাইপে পরিষ্কার ছাপা, কাগজের শক্ত মলাট। দাম এক টাকা।

এই বইয়ে নয়টি প্রবন্ধ আছে—১। আধুনিকতম সাহিত্য, ২। আধুনিকতার একটি দিক, ৩। আধুনিকের স্বরূপ, ৪। আধুনিকের গতি-বৈপরীত্য, ৫। অদৃশ্য জগৎ, ৬। অতিআধুনিকের বার্ত্তা, ৭। শিল্পে অন্তর্দ্ধান ও অন্তঃপ্রেরণা, ৮। অতিআধুনিক নারী, ৯। ফরাসী-কবি বোদেলের। সব প্রবন্ধ আধুনিকতার সম্বন্ধেই লেখা, যদিও কোনো কোনটির নাম দেখে তাদের বক্তব্য ঠিক ধরা যায় না। প্রবন্ধগুলি নানা সময়ে নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হলেও তাদের মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য আছে।

লেখক নয়টি প্রবন্ধেই আধুনিক যুগের সাহিত্যের ধারা ও প্রবণতা সম্বন্ধেই অতি নিপুণ বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করেছেন। নলিনী-বাবু গভীর মনীষাসম্পন্ন সুপণ্ডিত লেখক। তাঁর প্রত্যেক প্রবন্ধে গভীর চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। যিনি এই বইখানি মনোযোগ করে পড়বেন তিনি অনেক নূতন চিন্তা ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করবেন। আমরা এই অসামান্য মননশীল প্রবন্ধাবলীর বহুল প্রচার কামনা করি।

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের ইংরেজী থেকে অনুবাদিত, অনুবাদক শ্রীঅনিলবরণ রায়। প্রকাশক মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩২ পৃষ্ঠা, এন্টিক কাগজে পাইকা টাইপে পরিষ্কার ছাপা। কাগজের শক্ত মলাট। দাম এক টাকা চার আনা।

এই পুস্তকে চারটি প্রবন্ধ আছে—১। প্রাচীন ভারতে সমাজ ও রাষ্ট্র, ২। ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি ও স্বরূপ, ৩। ভারতে রাষ্ট্রবিকাশের ধারা, ৪। ভারতীয় ঐক্য-সাধনা-সমস্যা।

অনুবাদক ভূমিকায় লিখেছেন—"স্বাধীন ভারতে স্বরাজের রূপ কি হইবে, তাহা লইয়া আজকাল নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে... ভারত একটা অতি পুরাতন দেশ, ভারতেরও একটা নিজস্ব রাষ্ট্রপ্রতিভা ... আছে, সে কথাটা কাহারও মনে উঠে না।

ভারতের সেই অতীত রাষ্ট্রনীতি এখনও ভারতবাসীর অবচেতনায় অনুস্যূত রহিয়াছে, তাই তাহারা কোনো বিদেশী ধরণের অনুষ্ঠান গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।...সেই জাতীয় ধারার বিকাশ করিয়াই বর্ত্তমান কালোপযোগী রাষ্ট্রের সৃজন করিতে হইবে, কেবল এই ভাবেই ভারতের অতি জটিল রাষ্ট্রনীতিক সমস্যাসমূহের সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রনীতি কিরূপ ছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।"

রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে বলেছেন, "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি।" অরবিন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতের রাষ্ট্র-সমস্যার সমাধান যা ব্যক্ত হয়েছে তারই পরিচয় এ গ্রন্থে ওজস্বী সতেজ ভাষায় দেওয়া হয়েছে। অনুবাদের ভাষা এমন গম্ভীর মার্জ্জিত ও অবলীল যে, এই পুস্তককে অনুবাদ ব'লে মনেই হয় না। অনিলবরণ-বাবু নিজে মনস্বী চিন্তাশীল লেখক, অরবিন্দের মত মহামনীষীর রচনা ও চিন্তার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও যোগ রয়েছে, সুতরাং তাঁর অনুবাদ যে প্রাণবান ও সুন্দর হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

"প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্রেরও অস্তিত্ব হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ-গঠনের রাজতন্ত্রই অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে।... রাজতন্ত্রের পশ্চাতে ভিত্তিস্বরূপ কি ছিল, তাহার সন্ধান করিলেই ভারতের রাষ্ট্রগঠনের মূল স্বরূপ আমাদের গোচর হইবে।...প্রাচীন ভারতীয়গণ বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, নিজের প্রকৃতির এবং নিজের শ্রেণীর বা জাতির প্রকৃতির সত্য ধারা ও আদর্শ অনুসরণ করে এবং সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক সঙ্ঘবদ্ধ সমষ্টিজীবনও যদি স্বধর্ম্মের, স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করে, তাহা হইলেই বিশ্বজগতের যেমন সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, মানব-জীবনেও সেইরূপ শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়।...ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা-বিধায়ক এক জটিল অনুষ্ঠান।...রাজনীতি ও অর্থনীতি নৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।...একটি নীতি বরাবর ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের সমুদয় গঠন বিস্তার ও পুনর্গঠনের মূলে স্থায়িভাবে বিদ্যমান ছিল। সেটি হইতেছে, ভিতর হইতে স্ব-নিয়ন্ত্রিত কম্যুনাল বা সমষ্টিগত সঙ্ঘবদ্ধ জীবনপ্রণালী... রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি কম্যুন্যাল স্বায়ত্ত শাসনের সহিত দৃঢ়প্রতিষ্ঠতা ও সুশৃঙ্খলার পূর্ণ সমন্বয়সাধন করিয়াছিল।...সেইজন্য তাঁহারা চক্রবর্ত্তীর আদর্শ বিকাশ করিয়াছিলেন—এক ঐক্যসাধক সাম্রাজ্যিক শাসন আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতের অন্তর্গত বহু রাজ্য ও জাতিগুলিকে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়া ঐক্যবদ্ধ করিবে। শিবাজীর রাজ্য গঠন করিয়াছিল, রক্ষা করিয়াছিল, মহারাষ্ট্র সমবায়; ও শিখ খালসা গঠন করিয়াছিল।...মুসলমানবিজয়ের দ্বারা যে-সমস্যাটি উঠিয়াছিল, সেটি বস্তুতঃ বিদেশীর পরাধীনতা এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার সমস্যা ছিল না; সেটি ছিল দুই সভ্যতার দ্বন্দ্ব,...একটি প্রাচীন ও দেশীয়, অপরটি মধ্যযুগীয় এবং বাহির হইতে আনীত। সমস্যাটি অসমাধানীয় হইয়া উঠিয়াছিল এই জন্য যে, উভয়ের সহিতই জড়িত ছিল এক একটি শক্তিশালী ধর্ম্ম;– একটি সংগ্রামপ্রিয় ও আক্রমণশীল, অপরটি আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া সহনশীল ও নমনীয় হইলেও নিজের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠাসম্পন্ন এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালে আত্মরক্ষাপরায়ণ। সমস্যাটির সমাধান দুই প্রকারে হইতে পারিত—এমন এক মহত্তর অধ্যাত্মতত্ত্বের অভ্যুত্থান যাহা উভয়ের মধ্যে সমন্বয় বিধান করিতে পারিত, অথবা এমন রাষ্ট্রনীতিক দেশপ্রেমের বিকাশ যাহা ধর্ম্মের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যসাধন করিতে পারিত।...ভাঙনের যুগে দুইটি বিশিষ্ট সৃষ্টির দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা পুরাতন অবস্থা-পরম্পরার মধ্যে নবজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিবার শেষ প্রয়াস করিয়াছিল, কিন্তু কোনটিই কার্য্যতঃ সমস্যাটির সমাধান করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই।...মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও শিখ খালসা সংগঠন। একটির মূলে ছিল প্রাদেশিকতা, অপর পক্ষে শিখ খালসা ছিল এক আশ্চর্য্য রকমের মৌলিক ও নূতন সৃষ্টি...এই অভিনব অনুষ্ঠান ছিল অধ্যাত্ম-স্তরে প্রবেশ করিবার অকাল-প্রয়াস।"

এই গ্রন্থে এইরূপ বহু সমস্যা আলোচিত ও মীমাংসিত হয়েছে। বর্ত্তমান রাষ্ট্রসংগঠনের সময়ে পাঠক-পাঠিকারা এই বইখানি পাঠ করলে বিশেষ উপকৃত হবেন, এবং একজন মনস্বীর সুচিন্তিত আলোচনার সহিত পরিচিত হয়ে নিজেদের গন্তব্য পথ ও কর্ত্তব্য অবধারণ ক'রে নেবার সুযোগ ও সুবিধা পাবেন। বইখানি গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এর ভিতরে যে-সব সমাজ ও রাষ্ট্র-সমস্যা আলোচিত হয়েছে আমি এই অল্প-পরিসর সমালোচনায় তার কিঞ্চিৎ পরিচয়ও দিতে পারলাম না। সুতরাং আমি সকলকে এই বইখানি পড়তে অনুরোধ করছি।

যুগমানব—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত, এম-এ, বি-এল প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ৫৮১ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা। দাম তিন টাকা।

গ্রন্থকার বিখ্যাত ও যশস্বী লেখক, বহু উপন্যাস লিখে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি একদিকে যেমন উচ্চপদস্থ বিচারক অপর দিকে তেমনি তিনি উচ্চ ভাবের ভাবুক, তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসে এক-একটি যুগ সমস্যা সমাধান করবার প্রয়াস দেখা যায়, আর এই বৃহৎ গ্রন্থে দেশ-বিদেশের যুগ-মানবদের সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাশীল মনের ধারণা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সকল সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে পাঠক-পাঠিকারা হয়ত একমত হ'তে পারবেন না, কিন্তু তাঁর চিন্তার সংস্পর্শে এসে তাঁদের চিত্তেও ভাবনার উৎস-মুখ খুলে যাবে। গ্রন্থকার নিত্য অবসর-কালে যেসব বিষয় চিন্তা করেছেন বা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন সেই-সব চিন্তা ও আলোচনা তিনি দিনলিপির আকারে প্রত্যহ লিখে লিখে গেছেন, এবং তারই সমষ্টি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মোটের উপর বইখানি পরম উপভোগ্য হয়েছে। পাঠক-পাঠিকারা এর মধ্যে অনেক বিষয়ের সংবাদ ও আলোচনা ত পাবেনই, তা ছাড়া এই বই পড়তে পড়তে তাঁদেরও চিন্তা উদ্রিক্ত হবে, এ বড় কম লাভ নয়। বইখানি পাঠ করলে মন ও চিন্তাশক্তি প্রসার লাভ করবে। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মনীষাসম্পন্ন।

আচার্য্য জগদীশ—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা। ১৪০ পৃষ্ঠা, সচিত্র, কাগজের বাঁধা শক্ত মলাট, সুদৃশ্য, পাইকা হরপে পরিষ্কার ছাপা। মূল্য এক টাকা।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারত-গৌরব। এই ভারতের প্রথম প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের জীবনী ও গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা বহু স্থান হ'তে সংগ্রহ ক'রে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সুতরাং পাঠক-সমাজে এই বই সমাদৃত হবে।

বিজ্ঞানে বাঙালী—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা। সচিত্র, ২০৩ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা।

পুস্তকখানিতে এই সকল বাঙালী বৈজ্ঞানিকের জীবনী ও কার্য্য সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার; আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়; বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর; নব্য বাংলার বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ নীলরতন ধর,

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া পরিশিষ্টে বাংলার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বাঙালীর সৃজনী প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা ও পরিচয় আছে, এবং সায়েন্স এসোসিয়েশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজ, কলিকাতা বিজ্ঞান-মন্দির, বসু-বিজ্ঞান মন্দির, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রভৃতিরও পরিচয় ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বইখানি সর্ব্বতোভাবে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের ও বালক-বালিকদের পাঠোপযোগী হয়েছে। একটি ভুল যা প্রায় সকলেই করে, সেই ভুলটির উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। প্রসিদ্ধ মাদ্রাজী বৈজ্ঞানিক স্যর চন্দ্রশেখরের নামের শেষাংশ রামন্, রমণ নহে। মাদ্রাজীরা নামের শব্দের অন্তে একটি করে ন্ দিয়ে থাকেন, যেমন রাধাকৃষ্ণন্, রামানুজন, রামন্। এর নাম রাম, মাদ্রাজী প্রথায় শেষে ন্ যোগ করাতে হয়েছে রামন্, রাম শব্দের প্রথমার একবচনে মাদ্রাজী রূপ।

বাঙলার মনীষী—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা। সচিত্র, ১১২ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

এই পুস্তকে বাংলা দেশের নিম্নলিখিত মনীষীদের জীবনী ও কর্ম্ম সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া হয়েছে—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য্য হরিনাথ দে, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। এঁরা সব কয়জনই বাংলা দেশের পরম গৌরবের পাত্র, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিচিত্রকর্ম্মা, এবং এঁদের কয়েকজন ত বিশ্ববিখ্যাত। এই সকল মনস্বী বাঙালীর জীবন ও কর্ম্মের সহিত বাংলার সকল নরনারীর ও বালক-বালিকার পরিচয় থাকা আবশ্যক, তাতে তাদেরও জ্ঞানলাভের স্পৃহা বর্দ্ধিত হবে, কর্ম্মে আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মাবে, এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমাদের দেশকে উন্নত ও অগ্রসর ক'রে দেবার চেষ্টা জাগ্রত হবে। এই সব পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বৈদিক সন্ধ্যা—দ্বিতীয় খণ্ড, ক্রিয়াংশ। শ্রীসোমেশচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত। ধানমণ্ডাই—সোমভাগ, সন্ধ্যাভবন হইতে শ্রীযজ্ঞেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজী ৩৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণ নানা বৈদিক গ্রন্থ থেকে উপযুক্ত মন্ত্র নির্ব্বাচন ক'রে আমাদের নিত্যপাঠ্য ও ধ্যেয় ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে রেখে গেছেন। মন্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য্য না জেনে পাঠ ক'রে কোনো ফল নেই—তা সাপের মন্ত্র পড়ার মত অর্থহীন শব্দোচ্চারণ মাত্র। যাতে প্রত্যেক মন্ত্র শুদ্ধ উচ্চারণে ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রে পাঠ করা হয় সেদিকে সকলের মনোযোগ রাখা আবশ্যক, নতুবা নিরর্থক মন্ত্র আওড়ানো পণ্ডশ্রম মাত্র। সোমেশবাবু এই সাধু উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এতে তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেক মন্ত্র কোন্ বেদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মূলনির্দ্দেশ, মন্ত্রের পাঠান্তর, মন্ত্রের অন্বয়, টীকা, ব্যাখ্যা, অনুবাদ ইত্যাদি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঐ মন্ত্রপাঠের কি তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য তাও নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া হয়েছে। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকটে এই গ্রন্থখানি সবিশেষ সমাদৃত হবার যোগ্য হয়েছে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন বৈচিত্র্য—একখানি সামাজিক উপন্যাস। রচয়িত্রী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী নূতন লেখিকা নহেন। অনেকগুলি কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা হইয়া আছেন। "জীবন বৈচিত্র্য" এবার তাঁহাকে উপন্যাসক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দান করিল। বইখানি দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু দুই ভাগের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক একটি ভাগ জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ের সমাপ্তি। এজন্য প্রত্যেক ভাগকে স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালী জীবনের ছোটখাট সুখ-দুঃখের কথা লইয়া বইখানি রচিত। এই জীবন-সংগ্রাম প্রথম ভাগে বস্তুত বিচিত্র হইয়াছে। ইহাতে পলিটিক্স-এর মারামারি কাটাকাটি নাই, পূর্ব্বানুরাগের দুশ্চিন্তাপূর্ণ আকুলতা নাই। নবদম্পতির সরল স্বচ্ছ অথচ মোহময় প্রেমাবেশ এবং নূতন পুরাতনের সঙ্ঘর্ষে সমাজস্তরের ছোটখাট বিপ্লবচিত্র লেখিকার সুনিপুণ তুলিকাগ্রে সুচারু সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে প্রতিদিন জীবনে যেরূপ দৃশ্য অভিনয় করিয়া যাই পুঁথির পাতায় অঙ্কিত তাহারই প্রতিমূর্ত্তি যেন আলোকচিত্রের ছায়াপাতের মত মনোরম প্রতিভাত হইয়া উঠে এবং গল্পের পরিণাম জানিবার জন্য বরাবরই প্রাণের মধ্যে বেশ একটি কৌতূহল জাগরূক থাকে। দ্বিতীয় ভাগে গল্পের আড়ম্বর একটু বেশী হইয়াছে, এবং ইহার ঘটনাগুলিও তেমন উদ্দীপক নহে। তবে স্ত্রীস্বভাবসুলভ ঘটকালির আবেগে কতকগুলি যুবকযুবতীকে একত্র আনিয়া যে বাসর সাজাইয়াছেন তাহাই একটি কৌতুকজনক ঘটনা

অনেক যুবক এ দৃশ্যে ভ্রূকুঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু পাঠিকাগণ এই ঘটনাটি পড়িতে হুলুধ্বনি তুলিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

কাঠবেড়ালী ভাই—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, বি-এ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্। ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৮০ আনা। পৃষ্ঠা ৬৩।

আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকের চাপে বালক-বালিকাদের মনে যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ও পুস্তক মাত্রকেই বর্জ্জন করিয়া চলার প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা অতি সত্য কথা। ইদানীং সহজ সরল ভাষায় চিত্রসম্বলিত পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাও আশানুরূপ নহে। বাংলা ভাষায় বালক-বালিকাদের অবসরকালে অনাবিল আনন্দদান করিতে পারে, এরূপ পুস্তকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কাজেই, এরূপ গ্রন্থাদি যতই লিখিত হয় ততই মঙ্গল। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বালক-বালিকাদের নীরস জীবনে রসের খোরাক জোগাইবার প্রয়াস আছে। কবিতা ও ছড়াগুলি পাঠ করিয়া তাহারা আনন্দ পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্রগুলিও উপভোগ করিবে।

বালক-বালিকাদের জন্য পুস্তক লিখিতে হইলে গ্রন্থকারের কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া দরকার, যথা,—বর্ণশুদ্ধি, ছাপা ও চিত্রগুলির সুসন্নিবেশ। এই সকল বিষয়ে আলোচ্য পুস্তকে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। "কাঠবেড়ালী," না 'কাঠবেরালী'?

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১। আলো আর কালো, ২। আপদ বিদায়, ৩। কুণাল, ৪। বাঁশীর ডাক, ৫। ফললাভ, ৬। দৃষ্টিদান—শ্রীঅসিতকুমার হালদার, লক্ষ্ণৌ আর্টস এণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স কলেজ, লক্ষ্ণৌ।

এই ছয়খানা একাঙ্ক নাটিকা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

মহাশয়ের রচনা। সব কয়খানারই সহিত পাঠকসমাজের অল্প-বিস্তর পরিচয় থাকিবার কথা; কারণ বাংলা সাময়িক পত্রে সব কয়টিই প্রথম প্রকাশিত হয়। সব কয়খানিরই রচনার উদ্দেশ্য "স্কুল কলেজের ছেলেদের ও বৈঠকী সভার অভিনয়।" তবে প্রথম নাটিকাখানি কচি শিশুদের ও সর্ব্বশেষখানি শিল্পীসঙ্ঘের অভিনয়োদ্দেশ্যে রচিত। যেমন বহিরাবরণে, ছাপায় ও বাঁধাইয়ে তেমনি রীতি ও বস্তুর দিক হইতেও নাটিকা কয়খানি এক শ্রেণীর; তাই ইহাদের আলোচনা একযোগে করাই উচিত।

রবীন্দ্রনাথের রূপক ও মিষ্টিক নাটকগুলির অনুকরণে এই নাটিকা কয়খানি রচিত। কবির গানই ইহাদের মধ্যেও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাত্রগণের কথাবার্ত্তায় সেই সুপরিচিত সুর, নাটিকাগুলির ভাববস্তুও রবীন্দ্রনাথের মুক্তিবাদ ও আনন্দবাদ ('কুণাল'-এর বিষয়-বস্তু অনেকটা সচরাচর নাটিকার অনুরূপ)। তাই, ইহাদের মধ্যে কোনও বিশেষ নূতনত্ব বা মৌলিকত্বের আশা করিলে নিরাশ হইতে হয়। তথাপি লেখক শিল্পী; তাহার প্রাণে রস ও চোখে রঙ আছে; সেই স্বকীয়তার ছোঁয়াচ তাহার লেখনীর সৃষ্টিতেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। নাটিকার পরীক্ষা হয় রঙ্গমঞ্চে; ইহাদের সৃষ্টি সার্থক কি অসার্থক বলিতে পারিবেন তাঁহারা—যাঁহারা ইহাদের অভিনয় দেখিয়াছেন। কিন্তু, এই নাটিকা-গুলির প্রাণ আবার ঘটনা ও ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাত নয়—আকুঞ্চন্ নয়। সাধারণ দর্শক ইহাতে কতটা পরিতৃপ্ত হইবেন বলা শক্ত।

এই নাটিকাগুলির রীতি, বাক্-বিন্যাস, ভাববস্তু—সকলের মধ্যেই চাতুর্য্যের ও রমণীয়তার চিহ্ন আছে, রঙীন কল্পনার আভাস আছে। নাটিকাগুলি বেশ 'প্রেটি'। এগুলিকে যে জীবনগতির সহিত নিঃসম্পর্কিত বলিয়া মনে হয় তাহার কারণ কি এই, যে নাটকের এই বিশেষ ধরণটির উপর এক অসহজ ভাবের (artificial) ছাপ থাকিয়া যায় এবং ইহাদের মূলে থাকে শুধু মিষ্টি ভাবের ও মিষ্টি কল্পনার চাতুরী?

ছাপায়, প্রচ্ছদ-পটে, বস্তু ও রীতিতে নাটিকা কয়খানি চিত্তাকর্ষক।

বিবেকানন্দ চরিত—অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ, এম-এ, পি আর এস্, প্রণীত। মূল্য ।/০। পৃঃ ৬৩।

সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে একটি আগুনের আবির্ভাব হইয়াছিল—তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার জ্বলন্ত বাণী, ভাস্বর কর্ম্মজীবন ও জাগ্রত তপস্যা গত যুগের (১৯০৫-'৩০) বাংলাকে প্রদীপ্ত ও মহিমান্বিত করিয়াছে। এই ছোট সুলিখিত বহিখানিতে সেই পবিত্র হোমশিখার একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়; তাই, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিলাম।

জলপথে মুর্শিদাবাদ—লেখক শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়, খড়দহ, ২৪ পরগণা। দাম ৮০।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি যুবক নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন—ইহা তাহারই বিবরণ। ভ্রমণকাহিনী নয়—তাহাদেরই একজনার রোজনামচা; তাই লেখায় আয়াস নাই, আড়ম্বর নাই; উপরন্তু আছে ডায়েরী-লেখকের সহজ ও অকৃত্রিম ধর্ম্মপ্রাণতা। যিনি অল্পকাল পরেই অধ্যাত্ম-প্রেরণায় গৃহত্যাগ করিয়া যান তাঁহার ডায়েরীতে ইহার ছাপ থাকা স্বাভাবিক।

শ্রীগোপাল হালদার

মেয়েদের পাতঞ্জল—ডাক্তার শ্রীচণ্ডীচরণ পাল সঙ্কলিত। জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ১২ নং বৃন্দাবন পালের লেন, কলিকাতা।

পাতঞ্জল যোগদর্শনের মত গম্ভীর বিশ্লেষণাত্মক বইকে "মেয়েদের" কাছে বোধগম্য করার চেষ্টায় সাহস আছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান চেষ্টার মধ্যে লেখকের একটুও সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া গেল না। সূত্রগুলির ব্যাপায় যে-সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এমনই খেলো, এবং অনেক সূত্রের ব্যাখ্যা এমনই অস্পষ্ট, যে মনে হয় ব্যাখ্যাকারের এত চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

মাধবিকা—শ্রীদেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫২ পৃষ্ঠা।

ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ ২৮টি কবিতা আছে। সবগুলিই মামুলি ধরণের কবিতা।

পথের গান—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। প্রাপ্তিস্থান—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহাতে সাতটি কবিতা আছে; সবগুলিই সুখপাঠ্য এবং ভাব ও ভাষা-সমৃদ্ধিতে সুন্দর। কিন্তু স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য, কল্পনা ও কথা ও কাহিনীর সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। মিলের প্রতি লেখকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ কবিতা সুন্দর হইলেও সৌন্দর্য্যহীন হইয়া পড়ে। পিতা ক্ষমতা, চরণে, প্রাণে; স্থলে, জলে, পথে, বীথোতে প্রভৃতি মিল্ নিতান্তই অশোভন। এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও কবিতাগুলি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। লেখকের ক্ষমতার পরিচয় প্রত্যেক কবিতাতেই পাওয়া যায়।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

রজনীগন্ধা—শ্রীমতী ভক্তিসুধা হার প্রণীত। বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় এই গ্রন্থের পরিচায়িকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থকর্ত্রীর কাব্য-সাধনাকে পাঠকচক্ষের নিকটে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। পরিচায়িকায় প্রকাশ, এই মহিলাকবি অল্পবয়স্কা। এই অল্প বয়সে তিনি যে রচনানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কতকগুলি কবিতায় ছন্দ ও মিলের ত্রুটি দেখা যায়, অবশ্য কাব্য-সাধনার প্রথম অবস্থায় এইরূপ ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থকর্ত্রীর তরুণ হস্তের সাধনায় যে রজনীগন্ধা ফুটিয়াছে তাহার মধুর গন্ধ কবিতাপ্রিয় পাঠক মাত্রেরই উপভোগ্য হইবে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মাতৃঋণ

শ্রীসীতা দেবী

৩

শীতকালের ছোট বেলা, দেখিতে দেখিতে গড়াইয়া আসিল। খাইয়া-দাইয়া প্রতাপ নিজের ঘরের কোণটুকু গুছাইয়া লইবার কাজে লাগিয়াছিল। রাজু ঘরটিকে একেবারে "এলেমেলোর মেল৷" করিয়া রাখিয়াছে। পিসিমা এ-সবে হাত দেন না, ছেলে তাহা হইলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠে, "মা, কেন বল ত তুমি আমার জিনিষপত্রে হাত দিতে যাও? কতবার যে বারণ করেছি, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। দরকারী কাগজপত্র কোথায় যে কি ফেলে দাও তার ঠিকানা থাকে না। তারপর আমি হায়রাণ হয়ে মরি। ও-সব আমি গোছাতে পারি ত হবে, নইলে অমনিই থাকবে।

বৌদিদির দেবরের ঘর গুছাইবার কোনোই উৎসাহ নাই, তিনি সেদিক মাড়ানও না। কানুকে ধরিবার জন্য কালেভদ্রে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এ ঘরে পদার্পণ করিতে হয়। প্রতাপের ইচ্ছা করিতে লাগিল, রাজুর টেবিল এবং আল্‌নাটা একটু গুছাইয়া দেয়, এবং কাপড়ের ট্রাঙ্কের উপর রক্ষিত হরেকরকমের দ্রব্যভাণ্ডারটি দূর করিয়া টানিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু রাজু পাছে মনে মনেও বিরক্ত হয়, এই ভয়ে সাহস করিয়া আর কিছু করিল না।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল আর দেরি করা চলে না। প্রথম দিনেই দেরি করিলে তাহার সম্বন্ধে নৃপেন্দ্রবাবুর ধারণা বিশেষ কিছু উচ্চ হইবে না। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিয়া সে প্রস্তুত হইতে লাগিয়া গেল। পরিষ্কার কাপড়চোপড় কিছুই নাই। পরিষ্কার করিয়া লইবারও সময় নেই। কাল যাহা পরিয়া গিয়াছিল, কলিকাতা শহরের ধোঁয়ার কল্যাণে আজ তাহা এক রকম অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ধুতিখানা হাতে করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, উহা পরিবে কি না।

পিসিমার দিবানিদ্রার ধাত ছিল না, এইজন্য বধূর দিনে ঘুমানোর উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। যথানিয়মে সূচ সুতা কাপড়ের পাড় প্রভৃতি লইয়া তিনি কাঁথা শেলাই করিতে বসিয়াছিলেন। প্রতাপ একটু কি ভাবিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, "পিসিমা, তোমার যদি ধোওয়া থান একখানা থাকে ত আমায় দিতে পার? আমার কাপড়টা বড় ময়লা হয়ে গেছে।"

পিসিমা তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তা দিতে পারি, নূতন কাপড় একজোড়া এ বছর পূজোয় ছেলেরা দিলে কি না? তা আমি আর পরছি কৈ? এই দুখানাতেই আমার হয়ে যায়। কোথায় বা আমি যাচ্ছি? দাঁড়া, নিয়ে আসি।"

দোতলার ঘরের পাশে একটি সুড়ঙ্গের মত জায়গা আছে। বাড়িওয়ালা এটি কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত। তবে এখন এটি পিসিমার বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার বাক্স এবং রামায়ণ-খানি থাকে এবং শীতকালে রাত্রে ইহার ভিতর তিনি শয়ন করেন। গ্রীষ্মকালে বারান্দাই তাঁহার আশ্রয় হয়।

কাঁথাখানি সযত্নে নামাইয়া রাখিয়া পিসিমা উঠিয়া গেলেন এবং মিনিট দুইয়ের ভিতরেই একখানা নূতন থানধুতি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কোর এখনও ভাল করিয়া ছাড়ে নাই। ধুতিখানা প্রতাপের হাতে দিয়া বলিলেন, "নে একদিনও পরিনি আমি।"

প্রতাপ বলিল, "আমি ধোপার বাড়ি দিয়ে ভাল ক'রে কাচিয়ে দেব এখন। আজ রাত্রেই খুঁজেপেতে দেখব কোথায় ধোপার আড্ডা আছে।"

পিসিমা বসিয়া আবার শেলাইয়ে মন দিলেন। প্রতাপ কাপড়খানা লইয়া ভিতরে আসিয়া দেখিল, জামাটা ইহার পাশে বড় বেশী ময়লা দেখাইতেছে। কিন্তু উপায় কি? জামা ধার দিতে পারে এমন মানুষ এখন বাড়িতে কেহ

উপস্থিত নাই। ছেঁড়া র‍্যাপারে যথাসাধ্য জামার মলিনতা আবৃত করিয়া প্রতাপ বাহির হইয়া পড়িল।

খুব বেশী দূর নয়। মিনিট দশ বারো হাঁটিয়া যাইতে লাগে। মিহির জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বোধ হয় প্রতাপেরই অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। বলিল, "আসুন আপনি সত্যি আসেন কি না দেখবার জন্যে আমি জানলার কাছে বসে ছিলাম।"

প্রতাপ হাসিয়া বলিল, "সত্যি না আসব কেন?"

কাল যে-ঘরে কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আজ সেই ঘরেই প্রতাপ পড়াইতে বসিল। বাড়িতে ঢুকিতেই সামনে পড়ে দোতলায় যাইবার সিঁড়ি। সিঁড়ির দুই ধার এবং মুখের জায়গাটি 'পাম্' এবং পাতাবাহারের ছোট গাছ দিয়া সাজান। সিঁড়ির দেওয়ালের গায়েও সব বাঁধান বিলাতী ছবি। একধারে এই ঘরখানি আর একধারেও ঠিক এমনই একটি ঘর, তবে তাহার দরজায় মোটা রঙীন কাপড়ের পরদা, কাজেই ভিতরে কি আছে তাহা বোঝা যায় না।

মিহির কি কি পড়ে, কোন্ বিষয়ে তাহার বিদ্যা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা প্রতাপ নানা ভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিল। ছেলেটিকে তাহার ভালই লাগিয়াছিল, সুতরাং এই কাজে যাহাতে সে টিকিয়া যাইতে পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে মনস্থ করিয়াছিল। কাজ না থাকার অসহায়তা যে কি পদার্থ তাহা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল বলিয়া নিজের কোনো দোষে আবার সেই অবস্থায় উপনীত হইতে প্রতাপের ইচ্ছা ছিল না।

ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একখানা বড় সেক্রেটারিয়াট টেবিল, তাহার দুই দিকে দুইখানা চেয়ার। যে দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিতে হয়, সেই দিকের চেয়ারে মিহির বসিয়া, ভিতরের দিকের চেয়ারে প্রতাপ। বাড়ির লোকজন যে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে নামিতেছে, বাহিরে যাইতেছে, ভিতরে ঢুকিতেছে, সবেরই পরিচয় মাঝে মাঝে তাহার কানে আসিতেছিল, অবশ্য চোখে দেখিতেছিল না সে কাহাকেও। পড়ান লইয়াই সে ব্যস্ত ছিল। মিহির সত্যই ইংরেজীতে একটু বেশী কাঁচা, তাড়াতাড়িতে কি উপায়ে এই ত্রুটির সংশোধন হইতে পারে, প্রতাপ তাহাই তাহাকে বিশদ ভাবে বুঝাইতে বসিল।

বাহিরে যেন একটা গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ শোনা গেল। মিহির একবার দরজার দিকে তাকাইল, তাহার পর আবার মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল। কে যেন সেই পরদা ঢাকা ঘরটিতে গিয়া ঢুকিল, তাহার পদশব্দে প্রতাপ ইহা অনুমান করিল। তাহার পর কোথা হইতে মৃদু একটা সুগন্ধ হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য প্রতাপের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। তাহার জীবনের ভিতর সুন্দর কিছুরই স্থান বহু বৎসর ছিল না, সুগন্ধ যে কেমন জিনিষ তাহাও সে ভুলিয়া বসিয়াছিল।

প্রতাপ মিহিরকে বুঝাইতেছিল, "শুধু ক্লাসের বই দুখানা পড়লে ত ইংরিজী শিখতে পারবে না, আরও ঢের বেশী বই পড়া দরকার। নিজের ভাষাটা আমরা এত শীগগির শিখি কেন? সেটা আমরা দিনরাত শুনছি, কাজে অকাজে কতবার যে পড়ছি, তার ঠিকঠিকানা নেই। অবশ্য অত বেশী করে ইংরিজী পড়া বা শোনা আমাদের সম্ভব নয়, তবু খানিকটা না পড়লে শুনলে একটা ভাষা আয়ত্ত করা চলে না।"

মিহির বলিল, "মেমদের স্কুলগুলো বেশ। তারা সারাদিন ইংরিজী পড়ছে, শিখতে কোনোই কষ্ট নেই। যা খুশী বই পড়ে, কেউ বারণও করবে না। আর আমরা যদি একখানা কিছু হাতে করেছি ঈসপস্ ফেবল্‌স্ ছাড়া, অমনি বাবা বল্‌বেন, "যত জ্যাঠামী, এ-সব বই এখন তোমাদের হাতে কেন?" অথচ দিদি ত যা খুশী পড়ছে, সিষ্টাররা কিছু বলেও না, কিছু না।"

বাড়ির লোকের গল্প এবং সমালোচনা যে মাষ্টার-মশায়ের সামনে করিতে নাই, সে জ্ঞান এখনও মিহিরের হয় নাই। প্রতাপ তাহার কথার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিল, "তোমাদের স্কুলে লাইব্রেরী আছে ত?"

মিহির বলিল, "আছে একটা কিন্তু বেশী ভাল বই কিছুই নেই।"

প্রতাপ বলিল, "তোমাদের নিতে দেয় ত বই?

তাহলে আমি বই বেছে দিতে পারি। আমি বেছে দিলে তোমার বাবা আর কিছু বল্‌বেন না। একখানা ক্যাটালগ পেলে হ'ত।"

মিহির বলিল, "তা জোগাড় করে আনা যায়। ভারি ত পাঁচটা আলমারি মাত্র, তার ক্যাটালগ করতে আর কত সময় লাগে? আমাদের অঙ্কের স্যর যিনি, তিনিই ত লাইব্রেরীয়ান, তাঁকে বল্‌ব।"

হঠাৎ টুং টুং করিয়া বাজনা বাজিয়া উঠিল। প্রতাপের মন এবার নিতান্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। কে বাজাইতেছে? মিহিরের দিদি কি? কেমন তিনি? কে জানে? বড়লোকের মেয়ে, মেম ইস্কুলে পড়ে, পিয়ানো বাজায়। এ ধরণের মেয়ের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়, এমন কি চাক্ষুষ পরিচয়ও প্রতাপের ছিল না। গল্পে উপন্যাসে মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের পরিচয় সে পাইয়াছে, হয়ত বা দুই একজনকে পথেঘাটে গাড়ী করিয়া যাইতে দেখিয়াছে। তখনকার দিনে শিক্ষিতা মহিলারাও পারতপক্ষে পথে বাহির হইতেন না। বাঙালীর চোখ ভদ্রঘরের মেয়েকে প্রকাশ্যস্থানে দেখিতে তখনও অভ্যস্ত হয় নাই। ইঁহাদের কথা খুব বেশী ভাবিবারই বা তাহার অবকাশ হইয়াছে কই? দারুণ অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে সে নিজের যৌবনকেও ভুলিয়া গিয়াছিল। কত আশা, কত কল্পনা, এই সময়ে মানুষ মাত্রেরই বুকে বাসা বাঁধিয়া থাকে, কল্পনার রথে চড়িয়া মানসভ্রমণে তাহারা দেশ কাল সকলই অতিক্রম করিয়া যায়, কিন্তু হতভাগ্য প্রতাপ এ সকল হইতেই বঞ্চিত ছিল। দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন ও মাথা গুঁজিবার একটা গর্ত্তের ভাবনায় সে জগতের সকল শোভা, সকল সৌন্দর্য্যের দিকে পিছন ফিরিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমন কি নারীর অস্তিত্ব, যাহা ভোলা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব, তাও তাহার কাছে ছায়ামাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

পিয়ানো বাজিয়া চলিল। ক্রমেই যেন উহা কি এক অপূর্ব্ব মায়ায় প্রতাপের চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল। কি বাজিতেছিল, তাহা সে জানে না, ভাল বাজিতেছিল, কি মন্দ, তাহা বুঝিবার মত শিক্ষাও তাহার ছিল না, কিন্তু কোন এক অদৃশ্য সুরলোকের সন্ধান যেন তাহার উপবাসী হৃদয়ের ভিতর আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। এ কোন্ উর্ব্বশীর নূপুর-নিক্কণ, তাহার দারিদ্র্যের কঠোর ব্রত ভঙ্গ করিতে আসিল? এমন কি মিহিরও তাহার অস্বাভাবিক বিচলিত অবস্থা লক্ষ্য করিল। বালকের মনোবৃত্তি দিয়া সে জিনিষটাকে একভাবে বুঝিয়া বলিল, "এই এক উৎপাত। রোজই প্রায় লেগে থাকবে, খালি বৃহস্পতি আর শনিবার ছাড়া। ঠিক এই সময়টাতেই যেন দিদির পিয়ানো না শিখলে কিছুতেই চল্‌ছিল না।"

প্রতাপ বলিল, "তা এমন কিছু মুস্কিল হবে না, ভাল বাজনাতে কিছু পড়াশোনার ব্যাঘাত হয় না। এই সময়টাতেই তুমি না হয় ট্রানস্‌লেশন ক'রো, আমি দেখে দেব। কথা বলার হাঙ্গামা থাকবে না তা হ'লে।"

মিহির বলিল, "আচ্ছা, তাই করা যাক্। এই বইটার থেকে আমি ট্রান্‌স্‌লেশন্ করি। এইটার থেকেই করব?"

প্রতাপ একটু যেন অন্যমনস্কভাবে বলিল, "আজ তাই কর, কাল আমি আর একখানা বই জোগাড় ক'রে আনব।"

মিহির বই খুলিয়া বসিল। প্রতাপ নিবিষ্টচিত্তে বাজনা শুনিতে লাগিল। তাহার মনের ভিতরটা একেবারে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সে নিজের দারিদ্র্য ভুলিল, দুঃখক্লিষ্ট জীবন ভুলিল, দেশ কাল সবই ভুলিয়া গেল। এই সুস্বরলহরী যেন মায়াবিনীর মত তাহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব কল্পলোকের দ্বারে টানিয়া লইয়া গেল, তাহার মধ্যে প্রতাপ নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলিল। মাঝে মাঝে বাজনা থামিয়া যাইতেছিল, মৃদুকণ্ঠে কে কি সব বলিতেছিল, তাহার একবর্ণও স্পষ্টভাবে প্রতাপের কানে আসিতেছিল না। কখন আবার বাদ্য আরম্ভ হইবে, তাহারই জন্য সে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেছিল।

খানিকপরে মিহির বলিল, "এই দেখুন স্যর, একটা প্যাসেজ হয়ে গেছে।"

প্রতাপ জোর করিয়া মনকে ফিরাইয়া আনিল। খাতা

টানিয়া লইয়া কি কি ভুল হইয়াছে তাহা সংশোধন করিতে এবং ছাত্রকে তাহা বুঝাইয়া দিতে বসিল। কাজ শেষ করিয়া একবার ঘড়ির দিকে তাকাইল। আর বেশী সময় নাই, মিনিট পনেরো আছে। পাশের ঘরে বাদ্য-ধ্বনি থামিয়া গিয়াছে, শিক্ষয়িত্রীরও বিদায় হইয়া যাইবার শব্দ শোনা গেল। কি করিয়া এই সময়টুকু কাটান যায়? আগে চলিয়া যাওয়া ভাল দেখাইবে না। অন্ততঃ প্রথম দিনেই আগেভাগে উঠিয়া চলিয়া গেলে প্রতাপ সম্বন্ধে মিহিরের বাবার ধারণা বিশেষ উচ্চ হইবে না।

অনেক ভাবিয়া সে মিহিরকে গোটাকয়েক শক্ত অঙ্ক কষিতে দিয়া বসিয়া রহিল। এই দিকে মিহিরের খুব উৎসাহ, অঙ্কে সর্ব্বদাই সে ক্লাসে প্রথম থাকে। প্রতাপকে নিজের গুণপনায় মুগ্ধ করিয়া দিবার জন্য সে গভীর মনোযোগ দিয়া অঙ্কগুলি কষিতে লাগিল।

প্রায় সব কয়টাই ঠিক হইল, একটা ছাড়া। সেটা বুঝাইয়া দিতে দিতেই সময় পার হইয়া গেল। প্রতাপ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আজ ত তেমন ভাল করে সব বিষয় পড়ান গেল না, কাল থেকে রীতিমত রুটিন ক'রে পড়ান যাবে। ইংরিজীর জন্যেই একটা ঘণ্টা পুরো দিতে হবে।"

মিহির বলিল, "তা ত হবেই, ঐটেই আমার আসল দরকার। অঙ্কে আমার কোনো "হেল্প" দরকার হবে না। বাকি ঘণ্টাটা অন্য সব সাবজেক্ট পড়লেই হবে।"

প্রতাপ বাহির হইয়া পড়িল। এখনও যেন তাহার মস্তিষ্ক ঠিক প্রকৃতিস্থ হয় নাই, তাহার ভিতর সুরের ঢেউ খেলিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু রাস্তায় নামিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিতেই সে যেন আবার আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিল। নিজের কাণ্ডে নিজেরই তাহার হাসি পাইতে লাগিল। কি ব্যাপার, না, পাশের ঘরে বসিয়া কে একজন পিয়ানো বাজাইতেছিল। সে তরুণী না বৃদ্ধা, সুন্দরী কি কুৎসিত, প্রতাপ কিছুই জানে না, অথচ এমন করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িল কেন? আজীবন বঞ্চিত বলিয়াই কি সৌন্দর্য্যের যে-কোনো রূপ তাহাকে এমন করিয়া মুগ্ধ করে? তাহা হইলে ত বিপদ। অশরীরী বাদ্য শুনিয়াই তাহার যে-অবস্থা হইয়াছিল, মূর্ত্তিমতী সঙ্গীত-রূপিনী কাহাকেও যদি কোনোদিন চোখে দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলে প্রতাপ হয়ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াই যাইবে। ঐ বাড়িতে যখন নিত্য তাহাকে যাইতেই হইবে, তখন সে-রকম ঘটনা ঘটা বিচিত্র কিছু নয়।

বাড়ি আসিয়া দেখিল, গজু রাজুও আসিয়া পৌছিয়াছে এবং তাহাদের চা জলখাবার জোগাইতে পিসিমা, বৌদিদি সকালেরই মত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের দলে জুটিয়া প্রতাপও তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া খাইতে বসিয়া গেল। বিকালে চা জলখাবার দূরে থাক, রাত্রে ভাত খাওয়ার পাটও বহু দিন অর্থাভাবে তাহার চুকিয়া গিয়াছিল। সবই যেন তাহার অতি নূতন, অতি আনন্দময় লাগিতে লাগিল। নিজের অবস্থা দেখিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইতে লাগিল। এত খুশী হইবার কি ঘটিয়াছে? চাকরি পাওয়া এবং খাইতে পাওয়া দুইটাই সুখের বিষয় বটে, তবে ও দুটার সঙ্গেই তাহার পূর্ব্বের পরিচয় আছে। শুধু এই কারণেই কি তাহার সবই এত ভাল লাগিতেছে? নারীর সেবাযত্ন হইতে সে বহু দিন বঞ্চিত, একটুখানি স্নেহের স্পর্শ তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে বটে, কিন্তু এতখানিই কি? আর এ-ও ত তাহার উঞ্ছবৃত্তি করিয়া নেওয়া? পিসিমা নিজের পুত্রের জন্য করিতেছেন, বৌদি করিতেছেন স্বামীর জন্য, সে নিতান্ত দলে জুটিয়া তাহাতে ভাগ বসাইতেছে বই ত নয়? তবু কারণটা খুঁজিয়া পা'ক বা নাই পা'ক মনের প্রসন্নতাটা তাহার থাকিয়াই গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ইহারই ভিতর ঘনাইয়া আসিয়াছিল। গজু নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল, রাজু বলিল, "আমাদের পাড়ায় একটা গানের ক্লাব আছে, অবশ্য শুধু গানই যে সেখানে হয় তা নয়, তাসটাসও চলে। যাবে না কি?"

প্রতাপ একটু ভাবিয়া বলিল, "থাক, ও সব করবার আমার সুযোগ এখন কিছু দিন হবে না। আমি একটু ঘুরে পাড়াটা দেখে আসি। একটা ধোপা কাছাকাছি কোথাও আছে বল্‌তে পার?"

রাজু বলিল, "ধোপার আবার অভাব কি? এই পিছনের গলিটা ঘুরে যাও, একেবারে ধোপার 'কলনি'-তে

হাজির হবে। মাঝে মাঝে সেখান থেকে যা সঙ্গীতের ধারা ভেসে আসে, তা আমাদের ক্লাবকে হার মানিয়ে দেয়।"

রাজু বাহির হইয়া গেল। প্রতাপ পিসিমার দেওয়া ধুতিখানি ছাড়িয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিল, এখনও কয়েক দিন ইহারই সাহায্যে কাজ চালাইতে হইবে। তাহার ধুতি ছখানিতে ঠেকিয়াছিল, একখানি সে পরিয়া চলিল, আর একখানা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবী কাগজে জড়াইয়া লইয়া চলিল, ধোপার বাড়ি দিয়া কাচাইয়া লইতে হইবে। এখনও নূতন কাপড়জামা করাইবার মত অবস্থা হইতে দেরি আছে।

ক্ষুদ্র উঠানের এককোণে তুলসীতলা, বৌদিদি সেখানে একটি প্রদীপ রাখিয়া, লালপেড়ে শাড়ীর আঁচলখানি গলায় জড়াইয়া প্রণাম করিতেছেন, শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি একবার সান্ধ্য আকাশকে মুখরিত করিয়া মিলাইয়া গেল। প্রতাপ চলিয়া যাইতে পারিল না, মিনিট ছুই দাঁড়াইয়া এই দৃশ্যটি ভাল করিয়া উপভোগ করিয়া গেল। বাঙালী ঘরে এই সামান্য চিত্রটুকু তাহার উপবাসী হৃদয়ে যেন স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ধরা দিল।

ফিরিয়া আসিতে রাত হইয়া গেল। একটু ভয়ে ভয়েই সে ফিরিতেছিল, হয়ত পিসিমা বা বৌদিদি বিরক্তভাবে তাহার অপেক্ষা করিতেছেন, দাদাদের হয়ত খাওয়া হইয়া গিয়াছে। মনটা অনেকদিন পরে একটু ভাল ছিল, তাই ঘুরিতে ঘুরিতে সে দেরি করিয়া ফেলিয়াছিল।

আসিয়া দেখিল, রাজু তখনও আসে নাই। বৌদিদির রান্না সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, তিনি কানুকে আসন পাতিয়া খাইতে বসাইতেছেন।

পিসিমা প্রতাপকে দেখিয়া বলিলেন, "তোর যদি সকাল সকাল খাওয়া অভ্যেস থাকে ত বসে যা কানুর সঙ্গে। ওদের এখনও দেরি আছে। রেজো যে কি নিয়মই করেছে, সাড়ে ন'টার আগে কখনও বাড়ি ফেরে না, ততক্ষণ তার জন্যে হাঁড়ি আগলে বসে থাক।"

প্রতাপের হাসি পাইল। সকাল সকাল খাওয়ারই অভ্যাস তার বটে! একেবারে সকাল সাড়ে ন'টায়। মুখে বলিল, "আমার কোনই তাড়া নেই। মেজদা, সেজদার সঙ্গে খাব এখন।"

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল বিছানাটিশুদ্ধ পাতা, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে তাহার উপর বসিয়া পড়িল। মানুষের সুখ কত অল্পেই, অথচ তাহা হইতেও কত হতভাগ্য বঞ্চিত।

৪

পরদিন হইতে প্রতাপের কাজ পুরাদস্তুর আরম্ভ হইল। সকালে প্রুফ দেখা, দশটা হইতে সাড়ে তিনটা স্কুলে পড়ানো, স্কুল হইতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া মিহিরকে পড়াইতে বসা। একেবারে সন্ধ্যা হইয়া যাইবার আগে তাহার আর নিঃশ্বাস ফেলিবারও সময় হইল না। তবু তাহার মন ভালই রহিল। খাটিতে তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু খাটুনিটা ব্যর্থ হইতেছে এই ধারণাটাই মানুষকে বড় মুষড়াইয়া ফেলে। সংগ্রাম করিতেই অধিকাংশ মানুষের জন্ম, আরামে বসিয়া থাকার ভাগ্য লইয়া কম মানুষই আসে, সুতরাং পরিশ্রমে কাতর হইলে চলিবে কেন? মাসের শেষে গ্রামে যে কয়েকটি টাকা পাঠাইতে পারিবে, মায়ের শীর্ণ মুখে একটুখানি যে নিশ্চিন্ততার হাসি ফুটিয়া উঠিবে, ইহা মনে করিয়াই তাহার সমস্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি যেন অর্দ্ধেক হইয়া গেল।

সেদিন ছিল শনিবার। সুতরাং মিহিরের পড়ানো নির্ব্বিঘ্নেই সমাপ্ত হইল। কোন নৃত্যপরা অপ্সরার নূপুরধ্বনি আজ প্রতাপের ধ্যানভঙ্গ করিল না। কিন্তু ইহাতে সে সুখী হইল বলিলে হয়ত ঠিক কথা বলা হয় না। মিহিরকে পড়াইয়া সে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন তাহার আর যেন হাঁটিবার ক্ষমতা ছিল না। জলখাবার খাইয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া একটা মাদুর টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। রাজু নিয়মমত ক্লাবে চলিয়া গেল এবং গজু ঘরে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। পিসিমা এ-বেলার রান্নার ব্যাপারে বড় একটা যোগ দেন না, তবে তরকারি কোটা, চাল ডাল বার করা, কানুকে আগলান প্রভৃতি করেন বটে, তাহাতেই তাঁর সন্ধ্যা কাটিয়া যায়।

শুইয়া পড়িয়া একথা সে-কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রতাপের একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল, এমন সময়

কানের কাছে কানুর শানাইয়ের মত গলার স্বর শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। কানু তাহার দিকে একখানা পোষ্ট-কার্ড অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "এই দেখ তোমার চিঠি এসেছে।"

প্রতাপ পোষ্টকার্ডখানা লইয়া দেখিল বাড়িরই চিঠি, মেস হইতে কেহ রিডাইরেক্ট করিয়া দিয়াছে। দাদা লিখিয়াছেন বাড়িতে তাঁহাদের অবর্ণনীয় দুর্গতি হইতেছে, ধার করিয়া, ভিক্ষা করিয়া একবেলা খাওয়াও আর জোটে না। প্রতাপ যদি অবিলম্বে কিছু পাঠাইতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের অনাহারে মৃত্যু ভিন্ন আর কোনো গতি থাকিবে না। বহুচেষ্টা করিয়াও সে কাজ কিছু জোটাইতে পারে নাই। মা এবং বোন দুটির পরিধেয় বস্ত্র শত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা লজ্জায় কাহারও সামনে বাহির হইতে পারেন না।

প্রতাপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। হায় রে সুখ, হায় নিশ্চিন্ততা! এ সব কি জগতে সত্যই কোথাও আছে? দরিদ্রের জন্য অন্ততঃ নাই। মাহিনার টাকা পাইতে এখনও একমাস দেরি, ততদিন কি করিয়া চলিবে? স্কুলে বা নৃপেন্দ্রবাবুর কাছে একদিন মাত্র কাজ করিয়া আগাম টাকা কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। চাহিবেই বা সে কোন্ মুখে? চাহিতে গেলে টাকা পাওয়ার পরিবর্ত্তে চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তাহার এমন কিছুই নাই, যাহা বিক্রয় করা বা বন্ধক দেওয়া চলিতে পারে। দেশেও সেই অবস্থা। কুঁড়ে ঘরটুকু নষ্ট করা চলে না তাহা হইলে সকলকে পথে বসিয়া থাকিতে হইবে, বরং না খাইয়া নিজের ঘরের ভিতর মরিয়া থাকে, সে-ও ভাল।

ধারই বা সে চাহিবে কার কাছে? কলিকাতায় তাহাকে কে চেনে, কে বিশ্বাস করিয়া টাকা ধার দিবে? মেসের লোকের কাছে এখনও তাহার ধারই বাকি, সে দিকে ত তাকানই যায় না। তাহার পরিচিত যাহারা আছে, তাহাদের কেহ প্রতাপকে খাতির করিয়া আট আনা পয়সাও দিবে না।

পিসিমার কাছে চাহিবে কি? তিনিই বা কি ভাবিবেন। তবু হাতে থাকিলে দিতে পারেন, কারণ দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। চিঠিখানা দেখাইলে তিনি অবিশ্বাস হয়ত করিবেন না। ছেলেরা শুনিলে বিরক্ত হইবে, কিন্তু উপায় নাই। জগতে নিজে না খাইয়া, না পরিয়া অসহ্য দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও প্রতাপ যদি নিজের মাথাটা খাড়া রাখিয়া চলিবার সুবিধাটুকু পাইত তাহাই সে যথেষ্ট মনে করিত। কিন্তু ইহাও তাহার অদৃষ্টে নাই। নিজের জন্য নয় পরিবারের জন্য, যাঁহার কোলে সে জন্মলাভ করিয়াছিল, বুকের রক্ত দিয়া যিনি তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, সে মায়ের জন্য ভাইবোনেরা যাহারা তাহার শিশুজীবনের অবলম্বন ছিল তাহাদের জন্য তাহাকে পরের নিকট অবনত হইতে হইবে। মানুষ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেক জিনিষ বিনা অধিকারে উপভোগ করে, তেমনি বিনাদোষে বহু দুঃখ অপমানও সহ্য করে। ইহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের স্থান্ নাই। মানুষ হইয়া জন্মানোরই ইহা ফল।

কানুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর ঠাকু'মা কোথায় রে?" কানু বলিল, "ঠাক্‌মা ত কাল পিটে করবে বলে ডাল ভিজচ্ছে, আর নারকোল কুরে রাখছে। কাল পিটেপার্ব্বণ জান না বুঝি? কাল খুব কষে পিঠে খেতে হয়।"

পালপার্ব্বন কখন যে কোন্‌টা তাহা প্রতাপ বহুকাল ভুলিয়া গিয়াছিল। কানুর কথায় মনে পড়িল, কাল সত্যই পৌষ-সংক্রান্তি বটে। বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। তখনও সংসারে দারিদ্র্য ছিল বটে, কিন্তু তাহা এখনকার মত সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে নাই। উঁচুদরের পিঠে না হোক, মা কলাইয়ের ডাল বাটিয়া তাহার দ্বারা যে সরুচাকলি পিঠা করিতেন তাহা নতুন খেজুর গুড় দিয়া খাইয়া প্রতাপরা সকলে যে পরিমাণ আনন্দিত হইত, দেবলোকে অমৃত পান করিয়াও ততখানি আনন্দের সৃষ্টি হইত কি না সন্দেহ। আর কাল তাহার ভাইবোনদের পেটে একমুঠা ভাতও পড়িবে না, পিঠা খাইয়া আনন্দ করা ত দূরে থাক। না, নিজের মানঅপমানের কথা আর মনের ত্রিসীমানায়ও আসিতে দিবার অধিকার প্রতাপের নাই।

ধীরে ধীরে উঠিয়া সে পিসিমার সন্ধানে চলিল। বেশীদূর তাহাকে যাইতে হইল না। পিসিমা রান্নাঘরের কাজ সারিয়া হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে করিয়া উপরেই

উঠিয়া আসিতেছিলেন। প্রতাপ বলিল, "পিসিমা একটু এ ঘরে আসবে, তোমার সঙ্গে কথা আছে একটা।"

পিসিমা বলিলেন, "আস্‌ছি বাছা, এই-সব গুছিয়ে আস্‌তে আস্‌তে দেরি হয়ে গেল। কাল খানকয়েক পিটে করতে হবে ত। যতদিন আমি বুড়ী বেঁচে আছি ততদিনই এ সব পালপার্ব্বণ, তারপর কে-ই বা এ-সব করছে? সর্ব মেমসাহেব হয়ে উঠেছে। এখন কথায় কথায় কেক্ কিনে খেতে চায়।"

পিসিমা আলোটা নিজের সুড়ঙ্গের মুখে রাখিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, "কি বলছিলি?"

প্রতাপ কি করিয়া কথা আরম্ভ করিবে বুঝিতে না পারিয়া পোষ্টকার্ডখানা তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "এইটে পড়ে দেখ পিসিমা, কি বিপদেই যে আমি পড়েছি।"

পিসিমা আলোর সামনে উবু হইয়া বসিয়া চিঠিখানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, তাহার পর বলিলেন, "সন্ধ্যের পর ভাল চোখে দেখি না বাছা, তা পড়ব কি? তুই-ই পড়ে শোনা? কে চিঠি দিয়েছে? তোর মা?"

প্রতাপ বলিল, "না দাদা।" পিসিমা যখন পড়িতে পারিবেনই না, তখন সে-ই পোষ্টকার্ডখানা ফিরাইয়া লইয়া পড়িয়া গেল। কথাগুলা যেন তাহার গলায় আটুকাইয়া যাইতেছিল, তবু জোর করিয়া পড়িল। পড়া শেষ হইলে পিসিমা বলিলেন, "আহা বড় মন্দ অদেষ্ট বৌয়ের, কোন-দিন ছেলেপিলে নিয়ে একটু সুখের মুখ দেখলে না। তবু হরিদাদা বেঁচে থাকলে, একরকম হত। তা তোর কাছে কিছু থাকে ত পাঠিয়ে দে।"

প্রতাপ বলিল, "আমার কাছে ত একটা আধলা পয়সাও নেই পিসিমা। আমি ত ভেবে পাচ্ছি না কি করব। অথচ কালই কিছু পাঠাতে না পারলে ওরা সব না খেয়েই মরবে।"

পিসিমা বুঝিলেন, প্রতাপ তাঁহারই কাছে সাহায্য চায়। বলিলেন, "আমার হাতে কি আর কিছু থাকে বাছা? সংসারের খরচপত্তরের টাকা ছেলেরা হাতে দেয় বটে, কিন্তু তার থেকে কি একটা টাকাও নিজে খরচ করতে পারি? মাসের শেষে বাবুদের হিসেব দেওয়ার ঘটা যদি দেখ। একবার ওই যে আমাদের বিন্দাবন, এই ত ঐ গলির মোড়েই থাকে, তাকে, নেহাৎ হাত-পা ধরাধরি করলে বলে, আটটাকা ধার দিয়েছিলাম। তা হতভাগা শোধও করল না কিছু না, সে ত এই এক বছর হতে চল্‌ল। তার জন্যে ছেলেদের কাছে আজও কথা শুন্‌ছি বাছা।"

প্রতাপ শুষ্কমুখে বলিল, "তাহ'লে কি করব পিসিমা? আমি ত উপায় কিছু দেখ্‌ছি না।"

পিসিমা বলিলেন "তুই চিনিস্ ত বিন্দাবনকে? তোদেরই গাঁয়ের ত? দেখ্ না তার কাছে টাকা কটা চেয়ে একবার। এখন দিলেও দিতে পারে, তার ছেলে কাজ করছে শুন্‌ছি। ছেলেদের ত বলবার জো নেই, তেড়ে খেতে আসে, বলে, 'আমরা কি কাবুলিওয়ালা যে তোমার একটাকা, দেড় টাকার তাগিদ্ দিয়ে বেড়াব?'

প্রতাপ একটু ভাবিয়া বলিল, "তাই যাই না হয়, আর কি করব? একখানা চিঠি লিখে দাও তাহলে।"

পিসিমা কাগজকলম সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। প্রতাপ যদি টাকা কয়টা উদ্ধার করিয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ভালই হয়। প্রতাপ নিশ্চয়ই টাকা শোধ না করিয়া ফেলিয়া রাখিবে না। ঘরেই যখন থাকিবে, তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরেই তাহাকে টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং ল্যাম্পের আলোতে চোখে দড়িবাঁধা চশমাজোড়া লাগাইয়া, অনেক কষ্টে তিনি চার-পাঁচ লাইন লিখিয়া নাম দস্তখৎ করিয়া প্রতাপের হাতে দিয়া দিলেন।

প্রতাপ জামাটা গায়ে দিয়া আবার বাহির হইয়া চলিল। বৃন্দাবনের বাড়ি কোথায় তাহা সে ঠিক জানে না, জিজ্ঞাসা করিয়া বাহির করিতে হইবে। সে-ও প্রতাপের গ্রামেরই এক হতভাগ্য জীব, তবে প্রতাপের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাহারও গ্রামের খরচ শহরের খরচ দুই-ই চালাইতে হয়, তাহার কাছে টাকা আদায়ের সম্ভাবনা খুবই কম। তবে সে এবং তাহার বড় ছেলে দুই জনে উপার্জ্জন করে, এইটুকুই যা ভরসার কথা।

পিসিমা বলিয়া দিয়াছিলেন, গলির মোড়ে বাড়ি। মোড়ের বাড়িটার সামনে দাঁড়াইয়া প্রতাপের মনে হইল না যে, এখানে বৃন্দাবনের মত গরীব কেহ বাস করে। বেশ

বড় দোতলা বাড়ি, বাহিরের রোয়াকে সার্জ্জের স্যুট পরা বছর দুই তিনের একটি ছেলে খেলা করিতেছে, একটা ছোক্‌রা চাকর বসিয়া তাহাকে আগলাইতেছে। তবু প্রতাপ নিশ্চিত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "বৃন্দাবনবাবু এই বাড়িতে থাকেন ?"

চাকরটা বলিল, "বিন্দেবন ? এ বাড়িতে না। ঐ কোণের বাড়ি।"

সে যে বাড়িটা দেখাইল, তাহা একতলা এবং জীর্ণ। পিসিমা কেন যে মোড়ের বাড়ি বলিয়াছিলেন, তাহা প্রতাপ ভাবিয়া পাইল না, বাড়িটা মোড় হইতে চার পাঁচখানা বাড়ি দূরে। যাহা হউক বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দরজায় ঠক ঠক করিয়া শব্দ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রথমবারে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, যদিও দরজার ও-পারে পদশব্দ দুই তিনবার প্রতাপ শুনিতে পাইল। আর একবার দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "বাড়িতে কে আছেন ?"

এই বার দরজাটা হড়াং করিয়া খুলিয়া গেল। বছর চারের একটা ছেলে দোনাই মুড়ি দিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "বাবা ত বাড়ি নেই।"

তাহার বাবা যে কে প্রতাপ ঠিক বুঝিল না। এ কি বৃন্দাবনের ছেলে, না নাতি ? বলিল, "আমি বৃন্দাবন-বাবর কাছে এসেছি।"

এমন সময় একজন যুবক কাশিতে কাশিতে ছেলেটার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা নেই বাড়ি, কি দরকার আপনার ?"

প্রতাপ গভীর ম্লান আলোতে ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিল, এই ত নিবারণ, বৃন্দাবনের বড়ছেলে। সে বয়সে প্রতাপের চেয়ে বছর দুইয়ের ছোট হইবে, কিন্তু এমন চেহারা হইয়াছে যেন চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়। দুনিয়াটা অবিবাংশ লোকের পক্ষেই অতি সুখের স্থান। কেন জানি না তাহার বাল্যকালে পড়া দু-লাইন একটা কবিতা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল,

এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান,
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান।

লেখক নিশ্চয়ই এটা তামাসা করিয়া লেখেন নাই, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের কাছেই ইহা এখন নিষ্ঠুর পরিহাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহা হউক, এখন তত্ত্বালোচনার সময় নয়। প্রতাপ বলিল, "কি হে নিবারণ, আমায় চিনতে পারছ না নাকি ? অনেক দিন দেখা হয়নি অবশ্য।"

নিবারণ সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রতাপকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, "প্রতাপদা না কি ? হ্যাঁ, দেখা-সাক্ষাৎ আর আজকাল কোথায় হয় ? নামেই একদেশে আছি। তা ভিতরে এস, বাবা এই ক'মিনিট আগে বেরিয়ে গেলেন।"

প্রতাপ ভিতরে ঢুকিল। নিবারণ দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "চোর-ছ্যাঁচড়ের উৎপাত বড্ড এ পাড়াটায়, এই পরশুই একটা চুমকি ঘটী চুরি হয়ে গেল।"

সামনে যে ঘরখানিতে প্রতাপ ঢুকিল, তাহা বসিবার ঘর নয়, শয়নকক্ষই, কোণে একটা তক্তপোষের উপর দুটি শিশু ঘুমাইতেছে। তাহারই একপাশে প্রতাপকে বসিতে দিয়া, নিবারণ জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর এদিকে কি মনে করে, এতকাল পরে ?"

প্রতাপের আর ভদ্রতা করিবার ইচ্ছা হইল না। আসিয়াছে যে কাজে, তাহাই বলা ভাল। পিসিমার চিঠিখানা বাহির করিয়া বলিল, "এই চিঠিটা তোমার বাবার কাছে নিয়ে এসেছি।"

নিবারণ চিঠিখানা পড়িয়া পড়িল। বিরক্তিতে তাহার মুখটা কালো হইয়া উঠিল। বলিল, বাবার উৎপাতে এবার আমায় আলাদা বাসা করতে হবে। ধার যে ক'রে আসেন, তা শোধ করবেন কোন চুলোর থেকে ? আমি যেন সকল দিকে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।"

প্রতাপ মিনিট দুই অপেক্ষা করিয়া বলিল, "পিসিমাকে কি বল্‌ব তাহ'লে ?"

নিবারণ তিক্তকণ্ঠে বলিল, "বল্‌বে আর কি ? পাওনা টাকা কেউ কখনও ছাড়ে ? যাদের কাছে আমরা পাই, তারা কস্মিনকালে দেবার নামও করে না, আর যারা পাবে তারা কোনোদিনও ভোলে না। ব'সো, দেখি কি করতে পারি," বলিয়া সে উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে কাবুলিওয়ালার মত টাকা আদায় করিতে আসিয়া প্রতাপের সমস্ত মনটা যেন ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কি উপায়? মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়াও যদি সে মা, ভাইবোনের মুখে অন্ন দিতে পারে, তাহা হইলেই নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মানিবে।

খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া নিবারণ বলিল, "এই চারটে টাকা আজ নিয়ে যাও, এর বেশী আর এখন হবে না। বাকিটা যখন পারি দেব।"

প্রতাপ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা আসি তবে, কিছু মনে ক'রো না।" হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া দুই মিনিটেই সে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল।

পিসিমা তখন বারান্দায় বসিয়া কানুকে শীত-বসন্তের উপাখ্যান শোনাইতেছিলেন। গল্পটা তাঁহার চেয়ে কানুরই জানা ছিল ভাল, সে প্রতি লাইনেই ঠাকুরমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেছিল। কোথায় কোন্ ছড়া, কোথায় কোন্ গান, ঠাকুরমার তাহা অত শত ঠিক নাই, কিন্তু কানু এ বিষয়ে একেবারে নির্ভুল। তবু গল্পটা ঠাকুরমার মুখে শোনা চাই, না হইলে তাহার রস সম্পূর্ণ উপভোগ করা যায় না। প্রতাপকে দেখিয়াই পিসিমা গল্প থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, দিলে কিছু?"

প্রতাপ টাকা চারিটা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "বাকিটা পরে দেবে বল্‌লে।" বৃন্দাবনের ছেলে নিবারণ দিলে, তার বাবা বাড়ি ছিল না।"

পিসিমা টাকা কয়টা আবার প্রতাপের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "রাখ এই কটাই। আর দু চার টাকা কোথা থেকে জোগাড় ক'রে পরশু পাঠিয়ে দিস্। কাল রোববার, কাল ত আর মণিঅর্ডার হবে না?"

প্রতাপ টাকা কটা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিল। আর কাহার কাছে কি পাইবে? শেষে চারটাকাই কি পাঠাইবে? পাঁচটাও নয়? আবার কোথাও বাহির হইবে কি? যে প্রেসের সে প্রুফ দেখার কাজ করে, সেখানে একবার যাইতে পারে। তাহারা কখনও আগাম টাকা দেয় নাই, এবার যদি দেয়। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে অনেক রাত হইয়া যাইবে। বউদিদি হয়ত মনে মনে বিরক্ত হইবেন। এখন খাইয়া গেলে হয়।

পিসিমাকে বলিল, "পিসিমা, রান্না হয়েছে কি? আমি এক জায়গায় যাব, ফিরতে অনেক রাত হবে। তাই ভাবছি একেবারে খেয়ে গেলেই হত।"

পিসিমা বলিলেন, "তা খেয়েই যা না। নীচে চল দেখি, তোর বৌদির কাছে, ওখানেই এক কোণে জায়গা ক'রে দেবে এখন।

প্রতাপ নামিয়া গেল। বৌদিদি বলিলেন, 'এ ধোঁয়ার রাজ্যে কি মনে করে ঠাকুরপো?"

প্রতাপ নিজের আবেদন জানাইল। বৌদিদি একখানা পিঁড়ি পাতিতে পাতিতে বলিলেন "তা ব'সো, যা হয়েছে ডালভাত খেয়ে যাও।"

প্রতাপ তাড়াতাড়ি করিয়া খাইয়া উঠিয়া পড়িল। গায়ে র‍্যাপারটা ভাল করিয়া জড়াইয়া যথাসম্ভব দ্রুতবেগে হাঁটিয়া চলিল। গাড়ী চড়িবার পয়সা নাই, আর হাঁটিয়া গেলে শীতটাও তত বেশী বোধ হয় না।

প্রায় এক ক্রোশ পথ তাহাকে হাঁটিয়া পার হইতে হইল। কিন্তু গিয়া শুনিল প্রেসের ম্যানেজার বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাড়ি কি একটা কাজ আছে। প্রতাপ দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এতটা হাঁটিয়া শুধু হাতেই কি ফিরিয়া যাইবে?

কম্পোজিটার রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "খুব কি দরকার ছিল বাবু?"

প্রতাপ শুষ্কমুখে বলিল, "বড় বেশী দরকার, নইলে এত রাত্রে তাঁকে বিরক্ত করতে আসব কেন? কাল সকালে কি তিনি আসবেন?"

রঘুনাথ বলিল, "বলা যায় না বাবু, বোনের বিয়ে, না কি বল্‌ছিলেন, তা আজ কি কাল জানি না। তাঁকে কিছু বল্‌বার আছে?"

প্রতাপ একটু থামিয়া বলিল, "না, কি আর বল্‌বে? সে আবার রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ি পৌঁছিল যখন, তখন সমস্ত পাড়া ঘুমে নিঝুম। অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া রাজুকে দিয়া দরজা খুলাইতে হইল। সে একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, "এত দেরি যে?"

প্রতাপ বিষণ্ণভাবে বলিল, "টাকার চেষ্টায় ঘুরছিলাম।"



পরিচয়

প্রথম যখন রামানন্দবাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের করলেন তার কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো ছবিতে অলঙ্কৃত রচনায় বিচিত্র এমন দামী জিনিষ যে বাংলাদেশে চল্‌তে পারে তা বিশ্বাস হয়নি। তা ছাড়া এর আগে বাংলা সাময়িক পত্রে সময়রক্ষা ক'রে চলবার বাঁধাবাঁধি ছিল না। সেকালে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ যেমন অপরাহ্ণে বা সায়াহ্নে যাত্রা সুরু করতে লজ্জিত হত না মাসিক পত্র তেমনি ললাটে মলাটে বৈশাখ মাসের তিলক কেটে অগ্রহায়ণ মাসে যখন অসঙ্কোচে আসবে নামত সহিষ্ণু পাঠকের কাছে কোনো কৈফিয়তের দরকার হত না। পাঠকদের ক্ষমাগুণের পরে নির্ভর ক'রে এমনতর আটপৌরে ঢিলেমি করবার সুযোগ প্রবাসী সম্পাদক স্বীকার করেন নি—নিজের মানরক্ষার খাতিরেই সময়রক্ষার স্খলন হতে দিলেন না। তিনি প্রমাণ করলেন বাংলা সাময়িক পত্রে এই প্রচুর ভোজ এবং নূতন ভদ্র চাল অচল হবে না। বস্তুত পাঠকদের এমন সম্মান জন্মে গেল যে আয়োজনে কম পড়লে বা আচরণে শৈথিল্য ঘটলে আর নিজগুণে তারা ত্রুটি মার্জ্জনা করবে না সে এতে সন্দেহ রইল না।

তার পর থেকে চলল এই ছাঁদেই মাসিক পত্রের অনুকরণ নূতনত্বের চেষ্টা কেবল পরিমাণবাহুল্যের দিকে যন্ত্রা রাদ্বির ঘোড়দৌড়। আরো ছবি আরো গল্প আরো হাজার রকমের ইত্যাদি।

প্রবাসী জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজনসিদ্ধি করেছে। জনসাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না নানা দিক থেকে মৃদু আঘাতে জাগিয়ে রাখে। এদিকে দেশে লেখক বেশি নেই এবং অধিকাংশ পাঠক গভীর বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করতে নারাজ। উদ্বোধনের চেয়ে উত্তেজনা তারা স্বভাবত বেশি পছন্দ করে। তাই সাহিত্যের মাসিক মজলিশে মদ যদি বা নাও থাকে অন্তত কড়া চুরুটের প্রচুর আমদানী চাই সাহিত্যিক তাসপাশার চেয়ে ভারী রকমের আয়োজনে বৈঠকের রসভঙ্গ হয়।

সাধারণের সঙ্গে যদি কারবার ক'রতে হয় তবে সাধারণের দাবি অজস্র পরিমাণেই মেটানো চাই। নইলে কাজ চলেই না। তাই লোক চিত্ত রঞ্জনের ব্যবস্থা জগৎ জুড়েই হাল্‌কা হ'য়ে গেছে। যারা সেই হাল্‌কা দরের মন ভোলানো মাল যথেষ্ট পরিমাণে ও নিঃসঙ্কোচে জোগাতে পারে তাদের সঙ্গেই আর সকলের প্রতিযোগিতা। হাড়ি চড়া চাই যে। এ ব্যবসায়ে যারা আছে তাদের মনে উচ্চ সঙ্কল্প থাকলেও নিজের অজ্ঞাতসারে আদর্শ নীচু হ'য়ে আসে। সাধারণের মনজোগাবার আয়োজন চারিদিকে যতই বিস্তারিত হয় ততই অলস মনের সৌখীন ফরমাস বেড়ে ওঠে। বিপদ এই, তাদেরই বাহবার বাজারদর বেশি। উপযুক্ত লেখকের সংখ্যা কম অথচ লেখার পরিমাণ সীমা মানতে চায় না। অর্থাৎ ভোজে রবাহূত অতিথিসমাগমে পাত পাড়া বেড়েই চলেছে, অথচ দইয়ের হাঁড়ি সে অনুপাতে টানলে বাড়ে না তাতে জলের উপর নির্ভর ক'রতেই হয় আর সে-জলও সকল সময়ে বিশুদ্ধ হতে পারে না। যদি একজন থিয়েটারওয়ালা লোভ দেখায় যে, দু'টাকার টিকিটে রাত একটা পর্য্যন্ত অভিনয়ের পালা চালাবে তাহলে তার চেয়েও দুঃসাহসিক রাত্রি দুটোর কমে বাতি নেবাবে না। তবুও সময় বাড়ালে ভোগ্য বস্তুটাকে ফিকে না করা অসম্ভব অথচ তাতে নেশার কমতি হলে মঞ্জুর হবে না। এর ফল হয় এই যে মিতাচারী যে মানুষ রাত এগারোটা পর্য্যন্ত ভালো জিনিষের রস ভোগ ক'রে ভালোমানুষের মতো বাড়ি ফিরতে চায় তার আর উপায় নেই। এমন কি ক্রমে তারও অভ্যাস মাটি হওয়ার আশঙ্কা জাগে।

আমার মতে সাহিত্যেই কি ব্যবহার সামগ্রীতেই কি অধিকাংশের সম্বলের দিকে তাকিয়ে এ কথা বলতেই হবে যে সস্তা সামগ্রীর প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে আছে। তাই বলে আদর্শের দাবি পরিমাণের মাপে যার বিচার করা চলে না। যদি স্তূপে স্তূপে চাপা প'ড়তে থাকে তাহলে তা'র চেয়ে লোকসান আর কিছুই হতে পারে না।

আদর্শ রক্ষা ক'রতে গেলে প্রধানত দরকার সাধনা না হ'লে চলে না। তাড়াতাড়ির আসরে দাঁড়িয়ে সাধনা অসম্ভব। সেই সাধনাপন্থী সাহিত্যের জন্য সময়ও চাই বড়ো ক্ষেত্রও চাই উদার। এ-জায়গায় ভিড় জমাবার আশা নেই কাজেই সেখানে পরিধিতার হাড়া অন্য পারিতোষিকের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিতেই হবে। সাধারণের খ্যাতি নিন্দার চড়া নামা অনুসারে অর্থের দিকে সাহিত্যযোজনার একসূচেষ্ট বেড়ে ওঠে না। সেদিকে দুর্যোগ ঘটলেও মনের শান্তি রক্ষা করা চাই। শান্তি থাকে না যদি অর্থের প্রয়োজন থাকে। শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ মেনে অর্থকে অনর্থ ব'লে উড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্মীর ভ্রূভঙ্গ উপেক্ষা ক'রেও যদি সরস্বতীর ভজনা করবার ভরসা থাকে তবেই বিশুদ্ধভাবে অবিচলিত মনে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনায় নিবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয়।

একদা আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের উপর দায়িত্ব ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসজাত শ্রেষ্ঠ আদর্শের বিশিষ্টতাকে বিশুদ্ধ রাখবেন তারা। সেই উদ্দেশ্যে জীবনযাত্রায় আড়ম্বরের বাহুল্য তাদের কমাতে হোলো। তাদের কাছ থেকে উজ্জ্বল বেশ বা আত্মঘোষণার বিচিত্র সমারোহ কেউ প্রত্যাশাই করত না। তাদের সম্মান নির্ভর করত তাদের সত্যের উপর গভীর সংযম ও বাহুল্যবর্জ্জিত শুচাচার উপর। অর্থাৎ পরিমাণ নিয়ে তাঁদের বিচার ছিল না তাদের গৌরব ছিল আন্তরিক পরিপূর্ণতা নিয়ে। জনসাধারণের সম্মতি মেনে নিয়ে তাদের আদর্শ ঠিক ছিল না তাদের আদর্শকেই জনসাধারণে সবিনয়ে মেনে নিত। তার কারণ সাধনার দ্বারাই তারা সত্যের অধিকার পেয়েছিলেন। ভোগবাহুল্যবর্জ্জিত উপকরণবিরল জীবনযাত্রার জন্যে তাদের যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল জনসাধারণ সেটা জুগিয়ে দেওয়া দ্বারাই নিজেকে সার্থক ও সম্মানিত জ্ঞান ক'রত—সেজন্যে কারো মন জুগিয়ে তাঁদের মাথা হেঁট ক'রতে হত না।

মণিলালের সঙ্গে প্রথম সর্ত্ত এই হোলো যে যারা ওজন দরে বা গজে মাপে সাহিত্য বিচার করে তাদের জন্যে এ-কাগজ [সবুজ পত্র] হবে না। সব লেখাই পয়লা নম্বর হওয়া অসম্ভব দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভিড় হয় না, অতএব আয়তন ছোটো ক'রতেই হবে। গল্প না দিলে নয়ই এবং তবু বাড়াবাড়ি বর্জ্জনীয় অর্থাৎ অল্পস্বল্প হবে এক গ্রাসে দুটো চারটে চলবে না। ছবি দেওয়া নিষেধ বিজ্ঞাপনের বোঝাও পরিত্যাজ্য, তা'র মানে, মুনফার লোভ থেকে দৃষ্টি যথাসম্ভব ফিরিয়ে আনা চাই।

লোকসান জিনিষটা কারো পক্ষে প্রার্থনীয় নয়, তা হোক, ছোট আয়তনের কাগজে ছোট আয়তনের লোকসান সংঘাতিক হবে না এই ভেবে মনটাকে বেপরোয়া এবং কলমটাকে নিঃসঙ্কোচ রাখাই ভালো। মণিলাল রাজি হলেন, বললেন, এ-কাগজে ব্যবসার ছোঁয়াচ একটুও লাগবে না। লক্ষ্মীদেবী সকৌতুকে হাসলেন কিন্তু ভ্রূকুটি করলেন না।···

অবশেষে সবুজ পত্র বাহির হোলো। এই পত্রকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলবার জন্যে কিছুকাল সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেম সে কথা তোমাদের জানা আছে। আশা ছিল ক্রমে আমার ভার লাঘব হবে এবং একদল নতুন লেখক নিজের শক্তিকে আবিষ্কার ক'রে নতুন উদ্যমে এ'কে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দুজনে লগি ঠেলার জায়গায় পাঁচ-সাতজন দাঁড়ি জুটে গেলে তখন হাঁফ ছাড়ব।

এই অধ্যবসায়ে অন্তত একজন ওস্তাদ লেখকের সাড়া পাওয়া গেল। তখন তাঁর নাম ছিল অজানা, আশা করি এখন তাঁর নাম জানে এমন লোক খুঁজলে মেলে। তিনি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি নিজের চিত্তের জোরে নিজের মতো ক'রেই ভাবেন এবং স্বচ্ছন্দে সেটা স্বচ্ছ করে প্রকাশ ক'রতে পারেন। তিনি নতুন কালের নতুন লেখক তাতে সন্দেহ নেই, সেইজন্যই তাঁকে বাইরে নূতনত্বের ভেক ধারণ ক'রতে হয় নি, চিন্তাশক্তির অন্তর্নিহিত সহজ নূতনত্ব নিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।

যাই হোক্ ভার কমল না। সাময়িক কাগজের বাঁধা ফরমাস জুগিয়ে চলা সেকেলে ট্রামগাড়ির ঘোড়ার মতো দুঃখী জীবের কাজ। মন ছুটি চাইল, ক্লান্ত হয়ে শেষকালে জবাব দিলুম। বন্ধ হোলো চিত্রবিহীন ফর্দ্দাবিরল সবুজ পত্র।...

সবুজ পত্র বাংলা ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল। এ-জন্যে যে-সাহস যে-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েচে তা'র সম্পূর্ণ গৌরব একা প্রমথনাথের। এর পূর্ব্বে সাহিত্যে চল্‌তি ভাষার প্রবেশ একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে ছিল খিড়কির রাস্তায় অন্দর মহলে। অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে সদরের সভায় এখন সে যে-প্রশস্ত আসন নিয়েচে সেটা আজকাল তক্‌মা-পরা চোপদারেরও চোখে পড়ে না। এ নিয়ে তর্কবিতর্ক বিবাদ বিদ্রূপ যথেষ্ট হ'য়ে গেছে কিন্তু শুধু যুক্তিতর্কের দ্বারা এ-সব জিনিষের যাথার্থ্য প্রমাণ হয় না। একবার যেমনি এ'কে আত্মপ্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেচে। তা'র কারণ, এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তা'র নিজের স্বভাবের মধ্যেই; ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

যথার্থ স্বত্বাধিকারীকে প্রবল পক্ষ অনেকদিন যখন বঞ্চিত ক'রেচে তখন তাকে দখল দেওয়াবার জন্যে যে-মানুষ কোমর বেঁধে সীমানার কাছে এসে দাঁড়ায় তা'র মাথা বাঁচানো শক্ত হয়, কারণ লোকে তাকেই বলে ডাকাত। প্রমথর পিঠে অনেক বাড়ি প'ড়েচে, কিন্তু অহিংস্রনীতি তাঁর নয়। মোটা লাঠির ঘা খেয়েচেন, চালিয়েচেন তীক্ষ্ণ সড়কি। যাই হোক্ বাংলা ভাষার হাওয়া যেই পুব দিকে মুখ ফেরাল অমনি তখন থেকে একটা নব বারিবর্ষণের পালা প'ড়েচে। শুনেচি তরুণেরা বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি অনেক নূতন কীর্ত্তি ক'রেচেন ব'লে গৌরব করেন, কিন্তু ভাষায় নূতন পথকে বাধামুক্ত করবার যে-উদ্যোগ প্রথম ক'রচেন তা'র চেয়ে ইদানীং আর কী উদ্ভাবিত আমি জানিনে। এটা জানা আছে প্রমথকে বয়স খতিয়ে তরুণ বলবার জো নেই।···

পরিচয়—কার্ত্তিক, ১৩৩৮ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আল্-বেরুণীর নূতন পাণ্ডুলিপি

মহামনীষী আল্-বেরুণী জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে যে সব অজস্র গ্রন্থ আরবী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সবগুলি মুদ্রিত হয় নাই। অল্প কয়েক বৎসর হইল তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজির মধ্যে মাত্র দুইখানা জার্ম্মাণ অধ্যাপক Sachau-এর সম্পাদকতায় সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে যথা—'কেতাবুলহিন' ও 'আসার বাকিয়া'।

তদ্ব্যতীত তাঁহার 'কানুন মসউদী' ও 'তফহীস' এবং উহার অপর খণ্ডগুলি ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত আছে। এগুলি এ যাবত মুদ্রিত হয় নাই। আল্-বেরুণী নিজের গ্রন্থাবলীর যে সুবিস্তৃত তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না, আর কতগুলি আবার একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তাঁহার এই তালিকা অসম্পূর্ণ। ইহা বিচিত্র নহে যে, এই তালিকা সংগ্রহের পরেও তিনি আরও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কারণ, আজ আমরা এমন একটি অপূর্ব্ব পাণ্ডুলিপির বর্ণনা প্রদান করিব যাহার নাম এই তালিকায় কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইবে না। অথচ ইহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, আলোচ্য গ্রন্থখানি আল্-বেরুণীরই লেখনীপ্রসূত। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত 'জীচ' অর্থাৎ "জ্যোতিষ বিদ্যা সম্বন্ধীয় তালিকার" আরবী অনুবাদ। এই সংস্কৃত জীচ-এর প্রণেতার নাম বেজানন্দ (সম্ভবতঃ ব্রজানন্দ)। আর তাঁহার পিতার নাম জহানন্দ (সম্ভবতঃ মহানন্দ) ইঁহারা বারাণসীর অধিবাসী ছিলেন। মূল সংস্কৃত পুস্তকের নাম "কিরণ তিলক"। আল্-বেরুণী এই সংস্কৃত পুস্তকটি আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

আহ্‌মদাবাদের শাহ্ পীর মোহাম্মদ সাহেবের কুতুব্‌খানাতে উপরোক্ত পাণ্ডুলিপিখানি সুরক্ষিত আছে। আর কোথাও উহার নকল আছে কিনা তাহা জানি না। তবে মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুজরাট মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব আরবী-পারসী ভাষার অধ্যাপক মওলানা সৈয়দ আবু জফর নদবী সাহেবও এই পাণ্ডুলিপি-খানি সম্প্রতি উক্ত কুতুবখানাতে দেখিয়া আসিয়াছেন। এই পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভে ইহার বিস্তারিত পরিচয় স্বরূপ এইরূপ লিখিত আছে :—

"বারাণসীর বেজানন্দ—যিনি 'জীচ' পুস্তকের নাম 'কিরণ তিলক' রাখিয়াছিলেন—উহার অর্থ 'জিচের কিরণ'—অর্থাৎ সূর্য্যের আলোক-রেখা। গুরু আবু রয়হান বেনে আহ্‌মদ আল্-বেরুণী বলিয়াছেন যে,—'আমি হিন্দুদের নিকট একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক দেখিয়াছিলাম, যাহা জহানন্দের পুত্র বেজানন্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পবিত্র নগরী বারাণসীতে তাঁহার গৃহ ছিল। ইনি তথাকার অন্যতম ভাষ্যকার, এবং এই পুস্তিকার নাম "জীচের কারণ" রাখিয়াছিলেন। ইহা ৬৮ পাতার একটি ছোট পুস্তিকা। ইহার শেষের কয়েক পাতা নাই। পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভে মূল গ্রন্থকারের নামের সহিত অনুবাদকেরও নাম বর্ণিত হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, হিজরী পঞ্চম সনের সূচনাতে সুলতান মহমুদ গজনীর যুগে আল্-বেরুণী মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন। মূল গ্রন্থকার বেজানন্দ কোন্ সনের লোক ও কোন্ সনে উহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলা সুকঠিন। পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় পাতাতে যে 'এবারত' আছে, তাহা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সেই যুগেই আল্-বেরুণী ইহা আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। যথা :—

"সেদিন এমন দিন ছিল, যেদিন বহু লোক সেখানে ছিল

এবং উহা সেই দিন ছিল যেদিনে স্থলতান মহমুদের সহিত সমরকন্দে ইউসফখানের মোকাবেলা হইয়াছিল। তিন দিনের রাস্তাতে অথবা তিন মন্‌জিলের পর বৃহস্পতিবারের দিনে দুই সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।" ইউসফ খান অর্থে সম্ভবতঃ তুর্কিস্থানের শাসনকর্ত্তা কদর খান ইউসফ বেনে কাজা খানকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার সহিত মহমুদ গজনীর কয়েকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। স্থলতান মহমুদ ৪২২ হিজরীতে (১০৩০) খৃষ্টাব্দে এবং ইউসফ খান ৪২৩ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। এবং যখন আল্-বেরুণী এই দুই নামের সহিত 'রহমুল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তখন ইহা সুনিশ্চিত যে, তিনি এই পুস্তক তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যুর পর লিখিয়াছিলেন। ৪৪০ হিজরীতে আল্-বেরুণী এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করেন।

এই পাণ্ডুলিপির শেষ পাতাতে যে শিরোনামা আছে তাহা সংস্কৃতের পরিভাষা এবং তাহার পর পাণ্ডুলিপিখানি অসম্পূর্ণ—সম্ভবতঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মোহাম্মদী পৌষ, ১৩৩৮　　　মঈন উদ্‌দীন হোসায়ন

বৃহস্পতি রায়মুকুট

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রাঢ়দেশে মহিন্তা-গ্রামের 'মহিন্তা-গাঁই' বংশে একজন জ্যোতিষী জন্মান। তাঁহার নাম শ্রীনিবাস মহিন্তা। তাঁহার এক গ্রন্থ আছে,—তাঁহার নাম 'শুদ্ধিদীপিকা'। উহাতে হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের উপযুক্ত কালনির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। কোন্‌টা বিবাহের যোগ্যকাল, কোন্‌টা উপনয়নের যোগ্য কাল, কোন্‌টা যাত্রার যোগ্য কাল—এই সব বিষয়েরই আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। শুদ্ধি শব্দের পরবর্ত্তীকালে যে অর্থই হউক, শ্রীনিবাসের সময় উহার অর্থ ছিল, ধর্ম্মকর্ম্মের শুদ্ধ কাল। শ্রীনিবাসের আরও একখানি বই আছে। সেখানি বিশুদ্ধ গণিতের বই। নাম গণিত-চূড়ামণি; ইংরেজী ১১৫৮ সালে লেখা। হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে শুদ্ধিদীপিকার উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লালসেন যে কুল-মর্য্যাদার সৃষ্টি করেন, তাহাতে তিনি মহিন্তাদের কাহাকেও কুলীন করেন নাই। সিদ্ধ শ্রোত্রিয়দের মধ্যে উহাদের আসন খুব উচ্চে ছিল। কিন্তু এই বংশের শ্রীনিবাস আপনাকে কুলীন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, রায়মুকুটও আপনাকে কুলীন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হয় বল্লালী কুল মানিতেন না, অথবা তাঁহারা কুলীন শব্দ সাধারণ অর্থে (উচ্চ-কুলপ্রসূত এই অর্থে) ব্যবহার করিয়াছেন।...

অদ্বৈত প্রভুর ঠাকুরদাদা নরসিংহ শ্রীহট্ট অঞ্চলে নাড়িয়া নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আসিয়া রাজা গণেশের মন্ত্রী হইলেন। মহিন্তা বৃহস্পতি এই সময় গৌড়ে আসিয়া বাস করিলেন এবং বহু ছাত্র পড়াইতে লাগিলেন। এক একবার মনে হয়, গণেশের ছেলে যদুও যেন তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলেন। তিনি বৃহস্পতিকে আচার্য্য এবং কবিচক্রবর্ত্তী উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি জগদত্তের পুত্র। এই জগদত্তই রাজা গণেশ।···

বৃহস্পতি 'স্মৃতিরত্নহার' নামে যে স্মৃতির গ্রন্থ লেখেন, তাহাতে তাঁহার উপরিলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি অমরকোষের 'পদার্থচন্দ্রিকা' বা 'অমরচন্দ্রিকা' নামে যে টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ, মাতার নাম নীলমুখী দেবী এবং স্ত্রীর নাম রমা। তাঁহার অনেকগুলি ছেলে ছিল। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্রাম ও রাম, এই দুইটি বড়। তাঁহারা দিগ্‌বিজয়ীদিগকেও জয় করিয়াছিলেন, অনেক বই লিখিয়াছিলেন এবং অনেক মহাদান করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি 'গৌড়াবনীবাসবের' (জলাল উদ্দীন) নিকট হইতে ছয়টি উপাধি পাইয়াছিলেন। প্রথম—আচার্য্য, তার পর কবিচক্রবর্ত্তী, পণ্ডিতসার্ব্বভৌম, কবিপণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য্য, রাজপণ্ডিত। কিন্তু রাজা যখন তাঁহাকে সর্ব্বশেষে 'রায়মুকুটমণি' এই উপাধি দেন, তখন খুব জাঁক করা হইয়াছিল। তাঁহাকে হাতীর উপর চড়াইয়া নানাবিধ বৈধ স্নান করান হইয়াছিল। তাঁহাকে একগাছি হার দেওয়া হইয়াছিল—তাহাতে অনেক হীরামাণিক লাগান ছিল—তাহাতে তাহা ঝলমল করিতেছিল। তাঁহাকে যে কুণ্ডল দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ঝক্‌ঝক্ করিত। দুই হাতে 'রতনচুর' দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে দশ আঙুলে দশটি আঙটি এবং তাহাতে হীরা লাগান ছিল। দুইটি ছাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনেকগুলি ঘোড়া দেওয়া হইয়াছিল।···

তিনি শিশুপালবধের এক টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'নির্ণয়বৃহস্পতি'।···

কিন্তু তাঁহার স্মৃতির বইখানি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ইতিহাসে একখানি অমূল্য রত্ন।···মাঘ-টীকার মঙ্গলাচরণ হইতে বেশ বোধ হয়, রায়মুকুট বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিরত্নহারে জন্মাষ্টমীর কথা নাই, রামনবমীর কথা নাই—রথের কথা নাই—দোলেরও কথা নাই। রাসের বদলে সুখরাত্রি আছে। ইহাতে কার্ত্তিক পূজা ও কালী পূজার কথাও নাই। দূর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তব্রত প্রভৃতিও ইহাতে নাই।···

বোধ হয়, বৃহস্পতির সময়েও ব্রাহ্মণেরা চারি বর্ণে বিবাহ করিতেন। কারণ, তিনি বর্ণসন্নিপাতাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণের যদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিবাহ থাকিত এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীর সন্তান থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের কিরূপ অশৌচ হইবে, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের এবং এখনকার চলিত স্মৃতির বইএ এইরূপ অশৌচের উল্লেখ নাই।···

অমরকোষের দুইখানি প্রধান প্রাচীন টীকা বাঙ্গালা দেশে লেখা হয়। একখানি ১১৫৯ সালে, সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটীয় (বন্দ্যোপাধ্যায়) কর্ত্তৃক লিখিত হয়। আর একখানি পদচন্দ্রিকা—বৃহস্পতি রায়মুকুটের লেখা। দুই জনেই পাণিনীয় ব্যাকরণে দক্ষ ছিলেন।···

সর্ব্বানন্দের টীকার সহিত রায়মুকুটের টীকার তুলনায় সমালোচনা দরকার। দু'জনেই বাঙ্গালী, দু'জনেই প্রকাণ্ড পণ্ডিত অথচ দু'জনে প্রায় তিন শ বৎসরের তফাৎ। এক বিষয়ে সর্ব্বানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না। তিনি অমরকোষের প্রায় দুই শত শব্দের তখনকার চলিত বাঙ্গালায় মানে দিয়া গিয়াছেন। রায়মুকুট দুই চারিটা দিয়াছেন বটে, কিন্তু এত নয়। সর্ব্বানন্দ অমরকোষের দশখানি টীকা দেখিয়া টীকাসর্ব্বস্ব লিখিয়াছিলেন। রায়মুকুট ষোলখানি টীকা দেখিয়া আপনার বই লিখিয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দ ১৯৪ খানি পুথি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রায়মুকুট ২৭০ খানি হইতে করিয়াছেন। রায়মুকুট গৌড়ের সুলতানের আশ্রিত ছিলেন—তাঁহার লাইব্রেরী খুব বড় ছিল। কিন্তু সর্ব্বানন্দ যে সকল পুস্তক পাইয়াছিলেন, তিনি তাহা সকল পান নাই। অনেক বই দুই তিন শ' বৎসরে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তথাপি তিনি সর্ব্বানন্দ অপেক্ষা প্রায় এক শ'খানি বেশী পুথি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। হয় ত দু' চার জায়গায় রায়মুকুটকে প্রমাণের জন্য অন্য লোকের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। তিনি অন্যের উদ্ধৃত প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সর্ব্বানন্দ ও রায়মুকুট উভয়েই অনেকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে আপনাদের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি মহাকাব্য। একখানি—বুদ্ধচরিত, একখানি, সৌন্দরনন্দ, আর একখানি কপ্‌ফণাভ্যুদয়। প্রথম দুইখানি অশ্বঘোষের

তৃতীয়খানি শিবস্বামীর। দুঃখের বিষয়, দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া আমাদের পণ্ডিতেরা এই সব গ্রন্থের নামও জানিতেন না। প্রথম দুখানি নেপাল হইতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয়খানি আরও সম্প্রতি পুরী ও দক্ষিণ-ভারত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রায়মুকুট বুদ্ধচরিত হইতে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি গণরত্নমহোদধি হইতে লইয়াছেন—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধচরিত হইতে নয়।

কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দুই জন টীকাকারই অভিধান ও ব্যাকরণের অনেক বৌদ্ধ বই হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন; যথা,—চন্দ্রগোমী, জয়াদিত্য, বামন, জিনেন্দ্রবুদ্ধি, পুরুষোত্তমদেব, মৈত্রেয় রক্ষিত। হিন্দু ও ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা বৌদ্ধলিখিত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রায়মুকুট কোন কোন বৌদ্ধাগম হইতেও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে সময়ে সর্ব্বানন্দ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন বাজালা ত বৌদ্ধে ভরা ছিল। নালন্দা মগধে, বিক্রমশিল ভাগলপুরে, জগদ্দল বগুড়ায়, বড় বড় বিহার ও সঙ্ঘারামে পরিপূর্ণ ছিল। তখনও বাঙ্গালায় বৌদ্ধ বই নকল হইতেছিল। ১৪৩৬ সালে বর্দ্ধমানে বেণুগ্রামে বোধিচর্য্যাবতার নকল হইয়াছিল। ইহার দশ বৎসর আগে মালদহে কালচক্রতন্ত্র নকল হইয়াছিল। উহা এখন কেম্ব্রিজে আছে। ইহারই কয়েক বৎসর পরে একজন বৃদ্ধ মঠধারীর সখ হয় তিনি সংস্কৃত শিখিবেন। তিনি কলাপব্যাকরণ টীকার সহিত নকল করান। ঐ পুথির কয়েক খণ্ড এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, রায়মুকুট যখন বই লেখেন, তখনও বাঙ্গালায় বৌদ্ধপ্রভাব বেশ ছিল।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা—২য় সংখ্যা, ১৩৩৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মানুষের একজোট হওয়া

ধর্ম্মরাজ্যে কতক মানুষ কয়েকবার একজোট হয়েছে, দেখা গেছে পৃথিবীর ইতিহাসে। বুদ্ধের অতিমানবীয় পরম সাধনায় নির্ব্বাণ বা শাশ্বত শান্তির স্বাদ পৃথিবীর মানুষ পেয়েছে। বহু মানুষ তার মধ্যে ডুবে যাবার জন্য একজোট হ'য়ে একপথে চলেছে বহুকাল ধরে'। কিন্তু পৃথিবীকে বাদ দিয়ে চল্‌তে হবে সে সাধনায়; তাই পৃথিবীর মোটাদরের মানুষ তার নাগাল পায় না সহজে। সাধনা চলুক্,—যিনি পারেন সে পথ ধরুন, আরম্ভ করুন, সেই পরম সিদ্ধি,—জ্বলুক পৃথিবীর কপালে সেই অনির্ব্বাণ আলোক জ্বল্ জ্বল্ করে'। কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ মানুষগুলো যায় কোথায় পৃথিবী ছেড়ে?—পৃথিবীর জল-মাটিই তাদের সর্ব্বস্ব, শস্য-ফসলই প্রাণ, পৃথিবীতে খেয়ে-বসেই তাদের সুখ,—পৃথিবীর ভালবাসাই তাদের স্বর্গ,—পৃথিবীকে সুন্দর করে' তুলে', সুখী হবার সহজ পথ তাই খোঁজে তারা সব সময়। পৃথিবীর ভালোতে নিজের ভাল কথাটা, বোঝে সহজে।

(অতঃপর বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদের কথা আলোচনা করিয়া লেখিকা বলিতেছেন,—)

এল রাজা রামমোহনের সংস্কারমুক্ত স্বাধীন বুদ্ধির উপলব্ধি—এক-সত্যের স্বাধীন জ্ঞান, স্বাধীন জ্ঞানের স্বাধীন কাজ,—ধরা পড়ে গেল মানুষজাতির গোড়ায় মিলটি আশ্চর্য্যভাবে। মানুষের ধর্ম্মের গোড়ায় মিল, কর্ম্মের গোড়ায় মিল, জ্ঞানের গোড়ায় মিল, ভাবেরও গোড়ায় মিল,—এক-কথায় মানুষজাতিটি আসলে এক; রাজা রামমোহন এই কথাটি ধ'রে দিলেন সকল মানুষের চোখের সাম্‌নে, দিনের আলোতে।

কথাটা উঠছিল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পৃথিবীর চারিপাশে,—জ্ঞানী ধ্যানী, সাধু-সাধক আভাস দিচ্ছিলেন তার থেকে থেকে। রামমোহনের প্রজ্ঞার আলোকে সেটি আগুন হ'য়ে জ্বলে' উঠল দপ্ করে'। দিনের আলোয় পথ দেখা গেল স্পষ্ট ভাবে, ভেঙে গেল ঠেলাঠেলি, ঠেসাঠেসি, চাপাচাপির চাপ—বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়্‌তে সুরু করল মানুষের দল একজোটে। সকল ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা সুরু হ'ল পৃথিবী জুড়ে'—আগুপিছু করে'। এল দেশে রামমোহনের স্বাধীন বুদ্ধির স্বাধীন কাজ—সর্ব্বোন্নতিবাদ বা উন্নতিসমন্বয়। কালক্রমে বিকৃত, প্রচলিত দেশীয় আচার অনুষ্ঠানের রাশীকৃত জঞ্জাল দূরীভূত হ'য়ে সুরু হ'ল সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, জ্ঞান, কর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা সবের উন্নতি এবং সকল উন্নতির পরাকাষ্ঠা এদেশে নারী-উন্নতি। একজোটে সমভাবে আলো পড়্‌ল ছোট-বড় পুরুষ-নারী সবার চোখ,—দেখ্‌ল সবাই, লোক-জোটানো কাজ নয় তার চোখ-ফোটানোই কাজ—

"সার গেঁথে কেউ চলবে না আর
চলার পথে,—
দিনের আলো পথ দেখাবে,
চলবে মানুষ ইচ্ছামতে।"

পৃথিবীর কাজ এগিয়ে চলেছে হু হু করে',—মানুষের জ্ঞান বেড়ে উঠছে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে,—সকল জাতি, সম্প্রদায়ে স্বাধীন বুদ্ধির মানুষ জন্মাচ্ছেন অসংখ্য। সকলের বুদ্ধি স্বাধীন করে' তুলে,' মানব-জ্ঞানে এক-সত্যের মিল ঘটিয়ে, পৃথিবী আশ্চর্য্য আনন্দের মধ্যে নিজেকে সফল করে' তুলতে চাইছে একান্ত চেষ্টায়; তারি আয়োজন আগাগোড়া।

সমস্ত পৃথিবী স্বাধীন হবে সর্ব্বতোভাবে, সকল মানুষ সমান অধিকার পাবে পৃথিবীর বিচিত্র কাজে, পৃথিবীর দিক্‌খোলা পথে ইচ্ছামত চলে' নরনারী সুখী হবে সকল দিক্ থেকে। এই ঐশ্বরিক প্রেরণার গতি রোধ করবে কে?

"এক্‌ই সুরে সবাই বাঁধা
জানি বা আর না-ই জানি,
এক্‌ই তারে সবাই বাঁধা
মানি বা আর না-ই মানি।
এক্‌ই কথা সবাই বলি
ভাষা যতই হোক্ নাকো,
এক রাগিণী সবাই ভাঁজি
সুরের তফাৎ থাক্ নাকো।
এক্‌ই মরণ সবাই মরি
মরতে চাই আর নাই বা চাই,
এক্‌ই জনম সবাই ধরি
ধরতে চাই আর না-ই বা চাই।
এক জোড়নে সবাই জোড়া
বাঁধা সবাই এক তাঁতে,
দশার ফেরে যতই ফিরি
আগু-পিছু এক সাথে।
এক নিয়মে গড়ছে সবাই—
যতই করি কোলাহল,
ভাঙতে তারে পারব না কেউ,
কারিগরের এমনি কল।
এক্‌ই ধরম, এক্‌ই করম
একেরই সব কারখানা,
এক ছাড়া দুই বলব যারে
কই কোথা তার নিশানা।"

বঙ্গলক্ষ্মী—পৌষ, ১৩৩৮] [শ্রীহেমলতা দেবী

দেশের পথে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

১

জগা, মধা আর বনা তিনজনে একসঙ্গে কটক ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি দিলে। বউ ছেলে মা বোন্ পড়ে রইল, কিন্তু উপায় কি? তারা ত অনাচারী বাঙালী নয়। তাদের সমাজে এখনও বিদেশে পা দিলে মেয়েদের জাত যায়—আর জাত খোয়ানোর চেয়ে দেশে পড়ে মরা যে অনেক শ্রেয় এ-কথা উৎকল নীতিশাস্ত্রে লেখে। অবশ্য প্রশ্ন হ'তে পারে যে, প্রাণের দায়ে নিজেরা দেশত্যাগ করার চেয়ে মেয়েদের সঙ্গে সহমৃত্যু বরণ করা কি শ্রেয় নয়, কিন্তু অকারণ মৃত্যু-সংখ্যা বাড়ানোর বিরুদ্ধে পুরুষজাতির একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ আছে—এবং তার সপক্ষে নীতিশাস্ত্রের কোন স্পষ্ট অনুশাসন নেই।

চামড়া-ঢাকা হাড়ের কাঠাম নিয়ে তিন বন্ধু যখন হাবড়া ষ্টেশনে নামল, তখন তাদের মনে হ'ল তারা একটা স্বর্গ-রাজ্যের দ্বারে উপস্থিত—কেন-না, যার দিকেই তারা চায় তারই গোলগাল নধর চেহারা। কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে শাকের ডাঁটা চিবোচ্চে না—কেউ তা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে পালাচ্চে না।

কিন্তু একটু পরেই তাদের শুক্‌নো চোখের গর্ত্ত দিয়ে দু-এক ফোঁটা ময়লা জল উঁকি মারতে লাগল। সেই জল যেন নীরব ভাষায় বলতে লাগল—'হায়, কোথায় এলুম আমরা, আর কোথায় রইল তারা।' নিজের প্রাণের আশা হলেই প্রিয়জনের প্রাণের জন্য একটা তীব্রতম দরদ জেগে ওঠে।

চোখের জল মুছে নিয়ে তারা ভিক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যার আগেই সাতটা পয়সা এবং সের-খানেক চাল রোজগার ক'রে তারা বুঝলে, তাদের জগড়নাথ এখন পালিয়ে এসে কলকাতাতেই আড্ডা নিয়েচেন। তিন পয়সার মুড়ি কিনে তারা বড়বাজারের ফুটপাথে বসে প্রাণভরে চিবোলে এবং রাস্তার কলের পরিষ্কার জল আঁজলা আঁজলা গিলে তিন মাসের জঠর-জ্বালাকে বেশ খানিকটা নির্ব্বাণ করলে।

যে-দেশে হাত পাতলেই এত পাওয়া যায় সে-দেশে কাজ করলে যে আরও কত পাওয়া যাবে, তা বুঝতে তাদের একটুও দেরি হ'ল না। তারা কাজের সন্ধানে ঘুরতে লাগল এবং আশ্চর্য্য এই যে, সাত দিনের মধ্যেই তাদের বেকার ভিক্ষুকত্ব ঘুচে গেল। কল্‌কাতায় কাজও এত সস্তা।

জগা বাইসমানি কাজে ভর্ত্তি হয়ে বেশ দু-পয়সা কামাতে লাগল। বনা পাইপে ক'রে রাস্তায় জল ছড়ায়, আর সকাল সন্ধ্যায় একজনের বাড়িতে পেট-ভাতায় কাজ করে। তারা মাস মাস দু-চার টাকা বাড়িতে মনি-অর্ডার ক'রে পাঠাতে লাগল এবং কটকের পিয়ন-গুলোসুদ্ধ যদি না চোর হয়ে উঠে থাকে, তাহ'লে তাদের বউ ছেলেদেরও একটা কিনারা হচ্চে এই কল্পনার আনন্দে তাদের হাড়ের উপর তাল তাল মাংস লাগতে লাগল।

মধার চেহারা কিন্তু বড়-একটা ফেরেনি। তার কণ্ঠার হাড় এখনও জেগে আছে। সে এক উকীলবাবুর বাড়িতে চাকরি জুটিয়েছে বটে, কিন্তু চাকরির সর্ত্ত বড়ই ভয়ঙ্কর। তিন বছরের জন্য সে মাইনেও পাবে না, দেশেও যেতে পাবে না। তার বদলে উকীলবাবু অগ্রিম ৭২ টাকা দিয়ে তার এক নিষ্ঠুর মহাজনের মায় সুদসুদ্ধ সমস্ত দেনা শোধ করবেন। উকীলবাবু সর্ত্তের নিজ অংশ পালন করেচেন—এখন মধা তার অংশ চোখ কান বুজে পালন করচে। সে যে একদিন ফাঁকি দিয়ে অর্থাৎ পালনীয় সর্ত্ত অসম্পূর্ণ রেখে দেশে চম্পট দেবে, এমন পথ উকীলবাবু রাখেন নি। তিনি তার নামধাম নাড়ীনক্ষত্র সব টুকে নিয়েচেন, এমন কি টিপ-সই পর্য্যন্ত নিয়ে স্থানীয় দারোগাবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েচেন। মধা ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে কোনো পিপড়ের গর্ত্তে গিয়ে

লুকোলেও সেখান হ'তে তাকে টেনে বের করে আনা হবে—এবং তারপর এমন কোনো জায়গায় তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে যেখানে গরুর মত ঘানি টেনে তেল বের করতে হয়। সুতরাং দুঃখ ও আতঙ্কে মধা যে তার দেহে তেল সঞ্চয় করতে পারচে না, তা খুবই স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, মধা এমন ভয়ঙ্কর কড়ারে নিজেকে আবদ্ধ করলে কেন? এ যে তিন বছরের জন্য নিজেকে একরকম বেচে ফেলা। কিন্তু বেচে ফেলা ছাড়া তার উপায় কি ছিল? মহাজনের দেনা না শোধ করলে এতদিন যে তার দেশের ভিটেবাড়ি পর্য্যন্ত নিলামে উঠত—তার বুড়ো মা ও একরত্তি বউকে উদ্বাস্ত হয়ে গাছতলায় মাথা গুঁজতে হ'ত।

আর একটি প্রশ্নও হ'তে পারে। উকীলবাবু একজন শিক্ষিত বাঙালী হয়ে সেই উৎকলী মহাজনের চেয়ে কম নিষ্ঠুর কিসে? মধা একদিনের জন্যও তাঁর বাড়ি ছেড়ে নড়তে পারবে না—সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে বিনা মাইনায় ক্রীতদাসের মত খেটে যাবে—এ-রকম ভাবে তার বুকে দাগা দিয়ে তার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া কি তাঁর উচিত হয়েছিল? এর উত্তর উকীলবাবুর হয়ে অতি সংক্ষেপেই দেওয়া যেতে পারে। উকীলবাবু জানতেন মধা একদিন সর্ত্ত ভঙ্গ ক'রে পালাবেই, কেন-না, উৎকলীয়দের সত্য-রক্ষা সম্বন্ধে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল না। তাঁর চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এটুকু তিনি ধ্রুব সত্য ব'লে জেনেই মধাকে একটু ভয়ের বাঁধনে বেঁধেছিলেন মাত্র। ভাল ক'রে চোখ-কান ফোটার আগে সে যদি পাঁচ সাত মাসও টিঁকে যায় তাহ'লে সেইটুকুই উকীলবাবু পরমলাভ ব'লে মনে করবেন—মনে করবেন তাতেই তাঁর বদান্যতার ৭২ টাকা উসুল হ'ল—কেন-না, তাঁর সংসারে আজকাল কোনো চাকরই পাঁচ-সাত দিনের বেশী টিঁকচে না তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কণ্ঠঝঙ্কারের গুণে। মধা পলাতক হ'লে তিনি যে সত্যই তার পিছনে হুলিয়া দিয়ে পুলিসের ডাল কুত্তো লেলিয়ে দেবেন, এমন ইচ্ছা তাঁর একটুও ছিল না। তবে সে যদি রিক্ত হস্তে না-পালিয়ে মোটা রকম কিছু চক্ষু দান ক'রে পালায় তাহ'লে অগত্যা নামধাম টিপসইয়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

উকীলবাবুর চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় ঘুণ ধরতে বসেচে। যতই দিন যাচ্ছে ততই তিনি বুঝতে পারচেন যে, মধা সে-জাতীয় মানুষ নয়, যারা সত্য ভঙ্গকেই সত্য-রক্ষার একার্থবোধক ব'লে মনে করে। তার চোখেমুখে এখনও একটা সরল নিরীহতার ছাপ—যা কোনো দিনও নিমকহারামিতে পরিণত হবে ব'লে আশঙ্কা করা যায় না। সে যে উকীলবাবুর দয়ালুতার গুণেই মহাজনের নৃশংস কবল হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছে—এটুকু যেন সে কিছুতেই ভুলতে পারচে না। সে যেন তার কৃতজ্ঞতাকে কেবলই ব্যক্ত করতে চায় তার অনলস কর্ম্মনিষ্ঠার ভিতর দিয়ে—এবং মোটা ভাতের সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর, মোটা বকুনির বুকনিকে বিনাবাক্যব্যয়ে হজম ক'রে। আর একটা মাস দেখে উকীলবাবু যে মধাকে তার অপ্রিয় কড়ারের হাত হতে মুক্তি দেবেন—অর্থাৎ তাকে মাস মাস মাইনা ও মাঝে মাঝে দেশে যাবার অনুমতি দিয়ে পুরস্কৃত করবেন, এ-রকম একটা সদিচ্ছা উকীলবাবুর মাথায় আজকাল উঁকিঝুঁকি মারছে।

মধা যে মাইনে পায় না, খাটে আর খায়—একথা অবশ্য জগা ও বনা কেউ জানে না—লজ্জার কথা বলেই মধা তাদের কাছ থেকে গোপন করেছে। তবে তারা এটুকু লক্ষ্য করেচে যে, মধা কোনদিনই একটা মনি-অর্ডার করে না। তারা ত জানে না যে, উকীলবাবুর স্ত্রী তাকে পান-গুণ্ডীর জন্য রোজ যে একটা পয়সা ক্রুদ্ধ হাতে ছুঁড়ে ফেলে দেন—তাই হচ্চে তার চাকরি-জীবনের একমাত্র আর্থিক সম্বল। তারা মনে করে সে মাইনের টাকাটা আত্মবিলাসেই নিয়োগ করে। হায় আত্মবিলাস! সে উৎকলীয় হয়েও দিনান্তে একটু পানগুণ্ডী মুখে দেয় না—যা কসের মধ্যে না পুরে দিলে সে আগে ঘুমতে পর্য্যন্ত পারত না। সে বড়জোর আজকাল দু-এক কুচি সুপুরি মুখে দিয়ে তার পানগুণ্ডীর সাধ মেটায়—কেন-না, এই পানগুণ্ডীর পয়সাটা না বাঁচালে সে কি দেশে পাঠাবে? কিন্তু—হায়, পয়সা-গুলো ত খুব তাড়াতাড়ি জমচে না—এতদিন ধরে জমিয়েও তার পুঁজি হয়েছে মোটে পাঁচসিকে।

বৈঠকখানার সংলগ্ন যে ছোট কুঠরীটি উকীলবাবুর চাকরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল তা নেহাৎ অপ্রশস্ত ছিল না। জগা ও বনা প্রত্যহ তার পাশে শুয়েই রাত্রি যাপন ক'রে

যায়। রাত বারোটার সময় তারা যখন বিড়ি মুখে দিয়ে হাসতে হাসতে তার ঘরে আড্ডা দিতে আসে, তখন তারা প্রায়ই দেখে সে হাঁটুর উপর চিবুক রেখে কি যেন ভাবচে। জগা হয়ত বন্ধুসুলভ আক্ষেপ ক'রে বলে—'তুই ভেবে ভেবেই শরীর সারতে পারছিস্ না—কি ভাবিস্?' বনা ঈষৎ ভৎর্সনার সুরে বলে—'ভাবে মাথা আর মুণ্ডু—আর যাই ভাবুক্ মা-বউয়ের জন্য ভাবে না। নইলে উপরি গণ্ডা না পায়, মাইনের টাকাই কোন্ বাড়িতে পাঠায়?' জগা সমঝদার রসিকের মত চোখ মিট্‌মিট্ ক'রে বলে—'কখন কাকে দিস্ বলত।' মধা অসোয়াস্তির সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—'নে, বকাস্‌নি। শুবি ত শো—আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।'

সেদিন সন্ধ্যার সময় মধা বাবুর জন্য তামাক সাজ ছিল। সে একমনে টিকেয় ফুঁ দিতে দিতে ভাবছিল, তারা কি আছে। চাল থাক্‌লে কি হয়, চুলো কি জ্বলে? এতদিনে জমলো কিনা মোটে পাঁচসিকে! পয়সা যদি মানুষের মত বংশবৃদ্ধি করতে পারত, তাহ'লে ঐ পাঁচসিকেই এতদিনে পঞ্চাশ সিকে হয়ে দাঁড়াত। তাহ'লে সে কি এমন মনমরা হয়ে বসে থাকে? এক লাফে পোষ্টাপিসে গিয়ে—

সহসা তার চিন্তার সূত্রকে ছিন্ন ক'রে দিয়ে শব্দ হ'ল—'মধারে—এই মধা আমরা দেশে যাচ্ছি।' সে চমকে উঠে চেয়ে দেখে জগা আর বনা। তাদের দুজনের বগলে দুই ছাতি—পিঠে দুটো বোঁচকা। তাদের মুখ দিয়ে আনন্দের আলো ঠিক্‌রে পড়চে। "তুই যাস ত চল্ না আমাদের সঙ্গে" জগা উৎসাহের সঙ্গে বললে। চোখ নীচু ক'রে মধা বললে—"কি ক'রে যাব? বাবুকে ত আগে বলিনি।" বনা চালাকের মত চোখ ঘুরিয়ে বললে—'কেন বদ্‌লি দিয়ে যাবি। এই যে আমরা যাচ্ছি কি ক'রে? কাল ত কিছুই ঠিক ছিল না—আজ সকালে দুজনে মতলব ক'রে গেলুম দুজনের বাবুর কাছে একেবারে বদ্‌লি সঙ্গে নিয়ে। ব্যস, কাজ হাঁসিল—তুইও ব'লে দেখ্ না—তোর বাবুকেও ত তেমন ছেঁচ্‌ড়া ব'লে মনে হয় না।

মধার চোখ বোধ হয় চুলকে কিংবা করকর ক'রে উঠল। সে টিকের কালিমাখা আঙুল দিয়ে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বললে—"না রে ভাই, সে হবে না—এখন কি ক'রে বল্‌ব? এই বড়দিনের বন্ধে বাবুর দেশের লোক এসেচে—কাজও বেড়েচে। এখন কি আর নতুন লোক দিলে চলে? এখন কখনও ছুটি দেয়?" টিটকিরীর সুরে জগা ব'লে উঠল—'দেয়—দেয়, একমাসের জন্তে বই ত নয়। তুই বলেই দেখ্ না। তুই যে আগে থাক্‌তেই কেঁচো হয়ে যাস্।' কোন উত্তর না দিয়ে মধা বার-বার ঢোক গিল্‌তে লাগ্‌ল। তার পিঠে একটা বড়গোছের ধাক্কা মেরে বনা বললে—'যা না। চেষ্টা করেই দেখ না, বেশ তিন জনে একসঙ্গে যাব, সে ভাল নয়? এর পর একলা কার সঙ্গে যাবি? যা, যা একটু গুছিয়ে বললেই হবে, বদ্‌লির লোক এখনই এনে দেব।'

জগা আর বনার নির্ব্বন্ধে পড়ে মধা কলকে নিয়ে আস্তে আস্তে তার মনিবের ঘরে ঢুকল। উকীলবাবু তখন টেবিলের উপর ঘাড় গুঁজে কি যেন লিখছিলেন—সে পা টিপে টিপে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে গড়গড়ার মাথায় কলকে বসিয়ে দিলে, কিন্তু মুখ দিয়ে তার কোনো কথাই সরল না। সে কোন্ মুখ দিয়ে দেশে যাওয়ার কথা বল্‌বে? সে যদি মুখ ফুটে বল্‌তে পারত তাহ'লে খুব সম্ভব তার প্রার্থনা ব্যর্থ হ'ত না। কিন্তু সে ত জানে না সে নিজেকে যতটা ক্রীতদাস ব'লে মনে করে তার বাবু ততটা করে না। সে একবার ঢোক গেলে, একবার মাথা চুলকোয়। একবার উস্‌খুস্ করে, একবার দরজার দিকে চেয়ে দেখে জগা বনা দূর হ'তে আড়িপেতে শুনচে কি না।

হঠাৎ উকীলবাবুর চমক ভাঙল—তিনি মধার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে?' মধা হাত কচলাতে কচলাতে বললে, 'আজ্ঞে এই একটু—এই একটু যাব'। 'কোথায় রে?' উকীলবাবু সরলভাবে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু ঐ ছোট্ট প্রশ্নের ধাক্কায় মধা একেবারে ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'আজ্ঞে আজ্ঞে—এই ওদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসতে—এই জগা আর বনাকে।' 'ওঃ আচ্ছা' ব'লে উকীল-বাবু আবার ঘাড় গুঁজে কাজ করতে লাগলেন।

মধা ঘর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসেই সঙ্গীদের বললে, 'চল্—ইষ্টিশান পর্য্যন্ত যাই। বাবু ইষ্টিশান পর্য্যন্ত যাবার

ছুটি দিয়েচে।' এই বলেই সে তার সঞ্চিত পাঁচসিকে পয়সাকে কোঁচার খুটে বেঁধে এবং এককুচো কাটাসুপুরি চট্ ক'রে মুখে ফেলে দিয়ে স্ফূর্ত্তির সঙ্গে আবার বল্লে, 'চল্—দেশের দিকে খানিকটা ত যাওয়া হবে।' জগা ও বনা একবাক্যে ব'লে উঠল—'ধেৎ—তুই একটা কিচ্ছু না।'

২

জগা ও বনা ট্রেনে চড়ে বসেছে। মধা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে কামরার দরজায় বুক বাধিয়ে একদৃষ্টে তাদের দিকে চেয়ে আছে।

ঢঙা ঢং ক'রে ঘণ্টা পড়ল। গার্ড নিশান তুলিয়ে হুইসেল্ দিলেন। উত্তপ্ত কড়াইয়ের উপর জল ঢেলে দিলে যেমন শব্দ হয়, তেম্নি শব্দ এঞ্জিনের দিক হ'তে ছুটে এল।

হঠাৎ মধা চম্‌কে উঠে তার কোঁচার খুট হ'তে এক টাকা তিন আনা বের ক'রে (কেন-না, প্লাটফরম্ টিকিটের জন্ম চার পয়সা খরচ হয়ে গিয়েছিল) জগার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে—'ধর্ ভাই—এই যা সঙ্গে আছে—আর ত আনতে ভুলেই গেছি—এই নিয়ে আমার বাড়ির তাদের হাতে দিস্—।'

তখন এঞ্জিন হাঁপ হাঁপ শব্দে ট্রেনটাকে টেনে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। মধা প্লাটফরমের উপর দিয়ে সজোরে হাঁটতে হাঁটতে বললে—'আর বলিস্—আমি ভালই আছি—দু-এক মাসের মধ্যেই দেশে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করব।'

সমস্ত লৌহ-সরীসৃপটা প্লাটফরমের গুহা ছেড়ে ঈষৎ বেঁকতে বেঁকতে মুক্ত আলোকে দেহ বিস্তার করেচে আর মধা দৌড়তে দৌড়তে তখনও বলচে, 'আর বলিস্ তেমন কষ্ট হয় ত রূপোর গয়নাই যেন দু-একখানা বেচে—আমি যাবার সময় আবার গড়িয়ে নিয়ে যাব।' কিন্তু এই শেষ কথাগুলো বোধ হয় জগা বনার কানে পৌঁছল না—তারা হাঁ-সূচক ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে, তাদের পানের বুগলী হ'তে পান বের ক'রে মুখে দিলে। মধা একজন কুলীর—'এই আউর কাঁহা যাতা হায়' শব্দে চম্‌কে উঠে চেয়ে দেখে সে প্লাটফরমের একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে পড়েচে। থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে সে ষ্টেশনত্যাগী ট্রেনকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে লাগল। ট্রেনের শেষ গাড়ীখানায় লাল আলো তার দিকে যেন নিষেধের রক্তচক্ষে চেয়ে বলতে লাগল—'ফিরে যা।' তবু সে ফিরলে-না। যতক্ষণ রক্তবিন্দুটি একেবারে না আঁধারের বুকে মিলিয়ে গেল—যতক্ষণ দূর চক্রের 'ঝক্ ঝক্' শব্দ প্লাটফরমের গোলমালের মধ্যে একেবারে না হারিয়ে গেল ততক্ষণ সে স্থিরনেত্রে দূর দিগন্তের পানে চেয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে প্লাটফরম বেয়ে ফিরতে লাগল।

হাবড়া ষ্টেশনের গেট পার হয়ে সে ধীরে ধীরে উঠল হাবড়ার পোলের উপর। সে চলেইচে—চলেইচে—পোল আর ফুরোয় না। পোল যেন আগেকার চেয়ে দশগুণ বেশী লম্বা হয়েচে। আশপাশের জনস্রোত তার দুপাশ দিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে—সে সকলের পিছনে পড়ে যাচ্ছে—কি স্ত্রীলোকের কি বালকের। কিন্তু তার সেদিকে খেয়াইল ছিল না। সে না-দেখ্ছিল লোক, না-দেখছিল নদী, না-দেখছিল জাহাজ। সে দেখ্ছিল একখানা ট্রেন মাঠের ভিতর দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছে, আর তারই একটি দীপ্ত কামরার মধ্যে তারই দুটি পরিচিত মুখ হাসির ফোয়ারা ছোটাচ্ছে।

'এই হট্ যাও—উল্লু' ব'লে একজন ষণ্ডা হিন্দুস্থানী মধাকে ধাক্কা মেরে চলে গেল—কেন-না, মধা বোধ হয় টল্‌তে টল্‌তে তার সামনে গিয়ে পড়েছিল। ধাক্কা অবশ্য এমন জোরে সে মারেনি যে মধার তা সামলান উচিত ছিল না, কিন্তু কেন জানি না মধা পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে গাড়ীর রাস্তায় গিয়ে পড়ল। তার দুর্ব্বল পা দুটোকে কুড়িয়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াবার আগেই একখানা মোটর গাড়ী ছুটে এসে তার গায়ের উপর পড়ল। ড্রাইভার হাঁ-হাঁ করে ব্রেক বেঁধে ফেল্লে বটে, কিন্তু মধা আর উঠে দাঁড়াতে পারলে না। তার মুখ দিয়ে শুধু গোঁ গোঁ শব্দ বেরতে লাগ্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পোলের উপর ভিড় জমে গেল। কনেষ্টবলরা ঠেলে ঠেলে লোক সরাবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগল।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই একখানা এম্বুলেন্স্ গাড়ী

এসে মধার পাশে দাঁড়াল। দু-জন লোক ষ্ট্রেচারে ক'রে মধাকে গাড়ীর মধ্যে তুলে নিতেই গাড়ী দ্রুতবেগে মেডিক্যাল কলেজের দিকে ছুটল।

মধার তখন অনেকটা সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। সে বুঝতে পারলে যে, গাড়ীতে ক'রে কোথাও যাচ্ছে, এবং এও বুঝতে পারলে যে সে-গাড়ী আর কোন গাড়ী নয়—কটকের ট্রেন—এবং তার পাশে যে-দুজন লোক বসে আছে তারা আর কেউ নয়, জগা আর বনা। সে শুধু বুঝতে পারলে না যে, কামড়াটা অন্ধকার কেন এবং তার পাঁজরায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে কেন। কিন্তু ও অন্ধকারেই বা কি আসে যায় আর যন্ত্রণাতেই বা কি আসে যায়? সে যে দীর্ঘ তিন মাস পরে তার দেশে চলেচে—যেখানে তার মা আর বউ হা-পিত্যেশ ক'রে তার পথ চেয়ে বসে আছে। সে ফিক্ ক'রে একটু হেসে ফেলে জড়িত স্বরে বল্‌লে—'জগা—এবার কোন্ ইষ্টিশান্—বালেশ্বর, না পুরী?'

ছন্দোবিশ্লেষ

(প্রথম পর্য্যায়)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

ছন্দের অন্তরের প্রকৃতি নির্ভর করে অযুগ্ম ও যুগ্ম-বিশেষে ধ্বনি-সমাবেশের উপর, আর ছন্দের আকৃতি অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয় যতি-স্থাপন ও পর্ব্ব-গঠনের রীতির দ্বারা। যতি ও পর্ব্ব খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; কারণ যতিস্থাপন ও পর্ব্ব-গঠনের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের উপর নির্ভর করে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বাংলা ছন্দের যতি তিন রকমের। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাচ্ছি।

আপাতত। এই আনন্দে ॥ পর্ব্বে বেড়াই। নেচে,
কালিদাস তো। নামেই আছেন ॥ আমি আছি। বেঁচে।
—সেকাল, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

ছন্দের দিক্ থেকে দেখা যাচ্ছে, একেকটি সিলেবল বা ধ্বনিই হচ্ছে এ দৃষ্টান্তটির unit বা ব্যষ্টি; সুতরাং এ ছন্দটি হচ্ছে স্বরবৃত্ত বা syllabic। আর ছন্দোবন্ধের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, চারটি ক'রে ব্যষ্টির পরেই ধ্বনির গতি একটু ক'রে বিরত হচ্ছে। ধ্বনি-গতির এই বিরামকেই ছন্দের পরিভাষায় বলা হয় যতি (pause) আর ধ্বনিশ্রেণীর যে-অংশের পর একটি ক'রে যতি থাকে সে-অংশটুকুকে বলা যায় পর্ব্ব (measure), বা গণ (group)। পর্ব্ব ও গণ যদিও একই জিনিষ তথাপি তাদের অর্থের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। পর্ব্ব মানে হচ্ছে দু'টি ছেদের মধ্যবর্ত্তী অংশ, আর কয়েকটি ব্যষ্টির সমবায়ে গঠিত একটি অংশকে বলা যায় একটি গণ। যেমন উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রত্যেকটি পংক্তিই চারটি যতি বা ছেদের দ্বারা চারটি পর্ব্বে বিভক্ত হয়েছে; আর চারটি ক'রে সিলেবল্ বা ধ্বনির যোগে একটি ক'রে গণ গঠিত হয়েছে। যা হোক, ছন্দের আলোচনায় পর্ব্ব ও গণ কার্য্যত একই জিনিষ। আমাদের আলোচনায় আমরা গণ শব্দের পরিবর্ত্তে পর্ব্ব কথাটাই ব্যবহার করব। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে প্রত্যেকটি পর্ব্বে চারটি ক'রে সিলেবল্ বা স্বর আছে; সুতরাং এগুলিকে চতুঃস্বর পর্ব্ব (tetrasyllabic measure) নাম দিতে পারি। অতএব ছন্দোবন্ধের তরফ থেকে এ ছন্দটিকে বলব চতুঃস্বর পর্ব্বিক ছন্দ। আবার যেহেতু এখানে প্রতি পংক্তিতেই চারটি ক'রে পর্ব্ব আছে আর শেষ পর্ব্বে দুটি ক'রে স্বর কম আছে সে-জন্যে এ ছন্দটির আরেক পরিচয় হচ্ছে এই যে, এটি অপূর্ণ চৌপর্ব্বিক (tetrameter catalectic) ছন্দ। অতএব উদ্ধৃত পংক্তি দুটি হচ্ছে স্বরবৃত্ত ছন্দের চতুঃস্বর অপূর্ণ চৌপর্ব্বিক ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত।

এবার এই পংক্তি-ছুটির যতি বিচার করা যাক্। একটু লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যাবে যে, এখানে যে চার স্থানে যতি স্থাপিত হয়েছে তার সবগুলিতে ধ্বনির বিরতি-কাল সমান নয়। চতুর্থ পর্ব্বের পরবর্ত্তী যতিতে ধ্বনি সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়েছে; সুতরাং এ যতিটিকে বল্‌তে পারি **'পূর্ণ-যতি।'** প্রথম ও তৃতীয় পর্ব্বের পরে ধ্বনির বিরতি অতি অল্প-সময় স্থায়ী; সুতরাং এ ছুটি যতিকে **'ঈষদ্-যতি'** নাম দেওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্ব্বের পরবর্ত্তী যতিটি কিন্তু চতুর্থ যতিটির মত পূর্ণ বিরতি-সূচকও নয়, আবার প্রথম ও তৃতীয় যতি ছু'টির মত ঈষৎ বিরতিসূচকও নয়; এটির স্থায়িত্বকাল মাঝামাঝি রকমের। তাই এ যতিটিকে **'অৰ্দ্ধ-যতি'** নামে অভিহিত করতে পারি। (এ বিষয়ের বিশদ-তর আলোচনা 'প্রবাসী'—১৩৩০, চৈত্র, ৭৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে ঈষদ্-যতি নির্দ্দেশ করার জন্যে একটি ছেদচিহ্ন এবং অর্দ্ধ-যতি নির্দ্দেশ করার জন্যে যুগ্ম-ছেদ চিহ্ন ব্যবহার করেছি; পূর্ণ-যতি নির্দ্দেশ করার জন্যে কোনো চিহ্ন ব্যবহার করিনি।

কালব্যাপ্তির দিক্ থেকে যতির এই প্রকারভেদের বিষয় রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেও সমর্থিত হয়।

তরণী। বেয়ে শেষে॥ এসেছি। ভাঙা ঘাটে

এই পংক্তিটির ছন্দোবিশ্লেষণ-উপলক্ষ্যে মাঘের 'পরিচয়ে' তিনি লিখেছেন, "সাত মাত্রার পরে একটা ক'রে যতি আছে, কিন্তু বেজোর অঙ্কের অসাম্য ঐ যতিতে পূরো বিরাম পায় না। সেইজন্যে সমস্ত পদটার মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে যে-পর্য্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে।" অর্থাৎ উদ্ধৃত পংক্তিটির শেষ প্রান্তে একটা 'সম্পূর্ণ স্থিতি' বা পূর্ণ-যতি আছে; আর পংক্তির মধ্যস্থলে যে-যতিটি আছে সেটি 'পূরো বিরাম' বা পূর্ণ-যতি নয়, সেটি হচ্ছে অর্দ্ধ-যতি। তাছাড়া প্রথম ও তৃতীয় পর্ব্বের পরে ছেদচিহ্নের দ্বারা যে-বিভাগটি নির্দ্দিষ্ট হয়েছে সেখানেও একটি ক'রে 'ঈষদ্-যতি' রয়েছে।

যতির এই প্রকারভেদের দ্বারা ছন্দোবদ্ধ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবার তাই দেখাব। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্।

দুঃখ সহার। তপস্যাতেই॥ হোক্ বাঙালীর। জয়,
ভয়কে যারা। মানে তারাই॥ জাগিয়ে রাখে। ভয়।
মৃত্যুকে যে। এড়িয়ে চলে॥ মৃত্যু তারেই। টানে,
মৃত্যু যারা। বুক পেতে লয়॥ বাঁচতে তারাই। জানে।
—চিঠি, পূরবী ; রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দটিরও unit বা ব্যষ্টি হচ্ছে সিলেবল্ বা স্বর। সুতরাং এটি স্বরবৃত্ত ছন্দ। এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে চোদ্দটি ক'রে স্বর-ব্যষ্টি (syllabic unit) আছে এবং আট স্বরের পরে অর্দ্ধ-যতি ও পংক্তির শেষ প্রান্তে পূর্ণ-যতি রয়েছে। সুতরাং এটিকে স্বরবৃত্ত পয়ার বল্‌তে পারি। পূর্ব্বে বলেছি ঈষদ্-যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছন্দ-পংক্তির অংশকে বলা যায় **'পর্ব্ব'**। কিন্তু অর্দ্ধ-যতির দ্বারা বিভক্ত ছন্দ-পংক্তির অংশকে কি বলা যাবে? ওই রকম অংশকেই বলা যায় ছন্দের **'পদ'**। ঈষদ-যতি ও অর্দ্ধ-যতির বিভাগ অনুসারে ছন্দ-পংক্তিকে 'পর্ব্ব' ও 'পদে' বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। ছন্দের 'পদ'-বিভাগ আছে ব'লেই ছন্দোবদ্ধ রচনার নাম হয়েছে 'পদ্য'।

মৃত্যু যারা। বুক পেতে লয়॥ মরতে তারাই। জানে

এই পংক্তিটিকে ঈষদ্-যতি ও পর্ব্ব-বিভাগের দিক্ থেকে বল্‌ব 'অপূর্ণ-চৌপর্ব্বিক'; শেষ পর্ব্বে ছু'টি স্বর বা সিলেবল্ কম আছে। আবার অর্দ্ধ-যতি ও পদ-বিভাগের দিক্ থেকে এই পংক্তিটিকে বলা যায় অপূর্ণ-দ্বিপদী; দ্বিতীয় পদে আটটি স্বর নেই ব'লে এ পদটি পূর্ণ নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে এখানে একেকটি পদে ছু'টি ক'রে পর্ব্ব আছে। বাংলা কবিতায় এ রকম দ্বিপর্ব্বিক পদই বেশী প্রচলিত। কিন্তু ত্রিপর্ব্বিক পদও আজকালকার ছন্দে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

মন্ত্র-জাঁতায়। পরাণ কাঁদায়,॥
ফিরি ধনের। গোলক-ধাঁধায়॥
শূন্যতারে। সাজাই নানা। সাজে।
—মাটির ডাক, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটি ছন্দ-হিসেবে স্বরবৃত্ত এবং ছন্দোবন্ধ-হিসেবে ত্রিপদী। অতএব এটিকে স্বরবৃত্ত ত্রিপদী বল্‌তে পারি। প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পরে অর্দ্ধ-যতি এবং তৃতীয় পদের পরে পূর্ণ-যতি রয়েছে। প্রথম ছু'টি পদে ছু'টি ক'রে পূর্ণ পর্ব্ব রয়েছে; এ ছু'টি দ্বিপর্ব্বিক পদ। কিন্তু তৃতীয় পদে ছু'টি পূর্ণ পর্ব্ব ও একটি অর্দ্ধ পর্ব্ব আছে; তাই এটিকে

অপূর্ণ-ত্রিপর্ব্বিক বা সার্দ্ধ-দ্বিপর্ব্বিক পদ বল্‌তে পারি। অর্দ্ধ-যতির বিভাগ অনুসারে এই শ্লোকাংশটিকে বলা যাবে ত্রিপদী ; কিন্তু ঈষদ-যতির বিভাগ অনুসারে এটিকে বল্‌তে হবে অপূর্ণ সপ্ত-পর্ব্বিক। এবার একটি স্বরবৃত্ত চৌপদীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আমার প্রিয়ার। মুগ্ধ দৃষ্টি॥
করুচে ভুবন। নূতন সৃষ্টি॥
মৃচকি হাসির। সুধার বৃষ্টি॥
চল্‌চে আজি। জগৎ জুড়ে।
—অতিবাদ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এ দৃষ্টান্তটির চারটি পদেই দুটি ক'রে পর্ব্ব আছে। সুতরাং এটিকে দ্বিপর্ব্বিক চৌপদী ব'লে পরিচয় দেওয়া যায়। একটি ত্রিপর্ব্বিক চৌপদীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

পাকা সে ফল। পড়্‌লো মাটির। টানে॥
শাখা আবার। চায়কি তাহার। পানে?॥
বাতাসেতে। উড়িয়ে-দেওয়া। গানে॥
তারে কি আর। স্মরণ করে। পাখী?
—দান, পূরবা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে চার পদেই দুটি ক'রে পূর্ণ পর্ব্ব ও একটি অর্দ্ধ পর্ব্ব রয়েছে। সুতরাং এটিকে অপূর্ণ-ত্রিপর্ব্বিক বা সার্দ্ধ-দ্বিপর্ব্বিক চৌপদী ব'লে অভিহিত করা যায়। মনে রাখা উচিত যে পয়ার (বা দ্বিপদী), ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দের নাম নয়, ছন্দোবন্ধের নাম।

আর দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আশা করি উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণ-প্রণালী থেকেই ছন্দ-পংক্তিকে ঈষদ্-যতি ও অর্দ্ধ-যতির সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে পর্ব্ব ও পদে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে।

যতির প্রকারভেদ এবং পর্ব্ব ও পদ-বিভাগের উপলক্ষ্যে আমি বহুবার 'ছন্দ-পংক্তি' কথাটা ব্যবহার করেছি। ছন্দের আলোচনায় 'পংক্তি' বল্‌তে ঠিক কি বোঝায় তা বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার।

আমাদের আলোচনা থেকে একথা আশা করি বোঝা গেছে যে, একেকটি ঈষদ্-যতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ধ্বনি-সমষ্টির নাম হচ্ছে পর্ব্ব, অর্দ্ধ-যতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন ধ্বনিশ্রেণীর অংশকেই বলেছি পদ, আর তেমনি ধ্বনি-গতির সূচনা থেকে ওই গতির পূর্ণ-বিরতি বা যতি পর্য্যন্ত যে ধ্বনিশ্রেণী তারই নাম 'ছন্দ-পংক্তি'। 'ছন্দ-পংক্তি' কথাটাকে আমি একটা পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করুছি; প্রচলিত অর্থের ছত্র বা লাইন শব্দ থেকে পংক্তি কথাটির পার্থক্য রক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ পদ্যের একটি ধ্বনি-শ্রেণীকে দুই বা ততোধিক 'ছত্রে' সাজিয়ে লেখা হ'লেও ছন্দের আলোচনায় তাকে এক 'পংক্তি' ব'লেই গণ্য করতে হবে। গতির আরম্ভ থেকে পূর্ণ-বিরতি পর্য্যন্ত ধ্বনি-শ্রেণীটি যদি নাতিদীর্ঘ হয় তবে তাকে এক লাইনেও লেখা যায়, আবার দু-তিন সারে সাজিয়েও লেখা যায়, তাছাড়া দীর্ঘত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি যে-সব ছন্দোবন্ধে ওই ধ্বনি-শ্রেণীটি অতি দীর্ঘ সে-সব স্থলে ওটিকে দুই, তিন কিংবা চার সারে সাজিয়ে লেখা ছাড়া পদ্যের চাক্ষুষ আকৃতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যত সার বা ছত্রেই লেখা হোক্ না কেন গতির প্রারম্ভ থেকে পূর্ণবিরতি পর্য্যন্ত সমগ্র ধ্বনি-শ্রেণীটিকে একটি ছন্দ-পংক্তি ব'লে গণ্য করাই ছন্দের আলোচনার পক্ষে সঙ্গত ও সুবিধাজনক। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দুঃখের। বরষায়॥ চক্ষের। জল যেই॥ নাম্‌ল
—১, গীতালি, রবীন্দ্রনাথ

এই ধ্বনি-শ্রেণীটি ঈষদ্-যতির দ্বারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছে ; সুতরাং এটি পঞ্চপর্ব্বিক। আবার অর্দ্ধ-যতির দ্বারা তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে ব'লে একে ত্রিপদী বল্‌ব। এখানে এই ধ্বনি-শ্রেণীটিকে এক সারেই লেখা হয়েছে বটে ; কিন্তু অর্দ্ধ-যতির বিভাগ অনুসারে এটিকে তিন সারে সাজিয়েও লেখা যায়। কিন্তু যেভাবেই লেখা হোক্ না কেন, এই ধ্বনি-শ্রেণীটিকে একটিমাত্র 'ছন্দ-পংক্তি' ব'লেই অভিহিত করব। পূর্ব্বে স্বরবৃত্ত ত্রিপদীর যে-দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে সেটি তিন সারে লিখিত হ'লেও এক পংক্তি ব'লেই গণ্য হবে। আর স্বরবৃত্ত চৌপদীর দৃষ্টান্ত দুটিও চার চার লাইনে লিখিত হয়েছে ; তথাপি ছন্দের আলোচনায় এগুলিকে একেক পংক্তি ব'লেই গণ্য করব।

ছন্দ-পংক্তির যে-সংজ্ঞা দেওয়া গেল তার ব্যতিক্রম-গুলির কথাও এস্থলে বলা প্রয়োজন। অধিকাংশ ছন্দেই পংক্তির শেষ প্রান্তে পূর্ণ-যতি স্থাপিত হয়। এর দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন কতকগুলি ছন্দ আছে যাতে ঈষদ্-যতি, অর্দ্ধ-যতি ও পূর্ণ-যতির স্থাপনরীতি

নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট নয়; এবং এক ছত্রে সাজানো ধ্বনি-শ্রেণীর শেষ প্রান্তে পূর্ণ-যতি স্থাপিত হওয়া আবশ্যিক নয়, বরং ওই ধরণের ছন্দে লাইন বা ছত্রের শেষে পূর্ণ-যতি স্থাপন না-করাই ও-ছন্দের রীতি। ওসব ছন্দে ছত্রের শেষ প্রান্তে পূর্ণ-যতির পরিবর্ত্তে অর্দ্ধ-যতি এবং এমন কি ঈষদ্-যতিও স্থাপিত হ'তে পারে; আবার ছত্রের মধ্যেও যে-কোনো পর্ব্ব বা পর্ব্বার্দ্ধের পরেই অর্দ্ধ-যতি বা পূর্ণ-যাতি স্থাপিত হ'তে পারে। এ-সব ছন্দে ধ্বনির গতি প্রতি-ছত্রের নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম ক'রে ছত্রের পর ছত্রে প্রবাহিত হ'তে থাকে এবং প্রয়োজন অনুসারে ছত্রের প্রান্তে কিংবা মধ্যেও ধ্বনি-গতি বিরত হ'তে পারে। যে-সব ছন্দে এ-ভাবে ছত্রের অন্তে পূর্ণ-যতি থাকা আবশ্যিক নয় সে-সব ছন্দকে আমি বলেছি **'প্রবহমান'** ছন্দ। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "লাইন-ডিঙোনো চাল" তাকেই আমি বলেছি 'প্রবহমানতা'। এই প্রবহমানতা বা "লাইন-ডিঙোনো চাল"-টাকেই ফরাসী ভাষায় বলা হয় 'enjambement'। ও-শব্দটার ইংরেজী রূপ হচ্ছে enjambment। যা হোক্, এই প্রবহমান ছন্দেও যে ধ্বনি-শ্রেণী একছত্রে সাজানো থাকে তাকেও আমি 'পংক্তি' নামেই অভিহিত করব, কেন-না, প্রবহমান ছন্দের ছত্রকে ইচ্ছামত ভেঙে্রে দু-তিন সারে সাজিয়ে লেখা চলে না, তাই এ-সব ছন্দের একেকটি সার বা ছত্রকে একেক 'পংক্তি' ব'লে অভিহিত করলে অর্থের বিভ্রাট ঘটার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রবহমান ছন্দের পংক্তিগুলিকে বলতে পারি প্রবহমান বা 'অ-যতিপ্রান্তিক পংক্তি' (run on বা unstopt lines); কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এই প্রবহমান পংক্তির অন্তে পূর্ণ-যতি থাকা আবশ্যিক না হ'লেও একটি ক'রে অর্দ্ধ বা ঈষদ্-যতি থাকা প্রয়োজন। আর যে-সব ছন্দ প্রবহমান নয় সে-সব ছন্দের পংক্তিগুলিকে শুধু 'পংক্তি' বা 'যতি-প্রান্তিক পংক্তি' (end stopt lines) বলতে পারি।

৪

বাংলা ছন্দকে আমি ধ্বনি-ব্যষ্টি বা unit-এর প্রকৃতিভেদে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ওরফে 'অক্ষরবৃত্ত' এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। ছন্দের এই তিন ধারার মধ্যে শুধু যৌগিক ও স্বরবৃত্ত ধারাতেই প্রবহমান ছন্দোবন্ধ রচনা করা সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যেও শুধু দ্বিপদী অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দোবন্ধকেই প্রবহমান আকার দেওয়া হ'য়ে থাকে। ইংরেজীতে যেমন শুধু Iambic pentameter-এই প্রবহমান (run-on) ছন্দোবন্ধ রচনা করা যায়, বাংলাতে তেম্‌নি শুধু যৌগিক ও স্বরবৃত্ত পয়ার বা দ্বিপদীকেই প্রবহমান আকার দেওয়া হ'য়ে থাকে। বাংলা কাব্যসাহিত্যের অধিকাংশ প্রবহমান ছন্দোবন্ধ চোদ্দ ব্যষ্টির যৌগিক পয়ারেই রচিত হয়েছে। চোদ্দ unit বা ব্যষ্টির প্রবহমান যৌগিক পয়ারের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' (মানসী), 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী), 'স্বর্গ হইতে বিদায়' (চিত্রা) প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করতে পারি। এগুলি হচ্ছে স-মিল প্রবহমান যৌগিক পয়ারের দৃষ্টান্ত। যদি এ-সব প্রবহমান পয়ারের পংক্তি প্রান্তস্থিত মিলটি উঠিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লেই এ ছন্দোবন্ধ তথাকথিত 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে পরিণত হবে। অর্থাৎ অ-মিল প্রবহমান যৌগিক পয়ার আর অমিত্রাক্ষর ছন্দ একই জিনিষ। আজ পর্যান্ত বাংলায় যত অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচিত হয়েছে তার সবই চোদ্দ ব্যষ্টির অ-মিল প্রবহমান যৌগিক পয়ার। আঠারো ব্যষ্টির অমিত্রাক্ষর ছন্দ কেউ রচনা করেন নি। কিন্তু আঠারো ব্যষ্টির যৌগিক পয়ারে অর্থাৎ বর্দ্ধিত যৌগিক পয়ারে অতি সুন্দর স-মিল প্রবহমান ছন্দোবন্ধ রচিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী), 'এবার ফিরাও মোরে' (চিত্রা) প্রভৃতি কবিতার নাম করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন আঠারো 'অক্ষরের' 'দীর্ঘপয়ার' বা 'বড়ো পয়ার' তাকেই আমি বলেছি 'বর্দ্ধিত যৌগিক পয়ার'।

স্বরবৃত্ত পয়ারেও প্রবহমান ছন্দোবন্ধ রচনা করা সম্ভব। চোদ্দ স্বরের পয়ারে প্রবহমান ছন্দোবন্ধ কেউ রচনা করেছেন ব'লে মনে হয় না। আঠারো স্বরের বর্দ্ধিত পয়ারে প্রবহমানতার দৃষ্টান্তও খুব কম আছে। এরকম ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'

(পূরবী), এবং সত্যেন্দ্রনাথের 'সরযূ' (বেলা শেষের গান) এ দুটি কবিতার উল্লেখ করতে পারি। সত্যেন্দ্রনাথের 'ইচ্ছামুক্তি' (বেলা শেষের গান) নামক আঠারো স্বরের স্বরবৃত্ত-পয়ারে রচিত সনেটটিতেও প্রবহমানতার আভাস পাই ; তাঁর 'কবির তিরোধান' (ঐ) নামক কবিতাটিতেও ওরকম আভাস আছে। যাহোক্, এস্থলে বৰ্দ্ধিত স্বরবৃত্ত-পয়ারের প্রবহমানতার দুষ্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) যারা আমার সাঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা ; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের পরে আমার প্রাণের ঝর্‌ণা নিলো তুলি ;
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু,
নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাস বায়ু।
পূরবী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

(২) ধাত্রী তুমি সম্রাটেদের ; সরিৎ-স্রোতে সাগর-ঢেউএর ফেনা
উথ্‌লাতে বল ধরে যারা, তেমন ছেলে পুষ্‌লে বারম্বারই
পীযষদানে। কবির গানে অমর যারা, যারা সবার চেনা,
মানুষ হ'ল তোমার স্নেহে তারা সবাই জৈত্র-ধনুর্ধারী।
—সরযূ, বেলাশেষের গান, সত্যেন্দ্রনাথ

যৌগিক বা স্বরবৃত্ত পঁয়ারে রচিত প্রবহমান ছন্দোবন্ধকে বল্‌তে পারি 'সম-পংক্তিক' প্রবহমান ছন্দ ; কেন-না, এজাতীয় ছন্দোবন্ধে প্রতি পংক্তির দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ব্যষ্টি-সংখ্যা, চোদ্দ বা আঠারো, কবিতার আদ্যন্ত সর্ব্বত্রই সমান থাকে কিন্তু দ্বিতীয় আরেক প্রকার প্রবহমান ছন্দোবন্ধ আছে যাতে প্রতি পংক্তির দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ ব্যষ্টি-সংখ্যার সমতা রক্ষিত হয় না। এ-জাতীয় ছন্দোবন্ধকে বলতে পারি **'অসম-পংক্তিক'** প্রবহমান ছন্দোবন্ধ। এই অসমপংক্তিক প্রবহমান ছন্দোবন্ধকেই আমি **'মুক্তক'** নামে অভিহিত করেছি। কেন-না এজাতীয় ছন্দোবন্ধে সুনির্দ্দিষ্টরূপে নিয়মিত যতি-স্থাপন, পরিমিত পদ-গঠন এবং পংক্তি-দৈর্ঘ্যের বন্ধন থেকে ছন্দের সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকায়' যৌগিক মুক্তক এবং তাঁর 'পলাতকা'য় স্বরবৃত্ত মুক্তকের প্রবর্ত্তন হয়েছে, একথা সকলেই জানেন। 'বলাকা'র মুক্তকগুলিতে পংক্তিপ্রান্তে মিল রয়েছে। কাজেই এগুলিকে বলব স-মিল মুক্তক। অ-মিল মুক্তকের একমাত্র নিদর্শনরূপে রবীন্দ্রনাথের 'নিস্ফল কামনা' নামক কবিতাটির (মানসী) উল্লেখ করা যেতে পারে। (সমপংক্তিক ও অসমপংক্তিক প্রবহমান ছন্দের বিশদতর আলোচনা 'জয়ন্তী-উৎসর্গ,' ৮২-৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

৫

পদ্যের ঈষদ্-যতি, অর্দ্ধ-যতি ও পূর্ণ-যতির সঙ্গে গদ্যের কমা, সেমিকোলন ও দাঁড়ি বা full•stop, এই তিনটি বিরাম-চিহ্নের যথাক্রমে তুলনা করলেই ওই যতি-তিনটির আসল প্রকৃতিটি বোঝা যাবে। গদ্যের ন্যায় পদ্যেও এই বিরাম-চিহ্ন তিনটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, ওই চিহ্ন-তিনটি শুধু ভাবগত যতিকেই নির্দ্দেশ করে, ছন্দোগত যতিকে নয়। ভাব যেখানে বিরত হয় ছন্দের ধ্বনি সেখানে বিরত নাও হ'তে পারে, আবার ছন্দের ধ্বনি যেখানে বিরত হয়েছে ভাবের প্রবাহ সেখানে স্তব্ধ না হ'তেও পারে। সুতরাং পদ্যরচনায় কমা, সেমিকোলন ও দাঁড়ি যথাক্রমে ঈষদ্-যতি অর্দ্ধ-যতি ও পূর্ণ-যতির নির্দ্দেশক নয়। ওই চিহ্ন তিনটি ভাবগত ঈষদ্-বিরতি, অর্দ্ধ-বিরতি ও পূর্ণ-বিরতিকে নির্দ্দেশ করে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

চিন্তা দিতেম। জলাঞ্জলি, ॥ থাক্‌তো নাকো। ত্বরা,
মৃদু পদে। যেতেম, যেন ॥ নাইকো মৃত্যু। জরা।
— সেকাল, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে ভাবের ঈষদ্-বিরতি-সূচক তিনটি কমা-চিহ্ন আছে। কিন্তু ওই তিন স্থলে ছন্দের ঈষদ্-যতি নেই। প্রথম কমাটি যেখানে আছে সেখানে রয়েছে ছন্দের অর্দ্ধ-যতি ; আর দ্বিতীয় কমাটির স্থানে ছন্দের পূর্ণ-যতি রয়েছে; কিন্তু তৃতীয় কমাটির স্থানে ছন্দে কোনো যতি, এমন কি ঈষদ্-যতিও নেই। অথচ যেখানে ছন্দোগত ঈষদ্-যতি, অর্দ্ধ-যতি ও পূর্ণ-যতি ঘটেছে সে-সব স্থলে কমা, সেমি-কোলন ইত্যাদি নেই।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই কথাগুলি শুধু অপ্রবহমান ছন্দের প্রতিই প্রযোজ্য, প্রবহমান ছন্দের প্রতি নয়। প্রবহমান ছন্দোবন্ধে যে-সব স্থলে কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি চিহ্ন থাকে সে-সব স্থলে অধিকাংশ সময়ই ছন্দোগত কোনো একপ্রকার যতি থাকে। পংক্তির প্রান্তে কিংবা

মধ্যে যে কোনো স্থলেই দাঁড়ি-চিহ্ন থাকে, পূর্ণ-যতিও সেখানেই থাকে; সেমিকোলনের দ্বারা পূর্ণ-যতি বা অর্দ্ধ-যতি সূচিত হয়; আর কমা-চিহ্ন ঈষদ্-যতি বা অর্দ্ধ-যতিকে নির্দ্দেশ করে। এরূপ হবার কারণ এই যে, প্রবহমান পদ্য ছন্দ গদ্য ছন্দের অনেকটা কাছাকাছি ও সমধর্ম্মী; এবং সে জন্যেই প্রবহমান ছন্দ ধ্বনি-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যধর্ম্মী ভাব-প্রবাহকেও অনুসরণ ক'রে থাকে। এই জন্যেই মহাকাব্যে বিশেষতঃ নাট্যকাব্যে প্রবহমান ছন্দের এত উপযোগিতা। দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে প্রবহমান ছন্দ শুধু গদ্যধর্ম্মী ও ভাবানুসারীই নয়, ধ্বনি-প্রবাহের গতি ও যতি রক্ষা ক'রে চলাও তার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাই এ ছন্দোবন্ধে কমা সেমিকোলনে ঈষৎ অর্দ্ধ বা পূর্ণ যতি থাকা যেমন প্রয়োজন, স্থানবিশেষে ও-সব চিহ্ন না থাকলেও যতি স্থাপন আবশ্যক। তবে যে-সব স্থলে ভাবগত ও ছন্দোগত যতির সমন্বয় ঘটে, সে-সব স্থলে একটু বৈচিত্র্য হয়।

বলেছিনু "ভুলিব না," যবে তব ছল-ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হ'লো। সেদিনের চুম্বনের পরে
কত নব বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোত-কাকলি
তারি পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এলো গেলো চলি'
কতদিন ফিরে ফিরে।
—কৃতজ্ঞ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এই আঠারো ব্যষ্টির যৌগিক প্রবহমান পয়ারটিকে যথারীতি আবৃত্তি ক'রে পড়লেই টের পাওয়া যাবে, ধ্বনি-প্রবাহ ও ভাব-প্রবাহ কেমন চমৎকার ভঙ্গীতে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে পরস্পর পাশাপাশি চলেছে। ধ্বনি-প্রবাহের গতি ও যতির একটা স্বকীয় ভঙ্গী আছে, অথচ সর্ব্বত্রই সে ভাবের গতিও যতিকে অনুসরণ ক'রে চলেছে, কোথাও তাকে লঙ্ঘন ক'রে চল্‌ছে না। অ-প্রবহমান ছন্দে এমন হয় না; কেন-না, সেখানে ধ্বনিরই প্রাধান্য, ভাব ধ্বনির অনুগামী মাত্র; কাজেই ধ্বনির গতি ও যতি ভাবের গতি ও যতিকে লঙ্ঘন ক'রে যেতে পারে। একটু পূর্ব্বে 'ক্ষণিকা' থেকে যে দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত করেছি তাতেই একথা প্রমাণিত হয়েছে।

৬

এবার বাংলা ছন্দের যতি ও পংক্তি-বিভাগগুলির সঙ্গে ইংরেজী ও সংস্কৃত ছন্দের যতি ও পংক্তি-বিভাগের তুলনা করা যাক। ইংরেজী ছন্দশাস্ত্রে যতি বা pause-এর প্রকারভেদ স্বীকার করা হয়। ওই শাস্ত্রে যতিকে অবস্থিতি-অনুসারে প্রান্তবর্ত্তী (final) ও মধ্যবর্ত্তী (internal বা middle), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অপ্রবহমান ইংরেজী ছন্দের পংক্তিপ্রান্তবর্ত্তী যতিটি পূর্ণ-বিরতি-সূচক ব'লে ওই অন্তিম যতিটিকে অনেক সময় দীর্ঘ-যতি বা strong pause ব'লে অভিহিত করা হয়। পংক্তিমধ্যবর্ত্তী-যতির দ্বারা সমগ্র পংক্তিটি খণ্ডিত হয়ে যায় ব'লে ওই মধ্য-যতিটিকে অনেক সময় গ্রীক্‌পরিভাষা অনুসরণ ক'রে ছেদ-যতি বা caesura বলা হ'য়ে থাকে। কালব্যাপ্তির দিক থেকে এই মধ্য-যতি বা ছেদ-যতিটির বিশেষ কোনো নাম নেই। ধ্বনি-প্রবাহের যে ঈষৎ বিরতির দ্বারা পংক্তি-পর্ব্ব গঠিত হয় তারও কোনো নাম নেই, এমন কি তাকে যতি ব'লে গণ্যই করা হয় না। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

Ring out । the feud ॥ of rich । and poor,
Ring in । re-dress ॥ to alĺ । man-kind.
—Tennyson.

এটি অন্ত্যগুরু দ্বিস্বর চৌপর্ব্বিক (iambic tetrameter) ছন্দ। এখানে প্রতি পংক্তির শেষেই একটি ক'রে অন্ত্য-যতি আছে; আর দ্বিতীয় পর্ব্বের পরে রয়েছে মধ্য-যতি বা ছেদ-যতি। প্রথম-দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়-চতুর্থ পর্ব্বের মধ্যে ধ্বনি-প্রবাহের যে ছেদ রয়েছে তাকে ইংরেজীতে যতি ব'লে গণ্য করা হয় না; বাংলার পদ্ধতিতে এটিকে আমরা ঈষৎ-যতি বা weak pause বল্‌তে পারি। অন্ত্য-যতিটিকে কাল-ব্যাপ্তির দিক্ থেকে দীর্ঘ-যতি বা strong pause বলা হয়; অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের কথিত পূর্ণ-যতির স্থানীয়। কিন্তু মধ্য-যতিটিকে কালব্যাপ্তির দিক থেকে কিছু বলা হয় না। আমরা এটিকে কালব্যাপ্তির দিক্ থেকেও মধ্য-যতি (medial pause) বল্‌তে পারি, কারণ কাল পরিমাণ হিসেবে এটি ঈষদ্-যতি ও দীর্ঘ-যতির মধ্যবর্ত্তী।

ইংরেজী ছন্দ-শাস্ত্রে একেকটি পর্ব্বকে বলা হয়,

measure বা 'প্রমাণ'', কারণ ওই পর্ব্বের দ্বারাই সমগ্র পংক্তিটা 'প্রমিত' হ'য়ে থাকে। বস্তুত ওই পর্ব্বের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় ব'লেই ছন্দের নাম হয়েছে metre। ওই measure বা পর্ব্বেরই আরেকটি নাম হচ্ছে foot অর্থাৎ পদ। কিন্তু লাইনের মধ্যবর্ত্তী ছেদ-যতির (caesura-র) দ্বারা বিচ্ছিন্ন পংক্তি খণ্ডকে ইংরেজী ছন্দ-শাস্ত্রে কোনো নাম দেওয়া হয় না। কারণ ইংরেজী ছন্দে ওই ছেদ-যতিটির অবস্থানের কোনো নির্দ্দিষ্ট রীতি নেই; এটি পংক্তির মধ্যস্থলে কিংবা অন্য যে-কোনো পর্ব্বের মধ্যে কিংবা প্রান্তে স্থাপিত হ'তে পারে। তাই ছেদ-যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন পংক্তি-খণ্ডের কোনো নির্দ্দিষ্ট আয়তন নেই; ফলে ছন্দ-শাস্ত্রে ওরকম পংক্তি-খণ্ডের বিশেষ নাম-করণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। কিন্তু বাংলায় অর্দ্ধ-যতিটির অবস্থান নির্দ্দিষ্ট এবং তাই ওটির দ্বারা বিচ্ছিন্ন পংক্তি-খণ্ডটি পরিমিত ও সুনির্দ্দিষ্ট। বস্তুত, ওরকম পংক্তি-খণ্ডের দ্বারাই বাংলা ছন্দ-পংক্তি গঠিত ও প্রমিত হ'য়ে থাকে; তাই ওই পংক্তিখণ্ডকে একটি বিশেষ নাম দেওয়া প্রয়োজন। অর্দ্ধ-যতির দ্বারা খণ্ডিত পংক্তিচ্ছেদকে 'পদ' বলা হয়েছে। আর তাতেই ছন্দ-পংক্তিকে ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি আখ্যা দেওয়ার সার্থকতা। বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'পর্ব্ব'কে measure এবং 'পদ'কে foot ব'লে ও-দুটি শব্দের পার্থক্য রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

৭

সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে এককেটি শ্লোককে চারটি 'পদ', পাদ বা চরণে বিভক্ত করা হয়। ছন্দ-শাস্ত্রকার গঙ্গাদাস তাই "পদ্যং চতুষ্পদী" (ছন্দোমঞ্জরী, ১।৪) এই কথা ব'লে গ্রন্থারম্ভ করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় পদ বা পাদ শব্দে যেমন 'চরণ' বোঝায়, তেমনি ওই শব্দের দ্বারা কোনো পদার্থের চতুর্থাংশকেও বোঝায়। তাই শ্লোকের পদ বা পাদ বলতে যেমন ছন্দের চরণ বুঝি, তেমনি শ্লোকের চতুর্থাংশও বুঝি। বাংলায় 'পদ' শব্দে শ্লোকাংশ বোঝায় বটে, কিন্তু শ্লোকের চতুর্থাংশই বোঝায় না। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ও বাংলা 'পদ' শব্দের পার্থক্য আরও বেশী। বাংলায় 'ছন্দ-পংক্তি'র যে-সংজ্ঞা দিয়েছি সংস্কৃত ছন্দে 'পদ' শব্দের সেই সংজ্ঞা। অর্থাৎ উভয়ত্রই গতির প্রারম্ভ থেকে পূর্ণ-বিরতি পর্য্যন্ত সমগ্র ধ্বনি-শ্রেণীটাকেই বোঝায়। তফাৎ এই যে, বাংলা ছন্দ-পংক্তিকে অবস্থাবিশেষে ভেঙে দুই বা ততোধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা চলে; আর সংস্কৃত ছন্দে অবস্থা-বিশেষে দুটি পদকে এক ছত্রে লেখা হ'য়ে থাকে, বিশেষত অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ প্রভৃতি যে-সব ছন্দের পদের দৈর্ঘ্য বেশী নয়।

সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে জিহ্বার অভীষ্ট বিরাম স্থানকেই 'যতি' বলা হয়। যতির্জিহ্বেষ্টবিরামস্থানম্ (ছন্দো-মঞ্জরী, ১।১৮); রসজ্ঞা-বিরতি-স্থানং কবিভির্যতিরুচ্যতে (শ্রুতবোধ, ৪)। কিন্তু কোথায় রসনার বিরতি ঘটবে সে-কথাও বহু ছন্দোবন্ধের সংজ্ঞার মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট আছে। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে কালব্যাপ্তি অনুসারে যতির প্রকারভেদ স্পষ্টত স্বীকৃত হয় না। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দেও যে কাল-ব্যাপ্তি অনুসারে যতির তারতম্য আছে, তার আভাস পাওয়া যায় পিঙ্গল-ছন্দঃ সূত্রের টীকাকার হলায়ুধের * টীকায় উদ্ধৃত একটি শ্লোক থেকে। সে শ্লোকটি হচ্ছে এই।—

> যতিঃ সর্ব্বত্র পাদান্তে শ্লোকার্দ্ধে চ বিশেষতঃ।
> সমুদ্রাদিপদান্তে চ ব্যক্তাব্যক্তবিভক্তিকে॥
> —পিঙ্গলছন্দস্সূত্রম্, ৬।১

এই বিধানটি থেকে মনে হয় শ্লোকের, বিশেষত অনুষ্টুপ ছন্দের, প্রথম পদের পরবর্ত্তী যতিটির চেয়ে দ্বিতীয় পদের পরবর্ত্তী যতিটি অধিকতর স্থায়ী। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

> মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্। অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
> যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদ্ একম্। অবধীঃ কামমোহিতম্॥

এই অনুষ্টুপ শ্লোকটির দুটি ক'রে পদ এক লাইনে সাজানো হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া

* বাংলা দেশের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রের টীকাকার হলায়ুধ এবং লক্ষ্মণসেনের (খৃঃ ১১৭৮—১২০৫) সভাপণ্ডিত ও 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা হলায়ুধ একই ব্যক্তি। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের ধারণা অন্যরকম। তাঁদের মতে ছন্দঃ-সূত্রের টীকাকার হলায়ুধ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের (খৃঃ ৯৪০-৬২) সমসাময়িক। এই হলায়ুধ ছিলেন একজন বৈয়াকরণিক-কবি; তাঁর কাব্যের নাম 'কবি-রহস্য'। 'অভিধান-রত্নমালা' নামে তাঁর একখানি শব্দকোষও পাওয়া গেছে।

যাবে যে, প্রথম পদের পরবর্ত্তী যতিটির স্থিতিকাল দ্বিতীয় পদের পরবর্ত্তী যতিটির চেয়ে কম। অর্থাৎ প্রথমটি অর্দ্ধ-যতি, দ্বিতীয়টি পূর্ণ-যতি। অনুষ্টুপ ছন্দে পদমধ্যবর্ত্তী যতি অর্থাৎ ছেদ-যতি নেই। অন্যান্য সংস্কৃত ছন্দে মধ্য-যতি বা ছেদ-যতির বহুল প্রয়োগ আছে। যথা—

কশ্চৈকান্তং। সুখমুপনতং। দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছ-। ত্যুপরি চ দশা। চক্রনেমিক্রমেণ।
মেঘদূত, উত্তরমেঘ

এটি হচ্ছে সতেরো 'অক্ষর' অর্থাৎ সিলেবল্-এর মন্দাক্রান্তা ছন্দের দুটি পদ। শাস্ত্রানুসারে এ ছন্দের প্রতি পদে যথাক্রমে চার, ছয় এবং সাত অক্ষরের পরে যতি স্থাপিত হয়। উক্ত দৃষ্টান্তের প্রত্যেকটি পদ তিনটি যতির দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যাবে যে, প্রথম দুটি যতির চেয়ে তৃতীয় যতিটির স্থিতিকাল দীর্ঘতর। অর্থাৎ মধ্য বা ছেদ-যতি দুটিকে যদি বলি লঘু-যতি তবে অন্ত্য-যতিটিকে গুরু-যতি বল্‌তে পারি। যাহোক এই যতি-তিনটির দ্বারা বিচ্ছিন্ন পদের বিভাগ-তিনটিকে কি নাম দেওয়া যায়? সংস্কৃত ছন্দোবিৎরা কোনো নাম দেন নি। এক্কেকটি ছত্রের সমগ্র ধ্বনি-শ্রেণীটাকেই যখন পদ বলা হয়েছে তখন ঐ বিভাগগুলিকে আর 'পদ' বলা সঙ্গত নয়। আমাদের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে ওই বিভাগগুলিকে 'পর্ব্ব' আখ্যা দিতে পারি। তা হ'লেই মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রত্যেকটি 'পদ'কে ত্রিপর্ব্বিক পদ এবং সমগ্র শ্লোকটাকে ত্রিপর্ব্বিক চৌপদী বল্‌তে পারি। মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রতি পদের পর্ব্বগুলি 'অক্ষর' অর্থাৎ সিলেবল্-সংখ্যা হিসেবে সমান দীর্ঘ নয়; সুতরাং এ ছন্দের পদগুলিকে অসমপর্ব্বিক পদ বলা যায়। একটা সমপর্ব্বিক পদ-ওয়ালা ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং। মুহুরনুপততি-। স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ। শরপতন ভয়াৎ। ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, প্রথম অঙ্ক

এটি হচ্ছে একুশ 'অক্ষর' বা সিলেবল্-এর স্রগ্ধরা ছন্দ। এ ছন্দের পদগুলিও মন্দাক্রান্তার পদের মত ত্রিপর্ব্বিক। তবে মন্দাক্রান্তার পদগুলি অসমপর্ব্বিক; আর এর পদগুলি সমপর্ব্বিক, কেন-না, এখানে সাত-সাত অক্ষরের পর যতি রয়েছে। একটু লক্ষ্য কর্‌লেই বোঝা যাবে যে মন্দাক্রান্তার অসমান পর্ব্বগুলিকে সমান ক'রেই স্রগ্ধরা ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে। মন্দাক্রান্তার শেষ পর্ব্বে আছে সাত অক্ষর, স্রগ্ধরাও তাই; শুধু তাই নয়, উভয়ত্রই লঘুগুরু-বিশেষে ধ্বনি-সন্নিবেশ প্রণালী অবিকল এক রকম। মন্দাক্রান্তার দ্বিতীয় পর্ব্বে আরেকটি লঘুবর্ণ বসালেই স্রগ্ধরার দ্বিতীয় পর্ব্ব তৈরি হয়। মন্দাক্রান্তার প্রথম পর্ব্ব ও স্রগ্ধরার প্রথম চারটি 'অক্ষর' অবিকল এক জিনিষ; বস্তুত মন্দাক্রান্তার প্রথম পর্ব্বে একটি লঘু ও দুটি গুরুধ্বনি যোগ কর্‌লেই স্রগ্ধরার প্রথম পর্ব্ব পাওয়া যায়। অতএব দেখা গেল মন্দাক্রান্তার প্রথম পর্ব্বে তিনটি অক্ষর এবং দ্বিতীয় পর্ব্বে একটি অক্ষর যোগ দিয়ে তিনটি অসমান পর্ব্বকে সমান ক'রেই স্রগ্ধরার সৃষ্টি হয়েছে। যাহোক, আমাদের অবলম্বিত প্রণালীতে বিশ্লেষণ কর্‌লে বলা যায় যে, স্রগ্ধরাও মন্দাক্রান্তার মত ত্রিপর্ব্বিক চৌপদী ছন্দ; শুধু পর্ব্ব-গঠনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

শিল্পী অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

"অবনী-অসিত-নন্দলালকে" কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশে যে-শিল্পিগোষ্ঠীটি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ভারতীয় চিত্র-সাধনার যে নবোদ্বোধন যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা আজ সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই শিল্পিগোষ্ঠী ও তাঁহাদের নূতন পদ্ধতি বহু বাধা বহু সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র দেশকে জয় করিয়াছে, দেশের শিল্পচর্চ্চা ও শিল্পসাধনার একটি নূতন ধারার, একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এই শিল্পি-গোষ্ঠীর শিক্ষা ও দীক্ষা লইয়া বাংলা দেশের তরুণ শিল্পিদল সিংহলে, অন্ধ্রদেশে, মান্দ্রাজে, জয়পুরে, বড়োদায়, গুজরাটে, লাহোরে, লক্ষ্ণৌয়ে যাঁহারা যেখানে গিয়াছেন, বাংলার নবোদ্বোধিত ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি সেইখানেই তাহার জয়পতাকা উড়াইয়াছে। তাহারই ফলে আজ দেশের সর্ব্বত্র জাতীয় শিল্পসাধনার এক নূতন রূপ দেখা যাইতেছে, নূতন বাণী শুনা যাইতেছে এবং সর্ব্বত্র ইহার মর্য্যাদার দাবি স্বীকৃত হইতেছে। আমাদের সদ্যপুষ্পিত জাতীয় জীবনের মূলে কি বাংলার এই নবোদ্বোধিত শিল্প-পদ্ধতি ও তাহার সাধনা অলক্ষ্যে প্রাণরসের সঞ্চার করে নাই—জাতীয় জীবনকে কি মহত্তর মর্য্যাদা দান করে নাই?

পঁচিশ বৎসর আগে অবনীন্দ্রনাথ যখন প্রথম প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া জাতীয় শিল্পসাধনার ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার সুকঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করেন, তখন বাংলার একটি প্রতিভার দুর্ব্বার শক্তি এমন করিয়া জয়যুক্ত হইবে, কে তাহা ভাবিয়াছিল? তারপর দেখিতে দেখিতে নন্দলাল, অসিতকুমার, মুকুলচন্দ্র, সমরেন্দ্রনাথ একে একে সকলে আসিয়া সেই প্রতিভার কাছে দীক্ষা লইলেন, ধীরে ধীরে রূপসাধনার এক নূতন পথ খুলিয়া গেল; বহু সাধনা বহু তপস্যার পর গুরুর সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যেরাও প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন, দেশ ও বিদেশ তাঁহাদের প্রতিভা স্বীকার করিল। কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যকলাসমিতি, ও শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত কলাভবনকে কেন্দ্র করিয়া এই নবোদ্বোধিত শিল্পসাধনা নূতন প্রাণে নূতন উৎসাহে



শ্রীঅর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপ্তি লাভ করিল। অবনীন্দ্রনাথের যোগ্যতম শিষ্য নন্দলাল শান্তিনিকেতন কলাভবনের ভার লইলেন, অসিতকুমার গেলেন লক্ষ্ণৌ সরকারী কলাভবনের অধ্যক্ষ হইয়া, সমরেন্দ্রনাথ গেলেন লাহোরে শিল্পাধ্যক্ষ হইয়া, মুকুলচন্দ্র গেলেন জাপানে চীনে য়ুরোপে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে; আজ তিনিও ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়া বসিয়াছেন।



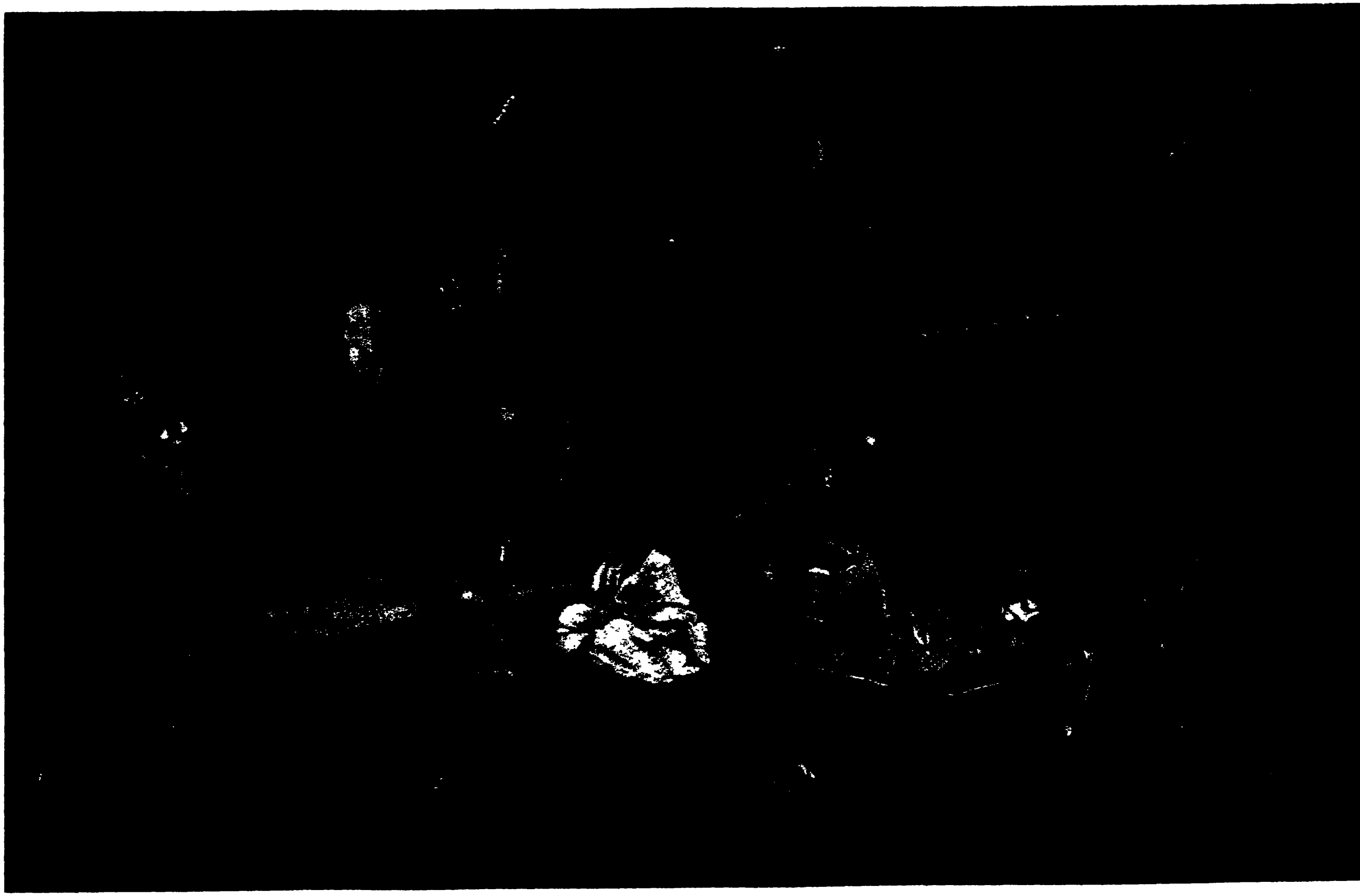
খেলার সাথী

হইতে দেন নাই। যে-পথ সহজ, যে-পথে অর্থ ও খ্যাতি সহজে আসে, যে পথ লোভসঙ্কুল, ইহাদের গুরু সে-পথে চলিতে ইহাদিগকে শেখান নাই। এই শিল্পিদলের অনেকেই তাঁহাদের গুরুর মত দারিদ্র্যব্রতী; অর্থ ও খ্যাতির লোভ ইহাদিগকে মাঝে মাঝে বিচলিত করিলেও কখনও ইহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। নন্দলাল ও শান্তিনিকেতন কলাভবনের দীক্ষা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া যাঁহারা বাংলার বাহিরে এই নূতন শিল্পসাধনার বাণী প্রচার করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সংখ্যায় খুব বেশী না হইলেও এবং সুপ্রচুর প্রতিষ্ঠা-গৌরবের অধিকারী না হইলেও যেখানে যিনি গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার ব্রত তিনি সার্থক করিয়া আসিয়াছেন, এবং নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে দুর্জ্জয় প্রতিভার সাহায্যে নূতন শিল্পসাধনার ধারাটিকে সুমহান্ গৌরবে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। শিল্পসাধনা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত-বর্ষে। যে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি হইয়াছে, কলিকাতা ও শান্তিনিকেতনের এই শিল্পিগোষ্ঠী রহিয়াছে তাহার মূলে।

শিল্পের বাণী বাংলার বাহিরে বহন করিয়া লইয়া গেলেন।

কিন্তু এই জয়স্রোত এইখানেই বন্ধ হইয়া যায় নাই। দেখিতে দেখিতে শান্তিনিকেতনে যে নবীনতর শিল্পিদল গড়িয়া উঠিল, তাঁহারাই আর এক নবীনতর জয়যাত্রার সূচনা করিলেন। অবনীন্দ্রনাথের নিকট ইহাদের মন্ত্রদীক্ষা হইলেও সাক্ষাৎভাবে ইহারা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন নন্দলালের পদপ্রান্তে। সেই স্বল্পভাষী নিরহঙ্কার ঋষিপ্রতিম শিল্পাচার্য্যের নিকট ইহারা কর্ম্মে ও জীবনে যে-শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহারা কখনও ব্যর্থ

শান্তিনিকেতন কলাভবন হইতে যাঁহারা এই বৃহত্তর বাংলা সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রভূষণ ও অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদের নাম সহজে করা যাইতে পারে। রমেন্দ্রনাথ গিয়াছিলেন মছলিপট্টমে অন্ধ্রজাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষ হইয়া, মণীন্দ্রভূষণ গিয়াছিলেন সিংহলের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-কেন্দ্রে; আর অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ গিয়াছিলেন মান্দ্রাজ থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়া। ইহারা সকলেই আজ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রমেন্দ্রনাথ কলিকাতা সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের প্রধান



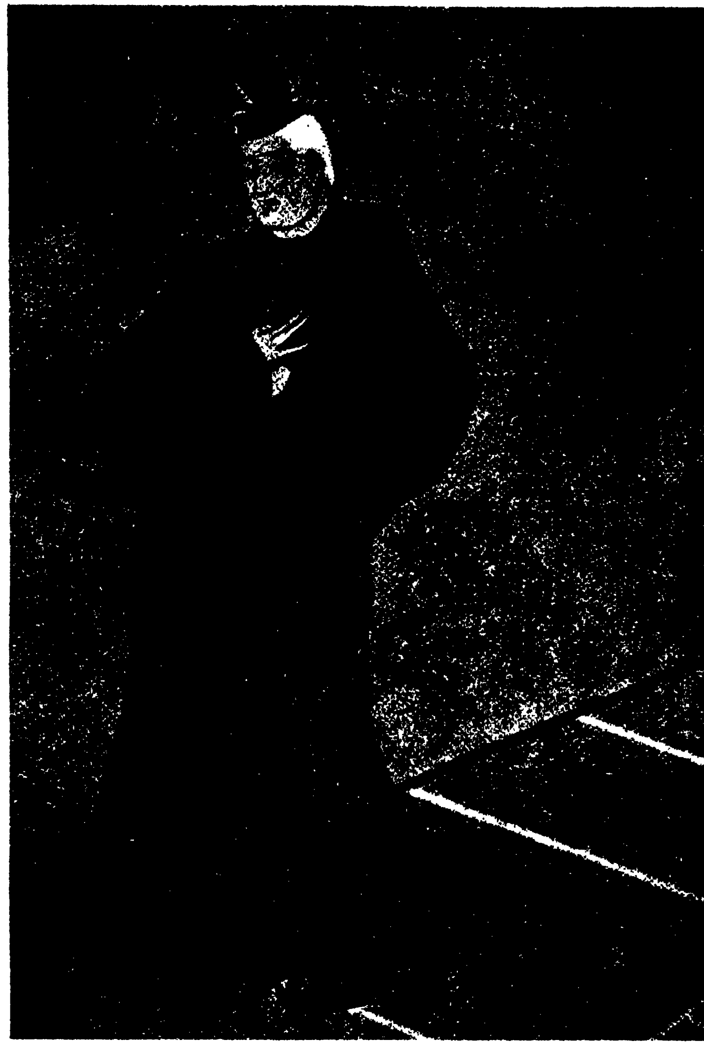
বনভোজন

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

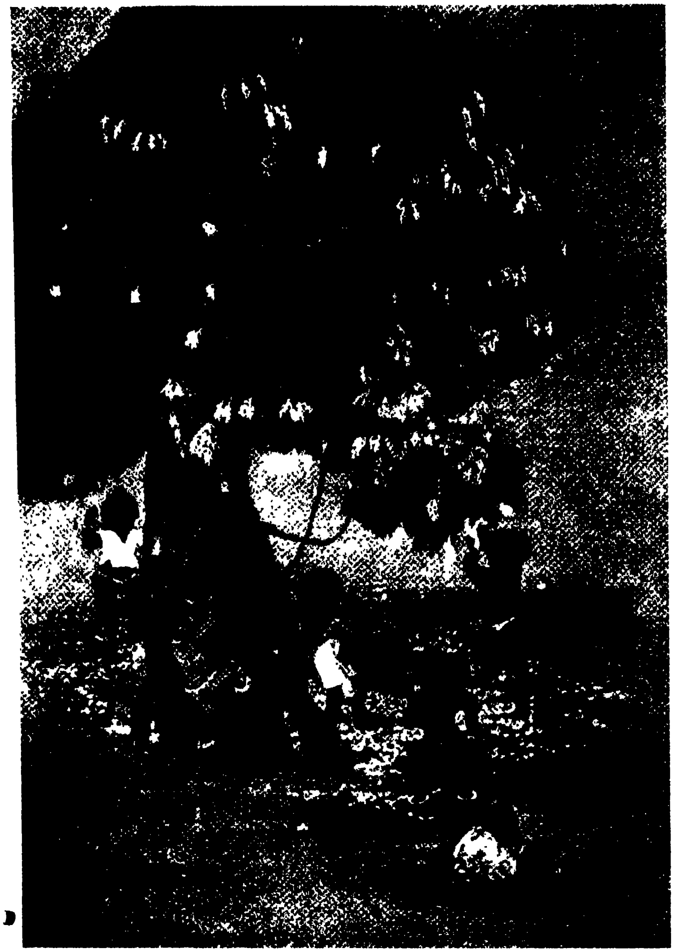
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শিক্ষক রূপে একদল শিল্পী গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন; মণীন্দ্রভূষণ রমেন্দ্রনাথকে সেই কাজে সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না থাকিয়াও দেশে যাহাতে এই নবোদ্বোধিত শিল্পসাধনার প্রচার হইতে পারে, সাধারণের শিল্পবোধ যাহাতে জাগ্রত হয়, জাতীয় শিল্প যাহাতে জাতীয় জীবনের একটি সত্য অভিব্যক্তির রূপ ধারণ করিতে পারে, তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের ছাড়াও নন্দলালের শিষ্যদের অনেকেই দেশের নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ প্রতিষ্ঠাও লাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণের নাম করা যাইতে পারে; দেশে ও বিদেশে তাঁহার শিল্পসাধনার আদর হইয়াছে, সম্প্রতি বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসের পরিচিত্রণের জন্য যে-চারিজন বাঙালী শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছেন, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহাদের একজন। ইঁহাদের সকলের মধ্যে অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদের শিল্পসাধনার একটা বিশেষ স্থান ও মূল্য আছে। তিনি অত্যন্ত নীরব ও শান্তধর্ম্মী কর্ম্মী এবং সহজলভ্য খ্যাতি হইতে নিজেকে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার যে-পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাঁহার চিত্রনিদর্শনের মধ্যে যে শিল্পিমন এবং কলাকৌশলের নিপুণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহার সলজ্জ গোপনতাকে অতিক্রম করিয়াছে; তাঁহার শিল্পপ্রতিভা অনাদৃত হয় নাই, সসম্ভ্রমে দেশ তাহা স্বীকার করিয়াছে।

বাল্যে ও কৈশোরে পিতার সহিত অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদকে বাংলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া নদীমাতৃক নিম্ন-বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের এবং পার্ব্বত্য আসামের অনেক স্থানেই ঘুরিতে হয়। বাংলা দেশের ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতি সেই সময় তাঁহার কবি ও শিল্পিমন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল; উদার আকাশের নীচে প্রবাহিত বিশাল পদ্মা, সারি-সারি পালতোলা নৌকা, ঘন বর্ষার পঙ্কিল জলের আবর্ত্ত, কাশগুচ্ছালঙ্কৃত নির্জ্জন তীরের হেমন্তকুহেলীবিলীন ধান্য-ক্ষেত্র, শ্যামায়মান বাংলার বনানী ও বর্ষাস্নাত পার্ব্বত্যভূমি কিশোর শিল্পিমনের উপর অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই নানারঙের মাটি, পাতা ও



চীন-সম্রাট



বসন্তোৎসব

আপনা হইতেই জাগিয়াছিল, যে সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছেন তাহাই তাঁহাকে শিল্প-সাধনার এই বিশেষ পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ প্রথম কলিকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং নিজের কর্ম্মকুশলতায় অল্পকালের মধ্যে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। পরে শান্তি-নিকেতনে যখন কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অর্দ্ধেন্দুবাবু অন্যতম প্রথম শিক্ষার্থীরূপে সেখানে প্রবেশ করেন। চিরাচরিত শিল্পপদ্ধতি ছাড়িয়া নূতন সাধনায় যাত্রার পথে তাঁহাকে কম বাধা অতিক্রম করিতে হয় নাই; শুধু রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের উৎসাহ ও পোষকতায় এবং নিজের আন্তরিক ইচ্ছা ও অনুরাগের বলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর-কাল নন্দলালের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ উড়িষ্যায়, দাক্ষিণাত্যে এবং ভারতবর্ষের শিল্প-সাধনার তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া

ফুলের রস দ্বারা রঙীন চিত্রে তাঁহার হাত অভ্যস্ত হইয়াছিল, পরে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শিল্পবোধ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ক্রমে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহা ছাড়া, সমগ্র বাল্য ও কৈশোর তাঁহার কাটিয়াছে পূর্ব্ববাংলার যাত্রা ও বাউল কবিগান ও কথকতার রসগ্রহণে। আমাদের দেশের সাধনা ও সংস্কৃতি এই ভাবেই ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তে ও মনে সঞ্চারিত হয় এবং তাঁহার শিল্পিমন তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠে। কোনো সজ্ঞান চেষ্টায় জাতীয় মন ও সংস্কৃতি তাঁহার শিল্পের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই; ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ এবং তাঁহার ভাবধারার সহিত আত্মীয়তাবোধ তাঁহার মনের মধ্যে

অধিকতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাহার পর তিনি মান্দ্রাজে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়া যান, কিন্তু নিজের কর্ম্মপদ্ধতির সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মতানৈক্য হওয়ায় কাজ ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া আসেন, তবুও নিজের স্বাধীন মত ও পদ্ধতি বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হন নাই।

অর্দ্ধেন্দুবাবুর ছবির মধ্যে ভাব, রং ও রেখার বিন্যাস, এবং অঙ্কনপদ্ধতির একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার শিল্পিচিত্ত বিশেষ করিয়া ভাবধর্ম্মী, তাঁহার কল্পনার ঐশ্বর্য্য প্রচুর; তাই বলিয়া কলাকৌশলের নিপুণতাও কম নয়। চিত্তবিশেষের ভাবব্যঞ্জনার জন্য

যে-রকম কলাকৌশলের নূতনত্বের প্রয়াস যখন যেমন প্রয়োজন হয়, তিনি তখন তাহাই অবলম্বন করেন ; এবং এই রকম অবস্থায় নানারকম নূতনত্বের প্রয়াসও করিয়া থাকেন, কোনো বাঁধাধরা নিয়ম তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁহার সাহস অপূর্ব্ব। দুঃখের বিষয় তাঁহার অঙ্কিত অনেক প্রসিদ্ধ ছবি দেশের বাহিরে য়ুরোপ আমেরিকার নানাস্থানে চলিয়া গিয়াছে ; মূল চিত্রের প্রতিলিপিও আর নাই, দেশে কোথাও তাহা প্রকাশিতও হয় নাই। বহুপূর্ব্বে অঙ্কিত কোনো কোনো ছবির সঙ্গে বাংলা দেশের শিল্পরসিকেরা হয়তপ রিচিত ; প্রবাসীতেও অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। পরিচিত ও প্রকাশিত ছবির মধ্যে "তৈমুরলঙ্," "চীন-সম্রাট," "নববধূ," "সাথী," "ফুলমেলা" প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

কিছুকাল যাবৎ অর্দ্ধেন্দুবাবু কলিকাতাকেই তাঁহার শিল্পসাধনার কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের জীবন-যাত্রার সকল ক্ষেত্রে যাহাতে একটা শিল্পবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা যাহাতে জাতীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠে, সেদিকে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা আছে। তাঁহার পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ সত্যই প্রশংসনীয়। শুধু চিত্রাঙ্কণে নয়, মৃণ্ময় ও ধাতু শিল্পে, লাক্ষার কাজে, কাঠ-খোদাই কাজে, বাত্তিক শিল্পে, গৃহসজ্জায় ও অলঙ্কার এবং বসনভূষণের পরিকল্পনায়ও তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ যুবক ; বিপুল তাঁহার শক্তি, অপূর্ব্ব তাঁহার উৎসাহ, যদিও তিনি একটু নীরবধর্ম্মী। বাংলা দেশের শিল্পপ্রচেষ্টায় তাঁহার মত উদ্যমশীল, শক্তিসম্পন্ন, ভাবসমৃদ্ধ, নির্লোভ যুবকেরই প্রয়োজন। বিদেশের বিচিত্র শিল্পসাধনার কেন্দ্র হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার একটা আগ্রহ তাঁহার বহুদিন হইতেই আছে। সে-সুযোগ যদি তাঁহার কখনও আসে তবে তাঁহার সমৃদ্ধ শিল্পসাধনা সমৃদ্ধতর হইবে, ইহাই আমাদের একান্ত বিশ্বাস। নিজের গোপনতা হইতে নিজেকে যদি তিনি সজোরে মুক্ত করিয়া লইতে পারেন, তবে তাঁহার সাধনা জয়যুক্ত হইবে ; দেশের কলা-লক্ষ্মীর প্রসাদ তিনি লাভ করিবেন, ইহা ধ্রুব।

জীবন-নৈবেদ্য

[*Pro Patria Mori* : Thomas Moore]

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্যে যেজন পূজিল নিত্য তোমা
সহসা যায় সে যদি চলি
বেদনার স্মৃতি আর অপরাধ-অখ্যাতির বোঝা
নীরবে পিছনে শুধু ফেলি ;
কেবল তোমারি তরে নির্ব্বিচারে বিসর্জ্জন দিল
পূর্ণপ্রাণ জীবনেরে তার
কলঙ্ক তাহার শুনি, বল দেবী, নেত্র বাহি তব
ঝরিবে কি অশ্রুজলধার ?
কাঁদিও, কাঁদিবে জানি ! বাধাহীন স্নেহবিগলিত
তোমার সে নয়নের জলে
নিঃশেষে মুছিয়া যাবে প্রচারিত শতনিন্দা মোর
শক্ররা মিলিয়া যাহা বলে।
দেবতা জানেন সত্য ; তোমারে বাসিয়াছিনু ভাল
বড় বেশী, প্রাণপণ করি,
যদিও শত্রুর দ্বারে নিত্য দোষী অপরাধী আমি,
অপরাধে পাত্র গেল ভরি।

প্রথম প্রেমের স্বপ্ন, ওগো দেবী, জীবনে আমার,
ফুটেছিল তোমারে ঘিরিয়া,
বুদ্ধির প্রত্যেক চিন্তা নিত্য মোর অন্তরের মাঝে
জেগেছিল তোমারে স্মরিয়া।
জীবনের শেষক্ষণে সর্ব্বশেষ প্রার্থনায় মোর
ঊর্দ্ধমুখে দেবতার আগে
তোমার মোহন নাম আমার নামের সনে মিশি
নিত্য যেন এক হয়ে জাগে।
তাদের পরমভাগ্য আজও যারা রহিল গো বাঁচি
দেশবন্ধু প্রেমিকের দলে
দেখিবে তাহারা সুখে গৌরবের দীপ্ত জয়টীকা
কেমনে ললাটে তব ঝলে।
আর ভাগ্যমন্ত তারা, দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদ
নিত্য ঝরে তাহাদের শিরে,
আজি যারা সগৌরবে ত্যজি প্রাণ, দেবী তব তরে
নীরবে দাঁড়াল সরি ধীরে।



ভারতবর্ষ

ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানী—

গত সেপ্টেম্বর মাসে বিলাতে অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে সেখানকার স্বর্ণমান বন্ধ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের মুদ্রাও ষ্টার্লিংএর সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। বিলাতে স্বর্ণমান রহিত হইবার পর হইতেই ভারতবর্ষে সোনার দর অত্যধিক রকম বাড়িয়া যায়। কারণ তখন বিদেশ হইতে সোনার চাহিদা বাড়িয়া যাইতে থাকে। ভারতবর্ষে গত দু-তিন বৎসর ধরিয়া ব্যবসায় মন্দা হওয়ায় লোকেরা অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই দুর্দ্দিনে যখন সোনার দর বাড়িয়া যাইতেছে তখন পেটের দায়ে লোকেরা স্বর্ণ বিক্রী না করিয়া কি করিবে? এরূপ অবস্থায় ভারত-সরকারেরই স্বর্ণ ক্রয় করা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। ভারতীয় বণিক-সমিতি ইহার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গত ২৬এ সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কি পরিমাণ স্বর্ণ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহার এই ফিরিস্তি দিয়াছেন।—

২৬এ সেপ্টেম্বর			২৬	লক্ষ	১৭	হাজার	টাকা
৩রা অক্টোবর	২	কোটি	৫৫	লক্ষ	৫৬	হাজার	,,
১০ই ,,	২	,,	৩৩	,,	৬৯	,,	,,
১৭ই ,,	২	,,	২	,,	৮৫	,,	,,
২৪এ ,,	১	,,	২৮	,,	৯৭	,,	,,
৩১এ ,,	২	,,	৪১	,,	৮২	,,	,,
৭ই নবেম্বর	২	,,	৪১	,,	৫৫	,,	,,
১৪ই ,,	১	,,	১১	,,	৮৯	,,	,,
২১এ ,,	২	,,	৬০	,,	৮২	,,	,,
২৮এ ,,	২	,,	৩২	,,	৩২	,,	,,
৫ই ডিসেম্বর	২	,,	৪৩	,,	৯২	,,	,,
১২ই ,,	৪	,,	২৩	,,	৫৬	,,	,,
১৯এ ,,	৪	,,	৬৮	,,	৮৭	,,	,,
২৬এ ,,	৩	,,	৯৯	,,	৯৯	,,	,,
১লা জানুয়ারী	২	,,	৪৬	,,	৪১	,,	,,
৮ই ,,	১	,,	৭১	,,	৮৪	,,	,,
১৫ই ,,	৩	,,	৬৬	,,	১৭	,,	,,
মোট	৪২	কোটি	৯৯	লক্ষ	৩৭	হাজার	টাকা

এই স্বর্ণ ভারতবর্ষ হইতে জগতের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তবে ইহার অধিকাংশ বিটেনকে সমৃদ্ধ করিতেছে নিঃসন্দেহ। কারণ, ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড, ফরাসী ও মার্কিণের নিকট ঋণের কিস্তি স্বর্ণে দিতে সমর্থ হইয়াছে।

নূতন জরুরি অর্ডিনান্স—

গত ১৯৩১ সনের নবেম্বর হইতে ভারতবর্ষে কতকগুলি বিশেষ বিধি প্রচারিত হইয়াছে। এই বিশেষ বিধিগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ভীতি-উৎপাদক দল দমনের জন্য ১৯৩১ সনের একাদশ বিধি (৩০এ নবেম্বর), যুক্ত-প্রদেশের কর-বন্ধ আন্দোলন দমনার্থ দ্বাদশ বিধি (১৪ই ডিসেম্বর), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শাসন-সৌকর্য্যার্থ ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বিধি (১৭ই ডিসেম্বর) প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত। সত্যাগ্রহ আন্দোলন দমনার্থ ৪ঠা জানুয়ারী প্রচারিত বিশেষ বিধিগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

প্রাদেশিক সরকারকে কি ভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিধিগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে নিম্নের বিষয়গুলি হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।—

(ক) কেহ কোন বে-আইনী সমিতির জন্য সাহায্য দান, সাহায্য গ্রহণ বা সাহায্য প্রার্থনা অথবা কোনও প্রকারে উহার কার্য্যে সহায়তা করিলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে দণ্ডার্হ। নিখিল ভারত কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ও বহু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারার বিধানানুরূপ সর্ত্তগুলি বর্ত্তমান থাকিবে। আইন অমান্য আন্দোলনে সর্ব্বপ্রকার সহায়তায়—কার্য্যপদ্ধতির সহায়তার, প্রত্যক্ষভাবে কার্য্যের অথবা প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে কার্য্য, আর্থিক সাহায্য, শোভাযাত্রাদিতে সহায়তা প্রভৃতির জন্য ফৌজদারী মামলা উপস্থিত করা হইবে।

(খ) বিশেষ বিধির ৪ ধারা অনুসারে প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, জনসাধারণের নির্ব্বিঘ্নতা ও শান্তির পরিপন্থী আন্দোলনের সহায়তার জন্য কেহ কার্য্য করিয়াছে, অথবা কার্য্য করিতে উদ্যত ইহা বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ থাকিলে, তাহার গতিবিধি ও ব্যবহার সংযত করিবার জন্য বঙ্গদেশের সমুদয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতার পুলিস কমিশনারকে উক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। আরও এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে যে, ঐরূপ ব্যক্তির দখলী অথবা কর্ত্তৃত্বাধীন সম্পত্তি সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ প্রদত্ত হইবে তাহাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) ১৩ ধারা অনুসারে ক্ষমতা-প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের সহায়তা প্রার্থনা করিতে পারেন। বিশেষ বিধির ২২ ধারার বিধান এই যে, কেহ উক্ত আদেশ প্রতিপালন না করিলে দণ্ডনীয় হইবে।

(ঘ) ১৬ ধারায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে রেলপথের ব্যবহার সংযত করিবার, বিশেষতঃ কোন রেলপথে কোনও বিশেষ দ্রব্য লইয়া যাওয়া হইবে না এরূপ আদেশ দিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

শিক্ষার জন্য দান—

পাটনার সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ নামে জনৈক কায়স্থ স্বীয় সমাজের লোকদের শিক্ষার্থ লাজ্জিটুলীর একখানি বাড়ি ও নগদ ২৪,০০০ টাকা এককালীন দান এবং বাৎসরিক ১,১৫০ টাকার আয় দিয়াছেন। উক্ত টাকার উদ্বৃত্ত আয় হইতে কায়স্থ সমাজের ছাত্রদের বৃত্তি দান করা হইবে।

বাংলা

ডক্টর সুনীতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী-সাহিত্যে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে



শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিরিয়াছেন। এলিজাবেথের যুগে গীতিকবিতার বিকাশ ও অভিব্যক্তি বিষয়ে তিনি দুই বৎসর ধরিয়া গবেষণা করেন। তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ অধ্যাপক গ্রীয়ারসন্ ও অধ্যাপক এলটনের নিকট অতি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

ডাঃ কুদ্রৎ-ই-খোদা—

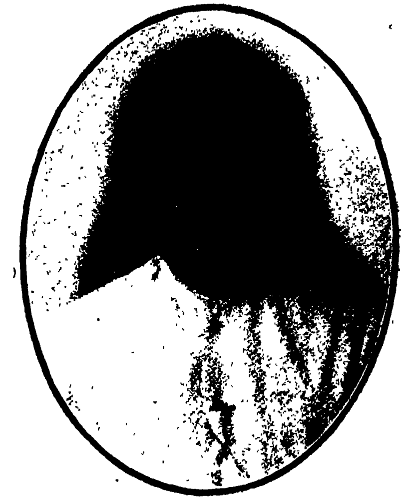
অধ্যাপক ডাঃ কুদ্রৎ-ই-খোদা কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি হইতে এবার বিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। ইনিই মুসলমানদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পি-আর-এস্।

শ্রীযুক্তা প্রতিভা চৌধুরী—

শিলং নিবাসী শ্রীযুক্তা প্রতিভা চৌধুরী যে কুমারী মন্তেসরী বর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী অধিগত করিতে বিলাতে গিয়াছেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। তিনি সম্প্রতি ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক মন্তেসরী শিক্ষা সমাপন করিয়া ডিপ্লোমা পাইয়াছেন।

শ্যামরাজ্যে বাঙালী—

মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী শ্রীযুক্ত সৈয়দ ওয়াহেদ আলী অর্থকষ্ট নিবন্ধন শিক্ষালাভে অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া অল্প বয়সে



শ্রীযুক্ত সৈয়দ ওয়াহেদ আলী

সামান্য বেতনে জরীপ-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্যাম গমন করিয়া তিনি তথাকার গবর্ণমেণ্টের জরীপ-বিভাগে প্রবিষ্ট হন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে একজন সুদক্ষ সার্ভেয়র প্রয়োজন হইলে শ্যাম-সরকার শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলীকেই মনোনীত করেন। এই সময়ে তাঁহার বেতন ২৫০ টাকা হয়। এই কার্য্য করিতে করিতে তিনি উক্ত কোম্পানী হইতে পুরস্কার স্বরূপ জমী প্রাপ্ত হন, নিজেও অনেক জমী খরিদ করেন। সমগ্র জমীর পরিমাণ এখন প্রায় ২০,০০০ বিঘা। এই সময়ে তিনি চাউল-ছাঁটাই কল, করাত-কল ইত্যাদি ক্রয় করেন। ইহাতে তাঁহার প্রভূত অর্থাগম হয় ও দেশ হইতে আত্মীয়স্বজনদের লইয়া গিয়া ঐ সব কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্যাম-সরকার তাঁহার দক্ষতায় প্রীত হইয়া 'লুয়ং' (Luong) উপাধি দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। 'লুয়ং' উপাধি বিদেশীদের মধ্যে ইঁহাকেই প্রথম দেওয়া হয়, এবং ইহার নাম হয় "লুয়ং, বারিদীমারক্ষ ওয়াহেদ আলী।" যদি নিজ জাতীয়তা ছাড়িয়া তিনি শ্যামবাসী হইতেন তাহা হইলে আরও উচ্চ উপাধি পাইতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, তিনি ও তাঁহার পরিবারের সকলেই নিজেদের বাঙালী বলিয়া পরিচয় দেন। বহুদিন সেখানে বাস ও বিবাহ আদি করিলেও "বাঙালী"ই রহিয়াছেন, সন্তানদেরও তিনি কলিকাতায় পড়াইয়াছেন ও তাঁহারা সকলেই বাংলা ভাষায় কথা বলেন। ভাষার জ্ঞানও তাঁহাদের যথেষ্ট। পুত্রদের মধ্যে ডাঃ এস্. আলী ডাক্তারি বিভাগে এবং এম্-এস্-আলী কৃষি-বিভাগে বিশেষজ্ঞ ভাবে কার্য্য করিতেছেন। অপর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা কৃষি, ধান্যের কল ইত্যাদিতে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ—

শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি কুমিল্লা গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি বার বৎসর সরকারী চাকুরী করিবার পর গত ১৯৩০ সনে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকারী কাজে ইস্তফা দেন। চাকুরী ছাড়িবার সময় তিনি প্রভিন্সিয়াল গ্রেডে ছিলেন এবং তাঁহার মাহিনা ছিল মাসে ২৫০৲ টাকা। তিনি কুমিল্লার অভয় আশ্রমে যোগ দেন এবং ঐ আশ্রমের কর্ত্তৃত্বাধীনে কুমিল্লায় 'কন্যা-শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। 'কন্যা-শিক্ষালয়'—একটি জাতীয় বিদ্যালয়। মেয়েদের জন্য উচ্চ জাতীয় বিদ্যালয় বাংলায় এই একটি-ই। কন্যা শিক্ষালয়ের বোর্ডিং হইতে তাঁহাকে গত মাসে নূতন বেঙ্গল অডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কুমিল্লা মহিলা সমিতির সম্পাদিকার কাজও তিনি যোগ্যতার সহিত বহু বৎসর যাবৎ সম্পন্ন করিয়াছেন।

বাংলায় লবণের কারখানা—

কলিকাতায় বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসন নামে লবণ তৈয়ারী করিবার এক কোম্পানীকে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষার জন্য লবণ তৈয়ারী করিবার অনুমতি দিয়াছেন। তদনুসারে উক্ত কোম্পানী মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় লবণের কারখানা খুলিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের লবণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কর্ম্মচারী মিঃ পিট বাংলা দেশের কোথায় লবণ তৈয়ারী হইতে পারে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ২৪ পরগণার ফ্রেজারগঞ্জ এবং মেদিনীপুরের কাঁথিতে কারখানা স্থাপনের অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত অনুমোদিত স্থানে লবণ তৈয়ারী করিবার লাইসেন্স পাইবার জন্য বহু আবেদন মিঃ পিটের নিকট গিয়াছে এবং বহু পরিমাণ লবণ কারখানায় এ বৎসর প্রস্তুত হইবে। এই দুই স্থানে পূর্ণভাবে লবণ প্রস্তুত হইতে থাকিলে বৎসরে ৫০ লক্ষ মণ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে উহা কলিকাতায় প্রতি মণ পাঁচ আনা বা প্রতি শতমণ ৩১।০ দরে বিক্রয় হইবে। বাংলাদেশে প্রস্তুত লবণের উপর কোনও শুল্ক থাকিবে না এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বাঙালীর দ্বারা লবণ প্রস্তুত হইবে আশা করা যায়।

বাংলা দেশে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণাতেই প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ লবণ প্রস্তুত হইবে। বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে লবণ তৈয়ারী হইলে সম্ভবতঃ অবশিষ্টাংশ লবণ পাওয়া যাইবে।

খাদেমুল এনছান্ রিলীফ ক্যাম্প, তাড়াশ (চলন বিল), পাবনা—

বিগত প্লাবনে উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের সহস্র সহস্র লোক নিরন্ন ও নিরাশ্রয় হইয়াছিল। লোকের বাড়ী-ঘর, আসবাব-পত্র, শস্য-ফসল ও গৃহপালিত পশু কতই-না ভাসিয়া গিয়াছিল। কেহ বা ঘরের চালে, গাছের ডালে, রেল লাইনে আশ্রয় লইয়াছিল, কেহ বা বন্যার জলের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে জীবন ত্যাগ করিয়াছে।

খাদেমুল এনছান সমিতি উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের বিধ্বস্ত অঞ্চলে দশটি রিলীফ ক্যাম্প স্থাপন করিয়া চৌদ্দটি সাহায্য-কেন্দ্রভুক্ত শত শত পল্লীর সহস্র সহস্র বিপন্ন হিন্দু-মুসলমান নর-নারীকে গত ছয় মাস কাল যাবৎ অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, পথ্য ও ঔষধ দান করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও কয়েকটি কেন্দ্রে "এনছান সমিতি"র সেবাকার্য্য চলিতেছে। এই সমিতি বেকার মজুরদের দ্বারা মৎস্য, কাষ্ঠ প্রভৃতির ব্যবসায় অবলম্বন করাইয়া তাহাদের জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। নিম্নের চিত্রে "এনছান সমিতি" সিরাজগঞ্জের অধীন তাড়াশে (চলন বিলের মধ্যে অবস্থিত) বিপন্নদের সাহায্যদান করিতেছেন।



খাদেমুল এনছান রিলীফ ক্যাম্প

এদেশের মুসলমান সমাজের কোন প্রতিষ্ঠান এইরূপ ব্যাপকভাবে আর কখনও সেবা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। এই সমিতি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সেবা, পল্লী-সংগঠন, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি কার্য্য প্রায় চারি বৎসর কাল যাবৎ করিয়া আসিতেছেন। সমিতি বিগত ১৩৩৫ সনের ১লা বৈশাখ তারিখে মৌলভী সৈয়দ আবদুর রব সাহেবের চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথমে ফরিদপুর শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত তিন বৎসর কাল ফরিদপুরই ইহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল; এখন কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতায় করা হইয়াছে। বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। "কেন্দ্রীয় খাদেমুল এনছান সমিতি" কর্ত্তৃক "মোয়াজ্জিন" নামক একখানা উচ্চ শ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্রিকাও এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্ররূপে জি ৩৩নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

—

বিদেশ

চীন-জাপানে লড়াই—

১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর হইতে চীন সাম্রাজ্যের মাঞ্চুরিয়ায় যে চীন-জাপানে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে তাহা আমরা গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছি। গত দু'তিন সপ্তাহ ধরিয়া এই দ্বন্দ্ব গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। জাপান সমগ্র মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া তথায় নিজেদের শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে এবং খাস চীনের এক শত মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। চীনের রেলপথগুলিও জাপানের হস্তগত। চীনা সরকার এতকাল একরূপ নির্ব্বাক ছিলেন। চীনা ছাত্রগণ চীন সরকারকে যুদ্ধকার্য্যে অবহিত করিবার জন্য রাজধানী পিকিঙে যাত্রা করিতে চাহিলে রেল কোম্পানী প্রথমতঃ তাহাদিগকে অনুমতি দেয় নাই। অতঃপর ছাত্রগণ রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়ে এবং রেল চলা কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকে। অবশেষে ছাত্রদের দাবিই স্বীকৃত হয়—তাহারা বিনা ভাড়ায় পিকিঙে যাইয়া সরকারের নিকট যুবক সম্প্রদায়ের মনোভাব ব্যক্ত করে। চীনা সরকার অগত্যা যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন। জাপান রণতরী শাংহাই অবরোধ করিয়া ইয়াংচি বাহিয়া নানকিং পৌছিয়াছে। উভয় পক্ষে যুদ্ধ ও হতাহতের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

চীন আত্মরক্ষার জন্য যথাশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘকে জানাইয়াছে যে, নবম শক্তির সন্ধির পঞ্চদশ দফা অনুযায়ী চীনে জাপানের নূতন ক্ষমতা ও আবিষ্কারের কোন প্রস্তাব উঠিতেই পারে না, কারণ আন্তর্জাতিক উপনিবেশে সকলেরই সমান অধিকার। আজ যদি জাপান বেশী ক্ষমতার দাবি করে কাল অন্য শক্তিসমূহ ততোধিক যে দাবি করিবে না তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? চীনের এই সঙ্গত প্রস্তাবে বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘের টনক নড়িয়াছে। চীন ও জাপান উভয়ই রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য। কিন্তু জাপান অধিকতর সংহত ও শক্তিশালী বলিয়া সংঘের কথায় তেমন কর্ণপাত করিতেছে না। ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন চীনের প্রস্তাবকে সঙ্গত বিবেচনা করিয়া স্বার্থরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহাদের রণতরী ও সেনানী সাংহাই মোতায়েন আছে।

প্রাচ্যের এই ব্যাপারে বিশ্ব রাষ্ট্র-সংঘের স্বরূপ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। বিগত সেপ্টেম্বর মাস হইতে জাপানের কার্য্যের জন্য চীনের আবেদন পেশ হইলে রাষ্ট্র-সংঘ উভয়কেই যুদ্ধ থামাইতে আদেশ দেন, জাপান কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করে নাই। রাষ্ট্র-সংঘ সংপ্রতি প্রাচ্যের এই ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্য লিটন কমিশন নামে এক কমিশন প্রেরণ করিয়াছেন। কমিশন বন্ধুভাবেই উভয় রাজ্যের বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ নির্ণয়ে ও প্রতিকার চেষ্টায় তাহাদের শক্তি নিয়োগ করিবেন, বিচারক হিসাবে তাহাদের তদন্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে না—উদ্দেশ্য এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।

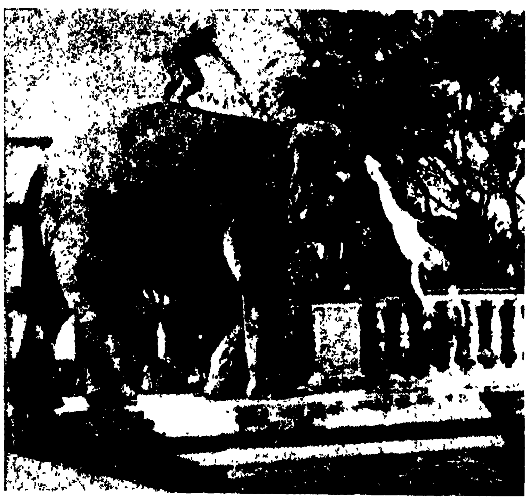
শাংহাইয়ের অন্তর্জাতিক উপনিবেশের লোকেরা এখন বিশেষ সন্ত্রস্ত। তবে উপনিবেশস্থ বিদেশী লোকদের এখন পর্য্যন্ত তেমন কিছু কষ্টভোগ হইতেছে না।



পঞ্চশস্য

ধনীর ছেলের সখ—

নানা রকমের পাখীর ছানা, বিড়াল ছানা, কুকুর ছানা, প্রভৃতি জীবজন্তুর শাবক পুষিবার সখ সব ছেলেমেয়েরই হয়। সাধারণতঃ তাহারা—বিশেষতঃ গরিব ও মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুরা যে-সব জীবজন্তুর ছানা কিনিতে হয় না বা খুব কম দামে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে পোষে ও আদর-যত্ন করে। কিন্তু ধনীর বাড়ির ছেলেমেয়েদের



হাতীর পিঠ হইতে ডুব দেওয়া

সখ অন্য রকম হয়। পরলোকগত বিখ্যাত ধনী এণ্ড্রু কার্নেগীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর একটি সিংহশাবক পুষিবার সখ হওয়ায় তাহার জন্য তাহাই কিনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমেরিকার ফ্লোরিডা প্রদেশের এক ক্রোড়পতির ছেলের সখ হাতী পুষিবার। চিত্রে দেখা যাইতেছে সে তার হাতীটির পিঠে উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।

আফ্রিকার আরব রমণী—

অনেকের এই রকম ধারণা আছে, যে, আফ্রিকার ইউরোপীয় বংশজাত অধিবাসীরা এবং ভারতীয়রা ছাড়া আর বাসিন্দাই নিগ্রো বা কাফ্রি এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও কদাকার। তাহা সত্য নহে। অবশ্য নিগ্রো বা কাফ্রিরা তাহাদের নিজের চোখে সুন্দর। কিন্তু যাহাদিগকে অন্যান্য মহাদেশের লোকেরাও কুৎসিৎ মনে করিবে না, বহু শতাব্দী ধরিয়া এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক পুরুষানুক্রমে আফ্রিকার উত্তরার্দ্ধের নানা অঞ্চলের অধিবাসী হইয়া আছে। সাহারা মরুভূমির মধ্যে মধ্যে যে-সব বৃক্ষলতাতৃণাকীর্ণ শ্যামল মরুদ্বীপ আছে, তাহাতে আরব-বংশীয় বিস্তর লোক বাস করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা যে পরিচ্ছদ পরিধান করে, তাহা সুশোভন ও কারুকার্য্যখচিত। ইহাদের চেহারাও ভাল।



সাহারার আরবরমণী

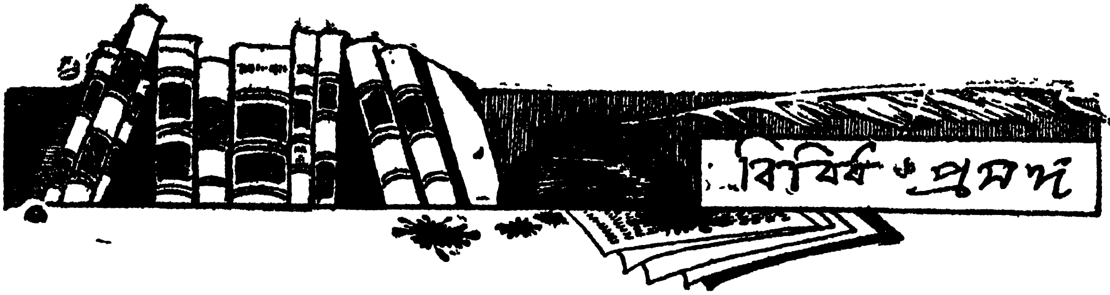
তীরন্দাজ মাছ—

এক রকম মাছ আছে, ইংরেজীতে তার নাম আর্চার ফিশ্ বা তীরন্দাজ মাছ। ইংরেজী প্রাণিবিদ্যার বহিতে দেখিতে পাই, এই



তীরন্দাজ মাছ মুখ হইতে জল ছুঁড়িয়া মাছি ধরিতেছে

মাছ ভারতবর্ষেও আছে। সমুদ্র হইতে নদীর মোহানা দিয়া এ



বঙ্গের গবর্ণরকে হত্যা করিবার চেষ্টা

গত ২৩শে মাঘ শনিবার কলিকাতার সেনেট হাউসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান-সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বঙ্গের গবর্ণর স্যর ষ্ট্যান্‌লী জ্যাক্সন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা হয়। তিনি সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন, একটি গুলিও তাঁহার গায়ে লাগে নাই। এই চেষ্টা করিবার অভিযোগে কুমারী বীণা দাস, বি-এ ধৃত হইয়াছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা কারণে এইরূপ চেষ্টার বিরুদ্ধে অন্যান্য সম্পাদকদিগের ন্যায় আমরা এইরূপ চেষ্টার আরম্ভ হইতেই সিকি শতাব্দী ধরিয়া এই প্রকার ঘটনা ঘটিলেই লিখিয়া আসিতেছি। অগণিত সভা-সমিতিতেও ঐরূপ মত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এরূপ চেষ্টা সফল বা ব্যর্থ, যাহাই হউক, তাহার দ্বারা দেশকে স্বাধীন করা যাইবে না, ইহাও বার-বার বলা হইয়াছে। কোন স্থলে উত্তেজনার কারণ থাকিলেও প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এরূপ চেষ্টা করা অনুচিত, এরূপ কথাও মহাত্মা গান্ধী এবং অন্য অনেক দেশনায়ক বার-বার বলিয়াছেন। রাজনৈতিক হত্যা-চেষ্টার দ্বারা কংগ্রেসের ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সভার স্বরাজলাভ-প্রয়াস বাধা পাইতেছে, ইহাও বহুবার বলা হইয়াছে। রক্তপাত দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হওয়া দূরে থাক, দমননীতিপ্রসূত যত প্রকার আইন ও অর্ডিন্যান্সের কঠোরভাবে প্রয়োগ সকল প্রদেশে হইতেছে, তৎসমুদয় বন্ধ হওয়া বা তাহাদের কঠোরতা দূর হওয়াতেও বাধা জন্মিতেছে এবং বিলম্বও খুব সম্ভব হইবে; কারণ, গবর্ন্মেণ্ট শাসনের কঠোরতা কমাইবার প্রয়োজন বুঝিয়া থাকিলেও (বুঝিয়াছেন কিনা জানি না), ভয়ে নরম ব্যবস্থা করিতেছেন এরূপ ধারণা জন্মিতে দিতে স্বভাবতঃ অনিচ্ছুক হইবেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

এই প্রকার নানা মত দীর্ঘকাল ধরিয়া বার-বার প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে বা উদ্দেশ্যে হত্যার চেষ্টা ও হত্যা বন্ধ হইতেছে না। রাজপুরুষেরা বার-বার বলিয়াছেন, লোকমত এইরূপ কার্য্যের বিরোধী হইলে প্রধানতঃ তাহার দ্বারাই ইহা বন্ধ হইবে। এ পর্য্যন্ত সে আশা পূর্ণ হয় নাই। রাজপুরুষেরা অবশ্য কেবল লোকমতের উপরই নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, আইন এবং অর্ডিন্যান্সের সাহায্যেও হত্যাচেষ্টা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতেও এপর্য্যন্ত বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

—

রাজনৈতিক হত্যাচেষ্টা নিবারণের উপায়

কি উপায়ে বিপ্লবীদিগের এরূপ কাজ বন্ধ হইতে পারে, তাহার আলোচনা সংবাদপত্রে কিয়ৎপরিমাণে হইয়াছে। দেশের আইন এরূপ, যে, সম্যক আলোচনা হইতে পারে নাই; এখন অধিকন্তু অনেকগুলি অর্ডিনান্স থাকায় সম্যক আলোচনা আরও কঠিন। আলোচনা অল্পস্বল্প যাহা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় অনেকে বলিয়াছেন, দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে বা দেশ স্বাধীন হইলে রাজনৈতিক হত্যাচেষ্টা বন্ধ হইবে। ইহার উত্তরে ইংরেজ রাজপুরুষেরা কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহা হইবে না। কয়েক দিন আগেও প্রেণ্টিস্ সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন, দেশের গবর্ন্মেণ্ট ভারতীয় হইলেও সে আমলেও রাজনৈতিক হত্যাচেষ্টা যে থাকিবে না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই মত সম্পূর্ণ অমূলক নহে, সম্পূর্ণ সত্যও নহে। বস্তুতঃ

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গবর্ন্মেণ্ট কি অর্থে ভারতীয় বা জাতীয় হইবে, ঐ গবর্ন্মেণ্টের প্রকৃতি কি প্রকার হইবে, তাহার উপর ভবিষ্যতে দেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে। এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। পৃথিবীর যে-সকল দেশের শাসন বা রাষ্ট্রীয়কার্য্যনির্ব্বাহ সেই দেশেরই অল্প বা অধিক লোকদের দ্বারা হয়, সেই সব দেশকে স্বাধীন বলা হইয়া থাকে। এই অর্থে স্বাধীন দেশসকলের অধিবাসীদিগের রাষ্ট্রীয় অধিকার অল্প বা অধিক থাকিতে পারে, কিছুই না থাকিতেও পারে। যে-সব দেশ গণতন্ত্রশাসনপ্রণালী অনুসারে শাসিত বলিয়া বিদিত, যেমন আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্, তাহাদের মধ্যেও কোন-না-কোনটিতেও কখন কখন রাজনৈতিক হত্যা-চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হয়। জাপানের মত প্রাচ্য স্বাধীন দেশেও হয়। অতএব, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, যে, ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে গণতন্ত্র জাতীয় গবর্ন্মেণ্টের আমলেও রাজনৈতিক হত্যাচেষ্টা হওয়া একেবারে অসম্ভব হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে এরূপ চেষ্টা দূর করিবার জন্য যে-সব উপায় অবলম্বিত হয়, তখন ঠিক্ তাহা না হইতে পারে। কারণ আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে এবং গণতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে শাসিত আরও কোন কোন দেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ ও রিভলভার ব্যবহার ভারতবর্ষের চেয়ে কম না হইলেও (কখন কখন বেশী হইলেও) সেই সেই দেশের সমুদয় লোকের উপর কঠোর আইন অর্ডিন্যান্স আদি জারি করিয়া তথায় কার্য্যতঃ সামরিক আইন প্রচলিত করা হয় না, সাধারণ আইনের প্রয়োগ দ্বারাই অপরাধীদিগকে দণ্ড দিবার এবং ভবিষ্যতে তদ্রূপ অপরাধ নিবারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। অধিকন্তু তথাকার কোন শ্রেণীর লোকের তীব্র অসন্তোষের কোন কারণ থাকিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টাও রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে হইয়া থাকে। ভারতে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের যুগ আসিলে যদি তখনও রাজনৈতিক হত্যাচেষ্টা থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশসকলে তাহা নিবারণের যেরূপ উপায় অবলম্বিত হয়, এদেশেও সেইরূপই হইবে।

ভবিষ্যতে কি হইবে না-হইবে, তাহার জন্য আমরা বসিয়া থাকিব না। দেশে প্রকৃত শান্ত অবস্থা আনয়নে আমাদের স্বার্থ ও আগ্রহ বিদেশীদের চেয়ে কম নয়। অশান্ত অবস্থায় ইংরেজদের জীবন অপেক্ষা ভারতীয়দের জীবনের অপচয় বেশী হইতেছে। এই অপচয় নিবারণের উপায় শীঘ্র আবিষ্কার ও অবলম্বন দেশের লোকদিগকে করিতে হইবে।

—

ডাকঘরের সুবিধা হ্রাস ও আয় হ্রাস

অনেক বৎসর ধরিয়া পোষ্টকার্ডের দাম ছিল এক পয়সা। তাহা বাড়িয়া দুই পয়সা হয়। এখন হইয়াছে তিন পয়সা। খামের দাম প্রথমতঃ ছিল দু পয়সা। কিছু দিন তিন পয়সাও হইয়াছিল। তাহার পর হয় এক আনা। তাহা বাড়িয়া এক আনা এক পাই হয়। এখন সম্প্রতি পাঁচ পয়সা এক পাই হইয়াছে। পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত মনি অর্ডারের কমিশন বহু বৎসর এক আনা ছিল। এখন এক টাকা বা দু-চার আনা পয়সা মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইলেও দু আনা কমিশন লাগে। চিঠি, পুলিন্দা প্রভৃতি রেজিষ্টারী করিবার খরচ আগে ছিল দু আনা, এখন হইয়াছে তিন আনা। ভ্যালুপেয়েবল প্যাকেটাদি আগে রেজিষ্টরী না করিয়াও পাঠান চলিত; কয়েক বৎসর হইতে সমুদয় ভ্যালুপেয়েবল রেজিষ্টরী করিবার নিয়ম হইয়াছে। বহি ও মুদ্রিত কাগজপত্রের মাশুল আগে যাহা ছিল, কয়েক বৎসর হইতে তাহা দ্বিগুণ হইয়াছে।

এই প্রকারে, ডাকঘরের সুবিধা পাইতে হইলে আগে যত খরচ করিতে হইত, এখন তাহা অপেক্ষা খরচ অনেক বেশী হইয়াছে। তাহাতে সরকারী আয় সে অনুপাতে বাড়ে নাই। ডাকঘরের আয় যে কমিয়াছে, তাহার নানা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতায় আগে প্রত্যহ আটবার চিঠি বিলি হইত, এখন তাহা কমাইয়া চার বার করা হইয়াছে। রবিবারে রেজিষ্টরী চিঠি বিলি ত অনেক দিন বন্ধ হইয়াছে। বিলাতী ডাক যখনই আসিত, আগে তাহা তখনই স্বতন্ত্র বিলি হইত। এখন

তাহা পরবর্ত্তী কোন দেশী চিঠি বিলির সঙ্গে হয়। কলিকাতাতেই দুই শত ডাকের পিয়াদার এবং পাঁচ শত কেরানীর কাজ গিয়াছে বা যাইবে।

ডাকঘরের আয় হ্রাসের কারণ কি? আমাদের অনুমান, ডাকমাশুল বৃদ্ধি করায়, লোকে আগে যত চিঠি লিখিত এখন তাহা লেখে না। আমরাও ব্যয়সংক্ষেপের জন্য দরকার পড়িলে সাধারণতঃ পোষ্টকার্ড লিখি। আমাদের অনুমান, অসহযোগ প্রচেষ্টার অঙ্গ স্বরূপ কংগ্রেস-নেতারা যে সকলকে যথাসম্ভব কম চিঠিপত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে অনুরোধ অনেকে পালন করিতেছে। তাহাতেও ডাকঘরের আয় কমিয়াছে। তৃতীয় কারণ, নানা কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের হ্রাস। ব্যবসা-বাণিজ্যের হ্রাস বলিলেই বুঝিতে হইবে, ব্যবসাদারেরা এখন ডাকে বিজ্ঞাপন ও চিঠিপত্র আগেকার মত বেশী পাঠাইতেছে না, সর্ব্বসাধারণও ব্যবসাদারদিগকে জিনিষ পাঠাইবার জন্য আগেকার মত চিঠি লিখিতেছে না। সুতরাং ভ্যালু-পেয়েবল ডাকে জিনিষ আগেকার চেয়ে কম যাইতেছে। মনিঅর্ডার ইন্সিওর প্রভৃতি দ্বারা টাকাকড়ি প্রেরণও কম হইতেছে।

ডাকঘরের আয় কমিবার আর একটা কারণও সম্ভবপর মনে হয়। যাহারা কোন ষড়যন্ত্রের মধ্যে নাই, ষড়যন্ত্র করিবার কল্পনাও কখনও করে নাই, তাহাদেরও চিঠি পুলিসের সন্দেহভাজন কাহারও বাড়ি খানাতল্লাসীর সময় এক আধটা পাওয়া গেলে তাহাদের গ্রেপ্তার এবং অন্যবিধ লাঞ্ছনা হইয়া থাকে। তা ছাড়া পুলিসের লোকে, বিলি হইবার আগেই, ডাকঘরে বিস্তর লোকের চিঠি খুলিয়া পড়ে। এই সব কারণে, অনেকে নিতান্ত দরকার ব্যতিরেকে চিঠি লেখা ছাড়িয়াই দিয়া থাকিবে।

ডাকঘরের আয় কমিবার আরও একটা কারণ সম্ভবতঃ ঘটিয়া থাকিবে। দৈনিক হইতে মাসিক সব কাগজ সেন্সরের আদেশে ও কর্ম্মিষ্ঠতায় আগেকার চেয়ে বৈচিত্র্য-হীন এবং কম চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তাহাতে, নানা হুজুক সত্ত্বেও, কাগজগুলার কাট্‌তি কমিয়াছে। রাজনৈতিকমতি-বিশিষ্ট বিস্তর গ্রাহক ও পাঠক কারারুদ্ধ হওয়াতেও এই ফল ফলিয়াছে। কাগজগুলার গ্রাহক এবং পাঠক হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ডাকঘরের আয়ও কিছু কমিয়াছে। কাহাকেও অসুবিধায় ফেলিতে গেলে অনেক সময় নিজেও অসুবিধায় পড়িতে হয়।

—

মাজিষ্ট্রেট্ হত্যার জন্য শাস্তি

ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ষ্টীভেন্স সাহেবকে হত্যা করার অপরাধে তিনজন হাইকোর্ট জজের বিশেষ আদালত কুমারী সুনীতি চৌধুরী ও কুমারী শান্তি ঘোষকে, তাহাদের বয়সের অল্পতা বিবেচনা করিয়া, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জজদের এই বিবেচনা সমীচীন হইয়াছে। কোন কোন সভ্য দেশের আইন হইতে প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ ঘাতকদের প্রাণদণ্ডও উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য অনেক দেশের আইনে প্রাণদণ্ড থাকিলেও কার্য্যতঃ উহা প্রযুক্ত হয় না। অপরাধীর দণ্ডদানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য তাহার চারিত্রিক উন্নতি;—অন্ততঃ উদ্দেশ্য তাহাই হওয়া উচিত। সুতরাং যাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহারা যাহাতে ভাল হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। হাঁসপাতাল-গুলি যেমন মানুষের দেহের ব্যাধির চিকিৎসার জায়গা, কারাগারগুলি তেমনি অপরাধী মানুষের হৃদয়মনের চরিত্রের চিকিৎসার জায়গা হওয়া উচিত। কুমারী সুনীতি চৌধুরী ও কুমারী শান্তি ঘোষকে দণ্ডিত করিবার সময়, সমাজে তাহারা যে স্তরের পরিবারে লালিত-পালিত, কারাগারে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা যেন তদ্রূপ হয়, জজেরা এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ হইবে কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বালিকাদ্বয়ের জীবনযাপনের অন্য ব্যবস্থা যাহাই হউক, তাহাদিগকে দয়া করিয়া পড়িবার ভাল ভাল বহি দিলে দাগী অপরাধীদের সংসর্গজনিত অবনতি নিবারিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

—

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার রায়

অধ্যাপক আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে হাজারিবাগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি

দীর্ঘজীবী হইয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছেন; সুতরাং যাঁহাদের অকালমৃত্যু হয়, তাঁহাদের মত তাঁহার জন্য শোক করিবার কোন কারণ নাই। তথাপি তাঁহার মত জ্ঞানী সাধু ভক্ত ও লোকহিতৈষী ব্যক্তিগণ যেখানেই থাকেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ও চারিত্রিক প্রভাবে সেই স্থানেরই কল্যাণ হয় বলিয়া তাঁহার মত লোকের অভাব অনুভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস-সি (বিজ্ঞানাচার্য্য) উপাধিলাভ করেন। শুনিয়াছি, তাঁহার পূর্ব্বে বিলাতের কোন ছাত্রও ঐ উপাধি পান নাই। ইহা ঠিক্ কিনা উক্ত দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার দেখিতে পাইলে বুঝিতে পারিব। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তিনি ও পরলোকগত লর্ড হলডেন সমান পারদর্শিতা দেখাইয়া প্রথমস্থানীয় হন। কয়েক বৎসর হইল, হলডেনের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বরাবর আচার্য্য রায়ের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং পত্রব্যবহার করিতেন। তিনি বিলাতের একজন বিখ্যাত দার্শনিক এবং তথাকার যুদ্ধমন্ত্রী ও লর্ড চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। কথিত আছে, স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত লর্ড হলডেনের একবার কথোপকথনের সময় তিনি বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ-শাসনে ভারতীয়দের দুঃখটা কি প্রকার। তাহার একটা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভূপেন্দ্রবাবু বলেন, "আপনি ও ডাঃ রায় সতীর্থ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমান ছিলেন; আপনার দেশে আপনার স্থান অতি উচ্চ, কিন্তু ডাঃ রায়কে একটা প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর পর্য্যন্ত করা হয় নাই।"

ডাঃ রায় পাটনা ঢাকা ও প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারও হইয়াছিলেন। সরকারী কাজ হইতে অবসর লইবার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-ইন্স্পেক্টর হইয়াছিলেন। এই কাজ তিনি বিশেষ যোগ্যতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার সহিত করিয়াছিলেন। সমুদয় কলেজের অধ্যাপকদিগের নিকট তিনি পাণ্ডিত্য অধ্যাপনা ও চরিত্রের উচ্চ আদর্শ আশা করিতেন।

প্রাচীন ও আধুনিক নানা ভাষা তাঁহার জানা না থাকিলেও তিনি ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে বিস্তৃত অধ্যয়নের দ্বারা প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দর্শনের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। দর্শনে সুপণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও হীরালাল হালদার মহাশয়েরা তাঁহার এবম্বিধ দার্শনিক বিদ্যাবত্তার কথা ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকায় লিখিয়াছেন। অধ্যাপক হীরালাল হালদার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এত লোককে সম্মানার্থ ডক্টর অর্থাৎ আচার্য্য উপাধি দিয়াছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুহিতকারী সুপণ্ডিত কর্ম্মী প্রসন্নকুমার রায়কে সম্মান দেখান নাই! তিনি ধর্ম্ম-তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এইজন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্যোগিতা ছিল। সিটি কলেজেও তিনি তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন, এবং উহার সভাপতির কাজও করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলের সহিত তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে লিখিয়াছেন, যে, গোখলে যে একসময় বলিয়াছিলেন, "আজ বাংলা দেশ যাহা চিন্তা করে, কাল সমগ্র ভারতবর্ষ সেই চিন্তা করে," তাহা আচার্য্য প্রসন্ন-কুমার রায় প্রভৃতি মনস্বী বাঙালীর সাহচর্য্যবশতই বলিয়াছিলেন।

আচার্য্য রায় যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ছিলেন, আমি তখন তথাকার ছাত্র। কিন্তু তখন আমি বিজ্ঞান পড়িতাম বলিয়া তাঁহার নিকট পড়িবার সুযোগ হয় নাই। সেই জন্য আমি যদিও তাঁহাকে বরাবর শিক্ষা-গুরুর মত সম্মান করিতাম, তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ সৌজন্যবশতঃ আমাকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমার ইহা ভাল না লাগিলেও তিনি আমাকে কখনও "তুমি" বলেন নাই। সকলের সহিত তাঁহার কথোপকথনের একটি বিশেষত্ব আমি লক্ষ্য করিতাম,

যে, সচরাচর তাঁহার কথাবার্ত্তার বিষয় ছিল জ্ঞান ও ধর্ম্ম কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ সম্বন্ধে; বাজে কথা বলিতে তাঁহাকে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। অথচ তিনি যে প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন না, তাহা নহে। তাঁহার সহিত শেষ দেখা হয় একজন অধ্যাপকের বাড়িতে। ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে কথা উঠায় তিনি এই মর্ম্মের কথা বলিলেন, "ইংরেজরা স্বেচ্ছায় প্রসন্নচিত্তে ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবে না, গুরুতর কোন চাপ তাহাদের উপর না পড়িলে দিবে না।"

তিনি একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে দারুণ শোক পাইয়াছিলেন, কিন্তু শোকে অভিভূত হন নাই।

—

মিঃ চার্চিলের বক্তৃতায় দমননীতির পূর্ব্বাভাস

আমরা কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে কলিকাতা পুলিসের গত বার্ষিক রিপোর্ট হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে, ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন দমনের কার্য্য হঠাৎ আরব্ধ হয় নাই, আগে হইতে ইহার আয়োজন চলিতেছিল। অন্য প্রমাণও নানা কাগজে বাহির হইয়াছে।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অর্ডিন্যান্সগুলি সম্বন্ধে স্যর হরি সিং গৌড়ের প্রস্তাব আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যাহা বলেন, ইংরেজী বহু দৈনিকে তাহার কিয়দংশের নিম্নোদ্ধৃত রিপোর্ট বাহির হইয়াছে।

He quoted from Mr. Churchill's speech of the 3rd December in the Commons wherein Mr. Churchill had asked as to how the proposed R. T. C. Committees would work in the various provinces which would be under a law amounting to martial law and that the repressive measures to be introduced were a result of the past foolish policy. Mr. Neogy asked: "How is it that Mr. Churchill knew that this regime was coming a month before Mahatma Gandhi's arrival and the promulgation of Ordinances? Many Congressmen asked me for an answer. I would ask the Government to enlighten them."

তাৎপর্য্য। তিনি বিলাতের হাউস্ অব্ কমন্সে গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখে মিঃ চার্চিলের বক্তৃতার সেই অংশ উদ্ধৃত করেন যাহাতে মিঃ চার্চিল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক কমিটিগুলি সামরিক আইনের সমতুল্য আইনের অধীন প্রদেশগুলিতে কি প্রকারে কাজ করিবে, এবং যাহাতে মিঃ চার্চিল বলিয়াছিলেন, যে, যে-সব দমনাত্মক বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত গত সরকারী নীতির ফল। মিঃ নিয়োগী জিজ্ঞাসা করেন, "মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার এবং বহু অর্ডিন্যান্স জারি হইবার এক মাস আগে মিঃ চার্চিল কেমন করিয়া জানিলেন যে এখন যেরূপ শাসন চলিতেছে তাহা প্রবর্ত্তিত হইবে? অনেক কংগ্রেসওয়ালা আমার নিকট এই প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছে। আমি গবন্মেণ্টকে তাঁহাদিগকে জ্ঞানালোক দিতে অনুরোধ করিতেছি।"

—

বোম্বাইয়ে শাসনের কঠোরতাবৃদ্ধির পূর্ব্বাভাস

পাঠকেরা কাগজে দেখিয়া থাকিবেন, পাইয়োনিয়ার প্রভৃতি কাগজে একটা গুজব বাহির হয়, যে, বোম্বাইয়ের গবর্ণর শাসন-কার্য্যে দুর্ব্বলতা দেখাইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে বিলাত ফিরিয়া যাইতে আদেশ করা হইবে। বিলাত হইতে এবং দিল্লী হইতে এই গুজবের সরকারী প্রতিবাদ তাহার পর বাহির হয়। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বাড়ি যাইতে হইবে, এরূপ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল কিনা জানা যায় নাই; কিন্তু তাঁহার শাসন যে আরও শক্ত হওয়া উচিত এরূপ কথা বিলাতে উঠিয়াছিল। বিলাতী রক্ষণশীল খবরের কাগজগুলার ইংরেজ সংবাদদাতারা ভারতবর্ষ হইতে খবর পাঠাইতেছিল, যে, বোম্বাইয়ে পুলিস জনতার উপর লাঠি চালাইতে অনিচ্ছা দেখাইতেছে এবং সেইজন্য জনতা আর বাগ মানিতেছে না, ইউরোপীয়েরা অপমানিত হইতেছে এবং পুলিসের অকেজোমি কংগ্রেসের দ্বারা দলবদ্ধ লোকদিগের আস্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দিতেছে। এলাহাবাদের লীডারের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা তাঁহার ২২শে জানুয়ারীর চিঠিতে এই প্রকার কথা লিখিবার পর বলিতেছেন, "আমরা ধরিয়া লইতে পারি, যে, শীঘ্রই বোম্বাই হইতে খবর আসিবে, যে, সেখানে শাসন পূর্ব্বাপেক্ষা শক্ত করা হইয়াছে।" পাঠকেরা জানেন, এই ইংরেজ সংবাদদাতা লণ্ডনে ২২শে জানুয়ারী যাহা লিখিয়াছিলেন, বোম্বাইয়ে তাহা ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে ঘটিয়াছে।

এই সব দেখিয়া, ভারতবর্ষে শাসনের "দৃঢ়তা" বৃদ্ধি কি প্রকারে সাধিত হয়, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। অনুমান অবশ্য অনুমানই, নিশ্চিত সত্য না

হইতেও পারে। অনুমান হয়, ভারতপ্রবাসী ইংরেজমহলে, বিশেষতঃ ভিলিয়ার্স-প্রমুখ কলিকাতার ইংরেজমহলে, ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যখন যে মত প্রচলিত থাকে, বিলাতী কাগজের এখানকার ইংরেজ সংবাদদাতারা তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিলাতে সংবাদ পাঠায়। সেই সংবাদগুলা সেখানে প্রকাশিত হইলে লোকমত ও মন্ত্রীমণ্ডলের মত (দুই-ই কতকটা এক) তদনুসারে গঠিত হয়। এই প্রকারে গঠিত তথাকার সরকারী মত অনুসারে এখানে গবন্মে‌ণ্টের নিকট অনুরোধ বা আদেশ (যাহাই বলুন) আসে, এবং তদনুসারে ভারতবর্ষে কাজ হয়।

—

লণ্ডনে ভারতীয় চিত্রকলা

আমরা আগে প্রবাসীতে লিখিয়াছি, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের অভ্যন্তর চিত্রভূষিত করিবার কাজে বাঙালী চারিজন চিত্রকরের কিরূপ প্রশংসা হইয়াছে। ঐরূপ আরও একটি প্রীতিকর সংবাদ আসিয়াছে। গত জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুমতি অনুসারে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটীর উদ্যোগিতায় তথায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীলের চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। চিত্রগুলির খুব প্রশংসা হইয়াছে। সারদা বাবুরা তিন ভাই চিত্রকর। যে-তিনজন বাঙালী চিত্রকর ইণ্ডিয়া হাউস ভূষিত করেন, তাঁহার ভাই রণদাচরণ উকীল তাঁহাদের অন্যতম। অন্য এক ভ্রাতা "রূপলেখা" নামক ইংরেজী ললিতকলাবিষয়ক পত্রিকার সংস্থাপক ও সম্পাদক বরদাচরণের হাতে লণ্ডনের এই প্রদর্শনীর ভার ছিল। সারদাবাবুর যে-সব ছবি প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার মধ্যে একটি গত বৎসর দিল্লীর প্রদর্শনীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া বড়লাটের "পেয়ালা" পুরস্কার পাইয়াছিল, এবং অন্য একটি মহীশূর প্রদর্শনীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র বলিয়া মহারাজার পুরস্কার পাইয়াছিল।

—

বোম্বাইয়ের তরুণ মুসলমানদের রাজনীতি

ভারতীয় সকল মুসলমান যে স্বাজাতিকতাবিরোধী ও পার্থক্যপ্রিয় নহেন, তাহার প্রমাণ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। বঙ্গে ও অন্য অনেক প্রদেশে তরুণ মুসলমানদের অনেকের মধ্যে স্বাজাতিকতা লক্ষিত হয়। সম্প্রতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর তরুণ মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন নিজেদের মতের যে বর্ণনাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁহারা বলিয়াছেন, যে, তরুণ মুসলমানেরা অবিমিশ্র স্বাজাতিকতার উপর এবং নিম্ন-মুদ্রিত তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ ভিন্ন সন্তুষ্ট হইবে না। যথা—সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডল (joint electorates), কেন্দ্রীয় গবন্মে‌ণ্টের হাতে "অবশিষ্ট ক্ষমতা"র ভারার্পণ (residuary powers to vest in the Centre) এবং সাবালক পুরুষ ও নারী মাত্রেরই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার (adult suffrage)।

—

বঙ্গীয় জর্জ ওয়াশিংটন স্মৃতিপরিষৎ

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের স্বাধীনতা যাঁহারা অর্জ্জন করেন, জর্জ ওয়াশিংটন তাঁহাদের অগ্রণী। এরূপ পুরুষকে সম্মানের সহিত প্রতিবৎসর স্মরণ করিলে কেবল যে মার্কিন জাতিরই কল্যাণ হয় তাহা নহে, অন্যেরও কল্যাণ হয়। এক সময়ে যিনি শত্রু বিবেচিত হইতেন, এখন তিনি শত্রুজাতি কর্ত্তৃকও সম্মানিত হন। এই জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অন্যতম ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ব্যালফুর সাহেব আমেরিকা ভ্রমণকালে জর্জ ওয়াশিংটনের একটি মূর্ত্তিকে মাল্যশোভিত করেন। বাংলা দেশে আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি প্রস্তাব হইয়াছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী এই অনুষ্ঠানটি নানা স্থানে সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয় জর্জ ওয়াশিংটন স্মৃতিপরিষৎ গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,

১৯৩২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জন্মদাতা জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জন্মতিথি দুই শতাব্দী পূর্ণ করিবে। এই উপলক্ষে মার্কিণ নর-নারী আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্রে ও জগতের নানাস্থানে

বিরাট উৎসবের ব্যবস্থা করিতেছে। বিভিন্ন ছোট বড় মাঝারি দেশের নর-নারীও স্বাধীনভাবে এইরূপ জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। এই অন্তর্জাতিক উৎসবে যোগদান করা ভারতীয় নর-নারীর পক্ষেও বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়।

ভারতের সার্ব্বজনিক সভা-সমিতি, সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান-পরিষৎ, শিল্প-বাণিজ্যভবন, গ্রন্থালয়, গবেষণা-গৃহ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি কেন্দ্রে কেন্দ্রে জর্জ ওয়াশিংটন ও তাঁহার দেশকে সম্বর্দ্ধনা করার গৌরব সহজেই অনুভূত হইবে আশা করিতেছি। এই উৎসবে যোগদান করিলে মার্কিণ নর-নারীর সঙ্গে ভারতীয় নর-নারীর আত্মীয়তা আরও খানিকটা নিবিড়তর হইয়া উঠিবে, এই বুঝিয়া দেশের জননায়কগণ নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে যথোচিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে উৎসাহী হইবেন, এরূপ ভরসা আছে।

আমরা এই প্রস্তাবের সমর্থক।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি

কুমার শরৎকুমার রায়ের সভাপতিত্বে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির গত বার্ষিক অধিবেশনের যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিবার্টিতে বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম গত বৎসর ৩২টি প্রাচীন জিনিষ সমিতির মিউজিয়মের জন্য সংগৃহীত ও তথায় রক্ষিত হইয়াছে। এই ৩২টির মধ্যে ১২টি বিষ্ণু, সূর্য্য, উমা-মহেশ্বর, ব্রহ্মা, এবং বরাহ অবতারের প্রস্তর-মূর্ত্তি। এইগুলি হইতে পাল-রাজাদিগের আমলের শিল্পের ক্রমবিকাশ বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন ২০টি নূতন মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। উহা রাজ্ঞী দিদ্দার রাজত্বকালের। এই রাজ্ঞীর বিষয়ে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে লোকের আগ্রহ হইবে।

সহযোগিতা পাইবার সরকারী ইচ্ছা

নয়া দিল্লী হইতে গত ৪ঠা জানুয়ারী ভারত গবন্মেণ্টের সেক্রেটরী এমার্সন সাহেব কংগ্রেসের প্রতি গবন্মেণ্টের ব্যবহার সমর্থনার্থ যে বর্ণনা-পত্র বাহির করিয়াছেন, তাহার শেষ দুই প্যারাগ্রাফে লিখিত হইয়াছে, যে, এখন সরকার ভারতশাসনবিধি সংস্কারের যে চেষ্টা করিতেছেন, সেই মহৎ কার্য্যে সহযোগিতা করিবার সুযোগ বিদ্যমান; এই মহৎ কার্য্য তাঁহারা অগ্রসর করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। শেষে বলা হইয়াছে :—

"In this task they appeal for the co-operation of all who have at heart the peace and happiness of the people of India and who, rejecting the methods of revolution, desire to follow to its certain goal the path of constitutional advance."

তাৎপর্য্য। যাঁহারা ভারতবর্ষের লোকদের শান্তি ও সুখ চান এবং যাঁহারা বিপ্লবের পন্থা ত্যাগ করিয়া শাসনবিধির প্রগতির বৈধ পথে নিশ্চিত শেষ লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিতে চান, সরকার এই কাজে তাঁহাদের সকলের সহযোগিতার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ জানাইতেছেন।

আমরা যদি বলি, যে, কংগ্রেস ভারতবর্ষের লোকদের শান্তি ও সুখ বরাবর চাহিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বিপ্লব না ঘটাইয়া আইনসঙ্গত পথেই সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং সেই জন্যই মহাত্মা গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকে গিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ভারতসচিব স্যর সামুয়েল হোরকে চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া বড়লাটের সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা হইলে আমাদের কথা ভারতীয় বিস্তর লোকের সমর্থন পাইলেও সরকার-পক্ষের লোকদের সম্মতি পাইবে না। অতএব আমরা কংগ্রেসকে বাদ দিলাম ;—যদিও কংগ্রেসের ৫০ বৎসর ব্যাপী চেষ্টার ফলেই গবন্মেণ্টকে শাসনবিধি সংস্কারের কাজে হাত দিতে হইয়াছে, কংগ্রেস ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মিষ্ঠ শক্তিশালী স্বাধীনতাকামী ও আত্মোৎসর্গ-পরায়ণ প্রতিষ্ঠান এবং তজ্জন্য উহার সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলেও আমরা কংগ্রেসকে বাদ দিয়া দেখিতে চাই, সরকার অন্য কাহাদের সহযোগিতা চান বা চান না।

গোল টেবিল বৈঠকের কাজ ভারতবর্ষে চালাইবার জন্য চারিটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে এমন অনেক লোকের নাম আছে, যাঁহারা খুবই অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু মডারেট দলের অতি প্রসিদ্ধ অনেক লোক কমিটি-গুলিতে নাই। যে-সব নেতাকে গবন্মেণ্ট এখনও জেলে পাঠান নাই এবং যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোল টেবিল বৈঠকের সভ্য তাঁহাদিগকে মডারেট বলিয়া ধরা অসঙ্গত হইবে না। প্রসিদ্ধ এইরূপ যে-সব লোকের মধ্যে একজনকেও একটা কমিটিতেও লওয়া হয় নাই, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিতেছি। যথা—পণ্ডিত মদনমোহন

মালবীয়, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্তর শিবস্বামী আইয়ার, স্তর চিমনলাল সেতলবাদ, দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাও, শ্রীযুক্ত মনু সুবেদার, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, স্তর জাহাঙ্গীর কয়াজী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ইত্যাদি। সরকার কেবল যে খ্যাতনামা বিচক্ষণ এই সব মডারেটদের সহযোগিতা চান নাই, তাহা নহে; এক একটা প্রদেশের শ্রেণী-বিশেষের বহু লক্ষ নিযুত কোটি লোকের সহযোগিতা চান নাই। লীডারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সি ওয়াই চিন্তামণিকে প্রথমে সরকার কোন কমিটিতে গ্রহণ করেন নাই। তিনি গবর্মেণ্টের একজন দক্ষ সমালোচক। পরে একটা কমিটিতে তাঁহাকে লওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য কি?

সরকার যে খুব অধিকসংখ্যক লোকের কোন প্রতিনিধি গ্রহণ করেন নাই, তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি। পঞ্জাবের মুসলমানদের ও শিখদের প্রতিনিধি লইয়াছেন, কিন্তু পঞ্জাবের হিন্দুদের প্রতিনিধি একজনও গ্রহণ করেন নাই। পঞ্জাবে শিখদের সংখ্যা ৩০,৩৪,০০০; হিন্দুদের সংখ্যা ৬৩,২৯,০০০। ত্রিশ লাখ শিখের প্রতিনিধি দুটা কমিটিতে ২জন লওয়া হইয়াছে, অথচ ৬৩ লাখ হিন্দুর একজন প্রতিনিধি একটা কমিটিতেও লওয়া হয় নাই। পঞ্জাবের ৩০ লাখ শিখের ২জন প্রতিনিধি লওয়া হইয়াছে, ১,৩৩,৩২,৪৬০ জন মুসলমানের কয়েক জন প্রতিনিধি লওয়া হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গের দুই কোটি পনর লক্ষ আটত্রিশ হাজার হিন্দুর একজন প্রতিনিধিও লওয়া হয় নাই। অন্য আর একটা দৃষ্টান্ত লউন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা ৭১,৮২,০০০। এই একাত্তর লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি সরকার বাহাদুর লইয়াছেন, কিন্তু বাংলা দেশের দু-কোটি পনর লক্ষ মানুষের একজন প্রতিনিধিও সরকার বাহাদুর গ্রহণ করেন নাই। অথচ বাংলা দেশে আধুনিক যুগে যত জগদ্বিখ্যাত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং জগদ্বিখ্যাত বাঙালী এখনও যত জন জীবিত আছেন, আগ্রা-অযোধ্যার মুসলমানদের মধ্যে তত জন জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং এখনও তাঁহাদের মধ্যে সেরূপ কেহ নাই। বঙ্গের হিন্দুদের চেয়ে আগ্রা-অযোধ্যার বা পঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারও বেশী হয় নাই।

মডারেটদের প্রতি সরকারের ব্যবহার এইরূপ। এরূপ ব্যবহারের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝা অসাধ্য নহে। অথচ অনেক মডারেট ব্যর্থ সহযোগিতা করিতে ব্যগ্র।

সরকার "অবনত" শ্রেণীর লোকদের জন্য বড়ই উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং "অবনত" শ্রেণীর লোকেরা বিপ্লবের পথ অবলম্বনও করেন নাই। কিন্তু বঙ্গের বহু লক্ষ "অবনত" শ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে ত একজনও প্রতিনিধি সরকার গ্রহণ করেন নাই।

তাহা হইলে সহযোগিতার জন্য সরকারী আপীল ঠিক্ কাহাদের জন্য অভিপ্রেত?

স্বর্গীয়া যামিনী সেন

কুমারী যামিনী সেন কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নির্ভীক লেখক স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা এবং কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের দ্বিতীয়া ভগিনী ছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে দুইবার বিলাত গিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর রাজকীয় হাঁসপাতালে তিনি কয়েক বৎসর সাতিশয় যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। সেখানে, এবং অন্য যে-সব জায়গায় তিনি কাজ করিয়াছেন, তাঁহার চারিত্রিক শুচিতা, মাধুর্য্য ও নম্রতা সকলকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল। তিনি উইমেন্স মেডিক্যাল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়া শিকারপুর, আগ্রা, আকোলা প্রভৃতি শহরে কাজ করিয়াছিলেন। সেই চাকরি ত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতাতেও কয়েক বৎসর কাজ করেন। গত দুই বৎসর অত্যন্ত পীড়িত থাকায় তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য পুরী যান। সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার গুণশালিতা জানিতে পারিয়া তত্রত্য জেনারাল হাঁসপাতালের ভার লইতে তাঁহাকে বাধ্য করেন। পুরীতে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া বরং পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং এখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

সরকারী দীর্ঘসূত্রিতা

লাহোর ট্রিবিউনের দিল্লীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে, গবর্ন্মেণ্ট স্থায়ী আর্থিক কমিটিকে (Standing Finance Committeeকে) জানাইয়াছেন, যে, গোল টেবিল বৈঠকের ফ্রাঞ্চিস্ (ভোটদানাধিকার) কমিটির কাজ এ বৎসর শেষ হইবে না, ঐ কমিটি আগামী বৎসরের শীতকালে আবার পাঁচ মাসের জন্য ভারতবর্ষে আসিবেন। উক্ত সংবাদদাতা আরও লিখিয়াছেন, এই বিলম্বোৎপাদন-কৌশলে ("delaying tactics"এ) লিবারাল অর্থাৎ মডারেট মহলে মানসিক তিক্ততা জন্মিয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় !

—

ভবিষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে গান্ধীজী

নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিক নিউ রিপাব্লিকের অন্যতম সম্পাদক ও তাহার সম্পাদক-সমিতির সভাপতি মিঃ ব্রুস্ ব্লিভেন লণ্ডনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। এই সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত তিনি নিউ রিপাব্লিকে প্রকাশ করিয়াছেন।

গান্ধীজীকে যে-সব প্রশ্ন করা হইয়াছিল, উত্তরসহ সেগুলি লিপিবদ্ধ করিবার আগে মিঃ ব্লিভেন লিখিয়াছেন, যে, মহাত্মাজী ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী সকলে মনে করেন, যে, গোল টেবিল বৈঠক দুঃখকর ব্যর্থতাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই আমেরিকান সম্পাদকের মতে "সকলেই জানেন মহাত্মাজী গোল টেবিল বৈঠকে অনিচ্ছার সহিত এবং পুনঃ পুনঃ ইহা বলার পর আসিয়াছিলেন, যে, উহার ব্যর্থতা নিশ্চিত।"

মিঃ ব্লিভেন আরও বলেন, "হিন্দুরা বিশ্বাস করিত এবং এখনও করে, যে, এই বৈঠকরূপ খেলার তাসগুলা তাহাদিগকে ঠকাইবার জন্য আগে হইতেই সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল, এবং বৈঠকটা একটা কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তরিক চেষ্টা ততটা নয়, যতটা রাজনৈতিক খেলোয়াড়ের ঐ সমস্যার সমাধান স্থগিত রাখিবার কৌশল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থগিত রাখিবার নৈতিক দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ-চেষ্টা।" যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয়কেই আমেরিকানরা হিন্দু বলে ; তা ছাড়া, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীকেও হিন্দু বলে। মিঃ ব্লিভেন কোন্ অর্থে হিন্দু শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন, জানি না।

মিঃ ব্লিভেন গান্ধীজীকে প্রথমেই প্রশ্ন করেন, ভবিষ্যতে কখনও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লীগ অব নেশ্যন্সের দ্বারা, অথবা (লীগ যদি ততদিন না টেঁকে) শক্তিশালী জাতিদের সমষ্টি দ্বারা গ্যারাণ্টি করান বাঞ্ছনীয় হইবে কি ? গান্ধীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, এরূপ জিনিষ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তিনি বলিলেন, "যদি লীগ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি দিয়া আমোদ করিতে চান, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তির কারণ নাই।* কিন্তু **কেহই অন্যের জন্য স্বাধীনতা জিনিয়া দিতে পারে না।** তাহাই সত্যকার স্বাধীনতা যাহা তুমি তোমার নিজের জন্য অর্জ্জন করিয়া লইতে পার এবং নিজের শক্তির দ্বারা দখল করিয়া থাকিতে পার। আমি নিশ্চয়ই আশা করি, যে, জাপান+ কিংবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (মিঃ ব্লিভেনের দিকে ব্যঙ্গ কটাক্ষ করিয়া) কখনও স্বাধীন ভারতকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিবে না। কিন্তু তাহারা যদি সে চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমরা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে অসহযোগ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাদের বিরুদ্ধেও তাহা করিব। তখন তাহারা অতি শীঘ্র দেখিতে পাইবে, যে, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে সম্ভবতঃ যাহা পাইতে পারে, উহা দখল করিয়া থাকিতে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইবে।"

মিঃ ব্লিভেন লিখিয়াছেন, গান্ধীজী মানেন গ্রেট ব্রিটেনের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইলেই ভারতবর্ষের সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। ইহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে সঙ্কটজনক সমস্যা কৃষকদের অবস্থা। ভারতবর্ষের সব চেয়ে বেশী লোক কৃষিজীবী। তাহারা হৃদয়হীন ভূস্বামীদের দ্বারা নিষ্পেষিত। বাকী অনেক লোক কলকারখানার মজুর। মিলগুলির দীর্ঘকালব্যাপী

* চীন-জাপান যুদ্ধে লীগের শক্তিহীনতা এখন যেরূপ স্পষ্ট হইয়াছে, এই কথোপকথনের সময় ততটা স্পষ্ট হইয়াছিল কিনা জানি না।

+ মাঞ্চুরিয়ার প্রতি জাপানের ব্যবহার দেখিবার পরও কি গান্ধীজী ইহা আশা করেন ?

পরিশ্রম, অল্প বেতন, বালকবালিকাদেরও কর্ম্মে নিয়োগের প্রথা, এবং কাজের অস্থায়িত্ব তৎসমুদয়ের অনিষ্টকারিতার কারণ। যাহা হউক, মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করেন, যে, গ্রেট ব্রিটেনের সহিত সংগ্রামে যে-সব কর্ম্মনীতি ভারতীয়েরা শিখিতেছে, তাহা তাহারা ভবিষ্যৎ অধিকতর স্বাধীনতার সংগ্রামে সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিবে। তিনি আবার বলিলেন, কেহই অপরের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া দিতে পারে না। "যখন ভারতবর্ষ বিদেশীর জোয়ালমুক্ত হইবে, তখন ভূস্বামীদের এবং ধণিকদের জোয়ালও ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিবে।"

মিঃ স্লিভেন লিখিয়াছেন, গান্ধীজীর দলের কেহ কেহ যে প্রায়ই বলেন, ভারতবর্ষের নানা মন্দ অবস্থা গোড়ায় ব্রিটিশ-শাসনেরই ফল, তিনি সেই মত পোষণ করেন না দেখিয়া বিষয়টি আমার মনে লাগিল। তিনি মনে করেন, ইংরেজরা গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু ও উদার সংস্কারপ্রিয় হিন্দুদের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে লাগাইয়াছে, এবং যখন তাহাদের নিজের মতবাদসমূহ ("theories") অনুসারেই তাহাদের উচিত ছিল উদার হিন্দুদের পক্ষে যুদ্ধ করা, তখন তাহারা নির্লিপ্ত ভাবে সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মন্দ বলিয়া স্বীকৃত ভারতবর্ষের নানা দশা দেশের সাধারণ অবস্থা হইতে উৎপন্ন, এবং কেবল বহুবৎসরব্যাপী চেষ্টার দ্বারা তৎসমুদয়ের উচ্ছেদ হইতে পারে। তিনি আরও বলিলেন, কোন কোন অবস্থা যত গুরুতর মনে করা হয়, তত গুরুতর নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, লিখনপঠনক্ষমদের সংখ্যা যে শতকরা খুব কম, সেই তথ্যটির উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন, অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও জ্ঞানবত্তা ও কেতাবী শিক্ষা সমর্থক নহে; শিক্ষিত মূর্খ এবং অশিক্ষিত জ্ঞানী লোক সব দেশেই আছে।

যন্ত্রপাতির প্রতি গান্ধীজীর মনের ভাব অনেকেই ভুল বুঝে; এই জন্য তিনি উহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি কলের বিরোধী নই।" তাঁহার চরখাটি দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি রিপোর্ট করিতে পারেন, যে, আপনি আমাকে একটি কল ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন, এবং ইহা বেশ ভাল সুন্দর ও সরল যন্ত্র। কল যত বড়ই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না; আমি কেবল চাই, যে, মানুষ কলটার প্রভু হইবে, তাহার দাস হইবে না; কলটা মানুষের সেবা করিবে, মানুষ কলটার সেবা করিবে না। ভারতবর্ষে কলের বিরুদ্ধে আপত্তি এই, যে, এখানে যে-মানুষগুলি কলটা চালায় তাহারা বস্তুতঃ দাসের মতই চালায়।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সমস্যার আর একটা দিক্ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গান্ধীজী কোনই অনিচ্ছা দেখাইলেন না;—তাহা হইতেছে, মুসলমান ও "অস্পৃশ্য"দের সম্বন্ধে আপত্তি। তিনি বলিলেন, যাহা তিনি অনেকবার বলিয়াছেন, "হিন্দুরা সবাইকে সম্পূর্ণ সাম্য ও ন্যায়বিচার দিতে চায়। সংখ্যান্যূনদের অপেক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত। তখন যদি তাহারা অনুভব করে, যে তাহাদের কোন অভিযোগ আছে, তাহা হইলে তাহাদের সুশৃঙ্খলভাবে উহার নিষ্পত্তি চাওয়া উচিত হইবে। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, ভ্রান্তভাবে যে পৃথক নির্ব্বাচন রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বজায় রাখিলে একটা দুঃসহ ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে।"

—

পরলোকগত চারুচন্দ্র দাস

গত ১৩ই পৌষ, মঙ্গলবার, পাটনার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার চারুচন্দ্র দাস মহাশয়ের পরলোকগমনে পাটনার এবং পাটনার প্রবাসী বাঙালী সমাজের নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে। দাস মহাশয় সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানে অন্যতম নেতা ছিলেন, এবং পাটনার প্রবাসী বাঙালী সমাজের সাহিত্যিক ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। পাটনার রবীন্দ্রজয়ন্তী ও সেই সম্পর্কে 'নটীর পূজা'র অভিনয় তাঁহার বিদুষী পত্নী ও তাঁহার কলাকুশল কন্যাগণের চেষ্টায় সফলতা লাভ করিয়াছিল। সহ সরলতা, উদারতা, সৌজন্য, বদান্যতা ও দেশপ্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণে তিনি পাটনার সকলেরই হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহদ্বার আশ্রয়হীন দরিদ্রজনের নিমিত্ত সর্ব্ব



পরলোকগত চারুচন্দ্র দাস

অবারিত থাকিত এবং তাঁহার গৃহ পাটনার প্রবাসী বাঙালীদের সকল অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মোটে বাহান্ন বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী মহিলাদের মধ্যে এখানকার রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক আন্দোলনের নেত্রীরূপে উত্তরবঙ্গে গত বন্যার সময় সকলের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বন্যাপীড়িত দীনজনের নিমিত্ত সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। নারীগণের শিক্ষা, অবরোধ-ত্যাগ প্রভৃতি সমাজহিতকর কার্য্যে তিনি তৎপর।

পরলোকগত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

শিলং যাইবার পথে আমিনগাঁও নামক স্থানে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র ছিলেন। তিনি অনেক বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টের "মাষ্টার" এবং অফিস্যাল রেফারীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি দেশভ্রমণপ্রিয় এবং বহুভাষাবিৎ ছিলেন। গ্রন্থকাররূপেও তিনি পরিচিত। তাঁহার স্বাধীন মন্তব্য সমন্বিত ভ্রমণবৃত্তান্ত আমরা অনেক বৎসর পূর্ব্বে "মহাবোধি" পত্রিকায় আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম।

প্রবাসী বাঙালী মহিলা অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদে দুই বৎসরের জন্য অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি বি-এ উপাধিধারিণী। ইঁহাকে কোন



শ্রীমতী প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাধে অভিযুক্ত নাবালক ছেলেমেয়েদের বিচার করিতে হইবে, রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবে না।

সন্তানের পিতা পুরুষ বিচারকেরাও অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়ের বিচারকালেও কেবল বিচারযন্ত্রের মতই নিজেদের কাজ করেন, পিতার হৃদয় ও বিবেচনাকে আমল দেন না। সন্তানের জননীরা বিচারক হইলে ন্যায়-বিচার অবশ্যই করিবেন এরূপ আশা করা হয়; কিন্তু এই আশাও নিশ্চয়ই করা হয়, যে, তাঁহারা মাতৃহৃদয়ের পরিচয় দিয়া দোষী ছেলেমেয়েদের জীবনের ভবিষ্যৎ সাফল্যের দিকেও দৃষ্টি রাখিবেন। এই কারণে আমরা মহিলাদিগকেও বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই।

—

চট্টগ্রামে অরাজকতার সরকারী তদন্ত

১লা ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে, চট্টগ্রামের হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকান লুট ও তাহাদের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে যে সরকারী তদন্ত হইয়াছে, তাহার রিপোর্টের একখণ্ড টেবিলে রাখিবার জন্য, অর্থাৎ উহা প্রকাশিত করিবার জন্য, প্রশ্নের আকারে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-কুমার বসু গবন্মেণ্টকে অনুরোধ করেন। উত্তরে সরকার পক্ষে মিঃ প্রেণ্টিস্ বলেন, উহা প্রকাশ করা সাধারণের স্বার্থসাধক ও কল্যাণকর হইবে না বলিয়া গবন্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন। তাহার পর অনেক সভ্য অনেক প্রশ্ন বৃষ্টি করিলেন, এবং মিঃ প্রেণ্টিস বলিতে লাগিলেন, "আমার আর কিছু বলিবার নাই।" সভাপতি তাঁহাকে উত্তর দিতে বাধ্য করিতে পারিলেন না।

৩রা ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চট্টগ্রাম-রিপোর্ট অপ্রকাশিত রাখার আলোচনা হয়। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। মিঃ প্রেণ্টিস্ কেবল বলিয়াছেন, যে, ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে গবন্মেণ্ট কি সিদ্ধান্ত করেন, তাহার মর্ম্ম পরে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইতে পারে। তিনি আর যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান করিলে তাহা গবন্মেণ্টের অনুকূল হইবে না। তিনি এই মর্ম্মের কথা বলেন, যে, সব রিপোর্ট তদন্তকারীরা প্রকাশের জন্য লেখেন না। প্রকাশিত হইবে জানিলে তাঁহারা রিপোর্টে যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা না করিয়া হয়ত অন্যরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতেন। লোকে প্রকাশের জন্য অনভিপ্রেত ব্যক্তিগত চিঠিতে যাহা লেখে, প্রকাশিতব্য চিঠিতে অনেক সময় তাহা লেখে না; নিজের বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যাহা বলে প্রকাশ্য সভায় তাহা বলে না; ইহা জানা কথা। সুতরাং ইহা হইতে পারে, যে, রিপোর্টে যাহা যে-ভাষায় লিখিত হইয়াছে, গবন্মেণ্টের বিবেচনায় তাহা প্রকাশযোগ্য নহে। এখন প্রশ্ন এই, গবন্মেণ্ট যে দুই জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারীকে তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কি আগে হইতেই বলিয়া দিয়াছিলেন, আপনাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে না, অতএব আপনারা সব কথা খোলাখুলি রিপোর্টে লিখিবেন? যদি তাহা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তদন্ত কমিটি নিয়োগের সময় কেন বলা হয় নাই, যে, এই তদন্ত কন্‌ফিডেন্‌শ্যাল হইবে, ইহার রিপোর্ট গোপনীয় হইবে? কমিটি-নিয়োগের সময় গবন্মেণ্ট তাহা না বলায়, লোকে অনুমান করিবে, যে, তদন্তকারীরা এমন কোন কোন কথা লিখিয়াছেন যাহা চট্টগ্রামের ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কোন গুজবের ও সর্ব্বসাধারণের কোন কোন ধারণার সমর্থন করে। এরূপ অনুমান মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে মিথ্যা তাহা বিশ্বাসজনকরূপে প্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় সমগ্র রিপোর্টটি প্রকাশ করা।

—

শিক্ষায় মহিলাদের কৃতিত্ব

ছাত্রীরা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রমাণ করিতেছেন, যে, তাঁহারা এবিষয়ে ছাত্রদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় নহেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এম-এ পরীক্ষায় কয়েকটি ছাত্রী বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সংস্কৃতের একটি পাঠ্যসমষ্টিতে কুমারী কমলরাণী সিংহ এবং অন্য একটি পাঠ্যসমষ্টিতে কুমারী প্রীতিলতা গুপ্ত প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে কুমারী ইলা সেন প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান



কুমারী প্রভাবতী বসু



কুমারী সুরমা মিত্র

অধিকার করিয়াছেন। কুমারী প্রভাবতী বসু রসায়নী বিদ্যায় এম্-এ পাস্ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন ছাত্রী এই বিষয়ে এম্-এ হন নাই। কুমারী শোভা সেন বাংলা সাহিত্যে এবং শ্রীমতী কনকলতা চৌধুরী দর্শনে এম্-এ পাস করিয়াছেন। ইহার আগেকার এম্-এ পরীক্ষায় কুমারী সুরমা মিত্র সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং সংস্কৃতের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যসমষ্টিতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হন, সকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি সংস্কৃত অনার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম হন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুশীলনবৃত্তি পাইয়া সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্তের শিক্ষাধীন থাকিয়া ভারতীয় বিজ্ঞানবাদের তুলনামূলক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। ইতিপূর্ব্বে 'ভারতীয় কোনও মহিলা দর্শনশাস্ত্রে গবেষণাবৃত্তি পাইয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের অংশ

আমরা মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে বার-বার দেখাইয়াছি, যে, বাংলা দেশের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের আড়াই গুণ হওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক-সভায় বঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা বোম্বাইয়ের আড়াই গুণ দ্বিগুণ, বা দেড় গুণও নহে, প্রায় সমান সমান। ভবিষ্যতে যাহাতে বঙ্গের প্রতি এই অবিচার স্থায়ী না হয়, তাহার জন্য আমরা বাঙালী সর্ব্বসাধারণকে আন্দোলন করিতেও অনুরোধ করিয়াছি। কয়েকদিন হইল এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ কলিকাতার তিনটি দেশী ইংরেজী দৈনিকে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা তাহা দয়া করিয়া সহজে চোখে না-পড়ে এরূপ জায়গায় ছাপিয়াওছেন। ভারতবর্ষের প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ মূলশাসনবিধি অনুসারে সমগ্র দেশের রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থাপক সভাকে দুটি চেম্বার বা কক্ষে বিভক্ত করিবার কথা হইয়াছে। তাহাতে বাংলাকে যত প্রতিনিধি দিবার কথা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গের

প্রতি বর্ত্তমান অবিচারের মাত্রা কিছু কম করা হইয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমরা এখন নিম্ন কক্ষটির বিষয়ই আলোচনা করিব। ব্রিটিশ-শাসিত কোন্ প্রদেশকে উহাতে কত প্রতিনিধি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা এবং প্রত্যেক প্রদেশের লোকসংখ্যা নীচের তালিকায় দেখান হইল। ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটি আগে হইতেই ব্রহ্মদেশকে বাদ দিয়া রাখিয়াছেন!

প্রদেশ।	লোক-সংখ্যা।	প্রতিনিধি-সংখ্যা।
মান্দ্রাজ	৪,৬৭,৪৮,৬৪৪	৩২
বোম্বাই	২,২২,৫৯,৯৭৭	২৬
বাংলা	৫,০১,২২,৫৫০	৩২
আগ্রা-অযোধ্যা	৪,৮৪,০৮,৭৬৩	৩২
পঞ্জাব	২,৩৫,৮০,৮৫১	২৬
বিহার-উড়িষ্যা	৩,৭৫,৯০,৩৫৬	২৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,৫৪,৭২,৬২৮	১২
আসাম	৮৬,২২,২৫১	৭
উ-প সীমান্ত	২৪,২৫,০৭৬	৩
দিল্লী	৬,৩৬,২৪৬	১
আজমের-মেরোআরা	৫,৬০,২৯২	১
কুর্গ	১,৬৩,০৮৯	১
ব্রিটিশ বালুচিস্তান	৪,৬৩,৫০৮	১
মোট	২৫,৭০,৮৩,৬৯৪	২০০

মোটামুটি পচিশ কোটি লোকের জন্য দুই শত প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যেক কোটিতে আটজন, প্রত্যেক সাড়ে বার লক্ষে এক জন। এই হিসাবে বাংলার পাঁচ কোটি লোকের প্রতিনিধি পাওয়া উচিত চল্লিশ জন, কিন্তু দিবার প্রস্তাব হইয়াছে ৩২ জন; মান্দ্রাজের পাওয়া উচিত ৩৬ জন, প্রস্তাব হইয়াছে ৩২ জন; বোম্বাইয়ের পাওয়া উচিত ১৭ বা ১৮ জন, প্রস্তাব হইয়াছে ২৬ জন; আগ্রা-অযোধ্যার পাওয়া উচিত ৩৮ বা ৩৯ জন, প্রস্তাব হইয়াছে ৩২ জন; পঞ্জাবের পাওয়া উচিত ১৯ জন, প্রস্তাব হইয়াছে ২৬ জন; বিহার-উড়িষ্যার পাওয়া উচিত ৩০ জন, প্রস্তাব হইয়াছে ২৬ জন; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাওয়া উচিত ২ জন, প্রস্তাব হইয়াছে ৩ জন; ইত্যাদি।

মান্দ্রাজ, বাংলা, আগ্রা-অযোধ্যা এবং বিহার-উড়িষ্যাকে ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বোম্বাই, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রভৃতিকে বেশী প্রতিনিধি দিবার কারণ ফেডার্যাল ষ্ট্রাক্‌চ্যার কমিটির অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘ গঠন কমিটির খসড়া রিপোর্টে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি।

বোম্বাই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে, উহা বহু বৎসর হইতে এ পর্য্যন্ত বাংলা, মান্দ্রাজ ও আগ্রা-অযোধ্যার সহিত প্রায় সমান প্রতিনিধি পাইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ অন্য প্রদেশগুলিকে এপর্য্যন্ত অন্যায় ভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে বলিয়াই, এখনও সেই অন্যায় বজায় রাখিতে হইবে! দ্বিতীয় কারণ বলা হইয়াছে, যে, বোম্বাই প্রদেশের খুব ঐতিহাসিক ও বাণিজ্যিক গুরুতা আছে। প্রাচীনকালের, মধ্যযুগের, অব্যবহিত প্রাগ্‌ব্রিটিশ সময়ের, এবং ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস একসঙ্গে বিবেচনা করিলে ইহা কোন ঐতিহাসিক স্বীকার করিবেন না, যে, আগ্রা-অযোধ্যা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী, বিহার-উড়িষ্যা এবং বাংলা দেশের ঐতিহাসিক গুরুতা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর চেয়ে কম। বোম্বাইয়ের ঐতিহাসিক গুরুতা অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু বলিতেছি, অন্য প্রদেশগুলিও ঐতিহাসিকের বিচারে বোম্বাই অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচিত হইবে না।

জার্মেনীতে ও আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসে ফেডার্যাল শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে। এই উভয় দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রগুলির ঐতিহাসিক গৌরবের তারতম্য আছে। কিন্তু সেই তারতম্য বিবেচনা করিয়া কাহাকেও কম কাহাকেও বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হয় নাই।

বোম্বাইকে বেশী প্রতিনিধি দিবার আর একটা কারণ তাহার বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠতা বলা হইয়াছে। সকল দেশেই কোন কোন অঞ্চল বাণিজ্যে অন্য কোন কোন অঞ্চল অপেক্ষা অগ্রসর। কিন্তু বাণিজ্যে প্রধান অঞ্চলগুলিকে সেই কারণে বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হয় না। তাহা দিতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থাও করিতে হইবে, যে, যাহার হাজার টাকা আয় তাহার একটি ভোট দিবার অধিকার থাকিলে লক্ষপতির ভোট হইবে এক শতটি

এবং ক্রোড়পতির ভোটের সংখ্যা হইবে দশ হাজার। এরূপ নিয়ম ত কোথাও নাই। সুতরাং এক এক জন ধনী লোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার যখন এক এক জন দরিদ্রতর ভোটারের সমান, তখন একটি বাণিজ্যপ্রধান ধনী প্রদেশের প্রতিনিধির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র প্রদেশের চেয়ে বেশী কেন হইবে?

এইরূপ তর্কে আমরা মানিয়া লইয়াছি, যে, বোম্বাইয়ের ব্যবসার পরিমাণ বঙ্গের ব্যবসার পরিমাণের চেয়ে বেশী। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। গোল টেবিল বৈঠকে ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের অন্যতম প্রতিনিধি মিঃ গেভিন জোন্স বলিয়াছিলেন, যে, বাংলার কারবারের পরিমাণ বোম্বাইয়ের চেয়ে কম নয়।

পঞ্জাবের লোকসংখ্যা অনুসারে তাহার যত প্রতিনিধি পাওনা হয় তার চেয়ে বেশী তাহাকে দিবার কারণ বলা হইয়াছে সমগ্র ভারতীয় রাষ্ট্রে তাহার সাধারণ গুরুত্ব ("the general importance in the body politic of the Panjab")। ঐ প্রদেশের সাধারণ গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশেরও সাধারণ গুরুত্ব আছে। সাধারণ গুরুত্ব জিনিষটা নানা বিষয়ে গুরুত্বের সমষ্টি মাত্র। পঞ্জাব অন্য সব প্রদেশের চেয়ে শিক্ষায় অগ্রসর নহে; বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, ঐতিহাসিক গবেষণায়, সাহিত্যসৃষ্টিতে, সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, রাজনৈতিক জ্ঞানে, ইত্যাদিতে অন্য সব প্রদেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহে। তাহার বিশেষত্ব দুটি বিষয়ে। পঞ্জাব হইতে যত সিপাহী লওয়া হয়, অন্য কোন প্রদেশ হইতে তত লওয়া হয় না, এবং পঞ্জাবে গম খুব উৎপন্ন ও রপ্তানী হয়। কিন্তু পঞ্জাব হইতে যে বেশী সিপাহী সংগ্রহ করা হয়, তাহাতে অন্য সব প্রদেশের দোষ নাই। আগে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ হইতেই অধিকাংশ সিপাহী লওয়া হইত। রাজনৈতিক কারণে একটি প্রদেশ হইতে বেশী সৈন্য সংগ্রহ করিবার রীতি অবলম্বন করিয়া সেই রীতিটিকে অন্যান্য প্রদেশের গুরুত্বাভাবের প্রমাণ বলিয়া ব্যবহার করা উচিত নয়।

ভারতবর্ষের যে-সব জিনিষ বিলাতে রপ্তানী হয়, তাহাদের ১৯২৭, ১৯২৮, ১৯২৯ তিন বৎসরের মূল্যের পরিমাণ ষ্টেট্‌সম্যান্স ইয়্যার বুকে দেখিলাম। প্রত্যেক বৎসরই রপ্তানী চায়ের মূল্য গম তুলা পাট প্রভৃতি প্রত্যেক রপ্তানী জিনিষের চেয়ে বেশী। চা উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ বঙ্গে ও আসামে। চা বাদ দিলে তার নীচেই সকলের চেয়ে বেশী মূল্যের জিনিষ যায়' পাট। পাট প্রধানতঃ বঙ্গে উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষে যত রকম খনিজ পদার্থ খনি হইতে উত্তোলিত হয়, তাহার মধ্যে কয়লার মোট দামই সব চেয়ে বেশী। কয়লা উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ বিহার-উড়িষ্যা ও বঙ্গে। বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে এখন কয়লার খনি যে-সব জায়গায় আছে, তাহার অধিকাংশ আগে বঙ্গের সামিল ছিল।

নানা দিক দিয়া দেখিলে বোম্বাই প্রদেশকে কাপাসের সুতা ও কাপড়ের কল ছাড়া অন্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধান স্থান দেওয়া যায় না। তাহা দিবার সত্য কারণ যদি থাকিত তাহা হইলেও ব্যবসাবাণিজ্যে কোন অঞ্চলের প্রাধান্য তাহাকে বেশী প্রতিনিধি দিবার ন্যায্য কারণ হইতে পারে না, আগেই দেখাইয়াছি। বেতনের বিনিময়ে সিপাহীগিরি করিবার লোক কোথাও বেশী পাওয়া গেলে তাহাকে বেশী প্রতিনিধি দিতে হইবে, ইহাও ন্যায়সঙ্গত নিয়ম নহে। স্কটল্যাণ্ডে হাইল্যাণ্ডারদের কি সংখ্যা হিসাবে প্রাপ্য প্রতিনিধি অপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি আছে?

ব্যবসাবাণিজ্য ও যুদ্ধ করা ছাড়া সভ্য মানুষের আরও অনেক কার্য্যক্ষেত্র আছে, শক্তির পরিচয় দিবার ক্ষেত্র আছে। সেইগুলিতে যে বোম্বাই ও পঞ্জাব অন্য সব প্রদেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা কেহ দেখাইতে পারিবে না।

—

বাঙালীর চা-বাগান

অনেক বৎসর হইতে বাঙালীরা চা উৎপাদনের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন

দাস প্রভৃতি এবিষয়ে পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের পরে অনেকে এই কাজে হাত দিয়াছেন। এখন অনেকগুলি চা-বাগান বাঙালীদের সম্পত্তি। আগের নিবন্ধিকাটিতে বলিয়াছি, ভারতবর্ষ হইতে যত রকম জিনিষ বিলাতে রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী টাকার জিনিষ যায় চা। বিলাত ছাড়া অন্যান্য দেশেও ভারতবর্ষের চা গিয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে শুধু বিলাতেই ১৯২৭, ১৯২৮, ১৯২৯ সালে যথাক্রমে ২৪১১৪৮৬৪, ২০১৮১৫৩৯ এবং ২০০৮২৫৪০ পাউণ্ডের চা গিয়াছিল! এক পাউণ্ড আজকাল ১৩৷৴৪-এর সমান। তাহা হইলে প্রতি বৎসর গড়ে অন্যূন ছাব্বিশ কোটি টাকার চা বিলাতেই যায়। ইহার মধ্যে বাঙালীদের বাগানের চা কত যায়, জানি না। বিদেশে যাহা রপ্তানী হয়, তাহা ছাড়া এদেশেও চায়ের কাট্‌তি আছে।

বাঙালীদের নিজেদের পাইকারী হিসাবে বেশী বেশী চা বিক্রীর কোন বন্দোবস্ত নাই শুনিলাম। সেই জন্য তাঁহাদের যে চা ইংরেজ সওদাগররা হয়ত ছয় আনা পাউণ্ড (আধ সের) দরে কিনিয়া লয়েন, তাহা উৎকর্ষ অনুসারে বার আনা এক টাকা দেড় টাকা পাউণ্ড বিক্রী করিয়া লাভবান্ হন। বাঙালী চা-বাগানওয়ালারা যদি নিজে একটি বিক্রয়সমিতি (marketing board) গঠন করিতে পারেন এবং উৎকর্ষ অনুসারে তাহাতে নিজেদের মার্কা ও লেবেল বসাইয়া দেন এবং তাহার উপর লোকদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন, তাহা হইলে এই ব্যবসায়ের অনেক উন্নতি হইতে পারে। লিপ্টনের চা, বা ব্রুক বণ্ডের চায়ের মত খ্যাতি অর্জ্জন করা অসম্ভব নহে।

—

কাশীর আর্য মহিলা বিদ্যালয়

কাশীর এই বিদ্যালয়টির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিমান্ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ ইহার সেক্রেটারী। ইহার প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা গিরিবালা রায় শাস্ত্রী এই বিদ্যালয়টির বিষয় স্বয়ং আমাদিগকে মৌখিক জানাইয়াছেন। তাহার পর আমরা তর্কভূষণ মহাশয়কে চিঠি লিখিয়া ইহার বিষয় অবগত হইয়াছি। ইহা প্রাচীন আদর্শ অনুসারে পরিচালিত, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে অত্যাবশ্যক কয়েকটি বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রীদের সকলকেই সংস্কৃত শিখান হয়। তর্কভূষণ মহাশয়ের পত্রে জানিয়াছি, ইহা সুপরিচালিত। বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, জেলাজজ শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র চন্দ্র ও তাঁহার পত্নী বিদ্যালয়টি দেখিয়া ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যান্য প্রশংসার মধ্যে লিখিয়াছেন, “বিদ্যালয়সংলগ্ন বিধবাশ্রমটিও সুচারুরূপে সংরক্ষিত হইতেছে।” কাশীতে অল্পবয়স্কা হিন্দু বিধবা অনেক গিয়া থাকেন। সেইজন্য তথায় এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। তদ্ভিন্ন অন্য হিন্দু মহিলাদের জন্যও বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়টির কোন স্থায়ী আয় নাই। হিন্দুহিতৈষী ব্যক্তিগণ সাধ্যমত কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিলেই ইহার অভাব সহজেই দূর হইবে। ঠিকানা, ৭৫ পীতাম্বরপুরা, বারাণসী।

—

ব্যবস্থাপক সভাকে সাক্ষী মানা

বড়লাট গত ২৫শে ডিসেম্বর এ বৎসরকার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের প্রারম্ভিক বক্তৃতার শেষে ঐ সভার দ্বারা আইনসঙ্গত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক দেশের যে প্রগতি হইতেছে তদ্বিষয়ে উহার সভ্যদিগকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করেন। তিনি বলেন ঃ—

> I look with confidence to you gentlemen sitting in this Assembly, which is a witness in itself of what has already been done and a promise of what may yet be achieved by the constitutional method to support me and my Government, ইত্যাদি।

এই ব্যবস্থাপক সভাতেই স্যর হরি সিং গৌড় বড়লাটকে কতকগুলি আইনসঙ্গত অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু সরকারী সভ্য, ইংরেজ সভ্য, সরকারের মনোনীত সভ্য এবং অল্পসংখ্যক নির্ব্বাচিত

সভ্যের ভোটে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়। উপস্থিত অধিকাংশ নির্ব্বাচিত সভ্য প্রস্তাবটির সপক্ষে ভোট দেন। অনেক নির্ব্বাচিত সভ্য অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কর্ত্তব্যে অবহেলা না করিয়া উপস্থিত থাকিলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইত। প্রস্তাবটিতে রাজনৈতিক হত্যা, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির নিন্দা ছিল, এবং অন্যান্য অনুরোধের মধ্যে এই অনুরোধ ছিল, যে, গবন্মেণ্ট অর্ডিন্যান্সগুলিকে বিলের আকারে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়া সেগুলিকে স্থায়ী আইনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুন। কিন্তু গবন্মেণ্ট গত বৎসরের ব্যবস্থাপক সভার শেষ অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই এবং বর্ত্তমান অধিবেশনের পূর্ব্বে অর্ডিন্যান্স বৃষ্টি করেন। বর্ত্তমান অধিবেশন থাকিতে থাকিতেই আরও একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। সুতরাং ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে, যে, মিঃ হুন নামক একজন সভ্য ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সভ্যদের "আত্মসম্মান" বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন।

স্যর হরি সিং গৌড়ের প্রস্তাবটি নীচে মুদ্রিত হইল।

Whereas this Assembly has reason to protest against the manner in which the Ordinances promulgated by the Government of India have been worked in various parts of the country by agents of the Government, and, in particular, considers that the action taken against Mr. Gandhi, without affording him the opportunity he sought for an interview with His Excellency the Viceroy, was unjustified, that the deportation of Khan Abdul Ghaffar Khan and the arrest of Mr. Sen Gupta before he even landed on Indian soil were against all canons of justice and fairplay, and ignored all elementary humane idea, and that the punishment meted out to ladies, including their classification as prisoners, is to the last degree exasperating to public opinion.

And whereas this Assembly disapproves of the fact that various Ordinances have been issued immediately after the conclusion of the last sitting of the Assembly.

And whereas this Assembly condemns the acts of terrorism, violence, and disapproves of the policy of the no-rent campaign and similar activities, and is convinced that it is the earnest duty of all patriotic citizens to join in the constructive task of expediting the inauguration of a new constitution ensuring lasting peace in the country.

This Assembly recommends to the Governor-General-in-Council (1) That he should place before the Assembly for its consideration such Emergency Bills in substitution of Ordinances as he may consider reasonable and necessary in order to enable this House to function effectively as intended by the Government of India Act, (2) That in view of grave happenings in the N.-W. F. Province a committee elected by Non-Official Members of the Assembly be forthwith appointed to inquire into the same, including the reported atrocities committeed therein, and (3) That he should secure the co-operation of Congress and Muslim and Hindu organizations, including the Depressed Classes in the inauguration of the new constitution for India.

বড়লাট ব্যবস্থাপক সভার সমর্থন চাহিয়াছেন, অর্থাৎ উহার নির্ব্বাচিত সভ্যদের মারফৎ দেশের লোকদের সহযোগিতা চাহিয়াছেন; কিন্তু দেশের লোকদের প্রতিনিধি ঐ নির্ব্বাচিত সভ্যদেরই অনুরোধ রক্ষা করিয়া দেশের লোকদের সহিত সহযোগিতা করিতে তাঁহার গবন্মেণ্ট রাজী নহেন। ব্যবস্থাপক সভার প্রধান কাজ আইন করা। তাহার দ্বারা আইন না করাইয়া অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াই যদি দেশ শাসন করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভা জিনিষটার ও তাহার নামটার সার্থকতা কোথায়?

বড়লাট লোককে বুঝাইতে চান, ব্যবস্থাপক সভার কৃতিত্ব খুব বেশী। কিন্তু কংগ্রেসের বাহিরের লোকেরাই, অর্থাৎ যাঁহাদিগকে মডারেট বলা হয় তাঁহারাই, আজকাল ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। সেই মডারেটদের একজন প্রধান নেতা মিঃ চিন্তামণি তাহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পায়োনীয়ারের এক প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছিলেন :—

"What is it that we non-Congressmen can place before the public as our substantial achievement in recent years?" declared Mr. Chintamani "We can only point to the intolerable load of new taxation, which has been imposed on the country in spite of us. We shall have to admit that our efforts to reduce that load have failed, that the law confers on the Executive Government the power of acting without support of the legislature. Then there are Ordinances, the sum total of which in plain language is Martial Law minus its name.

তাৎপর্য্য। মিঃ চিন্তামণি বলিলেন, "সম্প্রতি কয়েক বৎসরে

আমাদের কীর্ত্তি বলিয়া আমরা অ-কংগ্রেসওয়ালারা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে কি স্থাপন করিতে পারি?" "আমাদের তদ্বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের উপর যে অসহ্য ট্যাক্সের বোঝা চাপান হইয়াছে, আমরা কেবল তাহার দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে, আমাদের ঐ বোঝা কমাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং আইন শাসকদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সমর্থন ব্যতিরেকেও কাজ করিবার ক্ষমতা দিয়াছে। তার উপর আছে অর্ডিন্যান্সগুলি, যাহাদের সমষ্টিকে সোজা স্পষ্ট ভাষায় সামরিক আইনের নামটি ছাড়া সামরিক আইন বলা যায়।

—

অসহযোগ ও মহিলাবৃন্দ

ভারতীয় মহিলাবৃন্দের সভার মান্দ্রাজে "স্ত্রীধর্ম্ম" নামক একটি ইংরেজী-হিন্দী-তামিল মাসিকপত্র আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, গতবারের অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে এবার মহিলারা বেশী সংখ্যায় ইহাতে যোগ দিতেছেন। ইহা সত্য হইলে ইহার কারণ কি?

—

কুকুর ও সার্থবাহ

ডগ অর্থাৎ কুকুর এক প্রকার চতুষ্পদ জন্তু; কিন্তু কোন কোন মানুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের জন্য কোন কোন ইংরেজ ব্যক্তি অবজ্ঞাত মানুষকেও ডগ্ অর্থাৎ কুকুর বলিয়া থাকে। ইংরেজী অভিধানে এইরূপ লেখা আছে। ক্যার্যাভ্যান কথাটার মানে সার্থবাহ অর্থাৎ একসঙ্গে গমনকারী বণিকের দল। পণ্যদ্রব্যাদি বহনের জন্য ব্যবহৃত বৃহৎ শকট-বিশেষকেও ক্যারাভ্যান বলে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি সম্পর্কে রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ, তদ্বিষয়ে ভারতসচিব স্যর স্যামুয়েল হোর পক্ষাধিক পূর্ব্বে বেতারবার্ত্তার যন্ত্র রেডিওর সাহায্যে নিজের মত বিলাতী জনসাধারণকে জানান। তাহার সম্বন্ধে রয়টার ২৯শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে এই খবর পাঠান, যে, ভারতসচিব তাঁহার ভাষণ এই বলিয়া শেষ করেন, "যদিও কুকুরগুলা ঘেউ ঘেউ করিতেছে, তথাপি সার্থবাহ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।"

ভারতসচিব ভারতে বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাজনীতির বিরোধীদিগকে—বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ কংগ্রেসওয়ালাদিগকে—কুকুর বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুকরণ করিতে অসমর্থ। কিন্তু ইহা বলিলে বোধ হয় অভদ্রতা হইবে না, যে, মহাত্মা গান্ধীর মত মানুষ হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যক্তি-বিশেষের বিবেচনায় কুকুর নাম পাওয়া স্যর স্যামুয়েল হোরের মতে মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা কংগ্রেসওয়ালা নহেন, গান্ধীজীর সেই-সব ভারতীয় জা'ত-ভাইয়েরও মত এইরূপ।

মহাত্মা গান্ধী স্যর স্যামুয়েল হোরের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি বেশ স্পষ্টবাদী। উক্ত ব্যক্তি বোধ করি মহাত্মাজীর সার্টিফিকেটের সত্যতা প্রমাণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। আমরা কিন্তু মহাত্মাজীর সার্টিফিকেটটির গুণগ্রহণ করিতে পারি নাই।

পৌরুষসম্পন্ন শত্রুরও প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, স্যর স্যামুয়েলের মাতৃভাষা ইংরেজীতে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

"To honour while you strike him down,
The foe who comes with fearless eyes."

"যে শত্রু ভয়বিহীন চক্ষে তোমার সম্মুখীন হয়, তাহাকে আঘাত করিয়া মাটিতে ফেলিবার সময়ও তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিও।"

স্যর স্যামুয়েলের এ শিক্ষা হয় নাই।

স্যর স্যামুয়েল কিন্তু অজ্ঞাতসারে একটা কথা খুব ঠিক্ বলিয়া ফেলিয়াছেন। তোমরা যতই ঘেউ ঘেউ কর, "একসঙ্গে গমনকারী বণিকের দল" নিজের কার্য্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য লোকেরা শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত উপদেশ মানিয়া চলে এবং ভারতীয়েরা যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ অনুসারে একগালে চড় খাইলে অন্য গাল পাতিয়া দেয়। আমরা সেইরূপ অন্য একটা ব্যাপারও দেখিতেছি। ঋগ্বেদে উপদেশ আছে :—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
সমানো মন্ত্রঃ, সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানী বঃ আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথাবঃ সুসহাসতি।

"তোমরা মিলিত হও; মিলিত হইয়া বাক্য বল; মিলিত হইয়া একে অন্যের মন জান। তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সিদ্ধি এক হউক;

তোমাদের মীমাংসা ও মন এক হউক। তোমাদের অধ্যবসায় এক হউক, হৃদয় এক হউক। তোমাদের মন এমন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মিলন সুন্দর হয়।"

ইংরেজরা তাহাদের সাংসারিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঠিক্ যেন ঋগ্‌বেদের এই মহৎ উপদেশের অনুসরণ করিতেছে—"একসঙ্গে গমনকারী বণিকের দল" হইতেছে। অন্য দিকে আমরা বাইবেলের আদি পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বাবেল স্তূপকে আদর্শ জ্ঞানে নানা জনে নানা কথা কহিতেছি; কেহ কাহারও কথা শুনিতেছি না, বুঝিতেছি না; বুঝিবার চেষ্টাও করিতেছি না।

—

পিকেটিঙের জন্য বেত মারা

বোম্বাইয়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দস্তুর পিকেটিঙের "অপরাধে" একটি চৌদ্দ বৎসরের ছেলেকে নিজের আদালতেই তাহার পশ্চাদ্দেশ বিবস্ত্র করাইয়া বেত্রাঘাত করাইয়াছেন। মান্দ্রাজেও কোথাও কোথাও কয়েকটি বালককে এইরূপ বর্ব্বরোচিত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। যাহারা খুব পাশব বা দুর্নীতিকলুষিত অপরাধ করে, এরূপ লোকদিগকেও বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া উচিত নয়, এই মত সভ্য দেশসকলে গৃহীত হইতেছে; কারণ এরূপ শাস্তিতে মানুষ না-সুধরাইয়া পশুপ্রকৃতি হয়। এদেশে কিন্তু যাহা মাসখানেক আগে অপরাধ ছিল না, আবার কিছু দিন পরেই অপরাধ থাকিবে না, সেই পিকেটিং কাজের জন্য বেত্রাঘাত দণ্ড হইল!

—

"সার্থবাহ অগ্রসর হইতেছে"

ভারতবর্ষ হইতে এপর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার সোনা বিলাতে রপ্তানী হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ডের সুবিধা হইতেছে। বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংলণ্ড ফ্রান্সের ও আমেরিকার তিন কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ মোটামুটি ৪০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। বিলাতী নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজ লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে সোনা রপ্তানী না হইলে এই ঋণ পরিশোধ করা যাইত না। ব্রিটিশ রাজস্বসচিব পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন, যে, আগামী আগষ্ট মাসে যে আরও আট কোটি পাউণ্ড ফ্রান্স ও আমেরিকাকে দিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে। কিন্তু নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান লিখিয়াছেন,

"But the return of eighty millions will cause us a good deal of trouble, unless gold continues to come from India on an increasing scale."

"কিন্তু যদি ভারতবর্ষ হইতে ক্রমশ অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে সোনা না-আসিতে থাকে, তাহা হইলে এই আট কোটি টাকা শোধ করিতে আমাদিগকে বেগ পাইতে হইবে।"

—

ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থাপক সভা

এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যসমূহ এবং ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিকে এক মূল শাসনবিধি অনুসারে একটি রাষ্ট্রসংঘে পরিণত করিয়া তাহার জন্য একটি ফেডার‍্যাল বা রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গোল টেবিল বৈঠকের ফেডার‍্যাল ষ্ট্রাক্‌চ্যার কমিটি বা রাষ্ট্রসংঘগঠন কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন, যে, এই ব্যবস্থাপক সভার উপরিতন কক্ষের সভ্য-সংখ্যা ২০০ এবং নিম্ন কক্ষের সভ্য-সংখ্যা ৩০০ হইবে। কমিটি আরও সুপারিশ করিয়াছেন, যে, উপরিতন কক্ষের শতকরা ৪০ জন সভ্য অর্থাৎ মোট ৮০ জন সভ্য এবং নিম্ন কক্ষের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মোট ১০০ জন সভ্য দেশী রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি হইবেন। দেশী রাজ্য-সমূহকে এত বেশী প্রতিনিধি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের ও দেশীয় রাজ্যসমূহের লোক-সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

ব্রহ্মদেশকে যে ভারত-সাম্রাজ্য হইতে আলাদা করা হইবে, রাষ্ট্রীয় সংঘগঠন কমিটি তাহা ধরিয়া লইয়া তাঁহাদের হিসাব কষিয়াছেন। আমরাও তাহাই করিব। ব্রিটিশ-শাসিত সমুদয় ভারতীয় প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা ২৫,৭০,৮৩,৬৯৪। দেশীয় রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা ৮,১২,৩৭,৫৬৪। সমগ্রভারতের লোকসংখ্যা ৩৩,৮৩,২১,২৫৮। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, দেশী রাজ্যসমূহে সমগ্র-ভারতের সিকির কিছু কম লোক বাস করে।

মোটামুটি সিকিই ধরা যাক্। অতএব, রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্ন কামরা বা চেম্বারে ৩০০ প্রতিনিধি থাকিলে দেশী রাজ্যগুলির প্রতিনিধি ন্যায়তঃ ৭৫এর বেশী হইতে পারে না। উপরিতন কক্ষেও মোট ২০০ প্রতিনিধির মধ্যে দেশী রাজ্যগুলির প্রতিনিধি ন্যায়তঃ ৫০এর বেশী হইতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘগঠন কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন তাহাদিগকে যথাক্রমে ১০০ ও ৮০ জন প্রতিনিধি দিতে হইবে। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। দেশী রাজ্যের রাজারা ও প্রজারা ব্রিটিশ-ভারতের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহেন এবং প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপ্রণালীতেও অধিকতর অভ্যস্ত নহেন। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল, তখন দেশী রাজ্য ও বিদেশী-শাসিত অঞ্চল বলিয়া ভারতবর্ষের দুটা ভাগ ছিল না; সুতরাং তখন ওরূপ দুটা ভাগের মানুষদের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতার কোন কথাও উঠিতে পারে না। ইংরেজদের আমলে এরূপ ভাগ হইয়াছে এবং দুটা ভাগের মধ্যে তুলনাও চলে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, শুধু লোকসংখ্যার তুলনা করিলে চলিবে না, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের এবং দেশী রাজ্যসমূহের আয়তনের তুলনাও করিতে হইবে। কিন্তু ইহা টেঁকসই যুক্তি নহে। ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চল সম্বন্ধে এরূপ যুক্তি প্রয়োগ করা হয় নাই। কয়েকটি অঞ্চলের আয়তন ও লোকসংখ্যা নীচে দিতেছি। তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারেই তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা প্রস্তাবিত হইয়াছে, আয়তন অনুসারে নহে।

প্রদেশ	বর্গমাইল	লোক-সংখ্যা	প্রতিনিধি-সংখ্যা
বালুচিস্থান	৫৪,২২৮	৪,৬৩,৫০৮	১
আসাম	৫৩,০১৫	৮৬,২২,২৫১	৭
উ-প সীমান্ত	১৩,৪১৯	২৪,২৫,০৭৬	৩
দিল্লী	৫৯৩	৬,৩৬,২৪৬	১
আজমীর	২,৭১১	৫,৬০,২৯২	১

কোন প্রদেশকে প্রতিনিধিশূন্য রাখা যায় না, আবার একের চেয়ে কম প্রতিনিধিও হয় না; এইজন্য অত্যন্ত অল্প-সংখ্যক লোককেও একজন করিয়া প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে।

মুসলমানেরা প্রতিনিধিসমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি চাহিয়াছেন; সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিসমষ্টির বা ব্রিটিশ-ভারতের প্রতিনিধিসমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ তাঁহারা চাহিয়াছেন, স্পষ্ট বুঝা যায় নাই। কমটাই ধরা যাক্, এবং ধরা যাক্, যে, তাঁহারা এক-তৃতীয়াংশ না পাইয়া সিকি পাইলেন। রাষ্ট্রসংঘগঠন কমিটির সুপারিশ অনুসারে দেশী রাজ্যসমূহ নিম্নকক্ষে পান ১০০ এবং ব্রিটিশ-ভারত পান ২০০ প্রতিনিধি। তাহা হইলে ২০০র সিকি ৫০ পান মুসলমানেরা। অর্থাৎ ৩০০ প্রতিনিধির মধ্যে দেশী রাজ্যের এবং মুসলমানদের ভাগেই গেল ১৫০। বাকী থাকে ১৫০। কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন, যে, "অবনত" শ্রেণী, ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ান, ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী, জমিদার, বণিক এবং শ্রমিকদিগকেও আলাদা করিয়া কিছু কিছু প্রতিনিধি দিতে হইবে। তাঁহারা কে কত জন প্রতিনিধি পাইবেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই, তৎসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন সুপারিশ হয় নাই। সর্ব্বশেষে, এই সকলের উপর ধরিতে হইবে সরকারী কয়েকজন সভ্য এবং গবর্ন্মেণ্ট-মনোনীত কয়েকজন সভ্য। তাহা হইলে যে ১৫০ প্রতিনিধি বাকী ছিল, তাহা হইতে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং সরকারী ও মনোনীত সভ্য কম করিয়া আরও ২০ জনও যদি বাদ যায়, তবে ব্রিটিশ-ভারতের সাধারণ হিন্দু জনগণের জন্য থাকিবে তিন শত প্রতিনিধির মধ্যে ১৩০ জন। অথচ এই হিন্দুরাই এদেশে সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং জ্ঞানে ব্যবসাবাণিজ্যে ধনশালিতায় জনহিতকর কার্য্যে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনার্থ ত্যাগে ও দুঃখস্বীকারে অগ্রণী। তাহা হইলে যুক্তিটা কি এই, যে, ঐ ঐ কারণেই তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে হইবে?

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে না। যাহা হউক, বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার তুলনায় প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থাপক সভা অধিক গণতান্ত্রিক এবং গণস্বাধীনতার অনুকূল ও গণস্বার্থরক্ষার সহায়ক হইবে কি না, তাহাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এখন দেশী সব নির্ব্বাচিত সভ্য উপস্থিত থাকিলে তাঁহারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বলিয়া কখন কখন গবর্ন্মেণ্ট পক্ষ ভোটে পরাজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-সংঘীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ সভ্য সরকারী লোকদের প্রভাবের অধীন থাকিবে, সুতরাং গবর্ন্মেণ্টের অনভিপ্রেত কোন ব্যাপারে লোকমত জয়ী হইবে না। দেশী রাজ্যের প্রতিনিধিগণ তথাকার প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইয়া

রাজাদের দ্বারা হইবে প্রস্তাব এইরূপ, এবং মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত এইরূপ প্রস্তাবের স্পষ্ট কোন প্রতিবাদ করেন নাই। রাজারা সংঘবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে অসম্মত বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের অর্থাৎ তাঁহার প্রতিনিধি বড়লাটের অর্থাৎ তন্নিযুক্ত রেসিডেন্ট ও পোলিটিক্যাল এজেণ্টদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং তাঁহারা ও তাঁহাদের মনোনীত প্রতিনিধিরা সরকারের ধামাধরা হইবেন। প্রধান মন্ত্রী ক্র্যাঙ্কিস্ কমিটিকে উপদেশ দিয়াছেন, যে, সাম্প্রদায়িক কোন আপোষমীমাংসা না হইলে পৃথক্ নির্ব্বাচনপ্রণালী থাকিবে ধরিয়া লইয়া যেন তাঁহারা কাজ করেন। ঐ প্রকার আপোষমীমাংসা যাঁহাদের চেষ্টায় হইতে পারিত সেইরূপ প্রভাবশালী নেতারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং ইহা এক রকম স্থির, যে, আপোষমীমাংসা হইবে না, পৃথক্ পৃথক্ নির্ব্বাচন থাকিবে। তদনুসারে নির্ব্বাচিত মুসলমান ও অন্যান্য সভ্যগণের অধিকাংশ গবর্ন্মেণ্টের পৃথক্‌নির্ব্বাচনাধিকাররূপ অনুগ্রহের প্রতিদান-স্বরূপ সরকার পক্ষে হাত তুলিবেন। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীরা এবং সরকারী ও সরকার-মনোনীত সভ্যেরাও তাহাই করিবে। এই প্রকারে রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থাপক সভায় লোকমতকে দাবাইয়া রাখিবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইতেছে। আমাদের বিবেচনায় এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপক সভা বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা অপেক্ষাও শক্তিহীন হইবে, এবং সেইজন্য ইহার সূতিকাগৃহে সহকারিতা করা অনাবশ্যক ও অকল্যাণকর।

—

১৯৩২এর ৭ম অর্ডিন্যান্স

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বড়লাট, ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলা সত্ত্বেও, আবার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। ইহা বর্ত্তমান ১৯৩২ সালের ৩৭ দিনের মধ্যে জারিকৃত সাতটি অর্ডিন্যান্সের সপ্তমস্থানীয়। ইহার দ্বারা এই বৎসরের দ্বিতীয় ও পঞ্চম অর্ডিন্যান্স সংশোধন দ্বারা ব্যাপকতরীকৃত ও কঠোরতরীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্স অনুসারে কোন অফিসার, সৈনিক, নাবিক ইত্যাদিকে বিপথচালিত করা অপরাধ ছিল। এখন সংশোধন এই হইল, যে, কেহ যদি এমন কিছু করে যাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ঐরূপ ফুসলান বা বিপথচালিত করণের দিকে যায়, তাহাও অপরাধ হইবে। কোন্ কাজ কথা বা মন্তব্যের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্রবণতা কোন্ দিকে নয়, বলা সুকঠিন। পঞ্চম অর্ডিন্যান্স অনুসারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিংও যে একটা অপরাধ তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইত না, যদিও শান্তিপূর্ণ পিকেটিঙের জন্যও বিস্তর লোকের জেল হইয়াছে। সংশোধন দ্বারা এই অস্পষ্টতা ত দূরীভূত হইলই, অধিকন্তু এখন সেই ব্যক্তিও অপরাধী বিবেচিত ও দণ্ডিত হইবে যে,

> "loiters at or near the place where such other person carries on business, in such a way or with intent that any person may thereby be deterred from entering or approaching or dealing at such place, or does any other act at or near such place which may have a like effect."

এখন কেহ যদি কোন দোকানের কাছে বা কতকটা দূরে ট্রাম বা বাসের অপেক্ষায় এক আধ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকে, কিংবা কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় অল্পক্ষণ কথা বলে, বা কোন্ দোকানে জিনিষ কিনিব না-কিনিব দ্বিধা-বশতঃ অল্পক্ষণ দাঁড়ায়, তাহাকেও গ্রেপ্তার করা চলিবে। গবর্ন্মেণ্ট অর্ডিন্যান্স ক্রমাগত কঠিনতর করিয়াও অভীষ্ট ফল পাইতেছেন-না, বুঝা যাইতেছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই গত ২৫শে জানুয়ারী রাগবী হইতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে সরকারী বেতারবার্ত্তা এদেশে প্রেরিত হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে,

"নির্ব্বাক্ বয়কটের ফল অধিকতর লক্ষিত হইতেছে।"

উক্ত বেতারবার্ত্তার গোড়ায়, অবস্থাটা সাধারণতঃ সন্তোষজনকের দিকে যাইতেছে ("shows a generally satisfactory tendency)", বলা হইয়াছে। কিন্তু শেষ করা হইয়াছে, "the effects of silent boycott are more marked," "নির্ব্বাক বয়কটের ফল অধিকতর লক্ষিত হইতেছে," বলিয়া।

—

বিদেশের সহিত কৃষ্টিবিষয়ক আদানপ্রদান

ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র কলিকাতায় একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছেন। ইহার নাম "সোসাইটী ফর কাল্‌চ্যারাল ফেলোশিপ উইথ ফরেন কাণ্ট্রিজ," অর্থাৎ বিদেশের সহিত কৃষ্টিবিষয়ক আদানপ্রদান ও মৈত্রী-সংসাধক সমিতি। আমাদের দেশে আমাদের পরিবারে সমাজে সাহিত্যে বিজ্ঞানে ললিতকলায় ও অন্য নানা বিষয়ে হৃদয়-মন-আত্মার উৎকর্ষের পরিচায়ক কি আছে, তাহা বিদেশীদিগকে জানান এবং বিদেশে ঐরূপ কি আছে তাহার সহিত স্বদেশবাসীদিগকে পরিচিত করা এই সমিতির উদ্দেশ্য বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি। ইহা গত বৎসরের মার্চ্চ মাস হইতে কাজ করিতেছে, কিন্তু ইহার প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছে গত বৎসর ২০শে ডিসেম্বর। ইহার উদ্দেশ্যাদি নীচে মুদ্রিত হইল।

(১) পরস্পরকে বুঝিবার চেষ্টা, পরস্পরের সেবা ও হিতৈষণা, বিদেশ পরিভ্রমণ ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা এবং ভারতবাসী এবং বৈদেশিকের শিক্ষা, সভ্যতা ও জীবনের আদর্শ প্রভৃতির সংস্পর্শ দ্বারা অন্তর্জাতিক বন্ধুভাবের পরিপুষ্টি এবং উন্নতিবিধান করা।

(২) ইউরোপ ও আমেরিকার ইণ্টারন্যাশনেল ষ্টুডেণ্ট ফেডারেশনের সহিত যুক্ত করিবার নিমিত্ত ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস ফেডারেশন নামক ছাত্রসমিতি প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলাদিগকে সম্মানিত করা।

(৪) ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ পৃথিবীর নানা দেশে এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ ভারতবর্ষে প্রচার করা।

(৫) অন্যান্য যে-সকল সভাসমিতি এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের সহিত সহযোগিতা করা।

(৬) সমিতির উদ্দেশ্যের অনুকূল অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা।

বিভিন্ন দেশের ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের মধ্যে যাঁহারা এই সমিতির উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং যাঁহারা এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ইহার সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন। সর্ব্বনিম্ন চাঁদা বার্ষিক ১০ টাকা; ছয় মাসের অগ্রিম দেয় চাঁদা ৫ টাকা এবং মাসে মাসে দেয় চাঁদা মাসিক ১৲ টাকা।

ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ইহার সম্পাদক। তাঁহার ঠিকানা ৪ শম্ভুনাথ ষ্ট্রীট, এলগিন রোড্ ডাকঘর, কলিকাতা।

—

কলিকাতাস্থ শান্তিভবন বিদ্যালয়

১৯২৬ সালের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত, বি-এ এই বিদ্যালয়টি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনেই শৈশব হইতে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিয়া পরে দীর্ঘকাল যাবৎ সেখানে শিক্ষকতা করিয়াছেন। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপক রূপে থাকায় তথাকার আদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালীর সহিত ইঁহারা বিশেষ রূপে পরিচিত। এখানে ছাত্রদিগকে নিয়মিত সঙ্গীত, চিত্রকলা, ব্যায়াম, ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়টি ২০ নং নবীন সরকার লেন, বাগবাজারে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়টির বিশেষত্ব এই যে, এখানকার ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের আন্তরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার ছাত্রেরা শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মত নিজেরাই নিজেদের নির্ব্বাচিত নায়ক ও সম্পাদকের অধিনায়কত্বে বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়ম পালন করে ও বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়, ক্রীড়া, পত্রিকা, সাহিত্য-সভা ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করে। এই ভাবে বিদ্যালয়টির গঠনকার্য্যে অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়ের মিলিত চেষ্টা থাকায় ইহার ক্রমশ উন্নতি হইতেছে। গত তিন বৎসর হইতে মহিলাদের দ্বারা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-বিভাগ পরিচালিত হইতেছে। গত ১৯২৯ সাল হইতে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম যে-ছাত্রটি এই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এরূপ অনেক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে।

—

"অবনত" শ্রেণীর লোকদের কথা

আমরা কোন শ্রেণীর লোককেই "অস্পৃশ্য" বা "অবনত" মনে করি না; এই জন্য ঐ দুটা কথা প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক। কাহাদের কথা বলা হইতেছে, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইবার জন্য ওরূপ শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই সকল শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষায় অনগ্রসর হইতে পারেন, গরিবও হইতে পারেন; কিন্তু ঐ ঐ শ্রেণীভুক্ত বলিয়াই কেহ মানুষ-হিসাবে হীন নিশ্চয়ই নহেন। ইঁহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া একান্ত আবশ্যক। তন্নিমিত্ত স্বাবলম্বন অবশ্যই

চাই ; কিন্তু ইহারা হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বলিয়া হিন্দুসমাজে যাঁহারা অগ্রসর তাঁহাদের সকলেরই ভ্রাতৃভাবে বন্ধুভাবে ইহাদের উন্নতির সহায় হওয়া উচিত। স্বাবলম্বন যে আবশ্যক, তাহা ইহারা অনেকে বুঝিয়াছেন। ডক্টর আম্বেদকরের রাজনৈতিক চা'লের সমর্থন আমরা করি না। কিন্তু তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে যে নিম্নমুদ্রিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য।

We have trusted the Government long enough to remove untouchability. But it has not lifted its finger to do anything in the matter and it has no right to ask us to stop. We must take the burden on our shoulders and do what we can to free ourselves from this curse at any cost. If the Government does not help us, it must not at least hamper our just cause. It is no use telling us that we must not create ill-feeling between different classes and communities. This appeal by Government should be addressed to all the communities and not to us alone. It should specially be addressed to those communities who are in the wrong and who are sinning in the matter.

তাৎপর্য্য। গবর্মেণ্ট অস্পৃশ্যতা দূর করিবেন গবর্মেণ্টের প্রতি এই বিশ্বাস আমরা যথেষ্ট দীর্ঘকাল পোষণ করিয়াছি। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কিছু করিবার নিমিত্ত আঙুলটি পর্য্যন্ত উঠান নাই, সুতরাং আমাদের সঙ্কল্পিত কোন চেষ্টা হইতে বিরত হইতে বলিবার কোন অধিকার সরকারের নাই। এই কর্ত্তব্যের ভার আমাদের নিজের কাঁধে লইতে হইবে এবং যে-কোন দুঃখকষ্টত্যাগের বিনিময়ে এই অভিশাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। গবর্মেণ্ট যদি আমাদিগকে সাহায্য না করেন, অন্ততঃ যেন আমাদের ন্যায্য চেষ্টায় বাধা না দেন। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মান উচিত নয়, ইহা আমাদিগকে বলা বৃথা। এই আপীল সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের উদ্দেশে গবর্মেণ্টের করা উচিত, শুধু আমাদের প্রতি নয়। বিশেষতঃ তাহাদের প্রতি ইহা করা উচিত যাহারা দোষী এবং যাহারা এবিষয়ে অপরাধ করিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাই গবর্মেণ্ট "অবনত" শ্রেণীসমূহ এবং ভীল প্রভৃতি আদিম জাতিসকলের অবস্থা বিবেচনার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটি অনেকগুলি সুপারিশ করেন। কিন্তু সবগুলিই, "বাঞ্ছনীয় নহে," "সম্ভব নহে," "কার্য্যতঃ সাধ্যায়ত্ত নহে," "সরকারের টাকার টানাটানি," "চিরাগত রীতির বিপরীত," ইত্যাদি নানা ওজুহাতে উক্ত গবর্মেণ্ট নামঞ্জুর করিয়াছেন। অথচ সহানুভূতি প্রকাশে কোন কার্পণ্য নাই। ঐ সব লোকদের জন্য যৌথ ঋণদান বা গৃহনির্ম্মাণ সমিতি প্রতিষ্ঠা, আরণ্য উপনিবেশ স্থাপন, গ্রাম অঞ্চলে তাহাদের জন্য বাস্তুভিটা নির্দ্দেশ, সরকারী চাকরিতে নিয়োগ, বেগার খাটান রদ করা, সেনাদলে তাহাদিগকে সিপাহীর কাজে ভর্ত্তি করা, প্রভৃতি সুপারিশ কমিটি করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ অনেক আগে হইতে এই সকল শ্রেণীর উন্নতির পক্ষে আছেন। মহাত্মা গান্ধী দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেস, সমগ্রভারতের হিন্দু মহাসভা, বঙ্গের হিন্দুমিশন ও হিন্দুসমাজ-সম্মেলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অপমানজনক সমুদয় অসুবিধা ও শিক্ষাদির বাধা দূর করিতে ইচ্ছুক। হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ডাঃ মুঞ্জে পুণার পার্ব্বতী মন্দিরে এই সকল লোকদিগকে প্রবেশ করিবার অধিকার যাহাতে দেওয়া হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গোঁড়া লোকেরা এখনও রাজী হন নাই। কিন্তু তিনি চেষ্টা ছাড়িবেন না।

—

"ব্রিটিশ জাহাজে সমুদ্রযাত্রা কর"

বিলাতে, "ব্রিটীশ জিনিষ ক্রয় কর," এ রব ত খুবই উঠিয়াছে; পি এণ্ড ও জাহাজ কোম্পানীর ডেপুটী চেয়ারম্যান সম্প্রতি ধুয়া তুলিয়াছেন, ইংরেজদের কেবল মাত্র ব্রিটিশ জাহাজে সমুদ্রপথে যাতায়াত করা ("Travel British") উচিত। সব ইংরেজ ইহার সমর্থক। কিন্তু ক্ষিতীশ নিয়োগী ও সারাভাই হাজী যে কেবল মাত্র ভারতীয় সমুদ্রোপকূলে যাতায়াতের অধিকার ভারতীয়দের জাহাজ সকলকে দিবার জন্য আইন করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে ইংরেজরা সবাই নানা বাজে আপত্তি তুলিয়াছে।

—

"ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ"

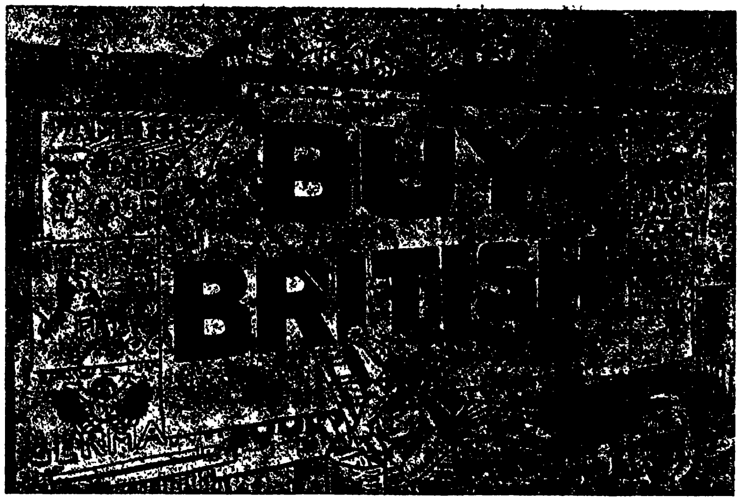
আমেরিকার ইউনিটি কাগজে লিখিত হইয়াছে, প্যারিসে ফ্রেঞ্চ ভাষায় ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের লেখা "ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ" পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

জাপান অন্য সাম্রাজ্যোপাসক জাতিদের পথের পথিক হইয়া তাহাদের বুলি বলিতেছে এবং তাহাদের কৌশল অবলম্বন করিতেছে। তাহার কুচেষ্টার ব্যর্থতা কামনা করিতেছি। চীন-জাপান যুদ্ধের শেষ খবর লিপিবদ্ধ করা মাসিক কাগজের সাধ্যায়ত্ত নহে।

ব্রিটিশ পণ্য ক্রয় কর



বিলাতে শুধু বিলাতী জিনিষ ক্রয় করাইবার
তুমুল প্রচেষ্টা চলিতেছে

ইংলণ্ডের আর্থিক সঙ্কট



স্বর্ণক্রুশবিদ্ধ জন বুল



লেজকাটা শেয়াল
ইংলণ্ড স্বর্ণমান হারাইয়াছে, কিন্তু আমেরিকার এখনও উহা আছে।

মাছ নদীতে আসে। ইহারা জলের উপর গাছপালার মাছি ও অন্য ছোট কীটপতঙ্গ দেখিলে মুখ হইতে তাহাদিগকে জোরে জল ছুঁড়িয়া মারে। তাহারা জলে পড়িয়া গেলে তাহাদিগকে ধরিয়া খায়। এই জল-নিক্ষেপের অভ্যাস হইতে ইহাদিগকে তীরন্দাজ বলে। এই মাছ বাংলা দেশে আছে কি না এবং থাকিলে তাহার বাংলা নাম কি, পাঠকেরা তাহারা সন্ধান লইবেন।

—

দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বিচিত্র দেশাচার—

মার্কুইস্ অফ্ ওয়াভ্রেঁ নামে একজন বেলজিয়ান পরিব্রাজক সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক অজ্ঞাত দেশ পর্য্যটন করিয়া সে-সকল প্রদেশ ও প্রদেশবাসী লোকদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি অনেক কষ্টে বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া জিভারো ইণ্ডিয়ানদের দেশে পৌছান।



জিভারো ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা রক্ষিত নরমুণ্ড



নাচের পোষাক ও মুখোস পরিহিত ইণ্ডিয়ান



বিচিত্র উল্কি আঁকা ইণ্ডিয়ান রমণী



উল্কি আঁকা দুইটি ইণ্ডিয়ান পুরুষ

এই ইণ্ডিয়ান জাতিটির মধ্যে এখনও শত্রুর মাথার ও মুখের ছাল ছাড়াইবার নৃশংস প্রথা বর্ত্তমান। শত্রুকে বন্দী করিয়া ইহারা প্রথমে মুখ ও মাথার মাংস ও চামড়া ছাড়াইয়া লয়। পরে উহা গরমজলে ভিজাইয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া আস্তে আস্তে সঙ্কুচিত করিয়া আনে এবং ইহার ভিতরে বালি ও পাথরের কুচি ভরিয়া একটি ছোট মানুষের মাথা গড়িয়া বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ ঘরে ঝুলাইয়া রাখে। পাশের চিত্রে এই উপায়ে সঙ্কুচিত একটি স্ত্রীলোকের মুখ দেখান হইয়াছে। এই স্ত্রীলোকটির মাথার চুলের দৈর্ঘ্য ঠিক পূর্ব্বের মতই আছে, কেবল মুখ ও মাথাটিকে সঙ্কুচিত করিয়া হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া রাখিবার মত করিয়া ফেলা হইয়াছে।

মার্ক্‌ইস্ অফ ওয়াত্রেঁ অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও গিয়াছেন। পিরস্ ও উকাইয়ালি ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে উল্কি পরিবার বিচিত্র প্রথা বিদ্যমান। অন্য এক ইণ্ডিয়ান জাতি এখনও ইঙ্কাদের মত বিচিত্র পরিচ্ছদ ও মুখোস পরিয়া নৃত্যোৎসব করে।

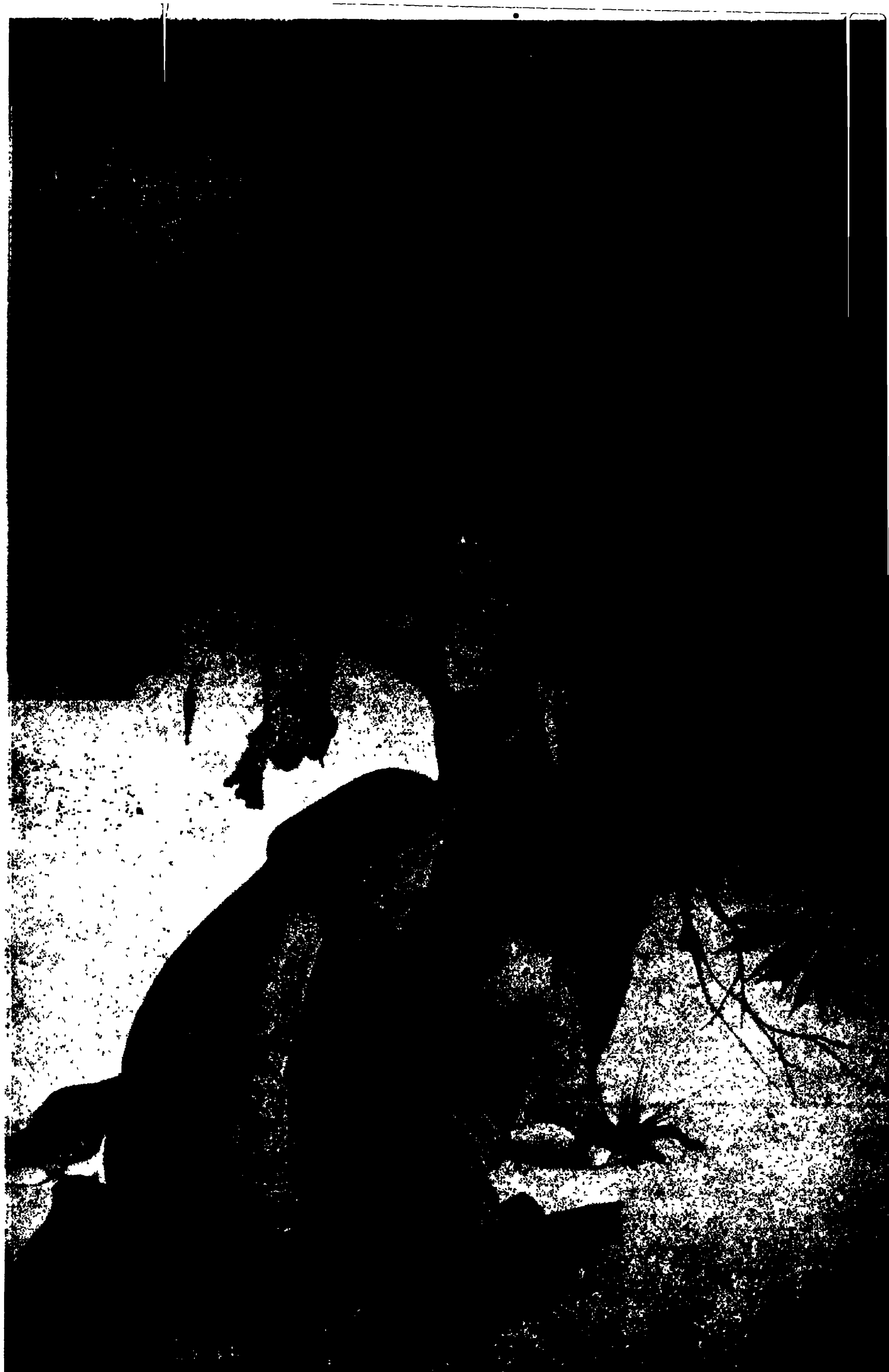
অতিসূক্ষ্ম প্রভেদ প্রদর্শক তুলাদণ্ড—

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাগারে রসায়নী বিদ্যার ছাত্রেরা এরূপ তুলাদণ্ড দেখিয়া ও ব্যবহার করিয়া থাকেন, যাহাতে ওজনের সামান্য প্রভেদও ধরা পড়ে। এই নিক্তিগুলি প্রায়ই ছোট ছোট অল্প ভারী জিনিষ ওজন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সায়েণ্টিফিক্ আমেরিকান্ নামক বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রের জানুয়ারী সংখ্যায় একটি অতিসূক্ষ্ম প্রভেদ প্রদর্শক তুলাদণ্ডের ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ সের পর্য্যন্ত ভারী জিনিষ ওজন করা যায়। অথচ এক টুকরা কাগজ ওজন করিয়া তাহার পর কাগজটিতে দুই-তিনটা পেন্সিলের দাগ কাটিলে তাহাতে তাহার ওজন যতটুকু বাড়ে, তাহাও এই বৃহৎ নিক্তিতে ধরা পড়ে। সায়েণ্টিফিক্ আমেরিকান্ বলেন, ইহা আমেরিকার অতিসূক্ষ্ম প্রভেদ প্রদর্শক তুলাদণ্ডগুলির মধ্যে সকলের চেয়ে বড়।



অতিসূক্ষ্ম প্রভেদ প্রদর্শক তুলাদণ্ড

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



অশোক বনে সীতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রবাসী প্রেস

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩১শ ভাগ, ২য় খণ্ড — চৈত্র, ১৩৩৮ — ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অপ্রকাশ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্ত হও, হে সুন্দরী।
ছিন্ন কর রঙীন কুয়াশা,
অবনত দৃষ্টির আবেশ,
এই অবরুদ্ধ ভাষা,
এই অবগুণ্ঠিত প্রকাশ।
সযত্ন লজ্জার ছায়া
তোমারে বেষ্টন করি জড়ায়েছে অস্পষ্টের মায়া
শত পাকে,
মোহ দিয়ে সৌন্দর্য্যেরে করেছে আবিল,
অপ্রকাশে হয়েছে অশুচি।
তাই তোমারে নিখিল
রেখেছে সরায়ে কোণে।
ব্যক্ত করিবার দীনতায়
নিজেরে হারালে তুমি,
প্রদোষের জ্যোতিঃ-ক্ষীণতায়।

দেখিতে পেলে না আজও আপনারে উদার আলোকে,—
বিশ্বেরে দেখনি, ভীরু, কোনোদিন বাধাহীন চোখে
উচ্চশির করি।
স্বরচিত সঙ্কোচে কাটাও দিন,
আত্ম-অপমানে চিত্ত দীপ্তিহীন, তাই পুণ্যহীন।
বিকশিত স্থলপদ্ম পবিত্র সে, মুক্ত তার হাসি,
পূজায় পেয়েছে স্থান আপনারে সম্পূর্ণ বিকাশি।
ছায়াচ্ছন্ন যে-লজ্জায় প্রকাশের দীপ্তি ফেলে মুছি,
সত্তার ঘোষণাবাণী স্তব্ধ করে, জেনো সে অশুচি।
উর্দ্ধশাখা বনস্পতি যে-ছায়ারে দিয়েছে আশ্রয়
তার সাথে আলোর মিত্রতা,
সমুন্নত সে বিনয়।
মাটিতে লুণ্ঠিছে গুল্ম সর্ব্ব অঙ্গ ছায়াপুঞ্জ করি,
তলে গুপ্ত গহ্বরেতে কীটের নিবাস।

হে সুন্দরী,
মুক্ত কর অসম্মান, তব অপ্রকাশ আবরণ,
হে বন্দিনী, বন্ধনেরে ক'রো না কৃত্রিম আভরণ।
জ্জিত লজ্জার খাঁচা, সেথায় আত্মার অবসাদ,—
অর্দ্ধেক বাধায় সেথা ভোগের বাড়ায়ে দিতে স্বাদ,
ভোগীর বাড়াতে গর্ব্ব, খর্ব্ব করিয়ো না আপনারে
খণ্ডিত জীবন লয়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে॥

মাঘ ১৩৩৮, খড়দা

দেশের কাজ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের শাস্ত্রে বলে ছ-টি রিপুর কথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। তাকেই রিপু বলে, যাতে আত্মবিস্মৃতি আনে। এমনি ক'রে নিজেকে হারানই মানুষের সর্ব্বনাশ করে, এই রিপুই জাতির পতন ঘটায়। এই ছ-টি রিপুর মধ্যে চতুর্থটির নাম মোহ। সে অন্ধতা আনে দেশের চিত্তে, অসাড়তা আনে তার প্রাণে, নিরুদ্যম ক'রে দেয় তার আত্মকর্ত্তৃত্বকে। মানবস্বভাবের মূলে যে সহজাত শক্তি আছে তার প্রতি বিশ্বাস সে ভুলিয়ে দেয়। এই বিহ্বলতার নামই মোহ। আর এই মোহেরই উল্টো হচ্চে মদ—অহঙ্কারের মত্ততা। মোহ আমাদের আত্মশক্তিতে বিস্মৃতি আনে, আমরা যা তার চেয়ে নিজেকে হীন ক'রে দেখি, আর গর্ব্ব, সে আপনাকে অসত্যভাবে বড় ক'রে তোলে। এ জগতে অনেক অভ্যুদয়শালী মহাজাতির পতন হয়েচে অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে। স্পর্দ্ধার বেগে তারা সত্যের সীমা লঙ্ঘন করেচে। আমাদের মরণ কিন্তু উল্টো পথে—আমাদের আচ্ছন্ন করেচে অবসাদের কুয়াশায়।

একটা অবসাদ এসে আমাদের শক্তিকে ভুলিয়ে দিয়েচে। এককালে আমরা অনেক কর্ম্ম করেচি, অনেক কীর্ত্তি রেখেচি, সে কথা ইতিহাস জানে। তারপর কখন অন্ধকার ঘনিয়ে এল ভারতবাসীর চিত্তে, আমাদের দেহে-মনে অসাড়তা এনে দিলে। মনুষ্যত্বের গৌরব যে আমাদের অন্তর্নিহিত, সেটাকে রক্ষা করবার জন্যে যে আমাদের প্রাণপণ করতে হবে, সে আমাদের মনে রইল না। একেই বলে মোহ। এই মোহে আমরা নিজের মরার পথ বাধামুক্ত করেচি, তারপরে যাদের আত্মম্ভরিতা প্রবল, আমাদের মার আসচে তাদেরই হাত দিয়ে। আজ বলতে এসেচি, আত্মাকে অবমানিত ক'রে রাখা আর চলবে না। আমরা বলতে এসেচি যে, আজ আমরা নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেম। একদিন সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেম, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রক্ষা করেছিলেম। তখন জলাশয়ে জল ছিল, মাঠে শস্য ছিল, তখন পুরুষকার ছিল মনে। এখন সমস্ত দূর হয়েছে। আবার একবার নিজেকে নিজের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।

কোনো উপায় নেই, এত বড় মিথ্যা কথা যেন না বলি। বাহির থেকে দেখলে তো দেখা যায় কিছু পরিমাণেও বেঁচে আছি। কিছু আগুনও যদি ছাই-চাপা পড়ে থাকে তাকে জাগিয়ে তোলা যায়। এ কথা যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে স্বীকার না করি তবে বুঝব এটাই মোহ। অর্থাৎ যা নয় তাই মনে করে বসা।

একটা ঘটনা শুনেছি—হাঁটুজলে মানুষ ডুবে মরেচে ভয়ে। আচমকা সে মনে করেছিল পায়ের তলায় মাটি নেই। আমাদেরও সেই রকম। মিথ্যে ভয় দূর করতে হবে, যেমনি হোক্ পায়ের তলায় খাড়া দাঁড়াবার জমি আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় করব সেই আমাদের ব্রত। এখানে এসেচি সেই ব্রতের কথা ঘোষণা করতে। বাইরে থেকে উপকার করতে নয়, দয়া দেখিয়ে কিছু দান করবার জন্যে নয়। যে প্রাণস্রোত তার আপনার পুরাতন খাত ফেলে দূরে সরে গেছে বাধামুক্ত ক'রে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এস, একত্রে কাজ করি।

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকূতীর্ণ মামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি॥

এই ঐক্য যাতে স্থাপিত হয়, তারই জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা চাই। ঘরে ঘরে কত বিরোধ। বিচ্ছিন্নতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের ঐশ্বর্য্যকে আমরা ধূলিস্খলিত ক'রে দিয়েছি। সর্ব্বনেশে ছিদ্রগুলোকে রোধ করতে হবে আপনার সব কিছু দিয়ে।

আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে

নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়। আমরা এই দেশকে আপনি জয় করিনি, দেশকে আপন করিনি। দেশে অনেক জড় পদার্থ আছে, আমরা তাদেরই প্রতিবেশী। দেশ যেমন এই-সব বস্তুপিণ্ডের নয়, দেশ তেমনি আমাদেরও নয়। এই জড়ত্ব—একেই বলে মোহ। যে মোহাভিভূত সেই তো চির-প্রবাসী। সে জানে না সে কোথায় আছে। সে জানে না তার সত্যসম্বন্ধ কার সঙ্গে। বাইরের সহায়তার দ্বারা নিজের সত্য বস্তু কখনই পাওয়া যায় না। আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনি আপন ব'লে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী স্বদেশে যে ফিরেচি তার লক্ষণ এই যে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ বলেই জানি। পাশেই প্রত্যক্ষ মরচে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চ'ড়ে দেশাত্মবোধের বাগ্‌বিস্তার করচি, এত বড় অবাস্তব অপদার্থতা আর কিছু হতেই পারে না।

রোগপীড়িত এই বৎসরে এই সভায় আজ আমরা বিশেষ ক'রে এই ঘোষণা করচি যে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, অবিরোধে একব্রত সাধনার দ্বারা। রোগজীর্ণ শরীর কর্ত্তব্য পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন, তেমনি আবার দারিদ্র্যও ব্যাধিকে পালন করে। আজ নিকটবর্ত্তী বারোটি গ্রাম একত্র ক'রে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এই কাজে গ্রামবাসীর সচেষ্ট মন চাই। তারা যেন সবলে বল্‌তে পারে, আমরা পারি, রোগ দূর আমাদের অসাধ্য নয়। যাদের মনের তেজ আছে তারা দুঃসাধ্য রোগকে নির্ম্মূল করতে পেরেচে, ইতিহাসে তা দেখা গেল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না।

দেবাঃ দুর্ব্বলঘাতকাঃ।

দুর্ব্বলতা অপরাধ। কেন-না, তা বহুল পরিমাণে আত্মকৃত, সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। দেবতা এই অপরাধ ক্ষমা করেন না। অনেক মার খেয়েচি, দেবতার কাছে এই শিক্ষার অপেক্ষায়। চৈতন্যের দুটি পন্থা আছে। এক হচ্চে মহাপুরুষদের মহাবাণী। তাঁরা মানবপ্রকৃতির গভীরতলে চৈতন্যকে উদ্বোধিত ক'রে দেন। তখন বহুধা শক্তি সকল দিক থেকেই জেগে ওঠে, তখন সকল কাজই সহজ হয়। আবার দুঃখের দিনও শুভদিন। তখন বাহিরের উপর নির্ভরের মোহ দূর হয়, তখন নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণ খুঁজতে প্রাণপণে উদ্যত হয়ে উঠি। একান্ত চেষ্টায় নিজের কাছে কি ক'রে আনুকূল্য দাবি করতে হয় অন্য দেশে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্চি। ইংলণ্ড আজ যখন দৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত তখন সে ঘোষণা করেচে, দেশের লোকে যথাসাধ্য নিজের উৎপন্ন দ্রব্যই নিজেরা ব্যবহার করবে। পথে পথে ঘরে ঘরে এই ঘোষণা যে, দেশজাত পণ্যদ্রব্যই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। বহুদিনের বহু অন্নপুষ্ট জাতের মধ্যে যখনই বেকার-সমস্যা উপস্থিত হ'ল তখনই দেশের ধন নিরন্নদের বাঁচাতে লেগেছে। এর থেকে দেখা যায় সেখানে দেশের লোকের সকলের চেয়ে বড় সম্পদ দেশব্যাপী আত্মীয়তা। তাদের উপরে আনুকূল্য রয়েচে সদাজাগ্রত। তাতে মনের মধ্যে ভরসা হয়। আমরা বেকার হয়ে মরচি অথচ কেউ আমাদের খবর নেবে না, এ কোনমতেই হতে পারে না,—এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে তাদের এত ভরসা। আমাদের ভরসা নেই। মারী, রোগ, দুর্ভিক্ষ, জাতিকে অবসন্ন ক'রে দিয়েচে। কিন্তু প্রেমের সাধনা কই, সেবার উদ্যোগ কোথায়? যে বৃহৎ স্বার্থবুদ্ধিতে বড় রকম ক'রে আত্মরক্ষা করতে হয় সে আমাদের কোথায়?

চোখ বুজে অনেক তুচ্ছ বিষয়ে আমরা বিদেশীর অনেক নকল করেচি, আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড় বিষয়ে ওদের অনুবর্ত্তন করতে হবে,—কোমর বেঁধে বলতে চাই কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হ'লেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব। আমাদের অতি ক্ষুদ্র সম্বল যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবেই। বিদেশে প্রভূত পরিমাণ

অর্থ চলে যাচ্ছে, সব তার ঠেকাবার শক্তি আমাদের হাতে এখন নেই, কিন্তু একান্ত চেষ্টায় যতটা রক্ষা করা সম্ভব তাতে যদি শৈথিল্য করি তবে সে অপরাধের ক্ষমা নেই।

দেশের উৎপাদিত পদার্থ আমরা নিজে ব্যবহার করব। এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন ক'রে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা। যথেষ্ট উদ্বৃত্ত অন্ন যদি আমাদের থাকত, অন্তত এতটুকুও যদি থাকত যাতে দেশের অজ্ঞান দূর হয়, রোগ দূর, দেশের জলকষ্ট পথকষ্ট বাসকষ্ট দূর হয়, দেশের স্ত্রীমারী, শিশুমারী দূর হ'তে পারত তাহ'লে দেশের অভাবের দিকেই দেশকে এমন আক্রাক্ষায় নিবিষ্ট হ'তে বল্‌তুম না। কিন্তু আত্মঘাত এবং আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সমস্ত চেষ্টাকে যদি উদ্যত না করি, অদ্যকার বহু দুঃখ বহু অবমাননার শিক্ষা যদি ব্যর্থ হয় তবে মানুষের কাছ থেকে ঘৃণা ও দেবতার কাছ থেকে অভিশাপ আমাদের জন্যে নিত্য নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকবে যে পর্য্যন্ত আমাদের জীর্ণ হাড় ক-খানা ধূলার মধ্যে মিশিয়ে না যায়।*

* শ্রীনিকেতনে বাৎসরিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ। ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩২।

তারা

শ্রীরজনীকান্ত গুহ

বাল্মীকির রামায়ণে নারী-চরিত্রের মধ্যে তারার একটু বিশেষত্ব আছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে বালী সুগ্রীবকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার আভাস পাওয়া যায়।

> সুষেণ দুহিতা চেয়মর্থসূক্ষ্মবিনিশ্চয়ে।
> ঔৎপাতিকে চ বিবিধে সর্ব্বতঃ পরিনিষ্ঠিতা॥
> যদেষা সাধ্বিতি ব্রূয়াৎ কার্য্যং তন্মুক্ত সংশয়ম্।
> ন হি তারামতং কিঞ্চিদন্যথা পরিবর্ত্ততে॥
> কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২২।১৩,১৪॥

"সুষেণ-দুহিতা এই তারা সকল কার্য্যের অতি দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থা; বিপৎকালে কি করিতে হইবে, তিনি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পটু; এবং ঐহিক পারত্রিক সমস্ত কর্ম্ম সম্বন্ধেই তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান আছে। অতএব ইনি যাহা উচিত বলিয়া বলিবেন, সংশয়মুক্ত হইয়া তাহা সম্পাদন করিবে। কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে তারা যে-মত ব্যক্ত করেন, কখনও তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হয় না।"

বালী নিজের অভিজ্ঞতাতে তারার মন্ত্রণাদক্ষতার পরিচয় পাইয়াছিলেন; তাই সুগ্রীবকে সকল বিষয়ে, এমন কি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মেও, তারার সহিত মন্ত্রণা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে অনুরোধ করিতেছেন। কৌশল্যাদি মানবী বা মন্দোদরী প্রভৃতি রাক্ষসী রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সংস্পর্শে যাইতেন না। কবি একা এই বানরীকে রাজ্যের আপদে বিপদে রাজা ও স্বামীর পার্শ্বে সহকর্ম্মিণীরূপে দাঁড়াইবার অধিকার দিয়াছেন। এইটি স্মরণ রাখিয়া বালী-সুগ্রীবের কাহিনী পাঠ করিলে আমরা প্রাচীন কালের একটি আর্য্যেতর সভ্যতার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিব। কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও ইঁহাতেই মনস্বিনী তারার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বাক্‌পটুতা ও সাহস ফুটিয়া উঠিবে।

বালী সুগ্রীব দুই ভাই; মাতা এক, পিতা বিভিন্ন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "শত্রুনিসূদন" বালী কিষ্কিন্ধার অধিপতি ছিলেন। মায়াবী নামক "তেজস্বী" অসুরের সহিত তাঁহার স্ত্রী-নিমিত্ত শত্রুতা হইল। (রামায়ণের মুখ্য কথাই স্ত্রীঘটিত বিবাদ)। একদা গভীর নিশীথে নিদ্রামগ্ন কিষ্কিন্ধার দ্বারে আসিয়া মায়াবী যুদ্ধার্থ বালীকে আহ্বান করিয়া "ভৈরবস্বনে" গর্জ্জন করিতে লাগিল। বালী গর্জ্জন শুনিয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়াই শত্রুকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন; স্ত্রীদিগের নিষেধ মানিলেন না। সুগ্রীবও সৌহার্দ্দবশতঃ তাঁহার সঙ্গে গেলেন। অসুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রাণভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অবশেষে এক

তৃণাচ্ছাদিত বৃহৎ গর্ত্তে প্রবেশ করিল। সেই সময়ে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, বালী ও সুগ্রীব চন্দ্রালোকে উহা দেখিতে পাইলেন। বালী আপনার পাদ স্পর্শ করাইয়া সুগ্রীবকে শপথ করাইলেন যে, তিনি যাবৎ মায়াবীকে হত্যা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তাবৎ সুগ্রীব সেই গর্ত্ত-দ্বারে অবস্থান করিবেন। বালী গর্ত্তে প্রবেশ করিবার পরে সুগ্রীব সেখানে এক বৎসরের অধিক কাল প্রতীক্ষা করিলেন, বালী ফিরিলেন না। দীর্ঘকাল অন্তে সুগ্রীব দেখিলেন, সেই ভূগর্ভস্থ দুর্গদ্বার হইতে "সফেন রুধির" বিনিঃসৃত হইতেছে। তিনি ভাবিলেন, বালী হত হইয়াছেন। তখন সুগ্রীব এক পর্ব্বতপ্রমাণ শিলা দ্বারা বিলের মুখ বন্ধ করিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি কথাটি গোপন রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রীরা উহা জানিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহারা সুগ্রীবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। এদিকে বালী রিপু বধ করিয়া আসিয়া দেখিলেন, সুগ্রীব রাজা হইয়া বসিয়াছেন।* ইহাতে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। সুগ্রীব মিষ্ট কথায় আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া স্বীয় দোষ ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিলেন; তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন; মাথা নত করিয়া জোড়হাতে তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন; কিন্তু বালী কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। তিনি যে অবাচ্য ভাষায় সুগ্রীবকে ভর্ৎসনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে; প্রত্যুত তাঁহাকে "একবস্ত্র" করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। সুগ্রীব সর্ব্বস্ব হারাইয়া হনূমানাদি চারিজন মন্ত্রীর সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। বালী শাপভয়ে সেখানে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। সুগ্রীবকে তাড়াইয়া দিয়া তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ রুমাকে স্বীয় শয্যাসঙ্গিনী করিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে বনবনান্তর অতিক্রম করিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় রাম ও সুগ্রীবের সখ্যবন্ধন হইল। সর্ত্ত রহিল, রাম বালী বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সুগ্রীব বানরসেনা সহ সীতার অন্বেষণে ও সীতার উদ্ধারে তাঁহার সহায় হইবেন।

এই আঁতাত (entente) বা সন্ধি অনুসারে সুগ্রীব বালীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন; এবং তাহার ফলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে পরাজিত এবং ক্লান্ত, রুধিরাক্ত-কলেবর ও প্রহারে জর্জ্জর হইয়া দ্রুতবেগে ঋষ্যমূকে পলাইয়া গেলেন। রাম লক্ষ্মণ কিয়ৎকাল পরে সুগ্রীবের নিকটে আসিলেন। সুগ্রীব রামকে দেখিয়া অধোবদন হইয়া বলিলেন, "আপনি বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে বলিয়া আমাকে শত্রুর দ্বারা প্রহার করাইয়া এ কি করিলেন? আমাকে যখন যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন, আপনার তখনই বলা উচিত ছিল, 'আমি বালীকে বধ করিব না।' তাহা হইলে আমি যাইতাম না।" রাম করুণ ও কোমল বচনে উত্তর করিলেন, তুমি ও বালী, গাত্রের বর্ণ, কণ্ঠস্বর, দৃষ্টিভঙ্গী, বিক্রম ও বাক্য, সকল বিষয়েই ঠিক এক রকম; কাজেই কাহাকে মারিতে কাহাকে মারিব, এই ভয়ে আমি শর নিক্ষেপ করিতে পারি নাই। আচ্ছা, তুমি একটা চিহ্ন ধারণ করিয়া আবার যুদ্ধে যাও, দেখিবে, আমি বালীকে এই মুহূর্ত্তেই হত্যা করিব।" রামের আদেশে লক্ষ্মণ গজপুষ্পের মালা রচনা করিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠে দিলেন। (একটা জীবন-মরণ মল্লযুদ্ধে ফুলের মালা কতক্ষণ টিকিবে, কবি সে সমস্যাটা চিন্তার যোগ্য মনে করেন নাই।)

সুগ্রীব পুনরায় কিষ্কিন্ধায় যাইয়া ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নিনাদ শুনিয়া প্রাণিকুল ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বালী তখন অন্তঃপুরে ছিলেন; সুগ্রীবের গর্জ্জন শুনিয়া তিনি ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং সবেগ পদচালনায় যেন মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইতে উদ্যত হইলেন। তখন তারা প্রণয়বশে তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "তুমি এখন যাইও না, কল্য প্রভাতে সুগ্রীবের সহিত

* ইংলণ্ডের রাজা 'সিংহমনাঃ" রিচার্ড যখন সুদূর পশ্চিম-আসিয়ায় ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং দৈবদুর্ব্বিপাকে কারাবাসী হওয়াতে যখন তাঁহার স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার আশা ক্ষীণ হইতেছিল, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর জন এমনই সিংহাসন অধিকার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

যুদ্ধ করিও। সুগ্রীব এইমাত্র তোমার হস্তে নিগৃহীত হইয়া পলাইয়া গেল, সে যে আবার যুদ্ধ করিতে আসিল, নিশ্চয়ই ইহার একটা বিশেষ কারণ আছে। তাহার গর্জ্জনে যেরূপ অধ্যবসায়, দর্প ও উৎসাহ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে উহার পশ্চাতে সামান্য কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি অঙ্গদের মুখে শুনিয়াছি, দশরথের পুত্র মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ বনবাসী হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়াছেন, এবং তোমার ভ্রাতার সহায় হইয়াছেন। রামের সহিত বিবাদ করা তোমার উচিত নহে। তুমি আমার হিতবচন শুন; সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। আমার বিবেচনায় সুগ্রীব ও রামের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করাই তোমার কর্ত্তব্য।"

বালী তারার এই হিতবাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "আমি শত্রু কনিষ্ঠ ভ্রাতার সক্রোধ গর্জ্জন ও আস্পর্দ্ধা কেন সহ্য করিব? বীরের পক্ষে শত্রুর পীড়ন সহ্য করা মৃত্যুর অপেক্ষাও দুর্ব্বহ। আর রামের জন্যই বা ভয় কিসের? তিনি ধর্ম্মজ্ঞ; কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, তাহা তিনি সবিশেষ জানেন; তিনি কেন অনর্থক আমাকে বধ করিবার মত একটা পাপকার্য্য করিবেন?"* বালী যখন তারার কথা কিছুতেই রাখিলেন না, তখন প্রিয়বাদিনী ও হিতকারিণী তারা রোদন করিতে করিতে স্বামীকে আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং তাঁহার বিজয়-কামনায় স্বস্ত্যয়ন করিয়া—স্বস্ত্যয়নের মন্ত্র তিনি জানিতেন—পরিচারিকাগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অতঃপর ক্রোধোন্মত্ত বালী মহাবেগে পুরী হইতে বহির্গত হইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমতঃ উভয়েই দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিয়া লইলেন, তৎপরে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম যখন দেখিলেন, সুগ্রীব ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছেন, তখন বালীর প্রতি বজ্রসম বাণ নিঃক্ষেপ করিলেন, বালী আহত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হইলেন।

(কিয়ৎকাল পরে বালী চৈতন্যলাভ করিলেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ সর্গে রামের প্রতি বালীর ভৎর্সনা, রামের উত্তর এবং রামের প্রতি বালীর অনুরোধ ও ক্ষমাপ্রার্থনা বর্ণিত হইয়াছে। এই তিনটি সর্গ গভীর মনোযোগের যোগ্য। আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সম্বন্ধ বিষয়ে ইহাতে অনেক ভাবিবার কথা আছে।)

তারা অন্তঃপুরে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন, বালী রামের বাণে নিহত হইয়াছেন। শুনিয়াই তিনি কিষ্কিন্ধা হইতে বহির্গত হইয়া রণভূমির দিকে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। পথে দেখিলেন, বানরগণ রামের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া ও তাহাদিগের নিষেধ না মানিয়া তারা কাঁদিতে কাঁদিতে এবং বক্ষে ও শিরে করাঘাত করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া পতিকে ভূপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি বালীর নিকটে যাইয়াই অবশাঙ্গ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, এবং পুনরায় সুপ্তার ন্যায় উত্থিত হইয়া 'হা আর্য্যপুত্র' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তারা বালীর বীরত্ব ও দাম্পত্যপ্রেম স্মরণ করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিলেন, "বানররাজ, তোমাকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়াও আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া সহস্রখণ্ড হয় নাই, ইহাতেই বোধ হইতেছে, যে উহা অতিশয় কঠিন।" কিন্তু এই শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যেও তারা বালীর দুষ্কর্ম্ম ভুলিলেন না। বলিলেন, "প্লবকপতি, তুমি পূর্ব্বে সুগ্রীবের পত্নীকে হরণ এবং তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলে, অদ্য মৃত্যুরূপে তাহার পরিণাম-ফল প্রাপ্ত হইলে।" এই অনার্য্যা নারী আর্য্যধর্ম্মনীতিকে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিতা হইলেন না। তারা রামকে বলিতেছেন, "কাকুৎস্থ রাম অন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার কালে বালীকে অন্যায়রূপে বধ করিয়াছেন; এই একান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াও তিনি যে সন্তপ্ত হইতেছেন না, ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয়।" পরিশেষে তিনি আপনার ও পুত্র অঙ্গদের জন্য খেদ করিতে লাগিলেন, "আমি পূর্ব্বে দুঃখ ভোগ না করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম; এক্ষণে অনাথা ও দুঃখে নিমগ্ন হইয়া শোকসন্তাপপূর্ণ বৈধব্যযন্ত্রণার মধ্যে কালযাপন করিব। আর আমার এই পুত্র সুকুমার বীর অঙ্গদ সুখে লালিত হইয়াছে; পিতৃবৎ ক্রোধে অন্ধ হইলে সে কি অবস্থায় বাস করিবে?"* তারা বালীকে

* গ্রীক-কাব্যে ইহাকে বলে dramatic irony.

* হেকেটারের মৃত্যুর পরে পত্নী আণ্ড্রমাখীও পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া এই প্রকার বিলাপ করিয়াছিলেন।

সম্বোধন করিয়া আবার বলিলেন, "রাম তোমাকে বধ করিয়া অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ; কারণ সুগ্রীবকে তিনি যে-প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিয়া ঋণ-মুক্ত হইয়াছেন।" তারা এতক্ষণ সুগ্রীবকে কিছু বলেন নাই, এখন বলিলেন, "সুগ্রীব, তোমার কামনা পূর্ণ হইল ; তুমি রুমাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। তোমার শত্রু ভ্রাতা হত হইয়াছেন, তুমি এক্ষণে নিরুদ্বেগে রাজ্য ভোগ কর।" পতির জন্য পুনশ্চ বিলাপ করিতে করিতে তারা পতিব্রতা নারীর চরম প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন। "হে বীর কপিনাথ, না বুঝিয়া যদি তোমার নিকটে কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, তবে তোমার পদে মাথা রাখিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমার সেই অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।" তারা করুণ স্বরে এইরূপ ক্রন্দন করিতে করিতে বালীর নিকটে বসিয়া বানরীগণের সহিত প্রায়োপবেশন করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন হনূমান্ মৃদুবাক্যে তারাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এই সময়ে বালী কিছুকালের জন্য সংজ্ঞা লাভ করিলেন। মরণের তীরে দাঁড়াইয়া তিনি সুগ্রীবকে যে হিতকথা শুনাইয়াছিলেন, বিংশ সর্গের তাহাই বর্ণিতব্য বিষয়। আমরা তারার প্রসঙ্গে উহা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, অধিক আবশ্যক নাই। সুগ্রীবকে উপদেশ দিয়াই বালী প্রাণত্যাগ করিলেন।

'লোকশ্রুতা' তারা মৃত পতির মুখচুম্বন করিয়া আবার কত বিলাপ করিলেন। "হে বীর, আমি অনাথা, আমাকে একাকিনী রাখিয়া তুমি কোথায় গেলে ? কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই আর বীরপুরুষকে কন্যাদান করিবেন না ; কেন-না, আমি ত বীরপত্নী ছিলাম, দেখ, আমি সহসা বিধবা হইয়া বিনষ্টা হইলাম। যে-নারী পতিহীনা, তিনি পুত্রবতী ও ধনধান্যে সমৃদ্ধিশালিনী হইলেও পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন।" বালীর গুণগ্রাম উল্লেখ করিয়া তিনি আরও কতরূপে শোক প্রকাশ করিলেন।

তারাকে শোকাকুলা দেখিয়া সুগ্রীবের অনুতাপ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্নেহ স্মরণ করিয়া তিনি বিস্তর খেদ করিলেন।*

পতিবিরহে অধীরা হইয়া তারা রামের নিকটে গিয়া বলিলেন, "বীর, তুমি যে-বাণ দ্বারা আমার প্রিয় পতিকে বধ করিয়াছ, সেই বাণ দ্বারা আমাকেও বধ কর ; আমি মরিয়া তাঁহার নিকটে যাইব ; বালী আমা ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গ সম্ভোগ করিবেন না।" তারার কাতরতা দেখিয়া রাম শোকার্ত্ত হইলেন, এবং তাঁহাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিয়া অনেক হিতবাক্য বলিলেন। অতঃপর যথাবিধি বালীর প্রেতকার্য্য সম্পন্ন হইল।†

তৎপরে সুগ্রীবের অভিষেক হইল। সুগ্রীব রাজা হইয়া স্বীয় পত্নী রুমাকে ত ফিরিয়া পাইলেনই, অধিকন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ তারাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। হীনচেতা আরামপ্রিয় পুরুষের যেমন হয়, সুগ্রীব রাজৈশ্বর্য্য পাইয়া ভোগের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন।

সুগ্রীব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, বর্ষার তিন মাস অতীত হইলে, শরতের প্রারম্ভে তিনি সীতার অন্বেষণে বানরগণকে দিকে দিকে প্রেরণ করিবেন। রাম দেখিলেন, বিলাসের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সুগ্রীব সেই প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, "শরদাগমনে নদী-সকলের তটদেশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, বিজয়াকাঙ্ক্ষী নৃপতিগণের ইহাই উদ্যোগকাল এবং যুদ্ধযাত্রার প্রথম সময়। সীতার অদর্শনে বর্ষার চারি মাস আমার নিকটে শত বর্ষ বলিয়া বোধ হইয়াছে। আমি প্রিয়াবিহীন, দুঃখার্ত্ত, রাজ্যহীন এবং নির্ব্বাসিত, ইহা দেখিয়াও সুগ্রীব আমাকে দয়া করিতেছে না। কেন-না, সে ভাবিতেছে, 'ইনি অনাথ, রাজ্যচ্যুত, রাবণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, গৃহহীন প্রবাসী, কামী ও আমারই শরণাগত।' এই জন্যই সেই দুরাত্মা বানররাজ আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। দুর্ম্মতি সুগ্রীব সময় নিরূপণ করিয়া সীতার অন্বেষণ বিষয়ে যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল, স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিয়া এক্ষণে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণ, যাও,

---

* তাঁহার খেদোক্তিতে বানর বা অনার্য্যের চিহ্ন কিছুই নাই, উহা পূর্ণমাত্রায় আর্য্যজনোচিত।

† অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধিটিও আর্য।

তুমি কিষ্কিন্ধায় গিয়া মূর্খ, হীন, সুখাসক্ত সুগ্রীবকে আমার হইয়া বল, 'যে-ব্যক্তি বলবান্ ও বীর্য্যসম্পন্ন সুহৃৎকে তাহার কামনা পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া পূর্ব্বে তাহার নিকটে উপকার পাইয়া, সেই সুহৃদের আশা পূরণ না করে, সে জনসমাজে পুরুষাধম। আর যিনি, একবার যে-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, শুভই হউক বা অশুভই হউক, যথাযথরূপে তাহা প্রতিপালন করেন, তিনিই বীর, পুরুষোত্তম।' তাহাকে বলিও, 'সে কি আমার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে চায়?' বলিও, 'বালী হত হইয়া যে-পথে গিয়াছে, সে-পথ আজিও রুদ্ধ হয় নাই। তুমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর, বালীর পথে অনুগমন করিও না।'''

রামের আদেশে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ লইয়া কিষ্কিন্ধার প্রাকার পরিখা ও মহৈশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে সুগ্রীবভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি প্রচুর যানাসন, সুবর্ণরজতময় পর্য্যঙ্ক, সুমধুর গীতবাদ্য, রূপযৌবনগর্ব্বিতা নারীকুল প্রভৃতি উচ্চতম সভ্যতার নিদর্শন-সকল দেখিতে পাইলেন। বোধ হয় সুগ্রীবের বিলাসবাহুল্য দেখিয়াই কুপিত হইয়া লক্ষ্মণ জ্যা-নির্ঘোষ করিলেন, সেই নির্ঘোষে দশ দিক্ পূর্ণ হইল; উহা শুনিয়া সুগ্রীব বুঝিলেন, লক্ষ্মণ আসিয়াছেন; তখন তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া তারার শরণ লইলেন। বলিলেন, "সুন্দরি, লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ মৃদুস্বভাব, ইনি কি জন্য ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার কারণ কি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ? ইনি অল্প কারণে ক্রোধ করেন নাই। যদি তোমার মনে হয়, আমি ইহাদিগের কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি, তবে তাহা নিশ্চিত বুঝিয়া শীঘ্র আমাকে বল। অথবা তুমি নিজেই লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ত্বনাসূচক বাক্যে তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন কর। ইনি বিশুদ্ধাত্মা, তোমাকে দেখিয়া রুষ্ট হইবেন না। মহাত্মারা স্ত্রীজাতির প্রতি কদাপি কঠোর ব্যবহার করেন না। তুমি গিয়া লক্ষ্মণকে প্রসন্ন কর; তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইলে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

(এ পর্য্যন্ত তারার চরিত্রে কালিমার রেখাপাত হয় নাই। কিন্তু অতঃপর কবি এই অনার্য্যা নারীকে লোক-চক্ষুতে হীন না করিয়া পারিলেন না। তিনি বলিতেছেন—)

তারা সুগ্রীবের অনুরোধে লক্ষ্মণের নিকটে গেলেন—তাঁহার দেহযষ্টি অবনত, মদ্যপান জন্য নয়নযুগল চঞ্চল, পদে পদে চরণদ্বয় স্খলিত হইতেছে, কাঞ্চী ও হেমসূত্র প্রলম্বিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ দেখিলেন, বানররাজপত্নী তারা আসিয়াছেন; স্ত্রীলোক নিকটে দেখিয়াই তাঁহার ক্রোধ তিরোহিত হইল; তিনি অধোমুখ হইয়া উদাসীনভাবে রহিলেন; তারা মদ্যপান করিয়া লজ্জা হারাইয়াছিলেন; লক্ষ্মণের প্রসন্নদৃষ্টি দেখিয়া প্রণয়-প্রণোদিত প্রগল্‌ভভাবে গভীর অর্থযুক্ত সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, "কে না আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে? তবে আপনার কোপের কারণ কি?" লক্ষ্মণ তারার সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া প্রণয়গর্ভ বচনে বলিলেন, "তুমি ভর্ত্তার হিতকারিণী; তোমার পতি যে কামবৃত্তি-পরবশ হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ লোপ করিতে বসিয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? বানরপতি সুগ্রীব অঙ্গীকার করিয়াছিল, যে, চারি মাস পরে সীতার অন্বেষণে উদ্যোগী হইবে; কিন্তু এক্ষণে মদ্যপানে ও ভোগসুখে মত্ত হইয়া সে ভুলিয়া গিয়াছে, যে, সেই সময় অতীত হইয়াছে। ধর্ম্মার্থসিদ্ধির পক্ষে মদ্যপান প্রশস্ত নহে—মদ্যপানে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নষ্ট হয়।"

তারা লক্ষ্মণের সঙ্গত কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন, "রাজকুমার, এটা আপনার ক্রোধের সময় নয়, এবং স্বজনের প্রতি আপনার ক্রোধ করাও উচিত নহে। সুগ্রীব আপনাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য একান্ত অভিলাষী; তাহার অপরাধ আপনার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। আপনার ন্যায় সাত্ত্বিক পুরুষ কেন ক্রোধের বশীভূত হইবেন? হে বীর, আপনি বিশুদ্ধস্বভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ; আপনি আমার সহিত অন্তঃপুরে সুগ্রীবের নিকটে আসুন।"

লক্ষ্মণ তারার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুগ্রীব দিব্য আভরণে ভূষিত ও প্রমদাগণে বেষ্টিত হইয়া মহার্হ আসনে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই লক্ষ্মণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সুগ্রীব সিংহাসন ছাড়িয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের নিকটে গমন করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে মর্ম্মঘাতী বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। "যে-রাজা উপকারী মিত্রগণ

উপকার করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া, সেই অঙ্গীকার রক্ষা না করে, সে অধার্ম্মিক, মিথ্যাপ্রতিজ্ঞাকারী ; তাহার অপেক্ষা নৃশংসতর কেহই নাই। যে প্রথমে মিত্রগণের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইয়া পরে প্রত্যুপকার না করে, সে কৃতঘ্ন, সকল জীবের বধ্য। পণ্ডিতেরা বলেন, 'গোবধকারী, সুরাপায়ী, চোর ও ভগ্নব্রত ব্যক্তিরও নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।' বানর, তুমি রামের সাহায্যে মনোরথ সিদ্ধি করিয়া তাঁহার প্রত্যুপকার করিতেছ না ; তুমি অনার্য্য, কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী। যদি তোমার প্রত্যুপকার করিবার ইচ্ছা থাকে তবে সীতার অন্বেষণে যত্ন কর। বালী হত হইয়া যে-পথে গিয়াছে, সে-পথ অদ্যাপি রুদ্ধ হয় নাই। তুমি প্রতিজ্ঞার পথে স্থির থাক, বালীর পথে যাইও না।"

লক্ষ্মণ স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া সুগ্রীবকে এই প্রকার বলিলে চন্দ্রমুখী তারা তাঁহাকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, এই কপিরাজ সুগ্রীবকে এরূপ কঠোর বাক্য বলা আপনার উচিত নয়, এবং আপনার মুখে এ প্রকার কঠোর বাক্য শোনাও সুগ্রীবের উচিত নয়। সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, শঠ, নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী বা কুটিল নহেন। রাম রণে অন্যের অসাধ্য যে-উপকার করিয়াছেন, বীর সুগ্রীব তাহা ভুলিয়া যান নাই। রামের প্রসাদেই সুগ্রীব কীর্ত্তি, চিরস্থায়ী কপিরাজ্য, রুমাকে এবং আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে অপরিসীম দুঃখভোগ করিয়া এই অনুপম সুখ লাভ করিয়াছেন, তাই মুনি বিশ্বামিত্রের ন্যায় অবশ্যকর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। ধর্ম্মাত্মা, মহামুনি বিশ্বামিত্র ঘৃতাচীর প্রতি আসক্ত হইয়া দশ বৎসরকে একদিন মনে করিয়াছিলেন। কালজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজা বিশ্বামিত্রই যখন কর্ত্তব্যকাল জানিতে পারেন নাই তখন যে সামান্য জন, তাহার কথায় কাজ কি ? লক্ষ্মণ, দেহধর্ম্ম-পরায়ণ, পরিশ্রান্ত, কাম্যবস্তুভোগে অপরিতৃপ্ত এই সুগ্রীবকে রামের ক্ষমা করা উচিত। তাত লক্ষ্মণ, কর্ত্তব্য বিষয় নির্ণয় না করিয়া সহসা ক্রোধ করা উচিত নহে। আপনার ন্যায় সাত্ত্বিক পুরুষেরা বিবেচনা না করিয়া সহসা ক্রোধের বশীভূত হন না। ধর্ম্মজ্ঞ, আমি সমাহিত হইয়া সুগ্রীবের জন্য আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি ক্রোধসমুৎপন্ন এই মহাক্ষোভ ত্যাগ করুন। আমি জানি, সুগ্রীব রামের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ রুমা, আমি, অঙ্গদ, রাজ্য, ধনধান্যপশু, সকলই পরিত্যাগ করিতে পারেন। সুগ্রীব সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে আনয়ন করিবেন, এবং শশাঙ্কের সহিত রোহিণীর ন্যায়, রামের সহিত সীতার মিলন ঘটাইবেন। কিন্তু লঙ্কায় কোটি কোটি দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস বাস করিতেছে ; তাহাদিগকে বধ না করিলে রাবণকে বধ করা অসম্ভব, সুগ্রীব একাকী সেই রাক্ষসদিগকে, বিশেষতঃ ক্রূরকর্ম্মা রাবণকে, কখনই বিনাশ করিতে পারিবেন না। কপিরাজ অভিজ্ঞ বালী রাবণের সৈন্যবল বিষয়ে আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ; তাঁহার মুখে শুনিয়া আমি আপনাকে বলিলাম। আপনাদিগের সাহায্যার্থই সুগ্রীব সহায়-সংগ্রহের মানসে বহুতর বানরসৈন্য আনয়নের জন্য নানা দিকে প্রধান প্রধান বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। বানরপতি সেই পরাক্রান্ত বানরগণের প্রতীক্ষা করিয়াই রামের কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রায় বিলম্ব করিতেছেন। সুগ্রীব পূর্ব্বে যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে অদ্যই কোটি কোটি ঋক্ষ, বানর, গো-লাঙ্গুল আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

মৃদুস্বভাব লক্ষ্মণ তারার এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত ও বিনয়পূর্ণ বাক্য গ্রহণ করিলেন। তখন সুগ্রীব মলিন বস্ত্রের ন্যায় লক্ষ্মণজনিত মহা ত্রাস ত্যাগ করিলেন, এবং কণ্ঠের বহুগুণ মালা ছেদন করিয়া মদশূন্য হইয়া তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে বানরসেনা কিষ্কিন্ধায় আগমন করিল এবং সীতান্বেষণের আয়োজন যথারীতি আরব্ধ হইল।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, তারার বাক্যাবলীতে মদের গন্ধ একবিন্দুও নাই। উহা মন্ত্রণাদক্ষা, বুদ্ধিমতী, ভয়রহিতা তারারই উপযুক্ত। ক্রোধোদ্দীপ্ত সশস্ত্র বীরপুরুষের সম্মুখীন হইয়া নম্র অথচ অর্থযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিতে পারেন, এরূপ নারী কবি রামায়ণে এই একটিই অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজ্যের সঙ্কটসময়ে ভয়বিহ্বল স্বামীকে শয়নকক্ষে রাখিয়া তাঁহার তারার

জন্য নির্ভয়ে গৃহের বাহির হইতে পারিয়াছেন, এরূপ রমণীর দৃষ্টান্তও জগতে সুলভ নহে। তাই মনে হয়, "নিত্যস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা"র অন্যতমা 'লোকশ্রুতা' তারাকে "প্রস্খলন্তী, মদবিহ্বলাক্ষী, প্রলম্বকাঞ্চীগুণ-হেমসূত্রা, পানযোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা"—এই সকল বিশেষণে বিশেষিত করিয়া হেয় করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। যে কবি উত্তরকাণ্ডে লিখিয়াছেন (৪২।১৮, ১৯)—"ইন্দ্র যেমন শচীকে মদ্য পান করান, তেমনি রাম সীতাকে বাম বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া পবিত্র মৈরেয়ক মদ পান করাইলেন" (সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি। পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ॥)—ইহা কি তাঁহারই কীর্ত্তি?

যাত্রা

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখের সপ্তমী তিথিতেই এ বাড়িতে আজ বিজয়া আসিয়াছে।

চারিদিকে বিচ্ছেদ-বেদনার একটি করুণ ছায়াপাত হইয়াছে। কারণটা সম্ভবতঃ এই যে, সকলেই অল্পাধিক শ্রান্ত।

অথচ উৎসরের জের এখনও মেটে নাই।

বাড়ি এখনও আত্মীয়-স্বজনে ভরিয়া আছে, ছেলে-মেয়েদের কলরব কালকের চেয়ে আজ কোন অংশেই কম নয়। অকেজো লোকের অকারণ চলাফেরা, কাজের লোকের অসহিষ্ণু ব্যস্ততা, খাওয়া খাওয়ানো, মাছ কাটা, তরকারী কোটা, হলুদ বাটা ও রান্নার সমারোহ সবই পুরাদমে চলিতেছে। উঠানের কোণে নিম আর আম গাছের মেশানো ছায়ায় পাতা চৌকিতে বয়স্ক প্রতিবেশীদের হুকা টানার বিরাম নাই। তা, ইহা স্বাভাবিক বই কি। এতগুলি মানুষের মধ্যে ধরিতে গেলে কয়জনেরই বা বুকের ভিতরটা আজ ভারি হইয়া উঠিয়াছে, চোখের আড়ালে অশ্রু জমিয়াছে? দৈনন্দিন জীবনটা নিরুৎসব সকলেরই, সে জীবন পিছনে ফেলিয়া উৎসবের নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছে আজ যাহারা, দাবি তাহাদের আনন্দ আর বৈচিত্র্য, বরকনে-বিদায় ব্যাপারটা তাহাদের কাছে বিদায়-উৎসব, ভিন্ন আর কিছুই নয়, মা ও মেয়ের কান্নাকাটি তাহারই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান মাত্র।

তবু বেশ বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত বাড়িটাই কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে; আছে সবই কেমন যেন বেমানান হইয়া আছে।

খানিক আগে কুড়াইয়া পাওয়া মালকোষকে ঠিকমত আয়ত্ত করিতে না পারিয়া শানাই এখন, এই বেলা এগারটার সময়, সহসা পূরবী ধরিয়া ফেলিয়াছে; অনাবশ্যক দীর্ঘ টানগুলির মধ্যে পূরবীত্ব কিছু কম থাকিলেও বিলাপ আছে প্রচুর। সদর দরজার দুইপাশে কলাগাছ দু'টি পাতা এলাইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, একটি মঙ্গল কলসের আম্রপল্লব কাল বোধ হয় ছাগলেই অর্দ্ধেক খাইয়া ফেলিয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত তাহা বদলাইয়া দেওয়া হয় নাই। আর হইবেও না। আর আধঘণ্টা পরে বাড়ির দুয়ারে মঙ্গল কলসেরই বা কি প্রয়োজন, তাহাতে অক্ষত আম্রপল্লব না থাকিলেই বা কি আসিয়া যাইবে!

ক্ষেন্তিই বিশেষ বন্ধু। ছেলে কোলে সকাল হইতে সে ইন্দুর কাছে থাকিয়াছে, নানা গল্প করিয়াছে, আশ্বাস, উপদেশ, সান্ত্বনা, নিজের প্রথম স্বামিগৃহে যাওয়ার বিশদ বর্ণনা, বলিতে কিছুই বাকী রাখে নাই। তবু যেন কথা ফুরাইতেছিল না।

না ফুরাইবারই কথা।

নেপথ্যে ভবিষ্যতের ব্যথা জমিয়াছে। আবার কবে দেখা হইবে কে জানে? এক সময় দু'জনে বাপের বাড়ি

আসিতে পারে তবেই ত। ক্ষেন্তির ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর দিন তিনেক, তারপর বছর খানেকের মত নিশ্চিন্ত।

নিজের কথার সূত্র ধরিয়া ক্ষেন্তি বলিয়া চলিল—

'নিজেকে দু'ভাগ করে ফেলতে হবে ভাই, একভাগ শাশুড়ী ননদ দেওর এদের জন্য, আর এক ভাগ বরের জন্য। যদি দেখিস শাশুড়ী ননদ একটু বেশী বেশী শত্তুর ভাবছে প্রথম প্রথম, বরের ভাগটা ছোট করে ওদের ভাগটা বড় করে ফেলবি। তোর বরকে ভালই মনে হ'ল, অল্পেই তুষ্ট থাকবে।'

ইন্দু সলজ্জে একটু হাসিল। ভাল, না ছাই! কি লজ্জাতেই ফেলিয়াছিল কাল? আড়িপাতার ব্যাপার জানে না কোন দেশের মানুষ ও?

ক্ষেন্তি বলিল, 'হাসিস্ কিলো? ও-বাড়ির পুষি বেড়ালটার পর্য্যন্ত যখন মন যুগিয়ে চলতে হবে তখন টের পাবি। এবার অবশ্য তেমন ভাবনা নেই,যে কটা দিন থাকিস্ বয়েস আর রূপের সমালোচনা শুনে আর যে যা ক'রতে বলে ক'রে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসবি। ঠ্যালা বুঝবি পরের বার। কেউ আপন করবার চেষ্টাটুকুও করবে না,—এক বর ছাড়া, তা বরও যে খুব বেশী চেষ্টা করবে মনেও করিস্ না,—নিজে নিজে তোকে সকলের আপন হতে হবে। বাব্বা, সে এক তপস্যা। লোক যদি ওরা মোটামুটি ভাল হয় তা হলে বছর খানেকের তপস্যাতেই এক রকম ঠিক হয়ে আসে, পান থেকে খসা চুনটুকু নিয়ে আর কেলেঙ্কারী কাণ্ড বেধে যায় না, গরম মেজাজী কেউ থাকলেই চিত্তির! একটা ফ্যাকড়া যদি বাধে, আর কি, রইল তা চিরস্থায়ী হয়ে, দোষ সে তোমারই হোক আর যারই হোক! আমার মেজ ননদ? কি রাগ বাবা, তাওয়ার মত তেতেই আছে! আমাকে গাল না দিয়ে আজও কি সে জল খায়? খায় না! শাশুড়ী মাগী লোক মন্দ নয় তাই রক্ষা, নইলে গিয়েছিলাম আর কি!' মেজ ননদের সঙ্গে কবে কি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া খুঁটিনাটি বাধিয়াছিল ক্ষেন্তি তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দাখিল করিল শেষে বলিল, 'তা শোন্, পরের বার যখন যাবি একটা কথা মনে রাখিস যে ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত যত মুখ বুজে খাটবি সবাই তত ভাল বলবে, আর রাত জেগে বরের সঙ্গে যত গুজগাজ্ ফিস্ফাস্ করতে পারবি বর তত খুশী থাকবে।' বলিয়া ক্ষেন্তি হাসিল।

ইন্দু মৃদুস্বরে বলিল, 'শেষেরটাতেই ভয় ভাই। যে ঘুমকাতুরে আমি জানিস্ ত।'

'ঘুম আর চোখে থাকবে না লো, থাকবে না, বরঞ্চ মনে হবে, পোড়া বিধাতার কি বিবেচনা মরে যাই, এত ছোট করেছে রাত, তার উপর আবার ঘুমের ব্যবস্থা!'

ঘটনার ঘনঘটায় ইন্দুর মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছিল, সখীর পরিহাসে সে অল্প একটু হাসিল বটে, কিন্তু কৌতুক অনুভব করিল আরও কম। হরেন (ইন্দুর বরের নাম; মানুষটার চেয়ে নামটির সঙ্গেই ইন্দুর পরিচয় বেশী দিনের; নাম ও নামীকে সে এখনও একত্র জড়াইয়া ভাবে) অনেকক্ষণ খাইতে বসিয়াছে, নতুন জামাইয়ের খাইতে সময় লাগে, কিন্তু সে আর কতক্ষণ, হরেনের খাওয়া হইলেই যাত্রা।

অজানা অচেনা মানুষের সঙ্গে সেই তালশিমূলীর উদ্দেশে যাত্রা, সেখানে যাইতে হইলে তের মাইল পাল্কীতে গিয়া ষ্টীমার ধরিতে হয়; রাত দশটায় সে ষ্টীমার কোন্ ষ্টীমার ঘাটে নামাইয়া দেয় কে জানে, তারপর রাত বারোটা অবধি পাড়ি জমাইতে হয় নৌকায়। মালপদি— হইতে তালশিমূলী অনেকদূর—এতই দূর যে ব্যবধানটা ইন্দুর মনে দিকহীন রাইঘোষানীর মাঠের মত ধূ ধূ করিতে থাকে,—বৈশাখের খররৌদ্রে যে মাঠের তৃণগুলি ঝল্সাইয়া গিয়াছে, এখন যাহার দিকে তাকাইলে আগুণের হল্কায় দু'চোখ টন টন করিবে।

রাইঘোষাণীর মাঠ ঘেঁষিয়া ষ্টীমার ঘাটের পথটা অনেক দূর অবধি সিধা চলিয়া গিয়াছে, তারপর ডাইনে বাঁকিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে সাতগাঁয়ে। ওই গ্রামে স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর বাড়ি। স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর ছেলের সঙ্গে ইন্দুর সম্বন্ধ হইতেছিল, কেন ভাঙিয়া গেল কে জানে! ওখানে বিবাহ হইলে একদিক দিয়া ভালই হইত ইন্দুর। যখন তখন সে বাপের বাড়ি আসিতে পারিত, সোমবারে বিষ্যুদ্‌বারে বাবা আর দাদা মালসিপুকুরের হাটে যাইবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতে পারিত, স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর

বাড়ির পিছনের ধান ক্ষেতটা পার হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলে মালপতির গাছপালা তাহার চোখে পড়িত ; সবচেয়ে উঁচু তাল গাছটার নীচেই তাহাদের এই বাড়ি। ছেলে কালো তো কি হইয়াছে ? বরের রঙ ধুইয়া সে কি জল খাইত ?

তা ছাড়া, স্বরূপ চক্রবর্ত্তী আর তাহার ছেলে দুজনেই তাকে বউ করিবার জন্য কি রকম ব্যগ্র হইয়াছিল ? চক্রবর্ত্তী-গিন্নিকেও সে দেখিয়াছে, ভারি শান্ত অমায়িক মানুষ। ওখানে বিবাহ হইলে শ্বশুরবাড়ির আদর জুটিবে কি অনাদর জুটিবে এই নিয়া ইন্দুকে আর এমন দুর্ভাবনায় পড়িতে হইত না। তাহাকে বউ পাইলে উহারা বর্ত্তিয়া যাইত।

তবে কিশোর মহাদেবের মত এমন বরটি তাহার জুটিত না, এই যা আপশোষের কথা।

মার অবসর কম, খুব ভোরে আধঘণ্টাখানেক মেয়েকে বুঝাইবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, তার পর মাঝে মাঝে নানা ছলে মেয়ের ম্লান মুখ-খানি দেখিয়া যাওয়ার বেশী সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। নূতন জামাইকে আদর করিয়া খাওয়াইবার লোক আবশ্যকের অতিরিক্তই ছিল তথাপি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'যা ত মা ক্ষেন্তি, জামায়ের খাওয়াটা একটু ত্যাখ তো গিয়ে।'

'সে কি মাসীমা ? জামাই একা খাচ্ছে না কি ?' ছেলেকে কাঁখে তুলিয়া ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মা বলিলেন, 'পাতের কাছে বস্‌লি আর উঠে এলি কিছুই তো খেলি না ইন্দু ? একটু দুধ এনে দি' চুমুক দিয়ে খেয়ে ফ্যাল্ মা, খিদেয় নইলে যে সারা হয়ে যাবি ?'

মার গলার স্বর এমন করুণ শোনাইল যে দুধ খাইতে ইন্দু একেবারে অস্বীকার করিতে পারিল না, বলিল, 'এখন না মা, পরে খাব 'খন।'

'পরে আর কখন খাবি মা, পর কি আর আছে ? জামায়ের খাওয়া হ'লে সবাই তোকে আবার ছেঁকে ধর্‌বে, তখন কি আর খেতে পারবি ? এখুনি খেয়ে নে।'

'আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না মা !'

মার চোখ সজল হইয়া উঠিল।—'তা কি আমি বুঝি না [illegible] হবে। রাস্তায় তুই খিদেয় কষ্ট পাচ্ছিস্ ভেবে আমি এখানে কি করে থাক্‌ব বল দেখি ? একটু দুধ তুই খা ইন্দু, লক্ষ্মী মা আমার।'

একটু মানে এক বাটি এবং বাটিটাও নেহাৎ ছোট নয়। দুধের পরিমাণ দেখিয়া ইন্দু ভয় পাইল। মার মুখ চাহিয়া সবখানি দুধ কোনমতে যে গেলা যায় না এমন নয়, কিন্তু রাস্তায় বমি হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবু খাইতে হইল তাহাকে সবটাই। সে যেন অবোধ অবাধ্য শিশু এমনি ভাবে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তোষামোদ করিয়া বকিয়া মা তাহাকে সবটুকু দুধ খাওয়াইলেন, ভিজা হাত মুখে বুলাইয়া নিজের আঁচলে মুখ মুছাইয়া দিলেন, চুপি চুপি বলিলেন, 'এক কাজ কর্‌বি ইন্দু ? খানিকটা সন্দেশ দলা করে কলাপাতায় মুড়ে দিচ্ছি, সঙ্গে নিবি ? রাস্তায় যদি খিদে পায়—'

মাগো, মেয়েকে যে তিনি এত ভালবাসেন আগে তাহা কে জানিত ! দুদিন আগেও ইহাকে কারণে অকারণে কত মুখঝাম্‌টা দিয়াছেন, কত লাঞ্ছনা করিয়াছেন। সে সব কথা ভাবিলেও আজ চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চায়। দেখিতে দেখিতে মেয়ের দেহ দীঘল হইয়া উঠিল, দুধ না, ভাল মাছটুকু না তবু যেন কলাগাছের মত হু হু করিয়া বাড়িয়া চলে, অথচ বর জোটে না। মেয়ের দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা যেন তাহার হিম হইয়া যাইত। এক বছর ধরিয়া পেটের মেয়ে যেন শত্রুরও বাড়া হইয়া ছিল। এমন রাজরাণীর মত আজ ইহাকে মানাইয়াছে, এমন গড়ন, এমন মাজা রঙ, এমন লাবণ্য,—কিছুই কি তখন চোখে পড়িত ছাই ! মনে হইত, এমন কুরূপা মেয়ে ভূভারতে আর জন্মায় নাই।

চিবুক ধরিয়া উঁচু করিয়া মা ইন্দুর লজ্জিত মুখখানি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিয়া ভাবিলেন, বড় অন্যায় হইয়াছিল, বিনা দোষে মুখ বুজিয়া কত দুঃখই এ মেয়ে তাঁহার সহিয়াছে ! বিন্দুর বেলা সাবধান থাকিবেন, আর অমন করিয়া যখন তখন বকিবেন না, যা তা খোঁটা দিবেন না।

আশ্চর্য্য এই, মেয়ে যে প্রায় আধাআধি সর্ব্বনাশ করিয়া চলিল এ কথা মার মনেও পড়িল না। তেরো বিঘা ধানের জমি একেবারেই গিয়াছে, স্বামী-পুত্র লইয়া মা

গুঁজিবার এই ঠাইটুকু এগারশো টাকায় বাঁধা পড়িয়াছে। কত মাস কত বছর ধরিয়া স্বামীর অল্প আয়ের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া এ বাড়ি মুক্ত হইবে কে জানে। কেমন করিয়া সংসার চলিবে, পাচ ছয় বছর পরেই বিন্দুর বিবাহ দিতে হইবে, তখন কি উপায় হইবে এ সব ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া যাওয়ার কথা, মা কিন্তু এখন ও-সব কিছুই ভাবিতেছিলেন না। ভাবিবার সময় অনেক জুটিবে, মেয়ে যে আজ তাঁহার মহা সমারোহে পর হইয়া যাইতেছে!

ইন্দু আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল,

"হ্যা মা, খোকার ঘুম ভাঙেনি?'

'জানিনে। ওর দিকে তাকাবারও সময় পেয়েছি কি সকাল থেকে? সময় মত ওষুদও আজ বোধ হয় খাওয়ানো হয়নি।'

ইন্দু বলিল, 'আমি খাইয়েছি ওষুদ। বিকালে ডাক্তার বাবুকে আর একবার আনিয়ো মা। দেখে আসি খোকাকে একবার—'

ওদিকের ছোট ঘরটিতে পাচ ছয় বছরের একটি ছেলে শুইয়াছিল, সাত আটদিন ক্রমাগত জরে ভুগিয়া ছেলেটি জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাত মাইল দূরের গ্রাম হইতে ডাক্তারকে বার দুই আনা হইয়াছিল, জরটা তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু দুইচার দিনের মধ্যে কমিয়া যাইবে বলিয়া খুব জোরালো আশ্বাস ও ঝাঁঝালো ওষুদ দিয়াছেন। খোকা জাগিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল, মাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, সে সন্দেশ খাইবে।

মা বুঝাইয়া বলিলেন, 'আজ দিদি চলে যাবে, আজকেই তুই সন্দেশ খাবি খোকা? দিদিকে তুই ভাল বাসিস্‌নে বুঝি? তুই কাঁদিস্ ত ইন্দু—খুব কাঁদিস্ পাল্কীতে উঠে।'

খোকা সভয়ে কান্না থামাইয়া বলিল, 'আমি দিদির সঙ্গে যাবে।'

'যাস্। আগে তবে বার্লি খা। বার্লি না খেলে দিদি সঙ্গে নেবে না। নিবি ইন্দু?'

ইন্দু কান্না চাপিয়া বলিল, 'না'।

মা বার্লি আনিতে চলিয়া গেলেন।

এ ঘরখানা খুবই ছোট, পুরোনো চাঁচের বেড়া, বিবর্ণ টিনের চাল। এককোণে এক বোঝা পাকাটি ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছিল কখন কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, বাঁশের তৈরি চৌকীর তলে সারি সারি গুড়ের হাঁড়ি সাজানো। দরজার বাহিরেই বাড়ির কিষাণ গরুর জন্য বিচালী কাটে, ঘরের মধ্যে খড়ের টুক্‌রা উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

এই ঘরেই খোকা জন্মিয়াছিল। ইন্দুর সহসা সে কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার আকস্মিক ও অপরিমিত আশঙ্কার মধ্যে যুক্তির সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটিল। মনে হইল, বিবাহের গোলমালে রোগা ছেলেটাকে যে এ ঘরে সরাইয়া আনা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় নিয়তির হাত ছিল, ফলটা হয়ত ইহার শুভ হইবে না।

মনে মনে ইন্দু ভয় পাইল। কয়েক সেকেণ্ডের কল্পনায় সে যেন ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ফেলিয়াছে। কুলুঙ্গিতে তিন চারিটা ওষুদের শিশি, চোখ তুলিয়া ইন্দু সেগুলি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, উপরের তাকে খোকার ময়লা রবারের বলটা কে যেন তুলিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের বুড়োটে খেয়ালের ঠিক উপরেই খোকার ছেলেখেলা।

'তোর বলটা তাকে কে তুলে রাখলে রে খোকা?'

গদাইদা রাখিয়াছে। খেলিতে খেলিতে খোকার হাত যখন ব্যথা হইয়া গেল, গদাইদা তখন বলটা তুলিয়া রাখিল।—'শুয়ে শুয়ে বল খেলা বিচ্ছিরি, না দিদি?'

'হ্যা। আচ্ছা খোকা, বল খেলতে তুই খুব ভালবাসিস্?"

বল খেলিতে ভালবাসে না! বাসেই ত!

'দাঁড়া তবে, আসবার সময় পোড়াবাড়ি ঘাটের সেই মনোহারি দোকান থেকে তোর জন্যে দুটো বল কিনে আনব, তেমন বল তুই কখনও দেখিস্‌নি খোকা, তোর এটা তো ছোট্ট, সেগুলি এর ঠিক দুনো হবে,—দেখিস্। আর সাদা যেন ধপ্ ধপ্ করছে! ভাল হয়ে এক সঙ্গে তিনটে বল নিয়ে মজা ক'রে খেলবি, কেমন?'

একটু উৎসুক উদগ্রীব সুরেই ইন্দু কথাগুলি বলিল, বলের বর্ণনা শুনিয়া খোকার লুব্ধতা চরমে উঠিয়া যাইবে

এ রকম একটা আশা যেন তাহার আছে। তাহার ফিরিয়া আসা অবধি বলের লোভে খোকা অশুভকে ঠেকাইয়া রাখিবে এমন যুক্তিহীন কথাও ইন্দু আজ এই একান্ত অসময়ে সম্ভব মনে না করিয়া পারিল না।

ঘরের পিছনেই ছিটাল, গোটা দুই কণ্টকাকীর্ণ বাবলা গাছের গোড়া হইতে ডোবার পাড়টা ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। ডোবায় এখন জল নাই, শুধু আগাছা আর কাদার একটু তলানি। একটা চাপা বাষ্পীয় দুর্গন্ধ ওখান হইতে উঠিয়া আসিতেছিল, কি যেন পচিয়া গিয়াছিল এখন রোদের তেজে শুকাইয়া উঠিতেছে। ইন্দুর মনে পড়িল বছর তিনেক আগে মার যখন কঠিন অসুখ হইয়াছিল তখন খোকাকে কাছে লইয়া শুইয়া প্রথম কয়েক রাত্রি যে গন্ধে তাহার ঘুম আসে নাই, এই দুর্গন্ধ যেন তাহারই অনুরূপ। আজ দুপুরে সেই ক'টি রাতদুপুরের নিরুপায় ক্রোধ ও বিরক্তি যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এতক্ষণে ইন্দুর ভাল করিয়া কান্না আসিল, উচ্ছল উচ্ছ্বসিত কান্না; চাপিবার চেষ্টা করিয়াও সে চাপিতে পারিল না, খোকাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। চোখে চাপা দেওয়া আঁচল তাহার চোখের জলে ভিজিয়া গেল।

কিন্তু বেশীক্ষণ সে কাঁদিল না, অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রান্ত ও নিস্তেজ হইয়া থামিয়া গেল। মনে হইল, একটু ঘুমাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিত। খোকার পাশে শুইয়া খোকার শীর্ণ তপ্ত দেহটি বুকে জড়াইয়া খানিকক্ষণের জন্য চোখ বুঝিবার লোভ ইন্দুকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বরের খাওয়া বোধ হয় এতক্ষণে হইয়া গিয়াছে, আঁচাইয়া পান মুখে দিতে তাহার যতটুকু সময় লাগিবে ঠিক ততটুকু সময় ইন্দু তাহার ছোট ভাইটির বিছানায় একটু শুইতে চায় আজ।

বিদায় সত্যই সমারোহের ব্যাপার।

কয়েকটি অনুষ্ঠান আছে। সুন্দর কয়েকটি মেয়েলি আচার [illegible] পালন করিতে হয়। প্রণামের ঘটাও কম নয়। উচ্চারিত অনুচ্চারিত 'আশীর্ব্বচন লিপিবদ্ধ করিলে একখানি চটি বই হয়।

প্রতিবেশিনীদের মন্তব্যগুলি (পরস্পরের প্রতি ফিস্ ফিস্ করিয়া কিন্তু বরকনে এবং অন্যান্য অনেকেরই সুশ্রাব্য স্বরে) চটি বইয়ে কুলায় না।

ইহাদের মধ্যে বয়স্করা স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারেন তিনটি ছেলে মেয়ে কোলে লইয়াও শ্বশুরবাড়ি আসিতে তাঁহারা কত কাঁদিয়াছিলেন, যাহারা ছোট শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় খুব একচোট কাঁদিবার ভরসা তাহারা রাখে। ইন্দু যে কাঁদিল না, ইহাদের সকলের কাছেই তাই তাহা অসহ ঠেকিল। শব্দ করিয়া না কাঁদুক ঘন ঘন চোখও কি মুছিতে পারে না মেয়েটা?

'দেখ্‌লে রাঙামাসী? মেয়ে ধাড়ি ক'রে বিয়ে দেবার ফলটা একবার দেখলে? বর পেয়ে বর্ত্তেছেন! এক ফোঁটা জল নেই গা মেয়ের চোখে?'

প্রতিবাদ করে ক্ষেন্তি।

'রাঙামাসী আবার কি দেখ্‌বে কালো পিসি? ওর চোখ দুটোর দিকে তুমিই চেয়ে ছ্যাখো। সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে চোখ যে ওর জবাফুল হয়ে আছে এতো কাণাও দেখতে পায়।'

কালো পিসি মুখ কালো করিয়া বলেন, 'কি জানি বাছা, কেঁদে না রাত জেগে চোখ জবাফুল হয়েছে—আজ-কালকার মেয়ে তোরাই ও-সব ভাল বুঝিস্!'

মুখ মুছিবার ছলে হরেন হাসি গোপন কর।

অথচ যে চোখ দুটির জবাফুল হওয়া নিয়া এই কৌতুক তাহা ঘোমটার আড়ালে গোপন হইয়াই থাকে, সে চোখে জল না কাজল ঘোমটা না তুলিলে তাহা আর নজরে পড়ে না। তা এই পুরানো মুখে ঘোমটাই এখানে দ্রষ্টব্য, ঘোমটা তুলিবার কৌতূহল ইহাদের কম। স্বামিগৃহে পা দিবামাত্র সেখানকার আবাল-বৃদ্ধবনিতার মধ্যে যে কৌতূহলের প্রাচুর্য্য ইন্দুর মুখখানিতে মুহুর্মুহু সিঁদুর ছড়াইয়া দিতে থাকিবে।

রওনা হওয়ার সময় হইয়া আসে, কিন্তু বিদায় দিয়াও বিদায় দেওয়া হয় না, বরকর্ত্তা তাগিদ দিতে দিতে উষ্ণ হইয়া ওঠেন, চারিদিক হইতে 'এই হ'ল' 'এই হ'ল'

রব উঠিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করে, কনের বাবা ঠেঙানো জন্তুর মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ক্রমাগত হাত কচলান, ওদিকে দিদির সঙ্গে যাওয়ার বায়না নিয়া খোকার কান্না আর থামে না।

ইন্দুর ইচ্ছা হয় এই অসহ্য অত্যাচারের হাত এড়াইতে ছুটিয়া পাল্কীতে উঠিয়া পড়ে। বেদনার এ বিরাট ভূমিকা কেন? থাকিবার যখন উপায় নাই তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল। উঠানে দাঁড়াইয়া না থাকা না যাওয়ার যন্ত্রণটা এমন সমারোহের সহিত ভোগ না করিলে কি নয়?

দাঁড়াইয়া থাকিতে ইন্দুর কষ্ট হয়। সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিতেছে।

অঙ্গন-লগ্ন ছায়াটিই ইন্দু দেখিতে পাইতেছে, তাহাও ঘোমটার ভিতর দিয়া কয়েক হাত পরিধির মধ্যেব অংশটুকু, কিন্তু মাথার উপরে যে প্রকাণ্ড আমগাছটি চাঁদোয়ার মত নিজেকে ডালপালায় ছড়াইয়া দিয়াছে তার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া মুকুলের সমারোহ সে স্পষ্ট কল্পনা করিতে পারে। আষাঢ়ের শেষাশেষি এ গাছের ফল পাকিবে—খাইয়া শেষ করা যায় না এত ফল। কে জানে সে তখন থাকিবে কোথায়?

খোকা কাঁদিতেছে, খুব আস্তে কাঁদিতেছে, পায়ের নীচের ঘন ছায়া কেমন গাঢ় নীল হইয়া উঠিল, ঘোমটার প্রান্ত হইতে একটা ধোঁয়াটে কুয়াসা উঠান পর্য্যন্ত নামিয়া যাইতেছে,—তবু খোকা কাঁদিতেছে, অনেক দূরে, তাল-শিমুলীর চেয়ে অনেক দূরে ঝিঁঝির ডাকের মত কেমন ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া খোকা কাঁদিতেছে, শুনিতে শুনিতে ইন্দুর মাথার মধ্যে একটা দুর্ব্বোধ্য ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দ আরম্ভ হইল এবং পর মুহূর্ত্তে সমস্ত উঠানটা বার কয়েক দুলিয়া শব্দহীন অন্ধকারে তলাইয়া গেল।

দুই হাত বাড়াইয়া উঠানটা ধরিতে গিয়া সে উঠানেই টলিয়া পড়িয়া গেল।

হরেনই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, কিন্তু ধরিয়া রাখিল না। আস্তে আস্তে উঠানে নামাইয়া দিয়া বাকী কর্ত্তব্যের ভার অন্য সকলের উপর ছাড়িয়া দিয়া সে চারিদিকে ভারি চেঁচামেচি আরম্ভ হইল। কি হইল এবং যা হইল তা কেমন করিয়া হইল জানিতে চাহিয়া, জল ও পাখার দাবি জানাইয়া সকলে বিষম হট্টগোল বাধাইয়া দিল, ভূলুণ্ঠিতা কন্যার মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া মা বার বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, মেয়েরা একবাক্যে হা-হুতাশ করিল।

তারপর জল আসিল, পাখা আসিল, ইন্দুর সীঁথির আল্‌গা সিঁদুর জলে ধুইয়া গেল, তাহার রাঙা চেলিতে উঠানের কাদা লাগিল এবং প্রায় চার মিনিট সময় সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত বিহ্বল ও উত্তেজিত করিয়া রাখিয়া ইন্দু চোখ মেলিয়া তাকাইল। চারিদিকে চাহিয়া সে বলপ্রয়োগে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মার দৃঢ় আলিঙ্গন ছাড়াইতে পারিল না।

মা বলিলেন, 'শুয়ে থাক্ মা, শুয়ে থাক্;—ও শ্রীহরি ও মধুসূদন, একি বিপদ ঘটালে!'

যাত্রা আধঘণ্টা খানিক পিছাইয়া গেল।

ইন্দুর আকস্মিক মূর্চ্ছার কারণ সম্বন্ধে গবেষণা হইল প্রচুর। উপবাস, দুর্ব্বলতা, মনোকষ্ট, গ্রীষ্মাতিশয্য এবং 'ঢংলো ঢং, ঢং করে মেয়ে মূর্চ্ছো গেলেন এ আর বুঝি না,' এই অনুমান কয়টিই প্রাধান্য পাইল বেশী। অবশেষে সাব্যস্ত হইল যে, দুর্ব্বলতা নয়, অমন স্বাস্থ্যবতী মেয়ের আবার দুর্ব্বলতা কিসের, গরমটাই আসল কারণ। সহজ গরমটা পড়িয়াছে আজ? বসিয়া থাকিতে থাকিতেই লোকেব ভির্মি লাগিবার উপক্রম হয়।

ছেলের বাবা কিন্তু গরমের অপরাধটা মানিয়া লইয়া মেয়ের বাবাকে অত সহজে রেহাই দিলেন না। বলিলেন, 'একি কাণ্ড মশাই? ফাঁকি দিয়ে একটা মৃগী রোগীকে ঘাড়ে চাপালেন?'

ইন্দুর বাবা ভয়ে ভয়ে বলিলেন, 'আজ্ঞে মৃগী রোগী নয়, জীবনে আর কখনও ওর ফিট হয়নি। আজ গরমে—'

গরম! কিসের গরম! গরম বলিয়াই ফিট হইবে না কি?—বলি, গরম লাগল কি একা আপনার মেয়ের? কই, এই ত এতগুলি মানুষ আছে এখানে আর কারো

পাত্রপক্ষের জনৈক মাতব্বর যোগ দিলেন 'বেহায়া মশায় বলুন, দাদা। বাবা, এ যে দিনে ডাকাতি!'

এ সমস্তের আর জবাব কি, ক্রুদ্ধ বৈবাহিকের সামনে বিপাকে-পড়া নৌকার মত ইন্দুর বাবা টল্‌মল্‌ করিতে লাগিলেন, তাঁর বংশ মৃগীরোগীর বংশ নয়, শুধু এই অস্বীকৃতির হালে কোন মতে সামলান গেল না। রফা হইল তিন-শ টাকায়। বরের বাবা পাষণ্ড নন, মূর্চ্ছার ব্যারাম আছে বলিয়াই পুত্রবধূকে তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন না, চিকিৎসা করিয়া বউকে তিনি আরাম করিবেন। মেয়ের চিকিৎসার খরচ মেয়ের বাবা যৎকিঞ্চিৎ আগাম দিবেন ইহা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়।

তা নিশ্চয় নয়, কিন্তু সঙ্গতি? মুখর জনতার মধ্যে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইন্দুর বাবা ভাবিতে লাগিলেন যে, মেয়ের শুভবিবাহে শুভ যে কাহার হইল তাহাই ভাবনার বিষয়।

উত্তেজিত বেদনায় হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়ার সময় চার মিনিট তাহাকে ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া রাখার জন্য ভাগ্য-ডাক্তারকে যে তিনশ' টাকা ঘুষ দিতে হইয়াছে ইন্দু তাহা জানিতে পারল না। জানাইয়া যাহারা দিত মেয়েকে এক প্রকার কোলে করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত মা তাহাদের সংযত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মর্ম্মবেদনার ব্যূহ ভেদ করিয়া আর কেহ ইন্দুর নাগাল পায় নাই।

পাল্কীর মধ্যে হরেনের সান্নিধ্যে মূর্চ্ছার জন্য ইন্দু তাই কেবল লজ্জাতেই মরিয়া যাইতেছিল,—বাধ্য হইয়া একটু একটু চেনা বরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইবার মধুর লজ্জা।

পাল্কী তখন আটজন বেহারার কাঁধে রাইঘোষানীর মাঠ ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। অন্য পাল্কী চারখানা পিছাইয়া পড়িয়াছিল, হরেন পাল্কীর দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, 'ঘামে সেদ্ধ হওয়ার চেয়ে এ গরম বাতাসও ভাল। কি বল?'

ইন্দু কিছুই বলিল না, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। বাধা দিয়া হরেন বলিল, 'না না, উঠো না, শুয়ে থাক।' ইন্দু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, 'আপনার কষ্ট হচ্ছে।'

একদিকে তরুলতাহীন প্রান্তর, অন্যদিকে গ্রাম ও ক্ষেত খামার, ইহারই মধ্য দিয়া অসময়ের যাত্রী দুটি এমনি ভাবে সর্ব্বপ্রথম পরস্পরের সুখসুবিধার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল। পাল্কী বেহারাদের পায়ে পায়ে যে ধূলা উঠিল, রাইঘোষানীর মাঠের বাতাস তাহা কোন্‌দিকে উড়াইয়া দিতে লাগিল তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না।

খানিক পরে পাল্কী সাতগাঁয়ে প্রবেশ করিল।

হরেন জিজ্ঞাসা করিল এ গাঁয়ের নাম জান, ইন্দু? আসবার সময় শুনেছিলাম, ভুলে গেছি?

পাল্কীর কোণে জড়সড় ইন্দু জবাব দিল, 'সাতগাঁ।'

গ্রামটিকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য হরেন পাল্কীর বাহিরে মুখ বাড়াইল। দেখিল, একটা ময়রার দোকানের পরে পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলে একটি কালো ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একখানা বই। বকুল গাছের ছায়ায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে পাল্কীর শব্দ শুনিয়া ছেলেটি কৌতূহলবশে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, হরেন এইরূপ অনুমান করিল।

তারপর আরও কত গ্রাম, কত মাঠ পার হইয়া সন্ধ্যার একটু আগে পাল্কী ষ্টীমার ঘাটে পৌছিল। ষ্টীমার তখন সবে আসিয়া নোঙর ফেলিয়াছে। নদীর অপর তীরে একটি চিতা প্রায় নিবিয়া আসিতেছিল। আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া হরেন বলিল, পথে চিতা দেখলে শুভ হয়। তোমায় আমায় খুব মনের মিল হবে, হবে না?

যেন পথে চিতা না দেখিলে তাহাদের মনের মিল হইতে বাকী থাকিত!

ছন্দোবিশ্লেষ

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

(১)

ছন্দের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে যতি ও পর্ব্বের ব্যবহার-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ইংরেজি ছন্দের প্রতিপংক্তিতে এবং সংস্কৃত ছন্দের প্রতি-পদে যতি থাকতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই ; এরকম পংক্তি বা পদ যদি হ্রস্ব হয় তবে তা যতিহীন হয়। কিন্তু দীর্ঘ পংক্তি বা পদে এক বা একাধিক মধ্য-যতি অর্থাৎ ছেদ-যতি থাকাই বিধি। পংক্তি-প্রান্তিক যতি অবশ্য দীর্ঘ হ্রস্ব সকল প্রকার পংক্তি বা পদেই থাকবে। বাংলা ছন্দেও পংক্তিমধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধ-যতিটি থাকা অবশ্যম্ভাবী নয়। যদি এক পংক্তিতে দুয়ের অধিক পর্ব্ব থাকে তবে দ্বিতীয় পর্ব্বের পর অর্দ্ধ-যতি থাকে ; যদি পংক্তিতে দুটি মাত্র পর্ব্ব থাকে তবে তাদের মধ্যে একটি ঈষদ্-যতি থাকে এবং পংক্তি-প্রান্তে থাকে পূর্ণ-যতি, অর্দ্ধ-যতি কোথাও থাকে না, আর যদি পংক্তিতে একটি মাত্র পর্ব্ব থাকে তবে ঈষদ্-যতি ও অর্দ্ধ-যতি থাকে না, একেবারে প্রান্তিক পূর্ণ যতি থাকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) গগন-তলে
আগুন জ্বলে |
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা।
—পাল্কীর গান, কুহু ও কেকা, সত্যেন্দ্রনাথ

(২) পক্ষ-চিলের | সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে | মেঘ্ চলেছে!
—ঐ

(৩) মিথ্যে তুমি | গাঁথলে মালা ॥
নবীন ফুলে,
ভেবেছ কি | কণ্ঠে আমার ॥
দেবে তুলে?
—উৎসৃষ্ট, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

প্রথম দৃষ্টান্তটি একপর্ব্বিক, তাই ওতে ঈষদ-যতি বা অর্দ্ধ-যতি নেই। দ্বিতীয়টি দ্বিপর্ব্বিক ; তাই পংক্তিমধ্যে একটি ক'রে ঈষদ-যতি রয়েছে, কিন্তু অর্দ্ধ-যতি নেই। তৃতীয়টি ত্রিপর্ব্বিক ; এখানে প্রথম পর্ব্বের পরে ঈষদ্-যতি ও দ্বিতীয় পর্ব্বের পরে অর্দ্ধ-যতি রয়েছে। প্রত্যেক দৃষ্টান্তেই পংক্তি-প্রান্তে পূর্ণ-যতি রয়েছে।

বাংলা ছন্দের প্রতি পংক্তিতে একটি, দুটি বা তিনটি অর্দ্ধ-যতি থাকতে পারে। যে-সব পংক্তিতে একটি অর্দ্ধ-যতি থাকে তাকেই দ্বিপদী বা পয়ার বলা হ'য়ে থাকে। দুটি অর্দ্ধ-যতি-ওয়ালা পংক্তিকে ত্রিপদী আর তিনটি অর্দ্ধ-যতি-ওয়ালা পংক্তিকে চৌপদী বলা হয়। দ্বিপদী (বা পয়ার), ত্রিপদী ও চৌপদীর দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। বাংলা ছন্দ-পংক্তিতে তিনের অধিক অর্দ্ধ-যতি থাকতে পারে না, অর্থাৎ বাংলায় বহুপদী পংক্তি রচনা করা যায় না। হেমচন্দ্র বহুপদী পংক্তি রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস সফল হয়েছে একথা বলা যায় না।

ইংরেজি ছন্দের ছেদ-যতি (caesura) পর্ব্বের প্রান্তে বা মধ্যে স্থাপিত হ'তে পারে। বাংলায় কিন্তু অর্দ্ধ-যতি সর্ব্বদাই পর্ব্বের প্রান্তে স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ছন্দেই ঈষদ্-যতিটি শব্দের মধ্যেও স্থাপিত হ'তে পারে অর্থাৎ উভয় ছন্দেই শব্দের মধ্যেই পর্ব্ব বিভক্ত হ'তে পারে। বাংলার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) বিচ্ছেদ ও সু- | দীর্ঘ হ'তো, ॥
অশ্রুজলের | নদীর মতো ॥
মন্দগতি | চল্‌তো রচি' ॥
দীর্ঘ করুণ | গাথা।
—সেকাল, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) কীর্ত্তিকে কেউ | ভালো বলে, ॥ মন্দ বলে | কেহ,
বিশ্বাসে কেউ | কাছে আসে, ॥ কেউ করে সন্- | দেহ।
—আশা, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'সুদীর্ঘ' ও 'সন্দেহ' কথা দুটিতে শব্দের মধ্যেই

পর্ব্ববিভাগ ঘটেছে অর্থাৎ ঈষদ্-যতি স্থাপিত হয়েছে। আমাদের প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যে এ-ভাবে শব্দের মধ্যে পর্ব্ব-বিভাগের প্রচলন খুব বেশি ছিল। যাহোক, বাংলায় শব্দের মধ্যে পর্ব্ববিভাগ করার অর্থাৎ ঈষদ্-যতি স্থাপিত করার ব্যবস্থা থাক্‌লেও শব্দের মধ্যে পদ-বিভাগ করার অর্থাৎ অর্দ্ধ-যতি স্থাপন করার ব্যবস্থা নেই। সংস্কৃত ছন্দে কিন্তু অবস্থা বিশেষে শব্দের মধ্যেও ছেদ-যতি স্থাপিত হ'তে পারে।

বাংলা ছন্দের ঈষদ্-যতির আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, কবি ইচ্ছে কর্‌লে এটিকে স্পষ্টতর ক'রে অর্দ্ধ-যতিতে পরিণত কর্‌তে পারেন। কিন্তু এই স্পষ্টতাকে অর্থাৎ ঈষদ্-যতির এই পদোন্নতিটিকে কানের কাছে প্রকটিত করার উদ্দেশ্যে একটি ক'রে অধিকতর মিল দিতে হয়। কারণ কানের সম্মতি না পেলে ধ্বনির গতি কিংবা যতি সমস্তই ব্যর্থ হয়। দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বিশদ হবে।—

(১) কোথায় গেছে | সেদিন আজি | যেদিন মম
তরুণ কালে | জীবন ছিল | মুকুল-সম ;
সকল শোভা | সকল মধু | গন্ধ যত
বক্ষোমাঝে | বন্ধ ছিল | বন্দী মতো।
—উৎসৃষ্ট, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) তোমার তরে | সবাই মোরে | কর্‌ছে দোষী,
হে প্রেয়সী !
বল্‌ছে—কবি | তোমার ছবি | আঁক্‌ছে গানে,
প্রণয়-গীতি | গাচ্ছে নিতি | তোমার কানে ;
নেশার মেতে | ছন্দে গেঁথে | তুচ্ছ কথা
ঢাক্‌ছে শেষে | বাংলা দেশে | উচ্চ কথা।
—ক্ষতিপূরণ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এ দুটিই স্বরবৃত্ত ত্রিপর্ব্বিক ছন্দ। কিন্তু প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির পর্ব্ববিভাগগুলিকে তথা ছেদ-যতিগুলিকে স্পষ্টতর করা কবির অভিপ্রায়। তাই দ্বিতীয়টিতে পর্ব্বে-পর্ব্বে একটি অধিক মিলের সমাবেশ হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এটি একপর্ব্বিক ত্রিপদীর ভঙ্গীতেই রচিত হয়েছে। ইংরেজীতে যাকে line-rhyme বলা হয়, এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের মিলগুলি ঠিক সে প্রকৃতির নয়। আমাদের ত্রিপদী ছন্দোবন্ধে যে রকম মিলের ব্যবস্থা আছে, এ মিলগুলি সেই প্রকৃতির। অর্থাৎ এ দৃষ্টান্তটির আসল রূপ হচ্ছে এই।—

তোমার তরে সবাই মোরে
কর্‌ছে দোষী,
হে প্রেয়সী !
বল্‌ছে—কবি তোমার ছবি
আঁক্‌ছে গানে,
প্রণয়-গীতি গাচ্ছে নিতি
তোমার কানে।

উপরের দৃষ্টান্ত-দুটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এ ছন্দের পর্ব্ববিভাগগুলি সর্ব্বদাই খুব স্পষ্ট থাকে ; তাই ঈষদ্-যতির স্থায়িত্বের তারতম্য খুব বেশি হ'তে পারে না। কিন্তু যৌগিক ছন্দে ঈষদ্-যতিটিকে অস্পষ্টও রাখা যায়, আবার খুব স্পষ্ট ক'রেও তোলা যায়।—

বেণীবন্ধ | তরঙ্গিত ॥ কোন্ ছন্দ | নিয়া,
স্বর্গ-বীণা | গুঞ্জরিছে ॥ তাই সন্ধ্যা- | নিয়া।
—'পরিচয়', মাঘ (১৩৩৮), রবীন্দ্রনাথ

এটি চোদ্দ ব্যষ্টির যৌগিক পয়ার। এটির প্রতি-পংক্তিতে প্রথম ও তৃতীয় পর্ব্বের পর ঈষদ্-যতি এবং দ্বিতীয় পর্ব্বের পরে অর্দ্ধ-যতি রয়েছে। প্রথম ঈষদ্-যতিটিকে যদি আরও স্পষ্ট ক'রে তুলে অর্দ্ধ-যতিতে পরিণত করা যায় তাহ'লে এটির কি রূপ হবে দেখা যাক।—

দেখ দ্বিজ ॥ মনসিজ ॥ জিনিয়া মূ- | রতি,
পদ্মপত্র ॥ যুগ্মনেত্র ॥ পরশয়ে | শ্রুতি।
অনুপম ॥ তনুশ্যাম ॥ নীলোৎপল | আভা,
মুখরুচি ॥ কত শুচি ॥ করিয়াছে | শোভা।
—মহাভারত, কাশীরামদাস

এখানে প্রথম ঈষদ্-যতিটি অর্দ্ধ-যতিতে এবং প্রথম পর্ব্ব দুটি দুটি পদে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ ছন্দটিকে ত্রিপদী পয়ার বল্‌তে পারি। এ ছন্দের প্রাচীন নাম হচ্ছে 'তরল পয়ার।' যদি এ ছন্দের তৃতীয় পর্ব্বের পরবর্ত্তী ঈষদ্-যতিটিকেও অর্দ্ধ-যতির শ্রেণীতে প্রোমোশন দেওয়া যায় তা হ'লে এ ছন্দের আকৃতি হবে এরূপ।—

কি রূপসী, ॥ অঙ্গে বসি, ॥ অঙ্গ খসি ॥ পড়ে।
প্রাণ দহে, ॥ কত সহে, ॥ নাহি রহে ॥ ধড়ে॥
—বিদ্যাসুন্দর, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

এটিকে বল্‌তে পারি চৌপদী পয়ার। এ ছন্দের প্রাচীন নাম হচ্ছে 'মালঝাঁপ'। পাঠক হয় ত লক্ষ্য ক'রে থাকবেন পয়ারের অন্তর্গত ঈষদ্-যতিগুলিকে যতই স্পষ্ট ক'রে তোলা হচ্ছে ধ্বনির গতিবেগ ততই খরতর

হচ্ছে। এর কারণটি হচ্ছে এই। যৌগিক পয়ারে ধ্বনির সাধারণ গতিক্রম হচ্ছে খুব দীর্ঘ, তাই তার তাল এবং লয় খুব বিলম্বিত। কিন্তু যদি এ ছন্দের ঈষদ্-যতিগুলিকে অর্থাৎ পদের ছেদগুলিকে স্পষ্ট ক'রে তোলা যায় তা হ'লে ধ্বনির গতিক্রম হ্রস্ব হয়ে পড়ে, তাই তার তাল এবং লয়টাও খুব দ্রুত হয়। সুতরাং যৌগিক পয়ারের ধ্বনিকে যদি গাম্ভীর্য্য ও ধীরগতি দান করতে হয় তাহ'লে তার ঈষদ্-যতি ও পর্ব্ব-বিভাগগুলিকে খুব অস্পষ্ট কিংবা বিলুপ্ত ক'রে দিতে হয়।

যৌগিক অর্থাৎ তথাকথিত 'অক্ষর'বৃত্ত ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, এ ছন্দে অতি সহজেই পর্ব্ব-বিভাজক ঈষদ্-যতিগুলিকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে দুটি পর্ব্বকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া যায়। এই তত্ত্বটির উপরেই যৌগিক ছন্দের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং এ তত্ত্বটিকে ভাল ক'রে বোঝা দরকার।

যৌগিক ছন্দে, বিশেষত পয়ারে, ধ্বনিবিন্যাসের স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দুই মাত্রার লয় তার একমাত্র কারণ নয়। পয়ারের পদগুলিতে তার ধ্বনি-বিভাগের বৈচিত্র্য একটা মস্ত কথা। * * * এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকাতেই প্রয়োজন হ'লে সে পদ্য হ'লেও গদ্যের অবন্ধগতি অনেকটা অনুকরণ করতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের এ-কথা খুবই সত্য। যৌগিক ছন্দের এই ছেদ-বৈচিত্র্যের হেতু কি, তার সন্ধান করা প্রয়োজন। যৌগিক ছন্দের গদ্যপ্রকৃতি ও ছন্দের একটা মস্ত কথা। এই গদ্যপ্রকৃতির ফলে ও ছন্দের ধ্বনিগত ব্যবহারে লক্ষ্য করার মত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এ ছন্দের প্রত্যেকটি শব্দ (word) সর্ব্বদাই পরবর্ত্তী শব্দ থেকে নিজের পার্থক্য রক্ষা ক'রে চলে; স্বরবৃত্ত ছন্দের মত দুটি পৃথক্ শব্দ কখনও পরস্পর সংলগ্ন হ'য়ে যায় না। শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণই সে শব্দটিকে পরবর্ত্তী শব্দ থেকে পৃথক্ ক'রে রাখে। দ্বিতীয়ত, যৌগিক ছন্দের উচ্চারণের গদ্য-প্রকৃতি রক্ষার জন্যে ও ছন্দে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ গদ্য-প্রথায় প্রায় সর্ব্বদাই সংশ্লিষ্ট, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ভঙ্গীতে বিশ্লিষ্ট হয় না। সুতরাং দেখা গেল যৌগিক ছন্দের প্রত্যেকটি শব্দই গদ্যের ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়। যৌগিক ছন্দের এই গদ্য-প্রকৃতি রক্ষার তৃতীয় প্রণালী হচ্ছে শব্দের মধ্যে যতিস্থাপন-বিমুখতা। আমরা পূর্ব্বে দেখেছি স্বরবৃত্ত ছন্দে শব্দের মধ্যে অতি-সহজেই পর্ব্ববিভাগ অর্থাৎ ঈষদ্-যতিস্থাপন চলতে পারে। কিন্তু যৌগিক ছন্দে এমনটি হবার জো নেই। অথচ যৌগিক ছন্দেও স্বরবৃত্তের ন্যায় প্রতি পর্ব্বের পরিমাণ হচ্ছে চার ব্যষ্টি। সুতরাং যদি এমন হয় যে চার ব্যষ্টির একটি পর্ব্ব বিভাগ করতে হ'লে কোনো একটি শব্দের মধ্যেই ঈষদ্-যতি বা ছেদ স্থাপন করতে হয়, তাহ'লে ওই ঈষদ্-যতিটিকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে দুটি পর্ব্বকে একত্র জুড়ে একটি জোড়া-পর্ব্ব অর্থাৎ যুক্তপর্ব্ব গঠিত করতে হবে। কিন্তু যৌগিক ছন্দেও পংক্তিমধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধ-যতিটি কখনও বিলুপ্ত হয় না। দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি সহজবোধ্য হবে।—

"সুরাঙ্গনা | নন্দনের ‖ নিকুঞ্জ প্রা- | ঙ্গণে
মন্দার ম- | ঞ্জরী তোলে ‖ চঞ্চল ক- | ঙ্কণে।
বেণীবন্ধ | তরঙ্গিত ‖ কোন্ ছন্দ | নিয়া,
স্বর্গবীণা | গুঞ্জরিছে ‖ তাই সন্ধা- | নিয়া।"

এ দৃষ্টান্তটির তৃতীয় পংক্তিতেই যৌগিক পয়ারের প্রকৃত রূপটি স্পষ্টভাবে আছে অর্থাৎ চার ব্যষ্টির তিনটি পূর্ণ-পর্ব্ব ও একটি অর্দ্ধ-পর্ব্ব এবং মধ্যবর্ত্তী ঈষদ্-যতিগুলি সুব্যক্ত রয়েছে। প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় ঈষদ্-যতিটি শব্দের মধ্যে পড়েছে, এ রকম শব্দমধ্যবর্ত্তী ঈষদ্-যতি যৌগিক ছন্দের প্রকৃতিবিরোধী; তাই এ ছন্দে ওই ঈষদ্-যতিটিকে অস্বীকার ক'রে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্বটিকে একটি যতি-বিহীন যুক্তপর্ব্ব বলেই গণ্য করা সঙ্গত। উপরের দৃষ্টান্তটির দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম-দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-চতুর্থ পর্ব্বকেও তেমনি যতি-হীন যুক্তপর্ব্ব বলেই ধরা উচিত। দুটি পূর্ণ-পর্ব্ব যুক্ত হ'লে তাকে 'পূর্ণ যুক্তপর্ব্ব' বা শুধু **'যুক্তপর্ব্ব'** বলব; আর, একটি পূর্ণ-পর্ব্ব ও একটি অর্দ্ধ-পর্ব্বযুক্ত হ'লে তাকে 'খণ্ডিত যুক্ত-পর্ব্ব, বা **'সার্দ্ধপর্ব্ব'** বলা যাবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত বাংলা ছন্দে প্রায় সর্ব্বদাই দুটি পর্ব্বের পরেই অর্দ্ধ-যতি স্থাপিত হয় অর্থাৎ প্রায়শই দুই পর্ব্বে একটি পদ গঠিত হয়, বিশেষত যৌগিক ছন্দে। সুতরাং যৌগিক ছন্দের যুক্তপর্ব্ব আর পূর্ণপদ একই জিনিষ; আর সার্দ্ধ

পূর্ব্বকেও 'খণ্ডিত পদ' নামে অভিহিত করতে পারি। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তটির প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই। —

সুরাঙ্গনা | নন্দনের ॥ নিকুঞ্জ প্রাঙ্গণে
মন্দার মঞ্জরী তোলে ॥ চঞ্চল কঙ্কণে।
বেণীবন্ধ | তরঙ্গিত ॥ কোন্ ছন্দ | নিয়া,
স্বর্ণবীণা | গুঞ্জরিছে ॥ তাই সন্ধানিয়া।

অর্থাৎ এখানে প্রথম পংক্তির প্রথম পদে আছে দুটি পূর্ণ-পর্ব্ব আর দ্বিতীয় পদে একটি সার্দ্ধ-পর্ব্ব; দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম পদে একটি যুক্ত-পর্ব্ব, দ্বিতীয় পদে একটি সার্দ্ধ-পর্ব্ব; তৃতীয় পংক্তির প্রথম পদে দুটি পূর্ণ-পর্ব্ব, দ্বিতীয় পদে একটি পূর্ণ ও একটি অর্দ্ধ-পর্ব্ব; চতুর্থ পংক্তির প্রথম পদে দুটি পূর্ণ-পর্ব্ব, দ্বিতীয় পদে একটি সার্দ্ধ-পর্ব্ব।

প্রকৃতপক্ষে এই পূর্ণ, অর্দ্ধ, যুক্ত এবং সার্দ্ধ পর্ব্বের দ্বারাই সমস্ত যৌগিক ছন্দ অর্থাৎ যৌগিক পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রবহমান পয়ার, মুক্তক প্রভৃতি সমস্ত ছন্দোবন্ধই গঠিত হয়ে থাকে। যৌগিক ছন্দের রচনা প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখলেই এ-কথার সত্যতা বোঝা যাবে। (জয়ন্তী-উৎসর্গ, ৮২-৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং দেখা গেল যৌগিক পয়ারের আসল বা বিযুক্ত রূপ হচ্ছে ৪।৪॥৪।২; আর তার যুক্ত-রূপ হচ্ছে—৮॥৬। যৌগিক ছন্দের যুক্ত-পর্ব্ব এবং সার্দ্ধ-পর্ব্ব গঠন করার প্রণালীটাও দেখা দরকার। যুক্তপর্ব্ব গঠিত হ'তে পারে দু'রকমে; যথা—৩+৩+২=৮ অথবা ২+৪+২৮; তার মধ্যে প্রথম প্রণালীটাই সাধারণত বেশি চলে। আর সার্দ্ধ-পর্ব্ব গঠনের প্রণালীও দু'রকম; যথা—৩+৩=৬ অথবা ২+৪=৬; এক্ষেত্রেও প্রথম প্রণালীটাই বেশি প্রচলিত। সুতরাং যৌগিক পয়ারের যুক্ত-রূপের বিশ্লেষণ হচ্ছে এই—৩+৩+২॥৩+৩ অথবা ২+৪+২॥২+৪। যৌগিক পয়ারের আসল বা বিযুক্ত রূপের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

শীর্ণ শান্ত | সাধু তব ॥ পুত্রদের | ধ'রে
দাও সবে | গৃহ ছাড়া ॥ লক্ষ্মীছাড়া | ক'রে।
—বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

যৌগিক পয়ারের সাধারণ যুক্তরূপেরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। —

পড়েছে তোমার 'পরে ॥ প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্দ্ধেক মানবী তুমি ॥ অর্দ্ধেক কল্পনা।
—মানসী, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

আমি বলেছি যৌগিক ছন্দের বিযুক্ত পর্ব্বের গঠনবিধি হচ্ছে চার-চার; আর যুক্ত-পর্ব্ব গঠনের সাধারণ বিধি হচ্ছে তিন-তিন-দুই। দুই-তিন-তিন কিংবা তিন-দুই-তিন এই পর্য্যায়ে 'অক্ষর' অর্থাৎ ব্যষ্টি বিন্যাস করা সঙ্গত নয়, তাতে শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটে। তাই মধুসূদনের "বাড়ায় মাত্র আঁধার" কিংবা 'মাৎসর্য্য-বিষদশন' প্রভৃতি পদগুলি নির্দ্দোষ নয়। (জয়ন্তী-উৎসর্গ, ৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তার কারণ

বাড়ায় মা- | ত্র আঁধার

কিংবা

মাৎসর্য্য-বি- | ষ-দশন

এভাবে পর্ব্ববিভাগ করলে ঈষদ্-যতির উভয় পার্শ্বে একটি ক'রে ব্যষ্টি থাকে এবং তা কানে ভাল শোনায় না। এ নিয়মটি যে শুধু বাংলায়ই খাটে, তা নয়। ছন্দঃসূত্রের টীকাকার হলায়ুধও এ নিয়মের উল্লেখ করেছেন, "পূর্ব্বোত্তরভাগয়োরেকাক্ষরত্বে তু (পদমধ্যে) যতির্দুষ্যতি" এবং এই শব্দ মধ্যবর্ত্তী পর্ব্ববিভাগদোষের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই পংক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। —

এতস্যাগ | গুতলমমলং | গাহতে চন্দ্রকক্ষম্
(মন্দাক্রান্তা)

চোদ্দ ব্যষ্টির যৌগিক পয়ার সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হ'ল সে সব কথা সাধারণভাবে সমস্ত যৌগিক ছন্দ সম্বন্ধেই খাটে। দৃষ্টান্তযোগে তা এখানে দেখাবার প্রয়োজন নেই। শুধু আঠারো ব্যষ্টির যৌগিক পয়ারের বিশ্লেষণ-প্রণালীটা একটু দেখাব। এ ছন্দের আসল অর্থাৎ বিযুক্তরূপ হচ্ছে এ রকম—৪।৪॥৪।৪।২; আর এ ছন্দের যুক্তরূপটি হচ্ছে আসলে এ রকম—৮॥৪।৬; কিন্তু কখনও কখনও এটি ৮॥৬।৪ এ আকারও ধারণ করে। এই বর্দ্ধিত পয়ারে দ্বিতীয় পদে প্রথম পর্ব্বের পরে একটা ঈষৎ-ছেদ থাকলেই ছন্দের ধ্বনিটা একটু বেশি শ্রুতিমধুর হয়। এ ছন্দের যুক্তরূপের সাধারণ বিশ্লেষণ-প্রণালী হচ্ছে এই—৩+৩+২॥৪।৩+৩। চোদ্দ ব্যষ্টির যৌগিক পয়ারের অন্য বিশ্লেষণগুলিও এর পক্ষে খাটে। যা হোক, এই বর্দ্ধিত যৌগিক পয়ারের আসল বা বিযুক্তরূপের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। —

হিমাদ্রির | ধ্যানে যাহা ॥ স্তব্ধ হয়ে | ছিল রাত্রি | দিন
সপ্তর্ষির | দৃষ্টি তলে ॥ বাক্যহীন | স্তব্ধতায় | লীন।
—'পরিচয়', মাঘ (১৩৩৮), রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দেরই যুক্তরূপেরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ছিল যা প্রদীপ্ত রূপে ॥ নানা ছন্দে | বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ | তরঙ্গের ॥ কম্পনে হানিছে | শূন্যতল।

—সমুদ্র, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রথম পংক্তিটা এ ছন্দের আসল যুক্তরূপ এবং এটিই দ্বিতীয় প্রকার যুক্তরূপের চেয়ে ভাল শোনায়। এ ছন্দের দ্বিতীয় পদের চার-ছয় রূপটিই ছয়-চার রূপের চেয়ে অধিকতর শ্রুতিমধুর। একথা বলা অনাবশ্যক যে এই ছোট বা বড়ো পয়ারকে যখন প্রবহমান (enjambed) আকারে রচনা করা যায় তখন এর মধ্যে ঈষৎ, অর্দ্ধ বা পূর্ণ যতি স্থাপনের বহু বৈচিত্র্য ঘটে এবং ফলে পংক্তির অন্তরের গঠনের মধ্যেও নানা প্রকারভেদ দেখা দেয়। কিন্তু তথাপি ওই প্রবহমান অবস্থায়ও পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণ-প্রণালীগুলিই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী) প্রভৃতি চোদ্দ ব্যষ্টির স-মিল প্রবহমান (enjambed) পয়ার, 'এবার ফিরাও মোরে' (চিত্রা) প্রভৃতি আঠারো ব্যষ্টির স-মিল প্রবহমান পয়ার, 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি নাট্য কাব্যের চোদ্দ ব্যষ্টির অ-মিল প্রবহমান পয়ার, 'ছবি' ও 'শা-জাহান' (বলাকা) প্রভৃতি স-মিল মুক্তক, এবং 'নিস্ফল কামনা' (মানসী) নামক অ-মিল মুক্তক ইত্যাদি কবিতার রচনা-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করলেই একথার সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। আঠারো ব্যষ্টির অ-মিল প্রবহমান পয়ার এবং অ-মিল মুক্তকের দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধদেবের 'কোনো বন্ধুর প্রতি' ও 'শাপভ্রষ্ট' (বন্দীর বন্দনা) প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যায়।

(২)

যৌগিক অর্থাৎ 'অক্ষর'বৃত্ত ছন্দে পর্ব্বের বিযুক্ত রূপের চেয়ে যুক্তরূপের ব্যবহারই বেশি। এ ছন্দের ধ্বনির গাম্ভীর্য্য, ধীরবিলম্বিত গতিক্রম এবং গুরুগম্ভীর বিষয়ের বাহন হবার উপযোগিতা, এ তিনটি বিশেষ গুণের প্রধান কারণই হচ্ছে ওর পর্ব্বের যুক্তরূপ। যদি এ ছন্দকে লঘু ভাবের বাহন করার প্রয়োজন হয় তবে পর্ব্বগুলির যুক্তরূপের পরিবর্ত্তে বিযুক্তরূপের ব্যবহারের দ্বারা এর ধ্বনিটাকে লঘু এবং গতিটাকে দ্রুত করে নেবার প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ এ কথাটিকেই অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। "আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চার মাত্রায় ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো হয়। বস্তুত লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্য্যাদা" (সবুজপত্র-১৩২১, শ্রাবণ, পৃঃ ২২৮)। ভাবটা লঘু না হ'লেও এ ছন্দে বিযুক্ত পর্ব্বের ব্যবহার চলে; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শুধু বিযুক্তপর্ব্বের ব্যবহারে এ ছন্দের চাল খাটো হয়, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত "সুরাঙ্গনা নন্দনের" ইত্যাদি পংক্তিগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে।

যৌগিক ছন্দে বিযুক্ত পর্ব্বের চেয়ে যুক্তপর্ব্বের ব্যবহারই বেশি বটে; কিন্তু চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত এবং চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অর্থাৎ স্বরবৃত্ত পয়ার এবং মাত্রিক পয়ারে যুক্তপর্ব্বের চেয়ে বিযুক্ত পর্ব্বেরই ব্যবহার বেশি। চতুঃস্বর এবং চতুর্মাত্রিক ছন্দে যুক্তপর্ব্বের চাল অর্থাৎ "লম্বানিশ্বাসের মন্দগতি চাল"টা বেশি খাপ খায় না। এ জন্যেই এ দুটি ছন্দকে যৌগিক ছন্দের মত খুব গুরু-গম্ভীর চালের উপযোগী করা যায় না। এ কথা মাত্রাবৃত্তের চেয়েও স্বরবৃত্তের পক্ষে বেশি খাটে। স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবণতাই হচ্ছে চার-চার স্বরের পরে ঈষদ্-যতিকে আশ্রয় করে পর্ব্বে পর্ব্বে বিভক্ত হ'য়ে পড়ার প্রতি; যুক্ত পর্ব্বের চালে এ ছন্দের ধ্বনি যেন পীড়িত হয়। দৃষ্টান্ত—

কর গো হতশ্রী ধরায় ॥ রূপের পূজা | প্রবর্ত্তন—
কত যুগ আর | চলবে অলীক ॥ পরীর রূপের | শব-সাধন?

—কবর-ই-নুরজাহান, অভ্র-আবীর, সত্যেন্দ্রনাথ

বলা বাহুল্য এটি চতুঃস্বর চৌপর্ব্বিক ছন্দ। এখানে প্রথম পংক্তির প্রথম পদটি ছাড়া অন্য সর্ব্বত্রই পর্ব্ব-বিভাগ অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু ওই প্রথম পদটিতে 'হতশ্রী' শব্দের হ-য়ের পরে ঈষদ্-যতি অর্থাৎ পর্ব্ববিভাগের ছেদ থাকার কথা। যৌগিক ছন্দে এমন অবস্থায় ও-জায়গায় ঈষদ্-যতিটি বিলুপ্ত হ'য়ে যুক্ত পর্ব্বের সৃষ্টি হয় এবং তাতেই ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও পদমর্য্যাদা, কেন না; তাতেই ধ্বনি-গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাবও অব্যাহত থাকে। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে ওই জায়গায় ঈষদ্-যতি ও পর্ব্ববিভাগের ব্যবস্থা না করলে ধ্বনি পীড়িত হয়; আবার ওখানে পর্ব্ব-

বিভাগ করলে ভাবটা খণ্ডিত হ'য়ে যায়। ওই স্বরবৃত্ত পদটার এই সমস্যাটি লক্ষ্য করার বিষয়।

চতুর্মাত্রিক ছন্দে যুক্তপর্ব্বের চাল চতুর্ব্যষ্টিক যৌগিক ছন্দের চেয়ে কম সহ্য হ'লেও চতুঃস্বর স্বরবৃত্তের চেয়ে বেশি সহ্য হয়। চতুর্মাত্রিক ছন্দরচনার সময় তাই খুব বিবেচনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে যুক্ত ও অযুক্ত পর্ব্বের পরিবেশন করতে হয়। মোটের উপর এ ছন্দে যুক্ত পর্ব্বের চেয়ে অযুক্ত পর্ব্বেরই ব্যবহার বেশি, এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ললিত গমনা কে গো ॥ তরঙ্গ- | ভঙ্গা।
জয়তু যমুনা জয়; ॥ জয় জয় | গঙ্গা।
* * *
কালীয় নাগের কালো ॥ নির্ম্মোক | পরে কে।
হরজটা | ভুজগেরে ॥ ভুজতটে | ধরে কে।

—যুক্তবেণী, বেলাশেষের গান, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির প্রথম পদটি যুক্তপর্ব্বিক, কেন-না ঈষদ্-যতি ও পর্ব্ববিভাগ শব্দের মধ্যে পড়েছে। অন্য সবগুলি পদই বিযুক্ত-পর্ব্বিক।

চতুর্মাত্রিক ছন্দ প্রায় সর্ব্ববিষয়েই চতুর্ব্যষ্টিক যৌগিক ছন্দের অনুরূপ; যে-যে রকমের ধ্বনি-বিন্যাস যৌগিক ছন্দের প্রকৃতি-বিরোধী সেগুলি চতুর্মাত্রিক ছন্দেরও প্রকৃতি-বিরোধী। কেবল দুটি বিষয়ে এদের পার্থক্য লক্ষ্য করা উচিত। প্রথমত, চতুর্মাত্রিক ছন্দে শেষ পর্ব্বে অসমসংখ্যক মাত্রা বেশ ভাল শোনায়; উপরের দৃষ্টান্ত-টিতেই তার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু পনেরো ব্যষ্টির যৌগিক পয়ার নিতান্ত শ্রুতিকটু হবে। তেরো বা এগারো ব্যষ্টির খণ্ডিত পয়ারও ভাল শোনায় না, কিন্তু তেরো বা এগারো মাত্রার খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার খুব শ্রুতিমধুর হয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

গগনে গরজে মেঘ, ॥ ঘন বরষা।
কূলে একা | ব'সে আছি ॥ নাহি ভরসা।
* * *
শূন্য নদীর তীরে ॥ রহিনু পড়ি,'
যাহা ছিল | নিয়ে গেল ॥ সোনার তরী।

—সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

এটা চতুর্মাত্রিক অপূর্ণ চৌপর্ব্বিক ছন্দ; প্রতি পংক্তিতে তেরো মাত্রা (morae) আছে। প্রতি পংক্তির শেষ পদটি এবং প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির প্রথম পদটি যুক্ত-পর্ব্বিক। যদি তথাকথিত 'অক্ষর'বৃত্ত অর্থাৎ যৌগিক ছন্দে এটি রচিত হ'ত তাহ'লে তার শ্রুতিমাধুর্য্য রক্ষা করা সম্ভব হ'ত না। অর্থাৎ 'অক্ষর'-সংখ্যা ঠিক রেখে তেরো 'অক্ষরের' খণ্ডিত পয়ার ভালো শোনাতো না। এ দৃষ্টান্তটিতে যুগ্মধ্বনির বিরলতা লক্ষ্য করার বিষয়। যুগ্মধ্বনির বাহুল্যে এ ছন্দটি কেমন তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে দেখা যাক্।—

পথপাশে | মল্লিকা ॥ দাঁড়ালো আসি';
বাতাসে সু- | গন্ধের ॥ বাজালো বাঁশি।
* *
কিংশুক | কুঙ্কুমে ॥ বসিল সেজে,
ধরণীর | কিঙ্কিনী ॥ উঠিল বেজে |

—বরযাত্রা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

পূর্ব্বের দৃষ্টান্তটির মত এটিও তেরো মাত্রার খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার। এরকম তেরো ব্যষ্টির খণ্ডিত যৌগিক পয়ার রচনা করতে গেলেই দেখা যাবে তাতে ধ্বনির সমতা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব।

চতুর্ব্যষ্টিক যৌগিক ছন্দের সঙ্গে চতুর্মাত্রিক ছন্দের দ্বিতীয় পার্থক্য এই। যৌগিক ছন্দের পদ সাধারণত যুক্ত-পর্ব্বিক, বিযুক্ত-পর্ব্বিক পদ বিরলতর; আর মাত্রিক ছন্দের পদ সাধারণত বিযুক্ত-পর্ব্বিক, যুক্ত-পর্ব্বিক পদ বিরলতর। অর্থাৎ যৌগিক পয়ারের সাধারণ বিশ্লেষণ-রূপ হচ্ছে—৩+৩+২।।৩+৩; আর চতুর্মাত্রিক পয়ারের সাধারণ রূপ হচ্ছে—৪।৪।।৪।২। তাই যৌগিক পয়ারকে মাত্রিক পয়ারে রূপান্তরিত করতে হ'লে এই পার্থক্যটির প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

নিম্নে যমুনা বহে ॥ স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্দ্ধে পাষাণ তট, ॥ শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে ॥ পশি জলধার
ছল ছল করতালি ॥ দেয় অনিবার।

—নিষ্ফল উপহার, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ যৌগিক পয়ারকে মাত্রিক পয়ারে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাত্রিক পয়ারের চতুর্মাত্রপর্ব্বিক প্রকৃতিটির প্রতি লক্ষ্য না থাকাতে তিনি ওই মাত্রিক পয়ারে সন্তুষ্ট

হ'তে পারেন নি। তাই পরবর্ত্তীকালে তিনি এই মাত্রিক পয়ারটিকে যৌগিক আকার দিয়েছিলেন। যথা—

নিম্নে আবর্ত্তিয়া ছুটে॥ যমুনার জল।
দুই তীরে গিরিতট,॥ উচ্চ শিলাতল।
সংকীর্ণ গুহার পথে॥ মূর্চ্ছি জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে গর্জ্জি॥ উঠে অনিবার।

—নিষ্ফল কামনা, কথা ও কাহিনী

কিন্তু আমার মনে হয় এরূপ করার প্রয়োজন ছিল না। কেন-না, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের চতুর্মাত্র-পর্ব্বিক প্রকৃতিটির প্রতি লক্ষ্য রাখলে মাত্রিক পয়ারের ধ্বনিতেও একটা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আনা যায়। ওই 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটিতেই যে-সব স্থলে পর্ব্বগুলির চতুর্মাত্রিক আকার রক্ষিত হয়েছে সেখানে ধ্বনিমাধুর্য্য অব্যাহতই আছে। যথা—

বরষার। নির্ঝরে॥ অঙ্কিত। কায়
দুই তীরে। গিরিমালা॥ কতদূর। যায়!
* *
আগ্রহে। যেন তার॥ প্রাণ মন। কায়
একখানি। বাহু হ'য়ে॥ ধরিবারে। যায়!

—মানসী

"এলায়ে জটিল বক্র নির্ঝরের বেণী" (কথা ও কাহিনী), এই যৌগিক পংক্তিটিরও যেমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, "বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়" এই মাত্রিক পংক্তিটিরও তেমনি একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আমি কোনোটিকেই বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছুক নই। পয়ারের যৌগিক ও মাত্রিক এই দ্বিবিধ রূপের প্রতিই আমার কানের আকর্ষণ আছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি দ্বৌ কর্ত্তব্যৌ।—

পয়ারের সম্বন্ধে যা বলা হ'ল খণ্ডিত পয়ারের সম্বন্ধেও তা খাটে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

হেথা কেন। দাঁড়ায়েছো,। কবি,
যেন কাষ্ঠপুত্তল-। ছবি?
* *
শ্রান্তি লুকাতে চাও। ত্রাসে,
কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে। আসে।

—কবির প্রতি নিবেদন, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এটি হচ্ছে দশ মাত্রার খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার; চার মাত্রার একটি পর্ব্ব খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার রচনার চেষ্টা সফল হয়নি; এই পংক্তিগুলির ধ্বনি কানের দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে না। তার কারণ এই,—যে-সব স্থলে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার হয়েছে সেখানেই পর্ব্বগুলি যুক্ত-আকার ধারণ করেছে, অথচ এ ছন্দে যুক্ত-পর্ব্বের চেয়ে বিযুক্ত পর্ব্বেরই প্রাধান্য। "কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে" পদটিতে দুটি পর্ব্ব এমন ভাবে যুক্ত হয়েছে যে শব্দের মধ্যেও পর্ব্ববিভাগ করা সম্ভব নয়। "যেন কাষ্ঠ-পুত্তল" পদটিতে ধ্বনি সমাবেশ হচ্ছে দুই-তিন-তিন এই পর্য্যায়ে; অথচ যৌগিক বা মাত্রিক কোনো পয়ারেই এই পর্য্যায় স্বীকৃত হয় না। তাই পংক্তিক'টির ধ্বনি কানকে খুশি করতে পারছে না। কিন্তু যদি এই বাধাগুলিকে পরিহার করা যায় তবে বেশ সুন্দর খণ্ডিত মাত্রিক-পয়ার রচনা করা সম্ভব, একথা রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তীকালের রচনা থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। যথা—

সুন্দরী। ওগো শুক-। তারা
রাত্রি না। যেতে এসো। তূর্ণ।
স্বপ্নে যে। বাণী হ'লো। সারা
জাগরণে। ক'রো তারে। পূর্ণ।

—শুকতারা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

খণ্ডিত মাত্রিক পয়ারের ন্যায় পূর্ণ মাত্রিক পয়ারও পরবর্ত্তী কালেই রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিণতি লাভ করেছে। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'মানসী'র যুগেই কি ক'রে তার সূত্রপাত হয়েছিল তা আগেই দেখানো হয়েছে।—

আমি তব। জীবনের॥ লক্ষ্য তো। নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে,॥ হে চির-বিরহী;
* * *
মার্জ্জনা। করো যদি॥ পাবে তবে। বল,
করুণা করিলে নাহি॥ ঘোচে আঁখি জল।

—দায়-মোচন, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

এখানে যুক্তপর্ব্বিক পদ রয়েছে মাত্র দুটি। আর যে-সব স্থলে যুগ্মধ্বনি আছে সে-সব স্থলের পদগুলি বিযুক্ত আছে। তাই এই মাত্রিক পয়ারটির ধ্বনি কোথাও ব্যাহত হয়নি। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথের রচিত চতুর্মাত্রিক ছন্দের একটি অতি-সুন্দর নিদর্শন আছে। এখানে সেটি থেকেও কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।—

চম্পক | তরু মোরে ॥ প্রিয় সখা | জানে যে,
গন্ধের | ইঙ্গিতে ॥ কাছে তাই | টানে যে।
মধুকর- | বন্দিত ॥ নন্দিত | সহকার
মুকুলিত | নতশাখে ॥ মুখে চাহে | কহ কার ;
* * *
পুষ্প-চয়িনী বধূ ॥ কঙ্কণ- । কণিতা,
অকথিতা । বাণী তার ॥ কার সুরে । ধ্বনিতা ॥
—মাণ্ডের আশ্বাস

এটি হচ্ছে মাত্রাবৃত্ত চৌপর্ব্বিক বা দ্বিপদী ছন্দ। এই পংক্তিক'টির সবগুলি পদই বিযুক্ত-পর্ব্বিক ; কেবল পঞ্চম পংক্তির প্রথম পদটি যুক্তপর্ব্বিক।

মাত্রিক পয়ার বা দ্বিপদী সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হ'ল মাত্রিক ত্রিপদী সম্বন্ধেও সেগুলি অবিকল খাটে। এ স্থলে আমি আট মাত্রার দীর্ঘত্রিপদীর কথাই বলছি, ছ'মাত্রার লঘুত্রিপদীর কথা নয়। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—

তোমারে ঘেরিয়া ফেলি' ॥
কোথা সেই করে কেলি ॥
কল্পনা, মুক্ত-পবন ?
* * *
রহিয়া নূতন প্রাণ ॥
ঝরিয়া পড়ে না গান ॥
ঊর্দ্ধ নয়ন এ ভুবনে।
—কবির প্রতি নিবেদন, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে যৌগিক ত্রিপদীকে মাত্রিক আকারে রূপান্তরিত করার চেষ্টা রয়েছে। তাই মাত্রাবৃত্তের চতুর্মাত্র-পর্ব্বিক প্রকৃতিটির প্রতি লক্ষ্য দেখা যায় না ; যৌগিক ত্রিপদীর ভঙ্গীতেই সর্ব্বত্র যুক্ত-পর্ব্বিক পদের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এটা মাত্রাবৃত্তের প্রকৃতি-বিরোধী। সেজন্যেই এই পংক্তি-ক'টিতে মাত্রাবৃত্তের ঠিক্ ধ্বনিটি ধরা পড়েনি। এর ধ্বনিটা কানকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পারছে না। তাই রবীন্দ্রনাথ যৌগিক ত্রিপদীকে মাত্রিক আকৃতিতে রূপান্তরিত করার প্রয়াস ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যখন মাত্রাবৃত্তের বিযুক্ত-পর্ব্বিক প্রকৃতিটি তাঁর কাছে ধরা পড়্‌ল তখন তিনি মাত্রিক ত্রিপদী ছন্দে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করার স্থান এটা নয়। তাই এস্থলে শুধু দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত কর্‌ছি।

(১) ইঙ্গিতে সঙ্গীতে
নৃত্যের ভঙ্গীতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।
—বরযাত্রা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

(২) এনেছি বসন্তের
অঞ্জলি গন্ধের,
পলাশের কুঙ্কুম, চাঁদিনীর চন্দন।
* *
তব আঁখি-পল্লবে
দিনু আঁখি-বল্লভ
গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন।
—বধূমঙ্গল, প্রবাসী (ভাদ্র, ১৩৩১), রবীন্দ্রনাথ



ধ্রুবা

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চন্দ্রগুপ্ত যখন মথুরায়, তখন একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাটলিপুত্র নগরের পৌরসঙ্ঘের নায়ক জয়কেশী রাজমার্গের উপরিস্থিত একটি বৃহৎ তোরণের নিম্নে দাঁড়াইয়াছিলেন। সহসা এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ "এই যে," বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। জয়কেশী তাহাকে উঠাইয়া দেখিলেন যে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, সকলের অভাবে তুমি আজ নগরের ঠাকুর, তুমি আমার একটা উপায় কর, আমার জা'ত রক্ষা কর। চৌদ্দ বছরের মেয়েটাকে তিনটে গুণ্ডায় ধরে নিয়ে গেল, আর পাড়ার লোকে রাজার ভয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে। এখনও একটা উপায় কর, এখনও তার জা'ত আছে।"

জয়কেশী শুষ্কমুখে কহিল, "কি করব বলুন, যে দেশের যেমন রাজা। থাকতেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত, তাহ'লে একবার বুঝে নিতাম। গুণ্ডা ব'লে ধরতে গেলাম, সে রুখে উঠে রাজমুদ্রা দেখালে। মহাপ্রতীহারের কাছে গেলে শুন্‌তে পাওয়া যায় যে, হয় তিনি উদ্যানবিহারে, না-হয় প্রাসাদে, ছয় মাসের দণ্ডবিধান বাকি পড়ে আছে। ভদ্রিল আর রুচিপতি এমন সাবধান হয়েছে যে প্রাসাদে আর নাগরিকদের ঢুকবার উপায় নেই।"

"এখনও সময় আছে, এখনও জা'ত যায় নি।"

"উপায় করব কাকে দিয়ে, দেশে কি আর মানুষ আছে? যে কয়জন মায়ের বেটা ছিল, প্রয়োজন হ'লে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারত, 'রাজা তুমি অত্যাচারী,' সে কয়জন ত কুমার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মথুরায় গিয়েছে।"

"তবে আমার মেয়েটির কি হবে?"

"বার-বার তিনবার হ'ল ভদ্র, আর ব'লো না, বললে পাগল হয়ে যাব। তুমি কি মনে করছ যে আমাদের ঘরে মাতা, ভগিনী, কন্যা নেই? তুমি কি ভাবছ যে পাটলিপুত্রে কেবল তোমার উপরেই অত্যাচার হচ্ছে? মহানগরে লক্ষ লক্ষ নাগরিক আছে, পৌরসঙ্ঘের ভাণ্ডারে কোটি কোটি স্বর্ণ আছে, অন্নবস্ত্রের অভাব নেই, নেই কেবল একটা মানুষ। ভদ্র, তোমার কন্যাকে উদ্ধার করতে হ'লে প্রাসাদ আক্রমণ করতে হবে, রাজদ্রোহ করতে হবে, রামগুপ্তকে সিংহাসনচ্যুত করতে হবে। কিন্তু মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ, যতদিন শকযুদ্ধ চলবে, ততদিন মগধে গৃহবিবাদ চলবে না। জয়নাগ যুদ্ধে গিয়েছে, সে পরমসুখে আছে, কিন্তু আমি পাটলিপুত্রের নগরনায়ক হয়ে কেবল সারাদিন মাথার চুল ছিঁড়ছি, আর বলছি,—'মধুসূদন, কবে মগধ রসাতলে যাবে, কবে রামগুপ্ত রক্ত বমন ক'রে মরবে, কবে রুচিপতিকে শেয়াল কুকুরে টেনে ছিঁড়বে'।"

"তবে কি সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যে অনাথের নাথ কেউ নেই?' আমার কি কোনো উপায়ই হবে না?"

"হ'তে পারে যদি মধুসূদন সুপ্রসন্ন হন, তোমার কন্যা উদ্ধার করতে পারে ঐ দীনা ভিখারিণী।"

"তুমি কি উপহাস করছ, নগরনায়ক? তুমি মহানগরের পৌরসঙ্ঘের নায়ক হয়ে যে-কাজ করতে ভরসা পাচ্ছ না, সে-কাজ ঐ দীনা, জীর্ণা ভিখারিণী করবে?"

"ভদ্র, ভদ্র, উপহাস করিনি। জেনে রাখ আমিও কুলপুত্র। ঐ দীনা ভিখারিণী পাটলিপুত্রের মা। আমি পালাই, না হ'লে হয়ত মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে ফেলব। নাগরিক, ঐ মলিনবসনা ভিখারিণী পট্টমহাদেবী দত্তদেবী—আর কিছু ব'লো না—আমি পাগল হয়ে উঠেছি।"

রাজপথের শেষে দুইটি রমণী ভিক্ষাপাত্র হস্তে অতি ধীরপদে অগ্রসর হইতেছিলেন। বৃদ্ধা দত্তদেবী, যুবতী ধ্রুবদেবী।

নাগরিক সন্দিগ্ধমনে দত্তদেবীর দিকে অগ্রসর হইলে তিনি ভিক্ষাপাত্র বাড়াইয়া বলিলেন, "ভদ্র, কন্যা দুইদিন উপবাসিনী, দুটি ভিক্ষা দেবে কি?" নাগরিক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। তখন দত্তদেবী ধ্রুবদেবীকে বলিলেন, "এই বার বার তিনবার হ'ল, ইনি যদি না দেন ধ্রুবা, তা হ'লে আজও উপবাস। আমার সহ্য হয়ে গেছে, কিন্তু তোর মুখ দেখ্‌লে যে আর স্থির থাকতে পারি না।"

ধ্রুবা। আমারও সহ্য হয়ে গেছে মা, তুমি আর ভিক্ষা ক'রো না। ভুলে গেছ কি মা, তুমি কে? পট্টমহাদেবী, তুমি আজ নগরের পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছ?

দত্ত। ভুলিনি মা, কিছুই ভুলিনি। এখন যে আমার সংসার হয়েছে, তোমাকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি ধ্রুবা, কর্ত্তব্য যে বড় কঠোর। আর একবার চাই। নাগরিক, কন্যা দুইদিন উপবাসিনী, ভিক্ষা দেবে কি?

জয়। এই নাগরিক পাগল, তাই তুমি ভিক্ষা চেয়েছ ব'লে আশ্চর্য্য হয়ে তোমার মুখের দিয়ে চেয়ে আছে। পরমেশ্বরী, ব্রহ্মশাপে কি পাটলিপুত্র পাষাণ হয়ে গেছে? লক্ষ বজ্র কি সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ধ্বংস করেছে? তুমি সমুদ্রগুপ্তের পট্টমহাদেবী, সমুদ্রগুপ্তের পাটলিপুত্রে ভিক্ষায় বেরিয়ে দুবার বিমুখ হয়েছ?

দত্ত। কন্যা দুদিন উপবাসিনী, তাই বেরিয়েছি।

জয়কেশী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি নেবে মা, বস্ত্র?" জয়কেশী মস্তকের উষ্ণীষ ও উত্তরচ্ছদ খুলিয়া দিল, "সঙ্গে মাত্র দুটি সুবর্ণ আছে, তাই নিয়ে তোমার স্বামীর ক্রীতদাসকে ধন্য কর, মা।"

"বস্ত্রে প্রয়োজন নাই, সুবর্ণ স্পর্শ করি না, যদি ভিক্ষা দাও, দু-মুষ্টি অন্ন দিও।"

যে নাগরিক অপহৃত কন্যার উদ্ধারে আসিয়াছিল, সে জয়কেশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর ইনি কে? অমন করে কাতর হয়ে কাকে কি বলছ?"

"তুমি ভাগ্যবান্, কিন্তু হতজ্ঞান। নাগরিক, আজ তোমার কন্যার উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একত্র হয়েছেন। সেইজন্যই পরমেশ্বরী, পরমভট্টারিকা, পট্টমহাদেবী দত্তদেবী পথে ভিক্ষায় বেরিয়ে দুবার বিমুখ হয়েছেন।"

তখন নাগরিক রাজপথের ধূলায় পড়িয়া শীর্ণা ভিখারিণীর চরণযুগল জড়াইয়া ধরিল। তাহার আর্ত্তনাদ শেষ হইলে দত্তদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগরনায়ক, এ কথা কি সত্য?"

"এ কথা পাটলিপুত্রে নিত্য।"

"আমাকে জানাও নি কেন, পুত্র?"

"মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ।"

"মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত!"

"মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত বৈকুণ্ঠবাসী হ'লে এক মহারাজ চন্দ্রগুপ্তই পাটলিপুত্রের নাগরিকের কাছে রাজা।"

"ধ্রুবা, মন্দিরে ফিরে যা। একা চল্‌তে পারবি ত? যদি না পারিস্, জগদ্ধরের কাছে যা।"

ধ্রুবা। কেন পারব না, মা? স্বামীর আদেশ, তোমার কাছে থাকব। ধর-বংশের গৃহে ধ্রুবার আর আশ্রয় নেই।"

জয়। ভিক্ষা গ্রহণ করবে না, মা?

দত্ত। কন্যাকে নিয়ে যাও, দুমুষ্টি অন্ন দিও; বাছা দু-সন্ধ্যা জলগ্রহণ করেনি। নাগরিক, ধর্ম্মই ধর্ম্ম রক্ষা করেন, আমি অভয় দিচ্ছি, আমার সঙ্গে এস। দত্তার জীবন থাকতে, পাটলিপুত্রের কুলকন্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ম্মবিচ্যুতা হবে না।

পথের এক দিক দিয়া দত্তদেবীর সঙ্গে নাগরিক এবং অপর দিক দিয়া জয়কেশীর সঙ্গে ধ্রুবদেবী চলিয়া গেলেন। তখন পথপার্শ্বে তালগুচ্ছের অন্তরাল হইতে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাহির হইল। বুড়া পথের ধূলায় বসিয়া আপনমনে বকিতে আরম্ভ করিল, "ধর্ম্ম, সত্যই কি ধর্ম্ম তুমি আছ? প্রয়োজনমত ত পরিচয় পাই না। কুমার চন্দ্রগুপ্ত স্ত্রীবেশে অরিপুরে কুলগৌরব রক্ষা করতে গেল, চিরশত্রু শকরাজ তার হাতে নিহত। সেই পাটলিপুত্রের শত শত নাগরিক, সেই চন্দ্রগুপ্তকে বধ করবার জন্যে লোলুপ হয়ে বেড়াচ্ছে। ধর্ম্ম, সত্যই যদি তুমি থাক, তবে আজ সংহার মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর, রক্তের সমুদ্র নিয়ে এস। রামগুপ্তের স্পর্শে কলঙ্কিত আর্য্যপট্ট মাগধ রক্তের প্রবল স্রোতে ধুয়ে দাও।"

দূর হইতে এক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুক আসিতেছে দেখিয়া

বৃদ্ধ স্থির হইল। নূতন ভিক্ষুক তাহাকে দেখিয়াই আপন মনে বকিতে আরম্ভ করিল, "পাটলিপুত্র বলে রাজধানী, এর নাম নাকি মহানগর—ঝাড়ু মারি এমন মহানগরের মুখে! তিন প্রহর বেলা হ'ল, এখনও একমুঠো ভিক্ষে পেলাম না। ঘাটে একখানা নৌকা নেই যে পার হয়ে চলে যাব।" কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুক তখন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, বৃদ্ধ তাহাকে অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "শোণের আর গঙ্গার ঘাটিতে কি সেনা আছে?"

"রুচিপতি সেই মানুষ? সেনা যথেষ্টই আছে, কিন্তু মগধের লোক একজনও নেই, সব নেপালের।"

তখন দূরে স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এক ভিখারিণী আসিল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "কে, হরিমতি না?"

ভিখারিণী নিকটে আসিয়া তালবৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল এবং নূতন গৈরিক বসনের অঞ্চলে মুখ মুছিয়া বলিল, "কি রামরাজ্যি বাবা! পথে বেরিয়ে অবধি একটা লোক গান শুনতে চাইলে না, মুখে আগুন, মুখে আগুন! একখানা নৌকা পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু সন্ধ্যার আগে খোলা হবে না, তাহ'লেই ধরে ফেলবে।"

"হর, হর, বম্ বম্—আদেশ?"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অস্ফুটস্বরে কহিল, "নৌকা শোণতীর থেকে ছেড়ে একেবারে গঙ্গাতীরে প্রমোদ-উদ্যানের ঘাটে আসবে। শোণের পারে তাল বৃক্ষের উপর রক্ত পতাকা উঠলে জানবে মহারাজ এসেছেন।"

যথাযোগ্য ভাষায় পাটলিপুত্রের নাগরিকদের কৃপণতা ও ধর্ম্মানুরাগের অভাব বর্ণনা করিতে করিতে ভিক্ষু, ভিখারিণী ও সন্ন্যাসী নানাদিকে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে গুপ্তরাজবংশের বিস্তৃত প্রমোদ-উদ্যান। এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, কিন্তু সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শোণের দুই-তিনটি শাখা এই ক্রোশ-ব্যাপী বিস্তীর্ণ উপবনের মধ্যে পড়িয়া কৃত্রিম হ্রদে পরিণত হইয়াছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রারম্ভ হইতে এই বিশাল উদ্যানের প্রত্যেক প্রবেশ-পথে সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরী উপস্থিত থাকিত। মহাপ্রতীহার হরিষেণ পাটলিপুত্রের নগরাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিলেও রাজপ্রাসাদ ও রাজোদ্যান-রক্ষার নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয় নাই।

যেদিন দ্বিপ্রহরে ভিক্ষুক, ভিখারিণী ও সন্ন্যাসিগণ যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের পাটলিপুত্র প্রত্যাবর্ত্তনের আশা করিতেছিল, সেই দিন সন্ধ্যার সামান্য পূর্ব্বে একজন পদাতিক সেনা রাজোদ্যানের হ্রদতীরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত এক সুখাসনের উপর বসিয়া একাকী উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতেছিল। তাহার অঙ্গে তখনও বর্ম্ম আছে, কিন্তু অসি চর্ম্ম ও শূল ভূমিতে নিক্ষিপ্ত। সৈনিক উদ্যানরক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজপ্রসাদের প্রভাবে সে তখন সম্রাট রামগুপ্তের সমতুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে আপন মনে বলিতেছিল, "এত মদ যে খেয়েই উঠতে পারি না, এমন না হ'লে রামরাজ্য? ধন্য রাজা, পুণ্য দেশ। রাজা রামগুপ্ত আর অযোধ্যার রামচন্দ্র সমান। লোকে বলে সমুদ্রগুপ্ত বড় রাজা ছিলেন, কিন্তু আমি ত দেখছি রাজা বলতে রামগুপ্ত, আর মন্ত্রী বলতে রুচিপতি। চাকর-বাকরের মদ কিনে খেতে হয় না। রাজপ্রাসাদের মদই ফুরোয় না, ত চাট খায় কখন?"

সৈনিক শোণের দিকে মুখ ফিরাইয়া রামগুপ্তের মদ্য-প্রশস্তি গাহিতেছিল, সেই অবসরে একজন বর্ম্মাবৃত পুরুষ উপবনের বনানীর অন্তরালে আশ্রয় লইয়া প্রমোদ-উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল। সৈনিক তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে ব্যক্তি তখন নিশ্চিন্ত হইয়া বনানীর আশ্রয় ছাড়িয়া প্রমোদ-উদ্যানের প্রকাশ্য পথে আসিল। সে যখন পা টিপিয়া সৈনিকের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও মাতালের চেতনা হইল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে সৈনিককে ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তীব্র রাজপ্রসাদের প্রভাবে সৈনিক কোনো আপত্তি না করিয়া নাসিকাগর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। আগন্তুক তখন বর্ম্মের উপর প্রতীহারের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রতীহারকে লতাগুল্মের মধ্যে টানিয়া ফেলিয়া দিল। নিজে মৃৎকলস হইতে এক পাত্র তীব্র সুরা পান করিয়া কৃষ্ণমর্ম্মরের বেদীর উপর শুইয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরেই নিয়মানুসারে একজন গৌল্মিক

প্রতীহার পরিদর্শন করিতে আসিল। সে আসিয়া দেখিল যে, প্রতীহারবেশী আগন্তুক শুইয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া গৌল্মিক বলিয়া উঠিল, "এ ব্যাটাও মাতাল হয়ে পড়েছে। আর আজ প্রমোদ-উদ্যানে কারও শাদা চোখ নেই। সে ছদ্মবেশী প্রতীহারকে মৃদু পদাঘাত করিয়া বলিল, "ওরে বেটা ওঠ, মহারাজ আসছেন।" প্রতীহার বলিল, "আসুক না দেবতা, মহারাজের রাজ্য রামরাজ্য, অফুরন্ত মদ, উঠি কি ক'রে ?"

"শীঘ্র ওঠ্ বল্‌ছি, রুচিপতি ঠাকুর এলে তোর কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খাবে।"

"খাক্ না, আর একটা কিনে নেব।"

"ওরে, সত্যি সত্যি মহারাজ আসছেন।"

"আসুক না গুরু, এত বড় দুনিয়াটায় মহারাজা ব্যাটার জায়গা হচ্ছে না ?"

দূরে মহামন্ত্রী রুচিপতিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গৌল্মিক সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিল। মহামাত্য মহানায়ক রুচিপতি দেবশর্ম্মা তখন রাজকীয় সুরায় অতীব সানন্দচিত্ত। তিনি দূর হইতেই বলিয়া উঠিলেন, "মাতাল হয়েছে, বেশ হয়েছে, ওকে বকচে কেন ? মহারাজ আসছেন—তিনিও ত মাতাল ? রাজা মাতাল, আর প্রজা মাতালে তফাৎ কি ?" গৌল্মিক অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "যথা আজ্ঞা, দেব।"

তখন দূরে নাগরিকের কন্যার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মহারাজাধিরাজ রামগুপ্তকে আসিতে দেখিয়া রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়।" রামগুপ্ত দক্ষিণ হস্ত হইতে রক্তস্রোত নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "রুচি ভাই, এ বেটী বেজায় শুচি, কিছুতেই মদ খেতে চায় না—হাতটা কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে।" নাগরিকের কন্যা তখন মাতালের প্রহারে বিকলাঙ্গ, তাহার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত, পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, কিন্তু তথাপি সে অবসর পাইলেই রামগুপ্তকে দংশন করিতেছে, আর বলিতেছে, "হাঁ, আমি সতী, আমি সতী মায়ের সতী মেয়ে। যদি মরি, তবু তোর মত রাজার রক্ত মরবার আগে দেখে যাব।"

কন্যার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, কৃষ্ণমর্ম্মরের বেদীর উপর শায়িত নাগরিকের চমক ভাঙিল, সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, যে, তাহার অবিবাহিতা যুবতী কন্যার মুখে মাতাল রামগুপ্ত পদাঘাত করিতেছে। তখন মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখের সম্মুখে বিশ্বজগৎ শূন্য হইয়া গেল। রুচিপতি ও গৌল্মিক যেন মেদিনীতে প্রবেশ করিল ও তাহার দীর্ঘশূল রামগুপ্তের বক্ষে প্রবেশ করিয়া পৃষ্ঠ দিয়া নির্গত হইল। তপ্ত রুধির ধারায় রুচিপতি ও গৌল্মিক সিক্ত হইয়া গেল, রামগুপ্ত এতদিনে জননীর মহালোভের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

রুচিপতি রক্তস্রোতের আঘাতে বসিয়া পড়িল। ঠিক এই সময় গৌল্মিকের ছিন্ন মুণ্ড তাহার মুখের উপর আঘাত করিল। "কাটা মাথা ভূত হবে," বলিয়া মহামাত্য মহানায়ক রুচিপতি দেবশর্ম্মা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। নিহত সম্রাট রামগুপ্ত ও গৌল্মিকের দেহ এবং সংজ্ঞাহীনা কন্যা লইয়া উন্মত্ত নাগরিক ঘোররবে হাসিতে আরম্ভ করিল।

তখন অদূরে শোণতীরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া লাগিল এবং তাহা হইতে একজন বর্ম্মাবৃত যুবক, একটি অবগুণ্ঠনাবৃতা নারী ও একজন নাবিক নামিল। নামিয়াই নাগরিক ও তাহার কন্যাকে দেখিয়া তিন জনেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ শূলবিদ্ধ রামগুপ্তের শব কোলে করিয়া বসিয়া পড়িলেন, নাবিক তাঁহার আদেশে নগরতোরণের দিকে ছুটিল, রমণী অবগুণ্ঠনের বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া মাধবসেনারূপে প্রকাশিতা হইল। তখন নগরের পথ দিয়া দত্তদেবী ও ধ্রুবদেবীর সহিত জনকতক সন্ন্যাসী ও ভিখারী সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অপর একজন ভিখারীকে কহিল, "রবি, দেবতার কাজ কি দেবতাই করে গেলেন ? আমাদের আর বিদ্রোহী হ'তে হ'ল না ?"

সেই বৃদ্ধ ভিখারী কহিল, "রাজহত্যা ও রাজদ্রোহ ! হরিষেণ, তুমি এখন থেকে নগরের ভার গ্রহণ কর। হত্যাকারীকে বন্দী করবার চেষ্টা কর।"

তখন সেই প্রতীহারবেশী নাগরিক ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "ঠাকুর, তোমরা কে তা জানি না, রামগুপ্তের হত্যাকারী আমি।"

তখন সেই বর্ম্মাবৃত পুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নির্ভয়ে বল, কোনো কথা গোপন ক'রো না। আমি যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত, তুমি মহারাজকে কেন হত্যা করলে ?"

"যুবরাজ, তোমার ভগিনী ছিল না, কন্যা নাই, তুমি হয়ত সহজে বুঝতে পারবে না আমি হঠাৎ কেন সমুদ্রগুপ্তের পুত্রকে হত্যা করেছি। তোমার জ্যেষ্ঠ দিবালোকে পাটলিপুত্রের প্রকাশ্য রাজপথে রুচিপতির লোক দিয়ে এই কুমারী যুবতীকে নিয়ে এসেছিল।

"যুবরাজ, যখন কন্যার পিতা হবে তখন রামগুপ্তের হত্যার কারণ বুঝতে পারবে। আমি তোমার ভ্রাতাকে হত্যা করেছি, আমার উচ্চশির এই দণ্ডে গ্রহণ কর, হস্তীর পদতলে আমায় চূর্ণ কর, বা জাহ্নবীর জলরাশিতে পিঞ্জরাবদ্ধ করে ফেলে দাও—কোনোই আপত্তি নাই। বিচার চাই না, দয়ার আশা করি না, চাই কেবল মৃত্যু। একমাত্র অনুরোধ, তোমরাও পাটলিপুত্রের নাগরিক, এই লাঞ্ছিতা মাগধ নারীকে আমার চিতায় জীবন্ত নিক্ষেপ ক'রো।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নাগরিকের সম্মুখে গিয়া বলিল, "শোন নাগরিক, আর্য্য সমুদ্রগুপ্ত দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু আমি এখনও মহানায়ক মহাবলাধিকৃত রবিগুপ্ত।"

"আমি এখনও মহারাজ ভট্টারকপাদীয় মহামাত্য দেবগুপ্ত।"

"আমি এখনও মহাদণ্ডনায়ক হরিগুপ্ত।"

"আমি পাটলিপুত্রের অর্দ্ধ শতাব্দীর শাসনকর্ত্তা নগরাধ্যক্ষ হরিষেণ।"

"আর আমি মগধের সীমান্তরক্ষী জাপিলীয় মহানায়ক রুদ্রধরের পুত্র জগদ্ধর।"

দ্বাদশজন ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "নাগরিক, মহারাজা রামগুপ্ত নিহত, আর্য্যপট্ট শূন্য, দ্বাদশ প্রধান এখন সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। সাম্রাজ্যের দ্বাদশ প্রধান আমরা ভাগীরথীর তীরে প্রতিজ্ঞা করছি, যদি তোমার প্রাণদণ্ড হয়, তোমার কন্যাকে তোমার চিতায় নিক্ষেপ করব।"

তখন একজন দুই জন করিয়া শত শত সশস্ত্র নাগরিক প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করিয়া রামগুপ্ত ও গৌল্মিকের শব বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ জয়নাগ ও যুবা জয়কেশী চন্দ্রগুপ্তের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আদেশ চাহিল। চন্দ্রগুপ্ত নাগরিককে কারাগারে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধ সচিব বিশ্বরূপ শর্ম্মা ও মহাপুরোহিত নারায়ণ শর্ম্মা শবের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। এতক্ষণ পরে চন্দ্রগুপ্ত প্রথম মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, তুমি একটু এখানে দাঁড়াও, আমার একটু কাজ আছে, সেটা সেরে এসে শ্মশানে যাব।" নারায়ণ শর্ম্মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন অশুচি চন্দ্র, এখন কোনো কাজ তোমার পক্ষে প্রশস্ত নয়।"

সকলে বিস্মিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কেবল ধ্রুবদেবী বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা, চল, শীঘ্র অন্যত্র চল, আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না।"

"জয়নাগ, তুমি দেবীদের সঙ্গে প্রাসাদে যাও। মহামাত্য, মহাবলাধিকৃত, আপনারাও প্রাসাদে যান, আমি সন্ধ্যায় আর্য্যপট্ট গ্রহণ করব।"

বৃদ্ধ জয়নাগ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "মহারাজ, যখন আদেশ করছেন, তখন যাচ্ছি, কিন্তু আমার আদেশে পৌরসংঘের পক্ষে ইন্দ্রদ্যুতি ও দশ-গুল্ম আপনার সঙ্গে থাকবে।"

চন্দ্রগুপ্ত অগ্রসর হইলে মাধবসেনা তাঁহার সঙ্গে চলিল। তাহা দেখিয়া যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাধবী, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

মাধবসেনা হাসিয়া কহিল, "মহারাজ, যে কুক্কুরী স্ত্রীবেশী মহারাজের সঙ্গে মথুরায় গিয়েছিল, সে কখনও এখন স্থির থাকতে পারে ?"

দত্তদেবী ও ধ্রুবদেবী দ্বাদশ মহানায়কের সহিত প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন, নাগরিক ও তাহার কন্যা কারাগারে চলিল, চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মাধবসেনা ও ইন্দ্রদ্যুতি প্রমোদ-উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিল, কেবল মহা-পুরোহিত নারায়ণ শর্ম্মা শব স্পর্শ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও তাহার সঙ্গীদের অধিক দূর যাইতে হইল না। গঙ্গাতীরে, কৃষ্ণমর্ম্মরের দ্বিতীয় সুখাসনে রুচিপতি এলাইয়া পড়িয়াছে, একজন দণ্ডধর একটা বৃহৎ তালপত্র ধরিয়া আছে, এবং দুই তিনজন প্রতীহার তাহাকে বেষ্টন

করিয়া আছে। রুচিপতি বলিতেছে, "রামগুপ্ত ব্যাটা লুকিয়ে লাল মদ খাচ্ছিল, আমরা এতদিন ফাঁকিতে পড়েছি।"

একজন প্রতীহার বলিল, "প্রভু, মহারাজ দেহত্যাগ করেছেন।"

রুচি। সোজা কথায় বল না বাবা, মরেছেন। রামভদ্র, তবে তুমি মরেছ? প্রমোদ-উদ্যানে আর যাকে খুশী ধরে আনবে না,—আর আকণ্ঠ সুরাপান ক'রে পাটলিপুত্রের রাজপথে অবমানিত হবে না? তবে আর এ রাজ্যের মজা কি? তবে বানপ্রস্থ অবলম্বন করি—না এখনও ত বয়স হয়নি। এক রাজা মরে, অন্য রাজা হয়, আমি কেন বা রাজা না হই? মাতাল রামগুপ্তের বদলে পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীশ্রী ১০৮ রুচিপতি দেব শর্ম্মা কুশলী! কি সুন্দর! এই প্রতীহার, এখন থেকে আমিই মহারাজাধিরাজ।"

১ম প্রতীহার। যথা আজ্ঞা, দেব।

রুচি। দূর ব্যাটা মাতাল, সোজা কথায় বল্ না কেন, হুঁ।

১ম প্রতী। প্রভু!

চন্দ্রগুপ্ত ইন্দ্রদ্যুতিকে সঙ্কেত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পৌরসঙ্ঘের অগণিত পদাতিক উপস্থিত হইয়া রুচিপতিকে বেষ্টন করিল। মাধবসেনা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, মত্ত অবস্থায়ই কি এর প্রাণদণ্ড হবে?"

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "পাগল হয়েছ? একদিনের জন্যও যখন রুচিপতি আর্য্যপট্টের পাশে বসেছে, তখন এ-ক্ষেত্রেও দ্বাদশ প্রধানের বিচার আবশ্যক।"

রুচিপতি গুপ্ত-সাম্রাজ্য শাসন করিতে করিতে ভুলিতে চড়িয়া কারাগারে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্যপূর্ব্বা কন্যা

রামগুপ্তের সৎকারের পরে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত ও দ্বাদশ-প্রধানের উপস্থিতি সত্ত্বেও মহানগর পাটলিপুত্রে অতি ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। নগরের সমস্ত নাগরিক রাজপ্রাসাদের তিনটি প্রধান অঙ্গন ও অলিন্দগুলিতে সোৎসুক চিত্তে দাঁড়াইয়া আছে, সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজ্যের অভিজাত কুলপুত্র সভামণ্ডপে সুখাসন গ্রহণ করিয়াছে। পাটলিপুত্রের পৌরসঙ্ঘের নির্দ্দিষ্ট প্রতিভূগণ আর্য্যপট্ট বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কেবল আর্য্যপট্ট শূন্য। আর্য্যপট্টের নিম্নে দ্বাদশ হস্তীদন্তনির্ম্মিত সিংহাসনে দ্বাদশ মহাপ্রধান, সকলেই উপবিষ্ট, কেবল মহাসচিব বিশ্বরূপ শর্ম্মা ও মহাপুরোহিত নারায়ণ শর্ম্মা আসনের উপরে দণ্ডায়মান। সকলের সম্মুখে বিবস্ত্র মস্তকে কুমার চন্দ্রগুপ্ত। আর্য্যপট্টের দক্ষিণে দত্তদেবী ও জয়স্বামিনী এবং বামদিকে বৃদ্ধ জয়নাগের হস্ত ধরিয়া ধ্রুবদেবী। দত্তদেবী অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি হবে?"

বিশ্বরূপ। হবে আর কি, ধ্রুবদেবীর বিবাহ হ'তে পারে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বে বিবাহিতা হয়েছিলেন ব'লে মহারাজের ধর্ম্মপত্নী হ'তে পারবেন না।

ধ্রুব। জেনে রাখুন ব্রাহ্মণ, রুদ্রধরের কন্যা ধর্ম্মপত্নী ভিন্ন অন্য কিছু হবে না।

চন্দ্র। মহানায়ক বিশ্বরূপ, যে-রাজ্যে নিরপরাধা নিষ্কলঙ্কা নারী কেবল জনসমাজের মনস্তুষ্টির জন্য নির্য্যাতিতা হয়, সে-রাজ্যের সিংহাসন চন্দ্রগুপ্ত গ্রহণ করে না।

নারায়ণ। ধ্রুবদেবীকে এখন আর কেউ নির্য্যাতন করে নি।

চন্দ্র। উপস্থিত করছেন আপনারা।

বিশ্বরূপ। আমরা?

ধ্রুব। ব্রাহ্মণমণ্ডলি! আমি কি সত্যই অন্যপূর্ব্বা? আমাকে কে সম্প্রদান করেছিল?

নারায়ণ। কেন, আপনার পিতা।

জগদ্ধর। পিতা কোনদিন ধ্রুবাকে সম্প্রদান করবার অবসর পান নাই।

চন্দ্র। তবে?

নারায়ণ। সম্প্রদানের প্রতীক্ষায় মহানায়ক রুদ্রধর কুমারী কন্যাকে প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রেরণ করেছিলেন। সেটা সম্প্রদান না হ'লেও সম্প্রদানের আকাঙ্ক্ষা।

চন্দ্র। শোন জয়নাগ, শোন ইন্দ্রদ্যুতি, শোন জয়কেশী, ইচ্ছামত সুখে আর্য্যপট্টে অন্য রাজা নির্ব্বাচন ক'রে মাগধ

তখন প্রতিপালন কর। তাহার আর্য্যপট্টে রুদ্রধরের "নির্ভয়ে উপবেশন করবেন না। চল জগদ্ধর, বিস্তৃত জগতে রাজ্যের অভাব হবে না। এখনও বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

সহসা বৃদ্ধ জয়নাগ আর্য্যপট্টের সম্মুখে কাঁদিয়া পড়িল। সে কহিল, "মহারাজ—শকযুদ্ধ যে শেষ হয়নি।"

সঙ্গে সঙ্গে পাটলিপুত্রের পৌরসঙ্ঘের প্রতিভূবর্গ চন্দ্রগুপ্তের সম্মুখে জানু পাতিয়া কহিল, "পিতা, ভীষণ বিপদে নগর রক্ষা কর।"

দেবগুপ্ত। চন্দ্র, কে রাজা হবে? সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে সমুদ্রগুপ্তের বংশধর ভিন্ন কে উপবেশন করতে সাহস করবে?

চন্দ্র। তাত, মনে করুন সে বংশ লুপ্ত!

দত্ত। চন্দ্র, তুই আমাকেও এ কথা শোনালি!

চন্দ্র। আমি শোনাই নি মা, শুনিয়েছে তোমার পরম-ধার্ম্মিক মগধের প্রজা। একদিন তোমার আদেশে ঐ সিংহাসন ছিন্ন কন্থার মত পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলাম। আবার আজও যাচ্ছি।

দত্ত। তবে মথুরায় গিয়েছিলে কেন?

চন্দ্র। বার-বার বল্‌ছি মা, তুমি শুন্‌ছ কই? আমি রামগুপ্তের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে মথুরায় যাইনি—সমুদ্রগুপ্তের বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করতেও পঞ্চশত বীর নিয়ে নারীবেশে বাসুদেবের সভামণ্ডপে নৃত্য করতে যাইনি। গিয়েছিলাম কেবল ধ্রুবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে। ধ্রুবা প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে, সে মথুরায় যাবে—তাই তার বেশ ধারণ ক'রে গিয়েছিলাম। আর গিয়েছিলাম কেন জান মা? দুরাচার বাসুদেব ধ্রুবাকে পরস্ত্রী জেনেও তাকে কামনা করেছিল ব'লে। সে-ধ্রুবাকে পরিত্যাগ করে আমি সাম্রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য চাই না।

বিশ্বরূপ। যুবরাজ, গুপ্তকুল চিরদিন ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও আচার রক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। তুমি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, তোমার পিতামহ শকাধিকার নির্ম্মূল ক'রে বৈষ্ণব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তুমি অশ্বমেধযাজী বিশ্ববিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্তের পুত্র, আর্য্যের ধর্ম্ম, বৈষ্ণবের শাস্ত্র, মগধের দেশাচার তুমি রক্ষা না করলে কে করবে?

চন্দ্র। হে ব্রাহ্মণ, তুমি অশেষ শাস্ত্র-পারদর্শী, তোমার বিদ্যার যশ সমুদ্র হ'তে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আর্য্যধর্ম্মে তুমি আমার শিক্ষাগুরু, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, অসহায়া অবলা নারীর নির্যাতন কি আর্য্যধর্ম্ম?

বিশ্ব। কখনই না। বিশাল মানবহৃদয়ের গভীরতম প্রেম পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের ভিত্তি।

চন্দ্র। গুরুদেব, যদি তাই হয়, তাহ'লে কোন্‌মুখে ধ্রুবাকে পরিত্যাগ করতে আদেশ করছ? ধ্রুবা অবলা, চারিদিক থেকে প্রবল মানব এতদিন তার উপরে অত্যাচার ক'রে এসেছে। যিনি ধ্রুবাকে সংসারে এনেছিলেন তিনি সাম্রাজ্যের লোভে কুমারী কন্যাকে বিবাহের পূর্ব্বে রামগুপ্তের চরণে নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু দুর্বৃত্ত রামগুপ্ত ধ্রুবার অতুলনীয় রূপরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করার অবসর পান নি। সুদূর মথুরা থেকে বৃদ্ধ বাসুদেব ধ্রুবার দিকে লালসাময় দৃষ্টিপাত করেছিল, সে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এখন পাটলিপুত্রের ধার্ম্মিক নাগরিকেরা সেই অস্পৃষ্টা পবিত্র কুলকন্যাকে সমাজচ্যুতা করতে চায়! গুরুদেব, তা হবে না। রুদ্রধরের আদেশে ধ্রুবার আশা পরিত্যাগ করেছিলাম, ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুরোধে ধ্রুবার বেশে মথুরায় গিয়েছিলাম, কিন্তু দেশাচারের অনুরোধে মানবধর্ম্ম বিস্মৃত হ'তে পারব না।

বিশ্ব। মহারাজ, আপনাকে মানবধর্ম্ম বিস্মৃত হ'তে অনুরোধ করিনি। আপনি একটি নারীর প্রতি দয়ার বশবর্ত্তী হয়ে মগধের লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রতি বিমুখ হচ্ছেন।

চন্দ্র। না আচার্য্য, আমি বিমুখ হইনি; বিমুখ হয়েছে মগধের নরনারী। যোদ্ধার বর্ম্মে সন্ধিস্থল থাকে, শত্রু সেই দুর্ব্বল সন্ধিস্থল সন্ধান করে। আজ মগধের নরনারী আমার শত্রু, ধ্রুবা আমার বর্ম্মের সন্ধিস্থল। আচার্য্য, তুমি ভুলে যাচ্ছ, যে, রাজাও মানুষ, রাজার দেহও রক্তমাংসের দেহ, তারও স্নেহমমতা আছে—সে রাজধর্ম্মানুশাসন প্রতিপালন করে ব'লে সে লৌহের যন্ত্র নয়—তার হৃদয় পাষাণ নয়। আজ যদি মগধের নরনারী আমার শত্রু না হ'ত—

জয়নাগ। এমন কথা মুখে এন না মহারাজ। যেদিন থেকে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তনুত্যাগ করেছেন সেইদিন

থেকে মগধের লোকের কাছে তুমি দেবতা—ছায়ার মত সহস্র সহস্র নাগরিক তোমার অনুসরণ করেছে।

চন্দ্র। সব জানি—সব বুঝি—জয়নাগ, তোমরা যে বুঝেও বুঝছ না? তোমরা কি বলতে চাও, যে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যের লোভে তার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে জাহ্নবীর জলে ফেলে দিয়ে—পাষাণের প্রতিমা হয়ে—ঐ আর্য্যপট্টে বসে থাকবে? তা হবে না—তা পারব না—আমার ধ্রুবা অসহায়া হয়ে পথে দাঁড়াবে না।

বিশ্ব। পুত্র, ধ্রুবদেবী যে অন্যপূর্ব্বা!

চন্দ্র। আচার্য্য, এই কি আর্য্যের শাস্ত্র? মহানায়ক রুদ্রধর ধ্রুবদেবীকে কার হস্তে পূর্ব্বে নিক্ষেপ করেছিলেন?

বিশ্ব। না—না—না। ধ্রুবা অন্যপূর্ব্বা নয়—বাগ্‌দত্তা!

চন্দ্র। সমস্ত পাটলিপুত্র নগরকে জিজ্ঞাসা কর গুরুদেব—রুদ্রধরের কন্যা কাকে বাক্যদান করেছিল? নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ?

জয়। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে।

চন্দ্র। নটীমুখ্যা মাধবসেনা?

মাধব। আপনাকে, প্রভু।

চন্দ্র। তাত রবিগুপ্ত?

রবি। তোমাকে পুত্র।

চন্দ্র। মাতা?

দত্ত। তোমাকে পুত্র।

চন্দ্র। পৌরসঙ্ঘের কি মত, ইন্দ্রদ্যুতি?

ইন্দ্র। আপনাকে মহারাজ।

চন্দ্র। ধর-বংশের নেতা, মহানায়ক জগদ্ধর, তোমার ভগিনীর বাক্যদান সম্বন্ধে তুমি কি বল?

জগ। চন্দ্র, এই জনসঙ্ঘের সম্মুখে পিতার পাপের কথা পুত্রের মুখে ব্যক্ত করাবে কেন?

চন্দ্র। জগৎ, আজ এই বিশাল জনসঙ্ঘের সম্মুখে ধর-বংশের নেতার মত কি আবশ্যক নহে?

জগ। তবে শোন, দেবতা ব্রাহ্মণ ও তিনজন নাগরিক সাক্ষী রেখে আমার পিতা মহানায়ক রুদ্রধর আমার ভগিনী ধ্রুবদেবীকে চন্দ্রগুপ্তের করে সমর্পণ করবেন ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

চন্দ্র। আচার্য্য, তবে কি দোষে কোন্ পাপে কোন্ শাস্ত্র অনুসারে ধ্রুবা অন্যের বাগ্‌দত্তা, যার জন্য সে সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী হবার অযোগ্যা? তোমার ঐ চরণতলে অধীত শাস্ত্র নিবেদন করছি। কুলাচার বা দেশাচার মতে অনাঘ্রাত কুসুম যদি দেবপূজার যোগ্য না হয় তাহ'লেও সে কুসুম কীটদষ্ট—পত্র নয়। দেশাচার মতে অন্য রাজা নির্ব্বাচন কর—দেবতা সাক্ষী ক'রে সমাজের সম্মুখে যে-ধ্রুবাকে মহানায়ক রুদ্রধর আমাকে সম্প্রদান করবেন ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন সে ধ্রুবা আমার ধর্ম্মপত্নী। সিংহাসনের লোভে সে-ধ্রুবাকে আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। যে-সিংহাসন আমার স্ত্রীকে চায় না, সে সিংহাসন আমার নয়। ভয় পেও না আচার্য্য—যদি দেশাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য করি—মগধে করব না—দূর বনান্তে চলে যাব; তবু ধ্রুবাকে পরিত্যাগ করতে পারব না।

সহসা মস্তকের অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "করিস নি—চলে যা—সেখানে প্রতি পদে প্রাণে ব্যথা পাবি না—সেখানে মানুষ পাটলিপুত্রের নাগরিকদের মত হিংস্র জন্তু নয়—সেইখানে চলে যা—আর আমি বাধা দেব না।"

তখন পট্টমহাদেবী দত্তদেবীর মুখ দেখিয়া ত্রস্ত দ্বাদশ প্রধান তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল, তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধ দেবগুপ্ত বলিল, "রক্ষা কর মা,—দুয়ারে প্রবল শত্রু, কেবল তোমার পুত্রের ভয়ে মাথা নত ক'রে আছে। এমন সময়ে চন্দ্রগুপ্ত মগধ পরিত্যাগ ক'রে গেলে মগধের সর্ব্বনাশ হবে।" সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরূপ শর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "রক্ষা কর মা, এই ভীষণ রোষানলে তুমি আর ঘৃতাহুতি দিও না।"

দত্ত। সে কথা মগধের নরনারী বুঝুক। আমি আজ ভুল ক'রে প্রাসাদে এসেছিলাম। বিদায় আচার্য্য, পাটলিপুত্রের প্রাসাদে দত্তদেবীর আর স্থান নাই।

চন্দ্র। চল ধ্রুবা, আর্য্যপট্টের লোভে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?

বৃদ্ধ জয়নাগ পাগলের মত চন্দ্রগুপ্তকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে ইন্দ্রদ্যুতি—ছুটে যা, ছুটে যা—নগরে প্রচার করে দে যে, মহারাজ চিরদিনের মত মগধ পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন।" ইন্দ্রদ্যুতি ও জয়কেশী ছুটিয়া পলাইল।

তখন দেবগুপ্ত, হরিগুপ্ত ও রবিগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "কোথা যাবে মহারাজ?" সজোরে রূঢ়ভাবে বৃদ্ধত্রয়ের বন্ধন মোচন করিয়া জগদ্ধর বলিয়া উঠিলেন, "না—না—যথেষ্ট শুনিয়েছেন—আমি আর শুনতে পারছি না—চল কুমার—চল ধ্রুবা।"

রবি। পাগলের মত কি বলছ জগদ্ধর?

জগ। সত্যি বলছি, ভট্টারক, হৃদয় ব্যাকুল হয়ে মুখ থেকে সার কথা বার ক'রে দিচ্ছে।

বিশ্ব। ক্ষান্ত হও, জগদ্ধর। শোন চন্দ্রগুপ্ত, শাস্ত্রধর্ম্ম, দেশাচার রসাতলে যাক্—তোমার মন তোমাকে যে সার সত্য দেখিয়ে দিচ্ছে সেই পথে চল। ধ্রুবাকে গ্রহণ ক'রে আর্য্যপট্টে উপবেশন কর।

চন্দ্র। ক্ষমা করুন, আচার্য্য। আজ মগধের বিপদ, তাই পাটলিপুত্রের নাগরিক আমার অনুরোধ রক্ষা করতে প্রস্তুত। কাল বিপদমুক্ত হ'লে সেই নাগরিকেরা বল্‌বে, যে, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র অপকৃষ্টা নারীকে সিংহাসনে স্থান দিয়েছে। ভারতের ইতিহাসে রাজধানীর নাগরিক বহুবার এই কাজ করেছে। অযোধ্যার নগরবাসীর অনুরোধে সীতাদেবী কেবল বনবাসে যান নি, শেষটা পাতালে প্রবেশ করলেন। আচার্য্য, রামচন্দ্র দেবতা কিন্তু আমি মানুষ।

হঠাৎ জয়নাগ চন্দ্রগুপ্তের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, দাসের শেষ অনুরোধ, ইন্দ্রদ্যুতি যতক্ষণ ফিরে না আসে, ততক্ষণ নগর পরিত্যাগ করবেন না।" "তাই হোক," বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত ধ্রুবদেবীকে হাত ধরিয়া আর্য্যপট্ট হইতে দূরে উপবেশন করিলেন। দেবগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "শূন্য আর্য্যপট্ট আর দেখতে পারছি না।" রবিগুপ্ত কহিলেন, "তবে চল আমরাও যাই।" উত্তরে চন্দ্রগুপ্ত হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু তাত, কেউ ত বলতে পারছ না যে, ধ্রুবাকে পরিত্যাগ করা অধর্ম্ম, ধ্রুবাকে অপকৃষ্টা জ্ঞান করা মহাপাপ—অতি ধীর শান্তভাবে পাটলিপুত্রের নাগরিকের অবিচার শুনে যাচ্ছ।

রবি। চন্দ্রগুপ্ত, অবিচার ক'রো না—আমি বলেছি, মহাদেবী দত্তদেবী শতবার বলেছেন—যত আপত্তি এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদলের!

বিশ্ব। মহাপাতক করেছি চন্দ্রগুপ্ত—রুদ্রধরের মত মহাপাতক করেছি—তুষানল আমার প্রায়শ্চিত্ত। তুমি যদি পাটলিপুত্র পরিত্যাগ ক'রে যাও তাহ'লে বিশ্বরূপের অন্য গতি নাই।

এই সময়ে সভামণ্ডপের অলিন্দে অলিন্দে রব উঠিল, "পথ ছাড়—শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহকুলিকনিগম উপস্থিত—নাগরিকগণ—কুলপুত্রগণ অবিলম্বে পথ ছাড়।" সকলে ব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। আগন্তুকেরা মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিয়া চন্দ্রগুপ্তকে বেষ্টন করিয়া জানু পাতিয়া বসিল। তাহাদের পশ্চাৎ হইতে জয়নাগ বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পৌরসঙ্ঘের অর্ঘ্য এনেছি। পিতা, তুমি মগধের পিতা; মাতা, তুমি মগধের জননী, সন্তানের অপরাধে ক্ষমা কর।

"পৌরসঙ্ঘ, ফিরে যাও—আজ মগধের দুয়ারে শত্রু, তাই ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছ—কাল শত্রু নিবারণ হ'লে ব'লে বেড়াবে যে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র অপকৃষ্টা নারীকে আর্য্যপট্টে বসিয়েছে।" তখন পৌরসঙ্ঘের সকল প্রধান যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের পদতলে মাথা পাতিয়া বলিয়া উঠিল, "আর্য্য, মহানগর পাটলিপুত্র মুক্ত মস্তকে ক্ষমাভিক্ষা করছে—বৃদ্ধের বাচালতা ও নারীর প্রগলভতা পৌরসঙ্ঘের বাক্য ব'লে গ্রহণ ক'রো না।" তখন ধ্রুবদেবী দুই হাত পাতিয়া পৌরসঙ্ঘের অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন; উচ্চ জয়ধ্বনিতে পাষাণনির্ম্মিত সভামণ্ডপ যেন বিদীর্ণ হইল।

যে নাগরিক রামগুপ্তকে হত্যা করিয়াছিল, সে কন্যার হাত ধরিয়া রুচিপতির সহিত অলিন্দে দাঁড়াইয়াছিল; জয়নাগ তাহাদের আনিয়া আর্য্যপট্টের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন, চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "এই তিনজনের বিচার আবশ্যক দ্বাদশ প্রধান।"

বিশ্বরূপ। যেখানে মহারাজাধিরাজ উপস্থিত সেখানে দ্বাদশ-প্রধানের বিচার অনাবশ্যক।

রবি। সামান্য নরঘাতক হ'লে রাজা বিচার করতে পারেন, কিন্তু এ যে রাজঘাতী।

বিশ্ব। কন্যা, কি করেছে?

দেব। আচার্য্য, দ্বাদশ প্রধানের আদেশ ভিন্ন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধিনির্দ্দেশ হ'তে পারে না!

বিশ্ব। মহামাত্য রুচিপতি?

বৃদ্ধ জয়নাগ হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে ভার পৌরসঙ্ঘের।" রুচিপতি বালকের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মহাপুরোহিত নারায়ণ শর্ম্মা দ্বাদশ প্রধানের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "অনুমতি করুন, আমি রাজঘাতক ও কন্যা সম্বন্ধে নাগরিকগণকে পরীক্ষা করি।"

দেব। করুন।

নাগরিক। পৌরসঙ্ঘ, রুচিপতির আদেশে দুষ্টেরা এই কন্যাকে রামগুপ্তের প্রমোদ-উদ্যানে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এই কন্যা কি ব্যভিচারিণী?

ইন্দ্র। না ঠাকুর, আমরা জানি কন্যা পবিত্রা।

বিশ্ব। এই বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে কে এ লাঞ্ছিতা কন্যাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ?

চন্দ্র। পৌরসঙ্ঘ, নীরব কেন?

দত্ত। কি বিচার করলে পৌরসঙ্ঘ! পাটলিপুত্রে কি আর পুরুষ নাই?

জগদ্ধর। মহারাজ আদেশ কর—মা, অনুমতি দাও, আমি, জাপীলীয় মহানায়ক রুদ্রধরের পুত্র—মহানায়ক জগদ্ধর এই অজ্ঞাতনামা নাগরিকের কন্যাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করলুম। সমস্ত পাটলিপুত্রের নিমন্ত্রণ, যদি সকলে এই কন্যার স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করে তবেই পাটলিপুত্রে বাস করব।

রবিগুপ্ত। জগদ্ধর, এ কন্যা আমি সম্প্রদান করব।

বিশ্ব। দ্বাদশ প্রধানের পক্ষ হইতে আমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

রবি। এস মা, আমি তোমাকে সম্প্রদান করি।

রবিগুপ্ত কন্যার হস্ত গ্রহণ করিয়া জগদ্ধরের হস্তে সম্প্রদান করিলেন।

তখন জয়স্বামিনী পাষাণ পুত্তলিকার মত আর্য্যপট্টে উঠিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "মহানায়কবর্গ, আমি রামগুপ্তের মা—আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমার পুত্রঘাতীকে মুক্ত ক'রে দাও।"

আবার ভীষণ জয়ধ্বনিতে পাষাণ-নির্ম্মিত সভামণ্ডপ কম্পিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ দেবগুপ্ত নিজে আসন পরিত্যাগ করিয়া নাগরিকের বন্ধনমোচন করিলেন। জয়নাগ তখন রুচিপতিকে দ্বাদশ প্রধানের সম্মুখে আনিয়া বলিয়া উঠিল, "দ্বাদশপ্রধান, অতি প্রাচীন পাটলিপুত্রের প্রাচীনতম রীতি অনুসারে রুচিপতির মত অপরাধীর বিচার কেবল নগরমণ্ডলেই সম্ভব। মহানায়ক রুদ্রধরের গৃহ হ'তে সামান্য কৃষক-গৃহ পর্য্যন্ত রুচিপতির অত্যাচারে মাতা স্ত্রী ও কন্যার অশ্রু ও রক্তে প্লাবিত হয়েছে।"

দ্বাদশ প্রধান সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "নিয়ে যাও, যথাবিহিত দণ্ডদান কর।"

বিংশতি জন নাগরিক রুচিপতিকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তখন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ধ্রুবদেবীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস, মহাদেবী।"

উভয়ে আর্য্যপট্টে উপবেশন করিলে নিশীথ রাত্রিতে ঐন্দ্র্য মহাভিষেক আরম্ভ হইল।

সমাপ্ত

বাক্য-হারা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ভেবেছিনু কেঁদে কেঁদে তোমারে ডাকিয়া
করিব চরণে তব আত্ম-নিবেদন,
ঢালিয়া প্রাণের দাহ তব পদ-তলে,
করিব গো চিরশান্ত অনন্ত বেদন।
আর্ত্তের ব্যাকুল ডাকে হইয়া কাতর,
হে দয়াল, তুমি যবে হবে মূর্ত্তিমান,
ধন্য করি অভাগায় স্নেহ-দিঠি দিয়া,
হেসে যবে দিবে মোরে বরাভয় দান।
ভেবেছিনু চাহিব গো কাঁদিয়া তখন
তোমার চরণ-তলে রত্ন-হেম-ধনে;
তুমি কিন্তু সত্য করি মূর্ত্ত হ'লে যবে,
রাহিনু চাহিয়া শুধু—মুগ্ধ এ নয়নে!
ভুলে গেনু সব ভিক্ষা—ভুলিনু আপন,
জাগে শুধু স্বেদ-কম্প-লাজ-শিহরণ!

পোল্যাণ্ডের প্রাচীন নৃত্যকলা

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

পোল্যাণ্ড দেশে ঘুরিবার সময়ে বিভিন্ন স্থানে উৎসবাদি উপলক্ষ্যে সেখানকার প্রাচীন কাল হইতে চলিত নানা প্রকার গ্রাম্য নৃত্য ও খেলা দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। সাধারণতঃ প্রাচীন নৃত্যকলাকে "লোক-ক্রীড়া" (folk-game) বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশেই বিশিষ্ট পোষাক ব্যবহৃত হয় এবং উৎসব পর্ব্বাদি উপলক্ষ্যে নানা রঙের পোষাকে ভূষিত হইয়া ছোট-বড় সকলেই এই ক্রীড়ায় যোগদান করে। প্রাচীন এই সকল লোক-ক্রীড়া সামাজিক জীবনে পুনঃ-প্রবর্ত্তিত করার চেষ্টা সর্ব্বত্রই চলিয়াছে। এমন কি সেখানকার বিদ্যালয় সমূহেও লোক-ক্রীড়ার যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে।



পুরুষদের প্রাচীন জাতীয় পোষাক

সুইডেনের ন্যাস সেমিনারিয়মে থাকা কালে সহপাঠী, কর্ম্মী ও বিভিন্ন দেশের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে জনৈক পোলিস শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। দেড় বৎসর পরে পোল্যাণ্ড দেশ ঘুরিবার সময়ে সেখানকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়-শহর ক্রাকভে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সঙ্গে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তিনি সরকারী আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। তাঁহার সৌজন্যে ও বিশেষ উদ্যোগে স্কুল-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে সেখানকার বিদ্যালয়-সমূহের কাজকর্ম্ম দেখিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। ক্রাকভ ছাড়িবার পূর্ব্বে সেখানকার শিক্ষক বন্ধুবান্ধবরা আমাকে ছাত্রছাত্রীদের নানাপ্রকার খেলা ও জাতীয় লোক-ক্রীড়া দেখাইবার আয়োজন করেন। নানা রঙের বিভিন্ন স্থানীয় পোষাকে লোক-ক্রীড়া অতিশয় রমণীয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, নৃত্যকলা সেই সব দেশে শিক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ

করিবার কালে চিরপ্রচলিত প্রাচীন লোক-ক্রীড়া ও নৃত্যের যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ক্রাকভের ঐ দিনের নৃত্য ও খেলা এত মনোরঞ্জক হইয়াছিল, যে, বিশেষ করিয়া ঐ সকলের ছবি



কাঠুরিয়ার নৃত্য



কয়োমিকা শহরের নৃত্য



বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নৃত্য



মাঙ্গলিক-উৎসবের নৃত্য



ওবেরেক নৃত্য



ভৃত্যের নৃত্য

সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা জনৈক বন্ধুর নিকট জ্ঞাপন করি। পরে ওয়ার্‌স নগরীতে ফিরিয়া আসিলে পোলিস মন্ত্রীমণ্ডল হইতে মাদাম সফিয়া গুলিনস্কার সৌজন্যে সেখানকার বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর তুলিতে আঁকা ঐ সব লোক-ক্রীড়ার প্রতিচ্ছবি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

স্থান ও প্রদেশের নামে সাধারণতঃ নৃত্য সকলের নামকরণ হইয়াছে। প্রত্যেকটি ছবির নীচে ক্রীড়ার নাম ও চিত্রকর শ্রীযুক্ত স্ত্রেনস্কার নাম রহিয়াছে। সেইগুলি হইতে কয়েকখানা 'প্রবাসী'র পাঠক-পাঠিকাদের—বিশেষ করিয়া নৃত্যকলানুরাগী ও শিল্পীদের—উপভোগ্য হইতে পারে, এই বিবেচনায় উপহার দিতেছি।

চৈত্র-শেষ

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

নিঃশ্বসিয়া বনতলে নিমের কুসুমদলে
আন্দোলিয়া ওগো চৈত্র-দিবা,
ফিরে কি দেখ না চেয়ে ধূ-ধূ শূন্য মাঠ ছেয়ে
পড়ে আসি খর রৌদ্র-বিভা!
পড়ে আসি চোখে মুখে পড়ে রিক্ত, দীর্ণ বুকে,
ভূমি-লক্ষ্মী বিধবা-বেশিনী—
ধরিছ কি একতারে দীপ্ত বহ্নি-বারতারে—
জ্বালার সঙ্গীত রিণিঝিনি!

প্রভাতে ফুটিলে কলি কত এসেছিল অলি
সুকুমার গুঞ্জন-বিলাসী—
দেখ নি তাদের পাখা ইন্দ্র-ধনু বর্ণমাখা
উষার ললিত লাজ-হাসি!
নমে নি কি তৃণ-শির? দেখ নি কি রজনীর
অভিসার-পদচিহ্নগুলি?
সারা রাত গান গেয়ে সে যে চলে গেল ধেয়ে
মল্লিকার বীথিকা আকুলি!

আজ খুলিয়াছি দ্বার, তপ্ত বায়ু অনিবার
বুকে লাগে ওগো চৈত্র-দিবা !
আজ র'ব কান পাতি তোমার ঝঙ্কারে মাতি
অগ্নিময়ী স্বর্ণচম্পা নিভা
রাগিণীরে ঘিরে ঘিরে পিঙ্গল গগন চিরে
শিখাসম সঙ্গীতের সনে,
প্রাণ মোর ঊর্দ্ধে চলে অদৃশ্য তারার দলে
জ্যোতির্ম্ময় কিরণ-কম্পনে !

অদূরে বাঁকের শেষে নীল জলধারা মেশে
ভাগীরথী বালুকা-বিলীনা—
শ্যামল শৈবালদল দোলাইয়া অবিরল
চলে জল কলশব্দহীনা !
দূর মেঠো পথ বাহি বধূরা চলেছে নাহি'
মুখগুলি দেখা নাহি যায়।
চলুক তোমার গান আমি ভরি মন-প্রাণ
দেখে লই কি আছে হোথায় !

দূর নভে চেয়ে চেয়ে হৃদয়ে এল কি ছেয়ে
মোহময় নীলাঞ্জন-রেখা !
নেত্র উঠে ছলছলি শ্যামা ধরণীরে বলি—
'ভাল ক'রে হ'ল না গো দেখা !'
কত সাধ, কত গান ভরিয়া উঠিত প্রাণ
কত প্রেম ফুটিতে না পায়—
ওগো চৈত্র, একবার ক্ষান্ত কর সুরধার
দেখে লই কি আছে হোথায় !

বিলের কিনার 'পর জেলেরা বেঁধেছে ঘর
খেলা করে কালো দু'টি মেয়ে ;
নিঃস্রোত, নিথর জলে দু'টি দাঁড় ঝলমলে
কা'রা চলে সারিগান গেয়ে—
ভরি সারা দিনমান পাখীরা ধরেছে তান
ঘুঘু শুধু টেনে চলে সুর !
ওগো চৈত্র, অবিরত সে সুর তোমারি মত
মনে আনে প্রদাহ মরুর।

অকারণ বেদনায় পরাণ উদাসি হায়
গাহ গান ওগো চৈত্র-দিবা,
ধূলিভরা পথ ধরি কে কোথা যাইবে সরি—
শ্রান্ত হ'বে খররৌদ্র-বিভা !
সাথে আন আজিকার শুধু পাতা ঝরাবার
বিবাগিনী বাউলী বাতাস—
কালের নিমেষগুলি মুঠায় ভরিয়া তুলি
বনে দাও গানের নিঃশ্বাস।

একটি বাঁশের শাখা গুলঞ্চ ফুলেতে ঢাকা
মালঞ্চে পড়েছে আজ নুয়ে—
বন-করবীরে ঘিরে প্রজাপতি ঘুরে ফিরে
মুকুলিত লিচুতরু ছুঁয়ে !
অরণ্য-মর্ম্মর-তলে কথা কানাকানি চলে—
আধ স্বর, আধ নীরবতা—
মধুপান করি শেষ, ছাড়িয়া যাবে কি দেশ ?
কোথা যা'বে ? কও সেই কথা।

তোমার সময় নাই নহিলে এ বন-ছায়
শিয়রে রাখিয়া একতারা,
গান শুনিতাম বসি মঞ্জরী পড়িত খসি
সব কাজ হ'য়ে যেত সারা !
কত হারা, ভোলা প্রাণ, কত বৃথা আত্মদান
কত মধু স্বপন-কাহিনী,
শুনাতে শুনাতে উঠে, সহসা চলিতে ছুটে
কণ্ঠে বহি উদাস রাগিনী !

গমকে গমকে সুর ধ্বনিছে মরম-পুর
শীর্ণ হাতে ধর মোর হাত ;
নবজীবনের দ্বারে হে বাউল, বারে বারে
কর গো কঠিন করাঘাত !
জনশূন্য ক্ষেত হ'তে উঠিছে সমীর-স্রোতে
দগ্ধ মাটি শেষশস্য ঘ্রাণ !
ওগো চৈত্র, সেইক্ষণে আসন্ন মেঘের সনে
শুনি যেন তোমার বিষাণ।

ডুকরি, হায়দরাবাদ, বোম্বাই

শ্রীশান্তা দেবী

মোহেঞ্জোদড়ো দেখার পর একবার নিকটবর্ত্তী ডুকরির বাজারটা দেখিয়া যাইব ভাবিলাম। বাজারের পথে টাঙ্গা ঢুকিবামাত্র দোকানে দোকানে ও পথের দুইধারে বিস্ময়স্তম্ভিত লোকের ভিড় জমিয়া গেল। বাঙালীর মেয়ে তাহারা কখনও দেখিয়াছে মনে হইল না। বিস্ময় যখন সীমা ছাড়াইয়া উঠিল, তখন আরম্ভ হইল সকলে মিলিয়া গাড়ীর পিছনে দৌড়ানো। একটা দোকানের সামনে টাঙ্গা থামিতেই ছোট ছোট মেয়েরা একেবারে আমার গায়ের উপর আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল। অভিভাবকদের মানা তাহারা শুনিল না। কেহ আমার জুতা, কেহ শাড়ির পাড়, কেহ হাতের চুড়ি হাত দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া তারিফ করিতে লাগিল। বাজারে কি আর দেখিব? তাই, দোকানদারদের ভাল ছিটের কাপড় দেখাইতে বলিলাম। বলিতেই বিলাতী আর্ট সিল্কের বোঝা আনিয়া হাজির! অনেক কষ্টে বুঝাইয়া দেশী ছাপানো চাদর কয়েকটা আবিষ্কার করা গেল; সেগুলা দীন দরিদ্র সকলেই গায়ে দিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার রূপ আছে। দামও কলিকাতা এবং বোম্বাই বাজারের অর্দ্ধেক। ভিড়ের মধ্যে ছেলেদের মাথায় দেখিলাম সুন্দর সুন্দর রেশম ও অভ্রের কারুকার্য্য করা টুপি, জরির টুপিও দুই একটা। কিনিতে চাহিলে পাওয়া গেল না। হাতের কাজ চাহিলে একজন কয়েকটা সাদা সুতার বিলাতী টেবিল ঢাকা আনিয়া দেখাইল, নিতান্ত ছেলেমানুষী বিলাতী নক্সার নকল কাজ করা। নিজেদের দেশের পুরাতন খাঁটি শিল্পের কাজগুলিকে ইহারা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে না।

ফিরিবার পথে সিন্ধু দেশের হায়দরাবাদে একবার নামিলাম। শহরটি অত্যন্ত আধুনিক। প্রকৃতি এখানে অনেকটা বাংলা দেশের মত। সিন্ধু দেশের অনেক জায়গায়ই খাল কাটিয়া জল আনিয়া শস্যক্ষেত্র তৈয়ারি হইয়াছে। আগে দেখিয়াছি রাজপুতানা ও সিন্ধুদেশের মাঝামাঝি জায়গায় ঘন সবুজ শস্যক্ষেত্র, আকাশে পাখীর ঝাঁক, বক চিল উড়িয়া চলিয়াছে, দূরে বড় বড় গাছ, মাঝে মাঝে ভিজামাটি। এসব ক্ষেত্রই খালের জলে পরিপুষ্ট। কিছু দূর রাজপুতানার মরুভূমির মত জমি, আবার তাহার কাছেই সারি সারি কাটা খাল ও পাশে পাশে সবুজ শস্যক্ষেত্র। কোথাও রেল লাইনের একধারে মরু আর একধারে চাষবাস, গাছপালা।

সিন্ধু দেশের পোষাক-পরিচ্ছদ, রাজপুতানা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। এখানে পুরুষদের হাজার রঙের পাগড়ী অন্তর্হিত হইয়া কালো টুপি দেখা দিয়াছে, পোষাক কোট ও ঢিলা পাজামা অথবা পুরা সাহেবী ড্রেস্। অল্পবয়স্ক অনেক সিন্ধী বালককে দেখিয়া ফিরিঙ্গী বলিয়া ভ্রম হয়। মেয়েদের পোষাকে কোনো সৌন্দর্যই চোখে পড়ে না। অধিকাংশ সাদা ঢিলা পাজামা, সাদা জামা ও সাদা ওড়না। পাজামা পেশোয়াজ কি চুড়িদার কিংবা ঘোরানো নয়, রঙের খেলাও পোষাকে প্রায় নাই। দুই একটি মেয়েকে বিলাতী রঙীন সিল্কের পাজামা পরিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাও সুদৃশ্য নয়, ইহাতে শাড়ী কি ঘাঘরার ভাঁজ ও দোলা নাই, আবার কাটা পোষাকের মাপ ও যুতসই কোনো কাটও নাই। ঘোমটাহীন অনেক অল্পবয়স্কা সিন্ধী মেয়েকে দেখিলাম বাঙালীর মত শাড়ী পরা। তাহারা দেখিতেও বাঙালীরই মত, কেবল অনেকে লম্বায় একটু বড়। পুরুষদের মুখের ভাব খুব বেশী বাঙালীর মত, তবে বাঙালীর সঙ্গে তাহাদের কাহারও কাহারও লম্বা চওড়া শরীরের তুলনা চলে না। এ দেশের খাদ্যেও বাঙালীর মত মৎস্যের প্রাধান্য দেখা যায়। খাবার দিবার জন্য পাতার ঠোঙ্গা এত পথ পরে এখানে আবার চোখে পড়ে।

হায়দারাবাদ ষ্টেশনের কাছেই মাটিলেপা বিরাট একটি কেল্লা। ট্রেন হইতেই সমস্ত শহরটা দেখা যায়, প্রত্যেক



পোল্যাণ্ডের কয়েকটি নৃ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বাড়ির মাথায় যেন এক জোড়া ডানা, শহর শুদ্ধ ঠিক উড়িবার ভঙ্গীতে রহিয়াছে। কাছে গিয়া মনে হইল এগুলি বোধ হয় স্কাইলাইট্। ষ্টেশনের বাড়িটা ভারী সুন্দর, অনেকটা যোধপুরের রেভিনিউ অফিসের মত।

এই অত্যন্ত আধুনিক ধরণের শহরে মাঝে মাঝে বাড়ির দেয়ালে সিন্ধু দেশীয় রঙীন টাইল বসানো ছাড়া বাড়িঘরে আর কোনো সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলাম না। সর্ব্বত্র বিলাতী জিনিষপত্রের ছড়াছড়ি। দেশী জিনিষ দোকানে কমই মনে হইল। খোঁজ লইতে লইতে অবশেষে শহরের একেবারে পট্টিতে ঢুকিলাম। সেখানেও এ দেশী ফুলকরি সেলাই ও রূপার উপর এনামেলের কাজ অনেক খুঁজিয়া তবে এক জহুরীর দোকানে দেখিলাম। একবোঝা নানা রকমের আশ্চর্য্য সুন্দর সেলাই তাল পাকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। রূপার উপর নীল এনামেল করা অনেক রকম গহনা আশ্চর্য্য সস্তা মজুরীতে দিতেছে। আমাদের বিস্ময় দেখিয়া জহুরীদের হুঁস হইল; আগে জানিলে আর একটু বেশী দাম চাহিত।

সারাদিন দোকানে বাজারে ঘুরিয়া বেলা ৩টায় হায়দাবাবাদ ছাড়িয়া সিন্ধু নদ পার হইয়া লুনী মাড়বার জংশন আবুরোড ইত্যাদির পথে চলিলাম। মেয়েদের লালকাল ঘন বেগুনী ছিটের ঘাঘরা ও ওড়না এখনও আছে তবে যোধপুরের মত উজ্জ্বল পীত আর নাই। গুজরাট কাছে আসিতেছে। সিন্ধু হইতে হাল্কা রং ও ছিটের অথবা শাদা শাড়ী পরা গুজরাটি মেয়েদের দেখা যায়। সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধীর সাবরমতী ছড়াইয়া রাত্রি ন'টায় আহমদাবাদ পৌঁছিলাম। সাবরমতী ষ্টেশনে ও বাহিরে খুব ঘন বাগান, কিন্তু কোনো বাড়ি দেখা গেল না। ঐটুকু দেখিয়াই মনটা খুশী হইয়া উঠিল। আহ্মদাবাদের আশে পাশে বড় বড় বাগানবাড়ি, নানা জায়গায় মস্ত মস্ত কলের চিমনী। ষ্টেশনে প্লাটফরম এত লম্বা যে হাঁটিয়া যেন শেস করা যায় না।

এখানে অন্য গাড়ী ধরিয়া সারারাত নিদ্রার পর একেবারে বোম্বাই মুল্লুকে ঘুম ভাঙিল। শহর আসিতে দেরি ছিল, কিন্তু দূর হইতেই পাহাড় আর সমুদ্র দেখা যায়; শহরতলীতে কত যে ষ্টেশন! শহরে যত না মানুষ তাহার অনেকগুণ বোধ হয় এই সব জায়গায়। ছোট ছোট ষ্টেশনে অসংখ্য মেছুনী কাছা দিয়া সুন্দর সুন্দর রঙীন শাড়ী পরিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ নামাইতেছে। তাহাদের সাজপোষাক ও পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মেছুনী বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাঙালীর সাহস হয় না। বাংলা দেশের



বাদশা আওরংজীব

মেয়েরা যে-সব শাড়ী খুব সৌখীন মনে করিয়া বিদেশ হইতে আনাইয়া পরেন, এখানে সে শাড়ী মেছুনীরাও পরে দেখিয়া বিস্ময় বোধ হয়। অথচ বাঙালী মেছুনী, মজুরনী কি চাষার মেয়েদের কাপড়চোপড় কি অপরিচ্ছন্ন ও শ্রীহীন! কোনো বিদেশিনী সখ করিয়া তাহার নকল করিতেছেন স্বপ্নেও ভাবা যায় না। সমুদ্রের জল মাঝে মাঝে ডাঙার ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে সেখানে শুভ্র ডানা মেলিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সীগল্ উড়িতেছে। দূরে অনেক ছোট ছোট পালতোলা নৌকা। সমুদ্রের দিকে তাকাইলে

ইহা আমাদের দেশ বলিয়া মনে হয় না। এখানকার মানুষের পোষাক চেহারা হাঁটা চলা ধরণ ধারণ সবই ভারতের অন্যান্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র। শহরতলীগুলি যতটা দেখা যায় খুব পরিষ্কার পরিছন্ন এবং প্রাসাদের মত বড় বড় বাড়ী চারিধারে শোভা পাইতেছে। ইউরোপ



শিবাজী

দেখি নাই, কিন্তু তবু মনে হয় যেন সেই দেশের সঙ্গে সাদৃশ্য বোম্বাই প্রদেশের খুব বেশী। এখানে মেয়েদের মাথায় যে শুধু ঘোমটা নাই তাহা নহে, ইহাদের ধরণ ধারণ খুবই পাশ্চাত্য দেশের মত।

সকাল বেলাই ছোট ছোট ষ্টেশনের বেঞ্চে বসিয়া অথবা প্লাটফরমে বেড়াইয়া মেয়েরা বই হাতে বৈদ্যুতিক ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছে। বৈদ্যুতিক ট্রেন অল্পক্ষণ দাঁড়ায়, গাড়ী আসিবামাত্র মেয়েদের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সিল্কের শাড়ী পরা চশমা-শোভিতা নব্যা মহিলা ও মেছুনী পসারিনী ইত্যাদি—সবাই টপাটপ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। গাড়ীতে ভয়ানক ভিড় এবং গাড়ী ছোটে ঝড়ের মত, মেয়েরা মাথার উপর খাটানো লোহার ডাণ্ডা শক্ত করিয়া ধরিয়া কামরায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই চলিয়াছে।

বোম্বাই শহরে শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীর আতিথ্যে পাঁচদিন খুব আনন্দে কাটিয়াছিল। ঠিক সমুদ্রের ধারেই অবজারভেটারীর বাগান বাড়ি; চোখের সামনে নীল আকাশের নীচে সমুদ্রের নীল জল সারাদিন খেলা করিতেছে। কলিকাতা শহরের রূপহীন জীবনের পর এই সাগরক্রোড়ের নীড়টিতে বসিয়া যেন কল্পলোকে নূতন জন্মলাভ হয়।

এখানকার সমুদ্রে উন্মত্ত ঢেউয়ের নৃত্য নাই, ছোট ছোট ঢেউ আসিয়া বালুতটের পাথরের গায়ে কচি মেয়ের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া খেলা করিয়া চলিয়াছে সারাদিন। যতদূর দেখা যায় সমুদ্রের জল নদীর মত স্থির, আর মাঝে মাঝে আলোকস্তম্ভ ও ছোট দ্বীপের উপর ছোট ছোট পাহাড়। রোদ পড়িয়া পরিষ্কার জল ঝল্‌মল্ করিতে থাকে, যেন অভ্রের গায়ে আলো লাগিয়া ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। একখানা পাল তুলিয়া ছোট বড় নৌকা অতি ধীর গতিতে গা ভাসাইয়া চলিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ করিয়া ষ্টীমারের কুশ্রীরূপের আবির্ভাব না হইলে এই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চোখ জুড়াইয়া যায়, সংসারীর মনের সকল অশান্তি ও তুচ্ছতা যেন নীল জলের তলে তলাইয়া চলিয়া যায়।

দুপুরে আকাশের রং ফিকা হইতে হইতে হাল্কা আশমানি হইয়া উঠে, তাহারই গায়ে একটুখানি বেগুনফুলী রঙের আমেজ দেওয়া সাদা মেঘ, তার নীচে দিগন্তে পাহাড়ের সারি মধ্যদিনের আলোর সূক্ষ্ম পরদার আড়ালে একটু আবছায়া হইয়া আসিয়াছে। তার নীচে ইস্পাতের মত ঘননীল সমুদ্রের অতি মৃদু কম্পন; আলোছায়ার খেলায় কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও কালো, কোথাও বা কোনো রঙীন আলোর মায়ায় একটু মরচে-ধরা লালচে মত। পাল তুলিয়া জলে কোনো আলোড়ন না করিয়াই ছোট ছোট নৌকাগুলি ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহাদের গতি দেখিয়া মনে হয় যেন পালকের মত হাল্কা; রোদ পড়িয়া শাদা পালের খানিকটা রূপার মত চকচক করে



জেনানায় পোলো খেলা

আর খানিকটা ছায়ায় ধোঁয়াটে। সন্ধ্যায় জল শেওলার মত সবুজ হইয়া আসে। সমুদ্রের জল বাগানের ফাঁক দিয়া খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা যায় না। সমুদ্রের সত্যই মায়া আছে। স্থির জলও যেন "এস এস চল ভেসে যাই," বলিয়া ডাক দিতে থাকে।

অবজারভেটরীর চারিধারে গোরাদের আড্ডা। সমুদ্রের ঠিক ধারে জলের দিকে মুখ করিয়া একটি কামান বসানো। রাত্রে শহর ঘুরিয়া বেড়াইতে গেলাম। বোম্বাই আধুনিক শহর, সুতরাং ঘরবাড়ী পথঘাট কলিকাতা হইতে বিশেষ ভিন্ন রকম নহে। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। কলিকাতায় চৌরঙ্গী প্রভৃতি পথ এবং দক্ষিণ দিকের ঘরবাড়িতে যে শ্রী দেখা যায়, উত্তর দিকে তেমন প্রায় দেখা যায় না। বোম্বাই আমি যতটা দেখিলাম ততটা সবই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়িগুলি পাশ্চাত্য ধরণের, কিন্তু অধিকাংশই সুদৃশ্য। পথের ধারে ধারে জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ নর্দ্দমা নাই, বারান্দা হইতে নোংরা কাপড় গামছা ও বিছানা ঝুলিয়া থাকে না, পথের লোকেরা পরিষ্কার কাপড় প্রায় সকলেই পরে, মেয়েদের ত একজনকেও বেশভূষায় উদাসীন মনে হয় না। যাহাদের বিলাসে অর্থ ব্যয় করিবার সাধ্য কি ইচ্ছা নাই, তাহারাও পরিচ্ছদে সুরুচির পরিচয় দিয়াছে।

এখানে বেড়াইবার জায়গা যত দেখিলাম সর্ব্বত্রই মেয়েদের ভিড়। মারাঠি মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় রঙীন শাড়ী পরিয়া খোলা মাথায় খোঁপায় সাদা ফুলের মালা জড়াইয়া চটি পায়ে ঘোরে, তাহাদের সহজ স্বচ্ছন্দ চলাফেরার সঙ্গে এই বেশটি ভারি সুন্দর মানায়। পার্শী ও গুজরাটীদের মধ্যে দৈহিক সৌন্দর্য্য বেশী। কিন্তু পার্শীদের বিলাসিতা ও পাশ্চাত্য ভাবভঙ্গী এত উগ্র যে, মারাঠি ও পার্শীকে পাশাপাশি দুই জগতের মানুষ মনে হয়। তবে আজকাল আবার একদল পার্শী মহিলা স্বদেশীর দিকে খুব ঝুঁকিয়াছেন। তাঁহাদের পরণে খদ্দর, তসর, গরদ, পায়ে মোজাহীন চটিজুতা। সিল্কের মোজা, উঁচু গোড়ালির নানা রঙের জুতা, বিলাতী ফিতা ও সিল্কের বহুমূল্য পোষাক ইত্যাদির বদলে সাদাসিদা গরদের শাড়ী ও চটি জুতায় এই সুন্দরীদের

দেখিতে অনেক ভাল লাগে। চুল বব্ করা ও লিপষ্টিক লাগানোটাও ছাড়িয়া দিলে ইঁহাদের স্বদেশী বেশ আরও সুশ্রী হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বোম্বাই শহর সমুদ্রকে অশ্বখুরের মত বেষ্টন করিয়া আছে। তাই সন্ধ্যায় মালাবার পাহাড়ের আলো জলের ও-পারে কোলাবা হইতে দীপান্বিতার আলোর মালার মত প্রত্যহই দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে, আবার মালাবার পাহাড় হইতেও এ দিকের আলো তেমনি নয়ন তৃপ্তিকর। মালাবার পাহাড় যদিও বেশী উঁচু নয়, তবু ইহার পথ ঘাট দার্জ্জিলিঙের মত লাগে। ইহার মাথার উপর জলের বৃহৎ পুষ্করিণী ঢাকিয়া একটি মস্ত বাগান আছে। সন্ধ্যায় সেখানে অল্প আলোয় ঘাসের উপর মেয়েরা একলা, দুজনে অথবা পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে বেশ ঘুরিয়া বেড়ায়, গল্প করে। তাহাদের কোনো ভাবনা কি ভয় আছে মনে হয় না। পাহাড়ের উপর ও নীচে অনেক জায়গা সমুদ্রের ধারে বসিবার আসন আছে। কোলাবার সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট ছেলেরা খুব ভিড় করিয়া বেড়াইতে আসে। এদেশে ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলেই বাঙালীর চেয়ে ঘরের বাহিরে ঘুরিতে বেশী জানে।

আমাদের বন্ধু এক পার্শী দম্পতির আতিথ্যে এখানকার একটা বড় ক্লাব ঘুরিয়া আসিলাম। ওয়েলিংডন ক্লাবের প্রকাণ্ড মাঠ বাগান বাড়ি। শহর হইতে কয়েক মাইল সুন্দর তরুবীথির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। সেই সযত্নরক্ষিত বাগান ও ময়দানে দেশী ও বিলাতী বহু নরনারীর মেলা। বাংলাদেশে সাহেব মেম ও এত দেশী স্ত্রী পুরুষ এক ক্লাবের সভ্য কোথাও আছে বলিয়া জানি না। প্রায় কোনোখানেই ত বাঙালীর স্থান নাই। পার্শীরা ধনী কোটিপতি, লক্ষপতি বলিয়া তাহাদের সঙ্গে এক ক্লাবে যাইতে পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষদের আপত্তি নাই, বরং তাহাদের বাদ দিতেই ভয় আছে। বাঙালীদের টাকা নাই সুতরাং শ্বেতাঙ্গের তাহাদের পাশে বসা চলে না।

বোম্বাই শহরে একটা বাজার আছে; সুলেখিকা শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী প্রভৃতি মহিলাদের উদ্যোগে তাহা আগা-গোড়াই স্বদেশী করিয়া ফেলা হইয়াছে শুনিলাম। বাজারটির সর্ব্বটাই ঘুরিয়া দেখিলাম, কোথাও একটি বিলাতী জিনিষ নাই। বাজারে কাপড়ের দোকানই সবচেয়ে বেশী। এখানকার মিলে অনেক রকম শাড়ী হয়, কত রঙের, কত পাড়ের, কত নক্সার যে ছড়াছড়ি বলা যায় না। ডুরে, চৌখুপী, জরিদার সব রকম কাপড়ই মিলে তৈয়ারী হয়। বাংলা দেশে ইহার দশ-ভাগের এক ভাগও নাই। বাঙালী মেয়েরা সাদা কাপড় বেশী পরে, এবং মিলের কাপড় আটপৌরে ভিন্ন ব্যবহার করে না বলিয়া হয়ত এত রকম কাপড় এ দেশে দেখা যায় না। বাঙালীর মেয়ে কোথাও যাইতে ২৷৷০।৩৲ টাকা দামের তাঁতের কাপড় পরিলেও ৫৲।৬৲ টাকা দিয়া মিলের কাপড় পরে না। আবার অন্য দিকে বোম্বাই মুলুকের মেয়েরা যতই দরিদ্র মুটে মজুর হউক রঙীন ও সুদৃশ্য কাপড় ছাড়া পড়ে না। সুতরাং মিলকে সে কাপড় যোগাইতেই হয়। অবশ্য বাঙালী মেয়ের মত ১৲।১৷০ সিকার কাপড় সেখানে কেহ পরে বলিয়া আমার মনে হয় না। পর্দ্দার দেশে পোষাকে পয়সা খরচ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আমরা অনুভব করি না। ঘরের ভিতর ছেঁড়া ময়লা কুশ্রী যে কোনো কাপড় একটা পরিলেই হইল।

দোকানগুলিতে মেয়েদের ভিড় খুব, কিন্তু কোথাও চেয়ার নাই। সর্ব্বত্রই মেয়েরা দোকানীর পাশেই ছোট গদির উপর ফরাসে বসিয়া কাপড় বাছিতেছে ও কিনিতেছে, অধিকাংশেরই পরিধানে মিলের শাড়ী। শাড়ীগুলি সবই প্রায় সরোজিনী নাইডু কিম্বা কমলা দেবী মার্কা, কিছু কস্তুরী বাঈ মার্কা। গুজরাটি মেয়েদের মধ্যে সাদার উপর আঁচলতোলা ও ফুল তোলা শান্তিপুরে শাড়ীর বেশ চলন আছে। এই কাপড় অনেক দোকানেই আছে। ঢাকাই শাড়ী এখানে সৌখীন বলিয়া চলিত। ছাপানো গরদের শাড়ী সমস্তই মুর্শিদাবাদ বহরমপুর ইত্যাদি বাংলা দেশের কাপড়ে হয়। রেশমটা বাংলা দেশের কিন্তু ছাপানো ও রঙানো বোম্বাই শহরে। এমন কি বাংলা দেশের ব্যবহারের কাপড়ও বেশী ভালগুলি বোম্বাই হইতে করিয়া আনা। শ্রীরামপুরের ছাপ বোম্বাইয়ের মত সুন্দর এখনও হয় নাই।

বাজারে বয়স্কদের খেলনা অর্থাৎ সুগন্ধি তেল, সুগন্ধি ক্রীম, রঙ বেরঙের কাপড়, চামড়ার জিনিষ ইত্যাদির

অনেক আয়োজন আছে, কিন্তু শিশুদের খেলনার দিকে কাহারও নজর নাই। সেই চির পুরাতন কাশীর কাঠের ও পিতলের খেলনার দুই একটি দোকান মাত্র সার। ভারতবর্ষের যেখানেই স্বদেশী খেলনা খুঁজিবেন, হয়ত কাশীর ছাড়া আর কোথাকারও মিলিবে না। জয়পুরের খেলনা জয়পুরে ও কলিকাতায় কিছু দেখা যায়, কিন্তু সে সাজাইয়া রাখিবার মতই বেশী, খেলিবার মত তত নয়।

বোম্বাইয়ে সাহেবী দোকানের পাড়ায় অনেক ধনী কন্যা ও ধনী গৃহিণী মিলিয়া "স্বদেশী" নামে একটি উঁচু দরের জিনিষের দোকান করিয়াছেন, সেখানে স্বদেশী চকোলেট, লজেঞ্জ, ও সীসার ঘোড়সওয়ার কিছু দেখিলাম। এই দোকানের তোয়ালে চাদর ইত্যাদি বিলাতী ফ্যাসনেবল জিনিষের মত সুদৃশ্য। দোকানের সব ব্যবস্থাই সুন্দর। আমাদের বাংলা দেশের মহিলা-পরিচালিত দোকানে এমন সুব্যবস্থা নাই, কারণ এখানে অর্থ ও বিদ্যায় ধনী মেয়েরা এ সব কাজ করেন না।

বোম্বাইকে প্রাসাদপুরী বলিয়া থাকে। ইহার বাড়িগুলি আকারে, উচ্চতায় এবং আলোকমালায় প্রাসাদতুল্য বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য ধরণের বলিয়া, ভারতীয়ের চক্ষে প্রাসাদ মনে হয় না; যেন সবই আপিস আদালত। জয়পুরকে আমাদের চক্ষে প্রাসাদনগরীর মত নয়নমোহন লাগে।

এখানে ইংরেজদের চেয়ে পার্ক ইত্যাদিতে দেশী মানুষের ভিড় বেশী। মেয়েরা ত দলে দলে বেড়ায়।

বোম্বাই স্কুল অব আর্টে দেখিবার মত কিছু থাকিবে মনে করিয়া গিয়াছিলাম। বাড়িটি প্রকাণ্ড, আয়োজনের সমারোহ খুবই, ভাস্কর্য্য বিদ্যা শিখাইবার জন্য ইঁহারা অনেক পয়সা খরচ করেন বোঝা গেল, শরীর গঠন শিখিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। অনেক বড় গ্রীসীয় মূর্ত্তির ছাঁচ ঘরে ঘরে সাজানো, মানুষের শরীরের প্রতি অঙ্গকে নানা ভাবে ও নানা দিক দিয়া দেখাইবার ছাঁচ অসংখ্য। কিন্তু দেশী ছাত্রেরা যে-সব মূর্ত্তি গড়িয়াছে তাহাতে এদেশের মানুষ সবাই আতুরাশ্রমের রুগী বলিয়া মানুষের না ভ্রম হয়। যাহারা সুস্থ দেখিতে তাহাদেরও আদর্শ-গুলিকে বোধ হয় কুশ্রীতার জন্য পয়সা দিয়া ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। সুন্দর মুখ দুই তিনটা অনেক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কুশ্রী মুখগুলিতেও উল্লেখযোগ্য কোনো ভাবের কি কল্পনার প্রকাশ মনে পড়ে না। দেওয়ালের গায়ে যে-সব বড় বড় ছবি আছে, তাহার দুইটি মাত্র আমার ভাল



বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি

লাগিল। মানুষের শরীরকে নানা ভাবে ঘুরাইয়া দুমড়াইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখাইতেই ছাত্ররা বেশী ব্যস্ত মনে হয়। ছবি ছবি হইল কি না, সে দিকে বাঙালী চিত্রীদের নজর অনেক বেশী।

বোম্বাই মিউজিয়মটি কিন্তু চিত্রসম্পদে আশ্চর্য্য ধনী। পাঁচ দিন মাত্র শহরে ছিলাম, কিন্তু তাহারই মধ্যে দুই দিন মিউজিয়ম দেখিতে গিয়াছি। একতলায় প্রবেশ-পথের হলে এখানেও কয়েকটি গ্রীসীয় মূর্ত্তি, তবে কতকগুলি ভাল সেলাই ও বেনারসী কাপড়ও সেই ঘরেই দেখা যায়।

ডানদিকের হলে বাদামীর হরপার্ব্বতী বিষ্ণু ও ব্রহ্মার চারিটি বড় বড় খোদিত চিত্র আছে। এখানে এলিফ্যান্টা ও ধারওয়ারের ভাস্কর্য্যের অনেক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখিলাম।



ধ্যানী বুদ্ধ

মিউজিয়মের কলা-বিভাগের অধিকাংশই স্যর রতন তাতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। তিনি উইল করিয়া ইহা মিউজিয়মে দান করিয়া যান। আমাদের দেশের একজন মানুষ—যিনি ব্যবসায়ী বলিয়াই পরিচিত—শিল্পকলার জন্য এত টাকা অজস্র ব্যয় করিয়াছিলেন দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। কোটি টাকার কমে এ সংগ্রহ সম্ভব মনে হয় না। শুধু অর্থ ব্যয় নয়, মানুষটি আসল জহুরী ছিলেন তাহা তাঁহার সংগ্রহই সাক্ষ্য দিতেছে।

ভারতীয় ছবির ঘরগুলি সকলের চেয়ে কোণের দিকে এবং সেখানে একটু আলো কম হইলেও দেখিতে বেশী অসুবিধা হয় না। এখানে ৪০০ বৎসরের পুরাতন অনেক মোগল-চিত্র, এবং তদপেক্ষা আধুনিক পারসীক ও রাজপুত চিত্র আছে। ছবিগুলি সময় কিংবা চিত্রাঙ্কন-রীতি অনুযায়ী সাজানো হয় নাই। কিন্তু অধিকাংশ ছবিই এত সুন্দর, তাহাদের রেখাঙ্কণ, তুলির টান প্রভৃতি এত সুক্ষ্ম যে শুধু দেখিয়াই যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। ৮০ নং ছবিতে খড়ম পায়ে জরির কাপড় পরা খোলামাথায় বেণে খোঁপা বাঁধা একটি তন্বী সুন্দরী গাছ তলায় দাঁড়াইয়া আছে। এত সুক্ষ্ম ও সুন্দর কাজে এমন মনোরম একটি মূর্ত্তি আঁকা সত্যই আশ্চর্য্য। ছবিটি অনাড়ম্বর বলিয়াই আরও সুন্দর। আরও তিন চারখানি ছবি এই ধরণে আঁকা। আওরংজেবের শেষ বয়সের কয়েকটি ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৩৯৮ হইতে ৪০৬ বার মাসের বারটি চিত্র। ছবিগুলি চোখে পড়িবার মত। ৪০৬ নং ফাল্গুনে হোলি খেলা। পুরুষেরা হাতীর পিঠে চড়িয়া মিছিল করিয়া রং খেলিতে খেলিতে চলিয়াছে। মেয়েরা দুতলা হইতে দেখিতে দেখিতে রং ছড়াইতেছে।

৫০৪ নং বাদশা বেগম সপরিবারে—রাজ-পরিবারের ঘরোয়া ছবি—খুব ঘন রঙের উপর স্পষ্ট করিয়া আঁকা। ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশিয়া বাদশাও মানুষ বলিয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছেন। সচরাচর বাদশাদের ফুল কি বাজ-পাখী হাতে একলার ছবিই দেখা যায়। তাই এটি অভিনব লাগিল। কয়েকটি ছবির ক্রমিক সংখ্যা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তাই দুই একটির উল্লেখ করিলাম। এইগুলিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তা বলা উদ্দেশ্য নয়। তবে শ্রেষ্ঠগুলির মধ্যে ইহারা পড়ে। সংখ্যা ধরিয়া পাঁচ-ছয় শত ছবির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, তাছাড়া দুই-একবার দেখিয়া চোখে ভাল লাগিয়াছে বলা যায়, তার চেয়ে বেশী বলিতে গেলে বিপদ্ ঘটিতে পারে। সুতরাং ছবির বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিব না।

মারাঠা রাজাদের পোষাক-পরিচ্ছদ বর্ম্ম ইত্যাদির একটি গ্যালারি আছে। দেখিয়া গৌরব ও আনন্দ হইল, যে, নানা ফড়নবীসের পত্নী ঢাকাই শাড়ী পরিতেন। ফড়নবীস নিজে যে শুভ্র মস্‌লিনের পোষাকটি পরিতেন তাহাও রহিয়াছে; পোষাকের নীচের দিকের ঘের বত্রিশ হাতের বেশী, কিন্তু তাহার ওজন আধসের মাত্র। ঢাকাই মস্‌লিন আরও আছে।

২নং গ্যালারীতে পারস্য দেশীয় কার্পেট, পর্দ্দা ছাড়া কচ্ছ, সিন্ধু ও লাহোরের নানারকম পর্দ্দা প্রভৃতির সুন্দর

হাতের কাজ আছে। কাশ্মীরী শালের ঘটাই বেশী। তাহাদের রং, নক্সা সেলাই, রং মিলানো সবই দেখিবার মত। শালগুলি বহুমূল্য।

একটি ঘরে অসংখ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির এবং দীপলক্ষ্মীর ধাতুমূর্ত্তি আছে। শক্তিমূর্ত্তি ও লক্ষ্মীমূর্ত্তিরও অভাব নাই। মূর্ত্তিগুলি আকারে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ইঞ্চির বেশী কমই আছে। গরুড়, গণপতি, নটরাজ ও হনুমানের বহুমূর্ত্তি আছে। রতন তাতার সংগ্রহে ইউরোপীয় চিত্র-করদের মূল্যবান ছবিও কতকগুলি আছে। এদেশে এ-গুলি দেখিতে পাওয়া শক্ত। টিশ্যান, গেন্‌জ্‌ব্রো, ডোবীন্‌য়ী, কন্‌স্‌টেবল ইত্যাদির ছবি দেখিলাম। এখানে শিবাজীর "বাঘনখ" আছে, কিন্তু আমার চোখে পড়ে নাই। পেশওয়াদের আতরদান, নস্যদানগুলি নিপুণ শিল্পের নিদর্শন।

চীন ও জাপানের শিল্পকলা সুবিখ্যাত। স্যর রতন তাতার বোধ হয় চীন ও জাপানী শিল্পের উপর খুব ঝোঁক ছিল। কতরকম স্ফটিক, চীনা মাটি, য়্যাম্বার, কাচ ও রঙীন মূল্যবান পাথরের বিচিত্র নস্যদানে দুইটি আলমারি বোঝাই। সেগুলি খুদিয়া খুদিয়া তাহার উপর শিল্পী কত মূর্ত্তি ও ছবি গড়িয়া তুলিয়াছে। এত ছোট পাত্রে এমন নিপুণ সুন্দর কাজ কি করিয়া সম্ভব হইল ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পোর্সিলেনের উপর উজ্জ্বল রঙের আঁকা ছবিও আছে। বহুবর্ণের মণিমাণিক্য (ইন্দ্রনীল, গোমেদ) খুদিয়া তৈয়ারী ছোট পাত্রগুলি দেখিলে চক্ষু ফিরানো যায় না। সবুজ স্ফটিক খোদিত দ্রব্যের এত ঘটা আর কোথাও দেখা যায় না। শুনা যায় রতন তাতার এই সবুজ স্ফটিকের (Jade) ঝোঁক খুব বেশী ছিল। তিনি বহুমূল্য জেড সংগ্রহ করিতে ভালবাসিতেন।

চীনা পোর্সিলেনের বহু মূল্যবান বাসন ও জাপানী হাতীর দাঁতের আশ্চর্য্য সুন্দর মূর্ত্তি এবং গালার কাজ অসংখ্য আছে। ফরাসী ও ভেনিশিয়ান কাচের জিনিষ এদেশে এত সুন্দর কোথাও দেখি নাই। জাপানী হাতীর দাঁতের শিশু বৃদ্ধ ও নারীমূর্ত্তিগুলি যেন এখনও চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। তাহাদের দাঁড়াইবার বসিবার ভঙ্গী, কাপড়ের ভাঁজ, মাথার চুল, মুখের হাসি সব এত জীবন্ত যে তিন চার মাসেও মন হইতে মুছে না।

মিউজিয়মের একতলায় বাংলার পাল রাজাদের সময়ের কতকগুলি তাম্রলিপি দেখিলাম।

একতলায় দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন সিন্ধুদেশের মিরপুর খাসের পোড়া মাটির বুদ্ধ মূর্ত্তি ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি রহিয়াছে। বুদ্ধের চুল মুখ প্রভৃতি জাভা, সারনাথ, তিব্বত ইত্যাদি বুদ্ধমূর্ত্তি হইতে অনেকটা বিভিন্ন। বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির বাবরী চুল দ্রষ্টব্য। মাটির জিনিষ এতকাল টিঁকিয়া আছে। সিন্ধুদেশের মাটি যে কত শক্ত তাহা আমরা মোহেঞ্জোদাড়োতে দেখিয়াছি।

লোহার উপর রূপার কাজ করিয়া পুরাকালে দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদে হুঁকা, পানদান, থালা, গাড়ু, গামলা প্রভৃতি অলঙ্কৃত হইত। ইহাকে বিদ্‌রী কাজ বলে। ইহার বহু নয়নরঞ্জক নিদর্শন মিউজিয়ামে রহিয়াছে। এই শিল্প আজকাল নষ্ট হইতে বসিয়াছে। রূপা, তামা ও পিতল মিশাইয়া যে-সব ঘড়া ঘটি থালা পূজার বাসন দাক্ষিণাত্যে ব্যবহার হয় সেগুলিতে তিনটি ধাতুকে গায়ে গায়ে নানা নক্সায় জোড়া দিয়া তিনটি ধাতুর রঙকেই ফুটাইয়া তোলা হয়। এই বাসনগুলির উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ রূপ পূজার বাসনেরই উপযুক্ত; ইহাতে ভারতীয় কারিগর-দের হাত ও চোখের আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ পায়। মিউজিয়মে এবং বোম্বাই স্কুল অব আর্টে এই রকম সুন্দর বাসন অনেক দেখিলাম। তামা পিতল মিশানো ঘড়া ও ঘটিগুলির গড়নও ভারী সুন্দর।

দেশীয় কারুশিল্পের ভাণ্ডার হিসাবে বোম্বাই মিউজিয়মটি উল্লেখযোগ্য, কলিকাতার মিউজিয়মে এত এই জাতীয় জিনিষ নাই। স্যর রতন তাতার সংগ্রহের গুণে বিদেশী কারু এবং চারুশিল্পও এখানে কলিকাতা অপেক্ষা বেশী। ভারতীয় চিত্র কলিকাতার আর্ট গ্যালারীতেও অনেক আছে। রতন তাতা, স্যর আকবর হইদরী ও দোরাব তাতা প্রভৃতির দানে বোম্বাই মিউজিয়মের আর্ট গ্যালারী খুবই সমৃদ্ধ।

এলিফ্যান্টা দেখিবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যেদিন যাইবার কথা তাহার আগের দিনই হঠাৎ পুনা চলিয়া যাইতে হইল; যাহার কথা মনে করিয়া সারাপথ আসিয়াছিলাম তাহাই অদেখা থাকিয়া গেল।

ভিখারী

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দেব

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। রাস্তার নালার কিনারায় দারুণ শীতের রাত্রি কাটাইবার জন্য ভিখারী আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। লাঠির ডগায় বাঁধিয়া ছোট্ট একটি পুঁটলী কাঁধে বহিয়া আনিয়াছে। এইবার পুঁটলীটি মাটিতে রাখিল এবং বালিশের বদলে ওরই উপর মাথা রাখিয়া পথশ্রম ও ক্ষুধায় অবসন্ন দেহ ঘাসের উপর বিছাইয়া দিল। অন্ধকার আকাশের গায়ে অসংখ্য তারকা ঝিকিমিকি করিতেছিল;—উদাসনেত্রে তারই দিকে চাহিয়া রহিল।

রাস্তার দুইপাশে জনমানবশূন্য নিবিড় বন। পাখী-গুলো পর্য্যন্ত তখন গাছের ডালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দূরে একখানি গ্রামের আবছায়া নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারকে যেন তালি দিয়া রাখিয়াছে। এই গভীর নিস্তব্ধতার ভিতর একাকী শুইয়া থাকিতে বুড়ার গলার ভিতর তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল।

বাপ-মার সঙ্গে জীবনে তার পরিচয় হয় নাই। দয়া করিয়া কেউ-বা হয়ত রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া বাড়িতে ঠাঁই দিয়াছিল। কিন্তু অন্ন-সংস্থানের জন্য অফুরন্ত পথই শৈশব হইতেই তার একমাত্র অবলম্বন। সংসার তার প্রতি বড়ই নির্ম্মম। দুঃখের ভিতর দিয়াই জীবনের সঙ্গে যা পরিচয়। কলঘরের ছায়ায় কত শীতের রাত্রিই না কাটাইতে হইয়াছে। ভিক্ষার লাঞ্ছনা।—মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা।—কতদিন ঘুমাইতে গিয়া ভাবিয়াছে, এই ঘুম যেন আর না ভাঙে। যারই সংস্পর্শে আসে, সে-ই ঘৃণা করে, সন্দেহের চোখে দেখে। প্রত্যেকটি লোকই যেন ভয়ে ভয়ে তাকে এড়াইয়া চলে; ছেলেমেয়েগুলো তাকে দেখিলেই দৌড়িয়া পলায়; তার ধূলিমাখা ছেঁড়া কাপড়চোপড় দেখিলে কুকুরগুলো তাড়া করিয়া আসে।

তবু কিন্তু জগতের কারও প্রতি তার কোন বিদ্বেষ ছিল না। আঘাতের পর আঘাত পাইয়া লোকটা একেবারে মুষ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল;—তাই প্রকৃতি ছিল নিতান্ত শান্ত!

ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। এমন সময় দূরে ঘোড়ার গলার ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল। ভিখারী মাথা তুলিয়া দেখিল, একটা উজ্জ্বল আলো তার দিকে আসিতেছে। উদাসনেত্রে আলোটার পানে চাহিয়া রহিল। একটা ঘোড়া মস্তবড় একখানা বোঝাই গাড়ী টানিয়া আনিতেছে। বোঝা এতই উঁচু এবং চওড়া যে মনে হইতেছিল, সমস্তটা রাস্তাই বুঝি জুড়িয়া গিয়াছে। গুন-গুন সুরে গান গাহিয়া লোকও একটি সঙ্গে আসিতেছিল।

ঘোড়াটাকে চাবুক মারিয়া লোকটা চেঁচাইতেছিল,—

"ওঠ্‌...ওঠ্‌...

গলা লম্বা করিয়া ঘোড়াটা প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ী টানিতেছিল। টানিতে টানিতে দুই-তিনবার থামিল। মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া টানিল, আবার উঠিল, শেষে এমনই জোরে একটা টান দিল যে তার আগের চামড়া কুঁকড়াইয়া পেছনে জমিয়া গেল। কিন্তু টাল সামলাইতে না পারিয়া ঘোড়াটা কাত হইয়া গেল এবং গাড়ীখানাও আর নড়িল না।

চালক তখন গাড়ীর চাকায় কাঁধ রাখিয়া হাত দিয়া গজাল ঠেলিতে ঠেলিতে আরও জোরে হাঁকিল,

"চল্‌!...চল্‌!...আগু!...আগু!..."

ঘোড়ার প্রাণান্ত চেষ্টাতেও গাড়ী নড়িল না।

"হট্‌!...হট্‌...আগু হট!"

চার পা ফাঁক করিয়া নাসা-গহ্বর কাঁপাইতে কাঁপাইতে ঘোড়াটা ঠায় একই জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল। আগ-পায়ের খুর দুইটি দিয়া অতিকষ্টে মাটি আঁকড়াইয়া

রাখিয়াছিল—যাতে অত বড় বোঝার টানে পিছু হটিয়া না যায়।

হঠাৎ খাতের ধারে ভিখারীর দিকে চোখ পড়িতেই চালক বলিয়া উঠিল,

"একটুখানি সাহায্য কর ভাই! জানোয়ারটা নড়তেই চাইছে না। উঠে একটু ঠেল।

ভিখারী উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীণশক্তিতে যতদূর সাধ্য ঠেলিতে ঠেলিতে সেও চালকের সঙ্গে হাঁকিতে লাগিল,

"হট্...হট্...আশু হট্..."

সব বৃথা!

নিজে হয়রান হইয়া ও ঘোড়াটার কষ্ট দেখিয়া ভিখারী বলিল,

"বেচারা শ্বাসটা টানুক! বোঝাটা ওর পক্ষে বড্ড ভারী হ'য়েছে।"

" মোটেই না! এর মত বদমায়েস আর দু'টো নেই! আজ যদি নাই দাও,—কাল আর পাহাড়ী রাস্তা উঠ্‌তেই চাইবে না। হেই! হেই! তুমি ভাই এক টুক্‌রো পাথর এনে চাকাটার তলায় ঠেস দাও। তারপর দু-জনে মিলে ওকে চালাবই..."

ভিখারী একখানা পাথর আনিল।

চালক বলিল—"ঠিক হয়েছে। আমি চাকায় থাক্‌ছি। ঐ যে ঐখানে চাবুকটা রয়েছে। ঐটে তুলে নিয়ে মাথা থেকে পা অবধি চাবকাও—পায়ে আচ্ছাসে লাগাবে...তা হলেই সায়েস্তা হবে..."

চাবুকের বাড়ির চোটে ঘোড়াটা আর একবার ভীষণ চেষ্টা করিল। খুরের ঘায়ে পাথর হইতে আগুনের ফুল্‌কী ছুটিয়া বেজায় শব্দ হইতে লাগিল।

"বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!"

কিন্তু ঘোড়াটা আড়-বাঁকা হইয়া হেঁচ্‌কা টান দেওয়ায় চালক যেমন চাকার নীচের পাথর সরাইয়া দিতে যাইবে অমনি পা ফস্কিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর বোঝা ঘোড়াটাকে পেছনে টানিয়া আনিল। চীৎকার করিয়া লোকটা চিৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। চোখ দুইটি তখন উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে, কনুই মাটিতে বসিয়া গিয়াছে, লোকটার মুখ-খেঁচুনীও আরম্ভ হইয়াছে। বোঝাসুদ্ধ গাড়ী যাতে বুকে না চাপে তার জন্যে চাকাটা শরীর হইতে সামান্য দূরে প্রাণপণে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া চালক বলিল,—

"সাম্‌নে হটাও! সাম্‌নে হটাও! একদম পিষে যাচ্ছি..."

চোখে না দেখিলেও ভিখারী অনুমানে বুঝিল, কি কাণ্ড ঘটিয়া গেল। চাবুক দিয়া ঘোড়াটাকে অনবরত পিটিতে সুরু করিল। চাবুকের বাড়ি সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোড়াটা হাঁটু গাড়িয়া একপাশে হেলিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানাও সামনে ঝুঁকিল এবং বোমা দুইটি মাটিতে পড়িয়া গেল। একই সঙ্গে লণ্ঠনটিও পড়িয়া নিবিয়া যাওয়ায় রাত্রির অন্ধকারে চালকের চাপা কাতরাণি ও ঘোড়ার ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না!

"ওঠ্!... ওঠ্!..."

ঘোড়াটাকে কিছুতেই মাটি হইতে উঠাইতে না পারিয়া চালককে মুক্ত করিতে ভিখারী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেল। কিন্তু চালক ততক্ষণে চাকায় আটকাইয়া গিয়াছে।

অমানুষিক শক্তিতে সে নিজ শরীরের দুই এক ইঞ্চি তফাতে চাকাটা ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। একবার ফস্কিলে—মুহূর্ত্তের জন্য সামান্য শক্তির অভাব হইলে—প্রকাণ্ড বোঝাই গাড়ীর চাপে সে একেবারে পিষিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। নিজেও সে কথা এতই স্পষ্ট বুঝিতেছিল যে, ভিখারীকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল,—

"ছুঁয়ো না। ছুঁয়ো না...দৌড়ে ঐ গাঁয়ে যাও... শীগ্‌গীর...বাড়িতে বাবা আছেন...লুসাদের বাড়ি...ডান হাতি প্রথম বাড়ি...মিনিট-দশেক চাকাটা ঠেকিয়ে রাখতে পারব...জল্‌দি...জল্‌দি..."

ভিখারী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। সোজা গিয়া সামনের গ্রামে ঢুকিল। সব দরজা বন্ধ।—না দেখা যায় একটু-খানি আলোর রেখা—না মিলে কোন জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ! ...ভিখারীর কিন্তু হুঁস্ ছিল না। পাহাড়ের তলায় পড়িয়া লোকটা যে কি কষ্টে পড়-পড় গাড়ীখানা নিজ শরীর হইতে সামান্য তফাতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, সেই চিন্তাতেই

সে অস্থির, অবশেষে সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে রাস্তা সমতল হইয়া চলিয়াছে। ডান হাতি একখানা বাড়ি। জানলার ফাঁক দিয়া যেন আলোর রেখা বাহির হইতেছে। —নিশ্চয় এই-ই সেই বাড়ি। ভিখারী গিয়া জানলায় ঘুষি দিল।

ভিতর হইতে কে একজন জিজ্ঞাসা করিল,

"কে—জুল ফিরে এলি না কি ?"

এতটা রাস্তা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসায় তার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। শুধু বার-বার জানলায় ঘা দিতে লাগিল। খাট ছাড়িয়া কে যেন উঠিল। জানালা খুলিয়া গেল। মাথা বাহির করিয়া ঘুম-জড়ানো চোখে লোকটি জিজ্ঞাসা করিল,

"জুল, ফির্‌লি না কি ?"

শ্বাস ফিরাইয়া নিয়া ভিখারী বলিল,

"না—, আমি এসেছি…"

লোকটি তাকে কথা শেষ করিতে দিল না।

"শুনে শরীর জল হয়ে গেল। এই দুপুর রাত্তিরে পাড়ার লোক জাগিয়ে মরতে এসেছিস কেন ? যা, যা, দূর হ, দূর হ,…"

ঘট্‌ করিয়া জানালা তার মুখের উপর বন্ধ করিয়া দিয়া লোকটা বিড়্‌ বিড়্‌ করিতে লাগিল,

"যত সব নিষ্কর্ম্মা, হাড়হাবাতে, ভবঘুরে…"

লোকটির নিষ্ঠুর বর্ব্বরতায় স্তব্ধ হইয়া ভিখারী যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

"এরা কি ভাব্‌ছে ? ভিক্ষা চাইতে এসেছি ? এদের কি অনিষ্ট করেছি ? বোধ হয় কাঁচা ঘুম ভেঙেছে তাই এত রাগ! আহা-হা, বেচারা যদি জান্‌ত তার কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে !"

ভয়ে ভয়ে আবার সে জানালায় ঘা দিল।

ভিতর হইতে ঐ লোকটাই আবার চীৎকার করিয়া উঠিল,

"এখনও যাস নি ? দাঁড়িয়ে আছিস্ ? আচ্ছা, তবে দাঁড়া। আবার বিছানা ছেড়ে উঠতে হ'লে মজাটা টের পাবি…!"

ততক্ষণে ভিখারীর সাহস ফিরিয়া আসিয়াছিল। দম ফিরাইয়া নিয়া সে জোরে বলিল,

"জানালা খোল…"

"যা, যা,…আর কোথাও যা… !"

"জানালা খোল…"

এবার জানালা খুলিল ; কিন্তু এত হঠাৎ এবং বেগে যে মাথা বাঁচাইতে ভিখারীকে লাফ দিয়া পিছু হটিতে হইল। খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া লোকটি রাগে থর থর কাঁপিতেছে—হাতে একটি বন্দুক।

"এ—ই—বদ্‌মায়েস, কথা কানে ঢোকেনি বুঝি ? এক্ষুণি বাড়ি না ছাড়লে এক কাঁচ্চা সীসে পেটে পুরে ফিরতে হবে জানিস্ ?"

ভিতর হইতে মেয়েলী গলায় কর্কশ আওয়াজ হইল,

"গুলি কর, পাড়ার লোকের হাড় জুড়োবে। কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, যত সব ভবঘুরে এর বাড়ি, তার বাড়ি রাত ভোর চুরি ক'রে বেড়ায়!…চুরি ত তবু ভাল…।"

তারই দিকে বন্দুক উঁচাইয়া ধরায় ভিখারী অন্ধকারে পিছাইয়া গিয়া কাঁপিতে লাগিল। তার ক্ষণিকের সঙ্গী যে ঠিক তখনই রাস্তায় পড়িয়া প্রতিমুহূর্ত্ত মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, সে কথা সে ভুলিয়া গেল। জীবনে এই-ই প্রথম একটা বিজাতীয় ক্রোধ তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এর পূর্ব্বে আর কেউ তাকে এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করে নাই।

না-হয় সে ক্ষুধায়ই কাতর। একটু আশ্রয়ের জন্যই না-হয় এত রাত্রে জানালায় ঘা দিয়াছিল। এই ত অপরাধ!—গোয়াল-ঘরের পেছনে সামান্য কিছু বিচালীও কি সে দাবি করিতে পারে না ? বাড়ির কুকুরটার সঙ্গে একটুকরা রুটি ? তার ছেঁড়া কাপড়ে মানুষের লজ্জা ঢাকে না। তাই ধনীরা তার দিকে বন্দুক উঁচায় ? রাগে তার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল !

একবার ভাবিল, লাঠির ঘায়ে জানালা ভাঙিয়া দেয় !– কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল,

"আবার যদি শব্দ হয় তবে লোকটা নিশ্চয়ই গুলি

করবে। যদি ডাকাডাকি করি, পাড়ার লোক জেগে উঠে কিছু শোনবার আগেই ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো করবে।”

মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া প্রায় লাফাইতে লাফাইতে সে ফিরিয়া ছুটিল। মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা জাগিয়া উঠিল, এদের সাহায্য ছাড়া একাই যদি তার পথের সাথীকে বাঁচাইতে পারে! পাগলের মত সে দৌড়িল! কে জানে, এতক্ষণে কি হইয়াছে!

একটা প্রবল উত্তেজনায় তার দেহে যুবকের শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। যেখানে লোকটাকে ফেলিয়া গিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেখানে পৌছিয়া ভিখারী ডাকিল—

“বন্ধু!”

কোন সাড়া নাই। আবার ডাকিল—

“বন্ধু!”

অন্ধকার এত গভীর যে ঘোড়ার ন্যায় বৃহৎ জন্তুটাকে পর্য্যন্ত দেখা গেল না। শুধু তার আওয়াজের মত একটা আওয়াজ শোনা গেল। ভিখারী অগ্রসর হইয়া দেখে, কয়েক পা আগে জন্তুটা কাত হইয়া পড়িয়া আছে এবং গাড়ীখানা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

“বন্ধু!…বন্ধু!”

সে নুইয়া খুঁজিতে লাগিল। এক টুকরা মেঘের আড়াল হইতে চাঁদ বাহির হইয়া আসিল। সেই আলোকে ভিখারী দেখিল—তার সঙ্গীর হাত দুইখানা দুইদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, চোখ দুইটি বুজিয়া গিয়া মুখ দিয়া রক্ত ঝরিতেছে, গাড়ীর প্রকাণ্ড চাকাখানি কাদায় যেমন বসিয়া যায় তেমনি তার বুকে বসিয়া গিয়াছে।

হতভাগার কোনই উপকারে আসিতে পারিল না বলিয়া ভিখারীর সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল ওর বাপ-মার উপর। প্রতিশোধের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। ঐ বাড়ির দিকে আবার তীব্রবেগে ছুটিল। এখন আর গুলির ভয় নাই। পৈশাচিক উল্লাসে অধীর হইয়া এইবার সে জানালায় ঘা দিল।

“ভুল, ফিরলি না কি?”

ভিখারী কোন উত্তর দিল না। জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া লোকটি যখন আবার ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল তখন সে বলিল,

“না! তোমার ছেলে রাস্তায় পড়ে মরছে, সেই খবরটা দিতে যে-ভবঘুরে একটুখানি আগে এসেছিল, সে-ই আবার ফিরে এসেছে!”

বাপ-মা দুইজনেই একসঙ্গে আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল,—

“বলে কি? ওগো, বলে কি? ভেতরে এস, ভেতরে এস…শীগ্‌গীর বাবা,…শীগ্‌গীর…”

কিন্তু ভিখারী ততক্ষণে তার ছেঁড়া কাপড়ে মাথা ঢাকিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল,—

“আমার আরও ঢের কাজ আছে। এখন আর তাড়াহুড়ো ক’রে লাভ কি। বড্ড দেরি করে ফেললে। আগের বার যখন এসেছিলুম তখন এই গরজটা দেখালে কাজ হ’ত…এখন যে বুকের উপর বোঝাই গাড়ীখানা নিয়ে সে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে…”

“দৌড়ে যাও…ওগো, দৌড়ে যাও…” মায়ের ব্যগ্রকণ্ঠ শোনা গেল!

তাড়াতাড়ি গায়ে একখানা কাপড় ফেলিয়া বাপ চীৎকার করিয়া ডাকিল,

“গেলে কোথায়? বাবা, শুনছ? ফের,—কোথা! ঈশ্বরের দোহাই…বল…”

ভিখারী কিন্তু তার একমাত্র সহায় লাঠিটি কাঁধে ফেলিয়া ততক্ষণে অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে।

শুধু, এদের ডাকহাঁকে ঘুম ভাঙিয়া গোবর-গাদা হইতে একটি মোরগ কোঁকর-কোঁ রবে ডাকিয়া উঠিল, আর পথের একটা কুকুর আকাশে চাঁদের দিকে মাথা তুলিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল!*

* ফরাসী লেখক মরিস্ লেভেলের গল্প হইতে।

পত্রধারা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জ্জিলিং

রাগ করতে যাব কেন? তুমি আমার নামে যে কয় দফা নালিশ তুলেছ প্রায় সবগুলোই যে সত্যি। অস্বীকার করতে পারব না যে অনেক কথাই বলেছি যা দেশের লোকের কানে মধুর ঠেকেনি। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন করতে গিয়ে সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন, প্রজারা জয় জয় করেছিল, সোনার সীতা দিয়ে তিনি ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছিলেন। দশের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে যদি সত্যকে নির্ব্বাসন দিতে পারতুম তাহ'লে সান্ত্বনার প্রয়োজনে সোনার অভাব ঘটত না। আমার চেয়ে ঢের বড় বড় লোকেরাও যে-কালে ও যে-সমাজে এসেছেন সেখানে তাঁরা তিরস্কৃত হয়েছেন—নইলে বিধাতা তাঁদের পাঠাবেন কেন? দশের ভিড়ে একাদশ দ্বাদশ সর্ব্বদাই আসে, কোম্পানীর কাগজ জমিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে আসে বিষম মুস্কিলটা, হিসাবী লোকের চটকা ভাঙিয়ে দেবার জন্যে। প্রতিধ্বনির সম্প্রদায়, প্রথার প্রাচীর তুলে অচল দুর্গ বানিয়েচে, তাদের কণ্ঠে কণ্ঠে পুঁথির প্রতিধ্বনি এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে হাজার হাজার বৎসর ধরে একটানা চলেইচে—মহাকালের শৃঙ্গধ্বনি মাঝে মাঝে জাগে সেই ফাঁকা আওয়াজের শূন্যতা ভরিয়ে দেবে ব'লে। পানাপুকুর স্তব্ধ হয়ে থাকে আপন পাড়ির বাঁধনে—হঠাৎ এক এক বছর বর্ষার প্লাবন আসে তার কূল ছাপিয়ে দিতে—সেটা দেখায় যেন বিরুদ্ধতার মত, কিন্তু তাতেই রক্ষে। আমি গোড়া থেকেই একঘরের দলে ভিড়েছি, ঘরের কোণ-বিহারীদের মাঝখানে যারা বেগানা—আমি সেই হা-ঘরেদের খাতায় নাম লিখিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লুম—খোরো যারা তারা মারতে আসবে, মারতে এসেই বেরোতে শিখবে।

তুমি লিখেছ আমি পুরাতন ভারতের প্রতিকূল। রঘুনন্দনের ভারতটাই বুঝি পুরাতন ভারত? দেবীদাসের কৌলীন্যই বুঝি সনাতন কৌলীন্য? মহাভারত পড়েছ ত?—পৌরাণিক যুগের আচার আচমনে উপবাসে বুকের হাড় বের-করা, পুরাতন ভারতের সঙ্গে কোন্‌খানে তার মিল? যে-পুরাতন ভারত চিরন্তন ভারত আমি তাকেই প্রণাম ক'রে মেনে নিয়েছি, তার বাইরে যাইনি। আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে-উপনিষদকে একদা বাংলা দেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিলেন রামমোহন রায়ের জাল-করা, যে-উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে-উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব ব'লে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার। সেই পরম চরিতার্থতা দেউলে দরোগায় নয়, পাণ্ডা পুরোহিতের পদসেবায় নয়। যে-য়ুরোপ জ্ঞানকে সংস্কারমুক্ত ক'রে কর্ম্মকে বিশ্বসেবার অনুকূল করেছে সেই য়ুরোপ উপনিষদের মন্ত্র-শিষ্য, তা সে জানুক বা না-জানুক। যে-য়ুরোপ শক্তিপূজার বীভৎস আয়োজনে বিজ্ঞানের খর্পরে নররক্তের অর্ঘ্য রচনা করেছে সেই য়ুরোপ জানে না বাহিরের যন্ত্র মনের দৈন্য তাড়াতে পারে না, যন্ত্রযোগে শান্তি গড়বার চেষ্টা বিড়ম্বনা। আমরাও যেমন অন্তরের পাপকে বাহিরের অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ করতে চেয়েছি, তারাও তেমনি অন্তরের অকৃতার্থতাকে বাহিরের আয়োজনে পূর্ণ করবার দুরাশা রাখে, এইখানেই যাকে আজকাল আমরা পুরাতন ভারত বলি তার সঙ্গে এদের মেলে। মেলে না সেই উপনিষদের সঙ্গে যিনি বলেচেন—

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুর্‌ অমৃতাস্তে ভবন্তি।

যে-দেবতা সকল জনানাং হৃদয়ে, যাঁর ধর্ম্ম আচার-বিচারের নিরর্থক ক্রিয়াকর্ম্ম নয়, সকল বিশ্বের কর্ম্ম, সকল আত্মার

মধ্যে যে-মহাত্মাকে উপলব্ধি করতে হয় তিনিই উপনিষদের দেবতা। তাঁকেই দেউলের মধ্যে সরিয়ে রেখেছে যাকে বলি পুরাতন ভারত—আর সোনার শিকলে বাঁধতে চেয়েছে স্বর্ণলঙ্কাপুরীর য়ুরোপ। এই উভয়ে পরস্পরের সতীন বলেই এদের প্রতি পরস্পরের এত বিরাগ। মানুষের আত্মায় যিনি মহাত্মা, মানুষের কর্ম্মে যিনি বিশ্বকর্ম্মা, আমি জেনে না-জেনে সেই দেবতাকেই মেনেচি,—তিনি যেখানে উপবাসী পীড়িত সেখান থেকে আমার ঠাকুরের ভোগ অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারিনে। খৃষ্ট বলেচেন, বিবস্ত্রকে যে কাপড় পরায় সেই আমাকে কাপড় পরায়, নিরন্নকে যে অন্ন দেয় সে আমাকেই অন্ন দেয়—এই কথাটাই ব্রহ্মভাষ্য। এই কথাটাকেই "দরিদ্র নারায়ণ" নামে আমরা হালে বানিয়েছি। যথার্থ পুরাতন ভারত, যে ভারত চিরনূতন—যে ভারতের বাণী, আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি—তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। আমার সব লেখা যদি ভাল ক'রে পড়তে তাহ'লে বুঝতে—আমার চিত্ত মহা-ভারতের অধিবাসী—এই মহা-ভারতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই।

যদি সময় পাই তোমার অন্য নালিশের কথা অন্য কোনো চিঠিতে বলতে চেষ্টা করব। ইতি ৩ আষাঢ় ১৩৩৮

২

দার্জ্জিলিং

আমার কল্পরূপকে আশ্রয় ক'রে যাঁকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেচ আমি তাঁকেই পূজা ক'রে থাকি, তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই—তিনি পরমমানব। নিজেকে বৃহৎ কালে বৃহৎ দেশে তাঁর মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিয়ে যখন আমি ধ্যান করি তখনি নিজেকে আমি সত্যরূপে জানি, আমার ছোট আমির যত কিছু ক্ষুদ্রতা সব বিলীন হয়ে যায়—তখন আমি সত্য আধারে নিত্য আধারে থাকি। তাঁরই আহ্বানে রাজপুত্র ছিন্নকন্থা প'রে পথে বেরিয়েছিলেন। বীরের বীর্য্য, গুণীর গুণ, প্রেমিকের প্রেম তাঁর মধ্যে চিরন্তন। তুমিও হৃদয় দিয়ে তাঁকেই গভীরের মধ্যে স্পর্শ কর, যেখানে তোমার ভক্তি, তোমার প্রীতি, তোমার সত্যকার আত্ম-নিবেদন। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ—তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁকে সত্য অনুভবের দ্বারা জানতে হবে, নিজের বাইরে, নিজের গভীরে। আমি শহরের মানুষ, একদিন হঠাৎ এক পল্লীবাসী বাউল ভিখারীর মুখে গান শুনলুম, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।" আমি যেন চমকে উঠলুম, বুঝতে পারলুম, এই মনের মানুষকে, এই সত্য মানুষকেই আমরা দেবতায় খুঁজি, মানুষে খুঁজি, কল্পনায় খুঁজি, ব্যবহারে খুঁজি, "হৃদা মনীষা"—হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে কর্ম্ম দিয়ে। সেই মহান আত্মার অমরাবতী হচ্ছে "সদা জনানাং হৃদয়ে।" কত লোক দেখেছি যারা নিজেকে নাস্তিক বলেই কল্পনা করে, অথচ সর্ব্বজনের উদ্দেশে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করেচে, আবার এও প্রায় দেখা যায় যারা নিজেকে ধার্ম্মিক ব'লে মনে করে তারা সর্ব্বজনের সেবায় পরম কৃপণ, মানুষকে তারা নানা উপলক্ষ্যেই পীড়িত করে, বঞ্চিত করে। বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে কর্ম্মের মিল আছে, মহান আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ আছে কত নাস্তিকের, তাদের সত্য পূজা জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে, কত বিচিত্র কীর্ত্তিতে জগতে নিত্য হয়ে গেছে, তাদের নৈবেদ্যের ডালি কোনোদিন রিক্ত হবে না। মনের মানুষের শাশ্বত রূপ তারা অন্তরে দেখেচে, তাই তারা অনায়াসে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত পণ করতে পারে।—তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যু পরিব্যথাঃ—সেই বেদনীয় পুরুষকে আপনার মধ্যে জানো, মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দিক্। য এতদ্ বিদুর্ অমৃতাস্তে ভবন্তি—কারণ তারা বেঁচে থাকে সকল কালের মধ্যে, সকল লোকের মধ্যে, যাঁর উপলব্ধির মধ্যে তাদের আত্মোপলব্ধি তাঁর বিরাট আয়ু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সকল সত্তাকে নিয়ে। মানুষকে অন্ন বস্ত্র বিদ্যা আরোগ্য শক্তি সাহস দিতে হবে এই সঙ্কল্প নিয়ে যারা আত্মনিবেদন করেচে তারা কোনো দেবতাকে বিশেষ সংজ্ঞা দ্বারা মানুক বা না-মানুক তারা সেই বেদ্য পুরুষকে জেনেছে, সেই মহান্ আত্মাকে সেই বিশ্বকর্ম্মাকে, যাঁকে জানলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতরে থেকে বাঁধা অনুষ্ঠানের মধ্যে তারা পূজাকে নিঃশেষিত ক'রে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না, কেননা, তারা মনের মানুষকে দেখেচে মনের মধ্যে, মানুষের মধ্যে নিত্যকালের বেদীতে। দেশ-বিদেশের সেই সব

নাস্তিক ভক্তদের আমি আপন ধর্ম্মভাই বলে জানি। সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাদের বেশী দেখলুম, কিন্তু তারা যে-দেশে থাকে সে-দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্ব্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক এই আমার কামনা। তোমার চিঠিতে বার-বার তুমি লিখেচ, নিজের দেশের কাছ থেকেই সব কিছু নিতে হবে। সত্য কথা, কিন্তু নিজের দেশ সকল দেশেই আছে, অন্য দেশের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সকল দেশের—যদি অভিমানে বা অশক্তিতে তা না নিই তবে নিজের সম্পত্তিকে অস্বীকার করা হয়। বিশ্বমানবের বেদীতে যে-নৈবেদ্য দেওয়া হয়, জ্ঞানের প্রেমের কর্ম্মের, তাতে সকল মানুষেরই ভোগের অধিকার,—তাকে নিয়েও যদি জাত মান্‌তে হয় তবে সঙ্কীর্ণ হিন্দু হয়েই মরব মানুষ হয়ে বাঁচব না। যদি বল দেশের বাইরে থেকে যা পাই সে তো নকল, তা নিজের দেশের নকলও নকল, পরের দেশের নকলও নকল—যে কর্ম্ম খাঁটি তা নকল নয়, যা মেকি তাই নকল, তার উপর স্বদেশেরই ছাপ থাক আর বিদেশের।

৩

দার্জ্জিলিং

এক একদিন তোমাকে চিঠি লেখার পর আমার মনে অনুতাপ বোধ হয়। যেখানে তোমার সব চেয়ে ব্যথা বাজে সেইখানে আমি তোমাকে বারে বারে আঘাত দিই। অথচ কখনই সেটা আমি ইচ্ছে ক'রে করিনে। তোমার চিঠিতে যে-ঠাকুরের কথা তুমি এমন গভীর আবেগের সঙ্গে বল তাঁকে আমি চিনি—তোমার উপলব্ধির সঙ্গে আমার মিল আছে—বোধ হয় সেই জন্যেই অনেকটা যেন অজ্ঞাতসারেই তোমার মনকে আঘাত না দিয়ে থাকতে পারিনে। আমার ঠাকুরকে আমি সেই মন্দিরে দেখতে চাই যেখানে কোনো বানানো লোকাচারের দেয়াল তুলে কোনো সম্প্রদায় তাকে সঙ্কীর্ণভাবে আত্মসাৎ করবার উদ্যোগ না করে—যেখানে সবাই অনায়াসে মিলতে পারে, তাঁকে পেতে পারে, বিশেষ দেশের পণ্ডিতের কাছে বিশেষ ভাষার শাস্ত্র ঘেঁটে বিশেষ রীতির পূজাপদ্ধতির মধ্যে মন আটকা না পড়ে। তুমি যাঁকে ভালবাস আমি তাঁকেই ভালবাসি, সেই জন্যেই আমি তাঁর দ্বার অবারিত করতে ইচ্ছে করি, তাঁর ভালবাসায় সকল দেশের সকল জাতকে আপন ক'রে দেখতে চাই। য়ুরোপে যে-অংশে তিনি সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েচেন সেখানে আমি আনন্দ করি, আমাদের দেশে যে-অংশে তিনি মুগ্ধ, আচারে আচ্ছন্ন সেখানে আমার মন অত্যন্ত পীড়িত। আমি জানি তাঁকে অবগুণ্ঠিত করার অপরাধেই আমার দেশ এতদিন ধরে প্রাণে জ্ঞানে মানে বঞ্চিত। তাঁর মধ্যে মানুষকে মুক্তি দেবার বিরুদ্ধে আমার দেশ পদে পদে বাধা দিয়েছে—দেশের অপমানিত মানুষ তাই ক্ষুদ্র হয়েছে দেশ তাই মুক্তি পায় নি। এইজন্যেই থাকতে পারিনে—রুদ্ধদ্বার মুক্ত করতে কঠোর আঘাত করি, নিজেও আহত হই। যিনি আমার সব চেয়ে সম্মানিত তাঁর জন্যেই দেশের লোকের কাছে অপমান স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েছি, তাঁকে প্রতারণা ক'রে দেশের আদর আমি চাইনে। তিনি কে ?—

—জানি না কে, চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী···············

খুব সম্ভব এ কবিতা তুমি পূর্ব্বেই পড়েছ তবু আমার ঠাকুরের ধ্যান তোমার কাছে রাখ্‌লুম সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের মাঝখানে, সকল বীরের সকল তপস্যায়, সকল প্রেমিকের সকল ত্যাগে। এ সব লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়, তার গভীরতম মর্ম্মস্থানে যে-কবি আছে তারই, সে কবির আসন সকল দেশেই, সকল মানুষেরই অন্তরে—(য়ুরোপেও)।

যাই হোক্ তুমি যেখানে আশ্রয় পেয়েছ সেখানেই উদারভাবে মুক্তভাবে বিরাজ কর, সেইখানেই তোমার চিত্তের বাতায়ন খুলে থাক, যেখান থেকে তুমি সর্ব্বকালের সর্ব্বজনের মনের মানুষকে আপন ব'লে দেখতে পাও, যিনি য়ুরোপেও, যিনি অস্পৃশ্য নমশূদ্রেরও, যিনি পণ্ডিত পুরোহিতের বেড়াদেওয়া কৃত্রিম শুচিতার নিষেধ লঙ্ঘন ক'রে তাঁরই বুকে আসবার জন্য দিকে দিকে আহ্বান পাঠিয়ে দিয়েচেন।

পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা

শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি-এল

ঐতিহাসিক ঘটনা কবিকল্পনার সহিত জড়িত হইয়া এক অভিনব আকার ধারণ করে। তখন তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করা কঠিন হইয়া উঠে। অবশ্য সাধারণতঃ ঐতিহাসিক কাব্যের মূল ঘটনাটি ইতিহাস হইতে লওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা এরূপ পল্লবিত এবং স্থানবিশেষে এরূপ বিকৃত হইয়া পড়ে যে, তখন প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তবে ইতিহাসের সহিত বিচার করিয়া দেখিলে তাহার ঐতিহাসিকতা কতটুকু তাহা অবশ্য বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যেখানে ঘটনাটি ঐতিহাসিক হইলেও তাহার বিশেষ বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না বা সে-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়, সেখানে যে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য কি, তাহা বুঝিয়া লইতে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেজন্য ঐতিহাসিক কাব্যের ঐতিহাসিকতা স্থির করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন হয়।

মীর মালিক মহম্মদ রচিত পদ্মাবৎ হিন্দী-সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যখানি ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়াই লিখিত। যদিও কবি ইহার একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি ইহা যে ঐতিহাসিক ঘটনা, ব্যক্তি ও স্থান লইয়াই লিখিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘটনাটি হইতেছে রাজপুতানা-মেবারের সেই প্রসিদ্ধ ব্যাপার—আলাউদ্দীনের চিতোর-আক্রমণ। চিতোরের পদ্মিনী উপাখ্যান সাধারণের নিকট সুপরিচিত। টড্ সাহেবের রাজস্থানের ইতিবৃত্তে এবং তাহা অবলম্বন করিয়া কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষায় লিখিত পদ্মিনী উপাখ্যানে সকলেই পদ্মিনী-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। বিশেষতঃ স্বাধীনতার কবি রঙ্গলালের সেই 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' কবিতা বাঙ্গালীকে এক নূতন আলোক দিয়া পদ্মিনী উপাখ্যানকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই পদ্মিনী-উপাখ্যানের এমন কি টডেরও বহুপূর্ব্বে মীর মহম্মদ তাঁহার পদ্মাবতে এবং তাহা অবলম্বন করিয়া মুসলমান বঙ্গকবি আলওয়াল তাঁহার পদ্মাবতীতে চিতোর আক্রমণের কথা জানাইয়া দিয়াছিলেন। পদ্মাবৎ বা পদ্মবতী যে পদ্মিনী সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা সেই পদ্মাবৎ বা পদ্মাবতী কাব্যের ঐতিহাসিকতা কি, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। পদ্মাবৎ বা পদ্মাবতী কাব্য, তবে ঐতিহাসিক কাব্য বটে। মীর মহম্মদ বা আলওয়াল তাঁহাদের কাব্য ঘটনার বহু পরে রচনা করেন। হিজরী ৭০৩-৪ বা ১৩০৩-৪ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হয়। ৯২৭ হিজরী বা ১৫২০ খৃঃ অব্দে মীর মহম্মদের পদ্মাবৎ রচিত হইতে আরম্ভ হয়। কবি নিজে বলিতেছেন,—

"সন নব সৈ সত্তাইস অহৈ।
কথা আরম্ভ যেন কবি কহৈ।"

আলওয়াল বলিতেছেন,—

"সেখ মহাম্মদ যতী জখনে রচিল পুথি
সংখ সপ্তবিংশ নবসত।" *

* পদ্মাবৎ-রচনার সময় লইয়া গ্রিয়ারসন ও দীনেশচন্দ্র তর্ক তুলিয়াছেন। পদ্মাবতে শের শাহের কথা থাকায় গ্রিয়ারসন ৯২৭ সনের পরিবর্ত্তে ৯৪৭ বলিতে চাহেন। কারণ শের শাহ ৯৪৭ হিজরীতে বাদশাহ হইয়াছিলেন। অবশ্য ৯২৭ সনে ইব্রাহিম লোদীর রাজত্ব-সময়ে শের শাহ ফরীদ নামে আপনার ভাগ্য অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ৪৭ সনেই তিনি দিল্লীর তক্তে আসীন হন। কাজেই ৯২৭ সনে তাঁহাকে শের শাহ বলিয়া উল্লেখ করিলে তারিখ-সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ারই কথা। আমাদের কথা হইতেছে মীর মহম্মদ বলিতেছেন—

সন নব সৈ সত্তাইস অহৈ।
কথা আরম্ভ যেন কবি কহৈ।"

৯২৭ সন গ্রন্থ আরম্ভের সময়, শেষ কবে হইয়াছিল, তাহা অবশ্য জানা যায় না। তবে গ্রন্থ শেষ হইতে ২০ বৎসর অবশ্য দীর্ঘ সময়। কিন্তু এই সময়ে ভারতে অনেক ওলটপালট হইতেছিল, মোগল-পাঠানে প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। কাজেই লোকের মনে শান্তি ছিল না, শান্তি না থাকিলে কবিতাচর্চ্চা ঘটে না। আর গ্রন্থরচনার পর মীর মহম্মদ পরে তাহাতে পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ করিতেও পারেন। কবিকঙ্কনের গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধেও এইরূপ গোলযোগ আছে।

পদ্মাবৎ রচনার এক শত বৎসর পরে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলওয়ালের পদ্মাবতী রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। সুতরাং চিতোর আক্রমণের দুই শত বৎসর পরে পদ্মাবৎ এবং তাহার আবার এক শত বৎসর পরে পদ্মাবতী রচিত হয়। কাজেই মূল ঘটনা লোকপরম্পরায় বিকৃত হইয়া পদ্মাবৎ-রচনার সময় অন্যরূপ ধারণ করা অসম্ভব নহে। আলওয়ালের হস্তে তাহারও কিছু কিছু রূপান্তর হইয়াছে। সে যাহা হউক, ইহার ঐতিহাসিকতা কি আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথমে গ্রন্থমধ্যে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি। পরে তাহা আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করার চেষ্টা করা যাইবে। গ্রন্থের বিবরণ সম্বন্ধে আলওয়াল এইরূপ বলিতেছেন,—

"সেখ মহাম্মদ যতী জখনে রচিল পুথি
সংখ সপ্তবিংশ নবসত ॥
চিতাওর ঈশ্বর রত্নসেন নৃপবর
শুকমুখে শুনিয়া মহত *
জুগী হইয়া নরাধিপ চলিল সিংহল দ্বিপ
সোলসত কুমার সঙ্গতী ॥
নদি বন খণ্ড বাট উত্তর সিংহল ঘাট
নৌকা দিল নৃপগজপতী *
সিংহল দিগেতে গিয়া নানাবিধি দুঃখ পাইয়া
বহুযত্নে পাইল পদ্মাবতী ॥
পক্ষিমুখে শুনি কথা নাগমতি চিন্তাভুক্তা
পুনি দেশে চলিল নৃপতী
সাগরে পাইয়া ক্লেশ পাইল চিতাওর দেশ
কন্যা বহু উৎসব আনন্দ ॥
রাঘব চেতন জানি অরি মন্ত্রি কহি বানি
প্রতিপদে দেখাইল চান্দ *
তত্ত্ব জানি নৃপবর পুনি কৈল্যে দেশান্তর
জাইতে হৈল কন্যা দরশন ॥
বহুল আনিন্দ মনে করের কঙ্কন দানে
পরিতোষে পাঠাইল ব্রাহ্মণ *
সোলতান আলাওদ্দিন দিল্লীশ্বর জগদিন
প্রচণ্ড প্রতাপ ছত্রধর ॥
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তথা কহিল কন্যার কথা
সুনি হরষিত নৃপবর *
শ্রীজানামে বিপ্রবর পাঠাইল রাজ্যেশ্বর
কন্যা মাগি রত্নসেন স্থানে ॥
পদ্মাবতি না পাইয়া শ্রীজা আইল পলাটিয়া
শুনি সাহা ক্রোধ কৈল মোনে *
বহুল মাতঙ্গরাজি চতুরঙ্গদল সাজি
গেল চিতাওর মারিবারে ॥
দ্বাদশ বৎসর রণ তথা ছিল অখণ্ডন
রত্নসেন ধরিল প্রকারে *
দিল্লীশ্বর দেশে আইল নৃপ কারাগারে থুইল
তাড়না করিল নানা ভাতি ॥
গোরা বাদিলা নাম ছিল রত্নসেন ঠাম
মুক্ত কল্য কপট জুকতি *
চিতাওর দেশে আসি বঞ্চিলেক সুখে নিশি
পদ্মাবতী সঙ্গে করি রঙ্গ ॥
দেওপাল নৃপকথা পদ্মাবতী মুখে তথা
শুনি নৃপ মোন হৈল ভঙ্গ *
সর্ব্বারম্ভে তথা গিয়া দেওপাল সংহারিয়া
জুদ্ধক্ষেত্রে আইল নৃপতি ॥
সপ্তমাস দিনান্তর মৈল রত্ন নৃপবর
দুই রাণী সঙ্গে কৈল গতি *
পুনি সাজি দিল্লীশ্বর আসি চিতাওর গড়
চিতা ধর্ম্ম দেখিলা বিদিত ॥
সতি গতী পদ্মাবতী শুনি সাহা মহামতী
মানাইল পরম চুক্তিত *
চিতোরে সালাম করি দিল্লীশ্বর গেলো ফিরি
পুস্তকের এহি বিবরণ ॥"

আলওয়ালের বিবরণ আমরা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। রাজা চিত্রসেনের পুত্র রত্নসেন চিতোরের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম নাগমতী। সেই সময়ে সিংহলের রাজা গন্ধর্ব্ব সেনের কন্যা পদ্মাবতীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের কথা তাঁহার পালিত শুকপক্ষীর মুখে শুনিয়া রত্নসেন সন্ন্যাসি-বেশে তাঁহার উদ্দেশে সিংহলে গমন করেন এবং পদ্মাবতীকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। পরে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া চিতোরে চলিয়া আসেন। রাণী নাগমতীর মনে তাহাতে অবশ্য দুঃখ উপস্থিত হয়। রাঘবচেতন নামে এক ব্রাহ্মণ রত্নসেনের সভায় আসিয়া কৌশল করিয়া প্রতিপদে চাঁদ দেখান। পরে তাঁহার কৌশল ধরা পড়িলে, রাজা তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ যাইবার সময় পদ্মাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি অনেক ধনরত্নের সহিত নিজের হস্তের একখানি কঙ্কণ তাঁহাকে প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ সেই কঙ্কন লইয়া দ্বিতীয় কঙ্কণের আশায় দিল্লীর বাদশাহ সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট গমন করিয়া পদ্মাবতীর রূপলাবণ্যের কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন। আলাউদ্দীন পদ্মাবতীকে পাইবার জন্য শ্রীজা নামে এক ব্রাহ্মণকে রত্নসেনের নিকট পাঠাইয়া

দেন। শাহ রত্নসেনকে অনেক প্রলোভনও দেখাইয়াছিলেন। রত্নসেন সুলতানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে, শ্রীজা আসিয়া বাদশাহকে তাহা অবগত করান। তখন বাদশাহ সৈন্য-সজ্জা করিয়া চিতোর আক্রমণে অগ্রসর হন। এদিকে রত্নসেন হিন্দু রাজগণকে সেই কথা জানাইলে, তাঁহারা আসিয়া চিতোরাধিপের সহিত মিলিত হন। রাজপুতগণ চিতোর দুর্গকে সুদৃঢ় করিয়া তাহার উপর কামান স্থাপন করেন, দুর্গমধ্যে অনেক খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করা হয়। রাজারা দুর্গের বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন, যুদ্ধে ফললাভ করিতে না পারিয়া তাঁহারা আবার দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হন। শাহ বুরুজ বাঁধিয়া দুর্গমধ্যে গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব হয়। আলাউদ্দীন রত্নসেনের আতিথ্য স্বীকার করেন। সেই সময়ে সখীদের অনুরোধে পদ্মাবতী শাহকে গোপনে দেখিতে চেষ্টা করেন। দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া শাহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। রত্নসেন শাহের প্রত্যুদ্গমন করিয়া দুর্গের বাহিরে আসিলে, আলাউদ্দীন তাঁহাকে ধৃত করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসেন ও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। শাহ দুর্গমধ্যে আসিলে, রাজ-অনুচর গোরা ও বাদিলা নামে দুই ভ্রাতা শাহকে বধ করিবার জন্য রাজাকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা সে-কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

পদ্মাবতী স্বামীর মুক্তির জন্য সাধু সন্ন্যাসীদের আশীর্ব্বাদ লাভের আশায় এক ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। শাহ এক নর্ত্তকীকে যোগিনী-বেশে তথায় পাঠাইয়া দেন। নর্ত্তকী রত্নসেনের দুরবস্থার কথা পদ্মাবতীকে জানাইয়া তাঁহাকে দিল্লী যাইতে বলে। পদ্মাবতী স্বামীকে দেখিবার জন্য তাহার সহিত যাইতে উদ্যত হন, কিন্তু সখীরা তাঁহাকে নিষেধ করে। সেই সময়ে দেওপাল নামে এক রাজা পদ্মাবতীকে হস্তগত করিবার জন্য এক দূতী পাঠাইয়া দেয়, পদ্মাবতী তাহাকে দূর করিয়া দেন। অবশেষে স্বামীর মুক্তির জন্য পদ্মাবতী গোরা ও বাদিলাকে অনুরোধ করিলে, দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া পদ্মাবতীর নামে শাহকে লিখিয়া পাঠান হয় যে, পদ্মাবতী দিল্লী যাইবেন, তবে শাহ যেন রত্নসেনের উপর আর কোন অত্যাচার না করেন। শাহও সে পত্রের উত্তর দেন ও রত্নসেনের প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ করেন। এদিকে গোরা ও বাদিলা এক চতুর্দ্দোলে কয়েকজন যোদ্ধাকে তুলিয়া পদ্মাবতীর গাত্রবাস তাহার মধ্যে ভরিয়া, কয়েকখানি বাসে দোলা আচ্ছাদিত করিয়া চলিতে থাকেন। পদ্মিনী-জাতীয়া পদ্মাবতীর গাত্রগন্ধে সুবাসিত সেই গাত্রবাস-সমূহের সৌরভে ভ্রমর সকল ছুটিয়া আসিতে লাগিল, সকলে মনে করিল পদ্মাবতীই যাইতেছেন। তাহার সঙ্গে অনেক লোকজনও চলিল, আর পাঁচ শত ডুলির মধ্যে রাজপুত বীরগণ লুক্কায়িতভাবে চলিতে লাগিল। দিল্লী পৌঁছিয়া শাহকে জানান হইল যে, পদ্মাবতী প্রথমে রত্নসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ভাণ্ডারের চাবি-সকল বুঝাইয়া দিবেন। শাহ অনুমতি দিলে, গোরা রাজার নিকট গিয়া তাঁহাকে লইয়া ডুলিতে তুলিলেন, পরে এক অশ্বে চড়াইয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। যখন সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন রাজপুত-পাঠানে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। গোরা বাদিলাকে দিয়া রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শাহ গোরাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যুদ্ধ করিতে করিতে গোরা দেহত্যাগ করেন, বাদিলা রাজাকে লইয়া চিতোরে উপস্থিত হন। গোরার মৃত্যুর পর শাহ-সৈন্য অগ্রসর হইলে, রত্নসেন ও বাদিলা তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন। চিতোরে আসিয়া রত্নসেন পদ্মাবতীর মুখে দেওপালের কুপ্রস্তাবের কথা শুনিয়া তাহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। সেই সময়ে এক বিষাক্ত শর রত্নসেনের শরীর বিদ্ধ করায়, তিনি পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, পদ্মাবতী ও নাগমতী তাঁহার সহগমন করেন। ইহার পর আলাউদ্দীন আর একবার চিতোরে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হন এবং পদ্মাবতীর সহমরণের কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। রত্নসেনের পুত্রেরা রাজা হন।

ইহাই হইল কাব্য-কথা। কিন্তু ইতিহাসে একথা কিরূপ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই আমরা দেখিবার

চেষ্টা করিব। ইতিহাসের কথা বলিতে গেলে প্রথমে টডের রাজস্থানের ইতিবৃত্তের কথা বলিতে হয়। টডের লিখিত বিবরণ যে সকল স্থলে ইতিহাস-সম্মত তাহা বলা যায় না, এস্থলেও প্রকৃত ইতিহাসের সহিত ইহার অনৈক্যও আছে। সে যাহা হউক, টডের ইতিবৃত্ত কতক পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। চিতোর-আক্রমণ সম্বন্ধে টড বলিতেছেন যে, ১৩৩১ সম্বতে ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসিংহ পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই সময় পাঠান-সম্রাট আলাউদ্দীন বর্ব্বরতার সহিত চিতোর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। দুইবার ইহা আক্রান্ত হইয়াছিল, প্রথমবারে ইহার শ্রেষ্ঠ রক্ষিগণের আত্মদানে ইহা যদিও লুণ্ঠনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী আক্রমণ সফলতা লাভ করিয়াছিল।* টডের মতে লক্ষ্মণসিংহ রাণা হইলেও তিনি অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বলিয়া তাঁহার পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। পদ্মিনী এই ভীমসিংহের পত্নী, তিনি সিংহলাধিপ চৌহান-বংশীয় হামীর শঙ্খের কন্যা। পদ্মিনী যারপরনাই রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে পাইবার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন তিনি একবার পদ্মিনীকে দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, এমন কি, দর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া জানাইয়া দেন। আলাউদ্দীন সামান্য কয়েকজন রক্ষীর সহিত চিতোর-দুর্গে প্রবেশ করিয়া দর্পণে প্রতিবিম্বিত পদ্মিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া ফিরিয়া আসেন। ভীমসিংহ তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলে, আলাউদ্দীন তাঁহাকে ধৃত করিয়া শিবিরে লইয়া যান এবং পদ্মিনীকে পাইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন। পদ্মিনী প্রথমে পাঠান-শিবিরে যাইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি আত্মসম্মান রক্ষার ও ভীমসিংহের উদ্ধারের জন্য আপনার আত্মীয় গোরা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সহিত পরামর্শ করেন। এইরূপ স্থির হয় যে, পদ্মিনী যাইবেন এইরূপ জানাইয়া সাত শত আচ্ছাদিত শিবিকায় পদ্মিনীর সহচরী বলিয়া রাজপুত বীরগণকে বসাইয়া গোরা ও বাদল পাঠান-শিবির অভিমুখে যাত্রা করিবেন। তখন সেইরূপই ব্যবস্থা করা হয়। আলাউদ্দীনকে পরিখার বাহিরে আসিতে বলিয়া ভীমসিংহের সহিত পদ্মিনীর সাক্ষাতের ছলে অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় চাওয়া হয়। সেই অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ভীমসিংহকে কৌশলে উদ্ধার করিয়া অশ্বারোহণে দুর্গাভিমুখে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর রাজপুতগণের কৌশল প্রকাশ পাইলে, পাঠানে ও রাজপুতে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। যুদ্ধে গোরা দেহত্যাগ করেন, বাদল শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন, আলাউদ্দীন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান।

তাহার পর আলাউদ্দীন বল সঞ্চয় করিয়া ১৩৪৬ সম্বতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দে আবার চিতোর-আক্রমণে অগ্রসর হন। ফেরিস্তার মতে ইহা ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া টড উল্লেখ করিয়াছেন। ফেরিস্তার মতে কিন্তু চিতোর একবার মাত্র আক্রান্ত হয়। দ্বিতীয় আক্রমণে টড সেই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর "মৈভূখা হূঁ" বাণী ও দ্বাদশজন মুকুটধারীর রক্তদানের কথা উল্লেখ করিয়া লক্ষ্মণসিংহ ও তাঁহার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একাদশ জনের জীবনবিসর্জ্জনের কথা বলিয়াছেন। কেবল মাত্র লক্ষ্মণের মধ্যম পুত্র অজয় সিংহ জীবিত থাকিয়া কৈলওয়ারে চলিয়া যান। লক্ষ্মণসিংহ সর্ব্বশেষে জীবনদান করেন। তাঁহার যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান হয়, রাণী ও অন্যান্য নারীগণ চিতাবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য পদ্মিনীও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। যে-গহ্বরে পদ্মিনী ও অন্যান্য নারীগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, আজিও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এক কাল বিষধর তাহাকে আগুলিয়া রাখিয়াছে। আলাউদ্দীন চিতোর ধ্বংস করিলে, পদ্মিনীর প্রাসাদটি রক্ষা

* "Lakumsi succeeded his father in S. 1331 (A. D. 1275), a memorable era in the annals, when Cheetore, the repository of all that was precious yet untouched of the arts of India, was stormed, sacked, and treated with remorseless barbarity, by the Pathan Emperor, Allaoodin. Twice it was attacked by the subjugator of India. In the first siege it escaped spoliation, though at the price of its best defenders: that which followed is the first successful assault and capture of which we have any detailed account."---Tod.

পাইয়াছিল বলিয়া টড উল্লেখ করিয়াছেন। মালদেব নামে এক সামন্ত রাজার উপর চিতোরের ভার দিয়া আলাউদ্দীন দিল্লী গমন করেন। অজয় সিংহ কৈলওয়ারে থাকিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তাহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরিসিংহের পুত্র হামীর রাজা হইয়া চিতোর উদ্ধার করেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে আমীর খসরুর তারিখি আলাই গ্রন্থে ও জিয়াউদ্দিন বার্নির তারিখি ফিরোজসাহীতে একবার মাত্র চিতোর আক্রমণের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমীর খসরু এই আক্রমণে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এই দুই গ্রন্থে পদ্মিনী সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু আমরা ফেরিস্তার লিখিত বিবরণ হইতে এ প্রসঙ্গের কথা জানিতে পারি। যদিও তাহাতে পদ্মিনীর নাম নাই, তথাপি তাঁহার লিখিত বর্ণনা হইতে সমস্তই বুঝিতে পারা যায়। ফেরিস্তার বিবরণে দেখা যায় যে, ৭০৩ হিজরী বা ১৩০৩ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন ছয় মাস অবরোধের পর চিতোর অধিকার করেন। ইহার পূর্ব্বে চিতোর মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই! আলাউদ্দীন জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁকে চিতোরের ভার অর্পণ করেন, তাঁহার নামানুসারে ইহার খিজিরাবাদ নাম হয়। আমীর খসরুও খিজির খাঁর উপর চিতোরের ভারার্পণ ও তাহার খিজিরাবাদ নামকরণের কথাও বলিয়াছেন। তাহার পর ফেরিস্তা চিতোরাধিপ রত্নসেনের পলায়নের কথা বলিতেছেন। রত্নসেন চিতোর-আক্রমণের সময় ধৃত হইয়া বন্দী হন। এই সময়ে (হিজরী ৭০৪ খৃঃ অব্দ ১৩০৪) তিনি আশ্চর্য্যরূপে নিষ্কৃতি লাভ করেন।* রাজা রত্নসেনের একটি কন্যার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া আলাউদ্দীন তাঁহাকে পাইলে রাজাকে মুক্তি দিতে সম্মত হন। রাজা উৎপীড়নের ভয়ে স্বীকৃত হইয়া কন্যাকে আসিতে সংবাদ দেন। রাজার পরিবারবর্গ সম্মানহানির ভয়ে কন্যার প্রতি বিষ প্রয়োগ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু কন্যা কৌশল করিয়া নিজের সম্মান রক্ষা ও পিতার উদ্ধারসাধন করেন। তিনি পিতাকে লিখিয়া পাঠান যে, এইরূপ প্রচার করা হউক, তিনি তাঁহার সহচরীবর্গসহ যাইতেছেন, তবে প্রকৃত কথা পিতাকে জানাইয়া দেন। কতকগুলি স্ত্রীলোকের শিবিকায় অনুচরবর্গকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া ও সঙ্গে কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া রাজকন্যা দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহাকে দিল্লী-প্রবেশের ছাড়পত্র পাঠান হইয়াছিল। রাত্রিকালে দিল্লীতে পৌছিয়া বাদশাহের আদেশে শিবিকাগুলি কারাগারের দিকে গমন করে। রাজপুতগণ তাহা হইতে বাহির হইয়া কারারক্ষিগণকে আক্রমণ করিয়া রাজাকে উদ্ধার করে এবং তাঁহাকে অশ্বে চড়াইয়া বিদায় করিয়া দেয়। রাজা তাঁহার রাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে থাকিয়া পাঠানদিগের অধিকৃত স্থানে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলে, আলাউদ্দীন খিজির খাঁকে চলিয়া আসিতে বলেন এবং রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর চিতোরের ভার অর্পণ করেন। তিনি সামন্ত রাজারূপে গণ্য হন।* ফেরিস্তার মতেও চিতোর একবার মাত্র আক্রান্ত হয় দেখা যাইতেছে। আর তাঁহার লিখিত রত্নসেনের কন্যাই যে পদ্মিনী তাহাও বুঝা যাইতেছে। তবে তিনি তাঁহার কন্যা না হইয়া যে পত্নী হইতেছেন, ইহা যেমন পদ্মাবতীতে দেখা যায়, সেইরূপ অন্য স্থানেও উল্লিখিত আছে। আমরা এক্ষণে সে-কথা বলিতেছি।

এ-সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য একটি প্রমাণ আছে। রাণা রাজসিংহ মেবারে একটি গিরিনির্ঝরিণীর স্রোতে বাঁধ দিয়া রাজসমুদ্র নামে হ্রদোপম যে-জলাশয় করিয়াছিলেন, তাহার বাঁধে পঁচিশখানি প্রস্তরখণ্ডে মেবারের রাজবংশ ও রাজসমুদ্রের বর্ণনা আছে। তাহাকে একখানি মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। তাহাতে লিখিত আছে যে, পৃথ্বীমল্লের পুত্র ভুবনসিংহ তাঁহার পুত্র ভীমসিংহ, ভীমসিংহের পুত্রের নাম জয়সিংহ, রাণা লক্ষ্মণ সিংহ তাঁহার পুত্র। লক্ষ্মণ সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রত্নসিংহ, পদ্মিনী তাঁহার স্ত্রী। এই পদ্মিনীর জন্য

* At this time, however, Ray Ruttun Sein, the Raja of Chittoor, who had been prisoner since the King had taken the fort, made his escape in an extraordinary manner." Brigg's Ferishta

* ফেরিস্তার কথা লইয়া কর্ণেল ডৌ-ও চিতোর-আক্রমণ সম্বন্ধে এইরূপই লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি রত্নসেনের নাম উল্লেখ করেন নাই, তবে তাঁহার কন্যা কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধারের কথা বলিয়াছেন।

আলাউদ্দীন চিতোর অবরোধ করেন। লক্ষ্মণ সিংহ দ্বাদশ ভ্রাতা ও সপ্তপুত্রের সহিত শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গগত হন। তাহার পর তাঁহার পুত্র অজয় সিংহ রাজা হইয়াছিলেন। অজয়ের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সহিত নিহত, অরিসিংহের পুত্র হামীর রাজছত্র ধারণ করেন।*

এক্ষণে পদ্মাবতীর সহিত এই সকল বর্ণনার কিরূপ সামঞ্জস্য আছে, আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। পদ্মাবতীর মতে চিতোরাধিপ রত্নসেনের পত্নীর নাম পদ্মাবতী। রাজপ্রশস্তিতে তিনি রত্নসিংহের স্ত্রী পদ্মিনী, সুতরাং পদ্মাবতীই যে পদ্মিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। ফেরিস্তা তাঁহাকে যে রত্নসেনের কন্যা বলিতেছেন, তাহা ঠিক নহে। টডের মতে পদ্মিনী ভীমসিংহের পত্নী, কিন্তু প্রশস্তির মতে ভীমসিংহ পদ্মিনীর স্বামী রত্নসিংহের পিতামহ। রাণা-বংশের অনুমতিক্রমে লিখিত হওয়ায় তাহারই কথা বিশ্বাসযোগ্য। প্রশস্তির কথা ফেরিস্তা ও পদ্মাবতী সমর্থন করিতেছে।† ফেরিস্তা অবশ্য পদ্মিনীকে রত্নসিংহের কন্যা বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। আর পদ্মাবতী ও ফেরিস্তা লক্ষ্মণসিংহের পরিবর্ত্তে রত্নসিংহকে চিতোরাধিপ বলিতেছেন। লক্ষ্মণসিংহই যে চিতোরের রাণা এ-বিষয়ে প্রশস্তি ও টড একমত। টড যে তাঁহাকে অপ্রাপ্ত ব্যবহার বলিয়া ভীমসিংহকে রাজ্যপরিচালনার কথা বলিয়াছেন, তাহাও বিশ্বাস করা যায় না। একে ত ভীমসিংহ পিতৃব্য নহেন, পিতামহ। তাহার পর টডের মতে চিতোর-আক্রমণের সময় যখন লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্র ও প্রশস্তির মতে সপ্তপুত্র বিদ্যমান, তখন সে সময় লক্ষ্মণসিংহ কিরূপে অপ্রাপ্তব্যবহার হইতে পারেন? তবে সিংহাসনারোহণের সময় তিনি অল্পবয়স্ক থাকিলেও থাকিতে পারেন। টড্ দুইবার চিতোর আক্রমণের কথা বলিতেছেন। প্রথম বার আক্রমণের সময় তিনি ভীমসিংহের কথা বলিয়াছেন, দ্বিতীয় বারে লক্ষ্মণসিংহের কথা বলিতেছেন। পদ্মিনী-উপাখ্যানে দ্বিতীয় বারেও ভীমসিংহের কথা বলিয়া তাঁহাকেই রাণা মনে করা হইয়াছে। টড ও প্রশস্তি হইতে লক্ষ্মণসিংহকেই রাণা বলিয়া জানা যায়। টডে দ্বিতীয় বার চিতোর-আক্রমণের তারিখ দেওয়া আছে, কিন্তু প্রথম বারের তারিখ নাই। যদি বাস্তবিক চিতোর দুইবার আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা পর পর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একটির দীর্ঘকাল পরে আর একটি হয় নাই, তাহা মুসলমান ঐতিহাসিকগণের ও পদ্মাবতীর বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। টড ভিন্ন আর সকলেই একবার আক্রমণের কথাই বলিতেছেন। প্রশস্তি হইতে একবার ভিন্ন দুইবার আক্রমণ বুঝা যায় না। পদ্মাবতীতে আলাউদ্দীনের দ্বিতীয় বার চিতোর গমনে আক্রমণের কথা বুঝা যায় না, তখন চিতোরের সব শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ চিতোর একবারই আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দুইবার আক্রমণের কথা স্বীকার করিলে বলিতে হয়, একই সময়ে পর পর দুইবার তাহা আক্রান্ত হইয়াছিল।

এক্ষণে রত্নসিংহ বন্দী হইয়াছিলেন কি না এবং পদ্মিনী কৌশল করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন কি না? এ সম্বন্ধে টড ফেরিস্তা ও পদ্মাবতী একমত। প্রশস্তিতে ইহার কোনও উল্লেখ নাই। অবশ্য প্রশস্তি

* "পৃথ্বীমল্লঃ সুতস্তস্য পুত্রো ভুবনসিংহকঃ।
তস্য পুত্রো ভীমসিংহোজয়সিংহোঽস্য তৎসুতঃ॥
লক্ষ্মসিংহ স্তেব গঢ়মণ্ডলীকাভিধোস্ত তু॥
কনিষ্ঠো রত্নসী ভ্রাতা পদ্মিনী তৎপ্রিয়াঽভবৎ॥
তৎকৃতেল্লাবদীনেন রুদ্ধে শ্রীচিত্রকূটকে।
লক্ষ্মসিংহো দ্বাদশ-স্বভ্রাতৃভিঃ সপ্তভিঃ সুতৈঃ॥
সহিতঃ শস্ত্রপূতোঽসৌ দিবং যাতোঽস্যচাত্মজঃ।
এক উর্ব্বরিতোঽ জৈদবীৎ রাজ্যংচক্রে ততোঽরসী॥
জ্যেষ্ঠঃ সুতঃ পিতুঃ সঙ্গে যো হতো তৎসুতো দধে।
রাজা হম্মীরো দানীন্দ্রো .... রাজপ্রশস্তি

আজমীরের রাজপুতানা মিউজিয়মের ১৯১৮ অব্দের বার্ষিক বিবরণীতে গৌরীশঙ্কর ওঝা রাজপ্রশস্তির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে পদ্মিনীকে লক্ষ্মণ সিংহের পত্নী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত মিউজিয়মে রাজপ্রশস্তির যে একটি নকল আছে, তাহাতে লিখিত আছে—

"লক্ষ্মসিংহস্তেব গঢ়মণ্ডলীকাভিধোস্ততু।
কনিষ্ঠো রত্নসী ভ্রাতা পদ্মিনী তৎপ্রিয়াঽভবৎ॥

ওঝা মহাশয় 'তৎপ্রিয়া'র 'তৎ' সর্ব্বনামটি রত্নসীর পরিবর্ত্তে না ধরিয়া লক্ষ্মণসিংহের পরিবর্ত্তে ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা রত্নসীকেই বুঝাইতেছে, লক্ষ্মণসিংহকে নহে। পদ্মাবতী ও ফেরিস্তা ইহার সমর্থন করিতেছে।

† আমরা ১৩২৯ সালের 'সাহিত্য' পত্রে 'পদ্মিনী-সমস্যা' নামক প্রবন্ধে এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে পদ্মাবতীর বিবরণ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করা হয় নাই। এখানে পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনার সময় তাহাদের পুনরুল্লেখ করিয়া পদ্মাবতীর সহিত তাহাদের ঐক্য ও অনৈক্য দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

সংক্ষেপে লিখিত, কিন্তু এরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ না করায় এ-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। তবে ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ হইতে যখন এ ঘটনার কথা জানা যাইতেছে, তখন ঘটনাটিকে একেবারে অবিশ্বাস করাও যায় না। পদ্মিনীর কৌশলের কথা টড, ফেরিস্তা ও পদ্মাবতী হইতে জানা যাইতেছে। দর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখার কথা পদ্মাবতীর সহিত টড একমত, ফেরিস্তাতে অবশ্য তাহার উল্লেখ নাই। ফেরিস্তা পদ্মিনীর দিল্লী-যাত্রার কথা যাহা বলিয়াছেন, পদ্মাবতী ও টড হইতে তাহা বুঝা যায় না। তবে ফেরিস্তা হইতেও পদ্মিনী দিল্লী পৌঁছিয়াছিলেন কি না, তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন। পদ্মিনীর দিল্লী না যাওয়াই সম্ভব। পদ্মিনীর কৌশলের কোনও মূল থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রশস্তির সহিত ইহার ঐক্য করিতে গেলে বলিতে হয়, চিতোর-আক্রমণের প্রথম ভাগেই তাহা ঘটিয়াছিল। তাহা হইলে পদ্মাবতী ও ফেরিস্তার মতে রত্নসিংহকে বন্দী করিয়া যে দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। টড যে পাঠান-শিবিরে বন্দী রাখার কথা বলিয়াছেন, তাহাই সম্ভব হইতে পারে। পদ্মাবতীতে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া চিতোর-আক্রমণের যে কথা আছে, তাহা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা যে ছয় মাস অবরোধের কথা বলিতেছেন, তাহাই সম্ভব হইতে পারে। পদ্মাবতীতে বা টডে যুদ্ধে কামান ব্যবহারের কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, পদ্মাবতীর রত্নসেন রত্নসিংহ এবং পদ্মাবতীই পদ্মিনী। ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। পদ্মাবতীর চিতোর-আক্রমণও ঐতিহাসিক ঘটনা। রত্নসিংহের উদ্ধার ঐতিহাসিক ব্যাপার হইলেও হইতে পারে। পদ্মাবতীর সহমরণও প্রকৃত ঘটনা। এখনও পদ্মিনীর ভস্মসাৎ হওয়ার স্থান বিদ্যমান আছে। পদ্মাবতীর লিখিত রত্নসেনের মৃত্যু ঠিক বলিয়া মনে হয় না, তাঁহার আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়াই সম্ভব, প্রশস্তি হইতে তাহাই অনুমান হয়। রত্নসেনের পিতার নাম জয়সিংহ,—চিত্রসেন নহে। টডের মতে পদ্মিনী সিংহল-রাজকন্যা হইলেও তাঁহার পিতার নাম হামীর শঙ্খ—পদ্মাবতীর লিখিত গন্ধর্ব্বসেন নহে। কিন্তু সিংহলে-মেবারে সম্বন্ধ স্থাপন বিবেচ্য বিষয়। চিতোরধ্বংসের পর রত্নসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মণের পুত্র অজয় সিংহ রাজা হইয়াছিলেন। প্রশস্তি ও টড এই কথা বলিতেছেন, ফেরিস্তাও রত্নসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজা হওয়ার কথা বলিয়াছেন। কাজেই পদ্মাবতীর রত্নসেনের পুত্রের রাজা হওয়ার কথা ঠিক নহে। পদ্মাবতীর গোরা ও বাদিলার কথাও টডে আছে। পদ্মাবতীতে তাঁহারা দুই ভ্রাতা, টডে কিন্তু গোরা বাদলের পিতৃব্য। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, পদ্মাবৎ বা পদ্মাবতী একখানি ঐতিহাসিক কাব্য। তবে ইহার ঐতিহাসিকতা কত দূর, তাহা আমরা দেখাইবারও চেষ্টা করিলাম।



মাতৃঋণ

শ্রীসীতা দেবী

৫

রবিবার দিন সকালবেলাটা চাকুরিজীবীর পক্ষে পরম রমণীয়। বিছানা ছাড়িয়া সহজে কেহ উঠিতে চায় না, আজ আপিস আদালত বা স্কুলের তাড়া নাই, একটুখানি মধুর আলস্য উপভোগ করিবার অধিকার তাহাদের আছে। যখন খুশী উঠিবে, যখন খুশী খাইবে, আজকার মত দুনিয়ায় তাহারা কাহারও অধীন নয়।

কিন্তু রবিবার উপভোগ করিবার মত অদৃষ্ট লইয়াও প্রতাপ জন্মগ্রহণ করে নাই। সকালে চোখ চাহিয়াই তাহার মনে হইল, কাল মণি অর্ডার না করিতে পারিলে, গ্রামের বাড়িতে পাঁচ ছয়টি প্রাণী শুকাইয়া থাকিবে। চারিটি টাকা মাত্র তাহার জুটিয়াছে, আজ সারাটা দিন তাহাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে, যদি আরও দু-চার টাকা জোগাড় করিতে পারে। স্কুল আজ নাই বটে, কিন্তু বিকালে মিহিরের কাছে যাইতে হইবে, তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য। সকাল এবং দুপুরটা সে ঘুরিতে পারে, নিজের কাজে।

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া জলযোগ ইত্যাদি সারিতে তাহার ঘণ্টাখানিক কাটিয়া গেল। তাহার পর ছেঁড়া জুতায় পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে ভাবিতে লাগিল, কোথায় সে প্রথমে যাইবে। প্রেসেই একবার যাওয়া যাউক, যদিই ম্যানেজারবাবুর শুভাগমন হইয়া থাকে। তাহার পর অন্যত্র চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হাঁটিয়া চলিল। উঃ, এখনও কি তীব্র শীত, উত্তরের হাওয়াটা যেন তাহার জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। পৃথিবীতে দরিদ্রের প্রতি প্রকৃতিও যেন নির্দয়। রাস্তার অন্য লোকগুলির দিকে চাহিয়া প্রতাপের মনে হইতে লাগিল, তাহাদের যেন তত কষ্ট হইতেছে না।

দু-মাইল পথ অতিক্রম করিতে তাহার ঘণ্টাখানিক কাটিয়া গেল। ততক্ষণে রৌদ্র উঠিয়া পড়াতে শীতের উৎপাত অনেকখানি কমিয়া গেল। দূর হইতে প্রেসের বাড়ির খোলা দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকাইতে তাকাইতে সে অগ্রসর হইতে লাগিল। ম্যানেজার বীরেশ্বরবাবু আসিলে প্রায়ই সদর দরজার ফাঁকে তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, দরজার ধারেই তাঁহার টেবিল্ চেয়ার, বপুখানিও এমন যে, এক মাইল দূর হইতেই চোখে পড়ে। কিন্তু দরজা হাঁ করিয়া খোলা বটে, বীরেশ্বরবাবুর মত কাহাকেও ত চোখে পড়ে না।

আশাহীনের আশা লইয়াই প্রতাপ অগ্রসর হইয়া চলিল। বীরেশ্বরবাবু আসেন নাই, আসিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই, কারণ আজই তাঁহার ভগিনীর বিবাহ। কাল সন্ধ্যায় একবার আসিলেও আসিতে পারেন। প্রতাপ বুঝিল, এখানে দাঁড়াইয়া কোনই লাভ নাই, তবু মিনিট-কয়েক সেখানে হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। প্রেসে যাহারা কাজ করিতেছে, সকলেই তাহার পরিচিত, কিন্তু তাহাদের কাছে কোনো কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। যতই কেন-না মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করুক যে আত্মসম্মানরক্ষা প্রভৃতি তাহার কাছে অতি মিথ্যা কল্পনা মাত্র, সে-সবের স্বপ্ন দেখিবারও তাহার অধিকার নাই, তবু সেই অলীক সম্মানবোধই যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। ইহাদের কাছে কি বলিবে সে? সব ত তাহারই মত দৈন্যপীড়িত, অভাবগ্রস্তের দল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে যাহার অন্নমুষ্টির জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছে, সে ইহাদের কাছে ভিক্ষা চাহিবে কোন্ লজ্জায়? ফিরিয়া যদি ইহাদের ভিতর কেহ তাহার কাছে ধার চায়, সে কি একটা পয়সাও কাহাকেও দিতে পারিবে? তবে চাহিবার মুখ তাহার কোথায়?

প্রেস হইতে বাহির হইয়া বহুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইল, কোথাও কিছু সুবিধা হইল না। অবশেষে

শ্রান্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। পিসীমা বলিলেন, "ওমা, বেলা যে গড়িয়ে যায়, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

প্রতাপ শুষ্কমুখে বলিল, "কোথাও দু-এক টাকা ধার পাই কি না, তারই চেষ্টায় ঘুরছিলাম।"

পিসীমা বলিলেন, "কিছু সুবিধে হ'ল না বুঝি? আর বাছা, যা দিনকাল পড়েছে, নিজের পেটের অন্ন জোটে না, অন্যকে কি দেবে? নে, বোস খেতে, গজু রাজু এই সবে খেয়ে উঠল।"

প্রতাপ নীরবে খাইতে বসিল। অন্নের গ্রাসও তাহার তিক্ত লাগিতে লাগিল। এতক্ষণে হয়ত বাড়িতে ছোট ভাই বোন ক'টা না খাইয়া শুকাইতেছে, মা দশবার ঘরবাহির করিতেছেন, যদিই পিওন টাকা লইয়া আসে তাহা হইলে চাল কিনিয়া ছেলেমেয়েদের রান্না করিয়া খাওয়াইবেন। তাঁহার চোখ সজল, মুখ শুষ্ক, আরক্ত। দাদা ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, বাহিরের দিকে তাকাইবার উৎসাহও তাহার চলিয়া গিয়াছে।

পিসীমা বলিলেন, "খেতে খেতে অমন ক'রে দীর্ঘ নিশ্বেস ফেলো না বাবা, ওতে পেটের ভাত আবার চাল হয়ে ওঠে। দুঃখু কষ্ট আর সংসারে কার নেই বল?"

ঠিক কথা, কিন্তু সকলেরই দুঃখ আছে জানিয়া এক জনের দুঃখ ত কমে না? কোনোমতে খাওয়া সারিয়া প্রতাপ উঠিয়া পড়িল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, রাজুর ঘড়িতে একটা বাজিয়া গিয়াছে। চারটার সময় প্রতাপকে মিহিরের কাছে গিয়া হাজির হইতে হইবে, তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য। আর ঘণ্টা-তুই মাত্র তাহার হাতে সময় আছে, ইহার ভিতর টাকা জোগাড়ের চেষ্টা তাহাকে শেষ করিতে হইবে। কাল সোমবার, নিঃশ্বাস ফেলিবার সময়ও তাহার থাকিবে না, কোনোমতে মণি অর্ডারটা করিয়া পাঠাইতে পারে।

কিন্তু কলিকাতায় আর একটা লোকের নামও সে মনে আনিতে পারিল না, যে দুইটা টাকাও তাহাকে ধার দিতে রাজী হইবে। বসিয়া বসিয়া মিনিট পাঁচ ভাবিয়া প্রতাপ নিজের টিনের বাক্সটার কাছে গিয়া উহা খুলিয়া ফেলিল। জিনিষপত্র ঘাঁটিয়া মোটা একখানি বই টানিয়া বাহির করিল। একটা বাংলা অভিধান, প্রতাপ স্কুলে প্রাইজ পাইয়াছিল। আর বই যত তাহার ছিল, সবই একখানা দুখানা করিয়া বিক্রী হইয়া গিয়াছে, অভাবের উৎপীড়নে নিজস্ব বলিয়া কোন জিনিষকেই সে রাখিতে পারে নাই, খালি এই বইখানা সে রাখিয়াছিল, প্রুফ দেখা লেখাপড়া প্রভৃতি সব ইহার সাহায্যে সে করিত, অভিধানখানা হাতের গোড়ায় না রাখিলে তাহার কাজের সুবিধা হইত না। ছয় সাত বৎসর আগেকার জিনিষ, কিন্তু যত্নে রক্ষিত বলিয়া এখনও ভাল অবস্থায় আছে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বইখানা লইয়া উঠিয়া পড়িল।

আবার হাঁটার পালা। সকাল হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতাপের পা দুইটা ব্যথা করিতেছিল, কিন্তু চার পয়সা দিয়া ট্রামে চড়িবারও তাহার সঙ্গতি নাই। এই চারিটা পয়সায় হয়ত বাড়ির মানুষ ক'টা একবেলা নুন-ভাত খাইতে পারে।

পুরাতন বইয়ের দোকানটা বেশ খানিকটা দূর। যাক, অবশেষে পৌঁছিয়া সে ক্লান্তভাবে একটা টুলের উপর বসিয়া পড়িল। অভিধানখানা দোকানীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "এটার জন্যে কত দিতে পার? নূতনের দাম আট টাকা।"

দোকানদার চশমাজোড়া চোখে তুলিয়া বইটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল, পরে বলিল, "এ সব বইয়ের বেশী বিক্রী নেই বাবু। তস্বীরওয়ালা বই হ'লে হয়। এ আমি রেখে কি লোকসান্ দিব?"

প্রতাপ বলিল, "যা দু-এক টাকা পার দাও, আমার বড্ড দরকার। না বিক্রী হয়, সামনে মাসে আমিই এসে ফেরৎ নিয়ে যাব, টাকা ফিরিয়ে দিয়ে।"

দু-টাকা আদায় করিতে প্রতাপকে আধ ঘণ্টা তর্ক করিতে হইল। অবশেষে দুই টাকা লইয়া সে পথে বাহির হইল। আর ত হাঁটিতে পারে না, পা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। মিহিরের সঙ্গেও ত তাহাকে হাঁটিতে হইবে, তখন পথে বসিয়া পড়িলে ত চলিবে না? ট্রামেই শেষে চড়িল, পাঁচ পয়সা খরচ করিয়া। সমস্ত পথ না হইলেও বেশীর ভাগ অতিক্রম করিয়া, বাড়ির কাছে আসিয়া নামিল। বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, মহাঘটা। পিসীমা, বৌদিদি দুইজনে মিলিয়া পিঠা করিতে লাগিয়া

গয়াছেন। গন্ধে সারা বাড়ি আমোদিত। পিঠা চাখিয়া চাখিয়া কানু ইহারই ভিতর পেট বোঝাই করিয়া ফেলিয়াছে।

পিসীমা প্রতাপকে দেখিয়া, ডাকিয়া বলিলেন, "খাবি না কি রে দুখানা? না ছেলেরা আসুক?"

প্রতাপ বলিল, "আমায় এখনি আবার বেরুতে হবে পিসীমা, একেবারে কাজ সেরে এসে খাব-এখন। তাড়াহুড়ো ক'রে খেয়ে সুখ হবে না। কতকাল পৌষ-পার্ব্বণে পিঠে খাইনি।"

ঘরে ঢুকিয়া টাকা দুইটি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল। ছয়টি টাকা কাল সকালেই পাঠাইয়া দিবে। দিনকতক উহারা শাকভাতও নিশ্চিন্ত হইয়া খাক। তাহার পর যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আবার নৃপেন্দ্রবাবুর বাড়ির দিকে যাত্রা করিল।

বাড়ির সামনে আসিয়া দেখিল একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাল্কী গাড়ী, তবে বাড়ির গাড়ী, ঘোড়া এবং গাড়ী দুইয়েরই একটু শ্রীছাঁদ আছে। নৃপেন্দ্রবাবুর গাড়ীই হইবে বোধ হয়। পাশ কাটাইয়া সে ভিতরে ঢুকিয়া গেল। মিহিরের দেখা নাই, খালি ঘরটায় বসিয়া প্রতাপ ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে ছাত্রকে খবর দেওয়া যায়। গাড়ীর ক্যোচম্যান্ সহিস ভিন্ন কোনো চাকরবাকরেরও দেখা নাই যে ডাকিয়া পাঠাইবে। বড়লোকের বড় চাল সম্বন্ধে নানা কড়া কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বাহিরে অনেকগুলি পদশব্দ শুনিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দরজার দিকের চেয়ারেই সে বসিয়াছিল চাকরবাকর কাহারও চোখে পড়িবার আশায়, কাজেই তাহাকে উঠিয়া দাঁড়ান ছাড়া আর কিছু করিতে হইল না।

সিঁড়ি দিয়া তিনটি মানুষ পরে পরে নামিয়া আসিল। প্রথমটি বাড়ির গৃহিণীই হইবেন বোধ হয়, অতি স্থূলকায়া, রং এককালে ফরশা ছিল হয়ত, এখন মেদের আতিশয্যে লাল হইয়া উঠিয়াছে। বয়সের তুলনায় সাজসজ্জা অতিরিক্ত বলিয়াই প্রতাপের চোখে ঠেকিল, অবশ্য এসব বিষয়ে কতটা সঙ্গত, এবং কতটা নয়, সে জ্ঞান প্রতাপের মোটেই ছিল না। উঁচু এবং সরু গোড়ালীযুক্ত জুতা পরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে এই জিনিষটাই তাহার চক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিল। কিন্তু তাঁহার পিছনেই যে মানুষটি আসিতেছিল, তাহার দিকে তাকাইয়া গৃহিণী সম্বন্ধে আর কিছু ভাবিতেই প্রতাপ ভুলিয়া গেল।

সে কি আশ্চর্য্য সুন্দর মুখ! প্রতাপের মনে হইল, সৌন্দর্য্যের এমন অপরূপ বিকাশ সে কল্পনায়ও কখনও আনিতে পারে নাই। সুন্দরী বলিতে প্রত্যেক মানুষের মনেই বিশেষ এক ছাঁদের রূপ মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু এই তরুণীর মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহার রহস্যময়ী মহিমা প্রতাপের চিত্তকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার আয়ত চোখের দৃষ্টি কি অপূর্ব্ব গভীর, তাহার ওষ্ঠপ্রান্তের ক্ষীণ হাসির রেখার অর্থ জগতের পণ্ডিত শ্রেষ্ঠেরও কি বুঝিবার ক্ষমতা আছে? অবতরণের ভঙ্গীর ভিতর যে আশ্চর্য্য সুষমা, তাহা কাব্যে বা চিত্রে কখনও কি ধরা দিয়াছে? প্রতাপের কঠোর তপস্যাক্লিষ্ট হৃদয়ের ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুৎ-শিখা খেলিয়া গেল। অপরিচিতা মহিলার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকা যে ভদ্রতাসঙ্গত নয়, তাহা পর্য্যন্ত সে ভুলিয়া গেল।

ইহাদের পশ্চাতে লাফাইতে লাফাইতে মিহির নামিতেছিল। গৃহিণী প্রতাপকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তরুণী দেখিয়াও দেখিল না, শুধু মিহির চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মাষ্টার মশায়! এখনও কিন্তু চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট দেরি আছে।"

প্রতাপ কিছু উত্তর দিবার আগেই প্রৌঢ়া মহিলা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হাউ মাউ ক'রে না চেঁচিয়ে কি কোনো কথা বলা যায় না? যাও এখনি জুতো প'রে রেডি হয়ে এস। ছ'টার মধ্যে ফিরে আসবে।"

তিনি গাড়ীর কপাট ধরিয়া কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া পড়িলেন, তরুণীও একবার প্রতাপ এবং মিহিরের দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিল। কোচ্ ম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

মিহির বলিল, 'আপনি বসুন, আমি জুতোটা প'রে

আস্‌ছি। এতক্ষণ হয়ে যেত, খালি মা আর দিদির সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।"

প্রতাপের মন তখনও অভিভূত, আর কিছু বলিবার না পাইয়া সে বলিল, "কি নিয়ে এত ঝগড়া হচ্ছিল?"

মিহির বলিল, "কিছুতেই ধুতি প'রে কোথাও যেতে দেবেন না, মায়ের যে কি জেদ। সব জায়গায় হাফপ্যাণ্ট প'রে ঘোরো, মোটেই আমার ভাল লাগে না।" প্রতাপের বড় ইচ্ছা করিতে লাগিল, মিহিরের দিদির এ বিষয়ে কি মত, তাহা জানিয়া লয়। তিনিও কি ধুতি পরাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন? কিন্তু ততক্ষণে তাহার সাধারণ বুদ্ধি খানিকটা ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং মিহিরও জুতা পরিতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কাজেই সে কথা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না। সে আবার চেয়ারখানা টানিয়া বসিয়া পড়িয়া, ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তাহার মন তখনও সেই এক চিন্তাতেই বিভোর। নারীকে অনেক ক্ষেত্রে মায়াবিনী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সত্যই এ জগতে মায়া তাহাদের আশ্রয় করিয়াই আছে। প্রতাপের মনে হইতে লাগিল, ঐ তরুণী যদি একদৃষ্টে কোনো মানুষের দিকে তাকাইয়া থাকে, তাহাকে অবিলম্বে সম্মোহিত করিয়া ফেলিতে পারে। অন্ততঃ তাহাকে যে পারে, সে বিষয়ে তাহার নিজের কোনো সন্দেহ ছিল না। নারীর সঙ্গ ও সাহচর্য্য হইতে আবাল্য বঞ্চিত বলিয়াই ইহার জন্য তাহার মনে নিজের অজ্ঞাতেই হয়ত একটা গভীর পিপাসা ছিল। দারিদ্র্যে আজন্ম নিষ্পিষ্ট হইলেও, তাহার প্রকৃতিগত ভাবপ্রবণতা একেবারে শুকাইয়া যায় নাই, নহিলে হঠাৎ তাহার এতখানি অভিভূত অবস্থা হইত না। যাহাকে সে দেখিয়াছে, সে যথার্থ সুন্দরী বটে, কিন্তু সুন্দর মুখ জগতে একেবারে বিরল নয়। তবে সৌন্দর্য্যের প্রভাব সব মানুষের উপর সমান হয় না, এবং সকল অবস্থাতেও সমান হয় না। প্রতাপের মন সৌন্দর্য্যের মোহিনী মায়ায় ধরা দিবার জন্য সকল দিক হইতেই উন্মুখ হইয়া ছিল, তাই ধরা পড়িতে তাহার মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব হইল না।

মিহির জুতা মোজা পরিয়া নামিয়া আসিল। প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে যাবে?"

মিহির বলিল, "আজ কয়েকটা ভাল ম্যাচ আছে, চলুন না একটাতে?"

ম্যাচে কালেভদ্রে প্রতাপ যায় বটে, সুতরাং পথঘাট তাহার নিতান্ত অজানা নয়। সে জিজ্ঞাসা করিল আবার, "হেঁটে যাবে না ট্রামে?"

মিহির বলিল, "খানিকটা ট্রামে না গেলে ত ছয়টার মধ্যে ফিরে আসতে পারব না?"

প্রতাপ বলিল, "তা বটে।" খানিক দূর হাঁটিয়া গিয়া দুই জনেই ট্রামে চড়িয়া বসিল। মিহির পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া প্রতাপের হাতে দিয়া বলিল, "মা এইটা আপনাকে দিতে বলেছিলেন, ট্রামের ভাড়ার জন্যে।"

খানিক দূর যাইয়া প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি ফুটবল্ খেলতে ভাল লাগে?"

মিহির বলিল, "ভাল ত লাগে, কিন্তু খেলি কোথায়? বাড়িতে ত জায়গা নেই, বাইরে কোথাও আমাকে খেল্‌তে যেতে দেবে না। মায়ের ইচ্ছে দিদিকে যেমন ঘরে আট্‌কে রাখেন, কারও সঙ্গে কথা বলতেও দিতে চান না, আমাকেও তাই করবেন। তাই নাকি কখনও হয়।"

মিহির ঘুরাইয়া ফিরাইয়া খালি সে মা আর দিদির কথাই আনিয়া তোলে। তাহারও বিশেষ দোষ নাই, পরিবারের গণ্ডীর ভিতরে তাহাকে এমন করিয়া আট্‌কা করিয়া রাখা হইয়াছে, যে, কথা বলিবারও সে আর কিছু খুঁজিয়া পায় না।

প্রতাপ হঠাৎ লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদি স্কুলে পড়েন না?" বলিয়াই সঙ্কোচে সে নিজেই মুষড়াইয়া গেল। এমন করিয়া কৌতূহল প্রকাশ করা তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে, যদি মিহির কোনগতিকে কথাটা বাড়িতে বলিয়া বসে, তাহা হইলে প্রতাপের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের কি চমৎকার ধারণাই হইবে!

মিহির কিন্তু দিব্য সহজভাবে বলিল, "পড়ত ত আগে

লোরেটোতে, এখন ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে পড়ে আর গান বাজনা শেখে।”

প্রতাপ আর কোনো প্রশ্ন করিল না, দিদির নামটা জানিবার জন্য যদিও একটা উৎকট আগ্রহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। যথাস্থানে নামিয়া ছাত্রকে ম্যাচ্ দেখাইয়া, বেড়াইয়া লইয়া আসিল। বাড়ি পৌছাইয়া দিবার সময় আশান্বিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু এবার আর কাহারও দর্শন মিলিল না।

প্রতাপ হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিয়া চলিল। সারাটা পথ কত আজগুবি ভাবনাই যে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, তাহার ঠিকানা নাই। মিহিরের মায়ের অতিরিক্ত সাহেবীয়ানা তাহার মনকে, কেন জানি না, অত্যন্তই পীড়া দিতে লাগিল। কি যে তাহার তাহাতে আসিয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই, অথচ কেবলই প্রতাপের মনে হইতে লাগিল, ইহা তাহার পক্ষে একটা দারুণ দুর্ঘটনা।

খানিকটা ঘোরা পথেই বাড়ি ফিরিল। তাহার পর পিসীমার হাতের পিঠা খাইয়া মধুরভাবেই রবিবার দিনটা শেষ করিল।

৬

মিহিরের বাবা নৃপেন্দ্রবাবুর জন্ম হইয়াছিল গোঁড়া হিন্দু ঘরে। হিন্দুত্ব জিনিষটাতে তাঁহার বিশেষ কিছু আপত্তি ছিল না, তবে গোঁড়ামী এবং তাহার নামে যত প্রকার সামাজিক অনাচার অত্যাচার চতুর্দ্দিকে চলিতে দেখিতেন, সেইগুলিই তাঁহার অসহ্য লাগিত। বালককালেও ইহা লইয়া আপত্তি করিতেন এবং তর্ক করিতেন বলিয়া গালাগালি ও মার তাঁহাকে যথেষ্টই খাইতে হইত।

কলেজে পড়িতে কলিকাতায় আসিয়া সমধর্ম্মী কয়েকটি যুবকের সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার আলাপ হয়। সমাজ-সংস্কারের নেশা তখন হইতেই তাঁহাকে উৎকটভাবে পাইয়া বসে, এবং বি-এ পাস করিবার কিছুদিন পরেই তিনি একটি বিধবা যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে পিতা তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করেন, এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক এক রকম ঘুচিয়াই যায়। কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকায় ইহার অধিক আর কোনো শাস্তি তাঁহাকে পাইতে হয় নাই। তাঁহার আর্থিক অবস্থার ক্রমেই উন্নতি হইতে থাকে, এবং তাহার গুণেই বোধ হয় আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্যটাও কাটিয়া যায়। এখন তাঁহার বাড়িতে আসিয়া উঠিতে, বা অর্থসাহায্য চাহিতে তাঁহাদের কোনো আপত্তি দেখা যায় না। গ্রামের বাড়িতে অবশ্য নৃপেন্দ্রবাবুর যাওয়া-আসা নাই।

সংস্কারের নেশা তাঁহার এখনও আছে, তবে অবসর কম। পরিবার-বৃদ্ধির সঙ্গে খরচও যথেষ্ট বাড়িয়াছে, সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায়ই তাঁহার বেশীর ভাগ সময় কাটিয়া যায়। তাহা ভিন্ন সংস্কারকার্য্যে গৃহিণী জ্ঞানদা এত অগ্রসর, যে, নৃপেনবাবুর এদিকে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজনই হয় না। বাল্যে ও কৈশোরে কুসংস্কারের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, বোধ হয় জ্ঞানদা সকল প্রকার দেশাচারের উপরেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাড়ি সাজাইয়াছিলেন তিনি সম্পূর্ণ ইংরেজী ধরণে। খাওয়া-দাওয়া করিতেন যথাসাধ্য বিদেশী প্রথায়, অবশ্য খাদ্য-তালিকা হইতে দেশী জিনিষ একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। এইখানে তাঁহার নিতান্ত স্বদেশীয় রসনাটি বাদ সাধিয়াছিল। স্বামীর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার মতে মিলিত না, তবে নৃপেন্দ্রবাবু অধিকাংশ স্থলেই জোর করিয়া নিজের মত খাটাইতেন না বলিয়া দিন একরকম চলিয়া যাইত। খালি ছেলেমেয়ের নাম রাখিবার সময় নৃপেন্দ্রবাবু কিছুতেই জেদ ছাড়িতে রাজী হন নাই। জ্ঞানদার ইচ্ছা ি ল মেয়ের নাম রাখেন রমলা, কিন্তু স্বামী জোর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন যামিনী। ছেলে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহার দেশী নাম রাখিয়া, তিনি জ্ঞানদাকে দমাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ছেলেমেয়ে মানুষ করাতে তাঁহার বিশেষ হাত রহিল না। ছেলে এখনও ধুতি পরিতে পায় না, যামিনী যোল বৎসর পর্য্যন্ত ফ্রক পরিয়া স্কুলে যাইত, তাহার পর নিতান্ত কান্নাকাটি অনাহার প্রভৃতির শরণ লইয়া বছর-দুই হইল শাড়ীতে প্রোমোশন্ পাইয়াছে। ছেলেমেয়ে দেশী স্কুলে পড়িতে পায় না, দেশী গান বাজনা শেখে না, বাংলা বইয়ের প্রতিও তাহাদের মায়ের বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা নাই। ছোট ছেলেপিলের পড়িবার

মত বই-ই না কি বাংলা ভাষায় নাই। যা তা পড়িয়া ছেলেমেয়েকে জ্যাঠা হইয়া যাইতে দিতে তিনি রাজী নন। ইংরেজী বই পড়িয়াও যে জ্যাঠা হইতে একেবারেই আট্‌কায় না, তাহা তাঁহার ধারণা ছিল না, কারণ ইংরাজী তিনি অতি সামান্যই জানিতেন। সুতরাং যামিনীর বই পড়াতে কোনো ব্যাঘাত ছিল না, কারণ ইংরেজী নভেল বুঝিবার বিদ্যা, এবং তাহার রস গ্রহণ করিবার বয়স তাহার হইয়াছিল। মিহিরের অদৃষ্টদোষে বিদেশী ভাষাটা সে ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তাই "রবিনসন্ ক্রুসো"র উপরে উঠিবার অধিকার এখনও সে পায় নাই।

আর একটি জিনিষকে জ্ঞানদা মারাত্মক রকম ভয় করিয়া চলিতেন, সেটি দারিদ্র্য। ইহারও কারণ তাঁর প্রথম জীবনের জ্বালাময় অভিজ্ঞতা। অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য তাঁহার নিরন্তর চেষ্টায়ই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে এতখানি অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। স্ত্রী তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও লাগাম ঢিলা দিতেন না। আর্থিক সচ্ছলতা বিহনে বাঁচিয়া থাকা যে একেবারেই বৃথা, এ ধারণা পরিবারস্থ সকলের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য জ্ঞানদার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ছেলেমেয়েকে দরিদ্র মানুষের সঙ্গে মিশিতে দিতেও তিনি চাহিতেন না, পাছে ছোঁয়াচ লাগিয়া তাহাদের আভিজাত্যবোধ কিছু কমিয়া যায়। ধনই এ জগতের একমাত্র কামনার জিনিষ, ইহা তিনি স্থির-নিশ্চয় করিয়া জানিতেন। স্বামী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও যাহাতে সমান চালে থাকিতে পারেন, তাহার জন্য হরেকরকম ব্যবস্থা তিনি এখন হইতেই করিয়া রাখিতেছিলেন। সন্তানাদির সংখ্যা বেশী না, ইহা তাঁহার একটা সান্ত্বনার বিষয় ছিল। মেয়ের খুব অবস্থা-পন্ন ঘরে বিবাহ দেওয়া এবং ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়া পাস করিবার আলোচনা, তাঁহার আর থামিতে চাহিত না।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের এ সকল বিষয়ে খুব বেশী উৎসাহ ছিল না, তবে স্ত্রীর কথায় সায় দেওয়া তাঁহার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহা করিয়া বসিতেন। বিলাত না যাইলে যে বিদ্যা হয় না, এ ধারণা তাঁহার ছিল না, তবে ভাল কাজ পাইবার অসুবিধা হয় বটে। মেয়েকেও সর্ব্বপ্রকারে সুশিক্ষিতা করিয়া দেশের ও সমাজের কাজে লাগাইবেন, তাঁহার এই-রূপ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জ্ঞানদা ইহা শুনিলে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিতেন। বাহিরে সাহেবীয়ানার ভড়ং যতই করুন, মনের ভিতরে অজ্ঞতার অন্ধকার তাঁহার নানা মূর্ত্তিতে লুকাইয়া ছিল। বিবাহিত জীবন ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কোনোভাবে বাঁচিয়া থাকাকে তিনি অনভিজাত বলিয়া মনে করিতেন। স্বামীর অর্থে বসিয়া খাওয়া এবং বুবায়ানী করা ভিন্ন, নারীর পক্ষে সম্মানকর আর কোনো পন্থাই তিনি জানিতেন না। স্ত্রীলোক হইয়াও যে খাটিয়া খায়, সে ত অতি নগণ্য। এজন্য এখন হইতেই কন্যার বিবাহের চেষ্টা তিনি তলে তলে সুরু করিয়াছিলেন। আর এক ক্ষেত্রেও তাঁহার সাহেবীয়ানার ব্যতিক্রম দেখা যাইত, সেটা স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলা-মেশার বিরুদ্ধতায়। মেয়ে সকল দিকেই মেমের মেয়ের মত মানুষ হইবে, অথচ বিবাহ দিবার সময় মা বাবার নির্ব্বাচন মাথা পাতিয়া লইবে, এই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। অবশ্য ইহা সম্ভব কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার কোনো প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নাই। কন্যাকে একাকিনী কোথাও যাইতে তিনি দিতেন না, এবং কোনো অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে কথা বলা তাহার একেবারে নিষেধ ছিল। যতদিন স্কুলে যাইত, ততদিন অন্ততঃ ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ তাহার ছিল, এখন বাড়িতে পড়ার কল্যাণে তাহার একেবারেই নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। বৃদ্ধ মাষ্টার এবং বাজনার শিক্ষয়িত্রী ভিন্ন বাহিরের লোকের মুখই সে দেখিত না। মা মধ্যে মধ্যে সঙ্গে করিয়া বড়মানুষ বন্ধুদের বাড়ি লইয়া যাইতেন, বেড়াইতেও লইয়া যাইতেন, কিন্তু তরুণ মনের সঙ্গীর অভাব তাহাতে বিন্দুমাত্রও মিটিত না।

যামিনীকে বাধ্য হইয়া ক্রমেই বেশী করিয়া পুস্তকের শরণ লইতে হইতেছিল। বাবার সঙ্গে প্রায়ই নানা পুস্তকের দোকানে বেড়াইতে গিয়া সে ইচ্ছামত বই কিনিয়া আনিত। ইহাতে মায়ের আপত্তি ছিল না, হি হি করিয়া হাসিয়া, আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করা

জিনিষটাকে তিনি শিক্ষিত সমাজের পক্ষে শোভন মনে করিতেন না। মিহির হৈ চৈ করার অপরাধে মায়ের কাছে প্রায়ই বকুনি খাইত। মিহিরের স্বভাব কিন্তু হাজার বকুনি খাইয়াও সংশোধিত হয় নাই।

বাড়িতে লোকের মধ্যে ত চারি জন, অবশ্য ঝি চাকর কয়েকটি ছিল, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও যাহাতে পুত্রকন্যা যথেষ্ট দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলে, সেদিকে জ্ঞানদার প্রখর দৃষ্টি ছিল। মিহির মাঝে মাঝে নিষেধ না মানিয়া, বেয়ারা ছোট্টুর সঙ্গে গল্প জমাইত, ইহাতে মা তাহার "ছোটলোকের মত স্বভাব" সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশ করিতেন। এতখানি উচ্চনীচ ভেদের আবার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। জ্ঞানদা তাঁহাকে বুঝাইতেন, চাকরবাকর সম্বন্ধে কড়াকড়ি না করিলে, ছেলেমেয়ের চাল-চলন একেবারে বেয়াড়া হইয়া উঠিবে, ভদ্রসমাজের উপযুক্ত আর থাকিবে না। নিজের খাস্ আয়া কিস্‌মতিয়া সম্বন্ধে তাঁহার একটুখানি উদারতা ছিল, কারণ সে বহু দিন এক য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ পরিবারে কাজ করিয়া খানিকটা আভিজাত্য অর্জ্জন করিয়াছিল। নানা কারণে মিহিরের মনে হইত মা এবং বাবাও দিদির প্রতি অযথা পক্ষপাত প্রদর্শন করেন। একে ত সে কাপড় জামা গহনা ইচ্ছামত পায়, এমন কি সে নিজে না চাহিলেও, মা তাহার জন্য কিনিয়া রাখেন। বই কেনার তাহার কোনো বাধা নাই, কিন্তু মিহিরের একখানিও বই নিজের খুশীমত কিনিবার উপায় নাই। বাবা বাছিয়া যাহা কিছু রদ্দিমাল তাহার ঘাড়ে চাপাইবেন, তাহাই তাহাকে লইতে হইবে। হকি-ষ্টিক্, ফুটবল্, লুডো বা ক্যারোমের আব্দার বছরে এক দিন মাত্র করা চলে। মিহিরের জন্মদিনে তাহার এইটুকু লাভ হইত। বাড়ির গাড়ীখানা ত মা আর দিদি এমন দখল করিয়াছেন, যে, বাবাও অর্দ্ধেক দিন আমল পান না, মিহিরের কথা ত ছাড়িয়াই দেওয়া যায়। মা এবং দিদির কাজ করিয়া দিবার জন্য একজন আলাদা আয়া আছে, মিহিরের কেহ নাই। ছোট্টু খুশী-মত একটু আধটু করে, বাকি তাহার নিজেরই সারিয়া লইতে হয়। আপত্তি করিলে বাবা বকেন। ফুলবাবু তৈরি হওয়ার যে কি পরিণাম তাহা শুনিতে শুনিতে মিহিরের দুই কান বোঝাই হইয়া যায়। এই সব কারণে দিদির সঙ্গে ঝগড়া মিহিরের লাগিয়াই থাকে। মা এখানেও পক্ষপাত দেখান, কিন্তু মিহিরকে দমাইতে পারেন না।

রবিবারে মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া, মিহির দেখিল বাড়িতে কোথাও কেহ নাই। অত্যন্ত চটিয়া হন্ হন্ করিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া, বুট জুতা পায়েই খাটে শুইয়া পড়িল। এই কাজটি তাহার মায়ের অত্যন্ত অপছন্দ, সেই জন্য ইচ্ছা করিয়া ইহা করিয়া সে অনুপস্থিত মায়ের উপর শোধ তুলিতে লাগিল।

ছোট্টু আসিয়া বলিল, "খোকাবাবু ওঠ, হামি বিছানা লাগাবে।"

মিহির বলিল, "উঠ্‌বো না, তুই বেরো।" ছোট্টু বলিল, "লক্ষ্মী খোকাবাবু উঠ, মেমসাহেব দেখলে গোস্‌সা করবে, শেষে তুমাকেই লাগাতে হোবে।"

বিছানা হইতে একটা বালিশ টানিয়া লইয়া মিহির ছোট্টুকে ছুঁড়িয়া মারিল। সে বেচারা অগত্যা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ঝগড়া করিবার জন্য মিহিরের মনটা এমনিতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, তাই নানা উপদ্রব করিয়া সে ঝগড়ার মালমশলা জোগাড় করিয়া রাখিতে লাগিল।

নিজের ঘরে মিনিট-পনেরো শুইয়া থাকিয়া মিহিরের আর ভাল লাগিল না। আস্তে আস্তে উঠিয়া মায়ের ঘরের দিকে চলিল। সেখানে কিস্‌মতিয়া কাপড় গুছাইতেছে। খালি দিদির রূপগুণের বর্ণনায় মুখর বলিয়া মিহির আয়াকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। সে তাড়াতাড়ি দিদির ঘরে চলিয়া গেল।

মায়ের ঘরের পাশেই দিদির ঘর, অত বড় নয় বটে, তবে ঢের বেশী সুসজ্জিত। এ ঘরের আসবাব, পরদা, বিছানা-ঢাকা, ছবি, সবগুলিই গৃহের অধিকারিণীর রুচির পরিচয় দিতেছে। অবিবাহিতা মেয়ের জন্য এত দামী আসবাব কেন কেনা হইয়াছে, তাহার কৈফিয়ৎ কেহ না চাহিলেও গৃহিণী যাচিয়া সকলকে শুনাইয়া দেন। জিনিষগুলি এক সাহেব অর্ডার দিয়া করাইয়াছিলেন, তাঁহার বাগদত্তা বধূর জন্য। তরুণীটি দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের পূর্ব্বেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যান।

আসবাবগুলি সাহেব তখনই নীলাম করিতে বিদায় করিয়া দিতেছিলেন, জ্ঞানদা ছোট্টর মুখে খবর পাইয়া, কিছু সস্তা দরেই সেগুলি কিনিয়া ফেলেন। সাহেব তাঁহাদের প্রতিবেশী ছিলেন, তিনিও অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। জ্ঞানদা বলিতেন, মেয়ের বিবাহে আসবাব ত দিতেই হইবে, তখন এগুলি পালিশ করাইয়া আচ্ছাদন বদলাইয়া দিলেই চলিবে। সে চমৎকার হইবে, জিনিষগুলি এত সুন্দর, যে, কেহ খুঁৎ ধরিতে পারিবে না।

যামিনী বইগুলি মিহিরের ভয়ে সর্ব্বদা আলমারিতে বন্ধ করিয়া রাখিত। একবার ভ্রাতার হাতে পড়িলে সেগুলির যা দুর্গতি হইত, দেখিয়া যামিনীর চোখে জল আসিয়া পড়িত। দিদির ছিঁচ্‌কাঁদুনে স্বভাব মিহিরের একটা ঠাট্টার জিনিষ ছিল। সে নিজে মার খাইয়া হাড় ভাঙিয়া গেলেও কাঁদিত না, কিন্তু দিদিকে উঁচু গলায় একটা কথা বল দেখি? তখনি নাক লাল হইয়া উঠিবে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিয়া কান্না সুরু হইয়া যাইবে। মেয়েরা না কি আবার ছেলেদের সমান হইতে পারে?

আজ মিহিরের কপালক্রমে একখানা বই দিদি টেবিলের উপর ফেলিয়া গিয়াছিল। তাহার সব বইয়েই মলাট্ লাগান, পাছে সুদৃশ্য বাঁধানোর চাকচিক্য কমিয়া যায়। মিহির প্রথমেই একটান দিয়া কাগজের মলাটটা খুলিয়া ফেলিল। বইখানি শার্লোট ব্রণ্টি লিখিত "জেন্ য়্যা"র সচিত্র সংস্করণ। গল্প পড়িবার চেষ্টা করিয়া মিহির দেখিল অল্প অল্প বোঝা যায় বটে, তবে মেয়ে-স্কুলের বর্ণনা পড়িতে তাহার বেশীক্ষণ ভাল লাগিল না। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ছবি দেখিতে লাগিল। কিন্তু ইহাও তাহার পছন্দমত হইল না, তখন পকেট হইতে একটা পেন্সিল বাহির করিয়া সে চিত্রিতা জেন্ য়্যারের মুখে একজোড়া সুন্দর গোঁফ রচনা করিতে লাগিল।

এত তন্ময় হইয়া সে কাজ করিতেছিল যে, পিছনে লঘু পদশব্দ শুনিতে পায় নাই। হঠাৎ তাহার ঘাড় ধরিয়া ঝাঁকানী দিয়া কে যেন বলিয়া উঠিল, "বাঁদর ছেলে, একি হচ্ছে? তুমি কোন্ আস্পর্দ্ধায় আমার বইয়ে দাগ কাটছ?"

পিছন ফিরিয়া দিদিকে দেখিয়া মিহির বলিল, "ছবিটা বড় প্যান্‌পেনে, তাই একটু জোরাল ক'রে দিচ্ছিলাম।"

রাগে বিরক্তিতে তখন যামিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে উঁচু গলায় বলিল, "একেবারে ধাঙড়, তোমায় দেখলে ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে কেউ বল্‌বে না। সুন্দর, পরিষ্কার কিছু কি তুই চোখে দেখতে পারিস্ না? এমন টেষ্ট তোর হ'ল কোথা থেকে?"

মেয়ের গলার স্বর শুনিয়া জ্ঞানদাও হাঁফাইতে হাঁপাইতে আসিয়া জুটিলেন। ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে, তোর জ্বালায় আমি কি করব বল দেখি? এত বড় ধেড়ে ছেলে, তোর বুদ্ধি হবে কখন? যা খুশী তাই করবি? তোকে কি এখনও কচি ছেলের মত কোণে দাঁড় করাতে হবে না কি?"

মিহির বই রাখিয়া দিয়া বলিল, "আমি ত আর একটা মানুষ না, আমি জেলের কয়েদী। নিজেরা খুব গাড়ী চড়ে বেড়াও, আর গাদা গাদা গহনা কাপড় প'রে সেজে বসে থাক, আর আমি কেবল ঘরের কোণে বসে পড়া মুখস্থ করি। বাংলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মালে লোকে হায় হায় করে, আমি ছেলে হয়ে জন্মেই যত অপরাধ করেছি।"

জ্ঞানদা তাড়া দিয়া বলিলেন, "চুপ কর্, বাঁর হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি। এতটুকু ছেলের এত জ্যাঠামা কেন?"

যামিনী বলিল, "আর নিজে যেন বেড়াতে যাসনি। আমি দেখলাম না যাবার সময় তোর টিউটার দাঁড়িয়ে আছে, তোকে নিয়ে যাবার জন্যে?"

মিহির উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আহা, বেড়িয়ে ত এলাম কত হিল্লি দিল্লি মক্কা! ট্রামে চড়ে বেড়ানোর মজা কত। একদিন আমাকে গাড়ীটা দিয়ে তোমরা যাও না ট্রামে?"

"যা নিজের ঘরে, খালি মুখে মুখে চোপা! এ ছেলে কোনো দিন মানুষ হবে না," বলিয়া জ্ঞানদা ছেলেকে ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

যামিনী বইখানিতে সযত্নে আবার মলাট পরাইতে পরাইতে বলিল, "ছবিটা একেবারে মাটি করে দিল। কি যে ভ্যাণ্ডালের মত স্বভাব হচ্ছে খোকার।"

জ্ঞানদা বলিলেন, "যেমন অসাবধান মেয়ে তুমি। জিনিষপত্র যে কত যত্নে রাখতে হয়, তা এত দেখেও তুমি শেখ না। ফের ড্রেসিং টেব্‌লের উপর জলের গেলাস কেন? ওগুলো এ রকম ক'রে নষ্ট করবার জন্যে দেওয়া হয় নি।"

যামিনী অনুতপ্ত হইয়া তাড়াতাড়ি জলের গেলাস নামাইয়া রাখিল। জ্ঞানদা নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

যামিনী বাহিরে গিয়াছিল মূল্যবান বাসন্তী রঙের ক্রেপের পোষাক পরিয়া। এখন সে সব ছাড়িয়া রাখিয়া ঘরোয়া সাজে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

মেয়েটি এই সুন্দর সুসজ্জিত ঘরের শোভা আরও যেন শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নয়, উজ্জ্বল শ্যাম, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য গৌরবর্ণকেও লজ্জা দেয়। ভিতরে একটা দীপ্তি যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে। বিপুল কবরীভারে তাহার মৃণাল গ্রীবা যেন ভাঙিয়া পড়িতে চায়। তাহার বিশাল চোখ দুইটি দেখিলে কখনও মনে হয় এ তরুণী জগতের পাপ-পঙ্কিলতা কখনও কল্পনাতেও জানে নাই, আবার কখনও মনে হয় ইহার দৃষ্টির মায়ায় সে ভুবন জয় করিতে পারে। যামিনী নামের সার্থকতা তাহার রূপে ছিল। রাত্রির মতই সে রহস্যময়ী।

ক্রমশঃ

নীরব প্রেম

শ্রীক্ষিতীশ রায়

ও ধারের ওই চষাক্ষেত হ'তে ঝিল্লী উঠিল ডেকে
সজল সমীর আকুলিত হ'ল মাটির গন্ধ মেখে।
নিঝুম সাঁঝের বুক অতিবাহি' যেতেছিনু দুইজনা—
সেদিনের কথা ভুলি নাই সখি!—কভু আমি ভুলিব না।

কপোতী-কাজল নয়ন তোমার মেলিলে তারার পানে
দৃষ্টি তোমার আপনা হারাল, যেন সুগভীর ধ্যানে!
সে নীরবতার মানেটুকু সখি, বুঝেছিনু মনে মনে
তাই ত তোমারে বাসিয়াছি ভাল, সাঁঝের সন্ধিক্ষণে।*

* ইটালিয়ান্ হইতে



লোরো য়োংরাং-এর কাহিনী

শ্রী সংগ্রাহক

যবদ্বীপ বা জাভার সর্ব্বত্র হিন্দু সভ্যতার চিহ্ন বিদ্যমান। হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম্মের, হিন্দু সাহিত্যের এবং হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের পরিচয় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। প্রাম্বানন্ নামক প্রাচীন নগরে বিস্তর শৈব ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল। এখনও তাহাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহার নিকটে চাণ্ডী সেবু নামক স্থানে আড়াই শতের অধিক মন্দির আছে। চাণ্ডী সেবুর অর্থ "সহস্র মন্দির।" এইগুলির মধ্যে একটির নাম "শ্রী লোরো য়োংরাং"-এর মন্দির। আমাদের নামের গোড়ায় আমরা যেমন শ্রী ব্যবহার করি, জাভাতেও হয়ত আগে সেইরূপ হইত। "লোরো" শব্দের অর্থ "অবিবাহিতা"। আমাদের দেশে এখনও অনেক লোক আছে, যাহারা বিশ্বাস করে আট নয় দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দিলে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়। জাভাতেও এই রকম একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে বিশ্বাস পূর্ব্বপুরুষদিগকে নরকে পাঠাইত না, যে-বালিকা আঠার উনিশ বৎসর বয়সেও বিবাহ করিতে রাজী হইত না, তাহাকে পাষাণে পরিণত করিত। শ্রী লোরো য়োংরাং-এর মন্দিরের সহিত এখনও এইরূপ একটি কুসংস্কারের কাহিনী জড়িত আছে। তাহাই বলিব

পুরাকালে যবদ্বীপে রাতু বোকো নামক এক রাজা মাতারম্ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র সন্তান ছিল। সেটি কন্যা। সূতিকাগারেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। কন্যাটির নাম তিনি শ্রী য়োংরাং রাখেন। কন্যাটি মায়ের মতই রূপসী ছিল। তাহাকে দেখিয়া রাতু বোকোর তাঁহার মহিষীকে মনে পড়িত। মহিষীর প্রতি তাঁহার প্রেম এবং কন্যার প্রতি স্নেহের আতিশয্য বশতঃ তিনি কন্যাটির সামান্য অভিলাষও অপূর্ণ রাখিতেন না। পিতার এইরূপ আদরে, বালিকারা, বিশেষতঃ রাজকুমারীরা, যতটা স্বাধীনতা পাইত, য়োংরাং তার চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনতা সম্ভোগ করিত। এই কারণে, য়োংরাং এত বেশী স্বাধীনচিত্ত হইয়া উঠিল, যে, তাহার শিক্ষকেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। যথাকালে রাজমন্ত্রীরা নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহের রাজপুত্রদের মধ্যে রাজকুমারী য়োংরাং-এর জন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিতে পাইয়া য়োংরাং পিতাকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন, যে, তিনি তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে কাহারও সহিত বিবাহ দিবেন না।

রাজনন্দিনীর পাণিপ্রার্থী হইয়া কত কত রাজকুমার রাতু বোকোর প্রাসাদে আসিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও য়োংরাং পছন্দ করিলেন না। য়োংরাং পরমা সুন্দরী ছিলেন বলিয়া অনেক প্রত্যাখ্যাত রাজপুত্র মর্ম্মাহত হইয়া নিজ নিজ পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু অন্য অনেকে মনে করিলেন, যে, তাঁহাদিগকে অপমান করা হইয়াছে, এবং সেইজন্য তাঁহারা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা রাজা রাতু বোকোকে এই বলিয়া দোষ দিতে লাগিলেন, যে, কন্যাকে বিবাহ করিতে আদেশ করা তাঁহার উচিত ছিল। তাঁহারা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না। অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মাতারম্ রাজ্যের বিরুদ্ধে বড় বড় সৈন্যদল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাতু বোকো এরূপ বিপৎসঙ্কুল যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হইয়া পড়িলেন, যে, তাঁহার প্রজারা অধীর হইয়া উঠিল। তাহারা একদিন প্রাসাদের সম্মুখস্থ চত্বরে সমবেত হইয়া চাহিয়া বসিল, যে, রাজা এমন কিছু করুন যাহাতে রাজকুমারীর নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চেতনা হয়।

লোকমতের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া রাতু বোকো য়োংরাংকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার চেটীদেব সমক্ষে বলিলেন,

"আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে,

তোমার সম্মতি ব্যতিরেকে তোমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব না। কিন্তু ইহা কখনই আমার অভিপ্রায় ছিল না, যে, যে-কেহ তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিবে তুমি তাহাকেই প্রত্যাখ্যান করিবে;—বিশেষ করিয়া



পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত য়োংরাং তাঁহার দিকে পিছন ফিরাইয়া অবনত মস্তকে ঠোঁট চাপিয়া বসিয়াছিলেন...

যখন দেখিতেছি তোমার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে এমন অনেক নৃপতি রহিয়াছেন যাঁহাদের পদমর্য্যাদা বিবেচনার যোগ্য। যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সংসারে তোমার আগমন, তুমি তাহাই এড়াইবার চেষ্টা করিতেছ, এবং আমার প্রজারা মুখ চাপিয়া হাসিতে ও তোমাকে 'লোরো' (অর্থাৎ থুবড়ী) বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার মনের ভাবটা আমাদের মত প্রাচীন রাজবংশের অযোগ্য। তোমার জন্য দেবতারা আমাদের বংশের উপর ক্রুদ্ধ হইতেছেন। সুতরাং তোমার এ রকম ব্যবহার আর বেশী দিন চলিবে না। আমি অবগত হইয়াছি, পায়াং-এর রাজা আমার দরবারে আসিতে ও তোমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জানাইতে চান। তিনি গভীর জ্ঞানী ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। তোমাকে যে কথা দিয়াছি, আমি তাহার দাস। কিন্তু তোমার বয়স এখন আঠার; তোমাকে দুটি জিনিষের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হইবে। হয় তুমি পায়াং-রাজকে বিবাহ করিবে, নতুবা তোমাকে তাসিক্‌মালায়ার মঠে গিয়া সেখানে চিরকুমারী থাকিতে হইবে।"

পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত য়োংরাং তাঁহার দিকে পিছন ফিরাইয়া (ইহাই জাভার রীতি) অবনত মস্তকে ঠোঁট চাপিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না—যে-স্বাধীন জীবনে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার মায়া কাটাইতে পারিতেছিলেন না। পিতার প্রাসাদে তাঁহার প্রত্যেকটি কথা সকলের শিরোধার্য্য ছিল বলিয়া তাহা ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার খুবই অনিচ্ছা ছিল। সর্ব্বোপরি, তাঁহার মা তাঁহার জন্মের পরই প্রাণত্যাগ করেন বলিয়া সন্তানের জননী হওয়া তাঁহার পক্ষে ভয়ের কারণ ছিল। অন্য দিকে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মঠে বিষণ্ণ সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে কালযাপনের চিন্তাও ভাল লাগিতেছিল না। পিতার কথা শুনিতে শুনিতে এইরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয়মন আন্দোলিত হইতেছিল। পিতার কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমার কথা শুনিব।"

কিন্তু পিতার কক্ষ হইতে বাহির হইতে-না-হইতেই তিনি এমন একটা কৌশল উদ্ভাবন করিতে সঙ্কল্প করিলেন, যাহাতে বিবাহও করিতে না হয়, মঠেও যাইতে না হয়। গভীর চিন্তার পর স্থির করিলেন, নিজের সঙ্কট অবস্থা হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় পায়াং-রাজকে তাঁহাকে বিবাহ করিবার নির্ব্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যাইতে সম্মত করা। তাহা হইলে তাঁহার পিতা বিবাহ না-করার জন্য তাঁহাকে দোষ দিতে বা মঠে পাঠাইতে পারিবেন না। কিন্তু এরূপ কৌশল কেমন করিয়া উদ্ভাবন করা যায়? পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি তিনি নিজের প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিলেন না, আহার প্রায় ছাড়িয়াই দিলেন; কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি পীড়িত হইয়াছেন ভাবিয়া পরিচারিকারা উদ্বিগ্ন হইল। ষষ্ঠ দিন প্রাতে তিনি হাসিতে হাসিতে কক্ষের বাহিরে আসিলেন এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গান করিতে করিতে বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার আনন্দের কারণ, তিনি সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়া-

ছেন। পরিচারিকাদেরও উদ্বেগ দূর হইল। তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, "শিবের ইচ্ছায় য়োংরাং অসুস্থ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর কৃপায় এখন সারিয়া উঠিয়াছেন।"

পরের সপ্তাহে পায়াং-নরেশ রাতু বোকোকে দূত-মুখে জানাইলেন, একদিনের মধ্যেই তিনি মাতারম্ পৌঁছিবেন। রাতু বোকো তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রচুর আয়োজন করিলেন, এবং আট ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া পায়াং-রাজকে প্রত্যুদ্‌গমন করিতে গেলেন। উভয় নৃপতি রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলে রাজ-অতিথিকে তাঁহার সুসজ্জিত কক্ষসমূহে লইয়া যাওয়া হইল। বিশেষ ঘটার সহিত সান্ধ্য ভোজ হইয়া গেল। জাভার গামেলাং ঐকতান বাদ্য সহযোগে সেরিম্পীরা (রাজকীয় নর্ত্তকীবৃন্দ) নৃত্যগীত দ্বারা পায়াং-রাজকে তৃপ্ত করিল।

পরদিন প্রাতে শ্রী য়োংরাং বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া পরিচারিকাদের সঙ্গে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। পায়াং-রাজ যতক্ষণ তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেছিলেন, ততক্ষণ রাজনন্দিনী অবনত নেত্রে কপট-সলজ্জ ভাবে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র শ্রী য়োংরাং মুখ তুলিয়া কতকটা সদর্পে বলিলেন, "মহারাজ, পিতার নিকট শুনিয়াছি, আপনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, এমন কিছুই নাই যাহা আপনার সাধ্যাতীত। এই প্রকার মানুষকেই আমি বিবাহ করিতে চাই। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানিতে চাই, আপনিই আমার পিতার বর্ণিত সেই নৃপতি কি না। আমি যাহা আপনাকে করিতে বলিব, আপনি তাহা করিতে পারিলে আপনাকে বিবাহ করিব।"

পায়াং-রাজ ইহা শুনিয়া আমোদিত হইলেন; বলিলেন, "য়োংরাং, তুমি আমাকে কি করিতে বল।"

রাজকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি এক রাত্রের মধ্যে এক হাজার পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিন্ এবং তাহার প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন সুভূষিত পাষাণ মূর্ত্তি স্থাপন করুন।" য়োংরাং ভাবিয়াছিলেন, এই অনুরোধ রক্ষা অসাধ্য বলিয়া রাজা কোন একটা ছুতা করিয়া বিরক্তিভরে নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহাকে সহাস্য এই উত্তর দিতে শুনিয়া রাজকন্যা স্তম্ভিত হইলেন,

"আচ্ছা য়োংরাং, কাল প্রত্যুষে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে—ঐ প্রান্তর এক সহস্র পাষাণমূর্ত্তিবিশিষ্ট এক হাজার মন্দিরে অলঙ্কৃত হইবে।"



"মহারাজ, পিতার নিকট শুনিয়াছি, আপনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন..."

য়োংরাং-এর হৃদয় আশঙ্কায় অবসন্ন হইল; তিনি নমস্কার করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে ফিরিয়া গেলেন। পায়াং-রাজ কি সত্যসত্যই তাঁহার পণ রক্ষা করিতে পারিবেন? তিনি কি সত্যসত্যই এমন শক্তিমান্? বাস্তবিকই কি তাঁহার এমন শক্তি আছে, যে, যে-কাজ করিতে হাজার মানুষের হাজার দিনরাত লাগে, তাহা তিনি এক রাত্রেই সম্পন্ন করিবেন?

সে রাত্রি তাঁহার প্রায় নিদ্রা হইল না—হয়ত বা তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এই বিষম চিন্তা তাঁহাকে

বিনিদ্র রাখিল। তথাপি তিনি আশা করিতে লাগিলেন, যে, রাজা প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিবেন না।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া বাহিরে গিয়াই সভয়ে দেখিলেন, প্রান্তর মন্দিরপুরীতে পরিণত হইয়াছে। তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কারণ, দেখিতে পাইলেন, পায়াং-রাজ তাঁহাকে নিজের কীর্ত্তি দেখাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এখন আর কোন্ ছলে বধূ না হইবেন? উদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি রাজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাজা মনে করিয়াছিলেন, সারা জীবন ধরিয়া তিনি যাহা করিতে পারেন নাই এক রাত্রে তাহা করিয়াছেন, অতঃপর রাজকন্যা নিশ্চয়ই আহ্লাদিত হইবেন ও তাঁহার প্রশংসা করিবেন। কিন্তু য়োংরাং-এর মুখে সন্তোষের কোন চিহ্ন না দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। রাজকন্যা কী আশা করিয়াছিলেন? কেহ কখনও যেরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই, এগুলি কি তার চেয়ে সুন্দর নয়?

জাভার রীতি অনুসারে বাগ্‌দত্ত দম্পতির ন্যায় হাত-ধরাধরি করিয়া উভয়ে প্রত্যেক মন্দিরের ভিতর গিয়া মূর্ত্তিগুলিকে প্রণাম করিতে লাগিলেন—রাজার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত, য়োংরাং-এর মুখ নৈরাশ্যে মলিন। কিন্তু শেষ মন্দিরটির সোপান বাহিয়া নামিতে নামিতে য়োংরাং-এর আবার মনে হইল, জীবন সুখময়। তাঁহার সুন্দর মুখ একটি আকস্মিক সুখকর চিন্তায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি রাজার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,

"মহারাজ, আপনার শক্তি অসাধারণ, আপনার বিদ্যা অতীব প্রশংসনীয়; কিন্তু আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই, আমি আপনার বধূ হইতে পারিব না।"

পায়াং-রাজের হাত রাজকুমারীর হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

ক্রোধভরে তিনি বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি নাই? এর মানে? এই ত এখানে তোমার বাঞ্ছিত হাজার মন্দির ও হাজার মূর্ত্তি দণ্ডায়মান!"

য়োংরাং মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমি হাজার মন্দির ও হাজার মূর্ত্তি চাহিয়াছিলাম। কিন্তু মোট নয় শত নিরানব্বইটি প্রস্তুত হইয়াছে।"

দরবারী আদবকায়দা ও শিষ্টাচার ভুলিয়া গিয়া পায়াং-রাজ য়োংরাংকে একা ফেলিয়া উন্মত্তের মত মন্দিরগুলি গণনা করিতে লাগিলেন। সত্যই ত! তিনি শ্রী য়োংরাংকে বলিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ, একটা কম আছে। কিন্তু এ ত্রুটি সারিতে দেরি হইবে না।"

তাহার পর তিনি স্থির দৃষ্টিতে য়োংরাং-এর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। অতঃপর যেন দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত হাত তুলিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন। য়োংরাং অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন তাহার রক্ত হিম হইয়া যাইতেছে। তিনি কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জিহ্বা যেন তালুতে সংলগ্ন হইয়া রহিল, ঠোঁট নড়িতে চাহিল না।

মাটি ভেদ করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া একটি মন্দির উঠিতেছে দেখিয়া য়োংরাং-এর হাসি বিলীন হইল। তাহার পরিবর্ত্তে ভয়বিহ্বলতার ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিল। তাঁহার পরিচারিকারা ভিতরে গিয়া দেখিল, তাহাদের রাজনন্দিনী দাঁড়াইয়া আছেন। তাহারা তাঁহাকে সম্বোধন করিল, কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠাধর নড়িল না...... রাজকুমারী পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন! পরিচারিকারা যখন বাহিরে আসিল, তখন পায়াং-রাজ অদৃশ্য হইয়াছেন।

ঐ প্রান্তরে "বিবাহবিমুখা কন্যার মন্দির" হাজার বৎসর ধরিয়া দণ্ডায়মান আছে; এবং, জাভার কুসংস্কার অনুসারে, বিবাহ না-করিতে দৃঢ়সঙ্কল্পা কুমারীদিগকে সাবধান করিবার জন্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। এখনও জাভার মাতারা কন্যাদিগকে এই মন্দিরে লইয়া অনূঢ়া শ্রী য়োংরাং-এর কাহিনী শুনাইয়া থাকে।

["চায়না জর্ন্যাল" অবলম্বনে লিখিত।]

চীনদেশের লো-হান্

শ্রী সংগ্রাহক

জগতের কোন কোন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকেরা যে নানা নামে ভিন্ন ভিন্ন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলে উদ্দেশ্য ভাল ছিল; এবং নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাযাবর ভিক্ষুকের অলস নিরুদ্বেগ জীবনের লোভে সন্ন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। সেই জন্য, আমাদের দেশে এখন সাধু-সন্ন্যাসী বলিলেই আর কেবল-



বৈষ্ণব সাধুদের ব্যঙ্গচিত্র

বিস্তর সন্ন্যাসী বাস্তবিকই "সাধু" নামের যোগ্য। এরূপ লোক বর্ত্তমান সময়েও জীবিত আছেন। তাঁহাদের দ্বারা মানবসমাজের বহু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

এই কারণে, প্রকৃত সাধু যাঁহারা তাঁহাদের প্রতি ভক্তি-প্রযুক্ত, নানা ধর্ম্মের মঠে গৃহীরা পুরাকাল হইতে অর্থাদি দান করিয়া আসিতেছেন। সন্ন্যাসী হইলে ভিক্ষাও পুরাকালে যেমন সহজে মিলিত, এখনও সেইরূপ সহজে অনেক স্থানে মিলে। ফলে কতকগুলি লোক মঠের সাধুর এবং মাত্র পবিত্রচেতা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বুঝায় না; পেশাদার "সাধু"র সংখ্যাও খুব বেশী হইয়াছে; সাধুদের মধ্যে ফেরারী আসামীও যে নাই, এমন বলা যায় না। ইহা নিতান্ত আধুনিক ব্যাপার নহে। কারণ, দুই শতাব্দী আগে আঁকা সন্ন্যাসীদের ব্যঙ্গচিত্র আছে। এরূপ কয়েকটি ছবি লাহোরের মিউজিয়মে আছে। ঐ মিউজিয়মের কিউরেটার মহাশয়ের অনুমতিক্রমে তাহার একখানির প্রতিলিপি দেওয়া গেল।

আমাদের দেশে যেমন, চীনদেশেও সেইরূপ, সন্ন্যাসীদের মধ্যে নানা রকম লোক দেখা যায়। চৈনিক বৌদ্ধধর্ম্মে লো-হান্ অর্থাৎ অর্হৎ বা বৌদ্ধ সাধুদের সংখ্যা আঠার। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন, যে,



লো-হান্ তাং-এ পাঁচশত লোহানের মূর্ত্তি

লো-হান্দের সংখ্যা কখন কখন পাঁচ শত পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। চীনের নানা প্রদেশে বৌদ্ধ মন্দির-সমূহের 'লো-হান তাং' নামক এক-একটি পৃথক অট্টালিকায় এই পাঁচ শত লো-হানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। কথিত আছে, যে, বিখ্যাত ইউরোপীয় পর্য্যটক মার্কো পোলোর মত কোন কোন বিদেশী ব্যক্তিকেও লো-হান্দের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। লো-হান্দের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক আছে; যথা—তপস্বী, যোদ্ধা, রাজদ্বারে দণ্ডিত দুষ্কর্ম্মকারী, ভিক্ষুক, ইত্যাদি। এ রকম ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে একই শ্রেণীভুক্ত করিবার কারণ কি, বলিতে পারি না। চৈনিক বৌদ্ধমন্দিরে রক্ষিত লো-হান্দের মূর্ত্তির ফোটোগ্রাফের যে প্রতিলিপি



কয়েকটি লো-হানের মূর্ত্তি

দিতেছি, তাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে, যেন ব্যঙ্গ করা হইয়াছে।

চৈনিক বৌদ্ধমন্দিরে যে-সকল লো-হানের মূর্ত্তি রাখা হয়, চীনদেশের চিত্রকরেরা তাহাদের ছবিও রং এবং তুলির সাহায্যে আঁকিয়া থাকে। তাঁহারা বেশ



আরও কয়েকটি লো-হান্

আরামে নানা প্রকার আমোদ সম্ভোগ করিতেছেন, এই ভাবে তাঁহাদিগকে আঁকা হয়। এই লো-হান বা অর্হৎসমূহ বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁহারা অবিচলিত আত্মতুষ্টির অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, এইরূপ মনে করা হয়। রাইকেল্ট (Reichelt) তাঁহার "চৈনিক বৌদ্ধধর্ম্মে সত্য ও ঐতিহ্য" ("Truth



লো-হানদের মূর্ত্তি

and Traditions in Chinese Buddhism") নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "ইঁহাদের (অর্থাৎ লো-হানদের) পরিত্রাণলাভ এবং জীবনের নবীভবন হইয়াছে ; কিন্তু তাহা মানবের সপ্রেম ও সদয় সেবার জন্য নহে, পরন্তু সুখকর সন্তোষে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামে কালযাপনের নিমিত্ত। এই কারণে চৈনিক সন্ন্যাসীদের মধ্যে, 'ওটা একটা লো-হান্ হয়ে গেছে' গালিগালাজের মধ্যে গণ্য। ইহার মানে, ওটা এমন হইয়াছে যে অন্যের দুঃখ অভাবে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।"

কোন কোন মন্দিরে ও বিহারে পাঁচ শত লো-হানের মূর্ত্তি মানুষের প্রমাণ আকারের এবং কারুকার্য্য হিসাবে সুনির্ম্মিত। সোনার পাতা ও জমকাল রঙে মূর্ত্তিগুলি অলঙ্কৃত। এই "সাধু-কক্ষ" ("hall of saints") মন্দির ও বিহারের অন্যতম প্রধান অংশ। এইগুলিতে দর্শকের সংখ্যা খুব বেশী হইয়া থাকে।

পশ্চিম চীনের য়ুন্নান্ প্রদেশের য়ুন্নান্ ফু শহরে য়ুআন্ তাংস্সু নামক যে বৃহৎ মন্দির আছে, সেখানে রক্ষিত লো-হান্দের মূর্ত্তির কয়েকটি ছবি আমরা দিলাম। এগুলি লিআও হ্সিন্ হ্সিওঃ নামক একজন চৈনিক চিত্রশিল্পীর গৃহীত ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি, এবং 'চায়না জর্ণ্যাল' হইতে গৃহীত।

লোহানদের মধ্যে একজন সাধু, তাঁহার অতিবর্দ্ধিতায়তন হাতটি বাড়াইয়া কি লইতেছেন, অনুমান করিতে পারি নাই।

পুস্তক পরিচয়

কালিকা-মঙ্গল—বলরাম কবিশেখর-বিরচিত। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ দ্বারা সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য সদস্য-পক্ষে ১৲, শাখা পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৶০ এবং সাধারণের পক্ষে ১।০। ডিমাই ৮ পেজি ১৭৯+৬+১৮৶০ +১৩ পৃষ্ঠা।

কালিকা-মঙ্গল একখানি প্রাচীন বাংলার পুস্তক। বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-কাহিনী লইয়া লেখা। সম্পাদক অনুমান করেন যে, লেখক বলরাম কবিশেখর হয়ত রামপ্রসাদ সেন, কবিরঞ্জনের ও ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন, এবং তাঁহার ভাষা দেখিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া মনে করিয়াছেন। বইখানি সুসম্পাদিত হইয়াছে। চিন্তাহরণ-বাবু সুপণ্ডিত, বহুবিধ বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি সুবিখ্যাত হইয়াছেন, এবং তাঁহার গবেষণা তথ্য-সঙ্কুল হয় বলিয়া সুধী-সমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থেও তিনি তাঁহার অনুসন্ধানের বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকার প্রাচীনত্ব ও বিস্তার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কাহিনীটি বহু প্রাচীন কাল হইতে নানা ভাষায় গ্রথিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বাংলা ভাষাতেও বহু কবি এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, যদিও ভারতচন্দ্রের কাব্যই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবিশেখর-কৃত কালিকা-মঙ্গলের বিবরণ ও বিশেষত্ব কবিশেখরের ভাষা, তাহার গ্রন্থে তদানীন্তন সমাজের রীতিনীতি পোষাক-পরিচ্ছদ খাদ্য অনুষ্ঠান ইত্যাদিরও বিবরণ সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় প্রদান করিয়াছেন। পরিশিষ্টে ও পাদটিকায় বহু শব্দের অর্থ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধতর বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর কোথায় কি পার্থক্য আছে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে শব্দসূচী ও অর্থনির্দ্দেশ আছে।

এই সুসম্পাদিত সংস্করণের মুখবন্ধ লিখিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন "পুথিখানার ভাষা বেশ চোস্ত এবং দুরস্ত, নিতান্ত নীরসও নয়, রস গড়ায়ও না। চিন্তাহরণ-বাবু কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সহিত মিলাইয়া যেখানে যেখানে ঐ সকল পুথি হইতে ইহা তফাৎ তাহা সব তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, অথচ পাদটীকার বিশেষ ঘটাও নাই। গ্রন্থকারের উপাধি কবিশেখর,…তিনি যে একজন ভাল লিখিয়ে ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অশ্লীলতার অংশ প্রায়ই নাই, যদি-বা আছে বেশ ভদ্রয়ানা ভাবে লেখা আছে। বইখানি সুপাঠ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, ছেলেপুলে লইয়া একত্রে পড়া যায়। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে বই লেখা অর্থাৎ কালিকার পূজা প্রচার সেটা এক রকম ভালই হয়।" মঙ্গলকাব্য বাংলার পুরাণ, কোনও বিশেষ দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের নিমিত্ত কোনও একটি প্রচলিত গল্প অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করা হইত; ইংরেজী শিক্ষার ফলে যখন আমাদের কবিদের মনন ও দৃষ্টির ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া গেল তখন হইতে এরূপ কাব্য আর রচিত হয় নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইহাই ছিল বাংলা কাব্যের বিশেষ ধারা ও ধরণ। কালিকা-মঙ্গলের আসল উদ্দেশ্য কালিকার মহিমা প্রচার, বিদ্যাসুন্দরের প্রেম-কাহিনী তাহার অবলম্বন মাত্র। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর যে ধারাবাহিক ইতিহাস চিন্তাহরণ-বাবু সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। এই বইখানির সম্পাদন-পারিপাট্য দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি, অনেক নূতন তথ্য শিখিলাম ও জানিলাম, এবং একজন অজ্ঞাত প্রাচীন কবির পরিচয় পাইলাম। যাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বইখানি ও বিশেষ করিয়া এই সংস্করণটি বিশেষ আগ্রহের সামগ্রী ও আবশ্যক সংগ্রহ হইবে।

টীকার মধ্যে সম্পাদক মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "চণ্ডমুণ্ড বধের জন্যই দেবীর চামুণ্ডা নাম হয়।" ইহা অবশ্য পুরাণের মন-গড়া ব্যাখ্যা; আসলে চামুণ্ডা শব্দটি দ্রবিড় ভাষার থেকে আমদানী,—দ্রবিড় 'চাবুণ্ডী' মানে 'মৃত্যুময়ী', 'শবু' মানে 'মৃত্যু' তাহা হইতেই সংস্কৃতে 'শব' শব্দ আসিয়াছে, এবং 'উণ্ডি' মানে 'অধিকার'; দ্রবিড় ভাষায় 'চ' অক্ষর এবং 'শ' অক্ষর একই প্রকার উচ্চারণ হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ময়ূরপঙ্খী—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। আশুতোষ লাইব্রেরী। কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বিভিন্ন সময়ে ছেলেমেয়েদের মাসিকপত্রে প্রকাশিত নয়টি গল্প পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। লেখক দৃষ্টিলাভ, বলির পুজো, ব্যথার বন্ধু, সোনার পদ্ম প্রভৃতি গল্পের ভিতর দিয়া বালক-বালিকাদের উপদেশ দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কয়েকটি গল্প, যথা—খোদার উপর খোদকারী, রাজার বিচার, উল্টো রাজার কাণ্ড বাস্তবিকই চমৎকার হইয়াছে। গল্পগুলির বিষয়বস্তু নিতান্ত অপরিচিত না হইলেও লেখার ভঙ্গীতে ইহা নূতন হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহা পাঠ করিয়া শিশুরা খানিকটা হাসিয়া লইতে পারিবে। বয়স্কেরাও পুস্তকখানি পাঠে আনন্দ পাইবেন।

রেখা-চিত্রের সংযোগে গল্পগুলির ভাব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পল্লী-স্বাস্থ্য ও সরল স্বাস্থ্য-বিধান—৺চুণীলাল বসু প্রণীত। নূতন (৩য়) সংস্করণ। ২৫ মহেন্দ্র বোস লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা হইতে এ, পি, বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৩১০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০ মাত্র।

পরলোকগত গ্রন্থকারের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় এই পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলিয়াছিলেন যে, পল্লীগ্রামে নানা অসুবিধার মধ্যে বাস করিয়া কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত মাত্র এই গ্রন্থে সূচিত হইয়াছে। সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করিলে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার কতিপয় মূল নিয়ম পালন করিলে আমরা সহজেই কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি

দুশ্চিকিৎস্য রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি। স্বর্গীয় লেখক জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যোন্নতি-বিষয়ক জ্ঞান যাহাতে প্রসার লাভ করে, তাহার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং তাঁহার দেহান্তের পর তাঁহার পুত্রদ্বয় যে এই সংস্করণে পুস্তকখানিতে আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা স্বর্গীয় লেখকের স্মৃতিরক্ষা ও জনসাধারণের হিতসাধন এই উভয় কার্য্যই একযোগে করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষাপ্রার্থিগণের নিমিত্ত স্বর্গীয় গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত যে বিষয়গুলি স্বাস্থ্য-বিদ্যার পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, উহাই অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও সংশোধন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

দেহচর্য্যা, কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রা, পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য, জল বায়ু সূর্য্যালোক প্রভৃতির উপকারিতা, খাদ্য সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা, ও পরিশেষে মানবদেহের গঠন ও ভিন্ন ভিন্ন অংশের ক্রিয়া,—পঞ্চদশটি অধ্যায়ে এই সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অনেকগুলি চিত্রও আছে এবং সেগুলির ছাপাও ভাল হইয়াছে।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ আসাম গভর্ণমেন্ট পাঠ্য-পুস্তক-তালিকাভুক্ত করিয়াছেন, এবং বাংলার শিক্ষাবিভাগের নির্দ্দেশানুযায়ী ইহা বাংলার স্কুলের লাইব্রেরী পুস্তক-তালিকার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আমরা এই পুস্তকখানি বাংলাদেশের পাঠ্য পুস্তক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব।

এইরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

রুশিয়া—লেখক শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সরস্বতী লাইব্রেরী, দাম ১।৵০, পৃ ২০৪।

সোভিয়েট রুশিয়া—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু; অনুবাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু। আত্মশক্তি লাইব্রেরী; দাম ১৲; পৃঃ ১২৮।

বলশেভিকী সঙ্কল্প—লেখক শ্রীপুলকেশ দে। আর্য্য পাব্লিশিং হাউস্; মূল্য ১।০, পৃঃ ১১৬।

বোলসেভিকি—লেখক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। আত্মশক্তি লাইব্রেরী; দাম ৸০, পৃঃ ৬৭+৯।

কোনও মনস্বী বলেন যে, রিণেসেন্সের পরে মাত্র একটি বিপ্লব সূচিত হইয়াছে—শিল্প-বিপ্লব। রুশ বিপ্লব সেই শেষ বিপ্লবেরই পরিণতি, না কোনও ভাবী কল্পান্তকারী বিপ্লবের সূচনা, তাহা ভাবী কাল বিচার করিবে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে উহা এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা। তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থ কয়খানি। বাংলা ভাষায় দেশ-বিদেশের আন্দোলনের যে ক্ষীণ ছায়াপাত হয়, তাহা বড় ক্ষীণ ও বড় অস্পষ্ট। কিন্তু, লাল রুশিয়ার রক্তিমাভাস শ্যামল বাংলার ক্ষুদ্র লেখক হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেরই মনে একটু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সোভিয়েট মন্ত্র ও সাধনার শক্তির পরিমাপ ইহা হইতেই করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে রুশদেশের একটা আত্মীয়তা আছে—অবস্থায়, ব্যবস্থায়, মনে ও প্রাণে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার রুশদেশ ও রুশ সাহিত্য আমাদের নিকট খুব দূর ও পর বলিয়া ঠেকে না। আলোচ্য প্রথম গ্রন্থখানিতে সেই পটভূমিকাটুকু সংক্ষেপে চিত্র করিয়া লেখক আমাদিগকে বর্ণিত রুশবিপ্লবের স্বরূপ বুঝিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকের পক্ষে কাজে লাগিবে।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি পণ্ডিত জহরলালজীর রচিত ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদ সরল হইয়াছে। ইহার তথ্য সংগ্রহে ও সাজানোতে মূল লেখকের কৃতিত্ব সুবিদিত। কিন্তু গ্রন্থখানির মূল্য অন্য কারণে—যুবক ও শক্তিশালী ভারতীয় নেতৃবর্গের মানস-লোকের ইহা দিগ্‌দর্শন।

'বলসেভিকী সঙ্কল্প' রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিক সঙ্কল্পের অর্থ ও গতি বুঝাইবার জন্য লেখা। পাঠক ইহা হইতে সেই মহাপ্রচেষ্টার কতকটা খাঁটি সংবাদ পাইবেন। আসলে বলশেভিকীর এই প্রয়াসই আজিকার পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বিষম চিন্তার ও বিস্ময়ের কথা। এ বিষয়ে আমরা যত জানিতে পারি ততই ভাল। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আরও বিশদ হইলে অধিকতর কার্য্যকরী হইত।

শেষ গ্রন্থখানি 'বোলসেভিকি'র নীতি, রীতি, ও মনোভাবের বিশ্লেষণ। লেখক সুপরিচিত, তাঁহার আদর্শ ও অধ্যাত্মানুরাগও সুবিদিত। ধর্ম্ম ও আত্মিককে যাঁহারা একই জিনিষ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই যৌগিকপন্থীদের নিকট সহানুভূতি পাইবেন না, জানা কথা। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন একদা গীতা ও যোগের উপর দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল, আজ সে 'জাতীয়তা' বিজাতীয় (না, জাতিহীন?) জড়বাদ, মার্কসীয় ও মেকি আসুরিক কর্ম্ম-যোগের উপর দাঁড়াইতে চায়;—তাই লেখক সেই বোলশেভিক-ধর্ম্মের ক্ষুদ্রতা অসারতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি চিন্তাশীল, কাজেই তাঁহার বক্তব্য সকলেরই প্রণিধান করা উচিত। তবে, বোলশেভিক্-এর বিরুদ্ধে এই সব যুক্তি নূতন নয়, এবং লেখকের লিখন-ভঙ্গী খুব সরল ও প্রাঞ্জল নয়—ইহা জানা থাকা ভাল।

রুশদেশ সম্বন্ধে এই গ্রন্থ কয়খানি পাঠে ইহাই মনে হয় যে, বাংলা ভাষায় সোভিয়েট নীতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে এখনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয় নাই।

বিপ্লবের ধারা—শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। আর্য্য পাব্লিশিং হাউস; মূল্য ১।০; পৃঃ ১০৮।

পৃথিবীতে বিপ্লবের আদর্শও দিনে দিন বদ্‌লাইতেছে। একদিন ফরাসী বিপ্লবই ছিল শেষ কথা। তাহার পরে বিপ্লবের কত পট-পরিবর্ত্তন হইয়াছে—ফরাসী কমিউন, রুশ দেশের ১৯০৫-এর প্রয়াস, আইরিশ বিদ্রোহ, ফাশিস্ত জাগরণ, বলশেভিক ক্রম। ইহা ছাড়াও বিপ্লবিক মত কত অভিনব রূপ লইতেছে, য়্যানার্কিজম্, সিণ্ডিকালিজম্, কমিউনিজম্, আবার ফাশিজম্। এই গ্রন্থে লেখক সেই সব মত ও আন্দোলনের ধারার সন্ধান দিয়াছেন। বাংলায় এ পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত হইবার কথা।

স্বদেশী যুগের স্মৃতি—শ্রীমতিলাল রায় রচিত। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস; মূল্য ১।৵০, পৃঃ ১৭২।

যে-স্মৃতি বাঙালী ভুলিবে না, এ তাহারই কথা। যিনি সেই মহাক্ষণে স্বদেশী ভাব ও প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, তিনি তাঁহার স্মৃতির দুয়ার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও অকৃত্রিম অনুভূতির বলে তাঁহার ভাষা হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু মনে হয় যেন, দুয়ার খুলিয়াও সম্পূর্ণ খুলিল না।

শিখের আত্মাহুতি—শ্রীদীনেশচন্দ্র বর্ম্মণ রচিত। আর্য্য পাব্লিশিং কোং; মূল্য ১৲, পৃঃ ১৫১।

প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া শিখ সম্প্রদায় অসিহস্তে আপনাদের বলবীর্য্যের প্রমাণ দিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা বর্ত্তমান ভারতের অহিংস আন্দোলনের সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন যে, অস্ত্রাঘাত না করিয়াও এই বীর জাতি কিরূপে সহাস্তে আত্মাহুতি দিতে পারে এই অপূর্ব্ব শক্তি কি করিয়া তাঁহাদের প্রাণে জন্মাইল? যিনি তাঁহাদের প্রাণে এই বল বীর্য্য, ত্যাগ ও আত্মদানের উৎসাহ সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, এ গ্রন্থখানি সেই গুরু গোবিন্দের কথা। লেখকের ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সতেজ।

শ্রীগোপাল হালদার

দূর্ব্বাদল—শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা। ইহা একখানি কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা রচনারীতিতে সঙ্গীতের ন্যায় হওয়াতে তাহা কবিতার ন্যায় আবৃত্তি করিতে গেলে ছন্দে বাধিয়া যায় এবং আবৃত্তিকালীন অনাবিল আনন্দ-উপভোগ করা যায় না। একমাত্র এই দোষ ছাড়া এই গ্রন্থে অন্য কোনও দোষ নাই। বরং ইহার এমন একটি গুণ আছে যাহাতে পাঠকের মনে শান্তি ও আনন্দ দান করে। স্থানে স্থানে ভাষার যে সকল ত্রুটি লক্ষিত হইল, সেই স্থানগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি, কারণ গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে একটু অবহিত হইলে সেই ত্রুটিগুলি অনায়াসে তাঁহারই চক্ষে পড়িবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহার রচনা অধিকতর সুখপাঠ্য ও উজ্জ্বল হইবে। এই গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভাল এবং অধিকাংশ কবিতাই ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জীবনীকোষ—শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান, ৮১ নং ওয়েষ্ট কমাযুট, পোঃ কমাউট, রেঙ্গুন, ব্রহ্মদেশ। মূল্য প্রতিসংখ্যা এক টাকা।

জীবনচরিতবিষয়ক এই বৃহৎ অভিধানের ভারতীয় পৌরাণিক অংশের নবম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার শেষ সাড়ে ছয় পৃষ্ঠায় বশিষ্ঠ ঋষির বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত পরবর্ত্তী দশম সংখ্যায় শেষ হইবে। অনুমান কুড়ি সংখ্যায় ভারতীয় পৌরাণিক অংশ সমাপ্ত হইবে। তাহাতে আঠার হাজারের উপর নাম থাকিবে। তাহার পর ভারতীয় ঐতিহাসিক, বিদেশীয় পৌরাণিক ও বিদেশীয় ঐতিহাসিক অংশত্রয় মুদ্রিত হইবে। গ্রন্থকার একত্রিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই বৃহৎ অভিধান রচনা করিয়াছেন। মুদ্রণ করিতেও অনেক পরিশ্রম হইতেছে। অর্থব্যয়ও খুব হইতেছে। অথচ তিনি ধনী লোক নহেন। মুদ্রণের কাজ নিয়মিত রূপে চালাইবার জন্য তিনি রেঙ্গুনেই প্রেস স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, উদ্যম, সাহস এবং ভারতীয় সভ্যতা ও বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রশংসনীয়। বাঙালীদের সমুদয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে এবং বিদ্যানুরাগী প্রত্যেক বাঙালীর স্বকীয় গ্রন্থাগারে ইহা রাখা আবশ্যক, এবং রাখিবার যোগ্য। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সাহসে ভর করিয়া কাজ চালাইতেছেন। আশা করি শিক্ষিত বাঙালীরা তাঁহার সহায় হইবেন।

গ্রন্থকারের পৈত্রিক নিবাস ত্রিপুরায় বলিয়া এবং স্বাধীন ত্রিপুরার রাজবংশ বিদ্যোৎসাহী এবং বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক বলিয়া তিনি অভিধানখানি স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে উৎসর্গ করিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর গ্রন্থকারকে আর্থিক উদ্বেগ হইতে মুক্ত করিলে তাহা তাঁহার বংশোচিত হইবে।

কবিপ্রশস্তি—রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাত্র-ছাত্রী উৎসব-পরিষৎ প্রকাশ-বিভাগপক্ষে শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। প্রায় এক শত পৃষ্ঠা। তদ্ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি আছে।

ইহাতে আছে—মঙ্গলাচরণ, কবি আবাহন, অর্ঘ্যদান, শান্তিবাচন, কবিপ্রশস্তি, ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষদের শ্রদ্ধার্ঘ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর ডক্টর হাসান্ সুরাবর্দ্দি লিখিত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধ, এবং তাহার পর অনেকগুলি ছাত্র ও তরুণদের রচনা। এই শেষোক্ত রচনাগুলি হইতে বুঝা যায়, শিক্ষিত বাঙালী সমাজে যাঁদের উঠ্‌তি বয়স, তাঁহারা 'পরের মুখে ঝাল খাইয়া' রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী নহেন, তাঁহার কার্য্যাবলী চিন্তাসহকারে আলোচনা করেন। রচনাগুলির নাম হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের রবীন্দ্রনাথের ছবি, পুলিনবিহারী সেনের রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়, অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটির কবি রবীন্দ্রনাথ, বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরীর গদ্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের রবীন্দ্রসাহিত্যে স্বদেশীয়তা, এবং সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপক নাটকে রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কালিদাসের গল্প—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মল্লিক, এম্-এ রচিত। মূল্য তিন টাকা।

'কালিদাসের গল্প' পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার লিপিকুশল ব্যক্তি—গল্প বলিবার তাঁহার বেশ ক্ষমতা আছে। তাঁহার রচনা সরল অথচ সরস। গল্পগুলি পড়িতে চিত্তাকর্ষণ হয়।

কালিদাস প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি—মহাকবি। তাঁহার কাব্য-নাটকের সহিত পরিচয় নাই—এ-কথা মুখে আনা ভারতবাসীর পক্ষে মহাপাপ। অথচ এ :শিক্ষার বিরলতার দিনে, সকলের পক্ষে মূলের রসাস্বাদন দুর্ঘট। এস্থলে 'কালিদাসের গল্প' দেশের একটি মহৎ প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিবে, কারণ, বাঙালী পাঠক এ গ্রন্থে একাধারে কালিদাসের সমস্ত কাব্য-নাটকের (এমন কি সংশয়াস্পদ নলোদয়ের পর্য্যন্ত) বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। গ্রন্থকার বিনয় করিয়া গ্রন্থের নাম দিয়াছেন—'কালিদাসের গল্প'। কিন্তু তিনি আখ্যানবস্তু সাজাইয়া গল্প বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—অনেক স্থলে মূলের অনুবাদ করিয়া মহাকবির 'রূপ ও রসের' খনির আস্বাদ পাঠককে উপভোগ করাইয়াছেন। ইহা তাঁহার দক্ষতার পরিচায়ক।

কয়েকখানি সুন্দর চিত্রের সন্নিবেশে এই সুমুদ্রিত গ্রন্থের সম্পদ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার বহুল প্রচার হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গীতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

৬

তৃতীয় অধ্যায়

৩।২৭-২৯ "প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু অহঙ্কার-বিমুগ্ধ আত্মা আমিই কর্ত্তা মনে করে। কিন্তু যিনি তত্ত্ববিৎ তিনি প্রকৃতির গুণ ও কর্ম্ম হইতে নিজেকে পৃথক জানিয়া ও ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় জানিয়া সঙ্গত্যাগ করেন অর্থাৎ বিষয় বা কর্ম্মে লিপ্ত হন না; যাহার বিষয়ে ও কর্ম্মে আসক্তি যায় নাই অর্থাৎ যে প্রকৃতিগুণে বিমুগ্ধ এরূপ লোকের বুদ্ধি বিচলিত করিতে নাই, অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিকে বলা উচিত নহে যে, পাপপুণ্য কর্ত্তব্য ইত্যাদি কিছুই নাই।" শ্বেতাশ্বতরের ৬ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে আছে—"পুরাকল্পে প্রকাশিত, বেদান্ত-প্রতিপাদিত এই গুহ্য বিদ্যা অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না এবং অযোগ্য পুত্রকে বা অযোগ্য শিষ্যকেও দিবে না।"

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।"

৩।৩০ "অধ্যাত্ম বুদ্ধিতে অর্থাৎ প্রকৃতির স্বভাব বুঝিয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম ন্যস্ত করিয়া ফলাশা ও মমতা পরিত্যাগ করিয়া অশোক চিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" 'অধ্যাত্ম' মানে স্বভাব—৮।৩ শ্লোকে অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ দেওয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রথমে বলিলেন, আমাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ কর, পরে বলিলেন ফলাশা ত্যাগ কর ও তৎপরে বলিলেন, নিসঙ্গচিত্ত হও। ১২।৮-১১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"আমাতেই অর্থাৎ আত্মাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, সহজে না পারিলে অভ্যাসের দ্বারা চেষ্টা কর তাহাতে সফল না হইলে আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ কর, তাহাও না পারিলে কর্ম্মের ফলাশা ত্যাগ কর।" প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কেন যুদ্ধ করিব। শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণে তাহার উত্তর দিলেন, 'প্রকৃতিবশে তুমি যুদ্ধ করিবে ও সামাজিক আদর্শরক্ষার অর্থাৎ লোকসংগ্রহের জন্য তুমি যুদ্ধ করিবে; যুদ্ধ যখন করিতেই হইবে তখন অনাসক্ত হইয়াই করিবে।'

৩।৩১-৩২ "আমি যেরূপ বলিলাম সেইরূপে চলিলে কর্মবন্ধন হইবে না, কিন্তু এই মতে না চলিলে নষ্ট হইতে হইবে।"

৩।৩৩-৩৪ "সকল প্রাণীই নিজ নিজ প্রকৃতির বশে চলিয়া থাকে, এমন কি জ্ঞানবান ব্যক্তিও প্রকৃতির বশীভূত, অতএব নিগ্রহ বা নিষেধে কি ফল লাভ হইবে। প্রকৃতির বশে বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ হইবেই; এই রাগদ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নহে কারণ ইহারা মনুষ্যের শত্রু।" উদ্দেশ্য এই যে, ভাল লাগা না-লাগার উপর নির্ভর করিবে না, ধর্ম্মবশে কাজ করিবে। যুদ্ধ করিব না বলিয়া নিজের প্রকৃতি নিগ্রহে কোন ফল নাই।

৩।৩৫ "প্রকৃতির বশে যখন মনুষ্য কার্য্য করিবেই এবং যখন বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের রাগদ্বেষ (attraction ও repulsion) হইবেই তখন নিজের সমাজনির্দ্দিষ্ট কাজ করাই কর্ত্তব্য; পরের কর্ম্ম নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ অপেক্ষা

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮
প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যা মনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫

ভাল ও সহজসাধ্য মনে হইলেও স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানই উচিত; স্বধর্ম্মে মরণও শ্রেয়ঃ পরাধর্ম্ম ভয়াবহ।"

এই শ্লোকের 'স্বধর্ম্ম' ও 'পরধর্ম্ম' কথা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ধর্ম্ম কথার যে ব্যাখ্যা দিয়াছি এখানেও সেই অর্থই ধরিব। স্বধর্ম্ম মানে সামাজিক ধর্ম্ম বা আচার-ব্যবহার। পরধর্ম্ম মানে অন্য সমাজের আচার-ব্যবহার। মনুষ্যের সকল ইচ্ছাই যখন প্রকৃতির অধীন, তখন এ-কাজ করা উচিত ও-কাজ করা উচিত নহে—এ সকল কথার বাস্তবিক কোন মূল্যই নাই। আমি নিজ ধর্ম্মে থাকিব বা পরধর্ম্মে যাইব বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই তাহা নির্দ্ধারণ করে—আমার নিজের তাহাতে কোন হাত নাই। ব্যক্তিগত মনের হিসাবে দেখিলেই উচিত-অনুচিত পাপপুণ্য ইত্যাদির কথা আসে। অতএব মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা মানিয়া লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের এই কথার বিচার করিব। প্রত্যেক মনুষ্যেরই নিজ সমাজ রক্ষার একটা আগ্রহ আছে; যাহার যে সামাজিক কাজ নির্দ্দিষ্ট আছে সে সেই কাজ না করিলে সমাজবন্ধন নষ্ট হইবে। মেথর যদি বলে আমি পায়খানা পরিষ্কার করিব না, চাকরে যদি বলে আমি জল তুলিব না, তবে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। প্রত্যেক সমাজেরই নানাবিধ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে ও আমাদের দেশে বিভিন্ন সামাজিক কর্ম্মের জাতিগত বিভাগ পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। জাতি বংশানুক্রমিক অর্থাৎ জন্মগত; কাজেই কর্ম্মের বিভাগ জন্মগত হইল। এখন কথা উঠিবে আমি যদি আমার বংশগত কাজ ছাড়িয়া অন্য কর্ম্ম করি ও তদ্দ্বারা উন্নতিসাধন করি, তবে তাহা না করিব কেন? আমি মেথরের পুত্র হইয়া যদি লেখাপড়া শিখিয়া ডেপুটি হই তবে তাহাতে দোষ কি। মেথরের কাজ অন্য লোকে করুক; মেথরই বা চিরকাল কেন সামাজিক হীনতা স্বীকার করিবে; শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-মত চলিলে মেথরের উন্নতি চিরকালের জন্য বন্ধ থাকিবে। সমাজকে যদি আরও বড় করিয়া দেখি তবে এক কাজের পরিবর্ত্তে অপর কাজ করিলে সমাজবন্ধন নষ্ট হইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই। মেথরের পরিবর্ত্তে ডেপুটি হইলে সামাজিক কাজই করিলাম। তবে স্বধর্ম্ম কাহাকে বলিব? বংশগত স্বধর্ম্ম না মানিয়া যদি শিক্ষামূলক বা নিজ প্রবৃত্তিমূলক স্বধর্ম্ম মানি তাহাতেই বা দোষ কি? ১৮ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোক হইতে ৪৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বধর্ম্মের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যথা:—"শম, দম, তপ, শৌচ ইত্যাদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বভাবজ; শৌর্য্য, তেজ, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষা ইত্যাদি বৈশ্যের স্বভাবধর্ম্ম ও পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়াও মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। নিজ কর্ম্মের দ্বারাই মনুষ্য পরমাত্মার অর্চনা করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা মন্দরূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম শ্রেয়। কারণ স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম করিলে মনুষ্যের পাপ হয় না। স্বাভাবিক কর্ম্ম দোষযুক্ত মনে হইলেও ত্যাগ করা উচিত নহে কারণ যে, কর্ম্মই করিতে যাও না কেন তাহাতে কোন-না-কোন দোষ আছেই। অসক্ত বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ হয়।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি স্বধর্ম্ম মানে সমাজনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্মের আর একটি ব্যাখ্যা দিলেন। স্বধর্ম্ম স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। স্বধর্ম্ম মানে দাঁড়াইল এই, যে-কর্ম্ম নিজ প্রবৃত্তির বিরোধী নহে এবং যাহা সমাজ দ্বারা অনুমোদিত। আমার প্রবৃত্তি যদি আমাকে খুন করিতে বলে তবে তাহা সমাজবিরুদ্ধ বলিয়া স্বধর্ম্ম হইবে না। পিতা মাতা ও আর পাঁচ জনে যদি আমাকে ডাক্তার হইতে বলেন ও আমার যদি ডাক্তার হইবার প্রবৃত্তি না থাকে তবে ডাক্তার হইবার চেষ্টা করা স্বধর্ম্ম হইবে না। আমার যদি চাকরি করিবার ইচ্ছা হয় ও লোকে যদি আমাকে চাকরি করার হীনতা দেখাইয়া কোন স্বাধীন কাজ করিতে বলে তাহা হইলেও চাকরিই আমার স্বধর্ম্ম। কারণ চাকরিও সমাজ-অনুমোদিত। এজন্যই দ্রোণাচার্য্য ও বিশ্বামিত্রকে স্বধর্ম্মদ্রোহী বলা যাইতে পারে না।

এই ব্যাখ্যা মানিলে স্বধর্ম্ম বংশগত একথা বলা চলে না। স্বধর্ম্ম নিজ প্রবৃত্তি ও সমাজগত। কেবল ব্রাহ্মণকে লইয়াই সমাজ হয় না। চতুর্বর্ণ লইয়াই সমাজ। এজন্য নিজ প্রবৃত্তিগত যে-কোন বর্ণের কর্ম্মই স্বধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ এমন কথা বলেন নাই যে, সকল ক্ষেত্রেই স্বভাব-

ধর্ম বংশগত। যাহার ব্রাহ্মণের মত ব্যবহার ও মনোবৃত্তি সে-ই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের মত মনোবৃত্তি হইলে সে ব্যক্তি শূদ্রই। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে heredity বা বংশানুক্রমে প্রবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় একথা সত্য, তবে সব সময়ে তাহা নহে। সমাজের বিশেষত্ব শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে আছে—"গুণ ও কর্ম্মভেদে আমি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।" প্রকৃতি-জাত গুণ অর্থাৎ স্বভাব ও কর্ম্ম ভেদেই বর্ণভেদ। কোন রাষ্ট্র বা state-এর কার্য্যবিভাগ দেখিলেই 'চতুর্বর্ণ' কথার অর্থ পরিষ্কার হইবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য রাষ্ট্রান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান ও মানসিক উন্নতি (moral and material progress of the people)। অতএব এক দল লোক অর্থাৎ সমাজের এক অঙ্গ শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা ব্যবস্থা করিবে ও আর এক দল মানসিক উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে। মানসিক উন্নতিবিধানের উপর রাষ্ট্রের বা সমাজের কৃষ্টি (kultur) নির্ভর করে; বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্ম-চর্চ্চা এই বিভাগের অন্তর্গত। শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা-বিধানের জন্য যে-সকল দ্রব্যের আবশ্যক তাহা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উপর নির্ভর করে; চিকিৎসা-শাস্ত্রও ইহার অন্তর্গত। কেবল এই দুই দল লোক হইলেই সমাজ চলিবে না। বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু হইতে সমাজ রক্ষা আবশ্যক। অপরাধীর দণ্ডবিধান, সমুদায় রাজকার্য্য ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সমস্ত বিভাগ সুচারুরূপে চালাইতে হইলে এমন কতকগুলি লোকের দরকার যাহারা পূর্ব্বোক্ত তিন বিভাগের কর্ম্মীদের আদেশ-পালনে নিযুক্ত থাকিবে ও তাহাদের ব্যক্তিগত অভাব প্রভৃতি দূর করিতে সচেষ্ট থাকিবে। সমাজের বা রাষ্ট্রের এই চারি অঙ্গ ব্যতীত অপর কোন অঙ্গের আবশ্যকতা নাই। সমাজের অন্তর্গত সমস্ত কর্ম্মীই এই চারি বিভাগের কোন-না-কোনটির অন্তর্গত। ভারত-গবর্ণমেণ্টের নয়টি বিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে Home, Finance, Legislative, Foreign and Political, Railway, Army রাজকার্য্যে ও সমাজ রক্ষায় ব্যাপৃত। Education, Health and Lands, Commerce, Industry and Labour—মানসিক উন্নতি ও শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য নিয়োজিত। প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য পিয়ন, চাকর, মুটে মজুর ইত্যাদি আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই চারি বিভাগ অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি-বিভাগ করিয়াছেন। "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টম্ গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ"—৪।১৩ ও ১৮।৪১ শ্লোকে বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসমূহ স্বভাবোৎপন্ন গুণদ্বারা বিভক্ত। ব্রাহ্মণের গুণ শম, দম, তপ, শৌচ বা পবিত্রতা, শান্তি, সরলতা, অধ্যাত্ম জ্ঞান ও বিবিধ বিজ্ঞান (science and philosophy) ও আস্তিক্য বুদ্ধি (১৮।৪২); ক্ষত্রিয়ের—শৌর্য্য তেজস্বিতা, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হইতে বিমুখ না হওয়া, দান ও কর্তৃত্ব (১৮।৪৩); বৈশ্যের—কৃষি, পশুপালন, বানিজ্য, এবং শূদ্রের পরিচর্য্যা করাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম (১৮।৪৪)। ১৮।৫৯-৬০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, যদি অহঙ্কারবশে মনে কর যুদ্ধ করিব না তবে সে ধারণা মিথ্যা। কারণ প্রকৃতিজাত তোমার স্বভাবজ প্রবৃত্তি তোমাকে যুদ্ধ করাইবেই। কেবল মোহবশেই যুদ্ধ করিব না বলিতেছ।

এইবার পরধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহার বিচার করিব। এক সমাজের ব্যক্তি যদি পৃথক সমাজের আদর্শে চলে তবে সে পরধর্ম্মী। অথবা একবর্ণের মনোবৃত্তি লইয়া যে অন্য বর্ণের আচরণপালনে চেষ্টিত হয় সে-ই পরধর্ম্মী। দ্রোণাচার্য্য যদি নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া যজন-যাজনে নিজেকে নিযুক্ত করিতেন তবে তিনি পরধর্ম্মী হইতেন। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মপালনে তিনি স্বধর্ম্মচ্যুত হন নাই। পরধর্ম্ম ভয়াবহ বলা হইয়াছে, কারণ পরধর্ম্মসেবীর কখনই চিত্তের বা ধাতুর প্রসন্নতা হয় না এবং তাহার পক্ষে সিদ্ধি অসম্ভব। নিজ প্রবৃত্তি-মত সামাজিক কার্য্য ও কর্ম্ম করিতে পারিলে ধাতু প্রসন্ন হইবার ও সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা।

পূর্ব্ববর্ণিত উপাখ্যানে শর্ব্বীলক নিজ কুলধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছিল; হয়ত ধনবীর শ্রেষ্ঠীকে হত্যা করিয়া সে তাহার স্বভাববশেই চলিয়াছিল; তত্রাচ তাহার কর্ম্ম গীতার অনুমোদিত নহে, কারণ গীতার কর্ম্মের

আদর্শ সমাজধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত স্বভাবসম্মত কর্ম্ম। শর্ব্বীলক ও অর্জ্জুনের দুইজনের প্রকৃতিতেই স্বভাবজ নিষ্ঠুরতা আছে, কিন্তু যুদ্ধ সমাজসম্মত বলিয়া অর্জ্জুনের পক্ষে তাহা স্বধর্ম্ম হইয়াছে এবং শর্ব্বীলকের হত্যাকার্য্য সমাজবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা পাপ। শর্ব্বীলক যদি যুদ্ধকার্য্যে যোগ দিত কিংবা যদি জল্লাদও হইত তাহা হইলে সে স্বধর্ম্মে থাকিত। গীতার উপদেশ এই যে, যদি শর্ব্বীলকের মত পাপী ব্যক্তিও গীতোক্ত ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় ও তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

আমরা প্রকৃতির বশেই যখন সকল কার্য্য করি এবং যখন আমাদের কোন কর্ত্তৃত্বই নাই, তখন বাস্তবিক পক্ষে স্বধর্ম্মেই থাকি আর পরধর্ম্মেই থাকি নিসঙ্গচিত্ত হইলে সিদ্ধিলাভ হইবেই। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতার শেষের দিকে ১৮।৬৬ শ্লোকে বলিয়াছেন, "সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব—ভয় করিও না।"

৩।৩৬ অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উঠিল যদি প্রকৃতির বশেই আমরা সকলে চলি এবং প্রকৃতির মূল স্রোত যখন সমাজানুগামী তখন সমাজবিরুদ্ধ কাজ বা পাপ কাজই বা আমরা করি কেন। স্রোতের বশে সব কুটাই যে চলিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই, কুটা ভারী হইলে তাহা ডুবিয়া যাইবে, এই ডোবাও প্রকৃতির নিয়মের বশেই ঘটে; অর্জ্জুনের মনে এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে প্রকৃতিজাত কোন গুণে মানুষ সামাজিক মূল স্রোতে না চলিয়া বিপথে চলিয়া থাকে। অর্জ্জুন বলিলেন, "ইচ্ছা না থাকিলেও মানুষ কিসের বশে পাপে প্রবৃত্ত হয়?"

৩।৩৭ "রজোগুণোদ্ভব কাম বা ক্রোধই মনুষ্যকে পাপে প্রবৃত্ত করায়। এই কামকে তৃপ্ত করা যায় না এবং ইহাই পাপের কারণ; ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিও।" কাম মানে কামনা।

বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্লোকের যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"পাঠক দেখিবেন যে, কাম, ক্রোধ, উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, কাম ও ক্রোধ একই। দুইটি পৃথক রিপুর কথা হইতেছে না। ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে ক্রোধে পরিণত হয়, অতএব কাম, ক্রোধ একই। (বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

কামনা প্রতিহত হইলে কোন্ ক্ষেত্রে ক্রোধের উৎপত্তি হয় এবং ক্রোধের স্বরূপই বা কি তাহার আলোচনা করিব। আধুনিক মনোবিদেরা বলেন, ক্রোধ একটি সহজ প্রবৃত্তি। সহজ প্রবৃত্তিগুলি আদি প্রবৃত্তি, এবং তাহাদের মূলে কি আছে আমরা তাহা জানি না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ক্রোধকে 'দ্বিতীয় রিপু' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই শ্লোকে কাম ও ক্রোধকে একই বলা হইতেছে, অতএব ক্রোধকে পৃথক মূল প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হইল না। আমি নিজে ক্রোধকে সহজ সংস্কার বলিয়া স্বীকার করিলেও মূল প্রবৃত্তি বলিয়া মানিতে রাজি নহি। কেন, তাহার বিচার করিব। ক্রোধের মূলে অন্য কোন প্রবৃত্তির অস্তিত্ব থাকিলে ক্রোধ কেন হয় বা কি হইতে তাহার উৎপত্তি, এরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত নহে। অন্যথা ক্রোধকে মূল প্রবৃত্তি বলিয়া মানিলে এরূপ প্রশ্ন চলে না। সচরাচর যে-সকল কারণে আমাদের রাগ হয় প্রথমে তাহার উল্লেখ করিতেছি :—

(১) কেহ আমার অনিষ্ট করিলে, আমি তাহার উপর রাগিয়া থাকি। শ্রীচৈতন্যদেব বা মহাত্মা গান্ধীর কথা স্বতন্ত্র। এরূপ মহাপুরুষদের কথা এখানে কিছু বলিব না,—সাধারণ লোকের যাহা হয়, তাহাই বলিব।

(২) কেহ অপমান করিলে

(৩) অনিচ্ছায় কোন কাজ করিতে হইলে

(৪) নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পাইলে

(৫) কেহ আমার কথা না শুনিলে

অর্জ্জুন উবাচ—
অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ—
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

(৬) প্রাপ্য সম্মান না পাইলে

(৭) বিনা অনুমতিতে কেহ আমার দ্রব্যাদি লইলে, বা আমার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলে।

(৮) কেহ আমাকে বোকা বলিলে আমার বুদ্ধিতে বড় হইবার অভিমানে আঘাত লাগে।

(৯) আমার কোন মিথ্যা কথা ধরা পড়িলে বা কেহ আমার নামে কলঙ্ক রটনা করিলে রাগ হয়, কারণ ইহাতে আমার ধর্ম্মের অভিমান খর্ব্ব হইয়া পড়ে ও লোকসমাজে আমি হেয় হই। উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের মনের মধ্যে বড় হইবার যে-ইচ্ছা নিহিত আছে, হয় সেই ইচ্ছানুরূপ কাজে বাহিরের অন্তরায় ঘটিয়াছে, নতুবা নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ আমার আর্থিক ক্ষতি করিল ফলে আমার বড়লোক হইবার ইচ্ছার পূর্ণতালাভের ব্যাঘাত হইল। কেহ অপমান করিল, বা পরের বশে কাজ করিতে হইল, ইহাতে নিজেকে ছোট মনে হইল। কেহ কথামত কাজ করিল না, বা না-বলিয়া আমার দ্রব্যে হাত দিল, ইহাতে কর্ত্তৃত্বের অভিমান ক্ষুণ্ণ হইল।

(১০) কেহ আমার আরামের ব্যাঘাত ঘটাইলে, অথবা ক্ষুধার সময় খাইতে বাধা দিলে রাগের সঞ্চার হয়।

(১১) আমার ভালবাসার জিনিষে ভাগীদার জুটিলে, অথবা স্ত্রী অন্য কাহাকেও, বা অন্য কেহ আমার স্ত্রীকে ভালবাসিলে আমি ক্রোধান্বিত হই।

(১০) ও (১১) সম্পর্কীয় ব্যাপারে আমার সুখের অথবা ভালবাসার অন্তরায় উপস্থিত হওয়াতেই রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। নিজেকে ভালবাসি বলিয়াই সুখান্বেষণে ধাবিত হই, সেই কারণে সুখের ব্যাঘাত এবং নিজের উপর ভালবাসার ব্যাঘাত, এই উভয়ের মধ্যে কোনই তফাৎ নাই।

আরও কতকগুলি অবস্থায় রাগ হইতে পারে :—

(১২) উচিত কথা শুনিলে

(১৩) কেহ কাজের ব্যাঘাত ঘটাইলে

(১৪) কেহ আমার সমালোচনা করিলে

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, এইগুলির মূলেও পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির কোন-না-কোনটির প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। (১) হইতে (১৪) পর্য্যন্ত সমস্ত কারণগুলিই প্রথম পুরুষকে লইয়া। নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলেও পরের কোন কোন কাজে আমার রাগ হইতে পারে ; যেমন—

(১৫) পরের ভাল দেখিলে

(১৬) নিজের ঘুম হইতেছে না, অথচ পরকে আরামে নাক ডাকাইতে দেখিলে

(১৭) পরে মিথ্যা বলিলে, বা কোন দোষ করিলে

(১৮) পরের বোকামি দেখিলে

এই শ্রেণীর কারণগুলি বড়ই বিচিত্র। এই সকল ব্যাপারে আমার নিজের কোন অনিষ্ট নাই। অন্যের বোকামি দেখিলে আমার কেন রাগ হয়, ভাবিবার কথা। পরে ইহার বিচার করিতেছি।

(১৯) কখন কখন সামান্য কারণে—এমন কি অকারণেও আমরা রাগিয়া থাকি। '১৭' বলিলে রাগ করে এমন লোকও আছে। এই শ্রেণীর লোককে ক্রোধান্বিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও হয়ত কোন সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। এরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে, রাগের আসল কারণটি তাহার মনের কোথাও লুক্কায়িত আছে, এবং তাহার কোন খবরই সে রাখে না।

দেখা গেল, আমরা সময়-বিশেষে

(ক) নিজ সম্পর্কিত ব্যাপারে রাগ করি

(খ) পরের ব্যাপারে রাগ করি

(গ) অজ্ঞাত কারণে রাগ করি।

নিজ সম্পর্কিত যে-সকল ব্যাপারে আমাদের রাগ হয়, সে-রাগের মূল কারণ যে আমাদের কোন-না-কোন ইচ্ছার পথে ব্যাঘাত, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। এরূপ ইচ্ছা হয় আত্মসম্মান, নয় ভালবাসা, সম্পর্কীয়। সুতরাং এরূপ স্থলে রাগকে মূল প্রবৃত্তি না বলিয়া ইচ্ছাকেই যদি মূল প্রবৃত্তি বলি, তবে বিশেষ অন্যায় হয় না। ইচ্ছা প্রতিহত হইলেই রাগের সৃষ্টি হয়, অতএব রাগ ইচ্ছারই রূপান্তর মাত্র। রাগের পৃথক অস্তিত্ব নাই। পরের বোকামি দেখিলে যখন আমার রাগ হয়, তখন ইচ্ছার ব্যাঘাতেই যে রাগের উৎপত্তি, এ কথা কেমন

করিয়া বলা চলে ? আমি অবশ্য বলিতে পারি যে, পরকে বুদ্ধিমান্ দেখিবার ইচ্ছা আমার মধ্যে আছে, সেই ইচ্ছার ব্যাঘাতেই রাগের উৎপত্তি হইল। কিন্তু পরের অতিরিক্ত বুদ্ধি দেখিলেও যে আমার রাগ হয়। কাজেই উত্তর ঠিক হইল না।

যে নিজে কালা, তাহার কথা লোকে শুনিতে না পাইলে সে চটিয়া উঠে ; কিন্তু খোঁড়া কাহাকেও খোঁড়াইতে দেখিলে চটে না, ইহারই বা কারণ কি ? খোঁড়ার খোঁড়ান লুকান যায় না, কিন্তু কালা জানাইতে চাহে না যে সে কালা। এই জন্যই অপর কাহারও বধিরতা দেখিলে তাহার বধিরতা ধরা পড়িবার আশঙ্কা অজ্ঞাতে মনে আসে ; তাই তাহার রাগ হয়। যে-দোষ আমি ঢাকিতে চাই, সে-দোষ পরের মধ্যে দেখিলে আমার রাগ হয়। অবশ্য কালা জানে যে সে কালা ; কিন্তু তাহার বধিরতাকে সে একটা দোষ বলিয়া মনে করে তাই ইচ্ছা করিয়া সে ইহা ঢাকিতে চায়। আমাদের মনের মধ্যে এমন অনেক দোষ আছে, যাহার অস্তিত্ব আমাদের জানা নাই। সহজে এই সকল দোষের অস্তিত্ব আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, আবার কেহ তাহা দেখাইয়া দিলেও মানিতে চাহি না, আর মানিতে চাহি না বলিয়াই রাগিয়া উঠি। আমার নিজের ভিতর, আমার অজ্ঞাতসারে, বোকামি আছে, তাই পরের বোকামি দেখিলে আমি রাগি। আমার নিজের মধ্যে চুরি করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াই, আমি চোর দেখিলে বা কেহ আমাকে চোর বলিলে রাগ করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চোর বলিলে আমার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, অর্থাৎ বড় হইবার ইচ্ছায় বাধা পড়ে, সেই জন্য রাগ হয়। কিন্তু এখন বলিতে চাই, চোর হইবার অজ্ঞাত ইচ্ছা মনের কোণে লুক্কায়িত আছে বলিয়াই লোকে চোর অপবাদ দিলে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। যে বাস্তবিকই চোর এবং নিজেকে চোর বলিয়া জানে, তাহাকে কেহ চোর বলিলে সে লোক-দেখান রাগের অভিনয় করিতে পারে, আসলে তাহার রাগ হয় না। আমি চোর—এ-কথা পরের কাছে লুকাইতে চাহিল রাগের ভাণ হয়, আর নিজের কাছে লুকাইতে চাহিলে বাস্তবিক রাগ হয়। এখানে আপত্তি উঠিতে পারে, চোর বলিলে আমরা প্রায় সকলেই রাগ করি, আর আমাদের মধ্যে যে চুরি ইচ্ছা আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি ? স্বল্প পরিসরের মধ্যে এ-সব কথার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে, অবস্থা-বিশেষে আমরা সকলেই চোর হইতে পারিতাম। শৈশবাবধি চোরের মধ্যে মানুষ হইলে চুরির ইচ্ছা যে আমাদের মনে জাগিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব স্বীকার করিতে হয়, আমাদের সকলেরই মনে অব্যক্তভাবে চুরির ইচ্ছা বর্ত্তমান রহিয়াছে,—সুযোগ সুবিধা পাইলেই তাহা ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। আবার মনে করুন, আমি কোন আপিসের খাতাঞ্চি। আমাকে কেহ যদি বলে, যে, তুমি ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের টাকা ভাঙিয়াছ, তাহা হইলে আমার রাগ হইবে না, কিন্তু কেহ যদি বলে যে তুমি নিজের আপিসের টাকা চুরি করিয়াছ তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের টাকা চুরির তুলনায় আপিসের টাকা চুরি করিবার সম্ভাবনা অধিক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যেখানে আমার পক্ষে চুরি করিবার সম্ভাবনা আছে, কেবল সেইখানেই আমার রাগ হয়—অন্যত্র নহে। এই সম্ভাবনার কথা অপরেই মনে করুক, বা আমি নিজেই মনে করি, তাহাতে কিছু আসে যায় না। যেখানে চুরি করিবার সম্ভাবনা আছে, বুঝিতে হইবে সেই সম্ভাবনার পশ্চাতে চুরি করিবার ইচ্ছাও আছে। যেখানে ইচ্ছা অসম্ভব, সেখানে সম্ভাবনাও অসম্ভব। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে আমার মধ্যে চুরি-ইচ্ছার অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হইল।

এই দুই প্রকার প্রমাণে পাঠক হয়ত সন্তুষ্ট হইবেন না। আমার 'স্বপ্ন' পুস্তকে আমাদের অজ্ঞাত ইচ্ছার অস্তিত্ব কি করিয়া ধরা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাল্যকালে জানিয়া শুনিয়া, অথবা বয়সকালে অজ্ঞাতসারে, আমরা অনেকেই পরের দ্রব্য না বলিয়া লইয়া থাকি। মনের

মধ্যে চুরি-ইচ্ছার অস্তিত্বের কথা মানিয়া লইলে, সহজেই এরূপ আচরণের কারণ বুঝান যায়।

আমাদের অজ্ঞাতে মনের মধ্যে চুরি-ইচ্ছা আছে, একথা মানিলে, সর্ব্ববিধ অন্যায় ইচ্ছাও যে আছে তাহাও মানিতে হয়। সকল সমাজেই অন্যায় কার্য্যে নিষেধ আছে; যেমন, চুরি করিও না, কাহাকেও মারিও না, পর-স্ত্রী হরণ করিও না, ইত্যাদি। 'নিষেধে'র অর্থ ই 'ইচ্ছা'র নিষেধ। এই সকল অবৈধ কার্য্যের সম্ভাবনা—অর্থাৎ ইচ্ছা—না থাকিলে, নিষেধ-বাক্যের কোনই সার্থকতা থাকিত না। "চুরি করিও না" বলিলে বুঝিতে হইবে, চুরি করিবার ইচ্ছা আছে। এইরূপ নানা প্রমাণের সাহায্যে মনের মধ্যে সকল রকম অবৈধ ইচ্ছারই অস্তিত্ব দেখান যাইতে পারে, অবশ্য এই সকল ইচ্ছা আমাদের অজ্ঞাত-সারেই মনে উঠে। নানা কারণে এইরূপ অবৈধ ইচ্ছাগুলি আমাদের মনে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে, ফুটিতে পায় না; সেইজন্য তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের নিকট অজানা থাকে। রুদ্ধ ইচ্ছা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা 'স্বপ্ন' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

যেখানে অকারণে, অথবা সামান্য কারণে, রাগ হয়, সেখানেও বুঝিতে হইবে, মনের মধ্যে কোন রুদ্ধ ইচ্ছা বর্ত্তমান রহিয়াছে। '১৭' বলিলে রাগ করাও এইরূপ কোন রুদ্ধ ইচ্ছার ফল। নিজের মধ্যে কোন ইচ্ছা রুদ্ধাবস্থায় থাকিলে, অপরের মনে যে অনুরূপ ইচ্ছা ঘটনাচক্রে পরিস্ফুট হওয়া স্বাভাবিক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; এইজন্য তাহার সহিত সহানুভূতিও থাকে না। আমার মধ্যে চুরি-ইচ্ছা রুদ্ধাবস্থায় থাকিলে, কিরূপ অবস্থায় পড়িলে অপরে চুরি করিতে পারে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না; সেইজন্য কাহাকেও চুরি করিতে দেখিলে রাগ হয়। গুরু-মহাশয় নিজের বোকামি ঢাকিতে এতই ব্যস্ত যে, মূর্খ ছাত্রের পক্ষে কোন একটি বিষয় না-বুঝা যে স্বাভাবিক, সে-কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাই ছাত্রের বুদ্ধিহীনতায় তিনি চটিয়া উঠেন। যে নিজে বোকা, অথচ জানে না যে সে বোকা, সে-ই অপরের বোকামি দেখিলে রাগ করে।

যিনি নিজের সমস্ত দোষ দেখিতে পান তিনি অপরের উপর কিছুতেই রাগ করেন না। এরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ।

পাপী কেন পাপ কাজ করে বুঝিতে পারিলে, অর্থাৎ পাপ-ইচ্ছা মনে উঠা সম্ভব একথা বুঝিলে, পাপীর উপর ঘৃণা থাকে না। নিজের অনিষ্ট হইলে আমরা যে রাগি, তাহার কারণ—আমাদের সকলেরই মনে নিজেকে পীড়া দিবার, এমন কি নিজের মৃত্যু হউক, এরূপ ইচ্ছাও রুদ্ধ এবং অজ্ঞাত অবস্থায় রহিয়াছে। একথা 'স্বপ্ন' পুস্তকে ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইচ্ছা এবং ক্রোধ—মূলতঃ একই। ভাষাতত্ত্বও ইহার সাক্ষ্য দেয়। রাগ কথাটা 'ভালবাসা' এবং 'ক্রোধ' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। গীতাকার কাম ও ক্রোধকে যে এক বলিয়াছেন তাহাতে কোন দোষ হয় নাই।

৩।৩৮-৪৩ এই শ্লোকগুলির ভাবার্থ এইরূপ।—"রজোগুণোদ্ভব কাম মনুষ্যকে পাপে প্রবৃত্ত করায়। এই সমুদায় সংসার কামের দ্বারা আবৃত আছে অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুতেই কামের অধিকার। কামের দ্বারা জ্ঞানীদের জ্ঞানও আবৃত। কামের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে; ইহাদের সাহায্যেই কাম দেহী অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান আবৃত করে; এজন্য ইন্দ্রিয়গণকে কামের বশীভূত না রাখিয়া আত্মার বশে রাখ এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশকারী পাপকারণ কামকে নষ্ট কর। স্থূলদেহ ও বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ যিনি সেই আত্মাকে জানিয়া

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভ স্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণা নলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধি রস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু রিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

নিজেকে নিজেতে স্তম্ভন বা সংহরণ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্বিজ্ঞেয় কামরূপ শত্রুকে মারিয়া ফেল।"

৩।৩৭ শ্লোকে 'রজোগুণ' কথা আছে। ইহার অর্থ পরে বিচার করিব। কঠের অষ্টম বল্লীর ৭।৮ শ্লোক গীতার ৩।৪২-৪৩ শ্লোকের অনুরূপ, যথা :—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥
অব্যক্তাত্তু পর পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥"

"ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব হইতে মহৎ অধিক, মহৎ অর্থাৎ মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীর পুরুষ শ্রেষ্ঠ যাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।" শ্রীকৃষ্ণ এ যাবৎ বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন—"বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ" ইহাই তাঁহার উপদেশ। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি এবং এইজন্যই তাহা বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের নিয়ামক। সমস্ত কর্ম্মই বিষয়াশ্রিত এবং পূর্ব্বে বলিয়াছি বিষয়জ্ঞান অব্যক্ত কামনা হইতে উৎপন্ন। এই কারণেই বলা হইয়াছে বুদ্ধি কামের অধিষ্ঠান। এই বুদ্ধিকে কামনা হইতে মুক্ত করা যায় না, কিন্তু ইহাকে ব্যবসায়াত্মিকা করা যাইতে পারে ও তখন এই বুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞানই চরম সাধন, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সিদ্ধিলাভের উপায় মাত্র। এই জন্যই বলা হইল বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মজ্ঞানই কাম-জয়ের উপায়।

৩।৪১ শ্লোকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' শব্দ আছে। শঙ্কর বলেন—'জ্ঞান' অর্থে শাস্ত্র তর্ক যুক্তি সিদ্ধ জ্ঞান ও 'বিজ্ঞান' অর্থে অনুভবসিদ্ধ বিশেষ জ্ঞান। অধুনা বাংলায় 'বিজ্ঞান' শব্দ যে-অর্থে ব্যবহৃত হয় অনেকে 'বিজ্ঞানে'র তাহাই যথার্থ অর্থ বলেন। আমার মতে প্রত্যক্ষ ও অনুভবসিদ্ধ প্রতীতিকে জ্ঞান বলা হইয়াছে এবং সেই জ্ঞান যখন যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি, বিচার ইত্যাদির দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে তখন তাহা বিশেষ জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। সপ্তম অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে বিজ্ঞান কথা আছে, সেখানে এই অর্থই পরিস্ফুট হইবে। গীতায় অন্যত্র ও উপনিষদে সর্ব্বত্র বিজ্ঞান শব্দের এই অর্থই সমীচীন। বাংলায় পদার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ যথোপযুক্ত, কারণ এই সকল শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান যুক্তি বিচার দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। Science ও Philosophy দুই-ই বিজ্ঞান।

কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ আমাদের পাশের গ্রামের একজন বিলাত ঘুরে এল। সমস্ত গ্রামে হুলস্থুল ব্যাপার! জাত গেল—ধর্ম্ম গেল—কুল গেল—সব গেল! পণ্ডিত-মহলে বড় বড় মজলিস বস্‌তে লাগল। হিন্দু ধর্ম্মের ক্যাশিয়ারদের চোখে আর ঘুম নেই! ভদ্রলোকটির পরিবারবর্গকে ত ইতি-পূর্ব্বেই একঘরে ক'রে রাখা হয়েছিল, কিন্তু এখন আর তাতেও স্বস্তি নাই; ধর্ম্মরক্ষকদের মগজ হ'তে ধর্ম্মরক্ষার আরও নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার হ'তে লাগল।

কিন্তু কিছুতেই বিলাতফেরৎ জব্দ হয় না। বেশ স্বচ্ছন্দেই তার দিন কেটে যাচ্ছে। তখন পণ্ডিতদের প্রাণে দয়ার সঞ্চার হ'ল। "তাই ত! গ্রামের মধ্যে একটি ভদ্রপরিবার একঘরে হয়ে থাকবে—এ কি সওয়া যায়! আহা! বেচারীকে শীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সমাজে তুলে নেওয়া হোক!" তখনই তাঁরা নিজেরাই বিলাত-ফেরতের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত; বললেন—"বাবা, যা হবার হয়ে গেছে এখন প্রায়শ্চিত্ত ক'রে জাতে ওঠ।"

ইতিপূর্ব্বে কিন্তু বহুবার প্রায়শ্চিত্তের কথা তোলা হয়েছিল, পণ্ডিতগণ সেকথা কানেই তোলেন নি।

বিলাতফেরতটি ছিল নিতান্ত ভালমানুষ; সে দেখল যদি প্রায়শ্চিত্ত করলেই এরা সন্তুষ্ট হয় তবে তাতে আর দোষ কি?

দু-দিন পরেই মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'ল; চারধারের যত পণ্ডিত সব জড় হলেন। নানা তর্ক-বিতর্ক অনুস্বার বিসর্গের মধ্য দিয়ে কাজ এগিয়ে চল্‌ল।

মস্তকমুণ্ডনাদি যত রকমের শুভকর্ম্ম সব শেষ হয়েছে—এখন বাকী আছে কেবল 'গোময়-ভক্ষণ'!

বৃদ্ধ শিরোমণি-মশায় এক ছটাক আন্দাজ একটি গোময়ের তাল বিলাতফেরতের সাম্‌নে ধরলেন, বললেন—"আচমন ক'রে উদরসাৎ ক'রে ফেল।"

সর্ব্বনাশ! বিলাতফেরতের ত চক্ষুস্থির! বললেন—"এও কি সম্ভব!"

শিরোমণি-মশায় বললেন—"তা বাবা শাস্ত্রের আদেশ!"

বিলাত-ফেরৎ চটে উঠল;—"শাস্ত্রের কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই! এতটা গোবর কি কখন মানুষে খেতে পারে?"

শিরোমণি উত্তর করলেন—"মানুষে না পারুক, বিলাত-ফেরতকে পার্‌তেই হবে।"

নব্যদলে মহাবিদ্রোহ উপস্থিত হ'ল। পণ্ডিতগণও নাছোরবান্দা। শেষে বিলাত-ফেরৎ বললে—"আচ্ছা। তাই খাব, দিন। যখন শাস্ত্রের আদেশ তখন ত আর উপায় নেই!"

নব্যদল চীৎকার ক'রে উঠল—"চুলোয় যাক এমন শাস্ত্র! খেয়ো না! খেয়ো না! কিছুতেই খেয়ো না!"

বিলাত-ফেরৎ ইঙ্গিতে তাদের থাম্‌তে ব'লে, শিরোমণি-মশায়কে বললেন—"দিন! শিরোমণি-মশায়, গোবর দিন!"

শিরোমণি ত মহা খুশী! বললেন—"এই ত বাবা, এই ত মানুষের মত কাজ! আশীর্ব্বাদ করি, শাস্ত্রে তোমার এমনি অচলা ভক্তি যেন চিরদিন থাকে!"

বিলাত-ফেরৎ বললেন, "কিন্তু শিরোমণি-মশায়; আর এক তাল যে চাই!"

শিরোমণি অবাক্! বললেন—"সেকি! আবার কেন! শাস্ত্রে ত এই এক তালেরই ব্যবস্থা করেছে!"

বিলাত-ফেরৎ জোর দিয়ে বললে—"সে আপনার ভাবতে হবে না। আপনি ঠিক এই রকম আর এক তাল গোবর দিন।"

শিরোমণি কি করেন! ঠিক সেই ওজনের আর এক তাল গোবর গিয়ে দিলেন।

বিলাত-ফেরৎ সেই দুই তাল গোবরই মুখের কাছে এগিয়ে নিল।

শিরোমণি বাধা দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"আহা আহা! এক তালই খাও! দু-তালের কোনো প্রয়োজন নেই।"

বিলাত-ফেরৎ কিছু না ব'লে গোবরের তাল দুটি মুখের কাছে ধরলে।

সভাসুদ্ধ লোক নির্ব্বাক! নিস্তব্ধ! কিছুক্ষণ পরে তাল দুটি নীচে নামিয়ে দিয়ে সে বললে—"নিন্ শিরোমণি-মশায়! 'গোময়-ভক্ষণ' ত হয়ে গেল।"

শিরোমণি ত হতভম্ব! বললে—"সে কি বাবা! এক তিলও ত মুখে তোল নি!"

বিলাত-ফেরৎ বললে—"বলেন কি ঠাকুর! হয়নি ত কি? জানেন না শাস্ত্রে বলেছে—'ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্'—তা আমার এই দুই তাল গোময়ের ঘ্রাণ নেওয়ায় ত এক তাল ভোজন হয়েই গেছে। পণ্ডিত হয়ে শাস্ত্রবাক্য অমান্য করবেন না! নিন নিন, এবার দক্ষিণেটা নিয়ে নিন।"

নব্যদলও চীৎকার ক'রে উঠল—"হাঁ হাঁ, আর গোলমাল করবেন না; দক্ষিণা নিয়ে নিন! দাও হে দাও, শিরোমণি-মশায়কে দক্ষিণা দিয়ে দাও!"

সেই মহা হট্টগোলের মধ্যে শিরোমণি-মশায়ের ক্ষীণ স্বর শোনা গেল—হাঁ হাঁ দাও, এবার দক্ষিণেটা চুকিয়ে দাও! বেশ মোটা রকম দিও কিন্তু! কারণ শাস্ত্রেই ত বলেছে—"

নব্যদল বাধা দিয়ে ব'লে উঠল—"থাক্ থাক্! শাস্ত্রের কথা পরে হবে—এখন দক্ষিণেটা নিয়ে নিন।"



স্বর্গীয়া ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

শ্রীহেমলতা সরকার

ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিতা রমণীর একটি আদর্শ চরিত্র।···ছেলেবেলায় তাঁহার মুখে কথা বড় ছিল না—স্বভাবতঃই চুপচাপ আত্মস্থপ্রকৃতির বালিকা ছিলেন। সকলের সঙ্গে ভাব, সকলের সঙ্গে হাসি-গল্প করিয়া করিয়া বেড়ানর অভ্যাস তাঁহার ছিল না। সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র এই আমার বাল্যবন্ধুকে দেখিতাম। কিন্তু সেই ছোট বেলা হইতে কি প্রতিজ্ঞার বল—যাহা ধরিতেন কেহ তাহা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিত না।···যামিনীর বন্ধুত্বের ভিতর একটু বিশেষত্ব ছিল, সেই কিশোর বয়সেই যাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়াছে সে বন্ধুত্ব এ জীবনে ছিন্ন হয় নাই। বিদ্যালয়ের বন্ধুকে রোগশয্যা-পার্শ্বে শেষ বিদায়ের দিন দেখিলাম।···

যামিনী মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তখন হইতে আমাদের দেখাশুনা কখনও কদাচিৎ হইত। ডাক্তারি পড়িবার সময় তাঁহাকে অনেকপ্রকার কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে—কিন্তু যামিনী কখনই আরামপ্রিয় ছিলেন না। নীরবে সকল প্রকার কষ্ট অসুবিধা সহ্য করা অভ্যাস ছিল। তারপর যথাসময়ে ডাক্তার হইয়া কলেজ হইতে বাহির হইলেন।

আমি যামিনীকে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিবার ও জানিবার সুযোগ পাইলাম—যখন ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে তাঁহারই চেষ্টায় আমার স্বামী 'বীর হাসপাতালে'র ডাক্তার হইয়া নেপালে গেলেন। তখন যামিনীর চরিত্রের অপূর্ব্ব বিকাশ, অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া গেলাম। কেবল কি কর্ম্মশক্তি,—কি তাঁর পুণ্য প্রভাব, নেপাল সরকারে কি তাঁর উচ্চ সম্মান! আরও দেখিলাম বাল্যের সেই নীরব বালিকা এখন কি তেজস্বিনী নারী! নেপালে প্রায় এক বৎসর নিত্য তাঁহার সহবাসে সুখে কাটিয়াছে—যদিও তাঁহার সহিত কদাচ নিশ্চিন্ত হইয়া দু'দণ্ড কথা বলিবার সুযোগ হইত না। আমরা প্রথমে একই বাগানে দুইটি ছোট ছোট বাড়ীতে থাকিতাম—তারপর পার্শ্বের বড় হাসপাতালে ডাক্তারের কোয়ার্টারে উঠিয়া যাই। আমরা নিদ্রা হইতে উঠিতে না উঠিতে দেখিতে পাইতাম যামিনীকে লইয়া যাইবার জন্য রাজপরিবার বা সম্ভ্রান্ত দরবারী লোকদের বাড়ী হইতে অনেক গাড়ী আসিয়াছে। এবং যামিনীর গাড়ীর পশ্চাতে অমন সাত আটখানি গাড়ী বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিতাম। যে গাড়ীখানি সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিল যামিনী সেই গাড়ীতে সেই বাড়ীতে সর্ব্বাগ্রে গেলেন—গাড়ীগুলি সব তাঁহার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শেষ গাড়ীখানি করিয়া শেষ রোগীকে দেখিয়া বাড়ী ফিরিলেন। প্রাতে ৭টার মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া সারাদিনের মত বাহির হইতেন। কখন বেলা ২।৩টায় ফিরিতেন—কখন বা ফিরিতে ফিরিতে দিনান্ত হইত।

একটী মেয়েদের হাসপাতালে যামিনীর তত্ত্বাবধান করিতে হইত—সেখানে বিস্তর বাহিরের রোগী এবং অনেগুলি স্থায়ী চিকিৎসাধীন রোগী ছিল। এই হাসপাতালের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম—কিন্তু হাসপাতাল খুলিবার পূর্ব্বেই ভোর হইতে না হইতেই তাঁহার জন্য গাড়ীর পর গাড়ী প্রতীক্ষা করিত। এমন অনেক সময় হইত, সারাদিন কঠিন শ্রম করিয়া শয্যা গ্রহণ করিতে না করিতে মধ্যরাত্রিতে জরুরি ডাক আসিত, তখন সেই প্রচণ্ড শীতে মিস্ সেন তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া রোগী দেখিতে যাইতেন। যখন তাঁহার পিতামাতা কিছুদিনের জন্য সেখানে ছিলেন, তখন তাঁহারা কত নিষেধ করিতেন, বিশেষভাবে তাঁহার পিতা বলিতেন—"এখন গাড়ী ফিরিয়ে দাও, সকালে যাবে বলে দাও।" যামিনী কখনও শুনিতেন না, বলিতেন, "অত্যন্ত প্রয়োজন না হ'লে কি আর রাত্রে লোকে গাড়ী পাঠায়? আমায় যেতেই হবে।" তখন পিতার চক্ষে জল আসিত—"আহা বড় কষ্ট তোমার!" যাঁহার ক্লেশের কথা স্মরণ করিয়া পিতার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত—তাঁহাকে কোনদিন কখনও কষ্টের কথা বা শ্রান্তির কথা বা অসুবিধার কথা উচ্চারণ করিতে শুনি নাই। এমন অনেক সময় হইয়াছে যে হাসপাতালে কঠিন রোগী আছে—কি কোন কঠিন অপারেশন আছে, তখন মিস্ সেনকে বাধ্য হইয়া রাজবাড়ীর গাড়ী ফিরাইয়া দিতে হইত, কারণ তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে দরিদ্র অসহায় নারীকে অবহেলা করিয়া রাণীদের সামান্য রোগের চিকিৎসা করিতে যাওয়া অবৈধ বোধ হইত। কিন্তু রাজবাড়ীর গাড়ী ফেরান এক দুঃসাহসিকতার কাজ!—কেহই এত বড় দুঃসাহসিক কাজ করিতেন না—"নয় হাসপাতালের রোগী মরেই যাবে, তাই বলে রাজবাড়ীর ডাক অগ্রাহ্য করা?" একমাত্র মিস্ সেনের সে সাহস ছিল—এবং একদিন সামান্য ভাবে মহারাজ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মিস্ সেন কি সত্যকথা শুনাইলেন, "আপনারা নিয়মে লিখে রেখেছেন হাসপাতালের কাজের সময় কেউ বাহিরের ডাকে যাবে না; কিন্তু রোগীর প্রাণের দায়েও আপনাদের ডাকে অবহেলা করলে অপরাধী হ'তে হয়—এ নিয়মের কি অর্থ!" মিস্ সেনের কথা শুনিয়া মহারাজের মুখ লাল হইয়া গেল। অন্য কাহারও মুখে একথা শুনিলে সেই দিনই তাঁহার বরখাস্ত হইত, কিন্তু মিস্ সেন "কাজ ছাড়িয়া দিব" বলিলে তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। নেপাল রাজ্যে সে সময় দাসপ্রথা ছিল—আরও কতপ্রকার সামাজিক কুরীতি, কুনীতি ছিল। যামিনীর দারুণ ঘৃণা এ সকলের প্রতি। আমার নিকট এই সকল কদাচার বর্ণনা কালে ঘৃণায় তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিত, বলিতেন—"প্রচুর উপার্জ্জন করি ব'লে না—টাকার মায়ায় নয়,—কখনও এদেশে থাকতে পারতাম না যদি না সাধ্বী সতী বড় মহারাণী ও মহারাজ চন্দ্র শমসেরের সাধ্বী পত্নীর চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করত।" এই দুই সাধ্বী নারী তাঁহাকে যে কি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন তাহা বলিতে পারি না।

মহারাজ-অধিরাজের জ্যেষ্ঠা মহিষী কুলু উপত্যকার কোন ক্ষত্রিয় গৃহস্থের কন্যা ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া ৭ বৎসরের বালিকাকে আনিয়া ৯ বৎসরের বালক মহারাজ-অধিরাজের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। এই বড় মহারাণীর মিস্ সেনের প্রতি যে গভীর ভালবাসা ছিল—তাহা বন্ধুত্ব বলিব, কি সখিত্ব বলিব, কি গুরুর প্রতি শিষ্যার ভক্তি বলিব তাহা আমি জানি না। এ এক অপূর্ব্ব প্রেম! এই বড় মহারাণী তখন যুবতী। মহারাজের জ্যেষ্ঠা মহিষী হইলেও

তিনি উপেক্ষিতাই ছিলেন—মনে হইত, জগতে মিস্ সেনই তাঁহার একমাত্র জুড়াইবার স্থান। প্রতিদিন নিজহস্তে রন্ধন করিয়া মিস্ সেনকে পাঠাইতেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রতিদিন মিস্ সেনের জন্য ফুলের মালা, ফুলের পাখা, নানাবিধ সুখাদ্য ও মহারাণীর নিজহস্তে প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী আসিত—যাহা দশজনের আহার করা কঠিন। তিনি নিজে যাহা আহার করিতেন সবই মিস্ সেনের জন্য আসিত। মিস্ সেন ছুটিতে দেশে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিলে একদিন মহারাণী বলিলেন, আমি অমুক আচার করেছি, কিন্তু মুখে দিই নি—আপনি আগে না আস্বাদ করলে আমি কি করে খাই?" এই মহারাণী যখনই শুনিতেন মিস্ সেন কাজ ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন, শোকে আচ্ছন্ন হইতেন, মিস্ সেনকে বলিতেন, "তবে আমি কি করে' বাঁচ্ব?" মিস্ সেন বলিতেন, "তবে কি আপনি আশা করেন, আপনাদের এদেশেই আমি মরব?—এখানে চিরদিন থাকা কি সম্ভব?" কিন্তু তাঁহার প্রাণ প্রবোধ মানিত না। ভগবানকে ধন্যবাদ—আজ তিনিও স্বর্গে।

একবার আমরা নেপালে থাকিতে সংবাদপত্রে পড়িলাম কুলু উপত্যকায় ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া বিস্তর লোকের প্রাণ গিয়াছে। সেই কত দিনের পুরানো সংবাদ মিস্ সেনের মুখে শুনিয়া মহারাণীর কি দুর্ভাবনা—কি দুঃখ! "মিস্ সেন, হয়ত আমার বাবা-মা প্রাণে মারা গিয়েছেন! আমি তাঁদের সংবাদ চাই—আমাকে আপনি তাঁদের সংবাদ এনে দিন।" আবার তখনই বলিতেন যে, "বাপ-মা ৭ বছরের মেয়ে আমাকে বিসর্জ্জন দিয়ে গিয়েছেন—আর এ জীবনে একদিনও দেখ্লেন না, সেই বাপ-মার জন্য আমার প্রাণ এত কাঁদে কেন? নারী হ'য়ে জন্মান কি কঠিন শাস্তি, মিস্ সেন!" আমি জানি মিস্ সেন অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন সংবাদ আনাইতে—কিন্তু ফল কি হইয়াছিল স্মরণ নাই। নেপাল রাজ্যে টেলিগ্রাম ছিল না। মিস্ সেন মহারাণীর জন্য অনেক করিতেন। নেপালের রাজবাড়ীতে মেয়েদের লেখাপড়া, গান বাজনা শেখান হয়। এই মহারাণী পিয়ানো বাজাইতে জানিতেন, —রাগরাগিণীর জ্ঞান খুব ছিল। মিস্ সেন অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতের রাগরাগিণী তাঁহাকে বলিলে তিনি বাজাইয়া শোনাইতেন, এবং ঠিক হইল কি না জিজ্ঞাসা করিতেন। কত ব্রহ্মসঙ্গীতের অর্থ বুঝাইয়া দিতে বলিতেন। মিস্ সেন অতি চোস্ত দরবারী নেপালী অনর্গল বলিতে পারিতেন। একদিন মনে আছে মিস্ সেন তাঁহারই অনুরোধে "কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কাঁদায়ে, হৃদয়-নিভৃতে নাথ যাহা আছে লুকায়ে" এই ব্রহ্মসঙ্গীতটির অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "এ ত পরমহংসের কথা—প্রাণ খুলে এ কথা কে বলতে পারে?" একদিন তিনি পূজায় বসিয়াছিলেন, মিস্ সেনকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি পূজা সারিয়া আসিতেই মিস্ সেন একটু বিরক্তির ভাবে বলিলেন, "মহারাণী, বড় সময় নষ্ট হ'ল—আপনি এতক্ষণ ধরে কি পূজা করছিলেন? এত পূজা কি করেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরকে বলি—জন্ম যদি দাও ত আর রাজরাণী ক'রো না।" এ সব কথা দিনের পর দিন যামিনী আমায় বলিতেন।

আর, মন্ত্রী মহারাজ চন্দ্র শামসেরের মহিষীর প্রতিও কি তাঁর অগাধ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। এই মহারাণী তিন বৎসর যক্ষ্মা রোগে কষ্ট পাইয়া মারা যান; মিস্ সেন এই তিন বৎসর প্রতিদিন তাঁর কত যে যত্ন, কত যে সেবা করিতেন তাহা আর বলিবার নয়। এই রাজদম্পতির আশ্চর্য্য ভালবাসার কথা মিস্ সেন কত যে বলিতেন। স্বামী রাত্রে বার বার আসিয়া পত্নী কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেন—আর পত্নীর জন্য কি তাঁহার ব্যাকুলতা! পত্নী তাই পীড়ার শেষ বৎসরে শীঘ্র মরিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। মিস্ সেনকে বলিলেন, "আমাকে শীঘ্র মরতে দিন—আমি মহারাজের কষ্ট আর দেখ্‌তে পারি না।" আমি তখন নেপালে, যখন এই সাধ্বী সতীর মৃত্যু হইল। বাঘমতী নদীর তীরে যখন তাঁর মৃত্যুর পর থাকিয়া থাকিয়া কামান ধ্বনিত হইতে লাগিল, মিস্ সেন নিজের ঘরে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য আজও চক্ষে ভাসিতেছে। বলিলেন, "এঁর জন্যই এ রাজ্যে বাস করতাম, আর নয়—এবার আমি যাবই।" বাস্তবিক মিস্ সেনের আত্মহারা সেবার কথা বলিতে পারি না—তিনি ডাক্তার ছিলেন না, সেবিকা ছিলেন।

মিস্ সেনের দিবানিশি যে দুরন্ত শ্রম দেখিয়াছি, এত শ্রম করিতে কখনও কোন নারীকে দেখি নাই। ডাক্তারি করিয়া যেটুকু সময় পাইতেন, ঘরের কাজ করিতে—এমন কি রন্ধন করিতে বসিতেন। তাঁহার ক্ষেত-খামার—গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি, ধান-চাল শাক-সব্‌জি নিয়ে প্রকাণ্ড সংসার। ভোক্তার অভাব ছিল না;—কেবল তদ্‌বির, গৃহিণীপনা, আর বিতরণ। তাঁহার হস্তের রান্নাও কি এত সুন্দর! এক এক দিন আমি অবাক্ হইয়া বলিতাম, "কবে এত রাঁধতে শিখলে, কোনদিন ত কিছু জানতে না?" বলিতেন এ সব না কি শিখতে হয়? ৬ মাসে ওস্তাদ রাঁধুনি হওয়া যায়। আমার রাঁধ্‌তে ভাল লাগে।" অবসর-সময়ে নিত্য কত সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমাদের পাঠাইতেন। যামিনীর যত্নে আমরা নেপালে যে সকল রাজভোগ্য বস্তু, অপ্রাপ্য ভোগ্য ভোগ করিয়াছি ঐ অল্পদিনে এমন কাহারও ভাগ্যে হয় না।

যামিনীর কথা বলিতে আরম্ভ করিলে শেষ করিতে পারিব না। আর দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিবৃত্ত হইব। আমরা নেপালে থাকিতেই তাঁহার বড় ভাই সেখানে মারা যান—তখন তাঁহার মা-ও সেখানে ছিলেন। সেই ভাইটিকে যামিনী কি প্রাণ দিয়া সেবা করিতেন! যখন ঔষধ-পথ্য খাইতে চাহিতেন না,—কি মিষ্ট করিয়া বলিতেন, "লক্ষ্মী ভাই খাও, ভাল হবে।" ভাইকে আর কেহ কিছু জোর করিয়া অনুরোধে করাইতে পারিত না; যামিনী বলিলেই অমনি শিশুর মত হাঁ করিতেন। ভাইয়ের সেবায় শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না—বাহিরে দুরন্ত শ্রম, ঘরে অনিদ্রায় রাত্রি-যাপন। সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা! সেই ভাই তাঁহার কোলেই গেলেন। সে শোক অবর্ণনীয়। যামিনীর মুখে সেদিন প্রথম অনুযোগ শুনিলাম, "ভগবান, আমার ভাইটির প্রাণ দান করবে ব'লে এত কষ্ট করলাম এই তোমার বিচার হ'ল!" অমনি তাঁহার ভক্তিমতী জননী বলিয়া উঠিলেন, "যামিনী, ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যা করেছেন ভালর জন্যই। প্রাণ ফেটে গেলেও—আমাদের শোকের সমস্তই মঙ্গলময় বল্‌তে হবে।" নেপালে ব্রাহ্মরা খৃষ্টানদের ন্যায় অস্পৃশ্য। পুত্রের মৃত দেহ কোলে করিয়া সেই গভীর শোকের সময় জননীর দারুণ অবস্থা মনে হইল—যামিনী বলিলেন, "মা, তোমায় আমায় নিয়ে যেতে পারব না?" অর্থাৎ স্পর্শ ত কেহ করিবে না। যামিনীর প্রতি মহারাজ চন্দ্র শামসেরের কি আশ্চর্য্য শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কত সহানুভূতি জানাইয়া উপযুক্ত সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দেখিয়াছিলাম সেই দুর্দ্দিনে জননীর বিশ্বাস, ভক্তি, আর কন্যার অপরাজিত সেবা ও ভাই'এর প্রতি ভালবাসা! সেই ভাইয়ের বিধবা পত্নীর প্রতি যামিনীর কি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল! যতগুলি ভাই

ছিল প্রত্যেকটিকে পিতামাতা যে স্নেহে সন্তান পালন করেন সেই গভীর স্নেহে প্রত্যেকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন মাতৃপিতৃ-ভক্তি—এমন স্বজনবাৎসল্য আর দেখিব না।

আর একটি ঘটনা।—যামিনী একদিন তিন মাসের একটি ভুটিয়া বালিকা ক্রয় করিলেন। মিস্ সেন সেদিন প্রাতঃকাল হইতে বাহিরের কাজে ঘুরিতেছেন। অতি দরিদ্র, ছিন্নবস্ত্রমাত্র পরিহিত পাহাড়ী দম্পতি তিন মাসের একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশু-বালিকা মিস্ সেনকে বিক্রয় করিবার জন্য উপস্থিত। মিস্ সেন একটি শিশু-বালিকা প্রতিপালন করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেই কথা লোকমুখে শুনিয়া এই দরিদ্র দম্পতি পেটের দায়ে তিন মাসের শিশু বিক্রয় করিতে আসিল। মিস্ সেন গৃহে নাই—আমার নিতান্ত আপত্তি, সেই নোংরা লোকেদের অতি নোংরা শিশুটিকে যামিনী গ্রহণ করেন। তাহাদের বলিলাম, "তোমরা আজ যাও, সন্ধ্যা হ'তে চল্ল, আজ আর কিছু হবে না।" তারা নড়ে না। দারুণ অশান্তি! এমন সময় যামিনী উপস্থিত। সেই হৃষ্টপুষ্ট মাতৃদুগ্ধপুষ্ট তিন মাসের ভুটিয়া শিশুটি যামিনীর মন কাড়িয়া লইল। তিনি তখনই দরদস্তুর করিয়া টাকা দিয়া শিশুটিকে কিনিলেন। কেনা হইলে শিশুটিকে যামিনীর কোলে দিয়া মা মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তার স্বামী সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তারা বিদায় হইল। তখন রাত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে যামিনী নিজহস্তে তাহার মাথায় ক্ষুর দিলেন। পরে সাবান ও গরম জলে ভাল করিয়া শিশুটিকে স্নান করাইলেন—সেই তার জীবনে প্রথম স্নান। তার পর পরান্ কি? আমার নিকট চাহিয়া পাঠাইলেন, "যদি শিশুর মত জামা কাপড় থাকে দাও।" আমি অবাক্! সত্য সত্যই এই শিশুটি যামিনী মানুষ করিবে? বলিলাম, "ভাই, কিন্‌লে ত মা'র দুধখেকো শিশু, কি ক'রে মানুষ করবে?" কি কষ্ট এই শিশুর জন্য তিনি করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনীয় নয়। কত রাত্রি তাহাকে কোলে করিয়া কাটাইয়াছেন। মায়ের ক্লান্তি আসে, যামিনীর ক্লান্তি বা বিরক্তি ছিল না। আমার মনে হইত অপাত্রে ন্যস্ত এত আদরযত্ন! কাঠকুড়ুনির মেয়ে কখনও ভাল হয়? এ মন্তব্য শুনিতে যামিনী ভালবাসিতেন না। শুনিলেই আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন। মহারাণী পর্য্যন্ত হাসিয়া বলিতেন, "মিস্ সেন, যতই কর, ওর মগজ তোমার মত হবে না।" মিস্ সেন বলিতেন, "সুশিক্ষায় কি হয় এবার পরীক্ষা হবে।" এই শিশুটি বড় হইল—একেবারে স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ হইল। যামিনীর ইংলণ্ড বাসের সময় টাইফয়েড জ্বরে ইহার মৃত্যু হয়। সন্তানের জন্য জননীর শোক কি তাহার অভিজ্ঞতা যামিনীর হইল। সেই প্রথম শিশুপালন।

তখন হইতে আরও কত অনাথা বালিকাকে যামিনী জননীর ন্যায় পালন করিয়াছেন। আমার স্বামী মহাশয় বলিতেন, "মিস্ সেনের কি বাৎসল্যের ক্ষুধা,—কি মা হবার যোগ্যতাও! কেবল পুরুষ জাতির কারও প্রতিই প্রেমদৃষ্টি পড়্‌ল না—উনি মা হ'তে প্রস্তুত, কিন্তু কার পত্নী হ'তে প্রস্তুত নন।" আমায় এই কথা বলিতেন, কিন্তু মিস্ সেনকে দেখিলে সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলিতেন। কি গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার মিস্ সেনের প্রতি ছিল।

মিস্ সেনকে দেখিলেই লোকের শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইত। রাজ্যে তাঁহার যে প্রভাব ছিল সে কেবল তাঁহারই চরিত্রের বলে। আমি দেখিয়াছি অর্থ তিনি প্রচুর উপার্জ্জন করিয়াছেন;—আশ্চর্য্য! অর্থ লইয়া নাড়া চাড়া করিতে কখনও দেখি নাই, এমন কি অর্থ স্পর্শ করিতে দেখি নাই। তাঁহার সঙ্গিনী মিসেস্ গুপ্তা বলিতেন, "আজ অমুক অমুক জায়গা হ'তে এত টাকা এসেছে—" অমনি বলিতেন, "কলকাতায় পাঠিয়ে দিন।" মিসেস গুপ্তা টাকার ব্যবস্থা করিতেন। যামিনীর আহারে পরিচ্ছদে বিলাসিতা ছিল না। প্রতিদিন প্রাতে ৫টায় উঠিয়া স্নান করিয়া আগাগোড়া ধোপার বাড়ীর নির্ম্মল শুভ্র কাপড় চোপড় পরিয়া শেষ করিতেন। ৭টার মধ্যে ডাল ভাত আলুসিদ্ধ ডিমসিদ্ধ খাইয়া প্রস্তুত। তাঁহার জন্য মুরগির ব্যবস্থা করিবার যো ছিল না—"আমার একার জন্য একটি প্রাণী, তা হবে না।"—ঘোরতর প্রতিবাদ! তাঁহার জন্য কোন বিশেষ ভাল ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, এই কথাই সর্ব্বদা বলিতেন। রেশমী শাড়ী কখনও পরিতেন না—কোন অলঙ্কার কখনও পরিতেন না—দুইখানি হাত খালি, কানে শুধু দুটি বহুমূল্য হীরার ড্রপ ছিল। আমি ঠাট্টা করিয়া বলিতাম, "কোথাও কিছু নাই—কানে বহুমূল্য হীরা।" বলিতেন, "মহারাণী নিজে আমায় পরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আমার স্মরণার্থ সর্ব্বদা পরবেন খুলবেন না,' তাই খুলতে পারি না।" অলঙ্কার বসনেভূষণে তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার প্রতিদিনের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রবসনা মূর্ত্তি দেখিয়া মহারাণীরা বলিতেন, "কি সুকুমারী আপনি! আমাদের দেখ্‌তে এত ভাল লাগে—প্রতিদিন সব পরিষ্কার নির্ম্মল কাপড়, এমন পবিত্র লাগে। কেন ভাল কাপড় গহনা পরেন না?" বলিলে কেবল হাসিতেন, কোন উত্তর দিতেন না। বহুমূল্য উপহারের ত অন্ত ছিল না—কিন্তু নিজ ভোগের জন্য কিছুই নয়। যামিনী যেমন স্নেহময়ী, তেমনি বুদ্ধিমতী, তেমনি তেজস্বিনী ছিলেন। চক্রান্তময় নেপাল রাজ্যে সকল বাড়ীতে তাঁহার গতিবিধি ও আদর ছিল—কিন্তু কাহারও নিকট ধরা দিতেন না,—তাঁহাদের সকল কথা শুনিতেন—একটি মন্তব্যও মুখ হইতে বাহির হইত না। তাঁহারা বলিতেন, "মিস্ সেন সব শোনেন, কিন্তু বোবা।" তিনি শুনিয়া যাইতেন—কোনপ্রকারে মনের ভাব জানিতে দিতেন না। আমি বিস্মিত হইয়া কত সময় ভাবিতাম, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া এত দূরদেশে এমন করিয়া কোন্ মেয়ে থাকিতে পারে? প্রচুর উপার্জ্জন করিয়াছেন,—কিন্তু ধনের মায়া কোনদিন ছিল না, ধন তাঁহার ভোগের জন্য নয়—পৃথিবীর কোন ভোগসুখে তাঁহার স্পৃহা ছিল না।

এমন নিষ্কাম পরসেবা—এমন নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি! অনাবিল দেহমন লইয়া সেই শুভ্র ফুলটি—বিধাতার হস্তরচিত সেই অপার্থিব শোভারাশি আজ অকস্মাৎ যবনিকা পার হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। এমন একটি অপূর্ব্ব নারীচরিত্র আমি কখনও দেখি নাই। অনন্যসাধারণ আশ্চর্য্য চরিত্র।…

(বঙ্গলক্ষ্মী—ফাল্গুন, ১৩৩৮)

আচার্য্য শীলের প্রশ্নোত্তর

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি

বিগত ১৩৩৭ সালের ১৫ই আশ্বিন বিজয়াদশমী দিবসে আচার্য্যদেব স্যর্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের দর্শন-লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিনি তখন পীড়িত হইয়া ভবানীপুরে তাঁহার কন্যার গৃহে বাস করিতেছিলেন। অসুস্থতাবশতঃ দীর্ঘকাল বাক্যালাপ করা চিকিৎসকদের নিষেধ ছিল। মাত্র আধঘণ্টাখানেক তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইয়াছিল।

বাংলার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শিক্ষিত-সমাজে পূজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তাঁহার কতিপয় ছাত্র এবং বন্ধুবান্ধব ভিন্ন অন্য অনেকেরই হয়ত নাই। যুগপৎ এত বহু বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য একজনের থাকিতে পারে ইহা ব্রজেন্দ্রনাথকে না জানিলে বিশ্বাস করাই দুষ্কর হইত। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের আভাস তাহার "Positive Sciences of the Hindus" গ্রন্থে কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি এবং বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের সাহিত্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুবিধ ভাষা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, গণিত, অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার যে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা আছে তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ কোন গ্রন্থ তাঁহার নাই। জাগতিক দৃষ্টিতে ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে এক মহা পরিতাপের বিষয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের চিন্তা ও গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হইলে ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ হইত, জগতের দর্শন-ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব তেমনই বৃদ্ধি পাইত। সুতরাং তাঁহার অসামান্য দান হইতে বঞ্চিত হওয়া ভারতের পক্ষে একটা মহা দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে হয়।

কি কারণে তিনি দর্শন সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিলেন না, ইহা জানার ঔৎসুক্য অনেকেরই হয়। আমার সঙ্গে প্রধানতঃ এই বিষয়ে ও অন্য কয়েকটি বিষয়ের আলাপ হইয়াছিল। বাংলার এই প্রবীণ মনীষীর মতামত জানার আগ্রহ অনেকেরই আছে। সেই জন্য এই কথোপকথনটির ভাবার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা উচিত মনে হইল।

কথোপকথনকালে আমার সঙ্গে আচার্য্যদেবের অন্যতম ছাত্র ও প্রিয় শিষ্য বোম্বাই প্রদেশস্থ তত্ত্বজ্ঞান-মন্দিরের (Institute of Philosophy-র) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস মহাশয়ও ছিলেন। তিন জনের মধ্যেই কথাবার্ত্তা হয়। আমরা মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্ন করি এবং তদুত্তরে আচার্য্যদেব অনেক কথা বলেন। অনেক বিষয়ে ঔৎসুক্য থাকিয়া গেলেও তাঁহার অসুস্থতার জন্য অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে হইল না।

প্রথমতঃ কুশল মঙ্গল ও ব্যক্তিগত প্রশ্নোত্তরের পর আচার্য্যদেব দর্শন ও রাষ্ট্রনীতির কথা উত্থাপন করিয়া বলেন যে দর্শনের ক্ষেত্র অতিব্যাপক, রাষ্ট্রনীতিও দর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। রাষ্ট্রনীতি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, সুতরাং উহার দৃষ্টিও ক্ষুদ্র, সীমানিবদ্ধ। দর্শনের দৃষ্টি অখণ্ড, বিষয়-বিশেষের সীমায় উহা আবদ্ধ নয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্বাধীনতার আবেগে মানুষ ভুলভ্রান্তি করিতে পারে। তবে স্বাধীনভাবে ভুল করার একটা মূল্য আছে। যেহেতু তাহাতে মানুষ স্বাধীনভাবে ভুল-সংশোধন করিবার শক্তিও অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যদিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তথাপি ইহা জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। ইহা চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার পক্ষে সহায়ক একটা উপায় মাত্র। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন-

হইয়া পরে কি করিব, কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিব ইহা ভুলিলে চলিবে না। ইহা ভুলিয়া গেলে স্বাধীনতা লাভ করিতে গিয়া মানুষ এমন উপায় অবলম্বন করে যাহাতে স্বাধীনতা তাহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্যে পৌছিবার পক্ষে সহায়ক না হইয়া বিঘ্নকারকই হইয়া উঠে। কিন্তু স্বাধীনতাকে জীবনের উদ্দেশ্য না ভাবিয়া একটা উপায় বলিয়া বিবেচনা করিলে এই অনর্থ ঘটে না। দর্শনের দৃষ্টি বা সমগ্রের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে দেখিলে ইহাদের এই যথার্থ স্থান সহজেই উপলব্ধ হয়।

ইহার পর আমি বলিলাম, "আপনার অসীম পাণ্ডিত্য ও গবেষণার কোনই ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেন না। আপনার দর্শন-সাধনার কোনই চিহ্ন রহিল না, ইহা ভারতের পক্ষে মহা দুর্ভাগ্য।"

উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন, "দর্শন সম্বন্ধে আমার লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দুইবার দুটি দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহা লেখা হইল না। জার্ম্মান দার্শনিক 'ভুণ্ড্' (Wundt) পর্য্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের যে পরিণতি ঘটিয়াছিল তাহা এবং আধুনিক বিজ্ঞানসমূহে যে-সব সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সমস্ত বিবেচনা করিয়া ও সমন্বয় করিয়া মনে মনে নিজে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম এবং তদনুযায়ী একটা দর্শনের রূপ আমার মনে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহা লিখিয়া ফেলিব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় আইন্‌ষ্টাইনের নূতন মতবাদ প্রচারিত হইল। এই নূতন আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের পুরাতন মতসকলও পরিবর্ত্তিত হইল। নূতন বিজ্ঞানের সহিত আমার সিদ্ধান্তের অসামঞ্জস্য ঘটিল। ফলে নিজ সিদ্ধান্তে অনাস্থা আসিল। যে মতের প্রতি আমার আস্থা নাই তাহা প্রচার করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া আমার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম না। এই আমার প্রথম দুর্বিপাক। ইহার পরে নূতন বিজ্ঞানের সমন্বয় করিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম। আইন্‌ষ্টাইন্ চার Dimensions-এর মত প্রচার করিয়াছেন। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, এমন সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে যাহাকে চার Dimensions দ্বারা বুঝান যায় না, পাঁচ Dimensions-এর প্রয়োজন হয়। পরে আরও সূক্ষ্ম কতকগুলি তত্ত্ব দেখিয়া ছয় Dimensions-এর প্রয়োজন বোধ হইল। কিন্তু আরও ভাবিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, যে বস্তুতঃ চার, পাঁচ বা ছয়-এর ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট Dimensions ঠিক নয়। অনির্দ্দিষ্ট বা 'n' সংখ্যক Dimensions-ই সত্য। মানুষের অভিজ্ঞতার এক-একটা বিশেষ স্তরের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এক-একটা বিশেষ-সংখ্যক Dimension-এর প্রয়োজন হয়। ছয়-এর উর্দ্ধে কোন Dimension-এর প্রয়োজন হয় এমন কোন তত্ত্বের সন্ধান অদ্যাপি পাই নাই। তবে বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার রাজ্যে ইহার চেয়ে বেশী Dimensions-এর প্রয়োজন না হইলেও ইহা হইতে উচ্চ কোন Dimension-এর কোন সময় প্রয়োজন হইবে না, ইহা ভাবার কারণ নাই। Dimensio-এর সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

তিনি পরে বলিলেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে মহীশূরে কোনও বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতিরূপে আমি এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছিলাম। এই সম্বন্ধে পুস্তকাকারে আমার মত লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল। এমন সময় হঠাৎ আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। ফলে ইহাও লিখা হইল না। এই আমার দ্বিতীয় দুর্বিপাক। এইরূপে দুই বার বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে আমার লেখা আর হইল না।"

আমরা ইহা শুনিয়া দুঃখিত হওয়াতে তিনি বলিলেন, "ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। আমার ভিতরে যে-সব চিন্তা প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা এই যুগেরই ভাব, এবং ইহা ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, ইহা 'ভূমার'ই ভাব; ব্যক্তি-বিশেষের ভিতর দিয়া ইহা প্রকাশিত হয় মাত্র। সুতরাং যাহা আমার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্য আধারে প্রকাশিত হইয়া যাইবে। সম্প্রতি শুনিলাম একজন বৈজ্ঞানিক পাঁচ Dimensions-এর কথা বলিতেছেন।"

তখন আমি বলিলাম—"আপনার কথা ঠিক হইলেও ইহা ত অস্বীকার করা যায় না যে, পাত্রভেদে ভূমার অভিব্যক্তির তারতম্য ঘটা সম্ভব। আপনার মত

আধারে ভূমার ভাব যত পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইত তত পূর্ণভাবে অন্যের ভিতরে প্রকাশিত না হওয়াই সম্ভব।"

তিনি উত্তরে বলিলেন, "তা সত্য বটে। তবে আমরা ভূমার বুদ্বুদ মাত্র। একটু বড় বুদ্বুদ, কেউ একটু ছোট। এই যা পার্থক্য।"

আমি বলিলাম, "আজকাল আমাদের দেশে ও অন্যত্র জ্ঞানের এক-একটি বিশেষ বিশেষ শাখায় অনেক বিশেষজ্ঞ হইতেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের সংবাদ মাত্র রাখেন। সেজন্য বিভিন্ন বিভাগে আবিষ্কৃত সকল সত্যের সমন্বয় করিয়া সমগ্র সত্যরাজ্য সম্বন্ধে কোন দর্শন রচনা করা এই খণ্ডদৃষ্টিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। আপনার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে অধিকারী পণ্ডিত ভিন্ন কেহই যে এই কাজ করিতে পারিবে না! জগতে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বমুখী পাণ্ডিত্য যে ক্রমেই অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিতেছে! এই জন্যই আমাদের নৈরাশ্য হইতেছে; আপনি যাহা করিতে পারিতেন, তাহা অন্য কারও দ্বারা হয়ত সম্ভবপর হইবে না।"

ইহার উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন, "বর্ত্তমান যুগে বিশেষজ্ঞদেরই প্রাধান্য বাড়িতেছে ঠিক। কিন্তু ভারতবর্ষ কোন দিনই বিশেষজ্ঞের খণ্ডদৃষ্টিতে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিবে না। ভারতের দৃষ্টি সর্ব্বদাই অখণ্ড ও ব্যাপক (synthetic) ছিল; খণ্ডদৃষ্টিতে ভারত কোন দিনই সন্তুষ্ট থাকে নাই। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝিতে পারিবে, বর্ত্তমানেও ভারত বিজ্ঞানসাধনায় খণ্ড হইতে অখণ্ডের দিকেই আকৃষ্ট হইতেছে। জগদীশচন্দ্র প্রথমতঃ পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে গবেষণা আরম্ভ করেন। এখন তিনি এমন স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন ও এমন সত্য আবিষ্কার করিতেছেন যে, উহাতে পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিজ্ঞানের মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। অধ্যাপক রামনও প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য লইয়া আবিষ্কার আরম্ভ করেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি যে-সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে একটা ব্যাপক দৃষ্টি আছে। ভারতীয় সভ্যতার এই বিশেষত্ব কোন দিনই খণ্ড দৃষ্টির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। অখণ্ড-দৃষ্টিসম্পন্ন দর্শন রচনাও অসম্ভব হইবে না।"

আমি বলিলাম, "তাহা সত্য হইলেও কবে ইহা হইবে তাহা অনিশ্চিত।"

উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন, "বাল্যকাল হইতেই আমার একটা ধারণা ছিল, জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই আমার চর্চ্চার বিষয় (every knowledge is my province)। সেই জন্য জীবনে সকল বিষয়ই আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে; অনেক বিষয়েরই চর্চ্চা করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। জ্ঞানসেবার যে সুযোগ ও অধিকার পাইয়াছিলাম তাহাতেই আমি ধন্য ও পরিতৃপ্ত। ইহার অন্য কোন ফল লাভ হইল না বলিয়া আমার কোনই দুঃখ নাই। সেবা নিষ্ফল হইবে না।"

ইত্যবসরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আত্মার অমরত্ব এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন?"

উত্তরে তিনি বলিলেন, "জন্মান্তরবাদ একটা সম্ভবপর সিদ্ধান্ত (It is a possible hypothesis)। খৃষ্টানরা মনে করেন, এক জীবনের পরীক্ষার উপরই জীব হয় অনন্ত নরকে, নয় অনন্ত স্বর্গে গমন করে। এই মত অপেক্ষা জন্মান্তরবাদ অধিক যুক্তিযুক্ত। আত্মা আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে কি-না এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা না থাকিলেও আত্মার যে ধ্বংস নাই ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। এই পৃথিবীতে বা অন্য গ্রহে, মানব রূপে বা অন্যরূপে আত্মার অস্তিত্ব যে থাকিবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ আত্মা শাশ্বত, অনন্ত ভূমারই প্রকাশ মাত্র। এই শাশ্বত পদার্থের সাক্ষাৎ অনুভূতি আজকাল করিতেছি। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভূমার অনুভূতি হইতেছে। তাহাতেই যেন আত্মা মগ্ন হইয়া আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই অনন্ত শাশ্বত পদার্থের অনুভূতি আপনার কি ভাবে হইতেছে? অদ্বৈতিগণ বলেন 'সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম।' আপনার কি ঐ প্রকার বোধ হইতেছে?"

আচার্য্যদেব বলিলেন, "অদ্বৈতিগণ ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় গতিহীন (static) বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমি

যে-ভূমার অপরোক্ষানুভূতি করিতেছি তাহা তেমন নয়; তাহা গতিশীল, ক্রিয়াশীল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে এই অনন্ত শাশ্বত গতিশীল পদার্থের অনুভূতি আপনি কিসের ভিতর দিয়া পাইতেছেন? সাক্ষিচৈতন্যের ভিতর দিয়া ইহার অনুভূতি হয় কি? না বার্গসঁর মত জীবন বা প্রাণের অনুভূতির ভিতর দিয়া ইহার প্রকাশ হয়?"

অধ্যাপক দাশ মহাশয় বলিলেন, "বোধ হয় প্রাণানুভূতির ভিতর দিয়া।"

উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন, "এই নিত্যপদার্থের অনুভূতি কিরূপ ও কি ভাবে ইহা হয় এই ভাব কিছুই আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতার ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। সাক্ষাৎ অনুভূতি ভিন্ন ইহা বুঝা কঠিন। ভূমার এই অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি এখন প্রতি-মুহূর্ত্তে হইতেছে। ইহাতে আত্মহারা হইয়া যাইতেছি। এই অনুভূতির মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না। পূর্ব্বে আমার বহু দিন বিশ্বাস ছিল, ভূমার মধ্যে এই জাগতিক জীবনের সকল আনন্দ ও সকল অনুভূতি একটা স্থান পাইবে। এই সবও কোন প্রকারে রক্ষিত হইবে। কিন্তু এখন ভূমার যে অনুভূতি হইতেছে তাহাতে এই সবের কোনই অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না। ('এই সমস্তই যেন একেবারে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে')। এই অনুভূতির এমন জোর আছে যে, উহার সম্বন্ধে কোন সংশয় মনে আসিতেই পারে না। এই অনুভূতির সামনে সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতা যেন দাঁড়াইতেই পারে না; এই সব অতি তুচ্ছ মনে হয়। দৈনন্দিন জগতের সহিত এই অনুভূতির জগতের কোনই সম্পর্ক খুঁজিয়া পাই না। এই দুইটি জগৎ যেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন (discontinuous)। দৈনন্দিন জগতটা একেবারে মিথ্যা এই কথা বলিতে চাই না। এক হিসাবে ইহাও অনন্ত। কিন্তু বর্ত্তমানে অনুভূতির মধ্যে যে অনন্ত, শাশ্বত সত্যের সাক্ষাৎকার পাইতেছি তাহার তুলনায় ইহা অতি নিম্নস্তরের সত্য। এই দুইটির মধ্যে কোনই যোগসূত্র পাইতেছি না। হয়ত ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে এবং ভূমাতে বিলীন হইয়া গেলে পরে হয়ত কখনও এই সম্বন্ধের উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার কোনই উপলব্ধি হইতেছে না। বর্ত্তমানে সর্ব্বদা যে-সত্যের অনুভূতি করিতেছি, বহুদিন পূর্ব্বে জীবনে আর একবারমাত্র এই অনুভূতি হইয়াছিল।"

অসুস্থ শরীরে তাঁহার পক্ষে অধিকক্ষণ কথা বলা ভাল নহে মনে করিয়া আমরা বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেওয়ালের এক কোণে আচার্য্যদেবের একখানা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ছিল। উহা দেখিয়া আমি বলিলাম, 'আপনার এ ছবিখানা বড় সুন্দর। ইহা কি—'

শুনিবামাত্র তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "এই নশ্বর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। এই নশ্বর পদার্থের প্রতি কোন আসক্তি থাকা উচিত নয়। হিন্দুদের মধ্যে একদিকে যেমন পৌত্তলিকতা ছিল, অন্যদিকে তাহার বিপরীত একটা উচ্চ ভাবও ছিল। তাঁহারা ইতিহাস লিখিয়া বা প্রতিকৃতি গড়িয়া নশ্বর দেহ ও জীবনকে ধরিয়া রাখার বৃথা চেষ্টা করিতেন না।"

আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু তিনি করজোড়ে প্রণাম করিতে বাধা দিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি এ কি করিতেছেন?! আপনি যে আমাদের গুরু।"

উত্তরে তিনি সসম্ভ্রমে জোরের সহিত বলিলেন, "মানুষ কখনও গুরু হ'তে পারে না।"

আমরা চলিয়া আসিলাম। তাঁহার সকল কথা হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু হৃদয়ে এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এক দিকে হৃদয়ের চিরপরিচিত, চিরপূজিত, মহাপণ্ডিত ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অন্যদিকে সকল পাণ্ডিত্যবিস্মৃত, সংসারবিরক্ত অনির্ব্বচনীয় ভূমানন্দে-মগ্ন শিশুভাবাপন্ন মহাপুরুষ। প্রথম রূপটিই এতদিন আদর্শ ও আরাধ্য দেবতা বলিয়া বুদ্ধির নিকট পূজা পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত জ্যোতির্ময় শিশুমূর্ত্তির আবির্ভাবে হৃদয়ে উভয়ের মধ্যে এক সংগ্রামের সৃষ্টি হইল; এক সংশয় জাগিল—ইহাদের মধ্যে কে সত্য? কে বড়? কে জীবনের আদর্শ?



প্রণয়পত্রিকা

প্রাচীন রাজপুত চিত্র

প্রবাসী প্রেস

ছবি

শ্রীসুবোধ বসু

সারাটা মাঠ রোদে ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে, যেন আগুনের অদৃশ্য লীলা, যেন সাহারার হাওয়া উড়িয়া আসিয়াছে। একটা পাখীও উড়িতেছে না, শুধু দু-একটা গরু ক্ষুধার জ্বালায় ছায়ার বাহিরে গিয়া ঘাস খাইতেছে। গাছের মাথায় তীব্র রোদ ঝিকমিক করিতেছে। হাওয়া আছে। কিন্তু গরম। তবু তার ভিতর বসন্তের মদিরতার আমেজ পাওয়া যায়।

একটা পলাশ গাছে ফুল ফুটিয়াছে, নীচে পাপড়ি ছড়ান, চমৎকার।

ও-দিকের ঘাসে কি-সব বুনো ফুল ফুটিয়াছিল। কিন্তু খর-তাপে তারা ম্লান—যে রূপসীরা কঠোরের কাছে প্রেম নিবেদন করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাদের মত ম্লান।

দূরের রাস্তায় ট্রাম, বাস, মটর, রিক্স। তাদের শব্দ কানে আসে না। শুধু ছবির মত তাদের দেখা যাইতেছে।

রাঙা সুরকির একটা মেঠো পথ, সিঁথির সিঁদুরের মত জ্বল-জ্বল করিতেছে। আরও দূরে বড় একটা অশথ্‌ গাছ মস্ত ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া। হাল্কা পাতাগুলি একটু হাওয়াতেই ঝিলিমিলি করে। একটা ঘুঘু ডাকিতেছে। তা ছাড়া সব একেবারে চুপ।

নির্জ্জন ময়দানে এতক্ষণ পরে একটা লোক দেখা গেল। বহুদূরে,—চেনা যায় না। লোকটা আগাইয়া আসিতেছে। আরও একটু পরে—বেশভূষা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

একজন বাঙালী যুবক। ছেঁড়া একটা পাঞ্জাবী গায়। তার বেতাম খোলা। অদ্ভুত ছাঁদে কাপড় পরা। সবই প্রায় ময়লা। পায়ে বিশ্রী রঙের একটা কাবুলী জুতা। ওর লম্বা রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলে ওর ঢিলা আধ-ময়লা কিছু-ছেঁড়া কাপড়জামায় যেমন একটা অযত্নের হয়ত অসৌন্দর্য্যের ভাব, ওর মুখখানা কিন্তু ঠিক তার সব ত্রুটি পোষাইয়া লইয়াছে। যেন প্রাচ্য প্রথায় আঁকা এক দেবতার মুখ। কেমন বিশেষ যে ধরণটা—এমন সচরাচর দেখা যায় না। তার ভিতর সৌন্দর্য্যের চাইতে বেশী আছে প্রাণ—নির্দ্দিষ্টের চাইতে বেশী আছে অনির্দ্দিষ্ট। হঠাৎ চমক লাগায়, কিন্তু যেন ঠিক বোঝা যায় না।

রোদে পুড়িয়া শেষে সে অশথ্‌ গাছের তলায় পৌছিল। কপাল হইতে ঘাম ঝাড়িয়া ফেলিল। চুলগুলিতে একবার আঙুল চালাইল, তারপর অশথ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। একটু শিস্‌ দিল। পকেট হইতে ক'টা পলাশ ফুল বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল ঘাসের উপর। একটা ঢিল ছুঁড়িয়া অদূরের পুকুরটাতে একটা শব্দ তুলিল। একটু চোখ বুজিয়াছিল। কিন্তু ক্ষণেকের জন্য। তারপর স্বপ্ন-মাখা চমৎকার দুটি চোখ মেলিয়া বাহিরে তাকাইল। দূরে দেখা যায় মহারাণীর স্মৃতি-সৌধ,—দুপুরের চোখে একটা আবছা স্বপ্নের মত।

সে কি যেন ভাবিতেছে। জামার হাতায় মুখটা মুছিয়া লইয়া তারপর পকেট হইতে এক মুঠা চিনা-বাদাম বাহির করিয়া খাইতে লাগিল। চমৎকার হাওয়া, অশথ-শাখায় ঝির-ঝির শব্দ। পুকুরের স্ফটিক জলে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়া কাঁপিতেছে। সাদা রেলিঙের উপর একটা লাল-সবুজ নানা-রঙা পাখী। নাম-না-জানা গান না-গাওয়া। শিশু-মঞ্জুরীর একটা গন্ধ। রাস্তায় একটা বাস্‌ যাইতেছে। ও-দিকের মাঠে একটা ঘূর্ণী উঠিয়াছে। শুক্‌নো পাতা, ধূলা-বালি একটু ঘুরিয়া নাচিয়া গেল। ক্বচিৎ একটা হাম্বা রব। আবার একটু হাওয়া। আবার ঘন-সুগন্ধ।

অদ্ভুত এই পান্থটি। ঠিক পাগল মনে হয় না, কিন্তু হয়ত একটু সাদৃশ্য ধরা যায়। হাওয়াতে আঙুল দিয়া যেন ছবি আঁকিতেছে। মুখখানার দিকে চাহিলে

ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়,—যদিও অযত্নের চিহ্ন তাতে স্পষ্ট হইয়া আছে। চুল আসিয়া পড়িয়া কপালের অর্দ্ধেকটা ঢাকিয়াছে। জুল্‌পীটা বড়। রাস্তার ধূলাও হয়ত কিছু আছে। তা ছাড়া রৌদ্র-দগ্ধ। কিন্তু তবু অপূর্ব্ব।

একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া দেখিল বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। পুকুরটার বাঁধানো সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়া একটুক্ষণ অমনি চাহিয়া বসিয়া রহিল। পকেট হইতে আরও কতগুলি পলাশ বাহির করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। তারপর মুখ হাত পা ধুইয়া উঠিয়া গেল।

…একটা পাঞ্জাবীদের রেস্তরাঁ। ঠিক নোঙ্‌রা না হইলেও পরিপাটি নয়। চেয়ার নাই,—বেঞ্চি। টেবিলের কভার নাই। ঘরও অপরিসর। উল্টা দিকের এক সাহেবী হোটেল এর দৈন্যটাকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

পান্থ আসিয়া তার সমুখে দাঁড়াইল। পকেটে একবার হাত দিয়া হয়ত পয়সা আছে কি না দেখিল। তারপর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

পাঞ্জাবী হোটেলের মালিক হয়ত তাকে চেনে। বাবুজী বলিয়া আদর করিয়া বসাইল।

চা চাই, আর—হ্যাঁ, পুরীও।

সাহেবী হোটেলের অর্‌কেষ্ট্রার শব্দ কানে আসিতেছে। মোটা একটা চুরুট কিনিয়া সে টানিতে লাগিল। আঃ বেশ্‌।

তারপর আবার রাস্তা! তার চলার আর শেষ নাই,—হয়ত উদ্দেশ্যও নাই কিছু। শুধু চলা। চলিতে পারায় যে কত আনন্দ তাহাই সে শুধু ভাবে। চলা, শুধু চলা,—মেঘের মত, আপনার প্রাণের লীলায়। অর্থহীন, কিন্তু মধুর। দোকান-পশার, হোটেল, বাড়ি, চূড়া-আলা গির্জ্জা, মন্দির, মসজিদ, পার্ক একটা, হয়ত একটা সিনেমার বাড়ি। কোথাও বিক্রেতা জিনিষ সাজাইয়া বসিয়া হাঁকে,—কোথাও লটারি, নয় ত ম্যাজিক। রাস্তায় যে কত রকম লোক, কত বিচিত্র ঘটনা, তার ঠিক নাই।

বাস্‌গুলি গন্তব্য স্থানের নাম করিয়া হাঁকে। তার ইচ্ছা করে বাস্‌-এর কন্‌ডাক্‌টার হইতে। হু-হু করিয়া শুধু ছুটিয়া চলা,—ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য বদ্‌লাইতেছে,—নতুন লোক কিছু ওঠে, কিছু নামে,—একটু থামা, তারপর আবার ছুট্‌। ভারী মজার!

এক রাস্তার মোড়ে কতগুলি নাবিক দাঁড়াইয়া। হয়ত আজই কোন্ জাহাজে আসিয়াছে সুদূর কোন্ দেশ হইতে। বোধ হয় পর্ত্তুগীজ।

কেমন ওদের জীবন! সীমা-হারা সাগরের ভিতর দিয়া দিনের পর দিন পাড়ি চলে। সূর্য্য ওঠে, অস্ত যায়। দিক্‌চক্ররেখার পারে ছোট্ট একটা তারা ফুটিয়া ওঠে। সমুদ্রের কলধ্বনি আর মেসিন-চলার শব্দ। হয়ত গানও। নয়ত ঝড় ওঠে,—মৃত্যু-রাজের লীলার মত। বুক দুরু-দুরু করে। জাহাজটা বুঝি ফাটিয়া যাইবে! মৃত্যু-ভীত নর-নারী আর্ত্তনাদ তোলে।

এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে পান্থ চলিল গঙ্গার ঘাটে। জাহাজগুলির দিকে তাকাইয়া দেখিয়া মনটা কেমন হু হু করে। তার যদি একটা ডিঙিও থাকিত তবে অমনি করিয়া আলো জ্বালাইয়া নদীর জলে তাহারই প্রতিবিম্বের পানে প্রহরের পর প্রহর ধরিয়া চাহিয়া থাকিত। দরকার থাকুক আর না-থাকুক পালও দিত একটা তুলিয়া,—পাল-তোলা নৌকা দেখায় কি চমৎকার!

ও-পারের চটকলগুলি আব্‌ছা দেখায়। বিজ্‌লী বাতিগুলি দেখিতে বেশ লাগে। সে যদি কলের কুলি হইত তবে হয়ত এতক্ষণ বাড়ি ফিরিয়া যাইত। ভাঙা আবর্জ্জনা-ভরা একটা ঘরের এক কোণায় তার খাটিয়া। তাহাতেই শুইয়া আছে এতক্ষণ। হয়ত একটু তাড়ি খাইয়াছে, একটু নেশা ধরিয়াছে! কলহের শব্দ আর তার সঙ্গে মাদলের। কি রকম বিচিত্র!

সন্ধ্যা গড়াইয়া রাতে পড়িয়াছে তখন। সাহেবী পাড়ার নির্জ্জন পথ দিয়া পান্থ চলিল অলসভাবে। কোনো তাড়া নাই, প্রয়োজন নাই। পথ-তরুগুলিতে ফুলের যে মঞ্জরী ধরিয়াছে তাহার গন্ধে বাতাস ভারী। ছুটিয়া-চলা দু-একটা মোটর হইতে পেট্রলের গন্ধও আসিতেছে। অদ্ভুত সংমিশ্রণ! আলোক বিচ্ছুরিত বাতায়নগুলি কি চমৎকার দেখাইতেছে। ঘরের ভিতর যাইলে কিন্তু

অত চমৎকার লাগে না। কেন? সে ভাবিতে থাকিল।

জগতে শুধু ছবি সুন্দর। জগতটাই তো একটা ছবি,—তাকে যারা সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরে তারাই তাকে দেখিতে পায় না। তারা ঠকে। পান্থ শুধু ছবি দেখে,—কত বিচিত্র, কত অপরূপ, আনাচে-কানাচে, এখানে-ওখানে ছবির ছড়াছড়ি।

যারা বোঝে না তারা বলে পাগল। কিন্তু ছবি দেখা আর রেখায় ও রঙে ফুটাইয়া তোলাই তার সাধনা। তার আত্মা তাহা চায়,—তার জীবন তাকে ছবি দেখায় ডাক দিয়াছে। হুস্ করিয়া একটা মোটর হর্ন না দিয়াই তাহার সম্মুখে আসিয়া ব্রেক কষিয়া ফেলিল। সেটা ফুটপাথের ভিতর দিয়া বাড়ি ঢুকিবার পথ। অস্ফুট একটা গালি তার কানে আসিল। এক মুহূর্ত্তে তার কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, হাতের মুঠিটা শক্ত হইল! কিন্তু কিছু না-করিয়া কিছু না-বলিয়া পথ হইতে সে সরিয়া গেল। মন্দ কি,—এই তো বণিক সভ্যতার ছবি!

বাড়ির পর বাড়ি পার হইয়া আসিল। কত হাসি, কত গান। পর্দ্দার ফাঁকে ঘরের ভিতরটাও কচিৎ চোখে পড়ে।

ডান দিকে মোড় ফিরিয়া সে চলিল। ফুটপাথের উপর একটু দূরে দূরেই কৃষ্ণচূড়া গাছ। গ্যাসের আলোয় তাদের ছায়া ফুটপাথে পড়িয়াছে।

হাঁটিয়া আসিয়া অবশেষে সে একটা বাড়ির ধারে থামিল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গীত-মুখরিত আলো-সমুজ্জ্বল বাড়িটার দিকে মুগ্ধ চোখে চাহিয়া রহিল! রাস্তার দিকে বাড়ির যে-অংশটা আসিয়া পড়িয়াছে সে-দিকটার উপর তলার ঘর হইতে এস্রাজের একটা সুর আসিতেছে। তার সঙ্গে আমের মঞ্জরীর গন্ধ। কি চমৎকার,—যেন স্বপ্ন! পান্থ জানে কে বাজাইতেছে। সে একটি বাঙালী মেয়ে,—তার নাম মঞ্জুলিকা। এই মঞ্জুলিকা তাকে ভালবাসে···ওর বাবা জমিদার! তবু মঞ্জুলিকা ভালবাসে তাকে। কেন যে, সে ভাবিয়া পায় না। জগতে তার মত একটা লক্ষ্মীছাড়ার জন্য কারুর মনে যে একটু মধু সঞ্চিত হইতে পারে তাহা সে ভাবিতে পারে না। কিন্তু তবু বড় ভাল লাগে। ওঃ মঞ্জুলি,···মঞ্জুলির ভাল লাগে তাকে,—আশ্চর্য্য!

মঞ্জুলিকার মুখটা স্বপ্নের মত,—হয়ত অনির্ব্বচনীয়। সে তো নিজে আর্টিষ্ট,—তবু মঞ্জুলীর চোখের মত চোখ সে দেখে নাই, কল্পনাও করিতে পারে নাই। তার চাউনির গভীরতায় দিনের পর দিন সাঁতার দেওয়া চলে। তার পক্ষ্মচ্ছায়ার নিবিড়তা ঘুমের মত, হয়ত মৃত্যুর মত।

মঞ্জুলিকা এক জীবন্ত ছবি।

আর মঞ্জুলিকার ভাল লাগে তাকে,—খামখেয়ালী, বিত্ত-হীন, ভোগ-বৈরাগী এক চিত্রকরকে! অবাক কাণ্ড!

কিন্তু মঞ্জুলীর বাবার পচ্ছন্দ নয়। কেনই বা চাহিবে—সংসারকে যে ভাল করিয়া তিনি চিনিয়াছেন। তাই পান্থ সরিয়া গিয়াছে। শুধু কোন সন্ধ্যার হাওয়ায় যখন ফুলের কলি পরাণ ফেলিয়াছে, যখন জ্যোৎস্না আসিয়া কৃষ্ণচূড়ার পাতায় আলো ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা সুরু করে, যখন অমাবস্যার আকাশ হীরার টুকরা তারায় তারায় ছাইয়া ফেলে, তখন হয়ত আনমনে চলিতে চলিতে কখন মঞ্জুলিকার বাতায়নের তলে আসিয়া সে উপস্থিত হয়। তারপর স্বপ্ন-ঘোর হইতে জাগিয়া উঠিলে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। বুকের ভিতর কি যে একটা অনুভূতি জাগিয়া উঠে,—কেমন একটা শিহরণ। ভারী অপূর্ব্ব!

এস্রাজটা তখন থামিয়াছে। কিন্তু তার খেয়াল নাই—ভাবনাগুলি আজ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। এখানে আসিয়া দাঁড়ান একটু দখিনা হাওয়ার মত, হঠাৎ গন্ধের-মত, গানের টুক্‌রার মত। তারপর আবার চলা, শুধু চলা।

ভোরবেলায় বাহির হইয়া পড়ে। হয়ত দরিদ্র এক রেস্তরাঁতে চা খায়। তারপর ব্যগ্র দু-চোখ মেলিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। দুপুরে হয়ত রুটি কেনে, আর মাংস। খাইয়া যায় ময়দানের এক ছায়া-গাছের তলায়। চামড়ার একটা ছোট্ট বাক্সের ভিতর হইতে আঁকিবার সরঞ্জাম বাহির করিয়া ছবি আঁকে। কোন দিন যায় মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে ছবি বেচিতে।

যা টাকা হয় তাহা দিয়াই আবার চলে। প্রদর্শনীতে ছবি বেচিয়াও কিছু টাকা আসে। স্বল্প অভাবের পক্ষে যথেষ্ট।

চিত্রকর-মহলে তার নাম হইয়াছে। কিন্তু অতি অল্প দু-একজন ছাড়া কেউ তাকে চেনে না। সে শুধু ঘুড়িয়া বেড়ায়,—শুধু ছবি দেখে।

…হ্যাঁ, মঞ্জুলিকার বাবা ঠিকই বলিয়াছেন। তাকে ভালবাসিয়া মঞ্জুলীর সুখ সত্যিই হইতে পারে না। কি করিয়া হইবে?—সে একটা খামখেয়ালী, কপর্দ্দকহীন চিত্রকর। তাই সে শুধু চুপি চুপি আসিয়া, শুধু ক্ষণেকের জন্য আসিয়া মঞ্জুলিকার বাতায়নের তলে দাঁড়ায়, তারপর ধীরে ধীরে কৃষ্ণচূড়ার ছায়াঘন রাস্তাটা দিয়া চলিয়া যায়। ক্বচিৎ যদি মঞ্জুলিকার সঙ্গে দেখা হইয়া যায় তবে ভয়ে সে শিহরিয়া উঠে। কাণ্ডজ্ঞানহীনা ঐ তরুণী নিজের ভালমন্দ বোঝে না,—পাগলামি করে! ঘর-ছাড়া এই পাগলটাকে কেন যে মঞ্জুলিকা অত স্নেহ করে, কেন যে তার জন্যই মঞ্জুলিকার দুই চোখে প্রেমস্নিগ্ধ চাউনি ঘনাইয়া আসে তাহা সে বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভারী অপূর্ব্ব লাগে, বুকটা করে ঝলমল।

সহসা উপর হইতে মাথায় এক গাদা ফুল, পদ্মের পাপড়ি, ঝরিয়া পড়ে। চমকিয়া উপরে তাকাইয়া দেখে,—হ্যাঁ, যা ভয় করিয়াছিল তাহাই,—হাস্য-বিকশিত আননে দাঁড়াইয়া আছে মঞ্জুলিকা। বুকটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল। পলাইতে পারিলে সে বাঁচিত, কিন্তু তার দেরি হইয়া গেছে।

মঞ্জুলিকা ডাকিল। কিন্তু সে না-দিল জবাব, না-নড়িল একটু। সিঁড়ি দিয়া নামার একটা শব্দ হইল। তার পরক্ষণেই ঘরের ভিতর জান্‌লার ও-দিকে মঞ্জুলিকা আসিয়া দাঁড়াইল।

—ডাকচি যে শোনো না? না, শুনেও তবু ইচ্ছে ক'রে সাড়া দেবে না?

পান্থ চুপ করিয়া রহিল।

—এদ্দিন কোথায় ছিলে?

—পথে-ঘাটে, যেখানে থাকি।

—আর আমাকে একটিবার ক'রেও দেখা দিতে পার নি?

—কি হ'ত?

মঞ্জুলিকা ইহার কোন জবাব দিল না। শুধু তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার চোখে যে-ভাষা লেখা তাহা প্রায় যেন পড়া যায়,—নিষ্ঠুর কি হইত তুমি তার কি বুঝিবে। একটুক্ষণ দু-জনেই চুপ। তারপর—

—আজ আমি মঞ্জুলিকা—

মঞ্জুলিকা ইহারও কোন জবাব দিল না। পান্থ হয়ত চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তখন অকস্মাৎ মঞ্জুলিকা শিকের ভিতর দিয়া হাত গলাইয়া তার পাঞ্জাবীর ছেঁড়া-হাতা টানিয়া ধরিল। বলিল,—না না, কোনমতেই এখন যেতে পারবে না।

পান্থ দাঁড়াইয়া পড়িল।

—কোথায় ছিলে আজ সারাদিন?

—এখানে-ওখানে রাস্তায়। তারপর দুপুরে ময়দানের অশথ্ ছায়ায়—বেশ কেটেছে দিনটা।

মঞ্জুলিকা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল। তারপর শুধাইল,—কি খেয়েছ?

—তোমার ভয় নেই মঞ্জুলী, পেট আমার ভরাই আছে।

মঞ্জুলী একটু চুপ থাকিয়া বলিল,—কিন্তু অমন ঘুরেই বা বেড়াবে কেন?

—ঘুরে বেড়ানই তো আমার কাজ,—ছবির খোঁজে ঘুরে বেড়াই,—জীবনের ছবি খুঁজি।

মঞ্জুলিকা চাহিয়া দেখিল। বন্ধুর সুকুমার মুখখানার উপর গ্যাসের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। চুলগুলি এলোমেলো। ঠিক করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তার উপায় নাই। মৃদু গলায় বলে—একটু বাঁশী শোনাবে অজয়?

—না।

—কত দিন যে শুনিনি,……ছেঁড়া জামাটা কেন শুধু শুধু পর?

—সবগুলিই যে ছেঁড়া।

মঞ্জুলিকার বুকের ভিতর একটা কান্না ঘনাইয়া আসিল। কি আপন-ভোলা মানুষ,—শুধু ছবি ছবি করিয়া পাগল হইয়া আছে। জীবনের সাধনাকে অমন করিয়া আর কাহাকেও সে গ্রহণ করিতে দেখে নাই। অজয় জীবনের ছবি আঁকে। যেমন আঁকে জ্যোৎস্নার ছবি তেমনি আঁকে দুপুরের ছবি। শরতের সোনার প্রভাত আঁকিয়া ভোলে না বৈশাখী সন্ধ্যার ঝড়ের কথা। মর্ম্মর প্রাসাদগুলি যেমন আছে, তেমনি আছে দরিদ্রের বস্তি। তার কত বেদনা, কত গ্লানি, সেখানকার জীবনের কত দীনতা, কত ক্ষুদ্রতা, সব তার তুলির টানে ফুটিয়া ওঠে। যুবতীকে আঁকিতে গিয়া বৃদ্ধার কথা সে ভোলে না। ভীড়ের ছবি, হাট-হট্টগোলের ছবি, মাতালের ছবি, কুষ্ঠরোগীর ছবি তার আর্টে স্থান পায় যেমন পায় পলাশগাছ, যেমন পায় অভিসারিকা, যেমন পায় বসন্তের বর্ণসম্ভার। অজয় জীবনের ছবি আঁকে।

মঞ্জুলিকা বলিল,—তোমার জামাগুলি এনে দিয়ে যেয়ো আমায়, ঠিক ক'রে দেবো। দিয়ে যাবে তো?

—বলতে পারি নে।

মঞ্জুলিকা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া অজয়ের হাত চাপিয়া কহিল,—আমাকে এখান থেকে তুমি উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাও অজয়।

—পাগলামি ক'রো না মঞ্জুলি!

মঞ্জুলিকার চোখে অশ্রু টলমল করে।

—হয়ত আমি পাগলই হয়ে যাব অজয়—দিনরাত শুধু তোমার কথা ভাবি। আজ ক্লাসে হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিলাম জানো?

অজয় চুপ।

—একটা কথার জবাব দেবে অজয়?

—কি কথা?

—তুমি,—তুমি আমাকে সত্যি ভালবাসো না? বলো বলো, আমি জান্‌তে চাই।

অজয় চমকিয়া উঠিল। বুকটা হু-হু করে,—দখিনা হাওয়ায় কৃষ্ণচূড়ার পাতার মত। গেটের উপরে মাধবী লতাটা দুলিতে লাগিল। একটা পাখী শিস্ দিয়া পলাইল, কোথা হইতে একটা ঘন সুগন্ধ ছুটিয়া আসিল। একটু চুপ থাকিয়া অজয় বলিল,—কাল ভেবে এর জবাব দেব, মঞ্জুলি।

তারপর আবার চুপ। অজয় সহসা মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া চলিয়া গেল। আর সেই বাতায়নের ধারে হাতে মাথা গুঁজিয়া মঞ্জুলিকা অশ্রুতে ভাঙিয়া পড়িল।

•

ভোরের আলো অজয়ের ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, ছোট্ট ঘরটা, আসবাবপত্র খুবই কম। কিন্তু তাই বলিয়া তার সাজসজ্জার মত ছেঁড়া-ভাঙা অ-গোছাল নয়। তার কারণ, বোধ হয় এই যে, ঘরে দিনের কোনো সময়েই সে থাকে না প্রায়। দেওয়ালে কতকগুলি ছবি—কিছু তার নিজের, কিছু দেশী-বিদেশী ক'জন বড় পটুয়ার। একটা ইজেল—তাতে অসমাপ্ত একটা ছবি।

তার ঘরের জানালাটার কাছে নিম-গাছের একটা ডাল আসিয়া পড়িয়াছে। একটা কোকিল ডাকিল। চোখ মেলিয়া বাহিরে তাকাইয়া অজয় চমকিয়া উঠিল। ঈস্! ভারী বেলা হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের অন্তঃপুরে প্রথম আলোর দুয়ার-নাড়া দিনের পর দিন সে দেখে তবু তার তৃপ্তি হয় না। কি অপরূপ সেই শুভক্ষণটি!

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া জান্‌লার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। নিম-কিশলয়ের উপর দিয়া এক ঝলক্ ভোরের আলো আসিয়া তার মুখে পড়িল—উষসীর আশীর্ব্বাদের মত। চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, মঞ্জুলিকার সুপ্ত সুন্দর মুখখানা এই পবিত্র স্নিগ্ধ আলো যাইয়া কেমন না জানি রাঙাইয়া দিয়াছে। আর মঞ্জুলিকা ভালবাসে তাকে!···কিন্তু···

অজয় বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, ভাবিতেছিল কোথায় যাইবে আজ। কোন এক বাজারে গিয়া ক্রেতা-বিক্রেতা দর-কষাকষি দেখিলে কেমন হয়? তারপর আপিস-পাড়ায় দাঁড়াইয়া দেখিবে মন্দভাগ্য কেরাণীরা ঊর্দ্ধগতিতে আপিসে ছুটিয়াছে,—গাড়ি, মোটর, ট্রাম, বাস্। তারপর সেখান হইতে ছুট। ব্যবসা-পল্লীতে চেঁচামেচি, হৈ-চৈ হট্টগোল। পিচের গরমে রিক্স-আলার পা পুড়িয়া যায়, মাথা-ফাটা রোদে ক্লিষ্ট গাড়োয়ান গরুগুলিকে

গালাগালি করে···। তারপর কোথাও কিছু খাওয়া। ময়দানের কোন এক ছায়া-গাছের তলায় গিয়া একটু বিশ্রাম। ছবি আঁকা। তারপর আবার ঘুরিয়া বেড়ান। দিনগুলি যেন নদীর জলে-পড়া পাতা,—এ স্রোতে ও-স্রোতে ভাসিয়া চলে, নাচিয়া যায়। কি চমৎকার!

হঠাৎ ঘরের কড়া নড়িয়া ওঠে। অজয় ভাবে হয়ত পাশের ঘরের মান্দ্রাজী ছেলেটা। নয়ত ব্যারাকের ওদিককার পাঞ্জাবী পরিবারের ছোট্ট মেয়েটি। মনটা খুশীই হয়···

দরজা খুলিয়া চমকিয়া উঠিল। তার এক সময়কার বন্ধু মঞ্জুলীর দাদা। অচিন্তনীয় ব্যাপার,—কেন? এমন কি প্রয়োজন পড়িয়াছে যে এতদিন পরে রাজার ছেলে আসিয়া আবার তার দরিদ্র ঘরে উপস্থিত হইয়াছে।

—তুমি শেষে বেরিয়ে যাবে, তাই খুব ভোরে জেগে উঠেই আসতে হ'ল।

—এস, কিন্তু হঠাৎ কেন ভাই?

সে তার উদ্দেশ্য বলিয়া গেল।··নন্দনপুরের যুবক জমিদারের সঙ্গে তার বাবা মঞ্জুলীর বিবাহ ঠিক করিয়াছে। কিন্তু নির্ব্বোধ মেয়েটা বাঁকিয়া বসিয়াছে এখন। তার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে নিশ্চয়, নইলে রূপে-গুণে এমন পাত্রকে অবহেলা দেখায় কখনও? অনুনয়, উপদেশ, ভর্ৎসনা—সবই ব্যর্থ হইয়াছে। এখন অজয় শুধু ভরসা। কেন যে মঞ্জুলীর এমন মনোভাব, অজয় হয়ত জানে, কিন্তু তাহা যে তার মঙ্গলের হইবে না তাহা কি অজয় বুঝিতে পারে না। অন্তত আর কিছু না হউক, মঞ্জুলীর সুখের জন্য অজয় তাকে ও-বিবাহে রাজী করুক। তার করা উচিত।···

অজয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। মঞ্জুলীর সুখের জন্য জীবন দিতে পারে সে—তার জন্য কি সে করিতে পারে না? সত্যই তো, তার জন্য মঞ্জুলীর যে মায়া সেটা মঞ্জুলীর সুখের হইবে না কখনও। সে ঘর-ছাড়া ক্ষ্যাপা বৈরাগী, বিত্তহীন, খামখেয়ালী।

অজয় রাজী হইল। হাঁ, বলিবে মঞ্জুলীকে। হয়ত চোখে একটু বাষ্প ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু সে তাড়াতাড়ি চাপিয়া ফেলিল।

সরকারী বাগানের এক বাদাম গাছের তলায় অর্দ্ধ শয়ানে অজয়ের দুপুরটা কাটে। ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছিল, পারে নাই। মনের লক্ষ ভাবনা আজ তাহার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মঞ্জুলীকে আজ একটা জবাব দিতে হইবে,—ভালবাসে কি না? অন্তর্যামী জানেন কোন্‌টা সত্য, কি তাহার প্রাণের কথা, তাহার চেতনার বাণী। কিন্তু তাহা বলিলে তো চলিবে না।

···নন্দনপুরের জমিদার খুবই যোগ্য পাত্র, রূপে গুণে। আর সে লক্ষ্মীছাড়া। সে শুধু ছবি আঁকে, শুধু খেয়ালের রূপ দেয়।

বেশ, কি জবাব দিবে সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। বুকটা হু হু করে, করুক। চোখে যদি জল ঘনাইয়া আসে, জামার হাতায় মুছিয়া ফেলিবে।

সন্ধ্যা হইল। পথে পথে গ্যাস জ্বলিল। দখিন হাওয়া জাগিল। কর্ম্মব্যস্ত নগরীর উপর কেমন একটা বিশ্রামের আমেজ, কেমন একটা শান্তির ছায়া।

হাঁটিতে হাঁটিতে চমকিয়া অজয় এক সময় দেখিল মঞ্জুলীদের বাড়ির পথে আসিয়া পৌছিয়াছে। ঐ তো মঞ্জুলীর ঘরে আলো জ্বলিতেছে! কে জানে, কাছে গেলে এস্রাজের সুরও হয়ত শোনা যাইবে। এ-ধারের ওধারের বাড়ি হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসে। হাসির টুক্‌রা, শিশুর আনন্দ-চীৎকার। জীবন এখানে আনন্দে ভরিয়া আছে, পূর্ণতায় ডগমগ করিতেছে। আর তার ছন্নছাড়া জীবনের চরম ব্যর্থতা এখান হইতেই বহন করিয়া লইতে হইবে তাহাকে।

ঐ তো জান্‌লা ধরিয়া মঞ্জুলী দাড়াইয়া আছে!

অকস্মাৎ অজয়ের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। মঞ্জুলী, মঞ্জুলী! অমন দুটি চোখ কোথা হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল মঞ্জুলী। তার রামধনু-বাঁকা দুটি ভুরু, তার কপালে আসিয়া পড়া আঙুর অলক, তার গ্রীবাভঙ্গী, তার—যাক্। কি হইবে ভাবিয়া? মঞ্জুলীকে ছাড়িতেই হইবে। মায়ার পাশ ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে তাহাকে। তবু খামখেয়ালীর বুকে বেদনা জাগে, নিবিড়, হয়ত অসহ।

যখন দিনের পর দিন সন্ধ্যাতারা উঠিবে, যখন রূপালী

জ্যোৎস্না কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পাতায় ঝিকিমিকি করিবে, যখন গন্ধ আসিবে, হাওয়া জাগিবে, তখন কি করিবে সে? জীবনে একটি মেয়ে তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। তার বাতায়নের তলে একটু আসিয়া দাঁড়ান ছিল তার জীবনের একটুখানি দখিন হাওয়া, একটু হঠাৎ গন্ধ।

তার বাতায়নখানি অজয়ের জীবনের উপর চিরদিনের জন্য এখন বন্ধ হইয়া যাইবে। দিনের পর দিন কাটিবে। রাতের পর রাত চলিয়া যাইবে। মৃত্যুর পর মৃত্যু নাচিয়া চলিবে। আকাশের রঙ বদ্‌লাইবে, পাতায় পাতায় নতুন সুরের গান জাগিবে। বর্ষার হিমে পৃথিবী ভিজিবে,—গ্রীষ্ম বসন্ত আবার শুকাইয়া উঠিবে। যেমন করিয়া জগতের দিন কাটে তেমনি করিয়া কাটিবে। শুধু তাহার লাগিয়া বাতায়নে কেহ আর আসিয়া দাড়াইবে না।

মনটা এক মুহূর্ত্তে লোভী স্বার্থপর হইয়া ওঠে! মঞ্জুলী, মঞ্জুলী!

তারপর আবার নিজেকে অজয় বোঝাইল। সে চিত্রকর, সে খামখেয়ালী। মঞ্জুলীর জীবন অসুখী করিবার তার অধিকার নাই।

জান্‌লার গরাদ ধরিয়া মঞ্জুলিকা যেখানে ছবির মত দাঁড়াইয়াছিল সেইখানেই অজয় আগাইয়া গেল। কথা নাই! অজয় মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারে না,—সে দুর্ব্বল, নিজেকে বিশ্বাস সে করিতে পারে না। মঞ্জুলিকার চোখের দিকে চাহিলে কর্ত্তব্যের বোধ তার হারাইয়া যায়—অন্তরের কি এক অনির্ব্বচনীয় চাওয়া দুর্দ্দম হইয়া উঠে! মঞ্জুলী, মঞ্জুলী, কোথায় অমন দুটি চোখ পাইয়াছিলে তুমি?

—অজয়?—মঞ্জুলী মৃদুস্বরে ডাকে।

সে সাড়া দিল না।

মঞ্জুলিকা বলিল,—অজয়, আজ বনমল্লিকা ফোটার মত জ্যোৎস্না উঠেছে। আজ বাতাস চন্দনের সুগন্ধ নিয়ে এসেছে অজয়। এমন রাতে শুধু তুমি বল মঞ্জুলিকে ভালবাস,—শুধু একটিবার বল!

অজয় কোনো জবাব দিল না। তাকাইলও না একবার মঞ্জুলিকার দিকে। শুধু চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

—অজয়, শুন্‌ছো না তুমি? শুধু একটিবার বল,—জগতে তবে আর কেউ আমাকে আট্‌কাতে পারে না।

কোনো উত্তর আসিল না। শুধু কৃষ্ণচূড়ার বনে একটা আর্ত্তস্বর জাগিয়া উঠিল। শুধু দূরে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

—অজয় অমন ক'রে তুমি চুপ ক'রে রইলে, ভয়ে যে আমি মারা যাই। অজয়, এমন শুভলগ্নে তুমি শুধু একবার বল। বল, বল, তোমার পায়ে পড়ি!

হঠাৎ মরিয়ার মত মাথা উঠাইয়া বিকৃত-কণ্ঠে অজয় বলিয়া উঠিল,—না।

একটা ঘূর্ণী হাওয়া অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল। একটা আর্ত্তনাদ। ভয়-পাওয়া রাত্রিচর কতকগুলি পাখীর চীৎকার। কৃষ্ণচূড়ার পাতায় একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস।

মঞ্জুলিকা শর-বিদ্ধ পাখীর মত ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অজয় শুধু একবার চাহিয়া ছুটিয়া চলিল—পাগলের মত, ভীরুর মত, মাতালের মত। সমস্ত পৃথিবীটা তার পায়ের নীচে টলিতেছে।

একটা তীব্র করুণ সুর কানে আসিল। ব্যথা-ক্লিষ্টার আর্ত্তনাদ,—বেদনা-সমুদ্রের তরঙ্গ-কল্লোলের মত।

দুই হাতে কান চাপিয়া অজয় ছুটিয়া চলিল। শুধু জল-ভরা দুটি চোখ সে মুছিতে থাকিল,—শুধু দাঁতে-দাঁত চাপিয়া চলিল। বলিল,—ভগবান তুমি ওর মঙ্গল করো, মঙ্গল করো,—ওকে সুখী করো। ঋতুর পর ঋতুর আস্তরণ দিয়ে ওকে আমার কথা ভুলিয়ে দিও,—শুধু আমি যেন ওর কথা না ভুলি।

অজয় তাহার সারা-জীবনের ছবি বেদনা-বিক্ষুব্ধ বুকের ভিতর বন্দী করিয়া অসংযত পায়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে গভীর রজনীর পানে হাঁটিয়া চলিল।

মহিলা-সংবাদ



শ্রীমতী প্রীতিলতা গুপ্ত



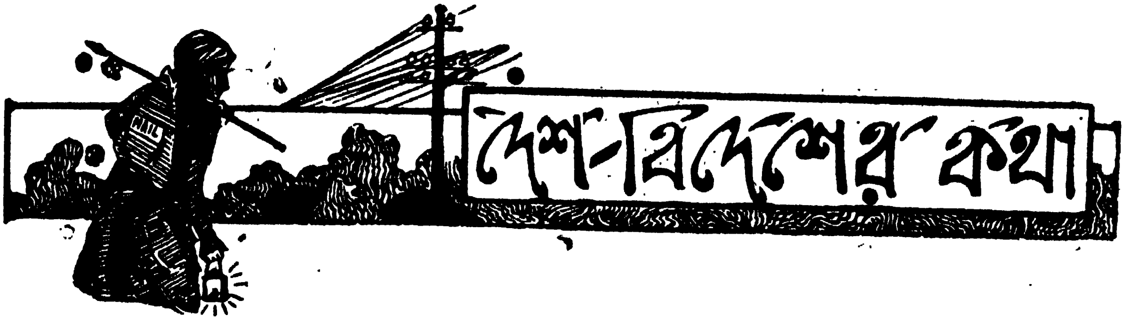
শ্রীমতী কমলরাণী সিংহ



শ্রীমতী পার্ব্বতী মঙ্গলম্

গত এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের একটি পাঠ্যসমষ্টিতে শ্রীমতী কমলরাণী সিংহ ও অন্য একটি পাঠ্যসমষ্টিতে কুমারী প্রীতিলতা গুপ্ত প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীমতী পার্ব্বতী মঙ্গলম্ দক্ষিণ ভারতের নম্বুদ্রি বা নাম্বিয়ার সমাজে প্রথম অবরোধ বর্জ্জন করিয়াছেন ও নম্বুদ্রি যুবজন-সংঘের নেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।



দেশ-বিদেশের কথা

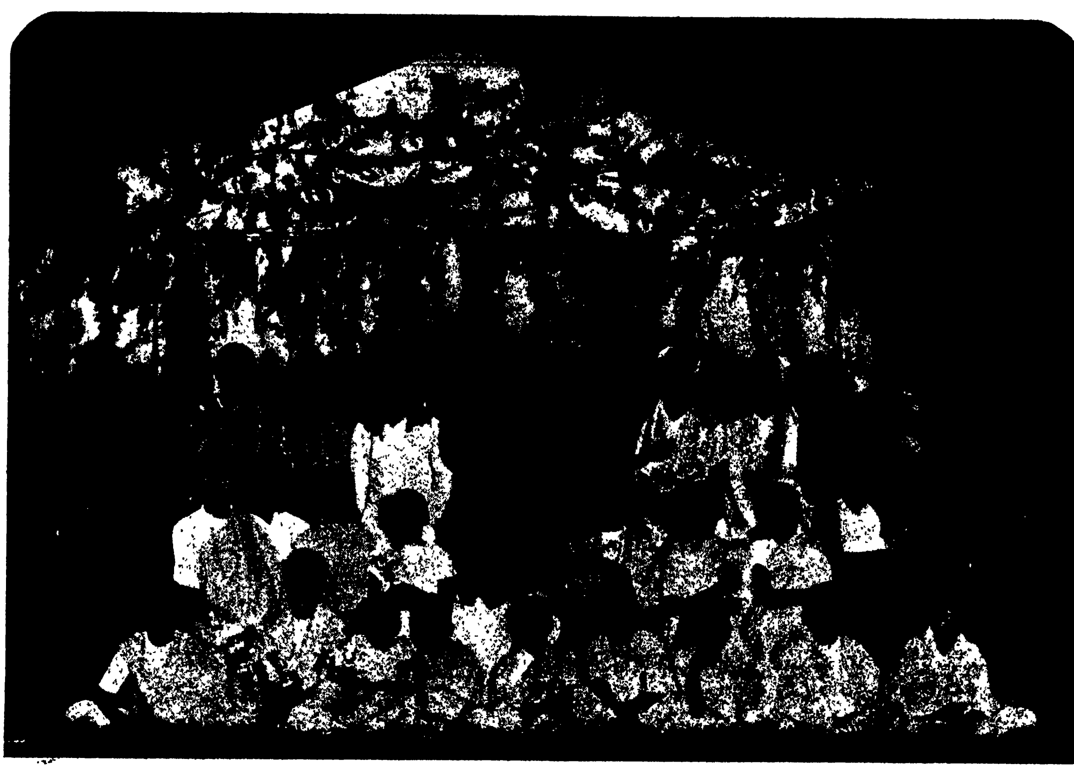
ভারতবর্ষ

রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী—

কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ শহরে যখন কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব করিবার আয়োজন আরম্ভ হয়, তখন রেঙ্গুনের বিভিন্ন জাতীয় নরনারীগণও সম্মিলিত হইয়া অনুরূপ একটি উৎসব করিবেন বলিয়া মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে, মাননীয় বিচারপতি মিঃ জে, আর, দাস-সভাপতি, এবং শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কে, এন, ডাঙ্গালী ও শ্রীযুক্ত কে, আর, চারী এই তিন জন সম্পাদক লইয়া একটি 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী সমিতি' গঠিত হয়। গত সেপ্টেম্বর মাস হইতেই এই সমিতি উৎসবের আয়োজন আরম্ভ করেন। সম্পাদকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব করিয়া রেঙ্গুন আপনার যথার্থ মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

বেঙ্গল একাডেমীর 'নিয়োগী হলে' সমস্ত উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। কবির একটি সুন্দর তৈলচিত্র মাল্য দ্বারা সাজাইয়া মঞ্চের উপর স্থাপন করা হয়। গত ২৮এ, ২৯এ ও ৩০এ ডিসেম্বর এই তিন দিন ধরিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে রেঙ্গুনের অধিবাসিগণ এই উৎসব-প্রাঙ্গণে মিলিত হইয়া কবিকে তাঁহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য প্রদান করেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী সমিতির সভাপতি বিচারপতি দাস মহাশয় উৎসবের উদ্বোধন করেন। কয়েক জন মহিলা ও পুরুষের সমবেতকণ্ঠে কবির বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গীত হইলে পর প্রথম দিনের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা হয়।



রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে অভিনয়

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনটি দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভাগে বাংলা ছাড়া ভারতীয় কয়েকটি ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সঙ্গীত হয়। প্রথমে, শ্রীযুক্ত পঙ্করত্নম পিল্লে তামিল ভাষায়

রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রাও বাহাদুর পি, টি, এস, পিল্লে মহাশয় ঐ সময় সভাপতির কার্য্য করেন। পরে খান বাহাদুর এ. চান্দু মহাশয়ের সভাপতিত্বে হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় সভার কার্য্য চলিতে থাকে। পণ্ডিত উমাদৎ শর্ম্মা বি-এ, এল,এল, বি, হিন্দী ভাষায় ও শ্রীযুক্ত শান্তিলাল মেহ্‌তা গুজরাটী ভাষায় বক্তৃতা ও সঙ্গীত করেন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় অংশটি সম্পূর্ণ ভাবে কবির মাতৃভাষা বাংলার জন্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল। আবৃত্তি, সঙ্গীত ও প্রবন্ধাদিতে ঐ অধিবেশন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সুশীলা দাস (মিসেস জে, আর, দাস) সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সমবেত কণ্ঠে কবির জাতীয় সঙ্গীতটি গীত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্তা বিভাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী অরুণা মিত্র ও শ্রীমতী নীলিমা বসু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত করেন, শ্রীমতী বেলা দেবী 'কবি বন্দনা' আবৃত্তি করেন। পরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

১। 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম সঙ্গীত'—শ্রীযুক্তা মুক্ত রুদ্র।

২। 'রবীন্দ্র সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য'—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী, এম-এ ; পি-আর-এস।

৩। 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য'—শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচার্য্য।

৪। 'রবীন্দ্রনাথ ও স্বাদেশিকতা'—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার।

উৎসবের তৃতীয় দিনটি সম্পূর্ণ ভাবে বাঙালীর নিজস্ব ব্যাপার ছিল এবং হাস্যে, গানে ও অভিনয়ে সমস্ত আয়োজনটিকে পরিপূর্ণতা দান করিয়াছিল। ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব' ও তৎসঙ্গে 'আশ্রম পীড়া' অভিনীত হয়। শ্রীযুক্তা সুজাতা সেন সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে এই তিনদিন বাঙালীদের মধ্যে একটা আনন্দ ও উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

পাটনায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী—

গত ২৬শে, ২৭এ ও ৩০এ অগ্রহায়ণ পাটনা বঙ্গসাহিত্য সভার উদ্যোগে রবীন্দ্র-জয়ন্তী মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ২৬এ অগ্রহায়ণ সন্ধ্যায় রামমোহন রায় সেমিনারী হলে বাঙালী ও অবাঙালীগণের এক বৃহৎ জনসভায় কবিবরের 'দেশ দেশ নন্দিত করি—' সঙ্গীত পরলোকগত ব্যারিষ্টার চারুচন্দ্র দাস মহাশয়ের কন্যা, শ্রীমতী সতী দেবী, শ্রীমতী জয়া দেবী ও শ্রীমতী বিজয়া দেবী কর্ত্তৃক গীত হইলে রবীন্দ্র জয়ন্তী সমিতির সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়া জয়ন্তীর উদ্বোধন করেন এবং কবিবরের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। তৎপর সুকবি শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবীর 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' শীর্ষক কবিতা শ্রীযুক্তা সুধাকণা চক্রবর্ত্তী পাঠ করিলে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী রায় সরস্বতীর 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' নামক নিবন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শম্ভুশরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত হয়। এই নিবন্ধে শ্রীযুক্তা রায় রবীন্দ্রনাথকে নারীগণের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পরে প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসংস্কার-বিষয়ে এক জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। পরিশেষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙীন হালদার সম্মানীয় অতিথি প্রমথবাবুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে কবিবরের 'জনগণমন অধিনায়ক' সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হয়।

২৭এ অগ্রহায়ণ প্রাগুক্ত স্থানেই আবার সভা হয়। এই দিন প্রারম্ভ সঙ্গীতের পর বিহারবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃপানাথ মিশ্র 'রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীমান্ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পরিণতি-বিষয়ে নিবন্ধ পাঠ করেন এবং যুবকগণের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমাপতি গুপ্ত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে চিকিৎসক ও চিকিৎসা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা সম্বন্ধে নিবন্ধ পাঠ করেন। পরে প্রথিতনামা ঐতিহাসিক স্তার যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার পণ্ডিতাপূর্ণ অভিভাষণে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন স্তর-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ মহাশয় স্তর যদুনাথকে ও সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে শেষ সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হয়।

৩০এ অগ্রহায়ণ শ্রীমতী রাধিকা সিংহ ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে বাঙালী মহিলাগণকর্ত্তৃক 'নটীর পূজা' অভিনীত হয়। রঙ্গমঞ্চ আড়ম্বরহীন ও উপকরণবিরল এবং দৃশ্যপট প্রাচীন স্থাপত্যকলার অনুযায়ী হইয়াছিল।

স্বর্গীয়া স্বর্ণলতা রায় চৌধুরী—

"দি ষ্টার অব উৎকল" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর স্ত্রী স্বর্ণলতা রায় চৌধুরী সম্প্রতি কটকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইনি আসামের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়ার একমাত্র কন্যা। কলিকাতা বেথুন কলেজে ইনি ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। লেখিকা হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন। অসমীয়া ভাষায় তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। ভারতীয় সংবাদপত্র সেবায়ও তিনি যথেষ্ট যশঃ অর্জ্জন করেন। ১৬ বৎসর যাবৎ তিনি কটক হইতে 'এসোসিয়েটেড প্রেসে'র সংবাদ সরবরাহ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক কন্যা ও চারি পুত্র বর্ত্তমান।

ভারতে বিদেশী চিনি—

ভারতে বিলাতী কাপড়ের পরে যে-সব জিনিষ অধিক পরিমাণে আমদানী হয়, তাহার মধ্যে চিনি অন্যতম। বোম্বাইয়ের স্বদেশী লীগের একটি হিসাবে প্রকাশ যে, ১৯২৯-৩০ সালে ভারতে বিদেশ হইতে মোট ১০ লক্ষ ১১ হাজার ৩৪৫ টন, ১৯৩০-৩১ সালে ১০ লক্ষ ৩ হাজার ১৭৭ টন এবং ১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৭৪ টন চিনি আমদানী হইয়াছে। মূল্যের দিক হইতে ১৯২৯—৩০ সালে ভারতে মোট ১৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪৬৭ টাকার, ১৯৩০—৩১ সালে ১০ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৬৪ টাকার এবং ১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৫৪ হাজার ২০৫ টাকার বিদেশী চিনি আমদানী হয়। যদিও উহার অর্দ্ধেকেরও বেশী টাকা গবর্ণমেণ্ট শুল্ক হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি বৎসরে ভারত হইতে চিনির জন্য কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। কাপড় ছাড়া আর কোন জিনিষের উপর আমরা এত অধিক অর্থ ব্যয় করি না।

ভারতে ২৮ লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ হইয়া থাকে এবং উহা হইতে ১১ লক্ষ টন চিনি ও ৩০ লক্ষ টন গুড় উৎপন্ন হয়। এই ৩০ লক্ষ টন গুড়ের অর্দ্ধেক হইতেও যদি চিনি তৈয়ারের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ভারতে বিলাতী চিনির আমদানী বন্ধ হইয়া যাইতে পারে ; কিন্তু তাড়াতাড়ি বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকারখানা খুলিয়া চিনি তৈয়ার করা সম্ভব নহে, কাজেই বর্ত্তমানে জনসাধারণ যদি চিনির পরিবর্ত্তে গুড়ের ব্যবহার আরম্ভ করে তাহা হইলেও বিদেশে এত অর্থ চলিয়া যাইবার পথ বন্ধ হইতে পারে।

ভারতে জাপানী জুতা—

জাপান হইতে সস্তা জুতা আসিয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। এই সমস্ত জুতার দর প্রতি জোড়া ১৲ হইতে ১৸৹; এত সস্তা বলিয়াই এই জুতার বিক্রয় খুব বেশী। প্রতি বৎসর জাপান হইতে কত জোড়া জুতা আমদানী হইতেছে এবং কি ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯২৬-২৭	১৯১৫০০০
১৯২৭-২৮	২৭৭১০০০
১৯২৮-২৯	৩৩২০০০০
১৯২৯-৩০	৬৭৬১০০০
১৯৩০-৩১	১০৯২১০০০

১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে আসিয়াছে ৭৩০৪০০০ জোড়া।

আর্য্যসমাজের কৃতিত্ব—

বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে আর্য্যসমাজের সংখ্যা ১৬৮১ এবং প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভার সংখ্যা ১৩। ইহার মধ্যে ৪টি প্রতিনিধি সভা ভারতের বাহিরে ও অন্যান্যগুলি ভারতের মধ্যে। সার্ব্বদেশিক আর্য্যসভার অধীনে আর্য্যসমাজের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত থাকে। ১৯৩১ সনের লোক গণনা অনুসারে আর্য্যের সংখ্যা ১০ লক্ষের উপর (ইহা ছাড়া সহায়ক সদস্য আরও অনেক আছে)। আর্য্যসমাজের প্রচার কার্য্যের জন্য ১৭২ বৈতনিক উপদেশক, ২৩০ অবৈতনিক উপদেশক, ১৩১ সন্ন্যাসী ও ৩৭ মহিলা নিযুক্ত আছেন। (আর্য্যসমাজের অধীনে) ২৮ গুরুকুল, ১০ কলেজ, ২০০ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ১৫২ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ কন্যা গুরুকুল, ৪ কন্যা কলেজ, ৪ কন্যা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ৭০০ কন্যা পাঠশালা, ৩০০ সংস্কৃত পাঠশালা ও ৩২২ দলিত পাঠশালা আছে। দলিত পাঠশালায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬১৫৬৭। এই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনে আর্য্যসমাজকে প্রতিবর্ষে ২০ লক্ষের কিছু অধিক টাকা ব্যয় করিতে হয়। ৩৭টি অনাথালয় বিভিন্ন স্থানে আছে—ইহাতে অনাথদের পালন পোষণ হয়। ৪১টি বিধবা ও বনিতাশ্রম আছে—ইহাতে পথভ্রষ্টা ও নির্য্যাতিতা নারীকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ডাক্তার শ্রীমতী কুন্তলকুমারী দেবীর তত্ত্বাবধানে দিল্লীতে একটি সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। আর্য্য সমাজের অধীনে ৩০টি প্রেস আছে এবং এই সব প্রেস হইতে ৫০-এর উপর হিন্দী, গুজরাটী, তেলেগু, সিন্ধী, ইংরেজী, উর্দ্দু ও বাংলা আদি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১০০টি গ্রন্থ-প্রকাশগৃহ ও পুস্তকালয় আছে, আর্য্যসমাজের অধীনে ১১ সাধু ও বাণপ্রস্থাশ্রম এবং যোগমঙ্গল, ৩ শুদ্ধি সভা, ৪৩ দলিত ও অচ্ছুতোদ্ধার সভা, ১ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (লক্ষ্ণৌ) এবং ঐ শাখা (আগ্রা)—আদি স্থাপিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ—

আমেদাবাদ, ২৮এ ফেব্রুয়ারী

আমেদাবাদের নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী প্রায় ২০০ জন খৃষ্টানকে শুদ্ধি মতে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা দান করা হইয়াছে। স্থানীয় হিন্দু মিশন এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

—এ পি

শিক্ষাবিস্তারে দান—

এড্‌ভোকেট-জেনেরাল স্যার কৃষ্ণস্বামী আয়ার মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত অন্ধ্র ইউনিভার্সিটিতে এক সহস্র মুদ্রা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। আগামী দশ বৎসরের জন্য এই সাহায্য প্রদত্ত হইতে থাকিবে।

মাদ্রাজ প্রদেশস্থ বারহামপুর জেলার অন্তর্গত হরিয়াখণ্ড মঠ উক্ত শহরে একটি সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদিক বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন; উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে পূর্ব্বোক্ত মঠ হইতে বার্ষিক ৩৬০০৲ টাকা এবং প্রাথমিক ব্যয়ের বাবদ ২৫০০৲ টাকা প্রদত্ত হইবে।

রেলওয়ে বিভাগে কর্ম্মচারী হ্রাস—

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় রেলওয়ে বজেট আলোচনার সময় সরকার পক্ষ হইতে মিঃ হেম্যান্স বলেন, গত ১৯৩০ সন হইতে রেলের আয় কমিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই ব্যয় সঙ্কোচের নীতি অবলম্বিত হয়। কর্ম্মচারীদিগকে যথাসম্ভব কম অসুবিধায় ফেলিয়া এই নীতি প্রতিপালনের দিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে। তিনটি কারণে লোককে চাকুরী হইতে ছাড়ান হয়—প্রথম, কর্ম্মক্ষমতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ, অল্পদিনের জন্য চাকুরী, তৃতীয়তঃ যাহারা অবসর গ্রহণের বয়সের নিকটবর্ত্তী। বিভিন্ন রেলপথে মোট ৪০,৫০২ জন কর্ম্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ই, আই, রেলপথে ১১,৭০০, উত্তর-পশ্চিম রেলপথে ৯,৩০০ এবং জি, আই, পি, রেলপথে ৮,৮০০ জন। এই ব্যাপারে উচ্চ কর্ম্মচারী এবং নিম্ন-কর্ম্মচারীদের মধ্যে ইতর বিশেষ করা হয় নাই।

বাংলা

শিল্প প্রদর্শনী নারী শিক্ষা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীঅবলা বসু জানাইতেছেন—

আগামী ২৫এ মার্চ্চ (বাং ১২ই চৈত্র) শুক্রবার শিল্প ও নানাবিধ কারুকার্য্যের উন্নতিকল্পে নারীশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে একটি মহিলা শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রদর্শনী তিন দিন খোলা থাকিবে।

১। স্থান—ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়, ২৯৪ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

২। সময়—২৫এ, ২৬এ ও ২৭এ মার্চ্চ শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার ১টা হইতে ৫টা।

২৫শে—মহিলাদের জন্য পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে আসিতে পারিবেন।
২৬শে— ঐ ঐ ঐ ঐ
২৭শে—সর্ব্ব সাধারণের জন্য।

৩। প্রবেশ ফি—পুরুষদিগের জন্য—৵৹, মহিলা ও বালক-বালিকাদিগের জন্য—৴৹
ফি দ্বারে গৃহীত হইবে।

৪। ষ্টল - (নানাবিধ জিনিষ বিক্রয়ের জন্য) পরিসর—৭৷৷৹ × ৭৷৷৹ ফুট মূল্য—৫৲ অগ্রিম দেয়।

এই উপলক্ষে মহিলাদিগকে হস্তনির্ম্মিত নানাপ্রকার শিল্প ও কারুকার্য্য প্রদর্শনী কমিটির সহকারী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবীর নামে ২৮নং বাদুড়বাগান লেনে (বাণী-ভবনে) পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। আগামী ১০ই মার্চ্চ হইতে ২০এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি গৃহীত হইবে। দ্রব্যাদির দুইটি তালিকা তৎসঙ্গে প্রেরণ করিতে হইবে। সহকারী সম্পাদিকাকে খবর পাঠাইলে

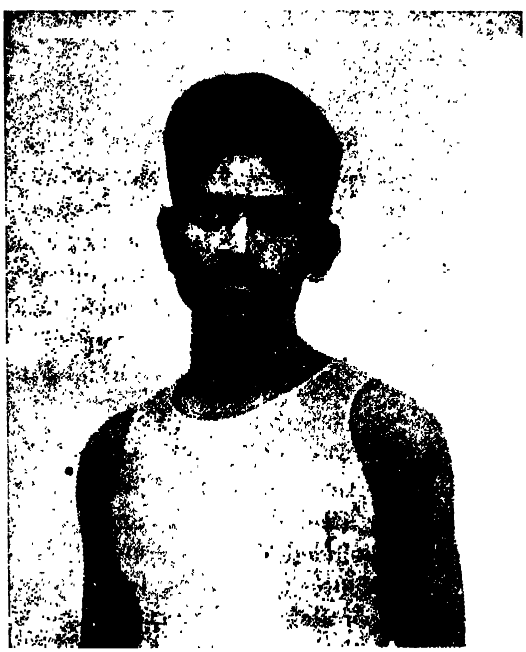
তিনি লোক পাঠাইয়া প্রদর্শনীর জন্য দ্রব্যাদি আনাইতে পারিবেন। কোন জিনিষ নষ্ট হইবার বা হারাইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই।

শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য—

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, পি-আর-এস-কে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় 'ডক্টর অব ফিলসফি' (দর্শনশাস্ত্র) উপাধি প্রদান করিয়াছেন। অক্সফোর্ড, প্যারিসের বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার গবেষণা-মূলক কার্য্যাবলীর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

না-থামিয়া পঞ্চাশ মাইল দৌড়—

কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দগোপাল নন্দী গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকুরিয়া লেকে ৭ ঘণ্টা ৫২ মিনিট ৩॥ সেকেণ্ডে



শ্রীযুত গোবিন্দগোপাল নন্দী

একাদিক্রমে একান্ন মাইল দৌড়াইয়াছেন। এশিয়া মহাদেশে এই সময়ের মধ্যে এত মাইল দৌড়ানো এই সর্ব্বপ্রথম।

গোবিন্দবাবু ইতিপূর্ব্বে তিন বার দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া উচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৯২৯ সনে পনর মাইল দৌড়াইয়া গবর্ণর পদক লাভ করেন। তিনি ১৯৩০ সনে পাঁচ মাইল দৌড়ে দ্বিতীয় এবং ১৯৩১ সনে দশ মাইল দৌড়ে প্রথম হইয়াছিলেন।

ব্যায়াম শিক্ষাগারে দান—

বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ সভায় স্থির হইয়াছে, একটি ব্যায়াম শিক্ষাগার নির্ম্মাণের নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা দান করা হইবে। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামে উক্ত ব্যায়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হইবে।

জমিদারের বদান্যতা—

প্রকাশ, বহরমপুর সদর হাসপাতালে একটি "রঞ্জন রশ্মি" বিভাগ খুলিবার, রক্ষা করিবার এবং উহার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য লালগোলার জমিদার রাজা রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় সি, আই, ই, ৪৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সৎকার্য্যে দান—

ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবেল সোসাইটির ইণ্ডিয়ান কমিটি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছেন যে, ৩৯ নং রাজকৃষ্ণ ঘোষাল রোডের বাবু হরিদাস দে তাঁহার মাতা শ্রীমতী রজনীবালা দাসীর নামে ২০০ টাকার ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ সোসাইটির হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে সোসাইটীর আশ্রিতদিগকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হইবে। উক্ত রজনীবালা এক সময়ে এই সোসাইটী হইতে সাহায্য পাইতেন।

ভারতী-মন্দির—

গত জানুয়ারী মাসে ভারতী মন্দির হইতে যে সকল রচনা প্রতিযোগিতা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে যে সকল ব্যক্তি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—১। শ্রীমতী দেবী সেনগুপ্তা (দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট), বিষয়—"বর্ত্তমান জগতে নারীরাজ্যে বঙ্গনারীর বৈশিষ্ট্য।" ২। শ্রীমান্ কিশোরীলাল চ্যাটার্জ্জী (শিবপুর), বিষয়—"অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন।" ৩। শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী (বেলুড় মঠ), বিষয়—"শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

বিধবা বিবাহ—

বিগত ১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার কলিকাতা, ২৭নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন নিবাসী শ্রীযুত বিহারীলাল দাস মহাশয়ের বাটীতে এক বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীসন্তোষকুমার মল্লিক (সূত্রধর) সাং হুগলী। কন্যার নাম শ্রীমতী নন্দরাণী। শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দাস ও তাঁহার পুত্রগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে এই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। বিবাহে স্বজাতীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন।

ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা—

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া-নিবাসী ডক্টর শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা বিলাত হইতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া গত জানুয়ারী মাসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ১৯২৩ সনে এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে অনার্সসহ বি-এস্‌সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯২৫ সনে এম্-এস্‌সি পরীক্ষায়ও প্রথম হন। অতঃপর ১৯২৬ সালে টাটা বৃত্তি লইয়া বীরেশচন্দ্র রসায়নশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষালাভের নিমিত্ত বিলাত গমন করেন। তথাকার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২৯ সনে পি-এইচ-ডি এবং ১৯৩১ সনে বাইয়ো-কেমিষ্ট্রীতে ডি-এসসি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বাঙালীর কারাবরণ—

প্রকাশ, এ বৎসর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী—মাত্র দুই মাসেই বাংলা দেশ হইতে মোট ৭,৯৪৭ জন কারাবরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৭১১ জন মহিলা।



মহারাজা শ্রীশশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
ক্যানিং টাউনে অনুষ্ঠিত হিন্দুসমাজ সম্মেলনের মূল সভাপতি।



রায় ধরণীধর সরদার
হিন্দুসমাজ সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

রেড্ ইণ্ডিয়ানদের দেশে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ

৫

নেভ্যাহোদের সমাজ কয়েকটি গোষ্ঠীতে (clan) বিভক্ত। বাংলা দেশে যেমন একই গোত্রের স্ত্রী-পুরুষে বিবাহ হয় না, নেভ্যাহোদের মধ্যেও তেমনি এক গোষ্ঠীর নরনারীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ হয় না—বিভিন্ন গোষ্ঠী ছাড়া এরূপ সম্বন্ধ হইবার উপায় নাই। মনে করুন, কোন এক গোষ্ঠী হইতে একদল লোক অন্যত্র গিয়া বসবাস করিতে লাগিল, গোষ্ঠীর নামটাও নূতন করিয়া রাখা হইল তথাপি তাহারা আদি গোষ্ঠীর লোকের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না। নেভ্যাহোদের সমাজে মাতৃ-প্রাধান্ত (matriarchy) প্রচলিত থাকায় সন্তানসন্ততি তাহাদের জননীর গোষ্ঠীর মধ্যেই পরিগণিত হয়। বিবাহের পরেও স্বামি-স্ত্রী নিজ নিজ স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভ্রাতৃগণের সন্তানসন্ততির মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। কনিষ্ঠা অথবা জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার সহিত এবং দেবর কি ভাসুরের সহিত বিবাহে কোন নিষেধ নাই। নেভ্যাহোদের ধারণা—নিষিদ্ধ সম্পর্কে বিবাহ হইলে সন্তানসন্ততি নির্ব্বুদ্ধি (দ্বীঃ গীজ্) হইয়া জন্মে।

অধিকাংশ আদিম জাতিদের মধ্যে তরুণ-তরুণীদের বিবাহে নির্ব্বাচন-বিষয়ে যে স্বাতন্ত্র্য আছে, নেভ্যাহোদের তাহা নাই। পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন কাজটা পিতামাতাই করিয়া থাকে। অন্ততঃ এইরূপ নিয়মই প্রাচীনকাল হইতে



বৃদ্ধা নেভ্যাহো স্ত্রীলোক

চলিতেছে। একালের ছেলেরা অবশ্য বাপমা'র নির্ব্বাচিতা পাত্রীকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়া মাঝে মাঝে গোলযোগ ঘটায়। কন্যা নির্ব্বাচন হইয়া গেলে পাত্রের পিতামাতা বা আত্মীয়েরা পাত্রীর পিতামাতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে। কন্যাপণ কত দিতে হইবে তাহাও স্থির হয়। নেভ্যাহোদের ভাষায় কন্যাপণকে 'ঈদ্বীৎক্ষীৎ' বলে। এই পণটি বিবাহের প্রধান সমস্যা বলিয়া ইহার মীমাংসা না হইলে আর কথাবার্ত্তা চলে না। সাধারণতঃ বারোটি টাট্টু ঘোড়া দিয়া 'ঈদ্বীৎক্ষীৎ' দেওয়া হয়। ইহার বেশীর ভাগই কন্যার পিতামাতা পাইয়া থাকে—তবে অপরাপর কুটুম্বেরাও যে যেমন পারে ভাগ লয়। সন্ধ্যাবেলায় অথবা রাত্রে পাত্রীর গৃহেই বিবাহের অনুষ্ঠান (ঈগ্‌গে) হয়। কন্যাপক্ষের লোক বাড়ির বাহিরে আসিয়া বরপক্ষকে অভ্যর্থনা করে এবং বিবাহের জন্য নির্ম্মিত গৃহে (hogan) লইয়া যায়। পাত্রীর মাতামহী জীবিতা থাকিলে বিবাহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আসিয়া পণের ঘোড়াগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। কোন ঘোড়া খারাপ থাকিলে বরপক্ষকে তাহা বদলাইয়া দিতে হয়।

বিবাহের জন্য যে ঘর তৈয়ারী হয়, তাহার ভিতর মেঝেতে ভেড়ার চামড়া বিছাইয়া বরযাত্রীদের বসিবার স্থান করা হয়। বর ও কন্যার জন্য উপর্য্যুপরি কয়েকখানি মেষচর্ম্ম পাতিয়া পৃথক আসন নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। বর ও বরযাত্রীরা আসন গ্রহণ করিলে পাত্রী ও তাহার পিতা বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করে। এক ঝুড়ি (থাচা) ভুট্টা (যাদ্বোৎদীন্ স্বানীল্) হাতে করিয়া পাত্রী আগে আগে আসে। একটি মাটির ভাঁড়ে (থুসজে) করিয়া জল লইয়া তাহার পিতা পিছনে পিছনে আসে। কন্যাপক্ষের লোক আগে হইতেই বরপক্ষের জন্য ছাগমেষাদি বলি দিয়া আহার্য্য তৈয়ারী করিয়া রাখে। এই সময় তাহারা সেই আহার্য্য আনিয়া বরপক্ষের সম্মুখে মেঝের উপর স্থাপন করে। এদিকে পাত্রীও (ভুট্টার পায়েস) corn meal বরের সম্মুখে রাখিয়া তাহার ডান পাশে বসিয়া যায়। পাত্রীর পিতাও জলের ভাঁড় ও কয়েকটি লাউখোলার তৈয়ারী বাটি পাত্রের সামনে রাখিয়া দেয়। অতঃপর সব আয়োজন সমাধা হইলে সে কিছু



একটি নেভ্যাহো তাঁতে বুনিতেছে

ভুট্টার বীজ লইয়া পূর্ব্বোক্ত ঝুড়ির ভিতরে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ও দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে ছড়াইয়া দেয়। ভুট্টার বীজ নেভ্যাহোদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র জিনিষ, সকল অনুষ্ঠানেই তাহা ব্যবহারের রীতি আছে। বিবাহ ক্ষেত্রে পাত্রীর পিতার এইরূপে প্রতি দিকে বীজ ছড়াইবার অর্থ হইল বরবধূও যেন প্রতিবিষয়ে একমত হইয়া সুখী হয়। যাহা হউক পাত্রী এইবার পূর্ব্বোক্ত বাটির মধ্যে কতকটা জল ঢালিয়া বরকে হাত ধুইতে দেয়। বরও কনেকে ঐরূপে জল দেয়। তৎপরে পাত্র ও পাত্রী যথাক্রমে ঝুড়ির পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ভাগ হইতে কিছু ভুট্টা উঠাইয়া লয়। অতঃপর প্রীতিভোজ (ষানেক্ষাণ্) সমাধা হইলে পাত্রীর পিতা তাহার বৈবাহিককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং জামাতাকে চাষবাস দেখা (কেইয়া-বাঃ-নাঃ-দ্বাইয়া) ও পুরুষমানুষদের জীবনসংক্রান্ত সকল বিষয়ে উপদেশ দেয়। কন্যাকেও স্বামীর

পরিচর্য্যা ও রন্ধনাদি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। পুত্র-কন্যা হইলে তাহারা যাহাতে সুখেস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে সেজন্য দুইজনকেই প্রস্তুত হইতে বলা হয়। পাত্রের পিতাও এই সকল কথার পুনরুক্তি করিলে নবদম্পতীকে সেই ঘরে রাখিয়া সকলে আপন আপন আবাসে ফিরিয়া যায়। আগেকার দিনে বরপক্ষের লোক বিবাহের রাতটা কন্যাপক্ষের আবাসে কাটাইয়া যাইত। এখন আর সে রীতি নাই। বিবাহের সময় হইতেই স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত স্ত্রীর বাড়িতে বাস করিতে থাকে। বিবাহের পর বেশী দিন না হইতেই বধূ উপঢৌকন-স্বরূপ কয়েকখানি



একটি নেভ্যাহো স্ত্রীলোকের চুল ওষুধ দিয়া ধোওয়া হইতেছে

বোনা কম্বল (ব্বোল্) লইয়া শ্বশুরশাশুড়ীকে দেখিতে যায়। এই উপলক্ষে সেখানে একটি ভোজের অনুষ্ঠান হয়। দুই একটি সন্তান জন্মিবার পর নূতন ঘর বাঁধিয়া দম্পতী ঘরকন্না আরম্ভ করে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য ইণ্ডিয়ান জাতিদের ন্যায় নেভ্যাহোরাও শিশুদের জন্য কাঠের দোল্না ব্যবহার করে। শিশুর জন্মের কয়েক দিন পরে তাহার পিতা কিংবা পিতামহ পাইন্ কাঠ দিয়া দোলাটি তৈয়ারী করিয়া দেয়। কাঠের দোলনায় শুইবার ফলে শিশুদের মাথার আকারের কতকটা বিকৃতি ঘটে এবং পিছন দিকের হাড়টি (occipital bone) অনেকটা চেপ্টা হইয়া যায়।

৬

ইউট্‌দের তুলনায় নেভ্যাহোদের একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের সমাজে মানুষের জীবনের প্রধান সংস্কারগুলি উপলক্ষ্য করিয়া নানা জটিল অনুষ্ঠান আছে। নৃত্য এই সকল অনুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ। রোগ সারাইবার জন্য মাটি দিয়া চিত্রাঙ্কন (sand-painting) করিয়া যে-সকল ধর্ম্মমূলক



একটি নেভ্যাহো ক্যাম্প

নাচ হয়, সেইগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করিলে নেভ্যাহোরা কতটা পুয়েব্লো peublo কৃষ্টির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায়। সামাজিক উৎসবগুলিতে মাটি দিয়া চিত্রাঙ্কন করিবার রীতি নাই। নিম্নে শেষোক্ত শ্রেণীর কয়েকটি উৎসবের বর্ণনা দিলাম।

(১) ইন্থা (Inthah)—ইহা একটি মেয়েদের নাচ। আগষ্ট মাসে যখন ক্ষেতের ফসল পাকিতে আরম্ভ করে, তখন ইহার অনুষ্ঠান হয়। এই নৃত্যোপলক্ষে স্ত্রীপুরুষ ও ছেলেমেয়েরা গোধূলি বেলায় একত্র হইয়া গোস্ত রুটি দিয়া পরিপাটিরূপে আহার সমাধা করে। অতঃপর এক-দল গায়ক তিন মাইল পর্য্যন্ত যতগুলি ছাউনি আছে, অশ্বপৃষ্ঠে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। পর পর তিন রাত্রি ধরিয়া এইরূপ চলে। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গান হইতে থাকে; তারপর নাচ আরম্ভ হইয়া উষাকালে আসর ভাঙে। মেয়েরা পুরুষদের কম্বল টানিয়া ধরিয়া নিজেদের কম্বলগুলি তাহাদের মাথার উপরে ছুঁড়িয়া দেয়—ইহাই হইল নৃত্যের জন্য সঙ্গী-নির্ব্বাচন করিবার রীতি। পুরুষটিকে ঘোড়া হইতে টানিয়া নামানো হইলে, মেয়েটি তাহার কম্বলখানি ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং পুরুষটি তাহার দিকে পিঠ ফিরাইয়া মিনিট পনের ধরিয়া তাহাকে ঘিরিয়া নাচিতে থাকে। প্রত্যেকটি নাচের জন্য মেয়েরা পৃথক পৃথক সঙ্গী নির্ব্বাচন করে। এইরূপে

নির্ব্বাচিত হইলে কোন পুরুষেরই কোন স্ত্রীলোকের সহিত নাচিতে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আগেকার দিনে কেবল অনূঢ়া মেয়েদের জন্যই বিশেষ করিয়া এই নৃত্যটি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন কিন্তু সকলেই ইহাতে যোগ দেয়। প্রথম ফসল পাকা উপলক্ষে আমোদআহ্লাদ করিবার জন্যই এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

(২) বীগ্গীন্ (Beed gin)—সামান্য সামান্য অসুখে আরোগ্য লাভ করিলে লোকে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করে। ইহা কোন বিশেষ পর্ব্বের ব্যাপার নহে। উৎসবের আগের



নেভ্যাহো দোভাষী, লেখক ও ডাঃ আরমষ্ট্রঙ্

দিন কতকগুলি লোককে নাচের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসা হয়। ঐ সকল ব্যক্তি তদনুযায়ী সূর্য্যাস্তের সময় নিমন্ত্রণ-কারীর কুটীরের সম্মুখে সমবেত হয়। সাধারণতঃ এই সঙ্গে সঙ্গীত, আমোদপ্রমোদ ও ভোজও চলে।

(৩) হুঞ্জোঞ্জি (Hunjonji)—নেভ্যাহোদের ভাষায় এই কথাটির অর্থ হইল লোককে প্রফুল্ল করিয়া দেওয়া। দুঃস্বপ্ন দেখিলে অথবা মরা সাপ ছোঁয়া প্রভৃতি কোন দুর্নিমিত্ত ঘটিলে, ইহা অনুষ্ঠিত হয়। বৎসরের যে-কোন দিনে এই নাচ হইতে পারে। এই উপলক্ষে ভিষক (medicine-man) কতক-গুলি ভুট্টার বীজ লইয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া



নেভ্যাহোদের জন্য ডিলাউজিউঙ (delousing) ক্যাম্প্

দেয় ও সোনাৎগ্লিয়াৎ (Sonatgliat) দেবীর কাছে প্রার্থনা জানায়। অতঃপর নাচগান আরম্ভ হয়।

এতদ্ব্যতীত নেভ্যাহোদের মধ্যে 'কিম্মালথা' (Kimaltha) বলিয়া আর এক প্রকার উৎসব হয়—তাহাতে নাচের রীতি নাই। কোন বালিকা প্রথম ঋতুমতী হইলে কুটীরের যে-অংশে তাহাকে রাখা হয়, সেখানে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। 'কিম্মালথা'র সঙ্গীতে মেয়েরা যোগ দেয় না।

এই ত গেল সামাজিক নৃত্য ও উৎসবাদির কথা। ধর্ম্মমূলক নৃত্যগুলির জন্য পৃথক্ করিয়া কুটীর রচিত হয়—মাটি দিয়া নানারূপ চিত্রাঙ্কনও (sand-painting) করা হয়। বর্ষা নামাইবার উদ্দেশ্যে অথবা পীড়িত লোকের রোগমুক্তির জন্য এই সকল নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। কয়েকটি প্রধান নৃত্যের নাম :—

(১) 'সোডোজিন'। (Sodozin)
(২) 'ডিসগ্নিহটাখল্'। (Disgnihottakhl)
(২) 'ইয়াবিচাই'। (Iyabichai)
(৪) ঝড়ের নাচ
(৫) বিদ্যুতের নাচ্।

৭

রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সব জাতিগুলিই আজ ধ্বংসোন্মুখ, কেবল টিকিয়া আছে ও সংখ্যায় বাড়িতেছে

এই নেভ্যাহোরা। এককালে ইহারা যাযাবর এবং বেশ যুদ্ধপ্রিয় ছিল, কিন্তু পরে পুয়েব্লোদের সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও শান্তিপ্রিয় হয় এবং কৃষিকার্য্য ও পশুপালন শিক্ষা করে। তাহারা ইউট্‌দের মত অত রুক্ষ ও ক্রূরস্বভাব নহে—তাহারা ইউট্‌দের অপেক্ষা দীর্ঘকায় এবং সুদর্শন। সদাসর্ব্বদা ঘোড়ায় চড়ে বলিয়া কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেই বেশ কর্ম্মপটু—চেহারাও শ্রীসম্পন্ন দেখা যায়। বিবাহের পূর্ব্বে কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতা চলিত থাকিলেও মোটের উপরে ইহারা সুনীতিপরায়ণ জাতি—স্বামি-স্ত্রী দুজনেই সাধারণতঃ পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে। বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজেই করা যায়—সাধারণতঃ স্বামিস্ত্রীর বনিবনাও না হইলে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর বিবাহের সময়কার কন্যাপণ ফেরত দেওয়া হয় না, সন্তানসন্ততিও তাহাদের জননীর কাছে থাকিয়া যায়। ব্যভিচার ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইলেও বিবাহচ্ছেদ হইতে পারে না।

পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইয়া মৃতের কবর দেওয়া হয়। এই সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ঘোড়া ও তাহার পিঠের সাজ প্রভৃতি জিনিষপত্রও প্রোথিত করিয়া ফেলা হয়। কেবল অসুখের সময়ে ব্যবহৃত তৈজসপত্র কবরে দেওয়া হয় না। মৃতব্যক্তি যে-সকল স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যায় তাহা তাহার স্ত্রী, পুত্রকন্যা, পিতামাতা প্রভৃতি নিকট আত্মীয়েরা সমানভাগে ভাগ করিয়া লয়।

ইউট্‌দের মত নেভ্যাহোরাও ভল্লুককে নিজেদের আদি পুরুষ বলিয়া ভক্তি করে—ভল্লুক মারিবারও নিয়ম নাই। কথা বলিতে না পারিলেও ভল্লুকরা যেন নেভ্যাহোদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের কোন অনিষ্ট করে না, এইরূপই



গোডাক্সিন নৃত্যের হোগান

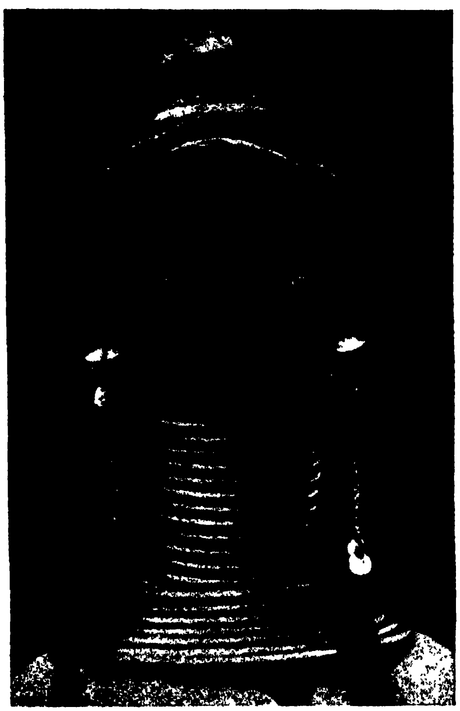
তাহাদের বিশ্বাস। এই জীবটিই না-কি এক সময় নেভ্যাহোদের অগ্নিনৃত্যের (চাষডিন্নে) পদ্ধতি শিখাইয়া দেয়।

ভল্লুকের মত ইহারা সর্পজাতিকেও ভক্তি করে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, সর্পেরা যখন মানুষের মত ছিল ও কথা বলিতে পারিত, তখন নেভ্যাহোদের ভিষগেরা (হোজিন্বে) তাহাদের কাছেই নিজেদের সকল গুপ্তবিদ্যা তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতি শিখিয়া লয়। এখন আর তাহারা কথা বলে না, কিন্তু মানুষদের কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারে এবং নেভ্যাহোদের সহিত বন্ধুর মত আচরণ করে।



বর্ম্মী পদাং নারী –

সকল দেশে সকল যুগেই নারীরা অলঙ্কারপ্রিয়। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারের ধরণ বদলায়, এই যা। বর্ম্মীর পদাং নারী এক

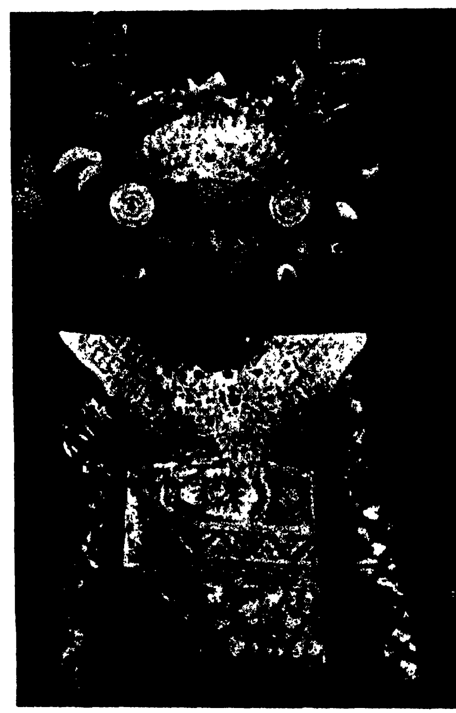


নূতন ধরণের গলার গহনা

অদ্ভুত রকম গহনা গলায় ধারণ করে। আমাদের নিকট ইহা বিসদৃশ ঠেকিবে বটে, কিন্তু বর্ম্মী পদাং নারীরা এই গহনা পরিয়া যে কত খুশী তাহা এই নারীচিত্রটির মুখের হাসিতেই সুপ্রকট।

বলীদ্বীপের বালিকা নর্ত্তকী—

বৃহত্তর ভারতের নানা স্থানে নৃত্যকলার বেশ চর্চ্চা আছে। বলীদ্বীপের নারীরাও ইহার চর্চ্চা করিতে পশ্চাৎপদ নহে। তাহারা সুন্দর সাজগোজ করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। নৃত্যের পোষাক



বলীদ্বীপের নর্ত্তকী

পরিহিত একটি বলীদ্বীপীয় বালিকার চিত্র এখানে দেওয়া গেল।

কৃত্রিম হাওয়া—

হাওয়া না হইলে আমরা বাঁচিতে পারি না, সকলেই জানে। আচ্ছা, এমন যদি কখনও হয় যখন হাওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে বা শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার উপযোগী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ হাওয়ার অভাব হইবে তখন কি উপায়? বৈজ্ঞানিকরা দশ-বিশটা বিষয়ের মত এ বিষয় লইয়াও

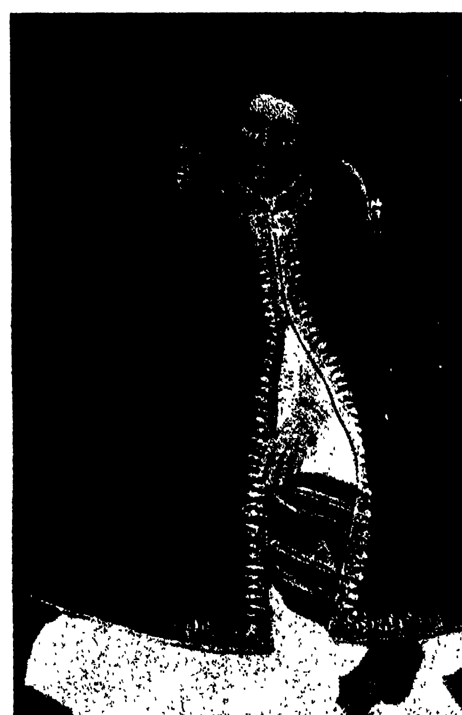
আজ মাথা ঘামাইতেছেন। একটি যন্ত্রের চিত্র এই সঙ্গে সন্নিবেশিত হইল। এই যন্ত্রে কৃত্রিম হাওয়া তৈরী করা হইতেছে। এই কৃত্রিম হাওয়া শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার পক্ষে উপযোগী কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বড় কাচের ঢাকনার মধ্যে একটি বিড়ালছানা রাখা হইয়াছে।



কৃত্রিম বায়ু তৈরীর যন্ত্র



আরব রমণী



আবিসিনিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাজ্ঞী জায়োদিতু



"অধ্যাপক চণ্ডীদাস"

ফাল্গুনের প্রবাসীতে আমার 'অধ্যাপক চণ্ডীদাস' প্রবন্ধের আলোচনা বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ১নং বক্তব্যে প্রকারান্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। 'বসি রাজ গতি পরিঃ পড়ূয়া পঠন করিঃ'কে শুদ্ধ করিয়া 'বসিয়া অবন্তিপুরে পড়ূয়া পড়ন পড়ে।' করা চলে কি না সে বিচার বিশেষজ্ঞরা করিবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষজ্ঞ নহেন। আমার আবিষ্কৃত পুঁথির পাঠও 'বসি রাজ-গদি পরিঃ পড়ূয়া পাঠনা করিঃ' না করিয়া 'বসি রাজ গতি পরিঃ পড়ূয়া পঠন করি'ই রাখা হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'বসিয়া অবন্তিপুরে পড়ূয়া পড়ন পড়ে। হেনকালে এক রসের নায়রি দরশন দিল মোরে॥'র অর্থ— অবন্তিপুরে পড়ূয়া পাঠাভ্যাস করিতেছিল, চণ্ডীদাস সেখানে ছিলেন, এমন সময় এক রসের নাগরী আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিল—এমনও হইতে পারে।

আমার—'রাজার বেগম চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া তাঁহার প্রেমে-পড়ায় রাজা তাঁহাকে বধ করেন' মন্তব্যের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতানৈক্য ঘটে নাই। অথচ তিনি তাঁহার ২ নং বক্তব্যে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আবিষ্কৃত পাঠের সহিত মিলাইয়া, আমার প্রবন্ধের 'কাহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস···' পদটির শেষার্দ্ধের অতি সহজেই (কোনও বেগ না পাইয়া) অর্থ বাহির করিয়া দিয়া বলিয়াছেন— 'রামী যে সেই দিনই এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দর্শনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন···' ইত্যাদি। 'চণ্ডিদাস সনে প্রীত' করার অপরাধে রাজা যদি 'প্রাণের দোসর'কে 'বধ কলে'নই তবে আবার 'মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দর্শনে' রামী 'আমাকে ছাড়িয়া যাইও না' বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিতে আসিলেন কোথা হইতে? আমার আবিষ্কৃত পুথির পাঠ—'রামি কহে ছাড়িয়া না জায়া'।

৩নং বক্তব্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার প্রবন্ধের 'কহিছে ধবিনি রামি...' পদটি শেষের নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি বাদ দিয়া উদ্ধৃত করিলেন কেন?

মধুর শ্রীঙ্গার রস ঃ সাধনে মানুস বশ ঃ
নিত্য নিলা দেহেতে প্রকাস॥
গ্রামদেবি বাসুলিরে ঃ জিজ্ঞাসিহ করজোড়ে ঃ
রামি কহে শ্রীঙ্গার সাধনে।
সরূপ আরপঙ্গার ঃ রসিক মণ্ডল তার ঃ
প্রাপ্তি হবে মদনমোহনে॥ ৩॥

তাহা হইলে পদটি চণ্ডীদাসের বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া কি? ছাপা পুস্তকে উক্ত পংক্তি কয়টি, চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত পদের মধ্যে পাওয়া যায়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'কাহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস···পদটি এতদিন রামীর রচিত বলিয়া চলিতেছিল। চণ্ডীদাস যদি মারাই যান তাহা হইলে কি ভাবে এ পদটি লিখিলেন?' এর সুরটা একটু নরম বলিয়া বোধ হইল। সম্ভবতঃ সাহিত্য-পরিষদের 'রামি কহে ছাড়িয়া না জায়।' পাঠ পড়িয়া তাঁহার মনে কিছু খট্‌কা লাগিয়া থাকিবে। চণ্ডীদাসের মারা যাওয়া বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ রহিয়াছে দেখিতেছি।

'রসিক দাশ' সম্বন্ধে আমার মন্তব্য ভুল প্রতিপন্ন করিয়া দিবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত দীনেশ সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এরই সম্পূর্ণ সাহায্য লইয়াছেন বুঝা যাইতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর পাতা উল্টাইলেন, অথচ পদকর্ত্তাদের তালিকায় 'রসিক দাশ'কে খুঁজিয়া দেখিলেন না—ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। দুই-তিনটি কবিতা লিখিয়াই কেহ কবি হইতে পারেন না। 'রসিক দাশ' ভণিতাযুক্ত দুই-তিনটি পদ কোথাও পাওয়া গিয়া থাকিলে, সে পদগুলি চণ্ডীদাসের কি না বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র হইলেও—একখানি পুঁথি, যাহাতে রামীর সহিত চণ্ডীদাসের আগাগোড়া প্রণয় বর্ণিত রহিয়াছে; যাহার ৮টি পদের মধ্যে ৭টি চণ্ডীদাসের;—সূচনার পদটিমাত্র 'রসিক দাশ' ভণিতাযুক্ত—সে 'রসিক দাশ' চণ্ডীদাস নন্ কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

৪নং বক্তব্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার 'বাসুলী বাঁকুড়ার গ্রামাদেবী' মন্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। দুঃখিত হইলাম। বাঁকুড়া বাশুলীকে কোনক্রমেই বিশালাক্ষী হইতে দিতে পারিতেছে না।

শেষ বক্তব্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে চণ্ডীদাসের 'বাড়ি বাঁকুড়ার ছাতনায় হওয়া অসম্ভব নহে' বলিয়াছেন, সেই চণ্ডীদাসকে লইয়াই আমার প্রবন্ধ;—অর্থাৎ যিনি বাশুলীপূজক ছিলেন (বাঁকুড়ার ছাতনায় বাশুলী আছেন);—রামী ধোবানী ছিল যাঁর সাধন-গুরু (বাঁকুড়ার ছাতনায় রামী ধোবানীর ভিটা আছে);—নান্নুরের কবি বলিয়া খ্যাত যিনি (বাঁকুড়ার ছাতনায় নান্নুর মাঠ আছে);—'নিত্যা'র সহিত সংস্রবযুক্ত যিনি (বাঁকুড়ার ছাতনার সন্নিকট শালতোড়ায় নিত্যা আছেন); এবং যিনি বাংলার আদিকবি (বাঁকুড়ার ছাতনায় চণ্ডীদাসের সমাধি আছে)। এই কারণে চণ্ডীদাসকে বীরভূমের নান্নুরের কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই।

পরিশেষে বক্তব্য,—কোনও নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক আমার 'অধ্যাপক চণ্ডীদাস' প্রবন্ধটি আলোচিত হইলে আমি আমার শ্রম-সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

[এ-সম্বন্ধে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হইবে না।—প্রবাসীর সম্পাদক]

মেদিনীপুর জেলায় উড়িয়ার সংখ্যা

গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রামানুজ কর মহাশয় মেদিনীপুর জেলায় গত সেন্‌সসে কত উড়িয়া ছিল, তাহার হিসাব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিতেছেন—

"মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলকে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য উড়িয়ারা আন্দোলন করিতেছেন। গত সেন্‌সসে মেদিনীপুর জেলায় উড়িয়ার সংখ্যা কত হইয়াছে জানিতে পারিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মেদিনীপুর জেলার কোন অংশের উপর উড়িষ্যার দাবি টিকিতে পারে না।'

গত সেন্‌সসের পরিমাণ দেখিয়া উড়িয়ারা মেদিনীপুরের কতক অংশকে উড়িষ্যার সহিত মিশাইবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন না। মেদিনীপুর জেলার কতক স্থানে বহুকাল হইতে উড়িয়ারা বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের নিজ ভাষা ও সাহিত্য ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া বাংলাতে পরিণত হইয়া যাইতেছে। সেই কারণ, তাঁহাদের উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিলে তাঁহাদের মৃত ভাষা ও সাহিত্যের তথা জাতীয়তার পুনরুদ্ধার হইতে পারিবে, এই আশায় উড়িয়ারা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় উড়িয়ার সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষের অধিক ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই সংখ্যা কমিয়া গত সেন্‌সসে ৪৫,১০১ দাঁড়াইয়াছে। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে যে-পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তদনুসারে মেদিনীপুর জেলায় উড়িয়ার সংখ্যা ৯ লক্ষ ২০ হাজারের অধিক হইবার কথা।* কিন্তু তাহা না হইয়া ৪৫,১০১-এ পরিণত হওয়া কি দুঃখের কথা নয়!

এই অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে জাতীয়তার উন্নতি-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির সংখ্যা, সাহিত্য ও ভাষার শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, কিন্তু উড়িষ্যার বাহিরে স্থিত উড়িয়াদের সর্ব্ববিধ অবনতি ঘটিবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। বাউণ্ডারী কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইলে, এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার মোট লোক-সংখ্যা গত সেন্‌সস্ মতে ২৭,৯৯,০৯৩ জন। যদি উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় ৯ লক্ষ ২০ হাজার উড়িয়া থাকিতেন, তবে কর-মহাশয় উড়িয়াদের জন্য কি ব্যবস্থা করিতেন, সেটা ভাবিবার কথা।

মেদিনীপুরস্থ সুসভ্য বাঙ্গালী ভাইদের সহিত সংখ্যালঘিষ্ঠ উড়িয়ারা বাস করিয়া নিজ নিজ ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি না করিয়া ম্রিয়মাণ অবস্থায় থাকিয়া, নিজের জাতীয়তা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা কি ক্ষোভের বিষয় নয়? সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির রক্ষার্থ সর্ব্বত্র বিধিব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মেদিনীপুর জেলায় সে ব্যবস্থা না হইবার কারণ কি?

* Vide "The Problem of India's Over-population, *Modern Review*, November 1931 :—

The population increased at		9.6 per cent in		1881-91
,,	,,	1.4	,,	1891-01
,,	,,	6.4	,,	1901-11
,,	,,	1.2	,,	1911-21
,,	,,	10.0	,,	1921-31

মেদিনীপুর জেলা যে বহুকাল হইতে উড়িষ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য প্রদর্শন করিবার স্থান ইহা নয়। বঙ্গের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, মনোমোহন গাঙ্গুলী ও যোগেশচন্দ্র বসু প্রমুখাৎ সুসন্তানগণ মেদিনীপুরকে উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত থাকিবার কথা স্বীকার করিয়াছেন। আশা করি, কর-মহাশয় এই সব আলোচনা করিয়া নিজ মত পরিবর্ত্তন করিবেন এবং উড়িয়ারা যে অবৈধ আন্দোলন করিতেছেন না, তাহা উপলব্ধি করিবেন। মেদিনীপুর জেলায় এই আন্দোলন অল্পদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গের বিশিষ্ট সম্পাদকেরা বলিতেছেন, 'বাঙালীকে অবাঙালী করিও না।' কিন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হয় না, বরং ৯ লক্ষ ২০ হাজার উড়িয়ার বাঙালীতে পরিণত হওয়া বুঝা যায়।

অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে মেদিনীপুর জেলার উড়িয়াদের কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে তাহার প্রমাণ সেন্‌সস্ রিপোর্ট হইতে নিম্নে উদ্ধার করিলাম। আশা করি, বঙ্গের উদারহৃদয়বিশিষ্ট নেতারা অনুন্নত উড়িয়াদের প্রতি যে-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিবেন। বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল পরগণার উড়িয়াদের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, এবং সেখানে উড়িয়াত্ব আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা কর-মহাশয় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

১৮৮১ খৃঃ	প্রায় ৭ লক্ষ উড়িয়া
১৮৯১ খৃঃ	— —
১৯০১ খৃঃ	প্রায় ৫ লক্ষ ৭২ হাজার
১৯১১ খৃঃ	প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার
১৯২১ খৃঃ	প্রায় ১ লক্ষ ৮১ হাজার
১৯৩১ খৃঃ	৪৫,১০১ জন মাত্র।

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা

—

ভ্রম-সংশোধন

(১)

গত ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৬৮৪ পৃষ্ঠা প্রথম পাটি ৪২শ পংক্তিতে "রাণী বলিতেছে" স্থলে "রানী বলিতেছে" হইবে।

(২)

গত পৌষ মাসের 'প্রবাসী'র ৪৩২ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছিল,—

"প্রবাসে ভাইস্-চ্যান্সেলার পদে বাঙালী—শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর নিয়োগী নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।"

ইঁহার প্রকৃত নাম এম্ ভাস্কর রাও নিয়োগী; ইনি মান্দ্রাজ প্রদেশের লোক।

(৩)

গত মাসের 'প্রবাসী'তে ৬১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখকের ভ্রমক্রমে "F. M. Cornford in the *Cambridge Ancient History*" স্থলে "F. M. Conford in *The Cambridge History of India*" মুদ্রিত হইয়াছে।

শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মহাপাত্র, বি-এস্‌-সি

রসায়নশাস্ত্র শিল্পক্ষেত্রে যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ও উন্নতি আনয়ন করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আজ পৃথিবীর সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা জন্মলাভ করিয়াছে রাসায়নিকের ক্ষুদ্র টেষ্ট টিউব হইতে এ-কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। রাসায়নিকের গবেষণার ফলে কত মৃত শিল্প পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে, কত নূতন নূতন শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছে এবং রসায়নশাস্ত্র কত-দিকে কত প্রকার শিল্পকে যে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নহে। জার্ম্মেনী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে কত রাসায়নিক গবেষক নিযুক্ত রহিয়াছেন; কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, তাঁহারা রাসায়নিক গবেষকের বেতন এবং সাজসরঞ্জাম বাবদ যাহা খরচ করিতেছেন, তাহার সহস্রগুণ লাভ করিয়া লইতেছেন ব্যবসাতে। রাসায়নিক গবেষকের সাহায্যে শুধু যে এক একটা শিল্পে প্রচুর টাকা আদায় করিয়া লইতেছেন তাহা নহে, গবেষণার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি প্রধান শিল্প হইতে কত প্রকারের শিল্প যে গজাইয়া উঠিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কোন কাজে লাগিবে না, অব্যবহার্য্য বলিয়া যে-সকল দ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া হয়, রাসায়নিক তাহা হইতে সোনা ফলাইয়া লইতেছেন। এক কলিকাতায় প্রায় চারি শত ক্ষুদ্রবৃহৎ চামড়ার কারখানা রহিয়াছে। এই সকল ট্যানারীতে প্রতিদিন শত শত কাঁচা চামড়া কাটিয়া ছিঁড়িয়া অব্যবহার্য্য অংশ বাদ করিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রতিদিন শুধু কলিকাতা শহরেই ঐ প্রকারে বহু মণ অব্যবহার্য্য কাঁচা চামড়ার টুক্‌রা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যদি কেহ গবেষণার দ্বারা ঐ সমস্ত টুক্‌রা চামড়া হইতে শিরিশ প্রস্তুত কিরূপে সম্ভবপর হইবে ঠিক করিয়া ঐ প্রকার একটি কারখানা খোলেন, তাহা হইলে ট্যানারীর ঐ সকল টুক্‌রা টুক্‌রা দুর্গন্ধ চামড়া হইতে বুদ্ধির কৌশলে টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু এক্ষণে সমস্ত ভারতবর্ষে ঐরূপ একটিও কারখানা নাই।

সুন্দরবনের ভীষণ জঙ্গলে গরান, সুন্দরী প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর রহিয়াছে। সকলেই এতদিন ঐ সমস্ত বৃক্ষকে জ্বালানী কাঠ এবং কাঁচা ঘর প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করিত। ঐ সমস্ত বৃক্ষের কষ হইতে যে কাঁচা চামড়া পাকা করা যায়, তাহা ভারত গভর্ণমেণ্টের ট্যানিং এক্সপার্ট পিল্‌গ্রিম সাহেবই গবেষণার দ্বারা আবিষ্কার করেন। এক্ষণে যদি ঐ গরানের কষে উপযুক্ত রূপ চামড়া প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে ভারতে ট্যানিং শিল্পের অত্যন্ত উপকার হইবে।

টার্টারিক এসিড একটা অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বাজারে ইহার বেশ কাট্‌তি, জানা গিয়াছে তেঁতুলে এই টার্টারিক এসিড আছে, আমাদের দেশে বহু তেঁতুল জন্মে, তাহার সামান্য অংশ মাত্র আমাদিগের জিহ্বার অম্লরসের খোরাক জোগায়, বাকী বেশীর ভাগ অংশ নষ্ট হইয়া যায়। গবেষণার দ্বারা যদি ঐ তেঁতুল হইতে টার্টারিক এসিড প্রস্তুতের একটি শিল্পোপযোগী প্রণালী (commercial process) আবিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে টাকা আদায়ের একটা নূতন উপায় সৃষ্টি হয়। এই প্রকার কত উপায়ে নূতন নূতন গবেষণার দ্বারা দেশের শিল্পের উন্নতি করিয়া যে ধনবৃদ্ধির সহায়তা করা যাইতে পারে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ কেহই দিতে পারিবেন না।

কয়লা একটি খনিজ পদার্থ। সহস্র সহস্র বৎসর ভূগর্ভের চাপে থাকিয়া বৃক্ষবহুল বনানী পাথুরে কয়লার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের মতে কয়লার জন্মের কারণ। ইহার রং ঝিম্ কালো, টিপিয়া একটুও

রসের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং দেখিতে একেবারেই নয়নপ্রীতিকর নহে। ইহাকে পোড়াইয়া অগ্নি উৎপাদন করা ছাড়া যে অন্য কোন কাজে লাগাইতে পারা যায় তাহা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। কিন্তু রাসায়নিক যে এই শক্ত, বিশ্রী পাথুরে কয়লা হইতে কত প্রকারের দ্রব্য বাহির করিয়া লইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একটি পুস্তকের প্রয়োজন হয়। এক কথায় বলিতে গেলে এই পাথুরে কয়লা হইতে এক দিকে যেরূপ মনুষ্যধ্বংসকারী বিস্ফোরক প্রস্তুত হইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ মনোমুগ্ধকর কত প্রকারের সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া মানবের বিলাসের উপকরণ যোগাইতেছে, ইহা হইতে যে কত প্রকার কৃত্রিম রঙের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। এই কয়লা হইতেই এক প্রকার গ্যাস অথবা বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়, যাহা বড় বড় শহরে রাত্রির অন্ধকার দূর করিতেছে; এবং প্রচুর পরিমাণে উত্তাপও এই গ্যাস হইতে পাওয়া যাইতেছে। এই কয়লা হইতেই য্যামোনিয়া নামক এক প্রকার যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়, যাহা মানুষের বহু প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। এই কয়লা হইতে পিচ্ নামক এক প্রকার অর্দ্ধতরল পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে, যাহা কত প্রকার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। এই পিচ শহরের কঙ্করময় বন্ধুর পথকে মসৃণ ও নরম করিয়া দিতেছে, এই কয়লা হইতেই ন্যাপথালীন্ নামক একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে যাহা প্রধানতঃ বহুমূল্য গ্রন্থ বস্ত্র প্রভৃতিকে কীটের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেছে, এই কয়লা হইতেই কোক্ পাওয়া যায়; ইহা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে প্রতিদিন সহস্র সহস্র কোটি টন্ জলকে জলীয় বাষ্পে পরিণত করিয়া যে বিপুল কল্পনাতীত শক্তির জন্ম দিতেছে, তাহাকে এক কথায় এই জগতের শক্তির আধার বলা যাইতে পারে। এক কথায় বলিতে গেলে, পৃথিবীর যান্ত্রিক সভ্যতা এক পদও এই বিশ্রী, নীরস পাথুরে কয়লা ছাড়া অগ্রসর হইতে পারে না। আজ কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হইতে বসিয়াছে। আজ বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তার বিষয় হইয়াছে—যখন এক সময় জগতে কয়লার খনি শূন্য হইয়া যাইবে তখন তাহার নিজে হাতে গড়া এই সভ্যতার পরিণাম কি হইবে! তাই আজ এই সামান্য কয়লার এই দাম। তাই যে দেশে যত অধিক কয়লার খনি রহিয়াছে সে দেশ শিল্পে তত বেশী পরিমাণে উন্নত বলা যাইতে পারে।

এই পাথুরে কয়লাকে যদি একটি বায়ুশূন্য পাত্রে উত্তাপ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে উহা হইতে সর্ব্বপ্রথম চারিটি দ্রব্য পাওয়া যায়, (১) একটি গ্যাস অথবা বায়বীয় পদার্থ, (২) টারী লিকুইড (tarry liquid) অথবা কোল্‌টার, (৩) তৃতীয় য্যামোনিয়াক্যাল লিকার্ (amoniacal liquor) অথবা য্যামোনিয়া, (৪) চতুর্থ কোক্ (coke) অথবা জ্বালানী কয়লা। পাথুরে কয়লা হইতে এই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহের জন্য কত বড় বড় কারখানার সৃষ্টি হইয়াছে। কতকগুলি কারখানায় কোক্ অথবা জ্বালানী কয়লা উৎপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, তাহাদিগকে কোক্ ওভেন্ (coke oven) বলে। টাটার লৌহের কারখানায় ঐরূপ কোক্ ওভেন্ রহিয়াছে, এবং অবশিষ্ট কারখানায় কোল-গ্যাস (coal gas) প্রস্তুত প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, কলিকাতায় ঐ প্রকার কারখানা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কোল গ্যাস্ প্রস্তুতের কারখানায় পাথুরে কয়লাকে বায়ুশূন্য পাত্রের ভিতর বাহির হইতে প্রায় ১২০০-১৪০০ ডিগ্রি (সেন্টিগ্রেড্) উত্তাপ প্রদান করিলে তাহা হইতে একটি গ্যাস অথবা বায়বীয় পদার্থ নির্গত হইয়া আসে; উহাকে অবিশুদ্ধ (crude) কোল গ্যাস বলা যাইতে পারে। যেটি জমাট (solid) অবস্থায় সেই পাত্রের ভিতর থাকিয়া যায়, তাহাকে কোক্ অথবা জ্বালানী কয়লা বলে। ঐ অবিশুদ্ধ গ্যাসকে হাইড্রলিক মেন্ (hydraulic main) নামক একটি জলপাত্রের ভিতর দিয়া চালনা করা হয়। তাহাতে বায়বীয় উত্তপ্ত কোল গ্যাস ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে কিয়ৎপরিমাণে তরলপদার্থে পরিণত হইয়া ঐ পাত্রটিতে থাকিয়া যায়। তরলীকৃত কোল্ গ্যাস ঐ পাত্রে দুইটি স্তরে ভাগ হইয়া যায়। উপরের স্তরটি হাল্কা; উহাকে য্যামোনিয়াক্যাল্ লিকার্ বলে। নিম্নের স্তরটি ভারী, উহাকে কোল্‌টার বলে। এই কোল্‌টারের সহিত আর একটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য জমিয়া যায়; তাহাকে ন্যাপথালীন বলে। [illegible]

পরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচ্ছিন্ন করা হয়। হাইড্রলিক্ মেন্-এর ভিতর দিয়া চালনা করিবার পর কোল গ্যাসকে আবার কতকগুলি লম্বা নলের ভিতর দিয়া চালনা করা হয়। ঐ নলগুলিকে বাহির হইতে ঠাণ্ডা জল কিংবা ঠাণ্ডা বাতাসের সাহায্যে ঠাণ্ডা রাখা হয়। উদ্দেশ্য যদি কিছু কোল্‌টার বায়বীয় অবস্থায় থাকিয়া যায়, তবে তাহা ঐ নলের ভিতর জমিয়া যাইবে। ইহাতেও আশা মিটে না। লম্বা নলের পর গ্যাসকে টার এক্সট্রাক্‌টার (tar extractor) নামক আর একটি যন্ত্রের ভিতর দিয়া চালনা করা হয়। ইহাতে যা-কিছু টার অবশিষ্ট থাকে, ঐখানে জমিয়া তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিশ্রী, দুর্গন্ধ কোল্‌টারের এমনিই আদর। যাহাতে উহার এক ফোঁটাও নষ্ট না হয়, তাহার জন্য কত চেষ্টা। টার এক্সট্রাক্‌টার হইতে বাহির হইবার পরে কোল্ গ্যাসকে ওয়াটার স্ক্রাবার্ (water scrubber) নামক আর একটি যন্ত্রের ভিতর দিয়া চালনা করা হয়। ঐখানে কোল্ গ্যাসে অন্যান্য যে সকল অবিশুদ্ধ গ্যাস অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ থাকে, তাহা দূর হইয়া যায় এবং কিছু য়্যামোনিয়াও জমিয়া যায়। এই য়্যামোনিয়াটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ; উহার বেশীর ভাগই হাইড্রলিক মেন-এ জমিয়া গিয়াছিল। অবশেষে কোল্ গ্যাসকে কতকগুলি পিউরিফায়ার্স-এর (purifiers) ভিতর দিয়া চালনা করা হয়; তাহাতে তাহার সমস্ত অবিশুদ্ধ অংশ পিউরিফায়ার্সের ভিতর থাকিয়া গিয়া গ্যাসটিকে আলো এবং উত্তাপ প্রদানের সম্পূর্ণরূপে উপযোগী করা হয়, সর্ব্বশেষে ঐ গ্যাসকে গ্যাস হোলডার্ (gas-holder) নামক একটি বৃহৎ বৃত্তাকার পাত্রে জমাইয়া রাখা হয়, ঐ পাত্রের সহিত শহরের সমস্ত গ্যাস সরবরাহকারী নলগুলির সংযোগ থাকে এবং দরকার-মত গ্যাস উহা হইতে চালিত হইয়া সমস্ত শহরকে আলোকিত করে। ইহা উত্তাপরূপেও কত উপকার করে; এমন কি প্রয়োজন হইলে রান্নার ব্যবস্থাও করিতে পারে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম লণ্ডনের রাস্তা কোল গ্যাস্ দ্বারা আলোকিত করা হয়। এক্ষণে কোল গ্যাস শিল্প-জগতের একটি প্রধান শিল্পে পরিণত হইয়াছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহা হইতে উত্তাপ এবং আলোক সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক্ষণে শুধু ইংলণ্ডেই প্রতিবৎসর ১৬০,০০০,০০০ (এক কোটী ষাট্ লক্ষ) টনের অধিক পাথুরে কয়লা এই গ্যাস প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা হয়।

বৈদ্যুতিক আলোকশিল্প এই গ্যাসশিল্পের এক ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যুতিক আলোর এক প্রধান সুবিধা এই যে, এক স্থানে সুইচ্ অর্থাৎ চাবি টিপিলেই সমস্ত শহর সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত হইয়া উঠে; কিন্তু গ্যাসের আলোতে প্রত্যেকটি বাতি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া জ্বালিতে হয়। বৈদ্যুতিক আলোর বহুল প্রচারে এক সময় গ্যাস আলো লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। বিপদ হইল কোল গ্যাস কারখানায় মালিকগণের। বহু সহস্র লোক তখন ঐ শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং বড় বড় শিল্পগৃহ গড়িয়া উঠিয়াছে। এমন সময় যদি কোল গ্যাসের ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পাথুরে কয়লায় উত্তাপ প্রদান করিয়া অন্যান্য যে-সমুদয় দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাদের দাম বাড়িয়া যাইবে অতএব তাহাদিগের চাহিদা কমিয়া যাইবে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে Auer নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার ইন্‌কান্‌ডেসেণ্ট ম্যানটল্ (incandescent mantle) আবিষ্কার করিয়া কোল গ্যাস শিল্পকে বৈদ্যুতিক আলোর ভীষণ প্রতিযোগিতায় বিলুপ্তি হইতে রক্ষা করিল। অধুনা কারবিউরেটেড ওয়াটার গ্যাস (carburetted water gas) নামক অন্য একপ্রকার গ্যাস কোল গ্যাসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। তাহাতে উহার উত্তাপ-উৎপাদন-ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। এক্ষণে আমরা বেশ বলিতে পারি যে, কোল গ্যাসের আলো বৈদ্যুতিক আলোর প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে।

পাথুরে কয়লায় উত্তাপ প্রদান করিয়া যে কালো, বিশ্রী, দুর্গন্ধ কোলটার পাওয়া যায়, তাহা রাসায়নিকের নিকট সৌন্দর্য্য এবং সুগন্ধের খনি, কত প্রকারের সুগন্ধি আতর এবং বিভিন্ন প্রকারের রং যে ইহা হইতে পাওয়া যায়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিবার উপায় এখানে নাই। শুধু যে রং এবং আতরই ইহা হইতে পাওয়া যায় তাহা নহে, আরও অনেক বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য এই কোল্‌টার হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র ইংলণ্ড শহর হইতে প্রায় ৩,৫৪,৩৩,০০০ (তিন

কোটি, চুয়ান্ন লক্ষ, তেত্রিশ হাজার) টাকা মূল্যের কোলটার এবং তাহা হইতে প্রস্তুত অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। কোলটার একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া অগ্নি অথবা গরম বাষ্পের সাহায্যে গরম করিলে উহা এক প্রকার বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়। ঐ বায়বীয় পদার্থ অথবা গ্যাসকে একটি দীর্ঘ নলের ভিতর দিয়া চালনা করা হয়। ঐ নলের চারিপাশে ঠাণ্ডা জল রাখা হয়। বায়বীয় কোলটার ঠাণ্ডা নলের ভিতর দিয়া যাইবার সময় পুনরায় তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং উহা একটি পাত্রে সংগৃহীত হয়। কোলটারের পাত্রে বিভিন্নরূপ উত্তাপ প্রদান করিলে বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট পদার্থ সংগৃহীত হয়। এই প্রকারে কেবল মাত্র উত্তাপের তারতম্যের দ্বারা কোলটার হইতে চারি প্রকার তৈলময় পদার্থ বাহির করিয়া লওয়া হয়। যে জিনিষটি সর্ব্বশেষে কোলটারের পাত্রে পড়িয়া থাকে তাহাকে পিচ বলে।

এই চারিটি তৈলময় তরল পদার্থই কোল্‌টার হইতে যত প্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্মদাতা। আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে নীলের চাষ হইত। এই নীল হইতে এক প্রকার রং বাহির করা হইত। শুধু নীল কেন, অনেক উদ্ভিদ হইতেই নানা প্রকারের রং পাওয়া যায় ইহা হইতেছে প্রকৃতিদত্ত রং। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে। সে কোল্‌টারে প্রস্তুত উপরোক্ত চারি প্রকার তৈলময় পদার্থ হইতে কৃত্রিম উপায়ে সহস্রাধিক রঙের সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির উপর বিজ্ঞানের জয়ঘোষণা করিতেছে। ইংরেজদের প্রতিকূলতায় আমাদিগের দেশের নীলের চাষ কি পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিতে চাহি না, কিন্তু ইহা সত্য যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এক জার্ম্মান ফার্ম্ম যখন কৃত্রিম উপায়ে সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত ঠিক নীলের রঙই বাজারে ছড়াইয়া দিল তখন ভারতে নীলের চাষের ভিত্তি নড়িয়া উঠিল। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পারকিন্ (Perkin) নামক জনৈক রাসায়নিকের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুতের শিল্প ইংলণ্ডে জন্ম লাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু হইলে কি হয়, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মেনীই কৃত্রিম রঙ শিল্পে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯১০ খৃঃ অঃ সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় ৩০,০০,০০,০০০ (ত্রিশ কোটী) টাকা মূল্যের কৃত্রিম রঙ প্রস্তুত হইয়াছিল; তন্মধ্যে কেবল জার্ম্মেনীই উহার ¾ অংশ অর্থাৎ প্রায় ২২॥ (সাড়ে বাইশ কোটী) টাকা মূল্যের কৃত্রিম রং প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ জার্ম্মেনী শিল্পক্ষেত্রে গবেষণার মূল্য বুঝিয়াছিল। তাই জার্ম্মেনীর রঙ শিল্প ব্যবসাদারের দ্বারা চালিত না হইয়া রাসায়নিকের ক্ষুদ্র টেষ্ট টিউবের দ্বারা চালিত হইয়াছিল। জার্ম্মেনীর Badische Auiliu und Soda-Fabrik নামক কারখানাটি জগতের মধ্যে বৃহত্তম কৃত্রিম রং প্রস্তুতের কারখানা। ইহাতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৭৫০০ শত মজুর, ৭০৯ জন কেরাণী এবং ১৯৭ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত রাসায়নিক, ৯৫ জন এঞ্জিনীয়ার দৈনিক কার্য্য করিত। ঐরূপ আরও কয়েকটি বড় বড় রঙের কারখানা জার্ম্মেনীতে রহিয়াছে। জার্ম্মেনী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কেবল-মাত্র ইউনাইটেড কিংডমকে (United Kingdom) প্রায় ৩,৬৯,২৫,৫০০ (তিন কোটী উনসত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার, পাঁচ শত) টাকা মূল্যের কৃত্রিম রং বিক্রয় করিয়াছিল এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র ইউনাইটেড্ ষ্টেটসকে ১,১৯,৬০,০০০ (এক কোটি, উনিশ লক্ষ, ষাট হাজার) টাকা মূল্যের ঐ প্রকার রঙ বিক্রয় করিয়াছিল। জার্ম্মেনী শুধু নীল (অর্থাৎ যে নীল বৃক্ষ বিশেষ হইতে সংগৃহীত হয়), রংটা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে কিরূপ লাভ করিয়া লইতেছে দেখুন! ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেনী সর্ব্বসমেত ৩,০০,০০,০০০ (তিন কোটি) টাকার কেবল মাত্র কৃত্রিম নীল রং বিক্রয় করিয়াছিল। কৃত্রিম উপায়ে রঙ প্রস্তুত শিল্পের প্রবর্ত্তন হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসরের মধ্যে আজ ইহা বিজ্ঞান এবং চেষ্টার ফলে কত বড় একটা শিল্পে পরিণত হইয়াছে! একটা শিল্প যখন বড় হইয়া উঠে তখন টাকা যে কত দিক দিয়া আসে তাহা বলা যায় না, এই এক কৃত্রিম রংপ্রস্তুত শিল্প উন্নত হওয়াতে রঞ্জন-শিল্পের অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে।

আজ বৈজ্ঞানিক যে এই দুর্গন্ধ কোলটার হইতে নানা প্রকার আতর বাহির করিয়া টাকা উপায়ের নূতন রাস্তা

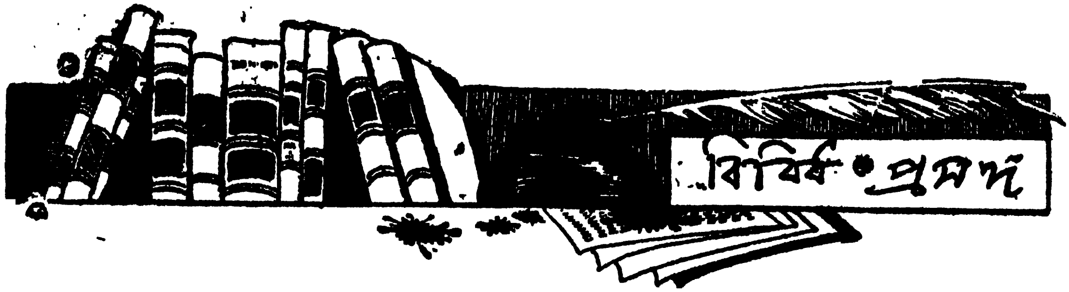
খুলিয়া দিয়াছে তাহাও বলিয়াছি। সে সকল সুগন্ধি দ্রব্য অসংখ্য প্রকারের হইতে পারে। জার্ম্মেনী এ বিষয়েও পৃথিবীর সকল দেশের অগ্রণী। এই কোলটারের আতর বিক্রয় করিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেনী প্রায় ৩,০০,০০,০০০ (তিন কোটী) টাকা পাইয়াছিল। ব্যাপার কি বুঝুন!

আজকাল জার্ম্মেনী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে সকল বারুদ প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতেও কোলটার রহিয়াছে। অতএব ইহার ভিতর রুদ্রের তেজও রহিয়াছে!

আধুনিক শিল্পের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কোন একটি প্রধান শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার সময় তাহা হইতে বাজে বলিয়া যে সকল জিনিষ পাওয়া যায়, কারখানার মালিকগণের চেষ্টা হয়—কি উপায়ে সেই বাজে জিনিষগুলাকে কাজের জিনিষে পরিণত করা যায়। এই কোলগ্যাস শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য গ্যাস প্রস্তুত করা; কিন্তু দেখিলেন, এই গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় পাওয়া যায় কোল্ গ্যাস, কোলটার, য়্যামোনিয়া এবং কোক। বৈজ্ঞানিক উপায়ে উপরোক্ত প্রত্যেকটি জিনিষ কত প্রকার কাজে লাগাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; এক কোলটার হইতে কত অসংখ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে। কোল গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় এত প্রকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায় বলিয়াই কোল গ্যাস নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়াও কারখানার মালিকগণ লাখপতি হইয়া যায়। আজ শিল্পক্ষেত্রে যিনি যত পরিমাণে ঐরূপে বাজে জিনিষকে কাজের জিনিষে পরিণত করিতে পারিবেন, তিনি তত কম মূল্যে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিবেন।

গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে ১৪,৬৫,৯৫১ (চৌদ্দ লক্ষ, পঁয়ষট্টি হাজার, নয়শত একান্ন) টাকা মূল্যের হলুদ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। এই হলুদে যে এক প্রকার রং বর্ত্তমান থাকে, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। ভারত যদি হলুদ হইতে সেই রঙটি বাহির করিয়া বিক্রয় করে তাহা হইলে সে প্রায় ঐ চৌদ্দ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজারের বহুগুণ টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। ভারতকে প্রতি বৎসর শুধু টার্টারিক এসিড ক্রয় করিতে হয় প্রায় তিন লক্ষ টাকার, যদি সে ঐ জিনিষটি তেঁতুল হইতে বাহির করিয়া লয় তাহা হইলে ঐ টাকাটা ত দেশে থাকিয়া যায়ই, উপরন্তু বাহির হইতে কিছু টাকা আদায় হইয়া যায়। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ উক্তবর্ষে ভারত শুধু ২,২৪,৮৩,৬২৮ (দুই কোটি, চব্বিশ লক্ষ, তিরাশীহাজার, ছয়শত আটাশ) টাকা মূল্যের বীটরুট চিনি ক্রয় করিয়াছে। ঐ চিনির আবিষ্কার করিয়াছিল জার্ম্মেনী। বীট নামক একপ্রকার গাছ ঐ দেশে হয়, তাহারা বিজ্ঞানের বলে উহার শিকড় হইতে চিনি বাহির করিয়া কত টাকা লুটিয়া লইতেছে। উক্তবর্ষে ভারতবর্ষ কোলটার হইতে প্রস্তুত কৃত্রিম রং ক্রয় করিয়াছিল ১,৯৭,৩২,৭১৬ (এক কোটি, সাতানব্বই লক্ষ, বত্রিশ হাজার, সাত শত ষোল) টাকা মূল্যের, শুধু কৃত্রিম নীল রঙটা ক্রয় করিয়াছিল ৭২,৮৭৭ (বাহাত্তর হাজার, আটশত সাতাত্তর) টাকা মূল্যের। ঐ কৃত্রিম নীলরঙের আবিষ্কার হয় জার্ম্মেনীতে। ফলে ভারত নীলের চাষ করিয়া যে টাকাটা পাইত, তাহা ত মারা গেল, তা ছাড়া তাহাকে প্রায় বাহাত্তর হাজার টাকার অধিক নীল রং কিনিতে হইল। বিজ্ঞানের এমনই প্রভাব। উক্ত বর্ষে ভারত শুধু গ্লু ক্রয় করিয়াছিল প্রায় সাড়ে আটলক্ষ টাকা মূল্যের; অথচ আমাদের দেশের ট্যানারীর টুক্‌রা চামড়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে; তাহা হইতে গ্লু কেহ করে না।

জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড, জাপান এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশ শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া প্রতিবৎসর কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়া লইতেছে। ভারতে যদি শিল্পের উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে যত সত্বর ঐ সকল দেশের অনুসরণ করা যায় তত মঙ্গল। মানুষের রোগের চিকিৎসার জন্য যেরূপ স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় রহিয়াছে, ভারতের শিল্পের উন্নতি করিতে লইলে শিল্পের চিকিৎসা এবং রোগনির্ণয় করিবার জন্য সেইরূপ বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের দরকার হইয়াছে। উপযুক্ত অর্থ, ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগদ্বারা ভারত প্রকৃতপক্ষে শিল্পক্ষেত্রে পৃথিবীর অগ্রণী হইতে পারে।



শান্তিবাদ

ইংরেজীতে যাহাকে প্যাসিফিসিজ্‌ম্ বা প্যাসিফিজ্‌ম্ বলে আমরা তাহাকে শান্তিবাদ বলিতেছি। প্যাসিফিসিজ্‌ম্ দ্বারা এই মত প্রকাশ করা হয়, যে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধের বিলোপ সাধন আবশ্যক এবং সম্ভবপর। এই মত সম্বন্ধে কিছু চিন্তা আজকাল অনেকের মনেই উদিত হইয়াছে। কারণ, পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন লীগ্ অব্ নেশুন্সের বা রাষ্ট্রসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বড় বড় রাষ্ট্রজাতির (নেশ্যনের) মধ্যে কয়েকটা চুক্তি হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক চলিতেছে, অথচ রাষ্ট্রসংঘের সভ্য চীন এবং জাপানে যুদ্ধও চলিতেছে।

একই দেশের একজন অধিবাসী চড়াও হইয়া অন্য কোন অধিবাসীকে আক্রমণ করিলে, তাহা সকল সভ্য দেশে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপ একে অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করিলে তাহাও সকল সভ্য দেশে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। সকল সভ্য দেশের গবন্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে খুব ধনী সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ অপরাধীকেও বিচারান্তে শাস্তি দিতে সমর্থ। এরূপ শাস্তি দিবার জন্য আইন আদালত বিচারক আছে। সকল সভ্য দেশেই কতকগুলা অপরাধীর যে শাস্তি হয় না, তথাকার গবর্ন্মেণ্টের অক্ষমতা তাহার কারণ নহে—কারণ অন্য নানা রকম থাকিতে পারে। প্রত্যেক সভ্য দেশে বা রাষ্ট্রে এক এক জন চোর, গুণ্ডা, ঘাতক প্রভৃতির শাস্তির জন্য যেমন আইন আদালত আছে, দলবদ্ধ চোর ডাকাত গুণ্ডা ঘাতকদের শাস্তির জন্যও সেইরূপ বন্দোবস্ত আছে।

ইহা সত্ত্বেও কেহ বলিতে পারেন, আমাকে কেহ মারিতে বা আমার ধন চুরি করিতে আসিলে আমার সামর্থ্য থাকিলেও আমি বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহার কাজে বাধা দিব না, আমার সর্ব্বনাশ হইলেও এবং আমার প্রাণনাশের সম্ভাবনা হইলেও আমি বলপ্রয়োগ করিব না। আত্মরক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ সাত্ত্বিক নিষ্ক্রিয় ভাব অবলম্বন করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু যিনি অন্যের ধনপ্রাণসম্মানের রক্ষক, তিনি যদি দেখেন, সেই অন্য ব্যক্তির ধনপ্রাণসম্মান বিপন্ন, তাহা হইলেও চরম উপায় স্বরূপ বলপ্রয়োগ উচিত কি না, বিবেচ্য নহে কি ?

ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া নেশ্যন বা রাষ্ট্রজাতির কথা ভাবিয়া দেখা যাক। এক রাষ্ট্রজাতির পক্ষে চড়াও হইয়া অন্য রাষ্ট্রজাতিকে আক্রমণ করা অনুচিত, ইহা আধুনিক সভ্য জগতের মত। যে রাষ্ট্রজাতি বাস্তবিক এইরূপ আক্রমণ করে, তাহারাও বাহ্যতঃ এই মত মানিয়া চলিবার ভাণ করে। কারণ, তাহারাও প্রচার করে, যে, তাহারা বস্তুতঃ অকারণ চড়াও হইয়া আক্রমণ করিতেছে না, অপর পক্ষ কিছু অন্যায় আচরণ করায় আক্রমণ করিতেছে কিংবা নিজের অধিকার রক্ষার জন্য করিতেছে ;—যেমন এখন জাপান চীন আক্রমণ সম্বন্ধে বলিতেছে। অতীত কালে এক রাষ্ট্রজাতির বা নৃপতির চড়াও হইয়া অন্যকে আক্রমণ, আজকালকার মত, অন্ততঃ মতপ্রকাশ হিসাবেও, অন্যায় মনে করা হইত না। হিন্দুরাজাদের দিগ্বিজয়, মুসলমান রাজাদের মুল্‌ক্‌-গিরি, অখ্রীষ্টিয়ান ও খ্রীষ্টিয়ান ইউরোপীয় রাজাদের পররাজ্যজয় সেকালে গৌরবের বিষয়ই ছিল।

কিন্তু কেতাবে কাগজে ও মুখের কথায় বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্রজাতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ব্যাপক ডাকাতি ও নরহত্যা দূষণীয় বলিয়া উক্ত হইলেও, রাষ্ট্রজাতীয় এইরূপ অপরাধের শাস্তি বা নিবারণোপায় দেখা যাইতেছে না। সাধারণ চোর বা চোরসমষ্টি কতকটা ভয়ে, কতকটা সামাজিক মতের প্রভাবে, তাহাদের দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে। কিন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্রজাতি কাহাকে ভয় করিবে, কাহার মতের প্রভাব অনুভব করিবে? সভ্য জগৎ ? সভ্য

জগৎ মানে কতকগুলি সভ্য দেশের সমষ্টি। জাপান আজ যাহা করিতেছে, প্রবলতম সভ্য দেশগুলির প্রত্যেকেই ইতিহাসের কোন-না-কোন যুগে তাহা করিয়াছে। সুতরাং জাপানের উপর তাহাদের কোন নৈতিক প্রভাব খাটিতে পারে না। তবে, যদি কোন রাষ্ট্রজাতি স্বকৃত অতীত অপরাধে অনুতপ্ত হইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অতীত দুষ্কর্ম্ম দ্বারা লব্ধ পরদেশ ধন বা সুবিধা বর্ত্তমানে ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে জাপানকে অন্ততঃ উপদেশ দিবার অধিকার, ক্ষমতা ও সাহস তাহার জন্মিত। কিন্তু সেরূপ প্রায়শ্চিত্ত কোন প্রবল রাষ্ট্রজাতি করে নাই। অন্যান্য কারণের মধ্যে এই কারণে কোন রাষ্ট্রজাতি বা রাষ্ট্রজাতিসংঘ জাপানকে উপদেশ দিতে বা তিরস্কার করিতে চাহিতেছে না। তাহা করিলেও জাপান গ্রাহ্য করিত না।

রাষ্ট্রসংঘ বা লীগ অব্ নেশ্যন্সের লিখিত এবং তাহার সভ্যপদে অধিষ্ঠিত প্রত্যেক দেশের দ্বারা স্বীকৃত নিয়ম এই, যে, ঐরূপ দুই দেশে কোন ঝগড়া বিবাদ হইলে লীগের মধ্যস্থতায় তাহার মীমাংসা করাইতে হইবে। কিন্তু চীন নালিশ করিলেও জাপান লীগের মধ্যস্থতায় রাজী হয় নাই; সামান্য অল্পস্বল্প মৌখিক রাজী হইলেও, লীগের মীমাংসার জন্য অপেক্ষা করে নাই। চীনের ও জাপানের প্রতিনিধিদের সহিত লীগের কৌন্সিলের কথাবার্ত্তা চলিবার সময়েও জাপান যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছে।

প্রবলতম রাষ্ট্রজাতিরা যে তাহাদের অতীত কালের অপকর্ম্মে লজ্জিত থাকাতেই জাপানের দুষ্কর্ম্মে বাধা দিতেছে না, তাহা নহে। তাহাদের অধিকাংশের এখন ক্ষমতা নাই। গত মহাযুদ্ধে জেতা বিজিত অনেক প্রবল দেশই অল্পাধিক নাজেহাল হইয়াছে। ঐ মহাযুদ্ধে জাপানের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। ব্রিটেনের এখন যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই। পরাজিত জার্ম্মেনীরও কোন পক্ষে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই। যেরূপ শোনা যাইতেছে, ফ্রান্স জাপানকে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম বিক্রী করিয়া বেশ কিছু লাভ করিবার ফন্দীতে আছে। আমেরিকার এই ভয় থাকা অসম্ভব-নহে, যে, সে চীনের পক্ষ অবলম্বন করিলে হয়ত জাপান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করিতে পারে। হয়ত সেই জন্য আমেরিকার বিস্তর রণতরী প্রশান্ত মহাসাগরে আসিতেছে বলিয়া রয়টারের তারের খবর প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ সামুদ্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত নহে বলিয়া তাহাও চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধে ব্রিটেনের নিশ্চেষ্ট থাকার একটা কারণ হইতে পারে।

চীন "সভ্যজগতে"র নৈতিক প্রভাবের আনুকূল্য কিংবা প্রবল কোন দেশের সামরিক সাহায্য পাইতেছে না; লীগ অব নেশ্যন্সের দ্বারাও চীনের অভিযোগের কোন প্রতীকার হইতেছে না। কারণ যাহাই হউক, অবস্থা এইরূপ।

তাহা হইলে শান্তিবাদের কি হয়? শান্তিবাদের মানে, কোন অবস্থাতেই যুদ্ধ-না-করা;—চড়াও হইয়া কোন দেশকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ-না-করা, এবং অন্যে আক্রমণ করিলেও আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ না-করা। গায়ে পড়িয়া পরদেশ আক্রমণ করিব না, ডাকাতের মত আক্রমণ করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করা ও তাহা রক্ষা করা প্রকৃত সভ্য প্রত্যেক দেশেরই চেষ্টাসাধ্য। কিন্তু অন্য দেশের লোকেরা যদি কোন দেশ আক্রমণ করে, যেমন জাপান চীনকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহা হইলে শান্তিবাদীরা আক্রান্ত দেশকে কি করিতে বলেন? সাধারণ চুরি ডাকাতী নিবারণের এবং চোর ডাকাত ধরিবার ও তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য পুলিস ও আইন আদালত আছে (যদিও তাহা সত্ত্বেও আত্মরক্ষায় অসমর্থ অনেক গৃহস্থের সর্ব্বনাশ ও প্রাণনাশ হয়)। কিন্তু আন্তর্জাতিক দস্যুতা নিবারণের ও আন্তর্জাতিক অপরাধীদিগের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা থাকিলেও আদালত কোথায়? আদালত থাকিলেও তাহার বিচার অনুসারে শাস্তি দিবার এবং মীমাংসা অনুসারে চলিতে আততায়ীকে বাধ্য করিবার কার্য্যকর উপায় কই?

তাহা হইলে শান্তিবাদী দেশ কি করিবে? যে-কেহ উহা আক্রমণ করিবে, তাহার দাসত্ব স্বীকার করিবে? এস্থলে দেশের লোক ও দেশের গবর্মেণ্ট এক কি না, তাহা স্থির করিতে হইবে। চীনেরই দৃষ্টান্ত লউন। অন্য সব দেশের গবর্মেণ্টের ন্যায় চীনের গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য, দেশের

স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং দেশের আবালবৃদ্ধ সব নরনারীর ধন প্রাণ ইজ্জৎ রক্ষা করা। চীনের গবর্মেণ্ট যদি জাপানের বশ্যতা স্বীকার করে, তাহা হইলে দেশের স্বাধীনতা থাকে না এবং অধিবাসীদের ধন প্রাণ ইজ্জৎ বিপন্ন হয়; সুতরাং চৈনিক গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি হয়। চীনের গবর্মেণ্ট দেশের সব লোকের মত লইয়া জাপানের দাসত্ব স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু মত লইবার সময় কোথায় এবং উপায় ও সুযোগই বা কি?

অবশ্য চীন (বা আক্রান্ত অন্য কোন দেশ) আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষার জন্য যুদ্ধ করিলেও তাহাতে পরাজিত হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে পারে। কিন্তু আগে হইতেই ভয়ে বা নৈরাশ্যে দাসত্ব স্বীকার করা অপেক্ষা ঐরূপ যুদ্ধ করা মনুষ্যোচিত।

শান্তিবাদী কোন নেশ্যন বা রাষ্ট্রজাতি আক্রান্ত হইলে আততায়ীকে বলিতে পারে, "আমরা তোমাদিগকে প্রত্যাক্রমণ করিব না, কিন্তু তোমাদের বশ্যতা স্বীকারও করিব না।" মৌখিক জবাবের পক্ষে ইহা বেশ। কিন্তু আক্রমণকারীরা যখন সম্পত্তি লুণ্ঠন, শিশু প্রভৃতির প্রাণবধ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি ইতিহাসবর্ণিত দুষ্কর্ম্ম করিতে থাকিবে, শান্তিবাদীরা তখন আক্রান্ত শিশু ও নারীদের এবং আক্রমণকারীদের মধ্যে আপনাদের দেহ স্থাপন করিয়া কার্য্যতঃ আত্মবলিদান ছাড়া আর কি করিতে পারেন? ইহা এক দিক্ দিয়া খুব মহৎ দৃষ্টান্ত মনে হইতে পারে বটে। কিন্তু তাহাতে নারীরক্ষা, শিশুরক্ষা প্রভৃতি মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য কাজ ত করা হইবে না; কেন-না ঐরূপ আত্মবলিদানে হিংস্রপ্রকৃতি দৃপ্ত আক্রমণকারীদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না এবং "সভ্য" জগৎও যদি কিছু করেন ত বড়-জোর বাহবা দিবেন। আমরা শান্তিবাদের পক্ষপাতী, বিদ্রূপ করা আমাদের অনভিপ্রেত। যাহা লিখিতেছি, কর্ত্তব্যনির্ণয়ে অসামর্থ্য বশতই লিখিতেছি।

আর একটা কথা মনে হইতেছে। ঐরূপ আত্ম-বলিদানে আক্রমণকারীরা হয়ত তখন তখন হত্যা, লুণ্ঠন, নারীহরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেও, আক্রান্ত দেশটা দখল করিতে ছাড়িবে না; তাহা পরপদানত হইবে এবং পরাধীনতার আনুষঙ্গিক সব ব্যাপার সেই দেশে ঘটিতে থাকিবে। তাহা ঘটিতে দেওয়া কি চীনদেশের (বা অন্য আক্রান্ত দেশের) পক্ষে মনুষ্যোচিত হইবে?

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ

আমরা চাই (এবং ইংরেজদের মধ্যে যাঁহারা মহাপ্রাণ তাঁহারাও চান), যে, ভারতবর্ষে পূর্ণস্বরাজ স্থাপিত হয়। কিন্তু চীনের অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ না-করিয়াও প্রত্যেক দেশ যখন স্বাধীন থাকিতে পারিবে, পৃথিবীর সভ্যতার সে-যুগ আসিতে দেরি আছে। ভারতবর্ষ কি সেই যুগে পূর্ণস্বরাজ পাইবে? না, তাহার পূর্ব্বে পাইবে? পূর্ব্বে হইলে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার উপায় কি হইবে?

ইহা কেহ যেন বাজে প্রশ্ন মনে না করেন। জাপান চীনের প্রভু হইতে পারিলে, তাহার যুদ্ধের আয়োজন করিবার ক্ষমতা খুব বাড়িয়া যাইবে। তখন সে কেন যে ভারতবর্ষের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিবে না, জানি না। চীন কর্ত্তৃক জাপানী জিনিষের বয়কট যুদ্ধের একটা প্রধান কারণ। ঐ বয়কটে এ পর্য্যন্ত জাপানের ৫০০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে শুনা যায়। ভারতবর্ষের সুতা ও কাপড়ের শিল্প রক্ষার জন্য ভারতবর্ষকে জাপানী জিনিষ বর্জ্জন করিতে হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষের উপর জাপানের ক্রোধের কারণ ত যে-কোন সময়ে হইতে পারে। উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম হইতেও বিপদের আশঙ্কা আছে। আমরা যুদ্ধ করা—আত্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ করা—যতই না-পছন্দ করি-না কেন, উহা অনিবার্য্য হইতে পারে। অথচ ভারতীয় সৈন্যদলে ইণ্ডিয়ানাইজেশ্যন অর্থাৎ সব অফিসারের পদে ভারতীয় নিয়োগের যে বন্দোবস্ত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে। এবং সমুদয় শক্তসমর্থ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে স্বেচ্ছাসৈনিকের শিক্ষা দিয়া বৃহৎ একটা অবৈতনিক পৌর সৈন্যদল (Citizen Army) প্রস্তুত করিবার চেষ্টাও হইতেছে না। এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের এবং নেতৃবর্গের মনোযোগ প্রার্থনীয়। কয়েক পৃষ্ঠা পরে মুদ্রিত দেরাদুনের সামরিক কলেজ সম্বন্ধীয় নিবন্ধিকা দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধ ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ

যুদ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত থাকায় নানা প্রকারে মানবজাতির ক্ষতি হইতেছে। যুদ্ধের নিমিত্ত আয়োজন সকল সময়ে যথেষ্ট রাখিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান সকল দেশকে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে হয়, এবং এই সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত লোকদের উপর বেশী ট্যাক্সের বোঝা চাপাইতে হয়। যুদ্ধ না থাকিলে এত ট্যাক্স বসাইবার প্রয়োজন থাকে না, এবং সাধারণ রকম ট্যাক্স হইতে সংগৃহীত টাকারও যে অংশ যুদ্ধায়োজনে ব্যয়িত হয়, তাহা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নানা প্রকারে ব্যয়িত হইতে পারে। যে-সব রাষ্ট্রজাতি নিজে স্বাধীন কিন্তু অন্য কোন-না-কোন দেশকে অধীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও সকলের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, তাহাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। সুতরাং অন্য দেশকে অধীন রাখিয়াও তাহারা সকলে সুখে কালযাপন করিতে পারিতেছে না, অথচ অন্যান্য দেশকে অধীন রাখা আবশ্যক বলিয়া তাহাদের যুদ্ধায়োজন কমান চলিতেছে না।

যুদ্ধের আয়োজন যথেষ্ট রাখিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষকে তাহার রাজস্বের শতকরা ৪৩ অংশ ব্যয় করিতে হয়। কোন জমীদারের বা অন্য ধনী লোকের বার্ষিক আয় যদি ১০,০০০ টাকা হয়, এবং তাঁহার দারোয়ান ও লাঠিয়ালদের বেতনাদি বাবদে যদি বার্ষিক ব্যয় হয় ৪,৩০০ টাকা, তবে অবস্থাটা যেমন দাঁড়ায়, ভারত-গবর্মেণ্টের অবস্থাও সেইরূপ। কোন কোন ইংরেজ রাজপুরুষ বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের রাজস্বের শতকরা ৪৩ অংশ যুদ্ধায়োজনে ব্যয় হয় না, শতকরা ২৫ হয়; কেন-না, সামরিক ব্যয় রাজস্বের কত অংশ, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইলে শুধু কেন্দ্রীয় ভারত গবর্মেণ্টের আয় না ধরিয়া প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির আয়ও তাহার সহিত যোগ করা উচিত, এবং তাহা করিলে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় হয় মোট রাজস্বের শতকরা ২৫ অংশ। এই হিসাব ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলেও, সমগ্র রাজস্বের সিকি যুদ্ধায়োজনে ব্যয় করা অত্যন্ত বেশী। ভারতবর্ষের রণতরী-বিভাগ এবং আকাশযুদ্ধ-বিভাগ নাই বলিলেই হয়, শুধু স্থলযুদ্ধায়োজনের ব্যয়ই ঐরূপ। কিন্তু অন্য অনেক দেশের জলে স্থলে আকাশে সামরিক ব্যয় ইহা অপেক্ষা কম। যথা ব্রিটেনের শতকরা ১৩.৮, ফ্রান্সের ২১.৯ (উপনিবেশগুলি সমেত), জার্মেনীর ৫.১, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রমণ্ডলের ১৬.৫, ইটালীর ২৩.৬। ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয়ের আতিশয্য বশতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ব্যয় অত্যন্ত কম। অন্যান্য দেশের অবস্থা এবিষয়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা ভাল হইলেও, সেখানেও সামরিক ব্যয় না করিতে হইলে মানবের উন্নতি সাধনার্থ নানাবিধ সদ্ব্যয় আরও বেশী হইতে পারে।

যুদ্ধ প্রচলিত থাকার আর এক দোষ এই, যে, পূর্ণ-সামর্থ্যবিশিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোককে যুদ্ধের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে আলস্যে কাল কাটাইতে হয়। এই আলস্য তাহাদের নিজের পক্ষে ক্ষতিকর, এবং জগতের পক্ষে ক্ষতিকর।

যুদ্ধ দ্বারা মানবপ্রকৃতির উন্নতি না হইয়া অবনতি হয়। ছলে বলে কৌশলে পরস্পরের প্রাণবধ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল না রাখিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। যাহা মানুষকে কতকটা হিংস্র পশুর মত করিয়া রাখে, তাহা কখনও ভাল রীতি নহে।

যুদ্ধের আর একটা দোষ, ইহা অনেক বৈজ্ঞানিককে ও কারিগরকে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য গবেষণা, আবিষ্ক্রিয়া ও যন্ত্রোদ্ভাবনে নিযুক্ত না রাখিয়া মানুষ মারিবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত রাখে।

যুদ্ধের পক্ষেও অবশ্য কিছু বলিবার আছে। ইহার জন্য মানুষের সাহস, শারীরিক শক্তি, দলবদ্ধ ভাবে নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি গুণ বাড়ান আবশ্যক হয়। কিন্তু রোগের সহিত যুদ্ধ, ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়া, স্বাস্থ্য শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি, জল স্থল আকাশে বিচরণ, দাসত্ব বেশ্যাবৃত্তি নেশার জিনিষের ব্যবসা ডাকাতি প্রভৃতি দমনের চেষ্টা—এইরূপ নানা কাজে সাহস ও শক্তির প্রয়োজন হয়। অধীন জাতিসমূহকে যুদ্ধ না করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সাহস শক্তি দুঃখসহিষ্ণুতা এবং দলবদ্ধ ভাবে নিয়মানুবর্ত্তিতা যুদ্ধের চেয়ে কম আবশ্যক হয় না।

যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া যুদ্ধের অপকর্ষ বুঝিতেছি, হৃদয়ও উহা চায় না। কিন্তু যুদ্ধের উচ্ছেদ সাধনের উপায় কি? ইউরোপের কতকগুলি সদাশয় লোক জাপান ও চীনের সৈন্যদলের মধ্যে জীবিত মানবদেহের প্রাচীর হইয়া দাঁড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন পক্ষ গোলাগুলি ছুঁড়িলে তাঁহাদের গায়ে লাগে এই ভাবে তাঁহারা দাঁড়াইয়া থাকিতে চান। তাঁহাদের মত নিরপেক্ষ লোকদের প্রাণ যাইবার ভয়ে যুদ্ধনিরত দুই দেশ যদি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা খুবই বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা প্রস্তাবটিকে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখুন।

—

রেলওয়ের উপর ব্যবস্থাপক সভার অনধিকার

বর্ত্তমান সময়ে রেলওয়েগুলির উপর ব্যবস্থাপক সভার যে বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে, তাহা নয়। কিন্তু তবু উহার সভ্যেরা রেলওয়ের আয় ব্যয় চাকরিতে-নিয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে পারেন। সেটুকুও বুঝি কর্ত্তাদের সহ্য হইতেছে না। গোল টেবিল বৈঠকে ভারতীয় সভ্যদিগকে আলোচনার সুযোগ না দিয়াই এবং তাঁহাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও লর্ড স্যাঙ্কী ভারতশাসনমূলক ভবিষ্যৎ বিধিতে একটা ষ্ট্যাটুটরী রেলওয়ে বোর্ড রাখিবার প্রস্তাব তাঁহার রিপোর্টে রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষে গোল টেবিল বৈঠকের যে পরামর্শদাতা কমিটি কাজ করিতেছেন, তাঁহারাও এইরূপ একটি বোর্ডের বিষয় আলোচনা করিতেছেন। এইরূপ বোর্ড গঠিত হইলে রেলওয়েগুলির উপর ভবিষ্যতের রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রায় কোন হাত থাকিবে না। এই জন্য দিল্লীতে বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার অনেক সভ্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেহ কেহ রেলওয়ে ষ্ট্যাটুটরী বোর্ড গঠন দ্বারা রেলওয়ে-গুলিকে ব্যবস্থাপক সভার অধিকার বহির্ভূত করিবার উদ্দেশ্যের আলোচনাও করিয়াছেন।

আমাদের বিবেচনায়, উদ্দেশ্য কি, ঠিক তাহা ধরিতে না পারিলেও, ফলাফল অনুমান করা যাইতে পারে। এখন রেলওয়ের বড় চাকরিগুলি প্রধানতঃ ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীদের একচেটিয়া। প্রস্তাবিত বোর্ড দ্বারা তাহাদের এই একচেটিয়া অধিকার বজায় থাকিবে। ভারতীয় যাত্রীদিগকে যাতায়াতের সুবিধা দেওয়া না-দেওয়া এবং ভারতীয় বণিকদিগকে মালপত্র আমদানী রপ্তানী করিবার সুবিধা দেওয়া না-দেওয়া অনেকটা তাহাদের ইচ্ছাধীন। ইহাতে ভারতীয়দিগকে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ছাড়া চলাফিরা এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে পরাধীনতাও অনুভব করিয়া মেরুদণ্ড বক্র এবং মস্তক অবনত রাখিতে হয়। রেলওয়েগুলি নির্ম্মিত হওয়ায় ভারতীয়দের কোনই সুবিধা হয় নাই, এমন নয়। কিন্তু রেলওয়ে নির্ম্মাণের দ্বারা প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সুবিধা ও লাভ হইয়াছে। ইহাতে বিলাতের লোহাইস্পাতের ব্যবসায়ীদের ও এঞ্জিন-নির্ম্মাতাদের কোটি কোটি টাকা লাভ হইয়াছে। বিস্তর ইংরেজ মোটা বেতনের কাজ পাইয়াছে। সুদের গ্যারাণ্টি থাকায় অনেক ইংরেজ ধনিক রেলওয়ে নির্ম্মাণে টাকা খাটাইয়া প্রভূত রোজগার করিয়াছে। রেলওয়ের সাহায্যে বিলাতী কারখানায় প্রস্তুত নানা পণ্যদ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাহাতে ইংরেজদের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতি এবং ভারতীয় নাগরিক ও গ্রাম্য কুটীরশিল্পের অবনতি সঙ্কোচ ও স্থলবিশেষে বিনাশ ঘটিয়াছে। রেলে মালগাড়ীতে জিনিষ চালানের কোন কোন নিয়ম ও ভাড়া এরূপ যে, তাহা এদেশ হইতে বিলাতে ও অন্য বিদেশে কাঁচা মাল রপ্তানী এবং কারখানায় প্রস্তুত বিদেশী পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানীর অনুকূল। রেলওয়ে থাকায় ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সাম্রাজ্য রক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজে করিতে পারিয়াছেন। বাংলা দেশে এবং ভারতবর্ষের আরও অনেক অঞ্চলে যে-সব নদী ও খাল আছে, সেগুলি জলযান যাতায়াতের উপযুক্ত অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা রেলওয়ে নির্ম্মাণ অপেক্ষা অনেক কমে করা যাইত, এবং তাহার দ্বারা দেশের অবিমিশ্র উপকার হইত। কিন্তু অনেক নদী খাল নালা মজিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ জলযান-নির্ম্মাতা ও মাঝিমাল্লা শত বৎসর ধরিয়া ক্রমশঃ বেকার, দরিদ্র ও নিরন্ন হইয়াছে। স্বাস্থ্যের ও চাষের ক্ষতি হইয়াছে।

একমাত্র বা প্রধানতঃ রেলওয়ে নির্ম্মাণে উৎসাহ না দিলে জলযান যাতায়াতের জন্য নূতন খাল খননও করা যাইত, এবং তাহাতে প্রধানতঃ ভারতবর্ষের উপকার হইত।

রেলওয়েগুলি যদি ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা-বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানে প্রধানতঃ ব্রিটিশ স্বার্থ সুবিধা ও প্রাধান্য রক্ষা সেগুলির দ্বারা যতটা হয় তাহা অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে তাহা হইতে পারিবে। সরকারী নানা বিভাগের চাকরি লইয়া হিন্দু মুসলমানে কাড়াকাড়ি জাতীয় অনৈক্যের একটা কারণ। ষ্ট্যাটুটরী রেলওয়ে বোর্ডের আমলে রেলওয়ে-বিভাগ সেরূপ কাড়াকাড়ির একটি প্রধান ক্ষেত্র হইতে পারে।

ভারতীয়দের কোন অধিকার খর্ব্ব বা লুপ্ত করিতে হইলে ইংরেজরা অনেক সময় বলে, ইংলণ্ডে বা কোন ডোমীনিয়নে ঐরূপ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু নজীরটা সর্ব্বদাই আমাদের অসুবিধা ঘটাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়, অধিকার বাড়াইবার জন্য প্রযুক্ত হয় না। আমরা বলি, "তোমরা আমাদিগকে ইংলণ্ডের বা ডোমীনিয়নগুলির মত স্বাধীন হইতে দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধাগুলাও ঘটাও।" কিন্তু তাহা ত হইবে না; আমরা কেবল অসুবিধাগুলা ভুগিবারই যোগ্য। রেলওয়ে ষ্ট্যাটুটরী বোর্ড গঠনের সপক্ষে বলা হইয়াছে, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় উহা প্রথম হইতে না থাকায় অসুবিধা ঘটিয়াছে। বেশ ত; আমাদিগকে আগে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মত স্বশাসক হইয়া অসুবিধা অনুভব করিয়া স্বয়ং তাহার প্রতিকার করিতে দাও। আমাদের প্রতি দরদ তোমরা একটু কমাইলে বাঁচি।

—

প্রবাসীর প্রবন্ধাদি ও বিজ্ঞাপন

গত কয়েক মাস হইতে প্রবাসীর অল্প পরিমাণ লেখা বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার সহিত প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে দুই চারি জন গ্রাহক অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহা তাঁহাদের বিবেচনার জন্য লিখিতেছি।

আমরা প্রবাসীতে প্রতিমাসে ১৪৪ পৃষ্ঠা লেখা দিতে প্রতিশ্রুত। তাহা প্রতি মাসেই দিয়া থাকি, অধিকন্তু কোন কোন মাসে বেশীও দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের সহিত যে দুই পৃষ্ঠা লেখা গত কয়েক মাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই ১৪৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত। সুতরাং গ্রাহকদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপনের সহিত মুদ্রিত অন্য কিছু পড়িতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুত পাঠ্যবিষয়ের সামান্য অংশ হইতেও বঞ্চিত করি নাই। অতিরিক্ত যে লেখা বিজ্ঞাপনের সহিত ছাপা হয়, তাহা পড়া-না-পড়া তাঁহাদের স্বেচ্ছাধীন।

বিজ্ঞাপনের সহিত যে-সব লেখা ছাপা হইবে, অতঃপর সেগুলির নূতন নাম দিয়া একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইবে।

বিজ্ঞাপনগুলি অনাবশ্যক জিনিষ নয়। বিজ্ঞাপন না পাইলে শুধু গ্রাহক ও খুচরা ক্রেতাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা হইতে পত্রিকার মালিকগণ যে এত বড় কাগজ পাঠকগণকে দিতে পারিতেন না, আমরা কেবল তাহা বলিয়া বিজ্ঞাপনসমূহের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিতে চাই না। ক্রেতাদের দরকারী জিনিষ কোথায় কি দামে পাওয়া যায়, তাহা জানিবার সুবিধাও বিজ্ঞাপনের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা নহে। পত্রিকার সঙ্গে বিজ্ঞাপনসমূহ বাঁধান থাকিলে তাহা ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকেরও কাজে লাগে। কথিত আছে, গ্ল্যাডষ্টোন সাহেব পুরাতন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেন, এবং তাহা হইতে বৎসর-বিশেষে জিনিষের দর, মানুষের রুচি ও ফ্যাশন, নানা রকম চাকরির মজুরী, নানা রকম রোগের অল্পাধিক প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারিতেন। পুরাতন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতা যে ঐতিহাসিকের কাজে লাগিতে পারে, তাহা আমাদের দেশেও কার্য্যতঃ বিদিত। তাহার একটি প্রমাণ গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর ২০৯ পৃষ্ঠায় পাঠকেরা পাইবেন; দেখিতে পাইবেন, যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার দর্পণ' নামক খবরের কাগজের একটি পুরাতন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হইতে রামমোহন রায়ের

মাণিকতলাস্থিত বাসবাটী ও বাগানের জমির পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এখানে প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, যে, পুরাতন পারিবারিক হিসাবের খাতাও আর্থিক গবেষণায় কাজে লাগে। গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য কোন্ জিনিষের দর কখন কিরূপ ছিল এবং তাঁহারা কোন্ জিনিষ কত ব্যবহার করিতেন, এই সব খাতা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

—

লেখকবর্গের প্রতি নিবেদন

প্রবাসীতে ছাপিবার জন্য যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া লেখা পাঠান তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, যে, যত লেখা আমরা পাই, সবগুলি প্রকাশের যোগ্য হইলেও স্থানাভাবে সমস্ত মুদ্রিত করা অসম্ভব হইত। অনেক ভাল কাগজের নিয়মাবলীতে লেখা আছে, যে, তাঁহারা অপ্রকাশিত লেখা ফেরত দেন না, অতএব লেখকেরা লেখা পাঠাইবার সময় যেন উহার নকল নিজেদের কাছে রাখেন। আমাদিগকেও যাঁহারা লেখা পাঠান, তাঁহারা উহার নকল নিজেদের নিকট রাখিলে ভাল হয়। কিন্তু অপ্রকাশিত কোন লেখাই আমরা ফেরত দিব না, এরূপ নিয়ম আমরা করিতেছি না। লেখার সহিত লেখকের নাম ও ঠিকানা এবং ফেরত দিবার জন্য যথেষ্ট ডাকমাশুল দেওয়া থাকিলে এবং তাহা প্রকাশিত না হইলে তাহা ফেরত দেওয়া হইবে। লেখা পাঠাইবার সময় উহা রেজিষ্টরী করিয়া পাঠান উচিত। তাহা হইলে উহা আমাদের নিকট না-পৌছিবার সম্ভাবনা খুব কম হয়, এবং আমাদিগকেও উহা পৌছা না-পৌছা সম্বন্ধে চিঠি লেখালেখি করিতে হয় না। ডাকমাশুল দেওয়া না থাকিলে আমরা এরূপ পত্রব্যবহার করিতে অসমর্থ।

—

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

বর্ত্তমান বৎসরে যাঁহারা প্রবাসীর গ্রাহক আছেন, তাঁহারা সকলে আগামী বৎসরেও গ্রাহক থাকিলে এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সাড়ে ছয় টাকা শীঘ্র পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। ভ্যালু পেয়েব্‌ল্ ডাকে কাগজ পাঠাইতে হইলে কিছু অতিরিক্ত খরচ হয় এবং আমাদের টাকা পাইতে বিলম্ব হয়, এবং সেই কারণে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইতেও দেরি হয়। এই জন্য কলিকাতার গ্রাহকদের লোক মারফৎ এবং মফঃস্বলের গ্রাহকদের মনি অর্ডার দ্বারা টাকা পাঠান শ্রেয়ঃ।

কোন গ্রাহক যদি কোন কারণে আপাততঃ আগামী বৎসরের চাঁদা পাঠাইতে না পারেন এবং আগামী বৈশাখ সংখ্যাও ভ্যালু পেয়েব্‌ল্ ডাকে লইতে ইচ্ছুক না হন, তাহা হইলে তাহা আমাদিগকে অবিলম্বে জানাইলে বাধিত হইব। ভ্যালু পেয়েব্লে প্রেরিত কাগজ ফেরত আসিলে একখানি কাগজ নষ্ট হয়, এবং ডাকমাশুল ও রেজিষ্ট্রী খরচা লোকসান হয়। আমাদের এরূপ লোকসান করা কোন গ্রাহকেরই অভিপ্রেত নহে।

—

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সম্মেলন

বিগত ৩০শে মাঘ ও ১লা ফাল্গুন চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী ক্যানিং টাউনে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের পাঁচশতাধিক প্রতিনিধি সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং কয়েক হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। রায় শ্রীযুক্ত ধরণীধর সর্দ্দার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। ইনি জাতিতে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়। মৈমনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া যথোপযুক্ত রূপে সভার কাজ পরিচালনা করিয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে-সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার কয়েকটি নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

ধার্ম্মিক ও সামাজিক বিষয়ের কয়েকটি প্রস্তাব প্রথমে মুদ্রিত করিতেছি।

হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম ও জাতীয়তার রক্ষা এবং বিকাশের পরিপন্থী যে-সকল অসংখ্য জন্মগত শ্রেণী-বিভাগ বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, ঐ সকল জন্মগত শ্রেণী-বিভাগ এই সম্মিলনী অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে পানাহার বিবাহাদি ধর্ম্মহানিকর বলিয়া যে ধারণা

রহিয়াছে, উহা হিন্দু জাতির সমষ্টিগত শক্তি বিকাশের প্রতিকূল বলিয়া এই সম্মিলনী ঘোষণা করিতেছে।

হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীসমূহ স্ব স্ব শ্রেণীর উন্নতি বিধানার্থ শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ বলে দ্বিজত্ব সংস্কারগ্রহণ-মূলক যে সকল উচ্চ জাতি-মর্য্যাদা দাবি করিতেছে, এই সম্মিলন তাহার সমর্থন করিতেছে, এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে যে, প্রত্যেকেই যেন অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের তাদৃশ দ্বিজত্বসংস্কারগ্রহণ-মূলক মর্য্যাদা-লাভের সহায়তা করেন।

জগতের সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে বিরোধ ও অশান্তি দূর করিয়া শান্তি ও প্রীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে এই সম্মিলন প্রত্যেক হিন্দুকে প্রাচীন ঋষি-প্রচারিত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম জগতের প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রচার অথবা প্রচারের সাহায্য করিতে অনুরোধ জানাইতেছে এবং হিন্দু সমাজের বহির্ভূত যে সকল মানব হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে সামাজিকভাবে সাদরে গ্রহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

এই সম্মিলন ঘোষণা করিতেছে যে, প্রত্যেক হিন্দুই স্ব স্ব ধর্ম্মকার্য্য পূজা অর্চনাদি পুরোহিতের সহায়তা না লইয়াও নিজে করিতে পারেন, এবং যে যে ক্ষেত্রে পুরোহিত-বরণের প্রয়োজন মনে করিবেন সেই সেই ক্ষেত্রে পৌরোহিত্যে পারদর্শী যে-কোনও হিন্দুকে বরণ করিতে পারেন।

এই সম্মিলন হিন্দুর শব-সৎকার বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত বৈষম্য পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাবটিতে পুরুষের সহিত নারীর সমান উত্তরাধিকার স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে :—

এই সম্মিলন ঘোষণা করিতেছে যে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে পুরুষের ন্যায় অবস্থানুসারে নারীরও উত্তরাধিকারসূত্রে সমানাধিকার পাওয়া উচিত এবং পুরুষের ন্যায় নারীজাতির বেদপাঠ, সামাজিক আচার ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছে।

কাশ্মীরের অত্যাচরিত হিন্দুদের সম্বন্ধে সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :—

এই সম্মিলনী কাশ্মীরের নির্যাতিত হিন্দুগণের ভয়াবহ শোচনীয় দুর্দশায় তাহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং তাহাদিগের সাহায্যকল্পে প্রত্যেক হিন্দুকে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইতেছে এবং যাঁহারা উৎপীড়িতের সেবা করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তিদিগকে স্বেচ্ছাসেবকশ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ করিতেছে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবটির রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, হিন্দুসমাজের যে-সব জাতিকে 'অস্পৃশ্য', 'অনাচরণীয়', 'অবনত', ইত্যাদি আখ্যা দিয়া অবমানিত করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্ করিবার চেষ্টা হয়, তাহাদের অন্যতম নেতারা সভাস্থলে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কয়েক জনের নাম দিতেছি ; যথা—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, নমঃশূদ্র, বরিশাল ; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস, মাহিষ্য, ২৪ পরগণা ; শ্রীযুক্ত গৌরহরি বিশ্বাস, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ২৪ পরগণা ; শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ নাথ, যোগী, নোয়াখালী। প্রস্তাবটি এই—

সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু-প্রতিনিধিদিগের এই সম্মিলন বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছে যে, বিভিন্ন সংস্কারকামী হিন্দু প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘকালব্যাপী প্রবল আন্দোলনের ফলে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের প্রায় সর্ব্বস্তর হইতেই অস্পৃশ্যতার অবসান হইতেছে।—

ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থায় উন্নত ও অনুন্নত হিন্দুর পৃথক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী গঠনের পরিকল্পনা সমগ্র হিন্দু সমাজে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে যেহেতু ঐরূপ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন-সম্পর্কিত সমুদয় কৃতকার্য্যতা সমূলে বিনষ্ট হইবে এবং লুপ্তপ্রায় অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপকে পুনর্জ্জীবিত ও স্থায়ী করা হইবে, সেই হেতু এই সভা পৃথক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী গঠনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং যুক্ত নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সমর্থন করিতেছে। এই সভার মতে যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদিগকে উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

হিন্দুসমাজ সম্মেলন অত্যাচরিতা নারীদের রক্ষক ও সহায় হইবার জন্য প্রত্যেক হিন্দুকে অনুরোধ জানাইয়াছেন—

এই সম্মিলন প্রত্যেক হিন্দুকে হিন্দু-সমাজের অসহায় নরনারীগণকে আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা ও উদ্ধারকল্পে সজ্ঞবদ্ধ হইতে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছে এবং ঐ সকল নিরপরাধ নির্যাতিত নরনারীগণকে সমাজে পুনঃগ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

হিন্দুসমাজ সম্মেলন বিধবা-বিবাহের সমর্থক—

(ক) এই সম্মিলন ঘোষণা করিতেছে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মানুসারে হিন্দু বিধবার বিবাহ করিবার শাস্ত্রত ও ন্যায়ত অধিকার আছে।

(খ) এই সম্মিলন হিন্দু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবাহেচ্ছুক বিধবাগণের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

রায় ধরণীধর সরদারের অভিভাষণ

হিন্দুসমাজ সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় ধরণীধর সরদার সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি হইলেও সাধারণ কৃষিজীবী গৃহস্থ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত আইনজীবী ডাক্তার হাকিম অধ্যাপক শিক্ষক কেরানী শ্রেণীর লোক নহেন। এরূপ গৃহস্থদের মধ্যেও কিরূপ উদার মত প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তাঁহার বক্তৃতা পড়িলে বুঝা যায়। ঐ বক্তৃতায় বহু শাস্ত্রীয় বচন ও উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে, যে, পুরাকালে ভারতবর্ষে এখনকার মত জন্মগত জাতিভেদ ছিল না। তাহার পর তিনি বলিতেছেন—

"যে সময়ে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইত এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিত, অর্থাৎ সমাজে দোষের দণ্ড ও গুণের আদর ছিল, সেই সময় এই হিন্দু সমাজে গুণী ব্যক্তির সৃষ্টি হইত। বর্ণ অনুসারে সমাজে সম্মানের ও গুরু-লঘুর

ব্যবস্থা ছিল তাই সমাজের প্রত্যাশায় নিম্নবর্ণ সততই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভে প্রয়াসী হইত, উচ্চবর্ণ নীচত্বের আশঙ্কায় সততই হীন কর্ম্ম পরিত্যাগে যত্নবান থাকিত, কাজেই সমাজের মধ্যে উন্নতির চেষ্টা ছিল। তৎপরে কালক্রমে যখন এরূপ প্রথা উঠিয়া গিয়া জন্মগত জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, তখন হইতে হিন্দুত্বের পতন আরম্ভ হইল। যেখানে গুণের সম্মান নাই সেখানে গুণী ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। ব্রাহ্মণ জানিল আমি যতই কেন অপকর্ম্ম করি না, তবুও ব্রাহ্মণ থাকিব; শূদ্রও বুঝিল আমি যতই কেন উচ্চ কর্ম্ম করি না তবুও শূদ্র থাকিব।

পুরাকালে অহিন্দুদিগকে হিন্দু করিয়া লইবার রীতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—

উদারস্বভাব প্রাচীন ঋষিগণের প্রাণে সর্ব্বদা ইহাই জাগরিত হইত যে, আমরা আজন্মকাল অসহনীয় কঠোর দৈহিক ক্লেশ সহ্য করিয়া ধ্যান ধারণা প্রভৃতি দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা নিজে মাত্র উপভোগ না করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বমানবকে বিভাগ করিয়া দিব। এই মহত্ত্বের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ মাত্র বল্কল পরিধান করিয়া হিমপ্রধান দুর্গম গিরি সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরপারস্থ মানবগণকে আপন উপার্জ্জিত নির্ম্মল পবিত্র ধর্ম্মশিক্ষা দান করিয়া তাহাদিগকে আপন মতে আনিতে চেষ্টা করিতেন। কেহ বা দুস্পার মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, কেহ বা হিংস্রক জীবপূর্ণ নিবিড় অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া মানবজাতিকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া আপন মতে আনিতে প্রয়াসী হইতেন। তাহারা অনার্য্য তাহারা ম্লেচ্ছ, তাহারা ভিন্নদেশীয় প্রভৃতি চিন্তা তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পাইত না, তাই বিভিন্ন দেশ হইতে শক হুন পারসীক মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি জাতিগণ হিন্দুত্বের অমৃতপানে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিত, হিন্দুগণও অবাধে তাহাদিগকে আপন সমাজে গ্রহণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য শিক্ষা দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত।

বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:—

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় যাহা সম্ভব হয় নাই আজ ক্রমে তাহা হইতেছে। হিন্দু-সভা, হিন্দু-মিশন বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভাসমূহের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে দেখা যায়, বাংলা দেশে প্রতি বৎসর সহস্রাধিক বাল-বিধবার বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে। উচ্চ নীচ সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই ইহা ক্রমশঃ যেরূপভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে তাহাতে আশা করা যায় শীঘ্রই বাংলার হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের বাধা অন্তর্হিত হইবে।

বিধবাবিবাহ না থাকার ফলে হিন্দু সমাজে প্রতিদিন বহু অনর্থ ঘটিতেছে। ইহারই ফলে বাংলার বারবনিতাদিগের শতকরা আশী জন হিন্দু। ইহারই ফলে বহু হিন্দু রমণী মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে।

হিন্দু-সমাজের এরূপ বহু জাতি আছে যাহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম। ইহাদের অনেক পুরুষ পণ দিয়া বিবাহ করিতে পারে না, অনেকে অধিক বয়সে বালিকা বিবাহ করিয়া স্ত্রীর যৌবনারম্ভেই দেহত্যাগ করেন। ফলে একদিকে ব্যভিচারের সৃষ্টি হয়, অপরদিকে দিন দিন ঐ সকল জাতি নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে। বিধবা-বিবাহের প্রচলনে কন্যার পণপ্রথা এবং বালবিধবার ব্যভিচার এই উভয়ই নিবারিত হইবে। এই বিষয়ে হিন্দু মহিলাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। ঘরে ঘরে গৃহিণীগণ সচেষ্ট হইলে বাল-বিধবা-বিবাহের সকল প্রতিবন্ধকই অনায়াসে দূরীভূত হইবে।

—

মৈমনসিংহের মহারাজার অভিভাষণ

মৈমনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী হিন্দুসমাজ সম্মেলনের সভাপতি রূপে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে "বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজ-সম্পর্কিত সমস্যাগুলির যে সমাধান হইতে পারিতেছে না তাহার কারণ সত্যের প্রতি অবজ্ঞা।" তাঁহার মতে একদল উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যাহা কিছু বৈদেশিক কেবল তাহারই আদর করিয়া সত্যের অবমাননা করেন।

আবার আর এক দল অন্য আকারে সত্যের প্রতি অবজ্ঞা করিতেছেন। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বে ইঁহারা হিন্দু সমাজের এক কল্পিত নিশ্চল মূর্ত্তিকেই একমাত্র সত্য ও সার জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্পর্ককে নির্ব্বাসিত করাতেই হিন্দুর কল্যাণ। ইঁহাদের সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা, বৃহত্তর জগতের সহিত সংস্পর্শ, সমুদ্র-যাত্রা—সকলই বর্জ্জনীয়। ইঁহারা দেশ কাল পাত্র প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া সমাজ-চিন্তা করিতে স্বীকৃত নহেন। হিন্দু সমাজ যে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান আকারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে—এ বিষয় শাস্ত্র ও ইতিহাস সমান ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে।

হিন্দু-জাতির আপেক্ষিক সংখ্যা-হ্রাসের কারণ সম্বন্ধে তিনি সকলকেই চিন্তা করিতে অনুরোধ করেন।

সময় থাকিতে এই বিপদ পরিহারের জন্য উপায় অবলম্বন করা উচিত। আমার মনে হয় হিন্দু সংগঠন ইহার প্রধান কার্য্য। এই সংগঠনের অর্থ দৃঢ় সামাজিক বন্ধনের সৃষ্টি, একতা স্থাপন। এজন্য সামাজিক বৈষম্যের নিরর্থক আড়ম্বরের সংকোচ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের অনাবশ্যক জঞ্জাল যে শাস্ত্র, সদাচার ও ধর্ম্ম-বিরোধী তাহা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিপন্ন করিতে হইবে।...

যাহারা দূরে সরিয়া আছে তাহাদিগকে কাছে টানিয়া আনিতে হইবে—যাহারা শত্রু হইয়া আছে তাহাদিগকে মিত্র করিতে হইবে—যাহারা পর হইয়া আছে তাহাদিগকে আপন করিতে হইবে। ইহাই আমাদের ধর্ম্মের ও ইতিহাসের সার শিক্ষা। যাঁহারা ইহাকে অশাস্ত্রীয় মনে করেন তাঁহারা শাস্ত্র এবং ইতিহাসকে হাস্যাস্পদ করিতেছেন মাত্র।

এক দিকে যেমন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে দীক্ষা দ্বারা হিন্দুত্বের গৌরবে ভূষিত করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনই হিন্দু সমাজে তাহার জন্য শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবনের সৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে যে-সকল বেদনাদায়ক বিধি-ব্যবস্থা বা ধর্ম্মাচরণের প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কার আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিতে হইবে। এই উভয় কার্য্যের যুগপৎ সাফল্যের উপরই আমাদের বংশধরগণ এক বিরাট অখণ্ড হিন্দুশক্তির প্রতিষ্ঠা করিবেন।

অন্য কয়েকটি বিষয়ে তিনি বলেন :—

বাংলার আকাশ বাতাস আজ অপহৃতা, নিগৃহীতা, অত্যাচরিতা নারীর আর্ত্তস্বরে মুখরিত, হিন্দুনারীর নির্যাতন ও অপহরণের কথা প্রতিদিনের সংবাদপত্রকে কলঙ্কিত করিতেছে। ইহার প্রতিকার আমাদিগকে করিতেই হইবে। এই সমস্যার প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যপালনে অসমর্থা বালবিধবাদিগের বিবাহের ব্যবস্থা না থাকায় সামাজিক জীবন স্থানে স্থানে কলুষিত হইতেছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংপথে ও সংযমের পথে পরিচালিত করা সমাজের একটি বিশিষ্ট কর্ত্তব্য। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সমাজের হিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এরূপ বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত হওয়া আমি আবশ্যক মনে করি।

আর একটি সামাজিক সমস্যার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ দেশাচারভঙ্গকারীকে সমাজ বর্জ্জন করেন। বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, তথাকথিত অস্পৃশ্যের সহিত পান ভোজন প্রভৃতি কারণে আমরা কত নরনারীকে বর্জ্জন করিয়াছি—তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কার্য্যের দ্বারা আমরা আমাদিগের শত্রু সৃষ্টি করিয়াছি—শত শত হিন্দুকে মুসলমান ও খৃষ্টানের আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য করিয়াছি—শত শত নিরপরাধিনী নারীকে গৃহত্যাগে বাধ্য করিয়াছি। যাহাতে এই বর্জ্জন-নীতি হিন্দু-সমাজ হইতে অন্তর্হিত হয় এবং সামাজিক শাসনের ধারা পরিবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য আমাদের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ আজ ভারতের বক্ষে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। এই যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ইহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেরই অনিষ্টজনক। যে মনোবৃত্তি মুসলমানকে হিন্দুর উপর অত্যাচার করিতে প্রণোদিত করে উহা সমুদয় সভ্য-সমাজের দ্বারা সর্ব্বত্রই ঘৃণিত হইয়াছে। কিন্তু, বাংলার হিন্দুকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে একদিকে যেরূপ প্রতিবেশী মুসলমানের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের উপযোগী শিক্ষা প্রচার করিতে হইবে—অন্যদিকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে ধন-প্রাণ মান-মর্য্যাদা রক্ষার উপযোগী শক্তি ও সাহসও অর্জ্জন করিতে হইবে এবং সংঘ বা সমষ্টি হিসাবে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। এই বিষয়টি যতই সাময়িক হউক, ইহা বাংলার হিন্দুর পক্ষে একটি সমস্যা।

তাঁহার মতে "বর্ত্তমান সময়ে বাংলার হিন্দু-সমাজে অস্পৃশ্যতা পাপ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও যে-সকল স্থানে ইহা বর্ত্তমান আছে তাহাও অবিলম্বে দূর হইবে।" অস্পৃশ্যতা-বোধ রূপ পাপের সম্পূর্ণ বিলোপ আমরা চাই। উহা অনেকটা কমিয়াছে এবং দক্ষিণ-ভারতের মত উহা বঙ্গে প্রবল নহে সত্য; কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিতে হইলে এখনও বহুমুখী চেষ্টার প্রয়োজন।

—

সদর খাজনার দায়ে তালুক নিলাম

বঙ্গের অনেক জেলা হইতে খাজনা দিতে না পারায় বিস্তর তালুক ও মহল বিক্রীর সংবাদ আসিতেছে। কোথাও কোথাও ক্রেতার অভাবে নিলাম নিষ্ফল হওয়ার খবরও আসিতেছে। ইহা বঙ্গের আর্থিক দুরবস্থার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। অনেক বৎসর হইতে বাংলা দেশে ধনশালী বণিকশ্রেণীর অভাব লক্ষিত হইতেছে। জমিদাররাই বঙ্গে ধনী বিবেচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদেরও আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়াছে।

—

কৃষিপ্রধান বঙ্গে কৃষিশিক্ষার অভাব

বাংলা দেশে পণ্যশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু যে কৃষি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বঙ্গের অধিকাংশ লোকের জীবনোপায় তাহার প্রয়োজন অন্য কোন প্রকার বৃত্তিশিক্ষা অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী। অথচ সমগ্র বঙ্গে চাষ শিখাইবার জন্য একটিও উচ্চ বিদ্যালয় নাই, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার একটি বিষয় নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বছর দশ একজন ছাত্রহীন কৃষি অধ্যাপকের বেতনাদি বাবতে লাখখানেক টাকা নষ্ট করিয়াছেন। দীঘাপতিয়ার স্বর্গীয় কুমার বসন্তকুমার রায় কৃষি-শিক্ষালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। তাহা এখন সুদ-সমেত চারি লক্ষ হইয়াছে শুনিতে পাই। কিন্তু সরকারী বিশেষজ্ঞেরা ঐ টাকার আয় হইতে শিক্ষালয়স্থাপনে রাজী নহেন। তাঁহারা নাকি (অনির্দ্দিষ্ট) ভবিষ্যতে খুব উচ্চ অঙ্গের একটা শিক্ষালয় স্থাপন করিবেন! কিছু না-করিবার ইহা একটা বাজে ওজর মাত্র। সরকারী কৃষি-বিভাগ গোটাকতক ধান পাট ও আকের জাতের নাম বৎসরের পর বৎসর আওড়াইয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন।

ভারতবর্ষের খাদ্যশস্যের মধ্যে চাল প্রথমস্থানীয়। ইহা ভারতের অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য। বাংলা দেশেই সকলের চেয়ে বেশী চাল উৎপন্ন হয়। পাট ভারতবর্ষের আর একটি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। ভারতবর্ষে যত জমীতে পাট হয়, তাহার শতকরা ৮৫ অংশ বঙ্গে স্থিত। চা-ও একটি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য, এবং তাহা

বঙ্গে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বঙ্গের জমীতে আরও নানা রকম জিনিষ জন্মে। কিন্তু তথাপি বাঙালীকে উচ্চতম কৃষি শিখাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। সাধারণ রকম শিক্ষা দিবার বন্দোবস্তই বা কি আছে?

—

মহাত্মা গান্ধী জেলে কি পড়েন

মহাত্মা গান্ধী জেলে বিদেশী কি কি বহি পড়েন বা পড়িতে চান এবং দৈনিক কাগজ কি কি পড়েন, তাহার খবর নানা কাগজে বাহির হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত দেশী "গোল্ডেন বুক অব্ টাগোর" আগ্রহ সহকারে চাহিয়া লইয়া পাইবামাত্র দুই ঘণ্টা ধরিয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার অনুরোধক্রমে প্রেরিত 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা পাঠ করেন, এই সংবাদ দুটি মডার্ণ রিভিউ কাগজে বাহির হইবার পর অন্য কোন কাগজ তাহা গ্রহণ করেন নাই। বলা বাহুল্য, অন্য কোন সম্পাদককে খবর দুটি ছাপিতে নিষেধ করা হয় নাই। একখানি বাংলা দৈনিক মডার্ন রিভিউ হইতে নিউ ইয়র্কের ও জেনিভার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় দুটি সংবাদ লইয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী ও মডার্ন রিভিউ সম্বন্ধীয় খবরগুলি গ্রহণ করেন নাই! মহাত্মাজী প্রবাসীর সম্পাদককে যে তিনটি চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার একটিতে আছে, "My love to Gurudev when you meet him," "গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) সহিত যখন দেখা হইবে, তখন তাঁহাকে আমার প্রীতি জানাইবেন।" চিঠি তিনটির ফটোগ্রাফ মার্চ্চের মডার্ণ রিভিউ কাগজে ছাপা হইয়াছে।

—

বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন

মাঘের প্রবাসীতে লিখিত আমাদের অঙ্গীকার অনুসারে আমরা ফাল্গুনের কাগজে কয়েকটি বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে ছাপিয়াছিলাম, এমাসেও ছাপিলাম। আমাদের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপনদাতারা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। বিদেশ হইতে কারখানা-জাত যেসব জিনিষ বঙ্গে আসিয়া থাকে, সেই রকম কোন জিনিষ বাঙালীর মূলধনে বাঙালীর শ্রম ও নৈপুণ্যে আমাদের দেশে প্রস্তুত হইলে আমরা তাহার বিজ্ঞাপন পাঁচ পংক্তি করিয়া আপাততঃ দুই মাস ছাপিতে চাহিয়াছিলাম। যতগুলি বিজ্ঞাপন আসিয়াছিল, সবগুলি আমাদের অভিপ্রায়ের অনুরূপ না হইলেও আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সবগুলিই ছাপিয়াছি।

—

দেরাদুনে সামরিক শিক্ষার পিতিরক্ষা

পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাসভূমি ভারতবর্ষের জন্য দেরাদুনে একটি যুদ্ধশিক্ষার কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। আগামী অক্টোবর মাস হইতে ইহার কাজ আরম্ভ হইবে। প্রথমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তাহার পর তাহাতে উত্তীর্ণ প্রবেশার্থী-দিগের একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইবে। ইহাতে যাহারা উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদের প্রথম বারো জনকে কলেজে ভর্ত্তি করা হইবে, এবং তা ছাড়া আরও তিন জনকে লওয়া হইবে। ভর্ত্তি হইবার দরখাস্ত পড়িয়াছে আট শত, যদিও প্রত্যেক ছাত্রের তিন বৎসরের শিক্ষার ব্যয় হইবে মোট ৪৭০০ টাকা। দরখাস্তের আধিক্য হইতে অন্ততঃ দুটা কথা প্রমাণিত হয়। প্রথম, যুবকদের মধ্যে যুদ্ধ শিখিবার লোকের মোটেই অভাব নাই; দ্বিতীয়, ভদ্র শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেকার-সমস্যা এমন সঙ্গীন হইয়াছে, যে, তিন বৎসরের বহুব্যয়সাধ্য কঠিন শিক্ষার পর ১৫টি কাজের জন্য এত ছাত্র ব্যগ্র।

ভারতবর্ষের সৈন্যদলের সর্ব্বোচ্চ নেতৃত্ব এবং তাহার নীচের ক্রমনিম্ন নেতৃত্ব যাঁহারা করেন, তাঁহাদের ইংলণ্ডের রাজার কমিশন (King's Commission) আছে। ইঁহাদের সংখ্যা গোল টেবিল বৈঠকের ডিফেন্স সব-কমিটির মতে ৩১৪১, ভারতীয় সামরিক কলেজ কমিটিকে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ৩২০০, স্কীন কমিটির মতে ৩৬০০, এবং শে (Shea) কমিটির মতে ৬৮৬৪। কোন্ সংখ্যাটি ঠিক্ জানি না। এই সকল রাজ-কমিশন-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অধিকাংশ ইংরেজ। ভারতীয় যুবকদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিয়া ক্রমে ক্রমে সব পদগুলিতেই ভারতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা

দেরাদুন সামরিক কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বৎসরে যে ১৫টি ছাত্রকে ভর্ত্তি করা হইবে, তাহারা সবাই শেষ পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত ও পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে, উপরের সংখ্যাগুলি অনুসারে, ৩১৪১ কর্ম্মচারী পাইতে ২১০ বৎসর, ৩২০০ জন পাইতে ২১৪ বৎসর, ৩৬০০ জন পাইতে ২৪০ বৎসর, এবং ৬৮৬৪ জন পাইতে ৪৫৮ বৎসর লাগিবে। অতএব ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সুমহৎ অনুগ্রহে যে কলেজ স্থাপিত হইতেছে, তাহার প্রসাদে সমুদয় ভারতীয় সৈন্যদলে উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত ভারতীয় সেনানায়ক নিযুক্ত হইতে ন্যূনতম সময় ২১০ বৎসর এবং দীর্ঘতম কাল ৪৫৮ বৎসর লাগিবে। সাতিশয় আশাপ্রদ ও সুখকর সংবাদ!

আর একটি সংবাদের ঝাপ্‌টা বাতাসে এই ক্ষীণ দীপশিখাটিও নিবিয়া যায়। ভারতীয় সামরিক কলেজ কমিটিকে গবর্ন্মেণ্ট যে-সব তথ্য জোগাইয়াছিলেন তদনুসারে রাজ-কমিশন-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের মধ্যে বার্ষিক অপচয় (wastage) ঘটে ১২০টি, অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে মৃত্যু, পেন্সান-প্রাপ্তি, ইস্তফা-প্রদান ও পদচ্যুতি বাবতে প্রতি বৎসর ১২০টি কর্ম্ম খালি হয়। সুতরাং প্রতি বৎসর যে ১৫টি ভারতীয় ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হইবে, তাহাদের দ্বারা ত এই শূন্য পদগুলিরই পূর্ত্তি হইবে না; অন্য পদে নিয়োগ ত দূরের কথা।

এই সকল তথ্য বিবেচনা করিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপন ব্যতিরেকে ভারতীয় সৈন্যদলে আপাদমস্তক ভারতীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইবে না। আবার অন্যদিকে ইংরেজরা আমাদিগকে বলেন, "তোমরা নিজেদের সামর্থ্যে যুদ্ধ দ্বারা ভারত-রক্ষায় সমর্থ না হইলে স্বরাজ পাইতে পার না।" অথচ আমাদের সেই সামর্থ্য-লাভের শিক্ষার সমাপ্তি ইংরেজ রাজত্বে যদি কখনও হয়, তাহাও দুই শতাব্দীর কমে নহে! বিষম সমস্যা!!

উচ্চ ইংরেজী মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয়

সম্প্রতি মৌলবী তমিজ উদ্দীন খাঁ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে, সমগ্র বাংলা দেশে মুসলমান বালিকাদের জন্য কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে কিনা এবং কলিকাতায় ঐরূপ একটি স্কুল স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল কি না? তাহার উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী মিঃ নাজিম উদ্দীন বলেন, বঙ্গে ওরূপ কোন বিদ্যালয় নাই, গবর্ন্মেণ্ট ওরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

এই প্রশ্নোত্তরগুলির ঠিক অর্থ বিশদ নহে। কেবল মাত্র মুসলমান বালিকাদের জন্য গবর্ন্মেণ্ট উচ্চ ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় নাই, ইহা সত্য কথা। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দু বা খ্রীষ্টিয়ান বালিকাদের জন্যও গবর্ন্মেণ্ট কোন উচ্চ ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই এবং চালান না। সুতরাং কেবলমাত্র অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান-বালিকাদের জন্য ঐরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত হইবে না। শিক্ষার জন্য গবর্ন্মেণ্ট সামান্যই খরচ করেন। সেই খরচ এরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্য করাই বাঞ্ছনীয় যাহাতে সকল ধর্ম্মের ও জাতির ছাত্র বা ছাত্রী পড়িতে পারে। ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়াকার সময়ে যেমন হিন্দুদের জন্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ তেমনি মুসলমানদের জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তাহার পর কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য কোন উচ্চ শিক্ষালয় স্থাপিত হয় নাই, কিন্তু মুসলমানদের জন্য কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজ, ঢাকা ইস্লামিক ইণ্টার-মীডিয়েট কলেজ, চট্টগ্রাম ইস্‌লামিক ইণ্টারমীডিয়েট কলেজ, রাজসাহী মাদ্রাসা, ঢাকা মাদ্রাসা, হুগলী মাদ্রাসা, এবং চট্টগ্রাম মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। ফলে (ইস্লামিক ইণ্টারমীডিয়েট কলেজগুলি, ৬২২টি কোরান স্কুল এবং ৬টি মুস্‌লিম ট্রেনিং স্কুলের খরচ বাদ দিয়াও) কেবল মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বাংলা গবর্ন্মেণ্টের বার্ষিক ব্যয় হয় প্রায় ষোল লক্ষ টাকা। কেবল হিন্দুদের শিক্ষায় ব্যয় হয় এক লক্ষের কিছু বেশী টাকা। বিশেষ বৃত্তান্ত গত (১৯৩১) নবেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার ৫৪৪-৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৯২৯-৩০ সালের বাংলা দেশের শিক্ষা-রিপোর্টের ৩১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, যে, ঐ বৎসর সখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং একথা সত্য নহে, যে, কেবলমাত্র

মুসলমান বালিকাদের জন্ত কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় নাই। কেবলমাত্র মুসলমান বালিকাদের জন্য কলিকাতায় একটি উচ্চ ইংরেজী সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন না করিয়া সখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য বাড়াইয়া দিলেই কলিকাতার মুসলমান সমাজের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে পারে।

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী এক এক প্রতিষ্ঠানে একত্র শিক্ষালাভ করিলে সমগ্র জাতির এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপকার হয়। ইহা যদি মুসলমানেরা না বুঝেন, তাহা তাঁহাদের ভ্রম।

১৯২৯-৩০ সালের বঙ্গীয় শিক্ষা-রিপোর্টের ৩১ পৃষ্ঠায় সরকারী ইংরেজী উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ৫, কিন্তু ৫৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে ৬। প্রকৃত সংখ্যা যাহাই হউক, এই বিদ্যালয়গুলিতে বাঙালী মুসলমান বালিকাদের ভর্ত্তি হওয়ার বিরুদ্ধে কোনই নিয়ম নাই। এইগুলির দ্বারাই তাহাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে পারে।

সমগ্র বাংলা দেশে ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়গুলির উচ্চ বিভাগে মুসলমান ছাত্রী পড়ে মোটে ৬২টি। কলিকাতায় কেবল মুসলমান বালিকাদের জন্য একটি সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করিলে তাহাতে কয়টি বালিকা পড়িবে? এবং খরচ কত হইবে?

—

মক্তবে ও টোলে সরকারী ব্যয়

১৯২৯-৩০ সালের বঙ্গীয় শিক্ষা-রিপোর্টের ৮৪ পৃষ্ঠায় গবর্মেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট ও লোক্যাল বোর্ড, এবং মিউনিসিপালিটী-সমূহ মুসলমানের মক্তব এবং হিন্দুদের টোলগুলির জন্য ঐ বৎসর কত খরচ করিয়াছিলেন, তাহার ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে। তাহা আমরা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

	গবর্মেণ্ট।	ডিষ্ট্রিক্ট ও লোক্যাল বোর্ড।	মিউনিসিপালিটি।
মুসলমানদের মক্তবে—	৭,২৬,৬২৫৲	২,৮০,২১৫৲	৫৭,৪৪৪৲
হিন্দুদের টোলে—	৬৭,৭৪৬৲	৩৭,৬৫৯৲	১৭,৫৪৩৲

গবর্মেণ্ট ১৫০১১টি মক্তবকে বালকদের এবং ৮৮৭৪টি মক্তবকে বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু একটি টোলকেও তাহা করেন নাই।

—

মুসলমানদের শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণ

বাংলা দেশে শিক্ষার প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্ত যত পাব্লিক টাকা খরচ হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাব্লিক টাকা খরচ হয় কেবলমাত্র মুসলমান-দের জন্ত। তাহা সত্ত্বেও যে মুসলমানেরা শিক্ষায় অনগ্রসর, তাহার কারণ, কিরূপ শিক্ষা মূল্যবান সে-বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা, মোটের উপর শিক্ষায় অনুরাগের অভাব, শিক্ষার জন্ত পরিশ্রমের ন্যূনতা, এবং মুসলমানদের আবদার ও দাবি অনুসারে অধিকশিক্ষিত হিন্দু থাকিতেও অল্প-শিক্ষিত মুসলমানকে গবর্মেণ্টের চাকরিতে নিয়োগ।

—

ভারতবর্ষ হইতে সোনা রপ্তানী

এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ৫৩ কোটি টাকার উপর মূল্যের সোনা রপ্তানী হইয়াছে। অবশ্ত এই সমস্ত সোনার দাম বিক্রেতারা রূপার টাকায় পাইয়াছে। কিন্তু রূপার আসল দাম খুব কম। ইউরোপ আমেরিকায় বড় বড় কারবারে ও বড় বড় ঋণ পরিশোধে রূপার মুদ্রা ব্যবহৃত হয় না। সবাই সোনা চায়। সেইজন্ত সস্তা রূপার মুদ্রা দিয়া ইংরেজ মূল্যবান্ সোনা কিনিয়া নিজের দেশে চালান করিতেছে।

—

বঙ্গে কুষ্ঠরোগ

বাংলা দেশের মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। ইহার কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা এখনও হয় নাই; হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বত্র কুষ্ঠরোগীদের বৈজ্ঞানিক ইঞ্জেক্শ্যন চিকিৎসার ও আলাদা বাসের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা আরম্ভ হইলে সারিবার সম্ভাবনা আছে। অনেকের সারিয়াছে, এরূপ বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে।

সুচিকিৎসা হইলে এই রোগ অন্ততঃ বাড়ে না, তাহার প্রমাণ আছে।

—

বঙ্গের লাটের প্রাণবধের চেষ্টা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় বঙ্গের লাট সাহেবকে গুলি করিবার চেষ্টা অপরাধে কুমারী বীণা দাস, বি-এ'র নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। বীণা নিজের দোষ স্বীকার করায় এবং অপরাধের অন্য প্রমাণ থাকায় জজেরা কলেজে ঐ ছাত্রীর সচ্চরিত্রতা ও অল্প বয়স বিবেচনা করিয়া এই দণ্ড দিয়াছেন। দণ্ড লঘু হয় নাই, অতিকঠোরও হয় নাই।

এই দুর্ঘটনার সম্পর্কে অন্য যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে রাজনীতির গতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। লাট সাহেব দৈবানুগ্রহে কিংবা নিজের মানসিক স্থৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বাঁচিয়া গিয়াছেন। কারণ, রিভলভার হইতে গুলি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তিনি চেয়ারের পশ্চাতে পড়িয়া যান কিংবা বসিয়া পড়েন। এই প্রকারে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। দুই তিনটা গুলি নিক্ষিপ্ত হইবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ হাসান সুহ্রাবর্দ্দি এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চীফ এক্সেকিউটিভ অফিসার মিঃ জে, সি, মুখুজ্যে একসঙ্গে কিংবা (হাইকোর্টে প্রদত্ত মোকদ্দমার সাক্ষ্য অনুসারে) মুখুজ্যে মহাশয় কয়েক সেকেণ্ড আগে কুমারী বীণা দাসকে ধরিয়া ফেলেন। তাহার পরও নাকি ঐ ছাত্রীর রিভলভার হইতে আরও দুটা গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু লাটসাহেব চেয়ারের পশ্চাতে থাকায় তাহা তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু উভয় ভদ্রলোক ছাত্রীর হাতটা উঁচু করিয়া না দিলে গুলি উপরের দিকে না গিয়া অন্য কাহারও গায়ে লাগিতে পারিত। সুতরাং লাটসাহেবের প্রাণরক্ষা আগেই হইয়া গিয়া থাকিলেও, ইঁহাদের সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা এবং নিজেদের প্রাণের চিন্তা না করিয়া অন্যের প্রাণরক্ষার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রথম প্রথম কলিকাতার সব কাগজে লাটসাহেবের প্রাণরক্ষক বলিয়া কেবল ডাঃ হাসান সুহ্রাবর্দ্দির নাম বাহির হয়, মিঃ জে, সি, মুখুজ্যের নাম পরে জানা যায়। বিলাতে কেবল ডাঃ হাসান সুহ্রাবর্দ্দির নাম তারে প্রেরিত হয়, এবং তদনুসারে তাঁহার ন্যায্য প্রশংসা হইয়াছে। এক জন মুসলমান যে লাটসাহেবের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, সেখানে এই কথাটার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে; এবং ইংলণ্ডেশ্বর তার-যোগে তাঁহাকে স্যর উপাধি দিয়াছেন। এরূপ পুরস্কার উচিতই হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার চাকরির উন্নতিও হইয়াছে। মিঃ জে, সি, মুখুজ্যের কথা এদেশে কেন প্রথম হইতেই বাহির হয় নাই, বিলাতে কেন উহা তারে প্রেরিত হয় নাই, তাহার কারণ আমরা অবগত নহি। তিনি কেন পুরস্কৃত হন নাই, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে যেমন মুসলমানদের দাবি অগ্রগণ্য, এক্ষেত্রেও তাহা হইয়া থাকিলে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

—

কুমারী বীণা দাসের স্বীকারোক্তি ও কৈফিয়ৎ

হাইকোর্টে কুমারী বীণা দাসের যে অপরাধ-স্বীকারোক্তি ও কৈফিয়ৎ পঠিত হয়, তাহা হাইকোর্টের বিচারের রিপোর্টের অঙ্গস্বরূপে প্রকাশ করিবার আইনসঙ্গত অধিকার সংবাদপত্রসমূহের ছিল। কিন্তু রায়ের দিন সন্ধ্যায় অল্প যাহা কলিকাতার কয়েকটা কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর আর কিছু বাংলা দেশে বাহির করিতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সমগ্র স্বীকারোক্তি ও কৈফিয়ৎ বিলাতে তারে পাঠান হইয়াছিল, এবং সেখানে খবরের কাগজে উহার উপর মন্তব্য বাহির হইয়াছে, প্রকাশ্যসভায় লর্ড আরুইনের সভাপতিত্বে উহার আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। এক ইংরেজ মহিলা উহার এরূপ আলোচনা করিতে থাকেন, যে, লর্ড আরুইন তাহাকে বসাইয়া দেন।

বাংলা দেশের বাহিরে অনেক লোক কোন প্রকারে উহা পাইয়া থাকিবেন; কারণ দেখিতেছি মান্দ্রাজের একটি এবং বোম্বাইয়ের একটি (উভয়ই প্রসিদ্ধ) কাগজে ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

রাজনৈতিক হিংসাত্মক যত অপরাধ ঘটে, তাহার জন্য অপরাধীদিগের নিন্দা করা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

ইহাও উপলব্ধি করা আবশ্যক, যে, দেশের লোকেরাও এবং গবন্মেণ্টও এই সব ঘটনা ঘটিবার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী;—দায়ী এ অর্থে নহে, যে, গবন্মেণ্ট বা দেশের লোকসমষ্টি কাহাকেও এরূপ অপরাধ করিতে প্ররোচিত করে, কিন্তু এই অর্থে দায়ী, যে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ হইলে ঐ প্রকার অপরাধ ঘটে না তদ্রূপ অবস্থায় দেশকে আনয়ন করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণ যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই, এখনও করিতেছেন না, এবং গবন্মেণ্টও করেন নাই, করিতেছেন না। রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক কোন প্রকার অপরাধেরই প্রতিকার কেবল অপরাধীর দণ্ডদান দ্বারা হইতে পারে না।

—

ছাত্রদের দীর্ঘ অবকাশ

যে-সকল ছাত্র ও ছাত্রীর পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে বা অবিলম্বে শেষ হইবে তাঁহারা কয়েক মাস অবকাশ পাইবেন। এ বৎসর যাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইবে না, তাঁহাদেরও গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইতে বেশী দেরি নাই। এই দীর্ঘ অবকাশ-কাল তাঁহারা কিরূপে যাপন করিবেন, তাহা স্থির করিবার মত বুদ্ধি তাঁহাদের আছে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য রকমের বহি অনেকেই পড়িবেন। দেশের নানা অভাবের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে। নানা গ্রামের জলাভাবের অভিযোগ ইতিমধ্যেই শুনা যাইতেছে। ছাত্রছাত্রীরা যদি গ্রামের লোকদিগকে দলবদ্ধ করিয়া নিজেই নিজেদের অভাব দূর করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারেন, তাহা সাতিশয় হিতকর হইবে। বাংলা দেশে উৎপন্ন নানা পণ্যদ্রব্যের বিক্রী কিরূপে বাড়িতে পারে, ক্ষুদ্রতম গ্রামেও সেগুলি কি প্রকারে পৌঁছান যায়, তাহার উপায় চিন্তা ও উপায় অবলম্বন ছাত্রছাত্রীরা করিতে পারেন।

আমাদের দেশের "উচ্চ" শ্রেণীর ও "নিম্ন" শ্রেণীর লোকদের, লিখনপঠনক্ষম ও নিরক্ষরদের মধ্যে যোগ ও ঘনিষ্ঠতার অল্পতা বা অভাবের "সুযোগে" ভারতশত্রুরা ভারতবর্ষের অনিষ্টচেষ্টা দীর্ঘকাল হইতে করিয়া আসিতেছে, এবং তাহারা চেষ্টা না করিলেও এরূপ অবস্থা স্বভাবতঃ অনিষ্টকর এবং ভারতবর্ষের দুর্ব্বলতার একটি কারণ; এই জন্য দরিদ্র, নিরক্ষর, ও শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকদের সহিত প্রীতি ও সেবা দ্বারা আত্মীয়তা স্থাপন একান্ত আবশ্যক।

লোকহিতের এইরূপ আরও নানা ক্ষেত্র ও উপায় রহিয়াছে। যাঁহারা হিতসাধন করিতে চান, তাঁহারা আত্মশুদ্ধি দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

—

নারীশিক্ষা-সমিতি

বালিকাদের ও প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের শিক্ষার জন্য বাংলা দেশে অনেকগুলি সমিতি কাজ করিতেছে। সকলগুলিই উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার যোগ্য। আমরা মাসের মধ্যে কেবল একবার নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে লিখি। এই জন্য যথাসময়ে সমুদয় সমিতি সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারি না। দৈনিক কাগজ হাতে থাকিলে এরূপ হইত না। বর্ত্তমানে নারীশিক্ষার জন্য যতগুলি পুরাতন সমিতি কাজ করিতেছে, নারীশিক্ষা-সমিতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু পুরাতন হইলেও ইহার উৎসাহ উদ্যম ও কার্য্যকারিতা কমে নাই। ইহার ১৯৩০-৩১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে দেখিতেছি, ১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই সমিতির চেষ্টায় চল্লিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ছয়টি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় চৌত্রিশটি চলিতেছে। বিধবাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর বাণীভবন দুইটি ছাত্রী লইয়া ১৯২২ সালে স্থাপিত হয়। ১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ্চ ছাত্রীসংখ্যা ছিল আটত্রিশটি। যাঁহারা শিক্ষালাভের পর চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সমেত ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ১২২টি ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ২৭৫টি ছাত্রীর ভর্ত্তি হইবার আবেদন তখন বিবেচনাধীন ছিল। সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থসাহায্য পাইলে নারীশিক্ষা-সমিতি ইঁহাদের সকলকেই ভর্ত্তি করিয়া লেখাপড়া এবং সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের কোন বৃত্তি শিক্ষা দিতে পারেন। বিদ্যাসাগর বাণীভবনে স্থান দিয়া চল্লিশটি ছাত্রীকে কুটীর-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন-পঞ্চাশ জন ছাত্রী প্রত্যহ বাড়ি হইতে আসিয়া কুটীর-শিল্প শিখিয়া যান। এই সমুদয় ছাত্রীদের প্রস্তুত সাত হাজার টাকার জিনিষ তিন বৎসরে বিক্রী হইয়াছে। নারীশিক্ষা-সমিতি অন্য কাজও করিয়া

থাকেন। মেয়েদের শিল্পকার্য্যের প্রদর্শনী প্রতি বৎসর হইয়া থাকে, এবং প্রসূতিমঙ্গল, শিশুমঙ্গল এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

এপর্য্যন্ত নারীশিক্ষা-সমিতির বিদ্যালয় সকলে চারি হাজারের উপর ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছে। নারীশিক্ষা-সমিতির উদ্দেশ্যাদি রিপোর্টে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

উদ্দেশ্য :—নারীশিক্ষা সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার এরূপ ব্যবস্থা করা যাহাতে বালিকারা সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে পারে; পুরস্ত্রী ও বিধবাগণ নিজ বাসগৃহকে শান্তির আলয় করিতে পারে; এবং প্রয়োজনমত শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী প্রভৃতির কাজের দ্বারা এবং শিল্পচর্চ্চার দ্বারা জীবনোপায় করিতে পারে।

বিভাগ :—এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নারীশিক্ষা-সমিতির কাজের তিনটি বিভাগ রহিয়াছে, শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা এবং আর্থিক উন্নতিসাধন।

বালিকা বিদ্যালয় :—শহরে ও গ্রামে বিশেষভাবে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা। বিশেষ বিবরণ সমিতির আপিসে পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন :—শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য এই নামে একটি বিধবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

এখানে হিন্দু আচারপদ্ধতি বজায় রাখিয়া বিনা খরচায় তিন বৎসর থাকিয়া যাবতীয় শিল্পকার্য্য ও মধ্য ইংরেজী পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া ট্রেনিং পড়িবার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পরবর্ত্তী বৎসরে ভর্ত্তি হইবার জন্য বাণীভবনের মুদ্রিত ফারমে নারীশিক্ষা-সমিতির সম্পাদিকার নিকট দরখাস্ত করিতে হয়।

—

বাংলা গবর্মেণ্টের অর্থাভাব

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অন্যায়মূলক মেস্টনী ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া এবং বাংলা গবর্মেণ্টকে যে বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের সামান্য অংশ মাত্র প্রাদেশিক ব্যয়ের জন্য রাখিতে দেওয়া হয়, এবং যথেষ্ট টাকা রাখিতে না দিলে যে বঙ্গের নৈরাশ্যজনক আর্থিক অবস্থা ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কারের পথে বাধা জন্মাইবে, ইত্যাদি কথা বলিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বাংলা দেশের প্রতি আর্থিক অবিচার বঙ্গের অনেক লাটসাহেব পর্য্যন্ত ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তাঁহারা একজনও যদি বলিতেন, যে, ইহার প্রতিকার না-হইলে পদত্যাগ করিবেন এবং প্রতিকার না-হওয়াতে পদত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত কিছু ফল হইত। বঙ্গের প্রতি সুবিচার লাভের অন্য এক রকম চেষ্টা, বঙ্গের প্রতি অবিচার সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে উদ্বুদ্ধ করা। তাহা করিতে হইলে বঙ্গের সব কাগজ ও সভাসমিতির এই বিষয়ে আন্দোলন করা উচিত। সেরূপ আন্দোলন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি থাকা দরকার। তাহা নাই। বঙ্গের লোক-সংখ্যা বোম্বাইয়ের আড়াইগুণ, অথচ প্রতিনিধির সংখ্যা সমান। আমরা যতদূর জানি, কেবল প্রবাসী ও মডার্ণ রিবিউ বার-বার এই অন্যায়ের প্রতিবাদ নানা যুক্তিতর্ক-সহকারে করিয়াছে, বাঙালীর বা অবাঙালীর অন্য কোন কাগজ তাহা করে নাই।

এই অবিচার ভবিষ্যৎ ফেডার্যাল বা রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও কিঞ্চিৎ ন্যূনভাবে স্থায়ী করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহা আমরা প্রবাসীতে দেখাইয়াছি। তাহার পর মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার বর্ত্তমান মার্চ্চ সংখ্যায় এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার এক এক খণ্ড চিঠিসহ আমাদের জানা বঙ্গদেশের সমুদয় দেশী ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে এবং অন্যান্য প্রদেশের সমুদয় দেশী ইংরেজী দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ও হিন্দী খবরের কাগজে পাঠাইয়াছি। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসংঘীয় ব্যবস্থাপক সভায় শুধু বঙ্গের প্রা... বঙ্গ, বিহার-উড়িষ্যা, আগ্রা-অযোধ্যা, এ... মান্দ্রাজের প্রতিও অবিচার হইবে—যদিও বঙ্গের প্রতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবিচার হইবে। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, এপর্য্যন্ত এবিষয়ের আলোচনা এই কাগজগুলির কোনটি করেন নাই।

কোন প্রদেশ হইতেই সব সময়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় খুব যোগ্য প্রতিনিধি না যাইতে পারেন; কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক সাধারণ যোগ্যতাবিশিষ্ট প্রতিনিধি গেলে প্রদেশের স্বার্থরক্ষা হয়। বঙ্গের যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি দীর্ঘকাল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নাই, ভবিষ্যতেও না-থাকিবার যে সম্ভাবনা হইয়াছে তাহা আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা অন্য সম্পাদকদের সাহায্য পাইতেছি না। আমাদের কাগজের উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বিষয়টির আলোচনা করিলে—এমন কি আমাদের ভ্রম হইয়া থাকিলে তাহা দেখাইয়া দিলেও—যথেষ্ট উপকার হইত।

বঙ্গে বন্যার স্থায়ী প্রতিকার

আর একটি বিষয়ে আমরা বঙ্গের দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলির সম্পাদকদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলাম, কিন্তু দুই-এক জন ছাড়া কাহারও সাহায্য পাই নাই। সকলেই জানেন, বঙ্গে মধ্যে মধ্যে ভীষণ বন্যায় অগণিত লোকের সম্পত্তি-নাশ এবং নানা দুঃখ ঘটিয়া থাকে। তখন সর্ব্বসাধারণ চাঁদা তুলিয়া বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বন্যার কোন স্থায়ী প্রতিকারের চেষ্টা হয় না। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মেঘনাথ সাহা, এফ্ আর এস্, ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিউতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও পারদর্শিতা এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার তাঁহার একমাত্র যোগ্যতা নহে। কয়েক বৎসর আগে যখন উত্তর-বঙ্গে বন্যায় অগণিত লোক বিপন্ন হয়, সাহায্যের কাজে তখন তিনি স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রধান সহকারী ছিলেন, এবং তিনি বন্যাপ্রপীড়িত অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁহার প্রবন্ধটি দ্বারা বন্যার স্থায়ী প্রতিকারের উপায়ের আলোচনাতে সম্পাদক মহাশয়েরা প্রবৃত্ত হন নাই [illegible] আমরা বাংলা দেশের আমাদের জানা সব দৈনিক ও সাপ্তাহিকে একটি চিঠি সহ মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেবলমাত্র একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক এই বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন এবং একটি বাংলা দৈনিক ডাঃ সাহার প্রবন্ধটির অনুবাদ দিয়াছেন। আর কেহ কিছু করিয়া থাকিলে সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতার জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

বিদেশী লবণের উপর শুল্ক

বিদেশ হইতে আমদানী লবণের উপর শুল্ক স্থাপন করায় বিশেষ করিয়া বাংলা দেশেরই যে অসুবিধা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদসূচক একটি প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছে। ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে কর্ত্তা বড়লাট। বাংলা দেশের উপর আধুনিক কোনো বড়লাটের যে নেকনজর ছিল বা আছে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বড়লাটকে কর্ত্তা বলিবার কারণ, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কোন শুল্ক না-মঞ্জুর করিলেও বড়লাট নিজের সার্টিফিকেটের জোরে তাহা বসাইতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা যে বাঙালী সভ্যদের অমতেও লবণ-শুল্ক ধার্য্য করিতে দিয়াছিলেন তাহার কারণ, যাহা কেবল বা প্রধানতঃ বঙ্গের অসুবিধাজনক তাহাতে অন্য প্রদেশের প্রতিনিধিদের প্রাণ কাঁদিবে কেন? বঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহার লোকসংখ্যার অনুযায়ী যথেষ্ট থাকিলে ভোটের জোরে বাঙালী প্রতিনিধিরা হয়ত কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন; কিন্তু বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের আড়াইগুণ হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী প্রতিনিধি আড়াইগুণ নহে—সমান সমান। ভবিষ্যতেও এই অবিচার থাকিবে এবং বাঙালীরা অরণ্যে রোদন করিতে থাকিবেন ও বাঙালী সম্পাদকেরা এই অবিচার সম্বন্ধে নির্ব্বাক থাকিবেন।

বিদেশী লবণের উপর শুল্ক ধার্য্য করাতে বাঙালীদেরই বেশী অসুবিধা কেন হইয়াছে তাহা বলিতেছি। বাংলা দেশের এক সীমানায় সমুদ্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বঙ্গে নুন তৈরি হয় না। তাহাতে বাঙালীর দোষ কতটা সে সব বিচার এখন করিব না। যদি বাংলা দেশে নুন তৈরি হইত, তাহা হইলে বিদেশী নুনের উপর ট্যাক্স বসায় বঙ্গীয় নুনের কাট্‌তি বাড়িয়া ঐ নুনের কারখানার সুবিধা হইত। কিন্তু বাঙালীর কোন নুনের কারখানা না থাকায় এ সুবিধা বাঙালী পায় নাই।

১৯৩১-এর মার্চ্চের মাঝখানে বিদেশী নুনের উপর ট্যাক্স বসে। তাহার পর হইতে মোটামুটি নয় মাসের একটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে। শুল্ক বসিবার আগে বঙ্গে বিদেশী নুনের দাম ছিল প্রতি ১০০ মণে চল্লিশ বিয়াল্লিশ টাকা; শুল্ক বসায় দাম বাড়িয়া ৬৪।৬৬ হইয়াছে। বেশীর ভাগ গরিব লোকেরাই এই অতিরিক্ত টাকাটা দিতেছে। নয় মাসে শুল্ক বাবতে বঙ্গদেশ ১৬ লক্ষ টাকা দিয়াছে। কথা ছিল, সংগৃহীত শুল্কের অষ্টমাংশ ভারত গবন্মেণ্ট পাইবেন, বাকী রকম চৌদ্দ আনা প্রাদেশিক গবন্মেণ্টরা পাইবে। সে হিসাবে যে-প্রদেশ হইতে যত শুল্ক আদায় হইয়াছে, তাহার সাত-অষ্টমাংশ (অর্থাৎ রকম-চৌদ্দ আনা)

সেই প্রদেশের পাওয়া উচিত ছিল। বঙ্গের পাওয়া উচিত ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাংলা গবন্মেণ্ট পাইয়াছেন মোটে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। ইহা কম এবং অন্যায় হইলেও এই টাকাটা বাঙালীদের ফুনের কারখানা স্থাপনে বা বঙ্গের অন্যবিধ দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইলে সুবিচার হইত। কিন্তু বাংলা গবন্মেণ্ট কিসে এই সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ করিবেন, জানা যায় নাই।

—

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী

অসহযোগ আন্দোলনের জন্য বিস্তর ভদ্র লোক ও ভদ্র মহিলা জেলে গিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর জানা না থাকিলেও, দেশের খবর যাঁহারা বিন্দুমাত্রও রাখেন এরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটদের এই সমুদয় বন্দীদিগকে ন্যূনকল্পে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থাপন করা উচিত ছিল (এবং যাঁহারা দেশের খবর জানেন না তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজের অযোগ্য)। কিন্তু যাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীতে ফেলা উচিত এমন বিস্তর বন্দীকে তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাকী সকলকেই ত ফেলা উচিত, তাঁহাদিগকেও তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। দমদমার দুটা জেলে শুনিতে পাই হাজার দুই এরূপ কয়েদী আছেন। এই সব কয়েদীকে সুস্থ রাখিতে সরকার বাধ্য। কিন্তু সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, জেল কোড অনুসারে প্রাপ্য তাঁহাদের খাদ্যও তাঁহারা পান না। কাপড়-চোপড় শরীর পরিষ্কার রাখিতে তাঁহারা বাধ্য, অথচ তাঁহাদিগকে সাবান দেওয়া হয় না, গায়ে মাখিবার সরিষার তেল দেওয়া হয় না। ভদ্রসন্তানদের জুতা পরা অভ্যাস, অথচ তাঁহাদের নিজের জুতা তাঁহাদিগকে পরিতে দেওয়া হয় না; নিজেদের কাপড় পরিতেও দেওয়া হয় না—আগেকার বারের অসহযোগ আন্দোলনের কয়েদীদিগকে নিজের জুতা ও কাপড় পরিতে দেওয়া হইত। তাহাতে গবন্মেণ্টের খরচ কম হইত। জেলের পরিচ্ছদে ভদ্রলোকদের শ্লীলতা রক্ষা হয় না। পরিচ্ছদের স্বল্পতা দ্বারা গবন্মেণ্ট যদি তাঁহাদিগকে মহাত্মা গান্ধীতে পরিণত করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে খাট জাঙ্গিয়া না দিয়া ছোট ধুতি দিতে পারেন। গবন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে জেলে বদ্ধ রাখিতে পারেন, পরিশ্রম করাইতে পারেন—কিন্তু লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিয়া কি লাভ? যাঁহারা আন্দোলন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা ইহাতে নিরস্ত হইবেন মনে করা ভুল। দমদমার জেলের হাসপাতালের ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত সন্তোষকর নহে।

যে-সব ভদ্র মহিলা জেলে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কয়েদীর পোষাক পরিতে বাধ্য করা আরও অন্যায়। বাঙালীর মেয়েরা খুব গরিব হইলেও ওরকম অভব্য পরিচ্ছদ পরেন না। তাঁহাদিগকে নিজের শাড়ী পরিতে কেন দেওয়া হয় না? তাহাতে গবন্মেণ্টের ব্যয় হ্রাস ভিন্ন ব্যয় বৃদ্ধি হইবে না।

—

বিপ্লবপ্রয়াস দমনার্থ নূতন আইন

গত বৎসর বঙ্গে বিপ্লবপ্রয়াস দমনের অভিপ্রায়ে বর্লিন গবন্মেণ্ট যে অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছিলেন, তাহার মিয়াদ এপ্রিলের ২৮শে শেষ হইবে। বঙ্গ বাংলা গবন্মেণ্ট সময় থাকিতে তাহা কঠোরতর করিয়া স্থায়ী আইনে পরিণত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আইনটা এক বৎসরের জন্য করিতে বলিয়াছিলেন। আরও কেহ কেহ অন্যান্য সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সবই অগ্রাহ্য হইয়া সরকারী অভিপ্রায় অনুযায়ী বিল আইনে পরিণত হইয়াছে।

যাহাকে বিপ্লবপ্রয়াস বলা হইতেছে, তাহার বিনাশ ও বিলোপ আমরাও চাই; কিন্তু কঠোর আইন দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ইংরেজীতে যাহাকে রিভলুশন বলে, বাংলায় তাহাকে বিপ্লব বলা হয়। ইংরেজী রিভলুশন কথাটির রাজনৈতিক মানে মোটামুটি দু-রকম। এক—"forcible substitution by subjects of new polity for the old"; ইহা আমরা চাই না। কিন্তু ইহার চেষ্টা বন্ধ করিতে হইলে অন্য অর্থে রিভলুশন দরকার। সে অর্থ, গণতন্ত্রের দিকে "complete change, fundamental reconstruction"। তাহার আয়োজন ত গবন্মেণ্ট করিতেছেন না।

—

বেথুন কলেজে অশান্তি

এত বড় বাংলা দেশে মেয়েদের বি-এ পর্য্যন্ত পড়িবার সরকারী কলেজ আছে মোটে একটি। হরতালে যোগ দেওয়া বা তদ্রূপ কারণে সেই বেথুন কলেজ হইতে অনেক ছাত্রীকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এখন আবার ট্রান্স্‌ফার চাহিলে তাহাদিগকে বলা হইতেছে, যে, তাহারা মাফ না চাহিলে ট্রান্স্‌ফার দেওয়া হইবে না। ইহা নিতান্ত বাড়াবাড়ি। গবর্ন্মেণ্ট যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কংগ্রেসকে পিষিয়া ফেলিবেন, বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়াও কি সেইরূপ কোন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন? সরকারী ছেলেদের কলেজে এখন ত এরূপ কিছু জেদ দেখিতেছি না। ছাত্রীরা কোন নিয়মই মানিবে না, বলিতেছি না। কিন্তু কড়া হাকিম হইয়া প্রীতির দ্বারা তাহাদিগকে ঠিক্ পথে চালান

—

বঙ্গে বিদেশী জুতার কারখানা

বাঙালী মুচিদের অন্ন মারিয়াছিল প্রথমে চীনা মুচি ও পশ্চিমা মুচিরা। তারপর সস্তা জাপানী জুতার আমদানীতে তাহাদের অন্ন আরও মারা গিয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালে জাপানী জুতা ভারতবর্ষে ১৯,১৫,০০০ জোড়া আমদানী হয়, ১৯৩০-৩১ সালে হয় ১,০৯,২১,০০০ জোড়া। এখন চেকোস্লোভাকিয়ার বিখ্যাত জুতার কারখানার মালিক মিঃ টমাস বাটা বাংলা দেশে কলিকাতার কাছে খুব বড় একটা জুতার কারখানা স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন। একে ত বাঙালীরা দীর্ঘকাল হইতে ব্যবসাতে বুদ্ধি ও টাকা কম খাটাইতেছিলেন, তাহার উপর মুচির কাজটা জাতি-ভেদের কৃপায় নিরক্ষর অবজ্ঞাত লোকদের কাজ বলিয়া উহাতে বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত শ্রেণীর খুব অল্প লোকেই মন দিয়াছেন। সুতরাং জুতার ব্যবসায়ের মত এত বড় একটা ব্যবসা যে বিদেশীদের হস্তগত হইতে যাইতেছে তাহা দুঃখের বিষয় হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা বাল্যকালে যত লোককে জুতা ব্যবহার করিতে দেখিতাম এখন তার চেয়ে অনেক বেশী লোককে জুতা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। জুতার কাট্‌তি এখনও খুব বাড়িবে। সুতরাং দেশী লোকদেরই অনেক জুতার কারখানা হইতে পারে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয়

সকল গবর্ন্মেণ্টের এবং নানা ব্যবসায়ের যেমন অর্থাগম কম হইতেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাগমও সেইরূপ কিছুকাল হইতে কমিয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট তিনটি সর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাৎসরিক ৩,৬০,০০০ টাকা দিতে চাহিয়াছেন—(১) বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কার কমিটির কোন কোন প্রস্তাব আপাততঃ কার্য্যে পরিণত না-করা, (২) পরীক্ষার ফী বাড়াইয়া অতিরিক্ত ত্রিশ হাজার টাকা তোলা, (৩) ফী বাবদে মোট ১১,৭২,০০০ টাকা সংগ্রহ করা। বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কার কমিটির প্রস্তাবগুলি আমরা দেখিতে পাই নাই। সুতরাং সরকারী প্রথম সর্ত্তটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিতেছি না। দেশের এই দুর্দ্দিনে, যখন প্রায় সকলের আয় কমিয়াছে, তখন পরীক্ষার ফী বাড়ান অসঙ্গত হইবে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িলে ফী হইতে সংগৃহীত মোট টাকা বাড়িত। কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমায় ফী হইতে আয় ৬০,০০০ টাকা কমিয়াছে। তদ্ভিন্ন, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর দেয় ফীর পরিমাণ বাড়াইলেই যে ফী হইতে প্রাপ্ত মোট টাকা বাড়িবে, এমন আশা করা ভুল। ফী বেশী বাড়িলে অনেক গরিব ছাত্র হয়ত পরীক্ষা দিতেই পারিবে না—যেমন ডাকমাশুল বাড়াইয়া দেওয়ায় অনেকে চিঠি কম লিখিতেছে, অনেকে মোটেই লিখিতেছে না। এই জন্য আমাদের বিবেচনায় ফী-সম্বন্ধীয় সর্ত্ত দুটি গবর্ন্মেণ্ট না করিলে ভাল করিতেন।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

চীনে ও জাপানে যুদ্ধ থামিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। জাপান সমুদয় চীন গ্রাস করিতে চায়, এবং মাঞ্চুরিয়াকে চীন-সাধারণতন্ত্রের অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক করিয়া তাহার মাথায় ভূতপূর্ব্ব চীন-সম্রাটকে সাক্ষী-গোপাল রূপে স্থাপন করিতে চায়। কিন্তু ভারতবর্ষ দখল করিয়া নির্ব্বিবাদে ইহার প্রভু থাকা ব্রিটেনের পক্ষে যত সহজ হইয়াছে, চীন দখল করিয়া তাহার প্রভু থাকা জাপানের পক্ষে তত সোজা হইবে না।

রুশিয়ার সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে; কারণ জাপান সাইবীরিয়া দখল করিতে চায়। জাপানের দুষ্ট ক্ষুধা জন্মিয়াছে।

—

ব্রহ্মদেশকে পৃথক্ করা

ব্রহ্মদেশের সকলের চেয়ে বড় জনসভাগুলি বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় তথাকার জনমত যথাকালে ভাল করিয়া প্রকাশ পায় নাই। এখন ঐ সভাগুলি আর বে-আইনী নাই। এখন তাহাদের মত প্রকাশ পাইতেছে। এখন বুঝা যাইতেছে, যে, ভিক্ষু উত্তম যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক। ব্রহ্মদেশীয়দের মধ্যে এক দল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, আর এক দল চায় ব্রিটিশ ডোমীনিয়নগুলির মত দায়িত্বমূলক গবর্মেণ্ট। ইহারা কেহই ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার অনুযায়ী ব্রিটিশ গবর্ণরের অধীনতাপাশে বদ্ধ গবর্মেণ্ট চায় না। যে-সব ব্রহ্মদেশীয় নেতা ভারতবর্ষ হইতে স্বাতন্ত্র্য এই আশায় চাহিয়াছিল, যে, ব্রহ্মের লোকেরা স্বশাসক হইবে, তাহারাও এখন ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা সামান্য কি দিতে চায় বুঝিতে পারিয়াছে; সুতরাং তাহাদের অনেকেরই ভুল ভাঙিয়াছে।

—

কাশ্মীরের হিন্দুদের নিদারুণ দুঃখ

পাটনা হইতে খবর আসিয়াছে, সেখানকার হিন্দুরা কাশ্মীরের অত্যাচরিত হিন্দুদের সহিত সহানুভূতি জানাইবার জন্য প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তথাকার গবর্মেণ্ট তাহা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে মুসলমানেরা "কাশ্মীর-দিবসে" সভা ও মিছিল করিয়াছিল এবং কাশ্মীরের মহারাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও কুৎসা প্রচার করিয়াছিল, গবর্মেণ্ট তাহাতে বাধা দেন নাই।

—

"অনুন্নত" শ্রেণী ও পৃথক্ নির্ব্বাচন

ডাঃ আম্বেদকর নিজেকে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের "অনুন্নত" হিন্দুদের প্রতিনিধি বলিয়া বিলাতে আপনাকে প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহারা অন্য হিন্দুদের হইতে পৃথক প্রতিনিধি পৃথক নির্ব্বাচন দ্বারা পাইতে চায়। এখন দেখা যাইতেছে, "অনুন্নত" হিন্দুদের অধিকাংশ সভা সমিতি ও প্রতিষ্ঠান অন্য হিন্দুদের সহিত সম্মিলিত নির্ব্বাচন চায়। এ বিষয়ে ডাঃ মুঞ্জে এবং "অনুন্নত" হিন্দুদের অন্যতম নেতা মিঃ এম সি রাজার সহিত এই চুক্তি হইয়াছে, যে, নির্ব্বাচন সম্মিলিতই হইবে, কিন্তু কতকগুলি প্রতিনিধির পদ "অনুন্নত" সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা করিয়া সংরক্ষিত থাকিবে। এই চুক্তি আম্বেদকরী দলের দাবি অপেক্ষা ভাল। কিন্তু ইহাও নির্দ্দোষ নহে। "অনুন্নত"দের অনেকে সম্মিলিত নির্ব্বাচন এবং সাবালক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটদানাধিকার পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ইহাই শ্রেষ্ঠ মীমাংসা।

হিন্দুদের কোন্ কোন্ জা'ত যে "অস্পৃশ্য", "অনাচরণীয়", "অবনত" বা "অনুন্নত" তাহা স্থির করা কঠিন, এবং যাহারা হয়ত আগে ঐরূপ কোন-না-কোন পদবাচ্য ছিল এখন তাহা নহে। ভবিষ্যৎ ঐরূপ কোন পদবাচ্য বলিয়া আপনাদিগকে স্বীকার করিবার অপমান যাহারা স্বেচ্ছায় মাথা পাতিয়া লইবে, তাহারাই সংরক্ষিত স্বতন্ত্র প্রতিনিধি পাইবে। তাহারা এবং অন্য হিন্দুরা, যে, দীর্ঘকাল ... "অস্পৃশ্যতা" প্রভৃতি দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই চেষ্টার সফলতা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দ্বারা যেমন বাধা পাইবে, সংরক্ষিত পৃথক প্রতিনিধির সম্মিলিত নির্ব্বাচন দ্বারাও সেইরূপ বাধা পাইবে।

কোন্ কোন্ জা'ত "অবনত" (depressed), তাহার তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার নিশ্চয়ই পড়িবে সরকারী লোকদের হাতে। তাহারা স্বভাবতঃ যত বেশী জা'তকে পারে এই তালিকাভুক্ত করিয়া অন্য হিন্দুদের থেকে পৃথক করিতে চাহিবে। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। ১৯২১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, যে, এরূপ কোন চূড়ান্ত তালিকা করা যায় না; সাইমন কমিশন রিপোর্টেও ঐরূপ কথা বলা হইয়াছে। ১৯০১ সালের ভারতীয় সেন্সস রিপোর্টের পরিশিষ্টে রিস্‌লী ও গেট সাহেব ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করেন। বাংলা দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের তালিকার তাৎপর্য্য দিতেছি। বঙ্গীয় হিন্দুদিগকে তাঁহারা সাতটি শ্রেণীতে

ভাগ করিয়াছিলেন। জা'তের নাম ইংরেজীতে তাঁহাদের তালিকায় যেমন আছে, সেইরূপ দিলাম। প্রথম শ্রেণী—ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় শ্রেণী ("castes ranking above clean Sudras", "শুদ্ধ শূদ্রদের উপরিস্থিত জা'ত সকল")—বৈদ্য, কায়স্থ, খত্রী, রাজপুত, উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরী। তৃতীয় শ্রেণী ("clean Sudras", "শুদ্ধ শূদ্রগণ")—বারুই, গন্ধবণিক, কামার, মালাকর, ময়রা বা মোদক, নাপিত, রাজু, সদ্‌গোপ, তামলি বা তাম্বুলী, তাঁতী, তেলী ও তিলি, অন্যান্য। চতুর্থ শ্রেণী ("clean castes with degraded Brahmans," "অবনত ব্রাহ্মণ-পুরোহিতবিশিষ্ট শুদ্ধ শূদ্র")—চাষী কৈবর্ত্ত, গোয়ালা বা আহীর। পঞ্চম শ্রেণী ("castes whose water is not taken," "যে সব জা'তের জল গৃহীত হয় না")—ভুঁইয়া, যুগী ও যোগী, শাহা (শুঁড়ী), স্বর্ণকার বা সোনার, সুবর্ণ-বণিক্, সূত্রধার, অন্যান্য। ষষ্ঠ শ্রেণী ("Low castes abstaining from beef, pork and fowls," "যে-সব নীচ জা'ত গোমাংস শূকরমাংস ও মুরগী খায় না")—বাগদী, চৈন,ধোবা, জালিয়া কৈবর্ত্ত, কলু, কপালী, কোটাল, মালো (ঝালো), নমঃশূদ্র (চণ্ডাল), পাটনী, পোদ, রাজবংশী, টিপারা, তিয়ার, অন্যান্য। সপ্তম শ্রেণী "unclean feeders," "অপবিত্র দ্রব্য ভোজী")—বাউরী, চামার, কাওরা, কোড়া, মাল, মুচী, অন্যান্য। এই সাত শ্রেণী ছাড়া ডোম ও হাড়িদিগকে "ময়লা-পরিষ্কারক" (scavengers) নাম দিয়া শেষে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঐ বিষয়ে কিছু বলিবার আগে আমরা জানাইতেছি যে,এই শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ—বন্ধনীর মধ্যে যাহা আছে তাহাও—সম্পূর্ণরূপে রিস্‌লী ও গেটের; আমরা উহার জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নহি এবং উহা পচ্ছন্দও করি না।

যে-সব জা'তের নাম ও শ্রেণীবন্ধন করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহাদিগকে "অস্পৃশ্য" "অবনত" ইত্যাদি বলা হইবে? তাহারা কি আপনাদিগকে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় বলিয়া স্বীকার করিবে? বৈশ্য শাহাদের নাম তালিকায় নাই। তাহারা কোন্ শ্রেণীর? যে-সব জা'তকে "অবনত" ইত্যাদি বলিয়া ধরা হইবে, তাহাদের কোন এক জা'তের কোন লোক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে তিনি কি অন্য জা'তদের দ্বারাও প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকৃত হইবেন? যদি এরূপ প্রত্যেক জা'তকে আলাদা আলাদা প্রতিনিধি দিতে হয়, তাহা হইলে কোন্ কোন্ জা'তকে দিতে হইবে, এবং তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে বা অন্য কোন কিছু অনুসারে কাহাকে কতজন প্রতিনিধি দিতে হইবে? প্রতিনিধি পাইবার লোভে তাহারা কি চিরকাল "অনাচরণীয়" "অবনত" ইত্যাদি অপমানকর আখ্যা ধারণ করিবে?

বাংলা দেশের তথাকথিত অনেক "অস্পৃশ্য" জা'তের নেতারা এবং সভা সমিতি প্রকাশ্যভাবে জানাইয়াছেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বা স্বতন্ত্র প্রতিনিধি চান না। দুঃখের বিষয়, যদিও অন্যান্য প্রদেশের এই রকমের খবর ভারতবর্ষের সব প্রদেশের কাগজে বাহির হইতেছে, কিন্তু বঙ্গের এই সব খবর ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশের কাগজে বাহির হয় না—হয়ত তাহাদিগকে পাঠাইবার উদ্যমও বাংলা দেশে নাই।

পণ্ডিত মালবীয় কর্ত্তৃক মন্ত্রদীক্ষা দান

খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, পণ্ডিত মদন-মোহন মালবীয় কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে অন্য সব হিন্দুর সহিত "অস্পৃশ্য" হিন্দুদিগকেও মন্ত্রদীক্ষা দিতেছেন, তাহাদিগকে মুদ্রিত ধর্ম্মোপদেশ-পত্রী দিতেছেন, এবং কথকতা করিতেছেন। এই প্রকারে তিনি অনেক "অশুদ্ধকে" শুদ্ধ করিতেছেন। তিনি শুধু নামে পণ্ডিত নহেন, বাস্তবিক নানা শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁহার আছে এবং উপদেশ দিবার যোগ্যতাও তাঁহার আছে। কিন্তু তিনি যে-সব তথাকথিত "অনাচরণীয়" ব্যক্তিকে দীক্ষা দিয়া 'শিষ্য' ও "শুদ্ধ" করিতেছেন, তাহারা এক গেলাস জল তাঁহাকে দিলে তিনি তাহা পান করিবেন না। তখন তাহারা বুঝিবে, এই "শুদ্ধি" মৌখিক ও শাব্দিক, বাস্তবিক নহে। অতএব পণ্ডিতজীকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে।

যাত্রার দলের সাজপোষাক

আমরা অবগত হইলাম, কাঁথি অঞ্চলে কোন কোন যাত্রার দল বিদেশী জিনিষের সাজপোষাকে যাত্রা করিলে দর্শক ও শ্রোতা জুটিবে না বলিয়া সম্পূর্ণ দেশী জিনিষের সাজপোষাক ব্যবহার করিতেছে। কাঁথি অঞ্চলের লোকদের এবং ঐ সব যাত্রার দলের লোকদের স্বদেশানুরাগ প্রশংসনীয়।

শারদা আইন বাতিল করিবার ব্যর্থ চেষ্টা

রাজপুতানার রায়-সাহেব হরবিলাস শারদা মহাশয়ের চেষ্টায় যে বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন প্রণীত হইয়াছে, খোকাখুকীর বিবাহের পক্ষপাতী ব্যক্তিরা তাহা রদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের অন্যতম সদস্য রাজা রঘুনন্দন প্রসাদের এইরূপ অশুভ চেষ্টা অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদিত না-হওয়ায় ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভাতে কেহ এরূপ দুশ্চেষ্টা করিলে তাহাও ব্যর্থ হওয়া উচিত।

"বিড়াল ও ইঁদুর মুক্তি"

অনেক সত্যাগ্রহীকে জেল হইতে এই বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, যে, তাঁহারা যেন আর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ না-দেন, যেন রোজ থানায় হাজরা

দেন, ইত্যাদি। কিন্তু মুক্তির পর তাঁহারা তাহা না করায় তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী করিয়া শাস্তি দেওয়া হইতেছে।

এইরূপ মুক্তিদান প্রথমে বোম্বাইয়ে আরম্ভ হয়, এখন বঙ্গেও চলিতেছে। দেশী ইংরেজী খবরের কাগজে পর্য্যন্ত এইরূপ মুক্তিদানকে প্যারোল (parole) শিরোনামা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু প্যারোলের মানে সম্পাদকেরা নিশ্চয়ই জানেন। ওয়েবষ্টারে উহার মানে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—"Promise of a prisoner of war upon his faith and honour to fulfil stated conditions,·········in consideration of special privileges, usually release from captivity." কিন্তু যে-সব দেশভক্ত নেতাকে ছাড়িয়া দিয়া সরকারী কর্ম্মচারীরা নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত ভঙ্গের অপরাধে আবার গ্রেপ্তার করিয়া অধিকতর শাস্তি দিতেছেন, তাঁহারা ত সেরূপ সর্ত্তে খালাস চান নাই এবং সর্ত্ত মানিবার কোন অঙ্গীকারও করেন নাই। সুতরাং প্যারোল কথাটার ব্যবহার অনুচিত। যে-সব সরকারী কর্ম্মচারী সত্যাগ্রহীদিগকে খালাস দিয়া এই উপায়ে আবার ধরিতেছেন এবং লোকের কাছে হয়ত এইরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া সত্যচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদের আচরণও নিন্দনীয়।

বিলাতী একটা আইন অনুসারে জেলের প্রায়োপবেশকদিগকে (hungerstrikersদিগকে) অল্পদিনের জন্য খালাস দিয়া আবার ধরা হইত। বিড়াল যেমন খেলার ছলে পুনঃ পুনঃ ইঁদুরকে ছাড়িয়া দিয়া আবার ধরে, ইহা তাহার মত বলিয়া ঐ আইনকে বিলাতে ইংরেজীতে "বিড়াল ও ইঁদুর আইন" (Cat and Mouse Act) বলে। এদেশে যে তথাকথিত প্যারোল দেওয়া হইতেছে, তাহাকে "বিড়াল ও ইঁদুর মুক্তি" (Cat and Mouse Release) বলিলে অন্যায় হয় না।

—

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের শাস্তি

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় ত্রিশ জন যুবক অভিযুক্ত ছিল। তাহার মধ্যে বার জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি এবং অন্য দু-জনের যথাক্রমে তিন ও দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। আদালত বাকী ষোল জনকে খালাস দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে।

সম্প্রতি তরুণবয়স্ক পুরুষ ও নারী অনেকগুলির যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকালের জন্য স্বাধীনতা-লোপের শাস্তি হইয়াছে। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সভ্য দেশের গবন্মেণ্ট। এই সব শাস্তিদানের উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নহে, সংশোধন উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহারা জানেন। এইজন্য জানিতে কৌতূহল হয়, এই যে শিক্ষিত শ্রেণীর বন্দীদের দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, সেই জীবন উন্নততর করিবার কি বন্দোবস্ত সরকারী জেল-বিভাগে আছে?

—

"ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা"

বিনা বিচারে বিস্তর লোককে আটক করিয়া রাখিবার সপক্ষে কর্ত্তৃপক্ষ মধ্যে মধ্যে বলেন, ইহাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, কিন্তু বিপ্লবীদের ভয়ে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিবে না বলিয়া ইহাদের প্রকাশ্য বিচার করা হয় না, ইত্যাদি। কিন্তু যে-জাতীয় অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিনা-বিচারে লোকগুলিকে বন্দী রাখা হয়, সেইরূপ অনেক অপরাধীর প্রকাশ্য বিচার হইয়া আসিতেছে, সাক্ষীও জুটিতেছে এবং শাস্তিও হইতেছে। অতএব কর্ত্তাদের এই কৈফিয়ৎটা সন্তোষজনক নহে।

তা ছাড়া, দীর্ঘকাল কারাবাসের পর যাহারা খালাস পায়, খালাস পাইবামাত্র এরূপ লোককে আবার কেন বিনা-বিচারে বন্দী করা হয়? তাহাদের অপরাধের শাস্তি ত তাহারা পাইয়া চুকিয়াছে। জেলে বসিয়া তাহারা ত আর কোন নূতন ষড়যন্ত্র বা গুরুতর অপরাধ করে নাই।

আবার, যাহারা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মোকদ্দমার বিচারের ন্যায় দীর্ঘ বিচারের ও দীর্ঘকাল হাজত বাসের পর তাহাদের বিরুদ্ধে সর্ববিধ প্রমাণ-প্রয়োগ সত্ত্বেও খালাস পায়, তাহারা [illegible] কোন্ অপরাধে বিনা বিচারে বন্দী হয়?

সাণ্ডার্ল্যাণ্ড-জয়ন্তী

বিখ্যাত আমেরিকান ভারতবন্ধু সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের নব্বই বৎসর বয়ঃক্রম গত ১১ই ফেব্রুয়ারী পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার বন্ধুগণ আমেরিকায় উৎসব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে সশ্রদ্ধ [illegible] জানাইয়াছেন।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নূতন আবিষ্কার

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা এক প্রকার নূতন রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার দ্বারা [illegible] গঠন নিরূপণে সাহায্য হইবে।

—

দেশপতি ডি ভ্যালেরা

আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের নূতন পার্লেমেণ্ট নির্ব্বাচনে সাধারণতন্ত্র দলের প্রতিনিধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায় তাঁহাদের নেতা মিঃ ডি ভ্যালেরা প্রেসিডেণ্ট বা দেশপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।